শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

মাসিক পত্র

সপ্তম খণ্ড

(সন ১৩২২ সালের কার্ত্তিক হইতে ১৩২৩ সালের আশ্বিন পর্য্যন্ত)

ইণ্ডিয়া প্রেস—২৪ নং মিডিল রোড, ইটালি, কলিকাতা হইতে
শ্রীক্ষেত্রনাথ বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচি

১। আলোচনা

প্রবন্ধ

মফস্বলের বাণী

অমৃতবাজার পত্রিকার
ভূতপূর্ব্ব সহযোগী সম্পাদক
স্বর্গীয় মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যা

"বামভাগে যে মহাদেশ দৃষ্ট হইতেছে উহা অতি পুণ্যভূমি। এই দেশ সিন্ধু গঙ্গাসঙ্গমজাত। ইহা মহামুনি কপিলদেবের তপস্যা-ক্ষেত্র·········সাঙ্খ্যসূত্র প্রণেতা কপিলদেব অন্য সকল দেশ ত্যাগ করিয়া এই দেশে আসিয়া বসতি করেন, তাঁহারই অংশাবতারগণ ন্যায়দর্শন ব্যাখ্যার যথোপযুক্ত স্থান বুঝিয়া এই দেশে অবতীর্ণ হয়েন এবং প্রীতিপীযূষপূর্ণ গোবিন্দগীতিও এই দেশে সংগীত হয়।······ চতুর্থ যুগের প্রকৃত বেদশাস্ত্র এই দেশেই প্রকাশিত হইয়াছে। এই দেশ পরম পবিত্র বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের—সূক্ষ্মানুসন্ধায়ী তার্কিকবর্গের—এবং প্রকৃত জ্ঞান-মার্গাবলম্বী শক্তিসমুপাসকদিগের প্রসূতি। এখানকার লোকেরা কলিকালেও দেবভাষায় প্রায় সমগ্ররূপেই অধিকারী হইয়া আছে।

ফল কথা, সত্যযুগে সরস্বতী-সন্তান ব্রহ্মর্ষিগণ যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন এই যুগে ভাগীরথী-সন্তানদিগের প্রতিও সেই কার্য্যের ভার সমর্পিত রহিয়াছে। ইহাঁদিগেরই দেশে পূর্ব্ব পিতৃগণের পুনরুদ্ধার সাধিত হইবে।"

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় ("পুষ্পাঞ্জলি")

সপ্তম খণ্ড
সপ্তম বর্ষ

কার্ত্তিক, ১৩২২

প্রথম সংখ্যা।

আলোচনা

১। বিজয়াদশমী

বাঙ্গালায় কয়েক দিনের জন্য হাসি ফুটিয়াছিল। ক্ষুধা, রোগ এবং মৃত্যুর কশাঘাত বাঙ্গালী এই কয়টা দিন ভুলিয়া গিয়াছিল। শারদকৌমুদীবিধৌত রজনীতে পূজার আরতির বাদ্য তাহার প্রাণে এক অপূর্ব্ব আনন্দ জাগাইয়া তুলিয়াছিল। পূজার তিন দিনের "দীয়তাং" "ভুজ্যতাং" রব, ঢাকঢোল, সানাই, কাঁশর, ঘণ্টার ধ্বনি বঙ্গের নিরানন্দ পল্লী হর্ষকোলাহলে মুখরিত করিয়াছিল। বাঙ্গালী এই কয়টা দিন জন্মভূমির সত্তা অনুভব করিতে পারে। তাহার প্রাণ পূজায়

আগেই পিতৃপিতামহের স্মৃতিমণ্ডিত পল্লী-ভবনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। বঙ্গভূমি বাস্তবিকই যে আমাদের "সকল সহা, সকল বহা স্নেহময়ী মা"—এই প্রাণমাতান, প্রাণ-ছাপানো চিরমধুর, চির-সরস সত্যটী হৃদয়-ভরিয়া বুঝিবার সুযোগ এই মহাপূজার কয়দিন। প্রকৃতির শুভ্রহাস্য শারদজ্যোৎস্নায়, কুমুদকহ্লারের, কমলশেফালিকার অনিন্দ্য-শোভায় উছলিয়া পড়িতেছে। শুচি-স্নাত ঋত্বিককুলের বোধন, পূজা আরতির ভিতর দিয়া দেশের সনাতন ভক্তির স্রোত সহস্রধারায় অসংখ্য হৃদয় উদ্বেল করিয়া ছুটিয়াছে। উপেক্ষিত পল্লী আবার জন-সমাগমে আনন্দকলরবে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। অভাব ও বিলাসে হিন্দুর রুদ্ধ-প্রায় হৃদয় আবার জননীর স্নেহস্পর্শে সঙ্কীর্ণতা ভুলিয়া, হীন স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া পূজার আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দু নিঃস্বার্থ ভাবের উপাসনায়, বহুপ্রসারী প্রেমের দীক্ষায় হৃদয় খুলিয়া দিয়াছে। হিন্দু মায়ের সন্তান, মায়ের সাধক, মা নামে মাতোয়ারা। বঙ্কিমচন্দ্র এই সারা বাঙ্গালা জোড়া ভাবের মহিমা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব 'দুর্গোৎসব' লিখিয়াছিলেন। প্রাণ খুলিয়া ভাবের সাগরে ডুব দিয়া বুঝিবার চেষ্টা কর, বাঙ্গালী, দুর্গোৎসবে মাতৃপূজার সন্ধান পাইবে। বরাভয়-প্রদায়িনী, অশুভ-সংহা-রিণী, চির কল্যাণময়ী জননী আমাদের পূর্ব্ব-পিতৃগণের বরণীয়া মাতৃভূমি, বহু শোভা ও শস্য-সম্ভার বুকে লইয়া তিনি যে আমাদেরও মা, তাঁহার অসীম, অনন্ত মাতৃস্নেহ যে সুপুত্র কুপুত্র নির্ব্বিচারে তাঁহার বহুকোটী সন্তানের উপর অজস্রধারায় বর্ষিত হইতেছে এ কথা আমা-দের কাছে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে। দুর্গোৎসব যথার্থই এক বিরাট জাতীয় উৎসব। এমন করিয়া সব ভুলাইয়া, প্রাণ মাতাইয়া যে উৎসব জাতির হৃদয় সরসতায়, নবীনতায় সজীব এবং সুন্দর করিয়া তোলে তাহার ঐশ্বর্য্য ও মহিমা স্বতঃই হিন্দুর কাছে সত্য এবং সুস্পষ্ট।

তাহার পর বিজয়াদশমী। ইহা "বিজয়ের" উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া "বিজয়া"। শক্তি-মত্তার আত্মপ্রসাদ, জয়ের উল্লাস, চরিতার্থ-তার আনন্দ দেশ মাতাইয়া তুলিয়াছে, নিখিল হিন্দুজাতিকে আন্দোলিত করিয়াছে। এই বিজয় গর্ব্বের, এই আনন্দের মহামিলন—বিজয়া। হিন্দুর প্রত্যেক ব্যষ্টি সে দিন এক বিরাট অখণ্ড সমষ্টির অবিভাজ্য-অংশ। উচ্চ-নীচ, ব্রাহ্মণ শূদ্র, ধনী নির্ধন, সুহৃৎ শত্রু, আত্মীয় অপরিচিত সেদিন তাহার নিবিড় সৌভ্রাত্রের, সর্ব্বপ্লাবী প্রেমের আলিঙ্গনে আবদ্ধ। এমন প্রাণ খোলা আশীর্ব্বাদ, বুক ভরা কোলাকুলি, এমন বিনয়পূর্ণ প্রণাম নমস্কার, এমন মিষ্টকথা, মিষ্টমুখ, মিষ্টপ্রাণ যে মহোৎসবের দান, অমর হউক সে উৎসব, অক্ষয় হউক তাহার শক্তি। হিন্দু তাহার জাতির সার্ব্বভৌম ঐক্যের ও মিলনের খোঁজ পায় বিজয়ায়। তাহার দেশ, তাহার জাতি এমন করিয়া মিলনের জন্য প্রাণ খুলিয়া দিয়াছে। নিখিল হিন্দুস্থান এক মহামিলনের বিরাট ভাবে উদ্বুদ্ধ! সবাই আত্মীয়, সকলকে কোল দিতে হইবে। যে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে চায়, সে এ মহামিলনের স্রোতে হৃদয় ঢালিয়া বুঝিতে পারিবে, কত বড় প্রেমের ঐক্য এই বিজয়া। ধন্য সেই পুণ্য-শ্লোক পিতৃগণ, যাঁহারা সমস্ত বাহ্য অবস্থার উপরে সমগ্র দেশের হৃদয়ের এই অখণ্ড, উদার মহামিলনের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ধন্য

হইব আমরাও—যদি আমরা তাঁহাদের অনাগত সন্তানসন্ততিগণের জন্য এই জাতীয় মহামিলনধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারি, আর ইহাকে আমাদের ঐকান্তিকতার চেষ্টায় ও সিদ্ধিতে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিতে পারি।

* * *

২। সাহিত্যে দুর্নীতি

আর মুখ বুজিয়া থাকা চলে না। বাণীর পবিত্র পীঠে রাশি রাশি আবর্জ্জনা আসিয়া জমিতেছে। উদার সাত্ত্বিক সামগান এই দেশের সাহিত্য আশ্রয় করিয়া বিশ্বে প্রচারিত হইয়াছিল। এই দেশের উপনিষদ্, গীতার অধ্যাত্মবাদের নিকট আজ জগৎ সসম্ভ্রমে মাথা নোয়াইতেছে। ভারতীয় সাহিত্যের শুভ্র, সৌম্য জ্যোতিঃ এখনও প্রাণের মলিনতা দূর করিয়া দেয়। ভারতীয় কাব্য চিরদিন মহৎ চরিত্র, মহৎ ভাব, মহৎ অবদান আশ্রয় করিয়া রচিত হইয়াছে। অভিজ্ঞান শকুন্তল ভারতীয় প্রতিভার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি। কিন্তু এখনকার সাহিত্য সেই সকল মুছিয়া ফেলিয়া উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল মূর্ত্তিতে সমাজের বুকে আপনার ভার চাপাইতেছে। ইউরোপের যথাযথচিত্রণমূলক উপন্যাসের (realistic novel) দোহাই দিয়া বঙ্গসাহিত্যে কি বিষম দৌরাত্ম্যই না চলিতেছে! রক্তমাংসের দুর্নিবার ক্ষুধা শিষ্টতার আবরণ দূরে ফেলিয়া, কলা চাতুর্য্যের (art) বিবিধ বর্ণে বিচিত্র ভঙ্গীতে চিত্রিত হইয়া, অবাধে নিঃসঙ্কোচে আমাদের মন্দিরের জীর্ণ কবাট ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আয়োজন করিতেছে। ইহার চক্ষে আকাঙ্ক্ষার তীব্র বহ্নি, অঙ্গের প্রতি লোমকূপে সম্ভোগলিপ্সার বীভৎস উত্তাপ। জগৎ ইহার কাছে বাসনার ক্ষেত্র, ভোগবিলাসের, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের অফুরন্ত উৎস। প্রৌঢ়ের লেখনী ইহার তাড়নায় মানুষের চিত্তকে উদ্ভ্রান্ত করিবার জন্য অলঙ্কার, উপমা, ভাষা, ভাব নিঃশেষ করিয়া, আর্টের সংযমের পর্দ্দা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, মদিরার তুফান ছুটাইয়াছে। দেশের উপদেষ্টা, স্বজাতির হিতকামী সাহিত্যরথী আজ ইহার আবেশে আত্মহারা। উদ্ভ্রান্ত দেশবাসী এখন তাঁহার সুবর্ণকলসের অপূর্ব্ব মদিরা পান করিয়া realistic artএর চরণে গড়াগড়ি দিবে। জানিনা কি ভাবিয়া প্রবীণ সাহিত্যরথী সমাজে এই লালসার বান ডাকাইতেছেন। যদি সাহিত্য-সাধনার বলে ভগীরথের মত ভস্মীভূত সমাজে শক্তির, মনুষ্যত্বের, দেবত্বের গঙ্গাস্রোত আনিতে পার, কৃতজ্ঞদেশ শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিবে, প্রসন্ন পিতৃপুরুষ আনন্দাশ্রু মোচন করিবেন। এই রক্তমাংসের ক্ষুধা আর জাগাইও না। নির্জ্জীব সমাজ এখনও প্রাচীন সংযমের অবশেষটুকু ভর করিয়া কোনও মতে বাঁচিয়া আছে। আর কেন ইহাকে উদ্ভ্রান্ত করিতেছ? শক্তি থাকে ইহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা কর। নূতন আদর্শে, নূতন ভাবে ইহার মনুষ্যত্ব যাহাতে জাগিয়া উঠে, ইহার সনাতন সংযম, নিষ্ঠা, শুচিতা আর অপচিত না হয়, হে সাহিত্যরথি! আজ সেই সাধনায় অগ্রসর হও। বহু যুগের অবসাদ, আলস্য ও মোহ ইহার শক্তির অনেকটাই ত নিঃশেষ করিয়াছে। যেটুকু এখনও নিঃশেষিত হয় নাই তাহার উপর তুমি ঘরের ছেলে হইয়া আর এমন নির্ম্মম চিত্তে ডাকাতি করিও না। এই অস্তিত্ব সঙ্কটের দিনে তাঁহারই সাহিত্যসাধনা ধন্য, তিনিই বরেণ্য, যিনি আমাদের কল্যাণের পথ, বাঁচিবার উপায় বলিয়া দিবার চেষ্টা করিবেন। তাঁহার শুভশঙ্খনিঃস্বনে আমাদের সুপ্ত

মনুষ্যত্ব, মোহাভিভূত দেবত্ব আবার জাগিয়া উঠিবে। এই আপদ্‌কালে আর কেন রক্ত-মাংসের বীভৎস ক্ষুধা বাড়াইয়া তুলিতেছ? একবার স্বদেশীয় সভ্যতার, স্বধর্ম্মের মর্ম্মস্থান অনুসন্ধান করিয়া দেখ। সন্তানের মত, ভক্তের মত একবার মায়ের ব্যথা বুঝিও; নিরন্ন, নির্জ্জীব, নিরাশ দেশবাসীর অবস্থা ভাবিয়া দেখিও। আমাদের ভিতের ইট আল্‌গা হইয়া পড়িতেছে; বিলাস-লালসার দুর্ব্বার স্রোত আমাদিগের বিরাট সৌধের তলদেশ ফোঁপরা করিয়া ফেলিতেছে। আর কেন লালসার অগ্নিতে ইন্ধন নিক্ষেপ কর? ভোগায়তন দেহের, সম্ভোগলিপ্সাতুর ইন্দ্রিয়-গণের তৃপ্তির জন্য সবাই ত আজ তাহাদের আত্মাকে বিকাইয়া দিতে বসিয়াছে। সমগ্র জাতি এখন ভোগ সুখের কাঙ্গাল। আর তোমার আর্টের কুহক সৃষ্টি করিয়া দেশ মজাইও না, সমাজ বিভ্রান্ত করিও না, দানবী ক্ষুধার সম্মুখে সম্ভোগের তিলোত্তমার মূর্ত্তি ধরিও না। যাহারা ঘরে আছে, যাহাদের কুলধর্ম্মবোধ এখনও মরিয়া যায় নাই, সংযমের বিরুদ্ধে যাহারা পুরাপুরি বিদ্রোহী হইয়া উঠে নাই, তাহাদিগকে আজ সেই সনাতন পবিত্রতা, শুচিতা ও সংযমের ভগ্নদুর্গে ঘরের মাঝেই থাকিতে দাও। বাহিরের বিলাস কোলাহলের, হুড়াহুড়ির, উচ্ছৃঙ্খলতার মাঝ-খানে তাহাদের টানিয়া আনিয়া আর মজাইও না। এই যে তোমার কলার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, ভাষা, অলঙ্কার ও উপমার শোভা, ইহাত সেই উপকথার প্রেতিণীর কুহকসৃষ্ট সৌন্দর্য্য। কামনার যে বহ্নি জ্বালাইয়াছ, তাহাতে ইতি-মধ্যেই দলে দলে পতঙ্গ ঝাঁপ দিয়া পুড়িয়া মরিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। যদি পার—এই ভীষণ অগ্নিকুণ্ডে শান্তিবারি নিক্ষেপ কর। খুঁজিয়া দেখ পূর্ব্বপুরুষগণের কমণ্ডলুর শান্তিজল এখনও নিঃশেষিত হয় নাই।

* *
*

৩। সাহিত্যের সমাজ-সেবা

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের তিনটী মহান্ অভাব। শাস্ত্রে বলে মানুষ চতুর্ব্বর্গ লাভ প্রয়াসী। মানুষের মত জাতিরও বর্গ-লাভ ঘটে। তবে উহার সংখ্যা ৪ না হইয়া ছয়। সমাজ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ধর্ম্ম, সাহিত্য ও অর্থ এই ষড়বর্গ লাভ হইলে জাতির মুক্তি হয়। মুক্তি অর্থে, বাধা হইতে, ভয় হইতে, অজ্ঞান হইতে, দুর্ব্বলতা হইতে উদ্ধার। বাধা হইতে গতিতে, ভয় হইতে ভরসায়, দুর্ব্বলতা হইতে শক্তিতে, ও অজ্ঞান হইতে জ্ঞানে যে অবস্থান্তর তাহাই জাতির মুক্তি। এই ছয়টী সম্বলের অভাবেই জাতির মৃত্যু বা অধঃপতন।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় ছয়টীরই কমবেশী অভাব ঘটিয়াছে, তবে সমাজ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা এই তিনটীরই অভাব আমরা পূর্ণ মাত্রায় অনুভব করিতেছি, আর মনে হয়, এই তিনটীর অভাব পূর্ণ হইলে বুঝি আমরা একটু মানুষের মত হইতে পারিব, পাঁচজনের নিকট একটী জাতি বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতে পারিব। সমাজ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাগত অভাবের বর্ত্তমান অবস্থা ও কিরূপে উহাদের প্রতিবিধান হওয়া উচিত তাহার আলোচনা আমাদের মনে হয় বর্ত্তমান সাহিত্যের প্রধান আলোচনার বিষয় হওয়া উচিত।

আবার সেই কথা! সাহিত্য কি তবে, সমাজ সমস্যা শিক্ষা বিধান ও স্বাস্থ্যরক্ষা লইয়া ব্যস্ত থাকিবে? তার আর কোনও কাজ নাই? উচ্চ ভাবের সহিত, অতীন্দ্রেয়ের সহিত, তার

কারবার বন্ধ করিতে হইবে? এই সকল প্রশ্ন লইয়া অধ্যাপক রাধাকমল বাবু ও রবীন্দ্রনাথের তর্ক আরম্ভ হইয়াছিল; সে তর্কের এখনও শেষ হয় নাই। আমরা রবীন্দ্রনাথের কথায় তার উত্তর দিতে পারি। স্বদেশী আন্দোলন যখন প্রবল বন্যায় ছুটিয়াছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ নিজ কবি প্রতিভাকে দেশের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন; এবং এই উপলক্ষ্যে apology স্বরূপ তিনি বলিয়াছিলেন "আমি যখন বাঁশি বাজাইতেছি, তখন সাপে তাড়া করিলে, বাঁশিকে লাঠির কার্য্যে নিয়োজিত করিলে কেহ দোষ দিতে পারে না।" ঠিক কথা; কেহ দোষ দেয় নাই, দিতেও পারে না; কবিকেও সাহিত্যিক যদি নিজের প্রতিভার ধারা দেশের ও দশের সেবা করেন তবে তাঁর প্রতিভার চরম সার্থকতা তাহাতে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা শোচনীয়। কি সমাজ কি স্বাস্থ্য, কি শিক্ষা, কি অর্থ, কি ধর্ম্ম, সবই লক্ষ্যহীন, দুর্ব্বল, দোষযুক্ত। চারিদিকে আমাদের বন্ধন, অজ্ঞানের বন্ধন, ভয়ের বন্ধন, দৌর্ব্বল্যের বন্ধন, দারিদ্র্যের বন্ধন, কুশিক্ষার বন্ধন, কুসংস্কারের বন্ধন, কদাচারের বন্ধন। এই নাগ পাশের সহস্র বন্ধন কাটিতে পারিলে তবে আমরা পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারিব, চলা ত পরের কথা। এ দুঃসময়ে যদি সাহিত্যিক, কবি ও শিল্পী, ভাবিবেন না, বা ভাবাইতে শিখাইবেন না। উচ্চ শৃঙ্গনাদে মহামন্ত্র প্রচার করিবেন না তবে লোকে জানিবে, শিখিবে, ভাবিবে বা বুঝিবে কিরূপে?—জাতীয় জীবনের সমস্যা পুরণসাধন যদি জাতীয় সাহিত্য না করিবে তবে আর উদ্বোধনের বিজয় সংগীতের জন্য কোন প্রতিভার নিকট দ্বারস্থ হইবে?—তবে কথা আছে, যে যেমন সে তেমনি উপায়ে এ চেষ্টায় হস্তক্ষেপ করিবেন। কবি বা শিল্পী, Text-book লিখিবেন না Statistics তৈয়ারী করিবেন না, বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিবেন না।—শিল্পের ভিতর দিয়া তাঁর বক্তব্য বা উপদেশ প্রকাশ করিবে সাফ বক্তব্যও বলা হইবে, শিল্পও বজায় থাকিবে এরূপ সাহিত্যিক চেষ্টার দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি সব দেশের সাহিত্যেই পাওয়া যায়।

আমাদের এখন অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। দেশের লোক খাদ্য ও পাণীয় অভাবে মৃতপ্রায়, শিক্ষা অভাবে অজ্ঞানমূঢ়, অন্ধসংস্কারাচ্ছন্ন অর্থাভাবে একাশনে, চীরধারী।—জ্বর জরা, মড়ক দেশকে আচ্ছন্ন করিয়াছে,—বাল্যবিবাহ, বালবৈধব্য, বরপণের ভীষণ তাড়না, লোককে বিড়ম্বিত করিতেছে, দারিদ্র্যে, শিক্ষাভাবে, অনশনে জীবনযুদ্ধ ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতেছে, এখন কি চাঁদের সুধা, ফুলের মধু, কোকিল কুজন প্রেম, পূর্ব্বরাগ বিরহ মিলন লইয়া কবি শিল্পী ও সাহিত্যিকের ব্যস্ত থাকিলে চলিবে? উচ্চ ভাব? অতীন্দ্রিয় বিষয়? দেশের ও দশের মঙ্গল সাধন, ভীতকে অভয় দান, অজ্ঞানকে শিক্ষাদান, অন্ধকে আলোক দান, ইহাপেক্ষা সাহিত্যিকের বিষয়-গৌরব আর কি আছে? যাহাকে আমরা ইন্দ্রিয় বলি তাহার মধ্যেই যে অতীন্দ্রিয় আছে ইহা দেখান বুঝান ত উচ্চ দরের সাহিত্যিকের কাজ? পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে যে art with a Proposeএর ধুয়া উঠিয়াছে উহার ভিত্তি ত এই সমাজ-সেবায়। যখন আমরা মানুষ হইব, ধনে, মানে, জ্ঞানে বড় হইব তখন উচ্চ ভাব ও অতীন্দ্রিয় বিষয় লইয়া কবি ও শিল্পীরা নিমগ্ন থাকিবার অবসর পাইবেন।

* *
*

৪। "দরিদ্রের ক্রন্দন"

ইতিপূর্ব্বে অধ্যাপক শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় সাহিত্যের সমাজসেবা ও যুগধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার "দরিদ্রের ক্রন্দনে" শুধু কর্ম্মনিষ্ঠ জনহিতব্রত পল্লীসেবক ও শিল্প প্রচারককে যে আহ্বান করিতেছে তাহা নহে, বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে তিনি এক নূতন আন্দোলনকে আহ্বান করিতেছেন

* * *

দেশের চারিদিকে দরিদ্রের ক্রন্দন এখন মর্ম্মস্পর্শী হইয়া পড়িয়াছে। নিরক্ষর, কৃষক, শিল্পী ও শ্রমজীবিগণের ক্রন্দনের রোলে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদিগেরও রোদনধ্বনি মিশিয়াছে। নানাকারণে ইহাঁদিগের দারিদ্র্য আরও পীড়াদায়ক। ইহাঁদিগের হৃদয় বিদারক কষ্ট কিন্তু ইহাঁরা মুখ ফুটিয়া তাহা সমাজকে বলিতে চাহেন না। অস্ফুট বেদনায় তাঁহাদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। সমাজে চিরকালই দারিদ্র্য থাকে; কিন্তু এক্ষণে আমাদের সমাজের দারিদ্র্য অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে। ইহার প্রতিকার না করিলে জাতির ধ্বংস সম্মুখীন।

বাস্তবিক দারিদ্র্য সমস্যাই আমাদের বর্ত্তমান সমস্যা। আমাদের সমস্ত আন্দোলনেই নিরর্থক হইবে যদি আমরা শীঘ্রই দারিদ্র্য নিবারণের জন্য একটা বিপুল আয়োজনে ব্রতী না হই।

দেশে বিবিধ কৃষিশিল্প ব্যবসায় অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তন ও প্রচলন করিবার জন্য এক্ষণে জনহিতব্রত কর্ম্মনিষ্ঠ শিল্প-প্রচারক ও পল্লীসেবকের প্রয়োজন। ইহাঁরা এই প্রচার কালে জীবন উৎসর্গ করিয়া আমাদের পল্লী সমাজের দুর্গতি প্রতিকার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সহায় হইবেন, শিল্প ও ব্যবসায় অনুষ্ঠানের ধুরন্ধর হইয়া মধ্যবিত্তদিগের অন্নসংস্থানের সুযোগ বিধান করিবেন, এবং জনসাধারণের জন্য উপযোগী ও কার্য্যকরী যথোচিত আয়োজন করিয়া জনসমাজকে নূতন প্রাণে অনুপ্রাণিত এবং নূতন বিজ্ঞান বিদ্যায় কর্ম্মনিষ্ঠ করিয়া তুলিবেন। দারিদ্র্য-পীড়িত সমাজের আশার কথা শুনাইয়া নূতন আকাঙ্ক্ষায় জাগ্রত ও নূতন কল্যাণ-কর্ম্মে ব্রতী করিবার জন্য তাঁহাদিগের ভাবুকতা চাই। দরিদ্রের ক্রন্দনে নিজে কাঁদিয়াও পরকে কাঁদাইয়া এই জননায়কগণ সমগ্র দেশকে এক কঠোর সাধনায় নিযুক্ত করিবেন। এই সাধনার সিদ্ধি--দেশের দারিদ্র্য-মোচন। দেশের ঐশ্বর্য্য ফিরিয়া আসিলে আমাদের সনাতন ধর্ম্ম ও বৈরাগ্য অবলম্বন সার্থক হইবে। বিজ্ঞান ও বৈরাগ্যের সম্মিলন সম্ভবপর হইবে। হিন্দু সমাজ ভোগবিধ জর্জ্জরিত বিপর্য্যস্ত পাশ্চাত্য জগৎকে যে বাণী প্রচার করিবার জন্য এত দুঃসহ বেদনা অসম্মান ভোগ করিয়াও এখনও জীবিত হইয়াছে তখন সে বাণী প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিয়া জগতে যুগান্তর আনিয়া দিবে।

সমগ্র সমাজ যাহাতে এই বিপুল দারিদ্র্য নিবারণ কার্য্যে অদম্য উৎসাহে ব্রতী হয় তাহার জন্য ঘরে ঘরে এক্ষণে দরিদ্রদের ক্রন্দন ও নিরন্নের হাহাকার, দরিদ্রদের অভাব অভিযোগ আর্ত্তের কথা সদাসর্ব্বদাই প্রচার করিতে হইবে, কাব্যের ভিতর, উপন্যাসের ভিতর, নাটকের ভিতর, গান গল্প গুজবের ভিতর, দেশের সমগ্র সাহিত্যের ভিতর যাহাতে সমাজের গভীর মর্ম্মবেদনা যেন গুমরিয়া উঠিতে থাকে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে জন সমাজের অভাব ও আদর্শ অল্পই স্থান পাইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "বঙ্গের কৃষক" ও দীনবন্ধু তাঁহার "নীলদর্পণে" দরিদ্রের করুণ আর্ত্তনাদ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট করিয়া দেশে যে আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আজ কালকার কোন সাহিত্যিক সাহিত্যের মধ্য দিয়া সেরূপ কোন আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিতেছেন না। ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়! দরিদ্রের অবস্থা কি পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইয়াছে? তাহা ত হয় নাই। বরং ক্রমশঃ মন্দই ত হইতেছে। তবে আমরা এখনও তাহাদিগের প্রতি উদাসীন কেন? তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া আমাদিগের সমাজ কি কখনও উন্নত হইতে পারে?

ভুল করিলে চলিবে না, যে অবনত দরিদ্রেরাই দেশের মর্ম্মস্থল। জনসাধারণ যদি ক্রমশঃ হীনবল ও অবনত হইতে থাকে, তবে সাহিত্যের জীবন কয়দিন? সুতরাং অচিরেই সমাজ ও সাহিত্য-জীবনের সেই মর্ম্মস্থল অবনত দারিদ্র্য-পীড়িত এবং তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মূক বেদনা সাহিত্যের ওজস্বিনী ভাষায় প্রগল্‌ভ করিয়া তুলিতে হইবে।

দরিদ্রের আকুল ক্রন্দন ভগীরথের শঙ্খধ্বনির মত বহুদিন হইতে সাহিত্য-সেবিগণকে আহ্বান করিতেছে। আপনাদের হৃদয় হইতে আন্দোলনের পবিত্র ধারা ভাগিরথীর ন্যায় প্রবাহিত হইয়া কি পতিত জনসমাজকে এখনও সঞ্জীবিত করিবে না?

* *
*

৫। কলেজ পত্রিকা

আজকাল প্রায় প্রতি কলেজেরই পত্রিকা বাহির হইতেছে। কলেজ যাহাতে ছাত্রজীবনে একটা জীবন্ত প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, কলেজের ছাত্রগণ যাহাতে কয়েকটী সুস্পষ্ট চিন্তা বা ভাব ভাল করিয়া বুঝে, কলেজের জ্ঞাতব্য ঘটনাগুলি সকল ছাত্রই জানিবার সুযোগ পায় এবং বিবিধ বিষয়ে যাহাতে ছাত্রদিগের মধ্যে রচনার উৎসাহ জন্মে, মুখ্যতঃ ইহাই বোধ হয় কলেজ পত্রিকাগুলির উদ্দেশ্য। পত্রিকাগুলি সাধারণতঃ বেশ দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে। কয়েকজন প্রতিনিধি ছাত্র মিলিয়া মিশিয়া একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজ চালাইবার শিক্ষা ধীরে ধীরে এইরূপ অনুষ্ঠানের সাহায্যে লাভ করা যাইতে পারে। কলেজে চিন্তার ও ভাবের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় এই পত্রিকাগুলি কিছু কাজ করিতে পারে। তবে সাহিত্য বিষয়ক সাধারণ আলোচনা ও প্রবন্ধের বাহুল্য অপেক্ষা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটাইবার উপযোগী সারবান্‌ রচনা এবং facts ও figures সমন্বিত স্বাস্থ্য, অর্থনীতি; সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞ অধ্যাপকের রচিত প্রবন্ধ ও তদ্বিষয়ে ছাত্রগণের আলোচনা থাকিলে পত্রিকাগুলির উপকারিতা সমধিক বৃদ্ধি পাইবে। পিতৃপ্রেরিত অথবা শ্বশুরনিষ্পেষিত অর্থে আমাদের দুলালগণ অনেকেই কলেজজীবনের খরচ চালান। বহু বিড়ম্বনার বিভীষিকা বক্ষে ধরিয়া নির্ম্মম ভবিষ্যৎ যে কি করাল মূর্ত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা অনুত্তীর্ণ ছাত্রদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইবে সে কথা কলেজে হোষ্টেলে থাকিবার সময় অনেকেই বুঝিতে পারে না। অনেক বিষয় যাহা অন্য দেশে নিতান্তই সাধারণ এবং সুবিদিত, আমাদের দেশে পাঠ্য পুস্তকে লেখা না থাকিলে জনকতকের মাত্র বিদিত। জীবনে উচ্চশিক্ষা

প্রাপ্ত ছাত্রের কয়েকটী অবশ্য পালনীয় নীতি (principle) মানিয়া চলা উচিত সেইগুলি আমাদের বোধ হয় এখনও অধিগত হইতে বিলম্ব আছে। ঘটনাপ্রবাহ আমাদিগকে যে দিকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, আমরা সেই দিকেই ভাসিয়া যাই। কলেজে আমরা পরীক্ষায় পাশ করিবার উপযোগী notes পাই, কিন্তু এই বহু দুর্ভাগ্যবিড়ম্বিত দেশে ও সমাজে অস্তিত্ব পরীক্ষার উপযোগী কোন সহায়তা কলেজে লাভ করি বলিয়া বোধ হয় না। কলেজের কোন গভীর, উদার, মনুষ্যোচিত শিক্ষার ছাপ (stamp) আমাদের চরিত্রে পড়ে না। তাই কলেজ পত্রিকাগুলির এক একটা কল্যাণকর সুর (healthy tone) দেখিতে চাই। নচেৎ নিতান্তই সাধারণ মাসপত্রী এবং ইংরাজী পুস্তক ও প্রবন্ধের প্রতিধ্বনিতেই কোনরূপ সার্থকতার সম্ভাবনা নাই। কলেজ বিশেষের যদি বিশেষ কিছু নিজস্ব শিখাইবার থাকে তবে পত্রিকার সাহায্যে তাহা সুস্পষ্ট করিয়া তুলিবার সুবিধা হইতে পারে। নচেৎ এক এক কলেজের এক এক খানা ছাপা এবং ছবিওয়ালা রচনার বই কয়েকটা টুকরা খবর জোড়া দিয়া ছাপাইলে তাহাতে আর সার্থকতা কি?

* *
*

৬। চুক্তিবদ্ধ "কুলী"

প্রায় একশত বৎসর অতীত হইল সভ্য-জগৎ হইতে দাসব্যবসায় লোপ পাইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে আজও বিভিন্ন আকারে ঐ প্রথার প্রচলন রহিয়াছে। ট্রিনিডাড্, ব্রিটিশ গিয়ানা, সুরিনাম, জ্যামেকা, ফিজি প্রভৃতি ব্রিটিশ-অধিকৃত উপনিবেশগুলিতে প্রতি-বৎসর ভারতবর্ষ হইতে কুলী চালান হইয়া থাকে। এ দেশে নানা স্থানে বেতনভোগী কুলী-সংগ্রাহকের অনেকগুলি আড্ডা আছে। তাহারা বিদেশের ক্ষেত্রে কাজ করিবার জন্য মজুর সংগ্রহ করিয়া থাকে। অজ্ঞ, নিরক্ষর, দুর্ব্বলচিত্ত কৃষকগণ—তাহাদের প্রলোভনে ভুলিয়া বিদেশের টাকার স্বপ্ন দেখে। দেশে অর্থোপার্জ্জনের পথ সুগম নহে দেখিয়া তাহারা বিদেশে যাইতে স্বীকৃত হয়, এবং কুলী-সংগ্রাহকের দাদন লইয়া অঙ্গীকার পত্রে চুক্তি করিয়া দেয়। এই অঙ্গীকার পত্র অনুসারে তাহাদিগকে পাঁচ বৎসরের জন্য বিদেশে বণিক-প্রভুর অধীনে থাকিতে হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, যাহারা সাধারণতঃ কুলী হইয়া বিদেশে যায়, তাহাদের মধ্যে অনেকেরই হৃদয় দুর্ব্বল, মন নিস্তেজ। যাহাদের হৃদয়ে উৎসাহ আছে, এবং যাহারা মনের বলের কিছুমাত্র ধার ধারে, তাহারা সহজে আড়কাটীর প্রলোভনে বিশ্বাস করে না। এই দুর্ব্বলমতি হতভাগ্যগণ যখন "সোনার দেশে" যাইয়া দেখে, তাহাদের সমস্ত আশা বিফল, তখন তাহাদের অনেকেরই বুক ভাঙ্গিয়া যায়, এবং পরিশেষে কেহ কেহ আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা জুড়ায়।

আইন আছে যে ১০০ জন পুরুষ মজুরের সঙ্গে ৪০ জন স্ত্রী মজুর চালান দিতে হইবে। যে ব্যবস্থায়, গৃহ হইতে সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরে বিদেশে অজানা স্থানে প্রতি ৩ জন পুরুষের সহিত ১ স্ত্রী কুলী পাঠান হইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা অস্বাভাবিক ব্যবস্থা আর কি হইতে পারে? ম্যাকনীল ও চিমনলাল মহোদয়গণ রিপোর্টে প্রস্তাব করিয়াছেন, স্ত্রীলোকের সংখ্যা শতকরা ৫০ করিয়া দেওয়া হউক। কিন্তু এই সামান্য পরিবর্ত্তনে মজুরগণের মধ্যে নৈতিক উন্নতি আশা কিরূপে করা যাইতে পারে?

হিন্দু স্ত্রী সহজে স্বামীগৃহ ত্যাগ করিতে চাহে না। আড়কাটী তাহা ভাল করিয়া বুঝে। তাই তাহারা স্ত্রী মজুর সংগ্রহের জন্য নানারূপ বৈধ অবৈধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। তাহারা কখন কখন স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক স্বামীর নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া যায়; কখন বা পথে একাকী পাইলে নানারূপ মিথ্যাবাক্যে প্রলুব্ধ করে; কখন কখন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ক্ষণিক মনোমালিন্য ঘটিলে সেই সুযোগে স্ত্রীকে প্রলোভন দ্বারা ভুলাইয়া লইয়া যায়। এই সকল কুলবধূ শীঘ্রই কর্ম্মস্থানে কুলটাগণের সহিত মিশে। যে স্থান গৃহের কল্যাণ প্রভাব হইতে সহস্র ক্রোশ দূরে, যেখানে ১০০ জন পুরুষের সহিত ৪০ জন স্ত্রীলোককে অল্পপরিসর কুলী-নিবাসে বাস করিতে হয়, সেইরূপ স্থানে স্ত্রীলোকগণ বা পুরুষগণ কিরূপে আপনাদের চরিত্র রক্ষা করিবে? স্ত্রীপুরুষের নৈতিক স্বাস্থ্য ত সেখানে স্বভাবতঃই দূষিত হইয়া উঠিবে। তাই তাহারা সেখানে পশুর মত জীবন যাপন করিয়া থাকে। শ্রীযুক্ত ম্যাক-নীল ও শ্রীযুক্ত চিমনলালের রিপোর্টে প্রকাশ, স্ত্রীলোকগণের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র বিবাহিত স্বামীর সহিত বাস করে। বাকী দুই-তৃতীয়াংশের বেশীর ভাগ কোনও রূপ বিবাহাদি সামাজিক সম্বন্ধের সম্পর্ক রাখে না। কেহ কেহ ঘৃণিত গণিকা-জীবন যাপন করে। ১৯১৪ সালে মার্চ্চ মাসে কলোনিয়াল অফিস (colonial office) পার্লামেণ্টকে (Parliament) যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা হইতে স্ত্রীপুরুষের সংখ্যা বেশ বুঝা যাইতে পারে।

	যুবক	যুবতী
ট্রিনিডাড্ ও টোব্যাগো	৩১৯৮৯	১৭১৫৭
ব্রিটিশ গিয়ানা	৫৩০৮৩	৩৪৭৭৭
জ্যামেকা	৭১৩৭	৪৭৭৫
ফিজি দ্বীপ	২০০৬২	৮৭৮৫

সার হেনরী কটন বলেন, স্ত্রীপুরুষের সংখ্যার এই অস্বাভাবিক অনুপাতের ফলে নানারূপ কদর্য্য কলহ ও ঈর্ষ্যা বশতঃ প্রতি বৎসর যে কতশত নরহত্যা, আত্মহত্যা চলি-তেছে, তাহার বিবরণ এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। তবে ফিজি দ্বীপে জনসংখ্যার তুলনায় যত অধিক লোকের ফাঁসী হয়, এরূপ বোধ হয়, ব্রিটিশ শাসিত অন্য কোন দেশে হয় কি না সন্দেহ। প্রাণদণ্ডপ্রাপ্ত লোকের মধ্যে বেশীর ভাগই ভারতবর্ষের হতভাগ্য কুলী! আর হতভাগ্যগণের অনেকেরই অপরাধ দূষিত প্রণয়ের ঈর্ষ্যা ও কলহের ফল।

বিদেশে চুক্তিবদ্ধ কুলী চালানের আর একটি বিষময় ফল—আত্মহত্যা। ফিজি, জ্যামেকা প্রভৃতি উপনিবেশগুলিতে—যেখানে বৎসর বৎসর মজুর পাঠান হইয়া থাকে—আত্মহত্যা-ব্যাধি যেরূপ প্রবল, এরূপ বোধ হয় পৃথিবীর আর কোথাও নহে। ফিজি দ্বীপের বিবরণ হইতে জানা গিয়াছে, গত ৫ বৎসরে আমদানী মজুরের মধ্যে প্রতি ১০ লক্ষে ৯২৬ জন আত্মহত্যা করিয়াছে। কিন্তু যে সকল ভারতবাসী সে স্থানে স্বাধীন-ভাবে বাস করিতেছে তাহাদের মধ্যে আত্ম-হত্যার হার প্রতি ১০ লক্ষে ১৪৭ জন। গত ১৯১২ সালে উক্ত দ্বীপে আমদানী কুলীর প্রতি ৮৫৩ জনের ভিতর ১জন আত্মহত্যা করিয়াছে। মান্দ্রাজ প্রদেশ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক শ্রমজীবি উপনিবেশগুলিতে যায়। কিন্তু ১৯০৮ সালের গণনা হইতে দেখা যায়—এই প্রদেশে প্রতি ২২৮৭৩ জনে ১ জন লোক আত্মঘাতী হইয়াছিল। দেশে

যতদিন বাস করে—ততদিন আত্মহত্যা-প্রবৃত্তি খুব কম থাকে, আর বিদেশে যখন কুলীরূপে রপ্তানি হয় তখনই তাহাদের মধ্যে এই দুষ্প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে—ইহার কারণ কি? কেনই বা ভারতীয় মজুরগণ বিদেশে যাইয়া এরূপভাবে আত্মহত্যা করিয়া থাকে? ম্যাকলীন ও চিমনলাল বলিতেছেন, স্ত্রী পুরুষের ঈর্ষ্যা ও গৃহস্থালী-সংক্রান্ত বিবাদই ইহার মূল কারণ। কিন্তু ইহা ছাড়া অন্যান্য কারণ আছে। যে দেশের অবস্থা যত শোচনীয় সেই দেশের আত্মহত্যার সংখ্যাও তত অধিক। আত্মহত্যার হার দ্বারা—দেশের দুর্দ্দশার পরিমাণ করিতে পারা যায়। দুর্ব্বলমতি, নিরন্ন মজুরগণ নানা প্রলোভনে ভুলিয়া অর্থের আশায়, গৃহ, স্বজন ত্যাগ করিয়া বিদেশে আসিয়া দেখে—সেখানে প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধ নিদারুণ নিষ্ঠুর, টাকার স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন—তখন তাহাদের সব আশায় ছাই পড়ে। তখন তাহারা গৃহে ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হয়, অবশেষে মানসিক কষ্ট সহিতে না পারিয়া কেহ কেহ আপনার আশাহীন, আনন্দহীন, অত্যাচারক্লিষ্ট জীবন বিনাশ করিয়া থাকে।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইল, দাদন দিয়া কুলী সংগ্রহের প্রথা চলিয়া আসিতেছে। এই প্রথার শৈশবকাল অতীত হইয়াছে। সুতরাং ইহার পরীক্ষার অবস্থা এখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলাফল সম্বন্ধে এখন সকলে নিশ্চিত। ইহার প্রচলনে কিরূপ দাসত্ব ও দুর্নীতি প্রশ্রয় পায় তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি। স্যর হেনরীকটন্, শ্রীযুক্ত সি এফ্ এণ্ড্রুজ, শ্রীযুক্ত পিয়ার্সন প্রভৃতি ইংরাজগণ এবং ভারতের শিক্ষিত সমাজ আজ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, এই জঘন্য কুপ্রথার একমাত্র প্রতিবিধান—ইহার লোপসাধন। একজন ইংরাজ লেখক লিখিয়াছেন—শ্রমজীবিগণকে যথেচ্ছনিয়োগ হইতে রক্ষা করিবার উপায় উদ্ভাবন উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। অতএব যদি চুক্তিবদ্ধ কুলী সংগ্রহ প্রথা আইন দ্বারা তুলিয়া দেওয়া হয়, তবে তাহা বোধ হয় বর্ত্তমান যুগের ভাবের বিরোধী কাজ হইবে না।

আমরা ঘরের কথা লইয়াই মগ্ন থাকি। বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশ হইতে চুক্তিবদ্ধ মজুর প্রেরিত হয় না। সুতরাং এই বিষম সমস্যায় বাঙ্গালী উদাসীন। কিন্তু বাঙ্গালী কি এখন তাহার হতভাগ্য ভারতবর্ষীয় ভাইবোনদের কথা ভাবিবে না? দক্ষিণ আফ্রিকার দিকে গান্ধী মহোদয়ের চেষ্টায় এক একবার আমাদের চোখ পড়িয়াছিল। যাহারা চোখের জলে বুক ভাসায়, তিল তিল করিয়া মরে, প্রতিদিন পশুত্বের অতল গহ্বরে নামিতে থাকে, যাহাদের জীবনে আত্মহত্যা, ফাঁসি একটা ব্যাধির মত চিরস্থায়ী উপদ্রব, সেই আশাহীন, শক্তিহীন নিরক্ষর ব্যথিত ভাইবোনগুলির কথা বাঙ্গালী এক একবার ভাবিও। তাহাদের দুঃখে সমবেদনা জানাইতে ভুলিও না। যতটুকু প্রতীকার তোমার চেষ্টায় হইতে পারে ততটুকু করিতে পরাঙ্মুখ হইও না। বাঙ্গালী! তুমি যে ভারতবাসী। মহাভারতবর্ষ যে তোমার জননী।

* *
*

৭। জগতের একজন পরলোকগত সুসন্তান

সরল, নির্ভীক, সত্যের উপাসক, বিশ্বমানবের অকৃত্রিম সুহৃৎ কেয়ার হার্ডি মহোদয় আর মরজগতে নাই। জীবনের কর্ম্মরাশি

প্রাণপণে অনুষ্ঠান করিয়া কর্ম্মবীর কেয়ার হার্ডি জীবনলীলা শেষ করিয়াছেন! ইনি শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। বাল্যে নিজে মজুরের কাজ করিয়া অধ্যবসায় ও চরিত্রবলে জগতের বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রে একজন অসাধারণ কর্ম্মীরূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইংল্যণ্ডের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে শ্রমজীবিগণের প্রতিনিধিরূপে তিনি যে নির্ভীক স্পষ্টবাদিতা ও তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে ইংল্যণ্ডে রাষ্ট্রীয়জীবনে একটা নূতন শক্তিস্রোতের ধাক্কা লাগিয়াছিল। সেই শক্তির নূতন স্রোত—শ্রমজীবি-সম্প্রদায় অর্থাৎ মজুরের দল। সত্যের খাতিরে, ন্যায়ের অনুরোধে তিনি কখনও মানুষকে ভয় করিতে শিখেন নাই। যাঁহার আপাদমস্তক মনুষ্যত্বে বলিষ্ঠ, যিনি আত্মশক্তিতে নির্ভর করিয়া সামান্য মজুর হইতে বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধাস্পদ আসনে উঠিয়াছিলেন, তাঁহার জীবন যে একটা তেজের আগ্নেয়গিরির মত প্রতিভাত হইবে তাহা ত স্বাভাবিক। ইংল্যণ্ডের জীবনীশক্তির শ্রেষ্ঠ পরিচয়—মজুরের দল হইতে একজন বিশ্ববরেণ্য কর্ম্মবীর উঠিতে পারে। শ্রমজীবি সম্প্রদায় ইংল্যণ্ডের রাষ্ট্রীয় জীবনে একটি নূতন শক্তি। কিন্তু এই শক্তি শৈশবেই যেরূপ তেজস্বিতা ও সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছে তাহাতে আর দ্বিধা থাকিতে পারে না যে মানবের ভবিষ্যৎ উপেক্ষিত নিম্নস্তরের জনসাধারণের মনুষ্যত্বের জাগরণের গৌরবে ও কর্ম্মে ধন্য হইবে। কেয়ার হার্ডি মহোদয়ের স্বদেশপ্রেম কোনও দিন বিশ্বহিতের বিরোধী হইয়া উঠে নাই। স্বজাতির উদরপূর্ত্তি ন্যায়ধর্ম্ম পদদলিত করিয়া ছুটিবে—এ কথা এই মজুর-নেতার হৃদয়ে কখনও স্থান পায় নাই। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অধর্ম্মের প্রতিকূলে তাঁহার বজ্রনির্ঘোষ শুনিয়া জগতের লোক তাঁহার চরণে হৃদয়ের শ্রদ্ধা ঢালিয়া দিয়াছে। মানুষ অন্য কিছুর সহায়তা না লইয়া শুধু মনুষ্যত্বের বলে কতবড় হইয়া উঠিতে পারে, মানুষের সত্য সাধনা তাহাকে কিরূপ শক্তিমান করিয়া তোলে, মজুরের বুকে কি প্রকাণ্ড বীর হৃদয় প্রচ্ছন্ন থাকা সম্ভব, তাহা কেয়ার হার্ডি মহোদয়ের জীবনবৃত্ত হইতে মানুষ শিখিতে পারিবে।

নিজে মানুষ বলিয়াই মানুষ, মানুষ বলিয়াই বড়, ধনী বলিয়া বড় নহেন, এমন নরোত্তমের মনুষ্যত্বদীপ্ত বিরাট মূর্ত্তি যাঁহারা, তাঁহারা বিশ্ববাসীর পরমাত্মীয়। তাঁহাদের মাভৈঃ বাণী যে দুর্ব্বল, নিস্তেজ, উপেক্ষিত মনুষ্য-সমষ্টিকে ডাকিয়া বলে, "উঠ, তোমরা মানুষ। শক্তি বাহিরের জিনিষ নহে, ভিতরে খুঁজিয়া দেখ, আপনার মাঝে অনুসন্ধান কর দেখিতে পাইবে কি বিপুল শক্তির অধীশ্বর তোমরা। তুমি মজুর, তুমি দরিদ্র; কিন্তু তুমি যে মানুষ। বিলাস-বিভব, সুযোগ-সুবিধা তোমাকে তাহাদের প্রসন্ন হাস্যে অভিনন্দিত করে নাই। কিন্তু বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান মনুষ্যত্ব যে তোমাদের জন্মলব্ধ অধিকার। সেই সম্পদের গর্ব্বে বুক বাঁধিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ কর। তোমাদিগকে পঙ্গু ও অক্ষম করিবার জন্য দায়ী তোমরা নিজেরা। নিরাভরণ মনুষ্যত্বই মানুষের শ্রেষ্ঠ গৌরব মুকুট। সেই অক্ষয় গৌরবের উপযোগী হইবার নিমিত্ত মনুষ্যত্ব ফুটাইয়া তোল।" কেয়ার হার্ডির মত মানুষ বিশ্বমানবের জ্ঞাতি। দেশ, কাল, ধর্ম্ম, সমাজ নির্ব্বিচারে ইহাঁরা মানুষের আত্মীয়। ব্যথিতের বেদনা সহস্র ক্রোশ দূরেও ইহাঁদের বুকে বাজে। লাঞ্ছি-

তের আর্ত্তনাদ এইরূপ মহাপ্রাণ কর্ম্মবীরের জীবন শান্তিহীন করিয়া তোলে। আজ তাই এমন মানুষের মৃত্যুতে পৃথিবী দরিদ্র। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের সময় তিনি একবার বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন; দুইদিনের ভবঘুরের মত ফটোর ক্যামেরা ঘাড়ে করিয়া আসেন নাই। তিনি আসিয়াছিলেন একটা প্রকাণ্ড শক্তিশালী হৃদয় লইয়া। ভারতবর্ষ সেইজন্য তাঁহার শ্রদ্ধা ও প্রেমের অর্ঘ্য পাইয়াছিল। ভারতবাসী এই পুরুষসিংহের পরিচয় পাইয়া মনুষ্যত্বের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিল। কেয়ার হার্ডি মহোদয়ের মৃত্যুতে তাই আজ ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজ আত্মীয় বিয়োগের বেদনা অনুভব করিতেছে।

* *
*

৮। সমাজ-শাসন

আমরা "উপাসনার" লেখক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দত্ত বি, এ মহাশয়ের নিকট সামাজিক ব্যাধি ও প্রতিকার সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ আলোচনা পাইয়াছি। এ বিষয়ে সমাজের প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মন দেওয়া কর্ত্তব্য। সমাজে শাস্ত্র অথবা নব্য শিক্ষার দোহাই দিয়া যে উচ্ছৃঙ্খলতা এখন দেখা গিয়াছে, তাহা এখনি দূর করিতে না পারিলে আমাদের জাতীয়ত্ব বজায় রাখা অসম্ভব হইবে।

* * *

বাঙ্গালায় বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের প্রধান দোষ হইয়াছে দলাদলি। একদল গোঁড়া সেকেলে হিন্দু, আর একদল নব্য একেলে হিন্দু। এই উভয় দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একটা ভণ্ডামির ভাব আবালবৃদ্ধ বনিতাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। ইচ্ছা করিয়া বা অনিচ্ছায় লোক মাত্রেই বিরুদ্ধ বা নিষিদ্ধাচারে দূষিত হইতেছে। সমাজের ভয় মুখে আছে, কিন্তু গুপ্তভাবে সমাজ-নিন্দিত আচারের অনুষ্ঠান হইতেছে। স্থবির সমাজের বিধিনিষেধ অক্ষরে অক্ষরে অন্ধভাবে মানিয়া চলাতে প্রাচীনদল একেবারে অচল, নব্যদল সেই সব বিধিনিষেধ উচ্ছৃঙ্খল ভাবে না মানাতে অত্যন্ত বেগশীল।

(১) সমাজের এক অঙ্গ একেবারে অচল, অন্য অংশ অত্যধিক বেগে মাত্রাধিক পরিমাণে সচল। ফলে উভয় অঙ্গের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী (Organic) সম্বন্ধ থাকা কঠিন হইয়াছে। সমাজ থাকিলেই এইরূপ দুইটা দল থাকিবে, দুইটা দল থাকা নিন্দনীয় নহে, দূষণীয় হইতে উভয় দলের মধ্যে প্রতিরোধী ক্রিয়া। এই দুই দলের মধ্যে আচার ও অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বুঝা পড়া হইলে সমাজে এ ভণ্ডামি, মিথ্যাচার তিনভাগ কমিয়া যায়। প্রাচীন দলকে বুঝিতে হইবে অতীত গৌরবজনক হইলেও অতীতের প্রতি অন্ধানুরাগ কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে। সমাজ-যন্ত্র জীব-যন্ত্রের মত বর্দ্ধনশীল, পারিপার্শ্বিকের পরিবর্ত্তনে উহার নব নব প্রয়োজন ঘটে, সকল নব নব প্রয়োজন অতীতের আচার ও নিয়মে পূরণ করা যায় না :—দেশ কাল ও অবস্থানুসারে সমাজের পুনঃসংস্কার প্রয়োজন হয়। মনুর সময় মনুই প্রবল, রঘুনন্দনের সময় রঘুনন্দন প্রবল কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে নূতন মনু ও নূতন রঘুনন্দন প্রয়োজন! প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সবই বর্দ্ধনশীল ও চলনশীল, আর মানুষের সমাজ কি তাহার নিয়মের বাহিরে? নব্যদলেরও বুঝা উচিত সংস্কারের দোহাই দিয়া যে উচ্ছৃঙ্খলের অবতারণা তাহাতে গৌরব ও মঙ্গল কিছুই নাই। শত পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও জাতির একটা জাতীয়ত্ব আছে, সেই জাতীয়ত্ব একটা সনাতন Type এর উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাকে

বজায় রাখিতে হইবেই। বৈদেশিক নিষ্ঠা বা পরানুকরণ-প্রিয়তা, প্রাচীনের প্রতি বিরাগ, সংস্কার নহে, পরন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনাচার। উহার মঙ্গলামঙ্গল নির্ণয় খুব সোজা কথা নহে যেমন Ethiop তাহার চামড়া ও Leopard তার Spot বদলাইতে পারে না তেমনি কোন ব্যক্তি তার জাতীয়ত্ব বদলাইতে পারে না। বাহ্যিক পরাচার ও পরানুষ্ঠানে এক জাতীয়ত্ব গিয়া অন্য জাতীয়ত্ব আসে না। যদি কেহ বংশানুক্রম মানেন তিনি বুঝিবেন হাজার হাজার বৎসরের অভ্যস্ত মানসিক, আধ্যাত্মিক অভ্যাস যাহা হাড়ে হাড়ে বসিয়া গিয়াছে তাহা বদলায় না। বদলাইবার চেষ্টা করিলে জাতির বৈরূপ্য ও বৈকল্য আসে, কোন মতে একটা নূতন জাতি হয় না। আমরা হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া যে বিধি ব্যবস্থায় ও সংস্কারে ও ভাবে গঠিত হইয়াছি সেই ভাবে গড়িয়া উঠাই আমাদের প্রকৃতি। উহাই আমাদের প্রকৃতিগত বীজ। যে আবহাওয়ায় বা যে মাটীতেই রোপণ করা যাক ঐ বীজই অঙ্কুরিত হইবে। সনাতন আদর্শেই পুর্নগঠিত হইয়া উঠাই আমাদের পক্ষে সহজ। সুতরাং সনাতন ভিত্তি বজায় রাখার দরকার। তবে নূতন মাল মসলা বিদেশ হইতে সংগ্রহ করায় দোষ নাই বরং মঙ্গলজনক। চিত্র শিল্প সম্বন্ধে আমাদের দেশে এই ভাবটা ফিরিয়া আসিয়াছে।

দাঁড়াইতেছে এই যে প্রাচীন বিধিনিষেধের মধ্যে কোনও কোনটা মানিতে হইবে, কতক বদলাইয়া নূতন বিধিনিষেধ চালাইতে হইবে। কথা হইতেছে কে বলিয়া দিবে কে স্থির করিবে কোন্ বিধি মানা উচিত কোন্ বিধি তুলিয়া দেওয়া উচিত! সমস্যা দুই (১) কোন্ বিধিনিষেধ পালনীয়, কোনটা বা অপালনীয় (২) এবং পালনীয় ও অপালনীয় কে ইহা স্থির করিয়া দিবেন?

আমার বোধ হয় জাতীয় উন্নতির অন্তরায় যে বিধিনিষেধ তাহা কোন মতেই পালনীয় নহে। কোন্ বিধিনিষেধ জাতীয় উন্নতির অনুকূল ও প্রতিকূল ইহা বিচার কে করিবে? কতকটা নিজে কতকটা জনসাধারণ করিবে। সহজ জ্ঞানে মোটামুটী তার একটা ধারণা হয়। আবার অনেক সময় তার মীমাংসাও কঠিন হয়। রঘুনন্দন যখন নূতন ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন তখন সমাজ ও সনাতন ধর্ম্মের অনুকূলতা প্রতিকূলতাকে বিধিনিষেধের চিহ্ন ধরিয়া লইয়াছিলেন।

তখন সমাজ জীবিত ছিল, শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণ অনায়াসে সদর্পে অন্যান্য অঙ্গকে চালিত করিয়া ছিলেন, এখন শীর্ষ, পদ, হস্ত, উদর সব অঙ্গই স্ব স্ব প্রধান, কে কাহার কথা শুনিবে? ব্রাহ্মণ-সমাজ জীবিত থাকিলে, বর্ত্তমান শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের কেহ না কেহ নূতন রঘুনন্দনরূপে অবতীর্ণ হইতেন এবং বিংশ উনবিংশ শতাব্দীর ভারতকে নূতন উদার নৈতিক ব্যবস্থা দ্বারা চালিত করিতেন এখন "নদে যদি মত দেন, ভাটপাড়া দেবেন না" এইরূপ অবস্থা আর "পিসে যদি ঘরে নেন, মেসো নেবেন না"। বঙ্গদেশের যাবতীয় প্রধান কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচন প্রথানুসারে উদার নৈতিক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে মিলিত করিয়া একটা ধর্ম্ম-মহামণ্ডল গঠিত করিয়া সমাজ ব্যবস্থার ভার দিলে কেমন হয় জানি না। এই সকল পণ্ডিতের বিদ্যাসাগরের মত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবে সমপুষ্ট হওয়া দরকার। শিক্ষিত জনসমাজ এই সভার পশ্চাতে থাকিয়া বল সঞ্চার করিবেন। এই-ই যে

উপায় আর প্রকৃষ্ট উপায় তাহা বলিতেছি না। পাঁচজনে যেমন একটা উপায় আন্দাজ করেন আমিও তাই করিতেছি, ইহার সম্ভব অসম্ভব সম্বন্ধে বলিবার অনেক আছে। কথা হইতেছে একজন শাসক ও ব্যবস্থাপক (ব্যক্তিই হউন বা সভাই হউন) নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। তদভাবে, প্রাচীনের অচলনশীলতা ও নবোর উচ্ছৃঙ্খলতা এই উভয়ের বিরোধ ও সামাজিক অন্যান্য দোষের কোন প্রতিকার নাই। বঙ্গদেশীয় একজন বিখ্যাত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে (বয়স প্রায় ৬০।৬৫) একবার বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে শুনিয়াছি—বক্তৃতাকালে তিনি ধর্ম্মাভাব, মিথ্যাচার, ম্লেচ্ছাচার, শাস্ত্রহীনতা লক্ষ্য করিয়া নব্যদিগকে ঘোরতর গালি দিয়াছিলেন। আমি কেবল বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। ইনি কেন ৫০ উর্দ্ধে বানপ্রস্থ অবলম্বন না করিয়া ৬০,৬৫ বৎসর বয়সে বিষয়াসক্তির চরম দেখাইতেছেন? কে ইহার উত্তর দিবে?

উচ্ছৃঙ্খল উভয়েই, শাস্ত্রজ্ঞ প্রাচীন, ও অশাস্ত্রজ্ঞ অর্ব্বাচীন! কালধর্ম্মই প্রবল, শাস্ত্র ধর্ম্ম নহে। উভয়ে কাল-ধর্ম্মের কবলগ্রস্ত। তথাপি সময়োপযোগী ও অবস্থা উপযোগী সংস্কার করিব না।

(২) সমাজের দ্বিতীয় ব্যাধি প্রধান প্রধান বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে বহু শ্রেণী বিভাগ। ফলে বিবাহের ক্ষেত্র পরিসরের সঙ্কীর্ণতা। বহু বৎসর ধরিয়া কায়স্থদিগের মধ্যে কুলীন, মৌলিক ভেদ, ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে, মেল বন্ধন। এই ক্ষেত্রকে এতই অল্প পরিসর করিয়াছে যে Free intermixture of blood হইতে না পাইয়া জাতি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। আন্তর্ব্বর্ণিক বিবাহ না চলিত হউক, প্রধান বর্ণের মধ্যে শ্রেণী বিচার তুলিয়া দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। যে জাতীর বিবাহ বন্ধন প্রথা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছিল তাহারই এখন অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে! কৌলীন্য প্রথা ইহারই চরম ফল। সৌভাগ্য বলে উহা প্রায় অদৃশ্য হইয়াছে।

(৩) বিবাহের বরপণ প্রথা যে কি পরিমাণ অনিষ্টজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা প্রবন্ধ লিখিয়া বুঝাইতে হয় না। সম্প্রতি ইহার চরম পরিণতি অবিবাহিতা কুমারীদিগের আত্মধ্বংসে দাঁড়াইয়াছে। কঠিন জীবন সংগ্রাম, অর্থাভাবে ক্রমশঃ কঠিনতর দাঁড়াইতেছে। তাহার উপর ভীষণ কন্যাদায় শিক্ষিত, মধ্যবিৎ সম্প্রদায়কে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে! ইহার প্রতিকার কি? মানুষ স্বার্থপর, দরিদ্র মানুষ আরো স্বার্থপর, পতিত অধীন জাতীয় দরিদ্র মানুষ ততোধিক স্বার্থপর। প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করাইয়া ইহার প্রতিবিধান নাই। আর "সমাজ" নামে যে অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অব্যয় শক্তি তিনি কন্যাদায়গ্রস্তের বন্ধু নহেন, শত্রু, কেননা, কন্যাদায় গ্রস্ত যদি অর্থাভাবে সৎ-পাত্রে দিতে না পারায় যদি সে কন্যাকে অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা রাখে তবে তখন "সমাজ" সশব্দ, স্বরূপ ভীষণ ভ্রূকুটী সহকারে তাহার জাতি নষ্ট করিতে উদ্যত।

ইহার প্রতিকার কি? আর্ত্ত রক্ষকের শরণ লয়। যখন সমাজ-রক্ষক ছিলেন আর্ত্ত আশ্রয় লইত অভয় পাইত। এই কন্যাদায়গ্রস্ত দীন ব্যক্তি কার কাছে শরণ লইবে? রাজা পরধর্ম্মী ভারতীয় প্রজার ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না। সমাজ-শাসক কে আছে? এই আর্ত্তকে অভয় দেয়? মুসলমানকে ছুঁইলে গঙ্গাস্নান করিতে হয় বিধান করিয়া-

ছিলেন কে জানি না; কিন্তু তাঁর নিষেধ এখনও কোটী কোটী বাঙ্গালী নতমস্তকে পালন করে; এমন কেহ কি এখন নাই যিনি অমিত প্রতাপে বিধি ব্যবস্থা করিতে পারেন "যে কন্যার পিতার কাছে পুত্র বিক্রয় করিয়া অর্থ লইবে তাহার এই এই প্রায়শ্চিত্ত" এবং সকলে সেই নিষেধ সভয়ে মানিয়া চলিবে?

৪। বাল্য বিবাহ।—বালক ও বালিকাদের বিবাহ কতদিন চলিয়া আসিতেছে জানি না। অতি প্রাচীন যুগে (সে সময়ের শাস্ত্র বিধানের দোহাই পদে পদে দেওয়া হয়) কিন্তু এ প্রথা ছিল না। বাঙ্গালা দেশে কতদিন হইতে ইহা প্রচলিত তাহা জানি না; তবে পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অনেক কমিয়াছে, বিশেষতঃ উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিতদের মধ্যে শৈশব বিবাহ নাই, তবে বাল্য বিবাহ আছে। এখনো যে পরিমাণে আছে তাহাও রোগের প্রধান মূল। অধ্যয়নাবস্থায় সে কালের ব্রহ্মচর্য্যাবস্থা ছিল, অধ্যয়নই এ বয়সের একমাত্র যোগসাধনা ছিল। বিবাহের বয়স আলাদা ছিল। এখন তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছে। অধ্যয়নাবস্থাতেই বিবাহ দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে পিতামাতাই ১৬ আনা দোষী। গৌরীদান ফললাভ, অর্থলাভ, পৌত্রমুখদর্শন সুখলাভ এই ত্রিবিধ লাভ পিপাসাই বাঙ্গালীকে এই বংশ হত্যায় নিয়োজিত করিয়াছে। 'বংশরক্ষা' নহে 'বংশহত্যা'। অপরিপুষ্ট দেহে পুত্রোৎপাদন করিয়া, অপরিপুষ্ট, চিররোগী সন্তান সন্ততির জন্মদান, অর্থাভাবে যাবজ্জীবন তাহাদের পরিমিত আহার ও শিক্ষাদানে অসমর্থতা বশতঃ ভবিষ্যতে তাহাদিগকে অক্ষম ও উপায় হীন অবস্থায় রাখিয়া যাওয়া—ইহা যদি বংশ হত্যা না হয় তবে 'বংশহত্যা' কাহাকে বলে?

শিক্ষা শেষ করিয়া অর্থোপার্জ্জন ক্ষমতা লাভের পূর্ব্বে ২।৪টী সন্তান সন্ততির জন্ম। প্রথমটী যদি কন্যা হইল, তাহা হইলে অর্থোপার্জ্জন করিবার পূর্ব্বেই 'কন্যাদায়' তারপর ঋণ, তারপর অর্দ্ধাশন, তারপর অনশন! মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী যুবকের শতকরা ৮০ জনের এই পরিণাম! তবু পিতামাতা পুত্রদিগের অল্প বয়সে বিবাহ দিতে ইচ্ছুক! উদ্দেশ্য হয়, পুত্র বিক্রয়ে অর্থলাভ, না হয় অত্যন্ত নির্ব্বোধ ইচ্ছা, বংশরক্ষা; অধ্যয়ন শেষ পূর্ব্বে যৌন সম্বন্ধে বদ্ধ হওয়া পাপ ইহা কোন সমাজশাসক বিধিবদ্ধ করিবেন? অপরিপুষ্টাঙ্গ ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকার গর্ভে হীনবীর্য্য ১৯।২০ বৎসর বয়স্ক যুবকের ঔরষে বাঙ্গালায় যে ভবিষ্য বংশ জন্মিতেছে তাহাই কি জাতীয় উন্নতির সূচনা?

এ ঘোরতর জাতিধ্বংসকর কুপ্রথার বিরুদ্ধে কার বজ্রগম্ভীর স্বর উঠিবে, কার নিষেধতর্জ্জনী সদর্পে উত্থাপিত হইবে।

বালিকা বধূ দুর্ভাগ্যক্রমে স্বামী হারা হইয়া চিরজীবনে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিবে আর জরাজীর্ণ বৃদ্ধ তৃতীয় পক্ষে পৌত্রী বয়স্কা কন্যার পানিগ্রহণ করিয়া তার জীবনের সমস্ত সুখ সাধের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে এ বিচিত্র ব্যাপারের কোন প্রতিকার কি হয় না? যে বয়সে বৃদ্ধ ভগবৎ চিন্তায় চিত্ত সমর্পণ করিবে, সেই বয়সে সে পুনর্ব্বার ঘৃণিত ভোগসুখে রত হইবে, আর যার ভোগ সুখের বয়স, সে সেই বয়সে ভোগসুখে বঞ্চিত থাকিয়া প্রবৃত্তির সহিত ঘোর সংগ্রাম করিয়া হয় কুপথে যাইবে, না হয় মাতৃত্ব গৌরব হীন দগ্ধ জীবন নির্ব্বাহ

করিবে এ বিসদৃশ আচারের বিরুদ্ধে শাসন-দণ্ড তুলিবার কে আছে ?

তাই বলিতেছি আমাদের সমাজের প্রধান অভাব একজন সমাজ-শাসকের। সমাজ-শাসক বলিয়া যাঁহাদের গর্ব্ব আছে তাঁহারা সমাজ-শাসক, সমাজ-নিয়ন্তা নহেন, এককালে ছিলেন বটে। নূতন অভাব বুঝিয়া, নূতন প্রয়োজনানুসারে, ভাঙ্গিয়া গড়িয়া নূতন বিধি বিধান করিয়া থাকেন। বিধান করিবার ও শাসন করিবার কে আছে ? কেহ না থাকিলে কর্ণধারবিহীন নৌকার ন্যায় সমাজ উচ্ছৃঙ্খলভাব অবলম্বন করিবে। দূষণীয় প্রথা ও আচারের প্রাবল্য বাড়িবে, জাতীয় জীবন শক্তিহীন থাকিয়া যাইবে।

আমার বিশ্বাস এই ব্রাহ্মণ জাতিই সমাজ-শাসকের পদে থাকিবেন। এখনও ভারতের শতকরা ৯০ জন ব্রাহ্মণকে সমাজগুরু বলিয়া মানে না। কাজেই ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কোন জাতির কর্ত্তৃত্ব ভারতবাসী সহজে মান্য করিবে না। নবযুগের কর্ণধার নূতন ব্রাহ্মণ ভারতে কবে দেখা দিবেন ?

মার্কিণ রাষ্ট্রের ফেডার‍্যাল্ কেন্দ্র

(১১১৭ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

ফেডার‍্যাল্ দরবারের রাষ্ট্র-কেন্দ্র

(১১) তথাকথিত মন্‌রো নীতি

ভারতবর্ষের চরমপন্থী রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকারিগণ রব তুলিয়াছেন "ভারতবর্ষ ভারতবাসীদিগেরই একচেটিয়া কর্ম্মক্ষেত্র থাকিবে—বিদেশীয় জনগণের কর্ত্তৃত্ব কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নয়।" বিদেশীয় দ্রব্যনিচয়ের বয়কট বা বহিষ্কার এই আন্দোলনের এক অঙ্গ। সর্ব্বতোমুখী বহিষ্কারের নীতিকে ইংরাজীতে বলা হয় "India for the Indians." সেইরূপ বিস্তৃত ক্ষেত্রে আজকাল এশিয়ার রাষ্ট্রধুরন্ধরগণ রব তুলিতেছেন—"Asia for the Asiatics" অর্থাৎ এশিয়ায় কোন ইয়োরোপীয় অথবা আমেরিকান জাতির প্রভুত্ব থাকিতে পারিবে না—এশিয়ার বৌদ্ধ মুসলমান ও হিন্দুজনগণ তাহাদের নিজ নিজ সমস্যা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে মীমাংসা করিবে।" এইরূপ বহিষ্কারনীতি ইয়াঙ্কিস্থানেও একটা আছে। সেই ফর্ম্মূলাকে বলা হয় Monroe Doctrine. ঊনবিংশশতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে মন্‌রো যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি ছিলেন। ইনি উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা হইতে ইয়োরোপীয় জাতিপুঞ্জকে বয়কট করিবার জন্য এক সূত্র প্রচার করেন। সেই নীতি ইয়াঙ্কিরা এখনও প্রচার করিতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের যেখানে সেখানে মন্‌রো-নীতির উল্লেখ হয়। স্বদেশের কথা ছাড়িয়া বিদেশের কোন কথা তুলিলেই ইয়াঙ্কিরা এই সূত্র আওড়াইয়া থাকে। ইহাই যুক্তরাষ্ট্রের Foreign Policyএর (পর-রাষ্ট্র-নীতির) প্রধানতম স্তম্ভ।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ওয়াটার্ল্যুর সমরে নেপোলিয়নের অবসান হয়। তাহার পর ইয়োরোপের রাষ্ট্রীয় সীমাগুলি কিছুকালের জন্য স্থির থাকে। এই সময়ে ইয়োরোপীয় নরপতিবর্গ সম্মিলিত হইয়া একটা দরবার স্থাপন করেন। কোন দেশের জনসাধারণকে বিদ্রোহী অথবা প্রজাতন্ত্রশাসনের পক্ষপাতী হইতে না দেওয়াই ইহাঁদের সমবেত স্বার্থ ছিল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লব হইতে ইয়োরোপে যে তাণ্ডব সৃষ্ট হয় তাহার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করাই সেই যুক্ত দরবারের উদ্দেশ্য। এই সম্মিলনীর নাম Holy Alliance (ধর্ম্মসম্মিলন)। রাজারা বুঝিয়াছিলেন,—"প্রজারা democracy, constitution, স্বায়ত্তশাসন ইত্যাদির জন্য বিপ্লব সৃষ্টি করিলে দেশের সর্ব্বত্র অধর্ম্ম ও দুর্নীতি প্রসারিত হইবে। সয়তানের প্ররোচনায়ই জনসাধারণ

এইরূপ রাজদ্বেষী হইতেছে। রাজভক্তিই ধর্ম্মসঙ্গত—বিপ্লবসাধন অধর্ম্মের কথা। অতএব সমাজে ধর্ম্মরক্ষার জন্য রাজাদিগের ব্রতবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। এইরূপ হইলেই ইয়োরোপে রাজতন্ত্রশাসন (monarchy) রক্ষা পাইবে—প্রজাবৃন্দকে দাবিয়া রাখা যাইবে—বিপ্লবের বীজ অঙ্কুরিত হইবার পূর্ব্বেই নষ্ট করিবার সুযোগ সৃষ্ট হইবে।” বিপ্লব ও প্রজাতন্ত্র-শাসন খর্ব্ব করিয়া রাজ-শক্তিকে নিষ্কণ্টক করিবার জন্য নৃপতিগণ ‘ধর্ম্ম-সম্মিলন’ প্রতিষ্ঠা করিলেন।

এ দিকে আমেরিকার নরনারীগণ ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে বিজয়ের সনন্দ লাভ করিয়াছে। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ইয়াঙ্কিরা একটা স্বাধীন প্রজাতন্ত্র-শাসনাবলম্বী যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রবর্ত্তক হইয়াছেন। জগতে প্রজা-তন্ত্রশাসনের প্রতিষ্ঠা এই প্রথম। ফরাসীরা তখনও বিপ্লব সুরু করে নাই। কাজেই ইয়াঙ্কিদিগকে জগতে প্রজাতন্ত্রশাসনের সুফল দেখাইবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতে হইত। ইংরাজেরা ইয়াঙ্কিদিগকে জব্দ করিবার উপায় সর্ব্বদাই খুঁজিতে লাগিলেন। ইয়োরোপের অন্যান্য রাজারাও এই অভিনব বিপ্লবকারীদিগের কাজকর্ম্ম ও রাষ্ট্রপরিচালনা দেখিয়া ভীত হইলেন। তাঁহাদের ভয় পাছে জার্ম্মাণ, ইতালীয়, রুশ ইত্যাদি লোকেরা ইয়াঙ্কিদের দৃষ্টান্তে রাজদ্বেষী হইয়া পড়ে। ইয়াঙ্কি প্রজাতন্ত্রশাসন বাস্তবিকই ইয়োরো-পীয় রাজগণের নিকট একটা উৎপাত স্বরূপ ছিল। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজে ইয়াঙ্কিতে পুনরায় যুদ্ধ বাধিল—ইংরাজেরা পুনরায় হারিলেন—প্রজাতন্ত্রশাসন টিকিয়া গেল। কাজেই যখন “ধর্ম্ম-সম্মিলন” প্রতিষ্ঠিত হইল ইয়াঙ্কিরা বুঝিলেন “ইয়োরোপীয় রাজাদের মরণকালে বিপরীত বুদ্ধি হইয়াছে—ইহাঁরা নিতান্তই বাড়াবাড়ি করিতেছেন।” কিন্তু ইয়াঙ্কিরা তখনও অতি দুর্ব্বল—ঘর সামলা-ইতেই পূরাপুরি সমর্থ নন—কাজেই কোন প্রকার প্রতিবাদ না করিয়া দূর হইতে দেখিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে—১৮২৩ খৃষ্টাব্দে স্পেনের অধোগতি ঘটে। সেই সুযোগে স্পেন-সাম্রাজ্যের দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে থাকে। স্বাধীনতা লাভ করিয়াই জনগণ প্রজাতন্ত্রশাসনের পক্ষ-পাতী হয়। একে বিপ্লব, তাহার উপর স্বায়ত্ত শাসন (republic বা ডিমক্রেসী)। কাজেই “ধর্ম্মসম্মিলনে”র চিন্তায় সয়তানের আস্ফালন এবং ইয়াঙ্কিদের বিবেচনায় কতকগুলি মিত্র-লাভ। স্পেন Holy Alliance এর পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন—“বিদ্রোহী উপনিবেশ-গুলিকে আমার সাম্রাজ্যের বশে আনিয়া দিন।” “ধর্ম্মসম্মিলন” হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন। ইয়াঙ্কি সভাপতি মন্‌রো গম্ভীরভাবে বলিলেন, “খবরদার—আমেরিকা ভূখণ্ডে কোন ইয়োরোপীয়ান হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। ইয়োরোপের মামুলি রাষ্ট্র-নীতি আমেরিকায় প্রবর্ত্তিত হইতে পারিবে না। আমেরিকার লোকেরা আমেরিকার উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ প্রান্তের সকল প্রকার ব্যবস্থা করিতে সমর্থ। আজ পর্য্যন্ত যে সকল ইয়োরোপীয়ানের সম্পত্তি এই নবভূখণ্ডে রহিয়াছে তাহা ভবি-ষ্যতেও থাকিবে। কিন্তু এই মহাদেশের আর এক ছটাক জমিও কোন ইয়োরোপীয়ান্ জাতি নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে পারিবেন না।” এই ইয়োরোপীয়-বহিষ্কার-ঘোষণাই মন্‌রো-নীতি। নানা কারণে “ধর্ম্মসম্মিলন”

স্পেনের সাহায্য করিতে অসমর্থ হইলেন—ঘটনাচক্রে ইংরাজও কতকগুলি স্বকীয় স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য ইয়াঙ্কিদের কথায়ই সায় দিলেন। মোটের উপর মনরোর জয় হইল। ইয়াঙ্কিরা প্রকারান্তরে সমগ্র আমেরিকাখণ্ডের অভিভাবক হইলেন। ইয়োরোপীয়েরা দক্ষিণ আমেরিকা ও মধ্য আমেরিকার দেশগুলি ভাগ বাটোয়ারা করিয়া লইবার অবসর এখনও পান নাই। "The Republics of Central and South America" নামক গ্রন্থের Foreign Relations and commerce অধ্যায়ে Enock বলিতেছেন—"There is little doubt that the partition of various territories of Latin America by certain European powers, would have taken place were it not for the restraining influence of the United States."

ইয়াঙ্কিরা ইয়োরোপ হইতে দূরে থাকিতে ভাল বাসিতেন। যুক্তরাষ্ট্রের পিতাস্বরূপ জর্জ্জ ওয়াশিংটনও ইয়াঙ্কিদিগকে ইয়োরোপ হইতে দূরে থাকিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন—"ইয়োরোপের সঙ্গে ব্যবসায় চালাইবে। কিন্তু কোন ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে কোন প্রকার সন্ধিস্থাপন করিবে না। ইয়োরোপীয়েরা বড় কুচক্রী—উহাদের গোলযোগের ভিতর একবার প্রবেশ করিলে বাহির হওয়া কঠিন হইবে। আমরা শিশুজাতি—আমাদের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিবার জন্য সাবধান হওয়া আবশ্যক। তাহা ছাড়া আমাদের রাষ্ট্রশাসন-প্রণালী জগতে নূতন। পুরাতন সভ্যতার অধিকারীরা এ তত্ত্ব বুঝিবে না। কাজেই উহাদের সঙ্গে আমাদের না মেশাই ভাল।" ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে জর্জ্জ ওয়াশিংটন জনগণকে বিদায় বক্তৃতায় বলেন—

"The nations of Europe have important problems which do not concern us as a free people. The causes of their frequent misunderstandings lie far outside of our province, and the circumstance that America is geographically remote will facilitate our political isolation, and the nations who go to war will hardly challenge our young nation, since it is clear that they will have nothing to gain by it."

সভাপতি জেফারসনও এইরূপ মতই পোষণ করিতেন। পরে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে Holy Allianceএর কার্য্যপ্রণালী লক্ষ্য করিয়া সভাপতি মনরো কংগ্রেসকে লিখিয়া পাঠান—

(১) "We should consider any attempt on their part to extend their system to any portion of this hemisphere as dangerous to our peace and safety.

(২) We could not have any interposition for the purpose of oppressing governments on this side of the water whose independence we had acknowledged or controlling in any manner their destiny by any European power, in any other light than as a manifestation of an unfriendly disposition toward the United States."

ইয়াঙ্কিদের এই চোখ রাঙান দেখিয়াই ইয়োরোপীয়েরা হতভম্ব হইয়া যায় নাই। ইয়োরোপীয়েরা নিজ নিজ গৃহবিবাদ মিটাইতে ব্যস্ত ছিল—এজন্য দক্ষিণ আমেরিকা ও মধ্য আমেরিকার নূতন দেশগুলির ভিতর স্বকীয় সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য বেশী নজর দিতে পারে নাই। ১৮২৩ সালের পর ইয়োরোপের ভিতর তিন চারিটা বড় বড় বিপ্লব সাধিত হইয়া গিয়াছে। সেই সকল সাম্‌লাইয়া উঠিতে পারা সহজ কথা নয়। ইতিমধ্যে জার্ম্মাণ, ইতালীয়, হাঙ্গারীয়ান, রুশ এবং অন্যান্য জাতীয় নরনারী ল্যাটিন আমেরিকার প্রদেশে প্রদেশে বসতি স্থাপন করিয়াছে। এশিয়া হইতে জাপানীরাও ল্যাটিন আমেরিকায় উপনিবেশ বসাইতেছে। ল্যাটিন আমেরিকার ২০ স্বরাজে এই সকল বিদেশীয় বসতি হইতে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় গোলযোগ উপস্থিত হইবে। "মনরো-নীতি"র দোহাই দিয়া ইয়াঙ্কিরা ইয়োরোপীয়ান অথবা এসিয়াটিক পীতজাতিকে হঠাইতে পারিবেন না। সেনাবল এবং নৌবল সাহায্য না করিলে একমাত্র বাক্যবলে জার্ম্মাণ বা জাপানীকে ল্যাটিন আমেরিকা হইতে বিতাড়িত করা অসম্ভব হইবে। মনরো-নীতির বুজরুকি ইয়াঙ্কি ভিন্ন আর কোন জাতি বর্ত্তমান কালে সম্মান করে না। ইয়োরোপীয়ান এবং জাপানী বলিতেছে :—

(১) "প্রজাতন্ত্র-শাসন বা স্বরাজ ইয়াঙ্কিস্থানে আবিষ্কৃত এবং প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সত্য। কিন্তু এই শাসন-প্রণালীর সুফল আজকাল জাপান, ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি, ইতালী ইত্যাদি প্রায় সকল সভ্য-দেশেই জনগণ ভোগ করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া সুইজর্ল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সে ত স্বরাজ আছেই। সুতরাং আজকাল কুশাসনের কথা বলিয়া ইয়াঙ্কিরা এশিয়া ও ইয়োরোপকে নিন্দা করিতে পারেন না। অষ্টাদশশতাব্দীতে আমাদের অসম্পূর্ণতা ছিল স্বীকার করিতেছি। তাহা ছাড়া আর একটা কথাও বুঝা উচিত। ল্যাটিন আমেরিকায় যে সকল তথাকথিত স্বরাজ বা republic স্থাপিত হইয়াছে তাহাদিগকে সত্যসত্যই কি স্বরাজ বলা চলে? ওগুলি ত অরাজ বা anarchy-এর নামান্তর মাত্র! একটা কথার মারপ্যাঁচে সভ্যতর জাতিগুলিকে অসভ্য জনপদের কর্ত্তৃত্ব হইতে বহিষ্কৃত করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

(২) আমরা না হয় নবভূখণ্ডের দেশ দখল করিতে অগ্রসর হইব না। আমেবিকার কোন রাষ্ট্রীয় গোলযোগে আমরা হস্তক্ষেপ করিব না। কিন্তু ইয়াঙ্কিরা কেন পুরাতন ভূখণ্ডের রাষ্ট্রমণ্ডলে নাক গুঁজিতেছেন? চীনে গোলযোগ বাধিল—তাহাতে ইয়োরোপীয়ানদিগের সঙ্গে ইয়াঙ্কিরা যোগ দিলেন! ফিলিপাইন দ্বীপের দেড় কোটি নরনারীকে ইয়াঙ্কি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইল। ইহা কি মনরো-নীতির প্রতিকূল আচরণ নয়? যদি আমাদিগকে আপনাদের মণ্ডল হইতে বাহিরে রাখিতে চাহেন, তাহা হইলে আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র হইতেও আপনাদের বাহিরে থাকা উচিত। কিন্তু দেখিতেছি ইয়াঙ্কি যুক্তরাষ্ট্র আজ কাল এশিয়া ও ইয়োরোপের সকল রাষ্ট্রব্যাপারেই একজন

ইয়াঙ্কিদের আধুনিক Imperialism বা সাম্রাজ্য-নীতি সমালোচনা করিয়া অনেকেই বলিতেছেন—"আর মনরো-নীতির কথা তুলিবেন না। ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রও যে বস্তু ইয়াঙ্কি যুক্তরাষ্ট্র ও সেই বস্তু—এক্ষণে শেয়ানায় শেয়ানায় কোলাকুলি চলিবে!" তার-

পর, ল্যাটিন আমেরিকার সমাস্যাগুলিও বড় সহজ নয়। কথার চটকে বিদেশীয়গণকে ল্যাটিন আমেরিকার স্বরাজগুলি হইতে বাহির করিয়া দেওয়া অসম্ভব মেক্সিকো হইতে চিলি পর্য্যন্ত প্রত্যেক রাষ্ট্রই ইয়োরোপ হইতে টাকা ধার লইয়া থাকেন। ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশীয় লোকের কোটি কোটি টাকা এই সকল দেশে খাটিতেছে অথচ টাকা আদায় করিবার সুবিধা পাওয়া যায় না—কারণ গবর্মেণ্টগুলি প্রায়ই দেউলিয়া থাকে। অধিকন্তু এই সকল দেশে বিপ্লব লাগিয়াই আছে। কাজেই বিদেশীয় ধনী জনগণের জীবন ও ধনসম্পত্তি সর্ব্বদা সুরক্ষিত হয় না। অশান্তি ও অরাজকতার ফলে অনেক সময়েই টাকা মারা যায়।

এই জন্য মন্‌রো-নীতির বিরুদ্ধবাদী ইয়োরোপীয়েরা ইয়াঙ্কি-রাষ্ট্রকে বলিতেছেন—"আমরা ত গায়ে পড়িয়া তোমাদের ল্যাটিন স্বরাজে যাই না। স্বরাজের শাসনকর্ত্তারা এবং জনগণ আমাদের টাকা ধারেন। আমাদিগকে ঐ সকল দেশে লইয়া যাওয়া উহাঁদেরই প্রধান স্বার্থ। অথচ ইহাঁরা সহজে টাকা শোধ দিতে পারেন না। আমরা কি কোন বন্ধক না লইয়াই টাকা ধার দিব? আমাদের ব্যবসায়ীরা কি এতই বেকুব? কাজেই আমাদের রাষ্ট্রসমূহ ল্যাটিন স্বরাজগুলির কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হন। যাহাতে ঘনঘন বিপ্লব উপস্থিত না হয়, যাহাতে দেশের ভিতর সর্ব্বদা শান্তি বিরাজিত থাকে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা আমাদের রাষ্ট্রসমূহের কর্ত্তব্য। এইখানেই বুঝিতেছেন যে, ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অনিবার্য্য। যদি ইয়াঙ্কি যুক্ত-রাষ্ট্র আমাদের জনগণের জীবন ও ধন সম্পত্তি রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করেন তাহা হইলে আমাদের রাষ্ট্রসমূহ ল্যাটিন আমেরিকায় আর হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হইবে না। আপনারা ত মন্‌রো-নীতি জারি করিয়া কাগজে কলমে ল্যাটিন আমেরিকার অভিভাবক এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইয়াছিলেন। এক্ষণে প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে অভিভাবক হউন—উহাদের দেশে শান্তি ও সুশাসনের ব্যবস্থা করুন—উহাদিগকে প্রয়োজনীয় টাকা ধার দিতে প্রবৃত্ত হউন—এবং আমাদের টাকা শোধ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করুন। তবেই বুঝিব মন্‌রো-নীতি রক্ষা করিবার ক্ষমতা আপনাদের আছে। তাহা না পারিলে বৃথা বাক্যাড়ম্বর করিবেন না। দুনিয়ার অন্যত্র যেরূপ হইয়াছে ল্যাটিন আমেরিকায়ও সেই রূপই হইবে—যথাসময়ে ভাগবাটোয়ারা সুরু হইবে।"

বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান কালে মন্‌রো-নীতি বৃথা বাগাড়ম্বর মাত্র। "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।" ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রপুঞ্জ যুক্তরাষ্ট্রের অভিভাবকত্ব আদৌ চাহে না। এই অভিভাবকত্বের ফলে ল্যাটিন আমেরিকা নিরাপদে শৈশব কাটাইয়াছে সত্য—কিন্তু এক্ষণে তাহাদের যৌবনকাল। ইহারা ইয়াঙ্কিদের কর্ত্তামি একেবারে সহ্য করিতে পারে না। Enock বলিতেছেন—

"The attitude of the United States towards Latin America has at times given rise to a feeling of resentment and perplexity on the part of their sensitive southern neighbours." কাজেই ইয়াঙ্কিদের অভিভাবকত্ব আর চলিবে না।

অধিকন্তু ইয়াঙ্কিরা এতদিন ল্যাটিন আমেরিকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদাসীন ও নিরপেক্ষ

ছিলেন। ইঁহাদের নিজের দেশ গড়িয়া তুলিতেই সময় ও অর্থব্যয় যৎপরোনাস্তি হইয়াছে। অন্যত্র দৃষ্টি ফেলিতে ইঁহাদের অবসর হয় নাই। এই জন্য বিদেশীয় ব্যবসায়ীরা ঐ সকল দেশে ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসিয়াছেন। বিদেশীয় টাকায় ল্যাটিন স্বরাজগুলি একপ্রকার কেনা হইয়া রহিয়াছে। ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া ইয়াঙ্কিরা Pan-American Union বা আমেরিকা-সম্মিলনী খাড়া করিয়াছেন। ইঁহারা আর নাকে তেল দিয়া ঘুমাইবেন না মনে হইতেছে—কিন্তু ল্যাটিন আমেরিকার গতি ফিরান এখন অসাধ্য—ওখানে কর্ত্তামি করাও দূরের কথা। বস্তুতঃ আমেরিকা-সম্মিলনীতে ল্যাটিনদিগকে হাতে পায়ে ধরিয়া রাখা হইতেছে।

(১২) নিগ্রো-বিশ্ববিদ্যালয়

নিগ্রোরা বেশ পরিহাসরসিক ও আমোদপ্রিয়। ইহারা গাল ভরিয়া হাসিতে পারে। এই খোলাপ্রাণ নরনারীর সঙ্গে কথা বলিয়া সুখ পাওয়া যায়।

আজ প্রায় একহাজার কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ ও রমণীকে একসঙ্গে দেখিলাম। হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নিগ্রো অধ্যাপক কুকের গৃহে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। সেই উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগ ও কার্য্য-পরিচালনা দেখিবার সুযোগ ঘটিল। প্রায় চারি ঘণ্টা এই কৃষ্ণাঙ্গ কর্ম্মী পুরুষের সঙ্গে কাটাইলাম।

কুকের বয়স ষাট বৎসরের অধিক—কিন্তু দেখিলে বোধ হইবে ৪০।৪৫ বৎসরের অধিক নয়। ইঁহাকে প্রধানতঃ সম্পাদক ও কর্ম্মকর্ত্তার কার্য্য করিতে হয়। এজন্য সর্ব্বদাই ইনি ব্যস্ত। একটা বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সকল দায়িত্ব ইঁহার ঘাড়ে পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া ছাত্র পড়ানও আছে। ইনি Commercial Law এবং International Law এই দুই বিষয়ের অধ্যাপনা করিয়া থাকেন।

লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী, বোর্ডিংগৃহ ইত্যাদি দেখা গেল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীরাও ছাত্রদের সঙ্গে পড়ে। ইয়াঙ্কিস্থানের এই ধরণের স্ত্রীপুরুষ সমন্বিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে Co-educational বলে। রমণী-স্বাধীনতা-প্রার্থী লোকেরা এইরূপ বিদ্যালয়ই পছন্দ করে।

কুক একজন ট্রিনিড্যাডদ্বীপবাসী ভারত-সন্তানের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিলেন। ইনি এখানকার একজন ছাত্র—ইঁহার জন্ম হইয়াছে ট্রিনিড্যাডে—কিন্তু মাতা আসিয়াছেন গাজিপুর হইতে এবং পিতা মান্দ্রাজ অঞ্চলের লোক। হিন্দীতে দুই চারিটা কথা বলিবার ক্ষমতা আছে দেখিলাম। ইনি বলিলেন,—"ট্রিনিড্যাডের হিন্দুস্থানীগণ ক্রমশঃ মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির কথা ভুলিয়া যাইতেছে। ইংরাজী ভাষাই ইহাদের মাতৃভাষায় পরিণত হইবে মনে হইতেছে।" ছাত্রের চেহারা দেখিয়া নিগ্রোর মূর্ত্তি মনে পড়ে না—দেখিবামাত্রই আলাপ হইবার পূর্ব্বে আমি ইহাকে হিন্দুস্থানের লোক বলিয়া সন্দেহ করিতেছিলাম। ইনি এখনও খৃষ্টান নহেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধরণের একজন ভারতসন্তানের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। তিনিও কোন ব্রিটিশ দ্বীপের অধিবাসী। তিনি খৃষ্টান—চাকরী করিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিবার সঙ্কল্প আছে বুঝিয়াছিলাম।

ছাত্রীদিগের বোর্ডিংগৃহ দেখিবার সময়ে একজন বলিলেন—"মহাশয় এই ঘরটা আমাদের ভজনালয়। ইয়াঙ্কিরা ধর্ম্মকথার আলোচনা অত্যধিক করে—উঠিতে বসিতে

ইহাদের মুখে প্রার্থনা শুনিতে পাইবেন। অথচ জীবনে ইহারা নিতান্ত নাস্তিক—ভগবদ্ভক্তি প্রায়ই দেখা যায় না। আমরাও ইহাদের সংস্পর্শে থাকিয়া মৌখিক ধর্ম্ম যথেষ্টই শিখিয়াছি। কিন্তু খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রভাবে আমাদের জীবন উন্নত হইয়াছে কি না বলিতে পারি না।" নিগ্রোরমণী ট্রিনিড্যাডবাসীকে বলিলেন—"এই ঘরে কোন সময়ে প্রার্থনা হয়—কোন সময়ে নাচগান বাজনা হয়!"

বিশ্ববিদ্যালয়ে এঞ্জিনীয়ারিং-বিভাগ এবং চিকিৎসা-বিভাগও আছে। ইয়াঙ্কিস্থানের সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে যতগুলি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এই নিগ্রোপ্রতিষ্ঠানেও ততগুলি লক্ষ্য করিলাম। আসবাব পত্র, সাজান গুছান, পরিচালনা ইত্যাদি সবই এক ধরণের। আদর্শের কিম্বা কর্ম্মপ্রণালীর পার্থক্য কিছুই নাই। নিগ্রোদের কারখানায় আসিলে নূতন কিছু দেখিতে পাইব এরূপ ভাবা ভুল। তবে কলাম্বিয়া, হার্ভার্ড ইত্যাদির সঙ্গে তুলনায় হাওয়ার্ড একটা পাঠশালা মাত্র। অবশ্য খরচপত্র টাকা পয়সা বাহ্যচটক ইত্যাদির কথা বলিতেছি। নিগ্রোবিশ্ববিদ্যালয় কিছু দরিদ্র। এইজন্য যতটুকু প্রভেদ হইতে পারে তাহাই লক্ষ্য করা যায়। শ্বেতাঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গের জাতিগত, চরিত্রগত অথবা মনীষাগত প্রভেদ কিছুই পাই না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যাপেল বা ধর্ম্মমন্দিরে ছাত্র ছাত্রী এবং অধ্যাপকগণ সমবেত হইলেন। এখানকার সভাপতি একজন শ্বেতাঙ্গ—শুনিলাম অধ্যাপকগণের মধ্যেও অনেক শ্বেতাঙ্গ আছেন। কুক বলিলেন—"পূর্ব্বে বহু শ্বেতাঙ্গ ছাত্রও হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িত। গত দশবৎসর হইতে তাহারা এদিকে আর ঘেঁশেন না—সম্প্রতি ১৫০০ শিক্ষার্থীর মধ্যে অধিকাংশই নিগ্রো।" ধর্ম্মমন্দিরে যথারীতি গান ও বক্তৃতা হইল।

সর্ব্বসমেত ১৩০ জন অধ্যাপক ও সহকারী শিক্ষক এখানে কার্য্য করেন। বার্ষিক ব্যয় মোটের উপর ৬০০০০০৲। আমেরিকার হিসাবে এ খরচ অতি সামান্য মাত্র। শুনিলাম সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে এত বড় নিগ্রো-বিশ্ববিদ্যালয় আর নাই। টাস্কেজীতে শিল্পশিক্ষা হয় মাত্র—সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় নাই।

কুককে জিজ্ঞাসা করিলাম—"অধিকাংশ ছাত্র ও ছাত্রীকেই ত কৃষ্ণাঙ্গ বোধ হইতেছে না। কোন কোন মুখের গঠনও শ্বেতাঙ্গ নরনারীর অনুরূপ। এমনকি চুলও কোঁকড়া নয়। কয় পুরুষে এইরূপ বর্ণপরিবর্ত্তন এবং গঠনপরিবর্ত্তন হয়?" ইনি বলিলেন—"আমার কথা বলিতেছি শুনুন। আমি ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশে গোলাম হইয়া জন্মিয়াছি। আমার মাতা নিগ্রো—পিতা শ্বেতাঙ্গ। আমার চেহারা দেখিয়া আপনি কখনই ভাবিতে পারিবেন না যে আমার ভিতর কৃষ্ণাঙ্গের রক্ত আছে। আমার রং পুরাপুরি শ্বেতাঙ্গের রঙের মতও নয়। কিন্তু আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্তই শ্বেতাঙ্গদিগের সদৃশ! দেখুন আমার চুল পর্য্যন্ত আপনার মতই লম্বা। এক পুরুষে দো-আঁসলা নরনারীর এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে। আমি যদি কোন শ্বেতাঙ্গ রমণীকে বিবাহ করিতাম তাহা হইলে খাঁটি শ্বেতাঙ্গ সন্তানের জন্ম হইত। রং বদলান অতি সহজ। চুল বদলাইতে বোধ হয় দুই তিন পুরুষ লাগে। আমার বিশ্বাস, রক্তসংমিশ্রণের সুযোগ যদি বেশী পাওয়া যায় তাহা হইলে গোলামের জাতি বলিয়া একটা পদার্থ পৃথিবীতে থাকিবেই না। আমি এখনই অনেক তথাকথিত শ্বেতাঙ্গের

জন্ম বিবরণ জানি। তাঁহারা আসল গোলামের বাচ্চা। কিন্তু চেহারা দেখিয়া কাহারও ধরিবার সাধ্য নাই।"

উচ্চশিক্ষিত নিগ্রোদের সঙ্গে কথা বলিলে তাঁহাদিগকে কোন একটা নিকৃষ্ট জাতির অন্তর্গত নরনারী ভাবিতে পারা যায় না। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ, ইয়াঙ্কি, ইংরাজ, হিন্দুস্থানী, জাপানী যে জাতীয় শিক্ষিত লোকই হউন না—দেখিতেছি চিন্তাপ্রণালী, কর্ম্মপ্রণালী, রসবোধ, বিচারশক্তি, ইত্যাদি সবই ন্যূনাধিক পরিমাণে একরূপ। অবশ্য বীরপদবাচ্য অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন প্রতিভাবান্ লোকের কথা ছাড়িয়া দিতেছি। কিন্তু সাধারণ উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান যুগে দুনিয়ার সর্ব্বত্রই এক ধরণে হাসে, এক কায়দায় কথা বলে, এক প্রণালীতে সমস্যার সমাধান করিতে প্রবৃত্ত হয়, একই ধরণের সাহিত্য শিল্পে আনন্দ উপভোগ করে। আধুনিক জগতের শিক্ষাপ্রণালী দুনিয়ার সকল লোককেই মোটের উপর এক জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া তুলিতেছে। নিগ্রোসমাজে বিচরণ করিয়া এই ধারণা বদ্ধমূলভাবে লাভ করিলাম। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই জাতির প্রায় প্রত্যেক নরনারীই খাঁটি গোলাম ছিল। অথচ আজ তাহাদের সন্তানসন্ততিরা শিক্ষাপ্রভাবে ইয়াঙ্কি, ইংরাজ, হিন্দু, জাপানীর সঙ্গে সমানভাবে বিশ্বসমালোচনায় সমর্থ।

কুক বলিলেন—"আমাদের এখানে একজন ভারতীয় মুসলমান ছাত্র ব্যবসায়বিদ্যা শিখিয়া স্বদেশে ফিরিয়াছে। শুনিয়াছি সে কোন তৈলের ব্যবসায়ে কর্ম্ম করিতেছে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"দেখিতেছি নিগ্রো ছাড়া অন্যান্য জাতীয় লোকও আপনাদের এখানে আসে?" ইনি বলিলেন—"আমেরিকার অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ও যাহা আমাদের এই হাওয়ার্ডও তাহাই।"

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারাল দরবার হইতে বহন করা হয়। কোন কোন কংগ্রেসওয়ালা এইবার টাকা বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু দেশময় নিগ্রোবন্ধু শ্বেতাঙ্গেরা আন্দোলন করিয়া প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে দেন নাই।

কুক্, বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিভাগ, ঔষধ-প্রস্তুতকরণ (Pharmacy)-বিভাগ এবং দাঁত-বাঁধান-বিভাগ ইত্যাদির সকল ল্যাবরেটরীতে লইয়া গেলেন। অধ্যাপকগণের সঙ্গে আলাপ হইল। একজন বলিলেন—"মহাশয়, কিছু দিন পূর্ব্বে আপনাদের জগদীশচন্দ্র বসু ওয়াশিংটনে উদ্ভিদের প্রাণস্পন্দন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া গিয়াছেন।" নিগ্রোরা চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শিতা দেখাইতেছে। বর্ত্তমান সভাপতি উড্রোউইল্‌সন সম্বন্ধে কুক বলিলেন—"মহাশয়, ইহাঁকে সভাপতি বলিয়া খাতির করিতে বাধ্য। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ইহাঁর প্রতি আমার কোন শ্রদ্ধা নাই। ইনি নিগ্রোদিগের হিতৈষী নহেন। অবশ্য হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা বন্ধ করিবার আন্দোলনে ইনি আমাদের বিরুদ্ধে যান নাই। তাহা হইলে ইহাঁর লোকসমাজে মুখ দেখান কঠিন হইবে যে!"

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

মিলন

মানব স্বভাবতঃ মিলনপ্রয়াসী। আসঙ্গলিপ্সা এত প্রবল বলিয়া মানব সর্ব্বদাই সমাজ গঠন করতঃ একত্রে বাস করিতে ভাল বাসে। এই মিলনের আকাঙ্ক্ষাপ্রণোদিত হইয়া মানব পাঁচজনে একত্রে মিলিয়া সকল সময় কার্য্য করিতে ভালবাসে। ইহার ফলে তাহাদের চিন্তাপ্রবাহ প্রায় এক প্রণালীতে চালিত হয়। সেই জন্যই পাঁচজনে একত্র হইয়া হরিনাম করিতে বসিলেই, চঞ্চলচিত্ত স্থির হইয়া যায় ও সেই অচঞ্চল প্রাণে আরাধ্য বস্তু আসিয়া উদিত হন। যেমন প্রকম্পিত বারিরাশির উপর পতিত চন্দ্রের প্রতিবিম্ব বারিতরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে উত্থিত ও পতিত হয়, সেইরূপ সংসারের নানাচিন্তায় প্রক্ষিপ্তচিত্ত স্থির না হইলে তথায় সচ্চিদানন্দবিগ্রহের উদয় হয় না। স্থির জলে পূর্ণচন্দ্র পূর্ণরূপে গোচরীভূত হয়েন। স্থিরচিত্তে ইষ্টদেবের শ্রীমূর্ত্তি উত্তমরূপে উপলব্ধ হয়েন। পাঁচজনে মিলিত হইয়া একত্রে সঙ্কীর্ত্তন করিতে বসিলেই, পরস্পরের শক্তিতে পরস্পরের বিক্ষিপ্ত চিত্ত স্থির হইয়া যায়। তখন স্বরূপ অনুভূতির পক্ষে কোন ব্যাঘাত ঘটে না। সহস্র জ্বালায় নির্য্যাতিত হইয়া মানব যখন শান্তির আশায় একত্রিত হইয়া মৃদঙ্গ করতালিযোগে ভগবানের গুণগান করে, তখন তিনি নিত্যধাম পরিত্যাগ করিয়া সেই ভক্তগণের মধ্যে উপস্থিত হয়েন তাই নারদকে বলিয়াছিলেন,—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥"

বৈকুণ্ঠ ও যোগীগণের হৃদয়ও তাঁহার নিকট ভক্তসমাগম অপেক্ষা প্রিয়তর নহে।

তথাহি আদি পুরাণে

"মদ্ভক্তাঃ যত্র গচ্ছন্তি তত্র গচ্ছামি পার্থিব।
ভক্তানামনুগচ্ছন্তি মুক্তয়ঃ শ্রুতিভিঃ সহ ॥"

আমার ভক্তগণ যথায় গমন করেন আমিও তথায় গমন করিয়া থাকি। মুক্ত পুরুষগণ শ্রুতিগণের সহিত ভক্তের অনুগমন করেন।

নদীয়ার শ্রীবিগ্রহ তাই জগতে আসিয়াছিলেন। জগতের ভ্রমান্ধ, মায়াকুজ্ঝটিকাজালে আবৃত জীবগণকে তাই এই সঙ্কীর্ত্তনরূপ ভাগবত ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার কারণ বৈকুণ্ঠধাম ত্যাগ করতঃ শ্রীমতীর ভাবকান্তি গ্রহণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিটি যুগ। এই চারিযুগের সাধন-পদ্ধতিও বিভিন্ন প্রকারের। কলির প্রবল পরাক্রমে ধর্ম্ম সঙ্কুচিত হইয়া আত্মগোপন করিলেন, পাপ সম্পূর্ণরূপে জগতে আধিপত্য বিস্তার করিলেন, ভগবান দেখিলেন যে ক্ষীণশক্তি কলিজীব তমঃপ্রধান অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়া পথভ্রষ্ট হইয়া অশেষবিধ কষ্ট পাইতেছে, তাহার উদ্ধারের কোন উপায় নাই। দয়াময়ের প্রাণ জীবের দুঃখে কাঁদিয়া উঠিল। তিনি যে কেবল দয়াময় নহেন,—আবার পূর্ণ প্রেমময়! তাই তাঁহার বিশ্বব্যাপী ভালবাসাপ্রণোদিত হইয়া আত্মসৃষ্টি করিলেন। জীবের দুর্গতি দূর করিতে, পতিতের উদ্ধারসাধন করিতে পতিত উদ্ধারণ পূর্ণরূপে, সশক্তি জগতে অবতীর্ণ হইলেন। ভক্তের মনোবাঞ্ছা

পূর্ণ করিবার জন্য বৃন্দাবনের যুগলরূপ পরিহার পূর্ব্বক সুরধুনীতীরে শক্তি শক্তিমান একত্রীভূত হইয়া মোহন শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইলেন। যাহা কখনও অর্পিত হয় নাই সেই অনর্পিত বস্তু জগতে বিলাইবার জন্য "রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত" হইয়া নদীয়াধামে উদয় হইলেন।

যথা শ্রীরূপ গোস্বামীকৃত বিদগ্ধমাধব নাটকে দ্বিতীয় শ্লোকে—

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতু মুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তি শ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দর দ্যুতিকদম্ব সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥"

পূর্ব্বে আর কখন যে উজ্জ্বল মধুর রস জগতে প্রদত্ত হয় নাই, সেই নিজভক্তি সম্পদ প্রদান করিবার জন্য যিনি কৃপা করিয়া কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন ও যাঁহার অঙ্গকান্তি সুবর্ণকান্তি হইতেও সুন্দর সেই শচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয়কন্দরে সর্ব্বদা প্রকাশিত থাকুন।

চিরদিনের জন্য অনর্পিত যে বস্তু, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে যাহা কখনও অর্পিত হয় নাই, আপনার উপর যে নিষ্কাম ভক্তি সেই অমূল্য ধন বিতরণের জন্য দয়ার্দ্র হইয়া কলিতে অবতীর্ণ হইলেন। দয়াময় আমাদের সম্ভোগের জন্য সর্ব্বস্ব দিয়াছেন কেবল একটি ধনের তিনি ভিখারী। সেটি শুদ্ধা-ভক্তি বা প্রেম। তিনি এই নিষ্কাম প্রেমের ভিখারী, এই প্রেমের বলে গোপীগণ তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। তাই বলিয়াছিলেন "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি।" গোপীপ্রেমে স্বয়ং এত মুগ্ধ যে বৃন্দাদেবীর তপোবন ত্যাগ করিয়া একপদও যাইবার তাঁহার অধিকার ছিল না। তিনি যে ভক্তবৎসল, ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু। কখন প্রকট এবং কখনও অপ্রকট ভাবে গোপীগণের সহিত তাঁহার যে লীলা তাহা নিত্য। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিলেন—

"এখনও সেই লীলা করে শ্যাম রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

যাঁহার ভাগ্য প্রসন্ন, গুরু কৃপায় যাঁহার জড় লোচনের মধ্যে দিব্যদৃষ্টি বিকাশিত, তিনিই সে লীলা বোধগম্য করিতে পারেন, অন্যে পারে না।

তাঁহার লীলা নিত্য। এই নিত্য লীলার মধ্যে ভক্ত তাঁহাকে যেরূপ অনুভব করিতে পারে অন্যরূপে সেরূপ হয় না। ঠাকুর যখন নরভাব পূর্ণরূপে পরিগ্রহ করিয়া নররূপে মর্ত্ত্যভূমিতে লীলা করেন, তখন জীব তাঁহাকে বুঝিতে পারে, নতুবা নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ ব্রহ্ম ধারণা সগুণ সবিশেষ জীবের সাধ্যায়ত্ত নয়। তাই ভক্ত লীলা এত ভালবাসে। মায়ামনুষ্যরূপে মায়ার খেলাঘরে অবতীর্ণ হইয়া মায়ার তরঙ্গে উদ্বেলিত ও শান্ত হইয়া যে লীলা করেন, তাহাই ভক্ত ধরিতে পারে নহিল "আবাঙ্‌মনসো গোচরং" আদিতত্ত্বকে কে ধারণা করিতে সমর্থ হইবে? জীবের পক্ষে তাহা অসম্ভব। এই লীলার মধ্যে ভগবানের ভক্তপ্রীতি বিশেষ পরিস্ফুট।

যখন রাসোৎসব সম্প্রবৃত্ত হইয়া দুই গোপীর মধ্যে দণ্ডায়মান ভগবান নৃত্য আরম্ভ করিলেন, তখন গোপীগণ উভয় পার্শ্বেই প্রাণকান্তকে অবলোকন করিয়া

"এবং ভগবতঃ কৃষ্ণাল্লব্ধমানা মহাত্মনঃ।
আত্মানাং মেনিরে স্ত্রীণাং মানিন্যো
হ্যধিকং ভুবি॥"

শ্রীভাগবত ১০।২৯.৪৭।

"এই প্রকারে অত্যন্তোদারচরিত্র ভগবান্

শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে প্রাপ্তমনোরথ গোপী সকল পৃথিবীস্থ সমস্ত স্ত্রীজাতির মধ্যে আপনাকে গৌরবান্বিত বোধ করিলেন এবং তন্নিমিত্ত মানিনীও হইলেন।"

নিজেকে অধিক মানশীলা মনে করিয়া কিঞ্চিৎ গর্ব্বিতা হইলেন। অমনি অন্তর্য্যামী তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তখন গোপীগণ কি করিলেন, তাহা বলিতেছি কিন্তু তৎপূর্ব্বে আরও কিছু বলিবার আছে।

লীলার মধ্যে ভগবানকে অতি সহজে বুঝা যায় বটে কিন্তু শ্রীমতী ছাড়িয়া কেবল শ্রীমানকে বুঝিতে যাইলে, বুঝা হইবে না। যেমন সুগন্ধ ছাড়িয়া কুসুমকে ধরা যায় না, দাহিকা ছাড়িয়া অগ্নির অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করা যায় না, সেইরূপ একাকী শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিতে গেলে, সে দুর্ব্বোধ্য তত্ত্বে প্রবিষ্ট হওয়া অত্যন্ত দুরূহ হইয়া পড়ে সুতরাং আজ রাধাশক্তি বাদ দিয়া কৃষ্ণকে বুঝা যাইতে পারে না। রাধা-শক্তি ধরিয়া শক্তিমানকে পাওয়া যাইবে কারণ "শক্তি শক্তি মাতারভেদঃ"। শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। ভক্তের মধ্যে ভগবানেব পূর্ণ বিকাশ বলিয়া ভক্তের ভিতর দিয়াই ভগবানকে সুস্পষ্ট বুঝা যায়। তাই আজ শ্রীমতীকে বাদ দিয়া শ্রীমান্‌কে বুঝা কঠিন হইয়া পড়ে।

ভগবানের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময়। সৎ চিৎ ও আনন্দ, এই তিন লইয়া শ্রীবিগ্রহ। সৎ অর্থাৎ সত্ত্বা, চিৎ অর্থাৎ চৈতন্য এবং আনন্দ অর্থাৎ হ্লাদিনী পরাশক্তি। এই তিন লইয়া ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি। সত্ত্বা ও চৈতন্যের লয় হ্লাদিনী শক্তিতে হয় কারণ আনন্দই আদি। সত্ত্বার আদিস্থান আনন্দ কারণ আনন্দই সৃষ্টির মূল। যথা "আনন্দাৎ খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন যাতানিজীবন্তি" ইত্যাদি শ্রুতি। সত্ত্বার স্থিতি ও গতি আনন্দে এবং চৈতন্যও সেই সত্ত্বার প্রধান বিকাশ বলিয়া চৈতন্যও আনন্দের মধ্যে আছে। সুতরাং আজ সত্ত্বা চৈতন্য ও আনন্দ লইয়া যে শ্রীবিগ্রহ তাহারও পরিণাম সেই আনন্দ তাই আজ শ্রীমতীকে বাদ দিয়া শ্রীমানকে বুঝা যায় না। তাই বলিতেছিলাম সত্ত্বা ও চৈতন্যের লয় হ্লাদিনীতে হয়। এই হ্লাদিনী শক্তির ঘনমূর্ত্তি শ্রীমতী রাধিকা। তাই শুধু কৃষ্ণ বুঝা কঠিন কিন্তু শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল বুঝা সহজ। সত্ত্বা ও চৈতন্য লইয়া যে শ্রীবিগ্রহ তাহার পূর্ণতা আনন্দে —এই আনন্দ ঘনমূর্ত্তিই শ্রীমতী রাধিকা— সর্ব্বার্থসাধিকা—ভক্ত-মনোবাঞ্ছা-পূর্ণকারিকা! তাই ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ দেখিলে বুঝিতে পারে না —শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তি তাহার নিকট বড় প্রীতিপ্রদ! তাই—

"রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডল মণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥"

শ্রীভাগবত ১০.৩০.৩

"মণ্ডলরূপে অবস্থিত দুই দুই গোপীর মধ্যে একৈকরূপে প্রবিষ্ট অতএব সকল গোপীই যাঁহাকে নিজের নিকটস্থ মনে করিতেছিলেন, সেই যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সমালিঙ্গিত গোপীদিগের মণ্ডলসমূহে সুশোভিত রাসোৎসব আরব্ধ হইল।"

এক গোপী এক কৃষ্ণ এইরূপে মণ্ডলাকারে নৃত্যশীলা গোপীগণ উভয় পার্শ্বে শ্রীমানকে দর্শন করিয়া মনে করিলেন তবে আমাকেই সর্ব্বা-পেক্ষা অধিক মান দিয়াছেন। কিঞ্চিৎ গর্ব্ব হইলে—

"তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত॥"

শ্রীভাগবত ১০।২৯।৪৮।

যাই গর্ব্ব হওয়া অমনি শ্রীমান অন্তর্ধান করি-লেন। তখন—

"অন্তর্হিতে ভগবতি সহসৈব ব্রজাঙ্গনাঃ।
অতপ্যং স্তমচক্ষাণাঃ করিণ্য ইব যূথপম্॥"

"এইরূপে অকস্মাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে, তাঁহার অদর্শনে ব্রজসুন্দরীগণ যূথপতির অদর্শনে করিণীগণের ন্যায় সন্তপ্ত হইয়াছিলেন।"

শ্রীমান অন্তর্হিত হইলে, যূথপতিকে হারাইলে করিণীর যে দশা হয়, গোপীগণেরও সেই দশা উপস্থিত হইল। তাঁহারা দশদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, তৃণ, পুষ্প, মেদিনী প্রত্যেককে মিনতি করিয়া আপন প্রাণকান্তের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। যখন কেহ কিছু বলিল না তখন তুলসীদেবীর নিকট উপস্থিত হইলেন।

"কচ্চিৎ তুলসি কল্যাণী গোবিন্দ চরণ প্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈ বিভ্রদ্দৃষ্ট স্তেঽতি প্রিয়োঽচ্যুতঃ॥"

"হে কল্যাণী, গোবিন্দচরণ প্রিয়ে তুলসি, তুমি কি তোমাকে সর্ব্বদা ধারণকারী ও তোমার অতিশয় প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছ?"

তিনিও যখন সন্ধান দিলেন না, তখন তাঁহারা ভগবল্লীলাভিনয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। এই লীলার মধ্যে ভগবানকে সহজে বুঝা যায়।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাভিনয় করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সহসা শ্রীমানের পদচিহ্ন কাননমধ্যে পরিদৃশ্যমান হইল। তখন সকলে সোৎসুকে সেই পদচিহ্ন দর্শন করিয়া বিভোর হইয়া দরদরিতধারে রোদন করিতে করিতে, সেই ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাঙ্কিত দেবমুনিন্দ্রবাঞ্ছিত শ্রীচরণচিহ্ন দর্শন করিয়া তদনুসরণে বনমধ্যে যাইতে যাইতে সহসা শ্রীমতীর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। রাসলীলায় প্রবৃত্ত ভগবান রাধারমণ শ্রীমতীকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীমানের পদচিহ্ন দেখিতে দেখিতে শ্রীরাধিকার পদচিহ্ন সম্মিলিত তদীয় পদচিহ্ন দেখিতে পাইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "এ কাহার পদচিহ্ন?"

"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয় দ্রহঃ॥"

"শ্রীকৃষ্ণের সহিত সমাগত এই রমণী নিশ্চয় ভগবান হরির বিশেষ আরাধনা করিয়াছেন; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ইহাঁর প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক একান্তে ইহাঁকে লইয়া আসিয়াছেন।" এক্ষণে রোরুদ্যমানা বৃষভানু-নন্দিনীকে দর্শন পাইয়া গোপীগণ আরও হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন। যে শ্রীমতীকে লাভ করিবার জন্য শ্রীমানের কত আগ্রহ, যাঁহার অদর্শনে শ্রীমান দশদিক অন্ধকার দেখেন, সেই শ্রীমতীকেও ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তবে কি হইবে? কি করিলে কোথায় যাইলে প্রাণনাথের দর্শন পাইব? তখন সকলে সমস্বরে শোকসূচক স্তবগীতি আরম্ভ করিলে শ্রীমান পুনরাবির্ভূত হইলেন

"তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্মরমানঃ মুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধর স্রগ্বীঃ সাক্ষাৎ মন্মথ মন্মথঃ॥"

তখন গোপীগণ তাঁহাকে পাইয়া পূর্ণমনোরথ হইলেন, ও রাসানন্দে দেহ-মনপ্রাণ ঢালিয়া দিলেন—তাঁহাদের সত্ত্বা—দেহাত্মবুদ্ধি, ও চৈতন্য সমস্ত বিলুপ্ত হইয়া আনন্দমূর্ত্তিতে সেই রাস-মণ্ডপে প্রকটীভূত হইল। তাই বলিতে ছিলাম শক্তি ছাড়িয়া শক্তিমান্‌কে বুঝা যায় না। যতক্ষণ শ্রীমতীর সহিত গোপীগণের সাক্ষাৎকার হয় নাই ততক্ষণ শ্রীমানের কোন উদ্দেশ ছিল না, যাই শ্রীমতীর দর্শন পাইলেন, অনতিবিলম্বে শ্রীমানও আসিয়া জুটিলেন। তাই ভক্ত যুগল এত ভালবাসে।

লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের নরলীলায় তিনটি স্তর

আছে। যথা কুরুক্ষেত্রের লীলা, পুরদ্বয়ের অর্থাৎ দ্বারকা ও মথুরালীলা, এবং শ্রীবৃন্দাবন লীলা। কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ দেখিলে ভক্তের প্রাণ শীতল হয় না, পরন্তু ব্যথিত হয়। কুরুক্ষেত্রে ঠাকুর পূর্ণভাবে লীলা করিয়াছেন। দ্বারকা ও মথুরা লীলার কিছু মধুরতা আছে, তাই সে লীলা পূর্ণতর ও শ্রীবৃন্দাবনের লীলা সর্ব্বমাধুর্য্যময় তাই পূর্ণতম। পূর্ণতম প্রেমের তরঙ্গে পূর্ণ প্রেমময়ী ক্রীড়াপরায়ণা। এই ভাব চিন্তা করিলেও হৃদয় পরিশুদ্ধ হইয়া দেবত্ব আনয়ন করে।

শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিতে হইলে তাঁহার পরাশক্তি শ্রীরাধিকাকে বুঝিতে হইবে। শ্রীরামচন্দ্র জানকী দেবীর মধ্য দিয়াই অধিক পরিস্ফুট। জগজ্জননী আদ্যাশক্তি না থাকিলে জগদ্‌গুরু শঙ্করকে কে বুঝিতে পারিত? তাই শাস্ত্র বলিতেছেন—

"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।"

শ্রীকৃষ্ণের শক্তি রাধা, রামশক্তি জানকী এবং বিশ্বশক্তি মহামায়া। এই শক্তি ত্যাগ করিয়া শক্তিমানকে বুঝা যায় না। যতক্ষণ গোপীগণ শ্রীরাধাকে পান নাই, ততক্ষণ কৃষ্ণান্বেষণের উপায়ও তাঁহাদের নিকট বোধগম্য হয় নাই। যাই শ্রীরাধাসঙ্গ মিলিল অমনি শ্রীমান উদিত হইলেন। তাই যুগল না হইলে বুঝা বড় কঠিন—বুঝা যায় না।

ভক্ত এই যুগল লইয়া কত বিলাস করেন। এই পূর্ণতম বিলাসমূর্ত্তি মাত্র শ্রীবৃন্দাবনে ব্রজদেবীগণ প্রত্যক্ষ করিতেন। তাই কুরুক্ষেত্রের মূর্ত্তিতে ভক্তের প্রাণ শান্ত হয় না। ভক্ত সে মূর্ত্তি দেখিয়া ব্যথিত, ক্ষুব্ধ হয়। ভক্ত চায় শুদ্ধা প্রেম, কামনাহীন ভালবাসা। অতীন্দ্রিয়, কামগন্ধহীন, নির্ম্মল ভাস্কর সম দীপ্তিমান উন্নতোজ্জ্বল রসসংযুক্ত এই প্রেম, ভক্তের হৃদয়ানন্দদায়ক! প্রাণ মাতান—মন ভুলান ধন! এই প্রেমের আস্বাদে ভক্ত বিভোর হইয়া যায়। এই প্রেমানন্দে মগ্ন হইয়া ভক্ত আপনার অস্তিত্ব ও জ্ঞানহারা হইয়া কেবল আনন্দানুভূতির সঙ্গে সেবানন্দ উপভোগ করে। তাই বলিতেছিলাম, সৎ-ও চিৎ এই দুইয়ের লয় আনন্দে! আনন্দই পূর্ণতম, আনন্দই সর্ব্বসার! এই আনন্দের জননী কৃষ্ণপ্রেম যাহা, তাহাও এই যুগল লইয়া, শক্তি শক্তিমান লইয়া। যুগলের মিলনে এই আনন্দের উৎপত্তি। এই মিলনরূপ ভক্ত আপন হৃদয়মন্দিরে অধিষ্ঠিত করিয়া প্রেমনয়নে দর্শন করেন ও বিভোর হইয়া যান। দেহজ্ঞানও থাকে না। এই সেবানন্দ লইয়া ভক্ত আজীবনের সাধ মিটান ও পূর্ণপ্রেমে প্রেমময়ের চরণে হৃদয় সমর্পন করিয়া মায়া পরাহত করেন। এই আনন্দলীলাই ভক্তের হৃদয়ধন—ভক্ত এই লীলা সম্ভোগ ব্যতীত জীবনধারণ করিতে পারেন না। যেমন মীন বারি ব্যতীত জীবন ধারণ করিতে পারে না, সেইরূপ তদ্গতপ্রাণ দীনভক্ত, দীনবৎসল, ভক্তের হৃদয়ধনকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তও জীবিত থাকিতে পারে না। তাই ভক্তের মানসের অভিলাষ পূর্ণ করিতে সময়ে সময়ে ভক্তপ্রাণ ভক্তমনোরঞ্জনরূপে প্রকট হয়েন। প্রকট ও অপ্রকট উভয় অবস্থাতেই এই লীলা নিত্য। লীলায় নিত্যত্ব আছে বলিয়া এই বিশ্বও আছে। লীলার ছলে ভগবান এই বিশ্ব বিকাশ করিয়াছেন।

তাহা হইলে এখন দেখা যাইতেছে যে এই যুগলরূপই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ – এই যুগলেই সৃষ্টি অবস্থিত ও লয় প্রাপ্ত হয়। তাই শ্রীভাগবৎকার বলিতেছেন—

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতর
তশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্।
তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদি কবয়ে
মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো
যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা।
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং সত্যং
পরং ধীমহি॥"

যাঁহা হইতে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে, সদসৎ সর্ব্ব পদার্থে সদসৎরূপে যাঁহার সত্তারই উপলব্ধি হয়, যে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, দেবাদির দুর্ব্বোধ্য বেদও অন্তর্য্যামীরূপে আদিজ্ঞানবান্ বিরিঞ্চির হৃদয়ে নিহিত করিয়াছেন; মরীচিকাদিতে জল ভ্রমের ন্যায়, জলে কাচ ভ্রমের ন্যায়, যাঁহার পরম সত্তায় অধিষ্ঠিত মায়াময় সৃষ্টিত্রয়কেও সত্য বলিয়া প্রতীতি হইতেছে, সেই মায়াতীত সদা স্বীয় প্রভাবে দেদীপ্যমান সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে আমরা ধ্যান করি।"

"অন্বয়াদিতরতঃ"—শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন "যদ্বা অন্বয় শব্দেনানুবৃত্তিঃ ইতরশব্দেন ব্যাবৃত্তিঃ" তাহা হইলে কি বুঝা যাইল? "অন্বয় ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা" যে বস্তু অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা অর্থাৎ অনুবৃত্তি ও ব্যাবৃত্তি দ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকে। এই বিপ্রলম্ভ ও মিলন মূর্ত্তি, এই মিলন ও বিচ্ছেদ লইয়াই এই বিশ্ব।

যাঁহা হইতে এই বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও লয়, সেই কপটতাহীন পরম সত্যকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস এই ভগবল্লীলা বর্ণন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই যুগলকিশোরই বিপ্রলম্ভ মূর্ত্তি। তাই বৈষ্ণব কবি গাহিলেন—

"রাধাকৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তি রস্মা
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং
গতৌ তৌ"

শ্রীরূপগোস্বামীকৃত কড়চা।

"শ্রীকৃষ্ণের প্রেমভাবরূপিণী হ্লাদিনী শক্তির নাম রাধা। রাধাকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতে অভিন্নাত্মা হইলেও পূর্ব্বে দ্বাপর যুগে শ্রীবৃন্দাবনে লীলার্থে পৃথক্ শরীর হইয়াছিলেন।"

একাত্মা হইয়াও লীলার ছলে ভিন্ন দেহ হইয়াছিলেন। এই বিপ্রলম্ভমূর্ত্তি কালিন্দীর কলনিনাদি সলিলরাশির, লতাবিটপী শোভিত যমুনাতীর সমাশ্রয়ী নিকুঞ্জবনের ও বৃন্দাবনের প্রতি কাননের শোভা শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়া ভক্ত মনোরঞ্জনের জন্য বিহার করিয়াছিলেন। এই বিরহমূর্ত্তিই শ্রীবৃন্দাবনের প্রেমের পূর্ণ বিকাশ!

সারানিশা বাসকসজ্জা করিয়া শ্রীমতী শ্রীমানের জন্য অপেক্ষা করিয়াও যখন প্রত্যূষ সময়েও ফিরিলেন না, তখন শ্রীমতীর মর্ম্মন্তুদ সেই কাতর দৃষ্টি, বিরহাতিশয্যে তাঁহার সেই কমনীয় বক্ষের স্ফীতভাব, ভগবান বিরহে ভক্তের কাতরতা জগৎকে শিখাইয়াছে। সে যে কি ব্যাকুলতা, এই আসে এই আসে করিয়া সেই উৎকণ্ঠা, আর কিসের সহিত তুলনীয় হইবে? রাধার বিরহজ্বালার উপমা রাধার বিরহ জ্বালা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। এ মর জগতে এমন কোন ভাষা নাই যদ্দ্বারা তাঁহার হৃদয়ের আকুল নিশ্বাস অভিব্যক্ত করা যাইতে পারে। এই বিচ্ছেদমূর্ত্তি ভক্তের প্রীতিপ্রদ হইলেও—ভক্ত যেন আরও কিছু চায়। মিলন প্রয়াসী জীব যেন আরও কিছুর জন্য আকুল হৃদয়ে বসিয়া আছে। যমুনারতটে, বসন্তানিল প্রকম্পিত বৃক্ষরাজীর

তলে, বৃন্দাবনের মধুরিমাময় কুঞ্জকানন মাঝে যে যুগলমূর্ত্তি ভক্তের হৃদয় মন আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, তাহা ছাড়া সে যেন আরও কিছু চায়—আরও নিকট চায়। অত প্রভেদ তাহার ভাল লাগে না। সে মিলনের জন্য উন্মুখ। এই বিপ্রলম্ভ বা বিচ্ছেদ মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে, বৃন্দাবনের সেই মধুর কাননের মধুময় কুসুমবেষ্টনে বেষ্টিত সেই যুগলকিশোর মূর্ত্তি দেখিয়া ভক্ত বিভোর হইয়া যায় কিন্তু তাহার শ্রবণের পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা যেন মিটে না। কিছু যেন বাকী রহিয়া যায়। সে যেন আরও কিছু চায়! আরও নিকট—হৃদয়ের আরও কাছাকাছি! শ্রীমতী শ্রীমানে অত দূরত্ব তার ভাল লাগে না। সে মিলন চায় কারণ স্বভাবতঃ সে মিলন প্রয়াসী, তাই সে দুই দেহ চায় না। তাই সে যমুনাতীর হইতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া সুরধুনীর-তীরে আসিতে চায়। তাই সে নদীয়া নগরের প্রান্তে মিশ্র জগন্নাথদেবের বাটীর সন্নিকটে উপস্থিত হইতে চায়। ভক্তের এই আগ্রহাতিশয্য তাঁহাকে আজ মিলনমূর্ত্তিতে প্রকট করিয়াছে।

তাই—

"চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং।
রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং॥"

ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে, ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু আজ মিলন মূর্ত্তিতে প্রকট হইলেন। যুগলকিশোর আজ একাধারে মিলিত হইয়া অপরূপ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে ভক্তনয়নে উদিত হইলেন। আজ ভক্তের প্রীতি শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়া ভক্তপ্রাণ ভক্তমনোমোহন-রূপে নদীয়াধামে প্রকট হইলেন। দুঃখের পর সুখ যেমন বড়ই আরামপ্রদ হয়, সেইরূপ বিপ্রলম্ভ মূর্ত্তির পর এই মিলন মূর্ত্তি "বাহু রাধা অন্ত কৃষ্ণ" মূর্ত্তি ভক্তের প্রাণ শীতল করিয়া অমিয় স্রোতে জগৎকে স্নাত করাইল। অবিরাম প্রেম প্রবাহে জগৎ ভাসিয়া গেল। পাপ মলিনতা বিধৌত হইয়া বিমল আনন্দ জ্যোতিতে দিক্‌চয় জ্যোতিষ্মান হইল, গ্রহ-নক্ষত্রাদির শোভা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া যেন লোকলোচনের তৃপ্তিসাধন করিল। প্রকৃতির হাস্যময়ী বদনে অবিরাম যেন নাম-ধারা বহিতে লাগিল। বিহঙ্গনিচয় স্বীয় মধুর কাকলি লহরীতে দিক মুখরিত করিয়া মনোসাধে আকাশের বিশাল বক্ষে বিচরণ করিতে লাগিল। পশু পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি, স্থাবর, জঙ্গম, মনুষ্য, তীর্য্যগ, সকলে নাম-ধারায় সিক্ত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল। বহু দিনের সঞ্চিত, বহু কুক্রিয়া কালিমার মলিনতা বিদূরিত হইয়া ধরিত্রী নবশোভায় শোভমানা হইয়া ভক্ত হৃদয়ের তৃপ্তি সাধন করিল। পূর্ণিমার নিশিতে চন্দ্র গ্রহণের সময় হরিনাম স্রোতের মধ্যে মিশ্রপাদ জগন্নাথ দেবের প্রাঙ্গণের নিম্ববৃক্ষ তলে যে অদ্ভুত শিশু ভূমিষ্ট হইল, সেই শিশুর প্রভাবে কলি পরাহত ও কলিজীব মুক্তির সোপান পাইয়া ধন্য হইল। ভক্তের কাতর আহ্বানে ভক্ত-প্রাণ নিত্যধাম পরিত্যাগ করিয়া আজ ভক্ত-বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে জগতে অবতীর্ণ হইলেন। সেই অদ্ভুত শিশু বাল্য চাপল্য বশতঃ সমবয়স্ক শিশুগণের সহিত ক্রীড়া পরায়ণ। ভক্ত নির্ণিমেষ লোচনে দেখিয়া বিভোর হইতেছে। ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে চাপল্য বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শচীমাতা আর শাসনে রাখিতে পারেন না। তাড়না করিলেই উৎসৃষ্ট দ্রব্যের উপর গিয়া বসেন ও হাস্য করেন। ভক্ত দেখিতেছে—ক্রমে পাঠাভ্যাস। পাছে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপের ন্যায় এ সন্তানও

সন্ন্যাসী হয় এই ভয়ে মিশ্রপাদ সন্তানকে মূর্খ করিয়া রাখিবার মনস্থ করিলেন। শ্রীপাদ গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে অবশেষে পাঠ সমাপন। পরে পিতৃকার্য্য করিতে ৺গয়াধামে প্রয়াণ। পরে প্রেমের পশরা মাথায় লইয়া ৺গয়াধাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন ও অদ্ভুত কৃষ্ণ-প্রেমবিলাস। কৃষ্ণপ্রেমবিলাসে বিভোর চিত্ত নিমাই পণ্ডিত ক্রমে হরিগুণ গান আরম্ভ করিলেন। সঙ্কীর্ত্তনের প্রবাহে জগৎ ভাসাইয়া, পাপ বিধৌত করিয়া, ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সুধাস্রোত ছুটাইয়া দিয়া, আচণ্ডালে প্রেম বিলাইলেন। সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া কলিহত জীবের সহজ সাধনার পথ দেখাইয়া দিলেন। এবং ভগবানের জন্য ভক্তের যে তীব্র অনুরাগ তাহা নিজে আচরিয়া জগৎগুরু জগৎকে শিক্ষা দিলেন। রাধাভাব পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিয়া, সেই ভাবে জগৎকে মাতাইলেন। "নেড়ার" সাধন হুঙ্কারের ফল ফলিল। প্রেম স্রোতে জগতের পাপ কল্মষ বিদূরিত হইল। কলির এই সাধনের পথ দেখাইয়া, আলৌকিক প্রেম নাট্যের অভিনয় করিয়া নট নাগর জগৎ বিমোহিত করিলেন। সেবারূপী দয়াল নিতাই চাঁদকে দ্বারে দ্বারে প্রেম ভিক্ষা দিতে পাঠাইলেন। প্রহৃত হইয়া প্রেম দেয়, আলিঙ্গন করে, এমন দয়াল ঠাকুর আর কখনও কি দেখিয়াছ—আর কোথাও কি দেখিয়াছ? না দেখিয়া থাক, চল ভাই একবার নদীয়া নগরে, দুই ভাই এসেছে—

"যাদের হরি বল্‌তে নয়ন ঝরে
(নদীয়ায়) তারা দুভাই এসেছে রে;
যারা মারখেয়ে প্রেম বিলায়
(নদীয়ায়) তারা দুভাই এসেছে রে।
যারা মা যশোদার প্রাণের নিধি
যারা আচণ্ডালে কোল দেয়
যারা জাতির বিচার করে নারে
(নদীয়ায়) তারা দুভাই এসেছে রে।"

আর ভয় কি? কোন কৃচ্ছ্র সাধনার প্রয়োজন নাই। কেবল হরিনাম কর, নাম করিতে করিতে নামীর উদয় হইবে। তখন একাধারে এই মিলন মূর্ত্তিতে নাম ও নামীর দর্শন করিয়া জন্মধারণ সার্থক করিব। বার বার গতায়াত ঘুচিবে—পুনঃ পুনঃ জঠর যন্ত্রণা ভোগের অবসান হইবে।

জীব স্বভাবতঃ মিলন প্রয়াসী বলিয়া ভক্তের মনোবাসনা মনে মনে বুঝিয়া আজ দয়াময়, প্রেমময় হরি, মিলন মূর্ত্তিতে ভক্তের সমীপে সমুপস্থিত। এস ভাই সকলে মিলিয়া সমস্বরে একবার বলি

"ভজ ভাই নিতাই গৌর রাধে শ্যাম
জপ হরে কৃষ্ণ হরে নাম।"

এমন মধুর নাম আর হবে না, এমন দীনদয়াল ঠাকুর আর পাবে না। যম যন্ত্রণা ঘুচিয়া যাইবে। প্রাণে শান্তি পাইবে। ত্রিতাপে আর পুড়িতে হইবে না।

গুরুপদে প্রার্থনা, যেন এই নাম লইয়া অমিয়ময়, তারকব্রহ্ম নাম লইয়া জগৎ ত্যাগ করিতে পারি। "নামৈব কেবলং" ইহা ভিন্ন গতি নাই।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু।

শ্রীকৃষ্ণের সংসার

(১০৬৪ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

শ্রীগীতায় ভগবান স্বয়ং বলিতেছেন :—

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি
মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাৎ যোগী
ভবার্জ্জুন।
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মৎগতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো
মতঃ॥"

তুমি কর্ম্মে বা ধর্ম্মে যোগে বা জ্ঞানে তাহাকে স্থাপন করিয়াও তজ্জন্য আনন্দ পাবে না কারণ যদি তাহা হইত ব্রহ্মা মোহিত হইতেন না; অথবা শৌনকাদি ঋষিগণ পূর্ব্বে জ্ঞান বা কর্ম্ম কাণ্ডে থাকিয়াও তাহাকে যখন পাইলেন না তখন কাতরভাবে সূতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; অতএব আর্ত্ত হও কাতরভাবে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ কর পাইবে নিশ্চয় পাইবে।

অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই—

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন :—

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে"

যে জন তাঁহাকে পাইবার জন্য কাঁদে, প্রাণের আকুলতা জানায় তিনি তাঁহাকে কৃপা করেন। যেমন বালকের ক্ষুধার উদ্রেক হইলে সর্ব্বপ্রকার ক্রীড়াকৌতুক হইতে নিবৃত্ত হয়; এবং মাতৃক্রোড়ই বিশ্রাম নিকেতন ও মাতৃস্তনই ক্ষুধা নিবারণের উপায় জানিয়া, কেবল ক্রন্দন মাত্র সম্বল লইয়া জননীর সন্নিধানে অগ্রসর হইতে বাসনা করে এবং সহজেই তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, ভক্ত সেইরূপ গুরুমুখে সেই ভক্তবৎসলের উদ্দেশ পাইয়া নিজ তৃপ্তি সাধনের জন্য বৈরাগ্যকে মাত্র অবলম্বন করিয়া কাতর হৃদয়ে মর্ম্মবেদনা জানাইতে থাকে। স্নেহময়ী জননী যেমন স্তন্যপান করাইয়াই ক্রন্দন থামাইবার জন্য নানাপ্রকার আবদার সহ্য করেন, ভগবানও ভক্তের হৃদয়-মন্দিরে উদিত হইয়াও মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য বাহিরেও নিজ লীলা ঐশ্বর্য্যাদি অনুভব করান; তাই শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ভক্তের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলেন কিন্তু চতুর্ব্বেদী ব্রহ্মা দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন; নিজের মায়া প্রকাশ করিতে গিয়া মহামায়াবী শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়া ভাবিতেছেন—একি? যেমন দিবসে সূর্য্য কিরণে খদ্যোত পৃথক প্রকাশ হতে পারে না; যেমন অন্ধকার রাত্রে হিম কণার পার্থক্য বুঝিতে পারা যায় না সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের মায়ার নিকটে ব্রহ্মার মায়া কিছুই নয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কারণ "তেনে ব্রহ্ম হৃদয়ে যা আদিকারে" তিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশ আছেন বলিয়াই ব্রহ্মা আজ প্রকাশমান বলিয়া বোধ হইতেছে। অনন্তর ব্রহ্মা নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া গদগদবচনে বলিয়াছিলেন :—

"নৌমীড্যতে ঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়,
গুঞ্জাবতং সে পরিপিচ্ছলায়।
বন্যস্রজে কবল বেত্রবিধান বেণু লক্ষশ্রিয়ে
মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়॥"

হে ঈড্য স্তবনীয়! আপনাকে প্রসন্ন

করাইবার জন্ম আপনারি স্তব করিতেছি। হে প্রভো! আপনার শরীর নব নীরদের ন্যায় শ্যাম বর্ণ। তদীয় বসন বিদ্যুৎ সদৃশ পীত, গুঞ্জার কর্ণভূষণ এবং ময়ূরপুচ্ছের শিরোভূষণে আপনার বদন অতিশয় শোভমান, আপনার গলদেশে পত্র পুষ্পাদিময়ী মালা কবল বেত্র বিষাণ ও বেণু প্রভৃতি লক্ষণে সুলক্ষিতা তোমার অঙ্কলক্ষ্মী; চরণ যুগল সুকোমল, তুমি গোপরাজ নন্দের অঙ্গজ তোমাকে প্রণাম করি। আমি আপনার মহিমা জানিতে পারি নাই, অথবা কেহ জানিতেও সমর্থ নয়। তুমি স্বেচ্ছাময়, তোমার রূপ অচিন্ত্য এবং আত্মসুখানুভব মাত্র; কেননা "অদ্যাপি তৎপদ রজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব" অতএব--

"উৎক্ষেপণং গর্ভগতস্য পাদয়োঃ
কিং কল্পতে মাতুরধোক্ষজাগসে।"

মাতৃগর্ভে শিশু পাদোৎক্ষেপণ করিলে, মাতা কি সে অপরাধ গ্রহণ করেন?

"অহো হতিধন্যা ব্রজ গোরমন্যঃ
স্তন্যা মৃতং পীত মতীব তে মুদা।
যাসাং বিভো বত্সরাত্মজাত্মনা—
যত্তৃপ্তয়ে হদ্যাপ্যথ নাকে সন্বরাঃ॥"

"অহো ভাগ্যং অহো ভাগ্যং নন্দগোপ ব্রজৌকসাং।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনং॥"

হে বিভো! অনাদি কাল প্রবৃত্ত বেদোক্ত যজ্ঞসমূহ অদ্যাপি যাঁহার তুষ্টি সাধনে সমর্থ হইতে পারে নাই সেই আপনি গোবৎস ও বালকের রূপ ধারণ করিয়া যাঁহাদের স্তন্যামৃত সুস্বাদু ও অমৃত জ্ঞানে পান করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতেছেন, সেই ব্রজবনিতাগণ ও গাভী সকলই ধন্যা। হে প্রভো! নন্দরাজের ব্রজে যাঁহারা বাস করেন তাঁহারাও ধন্য কারণ পরমানন্দ স্বরূপ পরমব্রহ্ম সনাতন তাঁহাদিগের নিকট সতত মিত্ররূপে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাদের ভাগ্যের কথা আর কি বর্ণনা করিব।

"তৎভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং
যদ্গোকুলেহপি বাত সাঙ্ঘ্রিরজোহভিষেকং।
যজ্জীবিতং তু নিহিনং ভগবান্ মুকুন্দ
স্ত্বদ্যাপি যৎ পদরজঃ শ্রুতি মৃগ্যমেব।"

হে মুকুন্দ! যে প্রকারেই জন্ম হউক না কেন, গোকুল মধ্যে কিম্বা বৃন্দাবনের বনেও যদি জন্মলাভ ঘটে, তাহাও দুর্লভ; কারণ এই গোকুলে জন্ম হইলে ব্রজবাসীদিগের পদধূলি আমার মস্তকে পতিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। শ্রুতি চিরদিন যাঁহার পদরজঃ অন্বেষণ করিতেছেন সেই মকুন্দই যখন তাঁহাদিগের জীবন সর্ব্বস্ব তখন সেই গোকুলবাসী অপেক্ষা কে সৌভাগ্যবান্ হইতে পারে?

"তদস্তমে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেহত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাং।
যেনাহ মে কোহপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবং॥

ভক্তি ব্যতীত যখন পরমার্থ লাভ হয় না তবে স্বকীয় কর্ম্মফল দ্বারা যদি কোনও অধম পশ্বাদি তির্য্যক্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে সেই জন্মে এইরূপ সৌভাগ্যের উদয় হয় যেন তোমার পাদপদ্ম অধিকারী একজন ভক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারি।

সহৃদয় পাঠকপাঠিকা! শ্রীকৃষ্ণের মহিমা অবগত হইয়া জগৎবিধাতা ব্রহ্মারও জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইল; তিনি বুঝিতে পারিলেন যে কোনও যোনিতে জন্মগ্রহণ হউক্ না কেন, ভগবৎভক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করাই জীবনের সার্থক। এইজন্যই তিনি ভগবান কৃষ্ণকে নাথ বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক দাস্যভাব প্রার্থনা করিলেন।

তিনি ব্রজবাসী ভক্তগণের সৌভাগ্য দর্শনে, তাহার, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজন্মকেও তুচ্ছজ্ঞান করিলেন। যদি ভগবানের ভক্ত হইয়া জন্ম জন্মান্তর নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে হয় তাহাও শ্রেয়, তথাপি অভক্ত হইয়া শুষ্ক জ্ঞানীর ন্যায় সর্ব্বোত্তম যোনিতে জন্মগ্রহণ করাও প্রার্থনীয় নহে।

রাগ দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি বিষয় কামনা বিসর্জ্জন না দিলে কৃষ্ণের দয়া হয় না। জীব অন্ধতম দেহাদিতে আত্মজ্ঞান দ্বারা ঘোর মোহজালে আবদ্ধ হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও স্ব স্ব গুণে আবৃত হইয়া সংসার কার্য্য করিয়া থাকেন। কিন্তু ভগবান জ্ঞান বুদ্ধির অগম্য যোগমায়া বিস্তার করিয়া নিরাকার হইয়াও ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য মানবের ন্যায় প্রতীত হয়েন। ঈশ্বর স্বতন্ত্র, জীব ঈশ্বরের অধীন। সুতরাং মায়া কর্ত্তৃক মোহিত ও প্রপঞ্চান্তর্গত রজ ও তমোগুণে আকৃষ্ট হইয়া জীব আপনি আপনাকে বিস্মরণ হইয়া যায়। প্রপঞ্চান্তর্গত রজঃ ও তমগুণের আধিক্য বশতঃ চিৎরূপের পরিস্ফুটতা না হওয়ায়, জড়ের ন্যায় ধারণা হইয়া থাকে এবং ভগবদ্ তত্ত্বের নির্দ্ধারণে অসমর্থ হয়। তন্মধ্যে যাঁহারা সত্বগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক প্রেমভক্তি যোগে তাঁহার কৃপার পাত্র হইতে পারেন তাঁহারাই আত্মনাত্ম জ্ঞান লাভ করিয়া ভগবৎ তত্ত্ব কথঞ্চিৎ জানিতে পারেন। ভক্তি হইতেই ভগবৎ জ্ঞানলাভ হয়। এই ভগবৎ জ্ঞানই কৃষ্ণ প্রাপ্তির দ্বার স্বরূপ। যাঁহার হৃদয়ে ভগবৎ জ্ঞান অঙ্কুরিত হইয়াছে তিনি নীচবংশ হইলেও শ্রেষ্ঠ ও আমার প্রণম্য। ভক্তি ব্যতীরেকে কেবল জ্ঞানে কিছু হয় না কারণ:—

"শ্রেয়ঃ স্মৃতিং ভক্তি মুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল বোধ লব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যৎ যথা স্থূল তুষাব ঘাতিনাং॥"

ব্রহ্মা বলিতেছেন হে বিভো! যে সকল ব্যক্তি পরম শ্রেয়ের বর্ত্ম স্বরূপ ভক্তি ত্যাগ করে এবং কেবল জ্ঞানের নিমিত্ত ক্লেশ করে তাদের কেবল ক্লেশমাত্র লাভ হয়। যেমন তণ্ডুল বিহীন স্থূল তুষ যাহা বাহিরে ধান্যের ন্যায় প্রকাশ পায়, তাহা অবঘাত করিলে যেমন কোনই ফল হয় না কেবল পরিশ্রম মাত্র সার—সেইরূপ ভক্তি ভিন্ন শুষ্ক জ্ঞানও কেবল শ্রম মাত্র।

এই জন্যই ব্রহ্মা সমস্ত ঐশ্বর্য্য ভোগ মোক্ষ প্রত্যাশা বিসর্জ্জন দিয়া কি উপায়ে ব্রজবাসী জনগণের চরণ লাভ করিবেন ইহাই প্রার্থনা করিলেন। হে দীননাথ! এই [দীনের প্রতি কৃপা বিতরণ করুন আমি যেন সেই ব্রজবাসীগণের চরণধূলি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। আমার ব্রহ্ম জন্ম অপেক্ষা যদি এই বৃন্দাবনের কোনও একস্থানে তৃণ হইয়াও জন্ম গ্রহণ করিতে পারি; সেও আমার পরম সৌভাগ্য। কেন না ব্রজবাসীগণের চরণধূলি আমার মস্তকোপরি নিপতিত হইবে।

হে ব্রজপতি! এই চরণধূলিই আমার একমাত্র প্রার্থনীয়। আমি শিলাদি পাষাণরূপ হইয়া এই ব্রজভূমির নগরপ্রান্তে নিপতিত থাকিব, যদি নগরবাসী, সূচিকাকর্ম্মজীবী কারুকার্য্যকারী বা মলগ্রাহীও আমার উপর পদনিক্ষেপপূর্ব্বক গমন করে তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইব। আমি জগৎ বিধাতা ব্রহ্মা বলিয়া কোনওরূপ লজ্জাবোধ করিব না। হে মুক্তিদাতা! লোকে

তাহাদিগকে নীচজাতি বলে বলুক, তাহাতে ক্ষতি নাই; যাহারা আপনার ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য দর্শনে জীবিত থাকে এবং ক্ষণমাত্র আপনার অদর্শনে হত হয়, তাহারা কি কখনও নীচ বা ঘৃণ্য হইতে পারে? তাহারা মস্তকের মণি সদৃশ।

হে ব্রহ্মণ্যদেব। শ্রুতিসমূহ অদ্যাবধি যাঁহার পদধূলি প্রাপ্ত হইতে পারে নাই; আমি তাহা অপেক্ষা এমন কি শ্রেষ্ঠ যে আমার লজ্জার উদয় হইবে। হে দেব! আমার প্রার্থনা কোন মতেই অকিঞ্চিৎকর নহে।

ব্রহ্মা যেমন দাস্য-ভক্তি প্রার্থনা করিতেছেন; সেইরূপ জীবেরও শ্রীগুরুর উপদেশ মত প্রথমে দাস্যভক্তি বা ভাব স্বীকার করিয়া ভাবময়কে ভাবনা করা উচিত। কারণ আমরা মোহান্ধ জীব, সেই মোহকে দূরীভূত করিতে হইলে শ্রীগুরুর উপদেশামৃত পান করা উচিত। কারণ শাস্ত্র বলিতেছেন :—

"যদা তে মোহ কলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরীষ্যতি তদা খণ্ডাসি নির্ব্বেদং।"

অতএব মোহকলুষিত চিত্তের মোহচ্ছেদের জন্য, শ্রীজগন্নাথের বিশেষ প্রকাশ অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তির ভজনা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। আমি দেখিতেছি মৃৎ ও চিৎভাবে দুই বিভিন্ন কেন না আমি উভয়ের স্বরূপ বুঝিতেছি না। প্রস্তর বল, মৃত্তিকা বল সবইত সেই অবিনাশী আনন্দময়ের অরূপ চিৎএর রূপ। মৃৎ ও চিতে কিছুই ভেদ নাই। যাহা মৃৎ তাহা চিৎ অর্থাৎ যাহা জড় তাহাই চৈতন্য। কার্য্যগুণে চৈতন্য জড়ে পরিণত এবং জড় আবার চৈতন্যে পরিণত হয়। যাহাকে তুমি দারুময়ী বা পাষাণময়ী বলিতেছ প্রকৃতপক্ষে উহা চিন্ময়ী। বিশ্বেশ্বরের বিশ্বমূর্ত্তি সম্মুখে থাকিতেও প্রবর্ত্তক সাধকের মূর্ত্তির প্রয়োজন হয় কারণ তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির সম্মুখে নদী থাকিলেও সে নদী পান না করিয়া ঘটী ভরিয়া জল তুলিয়া পান করে—সেইরূপ ক্ষুদ্র হৃদয় জীব বিশ্বরূপের বিশ্বমূর্ত্তি ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধারণা করিতে পারে না, তাই সে বাসনানুরূপ সাধনানুরূপ মূর্ত্তি গঠন করিয়া যার যে ভাব সেই ভাবে ভাবনিধি ভগবানের ভাবনা করিয়া থাকে। অতএব জীব তোমার সম্মুখে অপার সমুদ্র, তোমার পাত্রকে প্রথমে শ্রীগুরুর উপদেশামৃতে প্রক্ষালন কর, তাহার পর যে পাত্রে যতটুকু পরিমাণে সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দের আনন্দঘন রস পান কর তোমার তৃষা দূর হইবে। যে যে ভাবেই পান করুক না কেন সবই সেই একই সমুদ্রের জল। পাত্রের রূপভেদে ভাবনার কেবল ভেদ দেখা যায়।

শ্যামা শ্যাম ভিন্ন কেবল আকারে
ভিন্ন আকারে ভিন্নাকার রে॥
শ্যামা ধরে অসি শ্যাম ধরে বাঁশী
অট্ট হাসি মৃদু হাসি যে অধরে॥
বৃন্দাবনে শ্যাম অপ্রাকৃত কাম
মদোন্মাদিনী শ্যামা ধরে নাম
যে যে ভাবে ভাবে পূরে মনস্কাম
প্রবর্ত্তে প্রভেদ ভিন্ন ভিন্নাকারে॥
দশভুজ রূপে শ্যামার এক মূর্ত্তি
দ্বিভুজ শ্যাম মদন গোপালমূর্ত্তি
উভয়ের পূজার মূল প্রেমভক্তি
অভিন্ন প্রণব রকারে লকারে॥

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ভাগবতভূষণ
কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ।

বর্দ্ধমান জেলার মেলার বিবরণ

২

জামালপুরের মেলা

গত শ্রাবণ মাসের গৃহস্থে আমার "অগ্রদ্বীপের মেলা" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর হইতে পল্লীবাসী অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন "এইরূপ মেলার বিবরণ সংগ্রহের উদ্দেশ্য কি ?"

তাঁহাদের অবগতির জন্য নিবেদন এই যে, আমি স্বেচ্ছায় এ কার্য্যে ব্রতী হই নাই, গত চৈত্রমাসে বর্দ্ধমানে অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সময় সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত "বাউলের ইতিহাস" লেখক অগ্রজ প্রতিম শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় আমাকে বর্দ্ধমান জেলার মেলার বিবরণ সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারই আদেশ মত বর্দ্ধমান জেলার মেলার বিবরণ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়া বুঝিতে পারিতেছি যে, এইরূপ ভাবে বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলার মেলার বিবরণ আলোচিত হইলে দেশের প্রকৃত ইতিহাস বাহির হইয়া পড়িবে।

এইরূপ আলোচনা উচ্চ সাহিত্যের মধ্যে স্থান পাইলে পল্লী সমাজের সহিত শিক্ষিত নাগরিকদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইবে। এইরূপে আমাদের সমাজ ও ধর্ম্মের অনেক তথ্যই সংগৃহীত হইবে এবং তদ্দ্বারা আমাদের ধারাবাহিক জাতীয় ইতিহাসের অনেক উপাদান প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

জেলা বর্দ্ধমান পূর্ব্বস্থলী থানার অধীন জামালপুর স্বল্পবনাবৃত একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে ভাগীরথী জামালপুরের প্রান্তবাহিনী ছিলেন—এখন তাহার বহু নিদর্শন জামালপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে ভাগীরথী জামালপুর হইতে প্রায় দু ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিকে সরিয়া গিয়াছেন। ম্যালেরিয়া রাক্ষসী সংপ্রতি উক্ত ক্ষুদ্র গ্রামখানিকে প্রায় উজাড় করিয়া তুলিয়াছে। আজকাল উক্ত গ্রাম প্রায় জনশূন্য ও জঙ্গলময় হইয়াছে; এবং সেই জঙ্গলে দুই একটা ব্যাঘ্রও বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে "ধর্ম্মরাজ" (যিনি এক্ষণে জামালপুরের বুড়রাজ নামে খ্যাত হইয়াছেন) ঠাকুরের অধিষ্ঠান। এই ধর্ম্মরাজ ঠাকুর যে এখানে কতকাল আছেন তাহার বিবরণ কেহ বলিতে পারেন না। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতির সময় যখন শৈব ধর্ম্মের বহুল বিস্তার আরম্ভ হয় সেই সময় রামাই পণ্ডিত মৃত বৌদ্ধ মহাজান ধর্ম্মকে পুনরুজ্জীবিত করিবার বাসনায় ধর্ম্ম পূজার প্রচার করেন। সুতরাং জামালপুরের ধর্ম্মরাজও যে সেই সময়ে বা তাহার কিছু পরে প্রতিষ্ঠিত তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তৎপরে বল্লাল সেনের রাজত্বকালে যখন "ধর্ম্মের গাজন" নীচ জন ভোগ্য হইয়া পড়ে, সেই সময় জামালপুরের "ধর্ম্মরাজ" বুড়রাজ নামে শিবত্ব প্রাপ্ত

হইয়া হিন্দুগণের আরাধ্য হইয়া পড়িয়াছেন।

জামালপুরের বুড়রাজের নাম বঙ্গের সকল স্থানেই পরিচিত। বাংলা দেশের বহু স্থান হইতে বহুলোক প্রতি বৎসর তথায় সমবেত হইয়া থাকেন। জামালপুরের নিকট-বর্ত্তী "গোয়ালপাড়া" নামক গ্রামও পূর্ব্বে জামালপুরের একটী অংশ ছিল।

কথিত আছে এই গোয়ালপাড়ায় অতি প্রাচীন কালে শ্রীমন্ত ঘোষ নামে গোপ জাতীয় একজন ভক্তিবান্ লোক বাস করিতেন; জামালপুরের ধর্ম্মরাজ তাহারই নিকট সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ হইয়াছিলেন। শ্রীমন্ত ঘোষের বংশধরগণের বাসবাটীর ভগ্নাবশেষ এখনও তথায় বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই শ্রীমন্ত ঘোষের "সুবুদ্ধি" নামে এক পয়স্বিনী গাভী ছিল। শ্রীমন্ত ঘোষ প্রায়ই জামালপুরের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত বনমধ্যে গোচারণ করিত। কোন সময়ে উক্ত বনে গোচারণে যাইয়া শ্রীমন্ত তাহার "সুবুদ্ধি"নাম্নী গাভীকে একদিন পালের মধ্যে দেখিতে পাই-লেন না, অনেক অন্বেষণ করিয়া "সুবুদ্ধি"কে দেখিতে না পাইয়া শ্রীমন্ত সন্ধ্যাকালে উদ্বিগ্ন-চিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং গোশা-লায় গমন করিয়া দেখিলেন "সুবুদ্ধি" অগ্রেই ফিরিয়া তথায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে। সে যাহাই হউক, সন্ধ্যার পর শ্রীমন্ত সেই গাভীকে দোহন করিতে গমন করিলেন; কিন্তু দোহন ত দূরের কথা "সুবুদ্ধি" তাহার বাছুরকে পর্য্যন্ত সেদিন দুগ্ধ প্রদান করিল না। সেই দিন হইতে প্রত্যহই ঐরূপ ঘটনা ঘটিতে লাগিল। শ্রীমন্তের পত্নী তখন শ্রীমন্তকে বলিলেন—

"শুন নাথ নিবেদন, একি দেখি অলক্ষণ,
নাহি কর তুমি কিছু ইহার উপায়।
বারেক ভাবনা মনে, তোমার সুবুদ্ধি ধনে,
মন্দলোকে মন্দ কিছু করেছে নিশ্চয়॥
নতুবা দেখহ কেন, বাছুরে না দেয় স্তন,
দোহন দূরের কথা কি কহিব আর।
সকলি ত জান তুমি, কি আর বলিব আমি,
দোহিতে কি পারিয়াছ দুগ্ধ একধার॥
যে গাভী সবার শ্রেষ্ঠ, করিল কে তারে নষ্ট,
আমাদের দুরদৃষ্ট হেতু হ'ল হেন।
আলস্যেরে পরিহরি, যাও নাথ ত্বরা করি,
কি হেতু এমন হ'ল জানহ সন্ধান॥"

(জামালপুরের শ্রীশ্রী৺বুড়রাজের মহিমা গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।)

পত্নীর কথামত পরদিন শ্রীমন্ত গো-চারণে যাইয়া অতি সাবধানে "সুবুদ্ধি"র তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীমন্ত দেখিলেন তাঁহার "সুবুদ্ধি" গাভী পাল হইতে বাহির হইয়া ধীরে ধীরে গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিতেছে; শ্রীমন্ত তাহার অনুসরণ করিলেন। দুর্গম বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্রীমন্ত একটী আম্র বৃক্ষের অন্তরাল হইতে দেখিতে পাইলেন—

"সুবুদ্ধির স্তন হ'তে,
দুগ্ধধারা পৃথিবীতে,
খারিত হতেছে স্বতঃ মৃত্তিকার উপর।
চমৎকার শব্দ তার হয় গড় গড়॥"

(৺বুড়রাজ মহিমা গ্রন্থ)

এই অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীমন্ত একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। তৎপরে চিন্তিত মনে বন হইতে বহির্গত হইয়া শ্রীমন্ত গো-পাল লইয়া বাড়ী ফিরিলেন এবং তাঁহার পত্নীকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন। স্বামীমুখে এই অলৌকিক কাহিনী শ্রবণ করিয়া গোপরমণী

"দৈবশক্তি হবে কহে মনে অনুমানিয়া।"

এই অলৌকিক ঘটনার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে শ্রীমন্তের পত্নীর সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। সেই রাত্রিতে তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন। আমরা নিম্নে "৺বুড়রাজ মহিমা গ্রন্থ হইতে অবিকল সেই স্বপ্নবৃত্তান্তটী নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যথা :—

"সুষুপ্ত ধরণী অন্ধকারময়,
জলে স্থলে শূন্য দেশে
নিদ্রায় চেতন হীন এ বিশ্ব সকল;
হেন কালে অতি এক আশ্চর্য্য স্বপন
দেখিল শ্রীমন্ত ভার্য্যা :—
অমল ধবল কায় ব্রাহ্মণ স্থবির এক,
দাঁড়ায়ে সম্মুখে তার।
শ্বেতবর্ণ দীর্ঘ শ্মশ্রু আচ্ছাদি চিবুক
দুলিতেছে বক্ষোপরে,
শিরোপরি শ্বেতবর্ণ চাঁচর চিকুর
শোভিছে সুন্দর।
শ্বেতবর্ণ পট্টবাস পিন্ধনে তাঁহার,
দিব্য এক শ্বেতবস্ত্রে আচ্ছাদিত কায়;—
উজলিছে যজ্ঞোপবীত তাহার ভিতর।
শিথিল গাত্রের চর্ম্ম, অদন্ত বদন, স্ববশে
চলিতে নারে শক্তিহীন তায়,
যষ্টিভরে উপনীত তাহার নিকট।
কাঁপিতে কাঁপিতে কহে—
শ্রীমন্ত ভার্য্যায়—
শুন গো আনন্দময়ী!
যথায় সুবুদ্ধি তব নিরজন বনে
দুগ্ধ দিতে প্রতিদিন গোপনেতে যায়।
যথায় গহ্বর মধ্যে গড় গড় রবে
নিপতিত হয় দুগ্ধ;—
পাষাণ মূরতি ধরি বিরাজি
তথায় আমি অপ্রকাশ্য ভাবে;
মহাদেব অংশ, মম নাম "ধর্ম্মরাজ"।
এতদিন এ কাননে ছিনু গুপ্তভাবে,
তোমারে করিয়া দয়া,
তোমার দ্বারায় প্রকাশ
হইব হেথা হইল বাসনা,
তেঁই সুলোচনে!
কহি স্বপনে তোমায়;
স্বপন আদেশ পাল হইবে মঙ্গল।
এ গহ্বর মধ্যে যথা শিলামূর্ত্তি মোর—
তাহার উপরে মম গৃহ
নিরমাণ করাও সুন্দরি!
অর্থের অভাব তব কিছু নাহি হবে,
রাখিয়াছি অর্থভাণ্ড তব—
গো-শালার ঈশান কোণেতে।
রজনী প্রভাতে অর্থ করিয়া গ্রহণ
নির্ম্মাইবে গৃহ মোর, সাহায্যে তাহার।
তোমার স্বামীরে কহ স্বপ্ন বিবরণ,
তাহার দ্বারায় মম গৃহ নিরমিত হইবে
উৎসাহ সহ।
নাহি কাজ অট্টালিকায়
মৃন্ময় গৃহেতে হবে বসতি আমার।
তব গ্রামে চট্টোবংশে শিবচন্দ্র নাম,
পৌরোহিত্য-পদে তাঁরে করিয়া নিয়োগ,
নিত্য পূজা দেও মোর ভক্তি সহকারে
বিল্বপত্র পুষ্পসহ চন্দনে চর্চ্চিয়া
জাহ্নবী জীবন সহ,
যথাসাধ্য সোপকর্ণে নৈবেদ্য করিয়া,
পূজিবে আমায় স্বীয় শ্রদ্ধা অনুসারে।
চৈত্র মাসে গাজনের নিয়ম যে সব
হয়ে থাকে শিবস্থানে,
সেইরূপ ক্রিয়াসব বৈশাখী পূর্ণিমায়
হইবে আমার স্থানে; এ জামালপুরে।
গার্হস্থ্য মঙ্গল কিম্বা দৈহিক পীড়ায়,
আমার নিকটে যেবা করিবে মানস,

পূর্ণ হবে মনোবাঞ্ছা তা'র।
কিন্তু এক কথা বলি রাখিও স্মরণে।
চণ্ড আদি বহু শিষ্য আমার নিকট
অলক্ষ্যেতে বিচরিবে;
তাদের ভোগের লাগি
ছাগ পশু বলিদান হইবে করিতে।
যেজন করিবে এই মানস আমার,
নিশ্চয় করিব পূর্ণ তার মনোরথ।
বৈশাখী, জ্যৈষ্ঠ কিম্বা মাঘী পূর্ণিমায়,
আর প্রতি শুক্ল সোমবারে
মানসিক পূজা মোর যে করিবে দান,
আর পাঁঠা দিবে বলি চণ্ডগণ তরে,
নাশিব তাহার আমি সকল অশিব;
সহস্র বিপদ হলে ঘটাব মঙ্গল।
মম গৃহ নির্ম্মাইয়া, বাদ্যভাণ্ড সহ
মহোৎসবে কর মোর পূজা;
এই মাত্র স্বপ্নাদেশ করিনু তোমায়;
নিদ্রাভঙ্গে পতিস্থানে—কহিও সকল।"

প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া শ্রীমন্তের পত্নী শ্রীমন্তকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত সমস্ত নিবেদন করিলেন। এই অদ্ভুত স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্ত চমকিত হইলেন এবং সাহসে নির্ভর করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং তথায় যেখানে সুবুদ্ধি গাভী দুগ্ধ প্রদান করিত তথায় একটী গহ্বর মধ্যে শ্রীমন্ত শিলা-মূর্ত্তি ধর্ম্মরাজকে দেখিয়া ভয়ে কম্পমান ও লোমাঞ্চিত কলেবর হইলেন এবং গললগ্নী-কৃতবাসে ভগবান ধর্ম্মরাজকে প্রণাম করিলেন। তৎপরে তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং পত্নীকে স্বপ্ন নির্দ্দিষ্ট অর্থভাণ্ড গোশালা হইতে তুলিয়া আনিতে অনুমতি করিলেন।

শ্রীমন্তগৃহিণী গোশালার ঈশান কোণ খনন করিয়া অর্থভাণ্ড তুলিয়া লইয়া স্বামীর নিকট গমন করিলেন। সেই অর্থদ্বারা শ্রীমন্ত বন কাটাইয়া সপ্তাহ মধ্যে তথায় একখানি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। তৎপরে

"আম্রশাখা দোলাইয়া,
পূর্ণ কুম্ভ বসাইয়া,
দুধারে কদলী বৃক্ষ করিল রোপণ।
লোহিত নিশান উড়ে,
মহানন্দে জামালপুরে
ঢাক ঢোল আদি বাদ্য করায় বাদন॥
নিকটস্থ গ্রামবাসী,
স্ত্রীপুরুষ সবে আসি,
বাবার মাথায় ঢালে দুগ্ধ গঙ্গাজল।
কোলাহলে পরিপূর্ণ
হইল সে ঘোর অরণ্য
জয়ধ্বনি সকলের মুখে অবিরল॥
আসিয়া ব্রাহ্মণগণ, করি মন্ত্র উচ্চারণ,
অভিষেক করাইয়া পূজায় বসিল।
পুষ্প বিল্বপত্র দিয়া, নৈবেদ্য উৎসর্গিয়া,
অজোৎসর্গ করি পরে খড়্গ উৎসর্গিল॥
হলে পূজা সমাধান, কর্ম্মকার বলিদান,
করিল নিয়ম মত চণ্ডগণ তরে।"

৺বুড়রাজ মহিমা।

এখানকার বুড়রাজের পূজা শিবের "ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজত গিরিনিভং চারু চন্দ্রাবতংসং রত্ন কল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশু মৃগবরা-ভীতি হস্তং প্রসন্নম্। পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুত মমরগণৈর্ব্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিল ভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনে-ত্রম্॥"ধ্যানে হইয়া থাকে; পূজান্তে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করা হয়ঃ—

"প্রণম্য সর্ব্বকর্ত্তারং সর্ব্বদং সর্ব্ব বেদিনম্।
সর্ব্বীয়ং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বং ধর্ম্মরাজ নমস্কৃতম্॥"

উপরি উদ্ধৃত বিষয়গুলির আলোচনা করিলে আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটী সিদ্ধান্তে উপনীত হই। যথা:—

১। হিন্দু সমাজ চিরকাল পরকে আপন করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছেন, এক সময়ে যাহা বৌদ্ধদিগের "ধর্ম্মের গাজন" ছিল এক্ষণে তাহা হিন্দুদিগের শিবের পূজায় পরিণত হইয়াছে।

২। বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা হিন্দুগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মরাজকে শিবত্ব আরোপ করিয়া পূজা করিলেও ছাগ বলিদান প্রথা রহিত করেন নাই; চণ্ডাদি শিবভক্তগণের উদ্দেশে বলি প্রদান করা কর্ত্তব্য বলিয়া বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা বজায় রাখিয়াছেন।

৩। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন বুড়রাজের পূজার ব্যবস্থা হওয়ায় বুঝিতে পারা যায় যে, ধর্ম্মের বার্ষিক গাজন বৈশাখী অক্ষয় তৃতীয়ার দিবসে আরম্ভ হইয়া পূর্ণিমায় শেষ হইত। সুতরাং ধর্ম্মকে শিবত্ব প্রদান করিয়া হিন্দু দেবতা করিয়া লওয়া স্বত্ত্বেও তাঁহার গাজনের দিন পরিবর্ত্তিত করা হয় নাই।

৪। ধর্ম্মের গাজনের শোভাযাত্রা, নৃত্যগীত বাদ্য, বাণ ফোঁড়া প্রভৃতি যে সকল অঙ্গ আছে জামালপুরের বুড়রাজের নিকটও গাজনে প্রায় সেই সকল নিয়মই প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

আজ পর্য্যন্ত জামালপুরে মহা বৈশাখী পূর্ণিমায় ৺বুড়রাজের মহাধুমধামে গাজন ও পূজা হইয়া থাকে। ঐ সময়ে বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে জামালপুরে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হইয়া থাকে এবং এক মাস ব্যাপী একটী বৃহৎ মেলা বসিয়া থাকে। এই মেলাতে কলিকাতা, কৃষ্ণনগর, মুর্শিদাবাদ, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে বহু জামা, জুতা, ছাতা, পিতল কাঁসার বাসন, মনোহারী দ্রব্য, মিষ্টান্ন, আম, লিচু, নারিকেল প্রভৃতি সকল প্রকার ফল মূলের, শিল্প, জাঁতা প্রভৃতি প্রস্তরের দ্রব্য সামগ্রীর বড় বড় দোকান আসিয়া থাকে। বহু টাকার মাল খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে। বৰ্দ্ধমান জেলার এই অঞ্চলের লোকেরা তাহাদের আবশ্যকীয় প্রায় সমস্ত দ্রব্যই এই মেলাস্থলী হইতে খরিদ করিয়া থাকেন। সার্কাস্, পেন্টিং থিয়েটার, বাঘের খেলা, নাগর দোলা প্রভৃতি অনেক ভাল ভাল খেলাও আসিয়া থাকে। মেলার সময় জঙ্গলময় ক্ষুদ্র জামালপুর পল্লী একটী বড় সহরে পরিণত হইয়া থাকে; এক মিষ্টান্নের দোকান এত আসিয়া থাকে যে, ঐ সময়ে লক্ষাধিক টাকার কেবল মিষ্টান্নই বিক্রয় হইয়া থাকে।

ইহা হইতেই এখানকার মেলার গুরুত্ব সকলে উপলব্ধি করুন। মহা জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমায় ও মাঘী পূর্ণিমাতেও এখানে দুইবার ছোট খাটো দুইটী মেলা হইয়া থাকে, তবে সে সময় কলিকাতা, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থান হইতে কোন দোকান পসারী আসে না; দেশের লোকেই দোকান পাতিয়া থাকে। এ দুই সময়ও বিশ পঁচিশ হাজার করিয়া লোক সমাগম হইয়া থাকে। প্রত্যেক বৎসর এখানে প্রায় চারি পাঁচ হাজার ছাগ শিশু বলিদান হইয়া থাকে!

বৈশাখী পূর্ণিমায় গাজনের সময় প্রায় দুই তিন হাজার 'সন্ন্যাসী' হইয়া থাকে। ঐ সকল সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকেই দশ পনের ক্রোশ তফাৎ হইতে এক পদও পদভরে অগ্রসর না হইয়া শয়ন করিয়া বুকে ভর দিয়া জামালপুর আসিয়া থাকে। তাহাদের সংযম ও কঠোরতা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়।

অনেক মুসলমানধর্ম্মাবলম্বীলোকও রোগ-মুক্তি কামনায় এখানে পূজা দিয়া থাকেন। ৺বুড় রাজেরও এমনি মহিমা যে, যে কোন ব্যক্তি, যে কোন প্রকারেরই কঠিন ব্যাধি-গ্রস্ত হইয়া সেই ব্যাধি-মুক্তির কামনায় বাবার নিকট মানস করেন এবং প্রতি মাসের শুক্ল-পক্ষের সোমবারে হবিষ্যান্ন করেন, তিনি সেই ব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন। আমরা স্বচক্ষে কতশত কুষ্ঠ, যক্ষ্মা প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ৺বুড়রাজের কৃপায় রোগমুক্ত হইতে দেখিয়াছি।

বর্দ্ধমান জেলায় চন্দ্রপুরের কবি জগদানন্দ কৃত একখানি গান উক্ত ঘটনার প্রমাণ স্বরূপ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যথা:—

জেলা বর্দ্ধমান, মহকুমা কালনার অধীন পূর্ব্বস্থলী থানার অন্তর্গত জামালপুরস্থিত—শ্রীশ্রী৺বুড়রাজ দেবের মাহাত্ম্যসঙ্গীত।

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।

বাবা বুড়রাজ দেখে তোমার কাজ
মানব সমাজ মোহিত সকলে।
ধীরাজাধিরাজ মহা কবিরাজ
করিছ বিরাজ জামালপুর অঞ্চলে।
হলে মহাব্যাধি বৈদ্যে না পায় বিধি
যদি ধাগা বাঁধি পালে নিয়ম বিধি,
ভক্তি বিনিময়ে ভক্তে নিরবধি
দাও মহৌষধি পুষ্প স্নানজলে ॥ ১
দয়াল বাবার দয়ার সীমা নাই দেখি
বন্দনার বলে অন্ধে পায় আঁখি
আমি ক'ব বা কি চারি দিকে থাকি
কয় ডাকি রোগ মুক্ত ভক্ত দলে ॥ ২
সিদ্ধ তব নাম স্মরি সিদ্ধ কাম
ধন্য পুণ্য ধাম জামালপুর গ্রাম॥
প্রতি পূর্ণিমায় হয় ধুমধাম
আসে কত গ্রাম হতে লোক সদলে ॥ ৩
বৈশাখী পূর্ণিমার আগে কয় দিন ধরে
তোমার গাজন উপলক্ষ করে
ভজন পূজন হয় সমাদরে
স্থানে লোক না ধরে থরে থরে চলে ॥ ৪
ভক্তে পূর্ণ জামাল পুরের অলিগলি
যার যেমন মানস সে তেমনি দেয় বলি
করিছে উৎসর্গ 'এই লও বাবা' বলি
সবে কুতূহলী এসে তোমার স্থলে ॥ ৫
বাজিছে বাজনা নাচে কত জনা
কর্‌ছে আনাগোনা যায় নাক লোক গণা
যার যেমন কামনা পূরাচ্ছ বাসনা
হয় না তোমার দেনা শোধ কোন কালে ॥ ৬
দোকানি পসারি বসে সারি সারি
রয় আড্ডা গাড়ি কত গরু গাড়ী
হুহুরি আনাড়ি যত পুরুষ নারী
বেচ্‌ছে কিনছে ভারি তোমার দোহাই বলে ॥ ৭
সমভাবে লোক দিবস রাত্রিতে
কোলাহলে পূর্ণ করেছে যাত্রিতে
ভক্ত দলে দলে মিলে একত্রিতে
ডাকে উচ্চৈস্বরে বাবার জয় বলে ॥ ৮
দ্বিজের সম্মান বাড়াতে বিধান
দ্বিজে দিলে হয় পূজা সমাধান
ননীগোপাল বন্দ্যো। সেবক প্রধান
করি অভয় দান রেখেছ কুশলে ॥ ৯
দূরস্থিত ভক্তে কর্‌তে অভয় দান
পোষ্ট পিপলন গ্রাম সন্নিধান
* ইছু গ্রামে আছে দ্বিতীয়াধিষ্ঠান
হিন্দু মুসলমান পূজে সবে মিলে ॥ ১০
পুণ্যক্ষেত্র পাশে সাধারণ হিতে
দেখ্‌লাম জলসত্র মিষ্টান্ন সহিতে
ভারী বিনা ভার কে পারে বহিতে
হয় না সহিতে টানাটানি জলে ॥ ১১

* বর্দ্ধমান জেলায় ইছুভাগড়া পল্লীতে উক্ত বুড়-রাজের আর একটী মেলা হয়।

কিবা শুভক্ষণে যাত্রা করেছিলাম
ভাগ্যক্রমে বাবা তোমার বাড়ী গেলাম
জগদানন্দ কয় ধন্য হ'লাম, তোমার
ভক্ত পদরেণু নিলাম মাথে তুলে ॥১২

এখানকার মেলাতেও কএকটী কুপ্রথা প্রচলিত আছে।

১। এখানেও মেলার সময় কখন কখন মদের ছড়াছড়ি হইয়া থাকে।

২। স্থানীয় অনেক ভদ্রসন্তান ও নিম্নশ্রেণীর ইতর লোক বহুদূর হইতে আগত লোকের নিকট পূজার জন্য মানীত পাঁঠা কাড়িয়া লইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা নিজেদের রসনা পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে। তবে আজ কাল পুলিশ পাহারার সুবন্দোবস্ত হওয়ায় ও কাল্‌নার সব্‌ডিভিসন্যাল অফিসার মহোদয় মেলার সময় স্বয়ং উপস্থিত থাকায় উক্ত অত্যাচার অনেকটা কমিয়াছে।
পূর্ব্বে এই ব্যাপার লইয়া অনেক দাঙ্গা মারা মারি খুন জখম হইয়া যাইত।

৩। ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়া পূজা দিবার শক্তি সকলের হয় না, কারণ ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিবার সুবন্দোবস্ত নাই, যাঁহাদের শরীরে বল আছে তাঁহারাই কেবল ঠেলাঠেলি মারামারি করিয়া কোন উপায়ে ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়া থাকেন; এই বিষয়ে একটু সুবন্দোবস্ত হইলে বড় ভাল হয়।

ধর্ম্মরাজের সর্ব্বপ্রথম সেবাইৎ ব্রাহ্মণ ৺ শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বংশ লোপ হওয়ায় নদীয়া জেলার মুড়াগাছা নিবাসী ৺ গোপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেবাইৎ হইয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এক্ষণে ৺ বুড়রাজের সেবাধিকারী হইয়াছেন। এই সেবা হইতে ননীবাবুর বাৎসরিক প্রায় চারি হাজার টাকা আয় হইয়া থাকে; অথচ জামালপুরে আজ পর্য্যন্ত একটী ভাল জলাশয় প্রতিষ্ঠা হইল না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। বৈশাখ মাসে মেলার সময় জলাভাবে কত পুরুষ, কত স্ত্রী, ও কত বালক বালিকার যে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয় তাহার ইয়ত্তা নাই।

মুকসীমপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ হালদার ও ঐ গ্রামের ডাক্তার শ্রীযুক্ত রঘুরাম বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বোধসাহার চক্রবর্ত্তী মহাশয়গণের চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে মেলার সময় একটী জলসত্র স্থাপিত হইয়া থাকে; সেই জন্য অনেকে পিপাসায় মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। এই নিঃস্বার্থ জলদানের জন্য ভগবান তাঁহাদের মঙ্গল করুন।

জামালপুর পূর্ব্বে কাষ্ঠশালীর ঘোষাল বাবুদের জমিদারী ছিল; এক্ষণে বর্দ্ধমানের বিখ্যাত উকীল স্বর্গীয় তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান জমিদার বাবুদেরও মেলাস্থানের উন্নতিতে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক।

জামালপুর ব্যাণ্ডেল কাটোয়া রেল লাইনের পাটুলী ষ্টেশন হইতে দুই ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত।

শ্রীভোলানাথ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিনোদ

বর্ত্তমান জগৎ

(চতুর্থ ভাগ)

ইয়াঙ্কিস্থান বা অতিরঞ্জিত ইয়োরোপ

প্রথম অধ্যায়

আট্‌লাণ্টিক-বক্ষে

১। বিলাতে ছয় মাস

প্রাকৃতিক দৃশ্য

ইংরাজ-স্থানে অর্দ্ধ বৎসর কাটিল। পৌঁছিয়াছিলাম গ্রীষ্মে। তখন কলিকাতায় ব্যবহারোপযোগী সাধারণ রেশমী কাপড়ের স্যুট্ পরিলেও চলিয়া যাইত। দিনের বেলায় বেশ গরম লাগিত। ছাড়িতেছি শীতের আরম্ভে। ইতিমধ্যে রাস্তায় দুএকদিন বরফ পড়িয়াছে। গরমের সময়ে এদেশের সর্ব্বত্র সবুজ তৃণপত্রের শোভা দেখিয়াছি। ক্রমশঃ শীতের প্রকোপে তরুরাজি বিকট আকার ধারণ করিতেছে। লণ্ডনের কোন গাছেই আর পাতা দেখিবার যো নাই। শ্মশানঘাটের আধ পোড়া কাঠের মত গাছগুলি ন্যাড়া ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। লোকজনের রং যেরূপ সাদা গাছগুলি এই ঋতুতে তেমনি কাল!

উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সকল দিকেরই দৃশ্য দেখিলাম। বিলাতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সৌন্দর্য্য প্রায়ই এক ধরণের। মোটের উপর একটা কুয়াসাবৃত ধোঁয়াটে রংয়ের সবুজ উপত্যকা ও সমতল-ভূমি এদেশের বিশেষত্ব। একটা গূঢ় রহস্যময় অন্ধকারাচ্ছন্ন জনপদের ভিতর বাস করিতেছি মনে হয়। অন্ধকার ও নীরবতা যেন দেশ-টাকে খানিকটা mysterious ও অতিপ্রাকৃত করিয়া রাখিয়াছে। ভারতবর্ষে প্রকৃতির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশাল বিরাট ও বৈচিত্র্যময়। সেই সৌন্দর্য্যে গরিমা উদারতা মহত্ত্ব ও বিভীষিকার পরিচয় পাওয়া যায়। বিলাতের মাঠঘাট নদীপর্ব্বত দেখিলে সে ভাব মনে জাগে না। ইংরাজীতে যাহাকে pretty বলে বিলাতের প্রাকৃতি সেইরূপ— Sublimity or grandeur এখানে নাই বলা চলিতে পারে। ফরাসীদেশের সৌন্দর্য্য দেখিয়া যতটা মুগ্ধ হওয়া যায় বিলাতের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া ততটা হওয়া যায় না। ফ্রান্সে স্বাভাবিক সুষমাকে মানুষের চেষ্টায় শতগুণ বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। সমস্ত দেশটা একখানা বাগান বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বিলাতে মানুষের সাহায্যে প্রকৃতির লাবণ্য বাড়ান হয় নাই। এখানে কৃষিকর্ম্মের প্রভাব বেশী দেখিলাম না।

বিলাতে মাত্র তিনমাস কাটাইবার ইচ্ছা ছিল। বিলাত ছাড়িয়া ইয়োরোপের বিক্রম-পুর স্বরূপ হল্যাণ্ড দেখিবার উদ্যোগ করিতে ছিলাম। সেখান হইতে নিশীথ সূর্য্যের দেশ নরওয়ে যাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

অকস্মাৎ ইয়োরোপ বিংশশতাব্দীর কুরুক্ষেত্রে পরিণত হইল। কাজেই নেপোলিয়ানের কর্ম্মক্ষেত্র ফিক্টে-বিস্মার্কের জন্মভূমি এবং ম্যাজিনির "দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার আমার দেশ" ইত্যাদিও আর দেখা হইল না। বিলাতেই এক প্রকার 'interned' বা আবদ্ধ হইয়া থাকা সঙ্গত বিবেচনা করিলাম।

বিগত দশ বৎসর

বিলাতে পদার্পণ করিয়া অবধি বুঝিয়াছি যে ইংরাজ সমাজে গত দশ বৎসরের ভিতর সকল দিকে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে বিংশশতাব্দীর বিগত দশ বৎসর ইয়োরোপ ও এশিয়ার সকল দেশেই একটা বিপ্লব আনিয়াছে। ইংরাজেরা নানা আন্দোলনের সাহায্যে নানাবিধ সংস্কার সুরু করিয়াছেন। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, রাষ্ট্র-শাসন, আইন ব্যবস্থা, শিক্ষা বিস্তার, লোক সেবা, সেনাবিভাগ, ইত্যাদি প্রত্যেক দিকেই পুরাতনের পরিবর্ত্তে নূতন অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের প্রবর্ত্তন চলিতেছে। তিন মাস কাল বিলাতে ঘুরিয়া তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। সম্প্রতি যে লড়াই সুরু হইল তাহার প্রভাবে এই ব্যাপক সংস্কারান্দোলন আরও বাড়িয়া চলিবে। যুদ্ধের পর ইংরাজের আর্থিক, রাষ্ট্রীয়, পারিবারিক এবং নৈতিক অবস্থা বিশেষ রূপেই বদলাইয়া যাইবে। বিলাতে একটা যুগান্তর আসিবে বলা যাইতে পারে। এইরূপ এক বিপ্লব প্রায় ১০০ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে সাধিত হইয়াছিল।

মানবজাতির ঐক্য

দূর হইতে একটা নূতন লোক বা জাতিকে যেরূপ দেখায় কাছে আসিলে সেরূপ দেখায় না। এইজন্য বর্ত্তমান কালে প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন ও ভারতের জনসাধারণকে সত্য-ভাবে বুঝিতে পারা কঠিন! যত দূরে থাকিব ততই বুঝিতে কষ্ট পাইতে হইবে। বলা বাহুল্য এই জন্যই এক জাতি অপর জাতিকে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারে না। পরস্পর পরস্পরকে অবিশ্বাস, সন্দেহ, নিন্দা ও ঘৃণা করিয়া থাকে। এইরূপ কুসংস্কার মানুষ ও জাতি মাত্রের পক্ষে স্বাভাবিক। এই সকল prejudices কোন দিন জগৎ হইতে দূরীভূত হইবে কিনা সন্দেহ। পরস্পর পরস্পরের জীবন ঘনিষ্ঠভাবে আলোচনা করিবার সুবিস্তৃত সুযোগ সৃষ্ট না হইলে জাতিগত সংস্কার বা ধারণার পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব।

ভিন্ন ভিন্ন ধরণের লোক যত বেশী দেখিতেছি ততই মনে হইতেছে যে মানব সমাজে বৈচিত্র্য অপেক্ষা ঐক্যই বেশী। রং ও ভাষা এই দুই বিষয়ে পার্থক্য বোধ হয় এক এক মাইল পরেই লক্ষ্য করিতে পারি। কিন্তু মানুষের চিত্ত সর্ব্বত্রই প্রায় একরূপ। বর্ত্তমান কালে যে সকল জাতি দেখিতেছি তাহাদের হৃদয় অনুসন্ধান করিলে বুঝিব যে তাহারা সকলেই একই অবস্থায় হাসে কাঁদে। আবার অতীতে যে সকল জাতি জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া গিয়াছে তাহাদের জীবন-নিদর্শনগুলি আলোচনা করিলেও বুঝিতে পারি যে আমাদেরই মত তাহারা রক্ত মাংসের মানুষ ছিল, আমাদের সুখ দুঃখের মত তাহাদেরও সুখ দুঃখ ছিল। মানব-হৃদয় সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা একরূপ। তথাপি জগতে আমরা বৈচিত্র্যগুলি লইয়াই এত মজিয়া রহিয়াছি কেন? আর এই বিভিন্নতার ওজর করিয়া পরস্পর ধ্বংস সাধনে ব্যাপৃত কেন?

ভারতবাসী ইংরাজের দাস—সুতরাং ইংরাজেরা ভারতবাসীকে সাধারণ মানুষ অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর জীব বিবেচনা করিতে বাধ্য। ইহা একটা কুসংস্কার বটে—কিন্তু ইহা স্বাভাবিক। আবার ভারতবাসীও এই কারণেই ইংরাজকে সাধারণ রক্ত মাংসের মানুষ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর জীব বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। ইহাও একটা কুসংস্কার—এই কুসংস্কারও স্বাভাবিক। পরাধীন মানবের চিত্ত এইরূপ সম্মোহিত হইয়াই থাকে।

ইংরাজ চরিত্র

কুসংস্কার ছাড়াইয়া উঠিতে পারিলে বর্ত্তমান ইংরাজকে কিরূপ মনে হয়? ছয় মাসে একটা জাতিকে বুঝা নিতান্তই দুরূহ। কিন্তু যেরূপ ধারণা জন্মিয়াছে তাহাতে বোধ হয় ইহারা স্থির ধীর ও গম্ভীর জাতি। নড়ন চড়ন গতিবিধি পরিবর্ত্তন বিপ্লব ইত্যাদি পছন্দ করে না—বরং এগুলি যথাসম্ভব বাঁচাইয়া চলিতে চেষ্টা করে। এমন কি কোন সময়ে যদি একটা পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াই যায় তথাপি ইহারা যেন পুরাতন অবস্থাতেই রহিয়াছে এইরূপ বিশ্বাস করিতে ভালবাসে। ইহাদের ভিতর উগ্রস্বভাব বা প্রচণ্ডতা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। জাতিটা নিতান্তই শান্তিপ্রিয় ও নিরীহ প্রকৃতি। ইহারা কথা খুব কম বলে—নীরব থাকিতে বেশী ভালবাসে—এবং আস্তে আস্তে কাজ করিতে করিতে জীবন পথে অগ্রসর হয়।

বর্ত্তমান ইংরাজসমাজে কোন অসাধারণ চিন্তাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি বা কর্ম্মবীর আছেন কি না সন্দেহ। অদ্ভুত ক্ষমতাবিশিষ্ট নরনারী দেখিবার জন্য বিলাতে আসিলে হয়ত হতাশ হইতে হইবে। সাধারণতঃ মানুষের যেসকল গুণ আশা করা যায় ইংরাজের ভিতর তাহা অপেক্ষা বিশেষ বা বেশী কিছু নাই। তবে ভারতবর্ষে যদি একশত লোকের মধ্যে সেই সকল গুণ থাকে তাহা হইলে বোধ হয় দশ হাজার ইংরাজের সেই সকল গুণ দেখিতে পাইব। কেবল সংখ্যার প্রভেদ—দুই জাতিতে উচ্চশ্রেণীর গুণী লোক সম্বন্ধে আর কোন প্রভেদ নাই।

ইংরাজজাতি ভাবুকতাময় একেবারেই নয়। ইহারা একটা দূর ভবিষ্যতের স্বপ্নরাজ্যে বাস করে না—অথবা অতীন্দ্রিয় জগতের ধার ধারে না। দুইজন চারি জন লোক হয়ত idealism, transcendentalism, mysticism ইত্যাদির চর্চ্চা করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধারণ উচ্চশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত সমাজে এরূপ কল্পনা-প্রবণতা ও আদর্শ-প্রিয়তার সম্পূর্ণ অভাব। ইহারা বর্ত্তমান লইয়া ব্যস্ত থাকিতে চাহে। হাতের সম্মুখে, চোখের সম্মুখে যে কাজ বা কর্ত্তব্য উপস্থিত তাহাই সমাধা করিবার জন্য উৎসুক। বেশী দূর ভবিষ্যতের লক্ষ্য ইহারা আলোচনা করিতে ইচ্ছা করে না। অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা যাইবে এইরূপ বিবেচনা করিয়া ইহারা সর্ব্বদা নিশ্চিন্ত থাকে। কাজেই কোনরূপ আবেগ, উদ্বেগ, হুজুগ, উন্মাদনা, উত্তেজনা বা অত্যধিক আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি বিলাতী সমাজে বিরল। কার্য্যকরী বুদ্ধিমত্তা ইহাদের জাতীয় গুণ স্বরূপ।

বিলাতেও "জাতিভেদ" যথেষ্ট। টাকা পয়সা হিসাবে এদেশে উচ্চনীচ বিভাগ হইয়া থাকে একথা সকলেই জানে। কিন্তু আমাদের অনেকের বিশ্বাস যে,—"ইংরাজেরা ইচ্ছা করিলে ছোট অবস্থা হইতে বড় অবস্থায় উঠিতে পারে; কাজেই বিলাতী জাতিভেদ প্রথা ভারতীয় জাতিভেদ প্রথা হইতে

স্বতন্ত্র ও উন্নত ধরণের।" কিন্তু বিলাতে আসিয়া তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এখানকার কুলী মজুর, গাড়োয়ান, দ্বারবান, ঝি চাকর, সৈন্য খালাশী ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া শিক্ষক, কেরাণী, অধ্যাপক, ব্যবসায়ী ইত্যাদি নানা শ্রেণীর লোকের বিবাহ সম্বন্ধ এবং বৈষয়িক ক্রমোন্নতির উপায় আলোচনা করিলে কি দেখিতে পাই? অনুসন্ধানে জানা যায়, যে নিম্ন হইতে উচ্চ স্তরে উঠিবার দৃষ্টান্ত এ-সমাজে অনেক আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু মোটের উপর শ্রেণীগুলি নিতান্তই আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা। গাড়োয়ানের বংশধরেরা কোন উচ্চতর সোপানে পদার্পণ করিবার সুযোগ অতি সামান্যই পাইয়া থাকে। ভারতীয় জাতিভেদের নিয়মে উঠানামা যেরূপ সহজ বা যেরূপ কঠিন বিলাতী জাতিবিভাগের ব্যবস্থায়ও প্রায় তদ্রূপ। এ বিষয়টা বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা করিতে হইলে দুই দেশের প্রত্যেক "জাতির" লোকসংখ্যা গণনা করিয়া তুলনা করা আবশ্যক।

উচ্চ জাতিস্থ লোকেরা ভারতবর্ষে তাহাদের নিম্ন শ্রেণীর নরনারীকে সামাজিক হিসাবে যতটা অবজ্ঞা করিয়া থাকে, ইংরাজেরা তাহাদের ছোট জাতিকে তাহা অপেক্ষা কম অবজ্ঞা করে না। এদেশে অস্পৃশ্যতা বা "জলচল" ইত্যাদি ধারণা নাই। এজন্য অবজ্ঞা বা ঘৃণার ভাব বুঝিতে পারা যায় না। ভারতবর্ষে untouchable সমস্যা অর্থাৎ "ছুঁৎ" জ্ঞান না থাকিলে জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান প্রতিবাদ লুপ্ত হইয়া যাইবে।

বিলাতী জাতিভেদ না বুঝিতে পারিবার আর একটা কারণ আছে। এদেশে Compulsory Education-প্রথা প্রচলিত। কাজেই ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রত্যেক বালক বালিকা লেখা পড়া শিখিতে বাধ্য। এই শিক্ষার ফলে আর কিছু লাভ হউক বা না হউক, সংবাদ-পত্র এবং উপন্যাস পাঠ করিবার ক্ষমতা জন্মে। কিন্তু এই শিক্ষার প্রভাবে সামাজিক বা আর্থিক উন্নতির সুযোগ বেশী কিছু সৃষ্ট হয় না। গাড়োয়ানের পুত্র প্রায়ই গাড়োয়ান এবং ঝির কন্যা প্রায়ই ঝি থাকিয়া যায়। ফলতঃ বংশগত জাতিভেদ বিলাতে নাই তাহা বলা চলিতে পারে না।

বিলাতে দারিদ্র্য-সমস্যা, শ্রমজীবি-সমস্যা, মহাজন-মজুর-বিরোধ, ধর্ম্মঘট, ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদি সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইংরাজ সমাজের দ্বিতীয় সমস্যা সামাজিক ও পারিবারিক। এখানকার স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ, বিবাহসমস্যা, রমণীজাতির অবস্থা, যৌন-বিভ্রাট, ইত্যাদি ভারতবাসীর নিকট বড়ই বিচিত্র। এদেশের স্ত্রীস্বাধীনতা ভারতবর্ষে নাই। কিন্তু ভারতীয় রমণীর দুরবস্থা বেশী কি ইংরাজ রমণীর দুরবস্থা বেশী তাহা মীমাংসা করা কঠিন। বিলাতী স্ত্রী-সমাজে দুঃখের সীমা নাই মনে হইয়াছে। দরিদ্র রমণীদিগকে খাটিয়া খাইতে হয়। ইহাদের কর্ম্মস্থানে নানা প্রকার কষ্ট বর্ত্তমান। ইহারা কোন প্রকার শান্তি বা সুখ পায় না। অধিকন্তু রমণীসমাজের জন্য মজুরীর যেরূপ হার নির্দ্ধারিত তাহার দ্বারা কোন স্ত্রীলোকের অশনবসনের ব্যয় কুলাইতে পারে না। কাজেই অনেক সময়ে অসদুপায়ে অন্নসংস্থানের আবশ্যক হয়।

এদিকে দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, ধনী ইত্যাদি সকল সমাজেই বিবাহিত জীবন বিরল হইতে চলিয়াছে। পারিবারিক দায়িত্ব গ্রহণ করিতে প্রায় লোকই অনিচ্ছুক। আবার বিবাহ হইলেও যাহাতে একাধিক সন্তান না জন্মে

তাহার জন্য স্ত্রী স্বামী উভয়েই নানা প্রকার কৌশল অবলম্বন করে। বলা বাহুল্য এই সকল কারণে দেশের ভিতর দুর্নীতি স্থায়ী ঘর করিয়া বসিতেছে।

সার্ব্বজনীন শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা পাশ্চাত্য জগতে অল্প দিন হইল মাত্র দেখা দিয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে Compulsory Education শব্দটা কোন ভাষায়ই সুপ্রচলিত ছিল না। ইহা উনবিংশশতাব্দীর শেষার্দ্ধের আবিষ্কার। কাজেই হিন্দু-সমাজের ভিতর এই প্রথার প্রভাব দেখিয়াই হিন্দু জীবনকে তিরস্কার করা যায় না। যে যুগ পর্য্যন্ত ভারতবাসীর স্বচেষ্টায় স্বকার্য্য সাধন করিত ততদিন পর্য্যন্ত ইয়োরোপের কুত্রাপি এই সার্ব্বজনীন লোক-শিক্ষার প্রবর্ত্তন হয় নাই।

আজ কাল বিলাতে অবশ্য বাধ্যতা মূলক শিক্ষা-নীতি প্রবর্ত্তিত। তাহার সুফল সামাজিক বা পারিবারিক জীবনে দেখা দিয়াছে কি না বিচার করিবার সুযোগ পাই নাই। কিন্তু আর্থিক হিসাবে এবং রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে এই লোকশিক্ষা প্রণালীর দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। স্বাধীন চিন্তা, কর্ত্তব্য বোধ, দায়িত্ব জ্ঞান ইত্যাদি ইংরাজ জনসাধারণের ভিতর অত্যধিক নাই। দুইচারি দশজন বড়লোক দেশের শিল্প ও রাষ্ট্রকে যেরূপ চালাইতেছেন দেশ সেইরূপ চলিতেছে।

(২) জাহাজে জীবন

শীতকালে ভারতমহাসাগর যেমন শান্ত আটলান্টিক মহাসাগর তেমনি ভয়ঙ্কর। লিভারপুল হইতে নিউইয়র্ক পৌছিতে সাত দিন মাত্র লাগে। এই সাত দিন বিছানায় শুইয়া কাটাইতে হইয়াছে। মাথা তুলিবার শক্তি ছিল না। কামরার ভিতর দুর্গন্ধের জন্য বেশীক্ষণ থাকা অসম্ভব। রাত্রিকালে ৬।৭ ঘণ্টা মাত্র কামরার মধ্যে থাকিতাম। দিবারাত্রের অবশিষ্ট সময় ডেকের উপর চেয়ারে লম্বা হইয়া পড়িতে হইত। ডেকের নির্ম্মল বায়ু সেবন করিলে উদ্গার বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু বাতাস এত ঠাণ্ডা ও প্রবল যে ডেকে বসিয়া সময় কাটানও যার পর নাই কষ্টকর। কাজেই আমেরিকা-যাত্রা বহুকাল মনে থাকিবে।

যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে আমেরিকাযাত্রীর সংখ্যা অভাবনীয়রূপে বাড়িয়া উঠিয়াছে। গত তিন মাসের ভিতর যত জাহাজ বিলাত হইতে আমেরিকা রওনা হইয়াছে তাহাতে লোকের ভিড় অত্যধিক ছিল। বহু কষ্টে এত দিনে টিকেট পাওয়া গিয়াছে।

জাহাজখানা আমেরিকান কোম্পানীর—অর্থাৎ উদাসীনরাষ্ট্রীয়। এই জাহাজে আসিবার জন্য সকলেই লালায়িত। কেন না শত্রুপক্ষীয় কোন রণতরী ইহাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। ইংরাজকোম্পানীর জাহাজে জার্ম্মাণ ও অষ্ট্রিয়ান যাত্রীর চলাফেরা করা অসম্ভব। কিন্তু উদাসীন জাহাজে ইংরাজ ও জার্ম্মাণ এক সঙ্গে বাস করিতে পারে। আমেরিকান কোম্পানী এই উপায়ে ব্যাঘ্রে বৃষভে সমন্বয় ঘটাইয়াছে বলিতে পারি।

একটা Noah's Arkএ রহিয়াছে মনে হইতেছে। এশিয়া ইয়োরোপ ও আমেরিকার নানাজাতীয় লোক সহযাত্রী। এক সঙ্গে নানা ভাষায় কথাবার্ত্তা চলিতেছে। কোনস্থানে বসিলে বা দাঁড়াইলে একটা ভাষাবিভ্রাট বা Babel of tongues এর পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য প্রায় সকলেই কমবেশী ইংরাজীও বলিতে পারে।

সহযাত্রী

এই জাহাজে সস্ত্রীক অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু আছেন। আমেরিকার ৪৫টা বিশ্‌বিদ্যালয় এবং বিজ্ঞানসভা ইহাঁকে বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। এতদিন ইনি ইয়োরোপের নানা কেন্দ্রে নিজ গবেষণার বিবরণ দিতেছিলেন। প্যারি, ভিয়েনা, অক্সফোর্ড, লণ্ডন, কেম্ব্রিজ ইত্যাদি নগরের বিভিন্ন বিদ্বৎপরিষদে ইহাঁর বক্তৃতা হইয়াছে। এই সকল বক্তৃতা যথেষ্ট সমাদৃতও হইয়াছে।

সহযাত্রীদিগের মধ্যে জাপানী, টার্ক, রুশ, হাঙ্গারিয়ান, অষ্ট্রিয়ান, বেলজিয়ান, জার্ম্মাণ, ফরাসী, অষ্ট্রেলিয়ান, ক্যানাডিয়ান, ইয়াঙ্কি ও ইংরাজ ইত্যাদি সকল জাতীয় দু'একজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইল। অষ্ট্রিয়ান, হাঙ্গারিয়ান ও জার্ম্মানদিগের এক্ষণে ইংলণ্ডে বাস করা কঠিন। প্রায় সকলকেই বন্দীভাবে থাকিতে হয়। এইজন্য কেহ কেহ নানা কৌশলে ইংরাজের কৃপাপাত্র হইয়া আমেরিকায় আসিবার অনুমতি-পত্র পাইয়াছে। এইরূপ অনুমতি-প্রাপ্ত পলাতক জার্ম্মাণ ও অষ্ট্রিয়ান জাহাজে অনেক দেখিলাম।

একজন হাঙ্গারিয়ান যুবক হাঙ্গারী দেশীয় কোন জাহাজ কোম্পানীর অধীনে কর্ম্ম করিত। যুবক ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট। যুদ্ধারম্ভের পর হইতে কোম্পানীর কাজ এক প্রকার বন্ধ রহিয়াছে। লণ্ডনে ইহাদের একটি প্রধান কেন্দ্র। যুবক লণ্ডনের আফিসে কর্ম্মচারী ছিল। যুদ্ধের হিড়িকে ইংরাজেরা ইংল্যাণ্ড-প্রবাসী প্রত্যেক অষ্ট্রিয়ান, হাঙ্গারিয়ান ও জার্ম্মাণ নরনারীকে গুপ্তচর জ্ঞানে কারারুদ্ধ করিতেছেন। এই উপায়ে প্রায় ১০,০০০ লোক এক্ষণে বন্দী হইয়াছে। হাঙ্গারিয়ান যুবক ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখাইয়া সপ্রমাণ করিয়াছে যে, তাহার শরীর অসুস্থ, সুতরাং যুদ্ধকর্ম্মের জন্য অপটু। এইজন্য ইংরাজ সরকার ইহাকে অব্যাহতি দিয়াছেন। যুবক নিউইয়র্কে পৌঁছিয়া কোন ব্যাঙ্কে চাকরী খুঁজিবে।

এক ইয়াঙ্কির সঙ্গে আলাপ হইল। ইহাঁর লম্বাচৌড়া বোলচাল ও আস্ফালন দেখিয়া হাস্যসংবরণ করা কঠিন। প্রথমেই ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা; তাহার পর ব্যবসায়ের কথা। ইনি বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আর কি, মহাশয়? দেখিতেছেন কি? যুদ্ধের ফলে জগতে কি হইবে জানেন? দুনিয়ার বাজারে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা হইয়া উঠিবে। ইতিমধ্যেই ইংল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কগুলি আমরা কিনিয়া ফেলিয়াছি! ইংরাজের বাণিজ্যও সবই ইয়াঙ্কিদের হস্তগত হইতে চলিল। ইয়োরোপের এই সংগ্রামে আমেরিকাবাসীর ষোলআনা লাভ।" তারপর যুদ্ধসম্বন্ধে কথা উঠিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "যদি আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধ বাধে তাহা হইলে কি হইবে?" ইনি বলিলেন, "আমরা কি বেকুব যে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইব? আর যুদ্ধ বাধিলেই বা ভয় কি? আমাদের বিজ্ঞানবীরেরা এরূপ অদ্ভুত বারুদ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন যে, ২০০ মাইল দূরের জাহাজ পলকের মধ্যে ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। অবশ্য আমাদের শত্রুপক্ষীয় কোন লোকই এখনও সেকথা জানে না। যুদ্ধ-বাধিলে মজা দেখাইব।" আমেরিকা অতিশয়োক্তির দেশ বলিয়া জানিতাম। এই বাক্যবীর ইয়াঙ্কিকে দেখিয়া খাঁটি আমেরিকান "Bluff"এর পরিচয় পাইলাম।

ইনি সহযাত্রীদিগকে জাহাজের নানা স্থানে লইয়া গিয়া নানা জিনিষ দেখাইতেছেন, নানা

বক্তৃতা করিতেছেন। সকলকে বুঝান হইতেছে, "এই যে কলটা দেখিতেছেন ইহা আর কোন জাহাজে পাইবেন না—ইহা ইয়াঙ্কিদের খাস। অমুক সুবিধা, অমুক ব্যবস্থা, অমুক নিয়ম ফরাসী, জার্ম্মাণ বা ইংরাজ জাহাজকোম্পানীরা করিতে পারেন না। এই সকল নূতন নূতন যাহাকিছু দেখিতেছেন সবই আমরা আবিষ্কার করিয়াছি।" ইত্যাদি।

জাপানী-পর্য্যটক

তিনজন জাপানী অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ হইল। একজন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানী ভাষা এবং তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের অধ্যাপক। ইনি ২০ বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি বলেন, "বৌদ্ধ প্রভাবে বহু সংস্কৃত শব্দ জাপানীভাষার অন্তর্গত হইয়াছে। প্রাচীন এশিয়ায় জাতিসংমিশ্রণ এবং ধর্ম্মবিনিময় কিরূপে সাধিত হইয়াছিল, ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনা করিলে তাহা নূতন উপায়ে স্পষ্ট হইতে পারে। এশিয়ার প্রাচীন ও নবীন ভাষাগুলি সম্বন্ধে এই কারণে বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক গবেষণা আরম্ভ করা আবশ্যক।"

অধ্যাপক মহাশয় রুশিয়া হইতে জার্ম্মাণি ফ্রান্স ইত্যাদি দেশ দেখিয়া ঘরে ফিরিবেন স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্বে রুশিয়া এবং পরে ইংল্যণ্ড এই দুই দেশমাত্র ঘুরিতে পারিয়াছেন। এক্ষণে আমেরিকা দেখিয়া জাপানে যাইবেন।

দ্বিতীয় জাপানী ইলেক্‌ট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ার। ইনি ১৫ বৎসর পূর্ব্বে একবার ইয়োরোপ ঘুরিয়া গিয়াছেন। ইতিমধ্যে পাশ্চাত্য জগতে কোন্ কোন্ বিষয়ে উন্নতি হইয়াছে তাহা বুঝিবার জন্য ইনি দ্বিতীয়বার আসিয়াছেন। ইনি বলেন "আমি যখন প্রথম বিলাতে আসি তখন ওদেশে ইলেক্‌ট্রিক্যাল কারখানা অতি সামান্য ধরণের ছিল। এখনও ইংল্যণ্ড হইতে এবিষয়ে জাপানের কিছু শিখিবার নাই।" ইনি সুইজর্ল্যণ্ড এবং জার্ম্মাণির প্রশংসা করিলেন।

তিনজন জাপানীই গবর্মেণ্টের খরচে প্রেরিত হইয়াছেন। কোথায় কোন্ জিনিষ নূতন এবং জাপানে প্রবর্ত্তনযোগ্য বিশেষভাবে এই অনুসন্ধানই ইহাঁদের উদ্দেশ্য। কাজেই ইহাঁরা কেহই নিতান্ত নাবালক নহেন। দেশে কাজকর্ম্ম করিয়া যাঁহারা পারদর্শী হইয়াছেন, তাঁহারাই বিদেশের তথ্য সংগ্রহ করিতে আসিয়াছেন। তৃতীয় অধ্যাপক জাপানের কোন প্রাদেশিক শিক্ষক-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক। শিক্ষা-বিজ্ঞান ইহাঁর আলোচ্য বিষয়। ইনি জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বৎসর কাটাইয়া দেশে ফিরিতেছেন। শুনিলাম যুদ্ধ বাধিবার পর জার্ম্মাণি হইতে পলাইবার সময়ে ইহাঁর বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল।

পলাতক কুমারীদ্বয়

আর দুই জন পলাতকের সঙ্গে আলাপ হইল। ইহাঁরা অল্পবয়স্কা কুমারী। একজন কোন অষ্ট্রীয়ান সেনাধ্যক্ষের কন্যা, অপরটি তুরস্কের প্রজা—ইহুদি কন্যা। সঙ্গে অভিভাবক কেহই নাই এবং নিউইয়র্কে জাহাজ লাগিবার সময়ে যে ১৫০৲ দেখাইতে হইবে তাহাও সঙ্গে নাই। এমন কি জাহাজের টিকেট কিনিবার পর হাতে মাত্র ২।৪৲ টাকা আছে। কিন্তু দুই জনেই নির্ভীক হৃদয়ে সাহসের সহিত চলা ফেরা করিতেছে। কোন রূপ উদ্বেগ বা আশঙ্কা নাই। উভয়েই জার্ম্মাণ, ফরাসী ও ইংরাজী ভাল জানে।

শুনিলাম, ইহারা আমেরিকায় পৌঁছিয়া

চাকরী করিবে সেই চাকরীর আশায়ই এতদূর আসিতেছে। ইহুদি-কন্যা শিক্ষয়িত্রী—স্যান্‌ফ্রান্সিস্কোর কোন বিদ্যালয়ে কর্ম্ম পাইবার আশা করিতেছে। অষ্ট্রীয়ান কন্যা ইতি মধ্যে বিলাতে থাকিতে থাকিতে নিজের অন্নসংস্থান করিয়া দেশে মাতার নিকট অর্থ সাহায্য পাঠাইয়াছে। যুদ্ধ বাধিবার পর লণ্ডনে থাকা কঠিন হয়, অথচ কর্ম্মাভাব এবং অন্নাভাব। কিন্তু দেশ হইতে টাকা আনাইবার পথ বন্ধ। কাজেই আমেরিকাবাসী কোন দূর আত্মীয়ের অর্থ সাহায্যে তাঁহার গৃহে আসিতেছে। এই খানে নাকি কোন চাকরী পাওয়া যাইবে। এই দুই রমণীরই নিজে খাটিয়া অন্নসংস্থান করিবার ইচ্ছা বলবতী। পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে কেহই চাহে না।

জাহাজে সমাজ

জাহাজে সদসৎ নানা প্রকার নরনারীই যাওয়া আসা করে। অভিভাবকবিহীন রমণীদিগের চরিত্র সম্বন্ধে কোম্পানীর সন্দেহ। বিশেষতঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আইনে ইয়োরোপ হইতে বেশ্যা আমদানীর বিরুদ্ধে বিশেষ যত্ন লওয়া হয়। এজন্য স্বাধীন রমণীদিগের উপর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি কিছু বেশী। জাহাজ লাগিবামাত্র প্রত্যেকের ঠিকানা ভাল করিয়া দেখা হয়। কেহ অসচ্চরিত্রা প্রমাণিত হইলে, তাহাকে বন্দরে নামিতেই দেওয়া হয় না। যদি কেহ বলে "আমার সঙ্গে কোন অভিভাবক নাই বটে কিন্তু আমি আমার আত্মীয়ের গৃহেই যাইতেছি," তাহা হইলে তাহার কথানুসারে কোম্পানীর লোক রেলওয়েষ্টেসন পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া টিকেট কিনিয়া দেয় অথবা তাহার আত্মীয়ের নিকট তারে সংবাদ লইয়া কর্ত্তব্য স্থির করে। এযাত্রায় দেখিলাম অষ্ট্রীয়ান-কন্যা ও ইহুদি-কন্যাকে কিছুকাল পর্য্যন্ত নজরবন্দ করিয়া পরে একজন রমণী কর্ম্মচারীর অধীনে রেলে বসাইয়া দেওয়া হইল।

এত কড়া নিয়ম সত্ত্বেও দুর্নীতির অব্যাহত গতি। জাহাজে দুষ্ট চরিত্র স্ত্রীপুরুষেরা যথেচ্ছ আচরণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করে না। তাহা ছাড়া ভদ্রঘরের যুবকযুবতীরাও জাহাজে প্রণয়পাশে বদ্ধ হইবার সুযোগ পায়। জাহাজে জীবন যাপন অনেক স্থলে বিবাহ-বন্ধনের উপায় স্বরূপ হইয়া উঠে। শুনিলাম, আমাদের সহযাত্রীদের মধ্যে দুইজনের বিবাহের পাকা কথা হইয়া গেল।

পাশ্চাত্য সমাজে বিবাহ বড়ই বিরল হইতে চলিয়াছে। বিশেষতঃ পুরুষেরা কোন এক জন রমণীর নিকট চির-বন্ধনে আবদ্ধ থাকিতে ইচ্ছা করে না। কাজেই স্ত্রীজাতি পুরুষজাতি সম্বন্ধে বড়ই সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া উঠিতেছে। পুরুষের প্রতিজ্ঞা বা ভালবাসার কথা শুনিয়া পাশ্চাত্য রমণীরা আর ভুলে না। অথচ অন্নবস্ত্রের জন্য স্বামী-সংগ্রহও আবশ্যক। কাজেই পাশ্চাত্য জগতের রমণীসমাজ বড়ই দুঃখনৈরাশ্যময় জীবন যাপন করে।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

ক্ষয়রোগ ও তন্নিবারণ সম্বন্ধে গুটিকয়েক অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়

ব্যামো বেড়ে যাচ্ছে

আমাদের বাঙ্গালাতে ক্ষয় রোগ যে ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে, সে কথা বোধ হয় কাউকে যুক্তি-তর্ক দিয়ে বোঝাতে হবে না। গবর্ণমেণ্টের স্যানিটারী কমিশনার যে রিপোর্ট দেন, তাতেও দেখা যায় যে, এ রোগ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ১৯০৮ সালে এক কলিকাতা সহরেই এই ব্যামোতে শত করা ৮ জন মারা পড়েছে—১৯১২ সালে মৃত্যুহার শতকরা ১০ জনে উঠেছে এবং উহা ক্রমাগতই বাড়্তিমুখে যাচ্ছে।

মৃত্যু তালিকা যে ভাবে নেওয়া হয় তাহা যথার্থ নহে

আমাদের দেশে কার কিসে মৃত্যু হলো সে খবর ঠিক নেওয়া হয় না। পাড়াগাঁয়ে ত চৌকীদারেরাই এই সব খবর নিয়ে থাকে। তাদের দিয়ে এই সব গুরুতর কাজ কতটা ভালরূপ চল্‌তে পারে তা সকলেই বুঝতে পারেন। সহরতলীতেও অনেক সময়ই মৃত্যুর কারণ যে যা বলে, তাই লিখে নেওয়া হয়। আমার মনে হয়, যাঁদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান আছে ও ব্যামো যাঁরা চিন্‌তে পারেন, এরূপ শিক্ষিত লোক যদি এই কাজের ভার নেন তবে অনেকটা সুফল ফল্‌তে পারে। সহরতলী ও মহকুমা-গুলিতে এঁদের এই কাজে লাগিয়ে দিয়ে পরীক্ষা স্বরূপ দেখা যেতে পারে।

যথার্থ ভাবে নেওয়ার উপায়

প্রত্যেক মহকুমায় স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য এক একজন করে স্যানিটারী ইনস্পেক্টার নিযুক্ত হ'বার কথা শুন্‌ছি, তাঁদের উপর এ ভার দিলে বেশ চল্‌তে পারে। তবে এক একটা মহকুমা আয়তনে বড় যেমন তেমন নয়, একজন দিয়ে সব কাজ কুলিয়ে উঠা বড় শক্ত। তা কি করা যায়—ঐ একজনই যে নেই। কথায় বলে 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল'। তা ঐ একজন দিয়েই বর্ত্তমানে আমাদের কাজ চালিয়ে নিতে হবে। প্রত্যেক মহকুমার অন্তর্গত গ্রামগুলি যদি ভাগ করে নেওয়া যায় এবং পর্য্যায়ক্রমে ঐগুলি ঘুরে দেখা যায়, তা হলে অনেকটা কাজ এগুতে পারে। অধীনস্থ লোকদের বলে দিতে হবে, যাতে তারা ঠিক খবর সংগ্রহ করে। যখন ইনস্পেক্টার সাহেব 'টুরে' যাবেন, তখন নোটবুক দেখে খোঁজ করলেই সন্দেহের কারণ দূর হবে। প্রত্যেক গ্রামে ত আর রোজই ১০।২০ জন ক'রে মরে না—আর খবরটা ৫।১০ দিন পরে পেলেও যখন 'ঝুটা' হয়ে যাবার ভয় নাই, তখন একটু মনোযোগ কর্‌লে যে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া যাবে তাতে কোনই সন্দেহ নাই।

যারা ব্যামোতে ভুগ্‌ছে, তাদের সংস্পর্শে আমাদের নিত্যই আস্‌তে হচ্ছে,—আমরা জানতে পারছি, ক্ষয় রোগ কেমন দ্রুত বেড়ে উঠ্‌ছে।

সরকারী রিপোর্টে যে মৃত্যুসংখ্যা দেখা যায় তা থেকে উহা ঢের বেশী বলে আমার মনে হয়। কারণ আমাদের প্রায় এমন দিন যায়ই না, যেদিন অন্ততঃ ২।১টী ক্ষয়ের রোগী না দেখি।

সতর্কতার প্রয়োজন

ক্ষয় বহুরূপী। একরূপে না হয় অন্যরূপে উহাকে নিয়তই দেখ্‌তে পাচ্ছি। এ শত্রু যদি আমাদের এতই পিছু নিয়ে থাকে তাহলে কি আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত নয়? ইহা যাতে একেবারে নির্ম্মূল হয়, তার জন্যে কি আমাদের সকলে মিলে একান্ত চেষ্টা করা উচিত নয়?

চেষ্টা কর্‌লে ইহা দূর করা যেতে পারে

ক্ষয় এমন একটা রোগ নয় যার আমরা কিছুই কর্‌তে পারি না। আমরা একটু সচেষ্ট হলেই একে দূর কর্‌তে পারি। কতক কতক দেশে ইহা চেষ্টার দ্বারা তাড়িত হয়েছে। ইংরেজদের মুলুকে এ রোগে মৃত্যু-সংখ্যা পূর্ব্বের চেয়ে ঢের কমে গিয়েছে। জার্ম্মাণি (?), ফরাসী প্রভৃতি উন্নত ও সুসভ্য দেশেও এতে এখন খুব কম লোক মারা যাচ্ছে। স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্যই ঐ সব দেশের মৃত্যুসংখ্যা কমেছে। প্রজাদের স্বাস্থ্য যাতে সর্ব্বদা ভাল থাকে, তথাকার গবর্ণমেণ্টের সে বিষয়ে সর্ব্বদাই দৃষ্টি রয়েছে। ক্ষয় যাতে না বাড়্‌তে পারে, তার জন্য তারা কত উপায়ই না উদ্ভাবন কর্‌ছে—আপদটা যাতে একেবারে দূর হয়ে যায়, তার জন্য সকলে মিলে কি চেষ্টাই না কর্‌ছে এবং সকলের এই সমবেত চেষ্টায় ব্যাধি খুব দ্রুত কমে যাচ্ছে।

এতৎসম্বন্ধে লোকশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

দেশের সাধারণ লোক কোন নূতন কথা সহজে বিশ্বাস কর্‌তে রাজি হয় না, পুরাণো সংস্কারও কেউ হঠাৎ দূর কর্‌তে পারে না। একটা বিষয় উপকারী কি অপকারী তা তলিয়ে না দেখে হঠাৎ বিশ্বাস করার দিন চলে গেছে। সুতরাং লোকের বিশ্বাস পেতে হ'লে বিষয়টার উপকার সম্বন্ধে তাদের বেশ করে বুঝিয়ে দিতে হবে। যদি তারা সুফল দেখ্‌তে পায়, তখন আপনা থেকে এসেই দলে মিশ্‌বে। যে সব উপায়ে অন্যান্য দেশে ক্ষয় কমে গেছে, সেগুলি যদি সকলকে সহজ ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া যায়, তবে অনেকটা উপকার প্রত্যাশা করা যায়।

গবর্ণমেণ্টের সাহায্য আবশ্যক

আশা করি, এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষিত হবে এবং যাতে সাধারণে এ বিষয়ে জ্ঞান-লাভ করিতে পারে, তার একটা উপায় হবে। গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ উভয়ে একযোগে চেষ্টা কর্‌লে আমাদের দেশ হতে এ ব্যামো সম্পূর্ণ দূর না হউক—অনেকটা যে কমে যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নাই।

ক্ষয় কোথায় কোথায় হয়

(১) ক্ষয় শরীরের সব জায়গায়ই হ'তে পারে, তবে প্রধাণতঃ ফুস্‌ফুস্‌কেই আক্রমণ করে, যাকে আমরা যক্ষ্মা কাশ হয়েছে বলে থাকি। জ্বর, কাসী, গলা দিয়ে রক্ত উঠা প্রভৃতি উহার লক্ষণ।

(২) গলায়, ঘাড়ে, বগলে, পেটে, কুঁচ্‌কীতে ও অন্যান্য স্থানের বীচিগুলি (glands) ক্ষয় দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। অনেক ছেলে মেয়ের গলার চারি পাশে সুপারী মত বীচি ফুলা দেখতে পাওয়া

যায়, ওগুলি প্রায়ই এই জাতীয়। উহা সময় সময় আপনা থেকেই পেকে ফেটে যায় ও পুঁজ রক্ত বের হয়; কিন্তু সারবার বেলায় সহজে সারে না—অনেক দিন ভুগ্‌তে হয়।

(৩) হাড়ে বা গাঁটেও এই ব্যামো দেখা যায়। সাধারণতঃ পিঠের শিরদাঁড়ার হাড়ে, কোমর ও উরুদেশের সন্ধিস্থলে ও হাঁটুতে ইহা দেখা যায়, যে কোন স্থানের হাড়ে বা গাঁটেই উহা হতে পারে।

(৪) মস্তিষ্ক ও অন্যান্য স্নায়ুকেও আক্রমণ করে। শিশুদের মেনেঞ্জাইটিস্ (menengitis) নামে যে ব্যামো হয়—যাতে তারা তাদের মাথা ক্রমাগতই এ পাশ ও পাশ কর্‌তে থাকে, ভুল বকে ও জ্বর হয়, তা প্রায়ই এই ক্ষয়জনিত।

(৫) ফুস্‌ফুসের উপরের পর্দ্দাটার প্রদাহ হয়ে প্লুরিসি (Plurisy) হয়। উহা প্রায়ই ক্ষয় হতে হয়, সময় সময় যে ক্ষয় ভিন্নও উহা না হয়, তা নয়। তবে আজকাল প্লুরিসি হ'লেই উহা ক্ষয়জনিত বলে ধরে নেওয়া হয় এবং সেই জন্য প্লুরিসি হ'লেই ডাক্তারেরা বিশেষ সাবধান হতে বলেন। হয়ত বুকে দু'দিন একটু বেদনা হয়ে জ্বর হলো, বেদনা হয়ত তত বেশীও হল না, অল্পেই সব সেরে গেল, কিন্তু ডাক্তারেরা বলে বস্‌লেন, একটু প্লুরিসি যখন হয়েছিল তখন দিন কয়েক হাওয়া বদ্‌লালে মন্দ হয় না, কিছুদিন বলকারক ঔষধ খাও, গায়ে পাৎলা ভিয়েলা ফ্লানেলের জামা রেখো, ঠাণ্ডা যেন না লাগে। অনেক রোগী হেসে উড়িয়ে দেয়—ভাবে ডাক্তার খামোখা একটা হাঙ্গামা বাধাচ্ছে, মশা মার্‌তে কামান দাগার বন্দোবস্ত কোর্‌ছে। বাস্তবিক তা নয়; যেমন জাহাজের পাকা কাপ্তেন আকাশে সামান্য এক টুকরা মেঘ দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারে, কোন্ মেঘে ঝড় হবার ভয় এবং বহুপূর্ব্বে হতেই জাহাজকে ঝড়থেকে বাঁচাবার জন্য সাবধানতা নেয়; বিজ্ঞ চিকিৎসকও তাই ক'রে থাকেন মাত্র। তাঁরা দেখে দেখে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন যে। যাঁরা এ সময়ে সাবধানতা নেন না, ভবিষ্যতে তাঁদের প্রায় সকলেরই যক্ষ্মা হতে দেখা যায়, কাজেই তাঁরা অত করে সাবধান করেন। বাস্তবিক বিষয়টি উপেক্ষার নহে।

এইরূপ অনেক সময় নিউমোনিয়া ও (Pneumonia) ব্রঙ্কাইটিসও (Bronchitis) ক্ষয় বীজ হতে হয় এবং অবশেষে পাকা যক্ষ্মায় পরিণত হয়।

পেটের ভিতরে ও পেটের চারিদিক ঘিরে একটা পরদা (Peritoneum) আছে উহারও ক্ষয়জনিত প্রদাহ হয়ে পেরিটোনাইটিস (Perietonitis) হয়।

(৬) পেটের ভিতরস্থিত আঁতে (Intestine) অনেক সময় ক্ষয়জনিত ঘা হয়, ঐ সব স্থানের বীচিগুলিও সঙ্গে সঙ্গে প্রায়শই বড় হয়।

(৭) উহা স্ত্রীলোকের গর্ভাশয় (uterus) ও তৎসম্পর্কীয় ডিম্বকোষ (ovary) ও ডিম্বনালীকে (tubes) আক্রমণ করে।

(৮) এ ছাড়া অন্যান্য স্থানেও ক্ষয় হতে পারে। যথা প্লীহা, যকৃৎ, মূত্রাশয়, অণ্ডকোষ ইত্যাদি। উহা একই সময়ে একাধিক স্থানও আক্রমণ কর্‌তে পারে।

(৯) সময় সময় উহা শরীরের সকল স্থানেই এককালীন আক্রমণ করে, তখন উহাকে জেনারেল মিলিয়ারী টিউবার্কিউলোসিস্ (general miliary tuberculosis) বলে। একটা আবদ্ধ স্থান হতেও ক্ষয় এইরূপে সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়্‌তে পারে।

ক্ষয়রোগে আক্রমণ করিলে, আক্রান্ত

স্থান সমূহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু গোটা হয় এবং এই গোটাগুলিকে টিউবার্কল (Tubercle) বলা হয়। এইজন্য এই ব্যাধিকে টিউবার্কিউ-লোসিস্ বা ক্ষয় বলা হয়।

ব্যামো দেখা দিবার সময়কার লক্ষণ

ক্ষয় হইলেই সঙ্গে সঙ্গে জ্বরটি এসে দেখা দেয়। অন্যান্য লক্ষণ যখন থাকে, তখন ইহা ধরা কিছু কঠিন নয়। কিন্তু অন্য কোন লক্ষণ না থাকলেও প্রায়শই শুধু জ্বরের প্রকৃতি দেখে একে ধরা যেতে পারে। প্রায়ই ঘুস্ ঘুসে জ্বর হয়। হয়ত সন্ধ্যার সময় একটু ৯৯ ; ৯৯.৬ হলো, কি বড় জোর ১০০° অবধি গেল। ভোরে ৯৮° ; ৯৭.৬, ৯৭ হল; এইরূপ। হয়ত থার্ম্মোমিটারে (Thermometer) জ্বর উঠলই না, কিন্তু বিকেলের দিকে একটু চোখ জ্বালা, একটু হাত পা জ্বালা হ'ল, শরীরটায় সোয়াস্তী বোধ হল না। কোন কোন সময় জ্বর ১০২°।১০৩° ও হয়ে থাকে, ক্বচিৎ আরও বেশী হয় তবে ঘুস্‌ঘুসে জ্বরই বেশী। জ্বর না হয়েও যে ক্ষয় না হয় তা নয়, তবে উহা নগণ্যের মধ্যে, জ্বরের জোর যত অধিক ব্যামোও তত বেশী খারাপ। এ ছাড়া অনেক সময়ই ঘুস্‌ঘুসে কাসী থাকে; ঠাণ্ডা লাগ্‌তে না লাগতেই সর্দ্দি হয় ও প্রায় শতকরা ৭০ জনেরই গলা দিয়ে রক্ত পড়ে। এ সমস্তই অবশ্য ফুসফুসের আক্রমণ কালে ঘটে।

মানুষ ছাড়া আর কোন্ কোন্ জন্তুর ক্ষয়রোগ হয়

ক্ষয় যে কেবল মানুষেরই হয়, এমন নয়। শূকর, গরু, ঘোড়া, মোরগ, খরগোস, গিনী-পিগ (Guinea-Pig) বানর ও টীয়াপাখী প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তুদেরও হয়ে থাকে। বনে, জঙ্গলে, খোলা জায়গায় যাদের থাকা স্বভাব তাদের যদি বাটীর ভিতর এনে পোরা যায়, তবে তাদের প্রায়ই ক্ষয় হয়। তবে কতকগুলি জন্তুর সহজে হয় না। ভ্যাড়া ও পাঁঠার খুব কম হয়, আবার গরু, শূকর, মুরগী ও বানরের খুব বেশী হয়। ইংলণ্ডে ত প্রায় শতকরা ৭০টা গরুরই ক্ষয়রোগ দেখা যায়। ভারতবর্ষের গরুর বড় একটা এ ব্যামো হয় না। মাছেরও যে এ ব্যামো একেবারে না হয়, তা নয়, তবে খুব কম।

ব্যামোর মুখ্য কারণ ক্ষয়-জীবাণু

ক্ষয় জীবাণু হতে ক্ষয় ব্যামো হয়ে থাকে। ক্ষয় জীবাণু শরীরে প্রবেশ কর্‌লেই যে ক্ষয় হবে তা একেবারেই নয়। শরীরেরও আবার এমন একটা অবস্থা হওয়া চাই, যাতে ক্ষয় জীবাণু সেখানে যেয়ে তার হুকুমজারী কর্‌তে পারে। সবল সুস্থ শরীরে ক্ষয় জীবাণু ঢুকে বড় একটা এঁটে উঠ্‌তে পারে না। কিন্তু শরীর ত আর লোহার নয়, দেহ থাক্‌লেই তার ভাল মন্দ আছে। শরীর কোন কারণে দুর্ব্বল হয়ে পড়্‌লে, তবেই ক্ষয় জীবাণু উহাকে আক্রমণ কর্‌তে পারে।

সব প্রাণীরই আত্মরক্ষার একটা স্বভাব-দত্ত ক্ষমতা আছে। একটা বিড়াল বা কুকুরকেও মার্‌তে গেলে, তারা তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হয় ও উল্টে আমাদিগকে আক্রমণ করে। যদি আমরা তাদের সঙ্গে পেরে না উঠি, তবে তারা বেঁচে গেল ; আর যদি আমরা বলবান হই, তারা মারা পড়্‌ল। বাঁচুক আর মরুকই সকলেই প্রাণপণে যোঝে।

এই লড়াই কর্‌বার শক্তি যে কেবল এদেরই আছে তা নয়, আমাদেরও যথেষ্ট আছে; কুকুরে কামড়াতে এলে আমরাও প্রাণরক্ষার্থ

রীতিমত লড়াই করি। যেমন এই সব চাক্ষুষ শত্রুর হাত হতে বাঁচ্‌বার চেষ্টা করি, সেইরূপ অতীন্দ্রিয় শত্রুর আক্রমণেও করি। ক্ষয় রোগের মতন অনেক ব্যাধিই সাধারণ দৃষ্টির অগোচর অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু (microbe) দ্বারা উৎপাদিত হয়। আমরা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের (microscope) সাহায্যে এই সকল দেখ্‌তে পাই।

আক্রমণের প্রণালী

ইহারা যখন আমাদিগকে আক্রমণ করে তখন আমরা নিশ্চিন্ত থাকি না। আমাদের দেহেরও স্বভাবদত্ত রক্ষণ ক্ষমতা আছে। গোরা সৈন্যেরা (শ্বেতরক্তকণিকা Leucocytes) সর্ব্বদাই পাহারা দিচ্ছে কোন শত্রু শরীরে ঢুক্‌লেই তারা অমনি আক্রমণ করে। দেহের সুস্থ অবস্থায় উহারা সবল ও সচল থাকে—এ সময়ে শত্রুর আক্রমণ হলে উহারা প্রায়ই তাহাদিগকে পরাস্ত করে। কিন্তু যদি শরীর কোন কারণে অসুস্থ থাকে, তবে উহারা হীনবল ও কতকটা অচল হয়—তখন প্রায়ই বাহিরের শত্রুর সহিত তাহারা পেরে উঠে না এবং সহজেই তাহাদের নিকট পরাস্ত হয়।

বাহিরের শত্রুর সংখ্যা ও বলের উপরেও এবিষয়ে অনেকটা নির্ভর করে। দু'দশটায় আক্রমণ কর্‌লেই যে আমাদের কিছু করতে পারে তা নয়, অনেক শত্রু পিছু লাগ্‌লে তবে যদি কিছু করতে পারে। আর সব শত্রুই সমান বলশালী নয়, কতক বা নির্জ্জীব কতক বা দুর্দ্দান্ত। সুতরাং শত্রুর সংখ্যা ও বল উভয় অনুসারেই আক্রমণের তারতম্য ঘটে। কাজেই ক্ষয় জীবাণু দেহে প্রবেশ কর্‌লেই আমাদের ক্ষয় হয় না। কত ক্ষয় জীবাণুই ত আমাদের শরীরের ভিতর আছে; কিন্তু আমাদের দেহের পাহারাওয়ালারাও সতর্ক—শত্রু ঢুক্‌তে না ঢুক্‌তেই তাদের তাড়া কর্‌ছে এবং ধ্বংস কর্‌ছে। তবে শরীর যদি কোনক্রমে ভেঙ্গে যায়,শরীরের স্বভাবিক বল যদি ক্ষয় হয় তবে পাহারাওয়ালারাও নির্জ্জীব হয়ে পড়ে ও তাহাদের শত্রুদমনে তত শক্তি থাকে না; তাই শত্রু দেহে প্রবেশ কর্‌বার সুযোগ পায়। তখনও অল্পসংখ্যায় এসে কিছু কর্‌তে পারে না, অনেকগুলি এলে তবেই সুবিধা কর্‌তে পারে; আর ইহারা যদি দুর্দ্দান্তজাতীয় (Virulent) হয়, তবে অল্পসংখ্যাতেও সময় সময় কাজ ফতে কর্‌তে পারে।

জীবাণুর আবিষ্কার

জার্ম্মাণীর প্রসিদ্ধ কীটতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ রবার্ট কক (Robert Koch) সাহেব ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে এই ক্ষয়জীবাণু আবিষ্কার করেন এবং তিনিই প্রথম দেখান যে, ক্ষয়-জীবাণু হতেই ক্ষয়ের উৎপত্তি হয়। ক্ষয়-জীবাণু উদ্ভিদজাতীয়ের অন্তর্গত ও অতি ক্ষুদ্রাকৃতি। অণুবীক্ষণের সাহায্য ভিন্ন ইহা শুধু চোখে দেখা যায় না।

জীবাণুর স্বরূপ

ইহা সরু কাঠির আকার (rod-shaped) সচরাচর সোজাভাবে থাকে; সময় সময় অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিরূপেও (curved) দেখা যায়। কতকগুলির গায় গোটা গোটা দেখা যায় (beaded appearance) কখনও বা অনেকগুলি জীবাণু একত্রে পুঞ্জীভূত হইয়াও থাকে। ইহা অন্যান্য কতকগুলি জীবাণুর মত নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায় না, স্থিরভাবে থাকে।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

ফরাসী সাহিত্যের অষ্টাদশ শতাব্দী

(১৩২২, আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর।)

মণ্টেস্কিউ ও ভল্‌টেয়ার যে অভিনব মতবাদের প্রচারকল্পে জীবনোৎসর্গ করিয়াছিলেন, একদিন বা এক বৎসরেই তাহা সমগ্র ফরাসী জনসাধারণের হৃদয় অধিকার করিতে সমর্থ হয় নাই। বস্তুতঃ, এতদ্দ্বারা কিছুমাত্র আকৃষ্ট হন নাই, অষ্টাদশশতাব্দীর প্রথমার্দ্ধভাগের ফরাসী-সাহিত্যে এরূপ অনেক গ্রন্থকার দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে এস্থলে মাত্র দুই জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য।

১। ম্যারি-ভোঁ—(১৬৮৮-১৭৬৩ খৃঃ অঃ)। ইনি একজন প্রসিদ্ধ নাটক-কার। সমসাময়িক ফরাসী জনসাধারণ ভল্‌টেয়ারকেই শ্রেষ্ঠ নাটক-কারের আসন প্রদান করিয়াছিল,—এমন কি, অনেকেই তাঁহাকে "র‍্যাসিনের" ও গৌরব-স্পর্দ্ধী বিবেচনা করিত। কিন্তু ভল্‌টেয়ার-রচিত নাটকাবলী সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রম-সঙ্কুল ও নিতান্ত একদেশদর্শী। বস্তুতঃ, ফরাসী নাট্য-সাহিত্যে যদি কেহ প্রকৃতই র‍্যাসিনের উত্তরাধিকারীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে তিনি এই ম্যারিভোঁ। অবশ্য, র‍্যাসিনে, সেক্ষপীর প্রভৃতির মত প্রথম শ্রেণীর নাটক-কার না হইলেও, উৎকৃষ্ট নাটক লিখিতে যে সমস্ত গুণের প্রয়োজন, ম্যারি-ভোঁর অল্প-বিস্তর তাহা সমস্তই ছিল। কল্পনা ও বাস্তবের অপরূপ সম্মিলনে তদঙ্কিত নাটকীয় চরিত্রগুলি প্রকৃতই অত্যন্ত উপাদেয় ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ম্যারিভোঁর অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল, এবং প্রধানতঃ, এই দুই কারণেই তদীয় গ্রন্থাবলী আজিও ফরাসী-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিতে পারিতেছে।

২। ডাক্ ডি সেণ্ট সাইমন্—(Duc de Saint-Simon, ১৬৭৫-১৭৫৫ খৃঃ অঃ)। সমগ্র ফরাসী-সাহিত্যে সাইমনের একটী অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব বা বিশেষত্ব আছে। সাইমন্ বড় লোকের—জমীদারের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তদীয় জীবনের শ্রেষ্ঠতমাংশ রাজদরবারে অতিবাহিত হইয়াছিল; অবশেষে জীবন-সায়াহ্নে বাক্‌দেবীর অর্চ্চনাতে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। সমগ্র ফরাসীসাহিত্যে এমন মনীষামণ্ডিত "সখের" সাহিত্যিক আর দ্বিতীয় নাই—ফরাসী "একাডেমী" কখনও এরূপ "বাবু" লেখককে শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে না। কিন্তু সাইমনের প্রকৃতি-দত্ত প্রতিভা ছিল, এবং প্রতিভা কখনও অপরের অঙ্গুলি-সঙ্কেতে স্বীয় অভিব্যক্তির পথ নির্দ্দেশ বা পরিবর্ত্তন করে না।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সাইমন্ বড় লোকের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থা নৃপতিশ্রেষ্ঠ চতুর্দ্দশ লুই ও তৎপরবর্ত্তী অপ্রাপ্ত-বয়স্ক রাজার দরবারে অতিবাহিত হইয়াছিল।

এরূপ অবস্থাপন্ন লোকের নিকট উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-সৃষ্টির আশা অনেক সময়েই বৃথা হয়। কিন্তু সাইমনের কয়েকটী অনন্যসাধারণ গুণ ছিল। তাঁহার বালকোচিত সরল হৃদয় সর্ব্বদাই উদ্দাম ভাবতন্ময়তার লীলা-নিকেতন ছিল;—তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ শক্তিও অসাধারণ ছিল,—একটিবার মাত্র যাহা দর্শন করিতেন, তাহার অবিকল বর্ণনা করিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এবং এই দুইটী নৈসর্গিক শক্তির অপরূপ সমবায় ও সংমিশ্রণেই তদীয় গ্রন্থ (Memoirs) আজিও সুধী-সমাজে সাদরে পঠিত হইতেছে।

লক্ষ্মীর বর-পুত্র, ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে প্রতিপালিত, নৃপতিশ্রেষ্ঠ চতুর্দ্দশ লুইর রাজ-দরবারের অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন, সাইমনের, সমসাময়িক ফরাসী জনসাধারণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, সুখ ও দুঃখের সহিত কিছুমাত্র সহানুভূতি ছিল না, বরং তদীয় গ্রন্থের অনেক স্থলেই অভিজাত-সম্প্রদায়-সুলভ হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা ও ভাবের কূপ-মণ্ডুকতাই পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু তথাপি তিনি ফরাসীরাজ চতুর্দ্দশ লুইর দরবারের যে একটী জীবন্ত ছবি, রাখিয়া গিয়াছেন, সমগ্র ফরাসী-সাহিত্যে তাহা বাস্তবিকই সম্পূর্ণ তুলনা রহিত। তাঁহার রচনায় ভাবের গভীরতা বা বুদ্ধি-শক্তির প্রাখর্য্য দৃষ্ট হয় না সত্য, কিন্তু অঙ্কিত চিত্রের সজীবতাতে তিনি অনন্য-প্রতিদ্বন্দ্বী। ফরাসী "একাডেমী"র বাঁধাবাঁধি আদব কায়দা ও নিয়ম কানুন সাইমনের কল্পনা-সুন্দরীকে কিছুমাত্র শৃঙ্খলিত করিতে পারে নাই; পরন্তু, যেখানে যেরূপ সুবিধা মনে করিয়াছেন, সেখানে সেইরূপ ভাব ও ভাষার সাহায্যে স্বীয় বক্তব্য প্রকটিত করিয়াছেন। ইহার ফলে, তদীয় Memoirs গ্রন্থ চতুর্দ্দশলুইর রাজ-দরবারের একটী নিখুঁত চিত্র হইয়াছে।

অষ্টাদশশতাব্দীর প্রারম্ভে মণ্টেস্কিউ ও ভল্টেয়ারের রচনা বলিতে আমরা যে অভিনব ভাবপ্রবাহের লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা সাইমন্ প্রভৃতিকে স্পর্শ না করিলেও একেবারে নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকে নাই। উহা লোকনয়নের অন্তরালে, অনুকূল আবহাওয়ার সাহায্যে, ধীরে ধীরে জীবনীশক্তি সঞ্চয় করিতেছিল, এবং পরিশেষে ১৭৫০ হইতে ১৭৬০ খৃঃ অব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে স্বকীয় বিশিষ্ট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সর্ব্ব সমক্ষে উপস্থিত হইল। ইহার পূর্ব্বেই ফরাসীরাজ চতুর্দ্দশ লুই স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অলোক সাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তদীয় রাজত্বকালে, সম্পূর্ণ একচ্ছত্র ও অনিয়ন্ত্রিত শাসন প্রথার অবশ্যম্ভাবী কুফল-সমূহ আত্মপ্রকাশ করিতে না পারিলেও পরবর্ত্তী নিতান্ত অকর্ম্মণ্য নৃপতির আমলে তৎসমুদয় স্বীয় বিভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করতঃ, করভারনিপীড়িত, অত্যাচারপ্রপীড়িত ফরাসী জনসাধারণের হৃদয়ে যুগপৎ আশঙ্কা ও নৈরাশ্যের উদ্রেক করিয়া দিল; যাহা অসামান্য মনীষাসম্পন্ন চতুর্দ্দশ লুইর ক্ষমতা ও গৌরবেরই দ্যোতনা করিত, পঞ্চদশ লুইর হস্তে তাহা নিরীহ প্রকৃতি-পুঞ্জের অহিতসাধনেই নিয়োজিত হইল। সুতরাং মণ্টেস্কিউ ভল্টেয়ার প্রভৃতি নব্যতন্ত্রের উপাসকগণ এযাবৎকাল যে সাধনার বীজ নীরবে বপন করিয়া আসিতেছিলেন, শ্লথমুষ্টি, অন্তঃসারশূন্য, কেবলমাত্র বাহ্যাড়ম্বর-প্রিয়, সর্ব্বপ্রকার রাজোচিত গুণহীন, অকর্ম্মণ্য নৃপতির আমলে তাহার অঙ্কুরোদ্গমের উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইল।

এই সময়ে ফরাসী-সাহিত্য-গগনে এমন এক শ্রেণীর প্রভাবশালী লেখকের উদয় হইল, যাঁহারা যুগযুগান্তের পুঞ্জীকৃত সমাজ, ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক অন্ধমত ও কুসংস্কার সমূহের এককালীন উচ্ছেদ-সাধনে আপনাদের সমগ্র বিদ্যা, বুদ্ধি ও সামর্থ্য প্রয়োগে কৃত-সংকল্প হইলেন। চতুর্দ্দশ লুইর আমলে রাজা ও অভিজাত সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বার্থপরতা সহিষ্ণুতার উচ্চতম সীমারেখায় উপস্থিত হইলেও তাঁহার অলোকসামান্য ব্যক্তিত্ব প্রভাবে কেহই এতাবৎকাল তদ্বিরুদ্ধে মাথা তুলিতে সাহসী হয় নাই। কিন্তু পঞ্চদশলুই সর্ব্বাংশেই চতুর্দ্দশলুইর বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত ছিলেন। সুতরাং দীর্ঘকাল যাবৎ অত্যাচারিত ও করভার প্রপীড়িত প্রকৃতিপুঞ্জ যে আপনাদের জন্মগত অধিকার লাভের জন্য তদীয় দুর্ব্বলতা ও অকর্ম্মণ্যতার সুযোগ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবে, তাহা নিতান্ত স্বাভাবিক। মণ্টেস্‌কিউ ও ভল্‌টেয়ারের শিষ্য প্রশিষ্যের সংখ্যা উত্তরোত্তর দ্রুতবেগে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; সমগ্র ফরাসী দেশের বুকের উপর দিয়া সংস্কারের একটা প্রবল বাত্যা প্রবাহিত হইতে লাগিল। ১৭৬০ হইতে ১৭৮৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ফরাসী সাহিত্যের "সংস্কার-যুগ।" তৎপরে "কর্ম্ম-যুগের" প্রারম্ভ। ফরাসী জনসাধারণের হৃদয়ে যাহাতে সর্ব্ববিধ সংস্কারের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা-বহ্নির প্রজ্বলন হয়, তজ্জন্য "সংস্কার-যুগের" নবীন ফরাসী সাহিত্যিকগণ ক্রমশঃ বর্দ্ধমান এক বিরাট আন্দোলন-প্রবাহের সৃষ্টি করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

নবমন্ত্রের উপাসক এই লেখক-সম্প্রদায় ফরাসী-সাহিত্যে সাধারণতঃ "দার্শনিক" বা Philosophist আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। যুক্তি ও বিশ্ব-মানবতা (Reason and Humanity) এই দুই মহামন্ত্রে এই দার্শনিক-সম্প্রদায় সঞ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। ইউরোপে "নবজীবনের" প্রথমোন্মেষে যে অন্তর্নিহিত মহাশক্তির অনুপ্রেরণায় মহামতি কলম্বাস অকুতোভয়ে মহাসমুদ্রে ঝম্পপ্রদান করিয়াছিলেন, কোপার্ণিকাস কর্ত্তৃক পৃথিবীর গতিশক্তির আবিষ্কার যাহার বহিঃপ্রকাশের আংশিক প্রচেষ্টা মাত্র, যাহার বলে বলী হইয়া ধর্ম্মপ্রাণ লুথার প্রচলিত ক্যাথলিক ধর্ম্মবাদের বিরুদ্ধে উইটেন্‌বার্গের গির্জ্জা মন্দিরের দ্বারদেশে স্বীয় "প্রতিবাদ পত্র" সংযোজিত করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, অষ্টাদশশতাব্দীর উদীয়মান ফরাসী "দার্শনিক" সম্প্রদায়ও ঠিক সেই মহা প্রেরণায় অনুপ্রাণিত ও সেই সর্ব্বোন্মাদিনী উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমির চিরপুঞ্জীকৃত কলঙ্ককালিমার অপনোদন-পূর্ব্বক ভূতলে নন্দন-শোভার বিস্তার সাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। জ্ঞান, যুক্তি ও সত্যের বিমল কিরণ-সম্পাত দ্বারা যুগযুগান্তসঞ্চিত অজ্ঞানতা, নির্ব্বুদ্ধিতা, কুসংস্কার ও সর্ব্ববিধ উপধর্ম্মের সম্পূর্ণ দূরীকরণ ও কেন্দ্রীকৃত সমাজ-শক্তির যথাযথ প্রয়োগ দ্বারা বিশ্বমানবের চির কল্যাণ সাধন—ইহাই ইহাঁদের জীবনের একমাত্র মহাব্রত ছিল। এই সময়ে ফরাসী দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এক দিকে যেমন অবনতির নিম্নতম সোপানে পতিত হইয়াছিল, পক্ষান্তরে, নব-বীজের অঙ্কুরোদ্‌গমের পক্ষেও সেইরূপ অনুকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যাঁহারা শাসন কর্ত্তার সম্মানজনক ও লোভনীয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, প্রতিকার্য্যেই তাঁহাদের অবিমিশ্র অকর্ম্মণ্যতা, স্বার্থপরতা

ও উচ্ছৃঙ্খলতার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইত; রাজার সংগ্রহব্যবস্থা যৎপরোনাস্তি একদেশদর্শী ও অত্যাচার দুষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল; শাসন ও বিচার বিভাগে অসভ্যোচিত বর্ব্বরতারই একাধিপত্য ছিল; অনুরূপ দায়িত্বজ্ঞান-বর্জ্জিত অধিকার ভোগে অভিজাত সম্প্রদায় নিতান্ত উন্মার্গগামী হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং ধর্ম্ম-বিদ্বেষ সর্ব্বপ্রকার সহিষ্ণুতার সীমা-মাত্রা অতিক্রম করিয়াছিল। নিরীহ প্রকৃতিপুঞ্জ নিতান্ত অসহনীয় করভারে প্রপীড়িত ও অভিজাতকুলের অন্যায় অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইতেছিল। কোনও নূতন ভাবের উন্মেষ ও বিকাশসাধনের পক্ষে এই অবস্থা যে সর্ব্বতো-ভাবে অনুকূল, পৃথিবীর ইতিহাস একবাক্যে তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। অমঙ্গলের মধ্যেই মঙ্গলের বীজ নিহিত থাকে, ইহা কবি-কল্পনা নহে। দার্শনিক সম্প্রদায় এই সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া অভীষ্টসাধনে মনো-নিবেশ করিলেন।

ইঁহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, রাজা বা মন্ত্রীবিশেষের নির্ব্বুদ্ধিতা বা দুর্ব্বুদ্ধিতাই জনসাধারণের দুঃখ দারিদ্র্যের এক-মাত্র কারণ নহে। পরন্তু, যুগ-যুগান্ত-সঞ্চিত শাসনবিষয়ক কুসংস্কার ও সংকীর্ণতাই দুঃখ দুর্দ্দশার মূল কারণ। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে শাসন-যন্ত্রের সংস্কার অপেক্ষা মূল শাসন-নীতির পরিবর্ত্তনই সর্ব্বাগ্রে প্রয়ো-জনীয়। টার্গট, রুশো প্রভৃতি ২।১ জন ভিন্ন-মতের পোষণ করিতেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি সামান্য ছিল। অধিকাংশ "দার্শনিক"ই পলিটিক্সের কাছ দিয়াও যাই-তেন না—দেশের তদানীন্তন অবস্থাতে ইহা সম্ভবপরও ছিল না।ইহাতে একদিকে ফরাসী দেশের পক্ষে যেমন কুফল উৎপন্ন হইয়াছিল, পক্ষান্তরে সমগ্র মানব-জাতির পক্ষে ইহা অমৃত-বৎ উপকার প্রদান করিয়াছিল। ইংলণ্ডের শাসন-সংস্কারের সহিত তুলনা করিলেই আমাদের উক্তির সারবত্তা প্রমাণিত হইবে।

আবহমানকাল হইতেই ইংলণ্ডের শাসন প্রথার ক্রম-পরিবর্ত্তন বা ক্রমোন্নতি সাধিত হইয়া আসিয়াছে,—ইংলণ্ডও প্রথম চার্লসের ছিন্নমুণ্ডের উপরেই স্বীয় নাগরিক স্বাধীনতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কিন্তু সমগ্র দেশের পক্ষে উহা ফরাসী বিপ্লবের ন্যায় দুর্ব্বিষহ হলাহল প্রসব করে নাই। কারণ কি? সর্ব্ববিধ শাসনকার্য্যে ব্যাপৃত থাকা হেতু শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে যাঁহাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল, তাঁহারাই আবার ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রকার রাষ্ট্র-নৈতিক সংস্কারের পাণ্ডা ছিলেন; সুতরাং তাঁহারা অতীতের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ রাখিয়াই,বস্তুতঃ,অতীতের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরেই, ভবিষ্যতের প্রাসাদ উত্তোলন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ফরাসী দার্শনিকগণের অদৃষ্টে এরূপ কোনও সুবিধা ঘটিয়া উঠে নাই!—দেশের শাসন কার্য্যের সহিত তাঁহাদের কোনও সংস্রব ছিল না; পরন্তু, শাসন-কর্ত্তৃগণ তাঁহাদিগকে নিতান্ত সন্দেহ ও অবজ্ঞার চক্ষেই অব-লোকন করিতেন। পুঁথিগত বিদ্যা যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলেও, প্রকৃত ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ইঁহাদের আদৌ ছিল না বলিলেই হয়। এবং কথা ও কাজের এই পার্থক্যের ফল—ফরাসী বিপ্লবের তাণ্ডব নৃত্য।

কিন্তু নিবিড় কৃষ্ণ মেঘের কোলেও সৌদা-মিনীর শুভ্র হাসি পরিদৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। স্বার্থান্বেষী, ক্ষুদ্রদৃষ্টি, তথাকথিত ঐতিহাসিকগণ ফরাসীবিপ্লবকে মসীবর্ণে রঞ্জিত করুন না কেন, উহারও

একটা উজ্জ্বল দিক আছে এবং সেইদিকে দৃষ্টি সংবদ্ধ হইলে মানব-হৃদয় স্বতঃই ভক্তি-ভরে অবনত হইয়া পড়ে। ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্ত্তনে ফরাসী বিপ্লবের তাণ্ডব-নৃত্য দেখিতে পাই না সত্য, কিন্তু উহাতে আমরা কি দেখিতে পাই? সমস্তই যেন জীবনী-শক্তি-বিহীন, গোঁজামিল; জীর্ণ-বস্ত্রে তালির ন্যায় উহা যেন কেমন খাপছাড়া হইয়া পড়িয়াছে। অবস্থানুসারে ঠিক যতটুকুর আবশ্যক, ইংরাজ সংস্কারকগণ ঠিক ততটুকুই করিয়াছেন,—তাহার বাহিরে এক পদও অগ্রসর হন নাই। তাঁহাদের সংস্কার-নীতির মূলে কোনও বিশ্বজনীন আদর্শের অস্তিত্ব দেখিতে পাই না—কোনও সার্ব্বজনীন ভাবস্রোতে তাঁহারা আপনাদিগকে ভাসাইয়া দিতে পারেন নাই। কিন্তু ফরাসী দার্শনিক সম্প্রদায় এরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না—এরূপ গোঁজামিলে তাঁহাদের কোনও আস্থা ছিল না। যে মহান্ উদার আদর্শের চিত্র তাঁহাদের হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছিল, স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমিকেও ঠিক সেই আদর্শে গড়িয়া তুলিতে তাঁহারা সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মানবহিতৈষিণী প্রবৃত্তি শুধু ফরাসী দেশের ভৌগলিক সীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, পরন্তু মানব-জাতির চরম নিয়তি ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁহারা যে গভীর ও উন্নত ধারণা হৃদয়ে পোষণ করিতেন নির্ভয়চিত্তে ও বজ্রগম্ভীরকণ্ঠে চতুর্দ্দিকে তাহার ঘোষণা করতঃ, সমগ্র মানবপ্রাণে এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আকাঙ্ক্ষার—উন্মাদনার জাগরণ করিয়া দিয়াছিলেন। শুধু স্বদেশের সমাজ-সমস্যা বা শাসন-সমস্যার সংস্কারসাধন করিয়াই তাঁহাদের মহাপ্রাণ আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতে পারে নাই—পরন্তু, জন্মভূমিকে উপলক্ষমাত্র করিয়া সমগ্র মানবসমাজের সমস্যা সমাধানে তাঁহাদের জীবন উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। বস্তুতঃ ভগবান শাক্যসিংহের আবির্ভাবের পর অষ্টাদশশতাব্দীর ফরাসী বিপ্লবই যে পৃথিবীর ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম ঘটনা, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। "জগতের ইতিহাসে,—মনুষ্যের উন্নতির ইতিহাসে বুদ্ধদেবের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। বুদ্ধদেব একভাবে মানব-সভ্যতার আদি-পুরোহিত ও সাধারণ-তন্ত্রের আদিম দ্রষ্টা;—মনুষ্যের পরম-স্বত্বের ও মনুষ্যত্বের আদি উপদেষ্টা;—শঙ্কিত, ভীত, মুগ্ধ, অজ্ঞানান্ধ মনুষ্যের নেত্রে প্রথম বিজ্ঞানের সূর্য্যালোক। ভারতবর্ষের যজ্ঞ-তন্ত্র-পীড়িত, দেব-ভীতি-ক্লিষ্ট মনুষ্য-মন, সর্ব্বপ্রথম এই সূর্য্যালোক-প্রভাবেই জাগিয়াছিল। খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব সপ্তম ষষ্ঠ শতাব্দী জগতের ইতিহাসে নানা বিষয়ে অপূর্ব্ব পদার্থ। ওই সময়েই মানব-আত্মার প্রথম জাগরণ,—মনুষ্য-মনের প্রথম বিপ্লব,—মানুষের ধর্ম্ম ও কর্ম্মের আদর্শে নব-জীবনের সূত্রপাত,—ভারতীয় ইতিহাসের উপনিষদ-যুগের শেষ অধ্যায়। এই দুই শতাব্দীতে সমস্ত পৃথিবীর মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইতেছিল। সভ্যতার ইতিহাসে বুদ্ধাত্মার বা শাক্যসিংহের শীর্ষস্থান।" খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতে লোক-তারণ ভগবান বুদ্ধদেব ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,—তখন আমাদের দীন-হীনা নিরাভরণা ভারত-জননীই পৃথিবীর কেন্দ্রস্থানীয়া ছিলেন। কাল-মাহাত্ম্যে এই ভার-কেন্দ্র ক্রমশঃই পশ্চিমদিকে অপসারিত হইয়াছিল। তাই, সার্দ্ধ-দ্বিসহস্র বৎসর পরে ভারতীয় বৌদ্ধ আত্মাই ফরাসী-বিপ্লবের অগ্রদূতরূপে অবতীর্ণ হইয়া কৌলিন্য ও জন্মগত মাহাত্ম্যের প্রভাব হইতে উদ্ধার

করিয়া ইউরোপীয় মনুষ্যত্ব-আদর্শকে স্বাধীন চরিত্র-গৌরবের বিমান-তলে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন "মানুষের আত্মাই বিশ্ব-প্রভু এবং মনুষ্যত্বই সকল ধর্ম্মসাধনের মূল লক্ষ্য"—জগতে ফরাসী "দার্শনিকগণের," অপিচ, ফরাসী বিপ্লবের ইহাই প্রধান শিক্ষা।

ইহাঁদের চিন্তা-প্রণালী সাধারণতঃ দুইদিকে বিশেষ ফল-প্রসূ হইয়াছিল। জগৎ-সমীপে ইহাঁরাই সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন যে শুধু চিন্তা-স্বাধীনতার দ্বারাই মানুষের পরমা উন্নতি সাধিত হইতে পারে না,—মনুষ্যত্বের পূর্ণ-বিকাশের জন্য কর্ম্ম-স্বাধীনতাও তুল্যরূপে আবশ্যকীয়। চিন্তা ও কার্য্যে তুল্যরূপ অধিকার ও স্বাধীনতা না থাকিলে মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন আদৌ সম্ভবপর নহে। ফরাসী দার্শনিক—অপিচ,ফরাসী বিপ্লবের দ্বিতীয় দান, —মানবত্ব-নিষ্ঠা। আজকাল আমাদের প্রায় প্রত্যেক কার্য্যেই যে বিশ্বমানবহিতেচ্ছা এত অধিক পরিমাণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে,তাহাও প্রধানতঃ, এই বিশ্বপ্রেমবিহ্বল উদার-হৃদয় ফরাসী দার্শনিকগণেরই অকৃত্রিম চেষ্টা ও অনুরাগের স্বভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী ফল-মাত্র। ইহাঁরাই সর্ব্বপ্রথম ফরাসী বিচারপ্রণালীর অন্তর্নিহিত দোষরাজির উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক যথেচ্ছাচার ও অনিয়ন্ত্রিত শাসনপ্রথার কুফল প্রদর্শন করেন, পাপ কার্য্য নিবারণের উদ্দেশ্য অযথা ক্লেশ প্রদান রীতির অকৃতকার্য্যতা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত করেন, এবং তৎকাল-প্রচলিত দণ্ডনীতির বর্ব্বরতা প্রতিপন্ন করিয়া মানব-হৃদয়ে সর্ব্বপ্রকার নির্দ্দয়তা ও অত্যাচার অবিচারের প্রতি আন্তরিক ঘৃণার উদ্রেক করেন। ইহাঁরাই সর্ব্বপ্রথম দাস-বাণিজ্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া মানুষমাত্রেরই ভ্রাতৃত্ব-সম্বন্ধ জগৎ সমীপে প্রচার করেন।

এস্থলে ইহাও বলিয়া রাখা সঙ্গত যে, এবম্প্রকার চিন্তাবিষয়ে ফরাসী দার্শনিকগণ সম্পূর্ণ মৌলিকতার দাবী করিতে পারেন না এবং যেখানেই তাঁহারা মৌলিক চিন্তা ও গবেষণার চেষ্টা করিয়াছেন, সেখানেই তাঁহাদের চিন্তাপ্রণালী তাদৃশ প্রস্ফুটাকার ধারণ করিতে পারে নাই, তাঁহাদের অধিকাংশ চিন্তাই পূর্ব্বগামী ইংলণ্ডীয় মণীষিগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত। কিন্তু তথাপি তাঁহারা অন্যের চিন্তাপ্রবাহকে বিশ্বমানবের হিতার্থে নিয়োজিত করিয়া পৃথিবীর ইতিহাসে এক অমর অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ, যুগযুগান্ত ধরিয়া ইউরোপীয় ইতিহাসে ইহাই ফরাসী-জাতীর বিশেষত্ব। অবিমিশ্র প্রবল তর্কস্রোতে ভাসমান হইয়া, অনেক সময়েই তাঁহারা হয়ত তর্কের বিষয়ীভূত মূলসূত্রগুলি হারাইয়া ফেলিয়াছেন, বা তর্কীভূত বিষয়ের প্রকৃত সত্যাসত্য নির্দ্ধারণে অনন্যসাধারণ বিচক্ষণতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে বিশেষ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা না থাকাতে ইহাঁদের সহানুভূতি ও সমপ্রাণতাও অনেকাংশেই হয়ত সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে দুর্নিবার ঘটনা-প্রবাহের আবর্ত্তে পতিত হইয়া অনেক সময়ে ইহাঁরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বা যে মতবাদের প্রচার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ইহাঁদের প্রচারিত "দর্শন"-তত্ত্বের যথার্থ মূল্য তন্মধ্যে খুঁজিলে পাওয়া যাইবে না। মানব-সমাজের সমস্যা সমাধান কল্পে ইহাঁরা যে সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রচারিত মতবাদ বা উপনীত সিদ্ধান্ত অপেক্ষা, ঐ সমস্ত প্রশ্নের মূল্য সহস্র গুণ অধিক ;—চিন্তন-প্রণালীর মৌলিকত্বে তাঁহাদের বাহা-

ছুরী না থাকিতে পারে সত্য, কিন্তু যে মহান্ আশার বাণী তাঁহারা জগৎ-সমীপে প্রচার করিয়াছেন, মানব-সভ্যতার ইতিহাসে তাহা বাস্তবিকই অমূল্য ও সম্পূর্ণ তুলনারহিত।

ইঁহাদের পূর্ব্বেও আরও অনেক প্রখ্যাত-নামা ইউরোপীয় চিন্তাবীর এই সমস্ত বিষয়ে অনেক চিন্তা, অনেক ধ্যান করিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের চিন্তাপ্রবাহ স্ব স্ব সমাজ বা দেশের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিশ্ব-মানবের হৃদয়-দুয়ারে আঘাত করিতে পারে নাই। ফরাসী দার্শনিকগণই সর্ব্বপ্রথম এই চিন্তা-মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়া মানব মাত্রকেই তন্মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য জলদ্-গম্ভীরস্বরে আহ্বান করেন;—সভ্যতার ফল-ভোগে মানুষ মাত্রেরই সমানাধিকার, এই মহাবানী তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথম উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত করেন। দুঃখ-দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট, অত্যাচার-অবিচার-প্রপীড়িত, পরপদ-দলিত জনসাধা-রণের নিরাশান্ধকার হৃদয়-কন্দরে ইঁহারাই সর্ব্বপ্রথম আশার বর্ত্তিকা প্রজ্বালিত করেন। মানুষের শক্তি অনন্ত, জ্ঞান অনন্ত, উন্নতি অনন্ত,—ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী,—ইহাই তাঁহাদের বীজমন্ত্র। কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদের সহানুভূতি ও সমপ্রাণতার কিঞ্চিৎ অভাব পরিলক্ষিত হইলেও, বিশ্বমানবপ্রেমে তাঁহাদের হৃদয় ভরপুর ছিল;—তাঁহারা সেই প্রেমামৃত পানে নিজেরা যেমন বিভোর হইয়াছিলেন, সেইরূপ জগৎবাসী ভ্রাতাভগ্নীগণকেও সেই প্রেমসুধা পানের জন্য অকপট হৃদয়ে আহ্বান করিয়াছিলেন। প্রচলিত খ্রীষ্ট ধর্ম্মবাদে তাঁহাদের বিশেষ আস্থা ছিল না বটে, কিন্তু মানুষের অনন্ত উন্নতিসাধনে—মানবত্বনিষ্ঠায় তাঁহাদের অচলা ভক্তি ছিল।

মণ্টেস্‌কিউ ও ভল্‌টেয়ার এই "দার্শনিক" সম্প্রদায়ের অগ্রদূত হইলেও জগৎপ্রসিদ্ধ Encyclopædia বা "বিশ্বকোষ"কে কেন্দ্র করিয়াই এই অভিনব দর্শনবাদ প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। ১৭২৭খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে সুপ্রসিদ্ধ ইফ্রেইম্ চেমবার্স (Ephraim Chambers) কৃত ইংরাজী Encyclopædia প্রকাশিত হয়। ফরাসী পুস্তক বিক্রেতা লি ব্রিটন্ (Le Breton) ১৭৪২ সালে উহার ফরাসী অনুবাদ প্রকাশিত করেন। কিন্তু শুধু অনু-বাদ প্রকাশ করিয়াই তাঁহার সারস্বত হৃদয় পরিতৃপ্ত হইতে পারে নাই। মাতৃভাষায় এইরূপ একখানি বিরাট গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য লি ব্রিটন্ প্রায় প্রত্যেক ফরাসী সাহিত্যিক-কেই আহ্বান করেন—কিন্তু কেহই তাঁহার প্রস্তাবে সহানুভূতি প্রকাশ করেন নাই। অবশেষে ডেনিস্ ডিডারো (Denis Did-erot—১৭১৩-১৭১৪) এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে অগ্রসর হন।

১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ডিডারো এই সম্পাদনকার্য্য আরম্ভ করেন এবং প্রায় ত্রিশবৎসরব্যাপী অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে ১৭৮০ খৃঃঅব্দে উহা শেষ হয়। রাষ্ট্র-নীতি, বিজ্ঞান, শিল্প-বাণিজ্য, দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে এ পর্য্যন্ত যতকিছু উন্নতি সাধিত হইয়া-ছিল, তৎসমুদয়ের বিশদ বিবরণ একত্র সমাবেশিত করাই বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এই বিরাট ব্যাপারের সম্পাদন শুধু এক ডিডারোর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না; বিভিন্নশাস্ত্রে পারদর্শী খ্যাতনামা ফরাসী সাহিত্যিকগণ এই গ্রন্থ সম্পাদনে যথাসাধ্য তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন। ইঁহারা পরস্পর বিভিন্নমতাবলম্বী হইলেও, সকলেই নব উদ্দীপনায় উদ্দীপিত এক নব

বিশ্বাসে সঞ্জীবিত ছিলেন, সকলেই যুক্তিতন্ত্র ও বিশ্ব-মানবতার একনিষ্ঠ উপাসক ছিলেন। বিশুদ্ধ সাহিত্যের হিসাবে এই অতিকায় গ্রন্থের মূল্য তাদৃশ বেশী না হইলেও, চিন্তা-স্বাধীনতা ও নবভাবের প্রচারকল্পে ইহা যে সহায়তা করিয়াছিল, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। কলেবর অত্যন্ত বৃহৎ হওয়া সত্বেও গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ফরাসী জনসাধারণ কর্ত্তৃক উহা এরূপ সাদরে গৃহীত হইল যে অত্যল্পকালের মধ্যেই সংস্করণের পর সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া গেল। এই অনুরাগ শুধু ফরাসীদেশের চতুঃসীমা মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। ইউরোপীয় জগতে তখন ফরাসী সাহিত্যের একচ্ছত্র প্রভাব। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত পরিচিত হইবার জন্য সকল দেশের সকল স্তরের লোকেই সমভাবে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। প্রুশিয়-রাজ ফ্রেডারিক্, রুশিয়ার রাণী ক্যাথারিণ্, পর্ত্তুগালের পোম্বাল্ প্রভৃতি ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের প্রায় সকলেই Encyclopædiaর গ্রাহক বা পৃষ্ঠপোষক হইলেন।

গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশে আরও অনেকে সাহায্য করিলেও, একমাত্র ডিডারোর অলোকসাধারণ প্রতিভা, উৎসাহ ও উদ্যম ব্যতীত এই মহনীয় ব্যাপার কখনই সুসম্পন্ন হইতে পারিত না ইহা নিশ্চয়। গ্রন্থারম্ভে, সাহায্য করিবার জন্য যাঁহারা প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, গ্রন্থ-সমাপ্তির পূর্ব্বেই তাঁহাদের অনেকেই,—এমন কি, স্বয়ং ড্যালেম্বার্ট (D' Alembert) পর্য্যন্তও সরিয়া পড়িয়াছিলেন। অর্থাভাবে তাঁহাকে প্রতি পদবিক্ষেপে চক্ষে সরিষার ফুল দেখিতে হইয়াছে,—গবর্ণমেণ্ট বারে বারে গ্রন্থ প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু কিছুই ডিডারোকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। অষ্টাদশশতাব্দীর ফরাসী দার্শনিকগণের যাহা কিছু বৈশিষ্ট্য—সার্ব্বজনীনতা, অনুসন্ধিৎসা, সংশয়বাদ, ঔদার্য্য, আশাপ্রবণতা, মানবত্ব-নিষ্ঠা—সকলেরই অপরূপ সমাবেশ এই ডিডারোতে দৃষ্ট হয়।

এই বিরাট গ্রন্থ সম্পাদনে জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ত্রিশ বৎসর অতিবাহিত হইলেও, তাঁহার অদম্য উদ্যম ও অফুরন্ত উৎসাহ শুধু একখানি মাত্র গ্রন্থ সম্পাদনেই পর্য্যবসিত হয় নাই। অন্যের পক্ষে অসম্ভব বোধ হইলেও অদ্ভুতকর্ম্মা ডিডারো এই সুবিশাল কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও, অবসরমত নটাক, নভেল, সাহিত্য ও চিত্রসমালোচনা, দার্শনিক প্রবন্ধ প্রভৃতি লিখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৭৬০ খৃঃঅব্দে তাঁহার *La Religieuse* নামক প্রসিদ্ধ গদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। Reformation বা খ্রীষ্টধর্ম্ম সংস্কারের পর ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের মঠজীবনের বিরুদ্ধে এরূপ তীব্র আক্রমণ করিতে বোধ হয় আর কেহই সাহসী হন নাই। *Neveu de Rameau*ই ডিডারোর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। বিশ্বকোষ সম্পাদনে ব্যাপৃত থাকিয়াও যে তিনি এরূপ একখানি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, বস্তুতঃ ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। দুই ব্যক্তির (একজন স্বয়ং ডিডারো) কথোপকথনচ্ছলে সমসাময়িক ফরাসী জনসাধারণের দোষাবলী ও দুর্ব্বলতাসমূহ অতি সুন্দরভাবে এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। ডিডারোর প্রাণের সমস্ত আবেগ এই গ্রন্থে উৎসাকারে দেখা দিয়াছে এবং ভাষার মনোমোহিনী শক্তিতে আজ-পর্য্যন্তও কেহ এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার

নিগ্রোনায়ক ড্‌বয়েস্‌

স্বাধীনতাপ্রাপ্ত নিগ্রোসমাজ

পঞ্চাশ বৎসর হইল যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রো-সমাজ স্বাধীনতালাভ করিয়াছে। এই পঞ্চাশ বৎসরে তাহাদের লোকসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। এক্ষণে এককোটি নিগ্রো নর-নারী যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী। সমগ্র শ্বেতাঙ্গ সমাজের লোকসংখ্যা দশ কোটি মাত্র।

স্বাধীন হইবার পর নিগ্রোরা সকল দিকে উন্নত হইয়াছে। অনেকে বলিতেছেন পঞ্চাশ বৎসরে এরূপ উন্নতি আর কোন স্বাধীন জাতি দেখাইতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ।

নিউইয়র্কে নিগ্রো বেশী চোখে পড়ে না। শুনিতে পাই নিগ্রোদের মধ্যে কেহ কেহ চিকিৎসা-ব্যবসায়ে, আইন-ব্যবসায়ে এবং অন্যান্য উচ্চশিক্ষা-সুলভ কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন। ধর্ম্মযাজকের কর্ম্ম অবশ্য বহুকাল হইতেই নিগ্রোরা করিয়া আসিতেছে। স্বাধীনতা লাভের পর নূতন নূতন উচ্চস্তরের কর্ম্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার সুযোগ সৃষ্ট হইয়াছে।

তথাপি নিগ্রোদের অবস্থা এক্ষণে নিতান্তই শোচনীয়। গোলামীর আমলে ইহাদের যত কষ্ট ও বেদনা ছিল এক্ষণে বোধ হয় তাহা অপেক্ষা বেশী। পূর্ব্বে ইয়াঙ্কিমহলে নিগ্রো-জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি উড়ু উড়ু কল্পনা-প্রসূত ধারণা ছিল মাত্র। Uncle Tom's Cabin পাঠ করিয়া প্রশস্তহৃদয় জনগণ দয়ার্দ্র হইত। ক্রমশঃ ভাবুকতার বন্যায় গোলাম জাতি স্বাধীন হইল। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর নিগ্রোরা যুক্তরাষ্ট্রের সত্য সত্যই একটা "সমস্যা" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শ্বেতাঙ্গে ও কৃষ্ণাঙ্গে আজকাল যেরূপ বিদ্বেষভাব বিরাজ করিতেছে গোলামীর যুগে এরূপ বোধ হয় ছিল না।

ল্যাটিন জাতীয় লোকেরা সাদা কাল চামড়ার ভেদ গ্রাহ্য করে না। ইহারা সামাজিক ভাবে যে কোন নরনারীর সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাইতে সঙ্কুচিত হয় না। তাহার ফলে পর্ত্তুগীজ ও স্পেনিস রক্ত সমগ্র ল্যাটিন আমেরিকায় ইণ্ডিয়ান ও নিগ্রো রক্তের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। মেক্সিকো হইতে দক্ষিণ আমেরিকার শেষ সীমা পর্য্যন্ত কোথাও রক্তসংমিশ্রণ এবং জাতিসঙ্করের অভাব নাই—বরং বর্ণভেদ এবং জাতিভেদ পাওয়াই কঠিন। সর্ব্বত্রই সাদায় লালে এবং কালায় মিশিয়া এক বিচিত্র সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছে। কিন্তু টিউটনিক এবং য়্যাংগ্লোস্যাক্সন আমেরিকার দৃশ্য স্বতন্ত্র। য়্যাংগ্লোস্যাক্সন জাতীয় লোকেরা বর্ণভেদ অত্যধিক স্বীকার করে। ইহারা, কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো অথবা লোহিতাঙ্গ ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে যৌনসম্বন্ধ পাতাইতে কখনই প্রবৃত্ত হয় না। ফলতঃ যুক্তরাষ্ট্রে আদিম ইণ্ডিয়ান্‌ লুপ্ত হইতে চলিয়াছে—এবং এককোটি কৃষ্ণাঙ্গ নরনারী আল্‌গাভাবে শ্বেতাঙ্গ সমাজের পার্শ্বে জীবন যাপন করিতেছে। কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ এক রাষ্ট্রে দুই স্বতন্ত্র জগতে বাস করে। ইহারা কখনই মিশিবে না।

কৃষ্ণাঙ্গ এক্ষণে কাগজে কলমে আর গোলাম নাই বটে—কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার

অবস্থা গোলামী হইতে সুখকর নয়। নিউ-ইয়র্কে নিগ্রো ইয়াঙ্কি উভয় জাতীয় বালক বালিকা একই বিদ্যালয়ে শিক্ষা পায় দেখিয়াছি। অথচ আফিসে, ব্যাঙ্কে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে, যৌথকারবারে কৃষ্ণাঙ্গ চোখে পড়ে না। নিউইয়র্কের কোন হোটেলে কৃষ্ণাঙ্গকে বসিতে না দিলে হোটেলস্বামী আইনে শাস্তি পান। অথচ কোন হোটেলে একটি নিগ্রোকেও দেখিতে পাই না। এমন কি কৃষ্ণাঙ্গ ভারতবাসীও কোন হোটেলে প্রবেশ করিলে হোটেলের কর্ম্মচারীরা তাহাকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে—"মহাশয় আপনার বাড়ী কোথায়?" অনেকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়াই আগন্তুককে বলিয়া ফেলে—"ভায়া সর্ব্ব পশ্চাদ্ভাগের চেয়ারে বসিবে কি?" হোটেলের খরিদ-দারেরা নিগ্রোদের সঙ্গে বসিয়া আহারাদি করিতে চাহে না অথচ আইনের প্রভাবে হোটেল হইতে নিগ্রোকে তাড়ান হইতে পারে না। কাজেই পশ্চাতে বসাইবার ব্যবস্থা। নিগ্রোরাও আত্মসম্মান রক্ষা করিবার জন্য সাধারণতঃ কোন শ্বেতাঙ্গ হোটেলে প্রবেশ করে না। এইজন্য শ্বেতাঙ্গ হোটেলে যদি কোন নূতন কৃষ্ণাঙ্গ সাহসপূর্ব্বক প্রবেশ করে এবং শ্বেতাঙ্গ পুরুষ রমণীগণের মধ্যে বসিয়া পড়ে তাহা হইলে লোকেরা বিবেচনা করে—"এই ব্যক্তি কৃষ্ণাঙ্গ দেখিতেছি—কিন্তু নিগ্রো কখনই নয়। নিশ্চয় বিদেশীয় লোক—হয়ত কিউবাদ্বীপবাসী, হয়ত ভারতবাসী, হয়ত বা স্পেনিষ ইত্যাদি।"

হোটেলের খান্সামা ও বাবুরচি, ইলেক্‌ট্রিসিটিচালিত উত্তোলন যন্ত্রের পরিচালক এবং ঘর বাড়ীর পরিদর্শক অথবা পেয়াদা ও ভৃত্য—ইত্যাদির অধিকাংশই নিউইয়র্কে নিগ্রো। নিগ্রোদিগকে কোন উচ্চতর কর্ম্মে দেখি নাই—তাহাদের সংখ্যা এত বিরল।

অভিংটনের নিগ্রোসেবা

গত দশ বৎসর ধরিয়া ইয়াঙ্কি কুমারী অভিংটন নিগ্রো সমাজের জন্য সেবাকার্য্যে ব্রতী আছেন। ইহাঁর বিবেচনায়, বর্ণভেদের প্রধান কুফল একটি। নিগ্রোরা খানিকদূর পর্য্যন্ত সকল দিকে অগ্রসর হইবার সুযোগ পায়। কিন্তু তাহার পর ইহাদের পথ রুদ্ধ। অভিংটনের সঙ্গে কয়েকবার আলাপ হইল। ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কি বিবেচনা করেন যে, নিগ্রো-সমস্যা এক্ষণে আর বর্ণ-সমস্যা নয়, ইহা সাধারণ দারিদ্র্য সমস্যার এক বিভাগ মাত্র? দরিদ্র ইতালী-য়ান ও স্পেনের যে দুরবস্থা নিগ্রোদের ও কি সেই দুরবস্থা?"—অভিংটন বলিলেন—"আমি সেইরূপই বিবেচনা করি। অবশ্য আমাদের একটা জাতিগত কুসংস্কার মজ্জাগত আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি নিগ্রোরা বৈষয়িক ক্ষেত্রে উন্নতি করিবার সুযোগ ও অবসর পায় তাহা হইলে নিগ্রোসমস্যা সহজ হইয়া যাইবে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কি বিশ্বাস করেন যে শ্বেতাঙ্গে এবং কৃষ্ণাঙ্গে মস্তিষ্ক সম্বন্ধে কোন প্রভেদ নাই? উভয়েই এক প্রকার কার্য্য করিতে সমর্থ? দুই সমাজেই উচ্চ অঙ্গের সভ্যতা সমানভাবে বিকশিত হইতে পারে?" ইনি বলিলেন—"এই রূপই আমার ধারণা। কেবল আমার নয়—আজ কালকার নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও এই কথাই বলিতেছেন। ইহাঁরা সভ্যতা বিস্তারে কোন জাতিবিশেষের একচেটিয়া অধিকার ও যোগ্যতা স্বীকার করেন না। আমার বিশ্বাস নিগ্রোরা যুক্তরাষ্ট্রে অর্দ্ধ মানব মাত্র বিবেচিত হয়। এজন্য এখানে নিগ্রো-

প্রতিভার বিকাশ হয় না। দুই তিন বৎসর হইল আমি 'Half a man' নাম দিয়া নিগ্রো-জাতির বৈষয়িক দুরবস্থার চিত্র প্রদান করিয়াছি। তাহার ভূমিকায় নৃতত্ত্ববিৎ বোয়াজ আমার সিদ্ধান্তই বৈজ্ঞানিকের সমর্থন-যোগ্য স্বীকার করিয়াছেন।"

বোয়াজ লিখিয়াছেন—

"Many students of anthropology recognise that no proof can be given of any material inferiority of the Negro race; that without doubt the bulk of the individuals composing the race are equal in mental aptitude to the bulk of our own people; that although their hereditory aptitudes may be in slightly different directions, it is very improbable that the majority of individuals composing the white race should possess greater ability than the Negro race."

কুমারী অভিংটনের এই গ্রন্থে নিউইয়র্কের নিগ্রোসমাজ বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। নিগ্রোদের আবাসস্থান ও কর্ম্মস্থান, তাহাদের শিশুজীবন ও নারীজীবন, তাহাদের ধনাগমের উপায় ইত্যাদি সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে বুঝা যায় যে প্রাচীনকালে ইহুদিদিগের যেরূপ দুরবস্থা ছিল বর্ত্তমান যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রোসমাজ তদপেক্ষা বেশী দুর্য্যোগ সহ্য করিতেছে।

অভিংটন নিগ্রোবালকবালিকাদিগের জন্য একখানা সাহিত্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইনি বলেন—সাধারণ বিদ্যালয়ে যে সকল পাঠ্য পুস্তক ব্যবহৃত হয় তাহাতে শ্বেতাঙ্গ ইয়াঙ্কিদিগের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন চিত্রিত থাকে। নিগ্রো ছাত্র ছাত্রীবা এই সকল গ্রন্থে নিজেদের আবেষ্টন দেখিতে পায় না—কাজেই ইহাদের শিক্ষালাভ সরস হয় না। এই বুঝিয়া অভিংটন নিগ্রোসমা-জের রীতিনীতি, পারিবারিক জীবন ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া পুস্তকখানা লিখিয়াছেন।

অভিংটনের সঙ্গে আলাপে জানা গেল আজকাল নিগ্রোসমাজে কয়েকজন কবি প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। নিগ্রোরা চিরকালই সঙ্গীত-বিদ্যায় পারদর্শী। উচ্চ অঙ্গের কবিতা রচনায়ও ইহারা ক্রমশঃ সিদ্ধিলাভ করিতেছে। ব্রেথ্ওয়েটের Lyrics of Life and Love সম্বন্ধে এক সম্পাদক লিখিয়া-ছেন:—

"We have in this maker of sweet verses the true poetic spirit and the work has that grace of form that distinguishes the work of the poet from that of the poetaster. * * * why is praise begrudged the poet? Why do those critics of the North who have so long been on the lookout for some one to wear the bays that rest but lightly on the head of Bliss Carmen pause before giving to the new-come singer the award that is his due? * * * He is one who is by the present volume proving himself to be what ninehundred and ninetynine of the thousand and one verse makers of this country are not—a poet. * * * Can you

tell why he is not hailed with praise?—He is a Negro."

সমাজতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক ডুবয়েস্

একদিন সন্ধ্যাকালে নিগ্রোদের একটি সঙ্গীত বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলাম। সঙ্গীত চর্চ্চা হইল—এবং নিগ্রোজাতির অন্যতম জননায়ক অধ্যাপক ডুবয়েস্ বক্তৃতা করিলেন। ইনি Krehbiel প্রণীত Afro-American Folksongs নামক গ্রন্থ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। ইঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে গান গীত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ইনি এই সমুদায়ের ব্যাখ্যা ও টিপ্পণী দিতে লাগিলেন। ডুবয়েস্ (Du Bois) নিগ্রোজাতীয় লোকসাহিত্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। উহা তাঁহার প্রসিদ্ধ (The Souls of Black folk) নামক গ্রন্থের শেষ অধ্যায়। এই প্রবন্ধ এবং সমস্ত গ্রন্থই সকলের পাঠ করা কর্ত্তব্য। কর্ম্মবীর বুকার ওয়াশিংটন প্রণীত Up from Slavery গ্রন্থের সঙ্গে অধ্যাপক ডুবয়েস্ প্রণীত এই গ্রন্থ পাঠ করিলে সমগ্র নিগ্রো-সমাজের সকল কথা অবগত হওয়া যায়। ডুবয়েসের রচনা সাহিত্যহিসাবেও অতি উচ্চশ্রেণীর অন্তর্গত।

ডুবয়েস্ বলিলেন—"আপনারা এই গানগুলি শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন সন্দেহ নাই। এই গীত শুনিয়া মুগ্ধ হয় না এমন লোক জগতে আছে কিনা জানি না। কিন্তু আপনারা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন কি যে এই সমুদয় গীত নিগ্রো জনসাধারণের হৃদয় হইতে উত্থিত হইয়াছিল? আপনারা নিগ্রোজাতি সম্বন্ধে বর্ত্তমানে অতি নীচ ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। এই অন্ধ কুসংস্কারের ফলে আপনারা কোন মতেই ভাবিতে পারেন না যে জগতের কতকগুলি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীত এই কৃষ্ণাঙ্গ গোলাম জাতির কৃতিত্ব সপ্রমাণ করিতেছে। আমাদিগকে আপনারা জঘন্য নীচ প্রকৃতি পশুস্বভাব ও হৃদয়হীন নরনারী বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। কাজেই আমাদের মুখে যদি কোন ভালকথা আপনারা শুনিতে পান আপনারা স্বভাবতই ভাবিয়া থাকেন যে ঐ সমুদয় বচন আমরা কতকগুলি পরকীয় বুলির ন্যায় আওড়াইতে শিখিয়াছি মাত্র। উচ্চ ধারণা, মহান্ ভাব, গভীর চিন্তা যে নিগ্রোহৃদয়ে জাগিতে পারে ইহা আপনাদের কল্পনার অতীত।

আজ শ্বেতাঙ্গেরা কৃষ্ণাঙ্গগণকে এইরূপ কুসংস্কারপূর্ণ চোখে দেখিতেছেন। কিন্তু মধ্যযুগে এবং প্রাচীনকালে কৃষ্ণাঙ্গ সম্বন্ধে শ্বেতাঙ্গের এইরূপ অন্যায় ধারণা ছিল কি? ইতিহাস আলোচনা করুন—দেখিবেন প্রাচীন কালে শ্বেতাঙ্গেরা কৃষ্ণাঙ্গকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিয়া চলিত। কৃষ্ণাঙ্গেরা অর্দ্ধমানব বিবেচিত হইত না। ধর্ম্মকর্ম্মে, শিল্পকর্ম্মে, সাহিত্য চর্চ্চায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইয়োরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন চিত্রালয় ও আর্ট গ্যালারী যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে প্রাচীন শিল্পীরা খৃষ্টধর্ম্ম-বিষয়ক অথবা সভ্যতা বিষয়ক চিত্রের ভিতর কৃষ্ণাঙ্গ জাতীয় নরনারীর ভক্তি, সেবা, দয়া, দাক্ষিণ্য, শৌর্য্যবীর্য্য এবং নানাবিধ উৎকর্ষের পরিচয় দিতেন। ইয়োরোপের অন্যান্য লোকেরা যেরূপ মানুষ এই সকল চিত্রকরগণের ধারণায় এশিয়া ও আফ্রিকার নরনারীগণও সেইরূপই মানুষ বিবেচিত হইত। কিন্তু আজ তিনশত বৎসরের গোলামীর ফলে নিগ্রোকে আপনারা পশুর সমান বিবেচনা করিতে শিখিয়াছেন। নিগ্রোরা যদি কখনও গোলামী না করিত তাহাহইলে আপনারা

এখনও তাহাদিগের চিন্তাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, ধর্ম্মজ্ঞান এবং সভ্যতা সম্মান করিয়া চলিতেন।"

ডুবয়েস্ আটলাণ্টা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। এই বিশ্ব-বিদ্যালয় আগাগোড়া নিগ্রো। এক্ষণে ইনি শিক্ষকতা ত্যাগ করিয়া মাসিকপত্রের সম্পাদক হইয়াছেন। কাগজের নাম Crisis—বর্ত্তমানে গ্রাহক সংখ্যা ৩০,০০০। ডুবয়েস খাঁটি নিগ্রো নহেন। বুকার ওয়াশিংটনের ন্যায় ইহাঁর শরীরে শ্বেতাঙ্গ রক্ত প্রবাহিত। ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষগণের ভিতর ফরাসী জন্মদাতা ছিল। ডুবয়েস্ ইয়োরোপের জাতিসমূহের মধ্যে ফরাসীকেই বেশী ভালবাসেন।

প্রাচীন চিত্র-শিল্পে কৃষ্ণাঙ্গদিগের মর্য্যাদা সম্বন্ধে ডুবয়েস্ Crisis পত্রে লিখিয়াছিলেন:—

"The reproduction of the 'Adoration of the kings' by Ian Gossart is one of a number of noted paintings which make the figure of the adoring flock king one of prominence. The Antwerp Museum houses the 'Adoration of the Magi' by Rubens, in which the Nubian slaves are grouped by the side of the worshipping camels and the African King is pictured parading in the centre of the picture. In the Lonvre is seen, painted, three years after, a second picture by the same master, commissioned for the church of the sisters of the Anunciation in which the black king is placed as the central figure.

In Bourne—Jones, 'The star of Bethelhem' the adoring Negro prince is the third figure on the right. A painting of an unlike subject, exhibited in the Vienna Gallery 'The Four Quarters of the Globe' by Rubens, symbolises the quarters of the globe by one of the great rivers—the Danube, the Nile, the Ganges and the Amazon. The rivers are in turn symbolised by four male figures with their beautiful female companions. Of 'bronze-hued' loveliness are the man and the maid that represent the Nile."

লোক-সাহিত্যে নিগ্রোজাতি

নিগ্রোদিগের জাতীয় সঙ্গীত ও লোক-সাহিত্য সম্বন্ধে ডুবয়েস্ তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থের "Of the Sorrow Songs" অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছেন। এই সাহিত্যে বর্ত্তমানের কষ্টদৈন্য অথচ ভবিষ্যতের আশা অতি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। গোলামের জাতিই গাহিয়া থাকে—"ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশাভরা আহ্লাদে।"

ডুবয়েস্ বলিতেছেন—

"They are the music of an unhappy people—of the children of disappointment, they tell of death and suffering and unvoiced longing toward a truer world, of misry wanderings and hidden ways."

ইহজগতে যাহারা কিছু কৃতিত্ব অর্জ্জন করিতে পারিল না তাহারা পরকাল, অধ্যাত্ম-

তত্ত্ব, স্বর্গ, ইত্যাদির স্বপ্ন দেখে। পদদলিত জাতির যীশুখ্রীষ্ট এইজন্যই প্রচার করিতেন—"My Kingdom is not of this world." নিগ্রো গাহিতেছেন—

"You may bury me in the East,
You may bury me in the West,
But I will hear the trumpet sound
in that morning."

রবীন্দ্রনাথের আশা-তত্ত্বও কি এইরূপ নয়?—

"তব চরণের আশা, ওগো মহারাজ
ছাড়ি নাই! এত যে হীনতা, এত লাজ
তবু ছাড়ি নাই আশা! * * *
আছ তুমি অন্তর্যামী এ লজ্জিত দেশে,
সবার অজ্ঞাতসারে হৃদয়ে হৃদয়ে
গৃহে গৃহে রাত্রিদিন জাগরূক হয়ে
তোমার নিগূঢ় শক্তি করিতেছে কাজ!"

নিগ্রোদিগের গীতাবলী অধিকাংশই আধ্যাত্মিক এবং ধর্ম্মবিষয়ক। সাংসারিক, বৈষয়িক ও পারিবারিক চিত্র এই সঙ্গীতে প্রায়ই পাওয়া যায় না। না পাইবারই কথা।

"Purely secular songs are few in number. * * * tell in word and music of trouble and exile, of strife and hiding; they grope toward some unseen power and sigh for rest in the End."

নিগ্রোরা সংসারে সুখ পায় নাই। কাজেই হয় স্বর্গের কথা গাহিয়াছে অথবা প্রকৃতির ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছে।

"My Lord calls me
He calls me by the thunder
The trumpet sounds it in my
soul."

নিগ্রোসাহিত্যে মাতার উল্লেখ আছে কিন্তু জন্মদাতার উল্লেখ নাই। বিবাহ, প্রেম, ভালবাসা, দাম্পত্য-সম্বন্ধ ইত্যাদির পরিচয় গোলামী যুগের রচনায় পাওয়া যায় না। বাস্তবিক পক্ষে গোলামজাতির যথার্থ পারিবারিক জীবন ছিল কিনা সন্দেহ। ডুবয়েস্ লিখিয়াছেন:—

"Mother and child are sung, but seldom father; fugitive and weary wanderer calls for pity and affection, but there is little of wooing and wedding, the rocks and mountains are well known, but home is unknown."

নিগ্রো সঙ্গীতের আর এক লক্ষণ এই যে ইহাতে মৃত্যু ভয় নাই।

"Of death the Negro showed little fear, but talked of it familiarly and even fondly as simply a crossing of the waters, perhaps—who knows?—back to his ancient forests again."

ইহাই কি "গীতার" বাণী নয়?

ডুবয়েসের গ্রন্থ হইতে আর এক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"Through all the sorrow of the sorrow songs there breathes a hope—a faith in the ultimate justice of things. The minor cadences of despair change often to triumph and calm confidence. Sometimes it is faith in life, sometimes a faith in death, sometimes assurance of boundless justice in some fair

world beyond. But whichever it is, the meaning is always clear; that sometime, somewhere men will judge men by their souls and not by their skins."

এইরূপ ভাবুকতা, এইরূপ স্বপ্ন, এইরূপ আশা লইয়াই নির্য্যাতিত জাতিরা জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

ক্রেহবিল তাঁহার Afro-American Folksongs গ্রন্থে নিগ্রোদিগের লোক-সাহিত্য আলোচনা করিবার সঙ্গে সঙ্গে রুশ, জার্ম্মাণ, ফিনিস, কেল্টিক ইত্যাদি নানা জাতীয় গীতাবলীর অবতারণা করিয়াছেন। এই জন্য এই গ্রন্থে নানা জাতির হৃদয়কথা বুঝিতে পারা যায়। এতদ্ব্যতীত লেখক গীত সাহিত্যের আলোচনায় বেশী মনোযোগ না দিয়া সঙ্গীত-কলা বুঝাইবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। অনেকের বিশ্বাস নিগ্রো-জাতির নিজস্ব কোন সঙ্গীত-কলা ছিল না— তাহারা আমেরিকায় আসিয়া শ্বেতাঙ্গদের বিদ্যা অনুকরণ করিয়াছে। এই জন্য লেখককে আফ্রিকাবাসী নিগ্রোদিগের সঙ্গীত-কলা এবং গীতসাহিত্য আলোচনা করিয়া মামুলি মত খণ্ডন করিতে হইয়াছে। ইঁহার মত নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

"Some of the melodies have peculiarities of scale and structure which could not possibly have been copied from the music which the blacks were privileged to hear on the plantations or anywhere else during the period of slavery. Correspondence will be disclosed, however, between these peculiarities and elements observed by travellers in African countries."

প্রাচীন মিশরে নিগ্রোসভ্যতা

"Crisis" আফিসে অধ্যাপক ডুবয়েসের সঙ্গে দেখা হইল। ইনি একখানা গ্রন্থের প্রুফ সংশোধন করিতেছিলেন। এই গ্রন্থ Home University Library গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইতেছে। নাম "The Negro". ইহাতে ডুবয়েস্ নিগ্রো সমাজের প্রাচীন সভ্যতা বিবৃত করিয়াছেন। সাধারণতঃ লোকের ধারণা এই যে নিগ্রোরা অতি শিশুজাতি—কয়েক শত বৎসর হইল শ্বেতাঙ্গ সমাজের অধীনে আসিয়া সভ্যতার অ আ ক খ লাভ করিতেছে। সুতরাং ইহাদের উন্নতি এখনও বহুকাল সাপেক্ষ। এই প্রচলিত কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অধ্যাপক মুন্ষ্টার-বার্গ তাঁহার "Americans" নামক গ্রন্থের Problems of population অধ্যায়ে লিখিয়াছেন :—

"It must be left to anthropology to find out whether the negro race is actually capable of such complete development as the Caucasian race has come to after thousands of years of steady labour and progress. The student of social politics need not go into such speculations; he faces the fact that the African Negro has not had the thousands of years of such training and therefore, although he might be theoretically capable of the highest calture, yet practically he is still unprepared for the higher duties of civilisation."

ডুবয়েস্ বলিতে লাগিলেন—"এইরূপ মতবাদ পণ্ডিতমহলে এবং সাধারণ শ্বেতাঙ্গ সমাজে প্রচলিত হইল কেন জানেন? আমরা ২০০ বৎসর কাল ইহাদের গোলামী করিয়াছি বলিয়া। আমাদের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করা কেহই আবশ্যক বোধ করেন নাই। আমরা ত গ্রীক দার্শনিক য্যারিষ্টটলের হিসাবে "জীবন্ত যন্ত্র" মাত্র। আমাদের কি আত্মা আছে? না চিত্ত আছে? কাজেই আমাদের অতীত, আমাদের বংশ মর্য্যাদা, আমাদের গৌরব কথা আবার কোথায়? পণ্ডিত মহাশয়গণ যদি বর্ত্তমানের কুসংস্কার এবং সাময়িক আবেষ্টন ছাড়াইয়া উঠিয়া "রাগদ্বেষবহিষ্কৃত"-ভাবে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক হইতে পারিতেন তাহা হইলে নিগ্রোজাতির অতীত গৌরব-কাহিনী বাণীর সন্ধান পাইতেন। প্রাচীনতম যুগের উৎকর্ষও বিবৃত হইতে পারিত এবং মধ্য-যুগের "missing links" বা ধ্বংসাবশেষও আবিষ্কৃত হইয়া যাইত। আপনি বোধ হয় জানেন যে প্রাচীন মিশরীয় ফ্যারাও সম্রাটদিগের আদিম বাসস্থান এবং জাতিতত্ত্ব এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। কিন্তু সেই যুগের মূর্ত্তি ও চিত্র আজকাল কে না দেখিয়াছে? সেগুলি দেখিয়া আধুনিক নিগ্রো নরনারীর কথা মনে না হওয়া অত্যন্ত বিস্ময়জনক। মিশরীয় নরপতিগণের রং, কেশবিন্যাস, আকৃতি এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সবই নিগ্রোজাতীয় বিবেচনা করিলে কোন অন্যায় হইবে না। নৃতত্ত্ববিদেরা তাহা জানেন। ঐতিহাসিকেরাও তাহা বুঝিতে পারেন। কিন্তু ইঁহারা এতই অন্ধ ও গতানুগতিক যে সেই বিরাট সভ্যতার প্রবর্ত্তকগণকে আধুনিক অবনত নিগ্রোদিগের পূর্ব্ব পুরুষ বিবেচনা করিতে দ্বিধা করিতেছেন। যাহারা কোন কালে জগতের শীর্ষস্থানে ছিল তাহারা কি ঘটনাচক্রে নিতান্ত নিকৃষ্ট সমাজে পরিণত হইতে পারে না? হইতে পারে। পণ্ডিতেরা তাহা বিশ্বাস করেন। কিন্তু নিগ্রোদের অতীত অতটা গৌরবসূচক সপ্রমাণ করা ইঁহারা পছন্দ করেন না। কারণ নিগ্রো যে বর্ত্তমানকালে শ্বেতাঙ্গদিগের গোলাম!"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি এই সকল কথা প্রমাণসহ বিবৃত করিয়াছেন কি?" ডুবয়েস্ বলিলেন—"মহাশয়—Home University Library Series এর কর্ম্মকর্ত্তারা আমাকে এইজন্য বিশেষ খাটিতে বলিয়াছেন। আমাকে তিনবার গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি বদলাইতে হইয়াছে। একটা বিস্তৃত Bibliographyও গ্রন্থের ভিতর দিয়াছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার এই কার্য্যে সঙ্গী কতজন পাইয়াছেন?" ইনি বলিলেন—"এখন পর্য্যন্ত একাকী চলিতেছি।" কিন্তু শীঘ্রই একটা পরিষৎ গঠনের ব্যবস্থা হইতেছে। Encyclopædia Africana নাম দিয়া একটা বিশ্বকোষ বাহির করা হইবে। তাহাতে আফ্রিকা বিষয়ক প্রাচীন ও নবীন সকল প্রকার তথ্য লিপিবদ্ধ হইবে। আমার এই "Negro" গ্রন্থ সেই বিরাট ব্যাপারের এক প্রকার ভূমিকা স্বরূপ।"

ডুবয়েস্ কয়েকখানা গ্রন্থের নাম করিলেন। এই গুলির লেখক নিগ্রো। প্রাচীন ও নবীন নিগ্রো সমাজবিষয়ক তথ্য এই সমুদয়ের আলোচ্য বিষয়। নিম্নে তালিকা প্রদত্ত হইতেছে:—

1. Negro-Culture in West Africa—Ellis.
2. Gold Coast Native Institutions—Hayford.

3. Out of the House of Bondage —Miller.
4. Facts of Reconstruction— Lynch.
5. The Negro in American History—Cromwell.
6. African Abroad—Ferris
7. Haitian Revolution— Steward.

কৃষ্ণাঙ্গ বিভীষিকা

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আফ্রিকার বর্ত্তমান নিগ্রোসমাজের সঙ্গে আমেরিকার নিগ্রোদিগের ভাব-বিনিময় এবং কর্ম্ম-বিনিময় হইয়া থাকে কি ?" ইনি বলিলেন—"ধর্ম্ম-বিষয়ে আদান প্রদান কথঞ্চিৎ হয়। আমরা জগতে সমগ্র কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোকে এক স্বতন্ত্র খৃষ্টান সম্প্রদায়ে পরিণত করিতে চাহি। এই আন্দোলনে শ্বেতাঙ্গেরা ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার নাম ইঁহারা Ethiopian Movement দিয়া থাকেন। এখনও অবশ্য আন্দোলন বিশেষ প্রবল নয়। কিন্তু নিগ্রোদের হাতে কিছু টাকা হইলে যখন আফ্রিকার ও আমেরিকার নিগ্রো ভ্রাতাদের ভিতর ব্যবসার সম্বন্ধ এবং বৈষয়িক আদান প্রদান প্রবর্ত্তিত হইবে তখন শ্বেতাঙ্গেরা একটা কৃষ্ণাঙ্গ বিভীষিকা (Black Peril) দেখিতে থাকিবেন সন্দেহ নাই ! শ্বেতাঙ্গেরা প্রায়ই বিভীষিকা দেখিয়া থাকেন। আজকাল আমেরিকায় Yellow Peril বা পীতাঙ্গ-বিভীষিকা এবং ইয়োরোপে মুসলমান-বিভীষিকা (Pan-Islamism) প্রবল। হয়ত আগামী ৩০ বৎসরের ভিতর কৃষ্ণাঙ্গ-বিভীষিকাও গজাইয়া উঠিবে !"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আফ্রিকার বহু নিগ্রো ত এখনও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। ইহারা খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিবে কি ?" ডুবয়েস্ বলেন—"মুসলমান ধর্ম্ম ত্যাগ করা নিগ্রোদের পক্ষে মঙ্গলকর নয়। আফ্রিকার মুসলমান নিগ্রোরা খৃষ্টান হইবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। প্রকৃত পক্ষে, আমার বিশ্বাস, খৃষ্টান সভ্যতার আওতায় নিগ্রোসমাজ উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না। মুসলমান সভ্যতার সংস্পর্শেই নিগ্রোজাতি অধিকতর উৎকর্ষলাভ করিয়াছে। Blyden প্রণীত "Christianity, Islam and the Negro Race" গ্রন্থে এই বিষয়ের আলোচনা পাইবেন।"

বুকার ওয়াশিংটন ও ডুবয়েস্

শিক্ষাপ্রচারক বুকার ওয়াশিংটন নিগ্রো-সমাজের নরম দলের নেতা। অধ্যাপক ডুবয়েস্ গরম অর্থাৎ চরমপন্থীদলের নেতা। এই দুই জনই আমেরিকায় সুপ্রসিদ্ধ। আমেরিকার বাহিরে যাঁহারা নিগ্রোসমাজের সংবাদ রাখেন তাঁহারা এই দুই জনকেই জানেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহাশয় আপনাতে এবং ওয়াশিংটনে মতভেদ কোন্ কোন্ বিষয়ে বেশী ?" ইনি বলিলেন—"আমার সঙ্গে ওয়াশিংটনের আকাশ পাতাল পার্থক্য। আমি ইঁহার চরিত্রবত্তা এবং অকপট স্বজাতিসেবা যার-পর-নাই সম্মান করিয়া থাকি। এরূপ কর্ম্মবীর জগতে বেশী নাই—এইরূপ আমার বিশ্বাস। কিন্তু ইঁহার মতের সঙ্গে আমি কোন দিনই মত মিলাইতে পারিলাম না। ইনি এতবেশী ঢিল দিয়াছেন যে সমগ্র নিগ্রোজাতি আমেরিকার রাষ্ট্রমণ্ডলে খানিকটা নামিয়া পড়িয়াছে। যাহাহউক—ইনি last of the submissionists—ইঁহার পরে আর কেহ বোধহয় ইঁহার প্রচারিত সহিষ্ণুতা-নীতি অবলম্বন করিবে না।"

বুকার ওয়াশিংটন নিগ্রোজাতির রাষ্ট্রীয় অধিকার সম্বন্ধে কোন কথা বলেন না এবং নিগ্রোদিগকেও ব'লতে দেন না। তাহার ফলে ইয়াঙ্কিরা বুঝিয়াছে যে নিগ্রোরা রাষ্ট্রমণ্ডলে উচ্চ অধিকার না পাইলেও শান্ত থাকিবে। ওয়াশিংটন নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গকে দুই ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রীয় জগতে বাস করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। ইনি কেবলমাত্র শিল্পের আন্দোলন, শিল্পশিক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য ইত্যাদির পুষ্টিসাধনে সমগ্র নিগ্রোসমাজকে ব্রতী করিতে চাহেন। আমাদের দেশে এইরূপ আন্দোলনকে "নুন চিনির বা জুতাকাপড়ের স্বদেশী" বলা হয়! বুকারের মত নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

"In all things purely social we can be as separate as the five fingers and yet one as the hand in all things essential to mutual progress."

ডুবয়েস্ বলেন—"এই কথায় ওয়াশিংটন সমগ্র নিগ্রোজাতিকে ইয়াঙ্কিদের নিকট বেচিয়া ফেলিয়াছেন বলিতে পারি। কাজেই ইয়াঙ্কিরা ওয়াশিংটনকে বড়ই খাতির করিয়া চলেন। ইনি সর্ব্বত্রই ইঁহার টাস্কেজী শিল্প-বিদ্যালয়ের জন্য টাকা সংগ্রহ করিতে পারেন। ইয়াঙ্কিরা বুঝে যে যদি এইরূপ সর্ব্বজনমান্য স্বার্থত্যাগী কর্ম্মবীর তাঁহার স্বজাতির জন্য বৈষয়িক উন্নতি মাত্রে সন্তুষ্ট হন তাহা হইলে আমেরিকা অনেকটা নিরাপদ হইবে—নিগ্রোসমস্যা আর থাকিবে না। এই বুঝিয়া ব্যবসায়-প্রধান ইয়াঙ্কী-সমাজ ওয়াশিংটনকে যথেষ্ট আদর করেন। কিন্তু নিগ্রোজাতি এই মতবাদের ফলে ক্রমশঃ অধোগতি লাভ করিতেছে। আজ নিগ্রো আমেরিকার রাষ্ট্রমণ্ডলে গোলামেরও অধম।"

ডুবয়েস্ বলেন—"আমরা রাষ্ট্রমণ্ডলে উচ্চ অধিকার আকাঙ্ক্ষা করি।—কেবলমাত্র টাকা পয়সার আন্দোলনে যোগ দিলেই নিগ্রোজাতির চরম উন্নতি হইবে না। আমরা সাহিত্য, সঙ্গীত, কলা, বিজ্ঞান ইত্যাদি সভ্যতার সকল অঙ্গেরই বিকাশসাধন করিতে চাহি। অধিকন্তু কেবলমাত্র কতকগুলি শিল্প-বিদ্যালয় অথবা নিম্ন ও মধ্যশ্রেণীর সাধারণ বিদ্যালয় স্থাপন করিলেই নিগ্রোদের শিক্ষা-সমস্যার মীমাংসা হইবে না। আমরা নিগ্রোদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, সাহিত্য-পরিষৎ, বিজ্ঞান-পরিষৎ ইত্যাদি সকল প্রকার উচ্চ প্রতিষ্ঠান গড়িতে চাহি। কিন্তু ওয়াশিংটন এরূপ ব্যাপক ও গভীরভাবে নিগ্রোজাতির ভবিষ্যৎ চিত্র কল্পনা করিতে পারেন না।"

"Of our spiritual strivings" নামক প্রবন্ধে ডুবয়েস্ আমেরিকাবাসী নিগ্রোর জাতীয় আদর্শ বর্ণনা করিয়াছেন—

"He would not Africanise America, for America has too much to teach the World and Africa. He would not bleach his Negro soul in a flood of white Americanism, for he knows that Negro blood has a message for the world. He simply wishes to make it possible for a man to be both a Negro and an American, without being cursed and spit upon by his fellows, without having the doors of opportunity closed rightly in his face."

অধ্যাপক ডুবয়েস্ নিগ্রো ভাবুকতার প্রতি-মূর্ত্তি। আধুনিক ইতিহাসের নজির দেখাইতে হইলে বলিবে ডুবয়েস্ ম্যাজিনি এবং ওয়াশিংটন কাভুর। একজন স্বপ্ন ও আদর্শ প্রচার করিতেছেন—আর একজন অবস্থা বুঝিয়া যথাসম্ভব কর্ত্তব্য বলিতেছেন।

ডুবয়েস্ আমাদের দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের উল্লেখ করিলেন। ইঁহার সঙ্গে লণ্ডনের Universal Races Congressএ দেখা হইয়াছিল।

শ্রীআমেরিকা প্রবাসী

পুষা কৃষি-কলেজের রেশম-বিভাগে পরীক্ষিত ফলাফল ও সিদ্ধান্ত

প্রস্তাবনা

তুঁতভুক রেশমকীট জাতিগুলির বিশেষত্ব :—ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশের বিভিন্ন প্রকারের তুঁতভুক রেশমকীট জাতিগুলির নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে ইহাদের বিশেষত্ব ও প্রত্যেক জাতীয় কোয়ার রেশমের পরিমাণ জানা যাইবে।

(১) বম্বিক্‌স মরি বা বিলাতি পলু :—এই জাতীয় রেশমকীট সাধারণতঃ চীন, জাপান, ইতালি, ফ্রান্স, কাশ্মীর, জম্মু, তুরস্ক, পারস্য, তুর্কীস্থান, অষ্ট্রিয়া, স্পেন, ককেশাস্, সাইপ্রাস্ প্রভৃতি দেশে গৃহাভ্যন্তরে পালন করা হয়; বাঙ্গালা, আসাম, মহীশূর, পাঞ্জাব এবং যুক্তপ্রদেশেও সম্প্রতি এই জাতীয় রেশম কীট অল্প পরিমাণে পালন করা হইতেছে। এই জাতীয় রেশমকীটের ডিম স্বভাবতঃ দশমাস ডিম অবস্থায় থাকিয়া বৎসরে একবার মাত্র ফুটিয়া থাকে; এই ডিমগুলি কিছু-কালের জন্য শীত সওয়াইয়া লইলে এক সময়ে ফুটিয়া থাকে। এই জাতীয় রেশম কীট শ্বেত বা হরিদ্রা বর্ণের, মধ্যস্থলে সমাকর্ষণ যুক্ত (দাবা) বা সমাকর্ষণহীন গুটি প্রস্তুত করিয়া থাকে; এই গুটি হইতে অন্যান্য জাতীয় গুটি অপেক্ষা পরিমাণে বেশী ও ভাল রেশম পাওয়া যায়।

আমাদের দেশে এই জাতীয় পলুর ডিম-গুলি কৃত্রিম উপায়ে শীত খাওয়াইয়া লইলে উপযুক্ত সময় মনোনীত করিয়া যে কোনও সময় ফুটাইয়া লইতে পারা যায়। ফার্ণহীট তাপমান যন্ত্রের ৬৫°-৭৫° ডিগ্রি তাপেতে এই জাতীয় রেশমকীটগুলি বেশ পালন করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ডিমগুলি এক সময়ে ফুটাইয়া লইতে হইলে পাড়িবার পর একমাস পর্য্যন্ত স্বাভাবিক আবহাওয়াতে খোলা যায়গায় রাখিয়া দিয়া কোনও পাহাড়ে বা বরফের কলে প্রায় চারি বা পাঁচমাস পর্য্যন্ত ফার্ণহীট তাপমান যন্ত্রের ৪০°-৫০° ডিগ্রি তাপ যুক্ত স্থানে রাখিতে হয়। শীত-প্রধান দেশে এই শীত খাওয়ান ডিমগুলি ডিম ফুটাইবার যন্ত্রে রাখিয়া প্রত্যহ দুই বা এক ডিগ্রি উত্তাপ প্রায় ২০।২৫ দিন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া প্রায় ৫০° হইতে ৭৫° ডিগ্রি ফার্ণহীট যন্ত্রের তাপে ক্রমে উঠাইয়া এক সময়ে ফুটা-ইয়া লওয়া হয়; কিন্তু ভারতবর্ষে ঐ ডিমগুলি উক্তপ্রকার যন্ত্রে না রাখিলেও (স্বাভাবিক তাপ ৬০° ডিগ্রি ফার্ণহীটের নিম্নে না হইলে)

শীত খাওয়াইয়া আনার ১০।১৫ দিন পরে, নিস্তারি, ছোট পলু প্রভৃতি বর্ষ-বহুজাত পলুর ডিমের ন্যায় ৬০°-৮০° ডিঃ ফাঃ তাপে খোলা যায়গায় রাখিয়া দিলে দুই তিন দিনের মধ্যেই ফুটিয়া থাকে; সুতরাং আমাদের দেশে এই ডিমগুলি ফুটাইয়া লইতে বেশী বেগ পাইতে হয় না।

ডিমগুলি ঠাণ্ডা স্থান হইতে ৪।৫ মাস পরে কিন্তু ১০।১১মাসের মধ্যে আনিলে নষ্ট হয় না; কিন্তু ঠাণ্ডাতে ১২ মাসের বেশী রাখিলে ভ্রূণগুলি কিছু নিস্তেজ হইয়া পড়ে। সুতরাং শীতে ডিমগুলি ৪।৫ মাস রাখিয়া যে কোনও সময় অল্প পরিমাণে ৩।৪ বা ততোধিক বার আনাইয়া লইয়া পালন করা যাইতে পারে। একবারে সবগুলি একসঙ্গে আনাইয়া লইলে প্রায় দুই তিন দিনের মধ্যেই সবগুলি ফুটিয়া যায়। ডিমগুলি শীত খাওয়াইতে না পাঠাইলে ফেব্রুয়ারী মাস হইতে দুই তিন মাস পর্য্যন্ত দুই একটি করিয়া ফুটিতে থাকিবে। এই স্থানে মনে রাখিতে হইবে যে ডিমগুলি এক সময়ে না ফুটিলে পোকাগুলি প্রত্যহ অল্প অল্প করিয়া পালন করিতে গেলে ব্যয়বাহুল্য হয় ও অনেক দিনে যৎসামান্য গুটি পাওয়া যায়; সুতরাং যাহাতে ডিমগুলি এক সময়ে ফোটে তাহাই বসনীদের (রেশম কীট বা পলু পালনকারীদের) লক্ষ্য। ডিমের মধ্যস্থিত ভ্রূণগুলি ঠাণ্ডা স্থানে থাকা পর্য্যন্ত অব্যক্ত বা স্থিরাবস্থায় থাকে; কিন্তু ঐ স্থান হইতে বাহির করিয়া অল্প গরম যায়গায় রাখিলেই ভ্রূণগুলি বাড়িতে থাকে এবং ১০।১২ দিনের মধ্যেই ফুটিয়া যায়; কিন্তু একবার ভ্রূণগুলি বাড়িতে থাকিলে পুনরায় ঠাণ্ডাস্থানে রাখিয়া উহাদের বৃদ্ধি বন্ধ করা সম্ভবপর নহে; তখন ইহারা শীতে বাড়িতে না পারিয়া ডিমের মধ্যেই মরিয়া যাইবে অথবা খুব দুর্ব্বল অবস্থায় ডিম হইতে বাহির হইবে। অল্প কয়েকদিন শীত খাওয়াইয়া গরম স্থানে আনিলে ভ্রূণগুলি অব্যক্ত অবস্থায় থাকে; সুতরাং পুনরায় উহাদিগকে অনায়াসে শীত খাওয়ান যাইতে পারে; কিন্তু ইহাতে পলুগুলি তেমন সবল হয় না। ভ্রূণগুলি নিয়মিতরূপে বৃদ্ধি করাইয়া লইতে হইলে অন্ততঃপক্ষে চারিমাস পর্য্যন্ত ৪০°-৪৫° ফাঃ ডিগ্রি ঠাণ্ডা স্থানে রাখিয়া দিতে হইবে। প্রয়োজনানুসারে চারি মাসের পর ইচ্ছামত কিছু কিছু ডিম কয়েকবারে বা একবারে আনিয়া ফুটাইয়া লওয়া যাইতে পারে; সুতরাং ঠাণ্ডার মধ্যে রাখিয়া দিলে যে কোনও সময় ডিম ফুটান আমাদের হাতে।

এই জাতীয় পলুর ডিমগুলি পাড়ার সময় হরিদ্রাযুক্ত শ্বেতবর্ণের হয় কিন্তু দুই তিন দিন পরেই ধূসরবর্ণে পরিণত হয় এবং এই অবস্থায় শীত অতিবাহন করে কিন্তু ফুটিবার দুই তিন দিন পূর্ব্বে কৃষ্ণাভ হয়।

(২) বম্বিক্স্ টেক্ষ্টার
(বড় পলু বা বড় পাট)

এই বর্ষ-একজাতীয় পলু বাঙ্গালা ও আসামে পালন করা হয়; ইহারা প্রায় সাদা অথবা হরিদ্রাযুক্ত শ্বেতবর্ণের গুটি প্রস্তুত করে এবং গুটির প্রান্তদ্বয় কিছু সূচাল হয়। বিলাতি পলুর গুটি অপেক্ষা ইহারা নরম ও নিকৃষ্ট এবং ইহাদের রেশমের পরিমাণও খুব কম হয়। এই ডিমগুলি আমাদের দেশে দুই এক দিনের মধ্যে ফোটে না কারণ বাঙ্গালার বসনীরা ডিমগুলি শীত খাওয়াইবার জন্য শীতপ্রধান স্থানে না পাঠাইয়া বাঙ্গালা দেশেই স্ব স্ব গৃহের

হাঁড়িতে শীতের কয়মাস রাখিয়া দেয় এবং শীতাবসানে হাঁড়ি হইতে ডিমগুলি বাহির করিয়া ঘরেতে খোলা জায়গায় রাখিয়া দিয়া ফুটাইয়া লয়; বেশী শীত লাগাতে ডিমগুলি এক সময়ে বরাবর না ফুটিয়া ১০।১২ দিনে ফুটিয়া থাকে। এই জাতীয় গুটি হইতে নিস্তারি, ছোটপলু প্রভৃতি বর্ষবহুজাত গুটি অপেক্ষা কিছু বেশী রেশম পাওয়া যায় বটে কিন্তু ইহার ডিম এক সময়ে ফুটাইয়া লইতে পারে না বলিয়া বসনীদের এই জাতীয় রেশম কীট পালনে তেমন আস্থা দেখা যায় না।

বসনীরা উপযুক্তরূপে শীত খাওয়াইয়া লইতে পারে না বলিয়া পলু পালন করিতে ইচ্ছুক নহে যদিও এই জাতীয় প্রত্যেক গুটি হইতে বড় পলুর গুটি অপেক্ষা প্রায় দুই গুণ বেশী রেশম পাওয়া যায়। শীত খাওয়ান ডিম বসনীদিগকে বিতরণ করিলে অথবা সামান্য মূল্যে প্রথমে দিলে এই জাতীয় পলু পালনে ইহাদিগকে উৎসাহিত করা যাইতে পারে। বড় পলুর ডিম বিলাতি পলুর ডিমের মত পূর্ব্বলিখিত মতে এক সময়ে ফুটাইয়া লওয়া যায়। ইহাদের একটু বিশেষত্ব এই যে ইহাদিগকে শীত খাওয়ানের জন্য একটু কম ঠাণ্ডা যায়গায় রাখিলেও ইহারা বেশ ফোটে এবং পলুগুলিও বেশী তাপ সহ্য করিয়া ভাল রেশম উৎপাদন করে। আজকাল বাঙ্গালা দেশের খুব কম স্থানেই বড় পলু পালন করা হয়।

(৩) বম্বিক্‌স্ মেরিডিয়নেলিশ্ (মহীশূর জাতি)

এই বর্ষবহুজাত জাতি মহীশূর ও মান্দ্রাসের কলিগগ অঞ্চলে পালন করা হয়; এই জাতি ঈষৎ সবুজযুক্ত শ্বেতবর্ণের গুটি প্রস্তুত করে এবং গুটির প্রান্তদ্বয় অল্প সূচাল থাকে। এই জাতীয় প্রজাপতির ডিমগুলি পাড়ার পর হরিদ্রাযুক্ত শ্বেত বর্ণের দেখায় এবং বিলাতি পলুর ডিমের মত দুই তিন দিন পরে ধূসরবর্ণে পরিণত হয় না কিন্তু ফুটিবার দুই তিন দিন পূর্ব্বে বিলাতি পলুর ডিমের ন্যায় কৃষ্ণাভ হয়। ঘরের মধ্যে খোলা যায়গায় রাখিয়া দিলে এই ডিমগুলি পাড়িবার দশম অথবা দ্বাদশ দিনে ফুটিয়া থাকে; এই জাতীয় ডিমগুলিকে শীত খাওয়াইবার কোন প্রয়োজন হয় না; তবে ডিমগুলি ঠাণ্ডা যায়গায় রাখিয়া দিলে প্রায় ৩০।৩৫ দিন পরে কোটে; কিন্তু খুব বেশী দিন ঠাণ্ডাতে রাখিলে ডিমের মধ্যস্থিত ভ্রূণগুলি নিস্তেজ হইয়া নষ্ট হইতে পারে।

এই জাতীয় পলু বিলাতি পলু অপেক্ষা অনেক কম রেশম দেয়; কিন্তু ইহা হইতে দেশীয় সমস্ত জাতি অপেক্ষা বেশী ও ভাল রেশম পাওয়া যায়। বৎসরে চারি পাঁচবার এই জাতি আমাদের দেশে সর্ব্বত্র পালন করা যাইতে পারে। বর্ষবহুজাত সকল জাতি ডিমের বিশেষত্ব এই জাতির অনুরূপ।

(৪) বম্বিক্‌স্ ক্রুশি (নিস্তারি বা মাদ্রাসী)

এই বর্ষবহুজাত জাতি বাঙ্গালাদেশে পালন করা হয়; এই জাতীয় গুটিগুলি হরিদ্রাবর্ণের এবং ইহাদের প্রান্তদ্বয় ঈষৎ সূচাল হয়। এই জাতি প্রধানতঃ চৈত্রমাসে ও বর্ষার সময় পালন করা হয়।

(৫) বম্বিক্‌স্ ফরটুনেটাস্ (দেশী বা ছোট পলু)

এই বর্ষবহুজাত জাতি বাঙ্গালাদেশে পালন করা হয়; ইহারা নিস্তারি অপেক্ষা কিছু ছোট গুটি প্রস্তুত করে। নিস্তারি জাতীয় গুটি অপেক্ষা ইহাদের প্রান্তদ্বয় একটু

বেশী সুচাল। এই জাতীয় গুটির রঙ্গ শ্বেত ও হরিদ্রাবর্ণের হইয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসেই এই জাতি সাধারণতঃ বেশী পালন করা হয়।

আসামে হরুপাট বা ছোটপাট নামে যে নিকৃষ্ট জাতি পালন করা হয় তাহা বোধ হয় এই জাতিরই অন্তর্ভুক্ত।

(৬) বম্বিক্স্ শিনেন্‌শিশ্ (চীনাপলু) এবং (৭) বুলু ঃ—

এই বর্ষবহুজাত জাতি দুইটি বাঙ্গালার মেদিনীপুর ও বীরভূম অঞ্চলে বেশী পালন করা হইত; কিন্তু আজকাল ইহাদের চাষ প্রায় লোপ পাইয়াছে। চীনাপলু হরিদ্রা বর্ণের ও বুলু পলু নীলাভশ্বেত বর্ণের গুটি প্রস্তুত করিয়া থাকে; এই দুই জাতি পলুই ছোট গুটি প্রস্তুত করে এবং নিস্তারি ও ছোট পলু অপেক্ষা এই জাতীয় গুটি হইতে কম রেশম পাওয়া যায়।

(৮) বম্বিক্স্ এরাকেনেন্‌শিশ্ (নিয়া-প)

এই বর্ষবহুজাত জাতি বর্ষাতে পালন করা হয়; এই জাতীয় পলুর গুটি শ্বেতবর্ণের ও হলুদ রঙ্গের হয়। এইজাতীয় গুটিগুলি দেখিতে খুব বড় বটে কিন্তু ইহাতে রেশমের পরিমাণ খুব কম থাকে।

চীন, জাপান ও ইউরোপে বর্ষদ্বিজাত, বর্ষত্রিজাত এবং বর্ষবহুজাত জাতিগুলিও অল্প পরিমাণে পালন করা হয়। বম্বিক্স্ জাতীয় সমস্ত পলুর প্রধান খাদ্য তুঁত পাতা; অন্যান্য গাছের পাতা ইহারা তেমন ভাল খায় না এবং খাইতে দিলেও খুব ছোট গুটি প্রস্তুত করে; কিন্তু চীন দেশে এক প্রকার পলু আছে যাহা কুড রেনিয়া ট্রাই লোবা হান্‌স্ গাছের পাতা খাইয়া বেশ ভাল গুটি প্রস্তুত করে; এই জাতীয় রেশমকীটের বিশেষত্ব এই যে ইহারা কীড়া বা পলু অবস্থায় তিন কলপ ছাড়িয়া গুটি প্রস্তুত করে; অন্যান্য পলুর ন্যায় চারি কলপে যায় না; কিন্তু প্রত্যেক কলপে যাইতে কিছু বেশীদিন লাগে; সুতরাং পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইতে অর্থাৎ পাকিতে এই দুই জাতির প্রায় একই সময় লাগে। আমি ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে টোকিও ইম্পিরিয়াল কৃষি-কলেজে এই জাতীয় পলু পুষিয়া ভাল ফল পাইয়াছিলাম।

নিম্নলিখিত তালিকায় প্রতি দশগ্রামে কয়টি করিয়া বিভিন্ন জাতীয় গুটি (যাহা হইতে ইষে ও কলপের খোলস বাহির করা হইয়াছে) গড়ে সাধারণতঃ হয় তাহাই দেওয়া গেল। এই তালিকা হইতে প্রত্যেক জাতীয় গুটির ভালমন্দ বিচার করা যাইবে।

জাতি	সংখ্যা	
ইউরোপে পালিত বম্বিক্স্ মরি	২৫	বর্ষএকজাত
পুষা কৃষিকলেজে পালিত বম্বিক্স্ মরি	৪০	
বড় পলু	৯০	
মহীশূর জাতি	৯০	বর্ষবহুজাত
নিস্তারি	৯৫	
ছোট পলু	১০০	
বর্ম্মার পলু	১১০	
বুলু পলু	১৩০	
চীনা পলু	১৩৫	
আসাম জাতি	১৪০	

বিভিন্ন জাতীয় গুটির একটি অবিচ্ছিন্ন সূত্রের প্রাকৃতিক বিশেষত্ব নিম্নলিখিত নির্ঘণ্টপত্রে দেওয়া গেল

জাতি	প্রত্যেক গুটির এক খেই সূত্রের পরিমাণ	গড়ে ৪৫০ মিটার এক খেই সূত্রের ডেনিয়ার	গড়ে ৪৫০ মিটার ৭ খেই সূত্রের ডেনিয়ার	গড়ে ৪৫০ মিটার সূত্রের মধ্যে ৭ খেই সূত্রের বল বা ভার-সহন-শীলতার পরিমাণ	৪৫০ মিটার সূত্রের মধ্যে গড়ে ৭ খেই সূত্রের স্থিতি-স্থাপকতার পরিমাণ	মন্তব্য
বিলাতি পলু বা বম্বিকস্ মরি	৬১৪·৭০মিটার	৩·১২৫	২২·০০	...	...	বর্ষএকজাত
বড় পলু	২৭৯·৭০ ,,	২·৪৫০	১৭·০০	৪৭·৭ গ্রাম	১২·৮৭মিলিমিঃ	ঐ
মহীশূর জাতি	৩৪২·০০ ,,	২·৩০০	১৬·০০	৪৬·০০ ,,	১৫·৫৩ ,,	বর্ষবহুজাত
নিস্তারি	৩০৮·৬৬ ,,	১·৮০০	১৩·৫০	৪২·৬০ ,,	১৮·৪০ ,,	ঐ
ছোট পলু	২৮৫·৫৭ ,,	১·৬০০	১১·৫০	৩৫·৩০ ,,	১৬·৪২ ,,	ঐ
আসাম জাতি (হক্ক পাট)	২১১·৪০ ,,	২·৪০০	১৭·২৫	৫৩·৮০ ,,	১০·৭৭ ,	ঐ

১ মিটার=৩৯·৩৭ ইঞ্চি
১ ডেনিয়ার=০·০৫ গ্রাম। ৪৫০ মিটার লম্বা এক খেই সূত্র ০·০৫ গ্রাম হইলে এক ডেনিয়ার বলা হয়।

ভারতের মধ্যে বাঙ্গালা, আসাম, বর্ম্মা, মহীশূর এবং কাশ্মীর রেশমকীট পালনের কেন্দ্রস্থল। কাশ্মীরে বর্ষএকজাত জাতি পালন হয়; এই জাতীয় ডিম স্বভাবতঃ বৎসরে একবার মাত্র ফুটিয়া থাকে এবং এই গুটি হইতে রেশমের পরিমাণ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ বেশী রেশম পাওয়া যায়। বর্ষবহুজাত জাতিগুলি সাধারণতঃ বাঙ্গালা, আসাম, বর্ম্মা ও মহীশূরে পালন করা হয়; এই জাতীয় গুটি হইতে খারাপ ও কম রেশম উৎপন্ন হয়। শীতপ্রধান দেশে অক্টোবর হইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত দারুণ শীতের জন্য গাছের পাতা ঝরিয়া যায়; সুতরাং ঐ কয় মাসে শীতপ্রধান দেশে পলু পালন করা সুকঠিন; কিন্তু এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত একই গাছ হইতে দুই-বার পাতা তুলিয়া পলু পালন করা যায়। নাতিশীতোষ্ণ দেশে প্রায় সব সময়েই তুঁত গাছের পাতা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং একই বড় গাছ হইতে বৎসরে দুইবার ও ঝোপ গাছ হইতে অন্ততঃ পক্ষে তিনবার পাতা পাওয়া যায়। নাতিশীতোষ্ণ দেশে

পাতাগুলি পলুকে না খাওয়াইলে নষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং বৎসরে অন্ততঃ পক্ষে তিনবার পলু পালন করিয়া লইতে পারিলে লাভ ছাড়া লোকসান হইবার সম্ভাবনা থাকে না। বিশেষতঃ ভারতের অনেক স্থানে পলু ব্যবসায়ীরা কেবল পলু পুষিয়াই জীবিকা অর্জ্জন করে। পলু পোষা ব্যতীত অন্য কোন কাজ ইহাদের নাই; সুতরাং ইহারা বৎসরে দুই প্রকার মাত্র পলু পুষিয়া সন্তুষ্ট হয় না। চীন-জাপান, ইতালি ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে কৃষকেরা অন্যান্য কৃষিকার্য্যও করিয়া থাকে এবং ঐ সকল কার্য্য হইতে অবসর পাইয়া পলু পালন করে; সুতরাং উহারা বৎসরে একবার মাত্র পলু পালন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে এবং কোনও কারণ বশতঃ ইহাদের পলু মরিয়া গেলেও ইহাদের তেমন ক্ষতি হয় না। কিন্তু আমাদের দেশের বসনীদের পলু একবার মারা গেলে ইহাদের অবস্থা খুব শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়।

বাঙ্গালার রেশম শিল্পের ক্রমেই অবনতি হইতেছে। একসময়ে প্রতিবৎসর ভারতবর্ষ হইতে প্রায় ১৫৫,৩২,২৯০৲ টাকা মূল্যের রেশম বিদেশে রপ্তানি হইত কিন্তু এখন প্রতিবৎসর প্রায় ৫০,৫৫,২৮৮৲ টাকা মূল্যের রেশম বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে; অপর পক্ষে ভারতে রেশমের আমদানি বৎসরে প্রায় ৫৮,৫০,০০০৲ টাকা হইতে ৩,০০,০০,০০০৲ টাকায় উঠিয়াছে। ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর প্রায় ১২,০০,০০০ সের রেশমসূত্র উৎপন্ন হয় এবং ৬,৬০,০০০ সের রেশমসূত্রের জিনিষ ভারতবাসীর প্রয়োজনে লাগে। আজকাল কৃত্রিম রেশমের আমদানিও ভারতে ক্রমেই বেশী হইতেছে এবং প্রতিবৎসর ইহা বেশী পরিমাণে বিদেশ হইতে আসিতেছে। বিশেষজ্ঞদিগের মত এই যে যদি কোনও উপায়ে রেশম শিল্পের অবনতি রোধ করিয়া উন্নতি না করা যায় তবে শীঘ্রই ভারতের অনেক স্থানের রেশম-শিল্প বিলুপ্ত হইবে।

বিশেষজ্ঞদিগের মত এই যে বাঙ্গালায় রেশমকীটজাতিগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা হীনবল হইয়া কম রেশম উৎপন্ন করিতেছে। বাঙ্গালার রেশম-শিল্পের অবস্থা প্রকাশ করিবার জন্য ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সভ্যগণও উক্তরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই সভ্যগণের উপদেশ অনুসারে বাঙ্গালাদেশে পূর্ব্বের মত বর্ষবহুজাত জাতিগুলিই পালন করা হইতেছে। পলুর মহামারী, মাছি এবং নীরোগ ডিমের অভাব বশতঃও এই শিল্প ধ্বংসমুখে পতিত হইতেছে। পরিশ্রম ও খাদ্যসম্ভারের মূল্যও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে; সুতরাং বসনীরা পূর্ব্বের মত গুটির মূল্য পাইলেও রেশমকীট পালনে এখন আর তেমন উৎসাহ প্রকাশ করিতেছে না; কারণ কুলি মজুরী করিয়াও ইহারা বেশী পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারে।

ভারতের রেশম-শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে নূতন সবলকায় কোনও জাতি পলুর (যাহা বেশী ও ভাল রেশম উৎপন্ন করিতে পারে) প্রবর্ত্তন ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে কি প্রকারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যাইতে পারে তাহা দেখা যাইবে।

(১) বিদেশ হইতে বর্ষএকজাত ডিম আনিয়া পালন করা।

(২) বর্ষএকজাত ও বর্ষবহুজাত জাতি লইয়া বর্ণশঙ্কর জাতি গঠন করা।

(৩) বর্ষবহুজাত জাতিগুলির মধ্যে নির্ব্বাচন করিয়া সবলকায় জাতি গঠন করা।

উদ্দেশ্য

কি উপায় অবলম্বন করিলে সবলকায় জাতি গঠন করতঃ রেশমশিল্পের উন্নতি করা যাইবে আমরা ১৯১০ খৃষ্টাব্দ হইতে পরীক্ষা করিয়া আসিতেছি এবং এই পরীক্ষার ফলাফল নিম্নে দেওয়া গেল। আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য একটি সবলকায় বর্ষবহুজাত জাতি গঠন করা যাহা নিস্তেজ না হইয়া ভাল ও বেশী রেশম উৎপন্ন করিবে।

রেশম ব্যবসায়ীরা যাহাতে উপকৃত হইতে পারে তাহা লক্ষ্য রাখিয়া প্রত্যেক পরীক্ষার ফল দেওয়া হইয়াছে ও আলোচনা করা হইয়াছে।

পরীক্ষাকালে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অনুসরণ করা হইয়াছে :—

(১) বিদেশ হইতে আনীত বর্ষএকজাত জাতির সহিত দেশীয় বর্ষবহুজাত জাতির মিশ্রণে বর্ণশঙ্কর জাতি গঠন করতঃ একই পুরুষের সব ডিমগুলি বর্ষবহুজাতিতে রূপান্তরিত না হওয়া পর্য্যন্ত উহাদিগকে বংশানুক্রমে পৃথক পালন করিয়া প্রত্যেক পুরুষ হইতে বর্ষএকজাত ডিমগুলি ত্যাগ করতঃ কেবল বর্ষবহুজাত ডিমগুলি পালন করা।

(২) বাঙ্গালার ও মহীশূরের বর্ষবহুজাত জাতিগুলির মিশ্রণে বর্ণশঙ্কর জাতি গঠন করতঃ পুরুষানুক্রমে পালন করা।

(৩) বিদেশী বর্ষএকজাত জাতির সহিত বাঙ্গালার জল বায়ু সহনশীল বর্ষএকজাত বড় পলু জাতির মিশ্রণে বর্ণশঙ্কর জাতি গঠন করতঃ পালন করা। এই জাতি অন্যান্য জাতি অপেক্ষা ভারতের আবহাওয়া প্রতিরোধ করিয়া ভাল ফল দিতে পারিবে।

(৪) আমরা প্রতিবৎসর বর্ষএকজাত জাতির ডিম বিদেশ হইতে আনিয়া শীত খাওয়াইবার জন্য উহাদিগকে পার্ব্বত্য প্রদেশে অথবা বরফের কলে ৪।৫ মাস কাল রাখিয়া ফুটাইয়া লইতেছি এবং তৎপরে উহাদিগকে বড় তুঁত গাছের ও ঝোপ গাছের পাতা খাইতে দিয়া পৃথক করিয়া পালন করতঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি যে কি প্রকার পাতা খাইয়া পলুগুলি ভাল ও বেশী রেশম প্রদান করে এবং ঝোপ তুঁত গাছের পাতা খাইয়া ভাল রেশম উৎপাদন করিতে পারে কি না। বিশেষজ্ঞ লোকের অভাবে বর্ষএকজাত জাতির ডিম ভারত-বর্ষে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির সময় হইতে অনেকবার বিদেশ হইতে আনয়ন পূর্ব্বক পালন করিয়া তেমন সুফল পাওয়া যায় নাই।

(৫) কৃত্রিম উপায়ে উত্তেজক দ্রব্যের সাহায্যে বর্ষএকজাত ডিমগুলি ফুটাইয়া লইয়া পালন করিয়া লওয়া যাইতে পারে কি না? এই উপায়ে ভাল ফল পাইলে ডিমগুলি শীত খাওয়াইবার জন্য শীতপ্রধান স্থানে অথবা বরফের কলে না পাঠাইয়া ঘরে কম খরচে ফুটাইয়া লওয়া চলিতে পারে।

(৬) দেশী বর্ষবহুজাত জাতিগুলির নির্ব্বাচন প্রণালীর দ্বারা উন্নতি সাধন করা। এই জাতীয় পলুগুলিকে বড় গাছের পাতা খাওয়াইয়া ভাল ফল পাওয়া যায় কি না? এই স্থানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে বাঙ্গালায় ও মহীশূরে বড় তুঁত গাছের চাষ আদতেই নাই (পুষা কৃষি কলেজ হইতে প্রকাশিত "তুঁত রেশম শিল্প সম্বন্ধে উপদেশ" দ্রষ্টব্য)।

(৭) পলুগুলি গৃহে পালন না করিয়া স্বাভাবিক উপায়ে তুঁত গাছে পালন করিলে ভাল গুটি উৎপাদন করা যায় কি না?

শ্রীমন্মথনাথ দে

মহিম্নস্তব *

আর্য্যজাতির দেবারাধনার স্তব কবচ একটী অঙ্গ, পূজারাধনকালে কিম্বা উপাসনার সময় অভীষ্টদেবতার পূজার অনন্তর জপ ও স্তবের প্রথা শাস্ত্রে বিশেষভাবে উল্লেখিত আছে। সম্প্রতি ঋষি-মহর্ষি প্রভৃতির প্রণীত বহুসহস্র দেবতার স্তব ও কবচ পাওয়া যায়। এই ভিন্ন অতি প্রাচীনকাল হইতে বিবিধগ্রন্থপ্রণেতৃগণ গ্রন্থের আরম্ভে এবং অবসানে স্ব স্ব অভীষ্টদেবতার স্তব পূর্ব্বক শ্লোক লিখিয়া থাকেন। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রথম স্তবনীয় দেবের স্বাভাবিক গুণবর্ণনা, দ্বিতীয় দেবতার আরোপিত গুণবর্ণন।

এতাদৃশ স্তব কবচ দ্বারা সাধকের মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি ও অভীষ্টদেবের বিশেষ তৃপ্তিসাধনপূর্ব্বক স্বীয় মনের অভিলাষ পূর্ণ করা। মানসিক স্তব ও বাচনিক স্তব—এই উভয়বিধ স্তবদ্বারা সাধকের হৃদয়ে দেবভাবের বিকাশ হইয়া শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকার সংঘটিত হয়। স্তব ও কবচ নানাবিধছন্দে নিবদ্ধ; সুমধুর সংস্কৃত স্বরে উচ্চারিত হইলে পাঠক এবং শ্রোতৃবর্গের মানসিক কালিমা, চাঞ্চল্য, অবসাদ প্রভৃতি যুগপৎ বিদূরিত করিয়া ঐশভাবের উন্মেষ করিয়া দেয়।

স্তবসমূহের মধ্যে শ্রীশিবের আরাধনায় মহিম্নস্তব অতি প্রসিদ্ধ। 'মহিমন্' এই শব্দ মাহাত্ম্য অর্থে ঋগ্ ও যজুর্ব্বেদের সূক্তে একাধিকবার উক্ত আছে। অতএব মহিমন্ শব্দ খুব প্রাচীন যে তাহাতে কোন সংশয় নাই। সাধারণতঃ শিব পূজার সময় সম্পূর্ণ স্তোত্র আবৃত্তি করিতে না পারিলে অন্ততঃ প্রথমে তিনটী স্তব অনেকে পাঠ করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশে ভট্টপল্লী, নবদ্বীপ, কোটালিপাড়া, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী প্রভৃতি স্থলে অধিকাংশ ব্রাহ্মণই শিবপূজান্তে এই স্তব বিশেষ ভাবে পাঠ করেন। তদ্দ্বারা তাঁহারা শ্রীভগবদ্ বিষয়ে একাগ্রতা এবং পরম শান্তিলাভ করেন। দক্ষিণাপথ ও মহারাষ্ট্রদেশে মহিম্নস্তব সহযোগে শতরুদ্রী বা রুদ্রাধ্যায়, শিব পূজার সময় পাঠ করেন।

আমাদের দেশে অনেক পণ্ডিতের ধারণা আছে যে, 'রুদ্রাধ্যায়' (শতরুদ্রী) কেবল যজুর্ব্বেদীয়বৃষোৎসর্গেই পাঠ করিতে হয়। কিন্তু দক্ষিণাপথ ও মহারাষ্ট্রদেশে (আমাদের) শ্রীদেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীর ন্যায় রোগে, বিপদে, ত্রিবিধ উৎপাতে (দিব্য, আন্তরীক্ষ, ভৌম) গ্রহদোষে, শান্তি স্বস্ত্যয়নে 'রুদ্রাধ্যায়' পাঠ করা হয়। এই বিষয়ে রুদ্রাধ্যায়ের ভাষ্যভূমিকায় শাস্ত্রীয় নানা প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীমৎ সায়ণ, মহীধর, ভট্ট ভাস্করাচার্য্য তাহার মাহাত্ম্য খ্যাপন করিয়াছেন। প্রতীচ্য দেশীয় কোন কোনও পণ্ডিত শিবকে অসুরের উপাস্য দেবতা বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা তাঁহাদের যজুর্ব্বেদের শতরুদ্রী, বেদান্ত

* এপ্রিল মাসের 'সরস্বতী' (প্রসিদ্ধ হিন্দী মাসিক পত্র) হইতে কোন কোন বিষয় এই প্রবন্ধে সংগ্রহ করা হইয়াছে।

দর্শনের শৈবভাষ্য, শিবার্কমণি দীপিকা, শিবতত্ত্ববিবেক, শিব রহস্য, কৈবল্যোপনিষৎ, সূত ও ঈশান সংহিতার ভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থের গূঢ় আশয় না জানাই হেতু। যাঁহারা চিণ্ময়ী পরমাশক্তি জগদম্বার মাহাত্ম্য অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের বঙ্গের মুদ্রিত সাতটী টীকাসহ দেবী মাহাত্ম্যচণ্ডী, দুর্গোপাসন কল্পদ্রুম, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য প্রণীত "প্রপঞ্চসার, লক্ষ্মণাচার্য্যের সারদা তিলক, তন্ত্ররাজ, দেবীভাগবত পাঠ করা উচিত মনে করি।" দেব আরাধনায় সিদ্ধ ও ফলার্থী আর্য্য ভক্তগণের ধারণা—'মহিম্ন স্তব' দ্বারা শ্রীশঙ্কর অতিশয় প্রসন্ন হইয়া থাকেন। এই নিমিত্ত পূজা আরাধন সময়ে বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে উক্ত স্তব পাঠ করা হয়। ইহা অতি প্রাচীন সংস্কৃতে সন্নিবদ্ধ ও রচিত হইয়াছে। এমন কি পৌরাণিক সংস্কৃত ভাষা হইতেও প্রাচীন সংস্কৃতে লিখিত এবং 'শার্দ্দুল বিক্রীড়িত' ছন্দঃ দ্বারা গ্রথিত। ইহা যেমন ভাবগম্ভীর, তদ্রূপ বিবিধ তত্ত্বপূর্ণ ও অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য গ্রথিত। ইহা যে কেবল শৈবগণের পাঠ্য তাহা নয়। ভক্তিসুধার্ণব ভাগবতের ন্যায় বৈষ্ণবগণেরও পাঠ্য। স্তবের সপ্তম শ্লোকে সকল সম্প্রদায়, সকল দার্শনিক এবং সর্ব্বশাস্ত্রের সার ও তাহার একমাত্র প্রতিপাদ্য যে জগদীশ শ্রীভগবান্ তাহা অতি বিশদরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। এই তত্ত্ব ফরিদপুর জেলার বৈদিক শ্রেণীতে লব্ধজন্মা নানা শাস্ত্র বিশারদ বঙ্গের প্রধান-বেদান্তী শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতী মহোদয়, শিব ও বিষ্ণু পক্ষে স্বীয় বিশেষ পাণ্ডিত্য ও দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ ব্যাখ্যায় সুব্যক্ত করিয়াছেন, এবং সকল শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সপ্তম শ্লোকের ব্যাখ্যায় 'প্রস্থানভেদ' করিয়া লিখিয়াছেন। শ্রীমৎ সরস্বতী মহোদয়ের ব্যাখ্যায় শিব ও বিষ্ণু প্রতি শ্লোকে যেন বর্ণিত হইয়াছেন এইরূপ বুঝা যায়। অতএব তদীয় ব্যাখ্যা উভয় সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধার সামগ্রী। তিনি ব্যাখ্যারম্ভে বলিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্বে যে সকল আচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন তিনি তাঁহাদেরই উক্তি সংগ্রহ করিতেছেন মাত্র'। অনেকে বলিয়া থাকেন শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় এমন সকল গীতার সারাংশ স্বরূপ একটী শ্লোক আছে তদ্রূপ মহিম্ন স্তবেরও সারাংশ এই শ্লোকটী। গীতার সারাংশ শ্লোক "মৎকর্ম্মকৃদ্ মৎপরমঃ" ইত্যাদি। মহিম্ন স্তবের সারাংশ 'ত্রয়ী সাংখ্যং যোগ' এই শ্লোকটী, ইহারই ব্যাখ্যার নাম সকল শাস্ত্র সারাংশ "প্রস্থান ভেদ"।* স্তবের ব্যাখ্যাতৃ সরস্বতী মহোদয়কে দক্ষিণ-ভারত ও উত্তর ভারতের লোকে তদ্দেশীয় মুনি বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। আমি প্রস্থানভেদের ব্যাখ্যায় তাঁহার জীবনের ইতিবৃত্ত অচিরে বাহির করিব। স্তবের হেতু নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া সরস্বতী মহোদয় টীকার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—'কোন এক গন্ধর্ব্বরাজ, জনৈক নরপতির প্রমোদ-কেলিবনের মনোহর কুসুমাবলি প্রতিরাত্রে প্রহরী সত্ত্বেও অলক্ষিত ভাবে অপহরণ করিত। রাজা বিশেষ অনুসন্ধানে ও দৈবজ্ঞ দ্বারা তাহা জানিতে পারিয়া উদ্যানের চতুষ্পার্শ্বে শিব নির্ম্মাল্য নিক্ষেপ করিয়া রাখিতে অনুমতি দিলেন। তৎপর দিবস রাত্রিতে যে সময় গন্ধর্ব্বরাজ ফুল অপহরণ করিতে আসেন সে সময় শিব-নির্ম্মাল্যে তদীয় পাদস্পর্শ জনিত অপরাধে তিনি খেচরত্ব হারাইয়া যাওয়াতে প্রতিহারী দ্বারা চৌররূপে

* 'পন্থা' ১৩২০—২১ দ্রষ্টব্য।

আবদ্ধ হইয়া কারাগৃহে নীত হন। কারারুদ্ধ গন্ধর্ব্বরাজ স্বীয় শিব-নির্ম্মাল্য লঙ্ঘন-জনিত অপরাধে খেচরত্ব হারাইয়া যাওয়ার কথা স্মরণ করিয়া কারামুক্তি ও অপরাধ পরি-মার্জ্জনার নিমিত্ত দেবাদিদেব মহাদেবের স্তব করিতে থাকেন। ইহাই পুষ্পদন্ত-গন্ধর্ব্বরাজের মহিম্নস্তব। এই স্তব সমাপ্ত হওয়ার পর পুনর্ব্বার তাঁহার খেচরত্ব লাভ হয়, অনন্তর অলক্ষিত ভাবে আকাশপথে চলিয়া যান।" ইহার পনের খানি টীকার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। মহিম্নস্তব শ্রীওঙ্কার নাথ শিবের মন্দিরের নিকট অমরেশ্বর নামক মহাদেবের মন্দিরে ৮০০ বৎসর পূর্ব্বে খোদিত হইয়াছে। দক্ষিণাপথের নর্ম্মদানদীর দক্ষিণপার্শ্বে উক্ত অমরেশ্বর নাথ মহাদেবের মন্দির বর্ত্তমান। ইহার সমীপে উত্তর দিকে অপর তীরে ওঙ্কার নাথের মন্দির। সম্প্রতি সেই দেশীয় কেহ কেহ এই মন্দিরকে 'মমলেশ্বর নাথের মন্দির'ও বলিয়া থাকে। এই স্থান মালবদেশের মধ্যে পরিগণিত। মহারাজ ইন্দোরাধিপতি হোল্-কারের ষ্টেট্ রেলওয়ের মোরঢক্কা নামক একটী ষ্টেসন আছে। এই মোরঢক্কা ষ্টেসন হইতে প্রায় ৮ মাইল পূর্ব্বে নর্ম্মদা নদীর পার্শ্বদেশে এই স্থান বিদ্যমান। এইখানে নর্ম্মদা নদীর উপর এক বিশাল সেতুও বিদ্যমান রহিয়াছে। অমরেশ্বর এবং তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ অতিশয় রমণীয় দৃশ্যে পরিপূর্ণ। তথা হইতে নৌকারোহণে পার্শ্ব-বর্ত্তী দৃশ্য সকল অবলোকন পূর্ব্বক, যাত্রিগণ ওঙ্কারনাথ দর্শনে যাইয়া থাকেন।" উক্ত সুরম্য মন্দিরের মধ্য স্থানে সভামণ্ডপের মধ্যে একটী ছোট প্রকোষ্ঠ আছে। এই স্থান অনেক সময় অন্ধকারে আবৃত থাকে। প্রাতে যে সময় সূর্য্যোদয় হয় সেই সময়ে ভিতের এক আধ্ স্থানে আলোকিত হয়। এই সূর্য্যালোকে বিশেষ প্রণিধান সহকারে দেখিলে বুঝা যায় যে, যেন ভিতের মধ্যে কিছু লেখা আছে। ইহাতে মহিম্ন স্তব (১) অমরেশ্বরের অষ্টক (২) হলায়ুধ প্রণীত মহাদেব অষ্টক (৩) নর্ম্মদাষ্টক (৪) খোদিত আছে। উক্ত স্তব সমূহের নীচে সম্বৎ ১১২০ শকাব্দ অঙ্কিত রহিয়াছে। বোধ হয় মন্দির নির্ম্মাণের সময়ে স্থপতি দ্বারা উল্লিখিত শ্লোক সকল ভক্ত ও দর্শনার্থিদের যাহাতে প্রবেশকালে দৃষ্টিপথে পতিত হয় এবং পাঠ করিতে পারে এই ভাবে খোদান হইয়াছে। মন্দিরের মধ্যবর্ত্তী সভামণ্ডপ, স্বনাম ধন্যা মহারাণী স্বর্গীয়া অহল্যা বাইর আদেশে প্রস্তুত হইয়াছিল। এই মণ্ডপ নির্ম্মাণের পর হইতেই ঐ প্রকোষ্ঠে কিছু অন্ধকার হইয়াছে। যদিও মন্দিরের ভিত্তিতে কোনও রাজা, মহারাজের সময়ের উল্লেখ নাই তথাপি অনুমান করা যায় যে, উক্ত লিপি রাজা উদয়াদিত্যের সময়ে খোদা হইয়াছিল। উদয়াদিত্য পরমার বংশে প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তিনি ভোজ-নৃপতির পরে ধারা নগরীর সিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন। ইহাতে অনুমান হয় যে, এই স্তব ৮০০ বৎসর পূর্ব্বে খোদিত হইয়াছে। কথা-সরিৎসাগরে লিখিত আছে,—পুষ্পদন্তনামক গন্ধর্ব্ব, শিবের অনুচর ছিল। এই অনুচর গোপনে শিব পার্ব্বতীর কথোপকথন শ্রবণ করাতে মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাকে শাপ দেন। সেই শাপে পুষ্পদন্ত মর্ত্ত্যলোকে কাত্যায়ন বররুচি নামে কৌশাম্বী (বর্ত্তমান আরা নগরী) নগরে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম পরিগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের পরই আকাশবাণী হয়—এই বালক শ্রুতিধর এবং বর্ষ পণ্ডিত হইতে বিদ্যা-লাভ করিবে। ইঁহারই প্রণীত মহিম্নস্তব

কিনা বলিতে পারি না। মন্দিরে খোদিত স্তব, প্রচলিত স্তবের শ্লোকাবলীর মধ্যে কতিপয় শ্লোকের পাঠের অনৈক্য দেখা যায়। তাহাতে কেবল একত্রিশটী শ্লোক আছে। স্তবের মাহাত্ম্যসূচক নয়টী শ্লোক খোদিত হয় নাই। তাহাতে অনুমিত হয় যে, পরিশেষে ঐ নয়টী শ্লোক স্তবের মাহাত্ম্য পরিচায়করূপে পণ্ডিতগণ যোগ করিয়া দিয়াছেন। সরস্বতী মহোদয় উক্ত একত্রিশটী শ্লোকেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শেষ নয়টীর কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। মাহাত্ম্যপরিচায়ক শ্লোকের মধ্যেও কোন পুস্তকে সংখ্যার তারতম্য দেখা যায়। কোথায়ও পাঁচটী, কোথায়ও সাতটী, কোথায় বা নয়টী। মন্দিরের খোদিত শ্লোকাবলীর শেষে স্তবরচয়িতা পুষ্পদন্ত গন্ধর্ব্বের নাম উৎকীর্ণ হয় নাই। যে যে শ্লোকের শিলালিপির পাঠের সঙ্গে প্রচলিত শ্লোকে পাঠের ভেদ আছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

(১) প্রচলিত পাঠ,	শ্লোক সংখ্যা,	(২) শিলালিপির পাঠ
'গিরিশ যৎ স্বয়ং তস্থে'	১০ — ৩-৪ ,	'গিরিশয় স্বয়ং তস্থে,
'নকস্যাপ্যুন্নত্যৈ'	১৩ — ৪- ,	'নকস্যা উন্নত্যৈ'
'দৌস্থ্যং যাত্য নিভৃত'	১৬ — ৩- ,	'দৌস্থ্যং যাতানভৃত'
'নখলু পরতন্ত্রাঃ,	১৮ — ৪- ,	'নখলু পরতন্ত্রাঃ'
'দৃঢ় পরিকরঃ'	২০ — ৪- ,	'কৃত পরিকরঃ'
'ক্রতু ভ্রংশঃ'	২১ — ৩- ,	'ক্রতুঃ ভ্রেশঃ'
'ধৃত ধনুষঃ'	২৩ — ১- ,	'ভৃত ধনুষঃ'
'নৃকরোটী'	২৪ — ২- ,	'নৃকরোডী'
'শ্রুতিরপি'	২৭ — ১- ,	'শ্রুতিরপি'
'বষিষ্ঠায়'	২৯ — ৩- ,	'বহিষ্ঠায়'

ইতি।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী, সাংখ্য-বেদান্ত-দর্শনতীর্থ

মফঃস্বলের বাণী

১। সৌন্দর্য্য-সাধনা

প্রাচীন কাব্য ও কাহিনীতে দেখিতে পাই, রাজকন্যাগণ প্রতি দিন ফুলের মালা গ্রহণ করিয়া ফুলরাণী সাজিতেন, রাজকুমারগণ ভাসিয়া ভাসিয়া ফুলের বাগানে লাগিতেন, মালিনীর মালঞ্চে থরে থরে কুসুম ফুটিয়া উঠিত। ভূপতিবর্গ প্রমোদোদ্যানে ফুলের মাঝে ফুলের সাজে অবসর সময় কাটাইয়া দিতেন। ধর্ম্মপ্রাণ নরনারীসমূহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া সাজি ভরিয়া ফুল তুলিয়া আরাধ্য-দেবতার পূজা করিতেন, পুষ্পরেণু-বাহি-সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া দেহমন সুশীতল করিয়া দিত। কত মুনি তনয়, কত কপিঞ্জল স্বর্গের সুরভি প্রসূনে সুশোভিত

হইয়া প্রাণ মন হরণ করিত, কত শকুন্তলা পুষ্প-ভূষণে ভূষিত হইয়া স্বর্গের দেবী সাজিতেন। ফুলের সহিত মানুষের কত ঘনিষ্ঠতা, কত তন্ময়তা ছিল—শকুন্তলার অধরে ফুল্লকুসুমের সাদৃশ্য দেখিয়া ভ্রমর গুন্ গুন্ রবে শকুন্তলার অধরের পানে ছুটিয়া যাইতেছে। প্রাণের সহিত ফুলকে ভাল না বাসিলে, কুসুম ও ভ্রমরের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ না হইলে কেহ কল্পনায় এমন সুন্দর ছবি আঁকিতে পারে কি?

কিন্তু সেদিন চলিয়া গিয়াছে। জাতীয় অধঃপতনের সহিত আমাদের জাতীয়সৌন্দর্য্য-বোধশক্তিও অন্তর্হিত হইয়াছে। আজ আমাদের লক্ষ্মী নাই, তাই আমাদের বাগান নাই, বাগানে সরোবর নাই, সরোবরে কুমুদ-কহ্লার ফোটে না, হংস হংসী কেলি করিয়া বেড়ায় না, থরে থরে ফুল ফোটে না, পরিমললেহিপবনহিল্লোলে প্রাণ পুলকিত হয় না; আজ কমল নাই, হংস নাই, সুষমা নাই, প্রীতি নাই, লক্ষ্মী সরস্বতী থাকিবেন কেন? এ দেশের বড় লোকের বাড়ী যাইয়া দেখুন সুধাধবলিত অট্টালিকার দ্বারদেশে এখানে ওখানে কেবল সঙ্গীন্ ও লাল পাগড়ী, দেবালয়ের সংলগ্ন উদ্যান এখনও আছে, তাহাতে তামাকের আবাদ হইতেছে, প্রাচীন উদ্যানের প্রাচীন পুষ্পতরুগুলি প্রাচীন কর্ত্তাদের স্মরণ করিয়া দুই চারিটি ফুল, দুই চারিটি অশ্রুবিন্দু ত্যাগ করিতেছে—কে তাহাদের খোঁজ লয়? সব যেন লক্ষ্মীহীন, শ্রীহীন। কিন্তু অই কুঠিয়াল সাহেবের বাড়ী যাইয়া দেখুন শ্বেত সৌধ শ্যাম-লতায় শ্যামায়মান হইয়া নিকুঞ্জ ভবনে পরিণত, সম্মুখে শ্যাম দূর্ব্বাদল মখমলের ন্যায় আস্তীর্ণ রহিয়াছে, চারিদিকে ফুটন্ত ফুল, ফুটন্ত শোভা, ফুটন্ত প্রীতি। টেবিলের উপর পুষ্পাধারে পুষ্পগুচ্ছ, হস্তে, বক্ষে পুষ্পগুচ্ছ, বারান্দায় প্রবেশপথে টবে টবে শ্যামসৌন্দর্য্যে প্রাণ ভরিয়া উঠে। যেখানে সৌন্দর্য্য, যেখানে প্রীতি, যেখানে প্রাণ, সেখানেই লক্ষ্মী, সেখানেই শক্তি, সেখানেই বুদ্ধি। সাহেবদের বাড়ীতে গেলে মনে হয় যেন ইন্দ্রালয়ে, যেন স্বপ্নালোকে, যেন কোন মায়াপুরীতে বিচরণ করিতেছি আর এদেশের কোন বড় লোকের বাড়ীতে গেলে মনে হয় কি যেন নাই, কি যেন খাপছাড়া, কিসের যেন একটা অভাব রহিয়াছে!

কিন্তু সৌন্দর্য্য-বোধ কি বিলাসিতা? আমরা বাজে কাজে কত ব্যয় করিয়া থাকি, আর সামান্য দুই চারিটা লতাপাতা ফুল ফলেই কি আমাদের মিতব্যয়িতা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়? বন জঙ্গলে স্বচ্ছন্দজাত কত লতাপাতা ফুল প্রকৃতি দেবীর শোভাসম্বর্দ্ধন করিতেছে—সে সমুদায় আনিতে বড় অর্থের প্রয়োজন হয় না, চাই একটু সৌন্দর্য্য বোধ, চাই একটু পরিশ্রম। আপনার বাড়ীখানা সাজাইতে প্রথমেই যা কিছু ব্যয় পড়ে, পরে সৌন্দর্য্যের রাণী লক্ষ্মী আসিয়া আপনই সেখানে অধিষ্ঠিতা হন। আমাদের দেশে কি একটা সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে কেশ প্রসাধন প্রভৃতি বিলাসিতা, তাই এ দেশের ছাত্র সম্প্রদায় অবিন্যস্ত-কেশ, লক্ষ্মীহীন, শ্রীশূন্য, বৃদ্ধ বয়সেও অভ্যাস দোষ বিদূরিত হয় না; আর ইউরোপ আমেরিকার আবাল-বৃদ্ধ বনিতা পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, লক্ষ্মীর বরপুত্র, তাই লক্ষ্মীও বোধ হয় তাঁহাদের প্রতি এত অনুকূল। আমাদের দেশের কোন বালক বা যুবক যদি কেশ বিন্যাসে মনোনিবেশ করে তাহা হইলে তাহাতেই তাহার এক ঘণ্টা

কাটিয়া যায়, কিন্তু অন্য দেশের বালক বালিকা সৌন্দর্য্য-সাধনকে কর্ত্তব্যসাধন বলিয়া মনে করে, তাই তাহাদের কোন কার্য্যেই বিলম্ব হয় না।

স্রোতের মত জলসঙ্ঘাতের মত মানুষ মৃত্যুসাগরের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে—কর্ত্তব্যের সহস্র ক্ষেত্র উভয় পার্শ্বে প্রসারিত, বিশ্রাম করিবার অবসর ভোগের অবকাশ কোথায়? যে দেশে নিষ্কামধর্ম্ম প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল, সে দেশে কি অনাসক্ত নির্ব্বিলাস ভাবে সৌন্দর্য্য-সাধন অসম্ভব? ভগবান করুন দেশে পুনরায় সুষমাদেবীর প্রতিষ্ঠা হউক, কান্তির সহিত শান্তি ফিরিয়া আসুক, সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া, আনন্দের মধ্য দিয়া এই মড়ার দেশে জীবনের স্রোত তর তর বেগে প্রবাহিত হউক।

রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ

২। খাইতে দাও

কোথাও বন্যা প্লাবন, কোথাও অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী প্রলয় তাণ্ডবে নৃত্য করিতেছে! সংক্রামক রোগের ন্যায় অন্নকষ্ট দেশব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে! মহামারী হবিপুষ্ট হুতাশনের মত লোল জিহ্বা বিস্তার করিতেছে! ঐ শুন বঙ্গভূমির করুণ কণ্ঠের আর্ত্তনাদ—"ম্যয় ভুখাঁহো"!

তুমি বিলাসী, স্বার্থ-মোক্ষ, বাঙ্গালী—তুমি কি দেশবাসীর এ বিপদ বুঝিতে পার? স্ত্রী পুত্র—চক্ষের সম্মুখে অনাহারে মরিতেছে—ইহাতে স্বামীর মনে, পিতার প্রাণে, যে কি কষ্ট হইতেছে—তুমি কি তা' বুঝিতে পার? ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর অনাহারে উপবাসে—কিরূপ হতাশভাবে জীবনের অন্তিম মুহূর্ত্ত ক্ষেপণ করিতেছে,—ঘরে বসিয়া—সুখ-লালিত তনু বাঙ্গালী—তুমি তা'কি বুঝিতে পার?

অভুক্ত দৈব-বিড়ম্বিত ক্ষুব্ধ প্রজার জন্য, আমাদের রাজার প্রাণ কাঁদিয়াছে, কিন্তু তুমি বাঙ্গালী—তোমার প্রতিবেশীর প্রতি তোমার সে সহানুভূতি কৈ? সংবাদপত্রের তালিকায় ছাপার অক্ষরে নাম ছাপার প্রলোভনে, অন্নকষ্ট-ক্লিষ্ট কাতর মুখের উপর তুমি যে এক মুষ্টি তণ্ডুল নিক্ষেপ করিয়া বলিতেছ—"যা' ইহা কুড়াইয়া লইয়া নিজের পথ দেখ।" ইহাই তোমার দান! ইহাই তোমার কর্ত্তব্য পালন! ইহাই তোমার মৈত্রী শিক্ষা!

চাঁদপুরে চাঁদমিঞা অনাহারে মরিয়াছে, মরিবার সময়ে বলিয়া গিয়াছে—"মৃত্যুতে আমার দুঃখ নাই, কেবল দুঃখ—মরিবার পূর্ব্বে একমুঠা ভাত খাইয়া মরিতে পাইলাম না!" বাঙ্গালি! বিলাস-ব্যসন-প্রিয় বাঙ্গালি! একথাটা তোমার শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিয়াছে কি? এ কি চাঁদমিঞার মুখের কথা?—ভাবিয়া দেখ দেখি—এ মর্ম্মবাণী কি বঙ্গভূমির বুকফাটা হাহাকার নয়? এক সময়ে যে শস্য-শ্যামল চির-শান্তি বিরাজিত শুভ্র বক্ষে, কমলার রত্নভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত ছিল, যে দেশের স্বপ্নময় ঐশ্বর্য্য মরীচিকার অনুসরণ—কত রাজ্যেশ্বরের জীবনের অদ্বিতীয় সাধনা বলিয়া মনে হইত, সেই কোহিনুর ও ময়ূর সিংহাসনের দেশে—আজ অন্নাভাব!

যে দেশের অতুল সমৃদ্ধি রূপসী ললনার লাবণ্য রজ্জুর ন্যায় মহম্মদ ঘোরীকে সপ্তদশবার নিজের শ্যামল অঙ্কে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিল, যাহার ক্ষতবক্ষে মাসিডনীয় আলেকজাণ্ডার আপনার বিজয় কেতন প্রোথিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই দেশের লোক আজ শুষ্কমুখে দু'টী অন্ন ভিক্ষা

চাহিতেছে; তাহাদের জন্য তুমি একটুও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছ কি ?

ইংরাজ দুর্ভিক্ষ দমনের চেষ্টা করিতেছেন, দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধান করিতেছেন, প্রজাকে বাঁচাইবার জন্য যত্ন করিতেছেন, কিন্তু তুমি বাঙ্গালী—তুমি তোমার অনশনক্লিষ্ট ভ্রাতা ভগিনীর জন্য কি করিয়াছ? তুমি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, উচ্চব্রতধারী মহৎ মনুষ্য-সমাজে প্রবেশের অধিকার লাভ করিয়া কেমন করিয়া দেখিতেছ—তোমার প্রতিবাসী হীন ক্ষুধার জ্বালায় দলে দলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে? তোমার ভ্রাতা, তোমার ভগিনী, তোমার সম্মুখে অবনত মস্তকে নত-জানু হইয়া যুক্ত-করে ভিক্ষা চাহিতেছে—তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া রহিয়াছ। ইহাই যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন ?

ঐ দেখ—অনাবৃষ্টির প্রবল প্রতাপে—মাঠ ধূ ধূ করিতেছে—রক্তবিন্দুর ন্যায় মূল্যবান শস্য শুকাইয়া যাইতেছে,—আবার ঐ দেখ, ঐদিকে—বন্যা প্লাবনে নগর সমুদ্রে রূপান্তরিত হইয়াছে, লোকের ঘরে অন্ন নাই, চালে খড় নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, দেশবাসীর এ দুঃখ তুমি না বুঝিলে, বুঝিবে কে? দাও, বাঙ্গালি! দাও—ভাইকে এক মুঠা খাইতে দাও, দু'দিনের জন্য তোমার বিলাসিতা একটু কমাও। তোমায় ১ দিনের খরচ—৫০টী জীবনকে রক্ষা করিতে পারে। দাও, বাঙ্গালি! তোমার ভাইকে দু'টী খাইতে দাও। চাঁদমিঞার আত্মা—বঙ্গের অস্থি মজ্জায় মিশিয়া বুভুক্ষার উন্মাদ তৃষা ঢালিয়া দিয়া, তোমার পানে চাহিয়া রহিয়াছে, ভাই সকল! দাদা সকল! প্রেতাত্মার তর্পণ করিয়া অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় কর। তুমি একটি পয়সা দিলে—তাহারা একটী মোহর জ্ঞান করিবে—দানের এমন মহান্ আত্মতৃপ্তি—উপেক্ষা করিও না। যেমন করিয়া পার, ভাইকে ভগিনীকে খাইতে দাও।

চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ

৩। স্বদেশী ব্রত

মহান কর্ত্তব্যপালন, সময় সাপেক্ষ, শক্তি সাপেক্ষ। ক্ষীণশক্তি মানব মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা স্বার্থসাধনার প্রবৃত্তি ভগবৎ প্রদত্ত। ভগবান সহজে তুষ্ট হন না। তাই সর্ব্ব প্রকার মহৎ লক্ষ্য সাধন জন্য মানব ব্রতধারণ করে। সতী মহেশ্বরকে পতি প্রাপ্তির জন্য স্বকীয় কোমলাঙ্গ ক্ষয়কর ব্রতধারণ করিয়াছিলেন। বেহুলা মৃতপতি সঞ্জীবিত করিবার জন্য ভেলায় অকুল সাগরে ভাসিয়াছিলেন। আজও সতী পত্নী পতির মঙ্গলার্থ কঠোর ব্রতধারণ করেন—দেশসেবক স্বার্থসাধক এমনি করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন। বাঙ্গালী স্বদেশী শিল্পোদ্ধার জন্য স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারে ধৃতব্রত হইয়াছিল—সেদিন সেই ব্রতের সহিত রাজানুগ্রহ লাভে বঙ্গভঙ্গরহিতকর সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্য সংমিশ্রিত ছিল—তাই রাজপুরুষগণ ঐ ব্রত খুব সদয় চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। কালক্রমে সে সাধনা সিদ্ধ হইয়াছে, রাজ-পুরুষগণ তুষ্ট হইয়াছেন—বিভক্ত বঙ্গ জোড়া লাগিয়াছে। সাধনা আংশিকরূপে সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু মূল সাধনার সিদ্ধি হয় নাই—তাই কেহ বলেন আর কেন—এ সাধনা সিদ্ধি হইবার নহে। এস নিজেদের ভ্রম স্বীকার করিয়া লই—স্বদেশী বর্জ্জন করি—অনেকে বিনা পরামর্শে ঐ পথে পদার্পণ করিয়াছে! কিন্তু আমরা দেখিতেছি যাহারা অসহিষ্ণু অবিশ্বাসী, আপাতলোভী ক্ষীণ দৃষ্টি তাহারাই একথা বলিতে পারে—আত্মপ্রত্যয়শীল আত্মসম্ভ্রমশীল দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন

ব্যক্তি একথা বলিতে পারেন না। তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে "ক্ষতি স্বীকার করিয়াও যথাসম্ভব স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিব"—ঐ শোন বঙ্গীয় আইন-সভা-মঞ্চ হইতে একদা পূর্ব্ববঙ্গের শাসনকর্ত্তা মিঃ বেল কি বলিতে-ছেন—ক্ষতি স্বীকার করিয়াও আমরা এদেশী জিনিষ সরকারী অফিস সমূহে ব্যবহার করিব। কিঞ্চিদধিক মূল্য দিয়াও এদেশে জিনিষ তৈয়ারী করিতে প্রয়াস পাইব! কারমাইকেল রুমাল এদেশেই তৈয়ারী হয়, এদেশী জিনিষ আমাদের উদারপ্রাণ মহাপুরুষ গবর্ণর বাহাদুর ব্যবহার করেন! তবে কেন বল সাধনা সিদ্ধ হয় নাই। সরকার সন্তুষ্ট হইয়াছেন—আমাদের স্বদেশীয় সিদ্ধি অদূরে। কেহ বলে সস্তায় জিনিষ পাইলে বেশী দরে কেন বস্ত্র কিনিব--কথা সত্য কিন্তু প্রথম জিজ্ঞাস্য এই, বৎসরে কত জোড়া কাপড় পর? শতকরা কত টাকা তোমার অধিক খরচ বাড়ে! সামান্য—অতি সামান্য। যদি বল আমি গরীব, সামান্য অতিরিক্ত ব্যয়ই বা কেন করিব?—করিবে তোমার নিজের উপকারার্থে—তোমার দেশবাসীর পেটে অন্ন যোগাইতে! ঐ যে লক্ষ লক্ষ কুলি—তোমা-রই ভাই ভগিনী বঙ্গলক্ষ্মী, মোহিনী, কল্যাণ-কটন, গণেশ ক্লথ মিলে কাজ করিতেছে—ঐ যে শতাধিক কলে বম্বেবাসী ভ্রাতৃবর্গ মজুরী লাভ করিয়া অকাল মৃত্যুর কবল হইতে মুক্তি পাইতেছে উহাদিগকে কি সাহায্য করা তোমার কর্ত্তব্য নহে—তুমি কি কাল ঐ কুলির অবস্থাপন্ন হইয়া ঐ মিলে চাকুরীর জন্য লালায়িত হইতে পার না! বলিবে ইহাতে ফল কি। মিলগুলি বস্ত্রের উন্নতি করিতেছে না! বলি ঐ খানেই সাধনাসিদ্ধির ক্ষেত্র। যদি ভারতীয় মিল সমূহ আজ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইতে পারিত তবে তোমার সাধনার সুযোগ কোথায় থাকিত। তাহারা যে তোমাদের অজ্ঞাতে বহুদিন ত্যাগ স্বীকার করিয়া বক্ষ পঞ্জরে জড়াইয়া মিলগুলি রক্ষা করিয়াছে তখন তুমি কাল নিদ্রায় বিভোর ছিলে, আজ তুমি দু এক আনা ক্ষতি স্বীকার করিতে পার না?

কিন্তু তোমার সাধনার জন্যই আজ এই অবস্থা। আজ কাপড় জোড়া প্রতি ৵০ আনা চার আনা ত্যাগ স্বীকার করিলে ভগবানের দয়া হইবে এবং রাজপুরুষগণেরও একটা ভাবিবার বিষয় হইবে—ভগবান রাজপুরুষ-দিগের প্রাণে একটা সদয় ভাব জাগ্রত করিয়া দিবেন। অদূরে তাহারই লক্ষণ সুস্পষ্ট ভাবে দেখা দিয়াছে। ঐ লাট কাউন্সিলে ভারতীয় বস্ত্রশুল্কের রহিতকর প্রস্তাব উপস্থিত করা হইতেছে—বিলাতের অবাধ-বাণিজ্য-নীতির সঙ্কোচন আরম্ভ হইয়াছে—ঐ জাপানী প্রতি-দ্বন্দিতা ঐ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার সুবিধা করিয়া দিতেছে। আমরা বলি আর একটু দৃঢ় হও, একটু সহিষ্ণু হও—একটু সাধনশীল হও। তুমি কি শুন নাই সাধন বলে প্রস্তরময়ী কালীমূর্ত্তি তৈলঙ্গ স্বামীর ইঙ্গিতে সচলা হইতেন।

সামান্য কিছু আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়া যে অর্থের তুমি নিত্য অপব্যবহার করিতেছ—বিলাস ব্যসনে ব্যয় করিতেছ তাহার সামান্য অংশ স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার কল্পে ব্যয় করিতে পার না? ধিক্ তোমাকে!

তুমি জান এই স্বদেশী শিল্পোদ্ধারের উপর তোমার জাতীয় জীবন মরণ নির্ভর করি-তেছে। তুমি একথা বুঝিয়াছিলে—তুমি তাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলে—আজ তুমি সে প্রতিজ্ঞা ভুলিলে তুমি আত্মপ্রবঞ্চক হও।

পর প্রবঞ্চকের মুক্তি থাকিতে পারে—আত্ম-প্রবঞ্চকের মুক্তি নাই। কবি বলিয়াছেন

To thy own self be true—

তোমার আত্মার নিকট তুমি সত্যবাদী হও—আমাদেরও আজ সেই প্রার্থনা। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা ভুলিবে কেন?—ভঙ্গ করিবে কেন। মানুষ তাহা করিতে পারেনা। তুমি কি মানুষ নও? সত্যবাদী হও—দেশবাসীর প্রতি সদয় হও. দেশ সেবক হও—মাতৃ সেবক হও। স্বদেশী ব্রত ত্যাগ করিও না।

বরিশাল-হিতৈষী

৪। মানবের লক্ষ্য

মানবের লক্ষ্য কি?—এই ভূমণ্ডলে যে ১৬২ কোটিরও অধিক মানব জীবলীলায় রত আছি, আমাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য কি? আমরা সকলেই যাহা পাইয়াছি তাহাতে তৃপ্ত নহি, আর কিছু চাহি। কি চাহি, কেন চাহি? আমার যখন মনে হয় যে আমা হইতে আমার প্রতিবেশী অধিকতর সুখী তখনই আমি তাঁহার মতন হওয়ার বা তাঁহার পথে তাঁহাকে অতিক্রম করিবার চেষ্টা করি। ইন্দ্রিয়নিচয়ের প্ররোচনায় সমগ্র মানবসমাজ এইরূপেই চলিতেছে:—এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে, এক সমাজ অন্য সমাজকে, এক জাতি অন্য জাতিকে পরাস্ত করিবার জন্য কত ব্যগ্র। আধুনিক শিক্ষা ইহাকে উন্নতির লক্ষণ কহে। কিন্তু এই উন্নতি কিসের জন্য, ইহার পরিণতি কতদূরে গিয়া দাঁড়াইবে কেহ ভাবিয়া দেখিতেছি কি? উন্নতির প্রবাহ দাঁড়াইবে,—একথা বলিলেও বর্ত্তমান নীতি অনুসারে পাপ হয়। কারণ, তন্মতে ক্রমোন্নতিই জীবন্ত মানবের, জীবন্ত সমাজের লক্ষ্য।

আমি কুঁড়ে ঘরে থাকি, সুলভ ডালভাত ফলমূল খাইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি। আপনি আমা হইতে অধিকতর সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবার জন্য ইচ্ছা করিলেন,—বুদ্ধিবৃত্তি খাটাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন; ধনধান্যে গৃহ পূর্ণ হইল, দ্বিতল ত্রিতল সৌধ নির্ম্মিত হইল, সর্ব্বদিকে আমা হইতে উন্নত-প্রণালীতে বিষয়সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। প্রতিবেশী অপর একজন আপনাকে অতিক্রম করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। এই ব্যক্তির গত স্বাচ্ছন্দ্যলাভের ইচ্ছা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব ক্রমে সমাজগত ও জাতিগত হইয়াছে। এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বৈষয়িক উন্নতির চিত্র ইউরোপেই সম্যক্ ফুটিয়াছে। এক এক যুগের সঞ্চিত কল কৌশল কূটবুদ্ধি প্রভৃতির সাহায্যে আজ একজন প্রাধান্যলাভ করিলেন, তাঁহাকে পশ্চাতে ফেলিবার জন্য আর একজন অভিনব কল কৌশল উদ্ভাবন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, রাজনীতির সমাজনীতির নূতন চাল খেলিতে লাগিলেন। সেই সমস্তের সাহায্যে তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিকে পশ্চাতে ফেলিয়া মদগর্ব্বে প্রমত্ত হইলেন, তাঁহার প্রতাপে ধরিত্রী কম্পিত হইয়া উঠিল,—অপর দুর্ব্বল জাতিসমূহকে অসভ্য বর্ব্বর ইত্যাদি আখ্যা দিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে লাগিলেন। আর তাঁহার কার্য্যগুলিকে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান গবেষণা জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য বলিয়া মনোরম সাজে চিত্রিত করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। এইরূপে একে অন্যকে পদতলে ফেলিয়া তদুপরি উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহাই কি মানবের লক্ষ্য?

পাশ্চাত্য জগৎ এই লক্ষ্যে ছুটিয়াছে; কিন্তু এযাবৎ কখনও তাহাতে তৃপ্তি লাভ করিতে পারিয়াছে কিনা তাহার প্রমাণ নাই।

এইরূপ অনির্ব্বাণ পিপাসা, এই মহাশোষণকর অতৃপ্তি কি মানবের লক্ষ্য হইতে পারে? যাহা পাইলে শান্তিলাভ করিব, তাহা পাই নাই বলিয়াই এই অতৃপ্তি। সুতরাং বুঝিতে হইবে যাহাতে এই অতৃপ্তি, এই পিপাসা বাড়িতেছে তাহা মানব প্রাণের লক্ষ্য নহে। যতদিন লক্ষ্য স্থির না হইবে ততদিন আমরা সকলেই অতৃপ্ত অন্তরে ছুটাছুটি করিব। কাড়াকাড়ি, কাটাকাটি, মারামারি করিয়া জগৎকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখিব।

ঐরূপ অতৃপ্তির তাড়নায় একদিন ভারতের প্রাণ যখন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল তখন গভীর নির্ঘোষে আদেশ হইল :—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"।

কাম ক্রোধ লোভ মোহাদি রিপুগণের ধর্ম্ম অনুসরণ করিও না, তাহাদের ধর্ম্মের সেবা যতই করিবে ততই তোমার পিপাসা বাড়িবে। তৃপ্তি যদি চাও, শান্তি যদি চাও সে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণ লও।' এই 'আমার শরণ' লওয়া কিরূপ? ডাকাতির সফলতার জন্য ডাকাতেরা কালীমূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করে, হত্যাকারী লক্ষ্মীনারায়ণের অর্চ্চনা করিয়া আইন আদালতকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করে, ধূর্ত্তেরা অন্যকে প্রবঞ্চনা করে। এইরূপ শরণে কি আত্মারামের শরণ লওয়া হয়?

স্বচ্ছন্দ ভোগবিলাস ও পোষাক পরিচ্ছদ পরিধানেও সে তৃপ্তিলাভ ঘটে না। এখন পোষাক পরিচ্ছদ দ্বারাই আমরা ভগবানের শরণ লইবার চেষ্টা করি। বাহিরেও পোষাক, ভিতরেও পোষাক। বর্ত্তমান যুগের বাহিরের পোষাকগুলি উৎকট কৃত্রিমতায় জড়িত, ভিতরেও জ্ঞানের নামে কৃত্রিম পোষাকে অন্তর ঢাকিয়া ফেলিয়াছি। সে সব উদ্ঘাটন করিয়া আত্মারামের খোঁজ লওয়া আজ কাল বড়ই দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং শান্তি তৃপ্তি পাইব কিরূপে? যতদিন লক্ষ্য স্থির না হইবে, যতদিন অন্তিম লক্ষ্যে না পঁহুছিব, ততদিন এই অশান্তি অতৃপ্তি লইয়া কাটাইব।

জ্যোতিঃ

৫। জাতীয় জীবন

বাঙ্গালী আজ জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য যত্নশীল হইয়াছে কিন্তু দেশের জীবনটা কোন্ স্থানে অবস্থিত তাহার অনুসন্ধান আজও পাইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। দুই হাত ও দুই পা লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেই মানুষ হওয়া যায় না। মনুষ্যত্ব একটী স্বতন্ত্রগুণ বা ধর্ম্ম এবং আত্মচেষ্টায় ইহার সম্যক্ স্ফূর্ত্তি ও বিকাশ সাধন হইয়া থাকে। সমাজের বা জাতির যে শ্রেণীতে যে পরিমাণে এই আত্মচেষ্টা শক্তি বা মনুষ্যত্ব আছে, জাতীয়তা সংস্থাপনে সেই শ্রেণীই ততটা সহায়তা করিয়া থাকে। এই আত্মশক্তির বিকাশেই মানুষের মনুষ্যত্ব। ইউরোপের এই "আত্মশক্তি" বিকশিত হইয়াছে সুতরাং সে আজ বসুন্ধরা উপভোগ করিতেছে। আমাদের ইহা নাই তাই আমরা পশুর অপেক্ষাও ঘৃণিত জীবন যাপন করিতেছি।

ইংরাজীতে একটী কথা আছে "The Nation lives in cottages" দরিদ্রের পর্ণকুটীরেই জাতির বাস। কথাটী খাঁটী সত্য। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠার পুরোহিত সাজিয়াছেন, বক্তৃতা-মঞ্চে বা সংবাদপত্রের স্তম্ভে এই নীতি বাক্যটীর সত্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেও, প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে যে সর্ব্বদাই ইহা স্মরণ রাখিয়া তাঁহারা কাজ করেন এরূপ বোধ হয় না। আমাদের নেতৃবৃন্দ এখনও অভিজাত

সম্প্রদায়ের আপাতমনোহর চাকচিক্যের প্রভাব এড়াইয়া দরিদ্রের পর্ণকুটীরে জাতীয়তার সন্ধান করিতে অভ্যস্ত হন নাই। এবং সেই জন্যই আমাদের অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ জীবনী শক্তির অভাবে দিন দিন ক্ষীণবল এবং অবশেষে বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে।

জাতীয়তা সংস্থাপনে জমিদার সম্প্রদায়ের কিছু মাত্র আবশ্যকতা নাই ইহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে সন্দেহ নাই. বর্ত্তমান সঙ্কট সময়ে জাতীয় শরীরের কোনও অঙ্গের প্রতি অমনোযোগী হইলে আমাদের সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইবে না। কিন্তু অঙ্গ বিশেষের প্রতি অধিকতর মনোনিবেশ ও যে স্থলে জাতির প্রাণ প্রতিষ্ঠিত, তৎপ্রতি অবহেলা করিলেও চলিবে না। আমাদিগকে দেখিতে হইবে সমাজের কোন শ্রেণীর মধ্যে মনুষ্যত্ব বলিতে আমরা যাহা যাহা বুঝি সেই সেই সমস্ত গুণের সম্যক্ বিকাশ সাধিত হইয়া থাকে। সমগ্র পৃথিবীর অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস ইহার একই উত্তর প্রদান করিতেছে যে জনসাধারণের হৃদয়েই জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠিত এবং যে দেশের জনসাধারণ যত উন্নত, যত আত্মপ্রতিষ্ঠ সে দেশ তত উন্নত ও তত সভ্য। কিন্তু আমরা অধিকাংশ সময়েই জনসাধারণের কথা একেবারেই ভুলিয়া যাই। সব কাজেই আমরা জনসাধারণের সহায়তা না চাহিয়া জমিদার ও অভিজাত সম্প্রদায়ের কৃপাপ্রার্থী হইয়া থাকি। অনেক সময়ে ইহাতে আমাদের আশা যে পূর্ণ হয় না তাহা নহে কিন্তু এইরূপ ভিক্ষা দ্বারা জাতীয় জীবনের উন্মেষ সাধনও সম্ভবপর নহে

যে আত্মনির্ভরতা গুণ জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় আমাদের জমিদার সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহার সম্যক্ বিকাশ দেখিতে পাই না এবং তাঁহারা সাধারণতঃ যে ভাবে ও যে অবস্থাতে থাকেন, তাহাতে ঐ শক্তির বিকাশ হওয়া অধিকাংশ সময়েই সম্ভবপর নহে। বাঙ্গালার জমিদার শ্রেণীর প্রায় ষোল আনাই আজ ঋণভারে প্রপীড়িত। এতদ্দ্বারা কি ইহাই প্রতিপন্ন হয় না যে আমাদের জমিদার সম্প্রদায় সর্ব্ববিষয়েই পরনির্ভরশীল ও হিতাহিতের বিচারে অক্ষম। সুতরাং জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা কার্য্যে জমিদারের সাহায্য দ্বারা আমাদের বিশেষ কোনও লাভের সম্ভাবনা নাই তবে যদি কোনও শিক্ষিত আত্মনির্ভরক্ষম জমিদার (সৌভাগ্যের বিষয় বাঙ্গালা দেশে আজও এমন ২।১ জন জমিদার বর্ত্তমান আছেন) আমাদের মাতৃপূজার পৌরোহিত্য করিতে অভিলাষী হন, তবে আমরা সানন্দে তাঁহাকে বরণ করিয়া লইব। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে দরিদ্রের পর্ণ কুটীরে, যেখানে মানুষ নিয়ত দুঃখ দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইয়াও আত্মশক্তির প্রভাবে উন্নতির দীর্ঘস্থানে আরোহণ করিতেছেন সেই খানেই আমাদিগকে জাতীয় জীবনস্রোতের মূল উৎস অনুসন্ধান করিতে হইবে। বড়লোকের কৃপাদত্ত অনুগ্রহে তৃপ্তিসাধন করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকিলে জাতীয় যজ্ঞের উদ্‌যাপন হইবে না, আমাদিগকে দরিদ্রের নিরহঙ্কার যত্নপ্রদত্ত শাকান্ন ভোজনেই গৌরবানুভব করিতে হইবে।

যাঁহারা দরিদ্রের পর্ণকুটীরে জন্মগ্রহণ করিয়া আত্মশক্তির বিকাশ সাধন করিয়া গিয়াছেন, শিক্ষার দোষে সেই নীরব কর্ম্মীদের প্রতি এতদিন আমরা যথোচিত সম্মান করি নাই কিন্তু এখন হইতে করিতে হইবে। আমরা লেখা পড়ার বড়াই করি কিন্তু ইউরোপ

কি ভাবে আজ বড় হইয়াছে ও হইতেছে প্রত্যক্ষ অনুভব দ্বারা তাহা আমরা জাতীয় জীবনে সম্যক অনুষ্ঠান করিতে পারি না ইহাই আমাদের দোষ। ইংরাজেরা ব্যারণ লিপ্‌টনের ভূয়সী প্রশংসা করেন আর তাঁহাদের দেখা দেখি আমরাও শতজিহ্বা হই। কিন্তু আমাদের হতভাগিনী চিরদুঃখিনী জননীর স্নেহময় ক্রোড়ে যে শত শত লিপ্‌টন ছিলেন এবং এখনও আছেন, তাহার কোনই খোঁজ খবর রাখি না। চা-ব্যবসায়ী লিপ্‌টন ও ঔষধব্যবসায়ী লালমোহন সাহা ও বটকৃষ্ণ পালে কি প্রভেদ আমরা জানি না। সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সম্মানিত হইবার পূর্ব্বে দেশের লোকের কাছে মার্টিন কোম্পানীর বড় বাবু নামেই পরিচিত ছিলেন! নলিন বিহারী সরকারের নাম কয়-জন জানে? বিলাতী জুতাওয়ালা ডসনের নামে আমরা ভক্তিভরে প্রণত হই কিন্তু কে, এম, দাস আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ হেতু চিরকালই ঘৃণিতই রহিয়া গেল! এইরূপে কখনই জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না ইহা সুনিশ্চিত।

স্বরাজ

৬। এ যে প্লাবন নয়—পাবন

মা শিশুর হাতে একটী খেলনা তুলিয়া দিলে, শিশু তাহা লইয়া খেলিতে খেলিতে মা হইতে দূরে সরিয়া পড়ে;—খেলায় এতই মত্ত হইয়া যায় যে, মার কথা আর মনে পড়ে না। কিন্তু হঠাৎ যদি খেলনাটি হাত হইতে ফস্কিয়া যায় তাহা হইলেই সে পেছন দিকে মায়ের পানে চাহিয়া কাঁদিয়া উঠে—তখন মাকে মনে পড়ে খেলার ধাঁধাঁ ছুটিয়া যায়।

আমরাও সংসারে আসিয়া ধন, জ্ঞান, কুলমান, বিদ্যাবিভবের কৃত্রিম খেলায় মত্ত হইয়া, আপনা আপনি শত ধাঁধাঁর সৃষ্টি করিয়া তাহাতে আটকা পড়িয়া যাই,—তাঁহাকে আর মনে থাকে না। আমরা ধনী দরিদ্র, ছোট বড়, উচ্চ নীচ, ইতর ভদ্র ইত্যাদি প্রভেদ জ্ঞান লইয়া একটা "সমাজের" সৃষ্টি করি; দলাদলি, হিংসা দ্বেষ ও ঈর্ষা নিন্দার কলঙ্কে ইহাকে কলুষিত ও আবর্জ্জনাময় করিয়া তুলি। এই-রূপ যখন আমরা আমাদেরই অন্যায় ও উদ্ধত আচরণে সৃষ্টির মহৎ উদ্দেশ্যটী পণ্ড করিয়া দেই, তখন সেই চিরমঙ্গলময় বিধাতা অতি ভীষণ আকস্মিক আঘাতে আমাদের ভুলের ঘর ভাঙ্গিয়া দিয়া আমাদের সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল-তার শাস্তি বিধান করেন।

এই বিরাট বন্যাবিপ্লবে আমরা এই নৈতিক শিক্ষাটুকু লাভ করিয়াছি।—কি দেখিলাম! এ কি দৃশ্য?—এ কি ভীষণ, একি সুন্দর? দৃশ্যটী একদিকে যেমনি ভীষণ, অন্যদিকে তেমনি সুন্দর! একদিকে চাহিয়া দেখ—প্রলয় পয়োধি ভীষণ হুঙ্কারে সব গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে, জলরাশি গভীর গর্জ্জনে প্রাণে আতঙ্ক তুলিয়া রাস্তাঘাট ভাঙ্গিয়া, ঘর দরজা, গাছ বাঁশ ভাসাইয়া লইয়া চলিয়া যাইতেছে, —বালবৃদ্ধ যুবা নরনারী গো মহিষ ইত্যাদি প্রাপ্তি মাত্রেই যেন মহাকালের করালগ্রাস হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আর্ত্তনাদ করিয়া ইতস্ততঃ ছুটিয়া পলাইতেছে! আবার অন্য-দিকে দেখ—কি সুন্দর দৃশ্য; কি বিরাট তীর্থক্ষেত্র;—ছোট বড়, ধনী দরিদ্র, ইতর ভদ্র, স্ত্রী পুরুষ একত্র সম্মিলিত। আজ হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্ম খ্রীষ্টিয়ান একই ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া সমভাবে সমস্বরে একজনের উপাসনায় প্রবৃত্ত —সম্মুখে অনন্তকায় বিপুল সমুদ্র, প্রান্ত-ভূমিতে বিরাট তীর্থক্ষেত্র, আজ আমরা বংশ কুল ধন মানের ঘৃণ্য গৌরব ভুলিয়া, জ্ঞান

বিজ্ঞানের অহঙ্কার পাশরিয়া মহাতীর্থের যাত্রী সাজিয়াছি। আজ আমরা জাতিভেদ ভুলিয়া, সম্প্রাদায়িকতার ভাব বিসর্জ্জন দিয়া আমরা নানা জাতীয় লোক এক তীর্থে এক দেবতাকে ডাকিতেছি।

হে মঙ্গলময়, তুমি আজ সকল ভুল ভাঙ্গিয়াছ, প্রভো! যে ধনী তাহার রম্য হর্ম্ম্যতলে বসিয়া অর্থ পরিপুষ্ট উদরে হস্ত মার্জ্জন করিতে করিতে পথবাহী নিরন্ন ভিক্ষুকের প্রতি কটু-কটাক্ষপাত করিতেন, তিনিই আজ মুহূর্ত্তমধ্যে সেই রম্য হর্ম্ম্য ত্যাগ করিয়া পথপার্শ্বে সেই ভিক্ষুকেরই কাছে দণ্ডায়মান। যে অতি শুচিবারগ্রস্ত পণ্ডিত হীন জাতীয় লোককে দেখিলে ছায়াপাতভয়ে কুড়িহস্ত তফাৎ হইতে "দূর হ" "দূর হ" বলিয়া নাসাকুঞ্চন করিতেন, তিনিই আজ মুচি মেথরের সঙ্গে একই গৃহতলে অবস্থান করিতেছেন। স্বর্ণালঙ্কার ও দেহসৌন্দর্য্যের অভিমানে গর্ব্বিতা রমণীও আজ অর্দ্ধনগ্না অনার্য্যরমণীর সন্নিধান শয়নে আপনাতে আপনি লজ্জমানা। আজ ধন, কুল, সৌন্দর্য্য, সভ্যতার অভিমান আর নাই।—আজ আমাদের বহুদিনের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া, অহমিকা চূর্ণ করিয়া, ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়া তোমার পবিত্র আসন পাতিয়া বিরাজ করিতেছ, প্রভো।

আজ কি শুভদিন, কি পুণ্য মুহূর্ত্ত। না জানি কি শুভলগ্নে তোমার এই বিরাট তীর্থের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। তাই আজ ঘরে ঘরে যেমন জলের তরঙ্গ খেলিতেছে, তেমনি হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেমের বন্যা বহিতেছে।—আজ ধনী দরিদ্রকে, বড় ছোটকে, পণ্ডিত মূর্খকে, পুণ্যবান পাপীকে ঘৃণাবিরহিতভাবে স্নেহসম্ভাষণ ও প্রেমালিঙ্গন করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছে না! আজ আমরা মহা সম্মিলনে সমবেত,—আজ মানুষ মনুষ্যত্বের সাধনা করিতে দাঁড়াইয়াছে—অপ্রেমিক প্রেমিক সাজিয়াছে, নিষ্কর্ম্মা কর্ম্মী সাজিয়াছে, কৃপণ দাতা হইয়া বসিয়াছে। আমাদের যে সকল বালক ও যুবা এতদিন "খেলার মাঠের পালোয়ান" বলিয়া কতজনের শ্লেষ গঞ্জনা সহ্য করিয়া আসিয়াছে, তাহারাই আজ কর্ম্মবীর সাজিয়া জীবের সেবা করতঃ নিন্দুকদিগকে স্তম্ভিত করিতেছে। যাহারা আজীবন লাভ ক্ষতির গণনা করিয়া কাটাইতেছে, তাহারাই আজ মুক্ত হস্তে দান করিতেছে,—যে চামচ দিয়া ভিক্ষা দিত, সে অঞ্জলি ভরিয়া তণ্ডুল বিতরণ করিতেছে। এইরূপে আজি সেবাধর্ম্মের সাধনা হইতেছে। ঐ যে শ্রেণীবদ্ধ অসংখ্য পাকপাত্রে স্তূপাকার অন্নব্যঞ্জন লুচি খিচুড়ি প্রস্তুত হইয়া অনবরত বিতরিত হইতেছে,—এই কাহার সেবা হইতেছে? এ তো তোমারাই আহুতি দেওয়া হইতেছে। ঐ যে সহস্র সহস্র নরনারী ক্ষুৎকাতর কণ্ঠে "দেও" "দেও" বলিয়া চীৎকার করিতেছে,—ইহারা তো তোমারই যজ্ঞের সাড়া দিতেছে! তুমিই তো সর্ব্বভূতে ক্ষুধারূপে সংস্থিতা" হইয়া অনন্তমুখে এই মহাযজ্ঞের মহাহুতি গ্রহণ করিতেছ।—এ তো তোমারই বিরাট বিশ্বরূপের বিকাশ!

জমি পুরাতন হইতে হইতে উৎপাদিকা শক্তি হারাইয়া পাষাণবৎ হইয়া পড়ে; তখন বন্যাজলে প্লাবিত হইলে বহুদিনের জমাট আবর্জ্জনা হইতে মুক্ত হইয়া উর্ব্বরতা লাভ করে। আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রেরও এই অবস্থা; আমরা আমাদেরই কর্ম্মদোষে নিজ নিজ সরল নির্ম্মল শিশুহৃদয়ে নানাসামাজিক ও সাংসারিক আবর্জ্জনা জমাট বাঁধাইয়া তুলি; প্রেমশূন্য হৃদয় ক্রমে পাষাণ কঠিন হইয়া পড়ে।

এমনি দুঃসময়ে, হে পতিতপাবন, তোমারই করুণাবারি বন্যাবেগে নানাপথে আসিয়া হৃদয়ক্ষেত্রকে প্লাবিত করিয়া সেই বহুদিনের জমাট আবর্জ্জনারাশি ধুইয়া লইয়া যায়। ধনীর ধনাভিমান, কুলীনের কুলগৌরব, কৃপণের কার্পণ্য, রূপবানের স্বরূপাভিমান, হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা নিন্দা বন্যাবেগে ভাসিয়া যাইতেছে। এ হেন শুভ মুহূর্ত্তে, তোমারি প্রেমবারি প্লাবনে পবিত্রীকৃত মানব হৃদয়ে প্রেমবীজ উপ্ত হইল, হে পতিতপাবন—এই বীজ যেন আবার অঙ্কুরে বিলীন না হয়; এই বিশ্বজনীন প্রেম সাধনা; এই সেবাধর্ম্মের আরাধনা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।

সুরমা

৭। মুষ্টিযোগ

ভগন্দর—দন্তিমূল, হরিদ্রা ও কেওয়ার মূল বাটিয়া প্রলেপ দিলে ভগন্দর ভাল হয়।

কর্ণপীড়া—শতমূল, বিড়ঙ্গ, মধুর সহিত বা ছাগলের মূত্র সৈন্ধবের সহিত, বা আকন্দের পাতা অল্প আগুনে তাতাইয়া তাহার রস কাণে দিলে কানের ভোঁ ভোঁ শব্দ করা, বা কাণ বেদনা ও পিকপড়া নিবারিত হয়।

চক্ষুরোগ—নিমপাতার রস শুণ্ঠী চূর্ণ বা বড়ই মূল ঘোলের সহিত চক্ষুতে কয়েক ফোঁটা করিয়া দিলে সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ আরোগ্য হয়।

দদ্রু—কনকধুতুরার মূল ও সেফালিকার পাতা কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া বা হরিদ্রা, হরিতাল, দূর্ব্বা, সৈন্ধব, গোমূত্র দ্বারা বাটিয়া দদ্রু স্থানে প্রলেপ লাগাইলে দদ্রু আরোগ্য হয়।

কুষ্ঠ—শ্বেত অপরাজিতার মূল, বা দেশী হরীতকী, দূর্ব্বা, চাউল, আকন্দের ক্ষীর (আঠা) আইঠাকলার বাকলের ক্ষীর একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ আরোগ্য হয়।

কুষ্ঠ (ধবল)—শেটী শাকের মূল, মরিচ, পিপুল শুণ্ঠী নিম গুড়ুচি, হরীতকী সমভাগে চাউলের জলদ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ধবল কুষ্ঠ নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হয়।

অর্শরোগ—পিপুল ও হরিদ্রা গোমূত্রে বাটিয়া বা হরীতকী চিনি ও পিপুল বাটিয়া ননী মিশাইয়া গুহ্যদ্বারে প্রলেপ দিলে অর্শ ভাল হয়।

প্লীহা—রক্ত চিতার মূল বড়ই (কুল) প্রমাণ লইয়া কলার মধ্যে ভরিয়া সেবনে ভাল হয়।

শোথ—কৃষ্ণতিল কাঁজির দ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিলে ব্রণ-শোথ আরোগ্য হয়।

ঠোঁট ফাটা—(১) রাত্রিকালে ঘুমাইবার পূর্ব্বে বাম কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা নাভিতে ও গুহ্যদ্বারে তিনবার করিয়া সরিষার তৈল লাগাইয়া ঘুমাইলে ঠোঁট ফাটা সারিয়া যায় (২) শিশিরের জলে কিয়দ্দিন মুখ ভিজাইলেও এই ব্যাধি আরোগ্য হয়।

জিহ্বা ফাটা—শনি কিম্বা মঙ্গলবারে অথবা হরগৌরী সংক্রান্তির দিনে আম্র-বৃক্ষের নিম্নে মাটীতে দাঁড়াইয়া হাতে না ধরিয়া গাছের একটী আম পাড়ি। ছাল ও আঁঠি প্রভৃতির সহিত খাইয়া ফেলিলে জিহ্বা ফাটা সারিয়া যায়। (২) সিদ্ধ চাউল একমুঠা লইয়া এমন ভাবে চর্ব্বণ করিবে, যেন ক্ষত স্থানে বেশ একটু লাগিয়া যায়। তাহার পর সেই চর্ব্বিত চাউল এমন স্থানে ফেলিবে যেন উহা কাকে খাইয়া যায়। ইহার নাম চাউলপড়া। এইরূপ টোটকায় নিশ্চতই জিহ্বার ক্ষত আরোগ্য হয়। (৩) সোহাগার খৈ মধুর সহিত মাড়িয়া জিহ্বার ক্ষত স্থানে দিলেও উহা আরোগ্য হয়।

কণ্ঠক্ষত—সেফালি গাছের মূল চিবাইলে গলার ক্ষত সারিয়া যায়।

চূণে পোড়া—তৈল কিম্বা কাঁজি দ্বারা কুলকুচা (কুল্লি) করিলে চূণ ভক্ষণ জন্য মুখ গহ্বরস্থ দন্তরোগ (চূণে পোড়া) সারিয়া যায় (২) খানিকটা চিনি কিয়ৎক্ষণ মুখে রাখিলে ইহা অল্প হইলে আরোগ্য হইয়া থাকে।

দাঁত পড়া—শ্লেষ্মাতিরেকাদি কারণে অনেকের দাঁত পড়িয়া যাইতে থাকে। পিপুল মূল, বাকস ছাল কিম্বা হিজলের মূল বাটিয়া দাঁতের গোড়ায় প্রলেপ দিলে এই রোগ সারিতে পারে।

দন্তকণ্ডূয়ন—চলিত কথায় ইহাকে দাঁত কড়মড়ি কহে। কেহ বা নিদ্রিত অবস্থায় কেহ বা জাগিয়া দাঁত কিড়্‌মিড় করিয়া থাকেন। কৃষ্ণকায় অশ্বের পুচ্ছের সাতগাছি লোম লইয়া তাহার বেণী প্রস্তুত করিয়া গলায় বাঁধিলে ইহা আরোগ্য হয়। (২) কাঁকড়ার একটী পা দুধের সহিত পাক করিয়া সেই দুধ ঘন হইলে নামাইয়া নিদ্রার্থ শয়নের পূর্ব্বে তাহা দ্বারা পদদ্বয় লেপন করিবে। ইহাতেই দন্তশব্দ দূর হইবে।

দাঁতের পোকা—বিচিকলার শিকড় কিম্বা কেশুত্তার শিকড় পোকা ধরা দাঁতে পুনঃ পুনঃ লাগাইলে দাঁতের পোকা পড়িয়া যায়। ২। সিজের শিকড় অথবা বড় পানার শিকড় কিম্বা ক্ষিরাইর মূল চর্ব্বণ করিয়া পোকা ধরা দাঁতে লাগাইয়া রাখিলে পোকা পড়িয়া যায় বা মরিয়া যায়।

৩। বটগাছের আঠা পোকা ধরা স্থানে লাগাইলেও উপকার দর্শিয়া থাকে।

৪। রশুন অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া লাগাইলেও উপকার হয়।

দাঁতের নালি ঘা—রশুন হিং এবং আকন্দের আঠা একত্র করিয়া দাঁতের গোড়ার নালিতে লাগাইলে আরোগ্য হয় এবং পোকা থাকিলে মরিয়া পড়িয়া যায়। ২। তেঁতুল পাতা ও লবণ একত্রে বাটিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইলে কথঞ্চিৎ জালা করে বটে, কিন্তু বিশেষ উপকার দর্শে।

প্রসূন

অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার

India Press, Calcutta.

"চাহ, চাহ, মতিমান, দেখ দেখি বিশাল জগতে,
মানবের কর্ম্মধারা কত দিকে আবর্ত্তিয়া ধায়!
কত সাধ কত আশা জেগে ওঠে সাধিতে কল্যাণ!
মানুষের শক্তি লয়ে কীটসম ব্যর্থ কর তারে?
বিধাতার পুণ্যদান—দলমল হিয়া-শতদল
গন্ধ চাহে বিতরিতে, তুমি তার রুধিবে দুয়ার?
একি—একি অপমান মনুষ্যত্বে হান অবিরত!
ভুলে যাও বর্ত্তমানে, ভেঙ্গে ফেল জড়তা-শিকল
দূর ভবিষ্যতে চাহি'। ভাসে ধরা আলোক-বন্যায়—
দুয়ারে পাখীর মত, আজি তোমা ডাকি প্রাণপণে,
বাহির হবে না তুমি?"

সপ্তম খণ্ড সপ্তম বর্ষ	অগ্রহায়ণ, ১৩২২	দ্বিতীয় সংখ্যা।

আলোচনা

১। ভারতবাসীর আয়ুঃ

বিভিন্ন দেশের লোকের আয়ুর গড় পরিমাণ :—

দেশ	সাল	পুরুষ	স্ত্রী
সুইডেন্	১৮৯১—১৯০০	৫০.৯	৫৩.৬
ডেন্মার্ক	১৮৯১—১৯০০	৫০.২	৫৩.৬
ফ্রান্স	১৮৯৮—১৯০৩	৪৫.৭	৪৯.১

দেশ	সাল	পুরুষ	স্ত্রী
ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলস্	১৮৯১—১৯০০	৪৪.১	৪৭.৭
ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্	১৮৯৩—১৮৯৭	৪৪.১	৪৬.৬
ইটালি	১৮৯৯—১৯০২	৪২.৮	৪৩.১
প্রাশিয়া	১৮৯১—১৯০০	৪১.০	৪৫.৫
ভারতবর্ষ	১৯০১	২৩.০	২৪.০

পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলির অধিবাসীরা গড়ে কত বৎসর বাঁচিয়া থাকে তাহার একটী তুলনামূলক তালিকা দেওয়া হইল। ৪১ বৎসরের নীচে কোন ইউরোপীয় জাতির মৃত্যুর হার নাই। কোথাও কোথাও ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত সাধারণের জীবনের পরিমাণ। ভারতবাসী পুরুষ গড়ে ২৩ বৎসর এবং স্ত্রীলোক গড়ে ২৪ বৎসর মাত্র বাঁচিয়া থাকে! এইরূপ শোচনীয় অবস্থা আর কোথাও নাই। আমরা যে কেবলমাত্র অল্লায়ুঃ তাহা নহে। যে ২৩টা বৎসর আমরা টিকিয়া থাকি তখনও স্বাস্থ্য, শক্তি, উদ্যম, উৎসাহ প্রভৃতি আমাদের বড় বেশী কিছু থাকে না। রোগের বোঝা বহিয়া, পেট ভরিয়া দুই বেলা পুষ্টিকর আহার না পাইয়া আমরা এমন নির্জীব হইয়া পড়ি, যে আমাদের মরা বাঁচার ব্যবধান-রেখা প্রায়ই খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। শ্রমসাধ্য, শৃঙ্খলাসাপেক্ষ কাজ ভাল করিষা সম্পন্ন করা ত দূরের কথা, সুস্থ দেহে দুই বেলা ভাত হজম করিয়া কায়ক্লেশে জীবনযাত্রার উপযোগী পরিশ্রম করিতেও আমরা অনেকেই কষ্ট বোধ করি। অনেকেরই কাছে জীবন যেন সুদীর্ঘ অভিশাপ, নিরবচ্ছিন্ন বেদনা। উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি মহৎ গুণগুলি আমাদের অল্লায়ুঃ লোক সমষ্টির ক্ষণভঙ্গুর দেহ আশ্রয় করিয়া তাই বাঁচিতেই পারে না। আমাদের একটা অপবাদ—আমরা যৎসামান্য লইয়াই তুষ্ট; "Divine discontent"—সর্ব্ববিধ মহৎকর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহৎজনোচিত অসন্তোষ, মানুষোচিত দুর্দ্দমনীয় উচ্চাভিলাষ আমাদের নাই। উপরোক্ত তালিকা তারস্বরে বলিয়া দিবে, "যাহারা এমন অল্লায়ুঃ যাহাদের জীবনীশক্তি নিস্তেজ, তাহারা মহৎ আকাঙ্ক্ষা, মহৎ প্রয়াসের দুর্ম্মূল্য দিবে কেমন করিয়া?" আমরা যে উদ্ভিদে পরিণত হইতে বসিয়াছি। ক্ষুধা, তৃষ্ণা আর দুই একটা অসহ্য প্রবৃত্তির তাড়না ছাড়া আর কিছু আমাদের স্তিমিত চেতনায় সাড়া আনিতে পারে না।

আমরা অনেকেই হয়ত জানি না যে আমাদের আয়ুঃ গৃহপালিত জীবের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালায় মৃত্যুর হার জন্মের হারের উপরে উঠিয়াছে! তাই আমরা ব্যথিত চিত্তে এই তুলনামূলক তালিকাটি আমাদের প্রিয় দেশবাসিগণের সম্মুখে ধরিলাম। এখন জিজ্ঞাস্য—বাঙ্গালী জাতি তাহার অস্তিত্ব সঙ্কটে বাঁচিবার জন্য চেষ্টা করিবে কি না; বাঁচিবার জন্য যে সকল উপাদানের প্রয়োজন, বাঙ্গালীর উদ্বদ্ধ চিত্ত ও সামর্থ্য তাহার কঠোর সাধ-

নায় কৃতসঙ্কল্প হইবে কি না। মানুষ চেষ্টা করিলে বাঁচিতে পারে, মানুষের সমবেত সাধনা মৃত্যুর পরিখা দূরে সরাইয়া দিতে পারে। ১৮৩৮ হইতে ১৮৯৪ এই ৫৭ বৎসর ইংরেজ গড়ে ৩৯.৯ বৎসর বাঁচিত। এখন তাহার আয়ুর হাত ৪৭.১। সুতরাং আমরা বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি ৫০ বৎসরে ইংরেজের আয়ু গড়ে ৪.২ বাড়িয়াছে। ইহাতে আমরা এক মহামূল্য শিক্ষা লাভ করিতে পারি—আমরাও সমবেত এবং অক্লান্ত চেষ্টার বলে দীর্ঘজীবী হইতে পারিব। 'অকাল মৃত্যু' শীর্ষক আলোচনায় ইতিপূর্ব্বে কতকগুলি কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। দুইবেলা পেটভরা পুষ্টিকর আহারের অভাব, দেশের সাধারণ অস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় জ্ঞানের অভাব, নৈরাশ্য, আনন্দহীনতা, উচ্চ সঙ্কল্পের অভাব, বাল্যবিবাহ, বিশেষতঃ বাল্য মাতৃত্ব এবং সর্ব্বগ্রাসী দরিদ্রতা—এইগুলির প্রতিকার করিতে পারিলে তবে এই নিদারুণ অল্পায়ু সমস্যার প্রতিকার সম্ভব মরণোন্মুখ বাঙ্গালী কি ভারতবাসীর এই মরণ বাঁচন সমস্যার কথা একবার ভাবিয়া দেখিবে না? ইহার প্রতিকারের জন্য কি আমরা এখন সচেষ্ট হইব না?

২। চরিত্রের গাম্ভীর্য্য

আমরা বড়ই হাল্কা হইয়া পড়িতেছি। চরিত্রের গাম্ভীর্য্য, গভীরতা আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভারি বিষয়ের অবতারণা করিলে কথা বেশ জমে না, ভারি কাজে হাত দিলে প্রাণ অস্বস্তি বোধ করে। ভারি চিন্তা মস্তিষ্কের খুলির সুদৃঢ় আবরণ ভেদ করিতেই পারে না। ইহা একটী গভীর দুর্লক্ষণ। ভাসা ভাসা ভাব, দেঁতো কথা, ছেঁদো গল্প, খোস আলাপ, চটুল বোলচাল প্রভৃতিতেই প্রাণ স্ফূর্ত্তি পায়! কিন্তু যখনই কোনও গুরুতর গভীরতর বিষয় ভাবিবার প্রয়োজন হয়, তখন সেটী একেবারে উৎপীড়ক দস্যুর মত আসিয়া হাজির হয়। আমরা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ি। কারণ তাহা আমাদের প্রাণের সুরের সঙ্গে একেবারে সম্পূর্ণ বেসুরো। আমাদের আবহাওয়া মোটেই তাহার উপযোগী নহে। এই দুর্ভাগ্যে কিন্তু আমরা ক্ষুব্ধ বা উৎকণ্ঠিত নহি। বেশ হাসিয়া খেলিয়া বকর বকর করিয়া গণ্ডগোলের মধ্যে দিন কাটাইয়া দিই। যা তা খাইয়া কোনও মতে পেট ভরাইয়া অধিকাংশ বাঙ্গালীরই যেমন পরিপাকশক্তি মরিয়া গিয়াছে, সেইরূপ গভীর ভাব ও আলোচনার সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালী জাতি গভীর বিষয়ে চিন্তা ও আলোচনার শক্তি হারাইয়া ফেলিতেছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের হাল্কামি দেখিয়া যাঁহারা মাঝে মাঝে ক্ষোভ প্রকাশ করেন, তাঁহারা যেন ভাবিয়া দেখেন রোগ কোথায়। ভারি বিষয়ের রচনা আমাদের জাতীয় পাকস্থলী জীর্ণ করিতে রাজি নহে। তাই 'চুটকী' আসিয়া বাজার ছাইয়া ফেলিতেছে। গভীরশ্বাস (deep breathing) স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। গভীর চিন্তা (deep thinking) ও মানুষের বাঁচিয়া থাকার পক্ষে সেইরূপ প্রয়োজনীয়। অবশ্য বাঁচিয়া থাকা অর্থে যদি আমরা বুঝিয়া থাকি, উদর পূরণ এবং বৎসরে বৎসরে বংশবৃদ্ধি, তবে যেরূপ ভাবে আছি তাহাই প্রশস্ত। গুরুত্ব, গাম্ভীর্য্য প্রভৃতির কোনই দরকার নাই। অনেকেই বলিবেন, "কোন দেশেই বা এমন গণ্ডায় গণ্ডায় গভীর

চিন্তামগ্ন লোক দেখিতে পাওয়া যায়?" সেই তুলনাবিৎগণের নিকট সবিনয়ে নিবেদন—"অন্য দেশের সমকক্ষ হইয়া, সব বিষয়ে তাহাদের সঙ্গে পাল্লা দিবার যোগ্যতা দেখাইয়া তাহার পর এই সকল বিষয়ে তুলনা করিলেই শোভন হইবে।"

সমস্ত বিষয়ে এই হাল্‌কা ভাব বড়ই ভীষণরূপে আমাদের গভীর দিকটা অসাড় করিয়া ফেলিতেছে। বহুদিন সাগর হইতে স্রোতের জল না আসিলে নদী মজিয়া যায়; তেমনি উচ্চভাব, গভীর চিন্তার জোয়ার না আসাতেই আমাদের মর্ম্মস্থান শুকাইয়া যাইতেছে। কেবল স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলি আমাদের মনকে জুড়িয়া বসিয়াছে। আমরা চিত্তের অনুশীলন এবং হৃদয়ের প্রসার ভুলিয়া কেবল রূপ-রসাদিরও ভোগের মধ্যে তলাইয়া যাইতেছি, তাহার একটী প্রধান কারণ বিক্ষেপমুক্ত গভীর মনন ও ধারণা প্রভৃতিকে আমরা দূরে তাড়াইয়া দিয়াছি। মন যে সকল ইন্দ্রিয়ের উপরে, সে সকলের রাজা, আর সকলে তাহার ভৃত্যমাত্র—এতত্ব শাস্ত্রের জীর্ণ পাতায় নির্ব্বাসিত। আমরা এখন সেই অনন্ত শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের আধার 'চিত্ত'-রাজাকে ভুলিয়া, তাঁহার চোপদার, ফৌজদার মাত্র যাহারা, সেই ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গেই চুড়ান্ত সম্পর্ক করিয়া বসিয়াছি। চোপদার, ফৌজদারের হাঁকডাক, চেঁচামেচি, দাঙ্গাহাঙ্গামাতেই আমরা মন দিই। কিন্তু আমরা কি এমন করিয়া ঐশ্বর্য্য ও মহিমা ভুলিয়া হৈ চৈ লইয়াই থাকিব? আমাদের কি ইহাই নিয়তি? এখনও আপামরের মুখে শুনিতে পাই, "আমাদেরও নিয়তি ঔদার্য্যে ও গৌরবে সমুজ্জ্বল হইবে।" যদি ইহাই আমাদের বিশ্বাস হয়, তবে আমরা যেন মনে রাখি, যেরূপ সাধনা, সিদ্ধিও ঠিক সেইরূপ হইবে। হাল্কামি কখনও মহত্ত্বের রাজাসনের সাধনা নহে।

৩। কৃষি-বিদ্যালয়

বোম্বাইয়ে ভারতবাসীর তত্ত্বাবধানে চারিটী কৃষি-বিদ্যালয় চলিতেছে। যে প্রথায় এদেশের কৃষকেরা চাষ করিয়া থাকে তাহা অতি পুরাতন। কৃষি-বিজ্ঞানে বর্ত্তমান সময়ে এই যে এত উন্নতি হইয়াছে, ভারতবর্ষের নিরক্ষর নিরন্ন কৃষক তাহার কোন সংবাদ রাখিবার সুযোগ বা সময় পায় নাই। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত, অধিকতর কার্য্যকরী, উন্নত প্রণালীতে কৃষি-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়াই বোম্বাইয়ের কৃষি-বিদ্যালয়গুলির উদ্দেশ্য। সেখানকার কৃষকেরা প্রভূত আগ্রহসহকারে নূতন উপায়গুলি শিখিয়া লইতেছে। নূতন পন্থায় কৃষিকার্য্যের সুত্রপাত হইয়াছে। বোম্বাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত একটি কৃষি কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। যাহাতে গ্রামের মোড়ল মাতব্বরগণ সাধারণ কৃষকদের মধ্যে এইরূপে উন্নত কৃষিবিদ্যা শিখিবার উৎসাহ জাগাইবার জন্য চেষ্টা করে কৃষি-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সেই নিমিত্ত বিশেষভাবে প্রয়াস পাইতেছিল। বড়ই আনন্দের বিষয়, দাক্ষিণাত্যের কোন কোন কর্ম্মকার বিলাতী লাঙ্গল ও অন্যান্য কৃষি যন্ত্রের অনুকরণে যন্ত্রাদি তৈয়ারী করিতে শিখিয়াছে। যাঁহারা অভিনব কৃষিবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতে চান, পুনা প্রদর্শনী তাঁহাদিগকে বিশেষ সুযোগ দিতেছেন। দেশীয় মিস্ত্রির প্রস্তুত নানা প্রকার পাশ্চাত্য প্রণালীর যন্ত্রাদি সেখানে দেখান হয়। এই বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষালাভ

করিয়া ছাত্রগণের কয়জন ভবিষ্য জীবনে কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা এখন বলা যায় না। তবে, যাহারা খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া, সখের জন্য কৃষি বিদ্যা শিখিতে চায় তাহাদিগকে যথাসম্ভব বাদ দেওয়া হয়। যেসকল ছাত্র বাস্তবিকই কৃষিকার্য্যে উৎসাহী, যাহারা ভারতবর্ষের চাষ আবাদের উন্নতির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে তাহাদের জন্যই বোম্বাইয়ের কৃষি-বিদ্যালয়ের স্থাপন।

বোম্বাইএর দৃষ্টান্ত অন্যান্য প্রদেশে স্থানীয় অবস্থার উপযোগী করিয়া চালাইলে বিস্তর কল্যাণ হইবে আশা করা যায়। বড় বড় জমিদার মহাশয়েরা নিজেদের জমিদারীতে কৃষির উন্নতির জন্য দুই চারি জনে মিলিয়া এইরূপ এক একটি কৃষি-বিদ্যালয় প্রদর্শনী ও আদর্শ কৃষিক্ষেত্র খুলিলে অজ্ঞ দরিদ্র কৃষকেরা কৃষির উন্নতি করিবার সুবিধা পায়।

* *
*

৪। ভারতবর্ষে দেশীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা

আমাদের শিল্পোন্নতির একটি প্রধান অন্তরায় উপযোগী মূলধনের অভাব। বিদেশীর নিকট আমাদের অপবাদ আছে আমরা টাকার ব্যবহার জানি না। বহু বৎসর কৃচ্ছ্র-সাধন করিয়া প্রচুর অর্থ জমাইয়া আমরা বিবাহ বা শ্রাদ্ধে তাহা সমস্ত নষ্ট করি, অথবা এইরূপ সামাজিক ব্যাপারে বিস্তর ঋণ করিয়া ফেলি। এই অপবাদের মধ্যে একটু অত্যুক্তি থাকিলেও উহাকে একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে অনেকে শিল্প বাণিজ্যে টাকা খাটাইতে শিখিয়াছিলেন। কিন্তু বারংবার বিফলতা আসিয়া সকলের বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। এখন লোকে টাকা খাটাইতে ভয় পান। এখন সমস্যা, স্বদেশী বণিক বিদেশীর ব্যাঙ্কে ধার পান না আবার মারা যাইবার ভয়ে স্বদেশী ব্যাঙ্কে আমরা টাকা রাখিতেও চাহি না।

যোগ্যতার অভাবে, অর্থের অভাবে ভারত-বর্ষে নানা স্থানে সর্ব্ববিধ স্বদেশী প্রচেষ্টার আশ্রয় ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠে নাই। অথচ এদেশে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা যে অত্যাবশ্যক তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত এস. আর দাবর "সাঁঝ বর্ত্তমান" পত্রিকায় বলিতেছেন, দেশের লোককে শিল্প বাণিজ্যে অর্থ নিয়োগ করিতে শিক্ষা দেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। তজ্জন্য দেশের সর্ব্বত্র ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে হইবে। তিনি লিখিতে-ছেন, ইয়োরোপীয়েরা এদেশে যৌথ ব্যাঙ্ক খুলিয়া দেশের কথঞ্চিৎ উপকার করিয়াছেন বটে; কিন্তু এই ব্যাঙ্ক দেশের পক্ষে সর্ব্ব-প্রকারে কল্যাণকর নহে। তাই ভারত-বাসীর জন্য ভারতবাসী পরিচালিত ব্যাঙ্ক এখন না খুলিলে কোনও মতেই চলিবে না। আমাদের দেশের প্রায় সকল ব্যাঙ্কই ইয়ো-রোপীয়দিগের হাতে। সামান্য সুদে ভারত-বাসীর লক্ষ লক্ষ টাকা ঐ সকল ব্যাঙ্কে খাটিতেছে বটে, কিন্তু তাহা ভারতীয় শিল্পের উন্নতির জন্য নিয়োজিত হইতেছে না। ইংরাজের ব্যাঙ্কে ইংরাজ ব্যবসাদারেরাই প্রধানতঃ টাকা ধার পাইয়া থাকে, দেশী লোকের সেখানে ধার মিলে না।

আমাদের আর একটি অসুবিধা ব্যাঙ্ক চালাইবার উপযোগী শিক্ষা পাইবার ক্ষেত্র আমাদের নাই। ইংরাজের ব্যাঙ্কে এদেশের লোকেরা কেবল কেরাণীগিরিই করিয়া

থাকে। কোনরূপ গুরুদায়িত্বভারসমন্বিত উচ্চপদে তাহাদের কখন লওয়া হয় না। স্নতরাং তাহাদের ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত জ্ঞান কেবল মাত্র হিসাব রাখার মাছিমারা নকল করার মধ্যেই পর্য্যবসিত। বাস্তবিক স্বদেশী ব্যাঙ্ক খুলিতে পারিলে দেশের একটা কতবড় অভাব দূর হইবে! ব্যাঙ্কের কাজ চালাইবার উপযোগী সুদক্ষ কর্ম্মপটু লোক সেখানে হাতে কলমে শিক্ষা পাইয়া গড়িয়া উঠিবে। নচেৎ জলে না নামিয়া ডাঙ্গায় সাঁতার শেখা কি সম্ভব? আর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা হইলে, যে সকল পরিশ্রমপটু বাণিজ্যোৎসাহীর আশা কল্পনা হৃদয়ে উঠিয়া হৃদয়েই লয় পায় তাঁহারাও প্রভূত সুবিধা পাইবেন। এইরূপে একদল বিশেষজ্ঞ entrepreneur শিল্প বাণিজ্যে ধুরন্ধর পাওয়া যাইবে। তখন আর ভারতবর্ষীয় ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্যাদি পরিচালকের বিশেষ অভাব হইবে না।

ইংরজের ব্যাঙ্কগুলি ভারতীয় সমাজ বা ভারতীয় বণিক সম্প্রদায়ের সহিত কোন সংশ্রব রাখে না। যতদিন না ভারতবাসী ব্যাঙ্ক খুলিতে এবং চালাইতে শিখেন ততদিন ভারতবর্ষের বণিকসমাজ কোনরূপ সাহায্য পাইবার আশা করিতে পারেন না একথা বলা নিষ্প্রয়োজন। দেশের অভাব অভিযোগ দেশীয় শিল্পের সুবিধা ও অসুবিধা একমাত্র দেশীয় ব্যাঙ্কপরিচালকগণই বুঝিতে সমর্থ।" আর দেশী ব্যাঙ্কের লাভও দেশেই থাকিবে।

কিছুদিন পূর্ব্বে যখন পঞ্জাবের একটী ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইয়া যায়, যখন যাঁহারা দেশী ব্যাঙ্কে টাকা জমাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আতঙ্কে গচ্ছিত টাকা হুড়মুড় করিয়া তুলিয়া লন। এইরূপে একের দোষে বা ভাগ্য বিপর্য্যয়ে অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলিকে কাজ বন্ধ করিয়া দিতে হয়। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার অষ্টাদশ ও উনবিংশশতাব্দীর ধনবিজ্ঞানের ইতিহাস যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন কত বৈফল্য, নৈরাশ্য ও দুর্গতি অতিক্রম করিয়া ইংরাজ এবং আমেরিকান শিল্পী ও ব্যবসায়িগণ সকলতার মুখ দেখিয়াছেন। তাঁহাদের তুলনায় আমাদের পথে বাধা বিঘ্ন অনেক বেশী। সুতরাং আমাদের প্রথম প্রয়াস অকৃতকার্য্য হইয়াছে বলিয়া পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। আর স্বদেশবাসিগণের মধ্যে যাঁহাদের উপহাস আমাদের অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে, তাঁহারা একবার সাফল্যের গর্ব্বদৃপ্ত ইংরাজ ও আমেরিকানগণের ধনবিজ্ঞানের ইতিহাস একটু খুঁটাইয়া পড়িবেন! তাহা হইলে আমরাও অযথা নিন্দা, বিদ্রূপ ও উপদেশের হাত হইতে রক্ষা পাইব। তবে অন্যে বিফল হইয়াছে বলিয়া আমরাও বিফলতায় উচ্চবাচ্য করিব না তাহা নয়। আমরা দমিব না। বৈফল্যের শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করিয়া লোকসানের আটঘাট বাঁধিয়া চরিত্রবল, পরিশ্রম ও অভিজ্ঞতার পাথেয় লইয়া নিরন্নজাতিকে বাঁচাইবার দুর্গম পথে যাত্রা করিব।

* *
*

৫। দেশীয় রাজ্যে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা—

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তঃপাতী ঔন্ধ নামক ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই ছিল। দরিদ্র ছাত্রদিগের বৃত্তি ও খাদ্য দান করিয়া সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের নিমিত্ত ঔন্ধরাজ ইতিপূর্ব্বেই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

মানুষ সকল সময়ের সুবিধা পাইলেই সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে না। ইয়োরোপ, আমেরিকা, জাপান, ফিলিপাইন দ্বীপ প্রভৃতিতে সেইজন্য আইন করিয়া সকলকে লেখাপড়া শিখিবার জন্য বাধ্য করা হইয়াছে। ঔন্ধরাজও তাই সম্প্রতি তাঁহার রাজ্যে বাধ্যতামূলক আইন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। বৃত্তিদান, বিনা পয়সায় আহারের বন্দোবস্ত এবং তাহার উপর আইনের বাধ্যতা, এবার নিশ্চয়ই ঔন্ধরাজ্যে দরিদ্র অজ্ঞ প্রজাদিগের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের প্রভূত সহায়তা করিবে।

শিশুরা সহজে লেখা পড়া শিখিতে চায় না। বিশেষতঃ যাহাদের বাপ দাদা কখনও লেখা পড়া শিখে নাই এবং যাহাদের শিক্ষা চাকুরীর উপযোগী হইবে না, তাহারা শিক্ষার প্রতি স্বভাবতঃই ঔদাসীন্য প্রকাশ করে। লেখা পড়া যে জীবনের সর্ব্ব-বিধ কার্য্যে ও আচারে কতখানি মঙ্গল প্রভাব বিস্তার করে অজ্ঞান লোকেরা তাহা বুঝিতে পারে না। যে জিনিসের স্বাদ তাহারা পূর্ব্বে কখনও পায় নাই, যাহা অনতিবিলম্বে টাকা আনা পাইএ রূপান্তরিত হয় না,—তাহার জন্য তাহারা বড় একটা আগ্রহ প্রকাশ করে না। গোখলে মহাশয় যখন বৃটীশ-শাসিত ভারতে বাধ্যতা-মূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার আইনের প্রস্তাব করেন তখন "Advancement of Learning" "শিক্ষার উন্নতি" ছাপ বুকে লইয়া কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ও সে প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতে ইতস্ততঃ করে নাই। বাধ্য করিলে যে কিরূপ ফল পাওয়া যায়, তাহা মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান স্যার বিশ্বেশ্বরাজ্যা মহোদয় 'দশরা প্রতিনিধি সভার' সমক্ষে বিবৃত করিয়াছেন,—"বাধ্যতা-মূলক শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে সকল স্থান নির্ব্বাচিত হইয়াছিল সেখানে ধীরে ধীরে কার্য্যারম্ভ করা হইয়াছে। আইন অনুসারে তথায় ১৬০০০ বালক বালিকার শিক্ষালাভের বয়স হইয়াছে। ১০৮০০ বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ে আসিয়া থাকে। আরও ১১০০ শিশু যাহাতে শিক্ষালাভ করিতে পারে তাহার জন্য বিশেষ সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে। দ্বাদশটী নূতন স্থানে বাধ্যতামূলক আইনের প্রসার করা হইবে—ইতিমধ্যেই স্থির করা হইয়াছে।" সুতরাং দেখা যাইতেছে শিক্ষা অবৈতনিক করিয়া দিলে এবং লেখা পড়া শিখিবার জন্য বাধ্য করিলে শতকরা অন্ততঃ ৬০ জন শিশু এই ব্যবস্থার প্রারম্ভ সময়েই লেখাপড়া শিখিয়া থাকে।

গোখলে মহাশয়ের পাণ্ডুলিপি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর আর কেহই বড়লাটের কাউন্সিলে সেই বিষয় লইয়া আর কোনরূপ উচ্চবাচ্য করেন নাই। এখন দেশীয় রাজ্য সমূহের বিবরণ পাঠ করিয়া এই প্রস্তাবের সুফল বুঝিতে পারা যায়। আমাদের দেশের জমিদারগণ তাঁহাদের জমিদারীতে বাধ্য করিতে না পারুন, অন্ততঃ যে সকল স্থানে দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর প্রজাগণের লেখাপড়া শিখিবার কোনরূপ সুবিধাই নাই সেখানে অবৈতনিক প্রাথমিক পাঠশালা স্থাপন করিয়া শিক্ষা অনেক পরিমাণে বিস্তৃত ও সুপ্রাপ্য করিয়া দিতে পারেন। আশা করা যায় ঔন্ধ প্রভৃতি ছোট ছোট দেশীয় রাজ্যের দৃষ্টান্ত আমাদের ভূস্বামীগণের মনে অনুরূপ সঙ্কল্প জাগাইবে। দেশীয় রাজ্যের পারিপার্শ্বিকের এই সাধু প্রভাবে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকেও এই অশেষ কল্যাণকর বিধানটি প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।

* *
*

৬। পরলোকগত ভারতবন্ধু কটন

মানুষের স্বভাব মহৎ কাজের জন্য সে আকর্ষণ অনুভব করে। যিনি বড় কাজের প্রতি যে পরিমাণে আকৃষ্ট, তাঁহার 'মানুষ' বলিয়া পরিচয় দিবার দাবীও তদনুরূপ। মানুষ শব্দটাই আভিজাত্য বাচক। "মানুষের মত মানুষ" প্রভৃতি পুরাতন সুপরিচিত শব্দ গুলি হইতে বুঝা যায় 'মানুষ' কতবড়, মানুষের আপনার ভিতরে কতবড় জিনিষ অবস্থিত রহিয়াছে। মানুষ ফুটবলের ব্লাডার নয়, যে, সে নিজে শুধুই ফাঁকা আবরণ, বাহিরের হাওয়া আসিয়া তাহাকে ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া কাজের উপযোগী করিয়া লইবে। তাই আমরা সবিস্ময়ে দেখি মহা বিরোধী অবস্থার মধ্য হইতে সময়ে সময়ে শক্তিমান্ কর্ম্মকুশল লোক বাধা প্রতিকূলতা ঠেলিয়া ফেলিয়া নিজের মনুষ্যত্বের স্পর্দ্ধায় মাথা তুলিয়া উঠেন। পরলোকগত ভারতবন্ধু কটন মহোদয় একজন এই শ্রেণীর মানুষ। তাঁহার হৃদয় "সিভিল সার্ভিসে"র সুদৃঢ় বাঁধ ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালার বিস্তৃত প্রান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। দুর্ব্বল অধীন জাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেমের নির্ম্মল স্রোত তাই বহু হৃদয় স্নিগ্ধ করিয়াছিল। কুলীদের চোখের জল অনর্থক তাহাদের বুকে শুষিয়া যায় নাই। কটন নিজের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া শক্তি ও তেজের সহিত কুলী আইনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি কর্ম্মত্যাগের সময় সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন "আমি চিরদিনই প্রবলের অত্যাচার হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। নিন্দা ও ক্ষতি আমাকে লইতে পারে নাই। সর্ব্বসাক্ষী কালের দরবারে আমার কাজের বিচার হইবে।" বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের সময় তিনি ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর ব্যথা তিনি বুঝিতেন, বাঙ্গালীর যোগ্যতা তাঁহার অবিদিত ছিল না। আসামের শাসনকর্ত্তৃত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বদেশে অবস্থান কালে পার্লামেণ্টের সদস্যরূপে তিনি আগ্রহ, যুক্তিমত্তা ও সাহসের সহিত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। দমননীতির বিরুদ্ধে তাঁহার প্রতিবাদ আজও যেন প্রতিধ্বনির মত কাণে ঠেকে। "মিণ্টোমর্লি" সংস্কার ভারতবর্ষের দাবার কাছে কতটুকু তাহা নির্ভীক কটন মর্লী সাহেবকে অকাট্য যুক্তির দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। কংগ্রেসের সভাপতিরূপে তিনি যখন শেষবার ভারতবর্ষে আসেন তখন তিনি ষোল আনা দেশের লোকের। গভর্ণমেণ্টের চাপরাস খুলিয়া তিনি যেন যথার্থই ভারতবর্ষের উত্তরীয় পরিহিত মানস সন্তান। তাঁহার যৌবনের "New India" "নবভারত" উদীয়মান্ ভারতবর্ষের শক্তি, আশা ও ঐক্যের যে চিত্র প্রকটিত করিয়াছিল, আজ আর তাহা অস্পষ্ট নহে। বার্দ্ধক্য রোগ, প্রভৃতিতে যখন তিনি দুর্ব্বল তখনও তাহার লেখনী ভারতবর্ষের অভাগা কয়েদী ও লাঞ্ছিত চুক্তিবদ্ধ সন্তানদের জন্য অক্লান্তভাবে আপনার কাজ করিয়াছে। আজ তিনি নাই। ভারতবর্ষের শোকাশ্রু তাঁহার স্মৃতিপীঠের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য।

৭। সত্যোপলব্ধি

সত্য চোখ বুজিয়া মানিয়া লইবার জিনিষ নয়। ইহার উপলব্ধি আবশ্যক। সত্য তখনই সত্য, যখন মানুষ তাহাকে হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করে। যাহা সত্য বলিয়া চলিয়া

আসিতেছে, বহুকাল ধরিয়া যাহা স্বীকৃত ও আচরিত, তাহা আমাদের কাছে জীবন্ত সত্য নয়, যদি আমাদের নিজেদের বোধ শক্তির সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ না থাকে। মানুষ পুরাতনের চিরাচরিতের দোহাই দিয়া কত মিথ্যাই না বহিয়া মরিতেছে! এইরূপেই তাহার বিচারশক্তি নির্জ্জীব, প্রতিভানিস্তেজ এবং কল্পনা ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। রঙ্গিণ, অসমতল কাচে কোনও পদার্থের প্রকৃত স্বরূপ বুঝা অসম্ভব হইয়া পড়ে। মানুষের মনও তেমনি সমাবস্থ এবং বিক্ষেপ ও আবরণ মুক্ত না হইলে সে সত্যের সাক্ষাৎ পাইবে কেমন করিয়া? বার বার মিথ্যা তাহাকে ছলনা করিবে। মানুষ অবস্তুতে বস্তু আরোপ করিয়া ভ্রমবশে রজ্জুকে সর্প বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবে, মেঘের আবরণের পশ্চাতে সূর্য্যকে না দেখিয়া শুধু মেঘ দেখিয়াই ক্ষান্ত হইবে। তাহার জ্ঞান ও বিশ্বাস সত্যের আলোকে সমুজ্জ্বল, অথবা সত্যের শক্তিতে বলিষ্ঠ হইবে না। অতীতের প্রাণহীন কঙ্কালের বোঝা বহিয়াই সে দিন কাটাইবে। মানুষ যখন সত্যের আভাস পায় তখন তাহার কাছে বিশ্বপৃথিবী নূতন হইয়া উঠে, কোথা হইতে সে শক্তিলাভ করে। মানুষের চেতনা তখনই জাগিয়া উঠে, তখনই তাহার জীবন প্রকৃত মনুষ্যত্বের ও চরিতার্থতার পথের সন্ধান পায়, যখন সে সত্যের মূর্ত্তি দেখিয়াছে, সত্যের সঙ্গে তাহার অন্তরাত্মার যেদিন আত্মীয়তা স্থাপিত হইয়াছে। মানুষের জীবন ব্যর্থ যখন সে সত্যচ্যুত। "নাস্তি সত্যসমং তপঃ" সত্যের সমান তপস্যা আর নাই মায়া, মোহ প্রপঞ্চাদির লীলাভূমি সম্ভোগলিপ্সার উৎসবক্ষেত্র পৃথিবীতে মানবের ক্ষণভঙ্গুর জীবন সার্থক হইবে কেমন করিয়া? সত্যোপলব্ধির দুরূহ এবং ঐকান্তিক তপস্যাই তাহার সম্বল। সংযম, ত্যাগ, শক্তিলাভ ও সিদ্ধি তাঁহারই পক্ষে সম্ভব, যিনি সঙ্কল্পারূঢ় হইয়াছেন—মিথ্যার মোহে ভুলিয়া হীন স্বার্থ ও সম্ভোগে মজিবনা, সত্যাশ্রিত, সত্যান্বিত হইয়া মহাসত্যের যজ্ঞে জীবনের পুরুষোচিত অক্লান্ত কর্ম্মরাশি এবং নির্ম্মল উদার জ্ঞান আজীবন উৎসর্গ করিব। মানুষ যদি সমস্ত প্রাণ দিয়া সত্যোপলব্ধি করে তবেই তাহার জীবন সার্থক হইবে। জরাজীর্ণ সংস্কারকে অবলম্বন না করিয়া সে নূতন শক্তির অনন্ত উৎসের সন্ধান পাইবে। তখন আর তাহার পরাজয় নাই। জয়ের পথে হার থাকিবে কেমন করিয়া? সত্যোপলব্ধি তাই জীবনের সর্ব্ববিধ সাধনায় জয়লাভের একমাত্র পাথেয় "সত্যমেব জয়তে নানৃতং।"

৮। পরলোকগত ফেরোজসাহ মেটা

বাঙ্গালীর সহিত ফেরোজ শা মেটার অনেক বিষয়েই মিল হয় নাই। গত কয়েক বৎসর ভাঙ্গা কংগ্রেস লইয়া বাঙ্গালী মেটা মহোদয়কে বড় ভাল নজরে দেখে নাই। আজ তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালার চিত্ত ব্যথিত হইয়াছে। মরণের আঘাত অন্য সব ভুলাইয়া তাঁহার গুণগুলি বাঙ্গালার কাছে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। পার্শীরা বহুশতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের আতিথ্যে, ভারতের অন্ন জলে পুষ্ট হইয়াছেন। ভারতবর্ষ তাঁহাদেরও জননী। সন্তানের মত দেহের শক্তি ও মনের ভক্তি মাতৃভূমির চরণে ঢালিয়া দিয়া মাতৃসেবাকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিতে

হইবে—এই আদর্শ, মহাপ্রাণ দাদাভাই নারৌজী মহাশয়ের প্রায় সপ্ততিবর্ষব্যাপী অকুণ্ঠ স্বদেশসেবা উজ্জ্বল ভাবে ভারতবাসীর সম্মুখে ধরিয়াছে। এই বৃদ্ধ পার্শীর অনুবর্ত্তিগণের মধ্যে পরলোকগত মেটা মহোদয় একজন। বোম্বাই মিউনিসিপালিটীর সভাপতিরূপে তিনি অনেক ভাল কাজ করিয়াছেন। কংগ্রেসে অন্য সকলে তাঁহার মতই মানিয়া চলিতেন। লাট কাউন্সিলে তাঁহার তেজস্বিতা, স্পষ্টবাদিতা ও যুক্তিনৈপুণ্য শত্রুমিত্র সকলকেই বিস্মিত করিয়াছিল। মেটা নিজে যাহা বুঝিতেন তাহা সবলে ধরিয়া থাকিতেন। তাঁহার অর্দ্ধশতাব্দীর পূর্ব্বের ধারণাগুলি তাই সর্ব্বত্র নূতন ভাব ও নূতন অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে নাই। মেটার বিশেষত্ব—তাঁহার প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব (individuality)। তিনি যেখানে, সেখানে তিনিই প্রধান, তাঁহার মতের বিরুদ্ধে তাঁহার দলের লোকেরা বড় একটা কথা বলিতে পারিতেন না। এমন অদম্য প্রকৃতি প্রকৃতই একটা মস্ত জিনিষ। মেটা মচকাইবার পাত্র ছিলেন না, একথা তাঁহার মহাবিরোধীকেও স্বীকার করিতে হইবে। একবার টগবগ্ করিয়া ফুটিয়া উঠিব কিছু পরে ঠাণ্ডা হইয়া পড়িব,—এইরূপ দুর্ব্বলচিত্ততার অপবাদ এই বলশালী পুরুষকে স্পর্শ করে নাই। তিনি যেন পাথরে গড়া, কোথাও কাদা নাই। বঙ্গদেশে ফেরোজ শা মেটা মহাশয় সম্বন্ধে বহু বিতণ্ডা কোলাহল হইয়া গিয়াছে। সেই পরলোকগত পুরুষ প্রবরের চরিত্রের অসামান্য দৃঢ়তা, অটল সঙ্কল্প ও নির্ভীক কর্ত্তব্যনিষ্ঠা বাঙ্গালী যদি আয়ত্ত করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার চরিত্র বহু অপবাদ হইতে মুক্ত হইবে। বাঙ্গালীর বহু সদ্গুণের সহিত এইরূপ অদম্য দৃঢ়তার সংযোগ হইলে, তাহার প্রভূত কল্যাণ হইবে।

৯। ৺কাশীধামে শুভানুষ্ঠান

গত মাঘীপূর্ণিমায় ৺কাশীধামে "বেদোদ্বোধিনী" নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমিতির উদ্দেশ্য বৈদিক ধর্ম্মমূলক চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ রক্ষা। এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সমিতির পণ্ডিত মণ্ডলীর উদ্‌যোগে "বেদোদ্বোধিনী" নামে একটি বৈদিক পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। বঙ্গীয় বিদ্যার্থিগণ যাহাতে স্বর ও অর্থের সহিত ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিতে পারেন, এবং বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড হাতে কলমে যথাবিধি শিক্ষা করিতে পারেন তাহার উত্তম ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সমগ্র বঙ্গদেশে যাহাতে বৈদিক ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন হয় তজ্জন্য সমিতি প্রতিষ্ঠিত বৈদিক ধর্ম্ম ও বেদগ্রন্থ প্রচার বিভাগের বেদ প্রকাশ কার্য্যালয় হইতে সম্প্রতি "ঋগ্বেদ সংহিতা" বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ-সস্বর-পদপাঠ-পদান্বয় ও সরল বঙ্গানুবাদ সহ আচার্য্যপ্রবর সায়নকৃতভাষ্য এবং শাকপূনি, যাস্ক প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিদিগের নিরুক্ত সম্মত "বেদোদ্বোধিনী টীকার সহিত খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। ঋগ্বেদভাষ্যের উপোদ্‌ঘাত প্রকরণের প্রথমখণ্ড বঙ্গানুবাদ সহ বাহির হইয়াছে এইরূপ শুভানুষ্ঠান সন্দর্শনে বাস্তবিকই আমরা পরমপ্রীতি লাভ করিয়াছি। কয়েকটী গরীব মনস্বী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দ্বারাই এই সমস্ত কার্য্য পরিচালিত হইতেছে, এবং এই সমিতির সভাপতি বৈদিক পণ্ডিতকুলপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্যশাস্ত্রী মহাশয় হইয়াছেন। ইহার স্থায়িত্ব কল্পে বর্ণাশ্রমধর্ম্মা-

বলম্বিমাত্রেরই সাহায্য করা উচিত। বৈদিক ধর্ম্মের যথাবিধি অনুষ্ঠান ব্যতীত সনাতন চাতুর্ব্বর্ণ্য আর্য্য সমাজের সুশৃঙ্খলা সংরক্ষিত হইতে পারে না। বেদ এবং বৈদিক ধর্ম্মই আমাদিগের একমাত্র পরমাশ্রয়। সেই বেদ এবং বৈদিক ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়াই ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হন। আশা করি বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণসন্তানগণ কাশীতে উক্ত সমিতির তত্বাবধানে থাকিয়া বেদাধ্যয়ন এবং বৈদিক ধর্ম্মকর্ম্ম বিধি ব্যবস্থা শিক্ষা করিয়া দেশের ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন।

যাহাতে অধিকারানুসারে সহজে বেদার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন এবং বেদগ্রন্থ পাইতে পাবেন তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মুদ্রন সাহায্য ৷৷০ আট আনা মাত্র। যাঁহারা অগ্রিম ৫৲ পাঁচ টাকা মুদ্রন সাহায্য করিবেন তাঁহারা একবৎসরে বারখণ্ড ঋগ্বেদ-সংহিতা বিনা ডাকমাশুলে গৃহে বসিয়াই প্রাপ্ত হইবেন। উক্ত গ্রন্থ পাইবার ঠিকানা—

শ্রীবিশ্বেশ্বর বিদ্যারত্ন
কাশীধাম বেদোদ্বোধিনী সমিতি
১১২নং হাউজকটরা, পাথর গলি,
বেনারস সিটি।

আমরা যতদূর জানি, তাহাতে বলিতে পারি সায়ণভাষ্য এবং অনুবাদসহ বঙ্গাক্ষরে ঋগ্বেদ-সংহিতা এই প্রথম প্রকাশিত হইতেছে। আমরা একখণ্ড গ্রন্থ পাইয়াছি। দেখিলাম, বাঙ্গলা অনুবাদ খুব প্রাঞ্জল এবং মুদ্রণকার্য্যও বেশ সুন্দর হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থের এরূপ ভাবে প্রচার বাস্তবিকই বড় আশাপ্রদ।

* *
*

১০। সাহিত্যে সংরক্ষণ-নীতি

"মাতৃভাষার সাহায্যে সকল বিষয়েই এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতেও শিক্ষাদান করিতে হইবে। এজন্য ভারতের প্রাদেশিক সাহিত্যগুলিকে অল্পকালের মধ্যে পুষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে কতিপয় যোগ্য লেখক, অধ্যাপক, অনুবাদককে সাহিত্য সেবায় অনন্যকর্ম্মা হইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। এই সাহিত্যসেবিগণের অন্নচিন্তা দূর করিবার জন্য সাহিত্যক্ষেত্রে "সংরক্ষণ-নীতি" প্রতিষ্ঠা দ্বারা তাঁহাদিগকে উপযুক্ত মাসিক অর্থসাহায্য করিতে হইবে।" ইহাই সংরক্ষণ-নীতির মূলমন্ত্র। ইংরাজী সাহিত্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভাল ভাল বই অনতিবিলম্বে অনূদিত হইয়া ইংরাজী পাঠকের জ্ঞান, ভাব ও চিন্তার ক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া দেয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাল ভাল পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা যদি ইংরাজী প্রভৃতি বৈদেশিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহের অনুবাদে উদাসীন থাকি, আমাদের চিত্তের প্রসার হইবে না। গৃহস্থে অধ্যাপক বিনয়কুমার নিগ্রো-জাতির কর্ম্মবীরের অনুবাদ প্রকাশ করিয়া একজন বিশ্ববরেণ্য কর্ম্মীর জীবনী আমাদের দেশবাসিগণের সম্মুখে ধরিয়াছেন। সুখের বিষয় শিক্ষিত সমাজে সংরক্ষণ নীতির কাজ আরম্ভ হইয়াছে। "জাতীয় শিক্ষা পরিষদের" সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সিংহ এম, এ, বি, এল মহাশয় "Plutarch's Lives" অনুবাদে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহার 'সিজার' প্রকাশিত হইয়াছে এবং 'আলেকজাণ্ডার' শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। প্লুটার্কের জীবনী ইউরোপীয় সাহিত্যের অমূল্যরত্ন। অধ্যাপক সিংহ মহাশয়ের অনুবাদ প্রায়

সর্ব্বত্রই মূলের অনুযায়ী হইয়াছে। পুস্তকের ভাষাও মূলের উপযোগী। অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার গ্রন্থের মূল্য সুলভ করিয়া আমাদের দরিদ্র দেশের পক্ষে সদ্বিবেচনার কাজ করিয়াছেন। আমরা দেশের কৃতবিদ্য সন্তানগণকে সংরক্ষণ-নীতি অনুসারে কাজ করিতে সাগ্রহে আহ্বান করিতেছি।

* *
*

১১। পরলোকগত নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর

গৃহস্থে ধারাবাহিকরূপে পৃথিবীর উপেক্ষিত ও লাঞ্ছিত নিগ্রোজাতির একজন অসাধারণ কর্ম্মীর কর্ম্মময় জীবনকথা প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি নিজে বলিয়াছিলেন "আমি কেনা গোলাম—জাতিতে নিগ্রো। নিতান্ত ছেলে বেলার কথার মধ্যে গোলামাবাদের কাজকর্ম্ম ও চালচলন গুলি মনে পড়ে। আর স্মরণ হয় সেই আবাদের গোলাম মহল্লার কুঠুরিগুলি—যেখানে আমার স্বজাতিরা তাহাদের দাসজীবন কাটাইত। নিতান্ত ঘৃণ্য, অবনত, দারিদ্র্য দুঃখময়, নৈরাশ্যপূর্ণ অবস্থার মধ্যেই আমার বাল্যজীবন কাটিয়াছে। পরে যুক্তরাজ্যের গৃহবিবাদের ফলে দাসজাতির স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। তখন হইতে আমরা স্বাধীন হইয়া গোলামখানা পরিত্যাগ করিয়াছি। আমার বাল্যজীবনে এবং অন্যান্য হাজার হাজার গোলামের বাল্যজীবনে কোনও প্রভেদই ছিল না। ছেলেবেলায় আমরা কোনও দিন বিছানায় শুইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আমরা তিন ভাই বোন মাটিতে পড়িয়া থাকিতাম। কতকগুলি ছেঁড়া, ময়লা ন্যাকড়ার বস্তার উপরে রাত্রি কাটাইতাম। আমাকে আবাদের অনেক কাজই করিতে হইত। আমি উঠান ঝাড়িতাম এবং কৃষিক্ষেত্রের চাষীদের কাজের জন্য জল যোগাইতাম। অধিকন্তু কলে পিষিবার জন্য সপ্তাহে একবার করিয়া শস্যাদি বহিয়া লইয়া যাইবার ভার আমার উপর ছিল। এই কার্য্য বড়ই কষ্টদায়ক হইত। আবাদ হইতে কল তিন মাইল দূরে। ঐ রাস্তায় যাওয়া আসা আমার পক্ষে বিষম উৎপাত বলিয়া বোধ হইত। বিশেষতঃ বেশী রাত্রে ঘরে ফিরিলে আবার জুতা, লাথি, গালি, খাওয়ারও সুব্যবস্থা ছিল। গোলামী করিতে করিতে আমি কখনও শিক্ষালাভের জন্য বিদ্যালয়ে যাই নাই। গোলামাবাদে আমার স্বজাতিরা সকলে নিরক্ষর ছিল। তথাপি দেখিতাম প্রায় সকলেই দেশের কথা বেশ জানিত ও বুঝিত। মায়ে ভায়ে সকলে এক সঙ্গে বসিয়া কখনও আমি আহার করিয়াছি এরূপ মনে হয় না। গরু ছাগল ইত্যাদি যেরূপ চরিয়া বেড়ায় এবং যেখানে যাহা পায় তাহাই খায় আমাদেরও ভোজন ব্যাপার সেইরূপ ছিল। কোন সময়ে কাজ করিতে করিতে হয়ত একটুক্‌রা মাংস খাইলাম। কখনও বা দুই একটা পোড়ান আলু হাঁটিতে হাঁটিতে চিবাইতে হইত। আমি জীবনে সর্ব্ব প্রথম যে জুতা পরি তাহা কাঠের তৈয়ারী। তাহা পরিতে পায়ের তলায় বড়ই লাগিত। কাঠের জুতা তবুও ভাল কিন্তু গোলামির আমলে আমাদিগকে যে জামা পরিতে হইত তাহা অতি ভয়ঙ্কর। বোধ হয় দাঁত টানিয়া তুলিতে যে কষ্ট হয় এই জামা পরিতে তাহা অপেক্ষা কম কষ্ট হইত না। * * * * নিগ্রোরা কখনও অবিশ্বাসী ও বিশ্বাসঘাতক হয় নাই। তাহারা ধর্ম্মভীরু, কৃতজ্ঞ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ। তাহারা কথার দাম বুঝে, কোন প্রতিজ্ঞা

করিলে তাহা ধর্ম্মবৎ পালন করে। * * * আমি গোলামি প্রথার পক্ষপাতী নহি—দাসত্ব প্রথা ভাল একথা আমি বলিতে চাহি না—সংসারে গোলামিগিরির আবশ্যকতাও আমি স্বীকার করিতে পারিব না। আমি জানি—আমার প্রভুরা ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আমাদিগকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেন নাই। আমি জানি যে তাঁহারা স্বার্থসিদ্ধির জন্যই আমাদিগকে গোলাম করিয়া রাখিয়াছেন। আমি জানি—আমরা যে কোন দিন মানুষ হইয়া উঠিব তাহা ইঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই—এবং মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য সজ্ঞানে কোন চেষ্টাও করেন নাই। আমি কেবল এইমাত্র বলিতে চাহি যে ভগবানের কর্ম্মকৌশল বিচিত্র। জগদীশ্বর যাহা করেন সবই মঙ্গলের জন্য। প্রথম দৃষ্টিতে যাহা তিক্ত ও কঠোর, পরিণামে তাহা মধুময় ফল প্রসব করে। আমাদের অজ্ঞাতসারে এই উপায়ে জগতের মহৎকর্ম্মগুলি নিষ্পন্ন হইয়া যায়। ভগবানের অপার করুণায় বিশ্বে কত অসম্ভব সম্ভব হইতেছে। মানুষ, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বিধাতার মঙ্গল হস্তে যন্ত্রের ন্যায় চালিত হইয়া তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছে। এই আশাতত্ত্ব প্রচার করিবার নিমিত্ত এত কথা বলিলাম। আজকাল লোকেরা আমায় জিজ্ঞাসা করে—'তুমি এই ঘোরতর দৈন্য, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার রাশির মধ্যে থাকিয়াও নিগ্রোজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিরূপে এত আশান্বিত ?' আমার একমাত্র উত্তর এই যে আমি ভগবানের মঙ্গলবিধানে বিশ্বাসবান্। যাঁহার করুণায় নানা দুর্দ্দৈবের ভিতর দিয়া আমরা এত দূর উঠিয়াছি তাঁহারই করুণায় আমরা আরও উন্নত হইব। নিগ্রোজাতি জগতের বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার স্বকীয় কৃতিত্ব দেখাইয়া জগদীশ্বরের অসীম ক্ষমতার পরিচয় দিবে।"

গোলাম কর্ম্মবীরের বাল্যজীবনের কথা তাঁহারই ভাষায় উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। যে প্রচণ্ড এবং অপরাজেয় বিশ্বাস তাঁহার জীবনের অগণিত কর্ম্মরাশি সাফল্যে ও সার্থকতায় দীপ্ত করিয়াছে তাহারও আভাষ দেওয়া হইল। তাঁহার জীবনপথের পাথেয় ছিল স্বাবলম্বন, পরিশ্রম ও একনিষ্ঠা—আর তাঁহার হৃদয়ে ছিল ভগবানে অনন্ত বিশ্বাস। নিগ্রোজাতির মনুষ্যত্ব, চরিত্র ও যোগ্যতা, শিক্ষা এবং কর্ম্মের দ্বারা উদ্বুদ্ধ করিয়া ভগবানের বিপুল কর্ম্মযজ্ঞে নিগ্রোর আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—ইহাই তাঁহার অসংখ্য কর্ম্মের মূলমন্ত্র। "টাস্‌কেজি" বিদ্যালয় আজ গোলাম নিগ্রোর আশা ও শক্তির তীর্থক্ষেত্র। বুকার ওয়াশিংটন নিগ্রোকে সর্ব্বপ্রকারে মানুষ করিয়া গড়িবার জন্য অক্ষুণ্ণ আত্মবশতার সুদৃঢ় পাষাণ ভিত্তির উপর এই পুণ্য প্রতিষ্ঠান গড়িয়াছেন। নিগ্রো মানুষ হইয়া উঠুক, তাহার চরিত্রে মানুষোচিত গুণগুলি ফুটিয়া উঠুক, তারপর বিশ্বে তাহার স্থান সেইই করিয়া লইবে। তাঁহার এই বিশ্বাস ভগবদিচ্ছার প্রতিধ্বনি বলিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার স্বার্থত্যাগ যথার্থই "লব্ধস্য বর্জ্জনং ত্যাগঃ।" নিজে প্রচুর অক্ষয় মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া তাহার পর সেই উপচিত মনুষ্যত্ব তাঁহার উপেক্ষিত স্বজাতির মঙ্গলের জন্য উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে যাঁহাদের জীবনের কর্ম্মকাহিনী নূতন আশার ও কর্ত্তব্যের অধ্যায় সংযোজনা করিয়াছে এই বিশ্ববরেণ্য গোলামবীর তাঁহাদের মধ্যে গণনীয়। তাঁহার জীবনচরিত নিরাশ হৃদয়ে আশা জাগাইবে, অবনত, উপেক্ষিতকে

গৌরব ও সম্মানের কর্ম্ম সোপান দেখাইয়া দিবে। এই ক্ষুদ্র আলোচনায় তাঁহার অসংখ্য কর্ম্মের পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। বুকর ওয়াশিংটনের আত্মচরিত পাঠ করিলে সকলেই তাঁহার মনুষ্যত্ব ও কর্ম্মের পরিচয় পাইবেন। বুকার ওয়াশিংটন আর মর্ত্ত্য-রাজ্যের অধিবাসী নহেন। কিন্তু তাঁহার কর্ম্ম, ত্যাগ, একনিষ্ঠ, বিশ্বাস ও আশা মর্ত্ত্য-বাসীর যে চিরস্থায়ী ও অপূর্ব্ব সম্পদরূপে বিরাজমান থাকিবে, উত্তরকালে মানবজাতির ইতিহাসে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উন্নতিকামী জনমণ্ডলী তাহা হইতে প্রচুর পাথেয় সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

১২। সাধারণের উন্নতি

ইংরাজীতে একটি কথা আছে—The nation dwells in cottages—জাতি বলিলে যাহারা বুঝায় তাহারা কুটীরে বাস করে—এ বাক্যটী আমাদের দেশের পক্ষে যেরূপ খাটে সেরূপ আর কোন দেশের পক্ষে নহে। জাতির পরিচয় লইতে হইলে ভারত-বর্ষের মুষ্টিমেয় সহর কয়টী অপেক্ষা অগণ্য পল্লীগুলির উপরেই বেশী মনোযোগ দিতে হইবে। কেবল মাত্র ধনী ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তি-দিগকে দেখিয়া যাঁহারা ভারতবর্ষের অবস্থা বিচার করিবেন, তাঁহারা ভারতবর্ষের কোন ধারণাই করিতে পারিবেন না। আমাদের সহর ও গ্রামগুলির মধ্যে একটা বিস্তৃত ব্যবধান রহিয়া গিয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান নেতারা সাধারণ লোকের প্রকৃত "প্রতিনিধি" হইতে পারেন না। তাঁহারা যেন জনসঙ্ঘ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বস্তুতঃ আমাদের দেশে দুই প্রকারের মনুষ্য আছেন। একদল আছেন—তাঁহাদের সংখ্যা অঙ্গুলিতে গণিয়া শেষ করা যায়—যাঁহারা বিদ্যায়, জ্ঞানে, মহত্ত্বে, কর্ম্মকুশলতায় জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি-গণের সমকক্ষ। আর একদল—দেশের জন-সাধারণ—অজ্ঞানতা, মলিনতা, কুসংস্কার ও দুর্গতির নিম্নতম স্তরে অবস্থিত।

দেশের উন্নতি অর্থে প্রথম প্রকারের মুষ্টি-মেয় লোকের উন্নতি নহে। যে মঙ্গল প্রচেষ্টা সমগ্র দেশব্যাপী না হইয়া কেবল ক্ষুদ্র সম্প্র-দায়ের মধ্যে আবদ্ধ, তাহাতে দেশের সম্যক্ কল্যাণ সম্ভব নহে। যে আন্দোলন অধ্যাত্ম-বোধ প্রচারের জন্যই হউক, অথবা আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্যই হউক সমগ্র সমাজকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, তাহা কখনও বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারে না। বৌদ্ধধর্ম্ম যখন জন সমষ্টিকে ছাড়িয়া সঙ্কীর্ণ "বিহার"-গুলির মধ্যে আশ্রয় খুঁজিয়া লইয়াছিল, তখনই তাহার পতন আরম্ভ হয়। শ্রীচৈতন্য প্রমুখ বৈষ্ণবগণ ধর্ম্মপ্রচারের জন্য পল্লীবাসী দরিদ্র সাধারণের মধ্যেই গিয়াছিলেন। তুকারামের অভঙ্গ, কবীরের দোঁহাবলী, তুলসীদাসের রামায়ণ, আধ্যাত্মিকতা ও হিন্দুধর্ম্মের সার সরল, ভক্তিপূর্ণ ভাষায় দেশবাসীর মধ্যে প্রচার করিয়া হিন্দুসমাজকে সঞ্জীবতা দান করিয়াছিল। রামপ্রসাদ প্রভৃতি ভক্ত কবি-গণ অজ্ঞ, অমার্জ্জিতবুদ্ধি জনসাধারণের উপ-যোগী করিয়া যে ভাবপূর্ণ, শ্রদ্ধামধুর সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আজও পল্লীর মাঠঘাট, গৃহপ্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়া থাকে।

কিন্তু বর্ত্তমান ভারতবর্ষের আন্দোলনগুলি প্রধানতঃ কতিপয় নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ। আমাদের কংগ্রেস মূক, দুর্ব্বল দেশবাসী হইতে বিচ্ছিন্ন; শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বহির্ভূত কেহ কংগ্রেসের নাম শুনে নাই। কংগ্রেসের কথা তাহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টাও কেহ করে নাই। আবার সেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কয়েক জন ব্যতীত কেহ মহাসভার কার্য্যে উৎসাহ প্রকাশ করেন না। কংগ্রেসের আশা, আকাঙ্ক্ষাকে দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণ আশা ও আকাঙ্ক্ষা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই। ময়মন-সিংহ ও বর্দ্ধমানে এই যে সাহিত্য সম্মিলন হইয়া গেল, তাহার খবর কয়জনে রাখিয়াছে? ময়মনসিংহ ও বর্দ্ধমানের কয়জন সাধারণ লোক ইহার উদ্দেশ্য ও সার্থকতা বুঝিতে পারিয়াছে? সম্মিলনকে ইহারা বাবুদের তামাসা ছাড়া আর কিছু মনে করে না।

চারিদিকের সকলে যখন অবনত, তখন

কোন বিশেষ সম্প্রদায় আপনাকে বেশীদিন উন্নত রাখিতে পারেন না, ক্রমেই নিম্নের আকর্ষণ তাহাকে নীচের স্তরে টানিয়া আনে। যে সমাজের অধিকাংশ লোকেই অবনত, সে সমাজের আদর্শও খুব ছোট। তাই আমাদের আন্দোলনগুলি দীর্ঘ স্থায়ী হইতেছে না। একজন কর্ম্মী কোন এক নূতন কর্ম্মের প্রবর্ত্তনা করিলেন। কিন্তু তাঁহার অনুবর্ত্তীর দল কই? নবজাগরণের দিন যে অফুরন্ত কর্ম্মীর দল স্রোতের মত দেশ প্লাবিত করিবেন এবং জটিল সাধনায় সিদ্ধি আনিয়া দিবেন, তাঁহারা কোথায়? আমাদের আন্দোলন তাই সমাজের সমস্ত স্তরগুলির মধ্যে আপনার মূল বিস্তৃত করিতে পারে নাই। তাই উহা সামান্য ঝড়ে ভাঙ্গিয়া পড়ে। উহা জনসাধারণের সহানুভূতি ও প্রয়াসের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে; উহার ভিত্তি অত্যন্ত শ্লথ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিকূলতার আক্রমণ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না। উচ্চশ্রেণীর আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টার সহিত নিম্ন শ্রেণীর কোন সংযোগ নাই, তাহার জন্য নিম্নশ্রেণীকে দোষ দেওয়া যায় না। যাহারা অর্থাভাবে, অন্নাভাবে দিন দিন শীর্ণ কঙ্কালসার হইয়া পড়িতেছে, জমিদারের খাজনা এবং মহাজনের সুদ দিতে ও ঋণ পরিশোধ করিতে যাহাদের সম্বৎসরের পরিশ্রমলব্ধ অর্থ ব্যয়িত হইয়া যায়, এবং পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে, স্বাস্থ্যজ্ঞানের অভাবে দুষ্ট জল হাওয়ায় বাস করিয়া যাহারা ক্রমেই রুগ্ন শ্রমবিমুখ, নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতেছে, শিক্ষার অভাবে যাহাদের মধ্যে নিঃস্বার্থ অথবা সমূহের স্বার্থমূলক বড় ভাবগুলি লোপ পাইতে বসিয়াছে, তাহারা যে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া সহরের আন্দোলনে যোগদান করিবে না ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? উন্নত শ্রেণীর নির্ম্মম ঔদাসীন্য তাহাদিগকে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদিগকে উর্দ্ধগামী করিয়া উন্নত শ্রেণীর সহিত সমভূমিতে আনিবার কোন বিশেষ চেষ্টা করা হয় নাই, ফলে, তাহারা ঔদাসীন্য দ্বারা আমাদিগের ঔদাসীন্যের প্রতিদান করিয়াছে।

দেশের সর্ব্বত্র অভাব, অপ্রাচুর্য্য। তাহার উপর দেশের শতকরা ৯৭।৯৮ জন নিরক্ষর। অক্লান্ত গতিতে জগৎপ্রবাহ ছুটিতেছে, উন্নতিকে লক্ষ্য করিয়া অবিরাম বেগে ধাবিত হইতেছে, ইহার কোন সংবাদ তাহারা রাখে না। তাহাদের জগৎ বহুদিন পূর্ব্বে যেখানে ছিল, আজ সেইখানেই আছে, বরং পিছাইয়া আসিয়াছে। কোন প্রকার বড় স্বার্থ বা মহৎভাবকে আশ্রয় করিয়া থাকা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। আশাহীন, আনন্দহীনভাবে জীবনের কয়টা দিন কাটাইয়া দেওয়া ব্যতীত আর কোন উপায় তাহারা দেখিতে পায় না। অদৃষ্টের দোহাই দিয়া নির্ব্বিবাদে তাহারা আপনাদের হীন অবস্থার সহিত আপোষ করিয়া লইয়াছে। গ্রামের রক্ষক স্বরূপ জমিদার ও ধনী ব্যক্তিগণ পল্লী ছাড়িয়া এখন নগরে বাস করিবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছেন। তাঁহাদের গৃহ প্রাসাদ অজ্ঞতা দারিদ্র্যের মরুর মাঝে জ্ঞান ও আলোকের মরুদ্বীপের মত ছিল। পূজার সময় তাঁহাদেরই প্রাঙ্গণে গ্রামের কৃষক, স্ত্রী, পুরুষ, হিন্দু, মুসলমান একত্রে আমোদ উপভোগ করিত। তাঁহারাই পল্লীর স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারেন, জ্ঞান বিস্তার করিতে পারেন, কৃষিকার্য্যের অভিনব উন্নত প্রণালী প্রচলিত করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের গ্রামত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামগুলি শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বে যে অর্থ পল্লীর কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত ব্যয়িত হইত, এখন তাহা কেবল নগরেই বিলাস বাবুয়ানায় খরচ হইয়া যাইতেছে। পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার হয় না, নদীগুলি মজিয়া যাইতেছে, আনন্দ কোলাহলপূর্ণ, উৎসবময় গ্রাম সকল এখন ম্যালেরিয়াদি রোগের এবং শৃগালাদি জন্তুর বাসস্থানে পরিণত হইয়াছে। কোন প্রকার উন্নত ক্রীড়া ও আমোদ না থাকায় এবং অভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর পানাশক্তি প্রবল হইয়া উঠিতেছে। দেশে যখন প্রাচুর্য্য ও নির্ম্মল আনন্দের অনাটন হয়, তখন লোকের মধ্যে নেশা প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। আমাদের আর একটী দুর্ভাগ্য, লোকের খাটিবার ক্ষমতা কমিয়া আসিতেছে এবং তৎপরিবর্ত্তে বিবাদ মামলা-

রাশি বাড়িয়া চলিয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানের কোন জ্ঞান না থাকায় কৃষক বা শিল্পী কৃষি বা শিল্পের উন্নতি করিতে পারিতেছে না। বিদেশী পণ্যের প্রতিযোগিতায় আমাদের শিল্পীরা কাজকর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া এক্ষণে মজুরী করিয়া দিনাতিপাত করিতেছে। প্রজাদিগের অবস্থার উৎকর্ষ সাধনে জমিদারের উৎসাহ কমিয়া আসিতেছে। সমাজের গুরুস্থানীয় ব্রাহ্মণগণের অবনতিবশতঃ নৈতিক শিক্ষার অভাববশতঃ গ্রাম্য জনসাধারণের নৈতিক চরিত্র শিথিল হইয়া পড়িতেছে।

কিন্তু এরূপ অবস্থার জন্য দায়ী প্রধানতঃ ভদ্র সম্প্রদায়। যে সমাজ আপনার অধিকাংশ অবনত লোককে উন্নত করিবার কোন চেষ্টা না করে তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। দেশের জনসংঘ জাতির মেরুদণ্ড। এই মেরুদণ্ড যদি ভাঙ্গিয়া পড়ে তবে মাথা অনেকদিন খাড়া থাকিবে না। মানুষের মনুষ্যত্ব ফুটাইবার জন্য সমাজ। তাহার অন্তর্নিহিত গুণগুলির বিকাশের সুযোগ দেওয়া উহার কাজ। সুযোগের অভাবে, অনুশীলনের অভাবে জনসাধারণের মধ্যে যে কতশত লোকের প্রতিভা ফুটিতে পারিতেছে না তাহার হিসাব কে রাখিয়াছে? মুসলমান জোলার ঘরে কবীরের জন্ম। ফ্রাঙ্কলিন, গারফীল্ড, লিঙ্কন, গ্র্যাণ্ট প্রমুখ মহাপুরুষগণ অতি সামান্য অবস্থা হইতে আপনাদিগকে ঊর্দ্ধে উন্নীত করিয়াছিলেন। আর্করাইটের প্রতিভা শিক্ষা দেয়—দরিদ্র উপেক্ষার পাত্র নহে, চেষ্টা করিলে, প্রকৃত অনুশীলনের সুযোগ দিলে তাহাদের মধ্য হইতে বড় লোক উঠিতে পারে।

হিন্দু বহুদিন তাহার নিম্নগামী, পতিত ভাই বোনদের কথা ভুলিয়া রহিয়াছে। তাহাদের উদ্ধারের কথা হিন্দুর মনে এখনও ভাল করিয়া স্থান পায় নাই। অসংখ্য দৈহিক অভাব দূর করিয়া, নানাপ্রকার শিক্ষার আলোক প্রবেশ করাইয়া তাহাদিগকে কর্ম্মশীলতায়, তেজস্বিতায় ও মনুষ্যত্বে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু ইহার জন্য আন্দোলন সমগ্র দেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে নাই। পঞ্জাবের আর্য্যসমাজ এবং ভারতবর্ষের খ্রীষ্টান মিশন ব্যতীত আর কোন সম্প্রদায় বিস্তৃতভাবে জনসংঘের মধ্যে কার্য্য আরম্ভ করেন নাই। বাঙ্গালী এ বিষয়ে এখনও উদাসীন। তাই বাঙ্গালার উপেক্ষিত নমঃশূদ্রাদি জাতি দলে দলে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে।

কিন্তু বহুকাল নিম্নশ্রেণীকে নীচে ফেলিয়া রাখিলে ত আমাদের জাতীয় শঙ্কট সমস্যার মীমাংসা হইবে না। নিখিল ভারতের উন্নতির জন্য ভারতের জনসাধারণকে বাদ দিলে চলিবে না। অবনতকে পতিতকে, অপমানিতকে সমাজের উচ্চস্তরে উত্তোলন এবং তাহাদের উন্নতি বিধানই নবভারতের মূলমন্ত্র হউক। যাঁহারা তাহাদের দুঃখে, যাতনায় বেদনা অনুভব করিতেছেন, তাঁহাদের নীরব আর্ত্ত নাদে যাঁহাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, সেই সকল মহাপ্রাণ কর্ম্মীরই এখন প্রয়োজন। যাঁহারা সব স্বার্থ ছাড়িয়া, অন্যান্য সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া উপেক্ষিত দীন জনসাধারণের কল্যাণার্থ আপনাদের সমস্ত শক্তি যোগ্যতা ও ভক্তি আগ্রহের সহিত উৎসর্গ করিবেন, তাঁহারাই আজিকার প্রকৃত কর্ম্মী।

দৃশ্য-কাব্য

আমাদের সাহিত্যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর নাটকের উপযুক্ত নাম থাকিলেও, বিদেশী নাম ব্যবহৃত হয় দেখিয়া, বহুদিন পূর্ব্বে একবার দৃশ্যকাব্যের প্রাচীন শ্রেণীবিভাগের কথা লিখিয়াছিলাম। নাট্য-সাহিত্যে যাঁহার কীর্ত্তির তুলনা নাই, সেই মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল প্রাচীন কালের কয়েকটি জাতিবাচী শব্দ গ্রহণীয় মনে করিয়াছিলেন। এবার বিস্তৃত ভাবে নাটকের শ্রেণী-বিভাগের কথা লিখিব। নাটক শব্দটি দেখিয়াই নিঃসন্দেহে ধরিতে পারা যায় যে, যাঁহারা ছান্দস্ ভাষা ব্যবহার করিতেন এবং যাঁহারা প্রাচীন ভাষায় অপভ্রংশ ও বিকৃতশব্দ ব্যবহার করিতেন না, তাঁহাদের হাতে নাটকের উৎপত্তি হয় নাই। নৃত্য শব্দটি হইতে যে নাট, নট, নাটক প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছিল সেগুলি প্রাকৃত ভাষার শব্দ। নট শব্দের সহিত যুক্ত স্বার্থের "ক" প্রাচীন প্রাকৃত ভাষাতেও অপেক্ষাকৃত হালের। সংস্কৃত ভাষায় প্রাকৃতের স্বার্থের "ক" এবং 'ত' এর স্থানে প্রবর্ত্তিত "ট" সশরীরে গৃহীত হইয়াছিল। প্রকৃত হইতে উৎপন্ন প্রকট, বিকৃত হইতে উৎপন্ন বিকট প্রভৃতি গ্রহণ করিবার পর, সংস্কৃতে নূতন ধাতুরও সৃষ্টি হইয়াছিল। পাণিনির সময়ের পূর্ব্ব হইতেই সংস্কৃতে প্রাকৃত বা অপভ্রংশ ব্যবহৃত হইতেছিল। প্রাচীন ব্রাহ্মণ ও ধর্ম্মসূত্র প্রভৃতিতে দেখিতে পাই যে গান-বাজনা রঙ্গ-তামাসা প্রভৃতি শিষ্টদিগের আদর্শের পরিপন্থী বলিয়া বিবেচিত হইত। দেশের লোকে কথা কহিবার ভাষায় চিত্ত-বিনোদনের জন্য যে সাহিত্য গড়িয়াছিল, নাটক সেই সাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। পাণিনি এবং উহার মহাভাষ্য দেখিয়া বুঝিতে পারি যে শিষ্টেরা অল্প সময়ের মধ্যেই অশিষ্ট আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। নৃত্য হইতে যে নচ্চ (নাচ) হইয়াছিল, অভিনয়ে উহা থাকিলেও, রঙ্গমঞ্চের নূতন জিনিসের জন্য নূতন প্রাকৃত নাম হইয়াছিল। বিশেষভাবে রঙ্গশালাগুলির কৃপায় আজকাল নানা শ্রেণীর দৃশ্যকাব্য সৃষ্ট হইতেছে। সকল বিষয়েও যেমন, এখানেও তেমন; ইংরেজি আদর্শে এবং ইংরেজি ছাঁচেই আমরা সকল জিনিস গড়িতেছি। এইজন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোনও দৃশ্যকাব্যের নাম অপেরা, কাহারও নাম গীতিনাট্য, কাহারও বা নাম মেলো ড্রামা। ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শে নূতন গড়ায় অনেক স্থলে লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই। কিন্তু বস্তুটি দেশীয় নাম এবং দেশীয় প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ না করিলে জোহন্ বাগ্‌দী এবং মেরী ডোমের মত নরকেরও অগ্রাহ্য হইবে। নামটা পরিচয়ের প্রথম কথা এবং পরিচিতের নিত্য সম্ভাষণের শব্দ।

প্রাচীন সাহিত্যে দৃশ্যকাব্যের বহুবিধ শ্রেণী-বিভাগ আছে। নূতন নূতন আদর্শে কাব্য লিখিলেও কিয়ৎপরিমাণে সেই প্রাচীন কাঠাম বজায় রাখা যাইতে পারে; তাহাতে নবসৃষ্ট কাব্যের পূর্ণ বিকাশে বাধা পড়িবে না, বরং সেই নবসৃষ্ট সাহিত্য একটু স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিবে। প্রাচীনেরা প্রতি-শ্রেণীর লক্ষণাদি লইয়া অনেক বাঁধাবাঁধি

করিয়া গিয়াছেন। একালের রচনায় সে সকল নিয়ম রক্ষিত হয় না; হইবার প্রয়োজনও নাই। কিন্তু সাধারণতঃ যে সকল মৌলিক ভাব বা বিশেষত্ব লইয়া শ্রেণী-বিভাগ হইয়াছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নবসৃষ্ট কাব্যগুলির বিভাগ এবং নামকরণ করা যাইতে পারে। দৃশ্যকাব্যের সাধারণ নাম রূপক। নাটক, রূপকের অন্তর্গত একটি শ্রেণী হইলেও, প্রাচীন কালেও সকল শ্রেণীর দৃশ্যকাব্যই নাটক নামে অভিহিত হইত; কাজেই রূপক শব্দটি অত্যন্ত উপযোগী হইলেও, প্রচলিত নাটক নামে দৃশ্যকাব্যের নামকরণ হইলে ক্ষতি হইবে না। দর্পণকারের বিভাগ অনুসারে রূপক দশভাগে এবং উপরূপক ১৮ ভাগে বিভক্ত। নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামগ, অঙ্ক, বীথী এবং প্রহসন, এই দশটি রূপক শ্রেণীতে। নাটিকা, ত্রোটক, গোষ্ঠী, সট্টক, নাট্যরাসক, প্রস্থান, উল্লাপ্য, কাব্য, প্রেঙ্খন, রাসক, সংলাপক, শ্রীগদিত, শিল্পক, বিলাসিকা দুর্ম্মল্লিকা, প্রকরণিকা, হল্লীশ এবং ভাণিকা এই ১৮টি উপরূপক।

ইংরেজিতে যাহাকে Historical Drama বলে, নাটক জিনিসটা তাহাই। নাটকের উৎপত্তির যুগে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ খ্যাতবৃত্ত লইয়াই অভিনয় হওয়া স্বাভাবিক ছিল বলিয়া, গোড়ায় যাহা নাটক হইয়াছিল, উহা ঐতিহাসিকই হইয়াছিল; এবং সেই সূত্রেই, যে কাব্যে রূপ আরোপিত হয়, তাহা রূপক বা দৃশ্যকাব্য নামে সাধারণভাবে অভিনীত হইবার সময়, ঐতিহাসিক রূপকের, নাটক নামই রক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু অলঙ্কার শাস্ত্রের বিভাগ স্বত্ত্বেও সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত সাধারণ দৃশ্যকাব্য অর্থেও নাটক নাম ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ভাষায় রূপক শব্দটি একটা বিশেষ অর্থেই চলিতেছে, কাজেই ঐ শব্দটি গ্রহণ না করিয়া সাহিত্যশ্রেণীর হিসাবে দৃশ্যকাব্য নাম চলিলেই যথেষ্ট হইবে। ঐতিহাসিক দৃশ্যকাব্য পাঁচ অঙ্কের অধিক হইলে মহানাটক হয় এবং পাঁচ অঙ্কের কম হইলে নাটিকা হয়; বাঙ্গালা সাহিত্যে এই সকল শ্রেণীর নাটক যথেষ্ট আছে। নাটক নাটিকাদির এই প্রভেদ জানা না থাকায়, কেহ কেহ মহানাটককেও নাটিকা নাম দিতে ছাড়েন নাই, কারণ গ্রন্থকারেরা নায়িকার নামে নামাঙ্কিত গ্রন্থকে নাটিকা নাম দেওয়াই ব্যাকরণসঙ্গত মনে করিয়া থাকেন। আশাকরি এই ভুলটুকু সংশোধিত হইবে। নাটকে যে পঞ্চসন্ধি প্রভৃতি থাকিবার কথা তাহার একটা খটমট ব্যাখ্যা দিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা ভাল নাটক রচনা করেন, তাঁহাদের সকলের নাটকেই পঞ্চসন্ধি থাকে। দৃশ্যকাব্য যদি আভ্যন্তরীণ লক্ষণের হিসাবে নাটকের মত হয়, কিন্তু আখ্যান বস্তুটি ঐতিহাসিক না হইয়া কবি কল্পিত হয়, তাহা হইলে ঐ দৃশ্যকাব্যের নাম হয় প্রকরণ। পাঁচ অঙ্কের কম হইলে নাটক যেমন নাটিকা হয়, প্রকরণও সেইরূপ প্রকরণিকা হয়। প্রধানতঃ সমাজচিত্র লইয়া বাঙ্গালা ভাষায় অনেক প্রকরণ এবং প্রকরণিকা রচিত হইয়াছে।

"ভাণঃ স্যাৎধূর্ত্তচরিতো নানাবস্থান্তরাত্মকঃ" ইত্যাদি।

মৌলিক লক্ষণের হিসাবে মাইকেলের "বুড়া শালিকের ঘাড়ে রোঁ," ভাণ শ্রেণীর। বুড়া শালিকে একটিই নায়ক, এবং চরিত্র ধূর্ত্ত-চরিত্র বটে; কাজেই এখানি প্রহসন শ্রেণীর অন্তর্গত হইতে পারে না। ব্যায়োগের বিশেষত্ব এইগুলি, যথা—খ্যাতেতিবৃত্ত,

প্রখ্যাত, বীরনায়ক বহুনরাশ্রিত, কৌশিকী বৃত্তি রহিত (অর্থাৎ মুখ্যতঃ শৃঙ্গার রস বর্ণিত নহে) এবং অঙ্গীরূপে হাস্য বা শৃঙ্গার অথবা শান্তরস প্রদর্শিত। ইহা একাঙ্ক। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাল্মীকি প্রতিভা, ব্যায়োগ শ্রেণীস্থ বলা যাইতে পারে, দেবাসুরাশ্রিত করিয়া সমবকারের মত একটা বিশেষ শ্রেণী রাখিবার আবশ্যকতা নাই। একালে ডিম নামটি বড় সুবিধার নহে। কিন্তু এই শ্রেণীর একটু বিশেষত্ব ছিল। "মায়েন্দ্রজালসংগ্রামক্রোধোৎভ্রান্তাদি চেষ্টিতৈঃ, উপরাগৈশ্চ ভূয়িষ্ঠে ডিমঃ খ্যাতেহ্‌তি বৃত্তকঃ" ইত্যাদি। তাঁহার উপর আবার "নায়কা দেবগন্ধর্ব্বযক্ষরক্ষমহোরগাঃ।" বাঙ্গালায় এ শ্রেণীর কাব্য হয়ত সৃষ্ট হয় নাই।

"নায়কো মৃগবদলভ্যাং নায়িকাং ঈহতে
(বাঞ্ছতি) ইতি ঈহামৃগঃ"।

একালে এই শ্রেণীটি রক্ষিত হওয়া প্রার্থনীয়। কাব্যরসিকেরা দেখিবেন যে, ইহাতে বিলক্ষণ রোমান্স আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক ভাষান্তরিত রত্নাবলী প্রায় এই শ্রেণীর। ঈহামৃগ কাহাকে বলে, মুখ্যতঃ তাহাই বুঝাইবার জন্য প্রায় ২৪ বৎসর পূর্ব্বে (১৮৯১) "পক্ষ পরিচ্ছদ" লিখিয়াছিলাম, এবং পরে উহা "কথা ও বীথী" নামক গ্রন্থে মুদ্রিত করিয়াছিলাম, সুরচিত হয় নাই বলিয়া উহা আর মুদ্রিত করি নাই। একটি অঙ্কের কারাগার হইতে মুক্ত করিলে "অঙ্কঃ" নামক দৃশ্যকাব্যও একালে ব্যবহৃত হইতে পারে। যেখানে নায়ক নায়িকার বিশেষ মিলন, গল্পের মুল অভিপ্রায় নহে, অথচ যে নাটকে করুণ-রসস্থায়ী, একালের সমাজে সে শ্রেণীর অনেক নাটক রচিত হইতে পারে, এবং হইয়াছে। সামাজিক রাজনৈতিক প্রভৃতি অবস্থার পীড়ন বর্ণনায় 'অঙ্ক' যথেষ্ট উপযোগী বলিয়া মনে হয়। সুপ্রসিদ্ধ "নীলদর্পণ" খানিকে অঙ্কশ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত বলা যাইতে পারে। শৃঙ্গাররস-বহুল একাঙ্কের রোমান্সপূর্ণ দৃশ্যকাব্যকে একালে "বীথী" বলা যাইতে পারে। এই শ্রেণীর রচনা বুঝাইবার জন্য সুমুখী নামে বীথী রচনা করিয়াছিলাম এবং উহাও এখন সাহিত্যে ত্যাজ্য মনে করিয়াছি। প্রহসন বাঙ্গালায় বহু প্রচলিত। সধবার একাদশী, একেই কি বলে সভ্যতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

নাটিকার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ত্রোটকের বিশেষত্ব "দিব্যমানুষসংশ্রয়ঃ" লইয়া; নচেৎ অন্যান্য বিষয়ে নাটকের লক্ষণযুক্ত। গোষ্ঠীর কোন বিশেষত্ব নাই বলিয়া বিশেষ উল্লেখের প্রয়োজন দেখি না। মাইকেলের পদ্মাবতী ত্রোটক নামে অভিহিত হইতে পারে। প্রাচীনকালে সকল কাব্যই সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইত; সেই জন্যই বোধ হয় প্রাকৃত-বহুল বলিয়া, সট্টক নামে নূতন শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছিল। গ্রাম্য ভাষার প্রচুরতার হিসাবেও একালে এই শ্রেণী রাখিবার প্রয়োজন হইবে না। একটি অঙ্কের সীমা ভাঙ্গিয়া দিলেই, যাহাকে একালে অপেরা বলি, তাহা নাট্যরাসকের অন্তর্ভূক্ত হয়। শৃঙ্গার এবং হাস্যরস যুক্ত বহু তাললয় সংযুক্ত অনেক নাটকের সৃষ্টি হইয়াছে; সেগুলি নাট্যরাসক নামে চলিলে ক্ষতি কি? কবি দ্বিজেন্দ্রলাল এই নামটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। "প্রস্থানে নায়কো দাসো হীনঃ স্যাৎ উপনায়কঃ; দাসী চ নায়িকা, বৃত্তিঃ কৌশিকী ভারতী তথা," এই সংজ্ঞার নাটক বঙ্গভাষায় অনেক সৃষ্ট হইতে পারে। প্রেঙ্খনের স্বাতন্ত্র্য না রাখিয়া প্রস্থানের অন্তর্গত করিয়া দিলেই

চলে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিরহ, প্রস্থান শ্রেণীর দৃশ্যকাব্য। উল্লাপ্য নানা রকম বাঁধাবাঁধি নিয়মে নিয়মিত। একালে উহার ব্যবহার হইবে, আশা নাই।

বীররসহীন হাস্যসঙ্কুল ক্ষুদ্র নাটক একালে "কাব্য" সংজ্ঞায় অভিহিত করা যাইতে পারে। প্রহসনের কাছাকাছি হইলেও কিছু প্রভেদ আছে। প্রহসন শ্রেণীর দৃষ্টান্তে যে গ্রন্থগুলির নাম উল্লেখ করিয়াছি, তাহার সহিত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কল্কী অবতার গ্রন্থের তুলনা করিলে কাব্যের বিশেষত্ব লক্ষিত হইবে। এই স্বাতন্ত্র্যটুকু রক্ষা করিলে কল্কী অবতারকে কাব্য শ্রেণীর অন্তর্গত বলা যায়। হয়ত এত বিভিন্ন বিভাগের ততটা প্রয়োজন নাই। রাসক, সংলাপক শ্রীগদিত, শিল্পক এবং বিলাসিকা বিশেষত্ব বিহীন বলিয়া পরিত্যক্ত হইতে পারে। দুর্ম্মল্লিকার বিশেষত্ব আছে। কৌশিকী বৃত্তি বাঙ্গালার অধিকাংশ কাব্যেরই প্রাণ। শৃঙ্গাররস বর্ণনার বৃত্তিকে কৌশিকী বৃত্তি বলে। * বিটক্রীড়াময়, কৌশিকী ও ভারতী বৃত্তি যুক্ত দুর্ম্মল্লিকা রক্ষিত হওয়া উচিত। "নাগরনরা-ন্যূন নায়ক ভূষিতা" একালের সামাজিক চিত্র অঙ্কনে বিশেষ উপযোগী। অমৃতলাল বসুর সামাজিক নক্সাগুলি প্রায়ই দুর্ম্মল্লিকার অন্তর্গত। নায়িকা সমান বংশজা হইতেও পারেন, না হইতেও পারেন। নাট্যরাসক যেমন একশ্রেণীর গীতি-নাট্য, হল্লীশ তেমনি অন্য শ্রেণীর। এ কালের যে সকল Farce কাব্য অংশতঃ অপেরার মত, তাহাকে হল্লীশ বলা যাইতে পারে। হল্লীশে, নাট্যরাসকের মত Serious প্রসঙ্গ থাকিত না। বহু নায়কনায়িকাপূর্ণ, বহু তাল লয়াদি যুক্ত, এবং নানা রসাশ্রিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র Farce সদৃশ দৃশ্যকাব্য হল্লীশ নামে প্রচলিত হইলে মন্দ হয় না। ভাণিকার অন্যান্য প্রাচীন লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া "উদাত্ত নায়িকা মন্দ পুরুষাঃ" প্রভৃতি রক্ষা করিলে এই শ্রেণীটি হয়ত বজায় রাখা যাইতে পারে।

ইউরোপে একালে এক শ্রেণীর দৃশ্যকাব্য রচিত হইতেছে যাহা Lyrical Drama নামে খ্যাত। গীতি-নাট্য বলিলে ইহার ঠিক অনুবাদ হয় না, কারণ ইহা তাললয় যুক্ত গানে পরিপূর্ণ নহে। এই শ্রেণীর কাব্য সম্বন্ধে একটু বিশেষ কথা লিখিবার প্রয়োজন আছে, কারণ কবি রবীন্দ্রনাথের অতি মনোহর বিসর্জ্জন কাব্যখানি এই শ্রেণীর। যাঁহারা খুব বেশী শিক্ষিত, তাঁহাদের কাছে ইহার চমৎকার অভিনয় করা চলে, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের কাছে অভিনীত হইলে লোকে উহার সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারিবে না। যাহা মনে মনে অনুভূত হয়, মানস রাজ্যে স্থাপন করিয়া যাহার অভিনয় দেখিয়া লইতে হয়, তাহা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের উপযোগী নহে। Browning কবির Pippa passes সুশিক্ষিত এবং সৌন্দর্য্যবোধে উদ্বুদ্ধব্যক্তিদিগের নিকট অত্যন্ত মনোহর, কিন্তু লণ্ডনের কোন রঙ্গমঞ্চে উহার অভিনয় হইলে সুশিক্ষিতেরাও অভিনয়ের সময়ে রসগ্রহণ করিতে পারিবেন না। Shakespere প্রভৃতির নাটক এমন ধরণে লেখা এবং প্রতিপদে প্রযুক্ত পাত্রদিগকে এমন করিয়া বাস্তব জগতে চালাইয়া লওয়া হইয়াছে, যে নাটকের সাধারণ ধাঁচা এবং বস্তু বুঝিয়া লইতে অথবা অভিনীত অবস্থার

* যা শ্লক্ষ্ণনেপথ্যবিশেষচিত্রাস্ত্রীসঙ্কুল পুষ্কল নৃত্যগীতা কামোপভোগ প্রভবোপচারাসাকৌশিকী চারুবিলাস যুক্তা

মোটামুটি সৌন্দর্য্যটুকু বুঝিতে সাধারণ লোকেরও ক্লেশ হয় না। We are such stuff as dreams are made of প্রভৃতি অনেক যথার্থ Lyric, Shakespere এর কাব্যে আছে; কিন্তু সেগুলি সুবোধ্য বাস্তব ঘটনার মধ্যে এমনভাবে অল্প পরিমাণে আছে, যাহাতে রঙ্গমঞ্চের সমক্ষে বসিয়াও ভাব-প্রধানতার সৌন্দর্য্য অনুভব করা যাইতে পারে। কবি দ্বিজেন্দ্র লালের অহল্যা কাব্যের যে সকল স্থান সম্পূর্ণ Lyrical হইয়াছে, কোনও প্রকারে রঙ্গমঞ্চে তাহাতে রূপ আরোপ করা চলে না। গোতম, পাহাড় হইতে পাহাড়ে অগ্রসর হইতেছেন এবং দূরে দূরে "প্রতিমা দিয়া কি পূজিব তোমারে" প্রতিধ্বনিত হইতেছে প্রভৃতি, কোন প্রকার দ্রুত পট পরিবর্ত্তনে তাহা দেখান চলে না, অথচ কক্ষে বসিয়া তাহার সৌন্দর্য্য অনুভব করা চলে। প্রাচীন আলঙ্কারিকদের ভাষায় বলি, যে "পাষাণী" কাব্যের "বীজ" "মুখ-সন্ধিতে" সুস্থাপিত, এবং উহার "বিমর্ষ" এবং 'নির্বহণ' অতি চমৎকার হইয়াছে; তবুও সাধারণ অভিনয়ে উহার রস উপিয়া যায়। কাব্যের "নির্বহণ-সন্ধি" কথঞ্চিৎ শ্লথ হইলেও, কবি রবীন্দ্রনাথের বিসর্জ্জন খানি Lyric এর গৌরবে বঙ্গভাষায় অদ্বিতীয়। উহার মনোহারিত্বের কথা অনেকবার বলিয়াছি, এবং ধীরে ধীরে নিজের কক্ষে বসিয়া উহা পড়িয়া অনেকবার মুগ্ধ হইয়াছি। কবি রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনিয়াছিলাম যে তিনি নিজে পুরোহিতের ভূমিকা লইয়া উহার যে অভিনয় করাইয়াছিলেন, তাহা শ্রোতাদের তৃপ্তিকর হইয়াছিল। অভিনয়টা যে সকল শিক্ষিত লোকের সমক্ষে হইয়াছিল, নিশ্চয়ই তাঁহারা সকলেই পূর্ব্বে গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া রসগ্রহণ করিয়াছিলেন। না-পড়া লোকের কাছে নূতন করিয়া অভিনয় করিলে আসর জমিবে না, মনে হয়। মানস-পট ঝুলাইয়া যাহার অভিনয় করিতে হয়, সে শ্রেণীর দৃশ্যকাব্যের একটা নূতন নামকরণের প্রয়োজন। ইংরাজিতে Lyric শব্দের গায়ে এতখানি নূতনভাব জমাট বাঁধিয়াছে, যে কেবল মৌলিক অর্থ ধরিয়া গীতিনাট্য নাম দিলে উহা অপেরা বা নাট্যরাসকের দলে পড়িবে, অর্থাৎ কর্পূর কার্পাসে ভেদ থাকিবে না। আমার স্মরণ হইতেছে যে প্রথম মুদ্রণের সময়ে কবি রবীন্দ্রনাথ যে মুখবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহাতে রঙ্গচ্ছলে একথাটি বলিয়াছিলেন, যে তাঁহার কাব্য, নাটক কিংবা অন্য কিছু, তাহা বুঝিতে গোল হইতে পারে। অভিনয়যোগ্য নাটকগুলির শ্রেণীবিভাগের কথা বলিয়া উপসংহারে এই নূতন শ্রেণীর নাটকের নূতন একটা নামের প্রস্তাব করিতেছি। একশ্রেণীর নাটকে যখন "ঈহামৃগ" নাম চলিতে পারিয়াছিল, তখন আমার পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাখ্যা অনুসারে এই শ্রেণীর নাটককে "মানসমৃগ্য" নাম দিলে ক্ষতি হইবে কি?

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

উজানি

উজানি বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া সবডিবিসনের অন্তর্গত অজয়নদের তীরস্থ একটী মহাপীঠ, এখানে বিষ্ণুচক্রছিন্ন সতীদেহের কফোণি পতিত হয়। যথাঃ—

"উজানিতে কফোণি মঙ্গলচণ্ডী দেবী,
ভৈরব কপিলাম্বর শুভ যাঁরে সেবি।"

কথিত আছে এই স্থানে অষ্টম শতাব্দীর প্রথমাংশে বিক্রমকেশরী নামে এক মহাবলশালী নৃপতি ছিলেন। সেই সময়ে ভারতবর্ষের আদর্শ নৃপতি বিক্রমাদিত্যের এবং তাঁহার রাজধানী শিপ্রাতরঙ্গানীলকম্পিত মহাকাল নিকেতন উজ্জয়িনীর নাম ভারতের সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার পরবর্ত্তী বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন অনেক রাজা বিক্রমাদিত্য বা বিক্রমকেশরী উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধোল্লিখিত বিক্রমকেশরীও বোধ হয় সেই শ্রেণীর একজন রাজা ছিলেন। বোধ হয় তিনি স্বনামখ্যাত বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উজ্জয়িনীর নামানুসারেই নিজ রাজধানীর উজানি নাম রক্ষা করিয়াছিলেন। যথা কবি কালিদাসের "মনসা মঙ্গলে" :—

"ভূপের ভারতী শুনি চন্দ্রপতি বলিছে
সাধুর পাশে,
উজানি নগরী বিক্রম কেশরী
বসতি তাঁহার দেশে।
রাজা মহামতি জ্ঞানে বৃহস্পতি
ধনুর্ব্বেদে ভীষ্ম সম,
দাতাকর্ণ যিনি রাজ শিরোমণি
রিপুপতি যেন যম।
তার সদাগর নাম ক্রোটীশ্বর
বসতি চম্পানগরী,
তাহার সন্ততি নাম চন্দ্রপতি
আমার আখ্যান ধরি।
সাধুর বচনে হরিস রাজনে
কৈল অতি সমাদর,
মনসামঙ্গল রচিল সুন্দর
কালিদাস কবিবর।"

বিক্রমকেশরীর সাধের রাজধানী উজানি এক্ষণে কোগ্রাম নামক একখানি সামান্য গ্রামে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বে ইহা একটী প্রকাণ্ড নগরী ছিল। বোধ হয় বর্ত্তমান মঙ্গলকোট থানার অধীন অধিকাংশ স্থানই উজানির অন্তর্গত ছিল। মানসিংহের দিল্লী যাত্রা উপলক্ষে কবিবর ভারতচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন :—

"এড়ায় মঙ্গল কোট উজানি নগর।
খুল্লনার সুত সাধু শ্রীমন্তের ঘর॥"

উজানি যে প্রকাণ্ড নগরী ছিল তাহাও কবির বর্ণনায় জানিতে পারা যায়। যথাঃ—

"রাজার সামন্ত নাহি পায় অন্ত
ঘুরে যদি একমাস।

উজানিতে এখন পর্য্যন্ত ৪।৫ হাত মৃত্তিকার নিম্নে বিক্রমকেশরীর প্রাসাদের ধ্বংসাবশিষ্ট প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃহের ভিত্তি ও সহস্রাধিক বৎসরের পুরাতন অসংখ্য ইষ্টক পরিলক্ষিত হয়।

বাংলার প্রাচীন কবি শ্রীকবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী বিরচিত "চণ্ডী কাব্যে" যে

উজানির বর্ণনা আছে তাহাও বর্দ্ধমান জেলার অজয়নদতীরস্থ এই মহাপীঠ উজানি। যথাঃ—

"উজানির নিকটে অজয় নদী যান।"

যাঁহাকে লইয়া চণ্ডীকাব্য সেই যুগযুগান্তরের দেবী মঙ্গলচণ্ডী অদ্যাপি তথায় বিদ্যমান রহিয়াছেন। এই উজানিতেই চণ্ডীকাব্যোক্ত ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগরের বাসস্থান ছিল। কেহ কেহ কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যোক্ত ধনপতি, শ্রীমন্ত, খুল্লনা প্রভৃতি নায়ক নায়িকাগণকে এবং তাঁহাদের বাসভূমি উজানিকে কবির কল্পনা প্রসূত বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান।

কিন্তু আমরা তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। কারণ আজ পর্য্যন্ত উজানিতে চণ্ডীকাব্যোক্ত "ভ্রমরাদহ" "মারগড়া" "ছাগচড়ানী মাঠ" "খুল্লনার ঘটস্থাপনের স্থান" প্রভৃতির স্মৃতিচিহ্ন পরিলক্ষিত হয়।

খুল্লনা যখন শ্রীমন্তকে ধনপতি সদাগরের অন্বেষণে বিদায় দেন, তখন শ্রীমন্ত উজানির প্রান্তবাহিনী ভ্রমরার ঘাটে নৌকায় চড়িয়া ইন্দ্রানি পর্য্যন্ত যে যে গ্রামের মধ্য বা পার্শ্ব দিয়া গমন করিয়াছিলেন এখনও সেই সকল গ্রামের অধিকাংশই বিদ্যমান রহিয়াছে। যথাঃ—

"প্রথমে ভ্রমরাজলে
শ্রীমন্ত নৌকায় চলে
পুজিয়া মঙ্গল চণ্ডীকায়।
এড়ায়ে ভ্রমরা পানি
সম্মুখেতে উজাবনি
নৌকে গ্রাম এড়াইয়া যায়॥
চাকদা কুমার খালা,
এড়ায় সাধুর বালা
হাড়মুর কৈল তেয়াগণ।
কাণ্ডার মালুম কাটে
এড়াইল থানা ঘাটে
মৌলায় দিল দরশন॥
সম্মুখে হুসনপুর
গড় পাড়া কতদূর
দৌলতপুর বাহিল তখন।
কাণ্ডার মেলাম বায়
বাঘা এড়ায়ে যায়
কালনায় দিল দরশন॥
হাটায় মেমান যায়
চড়কি এড়ায়ে যায়
আঙ্গারপুর বেনিয়ার বালা।
পার হয় নব গাঁ
তাহাতে করিল বা
উত্তরিল মাঠগিয়া কোলা॥
সমুখে উধনপুর
নৈহাটী কতদূর
শাঁখাই ঘাটে দিল দরশন।
পাইয়া গঙ্গার পানি
মহাপুণ্য মনে গণি
পুজা কৈল গঙ্গার চরণ॥
মণ্ডলহাট ডাহিনে আছে
থাকিব হাটের কাছে
আনন্দিত সাধুর নন্দন।
সম্মুখে ইন্দ্রানি
ভুবনে দুর্লভ জানি
দেব আইসে যাহার সদন॥"

ইহার মধ্যে এখন ভ্রমরার দহ উজানির নিম্নেই বিদ্যমান রহিয়াছে, নৌযাত্রা করিতে হইলে এই খানেই নৌকায় চড়িতে হয়।

মঙ্গলকোট অঞ্চলে প্রবাদ যে, তাল বেতাল সিদ্ধ বিক্রমাদিত্যই উজানীর বিক্রমকেশরী। তাঁহারা বিক্রমাদিত্যের তাল বেতাল সিদ্ধির স্থান পর্য্যন্ত দেখাইয়া থাকেন

এবং মহাকবি কালিদাসকে এই উজানী রাজ্যের মুখোজ্জ্বল সন্তান বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন।

উজানির ভিন্ন ভিন্ন অংশ যে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে পরিণত হইতে আরম্ভ হইয়াছে সেই সময় হইতেই বিক্রমকেশরীর সাধের রাজধানী উজানির পূর্ব্বগৌরব বিলুপ্ত হইয়াছে। সেই সময় হইতেই উজানির শ্রেষ্ঠ অংশ কোগ্রাম নামে খ্যাত হইয়াছে। ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে এইখানেই বৈষ্ণব কবি শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য বিখ্যাত লোচন দাস ঠাকুর অবতীর্ণ হইয়া প্রেমের অমিয় মন্দাকিনী শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। কবি স্বরচিত গ্রন্থে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহার একস্থানে লিখিয়াছেন :—

"বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রামে বাস।"

লোচন দাস ঠাকুর ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম কমলাকর দাস, মাতার নাম সদানন্দী ছিল; যথা :—

"মাতা শুদ্ধমতি সদানন্দী তাঁর নাম।
যাঁহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণনাম॥
কমলাকর দাস মোর পিতা জন্মদাতা
শ্রীনরহরি দাস মোর প্রেম ভক্তি দাতা॥
মাতৃকুল পিতৃকুল হয় এক গ্রামে।
ধন্য মাতামহী সে অভয়া দেবী নামে॥
মাতামহের নাম শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত।
সর্ব্বতীর্থ পূত তিঁহ তপস্যায় তৃপ্ত॥
মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি একমাত্র।
সহোদর নাই মোর মাতামহের পুত্র॥
যথা যাই তথাই দুলিন করে মোরে।
দুলিন দেখিয়া কেহ পড়াইতে নারে॥
মারিয়া ধরিয়া মোরে শিখান আখর।
ধন্য সে পুরুষোত্তম চরিত তাঁহার॥

(শ্রীচৈতন্য মঙ্গল।)

শ্রীচৈতন্য মঙ্গল ছাড়া, তিনি—"দুর্লভসার" গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। লোচন দাস ঠাকুর রচিত অনেক মধুর ধামালী পদও আছে। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর ও শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামী অপেক্ষা লোচন দাস ঠাকুর উচ্চাঙ্গের কবি ছিলেন। কবিত্ব-সম্পদে লোচন দাসের শ্রীচৈতন্য মঙ্গল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মধুর পদাবলী রচনায় ও লোচন দাস অনেক বৈষ্ণব কবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহার ধামালী পদাবলী পাঠ করিলেই এ বিষয় বুঝিতে পারা যায়। ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে লোচন দাসের তিরোধান হয়। আজ পর্য্যন্ত কো-গ্রামে তাঁহার সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহার তিরোভাবের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত পৌষ সংক্রান্তির দিন কো-গ্রামে একটী মহোৎসব ও তদুপলক্ষ্যে একটী মেলা হইয়া থাকে। লোকে তাহাকে "উজানীর মেলা" বলিয়া থাকে। মুসলমান অধিকারের সময়েও উজানীতে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, বাহুল্যভয়ে এ প্রবন্ধে আর সে সকল ঘটনার অবতারণা করিলাম না। সময়ান্তরে অন্য প্রবন্ধে তাহা লিখিতে বাসনা রহিল।

স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী

পল্লীভবন

বড়ই সুখের কথা যে, এখন আমাদের শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আমাদের গ্রাম ও পল্লীর দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। এতদিন যাহা একেবারে উপেক্ষিত ছিল, এখন অন্ততঃ সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা আন্দোলন হইতেছে।

কিন্তু আলোচনা আন্দোলনে যেটুকু কাজ হয়, তাহাই যথেষ্ট নহে; আমাদের দেশে অনেক বিষয় লইয়া অনেক সময় অনেক আলোচনা আন্দোলন হইয়া গিয়াছে; তাহার দুই চারিটীর যে ফল না হইয়াছে, তাহা নহে; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই যত উৎসাহ, যত আগ্রহ, তাহা আন্দোলনেই পর্য্যবসিত হইয়াছে, আসল কাজ কিছুই হয় নাই। একটা একটা করিয়া সেগুলির উল্লেখের প্রয়োজন দেখিতেছি না। এই আন্দোলনটাও সেই পথ অবলম্বন না করে, ইহাই আমাদের ভয়।

ভয়ের একটু কারণ যে নাই, তাহা নহে। কথাটা খুলিয়াই বলি। এই যে সুদীর্ঘ পূজার অবকাশ গেল, এ সময়ে আমাদের সহর নগর প্রবাসী কয়জন তাঁহাদের পল্লী-ভবনে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন, এই কথাটা আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই। পূজার পূর্ব্বে যখন যে বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি "মহাশয় এবার ছুটীতে কোথায় যাইতেছেন?" ভায়া, এবার ছুটীটা কোথায় কাটাইবে?" কিন্তু প্রায় সকলেই ভূগোলসূত্রে উল্লিখিত নানা স্থানের নাম করিয়াছেন; দুই একজন ব্যতীত কেহই তাঁহাদের পল্লী-ভবনের নামও করেন নাই। কলিকাতা সহরে যাঁহাদের বাস তাঁহাদের কথা বলিতেছি না; যাঁহারা পল্লীবাসী, বিষয়-কর্ম্ম উপলক্ষে নগরপ্রবাসী, আমি তাঁহাদেরই কথা বলিতেছি।

প্রথম কথা এই, আমাদের পল্লীগুলির এমন দুরবস্থা হইল কেন? আমাদের দেশের গ্রাম ও পল্লী যে ম্যালেরিয়ার কবলে পড়িয়া উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, ইহার কারণ কি? বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে কি বলে, জানি না, কিন্তু আমাদের সহজ বুদ্ধিতে আমরা ইহাই বুঝিতে পারি যে, আমাদের দোষেই আমাদের গ্রাম পল্লীর এমন দুরবস্থা হইয়াছে।

প্রথমে ধরুন, ভাল পানীয় জলের অভাব। এ অভাব কেন হইল? পূর্ব্বে আমাদের দেশের যাঁহারা জমিদারছিলেন, যাঁহারা দুপয়সা উপার্জ্জন করিতে পারিতেন, তাঁহারা সকলেই গ্রামের উন্নতিকল্পে চেষ্টা করিতেন; যাঁহার যেটুকু সাধ্য তিনি গ্রামের জন্য তাহাই করিতেন। জলাশয় খনন তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য একটী পুণ্য কার্য্য ছিল। সেইজন্য আমাদের পল্লী-অঞ্চলে কখন জলের অভাব হয় নাই; এবং ভাল পানীয় জল সর্ব্বত্র সুলভ ছিল। এখনও অনেক গ্রামে অনেক বড় বড় পুষ্করিণী রহিয়াছে, অনেকগুলি বা একেবারে মজিয়া গিয়াছে। এ সকল পুষ্করিণীর জল সম্পূর্ণ অব্যবহার্য্য হইয়াছে। যাঁহাদের পুষ্করিণী, তাঁহারা হয় ত কেহ বহু-সরিকে বিভক্ত হইয়া নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন, জলাশয় সংস্কারের সাধ্য তাঁহাদের নাই। যাঁহারা অবস্থাপন্ন তাঁহারা ত দেশের মায়া কাটাইয়া সহরবাসী হইয়াছেন; তাঁহাদের দৃষ্টি সে সকল পুষ্করিণীর দিকে নিপতিত

হয় না। তাঁহারা নগরে সহরে সপরিবারে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছেন, কলের জল পান করিতেছেন; আর তাঁহাদের পিতৃ-পিতামহের প্রতিষ্ঠিত জলাশয় সকল মজিয়া যাইতেছে। যাঁহারা দেশের মায়া কাটাইতে পারেন নাই, তাঁহারা গরিব; তাঁহাদের অন্য কোথাও যাইবার সঙ্গতি নাই; সুতরাং তাঁহারা দেশের মাটী কামড়াইয়াই পড়িয়া আছেন। তাঁহারা সকলেই গরিব গৃহস্থ; অতি কষ্টে কোন রকমে তাঁহাদের দিনপাত হয়। তাঁহাদের সাধ্য কি যে, পুষ্করিণীগুলির সংস্কার করেন, বা নূতন জলাশয় খননের ব্যবস্থা করেন। তাঁহারা সেই সকল মলিন পঙ্কিল, নানা বিষাক্ত দ্রব্যপূর্ণ জলপান করেন। তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল ম্যালেরিয়া;—তাহার পর সর্ব্ব সন্তাপনাশিনী মৃত্যু আসিয়া তাঁহাদিগের সকল যন্ত্রণার অবসান করিয়া দেয়; আর যাঁহারা বাঁচিয়া থাকেন, তাঁহারাও জীবন্মৃত; সাগু ও কুইনাইন সম্বল করিয়া তাঁহারা দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতেছেন।

তাহার পর দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের গ্রাম পল্লী সকল জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এ দোষ কাহার? আমরা পল্লীবাসী; আমরা পল্লীর এ দুরবস্থার কারণ হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি। আমরা দেখিতে পাই, যাঁহার দুপয়সা সংস্থান হইল, তিনি আর দেশে থাকিতে চান না, সহরে নগরে গৃহ-নির্ম্মাণ করিয়া অথবা বাড়ীভাড়া করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন; দেশের বাড়ী পড়িয়া রহিল। হয়ত কাহারও গৃহে বহু-দিনের দেবসেবা আছে। চক্ষুলজ্জার দায়ে ত আর নারায়ণকে নদী জলে বিসর্জ্জন দিয়া সেবার দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন না। তাই, বিধবা মাসী, পিসি কি দিদি গ্রামের সেই ঠাকুর আগ্‌লাইয়া বসিয়া আছেন। প্রকাণ্ড বাড়ী, বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, বড় বড় বাগান! কিন্তু কে তাহাদের রক্ষণা-বেক্ষণ করে, কে সে সব দেখে। হয় ত একজন গোমস্তা বাড়ীতে আছে; সে বেচারী প্রজার কাছে খাজনা আদায় করে, যথাসময়ে বাবুদের নিকট টাকা পাঠাইয়া দেয়। এইটুকুই সে তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়া রাখিয়াছে। তাহার অধিক কিছু করা তাহার যে কর্ত্তব্য, তাহা সে জানেও না, বোঝেও না। ফলে অট্টালিকা-গুলি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, সমস্ত গৃহ, বাগান চত্বর জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া যাইতেছে; আর মশকবৃন্দ তাহাতে চিরস্থায়ী বাসা বাঁধিতেছে। ইহাই আমাদের গ্রাম পল্লীর সাধারণ অবস্থা। যে কোন গ্রামে যাইবে; দেখিতে পাইবে অনেক বাড়ী তালাবদ্ধ; বাড়ীগুলি দেখিলে মনে ভয়ের সঞ্চার হয়; সন্ধ্যার পর গ্রামের মধ্যে বাহির হইতে হইলে গা ছম্ ছম্ করে।

অনেকে হয় ত বলিবেন যে, এখন আমা-দের যে প্রকার অবস্থা হইয়াছে তাহাতে গ্রামে বাস করিলে গ্রাসাচ্ছাদন চলিবে কি করিয়া। পূর্ব্বে লোকের বড় একটা চাকুরী করিতে হইত না; গ্রামের দুই একজন লোক বিদেশে চাকুরী করিতে যাইত; আর সকলেই গ্রামেই বাস করিত; চাষবাস করিত; তাহাতেই এক রকমে মোটা ভাত, মোটা কাপড় চলিয়া যাইত। তখন গ্রামের শ্রী ছিল। এখন ত আর সে অবস্থা নাই; এখন অনেককেই দুই পয়সা উপার্জ্জনের জন্য দিল্লী লাহোর কোচবিহার যাইতে হয়, কালে ভদ্রে দুই চারি দিন ছুটী মিলে। এ অবস্থায় যাহা হয়, তাহাই হইতেছে। সেকালে অল্প

দুই চারি জন ভদ্রলোক চাকুরী করিতেন; তখন কর্ম্মস্থলে পরিবার লইয়া যাওয়ার রেওয়াজ ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না। এখন ত আর সেদিন নাই; এখন বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে যখন বার মাসই বিদেশে বাস করিতে হইবে, তখন স্ত্রী পুত্র কন্যা ছাড়িয়া থাকিলে নানা অসুবিধায় পড়িতে হয়। তাই এখন চাকুরীজীবিরা যাযাবরবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইচ্ছা করিয়া কে নির্ব্বাসন-দণ্ড গ্রহণ করিতে চায়?

কথাটা যে অসত্য, তাহা আমরা বলি না। সত্যসত্যই এখন ঐ প্রকারই অবস্থা হইয়াছে। কিন্তু তাহা বলিয়া যে কেহ বৎসরে একবারও পল্লীগৃহে যাইতে পারেন না, একথা স্বীকার করিতে কিছুতেই আমরা সম্মত নহি অবশ্য যাঁহারা অতি অল্প বেতনভোগী, তাঁহাদের পক্ষে মধ্যে মধ্যে সপরিবারে পল্লীভবনে গমন করা সাধ্যায়ত্ত নহে; কিন্তু আমরা ত তাঁহাদের কথা বলিতেছি না। যাঁহারা অবস্থাপন্ন, যাঁহারা জমিদার তাঁহারা দেশের মায়া ত্যাগ করাতেই দেশের এই দুরবস্থা হইয়াছে। ছুটী হইলে অনেকেই ত নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে যান; এমনও অনেককে জানি যাঁহারা অবকাশ সময় কলিকাতায় বাড়ীভাড়া করিয়া বাস করেন, অথচ গ্রামে নিজের বাড়ীতে যান না। কারণ জিজ্ঞাসা করিলেই বলেন "দেশে যে ম্যালেরিয়া, যে জলের কষ্ট, দেশে যাইয়া কি মরিব?" কিন্তু তাঁহারা মোটেই ভাবিয়া দেখেন না যে, তাঁহারা যদি যাতায়াত আরম্ভ করেন, তাহা হইলেই গৃহবেষ্টিত জঙ্গল, পঙ্কিল ও মলিন জলপূর্ণ জলাশয়ের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িবে এবং তাঁহারা ক্রমে ক্রমে জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধারে মনোনিবেশ করিবেন, বাড়ীর চারিদিকের জঙ্গল পরিষ্কার করিবেন। তাহা হইলেই গ্রাম বাসযোগ্য হইবে। সহরের বিলাসিতার প্রলোভন ত্যাগ না করিলে চলিবে না।

শ্রীজলধর সেন

স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী

"নহে কোন কর্ম্মী নহে কোন বীর,
নহে কোন ধনী গর্ব্বোন্নত শির,
কোন মহারাজা নহে পৃথিবীর,
তবু কাঁদ কাঁদ জনম ভূমির,
সে এক দরিদ্র কবি।"

কয়েক মাস পূর্ব্বে গৃহস্থের পাঠকগণের নিকট বর্দ্ধমান জেলার একজন প্রাচীন সাধক কবির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলাম। অদ্য ঐ জেলার বর্ত্তমানকালের আর একজন কবির বিবরণ লইয়া উপস্থিত হইতেছি।

জন্ম ও বংশপরিচয়

বাণীর একনিষ্ঠ সাধক, গৌরাঙ্গদেবের পরম ভক্ত স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয় ১৭৭২ শকের ৫ই ফাল্গুন রবিবার রাত্রি ১০ টার সময় বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত দেমুড়

গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺শ্রীরাম ব্রহ্মচারী ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাজসাহী দেওয়ানী আদালতের নাজির ছিলেন। মহারাজ আদিশূর আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম ভরদ্বাজ গোত্রসম্ভূত শ্রীহর্ষের পুত্র ভিগুসাহী গ্রামী সতের পুত্র শুদ্ধ শ্রোত্রীয় রায় পরমানন্দ দেম্বর ব্রহ্মচারী বংশের প্রবর্ত্তক। শ্রীমৎ চৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গুরু শ্রীপাদ্ কেশব ভারতী প্রভুর ভ্রাতা বলভদ্র অম্বিকাচরণের অন্যতম পূর্ব্বপুরুষ। রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিভুক্ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ ব্রহ্মচারী এম্ এ, বি এল্, সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী এম্ এ, এম্ ডি, পিএচ্ ডি, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ব্রহ্মচারী এম্ এ, প্রভৃতি সুবিখ্যাত ব্যক্তিগণ এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

বাল্যজীবন

অম্বিকাচরণ শৈশবে গ্রাম্য পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করেন। পরে দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে রামপুর বোয়ালিয়ায় পিতৃসমীপে গমন করিয়া রাজসাহী গবর্ণমেণ্ট স্কুলে ইংরাজী পড়িতে প্রবৃত্ত হন। বাল্যকাল হইতেই তিনি সাহিত্যের আবহাওয়ার মধ্যে লালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। "দেবীযুদ্ধ" প্রণেতা সুকবি শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, কবি ও মানবতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত শশধর রায়, ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার রাজসাহী স্কুলে অম্বিকাচরণের সতীর্থ ছিলেন। স্বর্গীয় তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় সেই সময়ে রাজসাহী স্কুলের প্রধান পণ্ডিত। তিনিই ইহাঁদের রচনা শিক্ষার গুরু। "হিন্দুরঞ্জিকা" ও "রাজসাহী সংবাদ" পত্রে তাঁহাদের বাঙ্গালা রচনার হাতে খড়ি। "রাজসাহী সংবাদ" সম্পাদক জগচ্চন্দ্র চৌধুরী এবং "জ্ঞানাঙ্কুর" সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণদাস নিজ নিজ পত্রিকায় তাঁহাদের রচনা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ উৎসাহিত করিতেন। "জ্ঞানাঙ্কুর" সে সময়ে একখানি লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্র ছিল। পাঠ্যাবস্থাতেই অম্বিকাচরণ উক্ত জ্ঞানাঙ্কুর পত্রে কয়েকটী গদ্য ও পদ্য প্রবন্ধ লিখিয়া সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অম্বিকাচরণ অধিকাংশ সময় সাহিত্যালোচনাতেই অতিবাহিত করিতেন, বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগ দিতেন না; এবং স্কুলের প্রচলিত শিক্ষাও তাঁহার রুচিকর ছিল না। সেই জন্য তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় দুইবার অকৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করেন, এবং অব্যাহত চিত্তে সাহিত্য চর্চ্চায় ব্রতী হন।

সাহিত্য চর্চ্চা

অম্বিকাচরণ পত্রান্তিক কাব্য, সুভদ্রাহরণ কাব্য, আমেরিকা আবিষ্কার কাব্য, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ নাটক, বঙ্গরত্ন ১ম ও ২য় ভাগ প্রভৃতি গ্রন্থ এবং অনেকগুলি গান ও খণ্ড কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি নববিকাশ, শান্তিকণা, শ্রীগৌরাঙ্গসেবক, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, আনন্দবাজার ও শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াপত্রিকা, পল্লীবাসী প্রভৃতি সাময়িক পত্রের নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাঁহার রচিত কয়েক খানি গ্রন্থ এবং অনেক গুলি গান ও কবিতা এখনও অমুদ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে।

পত্রান্তিক কাব্য

অম্বিকাচরণ যে সময়ে সাহিত্য চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হন, তখন বঙ্গসাহিত্যে মধুসূদনের যুগ। এখন বঙ্গসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যুগ।

এখন প্রায় সকল লেখকই জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক ভাবে, ভাষায় ও ছন্দে রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ করিয়া থাকেন। সেইরূপ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে মধুসূদন স্বীয় দৈবী প্রতিভাবলে ভাবের গাম্ভীর্য্যে, ভাষার ওজস্বিতায় ও ছন্দের নূতনত্বে বাঙ্গালা কবিতায় যে নবজীবন সঞ্চার করিয়াছিলেন, সে কালের সকল কবিই তদ্দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, এবং প্রায় সকলেরই লেখায় অল্পাধিক পরিমাণে তাঁহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অম্বিকাচরণও সেই প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। তাঁহার "পত্রাষ্টক" কাব্য মধুসূদনের "বীরাঙ্গনা" কাব্যের অনুকরণে লিখিত। বীরাঙ্গনার অনুকরণে সে সময়ে আরও কয়েক খানি কাব্য লিখিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের মধ্যে পত্রাষ্টকই সর্ব্ববাদিসম্মত শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছিল। রামদাস সেন, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাকুমার কবিরত্ন, রাজকৃষ্ণ রায়, যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সুবিখ্যাত সাহিত্যিকগণ এবং প্রায় সমস্ত সাময়িক পত্রের সম্পাদক একবাক্যে পত্রাষ্টকের সুখ্যাতি করিয়াছিলেন।

বীরাঙ্গনা ও পত্রাষ্টক

বীরাঙ্গনার অনুকরণে লিখিত হইলেও পত্রাষ্টক কাব্যে কবির মৌলিক প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অধিকাংশ স্থলেই ভাব ও ভাষা কবির সম্পূর্ণ নিজস্ব। বীরাঙ্গনার ভাব গম্ভীর, রচনা ওজোগুণসম্পন্ন; পত্রাষ্টকের ভাব মধুর এবং রচনা প্রাঞ্জল ও প্রসাদগুণসম্পন্ন। বীরাঙ্গনার ন্যায় পত্রাষ্টকের পত্র কয়খানি কতিপয় পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। কিন্তু বীরাঙ্গনার এমন অনেক বিষয় আছে যাহা চিরন্তন হিন্দু সংস্কারের বিরোধী এবং হিন্দু পুরাণ ইতিহাসের অননুমোদিত। মধুসূদন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, পাশ্চাত্য ভাবে অনুপ্রাণিত, আচারভ্রষ্ট, ধর্ম্মান্তর পরিগ্রাহী। তিনি অনেকটা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াই হিন্দুর চিরাগত সংস্কারকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু অম্বিকাচরণ কিয়ৎপরিমাণে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলেও হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া আবাল্য কঠোর সংযম ও বিধিনিষেধের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন; নিজেও নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন এবং পরধর্ম্মকে ভয়াবহ বলিয়া মনে করিতেন। হিন্দু সংস্কারের বিরোধী বা হিন্দু ধর্ম্মের অননুমোদিত কোন ভাব তাঁহার রচনা মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। পৌরাণিক কোন চিত্রকে তিনি ম্লান করেন নাই, বরং স্থানে স্থানে অধিকতর উজ্জ্বল করিয়াছেন।

মহর্ষির সীতা রমণীকুলের আদর্শ, পাতিব্রত্য ধর্ম্মের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি। অম্বিকাচরণও একখানি ক্ষুদ্র পত্রে মহর্ষির সেই বিরাট ভাব সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন, পতিবিরহে পতিপ্রাণা জানকী জীবন ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

"একবার লঙ্কাধামে তোমার বিরহে,
তব নাম সুধাপানে পূর্ব্বে বাঁচিয়াছি,
আবার সে নাম সুধা হয়েছে সম্বল,
তাই বুঝি সুধাপানে হয়েছি অমর।
আরো এক বাঁচিবার হয়েছে কারণ,
বিনয়ে নিবেদি তাহা রাজীব চরণে ;—
রামরাজা হয়েছেন এবে ভবধামে,
সুখময় রামরাজ্যে সুখী সমুদয়
হেরি যত দুঃখচয়, না পেয়ে আশ্রয়
অনাথ হইয়া তারা ভ্রমিতে ভ্রমিতে
আসিয়া কান্তারে, হেরি শোকাকুলা মোরে,
নিবেদিলা সবে মেলি কৃতাঞ্জলি করি ;

"জগতে যেখানে যাই সেইখানে হেরি
রামরাজ্যে সুখী সবে কেহ নহে দুঃখী ;
বল মা কেমনে তবে, কোথা যাই মোরা ;
তুমি যদি কৃপা করি দেহ গো আশ্রয়,
তবে ত থাকিতে পারি এ ভব মাঝারে,
নতুবা দুঃখের নাম যায় ভব হ'তে।"
শুনিয়া দুঃখের দুঃখ হেরিয়া নয়নে,
দিলাম আশ্রয় নাথ তা'সবারে আমি ;
তেঁই নাথ আছে সীতা এখন জীবিতা,
তাদের আশ্রয় হয়ে ; মরি যদি আমি
যায় তারা কোথা বল, আধার ভাঙ্গিলে
থাকে কি সলিল কভু নিরাশ্রয়ে আর।
যতদিন দুঃখচয় থাকে দেহে মোর
ততদিন মাত্র সীতা আছে ভবধামে।"

কবির এই অভিনব কল্পনাটী কি সুন্দর! কি মধুর!

শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদে "মধুর বৃন্দাবন" যেরূপ শ্রীহীন হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা পাঠকালে বোধ হয় যেন স্বচক্ষে সেই ভাব প্রত্যক্ষ করিতেছি। সাধ্য ও সাধকের মাখামাখি ভাবই সাধকের যে চরম ও পরম আনন্দ, এবং কোনও অপরিহার্য্য ঘটনাসূত্রে সেই ভাবের শিথিলতায় সাধকহৃদয় কি যেন কি হারাধন পুনঃ পাইবার আশায় যে উন্মত্তাবস্থা প্রাপ্ত হয় আমাদের আদর্শ সাধ্য-সাধকের সেই ভাব, সেই অবস্থা কবি শ্রীরাধিকার পত্রচ্ছলে অতি সুন্দর রূপে বুঝাইয়াছেন। আবার "শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি শচীমাতা" অনাবিল বাৎসল্য রসের অফুরন্ত প্রস্রবন। কবি এই পত্রগুলিতে রমণীর পত্নীত্ব ও মাতৃত্ব দুই ভাবই বেশ সুন্দররূপে পরিস্ফুট করিয়াছেন।

প্রাচীন সাহিত্যালোচনা

প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ অম্বিকাচরণের জীবনের প্রধান কীর্ত্তি। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া এ বিষয়ে অনেক লোকের আগ্রহ পরিদৃষ্ট হইতেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কয়েকজন সদস্যের চেষ্টায় পরিষদ্ পুস্তকালয়ে অনেক প্রাচীন পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। আশা করি ঐ সকল উপকরণ হইতে অচিরে বঙ্গসাহিত্যের একখানি ধারাবাহিক ইতিহাস রচিত হইবে। অম্বিকাচরণ ত্রিশ বৎসর কাল উক্ত কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতি অনুরাগবশতঃ প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মে। তিনি চৈতন্যভাগবত রচয়িতা বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের এবং ধর্ম্মমঙ্গল প্রণেতা ঘনরামের জীবনী সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করিয়া বঙ্গরত্ন ১ম ও ২য় ভাগ নাম দিয়া দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত চৈতন্য ভাগবতের অপূর্ব্ব প্রকাশিত শেষ তিন অধ্যায় সংগৃহীত ও সম্পাদিত হইয়া কালনা হইতে প্রকাশিত "পল্লীবাসী" নামক সংবাদ পত্রের উপহার রূপে বিতরিত হইয়াছিল। বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের আর একখানি অপূর্ব্ব প্রকাশিত গ্রন্থ "ভক্তি চিন্তামণি" তিনি পাঠান্তর, শাস্ত্রীয় বচন ও বিস্তৃত কবি জীবনীসহ সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। সেখানি এখনও অমুদ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে। বর্ত্তমান কালের অনেক ঐতিহাসিক মহারাজ আদিশূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু অম্বিকাচরণ বহু প্রাচীন সাহিত্য ও কিংবদন্তি হইতে সে সন্দেহ নিরাশ করিয়াছেন এবং প্রমাণ করিয়াছেন যে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত "শূরনগর" বা "শূরো" আদিশূরের রাজধানী ছিল। তদ্বিষয়ক তাঁহার একটী প্রবন্ধ সাহিত্য পরিষদে পঠিত ও পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া সাহিত্য পরিষদের "সহায়ক

সদস্য" ছিলেন, এবং বহু পুঁথি সংগ্রহ করিয়া পরিষদ্ পুস্তকালয়ে উপহার দিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতি তাঁহাকে প্রদর্শনী বিভাগের অধ্যক্ষ মনোনীত করিয়াছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় সে ভার অন্য ব্যক্তির প্রতি অর্পিত হয়। তবে তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ব্রহ্মচারী তাঁহার সংগৃহীত কতকগুলি প্রাচীন পুঁথি, মুদ্রা ও হস্তাক্ষর প্রদর্শনী ক্ষেত্রে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে শ্রীমৎ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর হস্তাক্ষর বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ধর্ম্ম-জীবন

অম্বিকাচরণের জন্মস্থান দেনুড় গ্রাম বৈষ্ণবদের একটী প্রধান তীর্থ। এই স্থানেই শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাট এবং এখনও সেখানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ বর্ত্তমান। অম্বিকাচরণ স্বয়ং শ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাসগুরু কেশব ভারতীর ভ্রাতৃবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। কেশবভারতীর শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ আজ পর্য্যন্ত নিত্য তাঁহাদের গৃহে পূজিত হইয়া থাকেন। এই সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বাস করায় বাল্যকালেই তাঁহার বৈষ্ণব ধর্ম্মে প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছিল, এবং তিনি চির-জীবন শ্রীগোবিন্দদেবের পরম ভক্ত ও শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন। "নামে রুচি, জীবে দয়া" তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্র ছিল। তাঁহার দীনতাব্যঞ্জক প্রতিভাদীপ্ত নয়ন যুগল ও প্রশান্ত মুখমণ্ডল দেখিলে হৃদয়ে স্বতঃই ভক্তির উদ্রেক হইত। তাঁহার নিত্যানন্দ নাটকের অভিনয় দর্শনে অতি কঠোর হৃদয় ব্যক্তিও অশ্রুসংবরণ করিতে পারে নাই। সংসারের অনেক ঝঞ্ঝাবাত্যা তাঁহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। পত্নী বিয়োগ, উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু কিছুই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। ইষ্টদেবতার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া সকল প্রকার সাংসারিক জ্বালা যন্ত্রণা তিনি নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন। বাস্তবিক, তিনি "তৃণাদপি সুনীচ ও তরোরপি সহিষ্ণু" ছিলেন। বৈষ্ণব সমাজে তাঁহার বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। বৈষ্ণব-সমাজ কর্ত্তৃক তিনি "ভক্তি রঞ্জন" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। স্বধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় আস্থা থাকিলেও অন্য ধর্ম্মে তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না। রামকৃষ্ণ পরমহংস, কেশবচন্দ্র সেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি মহাত্মগণকে তিনি অন্তরের সহিত ভক্তি করিতেন।

উপসংহার

গত ১৩২১ সালের ৩রা মাঘ রবিবার রাত্রি ৯টার সময় অম্বিকাচরণ ইষ্টদেবতার নাম জপ করিতে করিতে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৬৪ বৎসর হইয়াছিল। তিনি বিনয়ী, সদালাপী ও বন্ধুবৎসল ছিলেন। তিনি চিরজীবন নীরবে সাহিত্য সেবায় ও ধর্ম্মালোচনায় অতিবাহিত করিয়াছেন; কখন বিষয়কার্য্যে মনোনিবেশ করেন নাই। তিনি সংসারী হইয়াও সংসারে অনাসক্ত ছিলেন। এক সময়ে ছোটলাট ক্যাম্বেল সাহেব তাঁহাকে সবডেপুটীর কার্য্য দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। অর্থোপার্জ্জনে স্পৃহা না থাকায় অম্বিকাচরণ সে কার্য্য গ্রহণ করেন নাই। সেই সকল কারণে শেষ জীবনে তাঁহাকে কিছু অর্থকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল।

অম্বিকাচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ব্রহ্মচারী পিতার ন্যায় সাহিত্যানুরাগী ও স্বধর্ম্মপরায়ণ। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তিনিও পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করুন।

শ্রীকামিনীনাথ রায়

লণ্ডনে সমাজসেবা

(SOCIAL SERVICE IN LONDON)

গত অক্টোবর মাসের 'সোশ্যাল সার্ভিস কোয়ার্টারলী' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত এন্, এম্ মজুমদার বিএ, বি এস্‌সি (লণ্ডন) মহাশয় লণ্ডনে সমাজ-সেবা সম্বন্ধে একটী সুলিখিত, নানা জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। ইংল্যাণ্ডের রাজধানী লণ্ডনে সেবাব্রত কিরূপ বিস্তৃত ও প্রণালীবদ্ধ ভাবে চলিয়া থাকে তাহা হইতে নবভাবে উদ্বুদ্ধ ভারতবর্ষের অনেক শিখিবার আছে। আমরা নিম্নে উক্ত প্রবন্ধটীর সারাংশ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া দিলাম।

ভারতবর্ষে সমাজ-সেবার একান্ত আবশ্যকতা এক্ষণে আমরা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি। সমাজ বলিয়া যে একটা প্রাণবান্ জিনিষ আছে তাহা এখন সকলে অনুভব করিতেছেন। ভারতীয় সমাজদেহ যে নানা রোগগ্রস্ত, ভারতীয় সমাজের উন্নতির জন্য সমাজ-সেবা যে একান্ত প্রয়োজনীয় তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছেন। সমাজ সেবা শুধু মুষ্টিভিক্ষা দান নহে, ইহার এতদপেক্ষা অনেক উচ্চতর অর্থ আছে, সুতরাং বর্ত্তমান জগতে ইহাকে নিয়ন্ত্রিত ভাবে চালাইতে হইলে সুচিন্তিত প্রণালী ও জোট বাঁধা দরকার—একথা এখন আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। সমাজকে পূর্ণভাবে উন্নত করিতে হইলে সমাজের লোকেরই চেষ্টা করিতে হইবে। বাহিরের লোকের করুণা কখনও কোনও সমাজের বা জাতির শক্তি-সঞ্চার করিতে পারে না।

প্রতীচ্য হইতে আমাদের অনেক বিষয় শিখিবার আছে। এখন আমাদের সমষ্টি জ্ঞানের উদ্রেক হইয়াছে, সমাজের রক্ষা ও কল্যাণের কথা ভাবিবার প্রবৃত্তি বহু আশা সম্মুখে লইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। তাই সেবাব্রতে অগ্রসর প্রতীচ্য হইতে সামাজিক কর্ত্তব্যের বিষয়ে শিক্ষা লইতে হইবে। মানুষকে শক্তিশালী ও কার্য্যক্ষম করিবার জন্য, তাহার শারীরিক মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য পাশ্চাত্য জগতে কতশত স্বেচ্ছাসেবী স্বেচ্ছায় কর্ম্মব্রতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। লণ্ডনেই সমাজহিতসাধনের কেন্দ্রস্থান। কি মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া, লণ্ডনে নানাবিধ হিতসাধন সভা সমিতি স্থাপিত হইয়াছে, কি পদ্ধতিতে সেখানে সমাজ-সেবকগণ কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদের চেষ্টা কিরূপ ফলপ্রসূ হইয়াছে প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করিয়া ভারতীয় নব্য সমাজ-সেবকগণ অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারিবেন।

শিশু-সেবা

প্রথমে জাতির যাহারা ভবিষ্যৎ সেই শিশুদের কথা ধরা যাউক। জাতির ভবিষ্যৎ শিশুর উপরেই নির্ভর করে। লণ্ডনে তাই শিশুদের মঙ্গলের জন্য শত শত সমিতি গঠিত হইয়াছে। শিশুদিগের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির প্রয়াস কেবল লণ্ডন নগরীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে; এই আন্দোলন সমগ্রদেশব্যাপী। বালক বালিকাগণের শারীরিক, মানসিক ও

নৈতিক পুষ্টির জন্য যাহা যাহা আবশ্যক, তাহাদের অন্তর্নিহিত সুপ্ত গুণগুলির পূর্ণ বিকাশের জন্য যে যে উপায় অবলম্বন করা উচিত, তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য 'শিশু-পর্য্যবেক্ষণ-সমিতি' (Child Study Society') নামে এক সভা স্থাপিত হইয়াছে। এই সভা হইতে Child Study ও Child নামক যে দুই খানি পত্রিকা বাহির হয়, তাহা শিশুজীবন সংক্রান্ত বহু প্রবন্ধ ও আলোচনায় পূর্ণ থাকে। জননীর লালন পালনের প্রভাব শিশুর ভবিষ্যৎ চরিত্রের উপর বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। নারীজাতিকে নিম্নে ফেলিয়া কোন দেশ উচ্চে উঠিতে পারে না। মাতৃত্বের কঠোর দায়িত্বে দীক্ষা দিবার জন্য লণ্ডনে তাই বহুসংখ্যক "মাতৃসভা" (Mothers' Association) আছে। লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলের পরিপোষকতায় অনেকগুলি "স্ত্রী-মণ্ডলী" (Women's Institutes) গঠিত হইয়াছে। সন্তানপালন সম্বন্ধে সেখানে প্রায়ই বক্তৃতা দেওয়া হয়। যে সকল দরিদ্র জননীকে কারখানায় বা ক্ষেত্রে কাজ করিতে হয় তাহাদের শিশুদিগকে দিবাভাগে লালন করিবার জন্য "দিবা লালন-আগার" (National Society of Day Nursuries) আছে।

অনেকে দেখিয়া থাকিবেন ভারতবর্ষের কল কারখানাতে স্ত্রী মজুরেরা প্রায়ই বাধ্য হইয়া শিশুদিগকে কর্ম্মস্থলে আনিয়া থাকে অথবা অহিফেন সেবন করাইয়া শিশুকে শান্ত ও নিদ্রিত করাইয়া রাখে। কারখানার দূষিত বায়ু ও কোলাহলের মধ্যে থাকিয়া শিশুদের যথেষ্ট স্বাস্থ্যহানি হয় এবং অনেক স্থলে যৌবনে বলিষ্ঠ ও সুস্থকায় হইবার আশা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। শিশুদিগকে অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে ভালভাবে প্রতিপালন করিবার জন্যই "লালন আগারের" প্রতিষ্ঠা। ইহার আর একটী কাজ আছে—স্ত্রীলোকদিগকে সন্তান-পালনে শিক্ষা দেওয়া। যে সকল বালকবালিকা স্কুলে যায় তাহাদিগের জন্য 'শিশুতত্ত্বাবধান-সমিতি' আছে (Children's care Committees)। এই কমিটির অন্তর্ভুক্ত কর্ম্মীর সংখ্যা অন্যান্য সম্প্রদায়গুলির অপেক্ষা অনেক বেশী। ইহাঁদের মধ্যে অনেকেই স্ত্রীলোক, কেহ কেহ বা স্ত্রী গ্র্যাজুয়েট। ইহাঁরা প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলির সহিত সংশ্লিষ্ট ভাবে কাজ করিয়া থাকেন। ছেলেদের কল্যাণ ও পুষ্টির দিকে তাঁহারা বিশেষ লক্ষ্য রাখেন, তাহাদের গৃহ ও পরিবারগণের পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন, এবং যাহাতে সন্তানগণ স্বাস্থ্যবান্, প্রফুল্ল বুদ্ধিমান্ হইয়া উঠিতে পারে তদ্বিষয়ে পিতামাতাদের শিক্ষা দেন।

দরিদ্র, গৃহহীন, অত্যাচার-পীড়িত, বিকলাঙ্গ, রুগ্ন বালকবালিকাদিগের প্রতি সমাজসেবকের সবিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ প্রয়াস এই সকল হতভাগ্যের দুঃখ দূরীকরণার্থ নিয়োজিত হইয়াছে। দুঃখীর সন্তানের বাসের জন্য গৃহ, শিক্ষার জন্য শিক্ষাগারের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। তরুণ অপরাধীর জন্য সংশোধনশালা নির্ম্মিত হইয়াছে। গৃহহীন শিশুর নিমিত্ত কুটীর Cottage Homes আছে। অনেকগুলি কৃষিবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। রেডহিলের (Redhill) "বিশ্বহিতৈষিণীসভা" (Philanthropic Society) এইরূপ একটী বিদ্যালয় পরিচালন করিয়া থাকেন। এই সভা প্রায় আট হাজার বালকের উদ্ধারসাধন করিয়াছেন! তাহারা কৃষিবিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর

শিক্ষা পাইয়া, এখন স্বদেশের ক্ষেত্রে বা উপনিবেশে কাজ করিতেছে। "পরিত্যক্ত নিঃস্ববালকহিতৈষিণী সভা" (The waifs' and Strays' Society). প্রায় ৪,৫০০ বালককে ভরণপোষণ করিয়া থাকেন। কতশত অসহায়, গৃহশূন্য, নিরুপায় বালক এই সভার সহায়তায় আশ্রয়, ভরণপোষণ ও শিক্ষা পাইয়া কালে কার্য্যক্ষম, উপার্জ্জনক্ষম মানুষ হইতে পারিয়াছে। "Referee Dinner Fund" গত কুড়ি বৎসর অভাবগ্রস্ত বিদ্যালয়ের বালকগণকে আহার জোগাইয়া আসিয়াছেন। মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত শিক্ষা সমিতি এখন ভোজনের বন্দোবস্ত করিয়াছেন, এবং কোন কোন স্থানে ছুটির দিনও ছেলেদের খাইতে দেওয়া হয়। এই সমিতির নিযুক্ত চিকিৎসকগণ মধ্যে মধ্যে ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া থাকেন।

অনাথ, বিকলাঙ্গ, অন্ধ, পঙ্গু, বধির, মূক বালকদিগের জন্য অসংখ্য আশ্রম নির্ম্মিত হইয়াছে। ডাক্তার বার্ণার্ডোর আশ্রমে এক হাজার বালক স্থান পাইয়াছে। ইহা ছাড়া "উপেক্ষিত শিক্ষা-বিজ্ঞান-মণ্ডলী" (*The Ragged School Union*) ৭০০০ বিকলাঙ্গ ছাত্রকে শিক্ষা দিতেছেন। বালকদিগের বিনাব্যয়ে চিকিৎসার নিমিত্ত Queen's Hospital প্রভৃতি অনেকগুলি আরোগ্যশালা (Hospital) খোলা হইয়াছে এবং তাহাদের পীড়াবসানে স্বাস্থ্যলাভের জন্য পঞ্চাশটীর উপর স্বাস্থ্যনিবাসের বন্দোবস্ত আছে। "জাতীয় শিশুনিবাস" (The National Children's Home) নামে Harpendenএ এইরূপে একটী স্বাস্থ্যনিবাসে দীন বালকের চিকিৎসা চলিয়া থাকে। এখানে রোগীরা যাহাতে গৃহের ন্যায় স্বচ্ছন্দে এবং আনন্দে থাকিয়া লেখাপড়া শিখিতে পারে তাহার সুন্দর ব্যবস্থা আছে। "শিশুর প্রতি দুর্ব্যবহার নিবারিণী সভার" শাখা সমগ্র দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই সভার সভ্যগণ শিশুগণের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহারের নিবারণ ও প্রতিবিধান করিয়া থাকেন। *The children's fresh air Mission* এবং *Country Holiday Fund* নগরের দরিদ্র বালকদিগকে পল্লীর মুক্ত বিশুদ্ধ বায়ু সেবন এবং ভ্রমণের সুযোগ দিয়াছেন। *The children's Happy Evenings Association* হইতে চল্লিশ হাজার বালকবালিকার জন্য স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম ও ক্রীড়ার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্রীমতী হামফ্রী ওয়ার্ড—প্রতিষ্ঠিত *Evening Play Centres* ছেলেদের খেলিবার খরচ যোগাইয়া থাকেন। বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় অনেকে Boy Scouts আন্দোলনের কথা শুনিয়া থাকিবেন। এই সকল বালক গুপ্তচর শত্রুনিবাসের চারিপার্শ্বে পরিভ্রমণ করিয়া শত্রুসৈন্যের সংখ্যা, অবস্থান, পরিচালন প্রভৃতি সম্বন্ধে সন্ধান দেয়। বিলাতে The Boy Scouts Association এ এক লক্ষ চল্লিশ হাজার বালক গুপ্তচর আছে। Scoutএর বিষয় শিখিবার সময় বালকেরা অনেক প্রকার কার্য্যোপযোগী জ্ঞান পাইবার সুবিধা পায়। বালিকাদিগের নিমিত্ত এইরূপ "বালিকা শিক্ষাবিধান" (Girl Guide) আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে। Guide সভা বালিকাগণের শারীরিক উন্নতিরদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। তাহারা এখান হইতে গৃহস্থালী-কাজ, সমাজসেবা, শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, শিল্পকর্ম্ম, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা পায়। সমাজের সকল শ্রেণীরই বালকবালিকারা এই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছে।

Batcombeতে তরুণ অপরাধীদিগের সংশোধনের নিমিত্ত যে "শিশু সাধারাণ তন্ত্র" (Little common wealth) এর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহা এক অভিনব ব্যাপার। ইহার নাগরিকগণের বয়স চৌদ্দ হইতে সতের! তাহারা নিজেদের শাসন নিজেরাই করিয়া থাকে। তাহাদের নিজেদের আইন-ব্যবস্থাপক, পুলিশ, বিচারক এবং শাসক আছে। তাহাদের "জনসাধারণের" মতবাদ পরস্পরকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। তাহারা খাটিয়া পয়সা উপায় করে, আইন ও শান্তির কদর করিতে শিখে এবং দুর্বৃত্তি ছাড়িয়া যাহাতে দশের ও দেশের উপকারে আসিতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করে। কতকগুলি রাজকর্ম্মচারী ও স্বেচ্ছা-সেবক লইয়া "শিশুপরামর্শদানমণ্ডলী" (The Juvenile advisory Committees) গঠিত হইয়াছে। যখন ছাত্রগণ স্কুল ছাড়িয়া সংসারে প্রবেশ করে এবং জীবিকানির্ব্বাহো-পযোগী কাজের জন্য ছুটিয়া বেড়ায়, তখন উক্ত মণ্ডলী তাহাদের কাজ জুটাইয়া দেন। দারুণ বেকার সমস্যার নিরাকরণের জন্য ইহা একটি সুন্দর উপায়। আমাদের অভাগা বেকরাদের উদরান্ন জুটাইয়া লইবার জন্য কেজো (practical) পরামর্শ দিবার ভার কাহারা লইবেন, তাহাদের জন্য কর্ম্মক্ষেত্র কাহারা প্রস্তুত করিবেন?

শিক্ষা

ইংল্যাণ্ডে অসংখ্য শিক্ষাসংঘ গড়িয়া উঠি-তেছে। আমরা এই প্রবন্ধের মাত্র কয়েকটীর উল্লেখ করিব। ব্রিটিশ ও বৈদেশিক বিদ্যালয় সংহতি (*The British and Foreign Schools Society*) প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। এই সংহতিই প্রথমে বিলাতে শিক্ষার আন্দোলন তুলেন। অল্পদিন হইল শিক্ষাদান রাষ্ট্রীয় ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন আইনের সাহায্যে সকলকে লেখাপড়া শিখিতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে ইঁহারাই দেশকে শিক্ষিত করিতে মনোযোগী হইয়াছিলেন। "জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ" (The National Educational Association) এইরূপ আর একটী সংঘ।

কিন্তু "শ্রমজীবি শিক্ষা পরিষৎ"ই (Workers Educational Association) বিলাতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। পরিষৎ উক্ত W. E. A. নামে সকলের নিকট পরিচিত। ইহা ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু এত অল্পকালের মধ্যেই সহস্রাধিক, সমিতি, শ্রমজীবি-সম্মিলন (Trade Unions) কো-অপারেটীভ কমিটি, শিক্ষক সম্মিলন, (Teachers Union) যুবক বিদ্যালয় "Adult schools" সহায়ক সমিতি "friendly Societies" রবিবাসরীয়বিদ্যালয় প্রভৃতি সকলের মিলনক্ষেত্র হইয়াছে। বিলাতের মজুরগণের মধ্যে লেখাপড়া শিখিতে কি আগ্রহ তাহা শ্রমজীবি-শিক্ষা-সমবায়ের কার্য্যাবলী হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। মজুরেরা নিজেরাই নিজেদের শিক্ষার জন্য প্রথম আন্দোলন তুলে। ১৯০৭ সাল হইতে বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি উচ্চশিক্ষা বিষয়ে তাহাদের সাহায্য করিতেছেন। শিক্ষাসমবায়ের কর্ম্মি-গণ শ্রমজীবিগণের মধ্যে উচ্চশিক্ষা লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া থাকেন এবং শিক্ষার যথাসাধ্য বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তাঁহারা মজুরদিগের শিক্ষাসংক্রান্ত অভাব অসুবিধা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া অধ্যাপক ও বিদ্যালয় পরিচালকগণের সহিত পরামর্শ করেন। শিক্ষাসমবায়ের উদ্যোগে রিপোর্ট, পুস্তিকা,

পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে। লণ্ডনে ইহাঁর তত্ত্বাবধানে একটী প্রকাণ্ড কলেজ চলিতেছে। কলেজে ১১৭টী ক্লাস আছে। ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা তিন হাজারের বেশী; ছাত্রীর সংখ্যা মোটের উপর ৬০০ এবং তাহাদের মধ্যে অনেককেই মজুরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়। সন্ধ্যাকালে ক্লাস বসে এবং প্রত্যেক ছাত্রকে তিন বৎসর এই কলেজে পড়িতে হয়। প্রত্যেক শ্রেণীতে ৩০ জনের অধিক ছাত্র লওয়া হয় না। কলেজে বক্তৃতা করা ছাড়া শিক্ষকগণ বাহিরে সমিতিতে, সম্মিলনে, কো-অপারেটিভ সোসাইটীতে, অন্যান্য স্কুলে, কলেজে, এমন কি গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা করিয়া থাকেন। ছাত্রীরা কলেজের পাঠ্যপুস্তক ছাড়া গৃহস্থালী-বিজ্ঞান, সূচীর কাজ, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, সন্তান-পালন প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত সরকারের তরফ হইতে যে সকল কমিশনার নিযুক্ত হন তাঁহারা এই সকল শ্রমজীবিছাত্রগণের বিদ্যা ও জ্ঞানলাভের আগ্রহ দেখিয়া বাস্তবিকই বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "বিশ্ববিদ্যালয় মাত্রেরই উচিত দেশের মজুরগণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার করা, এখানেই ইহার সার্থকতা।" একবার কোন শ্রমজীবিশিক্ষাসমবায়ের ছাত্র বলিয়াছিলেন, "জীবনের উদ্দেশ্য জীবনের মলিনতা সম্পূর্ণরূপে দূর করা।" কুলীমজুরগণের অবস্থার উৎকর্ষসাধন ও তাহাদের জীবনকে উন্নত করিবার মহৎ উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া শ্রমজীবিশিক্ষা-পরিষদের কর্ম্মিগণ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

অপরাধী

অপরাধিগণের সংশোধন করিয়া সমাজে ফিরাইয়া আনিবার জন্য কতকগুলি মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। The Barstal Association এবং ইহার শাখাগুলি প্রতি বৎসরে সহস্রাধিক তরুণ অপরাধীকে উদ্ধার করে। (*The Central Association for the aid of discharged convicts*) মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীর সাহায্যের জন্য যে কেন্দ্রসভা আছে সেখান হইতে বয়স্ক কয়েদীদিগকে শোধরাইয়া লওয়া হয়। সভার অন্তর্গত শাখা সমিতিগুলি তাহাদের কারাবাস শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার ভার গ্রহণ করেন। তাহাদের অবস্থাদি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে তদন্ত করা হয় এবং কারামুক্তির পরই যাহাতে তাহারা সাধুপথে থাকিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে পারে তাহার উপায় করিয়া দেওয়া হয়।

দৈন্য নিবারণ

শুধু দরিদ্রের দুঃখ দূর করিয়া লণ্ডনের সমাজসেবিগণ নিশ্চিন্ত নহেন, তাঁহারা দারিদ্র্যের মূলে কুঠারাঘাত করিতে চাহেন। ১৯১২ সালে শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী সিডনি ওয়েবের উদ্যোগে জাতীয় দারিদ্র্য-নিবারিণী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। শিশুদিগের শরীর ও মনের প্রকৃত পুষ্টির প্রতি যাহাতে অবহেলা করা না হয়, দুর্ব্বলমতি ব্যক্তিগণের পরিচর্য্যা, যক্ষ্মারোগ নিবারণ, জীবন বীমার আবশ্যকতা, আলস্য, শৈথিল্য, শ্রমবিমুখতা নিবারণ প্রভৃতি বিষয়ে জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়াই সভার একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রায় পাঁচশত বক্তা ও লেখক এই সভার অন্তর্ভুক্ত আছেন। তাঁহারা দরিদ্রতার কারণ ও নিবারণের উপায় সম্বন্ধে বক্তৃতা ও আলোচনা করেন, ও কাগজে লিখিয়া

থাকেন। দারিদ্র্য-ব্যাধি আরোগ্য করা চাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধির (prevention) আক্রমণ হইতে সকলকে রক্ষা করা আরও বেশী দরকার। তাই "দারিদ্র্য-নিবারিণী-সভা" দৈন্যের কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতীকারে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

নারী-মণ্ডলী

নারীদিগের মঙ্গলার্থে নারীদিগের দ্বারা পরিচালিত বহুসংখ্যক সমাজসেবাসদন আছে। "(সমাজ) সেবিকামণ্ডলী" (Women's League of Service) রোগীর শুশ্রূষা, স্ত্রী-চিকিৎসক দ্বারা শিশুগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও শিশুপালন বিষয়ে উপদেশ দিবার বন্দোবস্ত করা হয়।

সমাজের কল্যাণকর আইনসমূহ বিধিবদ্ধ করিবার জন্য নারীসেবকগণ গত বৎসর পার্লামেন্টের সভ্যগণের সহিত মিলিত হইয়া একটী কমিটি গঠন করিয়াছেন। '*Women's Imperial Health Association*'; 'Federation of Universal women', 'Women's co-operative guild' প্রভৃতি বহুসংখ্যক মহিলা সমিতি স্ত্রীজাতির জীবনকে উন্নত ও শক্তিশালী করিয়া তাহাদিগকে সন্তানপালন, গৃহস্থালী ও সামাজিক কার্য্যের উপযোগী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন।

অন্তর্জাতিক সমাজ-সংস্কার সম্মিলন

(International Institute for Co-operation in Social Reform) নামে ইয়োরোপব্যাপী যে সম্মিলন আছে, তাহারই এক শাখা লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইয়োরোপের দেড়শত প্রধান প্রধান নগরে সম্মিলনের শাখা বিস্তৃত। পৃথিবীর যে যে স্থানে সমাজের উৎকর্ষ সাধনের জন্য কাজ চলিতেছে, সেই সেই স্থানে কি কি সুফল ফলিয়াছে এবং কোন্ কোন্ সামাজিক সমস্যার সমাধান হইয়াছে,—এই সকল কার্য্যকর জ্ঞান সমাজসেবকমণ্ডলীগুলির মধ্যে বিস্তার করাই "অন্তর্জাতিক সমাজসংস্কার সম্মিলনে"র প্রধান কাজ।

দানমণ্ডলী

CHARITY ORGANISATION.

দরিদ্রের ভরণপোষণার্থ লণ্ডন নগরীতে যে সকল মণ্ডলী আছে Charity Organisation Society-ই সর্ব্বপ্রধান। এই সভা সাধারণের নিকট চাঁদা সংগ্রহ করিয়া অর্থহীন, অক্ষম লোকদিগের সাহায্যে ব্যয় করিয়া থাকেন। দরিদ্র ব্যক্তিকে অর্থদানই ইঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে, দরিদ্রের অবস্থার উন্নতি ও দারিদ্র্য নিবারণই ইঁহাদের লক্ষ্যীভূত। তাই উক্ত সভার সভ্যগণ শৃঙ্খলার সহিত নিয়মবদ্ধভাবে সাহায্যদানের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। তাঁহারা শুধু ব্যক্তিগত দৈন্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ক্ষান্ত থাকেন না, দরিদ্র সমাজের অর্থহীনতার কারণ কি কি তাহার অনুসন্ধান ও বিচার করেন। কোন দুঃখীকে সাহায্য করিবার পূর্ব্বে সভা তাহার অবস্থাদি বিষয়ে তদন্ত করেন। প্রায়ই দেখা যায় নিজেদের দোষে ও চরিত্রহীনতার ফলে দরিদ্র লোকেরা ভুগিতেছে। সে ক্ষেত্রে সভ্যগণ তাহাদের চরিত্রের দোষগুলি দূর করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, কারণ কেবল মাত্র অর্থ সাহায্য দ্বারা এইরূপ লোকের অবস্থা স্থায়ীভাবে ভাল করা যায় না। সাহায্য দানের সময় তাঁহারা গৃহস্থালী অর্থনীতি, গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, মিতব্যয়িতা, স্বাবলম্বন প্রভৃতি বিষয় নানা ভাবে

শিক্ষা দিয়া থাকেন। ব্যক্তি বিশেষের অনুষ্ঠিত সেবাকার্য্য ও দান এখন সমাজের দুঃখ এবং অভাব মোচনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠানগুলিকে একটী সমূহে বাঁধিয়া কাজে লাগাইবার চেষ্টা হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে একদল উপযোগী কর্ম্মী গড়িয়া উঠিতেছে। Charity Organisationএর আর একটী কাজ দরিদ্রগণ যাহাতে নিজেরা নিজেদের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সভা সমিতি করিয়া আত্মনির্ভরতা শিখিতে পারে তাহার উপায় করিয়া দেওয়া। দরিদ্রকে দান-নির্ভর করিয়া রাখিলে, তাহার আত্মনির্ভরতা হারাইয়া পঙ্গু হইয়া পড়িবে। কাজে কাজেই তাহাদিগকে আত্মশক্তিতে নির্ভরশীল শিক্ষাদানই শ্রেষ্ঠদান।

ব্যক্তিগতভাবে সেবা
PERSONAL SERVICE.

যাঁহারা অর্থ দিয়া সমাজের কল্যাণসাধনে সমর্থ নহেন, তাঁহারা তাঁহাদের কিছু সময় ও কাজ সমাজসেবায় অর্পণ করেন। এই স্বেচ্ছাসেবী কর্ম্মিগণের একটী সম্প্রদায় আছে (Prsonal Service Association)। লোকের সহিত মিশিয়া আত্মীয়ের মত ব্যবহারের দ্বারা তাহাদের হৃদয়ের প্রসার, সদালোচনা দ্বারা তাহাদের জ্ঞানের বিস্তৃতি, নানা বিষয়ে তাহাদের মধ্যে ভাব ও চিন্তার বিস্তার প্রভৃতি এইরূপ সমিতির চেষ্টায় অল্পায়াসেই সিদ্ধ হয়।

কর্ম্মিগণের উৎসাহ ও কর্ম্মে আগ্রহ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদের মধ্যে যিনি যে কাজের উপযুক্ত সেই কাজে নিযুক্ত করা হয়। তাঁহারা দরিদ্র পরিবারগণের সহিত আলাপ পরিচয় রাখিয়া দরিদ্রতার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিয়া থাকেন এবং তাহার যদি কোনও প্রতীকার থাকে তাহার ব্যবস্থা করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সেবাধর্ম্ম
UNION & SOCIAL WORKS.

বর্ত্তমানে সেবাব্রত কিরূপ সুনিয়ন্ত্রিতভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চলিতেছে তাহা লণ্ডন নগরীর "বিশ্ববিদ্যালয়-সেবাশ্রমের" (Universal Settlement) কার্য্যপ্রণালী হইতে বুঝা যায়। ইহা সমাজবিজ্ঞানের গবেষণার জন্য একটী 'ল্যাবরেটারী' পরীক্ষাগার বিশেষ। যাঁহারা সেবাধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে সেবাকার্য্য বিশেষ করিয়া শিখান দরকার। নচেৎ তাঁহাদের উৎসাহ ও চেষ্টা যথোচিত কার্য্যকরী হইবে না। কাজের যোগ্যতা অর্জ্জন না করিয়া শুধু উৎসাহের উত্তেজনায় 'নিধিরাম সর্দ্দারি' করিতে যাইয়া যে কি বিড়ম্বনা আমরা তাহা বেশ বুঝিয়াছি। লণ্ডনে কেজো শিক্ষাদিবার জন্য সমাজবিজ্ঞানবিদ্যালয় খোলা হইয়াছে, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রগণকে সমাজতত্ত্বে শিক্ষিত করিতেছেন।

বর্ত্তমান বাণিজ্যপ্রধান যুগে কলকারখানার দিনে পৃথিবীর অনেক স্থলে বড় বড় নগর গড়িয়া উঠিতেছে, ধনী ও নির্ধনের মধ্যে বিভেদ ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে। অর্থবান্ মূলধনদাতা ও দরিদ্র শ্রমজীবির এই যে বিরোধ ইহা কখনই সমাজের মঙ্গলজনক নহে। তাই আজ নূতন নূতন সামাজিক সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। এইরূপ সমস্যার মীমাংসার নিমিত্ত সুবিখ্যাত Toynbee Hall এর স্থাপনা। এই Toynbee Hall এর উৎসাহে বিশ্ববিদ্যালয় সেবাশ্রম অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। এই Toynbee Hall এরই দৃষ্টান্তে শতশত বিশ্ববিদ্যালয়ের

ছাত্র ও ছাত্রী, দরিদ্রের হিতার্থে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন এবং দরিদ্রের জীবনকে উন্নত করিবার নিমিত্ত তাহাদের মধ্যে বাস করিতেছেন। *Bermondsey*র Oxford-সেবাশ্রম এবং *Southwark*এর মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়-সেবাশ্রম সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ১৮৮৭ সালে *Oxford* ও Cambridgeএর অন্তর্ভুক্ত মহিলাকলেজগুলি সম্মিলিত হইয়া Southwarkএ "আশ্রম" খুলেন। উহাই মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়-সেবাশ্রম নামে পরিচিত।

Southwarkএর অধিবাসীদিগের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় তাহা বর্ণনা করা যায় না। সকল সময়ে তাহাদের কাজ কর্ম্ম জুটে না, তাই তাহারা চিরদিনই কপর্দ্দকহীন, ভালরূপ আহার বা থাকিবার স্থান পায় না। তাহার উপর অতিশয় পানাসক্তি প্রভৃতি নানাবিধ পাপ আসিয়া ঢুকিয়াছে। এই সকল হতভাগ্য পানাসক্ত, চরিত্রহীন দরিদ্রের মধ্যে আসিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রমণীগণ "আশ্রম" স্থাপন করিয়াছেন। পূর্ব্ব হইতে যে সকল সম্প্রদায় Southwark এ কাজ করিয়া আসিতেছিলেন, ইঁহারা তাঁহাদের সাহায্য করিতে লাগিলেন। সেইজন্য তাঁহারা বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের দিকে প্রথম মনোযোগ দিলেন। কারণ সমাজের দুঃখ দারিদ্র্য, অভাব অক্ষমতা দূর করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ভবিষ্যতের আশাস্থল বালকবালিকাদের তৈয়ারি করিয়া লইতে হইবে। স্কুলগুলিই ক্রমে তাঁহাদের কার্য্যের কেন্দ্র স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল এবং স্কুলের ভিতর দিয়াই বালকগণের পিতামাতার সহিত পরিচিত হইতে লাগিলেন। বিকলাঙ্গ বালকবালিকার শিক্ষার জন্য স্বেচ্ছাসেবকের দ্বারা পরিচিত বহুসংখ্যক বিদ্যালয় খোলা হয়। (ইহার বহু বৎসর পরে London County Councilএর মনোযোগ বিকলাঙ্গদিগের দিকে আকৃষ্ট হয়)। ১৮৯৪ সালে উক্ত আশ্রমের তত্ত্বাবধানে "বালিকা-সমিতি" (Girl's Club) নামে বালক বালিকার জন্য নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। "বালিকা-সমিতি" গ্রীষ্মের ছুটিতে পল্লীভ্রমণ, নানাপ্রকার ক্রীড়া ও ব্যায়াম, আমোদ প্রমোদ, সান্ধ্যসম্মিলন প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছেন। এমন কি "সমিতি"র বালকবালিকার কমিটি হইতে একখানি পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে। স্কুলের ছেলেরা যখন স্কুল ছাড়িয়া সংসারে প্রবেশ করে তখন "আশ্রম" তাহাদের কাজকর্ম্ম শিখিবার ও জীবিকা উপার্জ্জনের উপায় করিয়া দেন। প্রয়োজন হইলে ব্যবসা বা কাজ শিখিবার জন্য অর্থ সাহায্যও দিয়া থাকেন। গভর্ণমেণ্টের Juvenile Advisory Committee নামে যে কমিটী আছে তাহা "আশ্রমের" সেবকগণের নিকটেই পরামর্শ করিয়া থাকেন এবং কমিটীর কার্য্যে উহাঁরাই প্রধান সহায়।

"British Institute of Social Service" একটী বিরাট আয়োজন। ইহা সমগ্র বিলাতের সমাজসেবা আন্দোলনের মস্তিষ্ক স্বরূপ, একটী সামাজিক "Clearing House" এখানে সব ময়লা দূর করিয়া সমাজকে বিশুদ্ধ করা হয়। পৃথিবীর যাবতীয় সমাজের অবস্থা, বিভিন্ন সেবকসম্প্রদায়ের চেষ্টা, কার্য্যপ্রণালী, বিবিধ সমাজসমস্যা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞাতব্য facts ও figuresএর ইহা ভাণ্ডার বিশেষ। দেশ দেশান্তরের সমাজসেবিগণের নিকট হইতে ভাব, জ্ঞান চয়ন করিয়া British Institute of Social Service সঞ্চয় করিয়া রাখেন। যাহাতে দেশে সেবাপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়,

যাহাতে সেবাব্রত বিস্তৃতভাবে চলিতে থাকে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় মিলিয়া বিধিবদ্ধভাবে কাজ করিতে পারেন, তাহার জন্য এই সভা বিশেষভাবে চেষ্টা করেন। কোন বিশেষ বিষয়ে ভালভাবে অনুসন্ধান করিবার জন্য সভা হইতে মধ্যে মধ্যে লোক নিযুক্ত করা হয়। সেবকগণের শিক্ষা ও সুবিধার জন্য সমাজসম্বন্ধে নানা বিষয়ের প্রবন্ধ ও পুস্তক এবং একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে। British Institute of Social Serviceএর উদ্যোগে সমাজের সেবাকার্য্যে উৎসাহী ব্যক্তিগণের সম্মিলনের মাঝে মাঝে কনফারেন্স বসিয়া থাকে। পার্লামেণ্টের ভিতরেও উক্ত সভার একটী Committee ও Council আছে।

সমাজসেবা—শিক্ষাদান ব্যবস্থা

TRAINING FOR SOCIAL WORK.

সমাজসেবায় নিযুক্ত অন্যান্য সভা সমিতির কথা বলিতে যাইয়া যদি একটী বিষয়ে কোন কিছু না বলি তাহা হইলে এই প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। নূতন কর্ম্মীদিগকে সেবাব্রতে শিক্ষিত ও অভ্যস্ত করিবার নিমিত্ত যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান আছে তাহাদের মধ্যে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত লণ্ডন অর্থনীতি বিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই স্থানে শৃঙ্খলার সহিত বৈজ্ঞানিক উপায়ে সমাজতত্ত্ব শিখান হয়। অধ্যাপক Ursurck এই বিভাগের কর্ত্তা এবং অধ্যাপক Hobhouse, Westermark প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানবিদ্‌গণ অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। শুধু কাজ করিবার সঙ্কল্প থাকিলেই কাজ করা যায় না, তদুপযোগী শিক্ষা ও অভ্যাস চাই। যাঁহারা জনসাধারণের কল্যাণার্থ আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত আছেন তাঁহাদিগকে সামাজিক কার্য্যের উপযোগী করিয়া তুলিবার নিমিত্ত শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। যে সভাসমিতি সেবাকার্য্য চালাইতেছেন, ছাত্রগণ সেইগুলির সহিত মিলিয়া মিশিয়া যাহাতে সামাজিক বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারে তাহারও বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

উপরে লণ্ডনে সমাজসেবার আয়োজন ও অনুষ্ঠানের কথা বলা হইল। ভারতবর্ষে কিরূপভাবে জনসাধারণের মঙ্গলকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে পারে তাহা সুধী ও দেশহিতৈষিগণের ভাবিবার বিষয়। আমাদের এখন প্রকৃত কর্ম্মীর অভাব। অর্থ অপেক্ষা লোকসাধারণের সেবায় উৎসর্গীকৃত চরিত্রবান্ দৃঢ়সংকল্প আশান্বিত কর্ম্মীর প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। যাঁহারা যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া, সমূহ গড়িয়া, সেবাকার্য্যে সফলতা আনিতে পারিবেন, ভারতবর্ষের অশিক্ষিত উপেক্ষিত, মুমূর্ষু মানবসমষ্টি আজ তাঁহাদেরই দিকে আশাপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া আছে। এই যে আজ কোটী কোটী নরনারী অজ্ঞতা, কুসংস্কারের নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারে পশুবৎ জীবন যাপন করিতেছে, তাহার উপর তাহারা দারিদ্র্য দুর্গতির গহ্বরে নিয়তই ডুবিতেছে। তাহাদের মুখে অন্ন নাই, দেহে শক্তি নাই, রোগে চিকিৎসা নাই, হৃদয়ে বল নাই, মনে আনন্দ নাই, আশা নাই, তাহারা যে চিরদিনই উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত! চৈতন্যদেবের পর আর তাহাদের কথা কে ভাবিয়াছে? কয়জন কর্ম্মীর কর্ম্মশক্তি তাহাদের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত হইয়াছে? এই যে সামর্থ্যহীন, নির্জ্জীব মানবসমাজ ইহার প্রাণ বলশালী করিতে হইবে, ইহাদের আঁধার কুটীরে জ্ঞানের আলোক দিতে হইবে, প্রকৃত মনুষ্যত্বে ইহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া জগতে

অন্যান্য জাতির সমকক্ষ করিয়া তুলিতে হইবে। ইহা কি সামান্য সাধনা? এত বড় সাধনা কোন দেশের সম্মুখে কখনও আসিয়াছে কি না সন্দেহ। এ সাধনার সাধকও দুর্লভ। এই অসাধারণ ব্রতের কর্ম্মীদিগেরও অসাধারণ হওয়া চাই। যাঁহার বিশাল উদার হৃদয় ত্রিশকোটী পতিত ভাই বোনকে প্রেমের অজস্র ধারায় অভিষিক্ত করিতে পারিবে, যিনি ছোটখাট স্বার্থ ও ভোগসুখের চিন্তা দূর করিয়া দিয়া দুঃসাধ্য বিরাট কার্য্যের মধ্যে আপনার কল্পনাকে বিস্তৃত করিয়া অনন্ত অদম্য আশা বুকে ধরিয়া সকল প্রকার স্বার্থ পায়ে ঠেলিয়া শুধু কর্ত্তব্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আজীবন অক্লান্তভাবে নির্ভীকচিত্তে এক দীন সেবকের মত বিনয় ও ভক্তিভরে কর্ম্ম করিতে পারিবেন তিনিই ভারতবর্ষের নব্যভাবের কর্ম্মী। তাঁহারই প্রয়াস এই বিপুল সাধনায় সিদ্ধি আনিয়া দিবে।

শ্রীসেবাভিক্ষু

গতি না স্থিতি

আসা আর যাওয়া এই নিয়েই এই ভবের কারবার। এই বিশ্বে অহরহঃই একটা চলার সাড়া পাওয়া যায়। এই জগতের হাটে যেন কেহই টিকিয়া থাকিতে রাজি নহে, সবাই এখানে চল্‌বার জন্য ব্যস্ত। পুরান যে সে নিতুই নূতনকে তার জায়গা গতাইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত। আবার এই নূতন যখন কাল পুরাতন হইবে সেও আর এক নূতনকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। এই রকম নূতন পুরাতনের আসা যাওয়ার মধ্য দিয়া এই বিশ্বলীলা সেই সময় থেকে চলিয়া আসিতেছে, সে সময়ের আরম্ভ কেহ কখনও ধারণাতেও আনিতে পারে না। আদিহীন কালের আদি হইতেই এই খেলা আরম্ভ হইয়াছে, এখনও সেই খেলা তেমনি সমান ভাবেই চলিতেছে, আবার অন্তহীন কালের শেষ পর্য্যন্ত এমনিই ভাবে চলিবে।

কিন্তু তাই বলিয়া গোড়ায় যাহা ছিল তাহা কি এখন একেবারেই নাই। আবার যাহা ছিল না তাহা কি নূতন করিয়া আসিয়াছে। তাহা কেমন করিয়া ধারণা করিব? যাহা ছিল কালের পরিণতির সঙ্গে তাহা তো অস্তিত্ব হারাইতে পারে না—আবার যাহা ছিল না তাহা তো নূতন করিয়া আসিতে পারে না। ঐ যে একটি ক্ষুদ্র বীজ হইতে একটি প্রকাণ্ড গাছ হইল, আপাততঃ মনে হয় বটে যে গাছটা বুঝি একান্তই ভুঁইফোড়; কিন্তু তাহা তো নহে। গাছটা যাহা দিয়া তৈয়ারী সে সব উপাদানগুলিই যে আগেই ধরিত্রীর রসে, রবির রশ্মীতে, বায়ুর হিল্লোলে লুকাইয়া ছিল। গাছে যে নূতন কিছুই নাই। কেবল সবগুলির একত্র সমাবেশের ফলে যে প্রাণের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে সেইটুকুই নূতন।

যাহা সৎ তাহার সত্বা যে অবিনশ্বর—তাহা যে চিরকালই থাকিবে। আবার যাহা অসৎ তাহার সত্বার উদ্ভব যে কখনই সম্ভব নহে তাহা যে চিরকালই অসৎ অস্তিত্ব বিবর্জ্জিত। সৎ মানেই যে 'আছে', থাকাই

যে তাহার ধর্ম্ম, অস্তিত্ব বজায় রাখাতেই যে তাহার প্রাণ। তাহা কখনও কি 'নাই' হইতে পারে। আবার যাহা অসৎ যাহা 'নাই' তাহা কখনও কি 'আছে' হইতে পারে।

মান্ধাতার আমল হইতে আমরা কালের একটা সুনাম শুনিয়া আসিতেছি বটে, কালের করাল কবলে পড়ে না এমন জিনিস পাওয়া কঠিন। কালের অনুকম্পায় এক সময়ে যাহার অস্তিত্ব বিশ্বের বিশিষ্ট গৌরবাস্পদ বলিয়া পরিগণিত হইত এমন অনেক জিনি-সের চিহ্ন পর্য্যন্ত আজ নাই। আবার এক সময়ে যাহার অস্তিত্ব আমাদের কল্পনায়ও আসিত না আজ তাহার সৌন্দর্য্য, তাহার সৌষ্ঠব, তাহার বিশিষ্টতা জগৎবাসীকে মোহিত করিয়া দিতেছে। কত উদ্ভব ও বিলয় যে কালের অবিরাম গতির সঙ্গে হইতেছে তাহার কি ইয়ত্তা আছে। কথাটা একেবারে মিথ্যা নহে। তবুও একথা সত্য যে যাহা সৎ তাহার বিনাশ নাই আর যাহা অসৎ তাহা কখনও নাই। কালের সঙ্গে সৃষ্টি ধ্বংসের যে আসা যাওয়া তাহার মূল হইতেছে সৎ বস্তুরই অবস্থা বিপর্য্যয়। আজ যাহা আছে কাল যদি তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় তাহা হইলে আমাদের অন্ততঃ এ কথা বলিতে হয় যে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার অবসান হইয়াছে। জলাধারের জল রৌদ্র-তাপে শুকাইয়া গেল, এখানে জলের কি একান্ত বিনাশ হইল? না তাহা তো নহে—এখানে জলের অভাবের সঙ্গে জলীয় বাষ্পের উৎপত্তি। একই সত্বার জলীয় অবস্থা বাষ্পীয় অবস্থানে পরিণত হইল। একই সৎ বস্তুর অবস্থান্তর হইল মাত্র। জল আর বাষ্প একই বস্তুর বিভিন্ন রূপ। একই সত্বার বিভিন্ন অবস্থা। জলের তো একান্ত উচ্ছেদ হইল না বাষ্পের তো নূতন উদ্ভব হইল না। সত্বার অস্তিত্ব ঠিকই বজায় রহিল মাঝে কেবল হইল সেই সৎ বস্তুর রূপান্তর।

বৌদ্ধ মতানুসারে অভাব হইতেই ভাবের উৎপত্তি হয়—অসৎ হইতেই সতের বিকাশ হয়। আর শুধু তাহাই নহে অসৎই সতের বিকাশের একমাত্র কারণ। অভাব না হইলে ভাবের জন্ম কখনও সম্ভব হয় না। বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ বলেন বীজ যতদিন বীজ অবস্থায় থাকিবে ততদিন বৃক্ষের অস্তিত্ব নাই। বীজের অভাব, বিনাশ হইতেই গাছের বিকাশ। বীজ লোপ পায় বলিয়াই গাছের অস্তিত্বের প্রকাশ। বীজের মৃত্যুই হইতেছে গাছের জননের একমাত্র কারণ। এই জন্ম মৃত্যুর মধ্য দিয়াই এই জগতের বিকাশ এই জগতের পরিণতি। পূর্ব্বাবস্থার উচ্ছেদ ও পরবর্ত্তী অবস্থার উদ্ভব—ইহাই জগতের নিয়ম। এখানে সৎ বলিয়া কিছু নাই যাহা এখন সৎ যাহা এখন আছে পর মুহূর্ত্তে তাহাই অসৎ তাহাই আবার নাই। যাহা এই মুহূর্ত্তে নাই পর মুহূর্ত্তে তাহাই আবার আছে। এই সৃষ্টি বিনাশ এই জন্ম মৃত্যুই জগৎ। স্থায়ী বলিয়া এখানে কিছু নাই এখানে সকলই অস্থির সকলই চঞ্চল। এই আছে এই নাই, ইহাই জগতের ভাব। অবিরাম গতিই জগ-তের জীবন। আবাহমান কাল হইতে ভাব অভাবের পারম্পর্য্যের মধ্য দিয়াই ভবের লীলা খেলা। সকলই ক্ষণিক সকলই তুচ্ছ সকলই অসৎ। সদ্বস্তুর এখানে একান্তই অভাব। সৎ বলিয়া এখানে কিছুই নাই। প্রতি মুহূর্ত্তেই পুরাতন যাহা তাহার ধ্বংস হই-তেছে আর সেই সঙ্গে আবার নূতনের সৃষ্টি হইতেছে। নূতন পুরাতনের স্থিতি লয়েই জাগতিক ধারা প্রবাহিত। ইহাই একমাত্র

সত্য এই প্রবাহই একমাত্র সৎ আর সব ক্ষণিক সব মিথ্যা। ঐ যে কুলু কুলু রব করিয়া ভাগীরথীর পুণ্যপ্রবাহ চলিতেছে আমরা তীরে দাঁড়াইয়া মনে করিতেছি বুঝি জাহ্নবী ভগীরথের সময়ে যেমনটী ছিলেন এখনও ঠিক তেমনই আছেন। কিন্তু তাই কি? যে জলরাশি তর তর করিয়া এই মুহূর্ত্তে আমার সামনে চলিতেছে পর মুহূর্ত্তে আমরা কি সেই জল পুঞ্জই দেখিতে পাই। তাহা তো নহে; কিন্তু এই প্রবাহ সমান ভাবে চলিয়া যাইতেছে আমাদের মনে হয় বুঝি সেই একই গঙ্গা। জগতেরও অবিরাম গতি ও পরিবর্ত্তন এমনি সমান ভাবে চলিতেছে বলিয়াই আমাদের ভ্রম হয় যে জগতের স্থায়ী সত্তা আছে। আমরা ধরিয়া লই যে সৎ বস্তু আছে। কিন্তু বাস্তব পক্ষে এই প্রবাহই জগতের সত্য। প্রবাহের পিছনে সৎ বলিয়া কিছু নাই। সতের ধারণা একেবারেই মিথ্যা একেবারেই কাল্পনিক। অজ্ঞান বলিয়া আমরা ক্ষণবিধ্বংসি অসতে সতের অধ্যাস করি। জগৎ-প্রবাহ চিরকাল বেশ সমান একটানা চলিতেছে বলিয়া সেই প্রবাহকে আমরা সৎ বস্তু বলিয়া মহা ভুল করি।

জগৎ পরিণামী, বিকারী, গতিশীল—কথাটা খুবই ঠিক। পরিবর্ত্তনই জগতের প্রাণ। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা বলা যায় না যে এখানে কিছুই সৎ নহে, সৎ বস্তুর এখানে একেবারেই অভাব। পরিণামই হউক আর পরিবর্ত্তনই হউক স্থায়ী জিনিসের অভাবে তাহাদের কোন অর্থ ই হয় না। পরিণাম বা পরিবর্ত্তন যে স্থায়ী জিনিসের একান্ত অপেক্ষা করে। স্থায়ী জিনিস না থাকিলে পরিবর্ত্তন হইবে কাহার? কাহারও বিকার হইতেছে না অথচ বিকার আছে এমন বিকার আমাদের ধারণার অতীত। গতি আছে অথচ গতিশীল কোন পদার্থ নাই এইরূপ ধারণা আকাশকুসুমের কল্পনা ছাড়া আর কি হইতে পারে? ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে—আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে দীপশিখা আগাগোড়াই সেই একই শিখা বলিয়া মনে হয় কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তের শিখাই যে ভিন্ন। আমরা জানি যে তেল পুড়িয়া আলো হইতেছে! কিন্তু একবার যেমনি তেল পুড়িল তখনই আবার তৈলাধার হইতে নূতন তৈল আসিয়া সেই শিখাটিকে বজায় রাখে। বৌদ্ধরা বলেন তৈল পুড়িয়াই, তৈলের অসদ্ভাব হইতেই আলোর উৎপত্তি। প্রতি মুহূর্ত্তের এই ভাব অভাবের ধারাই দীপ শিখার প্রাণ। কিন্তু তাই কি? এখানে অভাব হইতেই কি ভাবের উৎপত্তি—অসৎ হইতেই কি সতের জন্ম? কৈ? আলোর প্রাণ ততক্ষণ যতক্ষণ তৈলাধারে তৈল থাকে। তৈলের যখন একান্ত অভাব হয় তখন তো আলো থাকে না। যদি অভাবই ভাবের পূর্ব্বাবস্থা হয় তবে তৈলাধারে তৈলের একান্ত অভাবই দীপশিখার প্রকৃষ্ট উজ্জ্বলতার কারণ হইত। কিন্তু তাহা তো হয় না। বীজের অভাব যদি গাছের উৎপত্তির কারণ হয় তাহা হইলে যেখানে বীজের যথেষ্ট অভাব মরুভূমিতেই গাছের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইত। কিন্তু তাহা হয় কৈ?

ইহা দেখিয়া আমরা বৌদ্ধবাদের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারি না। অসৎ হইতে সতের বিকাশ কখনই সম্ভব নহে। সতের বিকাশ সৎ হইতেই একমাত্র হইতে পারে। তাই বা কিরূপে বলিব? সতের বিকাশ বলিলে পুরাতন হইতে নূতন সতের বিকাশ হয় আমরা এইরূপ অনু-

মান করিতে পারি। কিন্তু সৎ যাহা তাহা শাশ্বত। নূতন পুরাতনের খেলা যে কেবল সতের রূপ পরিবর্ত্তন লইয়াই। নূতন রূপের যে বিকাশ হইল তাহা পুরাতনের মধ্যেই ছিল, আর যে পুরাতন চলিয়া গেল তাহা নূতনের মধ্যে লুকাইয়া রহিল। অবস্থার ফেরে পড়িয়া পুরাতনের আবার পুনরাবির্ভাব হয়। জল যখন বাষ্প হয় তখন সেই বাষ্পের মধ্যেই জল থাকে।

আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণও এই সতের অবিনশ্বরত্বের কথাই বলেন। তাঁহারা বলেন 'matter is indestructible and energy is transformable from one form into another" কিন্তু—তাঁহাদের মতে এই শাশ্বত সৎ কেবল জড় ও শক্তির রূপ মাত্র। তাঁহাদের সিদ্ধান্তে কেবল অন্ধ জড় ও শক্তিপুঞ্জের ঘাত প্রতিঘাতেই জগতের অস্তিত্ব ও পরিণতি। জড় ও শক্তিই কেবল সৎ—একমাত্র সত্য। গোড়ায় ছিল কেবল ভৌতিক পরমাণুপুঞ্জ। আকাশে আমরা যে নীহারিকা দেখিতে পাই সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থায় জড়েরও অবস্থা ঠিক সেই রকম ছিল। তার পর কোথা হইতে একটা শক্তি আসিয়া সেই জড়রাশির মধ্যে বিষম আলোড়ন আনিল মহা তরঙ্গ বহাইয়া দিল। সেই যে তরঙ্গের সূত্রপাত হইল তাহা আর থামিল না। সেই তরঙ্গের প্রভাবে সেই জড়পিণ্ডের মধ্যে যে বিপর্য্যয় উপস্থিত হইল সেই বিপর্য্যয়ই হইতেছে এই সৃষ্টির গোড়া। বিপর্য্যয়ের পর বিপর্য্যয় আসিয়া জড়রাশির সেই আদিম অবস্থার যে কত পরিবর্ত্তন যে কত রূপান্তর হইল যে কত অবস্থার উত্থান পতন হইল কে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিবে? কত অসংখ্য পরিবর্ত্তন পরিণতির পর যে জগতের আধুনিক অবস্থা আসিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কোথায় সেই নির্জ্জীব কিম্ভূত কিমাকার জড়ের তাল মাত্র আর কোথায় বর্ত্তমান সুবিশাল নয়নাভিরাম কত উদ্ভিদ্ পশু পক্ষী সমাকীর্ণ এই জগৎ। কিন্তু যতই পরিণতি হউক না কেন সেই জড় সেই জড়ই আছে সেই অন্ধ শক্তি অন্ধ শক্তিই আছে। যাহা ছিল তাহাই আছে নূতন কিছু হয় নাই নূতন কিছু আসে নাই। সবই জল। উদ্ভিদের প্রাণ। প্রাণীর চেতনা আর মানুষের ধী সকলেরই মূলে আছে কেবল জড় ও অন্ধ শক্তি। ধী, চেতনা, প্রাণ জড়ের বিভিন্ন সমাবেশের বিভিন্ন রূপ মাত্র। এই যে মানুষ, এই যে তার প্রকৃষ্টতা, এই যে সমাজের, ধর্ম্মের, সভ্যতার প্রতিষ্ঠা, এই যে জ্ঞান বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা, এই যে প্রেম ভক্তিতে মানুষে দেবত্বের আভাষ সকলই জড়াত্মক—কেবল বিশেষ বিশেষ জড় শক্তির সমষ্টি সমন্বিত। জড় আর শক্তিই কেবল আছে আর কিছু নাই, নাই। বৈজ্ঞানিকগণ এমন পর্য্যন্ত আস্ফালন করিয়া বলেন, 'Give me *matter* and *Energy* and I will create the universe'. তাঁহারা দম্ভ করিয়া বলেন যদি জগৎস্রষ্টা বলিয়া এমন কেহ থাকেন জগৎ সৃষ্টি করিয়া তিনি এমন কি বাহাদুরী করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ভগবানের কল্পনার কোন প্রয়োজন নাই, জড় ও শক্তি মানিয়া লইলেই আমরা জগতের পরিণতির প্রতি স্তরই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি। কিন্তু এ দম্ভের ভিত্তি কোথায়? যে জড় ও শক্তি লইয়া বৈজ্ঞানিক আচার্য্যগণের এ বড়াই সে জড় কি? জড় সম্বন্ধে প্রথমতঃ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণই তো বহুমতাবলম্বী। কেহ কেহ জড়কে সূক্ষ্ম

পরমাণু বিশেষ মনে করেন। এই সিদ্ধান্তকে Atomic theory বলে। কিন্তু আধুনিক মনীষিগণ পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্মতর অবস্থার ধারণা করিয়াছেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্তে জড় শক্তির রূপান্তর মাত্র। জড় শক্তির—একটা স্থায়ী অবস্থা মাত্র। জড় পরমাণু (or atom) কতকগুলি শক্তিধারার কেন্দ্র স্বরূপ (Centre of forces)। যদি ক, খ এবং গ শক্তিত্রয় চ বিন্দুতে একত্র কার্য্য করিয়া পরস্পর পরস্পরকে সংযত করে তবে ঐ শক্তিত্রয়ের সমাবেশের ফলে আমরা চ বিন্দুকে জড়পরমাণু বলিয়া মনে করি। এই সিদ্ধান্তকে Kinetic theory of matter বলে।

ক

o— —খ

চ

গ

এই বিরোধী মতসমূহের কথা ছাড়িয়া দিলাম। এখন জিজ্ঞাসা করি এই জড় কি? atomic theory অনুসারেই হউক আর kinetic theory অনুসারেই হউক জড় বা শক্তির অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের কল্পনায় ছাড়া আর কোথাও আছে কি? বৈজ্ঞানিকগণ আমাদের চেতনা শক্তিকে জড়েরই বিশেষ কার্য্য বলেন। আমাদের মস্তিষ্কে যে সকল কোষ বা cells আছে আমাদের জ্ঞান বা চেতনা শক্তি তাহাদের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাতেরই ফল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে তাঁহারা ভুলিয়া যান যে এই ঘাত প্রতিঘাত তত্ত্ব আমাদের জ্ঞান বা চেতনা শক্তির একটা বিশেষ অবস্থা হইতেই উদ্ভূত। তাঁহাদের মতে রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, ঘ্রাণ এই গুলিই দ্রব্যের গৌণ গুণ (বা Secondary attributes) আর আকৃতি, গুরুত্ব, কাঠিন্য প্রভৃতি দ্রব্যের মুখ্য গুণ (বা Primary attributes)। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এটুকু স্বীকার করেন যে দ্রব্যের গৌণ গুণগুলির অস্তিত্ব আমাদের মনের ভিতর ছাড়া বাহিরে নাই। যদি দেখিবার বা শুনিবার কেহ নাহি থাকে তবে এই গুণগুলির কোন অস্তিত্বই থাকে না। কিন্তু মুখ্য গুণ সম্বন্ধে তাঁহারা একথা বলেন না। মুখ্য গুণগুলি বাহিরে যেমন আছে আমাদের মনেও ঠিক সেইরূপ প্রতিভাত হয়। ঐ যে সুন্দরী পথ দিয়া যাইতেছে তার গায়ের চাঁপাসোনা রং দেখিয়া লোকে মোহিত হইতেছে, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ তাহা দেখিয়া বলিতেছেন ওগো তোমরা কি দেখিয়া মোহিত হইতেছ ঐ রঙের কি কোন বাস্তব অস্তিত্ব আছে, ও রঙ তো তোমার চোখে ছাড়া বাহিরে নাই—বাহিরে আছে কেবল অতি সূক্ষ্ম জড় পরমাণুর দ্রুত স্পন্দন (ethereal vibration)। সেই স্পন্দনের বেগ চক্ষুর আভ্যন্তরীণ পর্দ্দায় লাগিয়া সূক্ষ্ম নাড়ীর মধ্য দিয়া সেই বেগ প্রবাহিত হইয়া আমাদের মস্তিষ্কে যে গতির সঞ্চার হয় তাহার ফলেই আমাদের মানস চক্ষের সামনে বর্ণের আভা ফুটিয়া ওঠে। অন্ধের কাছে রঙ নাই তাহার কাছে জগৎটা একটা রূপহীন অস্তিত্ব। যে বধির তার কাছে জগৎ শব্দহীন। কিন্তু তাহাদের উভয়ের কাছেই জগতের কোমল কঠিনের তারতম্য আছে, গুরুত্ব লঘুত্ব আছে, একটা গড়ন আছে। কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, মুখ্য গুণগুলির বাস্তব অস্তিত্ব আমরা কিরূপে বুঝিতে পারি? তাহাদের অস্তিত্ব ও যে গৌণ গুণগুলির মতন কেবল আমাদের কল্পনায় নাই কে বলিবে? পরমাণু কেহ কি

চক্ষে দেখিয়াছে? এই যে গুরুত্ব, লঘুত্ব তারল্য, কাঠিন্য আমাদের উপলব্ধির বাহিরে তাহাদের অস্তিত্ব যে থাকে আমরা এমন কথা জোর করিয়া কি বলিতে পারি? একটা জিনিষ যে ভারি কেহ না বোধ করিলে তাহা কি করিয়া বুঝা যায়? বাহিরে যদি বর্ণের অস্তিত্ব না থাকে তবে ইহাও সত্য যে একই যুক্তি অনুসারে মুখ্য গুণগুলিরও আমাদের বোধ শক্তির বাহিরে কোন অস্তিত্ব নাই।

তবে বাহিরে কি কিছুই নাই? কেহ কেহ অবশ্য বলেন যে জগতের সত্তা কেবল আমাদের কল্পনাপ্রসূত আমাদের বোধ শক্তির বাহিরে কোন বাস্তব সত্তা নাই। চক্ষু বুজিলেই সব অন্ধকার। যতক্ষণ আমার চেতনা, যতক্ষণ আমার বোধ শক্তি ততক্ষণই জগৎ তার পর সব শূন্য সব ফাঁকি। গোলযোগের কথা বটে। এই যে এতবড় জগৎটা ইহা কেবল আমার কল্পনা। আমরা যাহা দেখি বা শুনি সব মায়া তাহার পিছনে কোন সত্য নাই। এরূপ ধারণা করিতেও আমাদের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হয়।

শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু

ক্ষয়রোগ ও তন্নিবারণ সম্বন্ধে গুটিকয়েক অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়

(৫৬ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বে প্রকাশিত অংশের পর)

মানুষের ও অপর প্রাণীর কি একই জীবাণু

আমরা পূর্ব্বে যে সব কথা বলেছি তাহতে দেখ্‌তে পাচ্ছি যে ক্ষয় মানুষ ও গৃহপালিত জন্তুদের মধ্যে হয় এবং ক্ষয় জীবাণুই উহার মুখ্য কারণ। উভয়ের একই জাতীয় জীবাণু দ্বারা এই ব্যাধি উৎপন্ন হয় কিংবা বিভিন্ন জীবাণু দ্বারা হয় একথা জান্‌বার কৌতূহল হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

মতের অনৈক্যতা

এ সমস্ত নিয়ে এত বাগবিতণ্ডা চল্‌ছে যে কোন একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। আজ যা অভ্রান্ত বলে মনে করা যাচ্ছে পর-অনুসন্ধানে সে মত হয়ত একেবারে উল্‌টে গেল। যা ভুল বলে ত্যাগ করা হয়েছিল আবার সেই মতই হয়ত সত্য বলে গ্রহণ করা গেল। এইরূপ সর্ব্বদাই হচ্ছে। আবার হয়ত কোন সম্বন্ধে একাধিক মতও আছে সুতরাং যে মত বেশীর ভাগ লোকে গ্রহণ করেছে, আমরা সেই মত অনুসারেই বলিব।

এই তিন জাতীয় জীবাণুতে আকৃতিগত কিছু পার্থক্য আছে। ভিন্ন ভিন্ন জীবে বিভিন্ন অবস্থায় বাসহেতু এই পার্থক্য এসেছে অথবা অন্য কোন কারণে উহা ঘটেছে তাহা বলা কঠিন। সাধারণতঃ একজাতীয় জীবাণু অন্য জাতীয় প্রাণীর ব্যাধি সৃষ্টি করে না। কখনও যে করে না, তা নয়। কারণ পরীক্ষা দ্বারা দেখা

গিয়াছে উহা অবস্থা বিশেষে সম্ভবপর। তবে এই সব পরীক্ষার ফলও সব সময়ে অকাট্য বলে গ্রহণ করা যায় না, কারণ যখন ক্ষয় হয় তখন শরীরের যে পরিবর্ত্তন হয় তাহা ত আর সুস্থ শরীরে থাকে না। সুতরাং সুস্থ শরীরের উপর যে সব পরীক্ষা করা হয়—তাহা একই ভাবে হয় কি না সন্দেহের বিষয়। যতটা সম্ভব একই ভাবে কর্‌বার যথোচিত চেষ্টা হয় সত্য। কক সাহেব মনে করেন যে গো-জাতীয় ও মনুষ্য জাতীয় জীবাণু পৃথক্ এবং একের দ্বারা অন্যের উদ্ভব সম্ভবে না। কিন্তু আরলইন্ (Arloing) র‍্যাভেনেল (Ravenel) প্রভৃতি মনীষিগণ সেরূপ মনে করেন না। তাঁরা বলেন সব জীবাণুই এক জাতীয় কেবল ভিন্ন জীবে বাস হেতু—এবং উহাদের স্বভাব এবং রীতিনীতির পার্থক্যের দরুণ উহারা সামান্য কিছু পৃথকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অধিকাংশ পণ্ডিত মণ্ডলীই শেষোক্ত মতের পোষকতা করেন।

পক্ষী জাতীয় জীবাণু সম্বন্ধে বেশী কিছু বলার প্রয়োজন মনে করি না।' কারণ এক মোরগ ব্যতীত আমরা অন্য পাখী হতে বড় একটা ছুঁত লই না, মোরগগুলি সর্ব্বদাই মানুষের থুতু খায়—ক্ষয় রোগীর থুথু খেয়ে উহাদের ক্ষয় হতে দেখা গিয়াছে—আবার ঐ ক্ষয়-গ্রস্ত মোরগ খেয়ে মানুষেরও পাল্টা ক্ষয় হতে দেখা গিয়েছে। সুতরাং যাঁহারা উহাতে আসক্ত তাঁহারা এ বিষয়ে সতর্ক হইবেন।

গো-জাতীয় ও মনুষ্য-জাতীয় জীবানু সম্বন্ধেই আমরা বিশেষভাবে সতর্কিত। ইহাদের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে জান্‌তে হলে অন্যান্য আরও অনেক বিষয়ের আলোচনা প্রয়োজন—আমরা ক্রমে ক্রমে এ কথার বিচার করিব এবং একের সহিত অপরের কি সম্বন্ধ তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

জীবাণুর প্রবেশ পথ

ক্ষয়জীবাণু মানুষকে নানাদিক দিয়ে আক্রমণ করে এবং দেহে নিম্নলিখিত পথ সমূহে প্রবেশ করে।

(১) ইহা শ্বাসের (inhalation) সহিত শ্বাসনালী (respiratory passage) দিয়ে প্রবেশ কর্‌তে পারে।

(২) খাবারের সহিত অন্ননালী (alimentary tract) দিয়ে যেতে পারে।

(৩) চামড়ার ভিতর (Through skin by inoculation) দিয়ে প্রবেশ কর্‌তে পারে।

(৪) ভ্রূণে (infection of Embryo in utero) প্রবেশ কর্‌তে পারে।

পিতামাতা হতে সন্তানে বর্ত্তে কি না

আমরা শেষের বিষয়টি সম্বন্ধেই প্রথমে আলোচনা করিব। ক্ষয় পিতা মাতা হইতে পুত্র কন্যায় বর্ত্তিতে পারে কি না তাহাই জিজ্ঞাস্য। এবিষয়েও অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয় ও বহু বাদানুবাদ চল্‌ছে। অনেকেই মনে করেন যে পিতা মাতা হতে ইহা ভ্রূণে প্রবেশ করে না; তাঁহারা বলেন যে পৈতৃক কারণে সন্তানের শরীর দুর্ব্বল ও ভঙ্গুর হয় এবং উহাদের সজীবতার অল্পতা বশতঃই ক্ষয় সহজে আক্রমণ করে। একথা আংশিক সত্য হলেও প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করা যায় না যেহেতু অনেক সময়েই সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্ব্বেই জরায়ুস্থিত ভ্রূণে ক্ষয় প্রকাশ হতে দেখা যায়। কাজেই এ কথা স্বীকার কর্‌তেই হবে যে পিতা মাতা হতে উহা সন্তানে বর্ত্তিতে পারে। তবে বাপ মার কাহারও থাক্‌লেই যে সন্তানের অবশ্যই হবে তাও নয়। এই সংক্রমণ বিষয় অন্যান্য অনেকগুলি বিষ-

য়ের উপর নির্ভর করে। সন্তানোৎপাদনের সময়ে পিতা মাতার শারীরিক অবস্থা, মানসিক অবস্থা ও অন্যান্য অনেক বিষয়ের ঘাত-প্রতিঘাত ভ্রূণের উপর ক্রীড়া করে। ৫টী সন্তানের মধ্যে ৩টীর ক্ষয় হয় ২টীর বা হয় না কেন—কখনও সকলটীরই হয়—কখনও এক জনেরও হয় না একথার সম্যক আলোচনা কর্‌তে গেলে পৃথক্ একটী প্রবন্ধের প্রয়োজন। বিষয়টি অত্যন্ত জটিল এবং এবিষয়ে সম্যক্ অনুসন্ধানও হয় নাই। তবে অনেক ক্ষেত্রেই যে ক্ষয় পিতামাতা হতে সন্তানে বর্ত্তে তাহাতে সন্দেহের কোনই কারণ নাই। মেণ্ডেলের নিয়ম (Mendel's Law) এ-সব সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে কি না তাহাও জানা যায় নাই। জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিগণের দৃষ্টি এ'দিকে পড়লে অনেক বিষয় জানা যেতে পার্‌বে।

চর্ম্মপথ

চামড়ার যে ক্ষয়রোগ হয় তাহা বলাই বাহুল্য। চামড়ার ভিতর দিয়ে ক্ষয়জীবাণু প্রবেশ করে অন্য স্থানের ক্ষয় জন্মাতে পারে কি না তাই জান্‌বার বিষয়। যদি কোন রূপে কোন স্থানের চামড়া উঠে যায় বা কোন স্থান কেটে যায় এবং ঐ সকল স্থানের সহিত ক্ষয়জীবাণুর যোগাযোগ হয় তবে ঐ সব স্থানের ক্ষয় হওয়া কিছুই অসম্ভব নয়। কসাইখানায় (Slaughter House) বা মড়া কাটা ঘরে (Post-mortem Room) ক্ষয়গ্রস্ত প্রাণীর বিস্তর আমদানী হয়। সেখানে অনেকে অসাবধানতা বশতঃ কাটা আঙ্গুল নিয়েই কাজ করে। ফলে ঐ সব স্থানের ক্ষয়রোগ হয়। কখনও আঙ্গুল ছাড়াইয়া হাত পর্য্যন্ত ফুলে উঠে, এমন কি বগল পর্য্যন্ত ফুলে উঠ্‌তেও দেখা যায়; বিশেষতঃ ঐ সব স্থানের বীচিগুলি বড় হয়। বিষ যদি তীব্র হয় তবে আরও ছাড়িয়ে যেতে পারে। একটা লোক কসাইখানায় কাজ কর্‌ত। একদিন হঠাৎ আঘাত লেগে তার একটা আঙ্গুল কেটে যায়। তার এ বিষয়ে খেয়াল না থাকায় ঐ কাটা আঙ্গুল নিয়েই ক্ষয়াক্রান্ত একটা গরুর চাম ছাড়ায়। পরদিন দেখা গেল তার হাতটা ফুলে উঠেছে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে অল্প সময়ের মধ্যেই বগল পর্য্যন্ত ফুলে গেল ও সঙ্গে সঙ্গে জ্বর দেখা দিল। বিশেষরূপ পরীক্ষা করে দেখা গেল যে ক্ষয়বীজের দরুণ এরূপ হয়েছে। এরূপ উদাহরণ অনেক দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং চর্ম্মপথে ক্ষয়বীজের প্রবেশ অসম্ভব নহে, তবে সাধারণতঃ উহারা এ রাস্তায় বড় একটা বেশীদূর যায় না এবং গুরুতর কোন অনর্থ ঘটায় না।

শ্বাস ও আহার্য্য পথ

সচরাচর নিশ্বাসের ও খাবারের সঙ্গেই ক্ষয়-বীজ শরীরের ভিতর প্রবেশ করে। কোন্‌টার সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ সেটা দেখা দরকার। এসম্বন্ধেও অনেক বাদানুবাদ চলেছে। পূর্ব্বে মনে করা হত শত্রু শ্বাস-পথেই ব্যূহ প্রবেশ করে, আজকাল অনেকে বিশ্বাস করেন যে খাওয়ার রাস্তাই তাহার বিশেষ প্রিয়। বিষয়টি দরকারী, শত্রুকে আমরা শ্বাসের সহিত টেনে লই কি খাবারের সহিত পেটে পুরি সে বিষয়ে একটু চিন্তা করা উচিত।

ক্ষয়রোগীর থুথু

যারা ক্ষয়ে ভুগ্‌ছে তারা যখন স্বাভাবিক অবস্থায় সহজভাবে প্রশ্বাস ছাড়ে তখন তাতে ক্ষয়জীবাণু থাকে না সুতরাং তাদের প্রশ্বাস হতে ক্ষয় ব্যামো হবার বিশেষ কোন

আশঙ্কা নাই। কিন্তু তারা যখন কাসে, হাঁচে, কথা কয় বা গান করে তখন তাদের, মুখ থেকে, চারিদিকে অতি সূক্ষ্মাকারে থুথু ছড়িয়ে পড়ে। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে এই থুথু ক্ষয়বীজে পূর্ণ, কাজেই এ থেকে ক্ষয় হবার সমূহ ভয় আছে।

জীবাণুর প্রকৃতি

ক্ষয়জীবাণুগুলি আকারে অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য হইলেও অতি কঠিন প্রাণ, সহজে মর্‌তে চায় না। শরীরের বাহিরেও উহারা দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে। সূর্য্যের প্রখর আলোকে ইহারা নিস্তেজ হয় এমন কি বেশীক্ষণ থাকিলে মারাই পড়ে। কিন্তু আঁধারে ইহাদের বৃদ্ধি। ভূত প্রেত যেমন অন্ধকারে চলে বেড়ায় এরাও যমদূতের মত অন্ধকারেই আনন্দ পায়। অন্ধকারে ইহারা অনেক দিন বেঁচে থাক্‌তে পারে। ঠাণ্ডায়ও সহজে উহার কিছু কর্‌তে পারে না। এমন কি বরফের ভিতরেও উহা দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে। তবে বেশী উত্তাপে অধিকক্ষণ বাঁচে না। থুথু ফেল্‌বার সময় কেহ কাছে থাক্‌লে উহার সূক্ষ্ম বিন্দুগুলি ভিতরে প্রবেশ করে ক্ষয় উৎপাদন কর্‌তে পারে; কিন্তু উহা ত্যাগ করার পরও নিষ্কৃতি নাই। উহা শুকাইবার পর আপদ যাওয়া দূরে থাকুক, ভয়ের কারণ আরও বৃদ্ধি হয়। থুথু শুকাইবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয় জীবাণুগুলি মরে না। ধূলি বালু দিয়ে ঢাকা পড়ে ইহারা বেশ সুখে বাস করে ও দীর্ঘ দিনেও এদের কিছু হয় না, ২।৪ মাস ত বাঁচেই এমন কি ৮।১০ মাসও সচ্ছন্দে বাঁচে। শুকাইয়া ধূলির সহিত মিশিয়া বায়ুর দ্বারা নানা স্থানে নীত হয়—এইরূপ ঝুল্যমান অবস্থায় শ্বাসের সহিত হয়ত আমাদের ফুসফুসে আসিয়া উপস্থিত হয়—হয়ত দেয়ালের ফাটালে, গালিচার নীচে বা ঘরে যে সব আসবাবপত্র আছে তার পেছনে, যে কোন স্থানে একটু মাথা গুজিবার ঠাঁই পেলেই, একটু চোখের আড়ালে থাক্‌তে পারলেই বেশ সচ্ছন্দচিত্তে বাস কর্‌তে থাকে।

ব্যাধির সূত্রপাত

হঠাৎ চোরের ন্যায় এসে কখন যে নিশ্বাসের সহিত ভিতরে চলে যায় তা জান্‌বার উপায় নাই। শত্রু অলক্ষিতে এসে কখন যে তার অধিকার স্থাপন কর্‌ল তা কেউ বল্‌তে পারে না। হয়ত কিছুদিন ধরে বাস কচ্ছে কিন্তু কোন সাড়া শব্দই নাই। আমরা একবারও বিপদের কথা মনে করি না; কেমন করেই বা জান্‌ব? যেই কোন কারণে শরীর একটু খারাপ হল, একটু দুর্ব্বলতা বেশী হল, সজীবতার একটু অভাব ঘট্‌ল অমনি ভিতরকার অজ্ঞাত বন্ধুটি একটু যেন ঘাড় বাঁকালেন এবং নিভৃত গণ্ডী থেকে পা বাড়াবার যোগাড় দেখ্‌লেন। হয়ত এখন ঐ পর্য্যন্তই। শরীরটা একটু খারাপ বোধ হল মাত্র কিন্তু কোনরূপ ভয়ের কারণ যে আছে সে সন্দেহও হল না। এইরূপ করে কিছুদিন কেটে গেল। আরও কিছুদিন বাদে হয়ত আরও কয়েকটি বন্ধু আসিয়া জুটিলেন—এইরূপ করে দল একটু পুষ্ট হল এবং যখন পুনরায় কোন কারণে শরীর অসুস্থ হল তখন তারা পূর্ব্বের চেয়ে একটু জোরে গা নাড়াচাড়া দিলেন, এবং সুযোগ পেয়ে রাবণের গুষ্ঠীর মত দ্রুত বেড়ে যেতে লাগ্‌লেন। সুবিধামত অবস্থা পেলে এরা সামান্য কটি হতে অল্প সময়ের মধ্যে এত বেশী জন্মাতে পারে যে সে কল্পনার অতীত। এইবার হয়ত শরীরটা একটু বেশী খারাপ

হল—২।৪ দিন একটু জর হল, একটু শুকনা কাশী বোধ হল, এইরূপে ক্রমে ব্যামো বেড়ে যেতে থাকে এবং যাহা প্রথমে উপেক্ষার বিষয় ছিল তাহা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়ায়।

ক্ষয় জীবাণু কোথা হতে আসে

যেমন থুথু হতে এ ব্যামো হতে পারে সেইরূপ শরীরের যে কোন স্থানের ক্ষয়জাত পুঁষ প্রভৃতি হতেও হতে পারে। ক্ষয় রোগগ্রস্তের মল মূত্র হতেও ব্যাধি সংক্রমণ হতে পারে। দুধ ও মাংসের সহিতও প্রবেশ করতে পারে। পৈতৃক কারণে যে হতে পারে সে বিষয়েরও পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি।

মাংসাহার

গরু, শূয়োর, মোরগ প্রভৃতির যখন ক্ষয় হয় তখন যারা মাংসাহারী তাদের যে হবে তার আর আশ্চর্য্য কি? ইদানীং কসাইখানা হতেই সহরের প্রায় সমস্ত খাদ্য মাংস সরবরাহ হয়। সেখানে অনেক জন্তুরই ক্ষয় দেখা যায়। এই সব মাংস পেটে গেলে তা থেকে ক্ষয় হওয়া আবশ্যম্ভাবী। তবে কয়েকটা কারণে আমরা অনেকটা বেঁচে যাই।

স্বাভাবিক অবস্থায় ক্ষয়জীবাণু বৃদ্ধি না পাইবার হেতু

(১) মাংসের ভিতরে ক্ষয়জীবাণুর বৃদ্ধির বড় একটা সুযোগ হয় না। জন্তুগুলি প্রায় সর্ব্বদাই নড়াচড়া করে। ঘাড় নাড়চে, পা ছুড়ছে, ল্যাজ দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছে এইরূপে শরীরটা অনবরতই নড়াচড়ার উপর আছে। এইরূপ করায় ওদের মাংসপেশীর (muscles) ভিতর থেকে একরূপ অম্লজাতীয় রস (acid secretion) বার হয়। এই অম্লরসে ক্ষয়জীবাণু নিস্তেজ হয়ে পড়ে ও অধিকক্ষণ সংস্পর্শে বাঁচে না।

(২) আমরা যারা সভ্য বলে পরিচয় দিই তারা কাঁচা মাংস বড় একটা খায় না। খাওয়ার আগে মাংসটাকে সিদ্ধ করে নেই। সিদ্ধ হবার সময় ক্ষয়জীবাণুগুলি মারা পড়ে।

(৩) আমাদের পাকস্থলী (Stomach) হতে যে রস বার হয় তাও অম্লজাতীয়। সেই জন্যই ক্ষয়জীবাণুগুলি সহজে পাকস্থলীকে আক্রমণ করতে পারে না উপরন্তু নিজেরাই মারা পড়ে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সহজ সুস্থ শরীরে মাংসের সহিত জীবাণু প্রবেশের বড় একটা ভয় নাই এবং আমরা নিশ্চিন্ত মনে সুপক মাংস উদরপূর্ত্তী করে খেতে পারি।

বৃদ্ধি পাইবার হেতু

(১) জন্তুগুলি সব সময়ে সুস্থ ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত নাও থাকতে পারে, আর যদি কখনও শরীর কোন কারণে নড়াচড়া না করে তবে হয়ত যথেষ্ট অম্লরস নির্গত হয় না।

(২) মাংসগুলিও যে সব সময়ে সুসিদ্ধ হয় এমনও নয়—বিশেষতঃ ইংরেজ প্রভৃতিরা আস্ত আস্ত মাংস খণ্ডগুলি যেরূপ করে আধপোড়া করে (roasting) খায় তাতে ভিতরকার মাংস অনেক সময়ই কাঁচা থাকে।

(৩) আমাদের পাকস্থলীর কার্য্যও সব সময়ে ঠিক থাকে না—নানারূপ ব্যমোতে নানারূপ বিকৃতি ঘটে। হয়ত আদৌ রসক্ষরণই হল না—হয়ত অম্লজাতীয় রসের পরিবর্ত্তে ক্ষার জাতীয় (Alkaline) রস নিঃসৃত হল। এই ক্ষারজাতীয় রসে ক্ষারজীবাণু অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

(৪) হয়ত পাকস্থলীর ক্রীড়া স্বাভাবিকই আছে কিন্তু ক্ষয়জীবাণুগুলি খাবার জিনিষের সঙ্গে এমন ভাবে মিশে গেল যে উহার আব-

রণে থেকে অম্লরসের আয়ত্তেই এল না এবং নিরুদ্বেগে আঁতের ভিতর চলে গেল।

খাদ্য মাংসের পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা

সুতরাং খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হবার পূর্ব্বে মাংসকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করাই সঙ্গত। যদি কোন জন্তুর ক্ষয়রোগের সামান্য সন্দেহও থাকে তবে উহার মাংস কদাচ খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হওয়া উচিত নহে। সহরের হেল্‌থ্ অফিসারদের (Health officers) এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। তাঁদের দৃষ্টির উপর বহু প্রাণীর জীবন নির্ভর কর্‌ছে।

দুগ্ধ

মাংসের সহিত যেরূপ এই জীবাণু শরীরের ভিতর যেতে পারে সেইরূপ দুধের সঙ্গেও যেতে পারে। যখন গাভীগুলির বাঁটে ক্ষয় রোগ থাকে তখন ত জীবাণু দুধের সহিত যেতেই পারে; কিন্তু বাঁটে কোন ব্যামো নাই অথচ শরীরের অন্য কোন স্থানে আছে এরূপ অবস্থায়ও দুধের সঙ্গে বেরুতে পারে। সুতরাং দুধের সম্বন্ধেও বিশেষ সাবধানতা লওয়া আবশ্যক। দুধ হইতে যে মাখন তোলা হয় উহার ভিতরেও সময় সময় ক্ষয় জীবাণু দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সব দেশের শিশুগণই দুধ খেয়ে বাঁচে, ইহাদিগকে দুগ্ধগত প্রাণ বল্‌লে কিছুই অত্যুক্তি করা হয় না।

ইউরোপীয় শিশুদের ক্ষয়াধিক্যের একটু কারণ

ইউরোপীয় শিশুদের কয়েকটী কারণে ক্ষয় বেশী হতে দেখা যায়।

(১) উহারা মায়ের বুকের দুধ প্রায়ই পায় না, বেশীর ভাগই বোতল থেকে গরুর দুধ খায়।

(২) আমরা যেমন দুধটা জ্বালে ফুটাইয়া খাওয়াই তারা তা করে না। দুধ দুইয়া কাঁচা অবস্থায়ই খাইতে দেয়।

আমাদের শিশুদিগের ক্ষয়ের অল্পতার কারণ

আমরা দুধ সর্ব্বদাই ফুটাইয়া দিই এবং উহাতে জীবাণুগুলি মারা পড়ে বলেই আমাদের দেশের শিশুদের মধ্যে ক্ষয় আপেক্ষিক কম, বিশেষতঃ যাতে বীচিগুলি আক্রমণ করে। আমাদের দেশের গাভী-গুলিও এ ব্যামোতে কম আক্রান্ত হয়। আমা-দের দেশের শিশুরা বোতল থেকেও দুধ বড় একটা খায় না। মায়ের বুকের যে অমৃত আছে তাই স্বচ্ছন্দে পান করে। কিন্তু ইদানীং আমাদের মায়েরা এবিষয়ে যেন একটু শিথিল হইতেছেন। বোতল বড় কম আমদানী হইতেছে না, ইহা দেশের পক্ষে বড়ই দুর্দ্দশার কথা এবং অতীব অকল্যাণকর। যাতে প্রাণসম সন্তানের অপকার হওয়ার সম্ভাবনা আমাদের মায়েরা কি তা নিবারণ কর্‌তে সচেষ্ট হবেন না ?

গাভী, দুগ্ধ ও দোয়ালের পরীক্ষার আবশ্যকতা

মাংস খাদ্যের উপযোগী কি না তা যেমন পরীক্ষা করে দেখা দরকার সেইরূপ গাভী-গুলি দুধ দেবার উপযুক্ত কি না তাও পরীক্ষা করে দেখা কর্ত্তব্য। এজন্য প্রতি গোশালায় গিয়ে হেল্‌থ্ অফিসারদের গাভীগুলি পরীক্ষা করা উচিত। আরও একটা বল্‌বার আছে। গাভীগুলি হয়ত বেশ সুস্থ ও সবল আছে—কোন রূপে ক্ষয়গ্রস্ত নয় কিন্তু তথাপি অনেক সময়ে পানীয় দুগ্ধে ক্ষয় জীবাণু পাওয়া যায়। প্রথমে উহা আশ্চর্য্য মনে হয় বটে কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখ্‌লে রহস্য সহজেই প্রকাশ

পায়। গরুর দুধ, দুহিবার পাত্রে আপনি এসে পড়ে না, একজন দোয়ালের দরকার হয়। মনে কর এই দোয়ালের যক্ষ্মারোগ আছে, দুইবার সময় বেশ ২।৪ বার খক্ খক্ করে কেসে নিলে। কাসীর সময় থুথু সহজেই দুধের মধ্যে যেতে পারে এবং দুধকে সংক্রামিত করতে পারে; সুতরাং দোয়াল ঠিক কর্‌বার সময়ও তাকে দেখে শুনে সুস্থ দেখে করা উচিত।

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখ্‌তে পেয়েছি যে ক্ষয়জীবাণু শ্বাসনালী (Respiratory Passage) বা অন্ননালী দিয়ে আমাদের দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এক একটী ধরে দেখা যাক্ কোন্ পথে কে কোন্ অবধি যায়।

ক্ষয়জীবাণু অন্ননালী পথে

মুখের ভিতর উহারা বড় একটা উৎপাত করে না, মুখে কচিৎ ক্ষয়জাতীয় ঘা হয়, তবে জিহ্বার পেছন দিকটায় এহতে অনেক সময় গোটা গোটা হয় ও ঘা হয়। জীবাণু গলার ভিতর দিয়াও প্রায়ই বিনা উৎপাতে চলে যায়। কিন্তু যদ্যপি গলার ভিতরে কোনরূপ ঘা থাকে বা সেখানকার পর্দ্দাটার (mucous membrane) কোনরূপে ক্ষত থাকে তবে ঐ স্থানের ক্ষয় হয়।

টন্সিলের ব্যবহার

কেহ যদি হাঁ করে তবে জিহ্বার মূলদেশে গলার দুইপাশে দুটা সুপারির মত জিনিষ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। উহাদিগকে টন্সিল (Tonsil) বলে। পূর্ব্বে এদের কার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা ছিল না, আজকালও যে বড় একটা জানা গিয়াছে তা নয়। তবে উহারা দেহ-দুর্গের অনেকটা দ্বারীর কাজ করে,—বহু গোরা পল্টন (Lincocytes) এই স্থানে বাস করে এবং কোন শত্রু প্রবেশের উদ্যোগ কর্‌লেই এরা বাধা দেয়। কিন্তু সময় সময় শত্রুগণ এই স্থানগুলি বেদখল করে বসে এবং এখান হতে দেহের বহুবিধ অনিষ্ট সাধন করে। এই সব শত্রুদের মধ্যে ক্ষয় জীবাণুর ইহা একটি প্রিয় বাসভূমি। ক্ষয়ের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এদের ব্যাধি ত হয়ই উপরন্তু এখান হতে জীবাণুগুলি নানা স্থানে যেয়ে নানাস্থানের ব্যাধি উৎপাদন করে। গলার চারি পাশের বিচিগুলি (curvical glands) প্রায়শই এখান হতে আক্রান্ত হয়। সাধারণতঃ গলার চতুপার্শ্বেই সীমাবদ্ধ থাকে—কিন্তু এখান হতে ফুসফুসে বা অন্যত্র যাওয়াও অসম্ভব নয়। ক্ষয়বীজ যদিও সময় সময় ইহাদিগকে মুখ্যভাবে (primarily) আক্রমণ করে কিন্তু অধিকাংশ সময়ই ফুস-ফুসকে বা অন্য স্থানকে মুখ্যভাবে আক্রমণ করিয়া ইহাদিগকে তৎপশ্চাৎ গৌণভাবে (Secondarily) আক্রমণ করে।

কাণে

কোন কোন সময় এই জীবাণু গলার ভিতর হতে কাণে চলে যায়। গলা হতে কাণ পর্য্যন্ত দুপাশে দুইটা সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে (Eustachian tube)। কাণের ক্ষয় হলে পুঁষ প্রভৃতি হয়ে অনেক ভোগ ভুগ্‌তে হয়।

পাকস্থলীতে

জীবাণু গলা হতে অন্ননালী দিয়ে পাক-স্থলীতে পৌছে। অন্ননালী দিয়ে যাবার সময় এত তাড়াতাড়ি যায় যে সেখানে জীবাণুগুলি বিশ্রাম কর্‌বার বড় একটা অবসর পায় না—কাজেই অন্ননালীর ব্যামো হবার আপদটা প্রায়ই কেটে যায়। পাক-স্থলীর ভিতর অম্লরস থাকার কথা পূর্ব্বেই বলেছি এবং ঐ রসে যে ক্ষয় জীবাণু বর্দ্ধিত

হয় না তাও বলেছি। সুতরাং পাকস্থলীরও ক্ষয় হতে বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু যদি কোন কারণে পাকস্থলীর অম্লতা না থাকে বা পাকস্থলীর অন্যবিধ পরিবর্ত্তন হয় তবে এ ব্যামো হওয়া অসম্ভব নয়।

আঁতে

হয়ত ক্ষয়জীবাণু পাকস্থলীর ভিতরে কোন পদার্থ দ্বারা আবৃত হয়ে বা অন্য কোন প্রকারে অম্লরসের সংস্পর্শে এল না এবং এইরূপে নিরাপদে আঁতে যাবার সুযোগ পেল। এখানে ভিতরকার রস ক্ষার জাতীয় সুতরাং ক্ষয়জীবাণু বৃদ্ধির একান্ত পরিপোষক। আমরা তাই অন্ত্রের মধ্যে ক্ষয়জাত ঘা অতি বিশদরূপে দেখ্‌তে পাই। এখান থেকে সময় সময় উদরবেষ্টন ঝিল্লীকে আক্রমণ করে এবং পেরিটোনাইটিস উৎপন্ন করে।

ফুস্‌ফুসে

অন্ত্রের সংলগ্ন যে সব বিচি (Lymphatic glands) আছে উহারা অধিকাংশ সময়ই আক্রান্ত হয় এবং তথা হইতে রসবাহী নাড়ী (Lymphatic vessel) সহযোগে বুকের ভিতরকার (Thoracic) বিচি সমূহ আক্রমণ করে ও পরে ফুসফুসস্থিত ব্রঙ্কইয়াল গ্ল্যাণ্ডগুলি ত (Bronchial glands) আক্রমণ করতে পারে এবং তথা হইতে অবশেষে ফুসফুসকে আক্রমণ করে যক্ষ্মা সৃষ্টি করে।

মলদ্বারে

আঁতের ভিতরকার ঘা দ্বারা আঁত কুঞ্চিত হয়ে সময় সময় বাহ্যে বন্ধের (Intestinal obstruction) কারণ স্বরূপ হয়। সময় সময় বীচিগুলি বড় হয়ে মলদ্বার প্রায় বন্ধ করে ফেলে (Tumour and Stricture) এবং নানারূপ যাতনার কারণ হয়। মলদ্বারে অনেক সময় ক্ষয়জাত ফোড়া ও ভগন্দর হয়।

পেটের যক্ষ্মা

অনেক সময়ই ডাক্তারেরা পেটে যক্ষ্মা হয়েছে বলে থাকেন এবং কথাটা সাধারণে প্রায়ই বুঝ্‌তে পারে না সুতরাং এসম্বন্ধে একটু অল্পবিস্তর বলা দরকার। উদরাভ্যন্তরে আঁতে ক্ষয় ব্যাধি হয় এ কথা এই মাত্র বলেছি। এই স্থান হতে ক্রমে বিচিগুলি আক্রান্ত হয় ও পেরিটোনাইটিস হওয়ার কথাও পূর্ব্বেই বলেছি। অনেক সময় জ্বর থাকে তবে সব সময় থাকে না। বাহ্যের বড় গোলমাল হয়। কতকদিন হয় ত খুব শক্ত বাহ্যে হল আবার কতকদিন পেটের অসুখ চল্‌ল। এই প্রকার একবার মল কাঠিন্য ও পরক্ষণে উদরাময় বড়ই সন্দেহের বিষয়। সঙ্গে সঙ্গে আহারে রুচি থাকে না, খাদ্য পরিপাক হয় না, সময় সময় বা বমন হয়। দেহের বল ক্ষয় হতে থাকে ও শরীর শুকাইয়া যায়। কিছুদিন এই রূপ চল্‌লে পেটে জল জমা অসম্ভব নহে। পেটটি বেশ টিলটিলে হয় উপরিভাগ মসৃণ হয় ও শিরাগুলি বেশ প্রকাশমান হয়। পেটের উপর থেকে হাত চাপ দিয়ে দেখ্‌লে পেটের ভিতর বিচিগুলি ফুলার দরুণ ডিম ডিম বোধ হয়। এই ব্যাধি শিশুদেরই অধিকাংশ হয় এবং ইহাকেই পেটে যক্ষ্মা হওয়া বলে থাকে। (Tabes mesenterica); বাস্তবিক যক্ষ্মা শব্দ মাত্র ফুসফুসের ক্ষয় ব্যাধি সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়। যক্ষ্মা কথাটার দ্বারা পেটের ক্ষয় সহজে ধারণা হবে বলেই উহা ব্যবহৃত হয় নতুবা উহার যক্ষ্মা নাম দেওয়া সঙ্গত নয়।

শ্বাসপথে

এদিকে জীবাণু শ্বাসপথে নাকের ভিতর প্রবেশ করে কোন্ দিকে যায় দেখা যাক্‌। নাকের ভিতর খুব কম আক্রমণ হয়। কণ্ঠ-

নালীর প্রবেশ দ্বারের (Larynx) প্রায়ই ক্ষয় দেখা যায়। এতে স্বরভঙ্গ হয়ে যেতে পারে ও আহারে কষ্ট হতে পারে। এত স্বরভঙ্গ হতে পারে যে কথা বলার শক্তি আদৌ থাকে না। আহার একেবারে বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং তদানুসঙ্গিক দেহক্ষয় এবং অবশেষে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে। কণ্ঠনালীর (Bronchial tube) দিয়ে ক্ষয়বীজ সোজা ফুস্‌ফুসে চলে যায়। কণ্ঠনালীর ভিতরে সিলিয়েটেড্ এপিথিলিয়ামের (ciliated Epitheliume) আবরণ থাকায় ক্ষয়-জীবাণু সহজে এ পথে প্রবেশ কর্‌তে পারে না। যেই প্রবেশ কর্‌তে যায় উহারা ঠেলে বের করে দেয়; অন্য কথায় কোন বাহিরের জিনিষ প্রবেশ কর্‌লেই এ সব স্থানের সুড়সুড়ি হতেই কাশি সুরু হয় এবং যা কিছু ভিতরে যাবার যোগাড় করেছিল তা বের হতে বাধ্য হয়। কিন্তু সিলিয়াগুলি সব সময়ে কর্ম্মক্ষম নাও থাক্‌তে পারে। তখন ত আর উপায় নাই ক্ষয়বীজ অবাধে ফুস্‌ফুসে চলে যায় ও যক্ষ্মার সূত্রপাত করে।

শ্বাসপথ ও অন্ননালী পথ সম্বন্ধে বিচার

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই মত অনেকেই অস্বীকার করেন, তাঁরা বলেন যে এ পথে ক্ষয়বীজ সাধারণতঃ ফুসফুসে যায় না। উহা পেটের ভিতরকার অন্ত্র হতে তথাকার বিচিগুলি আক্রমণ করে এবং তথা হতে ক্রমে উর্দ্ধগতি হইয়া ফুসফুসের নিকট বিচিগুলি আক্রমণ করে এবং অবশেষে ফুসফুসকেই ধরিয়া বসে। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা বলা যাইতে পারে।

(১) অন্ত্রের ভিতর যে সব ক্ষয়বীজ দেখা যায় তাহা প্রায়ই গোজাতীয়; কিন্তু ফুসফুসের ভিতর মাত্র মনুষ্যজাতীয় জীবাণুই দেখা যায়।

(২) যক্ষার সব অবস্থায়ই অন্ত্রের ভিতর ঘা বা তথাকার বিচিগুলিকে ব্যাধিগ্রস্ত দেখা যায় না।

(৩) আমাদের এই ভারতবর্ষে এমন হাজার হাজার লোক আছে যারা মাংস কোন জন্মে খায় না এবং দুধও যে একটু আধটু খাবে অদৃষ্টবৈগুণ্যে দারিদ্র্য জন্য সে সুখ হতেও তারা বঞ্চিত—কিন্তু তাদের মধ্যেও অনেকের যক্ষা রোগ দেখা যায়।

প্রথম মতের অনুকূলে এই বলা যেতে পারে যে, দেহে প্রবেশ কর্‌বার সময় গো-জাতীয় জীবাণুই প্রবেশ করে; কিন্তু বহুকাল শরীরের ভিতর থাকার দরুণ এবং উহার চারিদিককার অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য উহা আস্তে আস্তে মনুষ্য-জাতীয়তে পরিবর্ত্তিত হতে পারে। কিন্তু কেহ এরূপ নিশ্চিতরূপে ঘট্‌তে দেখেছেন বলে বলেন নাই এবং যে পর্য্যন্ত এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান না হয় এবং বিশিষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ না হয় সে পর্য্যন্ত এই মতের পোষকতা করা যায় না।

দ্বিতীয় মতের স্বাপক্ষে এই বলা যেতে পারে যে, হয়ত ক্ষত অতি যৎসামান্য হয়েছিল এবং উহা এমন ভাবে সেরে গেছে যে উহার চিহ্নমাত্র নাই। বিচির ভিতর দিয়েও জীবাণুগুলি এত তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছে যে উহার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘট্‌বার অবকাশ হয় নাই। কিন্তু এরূপ সকল সময়ে সম্ভব নয়।

তৃতীয় মত ইহার একান্তই বিপক্ষে। সুতরাং আমরা যে সব প্রমাণ পাইতেছি তাহা হতে দেখা যায় যে ক্ষয়জীবাণু, সাধা-

রণতঃ সোজা শ্বাস পথেই যায় এবং মনুষ্য-জাতীয় জীবাণু দ্বারাই যক্ষ্মা উৎপাদিত হয়। কিন্তু একথাও আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, কতক কতক জীবাণু খাদ্যপথে দেহে প্রবেশ করে এবং সম্ভবতঃ অবস্থাবিশেষে সময় সময় গোজাতীয় জীবাণু দ্বারাও এই ব্যাধি উৎপন্ন হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

পুণ্যক্ষেত্র ৺কালীক্ষেত্র

(গত ভাদ্র মাহার ১০৩৯ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

(৪)

(কালীঘাটের কয়েকজন সন্ন্যাসী)

কটুভাষী সন্ন্যাসী

সন্ন্যাসিগণের সহিত আলাপ পরিচয় সকল সময় সুখকর নহে, কখন কখন বিনা কারণে লাঞ্ছিত হইতে হয়।

বাটির নিকটেই কোন এক গঙ্গার ঘাটে কিছুদিন হইতে এক বাঙ্গালী সাধুর দর্শন পাইয়া তাঁহার সহিত আলাপে ব্যগ্রতা জন্মিল। সন্ন্যাসী মাঝে মাঝে চণ্ডীপাঠ করিতেন ও তখন তাহা বড় সুশ্রাব্য বোধ হইত। অজ্ঞাতসারে সন্ন্যাসী আমার একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

একদিন রাত্রিকালে মায়ের নাটমন্দিরে দেখি সন্ন্যাসিটি বসিয়া আছেন ও গান জুড়িয়া দিয়াছেন। গলা যেমন সুমিষ্ট, গানের ভাবটিও তেমনই সুন্দর। কথাগুলি মনে নাই কিন্তু ভাবটি যাহা মনে আছে তাহাতে মনে হয় গায়ক, ৺শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় বিরচিত নিম্নলিখিত সুন্দর গানটিই গাহিতেছিলেন।

এই সময় তারা জাগো জাগো।
ঘোর মহানিশায় ঘোর শিবা রব,
শিব সীমন্তিনি জাগো জাগো।
তুমি ঘুমাইলে সংসার জাগে মা,
সংসার ঘুমাইলে তুমি জাগো শ্যামা
এখন ঘুমাল সংসার জাগো তাই একবার
এই ত সময় যায় গো।
দেহ মনোবৃত্তি দশেন্দ্রিয় শক্তি,
ঘুমাইল তারা হইল সুষুপ্তি;
এখন দূরে গেল তারা, তুমি জাগো তারা!
পুরাও মা অন্তর্যাগ।
এ বিশাল বিশ্ব গভীর আঁধারে,
ঢাকিল মা মহা অবিদ্যার ঘোরে,
ভোগে পশুপক্ষীনরচরাচরে,
আপন আপন ভাগ।
ভেদি এ আঁধার আধার কমলে,
জাগো কুল কুণ্ডলিনি! চতুর্দ্দলে;
দোল দলে দলে, যোগিনীর দলে
দোলায়ে দোল মাগো॥ ইত্যাদি।

তখন আমি ঐ গীতটি আর কোথাও পড়ি নাই। ভাল লাগায়, অপরাধের মধ্যে ঐ গানটি আর একবার গাহিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। ইহাতেই কিন্তু তিনি চটিয়া গিয়া মুখঝাম্‌টা দিয়া বলিয়া বসিলেন—"আমি ত তোমার চাকর নহি যে হুকুমে ফরমাস খাটিতে হইবে।" তাঁহার এইরূপ কোপন প্রকৃতি, সময় সময় অধিকতর

কটুভাষা ও অশ্লীল গালাগালি প্রভৃতি হেতু তাঁহার সহিত বেশী মিশিতে আর প্রবৃত্তি বা সাহস হয় নাই। কিছুকাল পরেই ইনি অন্যত্র চলিয়া যান, আর দেখা হয় নাই। কে বলিতে পারে, ইনি ঐ পূর্ব্বকথিত জড়োন্মত্ত পিশাচ-বেশী কোন মহাপুরুষ নহেন? কারণ ঠিক এইরূপ আকৃতি প্রকৃতির এক সন্ন্যাসীর সহিত পরিচিত ও তাঁহার কোন ভক্তের নিকট পরে শুনিয়াছিলাম, সন্ন্যাসীটির নাম শাঙ্খ বা সাংখ্য বাবা এবং তিনি একজন অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষ।

সন্ন্যাসী সজ্জনের প্রকৃত পরিচয় লাভের পক্ষে এই এক মস্ত বাধা বিদ্যমান। তাঁহারা সত্য সত্যই কোন অসাধারণ পুরুষ অথবা শ্রদ্ধালু হৃদয়ের শ্রদ্ধার গুণে ঐরূপে অনুভূত হন মাত্র, নির্ণয় করিয়া উঠা সুকঠিন। আমরা জানি, ভক্তিরূপ স্পর্শমণি প্রভাবে এইরূপ অঘটন নিত্য ঘটিয়া থাকে। সন্তানের নিকট জনকজননী, জনকজননীর নিকট সন্তান, পত্নীর নিকটে পতি বা পতির নিকটে পত্নী, বন্ধুর নিকটে বন্ধু, ইত্যাদি সকলে,—সম্পর্ক বিরহিতের নিকট যে ভাবেই প্রতীয়মান হউন, ইহাঁরা সকলে যত দোষেরই আধার হউন,—অনুরাগরূপ স্পর্শমণি প্রভাবে পরস্পরের নিকট দেবতার ন্যায় সুন্দর ও মনোহর। ভক্তি প্রভাবে এইরূপ দিব্যপ্রকৃতি ও দিব্যদৃষ্টিলাভ হয়; ভক্তের নিকট অসুন্দর কিছু রহে না; ভক্ত তাহার ভক্তি প্রভাবে সদাসুন্দর বৈকুণ্ঠপুরি রচনা করিয়া তাহার মাঝে নিয়ত বিহার করে। এই জন্যই বলে ঢেঁকি ভজেও স্বর্গে যাওয়া যায়, পক্ষান্তরে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে নিকটে পেয়েও দুর্য্যোধনাদির মন মজেনা।

এ সম্বন্ধে অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। পথের ধারে নর্দ্দামার কাছে, আজ এখানে কাল ওখানে কাঁথা কানি বেষ্টিত হৃষ্ট পুষ্ট সদা প্রফুল্লচিত্ত একজনকে দেখিতাম। তাহার এই সদা প্রফুল্ল ভাবটই একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। কাজের মধ্যে এক ছেলে মানুষি কাজ—টিনের একটা মগের মধ্যে একটা বাঁশের চোঙ্গ রাখিয়া তাহাতে ফুঁ দিয়া খুব গম্ভীর আওয়াজ বাহির করা, শব্দ শুনলে মনে হ'ত যেন বাঘ গজরাচ্ছে। ৺গয়াধামে একজন যাত্রীর সঙ্গে আলাপ হয়, তিনি কথায় কথায় আমার কালীঘাট ভবানীপুরে বাড়ি শুনে জিজ্ঞাসা করিলেন, পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতির কোন সাধু ব্যক্তির সহিত আমি পরিচিত কি না এবং পরিচিত নহি শুনিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত পরিচিত হইতে যেন চেষ্টা পাই তিনি একজন অসাধারণ পুরুষ। কৌতুহলী হয়ে বাটি এসেই তাঁহার সন্ধানে চলিয়াছি, পথেই দেখি কাঁথা কানি সব কাঁধে লয়ে, মোটাসোটা যেন একজন কাবুলীর ন্যায় দেখিতে হয়ে, সন্ন্যাসী ঐ দিনই কোথায় চলিয়া যাইতেছেন; মুসলমানের ন্যায় দেখিতে মাথায় কিন্তু এক নামাবলি জড়ান কে আর একজন পথ আগুলিয়া দাঁড়িয়েছে। সন্ন্যাসীর মুখের কাছে হাত নাড়িয়া নাড়িয়া, শেষোক্তটি মৃদুস্বরে কি গান শুনাইতেছে; সন্ন্যাসী একটু মুচকি মুচকি হাসিয়া মাঝে মাঝে আমাদের দিকে চাহিয়া এক একবার চোখ ঠারিতেছেন, ইঙ্গিতে যেন বলিতেছেন "পাগলটার রকম দেখ"। অনেক লোক এই দুই পাগলের কাণ্ড দেখিতে জমা হয়েছে। আমি কাছে যাইতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু জনতা ঠেলিয়া নিকটে যাইতে অসুবিধা বোধ হ'ল। একটু পরেই নামাবলি মাথায় মুসলমানটি নিকটের এক গাঁজার দোকান হইতে

দুপয়সার গাঁজা কিনিয়া সন্ন্যাসীকে দিলেন। সন্ন্যাসী সেই যে চলিয়া গেলেন সেই অবধি আর দেখা হয় নাই। ইনি একজন প্রকৃতই কোন মহাপুরুষ কি না, ইহাঁর সহিত পরিচিত হইবার আমার সৌভাগ্য নাই সেইজন্য অথবা প্রকটিত হইবার ভয়ে ঐ ভাবে অন্তর্হিত হইলেন, কিরূপে নির্ণীত হইবে?

গাঁজা কেনা প্রসঙ্গে একটা কথা মনে উঠিল। একবার একজন সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাঁহারা অত গঞ্জিকার ধূমপান করেন কেন? সন্ন্যাসী যাহা উত্তর দিয়াছিলেন, নিতান্ত অযৌক্তিক মনে হয় না। তিনি বলিয়াছিলেন গৃহী ও সন্ন্যাসীর অবস্থা একরূপ নহে। সন্ন্যাসীদিগকে সর্ব্বদা পাঁচ ঘাটের জল খাইতে হয়, অর্থাৎ বিভিন্ন স্থলে নিয়ত শীতাতপের পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে হয়, ঐ সমস্ত বিষের প্রভাবে তাঁহারা অনেকটা পীড়ামুক্ত থাকেন। কালকূট বিষও সন্ন্যাসীদের পক্ষে অপকারী না হইয়া অনেক সময় অমৃতের তুল্য উপকারী হয়। আমরা জানি, সেকালে ইংরাজিটিকা লইবার পর, সকলে কিছুদিন বিভিন্ন পল্লীর বিভিন্ন পুষ্করিণী সমূহে এক একদিন স্নান করিয়া কৃত্রিম উপায়ে শীঘ্র শীঘ্র জ্বর আনয়নে চেষ্টা পাইতেন, ইহাতে টিকা লইবার উদ্দেশ্যটি অধিকতর সুসিদ্ধ হয় বিবেচনা করা হইত। এখন ওরূপ করা অনাবশ্যক বিবেচিত হয় এবং এখন আর তেমন পাড়ায় পাড়ায় পুকুরেরও ছড়াছড়ি নাই। কোন্ পুকুরের জল হাল্কা, কোন্ পুকুরের জল ভারি এবং এইরূপ পাঁচ ঘাটের পাঁচ রকম জল ব্যবহার শরীরের পক্ষে অপকারী অনেকেরই জানা ছিল। পক্ষান্তরে সন্ন্যাসীগণের প্রিয় পারাভস্মাদি গরম ঔষধ ব্যবহার ফলে অনেক গৃহীকে আজীবন ডাবের জল চিনির পানা প্রভৃতি শীতল দ্রব্য ব্যবহার করিয়া শরীর সুস্থ রাখিতে হইত। এই সব হইতেও বুঝা যায় সন্ন্যাসীর কথাগুলি নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। গৃহী ও সন্ন্যাসীর অবস্থা বহু বিষয়ে ভিন্ন সুতরাং গৃহীর আদর্শের মাপকাঠি লইয়া সন্ন্যাসীগণের অনেক আচরণ ভাল কি মন্দ বিচার করা সকল সময় সঙ্গত নহে অথবা মহতের আচরণ অনুকরণীয় এই অছিলা করিয়া উহাঁদের অনেক আচরণের অন্ধ অনুকরণ করাও কর্ত্তব্য নহে।

"সোত্রাঁও" নামে এইরূপ আর একজন সাধুকে প্রায় ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে একটি একতারা বাজাইয়া পথে ঘাটে বিচরণ করিতে দেখা যাইত। শ্মশানে বাস ও মদ্যপান করিতেন এবং খাদ্যাখাদ্যের বিচার ছিল না। শুনা যায় গলা পচা মাংস এমন কি মড়াপোড়া মাংস অবধি খাইতে আপত্তি ছিল না। এরূপ পৈশাচিক ধরণ ধারণ সত্ত্বেও তিনি অনেকের সবিশেষ ভয় ভক্তির পাত্র ছিলেন এবং তাঁহাকে একজন অসাধারণ পুরুষরূপে অনেকেই বিশ্বাস করিতেন। পথে ঘাটে জড়োন্মত্ত পিশাচ প্রকৃতির লোক খুব বিরল নহে কিন্তু সকলের প্রতি সকলে ত শ্রদ্ধান্বিত হয় না এবং এত সহজে যশঃ মান পাইবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও কয়জন লোক এভাবে জীবন যাপনে সম্মত হইতে পারে?

"বংশী বাবা"

কালীঘাটে এইরূপ অজানা সন্ন্যাসীর সংখ্যা বিস্তর। যতদিন উপস্থিত থাকেন ততদিন তাঁহাদের সহিত মিশিতে অনেকেরই প্রবৃত্তি বা অবসর হয় না। তথাপি অনেকেরই ছোট খাট ভক্তের দল থাকে, কোন গুণের

পরিচয় না পাইলে তাঁহারা মুগ্ধ হনই বা কেন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই অনুরাগটা ভক্তের ভক্তি প্রবণ প্রকৃতির বা সন্ন্যাসীর সাধন মার্গে অগ্রগামিতার পরিচায়ক সকল সময় নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা যায় না। যাহা হউক এই সমস্ত হইতে আমরা আমাদের সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থার অনেকটা পরিচয় পাই। প্রবল ধর্ম্মানুরাগের একটা পূত অন্তঃসলিল প্রবাহ এখানে নিয়ত প্রবাহমান। ধর্ম্মানুরাগী সাধক ও সিদ্ধ পুরুষগণের অভাব এখানে কখনই হয় নাই এবং বোধ হয় হইবারও নহে।

কালীঘাটেরই উপকণ্ঠস্থিত টালিগঞ্জের প্রসিদ্ধ মোড়ল বাবুদের ঘাটে একজন সন্ন্যাসী কিছুদিন অবস্থান করিতেন। একটা বাঁশের বাঁশী বাজাইয়া প্রায় বেড়াইতেন বলিয়া লোকের নিকট ইনি বংশীবাবা, নামে পরিচিত ছিলেন। ইনি একজন নানকপন্থী উদাসীন এবং এবারকার হরিদ্বারের কুম্ভ মেলায় দেহ রক্ষা করিয়াছেন। বাবা নানক প্রবর্ত্তিত শিখ সম্প্রদায়কে হিন্দুগণ হইতে পৃথক্‌রূপে পরিগণিত করিতে আজকাল কেহ কেহ অভিলাষ দেখান কিন্তু এইরূপ একজন নানকপন্থী উদাসীনের সংস্রবে আসিয়াই ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের প্রাণের ধর্ম্মপিপাসা পরিতৃপ্ত হইয়াছিল এবং ক্রমশঃ তিনি আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্মের উপর অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছিলেন। যাহা হউক শিখগণ হিন্দু বা অহিন্দু সে মীমাংসা আপাততঃ অনাবশ্যক।

একজন বিশ্বাস্য প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে বংশীবাবা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অদ্ভুত কাহিনীটি শ্রবণ করিয়াছি।

একদিন অনেকে ইহাঁর নিকট বসিয়া আছেন, সহসা চারিদিকে শৃগাল ডাকিয়া উঠিল। শৃগালেরা রজনীতে এই ভাবে প্রহরে প্রহরে চীৎকার করে বলিয়া ইহাদের একটি নাম "যামঘোষ"। আরও অনেক নিশাচর প্রাণী আছে তাহারা কিন্তু এভাবে প্রসিদ্ধিলাভ করে নাই। যাহা হউক উহাদের এরূপ সমস্বরে চীৎকারে যতই বিশেষত্ব থাকুক, ইহা একটা অসাধারণ ব্যাপার নহে। শৃগালগণের ডাক থামিলে সন্ন্যাসী কিন্তু বলিয়া উঠিলেন "হুঁ! বহুৎ আচ্ছা।" সকলে ইহার কারণ জানিতে চাহিলে ইনি বলিয়াছিলেন, "গঙ্গার জল বাড়িয়া শীঘ্রই একটা প্লাবন উপস্থিত হ'বে ও অনেক জীবজন্তু মারা পড়িবে, ইহারা তাহাই জানাইয়া গেল।" ইহার অল্পকাল পরেই, গঙ্গার সহিতই সংযুক্ত দামোদর নদের ভীষণ প্লাবন সংঘটিত হয়।

এই যে একটি ঘটনার কথা উল্লিখিত হইল আজিকারদিনে অনেকেরই নিকট ইহা একটি ঘোর অবিশ্বাস্য ও উপহাস্য ব্যাপার কিন্তু তথাপি ঘটনাটি যে সত্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন ইহা হইতে কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে, পাঠকবর্গ নিজ নিজ রুচি ও বিদ্যাবুদ্ধি অনুযায়ী তাহা স্থির করিয়া লউন। এই প্রসঙ্গে আমাদের এইটুকু মনে রাখা ভাল, নাস্তিকতা ও অবিশ্বাসটা অনেক সময় অজ্ঞানতা ও অক্ষমতারই নামান্তর মাত্র।

এক সময়ে কি এদেশে কি অন্য দেশে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই বহুবহু পশুপক্ষীর আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধে অনেকেই অল্প বিস্তর বিশ্বাসবান্ ছিলেন। জন্মান্তরবাদিগণ ত স্বীকারই করেন, আত্মা শুধু নরদেহেই নিবদ্ধ নহে। প্রাচীন মিশরে গো-পূজা প্রচলিত ছিল। ইহাঁদের সংস্রবে আসিয়া প্রাচীন য়িহুদিগণ অনেকে গো-পূজক হইয়া উঠিয়া-

ছিলেন এবং উহাঁদের এই স্বভাব পরিবর্ত্তনার্থ য়িহুদি নেতাদিগকে অনেক আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। এদেশে এখনও অনেকে বানর, গো, সর্প, কুক্কুর, বিড়াল, শৃগাল, কাক, পেচক প্রভৃতি বিবিধ পশুপক্ষীর নানারূপ আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধে অল্পবিস্তর আস্থা সম্পন্ন। ভারতের নানাস্থলে "মহাবীর" মারুতি জাগ্রত দেবতারূপে পূজিত, কুস্তির আখড়ায় আখড়ায় ইহাঁর মূর্ত্তি রক্ষিত, প্রাচীন রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় বাঙ্গালীর ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যেও হনুমানের কীর্ত্তিকথা বিঘোষিত। গো-মাতার গুণগানে হিন্দুর শাস্ত্র কাব্যসমূহ মুখরিত; গো-সেবায় পুণ্য বৃদ্ধি ও পাপক্ষয় হয়, অপুত্রক পুত্রপায়, অমঙ্গল দূরে যায়, গোধনের তুল্য ধন নাই, গোদানের তুল্য দান নাই, পঞ্চগব্য পাতিত্য নাশক, গব্যদুগ্ধ ও গব্যঘৃত জরাব্যাধি প্রশমনকারী শ্রেষ্ঠ রসায়ন, গোমূত্র ও গোময় সাহায্যে ধাতু-ভস্মাদি শ্রেষ্ঠ ঔষধীয় উপাদান সমূহ প্রস্তুত হয়। বাস্তুসাপ ও লক্ষ্মীপেঁচা গৃহস্থের মঙ্গল-কারণ। কুক্কুর সন্ন্যাসীর আদৃত জীব, ভৈরবদেবের বাহন, ধর্ম্মের মূর্ত্তি। কাল-পেঁচা, দাঁড়কাক, কুক্কুর, শৃগাল, বিড়াল প্রভৃতির বিকট চীৎকার অশুভসূচক। ভুষুণ্ডী কাক চির জ্ঞানের আধার। শাকুন বিদ্যায় পারদর্শিতা জন্মিলে শৃগালের ন্যায় কাকের ডাক শুনেও অনেক বিষয় অবগত হওয়া যায়। শৃগাল গর্দ্দভ প্রভৃতির ডাক শুনিয়া ঠগীরা একসময় নিয়ন্ত্রিত হইত। কৃত্তি-বাসী রামায়ণের পাঠক অবগত আছেন,—

"হাতে ধনুর্ব্বাণ রাম আইসেন ঘরে,
পথে অমঙ্গল যত পড়য়ে গোচরে,
বামে সর্প দেখিলেন, শৃগাল দক্ষিণে,
তোলাপাড়া করেন শ্রীরাম কত মনে।"

শৃগাল বড় সাধারণ জীব নহেন, শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলে বসুদেব যখন কংসভয়ে সদ্যোজাত শিশুটিকে লইয়া সখা নন্দ গোপের গৃহে রাখিয়া আসিবার জন্য পলায়ন করিতে-ছিলেন এবং দুর্য্যোগময়ী রজনীতে বর্ষার জলে কালিন্দীর স্ফীত কলেবর দেখিয়া প্রমাদ গণিতেছিলেন, মহাদেবী যোগমায়া সেই সময় স্বয়ং শৃগাল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অনায়াসে নদী পার হইয়া গিয়া বসুদেবের অবসন্ন হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিয়া দিলেন। শিবাগণ শ্মশান-তারিণী হরজায়া শিবাণীর নিত্য সহচর এবং তাঁহার আদেশে আশ্রিত জীবরূপে অনেক অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন। গাজনের সময় শিবা বলি অর্থাৎ শৃগালগণের উদ্দেশে আহার্য্য প্রদত্ত হয়। (দেবগণের উদ্দেশে নিবেদিত দ্রব্যসমূহের সাধারণ নাম বলি, বলি ও প্রাণ হনন নিত্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ নহে, বলি শব্দের এই সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিয়া আমরা সকলেই বলিতে পারি "নরবলির" তুল্য শ্রেষ্ঠ বলি বাস্ত-বিকই আর নাই। বলা বাহুল্য নরবলি শব্দের অর্থ এখানে নরহত্যা নহে, পরন্তু ধর্ম্মার্থ জীবন উৎসর্গ বা ধর্ম্মকেই জীবনব্রতরূপে গ্রহণ মাত্র)। নবান্নের সময় গৃহস্থগৃহে কাকবলি প্রদত্ত হয়। চারিদিকে আহার্য্য জুটে বলিয়া, অথবা সহসা এত আদরের অর্থ কি ভাবিয়া সে দিন কাকদের গর্ব্ব বা সন্দেহ বাড়িয়া যায়, গৃহস্থগৃহে সহসা তাঁহারা দর্শন দেন না। গৃহে কাক এসে একটু বিশেষ ভাবে কলরব আরম্ভ করিলে, গৃহস্থবধূ অনেক সময় তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন "কুটুম আসে যদি তবে নড়ে বস্" এবং কাক ঐ কথা শুনিয়া নড়িয়া বসিল কিনা দেখিয়া আত্মীয় কুটুম্বের শুভাগমন প্রতীক্ষা করেন। বিড়ালেরা প্রায়ই তাহাদের অঙ্গ পরিষ্কারে প্রবৃত্ত থাকে,

এটি তাহাদের একটু অসাধারণ স্বভাব। বিড়ালকে একটু যত্ন সহকারে মুখ মুছিতে দেখিলে, গৃহস্থবধূ অমনই তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "কুটুম আসে যদি কাণ তুলে তুলে আঁচা", বিড়ালও অমনই অনেক সময় তাহার থুলো দিয়া কর্ণদেশ অবধি মুছিয়া লয়, গৃহস্থ বধূও জানিতে পারেন গৃহে অতিথীর আগমন হইতেছে।

দৃষ্টান্তগুলি অবশ্য সামান্য কিন্তু এই সমস্ত হইতে বুঝাযায় এই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান লাভ, ফলিত জ্যোতিষের একটা অঙ্গ স্বরূপ বা সতন্ত্র বিজ্ঞান বা বিদ্যাবিশেষরূপে বিবেচিত হইত। জড় বিজ্ঞান চর্চ্চা ফলে, তাপমান, বায়ুমান, অণুবীক্ষণ, দুরবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্রযোগে যেমন আমাদের দিব্যদৃষ্টি বা জ্ঞাননেত্র কিয়ৎপরিমাণে বিকশিত হয় তদ্রূপ ঐ সমস্ত বিদ্যাবলে অনুরূপ বা উৎকৃষ্টতা রূপ জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী হওয়া যাইতে পারে, এইরূপ ধারণা একসময় অনেকেই পোষণ করিতেন।

তারপর নানা কারণে অল্পে অল্পে অবিশ্বাসের যুগ দেখা দিল। আমরা অনেকেই এই সমস্ত বিদ্যার বিশ্বাস কুসংস্কার মাত্র মনে করিয়া, সবই নস্যাৎ করিয়া দিয়া অথবা এসব বিষয়ে মাথাঘামান নিরর্থক ভাবিয়া অজ্ঞানের অন্ধকারে নিশ্চিন্ত মানসে নিদ্রা যাইব স্থির করিয়াছিলাম, কিম্বা এই সব দুর্জ্জেয় জটীল বিষয়ে বহু পরিশ্রম সহকারে তত্ত্বানুসন্ধান অপেক্ষা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের শিষ্যত্ব স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাদের বহু তপস্যালব্ধ জড় বিজ্ঞানটি অল্পায়াসে আয়ত্ত করিয়া লইয়া অধিকতর লাভবান্ হইবার আশায় উৎফুল্ল হইতে ছিলাম। কিন্তু এতদিন পরে এ আবার কি! এতদিন পরে আবার কি সেই বহুদিনের অবজ্ঞাত গুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় ভারতের নানা বিদ্যা, ভাস্বর মূর্ত্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়া আমাদের অবিশ্বাসের অন্ধকার উড়াইয়া দিবে ইহা কি তাহারই সূচনা? অথবা আমাদের জ্ঞান ও ক্রমোন্নতির অভিমানটা একটু সংযত করিবার জন্য, আমাদের প্রাচীন উন্নতি ও বিবিধ বিদ্যার কাহিনীগুলা যে কুসংস্কার ও অলীক উপন্যাস মাত্র নহে তাহা বুঝাইবার জন্যই কি জানি কাহার কৃপায় মাঝে মাঝে এইরূপ সব প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলে কি না কে বলিতে পারে?

বংশীবাবার একটা প্রিয় উপদেশ এই, "সমরতি" অর্থাৎ সূর্য্যের ন্যায় সকলের উপর সমদৃষ্টি সম্পন্ন হও। এ সেই চির পুরাতন অথচ চির নূতন সনাতন উপদেশ "শুনিচৈব শ্বপাকেচ পণ্ডিতা সমদর্শিনঃ।" প্রকৃত পণ্ডিত পদবাচ্য যিনি, তিনি ঘৃণিত কুকুর বা অস্পৃশ্য চণ্ডালকেও অবজ্ঞা বা উপেক্ষার ভাবে দেখেন না। "সমরতি" এই সামান্য কথাটিতে সর্ব্বভূতে দ্বেষবিহীন করুণাপর প্রকৃতি, শত্রুমিত্রে সমজ্ঞান, শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ, মান অপমান ইত্যাদি ব্যাপারে অবিচলিত ভাবে অবস্থান, হর্ষানর্ষ ভয় উদ্বেগ ইত্যাদি হইতে মুক্তি লাভ, প্রভৃতি গীতার অনেকগুলি সুমহৎ উপদেশ অতি অল্পাক্ষরে সূচিত। ফলতঃ যতই চিন্তা করা যায়, কথাটির ভিতর হইতে যেন নব নব সুন্দর ভাব বাহির হইতে থাকে। পাকা "সমরতি" আর বেদান্তের নির্গুণ ভাবে অবস্থিতি একই কথা। একটুও ভেদজ্ঞান বা দ্বৈতজ্ঞান অবশেষ থাকিতে সমজ্ঞানটা আর ষোল আনা হইল কিরূপে বলা সাজে? আবার সর্ব্বত্র "রতি" বা আনন্দ উপভোগ, আর মহারাসে শ্রীকৃষ্ণ সুন্দরে মজে যাওয়া একই কথা নহে কি? "চিনি হ'তে চাইনা

রে মন, চিনি খেতে চাই।” যিনি চিনি খেতে চাহেন, তিনি চিনি হবার চিন্তায় যদি ডরিয়ে উঠেন বা চিনি হ’তেই যাঁহার বাসনা চিনি খেতে পেলেও যদি সাধকরে তিনি সে রসে বঞ্চিত থাকেন তবে উহাদের কোনটাই ঠিক “সমরতি” হইল না। একজন গ্রীক দার্শনিক বলিয়া বেড়াইতেন, “জীবন ও মরণ দুটাই তাঁহার বিবেচনায় সমান, কোন ভেদ নাই; একটার যেখানে অন্ত অন্যটার তথায় আরম্ভ, এই হিসাবে মরণটা নবজীবন এবং জীবনটা মরণ নামে অভিহিত করিলেও দোষ নাই; ফলতঃ মরণই বা কোথায় জীবনই বা কোথায়? অনন্তের শুধু দুটা কাল্পনিক অংশ-ভেদ মাত্র।” একজন তরলমতি দুষ্টবুদ্ধি তার্কিক যুবক তাঁহাকে একদিন পাকড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, জীবন ও মরণ সত্য সত্যই যদি তিনি সমজ্ঞান করেন তবে বাঁচিয়া আছেন কেন? কৈ মরিয়া দেখান দেখি যে দুটাই তাঁহার বিবেচনায় সমান! দার্শনিক কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া উত্তর দিলেন, “দুটাই যে সমান, একটা ছেড়ে আর একটার জন্যই বা ব্যস্ত হইব কেন?” ফলতঃ এইরূপ ভাবে সমজ্ঞানটাও সর্ব্বথা অভেদজ্ঞান নামে অভিহিত হইবার উপযুক্ত, আর অভেদ জ্ঞানই ত অদ্বৈতজ্ঞান। ফলতঃ আমাদের বিবেচনায় অদ্বৈতবাদের ইহাও এক উপযুক্ত ও সঙ্গত অর্থ। এই অর্থ গ্রহণ করিলে, দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের মধ্যে এক অচিন্ত্য ভাবে সমন্বয় সিদ্ধ হয়; শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য প্রভৃতি আচার্য্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট বিচার লয়ে আর লাঠালাঠি গালাগালির প্রয়োজন থাকে না। শুধু বুঝিবার বা বুঝাই-বার দোষে উহঁাদিগকে পরস্পরের বিরুদ্ধবাদী রূপে খাড়া করা হয় মাত্র! সুখের বিষয় বর্ত্তমানকালের একজন বাঙ্গালীর—“পত্রাবলী” মহাত্মা হরনাথের—চিন্তায় জীবন্মুক্তির এই নব অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অল্প পরিচিত আদর্শের প্রচার আমরা দেখিতে পাই।

গীতার একটী শ্লোকে আছে “সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ” ইত্যাদি। যাঁহার সুখে দুঃখে সমজ্ঞান জন্মেছে, তাঁহার এইরূপ সদা সন্তুষ্ট ভাব, কারণ কোন এক নির্দ্দিষ্ট অবস্থা প্রাপ্তিজন্য তাঁহার আর যত্ন থাকে না। সহসা সন্দেহ হ’তে পারে, গৃহীর পক্ষে একটা হয়ত খুব প্রার্থনীয় আদর্শ নহে, কারণ “অসন্তুষ্টাঃ দ্বিজাঃ নষ্টাঃ সন্তুষ্টাইব পার্থিবাঃ” দ্বিজগণের পক্ষে সন্তোষ ভূষণ এবং অসন্তোষ বিনাশের কারণ পার্থিবগণের অথবা উচ্চা-কাঙ্ক্ষিগণের পক্ষে ইহার বিপরীত ব্যবস্থা। উন্নতি অভিলাষী গৃহী ব্যক্তি, সন্তোষ বজায় রাখিয়া এবং মনে মনে সাংসারিক সমুদয় বিষয়ই মায়ার খেলা মাত্র অনুভব করিয়া, রঙ্গালয়ে অভিনয় করার ন্যায়, সংসারের সুখ-বৃদ্ধি ও দুঃখ পরিহারার্থ প্রচণ্ডভাবে যত্নশীল হইতে পারেন।

“সমরতি” শব্দের একটি অর্থ, সর্ব্বত্র সম অনুরাগী, সমদর্শী, পক্ষপাতবিহীন প্রকৃতি হওয়া। সকলেরই দুঃখে দুঃখিত ও সুখে সুখী বোধ করিতে পারিলে জানিবে সমদর্শি-তার পথে অগ্রসর হ’চ্ছে, নতুবা সমদর্শিতা শব্দের ইহা অভিপ্রায় নহে, যে সকলকেই এক ছাঁচে গড়িয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু দেখা যায় কেহ কেহ এই শেষোক্ত ভুলটি করিয়া বসেন, আদর্শভেদ, কর্ত্তব্যভেদ, অধিকারভেদ ইত্যাদি ভেদের দিক্‌টা মোটেই ভাবিয়া দেখেন না। বেঁটে মানুষকে টেনে বড় করা বা লম্বা মানুষকে চাপ দিয়ে ছোট করিবার চেষ্টার নাম সমদর্শিতা নহে।

এইভুল ঘটে বলিয়া সমদর্শিতা ব্যপদেশে সময় সময় বিষম দলাদলি ও অনর্থের সূত্রপাত হয়, সাম্য-স্বাধীনতা-মৈত্রী প্রবর্ত্তিত করিতে গিয়া রক্তস্রোত বহিয়া যায়, ব্রাহ্মণ শূদ্রে মিলনের স্থলে অমিলনের উৎপত্তি হয় ইত্যাদি। ফলতঃ সমদর্শী প্রকৃতি লাভের ন্যায় কার্য্যক্ষেত্রে সমদর্শিতা প্রদর্শন কিছু কঠিন, উহার জন্য শিক্ষা, সাবধানতা এবং দীর্ঘকালব্যাপী শম দমাদি সাধনার প্রয়োজন।

বংশীবাবা সম্বন্ধে এই নিতান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণটি লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে, এমন সময় একদিন ট্রামগাড়িতে যাইতে যাইতে মদীয় অনুজ, ঘটনাচক্রে বংশীবাবার সহিত পরিচিত জনৈক ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ পান। ইঁহার নিকট বংশীবাবা সম্বন্ধে আরও কিছু বিবরণ জানিতে পারা গেল।

বংশীবাবা বলিতেন জীবনান্তে তাঁহার দেহটিকে যেন গঙ্গায় ভাসাইয়া দেওয়া হয়। বংশীবাবা সমস্ত নদনদীকেই সাধারণ ভাবে গঙ্গানামে অভিহিত করিতেন, অথবা ইহা তাঁহার গঙ্গার উপর একটু বিশেষ শ্রদ্ধার পরিচায়ক আমরা বলিতে পারিলাম না। এবারে হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় ইনি বিসূচিকা পীড়াক্রান্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহার শেষ দিন সমাগত সুতরাং পীড়ামুক্তি চেষ্টায় তাঁহাকে অন্যত্র লইয়া যাইবার আর আবশ্যক নাই। তদনুসারে দেহত্যাগের পর হরিদ্বারের নিকটেই কোন স্থানে তাঁহার দেহের জল-সমাধি প্রদত্ত হইয়াছে। অনেকেই বোধ হয় জানেন, সাধুগণের দেহের এই ভাবে সৎকার একটা নূতন কাণ্ড নহে, গৃহিগণের ন্যায় তাঁহাদের দেহের অগ্নিসৎকার অত্যাবশ্যক নহে।

টালিগঞ্জের মোড়ল বাবুদের (শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মণ্ডল মহাশয়ের) একটি গাভী, মাত্র দেড় দিনের এক বাছুর রাখিয়া সর্পাঘাতে মারা যায়। বংশীবাবা এই মাতৃহীনা দেড় দিনের বাছুরের মায়ায় মুগ্ধ হইলেন ও তাহার লালন পালনে প্রবৃত্ত হইলেন। বাছুরটিকে তিনি "চা" খাওয়াইতেন, কখন বা কেহ তাঁহাকে পান খাইতে দিয়াছে নিজে না খাইয়া আদর করিয়া বাছুরটিকে উহা খাওয়াইতেন। বাছুরটি তাহার সন্ন্যাসী মাকে পাইয়া এইরূপ ভাবে বাঁচিয়া উঠিল ও উভয়ের মধ্যে হৃদয়ের এক সূক্ষ্ম আকর্ষণ বা ভাবের আদান প্রদানের হয়ত উদ্ভব হইয়াছিল। বাছুরটির সর্ব্বাঙ্গ শুভ্র কিন্তু বংশীবাবা তাহাকে আদর করিয়া ডাকিতেন "যমুনা"। জমুনার জল কাল, আদরের সাদা বাছুরের তাই এই উল্টা নাম, অথবা শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতির সহিত বিজড়িত পুণ্যতোয়া নদীর নামে বাছুরটির নামকরণ সকলের পছন্দ হওয়ায় উহার এই নামই বাহাল হইয়া গিয়াছে। যমুনা এখন বড় হইয়া উঠিয়াছে, সের আড়াই করিয়া দুধ দেয়। অনেকবার দেখা গিয়াছে বংশীবাবা কখন স্থানান্তরে গেলে, যমুনা ঠিক যেন তাঁহার মায়ের মত অথবা মেয়ের মত, কি জানি কি আশঙ্কায় বা বিরহ বেদনায় বড় উন্মনা থাকিত, ভাল করিয়া আহারাদি করিত না। সাধুজি এবার যখন কুম্ভমেলায় গমন করেন, যমুনার চোখে জলধারা বহিতে দেখিয়া একটা কিছু অশুভের আশঙ্কায় অনেকেই উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন, কারণ হিন্দু মাত্রেরই সংস্কার গরুর চোখে জল পড়িতে নাই। বাবাজি দেহত্যাগ করিলে এখানে সে সংবাদ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সকলে একদিন যমুনাকে অজস্র কাঁদিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল এবং

ব্যাপার কি তখনও কেহ বুঝিতে পারে নাই।

বংশীবাবার অলৌকিক শক্তির পরিচায়ক একটি কাহিনীও ভদ্রলোকটি ব্যক্ত করিয়াছিলেন কিন্তু লেখক, আজিকার দিনে অনেকের অবিশ্বাস্য এই সব কাহিনী বর্ণনের ভার একা না লইয়া, কেহ ইচ্ছা করিলে ভদ্রলোকটির মুখে উহা শুনিতে পাইবেন বলিয়া এখানে তাঁহার ঠিকানাটি উদ্ধৃত করিয়া দিলেন। জিজ্ঞাসু পাঠক, "শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বেঙ্গল ব্যাঙ্ক, ডিপজিটার্স ডিপার্টমেণ্ট "এই ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

চাঁড়াল সাধু

আমাদের মুনি ঋষিগণ ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি এবং দিব্য শক্তির আধাররূপে চিরপূজিত। অগ্নিসাহায্যে যেমন নানা কার্য্য নিষ্পন্ন করা যায় তদ্রূপ প্রধাণতঃ এই ব্রহ্মণ্য অগ্নি প্রভাবে আমাদের মুনি ঋষি ব্রাহ্মণগণ আমাদের সমাজের শাস্তা বা পরিচালক স্বরূপ ছিলেন এবং এখনও আছেন। দেখা যায়, ধার্ম্মিক পুরুষ মাত্রই অল্পাধিক পরিমাণে এইরূপ দিব্য শক্তি লাভে সমর্থ হন। এ বিষয়ে স্ত্রী শূদ্র ম্লেচ্ছ প্রভৃতিতে ভেদ নাই। হিন্দু ব্যতীত বৌদ্ধ খৃষ্টিয়ান মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়েও বহু বহু সাধু মহাত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহই সন্দেহ প্রকাশ করেন না। সতী নারীর তেজের মহিমা কে না অবগত আছেন? ধার্ম্মিক শূদ্রও ধর্ম্মরূপ এই ব্রহ্মণ্য অগ্নি প্রভাবে অজ্ঞাতসারে ব্রাহ্মণের ন্যায়ই অনেকের হৃদয় অধিকারে ও সমাজ পরিচালনে শক্তিলাভ করেন। শূদ্রের পক্ষে তপস্যা, সন্ন্যাস, প্রভৃতি বৈধ অবৈধ অথবা উহাঁদের ধর্ম্মসাধন প্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত সে বিষয়ে বিচার এখানে অনাবশ্যক কিন্তু স্ত্রীশূদ্র ম্লেচ্ছ কাহারও যে ধার্ম্মিক হইতে বাধা নাই, ইহা সকলেই স্বীকার করেন এবং ধর্ম্মপরায়ণ জনমাত্রই কিয়ৎ পরিমাণে ব্রাহ্মণোচিত নানা শক্তির আধার হন, কারণ "ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকম্"। ব্রাহ্মণও শ্রেষ্ঠ প্রায় সমার্থবাচক শব্দ। এই হিসাবে প্রকৃত পূজ্যব্যক্তি মাত্রই সেই শাশ্বত ধর্ম্মগোপ্তা পুরুষোত্তম ব্রহ্মণ্য দেবেরই অংশরূপে একভাবে ব্রাহ্মণ নামে অভিধেয়। এই জন্যই বলে "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ।" হরিভক্তি পরায়ণ ধার্ম্মিক চণ্ডাল দ্বিজশ্রেষ্ঠ রূপেই পরিগণিত। বলা বাহুল্য ইহাতে ব্রাহ্মণ বর্ণের মর্য্যাদার হানি হয় না কারণ হরিভক্তিপরায়ণ (অর্থাৎ ধার্ম্মিক) দ্বিজ ও চণ্ডাল উভয়ের মধ্যে কেহ কাহারও তুলনায় শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট ইহাতে মীমাংসিত হয় না, এবং কেহ কোন এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইলেও সর্ব্ববিষয়েই যে শ্রেষ্ঠ, প্রমাণীত হয় না—দৃষ্টান্ত পুত্র যত গুণবান্ই হউন, পিতামাতা তাঁহার চির গুরুই রহিয়া যান। রাম কৃষ্ণাদি অবতার অবধি ব্রাহ্মণের শাসনাধীনে অবস্থিত। ভগবানের অবতাররূপে বহু স্থলে স্বীকৃত চৈতন্যদেবও একদা পীড়া হইতে মুক্তিলাভ জন্য ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করিয়া হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ অন্য কেহ ব্রাহ্মণের ন্যায় দিব্যশক্তির পরিচয় দিতে সমর্থ হইলেও, সেই কারণে ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা লোপ হয় না।

কালীঘাটে সময় সময় এইরূপ ব্রাহ্মণেতর সম্প্রদায়ের সাধুও নয়নগোচর হয়। একবার একজন চাঁড়াল সাধুর আগমন হয়ে ছিল। আমরা তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার বেশভূষা কিন্তু সাধারণ লোকের ন্যায়ই ছিল—সন্ন্যাসীর ন্যায় ছিল না। বাক্-

সিদ্ধ পুরুষ অর্থাৎ যাহাকে যাহা বলেন মিলিয়া যায় বলিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধি রটিয়াছিল। ইহাঁরই স্বজাতি, শ্রীশ্রীমনসা মাতার ভক্ত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বহু গুণাধার, চাঁদসীর প্রসিদ্ধ ক্ষত চিকিৎসক শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন ডাক্তারের গৃহে ইনি অবস্থিতি করিতেছিলেন। আমাদের ন্যায় আরও অনেকে কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া ইহাঁকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। দেখিলাম দু' একজন ব্রাহ্মণ অবধি আসিয়া ইহাঁর দিব্যশক্তির প্রভাব শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া ইহাঁকে প্রণাম করিয়া নিকটে উপবিষ্ট হইলেন। শেষে বাহিরে আসিয়া, এই লয়ে দুটা দলের সৃষ্টি হয়। একদলের মতে, গুণ ও শক্তিটাই উপাস্য এবং ইহাদেরই অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব অনুসারে আধারের আদর বা অনাদর; গুণবান্ শক্তিশালী ম্লেচ্ছও সকলের পূজ্য, আর বিপ্র অবধি গুণহীন শক্তিহীন হইলে অন্যের অবজ্ঞা ও উপেক্ষার পাত্র হন। বিশেষতঃ সাধু মহাত্মারা বর্ণাশ্রমের বিধি নিষেধের অতীত। আর একদল ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, ইহাঁদের বিবেচনায় গুণবান্ ও শক্তিধর পুরুষরা যথোচিত শ্রদ্ধা অনুরাগের পাত্র বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে কখনই প্রণম্য নহেন। স্বয়ং ব্রহ্মণ্যদেব ভৃগুপদ লাঞ্ছনা। বুঝিয়া না চলিলে গুণ ও শক্তি পূজার বাড়াবাড়িটা পতনেরই কারণ। কে প্রকৃষ্ট গুণবান্ কে বা প্রভূত শক্তিশালী কার্য্যকালে সর্ব্বদা যথার্থতঃ নির্ণীত হইবে কিরূপে? এবং একজনের গুণবত্তা বা গুণাভাব আর একজনকে কেনই বা বিচলিত করিবে?—বেল পাকিলে কাকের কি? বাপ মা গুণবান্ই হউন বা গুণহীন্ই হউন সন্তানের চির প্রণম্য রহেন না কি? ফলতঃ বাধ্যবাধকতা বা পূজ্য পূজক ভাবটা শুধু গুণ বা শক্তির উপরই নির্ভর করে না। যে রাজ্যে বিচারপতি, রাজার ভ্রূকুটি ভঙ্গিতে পরিচালিত হন, সে রাজ্যের কল্যাণ কোথায়? সামাজিক কল্যাণ ইচ্ছা থাকিলে সেইরূপ আমাদের মাঝে এমন এক সম্প্রদায়কে সর্ব্বদা সযত্নে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে, যাঁহাদিগকে লোভে, ভয়ে বা কোন কারণেই কাহারও নিকট নতশির হইতে হইবে না—আমাদের ব্রাহ্মণ বর্ণই সেই সম্প্রদায়।

এ বিষয়ে লেখকের ধারণা এই শেষোক্ত দলের অনুযায়ী। ইহা কিন্তু স্বীকার করিতে হইবে এই ধারণানুযায়ী কার্য্য বর্ত্তমানকালে সর্ব্বত্র হইয়া উঠা অসম্ভব, এবং পূর্ব্বোক্ত ঘটনাটি হইতে বুঝা যায় এ-সম্বন্ধে কাহারও কাহারও ধারণা কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যাহা হউক এ-সম্বন্ধে আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, আমরা শুধু সামাজিক ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠায় পাঠকগণের কিছু মনোযোগ আকর্ষণ করিলাম।

যাঁহার জন্য এত কাণ্ড তিনি নিজে এ সম্বন্ধে উদাসীনবৎ অবস্থিত ছিলেন, কে প্রণাম করিল বা না করিল গোঁজ লইতে ব্যগ্র ছিলেন না বা ইহার অনুকূলে বা প্রতিকূলেও কোন কথা বলেন নাই। যাহা হউক সাধুটির অদ্ভুত শক্তি সম্বন্ধে কিন্তু আমরা একটা সাক্ষ্য দিতে পারি।

আমাদেরই একজন নিকট আত্মীয়ের প্রায় দুই বৎসর বয়স্ক কোন শিশু কন্যা অনেক দিন হইতে প্লীহা যকৃৎ প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া উত্থানশক্তি রহিত হইয়াছিল। চিকিৎসায় কোন ফল না পাওয়ায় তাহার জীবনাশা সম্বন্ধে সকলেই প্রায় হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম। সাধুকে কন্যাটির কথা বলিলে তিনি তাহাকে একবার দেখিতে চাহেন এবং তদনু-

সারে কন্যাটিকে তাঁহার নিকট লইয়া যাওয়া হয়। সাধু তাহাকে মাটির উপর শুয়াইয়া দিতে বলিয়া, নিজে বিছানার উপর বসিয়া তাহাকে একদৃষ্টে দেখিতে দেখিতে তামাকুর ধূমপান করিতে লাগিলেন। মেয়েটি বড় কাঁদিতেছে দেখিয়া তাহার পিতা তাহাকে কোলে তুলিতে গেলে সাধু ধমকাইয়া উঠিয়া উহাকে ছুঁইতে নিষেধ করিলেন। কিছু পরে উহাকে বাটি লইয়া গিয়া সেই জ্বর ভোগের অবস্থাতেই স্নান করাইয়া দিতে এবং সে যাহা খাইতে চাহে তাহাই খাইতে দিতে বলিলেন। বাটিতে আসিয়া এই অনুচিত ব্যবস্থা পালনীয় কি না তাই স্থির করিতে অনেক তর্ক বিতর্কের পর শেষে চাঁড়াল সাধুর আদেশই পালিত হইল। সে রাত্রিতেই একটা কিছু অত্যাহিত ঘটিবে আশঙ্কা করা যাইতে ছিল, কিন্তু বড়ই বিস্ময়ের ও আনন্দের বিষয় এই অহিতের পরিবর্ত্তে হিতই ঘটিল, সেই রাত্রিতেই মেয়েটি জ্বরমুক্ত হইল এবং অন্য কোনরূপ ঔষধ সেবন বিনা, অমন দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির কবল হইতে ক্রমশঃ মুক্তি লাভ করিল।

আর একজন চাঁড়াল সাধুর বিবরণও উল্লেখ-যোগ্য। ইনি আগে কালীঘাটের দক্ষিণ পশ্চিম কোণস্থিত কেওড়া তলার শ্মশানে বাস করিতেন, তারপর রামকৃষ্ণপুরের শ্মশানে উঠিয়া যান। ধরণ ধারণ অনেকটা পৈশাচিক, মদ্যপান করিতেন, সন্ন্যাসীদের ন্যায় জটাজুট ধারণ প্রভৃতি কোন চিহ্ন নাই, কিন্তু পিশাচ সাধনাদি নানারূপ তান্ত্রিক ক্রিয়ায় অভিজ্ঞ এবং একজন শক্তিশালী পুরুষরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইহাঁরও নিকট একজন একটি দুশ্চিকিৎস্য পীড়া হইতে মুক্তিলাভ আশায় আগমন করেন।

চাঁড়াল সন্ন্যাসী ইহাঁকে দেখিয়া বলেন তোমরা ব্রাহ্মণ হয়ে, নিজেদের ভিতরের আগুন না জ্বালাইয়া অন্যের শরণাগত হও কেন? যাহা হউক পীড়া শান্তি জন্য চেষ্টা করিতে সন্ন্যাসী অবশেষে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং একটা নির্দ্দিষ্ট দিনে ইহার জন্য ক্রিয়াদি করিবেন জানাইলেন। নির্দ্দিষ্ট কালান্তে ক্রিয়ার ফল জানিবার জন্য সন্ন্যাসীটির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া পীড়িত ব্যক্তিটি যাহা শুনিলেন ও দেখিলেন তাহা একটু বিচিত্র বটে। ঐ শ্মশানেরই এককোণে পুরাতন এক বৃক্ষতলে ছোট একটি বেদি ছিল। নির্দ্দিষ্ট রাত্রিতে সেইখানে বসিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সন্ন্যাসী শ্মশানের অন্যান্য ডোমদের বলিয়া গিয়াছিলেন তাহারা যেন মাঝে মাঝে আসিয়া তাঁহার সংবাদ লয়। ডোমেরা ভোর বেলায় গিয়া দেখে সন্ন্যাসী বেদিতলে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া আছেন। তাহারা তখন ধরাধরি করিয়া তুলিয়া আনিয়া তাঁহাকে একটি আটচালার ভিতর শুয়াইয়া রাখে এবং লোকটি যখন দেখিতে যান সন্ন্যাসী তখনও একটি কাপড় মুড়ি দিয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। সন্ন্যাসী জানাইলেন তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই; সাধনায় বসিবার পর বিভীষিকাপ্রদ কোন মূর্ত্তি আসিয়া তাঁহাকে নিরস্ত হইবার জন্য আদেশ করিল; (চাঁড়ালের পোও একজন অসাধারণ দৃঢ়চেতা নির্ভীক পুরুষ) শরণাগতকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা পাইতে যখন প্রতিশ্রুত হইয়াছেন তখন অত সহজে তিনি নিরস্ত হইতে পারেন না; ইহার ফলে বেদি হইতে তাঁহাকে ফেলিয়া দিয়াছে ও তাঁহার হাতে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে। কিছুদিন পরে পুনরায় দেখা করিতে গিয়া লোকটি শুনিলেন, ঐ ঘটনার অল্পকাল পরেই কাহাকেও কিছু না বলিয়া কাঁধে একটি গামছা মাত্র লইয়া

সন্ন্যাসী কোথায় যে চলিয়া গিয়াছেন আর আসেন নাই।

নাস্তিকের চেয়ে আস্তিকের সাহসের মূল্য বেশী। যে, ভূত দেখে নাই বা ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নহে, ভূতকে ভয় না করা তাহার পক্ষে একটা মস্ত সাহসের পরিচায়ক নহে কিন্তু ভূতকে যে ভয় ভক্তি করে সে যদি ভূতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহস পায় সেটা তার নিশ্চিতই অসামান্য হৃদয় বলের পরিচায়ক। বস্তুতঃ এই চাঁড়াল সাধুটির ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধাসূচক ব্যবহার, শরণাগত রক্ষা প্রবৃত্তি এবং অসাধারণ দৃঢ়চিত্ততা ও নির্ভীকতা, আজিকার দিনে অনেক শিক্ষিত ভদ্র সন্তানেরও ভাবিবার ও শিখিবার বিষয়।

"শ্রীমন্নর্ম্মদেশ্বর বাবাজি"

বাবাজির প্রকৃত নামটি অজ্ঞাত, প্রদত্ত নামটি আমারই কল্পিত। এত নাম থাকিতে তাঁহাকে ঐ নামে অভিহিত করিলাম কেন, নিম্নোক্ত বিবরণটি পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন।

তখন আমার বয়স বেশী হয় নাই, হৃদয় অনেকটা আবেগভরা, কাজেই একদিনের একটা তুচ্ছ পরিচয়েই বাবাজির স্মৃতিটি হৃদয়ে গাঁথিয়া গিয়াছে।

বাবাজি একযোড়া খড়ম পায়ে দিয়া খটাস্ খটাস্ করিয়া পথে ঘাটে বেড়াইতেন; নাতিদীর্ঘ কৃশ কর্ম্মঠ দেহ; মাথায় এক প্রকাণ্ড জটাভার, তাহা জড়াইয়া চূড়ার আকারে বাঁধিয়া রাখিতেন, যেন একটা পিরামিড বহিয়া বেড়াইতেছেন। গঙ্গায় স্নান করিতে গেলে প্রায়ই দেখা হইত, সম্ভবতঃ নিকটের কোন স্নানের ঘাটেই তিনি অবস্থান করিতেন। নিত্য যাহা দেখা যায়, তাহাতে অসাধারণত্ব বোধ সহজে জন্মে না, ইহার উপর কিশোর বয়সের উদ্দাম ভাব, বাবাজিকে দেখিলে আমার তেমন শ্রদ্ধা ভক্তির উদয় হ'ত না। বাবাজি খড়ম পায়ে কেমন সচ্ছন্দে চলা ফেরা করেন, আঙ্গুলের ডগে ব্যথা হয় না, বা পিছল ঘাটে নামিতে উঠিতে আছাড় খেয়ে পড়েন না, আপনাকে কেমন সামলাইয়া চলেন, বাবাজি সম্বন্ধে এইটাই আমার লক্ষ্যণীয় মনে হইত। এইভাবে চলা ফেরাটা যে বেশ একটি আধ্যাত্মিক অর্থেও গ্রহণ করা যায় সে কথা মনেই উঠিত না। আমার একজন বাল্যবন্ধুর দৃষ্টিতে বাবাজির জটাভারটাই তারিফের বিষয় ছিল। বয়স বা শিক্ষার দোষে আমরা দুজনেই কেমন ঠিক করিয়াছিলাম, লোকটা একটা বুজরুক, না হ'লে অমন খড়ম পায়ে যেন দম্ভভরে খটাস্ খটাস্ করে সশব্দে চলন, আর খোঁপা বাঁধার মত অত যত্ন করে জটাবাঁধা।

তারপর একদিন একটা ঘটনা ঘটিয়া বাবাজি সম্বন্ধে আমার ধারণা অনেকটা পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল।

একদিন গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে করিতে অনেকদিন পরে বাবাজির সহিত সাক্ষাৎ। আমার পাশে একজন স্নান করিতেছিলেন; তিনিও অনেকদিন পরে বাবাজির দেখা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বাবা অনেক দিন যে দেখা হয় নাই, এতদিন কোথায় ছিলেন?"

সন্ন্যাসী। "আর বাবা, সে কি এখানে, সেই সিংহলে গিয়াছিলাম। সেতুবন্ধ ছাড়িয়ে, সমুদ্রের উপর সাত দিন নৌকায় কাটাতে হয়েছে, ঢেউয়ের উঠা নামায় প্রাণ যায় আর কি। সিংহলে কিছুদিন থাকা গিয়াছিল। সেখানে দেখি সকলে ছেলেকেই চিনে বাপ মায়ের খবর রাখে না, (কার্ত্তিক বা গণেশের

পূজায় ত হরগৌরীর খোঁজ নাই)। আমি ভাবিলাম এটাত ভাল নয়, বাপ মায়ের পূজা প্রবর্ত্তনে কেমন সাধ গেল, অনেকটা কৃতকার্য্যও হয়েছি, একটা ছোটখাট মন্দিরের মত করে এসেছি আসিবার সময় একজন চেলার উপর ভার দিয়া আসিয়াছি। কলিকাতায় আসিয়া ৺নর্ম্মদেশ্বর শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি গড়াইতে দিয়াছি। এবার যখন যাইব তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিব। দেখি বাবার কি ইচ্ছা।"

আমার অভক্তি উড়িয়া গেল। ভাবিতে লাগিলাম, এই সেই আমাদের অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত সন্ন্যাসী, ইহার এমন অধ্যবসায় এত কর্ম্মশক্তি! কিসের জন্য এ ব্যক্তি এ সব কাজে ঘুরে মরে—শুধু কর্ম্মজনিত আনন্দে? জীবিকার্জ্জনও যদি একটা অবান্তর উদ্দেশ্য থাকে, তাতেই বা দোষ কি? ইহার কাজে, দেশের ও দশের ইষ্ট বই অনিষ্ট হতেছে কি? এ যেমন বিনাড়ম্বরে দেশের একটা কাজ করিয়া যাইতেছে, আমরা অনেকেই ঐরূপ ভাবে দেশের কোন কাজে লাগিয়া আছি কি? ওরূপ করিবার সামর্থ্য আছে কি? কোথা হ'তে এ ব্যক্তি সাহায্য পায়, কি করেই বা এর চেষ্টা সফল হয়? ইত্যাদি।

এই সব বিষয়ে অভিজ্ঞ কোন একজন রাজকর্ম্মচারী সেন্‌সাস্ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ কালে যেন একটু দুঃখ করিয়াই লিখিয়াছেন, "অনেকেরই বিশ্বাস, হিন্দুগণ বুঝি অন্যকে স্বধর্ম্মভুক্ত করিতে মোটেই প্রয়াসী নহেন, বাহিরের লোকের পক্ষে হিন্দুধর্ম্মে প্রবেশ বুঝি অসম্ভব, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নহে। হিন্দুধর্ম্মের রক্ষাসাধন ও হিন্দুর দলপুষ্টি জন্য গুপ্তভাবে অবিশ্রাম একটা চেষ্টা চলিতেছে। বহু বহু সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব গোঁসাই, এবং স্ব সমাজে অনাদৃত বর্ণব্রাহ্মণ জীবিকানির্ব্বাহে সুবিধার জন্য শিষ্য যজমান প্রভৃতি সংগ্রহে নিয়ত চেষ্টা পাইতেছে! ইহাদের সংসর্গে আসিয়াও এইরূপ চেষ্টার ফলে, হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস বিশেষভাবে ঘটিতে পাইতেছে না। পূর্ব্বে অনেক পার্ব্বত্য বন্যজাতি আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিত না, কিন্তু এখন দেয়।"

যাঁহাদের জন্য এরূপ হইতেছে তাঁহাদের প্রতি আমাদের কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য সে বিষয়ে আলোচনা করিতে বসিলে প্রবন্ধ কলেবর বাড়িয়া যায়। যাহা হউক উপরে যে সন্ন্যাসীর বিবরণ প্রদত্ত হইল উহা হইতে বুঝা যাইবে সেন্‌সাস্ সম্বন্ধে প্রাগুক্ত মন্তব্যটি ভিত্তিহীন নহে এবং উহাতে আমাদের ভাবিবার ও শিখিবার বিষয় আছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়।

শিক্ষায় পঙ্গুত্ব

সেপ্টেম্বর মাসের এক দিবস অপরাহ্ণকালে মানসিক অবস্থাটা হঠাৎ যেন নিস্প্রভ হইয়া পড়িল। ক্রমে এমন হইল যে ব্লিদা সহরের সিদি লাক্‌দার ও আমায় কোনই পার্থক্য নাই। কাজেই ঘরের মধ্যে আরাম কেদারার আশ্রয় পরিত্যাগ করে এমন সাধ্য কার?

সেদিন বেশ একটু শীতও আরম্ভ হইয়াছিল। আবার অস্তাচলগামী সূর্য্যের শেষ কিরণ রেখা কয়টী গবাক্ষ পথ দিয়া গণ্ডদেশে মৃদুমন্দ উত্তাপ প্রদান করিয়া সান্ধ্য ভোজনের পূর্ব্ব-বর্ত্তী জড়তাকে মহামহিমান্বিত করিয়াই তুলিল। অনেক সময় দেখিয়াছি যে এইরূপ শারীরিক আলস্যের উপর গা ঢালিয়া দিলে ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানা বিষয়ক প্রশ্ন উপস্থিত হইয়া মানসিক চাঞ্চল্য আনয়ন করে। সে দিনও অনেকানেক অবান্তর বিষয়ের মীমাংসা আভ্যন্তরিণ নিস্পন্দতা অপনোদনের হেতু। মনে যতই চিন্তার ঢেউ উপস্থিত হইতে লাগিল ততই বিরক্তিবোধ করিতে লাগিলাম। থাকিতে থাকিতে নিরুপায় হইয়া সম্মুখস্থ টেবিলের উপর রক্ষিত পুস্তকনিচয় হইতে "A Woman's Inspirations of the Philippines" নামক বইখানি লইয়াই উহার মধ্যস্থলের এক অংশ পড়িতে আরম্ভ করি।

বস্তুতঃই এককালে পীত জাতিসমূহ ভারত মাতাকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিল। এক সময় ভারত এমনই গৌরবমণ্ডিত ছিল, যাহার প্রভাবে "আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ জগৎ ভক্তিপ্রণত চরণে তাঁর"।

কোনও এক ফিলিপিনো ছাত্র তাহার মার্কিণদেশীয়া শিক্ষয়িত্রীকে বলিয়াছিল, "আপনি যতই না কেন পদার্থবিদ্যা আর তাড়িৎবিদ্যা বলিয়া চীৎকার করুন আমার কাণের তুলা কিন্তু খসিবে না। এ সবই আপনার বুজরুকি। ইহাতে আমি কি প্রকারে বিশ্বাস স্থাপন করি? আমি যে আমার চোখের সাম্নে প্রকাণ্ড লোহার মাথাওয়ালা তড়িৎ দেখিতে পাইতেছি। ইহার নাম বজ্র। আমার চৌদ্দ পুরুষে ইহার কথা জানে। আজ কি না আমায় পদার্থ-বিদ্যার বুকনি দেওয়া?" বন্ধো! শিক্ষয়িত্রী তোমার অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের নিকট অর্জ্জিত বজ্রজ্ঞানে জলাঞ্জলি প্রদান জন্য বক্তৃতা করিতেছেন, কি ক্ষোভের বিষয়! ও কথায় কখনও কর্ণপাত করিবে না। তোমরা বোকা বলিয়াই ইংরাজী কেতাবের কথায় বিশ্বাস কর। আমাদের পণ্ডিতজগতে কিন্তু ওসবের ডা'ল গলে না। আমরা নিয়মিতরূপে নস্য গ্রহণ পূর্ব্বক সনাতন জ্ঞানা-লোচনায় প্রবৃত্ত হই। জ্ঞানের বিষয় কি? প্রাতঃসময়ে শৌচের নিমিত্ত কতবার মৃত্তিকা গ্রহণ করিতে হইবে; বেদপাঠ যদি শূদ্রের কর্ণে প্রবেশ করে তাহা হইলে পাপাত্মার কর্ণকুহরে কত সের উত্তপ্ত লাক্ষা ঢালিয়া দিতে হইবে; ইহাই আমাদের ধর্ম্ম-শিক্ষা। ইক্ষু-সমুদ্র ক্ষীর-সমুদ্রের দক্ষিণে না পশ্চিমে ইহাই আমাদের মহাগৌরবের ভূগোলজ্ঞান। অনন্ত নাগের শিরঃসঞ্চালনে মেদিনীর কম্পন উপস্থিত হয়; এই কথাটী প্রাকৃতিক ভূগোলে আমাদের মহাজ্ঞান থাকার জন্যই পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়াছে।

এই সব অতি হীন জাতীয় বিচারে আমাদের মস্তিষ্ক নিয়তই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। আমরা এইটুকু খবর রাখি না যে এই সকল সারবিহীন বাক্যজাল ব্যতীত ভারতবর্ষে এমন সব পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছিল যাহা চর্চ্চা করিয়া সভ্যজগৎ অধিকতর সভ্য হইতেছে। যাহাদিগকে আমরা গো-খাদক, ম্লেচ্ছ ও নিরয়গামী বলিয়া উল্লেখ করি তাঁহারাই অন্ধতমসাচ্ছন্ন ভারতীয় জ্ঞান রত্নাকরে বর্ত্তিকা ধারণ করিয়া আমাদিগকে উপহাস করিতেছে। বেদাধ্যায়ী শূদ্রের জিহ্বাচ্ছেদ ত অনিবার্য্য! কিন্তু সংস্কৃত ভাষায়

উৎপত্তি, গতি, পরিণতি, অপরাপর আর্য্য-ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার সম্বন্ধ নির্ণয়—ইত্যাকার বিষয় সম্বন্ধে ভারতবর্ষের শূদ্রদ্বেষিগণ যাহা করিয়াছেন তাহার সহিত Max Muller, Weber, Paul Duschen, Oldenberg, Windisch, Du Meril, Grassmann, Capeller, William Jones ও Hopkins প্রমুখ বিজাতীয় মূর্খমণ্ডলীর দানের তুলনা করিয়া দেখ।

শিক্ষা বিষয়ে আমাদের পঙ্গুতার কারণ প্রধানতঃ দুইটী। প্রথমতঃ হিন্দুজাতির স্বাভাবিক স্থিতিশীলতা। এজন্য আমি ব্রাহ্মণেতর জাতিবিশেষকে অনুমাত্রও দোষী করি না। কারণ তাহারা ত বাহ্মণাখ্য জাতির দাসস্য দাসঃ। সত্যই তাহাদিগের দাসত্ব রোমকদাস ও নিগ্রোদিগের অবস্থাপেক্ষা অধিকতর শোচণীয়। ইংরাজাধিকারে ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞানোদ্দীপ্ত পাশ্চাত্য খণ্ডের সাহচর্য্যলাভ করিয়াও সামাজিক শক্তির এই স্থিতিশীল প্রকৃতি বশতঃই তাহার অবস্থা যথাপূর্ব্বং তথাপরং। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-গণ কেবলমাত্র ব্যোপদেব কণ্ঠস্থ করিতে সুদীর্ঘ দ্বাদশবর্ষ অতিবাহিত না করিয়া যদি আধুনিক উপায়ে সংস্কৃত সাহিত্য, জ্যোতিষ ইত্যাদির চর্চ্চা করিতেন তাহাহইলে আজ আমাদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে এরূপ শক্তি কাহার? সেই জন্যই প্রায় সপ্তদশ বর্ষ পূর্ব্বে জনৈক হিন্দুঋষি বলিয়াছিলেন "আমি বরং তোমাদিগের প্রত্যেককে নাস্তিক দেখিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু কুসংস্কারগ্রস্থ নির্ব্বোধ দেখিতে ইচ্ছা করি না; কারণ নাস্তিকের বরং জীবন আছে, তাহার কিছু হইবার আশা আছে, সে মৃত নহে। কিন্তু যদি কুসংস্কার ঢোকে, তবে মাথা একেবারে যায়, মস্তিষ্ক নির্বীর্য্য হইয়া যায়; মৃত্যু-কীট সেই জীবন্ত শরীরে প্রবেশ করে। এই দুইটীই পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমরা চাই রক্ত তাজা হউক, স্নায়ু সতেজ হউক, পেশী লৌহদৃঢ় হউক। মস্তিষ্কের নির্বীর্য্যতা সম্পাদক, দৌর্ব্বল্যজনক ভাবের দরকার নাই; সেগুলি পরিত্যাগ কর।"

পঙ্গুত্বের দ্বিতীয় কারণ এই। ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্ব স্থাপনের পর হিন্দুসমাজের অতি নগন্য অংশ চির পুরাতন প্রভাব কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়া মস্তকোত্তোলন করিতে প্রয়াসী হইলে অমনি রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্য কুটিল যুক্তি প্রয়োগে আমাদিগের শিশুমস্তিষ্ককে সম্মোহিত করা হইল। এতদিনে আমরা বুঝিতে পারিতেছি "আশার ছলনে হায়, কি ফল লভিনু এবে তাই ভাবি মনে।"

মেকলে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে তাঁহার বিষবটিকার প্রতি ছাত্রদিগের প্রলোভন উদ্বুদ্ধ করিতে পারিলেই উহার উন্মাদিকা শক্তি সমগ্র জাতির অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিবে; যেহেতু শিক্ষিত ছাত্রগণই ভবিষ্য সমাজের কর্ণধার। ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি যখন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তখন ভারতবর্ষে দুই পরস্পর বিরোধী দলের সৃষ্টি হয়। কার্য্যতঃ মেকলের পৃষ্ঠপোষকগণই বিজয়লাভে সমর্থ হন। তাঁহাদের ব্যবস্থা হইল যে হিন্দু শব্দটী কেবল মাত্র চর্ম্মের কৃষ্ণত্ব ব্যঞ্জক বলিয়া রক্ষিত হউক। তদ্ব্যতীত হিন্দুমেষকে বৃটিশ সিংহের গর্ভশায়ী করিতে হইবে।

সভ্যতা বিকাশের মূলে তিনটী তথ্য বর্ত্তমান। (১) যে জাতির স্বতন্ত্র ভাষা নাই সে জাতির অবচ্ছিন্ন স্বাতন্ত্র্য ব্যঞ্জক সভ্যতাও থাকিতে পারে না। (২) সজীব পদার্থ মাত্রই

যেরূপ তাহার চতুষ্পার্শ্ব হইতে সংগৃহীত পদার্থ-নিচয় ভক্ষণান্তে তাহাদিগকে স্বীয় দেহ-গঠনোপযোগী পদার্থে পরিণত করে, তদ্রূপ সভ্যতা বিশেষেরও বিজাতীয় স্বাতন্ত্র্য হইতে গ্রহণীয় ভাবরাশি গ্রাস করিয়া তাহাকে আত্ম-বস্তুতে পরিণত করা প্রয়োজনীয়। এইরূপেই যে কোন সভ্যতা উত্তরোত্তর বিস্তার লাভ করিতে থাকে। (৩) জাতীয় সভ্যতা যতই সুপ্রতিষ্ঠিত হউক না কেন, বৈদেশিক ভাব-বন্যা যদি খর প্রবাহে দেশ মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে এবং সমাজস্থ ব্যক্তিগণ যদি সেই স্রোতকে আত্মগত করিতে অক্ষম হন তাহা হইলে সমগ্র সমাজ ঐ স্রোতস্বিনীতে আত্মবিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হয়। ইহাতে যে নূতন সভ্যতার সৃষ্টি হয় তাহার মধ্যে পুরাতনের পরিচয় পাওয়া যায় কেবলমাত্র ব্যক্তিবর্গের রক্তে ও মাংসে।

ভারতীয় জাতীয়ত্বের সমূলে উচ্ছেদ সাধন করিবার নিমিত্ত মেকলে এই তৃতীয় নিয়মটীর আশ্রয়গ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু সভ্যতার দন্তোৎপাটন করিয়া তাহার খাদ্যচর্ব্বণ শক্তি হরণ করিলেন। ভাষাই সভ্যতার দন্ত স্বরূপ। যে জাতির ভাষা যত নিকৃষ্ট তাহাদের চিন্তা-প্রণালীও তদ্রূপ অনুন্নত বলিয়া প্রতীত হয়। মূলে অবশ্য চিন্তা-প্রণালীই ভাষার উৎপাদক। ভারতবর্ষ ইংরাজ-শাসনাধিকারে আসিয়া ইউরোপীয় সভ্যতাকে বিশ্লেষণ করিবার সুযোগ পাইলেও দন্তবিহীন বলিয়া উহা করিতে পারিল না। গত অশীতি বৎসর ধরিয়া বিদেশাগত খাদ্য নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আমরা গ্রহণ করিতেছি, কিন্তু হজম করিয়া তাহাকে স্বীয় দেহগঠনোপযোগী করিবার শক্তি আমাদের নাই। মাত্র আশি বৎসর গত হইয়াছে। এখনও আমরা প্রজাপতি হইয়া পড়ি নাই, রেশমকীটের অবস্থাতেই বর্ত্তমান।

দুঃখের বিষয় এই যে এখনও অধিকাংশ "ভদ্রমহাশয়দের" চক্ষুরুন্মীলন হয় নাই। সেই জন্যই তাঁহারা বলিয়া থাকেন বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি প্রকাশ করা অসম্ভব। মতটী পূর্ণ মাত্রায় অলীক। মহাশয়গণ আপনারা বিদ্যালয়ে যাইবার পূর্ব্বে ভাত খাইতে খাইতে যখন বন্ধুবান্ধবের সহিত পড়া শুনার আলোচনা করেন তখন ইঙ্গবুলি আরম্ভ করিয়া দেন—না যে ভাষায় দিদিমার কোলে বসিয়া রূপকথা শুনিতেন তাহারই সাহায্যে জ্ঞানামৃত পান করেন? পদার্থ-বিদ্যার Phenomena beyond the critical angle, উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানের Transpiration stream, প্রাণি-বিজ্ঞানের Taxonomic system, প্রাণ-বিজ্ঞানের cowcealing coloration in the animal Kingdom; অর্থনীতির joint cost and demand, ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে যখন বিছানায় শুইয়া শুইয়া চিন্তা করেন তখন ইংরাজীর বিভীষিকায় আচ্ছন্ন হয়েন না "পুণ্য পীযুষস্তন্য বাহিণী" বঙ্গমাতার ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন করিয়া সুখে নিদ্রা যান? আমার ত সম্পূর্ণ বিশ্বাস ইঁহারা ভাবের ঘরে চুরি করেন; কেন না বাঙ্গালা বলিতে না পারা বিদ্বানের লক্ষণ, অন্ততঃ শিক্ষাভিমানিগণের কায়দা। নিশ্চয়ই বাঙ্গালা যার প্রাণের ভাষা, হাজার শক্ত বিষয় হউক না কেন, সে কখনই মাতৃভাষায় চিন্তা না করিয়াই থাকিতে পারে না। অবশ্য এটুকুও আমায় স্বীকার করিতে হইবে যে অধিকাংশ স্থলে ইংরাজী নামগুলি ব্যবহার করিতে হয়। আসলে সবগুলি ইংরাজী নাম নয়। ও সব খিচুড়ী। অনেক ইংরাজী নাম জার্ম্মাণ

ভাষাতে ব্যবহৃত হয়, আবার অনেক ফরাসী নাম ইংরাজীতে চলিত। ইহারই নাম হজম করা।

ভাষা কখনও বিপ্লবের সাহায্যে রাতারাতি সৃষ্ট হয় নাই। ইহা যুগ যুগান্তরের বিবর্ত্তনের ফল। যে কোনও ভাষার কোনও এক যুগ বিশেষের অবস্থা সমসাময়িক ব্যক্তি কর্ত্তৃক পর্য্যালোচিত হইলে উহা ন্যূনাধিক পরিমাণে খিচুরী বলিয়াই বোধ হয়। এই খিচুরীই বিশ বৎসর পরে যখন ঐতিহাসিক ভাবে আলোচিত হয় তখনই ব্যাকরণের সংস্কৃত মিয়মাবলী জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং অধিক বিলম্ব না করিয়া বংশরক্ষার উপায় অবলম্বনই যুক্তিযুক্ত।

ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষার পর আমাদের ছাত্রেরা বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের আস্বাদ পাইতে আরম্ভ করে। প্রথম বর্ষে তাহারা যে সমস্ত বিষয় আরম্ভ করে তাহা বস্তুতঃ সময়ের তুলনায় অতি সামান্য। যে দেশে মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রচার করা হয় তথায় ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই ঐ ধরণের বস্তুর পরিচয় লাভ করে। মাতৃভাষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে আমরাও ঐ সব বিজ্ঞান নামধেয় জন্তুকে বাল্যকালেই আত্মসাৎ করিতে পারি।

এখন আসল কথা হইতেছে যে আমরা খাঁটী কাজ চাই। ফেণায়িত ভাষায় সংবাদপত্রের কলেবর আবরিত না করিয়া নিটোল বস্তু তান্ত্রিক ভাষায় ফলপ্রদ ব্যবস্থাপত্র লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। ইংরাজী ভাষায় Consciousness কথাটা অতি পবিত্র ও বীর্য্যশালী। প্রাণীজগতের নিয়ম এই যে যে সকল জন্তু স্বীয় অস্তিত্ব ও পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে যত জ্ঞানবান্ জীবনসংগ্রামে তাহারা ততই কৃতকার্য্য। মানব সমাজেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না। পুরুষকারবিহীন ও আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসী জাতি লৌকিক বা পারত্রিক কোন জীবনই পরিণতি লাভ করিতে পারে না। তাই বলি "এ নয়ন কবে খুলিবে মা? অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন দৃষ্টিশূন্য এ নয়ন কবে তোমার কৃপাজ্যোতিঃ পাইয়া আবার দর্শনক্ষম হইবে?" ইত্যাদি ভিক্ষার বাণী সংকীর্ত্তণ না করিয়া স্বীয় অন্তঃশায়িনী শক্তিকে ভীমবেশে ও রুদ্রতেজে সজ্জিতা করতঃ নিজের পথ নিজেই উন্মুক্ত করিতে অগ্রসর হও।

শ্রীখগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র।

এক সপ্তাহে অর্দ্ধ জাপান

(১) নিক্কো পাহাড়

জাপানী সমাজে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে। তাহার ইংরাজী অনুবাদ এই— "Do not say Kakko (magnificent Splendid, Superb) before you see Nikko." অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিক্কো দেখে নাই সে "কেক্কো" বা মনোমোহন সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করে নাই। জাপানীদের চিন্তায় নিক্কো অপরূপ সৌন্দর্য্যের খনি। আজ সেই নিক্কো দেখিতে চলিয়াছি।

উয়েনো ষ্টেসনে গাড়ীতে বসিলাম। মহা গরম পড়িয়াছে। ধুলা বালুর দৌরাত্ম্যে গাড়ীতে স্থিরভাবে বসিয়া থাকা অসম্ভব। সহর ছাড়াইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী দুইধারে দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতেছি। একস্থানে সুমিদা নদী এবং অপর স্থানে

ডোলে নদী পার হইলাম। দ্বিতীয় নদী জাপানে প্রশস্ততম নদীর অন্যতম। সাধারণ সমতল ক্ষেত্রের উপর দিয়া রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যের কোন বিশেষত্ব এই অঞ্চলে লক্ষ্য করিতেছি না।

সাড়ে তিন বা চারি ঘণ্টা পরে উৎসুনোমিয়া ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। এই নগর একটা "প্রেফেক্ট" বা জেলার কেন্দ্র। সমগ্র জাপানে এইরূপ ৪৬টা প্রেফেক্ট আছে। গাইড বলিলেন,—"এই সহরের লোকসংখ্যা ৪০,০০০।" এখান হইতে গাড়ী একটা শাখা লাইনে চলিতে থাকিল। পথে একটা জেলা-স্কুল দেখিলাম। তাহার পর হইতে ক্রমশঃ উচ্চতর ভূমির উপর দিয়া গাড়ী চলিতেছে। কুমড়া, কচু, ধনে ইত্যাদির আবাদ রেলপথের দুই ধারে দেখিতেছি। ক্রমশঃ পার্ব্বত্য বনজঙ্গলের ভিতর আসিয়া পড়িলাম। মাঝে মাঝে সরল বা pine তরুর ঝাড় দেখিতে পাইতেছি।

অদূরে পাহাড় দেখা যাইতেছে। উহাই নিক্কো পাহাড়। আকাশের কুয়াশায় পর্ব্বত-গাত্রের নীলিমা কথঞ্চিৎ ঢাকা পড়িয়াছে—কিন্তু গাড়ী হইতে যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, সবুজ তৃণপত্র উদ্ভিদের আবেষ্টন চোখে পড়ে। পাহাড় দেখিতে ঠিক যেন উল্টাভাবে রাখা করাত। পর্ব্বতের সমাবেশ একটা পাতলা তীক্ষ্ণ দন্তবিশিষ্ট নীল মৃত্তিকাস্তূপের মত বোধ হইতেছে। ত্রিভুজাকার পিরামিড সদৃশ গিরিশৃঙ্গ দেখা যাইতেছে না। সমতল ভূমি হইতে পাহাড় খাড়া মাথা তুলিয়াছে।

এই অঞ্চলের রেলষ্টেসনে দেখিতেছি কাঠের ব্যবসায় বেশ প্রবল। পার্ব্বত্য প্রদেশে এইরূপ হইবারই কথা। পাইন গাছের সঙ্গে সঙ্গে আর একপ্রকার তরুবরের সারি ক্রমশঃ দেখা গেল। দেখিবামাত্র গাইড বলিলেন,—"এই সকল বৃক্ষের নাম ক্রুপ্‌টোমেরিয়া। তিনশত বৎসর পূর্ব্বে এইগুলি নিক্কো অঞ্চলে রোপিত হইয়াছিল। দুই সারি বৃক্ষের ভিতর দিয়া পথ নির্ম্মিত হইয়াছে। উৎসুনোমিয়া হইতে নিক্কো পর্য্যন্ত এই কুঞ্জপথ (avenue) দেখিতে পাইবেন।" আজ এই বৃক্ষগুলিকে আকাশ-স্পর্শী বোধ হইতেছে। দুইদিকের শাখা প্রশাখা উর্দ্ধে মিলিত হইয়া সঙ্কীর্ণ পথের একটা আবরণ প্রস্তুত করিয়াছে। তাহার ভিতর দিয়া সূর্য্যরশ্মি কোথাও কোথাও উঁকি মারে মাত্র।

গাড়ী ষ্টেসনে আসিয়া দাঁড়াইল। টোকিও হইতে একশত মাইল উত্তরে আসিয়াছি। এইস্থান সমুদ্রের স্তর হইতে ২০০০ ফিট উচ্চ। অর্থাৎ হিমলয়ের টিণ্ডেরিয়ায় বা ছোটনাগপুরের হাজারিবাগে যেন উপস্থিত হইয়াছি।

ট্রামে চড়িয়া হোটেলে পৌঁছিলাম। কিন্তু ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম। সঙ্কীর্ণ পথের দুই ধারে জাপানী হোটেল, সরাই, বা গৃহ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনোহারি দোকান ইত্যাদি অবস্থিত। দায়া নামক একটা পার্ব্বত্য ঝোরা বা নদী পার হইলাম। দুইটা সেতু আছে। একটা সেতু রক্তবর্ণ ল্যাকারধাতুনির্ম্মিত। ইহার উপর দিয়া সাধারণ গাড়ী বা লোকজন যাতায়াত করিতে পারে না। বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে যখন মিকাডোর প্রতিনিধি নিক্কো মন্দিরে আসেন তখন এই সেতু একমাত্র তাঁহার দ্বারা ব্যবহৃত হয়। আজ সেতুর দ্বার রুদ্ধ সেতু পার হইয়া নদীর পার্শ্ব দিয়া ট্রাম চলিতে লাগিল। নির্ঝরের সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে হোটেলে উপস্থিত

নিক্কোমন্দিরের ফটক

তিশি পচান

India Press, Calcutta.
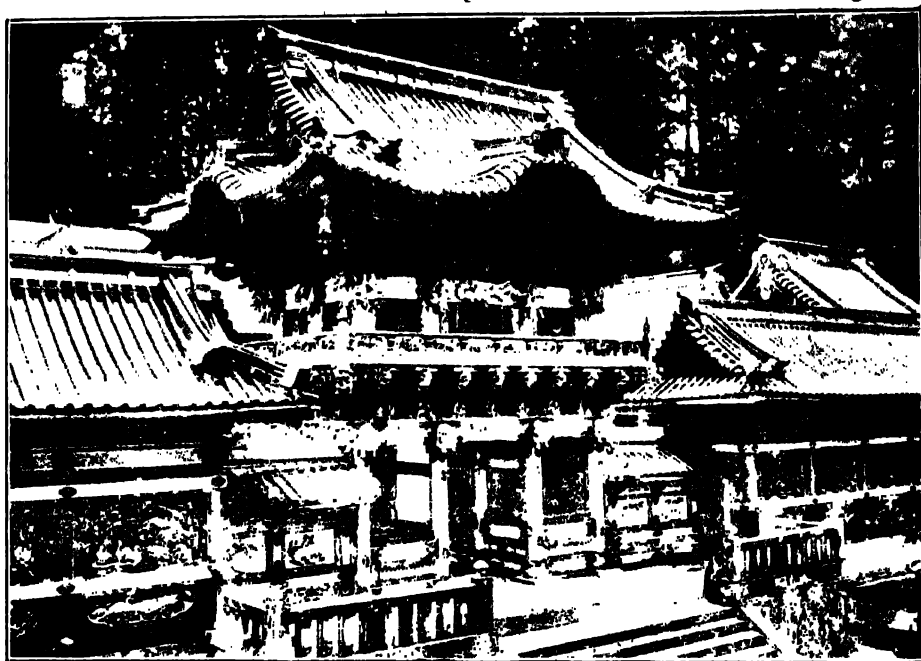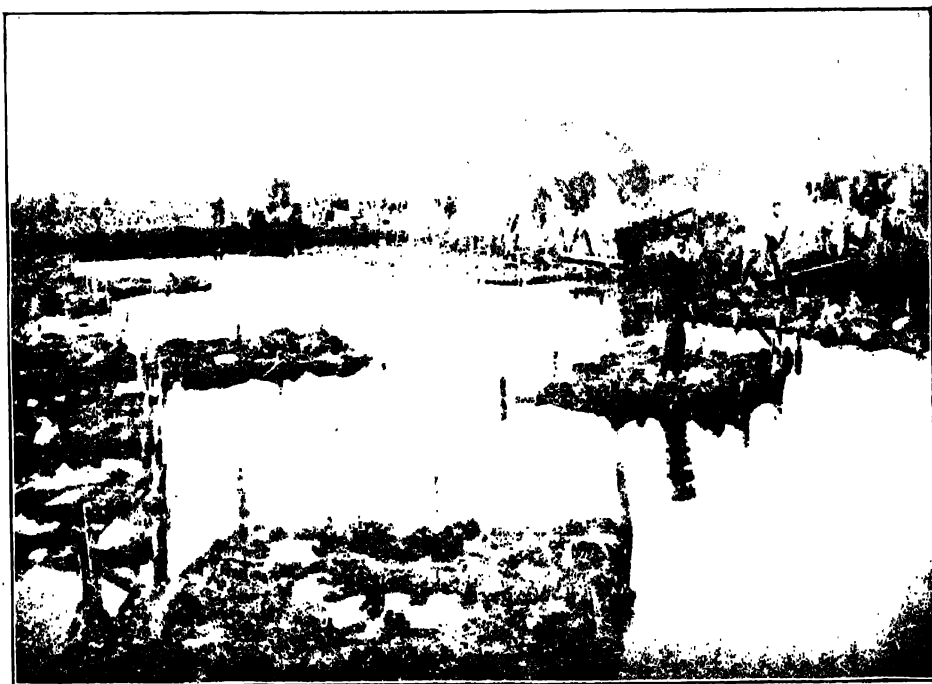
হইলাম। দায়া উপত্যকা দুই সমান্তরাল পর্ব্বতশ্রেণীর অভ্যন্তরে অবস্থিত। হোটেলের গৃহে বসিয়া সম্মুখের পাহাড় দেখিতেছি। পর্ব্বতের একটা দেয়াল যেন দৃষ্টিপথে বাধা দিতেছে। নদীর অনন্ত ঝর ঝর অবিরাম শুনিতে পাইতেছি।

আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। অদূরের পাহাড় আর দেখিতে পাইতেছি না। ভয়ঙ্কর মেঘগর্জ্জন ঘন ঘন শুনিতে পাওয়া গেল। বাঙ্গালা দেশেও আজ শ্রাবণের বর্ষাকাল চলিতেছে। এক পশলা খুব বৃষ্টি হইয়া গেল। ধরিত্রী অনেকটা ঠাণ্ডা হইল।

আজ ১৪ই জুলাই। এই তারিখে ফরাসীরা তাহাদের অষ্টাদশ লুইয়ের (ব্যাষ্টিল) Bastile দুর্গ ধ্বংস করিয়া ইয়োরোপে নবযুগ আনয়ন করে। এই দিনে ফরাসী "রিপাব্লিক" বা স্বরাজের জন্ম। কাজেই ফরাসী সমাজের আজ প্রধান উৎসব-তিথি। এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্য ইংরাজীতে প্রকাশিত হইয়াছে—

"To-morrow July 14th is the French national holiday in honour of the fall of the Bastille, and though there will not be the usual celebration, all who honour France for the magnificent struggle she is waging against the Bully of Europe will show that sympathy by the display of national flags. Especially will the occasion be taken by the British and the subjects of other allied powers to show their respect for and sympathy with the great Republic in her fight for the freedom of the world."

ফরাসী-বিপ্লবের সর্ব্বপ্রধান শত্রু ছিলেন ইংরাজ। অথচ আজ ইংরাজ সেই বিপ্লব-তিথি সম্মান করিতে অগ্রসর। চিরস্মরণীয় ১৪ই জুলাইয়ের ঘটনায় ফরাসীকে ধ্বংস করিবার জন্য ইংরাজ ও জার্ম্মাণ জাতিদ্বয় ব্রতবদ্ধ হইয়াছিল। অথচ আজ সেই তারিখের উৎসবে ফরাসীকে সাহায্য করিতেছেন ইংরাজ।

জাপানের তাজমহল

নিক্কোতে পাহাড় আছে, নদী আছে, উপত্যকা আছে, ছোট বড় মাঝারি উদ্ভিদ্ আছে, কুয়াশা মাখা নভোমণ্ডল আছে, নিবিড় বন জঙ্গল আছে, নীরবতা ও শান্তি আছে, আর এই শান্তিভঙ্গকারী জলস্রোতের কল কল নিনাদ আছে। প্রাকৃতিক হিসাবে নিক্কো নিতান্তই রমণীয় সন্দেহ নাই—চিত্রে আঁকিবার অথবা কবিতা লিখিবার যোগ্যবস্তু। প্রকৃতিদেবী নিক্কোকে সত্য সত্যই "কেক্কো" করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

বর্ষার দিনে আসিয়াছি—এখন না আছে শীতের শুভ্রতুষার, না আছে মে মাসের চেরি-ব্লসম, না আছে শরৎ কালের স্বর্ণপ্রভা। নীল গিরি এবং সবুজ উদ্ভিদই এখন চোখের সহচর।

বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে Cryptomeria avenue এর ভিতর দিয়া ইয়েয়সু (Yeyasu) শোগুণের সমাধিক্ষেত্র দেখিতে বাহির হইলাম। ইয়েয়সু তোকুগাওয়া বংশের শোগুণী স্থাপন করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে নিক্কো পাহাড়ের এক নিভৃত স্থানে তাঁহার কবরের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সকল সৌধ ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত।

টোকিওর শিবা-পার্কে শোগুণী সমাধিক্ষেত্র দেখিয়াছি। এই স্থানেও অবিকল তাহাই দেখিতেছি। সেই তোরী বা তোরণদ্বার, সেই প্যাগোডা, সেই প্রস্তরপ্রদীপ, সেই কাষ্ঠ গৃহ, সেই ত্রিভঙ্গিম বক্রগতি ছাদ সমাবেশ, সেই স্বর্ণশিল্প ও ল্যাকার-শিল্প, সেই সুচিত্রিত অন্ধকারময় গৃহাভ্যন্তর—সবই প্রথম তোকুগাওয়া শোগুনের সমাধিক্ষেত্রে বিরাজ করিতেছে। শিবাপার্কের সৌধসম্পদ দেখা থাকিলে নিক্কোর হর্ম্ম্যাবলী না দেখিলেও চলে।

তোরী, ফটক, আস্তাবল, প্যাগোডা, ভাণ্ডার-গৃহ, চৌবাচ্চা, ঘণ্টাগৃহ, বাদ্যগৃহ ইত্যাদি প্রত্যেকটার জাপানী নামে এক একটা ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হওয়া যায়। কোনটা ডাইমোদিগের দান, কোনটা কোরিয়া নৃপতির দান, কোনটা ওলন্দাজ গবর্মেণ্টের দান ইত্যাদি। ভাণ্ডার-গৃহে উৎসবের জিনিষপত্র রক্ষিত হয়—বৎসরে দুইবার করিয়া এই গৃহ হইতে শোভাযাত্রার সাজসরঞ্জাম বাহির করা হইয়া থাকে। আস্তাবলে শোভাযাত্রার ব্যবহৃত ঘোড়া রাখা হয়। সমাধিক্ষেত্রের সকল গৃহই ল্যাকারমণ্ডিত এবং সুচিত্রিত—কিন্তু আস্তাবলে কাষ্ঠের উপর কোন কারুকার্য্য নাই। এই ঘরের প্রাচীরের দিকে দেখাইয়া গাইড বলিলেন—"বানরের সারি দেখিতেছেন—উহাদের একজনের মুখ ঢাকা, একজনের চোখ ঢাকা, একজনের কাণ ঢাকা। ইহার দ্বারা বুঝান হইয়াছে যে কুদৃষ্টি দেখা উচিত নয়, কুকথা বলা উচিত নয়, এবং কুকথা শুনা উচিত নয়।"

কোন্ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে কত খরচ পড়িয়াছিল তাহার তালিকা কোন কোন স্থানে প্রদত্ত হইয়াছে। শুনিলাম তিন শত ডাইমো-রাজগণের গৃহে যুদ্ধের জন্য যতটাকা সঞ্চিত ছিল তাহার সমস্তই এই ভবন নির্ম্মাণে খরচ করা হইয়াছিল। ক্রপ্‌টোমেরিয়া বৃক্ষের কুঞ্জপথ সম্বন্ধে গাইড বলিলেন—"মাসাৎসুনা ডাইমো বিশ বৎসর কাল চেষ্টা করিয়া এই য়্যাভিনিউ প্রস্তুত করিয়াছেন। এই পথ প্রায় ২২ মাইল বিস্তৃত।"

ইয়েয়সু বহু উপদেশ বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বহস্তে লিখিত একটি উপদেশের ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত হইতেছে—

Life is like unto a long journey with a heavy load. Let thy steps be slow and steady, that thou stumble not. Persuade thyself that imperfection and inconvenience is the natural lot of mortals, and there will be no room for discontent, neither for despair. When ambitious desires arise in thy heart, recall the days of Extremity thou hast passed through. Forbearance is the root of quietness and assurance for ever, look upon wrath as thy enemy. If thou knowest only what it is to conquer, and knowest not what it is to be defeated, woe unto thee! it will fare ill with thee. Find fault with thyself rather than with others. Better the less than the more."

ইহা ঘরবাড়ী ছাড়িয়া জঙ্গলে পলাইবার উপদেশ নয়। ইয়েয়সু কর্ম্মবীর ছিলেন। তাঁহার বাহুবল ও চরিত্রবল জাপানের সংখ্যাতীত ডাইমোগণকে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার

নিক্কোপাহাড়ে জলপ্রপাত

লিনেন-ফ্যাক্টরি

India Press, Calcutta.
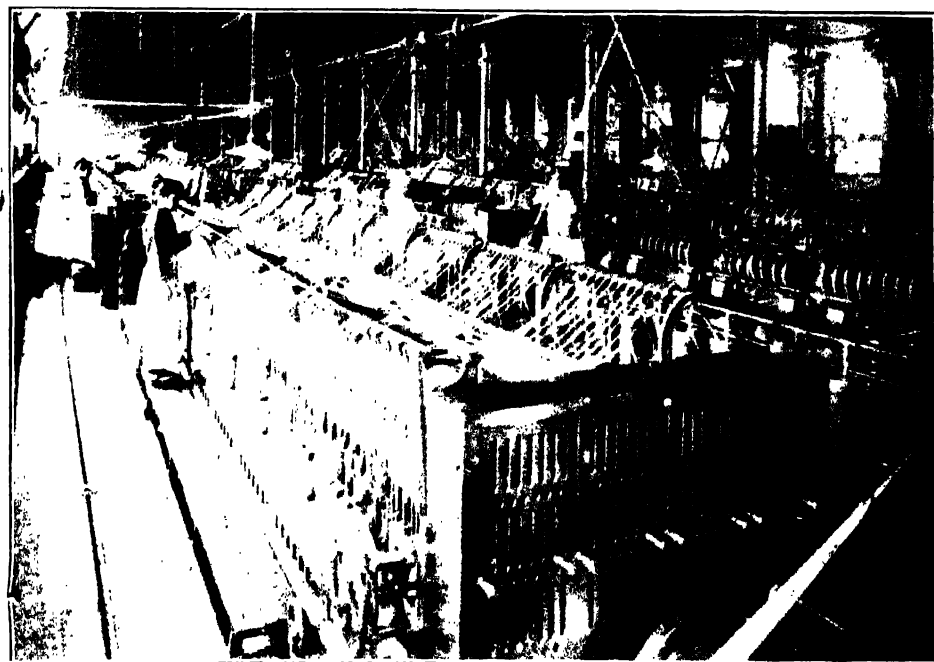
করাইয়াছিল। কার্য্যোপযোগী পাণ্ডিত্যের প্রভাবেই তিনি নিতান্ত নগণ্যপদ হইতে জাপান রাজ্যের শোগুণীপদ অর্জ্জন করেন। এইরূপ আত্মপ্রতিষ্ঠ ও স্বাবলম্বী বীরপুরুষই কর্ম্মযোগের অনুশাসন প্রচার করিতে অধিকারী।

একটা ফটকের ভিতরে বাহিরে উপরে কারুকার্য্য খোদাই ও চিত্রণ এত বেশী যে সমস্ত দিন দেখিলেও সব শেষ করা যায় না। নয় লক্ষ টাকায় এই ফটক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই ফটকের জাপানী নামে ইংরাজেরা বুঝিয়া থাকেন—"The gate where one spends the whole day."

একটা ফটকের নাম "চীনা ফটক।" সিংহ ও ড্রেগন এই দ্বারের বিশেষত্ব। এগুলি চিত্রিত নয়—কাষ্ঠদ্বারের উপর আল্‌গাভাবে বসান।

প্রধান গৃহের অভ্যন্তর দেখিয়া মোটের উপর শিবাপার্কের ভবন মনে পড়িল। সাজ-সজ্জা আসবাব পত্র ইত্যাদি এখানে কথঞ্চিৎ বিভিন্ন। ভিতরকার ছাদ এবং প্রাচীন গাত্রের চিত্রাঙ্কনও স্বতন্ত্র। দেওয়ালে জাপানের ৩ জন প্রসিদ্ধ কবিবরের চিত্র ঝুলান আছে। সেদিন তোকুতোমির সংগৃহীত প্রাচীন পুস্তকের মধ্যে এই সকল চিত্র দেখিয়াছি। একপ্রকার সোনালি কাগজের পাত্র গৃহের মধ্যভাগে রক্ষিত হইতেছে। এইগুলি নাকি ধর্ম্ম কর্ম্মে লাগে—প্রকৃত অর্থ বুঝিলাম না। এতদ্ব্যতীত ফুল ফল জানোয়ার গাছ ইত্যাদির খোদাই অথবা চিত্র শিবাপার্কের সৌধাবলীতেও দেখা যায়। কতকগুলি গৃহে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ।

একটা কাষ্ঠদ্বারের নিকটে যাইয়া গাইড বলিলেন—"উপরে দৃষ্টিপাত করুন। পিয়নি ফুলের নীচে একটি বিড়াল নিদ্রা যাইতেছে। কাঠের খোদাই-কার্য্যে ঠিক যেন জীবিত বিড়াল দেখিতে পাইতেছি।" আর একটা ফটকে খোদাই করা ব্যাঘ্রদ্বয়ের তারিফ করিতে করিতে গাইড বলিলেন—"কাঠের উপর কারিগর কাজ করিয়াছেন—কিন্তু ঠিক যেন জীবন্ত জানোয়ারের লোম দেখিতেছি।"

ইয়েয়সুর মন্দির পূর্ব্বে বৌদ্ধ সরঞ্জামে পূর্ণ ছিল। সুবর্ণ মূর্ত্তি, সুবর্ণ পদ্মপত্র, প্রকাণ্ড বাতিদান, ঢাক, কাঁশর, ঘণ্টা, শঙ্খ, পতাকা, ধূপপাত্র ইত্যাদিতে ঘর ভরা ছিল। কিন্তু "মেজি"-যুগে বৌদ্ধধর্ম্মের পরিবর্ত্তে শিণ্টো-মতের প্রতি জাপান গবর্মেণ্ট সদয় হইয়াছেন। স্বয়ং মিকাডো একবার ইয়েয়সুর মন্দির দেখিতে আসেন। তখন হইতে একটা দর্পণ এবং কাগজের পত্র গৃহাভ্যন্তরে স্থান পাইতেছে—বৌদ্ধ সরঞ্জামগুলিকে দূরীভূত করা হইয়াছে।

এই মন্দিরে বৎসরে দুইবার করিয়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব প্রধানতঃ শোভাযাত্রার আকার ধারণ করে। এক মন্দির হইতে অন্য মন্দিরে তিনটা ক্ষুদ্র মন্দির বহন করিয়া লওয়া হয়—আবার সেইগুলি ফিরাইয়া আনা হয়। অনুষ্ঠানটিকে অনেকটা রথযাত্রার মত বিবেচনা করা যাইতে পারে। সম্রাটের দূত আসিয়া পূজার অর্ঘ্যপ্রদান করেন। সেই সময়ে দাওয়ার উপরকার রক্তবর্ণ ল্যাকার সেতু খুলিয়া দিবার নিয়ম আছে।

জুন মাসে সাধারণতঃ যে শোভাযাত্রা বাহির হয় তাহার বিভিন্ন অঙ্গ নিম্নে বিবৃত হইতেছে। ঠিক যেন 'রামলীলা'র মিছিলের ফর্দ্দ।

১০০ শ্বেত পোষাকাবৃত ব্যক্তি পবিত্র বৃক্ষ বহন করে।

তাহাদের পশ্চাতে একটি দেবতা শোভা-যাত্রার দলপতি হন।

দুইটা সিংহের মুখোস বহন করিয়া ছয়জন লোক যায়।

তিনজন শিন্তো বাদক।

তিনটি শিন্তো পুরোহিতপত্নী।

দুইজন শিন্তো পুরোহিত অশ্বপৃষ্ঠে দলবল সহ অগ্রসর হন।

তিনটি অশ্ব।

১০০ গোলন্দাজ।

১০০ তীরন্দাজ।

১০০ বল্লমধারী সৈন্য।

১০০ সশস্ত্র সৈনিকপুরুষ।

১২ জন যুবক পুরোহিত ফুলের টুপি মাথায় পরিয়া থাকেন।

১০০ বিভিন্ন মুখোসপরা সৈন্য।

৪টা পাখার মত পতাকা।

অশ্বপৃষ্ঠে শিন্তো পুরোহিত তরবারি ধারণ করেন।

অশ্বপৃষ্ঠে শিন্তো পুরোহিত ধ্বজা ধারণ করেন।

তিনটি বিভিন্ন পতাকা ধারণ করিবার জন্য শ্বেত পোষাকাবৃত ব্যক্তি।

ঢাক বহন করিবার জন্য তিনজন শ্বেত পোষাকধারী ব্যক্তি।

ঘণ্টা বহনকারী।

৩০ বালক বানরের মুখোস পরিয়া চলে।

বানর ও তাহাদের পালক।

৬ শিন্তো পুরোহিত প্রাচীন সম্ভ্রান্তবংশীয় বেশে।

৫০ শিন্তো পুরোহিত প্রাচীন বেশে।

১২ বাদক।

১০ ব্যাধ পক্ষী হস্তে।

২ মঞ্চ।

সোনালি কাগজের পত্র বহন করিবার জন্য শিন্তো পুরোহিত।

অশ্বপৃষ্ঠে শিন্তো পুরোহিত।

এই শোভাযাত্রা দেখিলে মধ্যযুগের জাপানকে বুঝিতে পারা যায়। নিক্কোর মন্দিরগুলির উপর বাহির ভাল করিয়া দেখিলেও জাপানের শোগুণী আমল সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মে। সৌধগুলি সেই যুগের মিউজিয়াম বিশেষ। জাপানের বাস্তুবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা, স্থাপত্যবিদ্যা, রঞ্জনশিল্প, কাষ্ঠশিল্প, ল্যাকার-শিল্প, সকলই এই সমাধিক্ষেত্রে পুঞ্জীকৃত হইয়াছে। শিন্তো বৌদ্ধজাপানের ধর্ম্মভাব এবং সামাজিক জীবন এই মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এইখানে আসিলে ৩০০ বৎসর পূর্ব্বেকার শোগুণী আমলের আব-হাওয়া ফিরিয়া পাওয়া যায়। অজন্তা, সাঞ্চি সারনাথ, ভারুত ইত্যাদি অঞ্চলের কারুকার্য্যে যেরূপ প্রাচীন ভারতের আর্থিক, সামাজিক রাষ্ট্রীয় এবং ধর্ম্মবিষয়ক অবস্থা বুঝিতে পারি, সেইরূপ নিক্কোসৌধগুলির চিত্রাঙ্কন, খোদাই কার্য্য এবং মূর্ত্তিসমূহ নিরীক্ষণ করিলে মধ্যযুগের জাপানী-জীবন আমাদের সম্মুখে ভাসিতে থাকে।

তোকু গাওয়াবংশের প্রবর্ত্তক য়েডো (টোকিও) নগরের স্থাপয়িতা বীরবর ইয়েয়সু ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। ১৯১৫ সালে এই ঘটনার তিনশত বর্ষ কাল হইল। এই উপলক্ষ্যে গত জুন মাসে নিক্কোতে মহা সমারোহে শোভাযাত্রা, লো-নৃত্য, মহোৎসব, পানভোজন, আমোদ প্রমোদ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। হোটেলের কর্ত্তা বলিলেন—"ব্যারণ শিবুসাওয়া এই অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন। তোকুগাওয়া শোগুণদিগের অনু-চরবর্গের মধ্যে শিবুসাওয়া সর্ব্বপ্রধান এবং আজকাল বিশেষ লব্ধপ্রতিষ্ঠ।"

জাপানী সরাই-স্যাপ্পরো

তোরী

India Press Calcutta,
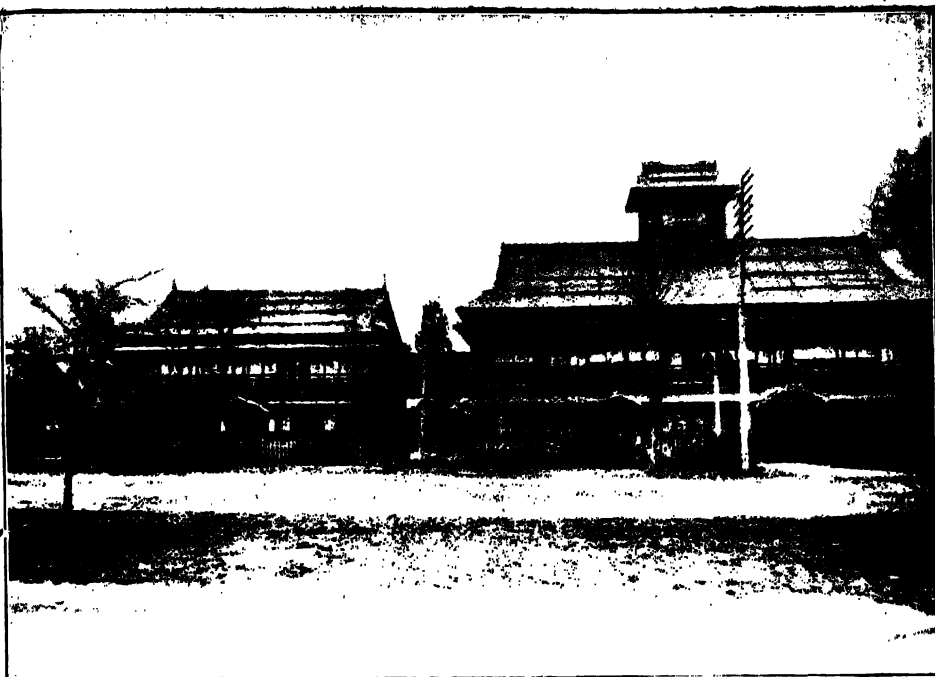
৩। তোকুগাওয়াযুগের বাস্তুশিল্প

ট্রামপথের শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল। নিক্কো পল্লীর পর আর একটা পল্লীতে আসিলাম। এইখানে একটা তাম্র ধাতুর কারখানা—তামা পরিষ্কার করা হয়—প্রায় আটশত লোক কর্ম্ম করে। দশ এগার মাইল দূরস্থিত এক পাহাড়ে তামার খনি আছে।

দায়া নদীর কিনারা দিয়া ট্রাম পথ বিস্তৃত। নীরব জনপদের মধ্যে নির্ঝরের ঝর ঝর সর্ব্বদাই শুনিতেছি। হাঁটিয়া খানিকদূর যাওয়া গেল। পার্ব্বত্য উপত্যকার দৃশ্য অনেকটা আল্‌মোড়ার পথের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। গাইড বলিলেন—"এখান হইতে চারি মাইল দূরে একটা হ্রদ আছে। সেই হ্রদ নিক্কো পল্লী হইতে ২০০০ ফিট উর্দ্ধে—অর্থাৎ সমুদ্র হইতে ৪০০০ ফিট উচ্চ। হ্রদ হইতে একটা বিপুল জলপ্রপাত পড়িয়া এই দায়া স্রোতস্বতী সৃষ্টি করিয়াছে।" শুনিলাম জলরাশি হ্রদের ২৫০ ফিট নিম্নে লাফাইয়া পড়িতেছে। বলাবাহুল্য তাহা হইলে এই প্রপাতে নায়াগ্রাঝোরার গৌরব উপলব্ধি করা যাইতে পারে। সকল দিক হইতেই নিক্কোঅঞ্চল ও তাহার সন্নিহিত ভূখণ্ড প্রাকৃতিক হিসাবে "কেক্কো" পদবাচ্য।

বস্তুতঃ এখানে প্রকৃতির মহিমা দেখিয়া ও শুনিয়াই মুগ্ধ হইতেছি। মানুষের কীর্ত্তি দেখিয়া মনে হইতেছে সেই ওয়ার্ডসওয়ার্থের দীর্ঘশ্বাস—"And is this Yarrow?" নিক্কোর বাস্তুশিল্প আমার চোখে কেক্কো বোধ হইল না। এখানকার সৌধগুলি কাষ্ঠময় তাজমহল সন্দেহ নাই। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর ভারতীয় প্রস্তরশিল্প দেখিয়া কখনও "And is this Yarrow?" বলি নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর জাপানী কাষ্ঠশিল্প দেখিয়া আশানুরূপ আনন্দ উপভোগ করিলাম না। মিশরের লুক্সর-কার্ণাক দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইয়াছি—প্রাচীন মিশরীয় শিল্পের সম্মুখীন হইলে "কেক্কে" বা চমৎকার না বলিয়া থাকা যায় না। কিন্তু নিক্কোর সৌন্দর্য্য ভাণ্ডারের লাবণ্য দেখিয়া চক্ষু পীড়া পাইতেছে—মরমে বিস্ময়লাভ করিতেছি না।

শিবাপার্ক এবং নিক্কো উভয় স্থানের হর্ম্ম্যসমূহেই সর্ব্বপ্রথম চোখে পড়ে ল্যাকারমণ্ডিত প্রাচীর, কপাট, ছাদ ইত্যাদি। সোনালি কাজের প্রভাও দর্শকমাত্রের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। এই দুই শিল্পের নিদর্শন প্রত্যেকটার এত বেশী সঞ্চিত হইয়াছে যে চোখ ঝলসিয়া যায়। ভিতরকার মূর্ত্তি এবং অঙ্কিত চিত্রগুলি স্বতন্ত্রভাবে দেখিলে অতি উচ্চ শ্রেণীর কারুকার্য্যই বিবেচিত হইবে—কিন্তু গৃহের ভিতর এগুলির সমাবেশে ইহাদের মূল্য অনেকটা কমিয়াছে। ঘরের বাহিরে অন্য কোথাও এগুলি আল্‌গা করিয়া প্রদর্শিত করিলে চিত্রকর ও ভাস্করের কৃতিত্ব প্রশংসিতই হইবে। কিন্তু গৃহ নির্ম্মাণকারী বাস্তুশিল্পিগণ গৃহের আভ্যন্তরীণ অলঙ্কার সংস্থানের মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছেন। সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতং হইয়া পড়িয়াছে।

এক কথায় বলিতে পারি যে, তোকুগাওয়াযুগের বাস্তুশিল্পে সংযমের অভাব যৎপরোনাস্তি। অল্পপরিসর স্থানের ভিতর নানা প্রকার উচ্চতম সৌন্দর্য্যের বস্তু রাশীকৃত করা হইয়াছে। এখানে কারিগরদিগের বিলাস অত্যধিক দেখিতে পাই। কিন্তু এই যুগের ভারতীয় হর্ম্ম্যে বাস্তুশিল্পের মধ্যে সংযমের সহিত সৌন্দর্য্য ভোগের নিদর্শন আছে। তাজমহল একটা উচ্ছৃঙ্খল সৌন্দর্য্য পিপাসার প্রতিমূর্ত্তি নয়। ইহার ভিতরকার সকল

অঙ্গের পরস্পর সম্বন্ধ অতি নিপুণভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। বাস্তুশিল্পীর ক্ষমতা এই বিষয়েই বিশেষরূপে প্রকটিত। তাজমহলের অসংখ্য প্রকার প্রস্তরকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে নিরীক্ষণ করিলে কোথাও হয়ত লাবণ্য পাইব না—সকলগুলির মিলনেই তাজমহলের গৌরব ও মহিমা। এই মর্ম্মর শিল্পের আভ্যন্তরীণ অলঙ্কার এবং বাহ্য গঠন উভয়ই চূড়ান্ত সামঞ্জস্য ও অনুপাত জ্ঞানের সাক্ষ্যপ্রদান করে। কিন্তু জাপানী শিল্পের সকল অঙ্গে সামঞ্জস্য পাইলাম না—প্রত্যেকটাই অত্যধিক দেখিতে পাই—কাজেই নয়ন তৃপ্ত হয় না। তাজমহলের শিল্পী নানাবিধ কারুকার্য্যের সাহায্যে একটা ভাবই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। জাপানের বাস্তুশিল্পে সকল কারিগরই নিজের নিজের চরম দেখাইতে ব্যস্ত।

(৪) রেলে বার ঘণ্টা

সকাল হইতেই অত্যধিক গরম পড়িয়াছে। যথাসময়ে রেলে বসিলাম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে একটা ছোট ষ্টেসনে নামা গেল। এইখানে চট, তোয়ালে, জিন ইত্যাদি তৈয়ারী করিবার কারখানা আছে। এতদিন কোথাও Linen Factory দেখি নাই। আজ দেখিবার সুযোগ হইল। অবশ্য ভিতরে সকল বয়ন কারখানাই একরূপ। সূতা প্রস্তুত করা এবং কাপড় বুনা এই দুই কাজের জন্যই কল আছে। পশম, তূলা, পাট ইত্যাদির বয়নেও এইরূপ। কারখানায় স্ত্রীমজুরের সংখ্যা বেশী বোধ হইল। লিনেন তিশি গাছের খড় হইতে প্রস্তুত করা হয়।

ষ্টেসনের নিকটে একটা সরাইয়ে আহার করা গেল। নিক্কো হোটেল হইতে ভাত, তরকারী, ভুট্টাসিদ্ধ, বেগুন ও কুমড়া ভাজা ইত্যাদি আনা হইয়াছিল। সরাইটা যেন গোয়ালন্দের একটা হোটেল বিশেষ। চৌকি সদৃশ মেজের উপর মাদুর বিছান রহিয়াছে—মাছি ভন্ ভন্ করিতেছে—উঠানে জলের গামলা সাজান। আহার করিবার সময়ে ঝী বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছে। প্রাচ্যদেশ ছাড়া দুনিয়ার অন্যত্র এই সকল দৃশ্য দেখিবার জো নাই।

সরাইয়ে লোক জন রাত্রিবাসও করিতে পারে—ইচ্ছা করিলে কয়েক দিবস কাটানও যায়। শয়নগৃহ ইত্যাদি আছে। জাপানীরা খাট বা চৌকি ব্যবহার করে না। মেজেতে মাদুর বিস্তৃত থাকে। তাহার উপর বিছানা পাতিয়া শুইতে হয়।

এই ধরণের সরাই বা চটি ষ্টেসনের নিকট অনেকগুলি দেখিলাম। খড়ো অথবা টিনের ছাদ, কাঠের বেড়া, অপরিষ্কার উঠান, ইত্যাদি ভারতীয় সরাইসমূহেরও আনুষঙ্গিক নহে কি? "স্বদেশী" জাপানে ও "স্বদেশী" ভারতে প্রভেদ খুঁজিয়া ত পাই না।

দ্বিপ্রহরে উৎসুনোমিয়া ষ্টেসনে গাড়ী আসিল। গরম এতবেশী যে রেল কোম্পানী প্লাটফর্ম্মে এবং ষ্টেসনের সকল ঘরে জল ছিটাইবার হুকুম দিয়াছেন। প্লাটফর্ম্মের উপর কয়েকটা আল্‌মারিতে দেখিলাম এই প্রেফেক্ট বা জেলায় কৃষিজাত ও শিল্পজাত যত প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহাদের নমুনা সংগৃহীত রহিয়াছে। রেলযাত্রীরা সহজেই সেগুলি দেখিয়া লইতে পারে।

নিক্কো হইতে শাখা লাইনের গাড়ীতে আসিয়াছি—বড় লাইনের গাড়ীর জন্য খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। টোকিও হইতে গাড়ী আসিলে তাহাতে বসিয়া উত্তরদিকে অগ্রসর হইতেছি। জাপানের উত্তরার্দ্ধ

অপেক্ষা দক্ষিণ অর্দ্ধই ঐতিহাসিকতায় প্রাচীনতর ও প্রসিদ্ধতর।

ধানের ক্ষেত দুই ধারেই দেখিতেছি—ভুট্টা ও তুঁতের চাষও স্থানে স্থানে দেখিলাম। কয়েকটা পার্ব্বত্য নদী পার হইলাম। নদীতে জল অল্প—প্রস্তর শিলার রাশিই বেশী দেখা যায়। জাপানে সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত নদী নাই। এই নদীগুলি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে ধাবিত। পূর্ব্ব অঞ্চলের পাহাড়গুলি ইহাদের উৎপত্তিস্থান।

ক্রমশঃ খাঁটি পার্ব্বত্য প্রদেশের ভিতর দিয়া গাড়ী চলিতেছে। যেন আমেরিকার নেভাডা অঞ্চল দেখিতে দেখিতে যাইতেছি। জঙ্গলাবৃত পর্ব্বত পৃষ্ঠ, সঙ্কীর্ণ কৃষিভূমি, নিবিড়বন, সুদীর্ঘ তরুবর অথবা ঘন ঝোঁপ এই সমুদয়ই চোখে পড়িতেছে। চারিদিকেই পাহাড়ের সমাবেশ। সন্ধ্যাকালে ফুকুশিমা নগরের নিকটে আসিতে আসিতে অতিশয় রম্য দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। পাহাড়ের উর্দ্ধদেশ হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে। রেল পথের দুই ধারেই পাহাড়—বনজঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে কতকগুলি কৃষিক্ষেত্র। খানিকটা দক্ষিণ ফ্রান্স ও রোণ উপত্যকার দৃশ্য মনে পড়ে। ফুকুশিমার পর আর একটা বড় সহর আছে। তাহার নাম সেন্ডাই। ইহাই উত্তর জাপানের সর্ব্বপ্রসিদ্ধ নগর। এখান হইতে আধ ঘণ্টার মধ্যে মাৎসুসিমায় পৌছিলাম। তাহার পর রিক্শতে হোটেলে পৌছিতে আরও ৪০ মিনিট লাগিল।

রাস্তার দুই ধারে পার্ব্বত্য পল্লীর মধ্যে যে সকল কুটির দেখিলাম সেগুলির চালা হয় খড়ের না হয় টালির নির্ম্মিত। ঘরের দেওয়াল প্রায়ই মৃত্তিকা গঠিত। মেজেতে কাঠের আবরণ নাই। বলা বাহুল্য এইরূপ পল্লীগৃহ ভারতের সকল প্রদেশেই দেখা যায়। চালার আকৃতিও ঠিক আমাদের চৌয়ারী বা আটচালা ঘরের ছাদের মত। টোকিওর ধনীজনগণের কাষ্ঠভবনগুলির চালাও আমাদের সুপরিচিত খড়োচালার অনুরূপ। জাপানে একমাত্র মন্দির, রাজপ্রাসাদ এবং দুর্গের ছাদ অন্য ধরণের দেখিতে পাই। এই সমুদয়ের গঠনকে ব্রহ্মদেশীয় প্যাগোডা-রীতির অন্তর্গত করা যায়। চালা দুই তিন ধাপে সম্পূর্ণ—প্রত্যেক ধাপই ত্রিভঙ্গিম ও বক্রগতি। এই তরঙ্গায়িত টালির বা টিনের ছাদ জাপানী বাস্তুশিল্পের বিশেষত্ব—ভারতবর্ষে এইরূপ ঢেউ কাটান চালা দেখিতে পাই না। জাপানীরা কোরিয়া ও চীন হইতে এই প্যাগোডা-রীতি আমদানি করিয়াছে।

শুক্ল পক্ষের চাঁদ ঘণ্টা খানেকের জন্য দেখা দিয়া অন্তর্হিত হইয়াছে। ষ্টেসনে যখন নামিলাম তখন চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। পল্লীর ভিতর ইলেক্‌ট্রিক বাতি মিটিমিটি জ্বলিতেছে। চীনা কাগজের লণ্ঠন রিক্‌সতে ঝুলাইয়া কুলীরা মাঠের ভিতরকার পথ দিয়া দৌড়িতে লাগিল। শীতল বাতাস বহিতেছে—মাঠের পর মাঠ পার হইতেছি স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র পল্লীর "চটি" বা মুদীখানা দেখা গেল। মেজেতে শুইয়া খালি গায়ে লোকজন নিদ্রা যাইতেছে। কোথাও জন প্রাণীর সাড়া শব্দ নাই—মাঝে মাঝে দুই একটা গাড়ীর কোঁকর কোঁকর শুনিয়া ভাবিলাম বোধহয় গরুর গাড়ী আসিতেছে। দেখিলাম এগুলি অশ্ববাহিত শকট বটে কিন্তু গরুর গাড়ীর সঙ্গে এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। নির্জ্জন নীরব প্রান্তর ও পল্লীর মধ্যে একমাত্র সহচর পাইলাম ব্যাঙের ডাক। বর্ষাকালে আমাদের

দেশের মত জাপানেও ভেক জাতির কন্‌সার্ট বাজিতে থাকে। নিম্নে সহস্র সহস্র ব্যাঙের গান এবং ঊর্দ্ধে আকাশের "ছায়াপথ" ও তারকারাজ, অদূরে নাতিউচ্চ অস্পষ্ট পাহাড়, আর সর্ব্বত্র অন্ধকার ও দুইচারিটা জোনাকী পোকা।

"সাধ হয় মনে, তারকারি সনে,
ধীরে উঠে চলি সুনীল গগনে,
ললিত লহরী তুলিয়া সুতানে,
জ্যোছনা কিরণে মিশাতে কায়।"

মাৎসুসিমার বাজার পাড়ায় বৈদ্যুতিক বাতির বাহার দেখিলাম। দোকানদারেরা ঘরের ভিতরে অথবা বাহিরে শুইয়া বসিয়া গল্প গুজব করিতেছে। ভারতীয় মফঃস্বলের নৈশ দৃশ্য। তফাৎ কেবল বিদ্যুতে।

৫। উপসাগরের কূলে

বাহিরে বেশ ঠাণ্ডা বাতাস—কিন্তু ঘরের ভিতর যেন অগ্নিকুণ্ড। রাত্রি প্রায় ১টা পর্য্যন্ত এই ভাবে গেল। বসিয়া বসিয়া কয়েক সংখ্যা "Japan Magazine," Alfred Noyes প্রণীত A tale of old Japan নামক কবিতা এবং Hundred verses from old Japan নামক প্রাচীন জাপানী কবিতার ইংরাজী অনুবাদ ইত্যাদি পাঠ করা গেল। পুরাতন জাপানী উপন্যাসে, গল্পে, কাব্যে এবং নোনাটকে বৌদ্ধ প্রভাব বেশ বুঝিতে পারা যায়। নির্ব্বাণ-তত্ত্ব, পরকালবাদ ইত্যাদির চিহ্ন যেখানে সেখানে পাই। জাপানীরা প্রেম-সাহিত্যেও যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। এমন কি অষ্টম নবম দশম শতাব্দীর কবিগণ ও নব্য ইয়োরামেরিকার রীতিতে romantic প্রণয়-কবিতা রচনা করিত। ইহা বিশেষ বিস্ময়ের কথা।

নবম শতাব্দীর এক রাজকুমার প্রেমে পড়িয়া আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত। কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে :—

" Now, in dire distress.
It is all the same to me;
So, then, let us meet
Even though it costs my life
In the Bay of Naniwa."

এখানে "যমুনাসলিলে সই অব তনু ডারব" — ইত্যাদির সুর শুনিতে পাই। এই সম্বন্ধে অনুবাদক ভাষ্য করিতেছেন—" It is clear from the poem that love a thousand years ago was much the same in power and unevenness as it is to-day."

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যে এইরূপ গীত রচিত হইত কি? তখন ইংল্যণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানীতেও এই ধরণের গীতি-কবিতা দেখা গিয়াছিল কি?

নৈশ অন্ধকারকে দৃষ্টিগোচর করিবার জন্যই যেন জোনাকি পোকাগুলি মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে। ঘরের ভিতরে মশকের জ্বালাতন যৎপরোনাস্তি। মশারির ব্যবহার হোটেলে প্রচলিত। চারিটার সময়েই উষার আবির্ভাব হইয়াছে। ছয়টার পূর্ব্বে ঘরের ভিতর সূর্য্যের উষ্ণ কিরণ দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। বিছানা হইতেই দেখিতে পাইলাম একটা হ্রদসদৃশ জলাশয় সম্মুখে বিস্তৃত রহিয়াছে। তাহার মধ্যে মধ্যে কয়েকটা ক্ষুদ্র পাহাড়।

মাৎসুশিমা জাপানী সমাজে প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্য বিখ্যাত। জাপানীরা কথায় কথায় বলিয়া থাকে—"আমাদের দেশে তিনটা অতি রমণীয় স্থান আছে। তাহার মধ্যে মাৎসুশিমা অন্যতম।" মাৎসু শব্দের

নিক্কোপাহাড়ের হ্রদ

দায়ার উপর ল্যাকার সেতু

'India Press,' Calcutta.

অর্থ pine বা সরল বৃক্ষ, শিমা শব্দের অর্থ দ্বীপ। ইহাকে পাইন বা সরল দ্বীপ বলা যাইতে পারে। এই জনপদে পাইন বৃক্ষের সংখ্যা অগণিত। একটা উপসাগরের চারি দিকে পাহাড়—বস্তুতঃ পার্ব্বত্য প্রদেশের অভ্যন্তরেই যেন একটা হ্রদ অবস্থিত। এই জলাশয়ের ভিতর স্থানে স্থানে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ। এই দ্বীপগুলি পর্ব্বতশৃঙ্গ বিশেষ। সর্ব্বত্রই সরল বৃক্ষের ঝাড় বিরাজমান। নিক্কো পাহাড়ের কৃত্রিম ক্রুপটোমেরিয়া য়্যাভিনিউ হইতে সাগর-কূলের এক প্রাকৃতিক পাইন-কুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।

মাৎসুশিমার সৌন্দর্য্য মধ্যযুগের জাপানীরাও উপলব্ধি করিয়াছিল। সেণ্ডাই জনপদের ডাইমোগণ এইখানে একটা গ্রীষ্ম ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রায় তিনশত বৎসরের পুরাতন একটা "ভিলা" আমাদের হোটেলের পার্শ্বেই অবস্থিত। গাইড বলিলেন—"লর্ড দাতে যখন সেণ্ডাইরাজ্যের ডাইমো ছিলেন তখন এই গৃহ নির্ম্মিত হয়।" সেদিন থিয়েটারে A Samurai and a Courtesan নাটকের অভিনয়ে দাতের পরিচয় পাইয়াছি।

মাৎসুশিমায় এতদিন পর্য্যন্ত জাপানী রীতির হোটেল, পান্থশালা, সরাই বা চটি মাত্র ছিল। ইয়োরামেরিকার পর্য্যটকগণ এই সকল গৃহে বাস করিয়া সুখ পাইত না। অথচ বিদেশীয় টুরিষ্টেরা এইখানে আসিতে আরম্ভ করিলে স্থানীয় লোকজনের ধনসম্পদ বৃদ্ধি পাইবার কথা। এইরূপ ভাবিয়া সেণ্ডাই প্রেফেক্টের কর্ত্তৃপক্ষ একটা উচ্চশ্রেণীর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সরকারী খরচে এই ভবন নির্ম্মিত হইয়াছে। নূতন একটা পার্ক বা উদ্যান রচিত হইতেছে। উপসাগরের কূলে সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক স্থানে এই উদ্যান ও গৃহের সমাবেশ। সকল প্রকার পাশ্চাত্য আহার বিহারের ব্যবস্থা করিবার জন্য একটা হোটেল-কোম্পানী গবর্মেণ্টের নিকট এই গৃহ ভাড়া লইয়াছেন। দুই এক বৎসরের ভিতর এই "পার্ক হোটেলের" সাহায্যে মাৎসুশিমা বিদেশীয় পর্য্যটকগণের মক্কায় পরিণত হইবে।

মধ্যযুগের ইতিহাস মাৎসুশিমার পর্ব্বতগাত্রে ও পর্ব্বতকন্দরে অনেক দেখিতে পাইলাম। সেতু পার হইয়া একটা দ্বীপে পদার্পণ করা গেল। ইহার ভিতর একটা বিরাট কাষ্ঠময় বুদ্ধমূর্ত্তি এবং বহু প্রস্তরময় শিশু-সংরক্ষক জিজোদেবের বিগ্রহ ইত্যাদি রহিয়াছে। কোন কোন স্থানে দেখিলাম ভারতীয় কার্লাভাজা ইত্যাদি পর্ব্বত গহ্বরের ক্ষীণ অনুকরণ করা রহিয়াছে। মৃত নরনারীর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ নানা প্রস্তরস্তূপ, কতকগুলি পর্ব্বতকন্দরে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই প্রস্তরস্তূপের উপর চীনা অক্ষরের লিপি পাঠ করিয়া বৌদ্ধ অনুষ্ঠান বুঝিতে পারা যায়। এই ধরণের কন্দর মাৎসুশিমার নানা অঞ্চলেই দেখিতে পাইলাম। স্মৃতি স্তম্ভের সর্ব্বনিম্নে চতুষ্কোণ প্রস্তর, তাহার উপর গোলাকার প্রস্তর—তাহার উপর আবার চতুষ্কোণ—তাহার উপর আবার গোলাকার এবং সর্ব্বোচ্চস্তর শীর্ষ সদৃশ।

মাৎসুশিমার বাজার-পাড়ায় আসিলাম। এইখানে একটা ফটকের ভিতর দিয়া ক্রুপ্টোমেরিয়া বৃক্ষের কুঞ্জপথে প্রবেশ করিলাম। এই পথে একটা বৌদ্ধ মন্দিরে আসা যায়। দাতে বংশীয় প্রথম ডাইমো এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। শুনিলাম পরলোকগত মিকাডো মৎসুয়িতো পাইন দ্বীপে ভ্রমণ করিতে আসিয়া এই মন্দিরে বাস করিয়াছিলেন। আজকাল যত জাপানী পর্য্যটক মাৎসুশিমা ভ্রমণে আসেন তাঁহারা সকলেই এই মন্দির দেখিয়া যান। গাইড বলিলেন—"এই পল্লীতে স্বদেশীয় লোকজনকে সাহায্য করিবার জন্য এক শ্রেণীর গাইড আছে। তাহারা তীর্থযাত্রী অথবা স্বাস্থ্যান্বেষী জাপানীগণকে সকল দর্শনীয় স্থানে লইয়া যায়।" আমি বুঝিলাম ইহারা আমাদের দেশে পাণ্ডা নামে পরিচিত।

এখানকার পাহাড় বিশেষ শক্ত নয়। নিতান্ত নরম স্যাণ্ডষ্টোন বা বালুকা প্রস্তরে এই অঞ্চল গঠিত। ঘুঘু, হাঁস, ইত্যাদি পাখীর ঝাঁক দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু গবর্মেণ্টের আইনে এই সকল শীকার করা দণ্ডনীয়। শীতকালে বরফ পড়ে তখন এই

অঞ্চলে লোকজনের গতিবিধি এক প্রকার বন্ধ থাকে। উপসাগারে স্রোত বা তরঙ্গ নাই। প্রত্যহ বিকালে জোয়ার হয়, তখন জলের পরিমাণ কিয়ৎকালের জন্য বাড়িয়া যায়। সাধারণ নৌকা, তড়িচ্চালিত নৌকা, বাষ্প-চালিত ষ্টীমার ইত্যাদি সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেছে। কিন্তু সুবিস্তৃত বাণিজ্যের কেন্দ্র এখনও মাৎসুশিমায় গড়িয়া উঠে নাই। কোন কৃষি বা শিল্পকর্ম্মের পরিচয়ও এই জনপদে পাইতেছি না। এমন কি সাধারণ শাকশব্জী, ফলমূল, মাংস মাছ, ডিম, দুধ, মাখন ইত্যাদির জন্যও হোটেলের কর্ত্তা সেগুাই সহরে লোক পাঠাইয়া থাকেন।

মাৎসুশিমা ভারতবাসীর পুরী বা ওয়াল্টেয়ার। গ্রীষ্মের সময়ে পয়সাওয়ালা লোকেরা এখানে কিছুকাল কাটাইতে ভালবাসেন। ইহা অর্থ ব্যয়ের স্থান—টাকা রোজগারের পথ এখানে নাই। ঘন সবুজ পাইন তরুর হাওয়া খাইয়া যাহাদের পেট ভরে অথবা মর্ম্মর ধ্বনি শুনিয়া যাহাদের চিত্ত উৎফুল্ল হয় তাহারা প্রকৃতির এই বিলাসক্ষেত্রে সুখ পাইবে। অথবা যাহারা সাগরকূলে বসিয়া বিরলে লহরমালা দেখিতে চাহে তাহাদের পক্ষেও এই স্থান প্রশস্ত। দুঃখের কথা লহরমালা এখানে দেখিতে হইলে নৌকা করিয়া কিছুদুর যাইতে হয়।

কোম্পানীর ষ্টীমারে দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে যাইবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু গাইডের পরামর্শে একটা আল্‌গা নৌকা ভাড়া করিয়া উপসাগর-বিহারে বাহির হইলাম। প্রাচীনকাল হইতে কোম্পানীদের ধারণা এই যে এই অঞ্চলে ৮০৮ দ্বীপ অবস্থিত। শুনিলাম দ্বীপ সংখ্যা প্রায় তিনশত আছে। দ্বীপগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ী "চর" মাত্র। একটা দ্বীপের নাম সৌভাগ্যদ্বীপ, কোন দ্বীপ দেবতার নামে অভিহিত, কোনটা বা প্রসিদ্ধ স্ত্রীকবির নামে বিখ্যাত। হোটেলের নিকটে সাগরে স্নানের সুবিধা নাই, জলের ভিতর জঙ্গল অত্যন্ত বেশী। আধ ঘণ্টা খানেক নৌকায় চলিয়া একটা দ্বীপে আসিলে স্নানের ঘাট পাওয়া যায়। একটা দ্বীপে একপ্রকার বাঁশ পাওয়া যায়—উহা পুরাপুরি নিরেট।

সন্ধ্যায় হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম। ভোজনালয়ে বসিয়া আহার করিতেছি এমন সময়ে দেখি ২০৷২৫ জন জাপানী বালক ও বালিকা বারান্দায় আসিয়া দেখিতেছে। ইহারা রঙ্গিন "চারখানা" বা ছিটের কিওমনো পরিয়াছে, পায়ে কোন খড়ম বা জুতা নাই, মাথায়ও কোন আভরণ নাই। ইহাদিগকে দেখিতে আমাদের স্বদেশীয় শিশুগণের মত। বোধ হয় ইহাদিগকে বঙ্গীয় মুসলমান সন্তান বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। ঘরের বাহিরে আসিবা মাত্র সকলে দূরে পলাইয়া গেল। আবার ভিতরে প্রবেশ করিলেই উহারা ফিরিয়া আসিতে লাগিল। পাশ্চাত্য দেশের শিশুগণকে এই ধরণের সঙ্কোচ বোধ করিতে দেখি নাই। পরে এক এক টুকরা রুটি প্রদান করিয়া ইহাদিগকে বিদায় করা গেল। উহারা এই জিনিষ গ্রহণ করিবে পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। গাড়ীর সময় হইয়া আসিল—সকলকে "সায়োনারা" বলিয়া রিক্‌শতে বসিলাম। তাহার পর আবার সেই বাজারের পথে মুদী দোকানদারের জটলা, জোনাকির রোশনাই, ব্যাঙের কনসার্ট অতিক্রম করিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত।

গাইডকে প্রতিদিন ৭॥০ করিয়া দিতে হইতেছে। তাহার উপর যাতায়াতের খরচ আছে। এই ব্যয়কে জাপানী ভাষা না জানার মূল্য বিবেচনা করিতেছি। মিশরেও গাইডের খরচ আবশ্যক হইয়াছিল। কোন মতে রেলজাহাজের মাস্তুল মাত্র লইয়া আসিলে বিদেশ ভ্রমণ করা চলে না।

৬। টোকিও হইতে সাতশত মাইল উত্তরে

আমেরিকার নিয়মে জাপানীরাও রেলে আরোহীদিগের জন্য ঘুমের গাড়ী প্রবর্ত্তন করিয়াছে। এই সকল গাড়ীতে একজন করিয়া সেবক সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকে। বিছানা পাড়া হইতে জুতা জামা পরিষ্কার পর্য্যন্ত সকল কাজই এই সেবকের কর্ত্তব্য। আমেরিকার গাড়ীতে মশারি ও চটি জুতা পাওয়া যায় নাই। জাপানী sleeping car এ এই দুই জিনিষ "অধিকন্তু"।

এক ঘুমে রাত্রি কাবার করিয়া দিলাম।

ভোরে আওমরি ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল। নিপ্পন দ্বীপের ইহাই সর্ব্বোত্তর সীমা। এইখানে উপসাগর ও প্রাণালী পার হইয়া পরবর্ত্তী দ্বীপে যাইতে হইবে। সেই দ্বীপের নাম হোক্কাইদো। এই দ্বীপের কেন্দ্রসহর স্যাপ্পরো যাত্রা করিয়াছি।

জাপানী রেলে ভাড়া অত্যন্ত অল্প। টোকিও হইতে স্যাপ্পরো ৭০০ মাইল। ইহার মধ্যে জাহাজে থাকিতে হয় পাঁচ ঘণ্টা—প্রায় ৬০ মাইল ব্যাপী জলপথ। নিদ্রা যাইবার জন্য অতিরিক্ত খরচ সমেত প্রথম শ্রেণীর মূল্য দিতে হইল মাত্র ৩৩৲। কিন্তু কলিকাতা হইতে ফাষ্টক্লাসে কাশী যাইতে হইলে খরচ হয় ৩৮৲। অথচ দূরত্ব মাত্র ৩৫০ মাইল। এদিকে আরাম বেশী জাপানী 'শ্লীপিং কারে'।

জাপানের প্রত্যেক গাড়ীতে ভোজন-প্রকোষ্ঠ থাকে না। প্রায় সকল যাত্রীই নিজ নিজ খাদ্যদ্রব্য বোচকায় বাঁধিয়া আনে। প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরাও এইরূপ করেন। ডাইনিংকারে যাইয়া খাওয়ার রীতি জাপানী সমাজে বেশী দেখিতেছি না। সাধারণতঃ স্বদেশী খাদ্য গ্রহণ করাই ইঁহাদের অভ্যাস। বিদেশীয় পোষাকেও বেশী জাপানী দৃষ্টিগোচর হয় না। ষ্টেশনের মোসাফেরখানার বেঞ্চ টেবিল দেখিতে পাই বটে—কিন্তু সাধারণতঃ ফরাস বিছাইয়া বসিবার অভ্যাসই বর্ত্তমান। আওমরি ষ্টেশনের Waiting Roomএ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা সকলেই টেবিল চেয়ারের কামরায় প্রবেশ করে না। মেজেতে আসন পাতিয়া বসাই সকলে পছন্দ করেন। রেল গাড়ীর এবং মোসাফেরখানার পায়খানাতেও জাপানীরা স্বদেশী কায়দাই রক্ষা করিয়াছে। পাশ্চাত্য "কমোড" ব্যবহার জাপানী সমাজে আরব্ধ হয় নাই। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় এবং ওয়েটিং রুমেও প্রাচ্য ধরণের পায়খানাই দেখিতে পাইতেছি। ভারতবর্ষে যে সকল রেল ষ্টীমার চলে তাহাতে দেশীয় লোকজনই যাতায়াত বেশী করে সত্য—কিন্তু রেলকোম্পানী দুই চারিজন শ্বেতাঙ্গ নরনারীর সুখ সুবিধা বিবেচনা করিয়াই সকল প্রকার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কোন্ ষ্টেশনে কতক্ষণ থাকিবে ইত্যাদি স্থির করা হইতে গাড়ী ঘরের পায়খানা পর্য্যন্ত কোন বিষয়েই ভারতীয় মোসাফেরদিগের স্বভাব অভ্যাস বিবেচনা করা হয় না। এই জন্যই রেল ষ্টীমারে চলাফেরা করা ভারতবাসীর পক্ষে একটা ঝকমারি বা কর্ম্মভোগ বিবেচিত হয়। কিন্তু জাপানীরা ভারতবাসীর পরে রেল দেখিয়াও অল্পকালের মধ্যেই ইয়োরামেরিকানদিগের ন্যায় এই সকল যান-ব্যবহারে সুদক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। রেল ষ্টীমার ইত্যাদি ইহারা হজম করিতে পারিয়াছে—এই সকল নব্য যান ইহাদের ধাতে লাগিয়াছে। একমাত্র কারণ এই যে, জাপানীরা নব্য কল যন্ত্র হাতিয়ারগুলি নিজ ইচ্ছানুসারে নিজ সুযোগ সুবিধা বাড়াইবার জন্য নিজ অভাব মোচন করিবার উদ্দেশ্যে আমদানি ও প্রয়োগ করিয়াছে। ফলতঃ ইহারা রেলওয়ে ষ্টীমার ইত্যাদি বিষয়ে পাকা ওস্তাদও হইতেছে—অথচ কোন বিষয়ে নিজস্ব পরিত্যাগ করিতেছে না। এদিকে ভারতবাসীরা এতদিনে স্বাধীন-ভাবে বাষ্পশকট বা বাষ্পজাহাজ তৈয়ারী করিতেও পারিল না, নিজ নায়কতায় চালাইতেও শিখিল না—অধিকন্তু রেলে জাহাজে চলিতে হইলে ভারত সন্তানকে নিজ স্বভাব ও অভ্যাস বর্জ্জন করিতে হয়। ভারতীয় স্নানাহারের নিয়ম অথবা সময় এবং মলমূত্র ত্যাগের আয়োজন জলাঞ্জলি না দিলে ভারতবর্ষে চলাফেরা করা অসম্ভব। কাজেই ষ্টীম-এঞ্জিন ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে assimilated বা অঙ্গীভূত হইবে কেন?

আওমরি ষ্টেসনের বিশ্রামগৃহে কয়েকটা আলমারি দেখিলাম। এই সহরে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয় সেগুলি এইখানে প্রদর্শিত হইতেছে। এক প্রকার বেতের বাক্স, চুপড়ী, ট্রাঙ্ক ইত্যাদি তৈয়ারী করিতে স্থানীয় লোকেরা সিদ্ধহস্ত। এতদ্ব্যতীত ল্যাকারের নানা প্রকার জিনিষও এই সহরে প্রস্তুত হয়।

পাঁচ ঘণ্টা জাহাজে কাটিল। জাহাজে পাশ্চাত্য ধরণের খানাঘর আছে—কিন্তু কোন জাপানী এখানে আহার করিল না।

জাহাজের রন্ধনালয়ে জাপানী খাদ্যই প্রস্তুত হইতেছে—একমাত্র আমার জন্য নূতন খাদ্য প্রস্তুত হইল। রুইমাছ ভাজার সঙ্গে ভাত আহার করা গেল।

জাপানীদের এইরূপ স্বাতন্ত্র্য দেখিয়া ভাবিতেছি—ইয়োরামেরিকার লোকেরা এইজন্যই জাপানের উপর বিরক্ত। পৃথিবীতে বোধ হয় জাপানই একমাত্র দেশ যেখানে পাশ্চাত্য নরনারীদিগের সুবিধার জন্য বিশেষভাবে সুবিধা সৃষ্টি করা আবশ্যক বিবেচিত হয় না। কাজেই সেই জাপানের ধ্বংস না হইলে ইয়োরামেরিকা সন্তুষ্ট থাকিতে পারে কি? যাহারা দুনিয়ার সর্ব্বত্র হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতার ন্যায় বিচরণ করে তাহারা জাপানে আসিয়া দেখে যে শ্বেতাঙ্গের কর্ত্তৃত্বে একটাও হোটেল নাই—রেলগাড়ীতে শ্বেতাঙ্গদিগের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নাই—ওয়েটিংরুমের পায়খানায় কমোড নাই!

হাকোদাতে বন্দরে আসিয়া জাহাজ থামিল। সমুদ্রের কিনারা হইতে পাহাড় উঠিয়াছে। পাহাড়ের গাত্রে গৃহসমূহ স্তরে স্তরে সাজান। সেনাবিভাগের ভবনাদি এইখানে অবস্থিত—এইজন্য ফটোগ্রাফ লওয়া নিষিদ্ধ। রিকশতে করিয়া নগর দেখিতে বাহির হইলাম। নগর অনেকাংশে ইয়োকোহামার মত বোধ হইল। রুশভাষায় এবং রুশ অক্ষরে বহু দোকানের সাইন-বোর্ডে বিজ্ঞাপন দেখিলাম। বাজারে বঙ্গদেশের সকল প্রকার শাকশব্জী এবং ফলমূল পাওয়া যায়। অতিরিক্ত কিছু না দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। কচু, আলু, আদা, লঙ্কা, কুমড়া, লাউ, শসা, বেগুন, কড়াইশুটি, সকরকন্দ, তরমুজ, নাসপাতি, কলা, মূলা, লকাট ইত্যাদি সবই বাঙ্গালীর সুপরিচিত। বোধ হয় চেরিফল আমাদের পক্ষে নূতন। ট্রামও আছে, তড়িতের বাতিও আছে—কিন্তু ঘরবাড়ী সবই আমাদের পল্লীকুটীরসমূহের অনুরূপ।

হাকোদাতে হইতে ১৮০ মাইল দূরে স্যাপ্পরো নগর পুরা নয় ঘণ্টার পথ। এই রেলে ডাইনিংকার অথবা স্লীপিংকার নাই। দুই ধারে পাহাড়—লোকালয় কোথাও চোখে পড়ে না। কৃষিক্ষেত্রও অতি বিরল। সর্ব্বত্র বনজঙ্গল দেখিতে পাইতেছি। খানিক পরে কিছুকাল পর্য্যন্ত সমুদ্রের কিনারা দিয়া রেল চলিল—বাম দিকে বৃক্ষাবৃত পর্ব্বত। স্থানে স্থানে কতকগুলি হ্রদ দেখিতে পাইলাম। এই সকল হ্রদ পার্ব্বত্য ঝোরার জলে গঠিত। সন্ধ্যার সময়ে গাড়ী অতিশয় রমণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্যের ভিতর চলিতে লাগিল। রেলপথের চারিদিকে পর্ব্বতশৃঙ্গ। সঙ্কীর্ণ উপত্যকার উপর সঙ্কীর্ণতর রাস্তা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। বক্রগতি পার্ব্বত্য নদী ঝর ঝর বহিয়া যাইতেছে। নিবিড় বনের উপর ক্ষীণচন্দ্রের কিরণ এক অপূর্ব্ব আলোক বিকীরণ করিতেছে। ঝরণার শব্দের সঙ্গে আওয়াজ মিশাইয়া গাড়ী গর্জ্জন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে। জনপ্রাণী জীবজন্তুর সাড়া শব্দ কোথাও নাই।

একটা ষ্টেসনে কিছু দুধ পান করা গেল। জাপানে দুধ পাওয়া একটা সৌভাগ্য বিশেষ। জাপানীরা দিনে অন্ততঃ ৫০ বার চা পান করে—কিন্তু দুধ কখনও চোখে দেখে না। খানিক পরে একটা বড় ষ্টেসনে আসিলাম। নাম ওতারো। উহা একটা সমুদ্রবন্দর।

ষ্টেসনের ফেরিওয়ালাদের ডাক শুনিয়া মনে হয় যেন ভারতীয় রেলে ভ্রমণ করিতেছি।

রাত্রি বারটার সময়ে স্যাপ্পরো পৌঁছিলাম। ষ্টেসনে অধ্যাপক স্যাতোর পুত্র আসিয়াছিলেন। ইনি এই বৎসর এখানকার কৃষি-মহাবিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি ইংরাজী বেশ বলেন। শুনিলাম এখানকার প্রায় সকল অধ্যাপকই ইংরাজী ও জার্ম্মাণ জানেন। অধ্যাপক সংখ্যা প্রায় একশত।

স্যাতো জাপানের একজন নামজাদা লোক—স্যাপ্পারোর মহাবিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম ছাত্র ছিলেন। এক্ষণে পরিচালক ও অধ্যক্ষ হইয়াছেন। ইনি পাঁচ বৎসর জার্ম্মানিতে ছিলেন—ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ইত্যাদি ভ্রমণও হইয়াছে। গত বৎসর যখন বিলাতে ছিলাম তখন ইনি আমেরিকায় বর্ত্তমান জাপান সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছিলেন।

দাতেবংশীয় প্রথম ডাইমো

India Press, Calcutta.

ইয়াঙ্কিস্থানের ধনকুবের কার্ণেগির হুজুগে একটা শান্তি-পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে। সেই পরিষদের আয়োজনে জাপানের ধুরন্ধরগণ আমেরিকায় বক্তৃতা করিতে যান এবং আমেরিকার নামজাদা লোকেরা জাপানে বক্তৃতা করিতে আসেন। গত বৎসর স্যাতোর পালা ছিল। তাহার পূর্ব্ব বৎসর "কুশিডো"-লেখক নিতোবে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। স্যাতো স্যাপ্পরো বিদ্যালয়ে কৃষিবিষয়ক ধনবিজ্ঞানের অধ্যাপনা করিয়া থাকেন।

ভাবিয়াছিলাম টোকিও হইতে বহু উত্তরে আসিতেছি—বোধ হয় শীত পড়িবে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কলিকাতা হইতে দক্ষিণ ইতালী ও দক্ষিণ স্পেন ইত্যাদি দেশ যত উত্তরে হোক্কাইদো দ্বীপ মাত্র তত উত্তরে। কাজেই যদিও টোকিওতে আজকাল Dog Days চলিতেছে, এবং সকলের মুখেই "একি গ্রীষ্ম ভাই প্রাণ আই ঢাই, ঠাঁই নাহি পাই কোথায় জুড়াই" শুনিয়াছি, স্যাপ্পরোতে পৌঁছিয়া আমাদের দেশী বসন্তের মলয় মারুৎ পাইলাম। ধূলা উড়িতেছে। রাস্তায় বাহির হইবামাত্র যুবক স্যাতো বলিলেন—"স্যাপ্পরোর রাস্তাগুলি সবই এইরূপ প্রশস্ত। আমেরিকার অনুকরণে এই নগর গঠিত হইয়াছে। সোজা সমান্তরাল ভাবে দুইদিক হইতে পথ নির্ম্মিত দেখিতে পাইবেন।"

একটা হোটেলে আশ্রয় লইলাম—ইহা জাপানীদের স্বদেশী সরাই। তবে বিদেশীয় পর্য্যটকগণের জন্য পাশ্চাত্য ধরণের কয়েকটা কামরা আছে।

সরকারী পশুশালা

প্রবেশদ্বারে জুতা রাখিয়া যথানির্দ্দিষ্ট ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এক জোড়া চটি জুতা নীচ হইতেই পাওয়া গেল।

সকালে উঠিয়া দেখি—সেবিকারা জাপানী ধরণের গৃহসমূহ হইতে বিছানাগুলি বাহির করিয়া আনিতেছে। দিবাভাগে গৃহের মধ্যে বিছানা রাখিবার নিয়ম নাই। আমার ঘরে কোনরূপ নড়ন চড়ন হইল না। কিন্তু পায়খানা সেই ভারতবর্ষের খাস জিনিষ।

আমরা বাহির হইতে শুনিতে পাই জাপানীরা ৪০।৫০ বৎসরের ভিতর অভাবনীয় রূপে সকল বিষয়ের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে। এই বিস্ময়জনক রূপান্তর পরিগ্রহ সত্য ভাবে বুঝিতে হইলে একবার জাপানে আসা আবশ্যক। আমরা সংবাদপত্রে পড়িয়া জাপানীদের পোর্ট আর্থার-কীর্ত্তি মাত্র বুঝিয়াছি। বস্তুতঃ পোর্ট-আর্থার ইহাদের অন্যতম কীর্ত্তিমাত্র। জীবনের কোন বিভাগ নাই যাহাতে জাপানীরা যুগান্তর প্রবর্ত্তন করে নাই। অর্দ্ধ শতাব্দীর ভিতর দেশটার চেহারাই বদলাইয়া গিয়াছে। এমন কি জীবজন্তু, শাকশব্জী ইত্যাদির বৃত্তান্ত অবগত হইলেও বুঝিতে পারি যে জাপানের যুগান্তর সত্য-সত্যই বিস্ময়জনক ও অদ্ভুত।

হোক্কাইদো দ্বীপের কথা ধরা যাউক। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এখানে মাত্র আদিম আইনোদিগের বসতি ছিল—আজ রেলপথে যে সকল বনজঙ্গল দেখিতেছি তাহার দশগুণ দুর্গম কানন ছিল—আর পশুর মধ্যে ছিল টাটুঘোড়া এবং কুকুর। আজ এখানে ১৫ লক্ষ সভ্য শিক্ষিত জাপানীর বাস। গোমহিষ বলদ, অশ্ব, মেষ, শূকর, খরগোশ, বিড়াল, মুরগী, হাঁস, তিত্তির, ঘুঘু ইত্যাদি জানোয়ারের বংশ বিশেষ সমৃদ্ধ হইতেছে। এদিকে গোধুম, যব, আলু, ধান, লবঙ্গ, ভুট্টা, নাশপাতি, আপেল, চেরি, আঙ্গুর, ষ্ট্রবেরি, কপি, পেঁয়াজ, কড়াইশুটি, মটর, শিম, কুমড়া, টোমাটো, য়্যাস্পারেগাস ইত্যাদিতে হোক্কাইদো আজকাল "সকল দেশের সেরা।" হোক্কাইদোর অধিকাংশ ভূখণ্ডই পতিত রহিয়াছে। দেশটার বাহ্য আকৃতি বদলাইয়া যায় নাই কি?

হোটেল হইতে সরকারী পশুশালা বহুদূরে। ইহার কর্ত্তা গাড়ী পাঠাইলেন। ধূলা, হাওয়া ও গরম ভোগ করিতে করিতে যথাস্থানে উপস্থিত হইলাম। এখানে চাষ আবাদও হয় কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্য পশুগণের খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এগুলি বাজারে বিক্রয় করা হয় না। অভ্যর্থনা-গৃহে এখানকার সকল দ্রব্য প্রদর্শিত দেখিলাম।

একপ্রকার গোধুমের গরম রস পান করিতে করিতে দুগ্ধ বিভাগের ওস্তাদের সঙ্গে

খানিকক্ষণ গল্প করা গেল। ইনি উইস্‌কন্‌সিন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়াছেন—পূর্ব্বে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট ছিলেন। এই পশুশালার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন ওস্তাদ নিযুক্ত। ওস্তাদের সংখ্যা ছয় জন। ইঁহাদের কর্ত্তা ও পরিচালক একজন। ইনি কয়েকবার ইয়োরোপ ও আমেরিকায় গাভী, বলদ, মেষ ইত্যাদি ক্রয় করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

জাপানে মেষ ছিল না। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে তিন জোড়া, স্পেন হইতে তিন জোড়া এবং বিলাত হইতে তিন জোড়া মেষ আমদানী করা হয়। মেষ পালন এখনও জাপানী সমাজে দাঁড়াইয়া যায় নাই। গবর্মেণ্ট ইহাদের সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এখনও যথেষ্ট অর্থব্যয়ে পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করিতেছেন। স্যাপ্পরোর্ এই পশুশালায় সম্প্রতি প্রায় ১৩০ মেষ রক্ষিত হইতেছে। বর্ত্তমানে বৎসরে একবার করিয়া মেষের লোম কাটা হয়। পশমের কাটাই বাছাই বুনাই ইত্যাদি জাপানীরা জানে না। তাহা শিখাইবার জন্য গবর্মেণ্ট এই পশুশালায় ক্ষুদ্রভাবে আয়োজন করিয়াছেন। জাপানে পশমের বস্ত্র তৈয়ারি করিবার জন্য কয়েকটা ফ্যাক্টরি আছে—ফ্যাক্টরির মালিকেরা অষ্ট্রেলিয়া ও বিলাতের পশম আমদানি করে। জাপানের ভিতর মেষ পালন এবং পশম ব্যবসায় সুপ্রচলিত হইলে এই কাঁচা মালের জন্য জাপানকে বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হইবে না। নিজ পায়ে দাঁড়াইবার জন্য গবর্মেণ্ট ৪০ বৎসর হইতে সংরক্ষণনীতি অবলম্বন পূর্ব্বক ফল পরীক্ষায় নিযুক্ত। এই নীতি প্রয়োগ করার ফলেই অল্পকালের ভিতর জাপানের রূপ বদলাইয়া গিয়াছে।

জাপানে আসিয়া অবধি দেখিতেছি দুধ অতি বিরল। মাত্র অল্পদিন হইল জাপানীরা দুধ মাখন ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। কাজেই গাইড একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়, আপনারা ভারতবর্ষে ইংরাজ আমলের পূর্ব্বে মাখান খাইতেন কি?" উত্তর দিলাম—'আজন্মকাল আমরা জানি 'আয়ুর্বৈ' ঘৃতম্।'

জাপানে গোপালন বিদ্যাও অনেকটা নূতন—গোপালন ব্যবসায়ও অনেকটা নূতন। হোক্কাইদো দ্বীপ সম্বন্ধে একথা বিশেষভাবেই খাটে। এদেশে আমেরিকা, জার্ম্মাণির হল্‌ষ্টাইণ জেলা, সুইজর্ল্যাণ্ড, ইংল্যণ্ড ইত্যাদি দেশ হইতে গোবলদ আমদানি করা হইয়া থাকে। ঘোঁড়ার আমদানিও আমেরিকা হইতে হয়। যেখানে যে জীব ভাল পাওয়া যায় জাপানীরা সেইখান হইতে সেই সমুদয় জীব আমদানি করিতে সুপটু। এইরূপেই দেশের শ্রী বদলাইয়া যায়।

স্যাপ্পরোর পশুশালায় প্রায় ২৭০টি বিদেশীয় গোবলদ আছে। প্রত্যেক গাভী প্রতিদিন প্রায় আধ মণ করিয়া দুধ দেয়। বলদগুলি মাঝে মাঝে বিভিন্ন জেলায় চালান করা হয়। এই উপায়ে জাপানী গোজাতির বংশোন্নতি সাধিত হইতেছে।

গোশালা, মেষশালা, দুগ্ধশালা ইত্যাদি দেখিলাম। শীতকালে পশুখাদ্যের অনটন সকল দেশেই হইয়া থাকে। তখন ভারতবর্ষে শুকনা ঘাস ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইয়াঙ্কিরা বর্ষার ঘাস বহুকাল পর্য্যন্ত তাজা রাখিবার জন্য এক কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন। একটা বায়ুহীন স্থানে এইগুলি পুঞ্জীকৃত করা হয়। পরে আবশ্যকমত এইগুলি বাহির করা চলে। জাপানীরাও সেই কৌশল প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

জাপানীরা দুধ দুহিবার সময়ে বাছুরকে দিয়া গাভীর বাঁট চাটায় না। গোয়ালা স্তনে হাত বুলাইয়া দুধ বাহির করে। জাপানীরা আমেরিকার রীতি অনুসরণ করিতেছে। দুগ্ধশালায় দেখিলাম দুধ বাষ্পে গরম করিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাজা রাখা হইতেছে। কলে মাখম প্রস্তুত করা হয়। প্রথমে cream বা দুগ্ধসার তৈয়ারি করা হইয়া থাকে—পরে দুগ্ধসার হইতে মাখন তৈয়ারি হয়। ১০০ ভাগ সাধারণ দুধ হইতে ১০ ভাগ মাত্র দুগ্ধসার পাওয়া যায়। আবার ১০০ ভাগ দুগ্ধসার হইতে ২৮ ভাগ মাখন প্রস্তুত হইতে পারে। দুগ্ধসার বাহির করিয়া লইলে দুগ্ধের যে অংশ অবশিষ্ট থাকে তাহা হইতে Condensed Milk বা ঘণীভূত দুধ, Milk

powder বা দুধের গুঁড়া, cheese বা পনির ইত্যাদি তৈয়ারি করা যায়। কিন্তু স্যাপ্পরোর এই পশুশালায় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাহা করেন না। দেখিলাম গোপালকেরা বাছুরগুলিকে সেই অবশিষ্টাংশ পান করাইতেছে। খাঁটি গোদুগ্ধ হইতে পনির এবং ঘণীভূত দুধ তৈয়ারি হইতেছে দেখা গেল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এবারকার প্যানামা-প্রদর্শনীতে এক প্রকার নূতন ঘণীভূত দুধ প্রদর্শিত হইতেছে। তাহার সংবাদ রাখেন কি?" দুগ্ধশালার ওস্তাদ বলিলেন—"আমরা সুইস্‌প্রণালী অনুসারে Condensed milk প্রস্তুত করিয়া থাকি। এই দুধের সঙ্গে চিনি মিশ্রিত হয়। এই জন্য দুধ আঠাল বোধ হয়। এবার একজন আমেরিকান যাহা উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহা evaporated milk. ইহাতে চিনি মিশ্রিত করা হয় না। কেবল মাত্র দুধের জলীয় অংশ বাষ্পরূপে বিতাড়িত করা হয়। এই দুধ আমি দেখিয়া আসিয়াছি—জাপানে এখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই।"

এই পশুশালার জন্য গবর্মেণ্টের বার্ষিক খরচ হয় ৭৫০০০৲। নানা বিভাগের দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া আমদানি হয় ৩৫০০০৲।

ঘোড়ার জন্য অনেকগুলি স্বতন্ত্র পশুশালা আছে। সেনাবিভাগের জন্য এবং কৃষিকার্য্যের জন্য এই সকল স্থানে উচ্চবংশীয় অশ্বের পালন বর্দ্ধন ইত্যাদি হইয়া থাকে।

হোক্কাইদোতে সর্ব্বসমেত আটটা পশুশালা আছে। এতদ্ব্যতীত জাপান সাম্রাজ্যের দ্বীপপুঞ্জে ছোটবড় সরকারী বেসরকারী বহুসংখ্যক পশুপালনের কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। নূতন নূতন জীবজন্তুর আমদানি এবং পুরাতন পশুজাতির বংশোন্নতি জাপানে যেরূপ দ্রুত চলিয়াছে তাহাতেই জাপানী যুগান্তরের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই যুগান্তর প্রবর্ত্তন করিল কে? স্বদেশী আন্দোলনের স্থাপয়িতা প্রজা-"সংরক্ষক" গবর্মেণ্ট।

৮। জাপানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

একটা সুবৃহৎ লিনেন ফ্যাক্টরি দেখিলাম। ১২০০ মজুর কার্য্য করে। কারখানার আয়তন বেশ বিস্তৃত। মালগুদামে রাশি রাশি সূতা, কাম্বিশ, চট, ইত্যাদি মজুত করা রহিয়াছে। গবর্মেণ্টের অর্ণব-যান-বিভাগের জন্য এইখানে মাল তৈয়ারী হয়। সেদিন নিক্কো হইতে আসিবার পথে কারখানায় যাহা দেখিয়াছি এখানেও তাহার বড় আকারে দেখিলাম। সূতা প্রস্তুত করা হইতে চট, তোয়ালে, জিন, কাম্বিশ ইত্যাদি ভাঁজ করা পর্য্যন্ত সবই কলে হইতেছে। তুলা, পশম, পাট, লিনেন ইত্যাদি সকল কারখানায়ই প্রায় একধরণের যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং একটা বয়ন-ফ্যাক্টরী দেখিলে সকল বয়ন কারখানার আসবাবপত্র ও পরিচালনা দেখা হয়। এই কোম্পাণীর তিশি-ক্ষেত্র আছে। সেখানে তিশিগাছ জলে পচাইয়া সূতা প্রস্তুত করিবার যোগ্য করা হইয়া থাকে। পাট পচান আর তিশি গাছ পচান এক ধরনেই নিষ্পন্ন হয়।

স্যাপ্পরোর সর্ব্বত্রই বৈদ্যুতিক বাতি দেখিতেছি কিন্তু বিদ্যুত চালিত ট্রাম দেখিতেছি না। ট্রামগাড়িগুলি অতিশয় ক্ষুদ্র—একটা ঘোড়ার দ্বারা টানা হয়।

ঘরে বসিয়া হোক্কাইদোর উদ্ভিদ্‌রাজ্য সম্বন্ধে পুস্তক পাঠ করিতেছি এমন সময়ে হঠাৎ কতকগুলি তুই পটকা ও বন্দুকের আওয়াজ শুনিলাম। বারান্দা হইতে দেখি রাস্তায় বহুলোক দাঁড়াইয়া গিয়াছে হোটেলের ঝি চাকরেরা ঘরের বাহিরে দৌড়িয়া গেল। রাস্তায় নামিয়া আসিলাম। দেখিতেছি একটা শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছে। ব্যাণ্ড বাজিতেছে—তাহার পশ্চাতে প্রায় ২০০ রিকৃশ চলিতেছে—কোনটাতে পুরুষ কোনটাতে রমণী বসিয়া আছে। সংবাদ পাওয়া গেল—টোকিও হইতে ইম্পিরিয়াল থিয়েটারের অভিনেতৃদল স্যাপ্পোরোতে কয়েকটা পালা অভিনয় করিবার জন্য আসিয়াছে। আজকার গাড়ীতে ইহারা পৌঁছিয়াছে। সহরময় এই সংবাদ প্রচার করিবার জন্য এই মিছিলের আয়োজন। বড় সহর হইতে মফঃস্বলে নামজাদা লোক জন আসিলে নাকি জাপানীরা এইরূপ করিয়া থাকে।

আমাদের দেশে যেমন কোন ঋতুতে দার্জ্জিলিঙ্গ শিমলা নৈনিতাল, কোন ঋতুতে

মধুপুর-দেওঘর পুরী ইত্যাদি যাইবার রেওয়াজ আছে জাপানে সেইরূপ গ্রীষ্মকালে লোকেরা ত্মাপ্পরোতে আসে। এক্ষণে এই সহরে পর্য্যটক আগমণের "যোগ" পড়িয়াছে সহরের প্রত্যেক সরাইয়েই বহুলোক আশ্রয় লইয়াছেন শুনিতে পাই।

মাৎসুশিমা হইতে আসিবার সময়ে জাহাজে দুইটি বালকের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। উহারা "ব্যাঙ্ক অফ্ জাপানে"র গবর্ণর শ্রীযুক্ত ভাইকাউণ্ট মিশিমার পুত্র। টোকিওতে সম্ভ্রান্ত ধণীবংশীয় সন্তানগণের জন্য Peers' School আছে। ইহারা সেই বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে। ইংরাজি বলিতে পারে মন্দ নয়। কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম গ্রীষ্মাবকাশে ইহারা হোক্কাইদো বেড়াইতে আসিয়াছে। সঙ্গে একজন অভিভাবক আছেন। আমাদের হোটেলেই ইহারা অতিথি হইল। বাহিরে যাইবার সময় কাপড় চোপড় পাশ্চাত্য ধরণের থাকে—কিন্তু সদাসর্ব্বদা জাপানী পোষাকেই ইহাদিগকে দেখিতেছি।

ইয়োরামেরিকার লোকেরা জাপানীদিগকে আফিসী পোষাকে দেখিয়া ভাবে যে জাপান পুরাপুরি পাশ্চাত্য জীবন অবলম্বন করিয়াছে। সত্য কথা জাপানীরা স্বদেশী কোন জিনিষই বিন্দুমাত্র ছাড়ে নাই। আমাদের দেশে উকিল, হাকিম, মাষ্টার, কেরাণী ইত্যাদি শ্রেণীর লোক কর্ম্মক্ষেত্রে যাইবার সময়ে কোট প্যাণ্ট চাপকান ইত্যাদি ব্যবহার করেন। এইমাত্র দেখিয়া বিদেশীয়েরা যদি ভাবেন যে ভারতবর্ষ Occidentalised হইয়া গিয়াছে তাহা হইলে ভারতবর্ষকে তাঁহারা যতটুকু বুঝিবেন তাঁহারা জাপানকে মাত্র ততটুকুই বুঝিয়াছেন।

এখানকার বোটানিক্যাল উদ্যানের ভিতর একটা মিউজিয়াম আছে। পক্ষীকুলের সংগ্রহ মন্দ নয়। জাপানের আদিম নিবাসী আইনোদিগের পোষাক পরিচ্ছদ, অস্ত্র শস্ত্র, ভল্লুক-পূজা, কৃষিশিল্প ইত্যাদি বিষয়ক নিদর্শন দেখিতে পাইলাম। অল্প সংখ্যক আইনো আজকাল হোক্কাইদোর এক নিভৃত পল্লীতে বাস করিতেছে। অতদূর যাইবার সময় করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

জাপানীদের স্বভাব চরিত্র অতিশয় মধুর। উচ্চ মধ্যম নিম্ন নানা শ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে আসিলাম—প্রত্যেককে নম্র ও বিনীত দেখিতেছি। পূর্ব্বে ভাবিয়া ছিলাম—"ফার্ষ্ট ক্লাশ পাওয়ারে"র নরনারীগণ অহঙ্কারী হইবে। কিন্তু সর্ব্বত্রই জাপানীদের ব্যবহারে অত্যন্ত আনন্দ পাইতেছি। বলা বাহুল্য যথেষ্ট বিস্মিতও হইলাম।

আগে ভাবিতাম জাপানীরা হাসে না—সর্ব্বদা মুখ লম্বা করিয়া বেরসিক ভাবে চলা ফেরা করে। অথচ জাপানে পদার্পণ করার পর হইতে দেখিতেছি এমন হাস্যপ্রিয় মধুরভাষী সুরসিক লোকজন খুব কমই আছে। ইহাদের ভাষা বুঝিতেছি না—তথাপি ইহাদিগকে আপনার মনে হইতেছে। ইহারা পরকে অতি শীঘ্র আপনার করিয়া লইতে পারে। শ্বেতাঙ্গ ইয়োরামেরিকানেরা জাপানে এতটা আত্মীয়তা ও সৌহার্দ্দ্য অনুভব করে কি না জানি না।

আমি ত দেখিতেছি জাপান ভারতবর্ষেরই যেন অন্যতম প্রদেশমাত্র। বাঙ্গালী মারাঠার ভাষা বুঝে না—তথাপি মারাঠাকে সকল বিষয়েই নিজের লোক বলিয়াই জানে। পুণার রাস্তায় দাঁড়াইয়া মারাঠীভাষী নর নারীকে যেরূপ দেখিতাম টোকিও নিক্কোমাৎসুশিমা-স্থাপ্পরোর রাস্তায় হোটেলে বাজারে জাপানী নরনারীকে দেখিয়া ঠিক সেইরূপ ভাবই মনে জাগিতেছে। ভাষার প্রভেদ সত্ত্বেও এশিয়ার হৃদয়ে ঐক্য অতি গূঢ়ভাবে রহিয়াছে। জাপানে এ কথাটা সত্যভাবে বুঝিলাম।

আদবকায়দা সৌজন্য শিষ্টাচার ইত্যাদি বিষয়ে আমরা মুসলমান জাতিকে জগৎপ্রসিদ্ধ বলিয়া জানি। জাপানীদের শিষ্টাচারের রীতি দেখিয়াও মুগ্ধ হইতেছি। পাশ্চাত্য লোকেরা কথায় কথায় Thank you ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে। কিন্তু এই শব্দের ভিতরে প্রাণ থাকে কি না বলা কঠিন। জাপানীরা সমস্ত শরীর ও মস্তক অবনত করিয়া অতিথির অভ্যর্থনা করে—অথচ এই বিনয়ের ভিতর বিন্দুমাত্র নীচতা ও দৈন্য প্রকাশিত হয় না। নম্রতার সঙ্গে আত্মসম্মানের সংযোগ

বানর-ত্রয়

মাৎসুসিমায় পার্কহোটেল

INDIA PRESS, Calcutta.
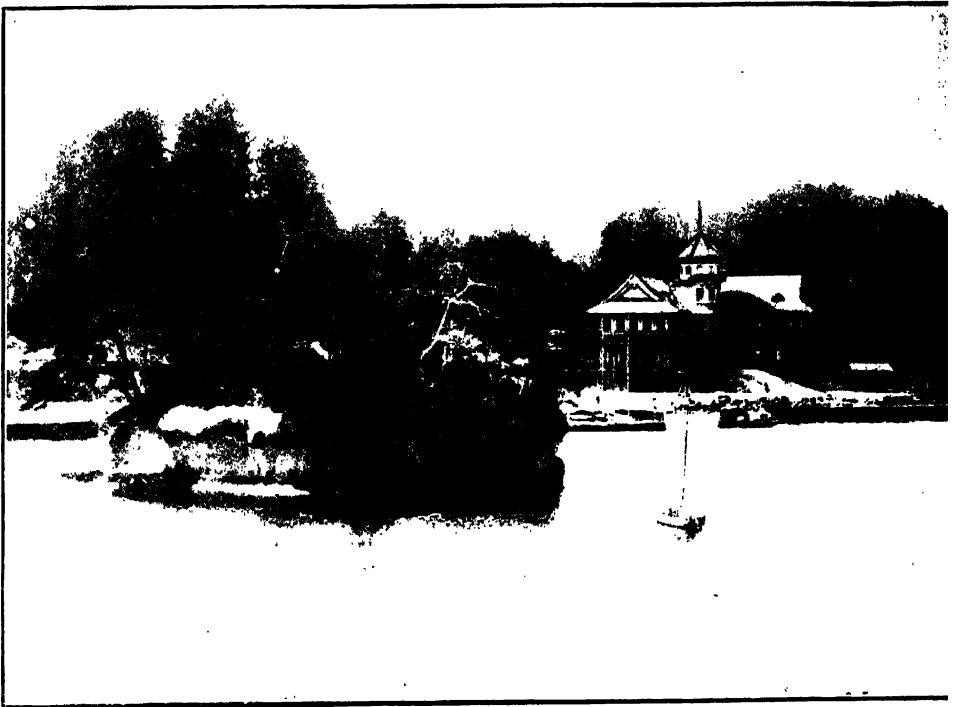
জাপানী চরিত্রের একটা বিশেষত্ব। ইহা বর্ত্তমান "মেজি-যুগের" নূতন সৃষ্টি নয়—হাজার বর্ষব্যাপী এশিয়াটিক সংস্কারের ও অভ্যাসের ফল।

৯। স্যাপ্পরোর কৃষি-মহাবিদ্যালয়

চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইয়াঙ্কিস্থানের মধ্য-পশ্চিম এবং মহা পশ্চিম প্রদেশে জনপদ ও নগর স্থাপিত হইতেছিল। প্রায় সেই সময়েই হোক্কাইদো দ্বীপে নব্য জাপানী উপ-নিবেশ স্থাপনের সুত্রপাত হয়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে মেজি-যুগ প্রবর্ত্তিত হইবামাত্র জাপানের সর্ব্বত্র নূতন নূতন কর্ম্মপ্রণালী আরব্ধ হয়। হোক্কাইদো দ্বীপের উন্নতি বিধানের জন্যও মিকাডো স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করেন। আজ এখানে যাহা কিছু দেখিতেছি সকলই গবর্মেণ্ট-প্রবর্ত্তিত সেই স্বতন্ত্র আয়োজনের ফল।

সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিলে কত কম সময়ে কত বেশী কাজ হইতে পারে তাহা বুঝিবার জন্য জাপানে আসা আবশ্যক। আবার জাপানের মধ্যে হোক্কাইদো দ্বীপও তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

সম্রাট্ প্রথমে এখানে একজন শাসনকর্ত্তা পাঠাইলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন এদেশ অতিশয় উর্ব্বর এবং ধাতুর আধার। কিন্তু কৃষিকার্য্য, পশুপালন অথবা আকর-খনন ইত্যাদি কার্য্য চালাইবার উপযুক্ত লোকের অভাব। স্থানীয় লোকের দ্বারা এই সব করান অসম্ভব—অধিকন্তু জাপানের প্রধান দ্বীপেও তখন এই ধরণের লোক পাওয়া যাইত না। কাজেই শাসনকর্ত্তা বিদেশের শরণাপন্ন হইলেন। জাপানীরা সেই সময়ে ইয়াঙ্কিস্থানকে প্রধান গুরুরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিল। বিশেষতঃ তখন সেদেশেও নব নব জনপদ গঠনের যুগ চলিতেছিল। এই জন্য হোক্কাইদোর শাসনকর্ত্তা উপনিবেশ স্থাপনের প্রণালী বুঝিবার জন্য আমেরিকা গমন করি-লেন। ফিরিবার সময়ে কয়েকজন ইয়াঙ্কি ওস্তাদ সঙ্গে লইয়া আসিলেন। দশ বৎসরের ভিতরে এইরূপে প্রায় ৭০ জন বিদেশীয় ওস্তাদ হোক্কাইদোতে আগমন করেন। জার্ম্মাণ, রুশ, ফরাসী, ইংরাজ, ইয়াঙ্কি সকল জাতি হইতেই বিশেষজ্ঞের আমদানি হইয়াছে।

এই সকল ওস্তাদ হোক্কাইদোতে জাপানী উপনিবেশ গঠনের পথ উন্মুক্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রধান ও প্রথম কার্য্য হইল বিদ্যালয় স্থাপন। এই বিদ্যালয়ে নূতন দেশে বসতি প্রতিষ্ঠা এবং ভূমি খনন ও কৃষিকর্ম্ম ইত্যাদি বিষয়ে আধুনিকতম জ্ঞান প্রচারিত হইতে থাকিল। বিশটি ছাত্র এবং একজন ইয়াঙ্কি অধ্যাপক লইয়া এই বিদ্যা-লয়টি স্থাপিত হয়। আজ এখানে বিরাট মহাবিদ্যালয় দেখিতেছি—৯০০ ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে, সহকারী ও কর্ম্মচারী লইয়া এক-শত অধ্যাপক আছেন—ইহাঁদের মধ্যে মাত্র একজন বিদেশীয়। উদ্ভিদ্, ধাতু এবং জীব-জন্তু সম্বন্ধে সকল প্রকার কার্য্যকরী বিদ্যার আলোচনা এইখানে হইয়া থাকে। এখান-কার অধ্যাপকগণ দুনিয়ার বিজ্ঞানমহলে সুপরিচিত। আমরা জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্ল চন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণা লইয়া যত বড়াই করিয়া থাকি সেইরূপ বড়াই অনেক বিজ্ঞানবীর সম্বন্ধে স্যাপ্পরোবাসিগণ করিতে অধিকারী।

উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মিয়াবে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তার আসা গ্রে (Asa Gray) র ছাত্র ছিলেন। স্যাপ্পরোতে কর্ম্মগ্রহণ করিবার পর হইতে নানা স্বাধীন গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। ল্যাবরেটরিতে ইহাঁর সঙ্গে আলাপ হইল। সম্প্রতি ইনি যে কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাহার উপকরণ-গুলি দেখিলাম। হোক্কাইদো দ্বীপের উদ্ভিদ্-সমূহ বৈজ্ঞানিক রীতিতে বিবৃত হইতেছে। Hooker প্রণীত Flora of India যেরূপ মিয়াবে প্রণীত গ্রন্থও সেইরূপ হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"উদ্ভিদের যে সমুদয় নমুনা দেখিতেছি সেগুলি সবই কি আপনি একাকী সংগ্রহ করিয়াছেন?" বৈজ্ঞানিক বলিলেন—"আমার মত আরও ২০।২২ জন সংগ্রাহকের সমবেত চেষ্টার ফল এইখানে সঞ্চিত রহিয়াছে। ২৫ বৎসর হইতে এই সংগ্রহকার্য্য চলিতেছে। কোন কোন উপকরণ বিদেশীয় পণ্ডিতগণের সংগ্রহ হইতে বিনিময়ে পাইয়াছি।"

কৃষি মহাবিদ্যালয়ের পাঠাগারে ইংরাজী,

জার্ম্মাণ, ফরাসী এবং জাপানী সকল প্রকার গ্রন্থ রক্ষিত হইয়াছে। লাইব্রেরিয়ান শ্রীযুক্ত তাকাওকা জার্ম্মাণ ভাষায় সুপণ্ডিত। ইনি জাপানী ও জার্ম্মাণ দুই ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন—ইংরাজীতেও কথা বলেন। ইনি বলিলেন—"আমাদের ছাত্রেরা প্রত্যেকে ইংরাজী, জার্ম্মাণ ও ফরাসী ভাষা শিখিয়া থাকে—তিন ভাষাতেই বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকে। অধ্যাপকগণ একমাত্র জাপানী ভাষায় বক্তৃতা করেন।" তাকাওকা Agricultural Economics বিষয়ে শিক্ষকতা করেন। ইনি লাইব্রেরীতে রক্ষিত ইয়োরামেরিকার পত্রিকাসমূহ দেখাইলেন। একমাত্র ধনবিজ্ঞান সম্পর্কিত বিদ্যাসমূহ আলোচনা করিবার জন্য জাপানী পত্রিকাও আছে। আমেরিকান, ইংরাজ, জার্ম্মাণ ও ফরাসী পণ্ডিতগণের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ প্রায় সবই জাপানীতে অনূদিত হইয়াছে। এখানকার লাইব্রেরী আমেরিকার প্রণালীতে সাজান। তাকাওকার সঙ্গে বিদ্যালয়ের কৃষিক্ষেত্র ও পাশুশালাগুলি দেখিলাম।

অধ্যাপক স্যাতো কয়েক বৎসর হইতে এই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা করিতেছেন। ইনি বলিলেন—"বার্ষিক ১॥০ লক্ষ টাকা অধ্যাপকগণের বেতনাদিতে খরচ হয়। আর দেড় লক্ষ টাকা বিদ্যালয়ের সম্পর্কিত পশুশালা ও কৃষিক্ষেত্র ইত্যাদিতে খরচ হয়। খরচের অর্দ্ধাংশ গবর্মেণ্ট হইতে পাওয়া যায়, অপরার্দ্ধ আবাদ হইতে আসে।"

বর্ত্তমানযুগে দুনিয়ার লোকেরা যে সকল সমস্যার মীমাংসা করিতেছে সেই সকল সমস্যার আলোচনায় যে জাতি যোগ দিতে পারিবে তাহাকেই বর্ত্তমান যুগের জাতি বলা যাইতে পারে, আর যে পারিবে না তাহাকে আধুনিক পদবাচ্য করা চলে না। এই হিসাবে ভারতবাসীকে আধুনিক বা বর্ত্তমান যুগের জীব বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। ত্রিশ কোটি নরনারীর মধ্যে আমরা কয় হাজার বা কয়শত বা কয় ডজন বা কয়গণ্ডা লোকের নাম করিতে পারি যাঁহারা বর্ত্তমান যুগের কর্ম্মপ্রবাহে ও চিন্তাপ্রবাহে গা ঢালিয়াছেন? কয়জন ভারতবাসীর চিন্তা ও কর্ম্মের সংবাদ লইয়া জগতের চিন্তাবীর ও কর্ম্মবীরেরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে অগ্রসর হন? বস্তুতঃ ভারতবর্ষ নামক একটা দেশ আছে কি না তাহা জানা না থাকিলেও বর্ত্তমান বিজ্ঞানবীরগণের কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু জাপান সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না। জাপানের লোকেরা বর্ত্তমান যুগের সকল আন্দোলনেই যোগ দিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্ভাবিত সত্যগুলির তালিকা করিলে বেশ বুঝিতে পারি যে, নব্য জাপান বর্ত্তমান জগতেরই একটা দেশ। অবশ্য জাপানের আবিষ্কারসমূহ বিজ্ঞান-সংসারের বিপ্লবসাধন করিবার উপযুক্ত কি না জানি না। কিন্তু এই পর্য্যন্ত বুঝা যায় যে, এখানকার অনুসন্ধানকারিগণ যেসমুদয় গবেষণা করিতেছেন সেগুলি দুনিয়ার অন্যান্য গবেষণাকারিগণ একবার খতাইয়া দেখিতে চেষ্টা করেন। জাপানীরা সত্য সত্যই আধুনিক বিজ্ঞান-মণ্ডলের অধিবাসী—ভারতবর্ষের লোক সেই উচ্চ অধিকার কবে লাভ করিবে?

বর্ত্তমান যুগের জীব হওয়া কাহাকে বলে তাহা বুঝাইবার জন্য একজন জাপানী বৈজ্ঞানিকের একটা প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। টোকিও ইম্পিরিয়্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের Journal of the College of Science পত্রিকায় A study of the Geniculæ of Corallinæ রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখক এই আলোচনার ইতিহাস জ্ঞাপন করিতেছেন। ইয়োরামেরিকার বৈজ্ঞানিকেরা এই বিষয়ে যতদূর অগ্রসর হইয়াছেন তাহার সঙ্গে জাপানী অনুসন্ধানকারীর যোগ কোথায় এই উদ্ধৃত অংশ হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

"As far as the present writer's observation extends, the literature relating to the subject in question is comparatively scarce. Nelson and Duncan jointly tried some investigations into the histology of the calcarasus algæ and left a valuable paper. Solus treated somewhat the same subject and wrote a few lines about the

formation of the genicula in the *Corallinoe*, and pointed out the difference between *Amphiroa* and *Corallina* in the structure of genicula. Heydrich noticed the critical points of the primary incrustation of *Corallina* and *Lithothamnion.* He took *Corallina officinalis L*, as the representative of the *Corallinæ* and mentioned the genicular formation as an important diverging point of the two subfamilies.

The writer previously noticed several interesting facts about the geniculæ of the *Corallina* while he was examining material from Japan and Canada. Some of the views arrived at a different conclusion from those of former investigators. They will be pointed out under the proper chapters."

যেদিন ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ অন্যান্য দেশীয় চিন্তাবীরগণের কর্ম্মসূত্র বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইবেন, এবং যেদিন ভারতীয় চিন্তাবীরগণের গবেষণা খতাইয়া না দেখিলে জগতের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ অসম্পূর্ণ থাকিবেন সেই দিন বুঝিব ভারতবর্ষ বর্ত্তমান জগতের দেশ। সেদিন কবে আসিবে? জাপানে সেই দিনের আবির্ভাব হইতে মাত্র ত্রিশ বৎসর লাগিয়াছে। সেই দিন আনিবার একমাত্র উপায়—"সংরক্ষণনীতির" প্রয়োগ।

১০। মৎস্যবিজ্ঞান ও সামুদ্রিক উদ্ভিদের চাষ

সাধারণ জাপানী পরিবারে মাংস খাওয়ার অভ্যাস এখনও বিশেষ প্রবল নয়। যাহারা মাংস খায় তাহারা পাখী পর্য্যন্ত উঠে। গোশূকরাদি নিতান্ত নব্য ইয়োরামেরিকা-প্রত্যাগত পরিবারে খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে জাপানীরা বাঙ্গালীর অনুরূপ। তবে কাঁচা মাছ খাইবার রেওয়াজ বঙ্গদেশে নাই—এই যা প্রভেদ। মাছের ঝোল, মাছ ভাজা, শুঁটকি মাছ ইত্যাদি দুই সমাজেরই সমান প্রিয়। একটা মজার কথা দেখিতেছি যে বাঙ্গালীদের মত জাপানীরাও রুই মাছের অত্যন্ত ভক্ত। বড় বড় মহোৎসব ব্যাপারে নাকি রুই মাছের আয়োজন না থাকিলে ষোলকলা পূর্ণ হয় না।

জাপানে আসিয়া অবধি একটা নূতন খাদ্য দ্রব্যের পরিচয় পাইতেছি। তাহার নাম Sea-weeds বা সামুদ্রিক উদ্ভিদ্। বাজারে এই উদ্ভিদের বিক্রয় যৎপরোনাস্তি দেখিতেছি। দোকানে শুষ্ক আকারে এই উদ্ভিদের বিক্রয় প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। জাপানের স্বদেশী হোটেলে বা সরাইয়ে এবং মিঠাইয়ের দোকানে Sea-weeds এর প্রস্তুত নানা দ্রব্য পাওয়া যায়। ইয়োরামেরিকার কোথাও এই উদ্ভিদের এরূপ ব্যবহার বোধ হয় নাই। জাপানীরা এই বস্তু খাইতে খুব ভালবাসে—ঝালে ঝোলে অম্বলে মিষ্টান্নে প্রত্যেক খাদ্য দ্রব্যেই ইহার প্রয়োগ হয়। অধিকন্তু এই উদ্ভিদের ব্যবসায় হইতে জাপানে বহুল পরিমাণে টাকা উৎপন্ন হয়। চীনারা জাপানীদের মতই এই উদ্ভিদের ব্যবহার করিয়া থাকে—জাপান হইতে তাহারা এইগুলি মণে মণে আমদানি করে।

সাপ্পরো কলেজে দেখিতেছি—সামুদ্রিক উদ্ভিদ সম্বন্ধে জ্ঞান প্রচার করিবার জন্য একজন অধ্যাপক স্বতন্ত্রভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার নাম য়েণ্ডো (Yendo)। সামুদ্রিক জীবজন্তু সম্বন্ধে গবেষণা করা ইঁহার বিশেষত্ব—মাছ এবং উদ্ভিদ দুই প্রকার জীব ইঁহার আলোচ্য বিষয়। Marine Botany, Fishery, Sea weeds ইত্যাদি বিষয়ে য়েণ্ডো বহুকালাবধি শিক্ষকতা করিতেছেন। বলা বাহুল্য এই সকল বিদ্যার নাম পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে শুনা যায় না।

য়েণ্ডো ইংরাজীতে বেশ কথা বলেন—জার্ম্মাণ ভাষায়ও সুপণ্ডিত। মৎস্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে একখানা বিরাট গ্রন্থ জাপানী ভাষায় লিখিয়াছেন। ইঁহার গবেষণাসমূহ ফরাসী, ইংরাজী, আমেরিকান ইত্যাদি বিদেশীয়

বৈজ্ঞানিক পত্রে বাহির হইয়া থাকে। অন্যান্য জাপানী পণ্ডিতের ন্যায় ইনিও আমেরিকা, জার্ম্মাণি, বিলাত ইত্যাদি দেশ ঘুরিয়া আসিয়াছেন। বিশেষ কথা এই যে, য়েণ্ডো প্রায় আড়াই বৎসর কাল নরওয়েতে ছিলেন। এইখানে সামুদ্রিক উদ্ভিদ্ আলোচনা করিবার ব্যবস্থা নাকি উৎকৃষ্ট।

য়্যাণ্ডো বলিলেন—"জাপানীরা এই উদ্ভিদের ব্যবসায় করিয়া চীন হইতে বৎসরে ৪,৫০০,-০০০৲ রোজগার করে। সর্ব্বসমেত ইহার প্রায় আড়াইগুণ টাকার কারবার জাপানে চলিতেছে। কাজেই Sea-weeds আমাদের নিকট তুচ্ছ খেলানার সামগ্রী নয়।"

ইহাঁর গৃহে একবার আলাপ হইল—স্বদেশী পোষাক আসবাব ইত্যাদিই দেখিলাম—কলেজেও একবার দেখা হইল—তখনও কিওমনো পরা দেখা গেল।

সামুদ্রিক উদ্ভিদের জন্ম, ক্রমবিকাশ ও বিস্তার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে আপনাদের ব্যবসায় একদিন না একদিন বন্ধ হইয়া যাইবে না কি? কারণ উদ্ভিদ্‌সমূহের জোগান ত সমুদ্রে অফুরন্ত নয়।" য়েণ্ডো বলিলেন—"সত্যই তাহা ঘটিয়াছে। বিগত ৪০ বৎসরের ভিতর আমাদের Sea-weed ব্যবসায়ীরা অত্যধিক "ফসল" টানিয়া তুলিয়াছে। তাহার ফলে সমুদ্রে ক্রমশঃ উদ্ভিদের অনটন পড়িতে থাকিল। কাজেই এই আবাদের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক আলোচনা সুরু হইয়াছে।"

আজকাল ফলের চাষ, মাছের চাষ, ডিমের চাষ—ইত্যাদি নানাবিধ চাষের কথা শুনা যায়। কৃষিকর্ম্ম বলিলে একমাত্র ধান চাউল গম যবের আবাদই বুঝায় না। জাপানে আসিয়া মুক্তার চাষও শুনিয়াছি। য়েণ্ডোর নিকট সামুদ্রিক উদ্ভিদের আবাদও শুনিলাম। বর্ত্তমান যুগের মানব প্রাকৃতিক শক্তি ও সুযোগসমূহের দাস হইয়া থাকিতে চাহে না। পূর্ব্বেও মানবসমাজ প্রকৃতির দাস ছিল না। এই জন্যই কৃষিকর্ম্ম ইত্যাদি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানকালে মানব-বিদ্যার যথেষ্ট প্রসার ও বিস্তৃতি সাধিত হইয়াছে—এইজন্য চাষ আবাদের ক্ষেত্রও বাড়িয়া যাইতেছে। প্রকৃতি যদি মুক্তহস্তে দান করিতে থাকেন—তাহাতে মানুষের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু মানুষ প্রকৃতির খেয়ালের উপর নির্ভর করিবে না। প্রকৃতির স্বভাব অবগত হইয়া সেগুলিকে নিজ ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুসারে কাজে লাগাইবার জন্য মানুষ নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেছে। এই সকল উপায়, নিয়ম ও কার্য্যপ্রণালীর উদ্ভাবনই বিজ্ঞানের কার্য্য।

য়েণ্ডো বলিলেন "আমি গত বৎসর আয়র্ল্যাণ্ডে গিয়াছিলাম। সেখানে ডাব্‌লিনের রয়্যাল সোসাইটিতে সামুদ্রিক উদ্ভিদের চাষ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিই। এই বক্তৃতার নাম শুনিয়াই অনেকে বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিস্মিত হইবার কারণ নাই। নদীর মাছ ও সমুদ্রের মাছ সম্বন্ধে যদি নিয়ম আবিষ্কার করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ ধীবরদিগকে কর্ম্মপ্রণালী শিখাইতে পারেন তাহা হইলে Sea-weeds এর "cultivation" সম্বন্ধেও সেইরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইতে পারিবে না কেন?" এই সামুদ্রিক আবাদকে Mariculture বলা হইতেছে।

কয়েক বৎসর হইল সামুদ্রিক উদ্ভিদের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। জাপান গবর্ণমেণ্ট য়েণ্ডোকে বিষয়টা বুঝিবার জন্য যথাস্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। য়েণ্ডো তদারক করিয়া মন্তব্য প্রচার করেন। মন্তব্য কার্য্যে পরিণত হইয়াছে।

বলা বাহুল্য, সকল সমুদ্রেই উদ্ভিদ জন্মে না। সমুদ্রের অভ্যন্তরস্থিত পর্ব্বতগাত্রের প্রকৃতির উপর ইহাদের জন্ম ও ক্রমবিকাশ নির্ভর করে। এতদ্ব্যতীত সমুদ্রজলের গভীরতা, উষ্ণতা, তরঙ্গ, স্রোত ইত্যাদিও সামুদ্রিক উদ্ভিদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। জলের মধ্যে লবণের পরিমাণও এই জীবের অনুকূল হওয়া আবশ্যক। অধিকন্তু জলের ভিতর সূর্য্যকিরণ এবং বায়ু প্রবেশ না করিলে Sea-weeds জীবিত থাকিতে পারে না। কাজেই অত্যন্ত গভীর জলপ্রদেশ সামুদ্রিক উদ্ভিদের জন্মনিকেতন হয় না।

এই সম্বন্ধে The Economic Proceedings of the Royal Dublin Society হইতে "On the Cultivation of Sea-weeds with special accounts of their Ecology" প্রবন্ধের স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"How far down in the water Sea-weeds can grow is a question not easily decided. * * * Various experiments have been carried out to ascertain the limit of Sun-Light in deep water. It is estimated that at the depth of about 500 fathoms there is absolute darkness. * * * From my own experience I have found that the amount of illumination during broad day light, penetrating to a depth of 12-13 fathoms, may be compared to clear moonlight.

*　　　*　　　*

Each species of algæ is adapted to enjoy a certain fixed amount of light. Some algologists attribute this phenomenon to the colour of the water. But I think I can give many examples to disprove this view. * * * The light acts upon Sea-weeds something in the same way as upon landplant. In the shaded place they may grow larger in size, but weaker in texture, and mostly poor in the chlorophyll grains."

য়েণ্ডো কিছুকাল বিলাতের প্রসিদ্ধ Kew Botanic Garden এ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করিয়াছেন। ইনি বলিলেন—"প্রায় ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে জাপান হইতে বহু উদ্ভিদের নমুনা বিলাতের পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক নীত হয়। আমি সেগুলি এখানে দেখিবামাত্র গবেষণা আরম্ভ করিয়া দিলাম। কতকগুলি উদ্ভিদের বিবরণে কিছু অসম্পূর্ণতা ও ভুল ছিল সেগুলি সংশোধন করিতে পারিয়াছি।"

কৃষিবিদ্যালয়ের Fishery Museum বা মৎস্য-ভবন দেখাইতে দেখাইতে য়েণ্ডো বলিলেন—"মৎস্য-বিজ্ঞান প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত—এই তিন বিভাগের সংগৃহীত বস্তু এই প্রদর্শনী গৃহে রহিয়াছে। প্রথম বিভাগের নাম মাছ ধরা, দ্বিতীয় বিভাগের নাম মৎস্য-পালন বা মাছের চাষ, তৃতীয় বিভাগের নাম মৎস্য-শিল্প। এই তিন বিষয়েই আমাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রচার করা হয়।"

মাছ ধরিবার ছিপ, বড়সি, জাল হইতে নৌকা, জাহাজ ইত্যাদি পর্য্যন্ত সকল বস্তুই এখানে দেখিলাম। ভিন্ন ভিন্ন মাছের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরণের জাল, জালপাতা এবং অন্যান্য যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এই সমুদয় প্রস্তুত করিবার প্রণালীও প্রদর্শিত হইয়াছে। ছবি, ফটোগ্রাফ ইত্যাদির সাহায্যেও বিষয়টা স্পষ্টভাবে বুঝা গেল। মৎস্য পালনের জন্য কিরূপ পুষ্করিণী খনন করিতে হয় তাহার একটা নমুনা এখানে আছে। ডিমের আকৃতি পরিবর্ত্তন, মাছের রং খোলা ইত্যাদির ক্রমবিকাশ এবং মৎস্য-জীবনের অন্যান্য বহু তথ্য মিউজিয়ামে বুঝিতে পারিলাম। Oceanography বা সমুদ্র-বিজ্ঞানবিষয়ক নানা কল যন্ত্র ও হাতিয়ার এই গৃহের ভিতর আছে। পূর্ব্বে এগুলি কখনও দেখি নাই। শুনিলাম জাপানীরাও ইয়োরামেরিকানদের মত কয়েকটা যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। মাছের চামড়া, অস্থি ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া যে সমুদয় দ্রব্য প্রস্তুত করা যায় তাহার নমুনা এখানে অনেক দেখিলাম। সামুদ্রিক উদ্ভিদের সংগ্রহও যৎপরোনাস্তি।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

মফঃস্বলের বাণী

বঙ্গের নব শিল্পজাগরণ ও স্বদেশী ব্রত

প্রত্যেক মানুষ, প্রত্যেক জাতির হৃদয়ে একটা আশা, একটা আকাঙ্ক্ষা, একটা-আদর্শ বা লক্ষ্য না থাকিলে তাহার প্রকৃত উন্নতি অসম্ভব। যাহার জীবনে কোন লক্ষ্য নাই, সে কর্ণধারহীন তরণির মত সংসার-সমুদ্রে ভাসিয়া বেড়ায়—তরঙ্গে তরঙ্গে-তটভূমিতে আহত হইয়া তাহার নিরর্থক-জীবনের অবসান হয়। আমরা এইরূপেই ভাসিয়া চলিয়াছিলাম; পরানুগ্রহ-পবনে আত্ম-সমর্পণ করিয়া পরের চাকুরীতে জীবনের সকল শক্তি সঁপিয়া দিয়া, সংসারসমুদ্রে গা ঢালিয়া দিয়াছিলাম। লক্ষ লক্ষ পশুপক্ষী চরিতেছে, উড়িতেছে, পড়িতেছে, মরিতেছে, আমরাও সেইরূপ পোড়া পেটের জন্য চারিদিকে ছুটিতেছিলাম, উঠিতেছিলাম, পড়িতেছিলাম, মরিতেছিলাম—আত্মসম্মান-বোধ, জাতীয়-গৌরব-জ্ঞান, জাতীয় অস্তিত্ব ও বিশেষত্ব তোষামোদির অতলজলে বিসর্জ্জন দিয়া, পরপদলেহনে মত্ত ছিলাম। হঠাৎ কাহার যেন করসঞ্চালনে, কাহার যেন ইঙ্গিতে, আমাদের স্নেহের বন্ধন ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল, সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি দ্বিধা বিভক্ত হইল, আমাদের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া দেখি, ঊর্দ্ধে গগনমণ্ডল এক মহাশক্তির জ্যোতিচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়াছে—যেন এক দেবীপ্রতিমা অঙ্গুলিসঙ্কেতে আমাদিগকে বলিতেছেন —"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত! লক্ষ লক্ষ বঙ্গের সন্তান! তোমরা সকলেই গড্ডলিকাপ্রবাহের ন্যায় দাসত্বের পঙ্কিল-পল্বলে ছুটিয়া চলিয়াছ—ইহাতে কখনও পিপাসার তৃপ্তি হয় না; ঐ দেখ শিল্প-বাণিজ্যের নির্ম্মল সরোবরে কত কুমুদ-কহ্লার-ফুটিয়া রহিয়াছে, বিদেশীয় বণিক্‌গণ রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমির ধূলিকণাও সংগ্রহ করিয়া তোমাদেরই নিকটে রূপান্তরে বিক্রয় করিতেছেন, আর তোমরা শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, রাজসেবা—জীবিকানির্ব্বাহের এতপথ থাকিতে শুধু পরসেবাকেই জীবনের একমাত্র অবলম্বনীয় বলিয়া মনে করিয়াছ; তোমাদের আশা কোথায়? বাঙ্গালী! যদি বাঁচিতে চাও, ভাগীরথীর ন্যায় সহস্র ধারায় জীবনসমুদ্রের দিকে ছুটিয়া যাও; আত্মপ্রত্যয়, আত্মনির্ভর আন; পরপ্রসাদভুক্ কুক্কুরের বৃত্তি যথা-সম্ভব পরিহার করিয়া, পরের অনুগ্রহে পদাঘাত করিয়া, আপনার পায়ে দাঁড়াইতে চেষ্টা কর, আপনার শিল্প, আপনার বাণিজ্য আপনি রক্ষা করিবার জন্য উৎসুক হও; তোমাদের বাগানে নব নব ফুল ফুটিয়া উঠুক, লক্ষ্মীর শূন্য মন্দিরে লক্ষ্মী প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হউক।"—কি যেন এক উদ্দীপনার স্রোত বহিয়া গেল, কাহার যেন মোহন-মুরলী পঞ্চমে তান ধরিল—বাঙ্গালী তন্ময় হইয়া ক্ষণেকের তরে স্থূল স্বার্থ ভুলিয়া স্বদেশীব্রত গ্রহণ করিল, বঙ্গে শিল্পের বীজ উপ্ত হইল। দেখিতে দেখিতে কত নূতন কল কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইল, বাঙ্গালার শিল্পোদ্যানে কত নূতন ফুল ফুটিতে আরম্ভ করিল, কত লোকের জীবিকার সংস্থান হইল। এই শিল্পের নব জাগরণে এই শিশুশিল্পকে কত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিতে হইয়াছে, কত বার পড়িতে হইয়াছে, বাঙ্গালী হৃদয়ের রক্ত দিয়া ইহাকে মানুষ করিতেছিল। বাঙ্গালী প্রতি শরতে একদিন অনশনে থাকিয়া মহামায়ার নিকটে এই শিশুশিল্পের মঙ্গল কামনা করিয়াছে।

কিন্তু অকস্মাৎ ছিন্ন বঙ্গ যুক্ত হইল, বাঙ্গালী সেই আনন্দে আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, বাঙ্গালীর সাধের শিল্প আজ অনাদরে ধূলি-বিলুণ্ঠিত! সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষরাক্ষসী বঙ্গের রক্ত শোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে—আজ বাঙ্গালী শক্তিহীন, অসহায়, দুর্ব্বল! বাঙ্গালী! আজ তুমি উত্থানশক্তি-হীন হইলেও যাহাকে বুকের রক্ত দিয়া মানুষ করিয়াছ, তোমার সেই শিশু সন্তান আজ ধূলিধূসরিত—উত্থানশক্তিশূন্য হইলেও আজ একবার তাহার পানে ফিরিয়া চাও, একবার তাহাকে অঙ্গুলিসঙ্কেতে আহ্বান কর!

অই যে অন্নপূর্ণা আসিতেছেন! আজ যেন নিরন্নের গৃহেও অন্নের সংস্থান হয়, বিষন্নের মুখেও প্রসন্নতা ফুটিয়া উঠে—আজ বাঙালীর ঘরে ঘরে শক্তির স্রোত প্রবাহিত হউক। আজ ভাই ভাইয়ের হস্ত ধরিয়া মহাশক্তির চরণ বন্দনা করিবে। ভাই বঙ্গবাসী! আজ তুমি দুর্ব্বল হইলেও তোমার অপেক্ষা দুর্ব্বলতর ভ্রাতার হাত ধরিয়া অগ্রসর হও, তোমার দৈহিক ও মানসিক শক্তির কিয়দংশ তোমার দুর্ব্বল ভাইদের দান কর—এসো আজ, সকলে মিলিয়া মায়ের পূজা করি, কোটি কোটি বঙ্গের সন্তান শক্তির পদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করুক, দেশের দুঃখ-দারিদ্র্য-দুর্ব্বলতা ঘুচিয়া যাউক। প্রয়াগে অক্ষয় বটের নিকটে সকল যাত্রীকেই একটি করিয়া ফল ত্যাগ করিতে হয়, আজ বাঙ্গালী, আদ্যা শক্তির নিকটে বিলাস বাসনা বিসর্জ্জন দেও—ধনী স্বদেশীয় দ্রব্য সম্ভারে শারদীয় উৎসব সমাপন করুন, দরিদ্র আজ একটী পয়সার স্বদেশীয় শিল্প-কুসুম মায়ের চরণে উপহার দাও! যাহার কিছু নাই, তিনি ধান্য দূর্ব্বায় কায়মনোবাক্যে বঙ্গের শিশুশিল্পকে আশীর্ব্বাদ করুন—বঙ্গের গৃহে গৃহে মঙ্গল-বায়ু প্রবাহিত হউক।

রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম

ভগবান মনু বলিয়াছেন, ঈশ্বরের সৃষ্ট পদার্থ মধ্যে যাহাদের প্রাণ আছে তাহারা শ্রেষ্ঠ। প্রাণীর মধ্যে যাহাদিগের বুদ্ধি আছে তাহারা শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধিজীবীর মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, এবং মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। তিনি ইহাও বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণের শরীরোৎপত্তিই ধর্ম্মের শাশ্বত মূর্ত্তিমান অবস্থা এবং ইহাঁরা জন্মগ্রহণ করিয়াই জগতি তলে সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠত্বে প্রতিষ্ঠিত, ধর্ম্মসমূহ রক্ষা করেন বলিয়া সকল জীবেরই ঈশ্বরত্বে ব্রতী ও ধর্ম্মার্থে উপনীত হওয়াতেই ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া থাকেন।

ব্রাহ্মণের উৎপত্তি সকল মানবের অগ্রে হওয়া ও সাতিশয় বেদ ধারণ করেন বলিয়া তাঁহারা পৃথিবীর সকল মানবের ধর্ম্মানুশাসনের প্রভু। তাই ভগবান মনু আদেশ করিয়াছেন যে, পৃথিবীর যাবতীয় মানব এই অগ্রজন্মা মানবের নিকট হইতে বর্ণোচিত আচার ব্যবহার শিক্ষা করিবে। এই বর্ণোচিত আচার প্রতিপালন করাকেই ধর্ম্ম প্রতিপালন করা বলে।

পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়গণ, ব্রাহ্মণদিগকে, তাহাদিগের নিজের ও তাহাদিগের পরিবারবর্গের প্রতিপালনোপযোগী আবশ্যকীয় বস্তু যোগাইয়া তাঁহাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্ত ভাবে স্বীয় বর্ণোচিত আচার প্রতিপালন করিতে এবং বর্ণেতর মানবকে তাহাদিগের আপন আপন বর্ণোচিত আচার প্রতিপালন করিতে শিক্ষা প্রদান করাইয়া উন্নত করিতেন। তাই বহুকাল জগতি তলে ভারতের ক্ষত্রিয় রাজারা, তাঁহাদিগেরই শক্তির দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া সর্ব্ব বিষয়ে পূজ্য ছিলেন এবং ভারত মাতাও শ্রেষ্ঠা ছিলেন।

মানবের ধর্ম্মই বল, ধর্ম্মই সম্বল এবং জগত ধর্ম্মদ্বারাই সুরক্ষিত। এই ধর্ম্মাপেক্ষায় সার বস্তু জগতে আর কিছুই নাই। তাই, হিন্দুরা পূর্ব্বকালে ধর্ম্ম রক্ষা করাই সর্ব্বোতভাবে কর্ত্তব্য মনে করিয়া, কিসে এই ধর্ম্ম রক্ষা হয়, তাহারই চেষ্টা করিতেন।

"ধর্ম্মে নৈব জগৎ সুরক্ষিত মিদং
ধর্ম্মো ধরা ধারকা।
ধর্ম্মাৎ বস্তু নহি কিঞ্চিত দস্তি ভুবনে
ধর্ম্মায় তস্মৈ নমঃ॥"

বৌদ্ধ ও যবনেরা বুঝিয়াছিল, যতদিন এই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ভারতে প্রবল থাকিবে ততদিন, ভারতের বর্ণেতর মানব ব্রাহ্মণদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তীই থাকিবে; তাহারা কিছুতেই একাধিপত্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইবে না। তাই-তাহারা ব্রাহ্মণদিগের উপর ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিল এবং তাহারই ফলে হিন্দুর বর্ণোচিত ধর্ম্মাচরণ পদ্ধতি উঠিয়া গিয়া, ধর্ম্মাচরণের নানারূপ নূতন নূতন পদ্ধতির অবতারণা হইয়া পড়িয়াছে। যদি তৎকালে হিন্দুজাতি "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহ" ব্রাহ্মণ দিগের প্রদত্ত এই মূল মন্ত্রটি হৃদয়ে পোষণ করিয়া ধর্ম্মেতরের আশ্রয় গ্রহণে বিরত থাকিত, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের লোপের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের হিন্দুস্থান উপাধিটি লোপ পাইত না ও তাহাদিগের এত হীন অবস্থা লাভ করিতেও হইত না।

বৌদ্ধদিগের, তৎপর বৌদ্ধ ও যবনদিগের শাসনকালে তাহারা ব্রাহ্মণদিগের ও তাঁহাদিগের পৃষ্ঠপোষক ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি ভয়ানক অত্যাচার করিতে থাকায়; ক্ষত্রিয়গণ নির্জীব হইয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্মের আশ্রয় লয়। তাই, ব্রাহ্মণগণ (আপদ কালে) পেটের দায়ে বর্ণেতরের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ ও পরিবার প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করাতে ক্রমে শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছেন এবং বর্ণেতর মানবও শিক্ষার অভাবে উন্নত হইতে না পারিয়া সমগ্র হিন্দুজাতি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি, ভারতের চারিবর্ণের মানবেরই বর্ণোচিত ধর্ম্ম, কালের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। উদর পোষণের জন্য এখন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অনেকে স্বধর্ম্মচর্চ্চা ও স্বধর্ম্মানুশীলন করিতে পারিতেছেন না বলিয়াই ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রাদির নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতেছেন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদিগের দেহ, যে উপাদানে গঠিত তাহা অন্তর্হিত হয় নাই, অঙ্কুরটি এখনও সজীবই আছে, তাঁহারা, নিরুপদ্রব ও নিশ্চিন্ত হইয়া সাধনা করিতে পারিলেই, বর্ণেতর হইতে সহজে ও সকালে পূর্ব্ববৎ শক্তিশালী যে হইতে পারিবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণ শক্তিশালী না হইতে পারিলে বর্ণেতরের উন্নতির আশা করা বোধ হয় দুরাশা মাত্র। এখনও আত্মোন্নতির জন্য বর্ণেতরের অনেক হিন্দু, ব্রাহ্মণদিগের নিকটই পূর্ব্ববৎ দীক্ষা গ্রহণ করিতেছেন ও হিন্দুর নিত্য নৈমিত্তিক দৈবকার্য্যাদি তাঁহাদিগের দ্বারাই করাইয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে বর্ণেতরের মধ্যে ব্রাহ্মণই নাই বলিয়া, কেহ কেহ স্বাধীনভাবে একরূপ নূতন রকমের ধর্ম্মানুশীলন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন দেখা যায় এবং শুনাও যাইতেছে অনেকেই, তাহাদিগের পিতৃপুরুষ ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা যে সকল নিত্য নৈমিত্তিক দৈব কার্য্যাদি করাইতেন তাহা তাঁহারা নিজেই করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া দেখেন না যে, সেই সত্যকাল হইতে এ পর্য্যন্ত সমগ্র হিন্দু, আত্মোন্নতির জন্য ব্রাহ্মণের নিকট শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করিয়াই উন্নত হইয়াছিলেন এবং এখনও অনেকেই তাহাই করিতেছেন। আত্মোন্নতির শিক্ষা দীক্ষা পুথি পড়িলে হয় না, উহা গুরুর উপদেশসাপেক্ষ। চৈতন্য মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি এবং ভগবান শঙ্করাচার্য্যাদি, মহাজ্ঞানী ও পণ্ডিতাগ্রগণ্য হইয়াও, গুরুর নিকট আত্মজয়ের উপদেশ লইয়া এক একটি ধর্ম্ম-স্রোত প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন। বহুদিনের কথা নহে, এই রাজসাহীর নাটোরাধিপতি পৃথ্বীপতি মহারাজাধিরাজ রামকৃষ্ণ রায় বাহাদুর, মহারাণী ভবানী, মহারাণী শরৎসুন্দরী, রামপ্রসাদ সেন, ঋষি বৎসরাচার্য্য, সাধকশ্রেষ্ঠ পূর্ণানন্দ গিরি, ব্রহ্মানন্দ গিরি ও ভৈরবানন্দ গিরি প্রভৃতি এই হীনবীর্য্য ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতেই দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বিখ্যাত। যতই ধর্ম্মবীর দেখা যায়, তাহারা সকলেই ব্রাহ্মণ মুখে শিক্ষা দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াই আত্মোন্নতি করিয়া ছিলেন। এমন কি, অনেকে স্বীয় স্বীয় গুরু অপেক্ষাও ক্ষমতাশালী হইয়া ছিলেন।

যাহারা জগৎগুরু ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করে কি তাঁহাদিগের অস্তিত্ব অস্বীকার করে বা যাহাদের তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ হয়, তাহারা এই সকল বিষয় অগ্রে অনুসন্ধান করিয়া পরে ঐরূপ ভাবটি প্রকাশ করিলেই ভাল হয়। নতুবা ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িয়া (বটতলার ২।৪ খানা বই পড়িয়া) ব্রাহ্মণনিন্দা দেবনিন্দা করা; বেদ ও স্মৃতির নিকট পঁহুছিবার শক্তি না থাকায় বেদ স্মৃতির দোহাই দিয়া; এবং পুরাণাদির মূল অর্থ বোধ করিবার শক্তি না থাকায় তাহার মর্ম্ম উল্লেখে যা তা একটি বলা বাতুলতা মাত্র।

তাই বলি, যদি কেহ আত্মোন্নতি করিতে চাও, যদি ভগবৎ কৃপা পাইতে চাও এবং যদি ভগবানের প্রতি প্রেম ভক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা কর; ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের উন্নতিকল্পে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হও। ব্রাহ্মণদ্বারা দীক্ষিত ও শিক্ষিত হইয়া যে কার্য্যই করিবে তাহাতেই উন্নতি লাভ করিবে। অন্যথা ফল লাভ তো হবেই না; বরং অবনতি অপরিহার্য্য।
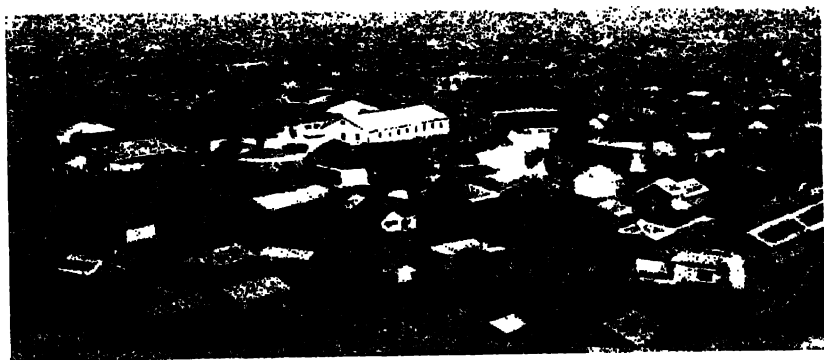
হিন্দুরঞ্জিকা

বৌদ্ধ মন্দির

ইয়োকোহামা নগর

India Press, Calcutta.

“চাহ, চাহ, মতিমান, দেখ দেখি বিশাল জগতে,
মানবের কর্ম্মধারা কত দিকে আবর্ত্তিয়া ধায়!
কত সাধ কত আশা জেগে ওঠে সাধিতে কল্যাণ!
মানুষের শক্তি লয়ে কীটসম ব্যর্থ কর তারে?
বিধাতার পুণ্যদান—দলমল হিয়া-শতদল
গন্ধ চাহে বিতরিতে, তুমি তার রুধিবে দুয়ার?
একি—একি অপমান মনুষ্যত্বে হান অবিরত!
ভুলে যাও বর্ত্তমানে, ভেঙ্গে ফেল জড়তা-শিকল
দূর ভবিষ্যতে চাহি’। ভাসে ধরা আলোক-বন্যায়-
দুয়ারে পাখীর মত, আজি তোমা ডাকি প্রাণপণে,
বাহির হবে না তুমি?”

সপ্তম খণ্ড সপ্তম বর্ষ	পৌষ, ১৩২২	তৃতীয় সংখ্যা।

আলোচনা

১। পারিপার্শ্বিক

প্রতিভা বংশগত কি না এ বিষয়ে প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতিত্বের দিনে অনেকেই সন্দেহ করেন। পিতা বা পিতামহ বা প্রপিতামহের দোষ বা গুণ সন্তানের মধ্যে বর্ত্তিবেই ইহা এখন সকলে মানিতে চাহেন না। আজ গণতন্ত্রের যুগ, জনসাধারণের যুগ, শিক্ষা, ান আজ কয়েকজন ধনাঢ্যের মধ্যে আবদ্ধ নাই—চারিদিকে সমাজের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছে। গণিতজ্ঞের পুত্র গণিতজ্ঞ হইবেন, রাজনীতিজ্ঞের পুত্র রাজনীতিজ্ঞ হইবেন, কৌটিল্যবিদের পুত্র কৌটিল্যবিৎ হইবেন—এ ধারণা এক্ষণে বদলাইয়া গিয়াছে। অতীত যুগ যখন শিক্ষা, সুসংস্কার, মানসিক উন্নতি সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ছিল, তখন প্রতিভা

বংশগত বলিয়া বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল। তখন সেই সম্প্রদায়ের (aristocratic section) মধ্য হইতেই কেবল সুমার্জ্জিত বুদ্ধি, শিক্ষিত লোকের উদ্ভব সম্ভব ছিল। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে যে, সে স্থলেও মানুষের দোষগুণ বংশ অপেক্ষা চারিপার্শ্বের অবস্থার উপরও নির্ভর করিত।

কিন্তু মনুষ্য চরিত্রের সহিত বংশের কোন সম্বন্ধ থাকুক বা না থাকুক, ইহার সহিত পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। সিংহশাবক শৃগালের সংসর্গে থাকিয়া শৃগাল-স্বভাবাপন্ন হইয়াছিল এইরূপ গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। চতুষ্পার্শ্বের আবহাওয়া অত্যন্ত সংক্রামক। ছোঁয়াচে রোগের মত উহার দোষ গুণ লোককে আক্রমণ করিয়া থাকে। মানুষের অভ্যাস, চরিত্র সামাজিক আবহাওয়ার অনুরূপ গঠিত হয়। যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে কেবলই দীনতা, হীনতা, সেখানে মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব প্রভৃতি বড় গুণগুলির বাঁচিয়া থাকা কষ্টকর। নির্জ্জীবতা, নিশ্চেষ্টতা, কাপুরুষতা যে সমাজের বিশেষত্ব, সে সমাজের মানুষ প্রচণ্ড কর্ম্মশীলতা, তেজস্বিতার পরিচয় দিতে পারে না। যেখানে আকাশে, বাতাসে নিয়তই ক্ষুদ্র, নীচ স্বার্থেরই কথা প্রতিধ্বনিত হইতেছে, সেখানে কি করিয়া উচ্চ আকাঙ্ক্ষা মহৎ কল্পনা, উন্নত ভাব উদার কর্ম্মপ্রিয়তা স্থান পাইবে?

অন্যদেশের অবস্থার সহিত আমাদের দেশের অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিলে উক্ত সত্যটী বেশ পরিস্ফুট হইবে। অন্য দেশের লোকদিগের সদভ্যাসাদি চরিত্রের কতক অংশ পারিপার্শ্বিকের সহায়তায় কেমন গড়িয়া উঠে। কিন্তু আমাদিগের আবহাওয়া একেবারে স্বতন্ত্র। ভারতবর্ষের পরিবারগুলির প্রতি দৃক্‌পাত করুন। সেস্থানে দেখিবেন—স্বার্থপরতা বাতাসকে আবিল করিয়া তুলিয়াছে; ত্যাগের কথা দূরে থাকুক, বড় স্বার্থের কথা সেখানে কখনও উঠে না; পিতা সেখানে সর্ব্বদাই সন্তানকে বাঁধিয়া, চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। একবার গুরুকুল বিদ্যালয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া জনৈক সমাজসেবক লিখিয়াছিলেন যে আশ্রম ছাত্রগণকে চরিত্রগঠনের প্রকৃষ্ট সময় বাল্যাবস্থাতেও গৃহের প্রভাব হইতে দূরে রাখেন। ইহাতে তাহাদের চরিত্র খর্ব্ব হইবার আশঙ্কা আছে। গুরুকুল সমাচার ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন বর্ত্তমান ভারতীয় গৃহগুলির প্রভাব সন্তানগণের পক্ষে আদৌ কল্যাণকর নহে। বাস্তবিক সমাচারের কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। তারপর সমাজের দিকে চাহিয়া দেখুন। দেখিবেন—যিনি উদ্যম, উৎসাহ এবং জীবনীশক্তির পরিচয় দিতে পারেন, তিনি বাতুল বলিয়া উপহাসের পাত্র; সমাজসেবা, পতিত জাতির উদ্ধার প্রভৃতি গুরুভার কর্ত্তব্যগুলি দুঃসাধ্য বলিয়া তাহা অকর্ত্তব্যরূপে পরিগণিত। আমাদের দেশ এখন মহাপুরুষ জন্মাইবার অনুকূল ক্ষেত্র নহে। আমাদের মধ্যে যাঁহারা প্রতিভা ও পুরুষকার বলে বড় হইয়াছেন তাঁহাদের কত বাধা বিপত্তি ঠেলিয়া, প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া উঠিতে হইয়াছে।

কিন্তু আমাদের দেশে পারিপার্শ্বিক সংশোধিত করিয়া উহাকে উচ্চভাবের পরিপোষক করিয়া তুলিতে হইবে। মানুষের মত মানুষ যাহাতে গড়িয়া উঠে তাহার উপায় করিতে হইবে। পারিপার্শ্বিক একেবারে অপরাজেয় নহে। প্রতিদিনের চেষ্টা দ্বারা উহার আমূল পরিবর্ত্তন করা যায়। দেশের

আবহাওয়াকে পবিত্র ও সুন্দর করিবার কয়েকটী উপায় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) জাগ্রত জীবন (conscious life)। জীবন সদা জাগ্রত সতর্ক রাখিব, কোন শত্রু আসিয়া অতর্কিতে আমার হৃদয়দুর্গ অধিকার করিতে পারিবে না। কোন কুচিন্তা ও কুভাব আমার অজ্ঞাতসারে আমাকে অভিভূত করিতে দিব না, এবং ভাল ভাবকে বিচার করিয়া সাদরে গ্রহণ করিব। আমার হস্ত যেন আমার অজ্ঞানে কোন কাজ না করে। এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা আবশ্যক। ইহার জন্য আত্মপরীক্ষার অনুশীলন করিতে হইবে। আমার মধ্যে কোন কোন দোষ রহিয়া গিয়াছে তাহা দূর করিবার এবং আমার ভিতরকার সদ্‌গুণ কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। মহাত্মা রাণাড়ে এইরূপ নিয়মিত ভাবে আপনার চরিত্রের পরীক্ষা আপনি গ্রহণ করিতেন।

(২) মহাপুরুষ সংশ্রয়। সমাজের সকলেই মন্দ নহেন। তাহার মধ্যে গুণী ব্যক্তি সংসর্গ লাভ করা যায়। তাঁহাদের সংশ্রয় কলুষিত আবহাওয়ার মধ্যে নির্ম্মল আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে পারে। তাঁহাদের সহিত সংপ্রসঙ্গ আলোচনা মানসিক পবিত্রতা রক্ষার পক্ষে বড় সহায়।

(৩) স্বাধ্যায়। শক্তিশালী, উন্নত মনের চিন্তা ও ভাবরাশি পাঠ করিয়া বাস্তবিকই প্রাণ একটা উদ্দীপনা অনুভব করে। মহাপুরুষগণের জীবনচরিত চারিদিকের বিক্ষিপ্ততার মাঝে আশ্রয় স্বরূপ। তাহাদের জীবনবৃত্তান্ত হইতে মানুষ ভাবের প্রেরণা লাভ করে।

(৪) সুচিন্তা। যাহা কিছু হৃদয়কে অপবিত্র করে, যাহা নৈতিক স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর সেই সকল হাল্কা চিন্তা ত্যাগ করিতে হইবে। দুষ্ট পারিপার্শ্বিকের মধ্যে থাকিয়া নানাপ্রকার হীন ভাবনা আসিবে, ইহা খুব স্বাভাবিক। তাহার প্রতি আদৌ মনোযোগ না দিয়া সদ্‌ভাবকে আশ্রয় করিয়া থাকাই শ্রেয়ঃ।

(৫) উন্নত হইবার জন্য আগ্রহ, ব্যাকুলতা ও চেষ্টা। আপনার উৎকর্ষ সাধনের জন্য তীব্র আগ্রহ চাই। চতুষ্পার্শ্ব আমাকে যতই টানিবার চেষ্টা করুক না কেন আমি ঠিক খাঁটি থাকিব। উহার প্রভাব হইতে আপনাকে বাঁচাইয়া আমি আপনার পথে চলিব। শুধু আগ্রহ থাকিলে চলিবে না, চেষ্টা প্রবর্ত্তক ব্যাকুলতা চাই। ব্যাকুলতার অভাবে অনেক সদিচ্ছা কোনরূপ ফলপ্রসূ হইবার পূর্ব্বেই মারা গিয়াছে।

(৬) জীবনে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ। জীবনের উদ্দেশ্য কি, জীবনে আমি কি কার্য্য করিব তাহা স্থির করিতে হইবে। একটা আদর্শকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া, একটী উদ্দেশ্যকে লক্ষ্যীভূত করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। যাঁহাদের জীবনের নিয়তি আছে তাঁহারাই প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারেন। যাঁহাদের গন্তব্যস্থল স্থির নাই, তাঁহারা ঘটনাস্রোত যে দিকে তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, সেই দিকেই ভাসিয়া যান। স্রোতকে ঠেলিবার মত উৎসাহ তাঁহাদের সাধারণতঃ থাকে না।

* *

২। বিজ্ঞানচর্চ্চা

আমাদের জাতি প্রাচীন এবং বর্ত্তমান জগতের শিক্ষা দীক্ষার গুরু হইলেও, অধুনিক জগতের নিকট নবীন, আধুনিক শিক্ষা দীক্ষার শিষ্য। আমরা জানিতে পারি, গৌরবও করি, আমাদের দেশেই জ্ঞান বিজ্ঞানের খনি

—সন্দেহ নাই। আমরা যে শুধু কালিদাস-মল্লিনাথ, পুরু-চাণক্য-চন্দ্রগুপ্তকে পাইয়াই গৌরবান্বিত তাহাই নহে। আমরা চিন্তা-ভাবনাহীন বিজ্ঞানরাজ্য হইতে বিচ্যুত নহি। চোখের সামনে যাহাদিগকে পাই তাহাদিগকে টানিলেও দেখিতে পাইব,—লাখ লাখ বৎসর পূর্ব্বের যাহাদের বিজ্ঞান চর্চ্চার ফল আর্য্যভট্ট, নাগার্জ্জুন, ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্য্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের বিজ্ঞানালোচনাই মধ্যযুগের ইউরোপের শিক্ষাক্ষেত্রে উপাদান দিয়াছিল, তাৎকালিক ইউরোপের বুভুক্ষু পণ্ডিতমণ্ডলীকে সঞ্জীবীত করিয়াছিল। কিন্তু আজ সমুদায় ভারতহৃদয় অজ্ঞতার কুয়াসায় আচ্ছন্ন। আমাদেরই কবি বলিয়াছেন—

"এই ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে
যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে॥"

কিন্তু আমাদের অবস্থা বিপরীত হইয়াছে। শুধু প্রাচীন বিজ্ঞানচর্চ্চার ফলেই আমরা আজও বাঁচিয়া আছি। কাব্য, উপন্যাস, এইগুলি মানুষের হৃদয়ে একটা সাময়িক পরিবর্ত্তন আনিতে পারে, আপাত মধুর রস উহাতে পাওয়া যাইতে পারে। তারপর লোকচরিত্র ও সমাজচিত্র আঁকিতে কাব্য ও উপন্যাসই প্রধান। কিন্তু চিরস্থায়ী আনন্দ, চিরমধুর রস বিজ্ঞানরাজ্যেই বর্ত্তমান; বিজ্ঞান সমাজচিত্র বা ব্যক্তিগত চরিত্রাঙ্কণেও যথেষ্ট পারদর্শী। আমাদের তিনশত বৎসরের ইতিহাস এই বিজ্ঞানের ভিতর দিয়াই কতকটা বুঝা যাইবে। বিজ্ঞান, শক্তিমান ভগবানের রূপান্তর মাত্র। বিজ্ঞানচর্চ্চায় নিরাশা ও হতাশা সর্ব্বত্র বিদ্যমান, কিন্তু আর একটুকু পেছনেই শাশ্বত আনন্দ অপেক্ষা করে। সাধারণতঃ যাঁহারা দার্শনিক বলিয়া পরিচিত তাঁহারা ভগবানের সত্বা কতকটা উপলব্ধি করিতে পারেন কিন্তু বৈজ্ঞানিক জড় জগতের সর্ব্বত্র তাঁহার মহিমা দর্শন করিয়া, প্রতি অণুতে তাঁহার মাহাত্ম্য দেখিয়াও তৃপ্ত হইতেছেন না, অনন্ত পিপাসা—অনন্ত ব্যাকুলতা। বৈজ্ঞানিকই প্রকৃত দার্শনিক। আমাদের মুনি ঋষিগণকে যাঁহারা জটাজুটধারী নেত্রনিমিলীত সাধারণ দার্শনিক ভাবেন, তাঁহারা অন্যায় বুঝেন। তাঁহারা জড়জগতে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে যাইয়াই দার্শনিক হইয়াছেন। তাঁহারা প্রকৃত বৈজ্ঞানিক। তাই বলিতেছিলাম, বিজ্ঞানের সৃষ্টি না হইলে মানুষ বাঁচিত না। সংসার একটা ভোগের স্থান হইত—লোক শূন্যবাদী হইয়া উন্মাদ হইত।

যে সমাজে বিজ্ঞানচর্চ্চা নাই সে সমাজ সমাজই নহে। যে জাতির হৃদয় বিজ্ঞানালোচনার জন্য ব্যাকুল নহে সে জাতির হৃদয় মরুভূমির তুল্য। জাতি বিজ্ঞানালোচনা ব্যতীত বাঁচিতে পারে না বলিয়াই আজ ৩০০ শত বৎসর পরেও আবার বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য আমাদের দেশবাসী সন্তানগণ অন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছে। লড়াইয়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও সাধারণ ভাবে বুঝা যায় এটা বিজ্ঞানের যুগ, কারণ যাঁহারা বিদেশ যাইতেছে তাহাদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য। সম্প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যাঁহারা বিদেশ হইতে আসিতেছেন তাঁহারা দেশে বিজ্ঞান-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করুন। বহুদিন তরল সাহিত্য ও অসার উপন্যাস পাঠ করিয়া বিজ্ঞানের রস লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যে বিজ্ঞানরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, আমরাই উহার শিশুপ্রজা হইব। বিজ্ঞানের শৈশবকালে, আধুনিক জগতের বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি

শুধু মুখস্থ না করাইয়া, প্রাঞ্জল ভাষায়, সহজ উদাহরণে, দেশীয়ভাবে বুঝাইতে পারিলে, সুবিধা হইবে। বিজ্ঞানজগতে প্রবেশ করিতে সহজ পন্থা পাইব। বিজ্ঞান বিষয় লিখিলেই যে দেশের লোক হঠাৎ আকৃষ্ট হইবে এমন নহে; কাব্যোপন্যাসের রাজ্যের ক্ষণিক রসভোগ সহসা পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। সুতরাং বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলিকে বহুল প্রচার করিতে হইলে কথায় বার্ত্তায়, গল্পে প্রবন্ধে সহজ মাত্রায় চালাইতে হইবে।

বিদেশপ্রত্যাগত বিজ্ঞানসেবী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের আবিষ্কারগুলি অনুবাদ করিলে গ্রন্থপ্রকাশেও সুবিধা হইবে। যতদিন না বৈজ্ঞানিক শিক্ষা সমাজে চলিতে থাকিবে ততদিন আমরা অতি নিভৃতে আছি বলিয়াই ধারণা হইবে। বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভগুলি বেশ রসাল হইলে খুব শীঘ্রই ফল পাওয়া যাইবে। সম্প্রতি পণ্ডিত মহলে যে বিষয়ের আলোচনা চলিতেছে—সেগুলিও প্রকাশিত হইলে বিজ্ঞান-রাজ্য অতি সত্বরেই প্রসার লাভ করিবে।

আমরা নবীন বিজ্ঞানসেবীদিগের অনেক আশা করিতেছি। তাঁহারা পকেট ঝাড়িয়া দিলেও আমরা খুসী হইব না। আধুনিক শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে ঘুরিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াও যদি তাহা নীরব থাকেন অথবা মজ্জাগত রীতির অনুবর্ত্তন করেন তাহা হইলে দেশের লোক ঠিক থাকিবে কি করিয়া? বৈদেশিক শিক্ষায় লোকের ভক্তি না অসিয়া বিতৃষ্ণা জন্মিবে। দেশের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। আমরা যেন আবার দেখিতে পাই—বিজ্ঞানালোচনা কিছুকাল স্থগিত থাকিলেও আমরা এইমাত্র প্রথম শিক্ষার্থী নই। প্রাচীন পণ্ডিতগণের দেশে তাহাদের বংশে আবার প্রতিভাবান্ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। শিক্ষণীয় বিষয় কখনও খাপছাড়া হয় না। যুগের পর যুগ চলিয়া যাইতেছে আর ঐ সঙ্গে সঙ্গে তাহার সূত্রও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। আমরা আশা করি, ষোড়শশতাব্দীর পর হইতে এই তিনশত বৎসরে আমরা যতটুকু পাছে পড়িয়াছি, এই বিংশশতাব্দীতে মানবজাতির উন্নতিযুগে তাহারাই ততটা পূরণ করিয়া দিতে সমর্থ হইবেন। আমাদিগকে বিজ্ঞান-রাজ্যে লইয়া যাইতে তাহাদিগকে অনবরত কষ্ট করিতে হইবে। শিক্ষাক্ষেত্রের সুবিধা অসুবিধা তাহাদিগকেই বহন করিতে হইবে। আমরা অজ্ঞান তমিস্রা হইতে মুক্ত হইয়া প্রকৃত দার্শনিক হইতে চাই। আমাদের ৩০০ বৎসরের পুরাতন খনি হইতে তাঁহারা আলোক হস্তে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মণি অনুসন্ধান করুন। তাঁহারা দেখাইয়া দিউন আমরা দেখিয়া সার্থক হই, আমরা নূতন নহি আমরা পুরাতন। ভবিষ্যতের শিক্ষাগুরু আমাদেরই দেশবাসী।

৩। বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি

বিগত ১৩২১ সালের ৫ই কার্ত্তিক এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, সি, আই, ই মহাশয় ইহার উপদেষ্টা। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্র নাথ বসু ইহার স্থায়ী সভাপতি, নিখিলনাথ রায় বি, এ, সহকারী সভাপতি। মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর ইহার সম্পাদক। তাঁহারই ব্যয়ে সমিতি পরিচালিত। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে

জানাইয়াছেন যে তাঁহারা এই এক বৎসরের মধ্যে বক্রেশ্বর, জোঁফলাই, সুপুর, কেন্দুবিল্ব, শ্যামারূপারগড়, মঙ্গলডিহি প্রভৃতি কয়েকটী স্থানের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া বীরভূম-বিবরণ নামক পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতেছেন। তন্মধ্যে সুপুর, বক্রেশ্বর, শ্যামারূপারগড় প্রভৃতি কয়েকটী স্থানের বিবরণ ইতিপূর্ব্বে 'গৃহস্থে' প্রকাশিত হইয়াছিল। সমিতির কার্য্য-কর্ত্তারা জনৈক ফটোগ্রাফার সমভিব্যাহারে বীরভূমের আরো অনেক স্থান ঘুরিয়া বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি ও মন্দিরাদির ফটো সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। তন্মধ্যে বক্রেশ্বরে মহিষমর্দ্দিনী, সেনভূমে সহস্র বৎসরের পুরাতন (বৌদ্ধ তারামূর্ত্তি) সুন্ধেশ্বরী, দেউলিতে দ্বাদশভুজ শিবমূর্ত্তি, কলেশ্বরের বাসুদেব মূর্ত্তি, ভদ্রপুরের দ্বিভুজ শিবমূর্ত্তি, একচক্রায় দশাবতার চিক্রযুক্ত বাসুদেব মূর্ত্তি প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সমিতি এবং বর্দ্ধমানের রাঢ়-অনুসন্ধান-সমিতি রীতিমত কার্য্য করিতে পারিলে রাঢ় দেশের পুরাতত্ত্ব বেশ সুন্দর-ভাবে সংগৃহীত হইতে পারিবে, আশা করা যায়। যে সব ধনাঢ্য ব্যক্তি অর্থসাহায্যে এই সকল সমিতিকে রক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র।

* *

৪। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা

Evolution theory আজ কাল বিজ্ঞান-জগতে একটা আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে। সর্ব্বত্রই শুনিতে পাই, জগতে যাহা কিছু ঘটে সে সকলই Evolution নিয়মানুসারে ঘটিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই মতটির আজ কাল এতই বাড়াবাড়ি হইয়াছে, যে Evolutionও যেন Evolution নিয়মানুযায়ী উদ্ভূত বলিয়া মনে হয়। ইহাকে বলে "সর্ব্বাত্যন্তং গর্হিতং"। যাহা হউক যখন বৈজ্ঞানিক মহারথীরা Evolution পদ্ধতির এত মর্য্যাদা, ও গৌরব প্রদর্শন করিতেছেন, তখন তাহার বিরুদ্ধে কেহ কোন আপত্তি উত্থাপন করিতে সমধিক সতর্কতা অবলম্বন করিবেন, এটা বাঞ্ছনীয়।

বৈজ্ঞানিকগণ কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ সাধন করিতে বদ্ধপরিকর; সুতরাং সহজেই মনে হয়, বিজ্ঞানবেত্তারা কুসংস্কার বিনির্ম্মুক্ত। কিন্তু একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রতীত হয়, তাঁহারাও মনে মনে কতকগুলি কুসংস্কারের পূজা করিয়া থাকেন।

নিজের ভ্রম নিজে কেহ দেখিতে পায় না, এটা জগতের রীতি। বৈজ্ঞানিকগণ সমীক্ষা পরীক্ষা পূর্ব্বক যে সকল সত্য আবিষ্কার করেন সেগুলি নির্ভুল হইলেও, মনে রাখিতে হইবে, কেবল সমীক্ষা ও পরীক্ষাই সত্য নহে, সত্য আবিষ্কারের সহায় মাত্র। এই সমীক্ষা ও পরীক্ষালব্ধ উপকরণ হইতে, কল্পনা দ্বারা সত্যের যে ছবি অঙ্কিত করা হয়, এই কল্পনার মধ্যেই ভ্রম প্রমাদের অবসর থাকিতে পারে। কেবল প্রত্যক্ষ দ্বারা সাধারণ তথ্যে উপনীত হওয়া যায় না। সুতরাং সমীক্ষা ও পরীক্ষার গণ্ডীকে অতিক্রম করিতেই হইবে, তাহা বুঝা যাইতেছে। এই গণ্ডীকে অতিক্রম করিতে যাইয়া বৈজ্ঞানিককেও বিশুদ্ধ দার্শনিক হইতে হয়। এই দার্শনিক বুদ্ধি ব্যতীত কোন তথ্যেরই যাথার্থ্য নির্ণীত হইতে পারে না। তাই বলিতেছিলাম, বিজ্ঞানের সমীক্ষা ও পরীক্ষা লইয়া বিশেষ বাদানুবাদ সম্ভবপর না হইলেও, তদবলম্বিত অনুমান সম্বন্ধে মতদ্বৈধ—সর্ব্বথা সম্ভবপর। হটকারিতা, কি দার্শনিক কি বৈজ্ঞানিক, উভয়েরই পরিহর্তব্য।

বৈজ্ঞানিকদিগের Evolution পাঠ করিতে গেলে দেখা যায় সেখানে রূপকের বহু অপপ্রয়োগ রহিয়াছে। তাঁহাদের প্রধান প্রধান শব্দগুলির বিশ্লেষণ করিলে একথার তাৎপর্য্য গৃহীত হইতে পারে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন, যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন, পারিপার্শ্বিক প্রভাব প্রভৃতি শব্দগুলির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের প্রতি দৃষ্টি করিলে বুঝা যায় তাহারা ভিন্নার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই ভিন্নার্থটা আমাদের বুদ্ধিগম্য কি না তাহা বিবেচ্য। প্রকৃতিকে অচেতন বলা হয়, কিন্তু প্রাকৃতিক "নির্ব্বাচন" কথাটার ছড়াছড়ি দেখিতে পাই। অচেতনের 'নির্ব্বাচন' ব্যাপারটা যে কি তাহা কিন্তু আমাদের বুদ্ধির অতীত। নির্ব্বাচন বলিতে আমরা যাহা বুঝি, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বলিতে যদি তদ্ভিন্ন অর্থের সূচনা করা হয়, তবে সে শব্দটা কি আমাদের দুর্ব্বোধ্য হয় না? অন্যান্য শব্দ সম্বন্ধেও এই প্রকার জানিতে হইবে। আমরা রূপকের প্রয়োগ করি কখন? যখন বস্তুটিকে পরিচিতের সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা করি, তখনই নহে কি? ব্যাখ্যা মাত্রেই পরিচিতের ভাষায় অপরিচিতের প্রকাশ। যদি বৈজ্ঞানিকগণ অপরিচিত বস্তুকে পরিচিতের কথায় প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক না হইয়াও পরিচিত ভাষার প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে, বিষয়টিকে জটিলতর করিয়া তোলা ব্যতীত আর কি করা হয়, আমরা বুঝিতে অক্ষম।

তারপর, Evolution জিনিষটার প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাই উহা একটা পদ্ধতি একটা প্রক্রিয়া মাত্র, স্বয়ং হেতু (agent) নহে। হেতুনিষ্ঠ শক্তি যে প্রণালীতে স্থূল ব্যবহারিক দশায় উপনীত হয়, সেই প্রণালীর নাম Evolution, কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ কেবল এই প্রক্রিয়াটাকেই সর্ব্বেসর্ব্বা বলিয়া ঘোষণা করেন প্রচ্ছন্ন শক্তির কথাটা খেয়ালে আনেন না। বরং তাহার অপলাপই করিয়া থাকেন। ইহা চিন্তাশীলতার পরিচায়ক নহে। যাহা হউক, বাঙ্গালা ভাষায় Evolution শব্দটির নানা ভাবে অনুবাদ করা হইয়াছে, দেখা যায়। কেহ বলেন ক্রমবিকাশ, কেহ বলেন পরিণাম, কেহ বলেন অভিব্যক্তি, কেহ বা বলেন বিবর্ত্ত। আমাদের মনে হয় প্রথম তিনটি শব্দ মন্দ নহে। তবে সংস্কৃত দার্শনিক ভাষায় 'পরিণাম' শব্দটিই বিশেষভাবে গৃহীত হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনে 'পরিণাম' শব্দেরই বিশিষ্ট প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। অভিব্যক্তি শব্দটিও উহার অনুকূল। কিন্তু যাঁহারা Evolution অর্থে 'বিবর্ত্ত' শব্দ ব্যবহার করেন, তাঁহাদের প্রতি নিবেদন, সংস্কৃত দর্শনে 'বিবর্ত্তবাদ' সম্পূর্ণ ভিন্নার্থবোধক। যাঁহারা সংস্কৃত দর্শনের চর্চ্চা করেন তাঁহাদের নিকট একথাটি নূতন নহে। বস্তুর স্বরূপের অন্যথাভাব হওয়াই 'পরিণাম', এবং স্বরূপের অন্যথাভাব না হইয়া যে বস্তন্তররূপে ভান তাহাই বিবর্ত্ত। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রবন্ধ লেখকগণ একটু বিবেচনা পূর্ব্বক শব্দাদির ব্যবহার করিলে, অর্থবোধ সহজ হইতে পারে। আশাকরি তাঁহারা শব্দের প্রসিদ্ধার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আলোচ্য বিষয়কে পরিস্ফুট করিতে শৈথিল্য প্রকাশ করিবেন না।

* *

আমাদের চিন্তাপ্রণালী

যাবৎ আমরা কর্ম্মজগতে ও চিন্তাজগতে অনড় ও অসাড় হইয়াছিলাম। ভাবিবার, চিন্তা করিবার বড় একটা প্রয়োজন বোধ করি নাই। এখন যদি হাল ফিরিয়াছে

তাহা হইলেও বাঁধা পথে ফিরিতেছি; চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিতেছি। নিজেরা কোন কোন নূতন বিষয় ভাবিবার আদৌ প্রস্তুত নহি; কোন এক ব্যক্তি যদি তাহার নূতন চিন্তার আভাস দিলেন তাহা হইলে অমনি বিভিন্ন লেখনী হইতে বিবিধ নামে প্রবন্ধ বাহির হইতে লাগিল। দুই একটী নূতন কথা যোগ করিয়া লেখক ভাবিলেন, কিছু করিলাম, কিন্তু জগৎ তোমার নিকট হইতে কি পাইল তুমি ত তাহা ফিরিয়া দেখিলে না। যে বিষয়গুলি লইয়া আমাদের সাহিত্য সমাজে নড়চড় চলিতেছে, অনেকে মনে করেন, এইগুলিই আধুনিক সমাজের বাণী ও আন্দোলনের বিষয় তাই তাহারা নিজস্ব ভাবিয়া থাকেন। আমরা একে একে ২।৪ টী বিষয়ের নমুনা দেখাইব।

প্রথমতঃ পল্লীচিন্তাই আমাদের প্রধান চিন্তা হইয়াছে। পল্লীর শিক্ষা, পল্লীর বিচার, পল্লীর সমাজ, পল্লীর শিল্প ইত্যাদিই চিন্তার অন্যতম ও প্রধান বিষয়। তারপর "করিতে হইবে" "করা উচিত" প্রভৃতি অনুজ্ঞা ও উপদেশপূর্ণ শব্দে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করে। আজকালকার দিনে Theoritically perfect হইলে চলিবে না। যদি কিছু করিতে হয় আগে নামিতে হইবে, ক্ষমতা থাকে কর। যেখানে একা পারা যায় না দু' একজনে মিলিয়া দু একটা উপদেশ নমুনাস্বরূপ ধর। আমাদের মত অবস্থায় কেহ কাহারও কথা শুনিতে চায় না স্বতরাং আগে নিজে না নামিলে অন্যকে পাওয়া মুস্কিল। অনেক লেখক মনে করেন, পত্রিকা তাহাদেরই জন্য তাহারা শুধু লিখিয়া পথ দেখাইবেন। লেখকদিগের মধ্যে এমন অনেক আছেন যাহারা দেখেন নাই, অথবা কেহ কেহ ২।১টী গ্রামের এক আধটুকু খবর রাখিয়াই তৃপ্ত। পল্লীতে ঘুরিয়া খবর সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য এমন কথা কেহ ভাবেন না কি? তারপর স্বায়ত্তশাসন—এ ব্যাপারটী কিছু বেশী দিনের পাকা হইলেও, একটা বলিবার ও লিখিবার বিষয় হইয়াছে। আমরা বরাবর শুনিয়া আসিতেছি,—উপযুক্ত হইলে শাসন ক্ষমতা পাইব; কিন্তু আমরা ভাবিয়া দেখি না, আমরা উপযুক্ত কি না। তাহারা বলে "দিবনা" আমরা বলি "চাইই।" তাহারা যত বেশী না করে, আমরা তত জোর করিতেছি। আমরা জোর করি কেন ঠিক বুঝিতে পারি না। আমাদের দাবী দাওয়া কি আছে সকল সময় বুঝি না। আর চাহিলেই বা দিবে কেন কে কাহাকে দেয়। এটা একটা আবদার হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—একেবারে মিথ্যাও নয়, আমরা এখনও শিশু —চাওয়া অভ্যাসটী আমাদের এখনও আছে। এক একবার শুনি "দিতে হইবে" অমনি মনে হয় যেন কপালে "চাঁদের টিপ" পড়িল। তারপর আরও মনে হয় না কি—এত বড় একটা শক্তিশালী জাতির সংস্পর্শে আসিয়া, "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা" যাঁহাদের বাণী তাঁহাদের রক্ত মাংসের হইয়াও, আমরা ভিক্ষাবৃত্তির আশা ছাড়িতে পারি নাই; ভুলে ঐ ভাবনাটাকে পরিত্যাগও করিতে পারি নাই। দুর্ব্বলের কাতরোক্তি সকলকে দূষিত করে, সুতরাং প্রার্থনা পরিত্যাগ করিয়া, শক্তিমানের পথে চলিয়া তাহার মহত্ত্ব বৃদ্ধি করি।

তৃতীয় চিন্তা প্রাথমিক-শিক্ষা—আমরা কি দেখিয়াও দেখিতেছি না, শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সমাজ অঙ্গকে প্রতিনিয়ত ঘা দিতেছে। বরোদা প্রভৃতি মিত্র রাজ্যের ন্যায় করদ রাজ্য সমূহ বাঙ্গলায়ও আছে, নাই কেবল প্রাণ।

যাঁহারা জমির মালিক হইয়া প্রচুর অর্থের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে নিজ নিজ এলাকায় ইচ্ছামত স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিতে পারেন না কি? গভর্ণমেণ্ট যখন করেন নাই তখন ত আর কোনই উপায় নাই! শুধু প্রার্থনা করি বলিয়াই আমাদের আবেদন মঞ্জুর হয় না। সকল সর্ব্বনাশ ঐ খানেই। আমাদের দেশে যখন যখন স্ত্রী-শিক্ষার আন্দোলন হয় তখন দূরাতিদূরেও তাহার প্রতিধ্বনি হয়। আমাদের প্রাণহীন চীৎকারকে থামাইবার জন্য একটা উপায় গৃহীত হয়। যদি অভাব সত্য সত্যই উপলব্ধি করিতাম তাহা হইলে বসিয়া বসিয়া চীৎকার না করিয়া, এক হাতে অশ্রু মুছিতাম অন্য হাতে কর্ত্তব্যের বোঝা টানিয়া লইতাম। দু'একজনের আজীবনের অশ্রুতে কিছু আসে যায় না। লিখিয়া, পড়িয়া বা বক্তৃতা দিয়া কোন লোকের কর্ম্মপ্রবৃত্তি জাগান যায় না। যথার্থ প্রাণহীন ব্যক্তি কোন কাজ করিতে পারে না। যেখানে প্রাণের স্পন্দন আবশ্যক সেখানে বাহ্য আস্ফালনে কোন কাজ হয় না। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে চীৎকার তাহা গোখ্‌লের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় থামিয়া গিয়াছে। আমাদের সবই আছে, নাই কেবল প্রাণের সাড়া, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুলতা। যেখানে একটী সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয় না সেখানে বিদ্যালয় হইবে কিরূপে। আবার কিছুদিন যাবৎ আর এক ধুয়া চলিতেছে—শিল্প বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা। আমরাও মনে করিলাম হইলে হইতেও পারে, কিন্তু শেষে স্থির করিলাম—"সকল ব্রত করছেন মাসী, বাকি আছে ভুমি একাদশী।" কাজের ঘরেও তাই।

তারপর ম্যালেরিয়ার নামে কত লিখন পঠন চলিতেছে। না করিয়াই বা উপায় কি? যতদিন এ জাতির প্রতি তৃণ ম্যালেরিয়ার বিষে জর্জ্জরিত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত না হয়, ততদিন এ চীৎকার চলিবেই, এ প্রলাপ বকিবেই। প্রথমে এক আধটুকু জায়গায় দাঁড়াইবার জন্য ম্যালেরিয়া ব্যস্ত হইয়াছিল এখন বিশাল শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে—বিরাট তাহার পাশ। আমরা আজ পর্য্যন্ত মানুষের কাছে প্রার্থনা করিতে ভুলিলাম না। মানুষে মানুষের জন্য কতটুকু করিতে পারে—শক্তি কৈ? সেখানে হিংসা ও স্বার্থের বীজ নিহিত রহিয়াছে। একমাত্র নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া ভগবানকে ডাকিলে কিছু কাজ হইত। তাঁহাকে অনন্ত বিশ্বের খবর লইতে হয়, যে আগে যাইবে তার পুরস্কার আগে দেন।

ম্যালেরিয়ার কোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ২.১টী সাধারণ নিয়ম পালন করিয়াছি কি? মশার সঙ্গে লড়াই করিয়া বাঁচিবার ক্ষমতা যদি না থাকে তাহা হইলে মানুষের মরাই শ্রেয়। সংসারে দুর্ব্বল চিরদিনই সবলের অধীন। শুধু মৃত্যুর তালিকা দেখাইলে আমাদের হৃদয় গলিবে না। সংসারে মানুষের মত বাস করিতে হইলে, খাটিতে হইবে, মাথার ঘাম পায়ে পড়িলে তবে কিছু করিতে পারিব। "কাঁদিবার তরে মানবজীবন যতদিন বাঁচি কাঁদিয়া যাই" এ দুর্ব্বলের মর্ম্মবাণী। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এত লোক মরিতেছে, তবুও ত আমরা ধাক্কা পাইতেছি না। ঐ ধাক্কাটা যদি জলের হইত তাহা হইলে কতকটা কাজ করিতে পারিতাম। ঐ সকল পুঞ্জীকৃত মৃত আত্মা যদি তাঁহাদের লৌহ পাদুকা দ্বারা লাথি দিতেন তাহা হইলে আমাদের জাতির একটু চেতন হইত। মানুষ মানুষের কাছে কাঁদে। তাহার ষোল আনাই ত বৃথা যায় তবে আর অনর্থক অশ্রু ত্যাগে ফল কি? নিজকে নিজে চিনিতে পারি এমন শক্তি চাই, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি।

* *

৮। বঙ্গভাষার প্রকৃতি

আল্ এস্‌লাম পত্রিকায় 'বাঙ্গালীর মাতৃভাষা' নামক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক বলিতেছেন, মাতৃভাষার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা বুদ্ধিমান জনোচিত কাজ নহে। আমরা যে কোন ভাষাই পড়িনা কেন, তাহা মাতৃভাষার সাহায্যেই বুঝিয়া থাকি, কারণ বাল্যকাল হইতে সেই ভাষা দ্বারাই আমাদের

অন্তরে কথা বুঝিবার শক্তি গঠিত হইয়া থাকে। আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা আমাদিগকে নানাদেশ ও নানাজাতিতে বিভক্ত করিয়া সৃজন করিয়াছেন এবং দেশ ও জাতি বিশেষে বিভিন্ন ভাষাও দিয়াছেন। এজন্য কাহারও লজ্জিত হওয়ার কারণ নাই। বাঙ্গলা, ইংরেজী, উর্দ্দু ও ফারসী ইত্যাদি ভাষা অর্থাৎ আরবী ভিন্ন পৃথিবীর যাবতীয় ভাষাই মুসলমানের জন্য সমান এবং সংস্কৃত ভিন্ন অন্য সকল ভাষাই হিন্দুর জন্য সেইরূপ। মাতৃভাষার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা, বাঙ্গালী হইয়া নিজেদের মাতৃভাষা উর্দ্দু বা আরবী বলিয়া পরিচয় দেওয়া, কিম্বা 'বাঙ্গালা জানি না বা ভুলিয়া গিয়াছি' এরূপ বলা—এই মারাত্মক রোগ কেবল এক শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যেই দেখা যায়। তাঁহাদের এরূপ নীতি অবলম্বন করা কি বাস্তবিক পক্ষে নিতান্ত লজ্জাজনক নহে? যাহারা এরূপ আচরণ করে তাহারা যে আপন মাতা ও মাতৃভূমির প্রতি নিন্দা প্রকাশ করে এবং নিজমুখে নিজের মায়ের এবং দেশের দীনতা হীনতা জ্ঞাপন করে, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। বাস্তবিক পক্ষে মাতৃভাষা শিক্ষা করা এবং তাহার উন্নতি সাধন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। বাঙ্গলা ভাষার উৎকর্ষ সাধন করিলে তাহা উর্দ্দু প্রভৃতি হইতে কোন মতেই হীন হওয়ার কথা নহে। আমাদের শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যই তদ্দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে। মায়ের কাজ মায়ের দ্বারাই সম্পন্ন করাইতে হইবে, অপরের দ্বারা তাহা কখন পূর্ণ হইবে না। এইরূপ না করার ফল এই হইয়াছে যে, আজকাল সামান্য-শিক্ষিত ব্যক্তির বাঙ্গালা বক্তৃতা শুনার জন্য যেখানে হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের ভক্তিভাজন মৌলবী মৌলানা সাহেবানের আরবী-উর্দ্দু ওয়াজ শুনিবার জন্য শীরণী, রসগোল্লা, লাড্ডু ও জিলাপী ইত্যাদি বিতরণের প্রলোভন সত্ত্বেও সভায় লোক উপস্থিত করা মহা মুস্কিল হইয়া থাকে।

মাতৃভাষার উন্নতি আমরা দুই রকমে করিতে পারি। প্রথমতঃ, ঐ ভাষায় ধর্ম্ম সংক্রান্ত কেতাব সকল তরজমা করা এবং ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বাদশা, অলী ও দরবেশগণের জীবন চরিত ইত্যাদি লেখা। দ্বিতীয়তঃ আজকালের নূতন আবিষ্কৃত হেকমত বা জ্ঞান বিজ্ঞান ও হিসাব ইত্যাদি পার্থিব উন্নতি বিষয়ক পুস্তকাদি লিখিয়া তাহা জনসমাজে প্রচারের সুবিধা করা।

আজকাল আমাদের দেশে দুই রকমের বাঙ্গালা দেখা যাইতেছে। একটী আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃগণের অবলম্বিত সংস্কৃতবহুল শব্দ বিজড়িত বাঙ্গালা, ইহা ইংরেজ আমলদারীর বিগত শতাব্দীর গড়ান বাঙ্গালা ভাষার নূতন সংস্করণ নামে অভিহিত হইতে পারে। বর্ত্তমান সময় অধিকাংশ শিক্ষিত মুসলমানও তাঁহাদের অনুকরণে ঐরূপ সাধু ভাষাজড়িত বাঙ্গালা বই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই রকম বাঙ্গালাই আজকাল স্কুলে পড়ান হয়। এই ভাষাতে বাঙ্গালীর পূর্ব্ব পুরুষগণ যে সব শব্দ কখনও শুনেন নাই, তাহা অতি অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা হইয়াছে। এমন কি, তাহা ভালমতে বুঝার জন্য মৃত সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা এবং ওস্তাদ ও অভিধানের সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত উপায় নাই। বাঙ্গালার সাধারণ লোকে কখনও ঐরূপ ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে না। ইহাকে তাহাদের মাতৃভাষা বলা যাইতে পারে না বরং তাহা মাতৃভাষার বিকৃতি মাত্র।

অন্যরূপ বাঙ্গালা এই দেশে বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত আছে। তাহাতে হিন্দু এবং মুসলমান উভয়ের ধর্ম্ম ও কারবারের আবশ্যকীয় প্রায় সমস্ত শব্দের ব্যবহার ও স্থান আছে। এই ভাষাই বাস্তবিকপক্ষে এদেশের লোকের মাতৃভাষা।

এইরূপ ভাষাকে মুসলমানী বাঙ্গলা বলা ঠিক হয় না, কারণ এই ভাষায় আমরা হিন্দু মুসলমান উভয় জাতি পুরুষানুক্রমে কথা বার্ত্তা ও লেখা পড়া করিয়া আসিতেছি। কাগজ, কলম, কেতাব, আদালত, আরজী, ইন্সাফ, কুরছি, মেজ, দোয়াত, সির, সির্ণী, মগজ, বরতন, পেয়ালা, তস্তরী, পালং, তোষক, বালিশ, গয়রহ ইত্যাদি শব্দ আমরা

উভয় সমাজে সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি এবং এখনও করিয়া থাকি। কিন্তু আজ ২০।২৫ বৎসর হইতে দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ শিক্ষা দোষে বাঙ্গালী হিন্দু ভ্রাতাদের মনে মুসলমান ভ্রাতাদের প্রতি ভালবাসা কমিয়া যাওয়ায়, তাঁহারা মুসলমানগণ হইতে পৃথক হওয়ার উদ্দেশ্যই যেন মাতৃভাষার অন্তরঙ্গ-স্বরূপ পুরুষানুক্রমে প্রচলিত শব্দ সমূহের স্থলে, নূতন শব্দ ব্যবহার করত এবং তাহাকে নানা রকমের বিকৃত আবরণ দ্বারা আবৃত করিয়া তাঁহারা যেন বৃদ্ধ মায়ের এক যুবতী সতীন গড়িয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে অনুকরণ-প্রিয় কতক মুসলমানও ইহার পরিণাম ফলের বিষয় চিন্তা না করিয়া মায়ের গায় কুড়াল মারিতে ক্রটী করেন নাই। এতদিন ত মুসলমানগণ লেখা পড়ার দিকে বিশেষ কোনরূপ মনোযোগ দেন নাই। তাহাদের বাদশাহী গেলেও কিন্তু বাদশাহী খেয়াল যায় নাই এবং পূর্ব্বপুরুষগণের ঝুটা (উচ্ছিষ্ট) সব খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছিলেন। কিন্তু এখন তাহাও ফুরাইয়া যাওয়ায় উপায়ান্তর না দেখিয়া বিদ্যা শিক্ষার জন্য স্কুল পাঠশালার দিকে ছুটিয়াছেন। সেখানে যাইয়া দেখেন, তাহাদিগকে মাতৃভাষা নামে এক নূতন ভাষা শিখিতে হইবে। তাঁহাদের মা বাপের নিকট যাহা কিছু শিখিয়াছিল, তাহার অধিকাংশই সেখানে কোন কাজে লাগিবে না এবং বাধ্য হইয়া তাহা ভুলিয়া যাইতে হইবে। বাস্তবিক বিগত ২০।২৫ বৎসর মধ্যে আমরা পূর্ব্ব প্রচলিত অনেক শব্দই ভুলিয়া গিয়াছি এবং কতক নিত্য ব্যবহারের শব্দও কমাইতে শিখিয়াছি। হায়! কি দুর্দ্দশা! যে জাতিকে মাতৃভাষাও নূতন করিয়া শিখিতে হয়, তাহারা কি শিক্ষা ক্ষেত্রে অপর লোকদের সমানে পড়া চলাইতে পারে? এখনও সময় আছে, শিক্ষার উন্নতির সহিত হিন্দুদের বেরাদরি ভাব বাড়িতেছে, এবং শিক্ষিত মুসলমানগণও এখন এত কম নহেন যে তাঁহাদিগকে তুচ্ছ করা যায়। বলাবাহুল্য যে সকলেই এখন উন্নতির দিকে ছুটিয়াছে। এমন সুসময়ে উভয় সমাজের লেখকগণের পক্ষে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া এ বিষয়ে—যে ক্ষেত্রে দেশের হিন্দু মুসলমান এই উভয় জাতি একত্রে সম্মিলিত হইতে পারে, মাতৃভাষাকে সেরূপ ভাবে গড়িয়া তোলা আবশ্যক, এবং আমি ভরসা করি, সকলে এই বিষয়ে মনোযোগী হইবেন।

লেখকের মতে বাঙ্গালা ভাষায় হিন্দু ও মুসলমানী শব্দ যাহা বহুকাল হইতেই প্রচলিত আছে, ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। আমরা জানি এখনও আমাদের বঙ্গভাষার সেইরূপ ব্যবহারই চলিতেছে। তবে কোন কোন লেখক তাঁহার রচনায় সংস্কৃতশব্দ বহুল প্রয়োগ করেন, এই মাত্র। এবং তাঁহার নিন্দুকের দলও যে বঙ্গীয় সাহিত্যিকদিগের মধ্যে কম আছে, তাহা নহে। বাঙ্গালাভাষায় এখন প্রাচীন কালের মত মুসলমানী শব্দ প্রয়োগ হইতেছে না, তাহার কারণ মুসলমানগণের প্রতি হিন্দুদিগের প্রীতির হ্রাস নহে, তাহার কারণ মুসলমানদিগের এমন কোন প্রভাব এখন দেশের মধ্যে নাই, যাহাদ্বারা দেশবাসী তাঁহাদিগের সাহিত্য বা আদবকায়দার দিকে আকৃষ্ট হইতে পারে। হয়ত সেইরূপ প্রভাব থাকিলে বাঙ্গালা ভাষার পরিপুষ্টি আজ অন্য রকমে হইত। তারপর বাঙ্গালা ভাষা যে ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা অনুধাবন করিলে বুঝা যায় ইহার উন্নতির মূলে সংস্কৃত ভাষা। দুটি একটি শব্দের ব্যবহারে ভাষার প্রকৃতি বদলায় না। যে সময় মুসলমানী শব্দ বহুল প্রচলিত ছিল, সে সময়েও বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতের আদর্শেই চলিত। কেন না বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি যে প্রাকৃতের মধ্য হইতে এবং তাহার উন্নতি যে সংস্কৃতেরই সাহায্যে! মুসলমান বিদ্বেষ জাগাইবার জন্যই জোর করিয়া কেহ যে সংস্কৃত শব্দ বেশী প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহা নহে। স্বাভাবিক ভাবেই সংস্কৃতের দিকে বাঙ্গালা ভাষার টান আছে বলিয়াই লেখকগণ ঐরূপ পথে চলিয়া থাকেন। বাঙ্গালা ভাষায় এখনও যে সকল মুসলমানী শব্দ এমন ভাবে জড়াইয়া আছে, যে অনেকের মনে সে সব আর মুসলমানী বলিয়াই মনে হয় না, তাহার একমাত্র কারণ

আমাদের সাহিত্য ও সমাজের উপরে প্রাচীন মুসলমানগণের অতিরিক্ত প্রভাব। সে প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইলে যাহা হয়, তাহাই এখন হইয়াছে। অতএব ইহার জন্য হিন্দুদিগকে দোষ দেওয়া উচিত নহে। কোন ভাষাকেই জোর করিয়া কেহ কৃত্রিম উপায়ে উন্নত করিতে পারে না। পারিপার্শ্বিকের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সে নিজের একটা স্বাভাবিক গতি লইয়াই চলে। বঙ্গভাষাও সেইরূপ তাহার উন্নতির পথে কত বর্জ্জন কত গ্রহণ করিয়া চলিতেছে। সেই চলার মধ্যে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতা থাকিতে পারে না, লেখক এই কথাটি যেন মনে রাখেন।

৭। যুদ্ধের কারণ

যুদ্ধ কেন হয়, ইহার মূলতত্ত্ব কি ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিয়া মিষ্টার এডওয়ার্ড কার্পেণ্টার তাঁহার মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বিবেচনা করেন অন্যান্য শ্রেণীর উপরে একটি শ্রেণীর আধিপত্য-প্রয়াসই যুদ্ধের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারণ। প্রধানতঃ মানুষের মধ্যে তিনটি শ্রেণী দেখা যায়। এক শ্রেণী ধর্ম্ম লইয়া থাকেন, আর এক শ্রেণী যুদ্ধ এবং অন্য এক শ্রেণী ব্যবসায় কালযাপন করেন। এই তিনটির যে কোন এক শ্রেণী প্রধান সাজিয়া জাতির শাসনবিভাগকে বিপর্য্যস্ত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। কেন না সেই শ্রেণীর প্রাধান্যে জাতির মধ্যে হিংসা দ্বেষ প্রবর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং তাহার ফলে কলহ বিবাদ বিসম্বাদ ও যুদ্ধ। এইরূপে একটি জাতির প্রধান শ্রেণীর স্বার্থ অন্য জাতির প্রধান শ্রেণীর স্বার্থে আঘাত করে এবং তাহাতেই আন্তর্জ্জাতিক বিরোধের সূত্রপাত হয়।

এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে জার্ম্মাণী এবং বৃটেনের ব্যবসায়ীদিগের স্বার্থ-সংঘাতই এই বর্ত্তমান যুদ্ধের কারণ। যুদ্ধ নিবারণ করিতে হইলে একমাত্র গণতন্ত্র-মূলক শাসনেই তাহা সম্ভবপর, এইরূপ তাঁহার বিশ্বাস। কেবলমাত্র জনসাধারণ কর্ত্তৃক শাসনদণ্ড পরিচালিত হইলেই হয় না, সমগ্রের মঙ্গলের জন্য অংশের ত্যাগস্বীকারেই সত্য-কারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য এইরূপ অবস্থা এখন আমাদের নাই, কিন্তু আজ হোক কাল হোক এইরূপ অবস্থায় আমাদিগকে উপনীত হইতেই হইবে।

* *

৮। দারিদ্র্য-নিবারণ

আমাদের দারিদ্র্য ঘুচাইবার জন্য নানান জনে নানান উপায় নির্দ্ধারণ করিতেছেন। কেহ বলেন বর্ত্তমান বৈষয়িক জীবনযুদ্ধে আমরা যদি বীরের মত অগ্রসর হই—অর্থাৎ বর্ত্তমানকালে যে সব প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়াই করিতে হইবে, তাহাদেরই ধরণে অথচ উন্নত রকমে সাজ সরঞ্জাম, শক্তি সাহস এবং জ্ঞান ও একাগ্রতা লইয়া নামিতে পারি, তাহা হইলে জয়লাভ সম্ভবপর হইবে, নচেৎ নহে। কেহ বলেন, ওরূপভাবে লড়াই করিবার কোনই দরকার নাই, নিজেরা অনাবশ্যক ব্যয় বাহুল্য যদি কমাইয়া দেই, তাহা হইলে প্রতিদ্বন্দ্বীরা বিনাযুদ্ধে পরাজিত হইবে। এবং দারিদ্র্যজন্য যে বেদনা এখন উপস্থিত হইয়াছে তাহাও আর থাকিবে না।

'সঞ্জীবনী' পত্রে ব্যাধি ও দরিদ্রতা সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা শেষোক্ত মতেরই পরিপোষক বলিয়া আমা-দের বিশ্বাস। আমরা লেখকের কথা তুলিয়া দিতেছি,—

"সেকাল অপেক্ষা একালের লোক দৈনিক আহার পান, পরিচ্ছদ গৃহসজ্জা, বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়া কর্ম্ম, সামাজিক নিমন্ত্রণ প্রভৃতি লৌকিকতা, আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি নানা বিষয়ে অতি ব্যয়ী হইয়া পড়িতেছে, অনেকেই এইরূপ বিশ্বাস করেন। বাঙ্গালীর আহার পান ও পরিচ্ছদ সম্বন্ধে কিরূপ সংস্কার করিলে শরীরের পুষ্টি সাধন হয় অথচ ব্যয় হ্রাস হয়, তাহা নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। পঞ্চব্যঞ্জন না হইলে বাঙ্গালীর দৈনিক আহার নিষ্পন্ন হয় না। ইহাতে ব্যয় অনেক কিন্তু শরীর রক্ষার জন্য যে অবশ্য প্রয়োজন এমন কথা বলা যায় না। পঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানীগণ ডাল আর রুটী

খান ইহাতে ব্যয় কম অথচ তাঁহাদের শরীর বাঙ্গালীর অপেক্ষা হৃষ্টপুষ্ট। জাপানীরা ভাত আর মাছ খান—ভাতের মাড় ফেলিয়া দেন না। তাঁহাদের আহারের ব্যয় কম অথচ শরীর অতি দৃঢ়। এই সকল চিন্তা করিয়া বাঙ্গালীর আহার সম্বন্ধে কিরূপ সংস্কার করা প্রয়োজন, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক।

রন্ধন প্রণালীর জন্যও অনেক ব্যয় হইয়া থাকে। রন্ধন প্রণালীর কিরূপ সংস্কার করিলে আহার্য্য দ্রব্য সুসিদ্ধ হয়, অল্প সময়ে ও অল্প ব্যয়ে রন্ধন কার্য্য নির্ব্বাহ হয় তাহাও নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন।

পূর্ব্বে জল, সরবৎ বা ডাবের জল ইহাই বাঙ্গালীর পানীয় ছিল। এখন সোডা, লেমনেড, চা, কফি প্রভৃতি নানা প্রকার পানীয় ব্যবহার হইতেছে। ইহাতে ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে, শরীরের কোন উপকার হয় কিনা তাহাও বিবেচ্য।

চা চুরুটে অনেক টাকা খরচ হয়। এই উৎপাত আগে ছিল না। সেকালে চিড়া, মুড়ি, মুড়কি, খৈ, গৃহজাত নারিকেলের লাড়ু, ক্ষীরের সন্দেশ প্রভৃতি জল খাবার দ্রব্য ছিল। অল্প ব্যয়ে এই সকল দ্রব্য তৈয়ার হইত, এখন তৎপরিবর্ত্তে দুর্ম্মূল্য মোণ্ডা মিঠাই ব্যবহৃত হইতেছে—এতদ্দ্বারা বেশী অর্থব্যয় হইতেছে, শরীরের তাদৃশ উপকার হয় কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে।

পরিচ্ছদের আড়ম্বরও অতি বেশী হইয়াছে। প্রথমে গঞ্জি, তাহার উপর জামা, তদুপরি কোট, এই গরম দেশে আর দরিদ্র দেশে এইরূপ পোষাক প্রচলিত হইতেছে। পায়ে মোজা ও বুট, ইহাতে পা সিদ্ধ হইয়া যাইতেছে। রেশমী কোট, রেশমী চাদর, ইহার ব্যবহার ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। মোটা কাপড় ও সদাসিধে পরিচ্ছদ ব্যবহার করিলে অতি ব্যয় হ্রাস হইতে পারে।

গৃহ-সজ্জা ক্রমে জাঁকাল হইতেছে। পল্লীগ্রামেও তক্তপোষ, জল চৌকি, ফরাসের পরিবর্ত্তে টেবিল চেয়ার, সোফা পালঙ্ক প্রবেশ করিতেছে। গৃহ সজ্জার একটা সীমা নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন হইয়াছে।

বরের পণ হইতে আরম্ভ করিয়া ঘড়ী, চেন, পালঙ্ক, আলমারী, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি উপহার দ্রব্য, আবার, বাজ্বারোসনাই, গোরার বাদ্য প্রভৃতি কত আড়ম্বরে বাঙ্গালীর ঘর শূন্য হইতেছে।

নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে এখন দই চিড়া বা লুচি সন্দেশে কাহারও মন উঠে না। পোলাও, কোরমা, চপ কালিয়ার দরকার হইয়াছে। শ্রাদ্ধেও এখন মাছ মাংস চাই।

আগে যাত্রাগান বিনাপয়সায় শোনা যাইত, এখন থিয়েটার বায়স্কোপের পালা পড়িয়াছে। যুবক বৃদ্ধ ইহার জন্য প্রতি মাসে বহু টাকা ব্যয় করিয়া দরিদ্র হইতেছে।

নানারূপে বাঙ্গালীর অপব্যয় হইতেছে। এই অপব্যয় নিবারণের জন্য চিন্তাশীল বাঙ্গালীদের মতামত প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। বাঙ্গালী সময়-স্রোতে গা ভাসাইয়া না দিয়া অবনতির পথ রুদ্ধ করুন।”

এখন কথা হইতেছে এই যে যাঁহারা বীরের মত বৈষয়িক যুদ্ধে অগ্রসর হইতে বলেন, তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না বীরত্ব আসিবে কোথা হইতে। দারিদ্র্য হইতে যতগুলি দোষ জাতির মধ্যে উদ্ভূত হইয়া থাকে, আমাদের সে সবগুলিই প্রায় হইয়াছে। হীন স্বার্থ, অবিশ্বাস, প্রতারণা প্রভৃতি নানাবিধ চরিত্রহীনতায় আমরা এখন কলঙ্কিত। সেই জন্য বর্ত্তমান প্রতিদ্বন্দীতার যুগে আমাদের যতখানি একতা, যতখানি একাগ্রতা, যতখানি উদ্যম, যতখানি ত্যাগের দরকার, ততখানি আমরা কিছুতেই লাভ করিতে পারিতেছি না। দারিদ্র্য আমাদিগকে সর্ব্বনাশ করিতেছে, ইহা বুঝিয়া, চোখের সম্মুখে দেখিয়াও দেশপ্রীতির অভাবে আমরা তাহা উন্মূল করিতে অক্ষম। আবার যাঁহারা আমাদিগকে বিলাস ব্যসন প্রভৃতি বিসর্জ্জন দিতে বলেন, তাঁহারাও ভুলিয়া যান যে আমাদের এমন কোন শিক্ষাই দেওয়া হয় না, যাহাতে আমরা ত্যাগের মাহাত্ম্য অন্তরের সঙ্গে উপলব্ধি করিয়া সংযমের পথে চালিত হইতে পারি। অভাবের বিভীষিকা চোখের উপর ধরিলেও সম্মোহিত চিত্ত তাহাতে প্রবুদ্ধ

হইবে কিরূপে? চিত্তের এই সম্মোহন ঘুচাইতে হইলে আমাদের উপযুক্ত শিক্ষা আবশ্যক—যে শিক্ষা আমাদের অন্তরে জাতীয় সমাজের প্রতি গভীর প্রীতি সঞ্চারিত করে—আমাদের স্বার্থ ব্যক্তিগত না করিয়া সমষ্টিগত করিয়া তুলে—আমাদিগকে যথার্থ মনুষ্যত্ব দানে ধন্য করে। সভা সমিতি করিয়া ভয় দেখাইয়া, সংস্কারের ডঙ্কা বাজাইয়া আমাদিগের চৈতন্য জাগ্রত করিবার প্রয়াস ব্যর্থ বিড়ম্বনা মাত্র।

৯। স্বার্থহীনতার শিক্ষা

ধর্ম্ম শিক্ষা ব্যতীত যে সেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে না, এ কথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। আমাদের সেই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া 'কায়স্থ পত্রিকা' বলিতেছেন, "বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক মূল্যহীন নহে, উহার অপব্যবহারই উহার গৌরবহীনতার বিষয়। স্বাধীন" চিন্তা ব্যতীত আমাদের প্রতিভা কার্য্যকরী হইতে পারিবে না। ধর্ম্ম শিক্ষা আমাদের বিদ্যালয় হইতে প্রাপ্ত শিক্ষার মূলে সংস্থিত হওয়া আবশ্যক। এবং তজ্জন্য বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশের যুবকবৃন্দ যাহারা জাতির ভবিষ্যৎ পিতা স্বরূপ তাহাদিগের জীবনে ভগবানের প্রতি বিশ্বাস রাখিতে হইবে। এবং শিক্ষিত বর্গের দেশের জনসাধারণকে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া শিক্ষা দান করিতে হইবে। সুতরাং এতগুলি বহু আয়াসসাধ্য ও কঠোর স্বার্থত্যাগময় কর্ম্মনিচয় আমাদের সম্মুখে আমাদের কর্ম্মক্ষম হস্তের প্রতীক্ষা করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। যদি আমরা এই কঠোর ব্রতাবলম্বন করিয়া তাহা উদ্যাপন করিতে পারি তবেই সিদ্ধি আমাদের হস্তগত—তবেই জাতিকে উন্নত করিতে সমর্থ হইব। সমাজকে শিক্ষিত করিতে পারিব। তবে আমরা এ কথা বলিতে সাহস করি যে জাতি বা সমাজকে এ ভাবে শিক্ষিত করা সময় সাপেক্ষ। এবং যে ভাবেই আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই না কেন, স্বার্থ ত্যাগ পূর্ব্বক পরিশ্রম করিতে হইবে। নতুবা বর্ত্তমান সময়ের যে সকল দেশহিতকর ও সমাজসংস্কারক সম্প্রদায়গুলি কর্ম্মের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের পরিশ্রম বৃথা হইবে। এবং এ কথার প্রত্যেক অক্ষরে অক্ষরের সত্যতা আমরা স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেখিতে পাইয়াছি। যখন, যত ক্ষুদ্র ভাবেই আমরা দেশের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি না কেন, উহা স্বার্থহীন উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া থাকিলে উহার পুরস্কার আমরা অবশ্যই উপার্জ্জন করিতে পারিব। যে কোন ভাবে আসিয়া সে কর্ম্মের ফল আমাদিকে বর্ত্তিবেই সুতরাং ইহাই যদি আমাদের জাতীয় জীবনের যথার্থ চিত্র হয়, তাহা হইলে স্বীয় প্রতিভার বিশ্বাস-পরায়ণ হইয়া স্বাধীন চিন্তায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। এবং স্বার্থত্যাগপূর্ব্বক সে চিন্তার ফল দেশের জীবন নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিতরণ করিতে হইবে।"

১০। ভারতের সঙ্গীতকলা

মনোবিজ্ঞান পড়াইবার সময় কলেজের ইংরাজ অধ্যাপক অনেকবার আমাদিগকে শুনাইয়া থাকেন, "তোমাদের দেশীয় সঙ্গীতে melody আছে কিন্তু harmony নাই—কিন্তু আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সঙ্গীতের চর্চ্চা হয় বলিয়া harmony সাধন করা সম্ভবপর হইয়াছে।" পাশ্চাত্য দেশ আমাদের সঙ্গীত সম্বন্ধে এইরূপ ধারণাই এতদিন পোষণ করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয় সেদিন প্রবাসীতে জানাইয়াছেন, পাশ্চাত্যের এই ধারণা এখন অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞদিগের একজায়গায় মিলিয়া বুঝাপড়া না হইলে এইরূপ বিকৃত ধারণা থাকিয়া যায়। পশ্চিম এখন ভারতের সঙ্গে নানাস্থলে মিলিতেছে, এবং মিলিতেছে বলিয়াই ভারতের মাহাত্ম্য নানাদিক হইতে বুঝিতে পারিতেছে।

ভারতবর্ষ সঙ্গীতকে কেবলমাত্র অলসের আমোদরূপে ব্যবহার করে নাই। খাওয়া

পরা ধ্যান ধারণার মত ইহাকেও জীবন যাত্রার অঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে। 'প্রতিভা' পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই উক্তির সমর্থন করিতেছি। "কিম্বদন্তী ছাড়িয়া দিয়া, ইতিহাসের আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে, কি রাজদরবারে, কি সাধারণ লোকের নিকট, সর্ব্বত্রই সর্ব্ববিধ কলাবিদ্যা মধ্যে সঙ্গীতকেই সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদত্ত হইয়াছে। নাটকীয় অভিনয় ধর্ম্মানুষ্ঠানে সঙ্গীত একটী অত্যাবশ্যক অঙ্গ বিশেষ। মানুষের নৈতিক চরিত্রগঠনেও ইহার প্রভাব বড় কম নয়, এবং শিক্ষা-ক্ষেত্রেও ইহার স্থান সযত্নে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

উনবিংশ শতাব্দীতে অন্যান্য শিল্পের ন্যায় সঙ্গীতশিল্পেরও যে অবসাদ দেখা যাইতেছে, কোনও আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতা বা ধ্বংসপ্রবণতা তাহার কারণ নহে। পাশ্চাত্য প্রভাবকে ভারতবাসীরা আজিও আপনাদের প্রকৃতির অঙ্গীভূত করিয়া লইতে পারে নাই,—অথচ হিতাহিত-বিবেচনাশূন্য হইয়া শুধু অনুকরণই করিতেছে। এই পাশ্চাত্য প্রভাবের আধিপত্য, ভারতে প্রতীচ্যজগতের বণিক-প্রকৃতির প্রবেশ লাভ, এবং পারিবারিক শিল্পপ্রথার পরিবর্ত্তে ফ্যাক্টারী প্রথার প্রবর্ত্তন প্রভৃতি এতাবৎ ভারতীয় সংগীত প্রতিভাকে দমিত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি ভারতের সর্ব্বত্র নবজাগরণের যে লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহাতে আশা হয় যে ভারতীয় ললিতকলা আবার স্বীয় স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুসারে ক্রমোন্নতি লাভে সমর্থ হইবে।

ভারতীয় জীবনের সহিত সঙ্গীত এরূপ ঘনিষ্টভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে যে, চিরাগত প্রথা হইতে উহা কখনই স্থায়ীভাবে স্খলিত হইবে না। প্রকৃত জাতীয় সঙ্গীত আজিও কিছুমাত্র প্রবর্ত্তিত হয় নাই। রাজোচিত সম্মান বা অধিকার হইতে উহাকে বিচ্যুত করা কখনই সম্ভবপর নহে। প্রকৃত জাতীয় সঙ্গীতই আমাদের বিবেচ্য বিষয়,—সাধারণতঃ বৈদেশিকগণ মিশ্রিত ও পাশ্চাত্য প্রভাবে কলুষিত যে একপ্রকার গান বা চীৎকার শুনিয়া থাকেন, তাহা আমাদের বিচার্য্য নহে। এই শিল্প এতকাল বৈদেশিকগণের দৃষ্টি হইতে আত্মগোপন করিয়াছিল। এতদিন এ সম্বন্ধে কিছুই শোনা যায় নাই বা লেখা হয় নাই; কোনও সমিতি কর্ত্তৃক ইহার প্রণালী বা নিয়মাদির আলোচনা করা হইয়াছে বা ইহার রক্ষার জন্য কোনও চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। তথাপি ইহা এক গৌরবময় অবিছিন্ন অতীত লইয়া আজ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। কিরূপে ইহা হইতে পারে, ইউরোপীয়দের কাছে তাহা প্রহেলিকাবৎ প্রতীয়মান হওয়া বিচিত্র নয়; কিন্তু প্রাচ্য দেশে এরূপ ঘটনা আদৌ অসম্ভব বা অসাধারণ নহে। আমাদের গ্রীককাব্যগুলি পূর্ব্বে মুখে মুখেই প্রচারিত হইত; এক্ষণে তৎসমুদয় লিখিবার প্রথা হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে এই মৌখিক প্রচার কার্য্য লিখিবার প্রথার সহিত একত্র বর্ত্তমান থাকিয়া এযাবৎকাল স্বীয় স্বতন্ত্র উদ্দেশ্যসাধনে তৎপর ছিল। বরং বড় বড় গ্রন্থগুলির এইরূপভাবে প্রচার করাই সুসঙ্গত বিবেচিত হইত। মনোভাবের ব্যাখ্যা করাই যে শিল্পের একমাত্র কার্য্য বা উদ্দেশ্য, মৌখিক প্রচারের অধিকতর স্বাধীনতাদ্বারাই অধিকতর স্বাধীনভাবে সেই শিল্পের অনুশীলন সম্ভবপর। এই কারণেই সাহিত্য অপেক্ষা সঙ্গীতেই মৌখিক প্রচারের অধিকতর প্রয়োজনীয়তা বিবেচিত হইত এবং এই জন্যই ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞেরা লেখা দেখিয়া মুখস্ত করিতে অসম্মত ছিল। এই জাতীয় শিল্পের একনিষ্ঠ সেবকেরা আজিও এই মৌখিক প্রচারেরই সমর্থন করিয়া থাকে এবং বিশ্বাস করে যে, ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রে প্রচুর পরিমাণ সাঙ্কেতিক চিহ্নের ব্যবহারের জন্য যে ধুয়া উঠিতেছে, উহা যথার্থই কার্য্যে পরিণত হইলে, ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্র অচিরেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

ডাক্তার কুমার-স্বামী বলিয়াছেন যে "প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও শিক্ষাসংস্কারকগণ যে পরিমাণে ভারতীয় সঙ্গীত অবহেলা করিয়াছেন, তাঁহারা, ঠিক সেই পরিমাণে

ভারতবাসী ও ভারতবর্ষকে বুঝিতে অক্ষম হইয়াছেন।"

অভিযোগটী এতই গুরুতর যে উহা অবহেলা করিলে চলিবে না। বাস্তবিকই যদি ইহা সত্যই হয়, তবে প্রকারান্তরে এতদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে ইউরোপীয়েরা তাঁহাদের সঙ্গীতের গুরুত্ব সম্বন্ধে বাস্তবিক যতটা দাবী করিতে পারেন, ভারতবর্ষীয়দিগের তাহাদের নিজ সঙ্গীতশাস্ত্রসম্বন্ধে দাবী তদপেক্ষা অনেক বেশী। পাশ্চাত্য-দেশীয়েরা সঙ্গীতবিষয়ে যতই বাক্যাড়ম্বর করুক না কেন, ইহা ঠিক যে একমাত্র বিশেষজ্ঞগণ ব্যতীত অপর কেহই তাঁহাদের সঙ্গীতের প্রকৃত ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না; মুষ্টিমেয় বিশেষজ্ঞ ছাড়া অসংখ্য লোকের নিকট বর্ত্তমান ইউরোপীয় সঙ্গীতের মূল্য অতি সামান্য। সঙ্গীতের দ্বারা ইহাদের দৈনন্দিন জীবন কিছুমাত্র প্রভাবান্বিত নহে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কিন্তু ভারতবাসীগণের জীবনে সঙ্গীতের প্রভাব এতদপেক্ষা অনেক বেশী। যেরূপ প্রণালীবদ্ধভাবে ইউরোপীয় সঙ্গীতের অনুশীলন হইয়াছে, ভারতবর্ষে সেরূপ কিছুই হয় নাই বটে—কিন্তু তাই বলিয়া ভারতীয় জীবনে সঙ্গীতের প্রভাব বা কার্য্য কিছুমাত্র কম নহে।

আজিও সঙ্গীত আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশবিশেষ বলিয়া স্বীকৃত হইবার সম্মান প্রাপ্ত হয় নাই;—এখনও উহা আমাদের নিত্য কর্ম্মের বাহিরেই পড়িয়া আছে। যাহার যেরূপ রুচি বা বুঝিবার ক্ষমতা, সঙ্গীতালোচনায় সে সেইরূপ আমোদ পাইয়া থাকে। কিন্তু সঙ্গীতের দ্বারা চরিত্র গঠিত বা আচার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হোক, কেহই ইহা আশা করে না। সঙ্গীত আমাদের উচ্চ শিক্ষার একটা আবশ্যক অঙ্গবিশেষ বটে,—কিন্তু উচ্চ শিক্ষাকে আমরা দৈনন্দিন জীবনের আবশ্যক অন্তরঙ্গরূপে ধরি না। কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞগণই সঙ্গীতরসভোগের অধিকারী, ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা একবাক্যে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াই নিশ্চিন্ত আছেন। সঙ্গীত বিশেষ স্বাভাবিক রুচি বা প্রবৃত্তি আছে, এমন কি প্রতিভাও আছে—সঙ্গীতজ্ঞ বলিতে ইউরোপে এমন লোককে বুঝায় না। সেখানে সঙ্গীতজ্ঞের অর্থ—এসম্বন্ধে যার একটু বেশ ব্যবসাদারী জ্ঞান বা চা'লচলন আছে।

কিন্তু ভারতবর্ষীয়গণের জাতীয় জীবন ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, সেখানে সঙ্গীত ধর্ম্মেরই সহচর, এবং সঙ্গীতানুশীলন যেমন একটা আমোদপ্রদ ব্যাপার, সেইরূপ একটা ধর্ম্মানুষ্ঠানও বটে। বেদ হইতেই সঙ্গীতের উৎপত্তি এবং ইহা অতি প্রাচীনকাল হইতেই ধর্ম্মকর্ম্মের সাহায্যকল্পে নিয়োজিত হইয়া আসিতেছে। এমন কি, আজিও প্রত্যেক ধর্ম্মানুষ্ঠান, ক্রিয়াকলাপবহুল প্রত্যেক উৎসব এবং অনেক নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য পর্য্যন্তও তাল মান লয়-শুদ্ধ সঙ্গীত বা নৃত্যের সাহায্যে সম্পাদিত হইয়া থাকে।"

বৌদ্ধমন্দিরে ঘণ্টা-গৃহ

ইয়োকোহামার একদৃশ্য

India Press. Calcutta

বর্ত্তমান জগৎ
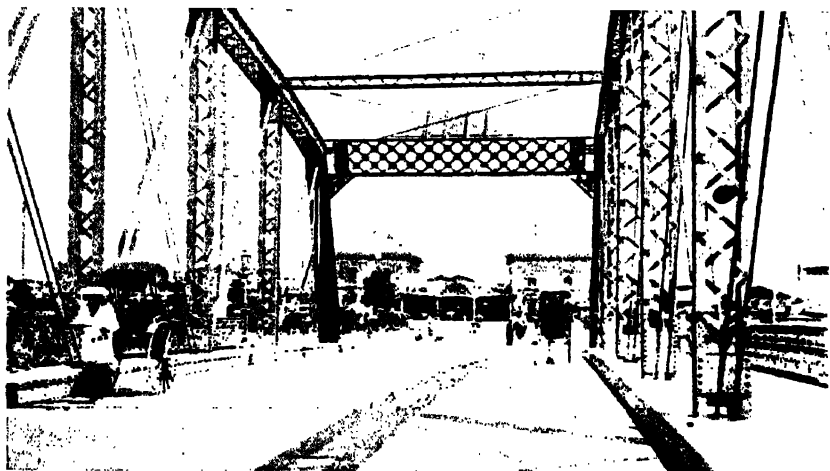
(চতুর্থ ভাগ)

ইয়াঙ্কিস্থান বা অতিরঞ্জিত ইয়োরোপ

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বাধীন এশিয়ার রাজধানী

১। টোকিওর পথে

জাহাজ প্রত্যুষে আসিয়া ইয়োকোহামায় ঠেকিল। জাপানে এখন বর্ষাকাল। আকাশ মেঘে ও কুয়াশায় আচ্ছন্ন। বিলাতেও এই সময়ে অবস্থা প্রায় এইরূপ—কিন্তু শীত কিছু বেশী।

ইয়োকোহামা বন্দর দেখিয়া নিউইয়র্কের বিরাট দৃশ্য ত মনে আসিলই না—এমন কি ফ্রান্সের মার্সেলও জাপানের সেরা বন্দর অপেক্ষা সমৃদ্ধিসম্পন্ন বোধ হইতে লাগিল।

এতদিন পর আবার ভাষাসমস্যায় পড়িলাম। ইংরাজীশিক্ষিত ভারতবাসীর নিকট ইংলিশস্থান ও ইয়াঙ্কিস্থান হিন্দুস্থানেরই বিস্তার মাত্র। এই দুই দেশের প্রত্যেক স্থানে নিজের দেশেই আছি ভাবিতাম। লোকজনের কথা বুঝিতে পারার এই ফল। আজ হিন্দু-প্রভাব-সমন্বিত এশিয়ার এক অংশে পদার্পণ করিবামাত্র নিতান্তই সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। ইয়োরামেরিকার নরনারীগণই এসিয়াবাসী অপেক্ষা ভারতবাসীর আত্মীয় মনে হইতেছে! ভাবিতেছি—"ইংরাজকে, ইয়াঙ্কিকে চিনিতে জানিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি—কিন্তু জাপানীকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াও সফল হইব কি ?"

'এশিয়ার ঐক্য' কথাটা বর্ত্তমানযুগে শব্দ মাত্র। প্রাচীন যুগে ভাষার ঐক্য না থাকিলেও সাহিত্যের ঐক্য, ভাবের ঐক্য, আদর্শের ঐক্য, জ্ঞান বিজ্ঞানের ঐক্য, সুকুমার শিল্পের ঐক্য, পূজাপাঠের ঐক্য ইত্যাদি ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু আধুনিক কালে এশিয়াবাসীর মূলমন্ত্র আসে এশিয়ার বাহির হইতে। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, আদর্শ, প্রেরণা ইত্যাদি সবই এশিয়া ইয়োরামেরিকা হইতে আমদানি করিয়া থাকে। ইয়োরামেরিকার সাগ্‌রেতী করিয়াছি বলিয়া ইয়োরামেরিকার প্রভাবে ও সাহায্যে ইয়োরামেরিকার কৃতী শিষ্য জাপানকে কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিব মাত্র। সুতরাং এশিয়ার ঐক্য মিথ্যা কথা—এশিয়া অনেক। পরন্তু ইয়োরামেরিকা অনেক ক্ষেত্রে সত্যসত্যই এক। ইয়োরামেরিকার ঐক্যেই দুনিয়ায় একটা চলনসই ঐক্যবন্ধন সৃষ্ট হইয়াছে। ইংরাজী ভাষা বর্ত্তমানযুগে এইরূপ এক বন্ধন-রজ্জু।

ইংরাজী ভাষাকে সম্বল করিয়া কোন ইতালীয় পর্য্যটক ভারতবর্ষে আসিলে হিন্দুস্থানের কতখানি বুঝিতে পারিবেন ? ভারতবাসীও ইংরাজীর মাহাত্ম্যে জাপানী-জীবনের ঠিক ততটুকুই বুঝিতে পারিবেন। বরং ইংরাজ-শাসিত ভারতবর্ষে ইংরাজীর সাহায্যে যথেষ্ট উপকার হয়। কিন্তু জাপান ত একমাত্র ইংল্যণ্ডকেই বর্ত্তমান জগৎ বিবেচনা করে না। জাপানীরা কেহ জার্ম্মাণ শিখে, কেহ ফরাসীতে গ্রন্থ লিখে, কেহ বা ইংরাজী চর্চ্চা করে। কাজেই ইংরাজী জানা লোক জাপানে বেশী না থাকারই কথা। মিশরের অবস্থাও এইরূপ দেখিয়াছি। মিশরীয়েরা এতকাল ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের আদরই করিয়াছে।

বন্দরে নামিয়া টুরিষ্ট কোম্পানীর আশ্রয় লইলাম। একজন লোক সঙ্গে পাওয়া গেল—জাতিতে রুশ—ইংরাজী কথা মন্দ বলে না। যথারীতি মাল পরীক্ষা স্থরু হইল। কাষ্টম আফিসের কর্ম্মচারীরা বাক্স খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন তামাক চুরুট ইত্যাদি সঙ্গে আছে কি না। প্রত্যেক বন্দরেই এই ব্যবস্থা।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে যখন মার্কিণ কমডোর পেরি জাহাজ লইয়া জাপানে উপস্থিত হন তখন ইয়োকোহামা একটা ধীবর-পল্লী মাত্র ছিল। আজ এই বন্দরে রণতরী বাঁধা থাকে—ইয়াঙ্কি-রাষ্ট্র এই বন্দরের ভয়ে জড়সড়—এই জাহাজখানার শক্তি খর্ব্ব করিতে পারিলে ইংরাজ, জার্ম্মাণ, ফরাসী, রুশ সকলেই যারপর নাই সন্তুষ্ট হয়। ষাট বৎসরে এই রূপান্তর।

অথচ ইয়োকোহামা সহরটা এখনও নিতান্ত জাঁকজমকহীন ও দরিদ্র দেখিতেছি। না আছে অট্টালিকা বৈভব—না আছে অগণিত লোকসমাগম। ইয়োরামেরিকার নগরগুলির তুলনায় ইয়োকোহামা এখনও একটা পল্লীই বটে।

এই সহরে মোটর-কার নাই বলিলেই চলে—ঘোড়ার গাড়ীও নাই। রাস্তায় হৈহৈ রৈরৈ সামান্য মাত্র দেখিতে পাই না। হোটেল, দোকান, বাজার ইত্যাদির ঐশ্বর্য্যই বা কৈ ? জাপানকে এশিয়ার ইংল্যণ্ড, এবং আজকাল জার্ম্মাণি বলিয়া বিবৃত করা হয়। অথচ তাহার সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র এত দরিদ্র কেন ? দেখিতেছি ইয়োরামেরিকার সমান ধনশালী ও চালচলনশীল না হইয়া ইয়োরামেরিকার বিজ্ঞান ও শিল্পের মূলমন্ত্র আয়ত্ত করা যায়। আর নিতান্ত দরিদ্র পল্লীবাসী জাতিও দুনিয়ায় প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রশক্তি (First class power) হইতে পারে। ইয়োকোহামায় নামিবার পূর্ব্বে এই কথাটা যথার্থরূপে বুঝিতে পারিতাম না। আজ বিস্ময়ের সীমা নাই। এই বিস্ময় দুনিয়ার সপ্তম আশ্চর্য্যজনক বস্তু বা অষ্টম আশ্চর্য্যজনক বস্তু দেখিবার বিস্ময়েরই অনুরূপ।

ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে ঠেলাগাড়ীর চলন আছে। সেইরূপ ঠেলাগাড়ীতে মাল চাপাইয়া জাপানী ঠেলাওয়ালারা সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। আমি বসিলাম মানুষ-ঠেলা রিক্‌শতে। এইরূপ ঠেলাগাড়ী এবং রিক্‌শই ইয়োকোহামার স্থল-যান। কতকগুলি গরুরগাড়ীর মত গাড়ীও দেখা গেল। এই সমুদয়ে মানুষ যাওয়া আসা করে না—মাল চালান দেওয়া হয়। এইগুলির বাহক গর্দ্দভপ্রায় অশ্ব। লিভারপুল, নিউইয়র্কের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাচ্য বন্দরের দৃশ্য এইরূপ।

রাস্তায় লোকজনের পায়ে কাহারও জুতা

আছে কাহারও বা নাই। জুতাও বিচিত্র। কাঠের খড়ম অথবা খড়ের চটি জুতা অধিকাংশ চরণের আবরণ দেখিলাম। চামড়ার সম্পূর্ণ জুতা অথবা বুট প্রায় কোন পথিকের পায়েই দেখা গেল না। বস্ত্রের মধ্যে জাপানী আল্‌খাল্লা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমাদের চোগা চাপকান, মিশরের গালাবিয়া আর জাপানীদের "কিওমনো" একশ্রেণীর অন্তর্গত। মাথার টুপি একধরণের নয়—তবে সকলের মস্তকেই একটা না একটা আবরণ রহিয়াছে। স্ত্রীলোকের মাথায় বিচিত্র খোপাই একমাত্র শিরস্ত্রাণ। জাপানী রমণীরা সর্ব্বদা বসিবার আসন সঙ্গে লইয়া যাতায়াত করে। এই আসন পৃষ্ঠে বোঁচকার মত বাঁধা থাকে। ইহারা শিশুসন্তানগণকে কোলে করিয়া বেড়ায় না—পীঠে বাঁধিয়া রাখে। ভারতবর্ষে পাহাড়ী মেয়েরা এইরূপ করে।

সহরের এদিক ওদিক সামান্য মাত্র ঘুরিয়া রেলওয়ে ষ্টেসনে আসিলাম। নগরের অন্যান্য দৃশ্যে যেরূপ এখানেও সেইরূপ দারিদ্র্যের লক্ষণই দেখিতে পাইতেছি। গাড়ীগুলি ছোট ছোট—কোন মতে কাজ সারা যায় এই উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হইয়াছে। ইয়াঙ্কিস্থান কুবেরের রাজ্য—সেখানকার বিষয়সম্পদ দেখিতে দেখিতে চাল বড় হইয়া গিয়াছে। কাজেই জাপানের বাহ্য অবস্থা দেখিয়া হতাশ হইতেছি। যে পরিমাণে হতাশ হইতেছি সেই পরিমাণে আবার বিস্ময় বাড়িতেছে। যতই বিস্ময় বাড়িতেছে ততই ভাবিতেছি—"রূপেতে কি করে বাপু, গুণ যদি থাকে ?" দুনিয়ার সম্পদহীন জাতিমাত্রেই জাপানের বাহ্য দুরবস্থা দেখিলে স্বকীয় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হইবে সন্দেহ নাই।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। জাপানের কয়েকখানা ইংরাজী সংবাদপত্র পাঠ করিতে লাগিলাম। এই সকল কাগজে আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের পক্ষ প্রধান ভাবে অবলম্বিত হইয়া থাকে। জাপানে একখানা মাসিকপত্র ইংরাজীতে সম্পাদিত হয়। নাম The Japan Magazine. ইহারও এক সংখ্যা কাগজের দোকানে পাওয়া গেল। পূর্ব্ব হইতেই কাগজের কথা জানা ছিল। ভারতবাসীরা এইখানা নিয়মিত পড়িলে নব্য জাপানের লেখকগণকে বুঝিতে পারিবেন। জাপানীরা বিগত দুই বৎসর হইতে ভারতবর্ষের সঙ্গে কারবার বাড়াইবার জন্য ঝুঁকিয়াছে। এইজন্য এই মাসিকপত্রের পরিচালকগণ আজকাল ভারতীয় মাসিকপত্রে নিজেদের বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া থাকেন। লেখকেরা অধিকাংশই জাপানী।

এশিয়া ছাড়িবার সময়ে মিশর দেখিয়াছি—এশিয়ায় প্রবেশ করিবার সময়ে জাপান দেখিতেছি। মিশরে ঐশ্বর্য্য সম্পদ ও সৌন্দর্য্যের আকর দেখিতেছি মনে হইত। জাপানের দৃশ্য প্রথম দৃষ্টিতে একেবারেই চিত্তাকর্ষক নয়।

রেলপথের দুই ধারে নিতান্ত অবজ্ঞেয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীগৃহ। ঘরগুলি যেন খেলানার সামগ্রী মাত্র। খড়ো চালা অথবা খোলা বা খাপরার ছাদ প্রায় অধিকাংশ গৃহেই দেখিতেছি। কোন কোন স্থানে সাধারণ টিনের ছাউনি। দোকানগুলি ভারতীয় পাড়াগেঁয়ে দোকানের মত। ম্যাঞ্চেষ্টার লণ্ডন ইত্যাদির পার্শ্বে এই ধরণের পল্লী কল্পনা করা অসম্ভব।

রেলপথের দুই ধারে কৃষিক্ষেত্র—চাষীরা কাজ করিতেছে। বর্ষাকাল—ক্ষেতে কাদা—কৃষকেরা ছত্রসম বৃহদাকার তালপাতার

টুপি মাথায় পরিয়া আছে। ভূমিতে উদ্ভিদের কোন বিশেষ উৎকর্ষ লক্ষ্য করিলাম না। পোর্ট-সৈয়দ হইতে কাইরোর পথে কৃষি-ক্ষেত্রের কত বিচিত্র দৃশ্য চোখে পড়ে—এখানে তাহার সম্পূর্ণ অভাব। বরং মোটের উপর বিশ্রী ও কদাকার দৃশ্যই দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। স্থানে স্থানে বাঙ্গালা দেশের পচা ডোবার জল ও দুর্গন্ধময় খালের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। স্থানে স্থানে উচ্চ পাহাড় থাকায় চট্টগ্রাম অঞ্চল মনে পড়ে—কখনও কখনও ফরিদপুর বা রাজশাহী জেলার ম্যালেরিয়াপ্রধান মাঠ যেন সম্মুখে বিস্তৃত। গোয়ালন্দ দামুকদিয়া পোড়াদহ ইত্যাদির হাট বাজার দোকান হোটেল ও আবহাওয়া যেন জাপানের এই স্যাঁত্‌স্যাতে অঞ্চলে দেখিতে পাইতেছি। প্রায় ঘণ্টা খানেকের মধ্যে টোকিও পৌঁছিলাম।

২। খোলার ঘরের মহানগরী

টোকিও ষ্টেসন বেশ বড়—কিন্তু রাজধানীর কোলাহল কিছুই শুনিতে পাই না। শুনিলাম এই সহরে বিশলক্ষ নরনারীর বাস—কিন্তু রেলে, ষ্টেসনে, রাস্তায় তাহার কোন চিহ্ন নাই।

ইয়াঙ্কিরা জাপানীদের গুরু—ইয়াঙ্কিস্থানের প্রয়াসেই জাপান দুনিয়ার কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে। কাজেই ইয়োকোহামায় টোকিওতে ইয়াঙ্কি প্রভাব দেখিতে পাইলাম। রেলওয়ে, ষ্টেসন, গাড়ী, যাতায়াত সহরের বিভিন্ন বিভাগ ইত্যাদি সম্বন্ধে জাপানীরা ইয়াঙ্কিদের পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। শাসন এবং কার্য্য নির্ব্বাহও ইয়াঙ্কি মতে হইতেছে।

টোকিওতেও রিকৃশ। ভারতবর্ষের একটা সাধারণ মফঃস্বলের সহরের ভিতর দিয়া যেন যাইতেছি। নিউইয়র্ক লণ্ডন ইত্যাদির কোন কোন রাস্তায় শুইয়া থাকিতে প্রবৃত্তি হয়-- সেগুলি এমনই সুগঠিত সুশ্রী ও পরিষ্কার। টোকিওর পথ ঘাট কর্দ্দমময় অপরিষ্কার। ইয়োরামেরিকার মাপকাঠিতে এখানকার রাস্তাগুলিকে পাকা রাস্তা বলা উচিত নয়। ট্রাম চলিতেছে—কিন্তু লোকের ভিড় নাই। কয়েকটা বড় বড় অট্টালিকা পথে পড়িল—এগুলি ছাড়া অন্যান্য গৃহসমূহ কাষ্ঠনির্ম্মিত ক্ষুদ্র ও অনুচ্চ। ছাদ প্রায় সর্ব্বত্রই টালি-নির্ম্মিত।

হোটেলে জিনিষপত্র রাখিয়া নগরদর্শনে বাহির হইলাম। কাইরোকে প্রাসাদপুরী মনে হইয়াছিল—টোকিওকে কুটির-নগর বলা যাইতে পারে। সত্যসত্যই টোকিও চালা-ঘরের রাজধানী। ইট পাথরের ঘর এখানে অতি বিরল। সহরের মধ্যে এইরূপ উল্লেখযোগ্য ভবন মাত্র দুই চারিটা আছে। বলা বাহুল্য জাপানী নরনারীগণ এই সমুদয় গৃহ অতিশয় কৌতূহলের সহিত দেখিয়া থাকে। আমাদের তাজমহল দেখা আর জাপানীদের "পাকা বাড়ী" দেখা অনেকটা একধরণের।

অনুচ্চ খোলার ঘরের রাজধানীর ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে ইহার একপ্রকার সৌন্দর্য্যও লক্ষ্য করিলাম। সে সৌন্দর্য্যের নমুনা ইয়োরামেরিকার কুত্রাপি পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। ভারতবর্ষের কুটির-সভ্যতায় তাহার নিদর্শন অনেক দেখা যায়। চৌয়ারি আটচালা, বাঙ্গালা ঘর, ইত্যাদির গঠনরীতি দেখা থাকিলে টোকিওর গৃহ-নির্ম্মাণশিল্প অনুমান করা সহজ। আমাদের দেশে মধ্যযুগে জমিদার ও রাজরাজড়ারা এই ধরণের গৃহ প্রস্তুত করিয়াই নগর বা

ডাইমোদ্বয়ের কলহ

টোকিওর একদৃশ্য

India Press, Calcutta.
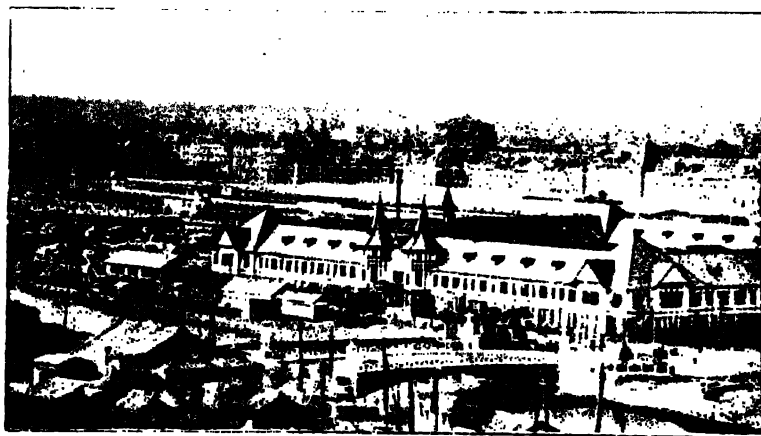
পল্লী বসাইতেন। টোকিওতে ঘুরিতে ঘুরিতে মহারাষ্ট্রের পুণানগরে আছি মনে হইল। সেখানকার "গায়কবাড়-ওয়াড়া" যেন জাপানী রাজধানীর পাড়ায় পাড়ায় দেখিতে পাইলাম।

এতদিন শুনিয়া আসিতেছিলাম যে জাপানীরা আগাগোড়া পাশ্চাত্য সভ্যতার চাপে পড়িয়া জাতীয় বিশেষত্ব বিসর্জ্জন দিতেছে। ইয়োকোহামা এবং টোকিওর বহির্দৃশ্য দেখিয়া ত তাহার কোন পরিচয় পাইলাম না। জাপানের হাট বাজার মাঠ বাগান রাস্তা ঘাট বাড়ীঘর লোক জন ইত্যাদি দেখিয়া ইয়োরামেরিকার প্রভাব শীঘ্র শীঘ্র অনুমাণ করা কঠিন। বরং জাপানীদিগকে ভারতবাসীর জ্ঞাতি বিবেচনা করাই সহজ ও স্বাভাবিক। ইয়োরামেরিকায় ও জাপানে আদৌ কোন আদানপ্রদান বা সংমিশ্রণ আছে কি না তাহা গ্রন্থে বর্ণিত প্রমাণ ব্যতীত হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ। জাপানকে ইয়োরামেরিকার অনুকরণ মাত্র অথবা দাসস্থান বা উপনিবেশ মাত্র ভাবিবার কোন কারণ নাই। জাপানে ইয়োরামেরিকা আসিয়াছে সত্য—কিন্তু সর্ব্বত্র এশিয়াই দেখিতে পাইতেছি।

ইয়োরামেরিকার বিচারে যেরূপ জীবনযাপনকে নিম্নতর মধ্যবিত্ত অথবা দরিদ্র বলা হয় জাপানের লোকজন বাড়ীঘর দেখিলে মোটের উপর সেইরূপ সংসারযাত্রার কথা মনে হইবে। সমগ্র বৈষয়িক জীবনই পাশ্চাত্য সমাজে যথেষ্ট উচ্চতর ভূমির উপর অবস্থিত। অশনবসনের যে সমুদয় দ্রব্য ইয়োরামেরিকায় একান্ত আবশ্যক জাপানীর বিচারে সেগুলি হয়ত বিলাস সামগ্রী স্বরূপ।

কয়েকটা গলি ও সঙ্কীর্ণ বক্র পথ অতিক্রম করিয়া একজন অধ্যাপকের গৃহে আসিলাম। অধ্যাপক গৃহে নাই। একজন আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। আগন্তুককে দেখিবামাত্র সে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। ভারতবর্ষ ছাড়িবার পর এতখানি মস্তক অবনত করা এই প্রথম দেখিলাম। ইয়োরামেরিকায় সম্মান প্রদর্শনের জন্য মাথা হেঁট করিবার রীতি নাই। এশিয়ায় চরণ-বন্দনা করাই দস্তুর। দাসীর কথা আমি বুঝিলাম না আমার কথাও দাসী বুঝিল না। দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিলাম গৃহের ভিতর হইতে একজন রমণী উঁকি মারিয়া দেখিতেছেন। বোধ হয় তিনি অধ্যাপকপত্নী। আবার এশিয়ার কথাই মনে হইতেছে—ইয়োরামেরিকার নয়। স্ত্রী-স্বাধীনতার পাশ্চাত্য সংস্করণ জাপানে অতি সামান্য মাত্র আমদানি হইয়াছে। জাপানে ও ভারতবর্ষে এ বিষয়ে প্রভেদ অল্প। রিক্শ-বাহক সংবাদ লইল অধ্যাপক গৃহে নাই। দুর্গন্ধময় পঙ্কিল নর্দ্দমা ও পাড়াগেঁয়ে "কাঁচা" গলির দৃশ্য দেখিতে দেখিতে হোটেলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

হোটেলের স্বত্বাধিকারিগণ সকলেই জাপানী—কর্ম্মচারী এবং দাস দাসীরাও স্বদেশী। কিন্তু থাকাখাওয়ার বন্দোবস্ত ইয়োরামেরিকার আদর্শে করা হয়। হোটেলে নানাদেশীয় পর্য্যটক অথবা জাপান-প্রবাসী বাস করিতেছেন। জাপানীও কয়েকজন আছেন। রুশ, ফরাসী এবং ইংরাজ পর-রাষ্ট্র-দৌত্য বিভাগের কোন কোন কর্ম্মচারী এই হোটেলের মক্কেল। খানাঘরে জাপানীরা তাঁহাদের স্বদেশী পোষাকই ব্যবহার করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য শ্বেতাঙ্গ অতিথিগণ ইঁহাদের খড়ো চটিজুতা এবং অসভ্যতাসূচক আল্‌খাল্লার বিরুদ্ধে কোন উচ্চবাচ্য করেন

না। ইয়োরামেরিকায় খানাঘরের পোষাক ব্যবহার সম্বন্ধে নিয়ম অত্যন্ত কড়া। কিন্তু জাপান যে first class power—কাজেই তাহার রাজধানীতে শ্বেতাঙ্গদের আস্ফালন টিকিবে কেন?

জাপানী দাস দাসীরা মনিবদিগকে অত্যন্ত খাতির করে দেখিতেছি। ইয়োরামেরিকায় খাতির সম্মান ইত্যাদির রেওয়াজ নাই বলিলেই চলে। বিলাতে Please বা Thank you বলিলেই চূড়ান্ত খাতির করা হয়—ইয়াঙ্কিস্থানে এই সকল শব্দের ব্যবহারও অত্যন্ত কম। ইয়াঙ্কিরা কেহ কাহারও তোয়াক্কা রাখে না। কিন্তু জাপানী ভৃত্যেরা মনিবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উঠে এবং অনেকখানি মাথা নীচু করিয়া অভিবাদন করে। এই অভ্যাস কি নিতান্তই গোলামীর লক্ষণ? ইহাতে জাতীয় চরিত্রের নূতন একপ্রকার উৎকর্ষ বুঝা যায় না কি?

আজ দেখিলাম হোটেলে নৈশভোজনের জন্য বহুলোক আসিতেছেন—সকলেই জাপানী। ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ব্যাপার কি? ইঁহারা কি হোটেলেই থাকেন?" ইনি বলিলেন—"না। আমাদের হোটেল টোকিও-সহরের সমাজ কেন্দ্র। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে এখানে ৮।১০টা সমিতির বৈঠক, আলোচনা, উৎসব ইত্যাদির সঙ্গে ভোজ হয়। জাপানের প্রধান মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের গণ্যমান্য সকল লোকই কোন না কোন উপায়ে এই সকল বৈঠকের সঙ্গে লিপ্ত আছেন। কোন কোন দিন রাত্রে দুই হাজারের অধিক লোকের সমাগম হইয়া থাকে। আজ প্রায় ৬০০ অতিথি উপস্থিত।" ভাবিলাম এই হোটেল ওয়াশিংটনের কস্‌মস্ ক্লাবের সমকক্ষ।

৩। নব্য জাপানের কতিপয় প্রতিষ্ঠান

জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বাঙ্গালা দেশে বর্ষা আরম্ভ হইয়া থাকে। জাপানেও তাহাই দেখিতেছি। আজ পূরাদমে অবিরাম বৃষ্টি পড়িতেছে। বহুদিন পর ঝমঝম বৃষ্টিপাত দেখিলাম—কিন্তু মেঘের গুড়ুম গুড়ুম ভারতবর্ষ ছাড়িবার পর শুনি নাই। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘের দৃশ্যও অনেকদিন দেখা হয় নাই।

বৃষ্টির মধ্যেই রিক্‌শতে বাহির হইলাম। কলিকাতার বর্ষাকাল দেখিতে পাইতেছি। ট্রাম-গাড়ীগুলির ভিতর খড়মের কাদা জমিয়া যাইতেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছাতা মাথায় দিয়া লোক জন চলাফেরা করিতেছে। পাশ্চাত্য ধরণের ছত্র অনেকেই ব্যবহার করে না। আমাদের দেশে কৃষকেরা যেরূপ তালপাতার ধামা স্বরূপ প্রকাণ্ড টুপি ব্যবহার করিয়া থাকে সেইরূপ টুপি টোকিওতেও ব্যবহৃত হইতেছে মাঠের কৃষক এবং রাস্তার পথিক উভয়েই এই ধরণের শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করে। ইহার দ্বারা রৌদ্র বৃষ্টি দুই হইতেই রক্ষা পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া ঘরের চালা-স্বরূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছত্র ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নদীর ঘাটে, সাধু সন্ন্যাসীদিগের আশ্রমে, তীর্থক্ষেত্রে, কুম্ভমেলায় এই ধরণের ছত্র অনেক দেখা যায়। সেই শ্রেণীর ছাতাই আজ বাদ্‌লার দিনে টোকিওর পথে পথে দেখিতেছি। জাপান ইয়োরামেরিকা হইতে এখনও বহুদূরে নহে কি?

বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী দেখিলাম। অধ্যাপক কান্তোবী উয়েদার সঙ্গে নিউইয়র্কে আসিবার সময়ে জাহাজে আলাপ হইয়াছিল।

ইঁহার সঙ্গে জাপানী ভাষা সম্বন্ধে খানিকক্ষণ গল্প হইল। ইনি বলিলেন—"জাপানীদের পক্ষেই জাপানী ভাষা কঠিন—জাপানী অক্ষর পরিচয়ই অনেকের পুরা পূরি হয় না। বিদেশীয় লোকের পক্ষে আমাদের ভাষা আয়ত্ত করা বিশেষ কষ্টসাধ্য।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"জাপানী বর্ণমালা ও লিপি-প্রণালী ত চীনা রীতি অনুসরণ করে। কোন বাঁধাবাঁধি নাই কি?" উয়েদা বলিলেন—"জাপানীরা চীনা লিপি গ্রহণ করিয়াছে সত্য—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা নূতন লিপিও প্রবর্ত্তন করিয়াছে। যে কোন জাপানী গ্রন্থে দুই ধরণের লিপিই দেখিতে পাইবেন। চীনা লিপির উচ্চারণ আবার সমস্যাপূর্ণ। খৃষ্টীয় সপ্তম অষ্টম শতাব্দীতে যে উচ্চারণ ছিল আজকাল চীনালিপির উচ্চারণ সেরূপ নয়। কাজেই কোন অক্ষর বা চিত্র দেখিলে তাহা দুই প্রকারে উচ্চারণ করা যায়। সুতরাং লেখা পড়িতে শিক্ষা করাই একটা প্রধান কাজ হইয়া পড়ে।"

জাপানীরা ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইংরাজী তিন ভাষারই গ্রন্থ সমানভাবে ব্যবহার করেন। ইঁহাদের অধ্যাপকগণ কেহ ফরাসী ভাষায়, কেহ জার্ম্মাণ ভাষায়, কেহ বা ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থাদি রচনা করিয়া থাকেন। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থালয় এই কারণে দেখিবার জিনিষ। চীনা গ্রন্থ ও হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ এখানে যথেষ্ট।

একটা ক্ষুদ্র মিউজিয়ামও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত। ভারতবর্ষের নিদর্শন এক গৃহে সংগৃহীত হইয়াছে। অধ্যাপক জুঞ্জিরো টাকাকুসু দুই তিনবার ভারতবর্ষ হইতে এই সমুদয় লইয়া আসিয়াছেন। শেষবার তাঁহার সঙ্গে দেশে দেখা হয়। টাকাকুসু বৌদ্ধ সাহিত্যাভিজ্ঞ ভারতবাসীর নিকট সুপরিচিত। টোকিওর বৌদ্ধ সাহিত্যাধ্যাপক মহাসেরো আনেসাকি এক্ষণে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেছেন। টাকাকুসু ভারতবর্ষে বিদেশী পোষাকে ছিলেন—আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখিলাম কিওমনো-পরা এবং খড়ো চটি পায়ে। অধ্যাপকগণ দ্বিপ্রহরে বিশ্ববিদ্যালয়ের হোটেলে আহার করেন—বিদেশী ধরণে রান্নাবাড়ি হয়। প্রায় সকল অধ্যাপকই বিদেশের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।

আমেরিকায় দেখিয়াছি ইয়াঙ্কিতে জাপানীতে সদ্ভাববর্দ্ধনের প্রয়াস দ্রুতবেগে চলিতেছে। "জাপান-পরিষৎ" স্থাপিত হইয়াছে—পরিষদের মুখপত্রের নাম New York Japan Review. পরিচালকগণ প্রধানতঃ জাপানী। বিশেষভাবে রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধের আলোচনাই উদ্দেশ্য—অন্যান্য বিষয়েও প্রবন্ধ-সমালোচনাদি বাহির হইয়া থাকে। "Japan Review aims to interpret Japan to America and America to Japan, and promote friendly relations between the two nations." পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মাসুজি মিয়াকাওয়া ডি সি, এল্. এল্, এল্, ডি। ইনি "Life of Japan" এবং "Powers of the American People" গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা।

হার্ভার্ডে দেখিয়াছি অধ্যাপক আনেসাকি জাপানীদের শান্তিপ্রিয়তা প্রচার করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। দুনিয়ায় যাহাতে শান্তি স্থাপিত হয় আজকাল সকল দেশেই তাহার পরামর্শ ও বৈঠক হইয়া থাকে। জাপানীরা এইরূপ শান্তির আন্দোলনে পশ্চাৎপদ নন। টোকিওতে এই জন্য Japan Association Concordia স্থাপিত হইয়াছে। আনেসাকি

ইয়াঙ্কি মহলে এই শান্তি-পরিষদের প্রতিনিধি।

ভারতবর্ষের সঙ্গেও জাপানীদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ করিবার জন্য জাপানীরা ব্যগ্র। ভারতীয় বাজারে জাপানী মালের কাটতি বাড়ানই উদ্দেশ্য। এই জন্য কয়েক বৎসর হইল Indo-Japanese Association নামক জাপানী-ভারতীয় পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে। বহু গণ্যমান্য জাপানী পরিষদের সভ্য—প্রধানতঃ মহাজন ও ব্যবসায়িগণ ইহার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী। নব্য জাপানের পিতৃস্থানীয় রাষ্ট্রবীর কাউণ্ট ওকুমা পরিষদের সভাপতি। দুনিয়ার রাষ্ট্রমণ্ডলে ভারতবর্ষের কোন স্থান নাই—ভারতবর্ষ বৃটিশসাম্রাজ্যের অংশ মাত্র—সুতরাং ভারতবর্ষ বিষয়ক রাষ্ট্রীয় সমস্যা মীমাংসা করিবার জন্য জাপানীরা বৃটিশ জাতির সঙ্গে আলোচনা করিয়া থাকেন। বিগত ৮।৯ বৎসর হইতে ইংরাজের সঙ্গে জাপানীদের offensive and defensive alliance স্থাপিত হইয়াছে। এই সন্ধির ফলে ভারতবর্ষের ভিতর বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে অথবা কোন শত্রুর আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষ রক্ষা করিবার জন্য জাপানীরা ইংরাজকে সকল প্রকারে সাহায্য করিবেন। অধিকন্তু ইংরাজ যদি এশিয়ায় কোন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করেন জাপানও তাহাই করিবেন। সেই বন্ধুত্বের সর্ত্তেই জার্ম্মাণির বিরুদ্ধে ইংরাজের যুদ্ধ সুরু হইবামাত্র জাপান চীনের জার্ম্মাণ রাজ্য আক্রমণ করেন।

কাজেই "জাপানী-ভারতীয়-পরিষদে"র কার্য্যতালিকায় রাষ্ট্রনীতির গন্ধ নাই। এই পরিষৎ বৎসরে দুইখানা ইংরাজী পত্র এবং দুই খানা জাপানী পত্র প্রচার করিয়া থাকেন। পরিষদের উদ্দেশ্য নিম্নে বিবৃত হইতেছে :—

"The object of the Association shall be to promote intimate relations between Japan and Indian countries (British India, Netherlands India, Straits Settlements, Siam, French, Indo China &c).

The work of the Association shall be as follows :—

(1) To study commercial, industrial, scientific and religious topics relating to the above-mentioned countries.

(2) To afford facilities for traffic and communication between the respective countries, and for the investigation and study of things Indian and Japanese.

ভারতবর্ষ শব্দে জাপানীরা সমগ্র ভারতমণ্ডল বুঝিতেছেন। শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, ফরাসী, চীন, যবদ্বীপ, সুমাত্রা ইত্যাদি জনপদ ইহার অন্তর্গত। ভারতবাসীরও এই বিস্তৃত অর্থ গ্রহণ ও প্রচার করা কর্ত্তব্য।

বলা বাহুল্য, বৌদ্ধ সাহিত্যে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ডাক্তার বুনিউ নাঞ্জিও, অধ্যাপক টাকাকুসু এবং অধ্যাপক আনেসাকি এই পরিষদের অন্যতম ধুরন্ধর। আজকাল জাপানের প্রায় ৫০০ মহাজন এই পরিষদের সভ্য। টোকিওর কর্ম্মবহুল অঞ্চলে ইঁহাদের কার্য্যালয় অবস্থিত। একজন প্রধান কর্ম্মচারীর সঙ্গে আলাপ করিলাম। কথাবার্ত্তায় বুঝা গেল—জাপানীরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তন করিতে অগ্রসর হইতেছেন। ইঁহারা রুশিয়াকে পরাজিত করিবার পর ৭।৮ বৎসর কাল ভারতবিরোধী ছিলেন।

সাতচল্লিশ রোগিনের গোরস্থান

খোলার ঘরের রাজধানী

India Press, Calcutta.

এখানে আসিয়া ভারতবাসীরা সহানুভূতি ও হৃদ্যতা পাইত না। সেই যুগের জাপান সম্বন্ধে পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছিলেন—"জাপান ভারতের মিত্র নহে।"

রাষ্ট্রমণ্ডলে মতপরিবর্ত্তন এবং কর্ম্ম-পরিবর্ত্তন অহরহঃ ঘটিতেছে। সুতরাং আট দশ বৎসরের মধ্যে জাপানে ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধে কার্য্য পরিবর্ত্তনের সূচনা হওয়া অতি স্বাভাবিক। বিশেষতঃ গতবৎসর হইতে ইয়োরোপের মহাকুরুক্ষেত্র সমর দুনিয়ার ভারকেন্দ্র স্থানান্তরিত করিতেছে। তাহার ফলে এশিয়ায় জার্ম্মাণ ও অষ্ট্রিয়ান শিল্প এবং বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ রহিয়াছে। ইহাতে একদিকে ভারতবর্ষে স্বদেশী আন্দোলন পুষ্টিলাভ করিতেছে—এমন কি বৃটিশ গবর্মেণ্টও বাধ্য হইয়া ভারতীয় স্বদেশীর সংরক্ষণ করিতেছেন। অপরদিকে এশিয়ায় জাপানের স্বর্ণসুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। শত চেষ্টা সত্ত্বেও জাপান স্বাধীন ভাবে যাহা করিতে পারিতেন না তাহা এই সংগ্রামের ফলে আপনা আপনিই সাধিত হইতেছে। এইরূপেই "একস্য সর্ব্বনাশঃ অন্যস্য তু পৌষমাসঃ" হইয়া থাকে। ইয়োরোপীয়েরা যুদ্ধ করিয়া মরিতেছে—ফাঁক তালে জাপান এশিয়ায় শিল্প ও ব্যবসায়ের সাম্রাজ্য গঠন করিয়া লইতেছেন। সুতরাং ১৯১৫ সালের জাপানে দেখিতেছি—বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ ভারতবর্ষের কথা জানিতে ও শুনিতে উদ্‌গ্রীব। জাপানের সকল মহলেই ভারতবর্ষ লইয়া একটা সাড়া পড়িয়াছে।

একটা ছাপাখানা দেখিলাম। ভারতবর্ষের ছাপাখানাগুলি হইতে এখানে কোন উৎকর্ষ লক্ষ্য করিবার নাই। ইয়োরামেরিকার কার্য্যালয়ে সাধারণতঃ যেরূপ পারিপাট্য, বাহ্য-সৌন্দর্য্য ও সুশৃঙ্খলা থাকে জাপানের কার্য্যালয়ে সেরূপ নয়। ইংরাজী ভাষার জন্য উৎকৃষ্ট মুদ্রাযন্ত্র জাপানে নাই। ভারতবর্ষে ইংরাজী ছাপা জাপানের তুলনায় ভালই হয়। তবে টাইপ হইতে আরম্ভ করিয়া, যন্ত্র, কালী, কাগজ সবই জাপানের স্বদেশী।

ট্রামে কয়েকবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আসা গেল। কণ্ডাক্টর কিংবা পথিক বা ট্রামযাত্রীরা প্রায়ই ইংরাজী জানে না। কাজেই হোটেলের ম্যানেজারের সাহায্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজে আমার গন্তব্য স্থানের নাম জাপানী ও ইংরাজী ভাষায় লিখাইয়া লইতেছি। কাগজের টুক্‌রাগুলি দেখাইয়া রাস্তায় চলাফেরা করিতেছি। রিক্‌শবাহকগণও লেখা পড়িতে পারে। সার্ব্বজনীন শিক্ষার সুফল টুরিষ্ট হিসাবে বেশ বুঝিতে পারা গেল। কোন ফরাসী পর্য্যটক ভারতবর্ষে বেড়াইতে আসিয়া যদি বাঙ্গালা, হিন্দী কিম্বা তেলেগু ভাষায় গন্তব্য স্থানের নাম লিখাইয়া লন তাহা হইলে তাঁহার গমনাগমন সুসাধ্য হয় কি? ভারতবর্ষের গাড়োয়ান মাঝি কুলী মজুরেরা নিরক্ষর যে!

ইংল্যাণ্ডে ও আমেরিকায় লোকসমাগমের কেন্দ্রে সুবিশাল মানচিত্র ঝুলাইয়া যুদ্ধের ফলাফল প্রতিদিন বুঝান হয়। বড় বড় অক্ষরে সংবাদ ছাপান হইয়া থাকে। আপামর জনসাধারণ পথে হাঁটিতে হাঁটিতে একবার সেদিকে দৃষ্টি পাত করে। টোকিওতেও স্থানে স্থানে অট্টালিকার প্রাচীরগাত্রে জাপানের মানচিত্র, আমেরিকার মানচিত্র, ইয়োরোপীয় মহাসমরের মানচিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে—জাপানী আবালবৃদ্ধবনিতা সেইগুলি আগ্রহের সহিত দেখিতেছে। ভারতবর্ষে এই দৃশ্য কবে দেখিতে পাইব?

জাপানের কোথাও ইষ্টক বা প্রস্তরের একটা নূতন সৌধ নির্ম্মিত হইলে তাহা সকলের পক্ষে একটা দর্শনযোগ্য বস্তু বিবেচিত হয়। খোলার ঘরের সহরে পাকা বাড়ী দেখিবার সাধ স্বাভাবিক। এইরূপ দেখিবার উপযুক্ত অট্টালিকা দুইটা একটা করিয়া টোকিওর নানা পাড়ায় মাথা তুলিতেছে। দুইটা বড় বড় দোকানগৃহের ভিতর দেখিলাম। এই দুই স্থানে ইয়াঙ্কিস্থানের রীতি অনুসারে কার্য্য চালান হয়। নামও Department store। প্রত্যেক দোকানে নানাবিধ দ্রব্য বিক্রয় হয়।

প্রথম কোম্পানীর নাম Maruzen & Co., ইঁহাদের পুস্তকবিভাগ দেখা গেল। টোকিওতে ইউরোপীয় গ্রন্থসমূহের ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দোকান। বলা বাহুল্য জাপানের সাধারণ পুস্তকালয়ে চীনা এবং জাপানী গ্রন্থই রক্ষিত হইয়া থাকে। ইরাজী, ফরাসী, জার্ম্মাণ বা রুশ ভাষায় প্রণীত গ্রন্থের জন্য ইয়োরোপে অথবা আমেরিকায় অর্ডার পাঠাইতে হয়। কিছুকাল হইল মারুজেন কোম্পানী এই অসুবিধা নিবারণের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইঁহারা প্রধান প্রধান ভাষায় রচিত বহুবিধ মূল্যবান্ গ্রন্থ সর্ব্বদা মজুত রাখিতেছেন। ইঁহাদের দোকানে বর্ত্তমান বিশ্বসাহিত্যের যে সমুদয় গ্রন্থ রক্ষিত হইতেছে সেই সমুদয় গ্রন্থ ভারতবর্ষের কোন দোকানে দেখিতে পাই না। ভারতবর্ষের সর্ব্ব বিখ্যাত পুস্তকালয়ে ইংরাজী গ্রন্থমালা মাত্রই পাওয়া যায়। কিন্তু মারুজেন কোম্পানী দুনিয়ার পুস্তক আমদানি করেন। কাইরোর কোন কোন দোকানে এইরূপ দেখিয়াছি—কিন্তু সেখানে স্বত্বাধিকারীরা হয় জার্ম্মাণ, না হয় ফরাসী। মারুজেন কোম্পানী আগাগোড়া স্বদেশী—কর্ম্মচারিগণের মধ্যে একজনও বিদেশী নাই—অথচ জার্ম্মাণ, ফরাসী, রুশ, ইংরাজী সকল প্রকার গ্রন্থেরই ব্যবসায় চলিতেছে। অধিকন্তু জাপান এবং চীন সম্বন্ধে দুনিয়ার লোকেরা যাহা যাহা লিখিতেছেন বিশেষভাবে সেই সমুদয় পুস্তকের সংগ্রহও হইতেছে। ভারতবাসী চীন ও জাপান সম্বন্ধে গ্রন্থতালিকা এই ডিপার্টমেণ্ট ষ্টোরের নিকট হইতে লইতে পারেন।

দ্বিতীয় দোকানের নাম Mitsukoshi. লণ্ডন, নিউইয়র্ক, শিকাগোর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিপার্টমেণ্ট ষ্টোরের ইহা সমকক্ষ। দোকান হিসাবে এসিয়ায় ইহার তুলনা নাই। সাজসজ্জা, আস্বাব, শৃঙ্খলা, কার্য্যপরিচালনা, খরিদদারের প্রতি মনোযোগ, কর্ম্মচারিগণের মধ্যে শ্রমবিভাগ ইত্যাদি সকল বিষয়েই মিৎসুকোষী ইয়াঙ্কি বা ইংরাজ দোকান বলা চলিতে পারে। দোকানগৃহও টোকিও নগরের উল্‌ওয়ার্থ বিল্ডিং বা তাজমহল। কোম্পানী আগাগোড়া স্বদেশী—দু একজন বোধ হয় বিদেশীয় কর্ম্মচারী আছেন। মাল স্বদেশী বিদেশী উভয় প্রকারই পাওয়া যায়। নূতন গৃহ মাত্র ১৪ বৎসর হইল নির্ম্মিত হইয়াছে। দোকান অতি পুরাতন—প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। কাজেই পর্য্যটক মাত্রেই অন্ততঃ দেখিবার জন্য মিৎসুকোষীতে আসিয়া থাকেন। আধুনিক এঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার সকলপ্রকার আবিষ্কারই এই ভবনে দেখিতে পাইলাম। তড়িতের শক্তিতে সিঁড়ি উঠা লণ্ডনে প্রথম দেখি—এই দোকানের ভিতরও দেখিলাম। জাপানী এঞ্জিনীয়ারই এই গৃহের নির্ম্মাণে দায়িত্ব পাইয়াছিলেন। অথচ ফরাসী, ইতালীয় ও প্রাচীন ইউরোপীয় বাস্তুরীতি অট্টালিকার ভিতর অবলম্বিত হইয়াছে।

ইহার নিম্নলিখিত বিবরণ উদ্ধৃত হইতেছে:—

The great edifice is of pure Renaissance style and is built of iron and concrete, while its accomodations are superb with the very latest equipments and apparatus. Especially fine are its fire prevention devices. * * * Several automatic sprinklers are provided at the right places throughout the building. Six passenger elevators are in the building, besides an escalator. * * * The mailchutes for the convenience of customers and visitors are installed alongside of the elevators. The cash received for goods is conveyed through pneumatic tubes from all parts of the store to the main cashier's desk on the ground floor.

ইয়োরামেরিকার আধুনিকতম দোকানেও এই সকল ব্যবস্থার অতিরিক্ত কিছু নাই। জাপানীদিগকে দেখিতে নিতান্তই unpromising, বুদ্ধিহীন ও অকেজো বোধ হয়। ইহারা যখন চারি ইঞ্চি উচ্চ কাঠের খড়ম পায়ে দিয়া রাস্তায় ঠকাশ ঠকাশ করিতে হাঁটে তখন ইহাদিগকে রুষ-বিজয়ী জাতি বিবেচনা করা অসম্ভব। অথচ এই চেহারা ও চালচলন লইয়াই জাপানীরা বড় বড় জাহাজও চালাইতেছে—দোকানও চালাইতেছে। ভারতবাসী বহুকাল নিষ্কর্ম্মা থাকিতে থাকিতে সামান্য কার্য্য সাধন করিবার ক্ষমতাও হারাইয়া বসিয়াছে। কাজেই কোন কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আমরা অগ্রপশ্চাৎ ভাবিতে ভাবিতে হয়রাণ হইয়া পড়ি। "আমরা কি এই কাজের যোগ্য?" "আমাদের ধাতে কি ইহা পোষাইবে?" ইত্যাদি নৈরাশ্যসূচক প্রশ্ন আমাদের মাথায় স্থায়ী ঘর করিয়া রহিয়াছে। ছোট খাট কাজকেও মহা গুরুতররূপে প্রচার করা আজকাল আমাদের স্বভাব। ফলতঃ কোন দিকেই আমরা অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। জাপানে আসিয়া দেখিতেছি—সত্যই "মরা হাড়েও ভেল্কি" খেলান যায়! যোগ্যতা, "Fitness", কার্য্যক্ষমতা, ইত্যাদি সম্বন্ধে বেশী উচ্চ মাপকাঠি রাখা বেকুব ও নিষ্কর্ম্মাজাতির প্রকৃতি।

৪। গাইডের সঙ্গে নগরভ্রমণ

জাপানে প্রতিবৎসর প্রায় ২০,০০০ পর্য্যটকের সমাগম হইয়া থাকে। জাপানী ভাষা তাঁহাদের প্রায় কাহারও জানা থাকে না। এই সকল লোকের সুবিধার জন্য গবর্মেণ্ট একটা "টুরিষ্ট বিউরো" স্থাপন করিয়াছেন। এই Japan Tourist Bureau সকলকে বিনামূল্যে পরামর্শ দিয়া থাকেন। বিউরোর কর্ত্তাদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া একজন জাপানী গাইড বা প্রদর্শক নিযুক্ত করিলাম। ইঁহার পারিশ্রমিক দিতে হইবে দৈনিক ৬৲। সহরের ভিতর সারাদিন ঘুরিয়া বেড়াইবার জন্য ল্যাণ্ডো ভাড়া করিতে হইবে। দৈনিক ভাড়া লাগিবে ১৪৲।

গাইড ইংরাজী মন্দ জানেন না। জিজ্ঞাসা করিলাম —"আপনি কি বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিখিয়াছেন?" ইনি বলিলেন—"না মহাশয়, লোকের সঙ্গে কারবার করিতে করিতে আমি এই ভাষা আয়ত্ত করিয়াছি। আমাকে দুই বৎসর আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে কাটাইতে হইয়াছে।" ইনি পূর্ব্বে ভারতীয়

পর্য্যটকগণের সংস্পর্শে আসিয়াছেন। শুনিলাম কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বড়োদার গায়কবাড় যখন জাপানে আসেন তখন তাঁহার সঙ্গে এই প্রদর্শক ঘুরা ফিরা করিয়াছেন। কিছুকাল হইল সিংহলের বৌদ্ধ প্রচারক শ্রীযুক্ত ধর্ম্মপাল জাপান ভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন। এই গাইড তাঁহাকেও সাহায্য করিতেন।

আমাদের দেশে বর্ষাকালে যেরূপ, এখানেও সেইরূপ, কখনও গুঁড়ি গুঁড়ি, কখনও মুসলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। কর্দ্দমময় রাস্তার অবস্থা দেখিয়া ভারতবাসীর নাক শিঁটকান উচিত নয়। পুরুষ ও স্ত্রী সকলেই উচ্চ খড়ম পায়ে চলিতেছে। বৃহদাকার ছাতাও বহু লোকের মাথায় দেখিতেছি। গাইড্ বলিলেন "জাপানের প্রাচীন স্বদেশী ছত্র দুই প্রকার। রৌদ্র হইতে আত্মরক্ষার জন্য একপ্রকার ছত্র ব্যবহৃত হয়। বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার জন্য আর এক প্রকার ব্যবহৃত হয়। দুইই কাগজের তৈয়ারী। বর্ষাকালে যে ছাতা ব্যবহৃত হয় তাহার কাগজ তৈলে সিক্ত করা থাকে।" জাপানীরা কাগজ প্রস্তুত করণে সিদ্ধ-হস্ত। জাপানীকাগজ খুব শক্তও হয়। কাগজের প্রাচীর, কাগজের সূতা ও দড়ি, কাগজের ছাতা ইত্যাদি জাপানের বিশেষত্ব।

চশ্‌মার দোকান

একটা দোকানে প্রবেশ করিলাম। এখানে চশ্‌মাসংক্রান্ত নানা প্রকার কাজ করা হয়। ইয়োরামেরিকার নূতনতম যন্ত্রাদি এই গৃহে অনেকবিধ দেখা গেল। অথচ বাহির হইতে দেখিলে ইহা একটা নিতান্ত নগণ্য ও খেলো কারবারের স্থান মনে হইবে। দোকানে টেবিল চেয়ার ইত্যাদি নাই। চৌকির উপর মাদুর পাতা রহিয়াছে। তাহাতে দুই জন পুরুষ ও একজন রমণী বসিয়া আছে। বসিবার রীতি ভারতীয় ধরণেরই। জাপানীদের বাহির দেখিয়া ভিতর বুঝিবার জো নাই। দারিদ্র্য সত্ত্বেও একটা জাতি কত বড় বড় কাজ করিতে পারে জাপান তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। কিন্তু মনোহারী দোকানদার ফরাসে বসিয়া কারবার চালাইতেছে—এই দৃশ্যই টোকিওর অধিকাংশ স্থলে দেখিতে পাই। মিৎসুকোষী ও মারুজেন কোম্পানীর আড়ম্বর জাপানী ব্যবসায় মহলে অতি বিরল। টোকিও দেখিয়া নিউ ইয়র্ক শিকাগোর সামান্য মাত্র ইঙ্গিতও পাইতেছি না—ভারতীয় মফঃস্বলের পরিচয়ই বেশী পাইতেছি। বর্ত্তমানযুগে Cottage Industry, Small Scale Production ক্ষুদ্র কারবার এবং পরিবারবদ্ধ শিল্পনীতি যন্ত্রচালিত বৃহদাকার কারখানার সঙ্গে কিরূপভাবে চলিতে পারে তাহা বুঝিবার জন্য জাপানে আসা আবশ্যক। জাপানে কুটির সভ্যতা বিলুপ্ত হয় নাই—ফ্যাক্টরীর দৌরাত্ম্য এখানে মারাত্মকভাবে দেখা দেয় নাই বিশ্বাস করিতেছি।

মিকাডো-প্রাসাদ

রাস্তায় দুই পার্শ্বে দোকান-শ্রেণী দেখিতে দেখিতে রাজপ্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইলাম। পথে কতকগুলি সুবৃহৎ অট্টালিকা চোখে পড়িল। প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্ক, আফিস, থিয়েটার ইত্যাদির জন্য এই সকল সৌধ নির্ম্মিত। স্থানে স্থানে দুই একবার নাতিবিস্তীর্ণ খাল পার হইতে হইল। এই খালগুলি মধ্যযুগে নগর-দুর্গের পরিখা ছিল। এক্ষণে গমনাগমনের, বিশেষতঃ মাল আমদানি রপ্তানির জন্য এইগুলি ব্যবহৃত হয়। এই কয়দিনে মালগুলির ভিন্ন ভিন্ন অংশ দেখিলাম। প্রত্যেক অংশেই সর্ব্বদা মহা-

বৌদ্ধ মন্দিরের তোরণদ্বার

আটাগো পাহাড় হইতে টোকিওর দৃশ্য

জনগণের নৌকা যাতায়াত করিতেছে। দেখিয়াছি।

রাজপ্রাসাদে কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। তবে যে বাগানের ভিতর ইহা অবস্থিত তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়। প্রাসাদ মধ্যযুগে নির্ম্মিত—তখন টোকিও নগরের নাম ছিল ইয়েডো। সেই সময়ে সম্রাট্‌গণের ক্ষমতা এক প্রকার ছিল না বলিলেই চলে। সম্রাটেরা কিয়োটো নগরের প্রাসাদে বন্দিস্বরূপ বাস করিতেন। সাম্রাজ্যের যথার্থ ক্ষমতা সেনাপতি বা শোগুনদিগের হস্তগত ছিল। সেই শোগুনেরা টোকিওতে তাঁহাদের কাছারী খুলেন। সেই কাছারীই বর্ত্তমানে রাজপ্রাসাদ। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে শোগুণদিগের ক্ষমতা ধ্বংস করিয়া সম্রাট্ যথার্থ সম্রাট্ হন। এই যুগের নাম Restoration বা Meiji (মীজি) অর্থাৎ সম্রাটের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। সঙ্গে সঙ্গে কিয়োটো হইতে টোকিওতে রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়াছে। আজকাল স্বাধীন এশিয়ার যে রাষ্ট্রকেন্দ্র দেখিতেছি তাহা মাত্র ৪৫ বৎসরের নগর। গাইড্‌কে জিজ্ঞাসা করিলাম—"প্রাসাদের নির্ম্মাণ সম্বন্ধে কোন কাহিনী প্রচলিত আছে কি? এই কার্য্যের জন্য ইয়োরোপীয়েরা নিযুক্ত হইয়াছিল কি?" ইনি উত্তর করিলেন—"সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহা নির্ম্মিত হয়। ওলন্দাজ শিল্পিগণের হাত বোধ হয় ইহাতে কিছু আছে। জাপানীরা ওলন্দাজ প্রভাব কোনদিনই সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করিতে পারে নাই।"

আটাগো পাহাড়

সপ্তদশ শতাব্দীর নির্ম্মিত একটা তোরণদ্বারের নিম্ন দিয়া অগ্রসর হইলাম। প্রাসাদের বাহিরে চারিদিকে বড় বড় সরকারী ভবনসমূহ অবস্থিত। বিচারালয়, পার্ল্যামেণ্ট-গৃহ, ইত্যাদিতে না নামিয়া একটা অনুচ্চ পাহাড়ের পাদদেশে আসিলাম। এই পাহাড়ে একটা শিণ্টো মন্দিরে অল্প হাঁটিয়া শিরোদেশে উঠা গেল। জাপানের গৌরব চেরিবৃসম তরুর শ্রেণী এখানে দেখিতে পাইলাম। বর্ষার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ফুল ফুটিয়াছে—এক্ষণে তরুসমূহ পুষ্পহীন। পাহাড়ে দাঁড়াইয়া নগরের দক্ষিণাংশ আগাগোড়া দেখিয়া লইলাম। মাঝে মাঝে কলের চিম্‌নি হইতে ধূম বহির্গত হইতেছে—অদূরে টোকিও সাগরের জলরাশি—কিন্তু মোটের উপর কৃষ্ণ টালিনির্ম্মিত ছাদের শোভাই দৃষ্টি বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিল। নাতিক্ষুদ্র নাতিবৃহৎ কাষ্ঠ কুটিরের সুন্দর সমাবেশ টোকিও ছাড়া আর কোথাও দেখিব কি না সন্দেহ হইতে লাগিল।

পূর্ব্বে কখনও শিণ্টো-মন্দির দেখি নাই। আটাগো পাহাড়ে এই প্রথম দেখিলাম। মন্দিরের সম্মুখে একটা ক্ষুদ্র আবৃত স্থানে এক চৌবাচ্চায় জল রহিয়াছে। এই জলে হাত মুখ ধুইয়া মন্দিরে পূজা করিতে আসা হয়। মন্দির দেখিতে জাপানের অন্যান্য মন্দিরেরই অনুরূপ। গৃহ-রচনায় জাপানীরা বৌদ্ধশিণ্টো প্রভেদ করিত না। বৌদ্ধ ও শিণ্টো দুই মতাবলম্বী লোকই আটাগোর শিণ্টো মন্দিরে আসিয়া থাকে। এশিয়ায় ধর্ম্মকলহ কখনও গুরুতর হয় নাই। এই মন্দিরের ভিতর কোন মূর্ত্তি দেখিলাম না—কিন্তু বৌদ্ধ মন্দিরে মূর্ত্তিপূজার চরম অবস্থা দেখা যায়। পূর্ব্বপুরুষগণের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি মন্দিরের ভিতর রক্ষিত হইতেছে। পিত্তলের মুকুর শিণ্টোমন্দির মাত্রের প্রধান অঙ্গ। এইগুলির প্রভাবে দুষ্ট প্রেতগুলি দূরে বিতাড়িত হয়। এইজন্য ঢক্কানিনাদও করা হইয়া থাকে।

পূর্ব্বপুরুষদিগের ঢাল তলওয়াল, পোষাক ইত্যাদি মন্দিরের ভিতর সাজান রহিয়াছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে জাপানীরা মুখোস পরিয়া নৃত্য করিত। সেই সকল মুখোসও কতিপয় দেখিতে পাইলাম। শিণ্টোমন্দিরের উপাসকগণ মন্দিরে প্রবেশ করে না—বাহির হইতে দুইবার হাতে তালি দিয়া অবনত মস্তকে পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে।

আটাগো পাহাড়ের পাদদেশে একটা কবরস্থান। ইহা অনেকদিনের পুরাতন—প্রায় ২৫০ বৎসরের হইবে। শিণ্টো মতাবলম্বীরা মৃতদেহ কবর দেয়। বৌদ্ধেরা প্রথমে ইহার অগ্নিসংকার করে, পরে ভস্ম কবরের ভিতর পুঁতিয়া রাখে। কবরের উপর প্রস্তরশিলা স্থাপন করা বৌদ্ধ শিণ্টো খৃষ্টান সকলেরই দস্তুর।

জাপানী ক্ষত্রিয়ের কাহিনী

পাহাড় হইতে নগরের ভিতর অনেকদূর পর্য্যন্ত গাড়ী চলিতে থাকিল। কুটির-সভ্যতার সমাজ টোকিওর সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইতেছি। যোজনব্যাপী মালগুদাম-সদৃশ বাসভবন বা আফিস-গৃহ যদি নব্যজীবনের সাক্ষ্য হয় তাহা হইলে টোকিওকে "সেকেলে" নগর বলিতে হইবে,—"আধুনিকতা" জাপানীসমাজে প্রবলমাত্রায় প্রবিষ্ট হয় নাই।

একটা সুবৃহৎ উদ্যানে আসিয়া পড়িলাম। নানাবিধ তরুবরের প্রভাবে ইহা সর্ব্বদা বনের মত দেখায়। সুদীর্ঘ সরল বৃক্ষের সারি অনেক রহিয়াছে। উদ্যানে সম্প্রতি থামিলাম না। বরাবর এক বৌদ্ধ মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল। একটা ফটক পার হইলাম। দুই পার্শ্বে তীর্থক্ষেত্রের সুপরিচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকান সাজান রহিয়াছে। জাপানী ছবি, ছড়ি, বাটি, পাখা, ইত্যাদি অনেক প্রকার দ্রব্য এইখানে বিক্রয় হয়।

দু এক পা হাঁটিতে হাঁটিতে দুইটি বৌদ্ধ সাধু বা দেবতার প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিলাম। অদূরে একটি তোরণদ্বার—ইহা জাপানের খাসরীতি অনুসারে নির্ম্মিত। ইহা দুইতল বিশিষ্ট—আগাগোড়া কাঠের প্রস্তুত। পার্শ্বস্থিত একটা কাষ্ঠগৃহে ঘণ্টা ঝুলিতেছে। কাশীর বিশ্বেশ্বর মন্দিরের দৃশ্য মনে পড়িল। সুবৃহৎ মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া গাইড্ বলিলেন—"এই মন্দির ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু অগ্নিকাণ্ডে সেই ভবন ভস্মসাৎ হয়—তাহার পর নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। তোরণদ্বার রক্ষা পাইয়াছিল।"

জাপানে বৈশাখ মাসে বুদ্ধদেবের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে জনসাধারণের বিরাট উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময়ে এই মন্দিরে যথেষ্ট লোকসমাগম হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত প্রতিদিনই তীর্থযাত্রীরা মন্দির দর্শন করিতে আসে। বৌদ্ধধর্ম্ম জাপানী-সমাজে জীবন্ত রহিয়াছে। ইয়োরামেরিকার প্রভাবে নব-যুগের লক্ষণ জাপানে যথেষ্ট আমদানি হইয়াছে সত্য—কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগের জীবন-প্রবাহ বিলুপ্ত হয় নাই। তথাকথিত কুসংস্কারসমূহের বিরুদ্ধে নব্য জাপানীরা যতই আন্দোলন করুক না কেন, জনসাধারণের চিত্ত হইতে বুদ্ধ-আত্মার প্রতি অকপট ভক্তি বিদূরিত হয় নাই; এই জন্য জাপানের নর-নারীগণকে দেখিলে ভারতসন্তানদিগের আত্মীয় বলিয়া সহজেই ধরিতে পারি। জাপানীদের চলাফেরায়, উঠাবসায়, ভাব-ভঙ্গীতে ইয়োরামেরিকার চিহ্ন দেখিতে পাই না। এই সমুদয়ে ভারতবর্ষেরই ছাপ যেন মারা রহিয়াছে।
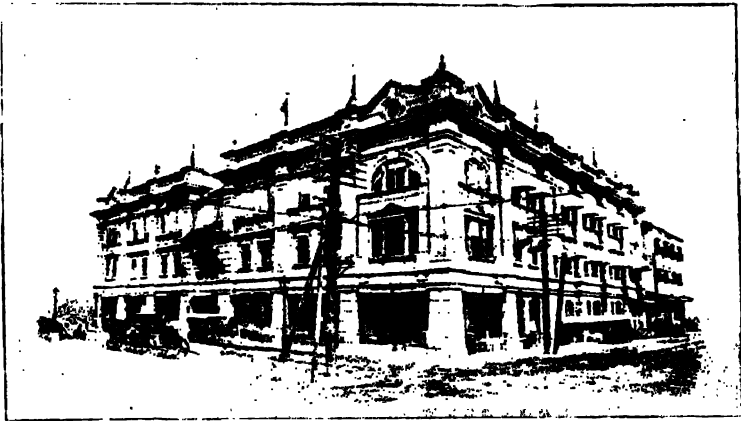
মিৎসুকোশী দ্রব্যভাণ্ডার

জাপানের সামুরাই ক্ষত্রিয়

India Press, Calcutta.

মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে অনেক পুরুষ ও রমণীকে বাগানের ভিতর অন্য একদিকে অগ্রসর হইতে দেখিলাম। গাইডকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই উদ্যানে বৌদ্ধ মন্দির ছাড়া আর কোন দেখিবার জিনিষ আছে কি?" গাইড্ বলিলেন—"জাপানী 'বুশিডো' বা ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের জলন্ত পরিচয় এই বাগানে আছে। জাপানীরা কিরূপ প্রভুভক্ত, সমাজভক্ত ও দেশভক্ত তাহার প্রমাণ এইখানে পাইবেন। মধ্যযুগে জাপানী ক্ষত্রিয়েরা প্রভুর জন্য প্রাণদান করিয়াছিল—তাহাদের কবর এই বাগানের ভিতর অবস্থিত। সেই গোরস্থান অদ্যাপি জাপানীজাতির তীর্থক্ষেত্র।"

প্রাচীন জাপান সম্বন্ধে আধুনিক জাপানীরা ভাবিয়া থাকে—

"দেশের জন্য ঢালিল রক্ত
অযুত যাহার ভক্ত বীর।"

সেই আত্মবলিদানের নাম বুশিডো-ধর্ম্ম। আবার সেই আত্মত্যাগের প্রবৃত্তিকে পূজা করিবার আগ্রহের নামও বুশিডো-ধর্ম্ম! যাঁহারা ভারতীয় রাজস্থানের কাহিনী জানেন তাঁহারা বুশিডো-প্রকৃতি বুঝিতে পারিবেন। কেবল মাত্র শারীরিক বলের প্রয়োগ ও পাশবিক ক্ষমতার বড়াইকে বুশিডো বা ক্ষাত্র-ধর্ম্ম বলা হয় না। অত্যাচারীর আক্রমণ হইতে দীনগণকে রক্ষা করা; স্বজাতি, স্বধর্ম্ম, স্বদেশ ও স্বসমাজের ইজ্জদরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করা; ব্যক্তিগত, পরিবারগত, গোত্রগত, কুলগত মানসম্ভ্রম অটুট রাখিবার জন্য শত্রু নিপাত করা; রমণীজাতির গৌরব রক্ষা করা ইত্যাদি কার্য্যই বুশিডো-ধর্ম্মের অন্তর্গত। "রঘুবংশে" ক্ষত্রিয় শব্দের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে—ক্ষতাৎ কিল ত্রায়তে ইত্যুদগ্রঃ ক্ষত্রস্য শব্দো ভুবনেষু রূঢ়ঃ।" বুশিডো শব্দেরও ব্যুৎপত্তি ঠিক এইরূপ।

গোরস্থানে ৪৭টি কবর দেখিতে পাইলাম। কবরের সম্মুখে ধূপ পোড়ান হয়। গাইডের কথানুসারে ধূপের কাঠি ক্রয় করা গেল। জাপানীরাও এইরূপই করিল। কবরের নিকট মস্তক অবনত করা এবং প্রজ্বলিত ধূপশলাকা স্থাপন করা পূজার অঙ্গ।

এই কবর সমূহে ৪৭ জন"রোণিন"বা ক্ষত্রিয়-বীরের শবদেহ প্রোথিত আছে। ইহারা তাহাদের প্রভুর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য তাঁহার শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। মধ্যযুগে প্রতিহিংসা গ্রহণ করা দুনিয়ার রীতি ছিল। দলাদলি, গৃহকলহ, পারিবারিক বিরোধ, feuds, clan-spirit ইত্যাদি ইংল্যাণ্ডে, ফ্রান্সে, জার্ম্মানীতে, ইতালীতে, ভারতবর্ষে, জাপানে সর্ব্বত্রই বিরাজ করিত। ব্যক্তিগত সম্মানের উনিশবিশ হইলে, অথবা বংশগত কৌলীন্য বা পদমর্য্যাদার সামান্য মাত্র অসম্মান হইলে মধ্যযুগের লোকেরা অস্ত্রধারণ করিত। স্যার ওয়াল্টার স্কটের Lay of the Last Minstrel কাব্যে "Till pride be quelled and love be free" কাহিনী বিবৃত আছে। রাজস্থানের প্রত্যেক কাহিনীই এই বংশমর্য্যাদা বা ব্যক্তিগত মর্য্যাদার আখ্যায়িকা। জাপানের মধ্যযুগেও সেই রেষারেষি, প্রতিযোগিতা, ও প্রতিহিংসার বৃত্তান্ত প্রচুর।

মিকাডোকে কিয়োটোর প্রাসাদে একপ্রকার বন্দী রাখিয়া তাঁহার শোগুণ কর্ম্মচারীরা কামাকুরা নগরে শাসন কার্য্য চালাইতেন। কোন এক জমিদারবংশই চিরকাল শোগুণী করিতে পারেন নাই। বংশে বংশে আড়াআড়ি ও ঠোকাঠুকি সর্ব্ব-

দাই চলিত—এক এক সময়ে এক এক পরিবার শোগুণী বা নবাবী করিত। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে টোকুগাওয়া-বংশীয় জমিদারেরা প্রবল হইয়া উঠে। ইহারা কামাকুরা হইতে ইয়েডো (বর্ত্তমান টোকিও) নগরে শাসনকেন্দ্র স্থানান্তরিত করে। টোকু-গাওয়া নবাবগণের আমলে দুইজন জমিদার-কর্ম্মচারীর মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। একজনের নাম আসানো—আর একজনের নাম কিলা। কিলা উচ্চতর পদের কর্ম্মচারী। ইনি আদেশ দ্বারা আসানোকে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখিতেন। অথচ আসানো কিলা অপেক্ষা চরিত্রে ও দেশ হিতৈষণায় উন্নত ছিলেন। অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া আসানো আত্মহত্যা করেন। আত্মহত্যার নাম জাপানী ভাষায় "হারাকিরি"। গত বৎসর মিকোডোর মৃত্যুর পর সেনাপতি নোগি এবং তাঁহার পত্নী এই-রূপ হারাকিরি করিয়াছেন। পেটের ভিতর ছোরা বসাইয়া প্রাণনাশ করাকে হারাকিরি বলে। বিষপান করা অথবা রিভলভারের সাহায্যে বুকে কিংবা গলায় গুলি করা হারাকিরি নয়।

আসানোর হারাকিরিতে তাঁহার বিশ্বাসী "রোণিন"গণ উত্তেজিত হইল। আমাদের দেশে যাহাকে প্রভুভক্ত লাঠিয়াল বলা হয় তাহাকে জাপানে "সামুরাই" Samurai বলা হইয়া থাকে। রোণিনেরা সামুরাই-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত দল-বিশেষ। প্রভুভক্তি ও যুদ্ধপিপাসা এই দুই লক্ষণে সামুরাই চরিত্র গঠিত। ভারত-বর্ষের প্রত্যেক রাজপুতকে জাপানী ভাষায় সামুরাই বলা যাইতে পারে, এবং প্রত্যেক দলপতি বা chiefকে জাপানী পারিভাষিক অনুসারে ডাইমো (daimio) বলা উচিত।

আসানো ডাইমোর "লাঠিয়ালেরা" প্রত্যেকেই মর্ম্মাহত হইয়া ভাবিতে লাগিল—"প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা সার। প্রতিহিংসা বিনা মম কিছু নাহি আর।" ঘটনা অষ্টাদশশতাব্দীর প্রথমভাগে ঘটিয়াছিল। ডাইমোতে ডাইমোতে বিবাদ প্রায়ই হইত—কাজেই শোগুণের কাণে এই হারাকিরি এবং রোণিনগণের উত্তেজনার কথা শীঘ্র উঠে নাই। রোণিনেরা কিলা ডাইমোর দুর্গ আক্রমণ করিল—ইহারা সংখ্যায় ৪৭। কিলার পেটোয়ারা আসানোর বীরগণের সঙ্গে লড়াইয়ে হার মানিল। রোণিনেরা কিলার মস্তকচ্ছেদন করিয়া সদর্পে আসানোর কবরের নিকট উপস্থিত হইল।

গাইড্ বলিলেন—"পথে আসিতে একটা কূপ দেখিয়াছেন। তাহার জলে কিলার মস্তক ধৌত করা হইয়াছিল। পরে উহা আসানোর কবরের সম্মুখে উপহার স্বরূপ রক্ষিত হয়। আসানোর কবরই এই গোর-স্থানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্রকৃত প্রস্তাবে এই গোর-স্থান আসানোবংশের জন্যই রক্ষিত—তাঁহার ভক্ত রোণিনগণকে পরিবারের অন্তর্গত করিয়া লওয়া হইয়াছে। এইজন্য তাহাদের কবরও এখানে দেখিতে পাইতেছেন।"

কিলা হত হইলে সংবাদ নবাবসর-কারে রটিয়া গেল। শোগুণের বিচারে রোণিনগণের হারাকিরি-দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইল। তাহাদের দোষ—তাহারা দেশের শান্তি ভঙ্গ করিয়াছে। রোণিনেরা আনন্দের সহিত এই আজ্ঞা গ্রহণ করিল। প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিজ হাতে পেটে ছুরি চালাইয়া আত্ম-হত্যা করিল। পরে শোগুণের ঘাতক ইহাদের মস্তক ছিন্ন করিল। বর্ত্তমানকালেও জাপানের আবাল বৃদ্ধ বনিতা ৪৭ রোণিনের

রোণিনেরা কিলার মস্তক প্রভু-কবরের নিকট উপহার দিতেছে

রোণিনেরা কিলা-ভবন আক্রমণ করিতেছে

India Press, Calcutta

প্রভুভক্তি, দেশসেবা ও আত্মত্যাগ কীর্ত্তন করিয়া থাকে।

শোগুণদিগের সমাধি-ক্ষেত্র

এইবার শিবা-পার্কের দিকে ফিরিলাম। বাগানের ভিতর বৌদ্ধ মন্দির এবং শোগুণ দিগের সমাধি অবস্থিত। মন্দির পুড়িয়া গিয়াছে—পুনরায় নির্ম্মিত হইতেছে। প্রাচীন বাস্তরীতি অনুসারেই কাষ্ঠময় ভবন নির্ম্মিত হইবে। টোকুগাওয়াবংশীয় দ্বিতীয় নবাব ও নবাবপত্নীর সমাধি-স্থান দেখিলাম। গৃহগুলি মন্দিরের রীতিতে নির্ম্মিত—সমস্তই কাষ্ঠময়।

সমাধিক্ষেত্রের চতুঃসীমার ভিতর প্রবেশ করিতে কতকগুলি আলোক-স্তম্ভ দুই পার্শ্বে সারিবদ্ধ দেখিলাম। মিশরের লুক্সর-কার্ণাকে স্ফিঙ্কসের সারি স্মরণে আসিল। গৃহে প্রবেশ করিবার সময় দ্বাররক্ষক জুতার উপর কাপড়ের জুতা পরাইয়া দিল। গৃহের মেজে পরিষ্কার রাখিবার জন্য এই নিয়ম। কাইরোতেও মস্‌জিদে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে এইরূপ করিতে হইয়াছিল। গৃহদ্বয়ের অভ্যন্তর অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত। মধ্যযুগের জাপানী সুকুমার শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন এই খানে বিদ্যমান। কেবলমাত্র চিত্রকলা নয়—রঞ্জনশিল্প, ধাতুর কার্য্য, কাষ্ঠশিল্প, Lacquer work ইত্যাদি নানা বিষয়ের উৎকর্ষ দেখিতে পাইলাম। কোন মূর্ত্তি বা প্রতিমা দেখা গেল না। শুনিলাম শোগুণের পরিবারস্থ লোকেরা আসিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের জন্য এখানে প্রার্থনা করিয়া থাকে। তাঁহাদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র, মুকুট, যুদ্ধঢাক ইত্যাদি গৃহের ভিতর পবিত্র ভাবে রক্ষিত হইতেছে।

প্রাচীরগাত্রে এবং ছাদে নানাপ্রকার চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। চিত্রের ভিতর কোন কাহিনী বর্ণিত নাই। প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনাই প্রধান উদ্দেশ্য। উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর নানা সমাবেশ চিত্রকরগণের কার্য্যে দেখিতে পাইতেছি। ময়ূর, সিংহ, পদ্ম, অশ্বত্থ ইত্যাদির চিত্রই বেশী। সিংহ আঁকিতে শিল্পীরা দক্ষ নন বুঝিলাম। এতদিন ইয়োরামেরিকায় নব্যযন্ত্রশাসিত কারুকার্য্য দেখিয়াছি। আজ জাপানী মধ্যযুগের হস্তশিল্প দেখিয়া এক অভিনব জগতে বিচরণ করিতেছি। এ যে মিশর-ভারতের শিল্প-সাধনা। মধ্যযুগের শিল্পকলা বোধ হয় জগতে আর ফিরিবে না। কিন্তু তাহার এক কণামাত্র দেখিলেই হৃদয় আবেগে পূর্ণ হয় কেন? নিউ-ইয়র্কের উল্‌ওয়ার্থ বিল্ডিং দেখিয়া সে রোমাঞ্চ ত অনুভব করি না!

সমাধিক্ষেত্রের চতুঃসীমার মধ্যে স্থানে স্থানে কৃষ্ণ গ্রানাইট প্রস্তরের উপর বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি খোদিত দেখিলাম। কোন কোনটায় বৌদ্ধ জাতকের কাহিনীও বিবৃত রহিয়াছে। নমুনাগুলি ভাস্কর্য্য হিসাবে উচ্চশ্রেণীর অন্তর্গত। একস্থানে একটা ব্রহ্মদেশীয় পঞ্চতল-বিশিষ্ট প্যাগোডা নির্ম্মিত হইয়াছে। বাগানের ভিতর কতকগুলি কর্পূর-বৃক্ষ দেখিলাম।

শিবা-পার্ক ছাড়িয়া রাজকুমারগণের প্রাসাদের দিকে আসিলাম। এই ভবন লণ্ডনের বাকিংহাম প্যালাসের অনুকরণে নির্ম্মিত। পথে সেনাপতি নোগির গৃহ দেখা গেল। নোগির দুই পুত্র রুশ যুদ্ধে মারা গিয়াছিল—তাঁহার পত্নীও স্বামীর সঙ্গে হারাকিরি করেন। এই জন্য নোগি তাঁহার সমগ্র সম্পত্তি টোকিও নগরকে সমর্পণ করিয়াছেন।

জাপানের স্বদেশী হোটেল

ইতিমধ্যে দু একবার জাপানী খানা দেখিয়াছি। আজ ষোড়শোপচারে জাপানী

ভোজনের ব্যবস্থা করিলাম। একটা হোটেলে আসা গেল। যেন গোয়ালন্দের কোন হোটেলে প্রবেশ করিতেছি। একজন দাসী আসিয়া একটা ক্ষুদ্র গৃহে লইয়া গেল। গৃহের ছাদ টালি-নির্ম্মিত ও অনুচ্চ। প্রাচীর এবং মেজে কাঠের প্রস্তুত। কাগজের ব্যবহারও কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে হয়। কাগজের দেওয়াল-বিশিষ্ট ঘরে বসিয়া যেন স্বপ্নরাজ্যে আছি অথবা খেলানার সামগ্রী দেখিতেছি মনে হইতে লাগিল। জুতা খুলিতে হইল। বালিশের মত আসনে আমাদের অভ্যস্ত নিয়মে উপবেশন করিলাম। জাপানীরা আসনের উপর সাধারণতঃ হাঁটু পাতিয়া বসে—আমরা যে ভাবে বসি তাহা কিছু অসভ্যতার লক্ষণ। বর্ষাকাল—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—ঘরে বাতি জ্বলিতেছে না—গৃহের চালা হইতে টুপুর টাপুর জল মাটিতে পড়িতেছে। মাদুরের ফরাসের উপর আসনে উপবিষ্ট হইয়া উর্দ্ধে ও পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিতেছি আর ভাবিতেছি,—জাপানের রাজধানীর ভিতর এরূপ নীরব নিঝুম শান্তিময় স্থান আছে! টোকিও কি আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্র—ইয়োরামেরিকান লণ্ডন নিউইয়র্কের প্রতিদ্বন্দী? এ যে পূর্ব্ববঙ্গের এক পল্লী-কুটির! অথচ টেলিফোনও দেখিলাম—আর তড়িতের বাতিও রহিয়াছে। ইহার নাম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়। পল্লীবাসী, কুটিরবাসী, রিক্তপদ, কিওমনোধারী, ভেতোজাপানীরা Wireless telegraphy, æroplane, এবং তড়িৎ ও বাষ্পের শক্তি নিজস্ব করিয়া লইয়াছে।

যে কুটিরে বসিলাম সেই কুটিরে অন্য কোন অতিথি আসিবে না। গাইড্ বলিলেন—"এইরূপ অনেকগুলি কুটির এই হোটেলে আছে। প্রত্যেকটাই স্বতন্ত্র। রন্ধনাদি একত্র হয়—কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপবেশন ও পরিবেষণের গৃহ।"

দাসী হাঁটু পাতিয়া এবং মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। প্রথমেই চা আসিল। দুধ ও চিনি চার সঙ্গে পাইলাম না। প্রত্যেকের সম্মুখে কাঠের একটা ক্ষুদ্র বাক্সের ভিতর কয়লার আগুনের ভাঁড় রক্ষিত হইল। গাইড্ ধূমপান করেন—আগুনে চুরুট জ্বালাইয়া লইলেন। বাক্সের ভিতর একটা ছোট চোঙ্গা দেখিলাম—তাহার ভিতর চুরুটের ছাই ফেলিতে হয়।

এইবার একটা কাঠের রেকাবিতে খাদ্য দ্রব্য আসিল। চারি পাঁচটা বাটিতে আহার্য্য ও পানীয় রক্ষিত হইয়াছে। বাটিগুলি চীনামাটির প্রস্তুত—অথবা কাষ্ঠ-নির্ম্মিত। কাষ্ঠপাত্রের উপর সোনালি কাজ করিতে জাপানীরা ওস্তাদ। দুইটা কাঠিও রেকাবিতে ছিল। কাঁটা চামচের পরিবর্ত্তে চীনা ও জাপানীরা কাঠি ব্যবহার করে। গাইড্ বলিলেন—"প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য স্বতন্ত্র কাঠি—একজনের ব্যবহৃত কাঠি অন্যে ব্যবহার করে না। পয়সাওয়ালা লোকেরা রূপার কাঠি ব্যবহার করে।" খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে মৎস্যই প্রধান। কাঁচা মাছও জাপানীরা খায়। শুঁটকি মাছও পাওয়া গেল। একটা ঝোল পান করিলাম—তাহার ভিতর চিংড়ি মাছ, পায়রার মাংস, শসা ইত্যাদি সিদ্ধ করা হইয়াছে। বেগুনভাজা খাইলাম। জাপানীরা সকল মাংসই ভক্ষণ করে—গোঁড়া বৌদ্ধগণ গোমাংস খায় না—মৎস্যে কাহারও আপত্তি নাই। খানিকক্ষণ পরে ভাত আসিল। গাইড্ মহাশয় কাঠির সাহায্যে সকল খাদ্যই উদরসাৎ করিলেন। আমি কেবল ঘ্রাণের

অর্দ্ধভোজনং করিলাম। তবে ঝোলটা চলন-সই ছিল। বকৃশিষ সহ মূল্য দিতে হইল সাড়ে তিন টাকা। আহারের পর দাসী গরম জলে গামছা ভিজাইয়া সম্মুখে রাখিল। মুখ মুছিয়া "সয়োনারা" বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। এই কথাটা মাত্র এ কয়দিনে রপ্ত হইয়াছে।

৫। সমর-মিউজিয়াম ও গৃহস্থালী-প্রদর্শনী

টোকিওর পার্ক বা উদ্যানগুলির ভিতরেই বড় বড় সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ অবস্থিত। পার্কের ভিতরেই প্রাচীন মন্দির এবং কবর-সমূহও দেখিয়াছি। একটা বাগানের মধ্যে টোকিওর সর্ব্বপ্রসিদ্ধ শিণ্টোমন্দির দেখিলাম। স্বয়ং মিকাডো এই মন্দিরে পূজা প্রদান করিয়া থাকেন। মন্দিরের সম্মুখে তোরণ-দ্বার যথারীতি অবস্থিত। শিণ্টো তোরণ-দ্বারে এবং বৌদ্ধ তোরণদ্বারে সামান্য প্রভেদ আছে। বৌদ্ধদ্বারের সর্ব্বোচ্চ দণ্ড বক্র—শিণ্টোদ্বারের দণ্ডগুলি সবই সরল রেখার ন্যায় সন্নিবেশিত।

গাইড্ বলিলেন—"এই মন্দিরে সেনা-বিভাগের লোকজনই বিশেষভাবে যোগদান করে। জাপানী বীরগণের মধ্যে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছে তাহাদের পবিত্র স্মৃতি রক্ষার জন্য এই মন্দির উৎসর্গী-কৃত। মন্দিরের বার্ষিক উৎসবের সময়ে সেনাবিভাগ হইতে ইহার সকল প্রকার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।"

শিণ্টোধর্ম্মে পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি বাড়াইয়া দেয়। তাহার ফলে "পিতা-মহদের অস্থিমজ্জা যত ধূলিরূপে তাহে রয়েছে মিশ্রিত" এই "ধ্রুবজ্ঞান" সর্ব্বদা লোকের মনে থাকিয়া যায়। যুদ্ধব্যবসায়ী ক্ষত্রিয় ও বুশিডোগণের পক্ষে ancestor-worship বা পিতৃ-পূজা বিশেষ কার্য্যকরী। যে ধর্ম্ম-মতের দ্বারা অতীত গৌরববাহিণী বাণী সাধারণ্যে সুপ্রচারিত হয় তাহাকে রণপণ্ডিত-গণ সর্ব্বথা সম্মান করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এইজন্য শিণ্টোতত্ত্ব জাপানের রাষ্ট্রীয় ধর্ম্ম।

শিণ্টোমন্দিরের সন্নিকটেই মিলিটারি বা সমর-মিউজিয়াম অবস্থিত। এই ভবনের সম্মুখে কতকগুলি ভগ্ন কামান রক্ষিত হই-য়াছে। রুশযুদ্ধে জাপানীরা যে কামান ব্যবহার করিয়াছিল তাহার দু একটা এখানে দেখিলাম। রুশেরা পোর্ট আর্থার দুর্গে যে সকল কামান ফেলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়া-ছিল তাহারও কয়েকটা এখানে দেখা গেল। এই বাগানে বহুসংখ্যক চেরিবৃক্ষসম বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম।

পয়সা দিয়া মিউজিয়ামের ভিতর প্রবেশ করিলাম। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কামান, গোলা ও বন্দুক অনেকগুলি সাজান রহি-য়াছে। এই সকল পুরাতন অস্ত্র শস্ত্র, রণ-পোষাক, দুর্গের নমুনা ইত্যাদির সংগ্রহে বহু প্রকোষ্ঠ পরিপূর্ণ। এইগুলি দেখিলে রাজপুত-মারাঠা-শিখ-মোগল যুগের যুদ্ধসজ্জাও বুঝিতে পারা যায়।

সামরিক চিত্রের সংখ্যাও মন্দ নয়। প্রসিদ্ধ সেনাপতিগণের ফটোগ্রাফ অথবা তৈলচিত্র, যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য, পুরাতন জাহাজের চিত্র ইত্যাদি প্রায় সকল গৃহেই দেখা গেল।

মধ্যযুগে জাপানী দুর্গ ও প্রাসাদগুলি ধর্ম্ম মন্দিরের রীতিতেই নির্ম্মিত হইত। এই সমুদয় অট্টালিকার মধ্যে একটা পরিবারগত সাম্য লক্ষ্য করিতে পারি।

এই সেদিন চীনের জার্ম্মাণ-বন্দর দখল

করিবার সময়ে জাপানীরা যে এরোপ্লেন ব্যবহার করিয়াছিল তাহাও দেখিতে পাইলাম। জাপানের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবজনক সমর ১৯০৫ সালের রুশ-সংগ্রাম। তাহার পর হইতেই জাপানকে জগতের রাষ্ট্রমণ্ডল প্রথমশ্রেণীর শক্তিরূপে স্বীকার করিতেছে। বলা বাহুল্য সেই রুশ-সমরের কাহিনীই এই সংগ্রহালয়ে যৎপরোনাস্তি বিবৃত রহিয়াছে। কোথাও রুশদিগের রন্ধন-শালা, কোথাও বা তাহাদের যুদ্ধ-সরঞ্জাম জাপানীদের trophy বা লুণ্ঠিত দ্রব্যরূপে বিরাজ করিতেছে।

রুশযুদ্ধের পূর্ব্বে জাপানীরা আর একটা সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিল। ১৮৯৪ সালে কোরিয়ায় গণ্ডগোল উপলক্ষ্যে চীনের বিরুদ্ধে জাপানীরা যুদ্ধঘোষণা করে। তখন ইয়োরামেরিকানেরা জাপানকে বিশেষ সম্মান ও ভয় করিত না। চীন সাম্রাজ্যের বিশাল বিস্তৃতি দেখিয়া তাহারা চীনাজাতিকে ভয় করিয়া চলিত। কিন্তু ইতিমধ্যে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ হইতে জাপানীরা নব্য বিজ্ঞান, নব্য শাসন, নব্য শিল্প ইত্যাদি প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক অভাবিতরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছে। তাহাদের নৌবল এবং সামরিক শক্তিও যথেষ্ট দৃঢ় হইয়াছে। জাপানী সেনা ও রণতরীর সম্মুখে চীনারা উড়িয়া গেল। চীনাদিগকে পরাজিত করিবামাত্র জাপান দুনিয়ায় বিশেষ বিখ্যাত হইয়া পড়িল। ১৮৯৪ সালেই ইয়োরামেরিকানেরা জাপানীদিগের কৃতিত্ব প্রথম লক্ষ্য করিল। তখন হইতে ১৯০৫ পর্য্যন্ত জাপানের গতিবিধি সকলেই মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিল। ১৯০৫ এর পর হইতে জাপানকে ইয়াঙ্কি এবং ইংরেজেরাও খোসামোদ করিতে লালায়িত। যাহাহউক ১৮৯৪ সালের চীনা-সমর নব্য জাপানের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। এই মিইজিয়ামে সেই সংগ্রামের বহুবস্তু প্রদর্শিত দেখিলাম।

নব্য জাপানের জন্ম হয় ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে। সেই বৎসর মিকাডো সম্রাট শোগুণদিগের ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া স্বকীয় আধিপত্য বিস্তার করেন। তখন হইতে জাপানে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, পাশ্চাত্য শাসন, পাশ্চাত্য কায়দার প্রবলভাবে আমদানি সুরু হয়। কিন্তু মিকাডোর সিংহানপ্রাপ্তি সহজে সাধিত হয় নাই। মিকাডোর পক্ষে এবং জমিদারবংশীয়গণের পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হয়। সেই Civil War বা গৃহ-বিবাদের কোন কোন চিত্রও সমরসংগ্রহালয়ে রহিয়াছে। টোকিও সহরের এক উদ্যানে শেষ যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধের এক চিত্রও দেখিলাম।

জাপানের সামরিক ইতিহাসে ১৮৬৮, ১৮৯৪, এবং ১৯০৫ স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। মধ্যযুগের কাহিনীসমূহ বংশগত বিবাদ, ব্যক্তিগত অভিমান ইত্যাদির বৃত্তান্ত। তাহাতে সামরিক তথ্য বা তত্ত্ব বিশেষ কিছু নাই। কাজেই "মিলিটারি মিউজিয়ামে" জাপানী মধ্যযুগের কোন যুদ্ধ বিবরণ নাই। তবে সেই যুগে যোদ্ধারা কিরূপ পোষাক পরিত, শিকারীরা কিরূপ অশ্বচালনা করিত, তীর ধনুক বন্দুক গোলা ইত্যাদি কিরূপ ব্যবহৃত হইত তাহার যথেষ্ট নিদর্শন সংগৃহীত রহিয়াছে। ষোড়শশতাব্দীতে জাপানীরা কোরিয়া দখল করিতে যাইয়া পরাজিত হয়। সেই কোরিয়া যুদ্ধের কোন বস্তু এখানে দেখিলাম না। তখনকার একটা জাহাজ দেখা গেল মাত্র। এশিয়া ও ইয়োরোপে বাষ্পযুগের পূর্ব্বে এক ধরণের জাহাজই নির্ম্মিত হইত।

জাপানীরা সর্ব্বদা গৌরব করিয়া থাকে যে

তাহাদের দেশ কখনও বিদেশীয় জনগণের হস্তগত হয় নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোগলেরা চীন দখল করিয়া জাপান আক্রমণ করে। মোগলের সাম্রাজ্য তখন ইয়োরোপের পশ্চিম সীমা হইতে এশিয়ার পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সর্ব্বগ্রাসী মোগল পরাক্রম দৈবক্রমে বিধ্বস্ত হয়। নাগাসাকি বন্দরের নিকট প্রবল ঝটিকায় মোগল নৌবল ধ্বংস হইয়া যায়। তাহার পর হইতে কোন বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণ জাপানী জাতিকে আশঙ্কিত করে নাই। ইংরাজের মত জাপানীরাও স্বাধীনতার বড়াই করিতে অধিকারী। এই মোগল আক্রমণের কয়েকটা পুরাতন চিত্র দুই তিন প্রাচীরে দেখিতে পাইলাম।

টোকিওর এই মিউজিয়াম দেখিলে সমগ্র জাপানের ধারাবাহিক ইতিহাস হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। প্রাগৈতিহাসিক যুগ এবং প্রস্তর যুগের অস্ত্রাদিও কিছু কিছু সংগৃহীত রহিয়াছে। জাপানের আদিম নিবাসী আইনোদিগের সামরিক জীবনও বুঝিতে পারা গেল।

বর্ত্তমান যুগে ইয়োরামেরিকার রাষ্ট্র-সমূহ যে সকল অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে এক গৃহে সেইগুলির নমুনা সংগৃহীত হইয়াছে। একটা আলমারির দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া গাইড্ বলিলেন—"এই দেখুন চুলের কাছি। চীনা-সমরের সময়ে একজন জাপানী রমণী স্ত্রীলোকের চুল সংগ্রহ করিয়া এই দড়ি প্রস্তুত করিয়াছিল। হাজার হাজার রমণী এই কাছির জন্য তাহাদের কেশ সমূলে নষ্ট করিয়াছিল। এই কাছি এক জাহাজের কাপ্তেনকে উপহার পাঠান হয়।" কোন কোন গৃহে অলঙ্কারস্বরূপ "পোষাকি" অস্ত্র শস্ত্র রক্ষিত হইয়াছে। এগুলি যুদ্ধে ব্যবহৃত হইত না। রাজদরবারে উৎসবোপলক্ষ্যে, অথবা সামাজিক কার্য্যকলাপের সময়ে মধ্য-যুগের "ডাইমো" বা দলপতিগণ এই সমুদয় মণিমুক্তাসমন্বিত তরবারি ধারণ করিতেন।

এক গৃহ সেনাপতি নোগির স্মৃতিরক্ষার জন্য উৎসর্গীকৃত। এখানে সেনাপতি এবং তাঁহার পত্নীর মূর্ত্তি রহিয়াছে। তাঁহাদের দুই পুত্র রুশযুদ্ধে মারা যায়। তাহাদের চিত্রও দেখিলাম। যে পোষাক পরিয়া সপত্নীক নোগি হারাকিরি করেন সেই পোষাকও প্রদর্শিত হইতেছে। নোগি ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মানী, জাপান ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র হইতে যে সমুদয় গৌরবসূচক "ব্যাজ" বা পদক পাইয়াছিলেন সেগুলির সঙ্গে তাঁহার হস্তলিপি এক আলমারির মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে। নোগির পূর্ব্ব পুরুষগণ যে সমুদয় সামরিক দ্রব্য রাখিয়া গিয়াছিলেন সেই সমুদয় বস্তুও এই গৃহে দেখিতে পাইলাম।

টোকিওর নৌচালন-বিদ্যালয়ে একবার আকস্মিক বিপদ্ ঘটে। একটা জাহাজে করিয়া বহুসংখ্যক ছাত্র ও শিক্ষক সমুদ্রে পরীক্ষা কার্য্য করিতে বাহির হন। পরে তাঁহারা নিরুদ্দেশ হইয়া পড়েন। সেই জাহাজের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। মিউজিয়ামের ভিতর এই জাহাজ ও আরোহি-গণের চিত্র দেখিলাম।

সমর-মিউজিয়াম হইতে উয়েনোপার্কে আসিলাম। ইহার ভিতর একটা পুষ্করিণী আছে। তাহার মধ্যে পদ্ম ফুটিয়া থাকে। এই পুষ্করিণীর সম্মুখে একটা সুবৃহৎ গৃহ দেখিলাম। গত বৎসর প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে এই অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়। এই বৎসর এখানে একটা House-Keeping Expo-

sition বা গৃহস্থালী-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইহা স্থায়ী প্রদর্শনী-গৃহ বা মিউজিয়াম স্বরূপ রক্ষিত হইবে।

জাপানীরা ইয়াঙ্কিদের নিকট প্রদর্শনী-পরিচালনা শিখিয়াছে। ব্যবস্থা আগাগোড়া সেইরূপ বোধ হইল। তবে জাপানের সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই দারিদ্র্যের লক্ষণ দেখিতে পাই—প্রদর্শনীর সাজসরঞ্জাম ইত্যাদিও দারিদ্র্যের পরিচয় প্রদান করিল। মেলায় যে সমুদয় বস্তু দেখিলাম এগুলিই কোন ইয়োরামেরিকান নগরে প্রদর্শিত হইলে ইহাদের সৌন্দর্য্য দশগুণ বেশী দেখিতাম। পাশ্চাত্যেরা বাহ্য আয়োজনগুলি অতিশয় উচ্চ অঙ্গের করিয়া থাকে। তাহাতে যথেষ্ট অর্থব্যয় হয়। এশিয়ার লোকেরা সেগুলিকে অনাবশ্যক বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত।

যাহাহউক এখানে জাপানের স্ত্রীশিক্ষা ও রমণীসমাজ সম্বন্ধে সকলপ্রকার তথ্য দেখিতে পাইলাম। চিত্রাঙ্কণ, শিশুবিনয়ন, ধাত্রীকার্য্য, বস্ত্রধৌতকরণ, রন্ধন ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহনির্ম্মাণ, পোষাকপ্রস্তুতকরণ ইত্যাদি সামাজিক জীবনের সকল প্রকার নিদর্শন সংগৃহীত হইয়াছে। গত বৎসরের ভিতর জাপানীরা যে যে বিষয়ে নূতন আয়োজন করিয়াছে এখানে সেইগুলিই প্রদর্শিত। গৃহস্থালীর প্রদর্শনীতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প ইত্যাদি সকল বিভাগেরই পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। এখানে তাহাই দেখিলাম। ডাব্লিনের Civic Exhibition আর টোকিওর House-Keeping Exposition অনেকটা একশ্রেণীর অন্তর্গত।

৬। স্বদেশী জাপান

মিৎসুকোষী কোম্পানী, মারুজেন কোম্পানী, বড় বড় ব্যাঙ্ক ও নব্যধরণের "ষ্টোরস্"-সমূহ গিঞ্জাষ্ট্রীটে অবস্থিত। গিঞ্জাষ্ট্রীটকে টোকিওর চৌরঙ্গি রোড বলা যাইতে পারে। নিউ-ইয়র্কের পঞ্চম য়্যাভিনিউ ও লণ্ডনের পিকাডিলি যাহা, টোকিওর গিঞ্জা-মহাল্লা তাহা। নব্য জাপানীর ব্যবসায়কেন্দ্র এইখানকার আধুনিক অট্টালিকাসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়। এই অঞ্চল দেখিয়া জাপানে ইয়োরামেরিকার প্রভাব কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিতেছি। অবশ্য গিঞ্জা দেখিয়া নিউইয়র্ক লণ্ডনের ধনসম্পদ ও লোক-সমারোহ অনুমান করা অসম্ভব।

গিঞ্জামহাল্লার বাহিরে নগরের স্থানে স্থানে কতকগুলি ইয়োরামেরিকান রীতির সৌধ দেখিতে পাই। এগুলি হয় রাজপ্রাসাদ কিম্বা সরকারী কার্য্যালয়। ইহাদের সংখ্যা বেশী নয়—কিন্তু দুই চারিটা প্রত্যেক অঞ্চলেই আছে। প্রকৃত প্রস্তাবে টোকিওর সর্ব্বত্র জাপানীর জাপানই লক্ষ্য করিতেছি। ক্ষুদ্র কুটির, সঙ্কীর্ণ গলি, কাঠের বাড়ী, কাগজের দেওয়াল, কাঠের খড়ম, কাগজের ছাতা, ঠেলাগাড়ী, ছেলে-পীঠেকরা রমণী, ফরাস-বিছান দোকান, মাছভাতের হোটেল,—ইত্যাদিই সর্ব্বদা চোখে পড়ে। আর ইয়োরামিকার ত্রিসীমানায় নাই—ভারতবর্ষের ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছি মনে হইতেছে। টোকিওতে হ্যাট্-কোট্-পরা, হোটেলবাসী ইয়োরামেরিকাপ্রিয়, জড়বাদী, ধর্ম্মত্যাগী জাপানী কয়জন? বুদ্ধসেবী, কুটিরবাসী, কিওমনো-পরা, পুরাতনতন্ত্রী নরনারীই এখনও জাপানের মেরুদণ্ড। বিগত ৫০ বৎসরের পাশ্চাত্য প্রভাবে স্বদেশী জাপান মারা যায় নাই—ইহার উপর কোন গভীর ও বিস্তৃত বিদেশীয় প্রলেপ পড়িয়াছে কি না সন্দেহ—বরং নূতন প্রবর্ত্তিত ইয়োরামেরিকান অনুষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানগুলিই জাপানীদের সাধারণ জীবন-প্রবাহের অঙ্গীভূত হইয়া যাইতেছে।

শব্জী-বাজার

আজ সকালে বাজার দেখিতে বাহির হইলাম। সহরের সর্ব্বাপেক্ষা বড়বাজারে আসা গেল। বাঙ্গালাদেশের মফঃস্বলে পাড়াগাঁয়ে হাট বসিলে যেরূপ হয় লণ্ডন নিউইয়র্কের সমকক্ষ টৌকিওর বাজার সেইরূপ মাত্র। ইংরাজ ও ইয়াঙ্কিরা এই বাজার দেখিয়া দূর হইতে ত্রাহি মধুসূদন বলিবে সন্দেহ নাই। উঁহারা যে সকল জাতিকে অসভ্য ও অর্দ্ধসভ্য বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত তাহাদের ধরণধারণ সবই জাপানী সমাজে বর্ত্তমান। অথচ জাপান রুশিয়াকে কাবু করিয়াছে—কাজেই সে আজ প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রশক্তি। সুতরাং তাহাকে অসভ্য বলে সাধ্য কার? কিন্তু ইয়োরামেরিকানেরা জাপানকে নিজেদের সঙ্গে একই রাষ্ট্রীয় আসনে স্থান দিতে বাধ্য হইয়া প্রতিপদে মর্ম্মাহত হইতেছে।

একটা মুদীখানায় প্রবেশ করিলাম। চৌকির উপর ফরাস পাতা রহিয়াছে। মুদী মহাশয় হাঁটু পাতিয়া বসিয়া আছেন। ঘরের মেঝে অপরিষ্কার—বিশেষরূপে পাকা-বাঁধান নয়। বাদলার দিনে খড়মের কাদায় ঘর ময়লা হইতেছে। মাছি ভন্ ভন্ করিতেছে। কতকগুলি কাঠের ভাঁড়ে নানাপ্রকার শস্য সাজান রহিয়াছে। আমাদের দেশে চটের বোরায় মাল রাখা হয়—জাপানীরা কাঠের ব্যারেল ব্যবহার করে। কতকগুলি ব্যারেল ঘরের বাহিরে রাস্তার উপরেই রক্ষিত হইয়াছে। মটর, তিল, গোধূম, শিমের বীজ ইত্যাদি দেখিতে পাইলাম। ধান চাউলের দোকান অন্যত্র। টিনের কৌটায় সুরক্ষিত ফলও এই দোকানে আছে। এইগুলি জাপানেই প্রস্তুত। গাইড্ বলিলেন—"এই যে বাক্সের ভিতর কতকগুলি শুষ্ক শব্জী ও ফল দেখিতেছেন এগুলি নিরামিষাশী বৌদ্ধ পুরোহিতগণের খাদ্য।" Sea weeds এবং mushrooms রৌদ্রে শুকাইয়া এইরূপে রাখা হয়।

মুদীখানা হইতে বাজারের ভিতর প্রবেশ করিলাম। ঠিক যেন এলাহাবাদের চকের ভিতর দিয়া চলিতেছি। এখানে কপির পাতা পচিতেছে, ওখানে মুলার শাক পড়িয়া আছে। কোথাও বা ঠেলাগাড়ীতে করিয়া কুমড়া, আদা, বেগুন, সাকরকন্দ আলু, শালগম ইত্যাদি স্থানান্তরিত হইতেছে—কোথাও বা অর্দ্ধাবৃতদেহ ভারবাহী বাঁকে করিয়া মাল চালান করিতেছে। তাহার উপর বৃষ্টির উৎপাতে জল কাদা দুর্গন্ধ ত যথারীতি আছেই।

ছোট ছোট চুপড়ীতে শাকশব্জীগুলি সাজান। দোকানঘরগুলি নিতান্তই ক্ষুদ্র—ঘরের বাহিরেই কেনা বেচা চলিতেছে। কোথাও বা একটা টিনের ছত্রস্বরূপ আবরণের নীচে দোকানদার বসিয়া আছেন। খোলার ছাদওয়ালা গৃহই বেশী। দেখিয়া শুনিয়া কলিকাতার কোন বাজারের কথা মনে হইল না। স্যাঁত স্যাঁতে বিক্রমপুরের হাটবাজার মেলার দৃশ্যই চোখে আসিল। টৌকিও কি "আধুনিক" নগর?

আমাদের দেশে বাজারের স্থানে স্থানে চাল কড়াই ভাজার দোকান দেখা যায়। এখানে সেইরূপ চার দোকান। কয়েকটা অন্ধকারময় ঘরে রুটি তৈয়ারী হইতেছে। মাছে আলুতে মিশাইয়া এই রুটি তৈয়ারি করা হয়। একজন অর্দ্ধউলঙ্গভাবে একটা গামলার ভিতর লাফাইতেছে—তাহার পায়ের

নীচে রুটির উপকরণ। টোকিওর বাজারে ফল বেশী দেখিলাম না। জাপানীরা ফর-মোসা হইতে কলা আমদানী করে এবং আমেরিকা হইতে লেবু আনয়ন করে। পূর্ব্বে জাপানে নাসপাতি জন্মিত না। কিছু-কাল হইল যুক্তরাষ্ট্র হইতে এই গাছের চারা আনা হইয়াছে। এক্ষণে নাসপাতি জাপানেই উৎপন্ন হয়।

হস্ত-শিল্পের কারবার

শব্জীবাজার হইতে বাহির হইয়া নগরের নানাস্থানে কতকগুলি দোকান দেখা গেল। এই সকল দোকান ইয়োরামেরিকায় দেখিতে পাই না। ভারতবাসীর পক্ষে অবশ্য এগুলি নূতন নয়। এই সমুদয়ে মধ্যযুগের জাপান, এশিয়াবাসী জাপানী এবং জাপানীর জাপান বুঝিতে পারা যায়। জাপানীরা যে ভারত-বাসীর শিষ্য ও আত্মীয় তাহার পরিচয় এইখানে পাইলাম।

বিলাতে ও ইয়াঙ্কিস্থানে আজকাল প্রায় সকল পদার্থই কলে প্রস্তুত হয়। বিগত ৩০।৪০ বৎসরের ভিতর জাপানেও যন্ত্রচালিত কার-খানার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। ছুরী কাঁচি হইতে গরদ পশম পর্য্যন্ত সকল বস্তুর জন্যই জাপা-নীরা ছোট বড় ফ্যাক্টরী স্থাপন করিয়াছে। টোকিও, ওসাকা, নাগাসাকি ইত্যাদির কোন কোন কারখানায় দশ হাজার নরনারী কর্ম্ম করিতেছে।

এই সকল কারখানায় যে সমুদয় জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারে তাহা ছাড়া ইয়োরামে-রিকায় বর্ত্তমানযুগে আর কোন বস্তু পাওয়া যায় না। কিন্তু জাপানে এখনও বহু জিনিষ হাতেই তৈয়ারী হয়—সেগুলির ফ্যাক্টরী বৃহৎ যন্ত্রচালিত কারখানা নয়—ক্ষুদ্র বৃহৎ পরিবারের কুটির, জাপানীদের এই হস্তশিল্প, কুটির-শিল্প এবং পরিবারগত কারবার না দেখিলে জাপানের যথার্থ রূপ দেখা হয় না। স্বদেশী জাপান বুঝিবার জন্য হস্তশিল্পের, handicrafts ও industrial artএর কয়েকটা দোকান খুঁজিয়া লইলাম। গাইডের সাহায্য আবশ্যক হইল।

ধাতুশিল্পের নমুনা দেখিয়া পাশ্চাত্যেরা বিস্মিত হইবেন। কিন্তু ভারতবাসীর চোখে এগুলির বিশেষত্ব বেশী নাই। তবে সোনা রূপা কাঁসা হাতীর দাঁত ইত্যাদির উপর জাপানী অলঙ্কার-সমাবেশ নূতন। এনামেল এবং চীনামাটির শিল্প সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। কাশী, মোরাদাবাদ, মুর্শিদাবাদ, তাঞ্জোর ইত্যাদির arts and crafts দেখা থাকিলে এই ধরণের কারুকার্য্য দুনিয়ার অন্যত্র দেখিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু দুইটা শিল্প বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। Lacquer ware বা সোনালি গালা (লাহা) নির্ম্মিত কলাইয়ের কার্য্যে জাপানীরা সুদক্ষ। এগুলি অতিশয় মনোরম। দ্বিতীয়তঃ, রেশমের উপর বুনন কার্য্য ইহাই জাপানীদের খাস শিল্প। এ বিষয়ে ইহারা জগতে অদ্বিতীয়।

সোনালি গালার কাজ ইতিমধ্যে জাপানের নানাস্থানে দেখিয়াছি। সাধারণ থালা বাটি বাক্স ছুরি ইত্যাদির উপর ইহার প্রলেপ যেখানে সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়। সেদিন টোকুগাওয়া বংশীয় দ্বিতীয় শোগুণের সমাধি-মন্দিরে সচিত্র lacquer worksএর প্রাচীর ও ছাদ দেখিয়া এক অভিনব শিল্প-জগতের পরিচয় পাইয়াছিলাম। ফরাসী শিল্প-সমালোচক M. Louis Gonse বলেন—"Japanese lacquered objects are the most perfect works that have ever issued from the hands of men."

জাপানের এই কারুকার্য্য সম্বন্ধে stewart Dick তাঁহার The Arts and Crafts of old Japan গ্রন্থে বলিতেছেন :—"The most wonderful of all Japanese arts is their lacquer work, and perhaps in this more completely then in any other medium does the peculiar genius of Japan find expression. * * * Even were the same brilliant faculty of design the gift of the European, the amazing and unfaltering precision of hand, and the limitless patience and unceasing care required by the technical processes, place lacquer work far beyond his scope."

রেশমী কাপড়ের দোকানে আসিয়া বিস্ময়ে আপ্লুত হইলাম। রেশমের উপর নানা রংয়ের রেশমী সুতার বুনন দেখিতেছি কি কাগজ কিম্বা কাম্বিশের উপর তুলির ছবি দেখিতেছি, কি সম্মুখে জীবন্ত পশুপক্ষী তৃণ-লতা দেখিতেছি বুঝা কঠিন। এই সকল কার্য্য পর্দ্দার জন্য, গালিচায় ব্যবহারের জন্য, আসনের জন্য টেবিল ক্লথের জন্য, অথবা দেওয়ালে ঝুলাইয়া রাখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। শিল্পীরা জাপানের প্রসিদ্ধ তীর্থ-স্থান, মন্দির, প্রাকৃতিক দৃশ্য, ঋতু, হ্রদ, নদী, সমুদ্র, আগ্নেয়গিরি ইত্যাদি এই রেশমী শিল্পে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিয়াছে। এই দোকানের সংগ্রহালয়ে দাঁড়াইয়া সমগ্র জাপা-নের প্রতিকৃতি দেখিয়া লইলাম।

জাপানীদের এই শিল্প ভারতবর্ষে নিতান্ত অপরিচিত নয়। Kakemono (কাকেমনো) নামক লম্বমান রেশমী চিত্রপট আমরা দেশে দেখিতে পাই। তাহাতে জাপানের ফুজি পর্ব্বত অথবা মিয়াজিমা শিণ্টো মন্দিরের তোরণদ্বার কিম্বা নারা নগরের বৌদ্ধ মন্দির, কিম্বা জাপানী বারমাসের বার ফুল দেখিয়া থাকি। এই সকল কাকেমনো মানচিত্রের মত গুটাইয়া রাখা যায়। জাপানী চিত্র-করেরা ছবি কাঠের ফ্রেমে বাঁধাইয়া রাখে না। চিত্র ঝুলাইয়া রাখা এবং আবশ্যক হইলে গুটাইয়া রাখা এদেশে দস্তুর। কাকে-মনোর আবিষ্কার চীনে হয়—পরে কোরিয়া হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে বৌদ্ধশিল্পের সকল অঙ্গ জাপানে আমদানি হইয়াছে।

এই রেশমী বুনন কার্য্যের দোকান জাপানে সুপ্রসিদ্ধ। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে টোকু-গাওয়া শোগুণদিগের আমলে এই দোকান খোলা হয়। সেই শোগুণেরা সকল প্রকার শিল্পকর্ম্মের উৎসাহদাতা ও সংরক্ষক ছিলেন। তাঁহাদের অর্ডার পাইয়াই কারিকরেরা সহিষ্ণু-তার সহিত হস্তিদন্ত, গালা, ধাতু, রেশম ইত্যাদির উপর সূক্ষ্ম কারুকার্য্য ফলাইতে সমর্থ হইত।

দোকানদার বলিলেন—"চৌদ্দ পনর বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ তাতা মহাশয় জাপানে আসিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট আমরা অনেক জিনিষ বেচিয়াছি। পাঁচসাত বৎসর হইল বড়োদার গায়কবাড় এখানে আসেন। তিনিও বহুসংখ্যক কাকেমনো, পর্দ্দা, টেবিলক্লথ, বিছানার চাদর ইত্যাদি ক্রয় করিয়াছেন।"

দুইখানা সুবৃহৎ পর্দ্দা দেখিলাম। একটার উপর সমুদ্রের তরঙ্গ বুনা হইয়াছে—অপরটায় পার্ব্বত্য প্রদেশে ধান্যক্ষেত্র দেখিতে পাই-তেছি। প্রথমটার মূল্য ৩০০০৲ দ্বিতীয়টার মূল্য ৬০০০৲। দুই কারিগরই কিয়োটো

নগরে বাস করেন। ইহাঁদের মত আরও অনেক ওস্তাদ কিয়োটোতে আছেন। ইহাঁদের কোন ফ্যাক্টরী নাই—স্বগৃহে সাগ্‌রেতের সাহায্যে কার্য্য করিয়া থাকেন। ভারতীয় গৃহ-শিল্প এইরূপ।

দোকানদার বলিলেন—"আমরা ইহাঁদের নিকট "ডিজাইন" চাহিয়া পাঠাই। বুনন কার্য্যের জন্য আর একশ্রেণীর লোক নিযুক্ত করি। সর্ব্বসমেত আমাদের অধীনে রেশমী-কার্য্যে ১০০ কারিগর কার্য্য করে। আমাদের দোকানের অন্যান্য বিভাগও আছে। কাগির সংখ্যা প্রায় ১০০০। কোন একস্থানে এই সকল লোক সমবেত হয় না। দশ বারটা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যালয় আছে। কোথাও আধুনিক যন্ত্রাদির ব্যবহার নাই।"

এই দোকানের বড় আফিস এবং কার্য্যালয়-গুলি কিয়োটোতে অবস্থিত। কিয়োটো নগর বহুকাল পর্য্যন্ত জাপানের রাজধানী ছিল—ইহা জাপানীদের দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, গৌড় বা মুর্শিদাবাদ। কাজেই এই নগর সকল প্রকার সুকুমার ও সূক্ষ্ম শিল্প-কারুকার্য্যের কেন্দ্রস্থল। দোকানের নাম নিশিমুরা কোম্পানী। রেশমী বুনন কার্য্য ষোড়শশতাব্দীতে শিল্পী শিজো কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছিল। কেইনিন, কোকিও প্রভৃতি আধুনিক কারিগরেরা তাঁহারই চেলা।

মুক্তার চাষ

মুক্তার কারবার সমগ্র এশিয়ার স্বদেশী। জাপানেও মুক্তার ব্যবসায় প্রসিদ্ধ। টোকিওর "মিকিমোতো পার্ল্‌ ষ্টোর" এই প্রাচ্য শিল্পের বিখ্যাত দোকান।

এই দোকানে মুক্তার জিনিষ অনেকবিধ রহিয়াছে। কিন্তু সেগুলি দেখিবার জন্য এখানে আসি নাই। এখানে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগে ইচ্ছানুরূপ খাঁটি মুক্তা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা আছে শুনিয়াই আসিয়াছি।

শুক্রনীতিতে বর্ণিত আছে যে সিংহলের লোকেরা কৃত্রিম উপায়ে মুক্তা প্রস্তুত করিত। এইজন্য সংস্কৃত নাটকীয় সাহিত্যে দেখিতে পাই যে খাঁটি মুক্তা বাছিয়া লইবার জন্য সুদক্ষ জহুরি নিযুক্ত হইত। কৃত্রিম মুক্তার বিবরণ আমরা পাশ্চাত্য সাহিত্যেও পাই। Imitation pearls, Roman pearls, Venetian pearls ইত্যাদি নামে কাচ, পাথর ইত্যাদি চালান হইত। কিন্তু জাপানের এই দোকানে সেইরূপ নামে মাত্র মুক্তার ব্যবসায় চলিতেছে না। দোকানের স্বত্বাধিকারী মিকিমোতো মহাশয় সমুদ্রের ভিতর আসল মুক্তা-জীবের পালন বা চাষ করিতেছেন। Agriculture, Horticultur, Pisci-culture ইত্যাদির ন্যায় Pearl-cultureও খাঁটি বিজ্ঞানের সাহায্যে চলিতেছে। সমুদ্র হইতে প্রকৃতির দান স্বরূপ মুক্তার অল্পমাত্র পাওয়া যায়। বিশেষ আয়োজনের ফলে মিকিমোতো প্রতিবৎসর বহুসংখ্যা মুক্তা পাইতেছেন। কাজেই বলা যাইতে পারে যে তিনি "attempts to make the pearl oyster work for man and produce natural and true pearls in a more reliable and methodical manner than nature—in short· a kind of "harnessing" the mollusc for the Service of man". ইয়াঙ্কি লুথার বার্ব্বাঙ্ক উদ্ভিজ্জগতে যাহা করিতেছেন জাপানী মিকিমোতো ঝিনুক শামুকের জগতে তাহাই করিতেছেন। ইহার তৈয়ারী মুক্তার কাটতি আজকাল বিলাতে ও আমেরিকায় বেশ বাড়িয়া চলিয়াছে।

টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবতত্ত্বাধ্যাপক ডাক্তার মিৎসুকুরীর পরামর্শে মিকিমোতো মুক্তার চাষে প্রবৃত্ত হন। মাছের চাষ যে কারণে সম্ভব, ঝিনুক শামুকের চাষও সেই কারণেই সম্ভব। যথারীতি ঝিনুকের চাষ করিতে পারিলে মুক্তালাভের আশা করা যায়। কৃত্রিম উপায়ে সকণ্টক উদ্ভিদ্‌কে নিষ্কণ্টক উদ্ভিদে রূপান্তরিত করা দেখিয়াছি। মিকিমোতোর দোকানে কৃত্রিম উপায়ে স্বাভাবিক মুক্তাফলের উৎপত্তি দেখিলাম। মুক্তার আবাদ-প্রণালী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে :—

Every year during the months of July and August, small pieces of rock and stone are placed where the oyster larvæ are most abundantly found. Soon small oyster spats are found attached to them. As this takes place in the shallow waters, if the oysters were left there during the winter they would die from chill. So together with the stones to which they are anchored, they are removed to deeper waters when they reach their third year, they are taken out of the sea, and undergo an operation which leads to the pearl formation. This consists chiefly in introducing into them small pearls or round pieces of nacre which are to serve as nucleü of pearls. The shells are then put back into the sea and carefully laid down on the bed. They are left there undisturbed for at least four years more. At the end of that period it will be found that the animal has invested the nucleus with many layers of nacre and in fact produced a pearl."

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

হংসদূত

বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে যে সকল কবি কাব্য লিখিয়া মানবহৃদয়ে প্রেমভক্তির সঞ্চার করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীল রূপগোস্বামী মহোদয় অন্যতম। শ্রীরূপের প্রণীত অনেক গ্রন্থ আছে,—সকলগুলিই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণির নাম বঙ্গীয় বৈষ্ণব মাত্রেরই সুবিদিত। এতদ্ব্যতীত ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাধব নাটকের নামও সুপ্রসিদ্ধ। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা বহুবার এই সকল গ্রন্থের পরিচয় পাইয়াছেন। যিনি নাটকচন্দ্রিকায় নাটকীয় লক্ষণ লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহার লিখিত ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাধব নাটক যে নাটকীয় লক্ষণে দোষ বিবর্জ্জিত হইবে ইহা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু এই দুই গ্রন্থের প্রকৃত প্রশংসা নাটকীয় লক্ষণ নিয়ামক নহে পূজ্যপাদ গ্রন্থকার এই

দুইখানি নাটকে যে মধুময় প্রেমভক্তির উৎস উৎসারিত করিয়া রাখিয়াছেন তাহাতে চিরদিনই তাঁহাকে প্রেমিক ভক্তসমাজে অমর করিয়া রাখিবে।

পবিত্র পুরুষোত্তমক্ষেত্রে সপার্ষদ শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এইরূপের এই দুই নাটকের রসাস্বাদন করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর ও শ্রীরায় রামানন্দকে এই দুইখানি নাটক শুনাইতেন, এক একটি শ্লোক শ্রবণে ভক্তগণ আনন্দ সুধাসাগরে একবারেই নিমগ্ন হইতেন যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

"যত ভক্তবৃন্দ আর রামানন্দ রায়।
শ্লোকশুনি সবার হৈল আনন্দ বিস্ময়॥
সবে কহে নাম মহিমা শুনিয়াছি অপার।
এমন মাধুর্য্য কেহ নাহি বর্ণে আর॥"

আবার অন্যত্র—

"রায় কহে তোমার কবিত্ব অমৃতের ধার।
দ্বিতীয় নাটকের কহ নান্দী ব্যবহার॥"

অপিচ—

"এতশুনি রায় কহে প্রভুর চরণে।
রূপের কবিত্ব গাহ সহস্র বদনে॥
কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার।
নাটক লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার॥
প্রেম পরিপাটি এই অদ্ভুত বর্ণন।
শুনি চিত্তে কর্ণের হয় আনন্দ ঘুর্ণন॥"

এই বলিয়া রসময় কবি শ্রীরামানন্দ একটি প্রাচীন শ্লোক বলিয়া নিজের বাক্য সমর্থন করিলেন, সে শ্লোকটি এই :—

"কিং কাব্যেন কবেস্তস্য কিং কাণ্ডেন ধনুষ্মতঃ।
পরস্য হৃদয়ে লগ্নং ন ঘূর্ণয়তি যচ্ছিরঃ॥"

অর্থাৎ সেই কবির কাব্যেই বা কি প্রয়োজন যদি উহা পাঠক ও শ্রোতার হৃদয়ে স্পর্শ করিয়া তাহার চিত্ত ঘূর্ণন করিতে সমর্থ না হয়, আর ধনুর্দ্ধারী বীরের সেই ধনুঃ কাণ্ডেরই বা কি প্রয়োজন, যদি সেই কাণ্ড অপরের হৃদয়ে লগ্ন হইয়া তাহার শিরোঘূর্ণন উপস্থিত করিতে না পারে? রূপের কাব্য শ্রবণে প্রকৃতস্থ থাকা সহজ নহে। তোমার শক্তি সঞ্চার ব্যতীত জীবের যে এইরূপ শক্তি হইতে পারে ইহাত আমার ধারণার বহির্ভূত।

"তোমার শক্তিবিনে এই জীবের নহে বাণী।
তুমি শক্তি দিয়া কহাও হেন অনুমানি॥"

প্রভু বলিলেন—প্রয়াগে ইহার সহিত আমার মিলন হয়, ইহার গুণে আমি ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। তোমরা ইহার নাটক শুনিলে তো?

"মধুর প্রসঙ্গ ইহার কাব্য সালঙ্কার।
ঐছে কবিত্ব বিনে নহে রসের প্রচার॥
সবে কৃপা করি ইহার দেও এই বর।
ব্রজলীলা রস প্রেম বর্ণে নিরন্তর॥"

ইহার পরে অখিল রসামৃত মূর্ত্তি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ইহার জ্যেষ্ঠ শ্রীল শ্রীপাদ সনাতনের পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইলেন :—

ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হয় নাম সনাতন।
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তার সম॥
তোমার যৈছে বিষয় ত্যাগ ঐছে তার রীতি।
দৈন্য বৈরাগ্য পাণ্ডিত্যের তাহাতেই স্থিতি।
এই দুই ভাই আমি পঠাইনু বৃন্দাবন।
শক্তি দিয়া ভক্তি শাস্ত্র করিতে প্রবর্ত্তন॥"

শ্রীপাদ রূপের কবিত্ব সমৃদ্ধির গুহ্যতত্ত্ব উহাতেই ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীপাদ রূপকৃত স্তবাবলীও ভাববৈভবে ও শব্দসম্পদে বাস্তবিকই বিস্ময়জনক।

এই অমর কবির সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির অধিকাংশই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত। কিন্তু হংসদূত ও উদ্ধব সন্দেশের নাম তত প্রসিদ্ধ নহে। আমরা এইস্থানে হংসদূতের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া ভক্ত পাঠকগণের সমক্ষে

বৌদ্ধ মন্দিরের তোরণদ্বার

আটাগো পাহাড় হইতে টোকিওর দৃশ্য

এই গ্রন্থখানি সমুত্থাপিত করিতে প্রয়াস পাইব।

বিরহবিধুর নায়কনায়িকার দূতদূতী-প্রেরণ-ব্যাপার-অবলম্বনে সংস্কৃত ভাষায় অনেক খণ্ডকাব্য দেখিতে পাওয়া যায়। মহাকাব্যের অন্তরালেও কখন কখন এইরূপ ব্যাপারের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। মহাকবি কালিদাস মেঘদূত-বিরচণের পূর্ব্বে খুব সম্ভবতঃ বিরহবিধুর নরনারীর বিরহবিহ্বলতা-জনিত উদ্ভ্রান্তচিত্তের এতাদৃশ দূতপ্রেরণ ব্যাপারের আভাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও আমরা ভ্রমর দূত দেখিতে পাই। কিন্তু কালিদাসের পূর্ব্বে এ বিষয়ে অপর কেহ কোনও খণ্ডকাব্য রচনা করিয়াছিলেন কি না, তাহার অনুসন্ধান করি নাই। পদাঙ্কদূত গ্রন্থখানি আধুনিক। বৈষ্ণব সমাজে এ গ্রন্থখানি বহুদিন হইতে সুপ্রচলিত। বটতলার প্রকাশকগণ বহুবার বাঙ্গালা পদ্যানুবাদের সহিত এই পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা শৈশব সময়ে গুরুজনদের মুখে পদাঙ্কদূতের আবৃত্তি শুনিয়াছি, তাঁহাদের চরণ সন্নিধানে উপবেশন করিয়া উহার অনেক শ্লোক কণ্ঠস্থও করিয়াছিলাম। কিন্তু তখনও হংসদূতের নাম শুনি নাই।

শ্রীরূপের গ্রন্থ অনুসন্ধান করিতে করিতে হংসদূতের নাম দেখিতে পাই, এবং উজ্জ্বল নীলমণি প্রভৃতিতে হংসদূতের দুই একটি শ্লোকও দেখিতে পাই। সে অনেক দিনের কথা। তাহার পরে ভগবদিচ্ছায় একখানি সুলিখিত সটীক হংসদূত গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হয়। টীকাকার সুবিখ্যাত বন্দ্যঘটীয় শ্রীল গোপাল চক্রবর্ত্তী। ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার কৃত দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডীর-টীকা পাঠ করিয়াছিলাম। গোপাল গমঘড়ীয় বন্দ্যবংশ-সম্ভূত; উপাধি—চক্রবর্ত্তী। ইনি ১৫১৬ শাকে এই টীকা প্রণয়ন করেন। টীকার উপসংহারে তিনি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন সেই স্থলেই উক্ত শকেরও উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয় অন্যান্য গ্রন্থে গ্রন্থ-প্রণয়ন-কাল নির্দ্দেশ করিলেও হংসদূতের উপসংহারে সে নিয়ম রক্ষা করেন নাই। হংসদূত যে উজ্জ্বল নীলমণি ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্বে বিরচিত এই দুই গ্রন্থ পাঠ করিলেই তাহা জানা যায়। এই দুই গ্রন্থের মধ্যে হংসদূতের অনেক শ্লোক উদাহরণ রূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। ভক্তিরসামৃত গ্রন্থখানি ১৪৬৩ শকে রচিত হইয়াছিল। ইহার প্রায় ২৫ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রয়াগে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সন্দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। খুব সম্ভবতঃ ১৪৩৭ বা ১৪৩৬ শকেরও পূর্ব্বে হংসদূত লিখিত হইয়াছিল। আমাদের এরূপ অনুমান করার কারণ এই যে শ্রীরূপ মহাপ্রভুর সহ সম্মিলন লাভের পরে যেসকল গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন সেই সকল গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বন্দনা কি দৃষ্ট হয়। কিন্তু হংসদূতে মহাপ্রভুর নামোল্লেখ নাই। সুতরাং ইহা একবারেই সুনিশ্চিত যে হংসদূত অতি পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ যে সুবিখ্যাত শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামীরই লিখিত তাহাতেও কোনও সন্দেহ নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধীয় লঘু তোষণী টীকার শেষে শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহাদের যে স্বীয় বংশাবলীর পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে হংসদূত শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত বলিয়াই উল্লেখিত আছে।

এখন এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানির সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা প্রয়োজনীয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—শ্রীরূপের এই কাব্যখানি—খণ্ড-

কাব্য। সাহিত্যদর্পণে খণ্ডকাব্যের যে লক্ষণ লিখিত আছে তাহা এইরূপ—

"খণ্ডকাব্যং ভবেৎ কাব্যস্যৈকদেশানুসারিক" যথা মেঘদূতাদি।

অর্থাৎ কাব্যের একদেশ মাত্র অবলম্বনে যে কাব্য রচিত হয়, তাহারই নাম খণ্ডকাব্য, যেমন মেঘদূতাদি। খণ্ডকাব্যও বহু প্রকার। সাহিত্যলক্ষণ বিচারক পণ্ডিতগণ কাব্যের শ্রেণী ও নাম বিনির্ণয়ে খণ্ডকাব্যের বহুল প্রকার-ভেদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন সেই সকল লক্ষণের বিচারে জানা যায় হংসদূত "সাংঘাখ্যে" খণ্ডকাব্য। উহার লক্ষণ এই :—

"যত্রৈকমর্থমেকেন সর্গেণৈবতু বর্ণয়েৎ।
একেন ছন্দসা তত্তু সাংঘাতাখ্যমুদাহৃতম্॥"

অর্থাৎ যে কাব্য এক ছন্দে এক সর্গে একমাত্র অর্থ বর্ণিত হয় সেই কাব্য সাংঘাতাখ্য খণ্ডকাব্য।

বিরহিণী নায়িকা শ্রীমতী রাধিকার বিরহ-ব্যথায় ব্যথিতা হইয়া তাহার মর্ম্মসখী শ্রীমতী ললিতা বিহ্বলা হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট বিরহব্যাকুলা শ্রীমতীর অন্তিমদশা জানাইবার জন্য এতই অধীরা হইয়া পড়িয়াছিলেন যে একটি হংসকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া তাহাকেই এই সংবাদ প্রেরণের দূতরূপে বরণ করিলেন।

কালিদাস অচেতন মেঘকে যক্ষের দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত করিতে গিয়া একটা কৈফিয়ৎ দিয়া লিখিয়াছেন।

"কামার্ত্তা হি প্রকৃতি কৃপণ চেতনাচেতনেষু"

শ্রীপাদ রূপগোস্বামীও এই রীতির অন্যথা করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন :—

"ধৃতোৎকণ্ঠা সদ্যোহরিসদসি সন্দেশহরণে"

টীকাকার এস্থলে লিখিয়াছেন :—

"উৎকণ্ঠা যুক্তাত্বাৎ যোগ্যা যোগ্য-
বিচারোহপি ন কৃতঃ।"

অর্থাৎ উৎকণ্ঠাযুক্ততা নিবন্ধন যোগ্যাযোগ্য বিচার করার অবসর ঘটে নাই।

অপিচ পাছে কেহ মনে করে যে বিশেষ জ্ঞানহীন পক্ষীকে এই গুরুতর কার্য্যের ভার দিয়া ললিতা ভাল কার্য্য করেন নাই তাই শ্রীপাদ গ্রন্থকার অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার দিয়া অপর শ্লোকে লিখিয়াছেন :—

"ন তস্যা দোষোহয়ং যদিহ বিহগং প্রার্থিতবতী।
ন কস্মিন্ বিশ্রম্ভং দিশতি হরিভক্তি প্রণয়িতা॥"

টীকাকার মহাশয় ইহার পরিস্ফুট ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন :—

ননু "বিশেষ জ্ঞানহীনং পক্ষিণং কথং দূতং কৃতবতী?" ইত্যাহ—"ইহ দৌত্য করণে যদ্বিহগং প্রার্থিতবতী তস্যায়ং সারাসার বিচার বিচাররহিত্ব দোষো ন। তত্র হেতুঃ— হরিভক্তি প্রণয়িতা শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবনাতিহর্ষিতা কস্মিন্ জনে বিশ্রম্ভং বিশ্বাসং ন দিশতি? হরি ভক্তি রসিকস্য সর্ব্বত্রেশ্বর দৃষ্ট্যা উচ্চনীচ ভেদাভেদাভাবাৎ। যদ্বা বিশ্রম্ভং প্রণয়ং হরিভক্তস্য সর্ব্বত্র প্রণয়াৎ।"

অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞানহীন পক্ষীকে ললিতা দৌত্য কার্য্যের জন্য বরণ করিলেন কেন? গ্রন্থকার বলিতেছেন, সারাসারবিচাররহিত পক্ষীকে দৌত্যকার্যে নিয়োগ ললিতার পক্ষে দোষের কারণ হয় নাই, কেননা শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রীতির এমনই মাহাত্ম্য যে উহার ফলে মানব-হৃদয় সর্ব্বত্রই বিশ্বাস স্থাপন করে। যেহেতু হরিভক্তিরসিক ব্যক্তিদিগের সর্ব্বত্রই ঈশ্বর জ্ঞান জন্মে তাহার ফলে উচ্চনীচ ভেদজ্ঞানের অভাব ঘটে। অথবা এমনও হইতে পারে যে হরিভক্তের কোথাও অপ্রণয় নাই, সুতরাং সর্ব্বত্রই তাঁহার বিশ্বাস।

বলা বাহুল্য ভক্ত কবি এইভাবে এই কাব্যের প্রায় সকল স্থানেই ভক্তির সুধা ধারার উৎস উৎসারিত করিয়া রাখিয়াছেন।

একমাত্র বিপ্রলম্ভ রসই এই কাব্যে প্রবাহিত হইয়াছে। এক সর্গে কাব্য পরিসমাপ্ত হইয়াছে। পদ্যগুলি শিখরিণী ছন্দে লিখিত। সর্ব্বশুদ্ধ একশত বিয়াল্লিশটী মাত্র পদ্যে এই খণ্ডকাব্য পরিসমাপ্ত হইয়াছে। গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র হইলেও ভক্ত ভাবুক ও সাহিত্যিক মাত্রের নিকটেই এই কাব্য সমধিক সমাদৃত। টীকায় কাব্যের মর্ম্মার্থ পরিস্ফুট করা হইয়াছে। বলাবাহুল্য বন্দ্যঘটীয় শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী বহুগ্রন্থের সুপণ্ডিত টীকাকার। তাঁহার টীকা সর্ব্বত্রই মধুর। টীকা ও অনুবাদসহ গ্রন্থখানি প্রকাশ করা অতি প্রয়োজনীয়। বাঙ্গালী গ্রন্থকার ও বাঙ্গালী টীকাকারের রচিত গ্রন্থ বাঙ্গালীদের আদরের ও গৌরবের সামগ্রী।

শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ

আসাম প্রদেশে বাঙ্গালা ভাষার প্রবর্ত্তক

৺গোপীনাথ ন্যায়ালঙ্কার

যে সকল বাঙ্গালী ইংরাজ আমলের প্রাথমিক সময়ে বাঙ্গালার বাহিরে ভারতবর্ষের নানাস্থানে আপনাদিগের প্রতিভাজাত প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিয়াছিলেন, কালপ্রভাবে তাঁহাদিগের স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

আসামপ্রবাসী ঐরূপ দুই একটি বাঙ্গালীর কর্ম্মজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার মানস করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে, ৺স্বর্গীয় পণ্ডিত গোপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ন্যায়ালঙ্কারের জীবনী সংক্ষেপে লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আসামে ইংরাজ-রাজত্বের অভ্যুদয় হইয়া পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষা বিস্তারের প্রাথমিক সময়ে ইনি শিক্ষাপ্রচারকল্পে আসামে আগমন করিয়া বঙ্গভাষায় শিক্ষা বিস্তার করেন।

৺গোপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলী জেলার বালীগড়ী পরগণার অন্তঃপাতী হরিপাল থানার অধীনে গোধা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ন্যায়ভূষণ। গোধার সুবিখ্যাত বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে বিদ্যাবুদ্ধি এবং সাধন প্রভাব অনেকের ছিল জানা যায়। বংশপরিচয়ে ইনি ফুলে মেল, গয়ঘড় গাঁই, হিরণ্য বন্দ্যোর সন্তান শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভঙ্গ কুলীন ব্রাহ্মণ। ইঁহারা পুরুষানুক্রমে পাণ্ডিত্য খ্যাতি অর্জ্জন করতঃ চতুষ্পাঠী স্থাপনা ও বিদ্যাদান করিতেন। তদ্ব্যতীত দেবত্র ব্রহ্মত্র ভূম্যাদির আয়ে স্বচ্ছলভাবে ক্রিয়া কর্ম্মান্বিত ও বহু প্রতিপাল্য প্রতিপালন করিয়া জীবন যাপন করিতেন। এ বংশে ৺গোপীনাথ ন্যায়ালঙ্কারের পূর্ব্বে কেহই রাজকীয় বৃত্তিভুক হইয়া রাজকর্ম্মে নিয়োজিত হইবার বাসনা করেন নাই।

ইঁহার পিতা ৺রামমোহন ন্যায়ভূষণ মহাশয় যবন বা ম্লেচ্ছের অধীনে বেতন ভোগী হইয়া শাস্ত্রালোচনা তথা বিদ্যাদান কার্য্যে অত্যন্ত বীতরাগ প্রদর্শন করিতেন। তদীয় জনৈক ছাত্রকে সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক পদ গ্রহণ জন্য আবেদন করিতে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ৺তারানাথ বাচস্পতি মহাশয় অনুরোধ করিলে

ন্যায়ভূষণ মহাশয় উত্তর দেন, আমার ছাত্র বেতনভোগী হইয়া ম্লেচ্ছের অধীনে শিক্ষাদান করিতে সম্মত হইবে বলিয়া মনে হয় না। শিরোমণি উপাধিধারী সুবর্ণবণিকযাজী তদীয় জনৈক ছাত্রকে আবেদন করিতে বলা হইলে, শিরোমণি মহাশয় বলেন, জীবিকার্জ্জনের জন্য হিন্দু সুবর্ণবণিকের দানগ্রহণ করিয়া পতিত হইয়া আছে, আবার ম্লেচ্ছের অধীনে বেতনগ্রাহী হইয়া বিদ্যাদান ব্যবসায় করিতে আজ্ঞা করিবেন না।

এহেন পিতার পুত্র গোপীনাথ, স্বয়ং সুপণ্ডিত হইয়াও কেন যে ম্লেচ্ছাধীনে শিক্ষা বিভাগে কর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাঁহার উপার্জ্জনের জন্য এ হীনতা স্বীকার করিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না, যেহেতু তখনও তাঁহার পৈত্রিক বিত্ত জনিত সাংসারিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল।

তাঁহার সার্ভিস বুকের নকল দৃষ্টে জানা যায়, ১৮৬১ সনে তাঁহার ষাট বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। তদ্দ্বারা অনুমান হয় তিনি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেই জন্মগ্রহণ করেন। যে উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা ও শিক্ষা সম্প্রসারিত হইয়া সমগ্র জগতকে জ্ঞানের নবীনদীপ্তিতে উদ্ভাসিত করিতেছিল, সেই শতাব্দীর প্রভাব এই ব্রাহ্মণকুলেও গোপীনাথে প্রথম সঞ্চারলাভ করিয়াছিল। বঙ্গদেশে এই সময়টা রামমোহন রায়ের যুগ। ৺রামমোহন ন্যায়ভূষণ মহাশয় রাজর্ষি রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত সংস্কারের প্রতিদ্বন্দ্বী দলের অন্যতম ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। তদানীন্তনকালের যে সকল গণ্যমান্য কলিকাতাবাসী ভদ্রলোকগণ রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত সংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেন, যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহাদিগের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন ৺পণ্ডিত রামমোহন ন্যায় ভূষণ তাঁহাদিগের অন্তর্গত ছিলেন। অথচ এই রামমোহনের ঔরষে পণ্ডিত গোপীনাথ জন্মগ্রহণ করিয়া পিতৃবিদ্যমানে তাঁহার অভিলষিত কার্য্যসাধনের জন্য পিতার ইচ্ছা বা রুচি অথবা বংশগত নিয়ম পালন করা আবশ্যক মনে করেন নাই।

গো পীনাথ পাণ্ডিত্যোচিত উপাধি লাভ করিয়া তদানীন্তন কালের অনেক ইংরাজ-রাজপুরুষকে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাদানকল্পে ব্রতী হইয়া তৎকালীন অনেক ইংরাজ-রাজপুরুষের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত হইয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানোন্নতি অনেকটা লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল ভারতের জনসাধারণ বহুলরূপে শিক্ষালোক প্রাপ্ত না হইলে ভারতের ভবিষ্যৎ কল্যাণ সূচিত হইবার আশা নাই।

তৎকালীন যে সকল উচ্চপদস্থ ইংরাজ-রাজপুরুষ ভারতে আগমন করিতেন, তাঁহাদের অনেকেই মনে করিতেন এতবড় একটা জাতির বহুকালের অধীনতা ও জড়তাজাত মলিনতা দূর হইয়া পাশ্চাত্য জ্ঞানের সহিত প্রাচ্য জ্ঞানের সম্মীলন হইয়া উন্নতিলাভ করিতে না পারিলে মঙ্গল হইবে না। এতবড় একটা জাতির প্রতি একটা কর্ত্তব্যের দায়িত্বভার ঈশ্বরকর্ত্তৃক তাঁহাদিগের উপর প্রদত্ত হইয়াছে বিবেচনা করিতেন।

উচ্চবংশীয় ভদ্রশ্রেণীর ভারতবাসীর সহিত উচ্চপদস্থ ভদ্রশ্রেণীর ইংরাজগণ কার্য্যক্ষেত্রে কর্ত্তব্যের অধীন হইয়া উচ্চতন অধস্তনভাবে মিলিত হইয়া বন্ধুভাবে সহযোগীতায় কার্য্য করিতেন। শাসক ও শাসিতভাব বদ্ধমূল হইয়া প্রভুভৃত্যের ন্যায় ক্ষমতা পরিচালনা ও আজ্ঞা প্রতিপালনে পর্য্যবসিত হইত না।

ভদ্র শ্রেণীর ভারতবাসীগণের চাকরী প্রবৃত্তি তখন তত পরিমাণে বদ্ধমূল হয় নাই, এবং অভাবের তাড়না ও বিলাস ব্যসনের ব্যয়াধিক্য এতটা পরিমাণে ছিল না। সংযমের ক্রোড়ে লালিত পালিত হওয়ায় তাঁহাদের আত্মমর্য্যাদা পরিস্ফুট থাকিত। কাজেই কর্ম্মজীবনে দাসত্বের তীব্রতা অনেককেই ভোগ করিতে হইত না। সুতরাং সে কালে অনেক ভদ্রবংশীয় ভারতবাসী আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া ইংরাজ-রাজপুরুষের অধীনতায় সম্মান সহকারে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কর্ত্তব্য পরিচালনার ও স্ব স্ব অভিরুচি অনুরূপ দেশের উন্নতিকল্পে কার্য্য করিবার সুযোগ পাইতেন। সেই জন্য তদানীন্তনকালের অনেক ভারতীয় রাজকর্ম্মচারী রাজকার্য্যে নিয়োজিত হইয়া রাজপুরুষদিগের সহায়তায় দেশসেবা করিয়া গিয়াছেন। নেতা ও নেতৃভাবে স্বার্থ সংঘর্ষ ফলে এখনকার কালের ন্যায় এতটা দূরে থাকিয়া দেশের কার্য্য করিবার জন্য স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিবার ভাব তখন বড় একটা দেখা যাইত না।

গোপীনাথের অভিলষিত জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তাররূপ কর্ম্মক্ষেত্রের উপযুক্ত ক্ষেত্র ভগবৎকৃপায় আসামে নির্দ্দিষ্ট হইল।

আসাম যখন ইংরাজের অধীন হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল যাবৎ, দেশে অন্তর্বিপ্লবে দেশের অবস্থা অতীব শোচনীয় ভাব ধারণ করিয়াছিল। ইংরাজ যখন এদেশে প্রভুত্ব স্থাপন করেন তখনকার এদেশের অবস্থা মিলস্ রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া যায়। বাহুল্য ভয়ে ঐতিহাসিক বিবরণ এস্থলে উল্লেখ করিতে বিরত হইলাম। ফলকথা লিখিতে পড়িতে জানা লোক এক একটি জেলায় কুড়ি ত্রিশ অথবা পঞ্চাশের অধিক ছিল না। ভয়ঙ্কর প্রলয়ঙ্কর প্রজাবিদ্রোহ ও রাষ্ট্রীয় বিপ্লবফলে প্রজাবর্গ উৎপীড়িত হইয়া সর্ব্বপ্রকার উন্নতি হারাইয়া অপরিসীম দুর্দ্দশা ও অজ্ঞানতায় আবৃত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধের শেষভাগে সন্নিবিষ্ট তদানীন্তনকালের স্থানীয় সম্ভ্রান্ত জনগণের স্বাক্ষরিত একটি পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া যাহা লেখা হইয়াছে উহার সহিত মফাট মিল সাহেবের সঙ্কলিত সরকারী রিপোর্টের উক্তির সহিত সাদৃশ্য দেখা যায়। ইংরাজ রাজত্বের অভ্যুদয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে আসাম বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তার অধীনে জনৈক পোলিটিকাল এজেণ্ট ও জুডিশিয়াল কমিশনারের শাসনাধীনে পরিচালিত হইতেছিল। সেই সময় দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইংরাজ-রাজত্বের আশু সুফলদায়ক বিবিধরূপ জনহিতকর কার্য্যের পূর্ব্ব সূচনা যে সময়ে আরম্ভ হয়, গোপীনাথ ঠিক সেই সময়ে বঙ্গদেশের শিক্ষা বিভাগের প্রধান রাজপুরুষের দ্বারা শিক্ষা বিভাগে নিয়োজিত হইয়া এদেশে আগমন করেন। ৺গোপীনাথ পণ্ডিত যে সময় আসামে আগমন করেন, শ্রুত হওয়া যায় সে সময় আগমন করা অত্যন্ত ক্লেশজনক ও বিঘ্নভীতিপ্রদ ছিল। তিন চারি মাসকাল নৌকাযোগে আগমন করিতে হইত। পথে দস্যু ও দৈববিপদ ভীতি ছিল। ব্যয় অত্যন্ত হইত। পরিবার লইয়া আগমন করা বড় অসুবিধাজনক ছিল বলিয়া প্রবাসীজীবনে পরিবার সঙ্গে রাখা সুবিধা হইত না বলিয়া বিদেশে পরিবার আনা বড় সামাজিক লজ্জাজনক ব্যাপার ছিল। তজ্জন্য দেখা যায় তৎকালে প্রবাসে অনেক বাঙ্গালী উচ্ছৃঙ্খলভাবে জীবন যাপন করিতেন। অনেক কলঙ্কিত চরিত্র বাঙ্গালীর জন্য বাঙ্গালী জাতির সম্বন্ধেই

অনেকের হীন ধারণা জন্মিত। চরিত্রগুণে ৺গোপীনাথ তৎকালীন এতদ্দেশীয় জনসমাজেও সম্মানিত হইতেন। তৎকালে দেশাচার অনুরোধে বাঙ্গালী অসমীয়া সম্প্রদায়ে পান ভোজন প্রচলিত ছিল না। কিন্তু শুনা যায় গোপীনাথের পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ভোজন করিতে এদেশীয় নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেও কেহ আপত্তি করেন নাই। সে সময় শিক্ষাবিভাগই দেশহিতের সূচনা করিয়াছিল। বঙ্গদেশেও শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত মনস্বীবর্গই নব যুবকদিগের অন্তকরণে নব ভাব জাগরণ করিয়া দেশে প্রকৃত মানুষ গঠন করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে দেশে অনেক কৃতী সুসন্তান যশঃসৌরভে পুণ্যস্মৃতি ও আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন।

গোপীনাথ ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারীতে কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া আসামে আসিয়া গৌহাটীতে বঙ্গবিদ্যালয়ের হেড্ পণ্ডিত রূপে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর হইতে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৩১ অক্টোবর পর্য্যন্ত গৌহাটী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে বিরাজিত থাকিয়া অভিলষিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার সুযোগ গ্রহণ করেন। কিরূপ কর্ত্তব্যনিষ্ঠার সহিত গোপীনাথ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন সে সকল বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে হইলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়ে। তদানীন্তন সময়ের প্রাদেশিক স্থানীয় শাসনকর্ত্তা ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীগণের ও স্থানীয় সম্ভ্রান্ত লোকদিগের পত্রাদি হইতে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিলাম।

Major General Jenkins সাহেব স্থানীয় শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ৯ই মে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে লিখিত একখানি পত্রে তিনি লিখিতেছেন।

"I am much pleased to see that so large a body of influential native gentlemen have so correctly appreciated the good service of such an old and valuable servant as the Pundit has proved himself to be, and it would give me sincere pleasure to bear testimony to the ability and zeal with which he has fulfilled his duties during the long period he has presided over vernacular education in Assam," "however we may think that the high degree of usefulness of the Pundit's long. continued labours in a rude and foreign Province may deserve to be noticed with the special favour of the Govt."—

আর একখানি পত্রে উক্ত মেজর জেনারেল জেনকিন্স সাহেব বাহাদুর লিখিয়াছিলেন—"but the services of the Pundit have been of an unusual description, for he has had to introduce the Bengalee Language into a Province where it was before unknown, and to found a system of instruction where none existed before. He came to this Province rather late in life, and had to labour against no ordinary difficulties, in a country foreign to him, but by great assiduity and much kindness to the Assamese lads he has succeeded in making

Bengalee current throughout the Province and has established an efficient system of elementary instruction everywhere under master that he had taught and trained."

এতদ্দ্বারা অবগত হওয়া যায় তিনিই প্রথমে আসামে বঙ্গভাষা শিক্ষাব্যপদেশে বিস্তার দান করেন।

এতদ্দেশে অহোম রাজাদিগের আমলে উচ্চবর্ণ ও বংশীয়গণের অত্যন্ত আভিজাত্য অহঙ্কার ছিল। হীনবংশীয় অথবা অন্ত্যজ জাতীয় লোকদিগকে অত্যন্ত উপেক্ষিত অবস্থায় থাকিতে হইত। ইংরাজ রাজ্যশাসনের প্রথম সুফল এই সকল পতিতজাতিদিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও সাম্যভাবে অধিকার দান করিয়া উন্নত করা। উচ্চ ও হীনবংশীয় ছাত্রগণ একত্রে বিদ্যালাভ করায় ও যোগ্যতানুসারে হীনবংশীয় ছাত্রও উচ্চবংশীয় ছাত্র অপেক্ষা শিক্ষকের নিকট সমধিক ছাত্রমর্য্যাদা লাভ করায় ঈর্ষা ও ঘৃণাবশতঃ উচ্চবংশীয় ছাত্র এ বিষয়ে গোপীনাথের নিকট আক্ষেপ করিলে, তিনি স্পষ্টতঃ বুঝাইয়া দিতেন যে তোমরা পুরুষানুক্রমে সুশিক্ষালাভ ও সদ্‌বৃত্তি অনুশীলনের সুযোগ পাইয়াও যোগ্যতানুসারে উহাদের অপেক্ষা উচ্চ বলিয়া কার্য্যতঃ পরিচয় না দিয়া শুধু আব্দার করিলে আমি আব্দারের জন্য কিরূপে পক্ষপাতীত্ব প্রদর্শন করিব। উহারা নানারূপ অসুবিধা ও উপেক্ষা সত্ত্বেও আপনাদিগের যোগ্যতা দেখাইয়া উচ্চস্থান লাভ করিলে উহাদিগকে সমধিক উৎসাহ দান করা আমার ধর্ম্মতঃ কর্ত্তব্য। অন্ত্যজ ও হীনবংশীয়দিগকে তিনি অত্যন্ত সহানুভূতি ও স্নেহভাবে দেখিতেন।

মেজার এগ্‌নিউ Major Agnew একজন তদানীন্তনকালে এদেশে উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ ছিলেন,—তিনি লিখিয়াছেন; "I have known Gopeenath nearly twenty years, I know the difficulties he has had to contend against, and the successful result of his labours in the cause of vernacular education * * *"

উইলিয়ম রবিনসন (William Robinson) সাহেব আসামে তদানীন্তনকালে শিক্ষাবিভাগের প্রধান রাজপুরুষ ছিলেন। আসামের ইতিহাস ইংরাজীতে প্রথমে রবিনসন সাহেব প্রণয়ন করেন। শুনা যায় গোপীনাথ তাঁহার সঙ্কলন কার্য্যে অনেক সাহায্য দান করিয়াছিলেন।

রবিনশন সাহেব একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"The Pundit came into Assam as one of the pioneers in the work of education, and, as through the entire period of his service, I have had the best opportunities of becoming acquainted with him, of witnessing his labours, and noting the mode in which he overcame the almost insuperable difficulties that met him at every step, how zealously he discharged his duties and what peculiar advantage he enjoyed from his natural disposition and superior attainments for the efficient discharge of those duties."—

স্বয়ং গোপীনাথ পণ্ডিত মাহাশয় একস্থানে লিখিয়াছিলেন,—"I came into Assam soon after the establishment of Gauhatty school when the first

attempts were being made to promote the cause of education in the Province."—

১৮৬২ খৃঃ ৭ই মে তারিখে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকগণের স্বাক্ষরিত একখানি পত্রে উল্লেখ আছে—"The history of his life from the date of his arrival in Assam is properly speaking the history of vernacular education in the country. He took charge in February 1838, of the Head Punditship of the Government Vernacular School at Gauhatty, which was then a school only in name—, under the most discouraging circumstances.

The people of the country were immersed in barbarism. The language spoken was a peculiar jargon. The knowledge of letters was confined only to a few. The court Umlahs were composed of only those natives of Bengal who could obtain no appointments in their native country. He began therefore his work in earnest, and after encountering for a time very great difficulties succeeded in effecting a complete change in the condition of the school under his charge. He then directed his attention to the amelioration of the condition of the people of the whole country. He introduced a system of education well adopted to the degraded condition of the people. He trained teachers to whom the charge of imparting instruction was given." "The whole country from Dhubri to Suddea lying in the extreme north, has yielded a rich harvest. Men able to read and write are to be found in every quarter. Indegenous schools have sprung up with rapidity of the prophets Gourd, in parts of the country which the rays of civilization could not penetrate before. In addition to all these advantages we have now members of Assamese Umlahs who have supplanted the natives of Bengal and are well competent to fill high posts."—

প্রধান প্রধান রাজপুরুষ ও শাসনকর্ত্তা, এবং সম্ভ্রান্ত প্রজাবর্গের নিকট এরূপ সুখ্যাতি অর্জ্জন করা বড় সৌভাগ্যের কথা নহে। পরলোকগত আসামের জননেতা মাণ্যবর মাণিকচন্দ্র বুড়ুয়া মহাশয়ের পিতৃদেব ও মান্যবর ব্যারিষ্টার তরুণরাম ফুকন মহাশয়ের পিতৃদেব মহাশয়ের স্বাক্ষরও উপরোক্ত পত্রে দৃষ্ট হয়। তেইশ বৎসর নয়মাস কাল কার্য্য করিয়া বাট বৎসর বয়ঃক্রমে অবসর বৃত্তি গ্রহণ করতঃ বহুকাল পেন্সন ভোগ করিয়া অশীতির অধিক বয়ঃক্রমে গোপীনাথ কলিকাতায় গঙ্গালাভ করেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

দর্শন ও বিজ্ঞান

দৃক্-দৃশ্য, জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় লইয়াই জগৎ। বিজ্ঞান বল, দর্শন বল, সাহিত্য বল, গণিত বল, যে কোন বিদ্যার কথাই বল না কেন, সমস্তই—এই দৃক্-দৃশ্যাত্মক জগৎ লইয়া। দ্রষ্টার যাহা দ্রষ্টব্য, জ্ঞাতব্য, তাহাই দৃশ্য, তাহাই বিষয় বা প্রতিভাস (phenomena)। দ্রষ্টা নিজের সম্বন্ধে যাহা দেখে, বা জানে, এবং অপর সম্বন্ধেও যাহা দেখে বা জানে—সমস্তই দৃশ্য বা প্রতিভাস। দ্রষ্টার স্ব-ব্যাপার ঘটিত দৃশ্যগুলির আলোচনা অধ্যাত্মবিজ্ঞান; এবং তদতিরিক্ত দৃশ্যগুলির আলোচনা অনাত্ম বিজ্ঞান বলিয়া ব্যবহৃত। ব্যবহারতঃ প্রথম শ্রেণীর দৃশ্যগুলিকে আন্তর ও দ্বিতীয় শ্রেণীর দৃশ্যগুলিকে বাহ্য নামে অভিহিত করা হয়। এই বিভাগানুসারে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞ'ন আন্তর বিজ্ঞান ও অনাত্ম-বিজ্ঞান বাহ্য বিজ্ঞানরূপে পরিকল্পিত। পরন্তু এই বিভাগ ন্যায়ানুমোদিত কি না তাহা বিচার করিয়া দেখা হয় না।

যাহা হউক, এই উভয়বিধ বিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহের তুলনামূলক মূল্যাবধারণ সহজ ব্যাপার নহে। এই উভয় শ্রেণীর বিষয়ের মধ্যে অর্থাৎ আন্তর ও বাহ্য বিষয়সমূহের মধ্যে, কোন্‌গুলি সম্যক্ নিশ্চিত, পরিস্ফুট ও অধিগত?—এই প্রকার প্রশ্ন করিলে অধ্যাত্মবিজ্ঞান ও অনাত্মবিজ্ঞানের উত্তর পরস্পর বিসদৃশ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অনাত্মবিজ্ঞানবেত্তা বলেন, বাহ্য বিষয়ই আমাদের সম্যক্ নিশ্চিত, পরিস্ফুট ও অধিগত; কেন না জীবের জীবন ইহার অধীন; ইহাকে অতিক্রম করিয়া ক্ষণমাত্র অবস্থান করিতে পারে না,—অবিলম্বে বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু আমাদের আন্তর বিষয়গুলি আমাদের ইচ্ছাধীন; ইহাদিগকে না মানিলেও আমাদের জীবনযাত্রার কোন বাধা হয় না; বিশেষতঃ আন্তর বিষয়গুলি সর্ব্বদা চঞ্চল, অস্থির, কিন্তু বাহ্য বিষয়গুলি নিত্য, স্থির, নিয়মানুবর্ত্তী।

মনস্তত্ত্ববেত্তার উত্তর সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। তাঁহার মতে সমস্ত বাহ্যজগৎটা মনের ভিতর। মনুষ্যের হাত পা মস্তক—এমন কি গোটা দেহটা—তাঁহার মানস ব্যাপার ব্যতীত আর কিছু কি না তাহা তিনি জানেন না। অবশ্য তিনিও বাহ্য জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন এবং সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহেন। তথাপি তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে 'বাহ্য' বলিয়া কোন পদার্থ নাই। জ্ঞানের বিশ্লেষণে বাহ্য জগতের কোন চিহ্ন তিনি দেখিতে পান না। যাহাকে অনাত্মবিজ্ঞান বলা হয়, তিনি বলেন, দেখিতে গেলে উহাকেও আত্মবিজ্ঞানের অন্তর্গত বলিয়া গ্রহণ করা যায়। মন বা আত্মা বলিয়া একটা স্বতন্ত্র সত্বস্তু আছে কি না মনস্তত্ত্ববিদ্ তাহা জিজ্ঞাসা করেন না, মানস ব্যাপার লইয়াই তিনি ব্যাপৃত। তাই কেহ কেহ মনস্তত্ত্বকে মনবিহীন মনস্তত্ত্ব বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়া থাকেন!

এই উভয় প্রকার উত্তরের মধ্যে কোনটি অধিকতর সমীচীন, আন্তর ও বাহ্য বিষয়ের মধ্যে কোনটি অধিকতর নিশ্চিত ও পরিজ্ঞাত, পাঠক তাহার বিচার করিবেন। আমার

মতে মনোবিজ্ঞানের উত্তরই অধিকতর সঙ্গত ও সমীচীন। জ্ঞান সম্বন্ধে আন্তর ও বাহ্য—এ প্রভেদ সর্ব্বথা অসিদ্ধ। দ্রষ্টাকে লইয়াও এ প্রকার প্রভেদ সিদ্ধ হয় না। দৃশ্য দ্রষ্টার অবভাস্য—এই মাত্র বলা যায়, দ্রষ্টার বাহিরে, এ কথার কোন অর্থ হয় না।

অনাত্ম-বিজ্ঞান বিষয়ভেদে নানাপ্রকার যথাঃ—জড়তত্ত্ব বিজ্ঞান (physics), রাসায়ন বিজ্ঞান (chemistry), জ্যোতিবিজ্ঞান (astronomy), ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান (geology), প্রভৃতি। সেই প্রকার, অধ্যাত্মবিজ্ঞান ও বিষয়ভেদে একাধিক প্রকার যথা :—মনোবিজ্ঞান, তর্কবিজ্ঞান প্রভৃতি।

বিজ্ঞানের সাধারণ উদ্দেশ্য, জগতের এক একটা বিভাগ লইয়া তাহার উপকরণ, পারম্পরিক সম্বন্ধ, স্বভাব ও তৎসংক্রান্ত নিয়মাবলীর আবিষ্কার। অনাত্মবিজ্ঞান ভৌতিক পদার্থের মাত্রা, গঠন ও কার্য্যপ্রণালীর বিবরণ প্রদান করে। কোন বস্তু কোন বস্তুর কতটা সংমিশ্রণে উদ্ভূত, কি কি অবস্থায় উৎপন্ন হইয়া থাকে এ সকল তত্ত্বও তাহার অন্তর্গত। বাহ্য বস্তুর সমীক্ষা, পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করত তাহাদের গতিবিধিজ্ঞাপক কতিপয় সঙ্ক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপকসূত্র প্রচার করিতে পারিলেই অনাত্মবিজ্ঞান সফলকাম। ইহার বস্তুপরীক্ষা পরিমাণগত,—অনুবীক্ষণে, দূরবীক্ষণে, অনলে, নলে, নিকৃতিতে,—হাতে কলমে।

বিজ্ঞান মাত্রেই কতকগুলি পদার্থকে অবিচারে মানিয়া লয়। জড়ের অস্তিত্ব, বহু পুরুষের অস্তিত্ব, দিক্‌কালের অস্তিত্ব, ইত্যাদি। এইগুলি মানিয়া লইয়া বস্তু পরীক্ষা ও তন্মূলক অন্বীক্ষা দ্বারা বিজ্ঞান যে সার্ব্বভৌম সিদ্ধান্তসূত্রের অবতারণা করে, সেই সূত্রগুলিকে বৈজ্ঞানিক মূলসূত্র বা মূলতথ্য (first principles) বলা যাইতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞান জগৎকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখে; এক এক বিজ্ঞানের এক একটি নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী রহিয়াছে, উহা তন্মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং বিজ্ঞান ঐকদেশিক বিদ্যা। ইহার সার্ব্বভৌম তথ্যগুলি তত্তৎ গণ্ডীর অন্তর্গত যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে সত্য।

পক্ষান্তরে দর্শনের উদ্দেশ্য,—আমি কি, দেশ কাল কি, জগৎ কি, প্রমাণ কি, সত্য কি, সৎ কি, জ্ঞান কি, উহার উৎপত্তি ক্রম ও উপকরণ কি, আমার আশা ভরসা, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কি—ইত্যাদি মানব-হৃদয়-নিহিত মূল ও গভীর প্রশ্নগুলির মীমাংসা চেষ্টা। এই প্রশ্নগুলির সদুত্তর দিতে যাইয়া দর্শন, বিজ্ঞানের নৈদানিক তথ্যগুলিকে ভিত্তিস্বরূপে গ্রহণ করত জগৎসম্বন্ধীয় অন্তবিরোধ শূন্য, সুসঙ্গত, সর্ব্ববিষয় ব্যাখ্যানুকূল ও সর্ব্ববিষয়ক উপপত্তি যোগ্য একটা স্পষ্ট ধারণা করিতে চায়। দর্শন বিজ্ঞানের ন্যায় একদেশদর্শী নহে, বরং সম্যক্‌দর্শী, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলিকে বিশ্লিষ্ট সমন্বিত সমীকৃত করিয়া বিশ্বজগতের যাবতীয় পদার্থের মধ্যে একটা মূল ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করে। দর্শন কেবল যে অনাত্মবিজ্ঞানের তথ্যগুলি লইয়া এই ঐক্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় তাহা নহে; অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলির সহিত মিলাইয়া মিশাইয়া অনাত্মবিজ্ঞানের তথ্যগুলিকে পরিমার্জ্জিত করিয়া লয়। মনোবিজ্ঞান, তর্কবিজ্ঞান এবং জ্ঞানবিজ্ঞান (epistemology) দর্শনের আলোচনার উপকরণ প্রদান করিয়া থাকে। এই নানাবিধ উপকরণ লইয়া দর্শন জগৎ-রহস্য উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করে। সকল বিজ্ঞানসিদ্ধ সত্যগুলির মর্ম্মাবধারণ (grasp of the

meaning) দ্বারা মূলতত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। বিজ্ঞান কেবল কার্য্যপরম্পরার নিয়ম অধিকার করে; কিন্তু উহাদের অর্থ কি—উহাদিগের দ্বারা কি সূচিত হয়—তাহার খবর রাখে না। বিষয়রাশির অর্থোপলব্ধিতাই দর্শনের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই যে বিরাট ব্রহ্মাণ্ড আমাদের সম্মুখে বিরাজমান, ইহার তাৎপর্য্য কি, অর্থ কি—ইহা কেন উপস্থিত হইল, ইহার অন্তর্নিবিষ্ট পদার্থরাজীর পারস্পরিক সম্বন্ধের উদ্দেশ্য অভিপ্রায় বা অর্থ কি—ইত্যাদি প্রশ্ন লইয়া দর্শন নিরন্তর ব্যস্ত।

জগতে সকলেই সত্যের অন্বেষণ করে। দর্শনও করে, বিজ্ঞানও করে। এবং সত্য যে মূলতঃ অদ্বয়—এক, সকলেই তাহা স্বীকার করিয়া থাকে। স্বীকার করে বলিয়াই সর্ব্বত্র ঐক্যের অনুসন্ধান করে। কিন্তু প্রজ্ঞার ও পর্য্যবেক্ষণের তারতম্যে এই অদ্বয় সত্য নানা আকারে আকারিত হইয়া পড়ে। যে যে আকারে উহাকে দেখিতে পায় সে সেই আকারকেই সত্য বলিতে চায়, অপর আকারকে অসত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বসে। তাই সমগ্রের দিক হইতে বিষয়কে অবলোকন—পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়। খণ্ডের দিকে অভিনিবেশ করিলে অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। এবং সেই জন্যই দর্শন সমগ্রের দিক হইতে বিষয়কে দেখিতে চায়।

অপরোক্ষ জ্ঞান দিয়াই পরোক্ষ বিষয়ের তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করা সম্ভবপর; পরোক্ষবিষয় দিয়া অপরোক্ষ জ্ঞানকে বুঝিতে চেষ্টা করা বাতুলতা। দর্শন সেই জন্য অপরোক্ষ জ্ঞানকেই বহির্ব্যাপারের চাবি স্বরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। আবার অনেক সময়ে অপরোক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞান এমন ভাবে পরস্পর মিশিয়া যায়, যে সম্যক বিচার ও বিশ্লেষণ ব্যতীত তাহাদের পার্থক্য নিরূপণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। এমন কি অনেক সময়ে আনুমানিক জ্ঞানকেও আমরা প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলিয়া প্রতারিত হই। গভীর বিশ্লেষণ-পটুতা না থাকিলে যেমন বাহ্যজগতে কৃতিত্ব লাভ করা কঠিন, অন্তর্জ্জগতের সত্যাবিষ্কারও সেই প্রকার কঠিন। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক উভয়ের পক্ষেই বিশ্লেষণ ও সংযোজনপটুতা নিতান্ত আবশ্যক। তবে একজনের বিশ্লেষণ পরিমাণগত,—হাতে কলমে; অপরের বিশ্লেষণ গুণগত, কেবল বুদ্ধি সহায়ে। একজনের বিশ্লেষণ কৃত্রিম যন্ত্রাদি লইয়া; অপরের বিশ্লেষণ প্রজ্ঞা লইয়া।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রত্যেক বিজ্ঞানের স্বীয় স্বীয় গণ্ডী নির্দ্ধারিত আছে। দর্শনের ঐ প্রকার কোন গণ্ডী নির্দ্দিষ্ট নাই। সুতরাং তাহার প্রসার সর্ব্বত্র। বিজ্ঞানের বিলাস-ক্ষেত্রে দর্শনের পদার্পণ উচিত কি না, তাহা সুধীবর্গের বিচার্য্য। তবে আমার মনে হয় জ্ঞানের মধ্য দিয়াই যখন সত্যের বিকাশ এবং জ্ঞানের যাথার্থ্যাবধারণই যখন দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন অবশ্যই দর্শন বিজ্ঞানের গণ্ডীতে নিজ অধিকার স্থাপন করিবে। তাহা নিবারণের উপায় নাই। তবে কি সত্য বিজ্ঞানের অন্বিষ্ট বা আয়ত্ত নহে?

সত্য দুই প্রকার,—পরমার্থিক সত্য (absolute truth); ও প্রাতিভাষিক বা ব্যবহারিক (relative or phenomenal) সত্য। পারমার্থিক সত্য দর্শনের অন্বিষ্ট ও লক্ষ্য। প্রাতিভাষিক বা ব্যবহারিক সত্য বিজ্ঞানের অন্বিষ্ট ও লক্ষ্য। অবশ্য বিজ্ঞান যে সত্য আবিষ্কার করে তাহাকে প্রাতিভাষিক না বলিয়া পারমার্থিক সত্য বলিয়াই গ্রহণ করে; কিন্তু

সমগ্রের দিক হইতে এই সত্যের বিচার করিলে ইহাকে ধ্রুব পূর্ণ পারমার্থিক সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় কি না, বিজ্ঞান তাহা বলিতে পারে না। বিজ্ঞান স্পর্দ্ধা করিয়া বলে বটে, তাহার আবিষ্কৃত সত্যই সনাতন নিরপেক্ষ সত্য; কিন্তু বিচার মুখে তাহা দাঁড়ায় কি না দেখিতে হইবে। কিন্তু কে দেখিবে? দর্শনই দেখিবে—সমগ্রের দিকে যাহার দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত, সেই দেখিবে, সঙ্কীর্ণ জ্ঞান বিজ্ঞানের তাহা দেখিবার সাধ্য নাই। এই পারমার্থিক সত্য দর্শনের অন্বিষ্ট বলিয়াই কেহ কেহ দর্শনকে পরাবিদ্যা (science of sciences) বা তত্ত্ব বিদ্যা (science of ultimate existence) প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন। মুণ্ডকোপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিদ্যাকে (science) পরা ও অপরাভেদে তত্ত্বদর্শীগণ দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে চতুর্ব্বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ সমস্তই অপরা বিদ্যা বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছে; এবং উপনিষৎ "যয় তদক্ষরমধিগম্যতে" তাহাকেই পরাবিদ্যা (the highest science) বলা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে তত্ত্ববিজ্ঞানই প্রকৃত দর্শন। ইংরাজীতে যাহাকে metaphysics বলে, তাহাই যথার্থ তত্ত্ববিজ্ঞান। তবে আমি এখানে দর্শনকে তাহা হইতে অভিন্ন করিয়াই গ্রহণ করিয়াছি।

বহুত্বের মধ্যে একত্বের অনুসন্ধান প্রজ্ঞার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। বিজ্ঞান কতিপয় প্রতিভাস সমষ্টির মধ্যে একটা ঐক্যের অন্বেষণ করে। কিন্তু সে ঐক্যও ব্যবহারিক ঐক্য। দর্শন সমস্ত বিশ্বের মধ্যে পারমার্থিক ঐক্যের অনুসন্ধান করে; সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে সেই ঐক্য খুঁজিয়া থাকে এবং সমস্ত প্রভেদের মূলে যে সেই ঐক্য সমাহিত, তাহা বুঝাইয়া দেয়। যেন মনিগণের ন্যায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই ঐক্যে গ্রথিত। মহামতি Herbert spencer দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা অতি উপাদেয়; বিজ্ঞান জিনিসটা কি তাহা বুঝাইতে যাইয়া তিনি বলিতেছেন,—

"Science means merely the family of sciences—stands for nothing more than the sum of knowledge formed of their contributions ; and ignores the knowledge constituted by the *fusion* of all these contributions into a whole. As usage has defined it, science consists of truths existing more or less separated ; and does not recognize these truths as entirely integrated."

দর্শন সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন,—"So long as these truths are known only apart and regarded as independent, even the most general of them cannot without laxity of speech be called philosophical. But when ... ... they are contemplated together as correlatives of some ultimate truth, then we rise to that kind of knowledge that constitutes philosophy proper." পরে তিনি প্রাকৃতজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দার্শনিক জ্ঞান সম্বন্ধে বলিতেছেন,—"knowledge of the lowest kind is *un-unified* knowledge ; Science is *partially-unified*

knowledge ; Philosophy is *completely-unified* knowledge." (pp. 132-134, First Principles).

আমাদের দেশে, অন্যান্য দেশের ন্যায়, মনোবিজ্ঞান, মনন-বিজ্ঞান, নীতি-বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান বলিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিদ্যা পরিদৃষ্ট হয় না। ইহারা দর্শনের অন্তর্ভুক্ত হইয়াই আলোচিত হইয়াছে।

দর্শন যেহেতু তত্ত্ব-বিজ্ঞান, সেই জন্যই ইহা কাহারও প্রভুত্ব স্বীকার করে না। অমুক মহাশয় এই বিষয় সম্বন্ধে এই প্রকার বলিয়াছেন, অতএব ইহাই সত্য, এ প্রকার আবদার দর্শন গ্রাহ্য করে না। তিনি যত বড় মনস্বীই হউন না কেন, চিন্তাজগতে ও যুক্তিমার্গে দর্শনের নিকট তাঁহার খাতির নাই। দর্শনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দর্শনের কাছেই করিতে হইবে, ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত সিদ্ধান্ত। বহির্জগৎ বিষয়ক জ্ঞান আমরা পরের সাক্ষ্যে গ্রহণ করিয়া থাকি। প্রত্যেক দ্রষ্টাই যে নিজে নিজে স্ব স্ব বিষয়ের পরীক্ষা করিবে—এমন কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই; কিন্তু অন্তর্জগৎ বিষয়ক জ্ঞানে, তত্ত্ববিদ্যার অনুশীলনে অপর দ্রষ্টার সাক্ষ্যের কোন মূল্য নাই। অন্তর্জগতেই দর্শনের প্রতিষ্ঠা, তাই সেখানে পরের সাক্ষ্যের কোন উপযোগিতা দৃষ্ট হয় না। *

এক শ্রেণীর লোক আছেন তাঁহারা দর্শনের উপর বড় চটা। তাঁহারা বলেন, দর্শন শাস্ত্রটা কেবল উন্মত্তের প্রলাপ মাত্র; উহার কিছুমাত্র বাস্তব ভিত্তি (foundation in fact) নাই; উহার কিছুমাত্র সার্থকতা (utility) নাই। দর্শন কুট-বুদ্ধি-প্রসূত অনাবশ্যক জল্পনা। সুতরাং উহার চর্চ্চা পণ্ডশ্রম মাত্র। পক্ষান্তরে দেখ, বিজ্ঞান কেমন বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; কেমন অভিজ্ঞতার সহিত একতান বিশিষ্ট (accordant with experience)। দৃঢ় প্রতিষ্ঠ বলিয়াই বিজ্ঞান ভবিষ্যৎবাণী করিতে পারে, গ্রহ উপগ্রহের ভবিষ্যৎ অবস্থান গতিবিধি পূর্ব্বেই স্থির করিতে পারে। বিজ্ঞান আমাদের নিত্য ব্যবহারে লাগে, আমাদের নিয়ম প্রয়োজন সাধন করে। কিন্তু দর্শন আমাদের কোন ব্যবহারে লাগে না; কোন নিত্য প্রয়োজন সাধন করে না।

এই প্রকার আপত্তির বিরুদ্ধে দুই চারিটি কথা বলা যাইতেছে। প্রথমতঃ দর্শনের কোন বাস্তব ভিত্তি নাই এই আপত্তিটির উত্তর দেওয়া যাউক। জিজ্ঞাসা করি 'বাস্তব ভিত্তি' শব্দের অর্থ কি ? বস্তু শব্দেরই বা অর্থ কি ? যদি বলা যায়, ধরা ছোঁয়া যায় এমন কোন বাহ্য পদার্থই বস্তু, ও এই বস্তু মূলকতাই 'বাস্তব ভিত্তি' শব্দের অর্থ, তাহাও ঠিক নহে। বস্তুকে বাহ্য ও আন্তর ভেদে দ্বিবিধ স্বীকার করিলে, যাহা বাহ্য বস্তু সম্বন্ধে ভিত্তিহীন, তাহা আন্তর বস্তু সম্বন্ধে ভিত্তিমূলক হইতে পারে। এবং তাহা হইলে দর্শন বাস্তব ভিত্তিহীন, এ আপত্তির কোন মূল্য থাকে না। আর যদি বস্তুকে বাহ্য ও অন্তর ভেদে দ্বিবিধ স্বীকার না করিয়া অভিন্ন করিয়াই গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে যে পরিমাণে উহা জ্ঞানাবচ্ছিন্ন সেই পরিমাণেই উহা বাস্তব-ভিত্তি-মূলক, এবং যে পরিমাণে উহা অজ্ঞাত সেই পরিমাণে

* "In point of fact, our knowledge of the external world is taken chiefly upon trust. ... ... in the science of mind we can believe nothing upon authority, take nothing upon trust."—Hamilton's metaphysics. Lecture XIX, Vol. I.

উহার সত্তা সন্দিগ্ধ. ইহাও সপ্রমাণ করা যায়। সুতরাং দর্শন বাস্তব ভিত্তিহীন,—কথাটা নিতান্তই অবিচারকের উক্তি, সন্দেহ নাই।

এক্ষণে দেখা যাউক দর্শনের কোন সার্থকতা বা উপযোগিতা (utility) আছে কি না। জিজ্ঞাসা করি, উপযোগিতা শব্দের অর্থ কি? যদি বলা যায়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপকারিতা। তাহার উত্তরে বলি, 'দর্শন' বা 'বিজ্ঞান' কোন শব্দটার ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থের মধ্যে এতাদৃশ কোন উপকারিতার আভাস নাই। উভয় শব্দের অর্থই জ্ঞানবিশেষ। যদি বলা যায়, বিজ্ঞানের সত্যগুলিকে যেমন মানব-জগতের উন্নতিসাধনে প্রযুক্ত করা যায়, দার্শনিক সত্যগুলিকে সে প্রকার কোন কার্য্যে প্রযুক্ত করা যায় না। ইহার উত্তরে বলা যায়, সকল সত্যই যে কার্য্যে পরিণত করা যাইবে তাহার প্রমাণ কি? উচ্চ গণিতের অনেক সত্যই মানুষের ব্যবহারে লাগে না এবং এই উচ্চ গণিত ভিন্ন বিজ্ঞানের উন্নতিসাধন হয় না; তাই বলিয়া কি বলিতে হইবে, উচ্চ গণিত-নিবন্ধন বিদ্যা, নিরর্থক শাস্ত্র? বিশেষতঃ ব্যবহারিক বস্তু, বা ব্যবহারিক সত্যকেই ব্যবহারিক উন্নতির কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবপর, কিন্তু যাহা সে জাতীয় বস্তু বা সত্য নহে তাহাকে ব্যবহারিক উন্নতির কার্য্যে পরিণত দেখিবার ইচ্ছাটা কি অজ্ঞতার পরিচায়ক নহে? উক্ত আপত্তিকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, আপত্তিকারী মানব-জগতের উন্নতিকে উপেয় (end) ও বিজ্ঞানকে তৎসাধক (means) বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। প্রণিধান করিলে বুঝা যাইবে উপেয় প্রাপ্তিই (realisation of an end) হইতেছে উপায়ের উপযোগিতা বা উপকারিতা। অর্থাৎ সাধন উপেয় প্রাপ্তির যতদুর সহায়, ততদুরই উহার উপযোগিতা বা উপকারিতা। যে উপায় অতি সহজে উপেয় প্রদান করিতে পারে, সেই উপায়ই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতম উপায়? উপেয় ভালই হউক আর মন্দই হউক, যাহাদ্বারা উহা অতি সহজে প্রাপ্তব্য, তাহাই উৎকৃষ্টতম উপায় বলিয়া গণ্য হইবে। বর্ত্তমান স্থলে মানবজগতের উন্নতিই উপেয়; এক্ষণে উপেয় লাভের প্রশস্ত উপায় বিজ্ঞান না দর্শন তাহাই বিচার্য্য। ইহা বিচার করিতে হইলে দেখিতে হইবে মানবজগতের উন্নতির আদর্শ বা মাপকাটি কি? জিজ্ঞাস্য,—কোন্ প্রকার উন্নতি মানব জগতের শ্রেষ্ঠতম উন্নতি? মানব সমাজের সুখ সুবিধার উৎকর্ষ? না মানবের পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ? যদি বলা যায় প্রথমটি। তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য, উহাই কি মানবের শ্রেষ্ঠতম উপেয় (the highest end of humanity)? যদি আপত্তিকারী বলেন, হাঁ; উহাই মানবের শ্রেষ্ঠতম উপেয়, এবং বিজ্ঞানই উহা লাভের শ্রেষ্ঠতম উপায়!—তাহা হইলে আমার বক্তব্য—বিজ্ঞানের যে অংশটা ভাবনাত্মক (speculative) তাহা দর্শনের অন্তর্গত। সে হিসাবে বিজ্ঞান দর্শনের বাহিরে নহে। যদি তাহাই হইল, তবে বিজ্ঞান-উদ্ভাবিত সুখ-সুবিধার সামগ্রীতে দর্শনের কিছুমাত্র সহায়তা নাই, তাহা কি প্রকারে বলা যায়? ইহা ত হইল তর্কের কথা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শারীরিক সুখসুবিধা পুরুষার্থ হইলেও উহা যে পরম পুরুষার্থ (highest end) নহে, তাহা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন। যদি তাহা না হইল, তবে তাহার উপায়ীভূত বিদ্যাও যে পরম উপায় (highest means) নহে, তাহাও সহজে অনুমেয়।

পরিশেষে বুঝা যাইতেছে পূর্ণ মনুষ্যত্বের

বিকাশই মানবের পরম পুরুষার্থ। এবং এই —মনুষ্যত্বের বিকাশই মনুষ্যের প্রকৃত মহত্ব। এক্ষণে দেখিতে হইবে এই পূর্ণমনুষ্যত্ব বিকাশের উপায়ীভূত বিদ্যা দর্শন না বিজ্ঞান।

আমার বিশ্বাস, পূর্ণমনুষ্যত্বের ধারণা করিতে হইলে সমগ্র জগৎটার সহিত তাহার সম্বন্ধ কি, জগতের মধ্যে মনুষ্যের স্থান কি, মনুষ্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কি, মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি ইত্যাদি গভীর তত্ত্বের আলোচনা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু আত্মার সমস্ত বৃত্তিগুলিকে অন্তর্মুখী করিয়া আত্মচিন্তায় নিযুক্ত করা ব্যতীত এই সকল জটিল তত্ত্বের মীমাংসা সম্ভবপর নহে; ইহাতে প্রজ্ঞার বিশুদ্ধ অনুশীলন ও প্রয়োগ একান্ত বাঞ্ছনীয়। ইহাই দর্শনের সার্থকতা। তাই অপরোক্ষভাবে না হইলেও, পরোক্ষভাবে দর্শনই পূর্ণ মনুষ্যত্ব অভিব্যক্তির উপায়, বিজ্ঞান নহে, ইহা প্রতীয়মান হইতেছে। পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশই পূর্ণানন্দ। এই পূর্ণানন্দের অন্বেষণে, মৃগগণের মৃগনাভি অনুসন্ধানের ন্যায়, মনুষ্য ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া থাকে। জাগতিক পদার্থনিচয়ের মধ্যে তাহার অন্বেষণ করে, কিন্তু সেখানে খণ্ড, ক্ষণভঙ্গুর সুখ বা আনন্দ ব্যতীত আর কিছু পায় না। তাহার হৃদয়ের ব্যাকুলতা যখন তাহাতে উপশান্ত হয় না, তখন তাহার সদসৎ বিবেকের উন্মেষ হয়, তাহার ফলে সে জগৎকে অন্য চক্ষে নিরীক্ষণ করে এবং তখন সে দেখিতে পায়—

যংলব্ধা চাপরংলাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

তাহা তাহার বাহিরে নহে, তাহার আত্মায়। তাই তখন সে প্রেয়ঃকে পরিত্যাগ করিয়া যাহা শ্রেয়ঃ তাহাই গ্রহণ করে। তাই তখন তাহার পূর্ণ মনুষ্যত্ব প্রস্ফুরিত হয়; সে স্থিতধী হইয়া যায়। আপত্তিকারীর আরও দুইটি আপত্তি আছে তাহারও উত্তর দেওয়া আবশ্যক! আপত্তিকারী বলেন, বিজ্ঞানের সত্য অকাট্য, বিজ্ঞান দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। দেখা যাউক একথা কতদূর ঠিক। বিজ্ঞানবিষয়ক সত্য অভিজ্ঞতালব্ধ (derived from experience) উহার স্বতঃসিদ্ধতা নাই; উহা তাৎকালিক সত্য, অনতিক্রমণীয় সত্য নহে; যে সত্য অভিজ্ঞতালব্ধ, অভিজ্ঞতার অন্যথাভাবে সে সত্যে অন্যথা হইতে পারে, বিজ্ঞানের পূর্ব্বাপর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেই এ কথার সত্যতা প্রতীয়মান হইবে। (১) পূর্ব্বে বলিয়াছি বিজ্ঞানের সত্য তাৎকালিক আপেক্ষিক। কিন্তু এই আপেক্ষিক সত্যের উপরই ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত; তাই ব্যবহারজগতে ইহার মূল্য কম নহে। বিশেষতঃ সকল বিজ্ঞানের সত্যই যে সমান মূল্যের সত্য তাহাও ত প্রতিপন্ন হয় না, এবং তত্ত্ববিদ্যাঘটিত যে সকল সমস্যা আছে, তাহা যে পর্য্যন্ত না মীমাংসা হয়, সে পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের সত্যকে খুব সম্ভবপর সত্য বলিব কি না তাহাও বিবেচ্য। John Stuart Mill বলেন (২) "the difficulties of metaphysics lie at the root of all science; that those difficulties can only be quieted by being resolved and until they are resolved,

(1) Examination of H's philosophy. Ch. I.

(2) A description of certain phenomena, though it be indubitably the simplest we can now give, may in the further progress of science be superseded by another simpler still. Of such like changes the past history of mechanics furnishes instances in plenty—Kirchh quoted by Ward.

positively whenever possible, but at any rate negatively, we are never assured that any human knowledge, even physical, stands on solid foundations."

আপত্তিকারীর চতুর্থ আপত্তি—দর্শন দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপে আমাদের কোন প্রয়োজন সাধনা করে না—কোন ব্যবহারে লাগে না। আপাততঃ এই আপত্তির উত্তর করা যাইতেছে। মানুষ প্রজ্ঞাসহ জন্মগ্রহণ করে। প্রজ্ঞার অনুশীলন-প্রবৃত্তিও তাহার স্বভাবসিদ্ধ। তাই মানুষ যতদিন বাঁচিয়া থাকে দর্শন-চর্চ্চা তাহার অনিবার্য্য। বিশুদ্ধ ভাবেই হউক আর অশুদ্ধ ভাবেই হউক, দার্শনিক বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন তাহার পক্ষে অপরিহার্য্য। সর্ব্বত্র যুক্তির অন্বেষণই তাহার প্রজ্ঞাবত্তার লক্ষণ। এই প্রজ্ঞাবত্তাই তাহাকে ইতর জন্তু হইতে বিশেষ করে, নতুবা কেবল জন্তুত্ব পুরস্কারে সে পশ্বাদি হইতে বিভিন্ন নহে। এই প্রজ্ঞানুশীলনই তাহার দার্শনিকতা। তাই Hamilton বলেন—"Man philosophises as he lives. He may philosophise well or ill, but philosophise he must. Philosophy can, indeed, only be assailed through philosophy." তাই Aristotle বলিয়াছেন,—"If we must philosophise, we must philosophise, if we must not philosophise we must philosophise ;—in any case, therefore, we must philosophise."

অতএব আপত্তিকারী যদি দৈনন্দিন ক্রিয়া কলাপে নিজের দার্শনিকতার পরিচয় প্রাপ্ত না হন, তবে বুঝিতে হইবে তাঁহার প্রজ্ঞাবত্তা (rationality) নাই। যদি তাঁহার প্রজ্ঞাবত্তা না থাকে তবে তাঁহাকে মানুষ বলিব কি না জানি না। কেন না মানুষের লক্ষণ হইতেছে,—জীবত্ব + প্রজ্ঞাবত্তা (animality + rationality)। যদি বলা যায়, মানুষ যে প্রতিদিন দার্শনিকতার পরিচয় দেয়, তাহা ত সে নিজে বুঝিতে পারে না। নিজে দার্শনিক, অথচ সে জানে না যে সে দার্শনিক ইহা কি অসঙ্গত নহে। ইহার উত্তরে বলা যায়, যাহা তাহার স্বভাবসিদ্ধ, তাহার পরিস্ফুট জ্ঞান তাহার থাকে না; অন্ততঃ সে তাহাকে 'খেয়ালে' আনে না। অতএব বুঝা গেল মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তিতে দর্শন আমাদের প্রধান সহায়। দর্শনই আমাদিগকে খণ্ড সুখ হইতে ভূমানন্দের দিকে টানিয়া লয়। দর্শনই আমাদিগকে বিপদে ধৈর্য্য, শোকে সান্ত্বনা, মোহে দিব্যচক্ষু, মরণে অভয়, তাপে শান্তি, প্রদান করে। দর্শনই আমাদিগকে সর্ব্বজীবে সমভাবের উপদেশ দেয়; ক্ষুদ্র হৃদয়ের ক্ষুদ্র গণ্ডী ভেদ করিয়া বিশ্বাত্মার সহিত এক হইবার সহায়তা করে। যে শাস্ত্রের কার্য্য এত গভীর, এত উদার, এত উচ্চ, সে শাস্ত্র মানব-জীবনের কোন কার্য্যে আইসে না,—একথা যাঁহারা বলেন তাঁহারা যে কতদূর ভ্রান্ত তাহা আর বলিতে হইবে না। লৌকিক দৃষ্টিতে দর্শনের কোন মূল্য না থাকিতে পারে; লৌকিক বুদ্ধিতে উহা অসার জল্পনা মাত্র হইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া দর্শনের সার্থকতা নাই, কোন ব্যবহার নাই ইহা প্রতিপন্ন হয় না। যাহার সার্থকতা —উপযোগিতা নাই, অভিব্যক্তির রাজ্যে তাহার উচ্ছেদ অনিবার্য্য। কিন্তু দর্শন যখন উদ্বৃত্ত হইয়া রহিয়াছে তখন উহা যে যোগ্যতম বিষয় তাহা নিঃসন্দিগ্ধ।

এক্ষণে দর্শনের সহিত অপরাপর বিদ্যার

কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। মনোবিজ্ঞান (Psychology) ও মনন শাস্ত্রের (Logic) সহিত দর্শনের সম্বন্ধ অতি নিকট। উহাদের কার্য্যক্ষেত্র ঐকদেশিক; উহারা মাত্র মানসী ক্রিয়াতেই সীমাবদ্ধ। মনোবিজ্ঞান আমাদের মানসিক ভাব, বৃত্তি বা অবস্থানিচয়ের ক্রম, উৎপত্তি, ও পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াই ক্ষান্ত হয়; (it only classifies and analyses the phenomena or the varying states of the human mind)। ইহাদের মূলদেশে কোন বাস্তব পদার্থ আছে কি না তাহার আলোচনা করে না।

মননশাস্ত্র বিশুদ্ধ মননের (correct thinking) নিয়মাদি নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। কি প্রকারে চিন্তা করিলে চিন্তায় দোষের (fallacy) সংস্পর্শ না হয়, সেই পদ্ধতি সূচিত করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য (It investigates the nature of the process which takes place in reasoning, and lays down rules to enable that process to be conducted as it ought.)। পরন্তু যাহা অবলম্বন করিয়া কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, অর্থাৎ যাহা data তাহার সত্যাসত্যতা অবধারণ করা উহার অন্তর্গত নহে। অবশ্য কোনও কোনও তার্কিক (Logician) dataর সত্যাসত্যতা নির্দ্ধারণের ভারও মননশাস্ত্রের উপর ন্যস্ত করিয়া ঐ শাস্ত্রকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছেন—Formal Logic ও Material Logic অর্থাৎ বস্তু নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ মননশাস্ত্র ও বাস্তব মননশাস্ত্র। তাঁহারা বলেন তর্কশাস্ত্র যখন সত্যনির্ণয়ের শাস্ত্র তখন উহাকে কেবল চিন্তার গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করিলে চলিবে কেন? প্রতিজ্ঞার ও হেতুর সত্যাসত্যতা পরীক্ষা করা ও ইহার আয়ত্তাধীন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এবং প্রতিজ্ঞা ও হেতু যথার্থ বিষয়-ঘটিত কি না তাহা অবগতির জন্য বিষয়ের সহিত উহাদিগকে মিলাইয়া দেখিতে হইবে। যাহা হউক, তর্কশাস্ত্রের এতাদৃশ লক্ষণ নির্দ্ধারিত হইলে তাহা প্রকারান্তরে দর্শন শাস্ত্রেই পর্য্যবসিত হয়, ইহা বুঝা যাইতেছে। কিন্তু তথাপি তর্কশাস্ত্র ঐকদেশিক শাস্ত্রই থাকিয়া যাইতেছে; সর্ব্বগ্রাহী অখণ্ড অদ্বৈতে পৌছিতে না পারায় দর্শনের ন্যায় ব্যাপক শাস্ত্র হইতে পারিতেছে না, ইহা প্রতীয়মান হইতেছে।

কেহ কেহ বলিবেন, দর্শনের এ আস্পর্দ্ধা, এ ধৃষ্টতা অমার্জ্জনীয়। কেননা, ইহা অমূলক। দর্শনের কোন একটা অবলম্বন, আশ্রয় বা ভিত্তি নাই যাহার উপর দাঁড়াইয়া ইহা স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুনিচয় অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞানাদি যেমন তাহাদের নিয়মাদি আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হয়; মানসী ক্রিয়াদিকে অবলম্বন করিয়া যেমন মননশাস্ত্র বা মনোবিজ্ঞান স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, দর্শনের সম্বন্ধে তেমন একটা মূলাবলম্বন বা আশ্রয় পরিদৃষ্ট হয় না। সকল সিদ্ধান্তের সমন্বয় সাধন, সকল বিচারের সমালোচনা অবশ্যই কোন একটা সত্যের আশ্রয়-সাপেক্ষ। দর্শনের সেই মূল সত্য কোথায়? কোথায়ও নাই; অতএব ইহার ধৃষ্টতা অসহনীয়। দর্শন শূন্যে বিচরণ করে, শূন্যে ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ করে; ইহা স্বয়ং শূন্যময়, বাজে জল্পনা মাত্র।

চিন্তাশীল দার্শনিকবৃন্দেরা এ আপত্তির—এ উপহাস বাক্যের—এ ব্যঙ্গের কি উত্তর দিবেন তাহা আমি বলিতে পারি না। হয়ত তাঁহারা প্রসাদোজ্জ্বল বদনে একটু হাসিয়া

বলিবেন,—"অমৃতং বালভাষিতং।" যাহা হউক, আমার মতে এ আপত্তি নিতান্ত অযৌক্তিক। একটা মূল আশ্রয়, বিজ্ঞানাদির ন্যায় দর্শনেরও আছে, দর্শন ইহা অস্বীকার করিতে পারে না। সেই অবলম্বন (আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেমন ধারণা করিতে পারি) আত্মবোধ (self-consciousness) ও তদবলম্বিত বিশুদ্ধ বিচার (pure reasoning)। এই প্রকার মূলকে অবলম্বন করিয়াই সমস্ত বিদ্যার প্রতিষ্ঠা; সমস্ত বিজ্ঞান মূলতঃ এই সত্যের অপেক্ষা করে; এই সত্যে অনাস্থা করিলে, অনাস্থার সত্যতাও অসিদ্ধ হয়। অতএব এই মূল আশ্রয় করিয়াই দর্শন স্বকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়। কবি, চিত্রকর, দার্শনিক ও উন্মাদদিগের পারম্পরিক সম্বন্ধ। ইহাদের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে গেলে দেখিতে পাই, কল্পনা (imagination) চারিজনেরই সাধারণ সম্পত্তি। কল্পনা যে কেবল ইহাদেরই নিজস্ব সম্পত্তি, অপর কাহারও নহে, আমার বলিবার উদ্দেশ্য তাহা নহে। বৈজ্ঞানিকেরাও কল্পনার সাহায্য লইয়া থাকেন। আমি বলিতে চাই, কল্পনা এই চারিজনের, অন্ততঃ তিনজনের, মধ্যে কিছু বেশী পরিমাণে বিদ্যমান।

কবি ও চিত্রকর উভয়েরই উদ্দেশ্য অপরের মনে হর্ষ বিষাদ ভয় বিস্ময় প্রভৃতি রসাত্মক ভাবের উদ্দীপনা করা। কবিরা কল্পনাবলে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া মানবের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে দাঁড় করান। সেই সৌন্দর্য্য বাস্তব হউক কিম্বা অবাস্তব হউক তাহাতে কবির বড় একটা যায় আসে না। মানব-হৃদয়ের নিগূঢ় সৌন্দর্য্যানুভাবকতাকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিলেই তাঁহার পরিতৃপ্তি। দার্শনিকের ন্যায় যুক্তি-তর্ক-পরম্পরায় তিনি স্বসিদ্ধান্তে উপনীত হন না; পরন্তু তাঁহার হৃদয়-নিহিত সিদ্ধান্তকে ব্যঞ্জনা-রাগ-রঞ্জিত করিয়া, নামরূপ পরিচ্ছদে বিভূষিত করিয়া, আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে একবারে হাজির করিয়া দেন। কল্পনার স্পষ্টতঃ অসঙ্গতি থাকিলে চিত্রের অঙ্গহানি হইতে পারে, তাই তিনি সঙ্গতির ঠাট বজায় রাখিয়া একটা পদ্ধতির (method) মধ্য দিয়া চলেন। কবির চিত্র কাব্যের অলঙ্কারে, ছন্দের তালে, শব্দের ঝঙ্কারে ফুটিয়া উঠে।

চিত্রকর কল্পনা বলে প্রকৃতির হুবহু চিত্র অনুরূপ বর্ণ বৈচিত্র্যে অঙ্কিত করিয়া দর্শকের মনে রসাত্মক ভাবলহরী উদ্দীপিত করেন অথবা মনঃকল্পিত বস্তুকে রূপসৌন্দর্য্যে লোকচক্ষুর গোচর করেন। তাঁহার সে চিত্র বাস্তব হউক কিম্বা অবাস্তব হউক, তাহাতে তাঁহার বড় একটা আসে যায় না। তবে সে চিত্র গঠনে নির্দ্দোষ, ভাবের সঞ্চারে কুশলী হইলেই তিনি সফলকাম। কবির উপকরণ ভাব ও ভাষা; চিত্রকরের উপকরণ ভাব ও বর্ণ। কিন্তু কথা হইতেছে ভাষার অধিকার অতি বিস্তৃত; বর্ণের অধিকার তত বিস্তৃত নহে। বর্ণের অধিকারকে অতিক্রম করিয়াও ভাষার অধিকার বিস্তৃত। সুতরাং ভাষার যাহা আয়ত্ত, তাহা বর্ণের আয়ত্ত হইবে, ইহা খুবই সম্ভাবনীয়। সুতরাং কবি যেমন শব্দ সাহায্যে অনেক অতীন্দ্রিয় বিষয়কে শ্রোতার বুদ্ধিগোচর করিতে সমর্থ হন, চিত্রকর বর্ণের সাহায্যে তাহা দর্শকের বুদ্ধির বিষয়ীভূত করিতে পারেন কি না সন্দেহ।

দার্শনিক কবির ন্যায় কল্পনাপ্রবণ হইলেও কবির ন্যায় আত্মহারা হন না। তাঁহার উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি নহে, সৌন্দর্য্যের আবিষ্কার। তাই তাঁহার প্রতি পদবিক্ষেপ সতর্ক,

তাঁহার চিন্তাগুলি গ্রথিত, শৃঙ্খলিত ও সত্যানুসন্ধী। তিনি যে সৌন্দর্য্য আবিষ্কৃত করেন, তাহা বিবেক-বিচার-সাপেক্ষ। কবির আদর্শ কাল্পনিক বলিয়া বিশ্বাস করিলে তাহার বিরুদ্ধে কবির কিছু বলিবার নাই। কেননা কবি কি প্রণালীতে এই আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা তিনি খুলিয়া বলেন না, বা বলিতে পারেন না। তাহা তিনি কখনও বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখান না। আমরা তাই তাঁহার আদর্শকে সত্য বলিয়া গ্রহণ বা মিথ্যা বলিয়া বর্জ্জন করিতে পারি। দার্শনিকের প্রণালী সকলের সমক্ষে উন্মুক্ত;—সোপানাবলীর ন্যায় বিন্যস্ত। তাহার দোষাদোষ বাহির করিবার জন্য সকলেই সমাহূত। তাঁহার সিদ্ধান্তে সন্দিহান হইতে হইলে তাঁহার যুক্তি প্রণালীতে, তাঁহার বিচারে গলদ বাহির করিতে হইবে; ইহা না করিতে পারিলে তাঁহার সিদ্ধান্ত অবশ্যই মাননীয়, অবশ্যই বিশ্বাস্য।

উন্মাদের সহিত কবি, চিত্রকর ও দার্শনিকের সাদৃশ্য এইটুকু যে সকলেই কল্পনা-প্রবণ। কিন্তু উন্মাদের কল্পনায় একটু বিশেষত্ব আছে। তাহার কল্পনা উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল, অসম্বদ্ধ। তাহার কল্পনায় সিদ্ধান্ত আছে, হেতু নাই; হেতু আছে, সিদ্ধান্ত নাই; চিন্তা আছে, অর্থ নাই; তাই তাহার চিন্তাকে অনুসরণ করা যায় না। যাহারা প্রকৃতিস্থ তাহাদের কল্পনার ধারাবাহিকতা আছে, পদ্ধতি আছে, সম্বন্ধ আছে, উদ্দেশ্য আছে; তাই তাহা অনুসরণ করা যায়, বুঝিতে পারা যায়। ব্যক্তি বিশেষ উন্মত্ত কি প্রকৃতিস্থ জানিতে হইলে দেখিতে হইবে তাহার আচরণে উদ্দেশ্য লক্ষিত হয় কি না, তাহার চিন্তায় শৃঙ্খলা ও ধারাবাহিকতার চিহ্ন পাওয়া যায় কি না। যদি সংসারে সকলেই উন্মত্ত হয়, তবে কে অল্প কে বেশী উন্মাদ অন্ততঃ ইহা জানিতে হইলেও সামঞ্জস্য ও উদ্দেশ্যের কষ্টিপাথরেই তাহাদের হাবভাব আচার ব্যবহার পরীক্ষা করিতে হইবে। এবং যে এই মাপকাঠির যত সন্নিকৃষ্ট হইবে তাহাকেই প্রকৃতিস্থ বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইবে।

শ্রীপ্রফুল্লনাথ লাহিড়ী বি, এ

উপল-খণ্ড

পাশ্চাত্য কলাবিৎ দেবতা গড়িতে মানুষ গড়েন; প্রাচ্য কলাবিৎ মানুষ গড়িতে দেবতা গড়িয়া ফেলেন।

Kipling বলিয়াছেন পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মিলন অসম্ভব। কিপ্লিং ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নহেন।

বন্ধনের প্রতি বিদ্রোহ জীব মাত্রের পক্ষেই স্বাভাবিক; তথাপি একমাত্র মানবই শুধু নিজের জন্য বন্ধনের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

স্রষ্টার নিকট এ জগৎ মিথ্যা মায়া নহে—নিতান্তই সত্য। কবির নিকট তাঁহার কাব্য শুধু কল্পনা নহে—সেইরূপই সত্য।

প্রতীচ্য শিল্পী যাঁহাকে ভালবাসেন, প্রাচ্য শিল্পী তাঁহাকে পূজা করেন। প্রতীচ্য শিল্পীর নিকট তাঁহার কলালক্ষ্মী—প্রেয়সী; প্রাচ্য শিল্পীর নিকট—জননী, দেবী।

ইউরোপে জাতীয়তার বর্ত্তমান উৎকট অভিব্যক্তি স্বার্থপরতার নামান্তর মাত্র।

মানবের জ্ঞান অসম্পূর্ণ; এমন কি দৃষ্টি শক্তি পর্য্যন্তও অসম্পূর্ণ। এত অসম্পূর্ণতা লইয়াও মানব পূর্ণতমের সমকক্ষতা লাভ করিতে ইচ্ছা করে?

কবিত্ব অনুভব করিবার বস্তু; সূত্র দ্বারা তাহার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব।

সৌজন্য অনেক সময় মিথ্যার নামান্তর মাত্র। কৃত্রিমতা মানুষকে এইরূপ ভাবেই অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

যাহাকে সুন্দর বলিয়া মনে করিতেছ, মুখোস খুলিয়া গেলে হয় ত তাহাকে কি কুৎসিতই না দেখাইবে!

কবি স্বপ্ন-বয়ন-পটু নহেন—বিশ্বের মর্ম্মবাণীর প্রকাশক। কাব্য—মিথ্যা কল্পনা নহে; সত্যের নিগূঢ় মর্ম্মবাণী।

বেদনা সহ্য করিতে পারিবে বলিয়া হৃদয়কে কঠিন করিয়া তুলিও না; তুলিলে আনন্দের স্পর্শও অনুভব করিতে পারিবে না।

জগতে নূতন বলিয়া কিছুই নাই। তবে যাহা এ পর্য্যন্ত তোমার অজানিত ছিল তাহাকে নূতন বলিতে পার।

সত্য চিরন্তন; মানুষ তাহাকে আবিষ্কার করে মাত্র।

ইউরোপে আজ যে অনন্ত দুঃখের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে—ধর্ম্মহীন, বিশ্বাসহীন ইউরোপ একমাত্র জাতীয়তার উপর আস্থা-স্থাপন করিয়াই তাহাকে সহ্য করিতে পারিতেছে।

সকল বিশ্বাসহীন মানবের পক্ষে বেদনা সহ্য করা অসম্ভব।

বৃক্ষ-লতা-পুষ্পের প্রাণ স্পন্দন এতদিন একমাত্র কবিগণই অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন—আজ বৈজ্ঞানিকও তাহার পরিচয় পাইয়াছেন।

জগতের মুক্তি বস্তুতন্ত্রতা বা ভাবতন্ত্রতায় নহে; উভয়ের সামঞ্জস্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনে। শুধু বিজ্ঞানে নহে—বিজ্ঞানে ও কাব্যে।

অন্ধ বিশ্বাস হইতে অবিশ্বাসও ভাল। অবিশ্বাস তোমার নিজেরই অপকার করিবে, অন্ধ বিশ্বাস অপরেরও ক্ষতির কারণ হয়।

ভগবান তাঁহার সৃষ্টিক্ষমতা একমাত্র কবি এবং শিল্পীকেই কিয়ৎ পরিমাণে দান করিয়াছেন।

দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক উভয়েই দিব্য-দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন। দার্শনিক চিন্তা দ্বারা, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের দ্বারা প্রকৃতির গুপ্ত রহস্যের পরিচয় পাইয়া থাকেন।

প্রতীচী একদিন মানবের স্রষ্টাকে বাদ দিয়া শুধু মানবতার পূজার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে পূজা ব্যর্থ হইয়াছে।

প্রকাশের আনন্দ হইতেই কাব্যের উৎপত্তি। বিশ্বসৃষ্টির কারণও তাহাই।

উষার আগমনের মত তোমার হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকাররাশি দূর করিয়া প্রেমের উদয় হউক।

নারীর যাহা জীবন, পুরুষের তাহা আরাম; নারীর যাহা প্রেম পুরুষের তাহা প্রণয়।

পশ্চিমে আজ যে ধ্বংসের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে তাহার বিরাটত্ব মানবের মনকে এরূপভাবে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে যে সে ইহার করুণ দিকটার বিষয় ভাবিবার অবসর পাইতেছে না। দেবদেব রুদ্রকে নমস্কার।

সর্ব্ব বিষয়ে সাম্য সম্ভাবনীয় হইলেও বাঞ্ছনীয় নহে। বৈচিত্র্য আছে বলিয়াই জগৎ এত সুন্দর।

পৃথিবীতে দুই প্রকার লোক চক্ষু থাকিতেও অন্ধ। যাহারা অতিরিক্ত ভাল-বাসে, এবং যাহারা তোষামদপ্রিয়।

যাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক তাঁহারা ক্রমে কতকগুলি মুদ্রাদোষের অধীন হইয়া পড়েন, এবং নিজেই নিজের অনুকরণ ও পুনরাবৃত্তি করিতে থাকেন।

প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। কেহ অপকারীর অপকার করিয়া, কেহ বা তাহাকে ক্ষমা করিয়া সে প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করেন।

বিজ্ঞান যে দিন জীবনকে ধ্বংস বা বিলাস-পরায়ণ করিবার জন্য নিয়োজিত না হইয়া তাহাকে সুন্দর করিবার জন্য নিয়োজিত হইবে, সেই দিনই সে সার্থকতা লাভ করিবে।

ভারত 'অতি মানুষ' বলিয়া পূজা করিত —যিনি আপনার সর্ব্বস্বকে ত্যাগ করিতে পারিতেন—তাঁহাকে। জার্ম্মাণী 'অতি মানুষ' (Super-man) বলিয়া পূজা করিতে চাহে যিনি অপরের সর্ব্বস্বকে জোর করিয়া কাড়িয়া লইতে পারেন—তাঁহাকে।

নিজের ইচ্ছানুযায়ী আপনাকে উন্নত করিবার যে শক্তি তাহাই স্বাধীনতা। ইচ্ছানুযায়ী নিজের অবনতি সম্পাদন—উচ্ছৃঙ্খলতা।

শক্তির এমনই মহিমা যে ঘোরতর অত্যাচারীকেও আমরা সম্পূর্ণরূপে ঘৃণা করিতে পারি না—কতকটা বিস্ময় ও প্রশংসার চক্ষে দেখিয়া থাকি।

সামঞ্জস্য সমতা নহে। সামঞ্জস্য—শান্তি; সমতা—মরণ।

দ্র ও তাঁহার

ৃতি *

তেন, সেই অটল কাব্যানুরাগ তাঁহার জীবনের শেষ দশা পর্য্যন্ত, অন্ধাবস্থাতেও অপ্রতিহত ভাবে বর্ত্তমান ছিল, তাহা আমরা তাঁহার জীবনের শেষ দশার কবিতাগুলি অনুসন্ধান করিলে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি।

"চিত্তবিকাশ"—হেমচন্দ্রের শেষ দশার রচনা। তখন তিনি চক্ষুদ্বয় হারাইয়াছেন কিন্তু প্রতিভার অন্তশ্চক্ষু হারান নাই। তাঁহার 'চিত্তবিকাশ' বাস্তবিকই চিত্ত-বিকাশ। অন্ধাবস্থায় কবিবর হেমচন্দ্রের অন্তর্দৃষ্টি আরও উন্মীলিত হইয়াছিল। Where telescope ends, microscope begins ফরাসী কবি হুগোর এই কথাটী খাঁটী সত্য। কবি হেমচন্দ্র তাঁহার 'চিত্ত-বিকাশে' নিজ জীবনস্মৃতির বহু আভাষ দিয়া গিয়াছেন। তিনি এমন নিখুঁত চিত্তের চিত্র তাঁহার অন্য কোন কবিতা-গ্রন্থেই তেমন প্রস্ফুটিত করিতে সমর্থ হন নাই। 'চিত্ত-বিকাশের' সকল কবিতাগুলিতেই কবির দুঃখের গাথা শেষজীবনের এবং সারাজীবনের সুখ দুঃখের কথা। 'চিত্তবিকাশে' যিনি 'বিভু কি দশা হবে আমার?'—শীর্ষক কবিতাটি পাঠ করিয়াছেন তিনি কবির দুঃখে বাস্তবিকই না কাঁদিয়া থাকিতে পারেন না। বাহুল্য ভয়ে আমরা কেবলমাত্র উক্ত কবিতার তিনটা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। কবি অতি দুঃখে গাহিতেছেন—

পাঠাগারের উদ্যোগে—স্মৃতিসভায় পঠিত।

"বিভু কি দশা হবে আমার?
একটী কুঠারাঘাত, শিরে হানি অকস্মাৎ
ঘুচাইলে ভবের স্বপন;—
সব আশা চূর্ণ করে রাখিলে অবনী'পরে
চিরদিন করিতে ক্রন্দন॥
সব ঘুচাইলে বিধি, হরে নিয়ে চক্ষু নিধি
মানবের অধম করিলে।
বল, বিত্ত সব হীন, পর প্রতিপাল্য দীন,
করে ভবে বাঁধিয়া রাখিলে।
ধন নাই বন্ধু নাই, কোথায় আশ্রয় পাই,
তুমিই হে আশ্রয়ের সার।
জীবনের শেষকালে সকলি হরিয়া নিলে,
প্রাণ নিয়া দুঃখে কর পার—
বিভু! কি দশা হবে আমার?"

কবির এই হৃদয়োত্থিত আক্ষেপ-উক্তি বঙ্গবাসী কি এত শীঘ্রই ভুলিবে! এমন প্রাণভেদী হাহাকার, বৃদ্ধবয়সে এমন কবি-ভাগ্যের দুর্দ্দশার চিত্র বঙ্গদেশে আর কাহার কবিতায় দেখিতে পাওয়া যায়! বাস্তবিকই হেমচন্দ্র বঙ্গদেশের Heine ছিলেন। Goldsmith-স্বভাব মাইকেল মধুসূদনকেও বহুবিধ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল বটে কিন্তু মাইকেল ইচ্ছা করিয়াই যেন কষ্টকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি বঙ্গের উন্মার্গগামী কবি, উচ্ছৃঙ্খলতা বশতঃ তাঁহাকে ইহজীবনে বহু স্বেচ্ছা-কৃত কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইয়াছিল; কিন্তু হেমচন্দ্র পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অদৃষ্ট-ফল ভোগ করিয়াছিলেন। মাইকেল যথেচ্ছাচারী প্রতিভাবান্ পুরুষ ছিলেন কিন্তু হেমচন্দ্রের প্রতিভায় বিচার-বুদ্ধি বা হিতাহিত জ্ঞান ছিল। প্রতিভাশালী ব্যক্তির পতন সম্ভব কিন্তু বিবেকী ব্যক্তির পতনে গুরুত্ব আছে। মাইকেলের জীবন-প্রারম্ভে কিছুরই অভাব ছিল না, যদি বুঝিয়া চলিতেন পরবর্ত্তী জীবনেও অভাব থাকিত না। কিন্তু হেমচন্দ্র অল্প বয়স হইতেই স্বচেষ্ট আত্মনির্ভরশীল পুরুষ। সামান্যাবস্থা হইতে হাইকোর্টের সরকারী উকীল হওয়া কবি হেমচন্দ্রের পক্ষে কম সহিষ্ণুতা ও আত্মনির্ভরশীলতার নিদর্শন নহে। এই অসাধারণ আত্ম-নির্ভরতার সঙ্গে ভগবান্ তাঁহাকে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী করিয়াছিলেন। এমন মহা সম্মান খুব অল্প কবি-ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে।

হায়, ভাবিলে বুক ফাটিয়া যায়, এমন সর্ব্বগুণমণ্ডিত ব্যক্তিকেও অবশেষে দুর্ব্বহ জীবন বহন করিতে হইয়াছিল। হেমচন্দ্রের ভগ্নদশা—fallen greatness—বড়ই মর্ম্মপীড়াদায়ক—ধনান্ধ মনুষ্যজীবনের বড়ই চৈতন্য-উৎপাদক! "হের ওই তরুটির কি দশা এখন!"—কবির এই মর্ম্মন্তুদ কথাটী যেন নিজের দশা স্মরণ করাইয়া দিয়া অপর সকলকে সাবধান করিয়া দিতেছে! হেমচন্দ্রের জীবন হইতে আমরা অনেক শিক্ষা পাই। পরম বিষয়াভিমানী ব্যক্তিরও ভগবদ্ভক্তি জাগিয়া উঠে। হেমচন্দ্রের বল বুদ্ধি বিদ্যার কিছুই অভাব ছিল না, তথাপিও তাঁহার জীবনে সুখের সৌভাগ্য বড় অল্পই দেখা গিয়াছিল!

হেমচন্দ্রের জীবনে প্রকৃত সুখ কি? এ কথার উত্তরে বলা যাইতে পারে একমাত্র কবিতারাজ্যেই তাঁহার সুখ। হেমচন্দ্রের কবিত্বের প্রত্যেক ছন্দে ছন্দে সে সুখ, সে আনন্দ স্বর্গের অমৃতধারার ন্যায় প্রবাহিত হইত। এতদ্ব্যতীত, সংসারী হইয়া, পুত্রকলত্র আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব লইয়া তিনি একলহমার জন্যও সুখী হইতে পারেন নাই। বাল্যে মতামহের যত্নে পালিত, যৌবনে পাগলিনী তাঁহার সহধর্ম্মিণী, প্রৌঢ়ে পুত্রগণ পিতা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথাবলম্বী, বিষ-বৃক্ষ

তুল্য সংসার এবং বৃদ্ধাবস্থাতে তাঁহার ততোধিক অভাবনীয় পরিণাম! চক্ষুদ্বয় অন্ধ, শরীর পঙ্গু, দতব্য-নির্ভর জীবন, এতদ্ভিন্ন নানারূপ বিড়ম্বনা ও প্রবঞ্চনা ভোগ করিয়া অমর হেমচন্দ্র নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

যাহাদিগকে তিনি আপন প্রসার হানি করিয়াও নিঃস্বার্থ পরোপকারের পরিচয় দিয়াছিলেন শেষে তাঁহারাই তাঁহাকে বিড়ম্বিত করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। অবশেষে তাঁহাকে দেশের লোকের কৃপার উপর জীবনধারণ করিতে হইয়াছিল। হায়, দারিদ্র্য-নিপীড়িত অন্ধ ব্রাহ্মণ হেমচন্দ্র, অবশেষে তোমার এমনি পরিণাম! তাই যেন চিত্তবিকাশে তোমার 'ভালবাসা' শীর্ষক কবিতায় হতাশ হইয়া লিখিয়াছিলে।—

"কতজনে কতবার সোদর অধিক
জড়ায়েছি হৃদয়েতে ভাবিয়া প্রেমিক,
বৃশ্চিক-দংশিত হয়ে ফিরিয়াছি শেষে,
কেঁদেছি রজনী দিবা যাতনার ক্লেশে।
কতবার কতজনে কণ্ঠের ভূষণ
করিয়া রেখেচি বুকে ভাবিয়া রতন,
ছিঁড়িয়া ফেলেছি শেষে বুঝিয়া স্বপন
করেছি কতই তপ্ত অশ্রু বিসর্জ্জন।"

অতি বড় মানসিক ক্লেশ না পাইলে হেমচন্দ্রের রচনা হইতে এইরূপ খেদোক্তি কখনই নির্গত হইত না। চিত্তবিকাশের মধ্য দিয়াই কবি আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। কবিতার ভিতর দিয়া হেমচন্দ্রের জীবন-কাহিনী আলোচনা করিতে হইলে কবির চিত্তবিকাশ'ই একমাত্র অবলম্বন। কবির আপন কথাতেই আমি যতদূর পারি কবির হৃদয়ের পরিচয় দিব। প্রায় সকল কবিই কবিতার ভিতর দিয়া আত্ম-প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা সহস্র চেষ্টা করিয়াও আত্ম-গোপন করিতে পারেন না—অনিচ্ছাস্বত্বেও আপনাদিগকে ধরা দিয়া ফেলেন। ইহাই কবিগণের অন্তঃ প্রকৃতি। দুঃখের কারাগারে, মেঘের অন্ধকারে, জীবনের নির্জ্জনতায় কবির স্বরূপ যেন আরও স্পষ্ট হইয়া পড়ে।

চিত্ত-বিকাশ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই, কবিবর হেমচন্দ্র কিছুই সঞ্চয় করিতে পারেন নাই, তাহার কারণ তিনি অমিতব্যয়ী ও মহা দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দরিদ্র ব্যক্তিকে কখন আজিকালকার বড় লোকের মত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন না। তিনি যাহা দান করিতেন, সাধারণে তাহা জানিতে পাইত না, তাঁহার মুক্তহস্ত গোপনে দুঃখীর দুঃখ মোচন করিত।

'চিত্ত-বিকাশে'র একস্থলে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—

"পরের হিতার্থ ধন না বুঝে যে ধনী
নিজ স্বার্থ চরিতার্থ সদা বাঞ্ছা করে
পরহিত ভাবে না যে মুহূর্ত্তের তরে,
সে জন দুরাত্মা অতি জগতের গ্লানি।"

পরদুঃখকাতরতা হেমচন্দ্রের জীবনের একটী বিশেষ গুণ ছিল। সপেনহাউর বলিয়াছেন সম্পূর্ণ পরার্থপরতাই (Complete objectivity) প্রতিভাবান্ ব্যক্তিগণের প্রধান লক্ষণ। নিঃস্বার্থপরতাই সকল সত্য উদ্ঘাটনের দ্বার। যাহারা যত অধিক পরার্থপর, তাহারা তত সত্যদর্শী সত্যঞ্চ সমদর্শিনম্। যেখানে যত স্বার্থপরতা এবং সঙ্কীর্ণতা মিথ্যা এবং কুটিলতাও তথায় ততোধিক বর্ত্তমান। ইহাই দর্শনের নিগূঢ় রহস্য।

আমাদিগের হেমচন্দ্র সরল এবং উদার স্বভাবের লোক ছিলেন। পরের প্রার্থনায় তিনি 'হবে না' বলিয়া পশ্চাৎপদ হইতেন না কিম্বা আত্মগোপন করিতেন না। তিনি

পরোপকারের মর্ম্ম বুঝিতেন, দরিদ্র ব্যক্তির দুঃখ দূর করিয়া তিনি অভাবনীয় আনন্দানুভব করিতেন। বালকাল হইতেই দরিদ্রের প্রতি তাঁহার অসীম সহানুভূতি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর বিধাতা যখন তাঁহার সৌভাগ্যের সময়ে ধন দিয়া মন দেখিলেন, বাল্যের সেই ফুটোন্মুখ স্বভাব তখন আরও ফুটিয়া উঠিল। তাই চিত্তবিকাশে কবির চিত্তমুকুর অন্বেষণ করিয়া দেখিতে পাই—

"নিত্য স্মরণীয় সেই মহাত্মা ভূতলে
কত দুঃখ, প্রাণী জ্বালা করে নিবারণ
জগতের কত হিত করে সে সাধন
সে কথা ভাবিলে প্রাণ আপনি উথলে।"

হেমচন্দ্রের বাল্যজীবন বড় মন্দ কাটে নাই। কবি স্বমুখেই বলিয়া গিয়াছেন।

"শৈশব সময় বর্ষ বার তের
বয়ঃক্রম বুঝি হইবে তখন,
জন্মিয়া অবধি একদিন তরে
জানি না কখন দুঃখ কেমন
তখন (ও) পূজার্হ মাতামহ মম
সুমেরুর মত উন্নত শরীর
মাতা পিতা আদি বন্ধু সর্ব্বজন
সে গিরি আশ্রয়ে আছে স্থির

*　　*　　*　　*

আদরে লালিত আদরে পালিত
মাতাম'র আর ছিল না কেহ
অগত্যা তাঁহার আমাদেরই প্রতি
ছিল আশৈশব অধিক স্নেহ।"

বৎসরে বৎসরে তাঁহার মাতামহের বাটীতে তখন শারদীয়া পূজা হইত। তাহাতে বালক হেমচন্দ্রের মাসাবধি ধরিয়া কতই না আনন্দ, কতই না উৎসাহ। কেবল আত্মীয় স্বজন লইয়াই একালের ন্যায় আনন্দে স্বার্থপরতা প্রকাশ পাইত না। সেকালের নিঃস্বার্থ আনন্দোৎসবে সকলেই যোগ দিতে পারিত। ধনী ব্যক্তির গৃহে আনন্দময়ী আগমন করিলে গ্রামের কেহই বাদ পড়িত না। শৈশবের এই সব সুমহান আনন্দোৎসবের ধারণাই হেমচন্দ্রের পরবর্ত্তী জীবনকে অসীম মহানু-ভবতায় গঠিত করিয়াছিল। বর্ত্তমান সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতার দিনে হেমচন্দ্রের ন্যায় দরিদ্রানুরাগী পরার্থদর্শী কবি জন্মিবার সম্ভাবনা কোথায়? মহাকবি জন্মাইবারও একটা কাল আছে, সংযোগ ও সুযোগ আছে। প্রতিভা আকাশকুসুম নহে—অল্প আয়াস ও অদৃষ্টের সাফল্য নহে। দেশপ্রকৃতি এবং জাতীয়প্রকৃতির প্রসারতা ব্যতীত প্রকৃত প্রতিভাবান্ কবি জন্মায় না। তাঁহারও একটা ভূমি চাই, উর্ব্বরতা চাই।

পূজাবাটীতে বৎসরান্তে আনন্দময়ী বিশ্ব-জননী বিজয়া আসিয়াছেন—এই কথা শুনিয়া গ্রামের চারিধার হইতে দীনদুঃখী হেমচন্দ্রের মাতামহ ভবনে সমবেত হইতেছে, সকলেই সেই তিনদিনের তরে সকল দুঃখ ভুলিয়া হাসি মুখে সর্ব্বদুঃখহরা আনন্দময়ীকে দেখিবে, তাহাতে আবালবৃদ্ধ বণিতার কত আগ্রহ, কত না আনন্দ! সেই নিঃস্বার্থ আনন্দে বালক হেমচন্দ্রের যোগদান কি অপূর্ব্ব—দীন দুঃখীর প্রতি তাঁহার কি করুণাপূর্ণ চাহনি! সে চাহনির মর্ম্ম তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের 'চিত্তবিকা-শে'র ভাষায়—প্রাণের ভাষায় ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে,—

"আসিত প্রত্যহ প্রতিমা দেখিতে
কত দুঃখী প্রাণী প্রফুল্ল মুখে
নব বস্ত্রে সবে নিজে নিজে সাজি
সাজায়ে বালিকা, বালকে সুখে
সে আনন্দ ছবি তাহাদের মুখে
হেরি কতবার সংশয়ে ভাবি,

কার বেশী শোভা প্রতিমার কিবা
তাহাদের প্রফুল্ল মুখের ছবি।"

এই কয়টী চরণ তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের রচনা অথচ দেখুন এ বৃদ্ধ বয়সেও হেমচন্দ্রের কিরূপ বালকভাব! মহাজনদিগের স্বভাবই এইরূপ—নীচাশয়তা তাঁহাদিগকে বিন্দুমাত্রও আশ্রয় করে না।

"কার বেশী শোভা, প্রতিমার কিবা, তাদের প্রফুল্ল মুখের ছবি।"

এইখান হইতেই কবি হেমচন্দ্রের জীবনে মহানুভবতা ও পরার্থ পরতার আরম্ভ। তাই বলিতেছিলাম প্রতিভা আকাশ হইতেই পড়ে না—প্রতিভা এই মাটী হইতেই বৰ্দ্ধিত হয়। এই মাটীর সংসর্গ হইতেই মানবের হৃদয়ে নিসর্গছবি ফুটিয়া উঠে। মানব জীবনের সম্পূর্ণ বিকাশ বড়ই রহস্যময়। তাই মহাকবি হুগো বলিয়াছেন—The production of souls is the secret of the unfathomable depths.

বালক হেমচন্দ্র সকলেরই আদরের পাত্র ছিলেন। সৰ্ব্বত্রই তাঁহার অবারিত দ্বার। ঘৃণা নাই, অবহেলা নাই, অহঙ্কার নাই। উচ্চ নীচ সকলেরই আনন্দের পশরা বহিয়া বালক হেমচন্দ্র আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দ-বিভোর।

"সে আনন্দ মাঝে আমি শিশু মতি
সদা হেসে খেলে সুখে বেড়াই
ধনী কি দরিদ্র প্রতিবেশী ঘরে
আমার প্রবেশ নিষেধ নাই।"

প্রবেশ নিষেধ থাকিলেও কবির স্বানুভূতির দ্বার কে রুদ্ধ করিতে পারে? কবির কার্য্যই হইতেছে প্রবেশ করা—মানব জীবনের অতি গভীরতম আধ্যাত্মিক প্রদেশের ভিতর প্রবেশ করা। মানব প্রকৃতির হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করাই কবির প্রকৃত কার্য্য। হেমচন্দ্রের অন্তঃ-প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করিবার জন্যই আমি এতগুলি কথার উত্থাপন করিতেছি।

'বর্ষ বার তের' বয়সেও বালক হেমচন্দ্র যে আনন্দে বিভোর থাকিতেন ষাটবর্ষ আয়ু-ষ্কালেও সে বিগতানন্দের সুখ-স্বাদ ভুলিতে পারেন নাই। চিত্ত-বিকাশে সেই সুখ-স্মৃতি কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখুন।

"ষাটবর্ষ আয়ুঃ ফুরাইতে যায়
সে সুখের দিন কবে গিয়াছে,
আজ ত সে দিন ভুলেনি হৃদয়
সে সুখের স্বাদ আজ ত আছে।"

"We have something of the child in us"—একথা যদি সত্য হয়, হেমচন্দ্রের এতাদৃশ বাল্যভাব পূর্ণ মাত্রায় আজীবন ছিল। অন্ধ ও বৃদ্ধাবস্থাতেও অতি দুঃখ বিপর্য্যয়ের মধ্যেও সেই তরুণ রসমাধুর্য্যে কবি আপনার চিত্তকে সদাসৰ্ব্বদা সিক্ত করিয়া রাখিতেন। অন্ধ হইয়াও কবি 'কৌমুদী' 'খদ্যোত' 'প্রজাপতি' 'আলোক' 'ফুল' 'সরিৎ-সময়' 'শিশু-বিয়োগ' 'ব্রজ-বালক' প্রভৃতি বালভাবাপন্ন কবিতারাশি কল্পনানেত্রে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

তিনি কেবল দশমহাবিদ্যা ও বৃত্রসংহারের গাম্ভীর্য্যময় কাব্যেরই কবি ছিলেন না তিনি আনন্দ ও রহস্যের কবিও ছিলেন। তিনি কেবল কালের ভেরী বাজাইয়া যান নাই, অনেক ব্যঙ্গ কবিতাও লিখিয়া গিয়াছেন।

হেমচন্দ্রের পারিবারিক অবস্থা ভাবিতে গেলে কিছু থাকে না—কবির একমাত্র পাগল হওয়া ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না কিন্তু অসীম পরীক্ষার মধ্যেও তিনি মহাযোগী, তিনি সংসারের সব চিন্তা ভুলিয়া স্বকীয় প্রতিভার ভাবজগতে মগ্ন হইয়া থাকিতেন। তাহার পর, বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার কি দুর্দ্দশাই না

গিয়াছে! কিন্তু হেমচন্দ্র তাহাতে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া দুঃখের দিনেও দুঃখের গাথা গাহিয়া তাহার কবিজীবন সার্থক করিয়া গিয়াছেন।

Shelly অতি দুঃখেই গাহিয়াছিলেন—

"Most Wretched men are cradled
into poetry by wrong,
They learn in suffering what they
teach in song"

আমাদিগের হতভাগ্য কবি হেমচন্দ্রও লিখিয়া গিয়াছেন।

"এ চির মনের সাধ মিটিল না, অপরাধ
লয়োনা দুঃখিনী মাগো, দৈব প্রতিকুল।
কমলা ঠেলিলা পায়, রোষ কৈলা সারদায়
শুষ্ক আশা-তরু মম বিনা ফল ফুল।

এক একবার কবির আনন্দ-মুদিত চক্ষু যখন তাঁহার শ্মশান-স্বরূপ সংসারের দিকে নিক্ষেপিত হইত তখন তাঁহার আক্ষেপের আর সীমা থাকিত না। কিন্তু জীবনের সান্ধ্যশ্মশানেও তিনি ভগ্নোদ্যম হন নাই—তখনও কবির হৃদয়ে কবিতার উৎস ক্ষান্ত হয় নাই। অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় সেই হৃদয়ান্ধকারের ভিতর দিয়া কহিয়া যাইত :—

"এ অতৃপ্তি কেন সদা, ধন যশ কি প্রেমদা
কিছুই সন্তোষ-কর নহে।
নাহিক আকাঙ্খা আশা, নাহিক কোন লালসা
প্রাণ যেন সদা শূন্য রহে।
মুখে ব্যঙ্গ পরিহাস, হৃদে খেদ বারমাস
ফল্গু সম লুকাইয়ে চলে।
বাহিরে আলোক পূর্ণ, হৃদয়ে অঙ্গার চূর্ণ
প্রাণে সদা বহ্নি শিখা জ্বলে।
সহেছি অনেক দিন স'ব আর কত দিন
দিনে দিনে ডুবিছে পাথারে।
সম্বর এ প্রাণ হরি এ দুঃখ ঘুচাও হরি,
এ যাতনা দিওনাক কারে।"

হেমচন্দ্র এত যাতনায়ও অধীর হইয়া পড়েন নাই। Cowper সেই সত্য চরণ দুইটী তিনি হৃদয়ের মধ্যে আঁকড়িয়া ধরিয়াছিলেন।

"Renounce all strength
but strength devine
And peace shall be for ever
thine"

"কে পারে খণ্ডিতে অদৃষ্ট শৃঙ্খলে?
ঘটেছে আমার যা'ছিল কপালে।
কে পারে রাখিতে বিধাতা কাঁদালে
বৃথা তবে কেন কাঁদিয়া মরি?"

কবি এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতেন। হেমচন্দ্রের 'কি হবে কাঁদিয়া?' শীর্ষক কবিতার আগা গোড়াই ওই স্বান্তনার কথা।

হেমচন্দ্রের জীবন-সঙ্গীতে এই একঘেয়ে দুঃখের সুর হয়ত অনেকের শুনিতে ভাল লাগিবে না, তজ্জন্য প্রবন্ধ বিস্তৃত করিতে চাহিনা। তবে, এই মাত্র বলিয়া রাখি যে বঙ্গবাসীর এমন প্রাণের কবি অভাগিনী বঙ্গভূমি আর প্রসব করিবেন কিনা সন্দেহ! হেমচন্দ্রকে ষোড়শোপচারে পূজা করিবার দিন চির হতভাগ্য বাঙ্গালীর জীবনে এখনও আসে নাই, সে অভিনন্দন ও সম্বর্দ্ধনার শুভ-মুহূর্ত্ত কখন আসিবে কি না, জানি না। যে দিন হেমচন্দ্রকে যথার্থ প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার দিন আসিবে সে দিন বাঙ্গালীর ভাগ্যাকাশেরও পরিবর্ত্তন ঘটিবে। সে দিন হেমচন্দ্রের বাণী আমাদের প্রত্যেক জীবনেই করাঘাত করিবে এবং প্রকৃত মনুষ্যত্বের পথে আমাদিগকে লইয়া চলিবে। তখন আমাদিগের বর্ত্তমান অর্থহীন অহঙ্কারের উন্মত্ততা আর থাকিবে না, অভিজাত্য ভুলিয়া তখন আমরা উদারতা ও সহায়তার ক্ষেত্রে পরস্পর মিলিত হইব।

"একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র মিলে,
কর দৃঢ় পণ এ মহী মণ্ডলে
তুলিতে আপন মহিমা ধ্বজা।"

অনৈক্যই যে জাতীয় অবনতির মূল এবং সৌভ্রাত্র ও সহৃদয়তাই যে সকল কল্যাণের জনয়িতা ইহা হেমচন্দ্র বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। সেই উদার স্বভাব ব্রাহ্মণ বাস্তবিকই ব্রহ্মণ্যদেবকে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেন,—

"প্রিয়ং মাকুণু দেবেষু, প্রিয়ং রাজষু মাকুণু
প্রিয়ং সর্ব্বস্য পশ্যত উত শূদ্র উতার্য্যে॥"

তিনি 'রাখি-বন্ধন' নামক কবিতায় যে একতার ছবি আঁকিয়াছিলেন তাহা বাস্তবিকই এক অপূর্ব্ব ও অভাবনীয় সংযোগে পূর্ণ!—সে মিলনে হিন্দু মুসলমান ভেদ নাই, পূরবী পঞ্জাবী ভেদ নাই। তিনি অভেদ ও ভারতের সুখময় চিত্র কল্পনা করিয়া কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও ভাবরসে নিমগ্ন থাকিতেন! হেমচন্দ্রই বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত! কেবল বাঙ্গালীরই বা বলি কেন সমগ্র ভারতবাসীর জীবন-প্রভাতের তিনি অগ্রদূত। নবজীবনের সাড়া লইয়া তিনি বঙ্গসাহিত্য-গগনের প্রভাত-শৈশবে সমুদিত হইয়াছিলেন। গদ্যসাহিত্যে বঙ্গে বঙ্কিমের স্থান যেমন অগ্রে, পদ্য সাহিত্যেও হেমচন্দ্রের স্থান তেমনি। প্রভেদ এই যে বঙ্কিমচন্দ্রের অনেকস্থলে একদেশ-দর্শিতা ও মুসলমান-বিদ্বেষ ছিল কিন্তু মহানুভব বিদ্বেষ-বুদ্ধিহীন হেমচন্দ্র সর্ব্বজাতি নির্ব্বিশেষে অভেদ ভারতের অপূর্ব্ব আদর্শ লইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। এই স্থানেই হেমচন্দ্রের বিশেষত্ব। তিনি সাহিত্য সাধনা দ্বারা ভরতবর্ষের আর একটী সন্তান মুসলমানকে পদে পদে লাঞ্ছিত করিয়া যান নাই। যাহাহউক হেমচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধ বাংলার মাটীর সঙ্গে; জাতীয় অনুপ্রেরণা, অনুপ্রাণনার সঙ্গে। ভারতচন্দ্রের পর বঙ্গভাষায় ওভাবের শক্তি হেমচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রই জাগাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বঙ্গভাষা যে কেবল ছেলেখেলা ও অন্তঃপুরের কঙ্কণধ্বনি নহে, বঙ্গভাষারও যে এক তাণ্ডব নৃত্য ও বজ্রনির্ঘোষ আছে ভারতচন্দ্রের পর রঙ্গলাল, রঙ্গলালের পর হেমচন্দ্রে তাহার পূর্ণ অভিব্যক্তি আমরা লক্ষ্য করি। আমার মনে হয়, মধুসূদনের অপেক্ষাও হেমচন্দ্রের প্রতিভায় তেজস্বিতা অধিকতর ছিল। 'বৃত্রসংহার' কাব্যে তাঁহার ভাষার জ্বলন্তছটায় যেন বজ্রতেজ নিহিত ছিল। দধিচীর অস্থিদান বাস্তবিকই কবিবর বজ্র দিয়া গড়িয়াছিলেন। 'বৃত্রসংহারে'র প্রারম্ভেই কিরূপ শব্দ-শক্তি লইয়া হেমচন্দ্র অবতীর্ণ হইতেছেন দেখুন,

"হা ধিক হা ধিক দেব! অদিতিপ্রসূত।
সুরভোগ্য স্বর্গ এবে দনুজের বাস!
নির্ব্বাসিত সুরগণ রসাতল ভূমে
অবসন্ন তেজশূন্য অশক্ত অলস!"

হেমচন্দ্রের ন্যায় শক্তিশালী কবি বাঙ্গলায় আর জন্মিবে কিনা সন্দেহ!

দশমহাবিদ্যাও হেমচন্দ্রের শব্দশক্তিমত্তার একটী অননুকরণীয় ও অভাবনীয় নিদর্শন।

"রে সতি, রে সতি" কাঁদিল পশুপতি,
পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগ মগন হর, তাপস যতদিন,
ততদিন না ছিল ক্লেশ।"

এসব অনুকরণ করিয়া লিখিতে যাওয়া ত দূরের কথা, যথার্থ সুর ভঙ্গিতে পঠন করাও আমার মত ক্ষীণজীবি অনেকের পক্ষে

দুঃসাধ্য। তাহাতে সবিশেষ বক্ষের বল ও কণ্ঠের বলও প্রয়োজন। লিখিবার কালে স্বয়ং মহাদেব যেন কবির কণ্ঠে আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এইরূপ ভাষা লইয়া সর্ব্বত্রই হেমচন্দ্রের তাণ্ডবনৃত্যন ও মেঘ-গম্ভীর গর্জ্জন! 'মহাদেবের বিলাপে'র আর একটী উদ্ধৃতি দেখুন,

জল নিধি মন্থনে অমৃত উছালিল
যত সুর বাঁটিলি তাহে।
ভস্ম ভকত হর, হরষিত অন্তর
গ্রাসিল গরল প্রবাহে॥

এ সব কবির নিজস্ব সম্পত্তি ও অবিনশ্বর কীর্ত্তি! মহামতি ফরাসী সমালোচক Taine একস্থলে বলিয়াছেন যে All original art is self-regulated ; and no original art can be regulated from without ; it carries its own counterpoise and does not receive it from else where, lives on its own blood." তেমতি, হেমচন্দ্রের প্রতিভা হেমচন্দ্রের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছিল। আধুনিক কবিগণের ন্যায় বাহিরের উচ্ছিষ্ট লইয়া তিনি স্বকীয় ভাব-জগৎকে পুষ্ট করেন নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি হেমচন্দ্রের প্রতিভার সম্যক্ পর্য্যালোচনার দিন এ নির্জীব বঙ্গভূমে আসিতে এখনও বহু বিলম্ব। বাঙ্গালীর জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন না ঘটিলে হেমচন্দ্রের যশো-সূর্য্যের পূর্ণ বিকাশ হইবে না। জীবদ্দশায় তিনি ভিক্ষা করিয়া ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, বাঙ্গালীর নিকট তিনি কোন সম্বর্দ্ধনাই পান নাই। কিন্তু এমন দিন আসিবে যে মহাদিনে হয়ত এই অন্ধ-কবি বাঙ্গালীর হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবেন।

মার্কিণ মহাকবি Walt Whitman তাঁহার অভিনব গ্রন্থ Leaves of Grassএ এক স্থলে লিখিয়াছেন, "that first class literature does not shine by any lurinosity of its own, nor do its poems. They grow of circumstances and are evolutionary." হেমচন্দ্রের মহতী কল্পনাও বিধাতার আশীর্ব্বাদ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। হয় ত সেই কল্পনা একদিন বাস্তবে পরিণত হইয়া আমাদিগের অধমাধম জীবনকে জ্ঞানে গরীয়ান ও সম্পদে মহীয়ান করতঃ বিবিধ উন্নতিশীল মানব-জাতির সমকক্ষ করিয়া তুলিবে। হেমচন্দ্রের জ্বলন্ত এবং জীবন্ত ভাষায় বঙ্গে জাতীয়-জীবনের বীজ রোপিত হইয়াছে—বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। "Still lives the song though Regnar dies." আমাদের হেমচন্দ্রও আজ ইহজগতে নাই বটে কিন্তু তাঁহার সঙ্গীত ফুরায় নাই, বাঙ্গালীর হৃদয়ে বংশপরম্পরায় তাহার রেশ্ প্রতিধ্বনিত হইতেছে ও হইবে। হেমচন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন বটে কিন্তু হেমচন্দ্রের আত্মার কার্য্য এখনও ফুরায় নাই। তাঁহার প্রতিধ্বনি জাতীয় জীবনের ধমনী হইয়া বাঙ্গালীর হৃদয়-মরুভূমে অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় বহিয়া যাইতেছে। হেমচন্দ্রের সঙ্গীতের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে Tennysonএর ভাষায় বলিতে হয়—"The song that nerves a nation's heart is in itself a deed."

হেমচন্দ্র দরিদ্রের দুঃখে যেমন সদাই ব্যথিত থাকিতেন তেমনি স্বদেশের দুঃখেও তিনি ম্রিয়মান ছিলেন। বিলাতফেরত বাঙ্গালীর উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার দেখিয়া, স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি অমনোযোগিতা দেখিয়া তিনি

বড়ই দুঃখিত হইতেন। তিনি ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেন,—

"হে জগৎপতি এ দাস মিনতি
রেখো এই দয়া বঙ্গমাতা প্রতি,
বঙ্গবাসী যেন কখনও কেহ
যেখানেই থাক যেখানেই যাক
যতই সম্মান যেখানেই পাক
না ভুলে স্বদেশ ভকতি স্নেহ।"

আমরা বিদেশের নোবেল প্রাইজই পাই বা ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বই পাই না কেন, যত দিন না দেশবাসীর হৃদয়ের সিংহাসন অধিকার করিতে পারিব, ততদিন আমাদের সকল সাধনাই বৃথা, ইহা হেমচন্দ্র বহুপূর্ব্বে বুঝিয়াছিলেন। তাই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও অনুকরণ-শক্তি থাকিতেও দেশের মাটীর সঙ্গে স্বকীয় চিন্তার যোগ লুপ্ত করেন নাই। তিনি বঙ্গের জাতীয় কবি বলিয়াই অনুকরণ করিতে গিয়া তাঁহার ছায়াময়ী, তাঁহার নলিনী-বসন্ত ব্যর্থ চেষ্টা হইয়াছে। যাঁহারা প্রকৃত প্রতিভা-শালী কবি তাঁহারা পরানুকরণ প্রবৃত্ত হইলেই কেমন ফাঁপরে পড়িয়া যান। অনুকরণ করা যে কৃত্রিম কবিগণেরই স্বভাব, এবং ব্যবসা। ভাবের ঘরে চুরি করিতে তাঁহারা বেদনার পরিবর্ত্তে আনন্দই অনুভব করিয়া থাকেন।

অধুনিক অল্পায়াসী যশের কাঙ্গালে উদীয়-মান কবিগণের অনুকরণ প্রবৃত্তিই প্রবল। তজ্জন্য তাঁহারা গীতি কবিতার ক্ষুদ্রতার ভিতর আপনাদিগকে আবদ্ধ রাখিতেই ভাল-বাসেন, মধুসূদন, হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্রের ন্যায় মহতী কল্পনা সাহিত্যের আসরে অবতরণ করিতে সমর্থ নহেন। আধুনিক প্রতিভার সে ভরসা কোথায়? প্রতিভার এখন জরা-জীর্ণ দৈন্যাবস্থা! মেঘনাদ বধ, বৃত্র-সংহার বা পলাশীর যুদ্ধের ভাব ও ভাষা আধুনিক কবিগণের কল্পনারও অতীত। কারণ অল্পায়াসী, বিজাতীয় উচ্ছিষ্টপ্রত্যাশী আমরা। সে পূর্ব্বাচর্য্যাগণের ন্যায় মহা-ভারত রামায়ণে, বাল্মীকি, বেদব্যাসে আমা-দের সাষ্টাঙ্গ প্রণতি কোথায়? তাই জ্যোৎস্না, ফুল ও রমণীরূপ বর্ণনা করিয়াই আমরা কবি বলিয়া যাই, নিজ ঢক্কা নিনাদিত করি ও আপনা-দিগকে অমর মনে করি। আমাদিগের সে শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কার কোথায়? যে শিক্ষায় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও মাইকেল মধুসূদন 'নমি আমি কবিগুরু বাল্মীকির পদে।'—বলিয়া ভক্তিভরে পূর্ব্বপুরুষের নিকট মস্তক অবনত করিয়া গিয়াছেন, আজীবন ধরিয়া পৌরাণিক সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন। আমাদের সে শিক্ষা কোথায়, যে শিক্ষায় হেমচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই প্রণোদিত। রামায়ণের গান শুনিতে বালক হেমচন্দ্র আহারনিদ্রা ভুলিয়া যাইত। কবিবর নিজেই লিখিয়াছেন:—

"সেকালের প্রথা রামায়ণ গান
অপরাহ্নে শুনি, মোহিত হয়ে
সমুদ্র লঙ্ঘন, পুষ্পকে গমন
শুনি স্তব্ধ হয়ে বিস্ময়ে ভয়ে।
নিশিতে আবার শুনি যাত্রাগান
সমস্ত রজনী জাগিয়া থাকি
শুনি সে আখ্যান না ভুলি কখন,
হৃদয়ফলকে লিখিয়া রাখি।"

হৃদয়ফলকে লিখিয়া না রাখিলে বৃত্র-সংহারের ন্যায় কাব্য কখনও হেমচন্দ্র রচনা করিতে পারিতেন না। এইরূপ মহাকাব্য গঠনের উপযোগী শিক্ষা আধুনিক কবিগণের কোথায়? তাই বঙ্গীয় সাহিত্য-প্রাঙ্গণ উর্ব্ব-রতা হারাইয়া কেবল আগাছা ও পরগাছা-তেই পূর্ণ হইতেছে।

আইস ভাই বাঙ্গালি, আমরা আবার

হেমচন্দ্রের একনিষ্ঠ আদর্শ ও অভেদভাব লইয়া সাহিত্য সাধনা দ্বারা বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনকে উন্নত করিয়া তুলি, সাহিত্যকে জাতীয় কল্যাণ ও সমাজের মুখ চাহিয়া গঠন করি। হেমচন্দ্রের মহানুভবতা এবং উদারতাকে বক্ষে এবং অন্তরে ধারণ করিয়া কর্ত্তব্য এবং কল্যাণের পথে অগ্রসর হই। তাঁহার যথার্থ সম্মান করিতে হইলে তাঁহার পদাঙ্ককে আমাদিগের ভুলিলে চলিবে না। তাঁহার অভেদ ভারতের সুখস্মৃতি আবার জাগ্রত করিতে হইবে। বিদ্বেষ বুদ্ধিকে সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে। এস ভাই আজ সেই মহাপ্রাণ কবির পরলোকগত আত্মার নিকট যোড়করে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি ও তাঁহার স্মৃতি-শিখরে যশের কিরীট পরাইয়া দিয়া জীবনকে ধন্য করি! Henley বলিয়াছেন—'Fame's a pearl that hides beneath a sea of tears" আমরাও আইস, তাঁহার ইহজীবনের দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া পরজীবনের মঙ্গল কামনা করি, তাঁহার দুঃখে অশ্রুবিসর্জ্জন করি।

ইংলণ্ডের কবি Pope বলিয়াছেন—"Fame is a fancied life in others breath" এখন তিনি আমাদিগকে অভাবের অশ্রুজল ও দীর্ঘনিঃশ্বাসে ফেলিয়া মহা শাশ্বতী শান্তিতে কি এক মৃত্যুহীন আনন্দরাজ্যে বিচরণ করিতেছেন! ইহজীবনের পরপারে কি এক অম্লান, চির-সৌরভময় কবিজীবনের পারিজাতমালা গ্রথিত হইয়াছে! হেমচন্দ্রও তথায় এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। সেই অন্ধ ভিখারী ব্রাহ্মণ এখন সমগ্র বঙ্গবাসীর হৃদয়ের রাজা। আর তিনি মুষ্টিভিক্ষার জন্য বাঙ্গালীর দ্বারে লালায়িত ন'ন—দাতব্য-নির্ভর—যন্ত্রণাকাতর জীবন বহন করেন না। এক্ষণে তিনি fancied life in other's breath লইয়া স্বর্গের কাব্যকুঞ্জে বিহার করিতেছেন ও অনন্তকাল ধরিয়া সেক্সপীয়র কালিদাস ও গাইটের ন্যায় ইহজগতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

শ্রীঅকিঞ্চন দাস

রাজশাহীর প্রাচীন যৎকিঞ্চিৎ

রাজশাহীর ঐতিহাসিকগর্ব্বে সমগ্র বঙ্গ—সমগ্র ভারতবর্ষ গরীয়ান; কিন্তু দুঃখের বিষয় রাজশাহীর ইতিহাস নাই। নাই বলিয়া কেহ তাহার চেষ্টাও করেন না—করিতেও বোধকরি ঘৃণাবোধ করেন। কিন্তু এদেশের ইতিহাস যে, বঙ্গ ইতিহাসের কতিপয় পরিচ্ছেদ পূরণ করিতে পারে—বঙ্গীয় কতিপয় প্রসিদ্ধজনের প্রাণে অতীত গৌরব—অতীত স্মৃতি উদ্দীপিত করিয়া জাতীয়তার একটা প্রাণ আনিতে পারে, একথা আমরা ভাবি না এবং ভাবিতেও চাই না। রাজশাহীর আদৎবাসীর কথা বলিতে গেলে সকলেই প্রায় আপন দেশের কিছুই জানেন না—সুতরাং রাজশাহীর ইতিহাস নাই। আমি আমার কোন ঐতিহাসিক বন্ধু দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া এখানে কতিপয় প্রাচীন রাজবংশের উদ্ভববার্ত্তা জ্ঞাপন করিব।

বক্তিয়ার খিলিজি বঙ্গ অধিকার করিলেন। তাঁহার দুইজন সেনাপতি লস্কর খাঁ ও তাহেরুল্লা খাঁকে যুদ্ধকালে সৈন্যসাহায্য করিবার জন্য তিনি কতিপয় স্থান জাইগির দিলেন। লস্করের জাইগিরের নাম লস্করপুর ও তাহেরুল্লার জাইগিরের নাম তাহেরপুর পরগণা।

১২৮২ খ্রীষ্টাব্দে নাছীরুদ্দীন গৌড়তক্তে। তাহেরুল্লা নিঃসন্তান পরলোক গমন করিলে নাছীরুদ্দীন আপন সৈনিকবিভাগের এক কর্ম্মচারী বিজয় লস্করকে তাহেরের জাইগির ও তাঁহার আত্মীয় সনাতন চৌধুরীকে গৌড়-রাজের খাস সম্পত্তি হুছরাপুর ও চাস্‌নাই পরগণা প্রদান করিলেন। নন্দনাবাসী প্রসিদ্ধ কল্লুক ভট্ট ও তাঁহার ভ্রাতা পুরুষোত্তম বেদান্তীর অধস্তন অষ্টম পুরুষে বিজয় ও সনাতনের জন্ম। প্রথমতঃ বিজয় লস্কর দিঘাগ্রামে (১) ও সনাতন গুয়াখায়াতে (২) বাস করিতেন। কিন্তু জাইগিরপ্রাপ্তির পর, বিজয় তাহেরপুর (৩) ও সনাতন ঝিকড়াতে (৪) বাস করিতেন। বিজয় লস্করের বংশধর তাহেরপুরের পূর্ব্ব রাজবংশীয়গণ। সে বংশের এখন কেহই নাই। সনাতনের বংশীয় ভানপুর (৫) ও কোশিয়ার (৬) চৌধুরীবর্গ, এবং তালন্দর (৭) রায়গণ এখনও হুছরাপুর পরগণার কতক কতক সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন।

সম্রাট বুলবন্ গৌড়াধিপ বখ্‌রা খাঁকে নিস্তেজ করিবার জন্য যখন বাঙ্গলায় আসেন প্রত্যাগমনকালে তিনি চন্দ্রকোলাবাসী (১) ঋষি বৎসরাচার্য্যের তপস্যার সাহায্য স্বরূপ কিছু ভূসম্পত্তি প্রদান করিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। তিনি অস্বীকার করিলে, বখ্‌রা খাঁর দ্বারা তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র পীতাম্বর বাগ্‌ছীকে (লস্করের মৃত্যুতে) খাস সম্পত্তি লস্করপুর জাইগির প্রদান করেন। পীতাম্বর, সম্রাট সুনয়নে পড়িয়া দিল্লীর নগর-রক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাই তিনি "পীতাম্বর সহরমণ্ডল" রূপে পরিচিত। পীতাম্বরের দিল্লী প্রবাসকালে, তাঁহার কনিষ্ঠ নীলাম্বর পুঠিয়াতে বসত বাস করতঃ সম্পত্তি দেখিতেন, অপর ভ্রাতা পুষ্পরাক্ষ তাহেরপুরের বিজয় লস্কর বংশোদ্ভব হরিনারায়ণ ও হৃদয় নারায়ণ ঠাকুরের অধীনে কর্ম্ম করিতেন।

হরিনারায়ণ ও হৃদয়নারায়ণের মধ্যে বিরোধ ঘটিল—হরিনারায়ণ নিঃসন্তান তাই তাহার অংশ পুষ্পরাক্ষকে দিয়া বারাণসী বাস করিলেন, পুষ্পরাক্ষ পুঠিয়াতে যাইয়া ভ্রাতা নীলাম্বরের সহিত উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। সহসা পীতাম্বর ও পুষ্পরাক্ষের মৃত্যু হইল। বাদসাহ সনন্দ লইয়া নীলাম্বর লস্করপুর প্রাপ্ত হইলেন। নীলাম্বরই পুঠিয়ার রাজাদিগের আদিপুরুষ। পুষ্পরাক্ষের প্রাপ্ত তাহেরপুরের অংশের জন্য আবার বিবাদ উঠিল। হৃদয়নারায়ণের দেওয়ান—তেঁতুলিয়ার (১) রায়চৌধুরী—নীলাম্বরকে

(১) দিঘা—নাটোর থানার অধীন। (২) গুয়াখারা—বড়াইগ্রাম থানার অধীন। (৩) তাহেরপুর—বাগমারা থানার অধীন।

(৪) ঝিকড়া—এখন জঙ্গলাকীর্ণ গোদাগাড়ী থানার অধীন।

(৫।৬) ভানপুর ও কোশিয়া—গোদাগাড়ী থানার অধীন।

(৭) তালন্দ—ভানইর থানার অধীন।

(১) চন্দ্রকোলা—পুঠিয়া থানার অন্তর্গত ও সন্নিকট।

(১) গোদাগাড়ী থানায় তেতুলিয়া। যেখানে ইহার বাড়ী ছিল তাহাই তেতুলিয়া ডাঙ্গা নামে খ্যাত।

ঐ অংশের পরিবর্ত্তে একদিক হইতে কিছু সম্পত্তি প্রদান করাইয়া বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন। পুঠিয়ার রাজারা এখনও কাছিহাটা লস্করপুর বলিয়া যাহা ভোগ করেন, তাহাই ঐ সম্পত্তি।

আলি মোবারকের গৌড় রাজত্বকালে, নাসীরুদ্দীনের পুত্র বার্ব্বক বরেন্দ্র শাসন করিতেন। "সরকার বার্ব্বকাবাদ" বলিয়া যেভূখণ্ড রাজশাহীর জমিদারবর্গের সেরেস্তায় লিখিত থাকা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই বার্ব্বকের শাসনচিহ্ন।

১৩৪৫ খ্রীষ্টাব্দে হাজি ইলিয়াস সামসুদ্দীন নামে বাঙ্গালার মসনদে বসিলেন। স্বাধীনতার প্রবল বাসনা তাঁহাকে মত্ত করিয়া তুলিল। আদমশুমারিতে স্থির হইল যে মাত্র ৩৪০০০ মুসলমান বঙ্গ, বেহার ও গৌড়ে অধিষ্ঠিত। মুষ্টিমেয় মুসলমানের সহযোগে হিন্দুর দেশে স্বাধীন হওয়া নিতান্ত কঠিন বুঝিয়া সমসুদ্দীন বর্ত্তমান বাঘা পাকুড়িয়ার(২) শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ীর পুত্র সুবুদ্ধি, কেশব ও জাগদানন্দ ভাদুড়ীও সাঁতৈলের (৩) শিখাই সান্যালের সহিত মিত্রতা করিলেন। জগদানন্দ রায়-উপাধি প্রাপ্ত হইয়া দেওয়ান হইলেন —সুবুদ্ধি, কেশব ও শিখাই খাঁ সাহেব খেলাত পাইয়া সেনাপতি সাজিলেন, ও তাঁহাদিগের সমবেত শক্তি প্রভাবে প্রায় পঞ্চাশ হাজার সুশিক্ষিত হিন্দু সৈন্যের সৃষ্টি হইল। সামসুদ্দীন স্বয়ং হিন্দুবলে বলীয়ান হইয়া স্বাধীন হইলেন।

সুবুদ্ধি, কেশব, জগদানন্দ ও শিখাই নামমাত্র এক টঙ্কার নজর দিয়া প্রত্যেকে একলক্ষ বিঘা জমি পাইলেন। সুবুদ্ধি, কেশব ও জগদানন্দ প্রভৃতি তিন ভ্রাতার জায়গির ভাদুড়ীর চক্র-ভাদুড়ীয়া বা ভাতুড়িয়া বলিয়া খ্যাত। এবং এই জায়গির, মুরসীদকুলি খাঁ যখন চাক্‌লা বিভাগ করেন তখন চাক্‌লা ভাতুড়ীয়া নাম গ্রহণ করিয়াছিল। পরে এই চাক্‌লা ভাতুড়ীয়া, তপ্পে ব্যাস, তপ্পে কুশুম্বি এবং তপ্পে ভাতুড়ীয়া তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া তিনটী পরগণা হয়।

উক্ত হিন্দু সভাসদবর্গের মধ্যে কেহই স্বয়ং দরবারে উপস্থিত থাকিতেন না—কেবল তাঁহাদিগকে প্রতিনিধি রাখিতে হইত,—তাঁহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া বাদশাহ বুদ্ধি বাহির করিতেন—তবে বিশেষ বিশেষ কর্ম্মে তাঁহাদিগের স্বয়ং উপস্থিত হইতে হইত। এই সকল প্রতিনিধির নাম ফৌজদার। সুবুদ্ধিদিগের পক্ষে সুবুদ্ধির তৃতীয় পুত্র, দুর্গাদাস খাঁর পুত্র, মধুখাঁ ও শিখাই সান্যালের পক্ষে তাঁহার তৃতীয় পুত্র, পুরাইয়ের পুত্র যাদব ঠাকুর ওরফে কংসরাম গৌড় বাদসাহের ফৌজদার ছিলেন। শিখাই সান্যালই সান্তোল রাজবংশের আদিপুরুষ।

সুবর্ণ গ্রামের ব্রজগোপিণী নাম্নী এক ব্রাহ্মণ-বিধবা অপহৃতা হইয়া গৌড়-বাদসাহের কুলবতী বেগম হইয়াছিলেন। সামসুদ্দীন, মৃত্যুকালে নূতনত্বের মোহে কুলবতীর গর্ভজাত সন্তান ময়জুদ্দীনকে বাদশাহী প্রদান করিয়া, পূর্ব্ব পত্নীর গর্ভজাত পুত্র গিয়াসুদ্দীনের কিছু মাসহারা অবধারণ করিয়া যান।

বাদসাহ সামসুদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই বেগমের বিবাদ বাঁধিল। কুলবতী পুত্রের অক্ষমতার কথা চিন্তা করিয়া, সেনাপতি জুনার্খাকে তৃতীয় পতিত্বে বরণ করিয়া মধুখাঁ ও কংসরামের যুগ্য মন্ত্রণায় গিয়াসুদ্দীনকে বধ করতঃ তাহার পত্নী ও আপন

(২) বাঘা পাকুড়িয়া—পাবনা জেলায়। (৩) সাঁতৈল—বড়াই গ্রাম থানার অন্তর্গত।

স্বপত্নীকে পাণ্ডুয়ার বাজারে পণ্যে পরিণত করিলেন। শিশু ময়জদ্দীন মাতৃগৌরবে গৌড়-তক্তে বসিলেন।

গৌড় সিংহাসনে বিশৃঙ্খলতার সহায় লইয়া কংসরাম হিন্দু রাজত্বের স্বপ্ন দেখিলেন। ঘাতকের গুপ্ত অসিতে প্রবল সেনাপতি জুনাখাঁ মর্ত্ত ছাড়িলেন—কংস পুত্র জনার্দ্দন পিতৃনির্দ্দেশে পাঠান সর্দ্দারবর্গকে অপসারিত করিলেন—কংস স্বয়ং ব্রাহ্মণকুমারী কুলবতীকে আপন হৃদয়তোষিণী করিয়া চতুর্থ পতিত্বের ডোর বাঁধিলেন। গৌড়সিংহাসনে হিন্দু রাজার স্থান হইল। কংস ময়জদ্দীনের অভিভাবক হইয়া সিংহাসনের পাশে বসিলেন।

সাঁতৈলের কংসের গৌড় শাসনকালে—মগেরা আরাকান রাজকে বিতাড়িত করিলে—রাজা কংসের সাহায্য প্রার্থী হন। ত্রি সহস্র সৈন্যসহ কংশপুত্র জনার্দ্দন, আরাকান হইতে মগ বিধ্বস্ত করিয়া আরাকান রাজকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাতে আরাকানরাজ জনার্দ্দনকে বজ্রবাহু উপাধি দিলেন, কংসরাম দিলেন শক্রম্ন এবং পাটনার নবাবি।

কংস, সুবুদ্ধি খাঁদিগের ভাতুড়ীয়া দখল করিয়া তাহাদিগকে নিস্তেজ করিলেন। ময়জদ্দীন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সেকন্দর নাম গ্রহণ করিয়া স্বয়ং শাসনভার লইয়া দেখিলেন—কংস বলে তাহার সিংহাসন টলায়মান; কংস নিহত হইল—ময়জদ্দীন সাঁতৈল ধ্বংসে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু মাতা ও মধুখাঁর অনুরোধে সাঁতোল রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া বার্ষিক ১৪০০ শত টাকা কর ধার্য্য করতঃ কংসের পুত্র গণেশ, কার্ত্তিক ও রূপবসন্তকে প্রদান করিলেন; সাঁতৈলের খাঁসাহেব উপাধি নষ্ট হইল—সাঁতৈল রাজ কেবল মাত্র ভুঁইয়া হইয়া গেলেন।

কংসের মৃত্যু পর, মধুখাঁ ময়জদ্দীন বা সেকন্দর সাহার দক্ষিণ হস্ত হইলেন। তাহার কার্য্যে তুষ্ট হইয়া বাদশাহ তাঁহাকে শোনাবাজু,প্রতাপবাজু ও বড়বাজু আদি ৪টী পরগণায় জমীদারী প্রদান করিয়া তদীয় আত্মীয় স্বজনকে সরকারের কর্ম্মচারীরূপে নিয়োজিত করিলেন।

জনার্দ্দন, পিতার নিধনে সাঁতোলের রাজ্য লোপ ও উপাধি লোপে ক্ষুব্ধ হইয়া, সসৈন্যে গৌড় আক্রমণ করিলেন—সেকন্দরও ভীত হইয়া পড়িলেন, পুত্রের বিপদে কুলবতী মধুখাঁকে পঞ্চম পতিত্বে বরণ করিয়া তদ্দ্বারা জনার্দ্দনকে নিহত করেন।

কংশের পুত্র গণেশ "দিল্লীশ্বরং বশীকৃত্য ক্রমোতস্য প্রিয়োভবেৎ" ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রবল হইয়া গৌড় বাদসাহ সামসুদ্দীন দ্বিতীয়কে বধ করিয়া লস্করপুর তাহেরপুর ব্যতীত পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত সমস্ত গৌড়মণ্ডলীতে অধিকার বিস্তার করতঃ আপন অধিকারভুক্ত করেন (১)। পাণ্ডুয়া রাজধানী বিশেষভাবে সজ্জিত হইল। তিনি দ্বারবাসিগণের জন্য বৃহৎ দ্বারাবতী পুরী (বর্ত্তমান দ্বারিয়াপুর) নির্ম্মাণ করতঃ তাহার দ্বারে দ্বারবাসীনী ভদ্রকালী প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করেন। এখনও মালদহবাসিগণ সেই মূর্ত্তি পূজা করেন।

(১) গণেশের অধিকৃত স্থান—সমস্ত ভাতুড়ীয়া, গোবিন্দপুর, আমরুল, ইসবসাহী, প্রতাপ বাজু, উজীরপুর, সায়েস্তানাবাদ, সায়েস্তানগর, রামপুর, খাসিদাবাদ, ইসলামপুর, গঙ্গাপথ, আক্রমনগর, বুপদি, কাটার মহল, গুড়িয়ানি, গঙ্গারামপুর, হিন্দাবাজ, সাহাজাদপুর, দিঘা, মেহেমনসাহী, বাজরান ও মহাম্মদপুর, ওপ্তয়রহ পরগণার স্থান।

Stewart সাহেব এই গণেশকেই Kanis, the *Zaminder* of Bhaturiaবলেন। কাহারও মতে সেই গণেশই দিনাজপুরের রাজা গণেশ। কিন্তু এই গণেশ যে দিনাজপুরস্থ নহে তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়; কারণ ভাতুড়ীয়া দিনাজপুরে নহে ইহা সাঁতোল রাজার রাজ্য ছিল। দিনাজপুর, এই গণেশের সময়েই উদ্ভূত হয়।

গণেশের গৌড়শাসনকালে তাঁহার সামন্ত এক বারেন্দ্র কায়স্থ রাজা অজবল উত্তর বরেন্দ্রে বর্দ্ধন কুঠীতে রাজত্ব করিতেন। হরিরাম ঘোষ নামে এক উত্তররাঢ়ী কায়স্থ তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। অজবল অপুত্রক হওয়ায় কাশীবাসী হইতে মনস্থ করিয়া আপন রাজ্য হরিরামকে দান করিয়া যান। বহুদিন পর ঈশ্বরানুগ্রহে কাশীধামে অজবলের একটী পুত্র জন্মে। হরিরাম, এই সংবাদ পাইয়া, প্রভুকে রাজ্য পুনঃগ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। অজবল স্বীকৃত হইলেন না। পুত্রটী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, হরিরাম অজবলের অনুমত্যানুসারে ঐ সম্পত্তির নয় আনা তাঁহাকে প্রদান করতঃ বর্দ্ধনকুঠীর রাজাসনে স্থাপন করেন। রাজা গণেশরাম অজবলের পুত্রকে লইয়া গিয়া "দীনরাজ" উপাধী প্রদান করতঃ তাঁহার উপপত্নীসুতার সহিত বিবাহ দিয়া তাহাকে আরও কিছু ভূসম্পত্তি প্রদান করেন। "দীনরাজের" নামানুসারে তদীয় আবাসস্থান "দীনাজপুর" আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

গণেশের পুত্র যদুরাম—মল্লযুদ্ধে পারদর্শী বলিয়া তিনি যদুমল্ল বা যেৎমল নামে কথিত। গণেশের জীবিতাবস্থাতেই, যদু আজিম সাহ্‌য়ের কন্যা আস্‌মানতারাকে বিবাহ করতঃ ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ১৩৯২ খ্রীষ্টাব্দে গণেশ কবরশায়ী হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র যদু জালালুদ্দীন হইয়া পিতৃ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। তাহার পর, তদীয় পুত্র আহম্মদ সাহ রাজা হন, কিন্তু গৌড়তক্তে সাঁতৈলের প্রতিপত্তি তাঁহার সহিতই (১৪২৬ খ্রীষ্টাব্দে) শেষ হইল।

তৎপর ফিরোজ সাহ আসিলেন। ফিরোজ সাহ দীনরাজের কার্য্যতৎপরতায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পেস্কারী পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই সময়ে বল্লালের স্থাপিত সামন্ত রাজ্যের অধস্তন ৮ম পুরুষে রাজা অচ্যুত কোন কমলা-পুরীতে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজধানী বর্ত্তমান বগুড়া জেলায়, ভবানীমাতার বাড়ীর উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। এখনও কমলা-পুরী রাজধানী ও দুর্গের চিহ্নাদি বর্ত্তমান রহিয়াছে। কমলাপুরী রাজ্যটী করতোয়া নদীর পশ্চিম তীর হইতে আত্রেয়ী নদীর পূর্ব্ব তীর মধ্যে অবস্থিত ছিল। রাজা অচ্যুতের কন্যা ভদ্রাবতী অধুনা দুর্ভাগিনী বঙ্গবালবিধবার বিশেষণরূপে পরিণত। ঐ ভদ্রাবর্ণিত মেয়ে দ্বারা অধুনা বঙ্গপ্রাঙ্গণ পূর্ণ। বিজয়বাহু, অচ্যুতের জনৈক বৃদ্ধমন্ত্রীর দৌহিত্র ভদ্রাবতীর লোভ করায় হতভাগা দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইল। ঘৃণা ও ক্ষোভে বিজয় ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কামলা খাঁ হইয়া ফিরোজ পুত্র উচ্ছৃঙ্খল আহম্মদের শরণ লইল। আহম্মদ ভদ্রাবতীকে যাচিলেন, অচ্যুত অস্বীকার করিলে, মুসলমান কমলাপুরী আক্রমণ করিল। আত্রেয়ী-তীরে অচ্যুত সেনাপতি প্রতাপের বিক্রমে মুসলমানের রক্ত বহিল।

পিতার মৃত্যুতে আহম্মদ রাজা হইলেন। কামলাখাঁর উত্তেজনার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আহম্মদ আবার কমলাপুরী রাজ্য আক্রমণ করিলেন। আবার আত্রেয়ী-তীরে রণদামা

বাজিল। হিন্দুর শোণিতে সরিৎ সলিল রক্তমিত হইয়া গেল—রাজকুমারী ভদ্রাবতী শিশুস্বামীকে (১) সাজাইয়া রণযজ্ঞে আহুতি দিলেন—সঙ্গে সঙ্গে করতোয়া তীরে চিতার সারি জ্বলিয়া উঠিল—সেই প্রজ্বলিত হুতাশনের মধ্যে হিন্দু ললনাগণসহ প্রবেশ করিলেন। এই হইতে কমলাপুরী রাজ্য গৌড় বাদসার খাসে গেল। আহম্মদ এই রাজ্যসহ সমস্ত উত্তর বরেন্দ্রের শাসন দীনরাজার হস্তে প্রদান করিলেন। (২)

আলাউদ্দীন হোসেন সাহ, সাঁতোল রাজ কংসের ভ্রাতুষ্পুত্র সীতানাথ ও লানৌয়ের নরনারায়ণ চৌধুরীর সাহায্যে ও কৌশলে যণ্ড শুল্‌তানকে নিহত করিয়া, গৌড় সিংহাসনে বসিলেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ সীতানাথ সমগ্র ভাতুড়ীয়ার ভুঁইয়া হইলেন ও নরনারায়ণ চৌধুরী শুজানগর গরগণা জাইগীর পাইলেন।

সীতানাথ অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধাবস্থায় সম্পত্তির শাসন-সংরক্ষণের ভার কনিষ্ঠ রামেশ্বরের হাতে পড়িল। সুবিস্তৃত সম্পত্তির অধিকারী হইয়া রামেশ্বর দুর্বৃত্ত হইলেন। তাঁহার পাপে সাঁতৈল রাজবংশ পঞ্চ-মহাপাপযুক্ত হইয়া পড়িল। উহার দুর্বৃত্ততার বলে তিনি আপন কন্যার সহিত বলপূর্ব্বক পুঠিয়ার রাজা রামচন্দ্র ঠাকুরের বিবাহ দেন ও সমাজে আবদ্ধ হইয়া কতকগুলি কুলীন শ্রোত্রীয় লইয়া নূতন সমাজ গঠিত করিয়াছিলেন। অদ্যাপিও তাহার চিহ্নস্বরূপ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে পাঁচুড়িয়াদোষগ্রস্ত অনেক লোক ও রামেশ্বরী পটী বলিয়া এক সম্প্রদায় কুলীন দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাঁচুড়িয়াদোষযুক্ত ব্রাহ্মণ ও রামেশ্বরী পটীর কুলীনদিগের আচার ব্যবহার, সাধারণ বারেন্দ্র সমাজের ব্রাহ্মণদিগের আচার ব্যবহারের সহিত এখনও কিছু কিছু প্রার্থক্য রহিয়াছে।

রামেশ্বরের পরলোকান্তে, তাঁহার দত্তক-পুত্র রামকৃষ্ণ রায় সাঁতোলের রাজা হইলেন। ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ ব্রহ্মানন্দগিরির অনু-রোধে জগৎরাম নামক জনৈক বাণিজ্য-ব্যবসায়ীকে বার্ব্বকপুর প্রদান করেন। জগৎরামের বংশধরেরাই আধুনিক দুবল-হাটীর রাজা, শৈলগাছি ও কুলবাগিচার জমিদারগণ।

রামকৃষ্ণ তেমরায় রায়বংশের সর্ব্বানীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ভবানী নামে সর্ব্বানীর এক কনিষ্ঠ ভগিনী ছিলেন। রামকৃষ্ণ তাহাকেও বিবাহ করিতে মনস্থ করেন; কিন্তু সাঁতোল রাজপণ্ডিত জয়দেব রাজাকে বঞ্চনা করিয়া ভবানীকে বিবাহ করতঃ পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিলেন। ভাবনায় রামকৃষ্ণের রাজকার্য্যে ব্যাঘাত হইতে লাগিল। দেওয়ান হরিপুরের রামদেব চৌধুরী এ সুযোগে আপন সৌভাগ্য বর্দ্ধিত করিলেন। ক্রমে রাজস্ব বাকী পড়িতে লাগিল।

নাটোরের রাইবাঁইয়া রঘুনন্দন রায় সর্ব্বা-নীর আপরা একটী ভাগিনী সর্ব্বমঙ্গলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি সাঁতোলের অবস্থা দেখিয়া, রামদেব দেওয়ানকে জানাইলেন—রামকৃষ্ণ বাকী রাজস্ব পরিশোধ না করিলে, তিনি পরিশোধ করিয়া দিয়া নবাব সরকারে আপন নাম পত্তন করাইয়া লইবেন। রাম-

(১) রাজা অচ্যুত ভদ্রাবতীর একটী শিশুর সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। লোকে ভদ্রাবতীকে "ছেলে ভাতারী" বলিত।

(২) কমলাপুরী রাজ্য—বড়বাজ, নওগাঁ, জিয়াসিন্ধু পরগণা ভাতুড়ীয়ার উত্তরস্থিত স্থান সমূহ।

কৃষ্ণ দেওয়ান মুখে এই বার্ত্তা পাইয়া আরও উৎকণ্ঠিত হইলেন, ভবানীর ভাবনা ও রাজ্য ভাবনা যুগপৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বসিল—ক্রমে উৎকট ব্যাধি আসিয়া দেখা-দিল রাজা ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিধামে চলিয়া গেলেন।

রামকৃষ্ণের পরলোকান্তে তৎপত্নী রাণীসর্ব্বাণী দেওয়ান রামদেবের সাহায্যে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য সংরক্ষণ করেন; কিন্তু বাকী রাজস্ব সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ হইল না। ওদিকে নবাব মুরসিদ্‌কুলির উপদ্রব বাড়িল, সেনা-পতি রেজা খাঁ মধ্যে মধ্যে সাঁতোলে আসিয়া উপদ্রব করিতে লাগিলেন, অপমানে ও ঘৃণায় রাণী সর্ব্বাণী আত্মহত্যা করিলেন।

রাণী সর্ব্বাণীর মৃত্যুর পর, রামকৃষ্ণের পিতৃব্য পুত্র বলরাম চৌধুরী দিল্লীশ্বর আরঙ্গজেবের নিকট সাঁতোল রাজ্য বার্ষিক ২৫০২৪৩ টাকা রাজস্ব বন্দোবস্ত করিয়া লন। সম্রাটের মৎলব ছিল, এই টাকাদ্বারা বঙ্গের সমস্ত কর্ম্মচারীর বেতন নির্ব্বাহ করিবেন, মুরসিদকুলিও এই আদেশ পাইলেন। আরঙ্গজেবের মৃত্যুতে বাহাদুর সাহ ভারতসম্রাটের আসনে উপবেশন করি-লেন। এই সময় বঙ্গের সুবেদার জানাইলেন —বলরাম চৌধুরী বৃদ্ধ, অন্ধ ও বধির। তাঁহার রাজ্য দেখিবার শক্তি নাই। তাঁহার রাজ্যমধ্যে লুঠ আরম্ভ হইয়াছে—রাজস্ব বাকী পড়াতে কর্ম্মচারীবর্গ বেতন পাইতেছেন না ও সেজন্য বঙ্গের কাজকর্ম্মও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারিতেছে না—সাঁতোল খাসে লওয়া হউক।

তাই ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে সাঁতোল রাজ্য খাসে আনিবার জন্য নবাব মুরসিদকুলি খাঁ সেনা-পতি মহাম্মদ রেজাখাঁকে সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন। সাঁতোল রাজ্য আক্রান্ত হইল—রাজার বিপদের সুযোগ লইয়া রামদেব রাজ-কোষের গুপ্তধন, মঙ্গলচণ্ডী, লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহসহ হরিপুরে প্রয়াণ করিলেন।

রাজা বলরামের সেনাপতি, কেউতের বেণী রায়ের দৌহিত্র যুগলকিশোর সান্যাল অসীম বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া ৭ দিন যুদ্ধের পর পরাজিত হইলেন। রেজাখাঁ রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠন করিলেন ও বলরামের সাঁতোল রাজ্য বেদখল হইয়া গেল। এই যুদ্ধে এত লোক নিহত হইল যে, সাঁতোল নগরী বিধবা দ্বারা পূর্ণ হইয়া যায়। তাই এখনও লোকে সেই যুদ্ধ ক্ষেত্রের নাম "ভাতার মারির মাঠ" বলিয়া থাকে।

বলরাম হৃতসর্ব্বস্ব হইলে, দেওয়ান রাম-দেবের পরামর্শে, রাণী সর্ব্বানীর অপরা ভগিনী শিবানীর পুত্র নানৌরের রামনারায়ণ ও চন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীকে সাঁতোল রাজ্যের অর্দ্ধেক লিখিয়াদেন (১)। রামদেব এই বুঝাইলেন যে, নানৌরের চৌধুরীদিগের সহিত রাইরাঁইয়া রঘুনন্দনের বিশেষ আত্মীয়তা আছে। তাঁহারা গিয়া তাঁহাকে ধরিলে, তিনি অবশ্যই তাঁহাদিগের জন্য চেষ্টা করিবেন ও তাহা হইলেই সাঁতোল রাজ্যের অন্ততঃ অর্দ্ধেক তাঁহার দখল থাকিবে। কিন্তু কার্য্যে তাহার বিপরীত ঘটিল।

বাকী রাজস্বের কিছু সঙ্গে লইয়া রাম-নারায়ণ চৌধুরী প্রভৃতি চার ভাই মুরশি-

(১) সোনৌয়ের চৌধুরীদিগের দখলে এখনও ভাতুড়ীয়া পরগণার ২।৪ খানা মৌজা থাকা তাহাদিগের পুরাতন কাগজ দৃষ্টে দেখা যায়।

দাবাদ চলিলেন। রাইরাঁইয়া রঘুনন্দন নবাবের বাকী রাজস্ব পরিশোধ করিয়া দিলে সাঁতোল রাজ্য তাঁহাদিগের সহিতই বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়াইবেন সম্মত হইলেন। কিন্তু যে টাকা বাকী থাকা অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, অত টাকা রামনারায়ণ চৌধুরী-দিগের নিকট ছিল না—তাই তাঁহারা দেওয়ান রামদেব রঘুনন্দনকে অনুরোধ করিতে বলিলেন যে—রঘুনন্দন নবাবকে একটুকুন আরও অনুরোধ করেন যাহাতে অবশিষ্ট টাকার জন্য একখানি কিস্তিবন্দী লিখিয়া রাজ্য ছাড়িয়া দেন। চৌধুরীদিগের ইচ্ছা ছিল দেওয়ান রামদেবের অপহৃত অর্থের কিঞ্চিৎ আদায় করিয়া অবশিষ্ট রাজস্ব পরে পরিশোধ করিবেন।

দেওয়ান রামদেব সমস্ত বুঝিলেন—বুঝিয়া রাইরাঁইয়া রঘুনন্দনের নিকট গিয়া বলিলেন চৌধুরীগণের এমন অর্থ নাই যে বাকী রাজস্ব শোধ করিতে পারে, আপনি ঐ টাকা দিয়া সাঁতোল রাজ্য গ্রহণ করুন উহাদিগকে দুই চারি খানা মৌজা দেন। তাহাই হইল। জ্যেষ্ঠ রামজীবন দ্বারা নবাবসরকারের বাকী রাজস্ব পরিশোধ করাইয়া, রঘুনন্দন, সাঁতোল রাজ্যটী নবাব সেরেস্তায় তাঁহার নামে পত্তন করাইয়া দিলেন। এবং রামনারায়ণ চৌধুরী দিগকেও দুই চারি খানা মৌজা দেওয়াইলেন। (১) তাই এখনও বলে "কান কথায় চৌধুরীদিগের ভাতুড়ীয়া নষ্ট।"

এই হইতেই সাঁতোল রাজের রাজ্য ধ্বংস হইয়া নাটোরের রাজার অধিকারভুক্ত হইল। *

শ্রীনৃত্যগোপাল রায়

ক্ষয়রোগ ও তন্নিবারণ সম্বন্ধে গুটিকয়েক অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়

(১৫১ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

শিশুদের ক্ষয়ব্যাধি সম্বন্ধে কয়েকটী কথা

আমরা যখন শিশুদের কথা বলছিলাম তখন খুব একটা দরকারী কথা বল্‌তে ভুল হয়েছিল। ইউরোপে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় যে শিশু-দের দুধ খাওয়া থেকেই ক্ষয়ের উৎপত্তি হয়। উহা প্রায়ই গোজাতীয় জীবাণুদ্বারা সৃষ্ট হয়। পেটের ভিতরকার বীচি ও গলার চতুষ্পার্শ্বস্থ বীচিগুলি আক্রমণ করে। গিরা ও হাড় প্রভৃতির ক্ষয়ও এই জাতীয় জীবাণু দ্বারাই হয়ে থাকে। তাই বলে শিশুদিগের মধ্যে যক্ষ্মাও বিরল নহে —অনেকেরই বিশ্বাস যে গোজাতীয় জীবাণু দুগ্ধের সহিত খাদ্যপথে প্রবেশ করে এবং অভ্যন্তরে অবস্থান্তর ঘটায় এবং উহা মনুষ্য-জাতীয়তে পরিবর্ত্তিত হইয়া ফুস্‌ফুসকে আক্রমণ করিয়া যক্ষ্মা উৎপন্ন করে।

(১) সোনোয়ের চৌধুরীদিগের ঘরে এই দলিল এখনও রহিয়াছে।

* প্রবন্ধটী উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে পঠিত হইবে বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল

কিন্তু একথা একবারও ভেবে দেখা হয় না যে ছেলে পিলেরা সর্ব্বদাই মাটীতে হামাগুড়ি দিচ্ছে—গড়াগড়ি খাচ্ছে—আর এই মাটীতেই থুতুর সহিত পরিত্যক্ত জীবাণু শুকাইয়া ধূলিরূপে পরিণত হয়ে আছে। ছেলেদের স্বভাবই এই যে তারা হাতের সামনে যে জিনিষই পাক না কেন তাই মুখে তুলে দেয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে দুধ ভিন্নও তাহারা এইরূপে একেবারে মনুষ্যজাতীয় জীবাণু গলাধঃকরণ কর্‌তে পারে। শিশুদের পাকস্থলীর রসের অম্লতা বয়স্কগণের চেয়ে ঢের কম সুতরাং উহার ভিতর ক্ষয় জীবাণু বৰ্দ্ধিত হবার বেশ সুযোগ পায় এবং এখান হতে পেটের ভিতর দিয়ে যেয়ে অবশেষে ফুস্‌ফুস অবধি যেতে পারে।

এবং এই একই কারণে ইহাও অধিক সম্ভব যে শিশুরা শ্বাসের সঙ্গে ধূলির সহিত ক্ষয়জীবাণু গ্রহণ করে এবং উহা সোজা শ্বাসপথে যেয়ে ফুস্‌ফুসের যক্ষ্মা সৃষ্টি করে।

আমাদের দেশের শিশুরা প্রায় সকলেই ফুটান (Boiled) দুধ খায় সুতরাং দুধের সহিত এদেশের শিশুদের মধ্যে ক্ষয়বীজ প্রবেশ করা তত সম্ভব নহে। জাপান ও চীনের লোকেরা দুধ একরূপ খায় না বল্লেই হয় কিন্তু তথায়ও শিশুদের মধ্যে এ ব্যাধির অভাব নাই।

যদিও আমাদের দেশে ছেলেদের বীচি-জাতীয় (glandular) ক্ষয় ব্যাধি তত না থাকুক তবে যক্ষ্মা একান্ত বিরল নয় উহা একমাত্র উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারেই ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

ব্যাধিগ্রস্ত মাতার স্তনপান সন্তানের উচিত কি না ?

আর একটী কথাও এই স্থানে উল্লেখ করিলে ভাল হয়। আমাদিগের দেশে শিশুদিগের মাতৃস্তন্যই প্রধান আহার্য্য। মাতার যদি যক্ষ্মা থাকে তবে উহার স্তনপানজনিত সন্তানেরও যক্ষ্মা হইতে পারে। এবিষয়ে এদেশে প্রায়ই সতর্কতা লওয়া হয় না। মাতার যক্ষ্মা থাকিলে সন্তানকে কোন ক্রমেই স্তনদান করিতে দেওয়া উচিত নহে। ইহাতে কেবল যে সন্তানের অনিষ্ট হয় তাহা নহে মাতারও অত্যন্ত অনিষ্ট হয়। এই সব অবস্থায় দুধ খাইতে দিলে মাতা ক্রমেই হীনবল হইতে থাকেন ও ব্যাধির আক্রমণও বৃদ্ধি হয়।

অন্যান্য স্থানের ব্যাধি

আমরা এ পর্য্যন্ত কেবল ফুসফুসের ব্যাধি সম্বন্ধেই আলোচনা করেছি। হাত, গাঁট প্রভৃতি অন্যান্য স্থানের ক্ষয় যে কিরূপে উৎ-পাদিত হয় সে সম্বন্ধে কিছুই বলি নাই। এ সম্বন্ধে সকল কথা আমরা জানিও না। প্রায়শই নিকটস্থ কোন ক্ষতমুখে ক্ষয়বীজ প্রবেশ লাভ করে এবং গাঁট প্রভৃতি আক্রমণ করে। ঐ ক্ষতগুলি সময় সময় এত সূক্ষ্ম থাকে যে আমরা উহার অস্তিত্বই উপলব্ধি করিতে পারি না—চোখে দেখা ত দূরের কথা। অথবা এমনও হতে পারে ক্ষয়বীজ ক্ষতমুখে কোন রক্তবাহী নাড়ীর (Blood vessels) ভিতর প্রবেশ লাভ করতে পারে এবং যেখানে কোনও দুর্ব্বল অঙ্গ পায় সেই স্থান আক্রমণ করে। মনে করুন একজনের হাঁটুতে আঘাত লেগে হাঁটুটা কমজোরী হয়ে আছে এমন সময় যদি যে শিরায় উহার রক্ত যোগায় তার মধ্যে কোনক্রমে ক্ষয়বীজ প্রবেশলাভ করতে পারে তবে সহজেই উক্ত হাঁটু আক্রমিত হতে পারে।

রসবাহী শিরা (Lymphatics) যোগেও এইরূপ আক্রমণ হতে পারে।

ব্যাধি আবার এইরূপে স্থানীয় আক্রমণ হতে সাধারণভাবে সমস্ত শরীরেও সংক্রমিত হতে পারে।

ব্যাধি নিবারণের উপায়

আমরা যদি এখন কতকগুলি বিষয় ভাল করে বুঝতে পারি তবে এ ব্যাধি নিবারণ করতে আমাদের বিশেষ কোন বেগ পেতে হবে না।

আমরা বুঝতে পেরেছি যে ক্ষয়জীবাণু ব্যতীত কখনও ক্ষয় উৎপাদিত হতে পারে না। আর এই ক্ষয়জীবাণু হয় থুথু না হয় দুধ না হয় মাংসের সহিত এসে আমাদিগকে আক্রমণ করে। ক্ষয়জীবাণু দেহে প্রবেশ করলেই যে আমরা ক্ষয়গ্রস্ত হব এমন কোন কথা নাই। আমাদের কোন অপকারে আসতে হলে উহাদের অনেকটির প্রয়োজন, হঠাৎ দু একটা এসে বড় কিছু একটা করতে পারে না। কিন্তু উহারা কখন আসে কখন বা না আসে তা জানবার ত সহজ কোন উপায় নাই। আমরা যাতে ক্ষয়বীজ হতে দূরে থাকতে পারি সর্ব্বদা সেই চেষ্টাই দেখা উচিত। আমাদের স্বাস্থ্য যখন সম্পূর্ণ ভাল থাকে, আমরা যখন বিশেষ সবল থাকি তখন হয়ত উহাদের ছোট খাট দল আমাদের দেহে প্রবেশ করে ও আমাদের কিছু করতে পারে না। কিন্তু যদি কোনও কারণে অসুস্থ হইয়া পড়ি, দেহের সাধারণ—আত্মরক্ষার শক্তি যদি কমে যায়, তবে হয়ত অল্পসংখ্যক শত্রু দ্বারাই নিপ্পেষিত হতে পারি। সুতরাং আমাদের অসুস্থতার সময় আমরা যাহাতে এই সব ক্ষয়রোগীর বা ক্ষয়জীবাণুর সংস্পর্শে না আসি তাহার জন্য বিশেষ সাবধানতা লওয়া আবশ্যক। দুধকে আমরা কিছু-কালের জন্য ফুটাইয়া লইলেই উহার দোষ দূর হয়। তবে উহা যে সব স্থান হইতে সরবরাহ করা হয় এবং বাজারের যে সব স্থানে উহার বিক্রী হয় সে সকল জায়গা এক-জন স্যানিটারী ইন্স্পেক্টার দ্বারা পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। মাংস সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। উহাকে সিদ্ধ করিয়া লইয়া এবং উহা পূর্ব্বে রীতিমত পরীক্ষিত হইলে উহাতে আর দোষ থাকা সম্ভব নহে।

থুথু সম্বন্ধেই বিশেষ সাবধানতা লওয়া প্রয়োজন। আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে যখনই কোন যক্ষ্মারোগী কাসে, হাঁচে বা কথা কহে, তাহার চতুর্দ্দিকে থুথু সূক্ষ্মা-কারে নিক্ষিপ্ত হয় ও তাহা ক্ষয়জীবাণুপূর্ণ। সুতরাং কোন যক্ষ্মারোগীর নিকট যাইতে হইলে এ বিষয়ে সাবধানতা লওয়া একান্ত আবশ্যক। যেহেতু ঐ সব জীবাণু শ্বাসপথে দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করলেই যক্ষ্মা হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অবশ্য যক্ষ্মা রোগীর নিকট গেলেই বা দু চারিটি যক্ষ্মাজীবাণু দেহে প্রবেশ করলেই যে যক্ষ্মায় আক্রমণ করবে এমন কোন কথা নাই তবে আশঙ্কা ত আছে? প্রতিবার কতটি জীবাণু দেহে প্রবেশ কচ্ছে তাত আমরা দেখতে পাই না? তবে সাবধানতা নিতে দোষ কি? এইরূপে একবারে না হয় দুবারে জীবাণু যদি ক্রমাগতই শরীরে ঢুকতে থাকে তবে উহার আক্রমণ হতে কতক্ষণ? সদ্য সদ্য ফল ফলে না বলেই কি এত অসাবধানতা? এ সম্বন্ধে লোকে এতই অসাবধান যে তা বলতে পারি না। তারা একত্রে বসে থাকবে, গল্পগুজব করবে, এক সঙ্গে খাবে, এক সঙ্গে বেড়াবে, এমন কি এক সঙ্গে পর্য্যন্ত শোবে। উহা যে কতদূর অন্যায় এবং কতদূর অর্ব্বাচীনের কাজ তা আমি বলতে পারি না। এই অসাবধানতা কেবল

যে অজ্ঞানতার দরুণ তাহাও নহে কারণ যাহাদিগকে এ সম্বন্ধে সবিশেষ বুঝাইয়া দেওয়া যায় যে ইহা হতে কত বিপদ আসতে পারে—তা সত্ত্বেও তারা বিন্দুমাত্র মনোযোগ দেয় না। এ কু-অভ্যাস আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যে এত গভীরভাবে বদ্ধমূল যে হাজার চেষ্টা করেও ইহা দূর করা যাচ্ছে না। ইহা কি কম পরিতাপের কথা!

যক্ষ্মারোগী যদি অসাবধান হয়ে যেখানে সেখানে থুথু ফেলে তার মত আপদ আর নাই। এ থেকে এ রোগ যত বিস্তৃত হতে পারে এরূপ আর কিছু থেকে নয়। থুথুগুলি আস্তে আস্তে শুকাতে থাকে এবং ধূলি বালু দ্বারা আবৃত হয়ে সূক্ষ্মকণাকারে যেখানে সেখানে বায়ু দ্বারা নীত হয়। অন্ধকার স্থানে নীত হলে ত কথাই নাই, সেখানে যে কতদিনের মত পীঠ স্থাপন হল সে কথা কেউ বলতে পারে না। আমরা ইচ্ছা করলে যক্ষ্মা রোগীর কাছে না যেতে পারি আর যদিই বা যাই তাহলেও খুব নিকটে না গেলে তেমন একটা আক্রমণের ভয় থাকে না। কিন্তু ধূলির সঙ্গে মিশে ক্ষয়বীজ কোথায় কোন স্থানে থাকে তাত আমরা জানতে পারি না। কাজেই এই ভাবে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। সুতরাং যেখানে সেখানে যক্ষ্মা রোগীর থুথু ফেলা যে সাধারণের পক্ষে একান্ত বিপদজনক একথাটি সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত এবং উহা যাহাতে নিবারিত হয় সে সম্বন্ধে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকা কর্ত্তব্য।

কোন একটী নির্দ্দিষ্ট পাত্রে থুথু ফেলাই ভাল, উহার ভিতর যদি কোন পচননিবারক লোসন্ (Antiseptic Lotion) থাকে তবে আরও ভাল হয়—একান্ত পক্ষে জল থাকিলেও চলে। কারণ যে পর্য্যন্ত থুথু না শুকাইবে সে পর্য্যন্ত তত ভয়ের কারণ নাই। উহা শেষে আগুনে ঢালিয়া পোড়াইয়া দিলেই শত্রু নির্ম্মূল হয়, একান্তপক্ষে ড্রেইনে ফেলিয়া দেওয়া উচিত। কোন কোন রোগী রুমালে থুথু ফেলেন—যদিও যেখানে সেখানে ফেলার চেয়ে উহা ভাল কিন্তু উহাও কর্ত্তব্য নয়।

কারণ রুমাল থেকে জীবাণুগুলি পকেটে লেগে থাকতে পারে, হাতে, জামায় এবং অন্যান্য স্থানেও লাগতে পারে। আর প্রত্যেকবার একখানি রুমাল পোড়াইয়া ফেলাও বড় একটা সহজ কথা নহে। তবে আজকাল খুব সস্তা একরূপ জাপানী কাগজের রুমাল পাওয়া যায়—উহা প্রত্যেকবার নূতন ব্যবহার করা যায় সত্য তবে উহা রাখিবার জন্য একটা আধার থাকা প্রয়োজনীয়। একটী থলে কি ব্যাগ। রাস্তায় রুমাল ব্যবহার করার পরই উহার ভিতর রাখিয়া দেওয়া যায় এবং বাড়ী ফিরিয়া রুমালগুলি পোড়াইয়া ফেলা যায়। এই থলে বা ব্যাগ এমন জিনিষের দ্বারা তৈয়ারী হওয়া কর্ত্তব্য যাহা পচননিবারক ঔষধাদি দ্বারা শোধন করিয়া লওয়া চলে।

রাস্তায় বেড়াবার সময় সঙ্গে নেবার জন্য বেশ সুবিধাজনক পাত্র আজকাল বাজারে পাওয়া যায়,—যেমন ডেট্‌ভিলারের (Dettveiler's pocket flask) পকেট ফ্লাস্ক। ইহার মধ্যে থুথু সহজেই ত্যাগ করা যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

মফঃস্বলের বাণী

১। পল্লীবেদনা

আজকাল অনেক সাময়িক পত্রেই পল্লীগ্রামের অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে ইহা একটী সুলক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাহিবেন; কিন্তু আমাদের মনে তাদৃশ কোনও আশার সঞ্চার হইতেছে না। আমরা এরূপ অনেক জল্পনা কল্পনা দেখিয়াছি কিন্তু কোথায়ও যে বিশেষ কিছু ফললাভ হইয়াছে এমন বোধ হয় না।

ইংরাজী শিক্ষার গুণে আমাদের লিখিবার ও বক্তৃতা করিবার শক্তির যে পরিমাণে অনুশীলন ও উন্নতিসাধন হইয়াছে, আমাদের কার্য্য করিবার শক্তিও যে ঠিক সেই পরিমাণেই হ্রাস পাইয়াছে, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। "মুখেন মারিতং জগৎ" এই প্রবাদ বাক্যটী শিক্ষাভিমানী আধুনিক বাঙ্গালী বাবুদের প্রতি যতটা প্রযুজ্য, পৃথিবীর আর কোনও জাতির প্রতি ততটা প্রযুজ্য নহে।

প্রকৃত আন্তরিকতা ও সমপ্রাণতার অভাবই যে এই সমস্ত বিফলতার মুখ্য কারণ তাহা বোধ হয় কাহাকেও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে না। আমাদের তথাকথিত শিক্ষাপ্রাপ্ত বাবুরা নাম কিনিবার জন্য যতটা ব্যগ্রতা প্রদর্শন করেন, প্রকৃত কার্য্য সম্পাদনে তাহার শতাংশের একাংশও দেখান কি না সন্দেহ। শুধু তাহাই নয়, অনেকে আবার এই গোলেমালে হরিবোল দিয়া নিজেও বেশ "দু'পয়সা" করিবার তালে থাকেন। ইহাকে আর যাহাই বল না কেন, পবিত্র স্বদেশপ্রেমিকতা বলিও না। এতদ্দ্বারা ব্যক্তিবিশেষের আর্থিক উন্নতি সাধিত হইলেও দেশের ক্ষতি ভিন্ন লাভ হইবে না ইহা নিশ্চয়।

তাই বলিতেছি যদি পল্লীগ্রামের উন্নতি সাধনই কাহারও প্রকৃত উদ্দেশ্য হয় তবে সহরে বসিয়া বক্তৃতা ও উপদেশের মেকী অভিনয়ে আত্মশক্তির ক্ষয় না করিয়া অবসর মত পল্লীগ্রামে আসিয়া বসবাস কর, পল্লীর দশজনের একজন হও, জনসাধারণের অভাব ও অভিযোগ নিজের মত বিবেচনা করিয়া তৎপ্রতিকারকল্পে যত্নশীল হও। ছুটীর সময় "হোমে" বা বৃথা দেশভ্রমণে না যাইয়া সপরিবারে পল্লীগ্রামে যাও। যদি তাহাই পার তবেই পল্লীর উন্নতি সম্ভবপর। তাহাহইলে দেখিবে, যে পানীয় জলের ব্যবস্থার জন্য জেলাবোর্ডের দ্বারে দ্বারে পল্লীবাসীর করুণ আর্ত্তনাদ উঠিতেছে সে ব্যবস্থা অতি সহজেই সম্পন্ন হইবে, যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তনের জন্য রাশি রাশি কাগজ ও মণে মণে কালি কলম খরচ করিতেছ তাহা আপনা হইতেই হইবে, যে বিলাত ফেরতের সমাজে গ্রহণের জন্য তোড়ায় তোড়ায় টাকা ঢালিয়াও কোনও কূল কিনারা পাইতেছ না সে সমস্যা অতি সহজেই সমাহিত হইবে। তাহাহইলে পল্লীমাতার কুঞ্জকুটীর আবার আনন্দ সঙ্গীতে মুখরিত হইবে, পল্লীজননীর বিরসকৃষ্ণ বদন আবার শুভ্র হাস্যের কিরণচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে; তোমাদের জ্ঞান ও বিদ্যার

বিমল কিরণে পল্লীর অন্ধকার বিদূরিত হইবে। এখন এত যত্ন চেষ্টা করিয়াও দেশবাসীর নিকট যে সম্মান ও আদর পাইতেছ না—"নেতার" উপযুক্ত সেই সম্মান ও আদর আপনা হইতেই পাইবে।

এতদিন আমরা তোমাদের কথায় চালিত হইয়াছি, তোমাদের কথায় নির্ভর করিয়া অসাধ্য সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু দেখিলাম তাহাতে কাহারও কোনও উপকার হইল না। এখন তাই তোমাদের কাছে আমরা নিবেদন করিতেছি, একটীবার তোমরা আমাদের কথা শুন, একবার মায়ের ছেলে মায়ের কোলে ফিরিয়া আইস,—দেখ তাহাতে কিছু হয় কি না?

সুরাজ

২। বঙ্গে দুর্ভিক্ষ

মহাকালের মহাভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে। দারুণ দুর্ভিক্ষের জ্বালায় বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া মহা হাহাকার পড়িয়াছে। সকলেই বলিতেছে বাঁচিবার উপায় কি? উপায় একমাত্র ভগবান। বলিতে কি—সমগ্র বাঙ্গালা জুড়িয়া দুর্ভিক্ষ রাক্ষসীর যে করাল গ্রাস দেখা দিয়াছে, তাহা হইতে বাঙ্গালার মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক ও কৃষককুলকে রক্ষা করিবার জন্য আজ দেশে যথার্থ কর্ম্মী পুরুষের আবশ্যক। যাঁহার অর্থ আছে ও সামর্থ্য আছে, তিনি আজ তাহার সদ্ব্যবহার করুন—নরনারায়ণের সেবা করিয়া কৃত কৃতার্থ হউন। অনাহারের যে বিভীষিকা চতুর্দ্দিকে মরণের মহা আহ্বান জাগাইয়াছে তাহা হইতে এই নিরন্ন, রোগক্লিষ্ট, অর্থহীন দুঃস্থ দেশবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য দেশের মহাপ্রাণ মহাপুরুষগণ অগ্রসর হইয়া আজ নরসেবাব্রত গ্রহণ করুন।

নচেৎ দরিদ্রের আর বাঁচিবার উপায় নাই। বাঙ্গালার পল্লীভবনের সে সুখস্বাচ্ছন্দ্য আজ অন্তর্হিত হইয়াছে। সেই চিরসুখী ও সদানন্দ পল্লীবাসী আজ ক্ষুধার তাড়নায়, রোগের যাতনায় কত বেদনাতুর, কত মর্ম্মক্লিষ্ট হইয়াছে, তাহা এই মহানগরীর সুসজ্জিত অট্টালিকায় বাস করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। ইউরোপ ভূখণ্ডে যে মহাযুদ্ধ বা ধ্বংসের অভিনয় চলিতেছে, তাহা কতদিন চলিবে কে তাহা স্থির করিতে পারে? কিন্তু এই বাঙ্গালা দেশের প্রায় ঘরে ঘরে আজ যে মহা জীবন-সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে, তাহার তীব্রতায় আজ আমরা অস্থির। আমাদের জীবন-সংগ্রামের উপসংহার কবে—তাহাই বা কে বলিবে? যে দেশের প্রতি ঘরে ঘরে অন্নাভাবে হাহাকার উঠিয়াছে, যে দেশের প্রতি ঘরে ঘরে শিশু সকল অন্নের অভাবে, দুগ্ধের অভাবে, দিন দিন মরণের মুখে চলিয়াছে সে দেশের জীবন-সংগ্রাম সমস্যা যে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর নহে, এ কথা কে অস্বীকার করিবে?

দেশপ্রাণ কৃষককুল আজ সর্ব্বস্বান্ত। মহাজন ঋণ দান করে না, জমীদার খাজানা মাপ করে না, ক্ষুধা ও অক্ষমতার অনুযোগ রক্ষা করে না। ইহাদের বাঁচিবার উপায় কি? এই হৃতসর্ব্বস্ব নিতান্ত নিরুপায় দীন প্রজাকুলের পানে চাহিয়া দেখিবার কেহ কি নাই? দেশে কত সভা সমিতি সম্মিলন বসিতেছে, চাঁদার ভাণ্ডার পূর্ণ হইতেছে, কিন্তু এই গরীব প্রজাকুলের জন্য একটী পয়সাও কি উঠিতেছে? সমগ্র বঙ্গ জুড়িয়া হাহাকার উঠিয়াছে। পূর্ব্ব-বঙ্গে হাহাকার, পশ্চিমবঙ্গে হাহাকার, উত্তর বঙ্গে হাহাকার। এই বাঙ্গালা দেশে অর্থশালী জমীদারের সংখ্যা কম নয়। তাঁহারা তাঁহাদের বিলাস-ভবনের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দুগ্ধ-ফেণ-নিভ

শয্যায় বসিয়া বিলাসের স্বর্গ কল্পনা করিতেছেন। হায় খেতাব, তোমাকে লাভ করিবার জন্য এই লক্ষ্মীর বরপুত্রগণ কত অর্থই না সান্ধ্য মজলিসে লুটাইয়া দিতেছেন! তাঁহাদের কর্ণরন্ধ্রে দুস্থ দেশবাসীর এ প্রাণান্তকর হাহাকার হয়ত পৌঁছায় না। যাহাদের সারা বৎসরের পরিশ্রমের ফল তাঁহারা উপভোগ করিতেছেন, তাহাদের মস্তকে তৈল নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, হস্তে অর্থ নাই, পেটে অন্ন নাই। হায় দরিদ্র, তুমি পৃথিবীর কেহ নও, কেহ তোমার পানে চাহিবে না!

যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারত-প্রবাসী লোকগণের উপর অত্যাচার হইয়াছিল, তখন দেখিতে দেখিতে সমগ্র ভারতবর্ষে কত সভা, কত ফণ্ড স্থাপিত হইয়াছিল। South African Indian League Fund বলিয়া আর্ত্তনাদ দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয়গণকে সাহায্যের জন্য যে ধনভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে কত অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, অনেকেই হয়ত তাহার খোঁজ রাখেন না। বোধ হয় প্রায় লক্ষাধিক টাকা কেবল এই বাঙ্গালা দেশ হইতেই প্রেরিত হয়। কিন্তু এই সমগ্র দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষে এই অনাহারে মরিবার বিষম সমস্যার দিনে সে সকল অক্লান্ত পরিশ্রম নেতৃবর্গ কোথায়? যাঁহারা কংগ্রেস মহাসভার রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা স্রোতে দেশবাসীকে মুগ্ধ করিয়াছেন,—এবং বক্তৃতা উপলক্ষে কত সহস্র টাকা বৃথা ব্যয় করাইয়াছেন, সেই নেতৃবর্গকে আজ আমরা এ দুর্দ্দিনে দেখিতে পাইতেছি না কেন?

বাঙ্গালা দেশে বর্ত্তমান সময়ে দুইটীমাত্র প্রধান শস্য,—একটী ধান্য, অপরটী পাট। গত বর্ষে অজন্মা গিয়াছে এবং যুদ্ধের কারণে পাট বুনিয়া কৃষকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। হালের গরু বেচিয়া, থালা, ঘটী, বাটী, বেচিয়া এতদিন তাহারা কোনমতে চালাইয়াছে। কিন্তু আর চলিল না। উপবাসী কৃষককুল অনেকস্থলে হালের গরু অভাবে চাষও করিতে পারে নাই। গত বৎসরের টাকা না পাইয়া মহাজনও ঋণদান করিতে পারে নাই। এইত অবস্থা! তবে কেমন করিয়া তাহারা বাঁচিবে? অধুনা দেশে দেশে চুরী ডাকাতির উপদ্রব ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। আমরা এক এক স্থান হইতে এরূপ সংবাদ পাইতেছি যে, বলিতে লজ্জা হয়, উপবাসী তস্কর গৃহস্থের সকল দ্রব্য ফেলিয়া কেবল ভাতের হাঁড়িটী চুরী করিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহা হইতেই বুঝা যায় দেশে কি বিষম দুর্দ্দিন উপস্থিত। মধ্যবিত্ত ভদ্র সন্তানগণেরও কষ্টের মাত্রা চরম সীমায় উঠিয়াছে।

দেশের এই দারুণ দুর্দ্দিনে এই অনাহার বিভীষিকায় ধনকুবেরগণের অর্থ ও সামর্থ্য আজও যদি সেই দুর্ভেদ্য লৌহসিন্ধুকে আবদ্ধ থাকে, তবে নিতান্তই বুঝিতে হইবে এদেশে আর মানুষ নাই—এদেশে প্রেতের বাসভূমি! ভাই, বাঙ্গালী যদি প্রকৃত মানুষের ন্যায় কাজ করিতে চাও,—তবে আজ কাজ করিবার দিন আসিয়াছে। আর অসার কল্পনা লইয়া বসিয়া থাকিও না। ঐ দেখ তোমাদের দ্বারে দ্বারে অনাহারক্লিষ্ট ভ্রাতৃগণ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের সাহায্য কর তাহাদের অন্ন দাও। তোমার যাহা সামর্থ্য তাহাই দাও। যদি একটী প্রাণও রক্ষা করিতে পার, তবেই তোমার অর্থ সামর্থ্যের সম্পূর্ণ সার্থকতা। দেখিও ভাইয়ের সম্মুখে ভাই যেন অনাহারে প্রাণত্যাগ না করে। যাহার যতটুকু শক্তি, দেশের ও দশের সেবায় আজ তিনি তাহা নিযুক্ত করুন। শক্তি সামর্থ্য

সত্ত্বেও দেশের এই দারুণ দুর্দ্দিনে যিনি নরনারায়ণের সেবায় ব্রতী না হইবেন, তাঁহাকে যে নরহত্যার নিরয় পঙ্কে নিমজ্জিত হইতে হইবে; তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ

৩। ব্যাধিপ্রপীড়িত পল্লীর শোচনীয় অবস্থা ও পল্লীবাসীর প্রার্থনা

দুর্ভিক্ষের হাহাকারের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি থামিতে না থামিতে চতুর্দ্দিকে মহাকালের করাল বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছে। বর্ষার প্রারম্ভেই এবার ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর যেরূপ অতুল বিক্রম পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাতে মনে হয়, এখন হইতে প্রতিকারের কোন প্রকৃষ্টতর উপায় অবলম্বিত না হইলে, রঙ্গপুরের পল্লীনিকেতনগুলি অচিরে শ্মশান ভূমিতে পরিণত হইবে। একদিকে ম্যালেরিয়ার আক্রমণে লোক বিব্রত, অপরদিকে ওলাদেবীর ভীষণ সংহারলীলার অভিনয়ে মফঃস্বলের সর্ব্বত্র আতঙ্কের বিষাদগম্ভীর ছায়া সুপ্রকটিত। কুড়িগ্রাম মহকুমার অনেক স্থানেই কলেরায় বিস্তর লোক মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে। এক ফুলবাড়ী থানার অধীন আটীয়াবাড়ী, খড়িবাড়ী, জকারহাট, পাণিমাছের কুঠী, চন্দ্রখানা, মরানদী প্রভৃতি ২০।২৫ খানি গ্রামে এই সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ অল্প বিস্তর বর্ত্তমান। সম্প্রতি নাওডাঙ্গার অদূরবর্ত্তী ভৈষুতলী গ্রামে ভয়ানক ওলাউঠা আরম্ভ হইয়াছে। শুনিলাম, এক সপ্তাহ মধ্যে উক্ত ক্ষুদ্র পল্লীখানিতে প্রায় ১৬।১৭ জন লোক এই দুরন্ত ব্যাধির আক্রমণে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। একখানি সামান্য গণ্ডগ্রামে কেবল ওলাউঠায় সাপ্তাহিক মৃত্যুসংখ্যা ১৬।১৭ জন, ইহা নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। এক গৃহস্থের বাটীতে ৮টী লোকের মধ্যে, তিন দিনের ভিতর, ৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে। কেবল স্থবির গৃহকর্ত্তা ও তাহার প্রৌঢ়া সহধর্ম্মিণী স্বজনবিয়োগে অচেতন প্রায় ভূশয্যায় অবলুণ্ঠিত হইতেছেন। হতভাগ্যদিগের শোকে সান্ত্বনা বা তৃষ্ণায় একবিন্দু জলপ্রদানের লোক পর্য্যন্ত নাই। এ দেশের লোক প্রতিবেশীর বাড়ী দূরে থাকুক, নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের বাটীতে কাহারও ওলাউঠা হইলে, তাহার সহিত সর্ব্বপ্রকার সংশ্রব বর্জ্জন করে। ওলাউঠা পীড়িত ব্যক্তির বাটী হইতে কেহ কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে গেলে, দোকানদার তাঁহার নিকট হইতে মূল্য লইয়া সওদা দিতে অনেক সময় ইতস্ততঃ করে। লোকাভাবে মৃত ব্যক্তির সৎকার হয় না। নিকটে নদী থাকিলে, শবদেহ নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়, নতুবা গৃহপ্রাঙ্গণের অদূরে পুতিয়া রাখে। রোগীর মলমূত্র শয্যা পরিচ্ছদাদিও এইরূপে হয় নদীগর্ভে, নয় নিকটবর্ত্তী মাঠে ফেলিয়া দেওয়া হয়। সূচনায় পানীয় জল ও বায়ু এই প্রকারে দূষিত হইয়া বীজ ক্রমশঃ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বিস্তৃতি লাভ করিয়া থাকে। এ দেশের পল্লীগ্রামগুলিতে এবেই চিকিৎসকের সংখ্যা নিতান্ত কম, দুই একজন হাতুড়ে চিকিৎসক যেখানে যিনি আছেন, তাঁহারা ওলাউঠার নাম শুনিলেই, "যঃ পলায়তি সঃ জীবতি" নীতির অনুসরণ করিয়া থাকেন। ফলে গ্রামে ওলাউঠা আরম্ভ হইলে, লোক একরূপ বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। এ দেশে এক শ্রেণীর ফকির আছে, নানারূপ দৈবানুষ্ঠানের দ্বারা ইহারা ওলাউঠা তাড়াইবার ভান করিয়া বিলক্ষণ দু পয়সা রোজগার করিয়া থাকে। নিরীহ গ্রামবাসিগণের তাহাদের উপর অটল বিশ্বাস।

গ্রামে ওলাউঠার আবির্ভাব হওয়া মাত্র প্রথমে গ্রাম রক্ষার জন্য ইহাদের ডাক পড়ে। শুনিতে পাওয়া যায়, বহুল উপার্জ্জনের আশায় ফকিকেরা অনেক সময় কলেরা রোগীর মূত্রপুরীষসংলিপ্ত বস্ত্রাদি গ্রামের কোন পুকুর বা কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া রোগ বিস্তারের সহায়তা করে। ইহা সত্য হইলে, এই শ্রেণীর ফকিরদের উপর কর্ত্তৃপক্ষের কঠোর দৃষ্টি থাকা আবশুক।

এ দেশে কলেরায় যতলোক মারা যায়, তাহাদের অধিকাংশেরই কোনরূপ চিকিৎসা হয় না। মূর্খ জনসাধারণের অজ্ঞতার ফলেও রোগ অনেক সময় মারাত্মক মূর্ত্তি ধারণ করে। কোন গ্রামে কলেরার আবির্ভাব সংবাদ পাওয়া মাত্র কর্ত্তৃপক্ষ যদ্যপি অবিলম্বে তথায় সুচিকিৎসক পাঠাইয়া পীড়া যাহাতে অধিক ব্যাপক না হইতে পারে, সূচনায় তাহার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে প্রতি বৎসর অনেক লোকের জীবন রক্ষা হইতে পারে। কোন স্থানে কলেরা আরম্ভ হইলে, তথাকার পানীয় জ.লর বিশুদ্ধতা যাহাতে রক্ষিত হয়, স্থানীয় চৌকিদার ও গ্রাম্য পঞ্চাইতগণকে তৎপ্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখিতে বাধ্য করিতে হইবে। শবদেহ ও রোগীর মল মূত্র বস্ত্র পরিচ্ছদাদি যেখানে সেখানে প্রোথিত বা নিক্ষিপ্ত না হয় তাহার ব্যবস্থা হওয়া আবশুক। স্থানীয় পুলিশ কর্ম্মচারিগণ এ সকল বিষয়ে একটু অধিকতর মনোযোগী হইলে রোগের সক্রামকতা অনেকটা হ্রাস হওয়ার আশা করা যায়।

আমরা শুনিয়াছিলাম, আমাদের সদাশয় ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর কলেরা পীড়িত স্থানে সবইন্‌স্পেক্টর, গ্রাম্য পঞ্চাইত ও দফাদারগণের যোগে কলেরা পিল বিতরণ এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংস্থানার্থ প্রয়োজনানুসারে স্থানে স্থানে কাঁচা কূপ খননের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমরা অন্ততঃ ফুলবাড়ী থানার এলাকার অধিবাসিগণ আজপর্য্যন্ত তাঁহার এ বদান্যতার পরিচয় পাই নাই। অবশু সে জন্য আমরা কর্ত্তৃপক্ষকে দোষ দিতে পারি না, কারণ রঙ্গপুরের গ্রাম্য পঞ্চাইতগণ প্রায়ই অশিক্ষিত। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের ঘোষণা লিপির তাৎপর্য্য পরিগ্রহণ বা তদনুসারে স্থানীয় অবস্থা কর্ত্তৃপক্ষকে পরিজ্ঞাপনের ক্ষমতা অনেকেরই নাই। কাজেই আমরা যে তিমিরে, সেই তিমিরেই আছি। যাহা হউক, আমাদের সদাশয় ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা, ম্যালেরিয়া ও কলেরার সর্ব্বসংহারিণী মূর্ত্তি জনপদ ধ্বংস করিবার পূর্ব্বে যাহাতে শান্ত ভাব ধারণ করে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়া সাধারণের উদ্বেগ দূর করুন।

রঙ্গপুর দর্পণ

৪। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম

ইংরাজী শিক্ষার প্রাদুর্ভাবে ও অন্যান্য কারণে এদেশের পুরাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে যে একটা দেশব্যাপী শৈথিল্য দেখা দিয়াছে তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার যো নাই। সামাজিক ক্রিয়া কাণ্ডে ও আদান প্রদানে কৌলিন্যের যে গৌরব ছিল এখন আর তাহা নাই। এই শৈথিল্যের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণজাতির গৌরবেরও অনেকটা লাঘব হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গকে তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে বড় একটা দেখা যায় না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এই শৈথিল্যই সমাজের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া মনে করেন। ইহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন বেশীর ভাগ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এবং প্রাচীন

ভাবাপন্ন কুলীন বৈদ্য ও কায়স্থগণ। ইংরাজী শিক্ষিত দলের মধ্যেও কেহ কেহ যে তাঁহাদের মতে সায় দেন না এমন নহে। তাঁহাদের মতে ইংরাজ জাতির অনুকরণে দেশটা রসাতলে যাইতে বসিয়াছে। দেশের পদস্থ ব্যক্তিগণ ও ধনী জমিদারগণ তখনকার দিনে আপনাদের আত্মীয় কুটুম্বগণের সহিত উঠা বসা আহার বিহার করিতে লজ্জাবোধ করিতেন না। ইহাঁদের মধ্যেও ছোট বড় ছিল। কিন্তু সে কুল লইয়া অর্থ লইয়া নহে। যিনি যত বড় কুলীন ছিলেন তাঁহার আদর ততবেশী ছিল। কিন্তু এখন আর সেদিন নাই। এখন মান সম্মান টাকা লইয়া। কথাটি যদি সত্য হয় ইহার প্রতীকার কল্পে দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মাত্রেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত। যে দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে জ্ঞান ধর্ম্ম ও চরিত্রই সমাজের পূজালাভ করিয়া আসিয়াছে, যে দেশের জ্ঞানিগণ ভক্তগণ ও সাধু মহাত্মাগণ দেশের পূজা লাভ করিয়া আসিয়াছেন সে দেশে যদি ধনিগণই সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পূজালাভ করিতে থাকে তাহা হইলে দেশের জ্ঞানগৌরব ধর্ম্মগৌরব চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইবে। কিন্তু আমাদের মতে দেশের এমন দুর্দ্দশা এখনও হয় নাই এদেশে জ্ঞানিগণ কর্ম্মিগণ ও সাধুগণ সমাজের পূজালাভ করিতেছেন। দেশের ধনিগণও তাঁহাদের পদধূলি মস্তকে লইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন। এদেশে এই যুগেও মহারাণী স্বর্ণময়ী, মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য, মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, মহারাজা জগৎকিশোর আচার্য্য প্রভৃতি অভিজাত বংশীয় ধনিগণ জন্মিতেছেন যাঁহারা ধনী অপেক্ষা জ্ঞানীকে জ্ঞানী অপেক্ষা ধার্ম্মিককে এবং ধার্ম্মিক অপেক্ষা সাধু মহাত্মাগণকে অধিকতর সম্মান দিয়াছেন। তবে শুধু জাত্যভিমান লইয়া সমাজের পূজালাভ করিবার দিন আর নাই। সেদিন চলিয়া গিয়াছে। শত চেষ্টা করিলেও তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না। জাত্যভিমানের উপর এদেশেই বহু দিন ধরিয়া যে আঘাত পড়িয়া আসিতেছে তাহার ফলে ইহা ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিতেছে। মুসলমান রাজত্বের বহু পূর্ব্ব হইতেই এই জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে। সর্ব্বশেষে ভক্তাবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেব আপন ধর্ম্মের অজয় শক্তিতে এই বর্ণভেদ প্রথার মূলোচ্ছেদের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। বৈষ্ণব সমাজে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে ভক্তগণই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মানের অধিকারী। যখনই জ্ঞান ধর্ম্মের আদর ব্রাহ্মণ জাতির আভিজাত্যের উপরে উঠিল তখনই ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত পড়িল। মহাপ্রভু আপনার জীবনে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া শিক্ষা দিলেন 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ।' যদি দরিদ্র বলিয়া বঙ্গীয় সমাজে জ্ঞানিগণ, ভক্তগণ ও সাধুগণ যথোচিত ও ধর্ম্ম রূপে সমাদৃত না হন দেশের জ্ঞানহীনতা ও ধর্ম্মহীনতাই তাহার প্রধান কারণ। আমাদের কিন্তু সে বিশ্বাস নাই। আমরাও দেখিতেছি বৈষ্ণব সমাজে সাধু ভক্তগণ ইহার বাহিরে অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এখনও সমাজের শ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তবে ধনের আবশ্যকতা সমাজে চিরদিনই থাকিবে ধনিগণও আপনাদের যোগ্য সম্মান লাভ করিবেন। বিশেষতঃ অর্থই যাহাদের পরমার্থ তাহারা ত সকল ছাড়িয়া ধনিগণের পদপ্রান্তে পড়িয়া থাকিবে। আমাদের বিশ্বাস এক্ষণে কৃত্রিম জাতিভেদের পরিবর্ত্তে সমাজে জ্ঞানগত ও

গুণগত কৌলিণ্যের সৃষ্টি হইতেছে। তাই জ্ঞানিগণ ও ধার্ম্মিকগণ দশের পূজা লাভ করিতেছেন। ভারতের জ্ঞাননিষ্ঠ ধর্ম্মপ্রাণ ঋষিগণ এই উদ্দেশ্যেই ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের এই গূঢ় তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়াই আমাদের এই দুর্দ্দশা। গুণগত কৌলিন্য কৃত্রিম কৌলিন্যে পরিণত হইয়া মহা অকল্যাণ সাধন করিয়াছিল। আধুনিক বর্ণভেদ প্রথা যে সকল সমাজে নাই তাহাদের মধ্যেই গুণগত কৌলিন্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে কারণ তাহা স্বাভাবিক এবং মানবের প্রকৃতিগত। মুসলমান সমাজে পীর ফকির ও মৌলবীগণের যে সম্মান ধনিগণ সে সম্মান পান না। চীন জাপান প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবে জ্ঞানী ও ধর্ম্মযাজকগণ সমাজের শ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ট। ধনিগণ তাঁহাদের পদতলে লুণ্ঠিত। যে ইয়োরোপীয়গণের অন্ধ অনুকরণে আমাদের কোন কোন সম্প্রদায় অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছেন তাঁহাদের দেশেও আমরা জ্ঞানগত ধর্ম্মগত কৌলিন্যের প্রভাবই বেশী দেখিতে পাই। জ্ঞান ও চরিত্র বলে অসংখ্য লোক সমাজের অতি নিম্নস্তর হইতে উচ্চতম স্তরে উন্নীত হইতেছেন। কত দরিদ্র সন্তান শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মযাচক অধ্যাপক ও রাজনৈতিকের পদে উপবিষ্ট হইতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরাও যদি জগতের অনুকরণে জ্ঞান ধর্ম্ম ও চরিত্রের আদর করিতে শিখি ঐশ্বর্য্যের মোহ আমাদিগকে অভিভূত করিতে পারিবে না। যে দেশের জ্ঞান ও ধর্ম্ম জগতের লোককে সভ্যতার অধিকারী করিয়াছে সে দেশ আপনার জাতীয় বিশেষত্ব ভুলিয়া অর্থকেই পরামর্থ রূপে বরণ করিবে ইহাত কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। মানবজীবনের সুখ শান্তি ধনে নহে, ঐশ্বর্য্যে নহে। খ্যাতি প্রতিপত্তিতেও নহে। সুখ শান্তি পাওয়া যায় একমাত্র জ্ঞানে, প্রেমে ও সাধুতায়। ভারতবাসীর প্রাণে প্রাণে এই বিশ্বাস জাগিয়া আছে। ঋষিগণের নিঃস্বার্থ নরহিতৈষণা চিরদিন ভারতবাসীকে কর্ম্মমন্ত্রে দীক্ষিত করিবে। তাঁহাদের অফুরন্ত পুণ্যালোকে আকুমারী হিমাচল সমগ্র ভারত উদ্ভাসিত থাকিবে। আজ নানা উপায়ে সমগ্র পৃথিবী এক মহাদেশে পরিণত হইয়াছে। কোন দেশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা এই যুগে আর সম্ভব হইবে না। যাহা কৃত্রিম, যাহা সঙ্কীর্ণ, যাহা চিরন্তন ও সর্ব্বব্যাপী নহে তাহার আর রক্ষা করা যাইবে না। সভ্যতার ঘাত প্রতিঘাতে তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। যাহা চিরন্তন যাহা বিশ্বজনীন তাহাই গড়িয়া উঠিবে। যে গুণগত শ্রেণীবিভাগ বিশ্ব মানবের হিতসাধনের অনুকূল তাহাই প্রতিষ্ঠিত হইবে। খরস্রোতা জাহ্নবী আজ সাগর সঙ্গমে আসিয়া উপস্থিত, তাহাকে পুনরায় হিমাদ্রির পদপ্রান্তে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করে এমন শক্তি কাহারও নাই।

রত্নাকর

৫। তুলসীর গুণ

আয়ুর্ব্বেদ বলেন—ইহা কফ নিঃসারক, মূত্রকারক, ম্যালেরিয়া নামক পারজপুষ্ট কীট নাশক, শুক্রকারক, পাচক, বিষনাশক, রক্তরোধক, বমনকারক, এবং প্রদাহ নিবারক। নির্ঘণ্টু রত্নাকর, প্রভৃতি বৈদ্যকগ্রন্থে তুলসীর দাহকারক, পিত্তজনক, দীপন, তীক্ষ্ণ প্রভৃতি গুণের উল্লেখ আছে। তাঁহারা বলিয়াছেন "শুক্লকৃষ্ণা চ গুণৈস্তুল্যা প্রকীর্ত্তিতা" অর্থাৎ শ্বেতকৃষ্ণ ভেদে তুলসী গুণের বেলায় সমান।

বাত, কফ, শ্বাস, কাশি, কৃমি, বমন, দুর্গন্ধকুষ্ঠ, মূত্রবিকার, গুল্ম, বিষদোষ, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তদোষ, জ্বর, হিক্কা প্রভৃতি পীড়ায় ইহার ব্যবহার অনুমোদিত। সর্দ্দি জন্য বহুবিধ পীড়ায় এবং পার্শ্ববেদনা প্লুরেসি নিউমোনিয়া প্রভৃতি পীড়ায় ইহা ব্যবহার হইয়া থাকে। শ্লেষ্মা নিঃসরণ কার্য্যে ইহার শক্তি অতুল্য। কবিরাজ মহাশয়গণ জ্বর প্রদর ও শ্লেষ্মজ পীড়ায় তুলসী ব্যবহারের বড় পক্ষপাতী। সবিরাম ও স্বল্প-বিরাম জ্বরে তুলসী ব্যবহার শাস্ত্রানুমোদিত।

শীতলতা জন্য জ্বর হইলে মাত্র তুলসীপত্ররস একটু লবণ সহ উষ্ণ করিয়া খাইলে আর দ্বিতীয় মাত্রা ঔষধ আবশ্যক করে না। ম্যালেরিয়া জ্বরে বিলাতী ডাক্তারগণ আজকাল তুলসী ব্যবহার করিতে আর বাড়ীতে তুলসীর গাছ রাখিতে আদেশ করিতেছেন। আয়ুর্ব্বেদের তুলসী ব্যবহার আর হিন্দুশাস্ত্রের তুলসীর পবিত্রতা আজকাল বহু বিলাতী ডাক্তার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার চরম নিদর্শন বলিয়া গণ্য করিতেছেন। পূর্ব্বে অনভিজ্ঞ ডাক্তারগণ আর অনুকরণকারী দেশীয় ডাক্তার ভায়ারা আয়ুর্ব্বেদকে অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা শাস্ত্র বলিয়া উপহাস করিতেন। কিন্তু বিজ্ঞানের ভূরি উন্নতি জন্য জগৎ এখন চাহিয়া দেখিতেছে যে হিন্দুর চিকিৎসা শাস্ত্রের কোন কথাই অবৈজ্ঞানিক নয়। আয়ুর্ব্বেদে ত বিজ্ঞানশাস্ত্রের পূর্ণ পরিণতির পরিপূর্ণ উদাহরণ; হিন্দুর প্রত্যেক অনুষ্ঠানই বিজ্ঞানমূলক। শয্যা হইতে উঠিয়া পুনঃ নিদ্রা যাইবার সময় পর্য্যন্ত প্রত্যেক সাংসারিক ঘটানাটী পর্য্যন্ত বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনুমোদিত অনুষ্ঠান। তুলসীর পবিত্রতা আর হিন্দুগৃহীর বাড়ীতে তুলসীবৃক্ষ স্থাপন পদ্ধতি মানবশরীরের কীদৃশ হিতকারী তাহা এখন জগৎ চাহিয়া দেখিয়া বিমুগ্ধ হইতেছে।

ম্যালেরিয়ায় দেশ উৎসন্ন করিল; কিন্তু ইহা নূতন ধ্বংসের পথ নহে। যাহাকে আজকাল ম্যালেরিয়া বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয় তাহা পূর্ব্বে শারদীয় জ্বর অর্থাৎ শরত ঋতুর জ্বর নামে অভিহিত ছিল। এই জ্বরের প্রতিষেধক তুলসীবৃক্ষরোপণ প্রথা কুইনাইন সিনকোনা হইতে কম নহে। যাহাহউক জ্বরপীড়ায় আমরা তুলসীর আশ্চর্য্য শক্তি বহুবার পরীক্ষা করিয়াছি এমন কি অল্প-পরিমাণে কুইনাইন তুলসীরসে বড়ী করিয়া খাওয়াইয়া এবং খাইয়া যথেষ্ট উপকার পাইয়াছি। এক সময়ে আমি কুইনাইনের অভাবে তুলসীর পত্রের রস ২ ড্রাম, গুলঞ্চেরপালো ২০ গ্রেণ, আতৈসচূর্ণ ।॰ গ্রেণ একত্রে দুই বড়ী প্রস্তুত করিয়া অনেক ম্যালেরিয়াপীড়িত ব্যক্তির জ্বর আরোগ্য করিয়াছি। আমি নিজে অতঃপর আর কুইনাইন খাই নাই। জ্বর দমন করিতে তুলসী একটী অতিশয় প্রধান ঔষধ! আবার তুলসীপাতার গুঁড়া নাসিকা রোগে মহোপকারী ঔষধ নস্যরূপে ব্যবহার করিতে হয় বা রস টানিয়া লইতে হয়।

একটি ব্রাহ্মণ কামিনী দীর্ঘকাল নাসিকা পীড়া ভোগ করিয়া শেষে তুলসীপত্ররসেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। বিষাক্ত জন্তুর দংশন যন্ত্রণা নিবারণ করিতে তুলসী অতি উপাদেয় উদ্ভিদ্।

বৃশ্চিক, বোলতা, ভীমরুল, চেলা এবং সিঙ্গিমৎস্যের আঘাত জন্য যন্ত্রণা নিবারণ করিতে তুলসীপত্রের রস এবং লবণ অমোঘ ঔষধ। আমাকে এক সময়ে রাত্রি ৩টার সময় চেলা নামক বৃশ্চিকজাতীয় জন্তুতে দংশন করে তখন যন্ত্রণায় সর্পদংশন হইয়াছে বলিয়া আমার পিতা এবং আত্মীয়গণ ব্যস্ত হইয়া উঠেন! কিন্তু একটী ১৫।১৬ বৎসরের ভৃত্য

বলে যে চেলায় কাটিয়াছে তুলসীরস দিয়া দেখি। ৺কাশীতে রাত্রিতে তুলসী পাওয়া কঠিন হইল তখন ডাক্তারী "লাইকার। এমন য়্যাসিড" লাগান হইতে লাগিল কিছুতেই কিছু হয় না দেখিয়া ঠাকুরপূজার নির্ম্মাল্য হইতে তুলসী কুড়াইয়া তাহার রস ২৩ বার লাগাইতেই যন্ত্রণা নিবারণ হইল। বলা বাহুল্য এক্ষেত্রে কাল তুলসী প্রধান। একটী বিধবা রাঁধুনীকে ভীমরুল নামক বোল্‌তা-জাতীয় কীটে বাতাসার দোকানে কাটিয়াছিল আমি তাহাকে কাল তুলসীর রস দিয়া সুস্থ করিয়াছিলাম।

শিশুর কর্ণে বেদনা হইলে এবং ঠাণ্ডা লাগিয়া বুকে সর্দ্দি বসিলে তুলসীপত্রই এদেশের গৃহিণীগণের একদিন প্রধান ঔষধ ছিল। এ অবস্থাতে কর্ণে ২।১ ফোঁটা রস দিতে হয়, আর মধুসহ অল্প লবণ এবং তুলসীরস খাইতে দিতে হয়। একরূপ অজ্ঞানব্যাধি আছে উহা অধিক উষ্ণতা ও পরিশ্রম জন্য রৌদ্রে ঘুরিলে উৎপন্ন হয় এই উৎপাতে তুলসীই উৎকৃষ্ট ভেষজ। সৈন্ধব-চূর্ণসহ তুলসীর মঞ্জরীর রস নাসিকা মধ্যে প্রবেশ করাইলে তৎক্ষণাৎ অজ্ঞানতা নিবারণ হয়। যে সকল কিশোরী বা যুবতী হিষ্টিরিয়া নামক ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ করে তাহাদের তুলসীর রস ও সৈন্ধব প্রধান ঔষধ। চর্ম্মের উপর এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ দাগ—ইহা অনেক সময় চুলকণা উপস্থিত করে ও চাষীগণের রৌদ্রে অবস্থান জন্য অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইয়া একরূপ দদ্রুপীড়া উপস্থিত করে। এই দুই ক্ষেত্রেও তুলসীপাতার রস উৎকৃষ্ট মহৌষধ।

নূতন সর্দ্দি পীড়ায় তুলসী ও আদা প্রাতেঃ ও সন্ধ্যায় খাইলে সহজেই উপদ্রব নিবারণ হয়। তুলসীর মঞ্জরী ও গরমজল খাইলে অজীর্ণ রোগ আরোগ্য হয়।

শুনিয়াছি তুলসীস্থিত স্বর্ণবর্ণের পোকা কলায় ভরিয়া খাইলে ক্ষিপ্ত শৃগাল ও কুকুরের দংশনজনিত বিষ দূর হয়। বলা বাহুল্য ইহা আমাদের পরীক্ষিত নহে। তুলসীর উপকারিতা সম্বন্ধীয় দুই একটী প্রত্যক্ষদর্শীর কথা এবার বলি।

বিবাহের ফুলসজ্জার দিন স্ত্রীর নাসিকার ওজিনা নামক ব্যাধির দুর্গন্ধে বিরক্ত হইয়া, স্বামী ক্রমাগত তিন চারি বৎসর পর্য্যন্ত ডাক্তারী এবং কবিরাজী বহু ঔষধ ব্যবহারে হতাশহৃদয়ে চিকিৎসা জন্য কলিকাতা লইয়া যাইতেছিলেন, পথে দৈব দুর্য্যোগে ঝড় জল হওয়ায় এক সূত্রধরের বাড়ীতে গিয়া অবস্থান করেন। এই স্থানে সূত্রধরের জননী ভদ্রলোকের বালিকা স্ত্রীসহ কলিকাতা গমনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন, উত্তর শুনিয়া সূত্রধর-জননী বলে যে "বাবু দুই দিনে তোমার স্ত্রীর পীড়া আরোগ্য করিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া বৃদ্ধা একখানা তামার কুশীতে করিয়া ঔষধ লইয়া ভদ্রবালিকার নাকে ৪৫ ফোঁটা প্রদান করিল। আবার দুই ঘণ্টা বাদে ঔষধ প্রয়োগ করিল, এইরূপে সেই ঝড় জল থাকিতে থাকিতে ৪ বার নাসিকায় ঔষধ দেওয়া হয়। ভগবানের ইচ্ছায় ভদ্র লোকের স্ত্রীটী তখন হাঁচিতে হাঁচিতে ঢিলের মত অতিদুর্গন্ধযুক্ত একটী শ্লেষ্মার দলা নাসিকা হইতে ত্যাগ করিল। অমনি সেই ভদ্রবধূর নাসিকা পাতলা হইল। আর যে উৎকট গন্ধে মুখের নিকট মুখ লওয়া যাইত না তাহাও দূর হইল, মাথার নিম্নাংশ পাতলা হইল, কাশি থামিল, মাথা কামড়ান নিবারণ হইল।

তখন বাবুটি সেই বৃদ্ধাকে কিছু উপহার

দিয়া সেই ঔষধটি শিক্ষা করিয়া দেশে ফিরিলেন, বৃদ্ধা কৃষ্ণ তুলসীর রস আর সৈন্ধব চূর্ণ তাম্রপাত্রে উষ্ণ করিয়া নাসিকায় দিয়াছিল। সেই ভদ্র যুবতী বাল্যকাল হইতে মস্তকের শ্লেষ্মাপীড়ায় কষ্ট পাইতেন আবদ্ধ ক্রুর শ্লেষ্মা তাহার নাসিকার ন্যাজাল ফুসা অর্থাৎ নাকের মধ্যস্থ খাতের মধ্যে জমাট হইয়া নিঃসরণ হইত না। তাহাতে নাসিকায় ক্ষত হইয়াছিল। শ্লেষ্মাবদ্ধ আর ক্ষতের পূয একত্রে দুর্গন্ধ জন্মাইয়া সময়ে সময়ে অতীব যন্ত্রণা দিত, তুলসী তাহা আরোগ্য করিল ; ইহা প্রকৃত ওজিনা পীড়া নহে তখন তাহা জানা গেল। বলা বাহুল্য ওজিনা হইলে তাহাও ভাল হইত।

আর একটি ১৪।১৫ বৎসরের সাহা জাতীয়া কামিনী স্বামীগৃহে যাইবার অনিচ্ছায় পার্শ্ববর্ত্তী একটী কায়স্থ যুবতীর হিষ্টিরিয়া পীড়ার অনুকরণ করিত। এইরূপ ব্যাধি হইলে যেরূপ ভাবভঙ্গী করিতে হয়, এই যুবতী তাহা সমস্তই নকল করিত। তখন স্বামী বেচারা বিপদাপন্ন হইয়া আমার শরণাগত হয়। আমি গিয়া দিবসে দুই বার যুবতীকে দেখিয়া বুঝিলাম যুবতীর পীড়া প্রকৃত নহে অনুকরণ মাত্র, তখন আমি কার্ব্বনেট অব য়্যামনিয়া শুঁকাইয়া যুবতীর হিষ্টিরিয়া ফিট নিবারণ করিলাম। কিন্তু আমার প্রস্থানের পর এক ঘণ্টা কাল বাদে নকল পীড়ায় আবার আক্রান্ত হইয়া প্রলাপচ্ছলে বলিতে লাগিল যে ডাক্তারের চুণ আর নিশাদলের গন্ধে আমার "আসন" আমি ছাড়িব না অর্থাৎ যুবতী বালিকা দেবীর আবেশে আবিষ্টার ভান করিতে লাগিল। তখন আবার আমার ডাক হইল। এবার আমি শুধু হাতে গিয়াছিলাম কিন্তু সেই বাড়ীতে তুলসীর বৃন্দাবন দেখিয়া কতকটা তুলসীর রস প্রস্তুত করিয়া সৈন্ধবচূর্ণসহ কলার পাতার নলযোগে ফুৎকারে যুবতীর নাসিকায় প্রবেশ করাইয়া দিলাম। অমনই কালীর আবির্ভাব দূর হইল স্বামীগৃহে যাইতে হইল।

আমার শ্যালক পুত্র দুইবর্ষের শিশু রাত্রিতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কর্ণের মধ্যে হাত দিতে লাগিল তখন তাহার ২।৪টী অর্দ্ধোচ্চারিত বুলি ফুটিয়াছে, সে বলিল যে 'দলে দলে কা।' অর্থাৎ কাণজ্বালা করে। এই সময় আমি ঢাল তলোয়ার হীন সর্দ্দার! ঔষধের নাম মাত্র আমার সঙ্গে নাই। বড় বিপন্ন হইয়া পড়িলাম। সহসা তুলসীর কথা মনে পড়িল, শ্যালক কন্যাকে দিয়া তুলসী আনাইয়া তাহার রস আর ঘরের কোণের কার্পাসের কাঁচা ফলের রস উষ্ণ করিয়া কাণে কয়েক ফোঁটা দিলাম, শিশু নিদ্রিত হইল। এই দিন হইতে আমি বালক বালিকার কর্ণবেদনায় নিম্নের ব্যবস্থা অনুযায়ী চলিয়া আসিতেছি।

তুলসীর রস ৩০ ফোঁটা, কার্পাসের কাঁচাফলের রস ২০ ফোঁটা, রসুনের রস ৩০ ফোঁটা, মধু ১॥ ড্রাম একত্রে মিশাইয়া রাখিতে হয়। আবশ্যক মতে ২।৩ ফোঁটা কর্ণে দেওয়া বিধি। বলা বাহুল্য মধুর তত আবশ্যকতা নাই।

আমার কোন বন্ধু তুলসীর গুণ সম্বন্ধে তাঁহার পরিজ্ঞাত ও পরীক্ষিত আরও কয়েকটি বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া দেওয়াতে তাহাও এইস্থানে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

বাবুই তুলসী প্রমেহ বা গণোরিয়া পীড়ায় একটি মহৌষধ। তুলসী বীজ পূর্ব্বদিন জলে ভিজাইয়া রাখিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া পরিষ্কৃত জল পরদিন প্রাতে রোগীকে খাইতে দিতে হয়। দুই তিন দিন ব্যবহারেই মূত্রত্যাগের সময় জ্বালা যন্ত্রণা দূর হয়।

উদরাময়েও তুলসী আশ্চর্য্য কার্য্য করে। এ পীড়াতেও ঐরূপ তুলসী বীজের সরবৎ ব্যবহার করিতে হয় কেবল তাহার সহিত পাকা কলা কিছু সংযুক্ত করিয়া রাখিতে হয়।

উদরে কৃমি হইলে কৃষ্ণতুলসী পাতার রস ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে।

তুলসীর ব্যবহারিক ঔষধ স্বরূপ গুণের কথা মাত্র এবার এ প্রস্তাবে বলা হইল। কারণ তুলসী সম্বন্ধে আর আর জ্ঞাতব্য এবং আধ্যাত্মিক গুণ বা ইহার মাহাত্ম্য বিষয় হিন্দুশাস্ত্রে যেরূপ উক্ত হইয়াছে তাহা ত্রিশূল পত্রেরই তৃতীয়বর্ষের নবম দশমাদি সংখ্যায় যথা সম্ভব আলোচিত হইয়াছে।

মেদিনীপুর-হিতৈষী

৬। বরপণের ঔষধ

কলিকাতায় বিগত ২৭শে আষাঢ় রবিবার বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যাপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটী বরপণ নিবারণী সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মিঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু কালিপদ ঘোষ, রায় রাধাগোবিন্দ বাহাদুর প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি-বর্গ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভা পণ-প্রথার মুলোচ্ছেদ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। কিন্তু এই মুলোচ্ছেদ কি ভাবে করিবেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। যাঁহারা উদ্যোক্তা এবং শ্রোতা তাঁহারা কেহই প্রকৃত বরপণের তীব্র হলাহলে জর্জ্জ-রিত নহেন, তাঁহারা দয়াপরায়ণ হইয়া আমা-দের কথা ভাবেন এই পর্য্যন্ত, অন্যথা তাঁহাদের পুত্র কন্যার বিবাহাদিতে আদান প্রদানের কথাও উঠে না, অভাবও হয় না। বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তা দূরে থাক তাঁহাদের বন্ধুবর্গও যে পরিমাণ যৌতুক প্রদান করেন তাহাতেও অনেক গরীবের বাড়ীর বিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইতে পারে। তাই বলিতেছিলাম এই সমস্ত সভাসদ বা সভাসমিতি দেশের প্রকৃত অভাব দূরীকরণে সমর্থ হইবে না। এই বরপণ নিবারণের উপায় একমাত্র বরপণ সংগ্রহেই দেশ যদি গরীব না হইত, প্রত্যেক কন্যাকর্ত্তার যদি বরকে দিবার মতন যথেষ্ট টাকা থাকিত তবে এই বরপণ নিবারণের চেষ্টা করিতে হইত না। বরপণ প্রশ্ন এত তীব্র হইত না, আজ যাহার টাকা আছে সে জামাতাকে যথোপযুক্ত প্রদান করিতে আনন্দ ব্যতীত দুঃখ বোধ করেনা, যত ক্রন্দন কেবল গরীব কন্যাকর্ত্তার! এই দারিদ্র্যদোষ নাশ করিবার চেষ্টা কর, মূল ব্যাধি দূর কর। বহিঃলক্ষণ নষ্ট করিতে চেষ্টা করিলে ফল কিছু হইবে না, অরণ্যে রোদন হইবে। বরপণ নাই কোথায়—? ছিলনা কোন যুগে? বর্ত্তমান সভ্যতার আদর্শ ইউরোপ ও আমেরিকায় বরপণের প্রাবল্য আছে কিন্তু তাহাতে দেশ গেল বলিয়া চীৎকার নাই। একবার ষ্টেটসম্যানে পড়িয়া ছিলাম ইংরেজেরা বলেনঃ—

"In marriage matters no other consideration should be made except money বিবাহে টাকা ব্যতীত অপর কোনদিক বিবেচনা করিতে হইবে না! তাই তাহারা এমেরিকান ধনকুবেরগণের মেয়ে বিবাহ করিতে লালায়িত।

ভারতের প্রাচীনকালেও সালঙ্কৃতা কন্যা এবং গোধন ইত্যাদি দান করিবার ব্যবস্থা ছিল। তবে তখন সমাজে একটা বাঁধ ছিল, কাহার কত প্রাপ্য তাহা নির্দ্দিষ্ট ছিল, আজ আর কেহ সমাজে নিয়ামক নাই, কাহারও হইবারও উপায় নাই। রাজনৈতিক নেতা এই সমাজ নিয়ামক নহেন, বৃথাই তাহাদের বাগ্‌বিস্তার, কার্য্যতঃ ফল কিছুই হইবার নহে। তাই বলিতেছিলাম দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এই সমাজব্যাধি দূর হইবার নহে, শত স্নেহলতার মৃত্যু এ প্রথা নিবারণ করিতে পারিবে না। বিবাহকার্য্যে উভয় পক্ষেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান, বর ও কন্যাকর্ত্তা উভয়ই শ্রেষ্ঠ পরিবারে বিবাহ দিতে চান, তাই সর্ব্বত্রই আদান প্রদান বাড়িয়া যায়। আজ যাহারা বিনা বরপণে বিবাহ করিতেছে বলিয়া সংবাদপত্রে ঢক্কা নিনাদ করে তাহারা কেহ গরীবের মেয়ে বিবাহ করে না, সহস্রপতি, লক্ষপতি, অথবা বড় চাকুরীজীবি—যাঁহারা না চাহিতেই প্রচুর দিয়া থাকেন তাঁহাদের মেয়েই বিবাহ করে, গরীবের প্রতি দয়া বর্ষণ করে না। তাই বলিতেছিলাম বরপণ নিবারণ কল্পে বরপণ সংগ্রহই একমাত্র উপায়। দেশকে ধনী কর অন্যান্য বিপদের সহিত এ বিপদও কমিয়া যাইবে।

বরিশাল হিতৈষী

"চাহ, চাহ, মতিমান, দেখ দেখি বিশাল জগতে,
মানবের কর্ম্মধারা কত দিকে আবর্ত্তিয়া ধায়!
কত সাধ কত আশা জেগে ওঠে সাধিতে কল্যাণ!
মানুষের শক্তি লয়ে কীটসম ব্যর্থ কর তারে?
বিধাতার পুণ্যদান—দলমল হিয়া-শতদল
গন্ধ চাহে বিতরিতে, তুমি তার রুধিবে দুয়ার?
একি—একি অপমান মনুষ্যত্বে হান অবিরত!
ভুলে যাও বর্ত্তমানে, ভেঙ্গে ফেল জড়তা-শিকল
দূর ভবিষ্যতে চাহি'। ভাসে ধরা আলোক-বন্যায়—
দুয়ারে পাখীর মত, আজি তোমা ডাকি প্রাণপণে,
বাহির হবে না তুমি?"

সপ্তম খণ্ড সপ্তম বর্ষ	মাঘ, ১৩২২	চতুর্থ সংখ্যা।

আলোচনা

১। কংগ্রেসে আমাদের লাভ

প্রতি বৎসর যেরূপ কংগ্রেস বসিয়া থাকে, এবারও সেরূপ হইয়াছে, সভায় অন্যান্য বারের ন্যায় মন্তব্যও গৃহীত হইয়াছে। ভারতবাসীর উচ্চপদের জন্য প্রার্থনা, সমর-বিভাগে প্রবেশ বা অস্ত্র আইন রদ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। মোটের উপর প্রার্থনা করিতে কোনটিই বাদ পড়ে নাই। তারপর সকল প্রার্থনা, সকল অনুরোধের মূল—যে স্বায়ত্ত শাসন লাভের জন্য, আজ ত্রিশ বৎসর যাবৎ কত জন আমরণ চেষ্টা করিয়া অবশেষে প্রাণপাত করিয়াছেন, এবারকার তিনদিনের ফুৎকারে তাহা যেন উড়িয়া যাইবার মত হইল। ত্রিশ বৎসর যাবৎ দেশের অর্থ, কর্ম্মীর একাগ্রতা, সাধকের প্রাণপাতসাধনা—ভবিষ্যতের শুভ

আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হইয়াও আজ যেন বিফলীকৃত।

এবার কংগ্রেসে আমাদের লাভ হইল— প্রমাণিত হইল আমাদের অনুপযুক্ততা। বিগত বৎসর পর্য্যন্ত সভাপতিগণ যাহাকে ধরা পড়া বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন, তাহা মিথ্যা প্রমাণিত হইল। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হইতে মেটা সাহেব পর্য্যন্ত পরলোকগত সভাপতিগণ কি এই ভ্রান্ত ধারণার পোষকতা করিয়া গিয়াছেন? তাঁহাদের আত্মা কি মাতৃমন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল— আমরা শাসনে অনুপযুক্ত? আমরা কোন্ সুদীর্ঘ কাল হইতে মহাতীর্থের জন্য যাত্রা করিয়া, সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়াও দেখি, আমাদের পথে শত শত কণ্টক বিদ্যমান। এই খানেই কি মহাতীর্থ দর্শনের বাসনা শেষ করিতে হইবে? কত আশা আমাদের হৃদয়-স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে অবিরত ঘা দিতেছে "আমরা জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে, রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ।" আমরা বৈষ্ণবীয় দর্শনশাস্ত্রের চূড়ান্ত মহিমা ঘোষণা করিব। এই সাম্যের যুগে, আত্মশক্তি প্রচারের মুহূর্ত্তে, আমরা জগতের জাতিসমূহের পশ্চাতে থাকিব ইহা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য নয়। জগতের স্বাধীন জাতিসমূহের ন্যায় সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিব, ন্যায্য অধিকারে স্বত্ববান হইব, ইহাই আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের বাসনা। কংগ্রেসের এই বাসনা পূর্ণ করিবার নিমিত্তই, আমাদের দেশবাসী নবীন ব্যবসায়িগণ বিভিন্নক্ষেত্রে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও, নবীন কর্ম্মিগণ নব নব কর্ম্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াও পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছেন, দারিদ্র্যের বিরাট বদনে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া আপনার পথে চলিয়া যাইতেছেন। এইরূপে চলিতেই হইবে, জগতের অন্যান্য জাতিসমূহের সমকক্ষ হইবার নিমিত্ত আমরা অগ্রসর না হইলে চলিবে কেন? সকল রকম কর্ম্মে আমরা বুঝাইব, আমরা অনুপযুক্ত নহি। আমাদের বীর্য্য, আমাদের উজ্জ্বল ললাট ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত।

সভাপতি মহাশয়, আধুনিক ভারতের কর্ম্মক্ষেত্র বাঙ্গালা দেশ হইতে ঋত্বিক্ পদে বৃত হইয়া, স্বরাজ-সেবক শিবজীর জন্মভূমির বুকে দাঁড়াইয়া তাঁহার ত্রিশকোটী দেশবাসীকে শক্তি-হীন বলিয়া প্রচার করিলেন।

তাঁহার এবম্বিধ প্রচার কংগ্রেসের মুখ্য উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পক্ষে কতটা ক্ষতিজনক তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তির বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। আমরা তাঁহার অন্য অনেক মতবাদের সহিত একমত হইলেও এই মতবাদকে বড়ই ভীতির চোখে দেখিতেছি।

২। পল্লী সমাজে চিকিৎসার ব্যবস্থা

সকলেই অবগত আছেন যে বঙ্গদেশের পল্লীতে পল্লীতে চিকিৎসার অভাবে কত জীবন নাশ হয় ও কত নবীন জীবন চির-কালের জন্য রোগ-ভগ্ন হইয়া গ্রামখানিকে নিরাশার ছায়ায় ঢাকিয়া রাখে। আজকাল পল্লীসেবার জন্য আমাদের যুবকবৃন্দের মধ্যে একটী আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। পল্লী-গ্রামকে কেবল কবিকল্পিত বেশভূষায় সাহিত্য-ক্ষেত্রে হাজির করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিবার দিন গিয়াছে। সুতরাং গ্রামকে যদি পুনরায় সভ্যতার আলয়, চিন্তার আশ্রম করিয়া তুলিতে হয় তবে যাহারা এখনও পূর্ব্বপুরুষের ভিটা ধরিয়া বাস করিতেছে

তাহারা যাহাতে সুস্থদেহে থাকিতে পারে আমরা সেই দিকে পল্লীসেবকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছি।

গ্রামে গ্রামে যদি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত করা আমাদের ক্ষমতার মধ্যে থাকিত তাহা হইলে ত কোন চিন্তাই থাকিত না। অথচ গ্রামে বাস এমন লোভনীয় নহে যে উপযুক্ত চিকিৎসকগণ সহরের বেশী আয়ের পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক গ্রামে যাইয়া বাস করিবেন। আবার Medical Bill এর উপদ্রবে যে কয়টী বেসরকারী চিকিৎসা-বিদ্যালয় ছিল তাহাদের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই পল্লীগ্রামে কোথা হইতে চিকিৎসক আমদানী হইবে তাহা একটা চিন্তার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। এ ক্ষেত্রে আমাদের কর্ত্তব্য কি তাহা অবিলম্বে নির্ণয় করা আবশ্যক। ডিসেম্বর মাসের Indian Reviewতে মহীশূরস্থ শ্রীযুক্ত জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের একটী বক্তৃতার অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি এই প্রশ্নের যে মীমাংসা করিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট কার্য্যকরী বলিয়া মনে হয়। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন—

"If simple medical assistance is to come within the reach of the great man of village population, we must think of an entirely different type of men. We must revert to something like the Native Doctor of the old times. We must have a set of men who, while able to render useful medical help in simple cases, will be satisfied to live as villagers amongst villagers on a modest income. Their education both general and professional may not be of a very high order on the theoretical side, but their training must have special reference to the peculiar requirements of the population amongst whom they will have to work. I think if we get hold of students who have read up to the lower secondary standard and train them in a special institution for a period of two years we may have the desired type of men. The course of instruction is to comprise of vaccination, Plague inoculation, diagnosis of simple medical cases, the use of drugs, first aid in accidents, a little surgery, a little midwifery and hygiene".

অনেকে বলিবে, "এত হাতুড়ে ডাক্তারের বন্দোবস্ত হইল।" আমরাও তাহা স্বীকার করি। কিন্তু এখন যে সব "হাতুড়ে" চিকিৎসক চিকিৎসা করিতেছেন তাঁহাদের অনেকেই হয়ত কোনও শিক্ষা পান নাই। অশিক্ষিত হাতুড়ে অপেক্ষা শিক্ষিত হাতুড়ে কি ভাল নয়?

* *
*

৩। কুমারী মণ্টেস্‌সরীর শিক্ষাপ্রণালী

সমাজে 'পতিত জাতি'র উন্নয়নকল্পে বহুবিধ আন্দোলন চলিতেছে। কিন্তু সংসারের মধ্যে যাহারা পতিত রহিয়াছে, তাহাদের উদ্ধারের

জন্য কয়জনে কায়মনোবাক্যে লাগিয়াছেন, তাহাত জানি না। শিশুরাই সংসারে 'পতিত জাতি' এবং তাহারাই অধিকাংশস্থলে বেশী অবজ্ঞাত। এই শিশুদিগকে প্রকৃত উপায়ে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য আমাদের একেবারেই চেষ্টা নাই। আমরা বিচারালয়ে দণ্ডিত অপরাধীর চরিত্র-সংশোধনে যত্নবান হই, বারাঙ্গনার হীন প্রবৃত্তিকে সুপথে চালাইবার জন্য চেষ্টা করি, কিন্তু শিশুদের জন্য আমরা কিছুই করি না। পুতুলকে আমরা যে ভাবে দেখি, শিশুকেও দেখি সেইরূপ। বড় জোর কয়েদীদের মত গার্ডের তত্ত্বাবধানে তাহাদিগকে রাখি। ফলে হয় এই, যখন গার্ডের নজর তাহাদের দিকে থাকে না, তখন তাহাদের দৃষ্টি কুকর্ম্মের দিকেই প্রধাবিত হয়। কিন্তু এমন করিয়া বাহিরের ভয়ে নিয়ম শিক্ষা শিক্ষাই নহে। ভিতর হইতে নিয়মবোধ জাগ্রত হইলেই তাহা পালনেচ্ছা স্বভাবতঃ জাগিয়া উঠে। শিশুদিগকে সেইজন্য এমন একটি আবেষ্টনের মধ্যে রাখা কর্ত্তব্য যেখানে তাহারা আপনা হইতেই সুপথ গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। কেমন করিয়া সেই আবেষ্টনটি প্রস্তুত করিতে হইবে, কেমন করিয়া তাহার মধ্যে শিশুদিগকে রাখিতে হইবে,তাহার এক প্রণালী কুমারী মণ্টেস্‌সরী আবিষ্কার করিয়াছেন। কুমারী মণ্টেস্‌সরী ইতালীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রথম স্ত্রী-গ্র্যাজুয়েট।

তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীতে শিক্ষকের হস্তক্ষেপ যথাসম্ভব নিবারিত করা হইয়াছে। শিশুদিগকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তাহার ফলে তাহাদের স্বাভাবিক কর্ম্মগতি বাধা পায় না। অবশ্য স্বাধীনতা দেওয়ার অর্থ ইহা নয় যে, শিশুদিগকে একেবারে পরিত্যাগ করা। তাহাদিগের জন্য শিক্ষক সযত্নে এমন একটি আবেষ্টন গড়িয়া তুলেন, যাহার মধ্যে শিশুরা তাহাদের স্বাধীনতা প্রকাশ করিতে সুযোগ এবং আনন্দ পায়। তাহারা যে যে উপায়ে আত্মনির্ভর, আত্মসংযমী এবং ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হইতে পারে, সেই সেই উপায় অবলম্বন করাই শিক্ষকদের কায। সেইজন্য জ্ঞানার্জ্জনের স্থান এই প্রণালীর মধ্যে দ্বিতীয়। কুমারী মণ্টেস্‌সরী মনে করেন, শিশুদের জন্য সব কিছু করিয়া দিলে তাহাদের ব্যক্তিত্বকে অপহরণ করা হয়। তাহাদের ভিতরে যে মানবাত্মা আছে, তাহাকে স্পর্শ করাই যথার্থ শিক্ষার কায।

৪। ব্যবসায়ে জাপানীর সাধনা

উপাসনায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় লিখিত "নবীন জাপানে শিল্প ও ব্যবসা" নামক প্রবন্ধের একস্থানে দেখিতে পাই, তিনি বলিয়াছেন, "জাপানীরা নিজের কার্য্যফল নিজে পরীক্ষা না করিয়া বাজারে বাহির হয় না। যতদিন পর্য্যন্ত সন্তোষজনক ফল পাওয়া না যায় ততদিন তাহারা পরীক্ষা অনুসন্ধান ইত্যাদি কার্য্যে লিপ্ত থাকে। এই experimental stage এর জন্য সময় ও অর্থ ব্যয় করা তাহারা অপব্যয় বিবেচনা করে না। এই জন্যই যখন তাহারা সত্যসত্যই কাজে লাগিয়া যায় তখন অল্পকালের মধ্যেই বিস্ময়জনক কার্য্য করিয়া ফেলে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে জাপানীরা যে সকল জিনিস দেশে প্রস্তুত করিতে পারিত না আজ তাহারা সেই সমুদয় জিনিস স্বদেশে প্রস্তুত করিয়া বিদেশে চালান দিতেছে। জাপানের গত দশ বৎসরের সঙ্গে আমাদের "স্বদেশী আন্দোলনের" যুগ

তুলনা করিলে জাপানী ও ভারতীয় কার্য্য-প্রণালীর প্রভেদ বুঝিতে পারিব।

আমরা কোন এক ব্যক্তিকে ।৩ বৎসর কাল আমেরিকায় বা জার্ম্মাণীতে শিখাইয়া আনি। তৎক্ষণাৎ তাহাকে ওস্তাদ করিয়া সুবৃহৎ কারখানা খুলিতে প্রবৃত্ত হই। জাপানীরা এইরূপ দু একজন ওস্তাদের উপর নির্ভর করে না। ওস্তাদের কার্য্যক্ষমতা প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে যাচাই করিয়া লইবার জন্য তাহাদের প্রয়াস থাকে। এইজন্য খরচপত্র করিতে তাহারা অভ্যস্ত। ভারতবর্ষে ১৯০৫ সালের আন্দোলন জাপানী-প্রণালীতে পরিচালিত হইতে পারে নাই—কারণ পরীক্ষা, অনুসন্ধান ও এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট ইত্যাদি হইবার পূর্ব্বেই বিদেশী-বর্জ্জন সুরু হইয়াছিল।”

নীরব সাধনা ভিন্ন কোন কিছুতেই সফল কাম হওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের সব বিষয়েই বাহ্যাড়ম্বর এবং হঠকারিতা প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হয়। ধৈর্য্য ধরিয়া লাগিয়া থাকার গুণ আমাদের একেবারেই নাই। সেই জন্য আমাদের অধিকাংশ আন্দোলন ও অনুষ্ঠান আতস বাজীর দশা প্রাপ্ত হইতেছে।

৫। সন্ন্যাস ও ব্যবসায়

সন্ন্যাসী সংসারবন্ধন বিচ্ছিন্ন, সকল মায়ামুক্ত। ব্যবসায় বাণিজ্য তাঁহার নিকট ছেলেখেলা। এই ভাব আমাদের জনসাধারণের মধ্যে ধ্রুব সত্য বলিয়া গৃহীত। বিদেশীগণও আমাদের ধর্ম্মপ্রাণ সাধুগণকে other worldly ও misanthropic anchorite বলিয়া তুচ্ছ করেন। এরূপ anchorite আমাদের দেশে থাকিতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিতেছি না। কিন্তু যে সন্ন্যাসীর অনুপ্রেরণায় আজ ভারতের জাতীয়তা ধর্ম্মের দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়া সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনকে পূর্ণতর করিয়া তুলিয়াছে, সেই সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসীর কাজ সম্বন্ধে কি মনে করিতেন তাঁহার একখানি নব প্রকাশিত পত্র হইতে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়।

"Dear Swami Vivekananda,—I trust you remember me as a fellow-traveller on your voyage from Japan to Chicago. I very much recall at this moment your views on the growth of the ascetic spirit in India and the duty, not of destroying, but of diverting it into useful channels.

"I recall these ideas in connection with my scheme of Research Institute of Science for India, of which you have doubtless heard or read. It seems to me that no better use can be made of the ascetic spirit than the establishment of monasteries or residential halls for men dominated by this sprit, where they should live with ordinary decency and devote their lives to the cultivation of sciences, natural and humanistic. I am of opinion that if such a crusade in favour of an asceticism of this kind were undertaken by a competent leader, it would greatly help asceticism, science, and the good name of our

common country ; and I know not who would make a more fitting general of such a campaign than Vivekananda. Do you think you would care to apply yourself to the misson of galvanising into life our ancient traditions in this respect? Perhaps, you had better begin with a fiery pamphlet rousing our people in this matter. I should cheerfully defray all the expenses of publication.

"With kind regards, I am, dear Swami, Yours faithfully, Jamsetji. N. Tata, 23rd November, 1898, Esplanade House, Bombay."

এই সন্ন্যাস কি other worldly? এইরূপ সন্ন্যাসিগণ যদি এক একটী অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত সংসারে ছড়াইয়া পড়েন, যদি তাঁহারা সামাজিক জীবনের সকল বিভাগকেই তপশ্চরণের ক্ষেত্র বলিয়া গ্রহণ করেন তবে এই নবোজ্জীবিত হিন্দুত্ব এক বিশ্বপ্রসারিণী শক্তিদ্বারা সমগ্র সংসারকে আপনার লীলাক্ষেত্রে পরিণত করিবে।

* * *

৬। হাস্যরস ও জাতীয়তা

আমরা বিশ্বরূপকে আনন্দময় বলিয়া পূজা করি। প্রতি পূজায়, প্রতি উপাসনা ক্ষেত্রে একদিকে যেমন ধ্যানীর যোগপরায়ণ মূর্ত্তি দেখিতে পাই, অন্যদিকে আবার জনতার আনন্দ কোলাহল শুনিতে পাই। একদিকে যেমন মূর্ত্তিমতী নিষ্ঠা, অপর দিকে আবার সেইরূপ হাস্যরসের কলকোলাহল। এই দুই বিপরীত ধারার মধ্য দিয়া আমাদের ধর্ম্ম জীবন বহিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজ পূজার বাড়ীতে আমোদ নাই, নিষ্ঠাও কতদূর আছে জানি না। ধর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দিলে সাহিত্যেও হাস্যরস ছড়াইতে পারেন এরূপ লোক অতি অল্পই দেখা যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের কোকিল-কণ্ঠ নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। অন্য দুই একজন তাহার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি করিতেছেন। সমস্ত দেশ অন্বেষণ করিলে ২।১ খানি ব্যতীত হাস্যরসের সাময়িক পত্রের খবর পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে অপর দেশে এ শ্রেণীর পত্রিকার অভাব অপেক্ষা বাহুল্যই পরিলক্ষিত হয়। আমাদের অন্যান্য সাহিত্য সম্বন্ধেও যেমন সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন আবশ্যক ব্যঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধেও সেই পন্থা অবলম্বনই আবশ্যক। ব্যঙ্গসাহিত্য জাতীয় সাহিত্যের একটী প্রধান অঙ্গ। এক্ষেত্রে আমরা উহার বিষয়ে একেবারে উদাসীন।

অথচ আমাদের সমাজে যে লৌকিক ব্যঙ্গসাহিত্যের কখনও প্রচলন ছিল না তাহা নহে। সর্ব্বত্রই কয়েকটী ঠাট্টা বিদ্রূপ ইত্যাদি প্রচলিত আছে। পাশ্চাত্য দেশে যেমন এই সকল লৌকিক ব্যঙ্গ প্রকাশিত হইয়া নিরন্তর সাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে আমাদের দেশে তাহা দেখিতে পাইতেছি না। আমরা শুধু এক গোপাল ভাঁড় লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। আমাদের মধ্যেও Mark Twain ও Stephen Seaco'ck আছেন ও সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে উচ্চ আসন দান করিয়া লোকরঞ্জনার্থ আহ্বান করিতে হইবে। পূর্ব্বে রাজা জমিদারেরা "ভাঁড়" বা "বয়স্য" রাখিতেন। ইহাঁরাই সমাজের হাস্যরসের Vice-Chancellor ছিলেন। আজ কাল সাহিত্য ও সমাজ নূতন আকার ধারণ

করিয়াছে কাজেই পূর্ব্ব প্রচলিত প্রথা অবলম্বন করিলে এখন আর কাজ চলিবে না। এখন ব্যঙ্গসাহিত্যকে সাময়িক সাহিত্যের অঙ্গীভূত করিতে হইবে।

অনেকে বলিবেন, এই দুঃখ-দারিদ্র্য-পীড়িত দেশে হাসি আসিবে কোথা হইতে? আমরা এ যুক্তির সার্থকতা বেশ বুঝিতে পারি। কিন্তু দুঃখের ঝড়ে, লোকের ঘূর্ণিবায়ুর মধ্যে হাসির ফোয়ারা ছুটানই কি বীরত্ব নয়? দুঃখকে আমরা দুঃখ বলিয়া মাথায় পাতিয়া লইব কেন? দারিদ্র্যকে আমরা আমাদের উপর প্রভুত্ব করিতে দিব কেন? শত উৎপীড়নের মধ্যেও বিশ্বরূপের শতমুখী আনন্দ আমাদের হৃদয় উৎস হইতে ঝরিয়া পড়িবে। আর যদি কিছু না পারি আমরা "হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে পরিহাস" করিতেও পারিব না?

৭। শিক্ষাপ্রচারে প্রতিবন্ধকতা

ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশের দেশীয় রাজ্যসমূহেই সম্প্রতি শিক্ষার বিস্তৃতি দেখা যাইতেছে। আমাদের দেশে শিক্ষার জন্য লোকের ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পাইলেও তাহা সাধারণকে আপনার পাশে টানিয়া লইতে পারে নাই। বরোদা প্রভৃতি রাজ্যের রাজন্যবৃন্দের শিক্ষা প্রচারের কথা আমরা অনেকবার বলিয়াছি। পশ্চিমাঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয় যাহা করিতে পারে নাই—বরোদার বিদ্যালয়সমূহে তাহা করিয়াছে। তাহার দেশব্যাপী সাধারণ পাঠাগার, তাহার সুপরিচালিত চলিষ্ণু পাঠাগার (Travelling Library) দেশের জনসাধারণকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের দেশের অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের শিক্ষার প্রতি অনুরাগ নাই বা তাহাদের সারহীন মস্তিষ্কে শিক্ষার বীজ উপ্ত হইবে না এসব ধারণার বশবর্ত্তী হইলে বরোদা এত উন্নত হইতে পারিত না। জনসাধারণ পয়সার অভাবে বিদ্যালয়ে যদি পড়িতে না পারে তাহা হইলে উহার জন্য দায়ী কে?

আমাদের দেশে শিক্ষাপ্রচারের প্রতিবন্ধকতার ২১টী কারণ দেখিতে পাই। অশিক্ষিত সম্প্রদায় জমিদারগণের প্রজা অথবা শিক্ষিত ভদ্রলোকগণের করতলগত। যাহারা শিক্ষিত তাহাদের ধারণা, এই সকল নিম্নশ্রেণীর লোক শিক্ষা লাভ করিতে থাকিলে চাকর পাওয়া যাইবে না; দ্বিতীয়তঃ ইহারা শিক্ষিত হইলে তাহাদের ক্ষমতা হ্রাস পাইবে। জমিদারদিগের ভয় প্রজাকুল মামলাবাজ হইয়া উঠিবে; তাহারা আপন সামর্থ্যের মাত্রা বুঝিলে জমিদারগণের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিতে সাহস করিবে।

চাকর পাওয়া যাইবে না অথবা সাম্প্রদায়িক ক্ষমতা প্রয়োগের যথেচ্ছ সুবিধা হইবে না ভাবিয়া অন্য একটা সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ চাপিতে যাইয়া নিজেরাই চাপা পড়িয়া যাইতেছি। আমরা ভাবিতে পারিতেছি না যে সংসারে সকলেই এক শ্রেণীর বা এক পদবাচ্য হয় নাই, হইবেও না। নিম্নশ্রেণীরা আমাদের চাকর হইবার জন্যই জন্মগ্রহণ করে নাই। যাহারা চাকর হইবে তাহাদিগকে শত সুবিধা করিয়া দিলেও তাহারা আপন পথ বাছিয়া লইবেই। জগতের আদর্শ সারস্বত-কেন্দ্র যুক্তরাষ্ট্রের অবাধ শিক্ষা দ্বারাও সকলেই সভাপতি হইবার ক্ষমতা লাভ করিতে পারে নাই। সাধারণের ন্যায্য অধিকারকে আভিজাত্যের ক্ষমতায় কাড়িয়া লওয়াই উন্নত রুচির পরিচায়ক নহে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে, ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মকেন্দ্রে সাধারণের

সুযোগ সৃষ্টি করাই উদারনীতির পরিচয়। ইহাই উন্নত জাতির, উন্নত হৃদয়ের কার্য্য।

পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যসমূহের মধ্যে সঙ্কীর্ণমনা রাজগণ যে না আছেন এমন নহে। বরোদার একনিষ্ঠ সাধনার মহদ্দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া অন্ধ্র, মহীশূর ও ইন্দোরের রাজগণ সর্ব্বস্ব দান করিতে বসিয়াছেন। আমরা আশাকরি, পশ্চিম ভারতীয় রাজ্যসমূহ অচিরেই এক একটী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইবে। ভগবান্ তাঁহাদের উদ্দেশ্য জয়যুক্ত করুন। কিন্তু অসংখ্য জমিদারশাসিত বাঙ্গলাদেশে অনবরত তাঁহাদের মহদ্দৃষ্টান্তের কথা বলিয়াও, শুনিতে পাইলাম না কোথাও বাধ্যতামূলক শিক্ষা দানের প্রস্তাব চলিতেছে।

যাহাদিগকে লইয়া বাস করিতে হয়, যাহারা আমাদের সুখদুঃখের চিরসঙ্গী তাহাদিগকে শিক্ষা না দেওয়ায় আমরা বর্ব্বর জাতির প্রতিবেশী হইতে চলিয়াছি। শিক্ষায় লোক কখনও বিরোধ শিখে না। শিক্ষাদ্বারা মানব সমাজ সৌম্য, শান্ত হইয়াছে। যেখানে শিক্ষাপ্রণালী প্রাণ হইতে বাহির হইতে পারে নাই সেখানেই শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া পাশবিক ভাব প্রবর্ত্তিত করে। দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে রাজার রাজশক্তি বৃদ্ধি পায়। একদিকে অনধিকার ও আভিজাত্যের শাসন, অপরদিকে প্রজার উন্নতিতে জমিদারের ভীতি উভয়ই একটা সম্প্রদায়ের অনিষ্টের মহা কারণ। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, এই ভিত্তিহীন ধারণা, অমূলক যুক্তি সবই দূর হইয়া যাক্। তিনি আমাদের হৃদয়ে নবীন আলোক দান করিয়া বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেরণ করুন। আমরা শুধু বরোদা প্রভৃতি রাজ্যের প্রশংসা কাণ ভরিয়া শুনিব ইহা কখনই হইতে পারে না। আমরা বুকভরা আশায় উৎফুল্ল হইয়া বলিতে পারি ভারতের নবযুগের কর্ম্মভূমি, শতকোটী সন্তান সেবিত, সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা জননী বঙ্গভূমি অচিরেই বিরাট সারস্বত ক্ষেত্র হইবে। বাঙ্গালার জমিদারগণ আপন আপন ধন ও অপরিমিত উৎসাহ লইয়া আমাদিগকে আশা দিলে আমরা শীঘ্রই বাঙ্গলা দেশে বরোদা, ইন্দোর, মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইব। প্রাচ্য ভারতও বাণী কমলার মিলনভূমি হইবে। বিক্রমশীলা ও নালন্দা আমাদের দেশেই প্রতিষ্ঠিত ছিল, এ কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

৮। সাহিত্য-পরিচয়

“গৃহস্থের” মূল সূত্র সাহিত্যে সংরক্ষণ নীতি। পৃথিবীতে যাহা কিছু চিন্তাস্রোত বহিতেছে আমাদের মাতৃভাষার মধ্য দিয়া তাহার সব গুলিকেই প্রবাহিত করিতে হইবে। ইহার সার্থকতা এই যে আমরা আর নিজের মধ্যে আবদ্ধ থাকিব না। জগতে যে কোন জ্ঞানের আবিষ্কার হউক না কেন, যে কোন দর্শনের সৃষ্টি হউক না কেন আমরা সে সকলের মধ্যেই অবগাহন করিব। বিষয়টী যতই তুচ্ছ হউক না কেন আমাদের দেশবাসিগণ সে বিষয়ে তাঁহাদের কি বলিবার আছে, কি ভাবিবার আছে তাহা জগৎকে দান করিবেন। বিশ্বের চিন্তাক্ষেত্রে যে বিরোধ চলিতেছে, দর্শনের যে বিরুদ্ধগামী প্রবাহ ছুটিয়াছে, আমাদের আজ তাহার মধ্যে পূর্ণ প্রাণে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে হইবে ও বিরোধিগণের সহিত প্রবল উৎসাহে যুদ্ধ করিতে হইবে। ইহাতে একদিকে যেমন আমাদের জাতীয়ত্ব ফুটিয়া

উঠিবে, অন্যদিকে আবার আমরা যে বিশ্ব মানবত্ব হইতে পৃথক্ নহি, আমরা যে পৃথিবীতে একটা ব্যতিরেক সৃষ্টি করিয়া বসিয়া নাই তাহাই প্রমাণিত হইবে।

এই আদর্শের অনুপ্রেরণায় "গৃহস্থ" এখন হইতে একটী সাহিত্য পরিচয় প্রকাশ করিবে। আমরা বহুদিন হইতেই নানা দেশীয় চিন্তার দিকে দেশবাসিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আসিতেছি। কিন্তু সকল সময়—বিভিন্ন মত-গুলির সম্যক আলোচনা করা সম্ভব হইয়া উঠে না। এই জন্য আমরা নূতন বিষয়ের সন্ধান যেখানে পাই তাহার একটা বিবরণ প্রতি মাসে প্রকাশ করিব। এ বিষয়ে আমাদের পাঠকগণের সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

* *

দরিদ্রের ক্রন্দন

জীবনের বিকাশের অর্থই এই যে মানব মনের প্রতি তুচ্ছ বিন্দু, মানব প্রাণের প্রতি ক্ষুদ্র পিপাসা একটী বড় ভাবের আলোকে একটী বলবতী অনুপ্রেরণায় সমগ্র জীবনের মধ্যে নিজের স্থান খুঁজিয়া লয়। ক্ষুদ্রের বৃহত্ব উপলব্ধি একের সহিত সমগ্রের সমন্বয়—ইহারই নাম বিকাশ। আমাদের জাতীয় জীবনের মধ্যেও আজ আমরা এই বিকাশের সাড়া পাইতেছি। আমরা আজ কেবল একটা ভাবের অনুপ্রেরণায় সংসারে বৈসাদৃশ্য ও দুঃখ যাতনাকে ভুলিয়া যাই নাই। কি উপায়ে সহস্র বেদনার মধ্যে জাতীয় আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, কিরূপে শত আবর্জ্জনা শত বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া জাতীয় জীবনকে তাহার প্রাকৃতিক গতি পথে নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে—এই চিন্তা কিছুদিন হইতে সকল চিন্তাশীল ব্যক্তির মনেই স্থান লাভ করিয়াছে। "দরিদ্রের ক্রন্দন" নামক পুস্তিকাখানি এই ভাবস্রোতের একটী আবর্ত্ত। পুস্তকখানির লেখক অর্থনীতিবিৎ। আজকাল পাশ্চাত্য জগতে যে সকল ব্যবসায় রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে বিশদ ভাবে লেখক আলোচনা করিয়াছেন। কল-কারখানা Large scale production এর সাজ সরঞ্জাম এদেশের উপযোগী নহে—তিনি আলোচনার ফলে এই মতে উপস্থিত হইয়াছেন; আমাদের দেশের ব্যবসায় Cottage industry তে আবদ্ধ রাখা আবশ্যক এই তাঁহার মত। তবে তিনি যে Large scale production এর বিরোধী তাহা নয়। যতদূর সম্ভব পারিবারিক জীবনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়-গুলিকে বিনষ্ট না করিয়া আবশ্যকমত আমাদিগকে বড় বড় ব্যবসায়ের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। তবে Industrialism ও অর্থান্বেষণ-কেই জীবনের কেন্দ্র করিয়া তুলিলে আমরা জাতীয় ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইব। জাতীয় ধর্ম্ম ও জাতীয় জীবনের আবাস পারিবারিক জীবনে। যাহাতে এই পারিবারিক জীবন ও তাহার আদর্শ কলুষিত না হয় এই ভাবেই আমাদের বৈষয়িক জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। কিন্তু পারিবারিক জীবন আমাদের দেশে আবহমান কাল হইতে পল্লীতেই শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়া আসিয়াছে। পল্লীর মধ্য দিয়াই ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। কাজেই যাহাতে মৃতপ্রায় পল্লীসমাজ পুরাতন আদর্শে আবার উজ্জীবিত হইয়া উঠে, যাহাতে পল্লীর নরনারী-গণ দুঃখ দারিদ্র্য মুক্ত হইয়া আবার সনাতন জীবন ধারায় জীবন মিশাইতে পারে, লেখক তাহারই পন্থা উদ্ভাবনে ব্রতী হইয়াছেন।

লেখকের এই ব্রতে বঙ্গদেশের সকল লোকেরই সহকর্ম্মী হওয়া উচিত। উপায় নির্দ্ধারণে যতই মতভেদ হউক, জীবনের আদর্শ নির্ণয়ে যতই বিবাদ থাকুক, লেখক যে উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছেন সে সম্বন্ধে কেহই বিরুদ্ধ মত পোষণ করিবেন না।

লেখক পল্লীসেবার বিষয়ে এত চিন্তা করিয়াছেন ও তদ্বিষয়ে এত অনুসন্ধান করিয়াছেন যে তাঁহার নিকট হইতে আমরা আরও কতকগুলি বিষয়ের আলোচনা প্রত্যাশা করি।

প্রথমতঃ প্রজাস্বত্ব বিষয়ক। "গৃহস্থের" এই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র রায় মহাশয় প্রজাদিগের যে দুঃখের বিবরণ দিয়াছেন ঐ সকল বিষয়ে আরও বহু আলোচনা হওয়া আবশ্যক। পল্লীসেবায় ব্রতী হইলে পল্লীবাসিগণ আজকাল কত বিষয়ে দুঃখ ও অপমান সহ্য করিতেছে তাহা না জানিলে সেবা কার্য্য ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা।

দ্বিতীয়তঃ আজকাল পল্লীতে পল্লীতে একটা দুর্নীতির আবহাওয়া উঠিয়াছে। পল্লীকে ধর্ম্মের নিকেতন ও সারল্যের আবাস বলিতে অনেক গ্রাম্যজীবনাভিজ্ঞ ব্যক্তিই সঙ্কুচিত হয়েন। অশিক্ষা ও কুশিক্ষার ফলে, দারিদ্র্যের তাড়নায় এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু পল্লীসেবককে এ বিষয়ে অন্ধ থাকিলে চলিবে না। যে দুর্নীতিতে পল্লীর পারিবারিক জীবনকে কলুষিত করিতেছে বলিয়া অনেকে মনে করেন, তাহার প্রকোপ কতখানি, তাহা কি কি কারণে উদ্ভূত, তাহার নিরাকরণ কি কি পন্থা অবলম্বনে সাধিত হইতে পারে সে বিষয়ে বহু অনুসন্ধান আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ পল্লীসমাজকে সভ্যতার কেন্দ্র করিতে হইলেই পল্লীতে যাহাতে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সন্তুষ্টচিত্তে জীবন-যাপনপূর্ব্বক দেশে নূতন নূতন চিন্তাজগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। প্রাচীন ভারতে সর্ব্বত্যাগী ঋষিগণ অরণ্যকেই সভ্যতার নিকেতন, দর্শনের মন্দির করিয়া তুলিয়াছিলেন। আজকাল এরূপ মুনি ঋষির নিতান্তই অভাব। কাজেই, আজকাল যাহারা চিন্তাবীর তাহাদিগকেই গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। নতুবা গ্রাম কখনই সভ্যতার কেন্দ্র হইতে পারিবে না। নগর যে আজ গ্রামকে চালন করিতেছে তাহার অর্থ ই এই যে নগর হইতে গ্রামে ভাবের প্রবাহ ছুটিয়া যাইতেছে; নগরেই সকল নূতন ভাবের মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। এখন এই সকল নূতন ভাবের ভাবুকগণ কি ভাবে গ্রাম্য জীবনে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবেন, কিরূপে জীবন যাপন করিবেন তাহার সবিশেষ আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

অন্নকাঙ্গাল

তোমরা তাহারে করিয়ো না হেলা,
আদর তাহারে করিয়ো দান,
খিদের তাড়ায় হারাল যে সব,
খিদের তাড়ায় খোয়াল মান!

শুভ্র তাহার আছিল জীবন,
গেছে কালি হয়ে খিদের চোটে,
চোর লম্পট সকলি সে আজ,
ছুনিয়ায় তার ঘর না জোটে!

বক্ষ তাহার আশার বাগান
ছিল এক কালে, আজিকে হায়!
মরুর মতন জ্বলিছে সতত,
তপ্ত নিশাস উড়িছে বায়!

গর্ব্বে তাহার ছিল শির উঁচু,
আজি সে সবার পায়ের তলে,
মারিলেও রোষ করে না কখনো,
খোসামুদী চালে সতত চলে!

দেহে বুঝি তার তপ্ত শোণিত
ঠাণ্ডা হয়েছে অনেক কাল!—
উদ্যম আর নাইরে এখন
গাঁথিতে নিত্য কর্ম্ম-জাল!

নেশায় ডুবায়ে রাখিবারে চায়
চিন্তার যত দহন জ্বালা,
মায়া মমতার শত আহ্বানে
হইবারে চায় কঠোর কালা!

তা বলে' তাহারে তুচ্ছ ক'রো না,
অন্নকাঙাল কি করে আর?
ফেলো তার তরে একটি নিশাস,
ফেলো এক ফোঁটা নয়নাসার!

শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী

প্রজার দুঃখ

বাঙ্গালায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হইবার সময় কোম্পানী মনে করিয়াছিলেন বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হইলে জমিদার প্রজার প্রতি সহানুভূতি দেখাইবে। প্রজারও খাজনা নির্দ্দিষ্ট হইলে প্রজা নিজের জমী মনে করিয়া উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিবে। আইন প্রচলিত হইলে বহুকাল পরে গভর্ণমেণ্ট দেখিলেন জমিদার প্রজাকে করতলগত করিয়া নানা প্রকারে অর্থ আদায় করিতেছে, প্রজার দুঃখের অন্ত নাই। ১৮৮৫ সালে তাই প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন পাশ হইল। অত্যাচার কিছু কমিল কিন্তু প্রজা নিশ্চিন্ত হইল না। কারণ জমীদার আইন না মানিয়া টাকা আদায় করিলে প্রজাকে আদালতে যাইয়া নালিশ করিতে হইবে। তাহাতেও টাকা খরচ, বিচার-ফল অজ্ঞাত। আর জলে থাকিয়া কুম্ভীরের সহিত বিবাদ করা প্রজার পক্ষে কিরূপ কল্যাণকর তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। এ সকল কষ্ট প্রজার সহিয়া গিয়াছে। কিন্তু দুই প্রকারের কষ্টে প্রজা "ত্রাহি মাম্ মধুসূদন" রবে চীৎকার করিতেছে। জানি না তাহাদের নীরব ক্রন্দন যথাস্থানে পৌছিবে কি না। রাজার নিকট জমীদারের দুঃখ কাহিনী জানাইবার জন্য জমীদার সভা আছে। কিন্তু প্রজার দুঃখ জানাইবার কোন সভাসমিতি তো নাই সংবাদপত্রেও তাহাদের দুঃখ নিবারণের জন্য যথারীতি আন্দোলন হয় না। আজ তাই প্রজার পক্ষ হইতে দু একটি কথা বলিব।

যেদিন পত্তনি প্রথার প্রথম প্রচলন হয় সেই দিনই প্রজার দুঃখের বিষবৃক্ষ জন্ম লইয়াছিল। প্রজা এখন সেই বিষবৃক্ষের ফল ভোজন করিতেছে। যে সকল পুরাতন জমীদার জমীদারি স্বত্ব রাখিতে পারিয়াছেন তাঁহাদের প্রজার কোন দুঃখ নাই। কেন না তাঁহারা হিসাব করিয়া দেখেন কেহ ১০০০৲ টাকা রাজস্ব প্রদান করিয়া খরচ খরচা বাদে কেহ ১০০০৲ কেহ ২০০০৲ কেহ বা ততোধিক টাকা বাঁচান ইহাই তাঁহাদের মুনফা। কাজেই তাঁহাদের অসন্তোষের বড় কারণ থাকে না। এতদ্ভিন্ন উৎপন্ন ফসলের মূল্য বৃদ্ধির সহিত প্রজাও কোথাও কোথাও বিনা ওজর আপত্তিতে সামান্য বর্দ্ধিত হারে খাজনা দিয়া থাকে। এরূপ জমিদারি পত্তনি বিলি হইলে পত্তনিদার জমীদারকে যৎকিঞ্চিৎ সেলামী দিয়া থাকেন। এই সেলামীর টাকাটা সময়ে সময়ে বড়ই বাড়িয়া উঠে। মোট হস্তবুদের টাকা হইতে শতকরা ১০৲ হিসাবে যে সরঞ্জামী খরচ বাদ দেওয়া হইয়া থাকে অনেক সময় তাহাতে খরচ কুলায় না। কাজেই পত্তনিদারকে আয়ের আইনসঙ্গত পন্থা আবিষ্কার করিতে হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার জনৈক নূতন পত্তনীদার যেরূপে এই আয়ের পন্থা বাহির করিয়াছিলেন তাহাই নিম্নে যথাযথ বর্ণনা করিতেছি।

সকলেই জানেন খিরাজী জমির প্রধানতঃ দুই প্রকার স্বত্ব। এক মৌরসী স্বত্ব আর এক অধিকারের স্বত্ব। প্রথমোক্ত স্বত্ব

হস্তান্তর ও দান বিক্রয় করা যাইতে পারে। ২য় প্রকারের স্বত্ব উত্তরাধিকারী ভোগদখল করিতে পারিবে কিন্তু দান বিক্রয় করিতে পারে না। প্রজা যদি কবুলতি দিয়া জমীদারের নিকট জমী লইয়া বা অন্য কোন প্রকারে ১২ বৎসরের অধিককাল ভোগ দখল করিতে পারে তাহা হইলে ২য় প্রকারের স্বত্ব জন্মে। জমীদার এরূপ প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে পারেন না। আর প্রজা যদি চেক দেখাইয়া প্রমাণ করিতে পারে যে সে ২০ বৎসরের অধিককাল বর্দ্ধিতহারে খাজনা না দিয়া এক খাজনা দিয়া আসিতেছে তাহা হইলে তাহার খাজনাও বাড়িতে পারে না তদ্ভিন্ন হস্তান্তর করিবার অধিকার আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। কিন্তু জমীতে প্রজার কোন প্রকারের স্বত্ব আছে ইহা লইয়া জমীদারের সহিত প্রজার মোকর্দ্দমা হইলে প্রজা এতদিনের চেক বাহির করিতে পারে না। কারণ যাহাদের সেরূপ স্বত্ব আছে তাহারা কোনদিনই ভাবে নাই যে জমীদারের সহিত এই বিষয় লইয়া বুঝাপড়া করিতে হইবে। অশিক্ষিত বাঙ্গালী প্রজার নিকট এরূপ দূরদর্শিতা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। কাজেই পত্তনীদার ধরিয়া লইয়া থাকেন তাঁহার জমীদারীর মধ্যে এরূপ স্বত্বের জমী একেবারেই নাই।

যখন ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হয় তখন বিষয়টা ছিল কি না ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু কিছুদিন হইতে জমীদার বলিতেছেন "আমার বিনা অনুমতিতে প্রজা তাহার কোন জমা হস্তান্তর করিতে পারিবে না। যদি কোথাও চৌথ দিবার প্রথা থাকে তাহা হইলে বিক্রেয় জমীর মূল্যের চৌথ অর্থাৎ সিকি টাকা আমাকে দিলে আমার খুসী হয় প্রজাকে বিক্রয়ের অনুমতি দিতে পারি। আমার বিনা অনুমতিতে জমী বিক্রয় করিলে খরিদদারকে আমি প্রজা বলিয়া স্বীকার করিব না তাহাকে যেদিন ইচ্ছা উচ্ছেদ করিয়া দিব।" ইহার ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা পরে করিতেছি।

যে জমীদারীর কথা বলিতেছি সেখানে পুরাতন জমীদারের সদর কাছারীতে জমীদারকে ২।১৲ টাকা নজর দিয়া নায়েব মহাশয়ের প্রণামীস্বরূপ কিছু দিলেই নাম খারিজ হইত। জমীদারের নিকট কোন প্রকার আবেদন করিতে গেলেই এইরূপ নজর দিবার প্রথা ছিল। জমীদার জমীদারীতে পদার্পণ করিলে প্রজারা জমীদারের সাক্ষাৎ করিতে যাইত তখনও নজর দিত। সুতরাং নাম খারিজের জন্য যে নজর দেওয়া হইত তাহা নাম খারিজের মূল্য নহে। কিন্তু কোথাও কোথাও এই নজর পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সেলামী আখ্যা পাইয়াছে। যাহা হউক এই জমীদারীর প্রজারা স্মরণাতীতকাল হইতে তাহাদের জোতজমা বিক্রয় করিয়া আসিতেছিল। নাম খারিজের জন্য কেহ ভাবিতও না। বিক্রেতার নামেই জমা লেখা থাকিত। ক্রেতার গুজরতে খাজনা জমা হইত। পুরাতন জমীদার একদিনের জন্যেও উচ্ছেদের কথা তুলেন নাই।

নূতন পত্তনীদার পুরাতন গোমস্তার নিকট এই সকল বহুকালের হস্তান্তরিত জোত জমার সংবাদ লইয়া একজন প্রজার উপর উচ্ছেদের নালিশ করিলেন। প্রজা পুরাতন প্রথা সপ্রমাণ করিবার জন্য সাক্ষী জোগাড় করিতে লাগিল, পত্তনীদার মাতব্বর সাক্ষীদিগকে বলিলেন "আপনারা সাক্ষী দিবেন না, আপনাদের জমা বাড়াইব না, আপনাদিগকে কোন জমী হইতে

উচ্ছেদ করিব না।” সাক্ষী ভাঙ্গিয়া গেল। প্রজা বাধ্য হইয়া সিকি টাকা সেলামী ও বর্দ্ধিতহারে খাজনা দিয়া রেহাই পাইল। কেন না এই সময়ে বহু নজীর বাহির হইল, সিকি টাকা পণ দিয়া হস্তান্তরের পর নাম খারিজ করিবার প্রথা কোথাও সপ্রমাণ হইল না। বিচারপতিরা সর্ব্বত্র জমীদারের পক্ষে উচ্ছেদের ডিগ্রী দিলেন। একজন প্রজা দায়ে পড়িয়া মিটমাট্‌ করিবার পর সকলেই উচ্ছেদের ভয়ে সেলামী ও বর্দ্ধিত হারে খাজনা দিয়া নিষ্কৃতি পাইল। পত্তনীদার যত টাকা সেলামী দিয়া পত্তনী স্বত্ব বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া ছিলেন প্রজার নিকট তাহা অপেক্ষা অধিক টাকা আদায় করিয়া হস্তবুদ বাড়াইয়া জমীদারী দরপত্তনী দিলেন। নিজের বেশ দুপয়সা লাভ রাখিলেন বলাই বাহুল্য। এক মুর্শিদাবাদে একটা ডিহিতে যেরূপ কাণ্ড হইয়াছে জানিনা সমস্ত বাঙ্গালা দেশে সেইরূপ কত স্থানে প্রজাপীড়ন চলিতেছে।

এইবার দ্বিতীয় প্রকারের প্রজা পীড়নের কথা বলিব। কোন জমী বাকী খাজনার ডিক্রিতে নীলাম হইলে নীলাম খরিদদারকে প্রজা বলিয়া স্বীকার করিতে জমীদার বাধ্য কিন্তু অন্য কোন ডিক্রির নীলামের খরিদদারকে জমীদার প্রজা বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য নহেন। এখন প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনে আছে বাকী খাজনার ডিক্রির জন্য প্রজার যে কোন জমা নীলামে বিক্রীত হইতে পারে। যে জমীর জন্য খাজানা বাকী পড়িয়াছে সেই জমী প্রথমে নীলামে বিক্রীত হইলে যদি ডিক্রির সমস্ত টাকা আদায় না হয় তাহা হইলে তাহার অন্য সম্পত্তিও নীলামে বিক্রীত হইতে পারে আইনে এইরূপ বিধান থাকিলেই ন্যায়সঙ্গত হইত। রাম যদুর ৫টা জমার মধ্যে একটা জমা খতের দেনার ডিক্রীর নীলামে অথবা যদুর নিকট হইতে খরিদ করিলেন। দেশের প্রথা অনুযায়ী নাম খারিজ করিতে রাম বিলম্ব করিলেন খাজনাও বাকী ফেলিলেন। জমীদার বাকী খাজনার দায়ে রামের জমী নীলামে না চড়াইয়া যদুর ৪টা জমার মধ্যে ২।১ টা জমা নীলামে চড়াইলেন। যদু দায়ে পড়িয়া ডিক্রির টাকা দাখিল করিলেন। রাম নির্ব্বিবাদে ক্রীত জমা ভোগ করিতে লাগিলেন। যদুর সাধ্য থাকে নালিশ করিয়া রামের নিকট হইতে এ আদায় করিতে পারেন। আপাততঃ কিন্তু তাহাকে ঘর হইতে নগদ টাকা বাহির করিতে হইল এ আইন কি সঙ্গত ?

জমীদারের বিনা অনুমতিতে কিম্বা প্রথা প্রচলিত থাকিলে চৌথ বা সিকিটাকা সেলামী না দিয়া জোত জমা হস্তান্তর করিতে পারিবে না এইরূপ নজীর বাহির হওয়াতে প্রজার কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে এইবার তাহাই দেখাইব। বাঙ্গলা দেশে “সম্পত্তি” বলিতে মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে জোত জমাই বুঝাইত। এই আইনে সম্পত্তি বলিয়া কিছু আর থাকিল না। প্রজা তাহার জমী বিক্রয় করিতে পারিবে না। যদি জমীদার সিকি টাকা সেলামী লইয়া হস্তান্তরের অনুমতি দেন তথাপি এই সিকী টাকা ও কর্ম্মচারীদিগের দস্তরী যোগাইতে অর্দ্ধেক টাকা চলিয়া যাইবে, কেননা কর্ম্মচারী বেশী টাকা না পাইলে জমীদারের নিকট রিপোর্ট করিবেন “ক্রেতা ৫০০৲ টাকায় জমী খরিদ করিয়াছে কিন্তু চৌথের পরিমাণ কমাইবার জন্য খতে ৩০০৲ টাকা লিখাইয়াছে।” আর সেখানে সিকি টাকা দিবার প্রথা নাই সেখানে জমীদারের অনুমতি লাভ

করা একেবারে অসম্ভব। জমিদার বলিবেন "তুমি জমী ছাড়িয়া দাও, আমি অন্য প্রজাকে বিলি করিব। আমি তোমাকে বিক্রয় করিতে দিব না।"

সম্পত্তি বিক্রয় সম্বন্ধে তো এইরূপ ব্যাপার, বন্ধক দেওয়া সম্বন্ধেও সেই বিপদ। উত্তমর্ণ বলিবে "আমি তোমাকে টাকা ধার দিয়া ফিরিয়া পাইব কেমন করিয়া? নীলাম করিতে গেলে তুমি তো জবাব দিয়া বসিবে 'এ জমীতে হস্তান্তর যোগ্য কোন স্বত্ব আমার নাই।' তুমি যদি সেরূপ জবাব নাই দাও তোমার জমীদার যে নীলাম খরিদদারকে প্রজা বলিয়া স্বীকার করিবে না সুতরাং নীলাম খরিদদার পাইব কোথায়?"

ফল এই হইয়াছে বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত প্রজা এতদিন যাহাকে সম্পত্তি বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছে আজ দেখিতেছে তাহা সম্পত্তি নহে। সহর বাজারে দোকান বা ভাড়ার ঘর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হয় কি? পল্লীতে আর কিছু সম্পত্তি বলিয়া থাকিল না। টাকা সুদে খাটাইবার তিন প্রকার পন্থা ছিল। অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া, জমী বন্ধক রাখিয়া ও শুধু হাতে। শেষ প্রকারে টাকা ডুবিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। ২য় প্রকারের উপায় তো বন্ধ হইল। থাকিল কেবল প্রথম উপায়। সামান্য পুঁজির লোকে যৌথ কারবারের অংশ কিনিয়া বা কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া কি আয় করিবে? বাঙ্গালার মধ্যবিত্ত প্রজার টাকা খাটাইবার উপায় আর থাকিল না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমস্ত সুবিধা ভোগ করিবে জমীদার, অথচ জমীর প্রকৃত মালিক প্রজা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমস্ত সুবিধা হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

পঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশে গবর্ণমেণ্ট রিপোর্ট পাইলেন মহাজনের সুদের অত্যধিক হারে প্রজা বড় বিপদে পড়িয়াছে তাহার জমীজমা নীলাম হইয়া যাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট আইন করিতে চাহিলেন প্রজা জমী পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে ভোগ দখল করিতে পারিবে কিন্তু বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারিবে না। গবর্ণমেণ্ট সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া প্রজাকে অত্যধিক সুদ ও তজ্জনিত মহাজনের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে চাহিয়া ছিলেন। কিন্তু আপত্তি হইল। ইহাতে প্রজার কষ্ট বৃদ্ধি পাইবে। অজন্মার বৎসর মহাজনের নিকট অত্যধিক সুদে টাকা লইয়া ফসল হইলে প্রজা শোধ দিতে পারে। বিবাহে বা শ্রাদ্ধে অর্থের প্রয়োজন হইলেও বেশী সুদেই হউক বা অল্প সুদেই হোক প্রজা এখন মহাজনের নিকট টাকা পায়। সময়ে কেহ কেহ শোধও করে। কিন্তু মহাজন যদি জানে যে জমী বিক্রয় করিয়া সে টাকা আদায় করিতে পারিবে না তাহা হইলে হয় সে টাকা ধার দিবে না, নয় টাকা ডুবিয়া যাইবার আশঙ্কা আছে বলিয়া বেশী সুদ চাহিবে। কাজেই ইহাতে প্রজার কষ্ট বাড়িবে। শুনিয়াছি এ প্রদেশে এরূপ আইন বিধিবদ্ধ হয় নাই। কিন্তু বাঙ্গলায় আইনের ধারায় একটু সামান্য পরিবর্ত্তনে প্রজার সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

শ্রীরাখালরাজ রায়

ভক্তি-পুষ্প

"অনাঘ্রাত ফুল চাহিগো আজিকে
মায়ের পূজার তরে"—
বলিয়া নৃপতি পাঠাল তখন
চারিদিকে অনুচরে।

নানা দিক খুঁজি হতাশ হইয়া
ফিরিয়া আসিল সবে,
বেলা দ্বিপ্রহর, পূজার সময়
অতীত হয়েছে তবে!

ক্ষুণ্ণচিত রাজা জিজ্ঞাসে তখন,
"কয়টি এনেছ ফুল?"
সবিনয়ে সবে কহিল, "হে প্রভু,
হয়েছে মোদের ভুল,—

যেখানে যে ফুল পেয়েছি দেখিতে,
দেখেছি তথায় হায়,
মধুপান করি অলিদল যত
গুঞ্জরিয়া চলি যায়!

বুঝিনি ত আগে অনাঘ্রাত ফুল
পাইব কেমন করে'?
বড় অপরাধ হয়েছে, রাজন,
ক্ষমা চাই যোড় করে।

ভকতি রয়েছে হৃদয়ে মোদের,
কুসুম তাহারে কয়,
অনাঘ্রাত সেই, দিতে পারি তারে,
অনুমতি যদি হয়!"

হাসিয়া নৃপতি বলিল তখন,
"অইত আমার চাই,
মায়েরে পূজিতে উহা ছাড়া আর
পবিত্র কুসুম নাই!"

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ

সাগরের ডাক

(নাটক)

ক

উল্টাডাঙা—গলি

বঙ্কিম। অত চুপচাপ কেন, মধু?

মধু। চুপচাপই আজ ভাল লাগ্‌ছে।

বঙ্কিম। এতদিন ত লাগেনি। আজ কেন?

মধু। চিরদিন কি একভাবেই যায়?

বঙ্কিম। তা যায় না বটে। কিন্তু অভ্যাস বলে' ত একটা জিনিষ আছে। তা হঠাৎ বদলায় কি? ছোটবেলা থেকেই তোমাকে দেখে আস্‌ছি—এমনতর ত কোনদিন দেখিনি; এমন তুমি হ'তে পার, তাও ত আমার ধারণা ছিল না। আজ তোমার হয়েছে কি?

মধু। কি হয়েছে, তা আমি নিজেই এখনো ধর্‌তে পারিনি। তবে আজ কারু সঙ্গ ভাল লাগ্‌ছে না, এটা বুঝ্‌তে পার্‌ছি।

বঙ্কিম। কি হয়েছে, তাও টের পাওনি, অথচ কারু সঙ্গও ভাল লাগ্‌ছে না! কোন নতুন রোগের সৃষ্টি হল না কি? না, ভাই, খুলে বল, ব্যাপার খানা কি। তুমি নিশ্চিত আমায় গোপন কর্‌ছ।

মধু। গোপন ঠিক নয়, বঙ্কিম। মনের মধ্যে কখনও এক একটা ভাব জাগে, যা এত ধোঁয়াটে যে নিজের কাছেই তার ঠিক মূর্ত্তিটা ধরা পড়ে না, এমন কি তার কারণটাও অস্পষ্ট থেকে যায়।

বঙ্কিম। তোমার ভাবান্তরের কারণটা কি, শুন্‌তে পারি? না, তাও টের পাও নি?

মধু। কি হবে শুনে?

বঙ্কিম। শুন্‌লে কি দোষ?

মধু। শুন্‌লে তুমি ঠাট্টা কর্‌বে।

বঙ্কিম। কেন, ঠাট্টাই কি আমার ব্যবসা?

মধু। শুন্‌বে?

বঙ্কিম। নইলে এত বক্তৃতা কর্‌ছি কি জন্যে?

মধু। যথার্থই শুন্‌বে?

বঙ্কিম। হাঁ গো হাঁ।

মধু। কাল বিকেলে একটা পথিক গান করে' যাচ্ছিল।

বঙ্কিম। তাই কি?

মধু। তার গান্‌টা বড় মিঠে—গলাটাও ভারী মিষ্টি।

বঙ্কিম। কিসের গান?

মধু। সাগরের।

বঙ্কিম। এই শুক্‌নো ডাঙার রাজ্যে সাগরের গান ত বিস্তর শোনা গেছে—সেটায় আর নূতনত্ব কি?

মধু। নূতনত্ব?—হাঁ, তা আছে বই কি। চিরপুরাতনই যে নতুন হয়ে মাঝে মাঝে আমাদের সাম্‌নে দাঁড়ায়! শুভ মুহূর্ত্তের অপেক্ষায় সে বসে' থাকে।

আচ্ছা, ভাই, তোমার কি সাগর দেখ্‌তে ইচ্ছে করে না?

বঙ্কিম। না, অমন ইচ্ছেকে আমি ক্ষ্যাপামির মধ্যেই গণনা করি। তার চেয়ে কিসে দু' পয়সা আসে, তার উপায় চিন্তা করলে কায দেয়। সাগর দেখে আমার লাভ?—অন্নের সংস্থান হবে?—সংসার চল্‌বে? এ ডাঙার দেশ, এখানে হাঁট্‌তে হবে, ফির্‌তে হবে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাট্‌তে হবে। এখানে সাগরের কোন প্রয়োজন নেই—এখানে তার কথাটা পর্য্যন্ত অলসের স্বপন ছাড়া আর কিছুই নয়।

মধু। তাইত, তুমি প্রয়োজনের নিক্তিতে সব ওজন করে' বেড়াচ্ছ! তুমি আমার ভাবটা বুঝ্‌বে না, কেন না তার প্রয়োজনটা তোমায় আমি এখন ভাল করে' বুঝিয়ে দিতে পারব না।

বঙ্কিম। বিলক্ষণ বুঝ্‌তে পেরেছি। তোমার কাছে ধোঁয়াটে হলেও তোমার ভাবটা আমার কাছে আর ধোঁয়াটে নয়। তুমি সাগরের গান শুনে' সাগর দেখবার জন্যে পাগল হতে চলেছ—ঐ যা অনেকেই হয়েছেন। সংসারটা মাটি করবে দেখ্‌ছি। তোমাকে বুদ্ধিমান বলে' আমার ধারণা ছিল। সে ধারণাটা বদ্‌লিয়ে দাও কেন?

মধু। না, আর কথা নয়। তোমার যা বল্‌বার বলে গেলে,এখন কায থাকে, সরে' পড়তে পার। কেযো লোক,—সময় নষ্ট করবে কেন?

বঙ্কিম। তা ঠিক বলেছ। ক্ষ্যাপার সঙ্গে বেশীক্ষণ থাকলে কায নষ্ট হবারই কথা। আমি যাচ্ছি, কিন্তু যাবার আগে একটা কথা বলে' যাই,—মনে রেখো। লেখা পড়া শিখেছ, বুদ্ধিও আছে, সে গুলোকে অপব্যয় ক'রো না। একটা খেয়ালের ঝোঁকে ঘুরে মরবার কোনই আবশ্যকতা নেই। সাগর আছে কি না আছে, কোথায় আছে, দেখ্‌তে কেমন—এ সব বাজে বিষয় ভেবে সাংসারটা অধঃপাতে দিয়ো না। সংসারটাই সত্য—তার উন্নতির জন্যেই চেষ্টা কর। যেটা থাকা না থাকা উভয়ই সমান—যেটা কোন দরকারেই লাগ্‌বে না, তার জন্যে জীবনপাত করা মানুষের ধর্ম্ম নয়।

(প্রস্থান)

মধু। কি উৎপাত! বেশ চুপচাপ ছিলাম, মনের এককোণে একটা আনন্দের আভাস জাগ্‌ছিল। হঠাৎ দম্‌কা হাওয়ায় বুঝি সব ছিনিয়ে নিয়ে গেল রে!

সত্যি কি?—এই উল্টাডাঙায় ওঠা বসা, খাওয়া দাওয়া, নাওয়া পরার মধ্যে ডুবে থাকাই জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য, একমাত্র লক্ষ্য? তা ছাড়া আর সব বাজে? সাগর এখানে মিথ্যা? তার কথা বলাও পাগলের প্রলাপ? তবে সাগরের দিকে এত লোক ছুটবার কথা শুনতে পাই কেন? বাড়ীঘর বিকিয়ে দিয়ে, ধনদৌলত পায়ে ঠেলে কত লোক ত আজও ছুট্‌ছে। কোন্‌টা সত্য?—সাগর, না ধনদৌলত? পাগল কারা?—যারা ছুট্‌ছে, তারা? না, যারা এই সব আঁকড়ে ধরে' পড়ে আছে, তারা?

ঐ যে নিবারণ দা আসছেন। দেখি, উনি কি বলেন।

[নিবারণের প্রবেশ]

নিবারণ। কিহে মধু, কি করছ এখানে?

মধু। কিছু না।

নিবারণ। এমন সময়টা কিছু না করে' কাটিয়ে দিচ্ছ?

মধু। কি করব, নিবারণ দা?

নিবারণ। এই যা কিছু নিয়ে একটু আমোদ।

মধু। সেটা কি একটা কায হবে?

নিবারণ। আমোদই ত দুনিয়ায় কায হে। তাছাড়া আর যা কিছু, সবই ত খাটুনি—ওতে তোমার নিবারণ দা নেই। চল, আড্ডায় চল, একটা কিছু খেলা যাবে।

মধু। না, নিবারণ দা, আজ মাপ কর্‌তে হবে।

নিবারণ। সে কি? মুখখানা অত গম্ভীর কেন? কি ভাব্‌ছ? আরে ভাবাটাও যে মস্ত একটা খাটুনি! ছি! ছি! শরীর নষ্ট কর্‌তে আছে? তার চেয়েও মূল্যবান সময় নষ্ট কর্‌তে আছে? দু দণ্ডের জীবন বইত নয়! আমোদ কর আমোদ —কর।

গান

(পিলু—যৎ)

নিমেষ তরে রসের বাটি
সাম্‌নে শুধু পাই,
ফেল্‌ব তারে কেমন করে',—
চাইব কারে ভাই?
থাক্‌রে গভীর তত্ত্ব-কথা,
থাক্‌রে কাযের মস্ত ব্যথা—
জীবনটারে পণ্ড করা
সাধ্য মম নাই।
ঐ রসটা আমার সত্যি জেনে,
ভয়-ভাবনায় তুড়ি হেনে,
চুমুক দিব—নিমেষ যাবে—
রইবে পড়ে' ছাই!

কি গো, পেচক বাহাদুর, মনে লাগ্‌ল? আঁখি ত মুদ্‌তেই হবে, আর মুদ্‌লেই সব অন্ধকার, তখন আগে থাক্‌তে মুদে লাভ কি? না, বাজে বক্‌বার সময় নেই। যাবে কি না বল?

মধু। না।

নিবারণ। তবে থাক পড়ে' অন্ধকারে। সুখে থাক্‌তে ভূতে কিলোয় আমি চ'ল্লাম।

মধু। শোন।

নিবারণ। কি?

মধু। আচ্ছা, তোমার কখনও কি কোন ভাবনা আসে না?

নিবারণ। না।

মধু। এ হ'তেই পারে না।

নিবারণ। তবে আসে!

মধু। না, না সত্যি বল।

নিবারণ। আসে,—যখন আমোদের বিঘ্ন জোটে।

মধু। তবে?

নিবারণ। তবে কি হে? আমি কি তাতে ডরাই? নতুন আমোদ সৃষ্টি কর্‌তে আমার কণামাত্রও বিলম্ব হয় না।

মধু। তুমি কেবল আমোদই চাও, নিবারণ দা।

নিবারণ। ঠিক বুঝেছ। আমোদই চাই।

মধু। তবে নতুন একটা আমোদ কর না।

নিবারণ। কি?

মধু। তুমি হাস্‌বে।

নিবারণ। বল না কি?

মধু। সাগর দেখ্‌বার—

নিবারণ। না—না, ওটা একেবারেই আমোদ নয়—বরং তার উল্টো। হাতের কাছে যা পাই, তাই নিয়েই আমার আমোদ। দূরের জিনিষে—অজানার রাজ্যে পা বাড়াবার সখ আমার কিছুমাত্র নেই।

মধু। তবে যাও।

নিবারণ। যাচ্ছি। কিন্তু এই সখটার জন্যেই কি তুমি মুখ ভার করে' রয়েছ?—ওটা ত সাগর দেখ্‌বার সখ নয়, জীবনটা তাড়াতাড়ি নষ্ট করবার সখ! দুদণ্ডকে একদণ্ডে নিয়ে যেতে আমোদ পাও, কর। কিন্তু আমি তা কর্‌তে পারব না। যাই—পালাই।

(সহসা তুড়ি দিয়া শীস দিতে দিতে প্রস্থান)

মধু। সাগরকে তবে কি কেউ চায় না? তাকে চাওয়াটাই মস্ত একটা ব্যর্থতা?

[গান করিতে করিতে ফুল দূর্ব্বা লইয়া কতকগুলি বালিকার প্রবেশ]

গান

পুণ্যিপুকুর করবি কেগো
চল্ লো ত্বরা চল্।
শুক্‌নো ডাঙা ভিজিয়ে দিব
এনে সাগর-জল।
বোশেখ মাসের দারুণ খরায়,
ছাতি সবার ফাট্‌ছে তিষায়
আগুন হাওয়া হল্‌কা হেনে
বইছে অবিরল!
চল্‌লো ত্বরা চল্।
"সাগর—সাগর" ডাক্‌লে পরে,
বান ডাকিবে শুক্‌নো সরে,
মরা নদী ছুট্‌বে ভরা,
মিল্‌বে হাতে ফল।
চল্‌লো ত্বরা চল্।

মধু। কিগো, বাছারা—তোমরা পুণ্যিপুকুর কর্‌তে চলেছ? কেমন করে' কর্‌বে?

একজন। সে কি গো!—তুমি পুণ্যিপুকুর দেখনি?

মধু। না।

একজন। তোমাদের বাড়ীতে বুঝি মেয়েছেলে নেই?

মধু। আছে।

একজন। তারা করে না?

মধু। না।

একজন। বা—রে—বা! পুণ্যিপুকুর করে না! শুন্‌ছিস লা?—কেমন ধারা মেয়ে!

মধু। বল—কেমন করে' কর্‌বে?

একজন। এই—খানিকটা মাটি খুঁড়ে' ছোট্ট একটা পুকুর কাটব—একহাত লম্বা, একহাত চওড়া। তার বেশী বা কম হওয়া দোষের। তাতে জল ঢেলে ফুল ডুবো দিয়ে পূজো কর্‌ব। দক্ষিণ মুখো হয়ে' পূজো কর্‌তে হয়,—সকলে মিলে এক সঙ্গে।

মধু। তারপর?

একজন। তারপর সকলে সেই জলে হাত দিয়ে বল্‌ব—

"পুণ্যিপুকুর-জল—
পুণ্যিসাগর-জল,
এই জলে আজ ঠাণ্ডা হবে
তপ্ত ধরাতল!—
টিপ্ টিপ্ টিপ্"

তিনবার বলে' গড় করলেই পূজো সাঙ্গ হলো।

মধু। বেশ ত পূজো! একবার দেখ্‌তে যাব। কোথায় হবে?

একজন। গণ্ডীপাড়ায়।

মধু। আচ্ছা, তোমরা এস।

[বালিকাদের প্রস্থান]

পুণ্যিপুকুর করে' এরা সাগরকে ডাক্‌ছে—ভাব্‌ছে পুণ্যিপুকুরের জলেই সাগর জলের আবির্ভাব হবে! কি সরল বিশ্বাস! ঐ বিশ্বাসেই ওদের পুণ্যি, ঐ বিশ্বাসেই ওদের আনন্দ! কতকাল ধরে' এই ব্রতটা চলে' আস্‌ছে, কিন্তু আজও কেউ সাগর-জলের দেখা পেল না। কে এই ব্রতটা উদ্‌যাপন করে' গেছে? সে কি সাগরের সন্ধান পেয়েছিল? সে কি সাগর দেখেছিল? না, মিথ্যা একটা কল্পনা দিয়ে এদের আনন্দ দেবার ব্যবস্থা করে' গেছে? মিথ্যাই যদি হয়, তবে আজও সে মিথ্যা ধরা পড়্‌ল না কেন?—এমন ব্যর্থ বিশ্বাস এরা হারাল না কেন? না—না, সাগর আছে। নইলে প্রাণ তাকে দেখ্‌তে চায় কেন?

সাগর—সাগর, তুমি নাই? থাক্‌লে, কোথায় আছ? আমি তোমায় দেখ্‌ব। দেখ্‌তে কি পাব না?

গান
বেহাগ

ধূলায় ধাঁধে নয়ন,
(আমার) পথে আঁধার ছায়—
দেখ্‌তে যারে চাহি,
তারে দেখাই হ'ল দায়!
নানান্ জনের কথা ঘেঁটে,
দিবস আমার যাচ্ছে কেটে,
ডাঙার দেশে
কেউ বলে না
সাগর কোথা—হায়!
জানে কি কেউ তাহার কথা?
পায় না কি কেউ গভীর ব্যথা?
হয় না কি প্রাণ
ব্যাকুল কারু
দরশ-লালসায়?

—*—

খ

উল্টাডাঙা—গণ্ডীপাড়া

অচলদেব। কাযটা ভাল কর্‌ছ না, চঞ্চলকুমার।

চঞ্চলকুমার। মন্দই যে কর্‌ছি, তার প্রমাণ কি?

অচলদেব। মন্দ নয়?—বাপদাদারা যা করে' গেছেন, তা না করা মন্দ নয়?

চঞ্চলকুমার। আপনারাই কি তা কর্‌ছেন?

অচলদেব। করছিই ত মনে হয়।

চঞ্চলকুমার। শোওয়া বসা, ওঠা নামা, খাওয়া পরা, চলা ফেরা, আদব কায়দা সবই কি ঠিক আছে? সময়-গুণে, সুযোগ বুঝে অনেক জিনিষ কি আপনাদের বদলাতে হয় নি?

অচলদেব। তা কিছু কিছু বদ্‌লালেও মূলে আমাদের ঠিক আছে। তোমরা যে মূলপর্য্যন্ত উল্‌টিয়ে দিচ্ছ!

চঞ্চলকুমার। কোন্‌টা মূল আপনাদের?

অচলদেব। ঐ ত—তা পর্য্যন্ত তোমাদের জানা নেই! বলি, দেবাক্ষর পড়্‌তে পার?

চঞ্চলকুমার। তার সঙ্গে মূলের কি সম্পর্ক?

অচলদেব। তা পরে হবে। বল, দেবাক্ষর পড়্‌তে পার কি না।

চঞ্চলকুমার। দেবাক্ষর আবার কোন্‌গুলো?

অচলদেব। তা-ও জান না? ওঃ—কপাল!

চঞ্চলকুমার। জানি খুব ভালই। কিন্তু আমি দেবাক্ষর বলি না। দেব দেবী আবার কি? যত সব ছাই ভস্ম! নরাক্ষর বলুন, মান্‌তে রাজী আছি।

অচলদেব। পাষণ্ড নাস্তিক কোথাকার! তোর মুখ দেখ্‌লেও অশুচি হয়। তুই এতদূর গোল্লায় গিয়েছিস্ তা'ত জানতাম না। ঐ নবীন দেড়েই তোর মাথাটা খেয়েছে, দেখ্‌ছি। দেবদেবী মান না এতখানি অহঙ্কার? রোস্, শীগ্‌গিরই টের্‌টা পাবে।

চঞ্চলকুমার। সেই টের্‌টা পাওয়ার জন্যেই ত ঘুরে বেড়াচ্ছি। তাঁরা থাকেন ত বেশ সাম্‌নাসাম্‌নি এসে দাঁড়ান না, লড়াই করে' তাঁদের দেবত্বের পরিচয়টা নি! শুধু নাম শুনে কি আর ভয় করা চলে?

তা যা'ক। এখন কোন্‌টা মূল আপনাদের, বলুন, দেখি।

অচলদেব। তোর সঙ্গে বাক্যালাপ করাও পাপ।

চঞ্চলকুমার। দশবার আচমন করলেই তা খণ্ডে যাবে! কেমন, পুঁথিতেও ত তাই লেখে?

অচলদেব। হুঁ, আবার ঠাট্টা হচ্ছে? আজ থাকৃত সমাজের শাসনদণ্ড হাতে, তাহলে বুঝিয়ে দিতাম বেয়াদবির মজা।

চঞ্চলকুমার। দণ্ডটা দোর্দ্দণ্ড ভাবে ব্যবহার করাতেই আজ হাত থেকে খ'সে পড়ে গেছে। শূন্য হাত আর শূন্যে ঠুকিয়ে মরেন কেন?

এখন বলুন, মূলের কথাটা।

অচলদেব। আজ এমন শুভদিনটা মাটি হল, দেখ্ছি। কি কুক্ষণেই ভোর হয়েছিল!

চঞ্চলকুমার। মূল বুঝি আদপেই জানা নেই—তাই অত রাগ রঙ্গ!

অচলদেব। বেণাবনে মুক্তো ছড়িয়ে লাভ? অমন বিধর্ম্মী যারা, তারা তার এক বর্ণও বুঝ্তে পারবে না।

চঞ্চলকুমার। বলে'ই দেখুন বুঝতে পারি কি না।

অচলদেব। হাজার জন্ম সাধনা কর, তারপর বুঝ্তে আসিস্। সোজা কথা কি না? এক বিন্দু শ্রদ্ধা নেই—অমনি শুনলেই হল? ন দেয়ং শ্রদ্ধাহীনায়—যা, তোকে কিচ্ছু বল্‌ব না।

চঞ্চলকুমার। তবে শোন্‌বার সম্ভাবনা নেই?

অচলদেব। না।

চঞ্চলকুমার। বেশ। তবে আসি। নমস্কার, ঠাকুর মশাই।

(হাসিতে হাসিতে প্রস্থান)

অচলদেব। বাঁচা গেল। কিছু দেখ্বে না, শুন্‌বে না, মান্‌বে না—গোঁয়ার গোবিন্দের মত ঘুরে' বেড়াবে, আর সেইটাই এরা বিজ্ঞত্বের লক্ষণ বলে' মনে করেছে। উচ্ছন্ন গেল! উচ্ছন্ন গেল! দেখ ত ছেলেটার আস্পর্দ্ধা—আমাকে এসেছে ঠাট্টা কর্‌তে! আর যাবার সময় দিয়ে গেল কি না "নমস্কার"! আরে, এ অচল শর্ম্মার পায়ের ধুলো পেলে কত লোক বহু জন্মের ভাগ্যি মনে করে—তাকে কি না অবহেলা? অধঃপাতে যাওয়ার আর কি বাকি আছে?

ঐ যে আর একটি নব্য যুবক আসছেন। ও বেটাদের দেখ্‌লেই গা জ্বলে যায়। সব গুলোই উচ্ছৃঙ্খলতার এক একটা জ্বলন্ত মূর্ত্তি!

[মধুর প্রবেশ এবং অচলদেবের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম]

হুঁ—এটার একটু বুদ্ধি শুদ্ধি আছে, দেখ্‌ছি। কিহে বাপু, আছ কেমন? অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ নেই।

মধু। আজ্ঞে, শারীরিক ভালই আছি।

অচলদেব। আর মানসিক?

মধু। তত সুঁবিধে নয়।

অচলদেব। কেন, কি হয়েছে তোমার?

মধু। তার জন্যেই আপনার কাছে এসেছি।

অচলদেব। বেশ করেছ—ভালই করেছ। আমি ত চিরকালই তোমাদেরে আত্মীয় জ্ঞান করি। কি হয়েছে?

মধু। আমাদের এই ডাঙার দেশে সাগরের কোন দরকার আছে কি না তাই ভাব্‌ছি। কিছুই স্থির কর্‌তে পারছি নি।

অচলদেব। তা আবার ভাব্‌ছ কেন? নিশ্চিত দরকার আছে। ডাঙাটা মাথা উঁচু করে' বড় বেশী রকম তাঁকে অবজ্ঞা কর্‌তে আরম্ভ করেছে। অপেক্ষা কর, তাঁর আবির্ভাব হল বলে'। প্রলয়-বান ডেকে তিনি আসবেন। তাঁর হুঙ্কারে সব ডাঙা কেঁপে উঠ্‌বে—তাঁর তাণ্ডবে যত সব অবজ্ঞার কাঠিন্য ভেঙে চুরে যাবে—তাঁর রুদ্র চরণে যত সব অহঙ্কার অবিশ্বাসের উঁচু মাথা আবার নত হয়ে পড়বে। পুঁথিতে লিখেছে, সে কি আর ভুল হবার জো আছে হে?

মধু। তবে, সাগর আছে?

অচলদেব। তাতে আবার সন্দেহ? পুঁথিতে এমন সব যুক্তি তর্ক দিয়ে তা প্রমাণ করা আছে যে তার বিরুদ্ধে আর টুঁ শব্দটি করে—কার সাধ্য?

মধু। তাঁকে দেখেছেন?

অচলদেব। সে কি আর সোজা কথা, বাপু? দেখা এক, আর আছেন, এই কথাটা মানা আর। তবে তাঁর তর্পণ নিত্য করে' থাকি। তার ব্যাঘাত হলে যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে তা করতেও কুণ্ঠিত হই না।

তুমি তর্পণ টর্পণ করে' থাক ত বাছা? না, ও গুলোতে বিশ্বাস নেই বলে' ছেড়ে দিয়ে বসে' আছ?

মধু। তর্পণ করি না। বিশ্বাস নেই বলে' নয়। মন ভিজে না, তাই।

অচলদেব। না না, অমন কর্ম্মও করো না। বাপ দাদারা যে বিধি দিয়ে গেছেন, তা সনাতন বিধি। তা উল্লঙ্ঘন করা মস্ত পাপ! পাপ করে' ভুগে মরবে কেন? আরম্ভ কর—আরম্ভ কর। তবে এতদিন না করায় যে পাপটা হয়েছে, তার জন্যে একটি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। সে বেশী কিছু নয়। সহজে যা'তে হ'তে পারে, তার ব্যবস্থা আমি করে' দিব।

মধু। তর্পণ করলেই সাগরকে পাব?

অচলদেব। অত পাওয়া না পাওয়ার কথা ভাব কেন? তাঁরা যেমন বলে' গেছেন, সেই অনুসারেই চলতে থাক—তার এক তিল এদিক ওদিক করো না। আর দেখ, বাপী কূপ সরোবর—এঁরাও খণ্ড সাগর। এঁদেরে অমান্য করো না কিন্তু। বিধিমতে পূজো করো—ফল পাবে, পুণ্যি হবে। না করলেই বিপদ! —হঠাৎ কোনদিন ক্ষেপে উঠে কি সর্ব্বনাশের ব্যবস্থা করবেন, কে জানে? পূজোর কোন অঙ্গহানি না হয়, সে বিষয়েও খুব সাবধান হতে হবে। সেবার সরোবর পূজোর শেষদিনে বিমুঘোষ ১০৮ টা রক্তজবার বদলে ৫০টা দিয়েছিল, সেই বছরের মধ্যেই তার বড় ছেলেটা রক্ত উঠে মারা গেল। বাকি রক্তজবাগুলোর বদলে ঐ রক্ত নিয়েই সরিৎদেবী শান্ত হলেন! এসব দেখে শুনেও আজকালকার পাষণ্ডগুলোর চোখ ফোটে না?

মধু। তা হলে তর্পণ করা ভিন্ন আর কোন উপায় নেই?

অচলদেব। না। বাপদাদারা যা করে' গেছেন তা ছাড়বে কেন? তুমি ত আর কুলাঙ্গার নও—বেশ সুবোধ শান্ত ছেলে! সনাতন বিধি লঙ্ঘন করা যে মহাপাপ, তা আর তোমাকে বুঝোতে হবে কেন? পুঁথিতেই লিখেছে—

পিতরো যেন যাতাস্মঃ যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেনৈব পথা গন্তব্যমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥

মধু। বেশ, তাই হবে।

চঞ্চলকুমার। অতি উত্তম! অতি উত্তম! আশীর্ব্বাদ করছি—দীর্ঘায়ু হও—সুখে থাক। বাপদাদার নাম বজায় থাক্।

এখন তবে আসি, বাবা। বড় দেরী হয়ে গেল—আজ আবার কূপ-পূজো। শুভদণ্ড অতিক্রম না হয়।

[মধু প্রণাম দিল। আশীর্ব্বাদ দিয়া অচলদেব প্রস্থান করিলেন।]

মধু। বাপদাদারা যা করে' গেছেন, তাই-ই করে' দেখি। কিন্তু বড় একটা সন্দেহ হয়—ঐ অচলদেব উনি ত সনাতন বিধি-নিয়মের এক পা বাইরে যান না। উনি আজপর্য্যন্ত সাগরের দর্শন পেলেন না কেন?

তবে কি ও পথে চল্লে সাগরকে দেখা যায় না, ও পথটা ঠিক নয়? কিন্তু কে এমন আছে, আমায় বলে দেয়—ওটা ঠিক কি বেঠিক? তবু ঐ পথে চলাই এখন সঙ্গত মনে কর্‌ছি—পিতৃপিতামহের প্রদর্শিত পথ হঠাৎ ত্যাগ করা বোধ হয় উচিত হবে না।

[চঞ্চলকুমারের পুনঃ প্রবেশ]

চঞ্চলকুমার। কি মধু, তুমি এখানে যে?

মধু। কায ছিল।

চঞ্চলকুমার। গণ্ডীপাড়ায় কায! এখানে কায বলে' কিছু হয় না কি?

মধু। হওয়ালেই হয়।

চঞ্চলকুমার। উহুঁ—তবে তুমি এ পাড়াটা ঠিক চিন্‌তে পার নি।

মধু। কেন?

চঞ্চলকুমার। চারদিকে দেয়াল তুলে দিয়ে, হাতে পায়ে শিকল এঁটে যদি কাউকে তার মধ্যে ফেলে দেওয়া যায়, সে যেমন কায কর্‌তে পারে, এখানে কায হয়—সেই রকম!

মধু। অমন করে' বাড়িয়ে বলো না।

চঞ্চলকুমার। বাড়িয়ে?—এক বিন্দু নয়। পদে পদে বিধি-নিষেধের শিকল—চল্‌তে গেলেই চারিদিক হতে হাঁ—হাঁ করে' বেড়া তুলে দেওয়া,—এ ত চোখের উপর অহোরহ চল্‌ছে। এমন বদ্ধ জায়গায় কি দুর্গন্ধ, ভাই,—আমি ত এক দণ্ডও টিঁক্‌তে পারি নে!

মধু। বোধ হয় তোমার চল্‌বার মধ্যেই একটা গোল রয়ে' গিয়েছে, তাই পদে পদে অত শিকলের ঝন্‌ঝনা কাণে বাজে। আর দুর্গন্ধ?—তাও হয়ত মনের বিকার!

চঞ্চলকুমার। তুমি তা'হলে এ পাড়াটার ভক্ত হয়ে উঠেছ!—বেশ—বেশ! লেখাপড়া শিখে বুদ্ধিটাকে পঙ্গু কর্‌তে চাও—যেমন ইচ্ছে তোমার।

মধু। ভক্ত—অভক্তের কথা হচ্ছে না, ভাই। বহুকালের জিনিষগুলো এক মুহূর্ত্তে ছেড়ে দিব—কিসের লোভে?

চঞ্চলকুমার। বুদ্ধিটা ত আছে? সেটাকে একটু খাটাতে হয়,—একটু বিচার কর্‌লেই সব গলদ ধরা পড়ে।

মধু। আমি ত বিচার করে' কিছু স্থির কর্‌তে পারি নি।

চঞ্চলকুমার। নবীন বাবুর কাছে কোন দিন গিয়েছ?

মধু। না।

চঞ্চলকুমার। একবার যেয়ো তাঁর কাছে। কি সুন্দর তাঁর বিচার-প্রণালী!—একেবারে চোখে আঙ্গুল দিয়ে গণ্ডীপাড়ার গলদগুলো দেখিয়ে দেবেন। আমি ত বেশ আনন্দ পাচ্ছি সেখানে যেয়ে—খোলা জায়গার খোলা হাওয়া লেগে গাটা জুড়িয়ে যাচ্ছে।

তুমি যাবে সেখানে? প্রতি শনিবারে বৈঠক হয়—কালকার বৈঠকের বিষয়—"সাগরের সন্ধান।" কাল যাবে?

মধু। সাগরের সন্ধান? তবে ত যাওয়াই চাই। সাগর!—সাগরের কথা সেখানে হয়?

চঞ্চলকুমার। নিশ্চিত। তা ছাড়া আর হবে কি? আর সে কি গণ্ডীপাড়ার মত কথা? শুন্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে। অমন জীবনে কখনও শোন নি।

মধু। শুন্‌ব। সাগরের কথা শুন্‌ব না?

চঞ্চলকুমার। তবে কাল যেয়ো কিন্তু। বল ত আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

মধু। বেশ, এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে।

চঞ্চলকুমার। কাল বিকেলে তবে বাড়ী থেকো।

মধু। আচ্ছা।

চঞ্চলকুমার। খুব সুখী হলাম, ভাই। নিজে

যে তৃপ্তি পাচ্ছি, আরেকজনকে তা দিতে পার্‌লে জীবনটা সার্থক হয়। বাড়ী থাকৃতে ভুলো না যেন। আমি কাল আস্‌ব।

মধু। এস।

চঞ্চলকুমার। তবে নমস্কার।

মধু। নমস্কার।

[চঞ্চলকুমারের প্রস্থান]

মধু। সাগরের সন্ধান! একেবারে সন্ধান? এত সহজে! এত নিকটে! সন্ধান যদি পাওয়া গেছে, দর্শনও তবে মিলেছে। আর ভাবনা কি?

গান

মন তুমি আর ভেবোনারে,
　　রতন তোমার আস্‌ছে হাতে।
অলস শয়ন ছাড়—ছাড়,
　　এনো না ঘুম নয়ন-পাতে।
আশার তরী ঘুরে ফিরে,
এত দিনে ভিড়বে তীরে,
বন্দরের ঐ বন্দনা-গান
　　ভাস্‌ছে বুঝি বায়ুর সাথে!

—*—

গ

উল্টাডাঙা—নূতন বস্তি

[বাগান মধ্যে একটি পাকা ঘর। দুয়ার জানালা সব খোলা। বেলা অপরাহ্ণ। নবীনচন্দ্র বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে এক একটা ফুলের গন্ধ লইতেছেন। তাঁহার মুখে চিন্তার রেখা।]

নবীনচন্দ্র। সন্ধ্যা হয়ে এল। বন্ধুবর্গ এখনি আস্‌বেন, তাঁদেরে আজ তৃপ্তি দিতে পার্‌লে হয়। বোধ হয় পার্‌ব—আজ বক্তৃতার বিষয়টা বেশ ভালই আছে। "সাগরের সন্ধান"—এ বিষয়টা নিয়ে আজ কতগুলো নতুন কথার অবতারণা করা যাবে। যা বল্‌ব ভেবে রেখেছি, তা বল্লে, প্রাচীন মতের অন্ধগুহা একটা নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌বে, আশা করা যায়।

[মালীর প্রবেশ]

মালী। হুজুর, আজ ত সাঁঝ লাগ্‌তেই জ্যোস্না উঠ্‌বে, বাইরে আজ আলো দেবার দরকার আছে কি?

নবীনচন্দ্র। দিবি বই কি? জ্যোস্নায় কি সব দেখা যায়? দে—দে আলো দে। সাঁঝ ত হয়ে এলরে, দেরী কর্‌ছিস্ কেন? দেখ্‌ছিস্ নি সন্ধ্যামণিরা সব ফুটে উঠেছে?

মালী। ওঃ—তাইত। দিচ্ছি আজ্ঞে।

নবীনচন্দ্র। একেবারে চোখ বুঁজে থাকিস্ না কি? না দেখিয়ে দিলে কিছুই দেখ্‌বি নি? তোদের দেশের ধরণটাই ঐরূপ। যা-যা, আলো আন্।

[মালীর প্রস্থান]

সমস্ত দেশের অবস্থাটা বাগানের ঐ মালীর গায়ে লেখা রয়েছে। চোখটা একেবারেই খুল্‌তে চায় না! পদে পদে কত যে ঠোক্কর খাচ্ছে—তবু হুঁস নেই। সেই মান্ধাতার আমলের ভাবগুলো একেবারে রক্তমাংসের সঙ্গে জড়িয়ে জড়িয়ে নিজেরা বরফের মত জমাট বেঁধে উঠ্‌ছে, তীব্র উত্তাপ না পেলে কিছুতেই আর গল্‌ছে না, দেখছি।

[মালী আলো জ্বালিয়া দিল। বন্ধুর দল আসিলেন, তন্মধ্যে চঞ্চলকুমার ও মধু। নবীনচন্দ্রের সঙ্গে প্রত্যেকের নমস্কার-বিনিময় হইল। চঞ্চলকুমার মধুকে নবীনচন্দ্রের সঙ্গে "সাগর-পিপাসু" বলিয়া পরিচিত করিয়া দিল। নবীচন্দ্র মৃদু হাস্যে তাহাকে ধন্যবাদ দিলেন। তারপর সকলে খোলা ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করিলেন—সেখানে কতগুলি

বেঞ্চপাতা, তদুপরি বন্ধুবর্গ উপবিষ্ট হইলেন এবং সকলের সম্মুখে কিঞ্চিৎ দূরে একটা উচ্চ বেদীতে নবীনচন্দ্র যাইয়া বসিলেন। ঘরটা খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ রহিল। তারপর দলের দুই তিন জনের দ্বারা গীত-আরম্ভ।]

গান
(মিশ্রভৈরবী—একতালা)

অন্ধকারে যে তোমারে
খুঁজিয়া মরিছে হায়—
সে কেবলি শ্রান্তি লভে,
মজে শুধু নিরাশায়!
হে সাগর, হে অরূপ,
নিখিলের রস-কূপ,
তোমারে দেখিতে হলে
নয়ন যে আলো চায়!
কে বলে গো তুমি দূরে?—
আছ ত অন্তরপুরে,
এই যে নূপুর তব
দিবারাতি শোনা যায়!
অদেহ পরশ তব
সদা করে অভিভব,
তাপিতে শীতল করে
ঘন-গূঢ় করুণায়!

[গীতান্তে গৃহ নীরব। কিছুক্ষণ নবীনচন্দ্র এবং মধু ব্যতীত দলের আর আর সকলে মুদিতনেত্রে, অবনতমস্তকে ধ্যানমগ্ন।]

নবীনচন্দ্র। সপ্তাহ পরে আজ আবার আমরা একস্থানে মিলিত হয়েছি। বোধ হয় কেহই আমরা ভুলি নি—আমাদের এ মিলনের উদ্দেশ্য কি। গণ্ডীপাড়া সাগর-সম্বন্ধে যে বিকৃত ধারণা লোকের মধ্যে প্রচার করছেন, আমরা তা রুদ্ধ করব—তাঁরা যে বিধি নিষেধের নাগপাশে লোকদেরে আড়ষ্ট করে' রাখছেন, আমরা বিচারের ক্ষুরে তা ছিন্ন করব। আমরা চেষ্টা করব যা'তে সাগরকে সকলে প্রাণে মনে অতি সহজে, অতি সরল ভাবে উপলব্ধি করতে পেরে ধন্য হয়।

আজ আমাদের বক্তৃতার বিষয় হচ্ছে—"সাগরের সন্ধান।"

আমরা দেখছি—ডাঙার দেশে সাগরকে চায় প্রায় সকলেই। ইতিহাস খুঁজলেই দেখা যায়,—অসভ্য বর্ব্বর যারা, তারাও সাগরকে বিশ্বাস করে' আসছে। এ বিশ্বাসের অন্ত নেই। যতকাল মানুষ, ততকাল এ বিশ্বাস। এর একমাত্র কারণ—ডাঙা যে সাগর হতেই উদ্ভুত। তাই সাগরের দিকে তার এই আকর্ষণটা স্বাভাবিক—অনুরাগটা আন্তরিক। কিন্তু অনুরাগ ও বিশ্বাস এক, আর তাঁকে উপলব্ধি করা আর। বিচার-বুদ্ধিতে সেই অনুভব করবার প্রণালীটা স্থির করে' নিতে হবে। নইলে অন্ধকারে যাকে হাতের মাথায় পাব, তাকেই সাগর বলে' ভুল করে' বসব!

আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব পিতৃপুরুষ—যাঁরা দ্রষ্টা ছিলেন, সাগরকে যাঁরা সদাসর্ব্বদা উপলব্ধি করতেন, তাঁরা বলে' গিয়েছেন—"সাগর অসীম।" কিন্তু তাঁদেরি বংশধর তাঁদের কথা অগ্রাহ্য করে' সাগরকে সসীম বলে' প্রচার করছেন! এ-ত কখনই হতে পারে না। অসীমকে সসীম করা—অনন্তকে সান্ত করা, এযে একেবারেই যুক্তিবিরুদ্ধ! এ করলে সাগরকে যে নিতান্তই অবমাননা করা হয়! আর সেই অপমান কখন কি তাঁর আরাধনা হ'তে পারে?

আমরা তাঁর সন্ধান করতে চাচ্ছি। কিন্তু কোথায়? তিনি ত দূরে ন'ন। তিনি ত আকার গ্রহণ করে' নিজের চারদিকে প্রাচীর তুলে প্রচ্ছন্ন থাকেন নি! তাঁর প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাস প্রতিনিয়তই ত হৃদয়-মধ্যে

স্পন্দিত হচ্ছে। এই যে তাঁর সুকোমল কর-স্পর্শ বায়ুর শৈত্যে অনুভব কর্‌ছি! এই যে অবিরামরোদনোচ্ছূনা বর্ষাদেবীর নেত্র-প্রান্তে তাঁরই প্রেমাশ্রু-ধারা!—এই যে বিশ্বের কলকোলাহলের মধ্যে তাঁরই সুমধুর কণ্ঠ-ধ্বনি শ্রুত হচ্ছে! এমন যে তাঁর রমণীয় আবির্ভাব, এমন যে তাঁর নীরব ঘোষণা, তবু লোকে তাঁকে ভুল করে? বাইরে তাঁকে সন্ধান কর্‌লে ত তাঁকে পাওয়া যাবে না! ভিতরে জ্ঞানের আলো জ্বেলে তাঁকে খুঁজলেই তাঁর দর্শন মিল্‌বে। সে ত অতি সহজ—অতি সুলভ!

হে প্রাণের প্রাণ, হে নিখিলরত্নের আকর, হে ধরিত্রীর জনয়িতা, তোমাকে লোকে কত-না উপায়ে অহোরহ লাঞ্ছিত কর্‌ছে। তুমি আছ, এ কথা মেনেও বাপীকূপ সারোবর ভেবে তোমায় তারা নাস্তিত্বের কোঠায় বসিয়ে রাখ্‌ছে। অরূপকে রূপের ফাঁদে ধরতে যাওয়া—সে কি ভীষণ বাতুলতা! হে করুণাময়, তুমি তাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর কর, তাদের চক্ষু ফুটিয়ে দাও, তারা একবার তাদের নিজের ভ্রান্তি-গড়া মোহ-প্রাচীর ভেঙে ফেলুক, তাদের এই বালসুলভ ক্রীড়াচপলতা ঘুচে যা'ক—বিধি-নিষেধের কাঁটাবন অপনীত হয়ে তাদের পক্ষে তোমাকে পাবার পথ একেবারে সুগম হয়ে উঠুক্!

বন্ধুগণ, আমাদের মিলন সার্থক হতে চলেছে। এর ক্রমঃবর্দ্ধিত মাধুর্য্যে আমরা তাঁর আবির্ভাব বেশ অনুভব কর্‌তে পারছি। আসুন, আমরা আজ এর জন্যে তাঁকে অন্তরের ধন্যবাদ প্রদান করি আর তাঁর চরণে প্রার্থনা করি তিনি যেন প্রতিদিন আমাদিগকে আনন্দের নব নব রসধারায় সঞ্জীবিত রাখ্‌তে বিরত না হ'ন, তাঁর প্রবল করুণায় আমাদের বুদ্ধির অমানিশা যেন ঘুচে যায়, আমরা যেন জ্ঞানের প্রদীপ্ত দিবালোকে বিচরণ কর্‌তে পারি!

[পুনর্ব্বার নবীনচন্দ্র ও তাঁহার দলের অবনতমস্তকে এবং মুদিত-নেত্রে অবস্থিতি। খানিকক্ষণ পরে দলের দুই তিনজনের দ্বারা সঙ্গীতারম্ভ।]

গান
(মিশ্র—যৎ)

দরদিয়া সাগর এস
দুয়ার দিয়া এই ঘরে,
কোন বাধাই রাখ্‌বোনাক
তোমার আসা-পথের'পরে।
এস শাওন ধারা-পাতে,
এস মধুর মধু-রাতে,
এস শরৎ জ্যোছনাতে,
যখন খুসী বরষ ধরে'।
দেখে তোমায় মনোলোভা,
ধরার গায়ে ফুট্‌বে শোভা,
পল্বল, সব তুচ্ছ ডোবা
মর্‌বে দারুণ লাজের ভরে!
মানুষ-গড়া প্রাচীর নাশি,
বাজ্‌বে তোমার জয়ের বাঁশী,
ফেণিল তব পুলক হাসি
জ্বাল্‌বে আলো সবার তরে।

[গীতান্তে সকলের নমস্কার-বিনিময় এবং বিদায়-গ্রহণ। নবীনচন্দ্র-প্রমুখ সকলের বাগান হইতে প্রস্থান। কেবল চঞ্চলকুমার ও মধুর বাহিরে বাগানে আসিয়া অবস্থিতি ও কথোপকথন।]

চঞ্চলকুমার। কেমন মধু, শুন্‌লে ত? ভাল লাগ্‌ল না?

মধু। কি শুন্‌লাম, বোধ হয়, তা বুঝ্‌তে পারি নি।

চঞ্চলকুমার। সে কি? গঙ্গীপাড়ার যে

একেবারে গোড়ায় গলদ,—অমন করে' উনি ধরিয়ে দিলেন, তা বুঝ্‌তে পার নি?

মধু। তুমি পেরেছ?

চঞ্চলকুমার। তা আর পারি নি? নইলে কি আর শুধু শুধু এ নতুন বস্তিতে আসা যাওয়া কর্‌ছি?

মধু। কি বুঝেছ?

চঞ্চলকুমার। বুঝেছি যে গণ্ডীপাড়ায় অসীম সাগরকে সসীম করে', নিরাকারকে আকার দিয়ে, অরূপকে রূপ দিয়ে, বাতুলতা করা হচ্ছে।

মধু। বক্তৃতার মধ্যে সে কথাটা আমিও শুনেছি।

চঞ্চলকুমার। তবে?

মধু। সাগরের সন্ধান মিল্‌ল কই?

চঞ্চলকুমার। আর কি সন্ধান চাও? বাইরে চাইলেই যে তাঁকে ভুল করবে!

মধু। অন্তরে ত তাঁকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

চঞ্চলকুমার। দেখ্‌বে কি? অনুভব কর।

মধু। তিনি ত নিরাকার বল্‌ছ—তাঁকে অনুভব করব কিরূপে?

চঞ্চলকুমার। অনুভব? এই বিচার করে'—জ্ঞানের আলো জেলে।

মধু। ঐ খানেই ত গোল লাগ্‌ছে। বিচার কর্‌তে গেলে ত কতগুলো শুষ্ক কথার কাটাকাটি, যথা—তিনি সাকার নন,—নিরাকার, তিনি সসীম নন,—অসীম,—এই সবই মনে ভাস্‌বে। ওতে যা সাব্যস্থ হবে, সে-ও ত "বাপীকূপ সরোবরে"র মত ভিন্নধরণে সাগরের একটা শাব্দিক কল্পনা হয়ে দাঁড়াবে! তোমরা ধ্যানের সময় কি ঐ শব্দগুলো চিন্তা কর্‌ছিলে?

চঞ্চলকুমার। কি জানি, ভাই, তোমার হৃদয়টা কেমন! আমি ত বেশ আনন্দ পাই।

মধু। ও আনন্দ কখনই বিচারের ফল নয়। যদি সত্যই আনন্দ পেয়ে থাক, তবে সেটা কল্পনারই খেলা। ক্ষণেকের অন্ধ উচ্ছ্বাস মাত্র। কিন্তু আমি চাই—প্রত্যক্ষের অনুভূতি। তা যতদিন না মিল্‌ছে, ততদিন গণ্ডীপাড়ার কাল্পনিক ভ্রান্ত উপায় ধরাও যা, তোমাদের এই নতুন বস্তির কাল্পনিক অনুভবের রাস্তাটাও তা-ই। না—না, এমন শূন্য নিয়ে প্রাণে আনন্দ পাব না। এখানে অসংখ্য বাক্‌বিতণ্ডার ঘনবিন্যস্ত মায়াজাল—আর সেখানে বিধি-নিষেধের কঠিন শিকল! এখন কোথায় যাই? তবু ঐ শিকলটা অনেকদিন হতে পর্‌তে পর্‌তে কিছু কিছু অভ্যস্ত হয়ে গেছে—এখন এই বাক্যজালের লোভে তাকে ছাড়লে ত আর অভীষ্টসিদ্ধ হবে না!

চঞ্চলকুমার। কি মাথা মুণ্ডু বক্‌ছ? তুমি কিছুই বুঝ্‌লে না ছাই!

মধু। বুঝ্‌তে দিলে কই?

চঞ্চলকুমার। তুমি কেবল বক্তৃতার কথাটাই ভাব্‌ছ, একবার দেখ্‌লে না ত এখানে কেমন স্বাধীনতা!

মধু। মিথ্যা ধারণা।

চঞ্চলকুমার। সে—কি?

মধু। মিথ্যা নয়? দল বেঁধে যখন তোমরা থাক্‌তে যাচ্ছ, তখনই ত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তোমাদের লোপ পেয়ে গেছে। আণবিক স্বাধীনতা—সে-ত সামাজিক মানুষের কখনই মিল্‌তে পারে না—বিধিনিষেধ তাকে কোন না কোন স্থানে মান্‌তেই হবে। না মান্‌লেই তার স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতার রূপ ধরে' তাকে পশুত্বে ঠেলে নিয়ে যাবে।

চঞ্চলকুমার। তুমি পুঁথির বিদ্যা আও-ড়াচ্ছ। একবার ভাল করে' দেখ দেখি—নতুনবস্তির ধরণ-ধারণ গুলো। একটু তলিয়ে মজিয়ে তুলনা করে' দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারবে—গণ্ডীপাড়ার চেয়ে এখানে স্বাধীনতা কত বেশী।

মধু। এ বিশ্বাস হয় না। হয়ত দেখ্‌তে পাব—হয় ত কেন?—নিশ্চিত দেখ্‌তে পাব—এখানে আরেক রকমের পরাধীনতা দেখা দিয়েছে—নতুন রকমের বাঁধনের আয়োজন চলেছে। বুঝ্‌তে পারছ না?—এ যে চল্‌বেই। বাঁধন ছাড়া মানুষ থাক্‌বে কিরূপে?

চঞ্চলকুমার। তোমার কথাগুলো একটু নতুন নতুন ঠেকছে। নবীনবাবুর সঙ্গে তোমার একবার ভাল করে' আলাপ হওয়া আবশ্যক। তিনি নতুন কথা খুব পছন্দ করেন।

মধু। আজ আর হয় না। আলাপ হওয়ার দরকারও আর মনে করছি না।

চঞ্চলকুমার। কেন?—তোমার ধারণাটা ভ্রান্ত ও ত হ'তে পারে!

মধু। তা-হোক। আমি তর্ক চাই না। আমি সাগর দেখ্‌তে চাই। তাঁর কাছে সে আশা নেই, তা তাঁর বক্তৃতা হতেই বুঝ্‌তে পেরেছি। কিন্তু কোথায় আছে? কেউ কি তার সন্ধান বল্‌তে পারে না?

চঞ্চলকুমার। তোমার গোঁড়ামীটা অসহ্য।

মধু। আর তোমার গোঁড়ামীটা খুবই সহ্য! যাও, ভাই, আর বৃথা বচসা দিয়ে কায নেই।

চঞ্চলকুমার। আমার আবার গোঁড়ামী দেখ্‌ছ কিসে? আমি ত সকল গোঁড়ামীর উপর খড়্গহস্ত।

মধু। ওটাও একরকমের গোঁড়ামী—আর ওটা আরও ভয়ানক যে নিজের ত্রুটির দিকে একবারও লক্ষ্য করে না—যত লক্ষ্য সব অপরের উপর!

চঞ্চলকুমার। না—তোমার সঙ্গে আজ পেরে উঠবার জো নেই। মাথাটা তোমার আজ ঠিক আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু আর ত এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে চল্‌বে না। ঐ যে মালী আস্‌ছে—বাগানের ফটক বন্ধ কর্‌তে। চল, বেরিয়ে পড়ি।

মধু। তাহ'লে দেখ্‌ছি এ বাগানের ফট-কও বন্ধ হয়! বেশ—বেশ! যাও, ভাই, তোমার সঙ্গে আর আমি চল্‌ছি নি। তুমি যাবে ঐ মুখো—আমি যাব এই মুখো।

চঞ্চলকুমার। তবে চল্লাম।

[প্রস্থান]

মধু। বড় আশা করে' এসেছিলাম। এমন হতাশ হব, তা'ত ভাবি নি। তবে বুঝি আমার ভাগ্যে সাগর দেখা নেই! কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে, ততই যে আমি তাকে দেখবার জন্যে উতল হয়ে উঠ্‌ছি! কি গোপন বাঁশীর ডাকে সে আমায় এমন করে' ডাক্‌ছে! কিন্তু সে কোথায়? দেখা কি দেবে না? দেখা কি হবে না?

গান

(পটমঞ্জরী—একতালা)

ওগো সুনীল বন্ধু আমার
কোথায় ব'সে বাজাও বাঁশী?
তোমার তরে এমন করে'
পরাণ কেন হয় উদাসী!
কি গান তুমি গেয়ে গেয়ে যাও,
অর্থ তাহার বুঝতে নাহি দাও,
দিগ্বিদিকে কেবল ঝরাও
সুরে সুরে পুষ্পরাশি!

শ্রবণ মম শুন্‌ছে যত গান,
আকুল করে দিচ্ছে এ নয়ান,
দরশ আশায় হায়রে দিনমান
জলে জলে যায় সে ভাসি।
মিষ্টি যদি এমন বাঁশী-সুর,
প্রাণটা তব নয় কিরে মধুর!
আড়াল ধরে' এমনি রবে দূর,—
দাঁড়াবে না সাম্‌নে আসি?

—০—

ঘ

উল্টাডাঙা—চৌমাথা

নিবারণ। আচ্ছা কারবার ফেঁদে ফেলেছ, বঙ্কিম। রাতদিন কেবল হুটোপুটি, দৌড়া-দৌড়ি, চেঁচামেচি,—যত রাজ্যের অকাল-কুষ্মাণ্ডদের ঠেলাঠেলি। কেবল খাই—খাই রব। একটু যে সোয়াস্তিতে থাকৃব—তার পথটা পর্য্যন্ত বন্ধ করে' দিয়েছ।

বঙ্কিম। তা না কর্‌লে চল্‌বে কেন, নিবারণ দা? টাকার দরকার ত সকলেরই। নইলে খাবে কি? সংসার চল্‌বে কিরূপে?

নিবারণ। আরে রাম বল—রাম বল। অমনতর খাটুনি! ওতে যে মৃত্যুকে তাড়াতাড়ি নিমন্ত্রণ করে' আন্‌ছে! আর টাকা দিয়ে কি হবে ছাই? জীবনটাই যদি বৃথা চলে' গেল, তবে টাকার থলে নিয়ে কি মৃত্যুর পারে বাঁচতে যাবে? যত সব অনাসৃষ্টি তোমাদের!

বঙ্কিম। তবে কি কর্‌তে হবে?

নিবারণ। হেসে খেলে নাও—হেসে খেলে নাও। দুদণ্ডের জীবন অমন করে' ব্যর্থ করা কখনই উচিত নয়।

বঙ্কিম। তুমি তা বল্‌তে পার। বাপ-দাদার টাকা রয়েছে—বসে' বসে' খেতে পাচ্ছ, হাসিখেলা তোমার আসবে না কেন? কিন্তু সকলে ত আর তোমার মত নয়,—তাদের টাকা রোজগার কর্‌তে হবে—খাট্‌তে হবে। নইলে, পথের কুকুর হয়ে' কাঙালবেশে পরের দরজায় লাঠিছাড়া আর কিছুই যে তাদের মিল্‌বে না! আমোদ তুমি কর্‌তে পার—কর, কিন্তু সকলকে তোমার দলে টেনো না—টান্‌তে পারবেও না।

নিবারণ। তাই ত বল্‌ছিলাম—আমার সোয়াস্তির পথটা তোমরা একেবারে কাঁটায় ভরে' দিচ্ছ। আমি এখানে থাকি কি করে'?

বঙ্কিম। থাকা চল্‌বে না। এখানে থাকৃতে হলে, খাট্‌তে হবে। আর খাট্‌বেই বা না কেন? বাপদাদারা না খাট্‌লে তোমার ও টাকাটা আস্‌ত কেমন করে'? আর তুমি না খেটে, সেই টাকাটা ভোগ কর্‌বে? এ হ'তেই পারে না। লক্ষ লক্ষ লোক টাকার অভাবে ছটফট্‌ কর্‌ছে—ঘুরে মর্‌ছে—মারা যাচ্ছে, আর তোমার ঘরে টাকার পুঁজি, অনায়াসে অক্লেশে তুমি তা উড়োচ্ছ—ফুর্ত্তি কর্‌ছ! কে বলেছে, ঐ পুঁজি টাকায় তোমার অধিকার? মিথ্যা কথা। রক্তের দোহাই দিয়ে অলস লোকে কখনই ও টাকার অধিকারী হতে পার্‌বে না—ওর উপযুক্ত উত্তরাধিকারী ঐ দীন দরিদ্র অন্নহীন কর্ম্মক্লান্ত জনসংঘ।

নিবারণ। তোমরা ক্ষেপেছ, দেখ্‌ছি। অনবরত টাকা-টাকা করে' খাট্‌তে খাট্‌তে তোমাদের মাথা কি আর খারাপ না হয়ে যায়? আরে ভাগ্য বলে' একটা জিনিষ আছে, তা'ত মান? আমার ভাগ্যে আছে—আমাকে টাকার জন্যে ভাব্‌তে হবে না—আমোদ আহ্লাদেই আমার জীবনটা কাট্‌বে। তোমরা জোর কর্‌লে ত আর কপালটা কেড়ে নিতে পার না!

বঙ্কিম। ভাগ্যই যদি থাকে, তবে সে

ভাগ্যটা সকলের সঙ্গে সমান ভাগ বসাবে—এই-ই আমরা চাই।

নিবারণ। এ কখনই হতে পারে না।

বঙ্কিম। এই-ই হবে। ভাগ্যের নামে অমন বুজরুকী আমরা কিছুতেই আর চল্‌তে দেব না। মানুষ মাত্রেরই সমান অধিকার। কারু বেশী, কারু কম, এ সব দরদস্তুর এবার আর চল্‌ছে না।

নিবারণ। তুমি ত ভয়ানক লোক দেখ্‌ছি হে। ভাগ্য মান না? উঁচু নীচু—সুখ সুবিধে ও সব যে ভাগ্যেরই ফল! এই দেখ না কেন, তোমার ত অনেক রকম কারবার চল্‌ছে, তাদের কুলী মজুরদের খাটাতে হলে তোমাকেই হুকুম কর্‌তে হয়। কেন, সে বেটারাও ত তোমাকে হুকুম কর্‌লে পারে? এ হয় না। তাদের ভাগ্য—হুকুম খাটা, তোমার ভাগ্য—হুকুম করা।

বঙ্কিম। তাদের শিক্ষার দোষে তারা কুলী মজুর হয়েছে—হুকুম খাট্‌ছে। এমন শিক্ষা দেব যাতে আর তারা হুকুমের তলে না থাকে।

নিবারণ। এ হতেই পারে না। হাজার শিক্ষা দাও, ভাগ্যে যাকে কুলী বা কুলীর কর্ত্তা হতে লিখেছে, সে তাই-ই হবে,—তা আর উল্‌টোতে পারছ না।

বঙ্কিম। এ হতেই হবে। ভাগ্যটাকে না উল্‌টিয়ে আমরা কিছুতেই আর ক্ষান্ত হচ্ছি নি।

নিবারণ। যখন উল্‌টিয়ে দিতে পার্‌বে, তখন তোমাদের নিবারণদা তোমাদের দলে মিশ্‌বেন। আপাততঃ কিছুদিন আমোদ ভোগ করা যখন তার ভাগ্যে আছে, তা হ'তে আর তাকে বঞ্চিত কর কেন?

না আর কথা নয়। তোমার সঙ্গে বকে' বকে' আমার প্রাণের রসটা শুকিয়ে উঠ্‌ল। এইবার সরে' পড়া যা'ক্। (সহসা তুড়ি দিয়া তান ধরিল)

"তুম্ তা-না-না-না-না দ্রিম্,
দ্রিম্ তা না-না-না—না,
দ্রিম্‌তা না-না-না-না—"

হাঁ, এতক্ষণে ফূর্ত্তিটা আবার জমে আস্‌ছে—বাঃ বাঃ!

[প্রস্থান]

বঙ্কিম। কেমন সুখের পায়রা সব!—কেবল রাতদিন আরাম খুঁজে বেড়াচ্ছেন। পরের দুঃখ কষ্টের দিকে একটুও লক্ষ্য নেই! যত লক্ষ্য সব নিজের সুখের দিকে! টাকাটা এক জায়গায় জড়' হলেই এই সব উপদ্রব সৃষ্টি করে। তারপর ঐ সেকেলে স্বত্ব-আইন, কি বিষময় ফলই না ওতে সমাজে এনে ফেলেছে! সবটার একেবারে আমূল সংস্কার আবশ্যক, নইলে আর এ ভীষণ বৈষম্যের হাত হতে রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

[প্রস্থান]

[অন্য দিক দিয়া চঞ্চলকুমারের প্রবেশ]

চঞ্চলকুমার। ও কে গেল?—বঙ্কিমদা নয়? ও—ও বঙ্কিম দা, আরে কোথায় যাচ্ছ হন্‌হন্ করে'? শোনই না।

[বঙ্কিমের পুনঃ প্রবেশ]

বঙ্কিম। কিরে ডাক্‌ছিস্ কেন? দেখ্‌ছিস্ নি বেলা হয়ে গেল? কাযের সময়, এখন কি আর দেরী কর্‌তে পারি? বল্ চট্‌ করে'—কি খবর।

চঞ্চলকুমার। আমাকে তোমার কারখানায় নেবে?

বঙ্কিম। সে কিরে? তোর আবার ও মতি হল কবে থেকে?

চঞ্চলকুমার। যবে থেকেই হোক। বল, নেবে?

বঙ্কিম। তুই কি পার্‌বি ? এর নাম কায রে কায—একেবারে মাথার ঘাম পায়ে ফেলা! এ ত আর বসে' বসে' স্বপন দেখা নয় ?

চঞ্চলকুমার। তা জানি। ঐ কাযই এখন আমার করতে হচ্ছে। নইলে খাব কি ?

বঙ্কিম। কেন, সাগরের স্বপন দেখে ? যত সব আকাটমূর্খ তোরা! আমি গোড়া থেকেই জানি—সাগর, সাগর বলে' চেঁচালে সাগর ত কোনদিন দেখা দেবেই না, লাভের মধ্যে মাথাটা যাবে খারাপ হয়ে, শরীরটা যাবে মাটি হয়ে', আর তার ফলে সংসার ও সমাজের বুকে জ্বল্‌বে আগুন!

যা'ক। এখন তবে তুই বুঝ্‌তে পেরেছিস্ —শরীরটাই আগে ?

চঞ্চলকুমার। হুঁ।

বঙ্কিম। বেশ। কিন্তু যে "ফুরফুরে বাবু" হয়ে পড়েছিস্, কি কায তুই করতে পার্‌বি, তা'ত বুঝতে পার্‌ছি নি।

চঞ্চলকুমার। এই যা হয় একটা কিছু। কিছুদিন শিক্ষানবীশীও ত করা চাই।

বঙ্কিম। তা'ত করতেই হবে রে। নইলে কি আর একচোটে কোন কাযের ভার তোকে দেওয়া যেতে পারে ? আচ্ছা, কিছুদিন সবুরই কর না—দেখি তোর মতিটা এর মধ্যে ফিরে যায় কি না!

চঞ্চলকুমার। না—না এবার আর তা হচ্ছে না।

বঙ্কিম। সেটা ফলেন পরিচীয়তে। তোর ত এর মধ্যেই কত পরিবর্ত্তন দেখলাম! এখন কোথায় যাচ্ছিস্, বল্ ?

চঞ্চলকুমার। তোমার কাছেই।

বঙ্কিম। তবে চল্, দুজনাই কারখানাটা একটু ঘুরে দেখে আসি।

চঞ্চলকুমার। চল।

[উভয়ের প্রস্থান।]

[অন্যদিক দিয়া মধুর প্রবেশ]

মধু। কিছু হল না—কিছু হল না। কই, সাগর কই ? প্রাণটা যে একেবারে শুকিয়ে উঠছে! কতকাল আর এ শুষ্কতার মধ্যে পড়ে' থাকব ? এযে বড়ই ভীষণ! না—না এমন করে' জীবনটাকে নষ্ট করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। আমি চল্‌ছি কই ? এ পথ কি তবে পথ নহে ?—এটা কি একটা গোলোকধাঁ-ধাঁ—বদ্ধ ঘর ? না, এ পথে চলবার মত সামর্থ্য আমার নেই ? না, চালক অভাবে পথের সঠিক বার্ত্তাই আমার কাছে এখনও পৌছায় নি ? বিষম সমস্যা! এ সমস্যার মীমাংসা করবে কে ? কে আমায় ঠিক পথে চালাবে ?—কে আমায় সাগরে নিয়ে যাবে ?

[বঙ্কিমের কারখানার একজন নিরক্ষর সর্দ্দারের প্রবেশ]

সর্দ্দার। পেরণাম, দাদাঠাকুর।

মধু। কোথায় যাচ্ছিস্ এত সকালে ? ভাল আছিস্ ত ?

সর্দ্দার। আজ্ঞে, আপনাদের আশীর্ব্বেদে ভালই আছি। গিয়েছিলাম আমাদের কর্ত্তাবাবুর খোঁজে। শুন্‌লাম তিনি বাড়ী নেই—কারখানায় বেরিয়েছেন। তাঁর দিয়ে খুব দরকার। এখনই চাই।

মধু। কেন, কি হয়েছে ?

সর্দ্দার। আজ ভোরে তেলের কারখানার দরজা খুলতে গিয়ে দেখি, উঠানে পিপেগুলোর কাছে তিনটে মোহর পড়ে' রয়েছে। একবার ভাবলাম, সে গুলোয় হাত দেব না—কেজানে কার মোহর ?—থাক্ পড়ে'! তারপর ভাবলাম, না—এ গুলো কর্ত্তাবাবুর হাতে দিই গিয়ে, তিনি খোঁজ ক'রে যার হয়, তাকে দিয়ে দিবেন। এই ভেবে মোহরগুলো যেই তুলেছি, অমনি রামু সর্দ্দার এসে উপস্থিত। সে দেখতে পেয়ে

ব্যাপারখানা কি জিগ্‌গেস কল্লে। আমি সবটা তাকে খুলে বল্লাম। সে কি বলে, দাদাঠাকুর, জানেন?—সে বলে, কুড়িয়ে পেয়েছিস্, আর দিতে যাবি কেন? লক্ষ্মীর ধন হাতছাড়া কর্‌তে নেইরে, হাতছাড়া কর্‌তে নেই।

মধু। তুই তাতে কি বল্লি?

সর্দ্দার। আমি বল্লাম, সে কি হয় রে রামু? এটা যে পরের জিনিষ! কোন্ ব্যাপারী হয় ত ফেলে গেছে, এতক্ষণ টের পেয়ে থাক্‌লে নিশ্চিত কান্নাকাটি যুড়ে দিয়েছে। এটা গোপন কর্‌লে, সাগর কি তা জান্‌তে পাবেন না? হয় ত এই পাপের জন্যেই কোন্ দিন তিনি ফুঁসে' উঠে আমার দফা রফা করবেন আর কি!

মধু। সাগর!—হাঁ, তারপর?

সর্দ্দার। রামু বল্লে—আর সাগরের ভয় কিরে? কর্ত্তাবাবু ত বলে'ই থাকেন, সাগর-টাগর ওসব বাজে—এখানে টাকাই হচ্ছে কাযের। তবে আর ডরাস্ কেন?

মধু। তুই কি উত্তর দিলি?

সর্দ্দার। আমি বল্লাম—আমরা মুরুক্ষু লোক কর্ত্তাবাবুর ও সব কথা কি বুঝি? আমরা সাগরকে ডরাই।

মধু। তাই বুঝি ঠিক করেছিস্—মোহর-গুলো বাবুর হাতে দিয়ে দিতে?

সর্দ্দার। আজ্ঞে।

মধু। বেশ করেছিস্। যা শীগ্‌গির। সাগর বাজে নয় রে, সাগরই কাযের, এই কথাটা কখনই ভুলিস্‌নি। আর কর্ত্তাবাবুকেও তোর ভয়ের কথাটা একটু ভাল করে' জানিয়ে দিবি।

সর্দ্দার। যে আজ্ঞে—তবে চল্লাম, দাদা-ঠাকুর। পেরণাম। [প্রস্থান]

মধু। আজ বঙ্কিম একটু বুঝ্‌তে পারবে—আর পরিণামে আরও ভাল করে' বুঝবে, উল্টাডাঙায় তার মতবাদটা কি অনিষ্ট করেছে ও কর্‌ছে। সাগরে বিশ্বাস, ভক্তি, শ্রদ্ধা বা ভীতি না থাক্‌লে এ ডাঙায় যে কেবল বাঘ ভালুক ছাড়া আর কিছুই বাস করত না! আরে শিক্ষা—শিক্ষা করে' চেঁচাচ্ছিস,—তার কেতাবী শিক্ষায় বুদ্ধিটাই যে কেবল ধারাল হবে, কিন্তু হৃদয়, তা উন্নত হবে কি করে'? তুই বল্‌ছিস্—মানুষ শিক্ষিত হবে, শিক্ষিত হয়ে পরস্পরের মধ্যে একটা চুক্তি করে' নিয়ে সমাজে বেশ শৃঙ্খলা বেঁধে থাক্‌বে। কিন্তু সে কোন্ শিক্ষা-প্রণালী, যাতে মানুষ তার সমস্ত হীনস্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হবে? সেই শিক্ষার প্রকার নিয়েই ত যত গোল! শুধু কেতাবী শিক্ষায় মানুষ কি কখন মানুষ হতে পারে?

তারপর সমাজের বিলাসিতা তুই ত কখনই রোধ কর্‌তে পার্‌বি নি, কর্‌লে যে অনেক-গুলো ব্যবসা মাটি হয়ে যাবে! অর্থের দিক্ দিয়ে দেখ্‌লে—বিলাসিতা যে তোদের আদরের বস্তু! আর যারা সেই বিলাসিতা ভোগ কর্‌তে পারবে না—অথচ কর্‌তে চাইবে—তারা যে তারই জন্যে গুপ্তচোর হতেও ছাড়বে না, তা নিবারণের উপায় কি কর্‌ছিস? ওসব চুক্তিফুক্তির চোখে ধুলো দিতে তারা ইতস্ততঃ কর্‌বে কেন? কিন্তু যার চোখে ধুলো দেওয়া যায় না—যে আড়ালে বসে' সব দেখ্‌ছে, শুন্‌ছে—সেই সর্ব্বশক্তিমান সাগরে বিশ্বাস নিয়ে কতকাল ধরে' এই ডাঙার রাজ্যের লোকগুলো সৎপথে চলে' আস্‌ছে—সে বিশ্বাস তাড়িয়ে দিয়ে লাভ ত হচ্ছেই না—বরং উল্টো হচ্ছে সাঙ্ঘাতিক ক্ষতি!

কিন্তু যা'ক্—ও নিয়ে মাথা ঘামানো বিফল। যে যা বুঝেছে, সে তাই-ই করে' যাক্—ফলে যা হয়, পরে হবে। আমার কিন্তু আজ ঐ সর্দ্দারের বিশ্বাসের কাছে হাজার বার মাথা নীচু করতে ইচ্ছে করছে। ঐ বিশ্বাসই সমাজের মেরুদণ্ড। থাক্—শিক্ষার অজস্র আলেয়া-আলো, তার চেয়ে মূর্খতার জমাট অন্ধকার ঢের বেশী বাঞ্ছনীয়—ঐ অন্ধকারের বুক হতেই নবারুণের কিরণ-শতদল ফুটে ওঠবার সম্ভাবনা আছে! আর আলেয়ায়?—কেবলমাত্র পথ-ভ্রান্তি আর বৃথা শ্রান্তি! দাও—দাও আমায় সাগরে দৃঢ়বিশ্বাস—চুলোয় যাক্ আমার শিক্ষার যত আবর্জ্জনা—আমি একবার নব্যশিক্ষিতদের মধ্য হ'তে মরে' পুনর্জ্জীবন লাভ করি। আর পারি না—স্তূপীকৃত মতবাদের উপলখণ্ডে ঘা খেয়ে খেয়ে হৃদয় যে ক্ষত বিক্ষত হয়ে পড়্‌ল! এবার ছুটতে চাই—সংশয়ের কঙ্করকঠিন অন্ধগুহায় জীবনটাকে আর নষ্ট করব না—করতে পারব না। এবার একেবারে সকলের বাইরে যেতে চাই—একেবারে মুক্ত হাওয়ায়, মুক্ত আলোয় অবগাহন করে' ধন্য হতে চাই। ঘনযবনিকার অন্তরালে, হে বধিরতম ভবিষ্যৎ, তুমি আমার জন্যে তোমার কোন রহস্য-কক্ষে সফলতার বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট একখানি মনোরম দৃশ্যপট কি রক্ষা করছ না?

গান

(মিশ্র—দাদ্‌রা)

সাগর যখন ডাক দিয়েছে,
থাকব না রে থাকব না,
গিরি-গুহার অন্ধকারে
বদ্ধ মোরে রাখ্‌ব না।
কঠিন শিলা ধসিয়ে দিয়ে,
চূড়ায় চূড়ায় লাফাইয়ে,
আপন মনে কল্‌কলিয়ে
নাম্‌ব—মানা মান্‌ব না।
হিমের দারুণ পরশ-ভারে
জড়িয়ে মোরে জমিয়ে মারে,
রবির কিরণ বরষ ধরে'
বারেক তরে যাচ্‌ব না।
খোলাখুলি আলো হাওয়ায়,
খোলা নভে, খোলা হিয়ায়,
পুলক মগন রইব সদায়,
ধার ত কারু ধারব না!

৬

যাত্রা-পথ

[১]

প্রান্তরে

(মধুর প্রবেশ)

মধু। কি অন্ধকার রাত!—কালো বাঘের মত হাঁ করে' এ যেন আমায় খেতে এয়েছে!—একটুও দয়া মায়া নেই?—অন্ধকার এত নিষ্ঠুর—এ'ত জানতাম না! এর গভীর অন্তস্থলে চোখ বিঁধিয়ে দিচ্ছি, তবু ভোরের কোন চিহ্নমাত্র দেখ্‌তে পাচ্ছি নি। সূর্য্যের আলোক-শিশুকে এ বুঝি গ্রাস করে' বসে' আছে? আমি চলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু অন্ধকার আমার দৃষ্টি আগ্‌লে বসে' থাক্‌ল! আমি কেমন করে' চলি?

আমি কোথায় আছি?—ঘরে না বাইরে? কিছুই ত ঠাওর করা যায় না, সব যে একাকার! উঃ শীতের কি কন্‌কনে হাওয়া—শরীরের সব রক্ত বুঝি জমে' গেল। একে অন্ধকার—তারপর শীত,—দুই-ই কি ভীষণ! এরা যুক্তি করে' আমার পায়ে শিকল বেঁধে দেবার আয়োজন করেছে। আমায় সাগর দেখ্‌তে দেবে না। কিন্তু এমন করে' সব সম্ভাবনা লোপ পেলেও, আমার সাগর দেখবার আশা ত লোপ পাচ্ছে না। আমি

তাকে দেখ্‌ব—দেখ্‌তে পাব—হৃদয়ের কাণে কাণে কে যেন অনবরত শুনিয়ে যাচ্ছে পাব—পাব, দেখ্‌তে পাব। এ অন্ধকার ঘুচে যাবে—এ শীতের হাওয়া সরে' যাবে,—পরিপূর্ণ আলো—বসন্তের সঞ্জীবনী সমীরণ-সুধা আমার জন্যে অপেক্ষা করে' বসে' রয়েছে! নিশ্চিত নিশ্চিত।

ও—কি?—পদশব্দ শোনা যাচ্ছে না? ঘাসের উপর অতি মৃদু-মধুর পদধ্বনি? এমন অন্ধকারে কে আস্‌ছে? মানুষ না পশু? মানুষই বটে! এমন তালে লয়ে বাঁধা ধীরোত্থিত পদশব্দ মানুষ ছাড়া আর কার হতে পারে? কে আস্‌ছে? কেন আস্‌ছে? কেউ চল্‌ছে না—এমন অন্ধকারে এ চলে' আস্‌ছে কেমন করে'? অই—নিকট হতেও নিকটতর!—অই—অই! কেগা এই অন্ধকারে? কই, উত্তর ত দিচ্ছে না? কে তুমি? একেবারে গায়ের উপর এসে পড়লে যে? বাঃ, কে—তুমি? বধির না কি? শুন্‌তে পাচ্ছে না!

[কেহই আসিবে না। পূর্ব্ব হইতেই অন্ধকারের আড়ালে একজন দাঁড়াইয়া থাকিবে, তাহার গায়ে নাড়া দিয়া]

ওগো, তুমি কে? উত্তর দিচ্ছ না কেন? শুন্‌তে পাচ্ছ না?

অপরিচিত। পাচ্ছি।

মধু। তবে বল—তুমি কে?

অপরিচিত। আমি কে!—কেমন করে' পরিচয় দেব?

মধু। কেন, তোমার নাম?

অপরিচিত। নাম কি আর আছে?

মধু। সে—কি? তুমি কি কর?

অপরিচিত। কি যে করি—তাও ত বল্‌তে পার্‌ছি নি।

মধু। ভাল—বেশ নতুন রকমের লোক দেখ্‌ছি ত! কোথায় যাচ্ছ তুমি?

অপরিচিত। কোথায়ও নয়।

মধু। বেশ!—এই যে তুমি এখানে চলে' এলে?

অপরিচিত। আমি এলাম?—না—তুমি এলে?

মধু। বাঃ আমি ত এখানেই দাঁড়িয়ে আছি! তোমারি ত পায়ের শব্দ শোনা গেল।

অপরিচিত। ভুল শুনেছ। ওটা আমার পায়ের শব্দ নয়। তোমারি পায়ের শব্দ পরের বলে' মনে হয়েছে।

মধু। আমার পায়ের শব্দ!!

অপরিচিত। হাঁ-গো-হাঁ, তোমারি পায়ের শব্দ। তুমিই ত চল্‌ছ—আমি ত আর চল্‌ছি নি।

মধু। আমি চল্‌ছি? ভীষণ অন্ধকার আমায় চল্‌তে দিচ্ছে কই? তবে চলবার ইচ্ছে আছে আমার।

অপরিচিত। ঐ ইচ্ছার তীব্রতাই তোমাকে চালাচ্ছে, তুমি বুঝ্‌তে পার নি।

মধু। এ ত বড় আশ্চর্য্য! আমি টের পাই নি, আর তুমি পেয়েছ?

অপরিচিত। না পেলে আর বল্‌ছি কি? আর এ টের-পাওয়াটা কঠিন কিসে? সাগরে যারা যেতে চায়, তারা এই প্রান্তরেই—এমন ভাবেই এসে উপস্থিত হয়ে থাকে।

মধু। সাগর?—সাগরে আমি যেতে চেয়েছি তাও তুমি বুঝ্‌তে পেরেছ?

অপরিচিত। পেরেছি—প্রান্তরে যখন এয়েছ।

মধু। তুমি—না—না তুমি নয়—আপনি এখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন—এই ভয়ানক অন্ধকারে?

অপরিচিত। দাঁড়িয়ে আমি আছি—এটা ঠিক। কিন্তু কখন কোন্ খানে তা'ত বল্‌তে পার্‌ছি নি।

মধু। কেন? এটা যে প্রান্তর তাত আপনিই বল্‌ছেন? আর অন্ধকার, তা কি আর আপনি দেখ্‌ছেন না?

অপরিচিত। প্রান্তর তোমার কাছে। অন্ধকার—সেও তোমার চোখে!

মধু। সে কিরূপ?

অপরিচিত। বুঝ্‌বে না। সাগর না দেখ্‌লে তা বোঝা যায় না।

মধু। আপনি তবে সাগর দেখেছেন? সাগরকে তবে দেখা যায়?

অপরিচিত। (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া) দেখ্‌তে চাইলেই দেখা যায়।

মধু। আমি দেখ্‌তে চাই। আপনি দেখাতে পারেন?

অপরিচিত। কিছু সাহায্য কর্‌তে পারি।

মধু। পারেন?

অপরিচিত। পারি বোধ হয়—যদি তুমি চল্‌তে চল্‌তে না থাম।

মধু। না—না থাম্‌ব না। আপনি আমায় দয়া করুন।

অপরিচিত। থাম্‌বে না?

মধু। না।

অপরিচিত। ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রপাত কত কি বিপদ আস্‌বে!—ভয় পেয়ে থাম্‌বে না?

মধু। আজকার মন নিয়ে বল্‌ছি—থাম্‌ব না।

অপরিচিত। কত সৌন্দর্য্য—কত মাধুর্য্য তোমায় পদে পদে আট্‌কে রাখ্‌তে চাইবে—তুমি সে সবে ভুল্‌বে না?

মধু। ভুলও যদি করি, তবে আপনার সাহায্যে সে ভুল ভাঙবে না কি?

অপরিচিত। ভাঙবে—যদি সাহায্য উপেক্ষা না কর।

মধু। সাগরের পথে যেতে সাহায্য কর্‌বেন আপনি, তাই কর্‌ব উপেক্ষা?—এ ত কখনই মনে হয় না।

অপরিচিত। তবে সম্মত হলাম।

মধু। অই যে চাঁদ উঠ্‌ছে! কৃষ্ণসুনিবিড় সুপ্ত গ্রামগুলোর গাছের আগা শাদা হয়ে উঠ্‌ল—এই যে চারদিকে কেমন আধ আলো,—আধ ছায়া! এইবার আপনাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি। আপনি এত সুন্দর!

অপরিচিত। আলো দেখ্‌তে পেয়েছ, তাই সুন্দর লাগ্‌ছে।

মধু। আপনাকে কি বলে' ডাক্‌ব?

অপরিচিত। যা খুসী—তাই বলে'।

মধু। তবে যখন যা মনে আসে, তাই বলে'ই ডাক্‌ব। সাড়া দিতে হবে কিন্তু।

অপরিচিত। বেশ, তাই ক'রো। (খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) একবার ভাল করে' তাকাও দেখি আমার দিকে। (মধু তাকাইল, তাহার কাঁধে হাত দিয়া) দেখ্‌তে পাচ্ছ ঐ সদ্যপ্রসূত জ্যোৎস্নাজ্যোতি? ঐ ধরে' চলে যাও—এই এদিকে। ও জ্যোৎস্নাও থাক্‌বে না,—নিভে যাবে। ভোরের অন্ধকার আস্‌বে, তা'ও থাক্‌বে না। তারপর উঠ্‌বে সূর্য্য—তখন রাস্তাটা দেখ্‌তে পার্‌বে ভাল করে'। সূর্য্য উঠবে, জ্বলবে, আবার অস্ত যাবে। আবার আস্‌বে রাত্রি—কখনও অন্ধকার, কখনও জ্যোৎস্না। আবার আস্‌বে দিন। এমন করে' দিন আর রাত্রির মধ্য দিয়ে চল্‌তে হবে—কতকাল, কে বল্‌বে? কিন্তু তারপর পড়্‌বে গিয়ে এমন জায়গায়—যেখানে দিনও নেই, রাত্রিও নেই, অথচ চির আলো উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। তেমন আলো

চোখে কখনও দেখনি। জান্‌বে তখনই সাগর তোমার অদূরে। যাও চলে' যাও, কোন ভয় নেই। যত কাঁদবে, তত পথ এগিয়ে যেতে পারবে। কান্নায় বিরাম দিয়ো না—দিতে পারবেও না যখন সাগরকে একবার প্রাণ দিয়ে দেখ্‌তে চেয়েছ! হাজার বৎসর ধরে' তর্পণ কর—বক্তৃতা কর, যা-ই কর না কেন—চোখের এক ফোঁটা জল না পড়্‌লে পথ কখনই দেখ্‌তে পাওয়া যায় না—তাই নানান্ পথের মুখে বসে'ও লোকে পথটা দেখ্‌তে পায় না। দেখ্‌তে পায় না বলে'ই কেবল জট্‌লা করে—চেঁচামেচি করে—কিন্তু চলে না! সবাই অটল ভাবে বসে' থাকে। বসে' থাক্‌বে না কেন? অত গলদ! ভিতরে গলদ—বাইরে গলদ! সেই গলদে তাদের পা রয়েছে আটকা!—কেমন করে' চলবে? কেউ কেউ বা জোর করে' বাইরের গলদ ভাঙতে চায়—কিন্তু ভিতরের গলদ আগে না ঘুচলে—বাইরের গলদ ভেঙে কি হবে? সাগর যারা দেখ্‌তে চায়, অমন জোড়াতাড়া, অমন লুকোচুরি—অমন চালাকী করলে ত আর তাদের পক্ষে চল্‌বে না! একেবারে সবদিকে ধোয়ামোছা তক্‌তকে ধপ্‌ধপে হতে পারলে, তবে সাগর দেখবার পথে চলা যায়।—নইলে সব ব্যর্থ আড়ম্বর - সব ভূয়ো—সব ফাঁকি!

তোমার বেদনা যখন জেগেছে, তখন আর ভাবনা নেই! চোখের জলে ধূলির ধূসরতা ধুয়ে মুছে ফেলো—চল্‌তে কোন বাধা পাবে না। (পিঠে হাত দিয়া) যাও—এগিয়ে যাও। ভয় কি?

[২]

লোকালয়ে

[মধুর প্রবেশ]

মধু। একি? আবার যে লোকালয়ে এসে পড়লাম! যেখান থেকে পরিত্রাণ চাই, পথ আমায় সেইখানেই টেনে আন্‌লে? ও কি ভীষণ জন কোলাহল!—ও কি প্রখর জনতা-স্রোত! ঐ যে হাট বাজারের দরদস্তুর চল্‌ছে—ঐ যে ধনীর ঘরে টাকার ঝন্‌ঝনানি—এই যে পাশের ঘরে নৃত্যরব—বিলাস-সঙ্গীতের অবিরল উচ্ছ্বাস! এ কোথায় এলাম?

বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি—হিংস্রকের গুপ্ত ছুরিকা এখানে চক্‌মক্ করে' উঠ্‌ছে—ক্রোধীর আরক্ত চক্ষু কট্‌মট্ করে' চেয়ে আছে—লোভীর রসনা লক্ লক্ করছে—কামুকের রক্তগণ্ড নেশায় ভরপুর! না—না এখানে থাকা নয়! আমার মনটাকে এরা চারদিক হতে টুক্‌রো টুক্‌রো করে' ফেল্‌তে চাচ্ছে! এখান হতে পালানই শ্রেয়ঃ। কিন্তু এ কি?—পালাতে চাইলেই এরা আরও ঘিরে' দাঁড়ায় যে! এ কি বিঘ্ন! এরা আমায় চল্‌তে দেবে না? না—আমি চল্‌বই চল্‌ব। কে আমার পথ আটকায় দেখা যাক্। (কিছু দূর অগ্রসর হইয়া) ঐ যে কতকালকার পরিচিত মুখচ্ছবি সব উঁকি মারছে! ঐ যে বাল্যকালের হরি, রামা, নন্থ—ঐ যে বীণু, শ্যামা, ললিতা—ঐ যে বিশে রাখাল, গোপাল গোয়ালা, মাধব মুদী—ঐ যে কেষ্টা চাকর—বিধু ঝি, কত-না পুতুলখেলা, কত লুকোচুরী, কত লাফালাফি, কত-না আষাঢ়ে গল্প! ঐ যে দিদিমার আদর—বাবার শাসন—গুরুমশাইয়ের ভয়! ঐ যে পরিণত বয়সের কত বন্ধু—বঙ্কিম,

চঞ্চলকুমার, নিবারণদা, ঐ যে নিজের সৃষ্ট কত না কর্ম্মজাল, কত অধ্যয়ন, কত অধ্যবসায়! বেশ লাগ্‌ছে! আমার প্রীতিকে এরা কত না উপায়ে গ্রহণ করেছে—এদের কথা কি ভোলা যায়? কি সুন্দর এরা! কি মধুর এরা!

না—না এ কি কর্‌ছি? আমি যে দাঁড়িয়ে গেলাম! এমন কর্‌লে ত সাগর দেখা ঘট্‌বে না। এরা সব গুলোই আমার পথের বিঘ্ন। ঠেলে ফেলে দিতে হবে—ঠেলে ফেলে দিতে হবে—এ সবে মন দিলে আর চল্‌বেনা। এতদিন ত এদেরেই মুখ্য করে' জীবনে মেনে নিয়েছিলাম, সাগর ছিল গৌণ। কিন্তু যে সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাকে গৌণ করে' রাখ্‌লে, সে কি আর দেখা দেয়? ঐ অচলদেব, ঐ নবীনচন্দ্র তাই এখনও তার সন্ধান বল্‌তে অক্ষম। সংসারকে গৌণ করে' সাগরকে মুখ্য না করলে—কখনই তার পথে চলা হবে না। আমি যখন চল্‌তে চেয়েছি, তখন আর থামা নয়। সাগর—সাগর, তুমি আমার সব হৃদয়টাকে দখল করে' বস। এমন করে' দখল কর, যেন আর কিছু সেখানে ঢুক্‌তে না পায়!

গান

(ভৈরবী—কাওয়ালী)

হৃদয় দিতে চেয়েছিলাম,
দেইনি আলস ভরে,
আপন মনের স্বপন নিয়ে,
দূরেই আছি সরে'!
কত শত সুখের সাথে,
কত সুখের বেদনাতে
দিবস গেছে কাটি,
রসের ভিয়ান নানান মতে,
করেছি গো আপন মতে,
ভরেছি এই বাটি—
সেই রসে আজ পা ডুবেছে,
ছাড়াই কেমন করে'?
ডাগর পরাণ ওগো সাগর,
বসে'ই আছ চিরজাগর,
দেখিছ মোর খেলা,
গুণ গুণিয়ে কেমন করে',
জীবনের এই বরষ ধরে'
ভাসাই শুধু ভেলা!—
ভুল করেছি!—ভুল ক'রোনা,
দখল কর মোরে।

[৩]

বন-পার্শ্বে

[মধুর প্রবেশ]

মধু। পথ চল্‌তে আরম্ভ করে' এ কোথায় এসে সন্ধ্যা হল! সাম্‌নে ঐ যে বিরাট বন দেখ্‌তে পাচ্ছি। বনের ছায়ায় অন্ধকার এসে মিশল—এখন কি করি? কই পথ কই? তার রেখা পর্য্যন্ত মিলিয়ে গেল যে! দেখি ভাল করে'। (এ দিক ও দিক পরিক্রমণ)—না—না—পথ ত আর দেখা যাচ্ছে না। কেমন করে' চলি? হায়, হায়, এবার বুঝি এখানেই ঘুরে মরতে হল! পথ বুঝি আর নেই! এখানেই বুঝি পথের শেষ! তাঁর কথায় এতদূর চলে' এসেছি—কিন্তু এ যে ঠিক পথে এসেছি, তার নিশ্চয়তা কি? বুঝি আগাগোড়াই ভুল হয়ে গেছে রে—অগোগোড়াই ভুল! অপরিচিতের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে' কি মূর্খতার কাযই না হয়েছে! সব ভুয়ো!—সব ভুয়ো! সাগরে যাওয়ার পথ কেউ জানে না! সকলেই সকলকে ঘুরিয়ে মারছে। হয় ত সাগরই বুঝি নেই রে, তাই এত গণ্ড গোল! আমার সব হাঁটা মিথ্যা, আমার লক্ষ্যটা মিথ্যা—আমার জীবনটাই একেবারে মিথ্যা হয়ে পড়ল? আজ সমস্ত অন্তরের আক্রোশ দিয়ে

বল্‌তে ইচ্ছে করছে—সব মিথ্যা—সাগর মিথ্যা—সাগরে যাওয়ার পথ যারা বলে' দেয় —তারা মিথ্যা! সব মিথ্যা!

ওগো অপরিচিত, ওগো ভণ্ড, ওগো নিষ্ঠুর, আজ তুমি কোথায়? আমায় এমন করে' পথ ভুলিয়ে মারবার কি দরকার ছিল তোমার? আমি ত তোমার কোন অনিষ্ট করি নি! তুমি আমায় পথ বলে' দিলে—আমি বিশ্বাস করে' নিলাম—কেন করলাম? —তোমার মূর্ত্তিটি দেখেছিলাম বড় সুন্দর,—উদ্ভাসিত জ্যোৎস্নার মধ্যে স্থির বিদ্যুতে গড়া তোমার দেহখানি—দেখে মনে হল—এই-ই আমায় ঠিক পথ বলে' দেবার উপযুক্ত লোক। ভুল করেছি—ভুল করেছি। এঁ্যা, সত্যই কি ভুল করেছি? অমন সৌন্দর্য্য যার, তার মধ্যে কি কুটিলতা থাক্‌তে পারে? না-না, ভুল করি নাই। না—না, ভুল করেছি। না—না, কি করেছি, তাই-ই ভাল করে' বুঝ্‌তে পার্‌ছি নি।

ও—কি!—বনের মাথায় আগুন জ্বলে' উঠ্‌ল কেন? ওঃ—চাঁদ উঠ্‌ছে! যাক, বাঁচা গেল, অন্ধকারে আর ত অন্ধ হয়ে' থাক্‌তে হবে না। যদি পথ থাকে, তবে তাও একটু ভাল করে' দেখে নেওয়া যাবে। (ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ) এই যে পথ আছে! তার রেখাটা কিছু ধরা যাচ্ছে। ও কে পথের উপর বসে'? এমন বিজনতার মধ্যেও জীবনের স্পন্দন! কেগো তুমি?

অপরিচিত। [অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন হইয়া পূর্ব্ব হইতেই বসিয়া থাকিবে] ভণ্ড—নিষ্ঠুর।

মধু। এঁ্যা—আপনি? আপনি এখানে বসে' রয়েছেন, তবু আমাকে সাড়া দেন নি?

অপরিচিত। দেখ্‌ছিলাম তুমি কি কর।

মধু। বড় অপরাধ হয়ে গেছে—আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম। আমাকে ক্ষমা করুন, (অপরিচিতের পদধারণ) ক্ষমা করুন।

অপরিচিত। পা ছাড়—পা ছাড়। ও কি কর?—পাগল হয়েছ!- তোমার দোষ কোথায়? ও ভুল যে করবেই—অমন সবাই করে' থাকে।

মধু। না—না দোষ হয়েছে। আমায় ক্ষমা নয়—শাস্তি দিন।

অপরিচিত। শাস্তি? হাঁ দিচ্ছি। (মধুর শিরশ্চুম্বন) কেমন,—হল?

মধু। এবার থেকে আপনি আর দূরে থাক্‌বেন না। দূরে থাক্‌লেই যত বিপদ।—আবার হয়ত কি সাঙ্ঘাতিক ভুল করে' বস্‌ব!

অপরিচিত। দূরে কোথায়?—নিকটেই ত রয়েছি। দূর মনে কর কেন?

মধু। কই, দেখ্‌তে যে পাই না!

অপরিচিত। ভাল করে' দেখনা, তাই দেখ্‌তে পাও না।

মধু। কেমন করে' ভাল করে' দেখা যায়?

অপরিচিত। আপ্‌নিই তা বুঝ্‌তে পার্‌বে।

মধু। বুঝ্‌তে পার্‌ব?

অপরিচিত। পার্‌বে।

মধু। তবে আশীর্ব্বাদ করুন আপনার উপর আমার বিশ্বাস যেন অটল হয়।

অপরিচিত। অটল করতে চেষ্টা কর্‌লেই অটল হবে।

মধু। তবু আশীর্ব্বাদ করবেন না?—কি ভয়ানক লোক আপনি!—আপনাকে বুঝ্‌তে পারলাম না,——আপনি এখনও আমার অপরিচিত!

অপরিচিত। পাগল—একেবারেই পাগল! বড় কষ্ট হচ্ছে তোর—না রে? কষ্ট ত হবেই। শুয়ে বসে' আরাম করে' কি আর সাগর দেখা যায়? কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র—কত

বৃহৎ বৃহৎ বাধা এসে সাম্‌নে দাঁড়ায়!—কোনটা আসে ভীষণ বেশে, কোনটা আসে মোহন রূপ ধরে', কিন্তু কোনটার কাছেই মাথা নোয়াতে নেই—সকলের সঙ্গেই লড়াই কর্‌তে হয়—আর সাহস রাখ্‌তে হয়,—রণে ভঙ্গ দেব না, জয়লাভ কর্‌বই কর্‌ব। সত্যই তাহ্‌লে জয়লাভ কর্‌তে পারা যায়।

মধু। সে কি আমার শক্তিতে কুলোবে? আমি যে বড়ই দুর্ব্বল!

অপরিচিত। সে কি রে?—নিজকে অত দুর্ব্বল ভাবিস কেন? এই যে এতটা বাধা ঠেলে চলে' এলি, কেমন করে' এলি, বল্ ত?

মধু। তা'ত বুঝ্‌তে পারি নি।

অপরিচিত। নিজের শক্তিতেই এসেছিস্।

মধু। আমার শক্তি? না—না এটা আপনারি দয়া!

অপরিচিত। পাগল!

মধু। তা যাই-ই বলুন, আমার কিন্তু বিশ্বাস, আপনার দয়া ছাড়া আমার এক পাও নড়্‌বার সামর্থ্য নেই। তাই ভয় হয়, কখন কি অপরাধ করে' সেই দয়া হ'তে বঞ্চিত হয়ে পড়ি!

অপরিচিত। আর ভয় কি রে? দুর্গম পথ ত প্রায় ফুরিয়ে এল, এখন জোর করে' চলে' যা।

—০—

[৪]

ঝরণা-তলে

[গাহিতে গাহিতে মধুর প্রবেশ]

গান

(পিলু্ বাঁরোয়া—যৎ)

ঐ ঘর-ছাড়া
মোরে করেছেরে ঘর-ছাড়া!
আজ পথের নেশা ধরিয়ে দিয়ে,
পথে এনে দেয় না সাড়া।
পুঁজি-পাটা বসন-ভূষণ মোর
হাত পেতে সে চেয়ে নিয়ে,
পরিয়ে দিল ডোর,
কাঙাল করি কেমন করে'
কাঁদিয়ে মারে চোখ-তাড়া!
যতই তাহার নিঠুর ব্যভার পাই,
ততই তারে গভীর ভাবে
বুকের কাছে চাই
তাই আদর্শনে এমন আমার
হৃদয়মাঝে দেয় নাড়া!
বন-মরু-মাঠ কত নগর গাঁয়,
পথ যে আমায় দিবানিশি
ঘুরিয়ে মারে হায়!
তার শেষ-সীমানা পাই না কেন,
হলাম কিরে দিক্‌হারা?

ওগো অপরিচিত, ওগো সুপরিচিত, ওগো নিষ্ঠুর, ওগো করুণ, ওগো শত্রু, ওগো মিত্র, ওগো আমার কি-যেন-কি, আজ তোমায় দেখ্‌তে বড় ইচ্ছে কর্‌ছে। তুমি বলেছ, তুমি কাছেই থাক, ভাল করে' চাইলেই তোমাকে দেখা যায়। আমি ত চাচ্ছি, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি কই? তবে বুঝি এ চাওয়াটা ভাল করে' চাওয়া হচ্ছে না! কেমন করে' ভাল করে' চাইতে হয়, আমায় শিখিয়ে দাও—আমি তোমায় প্রাণ ভরে' দেখি। তুমি এত সুন্দর!—এত মধুর!—তোমায় না দেখে থাকা যায়? সাগর কোনদিন দেখিনি, কোনদিন দেখ্‌তে পাব কি না, তা'ও জানি নি। কিন্তু তোমায় দেখেছি—আমার চোখে, মনে কি অপরূপ অঞ্জন লেগে গেছে!—তাই মুহূর্ত্তমাত্র তোমাছাড়া থাকৃতে সাধ হচ্ছে না। (খানিকটা গমন)

এই যে একটা ঝরণাতলায় এসে উপস্থিত হওয়া গেল। কত বনজঙ্গল মাঠ পেরিয়ে,

কত কত প্রাণহীন নগরীর সৌধশ্রেণী ছাড়িয়ে, কত কত নির্ব্বাক্ জনপদের শ্যামলতা এড়িয়ে, কত বিরাট মরুভূমির মারাত্মক শুষ্কতা সহ্য করে' এসেছি। বড়ই ক্লান্ত, তৃষার্ত্ত হয়ে পড়া গেছে। এখন ঝরণাতলায় খানিকটা বিশ্রাম করা যাক্। (উপবেশন) আঃ শরীরটা জুড়িয়ে গেল!—কেমন মিঠে ঠাণ্ডা হাওয়া এখানকার! আর পিপাসাও বুঝি থাক্‌ল না!

ওগো প্রাণ-প্রিয়, এখন একবার দেখা দাও। দুঃখে তোমায় ডেকেছি—কখনও দেখা পেয়েছি, কখনও পাই নি, আজ এই শান্তিতে তোমার সঙ্গ কত সুখের হয়, জান্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে। দেখা দাও— দেখা দাও।

এ-কি! সমস্ত ইন্দ্রিয় যে শান্তির রসে অবশ হয়ে পড়্‌ছে! চোখ যে আর তুল্‌তে পার্‌ছি নি! আঃ একটু ঘুমোই। (শয়ন ও মুদিত নেত্রে) এই যে বন্ধু আমার এসে দাঁড়িয়েছে! বেশ!—বেশ! দাঁড়াও, দাঁড়াও, তোমাকে ভাল করে' দেখে নি। অনেকদিন দেখা দাও না, আজ ভেসে উঠেছ—একেবারে মেঘমুক্ত আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ! আর কি চোখ ফেরাতে পারি? দাঁড়াও—দাঁড়াও, সরে' যেয়ো না—দাঁড়াও। ওগো অপরিচিত, বহুদিনের না দেখায়, তোমার পরিচয় ত মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পেয়েছি—মনে হয়েছে, তুমিই আমার সব। কিন্তু তবু এখনও তোমায় ভাল করে' চিন্‌তে পারিনি—তুমি যে বড় রহস্যময়!—এখনও ভুল কর্‌বার আশঙ্কা আছে। দাঁড়াও—দাঁড়াও, তোমার স্মিতহাস্যে আমার সমস্ত আশঙ্কা ছিন্ন করে' নি। (খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া)

কই—কই? বন্ধু, কোথায় গেলে তুমি? এইযে এইমাত্র তোমায় দেখ্‌তে পেলাম—আবার লুকোলে কেন? একেবারে সব শূন্য হয়ে গেল যে! * * * ও আবার কার মূর্ত্তি ভেসে উঠ্‌ল? এমন বিরাট বিশাল বপু ত কখন দেখিনি! ও কি রাগরক্ত চোখ! ওকি ভীষণ ভ্রূকুটি! ও কি বিস্ফারিত নাসা! কার এ রুদ্র মূর্ত্তি? ও—ও! এযে একেবারে মূর্ত্ত বিপদ!—একেবারে মূর্ত্ত মরণ!—প্রলয়ঙ্কর বদন ব্যাদান করে' গ্রাস কর্‌তে আস্‌ছে—আমায় গ্রাস করে' ফেল্‌বে—চরাচর গ্রাস করে' ফেল্‌বে—ও—ও—গেলাম, গেলাম—হৃদয়-বন্ধু, কোথায় তুমি? এস-এস—রক্ষা কর। একি! মূর্ত্তিটার মুখ যে আমার বন্ধুরই মত! এযে বন্ধুরই মুখ! এঁ্যা, বন্ধু আমার এত ভীষণ? বেশ-বেশ! তবে ত আর ভয় নেই—আমার বন্ধু, সে ভীষণ হোক—যেমন হোক—সে আমারি বন্ধু! এই যে ভীষণ রূপ ঝরে' পড়ে গেল! বন্ধু আমার যেমন, তেমন করে'ই দাঁড়িয়েছে—কি সুন্দর!

(খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া)

বন্ধু, এ আবার কি হল? তুমিই যে পথ হয়ে আমার সাম্‌নে বিস্তীর্ণ হয়ে পড়্‌লে! ও—কি? তুমিই যে গলে' গলে' সুনীল আকাশের মত তরঙ্গায়িত কি যেন-কি হয়ে পড়্‌ছ! এ কি পরিবর্ত্তন! একি মনোহর বিস্ময়! না—না এটা ভ্রান্তি! তুমি এ-নও—তুমি ও-নও—তুমি—তুমি! যেমন করে' আমার মন মাতিয়েছ, তোমায় তেমন করে' দেখ্‌লেই আমার ভাল লাগে! তেমন করে'ই আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়াও।

এই যে দাঁড়িয়েছ! বেশ—বেশ! আমার কথা তবে তুমি শুনে থাক? শুন্‌বে না কেন? আমারই ত তুমি—তোমারি ত আমি, না শুন্‌লে চল্‌বে কেন? তুমি গোপনে গোপনে আমার অস্থিচর্ম্মে প্রবেশ করেছ, তুমি গোপনে

গোপনে আমার শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হয়েছ, তুমি গোপনে গোপনে আমার সবটা দখল করে' নিয়েছ। এখন আমি ডাক্‌ছি—তুমি শুন্‌বে না!—এ কি কখন হয়? আমার মর্ম্মের ডাক, সে বুঝি এখন তোমারি ডাক। আর কি তুমি আমায় প্রত্যাখ্যান কর্‌তে পার? এখন একবার ভাল করে' তাকাও দেখি,—তোমার স্নিগ্ধ নয়নের মধ্য দিয়ে আমার হৃদয়ের সত্যকারের ছবিটা দেখে জীবন সার্থক করি!

—*—

[৫]

গিরি-গাত্রে

[বন্ধুসহ মধু]

মধু। ভিতরে 'আপনি'র বেড়া ভেঙে গেছে। তাই বাইরেও সেটা ভেঙে দিলাম। আজ আপনি—আমার তুমি। বন্ধু, আজ আর আমার আনন্দের সীমা নেই। তোমার কাছে কাছে থাক্‌তে পাচ্ছি, এর চেয়ে সৌভাগ্য আর আমার কি হতে পারে? কাছে—এত কাছে যে অনেক সময় মনে হচ্ছে তুমি আমি এক হয়ে গেছি!—শরীরের ব্যবধানও বুঝি নেই!

তোমায় কাছে পেয়েছি বলে'ই আজ নির্ভয়ে সকল দিকে দৃষ্টি দিতে পারছি। এই যে চারদিককার তরুলতায় জীবনের সরসতা—শ্যামলতা! এই যে চরাচরে—জড়েজীবে মিলনের অদ্ভুত-আনন্দ! বুঝ্‌তে পার্‌ছি—বসন্ত এয়েছে। তার গোপন আবির্ভাবে স্থাবর জঙ্গমে আনন্দের বিচিত্র লীলামাধুর্য্য। আজ এই আনন্দে—এই মিলনের মাধুর্য্যে অবগাহন করে' ধন্য হলাম। কোথা হতে অদৃশ্য ফুলরাশির সৌরভ ভেসে আস্‌ছে? প্রাণটা মাতাল হয়ে উঠ্‌ল, দেখ্‌ছি! কোথায় বাজ্‌না বাজ্‌ছে না? কেমন মধুর বাজ্‌না! কাণ পেতে কেবল শুন্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে। বন্ধু, বড় সুন্দর জায়গায় আমাকে এনে ফেলেছ!

ঐযে এ কেমন আলো এখানে ফুটে উঠ্‌ল? এমন আলো ত চোখে কখনও দেখি নি! এ কিসের আলো?—সূর্য্যের? না—না, সূর্য্যের আলো ত এত স্নিগ্ধ নয়! এ কি চন্দ্রের আলো? না—না, চন্দ্রের আলোত এত শুভ্র নয়! বন্ধু, এ কি আলো? কিসের আলো?

বন্ধু। এই আলোর কথাই পূর্ব্বে বলেছিলাম।

মধু। এই আলোয় আজ নিকট, দূর দূরান্তর সব পরিষ্কার হয়ে দেখা দিচ্ছে। এদিকে এই পর্ব্বতের সানুদেশে, যেখান দিয়ে আমি চলে' এসেছি, সব সুন্দরভাবে দেখা যাচ্ছে। সেখানে চলবার সময় কত উঁচু-নীচু, খালখন্দ, কত ভেদ-ব্যবধান দেখা গিয়েছিল, এখন এখান হতে, এই আলোর সাহায্যে দেখ্‌তে পাচ্ছি, সব এক রকম, কোথাও কোন ভেদ নেই, উঁচু নীচু সব সমান! বন্ধু, দেখ ত এদিকে, বল ত, আমার দেখাটা ভুল হল কি না?

বন্ধু। ভুল হবে কেন? ঠিকই দেখেছিস্। এখানে উঠে, এই আলো পেয়ে ঐরূপই দেখা যায়। এখানে না উঠে যারা অমন দেখার কথাটা বলে, তাদের সেটা কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই সেটা ভাঙতেও বিলম্ব হয় না। এই আলোকে ভিতর-বাহির সব একাকার করে' দেয় রে—সব একাকার করে' দেয়! এ আলোর দেখা ভাঙে না, কখনও ভাঙে না! উঠে চল্, উঠে চল্—আরও কত কি দেখ্‌তে পাবি। এখানেই দাঁড়িয়ে যাস্ নি। সাগর দেখ্‌তে হবে—সাগরে সাঁতার

খেল্‌তে হবে—সাগরে ডুব্‌তে হবে—নাইতে হবে। তারপর পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের আনন্দে ফিরে যেতে হবে আবার সেই উল্টাডাঙার রাজপথে। সেটা ঠিক ফেরা নয়, আপাতত ফেরা বলে'ই বল্‌তে হল।

তুই যেমন কেঁদেছিলি, তেমনি কত কত তৃষার্ত্ত—কত কত দুঃখদৈন্য মলিনতায় আচ্ছন্ন—কত কত স্বাস্থ্যহীন—শক্তিহীন—লাবণ্য-হীন সাগরের জন্যে কেঁদে মর্‌ছে। তাদের কাছে ফিরে না গেলে চল্‌বে কেন? এই পথের বার্ত্তা—আনন্দের সন্ধান তাদিগকে দিতেই হবে—নইলে তোর নিজের শান্তিই অসম্পূর্ণ হ'য়ে থাকবে যে!

মধু। সে কি বন্ধু! আবার উল্টাডাঙা? আবার প্রত্যাবর্ত্তন? আবার জনকোলাহল?

বন্ধু। হাঁ, আবার সবই—কিন্তু নতুন ধরণে। ভয় নেই—এবার আর তোর বিক্ষেপ আস্‌বে না।

মধু। না—না আমায় এমন আদেশ ক'রো না।—আবার লোকসংসর্গ? বেশ চলেছি—নিজের আনন্দে! এ হতে আমায় বঞ্চিত হতে ব'লো না। বড়ই ভয় হয়।

বন্ধু। বল্‌ছি ভয় নেই। সাগরে সাঁতার কাটলে কি আর ভয় থাকে রে? যে পূর্ণতা অর্জ্জন করে' তুই ফির্‌বি, উল্টাডাঙায় এমন কি আছে যে তার ক্ষতি কর্‌তে পারে?

তুই জানিস্ নি, প্রায় সকলকেই এমন করে' ফিরতে হয়। কেউ হয়ত অল্প দিনের জন্যে ফেরে, কেউ হয়ত ফেরে বেশী দিনের তারপর হঠাৎ কোনদিন তারা সাগরে এমন ডুব মারে যে আর তাদের খোঁজ পাওয়া যায় না!

আচ্ছা, মনে করে' দেখ্‌ত, কারু কাছে ঠিক পথের বার্ত্তাটি না পেলে তোর কি দশা হ'ত?

মধু। বুঝ্‌লাম। তোমার যা ইচ্ছে—তাই-ই হবে।

[উভয়ের আরও উচ্চে আরোহণ]

মধু। বাঃ বাঃ ঐ দিক্‌কার দিগন্তের দৃশ্যটি ত বড় চমৎকার!—এমন অবাধ বিস্তার, এমন উন্মুক্ত দিক্‌চক্র ত কখনও দেখি নি! ওর সারা বুকটা জুড়ে এ কি প্রবল ধূধূর খেলা! আলোর ধূধূ!—সৌন্দর্য্যের ধূধূ! মাধুর্য্যের ধূধূ! গাম্ভীর্য্যের ধূধূ!—সব ধূধূময়! চোখ যে একেবারে ধূধূর নেশায় জড়িয়ে গেল!

বন্ধু, বন্ধু, শোন ত একবার—ঐ নির্ব্বিকার দিগন্তের হৃদয় ভিন্ন করে' একটা, গর্জ্জন ভেসে আস্‌ছে না?—একটা ভীষণ মধুর গর্জ্জন? শোন—শোন, কি অবিরলোত্থ গর্জ্জন! যে বাতাসে ঐ বিপুলধ্বনি ভেসে আস্‌ছে, তাতে কি প্রাণস্নিগ্ধকর শৈত্য! এ-কি!—আমার সারা অঙ্গে স্বাস্থ্যের লাবণ্য ফুটে উঠ্‌ল যে!—একি আমি এমন শক্তিমান হয়ে উঠ্‌লাম কেমন করে'?—এ কি বিরাট বীর্য্য—এ কি বিপুল শান্তি—এ কি গভীর আনন্দ আমার মধ্যে আবির্ভূত হচ্ছে!—বন্ধু, বন্ধু, সাগর কি তবে ঐ?

বন্ধু। ঐ—ঐ! আরো ওঠ্—আরে যা।

শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী

বর্ত্তমান জগৎ

(চতুর্থ ভাগ)

স্বাধীন এশিয়ার রাজধানী

(২৩৫ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

৭। নেভ্যাল মিউজিয়াম

হোটেলের অতি নিকটেই "নেভ্যাল মিউজিয়াম" বা নৌসংগ্রহালয়। একটা খাল পার হইয়া মিউজিয়ামে প্রবেশ করিলাম। গৃহের চারিদিকে বাগান—অট্টালিকা আধুনিক ধরণের। বাগানের চারিদিকে পোর্ট আর্থারে লুণ্ঠিত রুশ কামান টর্পেডো এবং জাহাজের অংশ-বিশেষ সাজান রহিয়াছে।

সংগ্রহালয়ের ভিতরও এইরূপ বহু trophy দেখিতে পাইলাম। ওসাকার কারখানায় প্রস্তুত কামান, গোলা ইত্যাদির সংগ্রহ মন্দ নয়। চীনা সংগ্রামে লুণ্ঠিত দ্রব্যের সংখ্যা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ষোড়শ-শতাব্দীতে জাপানীরা কোরিয়া আক্রমণ করিতে যাইয়া বিফল হয়। সেই সময়ে ব্যবহৃত জাহাজের নমুনা মিউজিয়ামে রহিয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় তৃতীয় শতাব্দীতে রাণী জিঙ্গো কোরিয়া দেশ জাপানের অধীন করেন। সেই বিজয় কাহিনীর কোন নিদর্শন "মিলিটারী মিউজিয়ামে"ও নাই এখানেও দেখিলাম না।

কতকগুলি বন্দর, পোতাশ্রয়, ডক্‌ইয়ার্ড ইত্যাদির নক্সা ও মডেল কোন কোন প্রকোষ্ঠে প্রদর্শিত হইতেছে। পোর্ট আর্থারের জলযুদ্ধ ও স্থলযুদ্ধ বুঝাইবার জন্যই কয়েকটা ঘর বিশেষভাবে রক্ষিত। মানচিত্র, মডেল ইত্যাদি দেখিলে সকলেই যুদ্ধের ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য সহজে বুঝিতে পারে। জাপানীরা কোথায় কতগুলি নিজেদের মালের জাহাজ ডুবাইয়া রুশ-রণতরীর পথ অবরুদ্ধ করিয়াছিল তাহা বেশ সুন্দর ভাবে দেখান হইয়াছে। একজন চিত্রকর রুশ যুদ্ধের কতকগুলি চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। নেপোলিয়ানী সমরের যুগে ফরাসী চিত্রকরেরা এইরূপ সুকুমার শিল্পে সুদক্ষ ছিলেন। তিনটি চিত্রের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে (শিল্পীর নাম টোজে):—

1. The Battle of Port Arthur A. m. March 10, 1904.
2. The Bambardment of Port Arthur. August 19, 1904.
3. The Battling up of Port Arthur.

কয়েকটা গৃহে তড়িতের যন্ত্র বহুবিধ দেখা গেল—বর্ত্তমান সমুদ্র-যুদ্ধ এবং অর্ণবযানের জটিল কলসমূহের প্রদর্শনী-গৃহ স্বরূপ এই ঘরগুলি ব্যবহৃত হয়। মিউজিয়ামের পার্শ্বেই নেভ্যাল কলেজ—এই মিউজিয়াম ছাত্রগণের ল্যাবরেটরী।

মিলিটারি মিউজিয়ামে দেখিয়াছি সেদিনকার জার্ম্মাণ-যুদ্ধে ব্যবহৃত আকাশযান জাপানীরা ইতিমধ্যেই সংগ্রহালয়ে তুলিয়াছেন। নেভ্যাল মিউজিয়ামেও জার্ম্মাণ উপনিবেশ এবং দ্বীপপুঞ্জের trophy সমূহ রক্ষিত হইতেছে।

রুশ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া জাপানীরা ইংরাজের নেপোলিয়ান ধ্বংসের গৌরব অনুভব করিতেছে। সেনাপতি নোগি জাপানের ওয়েলিংটন, এবং য়্যাডমিরাল টোগো ইহাদের নেল্‌সন। ১৯০৫ সালের ২৭ মে তারিখে বেলা ১-৫৫ মিনিটের সময় টোগো চিরস্মরণীয় জয়লাভ করেন। তিনি যে জাহাজে বসিয়া সমগ্র নৌবিভাগের পরিচালনা করিতেছিলেন তাহার নাম "মিকাসা।" নেভ্যাল কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকগণ ২৭ মে তারিখে উৎসব করিয়া থাকে। মিউজিয়ামের একগৃহে জাপানী নেল্‌সনের "ফ্ল্যাগ্‌শিপ" ঝুলান রহিয়াছে।

মধ্যযুগের কয়েকখানা রণতরীর নমুনা ও চিত্র একগৃহে দেখিতে পাইলাম। একটা জাহাজ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে :—"The Ataka Maree was the biggest war-galley possessed by shogun before the new Navy was established. Her dimensions were 180 ft. long, 63 ft. broad and 22 ft. deep and proplled by 130 oars. She mounted five guns besides numerous small arms and the vital parts of the ship were protected by copper sheets."

বর্ত্তমান রণতরীর তুলনায় এই জাহাজ একখানা পান্সী বা বজরা মাত্র! চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে জাপানীদের এই অবস্থা ছিল। অথচ আজ জাপানের হস্তে প্রশান্ত মহাসাগরের আধিপত্য—ইয়াঙ্কিরা জাপানী রণতরীর ভয়ে অস্থির—ইংরাজও আশঙ্কিত!

জলযুদ্ধে আজকাল শত্রুপক্ষীয় টর্পেডো-সমূহের আক্রমণই বিশেষ ভীতিজনক। এই যন্ত্রগুলি জলের ভিতর লুক্কায়িত থাকে—এবং অলক্ষ্যে আসিয়া বহু ব্যয়সাধ্য বিরাট জাহাজগুলিকে এক নিমেষের মধ্যে রসাতলে পাঠাইয়া দেয়। কাজেই টর্পেডো ধ্বংস করিতে পারা বর্ত্তমানকালে অত্যন্ত আবশ্যক। গাইড কয়েকটা আল্‌মারির নিকট লইয়া গিয়া বলিলেন—"এই যে পদক, পেয়ালা, ফুলের বাটি ইত্যাদি দেখিতেছেন এগুলি প্রাইজ বা পুরস্কার। যে সকল নাবিক টর্পেডে ধ্বংস করিতে কৃতিত্ব দেখায় তাহারা নৌবিভাগ হইতে এই সকল পুরস্কার পাইয়া থাকে।"

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ইয়াঙ্কি নাবধ্যক্ষ পেরি জাপানে আগমন করেন। তখন জাপানে শোগুণী আমল। ইয়াঙ্কিদিগকে এবং অন্যান্য "ম্লেচ্ছ"গণকে জাপানে বসতিস্থাপন এবং বাণিজ্য বিস্তার করিতে দেওয়া হইবে কি না এই বিষয়ে দুই দল জাপানে দেখা দিল। শেষ পর্য্যন্ত মিকাডোর অনুমতি না লইয়াই শোগুণ পেরিকে দরবারে আহ্বান করিলেন। পেরির জাপানী দরবারে আগমন একটা সমসাময়িক চিত্রে অঙ্কিত রহিয়াছে। মিউজিয়ামে তাহা দেখিলাম। ক্লাইব মুর্শিদাবাদের নবাবের নিকট "দেওয়ানী"র সনন্দ লাভ করিবার সময়ে যে ভাবে দরবারে উপস্থিত ছিলেন তাহার এক চিত্র ভারতবর্ষে দেখিয়াছি। সদলবল পেরি চিত্র দেখিয়া সেই কাহিনী মনে পড়িল। দুই ঘটনায় প্রায় ১০০ বৎসরের ব্যবধান।

জাপানীরা বহুকাল পর্য্যন্ত সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া "গৃহে চ মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ" ভাবিতেছিলেন। বিদেশীয়গণকে ম্লেচ্ছ জ্ঞান করা তাহাদের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল। অবশেষে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে সাত

আটজন জাপানীকে ইয়াঙ্কিস্থানে পাঠান হয়। এই কয়জন নব্য জাপানীর চিত্র দেখা গেল। ইহারা তখনও ম্লেচ্ছ পোষাক ধরে নাই—ইহারা হিন্দু মতেই খাঁটি স্বদেশী ভাবে সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিল। ৩৩ বৎসর মাত্র বিদেশগমনের পর জাপানীরা Wireless telegraphy, আকাশযান, floating mines টর্পেডো ইত্যাদির ব্যবহার করিয়া ইয়োরোপের আশঙ্কাস্থল রুশজাতিকে পদদলিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই বিস্ময়জনক ঘটনার তুলনা জগতে নাই।

রুশযুদ্ধের পর ইংরাজেরা জাপানকে বন্ধুত্ব পাশে আবদ্ধ হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। এই বন্ধুত্বলাভ করা জাপানের পক্ষেও গৌরবজনক সন্দেহ নাই। বন্ধুত্ব সুদৃঢ় করিবার জন্য ১৯১০ সালে ইংল্যণ্ডে এক বিরাট প্রদর্শনী খোলা হয়—যে কোন কার্য্যের জন্য প্রদর্শনী খোলা বর্ত্তমান যুগের রীতি। প্রদর্শনীর নাম Anglo-Japanese Exhibition, এই প্রদর্শনীর জন্য জাপান হইতে সকল প্রকার দ্রব্য লণ্ডনে পাঠান হইয়াছিল। জাপানকে ইংলিশস্থানে সুপ্রচারিত করিবার জন্য একজন জাপানী রাষ্ট্রনায়ক Japan Today, নামক সুবৃহৎ সচিত্র গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার নাম মোচিজুকি। সেই মেলায় প্রদর্শিত কোন কোন দ্রব্য এই নৌসংগ্রহালয়ে দেখিলাম।

৮। চিত্রশালা ও ইম্পিরিয়্যাল মিউজিয়াম

বর্ত্তমান সম্রাটের বিবাহোপলক্ষ্যে টোকিওবাসিগণ তাঁহাকে একটা অট্টালিকা উপহার দিয়াছিলেন। সেই অট্টালিকা আজকাল জাপানীদের সুকুমারশিল্পভবন। ইম্পিরিয়্যাল মিউজিয়ামের সংলগ্ন এই সৌধে গবর্মেণ্ট Fine and Industrial Arts এর নিদর্শন সংগ্রহ করিয়াছেন।

কতকগুলি প্রকোষ্ঠে চীনা অক্ষরে প্রাচীন চীনা সাহিত্যের লম্বমান "কাকেমোনো" দেখিলাম। ইয়োরোপে এবং এশিয়ায় মধ্যযুগের লোকেরা লিপিচাতুর্য্যের জন্য জীবন কাটাইয়া ফেলিত। পার্শী, আরবী, ল্যাটিন, চীনা সকল ভাষায়ই সযত্নে লিখিত পুঁথি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মিউজিয়ামে যাহা দেখিলাম তাহার অধিকাংশই সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যের চীনা অনুবাদ।

অন্যান্য গৃহে চিত্রাবলী প্রদর্শিত হইতেছে —আগাগোড়া "কাকেমোনো"। এইগুলি সমস্তই মধ্যযুগের চীনাশিল্প। শুনিলাম— "মিউজিয়ামের কর্ত্তাদের নিকট এত বেশী চীনা চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে যে সেগুলি একসঙ্গে প্রদর্শন করা অসম্ভব। এই জন্য দুইতিন সপ্তাহ পর নূতন নূতন কাকেমোনোর তাড়া খুলিয়া দেওয়া হয়।" আজ প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রই দেখিলাম। একজন বলিলেন —" ইহার পূর্ব্বে চীনাদের বৌদ্ধধর্ম্মবিষয়ক চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।"

চীনারা উদ্ভিদ্ পর্ব্বত ইত্যাদি আঁকিতে যাইয়া প্রকৃতির অনুকরণ করে না। এগুলি দেখিলে স্বাভাবিক বস্তুর পরিচয় পাই না। কেবল বুঝিতে পারি যে—গাছপাতা পাহাড় পর্ব্বত চিত্রিত রহিয়াছে কিন্তু কোন জাতীয় গাছ বা কোন পাহাড় আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

কিন্তু ইহাদের অঙ্কিত জীবজন্তুগুলি সবই স্বাভাবিক। দেখিবামাত্র চিনিতে পারা যায়। অঙ্কনেও যথেষ্ট ক্ষমতা আছে।

চিত্রশালায় জাপানী শিল্পের নিদর্শন একটাও নাই। কোন কোন গৃহে কোরিয়ার

হস্তশিল্প এবং চীনামাটির কাজ প্রদর্শিত হইতেছে। এখান হইতে ইম্পিরিয়্যাল মিউজিয়ামে প্রবেশ করিলাম। প্রথমেই স্থাপত্য-গৃহ। এই গৃহে হিন্দু বৌদ্ধ-তান্ত্রিক দেব দেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। বুদ্ধ, অবলোকিতেশ্বর ইত্যাদি দেখিয়া ভারতীয় মিউজিয়াম সমূহের অভ্যন্তর মনে আসিল। বিদ্যার দেবতা, দীর্ঘ আয়ুর দেবতা ইত্যাদিও অনেক রহিয়াছে। কিম্ভূত কিমাকার আকৃতি-বিশিষ্ট দেব দেবীর মূর্ত্তিও কম নাই। এই সকলগুলি প্রধানতঃ কাষ্ঠনির্ম্মিত। ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তির সংখ্যা অল্প। প্রস্তর মূর্ত্তি দেখিলাম না—ধাতুর মধ্যে পিতলের ব্যবহার বুঝা গেল। কামাকুরা নগর হইতে এইগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। ইয়েডো বা টোকিওতে টোকুগাওয়া শোগুণেরা রাষ্ট্রকেন্দ্র স্থাপন করিবার পূর্ব্বে কামাকুরায় শোগুণী দরবার অবস্থিত ছিল। সুতরাং মিউজিয়ামের এই মূর্ত্তিগুলি ষোড়শশতাব্দীর পূর্ব্বেকার যুগ উন্মুক্ত করিতেছে।

জাপানী স্থাপত্য সম্বন্ধে Chamberlain বলিতেছেন:—"Sculpture long remained exclusively in Buddhist hands—at first in those of Korean Priests or of descendants of Korean and Chinese Craftsmen—whence it not unnaturally exhibit Indian influence. Critics still hesitate as to the share to be attributed to native Japanese in a series of large wood and bronze images adorning the temples of Kyoto and Nara. Whatever their origin and date (some are attributed to the sixth and seventh centuries), these figures, by virtue of their passionate vitality of expression and of their truth to Anatomical detail, may claim a place among the world's masterpieces. The ideal they embodied has not again been reached on Japanese soil. Japan also possesses some early stone images and a few remarkable stone carvings in relief, but this brand of the art has remained comparatively unimportant."

৫৫২ খৃষ্টাব্দে কোরিয়া হইতে জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম্মের আমদানি হয়। ইহাই জাপানী সভ্যতার প্রথম বর্ষ। জাপানের শিল্প, শিক্ষা, শাসন, ইত্যাদি সকল বস্তুই এই ঘটনার পর আরব্ধ হইয়াছে। এই ঘটনার পূর্ব্ববর্ত্তী বৃত্তান্তসমূহকে প্রাগৈতিহাসিক বলা চলে। আমরা এখন পর্য্যন্ত খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর (অর্থাৎ বুদ্ধদেবের) পূর্ব্বেকার ভারত সম্বন্ধে প্রমাণসিদ্ধ ঘটনা উল্লেখ করিতে পারি না। কাজেই বলিতে হইবে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব কালের ১১০০।১২০০ বৎসর পরে জাপানে সভ্যতার বীজ উপ্ত হয়। এই হিসাবে জাপানের দীক্ষাগুরু ভারতবর্ষ জাপান অপেক্ষা ১১০০।১২০০ বৎসর প্রাচীন। জাপান যখন কোরিয়ার নিকট ধর্ম্মগ্রহণ করিতেছিল তখন ভারতবর্ষে কালিদাস, বিক্রমাদিত্য, বরাহ, মিহিরের স্বর্ণযুগ প্রায় অতীত হইতেছে। তখনও হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্যগৌরব সুরু হয় নাই। জাপানে কোন্ ধরণের ভারতীয় প্রভাব প্রবেশ করিয়াছে তাহা বুঝিবার জন্য এই সন তারিখটা মনে রাখা আবশ্যক। এই

কথা মনে না রাখিলে জাপানী বৌদ্ধধর্ম্ম, জাপানী মূর্ত্তিতত্ত্ব, জাপানী চিত্র কলা ও অন্যান্য সূক্ষ্মশিল্প যথার্থরূপে বুঝা যাইবে না।

ইম্পিরিয়্যাল মিউজিয়ামের অন্যান্য গৃহে জাপানী চিত্রকলার নিদর্শন প্রদর্শিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য বৌদ্ধশিল্পের পরিচয়ই বেশী পাইলাম। কিন্তু জাপানী শিল্প একমাত্র ধর্ম্মশিল্পই নয়। বাস্তব জগৎ লইয়া ভারত-বাসীর মত জাপানীরাও নাড়াচাড়া করিত। প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং ঐতিহাসিক ঘটনার চিত্রনে জাপানীরা ক্ষমতা দেখাইয়াছে। অবশ্য জাপানী চিত্রকলার প্রত্যেক যুগেই চীন ও কোরিয়ার শিল্পীদিগের প্রভাব ন্যূনাধিক বর্ত্তমান।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ হইতে নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত জাপানের বৌদ্ধ চিত্রকলা বোধ হয় আগা-গোড়া বিদেশীয় শিল্পিগণের কৃতিত্বের সাক্ষী। এই যুগে প্রধানতঃ ধর্ম্মচিত্রই অঙ্কিত হইত। আর তখন কোন জাপানী সন্তান চিত্রবিদ্যায় হাত দেখাইতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। এই যুগে চীনে টাঙ্গ ও সুঙ্গ রাজবংশের আমল এবং ভারতবর্ষে হর্ষবর্দ্ধন ধর্ম্মপাল ও চোল সম্রাটগণের অভ্যুদয়। এই যুগের চীনে এবং ভারতে সাহিত্য, শিল্প, রাষ্ট্র ও বাণিজ্যের যৎপরোনাস্তি উৎকর্ষ সাধিত হয়। এই যুগের ভারতবর্ষ সম্বন্ধেই সদর্পে বলা যায়—

"সন্তান যার তিব্বত চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ।" সমগ্র এশিয়ায় ভারতমণ্ডল। (Indian sphere of influence) এই যুগেই স্থাপিত হইয়াছিল। জাপানের তখন প্রত্যেক বিষয়ে হাতে খড়ী হইতেছে মাত্র।

এই যুগের ভারত-শিষ্য জাপান সম্বন্ধে Stewart Dick বলিতেছেন:—The chief centres of the new culture which spread over the land were the great Buddhist Monasteries. Just as our own mediœval cathedrals and monasteries were the nurseries of the arts, so in Japan arose a race of artists priests. Their work at first applied solely to religious purposes, but afterwards widened out till, along with the sacred, there existed also a secular school. For three or four hundred years under these benign and mellowing influences the country grew and prospered. The quiet and peaceful times from the eighth to the 10th century marked a period of great literary activity several of the most famous poets of Japan, whose writings still live in old tradition, flourishing during this period.

হিন্দুস্থানের সভ্যতা-তপন যখন মধ্যাহ্নগগন হইতে ক্রমশঃ অস্তাচলের পথে অগ্রসর, জাপানে তখনমাত্র সূর্য্যোদয় দেখা দিতেছে।

বড় বড় মিউজিয়ামে যাহা থাকা আবশ্যক টোকিওর ইম্পিরিয়্যাল মিউজিয়ামে তাহার সবই আছে। তবে ইহাকে প্রথম শ্রেণীর সংগ্রহালয় বলিতে পারি না। খনিজতত্ত্ব, উদ্ভিদ্-তত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধানকার্য্যের ফল মুদ্রিত হইয়াছে দেখিলাম। জাপানী অধ্যাপক-গণ আধুনিক বিজ্ঞানচর্চ্চায় যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিতেছেন। Zoology, Botany, Engineering, Electricity, Chemisty ইত্যাদি বিষয়ে জাপানী বৈজ্ঞানিকেরা মৌলিক গবে-

মণা প্রায়ই ছাপাইয়া থাকেন। মারুজেন কোম্পানী ইহাঁদের আলোচনা ও অনুসন্ধান এবং পরীক্ষার তালিকা স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। জাপানী বিজ্ঞান-সেবিগণের পক্ষে বসিয়া থাকা অসম্ভব।

৯। "কোক্কা" বা সুকুমার-শিল্পের পত্রিকা

একজন পত্রিকা-সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ হইল। নাম সেইচিটাকি। ইনি কয়েক বৎসর হইল ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন। ইংরাজী ও জার্ম্মাণ ভাষায় প্রণীত গ্রন্থ পাঠ করিবার ক্ষমতা আছে—কিন্তু কোন বিদেশীয় ভাষায় লিখিবার ক্ষমতা নাই। ইনি ইংরাজীতে কথা বেশ বলেন।

ইহাঁর আফিসে দেখা করিলাম। অতিশয় ক্ষুদ্র কার্য্যালয়। খাঁটি স্বদেশীভাবে কাজ কর্ম্ম চলিতেছে—সাধারণ ভারতীয় ছাপাখানার অবস্থা এইরূপ। প্রথমেই দুধহীন চিনিহীন চা পান করিলাম। মিশরীয়েরা কাফি দিয়া আগন্তুককে আলাপ আপ্যায়িত করে—জাপানীরা চা দিয়া করে—আর ভারতবর্ষের রেওয়াজ পান তামাক। ইয়োরামেরিকানেরা যখন তখন কোন লোককে পান ভোজনের জন্য খোসামোদ করে না। যাহাকে আহারাদির জন্য নিমন্ত্রণ করা হয় সে যথাসময়ে আসিয়া টেবিলে বসে। তবে যে কোন সময়ে সিগারেট প্রদানের ব্যবস্থা আছে।

টেবিলের উপর কয়েকখানা মোটা বই পড়িয়া আছে। ভিতরে স্থানে স্থানে জাপানী লেখা—কিন্তু এগুলি চিত্রসংগ্রহের পুস্তক। শ্রীযুক্ত কুমারস্বামীর Selected Examples of Indian Art এর মত এই পুস্তকসমূহে চীনা শিল্পের নিদর্শন মুদ্রিত হইয়াছে। টাকি বলিলেন—এই ধরণের গ্রন্থ প্রকাশ "কোক্কা" কার্য্যালয়ের অন্যতম কার্য্য। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনারা কি Archœology বা পুরাতত্ত্বের দিকেই বেশী নজর দিয়াছেন? সুকুমারশিল্পের æsthetics বা সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সম্বন্ধে 'কোক্কা'য় আলোচনা প্রকাশিত হয় না কি?" টাকি বলিলেন, "আমি স্বয়ং চিত্রবিদ্যা শিখিয়াছিলাম। প্রথম বয়সে চিত্রাঙ্কনও করিয়াছি। পরে চিত্রসমালোচনায় লাগিয়াছি। এক্ষণে চিত্র বা স্থাপত্যের ঐতিহাসিক তথ্য ও তত্ত্বের আলোচনায়ই বেশী মনোযোগ দিয়াছি। তবে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব একেবারে বাদ দিই না।"

টাকি টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে Art-history বা সুকুমার শিল্পের ইতিহাস সম্বন্ধে অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাস বিদ্যার প্রত্যেক ছাত্রকেই এই বিষয় শিখিতে হয়। এই হিসাবে টোকিওর বিশ্ববিদ্যালয় জগতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্বতন্ত্র। টাকি বলিলেন—"বোধ হয় একমাত্র জার্ম্মানীতে এই নিয়ম আছে।" বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষে Art-history নামক একটা বিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পাঠ্য তালিকায়ই এখনও স্থান পায় নাই।

টাকি এই ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যেই ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন। কলিকাতা, সারনাথ, লক্ষ্ণৌ, মথুরা ও লাহোরের মিউজিয়ামগুলি দেখিয়াছেন। অজন্তায় যাওয়াই ইহাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। টাকি বলিলেন—"আমি পূর্ব্বে Griffiths এর অজন্তাবিষয়ক গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়াছিলাম। তাঁহার শিষ্যবর্গের অঙ্কিত নকল চিত্রগুলি দেখিয়া অজন্তার একটা মোটা জ্ঞান লাভ

করি। কিন্তু স্বচক্ষে সেই বিরাট গহ্বর-শিল্প দেখিয়া সম্পূর্ণ নূতন জ্ঞান লাভ করিয়াছি। আমি এতদিন চীনা চিত্রকলার চর্চ্চা করিতাম। খৃষ্টীয় সপ্তম হইতে দশম একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যুগের চীনা শিল্প বিশেষ প্রসিদ্ধ। অজন্তার চিত্রাবলী দেখিবা মাত্র আমি ভাবিলাম যেন চীনা কারিগরদিগের কারুকার্য্য দেখিতেছি। অথচ চীনা শিল্পের গৌরবযুগ অজন্তার যুগের বহু পরবর্ত্তী। কাজেই অজন্তার শিল্পিগণকে চীনা শিল্পীদিগের গুরু অথবা গুরু ভাই বলিতে আমার প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গ্রিফিথ্‌সের গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট চিত্রাবলী দেখিয়া আসল অজন্তার যথার্থ স্বরূপ বুঝা যায় না। তাঁহার চিত্রকরগণ সকলেই পাশ্চাত্য চিত্রবিদ্যায় নিপুণ ছিলেন—তাঁহারা প্রাচ্য কায়দার অধিকারী ছিলেন না। এই জন্য অজন্তার নকল করিতে যাইয়া তাঁহারা অজ্ঞাতসারে পাশ্চাত্য-লক্ষণ-সমন্বিত রচনা সৃষ্টি করিয়াছেন। আসল অজন্তায় চীনা লক্ষণ পাই—অথচ গ্রিফিথ্‌সের পুস্তকে পাই না। এই সকল কথা আমি ভারত-ভ্রমণের পর কোন কোন জাপানী পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি।"

টাকি সারনাথ ও মথুরার স্থাপত্য-শিল্প সম্বন্ধে বলিলেন—"এইগুলিই আমার ভাল লাগে। আর এই গুলিই খাঁটি ভারতীয়। দেখিবামাত্র ভারতবর্ষীয় মূর্ত্তি বলিয়া চেনা যায়। অধিকন্তু মূর্ত্তিসমূহের ভিতর দিয়া একটা গাম্ভীর্য্য ও শান্তিপ্রিয়তা ফুটিয়া বাহির হইতেছে বুঝিতে পারি। কিন্তু গান্ধার স্থাপত্যে বিদেশীয় প্রভাব যথেষ্ট। চীনা স্থাপত্যে খাঁটি-ভারতীয় এবং গান্ধার উভয় শিল্পেরই লক্ষণ বিদ্যমান।"

কোক্কা কোম্পানীর ছাপাখানা হইতে কয়েকদিন হইল একখানা সুবৃহৎ গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। ইহা দুই খণ্ডে বিভক্ত। ইংরাজ প্রত্নতত্ত্ববিৎ Stein যেমন খোটান তুর্কীস্থান ইত্যাদি অঞ্চলে খননকার্য্য করিতেছেন জাপানী বৌদ্ধ পণ্ডিত ওটানিও সেইরূপ করিতেছেন। তাঁহার আবিষ্কৃত তথ্যরাশি এই দুই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"ওটানিকে কি জাপান গবর্মেণ্ট এই কার্য্যের জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন?" টাকি বলিলেন—"না। ওটানি আমাদের সর্ব্বপ্রধান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কর্ত্তা। ইহাঁর অধীনে প্রচুর অর্থের আয় ব্যয় হইয়া থাকে। ইহাঁর পুরানাম ও বিবরণ Count Otani, Archbishop of Western Honganji Temple, Kyoto. ইনি স্বয়ং আধুনিক বিদ্যায় পারদর্শী—ইংল্যণ্ডে লেখাপড়া শিখিয়াছেন। ভৌগোলিক অনুসন্ধান exploration, excavation ইত্যাদিতে ওটানির আগ্রহ যথেষ্ট। ইনি দুই তিনবার তুর্কীস্থান অঞ্চলে শিষ্য সহ অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন। এক্ষণে ইহাঁদের সংগৃহীত পদার্থের কিয়দংশ মাত্র প্রকাশিত হইল। সকল বস্তুই কিয়োটোর প্রধান মন্দিরে রক্ষিত হইতেছে।" গ্রন্থদ্বয়ের ভিতর প্রধান শিল্পি, মুদ্রা, মূর্ত্তি, বৌদ্ধসূত্র, অলঙ্কার ইত্যাদির ফটোগ্রাফ ছাপা হইয়াছে। খরচ হইল প্রায় দশ হাজার টাকা।

টাকিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোক্কা কোম্পানীর কার্য্য কি লাভজনক? গবর্মেণ্ট বোধ হয় আপনাদিগকে অর্থ-সাহায্য করেন।" অধ্যাপক বলিলেন—"গবর্মেণ্টের সাহায্য আমরা পাই না। অথচ আমাদের কার্য্য আদৌ লাভজনক নয়। প্রত্যেক বৎসরই

লোকসান দিতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে এই কার্য্যের জন্য দুইজন বন্ধু পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারা টোকিওর সর্ব্ববিখ্যাত "আসাহি" দৈনিক পত্রের স্বত্বাধিকারী। দৈনিক পত্রের পরিচালনায় লাভ যথেষ্ট থাকে। তাঁহারা এই লাভের কিয়দংশে কোক্কা কোম্পানীর কার্য্য চালাইয়া থাকেন। ইহাঁদের নাম মুরায়ামা এবং উয়েনো—উভয়েই ওসাকার অধিবাসী।" কোক্কা কোম্পানীর মাসিক খরচ প্রায় ৩০০০৲।

কোক্কা পত্রিকা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইল। "কোক্কা" শব্দের অর্থ "The flower of the naton" অর্থাৎ দেশের ফুল। সুকুমার শিল্পকে জাপানীরা ফুলের আখ্যা দিয়াছে। মাত্র ৩০০ কাপি প্রতিমাসে ছাপা হয়। ইংরাজী সংস্করণ ও জাপানী সংস্করণ—দুই সংস্করণ বাহির হয়। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি ইংরাজী লিখিতে পারেন না বলিলেন—তবে ইংরাজী সংস্করণের সম্পাদক হইলেন কি করিয়া?" ইনি বলিলেন—"আমার বক্তব্য জাপানীতে লিখি। একজন বন্ধু তাহার অনুবাদ করেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কাগজের কাট্‌তি কোন্ দেশে বেশী?" ইনি বলিলেন—"ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত বলিয়া ইহার বিক্রয় বিলাতেই বেশী হয়—আমেরিকায় অতি অল্প। ভারতবর্ষে Thacker Spink এর নিকট ৫।৬ খানা পাঠান হয়। ফরাসী ও জার্ম্মাণেরা আমাদের কার্য্য এবং প্রাচ্য চিত্র ও স্থাপত্য যথেষ্ট আদর করেন। প্রাচ্য শিল্পের যথার্থ সমাদর বিলাতে বেশী নয়। ইংরাজী সংস্করণের প্রথম কয়েক পৃষ্ঠায় সমগ্র সংখ্যার সারাংশ ফরাসী ভাষায় দেওয়া হয়।"

ইহাঁর গৃহে দেখিলাম—নন্দলাল বসুর "কৈকেয়ী"-চিত্র ঝুলিতেছে। টাকি বলিলেন—"কয়েক বৎসর হইল, কোক্কাতে অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এবং নন্দলাল বসুর কয়েকটা কার্য্য প্রকাশিত হইয়াছিল। এক সংখ্যায় জজ উড্রফের লিখিত Modern School of Indian Art নামক প্রবন্ধও বাহির হয়। এই দেখুন সেই সংখ্যা।"

টাকি বলিতে লাগিলেন—"ওকাকুরার প্রভাবে আজকাল যুবক জাপান নব্য ভারতীয় চিত্রকলার ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি তরুণ শিল্পিগণ অবণীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত কলা-পদ্ধতির অন্ধ অনুকরণও আরম্ভ করিয়াছেন। আমি নিজে আপনাদের নব্য শিল্প ভালবাসি—কিন্তু, মাপ করিবেন, আপনাদের চিত্রকরগণ এখনও তেজস্বিতা ও শক্তিমত্তার নিদর্শন সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। সকল চিত্রেই যেন একটা অত্যধিক কোমলতা ও মেয়েলি ভাব মাখান রহিয়াছে। কিন্তু রেখাপাত ও বর্ণ-সমাবেশ সর্ব্বথা প্রশংসাযোগ্য।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"পাশ্চাত্য শিল্প আপনাদের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিতেছে?" টাকি উত্তর করিলেন,—"আমাদের দেশে শিল্পকলা সম্বন্ধে বর্ত্তমানে দুই দল চলিতেছে। স্বদেশী আন্দোলনের দল—এবং বিদেশী অনুকরণের দল। বিদেশী অনুকরণপন্থীরা খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারেন নাই—স্বদেশী ওয়ালারাই শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া যাইবে।"

মধ্যযুগের জাপানী শিল্পে ওলন্দাজ বা ফরাসী শিল্পের প্রভাব সম্বন্ধে টাকি বলেন—"চিত্রকলায় সামান্য মাত্র প্রভাব পাই না। কোন কোন মূর্ত্তি-চিত্রনে রেখাবাহুল্য দেখিয়া পাশ্চাত্য প্রভাব আন্দাজ করিতে পারি। কিন্তু ধাতুশিল্প, অলঙ্কার-শিল্প ইত্যাদি Minor

Arts এ ইয়োরোপীয়দিগের প্রভাব সহজেই ধরিতে পারি।"

আফিসে বসিয়া টাকি কার্য্য পরিদর্শন করিতেছেন। কয়েকজন লোক ফটো তুলিতেছে—কয়েকজন ছবি আঁকিতেছে। কাঠ খোদাইয়ের কার্য্যে এবং রংলাগাইবার কার্য্যেও ২০।২৫ জন লোক নিযুক্ত। কোন কোন ছবি রঙাইতে প্রায় ১০০ বার স্বতন্ত্র প্রয়াস করিতে হয়। সমস্ত কাজই হাতে হইতেছে। কারিগরেরা এক প্রকার উলঙ্গ ভাবে ফরাসে বসিয়া কাজ করে। ল্যাঙ্গট-পরা আছে মাত্র—গায়ে কোন জামা নাই। কোন কোন কারিগরের মাসিক আয় ১০০।১৫০৲।

১০। রঙ্গালয়ে পাঁচ ঘণ্টা

মিকাডো-প্রাসাদের সম্মুখেই নব্য জাপানের সর্ব্বপ্রসিদ্ধ রঙ্গালয় অবস্থিত। ইহার নাম Imperial Theatre. এই থিয়েটারে ইংল্যণ্ড ও আমেরিকার নূতনতম সাজ সরঞ্জাম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মঞ্চ, গ্যালারি, চেয়ার, দ্বারবান, দাসদাসী, টিকেট-গৃহ ইত্যাদি সবই ইয়োরামেরিকার ধরণের দেখিলাম। তবে টিকেট কিছু সস্তা—প্রথম শ্রেণীর মূল্য ৪৲ মাত্র। একটা বিশেষ প্রভেদ এই যে, এখানে পাঁচ ঘণ্টা করিয়া অভিনয় হয়। বিকাল পাঁচটা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত নাটক চলিতে থাকে। মাঝে মাঝে ১০।১৫।২০ মিনিট অবকাশ পাওয়া যায়। সেই অবকাশে পান ভোজনাদি সারিতে হয়। এই জন্য থিয়েটারের ভিতরেই জাপানী বিদেশীয় দুই ধরণের হোটেল রহিয়াছে।

থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী, নটনটী, পরিচালক ইত্যাদি সকলেই জাপানী। জাপানী ভাষায় জাপানী নাটকেরই অভিনয় হয়। গাইড্ বলিলেন—"মাঝে মাঝে ফরাসী, ইংরাজ বা আমেরিকান কোম্পানী আসিয়া গৃহ ভাড়া করিয়া লয়। তখন জাপানীরা বিদেশী থিয়েটার দেখিবার সুযোগ পায়।"

গাইড্ একখানা ইংরাজী ভাষায় লিখিত "প্রোগ্রাম" লইয়া আসিলেন। ইহাতে নাটকের সংক্ষিপ্ত সার দেওয়া আছে। সুতরাং গল্প বুঝিয়া অভিনয় বুঝিবার সুযোগ ঘটিল। প্রথমে একটা তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ নাটক, পরে একটা এক অঙ্কে সম্পূর্ণ নাটক অভিনীত হইল। বেশীক্ষণ আর বসিয়া থাকা গেল না। পরে আরও একটা ক্ষুদ্র নাটকের অভিনয় ছিল।

আজকার অভিনয়ে অল্পবিস্তর নাচ গানও ছিল। জাপানী গান আমরা সহজেই বুঝিতে পারি—কিন্তু নিতান্ত এক ঘেয়ে বোধ হইল। যেন প্রত্যেক লাইনই ঝিঁঝিঁটের সুরে বাঁধা। জাপানীরা অভিনয়ের সময়ে আমাদের পরিচিত "গুলিখোরী" ভাঙ্গা গলা ব্যবহার করে ভাবিতেছি। ইহা কতটা কৃত্রিম কতটা স্বাভাবিক এবং কতটা জাপানীদের উপভোগ্য তাহা এত শীঘ্র বুঝিয়া উঠিবার যোগ্যতা হয় নাই। এইরূপ গলার আওয়াজ জাহাজে অনুষ্ঠিত অভিনয়েও লক্ষ্য করিয়াছি। ইহা আমাদের যাত্রাদলের টানা নাকী সুরের মত কি না কে বলিতে পারে?

প্রথম নাটকের নাম "বারাঙ্গনা ও সামুরাই"। মধ্যযুগের জাপানী সমাজ এই কাব্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। লেখকও আধুনিক নন প্রায় ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে এই রচনা প্রথম প্রকাশিত হয়। তখনও নব্য জাপানের জন্ম হয় নাই। নাটকের তিন অঙ্কে যেন তিনটা স্বতন্ত্র গল্প পাইলাম—পরস্পর-সম্বন্ধ অতি সামান্য মাত্র। কোন চরিত্রের বিকাশ অথবা জটিল সমস্যার সমাধান কাব্যের ভিতর নাই।

তবে জাপানের "ফিউড্যাল" যুগ বা নবাবী আমল সম্বন্ধে কয়েকটা স্পষ্ট চিত্র পাওয়া গেল। নটনটীদিগের সংখ্যাধিক্যে বেশ বৈচিত্র্য সৃষ্ট হইয়াছিল। ইংরাজেরা "কিস্‌মেত" দেখিয়া মুসলমান সমাজ যেরূপ বুঝে, আমি "A Courtezan and a Samurai" এর গল্প পড়িয়া এবং অভিনয় দেখিয়া জাপানের শোগুণী আমল সেইরূপ বুঝিলাম। প্রথম অঙ্কে দেখা গেল জমিদার (ডাইমো) লাঠিয়ালে (সামুরাই) বেশ্যা লইয়া বিরোধ। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রধান বিষয় শোগুণীশাসনে রাস্তাঘাট, বিষয়সম্পত্তি রক্ষা, পান্থশালা ইত্যাদির ব্যবস্থা। তৃতীয় অঙ্কে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব, ভূতপ্রেতে বিশ্বাস ইত্যাদি বুঝিতে পারা যায়।

দ্বিতীয় নাটকের নাম "কোহারু এবং জিহেই।" ইহাও জাপানের শোগুণী আমলেরই চিত্র। নায়ক নায়িকার প্রেম এবং তাহার পরিণাম ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। মোটের উপর ইহাকে জাপানী সাহিত্যের "Romeo and Juliet" বলা চলিতে পারে। গল্পাংশ লইয়া জাপানী ও ইংরাজী কাব্যে কোন তুলনাই হয় না। দুই প্রেমিকের অবৈধ প্রণয়, এবং অবশেষে "মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান" এই ভাবিয়া উভয়ের আত্মহত্যা—এই দুই লক্ষণ সেক্‌স্‌পীয়ার ও জাপানী নাট্যকারের রচনায় দর্শকমাত্রই দেখিতে পাইবেন। ইংরাজী প্রোগ্রামে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে :—

Koharu and Jihei.

A Classic Love-tragedy in one Act by Chikamatsu Monzosmon.

Time : 1720. Place : Osaka.

Scene : The Kwasho tea-house in the prostitute quarter of Sonesaki, Osaka.

গল্প অতি সহজ ও সরল—ইহাতে নাটকোচিত উপকরণ কিছুই নাই। জিহেই একজন বিবাহিত যুবক। কোহারু একজন বেশ্যা—ওসাকা নগরের বেশ্যাপাড়ায় তাহার বাস। দুইজনে প্রণয় জন্মে কিন্তু বিবাহ অসম্ভব কাজেই দুইজনে আত্মহত্যার পরামর্শ করে। এই আত্মহত্যার সংকল্প লইয়াই নাটক সুরু হইয়াছে। এদিকে জিহেইয়ের ভাই ও পত্নী তাহাকে এই প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গাইবার জন্য চেষ্টিত। কোন উপায় না পাইয়া জিহেইয়ের ভাই "সামুরাই" বেশে কোহারুর গৃহে প্রবেশ করিল। কোহারুকে নিতান্ত বিষণ্ণ দেখিয়া বেশ্যা-পাড়ার মালিককে জিজ্ঞাসা করিল—"ব্যাপার কি?" বেশ্যা-ব্যবসায়ী বলিল—"কোহারু পাগল হইয়াছে—একটা যুবকের পাল্লায় পড়িয়া প্রাণ দিবার আয়োজন করিয়াছে।"

সামুরাই বিশেষ করিয়া কোহারুকে বুঝাইল। কোহারু শেষ পর্য্যন্ত জিহেইকে ভুলিয়া যাইতে রাজী হইল। ইতিমধ্যে কোহারু জিহেইয়ের পত্নীর নিকট হইতে একখানা চিঠি পাইয়াছে। পত্নীর কাকুতি মিনতিতে বেশ্যার হৃদয় গলিয়া রহিয়াছিল। কাজেই আত্মহত্যা না করাই তাহার ইচ্ছা হইল।

জিহেই বেশ্যালয়ের বাহির হইতে কাণ পাতিয়া সামুরাই ও কোহারুর কথোপকথন শুনিতেছিল। রাগে অন্ধ হইয়া সে কাগজের দেওয়ালের ভিতর দিয়া ছোরা চালাইল—কিন্তু কোহারু বাঁচিয়া গেল। সামুরাই আসিয়া জিহেইকে বাঁধিয়া ফেলিল। এতক্ষণে জিহেইয়ের এক প্রতিদ্বন্দ্বী কোহারুর গৃহসম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। তাহার সঙ্গে

জিহেইয়ের কিছু বচসা ও মারপিট হইবার উপক্রম। সামুরাই জিহেইকে প্রতিদ্বন্দ্বীর আঘাত হইতে রক্ষা করিল। অবশেষে সে নিজের মুখোস খুলিয়া দাঁড়াইল। ভাইকে দেখিয়া জিহেই কিছু অপ্রতিভ এবং শান্ত হইল। কিন্তু কোহারু যে তাহাকে এত শীঘ্র ভুলিয়া যাইতে স্বীকৃত হইয়াছিল সেই দুঃখে জিহেইয়ের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। অকস্মাৎ তাহার পত্নীর চিঠি জিহেই কোহারুর গৃহে দেখিতে পাইল। তাহার দুঃখ আর থাকিল না। কিছুকাল বেশ দিনগুলি কাটিল। কিন্তু ভালবাসার স্মৃতি জিহেই ও কোহারুর হৃদয় হইতে কোন মতেই উন্মূলিত হইল না। অবশেষে আত্মহত্যা ভিন্ন তাহাদের দুঃখ ঘুচিবার উপায় রহিল না। জাপানে আত্মহত্যা সুপ্রচলিত।

১১। জাপানের শোগুণী আমল

১৬৭০ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। সেণ্ডাই প্রদেশের ডাইমো এক বারাঙ্গনাকে মুক্তি প্রদান করিয়াছিল। বারাঙ্গনার নাম টাকাও। টাকাওকে বেশ্যা-ব্যবসায়ীর কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ডাইমোকে টাকাওর সমান ওজনে স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করিতে হইয়াছিল। টোকিওর বেশ্যা পাড়ার নাম জাপানী ভাষায় যোশীবাড়া। ইহা অদ্যাপি বর্ত্তমান।

যোশীবাড়া সম্বন্ধে I. E. De Beeker একখানা সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। নাম "The Nightless City or the History of the Yoshiwara Tukwaku" ভূমিকায় লেখক বলিতেছেন,—"I have compiled this book with the object of providing foreign students of Sociology, medical men and philanthropists, with some reliable *data* regarding the practical working of the system in the leading prostitute quarter of the Japanese Metropolis, and I leave my readers to form their own opinions as to the pros and cons of the successor otherwise achieved by the plan of strict segregaton adopted in this country."

ইয়োরামেরিকার অনেক দেশে স্বতন্ত্র বেশ্যাপাড়া নাই—বেশ্যা বলিয়া সমাজের কোন শ্রেণীও দেখা যায় না। তাহা বলিয়া সেই সকল দেশকে বেশ্যাহীন বা পুণ্যাত্মাগণের দেশ বলা উচিত নয়। গ্রন্থকার বলিতেছেন :—

To Japanese who may think that the Yoshiwara is a disgrace to Japan I would remark that this Empire has by no means a monopoly of vice; and to foreigners who declaim against the "immorality of Japanese" I would say frankly—"Read the History of Prostitution by Dr. W. W. Sanger of New York, also the *Maiden Tribute of Modern Babylon* which appeared in the Pall Mall Gazette fourteen years ago. You cannot criticise this country too closely, for you certainly dare not lay the flattering unction to your souls that you, as a race, have any monopoly of vice.

বারাঙ্গনা ও সামুরাই নাটকের ইংরাজী প্রোগ্রাম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

An Historical Drama in three Acts plotted by Takenoya and adopted by Torahiko Migita.

Time : 1673. Place : Yedo and Shimotsake Province.

Act I. The pleasure-boat, Takamaru, on the Sumida river

Act II. Lord Date's procession on the Wohu highway

Act III. Scene 1. The Dwelling of Chosuke the father of Takao at Shiobara, Shimotsake province.

Scene 2. The Hokigawa river near the house of Chosuke.

টোকিও নগর সুমিদা নদীর উপর অবস্থিত। টোকুগাওয়া শোগুণদিগের আমলে টোকিওর নাম ছিল ইয়েডো। সুমিদার উপর একখানা সুবৃহৎ বিলাস-বজরা ধীরে ভাসিয়া যাইতেছে—এই দৃশ্য প্রথমেই দেখিলাম। বেশ্যালয় হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত টাকাও বজরায় দাঁড়াইয়া দূর হইতে আগত বংশীধ্বনি শুনিতেছে। দেখিতে দেখিতে একটা ছোট নৌকা বাহিয়া তাহার পূর্ব্ব-বন্ধু সামুরাই বজরার নিকট উপস্থিত হইল। পুরাতন স্মৃতি জাগিয়া উঠিল—টাকাও সামুরাইয়ের নৌকায় একখানা পত্র নিক্ষেপ করিয়া বলিল—"যদি এই পত্রে লিখিত প্রস্তাবে, তোমার সম্মতি থাকে তাহা হইলে তোমার বাঁশী বাজাইয়া উত্তর দিবে।"

সামুরাই চলিয়া যাইতেছে এমন সময়ে সদলবল ডাইমো বজরা হইতে তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল—"খবরদার, তুমি টাকাওয়ের নিকট আর আসিও না। এখন সে আর বাজারের বেশ্যা নয়।" সামুরাই বলিল—"টাকাওকে জিজ্ঞাসা করুন, মহাশয়। দেখিবেন সে আপনার নয়—তাহার হৃদয়ে একমাত্র আমার আসন।" ডাইমো তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিল—সামুরাইয়ের উপর ছোরা চালাইল। সামুরাই ছোরা সাম্‌লাইয়া বিদ্রূপ-হাস্য হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। খানিক পরে তাহার বাঁশী হইতে করুণ ধ্বনি উড়িয়া আসিল। টাকাও বুঝিল সামুরাই তাহার প্রস্তাবে সম্মত আছে।

টাকাও এক্ষণে ডাইমোকে বলিল—"মহাশয়, আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। আমাকে বিদায় দিন।" ডাইমো বলিলেন—"তুমি কি ক্ষেপিয়াছ? এত অর্থব্যয়ে তোমাকে মুক্ত করিয়াছি কি বনে ছাড়িয়া দিবার জন্য?" টাকাও আত্মহত্যার সঙ্কল্প করিল। তাহার চেষ্টা ফলবতী হইল না। ডাইমো নিতান্ত বিরক্ত হইয়া টাকাওকে হত্যা করিল। মধ্যযুগের জমিদারগণের পক্ষে নরহত্যা করা অতি সাধারণ কথা।

দ্বিতীয় অঙ্কে ডাইমো ইয়েডো হইতে স্বকীয় জমিদারীতে গমন করিতেছেন। পথের দৃশ্য দেখান হইয়াছে। সেই যুগে গমনাগমন বিশেষ নিরাপদ ছিল না। চোর ডাকাইতের উপদ্রব প্রায়ই দেখা যাইত। যে পথে ডাইমো দলবলসহ যাত্রা করিয়াছেন সেই পথে সামুরাই ছদ্মবেশে বসিয়া আছে। তাহার প্রণয়িণীকে হত্যা করার প্রতিশোধ না লইয়া সে মরিবে না—ইহাই তাহার প্রতিজ্ঞা। সামুরাইয়ের হাতে একটা বন্দুক। তাহাকে পাক্‌ড়াও করিবার জন্য ডাইমোর লোকজন চারিদিকে ছুটিল।

রাস্তায় এক দাগী ডাকাইত একজন বৃদ্ধের সঙ্গে বচসা করিতে করিতে উপস্থিত। বৃদ্ধের সঙ্গে দুই কন্যা। বৃদ্ধ বলিতেছে—

"কাল রাত্রে আমি সরাইয়ে বাস করিবার সময়ে কিছু টাকা হারাইয়াছি। সে টাকা নিশ্চয়ই তুমি চুরি করিয়াছ।" ডাকাইত ধরা পড়িবার উপক্রম দেখিয়া টাকার থলেটা বৃদ্ধের অগোচরে একটা ঝোপের ভিতর ফেলিয়া দিল। বৃদ্ধের উপর ডাকাইত জুলুম করিতেছে এমন সময়ে ডাইমোর একজন অনুচর থলেটা বৃদ্ধকে ফিরাইয়া দিল। সে ঝোপ হইতে এটা তুলিয়া আনিয়াছিল। বৃদ্ধ প্রস্থান করিল।

ডাইমোর অনুচর দাগী ডাকাইতকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইল। ডাকাইতের ভ্রূক্ষেপ নাই—সে ইচ্ছা করিয়া অনুচরের ছোরার নিকট মাথা লইয়া গেল। তাহার সাহস দেখিয়া অনুচর প্রীত হইল এবং তাহাকে খুন না করিয়া কাজে নিযুক্ত করিল। অনুচরকে বলা হইল—"পুরোহিতবেশে একব্যক্তি ঐ সরাইয়ে বাস করিতেছে। তোমাকে ঐখানে থাকিয়া তাহার গাঁটুরি অনুসন্ধান করিতে হইবে। তাহার ভিতর বোধ হয় একটা বন্দুক আছে। সেটা যদি আমাকে আনিয়া দিতে পার তাহা হইলে তোমার ইচ্ছানুরূপ বকশিষ পাইবে।" এইরূপ কথা-বার্ত্তার পর দুই জনে প্রস্থান করিল।

সামুরাই দেখিল রাস্তায় এখন কেহ নাই। অদূরে ডাইমোর লাঠিয়াল বরকন্দাজ, কুলী সহিস ও সেবকগণ আসিতেছে। কাহারও বাঁকে প্যাটুরা, কাহারও ঘাড়ে বর্শা—কেহ বা খাদ্যদ্রব্য বহন করিতেছে—কেহবা অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে লইয়া যাইতেছে। স্বয়ং ডাইমো পাল্কীর ভিতর বসিয়া আছেন। সামুরাই বন্দুকের গুলি ডাইমোর দিকে চালাইল। হঠাৎ এই আক্রমণে জমিদারের লোকজন ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। পরে তাহারা সামুইরাকে আক্রমণ করিল। এই আক্রমণে জাপা[নী] লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, জিউজিৎসু ইত্যা[দি] দেখিতে পাইলাম। সামুরাই তাহার ভৃ[ত্য] সেবককে সঙ্গে আনিয়াছিল। দুই জনেই লা[ঠি] ছোরায় ওস্তাদ—কাজেই ডাইমোর বহুসংখ্যক অনুচরকে অতি সহজেই ধরাশায়ী করিল রঙ্গমঞ্চের উপর বাহুযুদ্ধের এই দৃশ্য বেশ দেখাইল।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে টাকাওর পিতা তাহার পত্নীর সাম্বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করিতেছে। শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে কয়েকজন বন্ধু নিমন্ত্রিত। জাপানী পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থা দেখা গেল। বৃদ্ধের গৃহে অতিথিগণের আহারাদি সমাপ্ত হইল। কথায় কথায় টাকাওয়ের কথা উঠিল। বৃদ্ধ বলিল—আমার দারিদ্র্যবশতঃ টাকাওকে প্রতিপালন করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম। এই সময়ে একজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়। ভাবিয়াছিলাম সে একজন ধনবান্ ব্যব-সায়ী। এই ভাবিয়া তাহার নিকট টাকাওকে দত্তক প্রদান করি। পরে জানিতে পারি এই ব্যক্তি এক নরাধম দাগী বদ্মায়েস। সে টাকাওকে স্বগৃহে প্রতিপালন না করিয়া যোশীবাড়ায় বেশ্যালয়ে রাখিয়াছে। কি করিব আমার দুরদৃষ্ট। আমার পাপেই আমি আমার সোনার কন্যাকে জাহান্নমে পাঠাইয়াছি। তাহার কষ্টের জন্য আমিই দায়ী। আমি জীবনে এত পশুহত্যা করিয়াছি যে নরকেও আমার স্থান হইবে না। এই পাপেই আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। এখন হইতে আমি বৌদ্ধধর্ম্মের সকল নিয়ম যথারীতি পালন করিব স্থির করিয়াছি। এই লও আমার বন্দুক আর জীবহত্যা আমার দ্বারা হইবে না।" অতিথিগণ বিদায় হইল।

খানিক পরে সেই দাগীকে পাকড়াও করিয়া বৃদ্ধের বন্ধুগণ ফিরিয়া আসিল। বৃদ্ধ বলিল—"নরাধম, তুই আমার কন্যার সর্ব্বনাশ করিয়াছিস। মৃত্যুই তোর একমাত্র শাস্তি।" পরক্ষণেই বৃদ্ধ ভাবিল—"অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ। আমি খাঁটি বৌদ্ধ হইতে চলিয়াছি। সুতরাং নরহত্যার কারণ হইব কি করিয়া?" কাজেই বদমায়েসকে খুন করা হইল না।

সকলে চলিয়া গেলে বৃদ্ধ বৌদ্ধ মন্দিরে পত্নীর উদ্দেশে প্রার্থনা করিতে লাগিল। এই সময়ে তাহার কন্যা যেন তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। রক্তমাংসের টাকাও যেন তাহাকে বলিতেছে—"আমি যোশীবাড়া হইতে মুক্তি পাইয়াই তোমার নিকট ফিরিয়া আসিয়াছি।" মাতার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া টাকাও যেন শোকে অভিভূত হইল এবং মন্দিরে প্রার্থনা করিবার জন্য প্রবেশ করিল।

এই সময়ে পুরোহিতবেশধারী সামুরাই আসিয়া বৃদ্ধকে বলিল—"তোমার কন্যা আমার প্রণয়িনী ছিল। কিন্তু আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই। আমার প্রভু ডাইমো তাহাকে নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করিয়াছে। সেই হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য আমি এই ছদ্মবেশে ঘুরিতেছি।" বৃদ্ধ বলিল—"সে কিহে বাপু? টাকাও যে জীবিত—সে এই মাত্র আমার সঙ্গে দেখা করিয়া গেল। ঐ ঘরেই এখনও সে আছে।" বৃদ্ধ মন্দিরের দরজা খুলিয়া দেখে—টাকাও অন্তর্হিত হইয়াছে।

এইবার সামুরাই তাহার বাঁশী বাজাইতে লাগিল। ধ্বনি শুনিবামাত্র টাকাও আবার মূর্ত্তি গ্রহণ করিল। সামুরাইকে ধন্যবাদ দিল এবং জানাইল—"আমি এক্ষণে নরক-যন্ত্রণা সহ্য করিতেছি।" এই বলিয়া টাকাও অগ্নিরূপে অদৃশ্য হইল। সামুরাই কিছুক্ষণ অচেতন ভাবে পড়িয়া রহিল। বৃদ্ধ আসিয়া সামুরাইকে জাগাইল। এই সময়ে ডাইমোর অনুচরেরা সামুরাইকে পাকড়াও করিতে বৃদ্ধের গৃহে আসিয়া উপস্থিত। উভয়ে সন্নিকটস্থ পর্ব্বতে পলায়ন করিল।

হোকিগাওয়া নদীর ধারে ডাইমোর লোকজন সমবেত। দাগী ডাকাইতটা বৃদ্ধকে ধরিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে—সামুরাইয়ের সন্ধান বলিয়া দিতেই হইবে। বৃদ্ধ কোন জবাব দিল না। দাগী তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত এমন সময়ে সামুরাই আসিয়া নরাধমকে ভূমিসাৎ করিল। কিন্তু ডাইমোর অনুচরবর্গ সামুরাইকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিল। ডাইমো বলিলেন—"উহাকে মারিয়া ফেলিও না। যদি পুরোহিতভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে স্বীকৃত হয় তাহা হইলে উহাকে মুক্তি দিব।" সামুরাই বলিল—"আমার পক্ষে সেরূপ জীবন দুর্ব্বহ।" এই বলিয়া সে হারাকিরি করিল।

১২। য়ামাতোস্থানের স্বর্গ—হিন্দুস্থান

হোটেলের নিকটেই একটা আফিসে কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হইল। কার্য্যালয়ের নিম্নতলায় সাইনবোর্ডে লেখা আছে South America Colonisation Company. ভাবিলাম প্যানামা খাল কাটার সুফল ভোগ করিবার জন্য জাপানীদের এই প্রতিষ্ঠান। ইতিপূর্ব্বেই জাপানীরা দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপনে ব্রতী হইয়াছেন। এক্ষণে ইহাঁদের উদ্যম বাড়িয়া যাইবারই কথা। অনুসন্ধানে বুঝিলাম—"ব্রেজিলের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠভাবে মাতাইবার জন্য এই আয়োজন হইয়াছে।" পূর্ব্বে জাপান হইতে ব্রেজিল যাইতে হইলে

দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইত। প্যানামা খালের প্রভাবে প্রশান্ত মহাসাগরের দিক হইতে অতি সহজেই জাপানীরা আটলান্টিক কূলের দেশসমূহে পৌঁছিতে পারিবে। কাজেই জাপানের ব্যবসায়ীরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। বর্ত্তমান কুরুক্ষেত্রে জার্ম্মাণীর বহির্ব্বাণিজ্য এক প্রকার স্থগিত—ইংরাজও নূতন দিকে নজর দিতে অসমর্থ। এই সুযোগে জাপান চারিদিকে হাত পা বাড়াইয়া চলিয়াছেন। ইহারই নাম একস্য সর্ব্বনাশঃ অন্যস্য তু পৌষ মাসঃ। আসিয়া অবধি ভারতবর্ষের প্রতি জাপানের সস্নেহ ভাব বেশ লক্ষ্য করিতেছি, দুই বৎসর পূর্ব্বে এতটা ছিল না; ব্যবসায়ের স্বার্থে জাপানের কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সুলক্ষণ বটে।

এই কার্য্যালয়ে একজন পত্রিকাসম্পাদকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইল। ইনি ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন—দুই তিন খানা মাসিক পত্রের পরিচালনা ইহাঁর হাতে রহিয়াছে। গত বৎসর একখানা কাগজ বাহির করিয়াছেন। তাহার নাম Twentieth Century. জাপানী ভাষায় ইহার প্রবন্ধাবলী লিখিত হয়। বার্ষিক মূল্য ৪৷৷০; গ্রাহক সংখ্যা ৭৫০০। সম্পাদক বলিলেন—"মাত্র এক বৎসর চলিতেছে—এইজন্য গ্রাহকসংখ্যা এত অল্প।" ইহাঁর নাম সাকুরাই—ইনি ইয়োরোপও দেখিয়াছেন।

সম্পাদক মহাশয় একজন ধর্ম্মপ্রচারকের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিলেন। দুইজনেই ইংরাজীতে কথা বলিতে পারেন। ধর্ম্মপ্রচারক মহাশয় বহুকাল টোকিওর কেও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিয়াছেন। অধ্যাপকের নাম কিঞ্জো কিশ্রে হিরাই। হিরাই দোতলার ঘরে ছিলেন। উপরে উঠিবার পূর্ব্বে বাহিরের ঘরে বুট খুলিয়া প্রবেশ করিতে হইল। জুতা খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করা জাপানীদের দস্তুর। ভারতবর্ষ ছাড়িবার পর আর কখনও জুতা খুলিতে হয় নাই। জাপানীরা সাধারণতঃ কাঠের খড়ম অথবা খড়ো চটি ব্যবহার করে—চামড়ার জুতা জাপানের স্বদেশী জিনিষ নয়। ইয়োরামেরিকান প্রভাবে বিদেশীয় ছাতা, বিদেশীয় টুপি এবং বিদেশীয় জুতা ব্যবহৃত হইতেছে—এখনও জনসাধারণ এবং রাস্তায় ঘাটে যত লোক দেখি তাহার অধিকাংশই প্রাচীন রেওয়াজই চালাইতেছে।

আমরা ভারতবর্ষকে "আর্য্যভূমি" বলিয়া থাকি—ভারতবাসীকে আর্য্য-সন্তান বলিয়া জানি। ভারতীয় চরিত্র বর্ণনা করিতে হইলে অনেক সময়ে আর্য্য-বীর্য্য, আর্য্য-শক্তি, আর্য্য-ধর্ম্ম ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত শব্দ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করি। ইংরাজেরা সেইরূপ নিজেদের দেশকে য়্যাল্‌বিয়ন (Albion) বলিয়া বর্ণনা করে। আইরিশ জাতি তাহাদের জন্মভূমিকে Erin (এরিন্) নামে ডাকিয়া থাকে। জার্ম্মাণেরা তাহাদের Vaterland বা পিতৃভূমিকে Deutsch land "ডয়শল্যাণ্ড" নামে প্রচারিত করে। সেইরূপ জাপান সম্বন্ধে খাঁটি জাপানী নাম Yamato (য়ামাতো)। জাপানীরা তাহাদের সভ্যতার বিশেষত্ব সংক্ষেপে জানাইতে হইলে Yamato Spirit অর্থাৎ আমাতো শক্তি, য়ামাতো বীর্য্য, য়ামাতো ধর্ম্ম বা য়ামাতোর 'ধাত' ইত্যাদি শব্দের পারিভাষিক প্রতিশব্দ ব্যবহার করে। আমরা যেমন বলি—"যতক্ষণ আমার শরীরে আর্য্যশোণিত প্রবাহিত ততক্ষণ আমার দ্বারা……"সেইরূপ জাপানীরা বলে—"আমাদের য়ামাতো-ধাতের সঙ্গে চীনা সভ্যতা,

ভারতীয় সভ্যতা এবং আজকাল ইয়োরামেরিকার সভ্যতা মিলাইয়া লইয়াছি। য়ামাতো-রক্ত সর্ব্বদা নূতন নূতন শক্তির সংস্পর্শে আসিয়া পুষ্ট হইতেছে। এই জন্য জাপান চিরকাল উন্নতিশীল।"

অধ্যাপক হিরাই বলিলেন—"মহাশয়, কিছুকাল হইল আমি একখান সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধান দেখিতেছিলাম। হঠাৎ যমকোটি শব্দ চোখে পড়িল। অভিধানে যেরূপ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায় লঙ্কা দ্বীপের যতটা পশ্চিমে ও উত্তরে জাপান অবস্থিত যমকোটি শব্দে হিন্দুরা সেই দেশ বুঝিত। জাপানী য়ামাতো যমকোটি শব্দের অপভ্রংশ কিনা কে বলিতে পারে?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"ভারতীয় ভাষা হইতে জাপানী শব্দের আমদানি হইয়াছে এরূপ বুঝিবার কোন কারণ আছে কি?" হিরাই উত্তর করিলেন—"কেবল ভাষা কেন, আমাদের জাতিও ভারতীয় জনগণেরই আত্মীয় এবং বংশসম্ভূত আমি এইরূপই বিশ্বাস করি। এতদিন পণ্ডিতগণের ধারণা ছিল যে জাপানীরা মঙ্গোলিয় বা পীত জাতি। চীন ও কোরিয়ার জনগণকে এবং জাপানী নরনারীকে এক গোত্রভুক্ত করা ভাষাতত্ত্ববিৎ নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের প্রয়াস ছিল। জাপানের অধ্যাপক মহাশয়গণও জাপানী জাতিকে Mongolian বা Yellow race বলিয়া জানেন। আমি এই মতের সম্পূর্ণ বিরোধী।" আমি বলিলাম—"আজকাল কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলিতেছেন—জাপানীরা মঙ্গোলিয় জাতিসম্ভূত নয়। তাহারা এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে অধিবাসী জনগণেরই আত্মীয়। চীনাদের সঙ্গে জাপানীদের রক্তগত অথবা ভাষাগত সম্বন্ধ কিছুই নাই। দুই সমাজকে এক পীতাঙ্গ জাতির দুই শাখা বিবেচনা করা চলে না।"

হিরাই বলিলেন—"আমিও চীনাদিগকে জাপানীর গোত্রভুক্ত করিতে পারি না; প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতীয় জনগণের সঙ্গেই আমাদের আত্মীয়তা ছিল এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে আমরা কোরিয়া হইতে আমদানি করি। তাহার পর হইতে কোরিয়া ও চীনের পীতাঙ্গ জাতির সঙ্গে আমাদের লেনদেন বাড়িয়া যায়। কিন্তু খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে এই য়ামাতো দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল? এ কথা সকলেরই জানা আছে যে জাপানের আদিম নিবাসিগণের নাম Aino (আইনো)। তাহাদের বংশধরেরা এক্ষণে জাপানী দ্বীপপুঞ্জের সর্ব্বোত্তর দ্বীপে বাস করিতেছে। এই আইনোদিগের জন্মস্থানে জাপানী ঔপনিবেশিকেরা বিদেশ হইতে আগমন করে। তাহার পর এই দেশের নাম হয় য়ামাতো। আর্য্যগণের আগমনের পর যেমন ভারতবর্ষের নাম আর্য্যস্থান, আর্য্যাবর্ত্ত বা আর্য্যভূমি, সেইরূপ বিদেশীয় আগমনের পর এই উদীয়মান সূর্য্যের দেশ য়ামাতোস্থান নামে পরিচিত হইল। কিন্তু এই বিদেশীয়েরা আসিল কোথা হইতে?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কি বলিতে চাহেন যে ভারতবর্ষ য়ামাতোস্থান-দিগের পিতৃভূমি? আপনাদের দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে জাপানীরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন সংবাদ রাখিত কি? কোরিয়া এবং চীনের সাহায্য পাইবার পূর্ব্বে জাপানীরা হিন্দুস্থানের পরিচয় পাইয়াছিল তাহার প্রমাণ কৈ?" হিরাই বলিলেন—"প্রথমেই আমি ধর্ম্মের প্রমাণ দিব। জাপা-

নীরা ষষ্ঠ শতাব্দীতে কোরিয়ার সাহায্যে বৌদ্ধধর্ম্ম আমদানি করে। তাহার পূর্ব্বে জাপানী সমাজে কি ধর্ম্মভাব আদৌ ছিল না? নিতান্ত অসভ্য ও বর্ব্বর সমাজে অল্পকালের ভিতর বৌদ্ধধর্ম্ম, সাহিত্য ও শিল্প স্থায়ী হইয়া গেল কি করিয়া? আমি বলিব—বৌদ্ধ ধর্ম্মের সমান অথবা অনুকূল ধর্ম্ম য়ামাতো দেশে ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বেই বিরাজ করিতেছিল। য়ামাতোধাতে কোরিয়ার বৌদ্ধধর্ম্ম নূতন বোধ হয় নাই—বরং য়ামাতোবাসিগণ এই উদার ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য অর্দ্ধ প্রস্তুত হইয়াছিল। সেই অর্দ্ধ প্রস্তুত থাকিবার যুগ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক আলোচনা এখনও বেশী হয় নাই। যখন হইবে তখন দেখা যাইবে যে সেই যুগের য়ামাতোস্থানে এবং হিন্দুস্থানে অতিশয় গভীর ও নিকট সম্বন্ধ ছিল। সেই যুগের হিন্দু-জাপানী সংমিশ্রণে চীনের সাহায্য আবশ্যক হয় নাই।"

এই কথা বলিতে বলিতে হিরাই amanopara (আমানোপারা) শব্দের উল্লেখ করিলেন। এই শব্দ সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের জাপানী লোক-সাহিত্যে পাওয়া যায়। ইহার অর্থ স্বর্গভূমি। য়ামাতোবাসিগণ তাহাদের পিতৃস্থান সম্বন্ধে এই আখ্যা প্রয়োগ করিত। য়ামাতোর প্রাচীনতম লোক-সাহিত্যে বহু ভারতীয় কাহিনীর উল্লেখ পাই। প্রাচীন জাপান এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের সাহিত্য তুলনা করা এইজন্য বিশেষ আবশ্যক। কিন্তু এইদিকে কোন পণ্ডিতেরই দৃষ্টি পড়ে নাই। সকলেই চীন-জাপানের আদান প্রদান বুঝিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন। কিন্তু চীনাযুগের পূর্ব্বে য়ামাতোস্থানের একটা ভারতীয় যুগ আছে এ কথা কাহারও মনে আসে নাই। হিরাইয়ের নিকট এই তথ্য প্রথম জানা গেল। ভারতীয় পণ্ডিতগণের কেহ কেহ এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোরিয়া হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম ও শিল্প আমদানির পূর্ব্বে য়ামাতোবাসিগণ অনেকটা বৌদ্ধভাবাপন্ন ছিল—আপনার এই মত সমর্থন করা সম্ভব কি?" হিরাই বলিলেন—"উপনিষদের গূঢ় অধ্যাত্মবাদ ও Esoteric Religion এবং Mysticism য়ামাতোস্থানে পূর্ব্ব হইতেই ছিল। এইরূপ ছিল বলিয়াই জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম সহজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছে। Eninokini (এনিনোকিনি) নামক একব্যক্তি ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে আমাদের সমাজে অর্দ্ধবৌদ্ধ অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রচার করিয়া যান। এইরূপ অধ্যাত্মবাদিগণের সংখ্যা একাধিক।"

ভাষার প্রমাণ সম্বন্ধে হিরাই বলিলেন—"এ বিষয়ে আমি যথেষ্ট কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি। জাপানী ভাষা গ্রীক, ল্যাটিন, সংস্কৃত এবং পার্শী ভাষাসমূহের ন্যায় আর্য্যভাষা। ইহা কোন মতেই মঙ্গোলিয় শ্রেণীর অন্তর্গত নয়। বাক্যে পদ সন্নিবেশের রীতি, বিভক্তি, ব্যাকরণ, শব্দসম্পদ ইত্যাদি সকল বিষয়েই জাপানীরা আর্য্যভাষাভাষী। আমরা চীনালিপি আমদানি করিয়াছি বলিয়া আমাদিগকে চীনাভাষাভাষিগণের পর্য্যায়ভুক্ত করা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক ভ্রান্তিমূলক। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ যে সকল প্রমাণের সাহায্যে ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় ভাষাসমূহের মধ্যে পারিবারিক ঐক্য স্থাপন করিয়াছেন আমি সেই সকল প্রমাণের সাহায্যেই জাপানী ভাষাকে আর্য্য বা ইণ্ডো-ইয়োরোপীয়ান পর্য্যায়ভুক্ত করিতে পারি। আমি বহু-

সংখ্যক জাপানী শব্দের সংগ্রহ করিয়াছি। এই গুলির সঙ্গে Indo-Aryan বা Indo-European বা Aryan অন্তর্গত অন্যান্য ভাষার শব্দের তুলনা সাধনও করিয়াছি। এই সকলগুলির উৎপত্তি যে এক এই বিষয়েও আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে। কিন্তু Philologistগণ এত শীঘ্র তাঁহাদের সংস্কার বর্জ্জন করিয়া আমার নূতন মত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবেন না। বলা বাহুল্য জাপানী ভাষাবিজ্ঞানবিদ্‌গণ সকল বিষয়েই এখনও ইয়োরামেরিকানদিগের অনুচর মাত্র। তাঁহারা আমার এই স্বাধীন মত নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিতেও প্রস্তুত নন!"

হিরাই একখানা পুস্তিকার * ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—

"It has generally been accepted almost as a truism that the Japanese language belongs to the Ural-Altaig or Turanian family. * * * In the face of this deep rooted opinion even a suggestion that our tongue is affiliated to the Indo-European branch would excite laughter. * * *

I wrote a brief treatise comparing the Japanese and Indo-European grammars, which, I think, must convince a careful reader of an undoubted family connexion between the two languages. * * * But as it was written in Japanese and cannot be widely read, I am now re-writing it in English at somewhat greater length than the original, in which I have compared our grammar mostly with the Bengali and Assami pointing out a great similarity between them. Having studied the Persian grammar since then, I have found it still more like our grammar. I have also examined the Nepali grammar. It is akin to tne Bengali and Assami, as all other Indo-Aryan dialects, Marathi, Hindusthani etc. bear close resemblance to them. All of them will be fully compared with our grammar in my treatise in English. Even the Greek and Sanskrit grammars should be consulted, as, to take a single example, the enclitic particles in them are nothing more nor less than our particles, known under the name of *Teniwoha*, and considered by most of us the only peculiarity of the Japanese language."

কয়েকটা জাপানী শব্দের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

Akir—clear luminous, distinct, obvious.

Greek, aigle (glitter, splendour, lustre, brightness), hence glad, aglaos, hence English glow. Latin acclaro (to make clear, to reveal) ; hence Eng. clear. Sanskrit and Hindusthani agurh (evident, easy of comprehension).

Ame—heaven, sky. Sanskrit Amar (immortal), amit (undying). Persian and Hindusthani Asman (sky, heaven). Pali Amata (immortal).

Aka—water, Sanskrit ap, Persian ab (water), Gothic ahwa (river), Old High German aha, Anglo-Saxon Ea, Lat. aqua (water).

* A Vocabulary of the Japanese and Aryan languages hypathetically compared.

Haruka—far, distant, remote. Sanskrit pâra (far, distant) Zend pâra, Greek pera, Lat. peren-die, Gothic fairra, German feru, English far.

Hiko—an echo, GK. eko, Lat. and English echo.

Musi—Insects, worms, bugs, Eng. Moth, Dutch mot, German motte.

Mugi—Barley, wheat, Swedesh muga (heap, esp of hay).

Kami—hair of thehead, Sanskrit ka (head), GK. Kome (hair) coma (foliage), Kometes (comet) English comet (lit. long haired).

কতিপয় শব্দের উচ্চারণ গত সাদৃশ্য দেখা-ইতে পারিলেই বিভিন্ন ভাষার ঐক্য স্থাপিত হয় না। ব্যাকরণের ঐক্য প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক। এই জন্য হিরাই বলিতেছেন :—

"I am not sanguine enough that my hypothesis will be taken into serious consideration until detailed grammatical evidence should be presented to the public. For the present I shall rest satisfied with this statement, that supposing the identification of our words with the Indo-European a mere chimerical fancy it will at least furnish aid in no small degree to linguists interested in the study of either the Japanese or the Indian or the European languages, as suggestions and helps to the memory of foreign words by Association."

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

কর্ম্ম-ভূমি

(গান)

শান্তি-হাওয়ায় ঘুম পাড়িয়ে রেখো না মা, দিনের বেলায়।
বিশ্ব-ভরা লোকের সাথে মাত্‌ব আমি ধূলা-খেলায়।

তোমার-ই যে হাতের গড়া,
খাঁটি তাই এ মাটির ধরা ;
আমাদের-ও স্নেহ-প্রীতি রচেছ ত মাটির ডেলায়।

সারাটা দিন ধরে' খাটাও,
যেথা হ'ক ছুটিয়ে পাঠাও,
ক্লান্তি এলেও আমায় হাঁটাও বিশ্ব-বাসের লোকের মেলায়।

স্বর্গটি ত স্বার্থে রচা ;
সে কূপে যে গন্ধ পচা !
নর-সেবার কর্ম্ম-ভূমি কেমন করে' ঠেল্‌ব হেলায় ?

শান্তি আনে সুখের সাজা ;
শক্তি-দানে কর তাজা !
ঝড় তুফানে দিব পাড়ি অকূল সাগর, ক্ষুদ্র ভেলায়।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

কার্য্য-কারণ তত্ত্ব

জগৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গেলেই, কিছু বুঝিতে গেলেই,—কোন বিষয় সম্বন্ধীয় তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিতে গেলেই, যুক্তিপ্রণালী অবলম্বন করিতে হয়। এই যুক্তিপ্রণালী স্থূল বা লৌকিক এবং সূক্ষ্ম বা অলৌকিক ভেদে দ্বিবিধ। স্থূল যুক্তিতর্কের অবতারণা স্থূলদর্শী বৈষয়িক ব্যক্তিরাই করিয়া থাকে। জগতের অধিকাংশ ব্যক্তিই স্থূলদর্শী। তাহারা যেন বিষয়টাকেই বিশেষভাবে জানে, বিষয়ীর সম্বন্ধে যেন তাহাদের ঔদাসিন্যই অধিক, এই প্রকার মনে হয়। এমন কি বিষয়-জগৎকেই যেন তাহারা সত্য স্বতন্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করে, আন্তর জগৎটাকে তাহার একটা গৌণ বা আনুষঙ্গিক ফল বলিয়া মানিয়া লয়। যাহাকে বৈজ্ঞানিক যুক্তিপ্রণালী বলা যায়, তাহা ব্যবস্থিত ও মার্জ্জিত স্থূলবুদ্ধিসম্ভূত যুক্তিপ্রণালী ব্যতীত আর কিছুই নহে। কেবল বিশুদ্ধ দার্শনিক প্রণালী স্বাত্মবোধমূলক সূক্ষ্ম বিচার। তাঁহারা বিষয়জগৎ অপেক্ষায় জ্ঞানজগতেরই অধিক আলোচনা করেন, আত্মপ্রত্যয়ের উপরই নিতান্ত নির্ভর করিয়া থাকেন। তাই তাঁহাদের বিচার প্রণালী অধিকতর জ্ঞান সম্পর্কিত। অতএব বর্ত্তমান প্রবন্ধে স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় যুক্তিই প্রযুক্ত হইবে। প্রতিপক্ষ যে প্রণালীর যুক্তি প্রদর্শন করিবেন, তাহার সমর্থন বা খণ্ডনও যথা সম্ভব সেই প্রকার প্রণালী অবলম্বনে করিতে হইবে।

বিষয়জগৎ সম্বন্ধে কোন তথ্য নির্দ্ধারণ করিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমেই আমরা কার্য্য-কারণ সম্বন্ধের আশ্রয় গ্রহণ করি। তাই কার্য্য কারণ সম্বন্ধে আপাততঃ দুই একটি কথা বলা আবশ্যক বোধ করিতেছি। কার্য্য কাহাকে বলে ?

ইহার উত্তরে কেহ বলেন, "যৎ সাবয়বং তৎকার্য্যং"। অর্থাৎ যাহা অবয়বারব্ধ—যাহা অনেক দ্রব্য সংযোগে উৎপন্ন তাহাই কার্য্য। কিন্তু এপ্রকার লক্ষণ সর্ব্বস্থলে ঠিকমত খাটে না। তাই কেহ কেহ বলেন, "প্রাগভাব প্রতিযোগিত্বং কার্য্যত্বং।" অর্থাৎ যাহা ছিল না হইল,—ঈদৃশ বুদ্ধির বিষয় তাহাই কার্য্য। যথা ঘট পট প্রভৃতি।

Mill প্রমুখ দার্শনিকেরাও কার্য্যের ঈদৃশ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে কার্য্য, ঘটনা, পরিবর্ত্তন প্রভৃতি সমপর্য্যায় শব্দ। Mill বলেন, "The matter composing the universe, whatever philosophical theory we hold concerning it, we know by experience to be constant in quantity ; never beginning or ending, only changing its forms. But its forms have a beginning and ending : and it is its forms, or rather its changes of form—the end of one form and beginning of another—which alone we seek a cause for, and believe to have a cause. It is *events*, that is to say, *changes*, not substances, that are subject to the law of causation."

বৈজ্ঞানিকেরাও বোধ হয় কার্য্যের এই প্রকার লক্ষণই স্বীকার করিবেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যাহা **বিকার, পরিবর্ত্তন** বা **ঘটনা** তাহাই কার্য্য।

এক্ষণে দেখা যাউক কারণ কাহাকে বলে? কারণের স্বরূপ সম্বন্ধে বহুল মতবিরোধ দৃষ্ট হয়। এবং কার্য্যকারণ সম্বন্ধের সত্যতা এবং দৃঢ়তা বিষয়েও সকলে একপন্থী নহেন। কারণ কাহাকে বলে? তাহার উত্তরে ন্যায়-বিদেরা বলেন, "অন্যথাসিদ্ধিশূন্যস্য নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিতা কারণত্বং।" ইংরাজী-অভিজ্ঞ পাঠকেরা এই লক্ষণের সহিত John Stuart Millএর লক্ষণের অবিকল সাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন। Millএর মতে যাহা invariable and unconditional antecedent তাহাই কারণ। কিন্তু আবার অনেক স্থলে তিনি বলিয়াছেন, নিমিত্ত সামগ্রী—যদ্ব্যতীত কার্য্য উৎপন্ন হয় না—তাহাই কারণ। নিমিত্ত সামগ্রীর অর্থ,—"Sum-total of all the conditions." অতএব দেখা যাইতেছে Millও কেবল কালিক পূর্ব্ববর্ত্তিতাকেই কারণ বলিতে পারিতেছেন না। তাঁহার "unconditional" শব্দ প্রয়োগই তাহা বুঝাইয়া দিতেছে। নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিতা যে কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না তাহার কারণ কি? তাহার কারণ এই যে, তাহা হইলে অনেক পূর্ব্ববর্ত্তিতাকে কারণ বলা যাইতে পারিত যাহা প্রকৃত পক্ষে কারণ নহে। বিজলীর পরে বজ্রধ্বনি, দিনের পর রাত্রি, স্রোতের পর স্রোত, ক্ষণের পর ক্ষণ—ইত্যাদি স্থলে অব্যবহিত নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিতা বর্ত্তমান, কিন্তু ইহারা সকলেই পরতন্ত্র ভাবে পূর্ব্ববর্ত্তী, নিরপেক্ষ ভাবে নহে। অন্য কারণকে অপেক্ষা করিয়াই ইহাদের উপপত্তি। সেই জন্য ইহারা ক্রমান্বয়ে একটি অপরটির কারণ হইতে পারিতেছে না।

আর একটি কথা বিবেচ্য। নিমিত্ত সামগ্রী (sum-total of all the conditions) এবং নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিতা এ দুইটি জিনিষ কি একার্থবোধক? কখনই নহে। একটির মধ্যে পৌর্ব্বাপর্য্যের গন্ধ মাত্র নাই; অপরটিতে পৌর্ব্বাপৌর্য্যই সর্ব্বস্ব। অতএব Mill এই উভয় লক্ষণ স্বীকার করিয়া তাঁহার কারণতাকে অস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন বলিতে হইবে।

এক্ষণে কারণের পূর্ব্ববৃত্তিতা সম্বন্ধে একটু চিন্তা করা যাউক। পূর্ব্ববর্ত্তিতার অর্থ যে ক্ষণে কার্য্যের আরম্ভ তাহার পূর্ব্বক্ষণে বিদ্যমানতা। ইহাদ্বারা কি ইহাই সূচিত নহে যে, যেক্ষণে কার্য্য আরব্ধ, সেক্ষণে কারণের অভাব; এবং যে ক্ষণে কারণের বিদ্যমানতা, সে ক্ষণে কার্য্যের অভাব? কিন্তু এ সিদ্ধান্ত সর্ব্বথা নির্যুক্তিক। যদি কারণ স্বক্ষণে কার্য্যের উৎপাদন করিতে না পারে, তবে পরক্ষণেই বা কি প্রকারে পারিবে, ইহা বুঝা যাইতেছে না। হইতে পারে এক ক্ষণাবচ্ছেদে কারণ সামগ্রীর সম্মিলন ঘটে না; কিন্তু তাহাতে কি হইল? ধরিয়া লওয়া যাউক যে কারণ সামগ্রীর সম্মিলন ঘটিতে কিঞ্চিৎ দীর্ঘকাল আবশ্যক হয়। কিন্তু কথা হইতেছে, যে কালে কারণসামগ্রীর মিলন ঘটে, সেই কালেই কার্য্যোৎপন্ন না হয় কেন? অর্থাৎ কারণ ও কার্য্যের ভিতরে কালের ব্যবধান থাকিবে কেন? সমগ্র কারণ বিদ্যমান সত্বেও যদি তৎক্ষণাৎ কার্য্যোৎপত্তি না ঘটে, তবে কস্মিন কালেও কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারিবে না। কেন না, কারণ সামগ্রী কার্য্য জননে অশক্ত, ইহাই সূচিত হইতেছে।

অন্যদিক দিয়াও আর এক প্রকার আপত্তি উত্থিত হইতে পারে। জগতে ঘটনাপ্রবাহ অনাদি। অনাদি প্রবাহের প্রত্যেক ব্যক্তিই অপরের অপেক্ষা রাখে। অতএব অনবচ্ছিন্ন ঘটনা পরম্পরার মধ্য হইতে কতকগুলিকে নির্বাচন করিয়া অপরগুলিকে পরিত্যাগ করা যায় না। কারণসামগ্রী সুতরাং অনাদি ঘটনা পরম্পরাকেই বলিতে হয়। তাহা হইলে কার্য্য কারণের সীমাবধারণ অসাধ্য হইয়া পড়ে। অথচ ব্যবহার বিষয়ে আমরা কার্য্য কারণের সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া থাকি; কিন্তু এ প্রকার ব্যবহারের মূলে কোন যুক্তি আছে কি না তাহা বুঝিতে পারা যায় না; কেন না যুক্তি এ ব্যবহারকে সমর্থিত করে না। এ সম্বন্ধে মহাত্মা ব্র্যাডলীর কোন গ্রন্থ হইতে দুই এক পংক্তি উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইতেছি।

"Do you mean that what we commonly call the 'conditions' of an event are really complete? In practice certainly we leave out of the account the whole background of existence; we isolate a group of elements, and we say that, whenever these occur, then something else always happens; and in this group we consider ourselves to possess the 'sum of the conditions.' And this assumption may be practically defensible, since the rest of existence may, on sufficient ground be taken as irrelevant. We can therefore treat this whole mass as if it were inactive. Yes, but that is one thing, and it is quite another thing to assert that really this mass does nothing. Certainly there is no logic which can warrant such a misuse of abstraction. The background of the whole world can be eleminated by no sound process, and the furthest conclusion, which can be logical, is that we need not consider it practically. .... But to give out this working *doctrine as theoretically true is quite illegitimate*". * আরও একটি কথা। যদি ঘটনারই কারণ অনুসন্ধেয় হয় তবে ঘটনা পরম্পরারও কারণ অনুসন্ধেয় হওয়া উচিত। কিন্তু যদি ঘটনা মাত্রই কার্য্যস্থানীয় হয়, তবে কারণ কোথায়? যে ঘটনাপরম্পরাকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতেছে, তাহা ত প্রকৃতপ্রস্তাবে কার্য্যই, কেননা ঘটনা, পরিবর্ত্তন, রূপান্তর ইহারা সমপর্য্যায়। ঘটনাই যদি কার্য্য হইল, তাহার কারণও কি ঘটনা। ইহা স্ববিরোধী। Martineau বলেন:—"Changes have only to be *change*, and the question is asked about them; and no answer is given till you go beyond the category of change, and instead of stepping from one member of it to another with endless beat, refer its whole contents, as such, to that which is other than phenomenon." অতএব কার্য্যত্বের লক্ষণই যখন ঘটনা (phenomena)

* Appearance and Reality—Activity, p. 67.

তখন কারণতার লক্ষণ তদতিরিক্ত না হইলে কোন প্রকারেই চলিতেছে না। যদি বলা যায়, কার্য্যবিশেষের প্রতি ঘটনাবিশেষ কারণ, সে বাক্যও নির্দ্দোষ নহে; কেননা উভয় দিক হইতে "বিশেষ" কথাটি অপসারিত করিলে, ঘটনাই ঘটনার কারণ, অথবা কার্য্যই কার্য্যের কারণ এই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। ইহা স্ববিরোধী।

বাস্তবিক কার্য্যকারণের জ্ঞান বিষয়জগৎ হইতে লাভ করিতে গেলে উক্ত প্রকার সমস্যা অনিবার্য্য ও অনিরাকরণীয় বলিয়াই বোধ হয়। তাই Martineau প্রভৃতি দার্শনিকেরা অন্তর্জগৎ হইতে ঐ জ্ঞান লাভ করিতে চাহেন। তাঁহারা বলেন, ইচ্ছা শক্তির পরিচালনা হইতেই মানুষ কারণতার জ্ঞান আহরণ করে। মানুষ নিজেকে যদি কর্ত্তা বলিয়া না জানিত তবে কারণতার বোধ তাহার কস্মিনকালেও সম্ভবপর হইত না। *Flint* বলেন:—"When the soul wills, it knows itself as an agent, as a cause. This is the first knowledge of causation which the mind acquires, and the most perfect knowledge thereof which it ever acquires. ...... If we did not know ourselves as causes, we could not know God as a cause; and we know ourselves as causes only in so far as we know ourselves as wills." Theism.

Martineau বলেন, এই ইচ্ছাশক্তির পরিচালনাতেই আমরা শক্তির জ্ঞান লাভ করি। ইচ্ছাই যে শক্তিরূপিণী তাহা আমাদের অব্যবহিত বোধসিদ্ধ। ইচ্ছাতে যে জ্ঞান ও শক্তির একত্র সন্নিবেশ তাহা আমাদের স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হয়। অতএব এই জ্ঞান-শক্তিরূপিণী ইচ্ছাই কার্য্যের একমাত্র কারণ। ইহা ঘটনাপরম্পরা নহে; ইহাই মূল কারণ; ইহার অতিরিক্ত আর কারণতা নাই।

কিন্তু প্রতিপক্ষ আপত্তি করিয়া থাকেন, ইচ্ছার পরিচালনায় আমরা শক্তির কোন প্রকার আভাস পাই না। অব্যবহিত ভাবে ত একেবারেই পাই না। ইচ্ছার পরিচালনা যদি বাহ্য জগতে কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে, তবেই আমরা অনুমান করি, উহা শক্তিসমন্বিত। কিন্তু যদি কোন ব্যাধি বশতঃ আজ্ঞানাড়ী (motor nerves) বিকৃত হয়, তাহা হইলে ইচ্ছা যে শক্তিরূপিণী তাহা বুঝিতেই পারা যাইবে না। বিশেষতঃ ইচ্ছা ও অঙ্গের আকুঞ্চনপ্রসারণ—এ উভয়ের মধ্যে ব্যবধান বড় বেশী; এবং এইখানটায় কি কি ঘটে তাহার কোন সংবাদই আমরা রাখি না; আমরা কেবল শেষ কার্য্যটি মাত্র দর্শন করিয়া থাকি। সুতরাং ইচ্ছা ও তৎকার্য্যের সম্বন্ধ আমরা পরোক্ষভাবে জানি, অপরোক্ষ ভাবে জানি না। বাহ্য জগতে কারণতার জ্ঞান নিশ্চিতই ইচ্ছাশক্তির অনুকরণে প্রাপ্ত বটে; স্বয়ং পরিবর্ত্তিত না হইয়া অন্য বিষয়কে পরিচালিত করা—পরিবর্ত্তন আরম্ভ করা, প্রভৃতি কারণতা বলিতে যাহা কিছু মৌলিক ধারণা, তাহা এই ইচ্ছাশক্তির পরিচালনায় লব্ধ বটে; কিন্তু তথাপি এই ইচ্ছার ফলোৎপত্তির অনিবার্য্যতা বা ভবিতব্যতা স্বতঃসিদ্ধ নহে। কার্য্যোৎপত্তি দর্শনে ইচ্ছার শক্তিমত্তা অনুমিত হয় মাত্র।

কেহ কেহ বলেন দৈহিক পরিবর্ত্তনজননে আত্মকর্ত্তৃত্ব বা আত্মশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু ইচ্ছার উপরেই যে আত্মার প্রভাব প্রকটিত হয়, তাহা হইতেই আত্মার

স্বাতন্ত্র্য ও শক্তিমত্তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এবং ইহাই কারণতা বোধের উপাদান। বাহ্যজগতে এই আত্মশক্তির উপমা লইয়াই কারণতা অনুমিত হয়। কিন্তু Mill ইহার উত্তরে বলেন, ঈদৃশ শক্তিমত্তার বোধই আমাদের নাই। "In common with our half of the psychological world, I am wholly ignorant of my possessing any such power. I can indeed influence my own volitions, but only as other people can influence my volitions, by the employment of appropriate means." Examination. অর্থাৎ আমরা উপযুক্ত করণপ্রয়োগে ইচ্ছাকে চালিত করিতে পারি বটে, কিন্তু ইহা হইতে আমাদের ইচ্ছার উপর যে আমাদের একটা শক্তি আছে তাহা প্রমাণসিদ্ধ নহে। নিজের ইচ্ছাকে চালিত করিতে আমিও যেমন পারি, অপর ব্যক্তিও ঠিক তেমনই ভাবে পারে। ইহাতে শক্তির কোন সাক্ষাৎ পরিচয় নাই।

আমার বোধ হয় Millএর উক্তি এখানে স্ববিরোধী। জিজ্ঞাসা করি, এখানে উপযুক্ত করণই কি ইচ্ছাকে চালিত করে, না করণ সহায়ে আমি ইচ্ছাকে চালিত করি? যদি করণ স্বতন্ত্রভাবেই ইচ্ছাকে পরিচালিত করে, এইরূপ আমাদের বোধ থাকে, তাহা হইলে করণের কর্তৃত্বশক্তি অবশ্যই প্রত্যক্ষলব্ধ ইহা স্বীকার করিতে হয়; এবং তাহা হইলে অহং-এর সম্বন্ধ তাহাতে অনুস্যূত কেন? "আমি করিতে পারি" একবার অর্থ কি? দ্বিতীয়তঃ করণের যে এপ্রকার স্বাতন্ত্র্য ও কর্তৃত্ব আছে তাহাই বা কি প্রকারে বোধগম্য হইবে? কর্তৃত্ববোধ না থাকিলে করণেই বা তাহার আরোপ সম্ভবে কি প্রকারে? তৃতীয়তঃ "ইচ্ছাকে আমি চালিত করিতে পারি" অথচ "ইচ্ছাকে চালিত করিবার সামর্থ্য আমার নাই"—এই দুইটি বাক্য কি পরস্পরবিরুদ্ধ নহে? "চালিত করিতে পারি" এই ভাবটাই কি সামর্থ্যসূচক নহে? Millএর বলা উচিত ছিল, ইচ্ছাকে আমরা চালিত করিতে পারি না, অথবা, চালিত করিতে পারি কি না তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। কিন্তু Mill তাহা না বলিয়া বলিতেছেন, ইচ্ছাকে আমরা চালিত করিতে পারি, কিন্তু চালিত করিতে সমর্থ নহি। ইহা স্ববিরোধী।

আরও একটি কথা। ইচ্ছা যে দৈহিক পরিবর্ত্তন উৎপন্ন করিতে পারে তাহা না হয় আমরা পরোক্ষ ভাবে—ফল দৃষ্টে—জ্ঞাত হইলাম; কিন্তু যে প্রকারেই জ্ঞাত হই না কেন, ইচ্ছাই যে ঐ পরিবর্ত্তনের আরম্ভক তাহা কি আমরা বুঝিতে পারি না? ফল উৎপন্ন হউক বা না হউক, ইচ্ছা প্রয়োগেই যে শক্তির বিকাশ তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। মনে করা যাউক একটি দেয়াল বা দৃঢ়মূল বৃক্ষকে স্থানচ্যুত করিবার জন্য আমি চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইলাম। আমার ইচ্ছাশক্তি উহাতে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারিল না। কিন্তু তাই বলিয়া আমি যে ঐ পরিবর্ত্তন ঘটাইতে বল প্রয়োগ করিয়াছি, তাহাও কি আমার অবিদিত রহিল? ব্যাধিবশতঃ অঙ্গাদির পরিচালনা স্তম্ভিত হইলে ঐপ্রকার শক্তিবোধ অসম্ভব হইত বটে, কিন্তু তাই বলিয়া নিরাময় ব্যক্তিও স্বেচ্ছাশক্তির প্রয়োগে একটা সামর্থ্যের জ্ঞান লাভ করে না, ইহা কি প্রকারে সম্ভব? চক্ষু মুদ্রিত করিলে বিষয়

দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু উন্মীলিত চক্ষুও কি বিষয় দর্শন করিবে না? যাহা হউক, আত্মার যথার্থ কর্তৃত্ব আছে কি না এবং থাকিলে তাহার স্বতঃ প্রকাশ কোথায়—ইহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে আমাদের দৃষ্টি অন্যত্র নিক্ষেপ করা আবশ্যক,—ইচ্ছাকৃত দৈহিক পরিবর্ত্তনের মধ্যে, বা ইচ্ছার পরিচালনে তাহার সম্যক অবগতির উপায় নাই। ইচ্ছার পরিচালনায় তাহার কতকটা আভাস পাইলেও সেখানে উহার স্বতঃ প্রকাশ অবিদ্যমান। আত্মার পূর্ণ কর্তৃত্ব বিষয়গ্রহণে, বুদ্ধির ব্যাপারে পরিস্ফুট। আত্মার কর্তৃত্ব ব্যতীত বিষয়বোধই (perception) অসম্ভব। কেন অসম্ভব তাহা স্থানান্তরে আলোচিত হইবে। প্রত্যেক ভাবনায়, প্রত্যেক বিষয়াবগতিতে এই আত্মকর্তৃত্ব স্বতঃসিদ্ধ। বুদ্ধি-ব্যাপার-বর্জ্জিত বিষয় গ্রহণের অযোগ্য। ভাবিয়া দেখিলেই ইহার সত্যতা প্রতীয়মান হইবে। বিষয়ের অবগতিই আত্মার কর্তৃত্ব এবং এই কর্তৃত্ববোধ স্বতঃসিদ্ধ। ইহাই কারণতাবোধের মূল সূত্র। বহির্জগতে আমরা যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করি, সমস্তই কার্য্য। এই কার্য্য-দর্শনে আমরা কারণের অনুমান করি বটে, কিন্তু কোন ঘটনার প্রত্যক্ষে কারণকে অব্যবহিত ভাবে উপলব্ধি করি না এবং কি প্রকার কার্য্য উৎপন্ন হইল, কিম্বা কল্পিত কারণের সহিত ইহার সম্বন্ধই বা কি প্রকার, বহির্বিষয় বিশ্লেষণে তাহা অবগত হইতে পারি না। বলিতে কি, এই স্বতঃসিদ্ধ কারণতার জ্ঞান লইয়াই আমরা বহির্বিষয় বুঝিতে চেষ্টা করি; তাই বহির্জগতে আমরা কারণের অনুসন্ধান করি! অনুসন্ধেয় বিষয়ের কিঞ্চিৎ জ্ঞান না থাকিলে অনুসন্ধানই অসম্ভব হয়। এবং এই জ্ঞান আত্মার বিষয়াববোধে প্রকট। এই ক্রিয়া ও কর্তৃত্বের জ্ঞান যদি অপরোক্ষভাবে লব্ধ না থাকে, তাহা হইলে বহির্জগতে ক্রিয়া ও কর্তৃত্বের ধারণাই সম্ভবপর নহে; এবং আত্মকর্তৃত্ববোধ যদি মিথ্যা হয়, তবে জগৎ-ব্যাপারের জ্ঞানও মিথ্যা ইহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না; তাই একজন দার্শনিক বলিয়াছেন:—"For we ourselves are the only cause of whose mode of action we have immediate knowledge, through inner intuition. In the case of every other, though we may perceive its effects, we can only infer from the facts, and cannot immediately learn by perception of the facts, the mode and kind of way in which those effects arise, and the connection of them with their cause."*

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি বিষয়ের অবগতিই আত্মার কর্তৃত্ব। এই কথাটি আরও একটু বিশদ করিয়া দেখিতে গেলে প্রতীয়মান হইবে, অবগতি একটা Passive ব্যাপার নহে পরন্তু সম্পূর্ণ active ব্যাপার, এমন কি যে প্রকারে আত্মা বিষয়কে বিশিষ্ট রূপে অবগত হয়, সেই প্রকারেই ইহা বিষয়ের উৎপাদক অর্থাৎ আত্মার পক্ষে বিষয়াবগতি ও বস্তুসৃষ্টি একই কথা। খণ্ডজ্ঞানে বিষয়ের স্বতন্ত্রতা প্রতীয়মান হয় সত্য; কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে কোন এক অখণ্ড স্থির অন্বয়ী জ্ঞান ব্যতীত খণ্ডজ্ঞানের পক্ষেও বিষয়বোধ সম্ভাব্য নহে। যে স্বতঃব্যাবর্ত্তকী সংশ্লেষণী ক্রিয়া বশতঃ

* Quoted by Dr. Martineau, chap. I, vol. I, p. 189.

বিষয়াববোধ সম্ভাব্য তাহাই আত্মপ্রযত্ন এবং তাহাতেই আত্মার স্বতঃ কর্তৃত্ব প্রস্ফুটিত। বিষয়াবদ্ধদৃষ্টি ব্যক্তিরা ইহা না বুঝিয়া বিষয়-জগৎকে স্বতন্ত্র মনে করে এবং তাহার মধ্যে কার্য্যকারণ অন্বেষণ করে। যাহা হউক এ তত্ত্ব আলোচনার স্থল অন্যত্র।

কারণতার স্বরূপ যাহাই হউক না কেন তাহা লইয়া আর বিবাদ না করিয়া এক্ষণে উহার সহিত কার্য্যের সম্বন্ধ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। Hume, Mill প্রভৃতি দার্শনিকেরা ঐ সম্বন্ধকে নিয়তসহ-চারিতা সম্বন্ধ বলিয়া থাকেন এবং উহাকে ভূয়োদর্শনজাত ভাবসংসর্গের ফল বলিয়া কীর্ত্তন করেন। কার্য্যকারণের মধ্যে যে একটা অনিবার্য্য সম্বন্ধ (necessary relation) পরিদৃষ্ট হয়, তাহা ভাবসংসর্গ ব্যতীত আর কিছুই নহে। উহাকে অভ্যাসজনিত সংস্কার বিশেষও বলা যায়। Hamilton যখন বলিলেন— * "The *necessity* of so thinking cannot be derived from a custom of so thinking. The force of custom, influential as it may be, is still always limited to the customary; and the customary never reaches, never even approaches to the necessary." Mill তাহার উত্তরে বলিলেন —"If this were so, not only could an inseparable association generate no necessity of belief, but there could be no such thing as inseparable association between two mental states." অর্থাৎ তাঁহার মতে ভাবসংসর্গই এই অনিবার্য্য বিশ্বাসের উৎপাদক। তবে ইহা অচ্ছেদ্য ভাবসংসর্গ হওয়া চাই। এই অচ্ছেদ্য বা অবিযোজ্য ভাবসংসর্গই কার্য্য-কারণ সম্বন্ধের অবশ্যম্ভাবিত্বের জনক। তিনি বলেন, "If there be any one feeling in our nature which the laws of association are obviously equal to producing, one would say it is that." পুনশ্চ—"Necessary, according to Kant's definition, and there is none better, is that of which the negation is impossible. If we find it impossible by any trial, to separate two ideas, we have all the feeling of necessity which the mind is capable of. Those, therefore, who deny that association can generate a necessity of thought, must be willing to affirm that two ideas are never so knit together by association as to be practically inseparable. But to affirm this is to contradict the most familiar experience of life. Many persons who have been frightened in childhood can never be alone in the dark without irrepressible terrors." কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—এখানে যে অবিযোজ্য ভাবসংসর্গের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে, কার্য্যকারণ সম্বন্ধের ন্যায়, সার্ব্বভৌমত্ব কোথায়? এগুলি সর্ব্বমানবগত সম্বন্ধ নহে, ব্যক্তি বিশেষের ভাবসংসর্গ মাত্র।

* Examination of Hamilton's philosophy—Inseparable Association ignored.

যদি অবিযোজ্য ভাবসংসর্গই কার্য্যকারণ সম্বন্ধের জনক হয়, এবং যদি ঐ ভাবসংসর্গ ঐ সম্বন্ধের অনিবার্য্যত্বই উৎপন্ন করে তাহা তেই বা ক্ষতি কি? অনিবার্য্যত্ব (necessity) অর্থে, যদি Kant এর লক্ষণই অর্থাৎ "of which the negation is impossible"— গৃহীত হয়, তাহা হইলে Mill যে বলিতেছেন "Now, as to real necessity, we do not know that it exists in the case (১) …………what experience makes known, is the fact of an invariable sequence between every event and some special combination of antecedent conditions, in such sort that wherever and whenever that union of antecedents exists, the event does not fail to occur. Any *must* in the case, any necessity, other than the unconditional universality of the fact, we know nothing of—" (২) এ বাক্য গুলির অর্থ কি? Real necessity ও necessity of thought, এ উভয়ের পার্থক্য কি? Mill কি বলিতে চাহেন যে, অবিযোজ্য ভাবসংসর্গ প্রকৃত necessityর উৎপাদনে অশক্ত? তাহা হইলে প্রকৃত necessity কাহাকে বলে তাহা প্রকাশ করিয়া বলা আবশ্যক। যদি প্রকৃত necessity = necessity of thought হয়, তবে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে তাহা তিনি অস্বীকার করেন কেন? তিনি necessity of thoughtও স্বীকার করিবেন অথচ 'must' বা অবশ্যম্ভাবিতাও মানিবেন না, ইহা কি প্রকারে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে তাহা বুঝা যাইতেছে না। তিনি যে বলিতেছেন, যেখানে এবং যখনই কারণ সামগ্রী বিদ্যমান, সেখানে তখনই কার্য্য ঘটে—ইহাই কি অবশ্যম্ভাবিতার পরিচায়ক নহে? যদি না হয়, তবে 'বর্ত্তমান ক্রিয়াপদ' প্রয়োগ করিবার অধিকারই বা তাঁহার কোথায় তাহা ত বুঝা যাইতেছে না। তিনি বড় জোর অতীত ঘটনা সম্বন্ধে এই প্রকার সার্ব্বভৌম বাক্য প্রয়োগ করিতে পারেন, বর্ত্তমান বা ভাবী ঘটনা সম্বন্ধে যদি তাঁহার সংশয় থাকে, তবে সে সম্বন্ধে ঐ প্রকার সার্ব্বভৌম বাক্যই তাঁহার অপ্রযোক্তব্য।

Mill এখানেই নিরস্ত হন নাই। তিনি আরও বলিতেছেন—"A volition is a moral effect, which follows the corresponding moral causes as certainly and invariably as physical effects follow their physical causes. Whether it *must* do so, I acknowledge myself entirely ignorant, be the phenomenon moral or physical; and I condemn, accordingly, the word Necessity as applied to either case. All I know is, that it always *does.* *.

পাঠক এখানে "All I know is that it always does" এই বাক্যটির প্রতি মনোযোগ করিবেন। এই বাক্যটি কি কেবল বর্ত্তমান সম্বন্ধ বাচক? 'always' শব্দটা

(১) Examination—Theory of causation.
(২) Do —Freedom of the will.
* Do Do

কি কালত্রয়কে অন্তর্গত করিতেছে না? এ বাক্য প্রয়োগ করিবার তাঁহার অধিকার কি? তাঁহার কি বলা উচিত ছিল না—All I know is that it always *did*? কেবল ইহাই নহে; এই বাক্যটিকে আর একটু বিশেষিত করিয়া তাঁহার বলা উচিত ছিল—"so far as our experience goes"—অর্থাৎ "যতদূর আমাদের অভিজ্ঞতার প্রসার।"

এক্ষণে Mill এর সর্ব্বার্থসাধক অবিযোজ্য ভাবসংসর্গ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। Mill বলেন—"When two phenomena have been very often experienced in conjunction, and have not, in any single instance, occurred separately either in experience or in thought, there is produced between them what has been called Inseparable, or less correctly, Indissoluble Association! by which is not meant that the association must inevitably last to the end of life—that no subsequent experience or process of thought can possibly avail to dissolve it; but only that as long as no such experience or process of thought has taken place, the association is irresistible; it is impossible for us to think the one thing disjoined from the other." * ইহাকে বলে Association by contiguity.

দ্বিতীয়—Association by similarity অর্থাৎ similar phenomena tend to be thought of together: এই দুই প্রকারেই ভাবসংসর্গ সাধিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে দেখা যাউক এই সিদ্ধান্তদ্বয় সমীচীন কি না। Mill বলিতেছেন "when two phenomena have been very often experienced।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটি অনুভূতি বা ভাব কি বারবার উপস্থিত হইয়া থাকে? যাহা একবার অনুভূত হইয়াছে, বারান্তরে কি ঠিক সেই ভাবটিই অনুভূত হয়? তাহা কখনই হয় না। অনুভূতির পুনরাবৃত্তি ঘটে না। যাহা পুনরায় উপস্থিত হয়, তাহা পূর্ব্বানুভূতির সদৃশ হইতে পারে, কিন্তু ঠিক সেই অনুভূতিই পুনর্ব্বার উপস্থিত হয় না। সুতরাং একই অনুভূতির পুনঃ পুনঃ উপলব্ধি—এই বাক্যই অযথার্থ। তাই Bradly ইহার প্রতিবাদে বলিয়াছেন—"The fundamental objection to this is that ideas or impressions once experienced do not recur; they are particular existences, and as such, do not persevere to recur or be presented." †

Millও একথা স্বীকার করেন। তিনি বলিতেছেন—'The sweet taste of today, and the similar sweet taste of a week ago which it reminds me of, have not 'previously constituted parts of the same act of cognition', unless we take literally the expression by which they are spoken of as the *same* taste, though they

* Examination. Psychological theory of belief in an external world.

† Encyclop. Brit. 4th Edition under 'Association.'

are no more the same taste, than two men are the same man if they happen to be exactly alike." * অতএব Mill এর মতেও একই অনুভূতি কালদ্বয়ে অনুভূত হইতে পারে না—ইহা বুঝা যাইতেছে।

মহামতি Bradly সাহচর্য্যজনিত ভাবসংসর্গের প্রতি দোষারোপ করিয়া নিজে এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"When we have experienced (or even thought of) several pairs of impressions (simultaneous or successive), which pairs are like one another ; then whenever an idea occurs which is like all the impressions on one side of these pairs, it tends to excite an idea which is like all the impressions on the other side. The statement is destructive of the title of the law, because it appears that what were contiguous (the impressions) are not associated and what are associated (the ideas) were not contiguous ; in other words the association is not due to contiguity at all."

Association by similarity সম্বন্ধেও Bradly দোষ প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন—"As regards the law of similarity it involves an even greater absurdity ; if two ideas are to be recognised as similar, they must both be present in the mind. If one is to call up the other, one must be absent." †

Bradly প্রচারিত প্রথম নিয়মটির অর্থ এই প্রকার—পরস্পর সদৃশ অনেক বিজ্ঞানযুগল অনুভবের পর, এমন একটা নূতন ভাবের যদি উদয় হয় যাহা ঐ অনুভূত যুগলের একপদের অনুরূপ, তাহা হইলে ঐ নূতন ভাবটি অপর একটি ভাবকে উপস্থিত করায় যাহা ঐ যুগলের অপরপাদের অনুরূপ। এই নিয়ম হইতে বুঝা যাইতেছে যে, যে ভাবযুগল যুগপৎ অনুভূত তাহারা সংসক্ত নহে ; পরন্তু যে ভাবদ্বয় সংসক্ত তাহারা যুগপৎ অনুভূত নহে ; অর্থাৎ ভাবসংসর্গ ভাবদ্বয়ের যৌগপত্যজনিত নহে।

দ্বিতীয় নিয়মটির অর্থ এই প্রকার—ভাবদ্বয়কে সদৃশ বলিয়া জানিতে হইলে, উভয় ভাবকেই মনে উপস্থাপিত করিতে হইবে। উভয় ভাব যুগপৎ মনে উপস্থাপিত না হইলে তাহাদের সাদৃশ্য বোধ বা বিকার অসম্ভব। পক্ষান্তরে যদি একটি ভাব অপরটিকে মনে উপস্থিত করায়, তবে বুঝিতে হইবে উহা উপস্থিত ছিল না।

যাহা হউক, Mill অবিচ্ছেদ্য ভাবসংসর্গকেই কারণতার হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই অবিচ্ছেদ্য ভাবসংসর্গের উৎপত্তি বিষয়ে যে নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন তাহা হইতে, ভাবসংসর্গ আদৌ অবিচ্ছেদ্য হইতে পারে কি না সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ রহিয়া যাইতেছে।

* Examination—Inseparable Association ignored by Messrs Hamilton and Mansel. ch. XIV.

† Encyclo. Brit. 4th Edition under Association.

তিনি বলেন—"No frequency of conjunction between the phenomena will create an inseparable association, if counter-associations are being created all the while." পুনশ্চ—"Nature as known in our experience, is uniform in its laws but extremely varied in its combinations. *" অর্থাৎ যদি বিরুদ্ধ প্রতীতি না থাকে, তবেই অসকৃৎ ভাবসংসর্গ অবিযোজ্য ভাবসংসর্গে পরিণত হইতে পারে; কিন্তু বিরোধী প্রতীতি অবিযোজ্য ভাবসংসর্গ উৎপত্তির প্রতিবন্ধক। এই প্রতিবন্ধকীভূত প্রতীতির পার্শ্বে ভূয়োদর্শনও ভাবসংসর্গকে অবিযোজ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ করিতে পারে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, প্রকৃতির বৈচিত্র্য স্বীকার করিলে, এ প্রকার প্রতিবন্ধক কি নিতান্ত সুলভ নহে? প্রকৃতি একদিকে যেমন ভাবসংসর্গের অনুকূল আদর্শ প্রদান করে, অন্যদিকে তেমনি প্রতিকূল আদর্শও উপস্থাপিত করে। আমি ত এমন কোন ভাবসংসর্গ দেখিতে পাই না, প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে যাহার বিরোধী আর একটা আদর্শ পাওয়া না যায়। এই আদর্শ টা যথার্থতঃ বিরুদ্ধ হউক বা না হউক তাহার কথা হইতেছে না; আপাত বিরুদ্ধ হইলেই যথেষ্ট হইল। কার্য্যকারণ নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া দেখিতে পাই, অনেকস্থলে কার্য্য আছে কারণ নাই; আবার অনেকস্থলে কারণ আছে কার্য্য নাই। বৃন্তচ্যুত ফলের পতন দেখিয়াছি, তাহার কারণ কোন দিন প্রত্যক্ষ করি নাই; ক্ষিতিস্পন্দ অনুভব করিয়াছি, তাহার কারণ কোনদিন দেখি নাই। নির্ম্মল গগনে মেঘোদয় দেখিয়াছি, তাহার কারণ লক্ষ্য করি নাই; বসন্তে নব পুষ্পোদ্গম দেখিয়াছি, তাহার কারণ দেখি নাই। অগ্নিতে তৃণরাজীকে দগ্ধ হইতে দেখিয়াছি, কাঞ্চনকে দগ্ধ হইতে দেখি নাই; জলে লৌহের নিমজ্জন দর্শন করিয়াছি, নৌকার নিমজ্জন দর্শন করি নাই; অথবা নৌকার নিমজ্জন দর্শন করিয়াছি, শোলার নিমজ্জন দর্শন করি নাই; অহিফেন সেবনে রামকে মরিতে দেখিয়াছি, শ্যামকে মরিতে দেখি নাই; রৌদ্রে কৃষকের ব্যাধি দেখি নাই; কিন্তু রসিক বাবুর শিরঃপীড়ার কথা শুনিয়াছি। কুইনাইন সেবনে প্রফুল্ল বাবুর জ্বর নিবৃত্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু কুমুদ বাবুর জ্বর দূরীভূত হয় নাই; ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রখণ্ডের নিপতন দেখিয়াছি বটে, কিন্তু পক্ষীর উৎগমনও দেখিয়াছি। ইত্যাদি

Mill বলেন—"Associations derived from experience are doubtless separable by a sufficient amount of contrary experience; but, in the cases we are considering, (অর্থাৎ কার্য্য কারণ সম্বন্ধে) no contrary experience is to be had. .... The whole process of acquiring our belief in causation takes place at an age of which we have no remembrance, and which precludes the possibility of testing the matter by experiment."

কিন্তু স্মরণাতীত শৈশবের অন্ধকার অবস্থায় যখন কার্য্যকারণের জনক ভাবসংসর্গ দৃঢ়ীভূত হইতেছিল, তখন কি সে দৃঢ়বন্ধন শিথিল করিবার পক্ষে কোন বিরুদ্ধ প্রতীতি

* Examination. Inseparable Association ignored.

উপস্থিত ছিল না? দেখা যাউক Mill স্বয়ং এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন। তিনি একস্থলে বলিতেছেন—"The uniformity is, in the first stages of our experience, an actual paradox; first appearances are against it; they seem to show that some events do indeed succeed each other with an approach, though only an approach, to uniformity, but that a far greater number have no fixed order whatever." যদি ইহা সত্য হয়, তবে শৈশবের দোহাই দিয়া, আশৈশব উপার্জ্জিত ভাবসংসর্গের দোহাই দিয়া, তিনি অভাবনীয়তার (inconceivabilityর) ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত কেন?

কেবল ইহাই নহে; কার্য্যকারণ সম্বন্ধ কি কেবল ভূয়োদর্শনজাত ভাবসংসর্গদ্বারা ব্যাঘাত হইতে পারে? অনেক স্থলে সকৃৎ পরীক্ষাই কি ঐ সম্বন্ধ নির্দ্ধারণে যথেষ্ট নহে? রাশি রাশি স্থল প্রত্যক্ষ করিয়াই কি সর্ব্বত্র কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণীত হইয়া থাকে? Mill এ সম্বন্ধে তাঁহার Logicএ কি বলিতেছেন, পাঠক শ্রবণ করুন। "Why is a single instance, in some cases, sufficient for a complete induction, while in others myriads of concurring instances, without a single exception known or presumed, go such a little way towards establishing a universal proposition? Whoever can answer this question knows more of the philosophy of logic than the wisest of the ancients, and has solved the problem of induction."

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে Mill ভাবসংসর্গ দ্বারা কার্য্যকারণ সম্বন্ধের মীমাংসা করিতে পারেন নাই। Millএর মতে বিজ্ঞানগুলি দলবদ্ধ হইয়া বিরাজ করে; কিন্তু বিজ্ঞানপ্রবাহ ক্রমবর্ত্তী (successive)। সুতরাং তাহারা স্বয়ং কি প্রকারে সংহত হইতে পারে? যখন একটি বিজ্ঞান পূর্ব্ব সংসক্ত বিজ্ঞানের সাহচর্য্যে লক্ষিত না হয়, তখন ভাবসংসর্গ শিথিল বা ভগ্ন না হয় কেন? এবং সেখানে সাপেক্ষধ্রুবতা * সূচিত হইবারই বা তাৎপর্য্য কি? আমি অগ্নির ঔজ্জ্বল্য ও উত্তাপ—এই বিজ্ঞানদ্বয় যুগপৎ বা অব্যবহিত পৌর্ব্বাপর্য্যে বহুবার অনুভব করিয়াছি; কিন্তু যখন আমি কেবল ঔজ্জ্বল্যই দেখিতেছি, উত্তাপ অনুভব করিতেছি না, তখন ঐ ভাবসংসর্গ বিচ্ছিন্ন হইবে না কেন? অবস্থান্তর কল্পনা করিয়া অর্থাৎ "যদি আমি অগ্নির সন্নিধানে থাকিতাম তাহা হইলে উহার উত্তাপও অনুভব করিতে পারিতাম"—এ প্রকার সাপেক্ষধ্রুবতা স্বীকার পূর্ব্বক ভাবসংসর্গের অক্ষুণ্ণতা বজায় রাখিতে চেষ্টা করিব কেন? যদি এ প্রকার স্বীকার করিতে প্রবৃত্ত হই, তবে নিশ্চিতই বুঝিতে হইবে আমি যে ক্রমে বিজ্ঞানগুলিকে ব্যবস্থিত ও সম্বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি সেই ক্রমভঙ্গের পরিহার করিতে যাইয়াই আমি পূর্ব্বাপর বিজ্ঞানের সঙ্গতি অন্বেষণ করিতেছি। আমার জ্ঞানধারার ক্রমভঙ্গ (break of continuity) আমার উদ্বেগজনক। বিজ্ঞানরাশির সম্বন্ধ সংস্থাপক এই আত্মকর্তৃত্ব পরিত্যাগ করিলে, যুগপৎ উৎপন্ন ক্ষণ-বিধ্বংসী বিজ্ঞান-

* Conditional certainty.

রাশির সমন্বয় বা সম্বন্ধ অথবা তাহাদের যথাক্রমে উদ্বোধন কিছুই ব্যাখ্যাত হইতে পারে না।

অতএব ইহা স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে কার্য্যকারণ সম্বন্ধের উৎপত্তি ভাবসংসর্গ হইতে পারে না; ভাবসংসর্গই আত্ম-কর্তৃত্বের ফল; আত্মার যে সংযোজনী ক্রিয়া ব্যতীত পদার্থাবগতিই অসম্ভব, সেই ক্রিয়া দ্বারাই ভাবসংসর্গ নির্দ্ধিত। তাই পণ্ডিত Ward বলিয়াছেন—"Association of ideas is determined, not mechanically, but by subjective selection and interest."

এক্ষণে আর একটি বিষয়ের আলোচনা করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আমরা যুক্তি তর্কের সময় প্রায়শই সম্ভাব্যতা, অসম্ভাব্যতার দোহাই দিয়া থাকি! জিজ্ঞাস্য, এই সম্ভাব্যতা ও অসম্ভাব্যতার মাপকাঠি (standard) কি?

প্রথমতঃ অসম্ভাব্যতার দিকেই লক্ষ্য করা যাউক। অসম্ভাব্য কি, জানিতে হইলে সম্ভাব্যের একটা ধারণা থাকা আবশ্যক। যেখানে সম্ভাব্যের কোন ধারণা নাই, সেখানে অসম্ভাব্যও কিছু নাই। এক্ষণে দেখা যাউক সম্ভাব্য শব্দের অর্থ কি? সম্ভাব্য শব্দটি 'ভূ' ধাতু নিষ্পন্ন। 'ভূ' ধাতুর অর্থ সত্তা অতএব সম্ভাব্য অর্থে "সত্তাসম্বন্ধীয়." সত্তাসম্বন্ধীয় অর্থ কি? না, সত্তার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। "সত্তার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট" অর্থে কি বুঝিব? "সত্তামূলক" ইহাই বুঝিব। Bradley বলিয়াছেন—"Without an actual basis in, and without a positive connection with, Reality, the possible is, in short, not possible at all." (১) পুনশ্চ "It must be developed from, and relative to a real basis. And hence, there can be no such thing as unconditional possibility. The possible, in other words, is always relative." (২)

এক্ষণে 'সত্তামূলক' শব্দের প্রতি দৃষ্টি করা যাউক। সত্তা কি? সত্তা বলিতে আমরা "অবাধিত অনুভবকেই" বুঝিয়া থাকি। অতএব 'সত্তামূলক' বলিলে এই অবাধিত অনুভবের সহিত অন্বিত (connected) ইহাই বুঝিয়া থাকি। অর্থাৎ যাহার ভিত্তি বা মূল অনুভবে প্রতিষ্ঠিত নহে, অনুভব কর্তৃক সমর্থিত নহে—তাহা সত্তামূলক নহে; সুতরাং তাহা সম্ভাব্যও নহে।

অন্যপ্রকারে বলিতে গেলে আমরা বলিতে পারি সম্ভাব্যতা—নিমিত্তাধীন নিশ্চয়তা (conditional certainty)। অর্থাৎ কৃপ্ত কারণ উপস্থিত থাকিলে যাহা অনুভবের বিষয়ীভূত হইবার যোগ্য তাহাই সম্ভাব্য। ফলতঃ যাহা অনুভব বা অনুভবমূলক হেতু-পরম্পরা সাধ্য তাহাই সম্ভাব্য। এ প্রকার অর্থ ব্যতীত উহার অন্য কোন প্রকার অর্থও সিদ্ধ নহে।

সমস্ত তর্কের চরম আশ্রয় অনুভব। ইহাই আমাদের সর্ব্ব ধ্রুবতার মুখ্য আদর্শ। অপরাপর প্রমাণের নিশ্চয়ত্ব বা প্রমাত্ব পরম্পরাক্রমে পরিশেষে এই অনুভব ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। Mill বলেন অনুভবের প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ; ইহাই অসন্দিগ্ধতার একমাত্র

1. Appearance and Reality—p. 391.

আদর্শ (our model of certainty)। তিনি বলেন— * "When I say I am convinced of it, I mean that the evidence is equal to that of my senses. I am as certain of the fact as if I had seen it.......... We mean by knowledge, and by certainty, an assurance similar and equal to that afforded by our senses: if the evidence in any other case can be brought up to this, we desire no more. If a person is not satisfied with this evidence, it is no concern of any body but himself, nor, practically, of himself, since it is admitted that this evidence is what we must, and may with full confidence, act upon. Absolute scepticism, if there be such a thing, may be dismissed from discussion, as raising an irrelevant issue, for in denying all knowledge it denies none. The dogmatist may be quite satisfied if the doctrine he maintains can be attacked by no arguments but those which apply to the evidence of the senses. If his evidence is equal to that, he needs no more; nay, it is philosophically maintainable that by the laws of *psychology we can conceive no more, and that this is the certainty which we call perfect.*"

অপিচ অন্যত্র;—"By contingent sensations are meant, sensations that are not in our present consciousness and individually never were in our consciousness at all, but which in virtue of the laws to which we have learnt by experience that our sensations are subject, we know that we should have felt under given supposable circumstances, and under those same circumstances, might still feel............ These possibilities which are conditional certainties, need a special name to distinguish them from *mere vague possibilities, which experience gives no warrant for reckoning upon.*" †

অতএব সম্ভাব্যতার অর্থ যে, অনুভবদত্ত হেত্বয়বসাধ্যতা ‡ তাহা Millও স্বীকার করিতেছেন।

এক্ষণে দেখা যাউক অসম্ভাব্যতা শব্দের অর্থ কি?

চিন্তার তিনটি মৌলিক অনতিক্রমনীয় (fundamental and inviolable) তথ্য (principles) আছে। এই তথ্যত্রয়কে লঙ্ঘন করিয়া কোন প্রকার চিন্তাই হইতে পারে না। ধারণায় (conception) স্ফুট ভাবেই হউক, কিম্বা অস্ফুট ভাবেই হউক,

* Examination of Hamilton's philo-Interpretation of Consciousness.

† Examination—Psychological theory of belief in an external world.

‡ Inferribility from premises based on experience.

চিন্তা অনুস্যূত থাকে। যে ধারণায় চিন্তার কিছুমাত্র কার্য্যকারিতা নাই তাহা ধারণা কি না তাহাও সন্দিগ্ধ। অতএব ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে চিন্তার সম্বন্ধে যাহা মূলতত্ত্ব, ধারণার সম্বন্ধেও তাহা মূলতত্ত্ব। এই তত্ত্বগুলি চিন্তাপাতে স্বতঃসিদ্ধ; সমুদয় প্রমাণের ভিত্তিস্বরূপ। এই তিনটি মূল তথ্যের নাম যথাক্রমে, তাদাত্ম তত্ত্ব (principle of identity) বিরোধ তত্ত্ব (principle of contradiction), এবং মধ্যাভাব তত্ত্ব (principle of excluded middle)। দেখিতে গেলে, প্রথম তত্ত্বটির মধ্যেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় তত্ত্ব দুইটি প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে, উপলব্ধ হইবে।

যাহা হউক। এই তিনটি স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব সমস্ত চিন্তাকে নিয়মিত করে। ইহারা প্রমাণ পুঞ্জের উপজীব্য বা আশ্রয়। যে কোন বিষয় এই মৌলিক তথ্যের কোন একটির বিরুদ্ধ হইবে, তাহা অসম্ভব। অন্ততঃ চিন্তার জগতে তাহা অসম্ভব। চিন্তানিরপেক্ষ জগৎ যদি একটা থাকে, তবে সেখানে চিন্তাবাধিত বিষয় সম্ভাবনীয় হইবে কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

Mill বলেন—"Any assertion, therefore, which conflicts with one of these laws—any proposition, for instance, which asserts a contradiction, though it were on a subject wholly removed from the sphere of our experience, is to us unbelievable. The belief in such a proposition is, in the present constitution of nature, impossible as a mental fact."

পুনশ্চ। "Now in respect to phenomenal attributes, no one denies the three 'Fundamental Laws' to be universally true. Since they are the laws of all Phaenomena and since Existence has to us no meaning but one which has relation to Phaenomena, we are quite safe in looking upon them as laws of Existence. *"

এখানে Millএর সহিত আমার একটু প্রভেদ আছে। আমি যখন চিন্তানিরপেক্ষ জগতের কথা বলিতেছি, তখন আমি চিন্তানিরপেক্ষ বিষয়জগতের কথাই বলিতেছি। চিন্তানিরপেক্ষ চিন্তার উপজীব্য স্বয়ংপ্রভ যদি কোন সত্তা (Existence) থাকে, তবে তাহা অস্বীকার করিতেছি না। Mill হয় ত চিন্তাগ্রাহ্য সত্তার অতিরিক্ত সত্তাই স্বীকার করিবেন না। যাহা হউক যাহা চিন্তার বিষয়, চিন্তাবাধিত হইলে তাহার সত্তা যে অসম্ভব Mill তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নহেন। এবং কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই বা তাহা অস্বীকার করিতে সাহস করিবেন?

অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি—যে বিষয় এই তথ্যত্রয়ের বিরোধী, তাহা অসম্ভব। এই সিদ্ধান্ত হইতে আমরা ইহাও পাইতেছি যে, যে বিষয় এই তথ্যত্রয়ের অবিরোধী তাহাই সম্ভাব্য বা সম্ভাবনীয়। কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে—এই প্রকার সম্ভাব্যতা ও প্রাগুক্ত সম্ভাব্যতা কি একই পদার্থ? তাহা ত নয়। প্রথম লক্ষণটি অনুসারে যাহা সম্ভাবনীয় বা অসম্ভাবনীয়, দ্বিতীয় লক্ষণানুসারে হয়ত তাহাই অসম্ভাবনীয় বা সম্ভাবনীয়। প্রথম লক্ষণানু-

* Examination—The Fundamental Laws of thought according to Sir W. Hamilton.

সারে দেখিতে গেলে, মনগড়া বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভাব্য নহে; নৃসিংহের অস্তিত্ব সম্ভাবনীয় নহে। কিন্তু দ্বিতীয় লক্ষণানুসারে—মৌলিক চিন্তার বা কল্পনার তথ্য বাধিত না হওয়ায়—উহা সম্ভাবনীয় হইতেছে।

এ সমস্যা অবশ্যই গুরুতর। যাহা হউক, আমার মনে হয় দ্বিতীয়ঃ সম্ভাবনীয়তা ও প্রাগুক্ত সম্ভাবনীয়তায় যে বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে তাহা আপাত বিরোধ, যথার্থ বিরোধ নহে। দ্বিতীয় সম্ভাবনীয়তা সম্ভাবনীয়তার সীমা নির্দ্দেশক। এই সীমার মধ্যে কোন পদার্থ বস্তুগত্যা সত্য তাহারই মাপকাটি প্রথমটি। অর্থাৎ সম্ভাবনীয় মাত্রই বস্তুগত্যা (actually) সত্য নহে; এই বস্তুগত্যা সত্যতার সম্ভাবনাই প্রাগুক্ত সম্ভাবনীয়তা। যাহা চিন্তা ব্যাঘাতক তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব; যাহা চিন্তা ব্যাঘাতক নহে, তাহা সম্ভাবনীয়; তন্মধ্যে যাহা অনুভব ও কল্প্য কারণ হইতে পাইবার যোগ্য তাহার সত্তাই সম্ভবপর অর্থাৎ কি না বাস্তব।

আপাততঃ এখানেই নিরস্ত হওয়া আবশ্যক। তবে এখানেও একটি গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে। কেহ বলিতে পারেন, চিন্তার এই মূল তথ্যত্রয় বস্তুসত্তাকে স্পর্শ করে না; কেবল সত্তাঘটিত চিন্তাকেই নিয়মিত করে সুতরাং বস্তুসত্তা চিন্তা নিয়মের অতীত। ইহার প্রত্যুত্তরে বক্তব্য, যে সত্তা চিন্তানিরপেক্ষে প্রতিভাত হয় না, সে সত্তা সম্পূর্ণরূপে চিন্তার নিয়মাধীন; কিন্তু যে সত্তা স্বয়ং সিদ্ধ, চিন্তার উপজীব্য—চিন্তানিরপেক্ষ, কেবল সেই সত্তাই চিন্তা নিয়মের অতীত; তদতিরিক্ত চিন্তাসিদ্ধ সকল সত্তাই চিন্তার নিয়মাধীন। এ হিসাবে চিন্তার বিরোধী চিন্তা-সাধ্য কোন সত্তা সম্ভাবনীয় নহে।

শ্রীপ্রফুল্লনাথ লাহিড়ী, বি, এ

ক্ষয়রোগ ও তন্নিবারণ সম্বন্ধে গুটি কয়েক অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়

(২৭৭ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

ইহার (Dettveiler's pocket flask) উপরে ও নীচে উভয় দিকেই খোলা যায়। স্ক্রু যোগে আটকান থাকে। উপরের দিকে খুলিয়া ভিতরে থুথু ত্যাগ করিতে হয়। নীচের দিকে খুলিয়া পরিষ্কার করিতে হয়। কতক কতক দোয়াতের ভিতর যেরূপ থাকে ইহার ভিতরেও সেইরূপ একটী ফানেলের মত আছে funnel)। ইহা থাকাতে পকেটে ঝাঁকি লাগিলে, এমন কি সময় সময় উহার মুখটা খোলা থাকিলেও থুথু গড়াইয়া পড়ে না।

মক্ষিকার কার্য্য

এই বিংশশতাব্দীর অশেষ কঠোরতার মধ্যে মানবজীবন রক্ষা একেই ত দুরূহ তার উপর চাক্ষুষ অচাক্ষুষ সমস্ত প্রাণীই যদি ইহার বিরুদ্ধে একভাবে না হয় অন্যভাবে দাঁড়ায় তবে নিরীহ মানুষগুলি যে একান্তই নিরুপায় হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত দেশে মশার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের কথা কে না শুনিয়াছে? কিন্তু মাছির ভন্‌ভনানি ভিন্ন যে উহার অপর কার্য্য আছে

এ কথা কে ভাবিয়াছিল? মক্ষিকা দংশন করে না সত্য কিন্তু যেরূপ ভাবে শত্রুতা সাধন করে তার চেয়ে যে দংশনের জ্বালাও ভাল ছিল। নানাবিধ ব্যাধি এই মক্ষিকা সহযোগে বিস্তৃত হয় এখানে সে সকলের কথা না বলিয়া শুধু ক্ষয় কিরূপে বিস্তৃত হয় সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করিব। মাছিগুলি সচরাচর ক্ষয় জীবাণুপূর্ণ থুথুগুলির উপর বসে এবং তথা হইতে যাইয়া কোন খাদ্য সামগ্রীর উপর পড়ে এবং এই খাদ্য সামগ্রী সহযোগে জীবাণু আমাদের দেহে প্রবেশ করে এবং ক্ষয় উৎপাদন করে।

মাছিগুলি থুথুর উপরে যখন বসে তখন শান্ত শিষ্ট ঋষিবালকের মত বসে না—যে কিছুই খাইবে ছুঁইবে না—পরন্তু উদরপূর্ত্তী করিয়া থুথুগুলি বা ক্ষয় জীবাণুপূর্ণ অন্য খাদ্য সামগ্রী ভক্ষণ করে এবং উদরাভ্যন্তরে ক্ষয়-জীবাণুর একটী বস্তী সৃষ্টি করে—ইহা শুধু কল্পনার কথা নহে যেহেতু ইহাদের উদরাভ্যন্তরে এই জীবাণু জীবন্ত অবস্থায় দেখা গিয়াছে। সে এক স্থানে যাইয়া এই জীবাণু সংগ্রহ করে এবং অপর খাদ্য সামগ্রীর উপর বসিয়া উহা বমন করে এবং ক্ষয়জীবাণু সংসৃষ্ট করে। এইরূপে মাছি ক্ষয় বিস্তারে সহায়তা করে। সুতরাং কোন ক্ষয়জীবাণুপূর্ণ স্থানে যাহাতে ইহা না বসিতে পারে তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং ততোধিক দৃষ্টি রাখিতে হইবে যাহাতে উহারা আমাদের আহার সামগ্রীর উপর না বসিতে পারে।

ইতিপূর্ব্বে যে সকল কথা বলা হইল তাহা হইতেই এ ব্যাধি কিরূপে দূর করা যাইতে পারে এবং সংক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা যাইতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

জনসাধারণের শিক্ষা

সর্ব্বাপেক্ষা আগে এই ব্যাধি সম্বন্ধে জনসমাজকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। তাহারা যদি একবার বুঝিতে পারে এই ব্যাধির কারণ কি—কি কারণে উহা সংক্রামিত হয় এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে এই সংক্রমণ নিবারিত হয় এবং ব্যাধি আসিয়া পড়িলে কিরূপে উহার সহিত সংগ্রাম করিয়া উহাকে বিনাশ করা যায় তবে এই ব্যাধিকে দূর করিতে বেশী কোন কষ্ট পাইতে হইবে না। উহা নিম্নলিখিত কয়েক উপায়ে হইতে পারে।

১। এই ব্যাধি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদ্বারা জনসমাজে বক্তৃতা দেওয়া।

২। ছায়াবাজী সাহায্যে ইহার স্থূল মর্ম্ম বুঝাইয়া দেওয়া।

৩। সহজ সরল ভাষায় এই সম্বন্ধে জ্ঞাতব্যবিষয়পূর্ণ পত্রাবলী বা পুস্তিকা বিতরণ।

ব্যাধি সংক্রামক কিন্তু ছোঁয়াচে নহে

এই স্থানে আর একটী প্রয়োজনীয় কথা বলা দরকার। এই ব্যাধি একজন হইতে অপর জনে সংক্রমিত হইবার আশঙ্কা থাকিলেও উহা ছোঁয়াচে নহে।

বসন্ত রোগীকে ছুঁইলেই যেমন ঐ রোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে ক্ষয়রোগে উহা আদৌ নাই। ক্ষয়রোগীর নিকট সর্ব্বদা যাতায়াত করিলে উহার জীবাণুপূর্ণ থুথু দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা আছে এবং মাত্র এই রূপেই উহা সংক্রামক।

থুথু সম্বন্ধে যে সব সাবধানতা লওয়া আবশ্যক তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

আলোক ও বায়ুর উপকারিতা

আমরা সূর্য্যের আলোক ও নির্ম্মল বায়ুর উপকারিতা সম্বন্ধেও পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ক্ষয়

জীবাণু সূর্য্যের আলোকে ও উন্মুক্ত বায়ুতে অধিকক্ষণ জীবিত থাকিতে পারে না। সুতরাং যাহাতে সর্ব্বস্থানে উভয়ই প্রচুর পরিমাণে আসিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত একান্ত প্রয়োজনীয়।

এই কারণে এই ব্যাধি আমরা সহরে বেশী দেখিতে পাই। সহরে বাটী নির্ম্মাণ সময়ে আলোক ও বায়ুর গমনাগমনের সম্বন্ধে বিশেষ কোন দৃষ্টি দেওয়া হয় না। এক বাটীর গায় আর এক বাটী উঠিতেছে উভয়ের মধ্যে একটু নিশ্বাস ছাড়িবার মত স্থানও থাকে না। চারিদিকে খোলা জায়গা ত প্রায় কোন বাটীতেই নাই। কেবল যে পাশাপাশিই এইরূপ বাড়ীর উপর বাড়ী তা নয় বাটীর পেছনেও এইরূপ। কলিকাতায় এবং অন্যান্য বড় সহরে জায়গার দর দুর্ম্মূল্য সত্য এবং আমাদের দেশের লোকের যেরূপ সামান্য আয় ও সাংসারিক দুরবস্থা তাহাতে তাহাদের খোলা জায়গা রাখা বড় সহজ বিষয় নহে। তবে জীবনের চেয়ে কিছুই বেশী নয়। একটী আলোক বায়ুশূন্য বাটীর জন্য যে কেবল নিজকেই ভুগিতে হয় তাহা নহে, পুরুষানুক্রমে সকলকে ভুগিতে হয়। এই সব বিশেষরূপে চিন্তা করা আবশ্যক।

মিউনিসিপালিটির কর্ত্তব্য

আমাদের মিউনিসিপালিটিরও এবিষয়ে বিশেষ ত্রুটি আছে। কমিশনারগণ হয়ত আইন করিলেন যে বাটীর খানিকটা অংশ অবশ্যই খোলা রাখিতে হইবে কিন্তু তা দেখে কে? এইত আইন আছে যে বাটীর অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ খোলা রাখিতে হইবে কিন্তু কয় খানা বাটীতে তাহা রাখা হয়? আইনের প্রায়ই অপ্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহা অতীব দুঃখের বিষয় ও দেশের বড়ই দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। আমরা যারা রোজ রোজ বাড়ী ঘুরে বেড়াই এবং দেখিতে পাই যে সহরের অধিকাংশ ব্যাধিই এই সব আলোক বায়ুহীন বাটীতে সূচনা হইয়া থাকে—তাহাদের এসব কথা একটু জোরের সহিত বলিবার অধিকার আছে। এই সব বাড়ী হইতে যদি রোগীকে ভাল বাড়ীতে লওয়া যায় তবে তাহাদের কিরূপ দ্রুত উন্নতি হয় তা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আশাকরি মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃপক্ষগণ এ বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী হইবেন। বাটীর চতুষ্পার্শ্বেই কতকটা খোলা জায়গা থাকা দরকার, অন্ততঃপক্ষে এক তৃতীয়াংশ ভূমি খোলা থাকা আবশ্যক। যাহাতে গৃহে রীতিমত দ্বার জানালা থাকে তাহাও দেখা আবশ্যক। এমন অনেক গৃহ আছে যাহার মধ্যে কস্মিন কালেও আলোক যাইবার সুযোগ পায় না—এমন অনেক ঘর আছে যাহার একটীমাত্র দরজাই সম্বল এবং উহা বন্ধ করিলে বায়ু চলাচলের কোন পথই থাকে না। ইহার এক বর্ণও অতিরঞ্জিত নহে।

রান্নাঘরের ব্যবস্থা

রান্নাঘরগুলি বসত ঘর হইতে পৃথক হইলে ভাল হয়। অনেক স্থানেই বসত ঘরের নীচের ঘর হয়ত রান্নাঘর। উহাতে ঘর বাড়ী কাপড় চোপড়ই যে শুধু অপরিষ্কার হয় তাহা নহে, স্বাস্থ্যও চিরকালের মত ভগ্ন হয়। ছাতের উপরে রান্নাঘর হইলে কতক বিষয়ে অসুবিধা থাকিলেও স্বাস্থ্য বিষয়ে ভাল। রান্নাঘর যদি পৃথক রাখা একান্তই সম্ভবপর না হয় তবে উহা হইতে যাহাতে সহজে ধূম নির্গত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা থাকা একান্ত সঙ্গত। ধূম বহির্গমনের চিমনী থাকিলে বেশ ভাল হয়। যাহারা আমাদের রান্নাঘরের

অবস্থা জানেন তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন যে আমাদের মেয়েদের বারো আনা ব্যারামই এইখানে সূত্রপাত হয়।

গৃহে লোকবাহুল্যের অপকারিতা

এই স্থানে আরও দু একটী আবশ্যকীয় কথা বলার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না। আমি এখন যে বিষয়টি বলতে যাচ্ছি সে সম্বন্ধে সকলের মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে চাই। কথাটি হচ্ছে যে আমাদের গৃহে যেরূপ লোক বাস করার বন্দোবস্ত আছে সর্ব্বদাই তথায় তা থেকে বেশী লোক থাকে। যেখানে ১০ জন লোক থাকবার মত জায়গা আছে সেখানে যদি বা ২০ জন নাই থাকুক অন্ততঃ ১৫ জন ত অবশ্যই থাকে। ইহা যে কতদূর অপকারী তা আমি বলতে পারি না। লোকের যে কেবল নানা বিষয়ে অসুবিধা হয় তাহা নহে, অনেকের স্বাস্থ্য শুধু এই কারণে একেবারে ভেঙ্গে পড়ে—জন্মের মত আর তা শোধরায় না। আমাদের দেশ যেরূপ গরীব এবং এখানে একান্নবর্ত্তীতা প্রথা থাকায় এ বিষয়ে কিছু একটা করে উঠা বড় সহজ ব্যাপার নহে, বলতে গেলে এ একটী কঠিন সমস্যা। কিন্তু আমরা যখন বুঝতে পাচ্ছি এ থেকে আমাদের অনিষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে তখন এ বিষয়ে প্রতিকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ধরুন কোন ভদ্রলোক বাসের জন্য একটী বাড়ী তৈয়ারী করলেন, তাঁর তিনটি ছেলে আছে। তাঁর মরবার সময় উহাদের প্রত্যেকের হয়ত ৩।৪ টী করে ছেলেমেয়ে জন্মেছে, পোষ্য সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গৃহবিস্তারের আদৌ ব্যবস্থা হয় নাই। এখন তিন জনে তিনটি বাটীতে থাকলে তবে সঙ্কুলান হয়—তা না করে যাহা একের ছিল তাই দেয়াল গেঁথে তিনের উপযোগী করা হ'ল। হয়ত বাটীতে রান্নাঘর একটীর বেশী দুটী ছিল না, এখন রান্নাঘরই চাই তিনটি, এখন কোথায় বা রাঁধে, কোথায় বা থাকে? এই ত অবস্থা! ঐ বাটীতে যদি এখন এতটি লোক বসবাস করা যায় তবে উহা জনাকীর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী ও ব্যাধি হওয়া স্বাভাবিক। এইরূপ জনাকীর্ণ গৃহে অনেক সময় মলমূত্র ত্যাগের অসুবিধা ও স্নানাহারের অনিয়ম ও তজ্জনিত ব্যাধি হতে অনেকবার লক্ষ্য করেছি সুতরাং গৃহ যাতে জনাকীর্ণ না হয় সে বিষয়ে সর্ব্বদা দৃষ্টি থাকা প্রয়োজনীয়।

আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধব

এই স্থানে আরও একটি কথা বলবার আছে। বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজন, সকলেরই আছে এবং তাদের যাতায়াত একান্তই স্বাভাবিক এবং সকলেই তাহাতে আহ্লাদিত হয়। কিন্তু আমাদের দেশে এমনই হইয়া পড়িয়াছে যে এ সম্বন্ধে আমরা একটা খবর দেওয়াও অধিকাংশ সময়েই আবশ্যক বোধ করি না। আমরা মনে করে থাকি যে অমুক ত আমার নিকট আত্মীয় তার বাড়ীতে যাব তার আবার একটা খবর কি? কিন্তু পাড়াগাঁ হইলে কোন কথা ছিল না, তথায় স্থানের একেবারেই অভাব নাই। সহরে নিজেরাই হয়ত অতি কষ্টে—অকুলান স্থানে বাস করিতেছে তার উপর যদি আত্মীয় ও বন্ধুরা বিনা খবরে আসিয়া উপস্থিত হন তবে তাহাদের যে কি পরিমাণ কষ্ট হয় তাহা বলা যায় না। যদি শুধু কষ্টের কারণই হইত তবে এ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করার প্রয়োজন হইত না। ইহা হইতে যে কত সময় স্বাস্থ্য ভগ্ন হয় তাহা বলিতে পারি না।

উহাঁরা আবার অধিকাংশ সময়ই পীড়িত ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া আসেন—সে সময়ে কষ্টের একশেষ হয়। এই অভ্যাস আমাদের দূর করিতে হইবে। এ অভ্যাস হয়ত এক-দিনে দূর হইবে না—কিন্তু যাহার দরুণ শুভ হইতে অশুভ অধিক তাহা যেমন করিয়া হউক দূর করিতে হইবে। আমি এমন কথা মোটেই বলি না যে বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনকে কেহ স্থান দিবেন না—যেখানে স্থান আছে—সেখানে সচ্ছন্দে আসুন—কিন্তু যেখানে স্থান নাই সেখানে না যাওয়াই ভাল, অন্ততঃ পূর্ব্ব হইতে খবর দিয়া এবং তাহাদের কোন অসুবিধার কারণ হইবে কি না এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে জানিয়া তবে যাওয়া দরকার। আমাদের দেশ চির অতিথিবৎসল, নিজেরা নিত্যই সহস্র কষ্ট সহিয়া আত্মীয় বন্ধুদের আদর ও তুষ্টির জন্য সকলে সততই উদ্‌গ্রীব সুতরাং তাহাদের কথা আর অধিক কি বলিব। আমরা সকলেই এ বিষয়ে অপরাধী। আমাদের সকলের অভ্যাসই পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

দেশ দরিদ্রপ্রধান

আমাদের দেশ দরিদ্রপ্রধান। এখানকার অধিকাংশ লোকের এমন শক্তি নাই যে, যে সব গৃহে সচ্ছন্দে আলোক ও বায়ু প্রবেশ করে সেরূপ গৃহে তাহারা বাস করে। সুতরাং উহাদের জন্য উপযুক্ত গৃহ নির্ম্মাণ করা প্রয়োজন।

মিউনিসিপালিটি ও ধনীদিগের কর্ত্তব্য

মিউনিসিপালিটির এইরূপ গৃহাদি প্রস্তুত করিয়া বিনা লাভে অল্প টাকায় ভাড়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ধনী, পরদুঃখকাতর দয়ালু ব্যক্তিগণ ইচ্ছা করিলে এ সম্বন্ধে বিশেষ সহায়তা করিতে পারেন। আমাদের আফিস, কাচারী, স্কুল, কলেজ, বায়স্কোপ, থিয়েটার, কল কারখানা প্রভৃতি স্থান যে সব স্থানে বহু জনসমাগম হইবার সম্ভাবনা তথায় আলোক ও বায়ু চলাচলের বিশেষ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বাসগৃহ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কেবল যে গৃহেরই এই সব ব্যবস্থা প্রয়োজন তাহা নহে। রাস্তাঘাটগুলিও সরল ও সুপ্রশস্ত হওয়া দরকার। সহরে নির্ম্মল বায়ু সেবনের জন্য নানা স্থানে খোলা জায়গা ও উদ্যান থাকা একান্ত আবশ্যক। সহরের এই মুক্ত স্থান গুলি দেহের ফুস্‌ফুস্ স্থানীয়। ফুস্‌ফুস্ যেমন দেহের দূষিত রক্তকে শোধিত করিয়া জীবন রক্ষার সহায়তা করে—এই মুক্ত স্থানের বায়ুও গৃহের দূষিত বায়ুসেবী লোকদিগকে নির্ম্মল বায়ুদানে জীবন রক্ষার উপায় করিয়া দেয়।

সর্ব্বত্রই যদি সূর্য্যের আলো যাবার বন্দোবস্ত করা যায় তবে ক্ষয়রোগ অনেকটা কম হইবার সম্ভাবনা। আমাদের দেশে সূর্য্যের কিরণের তেজ খুব বেশী, এইজন্য ইউরোপ হতে উহা দ্বারা আমরা বেশী উপকার পাই। কিন্তু সংসারে কোন জিনিসই অবিমিশ্র ভাল নয়। আমরা বেশী আলো পাই সত্য কিন্তু সেই কারণে—আমাদের জায়গাগুলি বেশী শুকনো ও ধূলি হইবার বেশী সুবিধা। ক্ষয় জীবাণুগুলি কিয়ৎক্ষণ আলোর সংস্পর্শে এলেই মারা পড়ে কিন্তু এখানে বেশী ধূলো থাকার দরুণ সহজে উহার আবরণ পায় ও জীবন রক্ষার একটা উপায় হয়। আমাদের দেশে বায়ুর গতিও বেশী সেইজন্য এই ধূলি-বিমণ্ডিত জীবাণুগুলি সহজে নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হয় এবং ব্যাধি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বার সুবিধে পায়। সুতরাং আমাদের

রাস্তাগুলি ভাল করে তৈয়ারী করা উচিত এবং যাহাতে উহাতে তৈল, আলকাতরা বা জলসেচন দ্বারা উহার ধূলি উড়তে না পারে তাহার বন্দোবস্ত আবশ্যক। ক্রমশঃ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

সাহিত্য-পরিচয়

যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র বি, এ, প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

প্রাচীন যুগ হইতে পাঠান রাজত্বের শেষ পর্য্যন্ত ইতিহাস এই গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য ঐ দুইটি জেলার ইতিহাস বলিতে গিয়া গ্রন্থকারকে যোগসূত্রে বঙ্গের অন্যান্য স্থানের ইতিবৃত্তকেও উল্লেখ করিতে হইয়াছে। তাহা না করিলে চলেও না। যে ঘটনাগুলিকে অবলম্বন করিয়া ইতিহাসের উৎপত্তি, সেই সব ঘটনা যে এক ক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়া সেখানেই আবদ্ধ থাকিবে, এমন কোন কথা নাই। তাহাদের বিস্তৃতি হয়, এবং সেইজন্য তাহাদের ইতিহাসও বিস্তৃত হইয়া থাকে। জেলা হিসাবে যাঁহারা ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই এই পন্থা অনুসরণ করিতে হইবে। খণ্ড সমগ্রের দিকে, সমগ্র খণ্ডের দিকে দৃষ্টি না রাখিলে পরিপূর্ণ সত্য উপলব্ধ হইতেই পারে না।

গ্রন্থকার এই ইতিহাসকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছেন—প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক। প্রাকৃতিক অংশে দুইটি জেলার নদীনালা, জলবায়ু, জীবজন্তু, বৃক্ষলতা প্রভৃতির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই অংশের মূল্য না বুঝিলে, ইহার ঐতিহাসিক অংশও বুঝা কঠিন। বাহিরের আবেষ্টন মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি ও বাহ্যপ্রকৃতি—তাহার রীতিনীতি, ক্রিয়াকলাপ, আচার-ব্যবহারের উপর কতখানি কায করে, তাহা যাঁহারা একটু চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহারাই ধরিতে পারেন। সেই আবেষ্টনের বিবরণ দিয়া সতীশবাবু আমাদের দেশীয় ঐতিহাসিকদিগকে একটা সুন্দর পথ দেখাইয়াছেন। তাঁহার ঐতিহাসিক অংশে ভ্রমপ্রমাদ আছে কি না, তাঁহার বিচারপ্রণালী সর্ব্বথা যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে কিনা, ইহা বিজ্ঞেরা বিচার করিবেন। তবে তিনি যে প্রণালীতে এই ইতিবৃত্ত গ্রথিত করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই খুব প্রশংসনীয়। অদম্য অধ্যবসায়ে তিনি যে সব মালমশলা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা এই তথ্যসংগ্রহের যুগে অগ্রাহ্য করিবার জো নাই। বাঙ্গালার এখনও খাঁটি ইতিহাস রচনার সময় বহু দূরে। যখন সে সময় আসিবে, তখন এবম্বিধ খণ্ড ইতিবৃত্তই যে বিপুলভাবে ব্যবহৃত হইবে, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ মাত্র নাই।

হিন্দী তরঙ্গিণী। আমাদের এই নূতন হিন্দী সহযোগীকে আমরা সাদরে ভারত-সাহিত্য-ক্ষেত্রে নিমন্ত্রণ করিতেছি। আগষ্টের সংখ্যা খানি (যে খানি আমাদের হস্তগত হইয়াছে) কিন্তু বিষয় নির্ব্বাচন সম্বন্ধে একেবারেই প্রশংসার্হ নহে। প্রায় অর্দ্ধেক পত্রিকাখানিই কবিতাপূর্ণ। কবিতা-

গুলি সাধারণ হিন্দী কবিতা হইতে উচ্চ প্রকৃতির। "প্রাবৃট্ বর্ণন" কবিতাটী অতি দীর্ঘ হইলেও সৌন্দর্য্যপূর্ণ। "সাময়িক প্রবাহ" নামক আলোচনাতে "নারীকী প্রতিযোগিতা" নামক একটী রচনা আছে। রচয়িত্রীর নাম দেখিয়া মনে হইতেছে যে ইনি বঙ্গ মহিলা। যদি আমাদের অনুমান সত্য হয় তবে ইহা বড় আনন্দের বিষয়। যদি বিভিন্ন প্রদেশের নরনারী এইরূপ পরস্পরের ভাষায় চিন্তার আদান প্রদান করিতে সক্ষম হয়েন তবে ভারতে যে নূতন জাতীয়তা ফুটিয়া উঠিতেছে তাহা অচিরেই দেশের প্রতি নগরে সুপ্রভাব বিস্তার করিবে।

মর্য্যাদা, আশ্বিন ও কার্ত্তিক। মর্য্যাদার এই দুই সংখ্যাই আমাদের নিকট অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছে। দুই সংখ্যাই বৈচিত্র্য ও চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ দ্বারা পুষ্টকলেবর। "সম্পাদকীয় টিপ্পণীয়াঁ" নামক আলোচনা ভাগ অতি উৎকৃষ্ট। আজকাল দেশ বিদেশের নানা সংবাদ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত যে কয়খানা হিন্দী পত্রিকার বিবরণ প্রদত্ত হইল, সবগুলিই সচিত্র। চিত্রগুলি দেখিয়া মনে হয় যে নবোদ্বোধিত ভারতীয় চিত্রকলা এখনও আমাদের হিন্দুস্থানী ভ্রাতৃ-বর্গের চিত্তাকর্ষণ করে নাই।

সরস্বতী নবেম্বর ১৯১৫। এই সংখ্যার সরস্বতীতে বৈচিত্র্যের নিতান্ত অভাব। জীবন চরিত, ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও যুদ্ধের খবরের চর্ব্বিত চর্ব্বণ ব্যতীত কিছুই নাই। কবিতাগুলিও নিতান্ত প্রাণহীন। "সবল ঔর নিবল," "তুলসীদাস ঔর রামায়ণ" নামক যে দুইটী কবিতা আছে তাহা নিতান্ত বালকের প্রবন্ধ লেখার ন্যায়। বরং "সুমন" নামক ক্ষুদ্র কবিতাটীর মধ্যে কিছু ভাব আছে। হিন্দী সাহিত্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে কেবল পুরাতনের পুনরাবৃত্তি বা চলিত সংবাদগুলি সংগ্রহ করিয়াই নিরস্ত থাকিলে চলিবে না। নূতন সৃষ্টি আবশ্যক। এই সংখ্যায় "ভারতমে শিক্ষা প্রচার" নামক আলোচনাটীই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ।

অশোক অনুশাসন। শ্রীচারু-চন্দ্র বসু ও শ্রীললিতমোহন কর কাব্য-তীর্থ এম্, এ, কর্তৃক সম্পাদিত। (১৩২২) মূল্য ১৷৷০ টাকা। প্রাপ্তি স্থান—মেট্‌কাফ্ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৩৪ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপরোক্ত পুস্তকটি বাহির হওয়ায় বঙ্গ-ভাষায় একটি বহুদিনের অভাব দূর হইয়াছে। ইংরাজী ও অপরাপর য়ুরোপীয় ভাষায় বহুকাল আগেই এই প্রসিদ্ধ ভারতীয় সম্রা-টের অনুশাসনগুলি অনূদিত হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন ভারতীয় আধুনিক ভাষায় এতকাল এগুলির অনুবাদ হয় নাই। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস পরিপুষ্টির জন্য এই অনুশাসনগুলির প্রয়োজনীয়তা যে কত অধিক তাহা এ স্থলে বলাই বাহুল্য। সেকালীন ভারতের আর্থিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতীক অনেক তথ্য, ও আন্তর্জাতিক সম্বন্ধক্ষেত্রে ভারতের প্রভাব ও উচ্চাসন বিষয়ক নানা সংবাদ এই অনুশাসন-গুলিতে নিহিত আছে। সুতরাং প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষে ইহার তথ্যসমূহ যাহাতে সহজলভ্য ও সুবোধ্য হয় তাহা ভারতীয় ইতিহাসক্ষেত্রে কর্ম্মীগণের লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। আলোচ্য পুস্তকটিতে অনুশাসন-গুলির সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহার দ্বারা বঙ্গভাষাভাষী ব্যক্তিরা যে কেবল উপকৃত হইবেন তাহা নহে, সংস্কৃত অনুবাদ

হইতে ভারতীয় অপরাপর ভাষায়ও অনুবাদ অল্প আয়াসেই হইতে পারে।

"উপক্রমণিকা"য় ব্রাহ্মী লিপির উৎপত্তি প্রভৃতি অনেকগুলি বিষয় সংক্ষেপে অথচ প্রাঞ্জলভাবে আলোচিত হইয়াছে, ও "পরিশিষ্টে" অনুশাসনের শক্ত কথাগুলির ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। ডাক্তার টমাস্ প্রভৃতি মনীষিগণ কোটিলীয় অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থের সাহায্যে ইদানীং অনুশান-নিহিত অনেক কথার বিশদতর অর্থ করিয়াছেন। সেগুলি পুস্তকটিতে অঙ্গীভূত হয় নাই। তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এগুলি ভবিষ্যতে ব্যবহার করিলেও হইতে পারে। কিন্তু কয়েকটি অনুশাসনের সংস্কৃত অনুবাদ দেওয়া হয় নাই, যথা পঞ্চম গিরিলিপি (পৃঃ ৪৪), দশম হইতে ত্রয়োদশ গিরিলিপি (পৃঃ ৪৭), চতুর্থ হইতে সপ্তম স্তম্ভলিপি (পৃঃ ৪৯) ইত্যাদি। অথচ পৃষ্ঠার সংখ্যা ধারাবাহিক দেখিতে পাই। ইহাতে বোধ হয় ঐ ঐ সংস্কৃত অনুবাদ আদৌ গ্রন্থে নিহিত হয় নাই। যাহা হউক ইহা সংশুদ্ধ হওয়াউচিত।

আর একটি কথা বলা আবশ্যক। বাঙ্গলা সাহিত্যিক-জগতে অশোক অনুশাসনগুলির এক বিশেষ গুরুত্ব আছে বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থরচয়িতারাও উল্লেখ করিয়াছেন যে অনুশাসনগুলির ভাষাকে মাগধী প্রাকৃতের প্রাচীনতম নিদর্শন বলা যাইতে পারে ও কথিত বাঙ্গালা মাগধী প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত। সুতরাং বঙ্গসাহিত্যের দিক হইতেও এগুলির প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। আলোচ্য পুস্তকটি এইরূপে আদি আর্য্যভাষার সহিত বাঙ্গলা ভাষার সম্বন্ধ বঙ্গের সাধারণ নরনারীর নয়নপথে আনিয়া তাহাদের মনে এক অভিনব স্বভাষা-গৌরব জাগাইয়া তুলিবে।

মফঃস্বলের বাণী

১। বঙ্গে ম্যালেরিয়া ও তৎপ্রতিকারে দেশবাসীর কর্ত্তব্য

যে ম্যালেরিয়ার পৈশাচিক অত্যাচারে বাঙ্গালার শান্ত, স্নিগ্ধ পল্লীগুলি আজ মহাশ্মশানে পরিণত, যাহার কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বাঙ্গালী পল্লীভিটা পরিত্যাগ করিয়া আজ সহরবাসী, সেই ম্যালেরিয়ার নিদান নির্ণয়ের জন্য অনেক সময় অনেক চেষ্টা হইয়াগিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী মনীষিগণের মতে জলাভূমিতে লতাগুল্মাদি পচিয়া যে বিষ-বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহাই ম্যালেরিয়ার কারণ। আবার কেহ কেহ বলেন বিগলিত উদ্ভিদ্ হইতেই এই রোগবীজাঙ্কুর জন্ম হয়। গত ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী সৈনিক দলের ডাক্তার ল্যাভেরন্ এই রোগের প্রকৃত কারণ আবিষ্কৃত করিয়া জগদ্বাসীর ঐকান্তিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে এক প্রকার জীবাণুই এই দুরন্ত জ্বরের জনয়িতা। ঐ জীবাণুগণ অনুদেহী এবং এক কোষযুক্ত। ইহারা মানবদেহে প্রবিষ্ট হইয়া রক্ত

মধ্যস্থিত রক্তকণিকার ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তথায় বংশবৃদ্ধি করিয়া আমাদের প্রাণ বিনাশোপযোগী বল সঞ্চয় করিতে থাকে। যে ভাবে ইহারা দেহমধ্যে বংশবৃদ্ধি করে তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। প্রথমে একটী জীবাণু দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দুইটী হয়। ঐ দুইটী আবার বিভক্ত হইয়া চারিটী হইয়া থাকে। এইভাবে অল্পকাল মধ্যে একটী জীবাণু হইতে বহুসংখ্যক জীবের সৃষ্টি হয়। রোগ-জীবাণু দেহপ্রবিষ্ট হইলেই যে সকল সময় আমরা পীড়িত হই, এমত নহে। প্রকৃতি আমাদের শরীরে এমন একটী প্রতিষেধক শক্তি দিয়াছেন, যাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া অনেক সময় রোগ গতায়ুঃ হইয়া পড়ে। ঐ ব্যাধি-প্রতিষেধক শক্তি আমাদের মধ্যে না থাকিলে আমরা ক্ষণকালও বাঁচিতাম কি না সন্দেহ। জলাকীর্ণস্থানে বাস, দুশ্চিন্তা, কদাহার, অনাহার, অতিরিক্ত পরিশ্রম, মাদক দ্রব্য ব্যবহার, শীতাতপ সেবন প্রভৃতি যে কোন কারণে স্বাস্থ্য-হানি ঘটিলেই আমাদের আত্মরক্ষা করিবার শক্তি কমিয়া যায়। তখন সমস্ত রোগ-জীবাণুই স্বচ্ছন্দে দেহমধ্যে বংশবৃদ্ধি করিয়া আমাদিগকে পীড়িত করিয়া ফেলে।

কিউলেক্স (culex) জাতীয় মশকগণ গোদের জীবাণু বহন করে। ইহা দেখিয়া সর্ব্বপ্রথমেই মহামতি ম্যান্‌সন্ অনুমান করেন যে ম্যালেরিয়া-জীবাণুও বোধ হয় ঐরূপ কোন জাতীয় মশকের দ্বারা রোগীর শরীর হইতে সুস্থ দেহে সংক্রামিত হয়। তাঁহার অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ডাক্তার রস্ নানা জাতীয় মশক লইয়া পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। অবশেষে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে উক্ত মহাত্মা সপ্রমাণ করিলেন যে এনোফিলিস্ জাতীয় মশকই ম্যালেরিয়া-জীবাণুর বাহক।

এনোফিলিস্ মশক রোগীর দেহে হুলবিদ্ধ করিয়া রক্তপান কালে রোগ-জীবাণু টানিয়া লয়। কয়েক দিবস পরে মশক-দেহে রোগ-জীবাণুর বংশবৃদ্ধি হইতে থাকে। ক্রমে মশকের লালায় জীবাণুগণ আশ্রয় গ্রহণ করে। ঐ অবস্থায় ঐ মশক কোন সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন করিলেই ম্যালেরিয়া-জীবাণু দষ্ট ব্যক্তির রক্তে প্রবিষ্ট হইয়া রোগানয়ন করিতে সমর্থ হয়। পরীক্ষা দ্বারা আরও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে এই জাতীয় মশক কখন দিবাভাগে দংশন করে না এবং ইহাদের মধ্যে স্ত্রী জাতীরাই বিষবাহক।

সাধারণ মশক হইতে এনোফিলিস্ মশকের অনেক পার্থক্য আছে। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে সকলেই ইহা বুঝিতে পারেন। এই মশকের হুলে উভয় পার্শ্বে দুইটী শুঁড় ও পক্ষোপরি ছিট ছিট শ্বেতকৃষ্ণ চিহ্ন দেখা যায়। এই শ্রেণীর মশক গৃহভিত্তিতে কখনই সোজা হইয়া বসিতে পারে না—ইহারা বাঁকা ভাবেই বসে। ডাক্তার রস্ বলেন যে দেশে এনোফিলিস্ নাই, তথায় ম্যালেরিয়া নাই। যে কোন উপায়ে দেশ এনোফিলিস্ শূন্য করিতে পারিলেই ম্যালেরিয়া শূন্য হইবে। এই কথার প্রমাণও যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে। সে কালে কলিকাতায় বন, জঙ্গল, জলাভূমি ও মশকের বড়ই প্রাদুর্ভাব ছিল। "রেতে মশা দিনে মাছি, এই নিয়ে কলিকাতায় আছি"—এই প্রচলিত বাক্য অদ্যাপি তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কলিকাতায় তখন জ্বরেরও একাধিপত্য। লোক ঐ জ্বরকে "পাকা জ্বর" বলিত। কোন কোন বৎসর বর্ষাকালে এই জ্বরে তথাকার

য়ুরোপীয় অধিবাসিবর্গের তিনভাগ মৃত্যুমুখে পতিত হইত। যে একভাগ জীবিত থাকিত, তাহারা প্রাণ রক্ষা করিতে পারিয়াছে বলিয়া প্রতি বৎসর ১৫ই অক্টোবর তারিখে একটী আনন্দ-ভোজের অনুষ্ঠান করিত। পূর্ব্বকালে আফ্রিকার কোন জনপদে ম্যালেরিয়ার অতিশয় দৌরাত্ম্য ছিল। অনেক শ্বেতাঙ্গ পুরুষ কর্ম্মোপলক্ষে ঐ স্থানে গিয়া অল্পকাল মধ্যেই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইতেন। এইজন্য ঐ স্থানকে লোকে শ্বেত মনুষ্যের গোরস্থান বলিত। এক্ষণে তথায় ম্যালেরিয়া নাই বলিলেই হয়। ইহার কারণ অনুষ্ঠান করিয়া দেখা গিয়াছে, ঐ স্থানে আর মশক নাই। ১৮৯৫ হইতে ৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মালয় উপদ্বীপে ম্যালেরিয়ার উপদ্রব বিলক্ষণ ছিল। মশক ধ্বংসের ফলে সে স্থানেও ম্যালেরিয়ার গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে। প্যানেমার অবস্থা একবার ভাবিয়া দেখুন। একদা রেল রাস্তা প্রস্তুত করিবার জন্য আফ্রিকা হইতে এক সহস্র নিগ্রো আনিয়া প্যানেমায় প্রেরণ করা হয়। কিন্তু ছয় মাসের মধ্যে তাহারা সকলেই জ্বররোগে ভবধাম পরিত্যাগ করে। আর একবার ঐ উদ্দেশ্যে তথায় এক সহস্র চীনবাসীকে পাঠান হইল। তাহারাও ছয় মাসের মধ্যে নিগ্রোদিগের অনুগমন করিয়াছিল। এনোফিলিস্ শূন্য করিয়া ঐ স্থানের স্বাস্থ্য এখন অনেক ভাল হইয়াছে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তথায় হাজার করা ৮ জন মাত্র ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছিল। প্যানেমাতে ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য যে যে উপায় অবলম্বিত হয়, তাহা এই :—

১। প্রত্যেক বাড়ীর একশত গজের মধ্যে এনোফিলিস্ জাতীয় মশকের ডিম পাড়িবার স্থানগুলি নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

২। বাড়ীর সান্নিধ্যে যাহাতে মশককুল আশ্রয় লইতে না পারে তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছিল। যে সকল স্থানে মশক আশ্রয় লইতে পারে তাহা নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

৩। প্রত্যেক লোক বাড়ীর দরজা জানালা তাম্র নির্ম্মিত এক প্রকার চাল দ্বারা এরূপভাবে আবদ্ধ করিয়াছিল, যাহাতে উহার মধ্যে মশক প্রবেশ করিতে না পারে।

৪। মশকের ডিম পাড়িবার যে স্থানগুলি নষ্ট করা সম্ভব হয় নাই তথায় কেরোসিন্ তৈল বা মশকের ডিম্ব নাশক অন্য কোন বিষপদার্থ মধ্যে মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হইত।

আমাদের বঙ্গদেশের লোক সংখ্যা ৪৫৩২ ৯২৪৭। তন্মধ্যে তথা হইতে প্রতি বৎসর এক জ্বর রোগে প্রায় নয় দশ লক্ষ লোক মহাপ্রয়াণ করে। ম্যালেরিয়াই এখন একাকী সহস্র বদন হইয়া অবাধে আমাদিগকে গ্রাস করিতেছে। আর আমরা বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া অদৃষ্টের দোহাই দিয়া বসিয়া আছি। দেশের ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশের মায়া মমতা পরিত্যাগ করিয়া প্রতিবেশী, আত্মীয়, স্বজনকে মৃত্যুর ক্রোড়ে তুলিয়া দিয়া নিজেরা মনের সুখে প্রবাসেই কাল কাটাইতেছেন। বাঙ্গালার যে পল্লীগ্রাম একদিন তপোবন তুল্য মনে হইত, আজ তাহা প্রেত নিকেতন বলিয়া বোধ হয়। কেবল জন কয়েক অস্থিচর্ম্মসার ব্যক্তি প্লীহা যকৃতের বোঝা বহিয়া তথায় বিচরণ করিতেছে। পল্লীগ্রাম এখন নিস্তব্ধ, নিরানন্দ, ব্যাঘ্র ভল্লুকের বিহার স্থান। সে দৃশ্য দেখিলে মৃত কবির সেই শোকোচ্ছ্বাস মনে পড়ে,—

"কি দুর্দ্দশা! ছিল যথা বাসগৃহ শ্রেণী কত
কোলাহল মুখরিত মধুকর চক্রমত,

খানক'ত জীর্ণঘর রহিয়াছে সেথা আজি,
ঘিরিয়াছে চারিদিকে তৃণগুল্মবন রাজি!
ধনীর প্রাসাদ চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়েছে ভূমে,
মন্দির, প্রাচীর, স্তম্ভ সকলি মেদিনী চুমে!
ভাঙ্গিয়াছে বাঁধাঘাট, নিবিড় শৈবাল দল
করিয়াছে জলাশয় সমল পঙ্কিলতল!
জন যাতায়াত শূন্য পল্লীপথগুলি পাশে,
দু'ধারে ঘিরিছে বনে, বিকট কণ্টক হাসে!
যে হয়েছে কৃতবিদ্য, লভেছে সম্পদ বল
সেই করিয়াছে ভিটা শ্বাপদ ভ্রমণ স্থল!"

যে ম্যালেরিয়ায় বাঙ্গালী যৌবনে বৃদ্ধ হইয়া অকালেই ভবসংসারের লীলাখেলা সাঙ্গ করিতেছে—যে ম্যালেরিয়ায় বঙ্গপল্লী শ্রীসম্পদ হারাইয়া উৎসন্নের পথে ধাবিত হইতেছে, আমরা চেষ্টা করিলে সেই মানব শত্রুকে অনায়াসেই দেশ হইতে বিদূরীত করিতে পারি। ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে মধ্যে পল্লীভবনে আসিয়া বাস করুন; মামলা-মোকর্দ্দমার সভাগুলি গ্রাম হইতে উঠাইয়া সেই স্থানে স্বাস্থ্য-সভা স্থাপিত করুন, সকলে সমবেত হইয়া নিজ নিজ বসত বাড়ীর নিকটস্থ মশকের আবাস-স্থান বন জঙ্গল পরিষ্কৃত করুন; বাসগৃহগুলি যাহাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে এবং উহাদের মধ্যে সমানভাবে বাতালোক প্রবেশ করিতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা করুন; বাড়ীর জল যাহাতে সহজেই নিকাশ হয়—বাড়ীর সান্নিধ্যে যাহাতে একবিন্দু জলও কোন স্থানে জমিতে না পারে, তদ্বিষয়ে খরদৃষ্টি রাখুন; খানা ডোবা ভরাট করিয়া ফেলুন; অসমর্থ হইলে মধ্যে মধ্যে তাহাতে কেরোসিন্ তৈল নিক্ষেপ করুন; রাত্রিকালে মশারি ব্যবহার করিয়া মশকের দংশন হইতে আত্মরক্ষা করুন; সুপেয় পানীয় জলের সংস্থান করুন, আর বাবুগিরির সাজ কামিজ কোট রুমাল-এসেন্সের ব্যয় কমাইয়া তদর্থে পবিত্র ঘৃত দুগ্ধাদি পুষ্টিকর সামগ্রী আহার করিয়া আবার নব বলে বলীয়ান্ হউন। দেখিবেন ম্যালেরিয়ার দৌরাত্ম্য—কৃতান্তের অনুকম্পা—বঙ্গপল্লীতে আর অধিককাল থাকিবে না। হে বঙ্গীয় যুবকগণ! তোমরাই দেশের আশা ও ভরসাস্থল। দেশ উ'সন্ন যাইল বলিয়া বৃথা বসিয়া আর হা হুতাশ করিও না। সকলে একত্র হইয়া প্রাগুক্ত বিজ্ঞানানুমোদিত পন্থা অবলম্বন কর—স্বাস্থ্যবিধি মান্য কর। আবার পল্লীবাসীর পাণ্ডুবর্ণ আস্যে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠুক—আবার পল্লীজীবন শান্তিময় হউক।

২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ

২। মধ্যবিত্তের অবস্থা ও তাহার প্রতিকার

দেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদিগের যে কি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে তাহা বর্ণনা করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নয়। দুর্ভিক্ষের ও অন্নকষ্টের সময় ইহাদের অবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় আকার ধারণ করে। দরিদ্র নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের ভিক্ষা করিয়া বা প্রকাশ্যে দান গ্রহণ করিয়া জঠর জ্বালা নিবারণ করিবার পথ উন্মুক্ত আছে, কিন্তু দরিদ্র মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদিগের সেইরূপ পন্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর নহে। তাহারা অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তবু প্রকাশ্যে সাধারণের দান গ্রহণ করিতে চাহিবে না। সুতরাং তাহাদের অভাব লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া যায়। ইহাদিগকে তাই বলিয়া কোনরূপ সাহায্য প্রদান করিতে হইলে ভিন্ন উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। এ নিমিত্ত বিশ্বস্ত লোক দ্বারা গোপনে ইহাদিগের

অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই সকল মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগকে দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় ইহাদিগকে অল্প সুদে ঋণ প্রদান করা। ইহাতে ঐ সকল ভদ্রলোক অন্যের নিকট হইতে দান গ্রহণ করার হীনতা হইতে মুক্ত থাকিবে; অপর দিকে যাহারা টাকা প্রদান করিবে তাহারাও একটা লাভে টাকা খাটাইতে পারিবে; তবে এখন প্রশ্ন এই টাকা পাওয়া যাইবে কোথায়? এ নিমিত্ত পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসী ত্রিপুরা জেলার জমীদারদিগের উপরই সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিহিত রহিয়াছে। ইচ্ছা কবিলে পশ্চিমবঙ্গের মহাজনদিগের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া আপন আপন প্রজার মধ্যে তাহা লগ্নি করিতে পারেন। নিজ নিজ প্রজার নিকট টাকা লগ্নি করিলে উহা আদায় করিতে কোনরূপ বেগ পাইতে হয় না। সুতরাং তাহারা নিরাপদে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া আপন জমীদারীর দরিদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোক-দিগের মহৎ উপকার সাধন করিতে পারেন। এই বিপদের সময় যদি তাঁহাদের দৃষ্টি এদিকে পতিত না হয়, তবে তাঁহাদের কর্ত্তব্যে বিশেষ ত্রুটি হইয়াছে বলিতে হইবে। আশা করা যায়, তাঁহারা এ বিষয়ে একটু দৃষ্টিপাত করিবেন।

ত্রিপুরা হিতৈষী

৩। পল্লী-প্রসঙ্গ

সোনার বাঙ্গালার সুজলা সুফলা মলয়জ-শীতলা শস্যশ্যামলা তাল-তমাল বনরাজিনীলা, সুখ-শান্তির চির লীলা-নিকেতন, সোনার পল্লীগ্রামগুলি যেন ক্রমশঃই ধ্বংসের মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই ধ্বংসের মুখ হইতে পল্লীগ্রামগুলিকে রক্ষা করিবার কি কোনই উপায় নাই? বাঙ্গালার সোনার পল্লীসমূহ কি এইরূপেই দিন দিন শ্মশান হইয়া যাইবে? পল্লীর দুঃখ-দুর্গতির কথা আমরা বহুবার আলোচনা করিয়াছি। পল্লীর করুণ কাহিনী লইয়া আমরা বহুবার অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি,—জানিনা, তাহাতে কয়জনের প্রাণ আর্দ্র হইয়াছে,—জানি না, তাহাতে কয়টী হৃদয় দ্রবীভূত হইয়াছে? সেকথা জানি, আর না জানি,—একথা নিশ্চয় জানি যে, পল্লীই বাঙ্গালী ও বাঙ্গালার প্রাণ—পল্লীবাস উঠাইলে বাঙ্গালী বাঁচিবে না। পল্লী পরিত্যাগ করিয়া—পল্লীর প্রতি অমনোযোগী হইয়া—পল্লীলক্ষ্মীর প্রতি অযত্ন করিয়া বাঙ্গালী বস্তুতঃই আজ ধনেপ্রাণে মজিতে বসিয়াছে। যদি বাঁচিতে হয়, বাঙ্গালীকে আবার পল্লীর সুখ-সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। পল্লীর প্রতি অমনোযোগী হইয়াই বাঙ্গালীর আজ এই মহাসর্ব্বনাশ! বাঙ্গালার এক একটী উন্নত পল্লী, ক্রমে কিরূপ শ্মশানের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে চলিয়াছে,—আজ পাঠক বর্গকে তাহারই যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

পল্লীগ্রামের বর্ত্তমান অবস্থাদি স্বচক্ষে দর্শন এবং উহার অভাব অভিযোগ ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিবার জন্য আমরা আপাততঃ এ জেলার কতকগুলি পল্লী পরিভ্রমণের সংকল্প করিয়াছি। সঙ্কল্পানুযায়ী সম্প্রতি আমরা গোবরডাঙ্গা গ্রামে গমন করিয়াছিলাম। গোবরডাঙ্গায় প্রায় দুই দিন অবস্থানপূর্ব্বক আমরা উক্ত গ্রামের অবস্থাদি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি এবং উক্ত গ্রামের অভাব-অভিযোগ ইত্যাদি যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি,—নিম্নে তাহাই পত্রস্থ করা হইল।

গোবরডাঙ্গা যমুনানদীতীরস্থ একটী প্রাচীন সমৃদ্ধ গ্রাম। গ্রামটী কলিকাতা হইতে ৩৬ মাইলের ব্যবধান মাত্র। গ্রামটী দেখিলেই মনে হয়,—এক সময় উহা সর্ব্ব প্রকারেই সুখ-সমৃদ্ধির লীলা-নিকেতন বলিয়া পরিচিত ছিল। কিন্তু ইদানীং সেই সুখ-সমৃদ্ধির আর বিশেষ কিছুই নাই। কেবল সেই সুখ সমৃদ্ধির ভগ্নাবশেষ বুকে লইয়া গ্রামটী পড়িয়া রহিয়াছে মাত্র। সুখের যাহা কিছু উপাদান,—গ্রামটীতে তাহার সকলই বর্ত্তমান আছে,—কিন্তু সুখের উপাদান সত্ত্বেও, লোকের মনে যেন সুখ নাই। নিদারুণ ম্যালেরিয়া লোকের সকল সুখেই বাদ সাধিয়াছে। গ্রামে রাশি রাশি ফলের বাগান,—তাহাতে

অসংখ্য-অগণ্য আম্র, কাঁঠাল, নারিকেল, তাল ও খেজুর গাছ, লতা পাতা ও জঙ্গলে পরিবেষ্টিত হইয়া মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রাস্তাঘাটগুলিও একটী গ্রামের পক্ষে যতদূর সম্ভব, উৎকৃষ্ট। কিন্তু পথগুলি প্রায়শঃ নির্জ্জন। দুরন্ত ম্যালেরিয়া রাক্ষসী ক্রমেই গ্রামটীকে জনশূন্য করিয়া তুলিতেছে। গ্রামে অনেকগুলি পুষ্করিণী আছে, —কিন্তু তাহার অধিকাংশই জলশূন্য, কোনটীতে জল যৎসামান্য যাহা আছে তাহাও পানের অযোগ্য এবং অব্যবহার্য্য। গ্রামটীর দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া যমুনা নদী প্রবাহিতা,—কিন্তু নদীটীর বর্ত্তমান অবস্থা যাহা দেখিলাম, তাহাতে উহাকে নদী না বলিয়া একটী ক্ষুদ্র খাল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নদীতে স্রোত এক রকম নাই বলিলেও চলে। স্থানে স্থানে জলজ জঙ্গল ও লতাগুল্ম উৎপন্ন হইয়া নদীবক্ষ প্রায় আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছে। নদীবক্ষে যৎসামান্য জল। ফাল্গুন চৈত্র মাসে নদীর কোন কোন স্থান একেবারে শুষ্ক হইয়া মাঠের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। অথচ এই নদীর জলই সমস্ত গ্রামবাসীর পানাহার ও স্নানের একমাত্র সম্বল!

গ্রামটীতে রাজা না থাকিলেও রাজপ্রতিম দুই এক ঘর সম্ভ্রান্ত জমীদার আছেন। ইহাঁদের রাজপ্রাসাদতুল্য সুবৃহৎ অট্টালিকা ও উদ্যান বাটী প্রভৃতি আছে। রায় শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন মুখার্জ্জি বাহাদুর এবং তদীয় অনুজ শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসন্ন মুখার্জ্জি প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ এক্ষণে গোবরডাঙ্গার জমীদার পদে সমাসীন আছেন। ইহাঁরা বিবিধ সদনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তক এবং সৎকার্য্যের চির উৎসাহদাতা। ইহাঁরা আছেন বলিয়াই গ্রামটী মরিতে মরিতেও আজ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছে। গোবরডাঙ্গার যে কোন সদনুষ্ঠানের মূলে ইহাঁদের সাহায্য ও সহানুভূতি বিদ্যমান আছে। বলিতে গেলে ইহাঁরাই এ গ্রামের প্রাণস্বরূপ।

এ গ্রামের অন্যান্য প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই অতি পুরাতন পাকা গৃহ ও পাকা প্রাচীর দেখিলাম। কিন্তু অধিকাংশই জীর্ণ ও ভগ্নপ্রায়। গ্রামে বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের বাস। কিন্তু অধিকাংশই এক্ষণে দরিদ্র। কেবল তাঁহাদের প্রাচীন ও জীর্ণ পাকা গৃহগুলি এবং ভগ্নপ্রাচীরসমূহ তাঁহাদের অতীত সৌভাগ্য-সমৃদ্ধির পরিচয় দান করিতেছে। কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাকা বাড়ী দেখিলাম,—জনমানবশূন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে! শুনিলাম,—গৃহস্বামীরা চির সহরবাসী! কাজেই উহা এক্ষণে পশুপক্ষীর আবাসস্থলে পরিণত হইতে চলিয়াছে! পূর্ব্বেই বলিয়াছি গ্রামটী এক সময়ে বেশ সমৃদ্ধ ছিল; কিন্তু বর্ত্তমানে একেবারেই যেন ধ্বংসোন্মুখ। গ্রামবাসীর চেহারা দেখিলেই মনে হয় ম্যালেরিয়া ক্রমশঃই যেন তাঁহাদিগকে অন্তঃসারশূন্য ও একেবারে অসার করিয়া ফেলিতেছে। কেবল ম্যালেরিয়াই যে সকল পল্লীর অবনতির কারণ, এমন কথাও বলা যায় না। এমন অনেক গ্রাম দেখা যায়, যেখানে ম্যালেরিয়া নাই অথচ সে সকল গ্রামও ধ্বংসের পথে অগ্রসর। ইহার কারণ পল্লীর প্রতি পল্লীবাসীর অমনোযোগ। যতদিন পর্য্যন্ত সহরের ভোগ-বিলাসিতার মোহমদিরায় আমরা আত্মহারা থাকিব, ততদিন আমাদের কল্যাণ নাই।

ভোগ-বিলাসিতা ত আমাদের সহিবে না। ত্যাগী ও বৈরাগীর আত্মবিস্মৃত অধঃপতিত সন্তান আমরা,—আমাদের এ ভোগ সহিবে না। ভোগবিলাসিতায় আমাদের যথার্থ শান্তি ও তৃপ্তি পাওয়া অসম্ভব। ত্যাগের পথে বৈরাগ্যের পথেই আমাদের চলিতে হইবে। যতদিন আমরা একথা না বুঝিব ততদিন সহরের প্রতি আমাদের মোহমায়া ঘুচিবে না। যেদিন বুঝিব, ত্যাগই কল্যাণের পথ,—বৈরাগ্যই শান্তির পথ, সেদিন আবার পল্লীর প্রতি আমাদের মায়া হইবে। সেদিন আবার পল্লীর শ্রী ফিরিবে।

এই যে ভীষণ ম্যালেরিয়া রাক্ষসী গ্রামের পর গ্রাম, আজ একেবারে উজাড় করিয়া ফেলিতেছে, চেষ্টা করিলে এই রাক্ষসীর হাত হইতে আমরা কি অর্দ্ধেক লোককেও উদ্ধার করিতে পারি না? মানুষের অসাধ্য যে কর্ম্ম নাই। চেষ্টা বলে অসাধ্যকেও সুসাধ্য করা

যায়। গোবরডাঙ্গার কত ভদ্রলোকের বাসবাটীর চতুর্দ্দিক যে জঙ্গলাকীর্ণ দেখিলাম—কত বৃহৎ বাটীর আশে পাশে ম্যালেরিয়ার আকরস্থল দূষিত জলপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কত যে ডোবা দেখিলাম, তাহার ইয়ত্তা নাই। চেষ্টা করিলে আমরা ইহার কি কোনই প্রতীকার করিতে পারি না? নিশ্চয়ই পারি! নিজের কার্য্য নিজে করায় লজ্জার বিষয় আর কি আছে? কেবল গোবরডাঙ্গা সম্পর্কেই যে আমরা এ কথা বলিতেছি, তাহা নহে। প্রায় প্রতি গ্রামেরই এই অবস্থা। আর প্রতি গ্রাম সম্পর্কেই আমাদের এই পরামর্শ। আমাদের আত্মরক্ষার জন্য আমাদিগকেই চেষ্টা করিতে হইবে—আমাদিগের কল্যাণের জন্য আমাদিগকেই চেষ্টিত হইতে হইবে,—আমাদিগের নিজকার্য্য আমাদিগের নিজ হস্তেই সম্পাদন করিতে হইবে। শক্তি সত্ত্বেও নিজের কার্য্যের জন্য যাহারা পরের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে, তাহাদের মত হতভাগ্য আর নাই। নিজের কার্য্য নিজেরা করাই মনুষ্যত্বের লক্ষণ। আত্মশক্তির প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসসম্পন্ন না হইলে কোন জাতীরই কল্যাণ নাই। প্রতি পদে সরকার বাহাদুরের সাহায্য চাহিলে চলিবে না। যাহা নিজেরা পারিব, তাহা নিজেরাই করিব, এ প্রতিজ্ঞায় সকলকে আবদ্ধ হইয়া আজ আমাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে হইবে। অন্যথা, আমাদের অবস্থোন্নতির আর উপায়ান্তর নাই।

অবশ্য এমন অনেক কার্য্য আছে, যাহা আমাদের আত্মশক্তির সাধ্যাতীত। কিন্তু একথা ঠিক যে পরস্পর ঐক্য ও আন্তরিকতা থাকিলে কোন কার্য্যই সংসারে অসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না।

এই যে যমুনা নদী আজ মজিতে বসিয়াছে ইহার প্রতিকার কল্পে আমরা দেশবাসী আজ একমত ও একপ্রাণ হইয়া যদি সহৃদয় সরকার বাহাদুরের নিকট আবেদন করি, তাহা হইলে, মনে হয় সে আবেদন কখনই অরণ্যরোদনে পর্য্যবেশিত হয় না। রেলপথ হওয়ার পর হইতেই গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলে যমুনার গতি মন্দীভূত হইয়াছে। যমুনার উপর দিয়া লৌহময় রেলবর্ত্ম চলিয়া গিয়াছে। যমুনার সে উদ্দাম গতি আজ আর নাই। যমুনা যেন আজ পাশবদ্ধা—মলিনা—কৃশা, যমুনার তীরে সেদিন বেড়াইতে গিয়া,—যমুনার দুই তীরের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া আমাদের কবির সেই করুণ সঙ্গীত মনে পড়িল! মনে মনে গাহিলাম:—

"যমুনে,—এই কি তুমি সেই যমুনে, প্রবাহিনী,
ও যার বিমল তটে রূপের হাটে
বিকাত নীলকান্তমণি॥
কোথা সে সুনীল তমুর ধেনু বেণু
মা যশোদা রোহিণী॥
কোথা চারু চন্দ্রাবলী, কোথা বা সে জলকেলি;
কোথা ললিতা সখী সুহাসিনী।—
ও যার মোহন স্বরে উজান ভরে
বইতে তুমি আপনি॥
তোমার তটে তটে, তোমার ঘাটে ঘাটে
তোমার সন্নিকটে কই সে ধনী!"

হায়! নদীর শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া মনে বড়ই ক্লেশ হইল। নদী একসময়ে যে বেশ প্রশস্ত ছিল নদীর তীর দেখিলেই বর্ত্তমান সময়ে তাহা বেশ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। নদী যে শীঘ্রই মরিয়া বা মজিয়া যাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই নদী মজিয়া গেলে গ্রামটী অচিরকাল মধ্যেই জনমানবশূন্য এক ভীষণ অরণ্যে পরিণত হইবে। আমরা আজ এবিষয়ের প্রতীকারার্থ বিশেষভাবে আমাদের মহামান্য সরকার বাহাদুরের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

গোবরডাঙ্গা গ্রামে এক সময় প্রায় শতাধিক চিনির কারখানা ছিল। এই সকল কারখানায় শত শত লোক কাজ করিত। এ সকল কারখানায় এত চিনি প্রস্তুত হইত যে সে চিনি দেশ বিদেশে চালান দিয়া স্থানীয় ব্যবসায়িগণ লাভবান হইত। বৈদেশিক চিনি ব্যবসায়িগণের প্রতিযোগীতায় আজ সেই সকল কারখানার প্রায় সকলগুলিই বিলুপ্ত হইয়াছে। আমরা দুইটী মাত্র চিনির কারখানা এক্ষণে বিদ্যমান্ দেখিলাম। একটী কারখানার কাজ কর্ম্ম আপাততঃ বন্ধ আছে,—অপরটী "ন যযৌ ন তস্থৌ" হইয়া কোন-

রূপে টিকিয়া আছে মাত্র। কারখানার প্রাচীর পরিবেষ্টিত বৃহৎ বাটী, উহার বিভিন্ন প্রকোষ্ঠাদি, সুবৃহৎ উনুনসমূহ, উহার অভ্যন্তর ভাগ, এবং সাজ সরঞ্জামাদি দেখিয়া মনে হইল যে একসময় অতি সুন্দররূপে এইসকল কারখানা পরিচালিত হইত। গোবরডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী খাঁটুরা নামে একটী স্থান আছে। এস্থানে বহুসংখ্যক ধনী ব্যবসায়ীর বাস। ব্যবসাবাণিজ্য করিয়া এই স্থানের অধিবাসিগণ ধনসম্পদে এক সময় বিশেষ উন্নত হইয়াছিলেন। এখনও এখানে ধনীর সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এস্থলেও আছে। খাঁটুরায় কিছুদিন হইল একটী ক্ষুদ্র লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু লাইব্রেরীর অবস্থা এখন পর্য্যন্ত বিশেষ আশাপ্রদ নহে। পল্লীগ্রামে একটী লাইব্রেরীর যথেষ্ট আবশ্যকতা রহিয়াছে। আমরা আশা করি, খাঁটুরার ধন-সমৃদ্ধ ব্যক্তিবর্গের সাহায্যে উক্ত লাইব্রেরী শীঘ্রই পুষ্ট ও শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিবে। উপসংহারে ব্যক্তব্য এই যে গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপ্যালিটীর সুযোগ্য হেড্ ক্লার্ক শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস ভট্টাচার্য্য এবং স্থানীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক এবং সুলেখক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহোদয়দ্বয় গোবরডাঙ্গায় অবস্থানকালে আমাদের সুখ-সুবিধার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া এবং পরিদর্শন ও পরিভ্রমণ কার্য্যে বিশেষভাবে আমাদের সহায়তা করিয়া, আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ

৪। আত্মনীতি

স্বরাষ্ট্রনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি বড় বড় কথা ছাড়িয়া আমরা সময়ে সময়ে আমাদের পাঠকবৃন্দের মন নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর দিকে ফিরাইবার চেষ্টা করি। পল্লীগ্রামে আমার বাস, আমার ঘরগুলি সবই খড়ের, বাড়ীর অদূরে কৃষিক্ষেত্র রহিয়াছে, তাহা হইতে চাল ডাল ঘরে আসে, বাড়ীর বাগানে ফুল ফল তরকারী রহিয়াছে, পুকুরে প্রচুর মাছ আছে, গোয়ালে ৫।৭ টা গরু আছে, দুধ ঘি যথেষ্ট পাই। পরিবারে পিতা মাতা খুড়া খুড়ী ভাই ভগ্নী অনেক। তদুপরি আত্মীয়বন্ধুদের ঘটা। শক্তি অনুসারে খাটি, যাহা পাই তাহাতেই সকলে মিলিয়া মিশিয়া সংসার চালাইয়া যাই। আমাদের পল্লী জীবনের চিত্র প্রায়ই এইরূপ ছিল। আত্মশক্তিগুণে যদি কেহ প্রাধান্য লাভ করিতেন, তাঁহার সে প্রাধান্য দেশের বিবিধ সৎকর্ম্মে দান ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রকাশ পাইত। সে প্রাধান্য শুধু নিজের বাসের জন্য সুরম্য সৌধ নির্ম্মাণে, গাড়ী ঘোড়ার দাপটে, পোষাক পরিচ্ছদের বাহারে আর শুধু নিজের ও নিজের স্ত্রীপুত্রকন্যার বিলাস সম্ভোগে পর্য্যবসিত হইত না। এখন কি দেখিতেছেন? আমাদের যাহা কিছু শক্তি সাধনা শুধু নিজের ঐ কয়টির জন্যই। বিদেশী ভিন্ন জাতির নিকট যাহা দেখিলাম যাহা পড়িলাম যাহা শুনিলাম মনে করিতে লাগিলাম তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং তেমনটি হওয়ার জন্য লালায়িত হইলাম। বিদেশীয়েরা যে যে উপায়ে অর্থোপার্জ্জন ও তাহার সম্ভোগ করে ক্রমে ক্রমে আমাদেরও দু'চার জন সেই সেই উপায়ে অর্থোপার্জ্জন ও সেই সেই প্রণালীতে তাহার সম্ভোগ আরম্ভ করিলাম। আমি যখন দেখিলাম যে অপর পল্লীর রামনাথের পুত্র এমএ, বিএল, পরে ডি, এল হইয়া খুব অর্থ রোজগার করিতেছেন, তাঁহার বাড়ী গাড়ী জুড়ি, জমিদারী হইয়াছে;—লোকে তাঁহাকে খুব জবরদস্ত লোক বলিতেছে। আমিও তাঁহার মত বড় লোক সাজিবার জন্য ব্যাকুল হইলাম, যে কোনরূপে অর্থাগমের উপায় করত সহরে আসিয়া পাকা এমারত করিলাম, জাঁকালো সাজসজ্জা হইল, জুড়ি মটোর হাঁকাইতে লাগিলাম, বাড়ীতে রাত্রে বৈদ্যুতিক আলো দপ্ দপ্ করিতেছে, বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়া চলিতেছে। নিজের পত্নী ও ছেলে মেয়েদের নিয়ে পরিপাটী আহারবিহারে দিন কাটিতেছে। আমার সুরম্য হর্ম্ম্যে পল্লীর আত্মীয় স্বজনের বা পাড়া প্রতিবেশীর হাট বসে না। পল্লীগ্রামের আমার সেই

জীবন, আর রাজধানীর এই জীবনে পার্থক্য কত হিসাব করুন।

শেষোক্ত প্রকারের জীবনযাত্রাই বর্ত্তমান যুগের আদর্শ হইয়াছে। এই আদর্শের অনুসরণ করিয়া আমরা কি হইতেছি তাহাই ভাবিবার বিষয়। এই আদর্শের অনুসরণে দেশের অনেক লোক গ্রাম ছাড়িয়া নগরে গিয়া বাস করিতেছেন; দীন হীন স্বজনগণের সংস্রব ত্যাগ করিয়া, নিজের পুত্র কন্যাদেরে বিদেশী আদর্শে গঠিত করিয়া মনে করিতেছেন, তাঁহারা জগতের শ্রেষ্ঠ সুসভ্য লোক হইয়া উঠিতেছেন। এইরূপ সুসভ্যতার মূল্য কতটুকু তাহা বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করিতে হইবে।

এই উৎকট অনুকরণের প্রথম ফল দেশের দশের সহিত সম্পর্কত্যাগ; দ্বিতীয় ফল স্বকীয় চিরাগত আচার ধর্ম্ম বর্জ্জন; তৃতীয় ফল স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তন। প্রথমটি বুঝিবার জন্য কাহাকেও কষ্ট করিতে হইবে না। প্রত্যেক পল্লীগ্রামের হিসাব লইয়া দেখুন যিনিই উপার্জ্জনক্ষম হইয়া উঠেন, তিনিই গ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নগরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যভোগের জন্য ছুটেন। পূর্ব্বে যিনি বিদ্যা বুদ্ধিবলে প্রধান হইতেন, তিনি স্বগ্রামের পানীয় জলের ব্যবস্থা করিতেন, রাস্তাঘাটের উন্নতি করিতেন, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকাণ্ডে ও উৎসবে আত্মীয় স্বজনের ও প্রতিবেশীর আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। তাঁহা হইতে নানা জন নানা প্রকারে সাহায্য লাভ করিত। তদ্দ্বারা দশ জনের উপর তাঁহার প্রাধান্য স্থাপিত হইত। তিনি গ্রামের লোকের বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইয়া দিতেন বলিয়া সামান্য বাদ বিসম্বাদ বা স্বার্থসংঘর্ষ তুমুল যুদ্ধে পরিণত হইতে পারিত না। এক গ্রামের ঐরূপ এক প্রধান ব্যক্তির জীবদ্দশায় ৩০ বৎসরকালে ১০টী মামলাও হইয়াছিল না। আর তাঁহার মৃত্যুর পর ৫ বৎসরের মধ্যে ঐ গ্রামের লোকেরা শতাধিক মামলা করিয়াছে। উঁহার জীবনের প্রারম্ভে উচ্চপদস্থ ৪।৫ জন লোক গ্রামে ছিলেন, বর্ত্তমান যুগের গ্রাডুয়েট একজনও ছিলেন না। আর এইক্ষণ ২০।২৫ জন গ্রাডুয়েট, বিএল, উকীল প্রভৃতি আছেন। তখন একজন মাত্র বৈদেশিক সভ্যতায় মুগ্ধ হইয়া স্বগ্রাম স্বধর্ম্ম ও স্বজাতির সম্পর্ক পরিত্যাগ পূর্ব্বক কলিকাতা নগরীর আশ্রয় লইয়াছিলেন, আজ গ্রামের শিক্ষিত উপার্জ্জনরত প্রায় সকলেই তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন। সুতরাং গ্রামবাসী জনসাধারণের যে কি দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়।

বর্ত্তমান যুগকে সভ্যতার ও উন্নতির যুগ বলা হয়। প্রতি বৎসর শত শত গ্রাডুয়েট, আণ্ডার গ্রাডুয়েট সৃষ্টি হইতেছে, বাড়ীঘরে পোষাকে পরিচ্ছদে সকলেই কেমন সুন্দর সাজিতেছে; কে বড় কে ছোট জানিবার উপায় নাই। সুতরাং ধরিয়া লই সকলেই বড়, সকলেই উন্নত, সুসভ্য।

এই উন্নতি ও সভ্যতা আমাদেরে লইয়া কোথায় ছুটিয়াছে, আমরা কি পাইতেছি, কি হারাইতেছি, আমাদের জাতীয় ধর্ম্ম ও জাতীয় শক্তি কতটুকু পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে, আর কি পরিমাণ বিনষ্ট হইতেছে,—আমাদের প্রত্যেক ভবিষ্যৎ কর্ম্ম কোন্ দিকে ফলপ্রসূ হইবে, সংসারপ্রবিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তির নিবিড়ভাবে তাহা চিন্তা করিতে হইবে।

জ্যোতিঃ

৫। "সাধের ঘুম ঘোর"

প্রভাতে অর্দ্ধালসনেত্রে শুনিতে পাইলাম, আমার গবাক্ষের নিম্ন দিয়া কে গাহিয়া চলিয়াছে "সাধের ঘুম ঘোর কভু কি ভাঙ্গিবে না!" সহসা তন্দ্রা বিদূরিত হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে যুগযুগান্তের স্মৃতি হৃদয়পটে অঙ্কিত হইয়া গেল। আমার হৃদয়রাজ্যে বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে, কে যেন তখনও গাহিতেছিল, 'সাধের ঘুমঘোর কভু কি ভাঙ্গিবে না!'

ভাবিয়া দেখিলাম, আমাদিগের এ ঘুমঘোর সহসা ভাঙ্গিবার নহে। আমরা যেন এক বিরাট অন্ধকারের মধ্যদিয়া কোন এক অজানিত অজ্ঞাত দেশে চলিয়াছি। এত আঘাতেও আমাদিগের চৈতন্য হইতেছে না।

বাঙ্গালার পল্লীভবন কম্পিত করিয়া ধ্বনি উঠিতেছে, "ময়ি ভুখা হুঁ"; কিন্তু এ ধ্বনি

কি নূতন? ইহারও পূর্ব্বে একাধিকবার কি এই ধ্বনি শুনিতে পাই নাই? ঐ যে অমল ধবল সৌধাবলি মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, উহার গবাক্ষ প্রান্তে কিছুক্ষণের জন্য কাণ পাতিয়া থাক, শুনিতে পাইবে, নির্জ্জীব ইট পাথর ভেদ করিয়া উত্থিত হইতেছে, "ময়ি ভুখাহুঁ।"

অন্যদিকে দৃষ্টিপাত কর, যেখানে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ তাহার আড়ম্বরহীন জীবন যাপন করিতেছেন, যেখানে প্রতিনিয়ত মৃত্যু ও জীবনের সংগ্রাম চলিতেছে, সেখানে একবার পদার্পণ কর, স্থিরদৃষ্টে চতুর্দ্দিকের অবস্থাবলি চিন্তা কর, সেখানেও দেখিবে, এক অনাহত "ময়ি ভুখা হুঁ" ধ্বনি পবিত্র গৃহাশ্রমের নীরবতা ভঙ্গ করিতেছে।

তারপর সমাজের সর্ব্বনিম্নস্তরে দৃষ্টিপাত কর, সেখানেই দেখিবে, সেই 'ময়ি ভুখা হুঁ।'

বাস্তবিকই আমাদিগের এ অবস্থা সহজে ফিরিবার নহে। আমরা এখনও যদি আমাদিগের সনাতন প্রাচীন আদর্শ অবলম্বন করিতে না পারি, এখনও যদি প্রজ্জ্বলিত লালসবহ্নি বক্ষে ধারণ করিয়া অন্ধের ন্যায় ছুটিতে থাকি, তবে এই হৃদয়নিহিত প্রচ্ছন্ন বহ্নিই আমাদিগকে একেবারে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিবে।

আমাদিগের পিতৃপুরুষের সুচিরার্জ্জিত প্রধান সম্পত্তি "সন্তোষ" আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। আজ কয়দিন হইল বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধদিবস চলিয়া গিয়াছে। বিদ্যাসাগর কি ছিলেন। সেই তালতলার চটি আর উড়ানী যাঁহার অঙ্গের ভূষণ ছিল, দেশের লাট বেলাট একদিন তাঁহারই সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিলে আপনাকে ধন্য মনে করিতেন। আজ আমরা চটি চাদর বর্জ্জন করিয়াছি, আমাদিগের সুট না হইলে চলে না! কিন্তু এই সুট পরিয়াও বিদ্যাসাগরের পদধূলি লাভের যোগ্য হইয়াছি কি?

কেহ বলিবেন, রাজদরবারে রাজ পরিচ্ছদ না হইলে চলিবে কেন? স্বীকার করিলাম, কিন্তু গৃহে আমরা কয়জন "রাজা নবকৃষ্ণের" ন্যায় আটহাতি ধুতি পরিয়া থাকি? 'অর্থাভাব! অর্থাভাব!! দারুণ অর্থাভাব!!! 'ময়ি ভুখা হুঁ" আমরা ইতস্ততঃ কেবল এই জ্বালাময়ী ধ্বনি করিয়া আসিতেছি, কিন্তু কি উপায়ে এই অর্থাভাব দূর হইতে পারে তাহা কি চিন্তা করিতেছি? আমরা নিজের দোষ পরের স্কন্ধে চাপাইতে চাই, হীরা বলিয়া কাঁচ তুলিয়া লই। আমাদিগের দুঃখ হইবে না? আমরা দুর্ভিক্ষে মরিব না? যদি তাহাই না হইবে, তবে কি করিয়া যুগযুগান্ত সঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে!

জাৰ্ম্মাণি আসিয়া আমাকে বলে না, 'ওগো এই ডিটমারের আলোটা কিনিয়া তোমার গৃহের শোভা বর্দ্ধন কর।' কিন্তু আমার ত ডিটমার না হইলে চলে না! ভাবিয়া দেখিয়াছি, আমার পিতৃপুরুষ, যাঁহারা জ্ঞান বিজ্ঞানে জগতে ধন্য হইয়াছেন, তাঁহাদিগের ঘরে কয়টা ডিটমার ছিল? কুম্ভকারের মৃত্তিকানির্ম্মিত দীপাধার ও দীপ কে বর্জ্জন করিল? ভাবিয়া দেখিয়াছি, আমার পিতৃপুরুষ এই ডিমটারের আলো না হইলেও জ্ঞান বিজ্ঞানে, ভূয়োদর্শনে, আধ্যাত্মিক রাজ্যে আমার অপেক্ষা কত উন্নত ছিলেন?

একজন ইউরোপীয়ের ক্ষুদ্র গৃহের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। দেখিবে গৃহের প্রতি ক্ষুদ্র অংশটুকু কত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সিন্দুরবিন্দুকণা পড়িলে তখনই তুলিয়া লওয়া যায়। প্রত্যেক জিনিষ যথাস্থানে সুবিন্যস্ত, যেন শৃঙ্খলা মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছে। আর তোমার স্বগৃহের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তোমার গৃহপ্রাঙ্গণের অপরিচ্ছন্নতার বিষয়, তোমার গৃহের, তোমার বাক্যের, তোমার কার্য্যের উশৃঙ্খলতার চিন্তা কর। তারপর ভাবিয়া দেখ তুমি তোমার প্রতিবেশী ইউরোপীয়ের অপেক্ষা আপনাকে অধিকতর গৌরবান্বিত মনে করিতে পার কিনা? একদিন তোমার পল্লীভবন এত বিলাস সম্ভারে অনাবশ্যকের তাড়নায় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে নাই। কিন্তু তোমার জীবন ধারণের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহারও ত অভাব হয় নাই। তুমি পাইতেছ পাশ্চাত্য সম্ভার, কিন্তু হারাইতেছ তোমার প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয়, আধ্যা-

ত্মিক সম্পদ, দেবদ্বিজে ভক্তি, ভগবানে আত্ম-নির্ভর, দীনপ্রতিপালন স্পৃহা। তোমার স্বার্থের গণ্ডী উত্তরোত্তর সুস্পষ্ট হইতেছে, কিন্তু তুমি ত কিছুতেই সুখী হইতে পারিতেছ না। সেই অনাহুত "ময়্ ভুখা হুঁ" ধ্বনি তোমাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে।

তোমার গৃহে অন্ন নাই কিন্তু বাজারে গিয়া তুমি সর্ব্বাপেক্ষা বড় ইলিশ মৎস্যটী ক্রয় করিয়া তোমার ঔদার্য্যের পরিচয় প্রদান করিলে—কারণ আজ তুমি তোমার বেতন পাইয়াছ, অথবা তোমার শ্যালক গৃহে পদার্পণ করিয়াছে। আজ তুমি তোমার দীনতা ঢাকিয়া রাখিতে পার, কিন্তু একদিন না একদিন উহা ফুটিয়া উঠিবে—প্রকৃতি একদিন তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে।

আমরা মৃত্যুর দ্বারে পৌছিয়াছি। যদি বাঁচিতে হয়, যদি এই 'ময়্ ভুখা হুঁ' ধ্বনি নিবারণ করিতে হয়, তবে একবার অতীতের সন্তোষরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে, কি ছিল কি নাই, কিসে রক্ষা পাইব, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিন্তা করিয়া তদনুসারে আমাদিগের জাতীয় জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, নচেৎ যুগ-যুগান্তর, জন্ম-জন্মান্তর শেষে, সুখশয্যায় শয়ন করিয়া শুনিতে থাকিবে, "সাধের ঘুমঘোর কভু কি ভাঙ্গিবে না?"

স্বরাজ

৬। ইয়ুরোপীয় যুদ্ধ পণ্য রপ্তানি বিষয়ে বাঙ্গালার কি ক্ষতি করিয়াছে।

বিগত বৎসর ইয়ুরোপে ভীষণ সমরানল প্রজ্জ্বলিত হওয়ায় বাঙ্গালার বাণিজ্য কারবারে যে বিষম আঘাত লাগিয়াছে তাহার ফলে এদেশে অর্থাগম অনেক কম হইয়াছে। নানা প্রকারের বহু কাঁচা মাল বঙ্গদেশ হইতে প্রভূত পরিমাণে ইয়ুরোপের বাণিজ্যপ্রধান দেশ সমূহে প্রতি বৎসর রপ্তানি হয় এবং তাহাতে অনেকটা বাঙ্গালার আর্থিক পুষ্টি সাধিত হয়। বিগত বৎসর তৎপূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এদেশ হইতে বিদেশে মাল রপ্তানি অনেক কম হইয়াছে, সুতরাং অর্থলাভও কম হইয়াছে। ১৯১৪-১৫ সনের বঙ্গীয় নৌবাণিজ্যের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী হইতে উদ্ধৃত করিয়া আমরা নিম্নে স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিতেছি, ১৯১৩-১৪ সনের তুলনায় ১৯১৪-১৫ সনে বঙ্গের পণ্য রপ্তানির কি পতন হইয়াছে এবং অর্থাগম কত কম হইয়াছে।

রপ্তানি করা মালের নাম	১৯১৩-১৪ সনে কত টাকার মাল রপ্তানি হইয়াছে।	১৯১৪-১৫ সনে কত টাকার মাল রপ্তানি হইয়াছে।
পাট নির্ম্মিত বস্ত্র	২৮১৯৯৫৭০২৲	২৫৭৭২৮৮১১৲
কাঁচা পাট	২৮০৪৪৩৫০৲	১১৮২৮৮৫০২৲
চা	৮৪৭৫৯৪৯৫৲	৫২০১১১৭৫৲
কাঁচা চামড়া	৮৩৩৫৬১১৫৲	৮৪৭৫৯৪৯৫৲
বীজ	৩৫৯০৭৬১০৲	৩৬২৬৯০২২৲
শস্য, কলাই, ময়দা	৬৮৫৬০৩৭০৲	৩৩৭০১১২২৲
আফিং	২০১৩৭৯৬২৲	১৭৩৪৫৮৫৲
লাক্ষা	১৯১৪৬৪১৭৲	১৫৯৪০৯৮৩৲
কাঁচা কার্পাস	২০২০১৪৭২৲	১০৬৪১৪৮৫৲
নীল	১৭৭৪৮৭৯৲	৬৯৪৪৩৯৯৲
কয়লা, কোক কয়লা	৬৯১৩৪৩৬৲	৫২৭৮৮০৩৲
কাঁচা শন	৫৬৪০৭৪৯৲	৪৬৬৭৮৯৯৲

রপ্তানি করা মালের নাম	১৯১৩-১৪ সনে কত টাকার মাল রপ্তানি হইয়াছে।	১৯১৪-১৫ সনে কত টাকার মাল রপ্তানি হইয়াছে।
ধাতু	৫৯৯৬৩৩১৲	৪১৭৪৭৮৬৲
সোরা	২৯৯৪১৮০৲	৪১৪০৭৬২৲
তৈল	২২৬৬২৩৩৲	২৩৬১৪৪২৲
অভ্র	৩৫৫১৪৮১৲	২৩০৪২৭২৲
খৈল	৪২২৭৭৭১৲	২২৭৭৮৬৫৲
সার	৩৩৪১৯১২৲	২১০৯১১৯৲
রং করিবার জিনিষ (নীল ব্যতীত)	২৮৬১৭০৭৲	২০৯৬৫১৪৲
মসল্লা	৩৭১৯৬৮৲	৯৩০৪০৫৲
পাক দেওয়া কার্পাস	৩১১৫০৫৬৲	৮২৯৯১৭৲
পশম নির্ম্মিত দ্রব্য	১৩৫৫৩৫৫৲	৭০২২২১৲
ভেষজ পদার্থ	৯১৯১৭৮৲	৬৩২৮৪৪৲
দড়ি কাছি	৬৯২৯২১৲	৬১৮৮৮০৲
কাঁচা রেশম	৯১৭১৪৮৲	৪৭৮৩০৩৲
নানা রকম মোম্	৫৫৭৯৩৪৲	৩৪৯৩২২৲
শিং	৫৬২৩৪৯৲	৩১৪৬৮২৲
পরিষ্কৃত চর্ম্ম	১১৯০৪৬৲	৩০৪৬১৯৲
তামাক	৩৭৬৪৮৭৲	২৫৮৯২৫৲
কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্র	২০২৪৩৪৲	১১১৬৭৭৲
কাঁঠ, খুটী	২৮৭৯০৩৲	১০৩৯০৮৲
কাঁচা রবার	৮০৯৬৪৲	১৭৭৬৩৲
কাঁচা পশম	৫২০৲	৬১৩০৲

বিগত বৎসর মোট যে পরিমাণ দেশীয় মাল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে তাহার মূল্য তৎপূর্ব্ব বৎসরের রপ্তানি মালের মূল্যের তুলনায় শতকরা ২৭.৬৬ টাকা কম হইয়াছে। তবেই, গত বৎসর কলিকাতার বন্দর হইতে বিদেশে যে পণ্য রপ্তানি হইয়াছে তাহাতে তৎপূর্ব্ব বৎসরের হিসাবে এক চতুর্থাংশেরও বেশী আয় কম হইয়াছে। ইয়ুরোপে যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায় এদেশের চামড়া, কার্পাস, ধাতু, কয়লা প্রভৃতি মাল রপ্তানিতে বিস্তর ক্ষতি ঘটিয়াছে। তবে, যুদ্ধের ফলে কোন কোন মালের যে রপ্তানি আবার না বাড়িয়াছে এমনও নয়; চা, নীল, সোরা, এই সকল জিনিষের রপ্তানি বরং যুদ্ধ হেতু পূর্ব্বাপেক্ষা বিস্তর পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতার কাষ্টম্ কলেক্টর-এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে বিগত বৎসর কাঁচা পাট, পাট নির্ম্মিত বস্ত্র, শস্য, ও আফিং এর রপ্তানি যে কম হইয়াছে তাহার সহিত যুদ্ধের কোন সংস্রব নাই।

বিশ্ব-বার্ত্তা

"চাহ, চাহ, মতিমান, দেখ দেখি বিশাল জগতে,
মানবের কর্ম্মধারা কত দিকে আবর্ত্তিয়া ধায়!
কত সাধ কত আশা জেগে ওঠে সাধিতে কল্যাণ!
মানুষের শক্তি লয়ে কীটসম ব্যর্থ কর তারে?
বিধাতার পুণ্যদান—দলমল হিয়া-শতদল
গন্ধ চাহে বিতরিতে, তুমি তার রুধিবে দুয়ার?
একি—একি অপমান মনুষ্যত্বে হান অবিরত!
ভুলে যাও বর্ত্তমানে, ভেঙ্গে ফেল জড়তা-শিকল
দূর ভবিষ্যতে চাহি'। ভাসে ধরা আলোক-বন্যায়—
দুয়ারে পাখীর মত, আজি তোমা ডাকি প্রাণপণে,
বাহির হবে না তুমি?"

সপ্তম খণ্ড
সপ্তম বর্ষ

ফাল্গুন, ১৩২২

পঞ্চম সংখ্যা।

আলোচনা

১। হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠান

হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন হইয়া গেল। দেশের চতুঃসীমা হইতে এ সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা উঠিতেছে। কেহ ইহার স্বপক্ষে কেহ বা বিপক্ষে মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন। সকলেই ধরিয়া লইতেছেন যে হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয় একটী সুনির্দ্দিষ্ট আদর্শ লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্বপক্ষ ও বিপক্ষবাদিগণ অনেক-স্থলেই এই আদর্শ লইয়াই আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এইরূপ আন্দোলনের একটী দোষ আছে। ইহার পর যখন কয়েক বৎসর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কাজ চলিবে, তখন দেখা যাইবে যে আদর্শ ও উদ্দেশ্যগুলি অনেক অংশে পরিবর্ত্তিত, পরিত্যক্ত বা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। সে সময় একটা কলরব উঠিবে যে হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয় আদর্শচ্যুত হইয়া

পড়িতেছে। কিন্তু এইরূপ সমালোচনা নিতান্ত অযৌক্তিক ও অবিচারপূর্ণ।

মানুষের আদর্শ স্থিতিশীল নয়। কার্য্যের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই আদর্শও বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এ কথাটী কোনও সমিতি বা সঙ্ঘের বিষয়ে বিশেষভাবে সত্য। যেখানেই একাধিক ব্যক্তির সম্মিলন সেখানেই মতভেদ অনিবার্য্য। এই মতভেদই সঙ্ঘের জীবনের লক্ষণ। কাজেই কর্ম্মের অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই আদর্শের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় যদি প্রাণবন্ত কার্য্যতৎপর জনসমূহের কার্য্য ও চিন্তার ফল হয় তবে আমরা ক্রমেই আশা করিব যে ইহার আদর্শ আশা ভরসা সমস্তই নূতন আকারে ফুটিয়া উঠিবে।

দেশের লোকের অনুষ্ঠিত কোনও একটী কাজ যদি কিছুদিনের জন্য পূর্ণ বেগে চলিতে না থাকে তবে অনেকেই "হা হতোস্মি" আরম্ভ করেন। এরূপ ব্যবহারের পরিচয় আমরা জাতীয় শিক্ষাপরিষৎদের সম্পর্কে পাইয়াছি। হয়ত এই "হা হতোস্মি"র ফলেই সমিতিবিশেষের মন্দীভূত কার্য্যক্ষমতা নিঃশেষ হইয়া আসে। কারণ বিদ্যালয় ও শিক্ষাসঙ্ঘ Bankএর মত জনসাধারণের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধায় পরিপুষ্ট। Bankএর উপর লোকে সন্দিহান হইলে যেমন Bank ফেল পড়িতে পারে, বিদ্যালয় প্রভৃতিরও সেইরূপ দশা হইতে পারে। কাজেই সময় অসময়ে সম্যক বিবেচনা না করিয়া অযথা একটা অবিশ্বাসের ছায়া কোনও একটা সমিতি বা সঙ্ঘের উপর ফেলাটা নিতান্তই অনিষ্টজনক।

আমরা জনসাধারণের অনুষ্ঠিত শিক্ষাসঙ্ঘের পরিচয় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে পাইয়াছি। এখন হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠাতৃগণের উচিত এই যে তাঁহারা জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পথে যে যে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে যে যে কারণে পরিষদের কার্য্য-পরিসর সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে তাহা সম্যক্ অবধারণ পূর্ব্বক তদনুসারে নিজেদের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করেন।

২। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও হিন্দুত্ব

একটা কথা উঠিয়াছে যে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দুত্বের প্রকাশ বিশেষ। এই হিন্দুত্বের অর্থ কি একথাটা কেহ স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। অনেকের মনের ধারণা এই যে শাস্ত্রাদির অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের বন্দোবস্ত করিয়া হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্বনামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারিবে। অনেকে আবার মনে করেন যে সকল শিক্ষার সহিত হিন্দুধর্ম্মের সামঞ্জস্য বিধান ও সকল বিষয়ের মধ্যে হিন্দু-ধর্ম্মের বিশেষত্বের অনুভূতি সাধন করিতে পারিলেই হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠান সার্থক হইবে। অপর একদল আছেন তাঁহাদের ধারণা যে ভারতের প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা ও নানা বিষয়ে হিন্দু জাতির পুরাতন গৌরব-স্মৃতির পুনরুজ্জীবন—ইহাই হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। অর্থাৎ হিন্দু culture এর আলোচনাই হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বিশেষত্ব হইবে। আমাদের মতে এ সকল মতের প্রত্যেকটীই অতিশয় সঙ্কীর্ণ। এ ভাবে দেখিলে হিন্দু-বিশ্ব-বিদ্যালয়কে অত্যন্ত খাটো করিয়া দেখা হয়।

হিন্দু cultureএর অনুশীলন বা হিন্দু ধর্ম্ম-সাহিত্য অধ্যয়ন যে কোনও বিদ্যালয়ে চলিতে পারে। ভারতবর্ষের বাহিরেও অনেকস্থলে

এ কাজ বিশেষ যত্নের সহিত অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইহার জন্য ভারতে একটা নূতন বিদ্যালয় এত ধূমধাম করিয়া স্থাপন করিবার কোনও প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু নব স্থাপিত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য কেবল উল্লিখিত বিষয়গুলিতেই আবদ্ধ নহে; যদি হইত, তবে বিদ্যালয়ে পাশ্চাত্য বিদ্যানুশীলনের কোনও বিশেষ অর্থ থাকিত না। হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়কে সার্থকনামা করিতে হইলে ইহাকে নূতন হিন্দুধর্ম্মের উৎস ও প্রতিষ্ঠানভূমি রূপে পূজা করিতে হইবে। মনে করিতে হইবে যে এই বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে হিন্দু ধর্ম্মে নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হইবে। যেমন পুরাকালের আরণ্য বিদ্যালয় হইতে আর্য্য ধর্ম্মের নানামুখী স্রোত সমগ্র ভারতকে প্লাবিত করিয়াছিল যেমন দ্রষ্টৃগণের জ্ঞানোজ্জ্বল দৃষ্টিতে জীবনের প্রতি তুচ্ছ অংশ, উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল আজ হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিকট হইতেও ভারত সেইরূপ নানামুখী চিন্তার স্রোত, সেইরূপ নির্ব্বিকৃত চিত্তের জ্ঞানধারা প্রত্যাশা করে। হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয় কেবল প্রত্নরত্নের কোষাগার নহে, ইহা হিন্দুত্বের নূতন জীবনের উৎস। এই জন্যই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার সকল বিষয়গুলিই হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আলোচ্য বিষয়ীভূত হইয়াছে। যে হিন্দুত্ব আজ ভারত প্রত্যাশা করিয়া আছে তাহা কেবল একটা শাস্ত্রগত সূত্র নহে। নব হিন্দুত্ব একটী জীবনের ধারা। আমাদের সমাজের প্রত্যেক বিভাগে এই হিন্দুত্ব নূতন প্রেরণা নূতন সৃষ্টি আনয়ন করিবে। এই হিন্দুত্ব হিন্দুকে জগতের মধ্যে কেবল একটা ব্যতিরেক বা Exception করিয়া ঘিরিয়া রাখিবে না। এই নূতন জীবন-ধারার স্রোত বিশ্ব-মানব-সাগরের মধ্যে যাইয়া পড়িবে ও এই জীবনের প্রেরণায় হিন্দু পৃথিবীর সকল জাতির সকল ধর্ম্মের সঙ্গে বুঝা পড়া করিয়া লইবে—সকলের সমক্ষে নির্ভয়ে নিজের ব্যক্তিত্ব প্রমাণ করিতে দণ্ডায়মান হইবে। যদি হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয় এইরূপ একটী নূতন জীবনের ধারা সৃষ্টি করিতে পারে, যদি অচলতার মধ্যে নিজেকে হারাইয়া না ফেলে, তবেই হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নাম সার্থক হইবে।

* *

৩। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও হিন্দুর ঐক্য

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠান উৎসবে ভারতের নানা প্রদেশের প্রতিনিধিসমূহ সমবেত হইয়াছিলেন। করদভূপতি বৃন্দ, শিক্ষানায়কগণ ও উচ্চ রাজকর্ম্মচারির দল ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ হইতে বারাণসীতে একত্র হইয়াছিলেন। এই ব্যাপার হইতে অনেকে বলিবেন যে বিশ্ববিদ্যালয়টীর মূলে একটী একতা, একটা fundamental unity রহিয়াছে। কাজেই মনে হইতে পারে যে বিদ্যালয় সঙ্ঘের কর্ম্মের গতি প্রতিহত হইবে সে সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যে ঐকমত্য কাজের আরম্ভে বিদ্যমান থাকে তাহার উপর নির্ভর করা—অযৌক্তিক। কোনও কাজেই প্রথমের ঐক্য বজায় থাকে না। এটী কেবল ভাবের ঐক্য—জ্ঞানের ঐক্য নয়। সংসারের শত বিঘ্নের প্রতিঘাতে স্বার্থের বিরোধে নিরন্তরই ভাবের ঐক্য ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। কঠোর সত্যের আঘাত সহ্য করিতে পারে এরূপ ভাব ও ভাবুক অতি বিরল। কাজেই কর্ম্মের অনুষ্ঠানের পর নানারূপ বিরোধের মধ্য দিয়া যে একতার ভিত্তি স্থাপিত হয় তাহাই প্রকৃত একতা।

এই নিয়ম যে আমরা কেবল ব্যক্তি-সঙ্ঘের কার্য্যে দেখিতে পাই তাহা নহে। জাতি গঠনেও এই নিয়মেরই উদাহরণ দেখা যাইতেছে। জার্ম্মাণী ও আমেরিকা এ বিষয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এই দুই দেশেই কতকগুলি প্রদেশের সংযোগের ফল। এই সংযোগ-সাধন একদিনে হয় নাই। আমেরিকা যখন স্বাধীনতার যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন বিভিন্ন states গুলির একটা ঐক্য ছিল বটে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতেই আবার বিরুদ্ধ মত জাগিয়া উঠিল। War of Independence হইতে Civil War এর পর পর্য্যন্ত এই প্রায় একশত বর্ষ ব্যাপিয়া যুক্তরাজ্যে একতা প্রতিষ্ঠিত হইল। Germanyতেও সেই zolleverein এর দিন হইতে ১৮৭০ এর পর পর্য্যন্ত রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে ঐক্যের আদর্শ প্রচার করিতে হইয়াছে। এইরূপে ঐকমত্য স্থাপন বিরোধের মধ্য দিয়া বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াই সম্ভব। কাজেই হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েও আমরা এই নিয়মের ব্যতিক্রম আশা করিতে পারি না। আজকাল জননায়কগণ একভাবের ভাবুক হইয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাই বলিয়া তাঁহাদের যে মতদ্বৈধ হইবে না তাহা নয়। অনেক বিরোধ হইবে, অনেক দলাদলি হইবে। আমরা যদি তাহা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ লইয়া অগ্রসর হইতে পারি, যদি বিরোধ সত্ত্বেও আদর্শ সৃষ্টির পথে চলিতে পারি তবেই ঐক্য স্থাপন সম্ভব।

* *

৪। বঙ্গসাহিত্যে দুর্ব্বলতা

বহুদিন পূর্ব্বে আমরা বঙ্গসাহিত্যে কাঠিন্য ধর্ম্ম কামনা করিয়া কতকগুলি কথা বলিয়াছিলাম। দেখিতেছি মাঘের নব্যভারতে 'বঙ্গসাহিত্যে কলঙ্করেখা' নামক প্রবন্ধেও অনেকটা সেই ধরণের কথা বলা হইয়াছে। লেখক বলেন "বর্ত্তমান যুগের বঙ্গ সাহিত্য পড়িয়া মনে হয়, বঙ্গ সাহিত্য বুঝি কোন মেরুদণ্ডহীন ভাবসর্ব্বস্ব মধুলেহী জাতির প্রেম গুঞ্জন। পাশ্চাত্য দেশের ছায়াবলম্বনে গঠিত হইলেও বঙ্গ সাহিত্যে কর্ম্মনিপুণতা, দৃঢ়তা, স্থির-প্রতিজ্ঞতা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণের আদর্শ আমরা দেখিতে পাই না। নায়িকার প্রেম বিহ্বল আত্মহারা নায়ক নিজ সুখ দুঃখের আবর্ত্তে ভ্রান্ত। প্রেম কর্ম্মশক্তিতে ঘৃতাহুতি অর্পণ করিয়া কর্ম্মকুশলতা দ্বিগুণ বাড়াইয়া দেয়! পুষ্প অপেক্ষাও কোমল হইলেও স্থান বিশেষে প্রেম বজ্র অপেক্ষাও কঠিন। শত সহস্র বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পরস্পরের ঈপ্সিত কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রেমের সাফল্য। ভবভূতি উত্তর রামচরিতে রামচন্দ্রের প্রেমপূর্ণ চিত্তকে লক্ষ্য করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি। লোকোত্তরাণাং চেতাংশি কো বা বিজ্ঞাতুমর্হসি।" বাস্তবিক প্রেমের এই কঠোর এবং মৃদু মধুরমূর্ত্তি একান্ত স্বাভাবিক; কিন্তু বর্ত্তমান সাহিত্যে আমরা প্রেমের কঠোর এবং অরিন্দমমূর্ত্তি দেখিতে পাই না। যে উৎকট কর্ম্মাকাঙ্ক্ষা সমগ্র জাতীয় জীবনের জীবনীস্বরূপ, যাহার ক্ষণিক স্ফুরণে ক্ষণপ্রভার হাস্যের ন্যায় ভূলোক এবং দ্যুলোক চমকিত করিয়া থাকে; বঙ্গ সাহিত্যে তাহার স্বরূপ আমরা দেখিতে পাই না।"

কিন্তু সাহিত্যের এই দুর্ব্বলতা লেখক কেবল সাহিত্যিকদিগের ঘাড়েই চাপাইয়াছেন, আমাদের মনে হয় সাহিত্যিকদিগের দোষেই যে এইরূপ হইয়া থাকে, তাহা নহে, ইহার জন্য বাঙ্গালী সমাজই দায়ী। বাঙ্গালীর কর্ম্মক্ষেত্র ও

জাতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমরা যাহা বলিয়াছিলাম তাহা হইতে কিঞ্চিৎ তুলিয়া দিয়াই এই কথাটা পরিষ্কার করিতেছি,— "তোমরা যদি বাঙ্গালা সাহিত্যকে বড় করিতে চাও, তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতিকে বড় করিয়া তোল। বাঙ্গালা ভাষার ভিতর দিয়া যদি সকল ভাব প্রকাশ করিতে চাও, সকল কথা বলিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে বাঙ্গালার সমাজকে সকল বিষয়ে গৌরবান্বিত করিতে চেষ্টা কর, বাঙ্গালার লোকগুলিকে দূরদর্শী, প্রশস্তহৃদয় ও চরিত্রবান্ করিবার আয়োজন কর। যদি বাঙ্গালীর সাহিত্যকে বিশাল ও বিপুল বিস্তৃত দেখিতে চাও, তাহা হইলে নানা উপায়ে বাঙ্গালা দেশটাকে মানব-সমাজে পূজ্য বরেণ্য মহনীয় করিয়া তোল। বাঙ্গালীর কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত হউক, বাঙ্গালীর চিন্তারাজ্য বাড়িয়া উঠুক, তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতির সাহিত্য মানবজাতির সারস্বতক্ষেত্রে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। বাঙ্গালার সমাজ হইতে ক্ষুদ্র কথা, তুচ্ছ কথা, স্বার্থের কথা, নীচাশয়তার কথা দূর করিয়া দাও। তাহার পরিবর্ত্তে অসাধারণ চিন্তা, অসামান্য আলোচনা, অনন্ত কর্ম্মের কথা, অসাধ্য সাধনের প্রচেষ্টা, অসীম প্রেম ও অফুরন্ত জ্ঞানের কথা বাঙ্গালার জনগণের হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে স্থান পাউক। বাঙ্গালার জেলায় জেলায় পঞ্চনদের কথা, মহারাষ্ট্রের কথা, দ্রাবিড়ের কথা, সিংহলের কথা আলোচিত হউক। পঞ্চনদের জেলায় জেলায়, দ্রাবিড়ের অঞ্চলে অঞ্চলে, সিংহলের নগরে নগরে বাঙ্গালার অনুষ্ঠান, বাঙ্গালার প্রতিষ্ঠান, বাঙ্গালার ইতিহাস-কথা, বাঙ্গালীর শিল্পনৈপুণ্য, বাঙ্গালীর কাজকর্ম্ম আলোচিত হউক। বাঙ্গালার বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে চীনের সাহিত্য, জাপানের শিল্প, আমেরিকার ব্যবসায়, ইউরোপের রাষ্ট্র বাঙ্গালী শিশু ও যুবকের প্রতিদিনকার শিক্ষণীয় বিষয় হউক। চীন-জাপানের বিদ্যামন্দিরে, বার্লিন হার্ভার্ড কেম্ব্রিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালীর ধর্ম্ম, বাঙ্গালীর সমাজ, বাঙ্গালীর রীতিনীতি বিভিন্ন দেশবাসীর পাঠ্য তালিকায় সন্নিবিষ্ট হউক। বাঙ্গালী দুঃসাধ্য কর্ম্ম আরম্ভ করুক, অসম্ভব সাধনায় নিযুক্ত হউক, বাঙ্গালী তাহার কর্ম্ম-রাজ্য বিস্তৃত করুক, বিশাল জগৎকে তাহার চিন্তার আয়ত্ত করুক, তাহা হইলে বাঙ্গালার সাহিত্য-সম্মিলনগুলি সার্থক হইবে।"

৫। কৃষি-সমস্যা

"বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ॥"

এই কথা অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কার্য্যতঃ আমাদের দেশে ভদ্র-লোকে কৃষিকার্য্যকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। ঐ কার্য্য যে ভদ্রলোকের উপযুক্ত হইতে পারে তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না। পনের টাকা বেতনে পরের কার্য্যে ভদ্রসন্তান দ্বাদশ ঘণ্টা পরিশ্রম করিবে তথাপি কৃষি-কার্য্যে মন দিতে পারিবে না।

ভদ্রলোকের কৃষি-কার্য্যে অবহেলার জন্য আমাদের সমাজ অনেকটা দায়ী। বাল্যকাল হইতে আমরা ঐ কার্য্যকে ঘৃণা করিতে শিখি। "লেখাপড়া শেখ নয়ত চাষ করে খেতে হবে" বাল্যকালে গুরুজনের এই তাড়না আজীবন মনে থাকে।

আমরা পরিশ্রমের মর্য্যাদা জানিনা। শারীরিক পরিশ্রম মাত্রকেই নিন্দার কার্য্য বিবেচনা করি। শ্রমজীবী লোক ভদ্র-সম্প্রদায় বহির্ভূত এইরূপ আমাদের ধারণা।

অন্যান্য সভ্যদেশে শ্রমজীবি-সম্প্রদায়কে সমাজের নিম্নস্থানে পড়িয়া থাকিতে হয় না ইংলণ্ডে এই সম্প্রদায় (Labour Party) রাজ্যের একটী প্রধান অঙ্গ। গবর্ণমেণ্টকে এই দলের মতামত মানিয়া চলিতে হয়।

হাউস অফ্ কমন্স (House of commons) নামক মহাসভায় শ্রমজীবিদলের নেতারা সভ্যপদ পাইয়া থাকেন। শ্রম মর্য্যাদা জ্ঞানের অভাব বশতঃই আমরা কৃষি-কার্য্যকে ঘৃণা করি। ইহাতে যে শারীরিক পরিশ্রম ব্যতীত বিদ্যা বা বুদ্ধির বিশেষ আবশ্যক ইহা আমরা ভাবি না।

অতি প্রাচীনকালে আমাদের দেশে কৃষি-কার্য্যকে কেহ ঘৃণা করিত না। কোন কোন পণ্ডিত আর্য্য শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে অনুমান করেন যে যাঁহারা ভূমিকর্ষণ করিতেন তাঁহারাই আর্য্য নামে অভিহিত হন। রামায়ণে আমরা পাঠ করি যে রাজা জনক যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিবার সময় সীতাদেবীকে পাইয়াছিলেন।

কৃষি-কার্য্যে ভদ্রলোকের অনাসক্তির জন্য দেশে বিষম অপকার হইতেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশে উদ্ভিদ্ বিদ্যার গভীর গবেষণা হইতেছে, নব নব আবিষ্কৃত যন্ত্র দ্বারা কৃষি-কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে কিন্তু আমাদের দেশে বিংশতি-পুরুষ-পরম্পরা-প্রচলিত সেই হল ও কোদালি আজও প্রধান যন্ত্র। অন্যান্য দেশে বিবিধ প্রকার সার প্রয়োগে জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করা হইতেছে আর আমাদের দেশে প্রকৃতিপ্রদত্ত উর্ব্বরতা ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। আমরা যাহাদের হস্তে চাষের ভার রাখিয়া নিশ্চিন্ত আছি তাহাদের প্রত্যহ দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইবার সংস্থান নাই, উপযুক্ত পরিধেয় বস্ত্র কিনিবার উপায় নাই। কোন্ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পাইবে এ জ্ঞান ত দূরের কথা, বর্ণমালার সহিত পরিচয় পাইবার অবসর তাহারা পায় না। অতিবৃষ্টি হইলে দেশে জল নিকাশের ভাল বন্দোবস্ত নাই, অনাবৃষ্টি হইলে জল দিবার আয়োজন সর্ব্বত্র নাই।

এই সম্বন্ধে স্বর্গীয় মহাত্মা গোখ্লে কোন বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,—

"The exhaustion of the soil is fast proceeding, the cropping is becoming more and more inferior and the crop-yield per acre already the lowest in the world is declining still further." অর্থাৎ ভারতবর্ষে জমির উর্ব্বরতা শীঘ্র শীঘ্র হ্রাস পাইতেছে। দিন দিন ফসল অধিক খারাপ হইতেছে। পৃথিবীর সকল দেশ অপেক্ষা আমাদের দেশে প্রতি একারে কম পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয়। ঐ পরিমাণ আরও কমিয়া যাইতেছে।

অধ্যাপক যদুনাথ সরকার তাঁহার Economics of British India নামক পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে ভারতবর্ষে প্রতি একারে মাত্র ১৩ বুশেল গম উৎপন্ন হয় কিন্তু ঠিক ঐ পরিমাণ জমিতে ক্যানাডায় ২২ বুশেল ও গ্রেটবিটনে ৩২ বুশেল গম হইয়া থাকে।

আমরা বিদ্যার কার্য্যকরী শক্তি প্রয়োগ করিতে জানি না। গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত কৃষিবিদ্যালয় খুলিয়াছেন সেখানে উপযুক্ত ছাত্র পাওয়া যাইতেছে না এইরূপ অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায়। যে সকল ছাত্র সেখানে শিক্ষালাভ করিতে যায় তাহাদের চাকরীর অনুসন্ধানই মুখ্য উদ্দেশ্য। মাননীয় মিষ্টার লি গত বিহার শিল্প সমিতির অধিবেশনে

এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"Institutions which provide an agricultural training in England and elsewhere have as students, the sons of landowners who wish to be suitably trained for the profession they intend to follow. In India most of the students are attracted to agricultural colleges for some government appointment and with no expectation of making use of their training in conducting agricultural operation অর্থাৎ ইংলণ্ডে ও অন্যান্য দেশে যে সমস্ত বিদ্যালয়ে কৃষি শিক্ষা দেওয়া হয় সেইখানে উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়া স্বতন্ত্র ব্যবসা করিবার জন্যই জমিদারের ছেলেরা যোগ দিয়া থাকে, কিন্তু ভারতবর্ষে অধিকাংশ ছাত্রই সরকারের অধীনে কর্ম্ম পাইবার জন্য কৃষি বিদ্যালয়ে যোগ দেয়।

মিষ্টার উল্ফ তাঁহার People's Banks নামক পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে ভারতবর্ষে কৃষি কার্য্যের বিবিধ সুবিধা সত্ত্বেও এ বিষয়ে উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায় না। সার না দিলেও এখানকার জমিতে প্রায় অন্যান্য দেশের সার দেওয়া জমির ন্যায় ফসল উৎপন্ন হয়। এ দেশে ভূমির যে উর্ব্বরতা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে আজ পর্য্যন্ত তাহার বিকাশের বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয় নাই।

মস্তিষ্ক ও অর্থের সাহায্য ব্যতীত কৃষি কার্য্যের উন্নতি অসম্ভব। শিক্ষিত ও ধনবান লোকের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইলে সোনার ভারতে প্রকৃতই সোনা ফলিবে।

৬। আমাদের ভবিষ্যৎ

আমাদের এটা ধারণা হইয়াছে এবং যথার্থ উপলব্ধিও করিয়াছি যে, কলকারখানার দ্বারা ভোগের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে যাইয়াই, স্বার্থে স্বার্থে সংঘর্ষণে ইউরোপে এই বিরাট অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। ইউরোপ ভোগের রাজ্যে বাস করিতেছে সত্য, কিন্তু আমাদের কথা ভাবিতে গেলেও নিতান্ত সহজ বলিয়া মনে হয় না। আমরা ইউরোপীয় ভাবে এতটা মোহিত হইয়াছি যে তাহা ছাড়া জীবন ধারণ করা কষ্টকর বলিয়া মনে করি। আমাদের এখনও ভোগের মাত্রা পূর্ণ হয় নাই। যদি আমাদের সমাজ প্রকৃতই ইউরোপীয় সভ্যতায় অভিভূত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের অবস্থা কি হইবে? ইউরোপীয় রাজন্যবৃন্দ এখন ক্ষাত্রশক্তির উপাসক। তাঁহারা সম্পূর্ণ তামসিক ভাব ছাড়াইতে না পারিলেও, রাজসিক ভাবে ভরপুর হইয়া জীবনের গতি পরিবর্ত্তনের জন্য ফিরিয়াছেন। এই যুদ্ধের দ্বারা, এই যুদ্ধের পর সম্পূর্ণ ভাবে না হউক কতকাংশে, ইউরোপীয়েরা নূতনভাবে দেখা দিবেন বলিয়া ধারণা হয়। তখন হয়ত ইউরোপের সাত্বিকভাবের বিকাশ অথবা নবযুগ আরম্ভ হইবে। আমরা তামসিকতাকে পবিত্র সাত্বিকতার নামে চালাইতেছি, উহাই আমাদের জাতীয় অনিষ্টের এক মহা কারণ। তামসিকভাব আমাদিগকে এতদূরে লইয়া গিয়াছে যে, আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না ভোগে বিপুল উদ্যমের প্রয়োজন হয় এবং সে উদ্যম জীবন-সংগ্রামে প্রকৃত চরিত্র পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করে।

সংসারে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, অল্প বিস্তর ভাবে ভোগের প্রয়োজন আছেই।

সেই ভোগকে যিনি নিজের ইচ্ছাধীন করিতে পারিবেন, তিনিই সত্ত্বরাজ্যে আগে পৌছিতে পারিবেন।

তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি আমাদের জাতীয় আদব্ কায়দা এখন ইউরোপীয় ভাবে মুগ্ধ, এবং আমরা এমন অবস্থায় পৌছিয়াছি যেখানে সত্ত্বরজের কোন চিহ্নই দেখা যাইতেছে না। আমরা দুই শিংয়ের মাঝখানে এমন জায়গায় দণ্ডায়মান যেখানে ইউরোপীয় কলকব্জার দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়াছি, ভোগে আকৃষ্ট হইয়াছি, কিন্তু ভোগ করিতে যে সুদৃঢ় অধ্যবসায় আবশ্যক, তাহা আয়ত্ত করিতে পারি নাই।

আমাদের ভোগ এখন তামসিক কিন্তু ইহাতে রাজসিক ভাব না আনিলে ভোগেরও পরিপূর্ণতা হইবে না, সত্ত্বেরও কোন সন্ধান মিলিবে না। ভোগের রাজসিকতা যে কেবল সামরিকতার মধ্য দিয়াই ফুটিয়া উঠে, ইহা কেহ মনে করিবেন না। উদ্যমেই রাজসিকতার সূচনা, তাই আমাদের নাই এবং সেই জন্যই ভোগেও আমরা বিড়ম্বিত হইতেছি।

লোক রাজসিক অবস্থায় প্রবেশ না করিলে সত্ত্বরাজ্যে পৌছিতে পারে না। ইউরোপের ক্ষাত্রবীর্য্য বহ্নি নির্ব্বাপিত হইলে আমাদের তমসাচ্ছন্ন সমাজেও একটা পরিবর্ত্তন আসিতে পারে। বিংশশতাব্দী মানবজাতির পরিবর্ত্তনের চিত্র লইয়াই দেখা দিয়াছে। এই যুগে পরিবর্ত্তন এত বেশী হইতেছে, তাহার কারণ লোক কোনটা ছাড়িয়া কোনটা ধরিবে কোন্ পথে যাইয়া শান্তি পাইবে তাহার পথ পাইতেছে না। মানবজাতি চির শান্তির জন্য ব্যগ্র বলিয়াই তাহাকে দৈন্য দুর্দ্দশার চক্রে বারংবার প্রতিহত হইয়াও আপনার পথ বাহির করিয়া লইতে হয়। শান্তি পাইবার জন্যই ইউরোপীয় জাতি নিচয় আপনাকে বড় করিয়া আপন আপন শক্তি বুঝিয়া সমরে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছেন—তাই আজ তাঁহারা মহাপ্রস্থানের পূর্ব্ব আয়োজন করিতেছেন। লোক ক্রমেই যেন শূন্যবাদের পাঁকে পড়িতেছে। এত বিদ্যা, এত যুক্তি, অসীম ক্ষমতা, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও তাঁহারা শান্তির রাজ্য খুঁজিয়া পাইতেছেন না। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ভগবানের মহিমা, জাতির গৌরব, আবিষ্কারকের পাণ্ডিত্য শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে পারে কিন্তু তাহার একমাত্র লক্ষ্য শান্তির দিকেই।

ইউরোপের এই যুদ্ধের দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসের অধ্যায় বৃদ্ধি এবং ভৌগলিক বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে। তাই দেখিতেছি ইউরোপীয় যুদ্ধের দ্বারা আমাদের সমাজেও নূতন রকমের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী এবং সেই পরিবর্ত্তনের মুহূর্ত্তে আমরা শুনিতে পাইব। "আমি নূতন নহি আমি পুরাতন আমি শুধু সেই বাক্যমাত্র।" যত দিন আমরাও একটা নূতন আশ্রয় পাই না ততদিন আমাদিগকেও শান্তির জন্য হাবুডুবু খাইতে হইবে।

* *
*

৭। স্বদেশীর অদূরদর্শিতা

ভগবানের চক্রে কা'র ভাগ্য কি ভাবে ঘুরিতেছে কে বুঝিতে পারে। তবুও মানুষ কতকটা উপলব্ধি করিতে পারে বলিয়াই সে তাঁহার শ্রেষ্ঠ সন্তান, এবং সময় বুঝিয়া মানুষের মধ্যেই অবতার বা আদর্শপুরুষ সমাজের নায়করূপে দেখা দেন। নায়কবিহীন সমাজ চলিতে পারে না। যেমন তেমন হইলেও একজন নায়ক চাইই।

আমরা সম্প্রতি জীবনধারণের এমনাবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, যেখানে চারিদিকেই শুধু অভাবের বিভিন্ন মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি—জটিল সমস্যা বর্ত্তমান। চারিদিকের ভীষণ সমস্যার মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া নিত্যব্যবহার্য্য কাগজ পেন্সিলের এতটা অভাব বোধ করিতেছি তাহা এই লেখনী সঞ্চালিত দেশে বেশী বলা অনাবশ্যক। প্রথমেই আমরা কোন জিনিষের অভাব বোধ করি নাই; কারণ জিনিষ দুষ্প্রাপ্য হইলেই মূল্য বৃদ্ধি হয়, পরে তাহার অভাব বোধ করি। আমরা তালপাতাতে লেখা পুঁথির হাত হইতে রক্ষা পাইয়া সভ্যতার সোপানে পদার্পণ করিতে না করিতেই তথা হইতে চ্যুত হইয়া পড়িতেছি। এ পতন হইতে রক্ষা পাওয়াও সহজ কথা নহে। কাগজ, পেন্সিল কালির অভাবে যদি লেখা পড়া ছাড়িতে হয়, তাহা হইলে পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

আবার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবেই। ব্রিটেনিয়া ও জার্ম্মাণীর সুলভপণ্য ব্যবহার করিবার সুযোগ আমরা আবার লাভ করিব; কিন্তু যদি যুদ্ধ আরও ২।৩ বৎসর চলে তাহা হইলে আমাদের অবস্থা কি হইবে এখনই যেন সে আতঙ্ক আসিতেছে। কিছুদিন যে শিল্প প্রতিষ্ঠানের আন্দোলন করিয়াছিলাম তাহাতে নিরাশ হইয়াও যেন নিবৃত্ত হইতে পারিতেছি না। যাহা অবশ্য প্রয়োজনীয়, যাহার অভাবে প্রাণের ভাব ফুটিয়া বাহির হয়, তাহাকে চাপিয়া রাখা যায় কতক্ষণ!

তাই ভাবিতেছি—এগার বৎসর পূর্ব্বে আমরা যে 'বয়কট' বা বিদেশী বর্জ্জন করিয়াছিলাম, সেটা কি ব্রিটেনিয়া বা জার্ম্মাণীর কাঁচামাল (Raw material) পাওয়া যাইবে এই ভাবিয়া? তাহা না হইলে আমাদের যাঁহারা নায়ক তাঁহারা ইহার ব্যবস্থা করেন নাই কেন? তাঁহারা ভাবেন নাই কেন যে জার্ম্মাণী ও ইংলণ্ডের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে আমাদের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইবে? আমরা পণ্য সম্বন্ধে ইউরোপের ছোট বড় সকল দেশের কাছেই ঋণী। বহুদিন হইতেই শিক্ষিত-সম্প্রদায় জানিতেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিদ্বয় ইহারাই এবং ইহাদের মধ্যে একটা সংঘর্ষণ উপস্থিত হইবে, তবে এতটা গড়াইবে এটা বোধ হয় ধারণা ছিল না। এই যুদ্ধের ছোটখাট ভূমিকা ইতঃপূর্ব্বে অনেকবারই দেখিয়াছি। এখন "রাজায় রাজায় লড়াই হয় উলু খড়োর প্রাণ যায়।" এই এগার বৎসর লিখিয়া পড়িয়া নানাভাবে লোকমতকে খণ্ডন করিয়া কাটাইয়াছি, আর যে কয়দিন যুদ্ধ চলে হা-হুতাশে কাটাইলেই বেশ শান্তি লাভ করা যাইবে!

আমরা নবীন উদ্যমে নবীনভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া স্বদেশীর পূজা করিয়াছিলাম। কিন্তু আমরা মন্ত্রপাঠ করিতেছিলাম সন্দিগ্ধ চিত্তে। যাঁহারা পুরোহিত ছিলেন তাঁহারা ঠিক মন্ত্রোচ্চারণ করিতে পারেন নাই। তাই আজ আমরা কোথায় সফলকাম হইব, আর কোথায় দূরে অতিদূরে বিফলতারদিকে সরিয়া যাইতেছি। আমরা ভারতের সাগরোপকূলে দাঁড়াইয়া বিদেশী দ্রব্যের আমদানী রপ্তানি নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। এক পা ছিল ডাঙ্গায়, অন্য পা ছিল জলে। আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, "দেশী জিনিষ পাইলে বিদেশী জিনিষ লইব না।" দেশী জিনিষ পাইবার উপায় করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করি নাই। যদি সেই সময় হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতাম তাহা হইলে আজ ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদিগের কৃপাকণার ভিখারী হইতাম না।

যুদ্ধ থামিয়া গেলে সন্ধির সঙ্গে সঙ্গেই গোলাগুলির পরিবর্ত্তে আবার বাণিজ্যার্থ দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইবে; কিন্তু আমাদের জোর করিবার মত আর কিছু রহিবে না। যদি কেহ এখনও বলেন এই দেড়শত বৎ-সরের লুপ্ত বাণিজ্য-শিল্পের পুনরুদ্ধার করিতে আরো দীর্ঘকালের প্রয়োজন। আমরা বলিব—আমাদের সর্ব্বনাশিনী ভ্রান্তি-ধারণাই সকল পতনের—এই মূঢ়তার কারণ। বিগত এগার বৎসরের মধ্যে আমাদের বাণিজ্য-সত্তার পুনরুজ্জীবিত না হইলেও নিজেকে গুছাইয়া লইবার মত সাজ সরঞ্জাম জোগাড় করিতে পারিতাম। আমরা এখন যে ধাক্কা পাইব তাহা সাম্‌লাইতে যে কতকাল যাইবে তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। "এ জাতির মাথার উপরে করে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি।" বাঁচিয়া থাকিব বটে কিন্তু আধমরার মত। তবে কি আমাদের আর কোন আশাই নাই? আমাদের সমাজে কি তবে নায়কের মত নায়ক নাই?

* *
*

৮। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক শিক্ষাদান

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক শিক্ষাদানের প্রস্তাব চলিতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ সৈন্যগঠন করিবার নিমিত্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। আগামী জুনমাসের মধ্যে কর্ম্ম-চারী তৈয়ার করা অসম্ভব, কাজেই প্রস্তাবিত নিয়মানুসারে যতদূর সম্ভব কাজ চলিতে থাকিবে। ইহার দ্বারা সাধারণের মধ্যে সৈনিক বৃত্তি জাগ্রত হইবে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ অভিজ্ঞতার মাত্রা বুঝিতে পারিবে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে কয়েকটী নিয়মাবলী প্রকাশিত হইয়াছে আমরা তাহাই সাধারণকে দেখাইতেছি।

১। সৈন্যদিগকে দলবিভাগ হইয়া সপ্তাহে দুই ঘণ্টাকাল ড্রিল্ করিতে হইবে। শীত কালে হিমেনওয়ে জিমন্যাসিয়াম বা বেস্‌বল্ কেজ্ (Hemenway gymnasium or Baseball Cage) এর ভিতরে ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া কাজ করিতে হইবে। বায়ু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ড্রিলের সময় কমাইয়া অন্য কাজ করিতে হইবে। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে দলবদ্ধ সৈনিক-দিগের ছোট খাট রকমের রণকৌশলের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হইবে। প্রত্যূষে ৭—৯টা এবং বিকালে ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত ড্রিলের সময় নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। সুতরাং সামরিক সভ্যগণ নিজেদের সুবিধা বুঝিয়া ড্রিলের সময় ও দিন ঠিক করিয়া লইতে পারিবেন। কোন একজন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সৈনিক কর্ম্মচারীর উপর ড্রিল করাইবার ভার দেওয়া হইবে।

২। সৈনিক বিভাগের প্রত্যেক সভ্যকে প্লাট্‌স্‌বার্গ (Plattsburg) এ সৈনিক সমিতি দ্বারা পরিচালিত সংবাদ-বিভাগের সভ্য হইতে হইবে। প্রতিমাসের মানচিত্র ও রণসমস্যা মীমাংসা করাই এই বিভাগের কাজ। সংবাদ মাত্রেরই উত্তর সামরিক বিভাগে প্রেরিত হইবে। যদি সেখানে উহার বিষম ভ্রমপ্রমাদ লক্ষিত হয় বা আরও কিছু বিশেষ জ্ঞাতব্য থাকে তাহা হইলে উহার সদুত্তর পরবর্ত্তী সমস্যাপ্রেরণের সময় পাঠাইতে হইবে।

৩। কেম্ব্রিজের কোন স্থানে সাব কেলিবার রাইফল্ (Sub-calibre Rifles) বন্দুক দ্বারা বন্দুক শিক্ষার বন্দোবস্ত হইবে। অথবা নিকট বর্ত্তী কোন সেনানিবাসের নিকট স্থান লওয়া হইবে। প্রচুর পরিমাণ বন্দুক সংগৃহীত হইয়াছে।

৪। প্রত্যেক ব্যক্তিকে বৎসরের শেষার্দ্ধে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ব্বাচিত,সমর-বিজ্ঞান পড়িতে হইবে। সমরবিভাগের কার্য্যপ্রণালীর এরূপ বন্দোবস্ত হইবে, যাহাতে কলেজের অন্য কোন শিক্ষার ব্যাঘাত না হয়। সমর বিভাগে শিক্ষা-দানের ভার বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের উপর ন্যস্ত হইবে। রণবিজ্ঞানও এই পাঠ্যপ্রণালীর সহিত সন্নিবেশিত হইবে। যাহারা কোন একটী সৈনিক শিবিরে বা তদনুরূপ অন্য কোন সামরিক শিক্ষাশ্রেণীতে যোগদান করিবে তাহারাই শুধু সামরিক উপাধি পাইবে।

৫। সময়ে সময়ে আমেরিকার সামরিক ইতিহাস ও বর্ত্তমান সেনা সন্নিবেশ প্রণালী এবং অন্যান্য বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় সকল বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইবে।

৬। অন্যান্য সময়ে সামরিক পরিচ্ছদের কোন প্রয়োজন নাই; কিন্তু সকলকেই নিজের জন্য একটি করিয়া সামরিক পরিচ্ছদ রাখিতে হইবে।

সমরবিজ্ঞান শিক্ষার্থী ছাত্রগণ কিরূপ ভাবে পরিগৃহীত হইবে, তাহার একটি প্ল্যান সামরিকব্যাপারসম্বন্ধীয় ষ্টুডেন্ট কাউন্সিল কমিটি কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে, যথা—

১। আমি আমার নাম, হার্ভার্ড সৈনিক বিভাগের তালিকাভুক্ত করিতেছি। বিশ্ব বিদ্যালয়ে আমার নির্ব্বাচিত পাঠ্যে অবহেলা না করিয়া সপ্তাহে তিন ঘণ্টা মৌখিক ও ব্যবহারিক সমর শিক্ষা পাইতে যত্নবান্ হইব। আমি আরও স্বীকার করিতেছি—ইউনাইটেড্‌ষ্টেট্‌স্ সমর-বিভাগ কর্ত্তৃক পরিচালিত সমর সংবাদ বিভাগের জন্য প্রতি-মাসে একখানি করিয়া মানচিত্র প্রস্তুত করিব এবং মানচিত্র বিষয়ক জটিল সমস্যা সমাধান করিতে চেষ্টা করিব।

২। যতদিন পর্য্যন্ত সামরিক শিক্ষা পাইব এবং আমার নাম হার্ভাড সৈনিক বিভাগের তালিকা ভুক্ত থাকিবে ততদিন ঊর্দ্ধতন সৈনিক কর্ম্মচারীর আদেশ পালন করিব।

৩। আমি আরও বলিতেছি যে, যদি আমি কোন ড্রিলে বা সমর-শিক্ষা শ্রেণীতে উপস্থিত না হই তাহা হইলে উপযুক্ত কারণ দেখাইতে না পারিলে প্রথম অপরাধের জন্য বিনা আপত্তিতে, শৃঙ্খলা সমিতি (Disciplinary committee) আমার নাম সৈনিক বিভাগের পত্রিকায় লিখিয়া রাখিবেন এবং ঐরূপ দ্বিতীয় অপরাধের জন্য সৈনিক শ্রেণী হইতে বিতাড়িত হইব; এবং আমার নামে মন্তব্য প্রকাশিত হইতে পারিবে।

৪। সৈনিক বিভাগে মনোযোগ দিতে এবং অন্যলোককে ১৯১৬ অব্দের গ্রীষ্ম হইতে সামরিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য উৎসাহ দিতে আমি আমার সামর্থ্যের ত্রুটী দেখাইব না।

৫। এই সর্ত্তানুসারে ১৯১৬ অব্দের ৩১ এ মে পর্য্যন্ত আমার দাম তালিকাভুক্ত থাকিবে।

বৎসরের শেষার্দ্ধে সৈনিক বিভাগে বক্তৃতা প্রদানের বিষয় ও সংখ্যা—

১। সাধারণ সামরিক নীতি এবং সৈন্যের বৃদ্ধি ও পুষ্টি প্রণালী সম্বন্ধে ১টী বক্তৃতা দেওয়া হইবে।

২। পদাতিক সৈনিকদিগের নিমিত্ত ৪টী বক্তৃতা।

৩। গোলন্দাজী সৈন্যদিগের জন্য ৩টা।

৪। সামুদ্রিক গোলন্দাজী সেনার জন্য ৩টা বক্তৃতা দেওয়া হইবে।

৫। অশ্বারোহী সৈন্যদিগের জন্য ৩টী বক্তৃতা হইবে।

৬। বিভিন্ন শ্রেণীর সামরিক ইঞ্জিনিয়ার-দিগের জন্য ৪টী বক্তৃতা।

৭। শারীরবিজ্ঞান এবং শিবির স্বাস্থ্য-রক্ষা সম্বন্ধে ১টী বক্তৃতা।

৮। সৈনিকদিগের সঙ্কেত এবং বায়ুযানে গমনাগমন বিষয়ক ২টী বক্তৃতা।

৯। জিনিষপত্র স্থানান্তর করণ ও সরবরাহ সম্বন্ধে ২টী বক্তৃতা।

১০। বৃহৎ গোলন্দাজীদিগের জন্য ১টী বক্তৃতা।

১১। যুদ্ধের জন্য সজ্জিত সৈন্যদিগের কর্ম্মচারি ও এঞ্জিনিয়ারগণ যেরূপ নিপুণ ভাবে গতিবিধি করে তাহা শিক্ষা দিবার জন্য ৬টী বক্তৃতা দেওয়া হইবে।

* *
•

৯। স্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়

আমরা পূর্ব্বেও একবার মহারাষ্ট্রের সমাজ সেবক অধ্যাপক কার্ব্বের কথা বলিয়াছি। তিনি অক্লান্ত কর্ম্মী, অক্লান্ত ভাবে মহারাষ্ট্র-দেশকে নানা উপায়ে সেবা করিতেছেন। মহারাষ্ট্রের 'নিষ্কাম কর্ম্মমঠ' ও 'হিন্দুবিধবা আশ্রম' তাঁহার অতুল কীর্ত্তি। মহারাষ্ট্রের নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে তাঁহার সেবা ও প্রীতির কাহিনী ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি তিনি মহারাষ্ট্রে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার ব্যাপক-ভাবে করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। শুধু কথায় বা কল্পনায় তাঁহার চিন্তারাশিকে পুষ্ট করেন নাই। ইতিমধ্যে তিনি তাঁহার প্রস্তাবিত স্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যও প্রকাশিত করিয়াছেন। যথা—

(ক) মারাঠি ভাষার সাহায্যে স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে।

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্ব্ব শিক্ষা-প্রণালীকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া বিশেষভাবে স্ত্রীপাঠোপযোগী পুস্তক সমূহ পাঠ্য নির্ব্বাচন করিতে হইবে।

(গ) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের জন্য শিক্ষকদিগের উপযুক্ত শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

(ঘ) স্ত্রী শিক্ষার উপযোগী এই ধরণের অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলি সেনেট সময়ে সময়ে যোগ করিয়া দিতে পারিবেন।

শিক্ষার সঙ্গে জ্ঞানের কতটা সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা কার্য্যক্ষেত্রে না নামিলে বুঝা যায় না। নিজকে বাঁচাইয়া রাখিতে যাইয়াই নানা প্রকারে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশ পাইয়াছে। হিন্দুর জ্ঞানবিজ্ঞান যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা কয়েকজন বিশেষজ্ঞের আলোচনার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে নাই, পরন্তু উহা যেখানে নিত্য ব্যবহৃত হইতে পারে, প্রতিমুহূর্ত্তে যেখানে পরীক্ষা করা সম্ভব সেই হিন্দুরমণীদের আলোচনার মধ্যেও স্থান পাইয়াছিল। সেই সকল আবিষ্কার আমাদের মাতৃজাতির মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়াই আজও হিন্দুর সংসারে তাহার কোন কোনটীর ব্যবহার দেখা যায়। আধুনিক সময়ে জ্ঞানরাজ্য যথেষ্ট বিস্তৃত হইয়াছে, স্ত্রীজাতিও লেখাপড়ায় বেশ উন্নত হইতেছেন, কিন্তু আবিষ্কর্ত্তা বা তাঁহার সমশ্রেণী দুই একজন ব্যতীত ফলাফল সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইতেছে না। আমাদের মাতৃ-জাতির মধ্যে সকলেই বিদুষী ছিলেন না কিন্তু শারীরবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতির নিয়মাবলী ব্যবহারিকভাবে যথেষ্ট আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাতে সুবিধা হইয়াছিল এই, বিদ্যাশিক্ষা না করিয়াও নিজের সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিজের হাতেই ছিল। মা সন্তানের স্বাস্থ্য যতটা ভাল

বুঝেন, ডাক্তার কবিরাজগণ ততটা ধারণা করিতে পারেন না। ছেলের প্রাথমিক শিক্ষা মায়ের আঁচলের ধারেই হয়। মায়ের চরিত্রের ভালমন্দ সন্তানের চরিত্রে অনেকটা বর্ত্তিয়া থাকে। এজন্য সুশিক্ষিতা মাতা সমাজে একান্ত আবশ্যক। জগতের ইতিহাসে বীর চরিত্রের শ্রেষ্ঠ উপাদান মায়ের নিকট হইতেই প্রাপ্ত। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সমাজে সুশিক্ষিতা মাতৃজাতি সন্তানের চরিত্রের উপর নিজেদের বিশেষত্ব ফুটাইতে পারিতেছেন না। তাঁহারা যেন একটা নূতন উপাদানে গঠিত হইতেছেন বলিয়া মনে হয়। সেই জন্যই অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার স্ত্রীশিক্ষা প্রণালীতে পৌরাণিক ও ধর্ম্মসাহিত্যের শিক্ষণীয় বিষয়ের শিক্ষা দিতে চাহেন। তিনি আরও বলিতে চাহেন "আমরা তাঁহাদিগকে সুশিক্ষিতা করিতে যাইয়া যেন তাঁহাদের মন হইতে ধর্ম্মভাবকে দূর করিয়া না দেই।" আমাদের সমাজ যতই কেন শিক্ষিত হউক না, রমণীদিগের সুশিক্ষার অভাবে যথেষ্ট পরিমাণে চিন্তাশীল লোক পাইব না। আমাদের জাতীয়ত্ব বজায় রাখিয়া যাহাতে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তৃতি লাভ করে সেই দিকেই আমাদিগকে নজর রাখিতে হইবে। আমাদের সমাজের প্রকৃত সুর সেইখানেই। হিন্দুর পারিবারিক জীবন, হিন্দুর সাহিত্য, হিন্দুর প্রবাদকাহিনী গুলি তাঁহাদের নিকট পরিচয় করাইয়া দিতে হইবে। মহাকালী পাঠশালা জাতীয়ত্ব বজায় রাখিয়া চলিতেছেন। অধ্যাপক মহাশয়ও তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীকে এই নিয়মে পরিচালিত করিবেন ইহাই আমাদের সমাজের আশার বিষয়।

* *
*

১০। ম্যালেরিয়ার প্রাচীনতা

আমরা এতদিন জানিতাম ম্যালেরিয়া আধুনিক যুগের ব্যাধি। কিন্তু কবিরাজ ভূপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয় "স্বাস্থ্যসমাচারে" লিখিয়া জানাইয়াছেন, আয়ুর্ব্বেদেও এই ব্যাধির লক্ষণ পাওয়া যায়। যাঁহারা চিকিৎসা-শাস্ত্রাভিজ্ঞ তাঁহারা তাঁহার উদ্ধৃত বচন-প্রমাণের সত্যতা নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন। আজকাল ম্যালেরিয়াজ্বরের উত্তাপ বৃদ্ধি পাইলেই ডাক্তারেরা রোগীর মাথায় শীতল জলের পটি বা বরফ দিতে বলিয়া থাকেন। কিন্তু কবিরাজ মহাশয়েরা অধিকাংশস্থলেই এরূপ শৈত্য প্রয়োগ বড় পছন্দ করেন না। সেনগুপ্ত মহাশয় যে সব বচন উঠাইয়াছেন, তাহা হইতে দেখা যাইতেছে এবম্বিধ শৈত্যপ্রয়োগ আধুনিক নহে—বহুকালের প্রাচীন। আমরা কবিরাজ মহাশয়ের কথাগুলি তুলিয়া দিতেছি :—

"ম্যালেরিয়ার নাম আমাদের দেশের সকলেই অবগত আছেন। ডাক্তার ও কবিরাজগণ সকলেই উক্ত নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। আয়ুর্ব্বেদে ম্যালেরিয়া কি! তাহার লক্ষণ আয়ুর্ব্বেদে কোন লক্ষণের সহিত সামঞ্জস্য হয় ইহাই আমার প্রধান বক্তব্য বিষয়—

ম্যালেরিয়া জ্বরটা আমাদের বিষম জ্বরের অন্তর্গত শীত-পূর্ব্ব-জ্বরের সঙ্গে বেশ সামঞ্জস্য হয়।

ত্বক্‌স্থৌ শ্লেষ্মানিলৌ শীতমাদৌ
　　জনয়তোজ্বরে।
তয়োঃ প্রশান্তয়োঃ পিত্ত মন্তে দাহং
　　করোতিচ॥
করোত্যাদৌ তথা পিত্তং ত্বক্‌স্থঃ
　　দাহ মতীবচ।
তস্মিন্ প্রশান্তে ত্বিতরৌ কুরুতঃ
　　শীত মন্ততঃ॥

অর্থাৎ দুষ্ট শ্লেষ্মা ও বায়ু ত্বকস্থ (রসস্থ) হইলে প্রথমে শীত হয় পরে জ্বর হয়। শ্লেষ্মা ও বায়ুর বেগ প্রশান্ত হইলে দুষ্ট পিত্ত দাহ উৎপাদন করে, এবং দুষ্ট পিত্ত রসস্থ হইলে প্রথমে অত্যন্ত দাহ হয়। সেই পিত্ত প্রশমিত হইলে কফ ও বায়ু শেষে শীত উৎপাদন করে।

গাত্র বেদনা প্রভৃতি অন্যান্য লক্ষণ বায়ুর কর্তৃত্বহেতু উপস্থিত হইয়া থাকে।

সর্ব্বেষু চ বিষম জ্বরেম্ববশ্যম্ভাবী বায়ু ঃ—যদাহ সুশ্রুতঃ—নর্ত্তেঽনিলাদ্ বৈ বিষমজ্বরঃ সমুপজায়তে। বায়ুর কর্ত্তৃত্ব ভিন্ন বিষম জ্বর উৎপন্ন হইতে পারে না।

উক্ত দাহাদি ও শীতাদি জ্বরের মধ্যে দাহ-পূর্ব্ব-জ্বর কষ্টসাধ্য ও কষ্টপ্রদ। শীতাদি অর্থাৎ ম্যালেরিয়া জ্বর সুচিকিৎসায় আরোগ্য হইয়া থাকে।

উত্তাপাধিক্যে কর্ত্তব্য—বাস্তবিকপক্ষে ম্যালেরিয়া জ্বরে যেরূপ সন্তাপের আধিক্য দেখা যায়, আমার বিশ্বাস আর কোনও জ্বরে প্রায় এরূপ হয় না। তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোগী পাগলের ন্যায় হইয়া পড়ে, প্রলাপ বকিতে থাকে এবং ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়ে। অত্যধিক উত্তাপ দেখিলেই রোগীর সেই উত্তাপ হ্রাসের নিমিত্ত অনতিবিলম্বে চেষ্টা করা সঙ্গত। এই উত্তাপ দীর্ঘ সময় থাকিলে নানা প্রকার উৎকট ও ভীষণ উপসর্গ উপস্থিত হইতে পারে এমন কি রোগীর জীবন নাশের খুব সম্ভাবনা, সুতরাং সর্ব্বাগ্রে তাহার প্রতিবিধান করা আবশ্যক। এই উত্তাপ হ্রাসের নিমিত্ত মাথায় শীতল জলের পটি বা বরফ দেওয়া সঙ্গত। ইহাতে উত্তাপ হ্রাস না হইলে গরম জল দ্বারা রোগীর সর্ব্বাঙ্গ মুছাইয়া দিলে ভাল হয়। পৃষ্ঠদেশের চামড়া খুব পুরু ও অনেক মাংসপেশী দ্বারা আবৃত থাকায় সহসা তাপ বাহির হইতে পারে না, সুতরাং পৃষ্ঠদেশ খুব ভাল করিয়া মুছাইয়া দেওয়া সঙ্গত।

সর্ব্বাপেক্ষা শীতল জল দ্বারা উত্তাপ হ্রাস করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। আমাদের দেশের সাধারণে এমন কি অনেক চিকিৎসক গাত্রে জল দিতে বড়ই ভয় পান। বাস্তবিক ভয়ের কোনই কারণ নাই।

আবশ্যক হইলে রোগীর গাত্র উত্তমরূপে ধৌত বা মর্দ্দন করিয়া দেওয়া সঙ্গত। ইহাতে শরীরের ভিতর হইতে গরম রক্ত চর্ম্মের উপরে আসিবে ও শীতল হইবে। উক্ত প্রক্রিয়ায় শরীরের যন্ত্রগুলির রক্তাধিক্য হ্রাস পায়, রোগীর সুনিদ্রা হয়, এবং অস্থিরতা দূর হওয়ায় রোগী বেশ আরাম বোধ করে। আয়ুর্ব্বেদে এরূপ অবস্থায় শৈত্য প্রয়োগ বা শীতল জল প্রদানের ব্যবস্থা নানাস্থানে দেখিতে পাই। যথা—

উত্তান সুপ্তস্য গভীর তাম্র,
কাংস্যাদি পাত্রং প্রণিধায় নাভৌ।
তত্রাম্বুধারা বহুলা পতন্তী,
নিহন্তি দাহং ত্বরিতং জ্বরঞ্চ॥

অর্থাৎ রোগীকে চীৎ করিয়া শোয়াইয়া তাহার নাভিদেশে গভীর তাম্র কিম্বা কাঁসার পাত্র রাখিয়া তাহাতে শীতল জলের ধারা দিলে শীঘ্রই দাহ ও জ্বর বিনষ্ট হয়।

অন্যত্র—কাঞ্জিকাদ্র´পটোনাবগুণ্ঠনং দাহনাশনম্।

কাঁঞ্জি দ্বারা বস্ত্র ভিজাইয়া তদ্দ্বারা রোগীর গাত্র ঢাকিয়া রাখিলে দাহ ও জ্বরের হ্রাস হয়।

চরকে—

অভ্যঙ্গাংশ্চ প্রদেহাংশ্চ সস্নেহান্
সাবগাহনান্।
বিভল শীতোষ্ণ কৃতান্ দদ্যাজ্জীর্ণ
জ্বরে ভিষক্॥
তৈ রাশু প্রশমং যাতি বহির্ম্মার্গ
গতো জ্বরঃ।
লভন্তে সুখ মঙ্গানি বলংবর্ণশ্চ
বর্দ্ধতে॥

অর্থাৎ চিকিৎসক জীর্ণ জ্বরে বিবেচনা পূর্ব্বক রোগীকে শীতল বা উষ্ণ অভ্যঙ্গ প্রদেহ অথবা স্নেহযুক্ত অবগাহন ব্যবস্থা করিবেন। এইরূপ করিলে বহির্ম্মার্গ গত জ্বরের শীঘ্র উপশম হইয়া থাকে এবং সমুদায় অঙ্গের সুখ, বল ও বর্ণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

কিরূপ জ্বরে কিরূপ অভ্যঙ্গ প্রদেহ ও পরিষেক করিবে তাহার প্রমাণ এই যথা, চরকে—

অভ্যঙ্গাংশ্চ প্রদেহাংশ্চ পরিষে-
কাংশ্চ কারয়েৎ।
যথাভিলাষং শীতোষ্ণং বিভজ্য
দ্বিবিধং জ্বরম্॥
সহস্র ধৌতং সর্পিবা তৈলং বা
চন্দনাদিকম্।
দাহজ্বর প্রশমনং দদ্যাদভ্যঞ্জনং
ভিষক্॥

অর্থাৎ—উষ্ণজ্বরে শীতল অভ্যঙ্গ, প্রদেহ ও পরিষেক এবং শীত জ্বরে উষ্ণ অভ্যঙ্গ, প্রদেহ ও পরিষেক প্রয়োগ করিবে। সহস্র ধৌত ঘৃত কিম্বা চন্দনাদি তৈলের দ্বারা অভ্যঙ্গ করিলে দাহযুক্ত জ্বর প্রশমিত হয়।

ফলতঃ উক্ত উপায়ে উত্তাপাধিক্যে জ্বর ছাড়াইবার জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। ইহাতে ভয়ের কোন কারণ নাই। বলা-বাহুল্য আমার উদ্ধৃত মত কফ সংশ্লিষ্ট জ্বরের জন্য নয়।

পল্লীগ্রামে যে সমস্ত তথাকথিত কবিরাজ মহাশয়গণ আছেন, আমরা আশা করি, এই ধরণের আলোচনায় তাঁহাদের মনগড়া ব্যবস্থা-প্রণালীর অনেকটা সংস্কার সাধিত হইবে।

* *
*

১১। বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজের জাগরণ

বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম সমাজ ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে বঙ্গীয় বৌদ্ধগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। আজকাল সকল সমাজেই একটা জীবনবত্তার লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এই সময়ে বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজ যে পশ্চাৎপদ রহেন নাই, ইহা বড়ই সুখের বিষয়। সম্প্রতি তাঁহাদের একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে, তাহার নাম "বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভা"। যে উদ্দেশ্য লইয়া এই সমিতি গঠিত, তাহা সম্যক সাধিত হইলে আমরা অল্পদিনের মধ্যেই দেশের একটি পুরাতন মৃতপ্রায় সমাজকে সকলদিকে পুনরুজ্জীবিত দেখিতে পাইব, বুঝিতে পারিব অতীত ও বর্ত্তমানকে বাঁধিবার জন্যই সেতুর মত এই সমাজের উদ্যম প্রযুক্ত হইয়াছে। নিম্নে আমরা এই সমিতির উদ্দেশ্যগুলি বিবৃত করিতেছি। আমাদের মনে হয় কেহই এ উদ্দেশ্যকে মহনীয় মনে না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

(১) বঙ্গীয় বৌদ্ধের সামাজিক, নৈতিক, শিক্ষা ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অবস্থার উন্নতিবিধান। (২) বৌদ্ধ বালক বালিকাদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার। (৩) বৌদ্ধনীতি এবং পালি ও

সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি (৪) গয়া, কুশীনগর প্রভৃতি তীর্থযাত্রীদিগের পথে উপযুক্ত পরিচালক ও স্থানাভাবে সাতিশয় অসুবিধা ও কষ্টভোগ করিতে হয়, এই অসুবিধা দূরীকরণ। (৫) মানসিক ও নৈতিক উন্নতিসাধন, উক্ত বিষয়ের অনুশীলনের জন্য বিভিন্ন গ্রামে বিদ্যালয়, টোল, চতুষ্পাঠী স্থাপন। (৬) বৌদ্ধগ্রন্থের অনুবাদ ও পালি ভাষার প্রচার ইত্যাদি। (৭) জগজ্জ্যোতিঃ নামক মাসিক পত্রের প্রচার ও পরিচালন। (৮) যথোপযুক্ত স্থানে শাখা সমিতি, ধর্ম্মশালা ও বিহার স্থাপন। (৯) বৌদ্ধ ধর্ম্মমূলক আলোচনা ও বক্তৃতার জন্য সুবন্দোবস্ত। (১০) তীর্থযাত্রীদিগের যাতায়াত পথে ধর্ম্মশালা স্থাপন। (১১) দরিদ্র ও যোগ্য বৌদ্ধছাত্রগণকে অর্থ সাহায্য করা। (১২) ইংরেজী ও বঙ্গভাষায় পালি সাহিত্যের অনুবাদ এবং পালিগ্রন্থ প্রচারের জন্য মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন। (১৩) গুণালঙ্কার লাইব্রেরী ও কৃপাশরণ ফ্রি ইনষ্টিটিউসনের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও পরিচালন (১৪) স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় ভাড়া বা সংগ্রহ। (১৫) সমান উদ্দেশ্যবিশিষ্ট সমিতির সহিত যোগদান। (১৬) সমিতির এক বা ততোধিক উদ্দেশ্যের জন্য দান গ্রহণ এবং (১৭) উপরোক্ত যে কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় সময়োচিৎ কার্য্য করা।

ভারত লক্ষ্মী

(মালিনীছন্দে—সঙ্গীত)

জয় জয় অয়ি মাগো ভারত ক্ষেম লক্ষ্মী।
অগণন সুত রঙ্গে ও পদে বক্ষ রক্তে
শত বুধ কবি ছন্দে পূজিছে লক্ষ ভক্তে,
তিরপিত চিত বন্দে, পুণ্য আশীষ বর্ষে
চরণ কমল গন্ধে মুগ্ধ এ চিত্ত মক্ষী।
জয় জয় অয়ি মাগো ভারত ক্ষেম লক্ষ্মী।

সুতগণ চির হাসে, তৃপ্ত যে নিত্য অন্নে,
তরণি নিকর ভাসে দৃপ্ত গো বিত্ত পণ্যে
তবু তুমি অতি দীনা কে কহে মত্ত গর্ব্বে?
নহ নহ তুমি হীনা চৌদিকে লক্ষ রক্ষী।
জয় জয় অয়ি মাগো ভারত ক্ষেম লক্ষ্মী।

সুগঠিত শত বর্ষে দেউলে শঙ্খ ঘণ্টা
সুললিত মধু হর্ষে ভারতী মুক্ত কণ্ঠা
ধরম করম হারা কে কহে তোরি পুত্রে?
পশু শিশু তরু বল্লী গায় যে তত্ত্ব পক্ষী।
জয় জয় অয়ি মাগো ভারত ক্ষেম লক্ষ্মী॥

শ্রীকালিদাস রায়।

ভবিষ্যতের মানবধর্ম্ম

এক কথায় ধর্ম্মের প্রকৃত সংজ্ঞা প্রদান করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। নানা লোক ও নানা জাতি যুগে যুগে মানবাত্মা, জীবন-প্রক্রিয়া, বিশ্বশক্তি এবং ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে বিভিন্ন ধারণা হৃদয়ঙ্গম করতঃ ধর্ম্মের বিচিত্র ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ক অনুভূতিসমূহ যতই বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী হউক না কেন, এই বৈচিত্র্য ও বিরোধের মধ্যে একটী সর্ব্ববাদি-সম্মত সত্যের উজ্জ্বল আত্মপ্রকাশ দৃষ্ট হয়। ইহাকেই স্থূলভাবে ধর্ম্মের সাধারণ সংজ্ঞারূপে প্রদান করা যাইতে পারে। সত্যটি এই যে চিরকালই মানব এক ঐশী বা আধ্যাত্মিক শক্তির অস্তিত্বে ও উপকারিতায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আসিয়াছে, এবং এই বিশ্বাস মানবপ্রকৃতির এক প্রকৃত অভাববোধ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যতদিন কোনও এক বিশেষ ধর্ম্ম মানবপ্রকৃতির এই অভাব পূরণে সমর্থ হইয়াছে, ততদিন ইহা জীবিত রহিয়াছে। পক্ষান্তরে, যখনই যে কোন ধর্ম্মানুশীলন এ অভাবমোচনে সমর্থ হয় নাই, তখনই ইহার শক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হইয়া মানব-সমাজ হইতে একবারে লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে,—অথবা অন্য এক উচ্চতর ও অধিকতর শক্তিমান্ ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে।

কিন্তু সমীপবর্ত্তী ভবিষ্যতের সমাজ ধর্ম্মের প্রকৃতি ও প্রসার অনুমান করিতে হইলে, আমাদিগকে অতীত ও বর্ত্তমান্ সমাজের ধর্ম্মাবস্থার সহিত কিয়ৎপরিমাণে পরিচিত হইতে হইবে। আদিম সমাজের মানুষ স্বপ্নদৃষ্ট প্রেতাত্মার (animism) অস্তিত্বে ও শক্তিমত্তায় বিশ্বাস করিত এবং ইহার কুদৃষ্টি হইতে পরিত্রাণ লাভের নিমিত্ত বহু অদ্ভুত প্রকারে ইহার পূজা করিত। শুধু তাহাই নয়,—ইহাদের অনেকে আবার দিবা দ্বিপ্রহরে ও ঘোর নিশীথে মাঠে, ঘাটে ও বনে অদ্ভুত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট বহু ভূত প্রেতের সাক্ষাৎ-লাভ করিত। বাল্যকালে আমি বহুলোকের নিকট এরূপ শতাধিক গল্প শুনিয়াছি ও ভয়ে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছে। অবশ্য নিজে একটীরও দর্শন লাভ করি নাই। কিন্তু এই প্রেতাত্মাগুলির অধিকাংশই অপকারী—উপকারী মাত্র দুই চারিটী। আমাদের দেশের পল্লীসমাজে, আমেরিকার আদিম অধিবাসী লাল-জাতির মধ্যে ও পৃথিবীর অন্যান্য অনেক নিম্নতর মানব-সমাজে এই প্রেতাত্মামূলক ধর্ম্ম-বিশ্বাসের প্রভাব এখনও অল্পাধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, য়ুরোপ ও আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ সমাজে 'ভূতের গল্প' ও ঠিক এই প্রকারের প্রেতাত্মায় বিশ্বাস এখন অতীতের কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে এবং প্রাচ্য সমাজের লোকের নিকট কখনও কখনও উপহাসচ্ছলে ব্যক্ত হইয়া থাকে মাত্র।

মনের 'ঝাপসা' কাটিয়া যাওয়ার জন্যই হউক বা অভীষ্টলাভে অসমর্থ হওয়ার জন্যই হউক, কালক্রমে কতক কতক লোকের মনে

এই প্রেতাত্মায় বিশ্বাসের বল ক্ষীণ হইয়া আসিল। কিন্তু দুর্ব্বল মানবচিত্ত তো একেবারে শূন্যে অবস্থান করিতে পারে না; সুতরাং আর এক প্রকারের ধর্ম্মভাব মানবান্তরে জাগ্রত হইয়া বিবিধ প্রকারে বাহ্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। এবার প্রকৃতির দীপ্তিমান্ প্রকাশগুলির (nature worship) প্রতি মানবচিত্ত আকৃষ্ট হইল। ভারতবর্ষের বৈদিক যুগের সূর্য্য, অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতির উপাসনা এরূপ ধর্ম্মানুশীলন ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। উপাসকগণ প্রকৃতির এই ঘটনাগুলির কোন কোনটীকে প্রত্যক্ষ দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতেন এবং কোন কোনটীর সৃজক ও পরিচালকরূপে কতিপয় দেবতার কল্পনা করিয়া লইয়া সশঙ্কচিত্তে তাহাদের আরাধনা করিতেন। এই পূজা ও আরাধনার মূলে বিশ্বশক্তির নিরপেক্ষ বোধ, স্বার্থসাধন ও অমঙ্গল হইতে নিষ্কৃতিলাভ—ত্রিবিধ ভাবই বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ প্রকৃতিপূজকের সংখ্যা ভারতবর্ষের ন্যায় অন্যান্য দেশেও নিতান্ত বিরল নহে।

তারপর প্রতিমাপূজা (Idolatry)। শুনিতে পাই মানুষ প্রথমাবস্থায় নিরাকার ব্রহ্মের সম্পূর্ণ ধারণা ও সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে না—পূজা করিবে কাহার? সুতরাং পণ্ডিতগণ নিজেদের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কল্পনা বলে মূর্খের ধর্ম্মপিপাসা নিবারণের জন্য নানা দেবদেবীর সৃষ্টি করিলেন। ত্রিতল গৃহের ছাদের উপর চড়িতে হইলে সোপান বহিয়া উঠিতে হয়। আমার কিন্তু এ সম্বন্ধে অন্য কথা মনে পড়ে। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসকগণ বা উপনিষদকারগণের দ্বারা এত সংখ্যক অদ্ভুত মূর্ত্তিমান্ দেবদেবীর সৃষ্টি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। খুব সম্ভব, এই সমস্ত দেবদেবীর সৃষ্টি নিম্নস্তরের জাতিগণ কর্ত্তৃকই সম্পন্ন হইয়াছিল। মানব-বিবর্ত্তনের ইতিহাসে এই বাক্যটীর সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমাজধর্ম্ম ও পূজা পদ্ধতি আর্য্য অনার্য্যের অথবা সভ্যাসভ্যের মিশ্রণজাত—ইতিহাসের উপদেশ মানিতে হইলে এ কথাটীও মানিতে হইবে। উৎপত্তি যে স্থান হইতে ও যে প্রকারেই হউক না কেন, প্রতিমাপূজা ভারতীয় হিন্দু সমাজের সর্ব্বস্তরেই প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সমস্ত ধর্ম্মানুশীলনের সঙ্গে বর্ত্তমান কালের মানবসমাজে আমরা আরও বিশেষ দ্বিবিধ ধর্ম্মবোধের অস্তিত্ব দেখিতে পাই। একটী পার্থিব অভাবমূলক (Prudential religion) ও অপরটী আধ্যাত্মিক অভাবমূলক (Mystical religion). মানুষের পার্থিব জীবনের সুখ, সাচ্ছন্দ্য ও সংরক্ষণের বাসনা হইতে প্রথম প্রকারের ধর্ম্মবোধটি উৎপন্ন হইয়া থাকে। পারিপার্শ্বিক জড় ও প্রাণিজগতের পদার্থ-সমূহ ও শক্তিরাশির ব্যবহার দ্বারা মানুষ তাহার এই অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকে। ঋতুপরিবর্ত্তন, উদ্ভিদের বিকাশ-বৃদ্ধি ও ফলোৎপাদন, জন্তুর খাদ্য ও সন্তানোৎপাদন, শস্যের বপন ও কর্ত্তন প্রভৃতি প্রকৃতির অধিকতর পরিচিত নিয়ম ও ক্রিয়াগুলি তাহার চিন্তা ও কর্ম্ম নিয়োজিত করিয়া থাকে। কাঠ, পাথর, লোহা প্রভৃতির সহিত পরিচিত হইয়া তদ্দ্বারা কৃষির যন্ত্রাদি ও গৃহ নির্ম্মাণ করে। কিন্তু সব সময়ই মানুষ প্রকৃতির এই শক্তিরাশি ও উপকরণগুলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক চলিতে পারে না।

ইহাদের অনিশ্চিত ও অচিন্তিত ক্রিয়ায় অনেক সময় তাহার আশাভরসা নির্ম্মূল হইয়া যায়, তাহার স্বাস্থ্য, সুখ ও জীবন বিপন্ন হইয়া পড়ে। অনাবৃষ্টি তাহার শস্য নষ্ট করিয়া ফেলে, মহামারী তাহার পশুগৃহ শূন্য করিয়া দেয়। অগ্নি ও ঝড়ে তাহার বাসগৃহ ভস্মীভূত ও ভূমিসাৎ হইয়া যায়। এই প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক শক্তিরাশির নির্ম্মম ভ্রূকুটি হইতে পরিত্রাণলাভ পূর্ব্বক তাহার ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রা নিরাময় রাখিবার জন্য মানব স্বভাবতই এক দেবতার শরণাপন্ন হইয়া পড়ে। এই দেবতা অসভ্য জাতিগণের এক অবোধ্য ছায়াময় শক্তি বা অদ্ভুত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট কোনও এক প্রাণী নয়, পরন্তু ইহা ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও উদ্দেশ্যযুক্ত মঙ্গলময় ভগবান্। যে ব্যক্তি এই শক্তিমান্ ভগবানের ইচ্ছা বা বিধানানুসারে কার্য্য করিবেন, তাহাকে তিনি সঙ্কটে বিপদে রক্ষা করিবেন ও ধনধান্যে ভূষিত করিয়া রাখিবেন। ভগবান্ কেবল শক্তিমান্ই নহেন, তিনি ন্যায়পরায়ণও বটেন; সুতরাং তিনি পাপীকে দণ্ডিত ও ধার্ম্মিককে পুরস্কৃত করিয়া থাকেন। সৎব্যক্তির পার্থিব সুখসাচ্ছন্দ্যভোগই ভগবানের পুরস্কার। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, ইহজগতে অবিশ্বাসী ও অসৎ ব্যক্তিও বিশ্বাসী ও সৎব্যক্তি অপেক্ষা বেশী সুখ ভোগ করিতেছে, তখন ভগবান পরজন্মে ইহার বিচার করিবেন—এই বিশ্বাসে সাধু ব্যক্তিগণ শান্তমনে দিন যাপন করেন। কিন্তু ভগবান্ ন্যায়পরায়ণই হউন বা মঙ্গলময়ই হউন, মানুষের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ উভয়স্থলেই সমান।

তারপর আধ্যাত্মিক অভাবমূলক ধর্ম্মবোধ। মানুষের মধ্যে আদর্শ সৌন্দর্য্যবোধ ও অবিমিশ্রিত সত্যের জ্ঞানার্জ্জন দ্বারা আত্মার উৎকর্ষসাধনের আকাঙ্ক্ষা প্রায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিসাধনের মূলেই তাহার আধ্যাত্মিক ধর্ম্মবোধের অঙ্কুর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষ পারিপার্শ্বিক জগৎ হইতে বহু আন্তরিক চেষ্টা দ্বারাও তাহার ন্যায্য বা স্বাভাবিক ফললাভে অনেক সময় বঞ্চিত হয়; তখন তাহার চিত্ত আধ্যাত্মিক ধর্ম্মভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। পার্থিব ধন, মান, যশঃ ও সুখের অনিশ্চয়তা ও অপ্রাপ্তিতে ক্ষুণ্ণ হইয়া সে স্বভাবতই অপার্থিব বা আধ্যাত্মিক বিষয়গুলির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে; কারণ এগুলি অচল ও নিশ্চিত এবং ইচ্ছা করিলেই সে ইহাদিগকে লাভ করিতে পারে। মানুষ এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল জগৎকে হতাশকারী ও সারশূন্যজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া এক আধ্যাত্মিক জগতের কল্পনা করিতে এবং ইহাকে তাহার 'খাঁটি ঘর' বিবেচনা করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে এই কল্পিত আধ্যাত্মিক রাজ্যেও তাহার বিশ্বাস অটল রাখা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। স্থূল জগৎ তাহাকে সর্ব্বদাই নিষ্পেষিত করিতেছে। ক্ষুধাতৃষা, শীতাতপ, জরামৃত্যু নিয়তই তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখিতেছে। আধ্যাত্মিক মঙ্গলের প্রতি ভরসা দৃঢ় রাখিবার জন্য মানুষ আবার এক ধর্ম্মের শরণাপন্ন হইয়া পড়ে। এবার সে এমন এক দেবতার কল্পনা করিতে বাধ্য হয়, যিনি অতি প্রাকৃত ও আধ্যাত্মিক জীবনের বাস্তবতার উপলব্ধিতে সহায়তা করিতে পারেন। এ দেবতা নিষ্কলঙ্ক, নির্ম্মল ও পবিত্র এবং জীব জগতের পাপ তাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এ হেন দেবতার ন্যায়বত্তা ও শক্তিমত্তা গুণদ্বয়ে এবার আর একটী গুণ যুক্ত হয়। সেটী

পবিত্রতা। তিনি মানবের কর্ম্ম ও চিন্তা-রাজ্যে সর্ব্বদাই অধিষ্ঠান করেন। কিন্তু মানুষ পার্থিব জঞ্জালের মধ্যে থাকিয়া তাঁহার মঙ্গলময় অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না। সুতরাং পার্থিবের সহিত অপার্থিবের সমন্বয় সাধনপূর্ব্বক মানুষকে তাঁহার মঙ্গলময় অস্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য একদল বিশেষজ্ঞের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই বিশেষজ্ঞ, পুরোহিত, ধর্ম্মযাজক বা ধর্ম্মগুরু-গণের সাহায্যে মানুষ স্বর্গীয় সুখের অধিকারী হয়—সচ্চিদানন্দের সাক্ষাৎ পায়। এইরূপে সাংসারিক ঝঞ্ঝাট হইতে মুক্ত হইয়া মানুষ স্বভাবতই "প্রতারণাময় মানব সমাজ" হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করে এবং পারলৌকিক সুখের আশায় ঐহিক জীবনের অবশিষ্ট দিন কয়টী যাপন করে।

অতীতকে ছাড়িয়া বর্ত্তমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে গিয়া আমরা উপরোক্ত সমস্ত ধর্ম্মানুশীলন-প্রণালীরই স্বতন্ত্র বা মিশ্রিত অস্তিত্ব দেখিতে পাই। এইমাত্র বিশেষ যে কোনও সমাজে একটীর প্রভাব বেশী, অপর কোন সমাজে অন্যটীর। অন্যান্য দেশাপেক্ষা ভারতবর্ষে এই স্বাতন্ত্র্য বা মিশ্রণের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। এখানে প্রেতাত্মায় বিশ্বাস হইতে আরম্ভ করিয়া নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা—এমন কি নাস্তিকতা—পর্য্যন্ত প্রত্যেকটীরই অস্তিত্ব স্বতন্ত্র ও মিশ্রিত ভাবে বিদ্যমান্। পাশ্চাত্য সভ্য-সমাজে কেবল শেষোক্ত দুই প্রকারের ধর্ম্মানুশীলনই স্বতন্ত্র ও মিশ্রিতভাবে বিরাজমান্ দৃষ্ট হয়। অপরগুলির অস্তিত্ব একেবারে লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু যে কেহই আধুনিক সভ্যসমাজের ইতিহাসের সহিত কথঞ্চিৎ পরিচিত, তিনিই ইহা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিবেন যে সভ্য ও শিক্ষিত মানবের নিকট, শেষোক্ত দ্বিবিধ ধর্ম্মানুশীলনও শক্তিশূন্য ও মূল্যহীন হইয়া আসিতেছে এবং প্রাকৃতিক বা আধ্যাত্মিক নির্ব্বাচনের নিয়মে সমীপ-ভবিষ্যতের মানব-সমাজ হইতে যে ক্রমশঃ লোপপ্রাপ্ত হইবে, তাহারও ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে।

এই শক্তিশূন্যতা ও লোপপ্রাপ্তির কারণ ইহা নয় যে, যে যে অভাববোধ হইতে উক্ত দ্বিবিধ ধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই সেই অভাব এখন মানবসমাজ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সুখ-সাচ্ছন্দ্যের জন্য মানুষ পূর্ব্বাপেক্ষা এখন কম পরিশ্রম করে না, আধ্যাত্মিক সুখলাভের বাসনাও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। লোপের কারণ হইতেছে যে, এই সমস্ত অভাব মোচনের জন্য মানুষ অন্যান্য অনেক অধিকতর ফলপ্রদ উপায় ও উপকরণ উদ্ভাবিত করিয়াছে। আধুনিক মানুষ প্রকৃতির প্রতিকূল শক্তিপুঞ্জের হাত এড়াইবার জন্য ভগবানের সঙ্গে আর 'চুক্তি' না করিয়া স্বীয় বুদ্ধিবলে বিশ্বশক্তির সহিত 'বোঝাপড়া' আরম্ভ করিয়াছে—পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান, উদ্ভাবনী শক্তি ও ব্যবহারিক জ্ঞান দ্বারা প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব করিতেছে। 'নৌকাডুবি' হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঈশ্বরের বিধান বা পরিণাম-দর্শিতার ভরসায় 'চুপ' করিয়া না থাকিয়া বাষ্পীয় পোত, দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র ও তারহীন বার্ত্তাবহ আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। অনাবৃষ্টি নিবারণের জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে ও কাতরস্বরে ঈশ্বর সমীপে কেবল প্রার্থনা না করিয়া বিবিধ জলসেচন প্রণালী বাহির করিতেছে। ওলাউঠা হইতে রক্ষা পাইবার

জন্য 'রক্ষা কালী'র পূজার আয়োজন না করিয়া ইহার প্রকৃত কারণ নির্ণয়ে যত্নপর হইতেছে এবং রোগকর বপুণুর আবিষ্কার ও বিনাশের উপায় উদ্ভাবিত করিতেছে। আধ্যাত্মিক অভাবমোচনের জন্য ছায়াবাদ বা মায়াবাদের অনুগত না হইয়া এবং সংসারিক ক্রিয়াকলাপ হইতে নিজকে বিচ্ছিন্ন না করিয়া, সংসার ও সমাজের মধ্যে থাকিয়াই এ সুখলাভের চেষ্টা করিতেছে—এবং বুঝিতেছে যে পরস্পরের যথাবিধি সম্বন্ধ ও সহানুভূতি দ্বারাই এই অভাব মোচত হইতে পারে। এই প্রকারে আধুনিক মানবসমাজ এরূপভাবে তাহার ক্রিয়াকলাপ শৃঙ্খলিত ও পরিচালিত করিতেছে যে সকলের অভিজ্ঞতা, অন্তর্দৃষ্টি ও উপলব্ধি প্রত্যেকের ব্যক্তিগত উৎকর্ষসাধনে নিয়োজিত হইতে পারে এই উদ্দেশ্যসাধন কল্পে ইহা লোকশিক্ষা ও স্বাধীন মতপ্রচার প্রবর্ত্তন করিতেছে, অনুসন্ধিৎসায় ও উদ্ভাবনে উৎসাহ প্রদান করিতেছে, শিল্পের উন্নয়নে ও স্বাস্থ্যকর ব্যায়ামচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিতেছে।

অতএব আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, শিল্পে, বিজ্ঞানের প্রয়োগদ্বারা প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব, বিষয়ভাগে ও শিক্ষাবিধানে সমান সুযোগ প্রদান দ্বারা ব্যক্তির মর্য্যাদারক্ষা, শাসনকার্য্যে সাধারণতন্ত্রের অবলম্বন দ্বারা দেশের সাধারণ উন্নতি এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ বিবিধ সামাজিক ক্রিয়াকলাপদ্বারা ব্যক্তিগত নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষসাধন—'ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ' রূপ এই চতুর্বর্গই আধুনিক মানব-সমাজের ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইতে চলিয়াছে। আধুনিক ডেমোক্রেসি বা সাধারণতন্ত্র বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা ইহারই নামান্তর। প্রকৃতপক্ষে ইহাই ডেমোক্রেসির কার্য্য ও সাধনা; কারণ ডেমোক্রেসি কেবল সূক্ষ্ম, নিরবচ্ছিন্ন ও নিষ্কলঙ্ক সমাজসাম্যের আদর্শই নয়, অধিকন্তু ইহা মানব-সমাজের এক নির্দ্দিষ্ট অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য এই সামাজিক কার্য্য, সাধনা ও সম্বন্ধদ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বকীয় ক্ষমতার সহজ পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। এই ডেমোক্রেসি কেবল একটী নির্দ্দিষ্ট আদর্শ বা কর্ত্তব্যই নয়, পরন্তু ইহা একটী নির্দ্দিষ্ট নীতি বা প্রণালীও বটে। জনগণের সমবেত কার্য্য ও অনুষ্ঠান দ্বারা মানবসমাজের পার্থিব সুখ ও প্রয়োজন বিধান ইহার আদর্শ সাধনের অন্যতম প্রণালী। সমাজে কোনও বিশেষ শ্রেণীর লোকগণ অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত জনগণের শ্রমলব্ধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আয়াসে উপভোগ করিতে পারিবে না। এই সমবায়-মূলক বিজ্ঞান-শ্রম-শিল্পানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া যাহাতে সকলে আধ্যাত্মিক সুখ উপভোগ করিতে পারে, তাহারও উপায়-সমূহ ডেমোক্রেসিই উদ্ভাবন করিবে। কোন শ্রেণীরই লোকগণ শ্রম হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকিয়া নিরবচ্ছিন্ন আলস্যসুখ ও আরাম-চিন্তা ভোগ করিবার অবকাশ পাইবে না। আধ্যাত্মিক সুখলাভের বাসনা সমাজ-জীবনের সাধারণ ও বিশেষ কর্ত্তব্য সম্পাদনের মধ্য দিয়াই পরিতৃপ্ত করিতে হইবে। ইহাই সর্ব্ববিধ সমাজধর্ম্মের মূল উৎস; কারণ বিজ্ঞান, শ্রম ও শিল্পবিষয়ক প্রতিষ্ঠানগুলিকে লাভজনক করিতে হইলে সমবায়-মূলক করিতে হয় এবং সমবায়-মূলক করিতে হইলে জনসাধারণের মধ্যে সহানুভূতি, সংযোগিতা ও সদ্ভাবের প্রয়োজন হয়। এই সমস্ত প্রাথমিক সামাজিক গুণ হইতেই প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান প্রভৃতি আধ্যাত্মিক জগতের দুর্ল্লভ গুণগুলি লব্ধ হইয়া থাকে। অতএব আমরা

বুঝিতে পারিতেছি যে, অতীতের বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠানগুলি যে সমস্ত অভাবমোচন কল্পে আবির্ভূত হইয়াছিল, আধুনিককালে শ্রমে, শিল্পে, শিক্ষায় ও শাসনে সমান সুবিধাবাদ ও সাধারণতন্ত্র বা ডেমোক্রেসি তাহা অধিকতর যুক্তিযুক্ত, ফলপ্রদ ও প্রত্যক্ষভাবে পূরণ করিতেছে। সুতরাং ইহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে আধুনিক সমাজের কর্ম্মযোগী ও জ্ঞানতপস্বী যাগ-যজ্ঞ-পূজা-পার্ব্বণ-মূলক ধর্ম্মের আসনে ভক্তিপূর্ণ চিত্তে এই ডেমোক্রেসিকেই বসাইবে।

কিন্তু যদি নৈতিক উন্নতিসাধন ও পার্থিব সুখবিধান ব্যতীত মানবসমাজে ধর্ম্মের আর কোনও প্রয়োজন না থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে ইহা সফলকাম হইয়া কালক্রমে মানব-সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইবে, অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত এমন কোনও অচিন্তিতপূর্ব্ব নূতন অভাবের আবির্ভাব না হয় যাহা বর্ত্তমানের বৈষয়িক, সামাজিক ও নৈতিক অনুষ্ঠানগুলি দ্বারা মোচিত হইতে না পারে, ততদিন পর্য্যন্ত মানবসমাজে আর কোনও বিশেষ ধর্ম্মের প্রয়োজন থাকিবে না। এমন কোনও অভাবের আবির্ভাব হইয়াছে কি? অর্থাৎ দৈহিক ও নৈতিক অভাব মোচন করিয়া ডেমোক্রেসি এমন কোনও অভাবের সৃষ্টি করিয়াছে কি যাহা কেবল কোনও বিশুদ্ধ ধর্ম্মবোধ বা ধর্ম্মানুশীলন দ্বারাই মোচিত হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানের চেষ্টা করিতে গিয়াই আমরা ভবিষ্যতের মানবধর্ম্মের আভাষ পাইতেছি।

জীবজগতের বৈষম্য প্রকৃতির নিয়ম। ব্যক্তিগত শক্তির তারতম্যও প্রকৃতিগত কিন্তু ডেমোক্রেসিকে ব্যক্তিগত ক্ষমতার পুষ্টিসাধন করত এই বৈষম্যপূর্ণ সমাজে সাম্য, মৈত্রী ও জ্ঞান আনিতে হইলে কিরূপ শক্তি সঞ্চয় ও প্রথা অবলম্বন করিতে হইবে? উত্তরে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি যে জনগণের পূর্ণ সহযোগিতা ও সুবৃহৎ সমাজজীবনের প্রতি ব্যক্তিগত জীবনের অচলা ভক্তি ও দৃঢ় বিশ্বাস। ব্যক্তিগত নৈতিক ক্ষমতার উৎকর্ষসাধন ও বিশ্বশক্তির পরিচালনার জন্য মানবজাতির মধ্যে যে পূর্ণ সহযোগিতার প্রয়োজন, তাহা কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থের খর্ব্বতা সাধন দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে। প্রাকৃতিক শক্তি করতলগত করিতে গিয়া মানব-সমাজ যে সমস্ত নূতন ক্ষমতা ও গুপ্ত তথ্যের অধিকারী হইয়াছে, তাহাতে কত সাধকেরই না স্বাস্থ্যনাশ ও জীবনপাত ঘটিয়াছে। রেলপথ নির্ম্মাণ, সেতুগঠন, খালকর্ত্তন, ব্যোমযান উদ্ভাবন প্রভৃতি মানবসমাজের অশেষ উপকারী কার্য্যগুলির জন্য কত কর্ম্মীই না প্রাণ-দান করিয়াছে। নূতন তন্ত্রের (disease germ) আবিষ্কারে ও বিনাশে কত লোকই না স্বীয় জীবন বিপদাপন্ন করিয়াছে। আধ্যাত্মিক জগতের উন্নতিসাধনেও কম জীবন ব্যয় হয় নাই। যীশু, মহম্মদ, বুদ্ধ, চৈতন্যের জীবনকাহিনী কে না জানে? অনেক সময় এই মহাত্মাগণের জীবন সঙ্কটাপন্ন না হইয়া থাকিলেও, ইঁহাদিগকে প্রাণের ন্যায় প্রিয় স্বকীয় জীবনের আদর্শ ও আকাঙ্খা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে এবং নিন্দা, অপযশ, ভ্রূকুটি ও গালাগালিও কম সহ্য করিতে হয় নাই।

সমাজজীবনের শ্রীবৃদ্ধিসাধনের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে গিয়া এইরূপে অনেক মহাত্মাকেই দুঃখ, কষ্ট ও মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে। এখন প্রশ্ন এই যে, শক্তিমান্ ব্যক্তিগণ সমাজজীবনের উন্নতি ও

আদর্শ সাধনের জন্য কেন নিজ নিজ স্বার্থ, সুখ, সময় ও জীবন উৎসর্গ করিবে? একটী মাত্র কারণে এরূপ জীবনদান সম্ভব। সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হউক যে, ব্যক্তির চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী আত্মসুখ ও ক্ষুদ্র স্বার্থের বাহিরে আর একটী বৃহত্তর সমাজজীবন ও বিশ্বমানবের জগৎ রহিয়াছে, যাহা অধিকতর অচল, অমর ও মহান্। ইহাই যদি সত্য হয়, তবে এতাদৃশ আত্মোৎসর্গে ব্যক্তির লাভ ব্যতীত ক্ষতি নাই; কারণ কেবল এই প্রকারেই মানুষ ক্ষুদ্র স্বার্থের পরিবর্ত্তে বৃহত্তর স্বার্থ ও নীচতর জীবনের পরিবর্ত্তে উচ্চতর জীবনের সন্ধান পাইয়া থাকে—এইরূপেই মানুষ বিশ্বমানবের গৌরবময় আসনে উপবেশন করিবার যোগ্যতা লাভ করে। কিন্তু এই 'জীবন গেলে জীবন পা'ব, হোক জনম সফল' বাক্যটীর সত্যতা ও মূল্য সব সময় 'দাঁড়ি-পাল্লা-বাটকারা' দ্বারা ওজন করা সম্ভব হইবে না—ন্যায়ের যুক্তিও পরাভব মানিবে। তথাপি ইহা মানবচিত্তের তীব্র উন্মাদনা ও প্রিয় আদর্শরূপে সমাজজীবনে টিকিয়া থাকিবেই এবং ধর্ম্মের প্রকৃত আসন অধিকার করিয়া যুগে যুগে সমাজজীবনকে দীপ্ত, গৌরবময় ও প্রভাবান্বিত করিবেই। এই ধর্ম্মবোধের উপরই ডেমক্রেসি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ডেমক্রেসি নিজে ইহা উৎপাদন করিতে পারে না। ইহা আত্মার প্রকৃত ধর্ম্ম—জীবনের বিশিষ্ট লক্ষণ। 'বেচাকেনার' সমানুপাতে ইহাকে আনা যায় না। ডেমক্রেসিসৃষ্ট আধুনিক মানবসমাজে ইহাই একটী নূতন অভাব এবং ধর্ম্মই এই অভাব পূরণে সমর্থ। সমাজজীবনের উচ্চতর সত্তা ও বাস্তবতায় বিশ্বাস এবং সামাজিক কার্য্য ও আদর্শসাধন কল্পে ব্যক্তিগত জীবনের উৎসর্গকে অতিপ্রাকৃতিক বা আধ্যাত্মিক ভিত্তি প্রদান করা—ইহাই ভবিষ্যতের মানবধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের অসংখ্য সূক্ষ্ম নিয়মগুলি অনুমাণ করা আমাদের পক্ষে এখন একরূপ অসম্ভব—কেবল সংক্ষেপে ইহার কয়েকটী বিশেষত্ব প্রদান করা যাইতে পারে মাত্র।

প্রথমতঃ, এই বৃহত্তর সমাজজীবনের ঐকান্তিক সেবায় ব্যক্তিত্বের অমরত্ব উপলব্ধি এবং সমাজজীবনের সহিত ব্যক্তিগত জীবনের একত্ববোধ। পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কারের জন্য মানুষের পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণে, অর্থাৎ কর্ম্মমূলক জন্মান্তরবাদে আধুনিক মানুষ আর আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছে না। বিশ্বমানবের উন্নয়ন বা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বকীয় ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবন উৎসৃষ্ট করিয়া যাঁহারা আত্মশক্তির উৎকর্ষসাধন ও অমরত্ব-উপলব্ধি করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট আর কি উচ্চতর নৈতিক, ধর্ম্মবিষয়ক বা মানবীয় আদর্শ থাকিতে পারে? দ্বিতীয়তঃ, যে মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণ নীরবে ও অম্লান বদনে বিশ্বমানবের উন্নয়নের জন্য অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতেছেন, মৃত্যুর পরেও যাঁহাদের আদর্শ সতত মানবজাতিকে ত্যাগ ও বীরত্ব শিক্ষা দিতেছে এবং যাঁহারা নিম্নস্তরে থাকিয়াও অম্লানবদনে ও বিশ্বস্তভাবে সামাজিক কর্ত্তব্যগুলি সাধন করিতেছেন—তাঁহাদেরকে লইয়া একটী আধ্যাত্মিক সমাজের সৃষ্টি হইবে এবং এই আধ্যাত্মিক সমাজের উজ্জ্বল আদর্শ ও দীপ্তিময় প্রভাব ক্রমে ক্রমে সাধারণ মানবসমাজে পরিব্যাপ্ত হইবে। তৃতীয়তঃ, সমাজজীবনের ক্রমবিকাশের পরিচালকরূপে এক ঈশ্বর বা ঐশী শক্তির বিশ্বব্যাপিত্ব ও মঙ্গলময়ত্বের উপলব্ধি এবং বিশ্ব-বিবর্ত্তনে ইহার নিরবচ্ছিন্ন উপস্থিতি বোধ।

আলোচ্য বিষয়টীর সারাংশের সংক্ষিপ্ত পুনরাবৃত্তি করিয়া আমরা প্রবন্ধটীর উপসংহার করিব। মায়াবশে, ভয়ে ও প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষ স্বীয় বিবর্ত্তনের প্রত্যেক স্তরেই এক বৃহত্তর বা মহত্তর দেবতা, ঈশ্বর বা শক্তির নিকট আত্মশক্তির দীনতা ও হীনতা স্বীকার করিয়াছে। মানবচিত্তের সহিত ঐশী শক্তির এই সম্বন্ধের কারণ, কার্য্য ও ফল কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সম্বন্ধের মূল ধারাটী কখনই শুষ্ক হয় নাই। কিন্তু মানুষ কেন নানাবিধ ভূতপ্রেত, দেবদেবী, ছায়ামায়ার কল্পনা করিল, আমরা এখনও ঠিক করিয়া বলিতে পারি না—হয় তো বা কখনই বলিতে পারিব না। কেবল কল্পনাই করে নাই—চোখেও দেখিয়াছে। সমস্যা বড়ই কঠিন। সম্ভবতঃ মস্তিষ্ক-বিকাশের ক্রমকে ইহার একটী কারণরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এরূপ বিশ্বাস, কল্পনা ও দর্শনের অস্তিত্ব জগতের সমস্ত আদিম সমাজের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং এগুলিকে বাস্তব প্রাকৃতিক ও মানসিক ঘটনারূপে স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে। আধুনিক মানুষের নিকট এগুলি হাস্যকর, অপ্রয়োজনীয় ও অস্বাভাবিক বোধ হইলেও, তাহাদের নিকট নিতান্তই প্রয়োজনীয়, উপকারী ও স্বাভাবিক ছিল। এই সব বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আদিম মানুষ অনেক "হোঁচট" খাইয়াছে সত্য, কিন্তু এই বিশ্বাসের মধ্য হইতেই আবার অনেক নৈতিক ও মানবীয় গুণ লাভ করিয়া তৎকালের প্রয়োজনোপযোগী সমাজ গঠনে সমর্থ হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী কালের উচ্চতর সমাজজীবনের পথ প্রস্তুত করিয়াছে। ইহাই কালের শিক্ষা; বিবর্ত্তনের আত্মকথা ও ইতিহাসের উপদেশ।

কিন্তু মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক বিকাশের মূল ধারা সর্ব্বত্র একরূপ হইলেও, ইহার শাখা প্রশাখাগুলি দেশকালপাত্রভেদে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। কোথায় কোথায় অভিব্যক্তির ক্রমটীরও কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ও বিপর্য্যয় দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষই ইহার উজ্জ্বল উদাহরণ। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা, জ্ঞান ও নীতির সংমিশ্রণ ইহার একটী কারণ হইতে পারে। মানসিক ক্রিয়ার প্রকৃতিও বোধ হয় আর একটী কারণ। ব্যক্তির মনের ন্যায় সমাজমনও ক্লান্ত হইয়া সময় সময় বিশ্রাম করিতে চাহে। এই বিশ্রামের কাল নানা কারণ বশতঃ কখনও কখনও এত দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে যে, কোন কোন সমাজ অভিব্যক্তির মূল ধারাটী হারাইয়া উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতিকেই আলিঙ্গন করিয়া ফেলিয়াছে এবং কোনও কোনও সমাজ একবারেই লুপ্ত হইয়াছে। লোপপ্রাপ্তির উদাহরণ—ব্যাবিলন; অবনতির উদাহরণ—চীন, ভারতবর্ষ, পারস্য প্রভৃতি। ভারতবর্ষের—বিশেষতঃ বঙ্গদেশের নব্য ঐতিহাসিক ও সমাজবিদ্‌গণ গ্রীস ও রোমকেও এই লোপপ্রাপ্তির মধ্যে টানিয়া আনেন,—অর্থাৎ তাঁহারা বলিতে চাহেন যে, "গ্রীস, রোম ও মিসর জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে নিজ নিজ দেয় দান দান করিতে করিতে কালের ক্রোড়ে অন্তিম শয়ন লাভ করিয়াছে একমাত্র ভারতবর্ষই স্বধর্ম্মবলে এখনও জীবিত রহিয়াছে।" আসল কথা—ভারতবর্ষ জীবিতও নাই এবং গ্রীস ও রোম মরেও নাই। জীবনমৃত্যুর প্রকৃতি ও অর্থবোধের উপরই ইঁহাদের উক্তির যাথার্থ্য নির্ভর করিতেছে। কিন্তু এ সব অনেক কথা।

আদিম মানুষের মনের 'ঝাপসা' কাটিয়া

গেল, জীবনসংগ্রাম ঘোরতর হইল, ভয় হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া সাহস বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং প্রাকৃতিক জ্ঞানের গণ্ডী প্রসারিত হইতে লাগিল। এই ঘটনানিচয় ক্রমান্বয়ে ও স্বতন্ত্রভাবে সংঘটিত হয় নাই; পরন্তু সকলের ঘাত-প্রতিঘাতে প্রত্যেকটী বিকশিত, বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইয়াছে। ইহার ফলে সমাজজীবনে নূতন নৈতিক শক্তি, নূতন কর্ম্মবিধি ও নূতন চিন্তাপ্রণালী প্রবেশ লাভ করিল। কিন্তু মানুষ দেবতার কল্পনা ও আরাধনা ছাড়িল না—তফাৎ এই যে প্রেতাত্মার পরিবর্ত্তে প্রতিমা ও প্রকৃতির পূজা আরম্ভ করিল। কিন্তু এই সঙ্গে সমাজে একটী নূতন বিষয় প্রবিষ্ট হইল। এটী—শ্রেণী বিভাগ, দাস-প্রভু ও রাজা-প্রজা সম্বন্ধ। এই বিশ্লেষিত সমাজসম্বন্ধ হইতে মানুষের চিন্তা, কর্ম্ম ও নীতি-বৈচিত্র্য ও গভীরতা লাভ করিয়া আধুনিক সমাজে ডেমোক্রেসির পথ পরিষ্কার করিয়া দিল।

আধুনিক মানুষের প্রাকৃতিক জ্ঞান অসম্ভবরূপেই বাড়িয়া গেল এবং ইহার ফলে ঈশ্বরে বিশ্বাস আমূল পরিবর্ত্তিত হইল। ভূতপ্রেত, প্রকৃতি-প্রতিমা, ছায়ামায়া নবজ্ঞানের স্রোতে তৃণসম ভাসিয়া গেল। এখন কেবল একটী কথা লইয়া গোলযোগ। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, বিশ্বরচনা কেবলমাত্র অণুপরমাণুর ঘাত-প্রতিঘাত ও সংযোগবিয়োগ দ্বারাই (Physico-chemical action) সম্পন্ন হইতেছে, অন্য একদল বলিতেছেন,—না, জড় ও জীবন স্বতন্ত্র জিনিষ। নির্জীব অণুপরমাণু অভিব্যক্তিপ্রাপ্ত হইয়া প্রাণ সৃষ্টি করিয়া থাকিলেও প্রাণের প্রকৃতি, গতি ও ক্রিয়া জড় হইতে সম্পূর্ণই বিভিন্ন। এই প্রাণবাদ বা প্রাণত্বকে (Vitalism) জড়ত্বে বা জড়বাদে (mechanism) পর্য্যবসিত করা যাইতে পারে না। তৃতীয় দলের কেহ কেহ বলিতেছেন—সৃষ্টির মূলে ঐশী শক্তি ও উদ্দেশ্য (Divine purpose) বর্ত্তমান দৃষ্ট হয়; কেহ কেহ বা বিশ্ববিবর্ত্তনকে প্রকৃতিরই আত্মপরিচালননীতি রূপে (Directive principle in nature) নির্দ্দেশ করিতেছেন। এই ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সামাজিক জীবনও অনেক 'উলট পালট' হইয়া গেল। জাতিভেদ, দাসপ্রভু, রাজাপ্রজা সম্বন্ধের তীব্রতা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ষ্টেট্, ডেমোক্রেসি, সমানসুবিধা, সোস্যালিজম্, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি আসিয়া দেখা দিল। কিন্তু ডেমোক্রেসিকেই আধুনিক মানুষ সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম, নীতি ও কর্ম্মের ভিত্তিরূপে আঁকড়াইয়া ধরিল। স্বনামধন্য মার্কিন জননায়ক শ্রীযুক্ত লীম্যান্ য়্যাবোট্ ১৮৯০ সালে জানুয়ারী মাসের এক বক্তৃতায় ডেমোক্রেসী সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাস নিম্নোদ্ধৃতভাবে প্রকাশ করিতেছেন:—

"We are believers in democracy. We believe in political democracy —that it is the right of the people to rule themselves, not because they are always competent to govern, but because they are more competent to govern themselves than any one else is to govern them, and because they will learn quicker by their blunders than by the wisdom of any aristocracy set over them. We believe in educational democracy. Because we believe in the capacity of the

people for education we believe it is the duty of the republic to open the way for all her citizens to all the education that is necessary for a large and noble citizenship. We believe also in a democracy of wealth. We believe in a common wealth that really means what that noble word means, a wealth that is common. The problem of Political Economy in the past has been how to accumulate wealth; the problem in the future is how to distribute wealth. Therefore we believe in such a reform in taxation as will give us taxes on wealth, not on expenditure, and taxes direct, not indirect. We believe that capital and labor are partners, and that it is the right of labor to organise for their own protection and the enhancement of their wages. We believe that the people must control the Corporations, not the Corporations the people, and that the great high ways of the Nation, its iron and steel muscles, and the electric wires of the Nation, its nerves, must be under the control, if not under the ownership, of the body politic. We do not believe that Government is a necessary evil and the less we have of it the better. We have no wish to go back to a paternal Government nor to go back of that to the barbarism of individualism. We look forward to a fraternal Government in which the people shall have learned to do by their common will and their common industry the things that are for their common well-being. With me this belief is a religion. I hold that it is a infidel to deny the brotherhood of man as to deny the Fatherhood of God and the first infidelity is far more common in this country than the second." কিন্তু আমরা জানি যে কোনও এক মানুষের শক্তি ও সামর্থ্য অন্য একজনের শক্তি ও সামর্থ্যের সমান নয়; সুতরাং এই অসম-শক্তি ব্যক্তিগঠিত মানব-সমাজে কেবল আইন প্রণয়ন দ্বারা রাষ্ট্রে, অর্থে ও কর্ম্মে পূর্ণ সাম্য আনা যাইতে পারে না। এবং এরূপ সাম্য আনিবার চেষ্টায় ক্ষতি ব্যতীত লাভ নাই—কারণ ইহা অস্বাভাবিক। সমাজে এই সাম্যের আদর্শ কেবল মানবচিত্তের এক বিশেষ প্রকারের ধর্ম্মবোধ দ্বারাই লব্ধ হইতে পারে। ইহাই ত্যাগধর্ম্ম। এই ত্যাগের অর্থ কেবল ঈশ্বর সমীপে আত্মসমর্পণই নয়; এণ্ড্রু কার্ণেগী, রাসবিহারী ও তারকনাথের কেবল অর্থদানই নয়,—পরন্তু ইহা বিশ্বমানবসেবায় ব্যক্তির আত্মোৎসর্গ, মানবত্বের নিকট ব্যক্তিত্বের 'ধূলায় আসন' ও 'ভক্তিপূর্ণ প্রণাম'। এই নূতন প্রকারের ত্যাগধর্ম্মের সহিত প্রাচীন ভারত কিয়ৎ পরিমাণে পরিচিত থাকিলেও, বর্ত্তমান ভারত

বহু পরিমাণেই অপরিচিত—অবশ্য আবার স্রোত ফিরিয়াছে; আর পাশ্চাত্য জগৎ তো তাহার শত শত ডেমোক্রেসি ও সহস্র সহস্র অর্থদান সত্ত্বেও ইহার সন্ধানই পায় নাই। এই ত্যাগপ্রসূত আত্মার অমরত্ববোধই সমীপবর্ত্তী ভবিষ্যতের মানবধর্ম্ম।

পাশ্চাত্যজাতির সাধনালব্ধ ডেমোক্রেসির বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা আলোচনা হইতে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতিসাধন জন্য আমরা যে সমস্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারি, সে সমস্ত 'গৃহস্থের' সাহায্যে বঙ্গভাষার মধ্য দিয়া ভারতবাসীর নিকট ক্রমে ক্রমে উপস্থাপিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীনবীনচন্দ্র দাস

নবীন এশিয়ার জন্মদাতা

এশিয়ার ম্যাঞ্চেষ্টার

১। দেহাত্মক বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ারাম

জাপানী ঐতিহাসিকগণ ওসাকাকে শোতোকুতাইশি এবং কোরিয়ার বৌদ্ধ প্রচারকগণের প্রথম কর্ম্মকেন্দ্ররূপে গৌরব প্রদান করিবেন। তেন্নোজির প্যাগোডা দূর হইতে দেখিয়া এইরূপ ভাবিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই গাড়ীর জানালায় মুখ বাড়াইয়া দেখি চারিদিকে "চিম্‌নির" জঙ্গল। অসংখ্য ধূমনির্গমের নলে ওসাকাকে একটা সুবৃহৎ কারখানায় পরিণত করিয়াছে। জাপানের প্রাচীনতম কেন্দ্রে বর্ত্তমান জগতের নবীনতম নিদর্শন পুঞ্জীকৃত রহিয়াছে। টোকিওর কল-যন্ত্রফ্যাক্টরি ইত্যাদি দেখিয়া ওসাকার রূপ কল্পনা করা যায় না। টোকিওতে প্রাচীন ও মধ্যযুগের চিহ্ন এখনও অনেক আছে—ওসাকা পুরাপুরি আধুনিক নগর। এখানে তেন্নোজি-বিহার আজকাল একটা খাপছাড়া পদার্থ। ইয়াঙ্কিস্থানের শিকাগো অথবা ইংরাজের ম্যাঞ্চেষ্টার যেন নিপ্পনদেশের এই সাগরকূলে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

শ্রাবণ মাসে ওসাকাতে যেরূপ গরম পাইতেছি কলিকাতায়ও এত দেখা যায় না। রাস্তার দুই ধারের দোকানদারেরা ছাদে ছাদে তার লাগাইয়া কাপড়ের আবরণ প্রস্তুত করিয়াছে। এই কারণে গলির ভিতর সূর্য্য-কিরণ প্রবেশ করিতে পারে না। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে এইরূপ করিবার প্রয়োজন হয়—মিশরের কাইরোতেও এইরূপে গলি ঢাকিবার ব্যবস্থা দেখিয়াছি। যাঁহারা বলিয়া থাকেন ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ বলিয়া ভারতীয় চরিত্র উন্নত হইতে পারে না তাঁহারা একবার ওসাকায় আসিয়া বাস করুন। ত্রিশ বৎসরের ভিতর নিতান্ত গ্রীষ্ম-পীড়িত মশকপ্রধান ম্যালেরিয়া বাথানেও

একটা ম্যাঞ্চেষ্টার গড়িয়া উঠিয়াছে—ইহা স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন।

আমরা ভারতবর্ষে মুক্তি, নির্ব্বাণ, ত্যাগ, বৈরাগ্য, সংযম, ইন্দ্রিয়দমন, ব্রহ্মচর্য্য ইত্যাদি শব্দ অত্যধিক ব্যবহার করিয়া থাকি। প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই সমুদয়ের ব্যবহার আরও বেশী ছিল। বর্ত্তমান কালে ব্যক্তিগত জীবনে, এবং সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠানে এই সমুদয় তত্ত্বের প্রয়োগ হউক বা না হউক, এগুলি মুখে আওড়ান এখনও আমরা বন্ধ করি নাই। "ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে"—এ কথা আমরা বোধ হয় চিরকালই বলিব। কথাটা যেন ভবিষ্যতে কার্য্যেও পরিণত হয়।

দুনিয়ার অন্যান্য সমাজে এই সকল শব্দ অথবা তত্ত্বের রেওয়াজ এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। ইংরাজ ও ইয়াঙ্কি—কেহই ব্রহ্মচর্য্য, বৈরাগ্য, ইন্দ্রিয়দমন ইত্যাদির ধার ধারে না। জাপানেও দেখিতেছি এখানকার লোকেরা "ইন্দ্রিয়ারাম" এবং "দেহাত্মক বুদ্ধি"কে ভারতবাসীর আদর্শানুসারে গর্হিত বিবেচনা করে না। খাওয়া দাওয়া স্ফূর্ত্তিকরা—সকল প্রকার ভোগ প্রবৃত্তির চূড়ান্ত প্রশ্রয় দেওয়া—দুনিয়ার মানবের স্বধর্ম্ম দেখিতেছি। তথাপি দুনিয়ার লোক উন্নত মস্তকে জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে। তথাপি ইহাদের শারীরিক শক্তি এবং সামরিক বলের হ্রাস হইতেছে না। তথাপি ইহারা প্রয়োজন হইলে একসঙ্গে লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রাণ দিতেছে। পরকালে ইহাদের কি হইবে তাহা ত জানি না—ইহকালে দেখিতেছি জাপানী বল, ইংরাজ বল, ইয়াঙ্কি বল সকলেই পার্থিব সুখের কোন বস্তুতে বঞ্চিত হইতেছে না। আর ভারতবাসী পরকালে নন্দন কাননে বিচরণ করিবেন কি না কে বলিতে পারে? বর্ত্তমানে ত দেখিতেছি সুখ, আনন্দ, স্ফূর্ত্তি, ভোগ ইত্যাদি কাহাকে বলে ভারতবাসীর অভিধানে তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভারতবাসীর না আছে শরীরে বল, না আছে চিত্তে শক্তি, না আছে ঘরে চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয়, না আছে হাটে বাজারে বাগানে পাহাড়ে খেলা ধূলা আমোদ প্রমোদ। ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়াও দুনিয়ার লোক "ফার্ষ্ট-ক্লাশ পাওয়ার" হইবার উপযুক্ত হইতে পারে। আর আমরা সংযম সন্ন্যাস ব্রহ্মচর্য্য ইত্যাদি আওড়াইয়াও একটা বড় ধরণের ব্যবসায় চালাইতে অসমর্থ হইতেছি। আমরা দেশে যেসকল কার্য্যকে নিতান্ত ঘৃণিত জঘন্য ও পাশবিক বিবেচনা করি তাহা স্বত্বেও জগদ্বাসী পৃথিবীতে কৃতকার্য্য হইতেছে। আমাদের হিসাবে যে সকল নরনারী চরিত্রহীন অথবা নীতিভ্রষ্ট সেই সকল নরনারী বাদ দিলে বর্ত্তমান জগতের কোন সমাজে লোক খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এই কথাটা সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণের গভীর ভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।

কাম, কাঞ্চন, কীর্ত্তি—এই তিন বস্তু আমাদের ভারতীয় চিন্তায় আধ্যাত্মিক জীবনের অন্তরায়। এগুলিকে পুরাপুরি না হউক—অন্ততঃ খানিকটা দাবিয়া রাখা আমাদের দেশে চরিত্রবত্তার লক্ষণ। ইয়োরামেরিকার লোকেরা এবং জাপানীরাও কোন বিষয়েই সংযমপালনের বিশেষ আবশ্যকতা আছে স্বীকারই করে না। "জন্মগ্রহণ করিয়াছ—যে ক্ষেত্রে যাহা পার করিয়া যাও"—ইহাই সকল জাতির ব্যক্ত অথবা অব্যক্ত নীতি। কীর্ত্তির কথাই ধরা যাউক—ইহা ত "last infirmity of noble minds."

যশের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে জগতে কয়জন পারে? ভারতের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিগণ কীর্ত্তির বাসনা বর্জ্জন করিয়াছেন এবং করিতে উপদেশ দেন। কিন্তু জগতের লোক কীর্ত্তি অর্জ্জন করিবার জন্যই ব্যস্ত। তাহারা জানে—"সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে।"

তাহার পর কাঞ্চনের কথা। টাকা পয়সার প্রতি লোভ নাই ইংল্যাণ্ডে, আমেরিকায় অথবা জাপানে এরূপ লোক আছে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। ভারতবর্ষে এরূপ লোক খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইবে না। "ঘুশ খাওয়া" দুনিয়ার সর্ব্বত্র প্রচলিত। আমেরিকায় অর্থগৃধ্নুতা বা "Corruption" আবহাওয়ার সঙ্গে যেন এক প্রকার মিশিয়া রহিয়াছে। বিলাতের কার্য্যালয়সমূহে ঘুশ দিবার ও লইবার রেওয়াজ বেশ আছে। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরাও "টিপ্" পাইলে মিষ্টভাবে "Thanks" শব্দ ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত। ট্যাক্সির গাড়োয়ান হইতে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার পর্য্যন্ত সকলেই পদমর্য্যাদা অনুসারে "টিপ্" অর্থাৎ বক্শিষ অর্থাৎ ঘুশ লইয়া থাকেন। সরকারী কাজে চুরি বাটপাড়িও সর্ব্বত্রই সুপ্রচলিত। বৎসর দুএক হইল জার্ম্মাণ গবর্মেণ্টের সেনাবিভাগে এইরূপ Corruptionএর কলঙ্ক প্রচারিত হয়। একজন উচ্চপদস্থ সেনাধ্যক্ষ চৌর্য্য অপরাধে দণ্ডিত হন। এই জার্ম্মাণ অর্থগৃধ্নুতার সঙ্গে জাপানী অর্থগৃধ্নুতা লিপ্ত ছিল। জার্ম্মাণ সরকারের অনুসন্ধানে একজন জাপানী নাবাধ্যক্ষের চৌর্য্যবৃত্তি ধরা পড়ে। জাপান সরকারকে তৎক্ষণাৎ জানান হয়। জাপানী নাবাধ্যক্ষের শাস্তি হইয়াছে। জাপানে আসিয়া অবধি প্রতিদিন শুনিতেছি আজ অমুক পার্ল্যামেণ্ট সভ্যকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে—আজ অমুক ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে জেলে পাঠান হইল ইত্যাদি। ইঁহাদের অপরাধ—সরকারী টাকা "মারিয়া লওয়া," embezzlement, ঘুশ খাওয়া, অর্থপৈশাচিকতা ইত্যাদি এমন কি এখানে মন্ত্রি-পরিষৎকেও বিশ্বাস করা চলে না। বহুক্ষেত্রে বহু মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ঘুশ খাওয়ার অভিযোগ হইয়াছে। বর্ত্তমান ওকুমা মন্ত্রি-পরিষদের আমলে নাকি কর্ম্মচারিগণের চরিত্র খানিকটা নিষ্কলঙ্ক। তথাপি কাণাঘুশা বেশ চলিতেছে। কাগজ পত্রে প্রকাশিত হয়—"মন্ত্রিবর ওকুমা চিরকাল ন্যায়পরায়ণতা, চরিত্রবত্তা, লোভহীনতা, কাঞ্চন-সংযম ইত্যাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া আসিয়াছেন। তথাপি তাঁহার আমলে অমুক অমুক বিভাগে উৎকোচ গ্রহণের জনরব প্রকাশিত হয় কেন?" শেষ পর্য্যন্ত একদিন কাগজে পড়িলাম—ওকুমার প্রধান সহকারী ভাইকাউণ্ট মহাশয়ের বিরুদ্ধে ঘোরতর অভিযোগ তোলা হইয়াছে। এই কারণে ওকুমা-মন্ত্রি-পরিষৎ মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিলেন। কাঞ্চনের স্পৃহা জাপানে কম কি? তথাপি জাপান "ফাষ্ট ক্লাশ পাওয়ার"! সুতরাং অর্থ-পিশাচ বলিয়া ভারতবাসী অবনত এরূপ ভাবা অনুচিত।

কীর্ত্তির আকাঙ্ক্ষা বা কাঞ্চনের আকাঙ্ক্ষা ভারতবাসীর চিন্তায় পাপস্বরূপ—কিন্তু জানিয়া রাখা আবশ্যক যে এই পাপ ভারতবাসীরই একচেটিয়া নয়

এইবার কামের কথা—এ বিষয়ে আলোচনা না করাই ভাল। ইয়োরামেরিকার সমাজে কামবিষয়ক সংযম কাহাকে বলে তাহা জানা নাই। আমাদের "ব্রহ্মচর্য্য" পালন এবং সতীত্ব এ সকল দেশের পারিবারিক ও

সামাজিক নিয়মে স্থান পাইতেই পারে না। সকলেই যথাসম্ভব চোখ বুজিয়া জীবনযাপন করে—পরস্পর পরস্পরের ভিতরকার কথা না জানিলেও সহজেই অনুমান করিয়া লয়। অসংযম, অনিয়ম বা ব্যভিচার ইত্যাদি মারাত্মক দোষরূপে গৃহীত হয় না। যে কোন ভারতবাসী ইহাদের কাণ্ড দেখিলে শিহরিয়া উঠিবেন।

জাপানেও এই কথা—উচ্চ শ্রেণী, মধ্য শ্রেণী, নিম্ন শ্রেণী সকল শ্রেণীর লোকই বেশ্যাসক্ত। প্রকাশ্যভাবে বেশ্যালয়ে যাওয়া আসা নিন্দিত নয়। ইয়োরামেরিকার খৃষ্টানেরা বেশ্যা শব্দ ব্যবহার করিতে নারাজ—কিন্তু বেশ্যাবৃত্তি বলিলে যাহা বুঝা যায় তাহা জাপানে যেরূপ পাশ্চাত্য সমাজেও সেইরূপ। অতএব দেখা যাইতেছে বেশ্যাসক্ত সমাজও পোর্টআর্থরে প্রাণ দিবার জন্য লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিকে পাঠাইতে পারে। আর আজ এইরূপ সংযমহীন সমাজ-সমূহ হইতেই বহুলক্ষ যুবক ও প্রবীন লোক ইয়োরোপের কুরুক্ষেত্রে প্রেরিত হইয়া মল্লযুদ্ধ করিতেছে। কাজেই কথায় কথায় ভারতীয় চরিত্রের অবনতিকে আমাদের অকৃত-কার্য্যতার কারণরূপে সপ্রমাণ করা উচিত নয়।

বিশুদ্ধ আমোদপ্রমোদ, সংযত ইন্দ্রিয়ারাম, নির্ম্মল আনন্দভোগ ইত্যাদি ত এই সকল দেশে আছেই। ভারতবাসীর মত নিরানন্দ ও নির্জ্জীবভাবে দুনিয়ার কোন লোক জীবন-ধারণ করে না। ওসাকাতে হোটেলের জানালা হইতে দেখিতেছি শত শত বালক যুবক বৃদ্ধ য়োদোগাওয়া নদীতে একসঙ্গে দল বাঁধিয়া সাঁতার দিতেছে। সন্ধ্যার পর সহর দেখিতে বাহির হইলাম। প্রত্যেক রাস্তায় ও গলিতে নরনারীর সংখ্যা অত্যধিক। সকলেই নৈশ ভোজনের পর বেড়াইতে বাহির হইয়াছে—কাহারও চিত্তে উদ্বেগ নাই আশঙ্কা নাই—দৈন্য নাই। কেহ রাস্তার আলো দেখিতেছে—কেহ দোকানগৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভিতরকার সাজান জিনিষগুলি দেখিতেছে—কেহ ধীরে ধীরে পায়চারি করিতেছে। নৈশ ওসাকার লোকজন, গতি-বিধি এবং আলোকমালা দেখিয়া নৈশ শিকাগো মনে পড়ে। থিয়েটার, বায়স্কোপ, নাচগান বাজনা ইত্যাদি বহির্ম্মুখী জীবনের সকল অনুষ্ঠানই জাপানের এই নবীন নগরে রাশীকৃত। পার্কে যাইয়া দেখি সেখানেও লোকের ভিড়। প্যারির Eifel Towerএর অনুকরণে ওসাকায় একটা টাওয়ার আছে। রাত্রিকালে বৈদ্যুতিক বাতির শোভায় ইহা সমুজ্জ্বল থাকে। ইলেকৃট্রিক লিফ্টের সাহায্যে লোকেরা শিখরে উঠিতে পারে—সেখান হইতে সমগ্র নগরের নৈশদৃশ্য দেখা যায়।

একবার রাত্রিকালে নৌকায় বাহির হইলাম। ক্ষুদ্র তরণী বিদ্যুতের শক্তিতে চলিতেছে। এইরূপ প্রমোদতরী ওসাকায় সহস্র সহস্র দেখিতে পাই। এতদ্ব্যতীত বহু-সংখ্যক বজরা, পান্সি, ছিপ ইত্যাদিও নানা চীনা লণ্ঠনের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া খালে ও নদীতে ভাসিতেছে। কোনটা হোটেল বা রেস্তরাঁ বা সরাই—কোনটা বা সৌখীন নর-নারীগণের বিহার-নৌকা। সহরের ভিতর দিয়া খাল ও নদী অনেক গিয়াছে। ওসাকায় স্থলপথের সংখ্যা বেশী কি জলপথের সংখ্যা বেশী বুঝিয়া উঠা কঠিন মনে হয়। এই কারণে ওসাকাকে এশিয়ার ভেনিস বলা হইয়া থাকে। রাত্রিকালে নৌকা হইতে দুই-দিকে দেখিতেছি নাচগান বাজনা আমোদ-

প্রমোদ বিশ্রাম, আনন্দ ইত্যাদির আয়োজন। নৈশ ওসাকায় কুত্রাপি চিন্তা, উদ্বেগ, আশঙ্কা, দুঃখ নাই।

সহর হইতে কিছু দূরে একটা পাহাড়ে বেড়াইতে গেলাম। মেপল্ তরুর জঙ্গলে এই পাহাড় সমাবৃত। মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র ঝরণা বাহিয়া যাইতেছে—দুইধারে উচ্চ পাড়। বক্র পথে পাদদেশ হইতে প্রায় ১৫০০ ফিট ঊর্দ্ধে উঠিলাম। ঝরণার উৎপত্তি স্থানে একটা সুবৃহৎ জলপ্রপাত। প্রায় ১০০ ফিট নিম্নে জল লাফাইয়া পড়িতেছে। এই পথে বহু জাপানী নরনারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সকলেই গরমের দিনে বৃক্ষসমাচ্ছাদিত পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে চলিয়াছে। অনেকে কিছুকাল এইখানে কাটাইবে। এজন্য বহু সরাই এবং হোটেল পার্ব্বত্য কুঞ্জবনে দেখিতে পাইলাম। জলপ্রপাতের সম্মুখস্থ একটা সরাইয়ে কয়েক ঘণ্টা কাটান গেল। একটা তাজা মিরুগেল মাছ ধরাইয়া বাঙ্গালী ঝোল প্রস্তুত করান হইল। বেগুন, আলু, কাঁচালঙ্কা ইত্যাদির ঝোল বহুদিন পরে আস্বাদন করিলাম। দোভাষী মহাশয় কাঁচা মাছই খাইলেন।

জাপানীরা সৌন্দর্য্যপ্রিয় এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যের অনুরক্ত। জাপানের ভিতর যতগুলি রমণীয় স্থান আছে সকলগুলির নাম ও বিবরণ ইহাদের সকলেরই জানা থাকে। ইহারা মাসের নাম করিতে হইলে সেই মাসে যে ফুল বেশী ফুটে তাহার উল্লেখ করে। ইহাদের চিত্রকলায় দেশের নদনদী, বনউপবন, পর্ব্বত, হ্রদ, সাগর কূল ইত্যাদি সবই চিরস্থায়ী হইয়াছে। আজ দেখিলাম কতিপয় চিত্র-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ এই ঝোরায় আসিয়া চিত্রাঙ্কন করিতেছে। Feudal and Modern Japan নামক গ্রন্থে Knapp লিখিয়াছেন—"It is not uncommon to read in the public journals that some prominent noble or minister of state is journeying to view some famed cherry blossom grove, and there soon follows the poem which the vision of beauty is sure to evoke from his pen."

জাপানীদের সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা এবং প্রকৃতি-পূজা দু'একদিনের জিনিষ নয়। অষ্টম শতাব্দীতেও জাপানী গ্রন্থকারেরা দেশের বৃত্তান্ত লিখিতে যাইয়া প্রকৃতির সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিবৃত করিতেন। এই সকল ভৌগোলিক পুস্তক পাঠ করিয়া জনসাধারণ স্বদেশের প্রকৃত মূর্ত্তি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিত। এবং দেশের পরিচয় লাভ করিবার জন্য পর্য্যটনে বাহির হইতে উৎসাহিত হইত। স্বদেশ-প্রেম জাগাইবার পক্ষে এইরূপ ভূগোল-রচনা এবং প্রকৃতি-পূজা অল্প সাহায্য করে নাই। প্রকৃতি-সেবক য়ামাতো-সন্তান আপনা আপনিই স্বদেশভক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

২। ওসাকার ফ্যাক্টরি ও মিউনিসিপ্যালিটি

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ওসাকাতে একটিও কল কব্জা যন্ত্র ইত্যাদি ছিল না। আজ এখানে কলের চরকাই আছে বিশলক্ষেরও অধিক। বিলাতের ম্যাঞ্চেষ্টারে চরকার সংখ্যা ইহার দ্বিগুণ মাত্র।

চীনে, কোরিয়ায় এবং এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে মাল যোগান ওসাকার মহাজনগণের কার্য। ভারতবর্ষের বাজার দখল করিবার জন্যও ইহাঁরা লালায়িত। এশিয়ার এই ম্যাঞ্চেষ্টার আসল ম্যাঞ্চেষ্টারের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে।

ওসাকার একজন জাপানী খ্রীষ্টান ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ হইল। নাম তানাকা। ইনি কিয়োটোর দোশিষা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়াছেন। পৃথিবী পরিভ্রমণও ইহাঁর হইয়াছে। ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"চীনারা ত কয়েক মাস হইল জাপানী মাল বয়কট সুরু করিয়াছে। তাহার ফলে আপনাদের ক্ষতি হইতেছে কি?" তানাকা বলিলেন—"যথেষ্টই হইতেছে। আমাদের বহু মহাজনের ঘরে মাল পচিতেছে। ইয়োরোপীয় যুদ্ধের ফলে জার্ম্মাণ এবং অষ্ট্রিয়ান মাল ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আমেরিকা ইত্যাদি দেশে আসিতে পারিতেছে না। এই সকল বাজারের কিয়দংশ জাপানীদের হস্তগত হইয়াছে। কিন্তু চীনা বয়কটে আমাদের যত অনিষ্ট হইতেছে তাহা পুরণ হওয়া সহজ নয়। চীনেই জাপানের বৃহত্তম বাজার। ওসাকার সমৃদ্ধি চীনের উপরই নির্ভর করে।"

জাপানে তুলার চাষ নাই—বিদেশী তুলা আমদানি করা হয়। ওসাকা তুলার কাপড়ের কলের জন্যই বিখ্যাত। ভারতীয় ধুতি প্রস্তুত করিতে এখানকার শিল্পীরা জানে না। তানাকা ধুতি দেখিবার জন্য একবার হোটেলে আসিলেন।

ছোট বড় মাঝারি সকল প্রকার কারখানার সংখ্যা ১০০০এর কম হইবে না। পশম, ধাতু, তেল, জাহাজ, দিয়াশলাই, যন্ত্র, সাবান, সিগারেট, ঔষধ, ছাতা, রং, কাগজ, বাতি, ল্যাকার, কার্পেট, থলে, লোহার সিন্দুক, বাদ্যযন্ত্র, ঘড়ি ইত্যাদি নানা বিষয়ের কারখানা ওসাকায় দেখিতে পাওয়া যায়। রেশমের ফ্যাক্টরি এখানে নাই। সাত আট হাজার টাকা মূলধনের কারবার নিতান্ত কম নয়। কোটি টাকা মূলধনের কারবার বোধ হয় দশ বারটা মাত্র হইবে। লক্ষ টাকা মূলধনের কারবারই সাধারণতঃ দেখিতে পাই।

একটা সুবৃহৎ চামড়ার কারখানায় গেলাম। এখানে আজকাল রুশ গবর্মেণ্ট যুদ্ধের জন্য ঘোড়ার সাজ ইত্যাদি প্রস্তুত করাইতেছেন। ম্যানেজার বলিলেন—"মহাশয়, ফ্যাক্টরি দেখান সম্প্রতি অসম্ভব। কোন বিদেশীয় লোককে রুশ সেনাবিভাগের দ্রব্যাদি দেখিতে দিলে রুশ গবর্মেণ্ট দুঃখিত হইবেন।"

একজন উচ্চশিক্ষিত যুবক ব্যবসায়ী চামড়ার কারখানা দেখাইতে সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ইনি বলিলেন—"মহাশয়, আমার মাতা যদি জানিতে পারেন যে, আমি এই ফ্যাক্টরিতে আসিয়াছিলাম তাহা হইলে আমাকে শুদ্ধ না করিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে দিবেন না।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"সে কি রকম?" যুবক বলিলেন "চামারেরা জাপানে অস্পৃশ্য জাতি। ইহাদিগকে ইত্তা বলে। ইহাদিগকে যদি স্পর্শ করি তাহা হইলে আমরা অশুদ্ধ হইয়া যাই। পুনরায় শুদ্ধ করিবার জন্য আমাদের উপর নুন ছিটান হইয়া থাকে।"

একটা কাচের কারখানা দেখিলাম। বড় বড় কাচের পাত এখানে তৈয়ারি হয় না। নানা প্রকার গ্লাশ, বাটি, ইত্যাদি ঢালাই করা তৈজসপত্র এই ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুত হয়। বালু ও চূণ কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে মিশাইয়া আগুনের ভাটিতে গলান হইয়া থাকে। এই গলান বস্তুই কাচ। পরে ইহা নানা আকারের ছাঁচে ঢালিতে হয়। নানা ভাটির সম্মুখে এই ঢালাই কাজ দেখিলাম। নিতান্ত শিশুগণকে এই কারখানায় কষ্টজনক কাজ করিতে দেখা গেল। এখান হইতে বহু বাক্স

কাচের বাসন কলিকাতায় ও বোম্বাইয়ে রপ্তানি হইতেছে শুনিলাম।

ওসাকায় লোক সংখ্যা ১,৪০০,০০০। তাহার মধ্যে মজুরের সংখ্যা লক্ষাধিক। ম্যাঞ্চেষ্টারের মত এই নগরে বড় বড় "tenement house" ব্যারাকের ভিতর কুলীদিগকে থাকিতে হয় না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরে ইহারা বাস করিবার সুযোগ পায়। এই জন্য শ্রমজীবী মহলে স্বাস্থ্যহানি বেশী হয় না।

প্রতি বৎসরই এই শিল্প ও ব্যবসায়-কেন্দ্রের উন্নতি সাধিত হইতেছে। কাঠের বাড়ী আগুনে প্রায়ই পুড়িয়া যায়। নূতন গৃহ নির্ম্মাণের সময় মিউনিসিপ্যালিটি প্রশস্ত রাস্তা তৈয়ারি করিবার ব্যবস্থা করেন। পূর্ব্বে যেখানে সঙ্কীর্ণ গলি ছিল আজ সেখানে কলিকাতার হ্যারিসন রোড দেখিতে পাই। আমেরিকার রীতিতে বড় বড় ইষ্টক প্রাসাদও সর্ব্বত্র মাথা তুলিতেছে। বহির্ব্বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ওসাকাবন্দরে বিরাট পোতাশ্রয় নির্ম্মিত হইতেছে। আগামী বৎসর ইহা কার্য্যোপযোগী হইবে। নবীন জাপানের নবীনতম জীবন বুঝিতে হইলে ওসাকাতে আসা আবশ্যক।

কয়েক বৎসর হইল এই দৈনিকোন্নতিশীল নগর সম্বন্ধে The Far East নামক সাপ্তাহিক পত্রে Osaka revisited শীর্ষক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"But Osaka still has its narrow streets, mile after mile of shops, factories, warehouses, and markets, with goods of every conceivable description blocking up the way and myriads of toilers active as bees in a hive. How do these people live, what do they make, and with whom do they trade? Countless thousands busily emplyed outside the modern factories, engaged in home industry, each supplying its quantum of goods for consumption in Japan, in China or in India. Countless thousands inside the big factories at spindle and loom, grimy beings young and old, bottle flowers, machine shop denizens, soap makers, all these and thousands more are concentrated on the few square miles of Osaka. * * * Away beyond the crowded city, in the harbour districts are more miles of shipping and shipmakers, carpenters and block makers, iron works and iron workers, more grime and activity; all representing the real Great Powers of the world, Capital and Labour; away beyond the crowded city landward the twinkling lights in the farmer's houses in the evening show them to be still at work. The day's work in the fields is done, but they are still busy—they are factory workers, too, busy at home with articles for export, tooth-brushes and all sorts of things for what they provide cheap labour, and which find a market

in far away Australia, in South America and even in London itself. Toilers by day and toilers by night, the industry of the race is typified in Osaka."

বয়ন-ফ্যাক্টরির কয়েকজন পরিচালকের সঙ্গে আলাপ হইল। একজন টোকিওর টেক্‌নিক্যাল বিদ্যালয়ে অধ্যাপক ছিলেন। নাম হিরাগা। ইঁহার কারখানা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সাকাই-বন্দরের নিকট অবস্থিত। সাকাই বর্ত্তমানকালেও বাণিজ্য-কেন্দ্র রহিয়াছে। এখান হইতে নৌকা চালাইয়া কোরিয়া যাইবার প্রথা এখনও চলিতেছে। কয়েকজন কোরিয়াযাত্রী মাঝির সঙ্গে দেখা হইল।

ওসাকার ট্রামগুলি মিউনিসিপ্যালিটির সম্পত্তি। ম্যাঞ্চেষ্টারেও এইরূপই দেখিয়াছি। মেয়রের একজন সহকারী বলিলেন—"আমি কয়েক বৎসর ফ্রান্সে ও বিলাতে মিউনি-সিপ্যালিটির কার্য্য শিক্ষা করিয়া আসিয়াছি। বিলাতী স্বাস্থ্যরক্ষার প্রণালী ওসাকাতে অবলম্বন করা একপ্রকার অসম্ভব দেখিতেছি। বিলাতে পায়খানার ময়লা নলের সাহায্যে জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু জাপানীরা এই ময়লা নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে না। আমাদের দেশে জমির সারের জন্য এই সকল ময়লা রক্ষা করা হইয়া থাকে। কাজেই পাশ্চাত্য দেশের মিউনিসিপ্যাল ব্যবস্থা জাপানে প্রবর্ত্তিত হওয়া এখনও সুদূর ভবিষ্যতের কথা।"

এখানকার ডেপুটি-মেয়র শ্রীযুক্ত ডাক্তার সেকি ওসাকার একজন প্রসিদ্ধ ধন-বিজ্ঞান-বিৎ। ইনি বলিলেন—"এতদিন টোকিও কিয়োটো এবং ওসাকা এই তিন নগরের মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তা গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেন। অল্পদিন হইল জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচনের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।" সেকিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ওসাকা জাপানের শিল্পকেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিল কেন?" উত্তর পাইলাম—"ওসাকার অপর পারে কিউসিউ দ্বীপ। এই দ্বীপে কয়লা ও লৌহের খনি আছে। জাপানে আর কোথাও এই দুই ধাতু উৎপন্ন হয় না। কিউসিউ হইতে ওসাকার ভিতর অতি সহজে কয়লা আমদানি করা চলে। খালের ভিতর দিয়া সাধারণ নৌকাগুলি স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করিতে পারে। এই জন্যই ওসাকানগরে এতগুলি কারখানা গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছে। অধিকন্তু আমাদের বাজার প্রধানতঃ চীনে ও কোরিয়ায়। ইয়োকোহামা হইতে ওসাকা এই দুই বাজারের নিকটে তাহা ছাড়া জাপানের প্রাচীনতম যুগেও এই নগর বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। বস্তুতঃ কিউসিউ হইতে জাপানের সর্ব্বপ্রথম মিকাডো প্রধান দ্বীপের এই বন্দরেই পদার্পণ করেন। তাহার পর য়োদা গাওয়া নদী বহু খালের জন্মদাত্রী হয়। সে আজ আড়াই হাজার বৎসরের কথা। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ হইতে অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের যুগেও এশিয়ার সঙ্গে ভাবের ও কর্ম্মের আদান প্রদান এই কেন্দ্রেই সাধিত হইত। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে হিদেয়শি ওসাকাতে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন—সঙ্গে সঙ্গে বন্দরের উন্নতিও সাধন করেন। এই অঞ্চল হইতেই জাপানী নেপোলিয়ন কোরিয়ায় অভিযান পাঠাইয়া ছিলেন। এবং জাপানের দুর্দ্দান্ত ডাইমোদিগকে সন্ত্রস্ত রাখিতেন। হিদেয়শির দুর্গ আজও দেখিবার জিনিষ।"

অবশ্য তোকুগাওয়া যুগে জাপানের সঙ্গে

বিদেশের বাণিজ্য পুরাপুরি স্থগিত থাকে। কিন্তু শোগুণেরা ওসাকাকে শিল্পকেন্দ্রে পরিণত করিতে এবং এখানে অন্তর্ব্বাণিজ্যের সুবিধা সৃষ্টি করিতে যারপর নাই চেষ্টিত ছিলেন। প্রাচীন খালগুলি ইহাঁদের আমলে বিশেষ উন্নতি লাভ করে।

কিউসিউ দ্বীপে যত লৌহ উৎপন্ন হয় তাহাতে জাপানীদের অভাব পূরণ হয় না। জাপানকে বিদেশ হইতে প্রচুর লোহা আমদানি করিতে হয়। চীন ও মাঞ্চুরিয়ার খনিসমূহ হস্তগত করিবার নিমিত্ত এই জন্যই জাপানের এত আগ্রহ। বর্ত্তমান যুগে কয়লা ও লৌহ যে দেশের আয়ত্ত নহে তাহার উন্নতি দ্রুত চলিতে পারে না।

হোটেলের পার্শ্বেই একটা প্রকাণ্ড সৌধ নির্ম্মিত হইতেছে। সমগ্র মেজের লোহার কাঠামো খাড়া করা হইয়াছে। এই লৌহ "ফ্রেমের" উপর ইট পাথরের গাঁথনি বসান হইবে। আমেরিকাতে এবং ইয়োরোপেও এই ধরণের গৃহনির্ম্মাণই আজকাল বেশী দেখা যায়। বহুতলবিশিষ্ট উচ্চ ভবনসমূহকে ভূমিকম্পের প্রভাব হইতে রক্ষা করিবার জন্য লোহার কাঠামো বিশেষ উপকারী।

শুনিলাম টাউনহলের জন্য এই সৌধ নির্ম্মিত হইতেছে। খরচ হইবে ১৫ লক্ষ টাকা। একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি সমস্ত টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহার ভগ্নীপতির সঙ্গে আলাপ হইল। ইনিও একজন ধনী মহাজন। নানাপ্রকার কারবারে ইহাঁর টাকা খাটিতেছে।

মহাজনটি সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া আসিয়াছেন। ইনি একজন গোঁড়া বৌদ্ধ। আমাদের দেশে যেমন গৃহদেবতা, ঠাকুরঘর ইত্যাদি থাকে জাপানী গৃহেও সেইরূপ "কামিদান," "বুৎসুদান" ইত্যাদি দেব-মন্দির থাকে। মহাজন তাঁহার গৃহের বৌদ্ধ মন্দির যত্নসহকারে দেখাইলেন। একটা সোনালি ল্যাকারমণ্ডিত আলমারির ভিতর একখানা গোটা মন্দিরের সকল আসবাব রহিয়াছে। মূর্ত্তি, বাতি, ধূপদান, ফুল, নৈবেদ্যের বাসন, ঘণ্টা, ধর্ম্মগ্রন্থ ইত্যাদি সকল বস্তুই দেখিলাম। হিন্দু পূজা পদ্ধতিতে আর জাপানী বৌদ্ধ পূজা পদ্ধতিতে কোন প্রভেদ নাই। কয়েকখানা পুস্তক দেখাইয়া বন্ধুটি বলিলেন—"এই গুলি চীনা অক্ষরে লিখিত সংস্কৃত পুস্তক। আমিদা বুদ্ধ স্বর্গ মর্ত্ত্য ও রসাতল সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছেন। সেই উপদেশ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ।"

৩। বৌদ্ধ মন্দিরে এক রাত্রি (৭ই আগস্ট, ১৯১৫)

টোকিওতে পৌছিয়া দেখি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীষ্মাবকাশ। ছুটির সময়ে জাপানী অধ্যাপকগণ মফঃস্বলে যাইয়া গ্রাম্য বিদ্যালয় খুলিয়া বসেন। জনসাধারণের ভিতর এই উপায়ে উচ্চতম বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যের উপদেশ প্রচারিত হয়।

বৌদ্ধ সাহিত্যাধ্যাপক তাকাকুসু, নানাস্থান ঘুরিয়া কিছুকালের জন্য কোয়া পাহাড়ে আশ্রয় লইয়াছেন। এখানে ইহাঁর বক্তৃতা নাই। মন্দিরে মন্দিরে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহের জন্য কয়েক সপ্তাহ এখানে কাটাইবেন।

তাকাকুসুর পত্র পাইয়া কোয়া পাহাড়ে বেড়াইতে গেলাম। ওসাকা হইতে চল্লিশ মাইল যাইতে হয়। ট্রামে ও রেলে কিছু দূর আসা গেল। এইখানে একটা পার্ব্বত্য স্রোতস্বতী—অপর পারে উপত্যকা ও পাহাড়। এই পার্ব্বত্য পথে ১২।১৪ মাইল যাইতে হইবে—রেল অথবা ট্রাম নাই।

গরমে অস্থির—নদীর কিনারায় একটা সরাইয়ে তরমুজ খাওয়া গেল। পরে খেয়া নৌকায় পার হইয়া রিক্‌শতে বসিলাম। ভুট্টা, বাঁশ, ধান ও তুঁতের ক্ষেতের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতেছি। চারি দিকে উচ্চ পাহাড়। গ্রাম্য কুটীর, রাস্তা, দোকান ও বালক বালিকা ভারতীয় পার্ব্বত্য পল্লীর দৃশ্যই স্মরণ করাইয়া দেয়। জাপানের এত জায়গা দেখিলাম—কোথাও পশুপক্ষীর পরিচয় বেশী পাইলাম না। মাঝে মাঝে দুই চারিটা কাকের ডাক শুনিয়াছি মাত্র—অবশ্য মাছের ঝাঁক সর্ব্বত্রই দেখা যায়। আজ দুএকটা সর্পও চোখে পড়িল।

রিক্‌শ বদলাইয়া ডুলিতে বসিলাম। এখান হইতে পার্ব্বত্য বক্রপথে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উঠিতে হইবে। আলমোড়া যাত্রার কথা মনে পড়িল। তবে ভারতীয় পাহাড়ে ব্যবহৃত ডাণ্ডি জাপানী ডুলি অপেক্ষা অধিকতর আরামদায়ক। এখানকার ডুলি আমাদের স্বদেশী ডুলিরই মত।

আল্‌মোড়ার পথে পাইনের সারি সর্ব্বত্র দেখা যায়—এখানে পাইন এবং ক্রিপ্‌টোমেরিয়া এই দুই জাতীয় তরুবর দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। উভয়ই দেখিতে অনেকটা এক প্রকার। এদিকে রাস্তার নিম্নে পার্ব্বত্য ঝরণা বা নদী বহিয়া যাইতেছে। কোয়া পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে সর্ব্বদা হিমালয়ের কথাই ভাবিতে লাগিলাম। প্রাকৃতিক দৃশ্যে কোন প্রভেদ নাই। এইরূপে তিনহাজার ফিট ঊর্দ্ধে উঠিলাম। এখন বেশ ঠাণ্ডা লাগিতেছে।

এক জায়গায় দেখি আকাশে মালপত্র পাঠান হইতেছে। কোয়া পাহাড়ের উচ্চতম শৃঙ্গের সঙ্গে নিম্নতম উপত্যকার যোগ সাধন করা হইয়াছে। টেলিগ্রাফের তার যে ভাবে পাহাড় হইতে পাহাড়ে লইয়া যাওয়া হয় সেই ভাবে মোটা তারের সাহায্যে শৃঙ্গে শৃঙ্গে সংযোগ সাধিত হইয়াছে। এই তারের সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহ চুপড়ি ঝুলিতেছে। এই গুলির ভিতর মাল রাখিয়া দেওয়া হয়। চুপড়িগুলি তড়িতের শক্তিতে ঊর্দ্ধে আপনা-আপনি চলিয়া যায় এবং নিম্নে আপনা আপনি নামিয়া আসে। শুনিলাম এই ধরণের চুপড়িতে মানুষের যাতায়াতও নাকি সুরু করা হইবে। অভিনব দৃশ্য বটে।

সন্ধ্যাকালে যথাস্থানে পৌঁছিলাম। পথে বহু তীর্থযাত্রীর সঙ্গে দেখা হইয়াছে—কেহ উঠিতেছে কেহ নামিতেছে। কেহ পদব্রজে, কেহ ডুলিতে। এই নগর বা পল্লী একটা বিরাট তীর্থক্ষেত্র। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে কোবো দাইশি এই সুরম্য স্থানে মন্দিরাদি স্থাপন করিয়া যান। তাঁহার প্রবর্ত্তিত বৌদ্ধ-সম্প্রদায় আজ পর্য্যন্ত কোয়া পাহাড়কে তাঁহাদের প্রধান তীর্থস্থান বিবেচনা করেন। শুনিলাম এখানে নয়শত মন্দির আছে বলিয়া জনশ্রুতি। বর্ত্তমানে প্রায় ৫০টা ছোট বড় মাঝারি মন্দির বা মঠ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ এক মন্দিরে রাত্রিবাস করিলাম। তাকাকুসু পার্শ্ববর্ত্তী মন্দিরে বাস করিতেছেন।

দার্জ্জিলিঙ্গে তিব্বত পর্য্যটক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাসের গৃহে জাপানী বৌদ্ধ পুরোহিত কাওয়াগুচি বাস করিতেন। তাঁহার সঙ্গে একজন জাপানী যুবকও ছিলেন। ইনি তিন বৎসর কাল ভারতবর্ষে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া কোয়া পাহাড়ের বৌদ্ধবিদ্যালয়ে অধ্যাপক হইয়াছেন। ইঁহার নাম হাসেবে। পূর্ব্বে ইনি ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি পাইয়াছিলেন। হাসেবে বলিলেন--"মন্দিরসমূহের পুরোহিত-

গণের জন্য এখানে একটি মহাবিদ্যালয় আছে। আমি ছাত্রগণকে সংস্কৃত শিখাইয়া থাকি। প্রায় ৪০০ পুরোহিত সংস্কৃত শিখিতেছে।” হাসেবে সংস্কৃত বেশী জানেন না—ভাণ্ডারকার প্রণীত “সংস্কৃত-পাঠ” পর্য্যন্ত ইঁহার বিদ্যা। এই গ্রন্থই এখানে পড়ান হইতেছে। যাহা হউক, বুঝা যাইতেছে, জাপানীরা একটা ভারতীয় আন্দোলন শীঘ্রই পাকাইয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর। নানা মহলে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

মন্দিরে আশ্রম বালকেরা অতিথিসেবা করিতেছে। রান্নাবাড়ি, ঘর ঝাড় দেওয়া, বিছানা করা ইত্যাদি সবই যুবক পুরোহিতগণ স্বহস্তে করিল। মঠে মন্দিরে নারী জাতির প্রবেশ নিষেধ। পুরোহিতেরা সকলেই অবিবাহিত থাকিতে বাধ্য। মৎস্য মাংসের ব্যবহারও মন্দিরে চলিতে পারে না। মন্দিরাদির অভ্যন্তরস্থিত গৃহসমুহের সাজসজ্জা আসবাব পত্র সবই অন্যান্য জাপানী গৃহের অনুরূপ। একটা সুন্দর বাগানও আছে। দোভাষী বলিলেন—“এই মন্দিরে আমি সাত বৎসর পূর্ব্বে একবার আসিয়াছিলাম। সঙ্গে ছিলেন সপত্নীক ফরাসী পর্য্যটক। তাঁহাদের জন্য হোটেল হইতে খাদ্য দ্রব্য আনিতে হইয়াছিল।”

প্রত্যূষে মন্দিরের দেবগৃহে “সাম-গান” আরম্ভ হইল। যুবক পুরোহিতগণ যথোচিত পোষাক পরিধান করিয়া মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। ভাষা বুঝিলাম না—আওয়াজে বুঝিলাম হিন্দু উপাসনা আর বৌদ্ধ উপাসনা আর গ্রীক রীতির খৃষ্টীয় উপাসনা সবই এক জাতীয়। ধরণ ধারণ, আদবকায়দা, কণ্ঠস্বর, কোন বিষয়েই পার্থক্য লক্ষ্য করা কঠিন। পৃথিবীর সকল লোক যদি কোন এক ভাষায় কথা কহিতে পারিত তাহা হইলে দুনিয়ায় কোন প্রকার দ্বন্দ্ব থাকিত কি না সন্দেহ।

কয়েকটা মন্দির দেখিয়া প্রধান মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। ইহার নাম “কোন্দো”। কোয়া পাহাড়ের কোন মন্দিরে আমিদা বুদ্ধের মূর্ত্তি নাই। কোবো দাইশি য়াকুশি দেবকে বুদ্ধ-বিগ্রহভাবে পূজা করিতেন। তাঁহার সম্প্রদায়ে য়াকুশি-বুদ্ধের মূর্ত্তি সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কোন্দোতেও তাহাই দেখিলাম। এইখানে ধ্যানোপবিষ্ট কোবোর মূর্ত্তিও রহিয়াছে। কোবো তাঁহার সম্প্রদায়ে বুদ্ধের অবতাররূপে পূজিত হন।

এই বিরাট মন্দির-নগরের সর্ব্বত্র কোবোদাইশির কীর্ত্তি প্রকটিত রহিয়াছে। তিনি কোথায় বসিয়াছিলেন, কোথায় হাত ধুইয়াছিলেন ইত্যাদিও যত্নসহকারে প্রদর্শিত হয়। কোন্দো হইতে কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়া এক সুবিস্তৃত গোরস্থান দেখিলাম। ক্রিপ্টোমেরিয়া তরুর কুঞ্জের ভিতর বহুসংখ্যক কবর ও স্মৃতিস্তম্ভ রহিয়াছে। দোভাষী বলিলেন—“কোবোদাইশি সম্প্রদায়ের লোকেরা এই গোরস্থানে সমাধিপ্রাপ্ত হইবার জন্য লালায়িত। জাপানের নানাস্থান হইতে মৃত ব্যক্তির চুল, নখ বা বেশভূষার কিয়দংশ এখানে পাঠান হয়। এই সমুদয় চিহ্নের উপরই কবরাকৃতি স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে।”

গোরস্থানের অন্তে একটা মন্দির—তাহার মধ্যে অসংখ্য প্রদীপ জ্বলিতেছে। একটা প্রদীপ দেখাইয়া পুরোহিত বলিলেন—“কোবোদাইশি স্বহস্তে ইহা প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন। তখন হইতে ইহা একবারও নির্ব্বাপিত হয় নাই।” এই মন্দিরের পশ্চাতে কোবোদাইশির কবর।

পথে একস্থানে কতকগুলি জিজো মূর্ত্তি

দেখিলাম। দোভাষী কাঠের হাতায় করিয়া মূর্ত্তিগুলির মস্তকে জল ছিটাইতে ছিটাইতে বলিলেন—"শিশুগণের আত্মার হিসাব রাখিতে রাখিতে জিজোদেব ক্লান্ত। এইজন্য জননীরা ইহাঁকে এইরূপে ঠাণ্ডা করিয়া থাকেন।"

৪। জাপানে সংস্কৃত-প্রবর্ত্তক কোবো দাইশি

জাপানী বৌদ্ধ মহলে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর হইতেই পুরোহিত কোবো দাইশির নাম শুনিতেছি। কাল সেই জাপানী মহাত্মার প্রতিষ্ঠিত তীর্থক্ষেত্রে রাত্রি যাপন করিলাম। কোবো দাইশি খৃষ্টীয় ৭৭৪ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার দুইশত বৎসর পূর্ব্বে কোরিয়ার বৌদ্ধ প্রচারকগণ জাপানে আসিয়া নূতন ধর্ম্ম, সাহিত্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সম্রাট শোতোকু তাইশি এই বিদেশীয় প্রচারকগণের সংরক্ষক ছিলেন এবং স্বয়ং বৌদ্ধ আদর্শে জীবন যাপন করিতেন। তাঁহাকে জাপানের অশোক বিবেচনা করা যাইতে পারে।

কোবো দাইশির পূর্ব্বে চীন, কোরিয়া ও ভারতবর্ষ হইতে সমাগত সুধীবৃন্দই জাপানে জ্ঞানালোক বিস্তার করিতেন। খাঁটি যামাতো সন্তানের কৃতিত্ব হরিলুজিযুগে (অর্থাৎ ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে) দেখা যায় না। অষ্টম শতাব্দীতে অর্থাৎ নারাযুগেও জাপানের স্বদেশী শিল্পী, পুরোহিত ও অধ্যাপকগণ বিশেষ লব্ধপ্রতিষ্ঠ হন নাই। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে নিপ্পনবাসী কোবো দাইশি প্রাদুর্ভূত হন। ইনি একাধারে কবি, চিত্রকর, ভাস্কর, দার্শনিক, শিক্ষক ও লিপিকর ছিলেন। ইনি চীনে যাইয়া মূলকেন্দ্র হইতে সকল প্রকার বৌদ্ধ বিদ্যা শিখিয়া আসেন এবং পরে স্বসমাজে তাহা সুপ্রচারিত করেন। চীনে ভারতপর্য্যটক চীনাপণ্ডিত হুয়েন্থ সাংয়ের স্থান যেরূপ, জাপানে চীনপর্য্যটক নিপ্পনসন্তান কোবো দাইশির স্থান সেইরূপ। ইনি জাপানের সর্ব্বপ্রথম "স্বদেশী" পণ্ডিত। ষষ্ঠ শতাব্দীর শোতোকুতাইশির পর অষ্টম শতাব্দীর কোবো দাইশি আজও জাপানী সমাজের সকল মহলে সাধুসন্ত পীর বা বুদ্ধাবতাররূপে পূজা পাইতেছেন। এই দুই মহাত্মার জীবনকথা না জানিলে জাপানী সভ্যতার গোড়ার কথা জানা হয় না।

আজকাল জাপানীরা কোবোদাইশির জন্মতিথি উপলক্ষ্যে মহোৎসব করিয়া থাকেন। সাত আট বৎসর হইল এইরূপ উৎসবে কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিজ্ঞানাধ্যাপক তানিমোতো জাপানী ভাষায় এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহার ইংরাজী অনুবাদ Japan Chronicleএ বাহির হইয়াছে। প্রবন্ধের নাম—"Kobo Daishi—His position in the history of Japanese civilisation."

কোরিয়া এবং চীনের ভাষা জাপানে সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। ক্রমশঃ সংস্কৃত ভাষার প্রবর্ত্তনও আবশ্যক হইয়া উঠে। কোবো দাইশির পূর্ব্বে কোন কোন জাপানী পণ্ডিত সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া ছিলেন কিন্তু তাঁহার চেষ্টায়ই সংস্কৃতের প্রতি অনুরাগ জাপানে বদ্ধমূল হয়।

তানিমোতো বলিতেছেন—"Though this language had been known in some small degree before, it was due to the efforts of the great Kobo Daishi that Sanskrit took deep root in this country.

In the book published during

the Kyobo era (about 1716 A.D.) entitled Sittan-san-mitsu-sho it is recorded that Sanskrit was first inculcated in Japan by Kobo Daishi. Among Kobo Daishi's various works there remains still a book concerning the Sanskrit language entitled Sittan-jibo—narabini—Shakugi.

This book, of course, apart from the deep secret meaning attached thereto, is quite simple and naive from the stand point of language, being the translation of the first number of Sanskrit spelling books consisting of twelve volumes, and may well be compared to an English primer."

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতে জাপানে "কানা" নামক নূতন লিপি প্রচারিত হইয়াছে। লিপি-সংস্কারকগণ জটিল এবং দুর্ব্বোধ্য বহুসংখ্যক চীনা চিত্র-লিপির স্থানে ৫০ টা সহজ ও সরল অক্ষর উদ্ভাবন করেন। এই অক্ষরগুলি দেখিতে দেবনাগরী অক্ষরের মত। অধ্যাপক তানিমোতো বলেন—"When one compares them with the Sanskrit, one will be impressed with the striking similarity. * * * If the fifty syllable table were taken from the Sanskrit it would not be unreasonable to conclude that the first Sanskrit Scholar Kobo Daishi was the inventor of these new characters."

কাল রাত্রে তাকাকুসুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোবো দাইশির মত সংস্কৃত প্রচারকের নাম জাপানী ইতিহাসে পাওয়া যায় কি?" ইনি বলিলেন—"খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে তোকুগাওয়াযুগের শেষ অর্থাৎ বর্ত্তমান মেজি-যুগের আরম্ভ পর্য্যন্ত আমি ৩০০ জাপানী সংস্কৃত বৈয়াকরণিকের নাম পাইয়াছি। অবশ্য ইহারা অনেকেই পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের অনুকরণ মাত্র করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি যে জাপানী ইতিহাসের কোন যুগেই আমাদের দেশে সংস্কৃত চর্চ্চা বন্ধ ছিল না। আমি আজকাল জাপানে সংস্কৃত প্রচারের তথ্যসমূহই অনুসন্ধান করিতেছি।" এই বলিয়া সংকারীকে একখানা কাপড়ে ঢাকা পুঁথি আনিতে বলিলেন পুঁথিখানার ভিতর জাপানী কানা এবং চীনা চিত্রলিপি দেখিলাম। তাকাকুসু কোন কোন পংক্তি দেখাইয়া বলিলেন—"এই দেখুন দেবনাগরী অক্ষর। দুঃখের কথা আমার গৃহে এক্ষণে নাগরী লিপিতে লিখিত জাপানী সংস্কৃত গ্রন্থ একখানাও নাই। নাগরী লিপি জাপানে সুপ্রচলিত ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রত্যহ পাইতেছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"জাপানীরা ভারতীয় বিদ্যাসমূহ চীনা গুরুগণের নিকট শিক্ষা করিত। চীনারা সংস্কৃত ভাষা তাহাদের চিত্রলিপিতেই প্রচার করিত না কি? চীনে বোধ হয় দেবনাগরী কখনও সুপ্রচলিত হইতে পারে নাই। তাহা হইলে জাপানীরা সংস্কৃতভাষা শিখিবার সময়ে দেবনাগরী শিখিত কোথা হইতে?"

তাকাকুসু বলিলেন—"জাপানীরা চীনে যাইয়া শিখিত বটে কিন্তু চীনারাই চীনে একমাত্র গুরু ছিলেন না। চীনের বিদ্যালয়ে

মঠে ও মন্দিরে বহুসংখ্যক Brahmin Bishop বা ভারতীয় পুরোহিত বাস করিতেন। জাপানী শিষ্যেরা চীনের যেখানেই বিদ্যার্জ্জনের জন্য যাইত সেখানেই একসঙ্গে চীনা এবং হিন্দু অধ্যাপকের সংশ্রবে আসিত। কাজেই ভারতীয় মূল প্রস্রবণের পরিচয়ও জাপানে পৌঁছিত। অধিকন্তু বহু ভারতীয় অধ্যাপক চীন হইতে জাপানেও আসিয়াছিলেন। সুতরাং দেবনাগরী অক্ষর শিখিবার সুযোগ জাপানীরা যথেষ্টই পাইয়াছিল বলিতে হইবে।"

সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েন্থসাঙ ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন। তিনি যখন স্বদেশে ফিরিয়া আসেন তখন তাঁহার নিকটও জাপানী ছাত্রেরা ভারততত্ত্ব শিক্ষা করে। এইরূপ দুই জনের নাম শুনিলাম—দোশো এবং গেম্বো। কোবো দাইশির একশত বৎসর পূর্ব্বেকার কথা।

দক্ষিণ চীন সম্বন্ধে তাকাকুসু বলিলেন—"বৌদ্ধপ্রধান আসল চীন ক্যান্টন-অঞ্চলে পাইবেন। ক্যান্টন বন্দরে বস্তুতঃ সমগ্র এশিয়ার প্রভাব পৌঁছিত। কেবল ভারতবর্ষ নয়, পারস্য এবং সুদূর আরব হইতেও এই নগরে লোক জনের আসা যাওয়া ছিল।" প্রাচীনকালের জাপানীরা ক্যান্টনকে "port of white and dark barbarians" বলিত। ভারতবর্ষের সঙ্গে জাপানের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লেন দেন বেশী ছিল কি না বলা যায় না। ভারতীয় বণিকগণ দৈবক্রমে একবার জাপানে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা জাপানী সমাজে তুলার বীজ বিতরণ করে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর "কোজিকি" নামক জাপানী ইতিহাস গ্রন্থে এই বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। তাকাকুসু বলিলেন—"আজকাল আমাদের রাষ্ট্রীয় সঙ্গীতে দুইটি ভারতীয় সুর ও তালের নাচ গান বাজনা রক্ষিত হইতেছে। চম্পাদেশ (আধুনিক কালে যাহার নাম কোচিন চায়না বা ফরাসী চীন) হইতে ভারতীয় বাদক ও গায়ক আসিয়া নারা নগরের এক মন্দিরে এই রীতি প্রবর্ত্তন করেন।"

আমাদের দেশে যাঁহারা পালের বাঙ্গালা, চোলের দাক্ষিণাত্য, ভারতীয় জাহাজ ও বহির্বাণিজ্য এবং বৃহত্তর ভারত ইত্যাদি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক আলোচনায় ব্যাপৃত আছেন তাঁহাদের পক্ষে হরিলুজিনারা এবং শোতোকু-তাইশি-কোবোদাইশি ইত্যাদির যুগ বিশেষরূপেই আলোচ্য বিষয় সন্দেহ নাই। অজন্তার চিত্রকলা বাঙ্গালার ভাস্কর্য্য মহাযান সংস্কৃত সাহিত্য ইত্যাদির প্রভাব বুঝিতে হইলে সমগ্র এশিয়া খণ্ডে বিচরণ করিতে হইবে। এইজন্য ভারতীয় পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের চীনে আড্ডা গাড়া আবশ্যক।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

জগন্নিত্যত্ববাদ

(Theory of the Eternity of the world.)

একদল দার্শনিক আছেন যাঁহারা মনে করেন, জগৎ যদি কার্য্যই হয় তবে না হয় ইহা কারণ জন্যই হইল, কেন না কারণ ব্যতীত কার্য্য হইতে পারে না ইহা সম্যক প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু জগৎ যে কার্য্য তাহারই বা প্রমাণ কি? একটা নিত্য অবিনশ্বর বস্তু সকল সম্প্রদায়কেই স্বীকার করিতে হইবে; যদি তাহাই হয় তবে জগৎকে সেই বস্তু বলিলেই ত সমস্ত গণ্ডগোল মিটিয়া যায়। তাঁহারা সেইজন্য বলেন, "জগৎ কার্য্য (effect) নহে; ইহা সৎ, নিত্য বস্তু (uncaused and eternal entity)। যদি ইহা তোমরা অস্বীকার কর, তবে তোমাদেরই বা বিশ্রামস্থল কোথায়? তোমরা নিত্য বলিয়া যে বস্তু নির্দ্দেশ করিবে, আমরা জিজ্ঞাসা করিব, তাহারই বা কারণ কি; এই প্রকারে প্রশ্ন করিয়া তোমাদিগকে কোথায়ও বিশ্রামলাভ করিতে দিব না। অতএব নিত্য বস্তু যদি একটা মানিতেই হয়, তবে জগৎই সেই নিত্য বস্তু, ইহা যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত।" মীমাংসা দর্শনকারও এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, "ন কদাচিদনীদৃশং জগৎ"।

এক্ষণে দেখা যাউক ঐ সিদ্ধান্ত বিচারসহ কি না। আলোচনার প্রারম্ভেই তিনটি প্রশ্ন আমাদের মনে উদিত হয়। ১। কার্য্যের লক্ষণ কি। ২। জগৎ শব্দের অর্থ কি? ৩। জগৎ কার্য্য কি না? কার্য্য কাহাকে বলে তাহার উত্তরে বলিতে পারা যায়,—যাহার উৎপত্তি (beginning) ও বিনাশ (dissolution) আছে, যাহা সাবয়ব (composite) তাহাই কার্য্য। প্রত্যেক ঘটনা (event), প্রত্যেক আরম্ভ (commencement), প্রত্যেক পরিবর্ত্তন (change) কার্য্য-শব্দের বাচ্য। জগৎ কাহাকে বলে, তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, ইন্দ্রিয়গ্রহণযোগ্য কার্য্যকারণশৃঙ্খলাবদ্ধ বিষয় সমষ্টিই জগৎ। তৃতীয় প্রশ্ন,—জগৎটা কার্য্য কি না? এক্ষণে এই তৃতীয় প্রশ্নের মীমাংসা করা যাইতেছে।

জগৎটা কার্য্য কি না,—বিচার করিতে হইলে দেখিতে হইবে জগতে কার্য্যের কোন চিহ্ন বা নিদর্শন পাওয়া যায় কি না। দেখিতে হইবে, জগৎ আরব্ধ বস্তু কি না—উহার উৎপত্তি বিনাশ আছে কিনা; উহা সাবয়ব কি না। আমরা দেখিতে পাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের কোনটিই নিত্য, নির্ব্বিকার নহে। কোনটিই স্বতন্ত্র, স্বয়ম্ভূ নহে। সমস্তই কার্য্য-কারণরূপী সার্ব্বভৌম শৃঙ্খলে আবদ্ধ ও নিয়মিত। প্রত্যেক বস্তুই সঙ্ঘাত, সাবয়ব, আবির্ভাবতিরোভাবশীল। প্রত্যেক বস্তুই, স্বপরিমাণ অপেক্ষা অণুতর পরিমাণ সংযোগারব্ধ। অতি তীক্ষ্ণ বীর্য্যসম্পন্ন যন্ত্রাদি সাহায্যে ইহা প্রতীয়মান হইতে পারে। স্থূল বস্তুকে সূক্ষ্ম অবয়ব রাশিতে বিশ্লিষ্ট করা যাইতে পারে। সূক্ষ্ম অবয়ব রাশিকেও আবার সূক্ষ্মতর অবয়বে বিচ্ছিন্ন করা যায়; এই প্রকারে সূক্ষ্মতর অবয়বকেও সূক্ষ্মতম উপাদানে পর্য্যবসিত করা যাইতে পারে। এই সূক্ষ্মতম উপাদানই

যে চরম উপাদন তাহাও সাহসপূর্ব্বক বলা যায় না; কেন না সেখানে যন্ত্রাদির বিশ্লেষণী-ক্ষমতা পরাহত হইয়াছে এই মাত্র, প্রত্যুত বিভাগের একান্ত (absolute) সীমা (limit) প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে একথা বলা যায় না। যন্ত্রাদির শক্তি বর্দ্ধিত হইলে, যাহাকে এক্ষণে চরম উপাদান বা মূলভূত বলা যাইতেছে, দেখা যাইবে তাহা চরম উপাদানও নহে, মূলভূতও নহে; তাহাও সাবয়ব, কার্য্য। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে বিজ্ঞান সত্তর পঁচাত্তরটি অবিশ্লিষ্ট ভূতকে (elements) মূলভূত (primary or simple elements) বলিয়া প্রচার করিয়াছিল বটে; কিন্তু এক্ষণে বিজ্ঞান সে ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করিতে তৎপর। আরও দ্রষ্টব্য; যদি মূল উপাদানগুলির সত্তাই স্বীকার করা যায়, তাহাতেই বা জগন্নিত্যতার সাহায্য হয় কি প্রকারে? ঐ মূলভূতগুলিই কি জগৎ! তাহারা জগদারম্ভক বটে, কিন্তু তাহারাই জগৎ নহে; তাহারা অতীন্দ্রিয় পদার্থ; তাহারা যখন মিলিত হইয়া স্থূলত্বে উপস্থিত হয় তখনই আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হয়; যতক্ষণ তাহা না হয়, ততক্ষণ তাহারা জগৎ শব্দবাচ্য নহে। অতএব আমাদের অভিজ্ঞতায় এমন কোন বস্তু পতিত হয় না, যাহাকে মূল, অবিশ্লেষণীয়, অবিভাজ্য নিত্য বস্তু বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি।

দুঃখের বিষয় John Stuart Mill—যাঁহার মতে বাহ্যজগতের অস্তিত্বই অসিদ্ধ—যাঁহার মতে জড় is the permanent posibility of sensations—এ সম্বন্ধে এক অভিনব মতের প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন :—

"There is in nature a permanent element, and also a changeable: the changes are always the effects of previous changes; the permanent existences, so far as we know, are not effects at all. It is true we are accustomed to say not only of events, but of objects, that they are produced by causes, as water by the union of hydrogen and oxygen. But by this we only mean that when they begin to exist, their beginning is the effect of a cause. But their beginning to exist is not an object, it is an event. * * * But that which in an object begins to exist, is that in it which belongs to the changeable element in nature; the outward form and the properties depending on mechanical or chemical combinations of its component parts. There is in every object another and a permanent element—viz., the specific elementary substance or substances of which it consists and their inherent properties. These are not known to us as beginning to exist: within the range of human knowledge they had no beginning, and consequently no cause: though they themselves are causes or uncauses of every thing that takes place. Experience, therefore, affords no evidences, not even analogies,

to justify our extending to the apparently immutable, a generalisation grounded only on our observation of the changeable."

[Three Essays on Religion -- pp. 142-143.]

ইহার মর্ম্মার্থ এই প্রকার—"প্রকৃতির মধ্যে দুই শ্রেণীর বস্তু আছে। এক শ্রেণীর বস্তু নিত্য, অপর শ্রেণীর বস্তু অনিত্য। বস্তুর মধ্যে যেটা আগন্তুক অংশ তাহাই বিকার বা পরিবর্ত্তন; আর উহার মধ্যে যে অংশটা স্থির, তাহাই নিত্য এবং সনাতন। সাধারণ কথায় আমরা বস্তুমাত্রকেই কার্য্য বলিয়া থাকি বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে কথা ঠিক নহে; বস্তুর আকৃতি, অবয়ব প্রভৃতি আগন্তুক ধর্ম্মই কার্য্য উহার ভিতরে যে অন্য একটি সত্তা আছে তাহা কার্য্য নহে। আমাদের অভিজ্ঞতার এমন কোন প্রমাণ বা সাদৃশ্য নাই যাহার বলে আমরা এই অনিত্য অংশ সম্পর্কিত কোন নিয়মকে বস্তুর নিত্যসত্তাতেও প্রসারিত করিতে পারি।"

অন্যত্র (Examn.—Theory of causation) Mill এই কথাই আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—" The matter composing the universe, whatever philosophical theory we hold concerning it, we know by experience to be constant in quantity; never beginning or ending, only changing its forms. But its forms have a beginning and ending: and it is its forms, or rather its changes of form—the end of one form and beginning of another —which alone we seek a cause for, and believe to have a cause. It is *events*, that is to say, *changes*, not substances that are subject to the law of causation."

এক্ষণে দেখা যাউক Millএর এ মতটি যুক্তিসঙ্গত কি না। Mill বলেন কার্য্য নামধেয় বস্তুর মধ্যে যাহা প্রকৃত কার্য্য তাহা বস্তুর আকৃতি, অবয়ব প্রভৃতি আগন্তুক ধর্ম্ম। কিন্তু ইহা ব্যতীত ঐ বস্তুর মধ্যে একটা নিত্যসত্তা (substance) আছে, যাহা কার্য্য-পদবাচ্য নহে। জিজ্ঞাসা করি প্রকৃতি-রাজ্যে এই যে নিত্যসত্তার (substance) কথা বলা হইল, ইহা কি স্বতঃসিদ্ধ সত্য, না প্রত্যক্ষলব্ধ সত্য? ইহার সহিত কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎ-ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ ঘটিয়াছে কি? জগতে বস্তু-সত্তার সমষ্টি অপরিবর্ত্তনীয় এ সত্যটা যে স্বতঃসিদ্ধ বা প্রত্যক্ষলব্ধ সত্য নহে তাহা Millএর নিম্নোদ্ধৃত বাক্য হইতেও বুঝা যাইতে পারে। "But we can conceive both a beginning and an end to all physical existence. As a mere hypothesis, the notion that matter cannot be annihilated arose early; but as a settled belief, it is the tardy result of scientific enquiry. All that is necessary for imagining matter annihilated is presented in our daily experience."

বিশেষতঃ Mill এখানে স্পষ্টতঃ বস্তুসত্তা ও আকৃতি বা রূপের প্রভেদ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে আমরা কি এই আকৃতি বা রূপ ব্যতীত আর কিছু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি? এই আকৃতি বা রূপের অতিরিক্ত যে একটা বস্তুসত্তা আছে,

আমরা কখন কি তাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিয়া থাকি। যাহাকে পরমাণু বলা হয়, তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে; এবং যদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হওয়া ইহাদের পক্ষে কখনো সম্ভাবনীয় হয়, তথাপি উহার আগন্তুক আকৃতি বা রূপের অতিরিক্ত সত্তা যে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইবে না তাহাও বুঝিতে পারা যাইতেছে। বাহ্যজগতে আকৃতি ও বস্তু-সত্তা পরস্পর আপেক্ষিক। যাহা একটির অপেক্ষায় আকৃতি তাহা অপরটির অপেক্ষায় বস্তুসত্তা; আবার যাহা একটির অপেক্ষায় বস্তুসত্তা তাহা অপরটির অপেক্ষায় আকৃতি বা রূপ। বস্তুসত্তা, বাঁধা কপির ন্যায়, কাল্পনিক পদার্থ। কপি ও তাহার পত্র, কথায় প্রভিন্ন বটে; কিন্তু কার্য্যতঃ পত্র ব্যতীত যেমন কপির সত্তা নাই, বস্তুসত্তা ও রূপ সম্বন্ধেও সেই প্রকার। বলিতে কি, বহির্জগতে কুত্রাপি বস্তুসত্তার সহিত আমাদের পরিচয় নাই; আমরা দেখি রূপ, জানি রূপ। Mill একথা নিজেও অবগত আছেন। তিনি অন্যত্র বলিতেছেন—

"It would be quite warranted by the practice of metaphysicians, to call any compound the form of its component elements; water, for instance, the form of hydrogen and oxygen. And since there is nothing that may not be regarded as matter relatively to something which can be constructed out of it, and which is form relatively to it, but matter relatively to some thing we have form within form, like a nest of boxes." (১)

পরমাণুর দোহাই দিয়া বস্তুসত্তা সিদ্ধিকরাও দুর্ঘট। তাহা পরমাণুবাদ প্রস্তাবে আলোচিত হইবে। কিন্তু Mill বস্তুসত্তা অর্থে শক্তিসত্তা—শক্তির অবিনাশিত্ব ও অপরিবর্ত্তনীয়তাই লক্ষ্য করিয়াছেন। কেন না তিনি বলিতেছেন—(২)

Whenever a physical phenomenon is traced to its cause, that cause when analysed is found to be a certain quantum of force, combined with certain collocations. And the last great generalisation of science, the conservation of force, teaches us that the variety in the effects depends partly upon the *amount* of the force and partly upon the diversity of the collocations. The force itself is essentially one and the same; and there exists of it in nature a fixed quantity, which (if the theory be true) is never increased or diminished. Here then, we find, even in the changes of material nature, a parmanent element, to all appearance the very one of which, were in quest. This it is apparently to which, if to anything, we must assign the character of First Cause, the cause of the other material universe. পুনশ্চ—"The

(1) Examination. Is Logic the science of the Laws or forms of thought?
(2) Mill's Three Essays on Religion.

First cause can be no other than force."

শক্তির অবিনাশিত্ব ও অপরিবর্ত্তনীয়তা সম্বন্ধেও স্থানান্তরে আমার আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে; সুতরাং এস্থলে সে সম্বন্ধে কিছু বলিব না। তবে Mill যে অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া বাক্য প্রয়োগ করেন নাই, সেইটুকু মাত্র আমি প্রদর্শন করিতেছি। শক্তির নিত্যতা সম্বন্ধে যতদূর বলা সম্ভাব্য তাহা তিনি এস্থলে বলিয়াছেন। কিন্তু আবার স্থানান্তরে তিনি এ কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত প্রচার করিয়া বসিয়াছেন। সেখানে শক্তির সত্তা ও সত্যতা একেবারে উড়াইয়া দিয়াছেন। ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রবন্ধে আলেকজাণ্ডারের প্রতিবাদে তিনি কি বলিয়াছেন শুনুন—(৩) "Ability and force are not real entities which can be felt as present when no effect follows; they are abstract names for the happening of the effect on the occurrence of the needful conditions, for our expectations of happening."

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, যদি শক্তি কার্য্যগম্য—কার্য্যের পূর্ব্বে অসৎ—পদার্থ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যের সহিত এ বাক্যের সামঞ্জস্য কোথায়? উপরে বলা হইয়াছে শক্তিই সর্ব্বেসর্ব্বা—সকলের মূল কারণ—নিত্যসত্তা। এক্ষণে বলা হইল—উহার কিছুমাত্র সত্তা নাই; উহা কার্য্য ঘটনারই একটা কাল্পনিক নাম। Millএর কোন বাক্য বিশ্বাস্য তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তিনি কারণতাবাদ প্রস্তাবে শক্তির সত্তা খণ্ডন করিতে বদ্ধপরিকর। তাই তিনি সেখানে শক্তির বোধই অস্বীকার করিতেছেন। এখানে আবার তাহার উল্টা সুর ধরিয়াছেন। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং।

কোন কোন দার্শনিক হয় ত বলিয়া বসিবেন—"স্বীকার করিলাম জগৎ সাবয়ব অতএব প্রাগভাবপ্রতিযোগি অর্থাৎ কার্য্য এই কার্য্য সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্ত বক্ষ্যমান প্রকার।

অসংখ্য পরমাণু অনন্তশূন্যে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে বিরাজ করিতে করিতে একদা অকস্মাৎ দলবদ্ধ হইয়া এই বিশাল বৈচিত্র্যময় জগতের সৃষ্টি করিয়াছে। পরমাণুগুলি স্বতঃ নিশ্চল, নিষ্ক্রিয়; আপনা আপনি দল বাঁধিতে পারে না। কিন্তু অকস্মাৎ (fortuitously) পরস্পর সম্মিলিত হইয়া সাবয়ব (compound) বস্তুর কারণ হইয়া থাকে। এই যে পরমাণুর কথা বলিলাম অনুমানগম্য পদার্থ, ইন্দ্রিয়গোচর নহে। একবার দলবদ্ধ হইলে তখন উহাদের মধ্যে শক্তির উদ্ভব হয়, এবং সেই শক্তির প্রভাবে ক্রমশঃ চৈতন্যের বিকাশ হইলে পরমাণুগুলি জৈব ও অজৈব organic ও inorganic এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। জগতে তখন নিয়ম সংস্থাপিত হয়, এবং সেই নিয়মাধীন অন্যান্য সকল কার্য্যই হইতে থাকে।"

এ প্রকার যুক্তি-হেতু-বিরহিত অসার জল্পনার প্রতিবাদে সময়ব্যয় যত অল্প হয় ততই মঙ্গল। তাই দুই একটি কথা মাত্র বলিয়া এ প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি।

১। পরমাণুগুলি সিদ্ধ পদার্থ (demonstrated facts) কি না সে তর্কে আপাততঃ কোন প্রয়োজন নাই। তাহা স্বীকার করি-

(3) Examn. Freedom of the will.

য়াই লইতেছি। প্রথমতঃ কার্য্য স্বীকার করিলে যে কার্য্যের কারণ থাকাটাও স্বীকার করিতে হয় এই ভাবুকবৃন্দ তাহা একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছেন। কার্য্যকারণ আপেক্ষিক (correlative) শব্দ; একটি থাকিলেই অপরটি থাকিবে—ইহা ইঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। বাধ্য হইয়া জগতের একটা কারণ নির্ণয় করিতে যাইয়া ইঁহারা পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু উহারা স্বতঃ পরস্পর মিলিত হইতে পারিবে না, উহাদিগকে নিশ্চল বা নিষ্ক্রিয় বলিয়া তাহারও একটা ব্যবস্থা করিয়া রাখিলেন। অথচ মিলন ব্যতীত সংঘাত বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে না ইহাও তাঁহারা জানিতেন। অগত্যা, এই সংযোগ সিদ্ধ করিতে যাইয়া, আকস্মিক আরম্ভবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

কিন্তু কার্য্য তাঁহাদের ইচ্ছাবশাৎ ক্বচিৎ সহেতুক কচিৎ অহেতুক হইবে জগতে এমন একটা নৈসর্গিক বিধান আছে কি? পরমাণুই বা ইঁহারা স্বীকার করেন কেন? জগৎ ব্যাপারটা বুঝাইবার জন্য নহে কি? যদি তাহাই হয়, তবে তাহাদিগকে হয় স্বতঃপ্রবৃত্ত (spontaneously active) বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, আর না হয়, তাহাদের মিলনকে কারণান্তর সাপেক্ষ বলিয়া মানিতে হইবে। ইহা না মানিলে, পরমাণুসত্তা স্বীকার করিবার যে উদ্দেশ্য তাহা ব্যর্থ হয়। এই দার্শনিকেরা যখন পরমাণুকে নিষ্ক্রিয় বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, তখন কারণান্তর স্বীকার ব্যতীত কদাচ ইহাদের সংযোগ সংঘটিত হইতে পারে না।

২। দলবদ্ধ হইলে পরমাণুর মধ্যে শক্তির আবির্ভাব হয়, কিন্তু দলবাঁধন ক্রিয়াটা আকস্মিক, অহেতুক; অথচ পশ্চাৎ উৎপন্ন কার্য্যগুলি নিয়ম ও কারণ পূর্ব্বক উৎপন্ন হয়—ইহা বড় আশ্চর্য্য সিদ্ধান্ত। জিজ্ঞাসা করি, এই যে ক্বচিৎ কারণাপেক্ষা (dependence on a cause) এবং ক্বচিৎ কারণ অনপেক্ষা (independence of a cause) ইহার কোন নিয়ামক (determinant factor) আছে কি না? যদি না থাকে, তবে কিছুই ব্যাঘাত হইল না; যদি থাকে, তবে 'অকস্মাৎ' শব্দই নিরর্থক।

৩। অকস্মাৎ উৎপত্তি চিন্তাবিরুদ্ধ, অতএব অসম্ভব। ইহা শূন্যোৎপত্তিবাদ প্রসঙ্গে প্রদর্শিত হইয়াছে।* ইত্যাদি যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে উক্তমতবাদটি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। অতঃপর পরমাণুর স্বভাব, ও নিত্যতা সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

শ্রীপ্রফুল্লনাথ লাহিড়ী

* উপাসনা মাঘ—দ্রষ্টব্য।

বর্দ্ধমান জেলার মেলার বিবরণ

(৪)

ক্ষীরগ্রামের মেলা

ক্ষীরগ্রাম বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত একটী অতি প্রাচীন পল্লী। এই স্থান নবনির্ম্মিত বর্দ্ধমান কাটোয়া রেলপথের ছুই মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। এই রেলপথে নিগনগ্রামে যে ষ্টেশন হইয়াছে তাহারই নাম ক্ষীরগ্রাম ষ্টেশন।

ভারতবর্ষীয় ৫১ পীঠস্থানের মধ্যে ক্ষীরগ্রাম একটী মহাপীঠ, এখানে বিষ্ণুচক্র-ছিন্ন ভগবতীর দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ পতিত হইয়াছিল। এখানকার শক্তি যোগাদ্যা (যুগাদ্যা) ও ভৈরব ক্ষীরকণ্ঠক। যথা :—

"ভূতধাত্রী মহামায়া ভৈরবঃক্ষীরকণ্ঠকঃ।
যোগাদ্যা সা মহাদেবী দক্ষাঙ্গুষ্ঠপদে নমঃ॥
(সংস্কৃত পীঠমালা।)

"ক্ষীরগ্রামে ডানি পার অঙ্গুষ্ঠ বৈভব।
যোগাদ্যা দেবতা ক্ষীরকণ্ঠক ভৈরব॥"
(অন্নদামঙ্গল)

ক্ষীরগ্রামের পশ্চিমে অবস্থিত নিগনগ্রামে লিঙ্গেশ্বর, পূর্ব্বে অবস্থিত গীধগ্রামে গীধেশ্বর, দক্ষিণে অবস্থিত পুঁইনী পলাসীতে পাতালেশ্বর এবং উত্তরে অবস্থিত শীতলগ্রাম বা সিদ্ধলগ্রামে সিদ্ধেশ্বর নামে চারিটী স্বয়ম্ভূশিবলিঙ্গ আছেন; কথিত আছে যে, ক্ষীরগ্রামের মহাপীঠ রক্ষার জন্যই এই চারিটী অনাদি লিঙ্গ শিবের আবির্ভাব।

ক্ষীরগ্রামের পূর্ব্ব সমৃদ্ধির এখন আর কিছুই নাই; সর্ব্বগ্রাসী কাল সমস্তই গ্রাস করিয়াছে।

অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথের পুত্র ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যখন পিতৃসত্য পালনের জন্য ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা সীতার সহিত বনে গমন করেন, সেই সময় লঙ্কাধিপতি রাবণ দণ্ডকারণ্য হইতে সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যান। ভগবান রামচন্দ্র হনুমানকে সীতা অন্বেষণে লঙ্কায় প্রেরণ করেন। কথিত আছে যে, হনুমান লঙ্কায় উপস্থিত হইলে রাবণের উপাস্যা লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবী উগ্রচণ্ডা হনুমানকে স্বর্ণলঙ্কা প্রদান করিয়া স্বয়ং পাতালে মহীরাবণের গৃহে গমন করেন, এবং তথায় ভদ্রকালী নামে পরিচিত হন। তৎপরে মহীরাবণ যখন রাম লক্ষ্মণকে নিহত করিবার বাসনায় পাতালে লইয়া যান, সেই সময় হনুমান পাতালে গমনপূর্ব্বক মহীরাবণকে নিহত করিয়া রাম লক্ষ্মণের উদ্ধার সাধন করেন এবং রাম লক্ষ্মণসহ দশভুজা উগ্রচণ্ডা দেবী ভদ্রকালীকে মহাপীঠ ক্ষীরগ্রামে লইয়া আসেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে বিশ্বকর্ম্মা ক্ষীরগ্রামে এক বিচিত্র দেউল নির্ম্মাণ করেন এবং সেই মন্দিরে স্বয়ং রামচন্দ্র সেই দশভুজা উগ্রচণ্ডা দেবীকে স্থাপন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন। পীঠেশ্বরী যোগাদ্যার নামানুসারে উগ্রচণ্ডা দেবী যোগাদ্যা নামে পরিচিত হন। সেই সময় ক্ষীরগ্রামে হরিদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। দেবী ভগবতী রাজা হরিদত্তকে স্বপ্নে দেখা দিয়া প্রত্যহ একটী করিয়া নরবলি দিয়া তাঁহার পূজা করিতে আদেশ দিলেন। যথা :—

৺বাঞ্ছারাম বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য প্রণীত "যোগাদ্যাবন্দনা"য়—

"বন্দিবে যোগাদ্যা যুগ আদ্যাশক্তি মাতা।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুবর্গ দাতা॥
ভয়ঙ্কর ঘোর মূর্ত্তি তীক্ষ্ণ খড়্গ হাতে।
উগ্রচণ্ডা নামে দেবী আছিল লঙ্কাতে॥
তাঁর পূজা রাবণরাজা ক'রে বহুকাল।
বাহু বলে স্বর্গ মর্ত্ত্য জিনিল পাতাল॥
দৈবযোগে বনবাসে গেলেন শ্রীহরি।
দণ্ডকারণ্যেতে রামের সীতা কৈল চুরি॥
সীতা হারা হয়ে রাম মনে পেয়ে শঙ্কা।
অন্বেষণে হনুমানে পাঠাইলা লঙ্কা॥
হনুমানে স্বর্ণ লঙ্কা সমর্পণ করি।
পাতালে মহীর ঘরে গেলেন শঙ্করী॥
রাবণতনয় সেই মহীরাবণ নাম।
পাতালে হরিয়া নিল লক্ষ্মণ শ্রীরাম॥
হনুমান গেলা তথা রামের উদ্দেশে।
রামের উদ্ধার কৈল বধিয়া রাক্ষসে॥
সঙ্গে করি নিয়া হরি আনিল দশভুজা।
ক্ষীরগ্রামে আসিয়া দেবীর কৈল পূজা॥
বিশ্বকর্ম্মা রামাজ্ঞায় হয়ে আগুয়ান।
বিচিত্র দেউল এক করিল নির্ম্মাণ॥
মহাপীঠে মহামায়া করিয়া স্থাপনা।
যোগাদ্যার নামে নাম করিলা ঘোষণা॥
হরিদত্ত নামে রাজা আছিল শুইয়া।
স্বপ্নেতে কহিল মাতা শিয়রে বসিয়া॥
কত নিদ্রা যাও রাজা হয়ে অচেতন।
কৈলাস ছাড়িয়া আইনু তোমার ভবন॥
তোমারে সদয় আমি দেবী ভদ্রকালী।
মোর পূজা কর নিত্য দিয়া নরবলি॥
বহুস্তুতি করে রাজা কৃতাঞ্জলি হয়ে।
করিব তোমার পূজা নিজ মুণ্ড দিয়ে॥"

রাজা হরিদত্তের সাত পুত্র ছিল। তিনি সাত দিন নিজের সাত পুত্রকে বলি দিয়া দেবীর পূজা করিলেন। তৎপরে প্রত্যহ একটী করিয়া নরবলির জন্য ঘরে ঘরে পালা করিয়া দিলেন। তাঁহার আদেশানুযায়ী সকলেই আপন আপন "পালামত" নরবলি প্রদান করিতে লাগিলেন। অবশেষে দেবীর পূজারি ব্রাহ্মণের পালা উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণের একটী মাত্র পুত্র ছিল। ব্রাহ্মণ সেই প্রাণাধিক পুত্রকে বলি দিতে পারিবেন না ভাবিয়া রাত্রিকালে স্ত্রী পুত্র লইয়া গোপনে গ্রাম হইতে পলায়ন করিবার জন্য বহির্গত হইলেন। তখন দেবী যোগাদ্যা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে মধ্য পথে ব্রাহ্মণকে গমনে বাধা প্রদান করিয়া কহিলেন "ব্রাহ্মণ, কি জন্য রাত্রিকালে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছ?" ব্রাহ্মণ কহিলেন,—"মা, বলিতে ভয় পাই, আমাদের গ্রামে যোগাদ্যা নামে এক রাক্ষসী এসেছে, সেই রাক্ষসীর করাল কবল হইতে প্রিয়তম পুত্রের প্রাণ রক্ষার জন্য পলায়ন করিতেছি।" যথাঃ—

"সাতদিন পূজা করে দিয়ে সাত বালা।
অবশেষে ক'রে দিল ঘরে ঘরে পালা॥
সকল লোকের পালা শেষ হৈয়া গেল।
পূজারি ব্রাহ্মণের পালা একদিন হৈল॥
এক পুত্র বিনা মোর আর পুত্র নাই।
কি দিয়া পূজিব আমি অভয়ার ঠাঁই॥
প্রাণ রক্ষা নাহি পাই ক্ষীরগ্রামে রয়ে।
স্ত্রী পুত্র লয়ে দ্বিজ যায় পলাইয়ে॥
রাত্রে উঠে দ্বিজবর পলাইয়ে যায়।
মন্দিরে বসিয়া দেবী দেখিবারে পায়॥
আমার ভয়েতে দ্বিজ পলাইয়ে যায়।
মন্দিরে বসিয়া দেবী মনে বিচারয়॥
বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে দাঁড়াইলা গিয়া।
মায়া করি মহামায়া পথ আগুলিয়া॥

দ্বিজের নন্দন হয়ে কেন এ সময়।
এত রাত্রে কোথা যাও প্রাণে পেয়ে ভয়॥
ব্রাহ্মণ বলেন মাতা কহিতে ভয় বাসি।
যোগাদ্যা নামেতে এক এসেছে রাক্ষসী॥
প্রাণ রক্ষা নাহি পাই ক্ষীরগ্রামে রয়ে।
স্ত্রী পুত্র লয়ে তাই যাই পলাইয়ে॥"

(যোগাদ্যা বন্দনা)

এই কথা শুনিয়া ছদ্মবেশধারিণী যোগাদ্যা কহিলেন—

"যার ভয়ে পলাইছ সেই দেবী আমি।"

তখন ব্রাহ্মণ অতিশয় ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলী-পুটে কহিলেন, "আপনি যে ভগবতী একথা বিশ্বাস হয় না, তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক যদি আপনার স্বরূপ প্রদর্শন করান তবে বিশ্বাস করি।" তখন ভগবতী বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে নিজ মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি দেখাইয়া কৃতার্থ করিলেন। যথা :—

যোগাদ্যা বন্দনায়—

"তুমি ভগবতী দেবী প্রত্যয় না হয়।
ছলনা করিয়া কেন ভণ্ডাহ আমায়॥

*   *   *   *

ভকতবৎসলা মাতা দেবী কাত্যায়নী।
হইলেন বিপ্র অগ্রে মহিষমর্দ্দিনী॥"

সেই দিন হইতে দেবীর আদেশে বাধ্যতা-মূলক নরবলি প্রথা বন্ধ হইল; কিন্তু নরবলি প্রথা একবারে রহিত হইল না। যথা :—

"আজি হতে ভয় আর না করিহ মোরে।
আনন্দে করগে বাস ফিরে যাও ঘরে॥
বৎসর অন্তর নর আপনি আসিবে।
মহাপূজার দিনে তারে বলিদান দিবে॥"

(যোগাদ্যা বন্দনা)

ক্ষীরগ্রামের নরবলি প্রথা ইংরাজরাজের আমলেই একবারে বন্ধ হইয়াছে।

ক্ষীরগ্রামের রাজা হরিদত্ত দেবীর নিকটে নিজের যে সাত পুত্রকে বলি দিয়াছিলেন, দেবীর কৃপায় ঐ সময়—তাঁহারাও পুনর্জীবন লাভ করিলেন। এই সমস্ত অলৌকিক ঘটনা সন্দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণ স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ভগবতী যোগাদ্যাও অন্তর্দ্ধান পূর্ব্বক স্বমন্দিরে গমন করিলেন। যথা :—

"হরিদত্ত সাত পুত্রে বলি দিয়ে ছিল।
দেবীর কৃপাতে তারা জীবন পাইল॥
দেখিয়া শুনিয়া দ্বিজ ফিরিয়া আসিল।
ভগবতী অলক্ষ্যে আপন ঘরে গেল॥"

(যোগাদ্যা বন্দনা)

ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা মহা জাগ্রৎ দেবী বলিয়া পরিচিত। কথিত আছে এক সময়ে দেবী যোগাদ্যা ভানুদত্ত নামক এক শাঁখারীর নিকট 'ধামাচে' নামক পুষ্করিণীর ঘাটে শাঁকা পরিয়াছিলেন। এই 'ধামাচে' পুষ্করিণীতে পূর্ব্বে যোগাদ্যা অবস্থান করিতেন। এক্ষণে পুষ্করিণীটী মজিয়া গিয়াছে, উহাতে আর বেশী জল থাকে না, সেই জন্য বর্দ্ধমান মহারাজের "ক্ষীরদীঘি" নামক পুষ্করিণীতে যোগাদ্যাকে রাখা হয়। যোগাদ্যা সমস্ত বৎসরই জলমধ্যে নিমজ্জিত থাকেন, কেবল মাত্র বৈশাখ মাসের সংক্রান্তির দিন মহাপূজার সময় একদিনের জন্য উত্তোলিত হইয়া থাকেন। যথা :—

"একদিন মহেশ্বরী সরোবর তটে।
স্নান ছলে বসিয়াছে ধামাচের ঘাটে॥
শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জনা বসে করেন শঙ্করী।
হেন কালে শঙ্খ লয়ে আইল শাঁখারী॥
ডাক দিয়া বলে দেবী শাঁখারীর তরে।
কিসের পসরা তব মস্তক উপরে॥
শাঁখারী বলিছে ভানুদত্ত মোর নাম।
শঙ্খ বেচিবারে আমি যাব ক্ষীরগ্রাম॥
শঙ্খ নামে শঙ্করীর ভুলে গেল মন।
আনহ শাঁখারী শঙ্খ দেখিব কেমন॥

এত শুনি এল বেণে ধামাচের ঘাটে।
শঙ্খ নামাইয়া দিল দেবীর নিকটে॥
শ্রীরাম নামেতে শঙ্খ দেখি দুই বাই।
শঙ্খ দেখি মহাসুখী হৈল মহা মাই॥
দেবী বলেন দুই বাই শঙ্খ লব আমি।
ইহার উচিত মূল্য কত লবে তুমি॥
শঙ্খের উচিত মূল্য পাঁচ তঙ্কা লয়ে।
দুই বাই শঙ্খ মোরে দেহ পরাইয়ে॥
বণিক বলিল তুমি বসে আছ একা।
তোমারে পরাতে শঙ্খ মনে পাই শঙ্কা॥
কাহার বহুরি তুমি কাহার ঝিয়ারি।
তুমি শঙ্খ পরিলে কে দিবে টাকা কড়ি॥
দেবীবলে শুন বেণে পরিচয় দি।
পূজারী ব্রাহ্মণ আছে আমি তার ঝি॥
এই কথা বলো মোর পিতার নিকটে।
তব কন্যা শঙ্খ পরে ধামাচের ঘাটে॥
গম্ভীরের কোলঙ্গাতে পাঁচ তঙ্কা আছে।
শঙ্খ পরাইয়ে টাকা লবে পিতার কাছে।
অভয়ার মায়া বেণে বুঝিতে নারিল।
দেবীর নিকটে শঙ্খ পরাতে বসিল॥"

(যোগাদ্যা বন্দনা)

দেবীকে শাঁখা পরাইয়া পূজারী ব্রহ্মণের নিকট শাঁখার মূল্য লইতে আসিয়া শাঁখারী জানিতে পারিল যে, সে দেবী যোগাদ্যাকে শাঁখা পরাইয়াছে। তখন শাঁখারী প্রতিজ্ঞা করিল "যতদিন আমি জীবিত থাকিব ততদিন মহাপূজার দিন স্বয়ং মাতা ভগবতীকে শাঁখা যোগাইব এবং আমার বংশধরগণকে আদেশ করিয়া যাইব যেন তাহারা আমার মৃত্যুর পর যে কোন কালে যে কেহ আমার বংশে থাকিবে সেই মহাপূজার দিন মহামায়াকে শাঁখা যোগায়।" যথাঃ—

"শঙ্খ পরাইয়ে বেণে করিল গমন।
দ্বিজের নিকটে আসি দিল দরশন॥
কি কর গো দ্বিজবর গৃহেতে বসিয়া।
তোমার কন্যাকে এলাম শঙ্খ পরাইয়া॥
টাকা দিয়া বিদায় কর বসে কর কি।
ধামাচের ঘাটে শঙ্খ পরিল তব ঝি॥
ব্রাহ্মণ বলিল বেণে তোরে আমি কই।
কার কন্যা শঙ্খ পরে মোর কন্যা নাই॥
বণিক বলিল ঠাকুর ক্ষমা দেহ মোরে।
পাঁচ তঙ্কা দেখ গিয়া গম্ভীরা ভিতরে॥
এত শুনি দ্বিজবর দেখিবারে যায়।
গম্ভীরার কোলঙ্গেতে পাঁচ তঙ্কা পায়॥
বণিকের কথা দ্বিজ মনে বিচারিয়া।
টাকা পেয়ে বণিকের পায়ে ধরে গিয়া॥
শাঁখারী বলিল ঠাকুর পা ছেড়ে দাও।
কে শঙ্খ পরিল দ্বিজ সত্য করে কও॥
দ্বিজ বলে ওরে বণিক কি বলিব আর।
শতেক পুরুষ তব হইল উদ্ধার॥
তোমার ভাগ্যের কথা কিবা দিব লেখা।
যুগের যোগাদ্যা মাকে পরাইলি শাঁখা॥
মাথার পসরা বেণে ফেলে টান দিয়া।
চলিল ধামাচের ঘাটে মা, মা, বলিয়া।
ব্রাহ্মণ বণিক দোঁহে উর্দ্ধমুখে ধায়।
ঘাটে নাহি জগদম্বা দেখিতে না পায়॥
যোড় হস্তে ব্রাহ্মণ দেবীকে করে স্তুতি।
কৃপাকরি দরশন দেহ ভগবতী॥
যদি দরশন মাগো না দিবে আমারে।
ব্রহ্মহত্যা হব আমি তোমার উপরে॥
ব্রাহ্মণের বাক্যে দেবী মনে পাই ভয়।
জল হ'তে দুই বাই শঙ্খ যে দেখায়॥
বণিক বলিল আমি যত কাল জীব।
মহাপূজা দিনে শঙ্খ দুই বাই দিব॥
কালেতে আমার বংশে যে কেহ রহিবে।
পূজার দিবস শাঁখা অবশ্য যোগাবে॥

(যোগাদ্যা বন্দনা)

এই শাঁখারীর বাটী বর্দ্ধমান জেলায় কড়ুই

গ্রামে ছিল। এখন তাঁহার বংশধরগণ ঐ গ্রামে বাস করেন।

দেবী যোগাদ্যার "জটাজুট সমাযুক্তাং অর্দ্ধেন্দু কৃতশেখরাং লোচনত্রয় সংযুক্তাং পূর্ণেন্দু সদৃশাননাং অতসী পুষ্পবর্ণাভ্যাং সর্ব্বাভরণ ভূষিতাং।" ইত্যাদি—শারদীয়া দুর্গার ধ্যানে পূজা হইয়া থাকে। ক্ষীরগ্রামে দেবী যোগাদ্যার পূজার সম্বন্ধে যে সকল বিধিনিষেধ প্রচলিত আছে তাহার বিবরণও আমরা নিম্নে "যোগাদ্যা বন্দনা" হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যথাঃ—

"শুন রাজা পূজার নিয়ম আমি বলি।
কদাচ ভুলনা ইহা পালিবে সকলি॥
সমস্ত বৈশাখ হিংসা না করিবে মাটী।
সলিতা না পাকাবে অন্ন না দিবে কাটি॥
চক্রাকার যেন ক্ষীরগ্রামে নাহি রেখ।
স্ত্রীপুরুষে শয়ন নাহি সমস্ত বৈশাখ॥
পূর্ণগর্ভা নারী যার হবে শুন ঘরে।
সমস্ত বৈশাখ তারে রেখ স্থানান্তরে।
পাকচক্র কভু ক্ষীরগ্রামে নাহি রেখ।
দিবে না মাথায় ছত্র সমস্ত বৈশাখ॥
আর যাহা বলি আমি শুন সাবধান।
সমস্ত বৈশাখ মাসে না ভানিবে ধান॥
আদি অন্ত বৈশাখের পঞ্চ পঞ্চ দিনে।
লিখিবেনা কভু আর লগনের দিনে॥
অন্যদিনে আলতায় লিখ সর্ব্বজন।
কালিতে লিখিলে হবে নিয়ম লঙ্ঘন॥
সমস্ত বৈশাখ মাসে না বহিবে হাল।
সংক্রান্তি দিবসে পূজা হবে চিরকাল॥
উত্তর দুয়ারি ঘরে না করিবে বাস।
সন্ধ্যাকালে আরতি করিবে বারমাস॥"

সামাজিক ভাবে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, দেবী যোগাদ্যার পূজার যে সকল বিধি নিষেধ প্রচলিত আছে সেইগুলিই ক্ষীরগ্রাম সমাজের রক্ষক, চালক এবং সংস্কারক।

ক্ষীরগ্রামে দেবীর যে প্রাচীন আদি শ্রীমূর্ত্তি ছিল, তাহা কিছুদিন পূর্ব্বে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সেই আদি শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া বৰ্দ্ধমান মহারাজের ব্যয়ে বৰ্দ্ধমান জেলার দাঁইহাট নিবাসী ভারতবিখ্যাত প্রস্তরশিল্পী ৺নবীনচন্দ্র ভাস্কর দেবীর বর্ত্তমান মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। নবনির্ম্মিত মূর্ত্তি অবিকল প্রাচীন আদি মূর্ত্তির অনুরূপ হইয়াছে। যাঁহারা প্রাচীন ও আধুনিক উভয় মূর্ত্তিই দেখিয়াছেন তাঁহাদের মুখেই একথা শুনিয়াছি।

এক্ষণে দেবী যোগাদ্যার সেবা বৰ্দ্ধমানাধিপতির ব্যয়ে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। সেবার বন্দোবস্ত ভালরূপই আছে। প্রত্যহ উদ্দেশে দেবীর নিয়মমত পূজা, ভোগ ও শীতলাদি হইয়া থাকে। যোগাদ্যাদেবীর ভোগের জন্য যে মাষকলাইএর ডাল পাক হইয়া থাকে, তাহা বড়ই উপাদেয়, ঐরূপ অমৃতের ন্যায় ডাল বোধ হয় কোথাও হয় না।

বৰ্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুরগণের ব্যয়েই যোগাদ্যার বর্ত্তমান মন্দির ও গম্ভীরা প্রভৃতি নির্ম্মিত। বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত যোগাদ্যার প্রাচীন মন্দিরের চিহ্ন মাত্রও নাই, কেবল পাতাল হইতে যে সুরঙ্গদ্বার দিয়া হনূমান দেবীকে উত্তোলন করিয়াছিলেন, সেই প্রাচীন সুরঙ্গদ্বার একখানি বৃহৎ প্রস্তর আচ্ছাদিত অবস্থায় আছে। কেহ কেহ বলেন নরবলি দিয়া সেই ছিন্ন নরদেহ ঐ সুরঙ্গে নিক্ষেপ করা হইত।

বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি দেবী যোগাদ্যার মহাপূজার দিন। ঐ দিন ভোরে দেবীকে ক্ষীরদীঘির জল হইতে উত্তোলন করা

হয় এবং রাত্রিতে পুনর্ব্বার দেবীকে ক্ষীর-দীঘির জলে ডুবাইয়া রাখা হয়।

দেবীকে ক্ষীরদীঘির জল হইতে উত্তোলন করিয়া প্রথমে ক্ষীরদীঘির পূর্ব্বপাহাড়ে উত্থান মন্দিরে রাখা হয়। উত্থান মন্দিরে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজের, কৃষ্ণনগরের মহারাজের, পাটুলির (বর্ত্তমানে সেওড়াফুলির) রাজাদের ও চুপীর দেওয়ান মহাশয়দিগের পূজা ও বলিদান হয়। তৎপরে "মাচ" পূজা হয়। ক্ষীরগ্রামে ক্ষীরদীঘির নিকটেই দুইটী "মাচ" আছে। একটী পুরাতন "মাচ", আর একটী নূতন "মাচ"। এক্ষণে নূতন মাচেই পূজা হইয়া থাকে।

"মাচ" গৃহেই সর্ব্বসাধারণের পূজা ও বলিদান হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে পূজার দিন বর্দ্ধমান জেলার প্রায় সমস্ত গ্রাম হইতেই যোগাদ্যার পূজা আসিত, এখনও অনেক গ্রাম হইতেই পূজা আসিয়া থাকে। পূর্ব্বে "মাচ" পূজার সময় বড়ই গোলযোগ হইত। লোকের ভিড়ে "মাচ" দখল করা বড়ই কঠিন ব্যাপার ছিল, সেইজন্য প্রত্যেক গ্রাম হইতেই পূজাদি দিতে আসিবার সময় একদল করিয়া বলিষ্ঠ লাঠিয়াল যুবক সঙ্গে আসিত। এই যুবক সম্প্রদায়ে ইতর ভদ্র সকল শ্রেণীরই লোক থাকিত। প্রত্যেক গ্রামেই একজন করিয়া দলপতির অধীনে কতকগুলি বলিষ্ঠ যুবক সমস্ত বৎসর ধরিয়া লাঠি খেলা শিক্ষা করিত এবং পূজার সময় ক্ষীরগ্রামে আসিয়া অগ্রে 'মাচ' দখল করিবার চেষ্টা করিত। অগ্রে যাহারা "মাচ" দখল করিতে পারিত তাহাদের বীরত্বের বিশেষ সুখ্যাতি হইত। এই খ্যাতি লাভের জন্য প্রতিযোগিতার অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী; প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে জয়লাভের বাসনা এতাদৃশ প্রবল ছিল যে, শারীরিক বল-চর্চ্চার প্রতি বর্দ্ধমান জেলার প্রত্যেক পল্লীর জনগণের বিশেষ লক্ষ্য পড়িয়াছিল। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় এই যে, এক্ষণে আর সেরূপ ভাব নাই, এক্ষণে ভদ্রসন্তানগণের মধ্যে আর কেহই সেরূপভাবে লাঠিখেলা শিক্ষা করেন না। ইতর শ্রেণীর লোকের সহিত লাঠিখেলা শিক্ষা অপমানের কাজ বলিয়া তাঁহাদের ধারণা হইয়াছে। হায়, অধঃপতিত বর্দ্ধমানবাসি!

'মাচ' পূজার সময় বর্দ্ধমান-মহারাজের একটী মহিষবলি হইয়া থাকে। "মাচ" তলায় এবং ক্ষীরদীঘির আশেপাশে প্রায় হাজার বার শত পাঁঠা বলি এখনও হইয়া থাকে।

ক্ষীরগ্রামের রাজা হরিদত্ত কত বড় রাজা ছিলেন, তাঁহার ক্ষমতা কি প্রকার ছিল, তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে তাঁহার অর্থব্যয়ে খনিত "ধামাচ" পুষ্করিণীর আকৃতি দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি একজন অর্থশালী লোক ছিলেন এবং তাঁহার প্রদত্ত নরবলি প্রথা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি একজন অসাধারণ ক্ষমতাশালী লোকও ছিলেন। তাঁহার হাত হইতে দেবীর পূজার ভার কোন্ কোন্ রাজার হাতে পড়িয়াছিল তাহা ঠিক্ জানা যায় না। কৃষ্ণনগর ও পাটুলীর রাজাদের হাতে কিছুদিন এই সেবার ভার ছিল; তৎপরে মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের আমলে এই সেবার ভার বর্দ্ধমান মহারাজদিগের হাতে আসিয়াছে বলিয়া শুনা যায়।

"মাচ" গৃহের পূর্ব্বদিকে একটী উচ্চ ইষ্টকনির্ম্মিত বেদীকা আছে। সেই বেদীকার নাম 'যজ্ঞকুণ্ড'। মহাপূজার দিন সেই যজ্ঞকুণ্ডে হোম হইয়া থাকে। হোমান্তে সামাজিক সম্মানানুসারে পর

পর সকলে হোমের তিলক গ্রহণ করিয়া থাকেন।

সর্ব্ব শেষে গম্ভীরা বা যোগাদ্যার আরাধনা মন্দিরের সম্মুখে সকলে একত্র সমবেত হইয়া বাদ্যভাণ্ড ও নৃত্যগীতাদিসহ দেবীর আরাধনা করিয়া থাকেন।

মহাপূজার দিন ক্ষীরগ্রামবাসিগণ দ্বারে দ্বারে মঙ্গল ঘট স্থাপন ও কদলীবৃক্ষ রোপণ করিয়া থাকেন এবং আম্রশাখা দ্বারা গৃহের সম্মুখভাগ ও রাস্তাঘাট সজ্জিত করিয়া থাকেন।

ঐ সময়ে প্রত্যেক বৎসর ক্ষীরগ্রামে একটী বৃহৎ মেলা বসিয়া থাকে। ঐ মেলা পূজার পরও কএক দিন থাকে। মেলায় মিষ্টান্ন, মনোহারী দ্রব্য প্রভৃতি সকল প্রকার দ্রব্যের বেশ খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে। তবে পিতল কাঁসার দ্রব্যের খরিদ বিক্রয়ই কিছু বেশী হইয়া থাকে। পূজার পর প্রায় মাসাধিক কাল পিতল কাঁসার বাসনের দোকান থাকে এবং প্রত্যহ সমান ভাবে খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে। বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া, দাঁইহাট প্রভৃতি স্থান ও নবদ্বীপ হইতে কাঁসারীর দোকান আসিয়া থাকে। জুতা, জামা প্রভৃতির দোকান বর্দ্ধমান হইতে আসে। কলিকাতা হইতে সার্কাস, থিয়েটার প্রভৃতি খেলা আসিয়া থাকে।

এখানকার মেলায় বালক, যুবা বৃদ্ধ, বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা, বাবু, সৌখীন, ফেসান দুরস্ত, অবাবু, অসৌখীন, নেংটিগ্রস্ত সকলেই সম্মিলিত হয়। এই মহাপীঠস্থানে যেন সে সময় ভেদাভেদ জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়। তবে পূর্ব্বকালের লোক এই সব মেলায় যে স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিত, আমরা আজ-কাল তাহার শতাংশের একাংশও উপভোগ করিতে পারি না; কারণ সেকালের লোক খাঁটি যাহা তাহারই আদর করিত, কিন্তু আমরা হতভাগ্য এ কালের লোক অন্তঃসার-বিহীন বাহ্য আড়ম্বরপূর্ণ কৃত্রিমতাকেই আদর করিয়া থাকি। সে কালের লোক মেলায় আসিত দেবদেবীর পূজার্চ্চনা করিয়া আত্মার উন্নতি সাধন করিতে, আর আমরা হতভাগ্য একালের লোক পাশ্চাত্য শিক্ষার অভিমানে আত্মহারা হইয়া ঠাকুর দেবতা না মানিয়া মেলায় যাই তামাসা দেখিতে। শুনিয়াছি পূর্ব্বে ক্ষীরগ্রামের জনসাধারণ মেলার সময় সমাগত আহূত অনাহূত সকলকে সমাদর করিয়া নিজ নিজ গৃহে লইয়া যাইতেন এবং সাধ্যমত পান ভোজনাদির দ্বারা তাঁহা-দিগকে তৃপ্ত করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন, আর আজকাল মেলার সময় যদি কোন লোক কাহার গৃহে অতিথি স্বরূপে গমন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে গৃহস্বামীর একটা জঞ্জাল বলিয়া বোধ হয়। এটা ক্ষীরগ্রাম-বাসীর দোষ নহে, এ কালের লোকের প্রবৃত্তির দোষ। কারণ একালের লোক অবশ্য-প্রতিপাল্য আত্মীয়বর্গের ভার গ্রহণ করিতেই যখন নারাজ, তখন অতিথি-সৎকার তো বহুদূরের কথা। এক্ষণে আমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলাইয়া যাহা উপার্জ্জন করি, তৎ-সমস্তই অভিমানিনী অর্দ্ধাঙ্গিনীর বাক্সজাত করিতে পারিলেই জীবনে একটু শান্তি পাই, নতুবা গৃহিণীর সপ্তমেচড়া স্বরতরঙ্গাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া গৃহ হইতে সরিয়া পড়িতে বাধ্য হই। হায়, সভ্য সমাজ তোমাকে ধিক্!

অতিশয় ঘৃণা, লজ্জা ও দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, এখানেও মেলার সময় বড়ই মদের ছড়াছড়ি ও মাতালের হুড়াহুড়ী হইয়া থাকে।

ক্ষীরগ্রাম বর্দ্ধমানাধিপতির বিশাল জমীদারীর অন্তর্ভূক্ত। বর্দ্ধমান জেলার শ্রীবাটীর বিখ্যাত "চন্দ্র" বাবুরা ইহার পত্তনি স্বত্বের মালিক ছিলেন, কিন্তু কএক বৎসর হইল ইহা তাঁহাদের হাত ছাড়া হইয়াছে। বর্দ্ধমানের বিখ্যাত উকীল, সাহিত্যজগতে সুপরিচিত গঙ্গাটিকুরী-নিবাসী স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রগণ এক্ষণে ক্ষীরগ্রাম লাটের পত্তনী স্বত্বের মালিক। মেলার সময় যাহাতে তাঁহাদের প্রজাগণের নৈতিক অবনতি না হয় তৎপ্রতি একটু দৃষ্টি রাখা তাঁহাদের অবশ্যকর্ত্তব্য।

শ্রীভোলানাথ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিনোদ

কৃষি-রসায়ন *

মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সমাগত সাহিত্যসেবী বন্ধুবর্গ বর্ত্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধের আরম্ভে, আমি আপনাদিগকে প্রবন্ধ সম্পর্কে, দু'একটী আত্মকথা বলিব। আশাকরি তজ্জন্য আপনারা কেহ আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।

সম্মিলনীর উদ্যোক্তাগণ তাঁহাদের নির্দ্ধারিত (১) "বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান অভাব ও তন্নিবারণের উপায়।"

(২) "বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থায় কৃষি-রসায়ণ ব্যবহারের উপায়।"

(৩) "বর্ত্তমান দর্শন ও বাঙ্গালা সাহিত্য তাহার প্রভাব।"

(৪) "পালরাজগণের সময়ে বাঙ্গালা ইতিহাসের উপকরণ।" এই চারিটী বিষয়ের কোন একটা বিষয়ে আমাকে প্রবন্ধ লিখিতে আদেশ করিয়াছেন। আমি সেই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছি সত্য, কিন্তু বিদ্বজ্জন-তীর্থ এই সারস্বত-ক্ষেত্রে, প্রবন্ধ রচনায় যে কৃতিত্ব প্রকাশ করিলে, সাহিত্যসেবিগণের হৃদয়রঞ্জন সম্ভবপর হইয়া থাকে, আমার নিকট আপনারা তাহার কিছুই প্রত্যাশা করিতে পারেন না। আমি প্রায় সমগ্র জীবন—চত্বারিংশৎ বর্ষকাল—বাঙ্গালার একটী নগণ্য পল্লীতে হৃদয়ের একটী দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় কৃষি-চর্চ্চা করিয়াছি। জীবনের শেষ ভাগে মাত্র, কৃষি-সাহিত্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। অদ্যাপি অনেক বিষয় আমার অনধীত রহিয়াছে। অধিকন্তু বিষয়টীও নীরস ও জটিল। বাঙ্গালা সাহিত্যে কাব্যোপন্যাসের ভাষাসম্পদের তুলনায়, কৃষি-সাহিত্য বড়ই দরিদ্র এবং বাঙ্গালা-সাহিত্য-সেবীর পক্ষে বড়ই অরুচিকর। সুতরাং কৃষি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা সুকর নহে। ফলে বৈজ্ঞানিক-কৃষি-সাহিত্যে একটা নীরস প্রবন্ধ লিখিতে যাইয়া, আমি সর্ব্ব প্রথমেই আমার ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করিতেছি। যদিও আমার কর্ম্মজীবনের অধিকাংশ কাল কৃষি সাধনায় কাটিয়া গিয়াছে, তথাপি মনে হয়, সমস্ত জীবনের উপার্জ্জিত প্রায় লক্ষাধিক

* বর্দ্ধমান নগরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীর অষ্টম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

টাকা মূল্যের বিত্ত সম্পত্তির বিনিময়ে, আমি কৃষি বিষয়ে যে সামান্য একটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, আজ তাহাই মাত্র সম্বল লইয়া, দুঃসাহসে বুক বাঁধিয়া, আপনাদের সমক্ষে দাঁড়াইতে সাহসী হইয়াছি। কিন্তু আমি জানি—

"মন্দঃ কবি যশঃ প্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্
প্রাংশু লভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিববামণঃ।"

সুতরাং আমি যে আপনাদের নিকট উপহাসাস্পদ হইব সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কোন মৌলিকতা নাই; তথাপি আমার নার্শেরী-উদ্যানে এবং কৃষিক্ষেত্রে, প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল, হাতে হেতেরে বৈজ্ঞানিক কৃষি-চর্চ্চায় এবং বিভিন্ন দেশের নানারূপ উদ্ভিদের পরিচর্য্যায়, যে শিক্ষা লাভ করিয়াছি, বর্ত্তমান প্রবন্ধ তদ্দারাই পুরিপুষ্ট করিব আমার তাদৃশী শিক্ষাও নাই। পরন্তু, কৃষি সাহিত্যের ভাষা এক্ষণও সর্ব্বাংশে সুগঠিত হয় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক কৃষি-প্রবন্ধে আপনারা ভাষা নৈপুণ্যের প্রত্যাশা করিবেন না। এবিষয়ে আমি আমার অক্ষমতা প্রকাশ করিতেছি।

আমি কখনও কৃষি-কলেজে অধ্যয়ন করি নাই। প্রকৃতি বিরচিত কৃষি-বিদ্যালয়ের আমি একজন অকৃতি শিক্ষার্থী। প্রকৃতির পাঠশালায় আমি যৎসামান্য কার্য্যকরী শিক্ষা লাভ করিয়াছি এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষি সম্পর্কে কাহারও কাহারও জীবনব্যাপী সাধনার কথা বা কৃষি-সাহিত্য যৎকিঞ্চিৎ অধ্যয়ন করিয়াছি মাত্র। সুতরাং আপনারা আমার নিকট কোনরূপ গবেষণামূলক প্রবন্ধও প্রত্যাশা করিতে পারেন না। যাহা হউক সভার উদ্যোক্তাবর্গ, সভাপতি মহাশয় এবং সমাগত সাহিত্যিক বন্ধুবর্গকে, এই শুভ সম্মিলনের জন্য, অন্তরের সহিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া এইক্ষণ আমি আমার বক্তব্য বিষয়ের অবতারণা করিতেছি।

প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়—বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থায় কৃষি-রসায়ন ব্যবহারের উপায় নির্দ্ধারণ। বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থা কি? কৃষির সহিত রসায়নের সম্বন্ধ কতটুকু বর্ত্তমান, এবং সাহিত্যের হিসাবে, অথবা অর্থের বা শিক্ষার হিসাবে ও বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থায় কৃষি-রসায়ন ব্যবহারের উপায় কি? প্রধানতঃ এই তিনটী বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিতেছি। ইহাতেই প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমাধান হইবে।

বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থা

বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় বুঝাইতে হইলে, এখন আর বিশেষ বাগ্মীতা বা সূক্ষ্মদর্শীতার আবশ্যক করে না। বর্ত্তমান অন্নসমস্যা সম্বন্ধে সমগ্র দেশব্যাপী যে আন্দোলন চলিতেছে, তাহা হইতেই আমরা বাঙ্গালার আভ্যন্তরীন্ অবস্থা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। অধুনা উদর পূর্ত্তির ব্যবস্থা করিতে গিয়াই আমাদিগকে বাধ্য হইয়া দেশের অবস্থা বুঝিতে হইতেছে। গৃহে অন্নাভাব হইলে, গৃহিণীর ভ্রূকুটি কুটিলমুখ এবং শিশু সন্তানগণের অনশন বা অর্দ্ধাশনজনিত ক্লিষ্টতা ও রোদন-ধ্বনিই আমাদিগকে দেশের অবস্থার বিষয় বুঝাইয়া দিতেছে। এতদিনে, আমরা কবি কালিদাসের "অন্নচিন্তা চমৎকারা।" শ্লোকটীর সার্থকতা হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছি।

"দরিদ্রস্য গুণাঃ সর্ব্বে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিবৎ।
অন্ন চিন্তা চমৎকারা কাতরে কবিতা কুতঃ।"

একদা কবি কালিদাস, গৃহ হইতে বহির্গত

হইয়া সভায় যাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার পত্নী বলিলেন, "আজ গৃহে তণ্ডুল নাই।" কালিদাস ভাবিতে ভাবিতে রাজ-সভায় গমন করিলেন। সে দিন মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে যে সকল সমস্যা পূরণ করিতে বলিলেন, কালিদাস তাহার কোনটীই পূরণ করিতে পারিলেন না। তখন বিক্রমাদিত্য বিস্মিত হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কালিদাস উল্লিখিত শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! দরিদ্রের গুণসমূহ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিবৎ অর্থাৎ তাহার স্ফুরণ হয় না। অন্ন চিন্তা চমৎকারা, সে চিন্তায় যে কাতর তাহার আর কবিতা শক্তি কিরূপে বিকসিত হইবে?" কালিদাসের ন্যায় অসামান্য প্রতিভাশালী কবি, সামান্য সময়ের অন্ন চিন্তায় জ্ঞান-বিমূঢ় হইয়াছিলেন। আমাদের জীবনব্যাপী উদর-জ্বালার ত এক মুহূর্ত্তও বিরাম নাই। তথাপি আমাদের চৈতন্য নাই। তথাপি আমরা বাবু? চাষার ছেলেও শিক্ষাভিমানী আমাদের আদর্শানুসরণে চাষা নাম ঘুচাইয়া চাষবাস ছাড়িয়া বাবু হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু এক্ষণে উদরের পীড়নে, অভাবের তাড়নে আমাদের কৃষির প্রতি সে ঘৃণার ভাব, অনেক লঘু হইয়া পড়িয়াছে। ভদ্র লোকের ছেলেও কেরাণীগিরি ছাড়িয়া এক্ষণে হাতে হেতেরে চাষবাসে মন মজাইতেছে। এই পরিবর্ত্তনের মূলেও বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থার ক্ষীণালোক পরিলক্ষিত হইতেছে।

বড়ই আনন্দের ও সুখের বিষয়, কৃষিপ্রাণ দেশের উপেক্ষিত কৃষিতত্ত্ব বা কৃষিকথা, আজকাল বঙ্গীয় সাহিত্যালোচনী সভাতেও স্থানলাভ করিতে পারিয়াছে এবং প্রথম ও প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা জানি "কৃষির্ধন্যা কৃষির্মেধ্যা জন্তুনাং জীবনং কৃষি।" তথাপি এই শাস্ত্রীয় বচনটী এতকাল শিক্ষিত-সমাজে উপেক্ষিত হইতেছিল। কৃষিকে আমরা ঘৃণার চক্ষে দেখিতে ছিলাম। কিন্তু সুখের বিষয় হইলেও এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিয়মান হয় যে "সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা" দেশের অধিবাসী হইয়াও বাঙ্গালী প্রকৃতই এক্ষণ অন্নের কাঙ্গাল হইয়া পড়িয়াছে।

আমাদের মাতৃরূপিণী এই মহিমান্বিতা বঙ্গভূমি চিরকালই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বলিয়া পরিচিতা ছিলেন। বাঙ্গালী কখনও পেটের দায়ে, পরের কাছে হাত পাতিয়া দাঁড়ায় নাই। বাঙ্গালীকে কখনও অন্নাভাবে অশ্রুসিক্ত নয়নে, একান্তে বসিয়া, অদৃষ্টের গতি চিন্তা করিতে হয় নাই। বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী বলিয়া কেহ কখনও অবজ্ঞার চক্ষে দর্শন করিতে সাহস করে নাই। সে বাঙ্গালী অন্নপূর্ণার সন্তান হইয়াও আজি সকলের কাছেই অন্নের কাঙ্গাল বলিয়া ঘৃণিত। দুই চারিজন প্রাসাদবাসী ঘৃতান্নপুষ্ট বাঙ্গালীর কথা আমি কহিতেছি না। বাঙ্গালী সাধারণের কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য। দেশে এই যে একটা অতৃপ্তি, অসন্তোষ ও অন্নাভাবের হাহাকার উঠিয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বাঙ্গালী দেশ না চিনিলেও দেশের অবস্থা কি এইক্ষণে তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছে, সুতরাং দেশের অবস্থা সম্বন্ধে আমার বলিবার আর বেশী কিছুই নাই।

বর্ত্তমান অবস্থা ঘটিবার প্রকৃত কারণ কি? দেশব্যাপী অভাবের প্রকৃত তত্ত্ব চিন্তা করিলে পরিলক্ষিত হইবে যে, কৃষিবৃত্তির বিড়ম্বনাই ইহার মুখ্য কারণ। সকল

দেশেরই ধনাগমের উপায় কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য, তন্মধ্যে কৃষিই সকলের মূল ভিত্তি। কৃষিতে অশন-বসনোপযোগী যাবতীয় সামগ্রী এবং শিল্পের অধিকাংশ উপকরণ বা কাঁচামাল উৎপন্ন হয়। এই সকল কৃষিজাত দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ে এবং শিল্পোচিত ব্যবহারে শ্রম-শিল্প, তথা ব্যবসায় বাণিজ্যের বিস্তার ঘটে। কৃষিই বাণিজ্যের এবং বাণিজ্যই অর্থের মূল। অর্থ ইহলৌকিক সুখ-সম্পদের এবং জাতীয় উত্থানের হেতু। সুতরাং সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে একমাত্র কৃষিই সর্ব্ববিধ উন্নতি ও সকল প্রকার সুখ-সম্পদের সৌকাযাসাধক। কৃষিই সমাজের মেরুদণ্ড, কৃষিই সমাজের ভিত্তি ও মানব-সমাজের মুখ্য বন্ধনী। ফলতঃ কৃষি লইয়াই সমাজ; কৃষিকার্য্যের উন্নতিই সমাজের সৃষ্টি ও স্থিতি; এবং কৃষির ক্রমোন্নতিতেই সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি। কৃষিই বাঙ্গালীর জীবন। একমাত্র কৃষিই বাঙ্গালীর সম্পদ ও বল। কৃষিই অন্ন-সংস্থানের একমাত্র উপায় এবং অন্নই মানুষের বল এবং প্রাণ; বল দ্বারাই প্রাণ; অন্নাভাবেই বলাভাব এবং বলাভাবেই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

"অন্ন মূলং বলং পুংসাং বল মূলংহি জীবনম্।
তস্মাৎ যত্নেন সংরক্ষেৎ বলঞ্চ কুশলোভিষক॥"

ভিষক অর্থাৎ বৈদ্যকেও যাহাতে রোগীর বল বৃদ্ধি হয়:এরূপ উপায় বিধান করিতে হয়। আমাদের গৃহে অন্নাভাব প্রতি নিয়ত বিদ্যমান। অন্নাভাবে দেশ সারহীন হইতেছে, সম্বল আছে কেবল বাগাড়ম্বর ও বাহ্যাড়ম্বর মাত্র।

এই কৃষির সহিত গো-জাতির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই গোজাতিই একদিন গোধন নামে পরিচিত ছিল। বস্তুতঃ গোজাতিই বাঙ্গালীর প্রকৃত ধন। এই ধনের অভাবেই আজ বাঙ্গালী এত নির্ধন ও অন্নের কাঙ্গালী হইয়া পড়িয়াছে, কৃষিই বাঙ্গালীর ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষলাভের যে একমাত্র উপায় তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। একদিন, বেশী দিনের কথা নহে, বঙ্গের কৃষক অথবা কৃষিজীবি ভদ্রলোক যদি বৎসরে ২।৩ শত মণ ধান ঘরে আনিতে পারিত এবং আপনার গোশালায় ২।৪টী গাভী রাখিত এবং বাড়ীর পুকুরে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য পুষিতে পারিত, তাহা হইলে সে, সারা বৎসরই মিষ্টান্ন, পরমান্ন, পিঠা, পায়স, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন ও মৎস্যের নানাবিধ সামগ্রী ভোজন করিত এবং আপনার পরিবারস্থ সকলকেই পরমা তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইতে সমর্থ হইত। অধিকন্তু আত্মীয় স্বজন প্রভৃতিও তাহার অন্নেই সুখে স্বচ্ছন্দে প্রতিপালিত হইত।

"ক্ষেতের ধান, পালের গাই
পুকুরের মাছ, যার আছে ভাই
তার সমান সুখী নাই।"

এইক্ষণে হিসাব করিয়া দেখুন আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণই সুখী ছিলেন, না আমরাই সুখী? এইক্ষণে পিতা মাতাও যে সন্তানের প্রদত্ত শাকান্ন দ্বারায় উদর পূরণ করিবে, এমন সৌভাগ্যই বা কয়জনের ঘটে। কেন এমন হইল, তাহার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে গেলেই বুঝিতে পারিবে, ধান্য ধন ও গোধনের অভাবেই বাঙ্গালীর ধর্ম্ম গিয়াছে, শক্তি গিয়াছে, বল গিয়াছে, সাহস গিয়াছে, জাতীয়তা গিয়াছে, স্বাস্থ্য গিয়াছে, সুখ গিয়াছে, শান্তি গিয়াছে এবং তৃপ্তি গিয়াছে। আছে কি? আছে কেবল ধর্ম্মহীন, কর্ম্মহীন বিশেষতঃ হৃদয়হীন বাঙ্গালীর পিতৃদত্ত প্রাণটী ও

অস্থিকঙ্কালখানি, আর আছে সেই কঙ্কালের ভিতর বাক্যের প্রবল তরঙ্গ ও ভাবের লহরী। যতদিন এদেশে কৃষির আদর ছিল, যতদিন পল্লীগ্রামের করিম সেখ ও পরাণ মণ্ডলকে করিম দাদা, পরাণ কাকা বলিয়াই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতি মাত্রেই সম্বোধন করিত, করিম দাদা ও পরাণ মণ্ডলকে গ্রামের সকলেই ভয় করিত, আদর করিত, তাহাদের সুখ, দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিত, ততদিন বাঙ্গালার প্রকৃত অভাব ছিল না।

অভাব কাহাকে বলে তাহাও বোধ হয় অনেকেই জানিত না।

কৃষিপ্রিয় প্রাচীন কবি মুকুন্দরাম, তাঁহার কবিকঙ্কন চণ্ডী কাব্যে লিখিয়া গিয়াছেন।

"ধন্য অগ্রহায়ণ মাস, ধন্য অগ্রহায়ণ মাস।
বিফল জীবন তার নাহি যার চাষ॥"

ইহাই যতদিন বাঙ্গালীর প্রাণের কথা ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত এদেশে অন্ন-কাঙ্গালের সংখ্যা বড় কম ছিল, ছিল না বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। কবি আপন বংশের মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য তাঁহার উক্ত কাব্যের অন্যত্র, ধর্ম্মের ও সম্মানের কথা তুচ্ছ করিয়া অকাতরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

সহর ছেলিমা বাজ, তাহাতে সজ্জন রাজ,
নিবসে নিউগী গোপীনাথ।
তাঁহার তালুকে বসি, দামুন্যায় চাষ চষি,
নিবাস পুরুষ ছয় সাত।"

সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ সন্তানেরাও যতদিন হালের কোটী বা মুঠা ধরিয়া চাষ বাস করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না, হালের কোটী ধরিলে যতদিন বাঙ্গালার উচ্চ শ্রেণীর লোকেরও জাতি যাইত না, যতদিন চাষের কাজ বা চাষার কাজ বঙ্গদেশে গৌরবের সামগ্রী ছিল ততদিন পর্য্যন্তও বাঙ্গালীকে বাঙ্গালি সাজিতে হয় নাই। কিন্তু যে দিন হইতে বাঙ্গালী বাবু সাজিতে শিখিয়াছে, যে দিন হইতে চাষা কথাটা এদেশে গালি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যে দিন হইতে করিমদাদা, পরাণ কাকা পাড়াগেয়ে ভূতের স্থান অধিকার করিয়াছে এবং বাবুদের জাঁক জমক কেবল কৃষকের হালের উপরই নির্ভর করে, ইহা যে দিন হইতে বাবুরা ভুলিয়া গিয়াছেন, সেই দিন হইতেই বাঙ্গালীর পোড়া কপালের সূত্রপাত হইয়াছে।

কৃষির আবশ্যকতা

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কৃষির আবশ্যকতার কথা আর বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। যে কৃষি আমাদের অশন-বসন যোগায়, যে কৃষি আমাদের শ্রম-শিল্প বা পণ্য-সম্ভারের জন্মদাতা সেই কৃষি বৃত্তিতে আমাদের বিজাতীয় ঘৃণার ফলেই যে দেশে অন্ন-সমস্যা ভীষণ ভাব ধারণ করিতেছে তাহা স্বীকার্য্য। এই অন্ন-সমস্যা সাধনের প্রধান উপায় কৃষি। সুতরাং এদেশে কৃষির আবশ্যকতা রহিয়াছে যথেষ্ট। কৃষি-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারিলে আমাদের কর্ম্মজীবন স্বতন্ত্রভাবে গঠিত হইয়া উঠিবে। বর্ত্তমান অন্ন-সমস্যার দিনে, আমরা আত্মরক্ষায় ও সমাজসেবায় অধিকতর কার্য্যক্ষম হইতে পারিব এবং আত্মপোষণে সর্ব্বাংশে বা অনেকাংশেই নির্ভরশীল হইবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে পারিব। চাষের নেশা লইয়া চাষে বাসে প্রবৃত্ত হইতে পারিলে আমাদের নূতন কর্ম্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে পারিব এবং তাহাতে চাকুরী সমস্যাও অনেকাংশেই নিরাকৃত হইতে পারে। শ্রমাধিক্যে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ক্ষেত্রজাত বস্তুর প্রকার, পরিমাণ ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি ভিন্ন, বাঙ্গালার আর গত্যন্তর নাই।

কৃষির সহিত কৃষি-রসায়নের সম্বন্ধ

একমাত্র কৃষিই যখন ইদানীং বঙ্গের একমাত্র আশার স্থল তখন কিসে ইহার উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে তাহা দেশের ও দশেরই প্রথম ও প্রধান আলোচ্য বিষয়। কৃষির সহিত কৃষি-রসয়নের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। ফলে কৃষি শিখিতে হইলে কৃষি-রসায়ন সম্বন্ধেও মোটামুটী ভাবে সকল তথ্যই জানিতে হয়। আত্মরক্ষার ও এদেশের অশিক্ষিত অনশনক্লিষ্ট ও অর্দ্ধলগ্ন কৃষক কুলকে রক্ষা করিতে হইলে, ক্ষেত্রের শস্যের উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে চাহিলে কৃষকদিগকে কৃষি-রসায়ন শিক্ষা দিতে হইবে। শিক্ষিত ভদ্র-সন্তানেরাও হাতে হেতেরে চাষ বাস আরম্ভ না করিলে আদর্শস্থলবর্ত্তী হইয়া কৃষককে সকল বিষয় বিশেষতঃ কৃষি-রসায়নের বিষয় শিক্ষা না দিতে পারিলে, পৃথিবী ক্রমাগতই শস্য হরণ করিয়া বাঙ্গালার দুঃখ-দুর্গতির মাত্রা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত করিয়া তুলিবেন। যে কৃষির উপরই আমদের জীবন-মরণ সমস্যা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে সেই কৃষির সর্বাঙ্গীন উন্নতি, কৃষি-রসায়ন ব্যবহার সাপেক্ষ। সুতরাং কৃষি-রসায়ন শিক্ষা না করিয়া কৃষিকার্য্যে হস্তক্ষেপ করা বিড়ম্বনা মাত্র। কৃষি-রসায়নকে কৃষি-কার্য্যে সাফল্য লাভের প্রথম ও প্রধান অবলম্বন বলা যায়।

কৃষি-রসায়ন

উদ্ভিদের সহিত মৃত্তিকার সম্বন্ধ কি, তাহা বুঝাইতে হইলেই উদ্ভিদের ও মৃত্তিকার রাসায়নিক তত্ত্ব বুঝিতে হইবে। কৃষির সহিত মৃত্তিকা ও উদ্ভিদের চির সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুতরাং ইহাদের রাসায়নিক তত্ত্ব অবগত হওয়াই কৃষি-রসায়ন শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। কি কি উপাদানে মৃত্তিকা ও উদ্ভিদ গঠিত হইয়াছে এবং মৃত্তিকার কোন্ কোন্ উপাদান কোন্ কোন্ জাতীয় উদ্ভিদের জীবন-রক্ষক, তাহা অবগত হইতে না পারিলে কৃষি-কার্য্যে সুফল লাভ করা যায় না। কৃষির প্রধান অবলম্বন মৃত্তিকার উপাদানগুলির দুই বা বহু পদার্থ পরস্পর সংযুক্ত হইলে উহারা এক বস্তুতে পরিণত এবং গুণান্তর প্রাপ্ত হইয়া উদ্ভিদদেহে কার্য্যকরি হইয়া থাকে। যে শাস্ত্র পাঠে এই বিষয়ে সম্যক জ্ঞান জন্মে তাহাকেই কৃষি-রসায়ন কহে। প্রথমতঃ মৃত্তিকার উপাদানের সংমিশ্রণ, গুণান্তর প্রাপ্তি এবং উদ্ভিদের পক্ষে তাহার প্রয়োজনীয়তার কথাই বলিতেছি। তৎপর কৃষি-রসায়ন ব্যবহারের উপায় নির্দ্দেশ করিব।

মৃত্তিকার ও উদ্ভিদের রাসায়নিক তত্ত্ব

ভূমি চাষ করিয়া তাহাতে ফসল উৎপন্ন করার নাম কৃষিকার্য্য। কৃষিকার্য্য নানারূপে সাধিত হইতে পারে। যে উপায়ে, অল্প ব্যয়ে, অধিক পরিমাণে ফসল উৎপন্ন করা যাইতে পারে তাহার নাম অর্থকরী কৃষিকার্য্য (Economical agriculture.)

অর্থকরী কৃষিকার্য্য করিতে হইলে (১) ভূমিতে যে ফসল উৎপন্ন করিতে হইবে, তাহার দৈহিক উপাদান ও স্বভাব এবং (২) মৃত্তিকার উপাদান ও উদ্ভিদদেহে তাহার কার্য্যকারিতা প্রধানতঃ এই দুইটী বিষয় সর্ব্বাগ্রে অবগত হওয়া আবশ্যক।

নানা জাতীয় উদ্ভিদ দেহের বিশ্লেষণ করিয়া তন্মধ্যে প্রায় বিংশতি প্রকার ধাতব পদার্থের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য একই উদ্ভিদে উক্ত বিংশতি প্রকার ধাতব পদার্থের সমাবেশ নাই। ধাতব পদার্থ সকল তরলাবস্থায় উদ্ভিদের মূল কর্ত্তৃক শোষিত

হইয়া উহার পত্রে নীত এবং তথায় জীর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। পত্রকে উদ্ভিদের পাকস্থালী-বিশেষ বলা যায়। এই পাকস্থালীতে নীত ধাতব পদার্থের যে অংশ জীর্ণ হয় তদ্দ্বারাই উদ্ভিদের পুরিপুষ্টতা সাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু ধাতব পদার্থের কিয়দংশ উত্তাপে তরলাবস্থা প্রাপ্ত বা জীর্ণ হয় না। উহা পত্রেই রহিয়া যায়। এই অজীর্ণ অংশ অনায়াসেই পত্র হইতে বাহির করিয়া লওয়া যায়। বৃক্ষের শুষ্ক পত্রে অগ্নি সংযোগ করিলেই উহা পুড়িয়া যাইবে এবং ওজনে কম হইবে। যে পরিমাণ ওজন কমিয়া যাইবে, তাহা জৈবিক পদার্থ, আর পুড়িবার পরও যাহা অবশিষ্ট থাকে উহাই ধাতব পদার্থ। পত্র ভস্মের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিলে তন্মধ্যে গন্ধক, ফস্ফোরাস (Phosphorus), পোটাস (Potash), চুণ (Lime) এবং সাইলেকস (Silex) নামক অগ্নি-প্রস্তরের (চক্মকি পাথরের) অংশই অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইবে। কিন্তু উহাদের প্রত্যেকের অংশ অতি সামান্য।

উদ্ভিদের ন্যায় প্রাণীদেহে ধাতব পদার্থের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ জীবদেহ অজৈব (Inorganic) বা ধাতব-পদার্থ-হীন উপাদানেই গঠিত। উল্লিখিত কতিপয় ধাতব পদার্থের সংমিশ্রণেই যে উদ্ভিদ দেহ সৃষ্ট হইয়াছে তাহা নহে। তন্মধ্যে আরও কতকগুলি পদার্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে। উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করিলে উহাতে প্রধানতঃ অঙ্গারজান (Carbon), অম্লজান (Oxygen), জলজান (Hydrogen) এবং যবক্ষারজান (Nitrogen) নামক পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কয়েকটী পদার্থ উদ্ভিদের ন্যায় জীবদেহেও বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহারা যৌগিক পদার্থ। সুতরাং প্রত্যেকেই পরস্পর সম্পৃক্ত ভাবে জীব ও উদ্ভিদ্ শরীরে বর্ত্তমান আছে। ইহাদের অস্তিত্বই জীবন এবং অভাবই মৃত্যু। এই জন্যই উহাদিগকে জৈব উপাদান (Organic elements) বলা যায়। জৈব উপাদান সকল পরস্পর বিমিশ্রভাবে থাকিতে পারে না। অঙ্গারজান, জলজান, অম্লজান একত্রে সংযুক্ত হয়। এই তিনের সংমিশ্রণকে ত্রিসংযোগ-মিশ্র (Ternary compound) কহে। এই ত্রিবিধ মিশ্র পদার্থের সহিত যবক্ষারজান ও গন্ধক সংযুক্ত হইলে যে মিশ্র পদার্থের সৃষ্টি হয়, উহার নাম জৈবেয় বা জীবাঙ্কুর-মিশ্র (Protoplasm)। ইহাই উদ্ভিদের সজীবতা ও তেজস্বিতা বৃদ্ধির মূলীভূত কারণ। জৈব ও অজৈব উপাদানসমূহ, পরস্পর বিষমভাবে বিদ্যমান থাকিয়া, উদ্ভিদদেহ গঠন করিয়া থাকে। এতন্মধ্যে অঙ্গারজানই উদ্ভিজ্জীবনের প্রধান উপাদান। ইহা জলের সহিত সহজেই মিশ্রিত হয়। অম্লজানের সংযোগে অঙ্গারজান তরলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তদবস্থায় উহা অঙ্গারাম্লরূপে পরিণত হয়, অঙ্গারজান তরলাবস্থা প্রাপ্ত হইলেই, উদ্ভিদের মূল দ্বারা শোষিত বা গৃহীত হইয়া থাকে। অঙ্গারাম্ল বাষ্প (Carbonic acid gas) বায়ুতে বিদ্যমান রহিয়াছে। বৃক্ষের সবুজ পত্রসমূহ, সূর্য্যোত্তাপের সাহায্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বায়ু হইতে উহা গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রাণিগণের প্রকৃতির সহিত উদ্ভিদের এই বিষয়েই অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। উদ্ভিদ, পত্র দ্বারা অঙ্গারাম্ল গ্রহণ এবং অম্লজান ত্যাগ করে। পক্ষান্তরে মনুষ্যাদি প্রাণীসমূহ শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত অঙ্গারাম্ল ত্যাগ ও অম্লজান গ্রহণ করিয়া থাকে। পত্র দ্বারা উদ্ভিদের আংশিক পরি-

মাণে নাসিকার কার্য্যও সাধিত হইয়া থাকে। বায়ুতে যে পরিমাণ অঙ্গারাম্ল বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং প্রাণিগণ প্রতিমুহূর্ত্তে যে পরিমাণ অঙ্গারাম্ল ত্যাগ করে, উদ্ভিদেরা তাহা গ্রহণ না করিলে, প্রাণী-জগৎ এতদিন অঙ্গারাম্ল বাষ্পে পূর্ণ হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত। কিন্তু বিশ্ববিধাতার অত্যাশ্চর্য্য বিধানে প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে উক্তরূপ অসামঞ্জস্য থাকাতেই পৃথিবী হইতে সজীব প্রাণীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইতে পারিতেছে না। উদ্ভিদেরা যে পরিমাণ অম্লজান ত্যাগ করে, সেই পরিমাণ অঙ্গারাম্ল বাষ্পও গ্রহণ করিয়া থাকে। ফলে কোন কালে কোনটীরই আধিক্য না হইয়া দুইটীরই সমতা রক্ষিত হইতেছে।

উদ্ভিদপত্রে অগ্নি সংযোগ করিলে, উহা প্রথমতঃ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। উহাতে অঙ্গারের ভাগ রহিয়াছে বলিয়াই ইহার বর্ণ-পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। অঙ্গার দাহ্য পদার্থ, পত্র পুড়িয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট রহে, উহাই ভস্ম। ভস্ম যে ধাতব পদার্থ ব্যতীত আর কিছুই নহে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যাহা পুড়িয়া গেল উহা জৈবিক পদার্থ। প্রাণীর অস্থি, মাংস বা দেহের অন্য কোন অংশ পোড়াইলেও জৈবিক ও ধাতব পদার্থের অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায়। পক্ষান্তরে, মৃত্তিকা অগ্নিদগ্ধ করিলেও তাহাতে এতদুভয় পদার্থের অস্তিত্ব অনুভব হয়।

জৈবিক ও ধাতব পদার্থসমূহ (১) সরল ও (২) মিশ্র এই দুই ভাগে বিভক্ত। সরল পদার্থ মাত্রই একটী মূল উপাদানে গঠিত। সুতরাং উহাদিগকে বিশ্লেষণ করা যায় না। কিন্তু মিশ্র পদার্থগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া পুনরায় মৌলিক পদার্থে পরিণত করা যাইতে পারে।

পৃথিবীর অভ্যন্তরে, পৃষ্ঠে ও উপরিভাগে যে সকল পদার্থ রহিয়াছে উহারা মোট ৬০টী মৌলিক পদার্থের সমবায়েই সৃষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৫টী জৈবিক এবং ৪৮টী ধাতব পদার্থ। জৈবিক ও ধাতব পদার্থসমূহের কোনটী বাষ্পাকার, কোনটী তরল, কোনটী কঠিন এবং কোনটী বা আকার পরিবর্ত্তনশীল। জলের আকার তরল। কিন্তু উহা জমিয়া গেলে কঠিন বরফে পরিণত হয়। আবার অধিক উষ্ণ হইলে বাষ্পের এবং শৈত্য সংস্পর্শে শিশির বা তুষারের আকার ধারণ করে। সুতরাং ইহার আকার পরিবর্ত্তনশীল। জৈবিক পদার্থের অধিকাংশই উত্তাপ ও বায়ু সংস্পর্শে পচিয়া যায়। উত্তাপে মিশ্র পদার্থ সংকীর্ণ হইয়া মৌলিক পদার্থে পরিণত হয়। যেমন কাষ্ঠ পোড়াইয়া উহা হইতে আলকাতরা (Tar) জল (Water) ও পাইরোলিগনিয়াস অম্ল (Pyroligneous acid) ও কয়লা প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাণিগন খাদ্য দ্রব্য হইতে, উদ্ভিদেরা মৃত্তিকা হইতে এবং মৃত্তিকা প্রস্তর পাহাড় (Rock) হইতে ধাতব পদার্থ গ্রহণ করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে প্রাণিগণ খাদ্য হইতে, উদ্ভিদ মৃত্তিকা ও বায়ু হইতে এবং মৃত্তিকা মৃত প্রাণী ও উদ্ভিদের শেষ পরিণতাবস্থা হইতে জৈবিক পদার্থ প্রাপ্ত হয়। মৃত্তিকায় যে জৈবিক ও ধাতব পদার্থ আছে, তাহা হইতেই উদ্ভিদের সংরক্ষণ, পরিপোষণ এবং জীবনধারণোপযোগী খাদ্য গৃহীত হইয়া থাকে। উদ্ভিদ দেহ বিশ্লেষণ করিলে যে সকল ধাতব ও জৈবিক উপাদান প্রাপ্ত হওয়া যায়, ভূমি হইতে উহাই উদ্ভিদ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। সুতরাং মৃত্তিকায় উহার কোন উপাদানের অভাব হইয়া পড়িলে, তাহা মৃত্তিকার সহিত সংযোগ করা আবশ্যক হয়। নতুবা যথোচিত

খাদ্যের অভাবে উদ্ভিদ নিস্তেজ হইয়া পড়ে বা মরিয়া যায়। মৃত্তিকায় উদ্ভিদের খাদ্য আবশ্যকানুযায়ী রহিয়াছে কি না, তাহা যদ্দ্বারা জানিতে পারা যায় তাহাই কৃষি-রসায়ন-বিদ্যা। কৃষি-রসায়ন সাহায্যে উদ্ভিদের খাদ্য, খাদ্যের পরিমাণ এবং মৃত্তিকায় তাহার অস্তিত্ব ও উহাকে উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী করিবার প্রণালী অবগত হওয়া যায়। সুতরাং কৃষিকার্য্যে সাফল্য বা সন্তোষজনক ফললাভ সুনিশ্চিত হইয়া পড়ে। বিষয়টা আরও একটুক স্পষ্ট করিয়াই বুঝাইতেছি। ধান্যের চাষে সন্তোষজনক ফললাভ করিতে হইলে, প্রথমতঃ চাউলে কি কি উপাদান রহিয়াছে, তাহা চাউল বিশ্লেষণ দ্বারা নির্ণয় করিতে হইবে। বিশ্লেষণের ফলে চাউলে কতকগুলি জৈবিক এবং কতকগুলি ধাতব পদার্থ পাওয়া যায়।

এই সকল উপাদান ধানগাছ, মৃত্তিকা হইতেই যে প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং যে মৃত্তিকায় এই সকল উপাদান সুলভ, সেই মৃত্তিকাই ধান্যের চাষ পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়া জানিবে। আবার যে ভূমিতে ধানের চাষ করিতে হইবে, উহার কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা পরীক্ষা করিলেই উহাতে ধানগাছের খাদ্যোপযোগী কোন্ কোন্ উপাদানের অভাব আছে, তাহা জানিতে পারা যায়। উহার অভাব কি, তাহা জানিতে পারিলে, কৃত্রিম উপায়ে অর্থাৎ সার প্রদান দ্বারা এই অভাব পূরণ করিয়া দেওয়া যায়। মৃত্তিকার খাদ্যের সংস্থান করিয়া রাখিয়া, তাহাতে ধানের চাষ করিলে ধানগাছগুলি যে সতেজ বর্দ্ধিত হইয়া আশানুরূপ ফল প্রসব করিবে তাহা নিঃসন্দেহেই বলিতে পারা যায়। মৃত্তিকায় যে সকল উপাদানের অভাবে, যেরূপ সারে ঐ সকল উপাদান সুলভ তাহাই ভূমিতে প্রয়োগ করিতে হইবে। কৃষি-রসায়ন-বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি-লাভ করিতে না পারিলে উদ্ভিদের খাদ্য এবং খাদ্যের অভাবপূরক সুলভ সারের বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করা যায় না। সুতরাং কৃষিকার্য্যেও সাফল্য লাভের আশা থাকে না। যাহা হউক সারের কথা পরেই বলিব। বিশ্লেষণ (Analysis) ক্রিয়া দ্বারা কি তরল, কি কঠিন, কি বাষ্পীয় সকল প্রকার পদার্থেরই মৌলিক উপাদানসমূহ পৃথক্ করিয়া লইতে পারা যায়। বিশ্লেষণ ক্রিয়া দ্বারা যেমন পদার্থের সৃষ্টির উপকরণসমূহ বিমুক্ত করা সম্ভব-পর তদ্রূপ প্রক্রিয়া বিশেষের সাহায্যে বিযুক্ত মৌলিক পদার্থগুলিও একত্রিত করিয়া পুনরায় পূর্ব্বাবস্থায় পরিণত করা যায়। পরস্পর বিভিন্ন জাতীয় পদার্থের সংযোগ, যে ক্রিয়া দ্বারা সাধিত হয়, উহাকে সংযোজক বা রাসায়নিক সম্বন্ধ (Affinity) কহে। কৃষি-রসায়নের সহিত এই বিশ্লেষণ ও সংযোগ ক্রিয়ার নিতান্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু এই উভয় কার্য্যই যন্ত্র-পরীক্ষা সাপেক্ষ এবং রসায়ন-তত্ত্ববিদের পক্ষে সহজসাধ্য। সুতরাং এ সম্বন্ধে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন।

কৃষকের ফসল মাত্রই ভূমির উপরিভাগ হইতে উহাদের পোষণোপযোগী খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু বৃক্ষাদি ভূমির অনেক নিম্নভাগ হইতেও উহা গ্রহণ করিতে পারে। উদ্ভিদেরা মূল দ্বারা ধাতব এবং পত্র দ্বারা জৈবিক পদার্থসমূহ গ্রহণ করে। উদ্ভিদ এবং প্রাণীদেহে সুশৃঙ্খলভাবে বহুসংখ্যক ছিদ্র আছে। এই সকল ছিদ্রকে শারীর-যন্ত্র (organ) কহে। এই সকল ছিদ্র দ্বারা আলো, উত্তাপ ও বায়ু উদ্ভিদদেহে প্রবেশ

করিয়া থাকে। এই তিনের কোন একটীর অভাবে উদ্ভিদ সুস্থতা ও তেজস্বিতা লাভ করিতে পারে না। অধিকন্তু পরীক্ষা দ্বারা ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে অধিক পরিমাণে ধাতব ও লবণাক্ত (Saline) পদার্থসমূহ উল্লিখিত ছিদ্রের সাহায্যে উদ্ভিদ দেহে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। এবং অনাবশ্যকীয় অংশ পুনরায় ঐ সকল ছিদ্র দ্বারাই ঘর্ম্মাকারে বহিষ্কৃত হইয়া থাকে। প্রাণীদেহের ছিদ্র দ্বারা ঘর্ম্ম ও শরীরের মল ইত্যাদি বহির্গত হয়। লোমকূপের ছিদ্র সকল কোনরূপে রুদ্ধ হইলে শরীরের মল বহির্গত হইতে পারে না। সুতরাং নানারূপ ব্যাধির উৎপত্তি হয়। সেই জন্যই মাঝে মাঝে শরীর পরিষ্কার করিয়া লোমকূপের ছিদ্র উন্মুক্ত রাখিতে হয়। এই সকল ছিদ্রই উদ্ভিদ এবং প্রাণিদেহের মল নির্গমন পথ বা বাহ্যদ্বার স্বরূপ। ইহা দ্বারাই আলো ও উত্তাপ দেহে প্রবেশ করিয়া থাকে। এই শরীর যন্ত্রদ্বারা যে ধাতব ও লবণাক্ত পদার্থ উদ্ভিদদেহে প্রবেশ করিয়া থাকে, উহা পুনরায় উহাদের পত্রের সহিত আংশিক রূপে মৃত্তিকায় ফিরিয়া আইসে। পত্রগুলি পচিয়া গিয়া মৃত্তিকার ধাতব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এইভাবে প্রতি নিয়তই প্রকৃতির সহিত আদান প্রদান চলিতেছে এবং সেই জন্যই মৃত্তিকা কখনও একবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িতে পারে না।

উদ্ভিদ, প্রাণী ও মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করিলে উহাদের প্রত্যেকটীতেই প্রধানতঃ (১) অঙ্গার (carbon) (২) অম্লজান (Oxygen) (৩) জলজান (Hydrogen) এবং (৪) যবক্ষারজান (Nytrogen) এই চারিটি মৌলিক পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন অত্যল্প পরিমাণে গন্ধক (Sulpher), ফস্ফোরাস (Phosphorus অন্ধকারে জ্বলনশীল দাহ্যবস্তু বিশেষ), ক্লোরাইন (clorine লবণ উপাদান বিশেষ) এবং সিলিকন (Silicon ইহা একরূপ বর্ণহীন বা শ্বেতবর্ণের পদার্থ বিশেষ। ইহা প্রস্তর পাহাড় জাত বালুকাত্মক স্ফটিকাভ পদার্থ বিশেষ) নামক পদার্থও আছে। ইহাদিগকে জৈবিক পদার্থ কহে। উদ্ভিদের সম্যক্ পরিপুষ্টি সাধনের জন্য উক্ত আটটি পদার্থই অত্যাবশ্যকীয়। কোন ভূমিতে এই আটটি পদার্থের কোনও একটীর অভাব এবং অন্যটীর আধিক্য হইলে চলিবে না। কেন না উদ্ভিদের পক্ষে, উহার প্রত্যেকটীরই আবশ্যকতা রহিয়াছে। উক্ত আটটী পদার্থের কোনটি দ্বারা উদ্ভিদের কাষ্ঠ-তন্তু (Woody-tissue or fiber), কোনটি দ্বারা শ্বেতসার (starch), কোনটি দ্বারা শর্করা (sugar), কোনটি দ্বারা আঠা (gum), কোনটি দ্বারা এলবুমেন (Albumen ডিম্বের অভ্যন্তরস্থ শ্বেতবর্ণ পদার্থ বিশেষ) এবং কোনটি দ্বারা গ্লুটেন (Gluten গম প্রভৃতি শস্যের ময়দার যবক্ষারজানযুক্ত কোমল আঠার ভাগ। ইহা জলে অদ্রবনীয়) এবং কোনটি দ্বারা ইহার তৈলাক্ত পদার্থ বা চর্ব্বি (fat or oil) সৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং উদ্ভিদের সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি অর্থাৎ উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং ফল ফুল প্রভৃতির পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে হইলে অঙ্গার প্রভৃতি উল্লিখিত আটটি পদার্থেরই আবশ্যকতা রহিয়াছে। ইহার কোন একটির অভাব হইলেই উদ্ভিদ অঙ্গহীন হইবে এবং সুফল প্রদান করিবে না। যদি মৃত্তিকায় উহার কোন একটির পরিমাণ আবশ্যকের চারিগুণ অধিক থাকে, তাহা হইলে যে জাতীয় উদ্ভিদের জন্য উহা আবশ্যক সেই জাতীয় উদ্ভিদের চাষ উহাতে ক্রমাগত চারি-

বার হইতে পারিবে। উদ্ভিদেরা প্রথমবার আবশ্যক মত উহার একগুণ গ্রহণ করিলেও ৪ ভাগ মৃত্তিকারই রহিয়া যাইবে। ইহা দ্বারা ঐ উদ্ভিদ ঐ ভূমিতে আরও তিনবার উৎপন্ন হইতে পারিবে। বলা বাহুল্য উক্ত আটটি পদার্থের মধ্যে একটির পরিমাণ, আবশ্যকাতিরিক্ত রহিয়াও যদি অন্যটির অভাব হয় এবং তাহা সাররূপে মৃত্তিকায় প্রদত্ত না হয়, তাহা হইলে ঐ উদ্ভিদ অঙ্গহীন বা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে।

আবশ্যকীয় পদার্থগুলি কেবল ভূমিতে বর্ত্তমান থাকিলেই চলিবে না। কারণ উহা তরলাবস্থা প্রাপ্ত না হইলে, উদ্ভিদেরা মূল দ্বারা তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং যাহাতে উদ্ভিদ খাদ্যসমূহ মৃত্তিকায় দ্রবনীয় অবস্থায় থাকে, তাহারও উপায় বিধান করিতে হইবে। এই কার্য্যে জলের আবশ্যক। পক্ষান্তরে যেটির অভাব পরিলক্ষিত হইবে, তাহাও সাররূপে ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে। যে ফসলের জন্য শতকরা দুইভাগ অঙ্গারের প্রয়োজন, সেই ফসলের চাষ করিয়া সুফল লাভ করিতে হইলে চাষের জমীতে ঐ পরিমাণ অঙ্গার থাকা প্রয়োজন। যদি তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থাৎ দুইভাগ অঙ্গারের অভাব হয়, তবে যে সারে ঐ অভাব পূর্ণ হইতে পারে, সেই সারই ভূমিতে প্রদান করা আবশ্যক। একই ভূমিতে উপর্য্যুপরি একই ফসলের চাষ করিলে এই ফসলের জন্য মৃত্তিকায় স্বতঃই প্রকৃতিদত্ত পদার্থের অভাব হইয়া থাকে। সুতরাং মৃত্তিকায় যে পদার্থের অভাব হয়, তাহাই পূরণ করিয়া দিতে হইবে। সার দ্বারা এই কার্য্য সাধন করিতে হয়।

প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহের জন্য যে সকল উপাদানের প্রয়োজন প্রকৃতি স্বতঃই মৃত্তিকায় উহা প্রদান করিতেছেন। তথাপি একই ভূমিতে পুনঃপুনঃ ফসলের চাষ করাতে ঐ ভূমিতে উদ্ভিদের খাদ্যের অভাব উপস্থিত হয় এবং খাদ্যের অভাবে মাটিও নির্জ্জীব হইয়া পড়ে। এমতাবস্থায় উহাতে আবশ্যক মত সার প্রদান না করিলে, মৃত্তিকা উর্ব্বরতা লাভ করিয়া সজীব হইতে পারে না। সার প্রয়োগ করিয়া, মৃত্তিকাকে উর্ব্বর করিয়া লইতে পারিলেই, উহা হইতে সুস্থ, সতেজ ও পুষ্ট ফল শস্যাদি লাভ করা যায়। সার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কি, তাহা এককথায় বুঝাইতে হইলে, এই মাত্র বলা যায় যে, উদ্ভিদের জীবনধারণোপযোগী খাদ্যের অভাব দূর করাই সার প্রদানের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভূমিতে সার প্রদানের ব্যবস্থা করিতে পারিলেই কৃষিকার্য্যের সুফল লাভের জন্য ভাবিতে হয় না।

কৃষিকার্য্যে সারের প্রয়োজনীয়তা কি? এবং শস্যের খাদ্যাভাব দূর করিতে হইলে, কিরূপ খাদ্যের জন্য কিরূপ সার ব্যবহার করিতে হইবে, মোটামুটী ভাবে এই সকল তথ্য অবগত হওয়া কৃষক মাত্রেরই পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এদেশের কৃষকেরা নির্দ্ধন ও নিরক্ষর। বিশেষতঃ তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবার লোকও এদেশে নাই। এই জন্যই সাধারণতঃ এ দেশের কৃষকদিগকে প্রকৃতির উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। ফলে কোন বৎসর প্রকৃতি প্রতিকূল হইলে এদেশে অন্নাভাব জনিত হাহাকার ধ্বনি উপস্থিত হইয়া থাকে। এদেশের কৃষকেরা মোটামুটী কৃষি-রসায়ন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে এবং তাহারা মৃত্তিকায় যথোপযুক্ত পরিমাণে রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োগ না করিতে পারিলে

দেশের অন্নাভাব কষ্ট যে দিন দিন ভীষণাকার ধারণ করিবে, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে। যদি এদেশের কৃষকেরা সার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে বাঙ্গালীকে কখনও অন্নের কাঙ্গালী সাজিতে হইত না।

আমাদের মাতৃরূপিণী সুজলা সুফলা বঙ্গভূমি প্রকৃতই স্বর্ণপ্রসবিনী। ইহার জলবায়ু কৃষিকার্য্যের সম্পূর্ণ অনুকূল। বিশেষতঃ প্রকৃতি-প্রদত্ত সারে, ইহা স্বতঃই উর্ব্বরা। এমন সোনার দেশের লোকও যে অন্নের কাঙ্গাল হইয়া পড়িয়াছে, ইহা বস্তুতঃই দুঃখের বিষয়। কৃষির প্রতি ঘৃণাই ইহার মুখ্য কারণ। ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপান প্রভৃতি দেশের মৃত্তিকা, এ দেশের মৃত্তিকার তুলনায় কৃষিকার্য্যের পক্ষে তত অনুকূল নহে। তথাপি কৃষি-রসায়নের সাহায্যে উক্ত দেশবাসিগণ, একই ভূমি হইতে বারম্বার প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপন্ন করিয়া কৃষির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনে সমর্থ হইতেছে। এ দেশের কৃষককে পাশ্চাত্য দেশের কৃষকদিগের ন্যায় অত্যধিক অর্থ্য ব্যয় ও পরিশ্রম করিয়া কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করিতে হয় না। এ দেশের কৃষকেরা যদি কৃষি-রসায়ন সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিতে ও উহার মূলসূত্রগুলির উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত, তাহা হইলে বোধ হয়, ফসল উৎপন্ন করিতে তাহাদিগকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে হইত না। পক্ষান্তরে, একই ভূমি হইতে পুনঃ পুনঃ একই ফসল উৎপন্ন করিয়া তাহারা দেশের ও দশের অন্ন সংস্থান করিয়া দিতে পারিত।

আমাদের দেশের কৃষকেরা কোন কোন সময় ভূমিকে বিশ্রাম দিয়া থাকে বটে, অর্থাৎ তাহাতে কোনরূপ শস্যের চাষ না করিয়া পতিত রাখে, ক্রমাগত ২।৪ বৎসর ভূমি পতিত রাখিয়া তৎপর উহাতে ফসলের চাষ করে। ভূমিকে বিশ্রাম দিতে পারিলে যে তাহাতে অধিক ফসল প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে সন্দেহ নাই। কেন না বিশ্রামকালে ভূমিতে প্রকৃতিদত্ত সার ক্রমে ৩।৪ বৎসর সঞ্চিত হইয়াই উহার উর্ব্বরতা শক্তি কিয়ৎ পরিমাণ বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। কিন্তু কৃষি-রসায়ন ব্যবহার করিতে পারিলে ভূমিকে বিশ্রাম দিয়া কৃষককে ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় না, বরং বিশ্রাম না দিয়াও তাহারা একই ক্ষেত্র হইতে পুনঃ পুনঃ প্রচুর পরিমাণে ফসল প্রাপ্ত হইতে পারে। ইহাতে তাহাদের আর্থিক লাভও যথেষ্ট হয় এবং দেশে ধনাগমের পথও প্রশস্ত হয়। এই প্রণালী অবলম্বনে কৃষি-কার্য্যে লাভের পরিমাণ অধিক হয় বলিয়াই, ইহাকে অর্থকরী কৃষি-কার্য্য বলা যায়। এ দেশের হীনদশাপ্রাপ্ত কৃষির উন্নতি করিতে হইলে, দেশে অর্থকরী কৃষিরই প্রচলন করিতে হইবে। কিন্তু এদেশের কৃষকের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করিতে না পারিলে এবং দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরাও কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত না হইলে, অর্থকরী কৃষিকার্য্যে বিস্তার সম্ভবপর হইতে পারে না। সুতরাং কৃষির উন্নতি সাধনের জন্য দেশের দশেরই লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজেরা হাতে হেতেড়ে চাষ-বাস না করিয়াও যদি দেশের নিরক্ষর কৃষকদিগের মধ্যে অর্থকরী কৃষি-শিক্ষা বিস্তারের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারেন এবং সার, সারের গুণ ও ব্যবহার প্রণালী বিষয়ে যাহাতে কৃষকেরা শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলেই দেশের প্রকৃত মঙ্গলজনক কার্য্য সাধিত হইতে পারে।

তাঁহারা এই বিষয়ে অগ্রসর হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে, কৃষকেরাও তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া, কৃষি-রসায়ন শিক্ষা করিতে আগ্রহের সহিত অগ্রবর্ত্তী হইবে।

সার। (Manure)

কি কৃষিকার্য্য, কি ঔদ্যানিক কার্য্য, কি সারবান বৃক্ষের চাষ ইহার প্রত্যেকটী কার্য্যেই সার ব্যবহার অতিশয় প্রয়োজনীয়। অন্ন, রুটী, ডাল, তরকারী, মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি খাদ্যের অভাবে আমরা জীবিত থাকিতে পারি না। পরন্তু অভাব হইলে প্রকৃতির সহায়তায় এবং নিজের চেষ্টায় তাহা সংগ্রহ করিয়া লইতে পারি। কিন্তু উদ্ভিদাদিই কি খাদ্যাভাবে বাঁচিতে পারে? প্রকৃতি স্বয়ং তাহাদের আহার্য্য সম্ভার প্রস্তুত করিতেছেন বটে; কিন্তু তাহার অভাব হইলে তাহাদের পক্ষে উহা সংগ্রহ করিবার উপায় কি? তাহারা আমাদের মত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে পারে না; বা কৃত্রিম উপায়ে খাদ্য সংগ্রহ করিতেও পারে না। সুতরাং তাহাদিগকে জীবিত রাখিতে হইলে, তাহাদের খাদ্যসংগ্রহকারিণী প্রকৃতিকে, অপ্রাকৃতিক উপায়ে আমাদেরই সহায়তা করিতে হইবে। উদ্ভিদ আমাদের নানা প্রয়োজন সিদ্ধ করে। সেইজন্য বাধ্য হইয়াই আমাদিগকেই উহাদের খাদ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। দুগ্ধের জন্য আমরা গোপালন করিয়া থাকি, গাভী হইতে দুগ্ধ পাইতে হইলে উহাকে রীতিমত আহার দিতে হয়। মাংসের জন্য ছাগ ও কুক্কুট প্রভৃতি পশু পক্ষী পালন করিতে হইলে উহাদিগকেও রীতিমত আহার দিতে হয়। উহারাও স্বকীয় খাদ্য বস্তু আপনারাই অনুসন্ধান করিয়া লইতে সমর্থ। কিন্তু উহাদের খাদ্যের অভাব হইলে আমাদিগকে তাহা যোগাইয়া দিতে হয়। বলিতে গেলে আমাদের খাদ্যও প্রায় ভূমি হইতেই উৎপন্ন হয়। দুগ্ধ ও মাংসকেও ভূমিজাত খাদ্য বলা যায়। ভূমি আমাদের আহার যোগাইতেছে। সুতরাং সার স্বরূপ খাদ্য প্রদান করিয়া উহার উর্ব্বরতা-শক্তি বৃদ্ধি করিলেই আমরা উহা হইতে আশানুরূপ ফললাভ করিতে সমর্থ হই। ভূমিতে উদ্ভিদের খাদ্য সঞ্চিত আছে। ভূমি ভিন্ন বায়ুমণ্ডলেও উদ্ভিদের আহার বিদ্যমান আছে। কিন্তু উহা উদ্ভিদের সম্যক পরিপুষ্টি সাধনের জন্য সর্ব্বদা যথেষ্ট হয় না। কোন কোন উদ্ভিদ কেবল ভূমি ও বায়ুমণ্ডলস্থিত স্বাভাবিক আহার দ্বারাই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যেমন রবিশস্যের জন্য সারের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। উহারা সাধারণতঃ প্রকৃতিসুলভ স্বাভাবিক আহার দ্বারাই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তথাপি ভূমিতে সার প্রয়োগ করিলে, উহাদেরও বিশেষ উপকার সাধিত হইয়া থাকে, এবং উহাদের ফলন ও বৃদ্ধি হয়। যেরূপ মটর ও ছোলা প্রভৃতি শিম্বিধারী উদ্ভিদের জন্য এদেশে কোন সার ব্যবহার হয় না। কিন্তু আমেরিকায় ভূমির টীকা (Inocculation of the Soil) দিয়া এই জাতীয় ফসলের ফলন দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বৃদ্ধি করা হয়। ভূমির টীকা দেওয়া কাহাকে বলে এই প্রবন্ধে সে প্রশ্নের সম্যক উত্তর দেওয়া অসম্ভব। তবে মোটামুটি ইহা বলা যাইতে পারে যে, জীবাণুর ক্রিয়া দ্বারা ভূমিতে নাইট্রোজেন সংগ্রহের উপায় বিধান করাকেই ভূমির টীকা দেওয়া বলে। কৃষিজ ফসলের পক্ষে যবক্ষারাম্ল (Nitric acid) অত্যাবশ্যক। যবক্ষারাম্লজাত নাইট্রেট (Nitrate) উদ্ভিদের উৎকৃষ্ট আহার্য্য। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে জৈবিক নাইট্রোজেন ও এমোনিয়া

তুল্য নাইট্রোজেন ভূমিস্থিত একরূপ জীবাণু (Bactaria) দ্বারা যবক্ষারাম্লাকারে পরিণত হয়। এই সকল জীবাণু ভূমিতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান থাকাতে উহাদের দ্বারা প্রতিনিয়তই বায়ু হইতে নাইট্রোজেন সংগৃহীত হইয়া ভূমিতে প্রদত্ত হইতেছে। ফলে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তিও সেই জন্য অনেকাংশেই রক্ষিত হইতেছে। আমেরিকায় কৃত্রিম উপায়ে এই সকল জীবাণু সংগৃহীত হইয়া বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ডাক্তার মুর (Dr. Moore) বৈজ্ঞানিক উপায়ে নাইট্রোজেনহীন একরূপ তরল পদার্থ (Solution) প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহাতে এই জীবাণু সকল সংগৃহীত হয়। তৎপর এই তরল পদার্থ তুলাতে নিক্ষেপ করিয়া দিয়া তাহা শুষ্ক করিয়া ঐ শুষ্ক তুলাতেই জীবাণু-গণকে রক্ষা করা হয়। জীবাণুগণ এই শুষ্ক তুলাতে রক্ষিত হইলে দীর্ঘকাল উহাদের প্রচ্ছন্ন জৈবশক্তি (dorment, অকার্য্যক্ষম) অবস্থায় থাকে। জীবাণুগণ যে তুলাতে রক্ষিত হয় উহাতেও এই সকল জীবাণুর আহারোপযোগী খাদ্য রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত করিয়া প্রদত্ত হয়। এইরূপে রক্ষিত জীবাণু-পূর্ণ তুলা পূর্ব্বোক্ত সলিউসনে আবশ্যক মত ভিজাইলেই জীবাণু সকল পুনরায় সজীবতা প্রাপ্ত হইয়া, আরও বহু-সংখ্যক নূতন জীবাণুর উৎপত্তি করিয়া থাকে। এই সলিউসনে বীজ ভিজাইয়া রোপণ করিলে ঐ বীজ হইতে উৎপন্ন গাছের মূলে বহু-সংখ্যক গুটী (Nodules) সৃষ্ট হয়। এই সকল গুটীই নাইট্রো ব্যকটারিয়া (Nitro Bacteria) সংগৃহীত নাইট্রোজেন। উক্ত জীবাণু সকল উদ্ভিদের বর্দ্ধন ও পরিপুষ্টি ক্রিয়া সাধন করিয়া ভূমিতে নাইট্রোজেন বৃদ্ধি করে। উপরোক্ত সলিউসনে বীজকে ভিজাইয়া উহা ভূমিতে রোপণ করিলেই ভূমির টীকা দেওয়া হইল। এই সকল জীবাণু, শিম্বিধারী উদ্ভিদের পক্ষে মহোপকারী। আমেরিকার ১৫ বিঘা জমী এই জীবাণুদ্বারা উর্ব্বর করিতে হইলে ১৫৲ টাকার অধিক ব্যয় হয় না। এদেশে শণ ও ধঞ্চে প্রভৃতির মূলে যে গুটী দৃষ্ট হয় উহাও ঐ সকল জীবাণুকর্তৃক সংগৃহীত নাইট্রোজেন সমষ্টি মাত্র।

ভূমিতে যে পরিমাণ উদ্ভিদের আহার সঞ্চিত আছে, ইহা ক্রমে উদ্ভিদকর্তৃক গৃহীত হওয়ায় পরিশেষে একবারে নিঃশেষিত হয়। উহা নিঃশেষিত হইলেই ভূমি অনুর্ব্বর হয় এবং অবসন্ন হইয়া পড়ে। উহাতে আর কোন ফসল জন্মে না। আমাদের খাদ্যের অভাব হইলে আমরা যেমন ক্রমে দুর্ব্বল ও শক্তিহীন হইয়া পড়ি, পরিশেষে মৃত্যু মুখে পতিত হই, উদ্ভিজ্জাতিরও সেই গতি হইয়া থাকে। উদ্ভিদের খাদ্যাভাব ঘটিলে আমাদের খাদ্যাভাব হওয়াও অবশ্যম্ভাবী, কেননা উদ্ভিদই আমাদের খাদ্য যোগাইবার প্রধান উপায়। উদ্ভিদের খাদ্য সার। ভূমিতে সার প্রদান করিলেই উহাদের খাদ্য প্রদান করা হয়। সারও রসায়ন দ্রব্য খাদ্যে পরিগণিত। রসায়ন দ্রব্যের সহিত সারের নিতান্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কৃষি-রসায়ন বলিতে আমরা কি বুঝিব? ভূমিতে উদ্ভিদের যে সকল খাদ্য সঞ্চিত আছে, তাহাতে বায়ু-মণ্ডলস্থিত উদ্ভিদ-খাদ্য ও বৃষ্টির জল প্রভৃতি পতিত হইয়া উহাদের নানাবিধ রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছে। তত্ত্বানুশীলন দ্বারা ইহা আমরা অহরহঃ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হই। প্রস্তরগিরি ও মগ্নগিরি সকল নৈসর্গিক ক্রিয়া দ্বারা অহরহঃ রূপান্তরিত

হইতেছে, ইহাদের রূপান্তরের মূলেও প্রচ্ছন্ন ভাবে রাসায়নিক ক্রিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল নৈসর্গিক ক্রিয়া দ্বারা ভূমির সৃষ্টি হইতেছে এবং ভূমিতেও উদ্ভিদ পোষণোপযোগী রাসায়নিক দ্রব্য সকল অল্প বা অধিক পরিমাণে স্বভাবতঃই মিশ্রিত হইয়া উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও তেজস্বিতা সম্পাদন করিতেছে। এই সকল রসায়ন দ্রব্যও সারের মধ্যে পরিগণিত। রসায়ন দ্রব্য মাত্রই যৌগিক বা মৌলিক উপাদানের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সংমিশ্রণ জনিত পরিবর্ত্তনের নামই রাসায়নিক পরিবর্ত্তন। রসায়ন দ্রব্য সকল, এই রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের প্রভাবে, কৃত্রিম উপায়ে, তরলতা প্রাপ্ত হইলেই উহারা উদ্ভিদের ভোগ্য হয়। সাধারণতঃ নৈসর্গিক ক্রিয়া দ্বারাই এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে। যেমন গোলাবাড়ী বা গোশালা-জাত তাজা সারে অতি অল্প পরিমাণে এমোনিয়া (Ammonia) ও যবক্ষারজান (Nytrogen) তরল অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যবক্ষারজান পশুর তাজা মলে কঠিন অবস্থায় বিদ্যমান থাকিলে, উহা উদ্ভিদ কর্তৃক গৃহীত হইতে পারে না। ঐ সার পচিয়া গেলে, উহাতে এমোনিয়া আকারে যবক্ষারজানের ভাগ বৃদ্ধি হয়। উহা তরল অবস্থায় অক্সাইডের (Oxide) গুণ প্রাপ্ত হইয়া ফসলের মূল কর্ত্তৃক গৃহীত হইতে পারে।

গোশালা ও গোলাবাড়ীজাত সার ফুটিবার (Fermentation) সময়ে, উহার নানারূপ রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। খড় ও অন্যান্য উদ্ভিজ্জ পদার্থ গোশালা এবং গোলাবাড়ীর আবর্জ্জনা, পশ্বাদির মলের সহিত মিশ্রিত হইয়া এই পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া থাকে। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দর্শনীয় একরূপ জীবাণু (Micro-organism) দ্বারা এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। এইরূপ পরিবর্ত্তনকে যবক্ষারত্ব-প্রাপ্তি (Nitrification) কহে। ভূমিতে অল্প অধিক সংখ্যায় এই সূক্ষ্মতম জীবিত প্রাণী বিদ্যমান আছে। ইহারাই বস্তুর যবক্ষারত্ব-প্রাপ্তির কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। ব্যাকটারিয়া (Bactaria) নামক একরূপ জীবাণু দৈবিক পদার্থকে নাইট্রেট (Nitrate) আকারে পরিণত করে। এই সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম জীব সকল প্রকৃতপক্ষে জীবিত উদ্ভিদাণু কি কীটাণু তাহা এ পর্য্যন্ত অবিসংবাদিতরূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। প্রাণীদেহেও ইহার অস্তিত্ব কখন কখন দৃষ্টিগোচর হয়। ইহারা প্রাণীদেহে প্রবেশ করিয়া নানা রোগের উৎপত্তি করে। ইহাদিগকে ব্যাসিলাস (Bacillus) নামেও অভিহিত করা হয়। উদ্ভিদ কীটাণুকে (Schizolyctes or Fungoid plant) বিভাগ দ্বারা অতি সূক্ষ্মতম অংশে পরিণত করিলে, যত অংশে উহাকে বিভাগ করা যায়, ততটী নূতন কীটের উৎপত্তি হয়, উহারা প্রকৃতপক্ষে জীবিত উদ্ভিদাণু কি জীবাণু যাহাই হউক না কেন আমি উহাদিগকে এস্থলে কীটাণু শব্দেই অভিহিত করিলাম। উপরে যে কয়েকটী ক্রিয়ার উল্লেখ করা হইল, উহাদ্বারাও বস্তুর রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। জল, কৃষি ও উদ্যানিক কার্য্যের প্রধান সহায়। ইহার অভাবে উদ্ভিদ জীবিত থাকিতে পারে না। জল ভূপৃষ্ঠে নানা আকারে বিদ্যমান রহিয়াছে। জলকে তরল, বাষ্প, গ্যাস (Gas) ও জড়পদার্থ আকারে সচরাচর দেখা যায়। বৈদ্যুতিক তেজ, জলে প্রবেশ করাইয়া উহার মৌলিক পদার্থগুলি পৃথক করা

যায়। পরীক্ষা দ্বারা ইহা স্থির হইয়াছে যে জলে দুই ভাগ অম্লজান ও এক ভাগ উদজান আছে। সজীব উদ্ভিদে জলের ভাগ অর্দ্ধেকেরও অধিক। জল দ্বারাও পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। ইহাতে অম্লজান ও উদজানের ভাগ থাকা হেতুই এইরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়।

রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা ইহা প্রতীয়মান হইয়াছে যে মৃত্তিকাতে যে সকল মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে উহারা উদ্ভিদ দেহেও সুলভ। সুতরাং উদ্ভিদ দেহ যে উপাদানে গঠিত, মৃত্তিকাতে ঐ সকল উপাদানের অভাব হইলে মৃত্তিকাকে উহা দিতে হইবে। জীবদেহ পঞ্চভূতাত্মক। অর্থাৎ পৃথিবী, জল, বায়ু, তেজ ও আকাশ এই পাঁচটী ভূতই জীবদেহ গঠনের প্রধান হেতু। উদ্ভিদের পক্ষেও এই পঞ্চভূত অত্যাবশ্যকীয়। তন্মধ্যে পৃথিবীই সর্ব্ব প্রধান।

আধুনিক মতে, পৃথিবী সূর্য্য হইতে সম্ভূত। পৃথিবী বা মৃত্তিকাই উদ্ভিদের প্রাণ। সুতরাং আমাদেরও প্রাণ। আমরা ভূপৃষ্ঠে বাস করি, উদ্ভিদও ভূপৃষ্ঠেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ভূপৃষ্ঠের নিম্নস্থ পাহাড় (Rock) সকল হইতেই মৃত্তিকার উৎপত্তি হইতেছে। এই সকল পাহাড় প্রস্তর রচিত। এই প্রস্তর সকল হইতেই মৃত্তিকার সৃষ্টি হইতেছে। প্রস্তর সকল, বালি প্রভৃতি কতকগুলি ধাতব পদার্থ ও একরূপ আঠা (cement) দ্বারা রচিত। এই আঠা রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা বিমুক্ত হইলেই প্রস্তর হইতে কঙ্কর, কঙ্কর হইতে বালি এবং বালি হইতে মৃত্তিকার উৎপত্তি হয়। এই মৃত্তিকাই উদ্ভিদের প্রাণ। মৃত্তিকাস্থিত উদ্ভিদ-পোষণোপযোগী উপাদান সকল রূপান্তরিত হইয়া উদ্ভিদ দেহে এবং উদ্ভিদ দেহ হইতে জীব দেহে প্রবেশ করিয়া থাকে।

ক্ষয় প্রাপ্ত উদ্ভিজ্জাতি পচিলে হিউমাস নামক একরূপ পদার্থের সৃষ্টি হয়। আর্দ্রতা ও উত্তাপের উপরেই উহার উৎপত্তি সর্ব্বোতভাবে নির্ভর করে। এই পদার্থ একরূপ পিঙ্গল বা কৃষ্ণবর্ণ গুঁড়া বিশেষ। বায়বীয় ক্রিয়া দ্বারা প্রাণী বা উদ্ভিদ দেহ হইতে ইহা উৎপন্ন হয়। অতিশয় সসার ভূমিতে ইহার অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। প্রাণী বা উদ্ভিদ দেহের পচন ক্রিয়া অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহার স্বভাব পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। পরিশেষে ইহা তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। উপরোক্ত ক্রিয়া দ্বারা অঙ্গারাম্ল বাষ্প ও এমোনিয়ার উৎপত্তি হয়। ইহা উদ্ভিদের উৎকৃষ্ট খাদ্য। এই উপাদান সকল পরিশেষে একরূপ একটী কালাবর্ত্তে প্রবেশ করিয়া থাকে যাহা জীবন এবং মৃত্যুর দুইটী অবস্থাভেদ মাত্র।

"Humus is obtained from decayed and well decomposed vegetable matter. Its composition chiefly depends upon certain conditions of moisture and temperature. As the decay progresses the nature of the Humus changes and is eventually liquidified evating cerbonic acid gas and ammonia which are the best plant food. These elements again enter into the cycle of which life and death are two different phases."

এখন চিন্তা করিলে দেখিতে পাইবেন, জীবন এবং মৃত্যু একই পদার্থের দুইটী ভিন্ন অবস্থা মাত্র। উদ্ভিদ ও প্রাণী মরিলে উহাদের

ধ্বংসাবশেষ যাহা থাকে উহা মৃত্তিকায় মিশিয়া যায়। পরে কোন কোন নৈসর্গিক ক্রিয়া দ্বারা উহার অবস্থার রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। উহা মৃত্তিকাতে মিশ্রিত হইয়া পুনরায় উদ্ভিদ-দেহে এবং উদ্ভিদ-দেহ হইতে প্রাণীদেহে প্রবেশ করিয়া থাকে। উহাদের সর্ব্বতোভাবে ক্ষয় নাই। আমরা যাহা খাইয়া জীবন ধারণ করি উহার অধিকাংশই উদ্ভিদ হইতেই প্রাপ্ত হই। উহারাই আমাদের দেহ গঠন করিয়া থাকে। আবার আমাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই উহারা মৃত্তিকায় প্রবেশ করিয়া থাকে। এই জন্য লোকে বলে মাটীর দেহ মাটীতেই বিলীন হয়।

একখণ্ড কাষ্ঠকে ফেলিয়া রাখুন উহা উই কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া পুনরায় মৃত্তিকায় পরিণত হইবে। উহা যে উপাদানে গঠিত হইয়াছিল, সেই উপাদান সকল পুনরায় মৃত্তিকাতেই মিশিয়া যাইবে। পুনরায় নৈসর্গিক ক্রিয়া প্রভাবে উহারা উদ্ভিদ দেহে এবং উদ্ভিদ হইতে প্রাণী দেহে প্রবেশ করিবে। ভগবানের এই নিয়তি পৃথিবীর সৃষ্টির আদি হইতেই চলিতেছে। যদি উদ্ভিদই আমাদের জীবন হয়, তাহা হইলে উদ্ভিদের পুষ্টিবর্দ্ধনকল্পে আমাদিগকে বিশেষ যত্নবান হইতে হইবে।

সার কি পদার্থ ইহার বিস্তারিত বিবরণ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। সুতরাং আমি অতি সংক্ষেপে উহার স্থূলতত্ত্ব এস্থলে সন্নিবেশিত করিতেছি। সাধারণতঃ সার শব্দে আমরা পশুর বিষ্ঠা, নর-বিষ্ঠাকেই বুঝিয়া থাকি। বাস্তবিক ইহা ভিন্ন আরও নানাজাতীয় সার আছে। সারকে নিম্নলিখিত চারিটী ভাগে বিভক্ত করা যায়।

১। জৈবিক সার (Organic manure).

প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহ হইতে ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাই স্বাভাবিক সার। মনুষ্য বিষ্ঠা, গোবিষ্ঠা ও অন্যান্য পশুবিষ্ঠা এবং মূত্রাদি উদ্ভিজ্জ সার মাত্রই ইহার অন্তর্গত।

২। ধাতব সার Mineral or inorganic manure.

এই সার নানাবিধ ধাতু হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা লৌহ, এলিউমিনাম, চূণ, ম্যেগনিসিয়াম, সোডিয়াম ও পোটাসিয়াম ইহারাও স্বাভাবিক সার মধ্যে পরিগণিত।

৩। কৃত্রিম সার Artificial manure.

জৈবিক পদার্থের সহিত ধাতব পদার্থের সংযোগ বা সংমিশ্রণ দ্বারা যে সার প্রস্তুত হয়, তাহাকে কৃত্রিম সার কহে। এক কথায় বলিতে গেলে বাজারে যে সকল সার প্রাপ্ত হওয়া যায় উহার অধিকাংশই কৃত্রিম সার। ভূমিতে সুলভ প্রকৃতিদত্ত সার ব্যতীত আর প্রায় সকল সারই অল্লাধিক পরিমাণে কৃত্রিম, একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এমোনিয়া লবণ (ammonia salt) নাইট্রেট অব সোডা (Nitrate of soda) অক্সাইড-অব-আয়রণ (Oxide of iron) এবং কার্ব্বোনেট অব লাইম (Carbonate of lime) প্রভৃতি সারও কৃত্রিম সার মধ্যে পরিগণিত। সাধারণতঃ তরল (liquid) ও চূর্ণ (Powder) এই দুই আকারেই কৃত্রিম সার প্রস্তুত হইয়া থাকে। উপরোক্ত কয়েকটী সারও মৃত্তিকার উৎকর্ষসাধক উদ্ভিদের পুষ্টিকর খাদ্য। অসংখ্য প্রকারের কৃত্রিম সার আছে। রাসায়নিক ক্রিয়াদ্বারা উহারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং কৃষি-রসায়ন-

বিদ্যা শিক্ষা না করিলে ইহাদিগকে প্রস্তুত ও ব্যবহার করা যায় না।

ফস্ফেটযুক্ত সার
(Phosphatic manure)

ফস্ফোরাস সংযুক্ত সারদ্বারা উদ্ভিদের বীজোৎপত্তি হইয়া থাকে এবং ইহা দ্বারাই বীজের বৃদ্ধি ও উহার গুণের উন্নতি সাধিত হয়। নিম্নে কয়েকটী ফস্ফেটিক সারের নামোল্লেখ করা হইল।

(ক) অস্থি-সুপারফস্ফেট (Bone Super-Phosphate)—অস্থি দ্রব করিয়া ঐই সার প্রস্তুত করা হয়। (খ) অস্থি ভস্মযুক্ত সুপার ফস্ফেট। (Bone ash Super-Phosphate). ইহ অস্থি ভস্মদ্বারা প্রস্তুত হয়। (গ) দ্রব অস্থি মিশ্র সার (Dissolved Phosphate-bone compound). (ঘ) ধাতব ফস্ফেট (Mineral Phosphate). (ঙ) ধাতব সুপারফস্ফেট (Mineral Super-Phosphate). (চ) রিট্রোগ্রেড্ ফস্ফেট (Retrograde Phosppate). (ছ) টমাস ফস্ফেট (Thomas Phosphate). (ঝ) গোয়ানোসার (Guano manure).

ইহারা নানা জাতি।

সালফেটযুক্ত সার (Sulphatic manure).

নানাবিধ সালফেটযুক্ত সার বাজারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহারা প্রান্তরজাত ফসলের (field crop) পক্ষে বিশেষ উপকারী সার। নিম্নে ইহাদের কয়েকটীর নামোল্লেখ হইল।

(ক) এমোনিয়াম্-সালফেট (Ammonium Sulphate). (খ) এমোনিয়া লিকার (Ammonia Liquor). (গ) সোডিয়াম সালফেট (Sodium Sulphate). (ঘ) ম্যোগনিসিয়াম সালফেট। (Magniciam Sulphate). (ঙ) লৌহ সালফেট (Iron Sulphate).

নাইট্রোজেন যুক্ত সার
(Nitrogenous manure)

উদ্ভিদ জীবনের জন্য নাইট্রোজেন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য। ইহা ব্যতিরেকে উদ্ভিদের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি অসম্ভব। ইহা দ্বারা উদ্ভিদের মূল, পত্র, কাষ্ঠ ও বীজের সৃষ্টি হয়। ইহা দ্বারা নানাবিধ কৃত্রিম সারও প্রস্তুত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রধান।

১। নাইট্রেট অব সোডা (Nitrate of Soda).

২। নাইট্রেট অব পোটাস (Nitrate of Potash).

বিশেষ সার
(Special manure)

ইহাও কৃত্রিম সার। বিভিন্ন ফসলের জন্য বিভিন্নরূপ সারের প্রয়োজন হয়। যে সার ব্যবহার করিলে ফসল বিশেষের বিশেষ উপকার সাধিত হয় উহাকে উহার বিশেষ সার বলা যায়। ফসল বিশেষের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি সাধন জন্য যে বিশেষ উপাদানের প্রয়োজন হয়, উহা যে সারে আছে, তাহাই উহার বিশেষ সার। যেমন গোবিষ্ঠা গোল আলুর পক্ষে উপকারী সাধারণ সার কিন্তু গোল আলুর জন্য যে পরিমাণ পোটাস, নাইট্রোজেন, ফস্ফেট, লৌহ-ফস্ফেট ও ম্যোগনিসিয়ার প্রয়োজন, গোবিষ্ঠায় উহার অভাব। এইজন্য ঐ সকল উপাদান দ্বারা আলুর চাষের জন্য যে সার প্রস্তুত করা যায় উহাই উহার বিশেষ সার।

উপরে যে সকল সারের উল্লেখ করা হইয়াছে উহারা এদেশে সুলভ নহে। সুতরাং

এদেশী কৃষকের পক্ষে ইহা ক্ষেত্রে ব্যবহার করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। উহারা যে যে উপাদানে প্রস্তুত হয় তাহা জানিলে এদেশে উহা প্রস্তুত করিয়া কৃষকদিগকে যোগাইতে পারা যায়। উহা প্রস্তুত করিতে কৃষি-রসায়ন-বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে রসায়ন-বিদ্যার সহিত কৃষির নিতান্ত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। সুতরাং কৃষি-রসায়ন দ্রব্য প্রস্তুত ও উহা ব্যবহার করার প্রণালী কৃষক মাত্রেরই শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

ভূমিস্থ ধাতব পদার্থ, অঙ্গার ও যবক্ষার-জান সকল প্রকার ফসলেরই উপকারসাধন করিয়া থাকে। সুতরাং উহারাও সার। ইহাদের পরস্পর সংযোগে যে সার উৎপন্ন হয়, উহারা যৌগিক সার। বায়ুমণ্ডলস্থিত সারের সহিত ইহাদের সম্মিলন হইলে রাসায়নিক ক্রিয়ার প্রভাবে ইহারা যৌগিক সাররূপে পরিণত হইয়া ফসলের উপকার-সাধন করিয়া থাকে। এই সম্মিলন কার্য্যকেও কৃষি-রসায়ন বলা যাইতে পারে। ইহা সকলেই অবগত আছেন যে উর্ব্বরা ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে ফসল জন্মিয়া থাকে। এইক্ষণে উর্ব্বরতা ভূমি কাহাকে বলে নিম্নে তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি।

১। যে ভূমিতে উদ্ভিদের পুষ্টিকর সকল পদার্থই প্রয়োজনানুরূপ বিদ্যমান আছে উহাই উর্ব্বরা ভূমি।

২। প্রতি ফসলের সঙ্গে সঙ্গেই এই সকল পদার্থের কিয়দংশ ব্যয়িত হয়। এই সকল পদার্থের ব্যয়িত কতকাংশ ভূমি বায়ুমণ্ডল হইতে স্বভাবতঃই পুনরায় প্রাপ্ত হয়। অবশিষ্টাংশের কতকাংশ একবারে নষ্ট হইয়া লোপ পায়। উহা আর প্রকৃতি কর্ত্তৃক ভূমিতে প্রত্যর্পিত হইতে পারে না। প্রতি ফসলের শেষে এই অপূরণাংশ পূরণ করিয়া দিলেই ভূমি উর্ব্বরা হয়।

৩। এইরূপে ফসলের পরিপুষ্টি বর্দ্ধক পদার্থ সকল ভূমিতে প্রত্যর্পিত হইলে, কখনও ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি নষ্ট হয় না। উহা ফসল কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি চিরকালই সমভাবে থাকে।

৪। ভূমিতে পোটাস, চুণ, ফস্ফরিক-এ্যাসিড্ ও লৌহের ভাগ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকিলেও উহারা তরল অবস্থা প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয় না। কেন না ঐ সকল পদার্থ তরলতা প্রাপ্ত না হইলে উদ্ভিদ্ কর্ত্তৃক গৃহীত হইতে পারে না।

৫। ভূমির মৃত্তিকার আঁশ এরূপ ভাবের হওয়া প্রয়োজন যে উহাতে বায়ু, আলো ও উত্তাপ অনায়াসে প্রবেশলাভ করিতে পারে। কিন্তু ভূমির আঁশ আবার অধিক হাল্কা হইলে, উদ্ভিদ ঐ ভূমিতে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। সুতরাং আবশ্যক পরিমাণের অপেক্ষা ভূমির আঁশ অধিক হাল্কা হওয়া সঙ্গত নহে।

৬। ভূমিতে জল রক্ষার উপায় থাকা প্রয়োজন, কিন্তু আবশ্যকতাতিরিক্ত জল নির্গমন পথ উন্মুক্ত রাখা চাই।

৭। ভূমিতে কিয়ৎ পরিমাণে জৈবিক পদার্থ বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। কেন না উহা ভূমির কাঠিন্য নষ্ট করিয়া উহাকে কোমল ও হাল্কা রাখে। ভূমি কোমল হইলেই উদ্ভিদ তরলীভূত যবক্ষারজানকে সহজেই গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। ভূমিতে অধিক পরিমাণে, অম্লপদার্থ বিদ্যমান থাকিলে উহা ফসলের পক্ষে উপকারী না হইয়া বরং অপকারীই হয়।

৮। কৃষি কার্য্যের দ্বারা স্বভাবতঃ যে সার উৎপন্ন হয়, উহা চিরস্থায়ী রূপে ভূমির উর্ব্বরতা-শক্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। প্রতি ফসল হইতেই শস্য ও খড় ইত্যাদি আকারে, ভূমিস্থিত সারের অধিকাংশ ব্যয়িত হইয়া থাকে। তজ্জন্য ভূমির উর্ব্বরতা শক্তির সমতা রক্ষা করার জন্য সার দেওয়া প্রয়োজন হয়।

উপরোক্ত কয়েকটী বিষয় লক্ষ্য রাখিয়া কৃষিকার্য্য করিলে উহাতে বিশেষ ফললাভ হইয়া থাকে। সুতরাং ভূমিতে রসায়ন দ্রব্য ব্যবহারের বিশেষ আবশ্যক হয়। এদেশে রসায়ন দ্রব্য প্রস্তুত, ব্যবহার করা সম্বন্ধে কোন আইন কানুনই নাই কিন্তু ইংলণ্ডে ও অন্যান্য দেশে এই বিষয়ে বিধিবদ্ধ আইন (Law) ও কানুন (Regulation) আছে। এই সকল আইন দ্বারা সারের ব্যবসায় পরিচালিত হইয়া থাকে। ইংরাজি ১৮৯৩ অব্দে, ইংলণ্ডে এ সম্বন্ধে এক আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। উহার নাম সার ও পশুখাদ্য বিষয়ক আইন (Fertiliser & feeding Stuff Act.) ইহাকে ভিক্টোরিয়া ৫৬ এবং ৫৭ অধ্যায় কহে। ইহা ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে জারী হইয়াছে। এই আইন মত কেহ কোন অপরাধ করিলে ২০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারে। যাহারা কৃত্রিম সারকে অকৃত্রিম বলিয়া বিক্রয় করিবে তাহাদের প্রতি ঐ দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধে ৬ মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন আরও বহু কানুন জারী হইয়াছে। আমাদের দেশে এইরূপ কোন আইন বা কানুন বিদ্যমান নাই এবং বর্ত্তমান সময়ে এরূপ আইনের বিশেষ প্রয়োজনও দেখা যায় না।

কৃষি-রসায়ন ব্যবহারের উপায় নির্দ্দেশ

আমরা ইংরাজের প্রসাদে, উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং কলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতেছি সন্দেহ নাই। কিন্তু যে শিক্ষার সহিত আমাদের জীবন-মরণ সম্বন্ধ, সে শিক্ষা আমরা কোথায় পাইব? এ বিষয়ে আমাদের গভর্ণমেণ্ট উদাসীন, শিক্ষিত সমাজ উদাসীন, ধনকুবেরগণ উদাসীন এবং ভূম্যধিকারিগণও উদাসীন। তাহা হইলে কঃ পন্থা?

দেশের লোককে, বিশেষতঃ কৃষককে বৈজ্ঞানিক মতে কৃষিকার্য্য ও কৃষি-রসায়ন বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য এদেশবাসীর সমবেত চেষ্টাই এই অভাব দূরীকরণের একমাত্র পথ। এদেশে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে কৃষিজীবির সংখ্যাই অধিক। তাহারা উৎপাদক (Producer) আমরা পরাঙ্গপুষ্ট উদ্ভিদ (Parasites) বা জলৌকা বিশেষ। আমরা তাহাদের রক্তমাংশ শোষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি। কি ভূম্যধিকারী সম্প্রদায়, কি বণিক সম্প্রদায়, কি কুসীদজীবিগণ, কি ব্যবহারজীব সম্প্রদায় সকলের জীবনই ইহাদের উপর নির্ভর করে। ইহাদের সুখে আমাদের সুখ, ইহাদের দুঃখে আমাদের দুঃখ ও ইহাদের মৃত্যুতে আমাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ইহাদের উন্নতিকল্পে আমরা বিন্দুমাত্রও চেষ্টা বা যত্ন করিতেছি না। বঙ্গের কৃষক মাত্রই নানা কারণে দুঃস্থ হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা ঋণজালে জড়িত। তাহাদের জমি জমা ক্রমে কুসীদজীবিদের হস্তগত হইতেছে। সুতরাং কালে এই কৃষিকুল নির্ম্মূল হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে। ইহারা আর কৃষক থাকিবে না। ইহারা হইবে কুলি আর কুসীদ-ব্যবসায়িগণ হইবে ইহাদের

প্রভু। কেবল ইহাদের প্রভু কেন সকল সম্প্রদায়েরই প্রভু হইবে। সুতরাং এখন হইতেই কৃষিকুলের উন্নতিকল্পে আমাদের ত্বরান্বিত হওয়া প্রয়োজন এবং যাহাতে উহারা বৈজ্ঞানিক মতে কৃষিকার্য্য করিয়া, নিজ নিজ অবস্থার উন্নতি বিধান করিতে সক্ষম হয় সে জন্য তাহাদিগকে আমাদিগের সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা করা কর্ত্তব্য। এজন্য উচ্চ শিক্ষা বিধানের আবশ্যক নাই। উচ্চ শিক্ষালাভ করিলে তাহারা আর কৃষক থাকিবে না তখন আমাদের ন্যায় তাহাদেরও উচ্চাভিলাষ স্বতঃই উৎপন্ন হইবে। আমরাও উচ্চাভিলাষে ও চাকরীর লালসার তরঙ্গে একেবারে গা ভাসাইয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু এইক্ষণ কূল না পাইয়া অন্ন চিন্তার স্রোতে হাবুডুবু খাইতেছি, বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের চরমের পরম পন্থা একমাত্র কৃষি। অতএব এই জন্য কৃষকদিগকে কৃষিকার্য্যেই লিপ্ত রাখিয়া, উহাদিগের কৃষি-শিক্ষার দ্বার সহজে প্রকাশ্যভাবে উদ্ঘাটন না করিলে অচিরে আমাদেরও পরিণাম ঘোর অন্ধকারময় হইয়া দাঁড়াইবে সন্দেহ নাই। কিরূপে এই কার্য্যে ফললাভ করা যাইতে পারে তাহার পন্থা আমাদিগের অগ্রেই নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য।

দেশে ২।৪ টি কৃষি-বিদ্যালয় ও কৃষি-কলেজ আছে সত্য। কিন্তু আমাদের কৃষকসন্তানগণের পক্ষে তাহা সুগম্য নহে। এই সকল বিদ্যালয় বা কলেজ কেবল নামকা ওয়াস্তে। উহাতে পাঠ করিয়া যে কাহারও কার্য্যকরী শিক্ষালাভ হইয়াছে আমার এরূপ বিশ্বাস নাই এবং ভবিষ্যতে যে হইবে আমি এরূপ আশাও পোষণ করি না। সুতরাং যাহাতে কৃষক ও কৃষকসন্তানগণ ঘরে বসিয়া কৃষি-কার্য্য ও কৃষিরসায়ন বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে তাহার উপায় বিধান করিতে হইবে। কৃষিরসায়ন কি, এবং কার্য্যক্ষেত্রে উহার ব্যবহার-প্রণালী কিরূপ, তাহা হাতে হেতেড়ে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। কেবল উচ্চমঞ্চে উপবেশন করিয়া উচ্চ ভাষায় বক্তৃতা দিলে তাহাতে ফলের সম্ভাবনা কোথায়? দেশের সর্ব্বত্র ২।৪টী গ্রাম লইয়া একটী গ্রাম্য সমিতির সৃষ্টি করিতে হইবে। প্রত্যেক সমিতির হস্তে কৃষকগণের শিক্ষার ভার অর্পণ করিতে হইবে। প্রত্যেক সমিতিতে একটী কৃষি-পাঠশালার সৃষ্টি করিতে হইবে। এই সকল পাঠশালার কৃষকগণকে সরল ও ব্যবহারিক উদ্ভিদতত্ত্ব, কৃষিতত্ত্ব, মৃত্তিকাতত্ত্ব ও কৃষি-রসায়ন-বিদ্যা সম্বন্ধীয় স্থূলতত্ত্বগুলি, শিক্ষা দিতে হইবে। যখন কৃষকগণ এই সকল বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব শিক্ষা করিতে পারিবে, তখন তাহাদের মন কৃষি-রসায়নের উপকারিতা পরীক্ষা করিতে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইবে। আমি যে পথের উল্লেখ করিলাম, উহা শুনিতে সুগম্য বলিয়া বোধ হয় সত্য, কিন্তু উহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে বহু দ্রব্যের প্রয়োজন হইবে। সর্ব্বাগ্রে একটী কৃষি-সম্বন্ধীয় অধ্যক্ষ-সভা (Agricultural Syndicate,) গঠিত করিতে হইবে। উহার অধীনে বড় বড় সহরে, জেলায় ও উপরি বিভাগসমূহে, এক একটী কৃষি-সমিতির (Agricultural Society) সৃষ্টি করিতে হইবে। এই সকল সমিতির তত্ত্বাবধানে গ্রাম্যসমিতি সকল পরিচালিত হইবে। গ্রাম্য পাঠশালাসমূহে রাসায়নিক পরীক্ষা ক্ষেত্র প্রস্তুত রাখিতে হইবে এবং উহাতে রাসায়নিক দ্রব্য (chemicals) ও যন্ত্রাদি যতদূর সম্ভব রাখিতে হইবে। অধ্যক্ষসভা (Syndicate) কর্ত্তৃক এই সকল সমিতি ও

পাঠশালার কার্য্যপ্রণালী ও ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত হইবে। শিক্ষকগণ ঐ ব্যবস্থা ও নিয়মানুসারে কৃষকগণকে শিক্ষা দিবেন। শিক্ষার জন্য কতকগুলি সরল কৃষিগ্রন্থ—উদ্ভিদতত্ত্ব, কৃষি রসায়নতত্ত্ব, মৃত্তিকাতত্ত্ব ও সারতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তক-প্রণয়ন করিতে হইবে। এই সকল পুস্তকের অভাবে কৃষিপাঠশালাসমূহের কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালিত হইবার সম্ভাবনা নাই। ঢাকার স্বর্গগত নবাব বাহাদুর মাননীয় খাজে সলিমুল্লা সাহেব, কয়েক বৎসর হইল আমাদের প্রস্তাবানুসারে এ বিষয়ের একটী অধ্যক্ষ সভা গঠিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তিনি আর এক্ষণ ইহলোকে নাই।

এই সিণ্ডিকেট-সমিতি ও পাঠশালাসমূহের কার্য্য পূর্ব্বোক্তরূপে পরিচালিত হইতে বহু অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হইবে। সুতরাং দেশের ভূম্যধিকারী সম্প্রদায়, শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং ধনী ও বণিক সম্প্রদায় এই বিষয়ে অগ্রসর না হইলে এবং তাঁহাদের সমবেত চেষ্টা ব্যতিরেকে এই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবার আশা করা যায় না। অথচ এইক্ষণ হইতেই এ বিষয়ে অগ্রসর না হইলে অদূর ভবিষ্যতেই বর্ত্তমান সময়াপেক্ষা মহা দুর্দ্দিন উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই।

উপরোক্ত প্রণালীতে কার্য্যারম্ভ করিলে বোধ হয় আমরা শীঘ্রই বাঙ্গালার কৃষিক্ষেত্রে কৃষি রসায়ন ব্যবহারের সফলতা দেখিতে সমর্থ হইব।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুহ

প্রাচীন ইজিপ্তের সহিত ভারতীয় ভাবের সৌসাদৃশ্য

ভারতীয় আর্য্যদিগের প্রভাব যে অতীব প্রাচীনকালে পৃথিবীর নানা স্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল তাহার সম্যক না হউক আভাষ দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতের বহিঃপ্রদেশে প্রাচীনকালের অতীব সভ্যতম সুদূর প্রদেশের যৎকিঞ্চিৎ যাহা কিছু বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা হইতেই ইহা উপলব্ধি হয়।

হিন্দু, বিশেষতঃ তান্ত্রিক শাক্ত হিন্দুগণ কামাখ্যা দেবীর যোনিপীঠ মহাপীঠের মধ্যে গণ্য করেন। আদ্যাশক্তি মহামায়ার পীঠাবলীর মধ্যে কামরূপে কামাখ্যাপীঠ মহাশক্তিপীঠের শ্রেষ্ঠ পীঠ বলিয়া পরিগণিত।

কালিকাপুরাণ অতীব প্রাচীনকালের কামরূপ প্রদেশের ঐতিহাসিক ভৌগোলিক প্রভৃতি নানাবিধ তথ্য সম্বলিত একখানি পুরাণ গ্রন্থ। উক্ত পুরাণ হইতে যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় সেগুলি প্রাচীন কামরূপের সংশ্রবে উল্লিখিত।

কালিকাপুরাণেই উল্লেখ আছে কামরূপেশ্বর নরকাসুর অপ্রতিহত আসুরিক শক্তিতে যখন কামরূপ প্রদেশ শাসন করিতে থাকেন, সে সময় স্বীয় শক্তি প্রতিষ্ঠা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য পৃথিবীর নানা স্থান হইতে মহা মহাবীর অসুরদিগকে আনয়ন করেন। ইন্দ্র বরুণাদি নরপতিগণ তাঁহার উৎপীড়ন ও পরাক্রম ভয়ে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতেন।

মহাভারতে উল্লেখ আছে নরকাসুরের পুত্র ভগদত্ত পশ্চিমসমুদ্রান্তরালবর্ত্তী যবনদেশেও প্রভুত্ব বিস্তার করিতেন। এই সকল আভাষ "গৃহস্থে" প্রকাশিত মল্লিখিত প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি।

ইন্দ্রদেশ, বরুণদেশ, যমরাজ্য, কুবেররাজ্য প্রভৃতি পুরাণোল্লিখিত দেশ ও রাজ্যাদি আধ্যাত্মিক জগতের কোন লোক বা দেশ বলিয়া ধারণা করিলে ভ্রমে পতিত হইতে হয়। ঐ গুলি এই পৃথিবীর অন্তর্গত নানা-দেশ মাত্র।

বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয়াংশ তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ আছে, ভারতবর্ষ নয় ভাগে বিভক্ত—ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরুমান, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গন্ধর্ব্ব, বরুণ, এবং এই সাগর সংবৃত দ্বীপ ভারতবর্ষ তাহাদের মধ্যে নবম।

"ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নব ভেদান্ নিশাময়।
ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুমান্ তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্॥
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গন্ধর্ব্বস্ত্বথ বারুণঃ।
অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগর সংবৃতঃ॥

এতদ্দ্বারা বর্ত্তমান ভারতবর্ষ সীমার বাহিরেও অনেক দেশ ভারতান্তর্গত ছিল বুঝা যায়। শানরাজ্য, ব্রহ্মদেশ, ইন্দ্রদ্বীপ, শ্যামরাজ্য সৌম্য, বর্ণিও, বারুণদ্বীপ বলিয়া অনুমান হয়।

মহাভারতে উল্লেখ আছে মহারাজ শান্তনু ইন্দ্রপদাধিকারী হইয়াছিলেন। ইন্দ্রদেশাধিপতিকে ইন্দ্র বলিয়া অভিহিত করা হইত। ভারতীয় অনেকানেক নরপতির সাহায্য যেরূপ ইন্দ্রকে লইতে হইত এবং তাঁহাদের শক্তি সাহায্যে ইন্দ্র বিপন্মুক্ত হইতেন, তদ্রূপ আবার ইন্দ্রদেশাধিপতি হওয়াও অনেকানেক ভারতীয় নরপতির ঐকান্তিক বাঞ্ছা অর্থাৎ তপস্যাধীন ছিল। পুরাণে কাব্যেঙ্গিতে এ সকল উল্লেখ আছে। এ সকল বিষয় ক্রমশঃ প্রবন্ধান্তরে অল্পবিস্তর আলোচনা করিব।

বিষ্ণুপুরাণে উক্ত অধ্যায়ে উল্লেখ আছে সমুদ্রের উত্তর ও হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত ভারত দ্বীপ বিস্তারে নব সহস্র যোজন, উত্তর দক্ষিণে সহস্র যোজন দীর্ঘ। ইহার পূর্ব্ব-দিকে কিরাতগণ ও পশ্চিমে যবনেরা অব-স্থিত। বিষ্ণুপুরাণ অতীব প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া মনে হয় না। তবে আধুনিক বলিতে ইতি-হাসের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের বলিয়া মনে হয়। পুরাণ শ্রেণীর অন্তর্গত আধুনিক বলিয়া অনুমান করিতে পারা যায়। উক্ত অধ্যায়ে ভারতের নদনদী জনপদাদির উল্লেখ, নানাবিধ জাতির বসবাসের উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে কামরূপ নিবাসিগণ বলিয়াও উল্লেখ আছে।

কালিকাপুরাণে অবগত হওয়া যায় কিরাতাদি জাতিগণ শৈবোপাসক ছিলেন। বিষ্ণুদ্বেষী দানব অসুরাদি জাতিগণ শিব শক্তির উপাসনা করিতেন বলিয়া অনেকানেক পুরাণে আভাষ পাওয়া যায়।

এইরূপে শৈবোপাসনা কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল ভারতীয় ব্রাহ্মণানুগত আর্য্যধর্ম্মের প্রভাব পৃথিবীর কতদূর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল উহার ধারণা করিলে, প্রাচীনতম-কালের ভারতীয় প্রভাব বোধগম্য হয়।

পরস্পর বৈরীতাজাত সুরাসুর প্রভেদ ও ভিন্ন প্রকৃতিজাত বিদ্বেষ সত্ত্বেও সুর অথবা অসুর দানবাদি জাতিনিচয় সকলেই ব্রাহ্মণানু-মোদিত দেবদেবীর উপাসনা করিতেন। মূলে প্রভেদ ছিল না।

রূপকাভাষে যতই কেন প্রচ্ছন্ন থাকুক না কেন তথাপি যেন মনে হয় পুরাণ অতীব প্রাচীনকালের ঐতিহাসিক আভাষ প্রদান করিতেছে।

যখন যে দেশে যাহাদের প্রভাব বিস্তৃত হয় তাহাদের ভাল মন্দ সকলগুলিই অল্প বিস্তর ব্যবহারিকতা মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয়।

ভারতীয় উৎসবগুলিও যে অতীব প্রাচীনকালে ভারতের অতীব দূরবর্ত্তী সুদূরতম প্রদেশে নীত হয় নাই একথা কেহ বলিতে পারেন বলিয়া মনে হয় না। ঐ সকল দেশ হইতে অবশ্য ভারতীয় সংশ্রব আভাষ প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন, কেন না সে সকল বিবরণ যাহা অবগত হওয়া যায় সেগুলি বাণিজ্য দ্রব্যের ন্যায় দেশ হইতে দেশান্তরে নীত, নানা দেশ ঘুরিয়া উপনীত হইয়াছে। আবার সে সকল বিবরণ যে সময়ে উল্লিখিত হইয়াছে তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষ ভারতবর্ষের বহিঃপ্রদেশ হইতে রাষ্ট্রীয় শক্তি হারাইয়া দিন দিন ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইতেছিল। মহাভারত বর্ণিত যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় অশ্বমেধ যজ্ঞের ন্যায় রাষ্ট্রীয় শক্তির মহাযজ্ঞ ভারতে আর দ্বিতীয়বার হয় নাই। কাযেই পৃথিবীর দূরতম প্রদেশে ভারতের মহিমা বিস্মৃত হইয়াছিল। হয়ত কতক কারণ বিদ্বেষ-সম্ভূত আর কতক কারণ সংশ্রবচ্যুত হইয়া। ভারতের উল্লেখ ঐ সকল দেশে যাহা ঈষৎ দেখা যায় তাহা অদ্ভুত কাহিনীর ন্যায় শ্রুত কথা। ভারতের পৌত্তলিকতা, ইন্দ্রজাল ও মানসকল্পিত স্বপ্নবৎ ঐশ্বর্য্য সমৃদ্ধি। মানস-কল্পিত কেন না উহা তাহাদিগের দৃষ্ট কল্পনা নহে শ্রুতিমাত্র।

এক্ষণে ইজিপ্ত সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতেছি।

ঈজিপ্তীয়গণ বহুবিধ দেব দেবীর পূজা করিতেন। তন্মধ্যে Sati, Horus, Seb, Kartak, Anata, সতী, হর, শিব, কার্ত্তিক, অনন্ত নামের অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। উক্ত ইতিহাসে উল্লেখ আছে ৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য; "all these deities are represented by distinct forms, and have distinct attributes." আর একস্থলে আছে "The Egyptians themselves speak not unfrequently of "the thousand Gods," sometimes further qualifying them, as "The Gods male, the Gods female, those which belong to the land of Egypt." স্ত্রী পুরুষ ভেদে সহস্র সহস্র দেবদেবী উপাসনা করিত জানা যায়।

৩১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, "The Egyptian was taught to pay a religious regard to animals." বৃষ, গাভী, মার্জ্জার, কুম্ভীর, ছাগ, বানর, কুকুর প্রভৃতিকে ধর্ম্মসংস্কারমূলক শ্রদ্ধার্পণ করিত বলিয়া জানা যায়। এমন কি ভগবানের অবতাররূপে পশুদিগকে সম্মান করিত উল্লেখ আছে। "The animal-worship reached its utmost pitch of grossness and absurdity when certain individual brute beasts were declared to be incarnate deities and treated accordingly."

রাজাকেও ঈশ্বরের অবতার বলিয়া গণ্য করিত, ৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য "The Egyptians had also a further God incarnate,—this was the monarch, who for the time being occupied the throne." Each king of the Egypt not only claimed to be "Son of the Sun," but to be an actual incarnation of the Sun."

রাজাগণ সূর্য্যবংশীয় বা সূর্য্যের অবতার বলিয়া গণ্য হইতেন। আমরা যেমন মনুদেব হইতে মানবের আদি বংশস্থাপয়িতা গণ্য করি এবং মন্বন্তর নিরুপণ করি, ঈজিপ্টীয়গণেরও ঐরূপ ধারণা ছিল অনুমান হয়। ৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য, "The Egyptians believed in Menes as a man; they placed him at the head of their dynastic lists." গ্রীশদেশে "Minos" জর্ম্মনীতে "Manmes" লিডিয়ায় "Manes" নামে মনুদেব অভিহিত হইতেন। Man বা মানব শব্দ মনু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়।

ঈজিপ্তদেশে সৌরোপাসনা প্রচলিত ছিল। প্রাচীনতম কালের সৌর উপাসনার মন্দিরাদির বিবরণ উক্ত গ্রন্থে জ্ঞাত হওয়া যায়। সৌরমণ্ডলও পূজিত হইত। রোম কনস্টাণ্টিনোপল হেলিপোলিস প্রভৃতি নানাস্থানে Thothoes III থথমি (তৃতীয়) নরপতির প্রতিষ্ঠিত স্তম্ভাদি দৃষ্ট হয়। ২০১।২০২ পৃঃ এবং ২২৩।২২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রাচীনতমকালের ঈজিপ্তের ইতিহাস আমাদিগের পুরাণের ন্যায় অলৌকিক বিবরণে পরিপূর্ণ। মহাভারত রামায়নাদি পুরাণের অন্তর্গত যেমন অলৌকিক ঘটনা ও দেবতাদির বংশসম্ভূত বা দেবতাগণকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত নরপতিদিগের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঈজিপ্তের ইতিহাসেও তদ্রূপ দেখা যায়।

আশিয়া মহাদেশ হইতে ঈজিপ্তাভিমুখে জনস্রোত বসতিস্থাপন করিতে গমন করিয়াছিল জানা যায়। "There are signs of a presence upon the north eastern frontier of Egypt on the part of the Asiatic needing a home"—১৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অসুরদিগের পীড়ন ঈজিপ্ত দেশেও হইয়াছিল জানা যায়। ১৩৩ পৃঃ—"Asahur had had to go forth out of the land of Shinar, and to make himself a habitation further to the northward, which must have pressed painfully upon other races."

উক্ত গ্রন্থের ৩৩৬ পৃঃ উল্লেখ আছে Asshur-banipal, অসুর বাণীপাল অসুরদল লইয়া ঈজিপ্ত বিধস্ত করিয়াছিল।

উক্ত গ্রন্থের ৪৩।৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। আমাদিগের জাতিভেদের ন্যায় ঠিক না হউক, জাতিভেদ ছিল। "Social ranks in Egypt were divided somewhat sharply. There was a large class of nobles, who were mostly great landed proprietors living of their estates, and having under them a vast body of dependents, servants labourers, artisans &c. There was also a numerous official class, partly employed at the court, partly holding Government posts throughout the country, which regarded itself as highly dignified, and looked down *de hant en bas* on "the people". Commands in the army seem to have been among the prizes which from time to time fell to the lot of such persons. Further, there was a literary class, which was eminently respectable, and which viewed with contempt those who were engaged in trade or

handicrafts. অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের ন্যায় শ্রেণীভেদ ছিল। যাঁহারা জ্ঞানচর্চা করিতেন তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, ভূস্বামীবর্গ, রাজপুরুষগণ এবং যোদ্ধৃকার্য্যেনিরত ব্যক্তিগণ উচ্চ সম্মান লাভ করিতেন। তদধীনে শিল্পী ও বণিকগণ গণ্য হইতেন বলিয়া মনে হয়। তদ্ব্যতীত ইতর শ্রেণী যথা শ্রমজীবি গোপালন বা কৃষি আদি কর্ম্মে সম্রান্তবর্গের অধীনে জীবিকার্জ্জন করিত। নৌজীবি, মৎস্যজীবি, ভাস্কর, তন্তুবায়, চর্ম্মকার, সূত্রধর, স্থপতিকার্য্যকর, দরজী, চিত্রকর, ধাতুদ্রব্য নির্ম্মাতা, কুম্ভকার প্রভৃতি নগণ্য ইতর শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইত।

"But all these employments, "Stank" in the nostrils of the upper classes, and were regarded as unworthy of anyone who wished to be thought respectable." তবে পরবর্ত্তী বিবরণ হইতে জানা যায় সকলে এক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ প্রাপ্ত হইত এবং নিম্নস্তরের ব্যক্তি যোগ্যতানুসারে উচ্চস্তরে উন্নীত হইয়া সম্রান্ত মধ্যে গণ্য হইতে পারিত। সাধারণতঃ বংশানুক্রমে জাতীয় বৃত্তি পরিচালনা করিত। গ্রন্থকার স্পষ্টতঃ বলেন জাতিভেদ প্রথা ছিল না। বিভিন্ন স্তরের মর্য্যাদা পার্থক্য জাতিভেদের প্রকারান্তর ব্যতীত কি বলিব। শ্রমজীবি-সম্প্রদায় রাজকার্য্যে "বেগারী" দিতে বাধ্য হইত। রাজা বা সম্রান্ত ব্যক্তিবর্গের খোস-খেয়াল বা সুখ-সুবিধার জন্য প্রাণ গেলেও কথা ছিল না। সুখ স্বচ্ছন্দ জীবন পরসেবায় নিযুক্ত থাকিত।

ঈজিপ্তীয়গণ আত্মা অবিনাশী বলিয়া স্বীকার করিতেন বলিয়া মনে হয়। জন্মান্তর-বাদ স্বীকার করিতেন। এমন কি পশ্বাদি-যোনি ভ্রমণ করিয়া কর্ম্মনাশ করিতে করিতে ক্রমে-উন্নতি দ্বারা উচ্চস্থান প্রাপ্তি স্বীকার করিতেন। ইহকালের কৃতকার্য্যের ফলাফল পরলোকে প্রাপ্ত হইতে হয়। জীবনান্তে পাপ পুণ্যের বিচার হইয়া স্বর্গ নরক ভোগ হইয়া থাকে। যম চিত্রগুপ্তের ন্যায় Osiris, Thoth, Annubis দেবতা পরকালে বিচার করেন।

তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডে বিশ্বাসী ছিলেন এবং হিন্দুগণের ন্যায় তাঁহারাও অন্নদানাদির ন্যায় দান, হিংসাদি বর্জ্জন পৃথিবী কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন জানা যায়।

ভারতীয় মন্দিরাদিতে অশ্লীল চিত্র প্রকটনের ন্যায় চিত্র প্রকটিত করিতেন। দেবতাদিগের দোহাই দিয়া অগম্যগমনও দোষণীয় হইত না। ৪২ পৃঃ দ্রষ্টব্য—"The religious Sculptures of the Egyptians were grossly indecent; their religious festivals were kept in an indecent way; phallic orgies were a part of them, and phallic orgies of a gross kind, the Egyptians tolerated incest, and could defend it by the example of the Gods."

ঈজিপ্তে পুরোহিত (ব্রাহ্মণ) সম্প্রদায় উচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হইতেন, একতৃতীয়াংশ প্রদেশ ব্রাহ্মণ ও দেবত্র সেবায় বৃত্তিরূপে নিয়ামিত ছিল, কর দিতে হইত না। ২৮৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য—"The position of the priests in Egypt was, from the first, one of high dignity and influence."—"they formed a very distinct order or class, separated by important previleges, and by their

habits of life, from the rest of the community, and recruited mainly from among their own sons, and other near relatives. Their independence and freedom was secured by a System of endowments." দেবালয় ছত্রাদিতে ব্রাহ্মণগণ (priests) বৃত্তিভোগী হইয়া স্বাচ্ছন্দ-জীবনে অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিতেন বলিয়া ধারণা হয়। রাজাও তাঁহাদিগের অভিশম্পাৎ ভয়ে ত্রস্ত থাকিতেন "The Kings lived always in a considerable amount of awe of the priests."

প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যগণের ন্যায় ঈজিপ্তেও রমণীগণ মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইতেন। রমণী শুধু শয্যাসঙ্গিণী বা সহচারিণী নহেন। সহধর্ম্মিণী এই ভারতীয় ভাব ঈজিপ্তেও ছিল বলিয়া ধারণা হয়। ১১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

" Women in Egypt had been, it is true, from very early times held in high estimation, were their husbands' companions, not their play things, or their slaves, appeared freely in public, and enjoyed much liberty of action."

ঈজিপ্তে Ramesses রামেসিস নামক এক রাজবংশ অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণ উহাদিগের আদিবংশধর আশিয়া মহাদেশ হইতে গমন করিয়া আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন বলেন। এই বংশের রাজত্বকালে ঈজিপ্তে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্থাপত্য পূর্ত্তাদি নানাবিধ দেশহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া প্রভূত নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন।

ঈজিপ্তের অনেক নরপতির কপোলদেশে সর্পাকৃতি মুকুট ধারণের প্রতিকৃতি দেখা যায়।

প্রায় হিন্দুমাত্রেরই ধারণা মন্ত্র তন্ত্র যাদুবিদ্যা কামরূপ প্রদেশ হইতে উদ্ভূত। কামাখ্যা তান্ত্রিকতা মন্ত্রতন্ত্র ইন্দ্রজাল বিদ্যার উৎপত্তি স্থান বলিয়া প্রাধান্য বিঘোষিত হইতে জানা যায়। মারণ বশীকরণাদি মন্ত্রও মায়া বিদ্যার জন্য কামাখ্যা কামরূপের প্রসিদ্ধি প্রাচীনকাল হইতে জানা যায়। শ্রীশ্রীভগবান শঙ্করাচার্য্য দেবের উপরও মন্ত্র প্রভাব প্রবর্ত্তিত হইয়া তাঁহাকে পীড়িত হইতে হইয়াছিল।

কালিকাপুরাণে দেবীপূজার প্রসঙ্গে মন্ত্রাচার প্রসঙ্গ দেখা যায়। পিঠুলীর পুতুল করিয়া অভিচার করিতে হয়।

ঈজিপ্তদেশের বিবরণ উক্ত গ্রন্থ হইতে জানা যায় ৪৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য "A belief in magic was general, and men endeavoured to destroy or injure those whom they hated by wasting their waken effigies at a slow fire to the accompaniment of incantations."

২৮৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে "Magic was practised by some of the chief men in the state, and the belief was widely spread that it was possible by charms, incantations, and the use of waxen images to bewitch men, or paralyse their limbs, or even to cause their deaths."

ডাকিনী যোগিনীর ন্যায় উহাদেরও ডাইনের ভয় ছিল। "Hags were to be found about the court as wicked

as Canidia, who were willing to sell their skill in the black art to the highest bidder."

উক্ত গ্রন্থের ৩১২—৩১৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য ঃ— Magical Texts :—"When Horus weeps, the water that falls from his eyes grows into plants producing a sweet perfume. When Typhon let fall blood from his nose, it grows into plants changing to cedars, and produces turpentine instead of the water"—ইত্যাদি—ইন্দ্রজাল মন্ত্র উল্লেখ দেখা যায়।

To make a magic mixture: Take two grains of incense, two fumigations, two jars of Cedar oil, two jars of tas, two jars of wine, two jars of spirit of wine, "apply it at the place of thy heart. Thou art protected against the accident of life, Thou art protected against a violent death; thou art protected against fire; thou art not ruined on earth, and thou escapest in heaven." মন্ত্র অভিচার ও প্রকরণ ঘটিত কিঞ্চিৎ নমুনা দেওয়া গেল।

হিন্দুদিগের বহু দেবতার ন্যায় ঈজিপ্তীয়দিগের দেবদেবীগণ কেহ কেহ সুখ শান্তি ঐশ্বর্য্যবিধান কেহ কেহ পীড়াদায়ক ছিলেন বলিয়া জানা যায়। দেবদেবীগণের আধিপত্য ও অধিষ্ঠান স্থানেরও পার্থক্য স্বীকার করিত। বহু দেবদেবীর উপাসনা সত্ত্বেও উহারা একেশ্বরবাদ স্বীকার করিত। ৩৫-৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রাচীন ঈজিপ্তীয়গণের আকৃতি ও পরিচ্ছদাদির সহিত ভারতবাসী তথা আমাদিগের সহিত সাদৃশ্য অনুমান হয়। ৬০-৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আড়ম্বর বিহীন বেশভূষা, উচ্চসম্প্রদায়ের লোকেরাও বড় আড়ম্বর বা অলঙ্কারপ্রিয় ছিলেন না। মস্তক মুণ্ডিত করিতে হইত। প্রধানগণ মস্তকে পরচুলা ধারণ করিতেন।

"But otherwise his customs was of the simplest and scantiest, ordinarily, when he was employed in the common duties of life, a short tunic, probably of white linen reaching from waiste to a little above of knee, (কোমর হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বিত শ্বেতবস্ত্র) was his sole garment. His arms, chest, legs, even his feet were naked. গলায় পদকসহ হার বিলম্বিত থাকিত। হস্তে বলয় এবং বাহুতে যষ্টি ধারণ করিত। এই আকৃতি বর্ণনা অনেকটা দুর্গামাতা কর্ত্তৃক আক্রান্ত প্রতিমার অসুরের ন্যায় বোধ হয়।

"The Egyptian *materfamilias* of the time wore her hair long, and gathered into three masses, one behind the head, and the other two in front of either shoulder. Like her Spouse, she had but little garment a short gown or petticoat reaching from just below the breasts to half way down the calf of the leg, and supported by two broad straps passed over the two shoulders. She exposed her arm

and bosom to sight, and her feet were bare, like her husband's. Her only ornaments were bracelets." নিম্নশ্রেণীর অসমীয়া রমণীগণ যেরূপ মেখলা পরিধান করে অনুমান হয় তদ্রূপ পরিচ্ছদ।

স্ত্রীলোকের অবরোধ প্রথা ছিল না "She is his associate in all his occupations," স্বামীর সহচারিণী ভাবে সর্ব্বকার্য্যে অধিকার ছিল।

ঈজিপ্ত হইতে পাশ্চাত্য দেশ সভ্যতালোক প্রাপ্ত হয়। মুরজাতি প্রাধান্য বিস্তার করিয়া বহু শতাব্দী যাবৎ ইয়ুরোপখণ্ডে আধিপত্য করে। জ্ঞান সভ্যতা, ধর্ম্ম নানা বিষয়ক প্রভাব পাশ্চাত্য মহাদেশে ঈজিপ্ত হইতে গৃহীত হয়। সুতরাং ঈজিপ্তের সহিত প্রাচীনকালের ভারতের ব্যবহার প্রণালী সৎ অসৎ সকল বিষয়ের সাদৃশ্য আলোচনায় অঙ্গাঙ্গিভাব ছিল বলিয়া মনে হয়। মহাভারত ও পুরাণ আভাষে যবন দেশের সহিত ভারতীয় সংশ্রবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

যে ভারতবাসীর শ্লীল অশ্লীল সকল প্রকার উৎসব আমোদ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য জগদ্ব্যাপ্ত হইয়াছিল। অন্য প্রভাব ত দূরের কথা, যে ভারতবাসী একদা আত্মসম্প্রসারণ করিয়া সমগ্র জগতকে বক্ষে ধারণ করিয়াছিল। যাহার নিদর্শন বহুধা বহুপ্রদেশে বিভক্ত বহুজাতি আচার ব্যবহার সমন্বিত ভারতে অদ্যাপি ক্ষীণ আভাসে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই ভারতবাসী সম্প্রসারণশীল শক্তি হারাইয়া আজি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও পরমুখাপেক্ষী; ইহাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে।

অন্য পৌরাণিক প্রবন্ধালোচনায় ঈজিপ্সিয়ানগণের বর্ণ বিচার (race) সম্বন্ধে উল্লেখ করিব। ইজিপ্ত দেশ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শক্তি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া "মিশ্রণ ভাব" প্রাপ্ত হইয়াছে। নচেৎ উহারা Nigritic race" "They were darker, had thicker lips, lower foreheads, larger heads, more advancing jaws, a fatter foot, and a more attenuated frame."

প্রাচীনকালের নরকপাল তুলনা করিয়া কোন প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পণ্ডিত বাঙ্গালী মুণ্ডের সহিত তুলনা করিয়াছেন। হিন্দু Vide Hindu Superiority.

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্ষয়রোগ ও তন্নিবারণ সম্বন্ধে গুটিকয়েক অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়

(৩৭১ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

যে সব কাজে ক্ষয় হওয়ার আশঙ্কা

কতকগুলি ব্যবসা আছে যাতে লিপ্ত হলে অনেক সময় ক্ষয়রোগকে উদ্যোগ করে ডেকে আনা হয়। যে সব কাজে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা উৎক্ষিপ্ত হয় এবং নিকটে থাকিলেই উহা ফুসফুসে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেই সব কাজ করতে গেলে ক্ষয় হওয়ার সমূহ আশঙ্কা। যারা ছুরি কাঁচি প্রভৃতি শান দেয় বা তৈয়ারী করে, চীনা মাটীর বাসন প্রস্তুত করে, টিনের কাজ করে, বা অন্যান্য

ধাতুর খনিতে কাজ করে, কয়লার খনিতে বা অভ্রের খনিতে কাজ করে, চুণ সুরকীর গুদামে কাজ করে, সুতা ও কাপড়ের কলে কাজ করে, পাটের আঁশ ছাড়ায়, পাট বা শণের গুদামে কাজ করে এবং তুলা ধোনে তাদের প্রায়শঃই ক্ষয়ে ভুগ্‌তে দেখা যায়। সুতরাং যারা এই সব কাজ করতে বাধ্য হয় তাদের বিশেষ সাবধানতা লওয়া আবশ্যক।

যে সব ব্যামো হলে ক্ষয়কাসি হওয়ার আশঙ্কা

এ ছাড়া কতকগুলি ব্যামো আছে যা হলে পরে ক্ষয় হবার আশঙ্কা থাকে। প্লুরিসির কথা পূর্ব্বেই বলেছি। হাম, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হুপীংকাসি, নিউমোনিয়া, প্রভৃতি রোগের পর ক্ষয়রোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং এই সব ব্যাধির পর শরীর যাহাতে সত্বর সবল হয় তাহাতে সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য; কারণ এই সব ব্যাধিতে শরীর এত দুর্ব্বল ও নিস্তেজ করে যে ক্ষয় অতি সহজেই আক্রমণ করতে সমর্থ হয় উপদংশ (Syphilis) ও বহুমূত্রের উপর এই পীড়া হইলে বা এই পীড়ার উপর উহাদের আক্রমণ হইলে ইহার গতি অত্যন্ত দ্রুত হয় এবং আরোগ্য হওয়ার কম আশা থাকে। অতিরিক্ত মদ্যপান ও ব্যভিচার করিলেও এই ব্যাধি সহজেই শরীরে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায়।

দারিদ্র্য ও স্বাস্থ্যহীনতা

এ ছাড়া আরও কতকগুলি কারণে এ ব্যাধি প্রকাশ পাইবার সুবিধা পায়। ইহার মধ্যে দরিদ্রতা ও দুর্ব্বলতাই প্রধান। দরিদ্র হইলেই অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিতে হয়, ভাল আলো বায়ুর ব্যবস্থা হয়ে উঠে না, পুষ্টিকর খাদ্য দূরে থাকুক দুবেলা পেট পুরিয়া খাওয়াই দুঃসাধ্য। আজকাল জীবনসংগ্রামের কঠোরতা বাড়িয়া গিয়াছে—লোকের কাজও বাড়িয়া গিয়াছে সর্ব্বদাই একটা ব্যস্ততার ভাব লাগিয়াই আছে।

আধুনিক সভ্যতার ফল

আধুনিক সভ্যতার ফলে সর্ব্বদাই একটা দৌড়াদৌড়ি একটা ছুটোছুটির ভাব লাগিয়াই আছে। জীবনের তার এত টানায় থাকে যে আর একটু টান পড়িলেই যেন ছিঁড়িয়া যাইবে। ইহার ফলে শরীরের কিছুমাত্র থাকে না--ব্যাধিকে দূর করিয়া দিবার শরীরের যে স্বাভাবিক ক্ষমতা তাহা সম্পূর্ণ হ্রাস প্রাপ্ত হয় জীবনটা স্ফূর্ত্তিহীন ও ভার বিশেষ বলিয়া অনুমান হয়। ইহাদের যে সন্তানসন্ততি জন্মে তাহাদের দেহও সবল ও সুস্থ হইতেছে না এবং সহজেই এই ব্যাধির আক্রমণে ধ্বংস হইতেছে। মধ্য-বিত্ত ভদ্রলোকেদের কষ্ট আরও বেশী হইয়া পড়িয়াছে এবং এ ব্যাধির প্রকোপও তাদের মধ্যেই বেশী পড়িয়া যাইতেছে। উহারা একদিকে বাহিরের ভদ্রলোকের খোলস রাখিতে গিয়া অন্যদিকে অভাবের দারুণ নিগ্রহে একেবারে জাঁতাপেষা হইতেছেন। যে পর্য্যন্ত ইহার একটা উপায় না হইতেছে সে পর্য্যন্ত এ ব্যধি দূর হইবার সম্ভাবনা নাই।

ম্যালেরিয়া

ইহার উপর আবার ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধিতে লোককে একরূপ আধমরা করিয়া রাখিয়াছে।

বাল্য-বিবাহ ও বিসদৃশ বিবাহ

বাল্য-বিবাহ দেশে প্রচলিত থাকায় ঐ বিবাহের অধিকাংশ সন্তানই দুর্ব্বল ও ক্ষীণ-তেজ জন্মিতেছে এবং এই সব ব্যাধির দ্বারা

অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। সুখের বিষয় যে এ বিষয়ে দেশের লোক সজাগ হইয়াছে এবং ইহারই মধ্যে বিবাহের বয়স পূর্ব্ব হইতে অনেকটা স্বাভাবিকের দিকে আসিয়াছে। যাঁহারা সবল ও সুস্থ সন্তান আশা করেন এবং যাঁহারা দেশের ও জাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, আশা করি তাঁহারা এ বিষয়ে স্বাধীন চিন্তা দ্বারা বাল্য-বিবাহের অপকারিতা উপলব্ধি করিবেন। বাল্য-বিবাহ ছাড়া আরও একটা দোষ দেখা দিয়াছে। পূর্ব্বে 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা' কথাই শুনা যাইত। এখন তা ত আছেই অধিকন্তু 'প্রৌঢ়স্য বালিকা ভার্য্যাও' চলিত হইয়াছে। আজকাল এমন অনেক পুরুষ আছেন যাঁহারা ৩০।৪০ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহিত হইতে চাহেন না অথচ কন্যা ১২।১৪ বৎসরের অধিক মিলে না। এই অযৌক্তিক ও বিসদৃশ বিবাহজনিত সবল ও সুস্থ সন্তান উৎপাদনের পক্ষে প্রশস্ত নহে। বয়সের এতটা বেশী পার্থক্য হইলে অনেক সময়ই বালিকা বধূর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে দেখা যায় এবং উহার অধিকাংশই ক্ষয়ে পরিসমাপ্তি হয় সুতরাং বিবাহের বয়সের অসামঞ্জস্যও দূর করিতে হইবে। দেশের লোকের যে পর্য্যন্ত সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি ও দরিদ্রতা দূর না হইতেছে সে পর্য্যন্ত এ ব্যাধি দূর হইবার আশা দুরাশা মাত্র।

বায়ু পরিবর্ত্তন

ক্ষয়রোগের প্রথম অবস্থায় স্বাস্থ্যকর স্থানে গেলে রোগ আরোগ্য হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আমাদের বাঙ্গলা দেশের দুর্ভাগ্য যে ইহার নিকটে বিশেষ কোন স্বাস্থ্যকর স্থান নাই। নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের মধ্যে সাঁওতাল পরগণার গিরিধি, মধুপুর, বৈদ্যনাথ, সিমুলতলা, ঝাঁঝাঁ, মিহিজাম, জামতারা, কার্ম্মাটার প্রভৃতি স্থান বেশ ভাল ও স্বাস্থ্যকর। সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানসমূহের মধ্যে পুরী ও কক্স বাজারই নিকটবর্ত্তী, ওয়ালটেয়ার ভিজাগাপাটাম, বম্বে, কলম্বো প্রভৃতি দূরবর্ত্তী ও ব্যয়সাধ্য। শৈলাবাসের মধ্যে দার্জ্জিলিং ও কার্সিয়ংই নিকটবর্ত্তী; সিলং, সিমলা, উটাকামণ্ড, কাশ্মীর, বিন্ধ্যাচল, নৈনীতাল প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর হইলেও দূরবর্ত্তী। রাঁচী, হাজারীবাগ, পুরুলিয়া, ঘাটশিলা, চক্রধরপুর, ডেরী অন্‌সোল, কাময়ানগর, ধানবাদ, বেনারস, চুনার, কটক প্রভৃতি স্থানও স্বাস্থ্যকর। উত্তরভারতের অধিকাংশ স্থানই স্বাস্থ্যকর। ওদেশটা উঁচু ও খট্‌খটে শুকনো সেই জন্যই স্বাস্থ্য ভাল। আমাদের বাঙ্গালার মত যে সব স্থান স্যাঁৎস্যাঁতে ও নীচু এবং বৎসরের অধিকাংশ সময়েই জলে ডোবা থাকে সেই সব স্থানই ব্যাধির আবাসভূমি।

এ সব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা সময়ান্তরে করার আশা রহিল। সকলের সকল স্থান সহ্য হয় না—সব সময়ে সব স্থান ভাল নহে। রোগীর দেহের অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা প্রয়োজন। এবিষয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া স্থান নির্ব্বাচন করাই কর্ত্তব্য।

স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসা

অল্পদিন পূর্ব্বেই স্যানাটোরিয়াম (Sanatorium) চিকিৎসার একটা ধুম পড়িয়া গিয়াছিল। স্যানাটোরিয়ামে না গেলে ক্ষয়রোগের চিকিৎসাই যেন অঙ্গহীন থাকিয়া যাইত। ইউরোপ দেশটা বড়ই হুজুগে, একবার যদি একটা নূতন কিছু হল অমনি সমস্ত লোক তাতে ঝুঁকে পড়ল। এই স্যানাটোরিয়ম চিকিৎসা সম্বন্ধে সকলেরই বোধ হয় অল্পবিস্তর জ্ঞান আছে। উহা প্রধানতঃ কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে, যেখানে

নির্ম্মল বায়ু পাওয়া যায় সেইরূপ স্থানে থাকিতে হয়। প্রায় সর্ব্বদাই বাহিরে উন্মুক্ত বায়ুতে থাকিবার ব্যবস্থা এবং উহাতেই ব্যাধি নিরাকৃত হয়। যাহাতে প্রচুর পরিমাণে আলো পাওয়া যায় তাহার বন্দোবস্তও করা হয়।

এ ছাড়া এখানে একটী সুচিকিৎসকের অধীনে ও তাহার তত্ত্বাবধানে থাকিতে হয়। ইহা হইতে যতটা ফল আশা করা গিয়াছিল ততটা ফল পাওয়া যায় নাই। স্যানাটোরিয়ামে চিকিৎসার যে উপকারিতা আছে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ইহাতে বায়ু পরিবর্ত্তন ত হয়ই, তার উপরে একটী সুদক্ষ, ও এই রোগ বিষয়ে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের অধীনে থাকিয়া জীবনটাকে নিয়মিত করা হয়। সুতরাং ভাল ডাক্তার ভাল স্থান ও সুনিয়ম তিনটি জিনিসেরই ফল ভোগ হইয়া থাকে এমত অবস্থায় উপকার না হইবার কোন কারণই নাই। বহুলোক এই সব স্যানাটোরিয়ামে আসিয়া রোগমুক্ত হইয়া গিয়াছে। তবে সব অবস্থার রোগীরই উপকার হয় না। যাহারা প্রথম অবস্থায় আসে তাহাদেরই বিশেষ উপকার দর্শে। এই স্যানাটোরিয়মে থাকিলে আর একটী এই উপকার হয় যে ব্যাধি সম্বন্ধে রোগীদের বিশেষ জ্ঞান জন্মে এবং যে সব সাবধানতা লওয়া আবশ্যক তাহা উহারা সহজে শিক্ষা করিতে পারে।

কাজেই উহারা লোকশিক্ষার সহায়তা করে এবং চিরদিনের মত নিজেদের জীবনও নিয়মিত করিতে পারে। স্যানাটোরিয়ামে যতদিন থাকে অধিকাংশ রোগীই বেশ থাকে। উহা হইতে ফিরিয়া আসিলে কতক রোগী বেশ সুস্থ থাকে কিন্তু অনেকেরই পুনরায় ব্যাধি বৃদ্ধি পায়। ইহার কারণ আর কিছুই নহে স্যানাটোরিয়ামে থাকিতে উহারা ভাল স্থানে থাকে, ভাল খায়, কিন্তু বাহিরে আসিয়া অস্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিতে হয়, আলো ও বায়ুর সুবন্দোবস্ত হয় না হয়ত সেরূপ আহারও জোগাইয়া উঠে না সুতরাং ব্যাধির প্রকোপ যে বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই সব কথা মনে রাখিতে হইবে এবং যাহাতে এই সব লোক ফিরিয়া আসিয়া ভাল ভাবে থাকিতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। মিউনিসিপালিটি ও গবর্ণমেণ্টের এই সব লোকদের জন্য স্বাস্থ্যকর বাড়ীর বন্দোবস্ত করা উচিত। যাহাতে উহারা উহাদের পুরাতন বাটীর ভাড়ায়ই এই সব ভাল বাড়ী পাইতে পারে তাহা করিতে হইবে। এ বিষয়ে দেশের ধনকুবেরদের সহায়তা একান্ত আবশ্যক। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের অপেক্ষা কম সৌভাগ্যবান দরিদ্র ভ্রাতাদের ও দেশের কি উপকারই না করিতে পারেন। আমাদের এই পরদুঃখ কাতর দেশে দয়ার্দ্র লোকের কি এতই অভাব হইয়াছে?

স্যানাটোরিয়াম ব বায়ুপরিবর্ত্তনের প্রধান অসুবিধা এই যে লোকটিকে একেবারে কার্য্য ত্যাগ করিয়া দীর্ঘদিনের জন্য দূর দেশে যাইতে হয় কতদিনে শরীর ভাল হইবে তাহার ত ঠিকানা নাই। হয়ত ইহার উপরই সংসারের সমস্ত নির্ভর করিতেছে কাজ ত্যাগ করিয়া গেলে বহুলোক অন্নাভাবে মারা পড়িবে। যাহাতে ইহারা নিশ্চিন্ত মনে চিকিৎসার জন্য যাইতে পারে সেজন্য ইহাদের অর্থ সাহায্যের জন্য যদি বন্দোবস্ত করা যায় তবে বড়ই ভাল হয়।

ব্যাধি হইলে সংবাদ দেওয়া প্রয়োজন কি না ? (Notification)

এই ব্যাধি প্রকাশ পাইলে কর্তৃপক্ষকে সংবাদ দিবার ব্যবস্থা থাকিলে বড়ই ভাল হয় এবং যাহাতে উহা নানা স্থানে ব্যাপ্ত না হইতে পারে তাহার উপায় হইতে পারে। প্রথম অবস্থায় সংবাদ পাইলে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবার চেষ্টা চলিতে পারে। কিন্তু প্রথম অবস্থায় সংবাদ দেওয়া সহজ নয়। ডাক্তারেরাই অনেক সময় সে সম্বন্ধে একটা নিশ্চিত মত দেন না। যখন একটা স্থির সিদ্ধান্তে আইসেন তখন হয়ত ব্যারাম বেশ আক্রমণ করিয়া বসিয়াছে এবং সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়ার সুযোগ এবং মাহেন্দ্রক্ষণ চলিয়া গিয়াছে। সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলেও ব্যাধিকে অনেকটা সীমাবদ্ধ করা যায় এবং যাহাতে একজন হইতে অপরের সংক্রমন না হইতে পারে সে বিষয়ে সতর্কতা লওয়া যায়। সংবাদ দিলে যদি কর্তৃপক্ষ দ্বারা উপকার পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে সংবাদ দিতে কাহারই দ্বিধা বোধ করিবার কারণ দেখি না। অনেক সময় সংবাদান্তে কর্তৃ-পক্ষীয়গণের তাড়নায় এত বিপদে পড়িতে হয় যে তখন কেবলই মনে হয় কেন খাল কাটিয়া কুমীর আনিলাম ? সুতরাং সংবাদ জ্ঞাপনের প্রথা অবশ্য কর্ত্তব্য (Compulsory) না হইয়া যদি ইচ্ছামত (Voluptary) হয় তবে বোধ হয় উপকার হইতে পারে। এ সম্বন্ধে এত বেশী কথা বলিবার আছে যে উহার জন্যই একটী স্বতন্ত্র পুস্তিকার প্রয়োজন!

ইহার জন্য স্বতন্ত্র চিকিৎসালয় দরকার

আমাদের দেশে আপামর সাধারণের জন্য যে দাতব্য চিকিৎসালয়গুলি আছে তথায় এ রোগের সব সময়ে সুবিধামত চিকিৎসা হয় না। ইহার জন্য স্বতন্ত্র চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ করা উচিত। এ সম্বন্ধে এত বিশেষ বিশেষ চিকিৎসা প্রচলিত হইয়াছে এবং এ সম্বন্ধে নিত্য এতই নূতন জ্ঞান সঞ্চয় হইতেছে যে ইহার জন্য বিশেষজ্ঞের (Specialist) একান্ত দরকার। সাধারণ চিকিৎসাগারগুলিতে ইহাদের সম্বন্ধে উপযুক্ত মনোযোগ দেওয়ার সুবিধা ত হয়ই না ববং ইহাদের সংস্পর্শে অপরাপর রোগীদের এই ব্যাধি হওয়ার সর্ব্বদাই আশঙ্কা থাকে। ইউরোপ প্রভৃতি স্থানে বহুদিন হইল ইহার স্বতন্ত্র চিকিৎসা চলিতেছে আমাদের এ হতভাগ্য দেশে কি ইহার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হওয়া কোন প্রকারেই সম্ভবপর নহে ? ইহা যে আমাদের কেবল লজ্জার বিষয় তাহা নহে এই অবহেলার দরুণ অনেকের যাহাদের আরোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা ছিল—তাহারা অকালে মৃত্যুগ্রাসে পড়িতেছে। ইহা কি কম পরিতাপের কথা!

লোকশিক্ষা

যে সব উপায়ে লোকশিক্ষার সহায়তা হইতে পারে সে সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই কাজ গবর্ণমেণ্ট ও জন-সাধারণ উভয়েরই একযোগে করা কর্ত্তব্য। ডাক্তারগণ ইচ্ছা করিলে এ বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারেন।

গবর্ণমেণ্ট

গবর্ণমেণ্ট নানা স্থানে এই ব্যাধির জন্য স্বতন্ত্র চিকিৎসাগার খুলিয়া—এই ব্যাধি সম্বন্ধে বিবিধ জ্ঞান বিস্তার করিয়া, দরিদ্রেরা যাহাতে অল্প ভাড়ায় অপেক্ষাকৃত ভাল ঘরে বাস করিতে পারে এবং এই চিকিৎসা লোকের পক্ষে যাহাতে সহজ হইতে

পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া ইহার প্রকোপ কমাইতে পারেন। এই ধরুন থুথুটা যদি বিনা পয়সায় পরীক্ষার বন্দোবস্ত হয় তবে দেশের একটা মহা উপকার হয়, থুথুটা একবার পরীক্ষা করাইতে গেলেই ৫৲ টাকা দক্ষিণা দিতে হয়। ক্ষয়রোগে এমনও দেখা গিয়াছে যে ২০।২৫ বার পরীক্ষার পরে তবে হয়ত থুথুতে জীবাণুর দর্শন মিলিয়াছে। তা আমাদের মত দীন দরিদ্র দেশের লোকের এমন কি অবস্থা আছে যে ১০০৲।১২৫৲ টাকা খরচ করিয়া ২০।২৫ বার থুথু পরীক্ষা করাইবে, অনেকের একবার ডাক্তার দেখাইবার অর্থ ই জোটে না যদিই বা ডাক্তার দেখান হইল অনেক সময় ঔষধ আনা ঘটিয়া উঠে না। বিনা অর্থে থুথু পরীক্ষা আকাশ কুসুমের কথা নহে। আজকাল ইউরোপের প্রায় সকল স্থানেই ইহা নিত্য হইতেছে এবং এই সব কারণেই স্বতন্ত্র চিকিৎসালয়েরও এত প্রয়োজন।

অর্থ

এই সব কার্য্যে বহু অর্থের প্রয়োজন। একা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তাহা হইবার নহে। আমাদের দেশের দীনদুঃখকাতর দয়ার্দ্র ব্যক্তিদের—লক্ষ্মীর যাঁহারা বরপুত্র তাঁহাদের এবং জনসাধারণেরও এ বিষয়ে অগ্রসর হইতে হইবে। ভাই কমলার সন্তানগণ—তোমরা যে ইহাদ্বারা কেবল দরিদ্রেরই উপকার করিবে তাহা নহে। দরিদ্রগণকে আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া নিজ নিজ জীবন রক্ষারই উপায় বিধান করিবে। সংসারে থাকিতে গেলে সকলের ভাল মন্দেই যে সকলের পায় তাহা ধ্রুব। তাই নিজের শুভ ইচ্ছা করিলে অপরের মন্দটা দূর করিতে হইবে। উহাদের ব্যাধি কম হইলে সংক্রমণের ভয় কম হইবে সুতরাং ঈশ্বরানুগ্রহ লাভে যাহারা কুবেরোপম তাহাদের এ বিষয়ে মুক্তহস্তে সাহায্য করা উচিত।

সমিতি গঠন

ইউরোপে অনেক স্থানে জনসাধারণে মিলিয়া সমিতি গঠন করিয়া এই ব্যাধি নিবারণের চেষ্টা করিতেছে। তাহারা সংবাদ পাইলেই যেখানে অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন সেখানে অর্থদান করে, যেখানে চিকিৎসকের অভাব সেখানে চিকিৎসক পাঠায়, যেখানে শুশ্রূষাকারিণীর প্রয়োজন সেখানে তাহাদিগকে নিয়োগ করে। কেমন করিয়া বাস করিতে হইবে, কোথায় থুথু ফেলিতে হইবে, কি করিলে শরীর ভাল হইবে, কিসে অন্য লোকের অনিষ্ট না ঘটিতে পারে এ সব সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে বহু লোক রোগমুক্ত হইয়া জাতির সংখ্যা ডবল বৃদ্ধি করিতেছে। ভাই সব, আমাদের দেশে কি এই সমিতি গঠন ও কার্য্য গ্রহণ একেবারেই অসম্ভব! আজ দেশে এই ব্যাধির তাড়নায় ঘরে ঘরে যে হাহাকার উঠিতেছে তাহার কি প্রতিকার হইবে না? আমরা কি নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিয়া ও মাত্র গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া ধ্বংস পাইব?

আশার কথা

যাঁহারা এই ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন তাঁহাদের হতাশ হইবার কারণ নাই। আমাদের মধ্যে অধিকাংশই এক সময় না এক সময় এই ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হই কিন্তু তাই বলিয়া কি সকলেই মরিয়া যাই? আমাদের শরীরের অনেক ক্ষমতা আছে; প্রকৃতি তাহাকে রোগ নিবারণের স্বাভাবিক বহু ক্ষমতা দিয়াছেন। আমরা যদি সাবধানতার

সহিত চলি—যদি এই ব্যাধি দূর করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করি—তবে উহাতে বেশীক্ষণ লাগে না। আমি বহু লোককে এই রোগ হইতে মুক্ত হইতে দেখিয়াছি; এমন কি যে সব রোগীর জীবনের আশা মাত্র করি নাই তাহার মধ্যেও অনেকে এমন আরোগ্য হইয়াছেন যে একেবারে আশ্চার্য্যান্বিত হইতে হইয়াছে। সুতরাং এ ব্যাধি আক্রমণ করিলেই জীবনে নিরাশ হইবার কারণ নাই।

আমাদের কর্ত্তব্য

এই ব্যাধিগ্রস্ত হইলে আমাদের কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে। নিজের জীবন নিজের নিকট যেমন অতিশয় প্রিয় সেইরূপ অন্যেরও। আমরা যাহাতে অপরকে সংক্রামিত না করি সে বিষয়ে একান্ত সচেষ্ট হইতে হইবে এমন কি উহা একটী ব্রতস্বরূপ মনে করিতে হইবে। আমরা যাহাতে ব্যাধিগ্রস্তের সহিত একত্রে আহার বিহার না করি, একত্রে নিদ্রা না যাই এক পাত্র হইতে পানীয় পান না করি বা একই থালায় না খাই যে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি থাকা কর্ত্তব্য। ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির ব্যবহারের জন্য সব জিনিসই স্বতন্ত্র থাকা প্রয়োজন। এক হুঁকায় তামাক খাওয়া সঙ্গত নহে। অপরকে চুম্বন নিষিদ্ধ বিশেষতঃ বালক বালিকাদিগকে কারণ উহারা অতি অল্পতেই সংক্রামিত হয়। সর্ব্বোপরি আমাদের যেখানে সেখানে থুথু ফেলা অনুচিত। ইহাতে যে কেবল সাধারণের উপকার করা হইবে তাহা নহে, নিজের অভ্যাসও ফিরিয়া যাইবে এবং উহাতে নিজেরও পরোক্ষভাবে উপকার আছে। অনেকের থুথু গিলিয়া খাইবার অভ্যাস আছে উহা অত্যন্ত খারাপ। ঐ জীবাণুপূর্ণ থুথু খাদ্যপথে যাইয়া নানা স্থানে নীত হইতে পারে এবং নানা স্থানের ক্ষয় উৎপাদন করিতে পারে এবং কোন কোন স্থান হইতে পুনরায় ফুসফুস্‌কে আক্রমণ করিতে পারে—সুতরাং এ সম্বন্ধেও বিশেষ সাবধানতা প্রয়োজন। এই সব বিষয়ে ম্রিয়মাণ হইবার কিছুই নাই। ব্যাধি হইলে লোকের মনে স্বতঃই কষ্ট হয় তাহার উপর এইরূপ কঠিন ব্যাধি হইলে আরও বেশী কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। তাই বলিয়াই কি হাইল ছাড়িয়া দিতে হইবে, সমস্ত কর্ত্তব্যজ্ঞান বিসর্জ্জন দিতে হইবে? যে ভারতবর্ষ পরের উপকারের জন্য নিজকে অর্ঘ্য দিতে চিরদিন শিক্ষা দিয়া আসিয়াছে, সেখানে কি এ সামান্য বিষয় এতই কঠিন? কখনই না। আমার বিশ্বাস সকলেই প্রফুল্লচিত্তে নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিবে এবং যাহাতে অপরে আক্রমিত না হইতে পারে তাহার জন্য সচেষ্ট হইবে।

সতর্ক হইবার লক্ষণসমূহ

যখনই বিশেষ কারণ ব্যতীত শরীর খারাপ বোধ হইবে হয়ত উহাতে ভয়ের কোনও কারণই নাই, হয়ত বিকেলে একটু একটু জ্বর হইতে থাকিল, কি প্রায়শঃই সর্দ্দি হইতে থাকিল—কি খুস্ খুসে কাসি দেখা দিল কিংবা রাত্রিতে অতিরিক্ত পরিমাণ ঘাম হইতে থাকিল—শরীরের নানা স্থানে বিশেষতঃ বুকে পিঠে বেদনা করিতে থাকিল, হঠাৎ গলা দিয়া রক্ত উঠিতে আরম্ভ হইল, শরীরটা খামাখা দুর্ব্বল হইয়া চলিল—হঠাৎ ক্ষুধাটা বা কমিয়া গেল, শরীরের ওজন হয়ত বিনা কারণে কমিতে আরম্ভ হইল বিশেষ, জ্বর নাই বা অন্য উপসর্গ নাই অথচ শরীরটায় সোয়াস্তী বোধ হইতেছে না—এই সবের কোনও একটী যদিও কঠিন লক্ষণ নয় বা উহাতে ভয়ের আদৌ কারণ নাই কিন্তু তবুও একটা মস্ত অসুবিধা ত? শারীরিক অসুস্থতা বোধ

করিতে হইতেছে ত ?—এমত অবস্থায় বৃথা কালক্ষেপ বা উপেক্ষা না করিয়া উপযুক্ত চিকিৎসকের উপদেশ লওয়াই একান্ত কর্ত্তব্য।

ডাক্তারদের কথা

আমাদের দেশে এই ব্যাধি নিরূপণ সম্বন্ধে বড়ই গোলযোগ দেখিতে পাই। ইহার চিকিৎসার ফল প্রত্যাশা করিলে এবং ইহার বিস্তার বন্ধ করিতে হইলে এই ব্যাধির সূত্র পাতেই ইহাকে ধরিতে হইবে। কিন্তু এই স্থানেই যত বিপদ! প্রায়শঃই প্রথমাবস্থায় অনেককেই এসম্বন্ধে একটা মত দিতে ইতস্ততঃ করিতে দেখিতে পাই। থুথুতে জীবাণু বা ফুস্ফুসে ক্রেপিটেসন্ (crepitation) প্রভৃতি না পাইলে এই রোগ সম্বন্ধে উঁহারা কোন মত দেন না। যখন ঐসকল পাওয়া যায় তখন ব্যাধি বহুদূর অগ্রসর হইয়া থাকে এবং ব্যাধির প্রতিকার করাও কষ্ট-সাধ্য। সুতরাং যাহাতে প্রথম অবস্থায় একটা মতামত দেওয়া যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। একজনে যদি বলেন যে হাঁ ব্যাধি সন্দেহ হইতেছে বটে—অপরে হয়ত বলিয়া বসেন—না হে এ সম্বন্ধে এখনও ঠিক বলা যায় না—ইহা যে অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। একেবারে প্রথম অবস্থায় ধরা যায় না সত্য তবে কিছু-দিন বাদেই এমন কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায় যাহা হইতে একেবারে নিশ্চয়রূপে বলা না গেলেও সন্দেহের যথেষ্ট কারণ বর্ত্ত-মান থাকে। রোগী শিক্ষিত হইলে সন্দেহ হওয়া মাত্রই তাহাকে স্বাস্থ্য বিষয়ে সতর্ক হইতে বলা সঙ্গত এবং তাহাকে যে মাঝে মাঝে দেখা আবশ্যক এসম্বন্ধেও বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। বার বার দেখিলে হয়ত সন্দেহের কারণ দূরীভূত হইবে নতুবা যাহা সন্দেহের ছিল তাহা পূর্ণ ব্যাধিরূপে প্রকাশ পাইবে, মানবজীবন বড়ই মূল্যবান—উহা যাহাতে আমাদের অবহেলায়, আমাদের মূর্খতায় বিনষ্ট না হয় তাহার যথোচিত চেষ্টা প্রয়োজন। আমরা হয়ত সব সময় সব কথা বুঝি না—মানুষ সদাই ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ—এমত অবস্থায় অধিক অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ লওয়া কর্ত্তব্য। অন্ততঃ একজনের মাথার চেয়ে যে দুজনের মাথার মূল্য বেশী তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

সাহিত্য পরিচয়

ছাত্রগণের নৈতিক অবস্থা ও তাহার প্রতিকার—শ্রীআদীশ্বর ভট্টাচার্য্য বি, এস্ সি, প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—২৭ নং বকুল বাগান রোড, ভবানীপুর। মূল্য ।৵০ আনা।

ছাত্রগণের নৈতিক অবস্থা কি প্রকারে খারাপ হইয়া পড়ে এবং কিসে খারাপ না হয়, তাহা দেখানই লেখকের উদ্দেশ্য। ছেলেদের উপযোগী বেশ প্রাঞ্জল ভাষায় ব্রহ্মচর্য্য পালনের উপায় পুস্তকখানিতে বিবৃত করা হইয়াছে। পুস্তকখানা শুধু ছেলেদের জন্য লিখিত নহে—অভিভাবকগণও ইহা পড়িয়া উপকৃত হইবেন। সমাজের উন্নতিকল্পে এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার আমরা কামনা করি। পুস্তকখানার নাম 'ছাত্রগণের নৈতিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার' হওয়া উচিত ছিল।

শ্রীমদগোমঙ্গলম্‌,—

শ্রীবিভূতীশচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—২৪ নং মিডিল রোড, ইটালী, কলিকাতা। মূল্য দুই আনা মাত্র। গো-জাতির মঙ্গলকল্পে পুস্তিকাখানি লিখিত। প্রত্যেক গৃহস্থেরই গোসেবা একটি অত্যাবশ্যক ধর্ম্ম। অতএব গৃহস্থ পত্রিকা এই পুস্তকের অনাদর করিতে পারে না।

হাম্মির (ঐতিহাসিক উপন্যাস)—শ্রীদয়ালচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস, ২২ নং কর্ণওয়ালিস্‌ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

যে প্রসিদ্ধ রাজপুতবীরের নামে এই আখ্যায়িকার নামকরণ হইয়াছে, তাঁহার চরিত্রবত্তা এবং বীর্য্যবত্তার উজ্জ্বল চিত্র উপন্যাস খানিতে আমরা আশা করিয়াছিলাম। আমরা ভাবিয়াছিলাম, হামিরের চরিত্রে আমরা এমন সকল গুণ দেখিতে পাইব, যাহাতে মুগ্ধ হইয়া রাজপুতগণ তাঁহার পতাকার তলে সমবেত হইতে পারিয়াছিল। কিন্তু লেখক সে বিষয়ে আমাদিগকে একেবারে নিরাশ করিয়াছেন। শুধু নিপুণ যোদ্ধার বেশে হামিরকে সাজাইয়া তিনি তাঁহাকে বীর বলিয়া মানিয়াই ক্ষান্ত। কিন্তু যুদ্ধে নিপুণত্ব যে বীরত্বের একটা আংশিক পরিচয়, একথা ভুলিলে ত চলিবে না। হামিরকে যে লোকে নেতার পদে বরণ করিয়াছিল, সে কি কেবল এই গুণে? তাঁহার ত্যাগ-স্বীকার, তাঁহার সাহসিকতা, তাঁহার উদ্যম, তাঁহার সকল সফলতার মূলে। ইতিহাস সে সব তথ্য সম্বন্ধে নীরব থাকিলেও ঔপন্যাসিকের কল্পনা সে সকলকে টানিয়া বাহির করিতে পারে—ইহা ত নিশ্চিত।

উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের বেশী কিছু বলিবার নাই। তাহাদের কোন কোনটি বেশ ভালই ফুটিয়াছে। লেখকের ভাষার উপর বেশ দখল আছে। রচনার এবং গল্প বলিবার ভঙ্গীটি পুরাতন ধরণের হইলেও আধুনিক যুগেও একেবারে কম উপভোগ্য নহে। গল্পের স্থানে স্থানে লেখক রসিকতার বড় বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, ঐ সব স্থলে আরও একটু সংযত হইলে মানাইত ভাল।

মঙ্গলনির্ঘোষ—কলিকাতা ভাগবত ধর্ম্মমণ্ডল হইতে শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কতিপয় বৈষ্ণব-প্রধান একজন চর্ম্মব্যবসায়ী

মূর্চিকে উন্নয়ন করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করাই এই নির্ঘোষের উদ্দেশ্য। এ নির্ঘোষ মঙ্গল কি অমঙ্গল সমাজপতিরা তাহা স্থির করিবেন। আমরা এ বিষয়ে কোন মতামত দিতে অক্ষম।

১। হিন্দী সরস্বতী—

জানুয়ারী ১৯১৬। সরস্বতীর এই সংখ্যা পূর্ব্বালোচিত সংখ্যাদ্বয় হইতে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। "হর্বর্ট স্পেন্সরকী অজ্ঞেয় মীমাংসা" একটী গতায়ু দার্শনিক তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি। "কালিদাসকা সময় নিরূপণ" ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশিত পঞ্চানন মিত্র মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধের আলোচনা। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ঐতিহাসিক বৃন্দ যে পরস্পরের গবেষণার সন্ধান রাখিতেছেন ইহা বড়ই সুখের বিষয়। ইহা ব্যতীত অন্যান্য গদ্য প্রবন্ধগুলিও সুপাঠ্য ও চিন্তাপূর্ণ। কিন্তু আমরা পদ্যগুলির একেবারেই প্রশংসা করিতে পারিলাম না।

২। সংস্কৃত শারদা—

জানুয়ারী ১৯১৬। এখানি সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত। আমরা আমাদের এই নবীন সহযোগীকে সাদরে সাহিত্য ক্ষেত্রে আহ্বান করিতেছি। এই সংখ্যায় ১০টী প্রবন্ধ ও পুস্তক পরিচয় আছে। প্রবন্ধগুলির মধ্যে সকলগুলিই অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অনেকগুলিই সুপাঠ্য। এই পত্রিকার প্রবন্ধগুলির দ্বারা একটা কথা বেশ উদাহৃত হইতেছে। আমাদের বিশ্বাস যে আমাদের সংস্কৃতজ্ঞ সুধীমণ্ডলী পাশ্চাত্য বিদ্যা ও পণ্ডিতগণ সম্বন্ধে উদাসীন। কিন্তু এই পত্রিকাখানি পাঠ করিলে সে ভ্রম নিরাকৃত হইবে। "ছায়াপথ" নামক প্রবন্ধটীতে ইউরোপীয় জ্যোতিষিবৃন্দের চিন্তার ফল আলোচিত হইয়াছে। পুস্তক পরিচয়ের মধ্যে সক্রেটিসের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। নবাবিষ্কৃত মহাকবিভাসের গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে একটী সুপাঠ্য প্রবন্ধ আছে। কিন্তু আমরা সংস্কৃত সাহিত্য রথিবৃন্দের নিকট হইতে ইহা অপেক্ষা অধিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ আশা করি।

৩। ইংরাজী—

Central Hiudu College Magazine.

ভারতের একটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠবিদ্যালয় প্রকাশিত পত্রিকা যেরূপ হওয়া উচিত এই পত্রিকাখানি তাহা অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। বিষয়ের বৈচিত্র্য নাই। পত্রিকার অধিকাংশই সংবাদপত্রে প্রকাশিত বক্তৃতাদি পূর্ণ। আশা করি Central Hindu Collegeএর অধ্যাপকগণ ছাত্রগণকে পত্রিকা খানির উৎকর্ষ সাধনে সাহায্য করিবেন।

মফঃস্বলের বাণী

১। বঙ্গে ম্যালেরিয়া

দেশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ যে ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকেই অগ্রসর হইতেছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দুইচারিটী জেলার ম্যালেরিয়া অগ্নিশিখার ন্যায় সমগ্র বঙ্গেই প্রসারিত হইয়া পড়িতেছে। এখনও এই দুর্জ্জেয় রোগের কারণ ও তাহার প্রতিকারের উপায় নির্দ্দেশ এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে পারিলে দেশ রক্ষা পাইবে—নতুবা আমাদের সকল উন্নতির চেষ্টা বৃথা।

ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা ও বিশ্বাস ডাক্তার বেণ্টলীর ন্যায় স্বাস্থ্যতত্ত্ব-বিশারদও তাহার অধিকাংশের সমর্থন করিয়াছেন। স্থূল চক্ষেই দেখিতে পাওয়া যায়, যেখানে আবর্জ্জনা ও জঞ্জাল সেখানেই পূতিগন্ধ, কীট ও মশকাদির বাস। জল, রৌদ্র ও অগ্নি এই তিনটিই শুদ্ধিকরণের প্রধান উপায়। আমরা বরাবর দেখিয়া আসিতেছি রীতিমত বর্ষার সময় ম্যালেরিয়া থাকে না। যাহা কিছু অপবিত্র, যাহা কিছু অস্বাস্থ্যকর, জলস্রোতে সমুদয় ধুইয়া লইয়া যায়। আমাদের দেশের নদী, নালা প্রভৃতি প্রকৃতির স্বাভাবিক পয়ঃপ্রণালী। এগুলি যতদিন কার্য্যকরী ছিল ততদিন দেশে বিষ সঞ্চরত হইতে পারে নাই—কিন্তু ইহারা শুষ্ক হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশে ম্যালেরিয়ার ভীষণ প্রকোপ দেখা দিয়াছে। এটা শুধু আমাদের বিশ্বাস নহে, আমরা বহু দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহার সমর্থন করিতে পারি। মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গার অবস্থা অতি শোচনীয়; গঙ্গা পরের কলুষ গ্রহণ করিতেছেন বটে কিন্তু তাহা বিদূরিত করিবার শক্তি আর গঙ্গার নাই। সকল পাপ সকল আবর্জ্জনা ভাগীরথীর নীরে ও কূলের স্তরে স্তরে সংক্রমিত হইয়া এক মহাবিষের সৃষ্টি করিতেছেন। সে বিষে বহরমপুর প্রভৃতি স্থানের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহা সকলেই জানেন। পূর্ব্বে রঙ্গপুর জেলার তিস্তার তীরবর্ত্তী স্থান সমূহ স্বাস্থ্যকর ছিল, কিন্তু তিস্তা সেতু নির্ম্মিত হইবার পর হইতে ত্রিস্রোতার সকল শক্তি অন্তর্হিত, তিস্তা প্রায় মরা-নদীতে পরিণত। তাই মুর্শিদাবাদের গঙ্গার ন্যায় তিস্তার চারিদিকেও ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে। পদ্মার অবস্থাও ষাড়াসেতু নির্ম্মাণের পর হইতে শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে—তাই পাবনা জেলাতেও গত বৎসর ভীষণ ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছিল। দিনাজপুরের প্রাকৃতিক পয়ঃপ্রণালী নদী প্রভৃতির অবস্থাও শোচনীয়। শুদ্ধীকারক বারির সহিত দেখা নাই ধূলিরাশির শত শত রোগ, বীজাণু পথ ঘাট, মাঠ এমন কি গাছ পাতা পর্য্যন্ত ছাইয়া ফেলিয়াছে—তাই সেখানেও এবার ভীষণ ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে।

যখন বর্ষা বেশী হয় তখন মরা নদীতেও স্রোত বহে, দেশের আবর্জ্জনা বিধৌত হইয়া যায়। এটা দৈবকৃপা। এবার পাবনা জেলায় বেশী বর্ষ হইয়াছে, তাই সে জেলায় এবার ম্যালেরিয়া নাই, কিন্তু এবার রঙ্গপুর দিনাজপুর জেলায় সেরূপ বর্ষা হয় নাই, তাই দেশের বিষ দেশের স্তরে স্তরে সংক্রমিত হইয়া ম্যালেরিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। ম্যালেরিয়ার মশকহেতুত্ব স্বীকার করি বা না করি, দেশের আবর্জ্জনা বিধৌত না হইলেই যে এই আপদের সৃষ্টি হয় তাহা আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি—তবে ডাক্তারেরা বলিতে পারেন, আবর্জ্জনা বৃদ্ধি হইলে মশক বংশও বৃদ্ধি পায়। জলনিকাশ ভালরূপ হইলে যে ম্যালেরিয়া হ্রাস পায়, তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত রঙ্গপুর সহরের ক্যানাল বা খাল। এই পয়ঃপ্রণালী খাত হইবার পূর্ব্বে রঙ্গপুর যমপুর ছিল, কিন্তু ইহার পর হইতে রঙ্গপুরের স্বাস্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে। তবে রেলসেতু নির্ম্মাণে দেশের পয়ঃপ্রণালী মূল নদীগুলি নিস্তেজ ও রেলের রাস্তা বৃদ্ধিতে জলনির্গমের পথ ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হওয়ায় দেশের স্বাস্থ্য ক্রমশঃই খারাপ হইতেছে। কেহ কেহ পাটকে ম্যালেরিয়ার কারণ বলেন, কিন্তু

পাটের উৎপত্তি স্বাস্থ্য হানির কারণ নহে—পাট পচিয়া যে দুর্গন্ধের ও বিষের সৃষ্টি করে, তাহাও আংশিক কারণ। এই বিষ স্রোতে বাহির হইয়া গেলে তত ভয়ের কারণ থাকে না। বেণ্টলি সাহেব যে বলিয়াছেন,—পাট ও ধান যে স্থানে অধিক উৎপন্ন হয় তথায় ম্যালেরিয়া কম, এ উক্তি সত্যবিরোধিনী। রঙ্গপুর দিনাজপুরে এবার খুব ম্যালেরিয়া দেখা গিয়াছে। তবে পাটপচানের বিষ ও সেই বিষ নির্গমের উপায়াভাব এই উভয় কারণেই এই দুই জেলায় এবার এত বেশী ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে।

দেশে যাহাতে জঙ্গল বৃদ্ধি না পায় সূর্য্যের কিরণ যাহাতে সকল স্থানকে পবিত্র করিতে পারে, অগ্নিশিখা যাহাতে দূষিত পদার্থকে শুদ্ধ করে এ সমুদয় বিষয়ে দেশবাসী মনোযোগ প্রদান করিতে পারেন। অগ্নি ও সূর্য্য প্রকৃতই বিশোধক—এই নিমিত্তই অগ্নি ও সূর্য্যের উপাসনা এদেশে প্রচলিত হইয়াছে। ডাক্তারেরাও নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা ক্ষত প্রভৃতিতে সূর্য্যরশ্মির উপকারিতা ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু নদীগুলির সংস্কার বহুব্যয় সাপেক্ষ—এদিকে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ না করিলে আর উপায়ান্তর নাই। গবর্ণমেণ্ট দেশের প্রাণ রক্ষা না করিলে গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য সকল কার্য্যে ব্যয়ই নিরর্থক হইয়া পড়িবে।

রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ

২। পল্লী-সেবার অন্তরায় ও উপায়

প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই আজ পল্লীগ্রামের দুরবস্থা চিন্তা করিয়া কাতর হইতেছেন এবং সেই দুরবস্থা দূরীকরণার্থ সাহিত্যে প্রবল আলোচনা সৃষ্টি করিতেছেন। ইহারা ভাবুক ইহারা কর্ম্মীও বটেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পল্লীগ্রামবাসী কি না সন্দেহ। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে লিখিত আছে—

তত্র মিত্র ন বস্তব্যং যত্র নাস্তি চতুষ্টয়ম।
ঋণদাতা চ বৈদ্যশ্চ শ্রোত্রিয় সজলা নদী॥

অর্থাৎ হে মিত্র যেখানে ঋণদাতা চিকিৎসক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সজলা নদী এই চারিটী বস্তু নাই সেখানে বাস করিবে না। আজ পল্লীজননীর সেবক বৃন্দ মাত্রই লক্ষ্য করিয়াছেন যে পল্লীগ্রামে ইহার প্রত্যেকটীর অভাব ঘটিয়াছে। গ্রামে আজ ঋণদাতা নাই। যাহারা আছে তাহারা চাষী প্রজার রক্তশোষণকারী। চিকিৎসক পয়সা পয়সা বলিয়া প্রায় গ্রাম ত্যাগ করিয়াছে। গণ্ড গ্রামসমূহেও আজ কোনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক নাই। উপাধিধারী ডাক্তার গ্রামে বাস করেন না। কারণ গ্রামে তাঁহাদের খরচ পোযায় না। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ আজ প্রায় কোথাও নাই। সে টোল এখন আর নাই, সেই বিনা বেতনে শিক্ষা প্রায় লোপ পাইয়াছে। সে গুরু দক্ষিণা আর কেহ দেয় না। যাজনিক ব্যবসায় আর কাহারও সংসার চলে না। সে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদায় নাই, সে কথকতা নাই শাস্ত্র পাঠ নাই। সজলা নদীর কথা আজ না বলিলেও চলে। নদী সব মজিয়া গিয়াছে। জলাশয়সমূহ জঙ্গলাকীর্ণ। এখন আর পিতৃপুণ্যে মাতৃপুণ্যে কেহ জলাশয় খনন করায় না। লোকহিতার্থেও নহে।

এই সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে লোক সকল গ্রামে বাস করিতে চায় না। তাই পল্লীগ্রাম সমূহ জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে কেন এমন হইল? এই অবস্থাই পূর্ব্বে হইয়াছে তারপর লোক সকল গ্রাম ত্যাগ করিয়াছে কি লোক সকল পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিয়াছে বলিয়াই পল্লীগ্রাম সমূহের অবস্থা এমন হইয়াছে। আমাদের মনে হয় দুই কারণ ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া গিয়াছে।

প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ লোক সকল শিক্ষিত হইবার আশায় পল্লীগ্রামের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করে। ইংরেজী শিক্ষারম্ভের প্রথম ভাগে শিক্ষাভিলাষী বালক মাত্রকেই বাল্যে পল্লীজননীকে ত্যাগ করিতে হইত, আজ কোনও কোনও গ্রামের সে অবস্থা দূরীভূত হইয়া থাকিলেও অনেক গ্রামের অবস্থা এখনও তদ্রূপ আছে। তারপর শিক্ষার যতই উন্নতি

হইল তত্র্য গ্রাম হইতে সহর, সহর হইতে রাজধানী গমন করিতে হইল। ছাত্র-জীবনের অবসানে অর্থাগমের জন্য পল্লীগ্রামের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া সহরবাসী হইতে হইল। কাজেই পল্লীগ্রামের দুর্দ্দশা ঘটিল। এই সমস্ত অবস্থাই মধ্যবিত্তদের সম্পর্কে ঘটে কারণ চাষাপ্রজা আজও গ্রামে বাস করে, মধ্যবিত্ত আর গ্রামে বসিয়া জীবনোপায়ের সংস্থান করিতে পারে না। পূর্ব্বেকার ভূমির আয় এখন আর অনেকের নাই। তদুপরি বিলাসিতা ও অবশ্য কর্ত্তব্য ব্যয়ের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

এখন ঐ অবস্থার পরিবর্ত্তন করা কতদূর সম্ভবপর তাহাই দ্রষ্টব্য। আমরা আগামী সপ্তাহে সেই বিষয় আলোচনা করিব।

বরিশাল হিতৈষী

৩। আমাদের কর্ত্তব্য

স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির উপকারের জন্য দেশের সকলেরই একটা ব্যাকুলতা পরিলক্ষিত হইতেছে। দেশের মঙ্গল সাধনের জন্য দিন দিন কত সভা সমিতির সৃষ্টি হইতেছে, তাহাদের গণনা করা অসাধ্য হইয়া উঠিতেছে; বিলাতে, এদেশে, লাট সভায়, টাউন হলে, জমীদার সভায়, বাগানে, বিপিনে, নদী সৈকতে, পুস্তকাগারে, চারিদিকেই বক্তৃতার স্রোত প্রবাহিত, প্রস্তাব উত্থাপন অনুমোদন, সমর্থন, ঘন ঘন করতালি প্রদান কিছুরই ত্রুটি নাই। কত লীগ, কত কনফারেন্স, কত সঙ্ঘ, কত সম্মিলন, কত পরিষদ কতই দেখিতেছি, আজ কাল আবার সমিতির নামের পূর্ব্বে 'সমগ্র ভারত' বা 'ভারত জোড়া' এই আখ্যার বাহারও দেখিতে পাইতেছি; এই রূপ 'ভারত জোড়া' সমিতিও অনেক গুলি হইয়াছে। ভারতে যত জাতি আছে দেখিতেছি প্রত্যেক জাতির উন্নতি বিধানের জন্য বিভিন্ন সমিতি গঠিত হইতেছে; আবার ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর; বেদাদি গ্রন্থ হইতে কত প্রমাণাদি সংগ্রহে তৎপর। কোন সমিতি বা রাজভক্তি উদ্দীপনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, কোন সমিতি অধিকতর রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য সচেষ্ট, কোন সমিতি একলিপি বিস্তারের জন্য ব্যগ্র, কোন সমিতি নীচ জাতীয় লোকদিগের উন্নয়নের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। কোম সমিতি বিবাহে পণ প্রথা রহিত করিবার জন্য স্বর্গ মর্ত্ত্য এক করিতেছেন; কোন সমিতি আয়ুর্ব্বেদ বিস্তারের জন্য ব্যস্ত; কোন সমিতি বা সাহিত্যের দুঃখে নয়ন নীর ফেলিতেছেন; কোন সমিতি বা শিল্পোন্নতির জন্য ব্যগ্র; কেহবা শিক্ষা বিস্তারের পথের পথিক, মোট কথা আমাদের যেন একটা ছট্‌ফটানি ধরিয়াছে, আমরা যেন পথ খুঁজিয়া পাইতেছি না, কোন পথ ধরিলে দেশের প্রকৃত হিত সাধন করা হইবে তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না, কাজেই অগণন শত শত সমিতি সঙ্ঘ গঠিত হইতেছে, কত গলাবাজী হইতেছে, কত মন্তব্য লিপিবদ্ধ হইতেছে।

কিন্তু নিয়তির এমনই উপহাস, বিধাতার এমনই বিধান যে উন্নতির মার্গ হইতে আমরা যেন দিন দিন দূরে গিয়া পড়িতেছি বনজঙ্গল অপসারিত হইয়া নূতন নগরের নির্ম্মাণ, রেল বিস্তার, মোটর গাড়ীর বাহুল্য, বৈদ্যুতিক আলোক, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, মুষ্টিমেয় জনপদে পরিষ্কৃত জল সরবরাহের ব্যবস্থা, দুই চারিটা গগনস্পর্শী অট্টালিকায় চিকিৎসালয় স্থাপন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বর্দ্ধিত করণ, লাট সভার সম্ভাষণ ইত্যাদিকে যদি উন্নতির মাপকাটি বলা যায় তাহা হইলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে বাস্তবিক আমরা দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছি। কিন্তু দারুণ সত্যকে লুকায়িত করিয়া বলিলে ত চলিবে না, যে ইহাই প্রকৃত উন্নতি এই অভিধানের যোগ্য। বলুন দেখি, সুস্থ শরীর ও সচ্ছন্দ চিত্ত এই যদি যাবতীয় উন্নতি বিধানের লক্ষীভূত হয়, তাহা হইলে ভারত দিন দিন উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতেছে কি না। জগতে সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলে শারীরিক সুস্থতা যে একান্ত প্রয়োজনীয় তাহা কে অস্বীকার করিবে? শরীর সুস্থ না

থাকিলে কোন বিষয়ে উন্নতি লাভ যে অসম্ভব, উন্নতি প্রয়াসী আমরা আমাদের সর্ব্বদা ইহা স্মরণপথে পতিত হয় কই!

আমরা উন্নতি উন্নতি বলিয়া চীৎকার করিতেছি, কিন্তু দেশের স্বাস্থ্য যে দিন দিন হীন হইতে হীনতর হইতেছে তৎপ্রতি যে মুদ্রিত নেত্র; দেশে ব্যাধির প্রাবল্য যে দিন দিন অধিক হইতেছে তাহার প্রতিকারের জন্য বদ্ধ পরিকর হইতেছি কই? দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে হইলে পল্লীগ্রামের দুর্দ্দশা সর্ব্বাগ্রে ঘুচাইবার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে হইবে। পল্লীগ্রামের অবস্থা যে দিন দিন শোচনীয় হইতেছে তাহা দেখিয়া আমাদের হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে কই?

আগে দেশের লোক শারীরিক সুস্থতা লাভ করুক তাহার পর শিক্ষা বিস্তার রাজনৈতিক অধিকার লাভ, সৈন্য শ্রেণী ভুক্ত হওয়া, ইত্যাদি বিষয়ে মনোনিবেশ করিবে। যাহাতে দেশের লোক সুস্থ শরীর ও সচ্ছন্দচিত্ত হইতে পারে তাহার জন্য আমাদের সকল চেষ্টা সকল উদ্যমকে একমুখী করাই আমাদের এখন প্রধান কর্ত্তব্য।

বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী

৪। ভারতে অশিক্ষিতের সংখ্যা

অনেকের ধারণা, শিক্ষা বিষয়ে রুসিয়া পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত দেশ অপেক্ষা বহু পশ্চাতে অবস্থিত। শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশ সকল জগতে যেরূপ খ্যাতি ও প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, রুসিয়া তদ্রূপ করে নাই। রুসিয়ার মত প্রকাণ্ড দেশ ঐ সকল ক্ষুদ্র দেশের সমকক্ষ হইতে পারে নাই বলিয়া লোকের ঐরূপ ধারণা হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু রুসিয়ার অশিক্ষিতের সংখ্যা ভারতের অশিক্ষিতের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক অল্প। গত ১৮৪০ অব্দে ইউরোপীয় রুসিয়ায় শতকরা ৯৮ জন লোক অশিক্ষিত ছিল। ৩০ বৎসর পরে ১৮৭০ অব্দে প্রকাশ পায়, রুসিয়ায় শতকরা ৮৫ জন লোক অশিক্ষিত। গত ১৯০০ অব্দের হিসাবে প্রকাশ পাইয়াছে, ঐ দেশে শতকরা ৭৮ জন লোক অশিক্ষিত। এসিয়াস্থ রুসিয়ায় শতকরা প্রায় ৮৭ জন লোক অশিক্ষিত। ভারতের অবস্থা ইহাপেক্ষা অত্যন্ত শোচনীয়। গত ১৯০১ সালের হিসাবে প্রকাশ পাইয়াছে যে, ভারতে শতকরা প্রায় ৯২ জন লোক অশিক্ষিত। যে দেশের লোকশিক্ষার অবস্থা এই প্রকার, সে দেশ হইতে শিল্প বাণিজ্য সম্বন্ধে উন্নতির কি আশা করা যাইতে পারে? শিক্ষার অভাবেই ভারতবাসী এই সকল বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছে না।

গত ১৮৭০ অব্দে ভারতে ১৬ হাজার ৪ শত বিদ্যালয়ে ৬ লক্ষ ১৭ জন ছাত্র পাঠাভ্যাস করিত। ১৮৮১ অব্দে ঐ সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া ৮৩ হাজার বিদ্যালয়ে ও ২০ লক্ষ ৬১ হাজার ছাত্রে দাঁড়ায়। ১৯০৭ সালের হিসাবে দেখা যায় যে ভারতে ৫৩ লক্ষ ৮৮ হাজার ৬ শত ৩২টি ছাত্র পাঠাভ্যাস করে। ১৯১২ অব্দে ঐ সংখ্যার বৃদ্ধি হইয়া ৬৭ লক্ষ ৮০ হাজার ৭ শত ২১ দাঁড়াইয়াছে। শিক্ষা বিষয়ে ইহা ক্রমোন্নতির পরিচায়ক বটে, কিন্তু ভারতের লোক সংখ্যার তুলনায় এই সংখ্যা নগণ্য মাত্র। যে দেশে ত্রিশ কোটি লোকের বাস, সেই দেশের মাত্র ৬৮ লক্ষ লোক লেখাপড়া করে। ইহা যেমন লজ্জাকর, তেমনি হাস্যজনক।

লর্ড লরেন্স বলিয়াছিলেন, "Among all the sources of difficulties in our administration and of possible danger to the stability of our government, there are few so serious as the ignorance of the people." ভারতবাসীর অশিক্ষিতাবস্থা যে কেবল তাহাদেরই কষ্টপ্রদ ও উন্নতির অন্তরায় তাহা নহে, উহা গবর্ণমেণ্টেরও ভবিষ্যৎ আশঙ্কার বিষয়। সুতরাং এ দেশের শিক্ষা প্রচারে গবর্ণমেণ্টের আরও অধিক আগ্রহশীল ও যত্নবান হওয়া আবশ্যক।

পল্লীবার্ত্তা

৫। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন

গত দুই বৎসর যাবৎ বঙ্গীয় সাহিত্য-

সম্মিলনকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কয়েকটী বিশেষজ্ঞের আড্ডায় পরিণত করা হইয়াছে। উদ্দেশ্য—এই সকল আড্ডায় বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ তিন দিন বিশেষজ্ঞগণ স্ব স্ব কণ্ঠশক্তির আখড়াই দিতে পারেন। বিশেষজ্ঞগণ যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন—অবিশেষজ্ঞ আমরা তাহাতে কোনও আপত্তি করি না। কিন্তু তাঁহারা যে পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাইবেন ইহা আমরা কোনও মতে সহ্য করিতে পারিব না। বিশেষজ্ঞগণের সম্মিলনের দরকার হইয়া থাকিলে তাঁহারা অন্য সময়ে ও নিজ নিজ ব্যয়ে তাহা করিতে পারেন—যাঁহাদের ইচ্ছা হয় তাঁহারাও সাহায্য করিতে পারেন। কিন্তু সরল বিশ্বাস লোকদের চক্ষে ধুলা দিয়া তাঁহারা নিজেদের মতলব হাসিল করিয়া লইবেন কেন?

বিশেষজ্ঞদের আলোচনায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের লাভ কি? দেশের লোক শতকরা নিরানব্বই জনই অশিক্ষিত,—যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদেরও অধিকাংশই মধ্যশিক্ষিত ও নিম্নশিক্ষিতের দল। বিশেষজ্ঞগণ সাধারণতঃ যে ভাষায় কথা বার্ত্তা বলিয়া থাকেন, মধ্যশিক্ষিত ও নিম্নশিক্ষিত লোকের তো দূরের কথা, অবিশেষজ্ঞ বি, এ, এম, এ, পাশওয়ালারাও তাহা বুঝিতে পারেন না। তবে এজন্য সর্ব্বসাধারণের কাণমলিয়া টাকা আদায় করা কেন? বিশেষজ্ঞগণ কি মনে করেন আমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যাহা রোজগার করি, তাহা কি তাঁহাদের শুধু ছিলি মিলি খেলিবারই জন্য? শুধু টাকা দিলেই কি অব্যাহতি আছে? একবার যেখানে একটা সাহিত্য-সম্মিলন হইয়া গিয়াছে, সেখানকার লোকেরাই অম্লানবদনে সাক্ষ্য দিবে তাহাদের বুকের উপর দিয়া কি ঝড়টাই না বহিয়া গিয়াছে। আহার নাই, নিদ্রা নাই—সর্ব্বদাই গললগ্নী কৃতবাসে কর্ত্তাদের নিকট দাঁড়াইয়া থাকি—তবু কর্ত্তাদের চোখ রাঙানীর অন্ত নাই; পান থেকে চুণ খসিলেই একেবারে প্রলয় উপস্থিত। সাহিত্য-সম্মিলনে আসিয়া অনেকেই মনে করেন যে অভ্যর্থনা-কারীদের সহিত তাঁহাদের কোনও নিকট সম্বন্ধ আছে। এত অত্যাচার, এত অসুবিধা, এত অর্থব্যয় সহ্য করি কেন? কর্ত্তারা হয়ত মনে করিতে পারেন যে, পূর্ব্বজন্মে তাঁহাদের নিকট আমরা ঋণী ছিলাম—ইহজন্মে তাহাই পরিশোধ করিতেছি। আহ্বানকারীদের ধারণা কিন্তু অন্যরূপ। তাঁহারা মনে করেন যে বাঙ্গালা দেশে শিক্ষিত বলিতে যাহা বুঝায়, তাঁহাদের একত্র সম্মিলনে, তাঁহাদের দৃষ্টান্তে, তাঁহাদের কথা বার্ত্তায় লোকের হৃদয়ে সাহিত্য পিপাসার উদয় হয়। প্রত্যুত, ইহাও দেখা গিয়াছে যে যেখানেই সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছে, সেখানেই সাহিত্য চর্চ্চার একটী কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, অধিকসংখ্যক লোক সাহিত্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই লাভটুকু হওয়াতেই সম্মিলনের সার্থকতা—আর আহ্বানকারীদের অর্থব্যয় ও অক্লান্ত পরিশ্রমের সাফল্য। কিন্তু সম্মিলনকে যদি এখন হইতে বিশেষজ্ঞগণের রণভূমিতে পরিণত করা হয়, তবে আমরা অবিশেষজ্ঞগণ উহার জন্য এত করিব কেন? আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে নিজের গ্রামে, এমন কি নিজের বংশে কি ঘটিয়াছে তাহারই কোনও খবর রাখে না—তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে কামস্কাট্কা বা হনোলুলু দ্বীপে কি হইয়াছিল তাহার খবরে তাহার প্রয়োজন কি? আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে বাতুলতাই প্রকটিত হয়। মনে রাখা উচিত বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন কখনই কয়েকজন তথাকথিত বিশেষজ্ঞের হক্ দখলি কায়েমী মৌরসী সম্পত্তি নহে যে তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবেন, আর আমরা ভেড়ার পালের মত তাঁহাদের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া স্ব স্ব অদৃষ্টকে ধিক্কার দিব। সাহিত্য-সম্মিলন দেশের,—সমাজের,—জনসাধারণের,—শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের। সুতরাং যাহাতে সর্ব্বসাধারণের কল্যাণ সাধিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত তাহা না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের সাহিত্যচর্চ্চা পণ্ডশ্রমেই পরিণত হইবে।

"চাহ, চাহ, মতিমান, দেখ দেখি বিশাল জগতে,
মানবের কর্ম্মধারা কত দিকে আবর্ত্তিয়া ধায়!
কত সাধ কত আশা জেগে ওঠে সাধিতে কল্যাণ!
মানুষের শক্তি লয়ে কীটসম ব্যর্থ কর তারে?
বিধাতার পুণ্যদান—দলমল হিয়া-শতদল
গন্ধ চাহে বিতরিতে, তুমি তার রুধিবে দুয়ার?
একি—একি অপমান মনুষ্যত্বে হান অবিরত!
ভুলে যাও বর্ত্তমানে, ভেঙ্গে ফেল জড়তা-শিকল
দূর ভবিষ্যতে চাহি'। ভাসে ধরা আলোক-বন্যায়
দুয়ারে পাখার মত, আজি তোমা ডাকি প্রাণপণে,
বাহির হবে না তুমি?"

সপ্তম খণ্ড
সপ্তম বর্ষ

চৈত্র, ১৩২২

ষষ্ঠ সংখ্যা

আলোচনা

১। জাতীয়তায় বিশ্বাস

আমরা কি সঙ্কটেই এখন পড়িয়াছি। প্রাণ ধরিয়া যে কাহাকে বিশ্বাস করিব, তাহার উপায় পর্য্যন্ত নাই। এখন ছেলে বাপকে, বাপ ছেলেকে, ভাই ভাইকে, বিশ্বাস করে না। প্রতিবাসীরা পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস হারাইয়াছে। এখন এক বর্ণের উপর আর এক বর্ণের বিশ্বাস নাই। এক জাতির উপর আর এক জাতির বিশ্বাস নাই। কি ভয়ানক সন্দেহের যুগই না এখন চলিতেছে!

কোন্ শিক্ষার দোষে, কোন্ অভাবের তাড়নায়, কোন্ আদর্শের পার্থক্যে, কোন্ স্বার্থপরতার বিষে এমন হইল, তাহা বিচার করিবার দরকার নাই। তবে সমাজের কর্ম্মশক্তি যে ইহাতে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে ইহা নিশ্চিত।

অনেক সময় দেখা যায় আদর্শ যেখানে এক, স্বার্থের কেন্দ্র যেখানে এক, পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস সেখানে অটল হয়। কিন্তু এ হতভাগ্য দেশে সেরূপ স্থলেও বিশ্বাস বড় একটা দেখা যায় না। যদি যাইত, তবে অনেকগুলি কারবার আজ ফেল মারিত না।

ফল কথা, গৃহেই হৌক, বাহিরেই হৌক, এক আদর্শ অনুসারে দলবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে গেলে, যতটুকু বুদ্ধি, যতটুকু জ্ঞান, যতটুকু ধীরতা, যতটুকু সাহসিকতা, যতটুকু উদারতা আবশ্যক, ততটুকু আমাদের নাই। তাই আমরা ঘরে বাহিরে সন্দেহের জালে জড়াইয়া মরিতেছি। তাই আমরা এখন মিত্রকে শত্রু মনে করিতেছি—শত্রুকে মিত্র মনে করিতেছি। আমাদের এই দারুণ অবস্থার কতকটা চিত্র ইবসেন তাঁহার An Enemy of society নাটকে প্রদান করিয়াছেন। তিনি সেখানে দেখাইয়াছেন সমাজের যে প্রকৃত হিতৈষী, সেই-ই অশিক্ষা ও সন্দেহের যুগে সমাজের শত্রু বলিয়াই লাঞ্ছিত হয়।

কথায় কথায় আমরা হীন স্বার্থপরতাকে বড় করিয়া তুলি, কথায় কথায় আমাদের নানা রকমের মারাত্মক খেয়াল জাগিয়া উঠে, কথায় কথায় আমরা নিজের বুদ্ধিকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিয়া হঠকারিতার পরিচয় দেই।—এত গলদ থাকিলে কি কখনও মঙ্গলের মুখ দেখা যায়? এই সব গলদের জন্যই ত আদর্শের উপরেও আমাদের গভীর শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে না। কারণ সেরূপ শ্রদ্ধা বিপুল চারিত্র বলেরই পরিচায়ক। সে বল আমাদের নাই।

কিন্তু কোথায় সেই নেতা যিনি তাঁহার চরিত্রের সবলতায় আমাদের চরিত্র সবল করিয়া তুলিবেন, যিনি ত্যাগের ধ্বজা দেখাইয়া হীন স্বার্থের দিক হইতে উদারতার দিকে আমাদের মুখ ফিরাইয়া দিবেন, যিনি আমাদের চাঞ্চল্য দূর করিয়া ধীরতার শান্তি প্রদান করিবেন, যিনি উপায় অপেক্ষা উপেয়ের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জাগাইয়া দিবেন, যিনি আমাদের সম্মুখে মঙ্গলময় আদর্শের ঐক্য স্থাপন করিয়া পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস ও প্রীতির ধারা সঞ্চারিত করিবেন?

যিনি "স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি" ফিরাইয়া আনিয়া আমাদের জাতিকে, আমাদের সমাজকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবেন, তিনি এখনও বোধ হয় জন্মগ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার জন্ম ত আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত ভাবে হইতে পারে না। মানুষের যুগোপযোগী আকাঙ্ক্ষা এবং সাধন প্রয়াসেই তাঁহার জন্ম প্রদান করিবে। তাই আজ এই সন্দেহের যুগে—এই মায়া কুহেলিকার ভোরে, তাঁহারই জন্মক্ষেত্র রচনায় আমরা যেন ব্যক্তিগত ভাবে যতটুকু সম্ভব ততটুকু প্রয়াস দেখাইতে বিরত না হই। আমরা যেন আমাদের জড়তা, আমাদের ভুলভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়াও তাহা সংশোধনে শৈথিল্য প্রকাশ না করি। প্রেমের পথে, বিশ্বাসের পথে অগ্রসর না হইলে কর্ম্মের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না, অন্ততঃ পক্ষে এ বোধটাও যেন আমাদের অন্তর হইতে অপসৃত হইয়া না যায়!

২। বিদ্যালয়ে বিপ্লব

প্রেসিডেন্সী কলেজের কয়েকজন অজ্ঞাতনামা ছাত্র একজন ইংরাজ অধ্যাপককে প্রহার করিয়াছে তজ্জন্য সমগ্র বিদ্যালয় অসময়ে বন্ধ করা হইয়াছে। সংবাদপত্রে

প্রকাশ যে উক্ত অধ্যাপক ছাত্রগণকে নানা-রূপ অপমান করিয়াছিলেন। ঘটনাটী সকলের নিকটই সুপরিচিত। দেশের সংবাদপত্রে, সভাসমিতিতে এই বিষয় লইয়া বহু আলোচনা, বাগবিতণ্ডা চলিয়াছে। কেহ অধ্যাপক মহাশয়কে নির্দোষ প্রমাণ করিয়া ছাত্রগণের শাসনের ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত; কেহ বা ছাত্রগণের দোষ স্খালনে প্রয়াসী। সকলেই স্বীকার করেন যে ঘটনাটী অতিশয় গুরুতর ও ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে এরূপ বিপরীত সম্বন্ধের সংঘটন অতিশয় দুঃখের বিষয়। আমরাও এ বিষয়ে অন্যান্য সহযোগীবৃন্দের সহিত একমত পোষণ করি।

এই ব্যাপারটী কাহার দোষে ঘটিয়াছে তাহা নিরূপণ করিবার জন্য একটী অনুসন্ধান কমিটির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। অনুসন্ধানের ফলে দোষের দায়িত্ব যাহার উপরই পড়ুক না কেন, ছাত্র শিক্ষকের এরূপ সংঘর্ষ যে দৈবাৎ ঘটে নাই তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। এই বিবাদের মূলে আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপ্রণালীর প্রকৃতিগত অসম্পূর্ণতা ও একদেশদর্শিতা বিদ্যমান রহিয়াছে। শিক্ষা ব্যাপারটী ব্যক্তিত্বের সামগ্র্য ও বৃদ্ধি সম্পাদনের উপায় মাত্র। যদি জীবনের প্রতি অংশে শিক্ষার প্রভাব বিস্তৃত না হয়, যদি শিক্ষা over specialisation বা পল্লব গ্রাহিতার জন্য একটী বহিরঙ্গ ব্যাপারে পরিণত হয় তবে শিক্ষার স্থূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই শিক্ষাকে জীবন প্রসারণের পন্থা না মনে করিয়া জীবনধারণের উপায় মনে করেন। জীবন সম্প্রসারণ ও জীবন ধারণের প্রচেষ্টায় একটী মূলগত পার্থক্য আছে। প্রসারণের উপায় culture। cultureএর মধ্যে ব্যক্তিগত বিরোধ নাই। Culture মানবাত্মার ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের বেদী। পক্ষান্তরে জীবন রক্ষা ও জীবনধারণের মূলেই বিরোধ। এই বিরোধের কথঞ্চিৎ শান্তি না হইলে কখনই cultureএর উৎপত্তি হইতে পারে না। এইরূপ ক্ষেত্রে যদি শিক্ষক ও ছাত্র শিক্ষাকে একদেশদর্শী করিয়া তোলেন, বিদ্যালয়কে যদি জীবনোপায়ের সাধন বলিয়া মনে করেন তবে তাঁহাদের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। স্বার্থে সঙ্কোচের সম্ভাবনা উপস্থিত হইলেই গুরু শিষ্য পরস্পর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিবেন। ছাত্র জানেন যে শিক্ষক তাহার জীবনের একটী অংশের অভাব পূরণ করিতেছেন। সমগ্র জীবনের উৎকর্ষ সাধনে তাঁহার কোনই হাত নাই। শিক্ষকও জানেন যে তিনি cultureএর জন্য খাটিতেছেন না, বেতনের জন্য খাটিতেছেন। কাজেই শিক্ষাকার্য্যের সহিত তাঁহার জীবনের এক অংশের মাত্র সম্বন্ধ। সুতরাং ছাত্র ও শিক্ষক দুই জনেই দুই জনের নিকট হইতে জীবনের একটা অংশ ঢাকিয়া রাখিতে ও রক্ষা করিতে ব্যস্ত। যখনই একজন স্বীয় নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া কক্ষান্তরে পদক্ষেপ করিবেন তখনই বিরোধের ভেরী বাজিয়া উঠিবে। এই বিরোধের নিরাকরণ কেবল একজন ছাত্র বা শিক্ষকের শাস্তি হইলেই হইবে না; সমগ্র শিক্ষা-প্রণালীর আদর্শ পরিবর্ত্তনই বিদ্যালয়ের বিপ্লব শান্তির উপায়। শিক্ষাকে যদি জীবনের মূলগত না করা হয় গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ যদি দুই জনের জীবনের অন্তরঙ্গ না হয় তবে এই বিরোধ চিরস্থায়ী হইবে।

* *
*

৩। ব্যর্গসঁ ও হাস্যতত্ত্ব

ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁ হাস্যরসের এক নূতন তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। এটী তাঁহার দার্শনিক মতবাদের প্রয়োগ বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

ব্যর্গসঁর মতে জগতের সারই হইতেছে জীবন-প্রবাহ। এই স্রোতই বিশ্বের তত্ত্ব বা reality. জীবন কেবল প্রবাহ মাত্র। ইহার মূলে কোনও অপরিবর্ত্তনীয় পদার্থ নাই; ইহার প্রকৃতিই পরিবর্ত্তন, প্রবাহ বা সৃষ্টি। জীবনের মধ্যে পুনরাবৃত্তি নাই, অংশ নাই। কারণ প্রবাহের আবার অংশ থাকিবে কি করিয়া? কাজেই জীবনের সহিত যন্ত্রের একটা প্রকৃতিগত পার্থক্য। যন্ত্রে একই কার্য্য পুনঃ পুনঃ সাধিত হয়, জীবনে কখনই কার্য্যের পুনরাবৃত্তি ঘটে না।

এই জীবনস্রোত জড়পদার্থের মধ্য দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। জড়পদার্থকে প্রতি-নিয়তই প্রতিনিয়ত জীবন-গতির যন্ত্র করিয়া জগতে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিতেছে। অনেক সময়ে আবার প্রবাহের চাঞ্চল্য জড়ের চাপে জমিয়া উঠিতেছে ও জীবন জড়তা প্রাপ্ত হইতেছে। সে সকল স্থানে জীব ও যন্ত্রের পার্থক্য অল্প হইতে অল্পতর হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু মানুষের শরীরেই জীবন স্ব স্বভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে। প্রবাহপ্রবণতা, চাঞ্চল্য, নূতন সৃষ্টি, নিরন্তর পরিবর্ত্তন—এসব মানব জীবনেই পরিলক্ষিত হয়। একটী পশুর ইন্দ্রিয়গ্রামের সহিত বাহ্য জগতের সংস্পর্শ হইলে পশু প্রায় যন্ত্রের মতনই ব্যবহার করে। বাহ্য অর্থ সমূহ যদি এক প্রকার হয় তবে পশুর প্রতিঘাত (reaction) ও একই প্রকার হইবে। কিন্তু মানুষের পক্ষে একথা খাটে না। বাহ্য অর্থ এক প্রকার হইলেও প্রতিঘাত (reaction) প্রতিবারই নূতন হইবে। এই জন্য মানুষকে একটা Centre of indetermination বলা হইয়াছে।

মানুষ যদি স্ব স্বভাব হারাইয়া যন্ত্রের ন্যায় ব্যবহার করে তবেই সে বিদ্রূপভাজন হয়। হাস্যসমাজের এই শাসনবাক্য প্রচার করে। কাজেই ব্যর্গসঁর মতে হাস্যের মধ্যে প্রীতিসূচক ভাব অতি অল্পই আছে। ব্যক্তি বিশেষ নিজের প্রকৃতি হারাইয়া বিসদৃশ ব্যবহার করে, দশ জন তাহাতে তাহার জীবন গতির বিফলতা অনুভব করিয়া হাসিয়া ওঠে। এ হাসি ব্যর্থতার উপর বিদ্রূপ এবং অনেক স্থানেই নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক। বার্গসঁ বলেন,—"Laughter cannot be absolutely just. Nor should it be kind-hearted either. Its function is to intimidate by humiliating.

৪। রঙ্গমঞ্চ ও সামাজিক জীবন

সমাজের সমবেত রসবোধ ব্যক্তিবিশেষের ভাবরাজ্যে তৃপ্তিলাভ করে বলিয়াই ললিত কলার সহিত সামাজিক জীবনের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তাহা না হইলে রসসৃষ্টি ব্যক্তিবিশেষের স্বপ্নের মত তুচ্ছ ও অর্থশূন্য হইত। কেবল তাহাই নহে। কলাবিৎ যদি সামাজিক জীবনের রসাধার হইতে তাঁহার কলারস সঞ্চয় না করেন, যদি তিনি নিজেকে তাঁহার চারিধারের জীবনপ্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলেন তবে তাঁহার ভাবের ভাণ্ডার অতি শীঘ্রই শূন্য হইয়া যায়। অবশ্য সামাজিক জীবনের সঙ্গে কবি বা

চিত্রকরের এই আদান প্রদান সকলের নিকট পরিস্ফুট না হইতে পারে, ব্যষ্টি ও সমষ্টির এই সম্বন্ধ অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত গূঢ়ভাবে বহিয়া চলিতে পারে, এবং সেজন্য কলাস্রষ্টক সমাজের রোষভাজন হইতে পারেন। কিন্তু সম্বন্ধটী নিত্য ও সততই বিরাজমান থাকা চাই।

যদি কলাসাধারণ সম্বন্ধে এইমত গ্রহণীয় হয় তবে দৃশ্যকাব্য সম্বন্ধে এটী বিশেষরূপে প্রযোজ্য। দৃশ্যকাব্যের বিষয় ও রস সম্ভোগ উভয়ই সামাজিক জীবনের উপর নির্ভর করে। কাব্যের বিষয়টী সামাজিক চরিত্র-চিত্রণ, বা সমাজের আদর্শ ব্যক্তি-চরিত্রের মধ্য দিয়া পরিস্ফুট করিয়া তোলা। মানব-চরিত্রে যে টুকু বিশ্বজনীনতা আছে তাহাই সামাজিক জীবনের ভাবরাজ্যের উৎস। এই ভাবরাজ্যকে বিশেষের মধ্য দিয়া পরিস্ফুট করিয়া তোলাই দৃশ্যকাব্যের কাজ। কাজেই যদি নাট্যকার তাঁহার চারিপাশের জীবন-স্রোতের সঙ্গে সম্বন্ধহীন হইয়া পড়েন তবে তাঁহার নাটকের প্রাণের উৎস শুকাইয়া যাইবে। অন্য দিক দিয়া দেখিতে গেলে নাটকের রসসম্ভোগ একটা সামাজিক ব্যাপার। একটী জনতার রসবোধ একত্র মিলিত হইয়া রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শিত চরিত্র-চিত্রণের মধ্যে আনন্দলাভ করে। যদি একটী বিমুখ জনতা দর্শকের পদে উপবিষ্ট থাকে তবে প্রয়োগ বিজ্ঞানের সহস্র চাতুরীও নাটকের মধ্যে জীবন আনয়ন করিতে পারে না। দৃশ্যকাব্য এইরূপে সমবেত ভাবে সম্ভোগ্য বলিয়াই জনতার চিন্তাস্রোতের সহিত রঙ্গমঞ্চের লাভালাভের একটা গূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে।

দৃশ্যকাব্য ও সমাজ-জীবনের মধ্যে আর একটা সম্বন্ধ আছে। প্রত্যেক নাটকেই একটা বাহ্যিক দৃশ্যের মধ্যে কল্পিত লীলার ক্রীড়া প্রদর্শিত হয়। কিন্তু এই বহিরঙ্গের সহিত লীলার অন্তরঙ্গের উপযুক্ত সম্বন্ধ কখনই সম্ভব নয়। এমন কি বাহ্য দৃশ্যটী পর্য্যন্ত স্বাভাবিক করিয়া তোলা দুঃসাধ্য। কাজেই দর্শক-জনতা যদি কল্পনা বলে প্রয়োগ বিজ্ঞানের এই অভাব পূরণ করিয়া না লয় এবং যদি স্বীয় রসবোধের বলে লীলার প্রাণমূলে প্রবেশ না করিতে পারে তবে দৃশ্য-কাব্য আনন্দ দান করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং সামাজিক প্রাণের সহিত রঙ্গমঞ্চের আদান প্রদান ও সহানুভূতি না থাকিলে ললিত-কলার অঙ্গহানি হয়।

৫। আমাদের দেশের ও পাশ্চাত্যের রঙ্গমঞ্চ

রঙ্গমঞ্চের সহিত সমাজের এই নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে বলিয়াই আমাদের দেশে প্রয়োগ-বিজ্ঞান আজকাল হতাদর হইয়া পড়িয়াছে। আমরা অভিনয় ব্যাপারটীকে যাহারা সমাজের "একঘরে" তাহাদের হস্তেই সমর্পণ করিয়াছি। কাজেই যে সকল উচ্চভাব সামাজিক জীবনকে তরঙ্গায়িত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, সেগুলি সহজে এই "একঘরে" রঙ্গমঞ্চকে স্পর্শ করিতে পারে না। আমরা যেমন শিল্প গুলিকে অশিক্ষিত শিল্পকারগণের হস্তে ছাড়িয়া দিয়া সে গুলির উৎকর্ষসাধনের পথ বন্ধ করিয়াছি, যেমন নৃত্যকলা ঘৃণিত চরিত্রের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া নৃত্যমাত্রকেই ঘৃণ্য করিয়া তুলিয়াছি, অভিনয় বিদ্যাকেও সেইরূপ চরিত্রহীন স্ত্রীপুরুষদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া দিয়াছি। কাজেই এক-

দিকে যেমন অভিনয় বিদ্যার উন্নতির পথ রোধ হইয়াছে, অপর দিকে আবার দৃশ্য-কাব্য মাত্রই সমাজের নীতিপরায়ণ ব্যক্তি-গণের নিকট ঘৃণার বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। ফল স্বরূপ ললিতকলা আমাদের দেশে কেবল আমোদলিপ্সা পরিতৃপ্তির উপায় মাত্র হইয়া উঠিয়াছে।

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য দেশে সমাজের উপর রঙ্গমঞ্চের প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। কালিদাসের যুগে যেমন আমাদের দেশে নৃপতি বৃন্দই রঙ্গমঞ্চের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, জনসাধা-রণের জীবনের সঙ্গে তাহার একটা বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না, কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে ইউরোপেও থিয়েটার সেইরূপ অভিজাত সহানুভূতি পরিপুষ্ট ছিল। কিন্তু এই কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই Royal Theatre People's Theatreএ পরিণত হইয়াছে। আজ ইউরোপের Theatre জনসাধারণের সহানু-ভূতি ও পৃষ্ঠপোষণের উপরই নির্ভর করে। অভিনয় বিদ্যা সমাজে একটা আদরণীয় বিদ্যা-রূপে পরিগণিত হয়। অভিনেতা ও অভি-নেত্রী বৃন্দ অনেক সময় উচ্চবংশ সমুদ্ভূত ও উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত। আমাদের দেশে অভিনেতা ও অভিনেত্রীবৃন্দের যেরূপ বিসদৃশ ও জঘন্য সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয় পাশ্চাত্য রঙ্গমঞ্চে ইহার বিপরীত ভাবই বিদ্যমান। Sir Johnston Forbes Robertson নিজের পত্নীর সহিত একত্র অভিনয় করেন। Sir Beerbohm Freeর কন্যা আজকাল Londonএর রঙ্গ-মঞ্চের একজন উদীয়মানা অভিনেত্রী বলিয়া বিবেচিত হন। এইজন্যই Theatreএর জীবনের স্বাধীনতা সত্ত্বেও উচ্ছৃঙ্খলতা সেখানে স্থান পায় না। কাজেই রঙ্গমঞ্চের জীবনের সহিত জনতার জীবনের একটা ব্যবধান নাই। ফলস্বরূপ নাট্যকলা সামাজিক জীবনের অন্তরঙ্গ বলিয়া গণিত হয়।

এই জন্যই দেখিতে পাই যে সমাজে যখনই নূতন ভাব সৃষ্টির দরকার হয় তখনই তাহা মূর্ত্ত হইয়া রঙ্গমঞ্চে স্থান পায়। আমেরিকায় আজকালকার রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক নাটকগুলির বিষয় আলোচনা করিলেই এই বিষয় বোধগম্য হয়। ইংলণ্ডে বার্ণার্ডশ নিজের সামাজিক মতগুলি রঙ্গ-মঞ্চেই প্রচার করিতেছেন ও Shavian Schoolএর প্রচারক অভিনেতা ও অভিনেত্রী-বৃন্দ। জন গলস্ওয়ারদীর দরিদ্র জীবনের করুণ রসাত্মক নাটকাগুলি সমাজের দৃষ্টির সমক্ষে দীন দরিদ্রের ভাবের গভীরতা ও হৃদ-য়ের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছে। লেডী গ্রীগরীর Irish plays একটা অত্যাচার পীড়িত জাতির প্রাণের বেদনা, তাহাদের করুণ রসিকতা এবং শত তুচ্ছতার মধ্যে তাহাদের জাতীয় জীবনের মহত্ত্বের কাহিনী জগতের সমক্ষে বর্ণনা করিয়াছে।

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে Stage thought-movement প্রচারের মিশনারী। সমাজ জীবন এই চিন্তাস্রোতের মধ্য দিয়াই বিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। কাজেই রঙ্গমঞ্চ সামাজিক বিবর্ত্তনকে কিরূপ ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে তাহা সহজেই বুঝা যায়।

আজ আমাদের জাতীয় জীবনে ভাব-স্রোত ও চিন্তাস্রোত বহুমুখী হইয়া ছুটিয়াছে। এ সকলকে যদি মূর্ত্তিপ্রদান করিতে হয়, যদি আমাদের জীবনের কাহিনী জগতের সমক্ষে প্রচার করিতে হয় তবে আমাদিগকে অবশ্যই নাটকের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। কেবল এই দেশেই নয় পৃথিবীময় আমাদের

বার্ত্তা আমাদের চিন্তাকে অঙ্গপ্রদান করিয়া রঙ্গমঞ্চে স্থাপন করিতে হইবে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আমাদের দেশে থিয়েটারের সহিত সমাজের যে বিরুদ্ধভাব দৃষ্ট হয় তাহার সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে। তাহার উপায় প্রথমতঃ শিক্ষিত ও চরিত্রবান্ ব্যক্তিগণের অভিনয়বৃত্তি অবলম্বন; দ্বিতীয়তঃ সমাজের "থিয়েটারাতঙ্ক" গ্রস্ত নীতিবিৎগণের কুসংস্কার মোচন।

* *
*

৬। চরিত্র গঠনের উপায়

মানব চরিত্র দুইটী চঞ্চল দোলার উপর দুই পা রাখিয়া অনবরত দুলিতেছে। কখন কাহার পতন কোন দিকে হইবে, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। আমরা যাহাকে পাপ বলি আমাদের জ্ঞানোন্মেষ হইতে যাহাকে ঘৃণা করি সেই দুশ্চারিত্র্যই যে পতনের একমাত্র কারণ তাহাই নহে। অনেক লোক আছেন যাঁহারা অনায়াসে উক্ত দুশ্চারিত্র্যের হাত এড়াইয়া অতিমাত্রায় যশঃ ও সম্মান লাভের জন্য ঘোর পঙ্কে পতিত হইতেছেন। সাধারণের নিকট তিনি জিতেন্দ্রিয় পুরুষ বলিয়া পরিচিত কিন্তু অপরিমিত যশঃ, অতুল সম্মানের জন্য নিজ মনুষ্যত্ব বিক্রয় করিতেছেন, দেব চরিত্রকে কলঙ্কিত করিতেছেন। স্বার্থ, দম্ভ যাহা কিছু নীচ, যাহা পরিত্যজ্য সকলগুলিই তাঁহার আশ্রয় হয়। চরিত্রবান্ ব্যক্তি একদিকে যেমন কামিনী কাঞ্চনের আসক্তি হইতে দূরে থাকেন, অন্যদিকে সম্মান, যশঃ কেও ঠেলিয়া দেন। মানুষমাত্রেই সম্মান ও যশের জন্য লালায়িত। এই যশঃ অর্জ্জন করিয়া মানুষ দেবত্বের সিংহাসন স্পর্শ করিতে পারে। কিন্তু নিজের ক্ষমতা, নিজের সামর্থ্য, ধরিয়া রাখিবার শক্তি চাই। একটু টান পড়িলেই সব চূর্ণ হইয়া যায়। কর্ম্মের প্রারম্ভেই যশের আকাঙ্ক্ষা জন্মে চরিত্রবান্ ব্যক্তি ব্যক্তিগত সমালোচনা বা সামাজিক খ্যাতি অখ্যাতির ধার ধারেন না। যাহাকে কিছু করিতে হইবে, তাঁহার নিকট অনেক সময় এমন সমস্যা দাঁড়ায় যেখানে সম্মান ও যশের পরিবর্ত্তে রাশি রাশি কালিমা আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে।

আদর্শ মানব চরিত্র খোঁজ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় মানব চরিত্রে প্রকৃত দেবত্ব কোন স্থানে লুক্কায়িত আছে, কোন শক্তিবলে রাশি রাশি সম্মান ও স্তূপীকৃত যশের উপর দৈন্যের ঔজ্জ্বল্য বিকশিত হইতেছে। মানব চরিত্রে নির্লিপ্ততাই সেই দেবত্ব, সেই শক্তি। নির্লিপ্ততাতেই পরম সুখ। যেখানে কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই ফলাকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে, সেইখানেই চরিত্রের ভেজাল বাহির হইয়া পড়ে। যত দুঃখ, যত দৈন্য, যাহা কিছু মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রতিকূল তাহাই সেই সময় মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়ায়। কর্ম্মের সম্মান ও যশঃ কর্ম্মীমাত্রেরই প্রাপ্য। প্রকৃত যাহা ত্যাগ, যাহা সন্ন্যাস তাহা গৃহের ভিতরেই বিশেষ পরিস্ফুট হয়। গৃহে বসিয়া আপনার সম্মান ও যশাকাঙ্ক্ষাকে ক্ষুদ্র করিয়া নিজের পথে নিজে চলিতে থাকিয়া যখন আর হীন বাসনার লেশমাত্র থাকে না তখনই আত্মোন্নতি হয়, প্রকৃত সন্ন্যাস চরিত্রবানের চরিত্রবল তখনই বিকশিত হয়।

আমরা সকল সময় নিজেকে ঠিক রাখিতে পারি না, আদর্শ চরিত্রগুলি সময়মত সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় না তাহার কারণ আমরা সেই সকলকে জীবনের স্তরে স্তরে বিশ্লেষণ করি না, জীবনের সুদীর্ঘ পিচ্ছিল পথের একমাত্র আশ্রয় করিতে পারি না। মানব

জীবনের কর্ম্মের ফলাফলগুলি যতক্ষণ না ভগবানে অর্পিত হয় ততক্ষণ শাশ্বত আনন্দ চির প্রফুল্লতা ও পূর্ণশান্তি হৃদয়ে বিরাজ করে না। মানব চরিত্র যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় তখনই হীন ও পূজ্য, উচ্চ ও তুচ্ছ, ধনী ও নির্ধনকে একই মুহূর্ত্তে আপনার বাহুযুগল দ্বারা টানিয়া লয়। সমাজের দৈন্য-কালিমাকে আপনার চরিত্রের ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত করিয়া দেয়।

বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে করিতেই চরিত্রের দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায় এবং বৃদ্ধি পাইলেই কোন রকম বাধা বিঘ্ন আর গ্রাহ্য হয় না। আমাদের অসাড় সমাজ এখন নানা রকমে বিড়ম্বিত। তাই তাহার এখন সজীব হইবার বাসনা জাগিয়াছে। এখন সে চরিত্রবান পুরুষের আদর্শ দেখিতে চাহে। তাই ছাত্রদিগের চরিত্রগঠনোদ্দেশ্যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা তাহার আকাঙ্ক্ষার বস্তু হইয়াছে। সেইজন্যই আমরা নানাস্থানে এবম্বিধ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিতেছি। সম্প্রতি কাশীধামের অতি নিকটে শিওপুরে "শ্রীঅন্নপূর্ণা ঋষিকুল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার সাহায্য কল্পে কাশীর শ্রীঅন্নপূর্ণামঠের উদারচরিত্র মোহান্তজী তাঁহার বাগানের অধিকাংশ জমি ছাড়িয়া দিয়াছেন। তারপর অর্থ ও সদুপদেশ প্রভৃতি দানেও এই কার্য্যে বিশেষ রকমে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন।

* *
*

৭। আয়ুর্ব্বেদের সমাদর

অনেকদিন হইতে আমাদের দেশে বিলাতী ঔষধ প্রচলিত হইয়াছে। আমরা ঘরে ঘরে এখন বিলাতী ঔষধের ব্যবহার দেখিতে পাইতেছি। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত আমাদের রসায়নশাস্ত্র বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে আপনার দাতব্য দান করিতেছিল। তখন আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ আমাদের নিজস্ব ছিল। আমাদের দেশীয় পণ্ডিতগণ যে সময় তাঁহাদের জ্ঞান-ভাণ্ডারের শেষ কণিকা পর্য্যন্ত বিতরণ করিতেছিলেন, ইউরোপে তখনও রসায়ন শাস্ত্র প্রচলিত হয় নাই।

আধুনিক সময়ে ইউরোপীয় রসায়ন খুব উন্নত হউক, তাহা জগতের বিস্ময় উৎপাদন করুক, কিন্তু যাহা আমার নিজের নয় লক্ষাধিক বৎসর যাবৎ যাহার অন্তঃপ্রকৃতি আমার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত তাহাকে আপন করিতে যাইয়া, তাহার ভিতরে নিশ্চয়ই এমন কোন একটা মায়াবিনী শক্তির মোহে মুগ্ধ হইয়াছি, যাহা আমাদের নিজের জিনিষের গৌরব করিবার ক্ষমতাটুকু পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়াছে। আমরা দুইটী বিষয়ের জন্য বিলাতী ঔষধের পক্ষপাতী।

(১) উহার ব্যবহার প্রণালী সহজ। একবারের তৈয়ারী ঔষধ বারবার ব্যবহার করান যাইতে পারে। অর্থাৎ গৃহস্থকে কোন পরিশ্রম করিতে হয় না।

(২) উহার দ্বারা আশু ফললাভ হয় এবং দুর্ব্বলকে অতি সত্বর সবল করিতে বিলাতী ঔষধ খুবই উপকারী বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস।

কিন্তু এ ধারণাটীর ঠিক পোষকতা করা যায় না। আয়ুর্ব্বেদের ভাণ্ডারে এমন কোন ঔষধ নাই যাহার জন্য চিকিৎসা বিষয়ে তাহাকে মূক হইতে হইবে, এমন অনেক দেশীয় ঔষধ আছে যাহা ব্যবহারে মরণোন্মুখ ব্যক্তি আর একবার জীবনের আশা করিতে পারে। ব্যবহার করিতেই বা কে জানে। আমরা সে সুবিধা পাইয়াছি কৈ।

তারপর জ্বর প্রভৃতি রোগে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ না কি আশু ফলদায়ক নহে। কিন্তু উহারও এমন শক্তি আছে যাহা কুইনাইন মিকশ্চারকেও হারাইতে পারে। রোগী একবার ব্যারামের ঝোঁক সামলাইয়া দাঁড়াইতে পারিলে আয়ুর্ব্বেদ সমস্ত ভার আপন কাঁধে লইতে পারে। সে ঔষধ ব্যবহারে রোগী দীর্ঘকালের নিমিত্ত শান্তিভোগ করিতে পারে, তাহার শরীর ক্ষণিক একটা পুষ্টির পরিচয় না দিয়া ধীরে ধীরে আনন্দ লাভ করিতে থাকে।

বৌদ্ধযুগেই রসায়ন বিজ্ঞান চিকিৎসা প্রণালীর ভিতর দিয়া বিশেষ উন্নতি লাভ করে। বিশেষতঃ পণ্ডিত নাগার্জ্জুনের সময়ই রসায়নের প্রকৃত গৌরবময় যুগ। তাঁহার পারদ (Mercury) শোধন প্রণালী আজও কেহ বুঝিতে পারেন নাই। তিনি মৃত্যুকে পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে ক্রমে ক্রমে অনেকানেক পণ্ডিত চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। পালরাজগণের রাজত্বকালে চক্রপাণি এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বাগ্‌ভট, বৃন্দ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অন্যতম পুষ্টিকর্ত্তা। আয়ুর্ব্বেদ যে Perfect Science বা নিখুঁত বিজ্ঞান তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। আমরা সহজেই দেখিতে পাই বিলাতী ঔষধ বেশীদিনের পুরাতন হইলে অব্যবহার্য্য হয়। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধ পুরাতন হইলেই দর বাড়ে। তারল্য এবং কাঠিন্যই যদি উহাদের দোষ গুণের কারণ হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে দীর্ঘশত বৎসর তাঁহাদিগকে বিজ্ঞানাগারে বসিয়া পরীক্ষা করিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে বেঙ্গল কেমিক্যাল, ইণ্ডিয়ান্ কেমিক্যাল প্রভৃতি ঔষধালয় সমূহ বিলাতী ধরণে দেশীয় উপাদানে, দেশের জলবায়ুর উপযোগী ঔষধ প্রস্তুত করিতেছেন। ২।১ স্থানে আয়ুর্ব্বেদীয় মতে ঔষধ পরীক্ষা হইতেছে। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগৃহ বা Laboratory আবশ্যক। একটী ঔষধ বাজারে বাহির করিতে কতজনের দীর্ঘকালের কঠোর সাধনার প্রয়োজন হয় তাহা আমরা ভাবিবার কোনই প্রয়োজন বোধ করি না। আমরা পূর্ব্বে একবার হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্রের অস্ত্র (Surgical instrument) প্রভৃতির বিবরণ দিয়াছিলাম। শারীরবিজ্ঞান, শবব্যবচ্ছেদ বিজ্ঞানেও যে তাঁহারা সুপণ্ডিত ছিলেন তাহা আজকার মত দিনে বলাই বাহুল্য।

আমাদের সৌভাগ্য যে ভারতের বহু বহু রাজা মহারাজ আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে অর্থব্যয় করিতে প্রস্তুত আছেন। অপেক্ষাকৃত ধনী ব্যক্তিগণও দানে বিমুখ নহেন। ইহাতে কাহারো আপেক্ষিক গুরুত্ব ওজন করিবার প্রয়োজন হয় না। মান্দ্রাজের বিভিন্ন প্রদেশে আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও দাতব্য ঔষধ বিভাগ (চিকিৎসালয়) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কোরের মহারাজগণই ইহার বিশেষ উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষক। প্রত্যেক স্থানের হাঁসপাতালে প্রতিমাসে গড়ে ১০০০ হাজার রোগীর চিকিৎসা চলিতেছে। কোন কোন চিকিৎসালয়ে বৎসরে ৬০।৬৫ হাজার রোগী চিকিৎসিত হইতেছে। নিখিল ভারতীয় বৈদ্য-সম্মিলনীর উদ্দেশ্য সফল হউক। তাঁহারা ভারতে আবার আয়ুর্ব্বেদের জীবন দান করুন। নতুবা শুধু যে আমাদের একটী চিকিৎসা বিভাগ ঢাকা পড়িবে এমন নহে আমাদের প্রাণ রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইবে। আমরা পরের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকি

বলিয়াই নিজের জিনিষ ফেলিয়া দিয়া আজ দ্বিগুণ ত্রিগুণ মূল্য দিয়াও ঔষধ পাইতেছি না। অনেক ঔষধ বন্ধ হইয়াও গিয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদের প্রচারক এখনও দেশে যথেষ্ট আছেন। দেশের বড় বড় চিকিৎসকগণ দীর্ঘকাল যাবৎ আপনাদের সাধনা দ্বারা যেটুকু গৌরব রাখিয়া গিয়াছেন কবিরাজ গঙ্গাধর দ্বারকানাথ বিজয়রত্ন সেই সাধনার ফলে আবার জন্মাইবেন। অনেকে পরের মুখে ঝাল খাওয়ার মত বলিয়া থাকেন, মনেও করিয়া থাকেন আমাদের কবিরাজগণ বিলাতী ডাক্তাদের মত গুণসম্পন্ন নহেন। আমাদের শ্রেষ্ঠ কবিরাজগণের প্রত্যেকের জীবনের সঙ্গেই এক একটী গৌরবময় ইতিহাস জড়িত রহিয়া গিয়াছে। যাহা আমার দেশীয়, আমার শিরার শিরায়, মজ্জায় মজ্জায় মিশিয়া গিয়াছে তাহাকে দূর করিতে যাওয়া, বাতুলতা, মূর্খতা, নির্ব্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আমাদের শরীর পুষ্টি ও মেধাবৃদ্ধির জন্য বিলাতী ঔষধ ব্যবহার করিলেও কবিরাজদের হাত এড়াইতে পারি না। আমাদের দেশীয় জিনিসে আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকিলেও আশু ফললাভের নিমিত্ত এবং একটা চল্‌তি খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়াই প্রথমে বিলাতী ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়। আয়ুর্ব্বেদ শুধু গাছ গাছড়ার আলোচনা করিয়াই তাহার চিকিৎসা শাস্ত্র সম্পূর্ণ করে নাই। খনিজ পদার্থের ব্যবহার তাহার বিশেষ জ্ঞানের পরিচায়ক। আর কোন দেশীয় রাসায়নিক পণ্ডিতগণ তাঁহাদের রসায়ন বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে খনিজ পদার্থের ব্যবহারের ফল কতটা দিতে পারিয়াছেন তাহা জানা আছে কি? ইংলণ্ডের রসায়ন বিজ্ঞানের শৈশবকাল ধাতু পরিবর্ত্তন যুগ বা alchemical period বলিয়া ইতিহাসে পরিচিত। তাহাও ঠিক উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। এবং তাহার উদ্দেশ্যও শারীরবিজ্ঞানের মুখী হয় নাই। কিন্তু হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে আমাদের চিকিৎসকগণ জড়জগতের প্রতি অণুপরমাণুতে আমাদের জীবনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

আমরা অনেকেই ভাবি কবিরাজী ঔষধের মূল্য বেশী তাই ব্যবহার করা দুষ্কর। কিন্তু আমরা একটী রোগেই ক্রমাগত নূতন নূতন ঔষধ যখন ব্যবহার করি, বিলাতী চিকিৎসকগণ অনেক পরিশ্রম করিয়াও সেই সকল ঔষধ যখন আমাদের রক্তমাংসের সঙ্গে মিশাইতে পারেন না, তখন সেই সব বিলাতী ঔষধের সম্মিলিত দামই যে কম হয়, তাহাই বা ভাবি কেন? তারপর বিলাতী ঔষধ ব্যবহার করিতে যাইয়া আমাদের দেশের লোকের খাদ্যাদির পরিবর্ত্তন দেখা যায়। বার রকমের ঔষধ ব্যবহার এবং তদনুরূপ খাদ্যাদির দ্বারা আমাদের শরীরটা ভেজাল মত হইয়া গিয়াছে। আমাদের একটা রোগ আছে নিজের যা কিছু ছোট মনে করা। আয়ুর্ব্বেদকেও এইরূপ দেশীয় লোকের উদ্ভাবিত বলিয়া ছোট মনে করিয়া থাকি। আমরা একটিবারও যেন জোর করিয়া বলিতে পারি না,—"তোমার ভাল তোমাতে থাক।" এখন সময় আসিয়াছে আমরা আবার দেশীয় জিনিসকে আয়ুর্ব্বেদকে আশ্রয় করিতে যাইতেছি। আমাদের আশ্রয় শক্তিশালী হইবে। বৈদ্যসম্মিলন সুসময়ে আরম্ভ হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের বাহিরেই রাজগণ ও জনসাধারণ ইহার উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। বাঙ্গালা দেশেও অনেকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন। আমরা আশা করি

আয়ুর্ব্বেদ আবার চিন্তাশীল ভারতীয় পণ্ডিত কবিরাজগণের সূক্ষ্মচিন্তায় আসিয়া জগতে প্রাচীনের নবীন বার্ত্তা ঘোষণা করিবে।

* *

৮। ত্রিবাঙ্কুরে শিক্ষাবিস্তার

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে শিক্ষা আশাতীত প্রসার লাভ করিয়াছে। তাহার তুলনায় ব্রিটিশ ভারত বা অন্যান্য দেশীয় রাজ্যসমূহে শিক্ষা-বিস্তার এখনও তেমন হয় নাই। যদিও সেখানে আইন করিয়া শিক্ষাকে এখনও বাধ্যকরী করা হয় নাই, তথাপি ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে অনুমোদিত বিদ্যালয়সমূহে গড়ে শতকরা ৭০২ জন বালক এবং ২৯ জন বালিকা শিক্ষালাভ করিতেছে। দেশীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে বড়োদাই বহু বিষয়ে উন্নত। কিন্তু তথা হইতেও ত্রিবাঙ্কুরের প্রশংসা আসিয়াছে। বড়োদায় বাধ্যকরী শিক্ষা। ত্রিবাঙ্কুরে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত শিক্ষা। অতএব ত্রিবাঙ্কুরে শিক্ষা-বিস্তার দেখিয়া বড়োদাকেও লজ্জিত হইতে হইয়াছে। ইহার একটি তালুকে তিরুবল্লে শতকরা ৯৯৮ জন ছাত্র শিক্ষা পাইতেছে। সারা ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষার এরূপ হার দেখা যায় না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রায় দেড়শত বৎসর ধরিয়া শিক্ষাপ্রচলনে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের এত অর্থ, এত সামর্থ্য, এত বিশেষজ্ঞ থাকিতেও তাঁহারা এখনও দেশে ত্রিবাঙ্কুরের মত শিক্ষার হার দেখাইতে পারিলেন না, ইহা বড়ই ক্ষোভের বিষয়।

ত্রিবাঙ্কুরের সদাশয় মহারাজা, কর্ম্মনিপুণ দেওয়ান বাহাদুর এবং দেশীয় কর্ম্মচারীবৃন্দ যে ভাবে জনসাধারণের সহিত মিলিয়া মিশিয়া পরামর্শ করিয়া শিক্ষাকার্য্যে অর্থভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিতেছেন, তাহা দেশের পক্ষে সবিশেষ অনুকরণযোগ্য। আইনের বিভীষিকা না দেখাইয়া শুধু প্রাণের দিক হইতে প্রীতির দিক হইতে দেশের মঙ্গলসাধন করা যায়—ত্রিবাঙ্কুরের দৃষ্টান্তে তাহাই আমরা বুঝিতে পারি, আর বুঝিতে পারি কথঞ্চিৎ স্বাধীনতা পাইলেই দেশবাসী তাহার সুপ্ত কার্য্যক্ষমতাকে আশ্চর্য্যরূপে জাগ্রত করিতে সক্ষম।

* *

৯। প্রাচীন আমেরিকায় হিন্দুপ্রভাব

হিন্দুর কাব্য-পুরাণে পাতালপুরীর কথা অনেকবার পাওয়া যায়। সেই পাতালপুরী আমেরিকা কি না বলা কঠিন। তবে এ দেশে এখনও আমেরিকাকে পাতালই বলা হইয়া থাকে। এবং এখনও আমেরিকায় সময় সময় এমন এক একটি আবিষ্কার হয়, যাহাতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের বর্ণিত পাতাল যে আমেরিকা, এই সম্ভাবনা জাগাইয়া দেয়।

কিছু দিন পূর্ব্বে নিউইয়র্কের লাটিন আমেরিকান চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি আলেকজেণ্ডার দেলমার একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি প্রাচীন আমেরিকায় হিন্দুপ্রভাবের নিদর্শন উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার মন্তব্যের কিয়দংশ নিম্নে দিতেছি। প্রাচীন আমেরিকায় প্রাচীন হিন্দুগণ প্রভাব দেখাইয়া গিয়াছেন, ইহা যদি সত্য হয়, তবে বর্ত্তমান আমেরিকায় বর্ত্তমান হিন্দুগণ কি কোন রকম প্রভাব বিস্তার করিবার আশাও পোষণ করিতে পারিবেন না?

আমেরিকার সুরক্ষিতস্থান-নির্ম্মাতাগণের (Mound builders) সম্বন্ধে যে রহস্যপূর্ণ ক্ষুদ্র বিবরণী পাওয়া গিয়াছে, তাহা সম্প্রতি একখানি পাঁজিপাথর (Calender Stone) বলিয়া অনুমোদিত হইয়াছে। যে স্থানে

মাউণ্ডষ্ট্রীট্‌, সিনসিনাটী এবং ওহায়ো মিলিত হইয়াছে, উহারই নিকটবর্ত্তী কোন প্রাচীন সুরক্ষিত স্থান হইতে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে উক্ত পাথরখানি খনিত হয়। মিসিসিপি এবং ইহার শাখানদী সমূহের উপত্যকায় বিক্ষিপ্তাবস্থায় প্রাপ্ত এই সকল বৃহৎ ও মৃন্ময় সেনাবিভাগের সমাধিস্থান এবং ধর্ম্মমন্দির আবিষ্কৃত হইয়া আমেরিকার প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দীর্ঘকালের একটা অভাব পূর্ণ করিয়াছে। এই সূত্রে সুরক্ষিতস্থান-নির্ম্মাতাগণের ধর্ম্ম, তাঁহাদের মাতৃভূমির সম্বন্ধে অভ্রান্ত ধারণা এবং আমেরিকায় আগমনের কারণ সম্বন্ধে নানা বিষয় অবগত হওয়া যায়। তাঁহাদের কথা ভাবিতে গেলে প্রথমে স্বতঃই মনে উদিত হয় এবং নিশ্চয় ধারণা জন্মে যে, ঐ সকল সুরক্ষিতস্থান-নির্ম্মাতাগণ খৃঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মঙ্গোলিয়া হইতে আমেরিকায় পদার্পণ করেন। তাঁহারাই আমেরিকায় শামনধর্ম্ম বা সর্ব্বশক্তিমানের পূজা প্রচলন করেন। তাঁহারা সূর্য্যকেই সর্ব্বশক্তিমানের—শক্তির আধার জ্ঞান করিতেন। বিন্দুসংযোগে ছবি বুঝাইবার জ্ঞান তাঁহাদের যথেষ্ট ছিল। পরবর্ত্তী পেরুভিয়ানগণ সংখ্যাপ্রকাশে ঐ প্রকার বিন্দুর ব্যবহার করিতেন এবং হিব্রুগণ এখনও উপাসনাকালীন পরিধেয় শাল, পেপলাম বা তালিতবস্ত্রের মধ্যেও ঐ প্রকার চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন।

সিনসিনাটী পাথর দৃষ্টে যে সময়ে শামনধর্ম্মের পতন এবং ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের উত্থান হয় সেই সময়ের বৎসর বিভাগের একটা নমুনা দেখা যায়। মেক্সিকো এবং মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকাতে কদাচিৎ বৃহৎ এবং সমৃদ্ধিশালী পরিবারে বা সমাজে এবং মিসিসিপির উপত্যকায় ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের উত্থানের বিশেষ চিহ্ন পাওয়া যায়। এখন আমরা কথিত বিষয়ের ইতিহাস দেখিতে পাইব। শামনগণ সৌরবৎসরকে ৮ ঋতুতে বিভাগ করেন। প্রত্যেক ঋতুকে ৪৫ দিনে এবং ১৫ দিনে ২৪টী অর্দ্ধচন্দ্র বা (নবমী) ধরা হইত। হিন্দুগণ এখনও শুক্লপক্ষকে যে "Tidis" বলেন রোমান এবং এতরাসকাসগণ তাহাকে 'ides' বা অর্দ্ধচন্দ্র বলিতেন এবং এই সকল তিথির প্রথম দিনকে প্রিদিম (প্রতিপদ) এবং নবমীর পরিবর্ত্তে 'প্রাইদাস্' ও নোনস বলিতেন তাহা হিন্দুদিগের নিকট হইতে ধার করা।

ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, উত্তর এসিয়ায় ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, ৩৬ দিনে এক-এক অংশ ধরিয়া সৌরবৎসরকে ১০ ভাগে ভাগ করা হইত। তারপর বুদ্ধের পর সৌরবৎসরকে ১২ ভাগে ভাগ করা হয়। বর্ত্তমানে এই রকমেই চলিতেছে। উত্তর এশিয়ার বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন মতের পাঁজি পাথরে সৌরবৎসর বিভাগ সম্বন্ধে দেখা যায়, শামনদিগের ৮ ভাগে, ব্রাহ্মণদিগের ১০ ভাগে এবং কৃষ্ণ বা বুদ্ধের সময়ে ১২ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। সুতরাং সিনসিনাটী ও মুস্কা পাথর শামন পূজারই উল্লেখ করিতেছে এবং তাহাদের কাল খৃঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দী বা কিঞ্চিদধিক পূর্ব্বে বলিয়াই বুঝাইয়া দিতেছে। মহাভারত যুদ্ধের তরঙ্গ যখন সমগ্র উত্তর এশিয়াতেও আঘাত দিতেছিল এবং উত্তর এশিয়ার বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায় যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল সে সময়েই যে, মঙ্গোলিয়ানগণ আমেরিকা যাইয়া থাকিবেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? কিন্তু তৎপূর্ব্বে মঙ্গোলিয়ানগণ আমেরিকায় যাইতে পারেন না—পারিলে, তাঁহাদের

সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যোপাসনাযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী অসংস্কৃত চান্দ্র বৎসর গণনার মাপকাঠিও যাইত। মহাভারত যুগের বহু পরেও তাঁহারা যান নাই—গেলে, লৌহ আবিষ্কারের ফলও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইত। ঐ ধাতুর ব্যবহার আমেরিকার সুরক্ষিতস্থান-নির্ম্মাতা-গণের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই ছিল।

মিসিসিপি প্রদেশের একজন লামার (Lamar) সমাজের জন্য প্রাণ দিবার পূর্ব্বে অধিকাংশ সময়েই জঙ্গলে শিকার করিয়া বেড়াইত। সে একবার কিছুদিন পর ফিরিয়া আসিয়া তাহার ভ্রমণ স্থানের বিবরণ দিল—ঐ প্রদেশে একটী অতিবিস্তৃত সমাহিত নগরে অনেক কাহিনী খোদিত রহিয়াছে। ঐ সকল স্মৃতি-কাহিনী-খোদিত পাথর এত বেশী যে তাহার বাড়ীখানি তাহাতে প্রায় পূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। তাহার কথিত প্রদেশে ঠিক জায়গা মত অনেক অনুসন্ধান করিয়াও সেই সকল স্মৃতিচিহ্ন কি হইল, সেগুলি কি অক্ষরে খোদিত ছিল তাহার সম্বন্ধে কোন খবরই জানা যায় নাই। এটা ঠিক জানা গিয়াছে, আরকান এবং সুরক্ষিত স্থান নির্ম্মাতাগণও তাহাদের সমাজের আয়ত্ত কোন স্মৃতিস্তম্ভ উত্তোলন করে নাই। অন্ততঃ একটিও দেখা যায় না। ফার্গুসন সাহেব তাঁহার শিল্পেতিহাসে এই মত পোষণ করেন যে কোন স্মৃতিস্তম্ভ বা দেবমন্দির উত্তোলন না করাই জগতের যে কোন স্থানে টুরানিয়ান্ জাতির বিশেষত্ব। তাহা হইলে এই সুরক্ষিতস্থান-নির্ম্মাতা-গণই-টুরানিয়ান ছিলেন। নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে এই সকল সুরক্ষিত স্থান নির্ম্মাতাগণ মঙ্গোলিয়ান ছিলেন এবং এই মঙ্গোলিয়ানগণই টুরানিয়ান জাতি বলিয়া পরিচিত। কিন্তু মধ্যআমেরিকা বাসিগণও কি টুরানিয়ানছিলেন না? তাঁহারা কি স্মৃতি সৌধ এবং ঐ সকল কারুখচিত মন্দির যাহা আজও হন্দুরাজ ও নিকারা-গাসের অন্ধকারময় অরণ্যাণীতে তাহাদের চির শুভ্র অকলঙ্কিত শীর্ষ উঁচু করিয়া রহিয়াছে, নির্ম্মান করেন নাই? সে যাহা হউক ঐ সকল সুরক্ষিত স্থান নির্ম্মাতাগণ টুরানিয়ান্ হউন আর নাই হউন, তাঁহাদের শিল্প ও ধর্ম্মভাব হিন্দুস্থান হইতেই গৃহীত।

ঐ সব সুরক্ষিত স্থানে বুদ্ধ অথবা কৃষ্ণের কতকগুলি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। যদিও মূর্ত্তিগুলির প্রত্যেকটীই বিসদৃশ ও মস্তকহীন তবুও এগুলি অত্যাবশ্যক। কারণ খোদাই কারকের স্বদেশীধরণে কচ্ছপের আবরণের উপর মূর্ত্তি খোদিত। সুতরাং ইহা হিন্দু কারিগরদিগের দ্বারাই আমেরিকায় আনীত হইবার সম্ভাবনা। বাঁকা কোমর, পা দুইটী লম্বা ও আড়া আড়িভাব, অঙ্গুলিগুলির প্রশস্তি, শরীরের সর্ব্বত্রই বিন্দু বা বৃত্ত অঙ্কন এবং পায়ের মলসূচক তিনটী করিয়া লাইন দেওয়া আছে। সেইগুলি উত্তর আমেরিকার মূর্ত্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং হিন্দুমূর্ত্তির অনুরূপ।

কোমরে ও কোমরের নীচের দিকের বেষ্টনী, স্তূপাকার পোষাকে শরীরের নিম্নার্দ্ধ আবরণ। এবং সর্ব্বোপরি একই পদার্থ নির্ম্মিত স্বস্তিকের সঙ্গে প্রাপ্ত মূর্ত্তিগুলি হিন্দু প্রভাবের বলবান নিদর্শন।

* *

১০। জালন্ধর কন্যা মহাবিদ্যালয়

উত্তর ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার বেশ উন্নতি দেখা যাইতেছে। প্রায় আটাশ বৎসর পূর্ব্বে

ঐ বিদ্যালয়টি স্থাপিত। এই সময়ের মধ্যে দেশের নানাস্থান হইতে শতশত বালিকা এই বিদ্যালয়ে পাঠার্থে আগমন করিয়াছে। জাতীয়ভাবে এই বিদ্যালয়ের উদ্বোধন। এখানে সংস্কৃতের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। হিন্দীর মধ্য দিয়া শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। পাঠার্থীর মন যাহাতে বিজাতীয়ভাবে গঠিত না হয়, তজ্জন্য এখানে জাতীয়ভাবে ধর্ম্ম, নীতি, আচার প্রভৃতি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে।

সুখের কথা, এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রায় পঞ্চাশ জন শিক্ষয়িত্রী এখানে প্রীতির সহিত কাজ করিতেছেন। বিধবাদিগকেও প্রচার ও শিক্ষাকার্য্যে সুদক্ষ করিবার জন্য রীতিমত শিক্ষিত করা হইতেছে। বিদ্যালয়ের অন্তর্গত একটি কলেজ ও স্কুল বিভাগ আছে।

যেমন হইয়া থাকে—ইহার আর্থিক অবস্থা বড় সুবিধাজনক নহে। দেশের ধনীবৃন্দ ইহার দিকে কৃপাদৃষ্টি না করিলে ইহার বহুদিন স্থায়িত্বের সম্ভাবনা কম। কলিকাতার মহাকালী পাঠশালা অর্থাভাবে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, আমাদের ভয় হয়, এই মহাবিদ্যালয়ের দশাও সেইরূপ না হইয়া পড়ে। এখনই দেশের হৃদয়বান ও ধনবানদিগের ইহার সাহায্যকল্পে ব্রতী হওয়া কর্ত্তব্য।

* *
*

১১। ভারত ও জাপান

কবি গাহিয়াছেন—

"উদিল যেখানে বুদ্ধ-আত্মা
মুক্ত করিতে মোক্ষদ্বার।
আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ জগত ভক্তি-প্রণত
চরণে যাঁর।"

ভারতবর্ষ মরে নাই। তাহার অতীত বাণী এখনও এশিয়ার নগরে কান্তারে প্রান্তরে গুহায় ধ্বনিত হইতেছে। তাহার বর্ত্তমান বাণীও অচিরেই এশিয়া ছাড়িয়া পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে প্রবেশ করিবে—ইতিমধ্যেই তাহার সূচনা আমরা দেখিতে পাইয়াছি। রবীন্দ্র নাথ জগদীশচন্দ্র এই বর্ত্তমান বাণী প্রচারে কুশীলব। তাঁহাদের একজনের বাণী জাপানে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, আজ আমরা তাহারই উল্লেখ করিব।

টোকিওর কেইও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত টি হিরোসে একখানি সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকায় লিখিয়াছেন, জাপান পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্যে বড় বেশী রকম সম্মোহিত হইতেছিল, তাহার পুরাতন জাতীয় ভাব অনেকটা লুপ্ত হইয়া যাইতেছিল, ঠিক এমনই মারাত্মক যুগে রবীন্দ্রনাথ যেন ঈশ্বর প্রেরিত হইয়া সেখানে প্রবেশ করিয়াছেন। চিন্তাশীল জাপান তাঁহার কথা কাণ পাতিয়া শুনিতেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার একান্ত প্রশংসায় সে বিভোর হইয়া যাইতেছিল, তাঁহার কথা শুনিয়া আবার সে প্রকৃতিস্থ হইতেছে, নিজের দেশেরই পুরাতন আচার ব্যবহারের প্রতি আবার তাহার শ্রদ্ধা ও প্রীতি ফিরিয়া আসিতেছে। অতএব রবীন্দ্রনাথের কাছে জাপান বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

১২। ঢাকা সাহিত্যপরিষৎ

বাঙ্গালা দেশে মূল সাহিত্যপরিষৎ তিনটী মাত্র দেখিতে পাই। কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, রঙ্গপুরে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ এবং ঢাকাতে ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ।

ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটী শাখা সাহিত্য পরিষৎও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ ১৩১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঢাকা ও পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যসেবিগণ ইহাকে ভাল করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য যথেষ্ট যত্ন লইতেছেন। ঢাকা ও পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্য-সেবিগণ আজপর্য্যন্ত প্রথমোক্ত তুইটী সাহিত্য পরিষদের সম্মিলনে কেবল মাত্র যোগদানই করিয়া আসিতেছেন। বাঙ্গালাদেশ এখন সাহিত্যে নবীন ভাবুকতা লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে। উন্নতিশীল বঙ্গদেশের পক্ষে এই তুইটী মাত্র সাহিত্য পরিষৎই যথেষ্ট নয়। সমগ্র বাঙ্গালাদেশকে ধরিবার জন্য এখন বিভিন্ন সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠাদ্বারা বর্ত্তমান জগতের আশা শিক্ষা, কর্ম্মপ্রণালীকে জন-সাধারণের ভিতর প্রচার করা দরকার। শুনিয়াছিলাম ঢাকা সাহিত্য পরিষদের, সাহিত্য সম্মিলন সহরে হাওয়া ছাড়িয়া পল্লী-কেই তাহার প্রচার ভূমি করিবে। ইহাতে আমরা একটা নূতন ভাব পাইয়াছিলাম এবং সফলতার উজ্জ্বল রেখা আমাদের হৃদয়ে কিরণ দিতেছিল। সাহিত্য সম্মিলনগুলি বিভিন্ন সময়ে হইলেই বিশেষ সুবিধা হয়। প্রথমতঃ বিভিন্ন সময়ে সম্মিলনগুলি সম্পন্ন হইলে দেশের ভিতর একটা স্রোত বহিতে থাকিবে, লোকে সে গুলিকে আপনাদের চিন্তার মধ্যে আনিতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন স্থানের সাহিত্যিকগণ সমবেত হইবার সময় পাইবেন। বিভিন্ন শ্রেণীর লেখক ও বিশেষজ্ঞদিগের চিন্তাশক্তি বিভিন্ন স্থানে ক্রিয়া করিবার অবসর পাইবে। একই সময়ে সম্মিলনগুলি সম্পন্ন হইলে লোকে তাড়াতাড়ি সেগুলিকে ধরিতে পারে না। উহা যেন একটা 'যোগের স্নানে'র মত হয়। কে কোথায় যাইবেন ঠিক করিতে পারেন না। ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে মালদহের এক পল্লীতে মালদহ সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে এবং সম্প্রতি মুন্সীগঞ্জে বিক্রম-পুর সাহিত্য সম্মিলন নিষ্পন্ন হইয়াছে। এইরূপ পল্লীতে সাহিত্যকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া পল্লী-সাহিত্য সম্মিলনের দ্বারা যতশীঘ্র মাতৃভাষার উন্নতি এবং লোকের ধারণা ও মনোগত ভাব উচ্চাকার ধারণ করিবে, সহরের সংখ্যা করা ২।৪টী সম্মিলনের দ্বারাও দেশের তেমন বিস্তর কাজ হইবে না। আমরা আশা করি ঢাকা ও পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যিকগণ শীঘ্রই তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র বিপুল বিস্তৃত করিবেন এবং প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য পরিষৎ অবিলম্বেই সাধারণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে নূতন ভাব ভাষা দান করিবে। পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যিকগণের এজন্য বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। আমরা এই নবীন সাহিত্য পরিষদের প্রবীণ সাহিত্যিক-গণের নিকট অনতিদূর ভবিষ্যতে অনেক বিষয়ের আশা করিতেছি।

* * *

১৩। নাট্য-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ

বর্ত্তমান নাট্য সাহিত্যের কথা বলিতে গেলে আমরা ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটী স্তর দেখিতে পাই। প্রথম স্তরে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক, দ্বিতীয় স্তরে ক্ষীরোদ প্রসাদের আধুনিক ইতিহাসের প্রথম অভিনয় এবং তৃতীয় স্তরে আধুনিক ঐতিহাসিক নাটকের চূড়ান্তকাল বা দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যযুগ গিরিশচন্দ্র তাঁহার হৃদয়ের যে ভাব পৌরাণিক নাটকের ভিতর দিয়া জনসাধারণে প্রচার করেন তাহা সমাজ গ্রহণ করিয়াও যখন নূতন চাহিতেছিল ঠিক সেই সময়েই ক্ষীরোদপ্রসাদ আপনার সাধনালব্ধ এক নূতন অপূর্ব্বকল্প

নাট্যরত্ন বঙ্গীয় সাহিত্য ভাণ্ডারে দান করিয়া নবযুগের বার্ত্তা প্রচার করিলেন। ক্ষীরোদ-প্রসাদ তাঁহার প্রাণের ভিতর হইতে যে সুর ধরিয়াছিলেন তাহা বিভিন্ন তান লয়ে পুষ্ট হইয়া দ্বিজেন্দ্রলালের সিংহলবিজয়ে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গলার গৌরব গাথা বাঙ্গালীর ইতি কথা ক্ষীরোদপ্রসাদ হইতে দ্বিজেন্দ্রলাল পর্য্যন্ত এক সুরে গীত হইয়াছে। বাঙ্গলার নাট্য মন্দিরে আধুনিক ঐতিহাসিক উপাদানে নাট্যাভিনয় শেষ হইয়া গিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। বিশেষতঃ কবি দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু যেন সেই ধারণাই আমাদের মনে জাগাইয়া দেয়। বাঙ্গালীর চরিত্রে বীররসের অবতারণা করিতে যাইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল যে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন তাহা শক্তিমান নবীন লেখকের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। নবীন ঐতিহাসিক নাটক লেখককে এক নূতন ভাবে গড়িয়া উঠিতে হইবে। তাঁহার ধারণা তাহার সাধনা নূতন ধরণের হইবে। বাঙ্গালী চরিত্রের জন্য বাঙ্গলার নাট্য-সাহিত্য-ভাণ্ডারের নিমিত্ত নূতন রকমের ঐতিহাসিক নাটকের প্রয়োজন। সমাজ এখন যাহা চায় তাহা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া কেহ কি তদনুযায়ী নাট্য-সাহিত্যে প্রচারে প্রবৃত্ত হইবেন না ?

দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের পর চতুর্থ স্তরে রবীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত মিষ্টিক বা আধ্যাত্মিক নাটকের ধারা দেখিতে পাই। আমাদের আশার কথা—সম্প্রতি নূতন নূতন লেখক নবীনভাবে নব নব চিন্তার অনুশীলনে তাঁহাদের সাধনালব্ধ ফল দ্বারা সাধ্যমত সমাজে নূতন ভাব দিতে চেষ্টা করিতেছেন। মানবচরিত্রে ভীরুতা ও কাপুরুষতা অর্জ্জিত হইলেও সে বীররসেরই অভিনয় দেখিতে ব্যস্ত। আমাদের সমাজেও সেইরূপ ভাব থাকিলেও সমাজ যেন নূতন কিছু চাহিতেছে। লোকের আকাঙ্ক্ষা যেন বীররসের ভিতর দিয়া আরও কিছু চাহিতেছে, সেইটী সময়োপযোগী প্রয়োজনে, তাহার রক্তমাংসের সংযোগ-ফলে, হৃদয়তন্ত্রীর এক নূতন ঝঙ্কারে। আমরা সাহিত্যে কাঠিন্য ধর্ম্মের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কাঠিন্য ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে গভীর ভাবুকতারও প্রয়োজন। আমাদের সমাজে এখন কাঠিন্য ধর্ম্মের ও গভীর ভাবুকতার নূতন চিত্র যিনি উপস্থাপিত করিতে পারিবেন শ্রোত্রীমণ্ডলী তাঁহারই জন্য অপেক্ষা করিবে। বাঙ্গল নাট্য সাহিত্যের অনুরাগিগণ ভবিষ্যতে এক নূতন অভিনয় দর্শন জন্য ব্যগ্র রহিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস অশান্ত মানবহৃদয় শান্তিলাভের জন্যই ব্যগ্র তাই নূতন নাট্য-সাহিত্যের অপেক্ষা করিতেছে। নাট্য-সাহিত্যও সময়োপযোগী এক নূতন পন্থা ধরিবার জন্য অচিরেই তাহার ব্যাকুলতা দেখাইবে।

প্রণাম

অন্তর মাঝে লভিয়াছে যেবা প্রজ্ঞার উন্মেষ,
ধ্যান ধারণায় পাইয়াছে যেবা সত্যের উদ্দেশ,
ভাব-প্রবুদ্ধ পরমাত্মার পাইয়াছে সাক্ষাৎ,
সকলের আগে তাঁহার চরণে করি আমি প্রণিপাত।

সুন্দরে যেবা মর্ম্মে মর্ম্মে করিয়াছে অনুভব,
নিষ্ঠাশ্রদ্ধা একাগ্রতায় আনন্দ সম্ভব,
শিল্পে, চিত্রে, গীতে, কবিতায়, জাগে মধুমহিমায়,
মূর্খ হলেও জ্ঞানী বলে' তার প্রণাম করিগো পায়।

যার বাহু দুটী পরশ মাণিক, পরশন-শিহরণে
মঙ্গলহেম জেগে উঠে যা'তে মানবের মনেমনে,
জীবনসমরে ন্যায়ের পক্ষে যুঝে যেবা প্রাণপণে,
ধীমান বলিয়া প্রণাম করিগো তাঁর দুটী শ্রীচরণে।

প্রেমে যার চোখে জলধারা বয়, হৃদি যার সিত ননী,
প্রাণ যার ক্ষমাভক্তি করুণাত্যাগ-ধীরতার খনি,
সরল তরল জীবন যাহার অবনত হয়ে চলে,
মহাজ্ঞানী বলি' করি প্রণিপাত তাঁহারো চরণ-তলে।

বয়সে প্রবীণ, জীবন যাহার জীবন্ত-ইতিহাস,
দেখিয়া ঠেকিয়া শিখিয়া চিতের আঁধার করেছে নাশ,
তরুণের পথ সরল করেছে নিজের জীবন ক্ষয়ে,
জ্ঞানী বলি' আমি করিগো প্রণাম তাঁহারো চরণদ্বয়ে।

পাঠে, আহরণে তপশ্চরণে বসি গুরুপদতলে,
অপরের জ্ঞান নিজের করেছে যেবা সাধনার ফলে,
জীবনাদর্শ গড়িয়া তুলেছে বিদ্যার মহিমায়,
জ্ঞানী বলি' আমি করিগো প্রণাম তাঁহারো দুইটি পায়।

ইঁহাদের যেবা মর্ম্ম বুঝিয়া ভক্তিতে রয় নত,
নিজে জ্ঞানী নাহি হয়েও যেজন জ্ঞানীর সেবায় রত,
তাঁদের সকাশে কুণ্ঠায় নিজে তৃণ বলি জ্ঞান যার,
শেষ প্রণিপাত তাঁহার চরণে করি আমি বার বার।

শ্রীকালিদাস রায়।

স্ত্রী-জাতির শিক্ষা-সমস্যা

স্ত্রীজাতির শিক্ষা সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপন করিতে হইলে অগ্রে দেখিতে হইবে পুরুষ-জাতি ও স্ত্রীজাতিতে কিরূপ প্রভেদ ? সেই প্রভেদ অনুসারে পুরুষ হইতে স্ত্রীজাতির জীবনের গতি এবং শিক্ষা আর এক হইয়া দাঁড়ায়। আমি সেই প্রভেদগুলি প্রথমে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

প্রথমতঃ, স্ত্রীজাতি পুরুষের অপেক্ষা দৈহিক দুর্ব্বলতাসম্পন্ন জীব। স্বভাবের গণ্ডী ছাড়াইয়া স্ত্রীজাতি যদি মস্তিষ্ক পরিচালনা করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে পুরুষের অপেক্ষা অনেক শারীরিক ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। তাঁহাদের সহিষ্ণুতাগুণ সত্ত্বেও দৈহিক দুর্ব্বলতা হেতু অত্যধিক মানসিক উত্তেজনায় তাঁহাদের শরীর ক্ষয়ের সম্ভাবনা অধিক।

দ্বিতীয়তঃ, পুরুষজাতির দেহযন্ত্র অপেক্ষা স্ত্রীজাতির দেহ-যন্ত্র প্রজনন-ক্রিয়ায় অধিকতর সহায়তা করে। সৃষ্টিরক্ষাকারিণী স্ত্রী-জাতির দেহ-যন্ত্রের মূল্য অধিক, দায়িত্বও অধিক। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, অত্যধিক মস্তিষ্ক পরিচালন করিলে স্ত্রীজাতির প্রজনন-ক্রিয়ায় অর্থাৎ জননীত্বে ব্যাঘাত পড়ে। পুরুষজাতির অপেক্ষা মানসিক পরিশ্রম জন্য স্ত্রীজাতির দেহ-যন্ত্রে বহুবিধ উৎকট রোগ ও বৈষম্য দে[illegible]দ।

তৃতীয়তঃ, [illegible]নস[illegible]তর মঙ্গলের [illegible] স্ত্রীজাতির অবাধ মানসিক প্রতিযোগিতা একটা সমাজ এবং সভ্যতার পক্ষে তেমন কল্যাণপ্রদ নহে।

জগতের সর্ব্বত্রই এখন একটা প্রতিযোগিতার রেশ চলিয়াছে। পুরাতন যুগের সে সহযোগিতার প্রচলন যেন উঠিয়া গিয়াছে। যথায় প্রতিযোগিতা বর্ত্তমান, স্বার্থপরতাও তথায় বিদ্যমান। ফলে এই বিশ্বসংসারের নর-নারীসমাজ তলে তলে দ্বেষহিংসার আগ্নেয়-গিরির সৃষ্টি করিয়া যেন একটা মহাপ্রলয়ের দিকে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়াছে। পুরাতনের সে সহযোগিতা আর নাই বলিয়াই আজ গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে এত অশান্তি, এত অভাব, এত যথেচ্ছাচারিতা। পরস্পর একটা সহানুভূতি না থাকিলে, অবনমিতা না থাকিলে একটা জাতীয়ত্বের তেমন প্রতিষ্ঠা হয় না। ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি লইয়াই জাতীয়ত্ব, সেই ব্যক্তিত্বই যে সমাজে বিষময় তথায় যথার্থ কল্যাণের আশা কোথায় ? বিদ্বেষ-বুদ্ধিতে কোন অনুষ্ঠান সুফল প্রসব করিতে পারে না। যে পাশ্চাত্য-সভ্যতার জন্য আমরা আজ লোলুপ, তাহা আপাত মনোরম হইলেও তাহার ভিত্তিভূমি ঐ প্রতিযোগিতা ও বিদ্বেষ বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। উপরে উপরে সভ্যতার বহু চাকচিক্য ও ক্রোটনের বাহার থাকিলেও অন্তরে অন্তরে তাহার বিষম বাড়বাগ্নি লুক্কায়িত রহিয়াছে। এই পাশ্চাত্য সভ্যতারূপ হলাহল আমাদের এই ঘোরতর দুর্দ্দিনে ও দুরবস্থায় কিরূপ সহিবে, তাহাই আমাদিগকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিতে হইবে।

পাশ্চাত্য-জগতের এই দারুণ প্রতিযোগিতার ভাব যদি আমাদিগের স্ত্রীজাতির ভিতরেও দেখা দেয়, তাহা হইলে আমাদিগের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরিক অবস্থাও অতীব শোচনীয় হইয়া পড়িবে।

মধুচক্রের ন্যায় পারিবারিক জীবনগঠন আমাদিগের হিন্দুত্বের একটি বিশেষত্ব। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সুখ ত আমরা নানা রকমে হারাইতে বসিয়াছি তাহার উপর যদি আমাদিগের জীবন হইতে পারিবারিক সহানুভূতিটুকুও যায়, তাহা হইলে আমাদিগের আর দুর্দ্দশার পরিসীমা থাকিবে না।

এই গার্হস্থ্যধর্ম্মকে অক্ষুন্ন রাখিতে হইলে অগ্রে আমাদিগকে স্ত্রীজাতির শিক্ষা সম্বন্ধে অধিকতর সতর্ক হইতে হইবে। কিরূপ ভাবে আমাদের স্ত্রীজাতির চরিত্রগঠন করিলে তাঁহাদিগের প্রকৃত উন্নতি ও শিক্ষা বিধান হয়, সব কায ফেলিয়া অগ্রে আমাদিগকে সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে কেবলমাত্র স্বামী স্ত্রী লইয়াই হিন্দুর সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ নহে, হিন্দুর সংসার পুণ্যের সংসার—সহযোগিতার সংসার, দয়া এবং দানের সংসার। হিন্দুর ধর্ম্ম শোষণ নহে, পোষণ! বিষ্ণুর পালনীশক্তির মহাবিকাশের জন্যই হিন্দু তাহার দয়া দান এবং আতিথেয়তা লইয়া আজিও ধরাবক্ষে দণ্ডায়মান—হিন্দুর সহধর্ম্মিণীরা আজিও গৃহে গৃহে অন্নপূর্ণার ন্যায় বিরাজমানা। পঞ্চসূনা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য হিন্দুকে পঞ্চযজ্ঞ করিতে হয়। হিন্দু কেবল ব্যক্তিত্বের বোঝা লইয়াই আসে নাই, প্রত্যেক হিন্দুকে সংসারের অনেক বোঝা বহিতে হয় সমষ্টিতেই প্রকৃত হিন্দুর চরম অভিব্যক্তি!—সে সকলকে জড়াইতে চায়, স্বর্গে মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে চায়, ঘরের একটি অনিষ্টকারী বিড়ালকেও সে যে নিরন্ন রাখিতে পারে না! এমনি হিন্দুর দয়ার সংসার। সেই দয়া যাহাতে আমাদের মনুষ্যত্ব হইতে চলিয়া না যায় তাহার দিকে আমাদিগকে বিশেষ সচেষ্ট হইতে হইবে। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই আমরা সেই দয়ার আধার স্নেহময়ী মাতৃমূর্ত্তিকে দেখিতে পাই। সেইদিন হইতেই আমাদিগের শিক্ষা হইতে থাকে।

মাতৃগর্ভ হইতেই আমাদের শিক্ষার সূচনা হয়, আমাদিগের সংসর্গ গঠিত হয়। এমন যে জননী, তাঁহার হৃদয়কে অশিক্ষিত রাখিয়া আমরা কেমন করিয়া অবহেলা করিতে পারি? Coleridge সত্য সত্যই ধরিয়াছিলেন, "The history of a man in the nine months before his birth would probably be more interesting, and would contain events of greater importance than any that may occur in after life"

সৎ-চরিত্র পিতামাতার যে কুচরিত্র পুত্র কন্যা হয়, ইহার কি কোন কারণই নাই? বাহির হইতে আমরা এইরূপ ঘটনা ঘটিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাই, কিন্তু তাহা ঘটিবার যে মাতৃগর্ভ হইতে একটি সুদূর-নিহিত কারণও রহিয়াছে তাহা আজকালকার কয়জন মঙ্গলকামী পিতা মাতা তলাইয়া দেখেন? মনুষ্যের সন্তানোৎপত্তি ত পশ্বাদির breeding এর ব্যাপার নহে যে কেবল pedigree (বংশ-কৌলিন্য) দেখিলেই চলিবে। ইহা যে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যাপার, কেবল কামপশুর সৃষ্টি করাই ত মানবজীবনের গূঢ় উদ্দেশ্য নহে। একটা উচ্চ আদর্শের উপর মানবসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত; যে সভ্যতায় সে দেবত্বের আদর্শ (divine idea) নাই, সেই সভ্যতার অধীনস্থ মানবসমাজ পশুত্বের গণ্ডীর ভিতরেই সহস্র ব্যবহারিক উন্নতি সত্ত্বেও আবদ্ধ। দেবভাবই মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। মহামতি Fichte তাঁহার

De Moribus Eruditorum অর্থাৎ "ছাত্র-জীবনের স্বধর্ম্ম নামক" বক্তৃতা-পুস্তকের এক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন যে,—

"The whole material world, with all its adaptations and ends, and, in particular, the life of man in this world, are by no means, in themselves and in deed and truth, that which they seem to be to the uncultivated and natural sense of man, but there is something higher, which lies concealed behind all natural appearance. This concealed foundation of all appearance may, in its greatest universality, be aptly named the Divine Idea."

মানবজীবনের গুরুত্বটা আমাদিগের দেশের পিতামাতাদিগকে বুঝাইবার জন্যই আমি এতগুলি কথা বলিলাম। এবং সেই মানব জীবনের মূলাধার হইতেছে মানব-জননী। কারণ, জননীই মানবজাতির পিতা মাতা উভয়কেই প্রসব করেন।

এমন যে জননী-রূপিণী স্ত্রীজাতি—ইহাদের জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্তই দায়িত্বপূর্ণ। পুরুষের নিশ্বাস ফেলিবার যথেষ্ট অবসর আছে কিন্তু ভাবিতে গেলে স্ত্রীজাতির জীবনব্যাপিনী সাধনা। স্ত্রীজাতির উপর একটা বিরাটজাতির কল্যাণাকল্যাণ নির্ভর করিতেছে। প্রজনন-কার্য্যে নারীজাতির তুলনায় পুরুষজাতির দান অতি সামান্য। গর্ভাধানে, সন্তান প্রসব এবং এমন কি সন্তান পালন কালেও নারীজাতির বিশেষ চরিত্রবল ও অটুটস্বাস্থ্যের প্রয়োজন হয়। মাতা বুদ্ধিমতী হউন আর নাই হউন তাহাতে তত যায় আসে না, কিন্তু মাতার দৈহিক ও মানসিক গতি নির্ম্মল রাখিতেই হইবে। বিদ্যাসাগরের জননীর বিদ্যার আবশ্যকতা তত নাও থাকিতে পারে কিন্তু বিদ্যাসাগরের জননী হইতে হইলে যে পাণ্ডিত্যের অপেক্ষা চরিত্রবল ও দৈহিকবল একান্ত প্রয়োজন তাহা কে অস্বীকার করিবে? পুত্রের কল্যাণ হেতু পিতার অপেক্ষা যে মাতার স্বাস্থ্যসম্পদ ও চরিত্রবল অধিক প্রয়োজন তাহা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু যেখানে অত্যধিক মস্তিষ্ক পরিচালনা করিতে হয় সেখানে পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অধিকতর হানি হইতে দেখা যায়। Spencer তাঁহার Principles of Biologyতে লিখিয়াছেন যে অস্বাভাবিক মস্তিষ্কের উত্তেজনায় স্ত্রীজাতি বন্ধ্যা হইয়া যায়। দেহতত্ত্ববিদ্‌গণ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, যে স্ত্রীলোক যত অধিক উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন তাহার সন্তান সন্ততিও তদনুরূপ দুর্ব্বল। Spencer আরও বলেন যে, এইসব উচ্চশিক্ষিতা স্ত্রীলোক তাঁহাদিগের শিশুসন্তানদিগকে স্তন্যদানেও অপারগ। শিক্ষাদ্বারা তাঁহাদের জীবন এমনই ভারাক্রান্ত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে তাঁহাদের বক্ষের বর্দ্ধনশক্তিরও হ্রাস হইয়া থাকে এবং সন্তানপালন করিতে তাঁহাদিগকে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিতে হয় (Vol. ii p. p. 485.—86)। Dr. Hertel, Prof. Bystroff প্রভৃতি অনেক স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্‌গণ এইরূপ সাক্ষ্য দিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের এইরূপ প্রতিযোগিতা ও পরীক্ষামূলক উচ্চশিক্ষার ফলে পাশ্চাত্য সমাজে যুবক যুবতীর জীবনে কত যে স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমাদিগের ছাত্র-সমাজের অকাল-পক্বতার একটী

প্রধান কারণ এই প্রতিযোগিতা ও পরীক্ষা-মূলক অদ্ভুত শিক্ষাবিস্তার। কিন্তু এই পাপ যদি আমাদিগের অন্তঃপুরেও প্রবেশ করে তাহাহইলে হয়ত আমরা এইরূপ জীবন্মৃত অবস্থাতেও থাকিতে পারিব না। এইরূপ উদ্দেশ্য-বিহীন শিক্ষার জন্য নরনারী উভয়ে মিলিয়া এইরূপভাবে জীবনপাত করিলে, হয়ত দুই তিন পুরুষেই আমরা জাতীয় ধ্বংসের একটা মহা সূচনা দেখিতে পাইব। আমাদিগের স্ত্রীজাতিও তাঁহাদের এক মহাদায়িত্বপূর্ণ মাতৃত্ব হইতেও অবসর লইবেন।

এই উচ্চ শিক্ষার বিস্তারে পাশ্চাত্য-জগতে স্ত্রীজাতির মধ্যে যে কিরূপ অবনতি ঘটিতেছে আমরা তাহারই কতকগুলা দৃষ্টান্ত দিয়া হিন্দু সমাজকে সাবধান করিয়া দিব।

এইরূপ উৎপীড়ন প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়াতে বালকদিগের অপেক্ষা বালিকাদিগের জীবনের আরও ক্ষতি হইতেছে। কারণ বালিকারা প্রায়ই বালকগণের অপেক্ষা গৃহাবদ্ধ, নির্জ্জন-প্রিয় ও ব্যায়াম-বিমুখ, একবার প্রতিযোগিতামূলক উচ্চশিক্ষার ফাঁদে পড়িলেই তাহারা অত্যধিক পঠন কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া স্বাস্থ্য ভঙ্গ করে। তাহার উপর এইরূপ ভগ্ন-স্বাস্থ্য লইয়া ধনবানের কন্যার নানারূপ আমোদ প্রমোদ ও বিলাসিতায় সময় অপব্যয় করে এবং গরীবের কন্যারা সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিয়া যায়। পাশ্চাত্য জগতের এইরূপ স্বাস্থ্যহানিকর শিক্ষার ব্যবহার দেখিয়া Clark নামক জনৈক মার্কিনবাসী সমাজতত্ত্ববিদ্ বলিতেছেন—"If this goes on for half a century it needs no prophet to predict, from the laws of heredity, "that the mothers of our future generations will have to be brought from beyond the Atlantic."

এইরূপ সামাজিক অবস্থায় কেবল বংশ-কৌলিন্য দেখিয়া বিবাহ দিলে সুদূর ভবিষ্যতে জাতীয় অধঃপতনের যে ইহাই একটি অব্যবহিত কারণ হইয়া পড়িবে তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই। কারণ এই সব শিক্ষিত সমাজের নারীগণ অতিরিক্ত শিক্ষা দ্বারা ক্রমশঃই জননীত্ব হইতে বঞ্চিত হইবেন এবং যদিও তাঁহাদের মাতৃত্বে পরিণতি ঘটে, সে সব পুত্রকন্যাদ্বারা সমাজের কোন কল্যাণই সাধিত হইবে না। তদ্‌পরিবর্ত্তে অল্পশিক্ষিতা গৃহকর্ম্মরতা, অটুট স্বাস্থ্য-সম্পন্না স্ত্রীলোকগণই একটি জাতীয় জীবন-গঠনে বিশেষ সহায়তা করিবেন। স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষাদ্বারা যদি জাতীয় জীবনী-শক্তিরই হ্রাস হয়, তাহা হইলে এমন শিক্ষায় কি লাভ?

একটা জাতিকে রক্ষা করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে স্ত্রীজাতির স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। একমাত্র নিয়মিত শ্রমই স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান উপায়। আমাদিগের অন্তঃপুরে অবরোধ প্রথা সত্ত্বেও শ্রমের অভাব নাই। অবরোধ-প্রথা স্ত্রীজাতির স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল না হইলেও উদ্দাম প্রবৃত্তি-স্রোত-প্লাবিত জনবহুল সহরে অবরোধপ্রথাভিন্ন উপায় নাই। সর্ব্বাগ্রে স্ত্রীজাতিকে নৈতিক অবনতি হইতে রক্ষা করা অভিভাবকগণের প্রধান কর্ত্তব্য। কারণ স্বাস্থ্য হারাইলে স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাওয়া যায়, কিন্তু একবার নৈতিক অবনতি ঘটিলে কি পুরুষ কি স্ত্রীজাতির কিছুতেই নিস্তার

নাই। অবরোধ-প্রথা একটা প্রবর্ত্তিত দেশাচার মাত্র, হিন্দুর নিজস্ব নহে। মুসলমানগণের অত্যাচার হেতু সতীদাহ এবং অবরোধ-প্রথা হিন্দুসমাজে বদ্ধমূল হইয়া যায়। এই অবরোধ-প্রথাকে উঠাইতে হইলে আমাদিগের পল্লী-জীবনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। পল্লীকে অবহেলা করিয়াই ত আজ আমরা নানা অভাবগ্রস্ত ও মৃতপ্রায় হইতে বসিয়াছি। পল্লীজীবন-প্রবর্ত্তন ব্যতীত আমাদিগের কি পুরুষ, কি স্ত্রীজাতি কাহারও মঙ্গল নাই। সহরে বাস করিতে হইলে দাঁড়ের পাখী হইতেই হইবে। শারীরিক দুর্ব্বলতাহেতু আমরা স্ত্রীজাতিকে কোনরূপ আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেও একান্ত অক্ষম। অবস্থাসম্পন্ন স্বামীর উপস্থিতি সত্ত্বেও যখন স্ত্রীজাতিকে লাঞ্ছিত হইতে দেখা যায়, তখন একজন সামান্য কেরাণী কেমন করিয়া তাঁহার স্ত্রী ভগ্নী কন্যাকে অবাধে ট্রাম গাড়ীতে বা গড়ের মাঠে ভ্রমণ করিতে ছাড়িয়া দিবেন? সহরের এই অবরুদ্ধ-ভাব পল্লীগ্রামে অনেকটা শিথিল হইতে পারে। উন্মুক্ত বায়ু এবং তদুপযুক্ত শ্রম আবার বঙ্গীয় মহিলাগণের পূর্ব্বকার স্বাস্থ্য আনয়ন করিতে পারে। তাই বলিয়া আমি স্ত্রীজনোচিত লজ্জাভূষণকে ত্যাগ করিতে বলিতেছি না। লজ্জা স্ত্রীজাতির গৌরব। লজ্জা স্ত্রীজাতির দুর্ব্বলতা নহে। স্ত্রীজাতির লজ্জাই তাঁহার জীবনের সতীত্বকে রক্ষা করে।

রূপ অপেক্ষা স্ত্রীজাতির স্বাস্থ্যের আকর্ষণ অধিক। অনেক চশমা-ধারিণী উচ্চশিক্ষিতা বঙ্গমহিলা দেখিতে পাই, বডিস গাউনে তাঁহারা কম সজ্জিত নহেন মোটর গাড়ীতে চড়িয়া হাওয়াও খান, কিন্তু দেখিলেই মনে হয় তাঁহারা যেন কোন না কোন আভ্যন্তরিক রোগগ্রস্ত, অটুট স্বাস্থ্যের জ্যোতি নাই যেন নির্জ্জীবতার প্রতিমা! ভবিষ্যদ্বংশের উন্নতিকল্পে এইরূপ বঙ্গনারীই কি অভিপ্রেত? Spencer তাঁহার Education এর ১৮৭—৮৮ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন,—

"Men care little for erudition in woman; but very much for physical beauty, good nature and sound sense. What man ever fell in love with a woman because she understood Italian?"

স্পেন্সার আরও লিখিয়াছেন যে স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা অপেক্ষা দৈহিক উন্নতি এবং নৈতিক মাধুর্য্য অধিকতর চিত্তাকর্ষক। স্বভাবের একটি সর্ব্বপ্রধান পরিণতি হইতেছে এই যে, ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের মঙ্গল চেষ্টা। পরন্তু একটা জাতির ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করিতে হইলে একমাত্র ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য-রক্ষাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

অপরিণত বয়সে এই উচ্চশিক্ষার বোঝা আমাদিগের নর-নারীজীবনের যে কিরূপ ক্ষতি করিতেছে তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। শিক্ষা অপেক্ষা স্বাস্থ্যের দিকটা আমরা বড়ই উপেক্ষা করিতেছি। কিন্তু, আমাদিগকে বাঁচিতে হইলে অগ্রে সব কার্য্য ফেলিয়া জীবনের স্বচ্ছলতা ও আহার বিহারের সুবিধা দেখিতে হইবে। Spencer লিখিতেছেন—

"That a good physique however poor the accompanying mental endowments, is worth preserving,

because through future generations the mental endowments may be indefinitely developed,"

স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তি মহাপ্রতিভাসম্পন্ন হইলেও তাহার উচ্চ আশার কিছুই মিটাইয়া যাইতে পারে না; কিন্তু পিতা মাতার যদি অটুট স্বাস্থ্য থাকে তাহা হইলে তাঁহারা নিরক্ষর হইলেও কোন সুদূর ভবিষ্যতে তাঁহাদের বংশধরেরা পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূল স্রোত পাইলে অনায়াসে মানসিক উন্নতি সাধন করিতে পারে।

ফরাসী সমাজদার্শনিক M. Guyau তাঁহার Education and Heredity নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—

"The mothers of Bacon and Goethe, though both very remarkable women, could not have written either the Novum organum or Faust; but if they had ever so little weakened their generative powers by excessive intellectual expenditure, they would not have had a Bacon or a Goethe as a son."

গাঁয়োর এই কথাগুলির ভিতর প্রবেশ করিলে আমরা আধুনিক বংশোৎকর্ষ বিজ্ঞানের (eugenics) কিঞ্চিৎ রহস্য উদ্ঘাটন করিতেও পারি। গাঁয়োর মতে নৈতিক শিক্ষার পরেই দৈহিক উৎকর্ষ সাধন একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ শক্তি এবং স্বাস্থ্যের উপরেই একটা জাতির যথাসর্ব্বস্ব নির্ভর করিতেছে। কেবল তাহাই নহে ব্যক্তিগত জীবনেও নীতি এবং বুদ্ধি-বৃত্তি দৈহিক সামর্থ্যের উপর দণ্ডায়মান। গরুমারিয়া জুতা দান যেমন, স্বাস্থ্যহানি করিয়া উচ্চশিক্ষালাভও তেমনি। বর্ত্তমান ফরাসী চিন্তার ধারা, তাই ব্যক্তি বিশেষ ব্যষ্টিতেই আবদ্ধ নহে, সমষ্টির দৈহিক এবং নৈতিক কল্যাণই নব্য ফরাসীর কাম্য হইয়া দাঁড়াইতেছে। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের এই সরল এবং সোজা কথা বিংশ শতাব্দীর ফরাসী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ অবস্থা-চক্রে পড়িয়া সবিশেষ বুঝিতে পারিয়াছেন। কোমতের পর্য্যুসিত বাণী আজ ফরাসীগণের মিষ্ট লাগিতেছে। কর্ত্তব্য এবং দায়িত্বজ্ঞান ব্যতীত কোন জাতিই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। অতীতের প্রদত্ত উপদেশের প্রতি সম্মান এবং অনাগত ভবিষ্যতের কল্যাণ-চিন্তা ব্যতীত বর্ত্তমানের তথাকথিত উন্নতির কোন সফলতাই নাই। বর্ত্তমানকে ভবিষ্যতের জন্য পথ প্রস্তুত করিয়া যাইতে হইবে, তবেই তাহার জাতীয় জীবনের সার্থকতা।

আর আমরা পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের ভ্রান্তিসমূহ ও পাশ্চাত্যজাতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অবনতিগুলাকেই সাদরে উন্নতি বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। প্রতীচ্য মনীষিগণ ক্রমশঃই আমাদিগের শাস্ত্রবিহিত উপাদেয় নিয়মাবলী গ্রহণ করিতেছেন আর আমরা Progressive ideas বলিয়া উহাদের হেয় মনোবৃত্তি গুলি-কেই গ্রহণ করিতেছি। এই সব Spencer, Guyau প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের কথায় তবে কি বুঝায় স্ত্রীজাতিকে শিক্ষা আদৌ দিবে না? না, তাহা নহে। তাঁহারা বলিয়াছেন, স্ত্রীজাতিকে সুশিক্ষিত করিতে হইবে, তাহাদের জীবনের বিশেষত্বের ভিতরদিয়া। শিক্ষা আর মানসিক অপব্যয় এক নহে। পঠন এবং পীড়ন এক নহে। সকল শিক্ষার মূলেই একই নিয়ম বিরাজ করিতেছে, শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা দিতে

হইবে। শরীরমাদ্যম্ খলু ধর্ম্মসাধনম্। শিক্ষা ত দূরের কথা শরীর মাটী করিয়া শিব-সংহিতা ধর্ম্মসাধন করিতেও সাবধান করিয়া দিতেছে।

বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির জীবনে এতই কর্ত্তব্য রহিয়াছে যে গৃহধর্ম্মকে অবহেলা করিয়া উচ্চ-শিক্ষায় বিভূষিতা হইতে যাওয়া তাঁহাদের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। গৃহকর্ম্মের অনুরূপে, নারীধর্ম্মের অনুরূপে সুদক্ষা ও সুশিক্ষিতা হইতে আমরা বঙ্গমহিলাগণকে বাধা দিতেছি না। সন্তানসন্ততির দৈহিক এবং নৈতিক উন্নতির ভার যতটা জননীর, ততটা জনকের নহে। মাতার দৃষ্টান্তেই সন্তান গঠিত হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া যেন বঙ্গ-মহিলাগণ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'ন। অধ্যয়নের অপেক্ষা তাঁহাদের দায়িত্বপূর্ণ জীবনে যে অধ্যাপনা অধিক ইহা যেন তাঁহারা ভুলিয়া না যান।

সূক্ষ্মদর্শী গাঁয়ো বলিতেছেন :—

"Practical pedagogy, with domestic hygiene, is almost the only knowledge necessary to woman, and it is literally the only training she does not get."

স্বাস্থ্য-শিক্ষা, সন্তানপালন, পরিচর্য্যা প্রভৃতির দিকে এই সব উচ্চ-শিক্ষিতাগণের আদৌ দৃষ্টি নাই, কেবল বেশভূষা ও সঙ্গীত আলাপন লইয়াই তাঁহারা ব্যাপৃত থাকেন, ইহা কি উচ্চশিক্ষার কুফল নহে? সন্তান সন্ততি যদি আশৈশব হইতে জননীকে অভিনেত্রীরূপেই দর্শন করে তাহা হইলে তাহাদের চরিত্র কি ভাব ধারণ করিবে, তাহা ত অনায়াসেই বুঝা যায়। সদাসর্ব্বদা স্বীয় পুত্র কন্যার নিকট জননীকে একটা নৈতিক আদর্শ ধরিয়া রাখিতে হইবে। বিদ্যাসাগর গুরুদাস প্রভৃতির জননী এইরূপই করিয়াছিলেন।

দয়া, স্নেহ, সেবা এবং নিঃস্বার্থপরতাই স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম। রাজনীতি কিম্বা কোনরূপ প্রতিযোগিতামূলক পুরুষ-জনোচিত শিক্ষা স্ত্রী-জাতির পক্ষে নিতান্ত অবান্তর বিষয়। সংসারে সহৃদয়তা বৃদ্ধি করার ভার একমাত্র স্ত্রী-জাতির উপরই সমর্পিত হইয়াছে। একমাত্র সহৃদয়তার উপরেই মাতৃত্বের বিকাশ নির্ভর করিতেছে। মস্তিষ্ক অপেক্ষা হৃদয় রাজ্যের বিস্তৃতি অধিক। হৃদয়ের শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। হৃদয় হইতেই সহযোগিতার উদ্ভব, মস্তিষ্ক হইতে প্রতিযোগিতার সূত্রপাত।

বর্ত্তমান শিক্ষার একটি বিশেষ দোষ এই যে, ছাত্র-জীবনের অনুকূল হউক বা নাই হউক স্বাস্থ্য-হানি করিয়াও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেই হইবে। অঙ্কশাস্ত্রের আমি আদৌ অধিকারী নই, সাহিত্য বা ইতিহাসের দিকেই আমার বাল্যাবধি অভিব্যক্তি অথচ পরীক্ষার দায়ে অঙ্কশাস্ত্রের সুগভীর জটিলতার মধ্যে আমাকে নিবদ্ধ থাকিতেই হইবে। এইরূপ শিক্ষায়, আমি কোনরূপে পাশ করিতে পারিলেও জীবনে তাহার আমি কোন সাফল্য লাভ করিতে পারিব না। ইহাতে কোনটাই আমার শিক্ষা হয় না অথচ যাহাতে আমার অধিকার আছে তাহাও আশানুরূপ বিকাশ লাভ করিতে পারে না। তাই বর্ত্তমান ছাত্রজীবনে এতাদৃশ অমনোযোগিতা পরিলক্ষিত হয়। একে রাশি রাশি পাঠ্য-পুস্তক তাহার উপর তৎসমুদায় হয় ত কাহারও কাহারও স্বভাবের সম্পূর্ণ প্রতিকূল বিষয়। এইরূপ অপ্রীতি

প্রণাম

অন্তর মাঝে লভিয়াছে যেবা প্রজ্ঞার উন্মেষ,
ধ্যান ধারণায় পাইয়াছে যেবা সত্যের উদ্দেশ,
ভাব-প্রবুদ্ধ পরমাত্মার পাইয়াছে সাক্ষাৎ,
সকলের আগে তাঁহার চরণে করি আমি প্রণিপাত।

সুন্দরে যেবা মর্ম্মে মর্ম্মে করিয়াছে অনুভব,
নিষ্ঠাশ্রদ্ধা একাগ্রতায় আনন্দ সম্ভব,
শিল্পে, চিত্রে, গীতে, কবিতায়, জাগে মধুমহিমায়,
মূর্খ হলেও জ্ঞানী বলে' তার প্রণাম করিগো পায়।

যার বাহু দুটী পরশ মাণিক, পরশন-শিহরণে
মঙ্গলহেম জেগে উঠে যা'তে মানবের মনেমনে,
জীবনসমরে ন্যায়ের পক্ষে যুঝে যেবা প্রাণপণে,
ধীমান বলিয়া প্রণাম করিগো তাঁর দুটী শ্রীচরণে।

প্রেমে যার চোখে জলধারা বয়, হৃদি যার সিত ননী,
প্রাণ যার ক্ষমাভক্তি করুণাত্যাগ-ধীরতার খনি,
সরল তরল জীবন যাহার অবনত হয়ে চলে,
মহাজ্ঞানী বলি' করি প্রণিপাত তাঁহারো চরণ-তলে।

বয়সে প্রবীণ, জীবন যাহার জীবন্ত-ইতিহাস,
দেখিয়া ঠেকিয়া শিখিয়া চিতের আঁধার করেছে নাশ,
তরুণের পথ সরল করেছে নিজের জীবন ক্ষয়ে,
জ্ঞানী বলি' আমি করিগো প্রণাম তাঁহারো চরণদ্বয়ে।

পাঠে, আহরণে তপশ্চরণে বসি গুরুপদতলে,
অপরের জ্ঞান নিজের করেছে যেবা সাধনার ফলে,
জীবনাদর্শ গড়িয়া তুলেছে বিদ্যার মহিমায়,
জ্ঞানী বলি' আমি করিগো প্রণাম তাঁহারো দুইটি পায়।

ইঁহাদের যেবা মর্ম্ম বুঝিয়া ভক্তিতে রয় নত,
নিজে জ্ঞানী নাহি হয়েও যেজন জ্ঞানীর সেবায় রত,
তাঁদের সকাশে কুণ্ঠায় নিজে তৃণ বলি জ্ঞান যার,
শেষ প্রণিপাত তাঁহার চরণে করি আমি বার বার।

শ্রীকালিদাস রায়।

স্ত্রী-জাতির শিক্ষা-সমস্যা

স্ত্রীজাতির শিক্ষা সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপন করিতে হইলে অগ্রে দেখিতে হইবে পুরুষ-জাতি ও স্ত্রীজাতিতে কিরূপ প্রভেদ? সেই প্রভেদ অনুসারে পুরুষ হইতে স্ত্রীজাতির জীবনের গতি এবং শিক্ষা আর এক হইয়া দাঁড়ায়। আমি সেই প্রভেদগুলি প্রথমে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

প্রথমতঃ, স্ত্রীজাতি পুরুষের অপেক্ষা দৈহিক দুর্ব্বলতাসম্পন্ন জীব। স্বভাবের গণ্ডী ছাড়াইয়া স্ত্রীজাতি যদি মস্তিষ্ক পরিচালনা করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে পুরুষের অপেক্ষা অনেক শারীরিক ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। তাঁহাদের সহিষ্ণুতাগুণ সত্বেও দৈহিক দুর্ব্বলতা হেতু অত্যধিক মানসিক উত্তেজনায় তাঁহাদের শরীর ক্ষয়ের সম্ভাবনা অধিক।

দ্বিতীয়তঃ, পুরুষজাতির দেহযন্ত্র অপেক্ষা স্ত্রীজাতির দেহ-যন্ত্র প্রজনন-ক্রিয়ায় অধিকতর সহায়তা করে। সৃষ্টিরক্ষাকারিণী স্ত্রী-জাতির দেহ-যন্ত্রের মূল্য অধিক, দায়িত্বও অধিক। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, অত্যধিক মস্তিষ্ক পরিচালন করিলে স্ত্রীজাতির প্রজনন-ক্রিয়ায় অর্থাৎ জননীত্বে ব্যাঘাত পড়ে। পুরুষজাতির অপেক্ষা মানসিক পরিশ্রম জন্য স্ত্রীজাতির দেহ-যন্ত্রে বহুবিধ উৎকট রোগ ও বৈষম্য দেখা দেয়।

তৃতীয়তঃ, সন্তানসন্ততির মঙ্গলের জন্যও স্ত্রীজাতির অবাধ মানসিক প্রতিযোগিতা একটা সমাজ এবং সভ্যতার পক্ষে তেমন কল্যাণপ্রদ নহে।

জগতের সর্ব্বত্রই এখন একটা প্রতিযোগিতার রেশ চলিয়াছে। পুরাতন যুগের সে সহযোগিতার প্রচলন যেন উঠিয়া গিয়াছে। যথায় প্রতিযোগিতা বর্ত্তমান, স্বার্থপরতাও তথায় বিদ্যমান। ফলে এই বিশ্বসংসারের নর-নারীসমাজ তলে তলে দ্বেষহিংসার আগ্নেয়-গিরির সৃষ্টি করিয়া যেন একটা মহাপ্রলয়ের দিকে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়াছে। পুরাতনের সে সহযোগিতা আর নাই বলিয়াই আজ গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে এত অশান্তি, এত অভাব, এত যথেচ্ছাচারিতা। পরস্পর একটা সহানুভূতি না থাকিলে, অবনমিতা না থাকিলে একটা জাতীয়ত্বের তেমন প্রতিষ্ঠা হয় না। ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি লইয়াই জাতীয়ত্ব, সেই ব্যক্তিত্বই যে সমাজে বিষময় তথায় যথার্থ কল্যাণের আশা কোথায়? বিদ্বেষ-বুদ্ধিতে কোন অনুষ্ঠান সুফল প্রসব করিতে পারে না। যে পাশ্চাত্য-সভ্যতার জন্য আমরা আজ লোলুপ, তাহা আপাত মনোরম হইলেও তাহার ভিত্তিভূমি ঐ প্রতিযোগিতা ও বিদ্বেষ বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। উপরে উপরে সভ্যতার বহু চাকচিক্য ও ক্রোটনের বাহার থাকিলেও অন্তরে অন্তরে তাহার বিষম বাড়বাগ্নি লুক্কায়িত রহিয়াছে। এই পাশ্চাত্য সভ্যতারূপ হলাহল আমাদের এই ঘোরতর দুর্দ্দিনে ও দুরবস্থায় কিরূপ সহিবে, তাহাই আমাদিগকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিতে হইবে।

পাশ্চাত্য-জগতের এই দারুণ প্রতিযোগিতার ভাব যদি আমাদিগের স্ত্রীজাতির ভিতরেও দেখা দেয়, তাহা হইলে আমাদিগের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরিক অবস্থাও অতীব শোচনীয় হইয়া পড়িবে।

মধুচক্রের ন্যায় পারিবারিক জীবনগঠন আমাদিগের হিন্দুত্বের একটি বিশেষত্ব। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সুখ ত আমরা নানা রকমে হারাইতে বসিয়াছি তাহার উপর যদি আমাদিগের জীবন হইতে পারিবারিক সহানুভূতিটুকুও যায়, তাহা হইলে আমাদিগের আর দুর্দ্দশার পরিসীমা থাকিবে না।

এই গার্হস্থ্যধর্ম্মকে অক্ষুন্ন রাখিতে হইলে অগ্রে আমাদিগকে স্ত্রীজাতির শিক্ষা সম্বন্ধে অধিকতর সতর্ক হইতে হইবে। কিরূপ ভাবে আমাদের স্ত্রীজাতির চরিত্রগঠন করিলে তাঁহাদিগের প্রকৃত উন্নতি ও শিক্ষা বিধান হয়, সব কায ফেলিয়া অগ্রে আমাদিগকে সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে কেবলমাত্র স্বামী স্ত্রী লইয়াই হিন্দুর সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ নহে. হিন্দুর সংসার পুণ্যের সংসার—সহযোগিতার সংসার, দয়া এবং দানের সংসার। হিন্দুর ধর্ম্ম শোষণ নহে, পোষণ! বিষ্ণুর পালনী-শক্তির মহাবিকাশের জন্যই হিন্দু তাহার দয়া দান এবং আতিথেয়তা লইয়া আজিও ধরাবক্ষে দণ্ডায়মান—হিন্দুর সহধর্ম্মিণীরা আজিও গৃহে গৃহে অন্নপূর্ণার ন্যায় বিরাজমানা। পঞ্চসূনা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য হিন্দুকে পঞ্চযজ্ঞ করিতে হয়। হিন্দু কেবল ব্যক্তিত্বের বোঝা লইয়াই আসে নাই, প্রত্যেক হিন্দুকে সংসারের অনেক বোঝা বহিতে হয় সমষ্টিতেই প্রকৃত হিন্দুর চরম অভিব্যক্তি!—সে সকলকে জড়াইতে চায়, স্বর্গে মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে চায়, ঘরের একটি অনিষ্টকারী বিড়ালকেও সে যে নিরন্ন রাখিতে পারে না! এমনি হিন্দুর দয়ার সংসার। সেই দয়া যাহাতে আমাদের মনুষ্যত্ব হইতে চলিয়া না যায় তাহার দিকে আমাদিগকে বিশেষ সচেষ্ট হইতে হইবে। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই আমরা সেই দয়ার আধার স্নেহময়ী মাতৃমূর্ত্তিকে দেখিতে পাই। সেইদিন হইতেই আমাদিগের শিক্ষা হইতে থাকে।

মাতৃগর্ভ হইতেই আমাদের শিক্ষার সূচনা হয়, আমাদিগের সংসর্গ গঠিত হয়। এমন যে জননী, তাঁহার হৃদয়কে অশিক্ষিত রাখিয়া আমরা কেমন করিয়া অবহেলা করিতে পারি? Coleridge সত্য সত্যই ধরিয়াছিলেন; "The history of a man in the nine months before his birth would probably be more interesting, and would contain events of greater importance than any that may occur in after life"

সৎ-চরিত্র পিতামাতার যে কুচরিত্র পুত্র কন্যা হয়, ইহার কি কোন কারণই নাই? বাহির হইতে আমরা এইরূপ ঘটনা ঘটিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাই, কিন্তু তাহা ঘটিবার যে মাতৃগর্ভ হইতে একটি সুদূর-নিহিত কারণও রহিয়াছে তাহা আজকালকার কয়জন মঙ্গল-কামী পিতা মাতা তলাইয়া দেখেন? মনুষ্যের সন্তানোৎপত্তি ত পশ্বাদির breeding এর ব্যাপার নহে যে কেবল pedigree (বংশ-কৌলিন্য) দেখিলেই চলিবে। ইহা যে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যাপার, কেবল কাম-পশুর সৃষ্টি করাই ত মানবজীবনের গূঢ় উদ্দেশ্য নহে। একটা উচ্চ আদর্শের উপর মানবসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত; যে সভ্যতায় সে দেবত্বের আদর্শ (divine idea) নাই, সেই সভ্যতার অধীনস্থ মানবসমাজ পশুত্বের গণ্ডীর ভিতরেই সহস্র ব্যবহারিক উন্নতি সত্ত্বেও আবদ্ধ। দেবভাবই মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। মহামতি Fichte তাঁহার

De Moribus Eruditorum অর্থাৎ "ছাত্র-জীবনের স্বধর্ম্ম নামক" বক্তৃতা-পুস্তকের এক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন যে,—

"The whole material world, with all its adaptations and ends, and, in particular, the life of man in this world, are by no means, in themselves and in deed and truth, that which they seem to be to the uncultivated and natural sense of man, but there is something higher, which lies concealed behind all natural appearance. This concealed foundation of all appearance may, in its greatest universality, be aptly named the Divine Idea."

মানবজীবনের গুরুত্বটা আমাদিগের দেশের পিতামাতাদিগকে বুঝাইবার জন্যই আমি এতগুলি কথা বলিলাম। এবং সেই মানব জীবনের মূলাধার হইতেছে মানব-জননী। কারণ, জননীই মানবজাতির পিতা মাতা উভয়কেই প্রসব করেন।

এমন যে জননী-রূপিণী স্ত্রীজাতি—ইহাদের জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্তই দায়িত্বপূর্ণ। পুরুষের নিশ্বাস ফেলিবার যথেষ্ট অবসর আছে কিন্তু ভাবিতে গেলে স্ত্রীজাতির জীবনব্যাপিনী সাধনা। স্ত্রীজাতির উপর একটা বিরাটজাতির কল্যাণাকল্যাণ নির্ভর করিতেছে। প্রজনন-কার্য্যে নারীজাতির তুলনায় পুরুষজাতির দান অতি সামান্য। গর্ভাধানে, সন্তান প্রসব এবং এমন কি সন্তান পালন কালেও নারীজাতির বিশেষ চরিত্রবল ও অটুটস্বাস্থ্যের প্রয়োজন হয়। মাতা বুদ্ধিমতী হউন আর নাই হউন তাহাতে তত যায় আসে না, কিন্তু মাতার দৈহিক ও মানসিক গতি নির্ম্মল রাখিতেই হইবে। বিদ্যাসাগরের জননীর বিদ্যার আবশ্যকতা তত নাও থাকিতে পারে কিন্তু বিদ্যাসাগরের জননী হইতে হইলে যে পাণ্ডিত্যের অপেক্ষা চরিত্রবল ও দৈহিকবল একান্ত প্রয়োজন তাহা কে অস্বীকার করিবে? পুত্রের কল্যাণ হেতু পিতার অপেক্ষা যে মাতার স্বাস্থ্যসম্পদ ও চরিত্রবল অধিক প্রয়োজন তাহা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু যেখানে অত্যধিক মস্তিষ্ক পরিচালনা করিতে হয় সেখানে পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অধিকতর হানি হইতে দেখা যায়। Spencer তাঁহার Principles of Biologyতে লিখিয়াছেন যে অস্বাভাবিক মস্তিষ্কের উত্তেজনায় স্ত্রীজাতি বন্ধ্যা হইয়া যায়। দেহতত্ত্ববিদ্গণ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, যে স্ত্রীলোক যত অধিক উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন তাহার সন্তান সন্ততিও তদনুরূপ দুর্ব্বল। Spencer আরও বলেন যে, এইসব উচ্চশিক্ষিতা স্ত্রীলোক তাঁহাদিগের শিশুসন্তানদিগকে স্তন্যদানেও অপারগ। শিক্ষাদ্বারা তাঁহাদের জীবন এমনই ভারাক্রান্ত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে তাঁহাদের বক্ষের বর্দ্ধনশক্তিরও হ্রাস হইয়া থাকে এবং সন্তানপালন করিতে তাঁহাদিগকে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিতে হয় (Vol. ii p. p. 485.—86)। Dr. Hertel, Prof. Bystroff প্রভৃতি অনেক স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্গণ এইরূপ সাক্ষ্য দিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের এইরূপ প্রতিযোগিতা ও পরীক্ষামূলক উচ্চশিক্ষার ফলে পাশ্চাত্য সমাজে যুবক যুবতীর জীবনে কত যে স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমাদিগের ছাত্র-সমাজের অকাল-পক্কতার একটী

প্রধান কারণ এই প্রতিযোগিতা ও পরীক্ষা-মূলক অদ্ভুত শিক্ষাবিস্তার। কিন্তু এই পাপ যদি আমাদিগের অন্তঃপুরেও প্রবেশ করে তাহাহইলে হয়ত আমরা এইরূপ জীবন্মৃত অবস্থাতেও থাকিতে পারিব না। এইরূপ উদ্দেশ্য-বিহীন শিক্ষার জন্য নরনারী উভয়ে মিলিয়া এইরূপভাবে জীবনপাত করিলে, হয়ত দুই তিন পুরুষেই আমরা জাতীয় ধ্বংসের একটা মহা সূচনা দেখিতে পাইব। আমাদিগের স্ত্রীজাতিও তাঁহাদের এক মহাদায়িত্বপূর্ণ মাতৃত্ব হইতেও অবসর লইবেন।

এই উচ্চ শিক্ষার বিস্তারে পাশ্চাত্য-জগতে স্ত্রীজাতির মধ্যে যে কিরূপ অবনতি ঘটিতেছে আমরা তাহারই কতকগুলা দৃষ্টান্ত দিয়া হিন্দু সমাজকে সাবধান করিয়া দিব।

এইরূপ উৎপীড়ন প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়াতে বালকদিগের অপেক্ষা বালিকাদিগের জীবনের আরও ক্ষতি হইতেছে। কারণ বালিকারা প্রায়ই বালকগণের অপেক্ষা গৃহাবদ্ধ, নির্জ্জন-প্রিয় ও ব্যায়াম-বিমুখ, একবার প্রতিযোগিতামূলক উচ্চশিক্ষার ফাঁদে পড়িলেই তাহারা অত্যধিক পঠন কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া স্বাস্থ্য ভঙ্গ করে। তাহার উপর এইরূপ ভগ্ন-স্বাস্থ্য লইয়া ধনবানের কন্যার নানারূপ আমোদ প্রমোদ ও বিলাসিতায় সময় অপব্যয় করে এবং গরীবের কন্যারা সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিয়া যায়। পাশ্চাত্য জগতের এইরূপ স্বাস্থ্যহানিকর শিক্ষার ব্যবহার দেখিয়া Clark নামক জনৈক মার্কিনবাসী সমাজতত্ত্ববিদ্ বলিতেছেন—"If this goes on for half a century it needs no prophet to predict, from the laws of heredity, "that the mothers of our future generations will have to be brought from beyond the Atlantic."

এইরূপ সামাজিক অবস্থায় কেবল বংশ-কৌলিন্য দেখিয়া বিবাহ দিলে সুদূর ভবিষ্যতে জাতীয় অধঃপতনের যে ইহাই একটি অব্যবহিত কারণ হইয়া পড়িবে তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই। কারণ এই সব শিক্ষিত সমাজের নারীগণ অতিরিক্ত শিক্ষা দ্বারা ক্রমশঃই জননীত্ব হইতে বঞ্চিত হইবেন এবং যদিও তাঁহাদের মাতৃত্বে পরিণতি ঘটে, সে সব পুত্রকন্যাদ্বারা সমাজের কোন কল্যাণই সাধিত হইবে না। তদ্পরিবর্ত্তে অল্পশিক্ষিতা গৃহকর্ম্মরতা, অটুট স্বাস্থ্য-সম্পন্না স্ত্রীলোকগণই একটি জাতীয় জীবন-গঠনে বিশেষ সহায়তা করিবেন। স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষাদ্বারা যদি জাতীয় জীবনী-শক্তিরই হ্রাস হয়, তাহা হইলে এমন শিক্ষায় কি লাভ?

একটা জাতিকে রক্ষা করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে স্ত্রীজাতির স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। একমাত্র নিয়মিত শ্রমই স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান উপায়। আমাদিগের অন্তঃপুরে অবরোধ প্রথা সত্ত্বেও শ্রমের অভাব নাই। অবরোধ-প্রথা স্ত্রীজাতির স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল না হইলেও উদ্দাম প্রবৃত্তি-স্রোত-প্লাবিত জনবহুল সহরে অবরোধপ্রথাভিন্ন উপায় নাই। সর্ব্বাগ্রে স্ত্রীজাতিকে নৈতিক অবনতি হইতে রক্ষা করা অভিভাবকগণের প্রধান কর্ত্তব্য। কারণ স্বাস্থ্য হারাইলে স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাওয়া যায়, কিন্তু একবার নৈতিক অবনতি ঘটিলে কি পুরুষ কি স্ত্রীজাতির কিছুতেই নিস্তার

নাই। অবরোধ-প্রথা একটা প্রবর্ত্তিত দেশাচার মাত্র, হিন্দুর নিজস্ব নহে। মুসলমানগণের অত্যাচার হেতু সতীদাহ এবং অবরোধ-প্রথা হিন্দুসমাজে বদ্ধমূল হইয়া যায়। এই অবরোধ-প্রথাকে উঠাইতে হইলে আমাদিগের পল্লী-জীবনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। পল্লীকে অবহেলা করিয়াই ত আজ আমরা নানা অভাবগ্রস্ত ও মৃতপ্রায় হইতে বসিয়াছি। পল্লীজীবন-প্রবর্ত্তন ব্যতীত আমাদিগের কি পুরুষ, কি স্ত্রীজাতি কাহারও মঙ্গল নাই। সহরে বাস করিতে হইলে দাঁড়ের পাখী হইতেই হইবে। শারীরিক দুর্ব্বলতাহেতু আমরা স্ত্রীজাতিকে কোনরূপ আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেও একান্ত অক্ষম। অবস্থাসম্পন্ন স্বামীর উপস্থিতি সত্বেও যখন স্ত্রীজাতিকে লাঞ্ছিত হইতে দেখা যায়, তখন একজন সামান্য কেরাণী কেমন করিয়া তাঁহার স্ত্রী ভগ্নী কন্যাকে অবাধে ট্রাম গাড়ীতে বা গড়ের মাঠে ভ্রমণ করিতে ছাড়িয়া দিবেন? সহরের এই অবরুদ্ধভাব পল্লীগ্রামে অনেকটা শিথিল হইতে পারে। উন্মুক্ত বায়ু এবং তদুপযুক্ত শ্রম আবার বঙ্গীয় মহিলাগণের পূর্ব্বকার স্বাস্থ্য আনয়ন করিতে পারে। তাই বলিয়া আমি স্ত্রীজনোচিত লজ্জাভূষণকে ত্যাগ করিতে বলিতেছি না। লজ্জা স্ত্রীজাতির গৌরব। লজ্জা স্ত্রীজাতির দুর্ব্বলতা নহে। স্ত্রীজাতির লজ্জাই তাঁহার জীবনের সতীত্বকে রক্ষা করে।

রূপ অপেক্ষা স্ত্রীজাতির স্বাস্থ্যের আকর্ষণ অধিক। অনেক চশমা-ধারিণী উচ্চশিক্ষিতা বঙ্গমহিলা দেখিতে পাই, বডিস গাউনে তাঁহারা কম সজ্জিত নহেন মোটর গাড়ীতে চড়িয়া হাওয়াও খান, কিন্তু দেখিলেই মনে হয় তাঁহারা যেন কোন না কোন আভ্যন্তরিক রোগগ্রস্ত, অটুট স্বাস্থ্যের জ্যোতি নাই যেন নির্জ্জীবতার প্রতিমা! ভবিষ্যদ্বংশের উন্নতিকল্পে এইরূপ বঙ্গনারীই কি অভিপ্রেত? Spencer তাঁহার Education এর ১৮৭—৮৮ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন,—

"Men care little for erudition in woman; but very much for physical beauty, good nature and sound sense. What man ever fell in love with a woman because she understood Italian?"

স্পেন্সার আরও লিখিয়াছেন যে স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা অপেক্ষা দৈহিক উন্নতি এবং নৈতিক মাধুর্য্য অধিকতর চিত্তাকর্ষক। স্বভাবের একটি সর্ব্বপ্রধান পরিণতি হইতেছে এই যে, ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের মঙ্গল চেষ্টা। পরন্তু একটা জাতির ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করিতে হইলে একমাত্র ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

অপরিণত বয়সে এই উচ্চশিক্ষার বোঝা আমাদিগের নর-নারীজীবনের যে কিরূপ ক্ষতি করিতেছে তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। শিক্ষা অপেক্ষা স্বাস্থ্যের দিকটা আমরা বড়ই উপেক্ষা করিতেছি। কিন্তু, আমাদিগকে বাঁচিতে হইলে অগ্রে সব কার্য্য ফেলিয়া জীবনের স্বচ্ছন্দতা ও আহার বিহারের সুবিধা দেখিতে হইবে। Spencer লিখিতেছেন—

"That a good physique however poor the accompanying mental endowments, is worth preserving,

because through future generations the mental endowments may be indefinitely developed,"

স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তি মহাপ্রতিভাসম্পন্ন হইলেও তাহার উচ্চ আশার কিছুই মিটাইয়া যাইতে পারে না; কিন্তু পিতা মাতার যদি অটুট স্বাস্থ্য থাকে তাহা হইলে তাঁহারা নিরক্ষর হইলেও কোন সুদূর ভবিষ্যতে তাঁহাদের বংশধরেরা পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূল স্রোত পাইলে অনায়াসে মানসিক উন্নতি সাধন করিতে পারে।

ফরাসী সমাজদার্শনিক M. Guyau তাঁহার Education and Heredity নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—

"The mothers of Bacon and Goethe, though both very remarkable women, could not have written either the Novum organum or Faust ; but if they had ever so little weakened their generative powers by excessive intellectual expenditure, they would not have had a Bacon or a Goethe as a son."

গাঁয়োর এই কথাগুলির ভিতর প্রবেশ করিলে আমরা আধুনিক বংশোৎকর্ষ বিজ্ঞানের (eugenics) কিঞ্চিৎ রহস্য উদ্ঘাটন করিতেও পারি। গাঁয়োর মতে নৈতিক শিক্ষার পরেই দৈহিক উৎকর্ষ সাধন একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ শক্তি এবং স্বাস্থ্যের উপরেই একটা জাতির যথাসর্ব্বস্ব নির্ভর করিতেছে। কেবল তাহাই নহে ব্যক্তিগত জীবনেও নীতি এবং বুদ্ধি-বৃত্তি দৈহিক সামর্থ্যের উপর দণ্ডায়মান। গরুমারিয়া জুতা দান যেমন, স্বাস্থ্যহানি করিয়া উচ্চশিক্ষালাভও তেমনি। বর্ত্তমান ফরাসী চিন্তার ধারা, তাই ব্যক্তি বিশেষ ব্যষ্টিতেই আবদ্ধ নহে, সমষ্টির দৈহিক এবং নৈতিক কল্যাণই নব্য ফরাসীর কাম্য হইয়া দাঁড়াইতেছে। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের এই সরল এবং সোজা কথা বিংশ শতাব্দীর ফরাসী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ অবস্থা-চক্রে পড়িয়া সবিশেষ বুঝিতে পারিয়াছেন। কোমতের পর্য্যুসিত বাণী আজ ফরাসীগণের মিষ্ট লাগিতেছে। কর্ত্তব্য এবং দায়িত্বজ্ঞান ব্যতীত কোন জাতিই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। অতীতের প্রদত্ত উপদেশের প্রতি সম্মান এবং অনাগত ভবিষ্যতের কল্যাণ-চিন্তা ব্যতীত বর্ত্তমানের তথাকথিত উন্নতির কোন সফলতাই নাই। বর্ত্তমানকে ভবিষ্যতের জন্য পথ প্রস্তুত করিয়া যাইতে হইবে, তবেই তাহার জাতীয় জীবনের সার্থকতা।

আর আমরা পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের ভ্রান্তিসমূহ ও পাশ্চাত্যজাতিকর্তৃক পরিত্যক্ত অবনতিগুলাকেই সাদরে উন্নতি বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। প্রতীচ্য মনীষিগণ ক্রমশঃই আমাদিগের শাস্ত্রবিহিত উপাদেয় নিয়মাবলী গ্রহণ করিতেছেন আর আমরা Progressive ideas বলিয়া উহাদের হেয় মনোবৃত্তি গুলিকেই গ্রহণ করিতেছি। এই সব Spencer, Guyau প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের কথায় তবে কি বুঝায় স্ত্রীজাতিকে শিক্ষা আদৌ দিবে না? না, তাহা নহে। তাঁহারা বলিয়াছেন, স্ত্রীজাতিকে সুশিক্ষিত করিতে হইবে, তাহাদের জীবনের বিশেষত্বের ভিতরদিয়া। শিক্ষা আর মানসিক অপব্যয় এক নহে। পঠন এবং পীড়ন এক নহে। সকল শিক্ষার মূলেই একই নিয়ম বিরাজ করিতেছে, শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা দিতে

হইবে। শরীরমাদ্যম্ খলু ধর্ম্মসাধনম্। শিক্ষা ত দূরের কথা শরীর মাটী করিয়া শিব-সংহিতা ধর্ম্মসাধন করিতেও সাবধান করিয়া দিতেছে।

বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির জীবনে এতই কর্ত্তব্য রহিয়াছে যে গৃহধর্ম্মকে অবহেলা করিয়া উচ্চ-শিক্ষায় বিভূষিতা হইতে যাওয়া তাঁহাদের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। গৃহকর্ম্মের অনুরূপে, নারীধর্ম্মের অনুরূপে সুদক্ষা ও সুশিক্ষিতা হইতে আমরা বঙ্গমহিলাগণকে বাধা দিতেছি না। সন্তানসন্ততির দৈহিক এবং নৈতিক উন্নতির ভার যতটা জননীর, ততটা জনকের নহে। মাতার দৃষ্টান্তেই সন্তান গঠিত হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া যেন বঙ্গ-মহিলাগণ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'ন। অধ্যয়নের অপেক্ষা তাঁহাদের দায়িত্বপূর্ণ জীবনে যে অধ্যাপনা অধিক ইহা যেন তাঁহারা ভুলিয়া না যান।

সূক্ষ্মদর্শী গাঁয়ো বলিতেছেন :—

"Practical pedagogy, with domestic hygiene, is almost the only knowledge necessary to woman, and it is literally the only training she does not get."

স্বাস্থ্য-শিক্ষা, সন্তানপালন, পরিচর্য্যা প্রভৃতির দিকে এই সব উচ্চ-শিক্ষিতাগণের আদৌ দৃষ্টি নাই, কেবল বেশভূষা ও সঙ্গীত আলাপন লইয়াই তাঁহারা ব্যাপৃত থাকেন, ইহা কি উচ্চশিক্ষার কুফল নহে? সন্তান সন্ততি যদি আশৈশব হইতে জননীকে অভিনেত্রীরূপেই দর্শন করে তাহা হইলে তাহাদের চরিত্র কি ভাব ধারণ করিবে, তাহা ত অনায়াসেই বুঝা যায়। সদাসর্ব্বদা স্বীয় পুত্র কন্যার নিকট জননীকে একটা নৈতিক আদর্শ ধরিয়া রাখিতে হইবে। বিদ্যাসাগর গুরুদাস প্রভৃতির জননী এইরূপই করিয়াছিলেন।

দয়া, স্নেহ, সেবা এবং নিঃস্বার্থপরতাই স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম। রাজনীতি কিম্বা কোনরূপ প্রতিযোগিতামূলক পুরুষ-জনোচিত শিক্ষা স্ত্রী-জাতির পক্ষে নিতান্ত অবান্তর বিষয়। সংসারে সহৃদয়তা বৃদ্ধি করার ভার একমাত্র স্ত্রী-জাতির উপরই সমর্পিত হইয়াছে। একমাত্র সহৃদয়তার উপরেই মাতৃত্বের বিকাশ নির্ভর করিতেছে। মস্তিষ্ক অপেক্ষা হৃদয় রাজ্যের বিস্তৃতি অধিক। হৃদয়ের শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। হৃদয় হইতেই সহযোগিতার উদ্ভব, মস্তিষ্ক হইতে প্রতিযোগিতার সূত্রপাত।

বর্ত্তমান শিক্ষার একটি বিশেষ দোষ এই যে, ছাত্র-জীবনের অনুকূল হউক বা নাই হউক স্বাস্থ্য-হানি করিয়াও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেই হইবে। অঙ্কশাস্ত্রের আমি আদৌ অধিকারী নই, সাহিত্য বা ইতিহাসের দিকেই আমার বাল্যাবধি অভিব্যক্তি অথচ পরীক্ষার দায়ে অঙ্কশাস্ত্রের সুগভীর জটিলতার মধ্যে আমাকে নিবদ্ধ থাকিতেই হইবে। এইরূপ শিক্ষায়, আমি কোনরূপে পাশ করিতে পারিলেও জীবনে তাহার আমি কোন সাফল্য লাভ করিতে পারিব না। ইহাতে কোনটাই আমার শিক্ষা হয় না অথচ যাহাতে আমার অধিকার আছে তাহাও আশানুরূপ বিকাশ লাভ করিতে পারে না। তাই বর্ত্তমান ছাত্রজীবনে এতাদৃশ অমনোযোগিতা পরিলক্ষিত হয়। একে রাশি রাশি পাঠ্য-পুস্তক তাহার উপর তৎসমুদায় হয় ত কাহারও কাহারও স্বভাবের সম্পূর্ণ প্রতিকূল বিষয়। এইরূপ অপ্রীতি

কর বিষয়ের আলোচনায় স্বাস্থ্যহানির আরও সম্ভাবনা। সাহিত্যানুরাগ যদি আমার স্বভাবগত হয় তাহা হইলে রাত্রদিন ধরিয়া সাহিত্য লইয়া পড়িয়া থাকিলেও তাহাতে আমার তেমন শারীরিক ক্ষতি করিবে না, যত ক্ষতি করিবে আমার প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা।

গাঁয়ো ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন যথা,—

Besides, nothing is so fatiguing as the irrational or the fastidious for the mind ceases to feel interest in it; and when no curiosity is felt effort alone remains, thus doubling the sense of tedium.

এতাদৃশ প্রতিকূলতা ও পাঠ্য-পীড়ন সত্ত্বেও পুরুষের পক্ষে আপনার জীবনের ধারা নির্ণয় করা সম্ভবপর হইলেও স্ত্রীজাতির পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে: কারণ জীবনে একটা বিশিষ্টতা রক্ষার অপেক্ষা স্ত্রীজাতির মাতৃত্বে পরিণত হওয়া সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। পরিণীত অবস্থাতেই স্ত্রীজাতির জীবনের আরম্ভ। স্ত্রীজাতির বিশেষত্ব অপেক্ষা সাধারণত্ব অধিকতর বাঞ্ছনীয়। অতএব বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রীজাতির সাধারণ শিক্ষাই ন্যায়সঙ্গত, বিবাহের পর পত্নী না হয় স্বামীর অবস্থা বুঝিয়া জীবনের গতি নির্দ্দেশ করিতে পারেন। কারণ, স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও স্ত্রীজাতির ঠিক মনের মত পতিলাভ দুর্লভ। রোমিও জুলিয়েতের ভিতর অগাধ প্রণয় এবং রূপ লিপ্সা ছিল কিন্তু উহাদের উন্মাদনা এত অধিক ছিল যে হয় ত বিবাহ হইলে তাহার অব্যবহিত পরেই ডাইভোর্স ব্যাপারও ঘটিয়া যাইত। Conventional ilss of our civilizationএর রচয়িতা Man Nordaw ও ইহার সমর্থন করেন। যেখানে যত রূপজ ঘনিষ্ঠতা, সেখানে তত বিচ্ছেদ;—পাশ্চাত্য জগতে এইরূপ ঘটনা প্রত্যহ ঘটিতেছে। যাহা হউক, প্রথম হইতে স্ত্রীজাতির সংসারোপযোগী সাধারণ বিষয়গুলি শিখিয়া রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। সর্ব্ব বিষয়ে স্বামীর সহধর্ম্মিনী হওয়াই স্ত্রীজাতির অভিপ্রেত। সহধর্ম্মিনী হওয়া অধীনতা নহে, সহযোগিতা—কর্ত্তব্যে সহায়তা। যেখানে একটা কর্ত্তব্যের উপর জাতীয় কল্যাণ এবং সুখস্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করিতেছে সেখানে স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই একটু মস্তক অবনত করিয়া চলিতে হয়—দণ্ডায়মান হইলে পরস্পর নির্ভরতা বিশেষ প্রয়োজন—স্বামী স্ত্রীতে নির্ভর করিয়া জাতীয় কল্যাণ বিধান করিবে তাহা বলাই বাহুল্য। Stendhal বলেন,—

"What an excellent adviser a man would find in his wife if she knew how think! The ignorant are the enemies of the education of women."

কিন্তু এই চিন্তাশীলতা ও শিক্ষাকে সুপথে না চালাইলে, শিক্ষা দ্বারা যেমন সুধা উত্থিত হয়, তেমনি গরলেরও উদ্গীরণ বড় কম হয় না। আমরা চাহি সুশিক্ষা, কেবল উচ্চ শিক্ষা নহে। এমন শিক্ষা আবশ্যক যাহাতে স্ত্রীজাতির অহমিকা বৃদ্ধি না পায়, অথচ স্ত্রীজাতির অন্তঃকরণকে মাজ্জিত করিয়া যথার্থ কল্যাণের দিকে প্রধাবিত করে। আমাদের উচ্চশিক্ষিতা বঙ্গমহিলাগণ কেবল অভিমান এবং অহঙ্কারেই স্ফীতা হইতেছেন উচ্চশিক্ষিতা হইয়া তাঁহারা কেবল fashion এবং fancyর ক্রীতদাসী হইয়া উঠিতেছেন। এইরূপ শিক্ষায় নারীজীবনের সফলতা

কোথায় ? পাশ্চাত্য জগতে ত উচ্চশিক্ষিতা-গণের সন্তানোৎপত্তি একটা আকস্মিক (accidental) ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। যে উচ্চশিক্ষা জীবনে কেবল কৃত্রিমতারই পোষক, আমরা তাহার একান্ত বিরোধী। যে অনুশীলনে একটা উপকারিতা বা সহযোগিতা নাই, আমরা তাহারও বিরোধী। আত্ম-তৃপ্তি এবং বিদ্বেষ-বুদ্ধিই জগতের এখন নিয়ামক হইয়াছে আন্তরিকতার অভাবে কি সমাজক্ষেত্রে কি শিক্ষাক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই হাহাকার উপস্থিত হইয়াছে।

গ্যাঁয়ো স্ত্রীজাতির শিক্ষার একটি সুন্দর পথ বলিয়া দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,

"But it should be clearly understood that we have not to teach her everything, but to fit her to learn everything, by giving her a taste for study and an interest in every subject."

কেবল স্ত্রীজাতি কেন ? গ্যাঁয়োর এই উপদেশটি আমাদের সুকুমারমতি যুবকদিগেরও অনুধাবনের বিষয়। আশা করি বঙ্গীয় অভিভাবকগণও গ্যাঁয়োর এই উক্তি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবেন।

কেবল ভারতবর্ষই নহে, জগতের সর্ব্বত্রই এখন শিক্ষা-সমস্যার যুগ। বিশ্ব-বিদ্যালয়-সমূহ কেবল পরীক্ষা লইয়া, এবং পাশ করাইয়াই খালাস, কিন্তু পড়ুয়ার জীবনে যে কি অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হইতেছে তাহার সমাধানে একান্ত বিমুখ। অর্থকরী বিদ্যার বিষময় ফল আজ জগতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পাশ করিয়া কোন বিভাগেই আর চাকুরী মিলিতেছে না, জীবনের লক্ষ্য স্থির হইতেছে না, জীবিকার্জ্জন ঘটিয়া উঠিতেছে না। বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহের কর্ত্তৃপক্ষগণ যে কি করিবেন তাহা ভাবিয়া পাইতেছেন না। অন্যোপায় না দেখিয়া তাঁহারা পাঠ্যপুস্তকের ভারই বৃদ্ধি করিতেছেন এবং পরীক্ষা কঠোর করিয়া তুলিতেছেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহ একটা জাতীয় ধ্বংসের সর্ব্ব-প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। পাশ্চাত্য-জগৎ একে উচ্চশিক্ষিত পুরুষদিগের দাবীই কুলাইয়া উঠিতে পারিতেছে না তাহার উপর সহস্র সহস্র পাশ করা নারীর আবেদন। এই পাশ্চাত্য কুহকে পড়িয়া আমরাও মজিতে বসিয়াছি।

বার্লিন "Gegenwart" শিক্ষিতা জর্ম্মাণ-মহিলাগণ সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

They are taught far too many useless things, dates, names and rules, which will be of no use to them later, while we neglect what is of incomparably geater inportance to form and develop the future mother." স্ত্রীজাতিকে "Walking encyclopaedias" সৃষ্টি করিয়া ইউরোপ আজ যৎপরোনাস্তি লজ্জিত ও অনুতপ্ত; আর আমরা এমনি অন্ধ সেই অনুতপ্ত ইউরোপেরই সভ্যতার ক্রীতদাস ও নকল-নবীশ হইবার জন্য লালায়িত। ঠিক আমাদিগের নীচাশয়তাপূর্ণ জীবনে ইউরোপ আজ ভবিষ্যতের চিন্তায় জাগরিত এবং আপনার কৃতকর্ম্মের অনুশোচনায় ম্রিয়মান আর আমরা তাহারই আবর্জ্জনা-রাশির অন্ধ অনুকরণে ব্যস্ত!

শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য্য আমরা এখনও ধরিতে পারি নাই। অর্থকরী এবং প্রতি-যোগিতামূলক বিদ্যায় এতাদৃশ বৈষম্য এবং

বিপ্লব আসিবেই। বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহে যতদিন না সহযোগিতার ভাব প্রবর্ত্তিত হইতেছে ততদিন হাহাকার উঠিবেই; বিশ্ব-বিদ্যালয় শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করে নাই কেবল কঠোর পরীক্ষা এবং গণ্ডীদ্বারা প্রকৃত শিক্ষার ক্ষেত্র উত্তরোত্তর আবদ্ধ ও দুর্গম করিয়াই তুলিতেছে। পাশ করিতে পারিলেই ছাত্রবৃন্দ আপনাদের জীবনের খেলা সাঙ্গ বলিয়া মনে করে, আর যেন তাহাদের জীবনের কোন উচ্চাভিলাষ নাই। ইহাই কি যথার্থ ছাত্র-জীবনের লক্ষণ? শিক্ষার শেষ কোথায়? শিক্ষা যে জীবনব্যাপী সাধনা। অর্থের সঙ্গে, পদমর্য্যাদার সঙ্গে প্রকৃত সরস্বতীর বরপুত্রগণের যে কোন সম্বন্ধ নাই।

"Lawyears and Doctors ride
And scholars foot it by their side"
(Barton's Anatomy of Meloncholy.)

কি পুরুষজাতিতে, কি স্ত্রীজাতিতে শিক্ষার একটি জেদ ধরাইয়া দিতে হইবে; তাহাই প্রকৃত শিক্ষাদান। এই শিক্ষার অগ্নি একবার জ্বলিতে আরম্ভ করিলে তাহার আর নির্ব্বাণ নাই। একমাত্র এইরূপ আগ্রহ-সৃষ্টি দ্বারা জীবন সংগঠিত ও পরিমার্জ্জিত হওয়া সম্ভব নচেৎ কেবল পাশ করা শিক্ষায় কোন ফলোদয়ই হইবে না। যে ছাত্রজীবন আপনার আগ্রহে আপনি পুষ্ট তাহাতে শিক্ষায় ক্লান্তিবোধ হইবে না—অভিনিবেশ আপনা হইতেই আসিবে। কর্ম্ম যেমন কাহারও পক্ষে পাশ, কাহারও পক্ষে লীলা—শিক্ষাও তেমনি কাহারও পক্ষে বন্ধন, কাহারও পক্ষে আনন্দের প্রস্রবন বা স্বাধীনতার আকাশ। কোন বিষয়ে জ্ঞানের বিস্তার অপেক্ষা আগ্রহের সৃষ্টি (to create a taste) করাই প্রকৃত শিক্ষা। এই জন্যই জ্ঞানের অপেক্ষা ভক্তি বড়। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের শিক্ষার স্বধর্ম্মও তাহাই ছিল। গুরুগৃহে অগ্রে ভক্তি শিক্ষা করিতে হইত। প্রত্যেক ছাত্র-জীবনে এই ভক্তিধর্ম্মের পুনরুদ্রেক করিতে হইবে তবে প্রকৃত শিক্ষার আমরা প্রবর্ত্তন করিতে পারিব। দৈহিক বৃদ্ধির একটা গণ্ডী (age limit) আছে কিন্তু আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের কোন গণ্ডী নাই—মানসিক শিক্ষা আজীবনব্যাপী। অগ্রে দৈহিকবল, নৈতিক বল বিধিমত অর্জ্জন কর। সেই হিন্দুর স্বধর্ম্ম ব্রহ্মচর্য্য, আচার, বিনয়—শিক্ষা কর, ভক্তি জাগাও, জীবনের গতি স্থির কর তবে যথার্থ শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইও। শিক্ষা ছেলেখেলার সামগ্রী নহে—শিক্ষা যে যোগ—চিত্তচাঞ্চল্যে—জীবনের স্থিরতাই হয় না—শিক্ষা কেমন করিয়া হইবে? যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ শিক্ষাও তাহাই। বর্ত্তমান ছাত্রছাত্রীগণ কি তদনুরূপ জীবন গঠিত করিতেছেন?

আমাদের ছাত্র-ছাত্রীগণ এবং তাঁহাদের উচ্চ ভাবাপন্ন অভিভাবকগণ গাঁয়োর নিম্নলিখিত মন্তব্যটি কি একবার ভাবিয়া দেখিবেন? প্রকৃত শিক্ষার স্বরূপ কি? গ্যাঁয়ো বলিতেছেন,—

"Less refinement in the ideas is needed, less erudition in the memory less history and literary theories, more moral and aesthetic ideas, more manual training, more energy in the will, more practical worldly wisdom, more talent for invention."

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের দেশে ছাত্র-ছাত্রীদিগকে যেরূপ শিক্ষা দীক্ষা

দেওয়া হইতেছে তাহা গ্যায়োর এই সারগর্ভ উক্তিগুলির সম্পূর্ণ বিপরীত। ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা যে রূপ আদর্শে পরিচালিত হইতেছি তাহা আমাদিগের সমাজের ভবিষ্যতের পক্ষে বাস্তবিকই শুভকর নহে। ইহা যেন আমরা মনে রাখি, সর্ব্ববিষয়ে উদ্দাম স্বাধীনতা-দানের অপেক্ষা, জীবনে সংযম (discipline) ও সুনিয়মের প্রতিষ্ঠা অধিকতর সমাজহিতকর। এই সংযমই হইতেছে জীবনের আসল শিক্ষা। ব্যক্তিত্ববাদের প্রবর্ত্তক মহামতি Kant ও তাঁহার Ueber Lädagogik এ এই discipline এর দিকেই সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য করিতে বলিয়াছেন। আমাদিগের শাস্ত্র বলিয়াছে ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ। অধ্যয়নকে তপস্যা বলা হইয়াছে, অধ্যয়ন কেবল পাশ করিয়া ডিপ্লোমা-প্রাপ্তি নহে, অধ্যয়নকে কার্য্যে পরিণত করাই ছাত্রজীবনের উদ্দেশ্য তজ্জন্যই গ্যায়ো বলিয়াছেন, less history and literary theories, more practical worldlly wisdom. সকল বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া ছাত্রজীবনের এই তপস্যাকে সবল করিতে হইবে। তপঃ দ্বন্দ্ব সহনম্। কিন্তু আমরা কি করিতেছি? সহিষ্ণুতা-শিক্ষার পরিবর্ত্তে আমরা জীবন-প্রারম্ভেই বিলাসিতা ও বাবু গিরির উপকরণ লইয়াই ছাত্র-ছাত্রীর সমক্ষে ধরিতেছি! ইহাই কি আমাদিগের সন্তানসন্ততির উপর কর্ত্তব্যপালন হইতেছে? স্ত্রীস্বাধীনতার দোহাই দিয়া আমরা আমাদিগের অন্তঃপুরে অবাধ বিলাসিতার প্রশ্রয় দিতেছি। ইহাতেই কি মাতৃস্বরূপা সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী জগন্মাতা নারীজাতির প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা করা হইতেছে? নারীজাতির দায়িত্ব কিরূপ? এবং নারীজাতির উপর আমাদিগের কর্ত্তব্যই বা কিরূপ? তাহা অগ্রে ভাল করিয়া বুঝিয়া যেন আমরা নারীজাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করি। বোধ করি, জগতে হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্মশাস্ত্র স্ত্রীজাতির প্রাপ্য ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যতটা নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়াছে, এই বিংশশতাব্দীতেও জগতের সভ্যতা-গর্ব্বিত অপর কোন জাতিই তদনুরূপ উদার ভাব দেখাইতে সক্ষম হয় নাই। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী," ইহাই হিন্দুর সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান বাণী। "জননীর পদতলেই স্বর্গরাজ্য অবস্থান করিতেছে" মুসলমানের কোরাণ ইহাই কহিয়া থাকে। পাশ্চাত্য জগৎ নারীজাতিকে প্রাচ্য-জগৎ অপেক্ষা কিরূপ অধিকতর মর্য্যাদা দান করিয়াছে তাহাই বিবেচ্য। স্বাধীনতা দান এবং মর্য্যাদা রক্ষণ এক কথা নহে। স্বাধীনতা দ্বারা কতকটা স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা রক্ষা হয়, তাহাও বিবেচ্য। তুলনা এবং বিচার করিয়া দেখিলে স্ত্রী-স্বাধীনতার অপেক্ষা স্ত্রীজাতির মর্য্যাদার মূল্য অধিক বলিয়া বোধ হয়। অবশ্য আমরা বলিতেছি না যে আমাদিগের নারীবিষয়ক রীতি-নীতিই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। প্রয়োজন এবং অবস্থানুসারে আমাদিগের নারীজাতির বিধিনিয়মের পরিবর্ত্তন আবশ্যক, কিন্তু তজ্জন্য আমরা পাশ্চাত্য স্ত্রীশিক্ষা-দীক্ষাকেও সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিতে একান্ত নারাজ।

নারীজীবনের প্রকৃত সার্থকতা অন্তঃপুরের শান্তি-স্থাপনে ও গৃহ-কর্ম্মে, নারীজীবনের প্রকৃত স্বাধীনতা সন্তান-পালনে। নারীর ষোলআনা প্রভুত্ব তাঁহার পুত্র কন্যার উপর, নারীর প্রভুত্ব তাঁহার স্বামীর উপর নহে। নারীজাতিই মনুষ্যসমাজের ভাগ্য-বিধাত্রী,

তাঁহার চরিত্রবলের দ্বারাই মানবজীবনের চরিত্র গঠিত হয়, তাঁহার সহৃদয়তার দ্বারাই মনুষ্যজীবনের যাহাকিছু সদ্‌গুণ বিকসিত হয়। আশৈশব স্ত্রীজাতি যেরূপ শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে গঠিত ও বর্দ্ধিত হন, উত্তর-কালে অবশ্যম্ভাবীরূপে নারী-অঙ্ক-বর্দ্ধিত সমাজ ও সেই শিক্ষা দীক্ষার ফলভোগ করে। বয়োপ্রাপ্ত অবস্থায় স্ত্রীজাতি যদি সমাজকে মহনীয় আদর্শে চালিত করিতে চাহেন তবে বাল্যকাল হইতেই নারীজাতিকে তাঁহাদের স্বভাবোচিত উচ্চ লক্ষ্য বক্ষে ধারণ করিয়া বর্দ্ধিত হইতে হইবে। ভোগের অপেক্ষা ত্যাগের দিকটা, আত্মসুখ অপেক্ষা পরার্থের দিকটা যেন তাঁহার খুলিয়া যায়। বাহিরের স্বাধীনতার অপেক্ষা তাঁহাদের অন্তরের স্বাধীনতা যে আরও অধিক তাহা যেন নারীজাতি ভুলিয়া না যান এবং তাঁহা-দের স্বাধীনতার লীলাভূমি যে অন্তঃপুর, ইহাও যেন তাঁহারা ভুলিয়া না যান। অন্তঃপুরের স্বাধীনতাই স্ত্রীজাতির বিধি-নির্দ্দিষ্ট বিধান। কারণ, গৃহকর্ম্মেই নারীর অপূর্ব্ব অধিকার—গৃহকর্ত্রীরূপেই সমগ্র বিশ্ব-কল্যাণের মাঝেই তাঁহাদিগের চিরকালের অধিষ্ঠান। নারীই সংসারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। একমাত্র নারীই এই সংসার-ভাণ্ডারের অধিকারিণী—নারীর এই গুরুতর দায়িত্বের কেহই প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। একমাত্র সহৃদয়তা এবং সতীত্বের দ্বারাই নারী এই বিশ্বসংসার শাসন করিতে পারেন। হৃদয়ের স্বাধীনতাই জগতে প্রকৃত স্বাধীনতা। সতীত্ব এবং লজ্জাই সেই স্বাধীনতা রক্ষার অমোঘ অস্ত্রদ্বয়। যে নারীর হৃদয়ে তেজ এবং চক্ষুলজ্জা বর্ত্তমান, তিনি নিজের স্বাধীনতা নিজেই রক্ষা করিতে পারেন, তাহাতে পুরুষের সহায়তার আবশ্যক হয় না। স্বামীহীনা বিধবা এই হৃদয়ের তেজ এবং চক্ষুলজ্জা দ্বারাই আপনাকে আপনি রক্ষা করিয়া যান। এই হৃদয়ের তেজ এবং চক্ষুলজ্জার অনুকুল করিয়া হিন্দু নারীর যথার্থ সুশিক্ষার পথ প্রস্তুত করিতে হইবে। সংসারে এইরূপ পবিত্র স্বভাবা নারীজাতির অনুশাসন দ্বারা যে সমাজশিশু পরিবর্দ্ধিত ও সুগঠিত হইবে তাহা একদিন যে জাতীয় কল্যাণে সিংহ-বিক্রম প্রকাশ করিবে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? ত্যাগ, সাহিষ্ণুতা, দুঃখ এবং সেবাই হইতেছে জাতীয় জীবন গঠনের কয়েকটি উপাদান—এই সব সমবেদনার দ্বারা যে মনুষ্যত্বের সৃষ্টি হইবে, এ জগতে তাহার তুলনা কোথায়? স্বাধীনতা এবং উচ্চশিক্ষার নামে আমরা স্ত্রীজাতির অবমাননা যেন আর নীরবে সহ্য না করি এবং যাহাতে আমাদিগের অন্তঃপুরে প্রকৃত শিক্ষার পুনঃ-প্রতিষ্ঠা হয় তদ্বিষয়ে যেন আর আমরা নিশ্চেষ্ট না থাকি। স্ত্রীজাতির প্রকৃত শিক্ষা এবং সম্মানরক্ষা ব্যতীত আমাদিগের হৃত-সর্ব্বস্ব সমাজের আর কল্যাণ নাই।

শ্রীঅকিঞ্চন দাস।

পরমাণুবাদ

(*Atomic theory*).

ডিমক্রিটাস প্রমুখ কতিপয় গ্রীক পণ্ডিত বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক পরমাণুবাদের অগ্রনেতা। ইহাঁরা জগৎ ব্যাপারটাকে দেশ (space) ও পরমাণু দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে অসংখ্য পরমাণু অনন্ত শূন্যে ঘুরিতে ঘুরিতে অনন্ত বস্তুর সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই পরমাণুগুলি নিশ্চল, নিষ্ক্রিয় নহে; ইহারা শাশ্বত, নিত্যবস্তু। প্রকৃত প্রস্তাবে সৃষ্টি বা বিনাশ বলিয়া জগতে কোন পদার্থ নাই; সৃষ্টি কেবল অবয়বের ঘনসন্নিবেশ, সংযোগ মাত্র; ধ্বংস কেবল এই অবয়ব সংযোগের বিয়োগ মাত্র। বিশ্বজগতে জড় ও শক্তির পরিমাণ অপরিবর্ত্তনীয়, হ্রাসবৃদ্ধি রহিত। এই পরমাণুনিচয় সমজাতীয় (homogeneou's), কেবল আকৃতি, বিন্যাস ও সংস্থান সম্বন্ধে পরস্পর বিভিন্ন। ইহারা চলিষ্ণু হইয়া সকল বস্তু আরম্ভ করে। ইহাদিগকে চলিষ্ণু করে কে? ইহার উত্তরে ইহাঁরা বলেন,—পরমাণু স্বতঃই চলিষ্ণু। অনন্ত শূন্যে পড়িতে পড়িতে অপেক্ষাকৃত ভারি পরমাণুগুলি দ্রুততর বেগে পড়িতে থাকায় অপেক্ষাকৃত লঘু পরমাণুগুলির গায়ে ধাক্কা দেয়। এই ধাক্কা পার্শ্বদেশে লাগিয়া উহাদের ঘূর্ণগতি উৎপন্ন করে;—এই গতিই জগৎ রচনার প্রারম্ভ। (১)

এই প্রকারে পুরাকালে ভারতের বাহিরে কতিপয় চিন্তাশীল ব্যক্তি নাস্তিক্য ও পরমাণুবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন; এবং সেই ভিত্তি অবলম্বন করিয়াই বর্ত্তমান সংস্কৃত বৈজ্ঞানিক পরমাণুবাদের উৎপত্তি।

আমাদের দেশে চার্ব্বাক, গোতম ও কণাদ প্রভৃতি দার্শনিকেরাও পরমাণুবাদের প্রচারক। তবে ডিমক্রিটাস ও চার্ব্বাক যেমন তাঁহাদের পরমাণুবাদকে নাস্তিক্যে পরিসমাপ্ত করিয়াছেন, গোতম কণাদ সে প্রকার করেন নাই; ইহাঁরা পরমাণু স্বীকার করিলেও তাহাদিগকে স্বতন্ত্র, স্বতঃপ্রবৃত্ত বলিয়া গ্রহণ করেন নাই; পরন্তু তাহাদের ক্রিয়া ঈশ্বরেচ্ছা পরতন্ত্র, ইহা তাঁহারা প্রমাণ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাঁদের পরমাণ দার্শনিক তত্ত্ব (metaphysical in their nature), আর ডিমক্রিটাসের পরমাণু অনেকটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব (scientific in their nature)। ইহাঁদের পরমাণুবাদ আলোচনার পূর্ব্বে ডিমক্রিটাস প্রভৃতির পরমাণুবাদটি বিচার করিয়া দেখা যাউক।

১। বলা হইয়াছে পরমাণুগুলি অনন্তশূন্যে অনাদিকাল হইতে পড়িতে পড়িতে পরিশেষে দলবদ্ধ হইয়াছে। এখানে জিজ্ঞাস্য, পতন শব্দের অর্থ কি? নিম্নাভিমুখী গতিই পতন-শব্দবাচ্য। কিন্তু অনন্তশূন্যে ঊর্দ্ধাধঃ বিভাগ নিষ্পত্তির উপায় কি? কোন একটা বিশেষ অবস্থান আশ্রয়পূর্ব্বক দিক বিভাগ সিদ্ধ হয়। অনন্তশূন্যে সে অবস্থানটি কি? ইহা নির্ণয়

1. In the eternal fall through infinite space, the greater which fall more quickly, strike against the lesser, and lateral movements and vortices that thus arise are the commencement of the formation of words. [Lange's History of Materialism.]

করিতে না পারিলে দিক্-বিভাগই সপ্রমাণ হয় না। দিকবিভাগ অবধারিত না হইলে, পতন, উৎগমন প্রভৃতি ক্রিয়ার কোন অর্থ প্রতীত হয় না।

২। বলা হইয়াছে পরমাণুগুলি সমজাতীয়; কিন্তু তাহা নহে, উহারা বিভিন্ন জাতীয়। অক্সিজেনের পরমাণু ও হাইড্রজেনের পরমাণু এক জাতীয় নহে, ইহা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত।

৩। বলা হইয়াছে পরমাণুগুলির মধ্যে ছোট বড়, লঘু গুরু ভেদ আছে। কিন্তু পরিমাণ-বৈষম্য ব্যতীত এ প্রকার হইতে পারে না। পরিমাণবৈষম্য স্বীকার করিলে উহাদের বিভাজ্যতাও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করিতে হয়। কেন না পরিমাণ স্থানব্যপ্তির পরিচায়ক। পক্ষান্তরে যদি উহাদের বিভাজ্যতা স্বীকার্য্য হয়, তবে উহাদের মৌলিকতার ব্যাঘাত হয়—ইহাও সপ্রমাণ হইতেছে।

৪। গুরু পরমাণুগুলি অপেক্ষাকৃত দ্রুত-বেগে পতিত হয় ও লঘু পরমাণুগুলি অপেক্ষাকৃত ধীরবেগে পতিত হয়; সুতরাং বুঝা যাইতেছে গুরু পরমাণুগুলি উর্দ্ধ দেশে ও লঘু পরমাণুগুলি অধোদেশে অবস্থিত। কেন না উহার বিপরীত অবস্থায়, গুরু পরমাণুগুলি পতনকালে লঘু পরমাণুগুলির গায়ে ধাক্কা দিতে পারে না। কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি, সমস্ত শূন্যের উর্দ্ধাধঃ বিভাগ সপ্রমাণ নহে। অতএব গুরু লঘু পরমাণু-গুলির পতনাদি অব্যাখ্যাত রহিয়া যাইতেছে। আরও দ্রষ্টব্য। প্রকৃত প্রস্তাবে লঘু পরমাণু-গুলিই উর্দ্ধদেশে এবং গুরুপরমাণুগুলি অধোদেশে থাকে, ইহাই নৈসর্গিক নিয়ম। এ নিয়ম লঙ্ঘন না করিলে গুরু লঘু পরমাণুর ঐ প্রকার সংস্থান নির্দ্দেশ অসম্ভব।

৫। নির্ব্বিশেষ-শূন্যের বাধা দিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং পরিমাণগত তারতম্য সত্ত্বেও এবম্বিধ শূন্যের মধ্য দিয়া পরমাণুগুলি সমান বেগেই পড়িবে। পতন বেগের তারতম্য পরিবাহনের (medium) ঘনত্বের তারতম্যের উপর নির্ভর করে; কিন্তু আকাশ যখন সর্ব্বত্র নির্ব্বিশেষ বা সমঘন, তখন পড়ন্ত পরমাণুগুলি সমান বেগেই পড়িবে। আর পড়ন্ত পরমাণুর গতি সরল রেখানুগামী। সুতরাং সরল রেখায় ও সমান বেগে পড়িতে থাকিলে পরমাণুগুলি, লঘু গুরু হইলেও কদাচ পরস্পর সংঘাত বা সম্বদ্ধ হইতে পারে না। সরল রেখা হইতে কিঞ্চিৎ এদিক ওদিক না সরিলে তাহাদের পারস্পরিক সংঘর্ষই অসম্ভব। কোন একটা বাহ্য শক্তিও স্বীকার করিতে ইঁহারা অনিচ্ছুক। সুতরাং কোন মতেই কেবল পরমাণু দ্বারা জগৎ রচনা সপ্রমাণ হইতেছে না।

এক্ষণে অস্মদ্দেশীয় পরমাণুবাদের আলো-চনা করা যাউক। আমাদের দেশে গৌতম ও কণাদ পরমাণুবাদের প্রতিষ্ঠাতা। তবে তাঁহারা তদতিরিক্ত আরও একটা শক্তি স্বীকার করেন। কেবল পরমাণু দ্বারা সৃষ্টি-রহস্য ব্যাখ্যা করেন নাই। তাহাদের পরমাণু সিদ্ধির যুক্তি এই প্রকার "যৎসাবয়বং তৎ স্বপরিমাণাদণুতরপরিমাণসংযোগসচিব স্বসমাণজাতীয়ানেকদ্রব্যারব্ধং দৃষ্টং। যথা তন্ত্বারব্ধ পট ইতি। এবং যৎকিঞ্চিৎ সাবয়বং দ্ব্যণুকাদি কার্য্যং তৎসর্ব্বমেবম্বিধদ্রব্যারব্ধং ইতি। অতোঽত্যন্তাণুপরিমাণা নিরবয়বাঃ সংযোগসচিবাঃ কার্য্যেন পার্থিবত্বাদিনা সমানজাতীয়া নিত্যা বহুবশ্চ পরমাণবঃ সাবয়ব দ্রব্যানামরম্ভকাঃ সিদ্ধাঃ।" পুনশ্চ—"অণুপরিমাণতারতম্যং ক্বচিদ্বিশ্রান্তং পরিমাণ-তারতম্যত্বাৎ মহৎপরিমাণতারতম্যবৎ।

ইত্যনুমানাগ্নহত্বপকর্ষ বিশ্রান্তিভূমিত্বেনাণূনাং পরতো বিভাগাসম্ভবাৎ।" ৫

কেহ কেহ বলেন, "যতঃ পরং ন বিভাগঃ স এব নিরবয়বঃ পরমাণুঃ।" দেখিতে পাওয়া যাইতেছে ন্যায় বৈশেষিকের পরমাণু জ্যামিতির বিন্দুর সহিত সমধর্ম্মাক্রান্ত। ইহাদের অবস্থিতি আছে কিন্তু অবয়ব অর্থাৎ অংশ নাই। ইহাঁরা বলেন বিভাগের যদি একটা বিশ্রান্তিস্থল স্বীকার না করা যায়, তবে অনবস্থা-প্রসঙ্গ হয়। এবং সুমেরু সর্ষপের তুল্যত্ব স্বীকার করিতে হয়। একটি মাত্র সর্ষপকে যদি অনন্তকাল বিভাগ করা সম্ভব হয়, তবে বুঝিতে হইবে উহা অনন্ত অবয়বারব্ধ। সেই প্রকারে সুমেরু শৈলকেও অনন্তকাল বিভাগ করা যাইবে; অতএব তাহাও অনন্তাবয়ব আরব্ধ, ইহাও স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইতেছে। সুতরাং সর্ষপ ও সুমেরু—এই উভয় দ্রব্যেই অনন্ত অবয়ব স্বীকার্য্য হইতেছে। যদি তাহাই স্বীকার্য্য হয়, তবে উভয়ই তুল্য হউক। কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষ বাধিত। এই সকল কারণে পরিমাণ বিভাগের একটা বিশ্রান্তিস্থল অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়; সেই বিশ্রান্তিস্থলই পরমাণু।

দেখিতে পাওয়া যায় সাংখ্যকার ও বৈদান্তিকগণ এই পরমাণুবাদ গ্রহণ করেন নাই; পরন্তু তাহার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। সাংখ্যকারের মতে পরমাণু নিত্য দ্রব্য নহে; উহা প্রকৃতির কার্য্য। প্রকৃতি ও পুরুষ—সাংখ্যকারের মতে এই দুই মূলতত্ত্ব। ইহার মধ্যে জাগতিক সর্ব্বপ্রকার বিকারই প্রকৃতির পরিণাম। পরমাণু প্রভৃতি মৌলিক তত্ত্ব নহে।

বৈদান্তিকগণ আরও তীব্রভাবে পরমাণুবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের যুক্তিগুলিই প্রদর্শিত হইতেছে। শঙ্কর বলেন ন্যায় বৈশেষিকের স্বীকৃত পরমাণু পরস্পর সংযুক্ত হইবার যোগ্য নহে; অতএব নিরর্থক। এতাদৃশ পরমাণু স্বীকারে লাভ কি? যদি উহারা পরস্পর মিশিয়া দ্রব্যের আরম্ভকই না হইতে পারিল, তবে মিছামিছি তাহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিব কেন? কেন তাহারা পরস্পর সংযুক্ত হইতে পারে না, তাহা বলা হইতেছে।

"সংযোগশ্চাণোরণ্বন্তরেণ সর্ব্বাত্মনা বা স্যাদেকদেশেন বা, সর্ব্বাত্মনা চেদুপচয়ানুপপত্তেরণুমাত্রত্ব প্রসঙ্গো দৃষ্টবিপর্য্যয় প্রসঙ্গশ্চ। প্রদেশবতো দ্রব্যস্য প্রদেশবতা দ্রব্যান্তরেণ সংযোগস্য দৃষ্টত্বাৎ। একদেশেন চেৎ সাবয়বত্ব প্রসঙ্গঃ। পরমাণূনাং কল্পিতাঃ প্রদেশাঃ স্যুরিতি চেৎ কল্পিতানামবস্তুত্বাৎ, অবস্ত্বেব সংযোগ ইতি বস্তুনঃ কার্য্যাস্যাসমবায়িকারণং ন স্যাৎ, অসতি চাসমবায়ি কারণে দ্ব্যনুকাদি কার্য্য দ্রব্যং নোৎপদ্যতে।" ১।

আপত্তিটি একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছি। বলা হইয়াছে পরমাণুর অবস্থিতি (position) আছে, কিন্তু অবয়ব (parts) নাই। এখানে অবস্থিতি অর্থে অবশ্যই দৈশিক অবস্থিতি (spatial position) বুঝিতে হইবে। এক্ষণে দৈশিক অবস্থিতির অর্থ কি, জিজ্ঞাসা করিলে বলা যাইতে পারে, দৈশিক ব্যাপ্তিই (extension) উহার অর্থ। কিন্তু ব্যাপ্তিত্ব বলিতেই বিভাগশীলত্ব পাওয়া যায়। সুতরাং যাহা বিভাজ্য তাহা পরমাণু শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। কেন না তাহা অবয়ব-

৫। অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধিঃ—প্রথম মুদ্গর প্রহারঃ।

১। বেদান্তদর্শনভাষ্য—২য় পাঃ অঃ, ১২

সমষ্টি হইয়া পড়ে, মৌলিক তত্ত্ব হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, যদি এই ব্যাপ্তিত্ব নিষিদ্ধ হয়, তাহা হইলে বহু ব্যাপ্তিহীন পরমাণুর সংযোগে কোন প্রকার ব্যাপ্তি বা দৈশিক কারণে পাওয়া যায় না। প্রত্যেক পরমাণুই—ব্যাপ্তিহীন, সুতরাং তাহাদের বহুর সংযোগও ব্যাপ্তিহীন হইবে। একটি শূন্যও যদি সংখ্যাবাচক না হয়, তবে শত সহস্র শূন্য সংযোগেও সংখ্যার উৎপত্তি হইবে না, ইহা বুঝা যাইতেছে।

বৈদেশিক কোন দার্শনিকও ঠিক এই কথা বলিয়াছেন; তাহা পাঠকের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করিলাম। ২।

"The assumption of a plurality of extended elements—even if they are conceived as infinitely small—can never be a final assumption for thought. We must give up either the unity of the atoms or their extension; in an extended atom every effect requires time, and is propagated from part to part; hence these parts would be more fundamental unities than the atoms themselves. If the atomic concept is to be a final one we must exclude all extension and conceive atoms as centres of force, each of which...... are starting points for the working of the original substance."

শঙ্করের অন্য আপত্তি পরমাণুর স্বভাব লইয়া। অপিচাণবঃ প্রবৃত্তিস্বভাবা বা নিবৃত্তিস্বভাবা বা উভয়স্বভাবা বা অনুভয়স্বভাবা বাভ্যুপগম্যেরন্ গত্যন্তরাভাবাৎ চতুর্দ্ধাপি নোপপদ্যন্তে। প্রবৃত্তিস্বভাবত্বে নিত্যমেবপ্রবৃত্তের্ভাবাৎ প্রলয়াভাবপ্রসঙ্গঃ। নিবৃত্তিস্বভাবত্বেঽপি নিত্যমেব নিবৃত্তের্ভাবাৎ সর্গাভাব প্রসঙ্গঃ। উভয় স্বভাবত্বঞ্চ বিরোধাৎ অসমঞ্জসং, অনুভয় স্বভাবত্বে তু নিমিত্তবশাৎ প্রবৃত্তি নিবৃত্ত্যোরভ্যুপগম্যমানয়োরদৃষ্টাদের্নিমিত্তস্য নিত্যসন্নিধানান্নিত্য প্রবৃত্তি প্রসঙ্গঃ, অতন্ত্রত্বেঽপ্যদৃষ্টাদেনিত্যপ্রবৃত্তিপ্রসঙ্গঃ, তস্মাদনুপপন্নঃ পরমাণুকারণবাদঃ। †

অর্থাৎ পরমাণুর চারি প্রকার স্বভাব কল্পনা করা যাইতে পারে কিন্তু সেই চারি প্রকারের কোন প্রকারই যুক্তিসহ বলিয়া বোধ হয় না। প্রথমতঃ যদি পরমাণু প্রবৃত্তিস্বভাব হয়, তবে কি হয়? প্রবৃত্তি স্বভাব শব্দের অর্থ কি দেখা যাউক। প্রবৃত্তি অর্থে গতিপ্রবণতা (tendency বা movement)। স্বভাব অর্থে স্ব-ভাব (essence, nature)। কিন্তু প্রবৃত্তি কোন দিকে? সংহতি,-সমবায়,-সংযোগের দিকে। সুতরাং প্রবৃত্তিস্বভাব অর্থে—সমবায় অভিমুখী গতি যাহার স্বভাব (whose essence it is to tend twoards integration) ইহাই প্রকাশিত হইতেছে। এক্ষণে যে বস্তুর স্বভাব কেবল সংযোগের দিকে, তাহাদের সংযোগ সুতরাং অনিবার্য্য। কিন্তু পরমাণুর এবম্বিধ স্বভাব স্বীকার করিলে প্রলয় (disintegration) অসম্ভব হইয়া উঠে। বস্তুর ধ্বংস সিদ্ধ হয় না। অথচ জগতে বস্তুর সংযোগ বিয়োগ, সৃষ্টি ধ্বংস নিয়ত প্রত্যক্ষের বিষয়।

2. Hoffding's History of Philosophy —p. 515, Vol. II.
† বেদান্ত দর্শনভাষ্য—২য় অঃ ২য় পাঃ ১৪

দ্বিতীয়তঃ পরমাণু যদি নিবৃত্তিস্বভাব হয় অর্থাৎ যদি কেবল বিচ্ছিন্ন হওয়াই ইহাদের স্বভাব হয়, তাহা হইলে সৃষ্টির পরিবর্ত্তে কেবল নিয়ত ধ্বংসই দৃষ্ট হইবে। কিন্তু জগতে সৃষ্টি ও ধ্বংস উভয়ই নিয়ত দৃষ্ট হইয়া থাকে।

তৃতীয়তঃ যদি পরমাণুতে যুগপৎ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি স্বীকার করা যায় তাহা স্ববিরোধী। বিরোধী ধর্ম্মের একত্র সন্নিবেশ অসম্ভব। চতুর্থতঃ যদি পরমাণুতে প্রবৃত্তি নিবৃত্তির অভাবই স্বীকার করা যায় অর্থাৎ যদি পরমাণু জড়স্বভাব (absolutely inert) হয়, তাহা হইলে তাহাদের সংযোগের জন্য অবশ্যই নিমিত্তান্তর স্বীকার করিতে হয়। যাহা স্বয়ং নিশ্চল, তাহার চাঞ্চল্য পরতন্ত্র, এ সিদ্ধান্ত দুর্ব্বার হইয়া পড়ে। এবং যাঁহারা জড়াতিরিক্ত সত্তায় সন্দিহান, তাঁহারা কদাচ পরমাণুর পারস্পরিক সম্বন্ধ বা মিলন ব্যাখ্যা করিতে পারিবেন না।

অবশ্য বৈজ্ঞানিকেরা পরমাণুতে যুগপৎ আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সন্নিবেশ স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এ সিদ্ধান্ত কতদূর বিচারসহ তাহা ক্রমশঃ পরিদৃষ্ট হইবে।

পরমাণুর অবস্থিতি আছে কিন্তু পৃথুতা (extension) নাই, ইহা স্বীকার করিলে অন্য আর এক প্রকার আপত্তি উত্থিত হইতে পারে। তাহা এই :—ইহা প্রথমতঃ স্ববিরোধী; দৈশিক অবস্থিতির অর্থই পৃথুতা, দ্বিতীয়তঃ, যদি পরমাণুর পৃথুতা বা ব্যাপ্তি না থাকে, তাহা হইলে, পরমাণুও আকাশের তুল্যত্ব প্রসঙ্গ হয়। কেন না আকাশের যেমন দিকদেশকালাবচ্ছেদ নাই, পরমাণুরও তেমনি দিকদেশাকালাবচ্ছেদ নাই, ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে। পক্ষান্তরে, এবম্প্রকার পরিচ্ছেদ স্বীকার করিলে, পরমাণুর নিরবয়বত্বের ব্যাঘাত ঘটে।

অন্য আপত্তি "রূপাদিমত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ।" * অর্থাৎ পরমাণুর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ থাকায় উহা পরমকারণাপেক্ষা স্থূলতর, সুতরাং বিনাশশীল। আর যদি উহারা অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অগন্ধ বলিয়া স্বীকৃত হয়, তবে উহাদের ভৌতিকত্বের হানি হয়।

উপরি উক্ত যুক্তি বলে শঙ্করপ্রমুখ বৈদান্তিকবৃন্দ পরমাণুবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

অধুনা বৈজ্ঞানিকগণের পরমাণুবাদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে। বৈজ্ঞানিকের পরমাণুও আনুমানিক পদার্থ,—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহে। এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় পরমাণুবাদ একপ্রকার পরিত্যাগই করিয়াছেন। আমি নিজে বৈজ্ঞানিক নহি, বিজ্ঞানের কোন প্রামাণিক গ্রন্থও অধ্যয়ন করি নাই; সুতরাং বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত বিষয়ে আলোচনা করা আমার ধৃষ্টতা মাত্র। যাঁহারা এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা James Ward কৃত Naturalism and Agnosticism নামক উপাদেয় গ্রন্থখানি পাঠ করিলে উপকৃত হইতে পারেন। আমি যাহা কিছু বলিব তাহা প্রধানতঃ সেই গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াই বলিব।

প্রথমতঃ পরমাণুগুলি যদি কঠিন বস্তু হয়, তাহা হইলে তাহাদের সংঘর্ষজনিত শক্তির কি ফল হয় দেখা যাউক। পরমাণুগুলি যখন কঠিন, তখন তাহাদের আকৃতি অচ্যুত; তাহারা স্থিতিস্থাপকও নহে, অস্থিতিস্থাপকও

* বেদান্তদর্শন ভাষ্য—২য় অঃ ২য় পাঃ ১৫

নহে। যাহাদের আকৃতির বিচ্যুতি ঘটে না, তাহারা কদাচ ঐ দুই ধর্ম্ম বিশিষ্ট হইতে পারে না। অতএব যদি পরমাণুগুলি কঠিন বলিয়াই স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে এবম্বিধ পরমাণুদ্বয়ের যখন সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তখন তাহার ফল কি দাঁড়ায়? স্থূল পিণ্ডদ্বয়ের সংঘর্ষে, সংঘর্ষজনিত শক্তি পিণ্ডদ্বয়ের বহিরাকৃতি পরিত্যাগপূর্ব্বক উহাদের অবয়বের কম্পনরূপে সংরক্ষিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ সংঘর্ষে দৃশ্য গতিশক্তি (kinetic energy) গূঢ় শক্তিরূপে পর্য্যবসিত হয় (converted into potential energy)। এক্ষণে পরমাণু যখন নিরবয়ব, তখন তাহাদের সংঘর্ষজনিত গতিশক্তির দশা কি হইবে? অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, এই গতিশক্তি (kinetic energy) তুল্য পরিমাণ প্রচ্ছন্ন-শক্তি উৎপন্ন না করিয়াই বিলুপ্ত হইয়াছে। (?)

দ্বিতীয়তঃ। যদি পরমাণুগুলি স্থিতিস্থাপক না হয়, তাহা হইলেও ঐ প্রকার আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। Ward বলেন—

"If we decide to regard the atoms as non-elastic, then, when two collide, we must conclude that kinetic energy disappears without an equivalent amount of potential energy taking its place."

তৃতীয়তঃ। পরমাণু যদি স্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে তিনি বলেন—" If we prefer to regard them as elastic, we are then compelled to infer that their motions are instantaneously reversed, in other words, a finite momentum is produced in no time; And if we combine the two, we combine these consequences; both of which contradict our fundamental axioms."

প্রকৃত কথা এই যে পরমাণুর কাঠিন্য প্রভৃতি ধর্ম্ম বস্তুমাত্রার পারস্পরিক শক্তির আদান-প্রদান জনিত (due to dynamical transactions between masses)। ভৌতিক বস্তুর গুণাবলী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, তাহারা সমস্তই শক্তিবাচক। যাহাকে স্থানব্যাপ্তিত্ব বলা যায়, তাহাও শক্তির বোধক। তাই বৈজ্ঞানিক মনস্বীবৃন্দ অধুনা জড়তত্ত্বকে শক্তিতত্ত্বে বিলীন করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। রসায়নবিদেরা এতকাল সত্তর হইতে আশিটি বিভিন্ন জাতীয় ভূতের মৌলিকত্ব স্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন। যথাসম্ভব উত্তাপ প্রয়োগে যে সকল ভূতকে বিচ্ছিন্ন করা যায় নাই, রাসায়নিকেরা তাহাদিগকেই মৌলিক ভূত (element) নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে পরীক্ষায় জানা গিয়াছে উত্তাপের আতিশয্যে তথাকথিত অনেক মৌলিক ভূতই স্বকীয় উপাদানে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। পরীক্ষকদিগের পরীক্ষাপ্রণালী বর্ত্তমান স্থলে লিপিবদ্ধ করা নিষ্প্রয়োজন।—তবে এ সম্বন্ধে কতিপয় প্রধান প্রধান মনস্বীর সুচিন্তিত অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রসিদ্ধ ভূতবিদ্যাবিৎ Sir Oliver Lodge বলেন :—

"For although it is now pretty well-known that atoms of matter are not the indestructible and immutable things they were once thought (seeing that, although we do not know how to break them

up, they are liable every now and then themselves to break up or explode, and so resolve themselves into simpler forms), yet it can be granted that these simpler forms are likewise themselves atoms, in the same sense, and that if they break up they will break up likewise into atoms: or ultimately, it may be, into these corpuscles or electrons or electric charges, of which one plausible theory conjectures that the atoms of matter are really composed." *

মহামতি Sir William Crookes এর মতে—In the centres of the hottest stars all elements are dissociated. But dissociated into what? Into that out of which they were all evolved, i.e. into prothyle—the undifferentiated basis of chemical evolution, the formless staff which is the origin of all substances. † বিজ্ঞানবিশারদ Lord Kelvin's এর মতে বিশ্বব্যাপী সমঘন একটা দ্রব পদার্থের ঘূর্ণীই পরমাণু (the vertex motion of an ultimate homogeneous fluid). ‡

ধীমান Boscovich এর মতে—atoms were strictly masspoints; occupation of space with him was due entirely to substantial forces, not to the absolute hardness of primitive particles; and all strictly mechanical action of the push and press kind was replaced by attractions or repulsions acting at a distance." তাঁহার মতে পরমাণু শক্তির কেন্দ্রস্থল (centres of force) ব্যতীত আর কিছুই নহে। §

যাহা হউক Clerk Maxwell প্রমুখ কতিপয় প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক কিন্তু পরমাণু বা ত্রাসরেণুকে মৌলিক তত্ত্ব ও অবিনশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন। Maxwell বলেন—"The same kind of molecule, say that of hydrogen, has the same set of periods of vibrations, whether we procure the hydrogen from water, from coal, or from meteoric iron...... whether in Sirius or in Arcturus (it) executes its vibrations precisely the same time." "Though in the course of ages catastrophes have occured, and may yet occur in the heavens, though ancient systems may be dissolved and new systems evolved out of their ruins; the molecules out of which these systems are built—the foundation stones of the material universe—remain unbroken and unworn" ¶

অর্থাৎ বিশ্বান্তর্গত যাবতীয় দ্রব্যোৎপত্তির উপাদানীভূত ত্রাসরেণুগুলি (molecules)

* Life and Matter.
† Schiller's Riddle of the sphinx.
‡ Naturalism and Agnosticism.
§ Collected Papers of Clerk Maxwell Vol II.—pp. 361 ff.
¶ Collected Essayes—vol. I. pp. 79 f.

অবিনশ্বর। সকল দ্রব্য বিধ্বস্ত হইয়া গেলেও ইহাদের স্বরূপের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটে না। অন্যকথায় ইহারা "সদকারণবৎ নিত্যং।"

পাঠক Maxwell এর মত অবগত হইলেন, এখন এ সম্বন্ধে Huxleyর মত গ্রহণ করুন। Huxley বলেন—The idea that atoms are absolutely ingenerable and immutable "manufactured articles" stands on the same sort of foundation as the idea that biological species are "manufactured articles" stood thirty years ago; and the supposed constancy of the elementary atoms, during the enormous lapse of time measured by the existence of our universe, is of no more weight against the possibility of change in them...than the constancy of species in Egypt since the days of Rameses or of Cheops is evidence of their immutability during all past epochs of the earth's history. It seems safe to prophesy that the hypothesis of the evolution of the elements from a primitive matter will, in future, play no less a part in the history of science than the atomic hypothesis, which, to begin with, had no greater, if as great, an emperical foundation."*

বৃহস্পতিকল্প Herbert Spencer বলেন :—

"We come down there finally to force, as the ultimate of ultimates. ......Matter and Motion, as we know them, are differently conditioned manifestations of force.······ Matter as opposing our muscular energies being immediately present to conciousness in terms of force; and its occupancy of space being known by an abstraction of experiences originally given in terms of force; it follows that forces standing in certain correlations, form the whole content of our idea of Matter." †

উপরি উদ্ধৃত প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিকদিগের সিদ্ধান্ত হইতে বুঝা যায়, জড় ও পরমাণুর ধারণা এমনই পরিবর্ত্তিত হইয়া সাংখ্যের প্রকৃতির সন্নিহিত হইতে বসিয়াছে।

স্থানান্তরে মহামতি Maxwell নিজেও ত্রাসরেণুর নশ্বরতা সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছেন। সেখানে তিনি বলিতেছেন—

"On the other hand, the exact equality of each molecule to all others of the same kind gives it, as Sir John Herschel has well said, the essential character of a manufactured article, and precludes the idea of its being eternal and self-existent."

মহামতি আর্ণেষ্ট হিকেলের শিষ্য Mecabe বলেন —

* Collected Essays—vol. I. p.p. 79.

† First Principles—pp. 167, 169.

"The astro-physicist finds a transitional matter in the heavenly bodies and now the terrestrial physicist announces that in his experiments with the new element, radium, he witnesses the actual breakdown of the ponderable atom into a form of matter he associates with electricity. In fact every modern theory of the atom implies its origin from ether or their common origin."

যাহা হউক এতকাল অণু পরমাণুগুলি যে মৌলিকত্বের আসন পাইয়া আসিতেছিল, বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহারা সেই আসন হইতে ভ্রষ্ট হইতে বসিয়াছে। অস্মদ্দেশীয় পূর্ব্বাচার্য্যেরা ভূতরাশিকে মাত্র পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। এবং সেই পাঁচ জাতীয় ভূতই যোগ বিয়োগে এই বিশ্ববৈচিত্র্য গঠন করিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন ভৌতিক জগৎকে বিশ্লেষণ করিলে, তাহার উপাদানীভূত এই পাঁচ জাতীয় ভূতই পাওয়া যায়। এবং সেই পঞ্চভূতের নাম—ক্ষিত্যপতেজ মরুৎব্যোম। বৈজ্ঞানিকবৃন্দের গবেষণায় সেই পঞ্চভূতের স্থলে প্রায় আশীতি প্রকার মৌলিক ভূত আবিষ্কৃত হইল। কালবশাৎ জগতে কতই না পরিবর্ত্তন ঘটে! অধুনাতন ভূতবিজ্ঞানবিদগণ, সাংখ্যাচার্য্যের ন্যায়, এই অশীতি জাতীয় ভূতকে একমাত্র মৌলিক অব্যক্ত পদার্থের পরিণাম বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তবে রাসায়নিকেরা যে অণু লইয়া লীলাখেলা করেন সেগুলি কি? এবং পারমাণবিক গুরুত্ব বলিয়া যে একটা জিনিষ আছে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাই বা কি?

রাসায়নিকের অণু (molecule) সম্বন্ধে James Ward কি বলেন শ্রবণ করুন। তিনি বলেন:—

Chemical molecules are not presented realities: in other words, a molecule—say of oxygen—is not a small body which is known to exist as an individual nitrogen, an individual of another definite species of small body. Individual chemical molecules are not known as rubies or palms are known, i.e., as instances of species and distinct from diamonds or cedars, instances of other species. The chemical molecute is a hypothetical conception. Such things may exist or the hypothesis would not be ligitimate. Whether they actually exist or not they, at any rate, serve, like certain legal and commercial fictions, to facilitate the business of scientific description. 1

If we ask for the evidence on which this generalisation (viz. conservation of matter) is founded we have to appeal to various delicate weighings, conducted chiefly by chemists for practical purposes, and very few of them really direct-

1. Naturalism and Agnosticism—vol. I. p. 109.

ed to ascertain whether the law is true or not. A few such direct experiments are now, indeed, being conducted with the hope of finding that the weight of a body does depend slightly on its state of aggregation or on some other physical property." 2

পুনশ্চ :—Supposing an atom thus broken up into electrons, its weight may possibly have disappeared. We simply do not know whether weight is a property of the grouping called an atom, or whether it belongs also to the individual ingredients or corpuscles of that atom. There is at present no evidence."3

এতাবতা আমরা দেখিতে পাইলাম পরমাণুবাদ কি দার্শনিক যুক্তি, কি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা—কোনটির দ্বারাই সমর্থিত নহে।

এক্ষণে পরমাণুর আকর্ষণ বিকর্ষণ সম্বন্ধে একটু কথা বলা যাউক। ভূতবিজ্ঞানবিদ্‌গণের মধ্যে অনেকে এক বিশ্বব্যাপী দ্রব পদার্থের কল্পনা করিয়া পরমাণুকে তাহার ঘূর্ণাবর্ত্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাহেন। অন্যথা পরমাণুর আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হয় না। এক বস্তুতে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের যুগপৎ বিষয় চিন্তাবিরুদ্ধ কি না তাহাও ভাবিবার বিষয়। Spencer এর শিষ্য Fisk বলেন :—

"Nevertheless, however verbally intellegible may be the proposition that pressure and tension everywhere co-exist, yet we cannot truly represent to ourselves one ultimate unit of matter as drawing another while resisting it." *

বাস্তবিক, বিজ্ঞানজগতে অনেক সময়ে চিন্তা-বিরোধী ব্যাপারকেও অভ্রান্ত সত্য বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিয়া থাকে। জগৎকার্য্য ব্যাখ্যা করিবার জন্যই মতবাদের প্রয়োজন ; কিন্তু যখন সে মতবাদ চিন্তা স্ববিরোধী হইয়া উঠে, তখন কোন যুক্তি বলে, কাহার আদেশে, তাহাকে মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিতে হইবে তাহা বুঝা সহজ নহে। ধন্য মনুষ্যের পক্ষপাতিত্ব! ধন্য বিজ্ঞানের সম্মোহনী শক্তি!

শ্রীপ্রফুল্লনাথ লাহিড়ী

2, 3. Life and matter—p.

* Cosmic Philosophy—vol. I,

জড়জগতের জাতিভেদ
বা
ভাঙ্গা গড়ার বিচিত্র খেলা *

জগৎজুড়ে, জন্ম মরণের বা ভাঙ্গাগড়ার বিচিত্র অভিনয় অবিশ্রাম চলিতেছে। স্রোতোবেগে নদীর এক তট যখন ভগ্ন হয়, অপর অংশ তখন ঠিক সেইভাবে পূর্ণ হইতে থাকে এবং এইরূপে জন্ম মরণ প্রবাহটা অক্ষুন্ন রহে। ভাবিয়া দেখিলে, এই ভাঙ্গাগড়ারূপ বিচিত্র ব্যাপারটিকে আমরা জাতিভেদ ও জাতিগঠন প্রক্রিয়া নামে অনায়াসে অভিহিত করিতে পারি। জাতিভেদ ও জাতি গঠনের একটা প্রধান লক্ষণ এই যে ইহার ফলে, ভিন্ন জাতি সমূহ হইতে পৃথক্ হইয়া স্বজাতীয় সকলে একত্র বা ঘনিষ্ঠ ভাবে পরস্পরের সহিত মিলিত হয়। জগৎ জোড়া ভাঙ্গাগড়ার ব্যাপারটির ভিতরেও এই প্রক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া আমরা স্তম্ভিত হই। জীবজগতের অবস্থা পর্য্যালোচনা কর, দেখিবে স্বজাতীয় সকলে একত্র অবস্থানে প্রয়াস পাওয়ায় ক্রমশঃ জনপূর্ণ বড় বড় নগরের সৃষ্টি হইতেছে; নগর মধ্যে আবার ব্যবসায়াদিভেদে বিভিন্ন পল্লী সমূহের উৎপত্তি হইতেছে। সমাজমধ্যেও এইরূপ গুণকর্ম্মানুযায়ী সমজাতিয়ত্ব অর্থাৎ প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির সমতা, দারিদ্র্য, ধনবত্তা, বিদ্যা, বয়ঃক্রম, স্বার্থ, কর্ম্মক্ষেত্র, বিভিন্ন দেশকাল ও কুলে জন্ম, ইত্যাদি বিষয়ে অবস্থার সমতা অনুসারে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে নানা-জাতি সমূহের সৃষ্টি পুষ্টি (এবং ক্ষয়ও) অহর্নিশ সাধিত হইতেছে। জগতে সর্ব্বত্র স্বজাতীয় সকলে, একটা অচিন্ত্য আকর্ষণ-শক্তি বলে পরস্পরাভিমুখে আকৃষ্ট এবং বিশ্লেষণ শক্তিপ্রভাবে ভিন্নজাতিসমূহ হইতে পৃথগ্‌ভূত হইয়া পড়িতেছে। আমাদের দেহগঠন, বংশবিস্তার প্রভৃতি ব্যাপারে অবধি এই নিয়মটি লক্ষিত হয়। দেখনা কেন কি অচিন্ত্য প্রক্রিয়ায় একই আহার্য্যমধ্য হইতে বিভিন্ন জীবদেহের ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যথাযথভাবে পুষ্টি সাধিত হইতেছে; তিক্তরসের উপাদান সমূহ নিম্ববৃক্ষে এবং মিষ্টরসের উপাদান সমূহ ইক্ষুদণ্ডে সঞ্চিত হইতেছে; এক এক জাতীয় বীজ হইতে সেই সেই জাতির বিকাশ হইতেছে। এসমস্তই, জীব ও উদ্ভিদ্‌জগতে জাতিভেদ ও জাতিগঠন ক্রিয়ার প্রমাণ। স্বাতন্ত্র্য সাধারণের বিরোধী ও অবাধ মিশ্রণের পক্ষপাতী হইয়া এই জাতিভেদ ও জাতিগঠন ব্যাপারটির বিলোপসাধন জন্য সময় সময় কত চেষ্টা হয় কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম উহাতে রুদ্ধ হয় না। দেখনা কেন, কেমন অজ্ঞাতসারে শেফিল্ড সহরটি একটি কামারপাড়া রূপে ল্যাঙ্কাশায়র একটি প্রকাণ্ড তাঁতিপাড়ায় পরিণত হইতেছে।

জড়জগৎ অবধি এই জাতিভেদ ও জাতি-

* The Making of the Earth নামক পুস্তক অবলম্বনে বিরচিত "ধরিত্রীর জন্মকথা" পুস্তকের এক অধ্যায়।

গঠন নিয়মের প্রভাব পরিমুক্ত নহে, বরং তথায় ইহা স্পষ্টতর। জড়জগতে জাতিভেদ আছে বলেই জল ও স্থল আজ এইরূপ পৃথক্। জড়ের মধ্যেও সমাবস্থ বা স্বজাতীয় সকলে একত্র থাকে বলেই, আমরা আমাদের প্রয়োজনানুরূপ দ্রব্যসমূহ এক এক স্থান হইতে বহুপরিমাণে সংগ্রহে সমর্থ হই। প্রস্তররাশি পর্ব্বতাকারে একত্র সঞ্চিত না রহিলে এক টুকরা পাথরের সন্ধানে যে সকলকে গলদ্ঘর্ম্ম হইতে হইত, এত বড় বড় পাথরের বাড়ীগুলিই বা কিরূপে নির্ম্মিত হইত? ধাতু সমূহের ভাণ্ডার বা পল্লীরূপে খনিগুলি বিদ্যমান না থাকিলে যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ কিরূপে সম্ভবপর হইত? চূণ, কয়লা প্রভৃতি নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমূহ যদি নানাস্থানে হইতে তিল তিল পরিমাণে খুঁজিয়া সংগ্রহ করিতে হইত তাহা হইলে সর্ব্ববিধ সাংসারিক উন্নতি সাধন একটা ভয়ানক কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাপার বা সুদূরপরাহত হইত। জড়জগতেও জাতিভেদ থাকায় এরূপ হয় নাই।

জড়জগতের এই জাতিভেদ ও জাতিগঠন পদ্ধতিটা আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি উহা সত্ত্ব রজ তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা অর্থাৎ এই ভাঙ্গা গড়া ব্যাপারটির ভিতর নিম্নোক্তরূপ তিনটি প্রক্রিয়া লক্ষিত হয়। প্রথম বিনাশ বা তমোগুণের কার্য্য প্রস্তরের সুকঠিন দেহও জরামরণের অতীত নহে, প্রকৃতির তমোগুণ বা বিশ্লেষণ শক্তি প্রভাবে ধীরে ধীরে নিয়তই ক্ষয় পাইতেছে। ভাঙ্গাগড়া ব্যাপারের দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটিতে রজোগুণের বিকাশ; ইহার প্রভাবে ক্ষয়িত অংশসমূহ স্থানান্তরে নীত হয়। তৃতীয় অবস্থাটি সত্ত্বগুণের ক্রিয়া; ইহার প্রভাবে স্থানান্তরিত ঐ সব অংশ বিভিন্ন স্থলে বিভিন্নভাবে সঞ্চিত ও সজ্জিত হইয়া নূতনের সৃষ্টি পুষ্টি করিতেছে।

ভূপৃষ্ঠের যে সমুদয় অংশ প্রথমে গলিয়া গিয়া ও পরে জমাট খাইয়া প্রস্তররূপে পরিণত হইয়াছিল, তাহাদের নাম primary rocks বা প্রথম জাত পর্ব্বত। এই গুলির উপরিভাগ কালসহকারে ক্ষয়িত এবং অন্যত্র পুনরায় সঞ্চিত হইয়া যে সমুদয় স্তরের বা পর্ব্বতের উৎপত্তি হইয়াছে তাহাদের নাম secondary rocks বা পশ্চাজ্জাত পর্ব্বত।

প্রথমজাত পর্ব্বতসমূহের বিনাশ বা ক্ষয় নানারূপে সংঘটিত হয়। অম্লজান (oxygen) এবং একভাগ অঙ্গার ও দুইভাগ অম্লজান সহযোগে সমুৎপন্ন দ্ব্যম্লঙ্গার (carbon dioxide) নামক বাষ্প ও জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে আসিলে প্রস্তর ক্ষয় পায়। বায়ুতে এই সমস্ত পদার্থই বিদ্যমান আছে। অবিরাম বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া পর্ব্বতগাত্রে লোণধরা বা মড়িচা পড়ার মত হইয়া উহা ধীরে ধীরে নিয়তই ক্ষরিয়া যাইতেছে। বায়ুস্থিত পূর্ব্বোক্ত দ্ব্যম্লঙ্গার বাষ্প বর্ষার জলে বহু পরিমাণে দ্রবীভূত ও মিশ্রিত হইয়া যায়, সুতরাং বর্ষাবারিও প্রস্তরগাত্র পচাইবার একটি কারণ। বায়ুস্থিত জলীয় বাষ্প প্রভাবেও পর্ব্বতগাত্র ভিজিয়া উঠে; কোথাও কোন ছিদ্র বা ফাটল থাকিলে তন্মধ্যে একটু আধটু জলকণা সঞ্চিত হয়; এই সব জলকণা আবার শীতে জমিয়া তুষাররূপে পরিণত হইবার সময় আয়তনে বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রস্তরগাত্রস্থ ঐ সব ছিদ্রাদি ভাঙ্গিয়া গিয়া ক্রমশঃ একটু একটু করিয়া বড় হইতে থাকে; তা ছাড়া পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে,

জলে দ্রবীভূত দ্ব্যম্লজার প্রভাবেও প্রস্তর পচিয়া উঠে।

জলস্রোত ও বায়ু প্রবাহে এই সব ক্ষয়িত অংশ নিয়তই স্থানান্তরিত হইতেছে, পর্ব্বতের ভিতরের অংশ বাহির হইয়া পড়িতেছে ও পুনরায় ঐ রূপে ক্ষয়িত স্থানান্তরিত ও অন্যত্র সঞ্চিত হইতেছে। এই প্রকারে প্রথম জাত পর্ব্বতসমূহের পরিণামস্বরূপে পশ্চাজ্জাত পর্ব্বত বা স্তর সমূহের উদ্ভব হইয়াছে।

ভূগর্ভের তাপ প্রভাবে সমুৎপন্ন বলিয়া প্রথমজাত পর্ব্বতগুলি igneous বা অগ্নি-সমুদ্ভূত নামেও অভিহিত হয়। প্রাচীন গ্রীকগণ, আমাদের যমরাজের ন্যায় পর-লোকের অধিপতি একটি দেবতা আছেন বিশ্বাস করিতেন এবং তাঁহাকে প্লুটো নামে অভিহিত করিতেন। ভূগর্ভে প্লুটোর রাজ্য ছিল। এই কারণে অগ্নি সম্ভূত পর্ব্বতগুলির আর এক নাম প্লুটোনিক্ পর্ব্বত। ঐ রূপ পশ্চাজ্জাত পর্ব্বতসমূহের মধ্যে যেগুলি প্রধানতঃ জলস্রোতে চালিত হইয়া সমুৎপন্ন তাহাদের নাম জলীয় বা aqueous পর্ব্বত এবং যেগুলি প্রধানতঃ বায়ু প্রভাবে সঞ্চিত তাহাদের নাম aeolian বা বায়ব্য পর্ব্বত। আকৃতি দেখিয়াই কোন স্তর বা পর্ব্বত কি ভাবে সমুৎপন্ন অনেকটা ধরিতে পারা যায়।

প্রথম ও পশ্চাজ্জাত পর্ব্বতসমূহ মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ কতকগুলি পার্থক্য বিদ্যমান থাকে।

(ক) প্রথমজাত প্রস্তরগুলি দানা বাঁধিয়া সমুৎপন্ন এবং উহাতে স্বভাবজ কাচের অস্তিত্ব পরিদৃষ্ট হয়। দ্রবীভূত অবস্থার পর জমাট্ বাঁধিয়া উহারা এইরূপ হইয়াছে। পক্ষান্তরে প্রথমজাত প্রস্তরের সূক্ষ্ম ভগ্নাংশ গুলি একত্র জমাট খাইয়া পশ্চাজ্জাত প্রস্তরের উৎপত্তি। এই হেতু ইহার এক নাম ক্লাষ্টিক (গ্রীক ভাষায় ক্লাষ্টস্ শব্দের অর্থ ভগ্ন)। কোন কোন বেলে পাথর প্রথমজাত প্রস্তর-গুলির ন্যায় দানাদার দেখিতে হয়, কিন্তু ঐ দানাগুলি প্রথম হইতেই সমুৎপন্ন নহে, প্রথমজাত প্রস্তরের ভগ্ন দানাগুলি জমাট খাইয়া ইহারা উৎপন্ন এই হেতু বেলে পাথর গুলি পশ্চাজ্জাত প্রস্তরের অন্তর্ভূত।

(খ) জলস্রোতে এবং বায়ু প্রবাহে চালিত হইয়া সমুৎপন্ন হওয়ায় secondary rock গুলি প্রায়ই চাদরের ন্যায় বিস্তৃত ও স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়। Primary rock গুলি এরূপ স্তরবিশিষ্ট নহে। উহারা কখন কখন লাভা বা আগ্নেয় পর্ব্বত-নিঃসৃত দ্রবী-ভূত পদার্থরাশির আকারে পৃথিবীর উপরি-ভাগে জমাট খাইয়া বিস্তীর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে; কখন বা dykes বা sills নামে পরিচিত হইয়া ভূপৃষ্ঠের সামান্য নিম্নভাগে ঐরূপভাবে অবস্থিত রহে; আবার কখন কখন "massifs" নামে অভিহিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের চাঁইয়ের আকারে ভূগর্ভের গভীরতর প্রদেশে পরিদৃষ্ট হয়।

(গ) দ্রবীভূত অবস্থায় সমুৎপন্ন হওয়ায় primary rock গুলি জীবচিহ্ন বিহীন কিন্তু secondary rock সমূহে অনেক জীব ও উদ্ভিদের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সব দেহাবশেষের ইংরাজি নাম "ফসিল"। ফসিলগুলির প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে, স্তরগুলি স্থলে অথবা জলে কিম্বা নদী হ্রদ বা সমুদ্র গর্ভে সঞ্জাত জানিতে পারা যায়।

কোনরূপ ফসিল পাওয়া না গেলে পশ্চা-জ্জাত প্রস্তরগুলির অণুসমূহের গঠন ও সংস্থান আলোচনা করিয়াও উহারা গভীর সমুদ্র-গর্ভে, খরস্রোতবিশিষ্ট নদীতটে, অথবা বায়ু

পরিচালিত বালুকণা সমবায়ে সমুৎপন্ন ইত্যাদি অনেক বিষয় অবগত হওয়া যায়।

ভূপৃষ্ঠের অধিকাংশই বিশেষতঃ ধনে জনে সমৃদ্ধিশালী উৎকৃষ্ট অংশসমূহ, এই পশ্চাজ্জাত স্তরাবলির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই হেতু ইহাদের বিষয় একটু বিশেষ ভাবে জানিয়া রাখা সকলেরই কর্ত্তব্য।

পশ্চাজ্জাত স্তরাবলি চতুর্গুণাত্মক বা এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত—বেলে পাথর, কর্দ্দম, চুণা পাথর ও কয়লা।

গৃহ-নির্ম্মাণ জন্য বেলে পাথর বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এইগুলি প্রথম অবস্থায় বালুকারাশির আকারে চূর্ণাবস্থায় বিদ্যমান থাকে। যে যে স্থলে কণাগুলি একটু জমাট বাঁধিয়াছে সে গুলির নাম বালির পাহাড়। কণাগুলি দৃঢ়তর ভাবে সংশ্লিষ্ট হইলে বেলে পাথর নামে অভিহিত হয়। বেলে পাথরের কণাগুলি যদি এরূপ দৃঢ়বদ্ধ হইয়া যায় যে পাথরগুলি ভাঙ্গিবার সময় কণাগুলি জোড়ের মুখে পৃথক্ না হইয়া নিজেরা অধিক ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে ঐরূপ প্রস্তরের নাম quartzite।

বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে বেলেপাথরের কণাগুলি quartz প্রস্তরের সূক্ষ্ম অংশ মাত্র কিন্তু অন্যান্য দেশে ভিন্ন পদার্থের কণাসমূহও দৃষ্টি-গোচর হয়। প্রশান্ত মহাসাগরস্থ প্রবাল দ্বীপসমূহে কণাগুলি carbonate of lime নামক পদার্থে নির্ম্মিত; কোন কোন বেলে পাথরের কণাগুলি আবার felspar নামক পদার্থের কণাসমূহ মাত্র।

কণাগুলি এইরূপ বিভিন্ন পদার্থে রচিত হইতে পারে বলিয়া, কোন স্তর বেলে পাথর কি না নির্ণয় করিবার কালে কণাগুলির আয়তন দেখিয়া নির্ণয় করাই সুবিধা। ক্ষুদ্রতম বালুকণাগুলির ব্যাস এক ইঞ্চির পাঁচ হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। এতদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর আয়তনের হইলে, সেগুলি কর্দ্দমকণা-রূপে পরিগণিত।

কণাগুলির আয়তন একটু বড় বড় হইলে নুড়ি বা কঙ্কর নামে অভিহিত হয়। এই-গুলি কোন কোন স্থলে বালুকারাশির ন্যায় বিশ্লিষ্টভাবে পড়িয়া থাকে, অনেক সময় আবার পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রস্তর-খণ্ডে পরিণত হয়। নুড়িগুলির আকার গোল গোল হইলে ঐরূপ প্রস্তরের নাম conglomerate এবং বন্ধুর ও কোণবিশিষ্ট হইলে উহাদের নাম brecia। ইহাদিগকে বেলে পাথরেরই প্রকারভেদ বলা চলে।

কর্দ্দম স্তরগুলির মূল্য সহজেই বুঝা যায়। এইরূপ ভূমিই কৃষিকার্য্যের উপযোগী ও উর্ব্বর এবং জল বায়ু প্রভাবে সহজেই সমতলক্ষেত্রে পরিণত হয়। কর্দ্দম স্তর থাকিলে, জল উহা ভেদ করিয়া ভূগর্ভের ভিতর অনাবশ্যকভাবে অধিকদূর প্রবেশ করিতে পারে না, ভূমি সহজে জলহীন হয় না এবং নদী, তড়াগ, কূপ, উৎস প্রভৃতি সহসা শুষ্ক হয় না।

Carbonate of lime নামক পদার্থ চুণা পাথরগুলির মুখ্য উপাদান। এই পদার্থটি জলে bicarbonate রূপে দ্রবীভূত থাকে এবং গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যে আমরা যেমন বালু কর্দ্দম প্রভৃতি ব্যবহার করি, কাঁকড়া শামুক গুগ্‌লি ঝিনুক কড়িশাঁখ প্রভৃতি অনেক জীব ও কোন কোন উদ্ভিদ সেইরূপ নিজ নিজ দেহের খোলা ও অন্যান্য অংশ নির্ম্মাণ জন্য জলমধ্য হইতে উহা সংগ্রহ করে। ইহাদের মৃত্যু হইলে এই সব অংশ ক্রমাগত সঞ্চিত এবং কালসহকারে জমাট্ বাঁধিয়া চুণা পাথরের সৃষ্টি হয়। স্বাভাবিক রাসায়নিক

প্রক্রিয়া ফলেও, জল হইতে Carbonate of lime বিশ্লিষ্ট হইয়া, বহুস্থলে চূর্ণাপাথরের উৎপত্তি হয়। চূর্ণাপাথরগুলিদ্বারা আমাদের বহু প্রয়োজন নিত্য সিদ্ধ হইতেছে; গৃহনির্ম্মাণোপযোগী প্রস্তর, সিমেণ্ট, সলিলরোধক উপাদানরূপে এবং ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধিজন্য—বিশেষতঃ দাইল শ্রেণীভুক্ত খাদ্যসমূহের উৎকর্ষসাধক সাররূপে ইহা ভূরি পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

পশ্চাজ্জাত পর্ব্বত বা প্রস্তর স্তরসমূহের চতুর্থ প্রকার ভেদের নাম অঙ্গারক কুল। ইঁহারাই আমাদের ইন্ধন ও তৈল যোগাইয়া থাকেন। উদ্ভিদ্‌কুল জীবদ্দশায় প্রধানতঃ অঙ্গার সংগ্রহ করিয়া পুষ্ট হয়; জীবনান্তে উহাদের ঐ অঙ্গারপূর্ণ দেহ স্থানে স্থানে প্রস্তরীভূত হইয়া কোল কয়লারূপে পরিণত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, মৃত্তিকা বালুকা প্রভৃতি প্রবলচাপে কালসহকারে প্রস্তররূপে পরিণত হয়; কাদা জমিয়া শ্লেট পাথর এবং বালি জমিয়া বেলে পাথরের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রাচীনকালের উদ্ভিদ্‌পূর্ণ অরণ্যসমূহও এইরূপ পূর্ব্বোক্ত নানা কারণে স্থানে স্থানে মাটি চাপা পড়িয়া প্রবলচাপে দীর্ঘকালে কয়লার খনিরূপে রূপান্তরিত হইয়াগিয়াছে।

কোল কয়লাগুলি এই পাঁচটি মুখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত :—

(১) ধূসরবর্ণের কোল বা lignite; ইঁহারা বনিয়াদি বংশের নহে, অন্যের তুলনায় অনেকটা আধুনিক কালে সঞ্জাত এবং দেহও বহুপরিমাণে কোমল।

(২) গৃহস্থ-সংসারে সাধারণতঃ ব্যবহৃত কঠিন ভঙ্গপ্রবণ ও কৃষ্ণবর্ণ কোল বা পাথুরে কয়লা।

(৩) গ্যাস কোল; এই জাতীয় কোল হইতে গ্যাসের আলোর উপযোগী শুভ্র উজ্জ্বল আলোক উৎপাদক ভাল গ্যাস বাহির হয়।

(৪) তৈলোৎপাদক কোল; এইগুলি মৃদুতাপে উত্তপ্ত করিয়া চুয়াইলে তৈল বাহির হয়।

(৫) (Anthracite) আন্থ্রাসাইট্ নামীয় কোল; মৃদঙ্গার বংশে ইঁহারা কুলীনস্বরূপ। এবং বহু আদৃত। প্রচুর তাপ বাহির হয়, শিখা বাহির করিয়া জলে না এবং ধূমের উৎপাত নাই। জাহাজ চালাইতে এই কয়লাই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী।

Basalt এবং Granite নামক প্রস্তর, প্রথমজাত প্রস্তরের অন্তর্নিবিষ্ট। মনে কর কোন দেশে এই দুই পাথরের পাহাড় আছে। কালসহকারে এই পাহাড় ক্ষয় পাইয়া কিরূপ পশ্চাজ্জাত স্তরসমূহের সৃষ্টি করিবে বা করিয়াছে, Basalt এবং Granite এর উপাদান বিশ্লেষণ করিয়া আমরা আগে হইতে জানিতে পারি। যথা——

প্রস্তরের নাম	প্রস্তরে দৃষ্ট খনিজ সমূহের নাম	খনিজ গুলির উপাদান	পশ্চাজ্জাত স্তর সমূহের প্রকৃতি।
Basalt	Basic Felspar	Silica Alumina.	কৰ্দ্দম।
		চূণ	চূণা পাথর।
		সোডা	লবণ।
	Pyroxene	Silica লৌহ Magnesia	কৰ্দ্দম। মণ্ডুর বা আকরিক লৌহ
	Olivine Magnetile	Silica Magnesia মণ্ডুর	কৰ্দ্দম ও চূর্ণ পাথর। মণ্ডুর।
Granite			কাদা, বালি, বেলে পাথর।
	Quartz	Silica	কৰ্দ্দম।
	Acid Felspar.	Silica Alumina	
		Potash	পটাশজাত লবণসমূহ।
		সোডা	সাধারণ লবণ।
	শ্বেত অভ্র	Silica Alumina Potash	অভ্র কণা।

প্রথমজাত পর্ব্বতগুলি ক্ষয় পাইয়া স্থানান্তরিত হইবার প্রক্রিয়া পূর্ব্বেই একরূপ উক্ত হইয়াছে। বায়ুপ্রবাহে প্রস্তরচ্যুত সূক্ষ্ম কণাগুলি সহজে নিয়তই স্থানান্তরিত হইতেছে; জলস্রোতে বড় বড় পাষাণখণ্ড পর্ব্বতগাত্র হইতে স্খলিত হইয়া গড়াইতে গড়াইতে বহু দূরে নীত হয়; ছোট ছোট নুড়িগুলির নিস্তার নাই, স্রোতের সঙ্গে চলিতে চলিতে অনবরত ঘৃষ্ট হইয়া অবশেষে চূর্ণ হইয়া যায়; স্রোতোবেগ মন্দীভূত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমতঃ স্থূলতর কণাগুলি বালুকার আকারে অনন্তর সূক্ষ্মতর কণাগুলি কর্দ্দমের আকারে ক্রমশঃ থিতাইয়া পড়ে। নদীতে স্নানকালে এই জন্য দেখা যায় স্রোত

যেখানে প্রখর সে স্থানের তলভূমি বালুকা বা কঙ্করময় এবং স্রোতোবেগ যেখানে দুর্ব্বল তথাকার তলভূমি কর্দ্দমাক্ত।

নদীর ন্যায় সমুদ্রের স্রোত ও তরঙ্গ প্রভাবেও তটভূমি ভগ্ন হইয়া প্রথমজাত পর্ব্বতসমূহের দেহাবশেষ ঐভাবে স্থানান্তরিত হয়।

জলে নানা পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে, সে গুলির কি হয়? স্থলের ন্যায় জলও নানারূপ জীব উদ্ভিদে পূর্ণ। ইহারা জল হইতে বহু দ্রব্য বিশ্লিষ্ট করিয়া লইয়া নিজ দেহ পুষ্ট করে। মৃত্যুর পর ইহাদের দেহের কঠিন অংশসমূহ সঞ্চিত হইয়া নানা দ্রব্যের ভাণ্ডার স্বরূপ হয়। শামুক, গুগ্‌লি, ঝিনুক প্রভৃতি অনেক জীবের খোলা Carbonate of lime নামক পদার্থে গঠিত; স্পঞ্জ, radiolaria, diatoms প্রভৃতি জীব-দেহের কঠিনাংশ সমূহ সঞ্চিত হইয়া একরূপ সিলিকাময় স্তরের সৃষ্টি করে। এইরূপ অস্থিসমূহের phosphate of lime নামক পদার্থে ফস্ফেট স্তর সমূহ সৃষ্ট হয়।

জলের ন্যায় বায়ুস্থিত নানা পদার্থও এইরূপে বিশ্লিষ্ট ও স্থানান্তরিত হইতেছে। আমরা নিশ্বাসের সহিত (Carbon dioxide) দ্ব্যঙ্গার নামক বিষাক্ত বাষ্প পরিত্যাগ করি; উদ্ভিদকুল কিন্তু এই পদার্থ যতক্ষণ পারে সংগ্রহ করিয়া পুষ্ট হয় ও জীবনান্তে অঙ্গারস্তর সমূহের জন্ম দেয়।

অন্যান্য উপায়েও পঞ্চভূত সমূহের এইরূপ নিয়ত বিশ্লেষণ ও স্থানান্তরে আহরণ প্রক্রিয়া সিদ্ধ হইতেছে। এবং ইহাই জন্ম, মৃত্যু ও জন্মান্তর প্রাপ্তি নামে অভিহিত হয়।

রৌদ্রতাপে সাগরবারি শুষ্ক হইয়া বিস্তীর্ণ লবণস্তরসমূহ সঞ্চিত হয়; প্রাকৃতিক নিয়মেই অনেক উৎস ও জলস্রোত হইতে Carbonate of lime বিশ্লিষ্ট হইয়া অনেক চূণাপাথর উৎপন্ন হইয়াছে; সমুদ্রজলস্থিত ফস্ফরিক এসিড ও কার্ব্বণেট অফ লাইম নামক পদার্থ-দ্বয়ের সহযোগেও অনেক ফস্ফেটু স্তর উৎপন্ন হইতেছে।

ভূপৃষ্ঠের প্রথমজাত পর্ব্বতসমূহ এই ভাবে নিঃশেষিত হইয়া গেলে কি হইবে? উপরের অংশ ক্ষয় হইয়া গেলে নীচেকার অংশ বাহির হইয়া পড়ে এবং ভূগর্ভস্থ পদার্থ প্রভাবে বহুস্থলে পুনরায় উপরে ঠেলিয়া উঠে। পৃথিবী এখনও ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হইতেছে, ভূপৃষ্ঠ সুতরাং ক্রমশঃ বসিয়া যাইতেছে। ইহার ফলে ভূগর্ভস্থ পদার্থরাজির উপর নানাস্থলে অসমভাবে চাপ পড়িতেছে। ভূগর্ভস্থ দ্রবীভূত প্রস্তরসমূহও যেখানে সুবিধা পাইতেছে উপরে উঠিয়া পড়িতেছে কিম্বা ভূপৃষ্ঠের অকঠিন অংশ সমূহকে ঠেলিয়া তুলিতেছে এবং নিজেরা জমিয়া গিয়া ও কঠিন হইয়া প্রথমজাত প্রস্তরের আকারে পরিণত হই-তেছে। গাছ পালার ন্যায় অনেক পাহাড়ও এইরূপে তিল তিল করিয়া বৃদ্ধি পায়।

ঐরূপ দ্রবীভূত প্রস্তর নিতান্ত উপরে উঠিয়া পড়িলে গৈরিকস্রাবরূপে বাহির হয় ও আগ্নেয়গিরির উৎপত্তি হয়। দ্রবীভূত অবস্থায় বাহির হইবার সময় জলীয় পদার্থে পূর্ণ থাকিলে তাহা উপরে আসিতে আসিতে বাষ্পে পরিণত হইয়া ভূপৃষ্ঠকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ছড়াইয়া ফেলে। নিক্ষিপ্ত খণ্ডগুলি নির্গমপথের চতুর্দ্দিকে পতিত ও পর্ব্বতাকারে সঞ্চিত হয়। এইরূপে আগ্নেয় গিরিগুলি, মধ্যে গহ্বরবিশিষ্ট পর্ব্বতরূপে পরিণত হয়।

শীতল হইবার সঙ্গে সঙ্গে দ্রবীভূত অবস্থা কাটিয়া যাইতে থাকে। প্রথমজাত পর্ব্বত-

সমূহের উৎপত্তি আরম্ভ হয়, বাষ্পের পরিবর্ত্তে উত্তপ্ত জলরাশি ঊর্দ্ধে সঞ্চিত হইতে থাকে। অত্যুষ্ণ জলরাশির এইরূপ ঊর্দ্ধগতির সময় উহার সহিত অনেক ধাতুর কণা দ্রবীভূত ও মিশ্রিত হইয়া যায়। এই সব ধাতুকণা থিতাইয়া পড়িবার কালে খনি সমূহের উৎপত্তি হয়।

জগৎজুড়ে এইরূপ ভাঙ্গা গড়ার বিচিত্র খেলা অহরহঃ চলিতেছে, জাতিভেদ ও জাতি গঠনের বিচিত্র লীলা নিত্য অভিনীত হইতেছে। ইহারই প্রকারভেদকে আমরা জীবের জন্ম, মৃত্যু ও জন্মান্তর প্রাপ্তি নামে অভিহিত করি।

শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গে বাল্যজীবন

ভাগবত বলিয়াছেন 'দ্বাবেব চিন্তয়া মুক্তৌ পরমানন্দেনাপ্লুতৌ যো বিমুগ্ধো জড়োবালো যো গুণেভ্যঃ পরংগতঃ' বালক এবং গুণাতীত মহাপুরুষ উভয়েই চিন্তা হইতে মুক্ত ও পরমানন্দে আপ্লুত। মহাত্মা যীশু একদিন তাঁহার শিষ্যবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, 'স্বচ্ছ সরল বালকের মত হইলে মানুষ ভগবচ্ছক্তি সম্পন্ন হয়।'

বঙ্গে বাল্য-জীবনের স্বচ্ছ সরল স্বচ্ছন্দতা, মন্দাকিনীর সুদূর প্রসৃত তরঙ্গস্পন্দনাভূতি, সমগ্র হৃদয়-বৃত্তির নবীনোন্মেষ পুলকোদ্গম দিন দিন ক্ষয়িত হইয়া যাইতেছে। এবং তৎসহিত বাঙ্গালার স্বাস্থ্য, সাহস, শৌর্য্য এবং আর্জ্জবের নবাঙ্কুর বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে। বঙ্গবালকের বিষাদচ্ছায়া বিমলিন মুখমণ্ডল দেখিলে হৃদয়ের সমস্ত আশা ভরসা মুহূর্ত্তে দমিত হইয়া যায়। তখন মনে হয়, জগতের অপরাপর জাতি হইতে আমরা কত বিষয়ে আজও কত পশ্চাৎবর্ত্তী। পঞ্চাশজন ইংরাজবালকের সহিত সমসংখ্যক বঙ্গবালকের তুলনা করিলে কি বিষাদময় পার্থক্য অনুভূত হয়। নৈরাশ্যের সহিত সংগ্রাম করিতে, বুক বাঁধিয়া জগতের জীবন-সংগ্রামে আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা করিতে, জ্ঞানালোক দানে দেশব্যাপী গাঢ়তমিস্রার অপনয়ন করিতে একমাত্র নির্ভর স্থল যাহারা তাহাদিগকে এমন দেখিলে কাহার প্রাণ অবসন্ন না হইয়া যায়?

বঙ্গবালকের হৃদয়ে এই অকাল বিষণ্ণতার মসী-মলিন প্রভাব কোথা হইতে আসিল এবং কিসে তাহার নিরাকরণ করা যাইতে পারে এ সম্বন্ধে কয়জন গাঢ়রূপে চিন্তা করিয়া থাকেন জানিনা, কিন্তু যাহাদের উপর আমাদের সমগ্র কর্ম্ম প্রচেষ্টার ফলাফল অপেক্ষা করে, সমগ্র উদ্বোধন আবাহনের মর্ম্মবাণী যাহাদের হৃদয়ে স্পন্দিত হইতেছে তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার আকাঙ্ক্ষা স্বদেশ-সেবক মাত্রেরই হৃদয়ে স্বতঃ স্ফুরিত হওয়া স্বাভাবিক।

আনন্দই জীবনের মূল; মৃত্তিকার আর্দ্রতা উদ্ভিদের বর্দ্ধনসাধনহেতু যদ্রূপ অত্যাবশ্যক মানব এবং মানবেতর প্রাণীবর্গের জীবন

মূলে এই জীবনীরস আনন্দধারার ও তদ্রূপ একান্ত প্রয়োজন।

বিভিন্ন প্রকৃতির মানবহৃদয়ে দেশ-কাল-জ্ঞানকর্ম্ম বিভাগানুযায়ী বিভিন্নশঃ এই আনন্দ-রস-ধারার বিচ্ছুরণ হয়; এবং যে পন্থায় তাহার গতি স্বচ্ছন্দে মানবহৃদয়ের সমগ্র প্রদেশ ব্যাপিয়া তাহার শরীর ও মনে সমভাবে সাড়া দিয়া প্রবাহিত হইতে পারে তাহাই তাহার স্বধর্ম্মানুমোদিত। এ পথে বাধা বিঘ্ন জুটিল, স্নিগ্ধতার অভাবে বৃক্ষদেহে যদ্রূপ শ্যামলতার সজীবতার হীনতা পরিলক্ষিত হয়, তাহার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া যেমন একটা শুষ্কতার এবং শীর্ণতার ছায়া পড়িয়া আসে, মানবের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার উপর তদ্রূপ কালিমালেপ, নির্জ্জীবতার মালিন্য আপতিত হয়। ভগবান বলিয়াছেন—

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ
পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।

সরলতা স্বচ্ছন্দতা এবং বিষয় চিন্তা—নির্লিপ্ততা বালক ধর্ম্ম। বর্ত্তমান শিক্ষা, বর্ত্তমান বাল্যজীবন পরিচালন পদ্ধতি, এই বালকধর্ম্মানুযায়ী হইয়া উঠিতেছে না। নানারূপে পরধর্ম্মের পকবীজ তৎসহ বিমিশ্রিত হইয়া বালকহৃদয়ে উপ্ত হওয়াতে তাহা আবর্জ্জনাদুষ্ট হইয়া পড়িতেছে। বাল্যের শান্তি-সুমধুর লীলাময় জীবন, কৈশোরের হৃদয়বৃত্তি সমূহের আত্মতৃপ্তি আশে অদম্য আবেগাকুলিত স্পন্দন-তরঙ্গ নৈশ বাতাহত সান্ধ্যদিবসশ্রীর ন্যায় বাঙ্গালীর জীবনের উপর দিয়া নীরব ও ত্বরিত প্রবাহে কখন যে বহিয়া যাইতেছে তাহাই আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমরা যেন পক্ব কেশ, কুব্জনত দেহযষ্টি লইয়াই মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইতেছি।

বিগত প্রাদেশিক সম্মিলনে শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় বালক-জীবনের উপর Discipline এর কুফল প্রভাবের উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ এই Dicsipline বা শৃঙ্খলার এবং Moralityর বা নীতির এতদ্দেশীয় বিদ্যালয় সমূহে অপপ্রয়োগ মাত্রা এত চড়িয়া গিয়াছে যে তাহাতে বাল্যজীবনের স্বচ্ছন্দতার লেশটুকুও ক্ষয়িত হইয়া যাইতে বসিয়াছে। বালকের পোষণহেতু যে উপাদান সর্ব্বপ্রধান, তাহারই উপর হস্তক্ষেপ করা হইতেছে, তাহার পুষ্টি এবং বৃদ্ধি হইবে কিসে?

অনেকে মনে করেন শৃঙ্খলার চরমতা, Law and regulation এর নাগপাশ বন্ধন, কড়াকড়ি, বালকের নৈতিকজীবনের নিয়ামক; ইহা একান্ত ভ্রান্ত ধারণা। স্বধর্ম্ম যদি বিগুণ বলিয়াও অপরের চক্ষে প্রতীত হয় তথাপি তাহা কষ্টসৃষ্ট পরধর্ম্মানুগমন অপেক্ষা প্রকৃষ্ট। উন্নতির ক্রমিক স্তর অতিক্রমিত না করিয়া কেহ সুপ্রতিষ্ঠার সৌধচূড়ে অধিরূঢ় হইতে পারে না।

যখন শৃঙ্খলার এত বন্ধন ছিল না, যখন বাঙ্গালীর ছেলে দৌড়াদৌড়ি হুড়াহুড়ি করিয়াও উচ্চ প্রতিভার পরিচয় দিত, ন্যায়, স্মৃতি, ব্যাকরণ ও তর্কশাস্ত্র এবং কাব্যের সূত্রগুলি আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ করিত, সুদূর মিথিলা হইতে স্মৃতিশাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া লইয়া আসিয়া মেধাশক্তির পরিচয় দিত, তখন কি তাহারা বর্ত্তমান যুগ অপেক্ষা নৈতিক বলে হীন ছিল? ঐতিহাসিক বলিবেন বর্ত্তমান অপেক্ষা বিগত বঙ্গেতিহাস সমধিক উজ্জ্বল। খুঁজিতে গেলে দেখা যাইবে পূর্ব্বকার বাঙ্গালীর ছেলে আধুনিক বঙ্গবালক অপেক্ষা

সাহসী ছিল। অমানিশার ঘোরান্ধকারে, চিতাজ্বালালোক-ভৈরব শ্মশানে বালকের হৃদয়ে নব্যন্যায়ের সন্ধান-সূত্র জাগিয়াছিল।

প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মচর্য্য ব্যতিরেকে বাল্য-জীবনের সার্থকতা থাকিতে পারে না। ব্রহ্মচারী না হইলে বিগতভীঃ হওয়া যায় না আবার ভয়কে জয় করিতে না পারিলে মানবত্ব লাভ অসম্ভব। Discipline'র অষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধনের ভিতর দিয়া ব্রহ্মচর্য্যের নীতিগুলি শুষ্কতর হইয়া এখন যেরূপে বালকদিগের সম্মুখে ধরা যাইতেছে, তাহার তিক্ততায় তাহারা জিহ্বা সরাইয়া লইয়া যাইতেছে। আমাদের বালকদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য স্থান বিশেষে দেখ্‌নাই ভাবে থাকিলেও তাহাতে তাহাদের হৃদয়বৃত্তির পরিতৃপ্তি হইতেছে না সুতরাং তাহা প্রতিষ্ঠাহীন।

জার্ম্মাণী, আমেরিকাদি সভ্যজগতের বিদ্যালয়গুলিতে আমাদের বিদ্যালয়গুলির অপেক্ষা নীতির বাঁধন কম, তাহাতেও সে দেশে আমাদের দেশের অনুপাতে শিক্ষিত বালকের সংখ্যা সমধিক এবং তাহাদের স্বাস্থ্যের সঙ্গে আমাদের বিদ্যার্থীদের স্বাস্থ্যের আকাশ পাতাল প্রভেদ। ব্রহ্মচর্য্যের ঘ্যাণ-ঘ্যানাণী বাঙ্গলার হাটে, পথে, ঘাটে, মাঠে চলিতেছে; তাহা সত্ত্বেও বালকদের মধ্যে যে সমস্ত কদর্য্য ব্যাধির সঞ্চার হইতেছে তাহা স্মরণ করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। ইউরোপের ছেলে ব্রহ্মচর্য্যের কিছু জানে না তবুও তাহারা এত ব্যাধি ও জড়তার আধার নহে।

এতদ্দেশীয় বালকদের নৈতিক অবস্থা বর্ত্তমানকাল অপেক্ষা পূর্ব্বে সমধিক উন্নত ছিল তাহার একটী প্রধান কারণ তাহাদের কর্ম্মজীবনের বিভিন্নতা। তাহাদিগকে এমন সমস্ত দৈনিক কর্ত্তব্যের ভিতর দিয়া বর্দ্ধিত হইতে হইত যাহাতে তাহাদের হৃদয়ের স্বচ্ছন্দতার বিকাশসাধন হইত, হৃদয়ক্ষেত্রে আনন্দরসের সঞ্জীবনী ধারার সুষ্ঠুসঞ্চার সম্ভব হইত। ইউরোপীয় ছাত্রদিগকে তাহাদের স্বাভাবিক বৃত্তির তৃপ্তিজনক কর্ম্মজীবনের ভিতর দিয়াই গড়িয়া উঠান হইয়া থাকে। সর্ব্বত্রই এই নীতি শ্রেয়ঃ। ইহার অভাবে ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মকানুন কেবল পুস্তকগত থাকিবে এবং তাহার অভাবে বাল্যজীবনে বার্দ্ধক্যের ছায়া আসিয়া পড়িবে।

যে দিক হইতেই দেখিতে যাই না কেন আমরা অন্যান্য দেশ হইতে বাল্যশিক্ষার একটা স্বতন্ত্র পথ ধরিয়া চলিয়াছি। স্বাধীন-চিত্ততা, আত্মনির্ভরতা, দৃঢ়তা ও তেজস্বীতার যাহাতে প্রতিষ্ঠা হয় তাহা না করিয়া নারী-সুলভ কোমলতা (Effiminateness) বালকহৃদয়ে ঢুকাইয়া দিবার উপরই আমাদের বেশী রোখ। ত্যাগ, সত্য আত্মদানের সাড়ায় পিতা মাতা শিহরিয়া উঠিতেছেন। তাহাদের সকলেরই যেন ইচ্ছা সন্তান বিষয়ের ক্ষুদ্র কীট হইয়া থাকুক, প্রতিবেশ প্রভাবের ঝঞ্ঝার সহিত যাহাতে যুদ্ধ করিতে না হয় এজন্য সে মাথা নোয়াইয়া রাখিয়াই স্ফুরণোন্মুখ মনোবৃত্তি খাট করিয়া আনিয়াই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করুক। বঙ্গ কবি আক্ষেপের সুরে গাহিয়াছিলেন—

বীরের স্বভাব যার
গোঁয়ার বদ্‌নাম তার
ধীর যিনি ভীরুতায় রত!

হৃদয়বৃত্তির স্বচ্ছন্দসঞ্চার ক্ষেত্র না পাইয়া বালকেরা নানাপ্রকার ঘৃণিত আমোদ প্রমোদে রত হইতেছে। এক একটী বিদ্যালয়ের প্রকৃত হৃদয় যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই জানেন

তাহা কত অন্ধকারময়। বঙ্গের এই বালক-বৈষম্য নিরাকরণ করিতে হইলে বালকদিগের স্বতন্ত্রতা ও স্বচ্ছন্দতার দিকটা প্রশস্ততর করিয়া দিতে হইবে। তাহাদিগকে প্রকৃত বীরত্ব, শূরত্ব এবং তেজের আদর্শ দেখাইয়া স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপে উন্নতির শিখর-যাত্রীপদে বরণ করিতে হইবে।

অপরাপর দেশে নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ ও গল্পকৌতুকের আশ্রয় সহকারে বালকচরিত্রের সহজ বিকাশ সাধন করা হইয়া থাকে। এদেশে সে পথে বড় উদ্যম দেখা যায় না। উঠিয়া পড়িয়া এ কাজে লাগিতে হইবে। বালকদের উপযোগী সরল ও সুলভ পুস্তকের প্রচার চেষ্টা করিতে হইবে, তাহার সাহায্যে বালক-হৃদয়ে মানবত্বের সবল অঙ্কুর রোপণ করিতে হইবে। বালকের উদ্দামতা, তদীয় জীবনের ঔদ্ধত্য ও শৃঙ্খলাবর্জ্জনোন্মুখতা যাহাতে প্রকৃত স্বধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত হইয়া তাহার জীবন-সংস্থান গঠনের সহায়করূপে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, তদ্ধেতু আমাদিগকে আপ্রাণ চেষ্টায় রত হইতে হইবে। সংবাদপত্র, মাসিকপত্র এবং সাময়িকপত্রের সাহায্যে তাহাদিগকে দৈহিক বলের মর্য্যাদা বুঝাইয়া দিতে হইবে। তবে শিশুর মুখের হাস্যচ্ছটা ভবিষ্যতের সুতীব্র নিরাশার তামসবক্ষঃ উজ্জ্বল করিয়া আমাদের হৃদয়ে শক্তির সঞ্চার সাধনে দৃঢ়তা আনিয়া দিবে।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন।

ক্ষুদ্র-পূজা

নূতন যুগের মহতী নবীন শিক্ষা এই, ক্ষুদ্রকে অবজ্ঞা করিও না, ক্ষুদ্রের মহিমা অবগত হও, ও ক্ষুদ্রকে আদর করিতে শিখ। Hero worship বা বীরপূজা, সমাজের আদিকাল হইতে প্রচলিত আছে। ধর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর, কর্ম্মবীর প্রভৃতি মহাজনগণ চিরদিনই সকলের সংপূজ্য। "মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ"। মহাজনের পদাঙ্কানুসরণই সমাজের ধর্ম্ম। বীরপূজাটা মন্দ কর্ম্ম নহে, এবং উহা পরিত্যাগ করিতেও কেহ বলিতেছে না, কিন্তু ক্ষুদ্র-পূজা ক্ষুদ্রের মাহাত্ম্যবোধ বীরপূজার তুলনায় অনেকের নিকট এখনও একটা অপরিচিত সুতরাং নূতন ব্যাপার এবং এই ব্যাপারে অভ্যস্ত হওয়াই নূতন যুগের বিশেষত্ব-জ্ঞাপক নূতন শিক্ষা দীক্ষা।

শূদ্রবর্ণ সমাজের পাদস্বরূপ এবং ব্রাহ্মণ উহার মস্তক কিন্তু পাদস্থলীয় বলিয়া শূদ্র নিশ্চিতই হেয় বা নগণ্য নহেন, প্রত্যুত নূতন যুগের নূতন শিক্ষা এই, শূদ্রকে লইয়াই সমাজ; সমাজের সভ্যতা অসভ্যতা উন্নতি অবনতি প্রভৃতি নির্ণয়ের মাপকাঠি এই সংখ্যাবহুল শূদ্রজাতি। দুষ্ট যে, সে চিরকালই হেয়, পরিত্যজ্য ও দণ্ডনীয়; কিন্তু নূতন যুগের নূতন শিক্ষা দীক্ষা এই, শাসনের সার্থকতা দুষ্টের দণ্ডদানে নহে পরন্তু সংশোধনে। জেলে কয়েদীর বুকে জগদ্দল পাথর চাপনের দিন এখন আর নাই, মুলা চোরকে শূলে চড়ানই সমাজ রক্ষার সুব্যবস্থা বলিয়া এখন আর কেহ মনে করেন না। প্রাচীন যুগের প্রাচীন শিক্ষা এই, অবশিষ্ট দেহের কল্যাণার্থ উরগ-

ক্ষত অঙ্গুলিটিকে নির্ম্মমভাবে ছেদন করিয়া ফেলিতে হয় কিন্তু নূতন যুগের নূতন শিক্ষা-দীক্ষা এই, পতিতের বর্জ্জনে বা দলনে ততটা কৃতিত্ব নাই, যতটা তাহার প্রায়শ্চিত্ত ও প্রত্যাগমন সাধনে। প্রজার তুলনায় রাজার তুল্য বড় লোক এবং রাজার তুলনায় প্রজার তুল্য ক্ষুদ্র আর কে? রাজা নরেন্দ্র ও দেবাংশসম্ভূত। নূতন যুগের নূতন শিক্ষা ইহা অস্বীকার না করিলেও নূতন করিয়া শিক্ষা দেয় প্রজাশক্তিই প্রকৃত ও শ্রেষ্ঠ রাজশক্তি। ক্ষুদ্র এইরূপ পরিত্যাজ্য নহেন, নগণ্য নহেন, ক্ষুদ্রকে পাইলেই বৃহতের অধিষ্ঠান সম্ভবপর—নতুবা নহে। ক্ষুদ্রই মহতের জন্মদাতা। নিদান ধরিয়া চিকিৎসার ন্যায়, ক্ষুদ্রের উৎকর্ষ সাধনই মহত্ত্বলাভের সদুপায়। এই যে প্রাসাদনগরী জনপূর্ণ রাজধানী কলিকাতার রাজপথের দুইপারে অভ্রংলিহ পর্ব্বতাকার সৌধসমূহ বিরাজিত, ভাবিয়া দেখ বুঝিতে পারিবে, উহাদের ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ, ঐ ইট কাঠ লোহা লক্কড় চূণ মশলা প্রভৃতিই উহাদের প্রাণ। এই গুলি উৎকৃষ্ট না হইলে, উৎকৃষ্ট সৌধ নির্ম্মাণ অসম্ভব নহে কি? কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবালকীটের পুঞ্জীভূত দেহাবশেষই শেষে প্রবালদ্বীপরূপে পরিণত হয়। চারিদিকে উত্তাল-তরঙ্গসঙ্কুল-লবণাম্বুধি মাঝে স্থির স্বচ্ছ স্বাদু বারি রাশির মুকুর হৃদয়ে ধারণ করিয়া ও নারিকেলকুঞ্জভূষণে ভূষি হইয়া এই সমস্ত দ্বীপ রত্নাকর-বক্ষে যেন রত্নহার রূপে শোভা পাইতে থাকে। ক্ষুদ্রই এক্ষেত্রে এইরূপ মহতের জন্মদাতা।

ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব, ক্ষুদ্র পূজাটা প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্য হইতে আমদানী একটা নূতন ভাব নহে। বীরপূজার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও চিরকাল প্রচারিত। দরিদ্র ব্রাহ্মণের পূজা, এই ক্ষুদ্র পূজারই রূপান্তর নহে কি? বৃদ্ধ পিতা মাতা গুরুজন প্রভৃতিকে ভক্তি শ্রদ্ধা, ক্ষুদ্র পূজা ব্যতীত আর কি নামে অভিধেয়? সাধনমার্গের নিম্নতর সোপানগুলিও যে হেয় বা পরিত্যাজ্য বিবেচিত হয় না, এই ক্ষুদ্র পূজাই তাহার কারণ। দয়া প্রেমাদিমূলক যে আকর্ষণ তাহাই ক্ষুদ্র পূজা। শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমে পূজা শিক্ষা দিয়া এই ক্ষুদ্র পূজাই প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। বিরাট্‌কে ক্ষুদ্রভাবে, বা ক্ষুদ্রের মধ্যে দেখিয়াই বৈষ্ণব সুখী; শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণু অপেক্ষা বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার মন-অলি মুগ্ধ। মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের প্রকৃতি পরীক্ষার্থ, ত্রেতাযুগের কর্ম্মবীর মহাবীর মারুতি যখন সামান্য মর্কটাকার ধারণ করিয়া পথের উপর পড়িয়া রহিলেন, এদিকে তাঁহার সেই এক যুগ ব্যবধানের অনুজটি শক্তিস্ফূর্ত্তি হেতু মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায়, সীতাদেবী প্রদত্ত হনুমানের সেই সাধের কদলিকানন নষ্ট করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন হনুমান্‌কে দেখিয়া, তৎকর্ত্তৃক উপরুদ্ধ হইলেও ক্ষুদ্র এক মর্কটজ্ঞানে তাঁহাকে লঙ্ঘন করিয়া যাইতে ভীমসেনের প্রবৃত্তি হইল না। সেই বলোন্মত্ত অবস্থাতেও ভীমসেন এ জ্ঞান হারান নাই, "যত্র জীব তত্র শিব রূপে নারায়ণ"। ইহা ক্ষুদ্র পূজা নহে যদি তাহলে কি? এই ক্ষুদ্র পূজার ফলেই "বসুধৈব কুটুম্বকম্" নীতির অভ্যুদয়। গুরুকে দেবতা জ্ঞানও এই ক্ষুদ্র পূজারই রূপান্তর বলা যায়। আবার, কর্ণের হৃদয়ে "সুতো বা সুত পুত্রো বা, যো বা সো বা ভবাম্যহম্, দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মদায়ত্তন্তু পৌরুষম্" এই শ্রেণীর যে মনোভাব, অথবা, গুরুর নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়াও একলব্যের উৎসাহপূর্ণ

হৃদয় ও অদম্য সাধনা, এই ক্ষুদ্র পূজারই পরিণতি মাত্র। বীর পূজার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র পূজাটাও এইরূপ চিরকাল প্রচারিত। তথাপি, যে কারণেই হউক, সমাজে মাঝে মাঝে এই ক্ষুদ্র পূজার ভাবটা ক্ষীণ আকার ধারণ করে, তখন উহার নূতন করিয়া উদ্বোধন আবশ্যক হয়।

নবীন যুগের তাই এই মহতী নূতন শিক্ষা, আপনাকে ক্ষুদ্র ভাবিয়া কখন অবজ্ঞা করিতে নাই, বা, উৎসাহহীন হইতে নাই। ক্ষুদ্রের মাহাত্ম্যবোধ, শ্রেষ্ঠ মনোবৃত্তির এবং উৎকৃষ্ট শিক্ষা দীক্ষার পরিচায়ক। জাতীয় উন্নতি সাধনে ইচ্ছা থাকিলে, ক্ষুদ্রের মহত্ত্ব ও আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া ক্ষুদ্রের হৃদয়ে আত্মসম্মান বোধ জন্মাইতে, ক্ষুদ্রের সমাদর ও পূজা করিতে এবং ক্ষুদ্রের উৎকর্ষ সাধনে আমাদিগকে মনোযোগী হইতে হইবে।

এইখানে একটু ভাবিবার ও বুঝিবার কথা আছে। ক্ষুদ্র পূজার ঝোঁকে পড়িয়া বীরপূজাটা ভুলিয়া গেলে, সেটাও ঠিক কাজ হইবে না। আদর্শ হারাইয়া ফেলার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর নাই, লক্ষ্যহীন জীবন যেন কর্ণধারহীন তরণী। বীরপূজাটা আদর্শ পূজারই নামান্তর মাত্র। ব্রাহ্মণের জীবনে, হিন্দুর আদর্শ ব্রহ্মণ্যদেবের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ। ব্রাহ্মণ এই জন্য মূর্ত্তিমান্ ভূদেব। ব্রাহ্মণপূজায় বীরপূজা ও ক্ষুদ্রপূজা উভয় ভাবমিলিত, ব্রাহ্মণ পূজা এই জন্য পতিতের উদ্ধারসাধক। দেখা যায়, কোন এক আদর্শের উপর অনুরাগ বাড়িলে, সাবধান না হইলে অনেক সময় সঙ্গে সঙ্গে আর কোন আদর্শের উপর বিরাগ বাড়ে। প্রজাশক্তির আদর করিতে গিয়া কেহ কেহ এইরূপ রাজশক্তির উপর শ্রদ্ধা হারাইয়া বসেন, মূলে কিন্তু ঐ উভয় শক্তিই এক। শূদ্রপ্রীতি দেখাইতে গিয়া অনেকে এইরূপ ব্রাহ্মণের মানহানি, বা, ব্রাহ্মণবিদ্বেষ প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন না। শূদ্র প্রেমের পাত্র, তাই বলিয়া ব্রাহ্মণ কখন অবজ্ঞা বা অনাদরের পাত্র নহেন। দুষ্ট, পতিত প্রভৃতি যদি প্রেমের পাত্র হইতে পারে, তা হ'লে হীন ব্রাহ্মণকেই বা সে প্রেমের অংশ থেকে বাদ দেওয়া হবে কেন? কার্য্যক্ষেত্রে, ভাবের খেলায় সর্বদিক বজায় রাখিয়া চলাফেরা করা এইরূপ কিছু কঠিন। যিনি যে পরিমাণে উহা করিতে সমর্থ, তিনি সেই পরিমাণে সমদর্শী, প্রকৃত শিক্ষিত ও মহৎপদবাচ্য।

সন্তানবৎসল পিতামাতার ন্যায়, ক্ষুদ্রপালনতৎপর, দরিদ্রবৎসল সমাজ, সমাজসমূহের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বিবেচিত হয়। ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব, আমাদের প্রাচীন সমাজ এই আদর্শে অনুপ্রাণিত। এখানে উচ্চতমবর্ণ ব্রাহ্মণ, আত্মসুখৈশ্বর্য্য বৃদ্ধির জন্য আত্মশক্তি প্রয়োগে ব্যস্ত নহেন। কৃষিগ্রন্থ তিনি রচনা করেন কৃষকের হিতার্থ, নিজে কৃষিব্যবসায়ে লাভবান্ হইবার জন্য নহে; ধনুর্ব্বেদে দক্ষতা লাভ করেন, ক্ষত্রিয়ের বলাধান জন্য, নিজে পরপীড়ক হইতে সুবিধা হইবে বলিয়া নহে; ক্ষত্রিয়কে তিনি শিক্ষা দেন "ক্ষতঃ ত্রায়তে ইতি ক্ষত্রিয়ঃ" বৈশ্যকে শিক্ষা দেন, "ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ, সন্নিমিত্তো বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি", শূদ্রকে শিক্ষা দেন, নিহিলিষ্ট বৃত্তি গ্রহণ করিয়া মহতের উচ্ছেদে নহে, পরন্তু মহতের রক্ষা ও পুষ্টিসাধনে বা দ্বিজ শুশ্রূষায় ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মণ, হিমালয় শিখরে মেডিক্যাল কংগ্রেস বসাইয়া, বহুজনে বহু আয়াস সহিয়া চরকের ন্যায়

মহা গ্রন্থের প্রচার করেন, দয়াদ্রচিত্তে জগতের রোগ শোকে বাধা দিবার জন্য, পেটেণ্ট বেচিয়া নিজেরা লক্ষপতি হইবার জন্য নহে; নিজের জন্য তাঁহার বিধান আছে, চিকিৎসা ব্যবসায়ী অর্থাৎ অর্থ লইয়া ঔষধ বিক্রয়কারী ব্রাহ্মণের মুখদর্শন করিতে নাই। দুগ্ধের ন্যায় পরম কল্যাণকর সুতরাং বহু লাভজনক দ্রব্যের ব্যবসায় ব্রাহ্মণের পক্ষে পাতিত্যসাধক—পাছে অর্থাভাবে দুগ্ধ লাভ হইতে কেহ বঞ্চিত হয়। অথচ গোপালন ও গো সেবা নিষিদ্ধ নহে, সেটা সকলের পক্ষেই মহাফলদায়ক। গো সেবাকে ভিত্তি করিয়া যেন হিন্দুসমাজ প্রতিষ্ঠিত। ঔষধ প্রস্তুত করিতে, ধর্ম্মকার্য্যে, দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ এবং দুগ্ধজ বিবিধ পদার্থের প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠা ও শক্তিলাভ পক্ষে বিদ্যা পরম সহায় স্বরূপ; ব্রাহ্মণ নিয়ত বিদ্যাচর্চ্চাব্রত রহিবেন কিন্তু বিদ্যা বিক্রয় তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ। একদিকে এইরূপ সব ক্ষুদ্রের পালন ব্যবস্থা, অন্যদিকে সাংসারিক দুঃখ অভাবাদির অংশ লইবার কালে ব্রাহ্মণ যাচিয়া অগ্রসর। এ হেন সমাজ যদি আদর্শ সমাজ বিবেচিত না হয়, তবে আদর্শ সমাজ আর কোথায় আছে আমাদের জানা নাই। পিতৃমাতৃবৎসল পুত্র যেরূপ বংশের গৌরব, আমাদের প্রাচীন সমাজ তদ্রূপ ব্রাহ্মণের গৌরব বাড়াইয়া নিজে গৌরবান্বিত। প্রকৃত বিষ্ণুভক্ত, কখন ঐশ্বর্য্য জন্য লালায়িত বা প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল নহেন। তিনি ঐ ব্রহ্মণ্য আদর্শরূপ ভৃগুপদচিহ্ন হৃদয়ে ধারণ করিয়া ঐ ব্রাহ্মণের ন্যায়ই, ধন মান তুচ্ছ জ্ঞান করেন, অমরাবতীর ঐশ্বর্য্য এবং দেবগণ মধ্যে পরিগণিত হইয়া স্বর্গবাসের গৌরব তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না, প্রেমের বৈকুণ্ঠপুরী তাঁহার লক্ষ্য, "গো ব্রাহ্মণ হিতায় জগদ্ধিতায়" জীবন ব্যয়িত হইলেই জীবন সার্থক হইল বলিয়া তিনি মনে করেন। এইভাবে ক্ষুদ্রের মাহাত্ম্য উপলব্ধি এবং বৈষ্ণবী প্রকৃতি অর্জ্জন, আমাদের সমাজের রক্ষা সাধনের শ্রেষ্ঠ সদুপায়।

"একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি" কিন্তু সকল ক্ষেত্রে নহে। দু একজন রথচাইল্ড বা জগৎশেঠে দেশের দুঃখ ঘুচে না, দু একজন কোটিপতির অস্তিত্বে দেশের সমৃদ্ধি সুচিত হয় না। অধিকাংশকে বাদ দিয়া নহে অধিকাংশকে লইয়াই দেশ। অভাবযুক্ত ক্ষুদ্রের দল বা শিক্ষিত ভদ্র মধ্যবিত্তকুলই সমাজের মেরুদণ্ড বা গৃহস্থাশ্রম স্বরূপ এবং সামাজিক সর্ব্ববিধ উন্নতির মূল। অভাব গ্রস্ত ক্ষুদ্র দরিদ্র বিদ্যমান থাকিতে সমাজের মুক্তি সাধন অসম্ভব। যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন-নীতি বা জীবনসংগ্রামের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে এ রোগের প্রতীকার হইবার নহে। একদল দরিদ্র ধ্বংস পাইলে, নূতন নূতন আর্ত্তের দল দেখা দিবে মাত্র। স্বার্থপরতারূপ প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ, ক্ষুদ্রের দলন, ক্ষুদ্র প্রতি ঔদাসীন্য ইত্যাদি এ রোগের ঔষধ নহে। সংযম, স্বার্থত্যাগ, পরার্থপরতা প্রভৃতি নিবৃত্তিমার্গের আশ্রয় লইলে এবং দয়া প্রেম প্রভৃতি দেবী শক্তির শরণ লইলেই বুঝি এই অভাব ও শক্তি হীনতারূপ রক্তবীজের আক্রমণ কথঞ্চিৎ প্রতিহত হইতে পারে। ক্ষুদ্রপ্রীতি বা ক্ষুদ্র-পূজাই এই ভাব বর্দ্ধনে সাহায্য করে।

ক্ষুদ্র মিলিত হইলে মহাবল ধারণ করে। ক্ষুদ্র তৃণ, গুচ্ছাকার প্রাপ্ত হইলে মত্ত হস্তীকেও বাঁধিবার বল পায়। ক্ষুদ্রের সম্মিলিত শক্তি যৌথ কারবারগুলি, ব্যক্তিগত কোটিপতির শক্তিকেও অতিক্রম করিয়া যায়।

ক্ষুদ্র প্রকৃত ক্ষুদ্র নহে—এইরূপ মহাশক্তির আধার এবং প্রেমই মিলন ও পূজার সদুপায়।

ব্যক্তিগত হিসাবেও ক্ষুদ্রের মান কি কিছু কম? দেবতার কাছে ছোট বড় ভেদ নাই। সচ্চেষ্টার মূল্য শুধু সাফল্য দেখিয়াই সকল সময় নির্দ্ধারিত হয় না। শক্তির স্বল্পতা বা আধিক্য সেই সর্ব্বশক্তিমানের নিকট কিছুই নহে। থিয়েটার সার্কাসে টাকা হিসাবে আসনের মান আছে কিন্তু দু পয়সা দানের অধিক যাহার শক্তি নাই সে কি সেই অপরাধে ভগবানের রাজ্যেও দুই টাকা দানকারীর নিম্নে আসন পায়? ভাবের বিকাশ কর্ম্মে, ভাবহীন কর্ম্ম যেন প্রাণহীন জড়গতের ব্যাপার। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন ভাবের আদর জানেন। সত্ত্বভাব মূলক ক্ষুদ্র কর্ম্মও ভাবের গুণে মহৎ এবং তামসিক ভাব মিশ্রিত বৃহদনুষ্ঠানও ভাবের দোষে কলুষিতবৎ হইয়া দাঁড়ায়। ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান এইরূপ অনেক সময় অনেক মহদনুষ্ঠান অপেক্ষাও মহত্তর হয়।

লোচনা বেণের নিবাস, দক্ষিণে জয়নগর মজিলপুর গ্রামের নিকট ছিল। লোচনের নাম ইতিহাসে বা সাহিত্যে রক্ষিত নাই; "কীর্ত্তির্যস্য সঃ জীবতি" মিসরের পিরামিডের ন্যায় কোন স্থায়ী কীর্ত্তি লোচন রচনা করিয়া যান নাই; কোন কোন বর্ষিয়সী মহিলার মুখে লোচনের ক্ষুদ্র কীর্ত্তিকাহিনী এখনও এক আধটু শুনা যায়. সে কীর্ত্তি কথা ক্ষুদ্র হইলেও গরীমার ক্ষুদ্র নহে।

লোচনের একটি কন্যা ছিল। একদিন সে খেলাতে খেলাতে সহসা গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া সঙ্গিনীদের বলিল, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে সে একাধিকবার আগুন খাইয়াছে অর্থাৎ সহমৃতা হইয়াছে এবং এ জন্মে তাহার চলিয়া যাইবার সময় আসিয়াছে। সহচরীরা এ কথায় বিস্মিতা হইলে, বালিকা একটি ঝিনুক বা খোলাম কুচি দিয়া নিজের অঙ্গুলি চিরিয়া দেখাইল, অঙ্গুলের ভিতর একাধিক খণ্ড কয়লা রহিয়াছে। ইহার পরই বালিকা অসুস্থ হইয়া পড়িল ও গৃহে গিয়াই যেমন বলিয়াছিল অমর ধামে চলিয়া গেল। ইহ জন্মে তাহার ভাবী পতির অকাল অন্তর্দ্ধান হেতুই এরূপ ঘটিল কি না কে জানে? এই সতী কাহিনীটি একটু বিচিত্র বটে। কন্যাবস্থাতেও সতী তাহার পতির সহিত কি সূক্ষ্মভাবে মিলিত থাকে? হিন্দুর দাম্পত্য বন্ধন কোর্টশিপ বা পূর্ব্বরাগের অপেক্ষা রাখে না, গাছে ফুল ফল ধরার মত সময় এলে রতি ও বসন্ত সহচর মদন ফুলধনু হস্তে দেখা দেন, কিন্তু "কাম" টা সতী প্রেমের একটু অতি সামান্য মূর্ত্তি মাত্র।

পতি-পত্নী সম্বন্ধ যত পবিত্রই হউক, সেই দক্ষ প্রজাপতির সময় হইতে, পতির জন্যই পিতাকে কন্যাহারা হইতে হয়। এ "হারান"র অর্থ অবশ্য চিরবিয়োগ বা জীবনান্ত না হইতেও পারে কিন্তু পতি-পার্শ্বই রমণীর প্রকৃত অবস্থান স্থান। যাহা হউক কন্যাশোককাতর লোচন বণিকের মন, প্রেমের সূক্ষ্মগতি আলোচনা করিয়া তাঁহার সতী তনয়ার শোক ভুলিতে পারিল না, তাঁহার বহু আদরের বালিকার কোনরূপ স্মৃতি রক্ষার্থ তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

গঞ্জ অর্থাৎ হাটের পথে যাইতে, "বাদা"র (মাঠের) মাঝে, চারিদিকে নারিকেল গাছে ঘেরা "লোচনা" বেণের পুকুর, বহুকাল পথশ্রান্ত পথিকের পিপাসা ও শ্রান্তি দূর করিত। এই শ্রেণীর সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠানগুলি পূর্ব্বে এদেশের লোকের প্রিয় ছিল।

ইহাদিগকে সজীব রাখিবার জন্য বড় বড় Organisaton বা সমিত, বহু কর্ম্মচারী প্রভৃতি বহ্বাড়ম্বর সমূহের প্রয়োজন হয় না। কাহারও বিনা যত্নে, শুধু প্রকৃতিমাতার প্রসাদেই, ঐ সব অনুষ্ঠান দীর্ঘকাল সজীব রহিতে সমর্থ। নিজেরা কলুষিত করিয়া না ফেলিলে কোন জলাশয়ের জল শীঘ্র নষ্ট হয় না; ফলবৃক্ষগুলি নিজের চেষ্টায় বাঁচিয়া থাকিয়া জনহিতে রত থাকে; ইহারা যেন সব শান্তিধামের অবৈতনিক দিব্য কর্ম্মচারী-কুল। লোভ, স্বার্থপরত', বিবাদ বিসম্বাদ প্রভৃতি দোষ জুটিয়া বিপদের নিকেতন করিয়া না তুলিলে এই শ্রেণীর সদনুষ্ঠান সমূহ দ্বারা উপকৃত ব্যক্তির আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ এবং আত্মবশ ভাব বজায় রাখিয়া উপকার সাধন সম্ভবপর হয়। এই শ্রেণীর সদনুষ্ঠান সমূহ সাত্ত্বিক দানের ফল এবং সাত্ত্বিকভাবের অস্তিত্ব বা বৃদ্ধি বিনা উহারা রক্ষা পায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বাধা দিবার কেহ নাই দেখিয়া, কেহ যদি অসাবধানে যদৃচ্ছামত ব্যবহারে পুকুরের জলটি নষ্ট করিয়া দেয়, গাছের ফল-গুলি পাড়িয়া বেচিয়া ফেলে, অন্যের ভোগের হন্তারক হয়, স্থানটিকে দস্যু তস্করের নিবাস-ভূমি করিয়া তুলে, তাহা হইলে ঐসব সদনুষ্ঠান আর কয়দিন টিকে? এই হিসাবে এগুলি ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান; তা ছাড়া বহুজনের মিলিত চেষ্টায় এতদপেক্ষা মহত্তর বহুবিধ অনুষ্ঠান-সমূহ নিশ্চিতই অনুষ্ঠিত হইতে পারে, তথাপি ক্ষুদ্র বলিয়া ঐগুলি নিশ্চিতই উপেক্ষণীয় নহে, উহাদের ফলে দেশে সাত্ত্বিক ভাব বৃদ্ধি পায়, উহাদের অভাব ঘটিয়াছে বলিয়াই আজ পল্লীগ্রামসমূহে এবংবিধ জলকষ্ট; "হেলঞ্চ, কল্‌মি লক্‌লক্‌ করে, তার উপর পক্ষী চরে," এ সব ক্রমশঃ গল্পকথা হইয়া দাঁড়াইতেছে, শাকান্নে উদরপূর্ণ করা অবধি দিন দিন অসম্ভব প্রায় হইয়া উঠিতেছে। ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানসমূহের মান বাড়ান ও ক্ষুদ্র পূজার প্রচলনই এ ব্যাধির প্রশমনের সদুপদায়। "লোচনা" বেণের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাত্ত্বিক কর্ম্মীকুলই সকল দেশের সকল সমাজের চিরভূষণ।

লোচনের ন্যায় অতটা করিতেও যদি শক্তি না থাকে, দেবতাকে স্মরণ করে ও দেশের কল্যাণ কামনা করে, যদি দুটা ভাল ফল ফুলের গাছও আমরা বসাইয়া যাই দেশের এমন কি বিশ্বমানবের কত কল্যাণ সিদ্ধ হইতে পারে। শ্রীরামচন্দ্র কতৃক সেতুবন্ধন কালে কাঠবিড়ালী তাঁহাকে সাহায্য করিতে আসিয়াছিল। দরিদ্র-বন্ধু শ্রীরামচন্দ্র সেই ক্ষুদ্র প্রাণীর ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা উপহাসে উড়াইয়া দেন নাই। তাহার অঙ্গে শ্রীকর বুলাইয়া আদর করিয়াছিলেন। অদ্যাপি কাঠবিড়ালী সেই অঙ্গুলীস্পর্শচিহ্ন অঙ্গে ধারণ করিয়া গৌরবে ও আনন্দে নৃত্য করিয়া বেড়ায় ও সেই দীনবন্ধুর মহিমা প্রচার করে। আমাদের দেশের এই ক্ষুদ্র কিম্বদন্তিটি, একটু সুভাবের নজরে দেখিলে, অবিশ্বাস্য বা সামান্য জ্ঞানে উপহাস করেতে আর প্রবৃত্তি হইবে না। অপরের ক্ষুদ্র চেষ্টার ফলে বহু দেশ বহু কল্যাণকর জীব উদ্ভিদে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। শুনা যায়, পেঁপে, কপি, গোলআলু প্রভৃতি পূর্ব্বে এদেশে ছিল না; তেঁতুল গাছটা আফ্রিকা হইতে আমদানী; তামাক ও কুইনাইনের (সিন্‌কোনা) আদি নিবাস আমেরিকা। আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় পূর্ব্বে ঘোটক ছিল না, এখন তথা হইতে অন্য দেশে অজস্র চালান যায়।

"চা" এদেশে বরাবরই জন্মাইত কিন্তু উহার ব্যবহার বড় কেহ জানিত না। এই

অল্পজ্ঞাত ক্ষুদ্র পত্র প্রভাবে এখন কত লোক বড় লোক। নূতন নূতন আবিষ্কারের ন্যায় পুরাতনের পুনঃ প্রবর্ত্তনেও অনেক সময় কত কল্যাণ সিদ্ধ হইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, "চা" পানের ন্যায় বিবিধ পাঁচন সমূহের প্রচলন বাড়িলে মন্দ হয় কি? প্রবোধ বাবুর উপদিষ্ট "অশ্বগন্ধা" ব্যবহারে "চা" অপেক্ষাও সুফল লাভ সম্ভবপর নহে কি? তেজপাতা, থুলকুড়ি, ভৃঙ্গরাজ, যষ্টিমধু প্রভৃতি জরা ব্যাধি প্রশমক রসায়ন ও জীবনীয় শ্রেণীর কত ভেষজ বর্ত্তমান রহিয়াছে, ক্ষুদ্র জ্ঞানে সেগুলি উপেক্ষা না করিলে আমাদেরই কল্যাণ বৃদ্ধি হয়।

প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্‌তত্ত্বজ্ঞ মহামতি বর্ব্বাঙ্ক স্বীয় মনীষা বলে অনেক অপকৃষ্ট উদ্ভিদের উৎকর্ষ বিধান এবং বহু নূতন নূতন উদ্ভিদের সৃষ্টি করিতেছেন। এই শ্রেণীর মহৎ অনুষ্ঠান সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে, ইহার তুলনায় উপকারী উদ্ভিদ্ সমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি সাধন, একস্থান হইতে স্থানান্তরে উপনিবেশ স্থাপন প্রভৃতি অনেকটা সহজসাধ্য ব্যাপার। হায়, আমাদের সেই প্রাচীন বৃক্ষপ্রতিষ্ঠারূপ ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান—যাহার ফলে ৺পুরীধামের পথে শুনা যায় লক্ষ আম্রবৃক্ষ সমন্বিত "একাম্র কাননে"র প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল—ক্ষুদ্র জ্ঞানে দিন দিন উপেক্ষিত হইতেছে কেন? বৃষোৎসর্গের উৎসৃষ্ট বৃষগুলির স্বাধীনতা আর সম্মানিত হয় না; নারিকেল, অশ্বত্থ, বট, নিম্ব, বিল্ব প্রভৃতি বৃক্ষ সমূহের উচ্ছেদসাধনে অনেকে আর সঙ্কুচিত হয় না; প্রয়োজনানুরোধে কোন স্থানে এই গুলির উচ্ছেদ আবশ্যক হইলে দেশের অহিত নিবারণার্থ অন্য কোন স্থলে নূতন গাছ বসান উচিত নহে কি? নানা কারণে দেশে গো হত্যা নিবারণ সহজসাধ্য নহে কিন্তু গোবংশের রক্ষা বৃদ্ধি ও উন্নতিসাধন সম্বন্ধে আমরা করিতেছি কি? ছাগের সংখ্যা অল্প হইলেও যদি ছাগীর সংখ্যা অধিক থাকে, ছাগকুলের সংখ্যা হ্রাস সহজে ঘটিতে পারে না, বাজারে ছাগীমাংস বিক্রয় নিষিদ্ধ হয় না কেন? ধর্ম্মভাব অক্ষুণ্ণ থাকিলে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতাদি পালনকালে মৎস্যাদি বহুবিধ জীব বংশবৃদ্ধির সুবিধা পায়। দিন দিন যেরূপ ব্যাপার দাঁড়াইতেছে তাহাতে হয়ত দুদিন বাদে আইন করিয়া ডিম ছাড়িবার সময় মাছ থাওয়া বা চারামাছ থাওয়া, আমাদিগকে বন্ধ রাখিতে হইবে। এইরূপ সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারে আমরা অমনোযোগী বলিয়াই বনরক্ষার আইন, শিকারের আইন প্রভৃতি বিবিধ আইন কানুন সমূহের প্রবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। ক্ষুদ্রের ভীমবল উপলব্ধি চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন কত নূতন নূতন তত্ত্ব আমরা অবগত হইতেছি। রোগ বিস্তারে মশা মাছি "ব্যাসিলিস্", ইঁদুর প্রভৃতির কার্য্য, শস্যকীটের উৎপাত নিবারণে পক্ষীকুলের সাহায্য, কাক, কুকুর, মোরগ প্রভৃতির জন্য সহরের স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদি দৃষ্টান্ত।

ক্ষুদ্রের কথা ভুলে গেলেই, সমাজের হৃদয়হীনতা ও অকর্ম্মণ্যতা ব্যক্ত হ'য়ে পড়ে। স্বায়ত্তশাসনে অধিকার পেলেও সে কলঙ্ক মুছিবার নহে। স্বায়ত্তশাসনকামী উন্নতি অভিমানী হিন্দু, তুমি স্বসমাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা দুঃখ অভাব সম্বন্ধে কতদিন আর হৃদয়হীন বা অন্ধের ন্যায় অবস্থান করিবে? স্বসমাজের প্রয়োজনানুরূপ অনুষ্ঠান সাধনে তুমি কি এতই অক্ষম! একটা দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা বিশদ করিব। সহরের নানাস্থানে

নানা পার্ক (উদ্যান) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু ফুল তুলিবার বা পাতা ছিঁড়িবার হুকুম নাই। এই উপলক্ষে যে সব শোচনীয় ব্যাপার সময় সময় সংঘটিত হয়, হৃদয়বান্ ব্যক্তি জীবনে বোধ হয় তাহা ভুলিতে পারেন না। লোকের এখন রুচিবিকার ঘটিয়াছে, ফুল তুলসীর পরিবর্ত্তে গৃহস্থ গৃহে এখন ক্রোটন গাছের সমাদর, সখের জন্য যে ফুল গাছ পুতিয়াছে দেবপূজার খাতিরে, সে তাহাতে হাত দিতে দেয় না, প্রভাতে, ঘরে ব্রাহ্মণ কুমারের পদরেণু লাভ, হিন্দু হয়ে হিন্দুর দেবপূজায় সাহায্য, এ সব চিন্তায় এখন আর কেহ মুগ্ধ হয় না। ফলে দাঁড়াইয়াছে এই, দেবতার জন্য ফুল দূর্ব্বা তুলসী বিল্বপত্রাদি সংগ্রহ দরিদ্র ব্রাহ্মণের পক্ষে দুঃস্বপ্নদর্শনের ন্যায় দিন দিন একটা বিভীষিকার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইহার জন্য মিউনিসিপাল পার্কে ঢুকিয়া অনেক ব্রাহ্মণ কুমার ও প্রাচীনা মহিলা প্রভৃতিকে বিপন্ন ও অপমানিত হইতে স্বচক্ষে দেখা গিয়াছে; অনেক স্থলে উপায়ান্তরাভাবে উদ্যানরক্ষককে নিয়মিত ভাবে কিছু কিছু উৎকোচ দিতে অনেকে বাধ্য হইয়া থাকেন। দেবতার জন্য এ নিগ্রহ ও অপমান ভোগের কথা শুনিয়া স্বধর্ম্মে মতিমান্ হিন্দু তোমার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবে না কি? উন্নতি অভিমানী তুমি, স্বায়ত্ত শাসনের আদর ও বড়াই করিতে শিখিয়াছ, হিন্দু সাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া হিন্দুর দেবপূজার সুবিধার জন্য পুরাতন তপোবন সমূহের আদর্শে স্থানে স্থানে পুষ্পোদ্যান সমূহ প্রতিষ্ঠা করিতে পার না? এ উদ্যম এ প্রবৃত্তি হয় না, শুধু ক্ষুদ্রের বেদনা ও অভাব বুঝিতে তুমি উদাসীন বা অক্ষম সেই জন্য। সমাজের প্রয়োজনানুরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানে কতদিন আমরা আর এভাবে উদাসীন রহিব। আবার পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তে, রুচিবিকারগ্রস্ত বড় লোকদের ঔদাসীন্য ঘুচাইতে অক্ষম হইলে, স্বধর্ম্মানুরাগী হিন্দুসন্তান মাত্রেই যদি স্ব স্ব গৃহে ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রশক্তির অনুরূপ ফুল দূর্ব্বাদি প্রাপ্তির যথাসম্ভব এক আধটু ব্যবস্থা করেন, ধর্ম্মগ্লানি নিবারণের ও স্বধর্ম্মরক্ষার কত সাহায্য হইতে পারে। ইহাও ক্ষুদ্রের মহিমা-জ্ঞাপক।

কত আর দৃষ্টান্ত দিব। একটুখানি সহানুভূতির ভাবে সামান্য একটু মনশ্চক্ষু খুলিলেই চারিদিকে ক্ষুদ্র পূজার মহিমা ও আবশ্যকতার শত দৃষ্টান্ত নজরে পড়িতে থাকে।

ধর্ম্মচর্চ্চাজন্য বড় বড় দেব-মন্দির নিশ্চিতই বড় শোভাময়, কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের গ্রাম্য দেবালয় পুরাতন বৃক্ষতলগুলিও কি অল্প সুন্দর বা লোক সমাগম পক্ষে অল্প অনুপযোগী? বড় বড় বাগ্মী, গায়ক, সাধক প্রভৃতির সমাবেশ নিশ্চিতই বড় স্পৃহনীয় কিন্তু সাধারণের সমাবেশে হরি কথা কীর্ত্তনও কি অল্প মনোহর? রোগ শোকে দেশবাসী আজ জর্জ্জর, মেডিকাল কলেজের পাশ করা ডাক্তরের বহু পরীক্ষিত চিকিৎসার সুযোগ ঘটিলে ত বহু ভাগ্য, কিন্তু সেকালের ন্যায় ঘরে ঘরে রমণীকুলকে অবধি ক্ষুদ্র মুষ্টিযোগ চিকিৎসাটা শিখাইয়া লইলে, যম দেবতার কোপ প্রশমনের সহজ পথটাই ধরা হয় না কি? রমণী, পুরুষের দাসী নহেন, পুরুষের ন্যায় সর্ব্ববিধ ভোগ সুখে তাঁহারও অধিকার আছে, ভার্য্যার ভার বহনে, ভার্য্যাকে সুখে রাখিতে অক্ষম পতি পতিপদের অযোগ্য ইত্যাদি মন্ত্রে দীক্ষিতা না হইয়া আমাদের শিক্ষিতা মহিলাকুল যদি

সেই গান্ধারীর ন্যায় অন্ধ অর্থাৎ ক্ষুদ্র পতিকেও পূজা করিতে সমর্থা রহেন, সংসার তাহা হইলে বড় সুখের হয় না কি? এরূপে ক্ষুদ্র পূজা সামর্থ্যের পরিচয় দিতে না পারিলে, বিলাসের মোহ কাটাইয়া, দরিদ্র (ক্ষুদ্র) পতিগৃহের নানা অভাব নানা দুঃখ সহিতে অরুচি দেখাইলে, ছেলেরাও সেয়ানা হইয়া সহজে আর বিবাহ করিতে চাহিবে না, কন্যাদায়ও শীঘ্র ঘুচিবে না এবং স্ত্রী-শিক্ষা স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রভৃতি সম্বন্ধে লোকের আতঙ্ক ও বিতৃষ্ণা সহজে বিদূরিত হইবে না। তীব্র জীবন-সংগ্রামে দেশবাসী দিন দিন অবসন্ন প্রায় হইয়া পড়িতেছেন। এ বিপদ হইতে উদ্ধার লাভেরও পুরাতন কোন ক্ষুদ্র উপায়ের সন্ধান পাওয়া যায় না কি?

হিন্দু অতি প্রাচীন জাতি, নানা ঝড় সহিয়া ও নানা বিপদ কাটাইয়া বাঁচিয়া আছে। কি ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ফলে এতদিন সে টিকিয়া আছে, ভাবিয়া দেখিলে আমাদের লাভ ব্যতীত অলাভ নাই। এ ভাবে জাতীয় ইতিহাস আলোচনার চেষ্টা পাইলে ইতিহাস রচনার হয় ত এক নূতন ধারা বাহির হইবে এবং জাতিটাকে জানিতে সুবিধা হইবে। আত্মতত্ত্বজ্ঞান যেমন শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, স্বজাতি সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট অভিজ্ঞতা যাহাতে বৃদ্ধি পায় সেই ইতিহাস সেইরূপ শ্রেষ্ঠ ইতিহাস। বর্ত্তমান ক্রমোন্নতিবাদের হুজুকে পড়িয়া আমাদের সমস্ত প্রাচীন প্রথাই নিকৃষ্ট বা ক্ষুদ্রজ্ঞানে উড়াইয়া দিলে, আমরা শুধু বঞ্চিত হইব মাত্র।

কালের অমোঘ নিকষ প্রস্তরে পরীক্ষিত হইয়া যে জাতি রক্ষা পাইয়াছে, তাহাকে ও তাহার অনুসৃত প্রথাসমূহকে ক্ষুদ্র জ্ঞানে উপেক্ষা করার তুল্য মহাভ্রম আর কি আছে? দৃষ্টান্তস্বরূপ, আজকাল সভ্যসমাজে প্রায়সর্ব্বত্র, অর্থই পরমার্থ, সর্ব্ববিধ সামর্থ্যমূল এবং শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট নিরূপণের একমাত্র পরশপাথররূপে বিবেচিত হইতে বসিয়াছে। আমাদের দেশে সাধুগণ শিক্ষা দেন "অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্"—অর্থকে অনর্থমূল ভাবিতে শিখ, "কামিনী কাঞ্চনের মোহ কাটাও," ইত্যাদি এবং অর্থের অতি প্রতাপ বা কুফল নিবারণ জন্য নানা চেষ্টা ও ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। প্রধানতঃ জীবন রক্ষা জন্যই অর্থের প্রয়োজন। আমাদের দেশে বিত্তার্জ্জন অপেক্ষা ঘরে ঘরে অন্ন বস্ত্রের সংস্থান চেষ্টাটা সমধিক পরিস্ফুট। প্রাচীন সিধা দান প্রথার এ হিসাবে বুঝি তুলনা নাই। মুষ্টিভিক্ষা ও সিধা দান ফলে, দেশবাসীর ঘরে ঘরে মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থানটা সুকৌশলে করিয়া দেওয়া যায়, দেশে সর্ব্বদা যথেষ্ট অন্ন সঞ্চিত রাখা আবশ্যক হয়, দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা তিরোহিত হয়, চাউলের দর দুই টাকা স্থলে দুই শত টাকা মণ হইলেও উদ্বেগের কারণ থাকে না। ফলতঃ বাঁচিয়া থাকিতে বাসনা থাকিলে এই একটি অতি ক্ষুদ্র প্রাচীন প্রথার পুনঃ প্রবর্ত্তনে হয়ত আমাদিগকে অল্পে অল্পে পুনরায় সচেষ্ট হইতে হইবে।

শিক্ষিত ভদ্র মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি পুষ্টি করিতে হইলে, মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান হইলেই যথেষ্ট হইল না, সঙ্গে সঙ্গে যথাসম্ভব বিদ্যা চর্চ্চারও ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। ইহার জন্য কি কি ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইতে পারে ভাবিয়া দেখা যাউক। লোকশিক্ষা বিস্তার বিনা দেশোন্নতির আশা বৃথা। অন্য দেশে মুটে মজুরেও লেখাপড়া শিখিতেছে, আমাদের দেশে যাহা ছিল তাহাও যাইতেছে। বালক বয়সে যে দৃশ্য দেখিয়াছি

এখন তাহা আর দেখিতে পাই না। ধর্মভাব যখন প্রবল ছিল, "হাতে খড়ি" সংস্কারের কল্যাণে নিরক্ষর ভদ্রবংশীয়ের অস্তিত্ব অসম্ভব ছিল; এখন সেন্‌সাস্ রিপোর্টে ত দেখিতে পাই, নিরক্ষর ব্রাহ্মণের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। যে উপায়ে হউক অচিরে এই অধোগতির প্রতিকার চেষ্টা না করিলে ব্রাহ্মণের রক্ষা নাই এবং ব্রাহ্মণপ্রিয় হিন্দু-সমাজেরও গৌরব বা শান্তি নাই। প্রধানতঃ দারিদ্র্য হেতুই ব্রাহ্মণনন্দনগণের পক্ষে কালোচিত ব্যয়বহুল উচ্চ শিক্ষা লাভ দিন দিন অসম্ভব প্রায় হইয়া উঠিতেছে. ইহার উপর সাধারণ ভাবের সামান্য শিক্ষাও বজায় না রাখিলে উপায় কি? লেখার ন্যায় পড়াও বিদ্যাবিস্তারের সদুপায়. নিরক্ষর ব্যক্তিও শিক্ষিত ও ভদ্র হইতে পারেন। আমাদের প্রাচীন সমাজে এ তত্ত্ব সুবিদিত ছিল। আদি-কাল হইতে বেদ বেদাঙ্গাদি বিবিধ বিদ্যা মুখে মুখে রক্ষিত ও প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বে দোকানী পশারীকে অবধি বৈকালে সুর করিয়া রামায়ণ, মহাভারত কাব্য গল্প পুস্তক প্রভৃতি পাঠ করিতে রত দেখিতাম; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রোতার দল তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া নিবিষ্ট মনে সেই সব শুনিত। এখন এসব দৃশ্য দিন দিন অদৃশ্য প্রায় হইতেছে কেন? দেশে বিদ্যা বিস্তারের বাসনা থাকিলে, অক্ষর পরিচয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাঠক ও কথক-কুলের সংখ্যা বাড়াইতে হইবে। ইঁহাদের গুণেই আমাদের স্ত্রীশূদ্র প্রভৃতি নিরক্ষর রহিয়াও শিক্ষিত ভদ্র সচ্চরিত্র ও নানা গুণে বিভূষিত ছিলেন। ধর্ম্মগ্রন্থাদির সঙ্গে সঙ্গে মাসিক পত্র ও সংবাদ পত্রগুলি নানাস্থানে নিয়মিত ভাবে পাঠের ব্যবস্থা করিলে দেশে কালোচিত শিক্ষাবিস্তারে যথেষ্ট সাহায্য হইবে। পূর্ব্বোক্ত মুষ্টিভিক্ষা, সিধাদান প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকিলে, আমাদের মনে হয় এই শ্রেণীর পাঠকের অসদ্ভাব ঘটিবে না। ক্ষুদ্র পূজার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশে শিক্ষা বিস্তারের পথ এইরূপে সুগম করা যায়।

শুধু সংবাদপত্র ও মাসিকপত্রগুলি লইয়াই দেশময় অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীপাঠাগার সমূহ বিরচিত হইতে পারে। শিক্ষা বিস্তার পক্ষে ইহাতেও দেশের পরম লাভ। এই লোক শিক্ষা ব্যাপারেও ক্ষুদ্রের মান দেখ। অঙ্গুলী-পর্ব্বাগ্রে গণনীয় জনকত সাহিত্যরথী বা সাহিত্য সম্রাটের পরিবর্ত্তে দেশের জন-সাধারণকে যেদিন আমরা সাহিত্য-সেবারত দেখিব, সেদিন বুঝিব দেশে বাগ্দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবার দিন আসিয়াছে।

আজকাল ব্রাহ্মণ রক্ষা ও ব্রাহ্মণের উন্নতি সাধন চেষ্টায় স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণ সভাদির প্রতিষ্ঠা হইতেছে। অধ্যয়ন অধ্যাপন ব্রাহ্মণের জাতীয় বৃত্তি; ব্রাহ্মণ সন্তান মাত্রেই যদি কর্ত্তব্যানুরোধে যথাশক্তি সাহিত্য চর্চ্চা-রত রহেন, ব্রাহ্মণের এবং ব্রাহ্মণ-রক্ষিত সমাজের উন্নতি রোধ করে কে? এমন একদিন ছিল, যখন মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন হয় নাই, তখনও কি প্রতি ব্রাহ্মণের গৃহে স্বলিখিত বা অন্য লিখিত দু-একখানি হাতের লেখা পুঁথির ছোট খাট লাইব্রেরী থাকিত না? তখন যাহা সম্ভবপর ছিল, এখনই বা তাহা হইবে না কেন? অর্থের অভাবে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে হাতের লেখা সকলের গোচরে নাই বা আসিল, নাই বা নাম প্রচার হ'ল, নিজে লিখিয়া অন্যের নামে প্রচার এদেশেই দেখা যাইত না কি? বাঙ্গলার শ্রীচৈতন্য আজ একজন বাঙ্গালীর মান বৃদ্ধি জন্য স্বহস্তের লেখা অনায়াসে জলে ফেলিয়া দেন নাই কি?

কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্মানুষ্ঠান, কর্ম্মজনিত আনন্দের জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান, এদেশেরই শিক্ষা দীক্ষা নহে কি? আমাদের বাসনা, ব্রাহ্মণ সন্তান মাত্রই লেখক ও পাঠক হইয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপন রূপ জাতীয় বৃত্তিটি যথাসম্ভব পুনঃ গ্রহণ করুন। অন্যে অনুবর্ত্তী হয়, আরও সুখের কথা; যাজন যজনাদিরূপ শাস্ত্রীয় ব্যাপারে ব্রাহ্মণের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে অন্য বর্ণের অধিকার থাকুক বা নাই থাকুক, ব্রাহ্মণ স্বপদে প্রতিষ্ঠিত রহিলে, স্ববৃত্তি ত্যাগ না করিলে, তাঁহার অধঃপতন না ঘটিলে, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অন্য সবাই উন্নত হইলে, তত্তুল্য সুখের বিষয় আর কি আছে? পূর্ব্বে যাহা সম্ভবপর ছিল এখনই বা তাহা হইবে না কেন? নিশ্চিতই সে দিন আসিবে অথবা সমাগতপ্রায়। নবীন যুগের নূতন শিক্ষা এই ক্ষুদ্র পূজা প্রভাবে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্মীকুলে দেশ ভরিয়া যাউক, ইহাঁরাই সমাজের উপাদানকারণস্বরূপ এবং দেশের প্রকৃত আশা ভরসার স্থল

শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়।

বীরভূমের বিবিধ প্রসঙ্গ

(১)

৺বক্রেশ্বর শ্রীশ্রীমহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি

প্রায় এক বৎসর হইতে চলিল আমাদের বিদ্যোৎসাহী মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত মহিমা নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতা ও সম্পাদকতায় "বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমিতির এই এক বৎসরের যথাসাধ্য যত্ন ও পরিশ্রমে সংগৃহীত তথ্যাবলি সমিতি সঙ্কলিত "বীরভূম বিবরণ" নামক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। বীরভূম বিবরণের উপকরণাদি সংগ্রহের জন্য আর একবার ৺বক্রেশ্বরাদি তীর্থ পরিদর্শন বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। মহারাজ কুমার বাহাদুরের নিকট প্রস্তাবটী উত্থাপন করিবামাত্র তিনি সাগ্রহে সম্মতি দান করিলেন। স্থির হইয়া গেল আগামী কল্যই যাত্রা করিতে হইবে। ২রা শ্রাবণ রাত্রি প্রভাত হইল। আমরাও সুপ্রভাত সুপ্রভাত বলিতে বলিতে গাত্রোত্থান করিয়া শ্রীহরি স্মরণে বাহির হইয়া পড়িলাম। যানের মধ্যে একখানি 'মোটার'; আর যাত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত মহারাজ কুমার বাহাদুর ও এই অধম লেখক এবং একজন মোটার চালক, মহারাজ কুমার বাহাদুরের একজন আরদালী ও একজন চাকর। হেতমপুর রাজবাটী হইতে বক্রেশ্বরের দূরত্ব প্রায় দশ মাইল হইবে। কয়েক মিনিটেই বক্রেশ্বরে গিয়া পৌছিলাম। কিন্তু পথের দৃশ্য যাহা দেখিলাম তাহাতে শরীর শিহরিয়া উঠিল। বর্ষাকাল হইলেও এখনো এতদঞ্চলে বিন্দুপাত হয় নাই। চারি পাশের মাঠ মরুভূমির মত ধূধূ করিতেছে। মাঠে জনপ্রাণীও নাই। জানিনা

মঙ্গলময়ের মনে কি আছে। ৺বক্রেশ্বরে পৌঁছিবামাত্র পাণ্ডার দল আসিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁইহাট নিবাসি সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ীর অধ্যক্ষ কামাক্ষ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়া সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। আমাদের স্নান পূজাদি শেষ হইল। তারপর বৈতরণীকুণ্ড, পাপহরা নদী ও অপর (উষ্ণ প্রস্রবন) কুণ্ডাদি দেখিয়া শ্বেতগঙ্গার উত্তরতটে বটবৃক্ষমূলে যথায় গৌর নিতাইয়ের শ্রীচরণ চিহ্ন বিদ্যমান, তথায় উপস্থিত হইলাম। অদূরে একটী বহুদিনের পরিচিত (ভগ্ন) হরগৌরির যুগল-মূর্ত্তি পতিত রহিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি, আই, ই ও প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন—ইহা একটী 'যুগলদ্ধ' মূর্ত্তি ও মূর্ত্তিটী প্রায় হাজার বৎসরের পুরাতন।" (১) কিন্তু এরূপ মূর্ত্তির সার্থকতা কি, এতদিন তাহার কিছুই বুঝিতে পারা যায় নাই। মূর্ত্তিটী উঠাইয়া বিশেষ করিয়া দেখিতেই হঠাৎ একজন পাণ্ডা বলিয়া উঠিলেন "আজ কিছু দিন হইল আমাদের বাড়ীর সমীপস্থ এক পুষ্করিণী গর্ভে একটী মূর্ত্তি কুড়াইয়া পাইয়াছি, মূর্ত্তিটী অবিকৃত আছে। শুনিয়াই তাঁহাদের বাড়ীতে গিয়া দেখিতে ইচ্ছুক হওয়ায় দুই একজন পাণ্ডা আমাকে তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। গিয়া দেখি এক অষ্টাদশভুজা দেবীমূর্ত্তি ? অপূর্ব্ব সে মূর্ত্তির পরিকল্পনা! একখণ্ড কৃষ্ণ প্রস্তরে মূর্ত্তিটী নির্ম্মিত। মূর্ত্তিটীকে বেড়িয়া কৌমারী বারাহী বৈষ্ণবী প্রভৃতি শক্তি চালচিত্রের মত শোভা পাইতেছেন।

"বক্রেশ্বরে মনঃ পাতঃ দেবী মহিষ মর্দ্দিনী
ভৈরবো বক্রনাথস্থ নদী তত্র পাপহরা।"

এই 'মহিষমর্দ্দিনী' এতদিন কেহ দেখিতে পাইত না। এইবার তিনি লোকলোচনের গোচরীভূতা হইয়াছেন। প্রাগুক্ত মূর্ত্তিটীই যে ৺বক্রেশ্বর মহাপীঠাধিষ্ঠাত্রী মহিষমর্দ্দিনী দেবী, তদ্বিষয়ে আমাদের আর কোনও সংশয় রহিল না। এতদিনে হরগৌরির ভগ্ন মূর্ত্তিটীর আবশ্যকতা বুঝিতে পারা গেল।

আমরা "বোম্বাই নির্ণয় সাগর যন্ত্র হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত, হরিকৃষ্ণ শর্ম্মণা সম্পাদিত দুর্গা সপ্তশতী" গ্রন্থ হইতে নিম্নে মূর্ত্তি পরিচয় বিবৃত করিতেছি।

'দুর্গা সপ্তশতী বৈকৃতিক রহস্যে' প্রথমে মধুকৈটভ বধাধিষ্ঠাত্রি যোগনিদ্রা মহাকালী দেবী বর্ণিত হইয়াছেন। তৎপরে-মহিষাসুর বধাধিষ্ঠাত্রি মহালক্ষ্মী মহিষমর্দ্দিনীর বর্ণনা আছে। যথা—

ঋষিরুবাচ—

সর্ব্বদেব শরীরেভ্য যাবির্ভূতা মিতপ্রভা।
ত্রিগুণা সা মহালক্ষ্মী সাক্ষান্মহিষমর্দ্দিনী॥
শ্বেতাননা নীলভুজা সুশ্বেত স্তনমণ্ডলা।
রক্ত মধ্যা রক্তপাদা নীল জঙ্ঘোরু রুন্মদা॥
সুচিত্র-জঘনাচিত্র মাল্যাম্বর বিভূষণা।
চিত্রানুলেপনা কান্তি রূপ সৌভাগ্যশালিনী॥

(১) দুর্গাসপ্তশতী গ্রন্থে বৈকৃতিক রহস্যে মহিষমর্দ্দিনী পূজা প্রসঙ্গে দেবতা স্থাপন ক্রমাদি আলোচনা করিয়া অনুমিত হয় যে মূর্ত্তিগুলি বৌদ্ধ প্লাবনের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্বেতনামক রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। তৎকর্ত্তৃক লুপ্তপ্রায় বক্রেশ্বর তীর্থ পুনঃ সংস্কৃত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। অনেকে বলেন তিনি খৃঃ ৪র্থ কি ৫ম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু তাহার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমাদের অনুমান তিনি বুদ্ধের জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে মঙ্গলকোটে রাজত্ব করিতেন। এবং মূর্ত্তিগুলি তৎসমসাময়িক। বিষয়টি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হওয়া প্রয়োজনীয়।

অষ্টাদশ ভুজা পূজ্যা সা সহস্র ভুজা সতী।
আয়ুধা ন্যত্র বক্ষ্যন্তে দক্ষিণাধঃ করঃ ক্রমাৎ॥
অক্ষমালাভ কমলং বানোঽসি কুলীশং গদা।
চক্রং ত্রিশুলং পরশুঃ শঙ্খো ঘণ্টা চ পাশকঃ॥
শক্তির্দণ্ডশ্চর্ম্ম চাপং পান পাত্রং কমণ্ডলু।
অলঙ্কৃত ভুজা নেভী রায়ুধৈ কমলাসনাং॥
সর্ব্বদেব ময়ী মীশাং মহালক্ষ্মী মিমাং নৃপ।
পূজয়েদ্‌সর্ব্ব দেবানাং স লোকানাং প্রভুর্ভবেৎ॥

বলাবাহুল্য যে আমাদের পরিদৃষ্ট মূর্ত্তিটীর অষ্টাদশভূজে এই অষ্টাদশ প্রকার আয়ুধাদি বিদ্যমান আছে। তবে বহুদিনের পুরাতন ও বহুদিন মৃত্তিকাগর্ভে নিহিত থাকায় মূর্ত্তিটী অনেকাংশে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। অধুনা চিত্র বর্ণাদি বুঝিবার উপায় নাই।

বৈকৃতিক রহস্যে অতঃপর শুম্ভ-নিশুম্ভ বধাধিষ্ঠাত্রী মহা সরস্বতীর রূপ বর্ণনা করিয়া ইহাদের পূজা করিতে হইলে কোথায় কোন্ মূর্ত্তির স্থাপনা করিতে হইবে তাহারই বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

মহালক্ষ্মী র্যদা পূজ্যা মহাকালী সরস্বতী।
দক্ষিণোত্তরয়ঃ পূজ্যে পৃষ্ঠতো মিথুন ত্রয়ং॥(২)
বিরিঞ্চী স্বরয়া মধ্যে রুদ্র গৌর্য্যাচ দক্ষিণে।
বামে লক্ষ্ম্যা হৃষিকেশ পুরতো দেবতাত্রয়ং॥
অষ্টাদশ ভুজা মধ্যে বামে চাস্যা দশাননা।
দক্ষিণেঽষ্ট ভুজা লক্ষ্মী মহতীতি সমর্চ্চয়েৎ॥
অষ্টাদশভুজা চৈসা যদা পূজ্যা নরাধিপ।
দশাননা চাষ্ট ভুজাং দক্ষিণোত্তরয় স্তদা॥
কাল মৃত্যুশ্চ সংপূজ্যৌ সর্ব্বারিষ্ট প্রশান্তয়ে।
নবাস্যা শক্তয়ঃ পূজ্যা(৩) স্তথা রুদ্রো বিনায়কৌ॥

মহালক্ষ্মীর পূজা করিতে হইলে দক্ষিণে মহাকালী ও বামে মহাসরস্বতী মূর্ত্তির স্থাপনা করিবে। (বলাবাহুল্য যে এই মহালক্ষ্মীই প্রাধানিক রহস্যের "সর্ব্বাসাদ্যা মহালক্ষ্মী স্ত্রিগুণা, পরমেশ্বরী"। এবং এই মহাকালী ও মহাসরস্বতী ইহারই অংশোদ্ভবা। ইহাদের প্রত্যেক হইতে আবার যে মূর্ত্তির উদ্ভব হইয়াছিল সেই মহালক্ষ্মী মহাকালী ও মহাসরস্বতী দেবীই অসুরনাশিনী। এক কথায় ইহারা 'অবতরি' তাঁহারা 'অবতার'।) মহালক্ষ্মীর পৃষ্ঠদেশে মিথুনত্রয়ের মধ্যে ব্রহ্মা ও বাণী, মহাকালীর পশ্চাতে রুদ্র ও গৌরী এবং মহাসরস্বতীর পশ্চাতে লক্ষ্মী ও হৃষিকেশ থাকিবেন। সম্মুখভাগে দেবতাত্রয়ের মধ্যে মহালক্ষ্মীর সম্মুখে অষ্টাদশভুজা মহিষমর্দ্দিনী মহাকালীর সম্মুখে দশাননা মহাকালী ও মহাসরস্বতীর সম্মুখে অষ্টভুজা মহাসরস্বতী। ইহাই সাধারণ ক্রম। তবে যেখানে অষ্টাদশ-ভুজা মহিষমর্দ্দিনীই বিশেষরূপে পূজিতা হইবেন তথায় একটু ব্যতিক্রম হইয়া তাঁহার দক্ষিণে দশাননা ও বামে অষ্টভুজা স্থাপিতা হইবেন। এবং তথায় কাল ও মৃত্যু, রুদ্র ও বিনায়ক এবং নব শক্তি পূজিতা হইবেন। বক্রেশ্বরে এই সমস্ত মূর্ত্তিই প্রতিষ্ঠিত ছিল। তথায় এই সমস্ত দেবতারই পূজা হইত।

কি অপূর্ব্ব এই পরিকল্পনা! কি মহান চিত্র! 'অনাদি মধ্যান্ত মনন্তবীর্য্য' বিরাটের কি সূক্ষ্ম অথচ মহান বিকাশ! জানিনা কোন্ পরমুদার হৃদয়ে এই ভীমকান্ত সৌন্দর্য্যের

(২) মিথুনত্রয়ের মধ্যে রুদ্র ও গৌরীর মূর্ত্তি পাওয়া যায় মাত্র। আমাদের পরিচিত যে হরগৌরীর যুগল মূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছি তাহা মিথুনত্রয়েরই একতম। এই মূর্ত্তিটী ও মহিষমর্দ্দিণীর মূর্ত্তি ভিন্ন বাকি কোনো মূর্ত্তিই পাওয়া যায় না।

(৩) 'গুপ্তবতী' টীকাকার বলেন "নব শক্তয়ঃ কবচোক্তা শৈলপুত্র্যাদয়ঃ পীঠ শক্তয়ো বা"। মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তিসহ যে কৌমারি ইন্দ্রাণী প্রভৃতি শক্তি মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

দ্যোতনা প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। কে সেই শিল্পী—কে সেই শক্তিমান সাধক—যাঁহার সার্থক হস্ত এই মূর্ত্তি সমূহ পরিনির্ম্মাণ করিয়াছিল। জানিনা এহেন ভাস্কর্য্যের সন্ধান এই ভারতবর্ষ ছাড়া অপর কোথাও মিলে কি না। হায় একালের দুর্ব্বল মানব! কল্পনায় একবার এ দৃশ্যের ধারণা করিতে পার? সে ধ্যান ধারণার সামর্থ্য কি আর তোমার আছে? থাকিলে কিন্তু ভাল হইত। শুদ্ধ কল্পনার চক্ষে—একবার মাত্র এদৃশ্য দর্শন করিতে পারিলে তুমি কৃতার্থ হইতে। তুমি অক্ষয় শক্তির অধিকারী হইতে পারিতে। হিন্দু! শারদীয়া দশভূজা প্রতিমার পাশে কি একবার এই অষ্টাদশভুজা মহিষমর্দ্দিনীর আবাহন করিতে পার না? একদিন ছিল, যখন তুমিই এই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলে, তুমিই এ মূর্ত্তির পূজা করিয়াছিলে। হায়! কবে তাহার বিজয়া হইয়া গিয়াছে, বোধনের দিন আর আসিল না!

কিরূপে 'মহাকালী' ও 'মহাসরস্বতীর' সৃষ্টি হইল কিরূপে মিথুন ত্রয় সৃজিত হইলেন দুর্গাসপ্তশতীতে রহস্যত্রয়ের প্রথমেই প্রাধানিক রহস্যে' তাহা বিবৃত হইয়াছে। নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

রাজোবাচ।

ভগবন্নবতারাণি চণ্ডিকায়াস্তয়োদিতা।
এতেষাং প্রকৃতিং ব্রহ্মং প্রধানং বক্তু, মর্হসি॥
আরাধ্য যন্ময়া দেব্যা স্বরূপং যেন তদ্বিজ।
বিধিনা ব্রূহি সকলং যথাবৎ প্রণতস্যমে॥

ঋষিরুবাচ—

ইদং রহস্য পরম মনাখ্যেয়ং প্রচক্ষতে।
ভক্তোঽহসীতি নমে কিঞ্চিৎ তবা বাচ্যং নরাধিপ॥
"সর্ব্বাসাদ্যা মহালক্ষ্মী স্ত্রিগুণা পরমেশ্বরী।
লক্ষ্যা লক্ষ স্বরূপাসা ব্যাপ্য কৃৎস্নং ব্যবস্থিতা॥
মাতুলিঙ্গং গদাংক্ষেটং পান পাত্রঞ্চ বিভ্রতি।
নাগং লিঙ্গং চ যোনীঞ্চ বিভ্রতি নৃপ মূর্দ্ধ্নী॥
তপ্ত কাঞ্চন বর্ণাভা তপ্ত কাঞ্চন ভূষণা।
শূন্যং তদখিলং স্বেন পূরয়ামাস তেজসা॥
শূন্যং তদখিলং লোকং বিলোক্য পরমেশ্বরী।
বভার রূপ মপরং তমসং কেবলেমহি" ॥

প্রথমেই তাঁহা হইতে এক ঘোরা কৃষ্ণবর্ণা দশন দংশিত বদনাবিশাল নয়না ক্ষীণ মধ্যা নারীর" উদ্ভব হইল। "খড়্গ, পাত্র, শিরঃ ক্ষেটকালঙ্কৃত চতুর্ভুজা—

সেই নারীর মহামায়া মহাকালী মহামারী ক্ষুধা তৃষ্ণা কালরাত্রি ইত্যাদি নামকরণ করিয়া মহালক্ষ্মী তাঁহাকে বলিলেন—

"ইমানি তবনামানি প্রতিপাদ্যানি কর্ম্মভিঃ।
এভি কর্ম্মাণি তে জ্ঞাত্বা যোধিতে
শোশূতে সুখং" ॥ (৪)

অতঃপর—"সত্ত্বাখ্যে নাতি শুদ্ধেন
শুণে নেন্দু প্রভং দধৌ।
অক্ষ মালাং কুশধরা বীণা পুস্তক
ধারিণী" ॥ (৫)

নারীর সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে মহাবিদ্যা, মহাবাণী, ভারতী, বাক্, সরস্বতী, আর্য্যা, ব্রাহ্মী ইত্যাদি নাম অর্পণ করিয়া

অথোবাচ মহালক্ষ্মী র্মহাকালীং সরস্বতীং।
যুবাং জনয়তাং দিব্যৌ মিথুনে স্বানুরূপতঃ॥

এই বলিয়া মহালক্ষ্মী স্বয়ং ব্রহ্মা ও লক্ষ্মীর সৃষ্টি করিলেন। মহাকালী হইতে রুদ্র ও বাণীর সৃষ্টি

(৪) এই মহাকালী হইতে মধুকৈটভ বধাধিষ্ঠাত্রী দশাননা মহাকালীর উদ্ভব হইয়াছিল। তাহার দশভুজ ও দশ চরণ।

(৫) ইনি শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের সময় অষ্টভুজারূপে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। অর্থাৎ শুম্ভ-নিশুম্ভ বধাধিষ্ঠাত্রী অষ্টভুজা মহাসরস্বতী ইহারই অংশরূপিণী।

হইল এবং মহাসরস্বতীদেবী শ্রীকৃষ্ণ ও গৌরীর সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মার অপর নাম বিরিঞ্চী ধাতা ইত্যাদি। শ্রী কমলা ইত্যাদি লক্ষ্মীর উপনাম। রুদ্র,—নীলকণ্ঠ, রক্তবাহু, কপর্দ্দী, স্থাণু ইত্যাদি নামে; সরস্বতী—ত্রয়ীবিদ্যা, কামধেনু, ভাষা অক্ষরা ইত্যাদি নামে; শ্রীকৃষ্ণ—বাসুদেব, জনার্দ্দন, বিষ্ণু ও হৃষিকেশ নামে, এবং গৌরী—সতী, চণ্ডী, সুভগা, সুন্দরী নামে অভিহিত ও অভিহিতা হইয়াছেন। মহালক্ষ্মী দেবী, রুদ্রকে গৌরী, বাসুদেবকে লক্ষ্মী, ও ব্রহ্মাকে সরস্বতী সমর্পণ করিলেন।

"স্বরয়া সহ সম্ভূয়ঃ বিরিঞ্চোণ্ড মজীজনং।
বিভেদ ভগবান রুদ্র স্তদ গৌর্য্যা সহ বীর্য্যবান॥
অণ্ড মধ্যে প্রধানাদি কার্য্যজাত মভূন্নৃপঃ।
মহাভূতা অকং সর্ব্বং জগৎ স্থাবর-জঙ্গমং॥
পুপোস পালয়ামাস তল্লক্ষ্ম্যা সহ কেশব।
মহালক্ষ্মী রেবমজা রাজন্! সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী (৬)॥
নিরাকারা চ সাকারা সৈব নানা ভিধানভৃৎ।
নামান্তর নিরূপ্যৈসা নাম্না নান্যেন কেনচিৎ॥"
ইতি প্রাধানিক রহস্যং।

যে পুষ্করিণীর কোনাংশে মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তথায় গৃহ নির্ম্মাণোপযোগী রাশীকৃত পুরাতন প্রস্তর পতিত ছিল। তাহার অধিকাংশ ৺বক্রেশ্বর শিবমন্দিরের পার্শ্বদেশস্থিত শ্বেতগঙ্গাকুণ্ড বাঁধাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। অবশিষ্টগুলি পাণ্ডা,—মহাশয়দিগের গৃহ সোপানাদির শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। দুই-—একটী এখনও পড়িয়া আছে। স্থানটী এবং প্রস্তরগুলি দেখিলে তথায় যে একটী প্রস্তর মন্দির ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। অনুমান হয় সেই প্রস্তর মন্দিরেই মহিষমর্দ্দিনী দেবী প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন। কালের দুরতিক্রম্য প্রভাব, ভূমিকম্পাদি প্রাকৃতিক বিপ্লবে, অথবা বিধর্ম্মীর অত্যাচারে তাহাকে লোকলোচনের অন্তরালে লুক্কায়িত রাখিয়াছিল। আবার কালই তাহাকে প্রকাশিত করিয়াছে। বক্রেশ্বর শিবমন্দির সংলগ্ন—(দক্ষিণদিকে) যে মহিষমর্দ্দিনীর মন্দির বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা অধুনাতন কালে নির্ম্মিত। পূর্ব্বকালে পীঠাধিষ্ঠাত্রীর মন্দির, ভৈরবের সান্নিধ্য হইতে দূরে অবস্থিত ছিল। পুরাতন প্রস্তর মন্দিরের যে অবস্থিত স্থান, আমরা নির্দ্দেশ করিতেছি; ৺বক্রেশ্বরের মন্দির হইতে তাহার দূরত্ব প্রায় তিন শত হস্ত হইবে। বর্ত্তমান মহিষমর্দ্দিনীর মন্দিরে, মর্ম্মর বেদীতে একটী পিত্তল নির্ম্মিত দশভুজা—মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি, পীঠাধিষ্ঠাত্রীর অভাব পূর্ণ করিতেছেন। প্রাপ্ত মূর্ত্তিটী যে সাধারণের সম্পত্তি, উহা বর্ত্তমান মন্দিরে রক্ষিত হওয়াই যে উচিত, পাণ্ডা মহাশয়দের ইহা কোনক্রমেই বুঝাইতে পারা গেল না। প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়ায় মূর্ত্তিটী যেন তাহাদের অধিকতর অন্তরঙ্গ হইয়া দাঁড়াইল। ভাবে বুঝা গেল মূর্ত্তিটী তাঁহারা নিজ বাড়ীতেই রাখিবেন। বলা বাহুল্য যে, তাহা হইলে মূর্ত্তিটী দেখাইয়া যাত্রীদের নিকট হইতে যে দর্শনী আদায় হইবে, তাহার আর কাহাকেও অংশ দিতে হইবে না। হায় তীর্থক্ষেত্র! পাণ্ডাগণকে ধন্যবাদ (প্রণামী ও লইয়াছিলেন) দিয়া ক্ষুন্ন মনে আমরা—হেতমপুরে ফিরিয়া আসিলাম।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

(৬) মহিষাসুর বধাধিষ্ঠাত্রী মহিষমর্দ্দিনী অষ্টাদশভুজা মহালক্ষ্মী ইহারই অংশ সম্ভূতা।

শিক্ষার মোহ ও ব্যবসার বিভীষিকা

দেশে প্রচলিত শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষার্থী যুবকবৃন্দের মনে আজকাল কি ধারণা ও বিভীষিকা বিরাজ করিতেছে তাহার একটী যথাযথ ছবি উপস্থাপিত করিলাম। আশাকরি ইহাতে দেশবাসীর মনে অন্ততঃ যৎকিঞ্চিৎ সুবিবেচনা জাগিবে।

একজন কলেজের ছাত্র সেই দিন কথায় কথায় আমায় বলিতেছিল, "আমাদের আজকাল এমন কেন হইল? নিজেদের মনের উপর এমন কি এক রকমের মোহ আধিপত্য করিতেছে যাহার ফলে আমরা ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারি না; বর্ত্তমানের আমোদ আহ্লাদেই ডুবিয়া থাকি।" আধুনিক শিক্ষার প্রবল মোহের সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা চলিতেছিল ইহা উদ্ধৃত কথাংশ হইতে বুঝা যায়। আমরা প্রত্যহ চক্ষের সম্মুখে কত শত দৃষ্টান্ত দেখিতেছি তবুও আমাদের শিক্ষার মায়া কাটে না (অবশ্য আমি এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি)। কথায় বলে উপদেশের চেয়ে দৃষ্টান্তে অনেক কাজ করে; কিন্তু আমাদের বেলা দেখি, উপদেশে ত কোনও কাজ হয়ই না, উহাতে কর্ণতৃপ্তিই হয় মাত্র—তা ছাড়া দৃষ্টান্তও আমাদিগকে কোনও কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করাইতে পারে না। কেমন এক মোহের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি, অবলম্বন কি গন্তব্য কোথায়, উদ্দেশ্যই বা কি, তাহার কোনও খবর রাখি না। শুধু মনে হয় এই মাত্র যে, এই স্রোতে ভাসিয়া চলিতেই হইবে। অথচ যাঁহারা চলিয়াছেন এবং পরিশেষে নিজে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়।

এই মোহ কি ইন্দ্রজালের প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে? দেশের যুবকগণ উহার প্রভাব এড়াইতেই পারিতেছেন না? কেহ কেহ হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া অস্তিত্ব লোপের পথে দাঁড়াইয়া আছেন তবুও ঐদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই,—শুধু ঐ স্রোতেই ভাসমান।

দরিদ্র যুবকবৃন্দ পড়ার খরচ চালাইতে পারেন না কাজেই ঐ খরচ বহনার্থ পৈত্রিক-সম্পত্তি যাহা কিছু থাকে তাহা বিক্রয় বন্ধকে অকুণ্ঠিতচিত্ত! পরে আবশ্যক হইলে ধার কর্জ্জ করিতেও ব্যগ্র তবুও কিন্তু পড়া চালাইতেই হইবে, যেন ভিতরের কোন এক তীব্র কার্য্যকরী শক্তি তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই এই বলিয়া উত্ত্যক্ত করিতেছে "যেমন করিয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অর্জ্জন কর"। ইহাই যেন মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য এতদ্ব্যতীত মনুষ্যত্ব-অর্জ্জনের দ্বিতীয় পন্থা নাই। আমার বিবেচনায় ইহাই মোহ।

মদীয় একজন পরিচিত বন্ধু ধার কর্জ্জ করিয়া বাস্তুভিটা বন্ধক দিয়া অতি কষ্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি কিনিয়াছিলেন;—English (ইংরেজী ভাষা)এ Honours

(বিশেষ সম্মান)ও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; যদিও ঐ সম্মান রীত্যনুসারে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ছিল। শুধু তা নয় ওকালতীর দিকে (B. L.)ও অনেকদূর অগ্রসর হইয়া মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন (Intermediate B.L.)। অবস্থার হিসাবে নিজে এখন ফকির। এই সব ডিগ্রি কিনিতে কিনিতে নিজে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বিশেষ উন্নতি দূরে থাক ১০। ১৫ বৎসরের মধ্যে ধার পরিশোধনান্তর যে নিজের বাস্তভিটা উদ্ধার করিয়া স্বীয় গৃহের পূর্ণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন তাহার আশাও দুরূহ, কারণ সবে এক ভাই মাত্র এবং বৃদ্ধা জননী বর্ত্তমান। *

অপর একজন পরিচিত ছাত্র (নাম লিখিতেও আপত্তি নাই—৺অক্ষয়কুমার দাস ; চট্টগ্রাম কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠাবান ছাত্র) ঠিক সমভাবে দারিদ্র্যের প্রকোপে পড়িয়াও অতিকষ্টে ডিগ্রি অর্জ্জনের নিমিত্ত তৎপরীক্ষায় প্রস্তুত হইতেছিলেন, ভগবানের নিগূঢ় বিধানে উহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তাঁর ভবলীলার অবসান হইয়াছে। বৃদ্ধ পিতামাতার অতি শোচনীয় অবস্থা। কলেজের অধ্যাপকবর্গ ও সহাধ্যায়ী ছাত্রমণ্ডলী সাধ্যমত বৃদ্ধকে অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন।

এই সব অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই মনে হয় চট্টগ্রাম কলেজের ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য অধ্যক্ষ Mr. Turner (সাহেব) মহোদয় একদিন এক গরীব ছাত্র প্রসঙ্গে বলিতেছিলেন "Remember that, the higher University Education is not intended for the poor.—বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা দরিদ্রের জন্য নয় ইহা স্মরণ রাখিও।" বাস্তবিক তথা কথিত উচ্চশিক্ষার লোভে পড়িয়া বঙ্গীয় যুবকের যে আজ কি শোচনীয় অবস্থা হইতেছে তাহা ভাবিতেও হৃদয় স্তম্ভিত হয়।

ইউরোপে ও আমেরিকায় যে ছাত্র লেখা পড়ার খরচ চালাইতে পারেনা বা সে দিকে তার তেমন ঝোঁক নাই সে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি ভিন্ন পথে চলিয়া যায় এবং তদবলম্বনে আপন প্রতিভার পরিচয় দেয়। এ দেশে সেই স্রোত এখনও বহিতে আরম্ভ করে নাই। ব্যবসা-বাণিজ্য কাহারও লক্ষ্য নয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যতীত উন্নতির অন্যোপায় নাই। হায়! আমাদের এই বোধ ভ্রান্তি আর কতদিনে ঘুচিবে? সংবাদপত্রে পড়িতে পাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া কত যুবক আত্মহত্যায় জীবনলীলা শেষ করেন। তাঁহারা যদি এই সর্ব্বনাশক মোহে আক্রান্ত না হইয়া নিজেদের প্রবৃত্ত্যনুসারে (according to their respective tendency) ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই জীবনে সফলতা আনয়ন করিতে পারেন সন্দেহ নাই! কারণ পৃথিবীতে মানুষের উন্নতি করিবার একদিকে না একদিকে পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে।

ইদানীং দেশের শুভাকাঙ্ক্ষিগণ দেশের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া নিতান্ত আকুল হইয়া পড়িয়া-

* লিখিতে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে যে এই মহান্ পুরুষের জীবনলীলা ইতিমধ্যেই শেষ হইয়া গেল। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুঝিতে যুঝিতে সম্পূর্ণ শক্তি সামর্থ্য হীন হইয়া রোগ জীর্ণ দেহী বৃদ্ধা জননীকেও অকূল দুঃখে ভাসাইয়া আজ কয়েক দিন হইল আমার এ বন্ধুপ্রবর স্বর্গলাভ করিয়াছেন। পাঠকবর্গ অবস্থা বুঝিয়া নিন্।

লেখক।

ছেন। কেহ বলেন বাণিজ্যে মন দাও, কেহ উপদেশ দেন সমাজের সংস্কার কর, আর কেহ বলিতেছেন শিক্ষার উন্নতি কর। এখন তাঁহাদেরই সম্মুখে আমার একটী অনুরোধ উত্থাপনের ইচ্ছা। **উপদেশের সময় আর নাই; ইহা উদাহরণের যুগ।** নিজে উদাহরণ দেখাইয়া দশের উন্নতির পথ করিয়া দিন। সহৃদয় দেশবাসীর নিকট প্রার্থনা, তাঁহারা নিজেদের সন্তানের Tendency বা প্রবৃত্তি বুঝিয়া তদনুসারে তাহাদিগকে জীবন সংগ্রামে ঢুকাইয়া দিন। নিজেদের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধপথে চলিয়া চলিয়া শক্তিহীন হইয়া পড়িলে পরিশেষে জীবনসংগ্রামে দাঁড়ান অসম্ভব হইয়া পড়িবে। আপনারা যদি মোহের পাশ কাটাইতে না পারেন তবে নবযৌবনোল্লাসিত অপুষ্ট-চিত্ত যুবকদলের সম্মুখে ব্যবসা বাণিজ্যের আদর্শ নিয়া উচ্চ চীৎকার করিলে কি ফল লাভ হইবে? দেশের চিন্তাশীল মনীষিবর্গ এই দিকে ভাবিয়া থাকিলেও কার্য্যে পরিণত খুব কমই করিয়াছেন যাহা নগণ্য ধরা যাইতে পারে। সত্য অপ্রিয় হইলেও তাহা আমায় বলিতেই হইবে; আশা করি তাঁহারা আমার ধৃষ্টতা মনে করিলে উহা মার্জ্জনা করিবেন। এই অভাবেই "বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (Bengal National Council of Education) এখন যেন একটা খেলায় পরিণত। তাহা ত হইবেই। আপনিও ভ্রান্তমতে ডুবিয়া আছেন আমিও আছি এক আধজন মোহমুক্ত ত্যাগী মহাপুরুষের ঘাড়ে সমস্ত ভার চাপাইয়া নিজেদের সন্তান সহ দূরে থাকিয়া শুধু তামাসা দেখিতেছি আর "কাজ কিছু হইতেছে না; সভই সার হইল" ইত্যাদি টিট্কারী দিয়া দূরে সরিতেছি। এইরূপে কি কোনও কাজ হয়? দেশের অনেক জ্ঞানী ও বয়োবৃদ্ধ এই মোহে অন্ধ হইয়া স্বীয় স্বীয় সন্তানের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন; শুধু তাহা নয় তাঁহারা দেশেরও মহা অনিষ্ট করিতেছেন!

এই মোহ দুশ্চিকিৎস্য। ইহার কবিরাজ বাহিরে খুঁজিয়া পাইবার চেষ্টা বৃথা। নিজে মনের বল আশ্রয় করুন তাহাই যথেষ্ট। মনোবলই এখন আমাদের সর্ব্ববিধ ব্যাধির অমোঘ চিকিৎসক। আমাদের মনে সাহস নাই, আমরা কি মানুষ? স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন "কাপুরুষতা মহাপাপ, দুর্ব্বলতা মহাপাপ উহা ত্যাগ কর তবেই মানুষ হইতে পারিবে।" মনের বল, হৃদয়ের দুর্জ্জয় সাহস, তীব্র সংযম এদেশেরই চির সম্পত্তি—ইহা ঋষির দেশ। আমরাই ত "ধ্রুবের" দেশবাসী!

আমি অনেক দরিদ্র যুবককে আক্ষেপ করিতে শুনিয়াছি তাঁহারা মূলধন (capital) অভাবেই ব্যবসার দিকে যাইতে চাহেন না। একথার মূলে কিছু সত্য আছে কি? জিজ্ঞাসা করি মূলধন কি কখনও বাতাসে আনিয়া দিতে শুনিয়াছ? নিজেকেই মূলধন সংগ্রহ করিতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবসা চালাইতে মূলধন কোথায় পাওয়া যায়? তখন ত ধার কর্জ্জ করিতে বা জায়গা জমি বিক্রয় করিতে মনে দ্বিধা জন্মে না! সব দ্বিধা সব নিরাশা যুগপৎ জড়াইয়া ধরে ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার বেলা। ভাবিয়াও যে হাসি পায়। যাহা লইয়া জীবন চলিবে, যাহাতে নিজের, দেশের ও দশের উপকার হইবে তাহা লইয়াই আমাদের যত দ্বিধা ও কুণ্ঠা। ইচ্ছা করিয়া নিজের জীবনটা মাটি করিতে ত কোনও কষ্ট বা দ্বিধা হয় না!

বাস্তবিক এই ডিগ্রি বা শিক্ষামোহ আমাদিগকে সম্পূর্ণ আত্ম-বিস্মৃত করিয়া ফেলিয়াছে। এমনতর আত্মবিস্মৃতিভাব পৃথিবীর আর কোথাও পরিলক্ষিত হয় কি না জানি না।

আমাদের মূলধন লাভ হইবে কি করিয়া? মনে করি বি, এ প্রভৃতি পাশ করিতে না পারিলে জীবনটা মাটিই হইল; ব্যবসা বাণিজ্য করিতে হইলেও বি এ ইত্যাদি পাশ করা প্রয়োজনীয়। ফলে বি, এ প্রভৃতি পাশ করিতেই ঋণের ভারে অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ি; তখন মূলধন (capital) সংগ্রহের কথা দূরে থাক্ হৃত-সর্ব্বস্বের পুনরুদ্ধারেই গলদ্দর্ম্ম হয়। পরে জীবনে নিরাশা ঢুকে, ব্যবসা বা অন্য উন্নতির সাধ মনেই লয় পায়! বাস্তবিক যদি সময় থাকিতে নিজেরা সাবধান হই, ব্যবসায় ঢুকিয়া অধ্যবসায়ের সহিত নিজেকে খাটাইয়া নিই তবে যথাসময়ে মূলধন হস্তগত করিতে তত বেগ পাইতে হইবে না। আমরা কি তাহা করিব? ডিগ্রি অর্জ্জনের পর সব আপনা আপনি হাতে আসিয়া পড়িবে এই মধুর স্বপ্নে বিভোর! ইহতে যে কত যুবকেরই নিত্য সর্ব্বস্ব নাশ হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

অবশ্য আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যে একেবারে অপ্রয়োজনীয় একথা মনে করিতে পারি না, মনে করাও মূর্খতা বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার অর্জ্জন করিতেই যখন দরিদ্র যুবকের সর্ব্বস্বপণ করিতে হয় তখন জীবনের অন্যবিধ উন্নতির উপায় কোথায় রহিল? যাঁহারা চালাইতে পারেন তাঁহাদিগের পক্ষে সবই ভাল; তবে দুঃখের বিষয় তাঁহাদের মধ্যেও অতি অল্পই এপথে উন্নতি করিয়াছেন যদিও তাঁহাদের ডিগ্রি অর্জ্জন বা মূলধন লাভ কোনটারই অভাব নাই। এই ভাবে সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার চেয়ে দরিদ্র যুবকের সময় থাকিতেই সাবধান হওয়া উচিত।

শ্রীরমণীরঞ্জন চৌধুরী।

বিবাহ

বিবাহ সভ্য সমাজের মর্ম্মগ্রন্থি। জাতীয় জীবনের আশ্রয়। যে সমাজের বিবাহ বন্ধন যত দৃঢ় সে সমাজের তদনুপাতে স্থায়িত্বাধিক্য। ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্নতায় কত শত জাতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া বলগর্ব্বে জগৎ প্রকম্পিত করিয়া সর্ব্বভুক্ কাল কবলে নিপতিত হইয়া চির বিলুপ্তি লাভ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু ধর্ম্মের অক্ষয় ভিত্তির উপর বিবাহ পদ্ধতির সংস্থিতিহেতু জগতের আদি সভ্য হিন্দু ভাগ্যলক্ষ্মীর অন্তর্ধানেও স্মৃতি বিলুপ্ত না হইয়া এখনও বিদ্যমান। যে জাতি রোডস্ দ্বীপে কলোসাস্, মিসরে পিরামিড, ব্যাবিলনে ঝুলান বাগান, চীনে অভেদ্য প্রাচীর প্রস্তুত করিয়াছিল তাহারা যে বর্ত্তমান লব্ধপ্রতিষ্ঠ জাতিবর্গ হইতে বল বিক্রমে জ্ঞান বিজ্ঞানে ন্যূন ছিল তাহা

মনে হয় না অথচ এখন তাহাদিগের জাতীয়তার চিহ্নমাত্রও নাই। হিন্দুর সৌভাগ্যসূর্য্য বহুকাল অস্তমিত, পরধর্ষণ যে কত সহ্য করিয়াছি তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না তথাপি হিন্দুর জাতীয় জীবন যে কালের প্রখর প্রতিকূল প্রবাহ তুচ্ছ করিয়া এখনও স্বীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণে সমর্থ হইতেছে বিবাহ বন্ধনের সুব্যবস্থাই তাহার মৌলিক হেতু।

একমাত্র ধর্ম্ম ভিন্ন এই নশ্বর জগতে আর কিছুই চিরস্থায়ী নহে। হিন্দুর বিবাহ, ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত তাই আমরা মরজগতে অমর। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু যে অনুপাতে স্বধর্ম্মচ্যুত হইতেছে মৃত্যু তদনুপাতে হিন্দুর নিকটবর্ত্তী হইতেছে। বর্ত্তমান শিক্ষিত হিন্দু সন্তানগণ প্রায় সকলেই পাশ্চাত্য মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া স্বধর্ম্ম বিচ্যুত। তাঁহারা ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর সন্তান কিন্তু শিক্ষাদোষে অহিন্দু। তুচ্ছ জ্ঞানে সনাতন ধর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক বৈষয়িক বুদ্ধিতে অনুপ্রাণিত। তাঁহাদিগের তাদৃশ কুদৃষ্টান্তে কুভাব ও ভেদবুদ্ধি সমাজময় বিকীর্ণ। পাশ্চাত্য শিক্ষারম্ভে তাঁহারা সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ায় হিন্দুসমাজের বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে নাই। জনসাধারণমধ্যে ভেদ বুদ্ধিও পদাঙ্ক সংস্থাপনে সাহসী হয় নাই। তাঁহারা নিজেই অহিন্দুত্বের গৌরব ভোগ করিতেন সমাজ তৎপ্রতি দৃক্পাতও করিত না অথচ ঘৃণার চক্ষে দেখিত। এখন তাঁহারা সমাজের অন্তরঙ্গ গৃহভেদী শত্রু। অহিন্দু অন্তর লইয়া বাহিরে হিন্দু। ধর্ম্মে বিশ্বাস নাই শাস্ত্রে শ্রদ্ধা নাই, সমাজে অনুরাগ নাই, সর্ব্ববিধ স্বজাতি স্নেহ পরিশূন্য, হইয়া স্থূল স্বার্থপরতার পূর্ণাবতার। মুখে যিনি যতই সৌজন্য প্রকাশ করুন না কেন কার্য্যতঃ কিন্তু তাঁহারা স্ব-দেহের আপাদমস্তকাধিক কিছুই দেখিতে পান না। কর্ত্তব্য জ্ঞানও তদতিক্রম করে না। তজ্জন্য বর্ত্তমানে হিন্দু-সমাজের ঘোর অরাজকাবস্থা।

আজকাল ইউরোপে মহাযুদ্ধ উপস্থিত। কল্পনাতেও যাহা স্থান পায় নাই বিজ্ঞানবলে তাহাই প্রত্যক্ষীভূত। কত বড় বড় যুদ্ধ জাহাজ জলমগ্ন হইতেছে, কত শত গ্রাম নগর ভস্মীভূত বা জনশূন্য হইতেছে। শিক্ষিত বিজ্ঞসমাজ মধ্যে তদালোচনা লইয়া কত আন্দোলন কত উৎসাহ। সত্য মিথ্যা সংবাদ সংযুক্ত দৈনিক পাঠার্থে কত উৎকণ্ঠা কত ব্যাকুলতা। সাপ্তাহিক মাসিক পত্রিকা সমূহে কত বড় বড় জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা, ঐতিহাসিক পৌরাণিক প্রবন্ধই বা কত, নানা দেশের নানা কথা। পাঠ করিলে মনে হয় দেশ যেন কতই উন্নত হইয়াছে জাতীয় অভ্যুদয় বুঝি চরম সীমায় উত্তীর্ণ। কিন্তু অদৃষ্টদোষে উহা কিছুই কিছু নহে, সকলই বাহিক সকলই অসার।

ধর্ম্ম গিয়াছে, কর্ম্ম গিয়াছে, সমাজ উৎসন্নপ্রায় তৎপ্রতি দৃক্পাত নাই। জীর্ণ শীর্ণ বাসগৃহে আগুন লাগিয়া হুহু করিয়া জ্বলিতেছে, বিলাতি পরিচ্ছদে যে দগ্ধ অঙ্গ ঢাকিয়া রাখিয়াছ তাহাতেও বড় বড় ফোস্কা দেখা দিয়াছে তথাপি মুখে হাসি, জ্ঞানের অহঙ্কার গ্রামোফনের গান শুনিতে, বায়স্কোপের অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে উৎসাহ। চিন্তা করিলে হাসি পায় দুঃখও ধরে, লজ্জায়ও মুখ আরক্তিম হয়। তোমরাই না কি আপনাদের কুলের মুখটি, সমাজের আশা ভরসার স্থান। যাহাদের সমাজের এমন হীনাবস্থা তাহাদিগের জ্ঞানাভিমান বা অসার আমোদ প্রমোদ কি কর্ত্তব্য-বিমুখতা বা কর্ত্তব্য জ্ঞানপরিশূন্যতার

পরিচায়ক নয়? কেবল ঔদাসীন্য নহে বিরুদ্ধ চেষ্টাও যথেষ্ট আছে।

হিন্দুর বিবাহ পূর্ব্বে যেমন ধর্ম্ম ছিল এখন আর তেমন নাই। ধর্ম্মবুদ্ধির পরিবর্ত্তে বৈষয়িক বুদ্ধি ইহার প্রবর্ত্তক হওয়ায় বর্ত্তমান হিন্দু বিবাহের আর হিন্দুত্ব নাই। উহা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া বৈদেশিক ভাবাপন্ন হইয়াছে। বিবাহে স্ত্রীরও স্বামী লাভ হয় না, পুরুষও ধর্ম্মপত্নী প্রাপ্ত হন না। হিন্দু দম্পতিতে পরস্পর যে সম্বন্ধ ছিল বর্ত্তমান পদ্ধতির বিবাহ সে সম্বন্ধ সংঘটন করে না। পুরুষের লক্ষ্য অর্থ লাভ, স্ত্রীর লক্ষ্য বিলাসিতা। পুরুষ মনুষ্যত্ব অপেক্ষা পশুত্বকে পৌরষাত্মক মনে করেন এবং স্ত্রীকে আত্মানুবর্ত্তিনী করিয়া তাহাকেও ধর্ম্মানুষ্ঠান বিমুখ করেন। কুসংশ্রবে কুপ্রবৃত্তি পরায়ণ সন্তান পাপস্রোত প্রবর্দ্ধিত করে।

পূর্ব্বে হিন্দুসমাজে যখন ধর্ম্মের আদর ছিল, লোকে যখন ধর্ম্মকে ঐহিক পারত্রিক সম্বল মনে করিত তখন বিবাহে সদ্বংশ অগ্রগণ্য ছিল।

হীয়তে হি মতিস্তাত!
হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ।
সমৈশ্চ সমতা মেতি
বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাম্॥

হীন সংশ্রবে হীনতা সম সংশ্রবে সমতা এবং বিশিষ্টের সংশ্রবে বিশিষ্টতা লাভ হয় বলিয়া কন্যা পক্ষ উচ্চবংশে কন্যাদান করিতে প্রয়াস পাইত এবং পাত্রপক্ষ উচ্চকুলের কন্যা পাইলে সাদরে গ্রহণ করিত। এখন কুশিক্ষা দোষে কুপ্রবৃত্তিপরায়ণ হইয়া পুরুষ পশুত্বে পরিণত হইয়াছে তজ্জন্য তাহারা আত্ম বিক্রয় দ্বারা লাভবান্ হইতে সচেষ্ট। পুরুষ এখন আর কুল শীল চায় না, কুল শীলের আদরও করে না তাহারা চায় টাকা। যে নিজে হীন ও হীনবুদ্ধিপরায়ণ তাহার নিকট বিশিষ্টতা আদরের সামগ্রী নহে সুতরাং সে বিশিষ্টতার আদরও করে না। তাহার উদার প্রাণ উচ্চ নীচ সকলকেই সমান দেখে। টাকা অধিক পাইলে সে উচ্চকুল তুচ্ছ করিয়া সাগ্রহে নীচকুলজাত কন্যা গ্রহণ করে। এ দিকে কন্যাপক্ষও সর্ব্বত্র বংশমর্য্যাদা উপেক্ষিত দেখিয়া কুলাকুল বিচার করেন না। শিক্ষিত বা সুসম্পন্ন পাত্র নীচ কুলোৎপন্ন হইলেও কন্যা সুখে থাকিবে মনে করিয়া তাহাকেই সাগ্রহে কন্যা দান করেন। এইরূপ বিষম সংশ্রবে সঙ্কর ভাবাপন্ন দূষিত সন্তান সমুদ্ভূত হইয়া হিন্দুসমাজকে পাপাশ্রিত ও মলিন করিয়া ফেলিতেছে।

পূর্ব্বে ধনের এত আদর ছিল না। সৎ সংশ্রবে যাহাতে সদ্বুদ্ধিপরায়ণ ধর্ম্মিষ্ঠ সন্তান উৎপন্ন হয় তৎপ্রতিই সকলের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল তজ্জন্য তাহারা নীচ কুলোদ্ভূত বিদ্বান্ বা আঢ্যপাত্র উপেক্ষা করিয়া সমান বা উচ্চতর কুলে কন্যা দান সঙ্গত মনে করিত। উচ্চতর বংশের কন্যা তৎকালে সাদরে গৃহীত হইত।

এখন আমরা যাঁহাদিগকে শিক্ষিত বোধে আদর করি তাঁহাদিগের অধিকাংশই নীচকুলজাত সুতরাং দুর্ব্বুদ্ধি যুক্ত। হয় তো তাঁহাদিগের অনেকেরই পিতৃপুরুষগণ স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি বলিয়া কোন না কোন ক্রমে বংশ রক্ষা করিয়াছেন কাজেই "অধনেন ধনং প্রাপ্য তৃণবন্মন্যতে জগৎ" বলিয়া তাঁহারা কন্যাদানেচ্ছুর সর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়াও তৃপ্তিলাভ করেন না। যদিও ম্যালেরিয়ার ন্যায় সংক্রামক দোষে সদসৎ উচ্চনিম্নবংশজ সকলই প্রায় একাকার তথাপি নীচকুলোদ্ভূতদিগেরই

বাড়াবাড়ি অত্যন্ত অধিক। পূর্ব্বে যাহাদিগের সহিত কন্যা বিবাহ দিতে ঘৃণা ও অপমান বোধ হইত, পার্য্যমানে কেহ যাহাদিগকে কন্যা দিত না সুতরাং কন্যাপ্রাপ্তি যাহারা পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি বলিয়া মনে করিত এখন তাদৃশ লোকের সহিত কন্যার সম্বন্ধ স্থির করিতে গেলে যে কত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যদিও অসৎ প্রবৃত্তিপরায়ণ, হৃদয়হীন বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজে সজ্জন অতীব দুর্লভ তথাপি সৎলোক একবারে অগ্রাহ্য নহে।

বর্ত্তমান শিক্ষায় আমরা যেরূপ কর্ত্তব্য-বিমুখ ও কর্ত্তব্যবোধ পরিশূন্য হইয়া পড়িয়াছি তেমন নিরেট জড়াবস্থা ইতিপূর্ব্বে আমাদিগের আর কখনও হয় নাই। আমরা শিক্ষিত মানুষ না হইয়া শিক্ষিত পশুত্বে পরিণত হইয়াছি। তাই "ধর্ম্মের খাতায় জমাশূন্য ভণ্ডামিতে চারটি পোয়া" পরিলক্ষিত।

পূর্ব্বে কৌলীন্য প্রথায় কুলমর্য্যাদাকারে পাত্রগণ গৃহীত হইত এবং তাহার একটা সীমা ছিল। এখন সসীম পণ অসীম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে কুলজ্ঞের ব্যবস্থা অগ্রগণ্য ছিল এখন তাহা নগণ্য। স্বেচ্ছাচারিতার মূর্ত্তিমান দৃশ্য। তখন অক্ষমাবস্থায় আত্মমর্য্যাদা খর্ব্ব করিয়া নীচকুলে কন্যা দিলে ব্যয়ভার কিছুই বহন করিতে হইত না এখন আর সে সুবিধা নাই, যাহার তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিতেও যথেষ্ট টাকা ব্যয় করিতে হয় কাজেই যাঁহার বৈষয়িক অবস্থা সুসম্পন্ন নহে তাঁহার সামাজিক গৌরব যেরূপই হউক না কেন, বংশ যতই উচ্চ হউক না কেন বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কন্যা বিবাহে নিরস্ত থাকিতে হয়। পূর্ব্বে লোকের মন অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ছিল। গরীব বলিয়া অনেকে দয়াও করিত এখন শিক্ষা-সংকীর্ণ চিত্তে দয়ার লেশ নাই মহত্ত্বের চিহ্ন নাই। সমাজের আপাদ মস্তকে পাষাণে নাস্তি কর্দ্দম অবস্থা। যিনি যত উচ্চপদস্থ তিনি তদনুপাতে দুরধিগম্য। শান্তিময় হিন্দু সমাজ মহাশ্মশানে বা সাহারা মরুতে পরিণত। কোথা বা হু হু করিয়া আগুন জ্বলিতেছে কোথা বা হতাশার মরুময় দৃশ্য ধূ ধূ করিতেছে। যে পর্য্যন্ত দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের এইরূপ কপট বাহিকতা দূর না হইবে সে পর্যান্ত হিন্দুসমাজ কোন ক্রমেই উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিবে না।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মণ্ডলী সমাজের নায়ক ছিলেন, তাঁহাদিগের আদর্শে, তাঁহাদিগের পরামর্শে তাঁহাদিগের মতানুসারে সমাজ পরিচালিত হইত। এখনও অনেকে কোন কোন বিষয়ে অগ্রসর হইতে নানাস্থানীয় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের সভা গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষায় ভেদবুদ্ধির প্রাবল্যে লোক সকল উচ্ছৃঙ্খল হওয়ায় এবং কাল দোষে পণ্ডিতগণও নানাবিধ অপণ্ডিত বৃত্তি অবলম্বন করায়, পণ্ডিত মণ্ডলী এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় সম্মানিত নহেন। এখন শিক্ষিত হিন্দুসন্তানগণই সাধারণতঃ সর্ব্ববিষয়ে অগ্রগণ্য কিন্তু তাঁহাদিগের মন বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি বৈদেশিক ভাবাপন্ন সুতরাং অনেকে হিন্দুসমাজের সহিত বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন। এ নিমিত্ত তাঁহারাও সমাজের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ দেখান না, সমাজও তাঁহাদিগকে আত্মীয় মনে করে না। শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ যদি তাঁহাদিগের হৃদগর্ভে বৈদেশিক ভাব পরিহার পূর্ব্বক দেশের প্রকৃত সুসন্তান হইয়া আত্মসমাজের প্রতি স্নেহ শ্রদ্ধা ভক্তি

প্রেম যুক্ত হন তাহা হইলে সামাজিক দোষ সমূহ বিদূরিত হইয়া হিন্দু সমাজ নষ্ট-গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে পারে। যাহারা বুঝে না বুঝিবার শক্তিও যাহাদের নাই তাহাদিগকে বলা বৃথা কিন্তু যাহারা বুঝিয়াও বুঝে না, বুদ্ধির বিকার হেতু যাহারা বিপরীত বুঝে বৈদেশিক মোহে সমাচ্ছন্ন বলিয়া যাহাদের বোধশক্তিপ্রচ্ছন্ন বা জড়ভাবাপন্ন চেষ্টা করিলে তাহারা তাহাদিগের চিত্তক্ষেত্রের গূঢ়তম প্রদেশে লুক্কায়িত স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেম পুনরায় জাগাইতে পারে। শাস্ত্র ও সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাবান ও আন্তরিক অনুরাগী হইয়া মহোপকার সাধন করিতে পারে। যে ক্ষীণ স্বার্থপরতা তাহাদিগকে স্বদেশ, স্বজাতি, স্বসমাজ ও স্বধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, কপটাচারী করিয়াছে সে স্বার্থতৃষ্ণা কতক পরিমাণে সংযত করিলেই আশানুরূপ সুফল লাভ হইতে পারে। এখন তাহারা যে তৃষ্ণায় মতিচ্ছন্ন সে তৃষ্ণায় সুখ নাই শান্তি নাই, সে তৃষ্ণার তৃপ্তি অসম্ভব।

> ন জাতু কামঃ কামিনা
> মুপভোগেন শাম্যতি।
> হবিষা কৃষ্ণ বার্ত্মেব
> ভূয় এবাভি বর্দ্ধতে॥

কার্য্যভোগে কামীর কামনা প্রশমিত হয় না। অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় ভোগে ভোগ-তৃষ্ণা উত্তরোত্তর সমধিক প্রবর্দ্ধিত করে মাত্র এই নিমিত্তই বিজ্ঞেরা তৃষ্ণা পরিহারার্থে উপদেশ দিয়াছেন।

> যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভি র্যান
> জীর্জ্জতি জীর্জ্জতঃ।
> যা সৌ প্রাণান্তিকো রোগ স্তাং
> তৃষ্ণাং ত্যজতঃ সুখং॥

দুর্লোভা যে তৃষ্ণা পরিহার করিতে পারে না, বার্দ্ধক্যে দেহ জীর্ণ হইলেও যে তৃষ্ণার বেগ মন্দীভূত হয় না, যে তৃষ্ণা লোকের প্রাণান্তিক রোগ স্বরূপ যিনি সেই তৃষ্ণা ত্যাগ করিতে পারেন প্রকৃত সুখাস্বাদনে তিনিই অধিকারী।

তৃষ্ণায়ও সুখ আছে তজ্জন্য প্রলোভন ছাড়ান দুঃসাধ্য। যাহা ধর্ম্ম বিগর্হিত সুতরাং অকর্ত্তব্য তৃষ্ণাবিক্যে তাহাও করিতে ইচ্ছা হয় এবং সেই ইচ্ছা বিবেক অভিভূত করিলে লোকে তাহা করিয়া বিপন্ন বা পাপী হয়। অনুচিত তৃষ্ণায় যে সুখ প্রদান করে তাহা অচিরস্থায়ী ও অশান্তিপ্রদ। অভ্যাসে দুষ্ক্রিয়া-জনিত অপবাদ বুঝিতে পারা যায় না তজ্জন্য অনেক স্থলে দুষ্কার্য্যও শ্লাঘনীয় মনে হয় কিন্তু কর্ম্মফল অপ্রতিহত ও অনিবার্য্য। এ নিমিত্ত বর্ত্তমান সময়ে আমরা যে সকল কুকার্য্য সুকার্য্য জ্ঞানে শ্লাঘান্বিত তৎ প্রভাবে দিন দিন আমরা যে অপবাদগ্রস্ত, মায়াবিনী পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবে আমরা আমাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্টতা প্রাপ্ত বা সমুন্নত মনে করিতেছি কিন্তু তাহা ভ্রম। পূর্ব্বে রাজপুরুষ-গণ আমাদিগকে মানুষ বলিয়া আদর করিতেন বিদেশীয়েরা ভারতকে জ্ঞানভাণ্ডার ও ধন-ভাণ্ডার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এখন আমা-দিগের সে গৌরবের সে সম্মানের লেশ মাত্রও অবশিষ্ট আছে বলিয়া বোধ হয় না।

বিদ্যাসাগর যখন হিন্দুস্কুলে পণ্ডিত ছিলেন তৎকালে শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর তাঁহার সহিত ভদ্রোচিত ব্যবহার না করায় তিনি যথা সময়ে ডাইরেক্টর সাহেবের সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করেন। তাহাতে ডিরেক্টর সাহেব আপনাকে অপমানিত মনে করিয়া প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের নিকট পণ্ডিতের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করেন। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব নিজে সেই অভিযোগের বিচারে সাহসী না হইয়া

কর্তৃপক্ষকে সেই অভিযোগের বিচার জন্য আহ্বান করেন। তাহাতে বাঙ্গালার লেফ্‌টনাণ্ট গভর্ণর হ্যালিডে সাহেব স্বয়ং বিচারের ভার গ্রহণ করেন এবং বিচারে ডিরেক্টর সাহেবকেই দোষী স্বাব্যস্ত করিয়া তাঁহাকে পণ্ডিতের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য করেন।

এই ঘটনা লইয়া চিন্তা করিয়া দেখুন দেখি তখন আমাদিগের কেমন উচ্চ সম্মান ছিল তত্তুলনায় এখন আমরা কিরূপ নগণ্য ঘৃণিত ও হেয় হইয়াছি। এখন ডাইরেক্টর সাহেব কেন নিতান্ত হীনপদস্থ কোন শ্বেতবর্ণের দ্বারা গুরুতররূপে লাঞ্ছিত হইয়াও আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলে আমাদিগের অত্যুচ্চ সম্মানিত ব্যক্তিকেও পদাঘাতে বিচ্ছিন্নগ্রীহ হইতে হয়।

হিন্দু পেট্রিয়টের এডিটর হরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় নীলকর সাহেবদিগের বিরুদ্ধে যে সমুদায় কথা লিখিতেন তাহাতে সাহেবদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছিল এখন তেমন ভাষা কোন পত্রিকায় ছাপা হইলে লেখক নির্ব্বাসিত হন, প্রেস সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়। দীনবন্ধু মিত্র নীলদর্পণ রচনা করিলেন কিন্তু তিনি উহা ছাপাইতে সাহসী না হইয়া লং সাহেবকে দেখাইলেন। লং সাহেব ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া নিজেই গ্রন্থকার বলিয়া প্রকাশ করিলেন। বাঙ্গালা নীলদর্পণে গ্রন্থকারের নাম দেওয়া হইল না। তাহাতে নীলকর সাহেবেরা ক্রুদ্ধ হইয়া লং সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করেন তাহাতে লং সাহেবের ১০০০৲ জরিমানা ও এক মাস কারাদণ্ড হইল। বাঙ্গালীর কষ্টে ইংরেজের তাদৃশ সহানুভূতি এখন আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

লেপ্টনাণ্ট গভর্ণর বা গভর্ণর জেনারলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনুমতির অপেক্ষা করিতে হইত না। পায়ে চটি জুতা, গায়ে সাদা জামা, ও লংক্লথের চাদর তাঁহার পোষাক ছিল, ছোট লাট বড় লাট সকলের সহিতই তিনি ঐ বেশে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। বাঙ্গালীর তেমন সম্মান এখন আর বড় কাহারও নাই।

পূর্ব্বে কর্তৃপক্ষের নিকট হাকিমদিগের বিশেষ সম্মান ছিল। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের নিকট অনেক বিষয়ে পরামর্শ লইতেন এবং তাঁহাদিগের পরামর্শ মতে অনেক কাজ করিতেন।

আধুনিক দেশীয় হাকিমদিগের সে সম্মান নাই, তাঁহারা এখন আদেশপালক ভৃত্য। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার না করিয়া যথাদিষ্ট কার্য্য সুসম্পাদন দ্বারা চাকরী রক্ষার্থে ব্যাকুল এবং গভর্ণমেণ্টের আদেশাধিক দুষ্কার্য্য দ্বারা অনেকে অনেক সময় উন্নতি লাভের প্রত্যাশী।

যে বিদ্যাবলে আত্মসম্মান রক্ষা করা যায় না, হীনতা বৃদ্ধি যে বিদ্যার পরিণাম তাহা লইয়া আবার গৌরব কেন? এই রকম বিদ্যালাভ করিয়াইত আমরা ধর্ম্ম ও সমাজের উপর অযথা দোষারোপ করিয়া অথবা গুণে দোষ আরোপ করিয়া স্বধর্ম্ম ও স্বসমাজের বিরুদ্ধাচরণদ্বারা আত্মাবনতি সাধন করিতেছি অন্যের উপর বৃথা দোষারোপ না করিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে আত্মশোধনই বিধেয়। কর্ম্মফল যখন আমাদিগকেই ভোগ করিতে হইতেছে তখন মিথ্যা ও অসার আত্মশ্লাঘা পরিহার পূর্ব্বক যাহাতে দোষ প্রশমিত হইতে পারে তাহার জন্যই বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। যে ভাঙ্গা ঘরে বাস করিতেছ যাহা ভিন্ন গত্যন্তর নাই সে গৃহ ভস্মসাৎ করিয়া একবারে নিরাশ্রয় হইবার

দুর্ব্বুদ্ধি ছাড়িয়া যাহাতে জীর্ণ গৃহ বাসোপযোগী হয় তাহার চেষ্টা কর। পণের উপদ্রব আর বাড়িতে দিও না। যথাসাধ্য চেষ্টায় তাহা উঠাইয়া দিয়া গৃহশান্তি সংস্থাপন কর। শাস্ত্রানুযায়ী বিবাহপদ্ধতি পুনঃ প্রতিষ্ঠা দ্বারা কুলে সুপুত্র সমুৎপত্তির বন্দোবস্ত করিয়া নষ্টগৌরব পুনঃপ্রাপ্তির পথ পরিষ্কার কর। মোহ বশতঃ কুবুদ্ধিপরায়ণ হইয়া আর বিভ্রাট জন্মাইও না।

শ্রীমাধবচন্দ্র সান্যাল।

জয়মল্ল ও পুত্তের

(১)

চিতোররাজ উদয়সিংহ তদীয় উপপত্নী বীরার অপূর্ব্ব রণকৌশলে ও বুদ্ধিচাতুর্য্যে আকবরের কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন বীরাঙ্গনা বীরার অপূর্ব্ব উদ্দীপনা ও সুকৌশল বচনবিন্যাসে সামন্ত ও সর্দ্দারগণ উদ্দীপ্ত হইয়া নৈশযুদ্ধে দিল্লীশ্বরকে পরাজিত করিয়া মহারাণা উদয় সিংহকে শত্রুশিবির হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। আকবর বীরাঙ্গনা বীরার ও তদীয় সৈন্যের প্রবল শক্তির বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া সমর-সম্ভারাদি পরিত্যাগ করতঃ চিতোর হইতে পলায়ন করিয়া নিজ জীবন রক্ষা করেন, এই প্রকার লজ্জাজনক পরাভব তাঁহার জীবনে আর কখন ঘটে নাই। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পর আকবর আবার চিতোর নগর আক্রমণ করিলেন। কারণ তিনি সেই ঘৃণাজনক পরাভবের অসীম যন্ত্রণা ও অপমান ভুলিতে পারেন নাই। মিবার রাজ্যের সর্ব্বোন্নত মস্তক নত করাও তাঁহার অপর উদ্দেশ্য ছিল। তজ্জন্য আবার প্রবল সেনাদল সহ চিতোর নগর আক্রমণ জন্য প্রস্তুত হইলেন। এবং শীঘ্রই বিপুলবাহিনী সহ প্রবল ঝটিকাকারে মিবার রাজ্যে আপতিত হইয়া তদীয় পর্ব্বত, কানন, নগর, দুর্গ, বেষ্টন করিয়া ফেলিলেন। আবার অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত পতাকাশ্রেণী ভারতাকাশ আবৃত করিয়া ধীর সমীরণে উড্ডীয়মান হইল। যেরূপেই হউক এইবার তিনি চিতোর নগর ধ্বংস করিয়া পবিত্র শিশোদীয় বংশে কলঙ্ককালিমা অর্পণ করিবেন নতুবা সম্মুখ সমরে নিজ জীবন বিসর্জ্জন করিবেন এই তাঁহার প্রবল প্রতিজ্ঞা। তজ্জন্যই তাঁহার এই বিরাট অভিযান। চিতোরের পথ-ঘাট, পর্ব্বত-কানন মোগলসৈন্যে ভরিয়া গিয়াছে। দুর্ব্বলচেতা রাণা উদয়সিংহ আকবরের অগ্রগতি রোধ করিতে পারেন নাই। কারণ নানা কারণে তাঁহার সামন্তশ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষের উগ্রবিষ বিসর্পিত হইয়াছে। কেহই রাজার ব্যবহারে সন্তুষ্ট নহেন। রাজভক্তি যাহা হিন্দুজাতির প্রাণ সেই অপূর্ব্ব বস্তু উদয়সিংহের কুব্যবহারে সৈনিকগণ হারাইয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং উদয়সিংহের পক্ষে এক্ষণে চিতোর রক্ষা অসম্ভব। চিতোরে থাকিলে পাছে আবার মুসলমানসম্রাট কর্ত্তৃক পূর্ব্বের ন্যায় ধৃত হইতে হয় এই বিবেচনা করিয়া কাপুরুষ রাজা চিতোর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লজ্জা বোধ করেন নাই। পবিত্র

সূর্য্যবংশে গাঢ় কলঙ্ক-কালিমা ঢালিয়া দিতে তাঁহার সঙ্কোচ বোধ হয় নাই। তিনি মোগলসম্রাটের অসীম বল ও সৈন্যসম্ভারাদি পরিদর্শন করিয়া আপনার অকিঞ্চিৎকর জীবনরক্ষার জন্য চিতোর নগর পরিত্যাগ করিয়াছেন। কুলনারীগণের সতীত্ব রক্ষা কে করিবে? নগরবাসী স্ত্রালোক ও বালকগণকে কে এই মহা আহব হইতে রক্ষা করিবে, আর সেই সুপবিত্র বাপ্পার বংশ-গৌরব পরিরক্ষণের জন্য কে দায়ী তাহা তিনি একবারও ভাবিবার অবকাশ পান নাই। ভীরু ফেরুপাল সম নিজ জীবন রক্ষার জন্য চিতোর নগর পরিত্যাগ করিয়াছেন। তবে কি চিতোর নগর রক্ষা হইবে না? তবে কি সেই স্বর্গভূমি যবনকর্ত্তৃক অধিকৃত, ধ্বংসীভূত ও চিরকলঙ্কিত হইবে? তবে কি সেই সিংহের আসনে ধূর্ত্ত মুসলমান নরপতি সমাসীন হইবেন? তবে কি হিন্দু কুলাঙ্গনাগণের পবিত্র সতীত্বরত্ন যবনকর্ত্তৃক অপহৃত ও বিলুণ্ঠিত হইবে? না না তাহা কখনই হইতে পারে না। যদিচ ক্ষুদ্রহৃদয় উদয়সিংহ চিতোর পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় হৃদয়ের লঘুতার ও নীচতার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তথাপি চিতোর এখনও বীরশূন্য ও হৃদয়শূন্য হয় নাই। আজও সেই বীরমাতার শ্রীচরণরক্তোৎপল দ্বারা পূজা করিবার জন্য অনেক উদারহৃদয় রাজ-পুত বীর বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই হৃদয়শোণিতের শেষবিন্দু পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া চিতোরের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিবেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত চিতোরের শুভচিন্তা করিয়া অন্তিমকালে তদীয় পবিত্র মৃত্তিকা চুম্বন করতঃ আপন আপন প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন। তথাপি বিনাযুদ্ধে আকবরের হস্তে চিতোরের স্বাধী-নতা তুলিয়া দিবেন না। আজ যেন মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্রবলে চিতোরের সেই ভস্মস্তূপ হইতে আবার অসংখ্য বীরের সৃষ্টি হইল। রাজস্থানের বিভিন্ন জনপদ হইতে ভিন্ন ভিন্ন বংশীয় বীরগণ আপনাদের সৈন্য সামন্ত লইয়া চিতোরের প্রাকার দ্বারে সমুপস্থিত হইলেন। বীরবর শহীদাস চন্দাবৎবংশীয় অনেক বীর সৈন্য লইয়া চিতোরের প্রধানতম তোরণ দ্বার "সূর্য্যদ্বারে" স্ফীতবক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া শত্রুগণের অগ্রগতি রোধ করিলেন। মাদেরিয়া, বৈদলা, কোটারিয়ো বিজোল্লি, সদ্রিব প্রদেশের সামন্তরাজগণ আপন আপন বীর সৈন্যসহ প্রবল মোগল-অনীকিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। ইহারা সকলেই চিতোরের সামন্তরাজা। তদ্ভিন্ন বিভিন্ন প্রদেশ হইতে দেবলপতি রাঘবজীর বংশ, ঝালোর পতি শনি গুরুরায়, ঈশ্বর দাস রাঠোর, করম চাঁদ, কদ্দাবহ ও তুয়াররাজ সকলেই এই মহান যুদ্ধে যোগদান করিলেন। সকলেই সূর্য্য সমক্ষে এক বাক্যে প্রতিজ্ঞা করিলেন কিছুতেই যবন হস্তে চিতোরের স্বাধীনতা অর্পণ করিবেন না। শরীরে এক-বিন্দু রক্ত থাকিতে মুসলমানগণের হস্তে চিতোরের স্বাধীনতা তুলিয়া দিবেন না। জীবনের, শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইবেন। তাঁহাদের জীবন থাকিতে চিতোরের পবিত্র অঙ্গে যেন তিলমাত্র কলঙ্ক-কালিমা স্পর্শ না করে। বীরগণ প্রাণপণে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সকলে একপ্রাণে সমরক্ষেত্রাভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। অচিরে হিন্দুমুসলমানে প্রবল সমরাভিনয় আরম্ভ হইল। মৃত্যু চতুর্দ্দিকে আপনার করাল বদন বিস্তার করিল। পরস্পরের অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন

হইয়া উভয় পক্ষের অনেক বীর ভূপতিত হইলেন। চারি দিক বিকট সিংহনাদ ও রণবাদ্যে পরিপূরিত হইল। মোগল কামানশ্রেণী গুড়ুম গুড়ুম শব্দ করিয়া চতুর্দ্দিক কম্পিত করিয়া তুলিল। সেই যুদ্ধে চন্দাবৎবংশীয় বীরতিলক শহীদাস চিতোরের সেনাপতিপদে বৃত হইয়া যবনসেনার প্রতি অবিশ্রান্ত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তদীয় শরাঘাতে চতুর্দ্দিকে মৃত্যুবৃষ্টি হইল। অসংখ্য মুসলমানসৈন্য বাণাহত হইয়া জর্জ্জরিত কলেবরে ভূপতিত হইল। তদ্দৃষ্টে মোগল সেনাপতি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। যবন সেনা তদীয় উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হইয়া "সূর্য্যদ্বার" অভিমুখে ধাবিত হইল। অসংখ্য ক্ষত্রিয় বীর যবনের আগ্নেয়াস্ত্র প্রহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। তথাপি ক্ষত্রিয় বীরকুলতিলক শহীদাস পদমাত্র অপসৃত হইলেন না। তিনি সেই মৃত্যুতরঙ্গের ভিতর নির্ভয়ে দণ্ডায়মান রহিয়া সূর্য্যদ্বার রক্ষা করিতে লাগিলেন। যতক্ষণ তাঁহার দেহে প্রাণ ছিল, ধমনীতে রক্ত ছিল, বজ্র মুষ্টির দৃঢ়তা ছিল ততক্ষণ শত্রুগণ কিছুতেই দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। শহীদাস এইরূপ আত্মোৎসর্গ দ্বারা সেইদিন চিতোরের সিংহদ্বার রক্ষা করিয়া অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করতঃ রক্তাক্ত কলেবরে ভূপতিত হইয়া অমরধামে চলিয়া গেলেন। তখন সূর্য্যাস্তের আর বিলম্ব নাই। যবন সেনাও ক্লান্ত হইয়াছে। রাজপুতেরা বীরবর শহীদাসকে হারাইয়া ক্ষুণ্নমনে সূর্য্যদ্বারের সুদৃঢ় কপাট অর্গলবদ্ধ করিয়া নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। মুসলমানগণও স্বীয় শিবিরে প্রত্যাগত হইল।

(২)

রজনীদেবী ধীরে ধীরে চিতোর নগরে আগমন করিলেন। আজ তদীয় অন্ধকার রাশির মত চিতোরবাসী নরনারীর হৃদয়ও গভীর নৈরাশ্যের আঁধারে সমাবৃত। মহারাণা নগর পরিত্যাগ করিয়াছেন, চন্দাবৎকুলপ্রদীপ শহীদাস সম্মুখ যুদ্ধে অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শনকরতঃ সংগ্রামক্ষেত্রে স্বীয় অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন, কে আজ চিতোরকে শত্রুকবল হইতে উদ্ধার করিবে? কে আজ সাগর সদৃশ উদ্বেলিত যবন সেনার হাত হইতে চিতোরকে রক্ষা করিবে চিতোরের অধিবাসী এই গুরু ভাবনায় অতি চিন্তিত! সকলেরই মুখে দুশ্চিন্তা ও বিষণ্ণতার ছায়া পরিস্ফুট। আজ কোন স্থানেই আনন্দের চিহ্নমাত্র নাই। শত শত সাহসী বীরগণ দুর্গ প্রাকারের স্থানে স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া শত্রুর গমনাগমন লক্ষ্য করিতেছে। রাজধানী গভীর চিন্তায় আত্মহারা!! ভবিষ্যতের ঘোর বিপদপাতের আশঙ্কায় যেন মুহ্যমান! মহাশক্তি চতুর্ভুজাদেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে আজ প্রধান প্রধান রাজপুত সেনানী, সর্দ্দার ও সামন্তগণ এবং শ্রেষ্ঠ নাগরিকেরা মৃদাসনে উপবিষ্ট হইয়া ভাবীযুদ্ধের বিষয় একমনে আলোচনা করিতেছেন। শহীদাসের বীরত্বের বিষয় শত শত মুখে সহস্র ভাষায় পরিকীর্ত্তিত হইতেছে। এমন সময় বেদোনোরের অধিপতি সামন্তরাজ জয়মল্ল ধীরে ধীরে সভার মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া দিব্য বাহুদণ্ড আন্দোলন করিয়া সুমিষ্ট স্বরে বলিতে লাগিলেন—"উপস্থিত ভদ্র মণ্ডলীকে আমি যথাযোগ্য নমস্কার, আশীর্ব্বাদ ও প্রেমালিঙ্গন দান করিয়া আমার হৃদয়ের বাসনা পরিজ্ঞাত করিতেছি। অদ্য চন্দাবৎ

বংশীয় বীরপ্রবর শহীদাস প্রবল যুদ্ধে সূর্য্যদ্বার রক্ষা করিয়া যে মহাবীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা জগতে অতুল্য। তাঁহার আত্মত্যাগ ও মহান বীরত্বে অদ্য চিতোর গৌরবান্বিত হইয়াছে, যবনেরা প্রতিহত ও বারম্বার পরাভূত হইয়া নিতান্ত ক্ষুণ্নমনে পলায়ন করিয়াছে। প্রাতঃস্মরণীয় পবিত্রচেতা বীর শহীদাসের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া কল্যকার যুদ্ধে কোন বীর, জাতীয়সেনাপতিরূপে যুদ্ধ-গমনকরতঃ চিতোরের মান সম্ভ্রম রক্ষা করিবেন? রাণা উদয়সিংহ নগর পরিত্যাগ সময় আমার হস্তে চিতোর রক্ষার ভার দিয়া নগর পরিত্যাগ করিয়াছেন। যদিচ অনেক বিষয়ে রাজা আমাদিগের মনোমত প্রার্থনা পূরণ না করিয়া নানা বিষয়ে আমাদিগকে অপমানিত ও বিরক্ত করিয়াছেন কিন্তু তাহাতে চিতোরের কোন অপরাধ নাই। চিতোরের পবিত্রা উচ্চবংশীয়া রাজপুত রমণীগণ আমাদিগের নিকট কোন প্রকারে অপরাধিনী নহেন। সূর্য্যবংশীয় মহারাজ কুশের বংশধরগণ জগতে চিরসম্মানিত। তদীয় সিংহাসন সকলেরই নিকট সম্মান ও পূজা পাইবার বস্তু। তজ্জন্য চিতোরের স্বাধীনতা রক্ষা করা সকলেরই নিতান্ত কর্ত্তব্য এবং বাঞ্ছনীয়। আজ সেই চিতোর নগরী ঘোর বিপন্না। কল্য দুরাচার যবনেরা উহার স্বাধীনতা নষ্ট করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিবে। আকবর সাহার দুই লক্ষ সেনা প্রাণপণে নগর প্রাকার ভেদ করিবার প্রবল চেষ্টা করিবে। সেই ঘোর বিপদে কোন্ বীরবর চিতোরের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার উপযুক্ত পাত্র। অদ্য এই সভায় স্থিরীকৃত হউক কোন্ বীরযোদ্ধার উচ্চ মস্তকে সেই বিজয় মুকুট পরিশোভিত হইবে? বর্ত্তমানে চিতোরের ভিতর কোন্ ব্যক্তি উক্ত কঠিন কার্য্যোদ্ধারের সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত পাত্র। সামন্তরাজগণ, সেনাপতিবর্গ, ও প্রধান প্রধান নাগরিক সকল আমি আপনাদের নিকট এই বিষয়ের প্রশ্ন করিতেছি। কল্য-কার অসাধ্য সাধন কোন্ বীরপ্রবর উচ্চ হৃদয়বান সেনাপতি দ্বারা সম্পাদিত হইবে? অদ্যই সেই বীররত্নকে এই সভার ভিতর সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিতে হইবে। অদ্যই তাঁহার সিংহগ্রীবা চতুর্ভুজার শ্রীচরণ-লিপ্ত চন্দনে অনুলেপিত কুসুমমালিকা দ্বারা পরিশোভিত করিতে হইবে। তদীয় বিস্তৃত ললাট বরণতিলক দ্বারা সমুজ্জ্বল করিতে হইবে। আপনারা কোন্ ভাগ্যবান ব্যক্তিকে এই দেবদুর্ল্লভ পদে বরণ করিতে চাহেন? জয়মল্লের বাক্য সমাপ্ত হইতে না হইতেই চতুর্দ্দিকে একস্বরে উচ্চারিত হইল—"কৈলবার অধিপতি যোড়শবর্ষীয় নবীন বীরযুবক পুত্তকে," তিনিই বর্ত্তমানে এই যুদ্ধের উপযুক্ত সেনা-পতি। উপস্থিত রাজপুত সেনানীর ভিতর তিনিই প্রধান বীর এবং সেনাপতি হইবার উপযুক্ত পাত্র। শীঘ্রই তাঁহার গলদেশে অভিষেকমাল্য অর্পণ করুন। ইহাই আমা-দের সকলের অভিমত। জয়মল্ল ধীরে ধীরে আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন।

মহোদয়গণ সেনাপতি নিয়োগ সম্বন্ধে আমারও সেইমত। আমি পুত্তের উদারতা, বীরত্ব ও অসাধারণ যুদ্ধচাতুর্য্যের বিষয় অব-গত আছি। আনন্দের বিষয় আপনারাও আমার মতের সম্পূর্ণ সমর্থন করিলেন। এই কথার পর তিনি পুত্তকে সম্বোধন করিয়া মিষ্ট বাক্যে বলিতে লাগিলেন প্রাণাধিক পুত্ত আমরা আজ অতি আহ্লাদের সহিত এই মহনীয় পদে তোমাকেই বরণ করিবার ইচ্ছা

প্রকাশ করিয়াছি, বৎস তুমি ভিন্ন কাহারও চিতোর রক্ষার শক্তি নাই। তুমিই জাতীয় তরণীর একমাত্র কর্ণধারের উপযুক্ত। তুমিই আমাদের একমাত্র আশা ভরসার স্থল। বৎস আশীর্ব্বাদ করি হেলায় যবনসিন্ধু মন্থন করিয়া বিজয়কিরীট দ্বারা স্বীয় মস্তক উজ্জ্বল করতঃ বিজয়ী বেশে হাসিতে হাসিতে আবার জন্মভূমির পবিত্র ক্রোড়ে ফিরিয়া আইস। চতুর্ভুজা অবশ্যই তোমার সহায় হইবেন। তাঁহার আশীর্ব্বাদে তোমার করযুগল সহস্র ভুজের ন্যায় যবনবিনাশে বলসম্পন্ন হইবে। আমরা সকলেই এক প্রাণে আজ তোমাকে চিতোরের সেনাপতিপদে বরণ করিলাম। তোমার আদেশে চালিত হইয়া আপনাদিগকে বিশেষরূপে গৌরবান্বিত মনে করিব। জয়মল্লের বাক্য পরিসমাপ্ত হইলে বীরবর পুত্ত সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার কপাট সদৃশ বিশাল বক্ষঃস্থল, শালতরুসম সবার হস্ত ও পদযুগল, জ্যোতিঃ পূর্ণ আকর্ণ প্রসারিত সুনীল নয়নযুগল, এবং সারল্য মাখা উজ্জ্বল বদনকান্তি পরিদর্শন করিয়া সভাস্থ সকলেই উৎফুল্ল হইলেন। সেই বিরাট জনমণ্ডলীর ভিতর অজ্ঞাতে যেন একটা আনন্দের প্রবল তরঙ্গ উদ্বেলিত হইল। পুত্ত ধীরে ধীরে প্রণত মস্তকে অতি সুমিষ্ট বাক্যে উত্তর করিলেন এই মহতী সভার ভিতর যে সকল মহাত্মাগণ উপস্থিত আছেন তাহার মধ্যে অনেকেই আমার প্রণম্য এবং গুরুস্থানীয়। আমি অনেকেরই নিকট যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি। তজ্জন্য আমি উপরোক্ত মহাত্মাগণের শ্রীচরণ বন্দনা করিতেছি। আর চিতোরের নাগরিকগণ যে উচ্চতম আয়াস সাধ্য কার্য্য উদ্ধারের উপযুক্ত মনে করিয়া আমাকে চিতোরের সেনাপতি পদে নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছেন তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। এই গুরুতর কার্য্যসম্পাদনে আমার কিরূপ যোগ্যতা আছে তাহা ভগবানই জানেন। এই বীর বালক আপনাদের নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছে সে তাহার অসির সম্মান অবশ্যই রক্ষা করিবে। শরীরে যতক্ষণ পর্য্যন্ত একবিন্দু রক্ত থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত যবন বিনাশ করিবে। ভগবানই জানেন এই গৌরবময় যুদ্ধে কাহার জয় পরাজয়। বহু পুণ্য ও পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি ফলে আমি আজ এই মহান ও উচ্চ পদে বৃত হইয়া আপনাকে ও আমার বংশকে ধন্য মনে করিতেছি। আর মনে করিতেছি আমার বীরমাতার স্তন্যপান বৃথা হয় নাই। সেনা ও সেনাপতিগণ আপনারা আমার অনুবর্ত্তন করিবেন। সম্রাট আকবরকে দেখাইব এই সিংহশিশু বাহুতে কিরূপ বিপুলশক্তি ধারণ করে। তাহার সমরপিপাসা কল্য জন্মেরমত পরিসমাপ্ত হইবে আমি এইরূপই আশা করি। শুনিয়াছি যবন সৈন্য দুই লক্ষের ন্যূন হইবে না। আমাদের সৈন্য সংখ্যা ত্রিংশৎসহস্রেরও কম হইবে। জগৎ দেখিবে আমার এই বীর ভ্রাতাগণ যবনসেনা-সমুদ্র কেমন করিয়া মন্থন করেন। এবং তাহা কিরূপ পুরুষার্থ পূর্ণ! তাঁহারা কিরূপ অদ্ভুত বীর!! রাজপুরোহিত ইত্যবসরে চতুর্ভুজার চরণোদক পুত্তকে পান করাইলেন। তাঁহার গলদেশে দেবী নিবেদিত চন্দনচর্চ্চিত ফুল মালা অর্পিত ও প্রশস্ত ললাটে বরণ তিলক শোভিত হইল। এইরূপে অভিষেক কার্য্য যথারীতি সম্পাদিত হইল, অমনি চারিদিক হইতে তুরি, ভেরী, দামামা, দগড় প্রভৃতি রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল, পুত্ত ধীরে ধীরে সভাস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গকে

প্রণাম করিলেন। ইহার অল্পক্ষণ পরে সভা ভঙ্গ হইল। সকলেরই মুখে ধ্বনিত হইল বীরবর পুত্ত কল্যকার যুদ্ধের সেনাপতি! তিনিই চিতোর রক্ষার উপযুক্ত পাত্র।

(৩)

রজনী দ্বিতীয় প্রহর। নক্ষত্ররাজি সুনীল আকাশপটে প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। নৈশ সমীরণ ধীরে ধীরে তরঙ্গায়িত হইয়া আহত সৈন্য সকলের স্বেদসিক্ত যন্ত্রণাক্লিষ্ট বদনমণ্ডলের ঘর্ম্মবিন্দু অপনোদন করিতেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে মাংসাহারী শ্বাপদেরা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া মনের আনন্দে শব ভক্ষণ করিতেছে। দূরে যবন শিবিরে আলোকরাশি প্রজ্জ্বলিত। তথায় স্থানে স্থানে সৈন্যগণ অনিদ্রায় আপন আপন সেনাপতির আদেশ পালন জন্য চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান। এমন সময় পুত্ত ধীরে ধীরে আপন মন্দিরে প্রবেশ লাভ করিলেন। তাঁহার মস্তকে স্বুবর্ণ কিরীট, কপালে বরণ-তিলক, গলদেশে পুষ্পমাল্য, সর্ব্বাঙ্গ বর্ম্মাবৃত, কটিদেশে দোদুল্যমান তরবারি, হস্তে সুদৃঢ়শূল, পৃষ্ঠে বৃহৎ ধনু ও নিষঙ্গ। বীরবর ধীরে ধীরে আসিয়া মাতৃচরণ বন্দনা করিলেন। পুত্রকে এইরূপ অপূর্ব্ব বীরসাজে সমাগত দেখিয়া বীরমাতার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। তিনি অপলক নেত্রে পুত্রের এই অপূর্ব্ব বীরকান্তি প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইলেন। তৎপরে বীরজননী পুত্রের মস্তকাঘ্রাণ করিয়া তদীয় বদনকমল বারম্বার চুম্বন করত বলিতে লাগিলেন পুত্ত এতদিনে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। স্তন্যদান সার্থক হইল। পুত্র আজ তুমি চিতোরের সেনাপতি পদে বৃত হইয়া যবন বিনাশের জন্য যুদ্ধ যাত্রা করিতেছ। তোমার কপালে বরণ-তিলক দৃষ্ট করিয়া আজ আমার হৃদয় কিরূপ আনন্দরসে পরিপ্লুত হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিতেছি না। এই মহান উদ্দেশ্য সম্পাদন জন্য তোমাকে আমি এত বড় করিয়াছি। তোমার পিতা বিগত যবনযুদ্ধে স্বর্গলাভ করিয়াছেন। দুরাত্মা আকবর স্বহস্তে তোমার পিতাকে নিধন করিয়াছিল। তাহার প্রতিশোধ কামনায় আমি স্বামীর প্রজ্জ্বলিত চিতানলে এই অসার দেহ সমর্পণ করিয়া সহমৃতা হই নাই। তুমি শিশু তোমাকে লালন পালন করিয়া তজ্জন্য এতদিন যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করাইলাম। চল আজ উভয়ে সেই স্বামীহন্তা পিতৃহন্তাকে বিনাশ করিব। উভয়ে আজ জীবনের স্বার্থকতা সম্পাদন করিব। পুত্ত দেখিলেন তদীয় বীরজননী বর্ম্ম পরিহিতা ও নানাপ্রকার যুদ্ধাস্ত্রে বিভূষিতা। তিনি যুদ্ধ গমন জন্য নিতান্তই ব্যাকুলা। আকবরের শিরশ্ছেদ করতঃ স্বামী-নিধন-যন্ত্রণার নিবারণকল্পে অতি অস্থিরা। পুত্ত ধীরভাবে এই রণচণ্ডী মূর্ত্তি দেখিলেন। এই স্থিরা বিদ্যুদ্দামময়ী অনল প্রতিমার প্রতিমূর্ত্তির প্রতি সভয়ে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার একটী কথা কহিবারও শক্তি রহিল না। জননী পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন—"পুত্ত তুমি কৈলবার বংশের একটী মাত্র কুলপ্রদীপ। তোমার অভাবে উক্ত রাজবংশে আর কেহ বংশধর রহিবে না। পিতৃপুরুষগণ জলপিণ্ড পাইবেন না। তথাপি জন্মভূমি রক্ষার গুরুত্ব ও পুণ্যের নিকট এই স্বার্থময় বাসনার বলিদান দিয়া তোমাকে ধর্ম্মযুদ্ধে, জাতীয় যুদ্ধে গমন করিবার জন্য প্রসন্ন মনে অনুমতি প্রদান করিলাম। যাহারা ক্ষুদ্র স্বার্থের নিকট জন্ম-

ভূমির কল্যাণ-কামনাকে বলিদান দেয় তাহারা মহাপাপী। নরকেও তাহাদের স্থান নাই। যাও পুত্র জাতীয় সংগ্রামে অগ্রসর হও। স্বীয় বাহুবলে যবন সৈন্য বিদলিত করিয়া বিজয়ের রথে আরোহণ করতঃ পুনর্ব্বার চিতোর দুর্গে প্রবেশ কর। মাতার আর একটী অনুরোধ তোমাকে পালন করিতে হইবে। বধূ সুকুমারী অল্প বয়স্কা। তাহাকে একাকী গৃহে রাখিয়া যুদ্ধে যাইতে আর ইচ্ছা নাই। ভবিতব্যতার কথা বলা যায় না। যদি যবনেরা যুদ্ধে বিজয়ী হয় তবে উহারা কাহারও জাতিকুল রাখিবে না। চিরপবিত্র বংশে নিশ্চয়ই কলঙ্ককালিমা লেপন করিবে। তজ্জন্য সুকুমারীকে যুদ্ধের সঙ্গিনী করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, সে রাজপুতকন্যা। বাল্যকাল হইতে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে। তোমার সঙ্গে যুদ্ধে যাইবার জন্য বিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছে। পুত্র তোমাকে আমার এই আদেশ পালন করিতে হইবে। পুত্ত আহ্লাদে মাতৃপদে প্রণাম করিলেন। এবং স্বীয় জননীর হৃদয়ের উচ্চতা ও মহামহিমাময়ী দেবীত্বের নিকট নতমস্তক হইলেন। ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন মাতঃ পুত্ত এ জীবনে তোমার পবিত্র আদেশ পালন জন্য চিরপ্রস্তুত। পুত্ত মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে নিজ শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন অস্ত্র শস্ত্র ভূষিতা এক দেবীমূর্ত্তি সুতীক্ষ্ণ শূলহস্তে তাঁহার অপেক্ষায় দণ্ডায়মানা। ধর্ম্মপত্নী সুকুমারী শরীরের সমস্ত অলঙ্কার রাশি পরিত্যাগ করত রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া ও সন্নাহভূষিতা হইয়া জগদ্ধাত্রীর বেশে যুদ্ধ যাইবার জন্য প্রস্তুত। তিনি স্বামী চরণে প্রণতা হইলেন এবং বলিলেন নাথ আমি যদিও তোমার সহিত যুদ্ধ গমনের নিতান্ত অনুপযুক্তা তথাপি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই দাসীকে সমরসঙ্গিনী করিয়া লইতে হইবে। দাসীর ক্ষীণকর অঙ্গের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনের জন্য নহে। যবন বিনাশের শাণিতাস্ত্ররূপে ভগবান উহা প্রদান করিয়াছেন। এই সুতীক্ষ্ণ শূলাঘাতে শত্রুদেহ বিদীর্ণ করিয়া নাথ তোমার সহিত আবার রণবিজয়িনী বেশে চিতোরে প্রবেশ লাভ করিব। পুত্ত আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি পদানতা প্রিয়াকে করে ধরিয়া যত্নের সহিত উঠাইলেন এবং প্রেমগদগদ চিত্তে বলিতে লাগিলেন সুকুমারী তুমি ধন্যা! তুমিই যথার্থ বীরপ্রণয়িনী, চিতোরের স্বাধীনতাদেবী বুঝি মানবী বেশে তদীয় আকারে অবতীর্ণা। তোমাকে যুদ্ধে যাইবার জন্য আমি প্রসন্ন মনে অনুমতি দান করিলাম। তোমার এই মহৎ দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া চিতোরের কুলাঙ্গনা ও কুলবধূগণ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রধাবিত হইবে। জহর ব্রত * গ্রহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করাপেক্ষা এইরূপে বীরত্ব প্রদর্শনকরত শত্রু-সৈন্য বিদলনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিতে পারিলে দেশের শত গুণ উপকার করা হয়। তোমার শুভাগমনে চিতোর ধন্য হইয়াছে। আমার বংশ ধন্য হইয়াছে। রাজপুত জাতির মহিমা শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। যবনকুল দেখুক এই রাজপুত কুলকামিনীরা তাহাদের পতির একমাত্র প্রেমপিপাসা নিবৃত্তির উপাদান নহে। উহারা প্র

* রাজপুত রমণীগণের স্বামী পুত্রেরা শেষ যুদ্ধ যাত্রায় গমন করিলে উহাঁরা তাঁহাদের জীবনে হতাশ হইয়া প্রজ্বলিত অনলে স্বীয় স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন করিতেন। উহাকে জহর ব্রত বলে।

জ্বালাময়ী বিদ্যুৎরূপিণী। স্বামীশত্রুর প্রাণঘাতিনী!! এই বলিয়া বীরবর বাহুপাশে বদ্ধ করিয়া সেই নবীন পুষ্পকোরক বারম্বার চুম্বন করিলেন, সে চুম্বন কত মধুর। কত স্বর্গীয়! শেষ বিদায়ের কত অস্ফুট মর্ম্মবেদনায় পরিষিক্ত!! উভয় হৃদয়ের অপূর্ব্ব বৈদ্যুতিক সংঘর্ষণে উত্তপ্ত!! পুত্র প্রেমগদগদ চিত্তে মনে মনে ভাবিলেন আমার জন্মগ্রহণ ধন্য। মাতা বীর রমণী। প্রাণাধিকা পত্নী স্বদেশ উদ্ধারে উৎসর্গীকৃতপ্রাণা। উভয়ের মধ্যে একজনও আমার যুদ্ধ যাত্রার পরিপন্থি নহে। বরং প্রাণপণে উৎসাহ দান করিয়া আমার চিত্তকে পরিস্ফুট করিতেছে। কাহার ভাগ্যে এইরূপ শুভযোগ উপস্থিত হয়? আমি বড় ধন্যবান!!

(৪)

নিদ্রাদেবী অদ্য চিতোর নগরে কাহারও হৃদয়ে স্বীয় সিংহাসন পাতিতে পারেন নাই। আজ ধনী গৃহস্থ দরিদ্র সকলের গৃহেই একরূপ বীরাভিনয় চলিতেছে। সকল রাজপুত রমণীগণই তাহাদের পতি পুত্র ভ্রাতাগণকে যুদ্ধের জন্য উদ্দীপ্ত করিতেছে। সকলের মুখেই সেই এক ভাষা। সকলেই বলিতেছে—"যাও বীরগণ চিতোর উদ্ধার জন্য আপন আপন অমূল্য জীবন উৎসর্গ কর। শত্রুর করে আত্মসমর্পণ করিও না। যুদ্ধ স্থান হইতে পলায়ন করিও না। রণজয়ী হইয়া বিজয়ীর বেশে জাতীয় ধ্বজা উড্ডীন করিয়া পুনর্ব্বার চিতোরে প্রবেশ লাভ কর। নতুবা শত্রুশরে বিদীর্ণ হইয়া চিতোরের পবিত্র মৃত্তিকা চুম্বন করিয়া অমরধামে গমন কর। জীবন চিরস্থায়ী নহে। কীর্ত্তিই চিরস্থায়ী। রাজপুত কুলকামিনীরাও মরিতে জানে। তোমাদের মৃত্যু ঘটিলে শীঘ্রই তাঁহারা পবিত্র জহোর ব্রতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া তোমাদের সহিত স্বর্গরাজ্যে মিলিত হইবে। এই অত্যল্পকাল বিচ্ছেদ জন্য ভীরুর মত প্রাণভয়ে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় বংশে কলঙ্ককালিমা লেপন করিও না। প্রতিগৃহে প্রত্যেক পুরুষের কর্ণে কর্ণে উচ্চমনা রাজপুত কুলকামিনীগণ এই মহামন্ত্র প্রদান করিতেছেন। উঁহাদের চক্ষে একবিন্দু অশ্রু নাই। হৃদয়ে একটী শোকের উচ্ছ্বাস উদ্বেলিত হয় না। সকলের মুখেই ঐরূপ বজ্রদাহী উদ্দীপনা প্রবাহ। পত্নী চুম্বন করিতে করিতে স্বামীকে সমর সজ্জায় সজ্জিত করিতেছেন। মাতা তাঁহার প্রাণের নন্দনকে আহ্লাদে বীরবেশে বিভূষিত করিতেছেন। ভগ্নী ভ্রাতার অঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র বাঁধিয়া দিতেছেন। সমস্ত চিতোর নগর আজ জাতীয় উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত। তথায় আজ স্নেহ, ভালবাসা, প্রেম মানুষকে বাঁধিয়া রাখিতে অক্ষম। এক উচ্চ মহান্ বিশ্বজনীন মানবহিতৈষণায় আজ চিতোরের নরনারী সমভাবে উদ্দীপ্ত। রাজ অস্ত্রাগার উন্মুক্ত রহিয়াছে। দলে দলে বীরগণ তথায় প্রবেশ করিয়া অস্ত্রশস্ত্র বাছিয়া লইতেছেন। সকলেই পীতবসনে সজ্জিত। সকলেই যেন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। চারণেরা দলে দলে রাজপথে বিজয় গান গাহিতেছে। বাপ্পা, সমরসিংহ, ভীমসিংহ প্রভৃতি ক্ষত্রিয় বীরগণ যে যে যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াছিলেন সেই সকল যুদ্ধের বিজয় গান তাহারা তালমান সহ গান করিয়া রাজপুত হৃদয়ে বীরত্ব সুধা ঢালিয়া দিতেছে। উহাদের প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় চিতোর আজ যেন জাগিয়া উঠিয়াছে। অবস্থা দৃষ্টে অনুমিত হইতেছে, হয় তাহারা বিজয়ী

হইবে নতুবা সমস্ত চিতোরবাসী জাতীয় স্বাধীনতার শ্রীচরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রহিবে। দেখিতে দেখিতে রজনীর তৃতীয় যাম অতীত হইল। অকস্মাৎ রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। নৈশ সমীরণে সেই সুমধুর বাদ্যধ্বনি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। উক্ত মধুর শব্দে বীরগণের হৃদয় তালে তালে নাচিয়া উঠিল। রণসজ্জিত বেশে সকলে দলে দলে তোরণ দ্বারের অভিমুখে ধাবিত হইল। সুশিক্ষিত অশ্বাবলী হ্রেষারব করিতে করিতে স্বীয় স্বীয় প্রভুকে পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া চলিল। উহারাও যেন আজ মহাসমরে জীবনদান জন্য প্রস্তুত। সকলের অগ্রেই জয়মল্ল ও পুত্ত উচ্চৈঃশ্রবা তুল্য দুই রণতুরঙ্গে আরোহণ করিয়া দ্বিতীয় ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অসি খুলিয়া পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদন করিলেন। পরস্পর পরস্পরের মনভাব বুঝিলেন। পরস্পর পরস্পরের নিকট নীরবে শেষ বিদায় গ্রহণ করিলেন। এই নীরবতা কত মধুর স্বর্গীয় ও প্রাণস্পর্শী। চিতোরের দুইটী মহাপ্রাণ এইরূপে কাল-সমরে ঝম্প প্রদান করিলেন। কড়কড় বজ্র শব্দে চিতোরের তোরণদ্বার উন্মুক্ত হইল। উভয় সেনাপতি সর্ব্বাগ্রে বহির্গত হইলেন। সকল সেনার মুখেই জাতীয় সঙ্গীত, মধ্যে মধ্যে রণশঙ্খের গম্ভীর শব্দ, ধ্বজবাহিগণ সূর্য্যচিহ্নিত জাতীয় ধ্বজা স্কন্ধে করিয়া বহির্গত হইতেছে। চারণেরা নাচিয়া নাচিয়া যুদ্ধের বিজয় গান গাহিতে লাগিল। এইরূপ এক অপূর্ব্ব উন্মাদনায় ও মনোন্মাদিনী স্বদেশ-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া রাজপুত সেনা সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করত বিজয় কেতন লাভ করিবার জন্য দলে দলে শত্রু শিবিরাভিমুখে ছুটিয়া চলিল। ভবিতব্যতাই জানেন ইহার পরিণাম কি!! উষার কনক-কিরণরেখা পূর্ব্বাকাশ ঈষৎ আলোকিত করিয়াছে এমন সময় চিতোরবাসী দর্শন করিল পর্ব্বতের উপর হইতে এক-রূপ-স্রোত ধীরে ধীরে নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। যুদ্ধাশ্বরোহণে পুত্তের বীর জননী নিজ পুত্রবধূ ও অন্যান্য উচ্চবংশীয়া ক্ষত্রিয় কুলকামিনীগণে পরিবৃতা ও যুদ্ধ সাজে সজ্জিতা হইয়া রণক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিতা হইতেছেন। যাঁহারা জীবনে কখন গৃহের বাহির হন নাই, যাঁহাদের মুখচন্দ্র বিমলিন হইবে বলিয়া সূর্য্যদেবও সভয়ে কিরণ বিতরণ করিতেন, সমীরণ ঘর্ম্মবিন্দু ধীরে ধীরে মুছাইয়া দিতেন, তাঁহারা আজ কি এক আশ্চর্য্য ইন্দ্রজাল বলে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া লজ্জা ও স্ত্রীসুলভ কোমলতাকে বিসর্জ্জন দিয়া শিরিষকুসুমনিভ সুকুমার দেহ লৌহবর্ম্মাবৃত করিয়া মুখে রণগীত গাহিয়া যবনশিবিরের অভিমুখে ছুটিতেছেন। তাঁহাদের মহৎ দৃষ্টান্তে উৎসাহিত অনেক কুলবালা রাজপুত মহিলা অস্ত্র শস্ত্রে বিভূষিতা হইয়া অশ্বারোহণে এই নারীসেনার সহিত যোগদান করিলেন। নিতান্ত ভীরু যাহারা তাহারাও এই সকল বীর রমণীর অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ ও বীরত্বের মহিমাময় মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া লজ্জাজনক নির্জ্জন বাস পরিত্যাগ করতঃ উদ্দীপ্ত হৃদয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে ছুটিয়া চলিল। বলিতে গেলে স্ত্রীপুরুষের এইরূপ একত্র অভিযানহেতু চিতোর একরূপ জনশূন্য হইয়া পড়িল। সকলেই স্বীয় হৃদপিণ্ড ছেদন করিয়া রক্তরাশি প্রদানে জন্মভূমি চিতোরের কল্যাণ কামনায় বদ্ধপরিকর হইল। এই মহৎভাব উচ্চ স্বদেশহিতৈষণা

বাস্তবিকই একদিন ভারতভূমির মহান গৌরব স্বরূপ ছিল। উহা একদিন জগতের আদর্শরূপে লোকনয়নে প্রতিভাত হইত।

(৫)

সূর্য্যের স্বর্ণ কিরণ প্রাচীগগনে সমুজ্জ্বল হইয়াছে। এমন সময় দুইটী বিরাট মহাসিন্ধুর সংঘর্ষণ হইল। দুই প্রমত্ত সেনাদল পরস্পরকে আক্রমণ করিবার জন্য সংমিশ্রিত হইল। অশ্বারোহীর সহিত অশ্বারোহীর অসিক্রীড়া আরম্ভ হইল। পদাতিকের সহিত পদাতিকের যুদ্ধ চলিতে লাগিল। উভয় পক্ষের বৈজয়ন্তীমালা প্রাতঃসমীরণে দুলিয়া দুলিয়া যেন ইঙ্গিতে বীরদিগকে যুদ্ধোৎসাহিত করিতে লাগিল। রণবাদ্য বীরগণের হৃদয়কে যেন মদিরোন্মত্ত করিল। সংসার ও আপন অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া বীরগণ ঘোরযুদ্ধে মাতিয়া উঠিল। বীরবর পুত্ত সকলের অগ্রে যবন বিনাশে নিযুক্ত। তাহার সন্ধান অব্যর্থ। কখন ধনুর্ব্বাণ, কখন খড়্গ চর্ম্ম কখন শেলশূল লইয়া বীরবর অসংখ্য যবন বিনাশ করিতেছেন। অসংখ্য আঘাত প্রতিহত করিতেছেন। তাঁহার শিক্ষিত অশ্ব রণস্থল আলোড়িত করিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ধাবিত হইতেছে। তিনি যে ধারে গমন করিতেছেন অসংখ্য যবন তদীয় অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন মুণ্ড হইয়া তথায় দলে দলে পতিত হইতেছে। রক্তের নদী বহিতেছে। ক্রমে ক্রমে বীরবর পুত্ত ভীষণ দুনিরীক্ষ্য হইলেন। তদীয় নয়নযুগল যেন জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইল। যুগলহস্ত যেন মৃত্যুর নিগড়ের ন্যায় সংহার কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। তাঁহার সিংহনাদ যেন প্রলয়কালের বিষাণ ধ্বনির ন্যায় যবনসৈন্যের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। ক্রমে ক্রমে পুত্তের সহিত যুদ্ধ করিয়া যবন সৈন্য অস্থির হইল। সেনাপতিগণ চঞ্চল হইয়া প্রমাদ গণিলেন। আকবর সাহও এই সিংহকুমারের অসি ক্রীড়া পরিদর্শন করিয়া স্তম্ভিত ও কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন। তাঁহার যুদ্ধ জয়াশা হৃদয় হইতে মুছিয়া গেল। পুত্তের জননীপ্রমুখ ক্ষত্রিয় নারীগণ একত্রে অশ্বারোহণে যবনসেনা বিদলন আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের আর নারীসুলভ কোমলতা নাই। ঘন ঘন সিংহনাদ ধনুষ্টঙ্কারে ও শঙ্খধ্বনিতে যবন বীরগণ কম্পিত কলেবর হইলেন। অব্যর্থ অস্ত্রাঘাতে শত শত যবন ছিন্নগ্রীব হইয়া ভূপতিত হইতে লাগিল, পুত্তজননী ভীমা ভগবতীর বেশে রণস্থল আলোড়িত ও দশদিক কম্পিত করিয়া বিদ্যুৎবেগে সমরাঙ্গন প্রকম্পিত করিতে লাগিলেন। তিনি যবনসৈন্যের ভিতর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কাহারও যেন অনুসন্ধান করিতেছেন বোধ হইল। বহু অনুসন্ধান পর তদীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। তিনি কিছু দূরে আকবর সাহাকে দর্শন করিয়া অতীব প্রীত হইলেন। এবং এক শ্রবণভৈরব শব্দে উচ্চচীৎকার করিয়া পুত্তকে বলিলেন পুত্ত ঐ দেখ সম্মুখে তোমার পিতৃহন্তা। শীঘ্র এস, শীঘ্র এস ঐ সম্মুখে তোমার পিতৃঘাতক!! মাতার কথায় পুত্তের হৃদয়,চমক ভঙ্গ হইল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন এক প্রকাণ্ড হস্তী পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া আকবর নিজেই সৈন্যপরিচালন ও তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। ক্ষত্রিয় বীরগণের প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া যবনসেনা বাণাঘাতে জর্জ্জরিত

কলেবরে দলে দলে পলায়ন করিতেছে। এমন সময় পুত্ত সদলে আকবর সাহের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। নারীসেনাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। পুত্তের বীরজননী সকলের অগ্রে নিষ্কোষিত কৃপাণ হস্তে হুহুঙ্কার শব্দে রণচামুণ্ডাবেশে ধাবিতা হইলেন। যবনসেনাপতি এই গুরুতর বিপদ অবলোকন করিলেন। এবং বুঝিলেন পুত্তও এই রণভীমা রাক্ষসীদিগের হস্তে আর সম্রাটের রক্ষা নাই। তদ্দর্শনে তিনি ক্ষণবিলম্ব না করিয়া বহু শত সাহসী সেনা লইয়া আকবরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। সম্রাটকে রক্ষা করিবার জন্য অসংখ্য মুসলমান সেনা তদীয় সঙ্কেতে স্তরে স্তরে লৌহপ্রাচীরের ন্যায় পথ আগুলিয়া দণ্ডায়মান হইল। যবনসেনাপতি আকবর সাহকে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন আপনি শীঘ্র এই স্থান পরিত্যাগ করুন। ঐ দেখুন প্রতিশোধ-পিপাসু রাজপুতসেনা ও পুত্তজননী আপনাকে সংহার করিবার জন্য সমুপস্থিত। এই সময় আপনি পলায়ন করুন। নতুবা আপনাকে কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিব না। সৈন্যগণ নিজ নিজ জীবন দিয়া ততক্ষণ বিপক্ষের অগ্রগতি রোধ করুক। সম্রাট সেনাপতির কথা শুনিলেন। সেই কাল বৈশ্বানররূপিণী, রণোন্মাদিনী, ভৈরবীবেশধারিণী, বর্ম্মপরিহিতা, অসিভল্লে সুসজ্জিতা, অশ্বারূঢ়া পুত্তজননীর সেই রণরঙ্গিনীরূপ পরিদর্শন করিলেন। সেই ঘোর অট্টহাস্য শ্রবণ করিলেন। প্রতিহিংসার ভীষণ দৃশ্য তাঁহার নয়ন ও বদনে যেন পরিস্ফুট। সেই ভীষণমূর্ত্তির প্রতি তাঁহার চাহিবার আর শক্তি রহিল না। এই বীর রমণীর অবস্থাদৃষ্টে আর একটী রাজপুত বীরাঙ্গনাকে তাঁহার মনে পড়িল। সেই নৈশ যুদ্ধের কথা মনে পড়িল। সেই উদয় সিংহের প্রাণপ্রতিমা জীবনের সর্ব্বস্ব ধর্ম্ম বীরাঙ্গনা বীরাকে * মনে পড়িল। তাঁহারও এইরূপ রণচামুণ্ডার ন্যায় ভীষণমূর্ত্তি ছিল। সেই মূর্ত্তির নিকট আকবর পরাজিত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছিলেন। এই ভয়ঙ্করী পুত্তজননী বুঝি তাহাপেক্ষাও বিভীষণা। ঘোর প্রতিহিংসা পরায়ণা! আরও অনেক বীর রমণী এই বীরাঙ্গণার সহচরী। আকবর এইরূপ ভীষণ যুদ্ধাবস্থা পরিদর্শন করিয়া কম্পিত কলেবর হইলেন। তাঁহার বীর হৃদয়ে দারুণ ভীতির সঞ্চার হইল, বদন কালিমারাগে রঞ্জিত হইল। হস্তীচালক ইত্যবসরে সেনাপতির ইঙ্গিত পাইয়া অন্যদিকে হস্তী চালাইয়া সম্রাটের প্রাণরক্ষা করিল। অসংখ্য যবন সৈন্য প্রভুর প্রাণ রক্ষায় নিজ নিজ জীবন বিসর্জ্জন দিয়া সেইদিনকার ভীষণাহবে সম্রাটের জীবন রক্ষা করিল, পুত্তের ও তদীয় জননীর অস্ত্রাঘাতে যবনসৈন্য ছিন্নমুণ্ড হইয়া পর্ব্বতাকারে স্তূপীকৃত হইল। কিছুতেই পুত্ত ও তদীয় জননী যবনব্যূহ ভেদ করিতে পারিলেন না। ভীষণ বজ্রনাদী অনেকগুলি কামান সেই যবনব্যূহের অগ্রভাগে অনলরাশি উদ্গীরণ করিতে লাগিল।

অন্য পার্শ্বে জয়মল্ল প্রমত্তভাবে যুদ্ধ করিতেছেন। তিনি দুর্গপ্রাকার রক্ষার জন্য বহুতর রাজপুত সেনাসহ যুদ্ধ করিতেছেন। যবনের জলদগ্নিপূর্ণ ভীষণ গোলকরাজি দুর্গপ্রাকার ধূলিসাৎ করিবার জন্য শিলাবৃষ্টির ন্যায় পতিত হইতেছে। জয়মল্লের বীর সৈন্যেরা উক্ত রক্তগোলক বক্ষপাতিয়া লইতেছে।

* রাণা উদয় সিংহের প্রণয়পত্নী।

তদীয় বীর সৈন্যগণ লৌহাস্ত্র প্রহারে উক্ত অগ্নি গোলকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। কিন্তু কতক্ষণ এরূপ যুদ্ধ চলিবে। যবনের প্রক্ষিপ্ত অনেক গোলা ফাটিয়া গিয়া রাজপুত সেনাগণকে উর্দ্ধে উৎক্ষেপ করিতেছে। প্রাচীরের ইষ্টক প্রস্তরাবলীকে রেণু রেণু চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া উড়াইয়া দিতেছে। জয়মল্ল এইরূপ ভীষণ সংহার ক্রীড়া দর্শন করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে অতি ক্রোধ উপস্থিত হইল। যখন ক্ষত্রিয়গণ এইরূপ অগ্নিগোলক প্রহার করেন না লৌহ অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা যুদ্ধ করিতেছেন, তাঁহাদের যখন একবারেই আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার নাই তখন তাহাদের বিরুদ্ধে কামান ও বন্দুক প্রয়োগ করা একবারেই সমরনীতির বিরোধী; এবং ঘোরতর অধর্ম্মের কার্য্য। কিন্তু জয়মল্ল ভ্রান্ত, যবনেরা হিন্দু নহে, তাহাদের হৃদয়ে ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ অতি অল্প, যে উপায়ে পারে শত্রু নাশ করা তাহাদের একমাত্র ইচ্ছা। চিতোর ধ্বংস করা তাহাদের কঠিন পণ। জয়মল্ল এইবার গোলক প্রহারী যবন সেনাদলকে আক্রমণ করিবার জন্য রাজপুত যোদ্ধাগণকে অনুমতি প্রদান করিলেন। তাঁহার আজ্ঞামাত্র অসংখ্য রাজপুত সেনা নিজ জীবন তুচ্ছ করিয়া কামান অধিকারে ধাবিত হইল। তাহারা হর হর বম বম শব্দ করিয়া কামান লইবার জন্য ছুটিল। জয়মল্লও অশ্বারোহণে উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। এমন সময় অকস্মাৎ একটী গুলি তাঁহার হৃদয় ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। বীরবর অশ্ব হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। এবং মহা ক্রোধে দন্তে দন্তে নিষ্পেষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন নারকী যবন তোমার কি ইহাই বীরজনোচিত ধর্ম্ম। এইরূপ গুপ্তহত্যা কি মুসলমান ধর্ম্মের অনুমোদিত? ধিক্ তোদিকে! ধিক্ তোদের পুরুষার্থে! ধিক্ তোদের বীরত্বে!! বীর জয়মল্লের দেহ হইতে তখন প্রবলবেগে রুধিরস্রোত পতিত হইতেছিল। বীরবর ক্রমশঃই ক্লান্ত হইতে লাগিলেন। এবং মনে মনে চিন্তা করিলেন চিতোরের শেষ। রাজপুতগণ আজ কামানের নিকট কিছুতেই চিতোর রাখিতে পারিবে না। কিছুতেই বংশগৌরব আর রক্ষা হইবে না। বিধর্ম্মী যবনেরা ধর্ম্ম কাহাকে বলে জানে না। মাতঃ চিতোর এ অধম সন্তান অকিঞ্চিৎকর জীবন বিনিময় দ্বারা তোমার কিছুমাত্র উপকার করিতে পারিল না। মরিবার সময় এই গভীর দুঃখেই মা হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। মাতঃ জন্মভূমি বিদায়! বিদায়!! এই বলিয়া বীরবর দারুণ অভিমানে ক্রোধজর্জ্জরিত হৃদয়ে যবনকুলকে অভিসম্পাত করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে প্রাণপরিত্যাগ করিলেন। যবনসেনা আল্লাহো আকবর শব্দে চতুর্দ্দিক কম্পিত করিয়া এই বিজয় ঘোষণা করিল। তাহাদের রণবাদ্য, গোলার গুড়ুম গুড়ুম বজ্রনাদ রণস্থল কম্পিত করিয়া জয়মল্লের নিধনবার্ত্তা বিঘোষিত করিল। রাজপুত সেনা দেখিল বীরবর জয়মল্ল নিহত হইয়াছে। যবন সেনাগণ বিজয়ের আস্বাদ পাইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে ক্ষত্রিয়গণকে আক্রমণ করিতেছে। আর বুঝি রক্ষার উপায় নাই। গুড়ুম গুড়ুম করিয়া কামান বজ্রশব্দে অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছে। ক্ষত্রিয় সেনা এইসকল অবস্থা পরিদর্শন করিয়া ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইল। আর শারীরিক বলের যুদ্ধনাই। শুধু অস্ত্র শস্ত্রের যুদ্ধ নাই। সেই বীরত্বের

যুগ, সেই সম্মুখ যুদ্ধে বল পরীক্ষার কাল অতীত হইয়াছে। নব্য বিজ্ঞানমূলক কামান যুদ্ধ মোগল সম্রাট কর্ত্তৃক চালিত হইয়াছে তজ্জন্য ক্ষত্রিয় বীরধুরন্ধরেরা সিংহসম বলশালী ও যুদ্ধনিপুণ হইলেও কামানের মুখে কিছু করিতে পারিলেন না! দলে দলে নিধনপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। পুত্ত দূর হইতে জয়মল্লের মৃত্যু দর্শন করিলেন। তাঁহার অমানুষিক বীরত্ব দর্শন করিয়া এতক্ষণ তাঁহাকে মনে মনে শত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছিলেন। অধর্ম্ম যুদ্ধে জয়মল্লকে এইরূপে নিহত হইতে দেখিয়া বীরবর অতিশয় ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। তদীয় মুষ্টিবল যেন আরও ভীমবলে দৃঢ় হইল! তিনি আরও ভীমবলে যবনসেনা-সমুদ্র মন্থন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছু-তেই কিছু হইল না। একদল যবন মৃত্যু-মুখে পতিত হইতেছে অপরদল তাহার স্থান অধিকার করিতেছে। যবন সৈন্যসাগর কিছুতেই নিস্তরঙ্গ হইবার নহে। উহা অনন্ত, অসীম এবং কল্লোলময়। যবনেরা ঘন ঘন কামান গর্জ্জনদ্বারা শত্রুবিদলনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এক এক গোলার আঘাতে বহুতর ক্ষত্রিয় সেনা বিচূর্ণিত হইতেছে। যবনের সিংহনাদ ক্রমশঃই প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিল। তাহারা সেনাপতির আদেশে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া নারীসেনা বেষ্টনের চেষ্টা করিতে লাগিল। পুত্তের জননী ও তদীয় সঙ্গিনীগণ এক্ষেণ ভীষণ ভাবে যুদ্ধ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের ভিতরও রক্তবর্ণ অগ্নি গোলক পতিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আর রক্ষা নাই। এই আগ্নেয় যুদ্ধে জয়লাভ করা একবারেই অসম্ভব। কিছুকাল এইরূপ ভাবে যুদ্ধ চলিতে থাকিলে অবশ্যই যবনকর্ত্তৃক ধৃত হইতে হইবে। যবন কবলিত হইলে বংশগৌরব বিলুপ্ত হইবে এই চিন্তা করিয়া পুত্তজননী স্বীয় সঙ্গিনীগণের নিকট আপনার মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া কোনও বীর রমণীর হৃদয় কম্পিত হইল না। কেহই তাঁহার আদেশ পালনে পরাঙ্মুখ হইলেন না। সকলে একবার প্রফুল্ল মুখে চিতোরের উচ্চ প্রাসাদচূড়া, কীর্ত্তিস্তম্ভ ও প্রাকারের প্রতি শেষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সকলে একবার রণস্থলে জীবিত স্বামী ভ্রাতাগণের মুখ চাহিয়া লইলেন। সকলে একবার জগৎকে শেষ দেখা দেখিয়া লইলেন। পরক্ষণেই সকলে স্বীয় স্বীয় বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে এক এক তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিলেন। সকলেই একবার ঊর্দ্ধমুখে সূর্য্যপানে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া মনে মনে তাঁহার স্তুতি করিলেন। তৎপর উক্ত ছুরিকা আপন আপন হৃদপিণ্ডে আমূল বসাইয়া দিয়া জীবনের শেষ নিশ্বাস পরি-ত্যাগ করিলেন। উহাঁদের রুধিরাক্ত দেহাবলী অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূপতিত হইল। লোহিত জলে সোণার মৃণাল ভাসিতে লাগিল। ভীরু যবনেরা এইরূপে রাজপুত রমনীকুলকে নিহত হইতে দেখিয়া হুঙ্কার শব্দে বিজয়োল্লাসে চারিদিক কাঁপাইয়া তুলিল। আকবর সাহ এই বীরাঙ্গনাদিগের এইরূপ অদ্ভুত হৃদয়বলের পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত ও ভীত হইলেন। পুত্ত নয়ন ফিরাইয়া দেখিলেন তাঁহার বীরমাতা প্রাণাধিকা পত্নী স্বকুমারী ও উহাঁদের সহ গামিনী রাজপুত বীর নারীগণ স্বর্গ গমন করিলেন। তাঁহারা চিতোরের লক্ষ্মীস্বরূপা ছিলেন। বীরাঙ্গনারা জন্মের মত চিতোর

পরিত্যাগ করিলেন। এই কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে গুরুশোকশেল বিদ্ধ হইল। মুহূর্ত্তে সেই বীরহৃদয় শোকের বজ্রাঘাতে যেন কম্পিত হইল। ধীরে ধীরে চিতোর রক্ষার আশা তাঁহার বীর হৃদয় হইতে অপনীত হইতে লাগিল। সেই সময় তিনি পশ্চাৎ ভাগে নয়ন ফিরাইয়া দেখিলেন বিজয় গান গাহিতে গাহিতে এক বীরসেনাস্রোত সহসা আসিয়া রণস্থল আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। ইহাঁরা সকলেই রাজপুত সেনা। তাঁহারা জয়মল্ল ও রাজপুতকুল উজ্জ্বলকারিণী যুদ্ধসাজে সজ্জিতা সমর নিপুণা সেই বীরাঙ্গনাগণকে সম্মুখ সমরে নিহত হইতে দেখিয়া "বীরা" * গ্রহণ পূর্ব্বক পীত বসন পরিধান করিয়া জন্মভূমির নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া শেষ যুদ্ধে সমুপস্থিত হইয়াছে। তাঁহাদের প্রাণের কামনা এই অদ্য সুতীক্ষ্ন খড়্গাঘাতে অসংখ্য যবন সেনা নিপাত করিয়া শেষ শয্যায় শয়ন করিবেন। তথাপি জীবন থাকিতে যবন-করে আত্মসমর্পণ করিবেন না। ধিক আত্মসমর্পণ! যবনের করে আত্মসমর্পণ! আত্মসমর্পণ পরাধীনতার একটী সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খল। মৃত্যু অপেক্ষাও মর্ম্মদাহী। নীচত্বের একটী পরিষ্কার প্রতিমূর্ত্তি! নরকের একটী প্রশস্ত পথ। হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের একটী পরিস্ফুট পাপচিত্র। চিরস্বাধীন বীর রাজপুত জাতিরা প্রাণ থাকিতে তাহা কখনই পারিবে না। তাহার পরিবর্ত্তে শত্রু অস্ত্রে বিদীর্ণ হইয়া রক্তাক্ত দেহে ভূমিতলে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রহিবে। তথাপি যবন করে আত্মসমর্পণ করিবে না।

পুত্ত নয়ন ফিরাইয়া দেখিলেন অবশিষ্ট নগরবাসী রাজপুত বীরগণ "বীরা" গ্রহণ করিয়া নিষ্কোষিত কৃপাণহস্তে জীবনের মায়া মমতা পরিত্যাগ করিয়া শেষ যুদ্ধে আগমন করিয়াছে। এবং অমিতবিক্রমে যবনসেনা উন্মূলিত করিতেছে। তিনি বুঝিলেন চিতোর রক্ষার আশা নাই। তোপের মুখে অস্ত্রবল বৃথা। তথাপি যত পারি যবনসেনা সংহারপূর্ব্বক সমরক্ষেত্রে স্বীয় জীবন পরিত্যাগ করিব। পুত্তের মনে আবার দৃঢ়তা আসিল। যুগল নয়নে আবার বহ্নির্গত হইল। আবার হস্তের মুষ্টি দৃঢ় হইল। আবার জয় হর হর বম বম শব্দে যবনসেনা মথিত করিতে লাগিলেন। আবার সিংহগর্জ্জনে শত্রুসেনা বিদলন করিলেন। তাঁহার ও তদীয় সহযোগীগণের হস্তে যতই যবনসেনা নির্ম্মূল হইতে লাগিল ততই নূতন নূতন সেনা আসিয়া তাহার স্থান পূরণ করিতে লাগিল। যবনের কামাননির্গত রক্তবর্ণ গোলাঘাতে আহত হইয়া শত শত রাজপুত সেনা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া আকাশ পথে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যে পুত্তের অশ্ববর গোলাঘাতে ভূপতিত হইল। পুত মৃত্তিকার উপর দণ্ডায়মান হইয়া খড়্গ চর্ম্ম লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে এইরূপ অবস্থায় পতিত হইতে দেখিয়া অসংখ্য যবনসেনা "আল্লা হো আকবর" শব্দে সমরস্থল কম্পিত করিয়া তদীয় অভিমুখে ধাবিত হইল। অসংখ্য যবনসেনা একেবারে শত শত অস্ত্র তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ আরম্ভ করিল। আশ্চর্য্য শিক্ষাবলে বীরবর তৎসমুদয় প্রতিহত করিতে লাগিলেন। বীর অভিমন্যুর ন্যায় সংগ্রামস্থল আলোড়িত করিয়া শত্রু বিদলন করিতে লাগিলেন। অভিমন্যু কেবল মাত্র সপ্তরথী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছিল।

* শেষবিদায় লইবার সময় রাজপুতগণ "বীরা" বা তাম্বুল গ্রহণ করিয়া থাকেন।

কিন্তু বীরবর পুত্ত শত সহস্র যবনসেনা কর্ত্তৃক প্রবলভাবে আক্রান্ত ও অবরুদ্ধ। যতক্ষণ তাঁহার শক্তি ছিল। অস্ত্রমুষ্টি দৃঢ় ছিল ততক্ষণ কোনও যবনসেনা তাঁহার নিকটস্থ হইতে পারে নাই। অবিরত রক্তস্রোতে বীরবর ক্রমশঃ হতবল হইয়া তদীয় হস্তে নিহত অসংখ্য যবন সেনার উপর পতিত হইলেন। সেই মৃত সৈন্য স্তূপের উপর যেন সুমেরুর স্বর্ণচূড়া খসিয়া পড়িল। সেই রক্ততরঙ্গের উপর যে মন্দারকুসুম ভাসিতে লাগিল। চিতোরের আশা ভরসা সমস্তই ফুরাইল। বীরবরের শেষ নিশ্বাস বায়ুসাগরে মিশাইয়া গেল। যবনসেনা বিজয়োন্মত্ত। উহাদের রণবাদ্য বিজয়গান গাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে বাজিয়া উঠিল। এক শ্রবণ ভৈরব উন্মত্ত পাশবিক শব্দে যবনেরা রণস্থল কম্পিত করিল। দেখিতে দেখিতে অবশিষ্ট রাজপুত সেনাকুলও যবনসেনা-সমুদ্রে মিলাইয়া গেল। সকলেই স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য পরিসমাপ্তির পর রক্তাক্ত কলেবরে বীর শয্যায় শয়ন করিল। বীরগণ চিরদিন এইরূপ মহাশয্যায় শয়নেরই পক্ষপাতী।

(৬)

আকবর সাহের মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হইল। তিনি বিপুল মোগলকটক সহ সেই মৃত রাজপুতদিগের রক্তমাখা অসংখ্য দেহকে পদবিদলিত করিয়া চিতোর দুর্গে প্রবেশ করিলেন। কামান দ্বারা উহার দুর্গপ্রাকার, বিজয়স্তম্ভ ও প্রাসাদারম্ভ বিচূর্ণ করিবার আদেশ প্রদত্ত হইল। তদীয় আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইয়াছিল। নগরের বৃদ্ধ, শিশু, স্ত্রীলোক সকলেই তদীয় অস্ত্রাঘাতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। এইরূপ ধ্বংস কার্য্য তিনদিন তিনরাত্রি অবাধে চলিয়াছিল। ইন্দ্রের অমরাবতী তুল্য চিতোর নগরী গোলাঘাতে ক্ষতবিক্ষত ও ধ্বংসীভূত হইল। সেদিনকার মহাযুদ্ধে ত্রিংশৎ সহস্র রাজপুত সেনা প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। সমস্ত ক্ষত্রিয় বীরগণ দ্বারা পীত বসনের সম্মান উপযুক্তভাবে রক্ষিত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন কি দেশীয় কি বিদেশীয় সকল প্রকার রাজদূত, সমস্ত সমিতির অধিনায়ক এবং রাণার সপ্তদশ শত নিকটস্থ কুটম্ব সকলেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। নয়জন রাজমহিষী, পাঁচজন রাজকুমারী, দুইটী অল্পবয়স্ক রাজশিশু, এবং সমস্ত সর্দ্দারকুলের মহিলাগণ সুকঠোর জহোর ব্রত সমাপনে অথবা সম্মুখ সংগ্রামে স্বীয় স্বীয় জীবনাহুতি প্রদান করিয়াছিল। সেই দিন হিন্দুর পক্ষে ভীষণ দুর্দ্দিন। উক্ত যুদ্ধ সংবৎ ১৬২৪ রবিবার ১১ই চৈত্র (খৃঃ ১৫৬৮) সালে সংঘটিত হইয়াছিল। সেই দিন রাজপুত স্বাধীনতাদেবীর প্রাণপ্রদায়িনী মহাশক্তি ভগবতী আদ্যাশক্তি চিরদিনের জন্য চিতোরনগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। চিতোরের স্বাধীনতার অবসান হইল। এই কাল যুদ্ধে কেবলমাত্র তুয়ার নৃপতি ভবিষ্যতের কোন গুরুতর কার্য্য উদ্ধার জন্য জীবিত ছিলেন। আকবর তুমি না জগৎগুরুরূপে আপনার পরিচয় প্রদান করিতে সঙ্কুচিত হও না। তুমি না সমদর্শী! তুমি না শিল্প কলার প্রধান সহায়? এই চিতোর ধ্বংসই তাহার কি সুন্দর উদাহরণ? ইহাদ্বারা তোমার হৃদয়ের কঠোর হিন্দু বিদ্বেষের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

আলাউদ্দিন বা কঠিন হৃদয় রাজ বাহাদুরের প্রচণ্ড বিদ্বেষানল হইতে চিতোরে যে সকল মন্দির, শোভনীয় প্রাসাদাবলী এবং কীর্ত্তিস্তম্ভ রক্ষা পাইয়াছিল তৎসমুদায়ই তুমি ধ্বংস

করিয়া প্রাণের জ্বালা জুড়াইয়াছিলে! ইহা কি তোমার প্রবল হিন্দু বিদ্বেষের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নহে? তোমার পাশবিক অত্যাচারে চিতোর জনশূন্য হইয়াছিল। তুমি চিতোরের নাকরাসমূহ, চতুর্ভুজা দেবীর গৃহস্থিত দীপবৃক্ষ এবং চিতোরের সিংহদ্বারের সুদৃঢ় কপাট অপহরণ করিতে লজ্জা বোধ কর নাই। তোমার রাজনীতি উপরে বেশ মসৃণ ও মানব হিতৈষণায় পরিপূর্ণ হইলেও ভিতর কিন্তু হলাহলপূর্ণ। এই কূটনীতি কর্তৃক হিন্দুর যে প্রকার গুরুতর ক্ষতি সংসাধিত হইয়াছে অপর কোন মুসলমান সম্রাটগণ কর্তৃক কখনই তাহা সংঘটিত হয় নাই! তুমি মোহনীয় প্রলোভনের বাগুরাজাল বিস্তৃত করিয়া রাজপুতগণকে বশীভূত করতঃ তাহাদের কুলকন্যাদিগকে—স্বর্গের দেববালাগণকে বিবাহ করিয়া উহাদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছিলে! তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া "নরোজা মেলা" বসাইয়া অসংখ্য রাজপুত মহিলার সতীত্বরত্ন অপহরণ করিয়া মনের জ্বালা জুড়াইয়াছিলে!! ইহা কি তোমার হিন্দু-বিদ্বেষবহ্নির জ্বালাময়ী শিখারাশি নহে? ইংরাজকুলতিলক মহামতি টড সাহেব স্বীয় ইতিহাসে তোমার যে দানবমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা কাল সলিলে কখনই ভাসিয়া যাইবে না। চিরদিনই তোমার পাপের হলাহল মাখা সেই বিকৃতচিত্র জগৎ সমক্ষে প্রকাশিত রহিবে। পাপ কখন প্রচ্ছন্নভাবে থাকিবার বস্তু নয়। সে কোন কালে আপনার বীভৎসমূর্ত্তি জগৎ সমক্ষে প্রকাশ করিবেই করিবে! তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অনেকে তোমাকে বীর বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকে। গুপ্তভাবে রাজপুত কুলতিলক জয়মল্লকে নিধন করা কি তোমার বীরত্বের উজ্জ্বল পরিচয়? এই সমস্ত ঘটনা দ্বারা তোমার হীন চরিত্রতারই যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃত জ্ঞানীর নিকট তোমার আসন অতি নিম্নে!

এই প্রবল ধ্বংসের পর চিতোর নগরী আর কখন উত্থানের সময় প্রাপ্ত হয় নাই। কারণ পরবর্ত্তী মহারাণা প্রতাপসিংহের সময়ও চিতোর মুসলমানাধিকৃত ছিল, এক কুলাঙ্গার ক্ষত্রিয় সুত দ্বারা চিতোরের শাসনকার্য্য সম্পাদিত হইত। প্রতাপসিংহ তাঁহার জীবনব্যাপী বহু চেষ্টা দ্বারা চিতোর নগর উদ্ধার করিতে পারেন নাই। সুতরাং যবনদিগের দারুণ আগ্নেয় অস্ত্রাঘাতে চিতোরের যে সমস্ত অংশ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছিল তাহা পুনর্ব্বার গঠিত হয় নাই। তৎপরবর্ত্তীকালও শান্তির যুগ নহে। পরবর্ত্তী রাণাগণ যবনের আক্রমণে আক্রান্ত হইয়া কেবলমাত্র আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। নবনগরী উদয়পুর মিবার রাজ্যের রাজধানী হওয়ায় পরবর্ত্তী রাণাগণ আর চিতোর ধ্বংসাবশেষের গঠনকার্য্যে দৃষ্টিপাত করেন নাই। তজ্জন্য ক্রমে ক্রমে চিতোর নগরী ধ্বংসের মুখে পতিত হইয়াছিল। উহা আজ সিংহ ব্যাঘ্র ও বিষধর সর্পের আবাসভূমি। প্রাচীন কীর্ত্তির সমাধি মন্দির!

এই ভীষণ যুদ্ধের গুরুত্ব ও লোক ধ্বংসের ইহাই যথেষ্ট পরিচয় যে, যেসকল রাজপুতগণ সম্মুখসমরে নিহত হইয়াছিলেন উহাদের যজ্ঞোপবীতের ওজন ৭৪॥০ মণ হইয়াছিল †। সেইদিন হইতে উক্ত ৭৪॥০ মণ অঙ্ক তিনক বা দিব্যরূপে কি সকল প্রকার পত্রে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এই চিহ্নের ভিতর কি এক গুরুতর উদ্দেশ্যরাশি নিহিত রহিয়াছে। উহা উক্ত মহাযুদ্ধেনিহত বীরগণের রক্তের ছাপ। যে এই পত্র খুলিবে সেই উক্ত হিন্দু হত্যার পাতকী হইবে। কার্থেজ বীর হানিবাল কাণিনগরের প্রচণ্ড সমরে যে সকল রোমীয় অশ্বারোহী বীরগণকে নিহত করিয়াছিলেন উহাদের অঙ্গুরীয়কের ওজন করিয়া আপনার জয় পরিমাণ নির্দ্ধারণ করেন। চিতোরের যুদ্ধে অনেক উপবীত বিহীন ক্ষত্রিয় শিশু অনেক বীরাঙ্গনা ও বহুতর নিম্ন হিন্দু প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, উহাদের উপবীত ছিল না। সুতরাং উপরোক্ত যজ্ঞোপবীতের ওজনে মৃতব্যক্তির প্রকৃত সংখ্যা অবধারিত হয় না।

† এই মণ পাকা চারি সের। কিন্তু ডৌ সাহেব ইহাকে ৪০ সেরে মণ ধরিয়াছেন।

যজ্ঞোপবীত দৃষ্টে যেরূপ মৃত্যু সংখ্যা অনুমিত হয় প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে তদপেক্ষা অনেক অধিক সংখ্যক লোকের উক্ত মহাহবে মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

আকবর আপনার বীরকীর্ত্তি সংরক্ষণের জন্যই হউক বা বীরপ্রবর জয়মল্ল ও বীর শিশু পুত্তের বিস্ময়জনক বীরত্ব অক্ষুন্ন রাখিবার উদ্দেশেই হউক দীল্লিতে এক প্রকাণ্ড প্রাসাদের সিংহদ্বারে অতি উচ্চ প্রস্তর বেদীর উপর তাঁহাদের উভয়েরই পাষাণ প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করেন। দুই শত বৎসর হইল ফরাসী পর্য্যটক বার্ণিয়র সাহেব তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থে (১৬৬৩।১লা জুলাই তারিখের পত্রে) তিনি পুত্তজয়মল্লের এই মূর্ত্তিদ্বয় নিরীক্ষণ করিয়া লিখিয়াছেন জয়মল্ল চিতোরের রাজা। পুত্ত তাঁহার ভ্রাতা। এই দুই মূর্ত্তি গজের উপর আরূঢ় ছিল। আমি উহাঁদের বীরত্বের বিষয় অবগত হইয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম। পুত্ত তদীয় জননী ও স্ত্রীর সহিত এই যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করেন। বার্ণিয়ার সাহেব জয়মল্লকে চিতোরের রাজা ও পুত্তকে তদীয় ভ্রাতা বলিয়া যে পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা নিতান্তই ভুল। তিনি বোধ হয় কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট উহাঁদের ভুল পরিচয় পাইয়াছিলেন। মহাত্মা টড সাহেবের ইতিহাসই রাজস্থানের যথার্থ ও সর্ব্বপ্রধান ইতিহাস। তিনি বহু অনুসন্ধানে রাজস্থানের রাজাদিগের দপ্তরের বহু কাগজ পত্র দৃষ্টে উহা প্রণয়ন করিয়া ভারতবাসীকে চিরকৃতজ্ঞতার দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খলে চির আবদ্ধ করিয়াছেন।

মহাবীর স্বদেশপ্রাণ জয়মল্ল ও পুত্ত রাজস্থানে আজও দেবতার মত পূজিত। ভট্টকবিগণ তাঁহাদের বীরত্বের শত চিত্র কবিতাকারে প্রকাশ করিয়া এখনও রাজপুত বীরগণের হৃদয়ে স্বাধীনতার বীজমন্ত্র প্রদান করিয়া থাকেন। এখনও রাজপুত মহিলাগণ দেবতাদিগকে সান্ধ্য প্রদীপ প্রদর্শন করিয়া নত মস্তকে পুত্ত ও জয়মল্লের ন্যায় বীরপুত্র লাভের প্রার্থনা করিয়া থাকেন। যব গোধূম চূর্ণ কারবার সময় রাজপুত মহিলাগণ এখনও পুত্ত-জয়মল্লসম্বন্ধীয় বীরগাথা গান করিয়া আপনাদিগকে সুখী ও গৌরবান্বিত মনে করেন। পুত্ত ও জয়মল্ল তোমরা রাজস্থানে জন্মগ্রহণ করিলেও জগতের অলঙ্কার। জগতে যত দিন স্বাধীনতার সম্মান রহিবে যত্দিন বীরত্বের পূজা রহিবে ততদিন পৃথিবীর নরনারীগণ তোমাদের উদ্দেশে ভক্তিপুষ্প বর্ষণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিবেন। ভারতকে বীরমাতা বলিয়া পূজা করিবেন।

শ্রীরামতারণ রায়।

ক্ষয়রোগ নিবারণ সম্বন্ধে দু'একটী কথা

ডাঃ উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আজ কয় মাস ধরিয়া "গৃহস্থে" ক্ষয়রোগের নানা কথা আলোচনা করিতেছেন। সহজে যাহাতে ক্ষয়রোগ নষ্ট হয়, তাহার জন্য অনেক উপদেশ দিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমার বহু আত্মীয়-আত্মীয়া ক্ষয়রোগে মারা গিয়াছেন সুতরাং ক্ষয়রোগ সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধই বিশেষ মন দিয়া পড়িয়াছি। তাঁহার প্রবন্ধগুলি পড়িয়া আমার ধারণা হইয়াছে, ক্ষয়রোগ যাহাতে ছড়াইয়া না পড়ে, তাহার উপায় ঠিক করিয়া দিতেই তিনি বড় ব্যস্ত। যাহার রোগ হইয়াছে, তাহার মুক্তি কিসে হইবে, তাহা কিন্তু কোথাও বলিতেছেন না। রোগটা বেশী না ছড়াইয়া পড়ে, তাহার তিনি নানা উপায় দেখাইয়াছেন। সে সকল পড়িলে মোটের উপর মনে হয়, আগুনই সকলের চেয়ে ভাল ঔষধ। তাহাই যদি হয়, তবে সেই কথাটা কোথাও স্পষ্ট করিয়া বলেন

না কেন? ক্ষয়রোগীর গয়ার (কাস), থুথু ইত্যাদি যক্ষ্মা রোগীর হাঁসপাতালের ব্যবস্থার মত পুড়াইয়া ফেলিবার জন্য বাড়ী হইতে দূরে স্থানও সকলের নাই বা লোকও বন্দোবস্ত নাই,—গৃহস্থে সে সকল করিবেই বা কিরূপে? একবার একটি কাস উঠিল, অমনি সেটি আগুনে ফেলা হইল—এ রকম করা অসাধ্য আর তাহা না হইলে কাস দুএক ঘণ্টা জমিতে দিলেই শুকাইয়া যাইবে, আর উপেন্দ্রবাবুর কথা মত ব্যাসিলিগুলি উড়িয়া বাড়ী শুদ্ধ সকলকে ছাইয়া ফেলিবে! ইহা হইলে ত নাচার! তাহার চেয়ে আমার মনে হয়, ভিজা রুমালে বা ছেঁড়া কাপড়ের টুকুরায় কাস ফেলিয়া, সেই রুমাল বা কাপড়ের টুকুরা আর রোগীর জামা, কাপড়, বিছানার চাদর বালিশের খোল, এই সমস্ত, সারাদিনের মধ্যে এক সময় গরমজলে কাচিয়া লইলেই ব্যাসিলির ঝাঁককে ঝাঁক মরিয়া যাইবে, বাবাজীরা আর উড়িতে পারিবেন না!

তারপর ক্ষয়রোগীর মুক্তির উপায় কি?—ডাক্তার বাবু বিশ্বাস করেন, একাল পর্য্যন্ত অনেক ব্যাকৃট্রিসাইড বা জারমিসাইড ঔষধ বাহির হইয়াছে আর ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারেন, কোথায় ব্যাকৃট্রিয়া বা জারমস্ জমিয়া আছে,—তা যদি হয়, তবে সেই সকল জায়গায় ঐ সকল জারমিসাইড ঔষধ ঢালিয়া দিবার উপায় করেন না কেন? বুকে যাহাদের রোগ জমে তাহাদের তবু "নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল"-র মত একটু উপায় করা হয়েছে—নাকে সোঁকা, আর কোথাও হইলে, তাহাদের কোন উপায়ই করা হয় নাই। নাকে সোঁকার ব্যবস্থাতেও যে বিশেষ কোন ফল পাওয়া যাইতেছে, তাহা মনে হয় না। অনেকে বলেন—জ্বর না থাকিলেই টিবাকিউলিন ইন্‌জেক্‌ট করিলেই আরাম হওয়া একবারে বাঁধাবাঁধির মধ্যে, কিন্তু অনেক স্থলেই ইন্‌জেক্‌সানের ফল হয় না আর অনেক স্থলে জ্বর ছাড়েই না—ছাড়িবার কথাও নহে,—রোগ থাকিতে ছাড়িবেই বা কেন? অথচ জ্বরের জন্য রোগী দিন দিন জীর্ণ হইয়া পড়ে, তাহার দেহের ভার কমিয়া যায়, মাংস শুকাইয়া যায়, রক্ত কমিয়া যায়, তাহার যে উপায় কি, তাহা আজিও কেহ ভাবিতেছে না। রোগী এভাবে দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে,'টিবার্কিউলিন' দিবার সময় আপনিই চলিয়া যায়, রোগীও চলিয়া যায়।

ইহাও বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে জারমিসাইড ঔষধ পঁচিশ গণ্ডা বাহির হইল অথচ জারম্ যেখানে জমিয়া আছে, সেখানে সেগুলি ঢালিয়া দিবার পথ করা হইল না। আমাদের দেশে যাঁহারা 'প্যাথলজিষ্ট' হইয়াছেন বলিয়া আপনা আপনি গুমোর করেন, তাঁহারাও তাহার জন্য ব্যস্ত নহেন, তাঁহারাও আশায় আশায় বসিয়া আছেন, কবে কোন ডাক্তার সাহেব তাহা খুঁজিয়া বাহির করিয়া দিবেন?

আর একটা কথা,—দেশের জিনিসগুলার উপর দেশের ডাক্তারদের নজর পড়ে না কেন, বলিতে পারি না। এই যে চন্দ্র সূর্য্য যতদিন, ততদিন থেকে সকল প্রকার সর্দ্দি কাসিতে পুরাতন ঘি মালিসের ব্যবস্থা আছে, তার কারণ কি? এটা জারমিসাইড কি না, তাহা কেউ পরীক্ষা করিয়া দেখেন না কেন? কেবল যে কাসি সর্দ্দিতেই ইহা ব্যবহার হয়, তাহা নহে,—আমাশয়ে যখন মাংস পচিয়া বাহির হয় (অর্থাৎ এখনকার মতে ইন্‌টেষ্টিন্থাল থাইসিস), জ্বরাতিসারে উহা মালিসের নিয়ম ছিল। সাহেব ডাক্তারেরা বোধ হয় উহার খবর পায় নাই, নতুবা এতদিন উহার পরীক্ষা হইয়া যাইত।

থাক্, আর বেশী কিছু বলিবার নাই,—ফল কথা রোগীর মুক্তির উপায় কিছুই হয় নাই। দেশী "প্যাথলজিষ্টরা" সাহেব প্রভুর মুখ চাহিয়া বসিয়া আছেন,—ততদিনে রোগীর দল নির্ম্মূল হউক।

জনৈক ভুক্তভোগী।

মফঃস্বলের বাণী

১। স্ত্রীশিক্ষা ও তাহার আদর্শ

ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রথম প্লাবনে যখন বঙ্গদেশ ডুবু ডুবু হইতে আরম্ভ হয়, তখন আমরা আমাদের গৃহসজ্জা সম্পত্তি সমুদায়ের প্রতি দৃকপাতশূন্য হইয়া সেই বারিরাশিতে দেহ ভাসাইয়া দিয়াছিলাম, মনে করিয়াছিলাম এই স্রোতের সাহায্যেই তীরে উত্তীর্ণ হইব। প্রথমতঃ আমরা ইংরাজী না শিখিলে সাহেবদের কাছে আদর ও সম্মান পাওয়া যায় না দেখিয়া ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিলাম—পরে সেই স্রোতো-বেগে আমরা গৃহ ছাড়িয়া, স্বদেশ স্বজাতীয় ভাব হইতে দূর হইতে দূরতর স্থানে ভাসিয়া যাইয়া, ক্রমশঃ বিজাতীয় বিদেশীয় দৃশ্যের বাহ্য চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। দেখিলাম, নব তেজ, নব ভাব, নব বলে দৃপ্ত, পাশ্চাত্য জাতির কুলবালাগণও পুরুষেরই মত একই ধরণে পরিচালিত বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইতেছে, পুরুষেরই মত, পুরুষের সহিত নানা জ্ঞানগর্ভ কথা বলিতেছে, অমনই আমরা স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া উঠিলাম, শাস্ত্র হইতে প্রমাণ তুলিলাম "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"—যেন এত দিন, যে দেশে এই সত্য প্রচারিত হইয়াছিল, সেদেশ হইতে এই ভাব মুছিয়া গিয়াছিল। তখন আমরা একবার দেখিয়াও দেখি নাই "এবং" শব্দের অর্থ কি, আমাদের "কর্ণ" বাস্তবিকই ছিল না, তাহা প্রকৃতই অপহৃত হইয়াছিল। আজ, নগরে নগরে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বহু ছাত্রী, ছাত্রবৃত্তি, ম্যাট্রিকুলেশন প্রভৃতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে, কিন্তু এই জীবনমরণসমস্যার দিনে আমরা দেখিতেছি এ শিক্ষা নহে কুশিক্ষা, এ জ্যোতিঃ জ্যোতিঃ নহে শুধু চোখের ধাঁধা মাত্র। আমাদের বালিকাগণ কাব্য পড়িয়া, শুধু ভাব লইয়া খেলা করিতেছে; শুধু কুন্দনন্দিনী ও স্নেহলতার অভিনয় করিতেছে, শুধু কল্পনার তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছে। পতিসেবা, সন্তান-পালন, গৃহিণীপনায়, ইহারা শিশু, অকর্ম্মণ্য, অসহায়। ইহাদিগকে দেখিয়া মনে পড়ে সেই মাতা ও মাতামহীর যুগের কথা, সেই উপন্যাস বর্ণিত প্রফুল্লের শাশুড়ীর কথা, সেই পতির ভোজনের সময়ে বৃন্তসঞ্চালন, শিশু চিকিৎসায় শিশুপালনে অপূর্ব্বজ্ঞান, অপূর্ব্বরন্ধন শিক্ষা, অপূর্ব্ব কর্ম্মনিপুণতা। আজ মনে হইতেছে শিক্ষা আক্ষরিক জ্ঞানে নহে—বর্ণ পরিচয় না থাকিলেও লোকে মহাপণ্ডিত হইতে পারে। এদেশের নারীগণ এইরূপ শিক্ষাতেই বংশপরম্পরা শিক্ষিতা হইয়া আসিয়াছেন, এ দেশের সীতা সাবিত্রী এ দেশের আর্য্যরমণী এইরূপ শিক্ষাতেই মহাপণ্ডিত ছিলেন। অবশ্য খনা গার্গী না জন্মিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু রমণী যাহাতে রমণীর ধর্ম্মে ভূষিতা হয়, তাহাই এদেশের চিরন্তন লক্ষ্য ছিল।

আজ আমাদের চোখের ঘোর অনেকটা অপনীত হইয়াছে, আজ আমরা দেখিতে পাইতেছি, পাশ্চাত্য দেশের স্ত্রীশিক্ষার গতিও এই উদ্দেশ্যের দিকেই ছুটিয়া চলিয়াছে। আমাদের দেশেও যেমন লোকে খনা গার্গীর আদর্শ বিস্মৃত হইয়া ক্রমশঃ সীতা সাবিত্রী অরুন্ধতীর আদর্শেই অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিল, এই সমুদয় দেশের তীব্র-বাসনার স্রোতোধারা ঠিক সেইরূপ বিজ্ঞান ও দর্শনের রাজ্য হইতে গতি ফিরাইয়া মাতৃত্ব ও পত্নীত্বের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে! প্রবাসীর বর্ত্তমান মাঘ সংখ্যায় স্বর্গীয় ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় মার্কিন্ মেয়েদের যে একটি আলেখ্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা এই আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শেরই উজ্জ্বল চিত্র। একটী মার্কিন্ কুমারী ইন্দুপ্রকাশ বাবুকে লিখিয়াছিলেন, "আমার মনে হয়, আমেরিকার মেয়েরা আসলে কেমনতর তা আপনার বুঝতে অসুবিধা হয়। বস্তুতঃ

আমার নিজের মনের ভাব যা তা' এই—নারীর পক্ষে মা হওয়ার বাড়া আর কোনো সৌভাগ্য নেই। এ পৃথিবীতে ভালো স্ত্রী ও ভালো মায়ের বড় প্রয়োজন। এই পৃথিবীতে আমার একান্ত কামনা যেন মিসেস * * * র মত আদর্শ মা হতে পারি। যদি মা হওয়ার দুর্লভ অধিকার হতে বঞ্চিত হই, তবে এমন কোনো শিক্ষাসংক্রান্ত অথবা প্রচার সম্পর্কীয় কাজ নেব যাতে অন্যান্য জননীরা যে সকল সন্তানের ভার নিতে পারেন না তাদের সামান্য সেবাতেও লাগ্‌তে পারি"। কি করুণ, কি মর্ম্মস্পর্শিনী উক্তি! আর একটী কুমারী লিখিয়াছেন "আমি সেই সকল গুণ কামনা করি যাহাতে আমি স্ত্রী ও মাতৃরূপে আমার সকল কর্ত্তব্য নিষ্ঠার সহিত পালন করিতে পারিব, ও গৃহের সকল অনুষ্ঠানে উদ্দীপনা আনিয়া দিতে সমর্থ হইব……যদি স্বামী ও সন্তান লাভ আমার ভাগ্যে না থাকে তবে ভবিষ্যতে যে ভাবেই হউক অল্পবয়স্ক বালক বালিকার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইতে আমার একান্ত কামনা।" রামের বনগমন সময়ে সীতাদেবীও যেন কতকটা এই ভাবেরই কথা বলিয়াছিলেন—তুমি বনে যাইবে, আর আমি সুখে রাজপ্রাসাদ ভোগ করিব? তুমি বনে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িবে আমি তখন তোমার শুশ্রূষা করিব, পায়ে কাঁটা ফুটিলে তাহা তুলিয়া দিব; তোমার সুখের জন্য আমার সকল শক্তি নিয়োগ করিব, তোমার দুঃখের পসরাও মাথা পাতিয়া লইব—ঠিক যেন বনভূমিতেও মূর্ত্তিমতী inspiration as wife. আজ সমুদয় পাশ্চাত্য জগতে স্ত্রী আর বিলাস সামগ্রী নহে, পাণ্ডিত্যের আদর্শাকাঙ্ক্ষিণী নহে আজ স্ত্রীজাতির আদর্শ স্কটের ministering angel. এই ভাব এই আদর্শে পরিচালিত হইয়াছিল বলিয়াই একদিন আমরা আমাদের মাতৃজাতিকে দাসীপণায় নিয়োজিত বলিয়া আক্ষেপ করিতাম—একমাত্র রক্ষণশীল বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কারকদের প্রদত্ত জুতা মোজা বাঁশী হার্ম্মোণিয়াম কাড়িয়া লইয়া, দর্শন বিজ্ঞানের আলোচনা হইতে নিবৃত্ত করিয়া দেবী চৌধুরাণীর দ্বারাও বাসন মাজাইয়াছিলেন। কিন্তু সে দিন চলিয়া গিয়াছে। এদেশের সূর্য্য আবার সে দেশেও উদিত হইয়াছে। এদেশের ভাগীরথী শুষ্ক হইয়া পাশ্চাত্যদেশে পূর্ণবেগে প্রবাহিত হইতেছে। কবি গাহিয়াছিলেন "ভাইয়ের মায়ের এমন স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ"—পাশ্চাত্যদেশও আজ এই সুরে মুগ্ধ; ভারতের প্রাচীন আদর্শ এ দেশে অবজ্ঞাত হইলেও নূতন জগৎ আবার প্রাচীন অদার্শের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

আমরা আমাদের বালিকাদিগকে কাব্য, গণিত, দর্শনবিজ্ঞান শিক্ষা দিয়া প্রকৃত শিক্ষা দিলাম বলিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছি, আর "আমেরিকার কোন কোন সহরে বালিকা-বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চশ্রেণীতে প্রত্যেক বালিকাকে মাতার কর্ত্তব্য ও শিশুপালন শিখিতে বাধ্য করা হয়।" সেই প্রাচীন গৃহিণীপণা ও সন্তানপালন, সেই প্রাচীনাদের শিশুচিকিৎসা, সেই আদর, সেই যত্ন—সেই "ভাইয়ের মায়ের এমন স্নেহ!" মানুষ হইতে হইলে প্রকৃত নারীত্ব ফুটাইয়া তুলিতে হইলে অতীতের সুন্দর সুন্দর আদর্শ ও ভিত্তিগুলিকে পদাঘাতে চূর্ণ করিলে চলিবে না। পিতৃপিতামহের কীর্ত্তি কলাপের স্বপ্নে, অতীতের আলোচনায় আমরা কি ছিলাম কি হইতেছি, আমাদের কি লাভ কি ক্ষতি বুঝিতে পারিব। অতীতকে বাদ দিয়া বর্ত্তমান দাঁড়াইতে পারে নাই পারিবেও না। অতীতের সহিত বর্ত্তমানের যোগসাধন করিয়া আমাদিগকে ভবিষ্যতের সৌধ রচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। মানুষ মানুষ না হইলে, রমণী রমণীয়ত্বের উৎস প্রকৃত রমণীতে পরিণত না হইলে আমাদের সকল আয়োজন বৃথা।

রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ।

২। ম্যালেরিয়া

প্রতি বৎসরই মনে হয়, এবার বঙ্গে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ যেরূপ হইয়াছে, বুঝি বা এরূপ প্রকোপ পূর্ব্বে কোন বৎসর হয় নাই। বাস্তবিক দিন দিন ম্যালেরিয়া ভীষণ হইতে ভীষণতর মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে।

বঙ্গব্যাপী এই মহাব্যাধি বিকট বদন ব্যাদান করিয়া লোক গ্রাসের জন্য সদাই যেন গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য কত চেষ্টা হইতেছে, কত কত বিশেষজ্ঞ কত মতই জাহির করিতেছেন; কুইনাইন বিক্রয় ও বিতরণ, মশকবংশের ধ্বংসের আয়োজন, বক্তৃতা প্রদান, কন্‌ফারেন্স, ম্যালেরিয়া কমিটীর অধিবেশন, এ সবের ত অভাব নাই, তবু ম্যালেরিয়ায় লোকক্ষয় নিবারিত হইতেছে কই? তাহা হইলেই মনে এই ধারণা আসে যে চেষ্টা খুবই হইতেছে বটে, কিন্তু তাহা সম্যক্ নয়; বোধ হয় আসল জিনিসে হাত পড়িতেছে না; গলদ থাকিয়া যাইতেছে। যাহা করিলে ম্যালেরিয়ার প্রতিকার হয়, তাহা করা হয় ত হইতেছে না। অদৃষ্টের উপহাস!

আমরা ইউরোপীয় মহাসমরে লোকক্ষয়ের সংবাদ পাইয়া বিস্মিত হইতেছি কিন্তু একবার ভাবি না যে প্রতিবৎসর ম্যালেরিয়ায় বঙ্গের কত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। ১৯১৪ সালে ম্যালেরিয়ায় মারা গিয়াছে প্রায় এগার লক্ষ। বঙ্গে উক্ত বর্ষে সর্ব্বসমেত চৌদ্দ লক্ষ জনের মৃত্যু হয়, তন্মধ্যে কেবল ম্যালেরিয়া জ্বরে দশ লক্ষের উপর লোক কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে—ব্যাপার কিরূপ ভয়ঙ্কর, তাহা বুঝুন! কোন বৎসর কিছু কম, কোন বৎসর কিছু বেশী, গড়ে বর্ষে বর্ষে বঙ্গে কেবল ম্যালেরিয়ায় দশ লক্ষ লোকের ভবলীলা সাঙ্গ হইতেছে, ইহা বলা যাইতে পারে। এই রোগে ভুগিয়া যাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে না, অর্থাৎ আরোগ্য লাভ করিতেছে, তাহারাও আজীবন ব্যাধিমন্দির হইয়া থাকিতেছে; এরূপ লোকের সংখ্যা নির্ণয় করা সহজ নহে; আবার ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া পরে উদরাময় আদি অন্য উপসর্গ উপস্থিত হওয়াতে, অনেক রোগী মারা যায়; তাহাদের সংখ্যাও কম নহে। ফলে ম্যালেরিয়ায় বঙ্গের যে ভীষণ লোকক্ষয় হইতেছে, ইহা হিসাব দেখাইয়া বুঝাইয়া দিবার আবশ্যকতা নাই। ম্যালেরিয়া বিষে বঙ্গ জর্জ্জরিভূত, ইহা সকলেই জানেন, সকলেই বুঝেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই বিষ দেশ হইতে বিদূরিত যাহাতে হয়, তদ্বিষয়ে দেশের লোকে তত যত্নবান্ বা উদ্যোগী না হইলেও, প্রজার হিতৈষী আমাদের সহৃদয় গভর্ণমেণ্ট উদাসীন নহেন। গভর্ণমেণ্ট খুবই চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু চেষ্টায় তত ফল হইতেছে না; এখন প্রতিকারের অন্য উপায় অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। কুইনাইনের প্রচলন যাহাতে বৃদ্ধি পায়, গভর্ণমেণ্ট তাহা করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। সংবাদপত্রে বা প্রাদেশিক সমিতিতে প্রতিকারের নানাবিধ উপায়ের কথা আলোচিত হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়া ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে প্রভূত কুইনাইন খাওয়াইলে রোগ চাপা থাকে সত্য, কিন্তু দেশ হইতে ম্যালেরিয়া বিষ তাড়াইবার তাহাই কি সম্যক্ উপায়? যাহাতে ম্যালেরিয়া ব্যাধির মূলোৎপাটন হয়, তাহাই করা বাঞ্ছনীয়। সংবাদপত্রের স্তম্ভে যে সকল উপায়ের কথা লিখিত হয়, কিংবা প্রাদেশিক সমিতিতে দেশের প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়া যে উপায় অবলম্বিত হওয়া উচিত বলেন, সেই উপায়গুলি অবলম্বনের যোগ্য কি না গভর্ণমেণ্ট তাহা বিবেচনা করুন, ইহাই আমাদের অনুরোধ। আমরা মোটামুটী বুঝি নদ নদীর সংস্কার; জল নিঃসরণের ব্যবস্থা, বনজঙ্গলের অপসারণ; সুপেয় পানীয় জলের সংস্থান; রেলের বাঁধে জল নিকাশের বাধা না ঘটে তৎপ্রতি দৃষ্টিক্ষেপ, এই উপায়গুলি সর্ব্বাগ্রে অবলম্বিত হওয়া উচিত। অবশ্য এগুলি ব্যয়সাধ্য; কিন্তু ম্যালেরিয়া-বিষ-জর্জ্জরিত বঙ্গের প্রজাবর্গকে রক্ষা করিবার জন্য প্রজাবৎসল গভর্ণমেণ্ট এ কাজে ব্যয়কুণ্ঠ হইবেন, আমরা এরূপ মনে করি না।

চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ।

৩। "তথাপি গাহিব আশার গান।"

চারিদিকে অবসাদ, নিষ্ক্রিয়তা, স্তাবকতা দর্শনে প্রাণে সময় সময় হতাশ আসে, হায় তবে কি আমরা ক্রমশঃ মনুষ্যত্বের নিম্নস্তরে অবনত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইব। কিন্তু

আবার মনে হয়, না, না, তাহা হইতে পারে না। এমন ভগবদনুগৃহীত দেশ, এমন ত্যাগের দেশ একবারে ধ্বংস হইতে পারে না। এই অবসাদের মধ্যে এই স্বার্থান্ধতার মধ্যে এই বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে আবার সাধুতার ত্যাগের, বিশ্বস্ততার নিদর্শন দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। চাই কর্ম্মস্পৃহা, চাই ঐকান্তিকতা, চাই ভগবানে অটল বিশ্বাস। তারপর সব ঠিক হইয়া যাইবে। আজিকার ভুল কালিকার ভ্রান্তি সব সংশোধিত হইবে। মাভৈঃ যেখানে কর্ম্ম পাও সেখানে ছুটিয়া যাও, লোক সেবা—দেশ সেবা—শিক্ষা দান কর। যেখানে দেখিবে লোক বিন্দুমাত্র স্বার্থত্যাগ করিতেছে সেখানে যাও তাহাকে আলিঙ্গন কর। তাহার স্পর্শে তোমার প্রাণে দ্বিগুণ বল আসিবে। বিজ্ঞানের চর্চ্চার ব্যবহারিক আবিষ্কারে শিল্পোন্নতির প্রয়াস দেখিলে নমস্কার কর। দেখিতেছ তোমার কোনও চেষ্টা সফলতা আনয়ন করিতেছে না? তথাপি বিশ্বাসের বলে দৃঢ় হও এ জগতে কোনও চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই—হইবে না। আজ যাহা ব্যর্থ কালই তাহা সফলতা আনয়ন করিবে। যে পথে নদী একবার বহিয়া গিয়াছে সেই পথে আবার নদী বহিবে—কোনও ভয় নাই।

কেন্দ্রীকৃত শক্তির সমক্ষে হিম হইও না। ধর্ম্ম নিষ্ঠা, ন্যায় নিষ্ঠা, কর্ম্ম নিষ্ঠার নিকটে সব বাধা দূরীভূত হইবে। শক্তিমান ক্রমে তোমার আদর বুঝিবে—আজ যাহা স্বপন কাল তাহা বাস্তব মনে করিবে।

বিক্রমপুর সম্মিলনীতে আচার্য্য জগদীশ-চন্দ্র বলিয়াছেন "যিনি ফরিদপুরে সর্ব্ব প্রথম লোন কোম্পানী করিয়া বিপন্ন হইয়াছিলেন—যিনি সর্ব্ব প্রথমে চা বাগান করিতে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন—তিনি আমার স্বর্গীয় পিতা ভগবান চন্দ্র বসু—কিন্তু তাঁহার চেষ্টার ব্যর্থতার মধ্যে দেশের কর্ম্ম সাফল্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাই বলি মাভৈঃ চারিদিকে চিত্তদৌর্ব্বল্য, স্বার্থপরতার বিকট আয়োজনে ভয় পাইও না।

নির্ম্মল শুচিস্নাত সাধকের ন্যায় নিরলস-ভাবে নিজ কর্ম্ম করিয়া যাও—এ জাতির ধ্বংস নাই, সাধনার ব্যর্থতা নাই। ভগবানের আইন রাজার আইন সমাজের আইন মানিয়া চলিও সর্ব্বনিয়ন্তা তোমাকে সফলতা দান করিবেন।

বরিশাল হিতৈষী।

৪। দেশীয় সংবাদপত্র ও গবর্ণমেণ্ট।

আধুনিক সভ্যতালোকপ্রাপ্ত দেশমাত্রেই সংবাদপত্র যে একটী অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিস তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। দেশীয় সংবাদপত্রসমূহ যেমন একদিকে জনসাধারণের কেন্দ্রীভূত মত গবর্ণমেণ্টের সমক্ষে উপস্থিত করে, সেইরূপ শাসকসম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য ও কার্য্যপদ্ধতিও জনসাধারণের গোচরীভূত করিয়া উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনে সহায়তা করিয়া থাকে। আমেরিকায় সর্ব্বত্রই সংবাদপত্রের গতিবিধি অবারিত। থানা, কাচারী প্রভৃতি যে কোনও স্থানেই হউক না কেন, সংবাদপত্রের লোক সাদরে গৃহীত হয় এবং তাঁহারা যাহা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা জানান হয়। এমন কি, রাজপুরুষগণও আবশ্যকীয় সংবাদাদি নিজেরাই সংবাদ পত্রের আফিসে অনেক সময়ে পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। ইহাতে আমেরিকার শাসনকার্য্য যে অতি সুচারুরূপে পরিচালিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতীয় গবর্ণমেণ্টও যে অনেক পরিমাণে এই প্রথার অনুসরণ না করেন তাহা নহে। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইব যে গবর্ণমেণ্টের নিকট এ বিষয়ে আমরা যতটা আশা করি, তাহা পাই না। আশার কথা দূরে থাকুক, আফিস আদালতের কর্ম্মচারী-বৃন্দের নিকটও আমরা আশানুরূপ সাহায্য পাই না। শুধু তাহাই নহে। আমরা যাহাকে স্বায়ত্বশাসন বলিয়া গর্ব্বানুভব করি, সেই ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপালিটীতেও আমাদের প্রবেশাধিকার নাই বলিলেই হয়। বাহিরে সদস্যগণের নিকট হইতে ব্যক্তিগত ভাবে সংবাদ সংগ্রহ ব্যতীত অন্য উপায়ে আমরা কোনও সংবাদ পাই না। আমাদের মতে জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপালিটীর

যাবতীয় কার্য্যকলাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণই কর্ত্তৃপক্ষের সাহায্যে স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়া উচিত। আমরা এ বিষয়ে বহুবার পাবনার জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপালিটীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। বলাই বাহুল্য কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের কথায় কর্ণপাত করা সঙ্গত মনে করেন নাই।

গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ইহা অপেক্ষাও আমাদের গুরুতর অভিযোগের কারণ আছে। ইংরাজী সংবাদপত্র মাত্রই একখানি কলিকাতা গেজেট বিনিময় স্বরূপ পাইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে শাসন ও অন্যান্য বিষয়সংক্রান্ত যে সমস্ত মন্তব্যাদি প্রকাশিত করেন, তৎসমুদয়েরও এক এক কপি ইংরাজী সংবাদপত্রে প্রদত্ত হয়। কিন্তু বাঙ্গালা সংবাদপত্রের প্রতি, বিশেষতঃ মফঃস্বলের কোনও সংবাদপত্রের প্রতি এই অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হয় বলিয়া আমরা জানি না। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আমরা যে সাক্ষাৎভাবে নিতান্ত অজ্ঞ থাকি, ইহা বলিলে অসঙ্গত হইবে না। দেশের সুশাসনের পক্ষে ইংরাজী সংবাদপত্র অপেক্ষা দেশীয় সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা কম, ইহা আমরা স্বীকার করি না। সুতরাং আমরা এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

অনেকেই বাঙ্গালা সংবাদপত্রসমূহকে একদেশদর্শী বলেন। কিন্তু যখন তাহাদিগকে অন্য দিক দেখিবার আবশ্যকমত সুযোগ দেওয়া হয় না তখন তাহারা একদেশদর্শী হইলে তাহাদিগকে তজ্জন্য বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস লর্ড কারমাইকেলের গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে যথাসম্ভব শীঘ্র সুবিচার করিবেন।

সুরাজ।

"চাহ, চাহ, মতিমান, দেখ দেখি বিশাল জগতে,
মানবের কর্ম্মধারা কত দিকে আবর্ত্তিয়া ধায় !
কত সাধ কত আশা জেগে ওঠে সাধিতে কল্যাণ !
মানুষের শক্তি লয়ে কীটসম ব্যর্থ কর তারে ?
বিধাতার পুণ্যদান—দলমল হিয়া-শতদল
গন্ধ চাহে বিতরিতে, তুমি তার রুধিবে দুয়ার ?
একি—একি অপমান মনুষ্যত্বে হান অবিরত !
ভুলে যাও বর্ত্তমানে, ভেঙ্গে ফেল জড়তা-শিকল
দূর ভবিষ্যতে চাহি'। ভাসে ধরা আলোক-বন্যায়
দুয়ারে পাখীর মত, আজি তোমা ডাকি প্রাণপণে,
বাহির হবে না তুমি ?"

সপ্তম খণ্ড সপ্তম বর্ষ	১৩২৩, বৈশাখ	সপ্তম সংখ্যা।

আলোচনা

১। মনস্তত্ত্বের প্রয়োগ

আমাদের দেশে একটা ধারণা আছে যে মনস্তত্ত্ব ব্যাপারটা নিতান্তই Theoretical বা অব্যবহারিক। কিন্তু সে কথাটা ঠিক নহে। মনস্তত্ত্ব আজ কাল একটা বিজ্ঞান হইয়া দাঁড়াইতেছে। যেমন রসায়ন বা পদার্থবিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগ আছে সেইরূপ মনস্তত্ত্বেরও ব্যবহারিক প্রয়োগ আছে।

মনস্তত্ত্বের বিষয় আমাদের চিত্তের বৃত্তি-ধারা। আজকালকার মনস্তাত্ত্বিকগণের অনেকেই মনকে একটা ধারা বা স্রোতের সহিত তুলনা করেন। এখন এই ধারার যে একটা নিয়ম আছে, এই স্রোতের গতির যে দিক্ নির্ণয় হইতে পারে তাহা আমাদের দৈনিক জীবনের কাজের মধ্যে আমরা ভুলিয়া যাই। কিন্তু সাধারণ লোকে যাহা ভুলিয়া যায়

বৈজ্ঞানিক তাহা তুচ্ছ করিতে পারেন না। কাজেই মনস্তত্ত্বের উদ্ভব। মনস্তত্ত্ব, চিত্তের ধারার নিয়ম ও গতি নির্ণয় করে।

আমাদের জীবনের কাজে অনেক সময়ই আমরা অন্যের মনের অবস্থা নির্ণয়ে ব্যাপৃত থাকি। পরীক্ষার্থী পরীক্ষকের মনের অবস্থা নির্ণয় করিতে ব্যস্ত; ব্যবহারজীবিগণ বিচারক কি করিবেন তাহা জানিবার জন্য আকুল হন; ব্যবসায় ক্রেতৃগণের ও ক্রেতৃগণ বিক্রেতার মনের গতি বুঝিবার জন্য নিরন্তরই প্রয়াসী। এক কথায় আমরা জীবনের দৈনিক কাজের মধ্যে প্রায় সর্ব্বদাই অপরের মনের ভাব বুঝিতে ব্যস্ত থাকি।

মনস্তত্ত্ব যদি কি নিয়মে মনের ধারা বহিয়া চলে তাহা নির্ণয় করিতে পারে তাহা হইলে আমাদের দৈনিক কাজের যে সুবিধা হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? আজকাল মনস্তত্ত্বের উন্নতির সঙ্গে আমরা মানুষের মনের নিয়ম বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি। কাজেই ব্যবসায়, বিচারালয়, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি সকল বিষয়েই এই নিয়মের প্রয়োগের অবসর ঘটিয়াছে। আইনের দিক্ হইতে একটী উদাহরণ দিতেছি। শারীরবিজ্ঞানের উন্নতির পূর্ব্বে মানুষের শরীরে কতখানি সামর্থ্য তাহা না বুঝিয়াই বিচারালয়ে তাহার শাস্তি বিধান করা হইত। ফলে অনেকে বিচারকের অভিপ্রায়াতিরিক্ত শাস্তি পাইত। কারণ যে শাস্তি একজনের পক্ষে কম অপরের পক্ষে হয়ত তাহা অসহ্য। মনোবিজ্ঞানের সাহায্য না লইয়া বিচার করাতেও আজকাল সেইরূপ অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে। কারণ শরীরের শক্তির বা সহন ক্ষমতার যেমন একটা সীমা আছে মনেরও সেইরূপ। একজনের পক্ষে যাহা লঘু দণ্ড অপরের পক্ষে তাহা অসহ্য হইতে পারে। অথচ ডাক্তার যেমন দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের শরীরের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন ও তৎপর তাহাদের দণ্ডের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয় মনোবৈজ্ঞানিককে সেরূপ করিতে অবসর দেওয়া হয় না।

আজকাল মনস্তত্ত্বের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক দেশে মনোবৈজ্ঞানিককে চিত্ত পরীক্ষার জন্য আহ্বান করা হইতেছে। বিচারালয়, ব্যবসায়, শিক্ষা, চিকিৎসা—সকল বিভাগেই মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ আরম্ভ হইয়াছে। ভবিষ্যতে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করিব।

**
*

২। অধ্যাপক রয়েস ও রাষ্ট্র বীমা

অধ্যাপক রয়েসের নাম দর্শনজগতে সুপরিচিত। জার্ম্মান্ দার্শনিক ফিকটে যে চিন্তার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন রয়েস ও তাঁহার সহযোগী মুনষ্টারবার্গ তাহাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিয়াছেন। এই জন্য একতত্ত্ববাদিগণের মধ্যে (Absolutist) রয়েসের স্থান অতি উচ্চে। দর্শনশাস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ও রয়েসের গবেষণায় বর্দ্ধিত-কলেবর হইয়াছে। সাহিত্য ও গণিত বিষয়ে তিনি নানারূপ আলোচনা প্রকাশ করিয়াছেন। আজকাল খ্রীষ্টধর্ম্মের মর্ম্মব্যাখ্যার জন্য দার্শনিক সম্প্রদায়ে যে আলোচনা চলিয়াছে রয়েস সে দিকেও স্বীয় প্রতিভার আলোক বিস্তারে পরাঙ্মুখ হন নাই।

ইউরোপের কুরুক্ষেত্রের প্রারম্ভে যখন সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই যুদ্ধের চিরনির্ব্বাসনের উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত ছিলেন, দার্শনিক

রয়েসও নির্ব্বাক থাকিতে পারেন নাই। তিনি এক রাষ্ট্র বীমা প্রণালী দ্বারা ক্ষাত্র-বীর্য্যের হঠকারিতার প্রতিবিধান করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই রাষ্ট্রবীমার মূলতত্ত্ব রয়েসের দার্শনিকমতের উপর প্রতিষ্ঠিত।

রয়েসের মতে ব্যক্তির জ্ঞান ও কর্ম্ম ব্যষ্টির উপর নির্ভর করে। কেবল বাহ্য অর্থের সহিত সংকর্ষেই জ্ঞানোৎপন্ন হয় না, কেবল বস্তুর উপর বল প্রয়োগেই কর্ম্ম হয় না। বাহ্য অর্থের সংকর্ষ জনিত চিত্তবৃত্তির মর্ম্ম যদি ব্যষ্টির চিত্তবৃত্তিতে পরিণত না হয় তাহা হইলে ব্যক্তির চিত্তবৃত্তিকে জ্ঞান বলা যায় না। কর্ম্ম সম্বন্ধেও সেই একই কথা খাটে। ইচ্ছা-শক্তির প্রয়োগের মূলে যে চিত্তবৃত্তি আছে তাহা ব্যষ্টির জ্ঞান হইতে ব্যক্তির মধ্যে প্রবাহিত হইয়া আসা চাই। কাজেই জ্ঞান ও কর্ম্মের মূলে একটা ত্রয়িক Triadic সম্বন্ধ রহিয়াছে। কেবল যুগলের সম্বন্ধে জ্ঞান হয় না।

কেবল জ্ঞান ও কর্ম্ম বলিয়া নয়; রয়েসের মতে যুগল সম্বন্ধ (Dyadic relation) মাত্রেই স্থিতির অভাব। এ সম্বন্ধ অতি সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়। দম্পতীর প্রেম যেমন অপত্য স্নেহে দৃঢ়ীকৃত হয় যুগল সম্বন্ধ মাত্রই সেইরূপ একটী তৃতীয়ের সমাগমে দৃঢ়ীকৃত হয়। এই ত্রয়ীর সম্মিলনেই জগতের কর্ম্ম ও জ্ঞানের ভিত্তি।

এ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রিক সম্বন্ধ যুগলের সম্বন্ধেই আবদ্ধ রহিয়াছে। যদিও Triple Entente Triple alliance প্রভৃতির কথা আমরা অহরহঃ শুনিতে পাইতেছি তথাপি তাহাদের মিলনভূমি প্রকৃতপক্ষে দুই এর মধ্যেই আবদ্ধ। যে ত্রয়িক সম্বন্ধ বহুকে এক সূত্রে বদ্ধ করে তাহা অন্তরাষ্ট্রীক ব্যাপারে দুর্লভ। এই জন্যই এই মহাবিপ্লবের সূচনা।

রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ত্রয়িক সম্বন্ধ স্থাপনের একটী প্রধান উপায়ই হইতেছে অন্তরাষ্ট্রিক বীমা। আজ কালকার সামাজিক চিন্তা অর্থনীতি দ্বারা চালিত হইতেছে। যাহা বৈষয়িক ব্যাপারের উন্নতিজনক নয়, যাহার মধ্যে অর্থের সম্বন্ধ নাই তাহাকে লোকে Idle বা Smere speculation বলিয়া উড়াইয়া দেয়। কাজেই অন্তরাষ্ট্রিক মিলনের ভিত্তি ব্যবসায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

এই জন্য রয়েস প্রস্তাব করেন যে সকল দেশের প্রতিনিধিবর্গ মিলিয়া একটী বীমা কোম্পানী স্থাপন করুন। এই কোম্পানীর অংশ ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিবেন। অর্থাৎ লোকে যেমন Life insuranc করে, গবর্ণমেণ্টও সেইরূপ Life insurace করিবেন। হেগ কনফারেন্স আজ কাল কেবল রাষ্ট্র সমূহের স্বার্থসিদ্ধির উপায় হইয়া রহিয়াছে, এই বীমাসমবায়ের দ্বারা তাহার ভিত্তি দৃঢ়রূপে স্থাপিত হইবে।

এই Insurance সমবায়ের মূলধন যেরূপ প্রতি দেশ হইতে সংগৃহীত হইবে, সেইরূপ সকল দেশেরই ব্যবসার সাহায্যে নিযুক্ত হইবে। ইহার লাভের অংশ, যদি কোনও দেশে কোনও প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা উপস্থিত হয় (যেমন ভূমিকম্প, জলপ্লাবন ইত্যাদি), তাহা হইলে সেই দেশের লোকের জন্য আংশিক ভাবে ব্যয়িত হইবে। ইহা ব্যতীত যদি দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয় তাহা হইলে যে দেশ প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ করে তাহার অংশ বাজেয়াপ্ত হইবে ও এই অংশ ক্ষতিগ্রস্ত দেশের (যেমন বেলজিয়ামের) প্রজাদিগের দুঃখ নিবারণে ব্যয়িত হইবে।

অনেকে বলিবেন যে এরূপ বীমা সমবায় স্থাপন অসম্ভব। কিন্তু আজ কালকার সকল বীমা কোম্পানীই প্রায় অন্তরাষ্ট্রিক হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষেত্রে উল্লিখিত বীমা প্রণালী অসম্ভব বিবেচনা করিবার কারণ নাই। অনেকে বলিবেন যে ইহাতে যুদ্ধ নিবারণের কোন আশাই নাই। একথা হয় ত সত্য। কিন্তু এইরূপ একটী সমবায় স্থাপিত হইলে অন্তরাষ্ট্রিক সম্বন্ধ যে দৃঢ়ীকৃত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

**
*

৩। প্রেততত্ত্ব বা Psychical Research :

মানুষ শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও তাহার জীবনকে এত ভালবাসে যে জীবন হানির সম্ভাবনায় সে নিতান্ত আকুল হইয়া উঠে। এই আকুলতার জন্যই মৃত্যুর পরপারে একটী নবজীবন লাভের আশা মানুষের মনে স্বভাবতঃই স্থান পায়। আত্মীয় স্বজন, ঘরবাড়ী, সুখ দুঃখের স্মৃতি, কর্ম্মের বন্ধন —এ সকল যেন দৃঢ়রূপে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। এইগুলির দ্বারাই একজন মানুষকে আর একজন ভিন্ন মানুষ বলিয়া জানা যায়। মনস্তত্ত্বের হিসাবে এইগুলিই মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক।

মৃত্যুর পর যাহাতে নিজের এই ব্যক্তিত্ব না হারাইয়া যায় তাহার জন্য লোকের মনে স্বভাবতঃই একটা আকাঙ্ক্ষা থাকে। ইহার উপর আবার আত্মীয় স্বজনের বিয়োগে এই ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব জ্ঞানের একটা প্রবল আশা মানুষের মনে জাগিয়া উঠে। মনে হয় আমি যাহাকে ভাল বাসি সে যদি মৃত্যুর পরে আবার জন্ম লাভ করিয়া থাকে তবে আমার দুঃখের তীব্রতা যেন কিছু হ্রাস হয়। এই আশা ও আকাঙ্ক্ষার উপরই প্রেতাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

এখন কথা হইতেছে এই যে, প্রেতাত্মার অস্তিত্বের কিছু প্রমাণ আছে কি না। এই প্রশ্নের সমাধান তিন প্রকারে হইতে পারে। প্রথমে আমরা দার্শনিক গবেষণা দ্বারা স্থির করিতে পারি যে জগতের প্রকৃতি অনুসারে মৃত্যুর উপর জীবন জয়লাভ না করিয়াই পারে না। কেবল বিশ্বের নিয়মই এই যে প্রাণ কখনও নষ্ট হইতে পারে না; কখনও প্রকাশ কখনও অপ্রকাশ থাকিতে পারে মাত্র। কিন্তু জীবনস্রোতের চিরন্তন প্রবাহের রোধ নাই। ইহাকে তত্ত্বমূলক (Metaphysical) প্রমাণ বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ জগতের কতকগুলি ব্যাপারের ব্যাখ্যা করিবার জন্য প্রেতজীবনের অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে। আমাদের একটা নৈতিক জীবন আছে। ভাল মন্দ সুখ দুঃখ ন্যায় অন্যায় এই সকল লইয়াই আমাদের জীবন। এখন এই গুলির মর্ম্ম বুঝিতে হইলেই হয়ত প্রেতজীবন মানিয়া লইতে হয়। এইরূপ প্রমাণকে ব্যাখ্যামূলক প্রমাণ (Explanatory postulation) বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তৃতীয়তঃ, অনেকে বলেন যে প্রত্যক্ষতঃই প্রেতের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। নানা স্থানে ভুতের গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ বলেন প্রেতগণ দৃশ্যতঃ উপদ্রব সৃষ্টি করিয়া থাকে। লোকের মনে প্রেতাবির্ভাবের কথাও এদেশে অনেক শুনা যায়। ইহা ছাড়া প্রেতগণ নানারূপে medium এর মধ্য দিয়া নিজেদের অস্তিত্বের বিষয় জ্ঞাপন করিয়া থাকে বলিয়াও শোনা গিয়াছে। ইহাকে

প্রত্যক্ষমূলক প্রমাণ বলা যাইতে পারে।

Psychical Research Society এই প্রত্যক্ষমূলক বিচার দ্বারাই প্রেততত্ত্ব প্রমাণে প্রয়াসী। এই সমাজের কার্য্য প্রায় ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে বিলাতে আরম্ভ হয়। বিলাতের বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি এই সভার সভ্য। রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সকলেই প্রেততত্ত্ব নির্ণয়ে প্রয়াসী হইয়াছেন। এই জন্য অনেকেই মনে করেন যে, যখন এতগুলি বড়লোক এই বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন তখন ইহা বোধ হয় প্রমাণের যোগ্য। অনেক সময়ে সভ্যগণের মধ্যে অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি প্রেততত্ত্বে নিজের বিশ্বাস জ্ঞাপন করিয়াছেন—যেমন আজকাল Sir Oliver Lodge. এই জন্য জনসাধারণের মধ্যে একটা বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, প্রেততত্ত্বে সংশয় করিবার আর কোনও কারণ নাই।

কিন্তু এ সম্বন্ধে কতকগুলি কথা মনে রাখা আবশ্যক।

প্রথমতঃ ছোট বড় সকলেরই কতকগুলি খেয়াল থাকিতে পারে। কয়েকজন বড় লোক একটা বিষয়ের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছেন বলিয়াই যে সে বিষয়টী প্রমাণ সাধ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে তাহার কোনও হেতু নাই। হইতে পারে যে তাঁহারা ও ব্যাপারটীকে অবসর যাপনের একটা উপায় মাত্র বলিয়া মনে করেন; হয়ত তাঁহারাও জনসাধারণের মত আশা ও আকাঙ্ক্ষার বশে বৈজ্ঞানিক প্রথা পরিত্যাগ করিয়া একদেশদর্শী হইয়া পড়েন।

দ্বিতীয়তঃ দুই একজন বড়লোক একটা কথা বিশ্বাস করেন বলিয়াই যে সেটা ঠিক হইবে এ কথা মনে করিবার কোনও কারণ নাই। Sir Oliver Lodge বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। পদার্থ বিদ্যায় তিনি অদ্বিতীয়। একথা কেহই অস্বীকার করে না। কিন্তু সে জন্য যে তিনি ধর্ম্ম, দর্শন, বা মনস্তত্ত্বেও অদ্বিতীয় হইবেন তাহার কোনও কারণ নাই। এ সব বিষয়ে তাঁহার মত সাধারণের মত অপেক্ষা বিশেষ বুদ্ধির পরিচায়ক নাও হইতে পারে। তিনি পদার্থ বিদ্যায় একচ্ছত্র বলিয়া সেই প্রতিপত্তির বশে তাঁহার অন্য মত গুলিকেও অসঙ্কোচে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা বুদ্ধির পরিচায়ক নহে।

তৃতীয়তঃ প্রমাণ দ্বারা আমরা যতটুকু অগ্রসর হইতে পারি বিজ্ঞান হিসাবে প্রেততত্ত্বকে ততটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ রাখিতে হইবে। প্রমাণিত বিষয়কে বিশ্বাস বা শাস্ত্রোক্ত তথ্যের সহিত মিলিত করিয়া বর্দ্ধিত কলেবর করিয়া তুলিলে চলিবে না। অবশ্য আমরা একটা বিষয়ে বিশ্বাস করিতে পারি। কিন্তু তাহার জন্য একটা বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণের কোনও প্রয়োজন হয় না। বিজ্ঞান প্রতিপাদিত সত্য ও বিশ্বাসের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য সত্যকে বিকৃত করা নিতান্ত দোষাবহ।

আমাদের দেশে সকলেই আজকাল Psychical Research এর ফল গুলিকে উপপাদিত বলিয়া গ্রহণ করেন। আমরা বলিতেছি না যে Psychical research এর দ্বারা কিছুই প্রমাণিত হয় নাই। কিন্তু কেবল authority র উপর নির্ভর করিয়া কোনও তথ্য গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে প্রমাণ সম্বন্ধে বিশেষরূপ অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

* *
*

৪। হিন্দুর বৈষয়িক সাধনা

জগতের কাছে ভারতের সম্মান তাহার দর্শনের জন্য। অধ্যাত্মরাজ্যে তাহার সাধনা এবং উন্নতি জগতের অন্যান্য জাতি-পুঞ্জ অপেক্ষা ঢের বেশী, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত কথা। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহুস্থানে হিন্দুদের মানসিক এবং নৈতিক ক্ষমতার প্রাচুর্য্যকে প্রশংসা করিয়াছেন এবং সেই প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও তাঁহারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে এই দিকে হিন্দুদের যেমন উন্নতি দেখা যায়, বৈষয়িক ব্যাপারে তেমনি তাহাদের অজ্ঞতা এবং অবনতি বড়ই হাস্যজনক। কিন্তু তাঁহাদের এই ধারণার মূলে কোন সত্য আছে কি না, তাহা বিচার করা কর্ত্তব্য।

সভ্যতার ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই মানসিক এবং নৈতিক উন্নতি বৈষয়িক ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। আগে যেখানে বৈষয়িক প্রচেষ্টা বা উন্নতির চিহ্ন দেখা যায় নাই, পরে সেখানে মানসিক উন্নতি সম্ভাবিত হইয়াছে, ইহার দৃষ্টান্ত কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু সেই দৃষ্টান্তের স্থল কি কেবল এই ভারতবর্ষ? ফলতঃ অমন সঙ্কীর্ণ করিয়া দেখিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। হিন্দুদের বহির্জ্জগতের প্রচেষ্টা কোন্ কোন্ আকারে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান না করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই ধারণা করিয়া বসা যুক্তি সঙ্গত নহে। হিন্দুর সভ্যতা ও সাধনা বুঝিতে গিয়া তাহার মুনি ঋষি, ভিক্ষু সন্ন্যাসী, ধর্ম্ম সংস্থাপক এবং সাহিত্যসেবী, তাহার অমর সাহিত্য-ভাণ্ডার প্রভৃতির দিকে শুধু নজর দিলে চলিবে না, তাহার বীর এবং যোদ্ধা, তাহার রাষ্ট্রনীতিবিদ্ তাহার রাজমন্ত্রী এবং তাহার প্রসিদ্ধ কর্ম্মীবৃন্দের দিকেও নজর দিতে হইবে, কারণ তাঁহারাই দেশের বৈষয়িক অবস্থাকে এমন অগ্রসর করিতে পারিয়াছিলেন, যাহাতে হিন্দুর সাধনা অব্যাহত এবং প্রচারিত হইতে পারিয়াছিল এবং এমন একটি শাসন-প্রণালী সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিল যাহার চরম ফল—মৌর্য্য এবং গুপ্তবংশের অসাধারণ সম্রাট্ শক্তি। ভারতীয় ইতিহাসে কপিল এবং বুদ্ধ, পানিনি এবং কালিদাস, শঙ্করাচার্য্য এবং চৈতন্য যেমন প্রসিদ্ধ, চাণক্য এবং চন্দ্রগুপ্ত, অশোক এবং সমুদ্রগুপ্ত, চরক এবং সুশ্রুতও তেমনি প্রসিদ্ধ।

আমাদের মনে হয়, হিন্দুর সাহিত্য হইতে হিন্দুর জ্ঞানগরিমা প্রকাশ বা প্রমাণ করিবার দরকার আর এখন বেশী কিছু নাই। এখন তাহা হইতে হিন্দুর কর্ম্মচেষ্টা কতবিধ আকার ধারণ করিয়াছিল তাহাই অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিবার সময় আসিয়াছে। হিন্দু-চিন্তা বহির্ম্মুখে কি কি পদার্থে কি কি প্রণালীতে প্রধাবিত হইয়াছিল, তাহাই আলোচনা করিয়া হিন্দুর প্রাকৃত বিজ্ঞানের একটি সর্ব্বাঙ্গীন বিবরণ প্রকাশ করা এখন আবশ্যক।

আশার কথা এইদিকে গবেষণা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন হিন্দুগণ ভেষজশাস্ত্রে, অস্ত্র-বিদ্যায়, শারীরবিদ্যায়, জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানে, কলা-বিদ্যায়, স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে, চিত্রশিল্পে, ধাতু-বিজ্ঞানে, ঔষধ প্রস্তুতকরণ বিদ্যায় এবং রঞ্জন-শিল্প প্রভৃতিতে কিরূপ উৎকর্ষলাভ করিয়াছিলেন, আমরা ইতিমধ্যেই তাহার কিছু কিছু জানিতে পারিয়াছি। আমরা আরও জানিয়াছি, হিন্দুর রসায়নশাস্ত্র ও তৎপরীক্ষিত ফলরাশি, হিন্দুর হস্তচালিত যন্ত্রে নির্ম্মিত দ্রব্যসম্ভার প্রাচীন জগতে বিস্তৃতিলাভ

করিয়াছিল এবং প্রাচীন বাণিজ্যে হিন্দুর স্থান অতি উচ্চে ছিল। জলপথ ও স্থলপথ উভয়ই তাহার করায়ত্ত ছিল এবং তাহার উদ্ভাবিত অর্ণবযান প্রাচীন সভ্যতার একটি চরম আদর্শ। কিন্তু তবু এখনও আমাদের অনেক জানিবার আছে,—বাহ্যজগতে শুধু গৌরবলাভের জন্য নহে, আমাদের মধ্যে কর্ম্মশক্তির বীজ নিহিত আছে এই বোধটা জাগাইবার জন্য। আমরা অধ্যাত্মরাজ্যে বড়, আমরা কর্ম্মরাজ্যেও ছোট নহি, এই জ্ঞান না থাকিলে আমরা কেবলমাত্র আলস্যের প্রশ্রয় দিয়াই ক্ষান্ত থাকিব—আমরা কখনই কর্ম্মে নামিতে সাহস পাইব না।

৫। বিদ্যালয়ের আকর্ষণ

শ্রদ্ধা ভক্তি আমাদের মনে যে পরিমাণে আছে সেরূপ অন্য দেশীয়দের নাই এইরূপ আমরা মনে করিয়া আসিতেছি। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব যে আমাদের হৃদয়ের সেই মহা সম্বল আজকাল আমরা কতখানি হারাইয়াছি। যে পাশ্চাত্যদিগকে আমরা শ্রদ্ধাশূন্য, অর্থান্বেষী ও স্বার্থপর বলিয়া সর্ব্বদা বিদ্রূপের চক্ষে দেখি তাহারা যে এই বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা আজকাল কত উচ্চে তাহা তাহাদের প্রতিকার্য্যে দৃষ্ট হয়। তাহারা অর্থান্বেষী হইতে পারে তাহা হইলেও অস্বীকার করার উপায় নাই যে অন্ততঃ তাহারা অর্থকেও শ্রদ্ধা ও ভালবাসার চক্ষে দেখে—কিন্তু আমাদের হৃদয়ে যদি অন্ততঃ সেই পরিমাণ শ্রদ্ধাও থাকিত তাহা হইলেও তাহাদিগের প্রতি বিদ্রূপ-কটাক্ষ-নিক্ষেপ করিবার উপযুক্ত হইতাম। একটী জিনিষ হইতে এই অনুমান সত্য বলিয়া মনে হয়। দেশের ভবিষ্যৎ কর্ম্মী ছাত্রগণের জীবনে যে বীজ রোপিত হয়, তাহাই ভবিষ্যতে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া সমস্ত দেশীয় কর্ম্মজীবনকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে। কিন্তু এই ভবিষ্যতের আশা, দেশের একমাত্র সম্বল, আমাদের ছাত্রগণের জীবনে এরূপ কোন মহা বৃক্ষের বীজ রোপিত হইয়াছে কি যাহার শ্যাম পল্লবছায়ার সুশীতল ও শান্তিময় স্পর্শে দেশের সমস্ত ভবিষ্যৎ কর্ম্মক্ষেত্র নন্দনের মহিমাময় দীপ্তি ধারণ করিবে? আমাদের দেশে শিক্ষাপ্রণালীর নানাপ্রকার দোষ থাকিতে পারে—কিন্তু সে গুলি আমাদের আলোচ্য বিষয়ের তুলনায় নিতান্ত ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় গুলি, শিক্ষামন্দির গুলি, প্রতিবৎসর যাহার হস্তে শত শত জীবন গঠনের ভার ন্যস্ত হইতেছে, তাহারা কোন দিন ছাত্রহৃদয়ের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণের প্রয়োজন অনুভব করে না। বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা শিক্ষামন্দির ত্যাগ করিয়া আমাদের ছাত্রগণ মনে করে যে তাহার সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেল। আমাদের এরূপ কোন বন্দোবস্তও নাই যাহা দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষামন্দিরের সহিত ছাত্রগণের সম্বন্ধ সমস্ত জীবন অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিরাজ করিতে পারে। যাহার নিকট হইতে নানাপ্রকার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া জীবনব্রতে প্রবৃত্ত হই—আমরা তাহার নিকট হইতে দূরে গেলেই তাহার কথা ভুলিয়া যাই ইহা অপেক্ষা আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধাহীনতার পরিচয় আর কোথায়? আমাদের প্রকৃতিগত বহু দিবসের সেই মহা বৃক্ষের মূল যে উপযুক্ত আদর্শ ও আশ্রয় অভাবে ক্রমে উৎপাটিত হইতে চলিয়াছে তাহার দিকে কি বিশ্ববিদ্যালয় বা

শিক্ষা মন্দিরগুলি মনোযোগ দিবেন না? পুণ্যাত্মা তারকনাথ ও দেশপূজ্য সার রাসবিহারীর ন্যায় আত্মত্যাগী যাহাতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রত্যেক সন্তানই হন ইহার জন্য কি কোন নূতন শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্ত্তন হইবে না? আমাদের সেই প্রাচীন গুরু-গৃহের ভক্তিবিনত ছাত্রজীবনের সহিত আধুনিক এই ছাত্র জীবনের কি ভীষণ অসামঞ্জস্য। আমরা পাশ্চাত্য দেশ হইতে অনেক অনুকরণ করিতেছি—আমাদের সমস্ত শিক্ষামন্দির ও বিশ্ববিদ্যালয়ই তদ্দে-শীয় আদর্শের উপর সংস্থাপিত। কিন্তু পাশ্চাত্য সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তাহা-দের সন্তানগণের যে জীবনব্যাপী সুদৃঢ় বন্ধন নানা উপায়ে সংরক্ষিত হয় তাহার অনুকরণ ত আমাদের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ই করেন নাই। এই জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত—শিক্ষা-মন্দিরের সহিত সমস্ত শ্রদ্ধার বন্ধন তাহার ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে শিথিল হইয়া আসে। আমাদের ছাত্রজীবনের এই মহা অভাব পরিপূর্ণ করিয়া যাহাতে ছাত্রগণকে প্রকৃত মানুষ করা হয় তাহার দিকে সকলের মনোযোগ দেওয়া উচিত।

৬। হিন্দুর ধর্ম্ম প্রবৃত্তি

ভারত তুমি চিরদিনই মুক্তির জন্য পাগল। মুক্তি কোথায়, মুক্তি কেমন করিয়া হয়, মুক্তির ফলাফল কিরূপ তাহা তুমি জান কি? তুমি না জানিলে চাহিবেই বা কেন! মুক্তি লাভে চাই জ্ঞান, চাই কর্ম্ম আর চাই ভক্তি। জ্ঞানে শ্রদ্ধা, কর্ম্মে শ্রদ্ধা, ভক্তিতে শ্রদ্ধা না থাকিলে লোক মুক্ত হয় না, মুক্তি পায় না। তারপর মুক্তি চায় প্রাণী মাত্রেই, কেহ আজ চাহিতেছে কাল মুক্ হইয়া যাইতেছে, আজ যে চেতন কাল সে আহার নিদ্রার অধীন থাকিয়াও জড় হইয়া যাইতেছে। তুমি আজ চেতন তুমি জগৎকে নাড়াচাড়া করিবার শক্তি রাখ, তোমার আপন পর জ্ঞান আছে তুমি উপকারীর উপকারের কিঞ্চিৎ গুণকীর্ত্তন করিবার দাবী রাখ তাই তুমি মুক্তির জন্য, মুক্তির পথ না পাইয়াও সন্ধান অদৃশ্য হইলেও বলিতেছ মুক্তি চাই, চাইই। মুক্তির ফল চিরশান্তি। সে শান্তির বার্ত্তা তোমায় আমায় কে দিল? তুমি আমি তার খবর ত ২।৪ পাতা বই পড়িয়া পাই নাই তবে কেন আমরা আজ না হউক দশ দিন পরেই মুক্তি চাই। যেখানে বিশ্বমানবের অশান্ত অতৃপ্ত হৃদয় পৌঁছিতে চায়, বিভিন্ন বাধা বিঘ্ন, গিরি গুহা ভেদ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের ঢাক বাজাইয়া সেই এক পথ চায় কে সে সন্ধানী? জানিবে আইস; আমরা হিন্দু—ভক্তি গঙ্গাজলে স্নান করিব, শুদ্ধ চিত্ত হইব তাহার পর জ্ঞানের তিলক ললাটে ধারণ করিয়া কর্ম্মমন্ত্র জপ করিব। পারিবে? এস মুক্তির সন্ধান আমি তোমায় দিব। তোমার ভিতরে যে আকাঙ্ক্ষার তরঙ্গ খেলিতেছে তুমি তাহাতেই কূল পাইবে। তোমার তরঙ্গ আরও বাড়িয়া উঠুক তুমি উন্মাদ হও তবে তুমি জানিতে পারিবে তোমাদের শিরায় শিরায় যাঁহাদের শোণিতের পবিত্র বিন্দু প্রবাহিত হইয়া হৃৎপিণ্ডের কূলে গিয়া প্রচণ্ডাঘাতে প্রতিহত হইতেছে তাঁহারাই মুক্তির সন্ধানী—তাঁহারাই তোমার আমার পূর্ব্ব পুরুষ পিতা পিতামহ। তাঁহারাই জননী ভারতকে শোভিত করিতে যাইয়া যখন অবিনশ্বর পদার্থের সন্ধানে তন্ময় হইয়া

ছিলেন অসংখ্য রত্নরাজি আহরণ করিয়াও যখন তৃপ্ত হইলেন না, কেবল অশান্তি, আরও চাই—'নেতি', যুগযুগান্ত বাহিয়া গেল তবুও 'নেতি', তখনই সন্ধান মিলিল; তখন তাঁহারা ভারতকে এক নবীনরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কৈ তুমি ত অতৃপ্ত নও, তোমার হৃদয় ত নবীনরূপ দেখিতে চায় না, তুমি স্বল্প জ্ঞান লইয়া কি করিয়া মুক্তির দ্বারে দাঁড়াইবে?

তার পর তোমার কর্ম্মেও ত নিষ্ঠা দেখিতেছি না। তুমি সাধকের সাধনা, ত্যাগীর ত্যাগ দেখিয়া একবারও ত ফিরিয়া চাহ না। তোমার হৃদয় কি প্রত্যহ নূতন কিছুই দেখে না? তুমি মুক্তির সন্ধান চাও—সুতরাং তোমাকে অনেক করিতে হইবে, তুমি কর্ম্ম মন্ত্রে দীক্ষিত হও। জগৎকে তোমার পদানত করিতে হইবে, পর্ব্বতকে উঠাইয়া সাগর করিতে হইবে, চন্দ্র সূর্য্যের পথ ঘুরাইয়া তোমাকে নূতন পথ বাহির করিতে হইবে। জগৎকে নূতন সন্ধান দিতে হইবে। বসিয়া থাকিলে মুক্তি লাভ হয় না। তোমার পদদাপে পরিবর্ত্তনপ্রার্থী সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবে? সে শক্তি আছে? বিস্মিত হইও না। তোমারই সব।

তারপর আর একটা কথা বলিব। তোমার মুক্তিলাভের শেষ উপায় ভক্তি। তুমি মুক্তি চাহিতেছ—এস, তোমার পথে অনেক বাধা বিঘ্ন পড়িবে, অনেক মায়া মমতা, স্নেহের মূর্ত্তি আসিয়া দাঁড়াইবে, তুমি তিল তিল করিয়া হাসিয়া প্রাণ দিতেছ তাহারা আকুল আর্ত্তনাদে ধরণী প্লাবিত করিবে, তুমি "হৃদয় গলিবে না, চরণ টলিবে না কাহারো আকুল ক্রন্দনে" বলিতে বলিতে আপন পথে চলিয়া যাইবে। তুমি ভক্তিতে মুক্তি চাও, তোমায় কর্ণ-শিবির ভূমিকা টানিতে হইবে; দাস্যভাবে তোমার অহেতুকী ভক্তি জাগ্রত হইলে তবে তুমি মুক্তির সন্ধান পাইবে। তুমি কেবল মুক্তি চাহিয়াছ উপায় চাও নাই। অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছ তাই জ্ঞানরাজ্য অনেক দূরে রহিয়াছে। এখন তোমার সম্মুখে দুইটী পথ আছে একটী বাছিয়া লও হয় কর্ম্ম না হয় ভক্তি। তুমি যে ভাবেই ভাবুক হও না কেন তাহাতেই বিশ্বময়ীর বিরাট সত্ত্বা অনুভব করিতে পারিবে। তখন তুমি "প্রতিকণ জড়জীবে" তাঁহার বিরাট মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে তোমার মুক্তির পথ সেই খানেই আরম্ভ হইবে।

তুমি বল আমি ভারতবাসী আমি মুক্তি, প্রার্থী আমি মুক্ত, আমিই মুক্তি দাতা। তুমি বিস্মিত হইও না, তুমি চিরদিন একই ভাবে আছ তাই শত শত দুঃখের আবর্ত্তে পড়িয়া ভোগে তৃপ্ত হইয়াও তুমি চাহিতেছ মুক্তি, তুমি চাহিতেছ চিরশান্তি। কিন্তু তুমি চাহিয়া দেখ তোমার সম্মুখে কত আবর্জ্জনা পড়িয়া রহিয়াছে, তোমার পিছনে কত আকর্ষণ রহিয়াছে, তোমার ভ্রাতা ভগিনী প্রতিবেশী বিদেশী সকলের হৃদয়কে তোমার হৃদয়ের সঙ্গে এক করিয়া লও। থাকুক তোমার পথে শত শত বাধাবিঘ্ন, পিছনে শত আকর্ষণ, থাকুক কুসংস্কার, অজ্ঞতা অর্ব্বাচীনতা। তুমি জ্ঞানী হইয়া 'নেতি' না বল, তোমার বৈরাগ্য আজ শতমুখী সমাজকে শান্ত করিতে না পারুক তাহাতে দুঃখ কি? তুমি সম্মুখে অসম্পাদিত, পরিত্যক্ত, বাতুলতাময় কর্ম্মগুলিকে ধরিয়া লও, তারপর তিল তিল করিয়া পচিতে পচিতে দহিতে দহিতে যখন ধ্বংস হইয়া যাইবে তখনও তোমার লক্ষ্য, আশা মুক্তির দিকেই থাকিবে। যুগ যুগান্তের সন্ধানলাভ করিয়া সকলকে সঙ্গে লও, মুক্তির উপায় সকলকে বলিয়া দাও। তোমার আশা সকল দিকে ধ্বনিত হউক—আমরা মুক্তি চাই।

* *
*

৭। সামাজিক উন্নতির অন্তরায়

সমাজে ধর্ম্ম হিসাবে একই উপাস্যের বিভিন্ন শ্রেণীর উপাসক থাকেন; তাঁহাদের মতবাদ, আচার ব্যবহারও ভিন্ন প্রকৃতির হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কেহ থাকেন গোঁড়া রক্ষণশীল আবার কেহ বা গোঁড়া

উদারনৈতিক। সেইরূপ রাষ্ট্র, শিক্ষা প্রভৃতি নানাদিকেও বিভিন্ন মতবাদ ও বিভিন্ন নিয়ম প্রণালীর প্রবর্ত্তন দেখিতে পাই। নিয়ম-প্রবর্ত্তন বেশ ভাল বলিয়াই মনে করি কারণ ইহাতে বিভিন্ন হৃদয়ের উচ্চভাব ও মস্তিষ্কের প্রখরতা প্রকাশ পায়। মানব-সমাজ যে ক্রমেই উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতেছে তাহা সমাজে বিভিন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তির অভ্যুত্থানেই প্রকাশ পাইতেছে। আমাদের সমাজেও সম্প্রতি বিভিন্ন শ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের ভিন্ন ভিন্ন চিন্তার সমাবেশ দেখিতে পাইতেছি সত্য, কিন্তু সে সকল চিন্তাপ্রণালী মাত্রই যে তাহাদের উদ্ভাবনার ফল তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না।

নব্য ভাবুকদিগের অন্যতম এক সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন, আমরা সুদূর অতীতের স্মৃতি, আমাদের পিতৃপিতামহগণের কীর্ত্তি ব্যাখ্যা করিতে যাইয়াই হীনবল হইয়া পড়িতেছি। ইহাতে আলস্যের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছে। আমরা তাঁহাদের ধ্বজা উড়াইয়া বড় হইতে চাহিতেছি, জাতীয় উন্নতির এইগুলিই অন্যতম অন্তরায়।

কিন্তু তাই কি ঠিক? যাহারা কর্ম্মী প্রকৃতই কর্ম্মমন্ত্রে দীক্ষিত, যাহারা স্বদেশসেবক প্রকৃতই জাতীয় উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর, যাহারা আপনাদের অশন বসনের ব্যবস্থা আপনারাই করিতে চায়, অর্থাৎ মনুষ্যত্বের বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতে চায় তাহারা কি অতীতের স্মৃতি কিম্বা পিতৃপিতামহের যশোগান করিয়া জাতীয় উন্নতির ব্যাঘাত করিতে পারে? পিতৃপিতামহগণের যশোগানে কি জাতীয় চরিত্র অবনত হয়, জাতীয় উন্নতির প্রতিকূলে কি তাই? যে জাতি অতীতের স্মৃতি স্মরণ করিয়া জড় হয় হীনবল হয় সে জাতি একটা জাতি নহে, ধরাপৃষ্ঠ হইতে অচিরে লুপ্ত হওয়াই তাঁহার কর্ত্তব্য। সে জাতি সংসারের পক্ষে, উন্নতিশীল জগতের নিকট, এক স্তূপ আবর্জ্জনা, রাশি রাশি দুগ্ধভাণ্ডে একবিন্দু গোমূত্র সদৃশ। আমাদের সমাজকে উঠাইতে যাইয়া যাঁহারা এই চিন্তাপ্রণালী প্রচার করেন তাঁহাদের এই চিন্তা শক্তি অন্যের নিকট হইতে ধার করা বলিয়াই ধারণা হয়। যাঁহাদের অতীত নাই, যাঁহাদের প্রাচীন ইতিহাসে কোন গৌরবের ভূমিকা নাই, যাঁহারা অতীতের সৃষ্টি করিতে যাইয়া বর্ত্তমানেরই যশোগান করেন তাঁহারাই এই বাণীর উদ্ভাবক। জগতের কোন জাতি অতীত চায় না একথা কেহ বলিতে পারিবেন না। কাহারও লাখ লাখ বৎসর পূর্ব্ব হইতে অতীতের সুমধুর ঝঙ্কারে শ্রোতৃমণ্ডলী মোহিত হইতেছেন আবার কাহারও বা অতীতের গৌরবইতিহাসের পৃষ্ঠায় বদ্ধ হইবার জন্য এইমাত্র ধরা দিতেছে। তারপর আমরা বলিতে চাই সমাজের যে অংশ এই বাণী প্রচার করিতেছেন তাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে কতটা অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন? আমাদের বিশ্বাস তাঁহারা এখনও মতবাদই প্রচার করিতেছেন।

আমাদের অতীত গৌরবের স্মৃতিকে গাঢ়-তমিস্রাপূর্ণ কাল্পনিক, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা ভূষিত করিতে যাইয়া বক্তা দেখিলেন তাঁহার যুক্তিতে আমরা বাঙ্গালী ভারতবাসী মোহিত হইয়াছি। এই সম্মোহন যতই আমাদিগকে আঘাত দিতেছিল ততই আমরা দ্বিগুণ হিসাবে নীচে নামিতেছিলাম। একটা ব্যক্তিকে তাহার ব্যক্তিত্বের নিন্দা করিতে থাকিলে তাহার অধঃপতনের সূচনা দেখা যায় আর একটা জাতি যাহার সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে একমাত্র সান্ত্বনা তাহার বংশগৌরব ও পিতৃপিতামহের কীর্ত্তি, তাহাই যদি লুপ্ত হইতে যায় তবে তাহার আর কি থাকিল? নিজেদের আর কি আছে? আপন বলিবার শুধু এক অতীতের স্মৃতি। আমাদের নব্যসম্প্রদায় যেন অতীতের কাহিনী স্মরণে ভীত না হন। আমরা যদি অতীতের স্মৃতিতে বিভোর হইতাম, অতীতের কাহিনী গুলিকে হৃদয়ে আঁকিয়া লইতে পারিতাম তাহা হইলে আমাদের অবস্থা অন্যরূপ হইত— আমরা মানুষ হইতে পারিতাম। যাঁহারা অতীত কাহিনী স্মরণকে জাতীয় উন্নতির প্রতিকূল মনে করেন, এবং যাঁহারা অতীতের

স্মৃতিতে তন্ময় হন নাই, তাঁহারা উভয়েই এখনও কর্ম্মক্ষেত্রে প্রকৃতভাবে প্রবেশ করিয়াছেন এ কথা বলা যায় না।

অতীতের স্মৃতিকে ভয় করিবার কিছুই নাই। জাতীয় উন্নতির অন্তরায় ঠিক তাহার বিপরীত আচরণে। আমরা জটিল সভ্যতার ধরণ ধারণগুলি লইয়া জাতীয় উন্নতির অনুকূলে দাঁড়াইতে চাহি কিন্তু আমাদের জাতীয় সভ্যতাভাণ্ডারে কতটুকু জাতিত্ব আছে? মারাঠি, পাঞ্জাবি, তামিলী, হিন্দুস্থানী, প্রভৃতি সকলেরই একটা জাতিত্ব বোধ আছে, স্বতন্ত্রভাবে আমাদেরও আছে, নাই সেখানে যেখানে মারাঠি, দ্রাবিড়ী, তামিলী, হিন্দুস্থানী ও আমরা শিক্ষিত বাঙ্গালী আসীন।

নব্য ভারতের উন্নতির প্রবর্ত্তক যদি আমরা বাঙ্গালীই হই যদি সমুদায় ভারতবাসী আমাদের দ্বারাই মহান কর্ত্তব্য সাধিত হইবে আশা করিয়া থাকে তাহা হইলে আমরা বলিব আমরা এত শীঘ্র শীঘ্র পরানুবাদ ও পরমুখনির্গত বাণীগুলি সত্যরূপে গ্রহণ করিতেছি যে, আমাদের দ্বারা বিষম অনিষ্টও সাধিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। যাঁহারা কিছুই করিবেন না কোন নূতন চিন্তা যাঁহাদের দ্বারা প্রসূত হইবে না তাঁহারা শুধু আমাদের অতীতের স্মৃতি স্মরণ করুন, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া, প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করুন। ইঁহাই তাঁহাদের কাজ, ইহাই আমাদের জীবনসাধনার অন্যতম উপায় হউক

* *
*

৮। সাগরের ডাক

তিনটি জিনিষের সন্নিচয়ে নাটকের সৃষ্টি হয়। প্রথমতঃ মানুষের লীলা, দ্বিতীয়তঃ বাহ্য ঘটনা ও কার্য্যের সমাবেশ, তৃতীয়তঃ একটী ভাবের উন্মেষ। এই তিনটীর মধ্যে যে কোনটী নাটকের মুখ্য বিষয় ও মূলগত হইতে পারে। এই গুলির এক একটীর প্রাধান্য অনুসারে নাটকের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয়। মানুষের লীলা যেখানে ঘটনা ও ভাবের সৃষ্টি করে, যেখানে নায়ক নায়িকার Temperament হইতেই plot ও ideal এর সৃষ্টি হয় তাহার উদাহরণ নাট্য-সাহিত্যে দুর্ল্লভ নহে। Hamlet কে এই শ্রেণীর নাটক বলা যাইতে পারে। অনেক সময় আবার বাহ্য ঘটনার সমাবেশেই নাটকের প্রাণ সৃষ্টি হয়। Plot এই নায়ক নায়িকার চরিত্রের ও আদর্শের গতি নির্ণয় করে। Shakespear এর Comedy of Errors কে এই শ্রেণীতে ফেলা যায়। কিন্তু ইহা ছাড়া নাটক আর এক রকম আকার ধারণ করিতে পারে। নাটকের মধ্যে সর্ব্বদাই একটা ভাব বা আদর্শ থাকে। কিন্তু উল্লিখিত শ্রেণীর নাটকে এই ভাব ঘটনার সমাবেশ ও মানব প্রকৃতির স্ফুরণের ফল বা কার্য্যমাত্র। কিন্তু এই শেষোক্ত প্রকারের নাটকে ভাবের দ্বারাই মানবচরিত্রের লীলা ও ঘটনার সমাবেশ নিয়ন্ত্রিত হয়। Character ও plot যেন এই আদর্শের এই ভাবের আত্মবিকাশের ভাষা মাত্র। Browning এর Paracelsus এই প্রকারের নাটক। শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ লাহিড়ী মহাশয়ের সাগরের ডাককেও আমরা এই শ্রেণীতে ফেলিতে চাই। নাটকের নায়কে মধু অনন্তের পিপাসায় আত্মহারা হইয়া কার্য্যের উদ্দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কেবল পরোক্ষ জ্ঞানে তাঁহার সাধ মিটিতেছে না। জনশ্রুতি অনন্ত সাগরকে হয় কূপবাপীতে পরিণত করে না হয় কেবল মাত্র কাল্পনিক ও ক্ষণিক অনুভূতির বিষয় মনে করে। মধু চান অপরোক্ষ অনুভূতি, সাক্ষাৎকার। তাই তিনি "গণ্ডী পাড়া" হইতে নূতন বস্তীতে, চলিলেন। কিন্তু সেখানেও দেখিলেন যে সাগরকে কেবলমাত্র একটা কবির কল্পনাতে পরিণত করা হইয়াছে। তাই মধু পথে বাহির হইলেন। এই পথে চলাটা ধর্ম্মপিপাসার Dialectic movement—আঁধারে আলোতে ঝড়ে ঝঞ্ঝায় জীবনটা উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিতেছে। প্রতি নিমেষেই আশার গতি রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহার মধ্য দিয়াই প্রতিপদে সাগরের আকাঙ্ক্ষাটা প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এইখানে আবার দেখান

হইতেছে যে এই পিপাসার শান্তি নিজে নিজে হয় না। এমন একজন চাই যে হাতে হাত দিয়া কণ্টক সঙ্কুল সরণে পিপাসুকে তার বাঞ্ছিত সাগরের দিকে লইয়া যাইবে। এমন একটা হৃদয় আবশ্যক যে নিজের বলে অপরের ক্ষীণ প্রাণকে বলীয়ান করিয়া তুলিবে। ইহা ছাড়া মানবের প্রাণ একক এত দূর পথ বাহিয়া চলিতে পারে না। এই যুগলের সম্বন্ধই হইতেছে হিন্দুর গুরুবাদ। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যুগলের যুগলত্ব থাকে না। প্রাণে প্রাণ মিশিয়া যায়, হৃদয়ে হৃদয় লীন হয়। পরে যখন সাগরের ভীষণ মধুর নির্ঘোষ মনের দ্বারে আসিয়া আঘাত করে তখন যেন গুরুশিষ্য একত্র মিশিয়া অনন্তের পানে ছুটিয়া চলে।

কিন্তু এইখানেই পথের শেষ নয়। যে পথ বাহিয়া সাগরের মুখে যাওয়া যায় স্নান তৃপ্ত প্রাণ আবার সেই পথ বাহিয়া ফিরিয়া আসে। তখন আঁধার মধুর গোধূলির আলোয় হাসিয়া উঠে, পথের তৃণ ধূলা ফুল হইয়া ফুটে, সংসারের পূতিগন্ধ আবর্জ্জনা অর্চনার ধূপগন্ধে আমোদিত হয়। এইরূপে সাগর "উল্‌টাডাঙা"তেও করুণার স্রোত প্রবাহিত করিল।

দর্শনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই গতি-চেষ্টা Dialectic। ইহা সুপরিচিত Hegelian Dialectic নয়। ইহার গতি অন্যরূপ—প্রতিপদেই একটা Antithesis আসিয়া Thesisকে চূর্ণিত করে না। আজকাল আমাদের দেশে যতগুলি এই ধরণের গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে সব গুলিতেই আমরা এই Dialectic পরিচয় পাই। রবীন্দ্রনাথের "রাজা" শ্রীযুক্তা সরযূবালা দাসগুপ্তার "বসন্ত প্রয়াণ" ও "ত্রিবেণী সঙ্গম" ও "সাগরের ডাক", সর্ব্বত্রই আমরা জীবনের এই নূতন গতির পরিচয় পাইতেছি। আশা করি কোনও দার্শনিক এই গতির Logic আমাদের নিকট সুপরিচিত করিয়া দিবেন।

"সাগরের ডাক" এর মূলগত ভাব জীবনের এই অভিনব আদর্শ। এই আদর্শই নানা মূর্ত্তিতে নানা পথে আত্মবিকাশ করিয়াছে ও নাটিকার Character ও Plot এর সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের "রাজা"র নায়ক নায়িকাদের যেমন একটা realistic প্রকৃতি আছে, তাহাদিগকে যেমন কেবল মাত্র একটা চিন্তা বা আদর্শের নাম বা প্রকাশ বলিয়া ধরিয়া লইবার কারণ নাই, "সাগরের ডাক" সম্বন্ধে আমরা সে কথা বলিতে পারি না। ইহার নায়ক রক্তমাংসের মানুষের মত মোটেই ব্যবহার করে না। একটীও অবান্তর কথা বলে না। কাজেই যদি লেখকের ভাষা চাতুর্য্যের একটুও অভাব হইত তবে দুই এক জায়গায় পড়িয়া মনে হইত যেন কেবল কতকগুলি বক্তৃতা একত্র করিয়া রাখা হইয়াছে।

আর একটী কথা বলিয়া আমরা সমালোচনা শেষ করিব। বইখানি পড়িয়াই বুঝা যায় যে লেখক কি বলিতে চান তাহা তাঁহার মনে অতি স্পষ্টভাবে বর্ত্তমান। যদি তাহা না হইত যদি লেখার সঙ্গে সঙ্গে ভাবটা ফুটিয়া উঠিত তবে বোধ হয় উপরোক্ত দোষটী মোটেই দৃষ্টিগোচর হইত না। কিন্তু ভাবটীও সেই সঙ্গে অপরিস্ফুট থাকিয়া যাইত। লেখক তাঁহার অসাধারণ শব্দ নির্ব্বাচন ও ভাব প্রকাশের ক্ষমতায় পুস্তক খানির যদি অপর কোনও দোষ থাকে তাহা লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিয়াছেন।

৯। পরলোকগত ব্যোমকেশ মুস্তফী

বাঙ্গালা দেশে অনেক কর্ম্মী আছেন, কর্ম্ম অপেক্ষা তাঁহাদের নাম যশ বেশী। হয়ত তাঁহারা চোকা চোকা ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারেন বা লিখিতে পারেন—হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির আড়ম্বর তাঁহাদের আছে—হয়ত আভিজাত্যের মর্য্যাদাও তাঁহাদের থাকিতে পারে। সেই জন্য তাঁহাদের চারিপাশে একটা মোহের সৃষ্টি হয় এবং অধিকাংশ লোকে তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে লইয়া একটা হৈ চৈ ব্যাপারের অভিনয় করে।

কিন্তু আমরা কর্ম্মী অপেক্ষা কর্ম্মকেই বেশী শ্রদ্ধা করিতে চাই। আমরা দেখিতে চাই কর্ম্মই কর্ম্মীকে ডুবাইয়া ফেলিয়াছে—কর্ম্মের ক্ষেত্রই বিস্তৃত হইতে বিস্তৃততর হইয়া পড়িতেছে—কিন্তু কর্ম্মীর নাম যশ নহে। এই ভাবে নিজকে আড়ালে রাখিয়া যিনি কর্ম্মধারাকে প্রবলভাবে প্রবাহিত করিয়া দিতে পারেন, আমরা তাঁহারই মধ্যে ভারতীয় কর্ম্মবীরের সাধনা পরিস্ফুট দেখিয়া থাকি। নিজের নামধাম নিজের ব্যক্তিগত জীবনেতিহাস খোঁজ করিবার ভার ভবিষ্যৎ বংশীয় প্রত্নতাত্ত্বিকদের হাতে ফেলিয়া যিনি তাঁহার কর্ম্মকে লোকচক্ষুর সম্মুখে জীবন্ত রাখিয়া যাইতে পারেন তিনিই ভারতের সন্তান।

পরলোকগত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের জীবনে আমরা এই ভারতীয় কর্ম্মসাধনার কিঞ্চিৎ আভাস পাই। উচ্চ উপাধি ধন সম্পদ বা অদ্ভুত সাহিত্য-প্রতিভা প্রভৃতি যে সকল বাজার গরম করিবার গুণ, তাহা তাঁহার কিছুই ছিল না। কিন্তু তাঁহার হৃদয় ছিল, অনুরাগ ছিল আর ছিল তাঁহার বিপুল পরিশ্রম করিবার শক্তি। সে সমস্তই তিনি বাঙ্গালার সাহিত্য-প্রচার-অনুষ্ঠানে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য-রচনায় রস পাইয়া থাকেন অনেকেই, সাহিত্য-প্রচার বা প্রচার-ক্ষেত্র নির্ম্মাণে রস উপভোগ অনেকেই করিতে চাহেন না বা পারেন না। কিন্তু ব্যোমকেশ সেই রস-উপভোগ করিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা লইয়া দেখা দিয়াছিলেন। ভুল করিলে চলিবে না সাহিত্য-অনুরাগ কেবলমাত্র লেখকেরই সম্পত্তি। পাঠক এবং প্রচারক উভয়েই তাহার অধিকারী, অতএব এ উভয়কে সাহিত্যের আসর হইতে বাদ দিলে চলে না। ব্যোমকেশকেও সেই জন্য আমরা সাহিত্যসেবী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-প্রতিষ্ঠা, তাহার শ্রীবৃদ্ধি এবং বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন অনুষ্ঠানে ব্যোমকেশ সেই সেবার যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ জানেন এই সেবাধর্ম্ম পালনে তিনি কতখানি আন্তরিকতা, কতখানি নিঃস্বার্থপরতা, কতখানি ত্যাগ স্বীকার দেখাইয়াছেন, কিন্তু বাহিরের লোক তাহা জানে না!—তাহারা কর্ম্মফল দেখিয়াছে কিন্তু তাহার পশ্চাতে কর্ম্মীকে দেখিতে পায় নাই—ইহাই ব্যোমকেশের বিশেষত্ব।

বাঙ্গালা দেশ হইতে ব্যোমকেশ চলিয়া গেলেন। তাঁহার কর্ম্ম রহিল। দেশবাসী সেই কর্ম্মকে প্রীতির চোখে না দেখিয়া থাকিতে পারিবেন না। কর্ম্মী তাঁহাদিগের নিকটে কোন প্রতিদানই আকাঙ্ক্ষা করেন নাই, কিন্তু কর্ম্মীর প্রতি তাঁহাদিগের একটা কর্ত্তব্য আছে। যাঁহারা সেই কর্ত্তব্য পালনে অগ্রসর হইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে বলিয়া দেওয়া উচিত ব্যোমকেশ প্রকাণ্ড ঋণের ভার ক্ষুদ্র পরিবারের স্কন্ধে চাপাইয়া প্রস্থান করিয়াছেন। এই ঋণ হইতে মুক্তি দিতে পারিলে তাঁহার প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়, একথা কি আর বলিয়া দিতে হইবে?

**
*

১০। কর্ম্মীর নীরবতা

একজনকে আদর্শ রাখিয়াই তাঁহার অধীনে শত শত সেবক কর্ম্মী গঠিত হইতে থাকে। যাহারা প্রকৃত কর্ম্মী হইতে চাহেন, তাঁহারা যখন তখন নিজেদের আত্মম্ভরিতা, অসার বাগ্মিতা প্রকাশ করেন না। কর্ম্মিগণকে সর্ব্বদাই সংযত সংহত হইয়া আদর্শ ব্যক্তির আদেশ পালন করিতে হয়। যিনি আদর্শ ব্যক্তির নিকট নিজ প্রাধান্য প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া পড়েন, তাঁহার দ্বারা সময়ে বিপদ ঘটিতে পারে। যখনই তাঁহার ব্যক্তিত্বে আঘাত পড়িবে তখনই তিনি সে নীচ প্রবৃত্তির আশ্রয় লইতে ছাড়িবেন না। এই জন্যই আমাদের সমাজ সেবার জন্য নীরব কর্ম্মীর সর্ব্বদা প্রয়োজন। কর্ম্মীর নীরবতা বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্য্য কলাপের অনুশীলন দ্বারাই আসে। কর্ম্মীকে সংযত করিবার জন্য আদর্শ পুরুষকে বিভিন্নরূপ শিক্ষণীয় বিষয় উপস্থিত করিতে হয়।

নীরব সেবক-কর্ম্মীর দ্বারাই সাম্প্রদায়িক মতবাদ পুষ্টিলাভ করে ও তাহার দ্বারাই সর্ব্বত্র প্রচার কার্য্য সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্য, রামমোহন ও রামকৃষ্ণের সেবক সম্প্রদায়ের মধ্যেও নীরব কর্ম্মী দেখিয়াছি এবং তাহাদের দ্বারাই সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য আজও সর্ব্বত্র প্রচারিত রহিয়াছে। বিভিন্ন যুগে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যাঁহাদের চরিত্রের পরিচয় রহিয়াছে, তাঁহারা গুরুসমীপে নীরবতা পালন দ্বারাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। গুরুসমীপে আত্মসমর্পণ ব্যতীত নীরবতার ভাব আসে না। আত্মসমর্পণ করা গুরু শিষ্য উভয়ের উপরেই নির্ভর করে। গুরু বা আদর্শ পুরুষের কোন দিনই ইচ্ছা নয় যে কর্ম্মীকে চাপিয়া রাখিয়া আপন কৃতিত্ব জাহির করেন। সেবকের কৃতিত্বেই তাঁহার কৃতিত্ব; সেবকের শান্তিকেই তাঁহার শান্তি।

সেবক সম্প্রদায়ের মধ্যে তিন শ্রেণীর কর্ম্মী দেখা যায়—এক শ্রেণী নামে সেবক কিন্তু আপন কৃতিত্ব প্রচারে উৎসুক, দাম্ভিকতার প্রতিমূর্ত্তি। আর এক শ্রেণী আছে তাহারা নিঃস্বার্থভাবে যে কোন কাজ করিতে পারে। ইহাদের নিজেদের কোন ব্যক্তিত্ব নাই। ইহারা Blind follower বা অবিবেচক কর্ম্মী হইলেও সাম্প্রদায়িক অনিষ্টের কোন হেতু নহে। তারপর যাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীতে তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। তাঁহারা আপন বিদ্যা-বুদ্ধির প্রখরতা জাহির করেন না। দাম্ভিকতা দ্বারা আপন ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য কোন উদ্বেগ তাঁহাদের নাই। নিঃস্বার্থভাবে সাম্প্রদায়িক কাজ কর্ম্মের বিধান করিতে যত-টুকু কৃতিত্ব দেখাইবার প্রয়োজন তদতিরিক্ত তাঁহারা প্রকাশ করেন না, সর্ব্বদাই আদর্শ পুরুষের আজ্ঞাপালনই একমাত্র কর্ত্তব্য মনে করিয়া "যথানিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" বলিয়া প্রতিমুহূর্ত্তেই সমাজের জন্য আপনাকে তাঁহারা বিলাইয়া দিতে থাকেন।

বিনা বিচারে বিনা তর্কে, কোন যুক্তির আশ্রয় না লইয়া যখন কর্ম্মী আদর্শ-পুরুষের ভিতর দিয়া সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যকে ধরিতে চায়, তখন সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গুরুর আদেশে আপন উজ্জ্বল বর্ত্তমানকে ভবিষ্যতের অন্ধকার গর্ভে বিলীন হইতে দেখিয়াও কোন রূপ অপ্রসন্নতা প্রকাশ করে না। ইহাতেই তাহার আত্মার প্রশান্তি। গুরুর মাহাত্ম্য সাম্প্রদায়িক কর্ম্ম প্রণালীর বহ্যৎ উন্নতির করে। এইরূপ কর্ম্মীর দ্বারাই সমাজে নূতন আলোক আসে, একটা পরিবর্ত্তনের সূচনা করে।

কর্ম্মবীর হনুমান ও অর্জ্জুন এই দাস্যভাবের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উভয়েই ব্যক্তিত্বের আদর্শ, মূর্ত্তিমান প্রলয় কিন্তু তবুও সংযত, আপনাদের উপাস্যের কাছে দীনাতিদীন, ইহাই তাঁহাদের মাহাত্ম্য বিকাশের কারণ। কর্ম্মীর ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠার জন্যই আত্মসমর্পণ দ্বারা নীরবতা অর্জ্জনের প্রয়োজন। সমাজ-গঠন, রাষ্ট্রগঠন বিভিন্ন কর্ম্ম প্রণালীর প্রবর্ত্তন কর্ম্মীর ব্যক্তিত্বেরই উপর নির্ভর করে। জ্ঞানে হউক, কর্ম্মে হউক, আর ভক্তিতেই হউক, চাই নীরবতা, চাই দাস্যভাব। আমরা প্রমাণ করিতে চাই কর্ম্মীর নীরবতা সমাজ জীবনের ভিত্তি। আমরা চাই শত ভ্রান্তি শত অন্যায় দেখিয়াও সে গুলিকে মঙ্গলের দীপ শিখা বলিয়া বরণ করিতে। আমরা চাই মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে।

১১। বঙ্গবাণীর ভাবীসেবক

বাঙ্গালা সাহিত্যের যজ্ঞভূমে নামিয়া আমরা বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীকেই হোতারূপে দেখিতে পাইতেছি। মুসলমানগণ ভিন্নদেশ হইতে আসিয়াছেন। তাঁহারা দীর্ঘকাল নীরবে বসিয়া থাকিলেও সম্প্রতি আপনাদের ভ্রম-সংশোধনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া নানাদিক বাছিয়া লইতেছেন। মহম্মদীয় সম্পাদকগণের পরিচালিত ২।৪ খানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রই মাতৃভাষার উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট নহে। তাই কেবল মাত্র মুসলমান লেখকদিগের দ্বারাই একখানি মাসিক পত্র চলিতেছে। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, তাঁহারা পূর্ব্বপুরুষগণের আরবিক ও পারসিক

সাহিত্যের দিকেই তাকাইয়া রহেন নাই, অথবা ভারতের অতীত ইতিহাসের এক অধ্যায় কেবল মাত্র মুসলমানগণের রণহুঙ্কারের দ্বারাই পূর্ণ রহিয়াছে বলিয়া তাঁহারা মত্ততার পরিচয় দিতেছেন না। আজ আমরা দেখিতে পাইতেছি তাঁহারা মাতৃভাষার একনিষ্ঠ শক্তিমান সেবক। তাঁহারা আমাদের উন্নতির জন্য কোন নূতন চিন্তা বা পরিকল্পনা খাড়া করিতে না পারিলেও বিভিন্নভাবে আপনাদের প্রাধান্য বজায় রাখিয়াছেন। সমৃদ্ধিশালী পারসিক সাহিত্যের অনুবাদ দ্বারা বঙ্গভাষার পুষ্টি তাঁহাদের দ্বারাই সম্পন্ন হইবে। গ্রাম্য মুসলমান কবিগণও মাতৃভাষার সেবায় নিরত।

আমরা এক কবি মধুসূদন ব্যতীত বঙ্গীয় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের বাঙ্গালা ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি না দেখিলেও তাঁহারা যে বাঙ্গালী জাতি এইটা আমরা তাঁহাদের কথোপকথনের ও চালচলন্তির দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছি।

এতদিন সংস্কৃত সাহিত্য ম্যাক্সমূলার প্রমুখ জার্ম্মাণ পণ্ডিতগণেরই একমাত্র আলোচ্য বিষয় ছিল। ভারতবর্ষের জ্ঞান বিজ্ঞানের রক্ষণ ও বিপুল প্রচার এই সকল জার্ম্মাণ পণ্ডিতগণেরই চেষ্টার ফল। আজ বাঙ্গালা সাহিত্য জার্ম্মাণ, ইংলিশ আমেরিক ও জাপানীদিগের পঠনীয় বিষয় হইয়াছে; এবং আমরা আশা করি অনতিদূর ভবিষ্যতেই দেখিতে পাইব, চীন জাপানের বিদ্যামন্দিরে, বার্লিন, হার্ভার্ড ও ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে বাঙ্গালা সাহিত্য অন্যতম পঠনীয় বিষয় রূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে।

খাঁটী ইউরোপীয়গণও বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় দেশীয় খ্রীষ্টান বা ইউরেশিয়ানগণ বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি অত্যন্ত উদাসীন। তাঁহারা যেন এ দেশে থাকিয়াও ইহার মধ্যে নাই বলিয়াই মনে হয়। ইউরেশিয়ানগণ ইউরোপীয় রক্তসংমিশ্রণের ফল হইলেও একমাত্র ইংরেজী ভাষাই তাঁহাদের মাতৃভাষা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তাঁহারা দীর্ঘকাল যাবৎ এ দেশের বিভিন্ন সহরে ও পল্লীতে আপনাদের 'টোলা' প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; আপনাদের ধর্ম্ম ভাষা ও সমাজ লইয়া এক অংশে পড়িয়া রহিয়াছেন। বিলাত যে তাঁহাদের মাতৃভূমি নয়, বিলাতের সূচ্যগ্র ভূমিও যে তাঁহাদের জন্য পড়িয়া রহে নাই, বিলাতের সমাজের অতি নিম্নশ্রেণীর নাগরিকও যে তাঁহাদের সঙ্গে একত্র উপবেশন করিতে নারাজ এক কথায় কোন ইউরেশীয়গণের স্বার্থ যে বিলাতের কাহারও স্বার্থের সহিত নিয়ন্ত্রিত নয় এ ধারণা ইউরেশিয়ানগণ এবং যে কোন বুদ্ধিমান লোক মাত্রেই করিতে পারেন।

আমরা সকল বাঙ্গালী যেখানে সমবেত, যেখানে হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান প্রত্যেকেই বিভিন্ন ধর্ম্মের হইয়াও শুধু বঙ্গবাণীর, আরাধনার কালে এক, তখন ইউরেশিয়ানগণ পৃথক্ থাকিলে চলিবে কেন? বাঙ্গালার মাটি, বাঙ্গলার ফল শস্য, ভারতের জলবায়ুতে তাঁহারা আমাদের সঙ্গে সমভাগে ভাগী। যুগযুগান্তের কত ধর্ম্মের উত্থান পতনের চিহ্ন ভারতের বুকে রহিয়াছে; হিন্দুধর্ম্মের সামাজিক বন্ধনের ফলে তাহার নিজেরই যে যথেষ্ট শ্রেণী বিভাগ রহিয়াছে। সে কি মাতৃসেবায় পৃথক্ ভাব আনিতে পারে? আজ সকলকেই ত আপনার পাশে টানিয়া লইবার মত বিভিন্ন কেন্দ্রে শক্তি সঞ্চয় করিতেছে। সেবক যে সম্প্রদায়েরই হউন না কেন সেব্য চিরদিনই তাহার উপাসনা গ্রহণ করিতে বাধ্য। ইউরেশিয়ানগণ পুরুষানুক্রমে এই দেশে বাস করিতেছেন। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে কি লাভালাভ পাইয়াছি? বলিতে গেলে এইমাত্র পাই—তাঁহারা দীর্ঘকাল এইদেশে বাস করিয়াও আমাদের সহিত জাতীয়তা পরিশূন্য। তাঁহারা বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালী জাতির হইয়াও ইংরেজী ভাষায় সেবক; বাঙ্গালাভাষাকে এই সুদীর্ঘকাল তাঁহারা আপন করিতে পারেন নাই। যাঁহারা অশন বসনে আমাদের অংশীদার, যাঁহারা বঙ্গের গৌরবে গৌরবান্বিত, আমাদের নিকটপ্রতিবেশী, ভবিষ্য সুখদুঃখে সহানুভূতির

আশ্রয়, বাঙ্গালা ভাষা তাঁহাদের নিকট আর অনাদৃত থাকিলে চলিবে কেন?

বিদেশী জাতিসমূহের অপেক্ষা নানা প্রকার সুবিধালাভ সত্ত্বেও তাঁহারা যদি বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চায় বীতশ্রদ্ধ হন এবং জাতীয়তার একমাত্র কেন্দ্রে লত হইতে ইচ্ছুক ন হন তাহা হইলে সে আমাদেরই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। হয় ইহা আমাদের চেষ্টার অভাব অথবা তাঁহাদের এক প্রকার গোঁড়ামির ফল।

অবশ্য একথা স্বীকার্য্য এক বা দুই পুরুষেই তাঁহাদের মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের বিপুল বিস্তৃতি হওয়া অসম্ভব। কিন্তু যদি তাঁহারা বাঙ্গালার স্বার্থের সঙ্গে আপনাদের স্বার্থ সম্পর্ক তুলনা করেন, তাহা হইলেই দেখিতে পাইবেন, বাঙ্গালা ভাষাকে আদর করা তাঁহাদের কতদূর কর্ত্তব্য। বুঝিতে পারিবেন, যে দেশে তাঁহাদের জন্মমৃত্যু সেই দেশের ভাষাকে মাতৃভাষার মত পূজা না করিলে তাঁহাদের ক্ষতির ভাগটাই বেশী।

হয়ত তাঁহাদের বাঙ্গালা ভাষার সেবা গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করে। কিন্তু একথা নিশ্চিতই বুঝিতে হইবে তাঁহারা আমাদের নিকট হইতে কখনই পৃথক থাকিতে পারিবেন না। একদিন না একদিন তাঁহারা নিজের অবস্থা ভাল করিয়াই হৃদয়ঙ্গম করিবেন এবং সেইদিন তাঁহারা দেখিতে পাইবেন ভাষার ঐক্য বন্ধন অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহারা এ দেশ হইতে কতটা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। সেই ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া আমরা তাঁহাদিগকে বঙ্গবাণীর আরাধনার জন্য এখন হইতেই আহ্বান করিতেছি। আমাদের এ আহ্বান হয়ত অনেকের কাছে এখন হাস্যকর বলিয়াই বোধ হইবে, হয়ত ইহা লইয়া খানিকটা বাকবিতণ্ডাও চলিতে পারে। তবু আমরা তাঁহাদিগকে ডাক দিতে ইতস্ততঃ করিতেছি না। তাঁহারা কি এই ডাকে কর্ণপাত করিবেন না?

অভিব্যক্তি বাদ

(Theory of Evolution)

ভুতাভিব্যক্তি বাদ

"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ,
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশ লোমানি,
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥"
মুণ্ডকোপানিষৎ।

পরমাণুবাদ বিশ্বব্যাপার ব্যাখ্যানের চরম সিদ্ধান্ত (final theory) হইতে পারে না। পরমাণু অবিনশ্বর মৌলিক পদার্থ নহে। কোন একটা ইন্দ্রিয়ের অতীব অসীম পদার্থের বিকৃতি বা পরিণাম ব্যতীত ইহারা আর কিছুই নহে। বিশেষতঃ বহু মৌলিক সত্তার স্বীকার দার্শনিকতার অনুকূল নহে। দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিদ্যাই বৈচিত্র্যকে ঐক্যে পরিণত করিবার চেষ্টা মাত্র। পরমাণুর মৌলিকত্ব স্বীকারে বস্তুতঃ বহুত্ববাদ আসিয়া পড়ে। এই বহুত্ববাদ বিজ্ঞান রাজ্যেও আদৃত নহে। দেখিতে পাওয়া যায় বটে যে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বিষয় ভিন্ন ভিন্ন। দেখিতে পাওয়া যায় বটে আলোক, উত্তাপ, তড়িৎ, চৌম্বক ধর্ম্ম প্রভৃতি পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কিন্তু পরীক্ষা করিলে প্রতীত হয়, এই বিভিন্নতার মূলদেশে এক ঐক্য বিরাজমান। প্রতীত হয়, এই দৃশ্যমান বিভিন্নতাই গৌণ বা আগন্তুক; ইহার অন্তস্তলে এক মহা একতা (identity) লুক্কায়িত। সমস্ত পার্থিব গুণবৈষম্য পরিমাণবৈষম্য হইতে সমুদ্ভূত। আলোক, উত্তাপ, তড়িৎ, চুম্বকশক্তি প্রভৃতি পদার্থকে একরূপ হইতে রূপান্তরে পরিবর্ত্তিত করা যায়। এতাবতা সপ্রমাণ হইতেছে ইহারা সকলেই এক মৌলিক তত্ত্বের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। বৈজ্ঞানিকগণ তাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন পরমাণুরূপী অসংখ্য ভৌতিক কণাগুলি সেই মূল প্রকৃতির বিকৃতি।

এই মূল প্রকৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে নানা মুনি নানাপ্রকার জল্পনা কল্পনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

গ্রীক দার্শনিক থেলস্ অনুমান করিলেন, অপই জগতের মূল প্রকৃতি। জাগতিক সর্ব্ব বস্তুই সেই অপের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি। এই অপ (humid element) সম্পূর্ণ জড় ধর্ম্মী নহে; একেবারে চিন্ময়ও নহে। অপ সংকোচন প্রসারণ এই দুইটি ধর্ম্মবিশিষ্ট।

হিরাক্লিটাস ভাবিলেন তাহা নহে। তেজই বিশ্বের মৌলিক তত্ত্ব। সমস্তই তেজ পদার্থের বিকৃতি। উহাতেই সকল বস্তুর উদ্ভব, উহাতেই সকল বস্তুর বিলয়। কিন্তু এই তেজ আমাদের চির-পরিচিত অগ্নি নহে। ইহা এক অদ্বিতীয়, অনির্দ্দেশ্য মূলতত্ত্ব।

অস্মদ্দেশীয় জ্ঞানবৃদ্ধ ঋষি কপিল মনে করিলেন, জগতের মূলতত্ত্ব দুইটি,—পুরুষ ও প্রকৃতি। তন্মধ্যে পুরুষ বহু, নির্গুণ, নির্লিপ্ত এবং নিষ্ক্রিয়; আর প্রকৃতি এক, অপরিচ্ছিন্ন,

নির্ব্বিশেষ পদার্থ। ইহাই সমস্ত দ্রব্যের মূলীভূত উপাদান। তাঁহার মতে—

"প্রকৃতি পুরুষয়োরণ্যৎ সর্ব্বমনিত্যং।

প্রকৃতি কাহাকে বলে—এই প্রশ্নের উত্তরে কপিল বলেন,—

"সত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ।"

এই প্রকৃতি "মূলে মূলাভাবাৎ অমূলং মূলং।"

ইহা হইতে প্রতীয়মান হইতেছে পরমাণু প্রভৃতি প্রকৃতি ও পুরুষের বহির্ভূত হওয়ায়, অনিত্য। যাহা অনিত্য তাহা "অমূলং মূলং" নহে; অর্থাৎ তাহা জগতের মূলতত্ত্ব হইতে পারে না।

সাংখ্যকার কপিল পরিণামবাদী--সৎকার্য্যবাদী। তাঁহার মতে "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" অর্থাৎ জগতে অসৎ পদার্থের উৎপত্তি হয় না, সৎ পদার্থেরও বিনাশ হয় না। শক্তির আবির্ভাব তিরোভাব অবলম্বন করিয়াই আমরা বস্তুর উৎপত্তি বিনাশ কল্পনা করিয়া থাকি। প্রকৃত পক্ষে যাহা কার্য্য তাহা কারণেরই ব্যক্তাবস্থা; এবং যাহা বিনাশ তাহা কারণেরই স্বরূপপ্রাপ্তি। তাই তিনি বলিয়াছেন, "নাশঃ কারণলয়ঃ। অর্থাৎ নাশ অর্থ, কারণে লয় প্রাপ্তি।

এই খানেই কপিলের সহিত গৌতমকণাদের বিরোধ। তাঁহারা আরম্ভবাদী, অসৎকার্য্যবাদী। তাঁহাদের মতে কার্য্য কারণঅতিরিক্ত অভিনব পদার্থ, উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহার অস্তিত্ব থাকে না। কারণ সমবায়ে তাহার আরম্ভ বা উৎপত্তি হয়। কারণকলাপের মিলনের পূর্ব্বে যদি কার্য্য বিদ্যমান থাকে, তবে কারণকলাপের প্রয়োজন কি? কপিল বলেন, প্রয়োজন আছে। কারণের পূর্ব্বে কার্য্য বিদ্যমান থাকিলেও স্থূলরূপে—ব্যক্তরূপে—বিদ্যমান থাকে না; তখন উহা কারণের আত্মভূত অবস্থায় থাকে; কারণকলাপের সাহায্যে তাহা ব্যক্ত ভাবাপন্ন হয় এই মাত্র।

মহাত্মা শঙ্কর বলিয়াছেন:—

প্রভবতি নহি কুম্ভোঽবিদ্যমানো মৃদশ্চেৎ
প্রভবতু সিকতায়া বামবা বারিণোবা।
নহি ভবতি চ তাভ্যাং সর্ব্বথা কাপি তস্মাদ্
যত উদয়তি যোঽর্থোঽস্যাত্র তস্য স্বভাবঃ।
অন্যথা বিপরীতং স্যাৎ কার্য্য কারণ লক্ষণম্
নিয়তং সর্ব্বশাস্ত্রেষু সর্ব্বলোকেষু সর্ব্বতঃ। ১

কিন্তু একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলে প্রতীত হইবে যে কপিল ও গৌতম যে বিষয় লইয়া বিবাদ করিতেছেন তাহা উভয়ের পক্ষেই ভিন্ন ভিন্ন। কপিল যাহাকে কার্য্য বলিতেছেন গৌতম তাহাকে কার্য্য বলিতেছেন না, অথবা তিনি যে ভাবে কার্য্যকে দেখিতেছেন, গৌতম সে ভাবে কার্য্যকে দেখিতেছেন না। উপাদানের দিক হইতে দেখিলে কপিলের কথাই সত্য; আবার পরিবর্ত্তনের দিক হইতে দেখিলে গৌতমকণাদের কথাই সত্য বলিয়া বোধ হয়। কারণের একটা অভিনব অবস্থা (mode) কপিলও অবশ্য স্বীকার করিবেন; এবং এ অবস্থাটী যে আগন্তুক তাহাও স্বীকার্য্য। এই অবস্থাই প্রতিবাদির কার্য্য। সুতরাং এখানে বিবাদের স্থল কোথায় তাহা বুঝা যাইতেছে না। ঘটরূপ অবস্থা নিশ্চিতই মৃত্তিকাবস্থা হইতে বিভিন্ন। গৌতম কণাদ বলেন উহাই প্রকৃত পক্ষে কার্য্য। কপিল

১। সর্ব্ববেদান্ত সিদ্ধান্ত সারসংগ্রহঃ—শূন্যবাদ-নিরাস ৫৯২—৫৯৩।

বলেন ঐ অভিনব অবস্থাটি যাহার তাহাই প্রকৃতপক্ষে কার্য্য। অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তন্নিরূপিত বস্তুর পরিবর্ত্তন হয় না। অথবা তাঁহার মতে এক অবস্থা অন্য অবস্থার আবরণ; ঘটের যেটা কারণ অবস্থা তাহা ঘটরূপের আবরণ; এই আবরণ উন্মুক্ত হইলেই ঘটরূপের প্রকাশ অবধারিত। কিন্তু এ তর্কও বিচারসহ নহে। আবৃত অবস্থা ও মুক্তাবস্থা উভয় বিভিন্ন। সেই প্রকার কারণ অবস্থা ও কার্য্য অবস্থাও বিভিন্ন। সুতরাং কার্য্য অবস্থার সম্বন্ধে সৎকার্য্যবাদ কি প্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে তাহা বুঝা যাইতেছে না। তবে সাংখ্যকার যে বলিয়াছেন "শক্তস্য শক্য করণাৎ" অর্থাৎ কারণে শক্তিরূপে যাহার সত্তা নাই, কার্য্যরূপে তাহার আবির্ভাব হইতে পারে না একথা খুবই সত্য বলিয়া বোধ হয়। গৌতম কণাদ বোধ হয় তাহাই অস্বীকার করিতে প্রবৃত্ত। তাই বোধ হয় কপিলের সহিত তাঁহাদের বিবাদ।

কপিল কার্য্যকে আবির্ভাবের পূর্ব্বে কারণাত্মক বা অব্যক্ত বা শক্তিরূপে স্বীকার করেন। যদিও ব্যক্ত অবস্থা অব্যক্ত অবস্থা হইতে বিভিন্ন, তথাপি এই ব্যক্ত অবস্থাটা ঐ অব্যক্ত অবস্থারই অভিব্যক্তি; ইহা একটা আকস্মিক ব্যাপার নহে। গৌতম কণাদ হয়ত মনে করেন ঐ ব্যক্ত অবস্থাটা পূর্ব্বাবস্থার —শক্তি-অবস্থার অভিব্যক্তি নহে, পরন্তু একান্ত অসতের আবির্ভাব। তাই এই বিবাদের সূত্রপাত।

আমাদের বিবেচনায় কপিলের কথাই সত্য। কার্য্যকে আবির্ভাবের পূর্ব্বে একান্ত অসৎ (non-existent) বলিয়া স্বীকার করিলে আকস্মিক বাদ আসিয়া পড়ে। মৃত্তিকায় ঘটশক্তি আছে বলিয়াই তাহা হইতে ঘটের আবির্ভাব সম্ভাবনীয়। যদি সে শক্তি অস্বীকৃত হয়, তবে মৃত্তিকার ন্যায় সিকতা, বারি প্রভৃতি হইতে ঘটের আবির্ভাব কে নিবারণ করিবে? মৃত্তিকায় ঘটশক্তির যেমন অভাব, সিকতায়, জলেও ঘটশক্তির তেমনি অভাব, অথচ মৃত্তিকা হইতে ঘটের উৎপত্তি নিয়মিত, অন্য হইতে নহে, ইহার তাৎপর্য্য কি? আরও একটি বিষয় দ্রষ্টব্য। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য যদি একান্ত অসৎই হয়, তবে অসত্তা নির্ব্বিশেষে, একই কারণ হইতে বিভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তি সম্ভাবনীয় হউক। বটবীজে বটজাতীয় বৃক্ষই উৎপন্ন হইবে, রসাল জাতীয় বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে না, এমন কোন নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। অতএব

"উপাদান নিয়মাৎ"

"সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বাসম্ভবাৎ।"

অনুমান করা যায়, কার্য্য শক্তিরই ব্যক্ত অবস্থা,—অসতের উৎপত্তি নহে। এবং ঐ শক্তিকে ব্যবহার দশায়—কার্য্য দশায় আনিবার জন্যই—কারণের প্রয়োজন।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—তবে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা যে দ্রব্যান্তরের উৎপত্তি হয়, সেটা কি? সে স্থলে কারণে ত ভাবী কার্য্যের নাম গন্ধ পর্য্যন্ত নাই; শক্তিই বা আছে কেমন করিয়া জানা যাইবে? হাইড্রজেন ও অক্সিজেন এই দুইটি পদার্থের রাসায়নিক সংমিশ্রণে জলের উৎপত্তি হয়, ইহা বিজ্ঞানের পরিক্ষিত সত্য। কিন্তু এই দুইটি পদার্থে জলীয়ত্বের কোন চিহ্নই দৃষ্ট হয় না।

অতএব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নূতন বস্তুর উৎপত্তি হয় ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে

হইবে। এই নূতন পদার্থের ধর্ম্ম তাহার অবয়ব পদার্থের ধর্ম্মের সহিত একতাপন্ন নহে; পরন্তু তদ্বিলক্ষণ। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তাই মূল পদার্থ অন্তর্হিত হইয়া নূতন পদার্থ-রূপে প্রকাশিত হয়। পণ্ডিত Huxley বলেন:—

When hydrogen and oxygen are mixed in a certain proportion, and the electric spark is passed through them, they disappear, and a quantity of water, equal in weight to the sum of their weights, appears in their place. There is not the slightest purity between the passive and active powers of the oxygen and hydrogen which have given rise to it. Nevertheless we do not hesitate to believe that in some way or another, the properties of the water result from the properties of the component elements of the water....Does any body quite comprehend the modus operandi of an electric spark, which traverses a mixture of oxygen and hydrogen? *

Huxleyর উদ্ধৃত বাক্যে আমরা দেখিতে পাই রাসায়নিক সংমিশ্রণে মৌলিক উপাদানের তিরোভাব ও নূতন পদার্থের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এই সংমিশ্রণ-সঞ্চারিণী তড়িচ্ছক্তির কি সামর্থ্য—কি প্রভাব তাহা কে বলিবে? বাস্তবিক ভাবিতে গেলে এই রাসায়নিক সংমিশ্রন ব্যাপারটি একটি দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকা বলিয়া মনে হয়। ইহা একটা অজ্ঞাত প্রক্রিয়ার সংজ্ঞাভেদ মাত্র। সাধারণ সংমিশ্রণের সহিত ইহার পার্থক্য এই মাত্র যে, তাহা বুদ্ধিগম্য; ইহা বুদ্ধির অগম্য। তাহা পরিজ্ঞাত; ইহা চিরাজ্ঞাত। হইতে পারে যে প্রচ্ছন্ন জলীয়ত্ব ধর্ম্ম ঐ সংমিশ্রনের ফলে ব্যক্তভাবাপন্ন হয়, কেবল তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ প্রয়োগে তাহা ব্যবহার দশায় আনীত হইয়াছে। এবং ঐ শক্তির প্রয়োগ ব্যতীত তাহা হইতে ঐ জলীয়ত্ব ধর্ম্ম কদাচ নিষ্ক্রান্ত হইতে পারে না। মহামতি Huxley সেই কথাই ইঙ্গিতে বুঝাইয়াছেন। তবে তিনি জড়বাদের সমর্থনে ঐ প্রকার মত প্রচার করিয়াছেন মাত্র। যাহা হউক একবার যুক্তি তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়া সমুদ্ভূত পদার্থের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

প্রথমতঃ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যে উপাদান পদার্থের তিরোভাব ঘটে, এই সিদ্ধান্তই জড়ের অনশ্বরত্ব বিঘাতক। রাসায়নিকের মতে Oxygen ও Hydrogen রাসায়নিক সংমিশ্রণে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং তাহাদের পরিবর্ত্তে তদুভয়ের সমান পরিমাণে জলীয়ত্বের আবির্ভাব হয়। এই আগন্তুক পদার্থ সম্পূর্ণ নূতন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে এই আগন্তুক পদার্থের সহিত ঐ দুই পদার্থের কেবল মাত্র পরিমাণগত সাম্য ব্যতীত আর কোন সাদৃশ্য নাই। কিন্তু কোন এক বস্তুর স্থলে তৎপরিমাণানুরূপ অন্য বস্তুর পরিমাণ পাইলেই পূর্ব্ব বস্তু যে অবিনশ্বর তাহা সপ্রমাণ হয় কি প্রকারে? 'ক'এর পরিমাণ 'খ' এর পরিমাণের তুল্য হইলে কি (অন্যান্যগুণ বৈপরীত্য সত্ত্বেও) 'ক' 'খ' হইয়া যায়?

* Physical basis of life.

এ সম্বন্ধে একজন দার্শনিকের তর্ক উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি বলেন :—১

"For example: it is the same substance which is—now carbon, oxygen and hydrogen; now, these united in vegetable tissue; now, after being eaten and assimilated, animal tissue; and finally carbon, oxygen, and hydrogen again. Mere experience, uninformed by the apriori laws of the understanding could only lead us to the conclusion that, at each of these changes, the previous substance was annihilated, and the new one created. Yet we instinctively and instantly reject this conclusion. Why? The chemist says, because we find by experiment that one of the accidents, namely, the aggregate weight, remains unchanged.

Be it so: what then? This would only prove that, whatever number or amount perishes, the same amount of substance is created anew, not necessarily that the same numerical or identical essence persists or endures. Besides, why infer identity from the one accident, weight, which persists in amount, rather than difference from the many others, volume, colour, texture, consistency, chemical affinity &c. which undergo great change?

"The atomistic view assumes that when in iron-oxyde, for example, all the sensible properties both of iron and oxygen have vanished, iron and oxygen are nevertheless there but now manifest other properties. We are so used to their assumption that it is hard for us to feel its oddity, nay, even its absurdity, when however, we reflect that all we know in a given kind of matter is its properties, we realize that the assertion that the matter is still there but without any of those properties, is not far removed from nonsense."—W. Ostwald.

বাস্তবিক ঐ প্রকারে গুণবিশেষের সাম্য লইয়া বস্তুদ্বয়ের অভিন্নত্ব (identity) প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা সম্পূর্ণ ন্যায় বিরুদ্ধ। এক সের স্বর্ণ যদি এক সের লৌহের সমান হয়, তবে স্বর্ণ = লৌহ, এ যুক্তিও যেমন অসার, জলের পরিমাণ ঐ দুই ভূতের পরিমাণের সহিত সমান, অতএব ঐ দুই পদার্থ জল হইতে অভিন্ন, এ যুক্তিও তেমনি অশ্রদ্ধেয়। বিশেষতঃ ভারীত্বও বস্তুর স্বরূপ লক্ষণ নহে, একটা আগন্তুক ধর্ম্ম। একটিমাত্র আগন্তুক গুণের সমতাদ্বারা পদার্থদ্বয়ের অভিন্নত্ব বা অনন্যত্ব কোনপ্রকারেই অনুমিত হইতে

১ Modern Philosophy by F. Bowen. p. 214.

পারে না। যদি পারে, তাহা হইলে অন্যান্য গুণের বৈলক্ষণ্য দ্বারা তাহাদের বিভিন্নত্বও অনুমিত না হইবে কেন? Kearl Pearson বলেন :—

"Or again, since our table is probably a bad one, we will break it up and burn it and so the blackboarc be converted into various gases and same ashes. What has now become of it? Size and shape, temperature and colour, hardness and strength have all gone. It is true that the chemist asserts that, if we could completely collect the gases and ashes, one sense inpression at least, that of weight, would remain the same in these and the original blackboard. But can we define sameness to consist in the phenomena of some one sub group of sense-impressions not-withstanding the divergence of the majority! * * * * If the gases and ashes could be collected! They have, indeed, been scattered to the winds and in course of time may be absorbed by other vegetable life, ultimately perhaps to reappear as other blackboards, or even in legs of mutton." *

পক্ষান্তরে, উক্তস্থলে বস্তুদ্বয়ের ভিন্নত্ব স্বীকার করিলে জড়ের অনশ্বরত্ব বাধিত হয়। প্রতি রাসায়নিক সংমিশ্রনে পূর্ব্ব বস্তুর একান্ত ধ্বংস ও অভিনব বস্তুর সৃষ্টি হয়, এই সিদ্ধান্তই আসিয়া পড়ে।

দ্বিতীয়তঃ জলীয়ত্ব একটী গুণ। গুণ পদার্থ বস্তুনিহিত (must be predicated of a substance)। কিন্তু উক্তস্থলে বস্তু মাত্র দুইটি Hydrogen ও oxygen। অতএব ঐ জলীয়ত্ব গুণটি উহাদেরই গুণ, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত সংমিশ্রণ বলিয়া যে একটা পদার্থ আছে, তাহা সম্বন্ধ বোধক। তাহা কোন বস্তু (substance) নহে; সুতরাং গুণের আশ্রয় হইতে পারে না। সুন্দরম আইয়ার তাঁহার Absolute Monism নামক গ্রন্থে বলিতেছেন :—

Combination is a term employed to indicate the relations existent between the ingredients of a body; and so is not a real existence at all. But property can be predicated only of a subsistent entity. How can, then, that which is a logical, i.e., fictitious, fact, have and manifest any affection at all? অতএব জলীয়ত্ব যদি ঐ বায়বীয় পদার্থদ্বয়েরই গুণ বা ধর্ম্ম হইল, তাহা হইলে সাংখ্যের "শক্তস্য শক্য করণাৎ" এই সিদ্ধান্তই দূরীভূত হইতেছে।

তৃতীয়তঃ রাসায়নিকসংযোগ যে একটা বিশেষ সংমিশ্রন (a peculiar combination) তাহাই বা কি প্রকারে বুঝিব? সাধারণ সংযোগই হউক আর বিশেষ সংযোগই হউক —সংমিশ্রণ ব্যাপারে সমবেত ভূতসূক্ষ্মের পরিস্পন্দ ও গতির তারতম্য ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। রাসায়নিক সংযোগে

* Grammer of Science. p. 85.

ইহার অতিরিক্ত কি আর কিছু প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে? রাসায়নিকসংযোগে ভূতসূক্ষ্মের যে গতি বা স্পন্দন তাহারই বা বিশেষত্ব কোথায়? যে স্পন্দন, যে চাঞ্চল্য, যে প্রকার গতি, বৈজ্ঞানিকের চির পরিচিত সেখানেও সেই তাণ্ডব, সেই স্পন্দন, বা সেই চাঞ্চল্য! তবে তাহার বিশেষত্বটা কি? কেবল ফল-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়া এবং তাহার কোন প্রকার ব্যাখ্যা প্রদানে অশক্ত হইয়াই (জগৎকে প্রতারিত করিবার জন্য?) বৈজ্ঞানিকেরা ঐ মিশ্রণকে রাসায়নিক প্রক্রিয়া বা একটা বিশেষ প্রক্রিয়া বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু এই প্রক্রিয়ার মধ্যে বিশেষত্বটা যে কোথায় তাহার সন্ধান কেহ বলিতে পারেন নাই। সাধারণ ও তথাকথিত বিশেষ সংমিশ্রনে যখন কেবল এক স্পন্দমান পরমাণুপুঞ্জের সত্তা ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্ট হয় না, তখন সংমিশ্রণকে সাধারণ ও বিশেষ ভেদে দ্বিধা কল্পনা করাও সর্ব্বথা অন্যায্য।

চতুর্থতঃ কারণ যদি কার্য্য উৎপাদনে অসমর্থ (incompetent) হয়, তবে কার্য্যোৎপত্তিই অসম্ভব। এবং কারণ যদি কার্য্যজননে শক্ত হয় তবে কার্য্যের শক্তিরূপত্বও সিদ্ধ হয়। আবার কার্য্যে কারণ অপেক্ষা কিছু অতিরিক্ত ধর্ম্ম স্বীকার করিলে অনিমিত্ততঃ ভাবোৎপত্তিও স্বীকার করিতে হয়। ইহা স্ববিরোধী।*

কেহ হয়ত আপত্তি করিতে পারেন; পরিমাণ সাম্যই কেবল বস্তুর অভিন্নতার কারণ না হইতে পারে; কিন্তু যখন তাপ প্রয়োগে ঐ জলকে বাষ্পীভূত করা যায়, তখন ত উহার পূর্ব্বোপাদানই প্রাপ্ত হওয়া যায়; সুতরাং বস্তুর বিলোপ কদাচ হয় না—ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে। ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায়,—তাহা হইলে আগন্তুক পদার্থকে তাহার উপাদান হইতে বিশিষ্ট করিবার তাৎপর্য্য কি? যদি উভয় অবস্থায় বস্তু অক্ষুন্ন থাকে, তবে তাহার অভিনবত্বই বা কোথায়? এবং তাপপ্রয়োগে জলকে বাষ্পীভূত করিয়া যদি আবার সমপরিমাণে হাইড্রজেন ও অক্‌সিজেন পাওয়া যায়, তাহা যে নূতন হাইড্রজেন ও অক্‌সিজেন নহে তাহার প্রমাণ কি? ঈশ্বর হইতে অহরহঃ এই প্রকার সৃষ্টিই হয়ত হইয়া থাকে।

গুণভেদ লইয়াই বস্তুর ভেদ সিদ্ধ হয়; কিন্তু কোন বস্তুই কেবলমাত্র একটি গুণের আশ্রয় হয় না। যেখানে ঐ গুণভেদের আধিক্য দৃষ্ট হয়, সেখানে অভেদ কল্পনাই সঙ্গত; তাই বলা হইয়াছে রাসায়নিক মিশ্রণ সম্ভূত পদার্থ নূতন; কিন্তু উহার ওজন উপাদানের ওজনের সহিত সমান, তাই বলা হইল—উভয় অভিন্ন। একই বস্তু এক সময়ে অপর হইতে ভিন্ন ও অভিন্ন এ সিদ্ধান্ত কি সমীচীন? যাহা হউক প্রসঙ্গক্রমে আমরা প্রকৃত প্রস্তাব হইতে কিঞ্চিৎ দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।

সাংখ্যকার বলেন—"পরিণাম স্বভাবাহি গুণা না পরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠন্তি।" অর্থাৎ প্রকৃতি নিত্য প্রসবধর্ম্মিণী। ক্ষণমাত্রও অপরিণত অবস্থায় থাকিতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতি যদি সর্ব্বদাই পরিণামস্বভাবা, তবে প্রলয়কালে মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির আবির্ভাব না হয় কেন? এ আপত্তির উত্তরে সাংখ্যেরা

* অশক্যো ন ভবেদ্‌ কামং হেতৌ শক্যো ন ভিন্নতা।
কার্য্যাস্য, নাধিকং কিঞ্চিৎ কার্য্যে 'চদ নিমিত্ততঃ॥ লেখক

বলেন—প্রকৃতির পরিণাম দ্বিবিধ—সদৃশ (similar) ও বিসদৃশ (dissimilar)। অথবা অনুলোম ও বিলোম। প্রলয়কালে অনুলোম-ক্রমে ও সৃষ্টিকালে বিলোমক্রমে প্রকৃতির অভিব্যক্তি বা পরিণাম হয়। অনুলোমক্রমে যখন তাহার পরিণাম আরব্ধ হয়, তখন পদার্থপুঞ্জ ক্রমশঃ সাম্যাবস্থাপন্ন হইতে থাকে। পরে প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়। বিলোম-ক্রমে আবার এই প্রকৃতি ব্যাকৃত হইয়া বিশ্ববৈচিত্র্য রচনা করে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে প্রকৃতির এই দ্বিবিধ পরিণামে চৈতন্যের অপেক্ষা আছে কি না? সাংখ্যমতে এ সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ মীমাংসা দৃষ্ট হয় না। সাংখ্যেরা একবার বলেন প্রকৃতির পরিণাম স্বতঃই হয়, কোন চৈতন্যের অপেক্ষা করে না :—

অচেতনত্বেঽপি ক্ষীরবৎ চেষ্টিতং প্রধানস্য।
স্বভাবাচ্চেষ্টিতমনভিসন্ধানাদ্ভৃত্যবৎ॥

কিন্তু আবার তাঁহারা একথাও বলেন যে প্রকৃতি পরতন্ত্রা—পরাধীনা। "প্রকৃতি নিবন্ধনা চেৎ ন তস্যা অপি পারতন্ত্র্যম।" অর্থাৎ প্রকৃতি নিবন্ধনই যদি আত্মার বন্ধন বল, তাহাও নহে, কেননা প্রকৃতি পরতন্ত্রা—স্বতন্ত্রা নহে। এস্থলে প্রকৃতিকে পরতন্ত্র স্পষ্টাক্ষরে বলা হইয়াছে।

পুনশ্চ সাংখ্যেরা বলেন—প্রকৃতি অচেতন বলিয়া অন্ধস্থানীয়; পুরুষ নিষ্ক্রিয় বলিয়া পঙ্গুস্থানীয়। কিন্তু তথাপি পরস্পরের মিলনে বিশ্ববৈচিত্র্য রচিত হয়।

সাংখ্যাচার্য্যদিগের এবাক্যের মর্ম্ম গ্রহণ দুষ্কর। প্রকৃতিকে অন্ধস্থানীয় বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহার চলচ্ছক্তি আছে ইহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু অচেতনের চলচ্ছক্তি থাকে কি প্রকারে? সেই প্রকার পুরুষকে নিষ্ক্রিয় বলিয়া পঙ্গুস্থানীয় ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। অথচ তাহার পরিচালকত্বও স্বীকৃত হইয়াছে। বুঝা যাইতেছে নিষ্ক্রিয় বলিয়া পুরুষ প্রকৃতির প্রবর্ত্তক হইতে পারে না; অচেতন বলিয়া প্রকৃতি স্বয়ংও চলিতে পারে না। অতএব উভয়ের মিলনে যে কার্য্যারম্ভ হইবে সে দুরাশা মাত্র। †

সাংখ্যেরা পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করেন। কেননা অন্যথা বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থার মীমাংসা হয় না। পুরুষ যদি এক হইত, তবে একজনের মুক্তিতে সকলের মুক্তি হইত; একজনের বন্ধন থাকিলে কেহই মুক্ত হইতে পারিত না। এক আত্মা সর্ব্বদেহস্থিত নহে বলিয়াই এক সময়ে সকলের কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি নিবৃত্তিও দেখা যায় না। অন্যথা একজনের প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে সকলেরই প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি দৃষ্ট হইত। অতএব

পুরুষবহুত্বং ব্যবস্থাতঃ।
জন্মাদি ব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বং॥

সাংখ্যকারের এ কথাও যে সপ্রমান তাহাও বোধ হয় না। তাঁহার মতে পুরুষ বহু হইলেও সসীম নহে। প্রত্যেক পুরুষই অনন্ত, অনাদি। সুতরাং প্রত্যেক পুরুষই অন্যান্য যাবতীয় দেহে বিদ্যমান। তবে এক পুরুষের প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে অন্যান্য ব্যক্তির প্রবৃত্তি নিবৃত্তি না হয় কেন? এবং ঐ পুরুষের বন্ধমোক্ষে অন্যান্য ব্যক্তির বন্ধমোক্ষ না হয় কেন? অদৃষ্ট বৈচিত্র্য দ্বারাও এ প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে না। কেননা, এক পুরুষের যাহা অদৃষ্ট, তাহা সর্ব্ব পুরুষেরই

† তথা প্রধানস্যাচৈতন্যাৎ পুরুষস্য চৌদাসীন্যাৎ তৃতীয়স্য চ তয়োঃ সম্বন্ধয়িতুরভাবাৎ সম্বন্ধানুপপত্তিঃ বেদান্ত দর্শন—শ: ভাঃ ২।২।৭

অদৃষ্ট হইয়া উঠে। এমন কি এক পুরুষের পক্ষে যাহা সম্ভাবনীয়, সকল পুরুষের পক্ষেই তাহা সম্ভাবনীয় হয়। আত্মাকে অবচ্ছিন্ন—পরিচ্ছিন্ন—সসীম না বলিলে সাংখ্যমতেও এ সকল আপত্তির উত্তর দেওয়া যায় না।

যাহা হউক এই পুরুষ পদার্থ টা কি প্রকার? ইহার উত্তরে সাংখ্যেরা বলেন—"জড়ব্যাবৃত্তো জড়ং প্রকাশয়তি চিদ্রূপঃ" অর্থাৎ যাহা জড় বিলক্ষণ (other than matter) এবং জড়ের প্রকাশক (percipient of matter) তাহাই পুরুষ। ইহা চিদ্রূপ বা চৈতন্যস্বরূপ (spirit)।

এই পুরুষ দেহাদি হইতে পৃথক বা বিলক্ষণ :—

দেহাদিব্যতিরিক্তোঽসৌ বৈচিত্র্যাৎ।

সাংখ্যকার প্রকৃতিবাদী হইলেও চৈতন্যকে কখনও জড়ের পরিণাম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন নাই। বরং তাহার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন—"ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ।"

যাহা হউক, এক্ষণে একটু বিশেষভাবে সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ পরীক্ষা করা যাউক। পূর্ব্বে বলিয়াছি সাংখ্যমতে প্রকৃতি সত্ত্ব-রজ-তমের সাম্যাবস্থা (state of equilibrium of the three gunas)। কিন্তু সাম্যাবস্থা কাহাকে বলে? না, যে অবস্থায় বিরোধী শক্তিপুঞ্জ প্রত্যেকেই তুল্যবল। একটি অপরটি অপেক্ষা প্রবলতর নহে। এখানে উক্ত গুণত্রয় যে অবস্থায় প্রত্যেকেই তুল্যবল-বিশিষ্ট কেহ অপরাপেক্ষা প্রবলতর নহে, সেই অবস্থার নামই প্রকৃতি। কিন্তু কথা হইতেছে প্রকৃতি অবস্থায় সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ব্যতীত পরিণাম উপপন্ন হয় কি প্রকারে? গুণত্রয় ত সমভাবাপন্ন, কেহ কাহাকে পরাভব করিয়া স্বীয় প্রাধান্য সংস্থাপন করিতে পারে না। সুতরাং কোন অন্তর শক্তি দ্বারা এই সাম্যভাবের বিক্ষোভ অসম্ভব। তবে এ সাম্যভাব বিক্ষুব্ধ হইবে কি প্রকারে? অবশ্যই কোন বাহ্যশক্তি স্বীকার করিতে হইবে। এই বাহ্যশক্তিই প্রকৃতির ক্ষোভয়িত্রী। মহাত্মা শঙ্কর বলিয়াছেন—(১)

বাহ্যস্য কস্যচিৎ ক্ষোভয়িতুরভাবাদ্গুণবৈষম্য নিমিত্তো মহদাদ্যুৎপাদো ন স্যাৎ। * * * * * বৈষম্যোপগমযোগ্যা অপি গুণাঃ সাম্যাবস্থায়াং নিমিত্তাভাবান্নৈব বৈষম্যং ভজেরন্, ভজমানা বা নিমিত্তাভাবাবিশেসাৎ সর্ব্বদৈব বৈষম্যং ভজেরন্ ইতি প্রসজ্যত এবায়মনন্তরোঽপি দোষঃ।

প্রকৃতি অচেতন হইলেও তাহার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক ক্ষীরাদির ন্যায়। সাংখ্যাচার্য্যদিগের এ উক্তিও সমর্থন যোগ্য নহে। নিমিত্তাভাবে অচেতনের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। চেতনাধিষ্ঠিত হইয়াই অচেতনের প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। দৃষ্টবিপরীত কল্পনা অশ্রদ্ধেয়। তর্ককেশরী মহামতি শঙ্কর বলেন :—স্যাদেবৎ যথা ক্ষীরমচেতনং স্বভাবেনৈব বৎসবিবৃদ্ধয়ে প্রবর্ত্ততে, যথা চ জলমচেতনং স্বভাবেনৈব লোকোপকারায় স্যন্দতে, এবং প্রধানমপ্যচেতনং স্বভাবেনৈব পুরুষার্থসিদ্ধয়ে প্রবর্ত্তিষ্যত ইতি। নৈতৎ সাধূচ্যতে। যতস্তত্রাপি পয়োঽম্বুনোশ্চেতনাধিষ্ঠিতয়োরেব প্রবৃত্তিরিত্যনুমিনীমহে উভয়-

(১) বেদান্তদর্শন। শঃ ভাঃ ২।২।৮-৯

বাদি প্রসিদ্ধে রথাদৌ অচেতনে কেবলে প্রবৃত্ত্যদর্শনাৎ। * * * তস্মাৎ সাধালক্ষ-নিক্ষিপ্তত্বাৎ পয়োহম্বু বদিত্যাণুপণ্যামঃ চেতনায়াশ্চ ধেনোঃ স্নেহেনেচ্ছয়া পয়সঃ প্রবর্ত্তকত্বোপপত্তেঃ বৎস চোষণেন চ পয়স আকৃষ্যমাণত্বাৎ। ন চাম্বুনোহপ্যত্যন্ত মনপেক্ষা নিম্নভূম্যাদ্যপেক্ষত্বাৎ স্যন্দনস্য। চেতনাপেক্ষত্বং তু সর্ব্বত্রোপদর্শিতং।

পুনশ্চ (২) সাংখ্যানাং ত্রয়োগুণাঃ সাম্যেনাবতিষ্ঠমানাঃ প্রধানং নতু তদ্ব্যতিরেকেন প্রধানস্য প্রবর্ত্তকং নিবর্ত্তকং বা কিঞ্চিৎ-বাহ্যমপেক্ষমবস্থিতমস্তি, পুরুষস্তূদাসীনো ন প্রবর্ত্তকো ন নিবর্ত্তক ইতি, অতোহনপেক্ষং প্রধানং অনপেক্ষত্বাচ্চ কদাচিৎ প্রধানং মহদাদ্যাকারেণ পরিণমতে কদাচিন্ন পরিণমত ইত্যেতদযুক্তং ঈশ্বরস্য তু সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ সর্ব্বশক্তিমত্ত্বাৎ মহামায়ত্বাচ্চ প্রবৃত্তপ্রবৃত্তৌ ন বিরুধ্যেতে।"

ইত্যাদি যুক্তি বলে শঙ্কর দেখাইয়াছেন যে চিরকাল সাম্যভাবে অবস্থিত গুণত্রয়ের সেই সাম্যভাব বিধ্বস্ত করিতে হইলে বাহ্য শক্তির প্রয়োগ নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু সাংখ্যমতে প্রকৃতির বাহিরে এক পুরুষ ব্যতীত আর কিছুই নাই; সে পুরুষও উদাসীন। সুতরাং এই সাম্যাবস্থা ভঙ্গের কোন হেতু পাওয়া যাইতেছে না। অথচ এই সাম্যাবস্থার বিক্ষোভ না হইলেও সৃষ্ট্যাদি সম্ভবে না। সাংখ্যদর্শনে এ সমস্যার মীমাংসা নাই।

আর একটি বিষয় দ্রষ্টব্য। একটু সূক্ষ্ম-ভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে সাংখ্যের প্রকৃতি কদাচ মূল কারণ হইতে পারে না। সাংখ্যের প্রকৃতি গুণত্রয়ের একটা অবস্থা condition মাত্র। অবস্থা একটা বিশেষ ধর্ম্ম এবং উহা দ্রব্য আশ্রিত। সুতরাং গুণত্রয়ই—মৌলিক দ্রব্য, সাম্যভাব তাহা-দের একটা আগন্তুক অবস্থা মাত্র। কিন্তু সাংখ্যেরা এই অবস্থাকেই দ্রব্যের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। অবস্থার বস্তুঅতি-রিক্ত সত্তা অসিদ্ধ। অতএব প্রকৃতির বা প্রধানের স্বাতন্ত্র্যই অসিদ্ধ। যাহার স্বাতন্ত্র্য অসিদ্ধ, তাহাকে "অমূলং মূলং" বলা কতদূর সঙ্গত তাহা সহজেই অনুমেয়। বিশেষতঃ এই সাম্যাবস্থা যখন অনিত্য, তখন প্রকৃতিকে নিত্যই বা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? পক্ষান্তরে গুণত্রয়ের সত্তাকে মৌলিক সত্তা বলিয়া গ্রহণ করিলে একত্ববাদ (monism) পরিত্যাগ করিয়া বহুত্ববাদ গ্রহণ করিতে হয়। বহুত্ববাদ কিন্তু দর্শন বিজ্ঞানের অশ্রদ্ধেয়।

সাংখ্যাচার্য্যেরা যাহাকে গুণ বলেন, বুঝিতে হইবে, তাহা ন্যায়-বৈশেষিকের গুণ নহে। ন্যায়-বৈশেষিকের মতে গুণ দ্রব্যাশ্রিত ধর্ম্ম (property)। সাংখ্যচার্য্যেরা 'গুণত্রয়' বলিতে কোন ধর্ম্মবিশেষকে বুঝেন না। পরন্তু ঐ গুণত্রয় তিনটি বস্তু। গুণের ন্যায় (রজ্জুর ন্যায়) পুরুষকে বন্ধন করে বলিয়া ঐ দ্রব্যত্রয়ের নাম হইয়াছে 'গুণ'। অতএব এক প্রকৃতির স্থানে আমরা তিনটি বস্তুকে জগতের নিদান বা মূলরূপে পাইতেছি। সাংখ্যকার স্পষ্টতঃ বলিতেছেন সত্ত্বরজতম প্রকৃতির ধর্ম্ম নহে; পরন্তু উহারাই প্রকৃতির রূপ বা স্বরূপ। * কিন্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে

(২) ঐ—ঐ ঐ ২।২।৩-৪

* সত্ত্বাদীনামতদ্ধর্ম্মত্বং তদ্রূপত্বাৎ।
সাংখ্যদর্শন ৬ষ্ঠ অঃ, ৪৭।

উহাদের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। এই উভয় উক্তিরও কোন সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় না। প্রকৃতির ঐ ত্রিমূর্ত্তি স্বীকার করিলে, প্রকৃতির স্বাবয়বত্বও দুর্ব্বার হইয়া পড়ে। আরও একটি বিষয় বিচার্য্য। সাংখ্যের প্রকৃতি অপরিচ্ছিন্ন—অখণ্ড—অসীম। তাহার যে এই পরিণাম, তাহা কি আংশিক না সার্ব্বত্রিক? আংশিক হইতে পারেনা, কেন না, যাহা অসীম নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ, অংশ বিশেষই তাহার অসিদ্ধ। আর যদি অংশ বিশেষই স্বীকৃত হয়, তবে উহার এক অংশ অপর অংশ হইতে বিভিন্ন হইবে কোন ধর্ম্ম লইয়া? বস্তুতঃ এবম্বিধ পদার্থের অংশাবচ্ছেদ দুর্নিরূপ্য। যে কারণে অংশ বিশেষের পরিণাম ঘটিবে, সে কারণে অপর অংশেও পরিবর্ত্তন ঘটা উচিত। এমন কারণ বিশেষও দৃষ্ট হয় না, যাহা অংশাবচ্ছেদেই ক্রিয়াশীল তাহা অন্যান্য অংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল অংশ বিশেষেই পরিবর্ত্তন ঘটায়। এবং অংশ বা প্রদেশ বিশেষ স্বীকার করিলে প্রকৃতির অখণ্ডতা ও অপরিচ্ছিন্নতা বজায় থাকে না। যাহা নিরবয়ব (not composed of atoms) তাহার অংশ কল্পনাও অযৌক্তিক। পক্ষান্তরে যদি প্রকৃতির কৃৎস্ন পরিণাম স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সসীম পদার্থের খণ্ড সসীম পরিণাম দুর্ব্যাখ্যেয় হইয়া পড়ে। অসীম বস্তুর সসীম বিকার, ইহা স্বীকারে অসীম বস্তুর নির্ব্বিশেষত্ব ব্যাহত হয়। একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই ইহা প্রতীত হইতে পারে।

উপরি উক্ত যুক্তিসমূহ দ্বারা সাংখ্যকারের স্বীকৃত স্বতন্ত্র জগদুপাদানীভূত প্রকৃতির বা প্রধানের সত্তা সদোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। শঙ্করাচার্য্য মনীষা বলে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে নিরপেক্ষ প্রধান বা প্রকৃতি স্বতঃ পরিণামগ্রস্ত হইয়া এই বিশ্ববৈচিত্র্য রচনায় অশক্ত। চৈতন্যের অধিষ্ঠান ব্যতীত অচেতন প্রধান বা প্রকৃতির কিঞ্চিন্মাত্র কার্য্যকারিত্ব থাকিতে পারে না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অভিব্যক্তির প্রবর্ত্তকরূপে কোন সর্ব্বজ্ঞ চৈতন্যপুরুষ অবশ্যই স্বীকার্য্য। এবং যাহাকে সাংখ্যাচার্য্যেরা স্বতন্ত্র প্রকৃতি মনে করিয়া ভ্রান্ত হইয়া থাকেন, সে প্রকৃতি যথার্থতঃ স্বতন্ত্র বস্তু নহে; পরন্তু তাহা ঐশীশক্তির সংজ্ঞাভেদ মাত্র। তিনি বলেনঃ—

সর্ব্বজ্ঞস্যেশ্বরস্য আত্মভূতে ইবা বিদ্যা কল্পিতে নামরূপে তত্ত্বান্যত্বা ভ্যামনির্ব্বচনীয়ে সংসারপ্রপঞ্চবীজভূতে সর্ব্বজ্ঞস্যেশ্বরস্য মায়া-শক্তিঃ প্রকৃতিরিতি চ শ্রুতিস্মৃত্যোর-ভিলপ্যেতে। (১) পুনশ্চ: "যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেক" ইতি চ তস্যা এবাবগমাৎ, ন স্বতন্ত্রা কাচিৎ প্রকৃতিঃ প্রধানং নামাজামন্ত্রেণাম্নায়ত ইতি শক্যতে বক্তুং। (২)

অতীতকালে অস্মদ্দেশে অভিব্যক্তিবাদ কি প্রকারে প্রচারিত হইয়াছিল ও তাহার বিরুদ্ধে কি প্রকার যুক্তিতর্ক উপন্যস্ত হইয়া-ছিল ইতঃপূর্ব্বে আমরা তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে আমরা বর্ত্তমান যুগের নবালোকোদ্ভাসিত বৈজ্ঞানিক যুক্তিপ্রগাঢ় পুষ্পিতবাণীবহুল অভিব্যক্তিবাদের সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব।

গুরুগম্ভীর গবেষণাগর্ব্বিত পাশ্চাত্য জগতে অভিব্যক্তিবাদ প্রধান প্রধান মনীষাসম্পন্ন

(১) বেঃ দঃ ভাঃ—২ অঃ ১ পাঃ ১৪।
(২) বেঃ দঃ ভাঃ—১ অঃ ৪ র্থঃ পাঃ ১।

ব্যক্তিকর্তৃক অনুমোদিত। মহামতি ডারবিন (Darwin) ও তদৃষ্টান্তে জ্ঞানবীর হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) জগতে অভিব্যক্তিবাদের বিখ্যাত প্রবর্ত্তক ও প্রচারক। আমরা অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে প্রধানতঃ এই শেষোক্ত ব্যক্তির মতামতই আলোচনা করিব। সাংখ্যাচার্য্যেরা যেমন একটা অবিশেষ অপরিচ্ছিন্ন দুর্বিজ্ঞেয় পদার্থ (প্রকৃতি) হইতে এই নানা বৈচিত্র্য বিশিষ্ট জগতের বিকাশ বা অভিব্যক্তি স্বীকার করিয়া থাকেন, স্পেনসারও সেই প্রকার একটা অবিশেষ অপরিচ্ছিন্ন পদার্থ রূপান্তরিত হইয়া বৈচিত্র্যময় হইয়া পড়িয়াছে ও পড়িতেছে বলিয়া অনুমান করেন। তাঁহার মতে এই অবিশেষের বিচিত্রভাবে বিকাশ বা রূপান্তরই অভিব্যক্তি "(transformation of the homogeneous into the heterogeneous)" এবং এই অভিব্যক্তির পশ্চাতে একটা অচিন্ত্য অজ্ঞেয় অসীম শক্তি বিরাজ করিতেছে—ইহাই তাঁহার সিদ্ধান্ত। বলিতে কি, প্রত্যেক দৃশ্য বা ব্যক্ত পদার্থই সেই অজ্ঞেয় শক্তির পরিণাম—ব্যাকৃত অবস্থা বা অভিব্যক্তি। লক্ষ্য রাখিতে হইবে অভিব্যক্তি বস্তুর আভ্যন্তরিণ শক্তির ক্রিয়াজনিত ফল এবং ইহাতে বস্তুর অনবত্তির (continuity) ব্যাঘাত হয় না। *

মহাত্মা স্পেনসার অভিব্যক্তির যে লক্ষণ প্রদান করিয়াছেন তাহা এই। "Evolution is a continuous change from indefinite incoherent homogeneity to definite coherent heterogeneity of structure and function, through successive differentiations and integrations." (লেখক Hudson প্রণীত "An Introduction to the Philosophy of Herbert spencer" নামক গ্রন্থ হইতে এই লক্ষণটি গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা স্পেনসারের স্বয়ং প্রদত্ত সংজ্ঞা না হইতে পারে।)

যাহা হউক। গণিতশাস্ত্রে সুবিজ্ঞ Kirkman ব্যঙ্গচ্ছলে এই সংজ্ঞার যে সরলভাষায় রূপান্তরিত করিয়াছেন, পাঠকের কৌতুহল নিবারণ জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। Kirkman এর অনুবাদ এই :—

"Evolution is a change from a nohowish, untalkaboutable, all-alikeness to a somehowish and in-general talkaboutable, not-all-alikeness, by continuous somethingelseifications and sticktogetherations."

Kirkman এবম্বিধ অনুবাদ দ্বারা অভিব্যক্তি শব্দটার দুর্বোধ্যতাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা বঙ্গভাষায় বলিতে গেলে স্পেনসারের সংজ্ঞাকে নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করিতে পারি :—

ক্রমাগত ব্যাকৃতি ও সংহতির মধ্য দিয়া কোন অনির্ব্বাচ্য অসম্বদ্ধ অবিশেষ পদার্থের যে বিশিষ্ট, পরস্পরান্বিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও ক্রিয়া শক্তির বৈচিত্র্যময় বিকাশ, তাহাই অভিব্যক্তি শব্দের অর্থ। অতি সংক্ষেপে ইহা "অবিশেষাৎ বিশেষারম্ভঃ" এই মাত্র বলিতে পারা যায়।

* "Evolution is the Progress of being in continuity by development from within, under external conditions conducive to advance."—Calderwood's Vocabulary of Philosophy.

স্থাবর জগতেই হউক বা অস্থাবর জগতেই হউক—সর্ব্বত্রই এই অভিব্যক্তি নিয়মের প্রসার রহিয়াছে। আনুবীক্ষণিক একটি বীজ হইতে অভিব্যক্তি নিয়মেই বিরাট বিশাল পাদপ আবির্ভূত হয়; অনুপরিমাণ জৈবিক বীজ হইতে এই নিয়মক্রমেই নানাজাতীয় প্রাণীর উৎপত্তি। স্পেনসার বলেন:—

"The investigations of Woyf, Goethe, and Von Baer, have established the truth that the series of changes gone through during the development of a seed into a tree, or an ovum into an animal, constitute an advance from homogeneity of structure to heterogeneity of structure. In its primary stage, every germ consists of a substance that is uniform throughout, both in structure and chemical composition. The first step is the appearance of a difference between two parts of this substance, or as the phenomenon is called in physiological language, a differentiation."

পুনশ্চ:—"An entire history of any thing must include its appearance out of the imperceptible. Be it a single object or the whole universe, any account which begins with it in a concrete form or leaves off with it in a concrete form, is incomplete. * * * * The change from a diffused imperceptible state to a concentrated, perceptible state is an integration of matter and concomitant dissipation of motion; and the change from a concentrated, perceptible state, to a diffused imperceptible state, is an absorption of motion and concomitant dissipation of matter."

দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা একটা হংস ডিম্ব গ্রহণ করিব। এই অণ্ডটি প্রসবান্তে ভগ্ন করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, উহার সমস্ত অংশটা একই প্রকার। উহার অংশ বিশেষের সহিত অপর অংশের রাসায়নিক গুণ বা বৈচিত্র্য সম্বন্ধে কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য নাই (uniform throughout, both in structure and chemical composition)। ক্রমশঃ, বাহ্য তাপাদির সাহায্যে, ঐ "অব্যাকৃত" (undifferentiated) দ্রব্য হইতে অংশগত বৈলক্ষণ্য, পরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৈচিত্র্য আবির্ভূত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে একটা নির্ব্বিশেষ অব্যাকৃত পদার্থ হইতে ক্রমে ক্রমে নানা বৈচিত্র্যবিশিষ্ট প্রাণীপুঞ্জের আবির্ভাব।

ইত্যাদি দৃষ্টান্তবলে স্পেনসার মনে করেন, বোধ হয় নীহারিকাই জগতের পূর্ব্বাবস্থা। এই নীহারিকা (nebula) পরমাণুপুঞ্জের প্রকীর্ণ অবস্থা। উহা ঘনীভূত ও কেন্দ্রীভূত হইয়া জ্যোতিষ্কমণ্ডলের সৃষ্টি করিয়াছে। ঘনীভূত হইবার পূর্ব্বে উহা স্বগতভেদপরিশূণ্য ছিল—উষ্ণত্ব ও অন্যান্য জড়ীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে সমভাব (homogeneous) ছিল। ক্রমশঃ তাপাপক্ষয়ে (dessipation of heat) উহা নিবিড়ত্বাপন্ন (integrated) হইয়া এই বৈচিত্র্যের আরম্ভ করিয়াছে। কোনও

কারণ বশতঃ এই সাম্যাবস্থ প্রকীর্ণ নীহারিকা রাশির বাহ্য ও আন্তর ঘনত্বে ও তাপে বৈষম্য উৎপন্ন হয়; তাহা হইতে এই নির্ব্বিশেষ পদার্থে ক্রমে ক্রমে নানা প্রকার বৈষম্য ও বৈচিত্র্য দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এক্ষণে, এই প্রকার পরিবর্ত্তন বা রূপান্তর যখন জগতের সর্ব্বত্র নিরন্তর দৃষ্টি গোচর হয়, কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—"কেন এই প্রকার হয়; এই নিয়ত পরিবর্ত্তনের প্রবর্ত্তক কি? ("why this continuous metamorphosis?) এই বিশ্বব্যাপী পরিবর্ত্তনের নিদান (rationale) কি? মহাত্মা স্পেন্সার এ সম্বন্ধে যথোচিত চিন্তা করিয়া ইহার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি স্থির করিলেন—কোন বৃহত্তর নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়াই প্রকৃতির পরিণাম কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। সেই বৃহত্তর নিয়মটি আর কিছুই নহে,—অবিশেষের অস্থায়ীস্বভাবত্ব (Instability of the homogeneous) কিন্তু বিশেষরূপ চিন্তা করিয়া তিনি বুঝিলেন এ নিয়মটিও মূল নিয়মরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে না; ইহা হইতেও বৃহত্তর কোন নিয়ম অবশ্যই থাকিবে। এবং ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন, শক্তির অবিনশ্বরত্বই (persistence of force) সেই নৈদানিক নিয়ম। অবিশেষের অস্থায়ীত্ব বা পরিণামস্বভাবত্ব নিয়ম এই শক্তিনিত্যত্ব নিয়মেরই ফলায়াত সিদ্ধান্ত (corollary)। অতএব স্পেনসারের মতে, সাংখ্যাচার্য্যদিগের ন্যায়, নির্ব্বিশেষ পদার্থ বা প্রকৃতি কদাচ এক অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় থাকিতে পারে না; সে সর্ব্বদাই অবস্থান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে (the condition of homogeneity is a condition of unstable equilibrium)। যদি বল কেন? তাহার উত্তর—যেহেতু শক্তি নিত্য। শক্তি যেহেতু নিত্য—অবিনশ্বর, সেই হেতু প্রকৃতি নিয়তপরিণাম স্বভাব। কেবল ইহাই নহে। যাহা একান্ত নির্ব্বিশেষ তাহাই সাম্যচ্যুতি প্রবণ এবং যাহা অল্প পরিমাণে নির্ব্বিশেষ তাহা তদপেক্ষা অল্পতর নির্ব্বিশেষে পরিবর্ত্তনশীল (The absolutely homogeneous must lose its equilibrium and the relative homogeneous must lapse into the less homogeneous—First Principles p. 429)

এতক্ষণ আমরা অভিব্যক্তি সম্বন্ধে স্পেনসারের মূলসূত্রগুলি কি কি তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। সম্প্রতি তাঁহার গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তগুলি লইয়া একটু বিচার করা আবশ্যক।

প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই, স্পেনসার প্রদত্ত অভিব্যক্তিবাদের সত্তা হইতে নীহারিকাকে মৌলিক তথ্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কেননা, নীহারিকা একটা নির্ব্বাচ্য নির্দ্দিষ্ট সবিশেষ পদার্থ। তাঁহার মতে অনির্ব্বাচ্য অবিশেষ পদার্থই নির্ব্বাচ্য অবিশেষ পদার্থে পরিণত বা ব্যাকৃত হয়। নীহারিকা বলিলেই পরমাণুপুঞ্জের অস্তিত্ব ও একটা বিশেষ মূর্ত্তি ও সংস্থান, ও একটা নির্দ্দিষ্ট স্বভাব সূচিত হইয়া থাকে। সুতরাং নীহারিকা মূল প্রকৃতি স্থানীয় হইতে পারে না। উহার পূর্ব্বে প্রকৃতির আরও কত পরিণাম বা পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে তাহা কে বলিবে? যাহা হউক যদি বিশিষ্ট রূপ, বিশিষ্ট গুণান্বিত পদার্থ মাত্রই কার্য্য হয়, তবে নীহারিকাও কার্য্য, ইহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। দার্শনিক পণ্ডিত Flint বলেন—The solar system could only

have been evolved out of its nebulous state into that which it now presents if the nebula possessed a certain size, mass, form and constitution—if it was neither too rare nor too dense, neither too fluid nor too tenacious ; if its atoms were all numbered, its elements all weighed, constituents all disposed in due relation to each other—that is to say, only if the nebula was, in reality, as much a system of order, for which intelligence alone could account, as the worlds which have been evolved from it. The origin of the nebula thus presents itself to the reason as a problem which demands solution no less than the origin of the planets. All the properties and laws of the nebula require to be accounted for. What origin are we to give to them ? It must be either reason or unreason. We may go back as far as we please, but at every step and stage of the regress we find ourselves confronted with the same question—the same alternative. *

আরও একটু বিবেচনা করিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ আজকাল পরমাণুকেও মূল পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। পরমাণুর মৌলিকত্বই যখন প্রতিপন্ন নহে, তখন তাহার একটা প্রকীর্ণ অবস্থা একটা সন্নিবেশ (নীহারিকা) কি প্রকার মৌলিক পদার্থ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে ? প্রথমতঃ প্রকৃতি হইতে ভূতের অভিব্যক্তি না হইলে—পরমাণুর অভিব্যক্তি না হইলে—নীহারিকার উৎপত্তিই অসিদ্ধ হয়। অতএব স্পেনসার নীহারিকাকে মৌলিক পদার্থ বলিয়া স্বীকার করায় অবিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন বলিতে হইবে। বিশেষতঃ তাঁহার মতে যখন জড়পদার্থ কোন অজ্ঞেয় অনন্ত শক্তির বিকাশ, তখন নীহারিকা যে একটি কার্য্য তাহা নিঃসন্দিগ্ধ।

শ্রীপ্রফুল্লনাথ লাহিড়ী।

---

* Theism by Prof. Flint pp. 191-192. Also see. Naturalism and Agnosticism vol. I. p 224.

চঞ্চল

কি বিপুল বিপর্য্যয়-স্রোত !
প্রতি দণ্ড মরি যায়
পরদণ্ড-ঘাতে,
মুহূর্ত্তের নবীনতা
হয় পুরাতন
মুহূর্ত্ত যেতে না যেতে !
অদ্যকার দিন
কল্য কার চিতাভস্মে
লভিছে জনম—
নিদারুণ একি চঞ্চলতা !

কহ সবে এই কি জীবন ?
চির বিপর্য্যয়-ধাপ
চলিয়াছে নামি
অনাদি অসীম কালে,
সুখদুঃখ বর্ণ-আঁকা,
সুবিপুল সমারোহে,
অযুত আকারে !—
অহেতুক বেগ ধারা
নদীর সমান,
বল দেখি—সেই কি জীবন ?

নমি তারে, সে যে অন্ধগতি !
জন্ম জরা মৃত্যু নিয়ে
তারি সৃষ্টি-লীলা
চলিয়াছে অবিরাম ;
বহু রূপ মাঝে
বিরাজিছে তারি রূপ
আনন্দ-চপল !
জীবন—জীবন বটে,
ভুল নাহি তায়,—
গতি-বেগ ! নমি তার পায়।

শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী

ধরণীর আকৃতি বিপর্য্যয়

সরল রেখার আদি ও অন্ত থাকে কিন্তু রেখাটি চক্রাকার হইলেই উহা অনন্ত হইয়া পড়ে। আদি অন্ত বিহীন কাণ্ড মাত্রই তাই একটা চক্রবৎ পরিবর্ত্তনশীল ব্যাপার রূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। সত্যত্রেতা-দ্বাপরকলির পর প্রলয় এবং প্রলয়ান্তে পুনরায় সত্য যুগাদির আরম্ভ, চক্রবৎ পরি-বর্ত্তন্তে সুখানি দুঃখানি চ; সৃষ্টি প্রক্রিয়া—নেবুলা হইতে সূর্য্যাদির সৃষ্টি এবং অন্তে পুনরায় উহাদের নেবুলার আকারে পরিণতি এইরূপ একটা চক্রবৎ পরিবর্ত্তনশীল আদি—অন্ত বিহীন কাণ্ড।

পৃথিবীর আকৃতি বিপর্য্যয়ও এইরূপ আর একটি চক্রবৎ পরিবর্ত্তনশীল ব্যাপার বা সৃষ্টি পুষ্টি প্রলয়ের পৌনঃপুনিক অভিনয় কাহিনী মাত্র।

পৃথিবী তাহার ঘন ত্রিভুজাকৃতি হারাইয়া পুনঃ পুনঃ বর্ত্তুলাকৃতি প্রাপ্ত হইতেছে এবং কিছুকাল পরে জলবিম্ববৎ উহা ভাঙ্গিয়া গিয়া ভূপৃষ্ঠে একটা খণ্ড প্রলয় উপস্থিত হইয়া পুনরা ঘন ত্রিভুজাকারের উৎপত্তি হইতেছে। এইরূ প্রক্রিয়া পুনঃ পুনঃ চলিতেছে।

এই খণ্ড প্রলয় ফলে ধরণীর আকৃতি বিপর্য্যয়ের ইতিহাসটা একটু আলোচনা করা যাউক।

পৃথিবীর ইতিহাস চারিটি প্রধানযুগে বিভক্ত—উহাদের নাম, The archaeozoic, The Palaeozoic, The Mesozoic and The Kainozoic অথবা (i) প্রাগৈতিহা-সিক, (ii) প্রাচীন, (iii) মধ্য এবং (iv) আধুনিক এই চারিযুগ (৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। একটা লক্ষ্যণীয় ব্যাপার এই, পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই, প্রাচীনযুগের প্রাচীনতম পর্ব্বতগুলি বড়ই কোঁচকান ধরণের দেখিতে। পরবর্ত্তী কালে উদ্ভূত কোন কোন পর্ব্বত ঐরূপ কোঁচকান এবং আরও নবীন স্তরগুলি প্রায়ই অনতিনিম্ন সমতল ক্ষেত্রের আকারে বহুদূর ব্যাপিয়া বিস্তৃত। ইহার কারণ কি? দেখা যায় আপেলের মত কোন পাতলা খোসা বিশিষ্ট ফল শুষ্ক হইবার সময় উহার খোসাটি প্রায় সর্ব্বাংশেই কোঁচকাইয়া যায়। কিন্তু একটি কমলালেবুর পুরুখোসা ওভাবে সর্ব্বাংশে কোঁচকায় না, স্থানে স্থানে মাত্র যেন চেপ্টা হইয়া যায়। এই দৃষ্টান্ত হইতে সহ-জেই মনে হয়, পৃথিবীর শৈশবাবস্থায় ভূপৃষ্ঠটি পরবর্ত্তীকালের তুলনায় পাতলা থাকায় ঐ সময়ে সঞ্জাত পর্ব্বতগুলি পৃথিবীর সর্ব্বাংশ ব্যাপিয়া ঐরূপ কোঁচকানো বা ভাঙ্গাচুরা আকার প্রাপ্ত হইয়াছে এবং নবীনতর স্তর গুলিও ঐ ভাবে বিভিন্নাকার ধারণ করি-য়াছে।

পৃথিবীর উত্তপ্তাবস্থায় তাপক্ষয় এবং সঙ্কোচন ক্রিয়াও দ্রুততর বেগে সিদ্ধ হইত, সুতরাং বর্ত্তুলাকার ভাঙ্গিয়া গিয়া ঘন ত্রিভুজা-কার প্রাপ্তি কালে ভূপৃষ্ঠের উপর খণ্ডপ্রলয় কাণ্ডটাও ভীষণতর ভাবে সংঘটিত হইত। এই কারণেও প্রাচীনতম পর্ব্বতগুলি এত অধিক ভাঙ্গাচুরা আকারের দেখিতে হইয়াছে।

পৃথিবীর স্তরাবলী পরীক্ষা করিয়া সমুদায় পৃথিবী ব্যাপিয়া এক একবার আগ্নেয় গিরির

অগ্ন্যুৎপাতের যুগ গিয়াছে এবং তাহার পর কিছুকাল শান্তভাবে কাটিয়াছে। সহজেই মনে হয়, বর্ত্তুলাকারটি ভাঙ্গিয়া গিয়া ঘন ত্রিভুজের আকার পাইবার সময় এইরূপ অগ্ন্যুৎপাত ঘটে এবং পুনরায় ধীরে ধীরে বর্ত্তুলাকার উপস্থিত হইয়া অল্পে অল্পে সঙ্কুচিত হইতে হইতে ভূপৃষ্ঠটি সহসা ভাঙ্গিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত সময়টি শান্তভাবে কাটে।

Archaeozoic বা প্রাগৈতিহাসিক যুগটি এইরূপ পৃথিবী ব্যাপিয়া আগ্নেয়গিরির উপদ্রবের যুগ; bombrian উপযুগে শান্তভাবটা সুস্পষ্ট; Ordovician উপযুগে আগ্নেয়গিরিগুলি পুনরায় সজাল; Silurian উপযুগে আবার শান্ত ভাব; Devonian উপযুগে আবার অগ্ন্যুৎপাতজনিত খণ্ড প্রলয় এই ভাবে বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। ধাতুময় ভূগর্ভটি, ভূপৃষ্ঠ অপেক্ষা একটু দ্রুততর বেগে সঙ্কুচিত হইতেছে; ফলে ভূপৃষ্ঠটি ধীরে ধীরে একটি শূন্যগর্ভ বর্ত্তুলাকৃতি হইয়া কাল সহকারে স্বদেহের সঙ্কোচন প্রভাবে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। ভাঙ্গিয়া পড়িবার সময় উহার কতক অংশ উৎক্ষিপ্ত কিয়দংশবা অধঃক্ষিপ্ত হইতেছে। অধঃক্ষিপ্ত অংশ সমূহের চাপে, নীচেকার অত্যুষ্ণ ও দ্রবীভূত প্রস্তর স্তর ফাটল মুখে বাহির হইয়া পড়িয়া আগ্নেয়যুগ সমূহের সূচনা করে।

পৃথিবী যে খুব বেশী পরিমাণে সঙ্কুচিতা হইয়াছেন, অনেকে বিশ্বাস করেন না। প্রথমাবধি পৃথিবীর আয়তন কতকটা কমিয়া গিয়াছে। নির্ণয়ের উপায় নাই, তথাপি এইটুকু যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, কোন এক সময়ে ভূপৃষ্ঠটি বর্ত্তমান কালের উচ্চতম পর্ব্বত শৃঙ্গ সহ সমতলভাবে অবস্থিত ছিল এবং উহার কোন কোন অংশ গভীরতম সমুদ্রের তলদেশ রূপে পরিণত হইয়াছে তাহা হইলেও এইমাত্র প্রমাণিত হয় যে ভূপৃষ্ঠটি দশ বার মাইল মাত্র বসিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ৮০০০ মাইল, ইহার তুলনায় দশ বার মাইল গণনার যোগ্যই নহে। তা না হউক, এইটুকু আমাদের মনে রাখিতে হইবে, উচ্চতার ঐ সামান্যরূপ বা উহা অপেক্ষাও অনেক অল্প পরিমাণ ব্যতিক্রম ঘটিলেই, অনেক মহাদেশ, মহাসাগর গর্ভে তলাইয়া যায়। সুতরাং পৃথিবী চিরবর্ত্তুলাকার থাকুন, বা, কখন ঘন ত্রিভুজাকার প্রাপ্ত না হউন তাঁহার আয়তন সঙ্কোচের যেটুকু প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতেই ভূপৃষ্ঠে খণ্ডপ্রলয় ঘটিতে বাধা নাই।

ভূপৃষ্ঠের যে অংশ বসিয়া গিয়াছে তাহাই সমুদ্রের তলদেশ, উচ্চ অংশটি স্থল। ভূপৃষ্ঠের কোন অংশ উৎক্ষিপ্ত হইয়া অথবা উহার পার্শ্বস্থ ভূমি অধঃক্ষিপ্ত হইয়া স্থল ভাগ সমূহ বিরচিত হইয়াছে।

আমরা মনে করি, জলধি জল সদাই চঞ্চল, স্থলভাগ কেমন কঠিন ও নিশ্চল। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু সমুদ্রের ন্যায় ভূপৃষ্ঠও সদা তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ। ভূপৃষ্ঠ নিয়তই মৃদুভাবে স্পন্দিত এবং কোথাও বা সামান্যভাবে উৎক্ষিপ্ত কোথাও বা অধঃপতিত হইতেছে। ভূপৃষ্ঠের এইরূপ স্পন্দন বা সূক্ষ্মগতি হেতু, পৃথিবীর উত্তর মেরুপ্রান্ত স্থির থাকিতে পারে না, একটি নির্দ্দিষ্ট অংশ মধ্যে বিচরণশীল রহিয়াছে। পণ্ডিতগণ অবধারণ করিয়াছেন, তুলাদণ্ডের পাত্রদ্বয়ের উত্থান পতনের ন্যায় ভূপৃষ্ঠের কোন অংশে অধিক মাত্রায় তুষার বা বারিপাত হইলে ভার বৈষম্য হেতু নিকটবর্ত্তী অংশের উত্থান পতনাদি হইয়া ঐরূপ ঘটে।

প্রফেসর Milne, সিস্মোগ্রাফ নামক যন্ত্র সাহায্যে নির্ণয় করিয়াছেন, বর্ষাকালে একটু

অধিক পরিমাণে বারিপাত হইলে জাপানের পশ্চিম অংশ সামান্য বসিয়া যায়। Sir George Darwin বলেন, জোয়ারের সময় জলরাশির আধিক্য হইলে সেই ভারেই English channel এর তলদেশ একটু বসিয়া যায় এবং ভাঁটার সময় জলের ভার কমিবার সঙ্গে সঙ্গে উহা পুনরায় উত্থিত হয়। প্রফেসর Hecker সম্প্রতি প্রমাণ করিয়াছেন, সূর্য্য চন্দ্রের আকর্ষণে স্থলের উপর জোয়ার ভাঁটা খেলিয়া উহা কি পরিমাণে উত্থিত বা পতিত হয় নির্ণয় করা অসম্ভব নহে।

ফলতঃ মাধ্যাকর্ষণ এবং নিয়ত আবর্ত্তন হেতু ভূপৃষ্ঠ যে বর্ত্তুলাকৃতি প্রাপ্ত হইতেছে, এইরূপ নানা কারণে তাহা নষ্ট হইয়া যাইতেছে। সুতরাং জল ও স্থলের অবস্থান বিপর্য্যয় ঘটিয়া বিভিন্ন যুগে পৃথিবীর আকৃতিও ও নানা পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে।

এই পরিবর্ত্তনটা কিরূপ, বুঝাইতে গিয়া এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ পৃথিবীর সেই অতি প্রাচীন কালের যে সমস্ত মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, সে গুলির কিন্তু পরস্পরের সহিত মিল নাই। যাহা হউক পরিবর্ত্তনের প্রকৃতি সম্বন্ধে এখনও এইরূপ নানা মুনির নানামত হইলেও, পরিবর্ত্তন যে ঘটিয়াছে সে সম্বন্ধে মতভেদ খুব কম এবং পরিবর্ত্তনের প্রকৃতি সম্বন্ধেও, কোন কোন বিষয়ে অমিলের ন্যায় অনেক বিষয়ে আবার মিলও আছে।

পরিবর্ত্তনের প্রকৃতিটা মোটামুটি এইরূপ। এখন যেখানে মহাদেশ এক সময় তাহার অধিকাংশ মহাসাগরের অন্তর্ভুক্ত এবং এখন যেখানে মহাসাগর কোন সময় তথায় মহাদেশ বিদ্যমান ছিল। ভূস্তরগুলিতে পরিদৃষ্ট জীব উদ্ভিদের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল সমূহের প্রকৃতি এবং মহাসমুদ্রের অগভীর অংশ সমূহ কিরূপ ভাবে অবস্থিত ইত্যাদি নানা বিষয় আলোচনা করিয়া উহা অবধারিত হয়।

পৃথিবী ঘন ত্রিভুজাকার প্রাপ্ত হইবার সময় প্রতিবারই যে উত্তর দিকে বিস্তৃত এবং দক্ষিণে সূক্ষ্মাগ্র হইতে হইবে এমন কোন নিয়ম নাই। কোনবারে দক্ষিণে বিস্তৃত ও উত্তরে সূক্ষ্মাগ্র হইলে, জল ও স্থলে কি ভাবে সংস্থান বিপর্য্যয় ঘটিবে মনে মনে কল্পনা করা কঠিন নহে। ত্রিভুজের তিনটি বাহু যথা স্থানেই রহিবে কেবল উহাদের উন্নত অবনত অংশের বিপর্য্যয় ঘটিবে; অধিকাংশ স্থল ভাগ দক্ষিণে, দক্ষিণ মেরুস্থিত মহাসমুদ্রকে অঙ্গুরীয়কের আকারে বেষ্টন করিয়া রহিবে; উত্তরার্দ্ধে, এই সমস্ত জল ও স্থলভাগের বিপরীতাদীভাবে উত্তর মেরুতে একটি মহাদেশ এবং অধিকাংশ উত্তরার্দ্ধ ভূভাগ মহাসমুদ্ররূপে দেখা দিবে। পণ্ডিতগণ, প্রস্তরীভূত কঙ্কালাদি দেখিয়া বিভিন্ন উপযুগে পৃথিবীর যে সব মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে মোটের উপর উক্ত নিয়মের যাথার্থ্যই প্রতিপন্ন হয়।

শ্রীযুক্ত Bailey Willis মহোদয়, উত্তর আমেরিকাকে Cambrian উপযুগে প্রধানতঃ স্থলময় কিন্তু Silurian উপযুগে উহার অধিকাংশই জলমগ্নরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। প্রফেসর Frech Ordovician উপযুগে পৃথিবীর যে মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে জল ও স্থলভাগ বর্ত্তমান কালের তুলনায় প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে অবস্থিত। উত্তর আমেরিকার অধিকাংশই তখন সলিলমগ্ন এবং ইহার বিপরীত-

বাদী ভাবে এখন কার ভারত মহাসাগর তখন এক মহাদেশরূপে বিরাজিত এবং আফ্রিকা ও উত্তর অষ্ট্রেলিয়া সহ সংযুক্ত। দক্ষিণ আমেরিকা তখন দক্ষিণদিকের পরিবর্ত্তে উত্তরদিকে সূক্ষ্মাগ্র। পৃথিবী তখন সম্ভবতঃ দক্ষিণে বিস্তৃত ও উত্তরে সূক্ষ্মাগ্র একটি ঘন ত্রিভুজের আকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

Cerleoniferous উপযুগের শেষ সময়ে এবং Permian উপযুগের আরম্ভ কালে ধরণী আবার এইরূপ আকার পাইয়াছিলেন। দক্ষিণার্দ্ধে ঐ সময় দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, ভারতবর্ষ এবং অষ্ট্রেলিয়া ব্যাপিয়া একটি মহাদেশ বিরাজিত ছিল। ভারতের Gondwona স্তরাবলীর নামানুসারে পণ্ডিতগণ এই অধুনা বিলুপ্ত প্রকাণ্ড মহা দেশের নাম দিয়াছেন Gondwanaland এই সবস্থলে Glossopteris নামক fern জাতীয় উদ্ভিদ্ বিশেষের অস্তিত্ব দেখিয়া ইহাদের পূর্ব্বসংযোগ সূচিত হয়। এই গাছটি, অষ্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ, রুশিয়া, আফ্রিকা ও ব্রাজিলে পরিদৃষ্ট হয় কিন্তু রুশিয়া ব্যতীত আর কোন উত্তর ভাগস্থ দেশ সমূহে লক্ষিত হয় না। এইরূপ উত্তরভাগস্থিত দেশ সমূহে Calamites জাতীয় আর এক-রূপ গাছ প্রস্তরীভূত হইয়া বিস্তর মৃদঙ্গার স্তরের (কোল কয়লার) সৃষ্টি করিয়াছে; এই শেষোক্ত বৃক্ষটি দক্ষিণাঞ্চলে দৃষ্ট হয় না, কেবল আফ্রিকার একটি স্থলে পূর্ব্বোক্ত Glossopteris উদ্ভিদসহ দৃষ্ট হইয়াছে। ইহা হইতে ইহাও বুঝা যায় এই দুই জাতীয় গাছ একই সময়ে বিদ্যমান ছিল। Frech সাহেবের মতে এই সময় উত্তরমেরুতে একটি মহাদেশ ছিল; উত্তর আমেরিকা ইহার সহিত সংযুক্ত ছিল এবং উত্তরমহাদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া চীনদেশ অবধি আর একটি মহাদেশ বিস্তৃত ছিল। গণ্ডোয়ানা মহাদেশটি উত্তরআমেরিকা হইতে পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত এবং দক্ষিণ মেরু প্রদেশে মহাসমুদ্র বিরাজিত ছিল। এই যুগে স্কণ্ডিনেভিয়া বৃটিশদ্বীপের উত্তরাংশসহ সংযুক্ত ছিল।

Mesozoic যুগে, নূতন একভাবে খণ্ড প্রলয় আরম্ভ হইল। এই সময় পৃথিবীর সর্ব্বত্র, মহাসমুদ্রগুলি ধীরে ধীরে অগভীর হইতে আরম্ভ করিল; সুতরাং আয়তনে বাড়িয়া উঠিয়া স্থলভাগগুলি ক্রমশঃ কুক্ষিসাৎ করিতে প্রবৃত্ত হইল। সমুদ্রের তলভূমি ধীরে ধীরে উত্থিত হওয়ার জন্যই সম্ভবতঃ এইরূপ ঘটিয়াছিল। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, পৃথিবী তাহার ঘন ত্রিভুজাকার পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় বর্ত্তুলাকার প্রাপ্ত হওয়ায় ঐরূপ ঘটিতে থাকে।

যথারীতি বর্ত্তুলাকারের অবসান ঘটিল, পৃথিবীব্যাপী আবার এক খণ্ডপ্রলয় দেখা দিল। উত্তরে স্থলভাগ বসিয়া গিয়া এই সময়েই সম্ভবতঃ উত্তরমহাসমুদ্র এবং উত্তর আটলান্টিক্ মহাসাগরের উৎপত্তি হয়। গ্রীণলাণ্ড হইতে স্কটলাণ্ড অবধি ভূখণ্ড এই সময় আগ্নেয়গিরির উপদ্রবে উপদ্রুত ছিল।

কিছুকাল একটু ধীর স্থির ভাবে কাটিবার পর, Miocene উপযুগে পুনরায় পর্ব্বত সৃষ্টি আরম্ভ হইল। পৃথিবীদেহে এই সময়ে ভাঁজ পড়া ধরণের যে স্পন্দন আরম্ভ হয়, উহার ফলে আল্পস্ এবং হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে। উত্তর আমেরিকার পশ্চিম প্রান্তস্থ পর্ব্বতমালা, দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ্ এবং জাপান হইতে নবজিলাণ্ড অবধি বিস্তৃত একটি পর্ব্বতশ্রেণী একটু ভিন্ন প্রক্রিয়ায় এই সময়েই উদ্ভূত। এই শেষোক্ত

পর্ব্বতশ্রেণীরই ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান কালে কতকগুলি দ্বীপরূপে পরিণত হইয়া প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমাংশে মালার ন্যায় আকারে অবস্থিত। *

শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়

একত্বে বহুত্ব ও বহুত্বে একত্ব

ভূমিকা

বাহ্য দৃশ্যমান জগৎ আহা কি সুন্দর! লতা পাতা ফুল ফল শোভিত নানাবিধ বিহঙ্গম-কূজিত শত শত নির্ঝরিণী নিনাদিত মানবের আবাসভূমি আহা কি প্রীতিপ্রদ। ভীমকায় বিমানস্পর্শী ভূধর, অনন্ত বিস্তার অতলস্পর্শী জলধি, বিপুল শস্যশ্যামল প্রান্তর, উপবন-বিভূষিত পল্লীশ্রেণী, বিমল শোভাধার নাগরিক নিকেতন সমূহ—এ চিত্রপট কি উজ্জ্বল-কি মনঃপ্রাণোন্মাদকারী, কি ভক্তি প্রীতি বিস্ময়াধার।

জগতে অনিয়ম ও নিয়ম

এই ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোমময়, এই কঠিন-তরল-বাষ্পীয় পদার্থরাজীসম্বলিত এই নদী-পর্ব্বতবনোদ্যাননগরপ্রান্তর চিহ্নিত পরিদৃশ্যমান, সংখ্যাতীত সৃষ্টি পর্য্যায় প্রবাহ অনিয়ন্ত্রিত নীতি বিগর্হিত স্তূপে ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত নহে কি? পদার্থের সংখ্যা নাই, পরিমাণের বিচার নাই, বিস্তারের নিয়ম নাই; কোথায় অত্যধিক সলিল কোথায় বা বারিবিন্দু হীন, কোথায় অত্যধিক শীত কোথায় বা অতিমাত্র গ্রীষ্ম, কোন প্রদেশে অখণ্ডস্থান তদ্রূপ মানব নাই, কুত্রাপি অসংখ্য মানব তদ্রূপ স্থান নাই যেমন রুষ রাজ্য ও চীন।

আবার নিয়মেরই বা অভাব কই? জল স্থল—স্থান বিভাগ; চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ্‌—পদার্থ বিভাগ; মানব পশু পক্ষী সরীসৃপ জলচর কীট পতঙ্গ—জীব বিভাগ; জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ,—প্রাণবিভাগ এইরূপ কত সাধারণ স্থূল বিভাগ বর্ত্তমান-স্থূল বিভাগ পুনরায় সূক্ষ্ম বিভাগে বিভক্ত সূক্ষ্ম অতি সূক্ষ্ম অসংখ্য ভাগ বিভাগ উপ-বিভাগে বিভাজ্য। মানব মণ্ডলী—ককেসিয়, সেমেটিক, মঙ্গলীয়, নিগ্রো, মালয় প্রভৃতি স্থূল বিভাগে বিভক্ত; ককেসীয় পুনর্ব্বার আর্য্য, ইরান, হেলেন, লাটীন। স্লাভ, টিউটন, কেল্ট প্রভৃতি উপবিভাগে বিভক্ত; এবং এই প্রত্যেক উপবিভাগ আবার যে কত সূক্ষ্ম ভাগ বিভাগ উপবিভাগে বিভাজ্য তাহা সহজেই নির্ণয় করা যায়। কেবলমাত্র মানবের নয় প্রত্যেক পদার্থের এইরূপ স্থূল সূক্ষ্ম অতিসূক্ষ্ম ভাগ বিভাগ উপবিভাগ শ্রেণী বর্ত্তমান। তবে কে বলিতে পারে জগত অনিয়ন্ত্রিত?

নিয়মের মধ্যে অনিয়ম

পুনর্ব্বার একি? পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে পাই—ভাগ ভাগই নহে, বিভাগ বিভাগই নয়, উপবিভাগ উপবিভাগ নয়; সকলই ভ্রম-

* The Making of the Earth নামক পুস্তক অবলম্বনে লিখিত।

মাত্র। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, ভাগ করিলাম—ক্ষিতিতে কি অপ্ নাই? অপে কি ক্ষিতি নাই? তেজে কি বায়ু নাই? বায়ুতে কি ব্যোম নাই? রাসায়নিকশাস্ত্র বিপরীত প্রমাণ করিতেছে। তজ্জন্য পুনরায় সিদ্ধান্ত হইয়াছে—ব্যোম হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে অপ্, অপ্ হইতে ক্ষিতির উৎপত্তি। কঠিন, তরল, বাষ্পীয়—পদার্থ বিভাগ করিলাম। বিভাগ কোথায়? তাপ ও ভারমাত্র বিভিন্ন, পদার্থতে তারতম্য কই? কঠিন—শীতল ও স-ভার তরল; বাষ্প—উষ্ণ ও স্বল্পভার তরল; কঠিন নিয়ম ভেদে তরল ও তরল নিয়মভেদে বাষ্প আকার ধারণ করে। অতএব পদার্থ পদার্থই রহিল, বিভাগ নিয়ম ভেদমাত্র। চেতন, উদ্ভিদ্ অচেতন—বস্তু বিভাগ করিলাম; বিভাগের সূক্ষ্ম মধ্য রেখা নির্দ্দেশ কর; দিনমান ও রাত্রিকালের মধ্যস্থিত সূক্ষ্ম প্রকৃত সন্ধ্যা মুহূর্ত্তের ন্যায় উহাও চিরন্তন মানব-মস্তিষ্কের অগোচর। সম্পূর্ণ চৈতন্য সম্পন্নের মধ্যেও অণুপ্রমাণ অচৈতন্য বিদ্যমান (যেমন মানবদেহে কেশ-দন্ত নখরাদি), প্রকৃত অচৈতন্যেও বিন্দুপ্রমাণ চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি দেখা যায় (যেমন পার্ব্বিতাবৃদ্ধি, মাধ্যাকর্ষণী শক্তি, আভ্যন্তরিণ উত্তাপ), কখন উদ্ভিদ জীব-ধর্ম্মাবলম্বী (যেমন মাংসাশী বৃক্ষ), কোথায় সচেতন অচেতন গুণাক্রান্ত (যেমন কম্পাস-বৃক্ষ প্রভৃতি) কোথায় একজাতি অন্যজাতিতে পরিণত হইতেছে (যেমন গুটীপোকা, প্রবাল-দ্বীপ, প্রভৃতি) অতএব প্রকৃতপ্রস্তাবে ভাগবিভাগের পার্থক্য থাকে না; একভাগ অজ্ঞাতসারে ক্রমে অপরভাগে পরিণত হইতেছে, এক বিভাগ ক্রমশঃ অপর বিভাগ হইয়া পড়িতেছে—মূলে এক সূক্ষ্ম সূত্র যেন সর্ব্ব ভাগ বিভাগের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান। তাই দার্শনিকগণও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন—জীবদেহে চৈতন্য কোথা হইতে আসিল? পঞ্চভূতের কোন অংশ ত পৃথক্ ভাবে চৈতন্য সম্পন্ন নহে; অভিনব কোন বস্তু কিরূপে জন্মিতে পারে? তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে অচৈতন্য অংশের মধ্যেও চেতনাংশ নিদ্রিত ভাবে ছিল, পরস্পরের সংযোগ বিয়োগে চৈতন্য স্ফুরিত হইয়াছে মাত্র; কিম্বা, অপর দিকে এক চৈতন্য হইতে সকলই ক্রমান্বয়ে বিকসিত হইয়াছে। "There is in Nature only a single thinking thing, which is expressed in an infinitude of ideas corresponding to the infinitude of things that are in Nature (Spinoza).

বিভিন্নতা ও একত্ব

একপক্ষে সকলই বিভিন্ন, অন্য পক্ষে সকলই এক। মানব—এক নামধেয় এক জীব, মানবে আবার কত জাতি। এক জাতিস্থ সকলে কোন সাধারণ লক্ষণাক্রান্ত যদ্দ্বারা তাহারা একজাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে. আবার তাহারা কোন স্বতন্ত্র লক্ষণাক্রান্ত যদ্দ্বারা অন্যজাতি মানব হইতে তাহাদিগের বিভিন্নতা প্রকাশ পাইতেছে; পুনর্ব্বার দুই বা ততোধিক স্বতন্ত্র গুণাক্রান্ত জাতির মধ্যেও কোন সাধারণ গুণ বিদ্যমান আছে, যদ্দ্বারা তাহারা সকলে কোনএক বৃহত্তর জাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এইরূপে সাধারণ ও স্বতন্ত্রগুণ প্রত্যেক ভাগ বিভাগ উপবিভাগের মূলে লক্ষিত হয়।

"The universal or permanent qualities are the primary ones and the variable or peculiar qualities

are the secondary ones. Primary qualities are 'extension' and motion ; Secondary qualities are colour 'etc' (Merrie's Introduction to philosophy.

কয়েকটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক। উদ্ভিদ্—বৃক্ষজাতি—আম্রবৃক্ষ—নানাজাতীয় আম্রবৃক্ষ। এক এক জাতীয় আম্রবৃক্ষ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে, পুনরায় সাধারণ আম্রবৃক্ষও রক্ষা করিতেছে। এক্ষণে অধিকতর মনোনিবেশ পূর্ব্বক দেখিতে পাই—এক জাতীয় আম্রের নানা বৃক্ষ পরস্পর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে, এমন কি এক বৃক্ষের নানা ফল, নানা পত্র প্রত্যেকে অন্য হইতে সাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে; কোনও দুইটী ফল বা পত্র সর্ব্বতোভাবে অর্থাৎ আকার গঠন গুণে সম্পূর্ণ একরূপ হইতে পারে না। কি বিভিন্নতা! তদ্রূপ দেড়শত কোটি মানবের মধ্যেও এমন দুইটী মানব পাওয়া যায় না, যাহারা আকৃতি প্রকৃতি ব্যবহার ও কার্য্যগত সর্ব্বতোভাবে একরূপ বরং বিভিন্নতা সুস্পষ্ট ও সুদূরগত। বাস্তবিক, মানব আকৃতিগত যেরূপ বিভিন্ন প্রকৃতিগতও কোন ক্রমে তদপেক্ষা ন্যূন বিভিন্ন নয়; সেইজন্যই বোধ হয় পণ্ডিতগণ আকৃতি প্রকৃতিগত সাদৃশ্য বিসদৃশ্য সম্বন্ধ বিচার করিয়া সামুদ্রিক শাস্ত্রাদি অবধারণ করিয়াছেন। কেবল মাত্র আকৃতি প্রকৃতি কেন? প্রত্যেক মানবের ইন্দ্রিয়শক্তির ন্যায় সূক্ষ্মাংশেও বিশেষত্ব বিদ্যমান—কণ্ঠস্বর, দৃষ্টি, ঘ্রাণ, শ্রবণ, স্পর্শশক্তি পর্য্যন্ত মানবে মানবে প্রকৃত এক নহে। এমন কি আমি নিজ হস্তে একশত, একশত কেন? এক সহস্র বা ততোধিক "ক" এই অক্ষরটী যদি লিখি, আমার কোনও দুইটী "ক" অক্ষর অবিকল এক প্রকারের হইবে না, অথচ সকল গুলিকেই অপরে "ক" অক্ষর বলিবে ও এমন কি অন্যান্য অক্ষরের সহিত কথায় লিখিত হইলে আমার হস্তাক্ষরের "ক"—অক্ষরও বলিবে সন্দেহ নাই। এইরূপে, যদি একজন নির্দ্দিষ্ট লোক একটী নির্দ্দিষ্ট কথা বারম্বার উচ্চারণ করে, তাহার কোনও দুইটী উচ্চারণ সর্ব্বতোভাবে একরূপ হইবে না। এ বিষয়ে বিস্ময়ের কোনও কারণ নাই। সত্য, আমরা স্থূল আকৃত্যাদি বিষয়ে যেরূপ সুস্পষ্ট বিভিন্নতা দর্শন করি সূক্ষ্ম বিষয়ে তদ্রূপ করি না—তজ্জন্যই সন্দেহের উদ্রেক হয়। বৈজ্ঞানিক দার্শনিকদিগের (Jevons প্রভৃতি) সম্ভাবনা বাদ মতে (Theory of Probability) বিচার করিলেও দেখা যায় এক হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প, বিভিন্ন অংশ সংখ্যায় যত অধিক হইবে, তাহাদিগের কোন এক ভাবে পুনর্মিলন হওয়ার সম্ভাবনাও ততোধিক অল্প। আমাদিগের কণ্ঠস্বরের তারতম্যানুযায়ী বিভিন্ন পর্দ্দার সংখ্যা স্বরোদয় শাস্ত্রে এত অধিক বলিয়া বর্ণিত আছে যে, তাহাদের সকলের একভাবে সম্পূর্ণরূপে পুনর্মিলন হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। বিকট দার্শনিক মতেও সর্ব্বতোভাবে সমান দুইটী ঘটনা দেশ কাল পৌর্ব্বাপর্য্যে কাল্পনিকভাবে ও তাহারা দৃশ্য জগতে পরস্পর চির বিচ্ছিন্ন, কখনই এক হইতে পারে না; কারণ যাহাকে বিভিন্নভাবে নির্দ্দেশ বা চিন্তা বা অনুভব করা যায় তাহাই বিভিন্ন। অর্থাৎ যদি একান্তই বল, আমার দুইটী কথার উচ্চারণ অবিকল এক প্রকার হইয়াছে, বিকট দার্শনিক মতে আমি বলিব কখনই না, অন্ততঃ দুইটী উচ্চারণের মধ্যে সময়ের বিভিন্নতা আছে,

ইহাতেও তাহারা বিভিন্ন ; তদ্রূপ হস্তলিখিত "ক"—অক্ষর গুলি অন্ততঃ স্থান বিষয়ে বিভিন্ন।

এরূপ বিকট দার্শনিক মত সুদূরে পরিত্যাগ করিলেও, আমাদিগের পরস্পরের মধ্যে আকৃতি প্রকৃতি, গুণ ও কার্য্যগত অনুভবনীয় বিভিন্নতা সচরাচর বিদ্যমান্। এইরূপ বিভিন্নতার বিষয় অনুধাবন করিতে করিতে আমার অনেক সময় মনে হয় ;— হয়ত তুমি তোমার এক পদার্থের যে ভাব উপলব্ধি করিতেছ, আমি আমার সেই ইন্দ্রিয়ে সেই পদার্থের ঠিক সেই গুণের উপলব্ধি করিতেছি না ; বোধ হয় যদি আমি তোমার কিম্বা তুমি আমার অন্তরে একদিন প্রবিষ্ট হইতে পারিতে বা পারিতাম, তাহা হইলে এ কথার সত্যতা নিরূপিত হইতে পারিত, তাহা হইলে তোমার "কাল" রং ; ও আমার "কাল" রং ; প্রকৃত স্বতন্ত্র কি না বুঝা যাইত, কিন্তু তুমি আজীবন যে পদার্থের যে রূপকে 'কাল' বলিলে, বিভিন্ন হইলেও আমিও সেই পদার্থের সেই রূপকেই তোমার 'কাল' বলিয়া ধারণা ও প্রকাশ করিলাম। অতএব তোমার 'কাল' আমি জানিলাম না বা আমার 'কাল' ও তুমি জানিলে না, অথচ, পদার্থগত রূপভেদে নামের সামঞ্জস্যও নষ্ট হইল না।

বিভিন্নতা ও একত্বের সম্বন্ধ

তাহা হইলে বিভিন্নতার কি চূড়ান্ত! বিচ্ছিন্নতার একশেষ! তবে কি আমরা বিচিত্র বিভিন্ন আকৃতি প্রকৃতি গুণ ক্রিয়া সম্বলিত সৃষ্টি প্রবাহের মধ্যে নিমজ্জিত? তবে কি আমরা একজাতীয় এক মণ্ডলী এক সমাজভুক্ত হইয়াও প্রত্যেকে এরূপ নূতন নূতন জীব? প্রকৃতপক্ষে, আমাদিগের, কেবল আমাদিগের কেন! সকল ভাগ, বিভাগ, উপবিভাগের সাধারণ একত্ব গুণ সংখ্যা অপেক্ষা স্বতন্ত্র বিভিন্ন গুণসংখ্যাই অধিক। তথাপি সাধারণ গুণমাত্রেই স্থূল, বৃহৎ, সুস্পষ্ট, নিয়মিত ও বিস্তৃত, স্বতন্ত্র গুণমাত্রেই সূক্ষ্ম, ক্ষুদ্র, অস্পষ্ট, অনায়ত ও অনিয়মিত। স্থূল দুই হস্ত, দুই পদ এক মুণ্ডোদর প্রভৃতি সাধারণ গুণবিশিষ্ট জীব মানব, সূক্ষ্ম নাসিকা, চক্ষু, কপালের গঠনপ্রণালীতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতি, লোক। এই সাধারণ গুণাবলীই স্বল্প প্রিয়পাত্র, বন্ধনহেতু ও পরার্থ ; এই স্বতন্ত্র গুণাবলীই প্রিয়তম, স্বাধীনেচ্ছু, স্বার্থ। মানবমাত্রেই এই পরার্থ ও স্বার্থ সম্বলিত দ্বিভাব বর্ত্তমান থাকায় দার্শনিকদিগের বাক্ বিতণ্ডার বর্দ্ধিত হইবার সুযোগ হইয়াছে ; তজ্জন্য পরসুখ কি আত্মসুখ (Altruistic or Egoistic Hedonism) অধিকতর বাঞ্ছনীয় তাহার বিচার করিতে অনেক মনীষী বহুকাল ক্ষেপণ করিয়াছেন।

সাধারণ ও স্বতন্ত্র গুণ

তথাপি একত্ব-কারক সাধারণ গুণগ্রাম ঊর্দ্ধমুখী, বহুত্বোৎপাদক স্বতন্ত্রগুণরাজী নিম্নপ্রসারণশালী—একত্ব ঊর্দ্ধে, বহুত্ব নিম্নে ; একত্বে দৃষ্টি পড়িলে বহুত্ব আবরিত হয় ; বহুত্ব স্বল্পদৃষ্টি, একত্ব দূরদৃষ্টি ; বহুত্ব প্রথম জ্ঞান, একত্ব পশ্চাৎ বিচার। এক্ষণে একত্বের ভাব পর্য্যবেক্ষণ করা যাউক। জীব, উদ্ভিদ্, অচেতন—পদার্থ-বিভাগ হইয়াছে। ইহারা পরস্পর কি ভিন্ন? জীব অচেতনে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, অচেতন উদ্ভিদে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। জীব নিশ্বাস দ্বারা দেহস্থ অঙ্গারাম্ল বায়ুতে প্রেরণ করিয়া প্রশ্বাস দ্বারা বায়ুস্থ শুদ্ধ অম্লযান লইল, উদ্ভিদ্ পত্রের দ্বারা বায়ুস্থ অঙ্গারাম্ল হইতে অঙ্গার লইয়া নিজ পুষ্টিসাধন

করিল ও শুদ্ধ অম্লযান রাখিয়া বায়ুকে পরিস্কৃত করিল, জীব নিত্য ক্ষয়প্রাপ্ত দেহস্থ অঙ্গার সেই উদ্ভিদ্ ভোজনে পরিপূরণ করিল। জীবে, বায়ুতে, উদ্ভিদে কি সুন্দর বিচারসঙ্গত নিয়মিত আদান প্রদান চলিতেছে! সামান্যাতিসামান্য হইতে মহদপি মহদ্বিষয়ে এরূপ ঐক্যতা দেখিয়া মানববুদ্ধি মুগ্ধ হইতেছে। জড়, সমচেতন, চেতন বিভিন্নকারী শক্তিগণ মিলিত হইয়া এক উদ্দেশ্যে ফল প্রসব করিতেছে। পদ বহন করিল, কর আহরণ করিয়া বদনকে দিল, দন্ত ও জিহ্বা চর্ব্বণ ও গলাধঃকরণ করিল, উদর নিজের ও সকলের সমভাবে উপকার সাধন করিল। এই বিভিন্ন মণ্ডলী সমষ্টিতে ক্রমে একভাব ধারণ করিতেছে।

পৃথিবীস্থ যাবতীয় সৃষ্টিপ্রবাহে একই মূলমন্ত্র সঞ্চারিত—নিম্নে বিচ্ছিন্নতা, উপরে একতা। স্বয়ং পৃথিবী বিচ্ছিন্ন, নিম্নগতি কক্ষযুক্ত, নির্দ্দিষ্টগতি কক্ষ-সম্বলিত চন্দ্রোপগ্রহান্বিত বহুগ্রহ বর্ত্তমান এই গ্রহ সকল সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া ঘূর্ণায়মান, সূর্য্যের ন্যায় আবার বহু বিভিন্ন নক্ষত্র-সূর্য্য বর্ত্তমান, এই সৌরমণ্ডল আবার বোধ হয় কোন মহাসূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া এক বিশাল কক্ষে প্রধাবিত, নিম্নে বহুত্ব, ঊর্দ্ধে একত্ব—বিশাল ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী সত্য।

বহুত্ব হইতে একত্ব

আমাদের জ্ঞানোন্মেষ রাজ্যেও বহুত্ব প্রথম, একত্ব পশ্চাৎ। একত্ব ভিন্ন সকলই বহুত্ব। জন্ম হইতেই আমরা দ্বিত্বভাবে প্রক্ষিপ্ত—আত্মা ও জগৎ, আমি ও তুমি, দিবা ও রাত্রি, আলোক ও অন্ধকার, স্ত্রী ও পুরুষ, হাস্য ও ক্রন্দন, সুখ ও দুঃখ, জন্ম ও মৃত্যু,—ইন্দ্রিয়োন্মেষই বিপরীত ভাবাবলম্বনে। আমাদের অন্তঃকরণেও সময়ে সময়ে কাহারা দুইজনে কথাবার্ত্তা কহে। দ্বিত্বভাবের বিশ্লেষণেই ত্রিত্ব, চতুষ্ট্য, বহুত্ব সন্দেহ নাই। দিবারাত্রির পর সন্ধ্যা, ভূতভবিষ্যতের পর বর্ত্তমান, আমি তুমির পর তিনি, শীত গ্রীষ্মের পর বর্ষা তৎপরে শরৎ হেমন্ত বসন্ত অনুমান করা যায়।

একত্বের উদ্ভব

একত্বের উদ্ভব বিচারফলে প্রথমতঃ বহুত্বের সমষ্টিজ্ঞানে দিবারাত্রিতে মোট দিবস, ঋতুসমষ্টিতে বর্ষ, ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের সমষ্টি কাল প্রভৃতি। এইরূপে বহুবিষয়ের সাধারণ গুণাবলম্বনে শব্দবিদ্ পণ্ডিতগণ গুণবাচক নাম বা বিশেষণপদের উৎপত্তি নির্ণয় করেন এবং ভাগ বিভাগাদির সংজ্ঞাও এবম্প্রকারে উৎপন্ন।

দ্বিতীয়তঃ একত্বভাব জগতের আবর্ত্তন অনুধাবনে উৎপন্ন হয়। এই বিষয়টী একটু বিশদভাবে বুঝান আবশ্যক। সূর্য্যমণ্ডল, গ্রহমণ্ডল, উপগ্রহমণ্ডল সকলেই নিজে নিজে বিঘূর্ণিত, অবিরত বিচলিত, স্বতঃ চিরচঞ্চল; প্রথম দর্শনে, স্বল্পদর্শনে তাহারা অনিয়মিত, ভূয়োদর্শনে দূরদর্শনে সকলে নিয়ন্ত্রিত, চাঞ্চল্য সত্বেও পুনঃ স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত, সমষ্টিজ্ঞানে গুণে অবিচলিত। পৃথিবীতে পুনরায় আবর্ত্তন—সমুদ্রসলিল রবিকরে মেঘাকারে শূন্যমার্গে উত্থিত, মেঘ জলাকারে স্থলে সিঞ্চিত, স্থলস্থ জল অবিরত সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত, সমুদ্র হৃতজল পুনঃপ্রাপ্ত; সেইরূপ, পূর্ণিমা-অমাবস্যা, অমাবস্যা-পূর্ণিমা; শীত গ্রীষ্ম, গ্রীষ্ম-শীত; বীজ-অঙ্কুর-পল্লব-শাখা-ফুল-ফল-বীজ। এইরূপ ভূরি ভূরি আবর্ত্তন পরম্পরা অচেতন-সমচেতন-সচেতন সর্ব্ববিধ পদার্থে সমভাবে পরিস্ফুট, অভ্যন্তর রাজ্যে

অদৃষ্টচক্র পর্য্যন্ত কৌমার-যৌবন জরা, ক্ষয়-বৃদ্ধি, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু আবর্ত্তনে নিয়ত বিঘূর্ণিত।

এক্ষণে এইরূপ এক প্রতিজ্ঞা স্থাপন করা যায়,—এই মহান্ পাদার্থিক ও গুণময় জগতের অসংখ্য বিবর্ত্তনের সাধারণ গুণই এক একটী কেন্দ্র ও স্বতন্ত্রগুণ এক একটী বৃত্তরেখা, এই বৃত্তরেখাস্থ এক একটী বিন্দু আবার অপর ক্ষুদ্রতর বৃত্তের কেন্দ্র প্রত্যেক বৃত্ত কেন্দ্র উত্তরোত্তর বৃহত্তর বৃত্ত কেন্দ্রের উদ্দেশে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে।

একমেবাদ্বিতীয়ম্ সূত্রার্থ

বহু বচারিত "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বা তদ্বৎ এক একটী মহদ্বাক্য চিরন্তন দার্শনিক ভাবুক ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মানস-সাগর আলোড়িত করিয়া আসিতেছে। এই চিরপ্রসিদ্ধ বাক্যটী কোন একটী ধর্ম্মবিশ্বাসের নিজস্ব চিহ্নমাত্র হইতে পারে না। ইহা দর্শনশাস্ত্রের একটী চরম স্বতঃসিদ্ধ মাত্র। এই মহদ্বাক্যের অর্থ ঈশ্বর শঙ্করাচার্য্য হইতে আচার্য্য কেশব সেন পর্য্যন্ত মনস্বিগণ বহুবিধ ভাবে ধারণা করিয়া গিয়াছেন। এই মহীয়সী সৃষ্টি, এই বহু অবয়ব, এই ভূতপদার্থ দৃশ্যপট, দার্শনিকদিগের পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব, সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি, বেদান্তের ব্রহ্ম ও অধ্যাসভাব সকলই বিলুপ্ত, শেষ মহাবিলোপ—কিছুই থাকে না,—জগৎ আত্মার স্বপ্ন, আত্মাই ব্রহ্ম, অখণ্ডাদ্বৈতরস ব্রহ্ম অজ্ঞানোপহিত হইয়া জীবাত্মারূপে জগৎ স্বপ্ন দেখিতেছে—ইহাই একমেবাদ্বিতীয়মের এক অর্থ। ইহার বিপরীত নানাভাবে Deism, Theism, Pantheism, Polytheism সকলই হইতে পারে। বহুগুণাবলম্বী সমষ্টি জগৎ বা "তুমি" এবং "আমি" এই দুই পুনরায় সমষ্টিভূত হইয়া এক "সে" (ব্রহ্মত্বে) পরিণত হয়; তখন "সে" ভিন্ন আর কিছুই অস্তিত্ব থাকে না। ইহাই Positive Philosopher Compt's "The Etro Supre'me," "The Grand Etro."

অন্যভাবে। এই চিরঘূর্ণায়মান ব্রহ্মাণ্ড যে এক মহানীতির বশবর্ত্তী হইয়া মহাবেগে এক ভীষণ কার্য্যে ব্যাপৃত, তাহাতে কি কোন শব্দ উত্থিত হইতেছে না? এই পৃথিবী ভীষণবেগে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে বিঘূর্ণিত হইতেছে এবং নিজেও চক্রনেমীবৎ বিঘূর্ণিত, প্রত্যেক গ্রহ ঐরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত, এমন কি, স্বয়ং সূর্য্যও কোন এক অতিদূরবর্ত্তী কেন্দ্র ধারণ করিয়া এক মহা ভীষণ বিবর্ত্তন কার্য্যে রত। স্বয়ং পৃথিবীতে প্রত্যেক মানব-পশু-পক্ষী নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতেছে লইতেছে, আহার বিহার কার্য্যাদি করিতেছে বাক্য-শব্দাদি করিতেছে, প্রত্যেক উদ্ভিদ বা অচেতন বায়ু জল তাড়নে সর্ব্বদা কম্পিত, ঘর্ষিত, শব্দিত। সমস্ত মিশ্রিত হইয়া কি কোনও এক অবর্ণনীয় শব্দ হইতেছে না? কে জানে? মানব ক্ষণমাত্রও এ শব্দের বিরামাবস্থা উপলব্ধি করে নাই, তজ্জন্য হয়ত কিছুই বুঝে না; আমরা কর্ণ বন্ধ করিয়া নির্জ্জনে শারীরিক শ্বাসপ্রশ্বাস ঘর্ষণ ধমনীর গতি প্রভৃতির শব্দ শ্রবণ করিতে পাই—ইহাকে চলিত কথা "রাবণের চুলীর" অবিরাম শব্দ বলে; পণ্ডিতগণও বলেন, আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসে অবিরল ওঙ্কার বা হংস বা সোহং ধ্বনি হইতেছে। সেইরূপ জগৎব্রহ্মাণ্ডও কি ঐরূপ কোন অব্যক্ত মহাওঙ্কার ধ্বনিতে চির ঘূর্ণায়মান? সত্য সত্যই কি স-রব শব্দে ঘূর্ণিত হইতেছে? শব্দ কি? বিজ্ঞান বলে—নিয়মিত স্পন্দন (vibraton)। জগতও ত নিয়মিতভাবে

স্পন্দিত (বিবর্ত্তিত) হইতেছে, কেন তবে শব্দ হইবে না? বায়ুতে শব্দ বহন করে, উৎপাদন করে না; বায়ুহীন স্থানের শব্দ নীরব শব্দ। হইতে পারে, আমাদিগের কর্ণ যেরূপ অতি সূক্ষ্ম পিপীলিকাদির অন্যথা প্রমাণিত রব গ্রহণে অসমর্থ, হয়ত সেইরূপ মহা ওঙ্কারধ্বনির ভীষণ রব গ্রহণেও নিরপেক্ষ; হইতে পারে সে মহা ওঙ্কার ধ্বনি নীরব শব্দ, বায়ুহীন স্থানের স্পন্দন সম্ভূত রব। কিন্তু তথাপি,

* * * *

"To Reason's ears they all rejoice
And speak a glorious voice."

* * *

Addison

কিবা তায়, ঘোরে যদি গভীর নীরবে
আঁধারেতে ভূমণ্ডল-চতুর্দ্দিকে সবে;
প্রকৃত নিস্বন, কিম্বা কোন কণ্ঠস্বর,
প্রদীপ্ত জ্যোতিষ্ক মাঝে নহেক গোচর?
বিচার শ্রবণে তারা আনন্দিত কত!
সুমহৎ স্বরে গান করে অবিরত;
জ্বলিতে জ্বলিতে তারা করিছে প্রচার,
'নির্ম্মিত যে করে মোরা তাহা বিধাতার'।

বাস্তবিকপক্ষে, শব্দ আকাশভূতের কর্ম্ম, বায়ুহীন স্থানেও শব্দ সম্ভব; তজ্জন্যই আর্য্য দর্শন বলিয়াছে ;—

"অনাদি নিধন শব্দ অর্থের ন্যায় নিত্য, শব্দ উচ্চারণের পূর্ব্বে অব্যক্তভাবে বিদ্যমান্ থাকে, উচ্চারণে ব্যক্ত এবং উচ্চারণের পরেও ইন্দ্রিয় অগ্রাহ্য হইয়া বর্ত্তমান থাকে; শব্দ মনুষ্য করে না, কণ্ঠধ্বনিতে শব্দ সজ্জিত করা হয় মাত্র।" (বেদান্ত দর্শন)

একত্ব ও বহুত্বের মর্ম্ম

এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সমষ্টির নিয়মিত স্পন্দন, মহাওঙ্কার রব প্রভৃতি একত্রীভূত হইয়া আত্মার অন্তরে এক মহা চৈতন্য কেন্দ্রের বিষয় জাগরিত করিতেছে; সেই মহা চৈতন্য কেন্দ্র স্ফুরিত ও বিচ্ছুরিত হইয়া দ্বিতীয় স্তরের বহু চৈতন্যকেন্দ্র সকল উৎপন্ন করিয়াছে, দ্বিতীয় স্তরের এক একটী আবার তৃতীয় স্তরের অসংখ্য চৈতন্য কেন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছে; এই নিয়মে ক্রমে আমি, তুমি, তিনি, প্রত্যেক নর, পশু, পক্ষী, কীট, উদ্ভিদ্ অচেতন প্রভৃতি অসংখ্য দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন স্তরের চৈতন্য-কেন্দ্র; মানবের অহং মমত্ব, পাশবিক সংস্কার (Instinct), মহানুভব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসুর নবাবিষ্কৃত উদ্ভিদের অনুভব শক্তি, পাদার্থিক মাধ্যাকর্ষণ, জড়ের ধর্ম্ম (Inertia) এক এক চৈতন্য-কেন্দ্রের উপলব্ধি মাত্র। অতএব সমষ্টি এক-চৈতন্য ব্যষ্টি বহু-চৈতন্য।

তুলনা

মনোবিজ্ঞান বিচারেও মনস্বিগণ প্রধানতঃ দুইটী পথ অবলম্বন করিয়া, বাহ্য জগৎ হইতে অন্তর্জ্জগতে আগমন, কিম্বা, অন্তর্জ্জগৎ হইতে বহির্জ্জগতে গমন করেন; এ দুই পথই এক—বিপরীত মুখে বিচরণ করা মাত্র—উভয়ই এক সত্যদৃশ্য প্রদর্শন করায়। প্রাচী পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ প্রথম পথ অবলম্বন করিয়াছেন অর্থাৎ বহুত্ব হইতে একত্ব নির্দ্ধারণ করেন (Induction); প্রতীচী পণ্ডিতগণ স্বভাবত দ্বিতীয় পথ গ্রহণে সমুৎসুক অর্থাৎ একত্ব হইতে বহুত্ব ধারণ করেন (Deduction)। প্রথমটী বহুত্বে একত্ব দর্শন ও দ্বিতীয়টী একত্বে বহুত্ব দর্শন; একটি সাধারণ লক্ষণ সমূহের সমষ্টি অনুভব, অপরটি স্বতন্ত্রগুণ সকলের ব্যষ্টি বিচার; একটী হিন্দু বৌদ্ধ ধর্ম্মের বীজ, অন্যটি খ্রীষ্টীয় সংম্প্রদায় ধর্ম্মের বীজ। উভয় পদ্ধতির সামঞ্জস্যে একমাত্র সত্যই উপলব্ধি হয়।

উপসংহার

"এক" গণিতশাস্ত্রের প্রথম সংখ্যা, এককই যাবতীয় সংখ্যায় সাধারণরূপে বিরাজমান অর্থাৎ যাবতীয় সংখ্যা এক হইতে উৎপন্ন ও একদ্বারা বিভাজ্য। অতএব শ্রীমদ্ভগবদ্গী-তার দশমাধ্যায়স্থ "অক্ষরাণা মকারোঽস্মি" প্রভৃতি শ্রীভগবদ্বাক্যের তুলনায় আমরা অনুভব করিতে পারি,—

"সংখ্যানামেকসংখ্যোঽস্মি"

শ্রীরামচন্দ্র মিত্র।

রাজা রামচন্দ্র দেব

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত কিঞ্চিদূন সার্দ্ধশত বর্ষ মধ্যে, বাঙ্গালা দেশে রামচন্দ্র নামধেয় অনেকগুলি হিন্দু রাজা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। সেই রাজাদিগের মধ্যে বেনাপোল-কাগজ-পুকুরিয়া, ছত্রভোগ ও চন্দ্রদ্বীপ এই তিন স্থানের তিনজন রাজাই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কাগজ-পুকুরিয়ার রাজা রামচন্দ্রের কথা, আমরা 'জীবন্ত-সমাধি' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ উপ-লক্ষ্যে, 'ভারতবর্ষ' ও 'মালঞ্চ' মাসিক পত্রে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার সম্বন্ধে এখন আর আমাদের কোনও বক্তব্য নাই। ছত্রভোগরাজ রামচন্দ্র প্রেমাবতার শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গদেবের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি মুসলমান শাসনকর্ত্তার অধীনে, সামন্ত-রাজরূপে, দক্ষিণে সীমান্ত রাজ্যের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন: সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু যখন ছত্রভোগে গিয়া, শ্রীজগন্নাথ দর্শনে অভিলাষী হন অথচ উড়িষ্যারাজ প্রতাপ-রুদ্রের সহিত গৌড়ীয় পাতসাহ হুসেন সাহের ঘোরতর যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতে থাকায়, তাঁহার উড়িষ্যা গমন (অবশ্যই লৌকিক আচারে) সম্ভবপর ছিল না, তখন রামচন্দ্র নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া, তাঁহার গমনে সহায়তা করিয়াছিলেন - তাঁহাকে নৌকাযোগে শ্রীক্ষেত্রে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। সেই ছত্রভোগরাজ রামচন্দ্রের সম্বন্ধেও আজ আমরা কোনও কথা বলিব না। চন্দ্র-দ্বীপাধিপতি রাজা রামচন্দ্রও আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহেন। আজ আমরা রামচন্দ্র নামধারী অপর এক নৃপতির, অন্য এক লুপ্তস্মৃতি হিন্দু রাজার লুপ্তপ্রায় কীর্ত্তিকাহিনী সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিব।

উল্লিখিত রামচন্দ্র চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত দুইজন ব্রাহ্মণবংশীয় এবং শেষোক্ত দুইজন কায়স্থ কুলসম্ভূত আর চন্দ্রদ্বীপাধিপতি ব্যতীত অপর তিনজনই খাঁ উপাধিধারী। সেকালে মুসলমান সম্রাট ও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা বা সুবাদারগণ, অধীন কর্ম্মচারী ও অনুগত ভূম্যধিকারীদিগকে খাঁ উপাধিদানে পুরস্কৃত করিতেন এবং সময়ে সময়ে সেই উপাধির সহিত ভূমিবৃত্তি বা জায়গীর প্রদান পূর্ব্বক শাসনাধিকারীও করিয়া দিতেন। আমাদের আলোচ্য রামচন্দ্রও সেইরূপ এক-জন খাঁ উপাধিধারী ভূম্যধিকারী। তবে তিনি যে কোনও পাতসাহ বা নবাব সরকার হইতে খাঁ উপাধির সহিত জমিদারী পাইয়া রাজা হইয়াছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। এজন্য অনুমান হয়, তিনি

স্বীয় বুদ্ধি নৈপুণ্যে বিপুল ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া, রাজোচিত প্রতিষ্ঠা প্রতাপের অধিকারী হইয়াছিলেন, আর তাঁহার গুণমুগ্ধ মুসলমান সুবাদার তাহা স্বীকার করিয়া লইয়া, খাঁ উপাধি দানে তাঁহাকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। কোনও কোনও লোকের মুখে এরূপ কথাও শুনিতে পাওয়া যায়—ব্রাহ্মণনগরের মটুকরাজার পিতামহ, রাজা রামচন্দ্রের পিতামহকে, ব্রাহ্মণনগর রাজ্য হইতে বজ্রদহ (বর্ত্তমান বাজদিয়া বা বাজডিহি) ও বারবাজার নামক দুই খানি গ্রাম ভূমিবৃত্তিরূপে অর্পণ করিয়াছিলেন আর রামচন্দ্র সেই গ্রামদ্বয় অবলম্বনে এক বিশাল রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজা হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু একথার কোনও ঐতিবৃত্তিক মূল্য নাই। ইহা জনসাধারণের মনঃকল্পিত একটা কিংবদন্তী মাত্র। মটুকরাজার পিতা পিতামহাদি কোনও পিতৃপুরুষই যে ব্রাহ্মণনগরে, এমন কি, যশোহর জিলার কোনও অংশেই কখনও রাজত্ব করেন নাই, অপিতু মটুকরাজাই যে ব্রাহ্মণনগরের সংস্থাপক, দূরবর্ত্তী পিতরাজ্য হইতে আসিয়া তিনিই যে এখানে বন পরিষ্কারান্তে নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা ভারতবর্ষে 'রাজা চন্দ্রকেতু' প্রবন্ধে কিছু কিছু প্রকাশ করিয়াছি এবং 'ব্রাহ্মণনগরের মটুকরাজা' নামক স্বতন্ত্র নিবন্ধে বিশেষ ভাবে লিপিবদ্ধ করিব। তবে মটুকরাজার সহিত রাজা রামচন্দ্রের যে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল আর সেই বন্ধুত্ব বিধি পালন, তাঁহার সাহায্য করিতে গিয়াই যে তাঁহার পতন হইয়াছিল তাহাতে মতবৈষম্য নাই। গাজী সাহেব মটুক রাজকে দমন করিতে গিয়া যখন দেখিলেন যে মহাবলশালী রাজা রামচন্দ্র তাঁহার প্রধান সহায়, রামচন্দ্রের দমন ব্যতীত তাঁহার দমন কোনও ক্রমেই সম্ভবপর নহে, তখন তিনি সর্ব্বাগ্রে সেই কার্য্য সাধনেই বদ্ধপরিকর হইলেন। সামান্য সূত্র ধরিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ বাধাইয়া দিলেন আর সেই যুদ্ধের ফলে রাজা রামচন্দ্রের সর্ব্বনাশ হইল, তাঁহার সমস্ত রাজ্য সম্পদ বিনষ্ট হইয়া গেল। গাজী সাহেবের সহিত এই যুদ্ধ ব্যতীত রাজা রামচন্দ্রের সম্বন্ধে আর অধিক কিছু জানিবার উপায় নাই। তাঁহার জীবনের প্রায় সমস্ত ঘটনাই অধুনা কালগর্ভে বিলীন, বিস্মৃতির অন্ধতমসে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। অতএব মাত্র সেই যুদ্ধ কথা বিবৃত করিয়াই আমাদিগকে রাজা রামচন্দ্রের কাহিনী শেষ করিতে হইবে।

রামচন্দ্রের কথা বলিতে হইলে, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী গাজী সাহেবের কথাও বলিতে হয়। নচেৎ প্রবন্ধের সমীচীনতা নষ্ট হয় এবং রামচন্দ্রের বিবরণও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এজন্য আমরা অগ্রে গাজী সাহেবের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া, শেষে তাঁহার বিষয় আলোচনা করিব। গাজী কাহার পুত্র, কোন্ স্থানের অধিবাসী এবং কোথা হইতে কোন্ সময়ে যে তিনি ব্রাহ্মণনগরে রামরাজার রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন, তাহার কোনও বিশ্বস্ত বিবরণ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। এ অঞ্চলের নানা জনে, নানা প্রকারে তাহার পরিচয় প্রদান করে। কেহ কেহ তাঁহাকে গোরা গাজী এবং কেহ বা হাড়োয়ার পীর গোরাচাঁদ উল্লেখে তাঁহার সম্বন্ধে নানা অবাস্তব অলৌকিক কথার প্রচার করিয়া থাকেন। 'কালু গাজী ও চম্পাবতী' নামক কেতাবে তিনি বিরাট নগরের রাজা সেকেন্দর সাহের পুত্র বলিয়া

অভিহিত হইয়াছেন। সংপ্রতি আবার এক-জন প্রবন্ধলেখক আর্য্যাবর্ত্ত মাসিকপত্রে উক্ত কেতাব অবলম্বনে মটুকরাজার বিবরণ লিখিতে গিয়া, তাঁহার বিসয়ে আর এক নূতন কথা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি হিজলীর সেকেন্দার পলোয়ানকে বিরাট নগরের সেকেন্দর সাহ ও গাজীকে তাঁহার পুত্র স্থির করিয়া তাঁহার জন্মকাল ১৪৮০ এবং মটুক রাজার রাজ্য নাশের কাল ১৫৩০ হইতে ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু প্রাগুক্ত জনবাদের ন্যায় তাহার এই সিদ্ধান্তেরও কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। গাজী সাহেব, গোরা গাজী ও পীর গোরাচাঁদ যে অভিন্ন ব্যক্তি নহেন, পরন্তু তিনজনই যে সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তি এবং পৃথক সময়ে পৃথক স্থানে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন আর গাজী সাহেবের সহিত হিজলীর সেকেন্দর পলোয়ানেরও যে কোনও সম্পর্ক ছিল না, তাহা সামান্য একটু অনুসন্ধান করিলেই বোধগম্য হইতে পারে। আমরা এস্থলে কেবল গাজী সাহেবের কথাই বলিব। তিনি যখন মটুক রাজা ও রামরাজার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন তিনি যে তাঁহাদের সমকালবর্ত্তী আর তাঁহাদের একজনের সময় নির্ণয় করিতে পারিলে তাঁহার সময়ও যে সহজে নির্নীত হইবে তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে কার্য্যও বিশেষ আয়াসসাধ্য নহে। এ দেশের প্রায় অধিকাংশ লোকই একথা অবগত আছেন যে, মটুক রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র কামদেব গাজী সাহেবের দ্বারা মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং 'ঠাকুরবর সাহেব' নামে পরিচিত হইয়া, চারঘাট গ্রামের হরিদাস সাহাকে স্বীয় শিষ্যশ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট করেন। হরিদাস সাহা 'হরে শুঁড়ী' নামেই এদেশে অধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং মধ্য বঙ্গের অন্যতম স্বনামধন্য ধার্ম্মিক রাজন্য বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। সেই হরিদাসের সহিত যশোহরের কায়স্থ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ ব্যাপার এদেশের একটী সর্ব্বজনবিদিত স্মরণীয় ঘটনা। এই ঘটনাকে মিথ্যা বলিয়া অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই, ইহার প্রতিকূলে এ পর্য্যন্ত কোনও কথাই প্রচারিত বা লিখিত হয় নাই। সুতরাং ঠাকুরবর সাহেব যে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন আর তাঁহার পিতা মটুক রাজা, মটুক রাজার বন্ধু রাজা রামচন্দ্র ও তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী গাজী সাহেব যে তাঁহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে অর্থাৎ মোগল সম্রাট আকবর সাহের শাসন কালের শেসাংশ হইতে জাহাঁগীরের শাসন কালের প্রথমাংশ পর্য্যন্ত কয়েক বর্ষের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। এ অবস্থায় হুমায়ুনের শাসনকালকে গাজী সাহেব কর্ত্তৃক মটুক রাজার এবং প্রকারান্তরে রাজা রামচন্দ্রের রাজ্য নাশের সময় বলিয়া উল্লেখ করিলে সত্যের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। তারপর গাজী সাহেবের জন্মকাল যদি ১৪৮০ খৃষ্টাব্দ বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে সেরূপ প্রাচীন বয়সে, ৫৩৫৪ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, সেরূপ উৎসাহ সহকারে দুইজন প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দু রাজার সহিত যুদ্ধ করাও যেন, তাঁহার পক্ষে, অনেকটা অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য হইয়া পড়ে। এই সকল কারণ বশতঃ আমরা উল্লিখিত প্রবন্ধ লেখকের সমস্ত সিদ্ধান্ত, প্রচলিত জনবাদের ন্যায়, অপ্রামাণ্য, অমূলক বলিয়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছি।

গাজীসাহেব কোন্ সেকেন্দর সাহের পুত্র এবং তাঁহার পৈতৃক বাসভূমি কোথায় ছিল, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে, আমরা এদেশে মাত্র চারিজন প্রসিদ্ধ সেকেন্দরের দর্শন পাই—দিল্লীর সেকেন্দর পলোয়ান, লোদী-বংশীয় দিল্লীশ্বর সেকেন্দর লোদী, বঙ্গেশ্বর সেকেন্দর সাহ এবং শূরবংশীয় সেকেন্দর সাহ শূর। এই চারি জনের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ সেকেন্দর সাহ শূর গাজী সাহেবের অনেকটা নিকটবর্ত্তী কিন্তু তাঁহাকেও তাঁহার পিতা বলিয়া স্থির করিতে পারা যায় না। বঙ্গেশ্বর সেকেন্দর সাহ ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত হন। তাঁহার সময়েই মুসলমান ধর্ম্ম-প্রচারক বা পীরগণ বঙ্গদেশে ধর্ম্ম-প্রচারার্থে আগমন করেন। সুতরাং তাঁহাকে বিরাট নগরের সেকেন্দর আর গাজীসাহেবকে তাঁহার পুত্র ও পীরদিগের একতম বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিলে, লুপ্ত-প্রায় ঐতিহ্য তথ্যের একটা নূতন অধ্যায়ের আবিষ্কার করা যাইত কিন্তু তাহা কোনও ক্রমেই সম্ভবপর হইতে পারে না। কারণ গাজী বঙ্গেশ্বর সেকেন্দর সাহের অনেক উত্তর-বর্ত্তী। কেহ কেহ তাঁহাকে সেকেন্দর নামা কোনও ধনী আমীরের পোষ্যপুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোনও কোনও লোকের মুখে আবার এরূপ কথাও শুনা যায় যে, তিনি আদৌ ব্রাহ্মণ ছিলেন, শেষে বঙ্গ-দেশাগত পীরদিগের কোনও শিষ্য বা প্রশিষ্যের নিকটে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পীর পদবাচ্য হইয়া উঠেন। এ অঞ্চলের অনেক প্রবীণ মুসলমানও এই মতের সমর্থন করিয়া থাকেন। 'কালু গাজী ও চম্পাবতী' নামক পুস্তকেও যেন ইহার আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ রাজা মটুক রায়ের কন্যা চম্পাবতী বা সুভদ্রার সহিত গাজীর বিবাহ হইলে, তাহা যে অশাস্ত্রীয় হইবে না, উক্ত পুস্তকের লেখক, গাজীর সহিত গঙ্গাদেবীর শোণিত সম্পর্কের উল্লেখে, তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। গাজী ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত না হইলে তাঁহার সম্বন্ধে সেরূপ কথা বলিবার কোনও প্রয়োজনই থাকিত না। সুতরাং গাজীকে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে বলিয়া মনে হয় না।

গাজীসাহেবের মূল বাসভূমি সম্বন্ধে নানা জনের মুখে নানা কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কেতাবে সেই স্থান বিরাট নগর নামে উক্ত হইলেও, দিল্লী ও আগরার নামও অনেকে করিয়া থাকেন। ফলতঃ যে স্থানেই তিনি জন্মগ্রহণ করুন না, তিনি যে 'ফকিরী' লইয়া বারুইপুর সব-ডিভিজানের অন্তর্গত ঘুটুরী গ্রামে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন, বহু অনুসন্ধানে আমরা তাহা জানিতে পারিয়াছি। ঘুটুরী বারুইপুরের চৌধুরী উপাধিধারী সুপ্রসিদ্ধ কায়স্থ ভূম্যধিকারীদিগের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত। এখন সেখানে গাজীর বাসভবন না থাকিলেও তাঁহার বাস্তুভিটার উপরে, তাঁহার নামে উৎসৃষ্ট একটী 'দরগা' আছে। শুনা যায়, উহা উক্ত চৌধুরী বাবুদের যত্নে ও ব্যয়ে নির্ম্মিত। দরগার নিকটে প্রতিবৎসর অম্বুবাচীর দিনে মেলা বসিয়া ২০।২৫ দিবস স্থায়ী হয় এবং তাহাতে বহু সহস্র লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এইরূপ প্রচার যে, মেলার সময়ে চৌধুরী মহাশয়েরাই সর্ব্বাগ্রে গাজীর দরগায় পূজা ও বলি প্রদান করেন এবং তাঁহারা পূজাদি না করিলে, কেহই সেই কার্য্যের অধিকারী হইতে পারে না। দরগার

সম্মুখে 'গাজীর পুকুর' নামে একটী ক্ষুদ্র জলাশয় আছে। উহাতে হিন্দু মুসলমান সকলেই, অভীষ্ট ফল প্রাপ্তির আশায়, গাজীর নামে 'সিন্নি ভাষায়।' আর সেই ভাসমান সিন্নি বা বাতসার বিশেষ প্রকার গতি প্রকৃতি অনুসারে আপন আপন মঙ্গলামঙ্গল স্থির করিয়া লয়। জনসাধারণের বিশ্বাস—জলাশয়টী দৈবশক্তিসম্পন্ন এবং যথাসাধ্য শক্তি প্রয়োগ সত্ত্বেও, কেহই নাকি উহার পরপারে লোষ্ট্র নিক্ষেপে সমর্থ হয় না। ঘুটুরী ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিবাসীরা গাজীর দরগা ও পুকুরের প্রতি যথোচিত সম্ভ্রম ও ভক্তি প্রদর্শন করে এবং রোগাদি 'অসুসার' নিবারণের জন্য, গাজীর উদ্দেশ্যে স্তুতিমিনতি আর তাঁহার দরগা ও পুকুরে 'হাজত' ও 'সিন্নি মানসা' করিয়া থাকে।

ঘুটুরী গাজী সাহেবের বাসস্থান হইলেও, সুন্দরবনই যে তাঁহার লীলাভূমি তাহা সর্ব্ববাদি সম্মত। সুন্দরবনে দক্ষিণ রায়ের আশ্রয়েই তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। এই স্থান হইতেই তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তি ও দৈবশক্তির সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল আর সেই শক্তি প্রতিষ্ঠার সাহায্যেই তিনি বিপুল বাহিনী সংগ্রহ করিয়া দুই জন প্রবল প্রতাপ হিন্দুরাজাকে পর্য্যুদস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গাজীসাহেব সন্ন্যাসব্রত লইয়া, ফকির হইয়া, কেন যে নরহত্যারূপ কুকার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে নিরূপণ করা সহজ নহে। আমরা বহু আয়াস স্বীকারে উহার যে কারণ নির্ণয় করিতে পারিয়াছি, তাহা 'ব্রাহ্মণ নগরের মটুক রাজা' প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিব। এখন রাজা রামচন্দ্রের যথা সংগৃহীত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিতেছি।

রাজা রামচন্দ্র কায়স্থ সমাজের দক্ষিণ রাঢ়ীয় শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট ছিলেন; তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের বাসস্থান ছিল মুড়াগাছা গ্রামে। সেখানে তাঁহারা যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তির সহিত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। রামচন্দ্রের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ, হরিনারায়ণ দেব এবং হরিনারায়ণের অধস্তন অষ্টম পুরুষ, পুরুষোত্তম নারায়ণ দেব হিন্দু ও মুসলমান রাজ-সরকারে উচ্চ উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, প্রভূত মান মর্য্যাদা ও বিষয় বিভব লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু পুরুষোত্তমের পৌত্র, কি কারণে জানা যায় না, পৈতৃক বাস্তু ভিটার উপরে বীতশ্রদ্ধ হন এবং মুড়াগাছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যশোহর জিলার যশোহর নগরের কিঞ্চিৎ দূরে, কোনও লুপ্তস্মৃতি পল্লীপ্রান্তে প্রান্তরমধ্যে গিয়া বাসভবন নির্ম্মাণ করেন। কালক্রমে সেই পল্লীপ্রান্তর সুরম্য হর্ম্ম্যমালায়, অসংখ্য দেব মন্দিরে এবং সুপরিসর পথ, সুরচিত উদ্যান ও সুদীর্ঘ সরোবর পরম্পরায় নগরে পরিণত হয় আর পরিশেষে দ্বাদশটী সুসমৃদ্ধ বিপণির নামানুসারে 'বার বাজার' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। কিন্তু সেই বারবাজার নগরের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামচন্দ্র কি তাঁহার কোনও পিতৃপুরুষ তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় না। অধুনা রামচন্দ্রের যে সব বংশধর খুলনা জিলার ন-পাড়া ও গঙ্গানন্দপুর গ্রামে বসবাস করিতেছেন, তাঁহারাও তাঁহাদের বংশ বিবরণের ন্যায়, এবিষয়েও কোন সঠিক কথা বলিতে পারেন না। তবে কলিকাতা সভাবাজারের দেব উপাধি বিশিষ্ট কায়স্থ রাজারা যে তাঁহাদের জ্ঞাতি তাহা দৃঢ়তা সহকারেই

প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ আবার একথাও বলেন যে, রামচন্দ্রের উপরি বর্ণিত পিতৃপুরুষ, পুরুষোত্তম দেবের পৌত্র, স্ব ইচ্ছায় স্বীয় বাসস্থান মুড়াগাছা ত্যাগ করেন নাই, মটুক রাজার একজন পূর্ব্বপুরুষ, প্রভূত জমি-জমা ও ধান্যের লোভে প্রলুব্ধ করিয়া, তাঁহাকে এখানে আনাইয়া বাস করাইয়া ছিলেন। কিন্তু একথাও যে, ভূমিবৃত্তিদানের ন্যায়, অলীক তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

রামচন্দ্রের বাসস্থান সম্বন্ধেও মতদ্বৈধ আছে। কেহ কেহ তাঁহাকে যশোহরের নিকটবর্ত্তী বাজদিয়া (প্রাচীন বজ্রদহ) গ্রামের অধিবাসী বলিয়া প্রকাশ করেন। বাজদিয়ার মধ্যবর্ত্তী একটী পরিখাতুল্য গভীর খাতই সেরূপ মত প্রকাশের কারণ বলিয়া বোধ হয়। খাতটীর বর্ত্তুলবৎ আকৃতি, দূর-বিস্তৃতি ও গভীরতার বিষয় চিন্তা করিলে স্বতঃই ধারণা হয়, যেন উহার মধ্যে প্রাচীর-পরিরক্ষিত এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা দণ্ডায়মান ছিল আর সেই অট্টালিকায় কোনও রাজ-প্রতিম ভূম্যধিকারী বহু পরিজনসহ বসবাস করিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, খাতের ভিতর বাহির কোনও স্থানেই প্রাসাদ ও প্রাচীরাদির কোনও নিদর্শন, এমন কি, একখানি ইষ্টক পর্য্যন্তও পরিদৃষ্ট হয় না। কোনও হিন্দু রাজার বাসস্থান হইলে, নিকটে দুই চারিটা বিলুপ্তপ্রায় বৃহৎ জলাশয় (মজাদীঘি) এবং দুই একটা দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান থাকিত। কিন্তু তাহা যখন নাই, রাজভবন থাকার কোনও চিহ্নই যখন কোনও স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন কি বিশ্বাসে রাজদিয়াকে রামরাজার বাসস্থান বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে? কেতাবে রামরাজার রাজধানীকে 'ছাপাই নগর' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু ছাপাই বলিয়া কোনও নগর যশোহর জিলায় নাই, কখনও ছিল বলিয়াও শুনিতে পাওয়া যায় না। আমাদের মনে হয়—ছাপাই বারবাজারেরই নামান্তর অথবা কেবল মাত্র কেতাবের লেখকই উহাকে ঐ নামে অভিহিত করিয়াছেন আর সেই বারবাজারই রাজা রামচন্দ্রের প্রকৃত রাজধানী। বারবাজারের বর্ত্তমান অবস্থা ও উহার পারিপার্শ্বিক চিহ্নাদি দর্শন করিলে স্পষ্টই তাহা বুঝিতে পারা যায়। সেখানে এখনও, রাজার বাস্তভিটার সহিত, 'রামরাজার দীঘি' নামা অনেকগুলি গভীর ও বৃহৎ জলাশয় বর্ত্তমান রহিয়াছে। নিকটবর্ত্তী গ্রামের অধিবাসীদিগের মুখে প্রকাশ—'বারবাজার পূর্ব্বে সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। উহার মধ্যভাগে রামরাজার ইষ্টক রচিত বৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকা ও তাহার চারিদিকে চারিটী প্রকাণ্ড শিব মন্দির বিরাজ করিত। রাজধানীতে অষ্টাধিক শতসংখ্যক বাপী এবং প্রত্যেক বাপীতটে এক একটী শিবমন্দির ও অত্রতত্র বহু অতিথিশালা বিদ্যমান ছিল। অতিথিশালায় জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে আগন্তুক মাত্রকেই অন্ন পানীয় দানে পরিতৃপ্ত করা হইত।' রাজার অতিথিসেবার কথা মুসলমানলেখকও স্বীকার করিয়াছেন। 'কালুগাজী ও চম্পাবতী' কেতাবে দেখিতে পাই—

"ছাপাই নগরের রাজা শ্রীরাম নামেতে।
শুনিনু যে অন্নদান করে নানামতে॥
গরীব এতিম আর দরিদ্র সবায়।
অন্নদানে সবাকারে তোষেন সদায়॥"

রাজবাড়ীর বর্ণনায় পুথি বলিতেছে—

"স্বর্গের তুলনা পুরী দেখিতে সুন্দর।"

এই সকল কিম্বদন্তী ও প্রমাণের সাহায্যে স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে, বারবাজারেই রাজা রামচন্দ্রের রাজধানী ছিল এবং তিনি যেমন ঐশ্বর্য্যশালী তেমনই পরোপকারী, প্রজাবৎসল ও ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। বারবাজারে এখনও তাঁহার পূর্ব্ব সমৃদ্ধির বহু নিদর্শন বিদ্যমান আছে। একটী কৃষ্ণ-স্তম্ভ সমন্বিত প্রকাণ্ড ও চূড়াহীন ভগ্ন শিব মন্দির অদ্যাপি তাহার ধর্ম্মনিষ্ঠার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মন্দিরের আকৃতি সুন্দর গঠন ও শিল্প নৈপুণ্য প্রশংসনীয় উহার দৈর্ঘ্যপ্রস্থ প্রায় তুল্যরূপ অর্থাৎ প্রত্যেক পার্শ্বের পরিমাণ বিংশতি হস্ত, ভিত্তির পরিসর কিঞ্চিদূন তিন হস্ত কিন্তু উচ্চতা ষষ্টি হস্তেরও অনেক অধিক বলিয়া বোধ হয়। আকবর-জাহাঁগীরের সময়ে বঙ্গ দেশের হর্ম্ম্যশিল্প যে কতদূর উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল তাহা এই মন্দিরের দ্বারা অনেকটা বোধগম্য হইতে পারে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, যত্নাভাবে ক্রমশঃই ইহার বিনাশের পথ প্রশস্ত হইয়া যাইতেছে।

উপরি বর্ণিত বিবরণ ব্যতীত রাজা রামচন্দ্র ও তাঁহার রাজধানী সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিবার নাই সুতরাং এখন আমরা তাঁহার জীবনের প্রধান ও শেষ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াই পাঠকগণের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিব। রামচন্দ্রের বিনাশসাধনই যখন গাজী সাহেবের সঙ্কল্প হইল, তখন তিনি তদনুরূপ কার্য্যসাধনে কালবিলম্ব করিলেন না। তিনি সুন্দরবন হইতে এক দল সেনা লইয়া আসিয়া, সহসা অতর্কিত ভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। রামচন্দ্র স্বীয় বীর পুত্রের সাহায্যে অনতিকাল মধ্যেই, তাহাকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া দিলেন। গাজীসাহেব পরাস্ত হইয়াও নিরস্ত বা ভীত হইলেন না, বরঞ্চ দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, পুনরায়, যুদ্ধসজ্জা করিলেন। এবার তিনি তাঁহার সুন্দরবন সেনার উপরে নির্ভর না করিয়া, নিকটবর্ত্তী ফৌজদারদিগের সহায়তা লইলেন। গাজীর অমানুষী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া গৌড়ীয় সুবাদারের এক সেনাপতিও স্বীয় সেনাবল লইয়া, তাঁহার পক্ষে যোগ দিলেন। গাজী সেই সেনাপতিকে স্থলপথে রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে পাঠাইয়া, নিজে স্বসৈন্যে নৌকারোহণে বারবাজার অভিমুখে যাত্রা করিলেন, রামচন্দ্র সেনাপতির আগমন বার্ত্তা শ্রবণ মাত্রেই, রাজধানী হইতে তিন চারি ক্রোশ অগ্রসর হইয়া, পথিমধ্যেই তাঁহার সহিত যুদ্ধ বাধাইয়া দিলেন। এদিকে গাজীসাহেব সুযোগ বুঝিয়া জলপথে আসিয়া, সহসা তাঁহার নগর আক্রমণ করিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, দুই দিক হইতে যুগপৎ আক্রান্ত হইলে, রামচন্দ্র নগর রক্ষায় সমর্থ হইবেন না আর তজ্জন্য অতি সহজেই তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। কিন্তু রামচন্দ্রের পুত্র তাঁহার অন্তরায় হইলেন। রাজা নগর ত্যাগ করিলেও রাজকুমার তাঁহার অনুগামী হন নাই। তিনি অল্পসংখ্যক সেনা লইয়া নগর মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এক্ষণে প্রভূত সেনাসহ সহসা গাজীসাহেবকে নগর বেষ্টন করিতে দেখিয়া তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন এবং সাহায্য প্রাপ্তির আশায় প্রথমতঃ ব্রাহ্মণনগরে ও শেষে যুদ্ধনিরত পিতার নিকটে দূত পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার উদ্বেগের অবসান হইল না। পাছে মটুক রাজার সহায়তা প্রাপ্তির কি

পিতার প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বেই তিনি গাজীর হস্তে পরাভূত ও সপরিবারে নিহত হন, এই আশঙ্কায় স্বীয় শিশুপুত্র কমলনারায়ণকে অপরাপর পরিজনদিগের সহিত স্থানান্তরিত করিলেন—বারবাজার হইতে ৫।৬ ক্রোশ দূরবর্ত্তী বোধখানা গ্রামে তাঁহাদের এক আত্মীয়ের গৃহে পাঠাইয়া দিলেন এবং সমস্ত সেনা একত্র করিয়া গাজীর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

রাজপুত্রের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গাজীর সঙ্কল্প আপাততঃ ব্যর্থ হইল বটে, কিন্তু তবুও তিনি হতাশ হইলেন না। বার বার বিপুল বলে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিলেন। এদিকে রামচন্দ্র দূত-মুখে পুত্রের বিপদের কথা শুনিয়াই ভীমবেগে মুসলমান সেনাপতির উপরে আপতিত হইলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যেই তাঁহার সেনাদলকে বিশৃঙ্খল ও ইতস্ততঃ বিতাড়িত করিয়া বিদ্যুদ্বেগে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। সেনাপতি তাঁহার তথাবিধ আকস্মিক আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত ও পশ্চাদপসরণে বাধ্য হইলেও পরাস্ত হন নাই সুতরাং তিনি অত্যল্পকাল মধ্যেই স্বীয় সেনাদিগকে একত্র সমাবিষ্ট ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তীরবেগে তাঁহার অনুগামী হইলেন এবং রামচন্দ্র নগরে প্রবেশ করিবা মাত্রই তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। রামচন্দ্র ভীত হইলেন না; কিন্তু পুত্রের সাহায্যার্থে নদীর দিকে যথাপ্রয়োজন সেনা পাঠাইয়া দিয়া, বিশেষ-ধীরতা ও সাবধানতা সহকারে সেনাপতির আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে নগরের দুইদিকে, একক্রমে পাঁচ দিবসকাল ঘোর যুদ্ধ চলিল। উভয়দলে বহু সেনা হতাহত হইল—হিন্দু ও মুসলমান সেনার রক্তে নদীর জল লোহিত বর্ণ ধারণ করিল, রণভূমি কর্দ্দমাক্ত, প্লাবিত হইয়া গেল। কিন্তু তথাপি যুদ্ধের বিরাম হইল না, কোনও পক্ষই পরাভব স্বীকার করিল না। গাজী সাহেব রাজা রামচন্দ্রের ও তাঁহার পুত্রের রণ-নৈপুণ্য ও পরাক্রম দেখিয়া ভয় পাইলেন এবং যুদ্ধের পরিণাম ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইল যে, এইরূপ ভাবে আর দুই দিবস যুদ্ধ চলিলেই তাঁহার পরাজয় ঘটিবে, তিনি সসৈন্যে রাজা রামচন্দ্রের হস্তে নিহত হইবেন। তখন তিনি আপনার প্রিয় শিষ্য বা অনুচর কালুসাহার সহিত যুক্তি করিয়া, ষষ্ঠদিন নিশীথরাত্রে নগরে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিলেন। নগর ধূ ধূ জ্বলিয়া উঠিল। অগ্নি শত শত লেলিহান রক্তজিহ্বা প্রসারিত করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যেই সমস্ত বারবাজার গ্রাস করিয়া ফেলিল। রামচন্দ্র পুত্রের সহিত সসৈন্যে সেই অগ্নিতে আত্মাহুতি প্রদান করিলেন আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিশাল রাজ্য, বিপুল ধন-সম্পদ ও সমস্ত শক্তি-প্রতিপত্তি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইয়া গেল।

রামচন্দ্র ও তাঁহার পুত্রের মৃত্যু সম্বন্ধে ভিন্ন মতও প্রচলিত আছে। যশোহর জিলার কোনও কোও অংশের অধিবাসীদিগের এইরূপ বিশ্বাস যে, তাঁহারা গাজী প্রদত্ত অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন নাই। বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিতে করিতে প্রথমে রাজা রামচন্দ্র ও শেষে তাঁহার পুত্র মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু কালু-গাজী ও চম্পাবতী কেতাবে অগ্নির কথাই লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক এই যুদ্ধে মটুক রাজা যে কেন রাজা রামচন্দ্রের সহায়তা করেন নাই তাহা বুঝিতে

পারা যায় না। অনেকে বলেন, তিনি যথা সময়ে যুদ্ধের সংবাদ পান নাই। তারপর যখন তাঁহার নিকটে সংবাদ পঁহুছিল আর তিনি 'ব্যস্ত সমস্ত' হইয়া, প্রভূত সেনাসহ নিজের এক পুত্রকে তাঁহার সাহায্যার্থে পাঠাইয়া দিলেন, তখন সমস্তই শেষ হইয়া গিয়াছে, মুসলমানেরা সপুত্র রাজা রামচন্দ্রকে নিহত করিয়া বারবাজার অধিকার করিয়া লইয়াছে। রাজকুমার ভৈরব নদের তীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াই ক্ষুন্নমনে স্বরাজ্যে ফিরিয়া গেলেন। যদি আর এক দিবস পূর্ব্বে তিনি বারবাজারে আসিয়া পঁহুছিতে পারিতেন, তাহা হইলে সমস্ত অবস্থারই পরিবর্ত্তন ঘটিত—রাজা রামচন্দ্র ও তাঁহার বীরপুত্র অকালে ইহসংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেন না এবং তাঁহাদের বিশাল রাজ্যেরও বিলোপ ঘটিত না। কিন্তু সমস্তই বিধির বিধান। সবই ভগবানের খেলা।

শ্রীঅঘোরনাথ বসু কবিশেখর।

নাইট্রোজেন ও তাহার আবর্ত্তন ক্রিয়া

বিংশশতাব্দীর এই বিরাট মহাসমরের সময় নাইট্রোজেনের ধ্বংসকরী ভয়াবহ কার্য্য ক্ষমতা দর্শন করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। বৈজ্ঞানিকগণ নাইট্রোজেনকে Inert বা স্বল্পক্রিয়াশীল বলিয়া সচরাচর বিশেসিত করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু অন্য পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া যখন ইহা আত্মশক্তি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে, তখন আর কেহ ইহাকে অদ্ভুত শক্তিশালী না বলিয়া থাকিতে পারে না। এমন কি আজকাল ইহা যে সমুদয় শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে তাহা প্রত্যক্ষ করিলে ইহাকে ভূগর্ভস্থ আগ্নেয় গিরির ন্যায় প্রলয়ঙ্করী বলিয়া মনে হয়।

বর্ত্তমান সময়ে যে সমস্ত Explosive বা বিস্ফোরকপদার্থ যুদ্ধ এবং ধ্বংস কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, তাহাদের সমুদয়ের মধ্যেই নাইট্রিক এসিড্ বা নাইট্রেট অনিবার্য্যরূপে বর্ত্তমান থাকে। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত নাইট্রেটই চিল্লীপ্রদেশের বিরাট খনি হইতে উত্তোলিত করিয়া এবং পরে 'নাইটার' বা পটোসিয়াম নাইট্রেটে পরিবর্ত্তিত করিয়া জমিতে সাররূপে ব্যবহৃত করা হইত। কিন্তু আজকাল নাইটারের প্রয়োজনীয়তা এতাধিক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে যে চিল্লীর সুবিশাল খণিও তাহা সরবরাহ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। বিস্ফোরক পদার্থে তাহার ব্যবহারই এই অভাবের একটী প্রধান কারণ। এ অবস্থায় প্রকৃতির সুবিশাল ভাণ্ডার বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেনকে মানুষের আয়ত্বাধীনে আনিবার জন্য বহুদিন হইতে বৈজ্ঞানিক কল্পনা চলিতেছিল এবং তাহার ফল স্বরূপ আজ কাল নানা উপায়ে বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন বাহির করিয়া নাইটার প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। যাহা হউক সে সমুদয় পরে বিবৃত হইবে।

যাবতীয় সজীব পদার্থ এবং জীবের শরীর হইতে যে মলমূত্র প্রভৃতি বহির্গত হয়, তন্মধ্যে নাইট্রোজেনের অবস্থিতির কথা বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন। যখন কোন জৈবিক পদার্থ Bacteria বা এক প্রকার জীবাণুর সাহায্যে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে থাকে, তখন নাইট্রোজেনের কতকাংশ বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়। অবশিষ্টাংশ মৃত্তিকা শোষণ করিয়া নিলে তাহা হইতে বৃক্ষাদি ইহাকে শোষণ করিয়া আপন দেহের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। জীবগণের নাইট্রোজেনের হজম করিবার ক্ষমতা নাই, এই জন্য তাহাদিগকে বৃক্ষলতাদির উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয় এবং বৃক্ষলতাদিও আবার ইহাকে বায়ুমণ্ডল হইতে টানিয়া আনিতে পারে না। নাইট্রোজেন সাধারণতঃ মৃত্তিকাভ্যন্তরে পটেসিয়াম, সোডিয়াম অথবা অন্য পদার্থের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। মাটীর সহিত বিভিন্ন রকমের Becteria বা জীবাণু থাকে, ইহারা নাইট্রোজেন মিশ্রিত পদার্থকে নাইট্রেট এবং বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন গ্যাসে পরিণত করিয়া থাকে। তখন নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়, কিন্তু সেখানে ইহার স্বীয় অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে না। ইহা বর্ষাকালে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গের (Electric discharge) সংস্পর্শে আসিয়া নাইট্রিক অক্সাইডে পরিণত হয় এবং বৃষ্টিরজলের সহিত ভূমিতে পড়িয়া আবার মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া থাকে। কিন্তু মৃত্তিকার উর্ব্বরতা শক্তির জন্য এত অধিক নাইট্রোজেনের প্রয়োজন হয় যে এই নাইট্রোজেন কিছুতেই তাহার অভাব পূরণ করিতে পারে না। এই জন্যই জমির মধ্যে নাইট্রোজেনবাহী নানা প্রকার সার প্রয়োগ করিয়া কৃষকগণ জমির উর্ব্বরা-শক্তি বর্দ্ধিত করিয়া থাকে।

নাইট্রোজেনের উপরি উক্ত রূপ অদ্ভুত অবস্থা বিবর্ত্তন আরও সুন্দররূপে কল্পনা করা যাইতে পারে। আজ হয়ত নাইট্রোজেন পরমাণু দুর্ব্বার দেহস্থ সূক্ষ্ম কোঠরীতে (Cells) অবস্থান করিতেছে আবার কাল হয়ত তাহা কোন প্রাণী শরীরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পরে তাহা প্রাণীর মলমূত্র হইতে বহির্গত হইয়া উর্দ্ধ পথে উঠিয়া বিদ্যুৎ সংস্পর্শে অক্সিজেন গ্যাসের সহিত মিশিয়া গেল এবং নিজের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে না পারিয়া আবার নিম্নগামী হইতে বাধ্য হইল এ যেন কলুর বলদের মত অবিরত বৃত্তাকার পথে ঘুরিতেছে।

এই ত গেল নাইট্রোজেন কিরূপে প্রকৃতির শক্তির প্রভাবে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তির বৃদ্ধি করে। এইরূপে ইহা অনন্তকাল ধরিয়া প্রকৃতির দাসত্ব করিয়া আসিতেছে এবং এই দাসত্ব—মোচন করিতে যে চেষ্টা করে নাই এই কথা বলিলে যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের একটী প্রকৃতিগত গুণকে অস্বীকার করা হয়। বহুদিনের দাসত্বফলে তাহার জীবনীশক্তি এমনই অসারতা প্রাপ্ত হইয়াছে যে এক শৃঙ্খল উন্মোচিত হইতে না হইতেই বৈজ্ঞানিকের সুদৃঢ় শৃঙ্খল তাহার পায়ে পড়িয়াছে ইহা হইতে তাহার আর কিছুতেই রক্ষা নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে নাইট্রোজেন জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে। ১৮৭৩ খৃঃ আমেরিকার চিল্লী ও পেরু প্রদেশের পটেসিয়াম নাইট্রেট মাটীর নীচে প্রায় ৫৫০০০০০০ বর্গ মাইল স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং পরীক্ষার ফলে দেখা গেল যে প্রতিবর্গ মাইলে

৭০ লক্ষ টন নাইটার আছে। কিন্তু প্রতি বৎসর তাহা এত প্রচুর পরিমাণে ব্যয়িত হইতে লাগিল যে অনেকেই বলিতে লাগিলেন এক শতাব্দীতে সমস্ত নাইটার নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। তজ্জন্য তখন হইতে ইহার প্রতি-বিধান চেষ্টায় কোন কোন বৈজ্ঞানিকের চিত্তচঞ্চল হইয়া উঠে। এবং কৃত্রিম উপায়ে অথচ স্বল্প ব্যয়ে যাহাতে নাইটার পাওয়া যাইতে পারে সে চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সাধনা সিদ্ধ হইল। প্রধানতঃ এ পর্য্যন্ত তিনটী উপায়ে অন্য পদার্থের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় নাইট্রোজেন প্রস্তুত হইয়া থাকে তন্মধ্যে শেষোক্তটীই আমাদের বিশেষ আলোচ্য।

১। কেলসিয়াম কারবাইড জলীয় বাষ্পের সহিত নাইট্রোজেনে উত্তপ্ত করিলে ইহা কেলসিয়াম শিনেমাইডে পরিণত হয়।

২। হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোজেন এই দুইটী মৌলিক পদার্থ হইতে এমোনিয়া প্রস্তুত করিয়া জমিতে ব্যবহার করা হয়।

৩। বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনকে রাসায়নিক প্রক্রিয়াবলে অক্সিজেনের সহিত মিশাইয়া তাহাকে জলে অথবা ক্ষারের মধ্য দিয়া প্রেরণ করিলে উহা শোষিত হইয়া যায়।

প্রিষ্টলি J. Priestly দেখিলেন যে বায়ুর মধ্যদিয়া বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ উৎপাদন করিলে কোন দ্রাবক পদার্থ (acid) উৎপন্ন হয় এবং বলিলেন যে ইহা কারবণিক এসিডই হইয়া থাকিবে। কিন্তু তৎপরে কেভেণ্ডিস (১৭৮৫) প্রমাণ করিলেন যে উক্ত প্রক্রিয়া হইতে উৎপন্ন পদার্থ নাইট্রিক এসিড।

খুব উচ্চ তাপমানে নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন একত্র করিলে নাইট্রিক্‌অক্সাইড্‌ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই উত্তাপের যতই বৃদ্ধি করা যায়, নাইট্রিক অক্সাইডের পরিমাণও তত অধিক হইয়া থাকে। সমান আয়তনে (Equal volume) উক্ত দুইটী পদার্থ মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ বর্দ্ধিত করিলে যে পরিমাণে নাইট্রিক অক্সাইড্‌ প্রস্তুত হয়, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

তাপমান ...	১৯১১°	২০৩৩°	২১৯৫°	৩০০০	৩২০০°
নাইট্রিক অক্সাইড ...	·৩৭	·৬৪	·৯৭	৪·৫	

আজকাল আবার বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনকে মানুষের আয়ত্তাধীনে আনিবার নূতন উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেনের মধ্যদিয়া যখন বিদ্যুৎ প্রবাহ হয়—তখন এই দুইটী গ্যাস একত্রিত হইয়া এমোনিয়া উৎপাদন করে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ বিপরীত ক্রিয়া (Reversible reaction) হয় বলিয়া উৎপন্ন এমোনিয়ার পরিমাণ অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। কিন্তু বাহির হইতে উক্ত দুইটি গ্যাসের উপর অত্যধিক চাপ প্রয়োগ করিলে উৎপন্ন গ্যাসের (এমোনিয়া) পরিমাণও অধিক হইতে দেখা যায়। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে 'হাবার' সামান্য এক প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে অত্যন্ত অধিক চাপ প্রয়োগ করিয়া (at 185 atmospheres pressure) প্রতি ঘণ্টায় ৯০ গ্রাম তরল এমোনিয়া প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আজকাল জার্ম্মাণীর লাডুইগ্‌সাফেন নগরে Badiche Anilinu. Soda-Febrik নামক কোম্পানি বিপুল পরিমাণে উক্ত উপায়ে বায়ুমণ্ডল

হইতে এমোনিয়া এবং তাহা হইতে জমিতে ব্যবহারোপযোগী সার প্রস্তুত করিতেছে।

এসিয়া ভূখণ্ডের প্রধানতঃ ভারতবর্ষ পারস্য এবং আরব প্রভৃতি উষ্ণপ্রধান দেশ সমূহের নগর ও গ্রামের মলমূত্র আবর্জ্জনা প্রভৃতি বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়ার সুবন্দোবস্ত না থাকায় অধিকাংশ স্থলেই ইহা মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। এজন্য মৃত্তিকাস্থিত জীবাণু অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আবর্জ্জনার উপর ক্রিয়া করিয়া তাহা হইতে নাইট্রোজেন উৎপাদন করিয়া থাকে। এই মৃত্তিকা অনেকবার জলে ধৌত করিলে ইহার কতকাংশ জলে গলিয়া যায়, পরে এই জল জ্বাল দিলে পটেসিয়াম ও কেলসিয়াম নাইট্রেট প্রায় বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। গঙ্গানদীর নিকটবর্ত্তী ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে পটেসিয়াম নাইট্রেট পাওয়া যায়। ইহা সাধারণতঃ বেঙ্গল সল্‌পিটার নামে পরিচিত। এই নাইটার জমিতে সাররূপে অথবা বারুদ প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

নেপোলিয়ানের সঙ্গে যখন ইউরোপের রাজন্যবর্গের যুদ্ধ বাধিয়া উঠে, তখন বারুদ প্রস্তুত করিবার জন্য ফ্রান্সে নাইটারের বিশেষ অভাব ঘটে এই জন্য ফরাসী গবর্ণমেণ্টের আদেশে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গর্ত্ত খনন করিয়া রাখা হইত। তন্মধ্যে মলমূত্র আবর্জ্জনা, ছাই প্রভৃতি স্তূপাকারে রাখা হইত। ইহার উপরে বৃষ্টির জল যাহাতে পড়িতে না পারে, তজ্জন্য উপরিভাগে টিনের সেড্ নির্ম্মিত হইত। পরে এক প্রকার নলের সাহায্যে আবর্জ্জনাস্তূপের উপর গবাদির মূত্র ছড়াইয়া দেওয়া হইত। এইভাবে কিছু দিন চলিলে নাইটারের সাদাস্তর তাহার উপরে দেখা দিতে আরম্ভ করিত। ইহাকে সময় মত অপসারিত করিয়া এবং জলে গলাইয়া উত্তাপের সাহায্যে বিশুদ্ধ নাইটার প্রস্তুত করা হইত।

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দত্তগুপ্ত।

মোসন পিক্‌চার

কএক বৎসর পূর্ব্বেও মোসন পিক্‌চার (Motion Picture) ছেলে খেলা ব্যতীত আর কিছুই ছিল বলিয়া বলা যাইতে পারে না, কিন্তু ইহা এখন জগতের একটী প্রধান বাণিজ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এখন আর মোসন পিক্‌চারখানি চলিত ছবি বলিয়া লোকে দেখিতে চায় না; দশ বৎসর পূর্ব্বেও লোকে খালি ছবি নড়ে, ছবিতে খায় ও মারামারি করে প্রভৃতি আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার দেখিবার জন্যই ইহা দেখিত; কিন্তু এখন ইহা যতই পুরাণ হইয়া আসিতেছে, ততই লোকে আর ছবি নড়া দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে পারে না। এই সমস্ত কথা ভাবিয়াই মোসন পিক্‌চার প্রস্তুতকারকেরা ইহা কি প্রকারে একটী বাণিজ্যে পরিণত করিতে পারে, তাহারই চেষ্টা দেখিতে লাগিল, তাহারই ফলে আধুনিক মোসন পিক্‌চারের সৃষ্টি হইয়াছে।

আধুনিক সময়ে জগতের যত বিজ্ঞানের আবিষ্কার হইয়াছে, তন্মধ্যে মোসন পিক্‌চার

বোধ হয় সর্ব্বপ্রধান কারণ ইহা মানুষ মারিবার কল নহে, ইহা জনহিতকর, শিক্ষা-প্রদায়ক ও আনন্দদায়ক যন্ত্র মাত্র।

ইউরোপীয় ও আমেরিকানগণ ইহার গুণ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, তাই ইহার বাণিজ্য দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, ইহার বাণিজ্যে লক্ষ লক্ষ লোকের আহারের সংস্থান হইতেছে ও কোটী কোটী টাকার মূলধন খাটিতেছে। ইহার ব্যবহার আজকাল অধিকাংশ জনহিতকর কার্য্যেই হইতেছে। ইহাই আমাদের চখের সামনে দেশদেশান্তরে কি হইতেছে তাহা দেখাইয়া থাকে, ইহাই দেশে কি হওয়া উচিত কি না হওয়া উচিত আমাদিগকে শিখাইয়া থাকে। নাটক ও যাত্রা কেবল মেকি জিনিষ দেখায়; কিন্তু ইহাতে প্রকৃত জিনিষ আমাদের চখের সামনে আনয়ন করে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ইতিহাস ভূগোল, সামাজিক রীতিনীতি, পৃথিবীর সুন্দর সুন্দর দৃশ্য, ইহাই আমাদের চখের সামনে আনয়ন করিয়া থাকে। বোধ হয় অধিকাংশ লোকেরই ভিন্ন ভিন্ন দেশ দেখিবার ও জানিবার ইচ্ছা, কিন্তু দেশশুদ্ধ লোকের পক্ষে অপর দেশে গমন করা কিম্বা পুস্তক পড়িয়া শিক্ষা করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু সকলের পক্ষেই মোসন পিক্‌চার দেখিয়া শিক্ষা করা সম্ভবপর ও আমোদজনক, ইহাতে দুই ফল হয় আনন্দ ও শিক্ষা। ক্রমে ক্রমে প্রাচ্য দেশের বিদ্যালয় প্রভৃতিতেও ইহার প্রচলন হইতেছে, ইতিহাস, বিজ্ঞান, Anthropology, Hygeine প্রভৃতি ইহার সাহায্যেই ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, পুস্তক পাঠ অপেক্ষা ইহাতে অধিক ফল হইয়া থাকে, কারণ আমোদজনক সেই জন্যই অধিক মনোনিবেশ করিয়া ছেলে মেয়েরা দেখে সেই জন্যই সহজে মনে রাখিতে পারে; চোখের সাম্‌নে কোন ঘটনা ঘটিলে, বোধ হয় তাহা চিরকাল মনে থাকিবে, কিন্তু পুস্তক পড়িয়া শিক্ষা করিলে, অনেক সময় ভুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা। বক্তৃতার দ্বারা যাহা না হয় মোসন পিক্‌চারে তাহা হইয়া থাকে। সেদিন একটী ড্রামা দেখিলাম যাহার নাম "What England Expects," এই ড্রামাটীর মতলব বোধ হয় দুই কথায় বর্ণনা করা যাইতে পারে, যে, সমস্ত ইংরাজরাজের প্রজাদের স্বদেশের জন্য জীবন দেওয়া উচিত ও এই যুদ্ধের সময় সকলের ধন-জীবন দ্বারা দেশকে রক্ষা করা প্রয়োজন। এই ড্রামাটি কেবল স্বদেশপ্রেমের প্রেরণায় প্রণীত হইয়াছে, তাহা নহে, কোম্পানির পয়সা কামাইবারও ইচ্ছা ইহা প্রণয়ণের কারণ। ইহা এমন ভাবে ঔপন্যাসিক করিয়া লেখা হইয়াছে যে, সর্ব্বাপেক্ষা স্বার্থপরের মনেও স্বদেশপ্রেম জাগাইয়া থাকে। ইহা বিনা পয়সায় দেখান হয় না, লোকে পয়সা ব্যয় করিয়া দেখে, কারণ ইহাতে এমন ঔপন্যাসিক সৌন্দর্য্য রহিয়াছে যে, ইহাতে লোকের মনে স্বদেশপ্রেমত আনয়ন করেই, পরন্তু অত্যন্ত আনন্দও দিয়া থাকে। এ ছবি আমেরিকাতেও দেখান হইতেছে। আমেরিকার লোকে পয়সা ব্যয় করিয়া ইহা কেন দেখে? তাহাদের Englandএর জন্য স্বদেশপ্রেমিক হইবার ত কোন প্রয়োজন নাই। আমেরিকায় সর্ব্বদেশের লোক বাস করে, ইহার ঔপন্যাসিক ও নাটকীয় সৌন্দর্য্য দিবার জন্যই এদেশের লোক ইহা দেখিয়া থাকে। আর-একটী এই প্রকারের ছবি দেখিয়াছি তাহার নাম "Englands' Menace," ইহাতে German Spy' হইতে সতর্ক হইবার জন্য

উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আমেরিকাতেও এই প্রকারের Public opinion বানাইবার গল্প (picture story) তৈয়ারী হইয়া থাকে; "Silent plea" বলিয়া একটী drama দেখিলাম; ইহা বিধবা মাতাদের সাহায্যের জন্য লোকের sentiment প্রস্তুত করিবার জন্য প্রণয়ন করা হইয়াছে। ইহাও একটী খুব সুন্দর dramatic story ইহাতে দেখান হইয়াছে যে বিধবাদের স্বামী মরিবার পর ছেলে মেয়েদের ভরণপোষণ করিতে ও উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারে না, তাই ছেলে মেয়েরা অসৎ পথে যাইয়া আপনাদের জীবন নষ্ট করিয়া ফেলে। ছেলে মেয়েই দেশের আশাস্থল, গল্পটিকে এমনভাবে হৃদয়স্পর্শী করা হইয়াছে যে, ইহাতে লোকের উৎসাহ না জাগিয়া পারে না। কেমন করিয়া দুষ্টলোকেরা প্রলোভন দ্বারা ভুলাইয়া গরীব মেয়েদের অসৎপথে আনয়ন করে, ইত্যাদির picture storyও বানাইয়া জনসাধারণকে সতর্ক করিবার জন্য দেখান হইয়া থাকে। আবার দেশের ইতিহাস, ভাল ভাল উপন্যাস, নাটক, শাস্ত্র প্রভৃতিও দেখান হইয়া থাকে। লোকে প্রকৃত নাটক হইতে মোসন পিক্‌চার দেখিতে ভাল বাসে, তাই অনেক বড় বড় ও ভাল ভাল Theatre এখন মোসন পিক্‌চারে পরিণত হইতেছে। আরও ইহা অতি সস্তা সকলেই দেখিতে পারে।

আমেরিকাতে প্রায় প্রতি গ্রামেই মোসন পিক্‌চার show আছে, যাহাকে সাধারণ ভাষায় নিকেল show বলা হইয়া থাকে। কারণ ইহা দেখিতে কেবলমাত্র এক নিকেল (পাঁচ সেণ্ট) খরচা হয়। এখানে কপার অর্থাৎ সেণ্টের বিশেষ চলন নাই, পাঁচ সেণ্ট এক নিকেলই সবচেয়ে কম দামের, আমাদের দেশে ইহা এক আনায় দেখান যাইতে পারে। নিকেল থিয়েটারে একঘণ্টা হইতে দুই ঘণ্টার অর্থাৎ চার হইতে আট রিন্ ছবি দেখান হইয়া থাকে, এই সমস্ত থিয়েটার দিন দশটা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। বড় বড় সহরে সপ্তাহে দুইবার কিম্বা তিনবার প্রোগ্রাম পরিবর্ত্তন করা হইয়া থাকে, কোথাও কোথাও প্রত্যহই পরিবর্ত্তন হয়। এই কারণে Manufacturerদেরও সংবাদপত্রের ন্যায়, ইহা সময় মত বাহির করিতে হয়। সমস্ত কোম্পানিরই সংবাদপত্রের ন্যায় চলিত ছবি বাহির হইবার একটী নির্দ্ধারিত দিন থাকে; সেই নির্দ্ধারিত দিবসে প্রস্তুতকারকেরা রেণ্টারের নিকট ইহা প্রেরণ করিয়া থাকে, renterরা আবার ইহা থিয়েটারের ম্যানেজারের নিকট পাঠায়। Censor থাকাতে কোন প্রকারের অশ্লীল কিম্বা যে সমস্ত ছবিতে কোমল হৃদয়ে খারাপ অথবা সমাজে অহিতকর ভাব আনয়ন করে তাহা দেখাইতে দেওয়া হয় না।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও কেবল চলিত ছবি দেখিবার কৌতূহল হইতেই লোকে ইহা দেখিত। যতই ইহার বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই লোকের কৌতূহল মিটিয়া আসিতে লাগিল; তাই ড্রামা প্রভৃতি লইবার জন্য প্রস্তুতকারকের Stage প্রভৃতি বানাইতে হইল; প্রস্তুত করিবার জন্য Deirector, গল্প লিখিবার জন্য লেখক প্রভৃতি নিযুক্ত করিতে হইল। Stageএ খালি ভিতরের দৃশ্য লওয়া হইয়া থাকে, বহির্দৃশ্য সকল গল্প লিখিত স্থানে যাইয়া প্রকৃত স্থান হইতে লওয়া হইয়া থাকে। অনেক সময় অনেক কোম্পানিকে কেবল বহির্দৃশ্য লইবার জন্য অন্য দেশে

যাইতে হয়। অনেক সময় স্বদেশেই মেকি (artificial) দৃশ্য বানাইয়া লওয়া হইয়া থাকে। অনেক সময় প্রকৃত দৃশ্য দেখাইবার জন্য অনেক বড় বড় বাড়ী জ্বালান হইয়া থাকে। মনে করুন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ছবি লইতে হইবে, এ ছবি আমরা কলিকাতায় বসিয়া লইলে প্রকৃত হইবে না; ইহা পানিপথের নিকটবর্ত্তী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের জন্য ঐতিহাসিকগণ যে স্থানকে কুরুক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন সেই স্থানে যাইয়া লইলে প্রকৃত ছবি হইবে। অবশ্য ঘরের মধ্যের সিন্‌সেট প্রভৃতি আমরা যেখানে সেখানে বসিয়া architect দ্বারা বানাইয়া লইতে পারি। ইহাও যতদূর সম্ভব তৎকালীন শিল্পের ন্যায় করিতে হইবে। যে ভাল imitate করিতে পারে তাহাকেই ভাল director বলা যায়। এমন বানাইতে হইবে যে সাধারণ জনমণ্ডলী কিছুতেই মনে করিতে পারিবে না যে ইহা বানান। যেমন এখানে যুদ্ধের ছবি লওয়া হয়, দুই পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ করে, যুদ্ধে যে সমস্ত Machinery ব্যবহৃত হয়, ইহাতেও সে সমস্ত প্রকৃত Machinery ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যুদ্ধে যেমন লোক মরে কিম্বা ঘোড়া মরে ইহাতেও তাহা হয়, প্রকৃতপক্ষে একজনও মরে না, লোকে দেখিয়া মনে করে সত্য সত্যই মরিতেছে। ঘোড়া শিক্ষিত থাকে সোয়ার সমেত মাটিতে পড়িয়া যায়, এমন আশ্চর্য্যভাবে করে যে সময় সময় দর্শকদের অনেককে ভয়ে চেঁচাইয়া উঠিতেও দেখা যায়।

অনেক সময় প্রকৃত ঘটনা হইতে প্রকৃত ব্যক্তি লইয়া ছবি লওয়া হয়, এদেশে এ সমস্ত ছবির অনেক দাম, লোকে খুব আদর করে, সম্প্রতি এই প্রকারের একটী ছবি লওয়া হইতেছে। ইজিপ্তের (Egypt) খাদিপ একজন আমেরিকান actressকে বিবাহ করে। তাহার মুসলমান হারাম (Harem) ভাল না লাগাতে, সেখান হইতে পালাইয়া আসে। এই স্ত্রীলোকটীকে লইয়া এখন ছবি লওয়া হইতেছে; এই স্ত্রীলোকটী কি প্রকারে পালায় এবং সেখানে কি প্রকারের জ্বালা যন্ত্রণা পাইয়াছে তাহার সত্য মিথ্যা করিয়া গল্প লিখিয়াছে, সেই গল্পই এখন ছবিতে পরিণত করা হইতেছে। ইনিই অনেক actor হইতে বাছিয়া খাদিপের চেহারাযুক্ত একটী actorকে খাদিপ বানাইয়াছেন। Motion Picture actorকে মানানসই করাও একটী কঠিন কাজ, কারণ actor যে পাঠ লইবে, তাহাকে ঠিক সেই লোকের মত দেখান চাই। এই ছবিতে আমাদের সুরেন গুহ Special directorএর কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার কাজ মুসলমানদের রীতি নীতি ও পোষাক পরিচ্ছদ দেখান ও সমস্ত সেট্ Egyptian artএর মত হইতেছে কি না তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা। অবশ্য প্রকৃত ঘটনা সব সময় ঠিক রাখা যায় না, লোকের মনোরঞ্জন করিবার জন্য বাড়ান কমান হইয়া থাকে। আমি একটী ছবিতে কার্য্য করিতেছি ইহার নাম "Raja's Vow" ইহা ভারতবর্ষের ছবি, আমারও সুরেন বাবুর ন্যায় কার্য্য করিতে হয়, ইহাতে হিন্দু রাজাদের মহত্বই দেখান হইয়াছে, যদিও তাঁহাদিগকে আধুনিক কাল হিসাবে অশিক্ষিত প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। Motion Picture Industry শিখিবার জন্যই আমরা কার্য্য করিয়া থাকি।

এখানে oriental ছবি বানাইতে বড় বেশী খরচা হইয়া থাকে। আমাদের দেশে এ

সমস্ত ছবি লইলে ত্রিশাংশ কমে বানান যাইতে পারে। কারণ এখানে মজুরের খরচ অনেক বেশী, আমাদের দেশীয় বাজার প্রভৃতি বানাইতে অনেক খরচ হয়, হাতী কিম্বা অন্য জানোয়ার প্রভৃতি ব্যবহার করিতে অনেক খরচ, একটী হাতীর ভাড়া এখানে পাঁচ শত ডলার অর্থাৎ পনর শত টাকারও অধিক রোজ দিতে হয়। উটের ভাড়া এক শত ডলার, অর্থাৎ তিন শত টাকারও অধিক। আমাদের দেশীয় রাজার পোষাক বানাইতে শত শত ডলার খরচ হইয়া থাকে যদিও ইহা মেকি পদার্থ দ্বারা বানান হইয়া থাকে। এ জন্য মজুরের মজুরি রোজ তিন ডলার অর্থাৎ নয় টাকারও উপর; আমাদের দেশে আট আনা রোজে মজুর সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

শ্রীনিরুপমচন্দ্র গুহ।

স্বোপার্জ্জিত জলকষ্ট

(রাঢ় খণ্ড

উত্তর বর্দ্ধমান

(১)

বাঙ্গলা দেশের সকল স্থানেই নদী, খাল, বিলের সংখ্যাধিক্য নাই। স্থানে স্থানে এমন কতকগুলি পল্লী ও তৎপারিপার্শ্বিক স্থান আছে যথায় নদী খাল বা বিল নাই। যাহাও বা আছে নাম মাত্র। ফাল্গুন মাসেই তথায় জলাভাব ঘটে। রাঢ়ভূমির মধ্যে বহু কেদারবাহিনী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী বিদ্যমান রহিয়াছে—রাঢ়বাসীরা উহাদিগকে "কাঁদোড়" বলে।

বর্ষাকালে কৃষিক্ষেত্রের বা বনভূমির জলধারাই 'কাঁদোড়ে'র প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে; গ্রাম বা পল্লীর পয়ঃ প্রণালীর জল গড়াইয়া গিয়া কাঁদোড়ে পড়ে। ইহাতেই কাঁদোড়ে জলপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। বর্ষার ধারার বিরাম হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কাঁদোড়ের প্রবাহ কমিতে থাকে ফাল্গুন চৈত্র মাসে অনেক কাঁদোড় একেবারে জলহীন হইয়া পড়ে। গ্রাম, পল্লী এবং কৃষিভূমির জলপ্রবাহ কাঁদোড়ে পড়ে, সেইজন্য ঐ সকল স্থান হইতে নিম্নভূমির উপর দিয়া কাঁদোড় খাত বিদ্যমান থাকে। কোন কোন 'কাঁদোড়' "চোয়াট" জলধারায় পুষ্ট হইয়া বৎসরের প্রায় সকল মাসেই ন্যূনাধিক জলে বিদ্যমান থাকে।

খড়ী (খড়েশ্বরী) নদীও এই প্রকারের একটি বড় কাঁদোড়। কাঁদোড়ে বাঁধ দিয়া পল্লীবাসীরা শস্যক্ষেত্রে আবশ্যকমত জলগ্রহণের বন্দোবস্ত করে। একটি কাদোড়ের বহুস্থানে এই রকমের বাঁধ পড়ে। চোঁয়াট জল ও ক্ষেত্রের জল অথবা কাঁদোড় প্রবাহের অতিরিক্ত জল দ্বারা বাঁধের মধ্যবর্ত্তী অংশে প্রচুর জল জমে।

পূর্ব্বে যখন দামোদরের বামকূলে বাঁধ পড়ে নাই, তখন খড়ী নদীর মত বহু কাঁদোড় বর্ষাকালে দামোদর হইতে জল পাইত; দামোদর স্ফীত হইলে ঐ রকমের কাঁদোড় ও বহু শাখা-

নদী দ্বারা দামোদরের প্রবাহ ছুটিয়া, মূল প্রবাহকে শান্ত করিয়া দিত। দেশের অনিষ্ট না হইয়া ইষ্ট হইত।

দামোদর হইতে এই রকমের অনেক নদী পূর্ব্বে রাঢ়ের একাংশে বিদ্যমান ছিল—বর্ত্তমানে তন্মধ্যের একটি বাঁকানদী। বাঁকার মত অনেকগুলি ছিল—যেমন "গাঙ্গুড়" একটি।

এই প্রকারের কাঁদোড় ও নদী দ্বারা দেশের দুইটি উপকার হইত।

(১) কৃষিভূমি বর্ষে বর্ষে নূতন 'পলিমাটি' দ্বারা উর্ব্বর হইত। খাল, বিল, কাঁদোড় ও নদীতে জলধারা বহিত, প্রচুর মৎস্য জন্মিত, এবং কৃষিক্ষেত্রে আদৌ জলাভাব হইত না। বর্দ্ধমান লক্ষ্মীর মন্দির ছিল।

(২) বন্যার জলে কৃষিক্ষেত্রগুলি প্লাবিত হইত—নূতন পলি পড়িয়া, মাঠের আবদ্ধ জল বহিয়া যাইত বলিয়া এ অঞ্চলের স্বাস্থ্য সুন্দর ছিল। ম্যালেরিয়ার নামও দেশের লোকে জানিত না।

একদিকে 'দামোদর,' অন্যদিকে 'অজয়' মধ্যে উহাদের শাখা ও কাঁদোড় সমূহ এই ভূভাগকে জালবৎ জলপ্রবাহে পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল। ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের 'কর্ড' ও লুপলাইন দিয়া এবং নবপ্রতিষ্ঠিত বর্দ্ধমান কাটোয়া রেলপথ দিয়া একবার ভ্রমণ করিলেই ঐ সকল অসংখ্য জল-প্রবাহের চিহ্ন দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। ব্যাণ্ডেল জংসন হইতে কাটোয়া রেলপথে পর্য্যটন করিলেও উহাদের অস্তিত্বের নিদর্শন উজ্জ্বল ভাবেই দৃষ্ট হইবে। ভাগীরথীর জলধারাই বহু শাখানদী দ্বারা প্রবাহিত হইত।

এই কারণে বর্দ্ধমানের উত্তরাংশ স্বর্গের নন্দনকাননবৎ সুন্দর ছিল। বর্ত্তমানে সে সৌন্দর্য্য আর নাই। কেন নাই? এই প্রশ্নের উত্তর বহুবার বহুব্যক্তি সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। "বঙ্গবাসী" বর্দ্ধমানের এই দুঃখের কথা যতবার যত রকমে বলিয়াছেন—এমন আর কেহ বলেন নাই।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলরাস্তা রক্ষার জন্য যখন বাঁধ বাঁধা হইল তাহার পরেই দেশের এই অবস্থা হইয়াছে। দামোদরের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে সকল খাল বা নদীর সম্বন্ধ ছিল তাহা লুপ্ত হওয়াতেই, সেই সকল জলস্রোত মজিয়া গিয়া জলজ উদ্ভিদ-দামে পূর্ণ হইয়া যায়। দেশের কৃষি-ক্ষেত্রগুলি আর পলি মাটি দ্বারা উর্ব্বর হইতে পাইল না। পচা জল বাহির হইতে পারিল না। মৎস্য বংশ বৃদ্ধি হইল না। কৃষিক্ষেত্রে জলাভাব দেখা দিল। ষোল খানা ফসলের স্থানে বারখানা উৎপন্ন হইতে আরম্ভ করিল। পতিত গরু-আবাদী জমিগুলির ঘাস পূর্ব্বের ন্যায় জন্মিল না।

ব্যাণ্ডেল হইতে বর্দ্ধমান ও গুস্করা, কাটোয়া ও কালনা অঞ্চল পরিভ্রমণ করিলে খাল, বিল, নদী ও কাঁদোড়ের বর্ত্তমান চিত্র দর্শনে দুঃখিত হইতে হয়। সকল জলস্রোতগুলি মজিয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে উহাদের গর্ভদেশে কৃষি-ক্ষেত্র হইয়াছে। কোন কোন অংশের চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে, পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই এই প্রকার শোচনীয় অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে—সুদূর ভবিষ্যতে যে আরও কি হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

পদব্রজে পল্লীগুলি পরিভ্রমণ করিলে আরও ভীষণ চিত্র ভ্রমণকারীর নেত্রসমক্ষে উপস্থিত হইবে। এক ক্রোশের মধ্যে এই প্রকার মরা বা মজা নদী বা খালের এবং কাঁদোড় কোথাও তিনটি কোথাও দুইটির অস্তিত্ব উপলব্ধি হইবেই হইবে।

আর দেখা যাইবে মাঠে ও পল্লীমধ্যে এবং পার্শ্বে অসংখ্য পুষ্করিণী ছোট বড় ও মধ্যম আকারের জলাশয়ে একান্তর পল্লীমধ্যস্থ মাঠগুলি সুশোভিত পুকুরের পাড়ে একাধিক অশ্বত্থ ও বটগাছ শীতল ছায়া প্রদান করিতেছে। সে কালের পল্লীবাসীরা পুণ্য কামনায় জলাশয় খনন করাইয়া প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, মুক্তি বাসনায় মাঠের মধ্যে অশ্বত্থাদি তরুবর রোপণ ও প্রতিষ্ঠা করিতেন। পথক্লান্ত শ্রান্ত পথিক পুষ্করিণীর স্বচ্ছ শীতল জল পান করিয়া বৃক্ষের শীতল ছায়ায় বিশ্রাম করিত এবং প্রতিষ্ঠাতৃগণকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ দিত। "কোন্ ভাগ্যবান পুষ্করিণী ও বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে রে! তাহার স্বর্গবাস হউক।"

প্রতিষ্ঠাতৃগণের কৃতকার্য্যের এবং পুণ্যের ফলে বর্ত্তমান স্বার্থবাগীশ পল্লীবাসী ভূস্বামী ও কৃষককুলের আজিও অন্নসংস্থান হইতেছে। তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিতেন। নিঃস্বার্থ দানই প্রকৃত পুণ্য। পুণ্য মানসে যে দান করা হয় তাহাই নিঃস্বার্থ দান।

বর্ত্তমানকালে পল্লী মধ্যে এবং পল্লী বেষ্টনীর পার্শ্বে যে সকল দীঘি, সায়ের, পুকুর ও গড়ে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাতেই পল্লীবাসীর নিত্যনৈমিত্তিক জলের সঙ্কুলান হইতেছে। স্নান, পান ইত্যাদি অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যের জন্য যত জলের প্রয়োজন তাহা ঐ সকল জলাশয় প্রদান করে।

প্রাচীন পল্লীবাসীর সুকৃতি নিবন্ধন বর্ত্তমান আকৃতি মানবের এখন জলাভাব হয় নাই, কেবলমাত্র জলকষ্ট দেখা দিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে অধিকাংশ পল্লীভবনে জলাভাব উপস্থিত হইবে, তাহার সূত্রপাত ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে।

পূর্ব্বপুরুষগণ স্ব স্ব সংসারযাত্রা বিলাসহীন ভাবে নির্ব্বাহ করিয়া, দেশের ও দশের উপকারার্থ পুষ্করিণী খনন করাইয়া গিয়াছেন—তাঁহারা বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী ছিলেন একথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে।

তাঁহারা জীবকুলের কল্যাণার্থে ত্রিপ্রান্তর মাঠে জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়া অর্থের স্বার্থকতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। সেই জলাশয়ের জলোত্তোলন দ্বারা এখন কৃষিক্ষেত্রে জল সিঞ্চন করা হয়। সেইজন্য মাঠের ধান গৃহে প্রবেশ করিতেছে। তাহা না হইলে বড় বড় মাঠগুলি উষর মরুতুল্য হইয়া পড়িত।

শুনিতে পাই বর্ত্তমান কালের নরনারী, পূর্ব্বপুরুষগণের অপেক্ষা বুদ্ধিজীবী, চতুর এবং বিদ্বান; সেকালের লোকেরা বিদ্যাহীন না হইলেও মূর্খ ছিল। বর্ত্তমানের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত তখন একটিও ছিল না! না থাকিবারই কথা—কারণ তাঁহারা বাবুগিরির ধার ধারিতেন না দশের ও দেশের উপকারই একমাত্র কর্ত্তব্য ও অবশ্য পালনীয় বলিয়াই মনে করিতেন। উহাই তখনকার বিজ্ঞান ছিল।

তাঁহারা মাঠে ঘাটে পল্লীতে যে সকল জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহারই ফলে এখন আমরা জীবিত রহিয়াছি; তত্রাচ সেই প্রাণতুল্য জলাশয়ের আবর্জ্জনা, দল, দাম, পানা আমরা পরিষ্কার করি না—জলাশয়গুলি 'ভরাট' হইয়া 'মজিয়া' উঠিয়াছে, পূর্ব্বে জলাশয়ে যে পরিমাণ জল সঞ্চিত থাকিত, এখন তাহার 'সিকি' আন্দাজ থাকিতেছে না, চক্ষের সম্মুখে নিয়ত দেখিতেছি জলকষ্ট অনুভব করিতেছি।

তত্রাচ এখন এমন একটি স্বদেশ প্রেমিক দেখিতেছি না যে তিনি মাঠের ভরাট ও

মজা পুষ্করিণীর সংস্কারে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন!—যাঁহার অর্থবল আছে তিনিও মাঠের ভরাট জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার করিয়া লক্ষ্মীর সম্বর্দ্ধনা করিতে প্রস্তুত নহেন। অথবা দশের মধ্যে মিশিয়া, দশকে বুঝাইয়া, দশের সাহায্যে নিজে কর্ম্মী হইয়া অন্ততঃ জীবনে একটী পুষ্করিণীরও পঙ্কোদ্ধার করিয়া যাইলেন। তাঁহার কর্ম্মই না হয়, দেশের মধ্যে আদর্শ গঠন করুক।

স্বল্পতোয়া মাঠের পুকুর গুলির—'ছেচ' লইয়া দ্বন্দ্ব, বর্ত্তমানে ঘন ঘন হইতেছে; কাহার ছেচ অগ্রে, কাহার পশ্চাতে, কে 'ছেচ' পায় না, আর কেই বা 'জাওনা' পায় আর কেউ বা পায় না। এই সকল ব্যাপার লইয়া, মাথা ফাটাফাটী হয়, দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়, মোকদ্দমা মামলা হয়, ঘরের সঞ্চিত অর্থ অথবা জমি জমা বন্ধক দিয়া ঋণ গ্রহণ পূর্ব্বক অর্থ—মোকদ্দমায় জলের মত ব্যয় করা হয়।

অর্থক্ষয়, বলক্ষয়, কালক্ষয় ত হয়ই, তদুপরি মনঃকষ্ট ও মিত্রভ্রষ্ট হইতে হয়। গ্রামে পক্ষাপক্ষ ভাব আসে, দলাদলি হয়—একটা বিবাদ হইতে দশটা বিবাদের সাক্ষাৎলাভ হয়। তত্রাচ মাঠের পুকুরের সংস্কার করার আগ্রহ নাই। লক্ষ্মী সেইজন্য আমাদের প্রতি নিগ্রহ করিতেছেন। লক্ষ্মীর অনুগ্রহ কি করিয়া নিগ্রহে পরিণত হয় তাহা ঐ দিক দিয়াই দেখিতে হইবে। জ্ঞানলাভ করিতে হইবে।

শুনা যায় মাঠের পুকুর দশের, তাহার সংস্কার করিয়া লাভ নাই—লাভ আছে কি নাই কৃষিক্ষেত্রে জলাভাব উপস্থিত হইলেই ত বুঝা যাইতেছে। তখন জলের জন্য সেই ভরাট ও মজা পুকুরের নিকট সাহায্য প্রার্থী হইতে হয় কেন? তখন পুকুর বলিয়া মনে পড়ে—নইলে ধান মরে। তখন ত উপলব্ধি হয় যে—ঐ পুকুরে আমার স্বার্থ কত বড়!

পূর্ব্বে এক একটি মেঠো পুকুরের জলে সেই মাঠের জমিগুলি আবাদ হইত আদৌ জলাভাব হইত না। বর্ষার জল প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত থাকিত এখন কেবল থাকে না। জমির কদর ও মূল্য বৃদ্ধির একমাত্র কারণ মাঠের পুকুরের 'ছেচ' বিদ্যমানতা। যে জমির 'ছেচ' নাই—তাহার নাম "আকাশ মোহানী।" তাহার আদর নাই। তত্রাচ বুঝিতে পারিতেছি না, পুকুরে স্বার্থ আছে কি নাই!

মেঠো পুকুর খনন করিতে হয় নাই—তজ্জন্য অর্থ ও সময় নষ্ট হয় নাই—পুণ্যবানেরা আমাদের জন্য তাহা করিয়া গিয়াছেন—আমরা তাঁহাদের পুণ্যের ফলে সুখী রহিয়াছি। সেই পুণ্যবানগণের কল্যাণেই কেবল আমাদের অকল্যাণ হয় নাই। আমরা কিন্তু এমন কিছু করিয়া যাইতেছি না যাহাতে ভাবীবংশধরগণের কল্যাণ হইবে; তাহাদিগকে ভবিষ্যৎ অকল্যাণের জন্য প্রস্তুত করিয়াই আমরা সংসার হইতে বিদায় গ্রহণার্থ উদ্‌গ্রীব হইয়াছি। সুতরাং মেঠো পুকুরের পঙ্কোদ্ধারে আমাদের স্বার্থ নাই!!—নিঃস্বার্থ!!

সেই কোন্ কালে কে বা কাহারা মাঠের পুকুরগুলি কাটাইয়া গিয়াছেন, এতকাল তাহাতেই চলিল—ক্রমশঃ অচল হইয়া আসিতেছে—এখন গ্রামের মধ্যে ভাল মন্দ লোকও আছেন কিন্তু তাঁহাদের ত চেষ্টা করা উচিত—যে যাঁহাদের যেখানে এলাকে সেইখানের পুকুরগুলির পঙ্কোদ্ধার করা 'মোহান'টি মজবুদ করিয়া বাঁধা। তাহা ত

হয়ই না কিন্তু পুকুরের পাড়ের ধারেই যাঁহাদের ক্ষেত, বৎসর বৎসর তাঁহারা 'পাড়' কাটিয়া জমি বাড়াইয়া লইতেছেন—লইতে জানেন, নষ্ট করিতে জানেন, কিন্তু বাহাল রাখিতে বা বাহাল করিতে চাহেন না বা জানেন না—উহার বেলাই উদাসীন হন।

ক্রমশঃ দেয়ালে পিঠ লাগিতেছে। শুনিতে পাই তাঁহারা বলেন,—"আর তেমন ফসল হয় না—ধরিত্রী শস্য হরণ করিতেছেন।" এখন প্রায়ই 'কেতারী' (কার্ত্তিক মাসের জলাভাব) তে টান পড়িতেছে—'চটকা' তে কি ধান হয়—'ফুলুতে' পারে না—ঝেড়ে শিষ বাহির হয় না। শেষে জলাভাবে 'বগা' মেরে যায়। ঝাড়ে পাতে মন্দ হয় না, কিন্তু কেতারীর টানে দশ আনা হয় ছ' আনা 'আগড়া' পড়ে। 'ভোমা' মেরে যায়।

পূর্ব্বকালে 'কেতারী' হইত, জলকষ্টও হইত—সেইজন্য মাঠের ধান রক্ষা করিবার জন্য মাঠে পুকুর কাটাইতেন—গ্রামের লোকে বড়লোককে উপরোধ অনুরোধ করিয়া কাটাইয়া লইতেন। দশের উপরোধ রক্ষা করিতেও মহাজন ও জমিদারগণ একটা না একটা পুকুর দিতেন এই রকমে—ধীরে ধীরে কানে কানে অনেকগুলি পুকুর মাঠের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিল।

এখনকার যাঁহারা শিক্ষিত তাঁহারা গ্রাম ছাড়িয়া সহরে বাস করিতেছেন গ্রামের পুকুরেরই পঙ্কোদ্ধার হয় না, সংস্কার হয় না—তাহাতে আবার নূতন পুকুর কাটান হইবে! মাঠের পুকুরের কথা ত বহু দূরের কথা। কাজেই দেশে ঘন ঘন 'অজন্মা' হইতেছে। শুনিতে পাই কিছুদিন পূর্ব্বে বর্দ্ধমান স্বাস্থ্য-নিবাস ছিল—তখনকার মধুপুর, দেওঘর, ধানবাঁদের কাজ বর্দ্ধমানেই হইত।

মরা নদী, খাল বিল কাঁদোড়ের অবস্থা শোচনীয় হইলে দেশের মাঠের পুকুর মজিয়া উঠিলে—এক মাত্র পানীয় জলের নির্ম্মলতা বিদূরিত হইল। সেই সময় হইতেই জ্বর, কলেরা, আমাশয় প্রভৃতি ব্যাধি পল্লীবাসে মৌরসি পাট্টা লইল।

ক্রমশঃই দেশের অবস্থা শোচনীয় হইতেছে কেন? চিকিৎসকের অভাবে নহে, ঔষধের অভাবে নহে,—কেবল নির্ম্মল পানীয় জলের অভাবে এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে।

পল্লী মধ্যে যত গুলি পুকুর, গড়ে আছে—প্রায় সকল গুলিই দল দামে পূর্ণ। 'এঁদো' হইয়া পড়িয়াছে—গড়ের চারিদিকে বাঁশবন ও গাছ গাছালিতে অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। গাছের পাতা পচিয়া জল ভট্ ভট্ করিতেছে—সকল গড়ের জলই দুর্গন্ধময়। বাড়ীর পচাজল—নর্দ্দমার জল ঐ সকল গড়েতেই জমা হয়—গড়ের ধারে ধারে 'ছুতোহাঁড়ী' ও কচুবন, জলে পানা কলমী ও হেঞ্চাশাকের লতায় ছাইয়া আছে।

এই রকমের নরককুণ্ডগুলি, পল্লীর পাড়ার মধ্যে এক বা একাধিক বিদ্যমান। কচি ছেলের 'গুয়ের ন্যুড়ো' ঐ গড়ের ধারের কচু বনের মধ্যেই ফেলা হয়। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ঐ সকল গড়ের ধারেই 'বাহ্যে ফেরে'। একটু বৃষ্টি পড়িলেই—ঐ সকল মাল মসলা গড়ের জলে গিয়া পড়ে। পল্লী গ্রামের লোকে গড়ের ধারেই 'সারকুড়' করে। উহাই এক একটি 'নরক' সুতরাং পল্লীস্বাস্থ্য অক্ষুন্ন থাকিবে কি করিয়া।

পূর্ব্ব পল্লীবাসিগণ বর্ষার পূর্ব্বেই গ্রামের পয়ঃপ্রণালীগুলি মিলিতভাবে ঝালাইয়া গভীর করিয়া দিত। গড়ের মোহনা ঝালাইয়া দিত, পল্লীর জল, পল্লীধৌত করিয়া পল্লীর

বাহিরে কৃষিক্ষেত্রে বা 'নালায়' গিয়া পড়িত এবং দূরে চলিয়া গিয়া, কাঁদোড়ে বা নদীতে পড়িত। বর্ষার সময় প্রতিবার পল্লী ধৌত হইত। গড়ের আবর্জ্জনাও বাহির হইয়া যাইত।

এখন আর কেহ পয়ঃপ্রণালীগুলি ঝালায় না—সেটাও যেন পরের কাজ মনে করে। উহাতেও স্বার্থ নাই বিবেচনা করে। পল্লীর স্বাস্থ্যের সহিত পল্লীবাসীর স্বাস্থ্য যে হাড়ে হাড়ে জড়িত তাহা আর কেহ বুঝিতে বা বুঝাইতে চাহে না।

ঐ গড়ের জলে বাসন মাজা—তরিতরকারী ধৌত করা হয়, কাপড় কাচা হয়—সন্ধ্যার সময় গড়ের ধার দিয়া চলিলে একটা উৎকট পচা গন্ধ পাওয়া যায়।

পল্লীবেষ্টনীর পার্শ্বেই স্নানের পুকুর তাহাও জলজ উদ্ভিদে পরিপূর্ণ কেবল অপ্রশস্ত ঘাট কি পরিষ্কার—সেই স্থানেই সাবান মাখা, স্নান এবং সেই জলই পান করা হয়।

পুকুরের ধারে ' গো-ভাগাড়—বর্ষাকালে ভাগাড়ধৌত জল পুকুরেই গড়াইয়া পড়ে—সেই পুকুরে স্নান হয় সেই পুকুরের জল পান করা হয়।

পল্লীগ্রামের চারিদিকেই 'শ্মশান' শ্মশানগুলি পুকুরের পাড়ে ও 'গাবায়' (গর্ত্তে) বর্ষাকালে শ্মশানধৌত জল পুকুরে পড়ে এ পুকুরের জল ও পুকুরে যায়। অনেক পুকুরে মরা কচিছেলে পোঁতা হয়। কদাচিৎ কোন পুকুর সংস্কৃত হয়। পঙ্কোদ্ধার ত আর হয়ই না।

নদীতে বান হয় না, বড় নদীর সঙ্গে বড় বাঁধ দিয়া সম্বন্ধ রোধ করা হইয়াছে। সুতরাং তাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় মাছ জন্মে না। গড়ে গুলিতে আদৌ মাছ হয় না। বড় বড় পুকুরগুলি জলজ উদ্ভিদে পূর্ণ বলিয়া মাছ জন্মায় না। দু দশটা মাছ হয় মাত্র।

একা বানের অভাবে বিল খাল মজিয়া উঠিয়াছে—জলহীন হইতেছে। যেখানে পূর্ব্বে আমন ও বোরা ধান হইত এখন তথায় হৈমন্তিক ধানের চাষ হইতেছে।

পুকুরে গোরুর গা ধোয়ান হয়, ধারে কাপড় কাচা হয়। মললিপ্ত বস্ত্র ধৌত করা হয়। পুকুরের মোহানা গুলি ভাল নহে, বর্ষার জল যেটুকু জমে তাহার অনেকটা বাহির হইয়া যায়। তদুপরি পল্লীর পুষ্করিণীতে বাঁশ বাকারী পচান হয়। শণ, পাট পচান হয়।

দু একটি এঁদোপুকুর বর্ত্তমানে কেহ কেহ কাটাইছেন তাহার ঘাট বাঁধান হইতেছে—পাড়ে আমবাগান, কলাবাগান হইতেছে ইহাতে কিছু কিছু মঙ্গল হইতেছে।

পল্লীর পুকুর গুলির অবস্থা পরিবর্ত্তন না হইলে—পূর্ব্বেকার মত পয়ঃপ্রণালী উন্নত না হইলে আর গ্রাম্য পথগুলির বর্ষাগমে পয়ঃপ্রণালীতে পরিবর্ত্তিত হইবার পথ রুদ্ধ হইবে না। গ্রামের পচা জল গ্রাম্য 'সরাণে' আবদ্ধ হইয়া—গ্রাম্য মধ্যেই শুষ্ক হইয়া যায়। বর্ষার পরই সোঁতা পল্লী মাটি হইতে দূষিত বাষ্প বহির্গত হইতে থাকে পুকুরও গড়ের পচাজল বাহির হইতে না পারিয়া ঘোলা হইয়া ও পচিয়া উঠে—সেই জন্যই পল্লীবাসীগণ বলেন—"কার্ত্তিক মাসে যমের দক্ষিণ দোর খোলা থাকে।"

আশ্বিন হইতে কার্ত্তিক মাসের মধ্যে জ্বর, নিউমোনীয়া প্লুরিসি ও উদরাময় এবং আমাশয়ে মরিতে থাকে। ফাল্গুন চৈত্র হইলে জল কমিয়া আইসে—জল দূষিত হয়—উদরাময় ও শেষে কলেরা দেখা দেয়—এই উপায়ে আমরা স্বোপার্জ্জিত জলকষ্ট লাভ করি।

শ্রীহরিদাস পালিত।

ফরাসী শিল্প ও বাণিজ্য *

ফ্রান্স প্রথমে রোমাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এইজন্য ফরাসী সমাজে রোমীয় সভ্যতার নিদর্শন রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু জার্ম্মাণ জাতীয় ফ্র্যাঙ্কেরা ফ্রান্সের রোমাণ রাষ্ট্রশক্তি ধ্বংস করে—তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই সভ্যতার চিহ্ন পর্যান্ত অনেকস্থলে লুপ্ত হইয়া যায়। এমন কি, ফ্রান্সের বহু লোক-সমাকীর্ণ নগর ও পল্লী পুনরায় জঙ্গলে পরিণত হয় এবং কৃষিক্ষেত্র সমূহ পতিত ভূমি হইয়া পড়ে।

এই সময়ে খৃষ্টমন্দির ও মঠগুলি সমাজে সভ্যতা বিকিরণের কার্য্য করিত। ফরাসীদের কৃষিকার্য্য মঠের অধীনেই বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। মধ্যযুগের প্রথম অবস্থায় মঠাদি হইতে সমাজের অশেষ উপকার হয়। —পরবর্ত্তী কালে মঠগুলিই জাতীয় উন্নতির মহা অন্তরায় দাঁড়াইয়াছিল। যাহা হউক ধনবান্ ভূম্যধিকারীরা যখন দলাদলি, দাঙ্গাহাঙ্গামা ও রক্তারক্তিতে ব্যাপৃত থাকিতেন সেই সময়ে ধর্ম্মশালার অধিবাসী পুরোহিতগণ সমাজের হিতসাধনে রত থাকিতেন। তাঁহাদের লাঠালাঠি ছিল না—কাজেই জনগণকে ক্ষেপাইয়া তোলা তাঁহারা আবশ্যক বিবেচনা করিতেন না। এইজন্য তাঁহাদের ভূমি গৃহ কৃষিক্ষেত্র এবং অন্যান্য সম্পত্তি ও গোবলদাদির উপর জুলুম একপ্রকার হইত না বলিলেই চলে। বরং তাঁহারা যথাসম্ভব শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেন এবং দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত নরনারীগণকে অন্নদান, জলদান, বস্ত্রদান ঔষধদান ও বিদ্যাদানের ব্যবস্থা করিতেন। এই উপায়ে সমাজের ভিতর মঠাধ্যক্ষগণের খ্যাতি রটিত। ফলতঃ ফরাসী জাতির বৈষয়িক ইতিহাসে মঠসমূহের স্থান নিতান্ত নগণ্য নয়। ফ্রান্সের ধনসম্পদ মধ্যযুগে আরও কতকগুলি ঘটনার প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। মুসলমানগণের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণার ফলে বহু ফরাসী এশিয়া মাইনারে গমনাগমন করিত। তাহাতে বাণিজ্য ও শিল্পের কথঞ্চিৎ গতি পরিবর্ত্তন হইয়াছে। রাজা নবম লুই দেশের ভিতর শিল্প-পরিষৎ 'গিল্ড' ইত্যাদি গঠন করেন। তাহার ফলে কতকগুলি শিল্প কেন্দ্র দেশের নানাস্থানে পুষ্ট হইয়া উঠে। এদিকে ফ্রান্স ইতালী ও ফ্ল্যাণ্ডার্সের সন্নিহিত বলিয়া সেই দুই জনপদের প্রভাব ফরাসীরা সহজেই পাইত। মোটের উপর ফরাসী-সমাজে মধ্যযুগের প্রথম অবস্থায় নানাদিক হইতে বৈষয়িক উন্নতির বীজ উপ্ত হইতেছিল বলা যাইতে পারে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে নর্ম্মাণ্ডি এবং ব্রিটানী প্রদেশদ্বয়ে পশম ও সূতার বস্ত্র যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইত। তাহার দ্বারা দেশের অভাব মোচন হইত সঙ্গে সঙ্গে বিলাতেও কিছু রপ্তানি হইতে পারিত। এই সময়েই আবার হান্সা-লীগের বণিকেরা ফ্রান্স হইতে মদ ও লুণ ক্রয় করিয়া অন্যত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিল।

প্রথম ফ্র্যান্সিস্ দক্ষিণ ফ্রান্সে রেশমবয়ন প্রবর্ত্তিত করেন। চতুর্থ হেন্‌রিও এই শিল্পের উন্নতিবিধানে যত্ন লয়েন, এবং কাচ সূতা ও পশমী বস্ত্রের ব্যবসায় উৎসাহিত করেন।

* ফ্রেড্‌রিক লিষ্ট প্রণীত "স্বদেশী ধন-বিজ্ঞান" গ্রন্থের ঐতিহাসিক বিভাগের এক অধ্যায়।

কলবার্টের বিরুদ্ধে পরবর্ত্তীকালে আর একটা নিন্দা রটিয়াছিল। তাঁহার শাসনফলে নাকি ফ্রান্সের শিল্পসম্পদ নষ্ট হইয়া যায়! নিতান্ত অজ্ঞ অথবা শত্রুপক্ষীয় লোকেরাই এইরূপ বলিবেন। ইতিহাস পাঠক মাত্রেই জানেন যে, ফরাসী-সমাজ হইতে পাঁচলক্ষ ধর্ম্মসংস্কারপন্থী হুনো (Huguenot) ধর্ম্মের হিড়িকে নির্ব্বাসিত হয়। চতুর্থ হেন্‌রির আমলে ন্যান্টেসবিধি (Edict of Nantes) প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তাহার ফলে সংস্কার পন্থীরা ক্যাথলিকগণের সঙ্গে ফ্রান্সে চলাফেরা করিতে পারিত কিন্তু ন্যান্টেসবিধি রদ করা হইলে তাহাদের সেই সকল সুবিধা নষ্ট হইয়া যায় তাহারা দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। কলবার্টের সংরক্ষণ-নীতির সঙ্গে এই ধর্ম্ম-নির্য্যাতন-নীতির কোন সংশ্রবই নাই।

কলবার্টের মৃত্যুর তিন বৎসর ভিতরেই ফ্রান্সের পাঁচলক্ষ শিল্পবিৎ ও ধনী নরনারী নির্ব্বাসিত হইল। তাহার ফলে ফরাসী সমাজে ঘোরতর অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তাহার জন্য কলবার্টকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। এই নির্ব্বাসনের ফলে প্রথমতঃ ফ্রান্সের শিল্প-কেন্দ্রগুলি নির্ম্মূল হইল—ফরাসী শিল্পশক্তি অবসন্ন হইল, মূলধনও কমিয়া আসিল। দ্বিতীয়তঃ ফ্রান্সের প্রতিদ্বন্দী দেশ সমূহ লাভবান হইল। সুইজর্লাণ্ড, জার্ম্মাণির সংস্কারপন্থী রাষ্ট্র সমূহ, প্রুশিয়া, হল্যাণ্ড এবং ইংল্যাণ্ড এই সকল দেশে ফরাসী পলাতকেরা সাদরে গৃহীত হইল। বস্তুতঃ ফ্রান্স এই উপায়ে তাঁহার শত্রুগণের শক্তি বৃদ্ধিতেই সাহায্য করিলেন। নিজ পায়ে এই রূপেই কুঠারাঘাত করা হইয়া থাকে। কলবার্ট সমগ্র জীবনব্যাপিনী সাধনার দ্বারা যে বিরাট কার্য্যসম্পন্ন করিয়াছিলেন তাহা একটা নীচ প্রকৃতি গোঁড়া বেশ্যার কুমন্ত্রণায় তিন বৎসরের ভিতর লুপ্ত হইয়া গেল। ফ্রান্স আবার সেই শোচনীয় অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিল। ফ্রান্সের দুর্দ্দশার সীমা থাকিল না। ঠিক এই সময়েই ইংলাণ্ড রাষ্ট্রবিপ্লবের পর নবীন উৎসাহে দুনিয়ায় দৃষ্টিপাত করিতেছে। এলিজাবেথের আমল হইতে যে কর্ম্মধারা ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়াছে ইংরাজ সমাজে তাহা এক্ষণে নব-শক্তি লাভ করিতেছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে ইংল্যাণ্ডের ক্রমোন্নতি এবং ফ্রান্সের ক্রমিক অবনতি একসঙ্গে চলিতে লাগিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে ফরাসী রাষ্ট্রবীরেরা স্বদেশের হিতসাধনে ব্রতী হইলেন। তাঁহারা কল্‌বার্ট-নীতি পুনঃ প্রবর্ত্তন করিলেন না। তাঁহারা "সংরক্ষণ-নীতির" পরিবর্ত্তে অবাধবাণিজ্য-নীতির পক্ষপাতী হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন—"বিলাতে যদি ফরাসী মদের বাজার পাওয়া যায় তাহা হইলে আমাদের অধিক দৈন্য ঘুচিয়া যাইবে। কাজেই বিলাতী-শিল্পজাত দ্রব্য আমাদের দেশে অল্প শুল্কে আমদানি করায় কোন ক্ষতি নাই।" ইংরাজেরা ফরাসীদের প্রস্তাবে যারপরনাই আহ্লাদিত হইল। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে এক বাণিজ্যসন্ধি স্থাপিত হইল—তাহার নাম ইডেন-সন্ধি। ইহা পর্ত্তুগীজদিগের সঙ্গে স্থাপিত মেথুয়েন সন্ধিরই নূতন সংস্করণ মাত্র। ফলও তাহারই অনুরূপ হইল।

ইংরাজেরা পর্ত্তুগালের মদে অভ্যস্ত হইয়াছিল—কাজেই ফরাসী মদের কাটতি ইংরাজ সমাজে বেশী হইল না। এদিকে

ফ্রান্সের বাজারে বাজারে বিলাতী মাল প্রবেশ করিল। ফ্রান্স হইতে বিলাতে বিলাসসামগ্রী মাত্র রপ্তানি হইতে পারিত—কিন্তু বিলাত হইতে ফ্রান্সে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানি হইত। বিলাতী জিনিষের মূল্য কম থাকিত—এগুলি টেকসইও বেশী হইত। আবার ইংরাজেরা বহুকাল পর্য্যন্ত ধারে মাল ছাড়িতে পারিত। সকল দিক হইতেই ফরাসীরা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিল—"জাতিও গেল, পেটও ভরিল না।"

কিছুকালের ভিতরেই ফরাসী শিল্পীরা ধ্বংসোন্মুখ হইল। ফ্রান্সের মদ বিক্রেতারাও বিশেষ লাভবান্ হইল না। তখন ফরাসী রাষ্ট্র ইডেন-সন্ধি রদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ক্ষতি সামলান অসম্ভব হইল। শিল্প গড়িয়া তুলিতে এক পুরুষ বা এক যুগ লাগে—কিন্তু শিল্প ধ্বংস করিতে একবৎসরও আবশ্যক হয় না। সন্ধি রদ করিয়া ইংরাজের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ করিলে কি হইবে? ফরাসীদের মতিই বিগড়াইয়া গিয়াছিল—তাহারা বিলাতী দ্রব্যই বেশী পছন্দ করিত। কাজেই গুপ্তভাবে অবৈধ বাণিজ্য চালান ইংরাজের পক্ষে কঠিন হইল না। ফরাসীরাষ্ট্র যত বাধাই দিন না, ফরাসী সমাজ ইংরাজ বণিকগণের সহায়ক থাকিল। সুতরাং ফ্রান্সের স্বদেশী আন্দোলন সফলতা লাভ করিল না। অথচ ইংরাজের কোন ক্ষতি হইল না। তাহারা ফরাসী মদ বেশী পান করিতও না—আর যাহারা ফরাসী মদ ধরিয়াছিল তাহারাও সহজেই পুনরায় পর্ত্তুগীজ মদ ধরিল।

ফরাসী বিপ্লবের ফলে এবং নেপোলিয়ানী সময়ে ফ্রান্সের শিল্প যথেষ্টই অবসন্ন হয়। এই সময়ে ফরাসীরা তাহাদের উপনিবেশ এবং সমুদ্রবাণিজ্য সবই হারাইতে বাধ্য হইয়াছিল। তথাপি নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যে ফরাসী শিল্প চরম উন্নতি লাভ করে। এরূপ উন্নতি বিপ্লবের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন যুগে ফ্রান্সে দেখা যায় নাই। তাহার একমাত্র কারণ—স্বদেশী আন্দোলন। ফ্রান্সের বাজারে কোন বিদেশী মাল আসিতে পারিত না। ইডেন-সন্ধি পূর্ব্বেই ছিন্ন করা হইয়াছে—এক্ষণে যুদ্ধের ফলে ফরাসীর বাজারে ইংরাজের প্রবেশ পুরাপুরি নিষিদ্ধ—অবৈধ গুপ্ত বাণিজ্যও স্থগিত রহিয়াছে। কাজেই একমাত্র ফরাসী শিল্পীরাই ফরাসীজাতির সকল অভাব মোচনের সুযোগ পাইল।

যুদ্ধের প্রভাবে ইংরাজ ফরাসীদেশ হইতে বয়কট হইয়া গেল। নেপোলিয়ান এইখানেই ক্ষান্ত রহিলেন না। তিনি ইয়োরোপের সকল দেশ হইতেই ইংরাজকে বয়কট করিবার ব্যবস্থা করিলেন। সেই ব্যবস্থার নাম Continental System. তিনি ঘোষণা করিলেন যে জার্ম্মাণি, রুশিয়া ইত্যাদি সকল দেশই তিনি blockade বা রণতরীদ্বারা অবরুদ্ধ করিয়াছেন। এই সকল দেশের সঙ্গে অন্য দেশীয় লোকের আসা যাওয়া নিষিদ্ধ। বিলাতী দ্রব্যের রপ্তানি বন্ধ করাই নেপোলিয়নের মতলব ছিল। বস্তুতঃ যতদিন তিনি এই ব্যবস্থা বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন ততদিন জার্ম্মাণিতে এবং অন্যান্য দেশে শিল্পের চূড়ান্ত উন্নতিই সাধিত হইয়াছিল। নেপোলিয়ানের কার্য্যফলে ঐ সকল দেশে আপনা আপনিই বিদেশী বর্জ্জন ও স্বদেশী-সংরক্ষণ সুরু হইয়াছিল। স্বদেশের বাজারে বিদেশীয় মালের আমদানি বন্ধ করাই শিল্পোন্নতির সর্ব্বপ্রথম উপায়।

নেপোলিয়ান বলিতেন—"আজকাল জগতের

যে অবস্থা, তাহাতে যে জাতি 'অবাধ বাণিজ্য'-নীতি অবলম্বন করিবে সেই অধঃপাতে যাইবে।" নেপোলিয়ান সংরক্ষণ নীতির পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন—এবং কৃষিকর্ম্মের সঙ্গে শিল্পোন্নতির সম্বন্ধ গভীরভাবে বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার মত—"প্রাচীন কালে ভূমিই একমাত্র সম্পত্তি ছিল। বর্ত্তমান যুগে শিল্প প্রত্যেক জাতির দ্বিতীয় সম্পত্তি।" নেপোলিয়ান তথাকথিত ধন-বিজ্ঞানবিদ্‌গণের রচনা পাঠ করিতেন না। না করিয়া ভালই করিয়াছিলেন। কারণ পাণ্ডিতেরা নেপোলিয়ানের ন্যায় দেশের অবস্থা ও দুনিয়ার অবস্থা তলাইয়া বুঝিতে পারিতেন না। নেপোলিয়ানের অশিক্ষিত পটুত্বেই ফ্রান্সের অসাধারণ উপকার হইয়াছে। নেপোলিয়ানের সমান স্বদেশসেবক জগতে বিরল। নেপোলিয়ান ফরাসী সমাজে শিল্পশিক্ষা প্রবর্ত্তন করেন—ইয়োরোপে ফ্রান্সের ইজ্জদ প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার উদ্যোগে নব নব শিল্প ও শিল্প-প্রণালী ফরাসী সমাজে প্রবর্ত্তিত হয়। দেশের ভিতর ভাল ভাল পথ প্রস্তুত করিতেও নেপোলিয়ান মনোযোগী ছিলেন। নেপোলিয়ানের আমলে ফ্রান্সে সকল দিক হইতেই লক্ষ্মীলাভ হয়।

নেপোলিয়ানের পতন হইলে ইংরাজ পুনরায় ইউরোপে ও আমেরিকার বাজার দখল করিল। ইংরাজেরা এতদিন সংরক্ষণ নীতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু ১৮১৫ সালের পর তাহাদের মুখে সর্ব্বপ্রথম অবাধবাণিজ্যের প্রশংসা প্রচারিত হয়। ঝ্যাডাম স্মিথের গ্রন্থ ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে বাহির হইয়াছিল। ৪০।৪৫ বৎসর পর তাঁহার মত ইংরাজ সমাজে আদৃত হইতে সুরু হইল। কিন্তু এই যুগের ইংরাজ-প্রচারিত অবাধ-বাণিজ্য-নীতি বড়ই বিচিত্র। ইহারা ইউরোপে এবং আমেরিকায় বিলাতী মাল রপ্তানি করা সম্বন্ধেই বাধাহীন শুল্কহীন ব্যবসায়ের প্রবর্ত্তক—কিন্তু যদি বিদেশীয় বণিক সম্প্রদায় বিলাতের বাজারে মাল পাঠাইতে অগ্রসর হয় তখন তাহাদের অবধি বাণিজ্য-নীতি কথামাত্রে পর্য্যবসিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের একজন প্রসিদ্ধ বিচারপতি বিলাতের এই নূতন অবাধ-বাণিজ্য-নীতি সম্বন্ধে ঠাট্টা করিয়া বলিতেন—"অন্যান্য বিলাতী মালের মত এই নিয়মটা বিলাতের বাহিরেই প্রযোজ্য। ইংরাজেরা স্বদেশে এই নিয়ম মানিতে প্রস্তুত নন। ইহাঁরা দেশের কারখানায় যে বস্তু তৈয়ারী করেন তাহা বিদেশে রপ্তানি হইবে। দেশীয় সমাজে তাহার স্থান নাই।"

যাহা হউক ইংরাজেরা উচ্চকণ্ঠে অবাধ-বাণিজ্য-নীতির মহিমা কীর্ত্তন করিতে থাকিল। ইউরোপের অদূরদর্শী ব্যক্তিগণ এই বক্তৃতায় ভুলিয়া গেল। অল্পকালের ভিতরেই দেখা গেল যে, নেপোলিয়ানের বিলাতী বয়কট, (continental system) প্রভাবে প্রত্যেক দেশের যৎপরোনাস্তি উন্নতি হইয়াছিল। এক্ষণে অবাধ-বাণিজ্যের হিড়িকে ঠিক উল্টা ফল ফলিতেছে। ফ্রান্সে অষ্টাদশ লুই ইংলণ্ডের অর্থবলে এবং রাষ্ট্রীয় অধীনতায় রাজা হইলেন ইংরাজেরা ভাবিল যে ফরাসীরা সহজেই বিলাতী মাল হজম করিবে। কিন্তু তাহাদের আশা ফলবতী হইল না। নেপোলিয়ানের সংরক্ষণ-নীতিই ফ্রান্সে বজায় রাখা হইল। তাহার ফলে ১৮১৫ হইতে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ভিতর ফরাসী শিল্প দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

প্রতিভা ও যোগানন্দ

ইমার্সন লিখিয়াছেন, প্রত্যেক মানুষই জগতে কোনও না কোন উপায়ে বড় হইতে পারে। তাহার জন্য জগতের একটা জায়গা খালি পড়িয়াই থাকে, যদি সে সে জায়গাটুকু জুড়িয়া বসিতে পারে তবেই তাহার প্রতিষ্ঠা-লাভ ঘটে। ঈশ্বর মানবকে, শুধু মানবকে কেন তদপেক্ষা নিকৃষ্টতর কোন জীবকেও নিরর্থক সংসারে পাঠান নাই। তাহার স্বীয় জীবনের বৈশিষ্ট্যটুকু ফুটাইয়া তুলিবার শক্তি মানবের ভিতরেই রহিয়াছে।

কি তবে মানুষ বড় হয় না কেন? এই যে অসংখ্য নরধাত্রী ধরিত্রী কয়জন সন্তানের মত সন্তান পাইয়া সৌভাগ্যশালিনী? পিছন ফিরিয়া অতীতের অসীম আঁধারের দিকে চাহিয়া দেখ, কয়টী নক্ষত্র তিমির উজ্জল করিয়া মানবের পথের আলো দিতে জাগিয়া আছে? জগতের বিশালতার তুলনায় তাহা অতি অল্প এবং পরিমিত।

সে কোন সুপ্ত শক্তি যাহার উদ্বোধনের অভাবে মানুষ বড় হইতে পারিল না; অসংখ্য জ্যোতিষ্কের ন্যায় আলোক বিকীর্ণ করিয়া ধন্য হইল না?

পণ্ডিত ইহার উত্তরে বলিলেন—প্রতিভা। প্রতিভা জাগিবে কিসে? জনসন বলেন—জাগতিক বিষয়ে বিসৃষ্ট বহুশাখাবিশিষ্ট মানসিকবৃত্তিকে সংযত করিয়া আনিয়া লক্ষ্য বিশেষের উপর প্রক্ষেপিত করিতে পারিলেই মানব প্রতিভার অধিকারী হইতে পারে। লক্ষ্য-বিশেষে মনের স্থৈর্য্য সাধনই মানবের আত্মস্থ সুপ্তা শক্তির উদ্বোধনের প্রধান উপায়।

"আতস পাথর অর্থাৎ Magnifying Glassএর মধ্য দিয়া সূর্য্য-রশ্মিকে কোন দাহ্য পদার্থের উপরে কেন্দ্রীভূত করিলে সেই দাহ্য পদার্থের ভিতরে যেমন অগ্নি প্রবেশ করিয়া তাহার অন্তর বাহির অগ্নিময় করিয়া তোলে তেমনি, আত্মশক্তি সংকারে মন লক্ষ্য বস্তুতে তদ্গতভাবে নিবিষ্ট হইলে সেই লক্ষ্য বস্তুকে জ্ঞানময় করিয়া তোলে। ইহার নামই যোগ, এই অবস্থায় উত্তীর্ণ হইলে মানুষের মনে আনন্দের ফোয়ারা খুলিয়া যায়" *

এবং এই যোগানন্দ বলেই সাধক অলৌকিক কার্য্য সংসাধন করিতে পারেন। কথিত আছে, সক্রেটিস প্রায়ই দিবস রজনী ব্যাপিয়া আহার নিদ্রা ভুলিয়া ধ্যানস্থ থাকিতেন। নিউটনাদি প্রাকৃতিক সত্যদ্রষ্টাগণ সকলেই যে ন্যূনাধিক পরিমাণে এই যোগবলের অধিকারী ছিলেন, ইহাতে ভুল নাই। মারকেটর নামক প্রসিদ্ধ ভূগোল-পণ্ডিত অবিশ্রান্ত অধ্যয়নে এমন আনন্দ পাইতেন যে তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা একেবারেই থাকিত না। তাঁহার পত্নী যদি তাঁহাকে স্নানাহারের জন্য ডাকিতেন কিংবা সম্মুখ হইতে মানচিত্র সরাইয়া লইতেন তবে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইতেন।

গলাস নামক রোমীয় পণ্ডিত প্রভাতে কাগজ কলম লইয়া বসিতেন আর অন্ধকার হইয়া আসিলে চমকিত হইয়া আসনত্যাগ করিতেন। যদি সায়াহ্নে বসিতেন তবে ভোরের আলো না পাইলে তাঁহার বাহ্য-চৈতন্য হইত না।

* গীতাপাঠ, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নিশ্চয়ই কোন আনন্দ মানুষকে এমন অবস্থায় সঞ্জীবিত ও পোষিত করে, তাহা না হইলে কি মানুষ এমন শারীরিক অভাব আকাঙ্ক্ষা ভুলিয়া যাইতে পারে? এই আনন্দধারা যোগরত মানবের উপর কেমন-ভাবে ক্রিয়া করে বাফন (Buffon) তদীয় স্বভাবসিদ্ধ বাগ্মিতার সহিত সুন্দরভাবে আহার বিষয়ে লিখিয়াছেন—আবিষ্ক্রিয়া ধৈর্য্য সাপেক্ষ। তোমার লক্ষ্য বস্তু দীর্ঘকাল অনুধ্যানকর; তাহার স্বরূপ ধীরে ধীরে তোমার নিকট প্রকটিত হইতে থাকিবে পরিশেষে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় একটা কিছু তোমার মস্তিষ্কের ভিতর সাড়া দিয়া উঠিবে এবং তাহা হইতে এক উজ্জ্বল দীপক তরঙ্গ প্রসূত হইয়া তোমার হৃদয়ে নামিয়া আসিবে —তখন সিদ্ধানন্দ। সে আনন্দের এম্নি প্রভাব যে আমি ক্রমাগত বার এবং চৌদ্দ ঘণ্টা লেখনী ধারণ করিয়াও মুহূর্ত্তের জন্য ক্লান্ত হই নাই। ইটালীর কবি মারিণি (Marini) সম্বন্ধে একটা কথা আছে, তিনি একদিন তাঁহার কাব্য লইয়া বসিয়াছিলেন তাঁহার একখানা পা আগুনে পুড়িয়া গিয়াছিল তবু তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হয় নাই! এই হ্লাদিনী শক্তি প্রভাবে ধ্রুব প্রহ্লাদ যে ভৌতিক দেহের উপর অত্যাচার হওয়া সত্বেও তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন রহিতে পারিয়া-ছিলেন তাহা একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার কথা নহে।

যোগোদ্ভূত আনন্দময়ী ওজস্বিনী শক্তি বা শাস্ত্রের কথায় হ্লাদিনী শক্তিই প্রতিভার দূতী। সে যে কি মোহন প্রভাবে সাধককে আনন্দবর্ত্ম দিয়া সিদ্ধির সঙ্গে মিলন করাইয়া দেয় তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

মহাকবি দান্তের (Dante) কথা লিখিতে যাইয়া জনৈক লেখক লিখিয়াছেন "তাঁহাকে যেমন উগ্র সাধনায় সমাহিত থাকিতে দেখি-য়াছি এমন আর কাহাকেও দেখি নাই।

যখন তিনি পড়িতেন তাঁহার সমগ্র মন তাহার ভিতরে ডুবিয়া যাইত। বাহ্য জগৎ যেন তাঁহার স্মৃতি হইতে একেবারে মুছিয়া গিয়াছে। একদিন দান্তে কোন শোভাযাত্রা দেখিবার জন্য বাড়ী হইতে বাহির হইয়া-ছিলেন; রাস্তার ধারে একটা বইয়ের দোকানে বসিয়া তিনি প্রদর্শিত রং ঢংগুলি দেখিবেন মনস্থ করিয়া তথায় যাইয়া আসন গ্রহণ করিলেন। দৈবক্রমে দোকানের পুস্তকাধারস্থ একখানা পুস্তকের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল; তিনি বইখানি হাতে লইয়া পড়িতে পড়িতে একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া গেলেন। দান্তে বাড়ী ফিরিয়া আসিলে কোন ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর ক্রমে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার চোখের সামনে যে সকল ধূম ধড়কা হইয়া গিয়াছিল তাহার বিন্দু বিসর্গও অবগত নহেন! গান বাজনার শব্দ, মানুষ জনের হৈ হৈ রৈ রৈয়ের টু শব্দটী পর্য্যন্ত তাঁহার কানে যায় নাই।

মানসিক আত্যন্তিক আনন্দ এইরূপে আমাদের চতুঃপার্শ্বস্থ দ্রব্য সন্নিবেশ হইতে আমাদিগকে বহুদূরে ব্যবহিত করিয়া ফেলে। যোগশাস্ত্র বলেন জীবাত্মা যখন আনন্দময় কোষের রসসম্ভোগে নিরত হন তখন তাহার স্থূলদেহ-সংশ্রিত জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়। একজন আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ একদিন গগন পর্য্যবেক্ষণের পর শয্যায় শয়ন করিতে গমন করেন; নীহারিকাপুঞ্জের সমুজ্জল ছবি তাঁহার চোখে চোখে লাগিয়াই থাকে। তিনি শয্যায় বসিয়া সেই ধ্যানলব্ধ দৃশ্যপটে আপনার সমস্যার মীমাংসা করিতে করিতে রজনী

ভোর করিয়া দিলেন। প্রভাতে লোকে তাহার ঘরে যাইয়া দেখে তিনি আপনা আপনি বিড়বিড় করিয়া বলিতেছেন। হাঁ, এটা দেখিতেছি এই রকমই হইবে; আচ্ছা, এখনকার মত রাখিয়া দেওয়া যাক্। আমাকে আবার শুইতে যাইতে হইবে; রাত্রিও বেশী হইয়া আসিল।

ঐকান্তিক যোগানন্দ মানুষের স্থূল দেহের উপরও অপূর্ব্বভাবে ক্রীড়া করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দেহ তিনি যখন মহাভাবে সমাহিত হইতেন তৎকালে বর্ত্তুলবৎ হইয়া আসিত। ভাগবত ভক্তের হৃন্নিহিত অব্যয় অমৃতধারা বাহ্যদেহে কেমন করিয়া ফুটিয়া উঠে তাহা বলিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—

'হসত্যথো রোদিতি রৌতিগায়ত্যু
ন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।

প্রতিভাশালিনী রমণী ম্যাডাম রোণান্ড, টেলিমেকস পড়িতে যাইয়া তাঁহার যে অবস্থান্তর ঘটিত সে বিষয়ে লিখিয়াছেন—তখন আমার শরীর উষ্ণ হইয়া উঠে, আমার বোধ হয়, একটা আগুনের ধাপ আমার মুখমণ্ডল উত্তপ্ত করতঃ তাহা রক্তাভ করিয়া তুলে। আমি যেন টেলিমেকসের য়ূচারিস (Eucharis) এবং টেনস্ত্রেডের এর্মিনিয়া হইয়া যাই। এই সময় চতুঃপার্শ্বস্থ দ্রব্যনিচয় সহসা উত্তোলিত দৃশ্যপটের ন্যায় আমার নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়। রোমীয় কবি মেটাষ্টাসিও (Metastassio) লিখিয়াছেন যখন আমি একটু মনোনিবেশ করি আমার স্নায়ুতন্ত্র উত্তেজিত হইয়া পড়ে; মাতালের মত আমার মুখ লাল হইয়া যায়। আর তখন বেশীক্ষণ কাজ করিতে পারি না। রুসোর মনে যখন মানবসমাজ সমস্যা বিষয়ে নবীন তত্ত্ব-চৈতন্য ঘটে তখন নাকি তাঁহাতে মাঝে মাঝে বিকারের লক্ষণ দেখা যাইত।

মানসিক আনন্দের গভীরতম চাপ অনেক সময় শরীরের পক্ষে হানিজনক হইয়া থাকে। এরূপ আনন্দের ঘেঁসা ঘেঁসি যাইবার অবস্থা মানুষের ক্বচিৎ হয়। চিদানন্দ সূর্য্যরশ্মি সমপাত বিকসিত জীবাত্মা তখন স্থূল প্রভাব হেলায় দলিয়া উর্দ্ধমুখে সঞ্জীবদৃঢ় সূক্ষ্ম শরীর লইয়া বিশাল আনন্দ রাজ্য অভিমুখে ধাবমান হন। ভাগবত ভক্তের এই অবস্থার মানসী ছবি কত না সুন্দর করিয়া সূক্ষ্ম তুলিকা অগ্রে জীবন্ত করিয়া জগৎ সমক্ষে ধরিয়া দেখাইয়াছেন! তাঁহার শ্লথৎবলয় মল্লিকা, ব্যস্তস্ত্র বস্ত্রভরণা জবলোলকুন্তলা ব্রজসুন্দরীরা মহাভাবময়ী মনোময়ী প্রতিমা। বৈষ্ণব কবি প্রেমদাস স্বামীর মুখ দিয়া শ্রীরাধাকে কহিতেছেন—

"নিরবধি আঁখিঝরে
পুলকে শরীর ভরে
দিনে দিনে ক্ষীণ কর তনু।

বোধ হয়, এই আনন্দেরই একটু আভাস পাইয়া ড্রাইডেন হোমারের অনুবাদ করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—

I found greater pleasure than virgil; But it was not a pleasure without pain, the continued agitation of the spirits must needs be weakener to any constitution মানবীয় প্রতিভা প্রকৃতির প্রচ্ছন্ন আচরণ উন্মোচন পূর্ব্বক সেই সচ্চিদানন্দ ঘনের সন্ধান পাইবার জন্য সে মধু প্রাণ ভরিয়া পান করিবার আশায় ছুটিয়া চলিয়াছে। সাধক অবিদ্যার আচ্ছাদনে ঘা' দিয়া বলিতেছেন—

হিরন্ময়েন পাত্রেণ সতস্য পিহিতং মুখং
তত্ত্বং পূষন্ অপারনুসত্যধর্ম্মস্য দীপ্তয়ে।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন।

জনসাধারণের শিক্ষা

মনোবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক উন্নতি দ্বারা আপনার সর্ব্ববিধ অভাব দূর করাকেই শিক্ষার মহৎ উদ্দেশ্য বলা যাইতে পারে। বৃত্তির উৎকর্ষ সাধনে উন্নতমনা ব্যক্তিই অবস্থানুসারে আপনার ভবিষ্যতের দায়িত্বও যথাসম্ভব বুঝিতে পারেন। আপনার ভবিষ্যৎকে বর্ত্তমানে বুঝিতে পারা আমাদের জীবনের একটী গুরুতর দায়িত্ব। বর্ত্তমানকে বুঝিয়া ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করিবার চেষ্টাই উন্নতিশীলের লক্ষণ। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে বুঝাইবার ভার যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, জনসমাজকে শিক্ষাদান করিতে তাঁহাদের দায়িত্বও গুরুতর। শিক্ষার সুব্যবস্থাতেই ব্যক্তিত্বের ক্রমশঃ সুবিকাশ হয়, ব্যক্তিত্বের সুবিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষা পূর্ণতালাভ করে, শিক্ষার ব্যবস্থা সুন্দর হইলেই অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতির স্ফুরণে জাতিগত স্ফূর্ত্তিলাভ ও জাতিগত উন্নতি সাধিত হয়। ব্যক্তিগত কিরূপ শিক্ষায় ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ ক্রমশঃ উন্নত হইতে পারে, ইহাই বিশেষ চিন্তার বিষয়। শিক্ষার ব্যবস্থায় আর্থিক অবস্থা ও নৈতিক অবস্থার উন্নতি না হইলে সে শিক্ষা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে সুফল প্রদান করিতে পারে না।

জনসাধারণের সর্ব্বপ্রধান অভাব আহার ও বাসস্থানের। আহার ও বাসস্থানের সুব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিলে উচ্চশিক্ষা অভিলাষী ছাত্রসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণ এখনও আহার ও বাসস্থানের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াও সফলকাম হইতেছে না। দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর ভদ্র জনসাধারণও অনেকটা এই অবস্থার মধ্যে নিপীড়িত, দেশের অবস্থা দেখিয়া তাহাও বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না। শিশু যেমন ভূমিষ্ঠ হইয়াই আহার্য্য ও পানীয়ের জন্য ব্যাকুল হয়, পরে মাতৃস্নেহে স্তন্যপান করিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা ভুলিয়া মায়ের কোলে আশ্রয় পায়, মানবজাতির শৈশব অবস্থাও তেমন সর্ব্বপ্রথম ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা মিটাইবার উপায় ও বাসস্থানের সংস্থান করে। যাহারা এখনও আহার ও বাসস্থানের সংস্থান করিতে পারে নাই, অথচ কোন রকমে লোকালয়ে উন্নত মানবের সংস্রবে আসিতে পারিয়াছে, তাহারা যদিও এখন আর মানব জাতির শৈশব অবস্থায় নাই, তথাপি তাহারা আহার ও বাসস্থানের সুব্যবস্থার আগে বিশেষ কোন উন্নত চিন্তার সংস্রবে এখনও তেমন আসিতে পারে না। দরিদ্র জনসাধারণ তাহার দুর্ব্বহ চিন্তা-ভার মাথায় লইয়া উন্নত চিন্তার গভীর গবেষণায় মনোনিবেশ করিতে এখনও অবসর পায় নাই। তাহাদের খাওয়া পরার উপযোগী শিক্ষার সঙ্গে যে কোন প্রয়োজনীয় শিক্ষা তাহারা চাইতে পারে; কিন্তু খাওয়া পরা কি করিয়া চলে, এ শিক্ষা পাওয়ার আগে তারা কোন শিক্ষাই চায় না।

উচ্চশিক্ষা দ্বারা উন্নত চিত্তের মানুষ গঠন করা যায়। বর্ত্তমানে উচ্চশিক্ষা দান নিতান্তই অর্থ সাপেক্ষ, এবং যাহা নিতান্তই অর্থ

সাপেক্ষ, তাহা জনসাধারণের শিক্ষা হইলে ধনী জনসাধারণ সেরূপ উচ্চশিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে পারেন, দরিদ্র জনসাধারণ খাওয়া পরার ব্যবস্থা না করিয়া সন্তান সন্ততির জন্য উচ্চশিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে পারেন না। যে পর্য্যন্ত দারিদ্র্য নিষ্পেষণে মানুষের অর্থ-চিন্তা ও হতাশা উভয়ই প্রবল থাকে, এবং যতদিনে সেই দারিদ্র্যের হস্ত হইতে সে অব্যাহতি না পায়, ততদিনে তাঁহার উচ্চ-শিক্ষার ফল উন্নত চিন্তাও সাধারণতঃ কার্য্য-করী হয় না। দরিদ্রের উন্নত চিন্তায় জগতের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই চিন্তা দরিদ্র জন সাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার সুবিধা এখনও তেমন হয় নাই। দরিদ্র জন সাধারণের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য উন্নত চিন্তার সংস্রবে আসিবার সুবিধা পাইয়াছেন, কিন্তু যাহারা বর্ণমালা ও ভাষা শিক্ষা করে নাই। ধর্ম্ম শিক্ষায় নৈতিক শিক্ষাও তেমন লাভ করে নাই, উন্নত চিন্তার সংস্রবে তাহা ত তেমন আসিবারই সুবিধা পায় নাই। অনেক অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিতের মাথায় প্রচারবলে অনেক উন্নত চিন্তা ঢুকাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, এবং উহা যে কিরূপ কার্য্যকরী হয়, প্রাচীন ভারতবর্ষ তাহার যেমন আদর্শ প্রচার করিয়াছে, আর কোথায়ও তেমন হইয়াছে কিনা আমাদের জানা নাই। দরিদ্রের মধ্যেও নীতিপ্রচার করা যায়, কিন্তু বর্ত্তমানকালের উচ্চশিক্ষা প্রচার করা যায় না। শিক্ষার ব্যবস্থা যদি প্রাচীন ভারতবর্ষের মত বিনা অর্থব্যয়ে হইত, তাহা হইলে বরং ধনী দরিদ্রকে একত্র টানিয়া আনিয়া শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইত।

দারিদ্র্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, দেশের অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। এ সময় দারিদ্র্য চিন্তা দূর করিবার শিক্ষা দেশের জনসাধারণের পক্ষে যেমন উপযোগী, আর কোন শিক্ষাই তেমন উপযোগী নহে। নিম্নশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প শিক্ষাই এখন দেশের জনসাধারণের মুখ্য শিক্ষা হওয়া উচিত। অর্থকরী শিল্পশিক্ষা জনসাধারণের শিক্ষা হইলে ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষা প্রচারের যথেষ্ট সুবিধা হইবে। অবস্থানুসারে এখন উচ্চশিক্ষা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেও দেশের নর-নারীকে শিল্পশিক্ষা প্রদান করা নিতান্ত উচিত। শিল্পশিক্ষাকে নিম্নশিক্ষা ও উচ্চ-শিক্ষার অন্তর্গত করিলে শুধু শিক্ষিতের কর্ম্ম-ক্ষেত্র বিস্তৃত হইবে তাহা নহে, কৃষি-শিল্পের প্রতি আমাদের উপেক্ষা ও অশ্রদ্ধাও কমিয়া যাইবে। উচ্চশিক্ষাই কৃষিশিল্পকে সম্মানের যথাযোগ্য আসন প্রদান করিতে সমর্থ হইবে।

কিরূপ শিল্পশিক্ষা নিম্নশিক্ষা ও উচ্চ-শিক্ষার সঙ্গে গৃহীত হইলে সুবিধা হইবে, অর্থোপার্জ্জনের পথ সুগম হইবে, উহা নিতান্তই বিচারসাপেক্ষ। বহু ব্যয়সাপেক্ষ যন্ত্রশিল্প অপেক্ষা অল্পব্যয়সাপেক্ষ যন্ত্রশিল্পও হস্তশিল্পের প্রচারই সাধারণতঃ কার্য্যকরী হইবে। ইহাতে প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনু-সারে নরনারী সকলেরই অর্থাগমের পথ সুগম হইবে। অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের মধ্যে অনেক স্থানে অনেক অবস্থায় অর্থকরী শিল্পে শিক্ষার প্রয়োজন, উহারও ব্যবস্থা করা নিতান্ত সঙ্গত।

বর্ত্তমানে যেরূপ ব্যয়সাধ্য শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়া পড়িতেছে, দরিদ্রের পক্ষে কি নিম্ন-শিক্ষায়, কি শিল্পশিক্ষায়, কি উচ্চশিক্ষায় কোথায়ও ইহাতে বিশেষ সুফল ফলিবে বলিয়া মনে হয় না। দরিদ্রের বিনা ব্যয়ে

বা স্বল্প ব্যয়ে নিম্নশিক্ষা, শিল্পশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন। শিক্ষার দ্বার ধনী দরিদ্রের জন্য সর্ব্বত্রই অবারিত থাকা উচিত। প্রতিভাশালী দরিদ্র ছাত্র কখনও স্বাবলম্বনে, কখনও পরানুগ্রহে আপনার ভবিষ্যৎ গঠন করিয়া উন্নত চিন্তার সংস্রবে আসিতে পারেন। দেশের উন্নতি ধনীর হাতেও নহে, দরিদ্রের হাতেও নহে; দেশের উন্নতি কর্ম্মীর হাতে।

যাহাদের আমরা, দেশের অশিক্ষিত লোক বলি, তাহাদের মধ্যেও নিম্নশিক্ষা শিল্পশিক্ষা ও নৈতিকশিক্ষা প্রচারিত হউক। যাহাদের আমরা যেমন করিয়াই হউক, শিক্ষিত করিতে চাই, তাহাদের মধ্যেও নিম্নশিক্ষা শিল্পশিক্ষা ও নৈতিকশিক্ষা প্রচারিত হউক। উচ্চশিক্ষার দ্বার অবারিত থাকুক, যে পারে আসুক, আপনাকে বিশ্ববাণীর সেবক নিযুক্ত করুক।

জনসাধারণের শিক্ষার ফলে দেশের দারিদ্র্য ঘুচুক। দরিদ্রের শিক্ষা দরিদ্রের মতনই হউক, কিন্তু শিক্ষার ফল যেন দরিদ্র না হয়, যথাসম্ভব সে দিকে আমাদের দৃষ্টি থাকুক। দেশের দরিদ্রের অবস্থা উন্নত হইয়াই ধনীর সংখ্যা বৃদ্ধি হউক। সর্ব্বাগ্রে আমরা দরিদ্রের আহার ও বাসস্থানের উপযোগী শিক্ষা চাই। দরিদ্রের আর্থিক, নৈতিক ও পারিবারিক উন্নতিই সমাজজীবনের জীবনীশক্তি বৃদ্ধির একটা প্রধান কথা। দরিদ্রের উন্নতিই শুধু উন্নতি নহে, সমাজ-জীবনের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করিতে ধনীর আর্থিক, নৈতিক ও পারিবারিক উন্নতি আরও বেশী প্রয়োজন। ধনীর সঞ্চিত অর্থ, ও দরিদ্রের পরিশ্রমই সুশিক্ষাবলে জাতীয় উন্নতির মূলধন রূপে গণ্য হইতে পারে। শিক্ষাকে ব্যক্তিগত, পরিবারগত, সমাজগত ও জাতিগত মনে করিতে পারিলে ধনী ও দরিদ্রের পক্ষে যথার্থ শিক্ষা কি, তাহার মীমাংসা কতকটা সহজ হইয়া পড়ে। ব্যক্তি ও পরিবারের চিন্তাধারা ক্রমশঃ যাহাতে উন্নত হয় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ব্যক্তি ও পরিবারের বিকাশের সঙ্গে ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি ও সমাজরক্ষিণী নীতি যাহাতে উচ্চশিক্ষার উচ্চস্তরের উদ্দেশ্য বলিয়া উচ্চশিক্ষাভিলাষীরা বুঝিতে পারেন, সেইরূপ শিক্ষার কথা প্রচার করা যেমন প্রয়োজন, ব্যক্তি ও পরিবারের বিকাশের সুশিক্ষা ও সর্ব্বসাধারণের পক্ষে তেমন প্রয়োজন। আমরা এই শিক্ষাই চাই, যাহাতে ব্যক্তি ও পরিবারের আর্থিক দুরবস্থা দূর হয় ও ব্যক্তি পরিবারের মধ্যে আপনার ও পারিবারিক বিকাশ বুঝিবার জন্য অর্থনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতিকে যথাসম্ভব বুঝিতে পারে। আমরা শিক্ষার ফলে দরিদ্রের চাই আহার, বাসস্থান ও বিশ্রাম; ধনীর চাই অর্থরক্ষা কবিরার ও বিলাসিতা হইতে আত্মরক্ষা করিবার শক্তি; আর চাই ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের জন্য উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত উন্নতমনা ধনী ও দরিদ্রের জাতীয় সর্ব্ববিধ উন্নতির চিন্তাধারা ও জাতীয় দারিদ্র্যের প্রশমন কল্পে সঞ্চিত মূলধন।

শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

যক্ষ্মা রোগে কয়েকটি বিশেষ উপসর্গের সহজ প্রতিকারোপায় বা গৃহ-চিকিৎসা *

যক্ষ্মা রোগে ধরিলে অধিকাংশের পক্ষেই উহা একটা জীবনব্যাপী সংগ্রাম হইয়া দাঁড়ায়; জীবনকে রক্ষা করিবার জন্য কোমরে কাপড় বাঁধিতে হয়, ব্যাধির সহিত অহোরাত্র হাতাহাতি করিয়া উহাকে নিরস্ত রাখিতে হয়। সাপের মাথার উপর যতক্ষণ পা থাকে ততক্ষণ উহার ফোঁসফোঁসানি পর্য্যন্ত বন্ধ থাকে; কিন্তু পা-টি কোনক্রমে আল্‌গা পাইলেই ফোঁসফোসানী চুলায় যাউক, একেবারে দাঁত ফুটাইয়া দেয়। সুতরাং এই ব্যাধিতে আক্রমণ করিলেই উহার গলায় পা দিতে চেষ্টা করিতে হইবে কারণ উহা কোন প্রকারে বাগ পাইলেই শত্রুতাসাধন করিতে ইতস্ততঃ করিবে না। এইজন্য উহাকে কোনরূপ সুযোগ না দেওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইলেই এই ব্যাধির আচার ব্যবহার, খুটি নাটি, সামান্য বৃহৎ, সমস্ত বিষয়েই জানা আবশ্যক। জানা শত্রুর সঙ্গে তবু লড়াই করা চলে, অজ্ঞাত শত্রু হইলে কোথা হইতে যে শাণিত অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া জীবনপাত করিবে তাহা কেহই বলিতে পারে না।

সেইজন্য এই ব্যাধি সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান অতি আবশ্যক। ইহার সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে, কিরূপে উহা আক্রমণ করে, কিরূপেই বা ঐ আক্রমণ নিবারণ করা যায় সে সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্ব্বে "ক্ষয় রোগ ও তন্নিবারণ সম্বন্ধে গুটিকয়েক জ্ঞাতব্য বিষয়" প্রবন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। উহার চিকিৎসাদি বিষয়ে আমি তথায় কিছুই বলি নাই, বলা আবশ্যকও মনে করি নাই। চিকিৎসা বিষয়টি বিশেষজ্ঞদেরই শোভা পায়। যাহারা এ বিষয়ে রীতিমত অনুশীলন করিয়াছেন, পুস্তকাদি পাঠে এ বিষয়ের জ্ঞানচর্চ্চা

---

* গত চৈত্র সংখ্যায় "জনৈক ভুক্তভোগী" আমার "ক্ষয় রোগ ও তন্নিবারণ সম্বন্ধে গুটিকয়েক জ্ঞাতব্য বিষয়" প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। আমার প্রবন্ধটি যে কাহারও কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছে তাহাতেই আমার শ্রম সফল জ্ঞান করিয়াছি। ভুক্তভোগীটি আমার অপরিচিত নহেন কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় তিনি আজ আর ইহসংসারে নাই। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় অকালে আমাদিগকে দুঃখের সাগরে ভাসাইয়া এই দুরন্ত ক্ষয়রোগেই গত ১৯শে চৈত্র স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। আমি জানি তিনিই ঐ প্রবন্ধটির রচয়িতা উহার প্রতিস্থানেই তাহার রোগক্লিষ্ট বেদনাকাতর হৃদয়টি দেখিতে পাই। ভুক্তভোগীর যাতনা অন্যে কি করিয়া বুঝিবে? এ কথা সত্য। কাজেই প্রবন্ধটির উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে বিশেষ কষ্টের কারণ হইয়াছে। আজ কাহাকে উত্তর দিব? কে আগ্রহ সহকারে পাঠ করিবে? তাহার মত বেদনাকাতর আরও অনেকে এই দুর্দ্দশাপ্রদ, যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধির কবলে পড়িয়া বহু কষ্ট ভোগ করিতেছেন এই কথা মনে করিয়াই আমি এই রোগের অন্যান্য বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধটিতে শুধু রোগের কারণ ও উহার নিবারণোপায় সম্বন্ধেই আলোচনা ছিল সুতরাং উহা হইতে চিকিৎসা বিষয়ে মত প্রত্যাশা করা মুস্তফী মহাশয়ের উচিত হয় নাই। তিনি আরও একটী বিষয়ে অবিচার করিয়াছেন আমি সর্ব্ব অবস্থায়ই থুথু অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে পরামর্শ দেই নাই। অবস্থা ভেদে নানাবিধ ব্যবস্থা দিয়াছি। যে কেহ আমার প্রবন্ধ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলেই তাহা দেখিতে পাইবেন। সে যাহা হউক আজ আর এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলা চলে না। যদি সময় পাই তাহা হইলে এবং আমার ক্ষুদ্র সামর্থে যতটুকু সম্ভব এই ব্যাধির সর্ব্ববিধ আলোচনা করিবার প্রয়াসে তাহা নিয়োগ করিতে চিরদিনই তৎপর থাকিব এবং সেই ভরসা লইয়াই আজ এই নূতন প্রস্তাব উপস্থিত করিলাম।

করিয়াছেন, যে সব বিষয় হাতে কলমে শিখিতে হয় তদ্রূপ শিক্ষা করিয়াছেন, ততোধিক পর্য্যবেক্ষণক্ষম, জ্ঞানবৃদ্ধ, অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের নিকট উপদেশ পাইয়াছেন, ও নানারূপ রোগী দেখিয়া বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ ব্যক্তিদেরই এইরূপ ভার লওয়া শোভা পায়। সুতরাং ব্যাধি হইলেই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত ও তাহার উপদেশ লওয়া সঙ্গত। কিন্তু এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়া পড়ে যখন চিকিৎসকের জন্য অপেক্ষা করিলে চলে না। এই কলিকাতা সহরে না হয় প্রতি রাস্তায় ৪।৫ গণ্ডা করিয়া ডাক্তার আছেন কিন্তু তাদেরই কি সব সময় পাওয়া যায়? বাটীর নিকটের ডাক্তারেই যে গৃহচিকিৎসক হইবেন এমন কোন কথা নাই। সকল ডাক্তারের উপর সমান শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস না থাকা অসম্ভব নহে। মনে করুন আপনার গৃহচিকিৎসকের বাটী প্রায় এক মাইল দূর, এমত অবস্থায় রোগীর কোনরূপ গুরুতর লক্ষণ হইলে তাহাকে ডাকিয়া আনিতেও সময়ের প্রয়োজন; হয়ত সব সময় তাঁহাকে পাওয়া না ও যাইতে পারে, সুতরাং আজকালকার মোটর, টেলিফোনের দিনেও সকল সময় ইচ্ছানুরূপ ডাক্তার মিলিয়া উঠে না। কলিকাতায় না হয় যেখান সেখান হইতে একজনকে ধরিয়া আনিয়া জোড়া তালির কাজ চালাইয়া দিতে পারা যায় কিন্তু তাও সব সময়ে ঘটিয়া যে উঠে না এরূপ আমরা অনেকবার দেখিয়াছি। পাড়াগাঁর কথা আর কি বলিব, তথায় স্থানে স্থানে ৮।১০ মাইল, এমন কি ২০।৩০ মাইলের মধ্যেও ভাল ডাক্তার নাই। কলিকাতায় বসিয়া উহা আশ্চর্য্য মনে হইতে পারে কিন্তু ইহার একবর্ণও অসত্য নহে। সে সব স্থানে হঠাৎ অবস্থা গুরুতর হইলে এবং নিজেদের দ্বারা কোন প্রতিকার না হইতে পারিলে, ডাক্তার আসিয়া পৌছিবার পূর্ব্বেই রোগীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং অবস্থা বিশেষে সাধারণে যাহাতে সতর্কতা লইতে পারে সে সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যক্ষ্মা ব্যাধিতে যে সব সঙ্কট ও সমস্যা উপস্থিত হইতে পারে আমরা এই প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করিব, এবং সাধারণ গৃহস্থে তাহার কি প্রতিকার লইতে পারে তাহার উপায় দেখিতে চেষ্টা করিব।

জ্বরে High fever

যক্ষ্মা রোগে জ্বর একটী প্রধান লক্ষণ। জ্বরের পরিমাণের কোন স্থির হিসাব নাই, কখনও বেশী, কখনও কম। সময় সময় জ্বর খুব বেশী হইয়া পড়ে। শরীরে বিষের মাত্রা বেশী অথবা অন্তবিধ বিষ (Secondary infection) প্রবেশ করিলে প্রায় ঐরূপ ঘটিয়া থাকে। ১০২°।১০৩° পর্য্যন্ত জ্বরে বিশেষ কোন ভয়ের কারণ থাকে না। ১০৩° এর উপরে উঠিলেই ব্যস্ত হইতে হয়। এবং ১০৪°এর উপরে উঠিলেই ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ১০৫°।১০৫°॥০ জ্বরে অনেক সময় ফিট্ (জ্বরধমক-Fits) হইয়া পড়ে এবং নানারূপ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং জ্বর বৃদ্ধি হইবার সময় হইতেই সাবধানতা লওয়া কর্ত্তব্য। জ্বর ১০২°।১০৩° হইলেই মাথার সম্মুখে কপাল বরাবর ঠাণ্ডা জলের পটী দেওয়া আবশ্যক। জলের সঙ্গে বরফ মিশাইলে আরও ঠাণ্ডা হয়। অনেক সময় অডিকোলন (Eude-cologne) বা ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার (Lavender Water) জলের সহিত মিশাইয়া মাথায় পটী দিলে বেশ আরাম

লাগে। এই সব জলে স্পিরিটের (Spirit) ভাগ থাকায় স্পিরিট উড়িয়া যাওয়ার সময় (Evaporation) গরমটা উঠিয়া যায় ও মাথা বেশ ঠাণ্ডা লাগে। এই সময় হাত পাখা লইয়া মাথায় একটু একটু বাতাস দিলে বেশ ভাল বোধ হয়।

যাহাদের সর্ব্বদা ইলেট্রিক্ পাখার (Electric Fan) নীচে থাকা অভ্যাস তাহাদের গায়ে বেশ করিয়া কাপড় দিয়া রেগুলেটারের (Regulator) ২।১ পয়েণ্ট (Point) খুলিয়া দিলেই যথেষ্ট, কিন্তু উহা অপেক্ষা হাত পাখাই ভাল। জলপটীতে যদি জ্বর না কমে বা রোগী যদি ভাল বোধ না করে তবে আইস্ ব্যাগে (Ice-bag) করিয়া মাথায় বরফ দেওয়া যাইতে পারে। উহাতে অধিকাংশ সময়েই আরাম পাওয়া যায় এবং প্রায়শঃই জ্বর নামিয়া আইসে। এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা আইস্ ব্যাগ দেওয়াতেও যদি জ্বর না নামে কিংবা উহা সত্বেও যদি জ্বর বাড়িয়া যাইতে থাকে তবে জল দ্বারা গা মোছাইয়া দেওয়া (Sponging) উচিত। এই গা মোছান সাধারণতঃ দুই প্রকারে হইয়া থাকে। প্রথমতঃ গরম জলের ভিতর স্পঞ্জ (Sponge) বা ছোট তোয়ালে বা পরিষ্কার কাপড়ের টুকরা ডুবাইয়া উহা নিংড়াইয়া লইয়া উহা দ্বারা গা মোছাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে এই ফল হয় যে শরীরটা বেশ পরিষ্কার হয়, লোমকূপের ছিদ্র-সমূহের মুখগুলি পরিষ্কার হয় ও তাপ লাগার দরুণ উপস্থিত রক্তবাহী শিরাসমূহ প্রসারিত হওয়াতে ভালরূপে রক্তসঞ্চালন হয় এবং ঘাম হইয়া শরীরের উত্তাপ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হয়। ইহার গুণ এই যে ইহাতে ঠাণ্ডা লাগার বেশী ভয় থাকে না। কার্য্যক্ষেত্রে কিন্তু ইহাতে জ্বর বড় একটা বেশী নামে না। তখন উপায়ান্তর হইয়া দ্বিতীয় পন্থাই অবলম্বন করিতে হয় অর্থাৎ ঠাণ্ডা জল দ্বারা গা মোছানই দরকার হইয়া পড়ে। সামান্য একটু সাবধানতা নিলে ইহাতেও ঠাণ্ডা লাগার কোন ভয় নাই। স্পঞ্জ করার সময় সমস্ত কাচের সারসী বন্ধ করিতে হইবে, যদি কাচের সারসী না থাকে তবে কাঠের দরজাগুলিই বন্ধ করিতে হইবে। অবশ্য সব সময়েই যে উহা প্রয়োজন তাহা নহে খুব গ্রীষ্মের সময় উহা বন্ধ না করিলেও চলে তবে ডাক্তার কাছে না থাকিলে একটু বেশী সাবধানতা লওয়াই সঙ্গত। ঈষদুষ্ণ জল হইতে আরম্ভ করিয়া রীতিমত কলের জল (Tap water) বা কূপের জল, পুকুর বা নদী সকল জলই ব্যবহার করা যাইতে পারে।

এ সময় পাখাদি একেবারে বন্ধ থাকিবে। দরকার হইলে ইহা অপেক্ষা অধিক ঠাণ্ডা জলও ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই স্পঞ্জিং করার সময় শরীর জল দ্বারা রীতিমত ভিজাইয়া দিতে হয়। সাধারণতঃ ঠাণ্ডা জলে গা মোছাইয়া দিলেই জ্বর নামিয়া আইসে, কিন্তু সময় সময় ৫।১০ মিনিট, এমন কি ১৫।২০ মিনিটও ঠাণ্ডা জল দ্বারা মোছাইয়া দিতে হয়। থারমোমিটারে যে পর্য্যন্ত তাপ নামিতে না দেখা যায় সে পর্য্যন্ত স্পঞ্জিং বন্ধ করা হয় না। সাধারণতঃ জ্বর ১০২°।১০১° পর্য্যন্ত নামিয়া আসিলেই উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া সঙ্গত; কারণ স্পঞ্জিং বন্ধ করিলেও উহার ক্রিয়া কিছুকাল চলিতে থাকে এবং উহার পরেও তাপ এক আধ ডিগ্রী কমে। তাপ বেশী কমিয়া গেলে হঠাৎ হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া যাইতে পারে যাহাকে 'কোলাপ্স' (collapse) বলা যায়, সুতরাং তাপ যাহাতে বেশী নামিয়া না পড়ে

সে দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। এই স্পঞ্জ করার জলের সহিত টয়লেট্ ভিনেগার (Toilet Vinegar) অডিকোলন বা ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার প্রভৃতি অল্প পরিমাণে মিশাইয়া দিলে শরীরটায় বেশ স্ফূর্ত্তি ও সোয়াস্তি বোধ হয়। স্পঞ্জিংএর সময় মাথায় আইস্ ব্যাগ্ রাখিলে ভাল হয় নতুবা ঠাণ্ডা জল দ্বারা মাথাটা বেশ করিয়া ধোয়াইয়া দেওয়া উচিত। ইহাতেও জ্বর না কমিলে রোগীকে ভিজা কাপড়ে কিছুকাল জড়াইয়া রাখিলে এবং যে পর্য্যন্ত তাপ না কমে সে পর্য্যন্ত উহার উপর জল ছিটাইয়া দিলে তাপ প্রায়শঃই কমিয়া আইসে। উহাতেও কৃত কার্য্য না হইলে রোগীর চারিদিকে বরফ দিলে তাপ দ্রুত কমিয়া যায়। শেষোক্ত দুইটী প্রক্রিয়া ডাক্তার ভিন্ন অপর কাহারও করা উচিত নহে; আমি প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ করিলাম মাত্র। মফঃস্বলের অনেক স্থানে বরফ পাওয়া যায় না। সে সব স্থানে জলপটী প্রভৃতিতে উপকার না দেখা দিলে স্পঞ্জিং করার পূর্ব্বে মাথাটা বেশ কয়েক ঘটী জল দ্বারা ধোয়াইয়া দিলে অনেক সময় উপকার হয় ও জ্বর নামিয়া আইসে। মফঃস্বলে রোগীর মাথায় অনেক সময়ে কলসী কলসী জল ঢালিতে হয় উহাতে ভয়ের কোন কারণই নাই।

নিশাদল (Ammon chloride) ও সোরা (Nitre) একত্রে মিশাইলে খুব ঠাণ্ডা হয়, উহা বরফের পরিবর্ত্তে ব্যাগে করিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে; তবে উহার দোষ এই যে রবারকে সত্বরে নষ্ট করিয়া দেয় এবং আইস ব্যাগটি একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। ইহা বরফের অপেক্ষা অধিক ব্যয়সাধ্য এবং বরফের মত শীতলও নহে; তবে উহা সর্ব্বত্র পাওয়া যায়, এবং ঠিক কাজ চলিয়া যাইতে পারে।

আইস্ ব্যাগও মফঃস্বলে সব সময়ে পাওয়া যায় না। শুপারী গাছের পত্র আবরণ সকলেই দেখিয়া থাকিবেন। উহার ভিতরের দিকে একটী পাতলা আবরণ থাকে। বহিরাংশ হইতে ছাড়াইয়া লইতে পারিলে উহার ভিতরে করিয়া বরফ দেওয়া যাইতে পারে। উহার ভিতর দিয়া সহসা জল নির্গত হয় না।

আইস্ ব্যাগ কতক্ষণ মাথায় রাখা যাইতে পারে, মাথার কোন্ দিকে কি ভাবে দিতে হয়, তাহার সম্যক্ জ্ঞানও সকলের নাই; সুতরাং এ সম্বন্ধেও এই স্থানে দু, চারিটি কথা বলা অসঙ্গত মনে করি না। সাধারণতঃ একযোগে আইস্ ব্যাগ দুই ঘণ্টার বেশী না দেওয়াই কর্ত্তব্য। দুই ঘণ্টা দিয়া পুনরায় ½ ঘণ্টা—এক ঘণ্টা বাদ দিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপে ক্রমাগত ১০।১২ ঘণ্টা চলিতে পারে। এসব সম্বন্ধে ডাক্তারের উপদেশমত চলিতে হইবে কারণ প্রত্যেক রোগীরই অবস্থা বিশেষে স্বতন্ত্র চিকিৎসার প্রয়োজন। ডাক্তার অনুপস্থিতির সময় কি করা দরকার আমি তাহাই বলিতেছি মাত্র। সুতরাং আইস্ ব্যাগ মাথায় দিয়া পাঁচ মিনিট পরেই নামাইবার জন্য ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। আইস্ ব্যাগ প্রধানতঃ মস্তকের সম্মুখের ভাগে দিতে হয়। আমাদের মস্তকের কার্য্যকরী শক্তির স্থান বিশেষতঃ তাপ উৎপাদনের কেন্দ্র (Heat producing centre) এই জায়গায়। কাজেই ঐ স্থানে প্রয়োগই প্রধান দরকার— তবে মস্তকের সমস্ত স্থানেই দেওয়া যাইতে পারে। মাথায় বেশী চুল থাকিলে আইস্ ব্যাগ দেওয়াতে অসুবিধা হয়। যাহাতে মাথার চামড়ার সহিত ব্যাগ লাগিতে পারে তাহার

জন্য মাথার চুল খুব ছোট করিয়া কাটিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য; মাথা একেবারে মুড়াইয়া দিলে আরও ভাল হয়। তবে মেয়েদের বেলায় এ বিষয়ে সাবধানে অগ্রসর হওয়া উচিত। কেশ রমণীর একটী প্রধান সৌন্দর্য্য; একান্ত আবশ্যক না হইলে উহার উচ্ছেদ কখনই সঙ্গত নহে। সময় সময় রোগী মাথায় আইস্ ব্যাগ রাখিতে আদৌ ভালবাসে না—নেহাৎ বিরক্ত মনে করে; সেরূপ স্থলে উহার পরিবর্ত্তে অন্য ব্যবস্থা করাই সঙ্গত। জল দ্বারা মাথা ধোয়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। রোগীকে আরাম দেওয়াই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য, তাহা না করিয়া যাহাতে সে বিরক্ত হয় সেরূপ কাজ সহসা এবং একান্ত প্রয়োজনীয় না হইলে কিছুতেই করা সঙ্গত নহে। এই সব স্পঞ্জ দেওয়ার পর মুহূর্ত্তেই ঘরের দরজা জানালা খুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, উহাতে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া নানাবিধ উপসর্গ আসিতে পারে। রোগীর শরীর বেশ করিয়া মোছাইয়া ও কাপড় ঢাকা দিয়া তবে দরজা জানালা খোলা উচিত। কিছুকালের জন্য একটা হাল্কা কম্বল দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া ভাল।

এই জ্বর বৃদ্ধির সময় রোগী অনেক সময় পিপাসায় কাতর হয়—ও একটু জল বা এক টুকরা বরফের জন্য অস্থির হয়। নিকটস্থ ব্যক্তিগণ উহা দিতে প্রায়ই ঘোর আপত্তি করেন, কিন্তু পিপাসার সময় একটু জল বা ছোট্ট একখণ্ড বরফ দিলে কোনই ভয় বা দোষের কারণ নাই, বরং জ্বর ত্যাগ বিষয়ে সহায়তা করে। আবশ্যকমত অল্প পরিমাণে সোডাওয়াটার বা লিমনেড দেওয়াও চলে। ফিট বা জ্বর চমকের (Fits) কথা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহা নানা প্রকারে হইতে পারে; সে কথার আলোচনা করিতে গেলে অনেক কথার অবতারণা করিতে হয়। সুতরাং ঐ সময়ে কি কি সাবধানতা লওয়া আবশ্যক কেবল মাত্র তাহারই উল্লেখ করিব। জ্বর চমক সাধারণতঃ বালক বালিকাদেরই বেশী হইতে দেখা যায়। ঐরূপ হইলে তৎক্ষণাৎ মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিবে মাথা জল দ্বারা ধোয়াইয়া দিবে। ও পাখার হাওয়া করিতে থাকিবে। রোগীকে বেশী নাড়া চাড়া করিবে না। গলায় জামার বোতাম আটকান থাকিলে উহা খুলিয়া দিবে। সম্ভবতঃ ইহাতেই জ্ঞান ফিরিয়া আসিবে।

জ্বরত্যাগে (Collapse.)

যেমন জ্বর বৃদ্ধির সময় ভয়ের কারণ আছে, সেইরূপ জ্বরত্যাগের সময়ও তাপ ৯৭° নীচে হইলেই আশঙ্কার কথা, তৎক্ষণাৎ ডাক্তারকে খবর দিবে। যদি হাত পা ঠাণ্ডা লাগে ও তাপ কমের দিকে যাইতে থাকে ডাক্তারের জন্য বসিয়া না থাকিয়া ফ্ল্যানেল গরম করিয়া রোগীর হাত পা বেশ করিয়া সেকিবে।

শরীরটা বেশ করিয়া কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিবে। বোতলে গরম জল পূরিয়া উহা কাপড় দিয়া জড়াইয়া দুই পায়ের ভিতরে ও বাহিরে রাখিয়া পা ঢাকিয়া দিবে। এইরূপ হাতের দু আশেও গরম জলের বোতল রাখিবে। বোতলের পরিবর্ত্তে রবারের ব্যাগেও গরম জল ভরিয়া রাখা যাইতে পারে। বোতলগুলির তাপ সহ্য করিবার ক্ষমতা থাকা চাই, যেন ফাটিয়া না যায়। সাধারণতঃ মদের বোতল, বা স্পিরিটের বোতল বা ডিস্‌টিল্‌ড ওয়াটারের (Distilled water) বোতলগুলিই ভাল। গরম জল পূরিয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দিবে—যখন বোতল

গরম হইয়া উঠিবে তখনও যদি না ফাটে তবে সম্ভবতঃ আর ফাটিবার আশঙ্কা নাই। বোতলের কাগ (cork) যাহাতে ভাল করিয়া বন্ধ হয় এবং খুলিয়া গরম জলে গা পুড়িয়া না যায় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ঐ একই কারণে বোতলটি কাপড় বা ফ্ল্যানেল দ্বারা জড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। অনেক স্থলে এই সামান্য বিষয়ে সাবধানতা না লওয়াতে রোগীর গায় ফোস্কা প্রভৃতি পড়িতে দেখা গিয়াছে।

যদি বেশী ঠাণ্ডা বোধ হয় তবে হাত পা ও শরীরের অন্যান্য স্থানে শুঁঠের গুড়া (Pulv Ginger) বেশ করিয়া রগড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। ঘরে ব্র্যাণ্ডী (Brandy) থাকিলে উহা ৬০।৭০ ফোটা ½ ছটাক জলের সহিত মিলাইয়া খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। মৃগনাভী ২ রতি ও মকরধ্বজ ১ রতি মধু বা বেদানার রস সহ মাড়িয়া খাওয়াইতে পারা যায়। সময় সময় ২।১ চামচ করিয়া গরম দুধ দিতে পারা যায়।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

সাহিত্য পরিচয়

ফিজীদ্বীপ সেঁ মেরে ২১ বর্ষ।—পণ্ডিত তোতারাম ধনাঢ্য প্রণীত। একদিন কবি গাহিয়াছিলেন :—

"দেশ দেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।
শীর্ণ, শান্ত, সাধু তব পুত্রদের ধরে
দাও সবে গৃহ ছাড়া লক্ষ্মী ছাড়া করে॥"

আজ ভারতমাতা তাঁহার পঞ্চ লক্ষাধিক সন্তানকে "গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া" করিয়া দিয়াছেন। তাহারা "দেশ দেশান্তর মাঝে" আপনার স্থান খুঁজিয়া লইবে বলিয়া বাহির হইয়াছে। উল্লিখিত পুস্তকখানি ভারতের এই সন্তান বৃন্দের জীবন যুদ্ধের বিবরণ। লেখক নিজে এই নির্ম্মম সংগ্রামের একজন যোদ্ধা। প্রতি পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় এই যুদ্ধের জয় পরাজয়ের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। প্রতি অধ্যায়েই বীরের শোণিতে ও শোকের অশ্রুতে দ্রবীভূত ভাবের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ একদিন গাহিয়াছিলেন :—

—"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা,
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা॥"

পণ্ডিত তোতারাম আশার বাণী ধ্বনিত করিতে সক্ষম হউন বা না হউন, তিনি আমাদের বহু লক্ষ ভগ্ন, রুগ্ন মূক কণ্ঠে ভাষা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। নীরব অপমান আজ বিচারের প্রত্যাশায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছেন। পণ্ডিত তোতারাম এইজন্য প্রতি দেশবন্ধুরই নমস্য।

ধর্ম্মপাল।—শ্রীরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। গুরুদাস চ্যাটার্জ্জি এণ্ড সন্স্ কর্ত্তৃক 'আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থমালার দ্বিতীয় গ্রন্থরূপে প্রকাশিত। স্কট ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়া তাঁহার দেশের অতীত ইতিহাসকে বর্ত্তমানের মত জীবন্ত করিয়া দাঁড় করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে বঙ্কিম বাবু এই পথ আংশিক অবলম্বন করেন।

কিন্তু শ্রীযুক্তরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুরাপুরি ভাবে এই পথে অগ্রসর। তাঁহার ধর্ম্মপাল সেই পথ-অনুসরণই নিদর্শন।

আমরা পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পড়িলাম। প্রবাসীতে যখন ইহা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়, তখনই আমরা ইহার সহিত পরিচিত হই। ইহার ঐতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য নাই। ধর্ম্মপাল সম্বন্ধে আমরা ত ইতিপূর্ব্বে একরকম অজ্ঞই ছিলাম। দেশের আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ-গণের গবেষণার ফলে ধর্ম্মপাল এখন অনেকটা আমাদের পরিচিত। সেই সব প্রত্নতত্ত্ববিদ-গণের মধ্যে রাখালবাবুর আসন অতি উচ্চে। অতএব তাঁহার রচিত ঐতিহাসিক গল্পের ঐতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধে আমাদের মত অবিশেষজ্ঞের বলিবার কিছু নাই। তবে তাঁহার লিখন পদ্ধতি, গল্প বলিবার ভঙ্গী, চরিত্রচিত্রন সম্বন্ধে দু এক কথা বলা যাইতে পারে।

পুরাতন কাহিনী বলিতে গিয়া রাখালবাবু পুরাতন ভঙ্গীই গ্রহণ করিয়াছেন। তাই তাঁহার রচনায় 'ওঠা নামা' নাই—সকল কথাই যেন এক সমতল ভূমির উপর দিয়া সমান চালে কুচ করিয়া চলিয়াছে। ইহাতে পাঠককে বড় ক্ষুণ্ণ হইতে হয়। রসবৈচিত্র্যের জন্য লিখন বৈচিত্র্য ঘটিয়া থাকে—পাঠক সেই বৈচিত্র্যটি পাইলে বেশ উপলব্ধি করিতে পারেন তাঁহার হৃদয় কেমন নানা রকমে দোল খাইতেছে এবং তাহাতেই তাঁহার পাঠতৃপ্তি। রাখালবাবু এই তৃপ্তি হইতে পাঠককে বঞ্চিত করিয়াছেন। তবে ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনা মিলাইয়া তিনি যে গল্পের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা মন্দ দাঁড়ায় নাই। কিন্তু দাঁড়াইলেও এ কথা যেন বারবার আমাদের মনে হইয়াছে—গল্পটা অযথাভাবে দীর্ঘায়িত। ইহার অনেক স্থান কাটিয়া ছাঁটিয়া দিলে মন্দ হইত না। এবং দিলে বোধ হয় অতীতটা আরও জীবন্ত হইয়া আমাদের সম্মুখে জাগিতে পারিত।

আখ্যায়িকার ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির মধ্যে ধর্ম্মপালের চরিত্র যতখানি ফুটিয়াছে, আর কাহারও ততটা নহে। কিন্তু কল্পিত চরিত্রগুলির অধিকাংশই বেশ পরিস্ফুট। ঐতিহাসিক তথ্যের অভাবই কি এই তার-তম্যের কারণ? বিশ্বানন্দ, ভীমদেব, কল্যাণী ত্যাগস্বীকারে গ্রন্থের মধ্যে এবং পাঠকের অন্তরে উজ্জ্বল। রাখাল বাবু এই ধরণের চরিত্র চিত্রণ যত করিবেন—বাঙ্গালী ততই তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিবে।

রাখাল বাবু যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বড়ই দুর্গম। পদে পদে নানারকমের বাধা। কিন্তু তিনি সে বাধা অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা রাখেন, তাহা তাঁহার বর্ত্তমান গ্রন্থখানি হইতেই বুঝিতে পারিয়াছি। দেশবাসী শুষ্ক ইতিহাসের তত্ত্বকথায় ভিজিতে চায় না। রাখালবাবু গল্পের সাহায্যে দেশের অতীত ইতিহাসের সহিত দেশবাসীর পরিচয় সাধন করিতে প্রয়াসী। 'গৌড় রাজমালা' 'গৌড় লেখমালা' প্রভৃতি গ্রন্থের পাঠক বঙ্গদেশে এখনও বিরল। কিন্তু আশা আছে, 'ধর্ম্মপাল' 'শশাঙ্ক' প্রভৃতির পাঠক দেশে কম হইবে না। বাঙ্গালী যদি তাহার অতীত বীর্য্য, অতীত শৌর্য্য, অতীত ধর্ম্ম-ভীরুতা, অতীত উদারতা, অতীত ঐশ্বর্য্য জানিতে চাহে, তবে 'ধর্ম্মপাল' তাহার পাঠ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

বিসূচিকা দর্পণ।—ডাক্তার শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ এম, ডি প্রণীত। গৃহস্থ

পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আড়াই টাকা।

বাঙ্গালা ভাষায় ওলাউঠা সম্বন্ধে হোমিওপ্যাথিক মতে যতগুলি চিকিৎসাগ্রন্থ আছে, তাহাদের মধ্যে বক্ষ্যমাণ পুস্তকখানি একটি শ্রেষ্ঠস্থান পাইবার যোগ্য। ইহা ডাক্তার মহাশয়ের বহুবর্ষব্যাপী অভিজ্ঞতার ফল। ইহাতে রোগের নিদান, রোগ নির্ণয়-লক্ষণ, রোগ নিবারণের উপায় এবং চিকিৎসার্থে প্রযোজ্য ভেষজগুলির লক্ষণাবলী এবং তাহাদের প্রকৃতিগত পার্থক্য প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা আছে। ওলাউঠা চিকিৎসা করিতে গিয়া যে সব স্থানে চিকিৎসকের মনে খটকা উপস্থিত হয়, ডাক্তার মহাশয় অতি সরল ও সুন্দর বিচারের দ্বারা সেই সব স্থান পরিষ্কার করিতে ক্রটি করেন নাই। যাঁহারা হোমিওপ্যাথিক মতে ওলাউঠা চিকিৎসা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা এই গ্রন্থ দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইবেন আশা করি।

শ্রীকমলা (হিন্দী)।—জানুয়ারী ১৯১৬। এই পত্রিকা খানির উদ্দেশ্য নবীন লেখকগণকে উৎসাহ প্রদান করা। সকল সাময়িক পত্রেই লেখকের পদমর্য্যাদা প্রভৃতি অনুসারে প্রবন্ধাদি গৃহীত হয়। শ্রীকমলাতে গুণ অনুসারেই রচনা আদৃত হইবে।

"পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং ন চাপি
কাব্যং নবমিত্যবদ্যং।
সন্তঃ পরীক্ষগণ্যাতরৎ ভজন্তে মূঢ়ঃ
পর প্রত্যয়নেয় বুদ্ধিঃ॥"

শ্রীকমলা কালিদাসের এই উক্তি শিরোধার্য্য করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়াছেন। দুঃখের বিষয় নবীন লেখকগণের নবীনতার গন্ধ বড় উগ্রভাবে প্রতি পৃষ্ঠায় বর্ত্তমান। বিশেষতঃ কবিতাগুলি পড়িয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। "ভারতকী হীনাবস্থা" শীর্ষক কবিতাটী একটী ছড়া ব্যতীত কিছুই নহে—রচনা বালক জনোচিত। "মুদ্রা রাক্ষসকা সময়" নামক প্রবন্ধটী সুপাঠ্য। কিন্তু লেখকের যুক্তিতে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। মুদ্রা রাক্ষসের নানা স্থানে "গুপ্ত," "চন্দ্রগুপ্ত" প্রভৃতির উল্লেখ আছে ও ভরতবাক্যে ম্লেচ্ছদিগের কথা আছে বলিয়া প্রবন্ধকার বলিতে চাহেন যে মুদ্রারাক্ষস ৪২০ খৃষ্টাব্দে রচিত। কালিদাসের সময় নির্ণয়ের জন্যও এইরূপ প্রমাণের অবতারণা করা হইয়াছে। কিন্তু কেবল এইরূপ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই পুস্তক বিশেষের তারিখ নির্ণয় করা যায় না। চিত্রগুলির আমরা মোটেই প্রশংসা করিতে পারিলাম না।

গীতাবিন্দু।—শ্রীবিহারী লাল গোস্বামী প্রণীত। **বিশ্বরূপ দর্শন** অনুবাদের উদ্দেশ্য ভাবের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করা। এক আবরণের মধ্যে ভাববিশেষ একদেশে বা কালে যেরূপ আত্মপ্রকাশ করে যদি আবরণান্তরেও তাহার সেই তথ্য অক্ষুন্ন থাকে তবেই বুঝিব যে অনুবাদ সার্থক হইয়াছে। পক্ষান্তরে সকল ভাবেরই এইরূপ অনুবাদ সম্ভব নয়। দেশকাল ব্যত্যয়ে কেবল বিশ্বজনীন ভাবগুলিই অনুবাদ সত্ত্বেও বোধগম্য হয়। যদি কেবল বুদ্ধির উপরেই অনুবাদ বিচারের ভার থাকিত তাহা হইলে বোধ হয় অনেক অনুবাদই সার্থক হইত। কিন্তু বস্ত্রের যেমন একটা সৌন্দর্য্য আছে, একটা æsthetic quality আছে, ভাষায়ও সেইরূপ। কাজেই ভাষান্তরে যদি এই

সৌন্দর্য্যটুকু রক্ষিত না হয় তবে ভাবটী পূর্ণরূপে বিকাশলাভ করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিব না।

যে মাপকাটী দিয়াই বিচার করি না কেন গোস্বামী মহাশয়ের অনুবাদকে perfect translation বলিয়া মানিয়া লইতে আমাদের কোনও দ্বিধা নাই। ইহা গীতার শ্লোকগুলির কেবল ভাবানুবাদ হয় নাই। ভাবের সহিত ভাষার সৌন্দর্য্য অবিকল রক্ষিত হইয়াছে। এমন কি প্রত্যেক শ্লোকের প্রত্যেক পাদের সহিত অনুবাদের প্রত্যেক শ্লোকের প্রত্যেক লাইনের মিল আছে। এরূপ ভাষা চাতুর্য্য কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ইহা ব্যতীত গ্রন্থকারের ছন্দের চাতুর্য্যও অসাধারণ। উপজাতি ছন্দকে অবশ্য তিনি উপজাতি ছন্দে বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন নাই। কিন্তু তিনি যে ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে উপজাতির মাধুর্য্য—পূর্ণভাবে বিদ্যমান আমরা দুই একটা উদাহরণ দিতেছি,

"লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ
লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো॥"

"অনল-শ্বসনা লেলিহ রসনা
মেলিয়া সকল দিশে
তোমার বদন বিশ্বের জন
নিঃশেষে গরাসিছে
নিখিল জগৎ তোমার মহৎ
তেজে যে উঠিল ভরি
উগ্র-ঝলক সমগ্র লোক দগ্ধি ছুটিল, হরি!"

নভস্পৃশং দীপ্তমনেক বর্ণং
ব্যত্তাননং দীপ্ত বিশাল নেত্রং।
দৃষ্টা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি সমং চ বিষ্ণো॥"

গগনে লিপ্ত মূরতি দীপ্ত রঞ্জিত বহু ধারা,
বিবৃত বদন বিশাল লোচন—
জ্বলিছে উগ্রতারা!
তোমারে নেহারি চিত্ত আমারি
ব্যথায় উঠিছে ভরি,
ধৈর্য্য না পাই, শান্তিও নাই,
কোথায় দাঁড়াই হরি!

আমরা এই অনুবাদকে নিঃসঙ্কোচে গীতার এই অংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদ বলিয়া স্বীকার করিতেছি।

মফঃস্বলের বাণী

১। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন

ইংরাজীতে একটা কথা আছে যে,—The Nation lives in cottages অর্থাৎ পর্ণ-কুটীর সমূহই জাতির বাস-গৃহ। কথাটী যে খুবই খাঁটী, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁহারা গলবাজী বা লিপি কণ্ডূয়ন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অধিকাংশই কাযের বেলায় উক্ত খাঁটী কথাটা ভুলিয়া যান। এই যে আমাদের জাতীয় উন্নতিকর অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ দিন দিনই ক্ষীণবল হইয়া পড়িতেছে, ইহার একমাত্র কারণ সমগ্র জাতিকে লইয়া আমরা আমাদের জাতীয় জীবন সংগঠন করিতে

পারি নাই। যতদিন পর্য্যন্ত কেবল মাত্র সহরের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত বা অর্দ্ধ শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে লইয়াই আমরা আমাদের জাতীয় জীবন বুঝিব এবং সেই মুষ্টিমেয় জন-সংখ্যার উন্নতি-অবনতির তারতম্যানুসারেই জাতীয় জীবনের উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার করিব, ততদিন আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে পারিব না—নিজে নিজকে প্রতারণা করিব মাত্র।

পৃথিবীর সমগ্র উন্নত জাতির অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস একবাক্যে স্বীকার করিতেছে যে দেশের আপামর জন-সাধারণের হৃদয়েই জাতির প্রাণ প্রতিষ্ঠিত এবং যে দেশের জন-সাধারণ যে পরিমাণে আত্মোন্নত ও আত্মপ্রতিষ্ঠ সে দেশ তত উন্নত ও সভ্য। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই আমরা দেশের জনসাধারণের কথা ভুলিয়া যাই। এই জন্যই আমাদের জাতির জীবনী শক্তি এত নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ। দেশের জনসাধারণকে এড়াইয়া চলা ও অবজ্ঞা করাই যেন আমাদেরই স্বভাব, অথচ পাশ্চাত্য জাতি সমূহের ঠিক তাহার বিপরীত। তাহারা চায় জনসাধারণের সাহচর্য্য ও সহযোগিতা এই জন্যই তাহাদিগের জাতীয় জীবন এত উন্নত। নগণ্য কুলি-মজুর হইতেও যে একজন বিশ্ববরেণ্য কর্ম্মবীরের উদ্ভব ও আবির্ভাব হইতে পারে পাশ্চাত্য দেশে ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। জাতীয় জীবনী শক্তির ইহাই এক শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

দেশবিখ্যাত স্বর্গগত মহাত্মা মনোমোহন ঘোষ যখন আমেরিকার যুক্তরাজ্যে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার ব্যাগবাহী একজন কুলি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে,—"আপনি কোন্ দেশের লোক?" তিনি উত্তর করিয়াছিলেন,—"আমি ভারতবাসী।" কুলি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়াছি—যে, ভারতবর্ষে প্রায় ত্রিশ কোটী লোকের বাস; কিন্তু মহাশয় জিজ্ঞাসা করি,—আপনারা সর্ব্ব প্রকারে এত পরাধীন কেন?" মনোমোহন এই কথায় বিস্মিত হইয়া তাহাকে বলিলেন,—"দেখিতেছি, তুমি বেশ লেখাপড়া জান। কিন্তু তুমি কুলির কার্য্য করিতেছ কেন?" কুলি উত্তর করিয়াছিল,—"মহাশয়, আপনি আজ দেখিতেছেন, আমি কুলী—কিন্তু এমন দিন আসিতে পারে, হয়ত যে দিন শুনিবেন,—আমি যুক্তরাজ্যের সর্ব্বোচ্চ শাসনকর্ত্তা বা প্রেসিডেণ্ট পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি।" তাই বলিতেছিলাম,—জাতীয় জীবনে যদি প্রাণ থাকে, তবে এই সব জাতিরই আছে,—ইহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে জাতির মত জাতি। অধঃপতিত ও জীবনীশক্তিবিহীন বাঙ্গালী আমরা—শুধু বৃথাই জাতীয়তার অভিমান করি! পৃথিবীর জাতীয় জীবনের ইতিহাসে বস্তুতঃই বাঙ্গালী জাতি মৃত! সমাজ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা এই তিনের উন্নতি ব্যতীত কোন জাতিরই জাতীয় জীবন সমুন্নত হইতে পারে না। এই তিনের উন্নতিতেই জাতীয় জীবনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা,—আর এই তিনের অবনতিতেই জাতির মৃত্যু বা অধঃপতন। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালাদেশে সমাজ স্বাস্থ্য ও শিক্ষা এই তিনেরই অভাব পূর্ণমাত্রায় আমরা অনুভব করিতেছি। মনে হয়, এই তিনের অভাব পূর্ণ হইলেই বুঝি আমরা একটু মানুষের মত মানুষ হইতে পারিব, দশ জনের নিকট একটী জাতি বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতে পারিব।

বাস্তবিক এখন আমাদের সেই সোনার বাঙ্গালার অবস্থা নানাদিকেই অত্যন্ত আশঙ্কা-

জনক। সমাজ উচ্ছৃঙ্খল—সমাজপতিগণ নীরব নিস্পন্দ। স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যেই বুঝি দেশান্তরিত হইয়াছে! জ্বর, জরা, মড়ক দেশকে উৎসন্ন করিয়া ফেলিতেছে। শিক্ষাভাবে দেশবাসীর জীবন সংগ্রাম ভীষণ হইতে ভীষণতর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে। বঙ্গের সাগরাম্বর ও কানন-কান্তার প্রতিধ্বনিত করিয়া দরিদ্রের কোটী-কণ্ঠে হাহাকার উঠিতেছে। দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী করাল বদন ব্যাদন করিয়া লোক ক্ষয় করিতেছে। ম্যালেরিয়ায় বঙ্গের সোনার পল্লী-সমূহ ছারখার হইতেছে। মহামারী হবিপুষ্ট হুতাশনের মত লোল জিহ্বা বিস্তার করিয়া বঙ্গের সর্ব্বনাশ করিতেছে। এ সকল দেখিয়া শুনিয়াও কত ধনী, বিলাস-ব্যসনের মাত্রা বৃদ্ধি বই হ্রাস করিতেছে না; কত জ্ঞানী তাহার পুঞ্জীকৃত জ্ঞানরাশি লইয়া জড় ভরত সাজিয়াছেন,—কত মানী মান রক্ষার্থ আপনারই কর্ত্তিত কর্ণ সযত্নে কেশাবৃত করিয়া চলিতেছেন! তাই বলিতেছিলাম,—বাঙ্গালীর যদি জাতীয় জীবন থাকে,—তবে মৃত কে?

ভাই বাঙ্গালী,—যদি বাঁচিতে চাও,—যদি পৃথিবীতে আপনার নাম ও অস্তিত্ব বজায় রাখিতে চাও—সমগ্র দেশবাসীকে আপনার ভ্রাতা জ্ঞান কর। যদি নিজে বাঁচিতে চাও—ভাইকে আগে বাঁচাও। মনে করিতে শিখ,—দেশের আপামর জনসাধারণ তোমার ভাই,—দেশের চাষা ভূষা মুচী মেথর সব তোমার ভাই। সমগ্র দেশবাসীকে লইয়া সমগ্র কুটীরবাসী দরিদ্রকে লইয়া আমাদের জাতি—জাতীয় জীবন আপামর জনসাধারণের হৃদয় লইয়া। তাই বলি ভাই, কায়মনোবাক্যে ভ্রাতৃসেবক ও মাতৃসেবক হও; ইহাই জাতীয় জীবন—ইহাতেই জাতীয় জীবনের প্রথম প্রাণ প্রতিষ্ঠা।

২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ।

২। রেশম-শিল্প

অধুনা বঙ্গদেশে সমস্ত শিল্পেরই অধোগতি ঘটিয়াছে। বাঙ্গালাদেশের রেশমের বস্ত্র এক সময়ে সমস্ত পৃথিবীর আদরের সামগ্রী ছিল। সেই শিল্পের একরূপ বিলোপ সাধন হইয়াছে। দেশের জনসাধারণ ও গভর্ণমেণ্ট প্রজাবৃন্দের অর্থাগমের এই উপায়গুলি সংরক্ষণের চেষ্টা না করিলে দেশের হাহাকার ও অন্নকষ্ট কিছুতেই দূর হইতে পারে না। "বীরভূমবাসী" পত্রিকায় এই সম্বন্ধে সংপ্রতি একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা উক্ত পত্র হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, বঙ্গের পণ্যসম্ভারের ভিতর বীরভূমের রেশম ও রেশমীবস্ত্র একদিন উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া পৃথিবীর সভ্যমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইত। মুর্শিদাবাদের শেঠ বংশীয়দিগের প্রাধান্যকাল পর্য্যন্ত মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী, মালদহ ও বীরভূম রেশম ও রেশমীবস্ত্র জল ও স্থল পথে পরিচালিত হইয়া সহস্র ধারায় এই কয়েক জেলার অধিবাসীদিগের ধনাগার পরিপূর্ণ করিত। যখন ইষ্টইণ্ডিয়াকোম্পানি কাশিমবাজারে রেশমী কুঠি খুলিয়া উহার বহির্ব্বাণিজ্য কিয়ৎপরিমাণে নিজেদের হাতে লইয়াছিলেন তখনও বীরভূমের রেশম ও রেশমীবস্ত্রের ব্যবসায় বিশেষ শোচনীয় ছিল না। ইংরাজরাজ্য সংস্থাপনের পর যখন ইংরাজ বণিকগণ স্থানে স্থানে রেশমী কুঠি খুলিয়া গুটীপোকা হইতে কাঁচা রেশম প্রস্তুত করিবার কার্য্যভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন, তখন দেশীয় বণিকগুলি অধোগতি হইতে আরম্ভ হয় এবং ধীরে ধীরে রেশমসূত্র প্রস্তুত কার্য্য উক্ত

কোম্পানীর হাতে পড়ে। মার্শেল কোম্পানী ময়ুরাক্ষী নদীর তীরস্থিত গনুটিয়া গ্রামে এক বিরাট রেশমী কুঠি সংস্থাপন করিয়া গুটি-পোকা হইতে রেশম তুলিবার ব্যবস্থা করেন। ময়ুরেশ্বর থানার অধীন কেটস্থর, তারাপুর এবং নলহাটীর অধীন ভদ্রপুরে উহাদের শাখা কুঠি সংস্থাপিত হয়। সকল কুঠিতে বহুদিন ধরিয়া কার্য্য চলে। দেশীয় রেশম তোলা কলগুলির কার্য্য বন্ধ হয়। এবং উক্ত কোম্পানী রেশমতোলা কার্য্যে সকল স্থানে জয়যুক্ত হন। যদি উক্ত কুঠি সংস্থাপনে দেশীয়গণের সম্পূর্ণ ক্ষতি হইয়াছিল ও কাঁচা রেশম প্রস্তুত বণিকদলের হস্তে পতিত হইয়াছিল তথাপি পলু পোকা পুষিয়া উহারা কম অর্থ প্রাপ্ত হইত না। উক্ত বণিকগণ বীরভূমের কৃষকগণ কর্ত্তৃক উৎপাদিত সুবর্ণবর্ণ রেশম কোষ ক্রয় করিয়া তদ্দ্বারা সূত্র উৎপন্ন করিত ইহাই কাঁচা রেশম নামে কথিত। সাধারণতঃ বীর-ভূমের উৎপন্ন গুটীপোকা হইতে গুটী আনাইয়া রঙ্গের সময় অতিবাহিত হইলে উহা হইতে রেশম প্রস্তুত করিতেন। এই রেশম শিল্প হইতে যে অর্থ উৎপন্ন হইত বীরভূমের কৃষকগণ তাহার অর্দ্ধেক প্রাপ্ত হইত তাহার সন্দেহ নাই এই রেশম কীটের খাদ্য তুঁতপাতা।

এই তুঁতপাতের চাষ বীরভূমের অধিবাসী-গণের এক লাভবান চাষরূপে পরিগণিত ছিল। এক বিঘা জমির চাষ করিয়া ১৫০। ২০০ টাকা লাভ বৎসরে সকল কৃষকেই প্রাপ্ত হইত। বৎসরের মধ্যে প্রধান চারি মাস পলুর চাষের সময়। প্রথম বন্দ আষাঢ় বা শ্রাবণ। ২য় বন্দ কার্ত্তিক। ৩য় বন্দ পৌষ শেষ চৈত্র এই চারিমাসে বীরভূমের প্রত্যেক পল্লী মুদ্রার ঝণঝণ শব্দে নিয়ত প্রতি-ধ্বনিত থাকিত।

বসোরা, বিষ্ণুপুর, কড়িধা প্রভৃতি গ্রামে বিস্তর তাঁতির বাস। উহারা দেশীয় কলের প্রস্তুত, কাঁচা রেশমে বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া প্রচুর পরিমাণে লাভবান হইত। উহাদের একদিন সৌভাগ্যের সীমা ছিল না উহারা অট্টালিকায় বাস করিত। উহাদের প্রস্তুত রেশমী বস্ত্র ভারতের নানাস্থানে প্রেরিত হইত। লণ্ডনের বাজারেও উহাদের প্রস্তুত রেশমী থান সমাদরে বিক্রিত হইত। বিষ্ণুপুর ও বশোয়ার অনেক মহাজন উহাদের নিকট বস্ত্র ক্রয় করিয়া লণ্ডনে চালান দিতেন। এবং প্রচুর পরিমাণে লাভবান হইতেন। একদিন রেশম শিল্পে বীরভূমের এত সৌভাগ্য ছিল। ধান্য বিক্রয় করিয়া কাহাকেও খাজানা দিতে হইত না। যাবতীয় নৈমিত্তিক ব্যয় নিত্য-ব্যয়ের অধিকাংশ কৃষকগণ রেশমীশিল্প ও তুঁতপাতের চাষ হইতে সংগ্রহ করিত। আজ প্রায় ৮।১০ বৎসর হইল হঠাৎ উক্ত মার্শেল কোম্পানি তাঁহাদের কুঠি গুলিকে তুলিয়া দিয়াছেন। উহাঁদের শুভাগমনে প্রাচীন কালের রেশমতোলা কলগুলি নির্ম্মূল হইয়া-ছিল এজন্য সাহেবদের কুঠি উঠিয়া যাওয়া ক্রেতার অভাবে গুটিপোকা অবিক্রীত রহিল। সুতরাং দুই চারিবার ক্ষতি সহ্য করিয়া কৃষকেরা উক্ত লাভজনক ব্যবসা গুটি প্রস্তুত কার্য্যে বিরত হইল। পলুর চাষ বন্ধ হওয়ায় তুঁতপাতা বিক্রয় হইল না, কৃষকগণ উহার চাষ তজ্জন্য বন্ধ করিয়া দিল। যে গ্রামে পূর্ব্বে ১০০ বিঘা জমিতে তুঁত উৎপন্ন হইত এখন তথায় ২।৪ বিঘা তুঁতের জমি আছে কি না সন্দেহের বিষয়। পূর্ব্বে যে গ্রামে ১০০ শত মন তাঁত মাকুর ঘুঙুরের ঝান্ ঝন্ শব্দে

নিয়ত প্রতিশব্দিত হইত তথায় এখন ১০ খান তাঁত চলে কিনা বলা যায় না। সুতরাং ১০।২০ বৎসর পূর্ব্বের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে যে এই রেশম শিল্পে ক্রমশঃ ঘোরতর অবনতি ঘটিয়াছে। এইরূপ দ্রুত অবনতি দৃষ্টে অনুমীত হয় উক্ত শিল্পের বুঝি একবারে নাশের আর বিলম্ব নাই। এই রেশম ব্যবসা যাহাতে একবারে লোপ না পাইয়া আবার ক্রমশঃ ক্রমশঃ উন্নত হইতে পারে এবং কি করিলে বীরভূমে আবার উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় আমাদের দয়াবান ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাহার উপায় চিন্তা করেন ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

ত্রিপুরা হিতৈষী

৩। বর্ত্তমান শিল্প সমস্যা

স্বদেশীর প্রারম্ভ হইতেই আমরা আমাদের দেশে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিল্প প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছি; এই আকাঙ্ক্ষার ফলে গত কয়েক বৎসর মধ্যে অতি দ্রুত গতিতে যৌথ পদ্ধতিতে কতকগুলি মিল ও কারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু এই সমুদয়ের দ্রুত পতন ও পতনোন্মুখতা আমাদের মনে এক আশঙ্কা জাগাইয়া তুলিয়াছে, যে পথ আমরা বুঝি ঠিক ধরিতে পারি নাই। কেহ আমাদের সততার অভাব কেহ বা যথেষ্ট মূলধনের অভাব ইত্যাদি যিনি যে দিক দিয়া পারেন আমাদের এই নবীন প্রতিষ্ঠানসমূহকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু সব দিক দেখিয়া কারণ নির্দ্ধারণ ও তৎপ্রতীকারের চেষ্টা আজ পর্য্যন্ত হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতায় অনেকের বিলাতী ধরণে শিল্প প্রতিষ্ঠায় যতগুলি অন্তরায় আমরা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি তন্মধ্যে (১) যথোপযুক্ত মূলধনের অভাব (২) বিদেশ প্রত্যাগত যুবকবৃন্দের ভারতীয় কাঁচা মালের (raw materials) সংস্থান ও ব্যবহারের অনভিজ্ঞতা (৩) দেশীয় মজুরগণের কল ইত্যাদির অভিজ্ঞতার অভাবে বিদেশীয় মজুরের ন্যায় বিচক্ষণতা ও কর্ম্মপটুতার অভাব (৪) অবাধ বাণিজ্য নীতির ফলে বৈদেশিক বিসম প্রতিযোগিতা ও তন্নিবারণে ভারতগবর্ণমেণ্টের একান্ত ঔদাসীন্য এবং কাহারও কাহারও মতে বিদেশ প্রত্যাগত শিল্পজ্ঞ যুবকবৃন্দের স্ব স্ব কার্য্যে জ্ঞানের অপর্য্যাপ্ততাই সর্ব্বপ্রধান। আমরা এতদিন যে পথ ধরিয়া চলিয়াছি সেই পথে কৃতকার্য্যতা লাভ করা নিতান্ত দুষ্কর; অথচ এই শিল্পসমস্যার যথাযথ সমাধান ব্যতীত জাতীয় জীবনে উন্নতির পথে কোন স্থায়ী ফললাভের আশা বোধ হয় কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই করেন না। ল্যাঙ্কেসায়ারের কলওয়ালাদের কৃপার উপর যে জাতির লজ্জা নিবারণের জন্য একান্ত নির্ভর, লিখিবার কালী কলম, পড়িবার পুঁথি—আমাদের সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজন ও বিলাসের সামগ্রী যখন পরে না যোগাইয়া দিলে আমরা একান্ত নিরুপায় তখন এই পরমুখাপেক্ষিতা না ঘুচিলে যে আমরা কি করিয়া নিজের পায়ে উঠিয়া দাঁড়াইব তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য।

এই বিষয়ে কোন আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমাদিগকে পাশ্চাত্য ঋষির অমর বাক্যটী স্মরণ রাখিতে হইবে "Humanity is a being" বিশ্বমানব ও জীব ধর্ম্মাক্রান্ত; অতএব প্রত্যেক মানব সমাজ ও এই জৈব নিয়মের (organic law) অধীন। জীব জগতে যেমন প্রত্যেক পরিবর্ত্তনের ইতি-

হাসের পশ্চাতে তাহার ভূত জীবনের ইতিহাসের একটা অকাট্য ছাপ থাকিয়া যায় তেমনি, সমাজও অতীতকে একান্ত ভাবে অগ্রাহ্য করিয়া ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হইতে পারে না। অতএব ভবিষ্যত চেষ্টার প্রকৃত পথ আবিষ্কার করিতে হইলে, এই বিলাতীর ঢেউ আসিবার পূর্ব্বে কোন পথে ও কি উপায়ে আমাদের পূর্ব্বতন শিল্প-ব্যবসায়গুলি পরিচালিত হইত তাহা একটু দেখা আবশ্যক। প্রাচীন কালে ভারতীয় শিল্প-ব্যবসায়ে মূলধনের কোনই প্রয়োজন হইত না। আজ সুইজার-লণ্ডের কৃষকবর্গ যে সমবায়-পদ্ধতির আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া বিপুল অর্থশালী মিলওয়ালাদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে ভারতের সমাজ-গঠন-চাতুর্য্যে এই সমবায়-ভারতের শিল্প ও কৃষকবর্গের মধ্যে স্বভাবতঃই গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সমবায়-পদ্ধতির-স্বরূপ একান্নবর্ত্তি পরিবার-প্রথা। অন্য হিসাবে যতই ভাল বা মন্দ হউক না কেন, শিল্প ও কৃষি ব্যবসায় হিসাবে এই একান্নবর্ত্তি পরিবারপ্রথা ভারতের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে। আজ পাশ্চাত্য দেশে শ্রমজীবিগণ (Labour) ও মূলধন ওয়ালাদের (Capital) মধ্যে যে গজকচ্ছপের যুদ্ধ চলিতেছে ভারতে তাহা কখনই সম্ভবপর হয় নাই। ভারতের এই সমাজগঠনবিশিষ্টতার শেষ কঙ্কাল আজ শ্রীহট্ট ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহের দুই এক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা কপালি ও নমশূদ্র জাতি মধ্যে এক পরিবারভুক্ত শতাধিক পোষ্য দেখিয়াছি; তাহাদের কৃষি-ব্যবসায়ে পয়সা দিয়া দিন-মজুর নিযুক্ত করিবার কোন প্রয়োজন নাই অতএব মূলধনেরও কোন আবশ্যকতা নাই। পুরাকালে শিল্প ব্যবসায়ও এই পদ্ধতিতেই চলিত; অতএব কাঁচা মাল খরিদের পয়সা ব্যতীত ব্যবসায়ীর অন্য কোন প্রকার মূলধনের আবশ্যক হইত না। বহু শত বৎসর যে জাতির শিল্প ব্যবসায়ে মূলধনের কোন প্রয়োজন হয় নাই সেই জাতির ব্যবসায়ীবর্গ একটা বিলাতী পদ্ধতি আমদানী করা হইয়াছে বলিয়াই সেয়ার কিনিতে মুক্তহস্ত হইয়া বসিবে এমন আশাটা কিন্তু নিতান্ত দুরাশা নহে কি? অতএব এইদেশে কোন প্রকার সফলতা লাভ করিতে হইলে দশ বিশ লাখের হাঁক ছাড়িয়া দশ বিশ হাজারে নামিতে হইবে। ইহার পরীক্ষা যে কতকটা না হইয়াছে তাহা নহে; নূতন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠায় মূলধনের অভাবে সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়, কিন্তু লোন আফিসগুলি অতিশয় গণ্ড-গ্রামেও এত সহজে গড়িয়া ওঠে যে দেখিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়। অল্প মূলধন লইয়া কাজ করিতে হইলে বড় বড় সহর ছাড়িয়া গ্রামে ঢুকিতে হইবে। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত অন্তরায় গুলির কতকটা প্রতিরোধের ব্যবস্থা যে না হইবে তাহা নহে। দেশী ও বিলাতী মালের প্রতিযোগিতা বড় সহরে যেমন পল্লীতে ততটা নহে। হাঁটুর উপরে ওঠা মোটা তাঁতের কাপড় আজও পল্লীগ্রামের বাজারে একান্ত দুষ্প্রাপ্য নহে। শিল্প প্রয়াসগুলি বিলাতীর বহু নকল না হইয়া যদি কতকটা দেশকালোপযোগী করা যায়, তবে কারিকরের কর্ম্মের অপটুতা নিয়াও এতটা ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে না এবং কাঁচা মাল সংস্থানের অসুবিধা দেশী জিনিষ নিয়া পরীক্ষার ফলে, আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে, একেবারেই থাকিবে না।

এখন সর্ব্বপ্রথম জিজ্ঞাস্য পথ কি ও লোক কোথায়? পথ বিষয়ে আমাদের উত্তর এই

যে ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটা বৃহৎ মিল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা স্থগিত রাখিয়া ১০।২০ হাজারের কারখানা গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠা করা। ইহাতে দেশে মূলধন প্রকৃতপক্ষে খাটিবে অনেক বেশী কিন্তু সংগ্রহের জন্য মোটেই ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে না। পরন্তু ব্যবসায়গুলি দেশময় ছড়াইয়া পড়িলে দেশের জনসাধারণে কোন না কোন প্রকারে ইহাতে যোগ দিতে পারিবে। ইহাও আমাদের পক্ষে কম লাভের কথা নয়। এই চেষ্টার ফলে হয়ত দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অনেকটা বাড়িয়া উঠিবে, কারণ কারখানায় কাজ করিতে নোটিশ ইত্যাদি পড়িতে সামান্য অক্ষর জ্ঞানও এত সাহায্য করে যে তখন প্রয়োজন বোধেই অনেক লোক শিক্ষা লাভের জন্য অগ্রসর হইবে। আগ্রহের ফলে ব্যাপারও অনেক সহজ হইয়া পড়িবে। দ্বিতীয়তঃ লোক—দুই শ্রেণীর লোকের আবশ্যক,—যাঁহারা সমুদয় উদ্যোগ করিয়া পরীক্ষার কর্ম্মটা সমাধা করিয়া দিবেন এবং যাঁহারা এই পরীক্ষা কার্য্যে স্ব স্ব উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগে নিযুক্ত থাকিবেন। প্রথম দল বর্ত্তমান বিজ্ঞান-সভার ন্যায় একটী সমিতি গঠন করিয়া পরীক্ষার ব্যয় ও অন্যান্য আবশ্যকীয় ব্যয়াদির ব্যবস্থা করিবেন এবং দ্বিতীয় দল স্ব স্ব বিশেষ বিদ্যা বা বিশেষ উদ্ভাবনী প্রতিভা দেশ ও কালোপযোগী করিয়া শিল্প নির্ম্মাণ কৌশল উদ্ভাবনে নিয়োগ করিবেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের অভাব হইবে না। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি; অভাব যা আমাদের আগ্রহ ও উৎসাহের। ফল লাভ কতটা করা যাইবে পরীক্ষার পূর্ব্বে বলা যায় না; কিন্তু পথ যখন আর নাই তখন একবার চেষ্টা করিয়া জানা বোধ হয়, নিতান্ত অযৌক্তিক হইবে না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সেক্সপিয়ার ও মিল্‌টন তৈয়্যারের কাজটা যদি আপাততঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ন্যস্ত রাখিয়া এই শিল্প-সমস্যা সমাধানে একটু মন দেন, তবে অল্প সময় মধ্যেই এই প্রকার একটী সমিতি গড়িয়া তোলা কষ্টকর হইবে না। অন্নশুদ্ধি ব্যতীত ভূতশুদ্ধি কখনই হইতে পারে না।

রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ।

৪। সাবাস ছাব্বিশ

ফরাসী গবর্মেণ্ট তাঁহাদের হিন্দু প্রজাদের সৈন্যদলে প্রবেশের অধিকার দান করিয়াছেন, এবং ছাব্বিশ জন হিন্দু ফরাসীপ্রজা ফরাসী সৈন্যদলে প্রবেশের জন্য আবেদন করিয়াছেন,—এ কথা পাঠকগণ অবগত আছেন। চন্দননগরের বড় ডাক্তার তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, তাঁহারা সৈন্যদলে প্রবেশের যোগ্য কি না। এই পরীক্ষায় তাঁহারা উত্তীর্ণ হইলে, তাঁহাদিগকে যোগ্যতার সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে, এইরূপ স্থির ছিল। গত রবিবার বেলা নয় ঘটিকার সময় তাঁহাদিগকে চন্দননগরের 'মারগেন্ হাঁসপাতালে' যথারীতি পরীক্ষা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে নির্ব্বাচিত আঠার জন সৈনিককে শীঘ্রই পণ্ডীচেরীতে প্রেরণ করা হইবে; সেখানে তাঁহারা ফরাসী সৈন্যদলে যোগদান করিবেন। ইহাই ফরাসী গবর্মেণ্টের প্রথম হিন্দু সৈনিকদল।

ভারতে ফরাসী গবর্মেণ্টের সহস্র সহস্র হিন্দু-প্রজা আছেন, তাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাদের গবর্মেণ্টের নিকট এই বিশিষ্ট অধিকার লাভ করিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, সহস্র সহস্র হিন্দুপ্রজার মধ্যে ছাব্বিশ জনের অধিক হিন্দু এই মহাব্রত গ্রহণপূর্ব্বক ইউরোপের সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইবার সুযোগের

সদ্ব্যবহার করিলেন না। প্রথমদৃষ্টিতে ইহা ক্ষোভের বিষয় হইলেও, সৈনিকপদপ্রার্থী হিন্দু ভলণ্টিয়ারগণের সংখ্যার অল্পতা দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইবার বিশেষ কোনও কারণ নাই। আমাদের দেশের একদল স্থূলদর্শী লোক ইহা হিন্দুর ভীরুতা ও অপদার্থতার নিদর্শন মনে করিয়া তাঁহাদিগকে উপহাস করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না; সংবাদপত্রে নির্লজ্জের মত বিরুদ্ধ সমালোচনা দ্বারা বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতেছে;—কিন্তু এই সকল স্থূলবুদ্ধি পল্লবগ্রাহীর দল একবারও ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পায় না,—এই প্রকার আত্মোৎসর্গে কি পরিমাণ সাহস, চরিত্রের দৃঢ়তা ও সাংসারিক সুখের প্রতি আসক্তির অভাব পরিব্যক্ত হইতেছে। স্বদেশ, আত্মীয়স্বজনগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সংসারের মায়ামমতা কাটাইয়া, সকল সুখের আশা বিসর্জ্জন দিয়া, দেশান্তরে—কোনও অপরিচিত প্রদেশে, ভিন্ন দেশবাসী, অন্যধর্ম্মাবলম্বী, অপরজাতীয় মিত্র সৈন্যগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে হইবে। তাহার শেষ ফল কি, কাহারও অনুমান করিবার সামর্থ্য নাই। পুনর্ব্বার স্বদেশে প্রত্যাগমনের আশা আছে কি না, তাহাও অনিশ্চিত, এবং স্বদেশে ফিরিতে পারিলেও কয়জন অক্ষতদেহে, কর্ম্মক্ষম অবস্থায় দেশে ফিরিবেন, তাহা একমাত্র মহাকাল ভিন্ন অন্যের অজ্ঞাত। এ অবস্থায় হাজার হাজার লোকের মধ্যে ছাব্বিশ জনের অধিক এই দুষ্কর ব্রত গ্রহণ করিল না কেন, বলিয়া যাহারা হিন্দুর কাপুরুষতাকে ধিক্কার দান করিতেছে, তাহারা কৃপার পাত্র। যদি তাহারা স্বয়ং সৈন্যদলে প্রবেশপূর্ব্বক দৃষ্টান্ত দ্বারা অন্যকে উৎসাহিত করিবার অবকাশ পাইত, তাহা হইলে আমরা তাহাদিগকে সম্মান করিতাম, এবং তখন তাহারা অন্যকে এই সুযোগের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে দেখিয়া বিস্ময় ও ক্রোধ প্রকাশ করিলে, তাহা ধৃষ্টতা মনে করা হয় ত সঙ্গত হইত না; কিন্তু যাহাদের যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার আপাততঃ কোনও সম্ভাবনা নাই, যাহারা ত্যাগের সহস্র সুযোগ হেলায় হারাইয়া অন্যকে আত্মোৎসর্গের পথে অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত দেখিয়া খবরের কাগজে ভাষা ফেনাইয়া প্রবন্ধ লিখিতেছে, তাহাদের জ্যাঠামী, পাকামী ও ধৃষ্টতার উপযুক্ত পুরস্কার কি?

কিন্তু যে ছাব্বিশ জন সৈন্যদলে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, আমরা কি বলিয়া তাঁহাদের উদ্যম, উৎসাহ ও আত্মোৎসর্গের প্রশংসা করিব, তাহা জানি না। তাঁহারা দেশের অলঙ্কার, হিন্দুজাতির গৌরব। তাঁহারা আমাদের দুর্নাম দূর করিয়া আমাদের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁহাদের এই মহৎ দৃষ্টান্ত কেবল ফরাসী গবর্মেণ্টের নহে, বৃটীশ গবর্মেণ্টের সহস্র সহস্র হিন্দুপ্রজাকেও আত্মোৎসর্গে উৎসাহিত করিবে, এবং সুযোগ পাইলে সহস্র সহস্র হিন্দুবীর স্বদেশের গৌরববর্দ্ধনের জন্য যে হিন্দু ফৌজের সৃষ্টি করিবেন,—তাহা কালে সাম্রাজ্যের সুদৃঢ় স্তম্ভে পরিণত হইবে, এ আশা আকাশ-কুসুমবৎ অলীক নহে। আত্মদান, আত্মোৎসর্গ, জীবনের মায়া-বিসর্জ্জন আদর্শসাপেক্ষ। সে আদর্শ এ দেশে সুলভ নহে; ছাব্বিশ দূরের কথা, ছয় জন ভারতীয় হিন্দুও যদি এই আদর্শ দেখাইতেন, তাহা হইলেও আমরা আশান্বিত—পুলকিত হইতাম। বটবৃক্ষের বীজ কত ক্ষুদ্র, তাহা হইতে কত ক্ষুদ্র অঙ্কুর নির্গত হয়, তাহা দেখিয়া কেহ কি কখনও কল্পনাও

করিতে পারে—তাহা কালে সহস্র পাখীর গৃহ, পান্থের আশ্রয়, ঝটিকায় প্রতিদ্বন্দ্বী মহামহীরূহে পরিণত হইবে ?

আমাদের আশা আছে, আমরা বিশ্বাস করি, যে ছাব্বিশ জন এই পৃথিবীব্যাপী মহা-নরমেধযজ্ঞে আত্মোৎসর্গ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহারাই ফরাসী গবর্মেণ্টের হিন্দু সৈনিকের শেষ দল নহেন। এই প্রকার সদিচ্ছা, এইরূপ আত্মোৎসর্গ, সাহস ও ধৈর্য্য পৃথিবীতে কখনও বৃথা হয় না। ত্যাগের তিলক আবার হিন্দু জাতির গৌরবদীপ্ত ললাট উজ্জ্বল করিবে। মনে পড়ে কি, যে দিন সর্ব্বপ্রথম মেডিকেল কলেজের হিন্দু ছাত্র শবব্যবচ্ছেদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সে দিন কেল্লায় তোপধ্বনি হইয়াছিল ? তাহার পর এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে হিন্দুসমাজের কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ! এখন মেডিকেল কলেজে হিন্দু ছাত্রের স্থান হয় না, অনেকে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও সেখানে প্রবেশ করিয়াও সুবিধা পাইতেছেন না। তাই বলিতেছি, প্রথম আহ্বানমাত্র হাজার হাজার হিন্দুকে যুদ্ধার্থ আত্মনিয়োগ করিতে না দেখিয়া, ক্ষুন্ন বা ব্যথিত হইও না ; ধীরভাবে পর্য্যবেক্ষণ কর, ক্রমে তাহাদের সংখ্যা পুষ্ট হয় কি না ? বেঙ্গল এম্বুলান্স কোরের সেবক-সম্প্রদায়ের ধৈর্য্য, সাহস, ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত চক্ষু মেলিয়া দেখ। তুচ্ছ সংসার সুখ অপেক্ষা মহত্তর সুখের জন্য যাঁহারা আগ্রহবান্, তাঁহারা কোনও দিকে না চাহিয়া এই পথের পথিক হইয়াছেন, ইহা গড্ডালিকা-প্রবাহের কার্য্য নহে। আমরা যাঁহাদিগকে সংসারজ্ঞানহীন, নিষ্কর্ম্মা, লক্ষ্মীছাড়ার দল মনে করিয়া নিজের বুদ্ধিমত্তার আত্মপ্রসাদে স্ফীত হই—তাঁহারাই এই স্বদেশের গৌরবসূচক আত্মোৎসর্গে প্রবর্ত্তক, এরূপ নিষ্কর্ম্মা লক্ষ্মীছাড়ার সংখ্যা এ দেশে বিরল নহে ; আমরা টাকা আনা পাই ও লাভ-লোকশানের হিসাব লইয়া ব্যস্ত থাকিতে পারি, কিন্তু দেশের নাম ইহারাই রাখিতেছেন এবং রাখিবেন। আমাদের জাতীয় জীবনের শূন্যভাণ্ডারে যদি কিছু সঞ্চয় করিবার আশা থাকে, তবে ইহারাই আমাদের সে আশা পূর্ণ করিবেন। সংসারতাপক্লিষ্ট, রৌদ্রপক্ক, জীবনের মায়ায় চিরবিমুগ্ধ, নানা অপমানে সদা জর্জ্জরিত, স্থবির বলিবর্দ্দগুলার দ্বারা এই মহৎ সংকল্পসিদ্ধির আশা নাই। হে অন্ধকারভারতাকাশের নবীন ভাস্করবৃন্দ ! তোমরা আমাদের অভিবাদন গ্রহণ কর।

বাঙ্গালী

৫। পল্লী সমস্যা

(প্রথম প্রস্তাব)

কি দেখিতেছি ? দেখিতেছি জীবনমরণ ও দরিদ্রতার সহিত নিরন্তর কঠোর সংগ্রাম। নিরীহ পল্লীবাসী সে সংগ্রামে ধ্বস্ত, বিধ্বস্ত ক্লান্ত ও পরাজিত—নিরাশ্রয় ও নিরুপায়। নিরাশ্রয় ও নিরুপায় পল্লীবাসীর যে শোচনীয় চিত্র অবলোকন করিতেছি জীবনে তাহা ভুলিতে পারিব না।

কি দেখিতেছি ? দেখিতেছি পল্লীর প্রতি পরিবার রোগে শোকে ক্লিষ্ট, পল্লীর চতুঃপ্রান্ত পীড়িতের হাহাকারে মুখরিত—মুখে জলটুকু দেওয়ার লোক নাই—'কেমন আছ' প্রকৃত সহানুভূতির সহিত জিজ্ঞাসা করিবে এরূপ একজন প্রতিবেশী নিকটে নাই—ডাক্তার কবিরাজ নাই, থাকিলেও দরিদ্র কৃষক তাহাকে অর্থ দিয়া ডাকিবে এরূপ সাধ্য নাই। ক্ষেত্রের স্বর্ণশস্য—হৃদয়ের শোণিত বিনিময়ে যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহা

মহাজনের ঋণ ও জমিদারের খাজনা দিতেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। পরিধানে বস্ত্র নাই, উদরে অন্ন নাই। ইহাই পল্লী জীবনের বাস্তব চিত্র।

কবিত্বের উচ্ছ্বাসে আমরা কতকগুলি অতিরঞ্জিত কথা বলিতেছি না—যাহা দেখিতেছি, তাহাই বলিতেছি। শতবার ভাবিয়াছি কি করিয়া পল্লীভূমির এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকার হইতে পারে, কি করিয়া আমাদিগের সাধের পল্লীজননীর অধরে হাস্যরেখা ফুটাইয়া তুলিতে পারা যাইতে পারে। ভাবিয়াছি—যাহা ভাবিয়াছি তাহাই বলিতেছি দেশের লোক তাহার গুরুত্ব অনুভব করুন।

আমাদিগের বিরুদ্ধে বিলাসিতার অভিযোগ আনিও না, আমরা কে? দুই চারিজন মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ও অর্দ্ধ শিক্ষিত জনসংঘ লইয়া আমাদিগের আমিত্ব গঠিত হয় নাই। ঐ লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর দীন দরিদ্র লইয়া আমাদিগের আমিত্ব—আমাদিগের গৌরব—উহারাই আমাদিগের আশ্রয়। উহাদিগেরই মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের বীজ নিহিত আছে। এই দীন-দরিদ্র নিরাশ্রয় পল্লীবাসীর বিরুদ্ধে আর যাহা ইচ্ছা বলিতে পার কিন্তু বিলাসিতার অভিযোগ আনিও না। বৎসরের মধ্যে একটী মেলা ও একটী উৎসব উপলক্ষে যদি সে একখানি ভাল বস্ত্র একখানি চারি পয়সার আয়না চিরুনী ও দুই পয়সার খেলেনা ক্রয় করিয়া থাকে তবে তাহা অমার্জ্জনীয় অপরাধ নহে, উহাকে বিলাসিতার সংজ্ঞা প্রদান করিয়া দুরপনেয় কলঙ্ক আনিও না। যতদিন ঘোর অজ্ঞতান্ধকার দেশের সর্ব্বত্র বিরাজ করিবে যতদিন শিক্ষিত সমাজ অশিক্ষিতের আদর্শ না হইবেন ততদিন এই দুই চারি পয়সার অপব্যয় রোধ করিতে পারিবে না। তোমরা যেখানে পাঁচ শত টাকা অপব্যয় করিয়া নির্ব্বুদ্ধিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন কর সেখানে দরিদ্র কৃষক পাঁচ পয়সা ব্যয় করিয়া একটু আত্মতৃপ্তি অনুভব করে। অপরাধ কাহার?

আমাদিগের প্রধান ও প্রথম সমস্যা দরিদ্রতা। এই দরিদ্রতার প্রতিকার করিতে না পারিলে আমাদিগের পল্লীভূমি বিজন শ্মশানে পরিণত হইবে—আমাদিগের 'সাধের স্বপন' আকাশ কুসুমে পরিণত হইবে—আর ইহাও নিশ্চয়, রাজসহায়তা ব্যতীত এই দারিদ্র্য সমস্যার কিছুতেই সমাধান হইতে পারে না।

দারিদ্র্যসমস্যার নিরাকরণের প্রধানতঃ এই কয়েকটী উপায় আছে :—

১। দেশের অর্থ সম্পদের বর্দ্ধন।

২। দেশের অর্থ দেশে সংরক্ষণ।

৩। বিদেশ হইতে অর্থ আনয়ন।

এই কয়েকটী প্রত্যক্ষ উপায়। এতদ্ব্যতীত আরও অনেকগুলি অপ্রত্যক্ষ উপায় আছে। প্রথম প্রত্যক্ষ উপায় কয়েকটীর আলোচনা করিব। আমরা দেখাইব রাজসহায়তা ব্যতীত উল্লিখিত কোন উপায়ই কার্য্যকরী হইতে পারে না—দেশের দারিদ্র্য মোচনে সক্ষম হইতে পারে না—দেশের আর্থিক উন্নতি সাধনে রাজসহায়তা অতীব প্রয়োজনীয়। অবশ্য প্রজারও সাহচর্য্য প্রয়োজন—সে সাহচর্য্যের কথা অনেকবার বলিয়াছি, প্রয়োজন হইলে আবারও বলিব। কিন্তু যেখানে রাজার মঙ্গল হস্ত প্রজার কল্যাণসাধনে নিরত হইতে পারে—নিরত হওয়া অত্যাবশ্যক, আমরা এইখানে তাহারই আলোচনা করিব।

দেশের অর্থ সম্পদ বর্দ্ধনের প্রধান উপায় কৃষি ও শিল্পের উৎকর্ষ সাধন—উপযুক্ত অর্থ

সাহায্য ব্যতীত ইহার কোনটীই সম্ভবপর হইতে পারে না। প্রথমতঃ কৃষির কথা—বিবেচনা করা যাউক। ভারতের—বঙ্গদেশের—অগণিত প্রজা সাধারণতঃ এরূপ নিরন্ন যে কৃষির উন্নতি সাধনের জন্য যেরূপ অর্থ সাহায্য প্রয়োজন, তাহা সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। সে অর্থাভাবে ভূমি সংগ্রহ করিতে পারে না, হলবলদ ক্রয় করিতে পারে না—সময়ে বীজ ক্রয় ও বীজ বপন করিতে পারে না, যদি করিতে হয়, তবে হয় মহাজনের নতুবা ভূম্যধিকারীগণের শরণাপন্ন হইতে হয়। যদি দেবতা সুপ্রসন্ন হন, তবে 'সাইলকরূপী' উত্তমর্ণের করালকবল হইতে সে কোনরূপে আত্মরক্ষা করিতে পারে। অন্যথা তাহার যাহা কিছু দরিদ্রের সম্বল তাহাও "দরিয়ায়" ভাসিয়া যায়—ধনীর অর্থকোষের শ্রীবৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি সাধন করে। এ অবস্থায় যদি গবর্ণমেণ্ট কৃষকমণ্ডলীকে প্রভূত পরিমাণে অর্থ সাহায্য করেন—দেশে শত শত কৃষি ব্যাঙ্কের উদ্ভব করা যায় তবেই দরিদ্র কৃষককুল দেশের ও দশের ধন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পল্লীভূমির উন্নতি সাধনে সমর্থ হয়। আমরা যতই চিৎকার করি গবর্ণমেণ্ট নেতৃত্ব গ্রহণ না করিলে দেশের লোক এই সকল ব্যাঙ্কের গঠন ও পরিপোষণ কল্পে কখনই অর্থ প্রদান করিবে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

সুরাজ।

৬। বঙ্গের স্বাস্থ্য ও ম্যালেরিয়া

জ্ঞানোজ্জ্বল প্রাচীন হিন্দু-ঋষিগণ জলদগম্ভীর স্বরে এই মহাবাণী ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যে,—

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

আগে শরীর রক্ষা অর্থাৎ স্বাস্থ্যরক্ষা,—পরে ধর্ম্ম সাধন। কেননা যাহার স্বাস্থ্য নাই, তাহার কিছুই নাই। বস্তুতঃ পৃথিবীতে যতপ্রকার সুখ আছে, স্বাস্থ্যসুখই তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। বাঙ্গালী আজ ম্যালেরিয়ার অত্যাচারে সেই সর্ব্বপ্রধান স্বাস্থ্যসুখে বঞ্চিত হইয়া দিন দিন লক্ষ্মীছাড়া হইয়া পড়িতেছে। শস্যশ্যামলা সোনার বাঙ্গালার সোনার পল্লীসমূহ যে দিন দিন শ্মশান হইয়া পড়িতেছে তাহার প্রধান কারণই যে ম্যালেরিয়া একথা আজ আর কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ম্যালেরিয়ার আক্রমণে মানুষ আর মানুষ থাকে না; মানুষ প্রায় অচেতনে পরিণত হইয়া পড়ে। বাঙ্গালার স্বাস্থ্য দিনই দিনই শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর আকার ধারণ করিতেছে। ম্যালেরিয়া আক্রমণের শোচনীয় করুণ কাহিনী আমরা বহুবার বিবৃত করিয়াছি। জরাজীর্ণ পল্লীবাসীর দুঃখ-দৈন্যের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী তুলিয়া আমরা বারবার অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি। আমরা বলিয়াছি ম্যালেরিয়াকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। যে যে কারণে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হইতেছে, তাহার প্রতিকারকল্পে রাজা প্রজা উভয়কেই সমবেত ভাবে উদ্যোগী হইতে হইবে। নচেৎ দেশের ও দশের কল্যাণ নাই।

বাঙ্গালার নদী নালার দুরবস্থা প্রভৃতির দরুণই যে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি, একথা আমরা বহুদিন হইতেই বলিয়া আসিতেছি। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে বাঙ্গালার স্যানিটারী কমিশনার ডাঃ বেণ্টলিও প্রায় সেই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। সম্প্রতি কলিকাতার সেনেট হলে ডাঃ বেণ্টলি ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি ও প্রতিকার সম্পর্কে অনেকগুলি জ্ঞাতব্য কথার আলোচনা করিয়া

ছেন। ডাঃ বেণ্টলি যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত ও সারমর্ম্ম এইঃ—

বহুদিন যাবৎ এই কথা শুনিয়া আসিতেছি যে, বাঙ্গালা দেশে স্থানে স্থানে বদ্ধ জল আটক থাকে বলিয়াই ম্যালেরিয়া হইয়া থাকে। কিন্তু ৬০।৭০টী ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত স্থানের প্রাকৃতিক অবস্থা সমালোচনা করিয়া বুঝিয়াছি যে, যে সকল অঞ্চলে জলের অভাব অধিক, সেই সকল স্থানেই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ প্রবল। ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে যখন একবার এদেশে ম্যালেরিয়া অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে, তখন জনকয়েক ডাক্তার এই সিদ্ধান্ত করেন যে, রোগবহুল স্থান সমূহে বদ্ধজল আটক হইয়া ঐরূপ পীড়া উৎপাদন করিয়াছে। কিন্তু সেই সময়ে স্থানীয় অধিবাসিগণ একবাক্যে বলিয়াছিলেন যে, জলের অভাবে তাঁহাদের কূপ পুষ্করিণী প্রভৃতি আর পূর্ব্বের ন্যায় জলপূর্ণ হয় নাই এবং ঐ সকল জলাধার অতি অল্পদিনের মধ্যেই শুকাইয়া যায়। বর্দ্ধমান জেলার রিপোর্ট সমূহে এইরূপ অনুযোগই দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এদেশে যে জ্বর-কমিশন বসে, তাহাতেও ইহা উল্লিখিত হয় যে, নদীয়া জেলাতেও জলের মাত্রাহ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে জ্বরের আক্রমণ বাড়িয়াছিল। তাহার পর এরূপ শত শত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, যাহাতে বুঝা যায় যে, এদেশের নদী নালা সমূহের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে জ্বরের প্রভাবও পরিপুষ্ট হইয়াছে। আজও বহু শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বাঙ্গালীর অভিমত এই যে, বাঙ্গালার নদী নালার স্বচ্ছন্দ বারিপ্রবাহ অবরুদ্ধ হওয়াতেই এদেশবাসীকে ভীষণ ম্যালেরিয়া রোগে গ্রাস করিতে বসিয়াছে এবং আজ যদি ঐ সকল নদী খনন করিয়া তাহাদের জল প্রবাহ আবার অব্যাহত রাখা যায়, তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতি আবার রোগ মুক্ত হইয়া উঠিবে।

আমরা এতকাল ম্যালেরিয়ার কারণ সম্পর্কে যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়া আসিতেছি, ডাঃ বেণ্টলির ন্যায় একজন স্বাস্থ্যতত্ত্ববিশারদ সুপণ্ডিত উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর মুখেও আজ সেই সিদ্ধান্তেরই প্রতিধ্বনি শুনিয়া আমরা উহার প্রতিকার বিষয়ে অনেকটা আশান্বিত হইয়াছি। আমাদের ভরসা, আছে,—এবার গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ উভয়েই ম্যালেরিয়ার প্রতিকার কল্পে বিশেষ সচেষ্ট হইবেন। সম্প্রতি ম্যালেরিয়ার প্রতিকার কল্পে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় মাননীয় মিঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও একটী সময়োপযোগী প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সুখের বিষয়, ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রস্তাবটী গ্রহণ করিয়াছেন। সুরেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবিত প্রসঙ্গ আগামী বারে আমাদের বিবৃত করিবার বাসনা রহিল।

২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ।

"আর মানুষ হ'তে হ'লে এই নৈরাশ্যের মধ্যেই আশার স্থান
খুঁজে নিয়ে পূর্ণ উদ্যমে মঙ্গল কর্ম্মের উদ্দেশ্যে চলতে
হবে। আপাতমধুর জিনিষ প্রকৃত মঙ্গলময় নয়।
তাই কষ্টকে আলিঙ্গন ক'রে, দারিদ্র্যকে
মস্তকে ধারণ করে, নৈরাশ্যের ভীতি-
কেই একমাত্র সহায় ক'রে
জীবনের কঠোর কর্ত্তব্যময়
কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ
হ'তে হবে।"

"সাধনা"

সপ্তম খণ্ড সপ্তম বর্ষ	১৩২৩, জ্যৈষ্ঠ	অষ্টম সংখ্যা।

আলোচনা

১। স্নেহের বন্ধন

ভাঙ্গা গড়ার কর্ত্তা, রক্ত মাংসের মানুষ চিরদিনই বন্ধন ও মুক্তির দাস। স্নেহে যখন দৌর্ব্বল্য স্পর্শ করে তখনই উহা বন্ধনের কারণ এবং যখন স্নেহের শত প্রকার মূর্ত্তি উপস্থিত হইয়াও তাহাকে আটকাইয়া রাখিতে পারে না তখনই তাহার মুক্তি হয়। নবীন সাধক যখন তাহার অভিপ্সিত লভ্যকে পাইবার জন্য আকুল হইয়া যায় তাহার নাম শ্রবণে তন্ময়তা আসে তখন তাহাকে প্রকৃত পথ খোঁজ করিয়া লইতে উপায় স্বরূপ কাহাকেও পাইতে বেশী দেরী হয় না। তাহার হৃদয়ে ভাবের গভীরতা অনুসারে তাহার পথের দুরত্বও কম বা বেশী হইয়া থাকে। নবীন সাধক—যাহার হৃদয় প্রকৃতই প্রেমে ভরপুর, যে ভক্তির মালা গাঁথিয়া কর্ম্মের গলে

দিতে চায়, বাসনা যাহার হীন স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়, লক্ষ্য পথের সামান্য স্নেহের বন্ধন তাহাকে কিছুই করিতে পারে না; কারণ মানুষের যাহা ধর্ম্ম, পুরুষের যাহা করণীয়, কোমলতা ও কঠোরতাকে যে সমভাবে টানিয়া লইতে পারিয়াছে—সাধারণ মানুষ তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে আপনার বলিতে যাহারা তাহারা হয়ত আজ তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারে, তাহার পথের কণ্টক হইতে পারে কিন্তু এমন এক সময় আসে যখন উপাস্য নিজেই তাহাকে সর্ব্বত্র পরিচিত করিয়া দেন, বিশ্ব তাহার আপন ঘর বাড়ী হয়, পরিত্যাগকারী আত্মীয় স্বজন তাহাকে মাথায় করিতেও দ্বিধা বোধ করে না, শতজন শতভাবে তাহাকে লাভ করিয়া গৌরবান্বিত হয়। স্নেহেরবন্ধনকে উপলক্ষ করিয়া মানবজীবনের পথে পঙ্গু হইয়া বসিয়া থাকা ভীরুতার লক্ষণ। যাহার ধর্ম্মের বাণী সত্য, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, যাহার প্রতি পদক্ষেপে একটা গৌরবের ভাব প্রকাশিত হয় ইতিহাস তাহার জন্য নূতন স্থান নির্দ্দেশ করে। হয়ত সংসারে অনেকেই সাধনার পথে—পা দিতে দিতেই সরিয়া গিয়াছেন, কেহ হয়ত আশ্রয় পাইয়াও ছুটিয়া পড়িয়াছেন ইহা তাঁহাদের পূর্ব্ব কর্ম্মফল হইলেও তাঁহাদের আজকার চেষ্টার অভাব অন্যতম কারণ।

সত্য যদি স্নেহই মানুষের বন্ধনের কারণ হইত তাহা হইলে মানবেতিহাসে আমরা এমন একটী কারণ পাইতাম না, যাহাকে আদর্শ করিয়া মানুষ নিরাশার সমুদ্রে সান্ত্বনা পাইত। আমরা জগতকে ছাড়িয়া দিলেও আমাদের দেশের ইতিহাসে দেখিতে পাই—বিভিন্ন রাষ্ট্রের উত্থান পতনের সঙ্গে বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, অত্যাচারীর হস্ত হইতে ধর্ম্মকে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য বিভিন্ন পুরুষসিংহের আবির্ভাব হইয়াছে। মানুষ হিসাবে সমাজের অতি ক্ষুদ্রকণা হইলেও সামর্থ্য অনুসারে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু করিবার আছেই। ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে সৃষ্টিকর্ত্তা বিনা উদ্দেশ্যে কাহাকেও সৃষ্টি করেন নাই, প্রকৃতির তৃণ অবধি তাঁহারই কোন না কোন উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে। আর আমরা মানুষ হইয়া, ভগবানের সৃষ্ট পদার্থের প্রতিনিধি হইয়া আজ জগতের দাবী দাওয়া অস্বীকার করিতে বসিয়াছি। মনুষ্যত্বের নামে, ধর্ম্মের নামে, দৌর্ব্বল্য ও অধর্ম্মকে চিনিয়া লইয়াছি। আমাদের বিশ্বাস আছে জয় পরাজয় যাহার ইচ্ছা, উত্থান পতন যাহার অঙ্গুলি সঙ্কেতের অপেক্ষা করে, মানুষ তাঁহার ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিতে পারে না। যেমন করিয়াই হউক, অসম্ভবে সম্ভব সাধিত হইয়া যাইতেছে চিরকাল যাইবেই—আত্মীয় পরিজনলালিত স্নেহের দুলাল সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া যায়, চক্ষের সম্মুখে কর্ত্তব্য দেখিয়া কত যুগের ভীরুতা এক মুহূর্ত্তে লোকে বিসর্জ্জন দেয়—স্নেহ কখনই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। নিজের প্রাণের বস্তু যাহা, নিজের শিরায় শিরায় শোণিতের সঙ্গে সঙ্গে যাহার ধারা প্রবাহিত, যাহা সম্পাদনের নিমিত্তই মানুষের জন্ম তাহা কতক্ষণ লোকে ভুলিয়া থাকিতে পারে? লুকোচুরী ত বেশীক্ষণ চলে না! স্বার্থের সম্বন্ধে স্নেহদুর্ব্বল বলিয়াই লোক চরিত্রে দেবত্ব কচিৎ দেখা যায়। কিন্তু সেই দুর্লভ দেবত্বই ইতিহাসের গৌরব, মানব সমাজের গৌরব, ভগবানের অনন্ত মহিমার প্রকাশ।

* *
*

২। আত্মপ্রতিষ্ঠা

দুঃখেই ব্যক্তির মহত্ত্ব, অভাবেই জাতির জাতীয়তা বোধ জাগে। অভাব হীন কোন ব্যক্তি বা জাতি নাই। সকলেরই কিছু না কিছু অভাব আছেই। আমাদেরও ছিল এবং এখনও আছে। কতগুলি অভাব আগত, কতগুলি সৃষ্ট। বাবুগিরির দ্বারা শেষোক্ত অভাব আমরা তৈয়ারী করিয়াছি এবং মসলিন্, তালিত প্রভৃতি বস্ত্র দ্বারা আমাদের দেশের সেই অভাব দূর হইয়াছে। কিন্তু সূক্ষ্ম বস্ত্রের উৎপাদনে এইমাত্র বুঝা যায় যে, আমরা বয়নশিল্পে উন্নত হইয়াছিলাম। মানুষ স্থূল হইতে ক্রমেই সূক্ষ্মে পৌছিতে চায়, মোটা কথা, মোটা হাবভাব ছাড়িয়া অল্প কথাতে ও ইঙ্গিতে আপনার পরিচয় দিতে চায়। দ্বৈত ও অদ্বৈতে, কর্ম্ম ও বৈরাগ্যে বিপরীত ভাব থাকিলেও যেমন নৈকট্যের পরিচয় দেয়, সন্ন্যাস ও সৌখিনীতেও তেমন একটা সম্বন্ধ আছেই। সংসারে কোন জাতিই একেবারে সন্ন্যাসী বা সৌখীন হয় নাই তবে সাম্প্রদায়িক নিয়ম সম্বন্ধে ভিন্ন কথা। সৌখিনী খারাপ হইতে পারে, তাহাতে জাতির দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি পায়, এবং ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় দেখা যায়, একজন মাথা ঘামাইয়া জীবনকে তুচ্ছ করিয়া এক হাতে অসি অন্য হাতে রুটী লইয়া রাজ্য জয় করিলেন আর পরবর্ত্তী বংশপরম্পরায় সুখ আসিয়া ভোগের আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া এক একটা জাতির অনিষ্ট সাধন করিয়া দিয়াছে।

আজকাল সকলেই আপন আপন বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত আপন আপন দেশে জিনিষের উৎপাদন করিতেছেন। জার্ম্মাণ জাতি জাতীয় উন্নতির জন্য গভীর ভাবে স্বদেশপ্রীতি বৃদ্ধির জন্য অভাবের দিনে বৈদেশিক দ্রব্যের বর্জ্জন করিতেছেন ইংরেজের ত কথাই নাই। কিন্তু ভারতের বাজার হইতে জার্ম্মাণ যাইবে, জাপানী আসিবে, জাপানীকে সরাইয়া আমেরিক আসিবে—এই বৃত্তাকার ভাবই চলিবে কি ?

আমাদের দেশে শিল্পবাণিজ্যের উপায় হইতেছে না কেন এবং উপায় হইলেও তাহা প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেছে না কেন তাহার মোটামুটী কারণ যে না আছে এমন নহে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে শিল্পালয় প্রতিষ্ঠা ও আজকার শিল্পালয় প্রতিষ্ঠায় একটা বড় রকমের তফাৎ আছেই। স্বদেশীর যুগে দাঁড়াইয়া ছিলাম বলিয়াই আজ উন্নতি না হউক কিন্তু উপায় বাহির করিবার নিমিত্ত খুঁজিয়া মরিতেছি। এইটা বলিতেই হইবে আজ যেমন দাগা পাইয়া হা হুতাশ করিতেছি, সে সময় এরূপ একটা অভাবে পড়ি নাই। আজ যেমন প্রত্যেকেই অভাব বুঝিতে পারিতেছি সে সময় এরূপ ধারণা করিবার কোনই প্রয়োজন হয় নাই।

আমাদের শিল্প-বাণিজ্যের উপায় করা প্রয়োজন বোধ করিলেও আজ আবশ্যক হইতেছে না তাহার কারণ ভারতের বাজার হইতে আজ পর্য্যন্তও বিদেশী মাল পাইয়া অভাব পূরণ করিতেছি। প্রতিষ্ঠালাভ না করার কারণ—(১) দেশী জিনিষ বিদেশীর মত না হওয়ায় অশ্রদ্ধা (২) অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে অক্ষম। গভর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক সাহায্য না পাইলে শিক্ষা-শিল্প কিছুই সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। দেশীয় জিনিষ প্রস্তুতকারীরা নিজ নিজ মূলধন লইয়া উদরান্নসংস্থানের উপায় করিতেছে, ইহাকে ব্যবসা বলে না। অধিকতর উন্নতাবস্থায় পৌছিবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তাহা ইহাদের নাই। তারপর ব্যবসা সম্বন্ধে

যে সকল গুণ ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন তাহারও যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে।

যাহা হউক যখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে গভর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য পাইব না, অথচ বৈদেশিক জিনিষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা অসম্ভব তখন কি বাঁচিয়া থাকিবার কোনই উপায় নাই? অভাব যদি বুঝিয়া থাকি, যদি সত্য সত্যই প্রাণ ফুঁড়িয়া দিতেছে বুঝি, তাহা হইলে উপায় কি? এক উপায় সংযম অন্য উপায় অভাবোপযোগী দ্রব্যাদি প্রস্তুত। যদি প্রকৃতই সৌখিনী করিবার ইচ্ছা থাকে, পুরাপুরি অভিমান থাকে তাহা হইলে ভারতীয় পণ্যে ভারতের বাজার পূর্ণ হইতে বেশী দিন লাগিবে না। স্বদেশীর দিনের প্রতিজ্ঞাটী আজ আবার করিতে পারি না কি? আপনার হৃদয়ের কাছে তাহার একটা অভিযোগ খাড়া করিতে পারি না কি? এক একটা আশার বাণী শুনিয়া, প্রতি বারেই তাহার প্রতিধ্বনি শুনিয়াই কি সব শেষ করিতে হইবে? বিদ্যা, বুদ্ধি যদি আজও অভাবের দিনে কোন কাজে না আসিল তাহা হইলে আর কি ফল হইল? ভারতের অট্টালিকাগুলি যে অল্পদিনের মধ্যেই নিঃস্ব হইয়া পড়িবে তাহা বুঝিতে আর কাহারও দেরী হইবে না। ধনী দরিদ্র, একই শ্রেণীতে গণ্য হইবে, তবুও মুখের রুচির একটু পার্থক্য থাকিবে মাত্র। বিদ্বান ও বিদ্যাহীনের মধ্যে কি পার্থক্য থাকিবে তাহা অর্দ্ধশিক্ষিত নরনারীর মধ্যেই শুধু বোঝা যাইবে। দুর্ব্বলের বল ভগবান ইহা মিথ্যা কথা। অলসকে তিনি সাহায্য করেন না। দুর্ব্বলকে কর্ম্মক্ষম করিবার নিমিত্তই এই বাণী প্রচারিত। বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, সাহস, শক্তি প্রভৃতি পুরুষের গুণনিচয় লাভ করিয়াও যদি তাহাতে বিশ্বাস না থাকে, তাহার ব্যবহার না হয়, তাহা হইলে মানুষে, মানুষের নিকটপ্রতিবেশী হইয়াও সাহায্য করে না, আর নিরপেক্ষ, সর্ব্বশক্তিমান পৌরষের পূর্ণমূর্ত্তি যিনি তিনি পরমুখাপেক্ষী, পরগলগ্রাহী, পরানুকরণকারী মানুষকে আশ্রয় দিবেন ইহাপেক্ষা বাতুলতা নির্ব্বুদ্ধিতা আর কি আছে? পুরুষের কাছে মনুষ্যত্বের বিচার হয়। অতএব পর পর বিভিন্ন দুঃখের আবর্ত্তে পড়িয়া যেন পরীক্ষা দিতেছি বলিয়া ভক্তির ভান না করিয়া সাধকের ভক্তিমন্ত্রকে কলুষিত না করি, যেন তখনই ভুলিয়া যাই—

> "বারে বারে যত দুঃখ দিয়েছ
> দিতেছ তারা।
> সে সকলি দয়া তব জেনেছি মা
> দুঃখ হরা।"

* *
*

৩। কর্ম্মীর অভিমান

দেশ যেমন কর্ম্মীর উপর তাহার সমস্ত বোঝা চাপাইয়া দেয়, কর্ম্মীরও তেমন একটা দায়িত্ব আছে। দেশ কর্ম্মীর কার্য্যে গৌরবান্বিত হয়, কর্ম্মীও পুরুষানুক্রমে অর্জ্জিত দেশের ইতিহাস স্মরণ করিয়া অভিমানে আত্মহারা হয়। অভিমানহীন কোন জাতিই নাই। অভিমানেই পুরুষের পৌরষ বৃদ্ধি হয়, অভিমানেই জয় আবার অভিমানেই পতন হয়—অবশ্য যখন অহঙ্কারে দাঁড়ায়। ইংলণ্ডের অভিমান রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে, জার্ম্মানীর অভিমান জ্ঞানে শিল্পে, ফরাসীর অভিমান আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতায়, আমেরিকার অভিমান ব্যবসায়, জাপানের অভিমান স্বদেশ প্রীতিতে, তুরস্কের অভিমান স্বজাতিপ্রিয়তায়। দেশ এবং জাতিভেদে সকলেরই একভাবে না একভাবে অভিমান আছেই। যখন কোন

ব্যক্তিকে অভিমান হীন বলিয়া বোধ হয় তখনই বুঝা যায় তাহার জাতির কোন স্থান কীটস্পৃষ্ট হইয়াছে। অভিমানহীন হইয়া কেহ সংসারে থাকিতে পারে না। বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধের মূল সূত্র ছাড়িয়া দিলেও আমাদের শাস্ত্র গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাই—ত্রেতাযুগের অনুপম কীর্ত্তি স্বর্ণপুরি লঙ্কা অভিমানেই বিসর্জ্জন গেল। ভারতের অতীত যুগের কীর্ত্তি দ্বাপরের হস্তিনাপুর অভিমানে ধ্বংস হইল। অভিমান ভিন্ন পুরুষ কখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন না। ধ্বংস এবং প্রতিষ্ঠা তাহার নিকট সমভাবে বাস করে। যে হিন্দু রামায়ণ মহাভারত পড়েন তাঁহাকে কি আর বেশী করিয়া বলিতে হইবে? ভক্তিমান ভারতবাসী দেখিতেছেন রাবণ দুর্য্যোধন পাপী হইলেও রামের হাতে কৃষ্ণের বিরুদ্ধেই মরিতে প্রস্তুত। তাঁহারা পুরুষ তাই পৃথিবীতে রাজত্ব করিয়া মৃত্যুর পর অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিলেন। ভক্তিমান ভারতবাসীর পুণ্য গ্রন্থ অভিমানের ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। অভিমান ভিন্ন ধর্ম্মলাভ, রাজত্বলাভ, কোন কিছুই লাভ হয় না। অভিমানকে উদ্ধত হইতে দেওয়া পুরুষের সংযমহীনতার কারণ, তাই ভাবিতে হয়, গলদশ্রু হইয়া বলিতে হয় আমায় শক্তিদাও।

কর্ম্মীকে সর্ব্বদাই অভিমানের উপর ভর করিয়া চলিতে হয়। তাহাকে সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে—আমার সমাজ আমার ধর্ম্ম আমার শিক্ষা আমারই জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তাহাকে প্রতি পদক্ষেপে দেখাইতে হইবে, আমি সমাজের, সমাজ আমার। নিজের ধর্ম্ম, নিজের সমাজ শত মন্দ হইলেও যাহা হইতে তাহার জন্ম সে কি নিন্দনীয় হইতে পারে?

কর্ম্মীর যদি সে অভিমান না থাকে, আপনার ধর্ম্ম ও সমাজকে বড় বলিয়া ভাবিতে দ্বিধা বোধ হয়, বড় ভাবিতে কোন প্রকার যুক্তির সাহায্য লইতে হয় তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে তাহার কর্ম্ম প্রবর্ত্তন একটা খোলা জায়গায় বালুর ঢিপির উপর প্রতিষ্ঠিত। মাতৃস্নেহে কোন যুক্তির প্রয়োজন হয় না। দেশপ্রীতি, ধর্ম্মভক্তিও সেইরূপ কোনরূপ যুক্তির অপেক্ষা করে না।

কর্ম্মীকে দাঁড়াইতে হইলে কোমলতা-কঠোরতা, স্বজাতি-প্রীতি, অভিমান ও আত্ম মর্য্যাদা চাই। এই সবগুলি পাশাপাশি গড়িয়া উঠিলে তবে তাহার অভিমান জাগিয়া উঠে। আপনাকে অভিমানের ভিতর দিয়া সর্ব্বজীবে সর্ব্বদেহে যখন মিশাইতে পারা যায় তখনই কর্ম্মী বলিতে পারেন—"আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, মূর্খ ভারতবাসী দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। * * * সদর্পে বল ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেব-দেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশু শয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ।" * * *

* *

৪। দেশের অভাব ও ধনবিজ্ঞান

দেশের ধনাগমের জন্য আজ পর্য্যন্ত অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই নিজ নিজ চিন্তার ফল সাধারণের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। তাহার ফলে আমরা কি পাইয়াছি?—আমরা পাইয়াছি আমাদের নব্য ইতিহাসের জন্য এক একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি, তাঁহাদের চিন্তা

প্রণালীর ধারাবাহিক ইতিহাস, বৈদেশিক ধনবিজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা স্বদেশে ধন বৃদ্ধি প্রচেষ্টা।

কিন্তু কৈ? আজ পর্য্যন্ত ত ধনাগমের কোন উপায় দেখিতে পাইতেছি না। মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, সুদীর্ঘ কালের সুপ্তির পর জাগরণে সাড়া দেওয়ার মত কেহ বা মত খণ্ডন করিতে প্রস্তুত হইতেছেন। এই কি আমাদের উন্নতির পরিচায়ক? আমরা শৈশবের সরলতা ধূলা খেলা ছাড়িয়া, যৌবনের প্রথমোন্মেষে বিশাল চিন্তা, গুরুভার কর্ম্ম গ্রহণ করিতে যাইয়া যদি পণ্ডিতগণের অসার যুক্তি তর্কের অবতারণা দেখিতে পাই তাহা হইলে দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক নয় কি?

আজ পর্য্যন্তও বৈষয়িক জীবনে ব্যক্তিগণের চিন্তার দ্বারা কোন উপকার পাই নাই তাহার প্রকৃত কারণ—শুধু প্রাণহীন চিন্তার ফল। আমাদের জাতির বুদ্ধিমত্তা প্রমাণ করিতে যাইয়া যদি প্রাণের স্পন্দনকে থামাইয়া রাখিতে চাই তাহা হইলে সেই সমীচীন চিন্তা কতক্ষণ টিঁকিয়া থাকিতে পারে? যতক্ষণ না মস্তিষ্ক আপনার ক্ষমতাকে প্রাণের আবেগের চরণে নোয়াইতে পারে ততক্ষণ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব শুধু অসার বাগ্মীতার পরিচয় দেয় মাত্র। তাই বলিতেছি যদি আজ চিন্তার ফল দেখাইতে চাও তাহা হইলে তোমার প্রাণকে সঙ্গে লও, দীর্ঘকাল দেশের কথা ভাবিতে ভাবিতে অশ্রু বিসর্জ্জন কর, পথ পাইবে। তোমার চিন্তাপ্রণালী সভ্য জগতে নূতন ফল দিবে। নতুবা—যেমন আছ তেমনই থাক।

আমাদের সবই ছিল, সব আছে আবার সবই ষড়ৈশ্বর্য্য হইয়া ফিরিবে এটা সত্য। তুমি যতটুকু সাধনা দ্বারা নূতন ভারতকে উন্নীত করিতে চেষ্টা করিয়াছ ততটুকুই পাইয়াছ। যেখানে প্রাণের টান প্রকৃতভাবে তোমাদিগকে টানিতেছে সেখানেই বহু বন্ধন দীর্ণ জীর্ণ হইয়া যাইতেছে। তোমাদের সাধনাই একদিন সিদ্ধির পথে আসিবে। স্বদেশের ধনাগমের নূতন প্রবেশ দ্বার তোমাদের দ্বারাই নির্ম্মিত হইবে। কিন্তু, যখন দেশ তোমাদের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইতেছে, নিজেদের অদৃষ্টের দোষ দিতেছে তখন তুমি (তোমরা) এবং তাহারা এই দুই জনে কি তফাৎ? তুমি শিক্ষিত সমাজকে বাণী শুনাইয়াছ এই খানেই তোমার দাবী শেষ। মস্তিষ্কের দ্বারা চিন্তা করিয়া পরের দুঃখভাগী হওয়া যায় না। প্রাণে প্রাণ মিশাইতে না পারিলে অনুভূতি আসে না, হৃদয় গলিয়া অশ্রু বাহির হয় না। সমাজ এখন আর প্রাণহীন বাণী শুনিতে রাজী নহে। যেখানে প্রাণের টান পড়ে মানুষ ন্যায়ান্যায় বিচার শূন্য হইয়া সেইদিকেই ছুটে।

যদি ধনবিজ্ঞানের চিন্তা শুধু মৌখিক ক্রিয়া কলাপেই আপনার পরিচয় দিতে চাহে তাহা হইলে আপাততঃ এইখানেই ধনবিজ্ঞানের চিন্তার পরিসমাপ্তি হওয়া ভাল। সকল দিকেই কেবল নূতন নূতন চিন্তাপ্রণালীর কথা শুনিতে পাই। এক শ্রেণীর, যাঁহারা লেখক তাঁহারা মনে করেন আমরা শুধু বাণী প্রচার করিয়াই যাইব। পরবর্ত্তী যুগে বা বিভিন্ন এক সম্প্রদায় আমাদের মতে কাজ করিবে। তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক জগতে এতদিন অনেক চিন্তাপ্রণালী গুদামজাত হইয়া থাকিত। ধনাগমের জন্যই যত মারামারি চলিতেছে। আগে দেশের লোককে বাঁচিবার উপায় করিয়া দেওয়া

হউক তবেই শিক্ষিত ব্যক্তিগণের বিশেষতঃ বৈষয়িক ভাবুকগণের যথেষ্ট করা হইবে। তাঁহারা এখন বিভিন্ন চিন্তার প্রচার ও মত-বাদের খণ্ডন দ্বারা আপন আপন ক্ষমতা দেখাইয়া আরও দীর্ঘকাল বসিয়া উপায় চিন্তা করুন। পরে কাজে আসিবে। আজ যখন দেশের লোক খাইতে পাইতেছে না, তখন আর ধন বৃদ্ধির জন্য মাথা ঘামাইয়া প্রয়োজন কি? অনর্থক চিন্তার আজ দরকার নাই। যদি সময়োপযোগী কিছু দেওয়ার থাকে সমাজ তাহাই চায়। আমরা তাঁহাদিগের নিকট শান্তির জন্য সেই পথ চাহিতেছি।

* *
*

৫। দেশাত্মবোধ

বাঙ্গালী ভারতবাসী এখন বড় হইয়াছেন, আপনাকে আপনি সামলাইয়া লইবার মত শক্তি সঞ্চয় করিয়াছেন, তাই আমরা বলিতে চাই যাঁহারা আজও তাঁহাদের কর্ম্মপ্রণালী সেবা শুশ্রূষা, ও সহায়তাকে, বাতুলতা বলিয়া উড়াইয়া দিবেন তাঁহাদিগকে আমরা বলিতেছি তাঁহারা যুক্তকরে উর্দ্ধনেত্র হইয়া আপন আপন আরাধ্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করুন—আমার হৃদয় হইতে দুর্ব্বলতা দূর কর, পরকে বড় করিয়া ভাবিবার শক্তি দাও আপনার জনের মাহাত্ম্য প্রচার করিতে স্নেহ দাও, ভালবাসিবার মত হৃদয় দাও, যে হৃদয়ে সেবক মাত্রেরই প্রতিচ্ছবি দৃষ্ট হয় এমন হৃদয় আমাকে দাও, আমাকে মানুষ করিয়া তোল।

যুবকের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রৌঢ়ের উন্নত-চিন্তা ও কর্ম্মশক্তি এবং বৃদ্ধের আশীর্ব্বাদ এই ত্রিশক্তি ব্যতীত সমাজঅঙ্গ পুষ্টি লাভ করিতে পারে না। যাঁহারা সেবা ধর্ম্মের অনুরক্ত তাঁহারা সেবকদিগকে উৎসাহ দিন, তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্রের বিস্তৃতি লাভে সহায়তা করুন ইহাই তাঁহাদের দৈনন্দিন অন্যতম কার্য্য হউক।

আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, ভারতবাসী কত বিপদকে তুচ্ছ করিয়াছেন—দক্ষিণ আফ্রিকার উপনিবেশ স্থাপনে তাঁহাদের হৃদয়ে সত্য ভারতীয় উপলব্ধি হয়। তাঁহারা যে ধর্ম্ম-প্রাণ, সত্যান্বেষী তাহা দেখাইয়াছেন। দামোদরের বন্যায় নিজেকে ভাসাইয়া, দেশের দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগের সঙ্গে অন্নকষ্ট ভোগ করিয়া দেখাইয়াছেন, স্বদেশকে স্বজাতিকে কেমন করিয়া ভাল বাসিতে হয়, কেমন করিয়া আপনার ভাইয়ের জন্য আপনার মায়ের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে হয়। যাঁহাদের তিন পুরুষের মধ্যে কেহ রণ হুঙ্কারের শেষ ধ্বনি পর্য্যন্ত শ্রবণ করেন নাই, যুদ্ধের নামে যাঁহা-দের প্রাণ শিহরিয়া উঠিত তাঁহাদেরই বংশের সন্তানগণ যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকের সেবায় জীবন দান করিয়া দেশবাসীকে ভালবাসার চূড়ান্ত দেখাইতেছেন। নিজের ভবিষ্যৎ উন্নতিকে এক মহাকর্ষণের পিছনে ফেলিয়া দিয়াছেন—ভবিষ্যতের বিপুল নির্ম্মল আনন্দলাভের জন্য। তাঁহাদেরই বংশের সন্তানগণ আজ পূর্ব্বস্মৃতি স্মরণ করিয়া সমর যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহারা

"হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গম্"
"জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্"

এই বাণীরই উপাসক। আজ তাহাদের প্রাণের অনুপ্রেরণায় বুঝিতে হইবে তাহারা দীর্ঘকালের রুদ্ধভাব, গলিতপ্রীতি জড়তা, দীনতা ও তন্দ্রাকে ঠেলিয়া দিতে পারিতে-ছেন—আপনারা সংযত, ভাবপ্রবণ, ভক্তি-

মান, সত্যপিপাসু হইতে পরিয়াছেন। ক্ষুদ্র স্বার্থের সেবা করিয়া লোক কোনদিন পুরুষের মত মৃত্যুকে আহ্বান করিতে সাহস করে না। গলিয়া পচিয়া শোকে-তাপে-দগ্ধ হইয়া মরিতেই তাহার চিত্তের পরমা তৃপ্তি। যাহার হৃদয়ে গলদ নাই সে মৃত্যুকে ভয় করিবে কেন? সংসারের বাসনা কামনা বিষয় ভাবনাই মনুষ্যত্ব প্রকাশের বিঘ্ন।

কোন দিন ভাবিতে পারি নাই ভারতবর্ষের অঞ্চলে অঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। হিন্দুর হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, মুসলমানের মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য চেষ্টা ইহা স্বাতন্ত্র্যবোধ জন্মাইলেও উন্নতির এক প্রকৃষ্ট উপায়, সম্মুখে একটা বিপদের ভান থাকিলেও চরমে যাইয়া আর কোন ভেদই নাই। যাহা হউক মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত ভারতের আদরের সামগ্রী, প্রাণের জিনিষ হইবে। ভারতবাসী আজ বিদ্যাদানের সুবন্দোবস্ত আপনার বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন দ্বারা নিষ্পন্ন করিবেন। ইংরেজ আমলের ভারতবর্ষে পাঁচটীর উপর আবার নূতন এক একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে ইহা ইংরেজের ইংরেজী শিক্ষাদানের ফল। প্রাণের ভিতর শক্তির ক্রীড়া আরম্ভ হইলে সমস্ত ভারত বিশ্ববিদ্যালয়েপূর্ণ হইবে এবং তখন জার্ম্মানীর অনুপাতে বড় হইতে তাহার বেশী দিনের দরকার হইবে না।

আজ আমরা নয়নোন্মীলন করিয়া দেখিতেছি আমরা শত শত দিকে প্রাণ পাইয়াছি আর আমরা দীন হইয়া থাকিব না। আমাদের কবি প্রাণফাটা দুঃখে বলিয়াছেন—

"রোম গ্রীস ডুবি উঠিল আবার,
অভাগী ভারত রহিল পড়িয়া।"

অশান্ত অতৃপ্ত, উন্মত্ত কবির আত্মা আমাদের ভালবাসা, আমাদের সেবাধর্ম্ম, আমাদের হৃদয়ের অকৃত্রিম ভক্তি দেখিয়া শান্তিলাভ করুন। ভারতীয় যুবক সেবক ও সেনানীগণের . ত্যাগ ও জাতিনির্ব্বিশেষে প্রীতির কথা প্রাণদানের কথা মারাথন, থার্ম্মোপাইলিতে ধ্বনিত হইয়া রোমের সিনেট সভায় প্রতিহত হউক।

* *

৬। বাঙ্গালার সাহিত্য সংসার

কলিকাতার বাহিরে মাসিক পত্র বা পত্রিকা ত এক রকম নাই বলিলেই হয়। সাহিত্য সম্মিলনীতে কলিকাতার বাহির হইতেও যে পণ্ডিতব্যক্তিগণ না আসিয়া থাকেন এমন নহে, কিন্তু তবুও তাঁহারা একমাত্র কলিকাতার মাসিকের দিকেই চাহিয়া থাকেন। শিশুপত্রিকাগুলির বড় জোর দুই একখানি মফঃস্বল হইতে বাহির হয়। মফঃস্বলের পাঠকগণের একটা অভ্যাস আছে তাঁহারা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত না হইলে মাসিক বা সাপ্তাহিককে মোটেই আসন দিতে চাহেন না। কলিকাতার মাসিক বা সাপ্তাহিকেই শুধু প্রবন্ধাদি দিবার নিমিত্ত তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া পড়েন। এটা একটা রোগ বলিলেও হয়।

যাহা হউক কলিকাতার বাহিরে বাঙ্গলা দেশের হিসাবে সাপ্তাহিক কাগজের সংখ্যা কম হইলেও, প্রায় প্রতি জেলা এবং কোন কোন মহকুমা হইতেও সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়। কোন কোন সহর হইতে ২।৩ খানিও বাহির হয় কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাতে সংবাদ পাই না। আমরা বুঝিতে পারি না, ঐ সকল সাপ্তাহিকের দ্বারা আমরা কি উপকার পাইতেছি। বাঙ্গালার সাপ্তাহিকের মধ্যে

৩১৪ খানিকে মাত্র সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সাহিত্য ও সমাজের উপযোগী আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে কি পাইতেছি—তাহা আজই বিচার করার সময়। আজকাল গমনাগমনের সুবিধা সৃষ্ট হইয়া থাকিলেও সকল সময়ে এবং সকল লোকেই সকল স্থানের খবর রাখে না। স্থানীয় অভাবঅভিযোগ আলোচনা করার পর তাঁহারা ব্যাপকভাবে বৃহত্তর দেশের বিষয় এবং আমাদের সমাজ জীবনের গতির সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়া দেখাইয়া দিবেন। মফঃস্বলের অভাবঅভিযোগ আলোচনা আজ সাধারণের নিকট নূতন না হইলেও তাঁহাদের যাহা বলিবার আছে, ভাবিবার আছে তাহা দেশের লোক জানিতে পারে না কেন? আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি বাঙ্গালীকে বড় করিতে হইলে, বাঙ্গালী জাতিকে বড় দেখিতে চাহিলে গভীর চিন্তা করিতে হইবে, অসাধ্য সাধন করিতে হইবে। ক্ষুদ্রচিন্তা ছাড়িয়া বৃহৎ ভাবরাজ্যে পৌঁছিতে হইবে। আজ আমরা বাঙ্গালা ভাষাকে বাঙ্গালী জাতিকে শ্রেষ্ঠ দেখিতে চাহিতেছি সত্য কিন্তু দুঃখের বিষয় পত্রিকার সম্পাদকগণ আজ যেন নীরব নিস্পন্দ। ইহাই কি তাঁহাদের উচিত? তাঁহারা যে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের শতমুখ, শতভাবের ফোয়ারা, সমাজরক্ষায় আলোক হস্তে অপরিচিত হিতৈষী।

সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণ একটা ব্যবসা করিতেছেন বটে, আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ভাল হউক মন্দ হউক কালির অক্ষর সাধারণের কাছে উপস্থিত করিতেছেন কিন্তু আমরা উহাকে শিক্ষিত সমাজের বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কি বলিব। তাঁহারা আমাদের সামাজিক উন্নতির দিনে নূতন কিছু কেন দিতেছেন না ইহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

সমগ্র বাঙ্গলা দেশ হইতে ২১৪ খানি কাগজ বাহির হইলে একটা নিন্দার কথা ছিল বটে কিন্তু সমাজ তাহার দ্বারা উপকৃত হইত। সংবাদ পত্রের যাহা কাজ তাহা হইতেছে কি? নিলামী ইস্তাহারের দ্বারা তথা কথিত শিক্ষিত সমাজ কিছু পাইতেছেন কি?

আমরা মফঃস্বলের সংবাদ পত্রে যুদ্ধের খবর চাইনা, আমরা চাই মফঃস্বলকে, আমরা আরও চাই, প্রতি জিলার সুখ দুঃখের কাহিনী পরস্পরকে জড়াইয়া ধরুক।

প্রকৃত কথা বলা যাইতে পারে সংবাদ পত্র চালাইতে যে যে উপায়ের প্রয়োজন তাহা আমাদের বিভিন্ন অভাবের দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে না। (১ম) অভাব—অর্থ, বিভিন্ন স্থানের সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য লোক নিয়োগ করা যায় না; বিস্তারিত ভাবে বর্ণনার জন্য কোন কোন কাগজের কলেবরও যথেষ্ট নহে কেবল মাত্র যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই তাঁহারা ব্যয় করেন। (২য়) অভাব—চেষ্টা, দশের সামনে ধরিবার জন্য, আপনার যাহা বক্তব্য তাহা প্রচারের জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করা ইত্যাদি হইয়া উঠে না। এবং নিজেরাও পরিশ্রম করিয়া আমাদিগকে নূতন কিছু ভাব ভাষা দিতে আর ইচ্ছা করেন না।

পাশ্চাত্য জগতের সংবাদ পত্র সমূহ সংখ্যায় কম নহে। এক আমেরিকা হইতে নানা রকমের কাগজ, ভারতের কাগজ অপেক্ষা ২৫ গুণের কম হইবে না। তারপর জার্ম্মাণী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশ ত আছেই। তাঁহারা কি লেখেন, কি চিন্তা করেন, কি

করিয়াই বা কাগজের পৃষ্ঠা পূর্ণ করেন আমাদের ভাবিবার বিষয়—দেখার বিষয়।

সুতরাং আজ বলিতে ইচ্ছা হয় বাঙ্গালার সাহিত্যসংসারে দৈন্য উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের শিক্ষিত এক সম্প্রদায় ভাবভাষা লইয়া উঠিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন আর একদল নীরব। ইহা কি হইতে পারে? দেবতার আরতিরকালে কাহাকে কি করিতে হইবে, পূজারী কিছু বলিয়া দেন কি? আমাদিগকেই নূতন চিন্তা করিতে হইবে, গড়িতে হইবে ভাঙ্গিতে হইবে তবেই না আমরা আমাদের আত্মার প্রসারতা বুঝিতে পারিব। যদি না থাকে তাহা হইলে তাহাই চাই। পরস্পরকে হাত ধরিয়া আনন্দময়ীর কাছে পৌঁছিতে হইবে। সুতরাং বাঙ্গালার সাহিত্যসংসারের দৈন্য ঘুচাইয়া চিরানন্দ আনিতে হইবে।

৭। দেশ কি চায়?

দেশ কি চায় তাহা আজ আর নূতন করিয়া আমাদিগকে বলিবার বা ভাবিবার কিছুই নাই। দেশ যাহা চায়—তাহা পৌরুষের উপর নির্ভর করে; নিষ্কলঙ্ক, ভাবপ্রবণ, সাহসী, আত্মজয়ী পুরুষই দেশ চায়। জীবনসংগ্রামে জয় পরাজয়ের মুহূর্ত্তে, মানবত্ব প্রতিষ্ঠার কালে, আপনার জনকে আপনার ধনকে আপনার বুকের রক্ত অপেক্ষাও আপন বলিয়া চিনিবার যুগে দেশ এইরূপ পুরুষ চায়। যাহার মুখের দিকে চাহিলে শত শত দারিদ্র্যপ্রপীড়িত নরনারীর উদর অমৃতের দ্বারা পূর্ণ হইয়া উঠে, সংসার জর্জ্জরিত, শোক-দুঃখ-কাতর পোড়াপ্রাণ পিতা মাতার প্রাণ, মন, শরীর, আপনা হইতেই শান্ত হয়, যাহার আহ্বানে লক্ষ লক্ষ দুর্ব্বল ও সবল, ভীরু ও সাহসী, ধনী ও দরিদ্র, যুবক ও বৃদ্ধ আপনার ক্ষমতা অক্ষমতার বিচার না করিয়া আসিয়া দাঁড়ায় দেশ মাত্রেই এই রকম পুরুষের জন্য প্রার্থনা করে, দুর্ব্বল ও অধঃপতিত সমাজ চিরদিন এইরূপপুরুষের পৌরুষের জন্যই লালায়িত, ব্যগ্র। যাহার হাব ভাবে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা, হৃদয়ের ভাবের পরিপূর্ণ সমাবেশ, পরকে আপন করিবার মোহন মন্ত্র, আপনাকে মুহূর্ত্তে উৎসর্গ করিয়া সমাজে পরিবর্ত্তনের নূতন যন্ত্র প্রদর্শন করিতে পারে দেশ চায় তাহাকেই।

দেশ চায়, অজ্ঞতা মূঢ়তা দূর করিয়া শিক্ষা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা, ব্যাধি দৈন্য বিদূরিত করিয়া স্বাস্থ্যলাভ করা। যে যাহা চায় তাই কি হয়? সকল অভাব সকল প্রার্থনার মূলসূত্র ধরিলে দেখা যায়, চারিদিক শূন্য, মস্তক ঘূর্ণিত প্রায় হইয়া উঠে। "আমি আজ আমাকে শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছি না। বংশের গৌরব, বার্দ্ধক্যের সহায় সন্তানদিগকে শৈশবেই জীর্ণ দীর্ণ করিয়া আমরাই বার্দ্ধক্যে পৌঁছাইয়া দিতেছি, সে কাহার জন্য? আমাদের ভবিষ্যৎ কোন সুখের নিমিত্ত? যাহারা আজীবন বিদ্যাচর্চ্চাকেই একমাত্র বরণ করিয়া লইয়া ছিলেন, ধনীর গর্ব্বিত মস্তকও যাহাদের চরণ তলে বিদ্যাচর্চ্চার জন্য লুটাইয়া পড়িয়াছে সেই আমরা আজ তাহাদেরই দেশবাসী মূঢ় বর্ব্বরের মত শিক্ষা পাইবার জন্য লালায়িত। আমার দেশের উপযোগী, আমার জলবায়ুতে পুষ্ট আমার ধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা কোথায়—কেন নাই কেন পাই না তাহা এই দীর্ঘকাল চিন্তা প্রয়োগের পর আজ কি বলিয়া আবার ভাবিতে চাই?

দৈন্যই যদি শিক্ষালাভের প্রতিকূলে হয় তাহা হইলে আজ আমাদের নিশ্চিতই ভাবা উচিত দেশ কি চায়। কি প্রকারে দৈন্য দুর্দ্দশা দূর করিয়া লইতে পারি তাহাই দেখা প্রয়োজন। "উপরে যাহার স্বর্ণ ফলে, মাটীর নীচে হীরার খনি" আমরা সেই দেশের হইয়াও আজ নিজেকে ঠিক রাখিতে পারিতেছি না। আজ হাহাকারে এদেশের সান্ত্বনা, দীনতাপ্রতিমাই এদেশের ঐতিহাসিক চিত্র। খাদ্যের অভাবে, পেটের তাড়নায়, লোক আপন পর বুঝিতে শিখিয়াছে, শূন্য ঘরেও কুলুপ দিতে শিখিয়াছে, চরিত্রগত নির্ম্মলতাকে পর্য্যন্ত কালিমা মণ্ডিত করিয়া লইতেছে, ইহাই আমাদের ভাবনার বিষয়। ম্যালেরিয়ায় প্রাণত্যাগ আহারের অভাবে, ক্ষয়রোগে মৃত্যু আহারের অভাবে, ইহা কি দেশ জানে না?

দেশের লোক কোন্ দিন পেট ভরিয়া ভাত খাইবে, আপন মুখের গ্রাস পরকে দিয়া শান্তি পাইবে, বাড়ীতে বাড়ীতে গোয়ালে দুগ্ধবতী গাভী সকল বিরাজ করিবে, দুধ, ঘি খাইয়া আপনাদের চিত্তকে শান্ত করিবে, অতিথি অভ্যাগতকে অভ্যর্থনা করিয়া দুধ দিয়া তাহার মুখ ধোয়াইবে তাহা একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্রীই জানেন। বাঙ্গালার বাজার ধান চা'লে ভরিয়া উঠিবে, দেশবাসী অকুণ্ঠিত চিত্তে দরিদ্র নারায়ণের সেবা করিয়া পুণ্যবান হইবে তাহা অত্যাচারী ও জর্জ্জরিত মানবের ধারণার অতীত—জানেন শুধু সৃষ্টিকর্ত্রীই।

**
*

৮। হিন্দুর একত্ববোধ

ভারতবাসী হিন্দু, আজ তোমার হীন অন্তঃ শক্তির মধ্যে স্পন্দিত প্রাণের সাড়া পাইতেছি, তোমাকে যেন আমি নবীন ভাবে মুগ্ধ দেখিতেছি। একটু স্থির হও, নিজের দিকে দৃষ্টিপাত কর, তুমিও দেখিতে পাইবে—তুমি নবীন মূর্ত্তিতে শোভা পাইতেছ, তুমিও অনুভব করিবে তোমার প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে। তুমি ভাব, তোমার এ শক্তিহীনতার কারণ কি? তুমি মানুষের মত হইয়া জন্মিয়াছ, সাহস, বীর্য্য, পূর্ব্বস্মৃতি প্রভৃতি মানুষের গুণনিচয় তোমার চারিপাশে ঘিরিয়া রহিয়াছে, তবুও তুমি আজ এমন কেন? তোমার জাতি বিভাগই কি তোমার হীন শক্তির কারণ? তাই বা কেন হইবে? তোমার জাতির বিভিন্ন বর্ণ থাকুক, তোমার আমার ধর্ম্ম এক, এক দেবমন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া বলিতে পার, তুমি হিন্দু আমি হিন্দু, তোমার আমার এক তীর্থ, তোমার আমার জন্য একই বিধি রহিয়াছে, তোমার আমার উপাস্য এক। একই পবিত্র শ্মশানভূমিতে আমাদের পরিণতি, তুমি আমি একই ভূমির শস্যে একই পুকুরের জলে সমভাগে ভাগী। তুমি গুরু আমি সেবক, তুমি প্রজা আমি ভূস্বামী তোমাতে আমাতে অভেদ কোথায়? যখন যখন, ধর্ম্মের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের উপর অত্যাচারের সময় শক্তিমান পুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তখন তোমাতে আমাতে কোন প্রভেদ ছিল না। তুমি ইতিহাস, পুরাণ পাঠ কর, দেখিবে শক্তিমান আদর্শ পুরুষের আবির্ভাবে উচ্চ নীচ, ধনী নির্ধন, ভক্ত অভক্ত এক হইয়া গিয়াছে। ভারতবাসী, তুমি কি জান না তোমার ধর্ম্ম কত বড় শক্তিমান? কুরুক্ষেত্রে রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, মানব চরিত্র-গঠননীতি প্রচারিত হইয়া শতমুখে তোমারই ধর্ম্মের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করিতেছে। তোমারই চৈতন্যদেব

ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচারের নিমিত্ত সকলকে এক করিয়া লইয়াছেন। তোমার ধর্ম্ম-ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞানের রসে সৃষ্ট, পুষ্ট ও গরিষ্ঠ হইয়াছে। তুমি যে দিক হইতে দেখ না কেন তোমার হৃদয়ের প্রসারতা অনুসারে সবই বুঝিতে পারিবে।

আজ তুমি আমি বিভিন্ন বর্ণের হইয়াও প্রীতিকে লক্ষ্য করিয়াই চিরদিন চলিতেছি। আমাদের প্রীতি আরও বর্দ্ধিত হইবে—যখনই কোন শক্তিমান পুরুষ আসিবেন তখনই তুমি আমি এক হইয়া যাইব। আমাদের উদ্দেশ্য আরও সুস্পষ্ট হইবে, আমাদের শক্তি একত্রিত হইবে—সেদিন মনে রাখিও না তুমি ব্রাহ্মণ আমি চণ্ডাল; তুমি শাস্তিগ্রহণকারী, অত্যাচারিত আমি শাস্তা, অত্যাচারী। সেই দিন শতধা বিভক্ত, শত মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হিন্দুসমাজ এক বিরাট দেহে প্রকাশ পাইবে। সেই সময় তুমি আমিই প্রচার করিব "বিশ্বময় জাগায়ে তোল ভা'য়ের প্রতি ভা'য়ের টান।"

যাঁহার অপার স্নেহে আমরা স্নিগ্ধ, যাঁহার কঠোরতা আমাদের পৌরুষের পরিচায়ক, যাহার শক্তি আমাদের মনুষ্যত্ব-লাভের সহায় আমরা আজ আবার তাঁহাকেই ডাকিতেছি। তাঁহার আগমনে ভারত-ভূমিতে মহামিলনের কার্য্য সম্পন্ন হউক। কুসংস্কার বলিয়া যাহা মিথ্যা প্রচারিত রহিয়াছে, তাহা বিদূরিত হউক। সমাজকে নূতন ভাবে ভাবিতে চাই—এতদিনের বিভিন্নতা আমাদের সমাজ-শক্তি বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হইয়াছে। ভারতভূমিতে কত ধর্ম্ম স্থান পাইয়াছে। আজ সকলেই একত্রিত হইতে চাই, যাহারা মায়ের পাশে দাঁড়াইবে তাহারা সকলেই এক। সেইদিন আমরা দেখাইতে পারিব—আমাদের হৃদয়বত্তা আমাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, আমাদের ভাবের প্রবাহ, আমাদের সাধনার লক্ষ্য। মহামিলনে হিন্দুর ধর্ম্ম আরও প্রাণস্পর্শী হইবে, আমি সেই মহা-মিলনের পথের পথিক হইতে চাই। সেই মহামিলন দর্শন, সেই বিরাট মূর্ত্তির স্বরূপ দর্শনই আমার শেষ বাসনা। হিন্দুর ধর্ম্ম জড়তা ও কুসংস্কারের আগার নয়, পরন্তু উহা শাশ্বত, প্রফুল্ল, শান্তিদায়ক, গম্ভীর একটা বিরাট ভাবের সৃষ্টি ইহাই আমরা ভাবিতে চাই। সেই মূর্ত্তি দেখিবার জন্য আমাদের প্রাণ নবভাবে সঞ্জীবিত হউক ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

৯। বর্ত্তমান ব্রহ্মের বৈষয়িক অবস্থা

কোন বিজিত জাতি কি করিয়া নিজেকে হারাইয়া ফেলে, আপনার শক্ত সামর্থ্যে কি করিয়া অবিশ্বাসী হয়, কর্ম্মপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করিতে যাইয়া কেনই বা অসার অমূলক যুক্তির অবতারণা করে, তাহা আমাদের ইতিহাস আলোচনা করিলেই বেশ বুঝা যাইবে। যাহারা অতদূরও যাইতে নারাজ বা ধারণা করিতে অক্ষম তাহাদিগকে দৃষ্টান্ত দিতেছি।

গবর্ণমেণ্টের রিপোর্ট প্রভৃতিতে দেখা যায় ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশে ইংরাজ রাজত্ব, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে দেশীয় ব্যবসা বাণিজ্য লোপ পাইতে বসিল। পরাধীন হইলে অশন বসনের চিন্তা যতটা বাড়ে জাতি বা ব্যক্তি ততটাই হীন হইয়া যায়। তাই কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ দেশীয় উৎপন্ন দ্রব্যাদির উপর ক্রমেই শুল্ক বৃদ্ধি করিতে

লাগিলেন। ভারতের শিল্পমাত্রেই এইরূপ দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া ভারতের বাজার হইতে অদৃশ্য হইল। তারপর বিদেশ হইতে শিল্পাদি আসিয়া ভারতের বাজারে পল্লীতে, হাটে ঘাটে ছড়াইয়া পড়িল আর দেশীয় শিল্পগুলি মাথা তুলিবে কি প্রকারে?

তারপর আরও একটুকু দেখিতে হইবে, যাহারা ব্যবসায়ী তাহারা মাল না পাইয়া বা অতিরিক্ত মূল্যে জিনিষ বিক্রয় করিতে না পারিয়া বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিল। অনেককে কোম্পানী চাকুরী দিতেছিলেন। তাহারা চাকুরী গ্রহণ করিয়া রাজদরবারে উচ্চপদ পাইল, অনুপযুক্ত ব্যক্তি উপযুক্ত ব্যক্তির ন্যায় বেতন গ্রহণ করিল। কিছুদিন পর ব্যবসায়ের দুরবস্থা বুঝিতে পারিয়া এবং চাকুরীতে আয়ের নির্দ্দিষ্ট পন্থা পাইয়া সকলেই ইহার জন্য লালায়িত হইল এবং ব্যবসাকে ঘৃণা করিল। রাজদরবারে সম্মানও হইল আমাদের জাতীয় জীবনে বিষবৃক্ষের বীজ রোপিত হইল।

তারপর হীনবীর্য্য হইবার আরও একটী কারণ আছে। যে সকল ব্যবসায়ী রাজদরবারে সম্মানলাভের অনুপযুক্ত অথবা ব্যবসা ত্যাগ করিতে চাহিল না তাহারা কোম্পানীর বড় বড় আড়ৎ দেখিয়া চমকাইয়া গেল। দশ হাজার টাকার জিনিষ লাখ টাকার মত করিয়া বড় বাড়ীতে সাজাইয়া গ্রাহককে দেখাইতে পারিল না। এই সম্মোহন আজ পর্য্যন্তও আমাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে।

ভারতীয় নৌবাণিজ্যে আমরা যে সব ব্যবসায়ীদিগের কৃতিত্বের পরিচয় পাই তাঁহাদের অনেকে যে বাঙ্গালা দেশের লোক ছিলেন এ ধারণা আমরা করিতে পারি না। কিন্তু কিম্বদন্তী আছে, গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তাই বিশ্বাস করিতে হয়। দেশীয় মাড়য়ারী, পার্শী, সাহা, তিলি প্রভৃতি জাত ব্যবসা ধরিয়া থাকিলেও তাহাদের উন্নতির প্রণালীকে আমরা টানিতে চাই না। বর্ত্তমান ব্যবসার প্রণালীকে ধরিতে চাই অথচ ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদিগের ব্যবসার বুদ্ধি বিদ্যাটুকু আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত তাহাদিগের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে চাহিনা। শুধু বিলাতে গিয়া ব্যবসা বিভাগ হইতে কৃতিত্বের সহিত পাশ করিলেই ব্যবসা-হিসাবে তাহার কোন মূল্য হয় না, যদি অভিজ্ঞতা না থাকে।

ব্রহ্মদেশের অধিবাসীদিগের অবস্থাও আমাদের মত হইবে, সন্দেহ নাই। ব্রহ্মদেশের শিল্প ব্যবসায় জগতের কাছে এক নূতন জিনিষ হইলেও পাশ্চাত্য শিল্প বিভাগের কাছে তাহাকে স্থান দেওয়া হইবে না। আমাদের তাঁতী ও অন্যান্য শিল্পীরা যে জোর জবরদস্তি করিয়াছিল সে শুধু তাহাদের ব্রহ্মদেশ এখন অন্যভাবে ভরপুর, ব্রহ্মবাসীরা আশাতীত অর্থ পাইয়া চাকুরী গ্রহণ করিতেছে; অর্থাগমের নির্দ্দিষ্ট পন্থা ধরিতে পাইয়াছে। কিছুদিন পর সাহেব বাড়ীর গুদাম দেখিয়া আমাদেরই মত তাহাদের হইবে; এখনই অনেকটা হইয়া গিয়াছে। ব্যবসাকে আর তাহারা পছন্দ করে না। আর ১৫।২০ বৎসর পর ব্রহ্মের শিল্প ভারতে পৌছিবে কি না সন্দেহ। আরও কিছুকাল পরই ব্রহ্মের শিল্প ভারতে একটা কিম্বদন্তী হইয়া থাকিবে।

আজ ভারতের চাকুরীর বাজার যেমন হইয়াছে, স্বার্থ লোলুপ সারমেয়দিগের সম্মুখে এক টুকরা রুটি লইয়া কামড়াকামড়ি চলিতেছে ব্রহ্মের অবস্থাও ঠিক তাই হইবে।

যদি আমাদের জাতীয় জীবনে বৈষয়িক উন্নতির নূতন পন্থা না পাই তাহা হইলে চাকুরী আর কুকুরবৃত্তির অপেক্ষা করিবে না। বিজিত জাতির ইহাই পরবর্ত্তী ইতিবৃত্ত। জাতি এই ভাবেই হীনবীর্য্য হয়। মান অপমান প্রকৃত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত না হইয়া জাতীয়তা বিনাশের হেতু হইয়া থাকে।

* *
*

১০। সমাজের গতি কোন দিকে

যাহার কিছু করিবার ইচ্ছা আছে, প্রাণের ভিতর হইতে একটা বিষম পরিবর্ত্তনের জন্য তোল পাড় করে সেই কিছু চায় ইহা সহজেই বুঝা যায় নতুবা সংসারের অবস্থা এমন হইত না। মানুষের শক্তি চেতন তাই সে এমন ব্যগ্র, একটা পরিবর্ত্তনের সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত উন্মত্ত। অবশ্য মানুষের মধ্যেও অচেতন অনেক আছে, তাহাতে এবং অন্যান্য প্রাণীতে কোনই প্রভেদ নাই। তাহারা ভাল মন্দও প্রাণদিয়া বুঝে না একটা লোক দেখান বোধশক্তি আছে মাত্র। এ জিনিষটাকে আমার বলিতে হইবে তাই আমার বলে, ওটা তোমার, তাই তোমার। এরূপ লোক সমাজের অন্নধ্বংসকারী ব্যতীত আর কিছুই নহে। লোক যখন ভাল জিনিষ পাইতে চায় তখনই তাহাকে উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিতে শোনা যায়, তাহার আকুল আর্ত্তনাদে পৃথিবী ভীতা হয়, কিন্তু কোন খারাপ জিনিষ যখন ব্যক্তিগত চরিত্রের ভিতর দিয়া সমাজকে দূষিত করিতে থাকে তখন কোন প্রকার ব্যাকুলতা আসে না। সেই সময় কেবল মাত্র সম্মোহনই আমাদিগকে সাম্‌নে আরও সাম্‌নে টানিতে থাকে। কিন্তু তারও একটা পরিবর্ত্তন না-ই কি? পরিবর্ত্তন প্রত্যেকেরই আছে। মোহের যা পরিবর্ত্তন তা ভয়ঙ্কর। আমরাও সেই ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তনের স্রোতে ভাসমান। আমরাই সেই ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তনের দ্রষ্টা আমরাই সেই পরিবর্ত্তনের স্রষ্টা। তাই আমরা আজ ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়া চীৎকার করিতেছি। ধর্ম্ম কি? তাহা হয়ত আমরা অনেকেই বুঝিনা তবুও বলি সমাজে ধর্ম্ম নাই। সমাজে একজন ন্যায়পরায়ণ লোক নাই দশজনে একজনকে বড় বলিয়া মানিতে চায় না। একথা কি ঠিক?

আমরা কখনই ভাবিতে পারিব না সমাজে ধর্ম্ম নাই এবং ধার্ম্মিক বা ন্যায়পরায়ণ কেহ নাই। তাহা হইলে সমাজ এতদিন চুরমার হইয়া যাইত। রাজতন্ত্র অথবা সাধারণতন্ত্র যাহাই হউক না কেন প্রত্যেকেই ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের দ্বারা রক্ষিত। আমাদের সমাজেও ন্যায়পরায়ণ বা ধার্ম্মিক ব্যক্তি আছেন নিশ্চয়ই, তবে আমরা তাঁহাদিগকে দেখিতে পাই না কেন? আমাদের নিজেদের স্বার্থত্যাগই নেতার প্রকৃত অর্চ্চনা।" সে স্বার্থত্যাগ কাহাকে বলে তাহা আজ পর্য্যন্ত বুঝিতে বা ভাবিতে অনেকেই চায় না। সেটাকে একটা বাতুলতা বা দুর্ভাবনা বলিয়া উড়াইতে অনেকেই বদ্ধ পরিকর।

ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে পাইতে হইলে আর এক প্রকার গভীর সাধনার প্রয়োজন —ভালবাসা। ভালবাসা অর্থ দুইয়ে, একে অথবা দুইয়ে চারের মধ্যে একত্র ভোজন, একত্র উপবেশন বা নিভৃত আলাপ নয়। রাশি রাশি লোভনীয় বস্তু হাতে পাইয়াও অন্যের সামান্য অপরাধের বোঝা টানিয়া লইয়া বিপক্ষকে আলিঙ্গন করাই প্রকৃত ভালবাসার পরিচায়ক। মোট কথা স্বার্থের সম্বন্ধই সেখানে নাই।

সকল পদার্থকেই আপনার সঙ্গে তুলনা করিয়া

ন্যায্য বিচার করিতে হয়। ভালবাসা যখন প্রাণ হইতে বাহির হয় তখন আর পাত্রাপাত্র বিচার করে না। তাই মুচি, মেথর, কুলি সময়ে আপনার জন হইতেও আপন বলিয়া মনে হয়। যে কোন ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে আপনার হৃদয়ের মহত্ত্বকে ক্ষুদ্র ভালবাসা দ্বারা বদ্ধ না করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিলে দেখা যায় ভালবাসার সীমা নাই—যতদূর ছাড়িয়া দিবে ভালবাসা আপন পথ আপনি খুঁজিয়া লইবে। এক পরিবারের এক ব্যক্তিকে ভাল বাসিয়া ক্ষুদ্রতার পরিচয় না দিয়া তাহার পরিবারের সকলকে ভাল বাসিব ইহাই আমাদের উচিত।

মুচি, মেথর ত দূরের কথা আমরা যাহাদিগকে লইয়া একত্র বসতি করি, আমাদের আপদে বিপদে যাহারা আমাদের স্বজন অপেক্ষাও নিকট বন্ধু তাহাদিগকেও আমরা প্রাণ দিয়া ভাল বাসি একথা হলপ করিয়া বলিতে পারিব না। বলিলে অন্যায় বলা হইবে। তাহারা চিরদিনই সাধ্য মত সকলকে বিশেষতঃ মনিবকে যতটা আপনার করিতে পারিয়াছে মনিব ততটা পারেন নাই। তাহারা মনিবের দুঃখে সান্ত্বনার কারণ হইয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে আমাদের ভালবাসা একটা লোক দেখান ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ভাল বাসাটা যেন কোন নিয়ম বা উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত না হয়। ভালবাসা ভালবাসারই জন্য এটা আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে কারণ অনেকদিন আমরা ভালবাসাটাকে 'উপহার' করিয়া তুলিয়াছিলাম।

আমরা প্রাণে মনে সব সময় যেন বুঝিতে চেষ্টা করি—উভয়ের বা বহুর মধ্যে এমন কোন্ সম্বন্ধ রহিয়াছে, যাহার জন্য আমরা এক হইব নিজের ক্ষতি করিয়াও অন্যের উপকার করিব। অন্য আর একজনকে আমার শরীরের রক্ত মাংসের মত মনে করিব। একটা লোকের মৌখিক দু'চারটা আলাপন শুনিয়া আপনার মনে করার পূর্ব্বে তাহার অন্তস্তলে যাইয়া দেখিব, সে এবং আমি কতটা আপন, বরং তখনকার জন্য ভালবাসা ততটুকু থাকাও ভাল তবুও আইনের নিয়মে বা উদ্দেশ্যের দ্বারা চালিত হইয়া আপন করিতে গেলে হঠাৎ একটা বিচ্ছেদ আসিতে পারে। আমরা রাজনৈতিক ভালবাসা চাহি না, উহাতে কেবল চালচলতির মারপ্যাচ আলাপ ব্যবহারে ধূর্ত্ততা আছে অবশেষ ছুরি লুকাইয়া মুখে হাসি। আমরা সামাজিক ভালবাসা চাই। যে ভালবাসার চাল চলতিতে সারল্য, আলাপ ব্যবহারে সারল্য, প্রতি হাসিতেই সারল্যের প্রকাশ সেটা কে চালায়? বিশ্ব সমাজ যে ভালবাসায় ভবিষ্যযুগে স্থিত হইবে আমরা সেই ভালবাসা চাই। আমাদিগকে ভালবাসা গড়িতে হইবে না,—মার্জ্জিত করিতে হইবে। যে ভালবাসায় মানুষ অন্যায় দেখিয়া পরোক্ষে অনুতাপ করে, বিচ্ছেদের ভয়ে ক্ষতি সহ্য করে সে ভালবাসা মহদুদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল হইলেও তাহা সমূহের কাছে, শেষ পরিণতির নিতান্তই প্রতিকূল। যে ভালবাসায় মানুষ ক্ষণেকেই অন্ধ হয় সেই ভালবাসাকে সদুদ্দেশ্যে চালিত করিলে সকল বিপদ কাটিয়া যায়, চিরানন্দের বিকাশ হয়। তখন একের সদুদ্দেশ্য দুই জনেরই স্বার্থ হইয়া দাঁড়ায়। নিজের প্রাণকে যতটুকু সরল করা যায় অন্যকেও ততটুকুই সরল দেখা যায়।

তাই বলিতেছি আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বাহিরে যাহারা আছে তাহাদের মধ্যে যখন আমাদের ভালবাসা ছড়াইব তখন যেন

সমষ্টির মধ্যেই আবদ্ধ না থাকি মেথরের শ্রেণী, মুচিরশ্রেণী, তন্তুবায়েরশ্রেণী এবং এইরূপ অন্যান্য শ্রেণীগুলিকেও যেন আমাদের ভালবাসার পাত্র করিতে পারি তাহাই প্রত্যেককে নজর রাখিতে হইবে

ভালবাসা যেন সাময়িক সদুদ্দেশ্যের উত্তেজনায় মুগ্ধ হইয়া পরক্ষণেই আবার অবসাদ-গ্রস্ত না হয়, তাহাই দেখিতে হইবে। কোনরূপ যুক্তি তর্ক আসিয়া স্থান অধিকার না করে তাহাই প্রধান দ্রষ্টব্য। ভালবাসা যখন সসীম ছাড়িয়া অসীমে যাইবে—আমাদের সকলের ভালবাসার মধ্যে আর কোন হীনভাব থাকিবে না তখনই ভালবাসার পূর্ণ-বিকাশ হইবে। সেই সময়ই আমরা দেখিতে পাইব—আমাদের সমাজ রক্ষক বা নেতা আবির্ভূত হইয়াছেন— তিনি "সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"।

আমাদের নবম অবতার পর্য্যন্ত দেখিতে পাই—অবতারগণ সকল শ্রেণীতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, প্রস্তর, তারপর মনুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকল শ্রেণীই তাঁহাদের অধিকারে ছিল। আমাদের সমাজরক্ষক ভালবাসা দ্বারা গঠিত হইবেন। আমরা ভবিষ্যৎ কর্ম্মক্ষেত্রে শুধু ভালবাসারই খেলা দেখিতে পাইব। অকৃত্রিম ভালবাসায় হৃদয় পূর্ণ করিয়া শত শত নর—নারায়ণ দেখা দিবেন। তখন আমরা বুঝিতে পারিব এই আমাদের সভ্যতা সাধনের প্রারম্ভকাল।

আহ্বান

যদি সাধন করিতে চাও সাধনা তোমার
হে প্রিয় তাপস মোর,
তবে নীরবে বিজনে আসি কর আরাধনা
দিবস যামিনী ভোর।
লাজ-মান-ভয় যত, কর দূরে পরিহার
দূর কর মন হতে বিষাদের ভার ;
ক্ষুদ্র স্বার্থ সঁপি দিয়ে মহাসাগরের জলে
নিভৃতে দাঁড়াও আসি মহাকাশ তলে।

কেন, এ রোদন কেন ? সরম ! সরম !
মুছে ফেল তব লোর
যদি সমাধি হয়েছে সাধ কিশোর বয়সে
হে প্রিয় তাপস মোর,
তবে নীরবে বিজনে আসি কর আরাধনা
দিবস যামিনী ভোর।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ

রুশিয়ার শিল্প ও বাণিজ্য *

রুশেরা প্রথমে গ্রীসের সঙ্গে বাণিজ্য সম্বন্ধ পাতাইয়াছিল। গ্রীক প্রভাবেই রুশিয়ার শিল্প ও সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত হয়। পরে হ্যান্সা-পরিষদের বণিকেরা নবগরড নগরে ব্যবসায় প্রবর্ত্তন করে। কিন্তু আইভান ওয়াশিল-স্তেভিচ কর্ত্তৃক এই নগর ধ্বংস করা হয়। তখন ইংরাজ এবং ওলন্দাজ-দিগের সঙ্গে রুশের দ্রব্য বিনিময় সুরু হয়। শ্বেত সাগরের পথ আবিষ্কৃত হওয়ায় এই বাণিজ্য সহজে নিষ্পন্ন হইত।

কিন্তু রুশ-শিল্প ও সভ্যতার যথার্থ প্রবর্ত্তক পিটার দি গ্রেট। তাঁহার কার্য্যফলেই বর্ত্তমান রুশিয়ার গোড়া পত্তন হইয়াছে। বিগত ১৫০ বৎসর ধরিয়া রুশ সমাজে যত কিছু দেখিতেছি সকলই এই কর্ম্মবীরের প্রতিভা প্রসূত। রুশজাতির সভ্যতা আলোচনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারি যে, রাষ্ট্র-শক্তি সুদৃঢ় ও অনুকূল হইলে অল্পকালের ভিতরেই দেশের বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। পিটার রুশিয়ার রাষ্ট্র-শক্তিকে সকল দিক হইতেই প্রবল করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে রুশিয়া কতকগুলি পরস্পর সম্বন্ধহীন অসভ্য ও অর্দ্ধ সভ্য জাতিপুঞ্জের আবাস স্থান ছিল। পিটার এই জনপদ গুলিকে ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করি-লেন। তাহার পর হইতে রুশসমাজে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং উন্নতিশীল শিল্পী ও বণিক দেখা দিয়াছে। গমনাগমনের সুবিধা, খাল ও রাস্তা নির্ম্মাণ ইত্যাদি বিষয়েও রাষ্ট্রের দৃষ্টি পড়িয়াছে। ফলতঃ অন্তর্ব্বা-ণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্ট হইয়াছে। বিদেশের সঙ্গে ব্যবসায় সম্বন্ধ বিস্তৃত হইয়াছে। রুশিয়া ইয়োরোপের নৌবল সমন্বিত ব্যবসায়শীল বণিক সমাজে স্থান পাইয়াছেন। পিটার যে কার্য্য করিয়া গিয়াছিলেন তাহার ভিতরেই এই সকল সমৃদ্ধির বীজ ছিল।

রুশিয়ার উন্নতি স্থিরপ্রতিষ্ঠ হইতে বহু-কাল লাগিয়া ছিল। নিতান্ত অসভ্য সমাজ বড় শীঘ্র জগতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে না। দ্বিতীয় ক্যাথেরিণ পিটারের আদর্শ অনুসারেই কার্য্য করিতে ছিলেন। তিনি বহু বিদেশীয় শিল্পী ও বণিকগণকে স্বদেশে আনাইয়া তাহাদিগের জন্য নানাবিধ সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দিলেন। তথাপি লৌহ, কাচ, সূতা ইত্যাদি শিল্প তাঁহার আমলে শৈশবা-বস্থা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। এমন কি রুশিয়ার কৃষিক্ষেত্র এবং আকর হইতে যে সমুদয় প্রাকৃতিক উপকরণ উৎপন্ন হইত সেগুলির উপযুক্ত শিল্পও বিশেষ উন্নত হয় নাই।

এই অবস্থায় রুশিয়ার শিল্পের অত্যধিক উন্নতি বাঞ্ছনীয়ও ছিল না। সভ্যতর দেশের সঙ্গে ব্যবসায় সম্বন্ধ রক্ষা করিলেই রুশ সমাজের যথার্থ উপকার হইত। কৃষিজাত দ্রব্যের রপ্তানি এবং উচ্চ শ্রেণীর শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানি কিছুকাল তাহার পক্ষে শ্রেয়স্কর ছিল। কিন্তু নেপোলিয়ানী সমর, Conti-

* ফ্রেড্‌রিক লিষ্ট প্রণীত "স্বদেশী ধনবিজ্ঞান" গ্রন্থের ঐতিহাসিক বিভাগের এক অধ্যায়।

nental Blockade দ্বারা বিলাতীবয়কট প্রচার ইত্যাদি দ্বারা রুশিয়ার গতি পরিবর্ত্তিত হইতে থাকিল। বিদেশ হইতে শিল্প দ্রব্য আসা বন্ধ হইল—বিদেশে প্রাকৃতিক উপকরণ পাঠানও স্থগিত থাকিল। সমুদ্র-পথে রুশিয়ার বহির্ব্বাণিজ্য আর চলিতে পারিল না—স্থলপথে জার্ম্মাণি ও ফ্রান্সের সঙ্গে সম্বন্ধ মাত্র রহিয়া গেল। মোটের উপর রুশিয়ার ক্ষতি হইল।

নেপোলিয়ানী সমরের অবসানে রুশেরা পুরাতন প্রথা প্রবর্ত্তন করিতে উৎসাহিত হইল। অবাধ বাণিজ্য নীতির পৃষ্ঠপোষক ষ্টর্চ্চ সমাজে খ্যাতিসম্পন্ন লোক ছিলেন। বিদেশীয় শিল্প দ্রব্য দেশের বাজার ভরিয়া দিল। স্বদেশী কারখানাগুলির অধোগতি হইল। বিলাতী দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় রুশ মাল তিষ্ঠিতে পারিল না। ষ্টর্চ্চের শিষ্য ও বন্ধুগণ বলিতে থাকিলেন—"কোন আশঙ্কার কারণ নাই। অবস্থা পরিবর্ত্তনের সময়ে এইরূপ বিপর্য্যয় ঘটিয়াই থাকে। অল্পকাল পরেই অবাধবাণিজ্য-নীতির সুফল দেখিতে পাইবে।" অবশ্য ঘটনাচক্রে রুশিয়ার সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল। ইউরোপের নানা দেশে শস্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়—এইজন্য রুশিয়ার কৃষিজাত দ্রব্য ঐ সকল দেশে রপ্তানি হইতে থাকিল। সুতরাং বিলাতী দ্রব্যের আমদানিতে স্বদেশী শিল্পের যত ক্ষতি হইয়াছিল এই শস্য রপ্তানির প্রভাবে তাহার পূরণ হইতেছিল। কাজেই এই ক্ষেত্রে কিয়ৎকালের জন্য অবাধবাণিজ্যের কুফল বুঝা যায় নাই।

কিন্তু বিদেশে দুর্ভিক্ষ বেশীকাল স্থায়ী হয় নাই—রুশশস্যের রপ্তানি অল্পকালের ভিতরই মন্দগতি হইতে লাগিল। বিলাতের রাষ্ট্র Corn-Low বা শস্য বিধি জারি করিয়া বিদেশীয় শস্য আমদানি বন্ধ করিয়া দিলেন। রুশিয়ার শস্য ও কাষ্ঠ বিলাতে যাইতে পারিল না। তখন হইতে রুশিয়ার দুরবস্থা স্পষ্ট হইতে থাকিল। তখন ষ্টর্চ্চ প্রবর্ত্তিত মতবাদ ও বাণিজ্যনীতির বিরুদ্ধে রুশসমাজে আন্দোলন সুরু হইল। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রবীর কাউণ্ট নেসেল বোড প্রচার করিলেন—"প্রত্যেক দেশের স্বার্থ স্বতন্ত্র—সুতরাং তাহার রাষ্ট্র-নীতি এবং ব্যবসায়-নীতিও স্বতন্ত্র। এই কথা স্বীকার করিয়া আমাদিগকে বাণিজ্যবিধি প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। এতদিন আমরা ভাবিতেছিলাম—দেশে দেশে কোন দ্বন্দ্ব নাই—এক দেশের লাভ হইলে অন্য দেশেরও লাভ হয়, এক দেশের ক্ষতি হইলে অন্য দেশেরও ক্ষতি হয়। এই বুঝিয়া আমরা স্বদেশীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করি নাই। কিন্তু বস্তুতঃ দেখিতেছি কি? এক জাতির লাভ হইতে থাকিলেই অন্যান্য জাতির লাভ না হইতেও পারে। বরং একজনের লাভ অপরের ক্ষতির কারণ। এই কারণে রুশিয়ার সকল বিভাগেই ক্ষতি দেখিতেছি। আমরা বিদেশে মাল রপ্তানি করিবার সুযোগ পাই না। আমাদের স্বদেশী শিল্প অবসন্ন প্রায়—আমাদের টাকা দেশে থাকিতেছে না—আর বড় বড় কারবারের মালিকেরা সর্ব্বস্বান্ত হইতে চলিয়াছেন।"

কাজেই স্বদেশী আন্দোলন আরব্ধ হইল—সংরক্ষণ-নীতি প্রবর্ত্তিত হইতে থাকিল। ষ্টর্চ্চ এবং তাঁহার শিষ্যবর্গের মত এই আন্দোলনে ভাসিয়া গেল। বিদেশ হইতে মূলধন রুশিয়ায় আসিল—বিদেশীয় বিচক্ষণ কারিগর, বণিক ও শিল্পী রুশিয়ায় আসিয়া বসতি স্থাপন

করিল। ইংল্যণ্ড ও জার্ম্মাণির লোকেরাই রুশসমাজে স্থায়ী ঘর করিতে বেশী অগ্রসর হইল।

সাম্রাজ্যের অধীশ্বর এই স্বদেশী আন্দোলনের প্রবর্ত্তক—কাজেই জমিদার এবং রাজরাজড়াগণও এই দিকেই ঝুঁকিলেন। তাঁহারা নিজ নিজ জমিদারীর ভিতর নানা শিল্পকেন্দ্র ও কারখানা খুলিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে দেশের নানা স্থানে নানা কারবার চলিতে লাগিল। পশমবয়নের কার্য্য বিশেষ প্রসারলাভ করিল। তাহার ফলে পশমের কাট্‌তি যথেষ্ট হইত। এইজন্য মেষপালকগণ তাঁহাদের ব্যবসায়ে বিশেষ লাভবান্ হইতে থাকিল—মেষপালন বিদ্যাও উন্নত হইল। চীন, পারস্য এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য বাড়িয়া চলিল। ফলতঃ রুশিয়ার বাণিজ্য-সচিব সাম্রাজ্যের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত গৌরবময়ী ভাষায় প্রকাশ করিলেন।

জার্ম্মাণেরা দুঃখ করিতেছেন—"রুশিয়ার স্বদেশী আন্দোলনের ফলে জার্ম্মাণির উত্তর পূর্ব্ব অঞ্চলের ক্ষতি হইয়াছে।" তাহা ত হইবেই। প্রত্যেক ব্যক্তির ন্যায় প্রত্যেক জাতির স্বার্থ স্বতন্ত্র। সকলেই নিজ নিজ স্বার্থ অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকে। জার্ম্মাণেরা যদি আশা করে যে রুশিয়া জার্ম্মাণসমাজের উপকার করিবে তাহা হইলে ইহাদের মত বেকুব দুনিয়ায় আর কেহ নাই। জার্ম্মাণদের কথা ভাবিবার জন্য রুশিয়ার মাথাব্যথা হইবে কেন? এই জন্যই জার্ম্মাণদিগকে বলিতেছি—"ওহে বাপু, একটা অবাধ বাণিজ্যের ধুয়া ধরিয়া নিজের গলায় নিজে ছুরি মারিও না। মানবজাতির কথা না ভাবিয়া জার্ম্মাণ জাতির কথা ভাব। বিশ্বপ্রেমে আত্মহারা না হইয়া স্বদেশপ্রেমে মাতিয়া যাও। মানবজাতির উদ্ধারকর্ত্তার আগমন প্রতীক্ষা না করিয়া স্বজাতীয় যুগাবতারের জন্য পথ প্রস্তুত করিয়া রাখ।" রুশেরা তোমাদের মত নির্ব্বোধ নয়। তাহারা জাতীয় স্বার্থ খুব ভাল রকম বুঝে। তাহাদের নিকট তোমরাও স্বদেশ হিতৈষণা শিক্ষা কর।"

বলা বাহুল্য ইংরাজ রুশিয়ার স্বদেশী-সংরক্ষণ-প্রচেষ্টায় ভীত হইল। কারণ ইহার ফলে রুশেরা প্রথমতঃ ইংরাজের সঙ্গে ব্যবসায় হিসাবে অধীনতার সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে পারিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ রুশিয়ায় ও ইংল্যণ্ডে এশিয়ার বাণিজ্য ও বাজার লইয়া একটা তুমুল প্রতিযোগিতা সুরু হইতে চলিল। ইংরাজ না হয় সস্তায় মাল তৈয়ারী করিল। কিন্তু মধ্যএশিয়ায় মাল পাঠাইতে ইংরাজের খরচ যথেষ্ট—অথচ মধ্যএশিয়া রুশিয়ার ঘরের কোণে। কাজেই ইংরাজকে এই বাজার হইতে হঠাইয়া দেওয়া রুশের পক্ষে নিতান্তই সহজ। তাহাছাড়া রুশিয়ার রাষ্ট্রীয় প্রভাবও এশিয়ায় যারপর নাই বাড়িয়া যাইবার কথা। রুশেরা ইউরোপের মাপ কাঠিতে অসভ্য বটে—কিন্তু এশিয়াবাসীর সঙ্গে তুলনায় যথেষ্ট সভ্য।

রুশিয়া সম্প্রতি এক বিরাট বিশ্ববাণিজ্য ও বিশ্বসাম্রাজ্যের প্রথম স্তরে পদার্পণ করিল। এই ভবিষ্যৎ গৌরবের যথার্থ অধিকারী হইবার জন্য বর্ত্তমানে রুশিয়ার কতিপয় কর্ত্তব্য রহিয়াছে। প্রথমতঃ রুশিয়ার শাসন প্রণালী খানিকটা উদার করা আবশ্যক। তাহা না হইলে শিল্পীদিগের সুবিধা এবং শিল্পের চরম উন্নতি হওয়া কঠিন। দ্বিতীয়তঃ রুশসাম্রাজ্যের প্রদেশ-শাসন এবং নগর-শাসন বিস্তৃত ভিত্তির উপর স্থাপন করা আবশ্যক।

জনগণের ক্ষমতা ও অধিকার শাসনকার্য্যে বিস্তৃত না হইলে দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিশেষ সমৃদ্ধ হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ রুশিয়ার গোলামজাতিকে স্বাধীনতা দিতে হইবে। চতুর্থতঃ, রুশসমাজে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভাব রহিয়াছে। এইরূপ এক সম্প্রদায় গঠিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়। পঞ্চমতঃ রুশিয়ার ভিতর গমনাগমনের সুবিধা বেশী নাই। রাস্তা নির্ম্মাণে সাম্রাজ্যের যৎপরোনাস্তি অর্থব্যয় করিতে হইবে। অধিকন্তু মধ্য এশিয়ার সঙ্গে যাতায়াতের পথও সুগম ও সুরক্ষিত করিতে হইবে।

উনবিংশ শতাব্দীতে রুশিয়ার সম্মুখে এই সকল সমস্যা রহিয়াছে। এই গুলির সমাধান হইতে থাকিলে কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, অর্ণব-বাণিজ্য ও নৌবল দ্রুতগতিতে উন্নতি লাভ করিবে। এই কথা বুঝিয়া রুশিয়ার ভূম্যধিকারিগণ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

রংপুরে নবম উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের কৃষিবিভাগের সভাপতির অভিভাষণ

এক সপ্তাহ পূর্ব্বে যখন আমি অন্যকার সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার জন্য জরুরি নিমন্ত্রণ পাইলাম, তখনই বুঝিলাম যে সম্মিলনের কৃষি-সাহিত্য বিভাগের পৃথক সভাপতির আবশ্যকতা আপনারা অনেক পরে অনুভব করিয়াছেন এবং হাতের কাছে আর কাহাকেও না পাইয়া আমাকে স্মরণ করিয়াছেন। এই সভার সভাপতিত্ব করিবার আমার যোগ্যতা আদৌ নাই আমি জানিতাম কিন্তু পাছে কাহাকেও না পাইয়া আপনারা বিপন্ন হন এই ভয়ে এই গুরুভার অনিচ্ছা সত্ত্বেও গ্রহণ করিয়াছি। আমি ক্ষুদ্র বিজ্ঞান-সেবী, আমার দ্বারা আপনাদের মনোরঞ্জন সম্ভবপর নহে, তবে ভরসার কথা এই যে আজ এই কৃষিশিল্পবাণিজ্যের বিশ্বপ্রতিযোগিতার দিনে সমগ্র ভারতের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই এই বিষয়ে চিন্তা ও আলোচনা করিতেছেন। আমিও সেই সুরে স্বর মিশাইয়া কৃষি সম্বন্ধে কয়েকটা মোটা মোটা কথা আপনাদিগকে নিবেদন করিব। বলা বাহুল্য কৃষি কার্য্য সম্বন্ধে আমার হাতে কলমে কোনও অভিজ্ঞতা নাই, কৃষি বিষয়ক পুস্তক ও কৃষি বিভাগের বার্ষিক রিপোর্টাদি পাঠে আমার যেটুকু ধারণা জন্মিয়াছে তাহাই এখানে বলিতেছি। তাহার উপর সময়াভাবে যাহা বলিবার ছিল তাহাও গুছাইয়া লিখিতে পারিলাম না, ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

কৃষি সাহিত্য

প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে, ভারত আবহমান কাল কৃষিপ্রধান দেশ ছিল, আছে এবং চিরকালই থাকিবে। হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, ব্রহ্ম হইতে পঞ্চনদ পর্য্যন্ত যে বিশাল উর্ব্বরা ভূমিভাগ আমরা বহুপুণ্য ফলে মাতৃভূমিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার

কর্ষণে চিরদিনই সোণা ফলিয়াছে ও ফলিবে: শিল্পবাণিজ্যে ভারতভূমি এককালে সমগ্র জগতের মধ্যে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় দেশ ছিল, এবং আশা করি যে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের মাতৃভূমি শিল্পবাণিজ্যে আবার তাহার পূর্ব্বাসন লাভ করিবে, তবুও ভারতের ভূমিজাত অন্ন চিরকালই ভারতের কেন, বহু দেশ বিদেশের, নরনারীর প্রাণ রক্ষা করিয়া আসিতেছে ও করিবে।

অধুনা ভারতের শতকরা আশী জন ব্যক্তির উপজীবিকা কৃষি। কৃষিই ভারতের সর্ব্বপ্রধান শিল্প। আপনারা এই সর্ব্বপ্রধান শিল্পের মাতৃভাষায় আলোচনার পথ প্রদর্শন করিয়া সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। আমি কিছুদিন পূর্ব্বে কোন্ কোন্ বিজ্ঞানে কতগুলি পুস্তক বঙ্গভাষায় লিখিত আছে তাহার অনুসন্ধান করিয়া "ভারতবর্ষে" একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। সেই সময় দেখিতে পাইলাম যে বঙ্গ সাহিত্যের কৃষিবিভাগে খুব বেশী পুস্তকাদি নাই। অথচ আধুনিক উন্নত কৃষিবিদ্যায় লব্ধ তথ্যগুলি মাতৃভাষায় প্রত্যেক গৃহস্থকে জ্ঞাত করাইতে পারিলে অনেক সুফল হইতে পারে। সরকার বাহাদুর কৃষিবিদ্যার আলোচনার জন্য পূসা, স্যাবোর, পুনা প্রভৃতি স্থানে কৃষিবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। তাহা ভিন্ন বাঙ্গালাদেশে ঢাকা, বর্দ্ধমান, রাজসাহী, রংপুর প্রভৃতি সহরে কৃষি পরীক্ষাক্ষেত্রে (Experimental farm) কৃষির উন্নতির জন্য বহু পরীক্ষা করিতেছেন। এই সকল স্থানে পরীক্ষায় অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া থাকে, কিন্তু সেগুলি ইংরাজিতে কৃষি বিভাগের রিপোর্টে এতদিন আবদ্ধ থাকিত; যাহার জন্য সেগুলি আবিষ্কৃত হইল সেই গৃহস্থকে সেগুলি মাতৃভাষায় জানাইবার এতদিন কোনও ব্যবস্থা ছিল না। সুখের বিষয় গত কয়েক বৎসর যাবৎ এই সকল পরীক্ষার ফল "কৃষি সমাচার" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। আশা করি অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই বিষয়ে বহু পুস্তকাদি রচনা করিয়া একদিকে মাতৃভাষার দৈন্য দূর করিবেন এবং অপর দিকে দেশে উন্নত কৃষি শিল্পের প্রতিষ্ঠার সহায়ক হইবেন। উত্তরবঙ্গ-সাহিত্যসম্মিলনের কৃষি-সাহিত্যের প্রসার বৃদ্ধির চেষ্টা আশা করি অদূর ভবিষ্যতে সফল হইবে।

শিক্ষিত সম্প্রদায় ও কৃষি

আজ কাল এই ভীষণ জীবন সংগ্রামের দিনে স্বভাবতই চাকুরি সম্বল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি শিল্পোন্নতির দিকে পড়িয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় কৃষির দিকে এখনও পড়ে নাই। বিশ পঁচিশ টাকার কেরাণীগিরিতে আর চলে না, বি, এ- এম, এ,র বাজার দর মাসিক পঞ্চাশ ষাইট টাকায় দাঁড়াইয়াছে—এক্ষেত্রে আয়ের অন্যবিধ পন্থা উন্মুক্ত না হইলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আর্থিক দৈন্য ঘুচিবে কি করিয়া বুঝিতে পারি না। উপরন্তু যখন দেশে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ শিক্ষিতের সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে, তখন কৃষি শিল্প প্রভৃতি আয়ের নূতন নূতন দ্বার উদ্ঘাটিত না হইলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বাজার দর আরও কমিতে থাকিবে। শিল্পোন্নতির জন্য অধিকাংশ স্থলেই হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ টাকার মূলধনের প্রয়োজন; তদুপরি শিল্পশিক্ষা ব্যবসাবুদ্ধি প্রভৃতি অর্জ্জন করা একান্ত আবশ্যক। এসকল সংগ্রহ করা দুরূহ। বড় রকমের কৃষি কারবার চালাইতেও এই সকলের প্রয়োজন সন্দেহ নাই, কিন্তু মাসিক যে পঁচিশ বা পঞ্চাশ টাকা মাহিনার জন্য

আমরা লালায়িত তাহা কৃষিকার্য্যের সাহায্যে অর্জ্জন করিতে শিক্ষিত গৃহস্থের পুঁজিপাটা ও বুদ্ধিই যথেষ্ট। যে সকল শিক্ষিত যুবক পঁচিশ বা পঞ্চাশ টাকার চাকুরির জন্য আফিসের দ্বারে দ্বারে বৃথা ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন তাঁহাদিগের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন "go back to the land"। এবিষয়ে কৃষি বিষয়ক রিপোর্টাদি পাঠ করিয়া আমার ধারণা জন্মিয়াছে যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কোনও কোন কৃষিজাত দ্রব্যের চাষ করিতে পারিলে যুবকগণ স্বল্পায়াসে ও স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইবেন। আমার বক্তব্য আপনাদের নিকট বিবৃত করিতেছি; ইহার কার্য্যকারিতা যদি যুবকগণ হাতে কলমে পরীক্ষা করিয়া দেখেন তাহা হইলে সুখী হইব।

বঙ্গদেশে ধান ও পাট প্রধানতম শস্য। উপজীবিকা হিসাবে ইহাদের চাষ খুব অধিক বিঘা করিতে না পারিলে শিক্ষিত গৃহস্থের পোষাইবে না। অবশ্য অন্যবিধ চাষ বা পেশার সহিত এসকল চাষ চলিতে পারে। কিন্তু ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি জিনিষের আবাদ সম্ভবপর যাহাতে বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিলে বিঘা প্রতি খুব বেশী লাভ হইতে পারে। ইহাদের বিষয় নিম্নে লিখিত হইল।

(১) ইক্ষুর চাষ—ইক্ষুর চাষ খুব লাভজনক। তাহার উপর যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে সার দেওয়া হয় এবং বারবেডোজ, মরিসাস, জাভা প্রভৃতি প্রদেশ হইতে আনীত আকের চাষ করা যায় তাহা হইলে এক এক বিঘাজাত আক হইতে ৪০ মণ পর্য্যন্ত গুড় উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার মূল্য ন্যূনকল্পে ২৫০৲ টাকা এবং খরচ প্রায় বিঘা প্রতি বড় জোর ৮০৲ টাকা হইতে পারে অতএব বিঘা প্রতি লাভ অন্ততঃ ১৫০৲ টাকা হইতে পারে। এবিষয়ে কৃষি বিভাগের বাঙ্গালা ১৩১৯—১৩২০ সালের বার্ষিক বিবরণী হইতে বঙ্গদেশের বিভিন্ন কৃষি ফার্ম্মে প্রাপ্ত ফসলাদির বিবরণ উদ্ধৃত হইল—

ঢাকা বিভাগে গেণ্ডারি নামক ইক্ষুর চাষই সমধিক প্রচলিত কিন্তু ঢাকা কৃষি ফার্ম্মে বিঘা প্রতি ১০ মণ চূণ, ১০০ মণ গোবর ও ৬⅓ মণ সরিষার খোল সার দিয়া বিঃ ১৪৭ ও ডোরাট্যানা নামক বিদেশী ইক্ষু হইতে গেণ্ডারিজাত গুড় অপেক্ষা প্রায় ডবল গুড় উৎপন্ন হইয়াছে—

নাম	তিন বিঘায় কত মণ গুড় পাওয়া গিয়াছে।
বিঃ ১৪৭	১২৩
ডোরা ট্যানা	১১২
হরিদ্রা ট্যানা	১০৬
ঢাকা গেণ্ডারি	৭৮

বিঃ ১৪৭ হইতে বিঘা প্রতি ৪০ মণ গুড় উৎপন্ন হইয়াছিল। রংপুর ফার্ম্মেও ইংরাজি ১৯১২—১৩ সালে একই প্রকারে আবাদ করিয়া নিম্নলিখিত ফল পাওয়া গিয়াছিল—

সাদা ট্যানা	তিন বিঘায়	১৩০	মণ	গুড়
ডোরা ট্যানা	"	১২০	"	"
মরিসাস	"	১০৪	"	"
গেণ্ডারি	"	৭১	"	"

রাজসাহী ফার্ম্মেও গত কয়েক বৎসর এই বিঃ ১৪৭ ও ডোরা ট্যানার চাষ হইতেছে, আমি সেগুলি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গিয়াছি। লম্বায় ৮।১০ হাত ও দেখিতে খুব মোটা। সেখানেও বিঘায় ৪০ মণ ভাল গুড় হইতেছে। রাজসাহী ফার্ম্মের অধ্যক্ষ তিন বিঘা প্রতি নিম্নলিখিত সার দিতে উপদেশ দেন।

২০০ মণ গোবর
১০ মণ রেড়ীর খোল
৬ মণ হাড়ের গুঁড়া।

চুঁচুড়ার ফার্ম্মেও জাভা ইক্ষু হইতে বিঘা প্রতি ৩০ মণের উপর গুড় হইয়াছে। যাঁহারা বেশী সার দিতে পারিবেন না তাঁহারা যেন এই সকল বিদেশী আকের চাষ না করেন—ঢাকার ফার্ম্মের এই মত। আমাদের দেশী আকের চাষে অত ফলন হয় না, বিঘা প্রতি ২০।২৫ মণ গুড় হয়, কিন্তু সার কম লাগে বলিয়া উহার চাষেও বিঘা প্রতি প্রায় ১০০৲ হইতে ১৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে। বিঘা প্রতি কেবল ১০০ মণ গোবরসার দিয়া ও বিনা সিঞ্চনে রাজসাহী ফার্ম্মে ১৯১১—১২ সালে নিম্নলিখিত গুড় উৎপন্ন হইয়াছিল। ভেল্লামুখী নামক ইক্ষুই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

আকের নাম	প্রতি বিঘার খরচ	প্রতি বিঘার উৎপন্ন গুড়	প্রতি বিঘার লাভ
গেণ্ডারি	৪০৲	২৪	১১৫৲
শ্যামসারা	৩২৲	২৭	১৪১৲
ভেল্লামুখী	৩৫৲	২৮	১৪৮৲
*দেশীয় খাগড়ী	৩১৲	২১	১০৯৲

তবেই দেখা যাইতেছে যে ইক্ষুর চাষে খরচ বাদে বিঘা প্রতি ১৫০৲ টাকা লাভ হইবার খুবই সম্ভাবনা। ১৫০৲ টাকার জায়গায় ১০০৲ টাকা লাভ হইলেও ১২ বিঘা জমিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইক্ষুর চাষ করিলে বৎসরে ১২০০৲ টাকা অথবা মাসে ১০০৲ টাকা আয় হইতে পারে। এই ১২ বিঘা জমির চাষের খরচের জন্য ৪০০৲।৫০০৲ মূলধন হইলেই চলিতে পারে। যাঁহারা বেশী উপার্জ্জন করিতে চাহেন তাঁহারা ১০০ বিঘার চাষ করিলে মাসে ৪০০।৫০০ টাকার বেশী উপার্জ্জন করিতে পারিবেন। যুবকগণ একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন কি? (বিদেশী আকের cuttings পাইতে হইলে রাজসাহী ডিভিসানের অধিবাসীরা Superintendent of Agriculture Rajshahi Division এর নিকট আবেদন করিলে পাইবেন। অন্যান্য ডিভিসানের অধিবাসীরা তত্রত্য কৃষি বিভাগের Superintendentএর কাছে আবেদন করুন)।

(২) তামাকের চাষ—তামাকের চাষ আর একটি লোভজনক চাষ। রংপুরের বুড়ির হাটে কৃষি ফার্ম্মে বিভিন্ন জাতীয় তামাকের পরীক্ষা হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে দেখা গিয়াছে যে, সুমাত্রা দেশ হইতে আনীত চুরুটে বহিরাবরণের উপযোগী তামাকের চাষ বঙ্গদেশে অন্ততঃ রংপুর জেলায় খুব ভাল হইতে পারে। উপযুক্ত সার দিয়া ১৯১০—১১ সালে তিন বিঘার ১৪১৮৸৶০ আনার সুমাত্রা তামাক উৎপন্ন হইয়াছিল এবং মাত্র ২২৪৶০ আনা খরচ হইয়াছিল, সুতরাং খরচ বাদে ১১৯৪৶০ আনা লাভ হইয়াছিল। ১৯১১—১৯১২ সালেও তিন বিঘা প্রতি খরচ খরচা বাদে ৬২৪৲ টাকা লাভ হইয়াছিল। খুব কম করিয়া ধরিলেও এইরূপ তামাকের চাষে এই

সকল রিপোর্ট পড়িয়া বিঘা প্রতি ১৫০৲ টাকা লাভ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বোধ হইতেছে।

(৩) **আলুর চাষ**—আলুর চাষে অত লাভ না হইলেও বিঘা প্রতি পঞ্চাশ ষাট টাকা হইতে পারে। বিভিন্ন কৃষি ফার্ম্মে পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে, অনেক স্থানে দার্জ্জিলিংএর আলুর বীজ হইতেই আলুর সমধিক ফলন হয়। ১৯১১—১২ সালে রাজসাহী ফার্ম্মে তিন প্রকার আলুর বীজ হইতে নিম্নলিখিত পরিমাণ লাভ হইয়াছিল।

আলুর নাম	প্রতি বিঘায় খরচ	প্রতি বিঘায় উৎপন্ন আলু	প্রতি বিঘায় লাভ
ইটালীয়	২৯৲	৩৮ মণ	৪৯৲
দার্জ্জিলিং	২৩৲	৪৮ „	৭৬৲
নৈনিতাল	৩০৲	২২ „	১৫৲

দেখা যাইতেছে যে দার্জ্জিলিং এর আলু হইতে লাভ সব চেয়ে বেশী। রংপুর আদর্শ কৃষি ফার্ম্মে ১৯১১ সালে বরবটীর সবজি-সারের (green manure) ব্যবহারে প্রতি তিন বিঘায় ২৫৫ মণ দার্জ্জিলিং আলু উৎপন্ন হইয়াছিল এবং খরচ বাদে তাহাতে ১৯৩ টাকা লাভ হইয়াছিল।

উপরোক্ত হিসাব হইতে বুঝা যাইতেছে যে ফার্ম্মে ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অন্ততঃ এই তিন দ্রব্যের মধ্যে যে কোনও এক বা ততোধিক দ্রব্য চাষ করিতে পারিলে উদরান্নের ব্যবস্থা কৃষি হইতেই হইতে পারে। আরও সুবিধা এই যে ঐ তিন দ্রব্যের বিক্রয়ের জন্য আদৌ ভাবিতে হইবে না। কারণ আমাদের দেশে গুড়, আলু ও তামাকের কাটতির অভাব নাই। যাঁহার যেরূপ পুঁজি ও সামর্থ্য তিনি পাঁচ, দশ, পঞ্চাশ বা একশত বিঘা চাষ করিয়া কৃষি বিভাগের রিপোর্ট সত্য কি না পরীক্ষা করিয়া দেখুন। ইহার মধ্যে একটি কথা আছে-নিজে খাটিতে হইবে। পরের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিলে চলিবে না। নিজেকে সব দেখিতে শুনিতে হইবে। পরিশ্রম করিতে হইবে, প্রয়োজন হইলে বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে মাঠে যাইতে হইবে। তাহার উপর যে প্রণালীতে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হইবে তাহা কৃষি বিভাগের অনুমোদিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। গভর্ণমেণ্ট আমাদের দেশেরই কৃষির উন্নতির জন্য দেশের স্থানে স্থানে ফার্ম্ম খুলিয়া বিবিধ পরীক্ষা করিতেছেন। সেই সকল পরীক্ষিত ফল যদি আমরা কার্য্যক্ষেত্রে গ্রহণ করিতে না পারি তাহা হইলে বাস্তবিকই আমরা কৃপার পাত্র। মনে করিবেন না যে, এই সকল ফার্ম্মে ঘোড়ার দ্বারা ষ্টিম বা বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রে কার্য্য হয়। সেখানেও সাধারণ লাঙ্গলাদি যন্ত্র অথবা তাহাদের কোন উন্নত সংস্করণই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তবে সার প্রভৃতি যেরূপ ও যত পরিমাণে দিতে উপদিষ্ট হইবেন তাহার যেন ব্যতিক্রম না হয়। প্রথমেই জমির রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া তাহার ফল কৃষি বিভাগের কোনও কর্ম্মচারীকে জানাইলে, তিনি সেই জমিতে কোন দ্রব্যের চাষ প্রশস্ত এবং কি কি সার কত পরিমাণে ব্যবহার করিতে হইবে তাহা বলিয়া দিতে সক্ষম হইবেন। এইরূপে চাষ করিতে পারিলে

ফার্ম্মে প্রাপ্ত ফসলের সমান পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হইবে, নচেৎ সস্তায় সারিতে যাইলে আশানুরূপ ফসলের অপ্রাপ্তিতে বেচারি কৃষি বিভাগের কর্ম্মচারিগণকে যেন গালি না দেন। জমির জন্য যে খুব বেশী চিন্তিত হইতে হয় তাহা নহে। দশ পঁচিশ বিঘা জমি, ক্রয় করিয়া না হউক, খাজনা করিয়া লওয়া কিছু শক্ত নহে; চারি পাঁচশত টাকা মূলধন অন্ততঃ ধার করিয়া সংগ্রহ করাও অনেকের পক্ষে অসম্ভবপর নহে। যুবকবৃন্দ বৃথা কেরাণীগিরির বিড়ম্বনার মধ্যে না গিয়া একবার কৃষিকার্য্যের দ্বারা স্বাধীনভাবে জীবিকা-অর্জ্জনে চেষ্টিত হইবেন কি?

মাঠে কৃষি প্রদর্শন

এইত গেল শিক্ষিত সমাজের কথা। দেশের কৃষকেরা ত নিরক্ষর। তাহারা ত কৃষি বিভাগের রিপোর্ট পড়িয়া শিক্ষালাভ করিতে পারিবে না, তাহাদিগকে উন্নত কৃষিবিদ্যার কথা মুখে বলিয়া দিলেও তাহারা সে কথা বিশ্বাস করিবে না। সেই জন্য রাজা মান্ধাতা যখন হইতে এদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন সেই সময় যে কৃষি পদ্ধতি ও যন্ত্রাদি প্রচলিত ছিল তাহাই এতাবৎ কাল চলিয়া আসিতেছে। অবশ্য কৃষিকার্য্যে বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতা তাহার সহায়; কিন্তু অনেক বিষয়েই উন্নতি নিশ্চয়ই সম্ভবপর। উপযুক্ত সার প্রয়োগে উন্নত কৃষি বিদ্যায় (Intensive cultivationএর) তথ্যগুলি, নূতন যন্ত্রাদির ক্রিয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে গিয়া তাহাকে হাতে কলমে না দেখাইয়া দিলে সে কিছুই বিশ্বাস করিবে না। এইজন্য হাতে কলমে কৃষি শিক্ষাদান (Field demonstration) একান্ত আবশ্যক। সুখের বিষয় গভর্ণমেণ্ট কয়েক বৎসর ধরিয়া এবিষয়ে বিশেষ ভাবে মনোযোগী হইয়াছেন; বঙ্গদেশের এক এক ডিভিসনে এক একজন বিশেষজ্ঞ Superintendent of Agriculture নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার অধীনে কয়েকজন District Inspector আছেন এবং তন্নিম্নে অনেকগুলি Demonstrators নিযুক্ত হইয়াছেন; ইঁহাদের কার্য্য হইতেছে যে মাঠে যাইয়া ইঁহারা হাতে কলমে কৃষকগণকে উন্নত কৃষি দেখাইয়া দিবেন এবং তাহাদিগকে উৎকৃষ্ট বীজ সংগ্রহ করিয়া দিবেন। কৃষি ফার্ম্মে এতদিন কেবল পরীক্ষাই চলিতেছিল। ইহাদের পরীক্ষার সহিত কোনও সম্পর্ক নাই, ইহারা পরীক্ষালব্ধ ফলগুলি আনিয়া কৃষকের মাঠে পঁহুছিয়া দিবেন। বলা বাহুল্য দেশে কৃষির উন্নতি করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। আশা করি ইহাদের কার্য্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে এবং রাজসাহী বিভাগেই ১৪।১৫ ডিমনষ্ট্রেটারের স্থানে একশত বা ততোধিক ব্যক্তি প্রতি গ্রামে গিয়া কৃষকগণকে হাতে কলমে উন্নত কৃষি শিক্ষা দিবেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি কৃষি বিভাগের যে কনফারেন্স নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহাতেও এই মাঠে কৃষি শিক্ষাদানের প্রথার সমধিক চলন ভারতের কৃষির উন্নতির প্রধান উপায় বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। বাস্তবিক কৃষক যদি স্বচক্ষে দেখিতে পায় যে উপযুক্ত সার দিয়া তাহার ফসল দ্বিগুণ বা তিনগুণ পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা হইলে তাহার চিরানুসৃত পন্থা সে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন করিবেই করিবে। বাঙ্গালা দেশের কৃষি বিভাগের বার্ষিক রিপোর্ট পাঠে অবগত হই যে ইহারই মধ্যেই এই উপায়ে অনেক উপকার দর্শাইতেছে। এখানে দুই একটি

দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল। বহু পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে বিঘা প্রতি একমণ হাড়ের গুঁড়া সার দিলে ধানের ফলন অনেক বাড়ে, এমন কি স্থলবিশেষে দুই গুণেরও বেশী ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে, এবং আরও সুবিধা এই যে হাড়ের গুঁড়ার সার একবার ব্যবহৃত হইলে তিন বৎসর আর লাগে না। কৃষি বিভাগ হইতে প্রথমতঃ বিনা-মূল্যে বা নাম মাত্র মূল্যে হাড়ের গুঁড়া অনেকগুলি কৃষককে দেওয়া হইয়াছিল এবং কৃষি প্রদর্শকেরা তাহার ব্যবহার দেখাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার ফল ক্রমশঃ এত সন্তোষজনক হইয়াছে যে হাজার হাজার মণ হাড়ের গুঁড়া এখন জমিতে সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইতেছে এবং লোকে অগ্রিম টাকা দিয়াও কৃষি বিভাগ হইতে হাড়ের গুঁড়া পাইতে-ছেন না।

পূর্ব্ববঙ্গে আলুর চাষ বড় বেশী প্রচলিত ছিল না। সম্প্রতি কৃষি বিভাগ কয়েক বৎসর ধরিয়া দার্জ্জিলিং আলুর বীজ আনাইয়া নাম মাত্র মূল্যে বা বিনামূল্যে প্রজাদিগকে দিতেছেন এবং কৃষি প্রদর্শকগণ উহার চাষ দেখাইয়া দিতেছেন। তাহার ফলে এই কয় বৎসরে ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ পাবনা, রাজসাহী প্রভৃতি জেলায় এখন আলুর চাষ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কৃষি বিভাগ আশা করেন যে আলুর চাষ অদূর ভবিষ্যতে পূর্ব্ব-বঙ্গে একটি সাধারণ কৃষি বলিয়া পরিগণিত হইবে।

এইরূপে নানা বিষয়ে ইতিমধ্যে উন্নতি দেখা যাইতেছে ও আশা হয় ভবিষ্যতে সমধিক উন্নতি সাধিত হইবে। আমার নিবেদন এই যে সরকার বাহাদুরের নিযুক্ত এই সকল কৃষি প্রদর্শককে যেন আমরা উপযুক্তরূপে খাটাইয়া লইতে পারি। যদি আমরা নিজ নিশ্চেষ্টতার ফলে এই সকল প্রদর্শকের সাহায্য পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে না পারি তাহা হইলে বুঝিতে হইবে দেশে উন্নত কৃষির প্রচলনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়টি আমাদেরই দোষে প্রসার লাভ করিবে না।

প্রাথমিক শিক্ষায় কৃষিবিদ্যা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কৃষি আমাদের দেশের সার্ব্বজনীন কৃষি শিক্ষার প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। বলাবাহুল্য কৃষিশিক্ষাও শিক্ষা। পুসা, স্যাবোর, পুনা ও নাগপুরে কৃষিশিক্ষার জন্য বড় বড় কলেজ আছে, সেখানে অধ্যয়ন করিলে কৃষি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইতে পারা যায়। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে কৃষি বিদ্যার প্রচলন নাই বলিলেই হয়। দেশের সার্ব্বজনীন শিক্ষা যদি দেশের সর্ব্বপ্রধান শিল্পের শিক্ষা হইতে একেবারে সম্পূর্ণরূপে বিযুক্ত থাকে তাহা হইলে সেটা নিতান্ত অন্যায় হইবে বলিয়া আমার ধারণা। আমি সেই জন্য মনে করি যে অন্ততঃ পল্লীগ্রামের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল গুলিতে কৃষি শিক্ষা অল্লাধিক প্রচলিত হওয়া উচিত। ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর পরীক্ষায় ছেলেরা পরি-মিতি, ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি অধ্যয়ন করে। জানিনা যাহারা পরে কলেজে না পড়িবে, এ বিদ্যা তাহাদের কোন্ কাজে আসিবে। কিন্তু উন্নত কৃষিবিদ্যা যদি কতক কতক পরিমাণে মাতৃভাষায় নিম্ন স্কুল সমূহে পঠন পাঠনের বিষয় হয়, তাহা হইলে তাহা অন্ততঃ কৃষিজীবীর পুত্রের পরে কাজে আসিতে পারে। শিক্ষার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ প্রথম ছাত্রের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন, দ্বিতীয় অন্নসংস্থানের উপায় নির্দ্ধারণ। যে শিক্ষা নিভাজ সাহিত্যিক

ধরণের (literary) তাহাতে দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইতে পারে না বলিয়া আমার বিশ্বাস। সেই জন্য শিল্প ও কৃষি শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার অঙ্গীভূত দেখিতে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বাসনা করি।

এই সাধারণের মধ্যে কৃষি শিক্ষার বিস্তারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা একমত নহেন দেখিতেছি। লক্ষ্ণৌএ গত তৃতীয় বিজ্ঞান সম্মিলনের কৃষি বিভাগের সভাপতি ও পুণা কৃষি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ কভেন্ট্রি সাহেব এইরূপে শিক্ষা প্রচলনের সমধিক পক্ষপাতী, কিন্তু যে কৃষি কনফারেন্সের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে এই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে এরূপ শিক্ষায় কোনও লাভ হইবে না। এই কনফারেন্সে শিক্ষা বিভাগের লোক খুব কম থাকাতে শিক্ষার দিক্‌টা ভাল করিয়া দেখান হয় নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস বাস্তবিক দেশের শিক্ষা জাতীয় অভাব পূরণেরই জন্য সৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই জন্য এ ক্ষেত্রে জাতীয় সর্ব্বপ্রধান জীবিকার উপায়কে বাদ দিয়া কোনও প্রকার শিক্ষা দেশে বেশীদিন প্রচলিত থাকিতে পারে না। নিভাজ সাহিত্যিক ধরণের শিক্ষায় মানসিক উন্নতি হইতে পারে, কিন্তু কৃষি ও শিল্প শিক্ষার সহিত বিচ্যুত হইলে উহা দেশের জন সাধারণের অন্ন সংস্থান করিয়া দিতে সম্পূর্ণ সক্ষম নহে।

কৃষকসন্তানের প্রাথমিক শিক্ষা

কৃষিশিক্ষার কথা ছাড়িয়া দিলেও কৃষিজীবী ও কৃষকের বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির জন্য সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা ত অন্ততঃ চাইই। আমাদের দেশের কৃষকগণ একেবারে নিরক্ষর। কৃষির উন্নতির কথা ত দূরে থাক সামান্য হিসাব নিকাস পর্য্যন্ত ভাল করিয়া করিতে না পারাতে বহু নীচপ্রকৃতি মহাজন তাহাদিগকে ঠকাইয়া থাকে একথা সর্ব্বজনবিদিত। কৃষককুলের ঋণভার (indebtedness of peasants) তাহার অজ্ঞতার প্রধান কুফল। ভারতের অধিবাসিগণের মধ্যে তিন কোটী যাট লক্ষ বালকবালিকা স্কুলে যাইবার বয়সপ্রাপ্ত, কিন্তু তাহাদের মধ্যে মাত্র পঁচাত্তর লক্ষ অর্থাৎ শতকরা কুড়িজন মাত্র শিক্ষার্থী। মনে রাখিতে হইবে যে ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ভদ্রসন্তান, কারণ ভদ্রসমাজে শিক্ষা আইনতঃ না হইলেও কার্য্যতঃ বাধ্যকরী। অবশ্য যতদিন দেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যয়মুক্ত ও বাধ্যকরী না হইতেছে ততদিন কৃষকসন্তানের মধ্যে শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে বিস্তৃত হইবে না। তাহা যতদিন না হইতেছে ততদিন কৃষকসন্তানগণের শিক্ষার জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কি কোনও কর্ত্তব্য নাই? আসামের চা-বাগানের অথবা কয়লার খনির কুলিদের ছেলেদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সাহেব ম্যানেজারেরা বিস্তর স্কুল স্থাপন করিয়াছে, আর যাহারা স্বীয় শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অন্ন উৎপাদন করিয়া দিতেছে তাহাদের সন্তানগণকে সামান্য শিক্ষা দিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে শিক্ষিত সম্প্রদায় ব্যক্তিগতভাবে কি দায়ী নহেন? আমার মনে হয় অন্ততঃ যদি প্রত্যেক গ্রামে এক বা ততোধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তাহা হইলে অনেক কৃষকসন্তান শিক্ষা লাভ করিতে পারে। চারি পাঁচ গ্রাম পার হইয়া কৃষকসন্তান যে শিক্ষা করিতে যাইবে না ইহা নিশ্চিতঃ অতএব আমাদের সকলের চেষ্টা করা উচিত যাহাতে নিজ নিজ গ্রামে অন্ততঃ একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এরূপ স্কুল স্থাপন করিতেও তাহা

চালাইতে বেশী অর্থের প্রয়োজন হয় না, গ্রামবাসীরা একটু চেষ্টা করিলেই হয়। এসম্বন্ধে আমার একটি ক্ষুদ্র প্রস্তাব আছে। স্কুল কলেজের গ্রীষ্মাবকাশ সন্নিকট। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মাবকাশে কলেজের ছাত্রেরা তিন মাস ও স্কুলের ছেলেরা দেড়মাস ছুটি পায়। এইরূপ কলেজের ছয় ক্লাশের ও স্কুলের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রায় পঞ্চাশ হাজার শিক্ষিত যুবক এই গ্রীষ্মাবকাশে তাহাদের স্বগ্রামে ফিরিয়া যায়। এই সময়টা যদি তাহারা তাস পাশা প্রভৃতি ক্রীড়ায় ব্যয় না করিয়া গ্রামে অন্তত: একটী স্কুল স্থাপনের জন্য চেষ্টা করে তাহা হইলে মনে হয় অনেক কাজ হইতে পারে। তাহাদিগকে অর্থ দিতে হইবে না, তাহারা কেবল চাঁদা প্রভৃতি যোগাড় করিয়া স্কুল-স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। চাঁদা দিতে অনেকে প্রস্তুত, কিন্তু যোগাড় করিবার লোকের অভাব। যুবকেরা যদি এইরূপ চেষ্টা করেন তাহা হইলে পঞ্চাশ জনের মধ্যে মাত্র এক জনও কৃতকার্য্য হইলে বৎসরে এক হাজার প্রাথমিক স্কুল আমরা নিজেই স্থাপিত করিতে পারি। এবিষয়ে ছাত্রেরা কি একটু মনোযোগ করিবেন? আমাদের মহামান্য সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনন্দনের উত্তরে বলিয়া গিয়াছেন যে তিনি ভারতীয় শ্রমজীবিগণের শ্রম মধুময় করিবার জন্য এইরূপ বহু বিদ্যালয় (a network of schools) স্থাপিত হইতে দেখিলে নিতান্তই সুখী হইবেন।

কৃষকের কর্ম্মশক্তি ও ম্যালেরিয়া

কিন্তু বঙ্গদেশে কৃষিজীবী ও কৃষকের কর্ম্মশক্তির প্রধান শত্রু ম্যালেরিয়া। ভদ্রসন্তানকে কৃষিজীবী হইতে হইলে তাঁহাকে গ্রামে যাইতে হইবে, কিন্তু বঙ্গের গ্রামগুলি ক্রমশঃ ম্যালেরিয়ার আবাসভূমি হইয়া উঠিয়াছে। ম্যালেরিয়ায় প্রতি বৎসর যে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে তাহার শতকরা অন্তত: নব্বই জন হয় কৃষিজীবী ভদ্রসন্তান না হয় কৃষক, কারণ সহরে ম্যালেরিয়া কমই হইয়া থাকে। তাহার উপর মনে রাখিতে হইবে যে, যে স্থলে এক ব্যক্তি ম্যালেরিয়ায় মরিয়াছে সেখানে ভুগিতেছে অন্তত: বিশ জন। এই কাল ব্যাধিতে বঙ্গের কৃষককুলের স্বাস্থ্য এবং সেই জন্য কর্ম্মশক্তি (efficiency of labour) কত নষ্ট হইতেছে তাহা পল্লীগ্রামের কৃষকগণের শীর্ণ দেহ ও প্লীহাযকৃৎসংযুক্ত উদর দেখিলে সহজেই বুঝা যায়। প্রভূত সার সংযোগে ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিয়া কি লাভ যদি কৃষকের কর্ম্মশক্তি দিন দিন হ্রাস পাইতে থাকে? সেই জন্য মনে হয় দেশের কৃষি-সম্পদ বৃদ্ধি করিতে হইলে অগ্রে এই ব্যাধির নিরাকরণ করিতে হইবে।

সুখের বিষয় আজকাল দেশের ও দশের দৃষ্টি এই বিষয়ে পতিত হইয়াছে, ফলে এ সম্বন্ধে আলোচনা সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে। বঙ্গদেশকে ম্যালেরিয়া মুক্ত করিতে হইলে দেশের সমস্ত পুকুর ভরাট করা, জঙ্গল পরিস্কার করা, নদীর মোহানা খুলিয়া দেওয়া প্রভৃতি কর্ত্তব্য বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহা বহু ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ। তাহা যতদিন না হইতেছে ততদিন আমরা বঙ্গের পল্লীবাসী গৃহস্থেরা নিজেকে ও পরিবারস্থ ব্যক্তিগণকে যাহাতে ম্যালেরিয়া মুক্ত রাখিতে পারি তাহার চেষ্টা কি করিব না? বিশেষজ্ঞেরা যেমন একদিকে পুকুর ভরাট ও জঙ্গল পরিষ্কার করিবার উপদেশ দিয়াছেন সেইরূপ ব্যক্তিগতভাবে

ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক কতকগুলি উপায়ও নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। সেগুলি পালন করিয়া নিজেকে সুস্থ রাখিতে সচেষ্ট হই না কেন? এ সম্বন্ধে আমার দুই একটি বক্তব্য আছে নিবেদন করিতেছি।

প্রথমতঃ বিশেষজ্ঞেরা বহু পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত করিয়াছেন যে দূষিত বায়ুর দ্বারা ম্যালেরিয়া সংক্রামিত হয় না, এনোফিলিস নামক মশকের দ্বারা ম্যালেরিয়া বিষ এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হয়। ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি মূলক এই বৈজ্ঞানিক তথ্য গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন। মশা কামড়াইয়া ম্যালেরিয়া হয় একথা স্বগ্রামে গিয়া কাহাকেও বলিলে তিনি তাহা হাসিয়াই উড়াইয়া দেন। এই অজ্ঞতা দূর করিতে পারিলে পল্লীগৃহস্থ ও কৃষক মশক কুল হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে শিখিবে। সুখের বিষয় নবপ্রতিষ্ঠিত কলিকাতার Social service league এই বিষয় বঙ্গ-ভাষায় প্রবন্ধ লিখিয়া অনেককে বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু কথা হইতেছে যে গ্রামের অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর, এ প্রবন্ধ পড়িবে কয় জন? আমার মনে হয় আলোকচিত্রের (Lantern slides) সাহায্যে গ্রামে গ্রামে যাহাতে এ বিষয়ের বক্তৃতাদি হয় তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। অনেকে বোধ হয় জানেন না যে গত কয়েক বৎসর যাবৎ বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট কয়েক জন এম, বি, ডাক্তারকে এইরূপ আলোকচিত্রের সাহায্যে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি ও নিবারণ সম্বন্ধে দেশের যাবতীয় সরকারী স্কুলের ছাত্রবৃন্দকে শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। রাজসাহীতে গতবৎসর ও এ বৎসর আমি এই বক্তৃতা শুনিয়াছি। দেখিলাম ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে দেশের অজ্ঞতা দূর করিবার এইরূপ বক্তৃতাই প্রকৃষ্ট উপায়, কারণ শ্রোতৃবর্গ আলোকচিত্রের সাহায্যে ম্যালেরিয়া বিষ কিরূপে সংক্রামিত ও বর্দ্ধিত হয় এবং কোন্ কোন্ প্রতিষেধক উপায় অবলম্বন করিলে আমরা ব্যক্তিগত ভাবে ম্যালেরিয়ার কবল হইতে মুক্ত থাকিতে পারি তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারেন। আমার মনে হয় যদি গ্রামে গ্রামে এইরূপ বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা। এইরূপ বক্তৃতার জন্য এম, বি, ডাক্তার নিযুক্ত করা বহু ব্যয় সাপেক্ষ, কারণ অনেক ডাক্তার প্রয়োজন। স্বল্পশিক্ষিত ডাক্তার এমন কি পাশ করা কম্পাউণ্ডার নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় শিখাইয়া এবং এক এক সেট আলোকচিত্র দিয়া যদি গ্রামে গ্রামে বক্তৃতার জন্য পাঠান যায়, তাহা হইলে ম্যালেরিয়ার নিদান ও নিবারণ সম্বন্ধে পল্লীগৃহস্থ ও কৃষকের অজ্ঞতা অতি অল্পদিনেই দূরীভূত হইতে পারে। Social service Leagueকে এই উপায় অবলম্বন করিতে আমি বিনীত উপরোধ করিতেছি।

দ্বিতীয় বিশেষজ্ঞেরা বলিয়াছেন যে মশক দংশন নিবারণের জন্য রাত্রে মশারি ব্যবহার ও কুইনাইন ঔষধ প্রতিষেধকরূপে সেবন করিলে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে। আমরা কুইনাইন ম্যালেরিয়ার ঔষধরূপে ব্যবহার করি কিন্তু উহা যে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক তাহা সকলে অবগত নহে। সপ্তাহে বারো গ্রেন কুইনাইন সেবন করিলে উহা প্রতিষেধকের কার্য্য করে এবং যে সকল সাহেব কর্ম্মোপলক্ষে পল্লীগ্রামে থাকেন তাঁহারা

প্রায় সকলেই কুইনাইন এইরূপে প্রতিষেধকরূপে সেবন করেন বলিয়া প্রায়ই ম্যালেরিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হন না। দেখা যায় যে বর্ষার শেষে অর্থাৎ শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসেই ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বেশী। সেই সময় যদি পল্লীগ্রামের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মশারি ব্যবহার ও কুইনাইন সেবনের দ্বারা কৃষকগণকে কার্য্যতঃ দেখাইতে পারেন যে, ঐ উপায়ে নিজেকে ম্যালেরিয়া মুক্ত রাখা যায় তাহা হইলে কৃষকগণও ক্রমশঃ তাঁহাদের অবলম্বিত পথ অনুসরণ করিবে। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ম্যালেরিয়ার ভয়ে পল্লীগ্রাম পরিত্যাগ করিলে ম্যালেরিয়া সমস্যার নিরাকরণ হইবে না, তাঁহাদিগকে বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করিয়া সুস্থ থাকিয়া অশিক্ষিত কৃষক সম্প্রদায়কে কার্য্যতঃ স্বাস্থ্যশিক্ষা দিতে হইবে। বলা বাহুল্য কৃষকগণের স্বাস্থ্যের উপর তাহার কর্ম্মশক্তি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। আমি পুনশ্চ নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি যে কৃষি আমাদের দেশের সর্ব্বপ্রাচীন ও সর্ব্বপ্রধান শিল্প। বলা বাহুল্য ইহার আলোচনা ও উন্নতির সহিত জাতীয় জীবনসংগ্রাম সমস্যা ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। উত্তর বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন কর্ত্তৃক মাতৃভাষায় ইহার আলোচনার সূত্রপাত বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছে। আশা করি এইরূপ আলোচনা ক্রমশঃ সর্ব্বত্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং উহা অদূর ভবিষ্যতে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রকৃত ফলপ্রসূ হইয়া উঠিবে। এ সভায় কৃষিশাস্ত্রে অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের মূল্যবান উপদেশ শ্রবণ করিয়া শিক্ষালাভ করিবার জন্য আমরা সকলেই আগ্রহান্বিত হইয়াছি। আপনাদিগের পক্ষ হইতে এ বিষয়ে যথা কর্ত্তব্য উপদেশ দিবার জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিয়া আমার এই ক্ষুদ্র অভিভাষণ সমাপ্ত করিলাম।

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ইতিহাস *

আফ্রিকার সংক্ষিপ্ত বর্ণন

ইউরোপের দক্ষিণদিকে এবং এশিয়ার পশ্চিমদিকে আফ্রিকা মহাদ্বীপ বিদ্যমান। দেশ অতিশয় বৃহৎ হইলেও ইহাতে সুসভ্য মনুষ্যের সংখ্যা অতিশয় কম। কেবল কোন কোন রমণীয় ও মনোরম ভূমির উপর কতিপয় সভ্য মনুষ্য বসবাস করেন। ইহাঁরা অন্যদেশ হইতে

* সত্যাগ্রহের অর্থ—নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ কিম্বা নিঃশস্ত্র প্রতিকার। ইহা ইংরাজী (Passive Resistance) শব্দের অর্থ। ইহার আসল ইংরাজী (Truth Force)। আত্মাগ্রহ (Soul Force) কিম্বা প্রেমাগ্রহ (Love Force) অর্থেও ইহা অভিহিত হইতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী ভারতবাসিগণের সহিষ্ণুতা, আত্মিক বল ও স্বদেশাভিমানের উপর এই ইতিহাস প্রতিষ্ঠিত। গ্রন্থকার ইহাকে সত্যাগ্রহের সংগ্রাম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। দেশভক্ত মহাত্মা গান্ধী ইহাকে সত্যাগ্রহের ইতিহাস নামে অভিহিত করিতে গ্রন্থকারকে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।

আসিয়া এখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। অবশিষ্ট সমস্ত ভূভাগ জনশূন্য আর নিবিড় বন দ্বারা আচ্ছাদিত। এমন কত বন রহিয়াছে যাহাতে এপর্য্যন্তও মনুষ্য প্রবেশলাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। কেবল চারিদিকে ভয়ঙ্কর বনচরসমূহ স্বেচ্ছানুযায়ী বিচরণ করিতেছে। ঐ সমস্ত নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে কোথাও কোথাও মনুষ্য দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু তাহারা কেবল মনুষ্য মাত্র। উহাদিগের আকার বৃহৎ, শরীর কৃষ্ণবর্ণ, মনুষ্যই আহার সামগ্রী আর সর্ব্বদাই উলঙ্গ। ইহারা ভোজন আচ্ছাদন এবং যুদ্ধ করা ব্যতীত অন্যান্য সাংসারিক ব্যবহার বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্তও উহাদের অবস্থা প্রায়ই একরূপ প্রতীত হয়। আর্য্যগণ আপনাদের উন্নতির অবস্থায় কেবল মিশ্র আর মাডাগাস্করগণকে সভ্য করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন; মুসলমানেরা কেবল সমুদ্র-তটস্থ বর্ব্বর ও জাঞ্জিবারগণকে সভ্য করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে যদিও ইউরোপীয়ান যাত্রিগণ প্রভূত কষ্ট স্বীকার করিয়া এই ভূভাগের উৎপত্তি বিষয় নির্ণয় করিয়াছেন তথাপি সমুদয় আফ্রিকাকে সুসভ্যকরা সহজ ব্যাপার নয় বরং এই কার্য্যে কয়েক শতাব্দীও অতিবাহিত হইতে পারে। যেখানে সেখানে ইউরোপীয়ানগণ সমুদ্রতীরে আপনাদের উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছেন। আর প্রথম হইতে কিন্তু যবন উপনিবেশও বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও আফ্রিকার আন্তরিক অবস্থা ও সাময়িক বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কিছু নির্ণীত হয় নাই। আফ্রিকার মানচিত্র কেবল অনুমানের উপর নিশ্চিত হইয়াছে। ইহার চতুর্দ্দিকের সীমানা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। বিখ্যাত শাহারা মরুভূমিই ৪০ লক্ষবর্গমাইল বিস্তৃত। শাহারাকে কেবল সমুদ্রের বালুকাদ্বারা পরিপূর্ণ বলিয়া অনুমিত হয়। এই মরুভূমিতে না কোথাও কোন বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হয়, না কোথাও বিন্দু-মাত্র জল প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম কারণ এখানে ত বৃষ্টির নাম গন্ধ নাই তথাপি যদিও কখন সামান্যমাত্র বৃষ্টি হইয়া থাকে তাহাও কোন প্রয়োজনে আসে না। 'আঁধিয়া'র বেগ ইহাতে সর্ব্বদা প্রচণ্ডভাবে বর্ত্তমান থাকে; আর "লু" এর উষ্ণতা এত অধিক যে তাহাতে শরীর দগ্ধ হইয়া যাইতে পারে। কেবল চারিদিকে বালুকা রাশি, ধু ধু করিতেছে।

যেমন কুদেশ তেমন লোক বনায়।
বিধি বিচিত্র সংযোগ মিলায়॥

যেরূপ জঙ্গলী দেশ সেরূপ এখানকার অধিবাসিগণও মূর্খ, পুরুষত্ব হীন, আলস্য-পরায়ণ ও অসভ্য। না চাষ করিতে জানে, না ব্যবসাবাণিজ্য করিতে জানে; কেবল ফলমূল খাইয়া আর বন্য পশু স্বীকার করিয়া কালাতিবাহিত করে। গৃহ প্রস্তুত করিতে, রন্ধন করিতে, কিম্বা ঘোড়ার উপর চড়িতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। যদি উহাদের হস্তে কোনও প্রকারের খাইবার জিনিস দেওয়া হয় তাহা হইলে উহাকে শুঁকিয়াই ফেলিয়া দিবে আর যদি কোন মাংসের টুকরা দেওয়া হয় তৎক্ষণাৎ খাইয়া ফেলিবে। উক্ত নিবিড় জঙ্গল সমূহে গমন করা এত কষ্টকর যে রাজকীয় ক্ষেত্র মাপিবার কর্ম্মচারিগণ ছয়মাসে কেবল ১৬ মাইল মাত্র জমি মাপিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সহস্র ক্রোশের মধ্যে না কোথাও জল পাওয়া যায়, না কোথাও নগর কিম্বা বাজার দৃষ্টিগোচর হয়। কেবল দলে দলে বিহঙ্গ, মদমত্ত হস্তী, আর ভয়ঙ্কর সিংহ সমূহ আরাম পূর্ব্বক বিচরণ করে। ইহা ত প্রসিদ্ধ কথা যে আফ্রিকার

জঙ্গল সমূহে বৃহৎ বৃহৎ সিংহ বাস করে। এখানকার অধিবাসিগণ এতদূর জঙ্গলী আর অসভ্য যে থাকিবার জন্য কোনও প্রকারের বাসস্থান নির্ম্মাণ করে না। ইহাদের আবির্ভাব কালের কোনরূপ বর্ণন করিতে পারা যায় না। কারণ এপর্য্যন্ত ইহাদের কোনও ইতিহাস প্রস্তুত হয় নাই। এইরূপ ভাবে জীবন যাপন করিতে করিতে ইহাদের অসংখ্য বংশ অতীত হইয়া গিয়াছে আর আজ পর্য্যন্তও ইহারা সেইরূপ পশুভাবে জীবন অতিবাহিত করিতেছে। কতিপয় প্রদেশ মিলাইয়া আফ্রিকা মহাদ্বীপ নাম হইয়াছে। মিশ্র, ট্যুনিস, ও আলজিরীয়া প্রভৃতি প্রদেশের নাম উত্তর আফ্রিকা; গিনি, অগোলা, সীনিগাম্বিয়া ও কঙ্গো প্রভৃতি প্রদেশের নাম পশ্চিম আফ্রিকা; জাঞ্জীবার, মোম্বাসা, সোমালিল্যাণ্ড ও মোজম্বিক প্রভৃতি প্রদেশের নাম পূর্ব্ব আফ্রিকা; এবং নেটাল, কেপ, ট্রান্সভাল আর অরেঞ্জফ্রীষ্টেট প্রভৃতি প্রদেশের নাম দক্ষিণ আফ্রিকা।

দক্ষিণ আফ্রিকাতে চারিটী বড় বড় প্রদেশ আছে। উহা নেটাল, ট্রান্সভাল, কেপ এবং অরেঞ্জফ্রীষ্টেট নামে প্রসিদ্ধ। ইহার দক্ষিণ প্রান্তের নাম "কেপ অব গুড্ হোপ।" কেপটাউন ইহার রাজধানী। ইহার ক্ষেত্রফল ২,৭৬,৯৯৫ বর্গমাইল আর লোক সংখ্যা ১১,৯১,৯৫৮জন। নেটালের—উত্তরে ট্রান্সভাল এবং এই উভয়ের মধ্যে অরেঞ্জফ্রীষ্টেট নামক প্রদেশ অবস্থিত। ট্রান্সভালের ক্ষেত্রফল ১১০,৪২৬ বর্গমাইল আর লোক সংখ্যা ৫,২৮,১৭৪ জন! ইহার রাজধানী প্রামফাণ্টীন। দক্ষিণ আফ্রিকাতে বড় বড় পাহাড় বর্ত্তমান রহিয়াছে। কোথাও কোথাও সমতল ভূমিও দৃষ্ট হয়। এস্থানের জলবায়ু বাসোপযোগী ও স্বাস্থ্যকর। নেটাল আর কেপ কলোনি সমুদ্রতীরবর্ত্তী বলিয়া এস্থানে কিছু গ্রীষ্ম অনুভূত হয়। কিন্তু ট্রান্সভাল ও ফ্রীষ্টেটে শীত অতিশয় প্রবল। এ স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ইউরোপের সমতুল্য। এখানকার খনিতে হীরা, সোণা, তামা, আর কয়লা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ট্রান্সভালে সোণা বাহির করিবার জন্য আর ফ্রীষ্টেটে হীরা বাহির করিবার জন্য কয়েকটি কারখানা আছে। এইজন্য ট্রান্সভালকে সোণার দেশ (Gold field) বলে আর ফ্রীষ্টেটকে হীরার দেশ (Diamond field) বলে। এখানে প্রায় বারমাস কিছু কিছু বর্ষা হয়। কট্টু, নৌকা ও মকই (শস্যবিশেষ) এখানে প্রভূত উৎপন্ন হয়। সকল রকমের ফলমূল ও শাক সবজিও এখানে পাওয়া যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকার আদি অধিবাসী

এ স্থানের আদিম অধিবাসী আমাদের দেশের কোল, ভীল, সাঁওতাল আর গোণ্ড প্রভৃতি জাতি হইতেও অধিক অসভ্য ও বন্য বলিয়া মনে হয়। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি মিলিত জাতি আছে, তাহাদের সমষ্টিকে কাফির বলে। নিম্নে ইহাদের জাতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বর্ণন করা গেল।

বুশমেন—ইহাদের আকার ছোট, বর্ণ হলদে ও ঈষৎ লাল্‌চে। ইহারা পশু মারিয়া ভক্ষণ করে।

হোটেন্টস—ইহারা বুশমেন জাতি অপেক্ষা সভ্য। জমী চাষ করে, গরু, ছাগল ও মেষ প্রতিপালন করে। ইহারা অতিশয় আলস্যপরায়ণ, ইহাদের গাত্র হইতে এক প্রকারের দুর্গন্ধ বাহির হয়। অর্থ সঞ্চয় সম্বন্ধে ইহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কেবল

খাওয়া দাওয়া নৃত্য করা ইহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। সূর্য্য, চন্দ্র আর নক্ষত্রগণকে ইহারা ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করে।

কাফির—ইহারা বুশমেন এবং হোটেণ্টস্ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের। ইহাদের রং একেবারে কাল। কাফির জাতি তিন ভাগে বিভক্ত যথা—পূর্ব্বীয় কাফির, যুক্ত কাফির, আর পশ্চিমীয় কাফির।

পূর্ব্বীয় কাফির—ইহার জুলু, মটাবেল, গোওস, মলটু, টেম্বস আর গৈকস জাতি সমূহের মধ্যে গণনীয়।

যুক্ত কাফির—ইহারা বচুআনস, এবং ডমরস জাতির মধ্যে গণনীয়।

প্রথমাবস্থায় ইহারা কখন কখন আরবের অধীনে ছিল। বর্ত্তমানে পর্ত্তুগীজ, জর্ম্মণ আর ইংরাজ জাতি প্রায় সমুদয় আফ্রিকা অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। স্বাধীনতার জন্য ইহারা ভয়ানক সংগ্রাম করিয়াছিল। এই সকল ভীষণ সংগ্রামে ইহাদের সহস্র সহস্র জীবন আহুতি প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া শেতাঙ্গগণের অত্যাচারেও ইহাদের সংখ্যা অনেক কম হইয়াছে। ইহাদের রক্তে আফ্রিকার জনপদ প্লাবিত হইয়াছে—আর ইউরোপের সর্ব্বোত্তম সভ্যতা জনপদ সমূহে বিস্তৃত হইয়াছে। অনুমান হয় দুই চারি শতাব্দী পশ্চাতে ইহাদের সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে এবং ইউরোপের আজব ঘরে ইহাদের অস্থি-খণ্ড সংরক্ষিত হইবে। ইউরোপীয়ানগণ প্রথমে হোটেণ্টস ও পশ্চাতে বুশমানকে অধীনে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সকল হতভাগ্যগণ কামান, বন্দুক প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক অস্ত্রের সম্মুখে কিরূপে দণ্ডায়মান হইবে এজন্য নির্দ্দয়তা সহকারে মারা পড়িয়াছিল। ইহাদিগকে দেখিবামাত্র ইউরোপীয়ানগণ পশুর মত মারিয়া ফেলিতেন কিম্বা দাস বনাইয়া রাখিয়া দিতেন। এক একজন শেতাঙ্গ ভূম্যধিপতির নিকট সহস্র সহস্র গোলাম রহিত। গোলামগণের ক্রয় বিক্রয়েরও বাজার গরম রহিত। ইহার পরে ইউরেপীয়ানগণ বাণ্টু নামক জাতিকে অধীনে আনয়ন করিবার চেষ্টা করেন। ইহারা অতিশয় স্বাধীনতাপ্রিয় ও প্রবল সাহসী। এজন্য অনেক দিন ধরিয়া শেতাঙ্গগণের প্রাধান্য মলিন হইয়া রহিয়াছিল। প্রায় শতেক বর্ষ ব্যাপী ইহারা ভীষণ সংগ্রামে নিযুক্ত থাকে। এই মহা সংগ্রামে কাফিরীগণের বীরতা এবং স্বতন্ত্রপ্রিয়তার আর শেতাঙ্গগণের ক্রুরতা ও অত্যাচার-প্রিয়তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এই বিরাট যুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার ভূমি লাল হইয়া গিয়াছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকার আবিষ্কার

সত্য কথা, ভারতবর্ষ বড়ই হতভাগ্য দেশ। ভারতবর্ষের গুণরাজি শুধু ভারতবর্ষের পক্ষে মারাত্মক হয় নাই বরং অন্যান্য দেশের পক্ষেও মারাত্মক হইয়াছিল। যেরূপ ভারত-বর্ষ অন্বেষণ করিতে করিতে কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন সেইরূপ ভারতবর্ষ খুঁজিবার সময় সন ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দে বার্থোলোমিউ ডায়জ কেপ অব্ গুড্ হোপ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইংরাজীতে 'কেপ' অন্তরীপের নাম। যে সময় ভারত অন্বেষণ করিতে করিতে পর্ত্তুগীজগণ দক্ষিণ আফ্রিকার দক্ষিণ তীরবর্ত্তী এই অন্তরীপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন সে সময়ে তাঁহাদের হতাশ হৃদয়ে আনন্দের প্রবাহ উথলিয়া উঠিয়াছিল। এইজন্য তাঁহারা ইহার নাম "কেপ অফ্ গুড্ হোপ" অর্থাৎ শুভ আশার অন্তরীপ রাখিয়াছিলেন।

নয় বৎসর আগে যে রাস্তা দিয়া বার্থো-লোমিউ ভারত অন্বেষণে আসিয়াছিলেন বাস্কোডিগামাও সেই রাস্তা দিয়া ভারতের অন্বেষণে বাহির হইয়াছিলেন। আফ্রিকার দক্ষিণ অংশ ঘুরিবার পর সন ১৪৯২ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে আফ্রিকার দক্ষিণ পূর্ব্ব তটোপরি বাস্কোডিগামা একটি দেশ দেখিতে পাইলেন। বহুদিনব্যাপী সমুদ্র মধ্যে অবস্থানের পর বিশেষতঃ ঐ সময়ের বিপদ সঙ্কুল অবস্থার পশ্চাতে স্থলভাগ দেখিতে পাইয়া এই সকল অতুল সাহসী নাবিকগণ যেরূপ আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা কল্পনাতে আনিতেও অসমর্থ। অদ্য-কারদিন খৃষ্টানগণের অতিশয় আনন্দের দিন। কেন না এই ২৫শে ডিসেম্বরই মহাত্মা যীশুখৃষ্ট পবিত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইদিনে খৃষ্টানগণ মহাউৎসবে নিমগ্ন হন। নেটাল শব্দের অর্থ ধর্ম্মবিষয়ক। বিশেষ করিয়া ২৫শে ডিসেম্বরই ইহার প্রয়োগ হয়। এজন্য বাস্কোডিগামা এই দেশের নাম নেটাল রাখিয়াছিলেন।

ইউরোপীয়ানগণের প্রবেশ

সন ১৬০১ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কয়েকখানি জলপোত 'কেপ অফ গুডহোপে' আসিয়া উপস্থিত হয়। এবং সন ১৬২০ খৃষ্টাব্দে দুই জন ইংরেজ কাপ্তেন এই দেশে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের নিশানা প্রোথিত করেন। সন ১৬০২ খৃষ্টাব্দে ডচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সংগঠিত হয়। এই কোম্পানীর ১৭ জন ডাইরেক্টর ছিলেন। উক্ত ডাইরেক্টরগণের সভা চেম্বর অফ সেভে-ন্টিন্থ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এই কোম্পানী পূর্ব্বের বাণিজ্য পর্ত্তুগীজ এবং ইংরাজের প্রতিযোগিতা করিতে আরম্ভ করেন। সন ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে টেবল্ সাগরে ডচ কোম্পানীর একখানি জাহাজ ভগ্ন হয়। আর ইহার নাবিকগণকে কয়েক মাসের জন্য সমুদ্রের তীরে অতিবাহিত করিতে হয়। পরন্তু এই আকস্মিক ঘটনার পরিণাম অতিশয় বিস্তৃত হইয়া উঠে। স্বদেশে উপস্থিত হইয়া ঐ সকল নাবিকগণ এই ভূভাগ সম্বন্ধে বহুত প্রশংসা করেন। আর বলেন যে যদি কেপের মধ্যে একটি ছোট বস্তী কেল্লাবন্দীর ভিতর বসান যায় তাহা হইলে বাণিজ্য সম্বন্ধে অধিক সুযোগ ও সুবিধা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। তদনুসারে সন ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে একদল ডচ্ 'কেপে' যাইবার জন্য রওয়ানা হন। জন বানরেবিক উঁহাদের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া টেবল বে'র তীরে বাস করিতে আরম্ভ করেন এবং সুদৃঢ় কেল্লা প্রস্তুত করিয়া চাষ করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমশঃ নেটালে ডচ্ প্রবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে। ইঁহাদের দেখাদেখি কতিপয় ফ্রেঞ্চ অধিবাসী এখানে আসিয়া বাস করিতে সুরু করেন আর ডচ্‌গণের সঙ্গে একত্র মিলিত হইয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দেন। সন ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে এখানকার শেতাঙ্গ অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় বার হাজার হইয়া উঠে। কিন্তু এই সকল অধিবাসীর সুবিধাও উত্তম শাসন বিধান সম্বন্ধে ডচ্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোন মনোযোগ ছিল না। এ কারণ ইঁহা-দের শাসন অনিয়ন্ত্রিত ও রাজপ্রণালী বিরুদ্ধ হইয়াছিল। বাণিজ্যের লোভ বশতঃ ইহাদের কার্য্য অতিশয় স্বার্থপ্ররণ হইয়াছিল। কোম্পানী আপন অধিকারের মধ্যে শেতাঙ্গ প্রবাসীগণের দ্বারা কার্য্য করানই সমুচিত বিবেচনা করিতেন। এই হেতু এখানে অরাজকতার অগ্নি ধক্ ধক্ করিয়া জলিয়া

উঠে। কোম্পানীর ভয়ে এখানকার শেতাঙ্গ অধিবাসীরা বহুদূরে পলায়ন করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন; এবং তথাকার আদিম অধিবাসিগণের সহিত যুদ্ধে রত থাকেন। এখানকার আদিম অধিবাসিগণের বিনাশ হইবার ইহাও একটি কারণ।

কোম্পানীর ১৪৩ বৎসরের জুলুম শাসনের পরিণাম ইহাই হইয়াছিল যে, প্রবাসী ক্রূর ও কপট বুয়র জাতি পরিশ্রম হইতে বিমুখ হইয়াছিল। ইহারা আদিম অধিবাসিগণকে গোলাম বনাইয়া তাহাদের উপর ভয়ানক অত্যাচার করিয়াছিল। অতঃপর সন ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে এই উপনিবেশ ইংরেজ জাতির অধিকারে আসে। কিন্তু আবার সন ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইহা ডচদিগের অধিকারভুক্ত হয়। আট বৎসরে এস্থানের শাসন পদ্ধতি অনেকটা সুধরাইয়া গিয়াছিল এবং ইহাতে ইংলণ্ডের ২৪ কোটি টাকা খরচ হইয়াছিল। কিছুদিন ডচ্ শাসনাধীনে থাকিবার পর সন ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের স্থায়ী রাজত্ব এখানে স্থাপিত হয়; উহাতে প্রবাসী বুয়রগণ অতিশয় অসন্তুষ্ট হয়।

আদিম অধিবাসিগণের উদ্ধার

সন ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে লর্ড চার্লস ষ্টোমর সেটের কথানুযায়ী ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বাছা বাছা চারি হাজার ইংরাজ, স্কট, ও আইরিশকে দক্ষিণ আফ্রিকাতে প্রেরণ করেন। স্থানে স্থানে দুর্গও নির্ম্মিত হয়। মিশনারীগণ বৃটিশ রাজ্য বৃদ্ধির জন্য অতিশয় সহায়তা করেন। ইঁহাদের উদ্যোগে আদিম অধিবাসীদিগের কষ্টের পরিমাণ কিছু লাঘব হয়। ইহাঁরা বুয়র আর ইংরাজের ঘৃণিত অত্যাচারের উপর অতিশয় খড়্গহস্ত ছিলেন। লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির ধর্ম্মযাজক জন ফিলিপের চেষ্টাতে সন ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এ স্থানের আদিম অধিবাসীদিগকে গোলামপনা হইতে মুক্ত করিয়া দেন। সন ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে সমুদয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে গোলামীগিরি উঠাইয়া দিবার আইন প্রস্তুত হয়। অবশেষে চারি বৎসর শিক্ষা প্রদান করিয়া সন ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর তারিখে সমস্ত গোলামগণকে স্বাধীন করিয়া দেওয়া হয়। এই সৎকার্য্যে ব্রিটিশ গভর্ণণ্টের ১ কোটী ৮৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা খরচ হয়। এই প্রকার একটি অত্যাবশ্যক সংস্কারের জন্য শেতাঙ্গ প্রবাসিগণ মিশনারীগণের বিদ্বেষ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ইহাতে মিশনারীগণ বিন্দুমাত্রও চিন্তিত না হইয়া তাহাদিগকে সুধরাইবার চেষ্টা করিতে থাকেন। যে বৎসর গোলামী প্রথা উঠিয়া যায় ঐ বৎসর কেপকলোনিস্থ শেতাঙ্গ সম্প্রদায় আর আদিম অধিবাসিগণের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই সময়ের ব্রিটিশ গভর্ণর সার বেঞ্জামীন ডি উর্বানের অত্যাচারমূলক নীতির ফলেই এই যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই সময়ে ডি উর্বান অধিক অগ্রসর হইয়া কাফ্রি প্রদেশকে নিজ অধীনে আনয়ন করিবার যথেষ্ট সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরন্তু উপযুক্ত পাদরি ডাক্তার ফিলিপের যত্নে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ডি উর্বানের এই অন্যায় অত্যাচার বিদিত হইয়া কাফ্রি প্রদেশ হইতে তাহাকে চলিয়া আসিতে বাধ্য করেন। প্রায় ৮০০০ বুয়র ও ইংরেজ এজন্য অসন্তুষ্ট হইয়া ব্রিটিশ শাসনের বাহিরে অরেঞ্জ নদীর পরপারে নেটাল ও ট্রান্সভালে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় বুয়রগণ ইংরাজের প্রতি অধিকতর দ্বেষ করিতে আরম্ভ করে। ইহার পরিচয় সন ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে 'বলয়ে'

আর প্রসিদ্ধ বুয়র যুদ্ধে পাওয়া যায়। এই দ্বেষ ভাব আজ পর্য্যন্তও নির্মূল হয় নাই। এদিকে নেটাল ও তাহার চারি দিকে বুয়র আর ইংরাজের বসতবৃদ্ধি হইতে থাকে। এই সকল লোক স্বাধীন ছিল। ইহারা মেরিৎস-বর্গে স্বতন্ত্র প্রজাতন্ত্র স্থাপন করে।

দুইটি প্রজাতন্ত্র

ব্রিটিশ শাসনে রুষ্ট হইয়া যে সকল লোক অরেঞ্জ নদীর পরপারে অধিবাস করিতে থাকে তাহাদিগকে অধীনে আনয়ন করিবার জন্য কেপকলোনীস্থ ব্রিটিশ গভর্ণর কয়েকবার প্রযত্ন করেন, কিন্তু সফলকাম হন নাই। সন ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ইহার স্বাধীনতা স্বীকার করেন। পরিণাম ইহাই হইয়াছিল যে ট্রান্সভালের অনেক ছোট ছোট স্থানেও স্বতন্ত্র প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। সন ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে অরেঞ্জ ফ্রীষ্টেটেও এক স্বতন্ত্র প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। এই প্রকারে দক্ষিণ আফ্রিকাতে এই সময় চারিটি রাজ্য গঠিত হয়। কেপকলোনী আর নেটাল প্রদেশ ব্রিটিশ উপনিবেশের মধ্যে এবং ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জফ্রীষ্টেট স্বতন্ত্র প্রজাতন্ত্রের মধ্যে পরিগণিত হয়।

তার পর জর্ম্মণ,ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ইউরোপীয়ন জাতিগণ ইহার চারি প্রান্তে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। তখন ইহাদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ ও মারামারিও হইতে থাকে। সন ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ট্রান্সভাল প্রদেশকে আপনার অধীনে আনয়ন করেন; ইহাতে বুয়রগণ ঘোর বিরুদ্ধাচারী হইয়া উঠে। অবশেষে যখন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট মিষ্টার গ্লাডষ্টোনকে ট্রান্সভাল প্রদেশ স্বাধীন করিয়া দিবার অঙ্গীকার করেন তখন বুয়রগণ ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে এবং সন ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী ইহারা মজুয়া পাহাড়ের উপর আক্রমণ করিয়া সার জর্জ্জ কোলের সমূহ ব্রিটিশ সেনাকে মারিয়া ফেলে। এই ভয়ানক যুদ্ধে স্বয়ং সেনাপতিও মারাগিয়াছিলেন। ট্রান্সভালস্থ বুয়রগণের এই জয়ের ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্ত বুয়রগণের একতার ভাব দৃঢ় হয়। বুয়রগণ ইংরেজগণকে অতিশয় ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে। অতঃপর সন ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ৩রা আগষ্ট প্রিটোরিয়া কনভেন্সন দ্বারা বুয়রগণ স্বরাজ্য প্রাপ্ত হয় এবং সন ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের লণ্ডন কনভেন্সন দ্বারা ট্রান্সভাল অর্দ্ধস্বাধীন প্রজাতন্ত্র প্রাপ্ত হয়।

বুয়রযুদ্ধ

পবল ক্রুগারের পরিশ্রমের ফলে ট্রান্সভাল অর্দ্ধস্বাধীন প্রজাতন্ত্র প্রাপ্ত হয়। ইহার পরে পবলক্রুগার এখানকার রাষ্ট্র পতি (প্রেসিডেণ্ট) হন। ইহাঁর ইহাই মহান আকাঙ্ক্ষাছিল যে সমুদয় দক্ষিণ আফ্রিকাব্যাপী এক প্রধান প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয় এবং তাহাতে বুয়র-গণের সম্পূর্ণ প্রাধান্য থাকে। তিনি ইহার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করেন। ইংরাজগণকে রাজনৈতিক সম্বন্ধ হইতে সম্পূর্ণ-রূপে বিচ্ছিন্ন করা হয়। ট্রান্সভালে সোণার খনি বাহির হওয়াতে ইহার আদরও বাড়িয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সর্দ্দারগণের লোভের মাত্রাও বাড়িয়া উঠে। বর্ষব্যাপী ট্রান্সভাল আর ব্রিটেনের মধ্যে কাগজ পত্রে বাদানুবাদ হইতে থাকে, পরন্তু ইহার পরিণাম কিছুই ঠিক হয় নাই কেবল মনোমালিন্য বৃদ্ধি হইয়াছিল মাত্র। অবশেষে সন ১৮৯৯ খৃষ্টা-ব্দের ৯ই অক্টোবর ট্রান্সভাল গভর্ণমেণ্ট প্রিটোরিয়ার ব্রিটিশ রাজদূত সার কেনিংগ হমগ্রীণকে ৪৮ ঘণ্টার সময় প্রদান করেন।

তদনুসারে ১১ই অক্টোবর যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ট্রান্সভাল আর অরেঞ্জফ্রীষ্টেট ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রগ্রহণ করে। নেটাল আর কেপকলোনীস্থ বুয়রগণও ইহাদের সহিত যোগদান করে। দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ বোথা স্মটস্ প্রভৃতি সমুদয় বীরগণ ইংরাজ রক্তে ভূমি প্লাবিত করিতে থাকে। এই যুদ্ধে বুয়রগণ আপনাদের বীরত্বের এমন অপূর্ব্ব পরিচয় প্রদান করিয়াছিল যে জগত স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। বার বৎসরের বালক হইতে আরম্ভ করিয়া ৮০ বৎসরের বৃদ্ধ পর্য্যন্ত এই যুদ্ধের অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। এমন কি স্ত্রীলোক পর্য্যন্তও অস্ত্রধারণ করিয়া নিজের প্রাণ অকাতরে বিসর্জ্জন দিয়াছিল। কিন্তু এত বড় বৃটিশ জাতির সাম্‌নে মুষ্টিমেয় বুয়র কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে? পরিশেষে বুয়রগণ পরাজিত হয় এবং সন ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে তারিখে প্রিটোরিয়াতে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এই ভয়ানক যুদ্ধে ৫৭৭৪ জন ইংরেজ হত ও ২২৮২৯ জন আহত হইয়াছিল বুয়রগণের ৪০০০ জন সৈনিক মারা গিয়াছিল।

সন্ধির সর্ত্ত

যে সর্ত্তে সন্ধি হইয়াছিল তাহার সারাংশ এই:—

(১) প্রত্যেক বুয়র পক্ষীয় পুরুষকে অস্ত্র সহিত আত্মসমর্পণ করিতে হইবে।

(২) ঐ সকল পুরুষ যাহারা আপনাদিগকে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের প্রজা বলিয়া স্বীকার করিবে তাহারা স্বাধীন ব্রিটিশ প্রজার অধিকার প্রাপ্ত হইবে।

(৩) আত্মসমর্পণকারী কোন বুয়রের সম্পত্তি কিম্বা স্বাধীনতা নষ্ট হইবে না।

(৪) যুদ্ধের সময় কৃত কোন কার্য্যের জন্য কাহারও উপর কোনও অভিযোগ আনীত হইবে না।

(৫) পিতা মাতা যদি ইচ্ছা করে তাহা হইলে তাহাদের সন্তানগণ সরকারী বিদ্যালয়ে ডচ ভাষা শিক্ষা পাইতে পারিবে এবং উহাও আদালতে পরিচালিত হইবে।

(৬) সকলেরই পাশ গ্রহণ করিয়া শিকারের জন্য বন্দুক রাখিবার অধিকার থাকিবে।

(৭) সন্ধির পর যথা সম্ভব শীঘ্র ফৌজী শাসনের পরিবর্ত্তন হইয়া মুলুকী শাসন পরিচালিত হইবে এবং তদপশ্চাৎ স্বরাজ্য প্রদত্ত হইবে।

(৮) যে পর্য্যন্ত না দক্ষিণ আফ্রিকা স্বরাজ্য প্রাপ্ত হয় সে পর্য্যন্ত আদিম অধিবাসিগণকে প্রজার অধিকার দিবার প্রশ্ন উত্থিত হইবে না।

(৯) যুদ্ধের খরচ আদায় করিবার জন্য জমিদারীর উপর কোনও রাজকর স্থাপিত হইবে না।

(১০) বুয়র সৈনিকগণের ক্ষতি পরিপূরণের জন্য—একটি কমিশন নির্ব্বাচিত হইবে এবং যুদ্ধের জন্য জমীর যে সকল ক্ষতি হইয়াছে তাহা পুরণ করিতে সাড়ে চারি কোটি টাকা প্রদত্ত হইবে।" এই সকল বিষয় সন্ধির সর্ত্ত। ইহা পাঠ করিলে অনুমান হইবে যে এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে ইংলণ্ডের ইহাই লাভ হইয়াছিল যে বুয়রগণ কেবল নামে মাত্র ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল এবং দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ শ্বেতাঙ্গ প্রজাগণ অন্যান্য প্রজার সমান অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল।

সংযুক্ত স্বরাজ্য

১৯১০ সালের ৩১শে মে ইংলণ্ড পার্লা-

নদীয়া ও তাহার প্রত্নসম্পৎ

"বালোসা" রাজার গড়

খননকার্য্য ভিন্ন প্রত্ন-সম্পদের উদ্ধারের আশা অনেক স্থলেই বৃথা জানিয়াও কেবল মাত্র ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টি আলোচ্য বিষয়ে আকর্ষণের জন্য আমার এই প্রয়াস। কিছু দিন পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে কাঠগড়াতে সংগৃহীত ইষ্টক-প্রদর্শন উপলক্ষে আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কয়েকটী কথা সংক্ষেপে বলিয়াছিলাম। সাধারণের অবগতির জন্য সে আলোচনা প্রবন্ধের আকারে প্রকাশ করিলাম।

সম্প্রতি নদীয়া জেলাতে "বালোসা রাজার গড়" নামে এক ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই ধ্বংসাবশেষ অবশ্য আমি তৈয়ার করিয়া নদীয়া জেলার গণ্ডীর ভিতরে ফেলি নাই। এই গড় কৃষ্ণনগরের নয় মাইল উত্তরপূর্ব্বে স্থিত। গত পূজার অবকাশে একদিন এই গড় দেখিতে পদব্রজে রওনা হই। গড়ে যাইবার পথে মহারাজপুর নামে একটী গ্রাম অতিক্রম করিতে হয়।

মহারাজপুর অতি প্রাচীন গ্রাম। অনেক পুরাতন গ্রামের ন্যায় এ গ্রামও বহু জঙ্গলাকীর্ণ। গ্রামের উত্তর অংশে "রাজার দীঘি" নামে একটী মজা সরোবর দেখা যায়। ইহার চারি পা'ড়ে গহন বন। সরোবরের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে বটগাছের তলে একটী পাতলা "আদরা" ইটের ঢিপি মহারাজপুরের রাজার বাড়ীর অবশেষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। স্থানটী জলঙ্গী নদী হইতে কিছু দূরে। কোন গ্রামের পুরাতত্ত্বের আলোচনার সহিত গ্রামের নামের উৎপত্তির আলোচনাটাও থাকা আবশ্যক, অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতের এইরূপ মত। শুনা যায় যে অতি পূর্ব্বকালে স্থানীয় কোন বিস্মৃতনাম নরপতির সম্পর্কে গ্রামের নাম মহারাজপুর হইয়াছে। একজন কৃষক দীঘির উত্তরের মাঠে ধান কাটিতেছিল। সে বলিল রাজার কাছারী বাড়ী ও কেল্লা নিকটে কাঠগড়া গ্রামে ছিল। এ কথা কতদূর সত্য জানি না। মহারাজপুর অঞ্চলে অনেক পুকুর মজা অবস্থাতে দেখা যায়। রাজধানীর জন্য বহুল জল সরবরাহের ব্যবস্থা প্রাচীন নীতিশাস্ত্রে দেখা যায়।

এখন কাঠগড়ার গড়ের কথা আলোচনা করা যাক্। পরিখা খননের সময়ে তাহার একধারে যে মাটী স্তূপীকৃত করা হয় তাহাকে গড় বলে, আবার কখনও কখনও পরিখাকেও লোকে গড় বলিয়া থাকে। কাঠগড়া গ্রামের পশ্চিম মাঠে একটী প্রায় চতুষ্কোণ ও অনুন্নতশীর্ষ মালভূমি বিশেষ দেখা যায়। ইহাই আলোচ্য গড়। ইহার উচ্চতা ৭।৮ হাতের বেশী নয়। গড়ের উপরিভাগে যে সকল ভিত দেখা যায় তাহা প্রায় তিন হাত চওড়া। ভিত গুলির মধ্যে স্থানে স্থানে "আয়ত" আকারের প্রকোষ্ঠের চিহ্ন পাওয়া যায়। এ গুলিতে বোধ হয় প্রহরী থাকিবার ব্যবস্থা ছিল। পাটনা খননকার্য্যেও প্রোথিত প্রাচীরে এইরূপ প্রহরীর খোপ পাওয়া গিয়াছে শুনিয়াছি। গড়ের উপরে নকসার ইটও দু একখানি পাওয়া যায়। এরূপ একখানি ইট বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রদত্ত হইয়াছে। ইষ্টকের উপরে

ভুজঙ্গদামবেষ্টিত একটী পদ্মফুল অঙ্কিত দেখা যায়। ইহাকে নদীয়া সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষবাবু নারায়ণের অনন্তশয্যা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। গড়ের পূর্ব্বে পুষ্করিণী ও দক্ষিণে ইন্দারার চিহ্ন দেখান হইয়া থাকে। এই ইন্দারাতে আন্দাজ ৪০ বৎসর পূর্ব্বেও জল ছিল। উহাতে একটী কুম্ভীর ও এক জোড়া মাছ দেখা যাইত, এরূপ প্রবাদ আছে; কুম্ভীর ও মাছের মাথাতে নাকি সিন্দুর ঢালা ছিল! গড়ের উত্তর দিয়া "কলিঙ্গের বিল" বাহিত। Bengal Revenue Settlement এর Record এ কলিঙ্গের নীচে নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই নদীর চূর্ণীর সহিত যোগ ছিল। বিলের কাঁধা খনন উপলক্ষে সময়ে সময়ে নদীর নিদর্শনও কিছু কিছু মিলে। কলিঙ্গের জমিদার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার হালদার বি, এর মুখে একথা শুনিয়াছি। বিলের উত্তর দক্ষিণের মাঠকে "ঝনঝনে করালী" ও বিলের ওপারের মাঠকে "করালী ডেঙ্গা" বলে। গড়ের পার্শ্ববর্ত্তী মাঠ এখনও গড়ের মাঠ বলিয়াই পরিচিত। গ্রামের নাম হইতে অনুমান হয় যে কাঠগড়াতে পূর্ব্বে কেল্লা ছিল।

গড়ের এক মাইল দক্ষিণে "দম্‌দমা পোতা" নামে একটী নাতি উচ্চ ভূমি আছে। "দম্‌দমা পোতা" ইটাবেড়িয়া গ্রামের লাগাও। এখানে পূর্ব্বে পুকুর ছিল। পরে পুকুর মজিয়া বিল হয়। মাটির নীচে এখনও বাঁধা ঘাটের চিহ্ন পাওয়া যায়।

কাঠগড়ার ধ্বংসাবশেষ দেখিলেই স্থানটীর প্রাচীনত্বের বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। ইহার ইতিহাস এখনও কেহই অবগত নহে। তবে এখানে বহু পূর্ব্বে কোন রাজা ছিলেন, তাহা অশীতিপর বৃদ্ধেরাও শুনিয়াছেন। এ অঞ্চলের অনেক প্রাচীন স্থানের ন্যায় আলোচ্য স্থানটীও কিংবদন্তী বিজড়িত ও বর্গির হাঙ্গামা বিষয়ক জনপ্রিয় প্রবাদের হাত হইতে এড়াইতে পারে নাই। এখানে প্রচলিত আর আর কিংবদন্তী গুলি ন্যূনাধিক অস্বাভাবিক। স্থানের পূর্ব্বগৌরব না থাকিলে তাহার উপরে অলৌকিকত্বের আরোপ অনেক স্থলেই সম্ভব নহে। তাই বলিয়া আমি কিংবদন্তীর মূল্য অধিক দিতেছি না। * স্থানটীর সহিত কোন বিষাদময় ব্যাপারের সংশ্রব আছে কি না আমরা জানি না। সাধারণের ধারণা যে গড়ের ইষ্টক লওয়া বা উহার সম্পর্কে আসাও বিপজ্জনক! বাঁশবেড়িয়ার এক সাহেব কয়েক গাড়ী ইট লইয়া গিয়া নাকি ফেরৎ পাঠাইয়া দেন। আর এই গড়ে "খামার" করাতে নাকি কাঠগড়ার লোকের সমূহ অনিষ্ট ঘটিয়াছিল।

অনুসন্ধান ক্রমে "দহের খালের" নিকটে জাবাতে আসিয়া জনৈক বৃদ্ধা "দেয়াসীনের"

* গড়ের বিষয়ে একটী বড় করুণ অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। গরু বাথাল "দেওয়ার" উপলক্ষে চাষারা মাঠে যাইত। ইহাদের মধ্যে এখনও জীবিত মুরুব্বি লোকের মুখে শুনা যায় যে তাহাদের বালককালে মধ্যে মধ্যে অন্ধকার রাত্রিতে একটী অলৌকিক দৃশ্য তাহাদের নয়নগোচর হইত। সকলে "নিশুতি" হইলে একখানি তাঞ্জাম গড় হইতে উঠিতে দেখা যাইত। ইহা ১৬ জন বেহারায় বহিত ও ইহার সম্মুখে ২ জন ও পিছনে দুজন মশাল ধরিয়া যাইত। আর আগে পিছু উপযুক্ত সৈন্য সামন্ত চলিত। ঘোর রজনীতে এই যাত্রা গড়ের পার্শ্ব হইতে বাহির হইয়া কলিঙ্গের বিল বাহিয়া তাহার পশ্চিম বাঁকে আসিয়া কোথায় মিলিয়া যাইত, সঙ্গে সঙ্গে আলো নিবিয়া যাইত, সে অসংখ্য পাদক্ষেপ আর দেখা যাইত না—যেন নদী বাঁকে আসিয়া সব ফুরাইত—কেবল এক অপার্থিব বিলাপের রোল আকাশ মার্গে উঠিতে থাকিত!

মুখে শুনিয়াছিলাম যে উক্ত গড় "বালোসা রাজার" বা "বাল বাদসা"র। বালোসা রাজার বিষয়ে সে বেশী কিছু জানে না। এই বাল রাজের বিষয়ে অনুসন্ধান আবশ্যক।

উক্ত জাবার পূর্ব্বভাগে "দম্‌দমা" নামে একটী উচ্চ ভূমি আছে। শুনিলাম এখানে পূর্ব্বে কোন মহাপুরুষ চেলাগণকে ভোজ দিয়াছিলেন। এই "দম্‌দমা"র দক্ষিণে "মুক্তোদা" উত্তরে "ফেনজোলা" ও কিছু পশ্চিমে দয়ের খালের দিকে "জোড়াপুকুর" নামে বিল আছে। শুনিলাম ঐ ভোজ উপলক্ষে "জোড়া পুকুরে" পাক হয়, ফেন জোলাতে ফেন ফেলে, দম্‌দমাতে ভাত ঢালে ও মুক্তোদাতে মুখ ধোয়।" লোকের মুখে শুনা যায়—রান্নার পর যে ছাই জমা হইয়াছিল তাহার ঢিপি আর যেখানে সাধু মহাপুরুষ—ভাতের কাটি পুঁতিয়াছিলেন সেখানে মাধবী কুঞ্জ এখনও দেখা যায়। 'দম্‌দমা"তে প্রতি মাঘী পূর্ণিমাতে মেলা হয়। হদোর রামভদ্র পালের কোন ধার্ম্মিক পূর্ব্ব পুরুষ ইহার প্রবর্ত্তন করেন।

আলোচ্য মহারাজপুর, দমদমা ও কাঠগড়া স্কুল কলেজের ছাত্রগণের পরিদর্শনের বিষয়। এইরূপ পরিদর্শনে তাঁহাদের অনুসন্ধিৎসার বৃদ্ধি এবং শারীরিক ও মানসিক স্ফূর্ত্তিলাভের বিশেষ সম্ভাবনা আছে। এ বিষয়ে রীতিমত ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের আবশ্যক। এস্থানে কোন শিলালিপি ও মুদ্রা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদের হাতে আসিয়া পড়ে নাই ও ইহা এই বাংলা দেশের সমতলে অবস্থিত বলিয়া ইহাকে সামান্য ঢিপি বিবেচনায় অবহেলা করা উচিত নয়। আমাদের বিশ্বাস এখানে খননে ঐতিহাসিক উপাদান মিলিতেও পারে। আশাকরি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের দৃষ্টি আলোচ্য গড়ের উপর পড়িবে।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

অভিব্যক্তিবাদ

ভূতাভিব্যক্তি বাদ

(৬০৭ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

নীহারিকা হইতে জগৎ উৎপত্তি হয় বলিলে কোন নির্দ্দিষ্ট অবস্থা (concrete form) হইতে জগতের আরম্ভ হয়—ইহাই স্বীকার করা হয়; কিন্তু স্পেনসারের মতে জগতের ঈদৃশ ইতিহাস সর্ব্বথা অসম্পূর্ণ (any account which begins with it in a concrete form or leaves off with it in a concrete form is incomplete.

দ্বিতীয়তঃ স্পেনসার এই নির্ব্বিশেষ অনির্ব্বাচ্য পদার্থের রূপান্তর প্রাপ্তির যে হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাও যুক্তিসহ বলিয়া বোধ হয় না। এই নির্ব্বিশেষ পদার্থ কেন নিয়ত পরিবর্ত্তিত—রূপান্তরিত হয়? স্পেনসার বলেন ঐ পদার্থ অস্থির স্বভাব—সর্ব্বদা চঞ্চল; রূপান্তর গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু একথা কতদূর সঙ্গত একটু ভাবিয়া দেখা যাউক। সাংখ্যের প্রকৃতির ন্যায় যে পদার্থ নির্ব্বিশেষ—যাহাতে স্বগত

ভেদের গন্ধ মাত্র নাই—তাহা নিয়ত সাম্যাবস্থায় না থাকিয়া কেবল অবস্থান্তর গ্রহণ করে কেন? নির্ব্বিশেষ পদার্থে চাঞ্চল্য কি প্রকারে আসিবে? আমরা দেখিতে পাই যে পদার্থ যথার্থতঃ নির্ব্বিশেষ নহে, যথা যে পদার্থ আপেক্ষিক ভাব—অপর পদার্থের তুলনায় কতকটা নির্ব্বিশেষ তাহাই বাহ্য কারণে ক্ষোভিত, বৈচিত্র্যময় ও জটিল হইয়া থাকে। এমন কি এই বাহ্য কারণ না থাকিলে তাহার অবস্থা কিঞ্চিৎমাত্রও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। স্পেনসার যে সকল অবিশেষ হইতে বিশেষারম্ভের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার একটিতেও এই বাহ্য কারণ-নিরপেক্ষতা সপ্রমাণ হয় নাই। তাঁহার নির্ব্বিশেষ বাহ্য নিমিত্ত জগৎই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাই অধ্যাপক ওয়ার্ড বলেন:—

"Moreover all such instances require that besides homogeneous and unstable object, or the heterogeneous or unstable object, as the case may be, there should be external forces affecting it. An egg alone in the void would neither hatch nor cook nor smell; it is on the object + external causes that the result—be it more, be it less complexity—essentially depends."

যাহা হউক স্পেনসার নির্ব্বিশেষ পদার্থের প্রবর্ত্তক রূপে বাহ্য নিমিত্তনিচয় আবশ্যক বুঝিয়াও তাহাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এই বাহ্য নিমিত্ত নিচয়কে উপেক্ষা করিলে যে নির্ব্বিশেষ পদার্থের পরিণাম একান্তই অসম্ভব হয়, তাহা তাঁহার প্রগাঢ় বুদ্ধির নিকট কখনও প্রতিভাত হয় নাই, ইহাই আশ্চর্য্য। তাই তিনি সগর্ব্বে বলিয়াছেন, "The absolutely homogeneous must lose its equilibrium." কিন্তু যতই গর্ব্বসহকারে উক্ত হউক না কেন, আচার্য্য শঙ্কর সাংখ্যমত খণ্ডন করিতে যাইয়া যে আপত্তি তুলিয়াছিলেন তাহা অকাট্য। তিনি বলিয়াছিলেন—"বাহ্যস্য কস্যচিৎ ক্ষোভয়িতুরভাবাৎ গুণ বৈষম্য নিমিত্তো মহদাদ্যুৎপাদো ন স্যাৎ। বৈষম্যোপগমযোগ্যা অপি গুণাঃ সাম্যাবস্থায়াং নিমিত্তাভাবান্নৈব বৈষম্যং ভজেরন।" বাস্তবিক নির্ব্বিশেষ পদার্থ বৈষম্যোপগম যোগ্য হইলেই যে স্বতঃ পরিণাম স্বভাব হইবে তাহা নহে; বাহ্য কারণ ব্যতীত উহার সাম্যভাব ক্ষোভিত হইতে পারে না। সাম্যাবস্থার অর্থই চাঞ্চল্যরহিত স্থির অবস্থা। বাহ্য অতি সামান্য শক্তির প্রয়োগেও সেই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিতে পারে বটে, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন বাহ্য শক্তি তাহার উপর প্রযুক্ত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাতে বৈষম্য—চাঞ্চল্য উৎপন্ন হইতে পারে না। পদার্থ যদি নির্ব্বিশেষত্ব বশতঃই অস্থির স্বভাব—নির্ব্বিশেষ বলিয়াই অস্থির—হইত, তাহা হইলে এই নির্ব্বিশেষকে বিশিষ্টাকারে পরিণত করিবার জন্য তাপাদির হ্রাস ও বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক নিচয়ের অভ্যুপগম কদাচ আবশ্যক হইত না। এগুলি অপরিহার্য্যরূপে আবশ্যক হয় বলিয়াই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, বাহ্য নিমিত্ত ব্যতীত, আপনা হইতেই, নির্ব্বিশেষ পদার্থের সাম্যভাব বিচ্যুত হয় না। * অধ্যাপক ওয়ার্ড বলেন—

* স্পেনসার বলেন—"Already this has been tacitly implied by assigning unlikeness in the exposure of its parts to surrounding agencies, as the reason why an uniform mass loses its uniformity." F. P. P. 426.

"Again if the instability is due to homogeneity simply, why is it essential to reduce the temparature and to insure "the presure of the varying surrounding affinities" before the lapse into heterogeneity can begin? If the homogeneity were absolute—that of Lord Kelvin's primordial medium, say,—than the stability would be absolute too. In other words, "if the indeinite, incoherent homogeneity" in which, according to Mr. Spencer, some rearrangement must result, were a state devoid of all qualitative diversity, and predicable of the universe, then............any 'rearrangement' could result only from external interference; it could not begin from within."

এক্ষণে যদি ব্রহ্মাণ্ডকে একটি মাত্র বস্তু বলিয়া ধরা যায় ও তাহাকে নির্ব্বিশেষ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ব্রহ্মাণ্ডের আর বাহ্য 'পারিপার্শ্বিক' কিছু থাকে না যাহার প্রভাবে উহার সাম্যাবস্থা পরিবর্ত্তিত হইবে এবং উহাতে বৈষম্যের আবির্ভাব ঘটিবে। অতএব স্পেনসারের স্বকীয় দৃষ্টান্তগুলিই তাঁহার মতের পোষকতা না করিয়া বরং তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। পক্ষান্তরে নির্ব্বিশেষ পদার্থ স্বভাবতঃ পরিণামী নহে, এই মতই দৃঢ়রূপে সমর্থিত হইতেছে।

স্পেনসার হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, কেন? প্রকৃতি স্বতঃ পরিণামী না হইতে পারে কেন? নির্ব্বিশেষ পদার্থ স্বতঃই পরিণাম স্বভাব—এ কথা বলিলে দোষ কি? বাহিরের শক্তি ব্যতীত যে নির্ব্বিশেষ পদার্থের সাম্যাবস্থা বিচ্যুত হয় না এমন কোন নিয়ম নাই। ইহার উত্তরে বলা যায় স্পেনসারের স্বয়ং উদাহৃত দৃষ্টান্তাবলীই তাঁহার মতবাদের পরিপন্থী। বাহ্য শক্তি নিরপেক্ষে কোন বস্তু রূপান্তরিত হইয়াছে, তিনি এ প্রকার কোন নিদর্শন দিতে পারেন নাই; তিনি যে সকল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন—সকল গুলিই বাহ্য শক্তির সাপেক্ষত্ব বোধক।*

তৃতীয়তঃ। ইহা ব্যতীত অন্য প্রকার যুক্তিও দেওয়া যাইতে পারে। অচেতন পদার্থ স্বতঃই ব্যক্ত—স্বতঃই গতিশীল হইতে পারে, এ সিদ্ধান্ত স্বীকারে গতির প্রাথমিক নিয়মটিই (the first law of motion) বাধিত হয়। ঐ নিয়ম বলিতেছে জড়ত্বের ধর্ম্মই এই যে নিমিত্তান্তর ব্যতীত জড় কথনও স্বকীয় অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে অসমর্থ। জড় স্বশক্তি প্রভাবে স্থির অবস্থা হইতে চঞ্চল অবস্থায়, কিম্বা চঞ্চল অবস্থা হইতে স্থির অবস্থায় প্রবৃত্ত হইতে পারে না। পণ্ডিত ওয়ার্ড বলেন—

"To suppose that matter in however unstable a condition can be set in motion without receiving any energy from without is not to find a loophole within the mechanical theory, but to deny the

* The instability thus variously illustrated is obviously consequent on the fact, that the several parts of any homogeneous aggregation are necessarily exposed to different forces—forces that differ either in kind or amount; and being exposed to different forces they are of necessity differently modified. F. P. P. 404.

absolute validity of its most fundamental conception—that of inertia. If such an assumption is legitimate, the first law* of motion is not true."

বিশেষতঃ নির্ব্বিশেষ বলিতেই যে অস্থির স্বভাব—পরিণাম স্বভাব বুঝিতে হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। নির্ব্বিশেষ বলিতে বরং কূটস্থ নির্ব্বিকার ভাবই স্বতঃসিদ্ধরূপে আমাদের মনে উদিত হয়। নির্ব্বিশেষকে যে অস্থির স্বভাব হইতেই হইবে ইহা যদি স্বতঃসিদ্ধরূপে কিম্বা প্রত্যক্ষতঃ উপপন্ন না হইল, তখন অবশ্যই তাহার পরিণামে বাহ্য হেতু অপেক্ষিত হইবে।

চতুর্থতঃ। স্পেনসার মনে করেন, শক্তির অবিনশ্বরতা (persistence of force) উহার পরিণাম প্রবর্ত্তক। অর্থাৎ যেহেতু শক্তি নিত্য নিরপায়ী সেই হেতু উহা পরিণাম স্বভাব। এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই এক অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় শক্তির বিভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে যে, শক্তির নিরপায়িতা বিকার বা পরিবর্ত্তনের হেতু নহে; ইহা কোন প্রকার অবস্থান্তরের উৎপাদক নহে; ইহা একটি পারিমাণিক নিয়ম মাত্র, গুণগত বৈচিত্র্যের নিয়ামক নহে। শক্তি রূপান্তরিত হইলেও উহার পরিমাণ অক্ষুণ্ণ থাকে—ইহাই শক্তির অবিনশ্বরতার তাৎপর্য্য। কিন্তু কি কি নিমিত্তবশাৎ ও কোন কোন অবস্থায় ইহার পরিবর্ত্তন আরব্ধ হয়, শক্তির অবিনশ্বরত্ব হইতে তাহার কোন সন্ধান বা ব্যাখ্যা আমরা প্রাপ্ত হই না। অমুক অমুক নিমিত্ত সহযোগে শক্তির আকার পরিবর্ত্তিত হইলে, পূর্ব্বাকারে উহার যে পরিমাণ ছিল, অভিনব আকারেও উহার ঠিক সেই পরিমাণ রহিয়াছে—পরীক্ষা প্রণালী দ্বারা এই টুকুমাত্র আমরা অবগত হই। অধ্যাপক ওয়ার্ড বলেন:—

"But the conservation of energy is not a law of change still less a law of qualities. It does not initiate events, and furnishes absolutely no clue to qualitative diversity. It is entirely a qualitative law. When energy is transformed, there is precise equivalence between the new form and the old, but of the circumstances determining transformation and of the possible kinds of transformation the principle tells us nothing. If energy is transformed, then the system doing work loses precisely what some other part of the universe gains; but again the principle tells us nothing of the conditions of such transferences."

স্পেনসার নিজেও বলিতেছেন, যে শক্তির নিত্যতা আমরা প্রতিপাদন করিতে যাইতেছি, সে শক্তি আমাদের পরিচিত প্রযত্নরূপী শক্তি নহে; কেন না প্রযত্নরূপী শক্তির নিত্যতা আমরা কদাচ প্রত্যক্ষ প্রমাণে অবগত হইতে পারি না। তবে যে শক্তি শাশ্বত, নিত্য, অব্যয়,—সে কোন্ শক্তি? স্পেনসার বলেন

* নিয়মটি এই—"Every body perseveres in its state of rest or of moving uniformly in a straight line except in so far as it is made to change that state by external forces."

তাহা আমাদের জ্ঞানাতীত—ইন্দ্রিয়ের অগোচর। সুতরাং তাহা পরীক্ষা যোগ্য খণ্ডশক্তি নহে। স্পেনসার বলেন :—

But what is the force of which we predicate persistence? It is not the force we are immediately conscious of in our muscular efforts; for this does not persist. Hence the force of which we assert persistence is that Absolute Force of which we are indefinitely conscious as the necessary correlate of the force we know. By the persistence of force, we really mean the persistence of some cause which transcends our knowledge and conception [p.p. 192c & 192d F.P.]

[পাঠক, লক্ষ্য করিবেন—স্পেনসার অবাঙমনসোগোচর শক্তির সম্বন্ধেই নিত্যতা সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু যাহা মন বুদ্ধির অতীত তাহার সম্বন্ধে এ প্রকার কিছু বলা যায় কি না তাহা বিবেচ্য। যে পদার্থ অবিজ্ঞেয় তাহার শক্তি যে নিত্য—অব্যয়, তাহা জানিবার উপায় কি? এবং তাহা যদি জানা সম্ভব হয়, তবে সে পদার্থকে অবিজ্ঞেয়—জ্ঞানের অগোচর—বলিতে পারা যায় কিরূপে?]

স্পেনসার নির্বিশেষ বস্তুর স্বাভাবিক অস্থিরতা (Instability of the Homogeneous) সম্বন্ধে যে অধ্যায়ের অবতারণা করিয়াছেন, তাহার কতকটা অংশে রাসায়নিক বৈচিত্র্য আলোচিত হইয়াছে। উহার এক স্থলে তিনি বলিতেছেন—

"Without entering into qualifications for which space fails, we believe no chemist will deny it to be general law of these inorganic combinations that *other things equal*, the stability decreases as the complexity increases. When we pass to the compounds of organic chemistry, we find this general law still further exemplified: we find much greater complexity and much less stability. পুনশ্চঃ—Chemical stability decreases as chemical complexity increases" কিন্তু প্রকৃতির পনর আনা বস্তু রাসায়নিক প্রক্রিয়া সমুদ্ভূত। এবং এই পনর আনা স্থলে দেখা যাইতেছে, জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, স্থিরতা তিরোহিত হয়। যে পরিমাণে রাসায়নিক জটিলতার বৃদ্ধি, সেই পরিমাণে বস্তুর স্থিরতার হ্রাস। সুতরাং বস্তুগুলি যত সরল—যত নির্বিশেষ ভাবের অভিমানী, উহাদের স্থিরতা বা স্থায়িত্বও তত বেশী। তাহা হইলে, যাহা যথার্থতঃ নির্বিশেষ—তাহা যে একান্ত স্থির স্বভাব হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? অতএব নির্বিশেষ বস্তু যে স্বভাবতই অস্থির স্বভাব—পরিণাম স্বভাব—সে সিদ্ধান্ত অন্ততঃ রাসায়নিক জগতে সত্য বলিয়া অঙ্গীকৃত হইতে পারে না।

স্পেনসার অভিব্যক্তির যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"অবিশেষের বিশিষ্টভাবে আগমন"—সে সংজ্ঞাও অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট। বস্তুর প্রধ্বংস অবস্থায় পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে জটিলতার (heterogeneity) আগম হয়—বস্তুর ধ্বংসাবস্থা স্থিত্যাবস্থাপেক্ষা

অনেক মিশ্র—জটিল; কিন্তু তাই বলিয়া সে অবস্থা কি বস্তুর অভিব্যক্ত—ব্যাকৃত অবস্থা? সরল অবস্থা হইতে অপেক্ষাকৃত জটিল অবস্থায় পরিণতিই কি অভিব্যক্তি? তাহা নহে; কেবল জটিলতার পরিবর্ত্তন হইলেই সে পরিবর্ত্তনকে অভিব্যক্তি (evolution) বলা যায় না; কেন না ধ্বংসাবস্থায়ও জটিলতা পরিদৃষ্ট হয়। অভিব্যক্তিও প্রধ্বংস (evolution & dissolution) পরস্পর বিরোধী অবস্থা। অভিব্যক্তিতে বস্তুর উন্নতি ও প্রধ্বংসে বস্তুর বিনাশ বা বিলোপ বা অধোগতি সূচিত হইয়া থাকে। এবং স্পেনসার অভিব্যক্তির যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা এই প্রধ্বংস সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে। স্পেনসারের অনুরক্ত ভক্ত Hudson এ কথাটার প্রতি কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিয়া বুঝিয়াছেন, স্পেনসারের উক্তি অযৌক্তিক। তিনি বলেন :—

"The mere change in the direction of increasing heterogeneity or complexity could not.........be held to constitute evolution, since there are many such changes which make, not for evolution,but for destruction. An injury to an organism renders that organism more multiform in its composition; a cancer in the system produces marked increase in heterogeneity; a revolution in the social state makes the state far less homogeneous; but we look upon none of these changes as changes in the line of progress or evolution. On the contrary, we see at once that they tend in the opposite direction—in the direction of dissolution; for let them go on long enough and far enough, and dissolution will be the inevitable results." *

একজন শারীরবিদ পণ্ডিত বলেন—

"I have already referred to the fact that these changes are now commonly described as "differentiation," an abstract expression which simply means the establishment of differences, without any reference to the peculiar nature of those differences, or their relations to each other and to the whole. But the inadequacy of the word to express the facts is surely obvious. The processes of dissolution and decay are processes of "differentiation" quite as much as the processes of growth and adaptation to living functions. Blood is differentiated just as much when, upon being split upon the ground, it separates into fibrine, serum and corpuscles, or finally into its inorganic elements, as when, circulating in the vessels, it bathes and feeds the various tissues of the

* Introduction to the Philosophy of Herbert Spencer by W. H. Hudson.

living Body. But these two operations—these two kinds of "differentiation"—are not only distinct but absolutely opposite in their nature and there does not seem to be much light in that philosophy which insists on using the same formula or expression to describe them both. It is a phrase which empties the facts as we can see and know them, of all that is special in our knowledge of them. *

অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি বিভিন্ন ব্যাপার বুঝাইতে যে সংজ্ঞা প্রযুক্ত হয়, তাহা স্বীয় লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিতে পারে না। স্পেনসারের অভিব্যক্তিবাচক সংজ্ঞা তাই অতি ব্যাপক হইয়া পড়িতেছে।

আরও একটি বিষয় দ্রষ্টব্য আছে। প্রকৃতির এই বিপরীত পরিণতি যাহাকে আমরা প্রলয় বলিতেছি—তাহার বাহ্যাবস্থাকেও স্পেনসার শক্তির অবিনাশিতাকেই কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে অভিব্যক্তি যেমন শক্তির অবিনাশিত্ব হেতুক, প্রলয়ও সেই প্রকার শক্তির অবিনশ্বরতা হেতুক। শক্তি নিত্য; তাই সে সাম্যাবস্থা হইতে বৈষম্যে আগমন করে; শক্তি নিত্য; তাই সে পুনর্ব্বার বৈষম্য হইতে সাম্যাবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করে। অতএব তাহার মতে এই বিপরীত প্রক্রিয়াদ্বয়ের একমাত্র কারণ শক্তির নিত্যতা।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে—যদি শক্তির অনপায়িত্বই তাহার অনুলোম ও বিলোম পরিণতির একমাত্র হেতু বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, কখনও ইহার অনুলোম পরিণতি, কখনও বিলোম পরিণতি হয় কেন? শক্তি যখন সাম্যভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন বহির্বস্তুর প্রবর্ত্তকতা ব্যতীত, তাহার সেই সাম্যভাবের চ্যুতি হইতে পারে কি? সাংখ্যের প্রকৃতি আলোচনায় এ কথার নির্যুক্তিকতা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সুতরাং এখানে আর সে তর্কের পুনর্ব্বার অবতারণা বাঞ্ছনীয় নহে। একটি বীজ বৃক্ষেই পরিণত হউক, বা বিনষ্টই হউক, একটি পরিবর্ত্তন যেমন শক্তির নিত্যতা হইতে অনুমিত হইতে পারে, অপর পরিবর্ত্তনও সেই প্রকার অনুমিত হইতে পারে; অথবা একটি পরিবর্ত্তন যেমন অনুমিত হইতে পারে না, অপর পরিবর্ত্তনটিও সেই প্রকার অনুমিত হইতে পারে না। শক্তির কেন এই প্রকার বিপরীত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, স্পেনসারের উক্তি হইতে তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে বুঝিতে পারা যায় না।

স্পেনসার সম্ভবতঃ শক্তি অর্থাৎ কার্য্যকরী ক্ষমতা ও কৃতকার্য্যকে অভিন্ন মনে করিয়া বলিতেছেন—"যতক্ষণ শক্তির পরিমাণ অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ততক্ষণ শক্তি নিরন্তর সমাবর্ত্তন পরায়ণ।" কিন্তু ইহা শক্তি সংরক্ষণের অবশ্যম্ভাবী ফল বলিয়া প্রতিভাত হয় না। বিশেষতঃ যদি শক্তির প্রধ্বংসবাদ সত্য হয়, তবে ত ইহা অসম্ভবই হইয়া পড়ে। কেন না, কেবল শক্তির নিত্যতার উপর এই সমাবর্ত্তন নির্ভর করে না। শক্তির রূপ যাহাই হউক না কেন, উহা উচ্চ ভূমি হইতে নিম্ন ভূমিতেই সঞ্চারিত হইয়া থাকে। সেই জন্য গুরু বস্তুকে পতিত হইতে, উষ্ণ বস্তুকে শীতল হইতে দেখা যায়। অতএব উভয়

* Text-book of Physiology by Prof. Forster of Cambridge.

বস্তুর সংস্থিতগত ও উষ্ণত্বগত বৈষম্যই তন্নিষ্ঠ শক্তির যতটুকু পরিমাণ কাজে লাগান যাইবে তাহার নিয়ামক। যেখানে এই বৈষম্য অবিদ্যমান, সেখানে বস্তুনিষ্ঠ শক্তিকে কাজে লাগান অসম্ভব। তাপের স্বভাবই উষ্ণ ভূমি হইতে শীতল ভূমিতে গমন করা। এই প্রকারে চলিবার সময় তাহা হইতে কতকটা কাজ পাওয়া যায়। কিন্তু যদি সকল ভূমিই সমান উষ্ণ থাকে, তাহা হইলে তাপও সঞ্চারিত হইবে না, তাহা হইতে কাজও পাওয়া যাইবে না। সাধারণতঃ সম-পরিমিত কার্য্য না জন্মাইয়া সঞ্চারিত হয় না; কিন্তু তাপ সম্বন্ধে এই নিয়ম খাটে না। তাহার কতকটা অংশ কার্য্যে লাগে বটে, কিন্তু আর কতকটা অংশ অপব্যয়িত হয়। এবং এইখানেই শক্তির অপচয়ের অবসর: পণ্ডিত ওয়ার্ড বলেন :—

Apparently, too, Mr. Spencer confuses energy or the *capacity of doing work* with work actually *done*, and imagines that so long as the quantity of energy persists, it must be manifest in perpetual changes of equivalent amount. But this in any case is not a necessary consequence of the conservation of energy, and if the dissipation of energy be true, it is an impossible consequence. For it is not on the bare persistence of energy, but on the transference and transformation of energy that physical changes depend. But energy, whatever be its form, is only transferrable from places of higher "intensity" to places of lower intensity, to use a convenient term. So we find heavy bodies tend to fall, hot bodies to cool, and so forth. Thus the amount of energy available for work of the total of the energy possessed by two bodies is a function of this difference of level or intensity, and is *nil* when the difference is *nil*, whatever total energy be. Generally speaking energy is not transferred without an equivalent transformation into work; but to this thermal energy is an exception. And it is here that the so-called waste or dissipation of available energy comes in.

স্পেনসার একস্থলে বলিতেছেন—নির্ব্বিশেষের বিশেষে পরিণতিই;—উন্নতি! সুতরাং অভিব্যক্তি শব্দটি তাঁহার মতে উন্নতির উপলক্ষণ। যথা:—From the earliest traceable results of civilization, we shall find that the transformation of the homogeneous into the heterogeneous is that in which progress essentially consists (pp. 7 & 8 Essays) *

কিন্তু পূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, অবিশেষের বিশেষে আগমনই উন্নতি নহে; কেন না বিধ্বংস কালেও বস্তুর আপেক্ষিক অবিশেষ ভাব হইতে বিশেষ ভাবে পরিবর্ত্তন দেখা যায়। এবং বিধ্বংস কখনও উন্নতি বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। যে বিশেষ ভাবে বস্তুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উচ্ছৃঙ্খল ও অসমঞ্জস হইয়া যায় এবং বস্তুর স্থিতি বিষয়ে পরস্পরে সহযোগিতা করে না, সে বিশেষ ভাবে বস্তু

* Spencer's Essays—A selection R. P. A. series

উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান না হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়। সংক্ষ কথায় যে অবস্থায় বস্তুর আপেক্ষিক-ভাব (organic unity) রক্ষিত না হয়, সে অবস্থা অবনতি বোধক, উন্নতি বোধক নহে।

যাহা হউক স্পেনসারের অভিব্যক্তিবাদ বিষয়ে আমার আর অধিক কিছু বলিবার নাই। অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে এক্ষণে দুই একটি কথা বলা যাউক।

পূর্ব্বে অভিব্যক্তি বলিতে ভ্রৌণিক অবস্থা হইতে দৈহিক বীজের ক্রম বিকশিত পূর্ণাঙ্গত্ব সম্প্রতিই সূচিত হইত। জীবের এই ক্রম বিকাশ এই বিভিন্ন উন্নতির স্তরগুলি অতিক্রম করিয়া উক্ত দশায় আগমন ব্যাপারটা কেবল কালেরই অবশ্যম্ভাবী ফল বলিয়া গণ্য হইত না। কিন্তু কোন চিচ্ছক্তি ঐ মুক্তিকে উদ্দেশ করিয়াই উপকরণচয়কে তাহার বিকাশোপযোগী করতঃ ধীরে ধীরে আত্ম প্রকটিত করিয়া থাকে, পূর্ব্বে অভিব্যক্তি বলিতে লোকে ইহাই বুঝিত। উপাদানগুলি যদৃচ্ছা বশাৎ ক্রীড়া করিতে করিতে সহসা একটা জীবরূপে প্রকটিত হউক ইহা অধুনাতন পণ্ডিতগণের জল্পনা; এই মতের বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র করিবার ইচ্ছা আছে।

অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে একটু বিশেষভাবে চিন্তা করিলে প্রতীয়মান হইবে, উহা চিচ্ছক্তি নিরপেক্ষে দুর্ব্বোধ্য। বর্ত্তমান অভিব্যক্তিবাদ কিন্তু অবয়বব্যক্তির একটা প্রক্রিয়া মাত্রেই পর্য্যবসিত। প্রকৃত প্রস্তাবে অধুনা অভিব্যক্তি শব্দটা কোন একটা বিশেষ প্রণালীর একটা প্রক্রিয়া বিশেষকেই লক্ষ্য করিয়া থাকে। সে প্রক্রিয়া যে চরম বিশ্লেষণে ঐ চিচ্ছক্তিরই আত্মলাভ চেষ্টা—সফলীভূত হইবার চেষ্টা, তাহা অনায়াসে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। প্রত্যক্ষের অগোচর বলিয়া সে শক্তিকে অস্বীকার বা অপলাপ করা যুক্তিযুক্ত নহে। প্রত্যক্ষগোচর না হইলেও অনুমানবলে তাহার অস্তিত্ব উপপন্ন হইতে পারে। পক্ষান্তরে তাহাকে বাদ দিলে অভিব্যক্তিতত্ত্বই ধারণাতীত হইয়া পড়ে।

এতাবৎ অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে যতটুকু আলোচনা করা গেল, তাহা হইতে এই টুকু মাত্র বুঝা যাইতেছে যে, তত্ত্বতঃ একটা কিছু তত্ত্ব প্রপঞ্চ সৃষ্টির পূর্ব্বেও ছিল। কিন্তু সেই তত্ত্ব কিংস্বরূপ তাহা নির্ব্বাচন করিয়া বলা যায় না। কেহ তাহাকে পরমাণু, কেহ বা প্রকৃতি, কেহ বা প্রধান, কেহ বা ঈশ্বর ইত্যাদি নানা ভাবে তাহাকে ধারণা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এবং সেই তত্ত্ব হইতে এই হইল পরিদৃশ্যমান জগৎ কি প্রকারে আবির্ভূত তাহাই প্রধানতঃ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু যিনি যে প্রকারই ধারণা করিয়াছেন—কোন বিশিষ্ট ধারণাই যে সে তত্ত্বের যথার্থ ধারণা হইতে পারে না তাহা বুঝা যাইতেছে। এবং সেই একতত্ত্ব কি প্রকারে বহুত্বে পরিণত হইতে পারে তাহাও নিঃসন্দিগ্ধভাবে কেহ বুঝাইতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বেদান্তবাদীরা সেই তত্ত্বকে সদসদ নির্ব্বচনীয় 'কিছু একটা' মনে করেন; তাহা "ইদং" "তৎ" ইত্যাদি শব্দবাচ্য নহে।

শ্রীপ্রফুল্লনাথ লাহিড়ী

কাক

হে কর্কশকণ্ঠ পক্ষী—ঘোরকৃষ্ণ কাক কুদর্শন
আঁধারের মূর্ত্তিমান্ মুহুর্মুহুঃ বিদায়-বচন।

অরুণ রথের শব্দ কণ্ঠে তব ঘোষিত আকাশে,
মঙ্গল বারতা তুমি আনো নিত্য ধরার সকাশে।

"জাগ' জাগ' স্বপ্নমূঢ়, অন্ধকার লভিছে বিদায়
আলোকের পুনর্জ্জন্ম হের ঐ প্রসন্ন আশায়,

কে আছ'রে এ সময় অন্ধগৃহে মুদি দু'নয়ন,
বহে যায় ব্রাহ্মক্ষণ সুসময় কর উন্মীলন।

সুপ্রসন্ন আঁখি পাতে বিশ্বপিতা চাহে ধরাপানে
বীর লহ সবিতায় আনন্দের পুণ্য সামগানে।

হারা'ও না এ মুহূর্ত্ত সারাদিন ব্যর্থতায় ভরি,
শুষ্ক হবে জীবনের শতদলে একটি পাপড়ি।

বনে বনে জাগে পুষ্প, শষ্প, অলি, জাগে সমীরণ
পশুপক্ষী তরুলতা তাহাদেরো হলো জাগরণ।

কেন নর ঘুমাইবে, ত্যজ শয্যা স্বপ্ন অবসাদ
জাগ জাগ কর্ম্মক্ষেত্রে আনিয়াছি আনন্দ সংবাদ।

চারিদিকে প্রকটিত বিধাতার প্রসন্ন ইঙ্গিত
ফুরাইয়া যায় ঐ ভক্তদের মঙ্গল সঙ্গীত।"

এই বাণী শুনি আমি হে বায়স, তব কণ্ঠস্বরে,
রুক্ষ ঋষি পক্ষী তুমি তপঃকৃষ্ণ শাসিতেছ নরে।

দোয়েল পাপিয়া পিক গাহে বটে সুমধুর স্বনে
ঘুমেরে ঘনায়ে আনে তন্দ্রাতান পশিয়া শ্রবণে।

কে জাগিবে মোহপঙ্কে না পীড়িলে কর্ণের পটহ,
নগ্ন তীব্র সত্য যাহা জাগায় তা' সতত দুঃসহ,

সত্য কহি যেই জন ভেঙে দিবে মোহের বিরাম,
সে কি কভু প্রিয় হয়—সে কি হয় নয়নাভিরাম?

সত্যসন্ধ বৈতালিক! ডাকো তুমি আলোকের পথে,
জানি আমি হিতবাক্য মনোহারী দুর্লভ, জগতে।

শ্রীকালিদাস রায়

নিত্যলীলা

জগতে এত গভীর উত্তেজনার মধ্যে এমন কে হতভাগ্য আছে, যাহার প্রাণ আশার নিশ্বাসে উৎফুল্ল হয় না? সকলেই জানেন আশা কুহকিনী, জীবকে বৃথা মায়ায় ভুলাইয়া দুর্লভের জন্য উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলে, কিন্তু কৈ, কেহই ত সে কুহকে মত্ত হইতে বিরত হয়েন না? মৃগ যেমন বালুকারাশি মধ্যে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া, মরুভূমির বালুকাস্তূপকে জলাশয় মনে করিয়া তদ্দিকে ধাবমান হয়, তৃষ্ণা শান্তির পরিবর্ত্তে, নিরাশায় প্রাণ হারায়, সেইরূপ এই সংসারের চাকচিক্যময় অনিত্য বস্তুর সম্ভোগকে মানব আনন্দ মনে করিয়া ক্রমাগত প্রধাবিত হইয়াও নিরাশ হইলে তথাপি এ অনুধাবন ত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি হয় না, অবশেষে বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে অবসাদ লইয়া জীবন কাটায়,—তথাপি নিত্য আনন্দের সন্ধান করিবার ইচ্ছাও হয় না। সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল নশ্বর এই সংসারের ক্ষুদ্র সম্ভোগে আত্মহারা হইয়া, মহান্ অবিচ্ছিন্ন সুখ ও আনন্দ সম্ভোগের দিকেও লক্ষ্য করে না। তাই শ্রীভগবান ব্যাসদেব শ্রীভাগবতে বলিয়াছেন—

"ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ॥"
২।৯।৩৩

"আভাস অর্থাৎ প্রতীয়মান দ্বিচন্দ্রাদি বস্তু যেমন বাস্তবিক কোন পদার্থ না হইলেও প্রতীত হয়, এবং তম অর্থাৎ অন্ধকার যেমন সৎ অর্থাৎ পদার্থ হইয়াও প্রতীয়মান হয় না, সেইরূপ অর্থ বিনা যাহা প্রতীত হয় এবং থাকিয়াও স্বপ্রকাশ আত্মাতে প্রকাশ পায় না, তাহাকেই আমার মায়া বলিয়া জানিবে।"

যাহা কিছুই নয় তাহাই সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করেন যে মায়া সেই মায়ার অধ্যাসে আত্মবিস্মৃত জীব, ক্রমান্বয়ে তেজে বারি ভ্রমের ন্যায়, কাচে জল ভ্রমের ন্যায় এই আপাতঃ মনোরম অসার সংসারের অনিত্য সুখসম্ভোগকে সার বিবেচনা করিয়া ইহাতেই মগ্ন হইতে চায়। অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য এই সতত পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতির ভাণ্ডারে আপন নিত্যানন্দ লাভের সন্ধান লইতে চায়, পরিণামে নিরাশ হইয়া অশেষবিধ কষ্ট পায়। তবুও এ প্রধাবন ত্যাগ করে না।

জগৎ গম ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। গম + ক্বিপ্ = জগৎ। যাহা যায়, অহরহঃ যাহা মৃত্যুর দিকে, ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে তাহাই জগৎ। ধ্বংসপ্রবণ এই জগৎ নশ্বর অণু পরমাণুর সমবায়ে গঠিত এই ধরিত্রী, অণু পরমাণুর বিচ্ছেদে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বালুকাস্তূপের উপর যদি কেহ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে, তাহা কতক্ষণ থাকে? বালুকাস্তূপের ন্যায় অসার বস্তুর উপর ভিত্তি করিয়া যে আনন্দ নিকেতন জীব সৃষ্টি করে, তাহা কয়দিনের জন্য? বালুকাস্তূপ সরিয়া যাইতে আরম্ভ করিলে যেমন তদুপরি নির্ম্মিত অট্টালিকাও ভগ্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ এই নশ্বর সংসারের স্বল্পায়ু উপকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত যে ক্ষুদ্র আনন্দ তাহাও সংসারের ত্রিতাপানলে ভস্মীভূত হইয়া যায়। অবশেষে নিরাশা ও অনন্ত দুঃখ তাহার স্থান অধিকার করিয়া

বসে। জীব যতক্ষণ বাহিরে আনন্দ অন্বেষণ করে, সে ততক্ষণ তাহা পায় না। বাহিরের সমস্ত পদার্থে আনন্দ লাভের আশায় প্রধাবিত হইয়া যখন নিরাশ হৃদয়ে আপনার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে নয়ন ফিরায়, তখন তাহার উপায়ের সুযোগ হয়। বাহিরের যে পদার্থে আনন্দ পাইবে মনে করিয়া ধরে, তাহারই পরিণাম নিরাশা ও নিরানন্দ দেখিয়া দেখিয়া যখন চৈতন্য হয়, মনে হয় বাহিরের কোন পদার্থে আনন্দ নাই, তখন তাহার অন্তর্দৃষ্টি আরম্ভ হয়। "বাহিরে কিছু নাই, আমার ভিতরেও কি কিছু নাই ?" কস্তুরিমৃগ যেমন আপন নাভিগন্ধে উন্মত্ত হইয়া, সেই সৌগন্ধের সন্ধানে অরণ্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তথাপি নিজের নাভিতে যে সদ্গন্ধ তাহার সন্ধানও পায় না, সেইরূপ জীব আপন হৃদয়ের গুহ্যতম প্রদেশে যে আনন্দ মূর্ত্তি বাহু প্রসারিত করিয়া তাহাকে বক্ষে ধারণ করিবার জন্য বসিয়া আছেন, তাঁহার দিকে লক্ষ্য না করিয়া, তাঁহার সন্ধান না পাইয়া ক্রমাগত সংসারের প্রত্যেক পদার্থে সুখান্বেষণ করিয়া বেড়ায়, অবশেষে নিরাশায় অবসাদে অত্যন্ত পরিতপ্ত হৃদয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থায় সাধুর কৃপায় তাহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যায়। তখন আপন আনন্দে সে আপনি বিভোর হইয়া এই মর্ত্ত্যেই আনন্দময়ের সেবানন্দ সম্ভোগ করিবার সুযোগ পায়। এই সেবানন্দই জীবের চরম লক্ষ্যের স্থান। ভক্ত "তুমি ও আমি" ভেদ রাখিয়া এই সেবানন্দ সম্ভোগের দ্বারা ব্রহ্মানন্দকেও তুচ্ছ করিয়া দেয়। ভক্ত মোক্ষ চায় না। সে চায় অবিচ্ছিন্ন সম্ভোগ। সে "চিনির পাহাড়" হইতে চায় না, সে পিপীলিকা হইতে চায়। সে অমৃত সাগরে বিলীন হইতে চায় না, সে চাহে অমৃত পান করিতে, সে চাহে প্রাণনাথের সহিত প্রাণ বিনিময় করিয়া অনন্তকাল তাঁহার বক্ষে মস্তক রাখিয়া সে অমৃত মধুর প্রেমের আস্বাদন লইতে, যেমন গোপীগণ বলিয়াছিলেন—

"সুরতবর্দ্ধনং শোক নাশনং
স্বরিত বেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্।
ইতররাগ বিস্মারণং নৃণাং
বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্॥"

শ্রীভাগবৎ গোপীগীতা।

"হে বীর সম্ভোগসুখবর্দ্ধনশীল শোক-নাশন বাদিতবেণু কর্ত্তৃক সম্যক্ চুম্বিত মনুষ্য-দিগের বিষয়ান্তর রাগের বিস্মারক তোমার অধরামৃত আমাদিগকে বিতরণ কর।" সেইরূপ সে সেই অতুল্য অধরের অমৃতময়ী সুধা পানে বিভোর হইতে চায়। সে তাঁহাকে লইয়া "ঘরকন্না" "খুটিনাটি" করিতে চায়। তাই সে জ্যোতি দর্শন করিতে চায় না—সে "জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপং দ্বিভুজং শ্যাম সুন্দরং" দর্শন করিয়া বিভোর হইতে চায়।

ভক্ত চায় বটে কিন্তু কুহকিনী মায়া আপন তমোময়ী আবরণ বিক্ষেপরূপা যবনিকা চক্ষের সমক্ষে ক্ষেপণ করিয়া দৃষ্টি আবরিত করিয়া সে সুখ সম্ভোগের আভাস পাইতে দেয় না। তাই অর্জ্জুনের ন্যায় শিষ্যকে ভগবান বলিয়াছিলেন,—হে অর্জ্জুন,

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

"সত্ত্ব রজ তমোগুণময়ী আমার এই দেব-সম্বন্ধীয় মায়া দুরত্যয়া, ইহাতে কেহই উত্তীর্ণ হইতে পারে না, কেবল আমাকে প্রপন্ন ব্যক্তিই একমাত্র এই মায়ার হাত এড়াইতে পারে।"

জীব বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না। সব জানিয়াও অন্ধের ন্যায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া রহে। শশকের লুক্কায়িত হইবার মত মনে করে যেন বেশ নিরাপদে আছে, কিন্তু কাল যে সতত সন্নিকটবর্ত্তী হইতেছে, তাহা ভাবিয়াও ভাবে না। মার্জ্জারের ন্যায় আড়াই পদ যাইতে না যাইতে সব ভুলিয়া যায়। সংসারের শত সহস্র সুস্বাদু তোয় জলাশয় থাকিতেও সে চাতকের ন্যায় মেঘের বারির জন্যই উন্মুখ হইয়া থাকে। তাই কবি গাহিলেন—

"কিং চাতকঃ ফলমবেক্ষ্য সবজ্রপাতাং।
পৌরন্দরী; কলয়াত নববারি ধারাম্॥"

শত শত সাধু জগতে বিদ্যমান থাকিতেও সে সে সঙ্গম পরিত্যাগ করিয়া অবিদ্যা মায়াবশে কামকাঞ্চনের দাস হইয়া আনন্দলাভ করিতে চাহে, অবশেষে তুষাবঘাতীর ন্যায় "শ্রম এবাহ কেবলং" হয়, পরন্তু অশেষ দুঃখও পায়।

জগতের ত এই ব্যাপার। এখন এই অত্যন্ত দুঃখ, এই ত্রিতাপ নিবারিত হয় কিসে? ভক্তি পরাঙ্মুখ মানব অহরহঃ এই দুঃখ জ্বালা ভোগ করিয়াও ইহাতেই লিপ্ত হইয়া আছে। জগতের এই সমস্ত অসার বস্তুর সম্ভোগের দ্বারা মানব এতদূর আত্মহারা হইয়া পড়ে যে বার বার অশেষবিধ যন্ত্রণা পাইয়াও উষ্ট্রের কণ্টক-তৃণ ভক্ষণের ন্যায় পুনঃ পুনঃ সেই সম্ভোগেরই লালসা করে। কি উপায়ে ইহার প্রতিকার হয়? কোন্ পথ অবলম্বন করিলে এই অনিত্য সুখসম্ভোগের পরিবর্ত্তে নিত্যানন্দ উপভোগে জীব শান্তি পাইতে পারে?

জীব যখনই কলির প্রভাবে অবসন্ন ও বিধ্বস্ত হইয়া পড়ে, তখনই জীবের প্রতি অনন্ত দয়াময় ভগবান বাসুদেব আত্মমায়াবলম্বনে আত্মসৃষ্টি করিয়া থাকেন। এই দুঃখের অবসান করিতে ধরায় অবতীর্ণ হয়েন। যথা গীতার সিদ্ধবাক্য—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

গীতা—৪র্থ অধ্যায়।

মায়ার অতীত বস্তু জীবের প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া মায়া মনুষ্যরূপে এই মায়ার খেলাঘরে লীলা করিতে আসেন। জীব ও পরমে যে কি সম্বন্ধ তাহা শিখাইবার জন্য, জীবরূপে জীব সন্নিধানে অবতীর্ণ হয়েন—তাই এই মর্ত্ত্যভূমে ত্রিদিবের লীলাভিনয়ে ভক্তের আশার পথ সুসার করিয়া দেন। যে লীলা নিত্যরূপে পূর্ণভাবে গোলোকে অহরহঃ অভিনীত হইতেছে, স্বধাম ত্যাগ করিয়া ভক্তপ্রাণ, ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু ভগবান ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে জগতে দেহ ধারণ করিয়া জীবকে তাহা শিখান। এই লীলা, শ্রীমান শ্রীমতীতে যে এই প্রেমলীলা, ইহাই নিত্য তাই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বলিলেন—

"এখনও সেই লীলা করে শ্যাম রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

এই লীলার অনুভূতির জন্য শ্রীগুরুর কৃপামাত্র ভরসা। নতুবা ইহা আস্বাদনের অন্য উপায় নাই।

শ্রীমান শ্রীমতীকে, জীব পরমে, ভক্ত ও ভগবানে এই যে লীলা ইহা নিত্য। বৃন্দাদেবীর তপোবনে যেরূপে এই লীলা প্রকট হইয়াছিল, তাহা অতি গুহ্য, সেই গুহ্য লীলা জীবকে আস্বাদন করাইবার জন্য আজ জীব ও পরমে, ভক্ত ও ভগবানে, শ্রীমান ও শ্রীমতীতে একত্রীভূত হইয়া প্রকট হইয়াছিলেন। গোপীপ্রেমের নিগূঢ় তত্ত্ব যাহাতে

জীব সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে সেই কারণ স্বয়ং আচরিয়া জগতকে শিখাইবার জন্য অদ্বৈত প্রভুর সাধন হুঙ্কারে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই লীলা নিত্য। নিত্যের বিকাশ বলিয়া এই জীবজগৎ অনিত্য উপাদানে গঠিত হইলেও, ইহা নিত্য। কারণ ধ্বংসের পর যে অবস্থা, অণু পরমাণুর সমবায়ে গঠিত এই জীবজগৎ অণু পরমাণুর বিচ্ছেদেও যে অবস্থায় থাকে তাহাও নিত্য কারণ সব পদার্থই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অবস্থায় লয়ের অনুগামী সুতরাং "স্বরূপেন ব্যবস্থিতিঃ।" যে সূক্ষ্ম হইতে এই বিরাট বিকাশ, লয়ের পর আবার সেই সূক্ষ্মেই পরিণতি। সূক্ষ্ম অবস্থায় সকল পদার্থই নিত্য বিদ্যমান—শাশ্বত!

তাই "অহং বহুস্যাম্" এই সিদ্ধ বাক্য অনুসারে ভগবান বাসুদেব যে লীলার অভিনয় করিয়াছেন ও অনন্তকাল ধরিয়া করিতেছেন, তাহা নিত্য! লীলা নিত্য বলিয়া এ বিশ্বও নিত্য!

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিতেন "যেমন নেতা কেতার হাঁড়ি। মেয়েদের একটা হাঁড়ি থাকে, তাহাতে একটু নীলবড়ি, সমুদ্রের ফেণা, শশার বিচি প্রভৃতি আবশ্যকীয় অনেক পদার্থ সংগৃহীত থাকে" সেইরূপ প্রলয়ের পর মা মহামায়া সৃষ্টি পত্তনের বীজ স্বরূপ সূক্ষ্ম তন্মাত্র সকল সংগ্রহ করিয়া রাখেন, আবার সৃষ্টির বিকাশে সেইগুলি বাহির করিয়া দেন। নূতন সৃষ্টি কিছুই হয় না। সকলই সূক্ষ্ম-ভাবে শ্রীভগবানে বিরাজিত থাকে। সৃষ্টির কালে সেইগুলি সত্ত্বরজতমোগুণের বিক্ষো-ভনে স্থূলরূপে বিকাশিত হয়। এই স্থূলই জগৎ সৃষ্টির মূলীভূত কারণ। লয়ে সূক্ষ্মাবস্থা ও বিকাশের কালে স্থূলাবস্থা এইরূপ স্থূল হইতে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম হইতে স্থূল ক্রমাগত চলিতেছে ও চলিবে। সুতরাং ইহাই নিত্যাবস্থা, বিলোম গমনে লয়ের অনুগামী ও অনুলোম গমনে সৃষ্টির পরিপোষক। এই নিত্য বস্তুর যে লীলা তাহাও নিত্য। যুগ্ম লইয়া যে জগৎ, তাহাও নিত্যের অংশ বলিয়া নিত্য, কারণ ভগবান যখন নিত্যবস্তু, তিনি ওতঃ প্রোতঃ ভাবে যখন এই সৃষ্টির মধ্যে বিরাজিত তখন ইহাকে অনিত্য বলা যায় না যথা গীতায় সিদ্ধবাক্য—

"ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং
সূত্রে মণিগণাইব।"

আবার শ্রীভাগবতে ২য় স্কন্ধে নবম অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন—

"অহমেবাস মেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎ পরং।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহং॥"

"সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আমিই ছিলাম, আমা ভিন্ন সৎ, অসৎ অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম কিংবা তদুভয়ের কারণ কিছুই ছিল না। সৃষ্টির পরে আমিই আছি। এই যে জগৎ তাহাও আমিই এবং সকল বিলীন হইলে আমিই অবশিষ্ট থাকি।"

নিত্য বস্তু যাহাতে অনুপ্রবিষ্ট, তাহা কখন অনিত্য হইতে পারে না কিন্তু এই জগৎ নিত্যের বিকাশ হইলেও ইহা সতত পরিবর্ত্তন-শীল। ইহা অব্যয় নহে। কালের আবর্ত্ত-নের সঙ্গে সঙ্গে ইহাও আবর্ত্তিত, পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সুতরাং এই পরিবর্ত্তনশীল জগত হইতে অপরিবর্ত্তনীয় আনন্দ লাভ হইতে পারে না। সতত চঞ্চল এই জগৎ, ইহা হইতে অচঞ্চল সুপ্রতিষ্ঠিত কোন আনন্দ লাভ হইতে পারে না। তাই জীব এই অনিত্যের অন্তরালে যে নিত্য বস্তু সতত বিরাজিত তাঁহার সন্ধান করিতে চায়। সেই

নিত্য বস্তুতে মনপ্রাণ সংযোজিত করিলে তবে নিত্যানন্দ ভোগ জীবের ভাগ্যে ঘটে। তাই মহাপ্রভু শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ভক্তি লীলাভিনয় করিয়া গিয়াছেন। ভক্তি সাধনার দ্বারা নিত্যানন্দ লাভ হইলে তবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লাভ হয়, জীবের শ্রীকৃষ্ণে মতি হয়, শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্তি হয়। সাধনার দ্বারা এই সাধ্য বস্তু লাভ অতি দুরূহ বলিয়া দয়াময় বাসুদেব অগ্রে নিত্যানন্দকে, দেবানন্দরূপী নিজ দক্ষিণ হস্তকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া জীবকে নাম সাধনা শিক্ষা দিয়াছেন। অতি গুহ্য বৃন্দাবনলীলা সুবোধ্য করিবার জন্য নাম ও নামীর, ভক্ত ও ভগবানের এই প্রেমলীলাভিনয়! নিত্যানন্দ প্রভুর অকাতরে নাম বিতরণ, জগতে ভক্তি-বীজ নির্ব্বিশেষে রোপণ করিবার জন্যই হইয়াছিল। এই ভক্তি লাভ ভিন্ন ভক্ত হয় না, এবং ভক্ত না হইলে ভক্তের একমাত্র ভজনীয় বস্তু ভগবান লাভ হয় না। তাই কিঞ্চিদধিক চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে দয়াময় এই প্রেমলীলাভিনয় করিয়া ক্ষীণ শক্তি কলিজীবের সহজ সাধনার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। বাবা প্রেমানন্দ ভারতী একস্থানে লিখিয়াছেন "Sree Krishna is a mystery & Gouranga is its explanation." শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব একটি গূঢ় রহস্য এবং শ্রীগৌরাঙ্গদেব এই রহস্য ভেদকারী। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর মধ্য দিয়া লাভ করিতে হইবে। নতুবা অন্য উপায় নাই। সৎ, চিৎ ও আনন্দ লইয়া যে বিগ্রহ তাহার সর্ব্ব-সার্থকতা আনন্দে। আমার গত কার্ত্তিক মাসের "মিলন" শীর্ষক প্রবন্ধে ইহার বিষয় কিছু আলোচনা করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব অতি দুরূহ তত্ত্ব, সুতরাং শ্রীমানকে বুঝিতে হইলে শ্রীমতীর মধ্য দিয়া বুঝিতে চেষ্টা না করিলে তাহা বোধগম্যই হইবে না। তাই বিপ্রলম্ভ মূর্ত্তি পরিহার পূর্ব্বক, দ্বাপরের যুগলকিশোর মূর্ত্তি পরিহার পূর্ব্বক, কলিতে ভগবান মিলন মূর্ত্তিতে প্রকট হইয়াছিলেন। নহিলে মায়ান্ধ, ভ্রমসঙ্কুল জীব কিরূপে তাঁহাকে ধরিতে পারিবে? তাই বাহ্য রাধা অন্তকৃষ্ণরূপে ভক্তের হৃদয়রঞ্জন করিতে নদীয়া ধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই লীলা সাধারণ লোকচক্ষুর গোচরীভূত করিবার জন্য প্রকট মূর্ত্তিতে, ভগবানের জন্য ভক্তের উৎকণ্ঠা সেই অদ্ভুত প্রেমবিলাস স্বয়ং আচরিয়া জগৎকে শিখাইয়াছেন। তাঁহার লীলা নিত্য হইলেও, যাঁহারা সাধনার দ্বারা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন নাই, তাঁহারা তাহা অনুভব করিতে পারেন না বলিয়া, গুহ্যকে ব্যক্ত করিতে আসিয়াছিলেন, অমৃতভাণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন সর্ব্বসাধারণ পান করিয়া অমর হইবে বলিয়া। নাম সুধা "অমৃতত্বায়-কল্পতে" বলিয়া দয়াময় প্রকট মূর্ত্তিতে জগতে নাম সুধাই বিতরণ করিয়াছেন। সেবানন্দ রূপী নিতাইচাঁদ জাতিনির্বিশেষে সেই সুধা বণ্টন করিয়া জগৎকে ধন্য করিয়াছেন। "নাম ভিন্ন গতি নাই—নাম নামী অভেদ, নাম পাইলে নামীকে পাইবে" এই শিক্ষা দিয়া কলি-পাবন নিতাইচাঁদ জগত উদ্ধার করিয়াছেন।

এই নামলীলাই নিত্য, সত্য। এই অলীক সংসারে একমাত্র নামই সত্যের আধার, কারণ নাম ও নামী অভেদ এবং নামী

"সত্য ব্রতং সত্য পরং ত্রি সত্যং
সতস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে
সত্যস্য সত্যমৃত সত্য নেত্রং
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥"

শ্রীভাগবত ১০।২।২৭

ভগবান বাসুদেব যখন দেবকীর কারাগৃহে অবতীর্ণ হয়েন, সেই সময় ঈশান ও ব্রহ্মাকে পুরোবর্ত্তী করিয়া দেবগণ তথায় উপস্থিত হইয়া যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহার প্রথম স্তোত্র উপরোক্ত শ্লোকে অভিব্যক্ত হইয়াছে। দেবগণ বলিতেছেন—

হে ভগবন, তোমার ব্রত অর্থাৎ সঙ্কল্প সত্য বলিয়া তুমি সত্যব্রত; তোমার প্রাপ্তির সম্বন্ধে সত্যই পর অর্থাৎ প্রধান সাধন বলিয়া তুমি সত্যপর; তুমি তিনকালেই সত্য বলিয়া তুমি ত্রিসত্য; সত্যের অর্থাৎ পঞ্চভূতের তুমিই যোনি অর্থাৎ উৎপত্তি কারণ; স্থিতির সময়েও তুমি ঐ সত্যের অর্থাৎ পঞ্চভূতে অন্তর্যামীরূপে নিহিত অর্থাৎ অবস্থিত; সত্যের অর্থাৎ প্রপঞ্চের সম্বন্ধ সত্য অর্থাৎ উহার নাশেও তুমিই অবশেষ থাক বলিয়া পরমার্থ বস্তু; ঋত অর্থাৎ সত্যবাক্য এবং সত্য অর্থাৎ সমদর্শন এই উভয়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া অথবা এই উভয় তোমার প্রাপক বলিয়া তুমি ঋত সত্যনেত্র; এইরূপে দেখা যায় তুমি সর্ব্বপ্রকারেই সত্য; অতএব সত্যাত্মা যে তুমি, আমরা তোমার শরণাপন্ন হইতেছি।" সুতরাং এখন দেখা যাইতেছে যে সত্যময় ভগবানের নাম লইয়া জীব নিত্যানন্দ লাভ করে। পরে তাহার শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক জ্ঞানলাভ হইলে, ভক্ত ও ভগবানে, জীব ও পরমে, শ্রীমান ও শ্রীমতীতে যে লীলা অনন্ত কাল ধরিয়া হয় তাহার অনুভূতি পায়। তাহাই নিত্য, সেই পরমপুরুষের বিরজাপারস্থিত পরব্যোমের এই নিত্যলীলা। এই লীলা সুখ লাভের আকাঙ্ক্ষায়,

"—শ্রীর্ললনা চরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতাঃ।"

শ্রীবৃন্দাবনে বংশীধ্বনি হইলে, সেই রব যখন ব্রহ্মকূটস্থ ভেদ করিয়া বৈকুণ্ঠে শ্রুত হইল, তখন কমলা ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর পদ-সেবা করিতেছিলেন। তিনি সেই রবে আত্মহারা হইয়া পাদ সেবা পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানহীনার ন্যায় শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে প্রয়াণ করিলে, শ্রীবিষ্ণু তাহাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য পথরোধ করিলে তিনি বলিলেন "প্রভো, আমি আর আপনার স্পর্শের যোগ্যা নহি। আমি অভিসার মানসে বৃন্দারণ্যে প্রস্থান করিয়াছিলাম।"

পালনকর্ত্তা উত্তর করিলেন "দেবি তুমি যেখানে যাইবার মানস করিয়াছ, তিনি বিভু, আমি তাঁহারই অংশ—অণু। সুতরাং তাঁহাতে অভিসার দোষ ঘটিতে পারে না। তুমি সতীশিরোমণি। তবে এক কথা সে স্থলে যাইবার বা সে লীলায় যোগ দিবার তোমার অধিকার নাই। তাই কমলা কঠোর তপস্যায় বসিয়া এই অধিকার লাভ করিলেন যে, যখন ভগবান গোপীমণ্ডল মণ্ডিত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে মহারাস আরম্ভ করিবেন, তখন কমলা তাঁহার বক্ষে স্বর্ণরেখার ন্যায় থাকিবেন মাত্র। তাই ভগবান বাসুদেবের বক্ষ শ্রীবৎস চিহ্নিত। শ্রী, বৎ, স অর্থাৎ তাঁহার বক্ষে শ্রী অর্থাৎ কমলা আছেন। এই মহারাসরূপী লীলাই নিত্য। অহরহঃ বিশ্বময় এই মহারাস হইতেছে। শ্রীগুরুর কৃপায় ইহার অনুভূতি জীব পাইতে পারে। আপন হৃদয়মধ্যে অণু পরমাণুর সমবায়ে, এই বিরাট বিশ্বমধ্যে যেখানে অন্বেষণ করিবে, এইলীলা সর্ব্বত্রসর্ব্বদা হইতেছে বুঝিতে পারিবে। কারণ সত্যময়ের লীলা সকলই সত্য, বিশ্ব ভরিয়া দেদীপ্যমান। তাই শ্রীরূপ গোস্বামী বলিলেন—

শ্রীরাধা প্রাণবন্ধোশ্চরণ কমলয়ো কেশ
শেষাগ্যগম্যা।
যা সাধ্যা প্রেমসেবা ব্রজ চরিত পরৈঃ গাঢ়
লৌল্যক লভ্যা॥
সা স্যাৎ প্রাপ্তা যয়াত্মাং প্রথয়িতুমধুনা
মানসীমস্যসেবা।
ভাব্যা রাগান্ধ পান্থৈঃ ব্রজমনচরিতঃ নৈত্তিকং
তস্থ নৌমি॥"

"যে চরণ কখন ব্রহ্মা, শিব বা অনন্তদেবেরও জ্ঞানের অতীত অর্থাৎ দেবগণও সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন না, এবং যাহা ব্রজধামের একমাত্র ধন, প্রগাঢ় লৌল্য ব্যতীত যাহা লাভ করা যায় না, সেই প্রেমসেবারূপ মানসী সেবাই নিত্য রাগানুগামার্গাবলম্বনে যাহার ধারণা—ভক্ত অনুভব করেন সেই নিত্যবস্তু বা নিত্যলীলারূপ প্রেমসেবাকে নমস্কার করি।"

এই নিত্যলীলা "ব্রজচরিতপর" ব্রজগোপীগণের একমাত্র ধন। গোপী না হইলে এই নিত্যলীলার আস্বাদন জীবের পক্ষে অতি দুরূহ। নররূপে ব্রজধামে অবতীর্ণ হইয়া সেই সমস্ত লীলা, সেই "কুঞ্জাদ্গোষ্ঠং নিশান্তে প্রবিশতি কুরুতে দোহনান্ন্যা সপন্থাং প্রাতঃ সায়ঞ্চ লীলাং বিহরতি সখিভিঃ সঙ্গবে চারয়ণ গাঃ। মধ্যাহ্নে চাথনক্তং বিলসতি বিপিনে রাধয়াদ্বাপরাহ্নে গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি সুহৃদো যঃ, সকৃষ্ণোঽবতাং নঃ॥"

শ্রীরূপ গোস্বামী।

নিশান্তে কুঞ্জ ভঙ্গের পর সেই গোষ্ঠ প্রবেশ, সেই প্রাতঃ ও সান্ধ্যলীলা, সেই গোচারণে সখাগণ সঙ্গে গোচারণ, মধ্যাহ্নে প্রখর রবিতাপতপ্ত হইলে বিপিনে বিহার অপরাহ্নে শ্রীরাধার সহিত প্রেমলীলা, এবং সেই সন্ধ্যা সময় গোষ্ঠ হইতে সুহৃদগণের সহিত প্রত্যাবর্ত্তন, এই সমস্ত লীলা চিন্তা করিতে করিতে ভক্ত জ্ঞানশূন্য হইয়া যায়। তাই বৈষ্ণব কবি গাহিলেন যে রাধাহৃদয় বিহারী এই সমস্ত লীলা করেন, তিনি আমাদিগকে চরণে স্থান দিয়া রক্ষা করুণ।

এই লীলা গোলোকে অহরহঃ সংসাধিত হইতেছে তাই রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন যথা—

"গোলোকেতে গোপীনাথ রাধা আদি গোপীনাথ,
শ্রীদামাদি সহচর গণ।
নন্দ যশোদাদি যত, সবে নিত্য অনুগত
কপিলাদি যতেক গোধন॥
সুধা সমুদ্রের মাঝে, চিন্তামণি বেদী সাজে
কল্পতরু কদম্ব কানন।
"নানাপুষ্প বিকশিত, নানাপক্ষী সুশোভিত
সদানন্দময় বৃন্দাবন॥
কাম সদা মূর্ত্তিমান, ছয় ঋতু অধিষ্ঠান
রাগিনী ছত্রিশ আর যত।
ব্রজাঙ্গনাগণ সঙ্গে, সদা রাস রসরঙ্গে
নৃত্যগীত বাদ্য নানামত॥

গোলোক সম্পদ লয়ে, ভকতে সদয় হয়ে
অবতীর্ণ হৈলা ভূমণ্ডলে।
কংস আদি দুষ্টগণ, করিবারে নিপাতন
দৈবকী জঠরে জন্ম ছলে ॥"

ত্রিদেবের এই নিত্যলীলা, গোলোকের এই গুপ্তধন, গুহ্য লীলা, জীবকে আস্বাদন করাইবার জন্য দয়াময় ব্রজধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই গুহ্যলীলা তখন কেবল ব্রজদেবীগণ, ব্রজদেবীরূপে স্বর্গের অমরগণ সম্ভোগ করিয়াছিলেন, তাহাও অতি গোপনে। সেই নিত্যধন সাধারণের সম্পত্তি করিবার জন্য, আবার দয়াময় এই কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ হইয়া, নাম সাধনা জগতকে শিখাইয়া গিয়াছেন, কারণ নাম সাধনেই জীব সর্ব্বানন্দ লাভ করিতে পারে। যাহাকে আমরা অত্যন্ত ভালবাসি, আপন স্ত্রী, কি প্রাণবন্ধু যাহার অদর্শনে দশদিক শূন্য বোধ হয়, এমন পরমাত্মীয়ের নাম অবশ্য আমরা সর্ব্বদা শুনিতে ভালবাসি। নাম করিলেই নামীকে মনে পড়ে বলিয়া, প্রিয়তমের নামটি পর্য্যন্তও আমাদের নিকট প্রিয়তম। তাই মহাপ্রভু এই নামধন আচণ্ডালে বিতরণ করিয়া আপন মহিমারই বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং জীবগণের পরিত্রাণের উপায় করিয়া দিয়াছেন। এই নাম লীলাই নিত্য। ইহারই মধ্যে সর্ব্ব সত্ত্বায় অধিষ্ঠান। এই নাম ও নামীর মিলনই মহারাসের পরিণতি। ভক্ত ও ভগবানের জীব ও পরমে, নাম ও নামীর এই মহামিলনই মহারাস।

এই নিত্যলীলার আস্বাদে, নাম সঙ্কীর্ত্তনের মধুর আস্বাদে নিত্যানন্দলাভ করিয়া শ্রীশুক দেব, দেবর্ষি নারদ প্রভৃতি দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষিগণ বিভোর হইয়া অনন্তকাল হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তনে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। ইহার নিকট, এই কীর্ত্তনানন্দের নিকট, প্রাণ নাথের মানসী সেবার দ্বারা যে জড় ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন হইয়া অতীন্দ্রিয় চিৎ সত্ত্বায় ও সম্ভোগ লালসা পরিপূর্ণতা লাভ করে, সেই সেবানন্দই সত্যসার, কারণ ইহার নিকট ব্রহ্মানন্দও তুচ্ছ।

ব্রহ্মানন্দ, জ্ঞানী জ্ঞানমার্গাবলম্বনে যে জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া আনন্দানুভব করেন, সে আনন্দকে যদি পরার্দ্ধগুণীকৃত করা হয়, শাস্ত্রকার বলিতেছেন, তথাপি সেবানন্দের একপরমাণুকণারও সমতুল্য হইবে না। যথা—

"ব্রহ্মানন্দভবেদেষা চেৎ পরার্দ্ধ গুণীকৃতঃ।
নহি ভক্তি সুখা শোষেঃ পরমাণুকণাবপি ॥"

এই ভক্তি পথকেই শ্রেষ্ঠ করিবার জন্য মহর্ষি বেদব্যাস শ্রীভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকে বলিলেন এই ভাগবদ্ধর্ম্ম "নির্ম্মৎসরাণাং সতাং বেদ্যং" ভক্তি মার্গ আশ্রয় না করিলে, ভাল বাসিতে না শিখিলে জীব নির্ম্মৎসর হইতে পারে না, সুতরাং এই ভালবাসা বা প্রেম হইতে যে আনন্দ দীনভক্ত লাভ করে, তাহার তুলনায় জ্ঞান ও কর্ম্ম মার্গের পরিণতি যে আনন্দে তাহা অতি ক্ষুদ্র।

শ্রীবৃন্দাবনে প্রকট ভাবে ভগবান যে লীলা করিয়াছেন। সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় ভগবান ঐশ্বর্য্য ভাব পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ মাধুর্য্যে যে লীলা করিয়াছেন, তাহাই নিত্য এবং সেই লীলাই অপ্রকট ভাবে—গোলোকে নিত্য হইয়া থাকে, তাই শ্রীভাগবতকার বলিলেন—

"ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্ল মল্লিকাঃ।
বিক্ষ্যরন্তু; মনশ্চক্রে যোগমায়া মুপাশ্রিতঃ ॥"

তিনি ভগবান হইয়াও, ষড়ৈশ্বর্য্যময় অপার, —অপরিমেয় বিরাট পুরুষ হইয়াও, "রস্তং মনশ্চক্রে।" তিনি যে শুধু ঈশ্বর নহেন, আবার মধুর, পূর্ণ মাধুর্য্যের আধার, তিনি "মধুর মধুর মেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং"—তিনি যে কেবল ঐশ্বর্য্যময় নহেন আবার পূর্ণ প্রেমময়। সেই প্রেমে যে জীবের নিকট ভক্তের নিকট অতি সুলভ, তাই ত গোপীগণ সর্ব্বত্যাগী হইয়া তাঁহাতে হৃদয় মন সমর্পণ করিতে পারিয়াছিলেন। তাহারা প্রতিদানাশা বর্জ্জিত হইয়া "প্রোজ্ঝিত কৈতব" হইয়া, ফলাভিসন্ধি রহিত হইয়া, মোক্ষের আশা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া তাঁহাতেই প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা তাঁহাকে লইয়া যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন, শ্রীমতীর চরণে পর্য্যন্ত ধরাইয়াছেন। তাই রাসমণ্ডলে যোগ দিবার জন্য যে সকল গোপী উন্মত্তবৎ প্রধাবিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা স্বীয় আত্মীয়ের দ্বারা প্রতিবাধিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কথায় শ্রীভাগবত বলিতেছেন।

"দুঃসহ প্রেষ্ঠ বিরহ তীব্রতাপধুতাশুভাঃ।
ধ্যান প্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষ নির্বৃত্যা ক্ষীণ মঙ্গলাঃ॥
তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণ বন্ধনাঃ॥

১০।২৯।১০।১১

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের দুঃসহ বিরহ তাপে তাহাদিগের অশুভ সকল বিনষ্ট হইয়া গেল এবং ধ্যানলব্ধ তদীয় আলিঙ্গন হইতে উৎপন্ন আনন্দে তাহাদিগের মঙ্গলসকলও ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। এই প্রকারে সদ্য বিমুক্ত বন্ধন গোপী সকল জার বুদ্ধির দ্বারাও পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া গুণময় শরীর পরিত্যাগ করিলেন।"

এই অপূর্ব্ব প্রেমের বলে তাঁহারা তাঁহাদের অসিদ্ধ দেহাংশ পরিত্যাগ করিয়া চিন্ময় দেহে সেই রাসোৎসবে যোগ দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা যে কামনা হীন ছিলেন, আর কিছু চাহিতেন না, তাই তাঁহারা শ্রীমানকে লইয়া যাহা ইচ্ছা করাইয়াছেন।

যোগী ঋষিগণ তপশ্চরণ পূর্ব্বক সিদ্ধিলাভ করিলে, ইষ্টদেবতা সম্মুখীন হইয়া "বরং বৃণু" বলিতেন। তাঁহারা কিছু বর লইলেই তাঁহারা "তথাস্তু" বলিয়াই কার্য্য ফুরাইত কিন্তু ব্রজদেবীগণ কিছুই চাহিতেন না। কিছু লইবার জন্য অনুরোধ করিলে তাঁহারা বলিতেন "আমাদের কিছুরই অভাব নাই, কি চাহিব?" এই কথা বলিতেন আর বলিতেন "আমাদের যাহা অভাব তাহা তুমি পূর্ণ করিয়া দাও। আমরা তোমার অভাবে অতিমাত্র ক্ষুণ্ণ, আমাদের সে অভাব পূর্ণ কর, আমাদের হৃদয় মন্দিরে তোমার জন্য সিংহাসন পাতা আছে, তাহা শূন্য করিও না। সতত যেন পূর্ণ থাকে এই চাই। আমরা তোমাকেই চাই।"

"অলুশ্চতে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরে হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
"সংসার কূপ পতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যু দিয়াৎ সদানঃ॥

শ্রীভাগবত।১০।৮২।৩৫

"হে পদ্মনাভ, সংসারকূপে পতিতকে উত্তোলন করিবার অবলম্বনস্বরূপ তোমার পদারবিন্দ গভীরজ্ঞানী যোগেশ্বরগণই সর্ব্বদা হৃদয়ে চিন্তা করিয়া থাকেন। আমরা গৃহে থাকিয়া সেবা করিলেও যেন আমাদিগের মনে সর্ব্বদা উদয় হয়।"

তাই ভক্তপ্রাণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া একপদও যাইতে পারেন না। তাই গোপী-

গণকে লইয়া তাঁহার এই নিত্যলীলা। এই কামনাহীন সম্ভোগ, এই নিষ্কাম প্রেম গোপী প্রেমকে এত উজ্জ্বল করিয়াছে। এই নিষ্কামত্বহেতু সকল গোপীই আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাসনা বর্জ্জন করিয়া কেবল শ্রীমতী শ্রীমানের উপযোগী, মনোমোহিনী করিয়া সাজাইতে ব্যস্ত। এক পুরুষের যদি দুই বিবাহ হয়, তাহা হইলে তাহার গৃহে অবস্থান অতি দুরূহ ব্যাপার হইয়া পড়ে। দুই পত্নীর অহরহঃ কলহে সে স্বামীকে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। কিন্তু সকল ব্রজ-দেবীই কেবল শ্রীমতীর জন্যই, শ্রীমতীর মনস্কামনাপূর্ণ করিবার জন্যই সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিতেন। যেমন মনের আনন্দ সম্পাদিত হইলে, সর্ব্বদেহেরও আনন্দ বিকাশ হয়, সেইরূপ যেমন শ্রীমতী মন ও ব্রজদেবীগণ তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। মনের তৃপ্তি সাধনেই সর্ব্বাঙ্গের তৃপ্তি সাধন! এ নিঃস্বার্থতা এই নিষ্কামত্ব গোপীপ্রেমকে অমর করিয়া জগৎ-ময় সুধাসিঞ্চনে পরিতপ্ত ভক্তহৃদয়ে বিমল শান্তি বিতরণ করিয়াছে। তাই এই বৃন্দাবন লীলাই নিত্য। এই নিত্যলীলার অভিনেতা নটনাগর স্বয়ং সর্ব্বরসের অবতারণা করিয়া বিশ্বে বিমোহিত করিয়াছেন কারণ "রসো বৈ সঃ।" সর্ব্বরসের আকর যে তিনি। সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য ও সর্ব্ব মাধুর্য্য লইয়া এই রাসলীলাই তাঁহার নিত্যলীলা। বিশ্ব ভরিয়া এই লীলা অহরহঃ হইতেছে এই লীলা সহজ বোধ্য করিবার জন্য নটনাগর স্বয়ং মিলন মূর্ত্তিতে নদীয়া নগরে অবতীর্ণ হইয়া আচরিয়া জগতকে বুঝাইয়াছেন। নহিলে কে ধরিতে পারিত? কে বুঝিতে পারিত? এই লীলায় নিত্যত্বই বৈষ্ণবের প্রাণ, নদীয়ার প্রেমধর্ম্মের মেরুদণ্ড। এই নিষ্কাম প্রেমের বলেই গোপীগণ বলিয়াছিলেন,

> যত্তে সুজাত চরণাম্বুরুহং স্তনেষু
> ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু
> তেনাটবী মটসি তদ্ ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
> কূর্পাদি ভির্ভ্রমতি ধীর্ভবতায়ুষাং নঃ।
>
> শ্রীভাগবত। ১০।৩১।১৯

"হে প্রিয়, তোমার যে সুকুমার চরণকমল আমাদিগের কঠিন স্তনসমূহে সম্মর্দ্দনাশঙ্কায় সভয়ে ধীরে ধীরে স্থাপন করিয়া থাকি, তুমি সেই চরণ দ্বারা বন মধ্যে বিচরণ করিতেছ এবং তাহাতে উহা সূক্ষ্ম পাষাণাদি দ্বারা ব্যথিত হইতেছে ভাবিয়া আমাদিগের চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইতেছে, কারণ তুমিই আমাদিগের জীবন।"

এই নিষ্কাম প্রেমের বলে গোপীগণ সঙ্গে শ্রীমানের যে লীলা তাহাই নিত্য। এই লীলার নিত্যত্বই জগৎ সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের মহা কারণ। এই লীলার মধ্যেই সৃষ্টির বীজ নিহিত।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু।

জ্যোতিষচর্চ্চাকলে মানব ও ব্রহ্মের ধারণা

মানব বলিলে আমরা কি বুঝিয়া থাকি? কতকগুলি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সমষ্টিই মানব নামে অভিহিত। আমাদের ফলিত জ্যোতিষের মতে, এই ইন্দ্রিয় সমষ্টিটা দ্বাদশ রাশিতে অবস্থিত নবগ্রহের বিভিন্নরূপ শক্তি ক্রীড়া মাত্র। সাধারণ লোকে, দুই হস্ত দুই পদ দুই চক্ষু নাসিকা কর্ণ ইত্যাদি বিভিন্ন অবয়বের সমষ্টিটাই মানবদেহরূপে কল্পনা করেন। জ্যোতির্ব্বিদের মানব ধারণা উহা হইতে কিছু স্বতন্ত্র। জ্যোতিষীরা মেষ বৃষাদি দ্বাদশ রাশিতে ব্রহ্মাণ্ড বিভাগের ন্যায়, জীব বা জীবের আয়ুঃ কালটিকে তনু, ধন, সহজ, বন্ধু, পুত্র, শত্রু, জায়া, নিধন, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আয় এবং ব্যয় এই দ্বাদশ ভাবে বা দ্বাদশবিধ শক্তিতে বিভক্ত করেন। ফলিত জ্যোতিষের মতে, মানব যেন এই দ্বাদশ ভাবের সমষ্টি বা উক্ত দ্বাদশ ভাব সমন্বিত এক একটি শক্তিপিণ্ড মাত্র। জড় বৈজ্ঞানিক যেমন কোন জড়পিণ্ড পাইলে তাহাতে কয়ভাগ অম্লজান (অক্সিজেন), কয়ভাগ উদ্যান (হাইড্রোজেন), কয়ভাগ বা অঙ্গার (কার্ব্বণ) ইত্যাদি মূল পদার্থ আছে বিশ্লেষণ করিতে বসিয়া যান এবং এই বিরাট বিশ্বটাকে কতকগুলি মূল পদার্থ সমূহের বিভিন্নরূপ সমাবেশ মাত্ররূপে উপলব্ধি করেন, শারীরতত্ত্ব বিদের দৃষ্টিতে মানব যেমন কতকগুলি সজীব বা কার্য্যক্ষম অস্থিপেশী প্রভৃতির সমাহার বা মিলন ফল মাত্র, আমাদের ফলিত জ্যোতিষগণও তদ্রূপ মানবকে পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ ভাবের বিভিন্নরূপ শক্তি ক্রীড়া এবং গ্রহগণকেই সেই শক্তির উৎসস্বরূপে বিবেচনা করেন। জ্যোতিষীর দৃষ্টিতে মানবদর্শন এইরূপ সাধারণ জীবের মানব সম্বন্ধীয় ধারণা হইতে কিছু বিভিন্ন। মানবকে এই ভাবে গ্রহগণের বা বিশ্বাত্মার শক্তি স্ফূরণমাত্ররূপে বিবেচনা করিতে আমরা এখনও তাদৃশ অভ্যস্ত হই নাই কিন্তু উক্তরূপ ভাবনার ভিতর ভাবিবার মত কিছু যে দার্শনিক সত্য নিহিত আছে, সকলেই তাহা কিছু কিছু উপলব্ধি করিতে পারি।

সম্প্রতি নাংটিন্থ সেঞ্চুরি নামক ইংরাজি মাসিক পত্রিকায় শ্রীযুক্ত এ-পি, সিনেট মহোদয়, জ্যোতিষীর ভাবে ব্রহ্ম দর্শন সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বঙ্গীয় পাঠকের গোচরার্থ আমরা এখানে উহার সার মর্ম্ম উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

য়ুরোপে শাস্ত্র ও বিজ্ঞানের বিরোধ বহুকাল যাবৎ আরম্ভ হইয়াছে। এতকাল পরে কিন্তু উভয় দল মধ্যে সন্ধি স্থাপনের একটা আগ্রহ লক্ষিত হইতেছে। শাস্ত্র বিশ্বাসী কুল, বিবিধ বিজ্ঞান সমূহ মধ্যে জ্যোতিষ শাস্ত্রটিকেই সর্ব্বাধিক সন্দেহের দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেন। পূর্ব্বে শাস্ত্রব্যবসায়িগণ শাস্ত্রার্থ অবধারণ কালে নিজেদের মধ্যে প্রচলিত পুরুষপরম্পরাগত শাস্ত্র মর্ম্ম সমূহের প্রচার করিতেন, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত সমূহের সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক বিবেচনা করিতেন না, বিজ্ঞানের প্রতি অনাদরের

ভাব প্রদর্শন করিতেন। পক্ষান্তরে কোন কাচের জিনিসের দোকানে ষাঁড় এসে ঢুকিলে, দোকানের জিনিস কুনিস যেমন সে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলে, সেইরূপ ডারউইন প্রমুখ বৈজ্ঞানিক বর্গের প্রথম অভ্যুদয় কালে বিজ্ঞানের হাতে পড়ে শাস্ত্রেরও কতকটা সেই দশা ঘটে ছিল। যাহা হউক বিজ্ঞান ও শাস্ত্রের মধ্যে এই উপেক্ষা বিদ্বেষ ও সন্দেহের ভাব ক্রমশঃই কাটিয়া আসিতেছে; এখন বরং বিজ্ঞানের মানই বজায় রাখিয়া তদনুযায়ী শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও শাস্ত্রার্থ অবধারণের চেষ্টাই লক্ষিত হয়। এখন আর বৈজ্ঞানিক ও নাস্তিক একার্থবাচক নহে; শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ অবধি তাঁহাদের আস্তিক্য-বুদ্ধি খ্যাপনে এখন আর কুণ্ঠা দেখান না এবং শাস্ত্রব্যবসায়িগণও বুঝিতেছেন, বিজ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকার ফলে, ধর্ম্ম, ঈশ্বর শাস্ত্রার্থ প্রভৃতি সম্বন্ধে সনাতন ধারণা সমূহ বহুলাংশে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে বটে, কিন্তু নূতন নূতন ভাবে উপলব্ধি আর নাস্তিক্য বুদ্ধি, দুটা ঠিক এক জিনিস নহে।

বিজ্ঞান ও শাস্ত্রের মধ্যে একটা প্রধান পার্থক্য এই, শাস্ত্র যেন উপর হইতে নীচের দিকে আগমন করে আর বিজ্ঞান উল্টা পথে নীচু হইতে উপরে উঠিতে যেন চেষ্টা পায়। আপ্ত বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া, যেন কোন অপ্রত্যক্ষের নির্দ্দেশানুযায়ী, প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গঠন, শাস্ত্রের অভিপ্রেত। আর বিজ্ঞান, প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তদনুযায়ী অপ্রত্যক্ষ সম্বন্ধে ধারণা গঠনে সাহসী। কি শ্রেয়ঃ কিবা প্রেয়ঃ, কি বিশ্বাস্য কি অবিশ্বাস্য, কি কর্ত্তব্য কিবা অকর্ত্তব্য ইত্যাদি নির্দ্ধারণ কালে শাস্ত্র ও বিজ্ঞান এইরূপ বিভিন্ন পথের অনুসরণ করেন। সরল সত্যপিপাসু হৃদয় উভয় পথেরই গৌরব বুঝিয়া এবং উভয়েরই অসম্পূর্ণতা অনুভব করিয়া উভয়ের সাহায্যে স্বীয় মত গঠনে চেষ্টা পান।

উভয়দলের মধ্যে এইরূপ সন্ধি স্থাপন চেষ্টা ফলে এখন আবার অল্পে অল্পে অনেকেই ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন, জড়ের ন্যায় চেতনেরও জন্মদাত্রী এই যে পূর্ণা প্রকৃতি, ইহাঁকে শুধু জড় রূপে ধারণা করিলে সেটা কি ভুল ধারণা হইবে না? জড় দেহ বিশিষ্ট সচেতন দেহীর ন্যায় জড় চেতন মিলিয়া পূর্ণ প্রকৃতিটা চৈতন্যময়ী ভাবিতেই বা বাধা কি! প্রাকৃতিক নিয়মগুলা জড়ের গুণরূপে যেমন ভাবনা করা হয় তদ্রূপ চৈতন্যময়েরই ইচ্ছা প্রকাশ ভাবিলেই বা দোষ কি? প্রকৃতিটা অচেতন জড় শক্তি না ভেবে, জড়টা সচেতনেরই বিকাশ ভেদ বা আংশিক স্ফূর্ত্তি মাত্র ভাবিবার জন্য ধীরে ধীরে মানব মন আবার প্রস্তুত হইতেছে।

জগৎস্রষ্টা কোন একদিন এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, স্রষ্টা সম্বন্ধে এই পুরাতন ধারণায় অনেকে আজকাল আর আকৃষ্ট হন না। সৃষ্টির কি আদি অন্ত লক্ষিত হয় যে উহার আরম্ভ কল্পনা করিতে হইবে? পক্ষান্তরে, ভ্রূণ হইতে মানবের বিকাশ, বীজ হইতে বৃক্ষের বিকাশ, নীহারিকা হইতে সৌরজগতের বিকাশ ইত্যাদি সৃষ্টি লীলা নিয়ত প্রত্যক্ষের বিষয়। বিশ্বময় সদা সজীব এই যে সৃষ্টি প্রক্রিয়া একভাবে দেখিলে ইহা আদ্যন্ত বিহীন, আর এক ভাবে দেখিলে ইহার আদি অন্ত অনুক্ষণ ঘটিতেছে। বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশবাদে সৃষ্টি রহস্য স্ফুটতর হইয়াছে। স্রষ্টা ও সৃষ্টি অভিন্নরূপে উপলব্ধি

করিবার জন্য মানব মন অল্পে অল্পে প্রস্তুত হইতেছে। নিরাকার অপ্রত্যক্ষ কল্পনায় ভগবানের পরিবর্ত্তে সাকার প্রত্যক্ষ ভগবানের জন্য ব্যগ্রতা বাড়িতেছে। স্থূল সূক্ষ্ম দুটাকে পৃথক্ না ভেবে একেরই মূর্ত্তিভেদ রূপে ধারণা জন্মিতেছে।

ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ বটে কিন্তু চৈতন্য বা জ্ঞানটি আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়েই নিবদ্ধ নহে এ ধারণা জন্মিতে বিলম্ব হয় না। যে জীব যেরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বাস করে তাহার তদুপযোগী দেহ ও ইন্দ্রিয়গ্রাম উদ্ভূত হয়। জলে চুপাইয়া ধরিলে আমরা বিনাশ পাই কিন্তু মৎস্যাদি জলচর জীবের ইন্দ্রিয়গ্রাম তাহাতে নষ্ট হয় না প্রত্যুত তদ্বিপরীত অবস্থায় কার্য্য শক্তি হারায়। এই ভাবে বিচার করিয়া যাইলে বরফ অপেক্ষাও শৈত্যে এবং অগ্নির অপেক্ষাও তাপে চৈতন্যের সত্বা বা জীবের অস্তিত্ব আর অসম্ভব বিবেচিত হইবে না; স্থূল সূক্ষ্ম যে কোন আকারে চৈতন্যের অধিষ্ঠান সম্ভব পর মনে হইবে। blairvoyance প্রভৃতি সূক্ষ্মেন্দ্রিয়ের বিকাশও প্রমাণিত করে, চৈতন্যের বিকাশ আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীতও নানা অবস্থায় ও নানা আকারে ঘটিতে পারে।

এই ভাবে বিচার করিয়া গেলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জীবপূর্ণ ভাবিতে আর ভয় হইবে না, সূর্য্যাদি গ্রহগণকে সচেতন মনে করিতেও সঙ্কোচ বোধ হইবে না, স্থূল শরীরী বা সূক্ষ্ম শরীরী দেবতা, এঞ্জেল, মুক্ত মহাত্মা প্রভৃতির কল্পনায় শিহরিয়া উঠিবার আবশ্যক হইবে না।

পুরাতন মতে এঞ্জেল বা দেবদূতগণ ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন কর্ম্মচারী স্বরূপ। নাস্তিক বৈজ্ঞানিক এই ভাবের কর্ম্মচারীকুলের অস্তিত্বে সন্দেহবান্। নাস্তিক আস্তিকের সন্ধির পরিণামে এই উভয় ভাবই কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত আকার প্রাপ্ত হয়। বীজ হইতে বৃক্ষের বিকাশ ভ্রূণ হইতে জীবদেহের বিকাশ প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমরা বুঝিতে পারি, বিশ্বব্যাপী ক্রমবিকাশ লীলা বা সৃষ্টি লীলাটি যেন কোন নাটকের অঙ্কের পর অঙ্কে ক্রম বিকাশের অনুরূপ সৃষ্টিস্থ ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলেই সেই পূর্ণা প্রকৃতি বা স্রষ্টার কর্ম্মচারী স্বরূপ অথবা অংশ স্বরূপ; অথবা এই সৃষ্টি লীলায় সকলেই যেন এক একটি অভিনেতা রূপে নিজ নিজ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। এই সমস্ত অভিনেতৃবর্গ বা কর্ম্মচারী কুল আমাদের ন্যায় প্রকৃতি বিশিষ্ট হউন বা না হউন, উহাঁদের অস্তিত্বে সন্দেহের কারণ নাই, কারণ উহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। বৈজ্ঞানিক এই বিশ্বের তাবৎ ব্যাপারে, সৃষ্টি লীলার এই সমস্ত অভিনেতৃবর্গ স্রষ্টার এই সব কর্ম্মচারী কুল বা অংশ সমূহ দেখিয়া সুখী হন। দেবতাদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিতে যদি সাধ যায়, জ্যোতির্ব্বিৎ ঐ সূর্য্য চন্দ্রাদিকে দেখাইয়া দিবেন। ইহাঁদের ন্যায় সৃষ্টি লীলার বিরাট অভিনেতা, স্রষ্টার মহৎ কর্ম্মচারী বা শ্রেষ্ঠ বিকাশ আর কি আছে?

মনের ভাব ভাষায় বা অক্ষরে প্রকাশ করা কত না দুরূহ! লেখনী চিত্র বা ভাষার সাহায্যে মানস চিত্রাঙ্কণ চেষ্টা অধিকাংশ স্থলেই অসম্পূর্ণ। এই অসম্পূর্ণতাকে বড় করিয়া দেখিয়া, এই ত্রুটিটা একটা জঘন্য ত্রুটি বিবেচনায় অভ্যস্ত হইয়া উপাস্য সম্বন্ধে মূর্ত্তি বা চিত্র রচনার চেষ্টা দেখিলে কেহ কেহ অতীব বিরক্ত হন, প্রতিমা পূজার নামেই অনেকে খড়্গহস্ত। তথাপি ভাষার সাহায্যে মনোভাব প্রকাশের চেষ্টা কমে না, লেখনী

চিত্রাঙ্কণে ও তুলিকা সাহায্যে চিত্রাঙ্কণে কেহ বিরত হন না। প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধবাদিগণও বহু সময় অজ্ঞাতসারে প্রতিমাপূজক সাজিয়া বসেন। য়ুরোপের মধ্যযুগের কোন কোন চিত্রে ত্রিমূর্ত্তি ঈশ্বরের (ঈশ্বর, খৃষ্ট ও পবিত্রাত্মার) পারিবারিক চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে দেখা যায়। উচুঁ একখানি আর্ম-চেয়ার বা কেদারার উপর বসিয়া দীর্ঘশ্মশ্রু পিতা ঈশ্বর শোভা পাইতেছেন, তাঁহার পিঠের উপর একটি ঘুঘুর রূপ ধরে পবিত্রাত্মা উপবিষ্ট, পার্শ্বে একটু নীচু আসনে পুত্র ঈশ্বর বা খৃষ্ট বিরাজমান। উপাস্যকে এবম্বিধ ভাবে চিত্রে প্রকাশিত দেখিলে আজিকালিকার দিনে অনেকেই শিহরিয়া উঠেন কিন্তু খৃষ্ট ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট ইত্যাকার শাস্ত্রের কথা শুনিলে ইঁহারাও শিহরিয়া উঠেন না। প্রতিমা পূজার উপর খড়্গহস্ত অনেকেই এইরূপ অজ্ঞাতসারে নিজেরাই প্রতিমা পূজক।

প্রতিমা পূজার বিড়ম্বনা বুঝিতে সত্য-সত্যই যদি সাধ থাকে, আকাশে একবার নেত্রপাত করা। সূর্য্যের দিকে একটি বার চাহিয়া দেখিলেই চক্ষু ঝলসিয়া যাইবে মূর্ত্তি বা চিত্ররচনা ত দূরের কথা। স্রষ্টার অনন্তত্ব জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান সাহায্যে যেমন প্রকটিত হয় এমন কোন ধর্ম্মশাস্ত্র সাহায্যে হয় কি না সন্দেহ। এই জ্যোতিষের সহিত খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্রের এক সময় কি বিবাদই না চলিয়াছিল। পৃথিবীকে সচল বলায় গ্যালিলিওকে কারা-বদ্ধ হইতে হইয়াছিল; বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সয়তানী কাণ্ডরূপে বিবেচিত হইত। এক-দিকে শাস্ত্র বিশ্বাসীকুল সদম্ভে বিশ্বাসের জয় ঘোষণায় প্রবৃত্ত, অন্য পক্ষে বৈজ্ঞানিকের দল, "কোন বিষয় অসত্য জানিয়াও তৎপ্রতি সত্যের ন্যায় সমাদর প্রদর্শন বা মিথ্যা পূজার নাম বিশ্বাস" বিশ্বাসের প্রতিকূলে এইরূপ সব উপেক্ষাবাণী সমূহের প্রচার রত। শাস্ত্র ও জ্যোতিষের সেই পুরাতন দ্বন্দ্ব এখন শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। জ্যোতিষের সাহায্যে শাস্ত্র এখন অনেক মার্জ্জিত তত্ত্বের অধিকারী হইতেছেন। অনন্তের ধারণা একটা উদা-হরণ।

আমাদের এই পৃথিবীটি কিরূপ বিশাল! কত কোটি কোটি জীব ইঁহার অঙ্কে লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইতেছে। আমাদের এই সৌরজগতের সূর্য্যটি, এই পৃথিবী অপেক্ষাও সহস্র সহস্র গুণ বৃহত্তর। আবার, এই সূর্য্য অপেক্ষাও বহুগুণে বৃহত্তর লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র বা সূর্য্যে আকাশের ছায়াপথ পূর্ণ। পৃথিবী তাঁহার বার্ষিক গতিতে সূর্য্যের চারিদিকে কত না বিস্তীর্ণ পথ প্রতি বর্ষে অতিক্রম করিতেছেন; নেপচুন গ্রহের ভ্রমণপথ এতদপেক্ষা কোটি কোটি গুণ বৃহত্তর। আজ কাল প্রায় সকল জ্যোতিষীই স্বীকার করেন, সূর্য্য তাঁহার অধীনস্থ গ্রহ উপগ্রহগুলিকে সঙ্গে লইয়া প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় বার চৌদ্দ মাইল হিসাবে প্রচণ্ডবেগে শূন্যপথে ছুটিয়া চলিয়াছেন। সূর্য্যের গন্তব্য পথটি যে কি সে সম্বন্ধে জ্যোতিষিগণ এখনও কোন স্পষ্ট জবাব দিতে পারেন না কিন্তু অনুমান সাহায্যে, ইহাও আমরা কিয়ৎ পরিমাণে নির্ণয় করিয়া লইতে পারি।

এই শ্রেণীর অনুমানের বৈজ্ঞানিক নাম extrapolation. নিয়মগুলা নিত্য ও বিশ্বব্যাপী এবং স্থূল সূক্ষ্ম প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ সর্ব্বত্র প্রসারিত এইরূপ একটা ধরিয়া লওয়া হয়। এইরূপ ধারণা বা স্বতঃ সিদ্ধি সাহায্যে, প্রত্যক্ষের অনুরূপে অনেক অপ্রত্যক্ষ সত্য

আমরা নির্ণয় করিয়া থাকি। উপমা অনুমানকে এই ভাবে প্রমাণরূপে গ্রহণ করার নাম extrapolation আমরা দেখিতে পাই, উল্কা ধূমকেতু প্রভৃতি কতকগুলি ব্যতীত অন্তরীক্ষচর যাবতীয় গ্রহ উপগ্রহাদি, আবর্ত্ত গতিতে বৃত্তাভাস পথে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহা হইতে প্রাগুক্ত extrapolation বা অনুমান বলে আমরা ধরিয়া লইতে পারি, আমাদের এই সৌর জগতের সূর্য্যও তাঁহার অধীনস্থ গ্রহ উপগ্রহ গুলিকে সঙ্গে লইয়া অতি বেগে, অনন্ত তুল্য এক অতি বিস্তীর্ণ পথে, অপর কোন বৃহত্তর সূর্য্য বা নক্ষত্রকে পরিবেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছেন।

উপমা অনুমানাদি ব্যতীত আরও এক সূক্ষ্মতর ভাবে বহু সত্যের আবিষ্ক্রিয়া হয়। এক সূক্ষ্ম চৈতন্য শক্তি বা জ্ঞান শক্তিতে এই বিশ্ব যেন ব্যাপ্ত হইয়া আছে। উপযুক্ত যন্ত্রে যেমন তারহীন তাড়িতবার্ত্তা সমূহ ধরা পড়িয়া যায়, আমাদের হৃদয়েও অনেক সত্যের আঁভাস সেই ভাবে যেন প্রতিফলিত হয়। স্বচ্ছ দর্পণে পরিষ্কার প্রতিবিম্ব উঠার মত, অনেক সত্য স্থূল আকারে বাহিরে প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে হৃদয় আকাশে সূক্ষ্মাকারে যেন তাহাদের একটা ছায়া উঠে। রেড়িয়ম্ আবিষ্কারের প্রায় দ্বাদশ বর্ষ পূর্ব্বে (শ্রীযুক্ত সিনেট্ মহোদয় কর্ত্তৃক) এতৎ সম্বন্ধে যে সমস্ত তত্ত্বাভাস প্রকাশিত হইয়াছিল সেগুলি পূর্ব্বোক্ত ভাবে সত্যোপলব্ধির উদাহরণরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে। সুখের বিষয় ঐ সব তত্ত্ব মুদ্রাযন্ত্র সাহায্যে পূর্ব্বেই জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল সুতরাং সে সব সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ বা বিবাদের সম্ভাবনা নাই। কতকটা এইরূপ ভাবের সত্যোপলব্ধির ধরণে, অনেকেই আজ কাল মনে করেন, আমাদের এই সূর্য্য ও সৌর জগৎ, sirius সিরিয়াস্ নামক নক্ষত্রটির চারিদিকে প্রদক্ষিণ রত।

এই সিরিয়াস্ নক্ষত্রটির দূরতা প্রভৃতি ভাবিতে বসিলে, "অনন্ত" যে কি ব্যাপার একটু আধটু আভাস পাওয়া যায় এবং তাহাতেই আমাদের মাথা ঘুরিয়া যায়। আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল; আলোক রেখা এক বর্ষে কতটা পথ অতিক্রমে সমর্থ ইহা হইতে গণিতের সাহায্যে নির্ণয় কর; সিরিয়সের দূরতা এইরূপ ৮.৮ বা প্রায় নয়টি আলোক বর্ষ। কতকগুলি সংখ্যার পার্শ্বে কতকগুলি শূন্য বসাইয়া আর ফল কি? মানব মন এ দূরতার ধারণায় অক্ষম।

সিরিয়াসের দূরতা ও ঔজ্জ্বল্য প্রভৃতি আলোচনা করিয়া জ্যোতিষিগণ বিবেচনা করেন, সিরিয়স্ নক্ষত্রটির আকার ও কিরণজাল আমাদের এই সূর্য্য অপেক্ষা তিন শত হইতে প্রায় সহস্র গুণ অধিক। আমাদের এই একটি মাত্র সৌর জগৎ নহে, এমন একাধিক সৌর জগৎ হয় ত এই সিরিয়াস্ নক্ষত্রটিকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে। পৃথিবীর তুলনায় অতি প্রকাণ্ড আমাদের এই সূর্য্যটি, সিরিয়াস্ নাক্ষত্রিক জগতে ক্ষুদ্র এক গ্রহস্থলীয় মাত্র।

এই বিরাট বিশ্বে, ক্ষুদ্র এই বসুন্ধরাই কি চৈতন্যের একমাত্র আবাস ও বিকাশ ক্ষেত্র? গত শতাব্দীর মধ্যভাগেও অনেক অনেক পণ্ডিতের অবধি এইরূপ ধারণা ছিল। এখন অল্পে অল্পে এই ভাবটি পরিত্যক্ত হইতেছে। মঙ্গল গ্রহের অবস্থা বহুপরিমাণে পৃথিবীর অনুরূপ বলিয়া, মঙ্গল গ্রহে আমাদের ন্যায় জীবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকেই আজকাল

বিশ্বাসবান্। আবার পৃথিবীর ন্যায় অবস্থা এবং মানবের ন্যায় জীবন না হইলে চৈতন্যের অধিষ্ঠান বা বিকাশ অসম্ভব, আজকাল অনেকেই আর এরূপ মনে করেন না। তৎসৎ ব্রহ্ম যে একমাত্র মানবেরই অনুরূপ ভাব বিশিষ্ট এ ধারণা অল্পে অল্পে পরিত্যক্ত হইতেছে, আত্মা সম্বন্ধে মানবের ধারণা এইরূপ ধীরে ধীরে আমূল পরিবর্ত্তিতাকার ধারণ করিতেছে।

আমাদের এই সৌর জগৎ সিরিয়াস্ নক্ষত্রটিকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে বলিয়া যেমন অনুমান করা যায়, তদ্রূপ ঐ সিরিয়াস্ নাক্ষত্রিক জগৎ আবার কোন বৃহত্তর নক্ষত্রকে বেষ্টন করিয়া সম্ভবতঃ ঘুরিতেছে। সিরিয়াস্ নক্ষত্রটির দূরতা প্রায় নয় আলোক বর্ষরূপে নিরূপিত হইয়াছে; আকাশের গায় আর্কটরস্ (arctarus) নামক আর একটি নক্ষত্রের দূরতা প্রায় ১৪০ আলোকবর্ষ অথচ ঔজ্জ্বল্যে ইহা সিরিয়সের সহিত প্রায় তুল্য মূল্য! ইহা হইতে এই আর্কটরস্ নক্ষত্রটির আকার ও কিরণের পরিমাণ কতকটা অনুধ্যেয়। আকাশের অনন্তদেহে এইরূপ আরও কত নক্ষত্র বিরাজিত নিরূপণে কাহারও শক্তি নাই।

মহৎ ছেড়ে একবার অণুরদিকে মন দাও। অণুতে অন্তর্লীলা বুঝিতে চাহ কি? বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, চারি ইঞ্চ মাত্র ব্যাস বিশিষ্ট কোন শূন্যগর্ভ কাচ গোলককে যদি ক্ষণতরে সম্পূর্ণ শূন্যগর্ভ করিয়া উহার মধ্যে প্রতি সেকেণ্ডে দশকোটি হিসাবে বায়ুর অণু প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলেও ঐ ক্ষুদ্র গোলকটি বায়ব অণুতে পূর্ণ হইতে পঞ্চাশ হাজার বর্ষ অতিবাহিত হইয়া যাইবে। বুঝিয়া দেখ কত ক্ষুদ্র স্থানে কত অধিক অণুর সমাবেশ। জ্যোতির্ব্বিদের বিশ্বব্যাপী স্রষ্টা বা সৃষ্টি শক্তি এইরূপ অনন্ত এবং অণোরনীয়ান ও মহতো মহীয়ান্।

এই স্রষ্টা বা সৃষ্টি শক্তিটির বৈচিত্র্য লীলাও অনন্ত। জীব ও জড় প্রত্যেকের মধ্যেই কত না বৈচিত্র্য। মূলতঃ এক সর্ব্বব্যাপী সৃষ্টি শক্তির অংশীভূত হইলেও সুতরাং বিভিন্ন জড়জীব প্রভৃতির ন্যায় বিভিন্ন দেবতা বা প্রধান প্রধান সৃষ্টি শক্তির অস্তিত্ব এবং তাঁহাদের প্রকৃতি ও কার্য্যক্ষেত্র স্বতন্ত্র ও বহুধা বিভিন্ন হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।

সৃষ্টির বিকাশ পদ্ধতিটি প্রণিধান করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি, উহা নানা পর্য্যায়ে বিভাজ্য। জড় জগতের সৃষ্টি পুষ্টি লয় আর জীবের ক্রমোন্নতির বা ক্রম পরিণতি ঠিক একভাবের বিকাশ নহে। (দৃষ্টান্ত স্বরূপ আহার্য্য সংস্থান জন্য জীবন সংগ্রামে জড়কে যোগ দিতে হয় না; জড় অন্নচিন্তা মুক্ত)। জীবের ভিতর আবার মানুষের ক্রমপরিণতির ইতিহাসে, আরও একটু বিভিন্ন ভাবে চৈতন্যের ক্রম বিকাশ লক্ষিত হয়। (ইতর জীবের বুদ্ধি কর্ম্মশক্তি প্রভৃতি কতকটা যেন জড় জগতের প্রাকৃতিক নিয়মের অনুরূপ, মৌমাছির চাক, বাবুয়ের বাসা চিরকাল একই ভাবে নির্ম্মিত—উহাদের সহিত মানুষের আবাস গৃহ সমূহের বৈচিত্র্য তুলনা কর; অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে ইতর জীব অপেক্ষা মানুষের সামর্থ্য অধিক; মানুষের ক্রমোন্নতি যে ভাবে শিক্ষা সাপেক্ষ ইতর জীবে তাহা দৃষ্ট হয় না—কচ্ছপের ছানাকে ডিম হইতে বাহির হইয়া সাঁতার শিখিবার জন্য স্কুলে যাইতে হয় না। ইত্যাদি ইত্যাদি দৃষ্টান্ত হইতে ইতর জীব ও মানুষের মধ্যে ক্রমবিকাশ পদ্ধতির বিভিন্ন ধারা

বুঝিতে পারা যায়)। মানুষের মধ্যে আবার সভ্য ও অসভ্য সমাজে শিক্ষার দান ও গ্রহণ শক্তিটি সমভাবে বিকশিত নহে। এই সমস্ত বিভিন্ন বিকাশের মূল স্বরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির সৃষ্টি, শক্তি, স্রষ্টা বা দেবতার পরিকল্পনায়ও দোষ নাই। প্রকৃত পক্ষে ইহারা সবাই অভিন্ন একই স্রষ্টার বহুধা বিকাশ মাত্র। কিন্তু ভাবের খেলায় একত্বের পরিবর্ত্তে বহুত্বটাই বড় করিয়া দেখিয়া জড় ও চৈতন্যকে পৃথক্ বিবেচনা করিলেও ক্ষতি নাই। সূর্য্য প্রাণহীন জড়পিণ্ড মাত্র ভাবিলেও, চেতন দেবতা, মুক্ত পুরুষ প্রভৃতি নানা উপাস্যের অস্তিত্ব সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত বা অসম্ভব বিবেচিত হইবে না। স্রষ্টার বা সৃষ্টি শক্তির একাংশ জড় ও অপরাংশ চৈতন্যময় ভাবিলেও উভয়ের বিকাশই অন্তহীন এই সমস্ত অনন্ত বিবিধ বিকাশ, ভাবের খেলায় কখন পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র কখন বা অভিন্ন রূপে উপলব্ধ হয়। একভাবে দেখিলে স্রষ্টা ও সৃষ্টি স্বতন্ত্র, সৃষ্টির মধ্যে আবার জড় ও চেতনরূপ দুটা প্রধান পার্থক্য, এবং এই দুই প্রধান পার্থক্যের প্রত্যেকটির ভিতর আবার অনন্ত পার্থক্য স্বীকৃত হয়। আর একভাবে দেখিলে উহার বিপরীত প্রক্রিয়ার চিন্তার গতি হইয়া একত্বটাই সত্যরূপে উপলব্ধ হয়, সৃষ্টি ও স্রষ্টা অভিন্ন হইয়া দাঁড়ায়। বৈজ্ঞানিকের ব্রহ্ম এইরূপ প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ উভয় ভাবান্বিত।

পুরাতন শাস্ত্র বিশ্বাসানুসারে আমাদের এই নানাভাবে অপরিণত, অসম্পূর্ণ, মানবাকারে বিকশিত চৈতন্যটিই অনন্তরূপে কল্পিত হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকের ক্রমবিকাশবাদ সহ পরিচয় ফলে, ধীরে ধীরে সেই পূর্ব্বধারণা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। চৈতন্যের ক্রমবিকাশ ফলে মানব ধীরে ধীরে অসভ্যাবস্থা হইতে সভ্যাবস্থায় উপনীত হয়। চৈতন্যের এই ক্রমবিকাশরূপী অনশ্বরত্ব আর পুরাতন শাস্ত্র বিশ্বাসীর মানবাত্মার অনশ্বরত্ব উভয় ধারণার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। অনন্ত এই বিশ্বের অনন্ত এই সৃষ্টি রহস্য পর্য্যালোচনা ফলে, জ্যোতির্ব্বিদের মানব ও ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় ধারণা, সাধারণ মানবের এতৎসম্বন্ধীয় ধারণা হইতে এইরূপ বহু বিষয়ে পৃথক্। বিজ্ঞানের সাহায্যে পুরাতন শাস্ত্র বিশ্বাস ও শাস্ত্রার্থের অবধারণ ধীরে ধীরে মার্জ্জিত ও পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

আমাদের মন্তব্য।—বঙ্গীয় পাঠক কুলকে শ্রীযুক্ত সিনেট মহোদয়ের প্রবন্ধের একটু পরিচয় প্রদান উদ্দেশ্যে, প্রধানতঃ উহা অবলম্বনেই, বর্ত্তমান প্রবন্ধটি লিখিত। উহাকে বেদ বাক্যরূপে প্রমাণ স্বরূপে উপস্থাপিত করা, বা সর্ব্বাংশে উহার সমর্থন আমাদের অভিপ্রেত নহে। ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় কোন সিদ্ধান্ত বা আলোচনা, সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে সর্ব্বজন কর্তৃক নির্ব্বিবাদে শিরোধার্য্য হইবার সম্ভাবনা খুবই অল্প। যাহা হউক জ্যোতিষচর্চ্চাফলে মানব ও ব্রহ্মসম্বন্ধীয় ধারণার একটি আভাস, সিনেট মহোদয়ের এই প্রবন্ধে আমরা প্রাপ্ত হই এবং উহাতে ভাবিবার মত যে অনেক বিষয় আছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বলা বাহুল্য, শাস্ত্র ও শাস্ত্রবিশ্বাসী বলিতে সিনেট মহোদয় প্রধানতঃ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র এবং তদ্বিশ্বাসী সম্প্রদায়কেই লক্ষ্য করিয়াছেন কিন্তু শাস্ত্র ও বিজ্ঞানের মধ্যে সংঘর্ষের পরিণাম বিষয়ক তাঁহার উক্তি গুলি অন্যান্য দেশের শাস্ত্র বিশ্বাসী সম্বন্ধেও বহুপরিমাণে যথার্থ।

সিনেট্ মহোদয়, ইউরোপে শাস্ত্রবিশ্বাসী ও বৈজ্ঞানিকের মধ্যে প্রবল বৈরিতার ইতিহাসের কিছু কিছু আভাস দিয়াছেন। আমাদের এদেশে কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র এবং বিজ্ঞান বা দর্শনের মধ্যে বিরোধের পরিবর্ত্তে একটা সন্ধিস্থাপনের চেষ্টাই যেন বরাবর লক্ষিত হয়। এদেশের দার্শনিক, স্বীয় মতানুযায়ী শাস্ত্র ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন এবং তদনুযায়ী সম্প্রদায় সমূহের উদ্ভব হয়; সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মতান্তর দৃষ্ট হয় কিন্তু শাস্ত্রের উপর সকল মতেরই ভিত্তি; শাস্ত্রকে স্বপক্ষে আনিতে যাঁহারা চাহেন না বা পারেন না, এদেশে সেই সব মতের প্রায়ই প্রতিষ্ঠা হয় না। য়ুরোপে যিনি বৈজ্ঞানিক তিনি শাস্ত্র ব্যাখ্যাতার পদ গ্রহণে প্রায়ই চেষ্টা পান না; ও দেশে আপ্তবাক্যে ও বিজ্ঞানে তাই এমন ঘন ঘন বিরোধ উপস্থিত হয়, আর আমাদের দেশে শাস্ত্র ও বেদ প্রায়ই উন্নতির পরিপন্থী রূপে বিবেচিত হয় না। শাস্ত্রব্যবসায়িগণ বিজ্ঞান দর্শনাদির চর্চ্চা না করিলে, অথবা বৈজ্ঞানিক দার্শনিকবর্গ শাস্ত্র চর্চ্চা ছাড়িয়া দিলে, ঐ ভাবের ধর্ম্ম বিপ্লব উপস্থিত হয়, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর মধ্যে বিরোধ বাধে ও শেষে একটা রফারফির বা সন্ধিস্থাপনের প্রয়োজন হয়।

নাস্তিকতাটা উপাসনারই প্রকার ভেদ মাত্র, বৈরিভাবে উপাসনা ও শ্রেষ্ঠ উপাসনা, ইত্যাকার মতবাদের সহিত এতদ্দেশবাসিগণ বহুদিন হইতে পরিচিত এবং এ সম্বন্ধে অনেক সুন্দর সুন্দর উদাহরণও বহুদিন হইতে এদেশে প্রচারিত। সিনেট্ মহোদয়ের সন্দর্ভে, শাস্ত্র ও বিজ্ঞানের মধ্যে সন্ধি বিগ্রহের ইঙ্গিতে এই বৈরিভাবে উপাসনার অর্থ সুন্দর ও বিশদ ভাবে আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়। শাস্ত্র বিশ্বাসীকুল যেন মিত্রভাবের উপাসক এবং সত্যপিপাসু বৈজ্ঞানিক ও নাস্তিক দার্শনিকের দল যেন উদাসীন ও বৈরিভাবের উপাসক সম্প্রদায়। উপাসনার এই ত্রিমূর্ত্তিটি অনুধ্যানের যোগ্য বটে। শেষোক্ত দুই উপাসক সম্প্রদায়কে আর রাবণ কংসাদির ন্যায় পুরাণের অতীত কাহিনীমাত্ররূপে ভাবিবার আবশ্যক হয় না।

সিনেট্ মহোদয়ের প্রবন্ধে বর্ত্তমান য়ুরোপীয় দর্শনের উপর প্রাচ্য দর্শনের প্রভাব স্পষ্ট লক্ষিত হয়। প্রকৃতিকে চৈতন্যময়ী জ্ঞান করিতে এদেশের লোক চিরাভ্যস্ত এবং ঐ তত্ত্বেরই বর্ত্তমান যুগের উপযোগী বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সংগ্রহ জন্য এদেশেরই একজন মনীষী (শ্রীযুক্ত জগদীশ বসু) বর্ত্তমানে তপস্যা নিরত।

স্রষ্টা ও সৃষ্টির অভেদ সম্বন্ধেও শ্রীযুক্ত সিনেট্ মহোদয়ের ধারণা এইরূপ এদেশবাসী অনেকের পক্ষে নূতন মনে হইবে না—উহা বেদান্তেরই শাখা বিশেষের মতবাদ মাত্র।

ধর্ম্মকে বিভিন্নরূপে দর্শন, ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা মতের উদ্ভব, মনে হয় যেন অনিবার্য্য। দেশ কাল পাত্র ভেদে একই কথার বিভিন্নরূপ অর্থোপলব্ধি হয়। "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের অর্থাবধারণ চেষ্টা এ বিষয়ের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। "তৎ ত্বম্ অসি" তুমিই সেই এবং "তস্যত্বম্ অসি" তুমি তাঁহার এই দুই ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করিয়া অদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদীরূপে দুই মহাসম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। সিনেট্ মহোদয় প্রোক্ত আত্মার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধেও এইরূপ নানা ধারণা দৃষ্ট হয়। কেহ মনে করেন দেহান্ত ঘটিলে জীবাত্মা কোন এক অপ্রত্যক্ষ সূক্ষ্ম লোকে চিরাবস্থিত রহিয়া ক্রমবিকাশ বা পরিণতি প্রাপ্ত হন; কাহারও বিবেচনায়

অপ্রত্যক্ষ সূক্ষ্ম লোক নাই, এই খানেই নূতন স্থূল দেহে জন্মান্তর লাভ হয়; কাহারও মতে, স্থূল সূক্ষ্ম উভয় লোকেই কিছুকাল করিয়া অবস্থিতি ও ক্রমবিকাশ ঘটে। অপর কাহারও বা ধারণায়, দেহান্তে দেহী সৃষ্টি শক্তিতে পর্য্যবসিত হইয়া যান, তাঁহার ব্যক্তিত্ব লোপ পায়; এবং নূতন নূতন জড়জীবের উদ্ভব হইয়া সৃষ্টির ক্রমবিকাশ লীলাটি মোটের উপর অব্যাহত থাকে। ইঁহাদের প্রত্যেক দলই আপন আপন মত স্থাপন জন্য নানাবিধ যুক্তি তর্কের শরণ লয়েন। ইহাদের মধ্যে এই শেষোক্ত মতটি কিয়ৎ পরিমাণে নাস্তিকতার প্রবর্ত্তক ও কাহারও কাহারও নিকট আপাত-প্রতীয়মান সত্যরূপে অনুভূত হইতে পারে বলিয়া এতৎ সম্বন্ধে শুধু আমরা বলিতে চাহি, যে সৃষ্টি শক্তিতে পর্য্যবসিত হইলে ব্যক্তিত্বের বিলোপ সাধন না ঘটিয়াও উহা হইতে পারে। এখনই কি আমরা সৃষ্টি শক্তিতে পর্য্যবসিত নহি? আমরা কি সৃষ্টি ক্রীড়ার বহির্ভূত। অহং অভিমানটি ত্যাগ করিতে যিনি যে পরিমাণে সমর্থ, জীবিতই হউন বা মৃতই হউন তাঁহার ব্যক্তিত্ব সেই পমিমাণে বিলুপ্ত, সেই পরিমাণে তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে সৃষ্টি শক্তিতে পর্য্যবসিত, সেই পরিমাণে তিনি মোক্ষাভিমুখে অগ্রসর। আমরা সবাই সতত সৃষ্টি শক্তিতে পর্য্যবসিত রহিলেও ব্যক্তিত্ব বোধ বিবর্জ্জিত নহি, আমাদের মধ্যে কয়জনই বা প্রকৃত মোক্ষাভিলাষী, এবং মরণের পরই উহা সহসা উহা ঘটিয়া যায় মনে করারও কারণ নাই। যাহা হউক আমরা দেখিলাম, একই ক্রমবিকাশবাদ পাত্রভেদে নানা ভাবে গৃহীত হয়।

স্রষ্টা ও সৃষ্টির অভেদ খ্যাপনেই বা গোল মিটে কৈ? নাস্তিকও এক হিসাবে অভেদবাদী কারণ নাস্তিক সৃষ্টির অতিরিক্ত স্রষ্টা স্বীকারে অসম্মত; তাঁহার দৃষ্টিতে স্রষ্টাই সৃষ্টি, সুতরাং এই হিসাবে তিনি অভেদবাদী। প্রভেদ এই, নাস্তিকের সৃষ্টিটা চেতনাবিহীন জড় পদার্থ মাত্র, নাস্তিকের দৃষ্টিতে চৈতন্য ক্ষণ-ভঙ্গুর। আস্তিক ওরূপ মনে করেন না। আস্তিক সৃষ্টির বাহিরে বা সৃষ্টিসহ মিলিত ভাবে, অস্তিত্বে বিশ্বাসী। একদল আস্তিকের মতে, স্রষ্টা ও চৈতন্যের চির সৃষ্টি মূলতঃ অভিন্ন; আর একদল আস্তিকের বিবেচনায় উহারা চির স্বতন্ত্র এমন কি সৃষ্ট জীব চৈতন্য আমি।

অস্তিকের অভেদবাদও একবিধ নহে। একদলের মতে, সৃষ্টিটা যেন দেহ এবং স্রষ্টা তাহার মধ্যে দেহীর ন্যায় বিরাজিত। কেহ বা এই প্রকৃতিকে সগুণা ও চৈতন্যময়ী রূপে জ্ঞান করেন এবং জড়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। কেহ বা এই সগুণার আধাররূপী নির্গুণ সচ্চিদানন্দময় সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎ পান। প্রসিদ্ধ ধর্ম্মোপদেষ্টা শ্রীযুক্ত হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, তাঁহার "পত্রাবলীতে" এই অভেদবাদের আর একটি নূতন ব্যাখ্যাসহ আমাদিগকে পরিচিত করেন। রক্তের পরিণতিই এই মাংস অস্থি প্রভৃতি হইলেও, এই হিসাবে মাংস অস্থি প্রভৃতি রক্তের সহিত অভিন্ন হইলেও, শোণিতেরএকটা মুখ্য সত্তা ও অধিষ্ঠান স্থল আছে; রাজা হইতে সমস্ত রাজকর্ম্মচারী অবধি একই রাজশক্তির বিবিধ বিকাশ মাত্র, তথাপি রাজার স্বতন্ত্র ও প্রধান অস্তিত্ব স্বীকার্য্য। স্রষ্টা ও সৃষ্টি এই ভাবে মূলতঃ অভিন্ন হইলেও উহাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে, অন্ততঃ ব্যবহারিক জগতে উপাস্য উপাসকের সম্বন্ধাদি বিলুপ্ত হয় না।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে এইরূপ নানা মুনির নানা মত আবহমান কাল হইতেই পরিদৃষ্ট। সিনেট মহোদয়ের স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্বন্ধীয় আলোচনারও সম্ভবতঃ ঐরূপ পরিণাম ঘটিবে।

অনুমান উপমাদি সাহায্যে সত্য নির্ণয় এবং নির্ম্মল হৃদয় দর্পণে সত্যের প্রকাশ এদেশেরই পুরাতন মত। সিনেট মহোদয়ের প্রবন্ধ হইতে বুঝা গেল, নব্য যুগেও ঐ সমস্ত মত অনাদৃত নহে।

সিনেট মহোদয়ের প্রবন্ধে জ্যোতিষের সাহায্যে অনন্তের ধারণাটি সুস্পষ্ট করিবার প্রয়াস বহুপরিমাণে সফল হইয়াছে। তাঁহার সন্দর্ভের এই অংশটুকু সকলেরই উপভোগ্য হইবে আশা করা যায়।

ফলতঃ বিজ্ঞানের সাহায্যে ধর্ম্ম বিশ্বাস যেমন মার্জ্জিত হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মের বিভিন্নরূপ ধারণা সহ পরিচয় বৃদ্ধি ফলেও মার্জ্জিত ধর্ম্মমত গঠনে সাহায্য হয়। প্রধানতঃ এই আশাতেই আমরা এই নানাভাবের দ্যোতক, উৎকৃষ্ট প্রবন্ধটির সার মর্ম্ম বঙ্গীয় পাঠক কুলের গোচরে আনিতে চেষ্টা পাইলাম।

শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়।

ভারতীয় মুসলমানসম্রাট্‌গণের সাহিত্যসেবা ও শিক্ষাবিস্তার

বাবর

নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, বাবর তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ তৈমুরলঙ্গের চরিত্রের কয়েকটী কঠোর গুণ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর শিষ্ট ও সদ্‌গুণ সম্পন্ন ছিলেন। ঐতিহাসিক পণ্ডিত এরস্কিন্ (Erskine) এই সুলতান সম্বন্ধে যে সকল প্রশংসা করিয়াছেন তাহা অপাত্রে অর্পিত হয় নাই যথা—

"মোটের উপর যদি আমরা পক্ষপাতিত্ব শূন্য হইয়া এশিয়ার ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করি তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব কয়েকজন মাত্র যুবরাজ বাবর অপেক্ষা প্রতিভা ও গুণে ভূষিত হইয়াছিলেন। হয়ত বাবরের পৌত্র আকবরই গভীর ও উদার নীতির জন্য তাঁহার উচ্চে স্থান পাইতে পারেন, কিন্তু কুটীল কৌশলী আরংজেব আকবরের সমশ্রেণী ভুক্ত হইতে পারেন না। চেঙ্গিস খাঁ ও তৈমুরের চরিত্রগত গুণ তাঁহাদের বিজয় কাহিনীর সঙ্গেই জড়িত রহিয়াছে এবং উহা বাবরের চরিত্রকে অনেক বেশী অতিক্রম করিয়াছিল। কিন্তু হৃদয়ের কার্য্যকারিণী শক্তি, উৎফুল্ল উদার প্রীতি এবং মনুষ্যোচিত ও সামাজিক গুণ সম্বন্ধে আমরা সম্ভবতঃ দেখিতে পাইব, এশিয়ার রাজগণের মধ্যে বাবর অপেক্ষা কেহই উচ্চাসন প্রাপ্ত হন নাই।"[১]

বাবরের চরিত্রের অন্যান্য গুণাবলীর সঙ্গে তাঁহার সাহিত্যানুরাগও সংযুক্ত হইতে পারে। তিনি আরবী পারসী ও হিন্দী সাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং বিচক্ষণ সমালোচক ছিলেন।[২] বাবর

1. Erskine's *Memoirs of Babar*. p. 432.

2. *Tuzkia Babari* Elliot iv, p. 219.

জ্ঞান-লাভের প্রথমাবস্থা হইতেই কবিতার বিশেষত্ব সম্বন্ধে চর্চ্চা করিয়াছিলেন এবং সংগৃহীত তুরকী কবিতা গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। ঐ সকল কবিতা তাঁহার জীবন স্মৃতিতে উদ্ধৃত হইয়াছে। আবুল ফজল বাবরের পারসী গ্রন্থ 'মাস্‌বাণী' রচনা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন উহা সুপ্রচারিত ছিল। বাবর ছন্দঃপ্রকরণ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন এবং আরও ছোট ছোট কতকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

তাঁহার যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থের নাম জীবন স্মৃতিতে১ লিখিত আছে উহা তুর্কী ভাষায় রচিত হয়।২ তিনি খোজা আব্দুল অরারের গ্রন্থকেও কবিতায় পরিবর্ত্তিত করেন। বাবর গদ্য ও পদ্য উভয় রচনাতেই কৃতী ছিলেন এবং সঙ্গীতাভিজ্ঞতা দ্বারা উক্ত বিষয় সম্বন্ধে উচ্চ ধরণের একখানি ভাষ্য৩ও লিখিয়াছিলেন। 'তারিখি রাসিদি' গ্রন্থের কর্ত্তা মির্জ্জা মহম্মদ হাইদার লিখিয়াছেন—

"তুর্কী কবিতা রচনায় তিনি আমীর আলি সার পরবর্ত্তী কবি ছিলেন।—তিনি মুরাইয়ান নামক ছন্দঃ প্রণালীর উদ্ভাবক। নিত্য প্রয়োজনীয় আইন বিজ্ঞানের ভাষ্যও তৎকর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। তুর্কী ছন্দঃপ্রকরণ সম্বন্ধেও তাঁহার রচিত ক্ষুদ্র ভাষ্য ছিল। উক্ত ভাষ্য অন্যান্য লোকদিগের অপেক্ষা সৌন্দর্য্যবিধায়ক হওয়াতে রিসালা—ই-ওয়ালিড়িয়া নামে কবিতায় লিপিবদ্ধ হইয়া তাঁহার নামের পবিত্রতা রক্ষা করিতেছে।" ৪

আমরা তারিখি মুজাফঃরী হইতে আরও জানিতে পারি যে, উবইদুল্লা অরারের মাতা কর্ত্তৃক লিখিত একখানি ধর্ম্ম গ্রন্থের ভাষ্যকে বাবর কবিতায় পরিবর্ত্তিত করেন। তিনি ছন্দঃপ্রকরণ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া উহার নাম রাখেন মুফঃস্বল ৫। ১৫০৪ খৃঃঅব্দে তিনি নূতন এক প্রকার হস্তাক্ষর প্রচলন করেন উহা 'বাবরী, হস্ত,৬ বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত ছিল। তিনি উক্ত হস্তাক্ষরে কোরআনের একখানি নকল করিয়া মক্কায় প্রেরণ করেন।

বাবরের শিক্ষালাভ সম্বন্ধে মাননীয় লেনপুল বলেন—

পাঁচবৎসর বয়সে শিশুকে (বাবর) সমরখন্দে লইয়া যাওয়া হয়। পরবর্ত্তী ছয় বৎসর শিক্ষা ও সৎসঙ্গে কাটিয়াছে কারণ সেই সময় নিজের শারীরিক উন্নতি বিধানের অবসর খুব কমই ছিল এবং দুইটী ভাষাতে যে প্রশংসনীয় জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, দ্রুত ধারণা শক্তিই উহার একমাত্র কারণ। আমরা তাঁহার শৈশবের শিক্ষা সম্বন্ধে কিছুই জানি না তবে ইহার কারণ সম্বন্ধে ধারণা হয় যে, শিক্ষার প্রকৃষ্ট সময় পরিবারের মহিলাদিগের নিকটেই কাটিয়াছিল।" ৭

1. *Babar's Memoirs* was translated into Persian by *Khan Khanan* at the instance of Akbar ; *vide* Miratul Alam M.S. in the Boh. coll., leaf 179.

2. Erskine's *Memoirs of Babar* P. 431 ; also *Ferisha* vol. ii, pp. 61 and 65.

3. Erskines *Memoirs of Babar* p. 431. Also Ferishta vol. ii. pp. 61 and 65.

4. Translation by E. D. Ross and N. Elias, pp. 173, 174, see also *Muntakkhabul Tawarikh*, vol. i, (Ranking) p. 449.

5. *Tarikhi Muzaffari* By Mahamad 'Alikhan Ansari, M.S. in ASB, pp. 14, 15.

6. Talbot's *Memoirs of Babar*, p. 97.

7. *Muntakkhabul Tawarikh*, vol i. (Ranking) p. 449.

বাবর আমোদপ্রিয় লোক ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই বন্ধুবান্ধবদিগের সঙ্গ ভাল বাসিতেন এবং সেই সময় সদ্য রচিত কবিতা এবং তুর্কী ও পারসী ভাষা হইতে নানা বিষয়ের আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন। প্রায়ই তাঁহার বন্ধুগণ কোন প্রকারে বিষাদিত হইলে, তিনি তাঁহার হৃদয় আমোদ আহ্লাদে পূর্ণ করিয়া নিশ্চল অর্ণবযানের মত আসিয়া উপস্থিত হইতেন। যাহা হউক তাঁহার বন্ধুদিগের মধ্যে অনেকেই সাহিত্যিক ছিলেন এবং তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনীতে বর্ণিত আছে যে, একখানি নৌকার উপরে সাহিত্যিকদিগের সম্মিলনীর মধ্যে বাবর এবং তাঁহার বন্ধুবর্গ পরস্পরকে কবিতা রচনা করিয়া আমোদিত করিতে ছিলেন। ১

সাহিত্যিকদিগের মধ্যে যে কয়জন বাবরের সহিত ঘনিষ্ঠসম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে নানা প্রকারে উৎসাহ ও পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম বিখ্যাত মীরখুন্দের পুত্র হবিবুল সিয়রের রচয়িতা খুন্দামীর, দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ও ভাব রচয়িতা মৌলানা সাহাবুদ্দিন, এবং হিরাটের মির্জ্জা ইব্রাহিম। তাঁহারা সুলতানের দরবারে বাস করিবার জন্য সুলতান কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন। খুন্দামীর অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়া হিরাট ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং হিন্দুস্থানে উপস্থিত হইয়া আগ্রাতে সম্রাটের সহিত পরিচিত হন। সম্রাট বাবরের বঙ্গযাত্রা উপলক্ষে তিনি সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর খুন্দামীর হুমায়ূন কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন এবং হুমায়ূনের নামে কোয়ানুনি-হুমায়ুন রচনা করেন। উহা আবুল ফজল আকবরনামাতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি হুমায়ুনের সঙ্গে গুজরাট যাত্রা করেন এবং সেই খানেই (১৫৩৪-৩৬ অব্দে) তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃতদেহকে, নিজামুদ্দিন অলিয়া, এবং আমীর খুসরুর সমাধির পাশে সমাহিত করা হইয়াছে।২

গ্রন্থকার হিসাবে তাঁহার প্রাথমিক জীবনে তিনি পারশ্য-সুলতান হোসেনের বিদ্বান মন্ত্রীর যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। সুলতান তাৎকালিক সমস্ত মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া একটা দামী লাইব্রেরী তৈয়ারী করেন এবং উক্ত মন্ত্রীকে উহার তত্ত্বধায়করূপে নিযুক্ত করেন।৩

যাহা হউক বাবরের জীবনস্মৃতিতে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতির কথা থাকিলেও ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে, যখনই আমরা উহাতে দেখিতে পাই যে হিন্দুস্থানে কোন কলেজ ছিল না লিখিত আছে তখনই ইহা মিথ্যা বলিয়া ধারণা হয়। উহাতে আরও লিখিত আছে—"হিন্দুস্থানবাসিগণের ভাল ঘোড়া নাই, এখানে ভাল মাংস পাওয়া যায় না, আঙ্গুর অথবা সুমিষ্ট তরমুজাদি নাই, কোন প্রকার ভাল ফল নাই, বরফ অথবা সুপেয় জল নাই, হিন্দুস্থানের বাজারে কোন প্রকার ভাল খাদ্য অথবা রুটি পাওয়া যায় না। কোন একটী স্নানাগার অথবা কলেজ নাই, মোমবাতি নাই মশাল নাই—নাই একটী আলোক

1. Erskine's Memoirs of Babar, p. 291.
2. Elliot iv, pp. 141, 143.
3. *Ibid.*

দানি।" কথাটার মূল্য কিরূপ সহজেই বুঝা যায়। ১

ভারতবর্ষে আলোচিত হিন্দু জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানমূলক গণনা এবং তাৎকালিক সমরখন্দের পর্য্যবেক্ষণাগার ও মুসলমানদিগের উদ্ভাবিত গণনা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—

"এই পর্য্যবেক্ষণাগার হইতে উলুগ বেগ মির্জ্জা জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় তালিকা প্রস্তুত করেন; সেই তালিকাই বর্ত্তমান সময়ে ব্যবহৃত হইতেছে কদাচিৎ অন্য গুলিও ব্যবহৃত হয়। ঐ সকল তালিকা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে হলাকুর রাজত্বকালে মরাঘা বেক্ষনাগার হইতে খাজা নসারের নির্ম্মিত ইল্‌খানি তালিকাই (সুত্র) সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইত। হলাকুখাঁ ইলখানিতে রাজত্ব করিতেন। সারা জগতের মধ্যে সাতটি কি আটটির বেশী পর্য্যবেক্ষণাগার ছিল না। এই সকল বেক্ষণ গৃহের মধ্যে একটি খালিপ মামুন কর্ত্তৃক উত্তোলিত হয়, এবং ঐ বেক্ষণাগার হইতে যে সকল তালিকা (সুত্র) বাহির হইত উহা পণ্ডিত মহলে 'জিক মামুনি' বলিয়া পরিচিত ছিল। একটী টলেমিয়াস (টলেমি) কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয় এবং অন্যতম একটী হিন্দুস্থানের রাজা বিক্রমজিতের সময়ে মালব রাজ্যে উজ্জয়িনী এবং ধারের কোন হিন্দু কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। উক্ত রাজ্য এখন মাণ্ডুদের রাজধানী বলিয়া পরিচিত। সেই সময়ে যে তালিকা (সুত্র) আবিষ্কৃত হয় হিন্দুগণ আজও তাহা ব্যবহার করিতেছেন। যাহা হউক তাহাদের আবিষ্কৃত সুত্রগুলি অন্য সকলেরই অপেক্ষা অসম্পূর্ণ। হিন্দুদের বেক্ষণাগারের অট্টালিকাটী আজপর্য্যন্ত ১৫৮৪ বৎসরের স্থাপিত।" ২

গাজিখাঁ পাঞ্জাবের একজন আফগান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। সম্রাট ইব্রাহিমের নিকট হইতে আফগানদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য বাবরকে আহ্বান করেন। তাঁহার এই বিশ্বাসঘাতকতার নিমিত্ত বাবর তাঁহাকে বন্দী করিয়া কিছুকাল পর মুক্তি দিলেন। গাজিখাঁর মূল্যবান গ্রন্থাদি শোভিত বড় পাঠাগার ছিল, বাবর ১৫২৫ অব্দে পাঠাগার পরিদর্শন করিয়া কতকগুলি গ্রন্থ হুমায়ুন ও কামরানের ব্যবহারের জন্য পাঠাইয়া দেন। লাইব্রেরীতে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কতকগুলি গ্রন্থ ছিল; ঐগুলি শুধু সুলতানের ধর্ম্মে মতি রাখিবার জন্যই পাঠাগারে ছিল। যাহা হউক বাবর পুস্তক কয়খানি গ্রহণ করিয়াও সন্তুষ্ট না হইয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন যে—"মোটের উপর এই বইগুলির চেহারা দেখিয়া যতটা মূল্যবান মনে করিয়াছিলাম কাজে তাহার পরিচয় পাইলাম না।" ৩

একখানি গ্রন্থকে ছবি দ্বারা অধিকতর সরল এবং চিত্তাকর্ষক করিবার অভ্যাসটি মুসলমানভারতে বাবরের আমল হইতে আরম্ভ হয়। তাঁহার জীবন স্মৃতিতে যে সকল প্রাণীর বিষয় বর্ণিত আছে তাহাদিগের মূর্ত্তি আঁকিয়া দেওয়া হইয়াছে। নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে ইহাতে গ্রন্থের সৌন্দর্য্য যথেষ্ট বৃদ্ধি

1. *Babar's Memoirs*, p. 333 (or Tablot's *Memoirs of Babar*, p. 190).

(2) Erskine's *Memoirs of Babar* pp. 50, 51. The task of farming the tables was given by Ulugh Beg Mirza first to Qazizadah Rumiaudon his death to Maulana Ghiyasuddin Jamshid and then to Ibn Ali Mahammad Kusliji.

(3) Talbot's *Memoris of Babar* p. 176 also *Tazkiratul-Salation* MS in the Book call, leaf 104.

পাইয়াছে কিন্তু জাহাঙ্গীর এই সকল ছবির দোষ বাহির করিয়া বলেন, খুব সম্ভবতঃ চিত্রকরগণ জীবনাদর্শ হইতে ছবিগুলি আঁকে নাই। তিনি তাঁহার নিজ জাহাঙ্গীর নামাতে এই অভাব দূর করিয়াছেন। ১

বাবর চিত্রবিদ্যার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন এবং সেই জন্যই তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের পাঠাগার হইতে যে সকল ছবি পাইয়াছিলেন প্রত্যেক খানিরই এক এক খানি নকল ভারতবর্ষে আনিয়া ছিলেন। নাদির সাহার দীল্লিজয়ের পর তৈমুর বংশীয়দের কেহ কেহ পারস্যে ঐ গুলি লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে।

এই সকল চিত্র ভারতীয় চিত্র শিল্পের উপর যথেষ্ট প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল। ২

বাবরের অমাত্য সৈয়দ মুখবীরআলি প্রণীত তাওয়ারিখ গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি যে, সেই সময়ের সাধারণ কর্ম্ম বিভাগের (সুরাটি আম) কার্য্য মোগলসম্রাটগণের বংশ পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছিল। আমরা বিশ্বাস করিতে পারি অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যের মধ্যে ডাক বিভাগ প্রতিষ্ঠা, সংবাদপত্র প্রচলন এবং স্কুল কলেজের গৃহ নির্ম্মাণ প্রভৃতি অন্যতম কার্য্য বলিয়া গৃহীত হইত। শিক্ষা বিভাগের কার্য্যাবলী গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টির মধ্যে ছিল এবং উহার কার্য্য পরিদর্শন সরকারী কাজের তালিকাভুক্ত ছিল।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে বাবরের সময়ের পণ্ডিত বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে— সেখজৈনখানি তিনি ওয়াকি-আতি-বাবরির অনুবাদ করেন, মৌলানা সাহাবুদ্দিন হেঁয়ালিজ্ঞ এবং মীর জামালুদ্দিন পুরাণ বর্ণনায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ৩

হুমায়ুন

হুমায়ুন তাঁহার পিতার প্রবাদ কাহিনী গুলিকে অনুধাবন করিয়া চলিলেন। নানা প্রকার আমোদপ্রমোদ ও সামাজিক বিষয়ের আলোচনা এবং রাষ্ট্র সংক্রান্ত কর্ত্তব্য ও পাঠাভ্যাসে সময়াতিবাহিত করিতেন। তিনি ভূগোল এবং খগোল বিদ্যার আলোচনা করিতেই ভালবাসিতেন এবং পঞ্চভূতের প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রবন্ধাদিও লিখিতেন। তাঁহার নিজের উক্ত বিষয়দ্বয়ের আলোচনার জন্য পার্থিব ও স্বর্গীয় গোলক ৪ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি পণ্ডিত কবি এবং দার্শনিকদিগের সংসর্গ ভাল বাসিতেন; তাঁহাদের সহিত সাহিত্য সম্বন্ধে নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক করিতেন। তিনি কাব্য প্রিয় ছিলেন। এবং নিজেও সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

সুলতানের বয়স যখন ৪ বৎসর ৪ মাস এবং ৪ দিন তখন তাঁহার প্রথম শিক্ষকাধীনে বিদ্যারম্ভের জন্য উৎসব করা হইয়াছিল।

(1) *Waquati-Fahangiri* Elliot, VI. p. 331.

(2) Martin's *Miniature painting and painters of India*, Persia and Turkey Vol. i. p. 79.

(3) *Muntakhabul-Tawarikh* vol. 1 (Ranking) p. 449.

Ferishta vol. ii, pp. 70, 71; *Ta-skhi-Akbari*, MS. in ASB, leaf 19; *Tarikhi-Salatani-Afaghana*, MS. in ASB, by Ahmad Yadgar, leaf 208; Abul Fazl, in his *Akbar Namah*, vol. i. p. 287 (Beveridge), says: "His noble nature was marked by the combination of the energy of Alexander and the learning of Aristotle."

শিশু সুলতানকে বসাইয়া বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের হাতে তাঁহার ভার দেওয়া হইয়াছিল। ১ সাজাহান নামাতে ইহা মকতব উৎসব ২ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

মাননীয় এল, এফ, স্মিথ (L. F. Smith) ১৮০১ অব্দে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের মুসলমান সমাজে এই বিদ্যারম্ভ উৎসব দেখিয়া যাহা বর্ণন করিয়াছেন নিম্নে তাহাই উদ্ধৃত হইল—"শিশু যখন ৪ বৎসর, ৪ মাস ও ৪ দিনের হয় সেই দিন তাহার জন্য রৌপ্য নির্ম্মিত একখানি শ্লেটে "সুরাহি ইকরা" নামে কোরআনের এক অধ্যায় লিখিয়া দেওয়া হয় এবং বালক উহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করে। অবশ্য এসময়ে একজন শিক্ষক সামনে রাখা হয়।" ৩

এই সুলতান তাঁহার দরবারে দাতা বলিয়া প্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার রাষ্ট্রের অধিবাসীদিগকে শ্রেণী বিভক্ত করেন, উপযুক্ততানুসারে পদোন্নতির সূত্রপাত করেন। বিভিন্ন শ্রেণীর অভার্থনার ৪ (বসিবার) জন্য কতকগুলি বড় বড় ঘর নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং বক্তৃতা শুনিবার জন্য তাহাদিগকে দিন ধার্য্য করিয়া দেওয়া হইত। এইরূপ ব্যবস্থা হইতে বুঝা যায় সাহিত্যিক (পণ্ডিত)দিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হইত এবং তাহাদিগকে কোন্ আসন দেওয়া হইত।

তাঁহার সাম্রাজ্যের জনসাধারণকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়:—

১। সাধু, সাহিত্যিক, আইনব্যবসায়ী এবং বৈজ্ঞানিকদিগকে লইয়া যে শ্রেণী বিভাগ করেন তাহার নাম রাখেন অলি-স, আদত। কারণ এইরূপ লোকের সংসর্গ করিলে, তাহাদের প্রতি সম্মান এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলে চিরোন্নতির সূচনা করে।

২। সুলতানের স্বজন সম্ভ্রান্তব্যক্তিবর্গ অমাত্যগণ এবং সৈনিক বিভাগকে লইয়া যে শ্রেণী বিভাগ করেন তাহার নাম রাখেন অলি দৌলত কারণ তাহাদের ছাড়া কোন প্রকার ধনলাভের আশা নাই।

৩। যাহাদের সুশ্রী এবং সৌন্দর্য্যছিল, যাহারা যুবক এবং লাবণ্যময় ছিল, যাহারা সঙ্গতজ্ঞ ও গায়ক ছিল তাহাদিগকে লইয়া এই শ্রেণী গঠন করেন উহার নাম দেওয়া হয় আলিমুরাদ (আমোদী লোক)। ৫

রাজা সাপ্তাহিক দিনগুলিকে পর্য্যন্ত ভাগ করিয়া দিলেন; এবং এই তিন দলের প্রত্যেকের জন্য ২ দিন নির্দ্দেশ করেন। শনি ও বৃহস্পতি বার (১) শ্রেণীর জন্য দেওয়া হয়। শনির নামানুসারে শনিবারে এবং বৃহস্পতির নামানুসারে বৃহস্পতিবারে দেওয়া হয়—কারণ এই গ্রহদ্বয় মানুষকে বিপদ হইতে রক্ষা করেন এবং নিরাপদ রাখিতে চেষ্টা করেন বলিয়াই এই বারদ্বয় দেওয়া হয়। রবি ও মঙ্গলবার (২) শ্রেণীর জন্য দেওয়া হয়, রবির (সূর্য্য) নামানুসারে রবিবারে দেওয়া

1. *Muntakhabul-Tawarikh*, vol. i (Ranking), p. 602 ; *Ferishta* vol. ii. pp. 178—180.

2. *Tazkiratul-Salatin*, MS. in the Boh. Coll. vol. i, leaf 169.

3. *Shah-Jahan-Namah*, MS. in ASB, leaf 45. The ceremony looks very much like the *Hate Khadi* (হাতে খড়ি) of Hindus.

4. L. F. Smith's Appendix to *Chahar Darwish*, p. 253.

5. *Humayun-Namah*, Elliot v, pp. 119, 120.

হইয়াছে কারণ প্রত্যেক রাজারই অদৃষ্ট সূর্য্যের উদয়াস্তের সঙ্গে গ্রথিত। এবং মঙ্গলের নামানুসারে মঙ্গলবারে দেওয়া হয় কারণ মঙ্গল যোদ্ধৃদিগের এবং সাহসী পুরুষদিগের পৃষ্ঠপোষক। সোম এবং বুধবার (৩) শ্রেণীর জন্য দেওয়া হয় কারণ চন্দ্রের নামানুসারে সোমবার এবং বুধের নামানুসারে বুধবার দেওয়া হইয়াছে। ইহা যুক্তি সঙ্গত যে, রাজা ঐ দুই বারে যুবক এবং চন্দ্রের মত সুশ্রী পুরুষদিগের সঙ্গে বাস করিবেন এবং তাহাদের সুমধুর সঙ্গীত এবং মনোহারী বাদ্য শ্রবণ করিবেন।"

প্রতি শুক্রবারেই (জুম্মাবার) রাজা তিন শ্রেণীকেই একত্রিত করিতেন এবং যতক্ষণ তাঁহার অন্য একটী কার্য্যের সময় না আসিত ততক্ষণ তাঁহাদের সঙ্গে একত্র উপবেশন করিতেন। ১

তাঁহার নির্দ্ধারিত উপরোক্ত তিনটি শ্রেণীর কোনটীতেই সাহিত্যিকদিগের জন্য কোন সম্মানের স্থান নাই; কিন্তু তিনি যে সকল সবডিভিসন (subdivision) প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহাতে স্থান দিয়াছেন। পদের তারতম্য দেখাইবার জন্য তিনি (রাজা) সোনার সঙ্গে অন্যান্য ধাতুর মিশ্রণের পরিমাণানুসারে সোনার তীর বিতরণ করিতেন। তিনটী প্রধান শ্রেণী ১২টী তীরন্দাজ শাখা শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। দ্বাদশ সংখ্যক তীর খাঁটী সোনার তৈয়ারী হইত এবং উহা রাজার নিজ তূণের মধ্যে রক্ষিত হইত। রাজাই স্বয়ং প্রথম শ্রেণীতে ছিলেন। একাদশ সংখ্যক তীর রাজার আত্মীয় এবং সরকারী কাজে নিযুক্ত 'সুলতান'গণ পাইতেন। দশম সংখ্যক তীর পণ্ডিত ও ধার্ম্মিকগণকে দেওয়া হইত। নবম সংখ্যকটী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে, ৮ম সংখ্যক তীর দরবারীদিগকে এবং রাজার নিজ পরিচিত পাত্রদিগের মধ্যে কেহ কেহ পাইতেন, সপ্তম সংখ্যক তীর—সেনাপতিদিগের পরিচিত ব্যক্তিরা পাইতেন, ৬ষ্ঠ সংখ্যকটী উত্তম ব্যবহারিণী স্ত্রীলোকেরা পঞ্চমটী যুবতী পরিচারিকাদিগকে চতুর্থটী কোষাধ্যক্ষ ও পরিচারকদিগকে, তৃতীয়টী সৈন্যদিগকে, দ্বিতীয়টী অতি নিম্ন শ্রেণীর ভৃত্যদিগকে এবং ১মটী প্রাসাদরক্ষক, উষ্ট্রপালক প্রভৃতিকে দেওয়া হইত।

এই সকল তীরন্দাজদিগেরও আবার তিনটী পদ আছে—উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন। ২

ফেরিস্তা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, সুলতান শ্রোতাদিগের নিমিত্ত ৭টী বড় বড় হর্ম্ম্য সকল তৈয়ারী করেন। ঐ সময় ঘরের মধ্যে তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদিগকেই গ্রহণ করিতেন। ৭টী গ্রহের নামানুসারেই ৭টী ঘরের নাম করণ হয়। চন্দ্রপ্রাসাদে, ভ্রমণকারী ও রাজদূত প্রভৃতি বক্তৃতা শুনিতেন। অতারদ্‌ অথবা শুক্র প্রাসাদে রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ স্থান পাইতেন। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ শনি ও বৃহস্পতি প্রাসাদে স্থান পাইতেন। হুমায়ুন বক্তৃতা দিনের গ্রহের অনুসারে সেই সেই ঘরে বক্তৃতা দিতেন এবং সেই দিন ঘরের আসবাব এবং ছবিগুলি এমন কি লোকদিগের পোষাক পর্য্যন্ত গ্রহের বর্ণিত

1. *Humayun-Namah*, Elliot v, pp. 121, 122.

2. *Humayun Namah*, Elliot v, p. 123.

পোষাকের মত পরিতে হইত। এই সকল প্রাসাদের প্রত্যেকটীতে তিনি সপ্তাহে একদিন বেচা কেনা করিবার প্রথা করিয়া দিয়াছিলেন। ১

লুব্বুল তওয়ারিখ প্রণেতা মীর আবদুল লতিফ সুলতান কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, কিন্তু হুমায়ুনের মৃত্যুর পর তিনি রাজ দরবারে পর্য্যন্ত স্থান পাইয়াছিলেন। তিনি একজন বড় দার্শনিক, ঐতিহাসিক এবং ধর্ম্ম শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। আকবরের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে তিনি তাঁহার গুরুর পদে অধিষ্ঠিত হন।' ২

সুবিখ্যাত পারশী ঐতিহাসিক খুন্দামির যিনি গুজরাটে সম্রাটের শিবিরে মৃত হন তিনিও সম্রাটের সাহিত্যিক বন্ধুদিগের অন্যতম ছিলেন।

তজকিরতুল ওয়াকি আত (হুমায়ুনের একখানি অজ্ঞাত জীবন চরিত) প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ জৌহর সম্রাটের অতি নিম্নশ্রেণীর ভৃত্য ছিলেন। তিনি যাহা কিছু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ভৃত্যাবস্থায় তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুবিধা ছিল। ৩

হুমায়ুন পুস্তক প্রিয় ছিলেন, এমন কি কোন স্থানে যাত্রাকালেও তাহার নির্ব্বাচিত লাইব্রেরীটী সঙ্গে যাইত। যখন তিনি সের সাহের ভয়ে দ্রুত পলায়ন করিতেছিলেন তখনও তাহার সঙ্গে পুস্তক রক্ষক এবং অতি প্রিয় কয়েক খানি পুস্তক লইয়াছিলেন।৪ যখন তিনি কাম্বের শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন সে সময় তাহার সঙ্গে কতকগুলি পুস্তক ছিল। সেই সকল পুস্তকের মধ্যে তৈমুরলঙ্গের ইতিহাসই প্রসিদ্ধ। একদা নৈশ আক্রমণের সময় তাঁহার শিবির হইতে এক শ্রেণীর বুনোজাতি 'কুলি' দিগের দ্বারা পুস্তকগুলি অপহৃত হয়। যাহা হউক পরে ঐ গ্রন্থ সকল আবার উদ্ধার করা হইয়াছিল। ৫

লাল বেগের পিতা নিজাম সুলতানের পুস্তক রক্ষক ছিলেন তিনি বজ বাহাদুর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ৬

সির মণ্ডলের ব্যবহার দ্বারা হুমায়ুনের সাহিত্য সাধনায় মতি পরিবর্ত্তন আরও অধিকতর প্রকাশ পাইয়া ছিল। পুরাণ কিল্লাতে ইহা সের সাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত

1. *Ferishta* vol. ii. p. 71. Briggs' note: Among the Hindus cities are usually subdivided into *puras* (wards) called after each day of the week, by which markets are regulated and equally distributed throughout the town; palaces sometimes derive their names from these words."

2. Elliot iv, p. 294.

3. Elliot v, p. 136.

4. Noer's *Akbar*, p. 136.

5. Elphinstone, vol. ii, p. 126 (ed. 1841). *Tazkiratul-Salatin*, MS. in Boh. Coll., vol. i., leaf 125, adds that the *Timur-Namah* was copied by one Mulla Sultan 'Ali; *Akbar Namah* vol. i p. 309 (Beveridge), informs us that it was illustrated by Ustad Bihzad.

6. *Tuzaki-Jahangiri*, by Rogers and Beveridge, p 21.

হয়; ইহা আমোদ গৃহরূপে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু হুমায়ুন যখন দ্বিতীয়বার দিল্লীর সিংহাসনে আসীন ছিলেন তখন তিনি উহাকে (সির মণ্ডল) পাঠাগারে পরিণত করেন। এই খানেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সিয়র উল মুতাখ খরিন প্রণেতা বলেন "একাদন" "সম্ভবতঃ শুক্রগ্রহ ১ নিয়মিত সময়ের কিছু পরে উঠিবে। এই কথা শুনা মাত্র সন্ধ্যার সময়ে তিনি (হুমায়ুন) ঐ গ্রহকে দেখিবার জন্য তাঁহার পাঠগৃহের ছাদের উপর আরোহন করেন। ছাদের উপর কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া নামিতে ইচ্ছা করিলেন। মু'আজা'নের সময় উপস্থিত হইল। হুমায়ুন আজানের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইবার জন্য নীচের সিঁড়িতে বসিতে চাহিলেন। সিঁড়ি গুলি মসৃণ থাকায় অত্যন্ত পিচ্ছিল ছিল। হঠাৎ ঐ সিঁড়ি হইতে পা সরিয়া যাওয়ায় হুমায়ুন, মাথা নীচের দিকে রাখিয়া সিঁড়ি গুলি গড়াইয়া মাটীতে পড়িয়া গেলেন।২ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং শরীরের গ্রন্থি গুলিতে খুব আঘাত পাইলেন। মাথার ডান দিকে খুব বেশী জখম পাওয়ায় ঐ সঙ্গেই অজ্ঞান হইয়া পড়েন।"৩ উহার কিছুকাল পরই তাঁহার মৃত্যু হয় (১৫৫৬ খৃঃ অব্দ—জানুয়ারী)।

আমরা দিল্লীতে হুমায়ুনের প্রতিষ্ঠিত একটী মাদ্রাসার কথা শুনিতে পাই। সেখ হোসেন সেখানে একজন অধ্যাপক ছিলেন। ৪

তাঁহার জীবিত কালের মধ্যে হেঁয়ালী রচনায়, সদ্য কবিতা রচনায় এবং পদ্য ও প্রবন্ধ উভয় বিষয়ের রচনায় সেখ জৈহুদ্দিন কাফি অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। সিনহারের (চুণার) নিকটে সেখ জৈনুদ্দিন কাফি ১৫৩৪ অব্দে দেহ ত্যাগ করেন এবং তাঁহার মৃত দেহ তৎপ্রতিষ্ঠিত কলেজের ভিতর সমাহিত হয়। তাঁহার স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার নিমিত্ত যমুনার তীরে আগ্রার বিপরীতদিকে একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ৫ হুমায়ুনের রাজত্ব কালে ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই দুইটী শিক্ষা কেন্দ্রের নাম শুনিতে পাই।

নূতন দিল্লীর সন্নিকটেই হুমায়ুনের যে বিখ্যাত সমাধি রহিয়াছে তাহাই এক সময়ে বিদ্যাদানের স্থানরূপে ব্যবহৃত হইত তাহা সাধারণে জানে না। সমাধিভবন সর্ব্বদাই কেবল মাত্র একটী সুন্দর ও অতুল গৃহ

1. *Sayyid Ahmad* (Garcin's Transl., p. 129) confirms the story, but Ferishta differs, and says that the Emperor went there for an airing. See also *Ferishta* vol. ii. pp. 177, 178. Hearn says, "His death was due to his astrological studies. One evening he was told that Venus ought to be visible, and he determined, if he saw the planet, to promote certain nobles, as it would be fortunate to do so."—Hearn's *Seven Cities of Delhi*, p. 218.

2. The fact of Humayun's "rolling downstairs on to the ground" has been taken as improbable by some writers. *e.g.* Elphinstone, Marshman, etc., though that is the story told by *Ferishta Muntakhabul-Tawarikh*, *Tabaqati-Akbari*, *Mira-tul-'Alam Shah-Jahan-Namah etc.* That Humayun fell headlong over the parapet is taken by them as more likely.

3. *Siyarul-Mutakhkhirin*, as quoted in C J Stephen's *Archæology of Delhi*, p 194.

4. Blochmman's *A'ini Akbari*, vol. i. p. 538.

5. *Muntakhabul-Tawarikh*, vol. i, (Ranking), pp. 610, 611.

হইয়া সম্রাটের কফিনকে স্থান দিবার জন্য বিরাজমান ছিল না; পরন্তু উহার উপর একটী মাদ্রাসা স্থাপিত হইয়াছিল। ইহাতে সমাধির ও বিদ্যাদানের দুই উদ্দেশ্যই সাধিত হইত। Stephen (সি, ষ্টিফেন) উহার পক্ষে সাক্ষ্য দিতেছেন।

"কলেজটী সমাধির ছাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এক সময়ে উহার কার্য্যকারিতা মন্দ ছিল না। বিভিন্ন পণ্ডিত ও প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তিগণ উহার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইতেন। যাহা হউক দীর্ঘকাল যাবৎ ইহার খ্যাতি আর সুপ্রচারিত নহে। বিশেষতঃ বিগত ১৫০ বৎসর সব গৃহগুলিই পরিত্যক্ত হইয়াছে—হয়ত এক সময় তাহাদের প্রত্যেকটি বেশ ভর্ত্তি থাকিত।"১

সের সা

সের সাহের রাজত্ব অতি স্বল্পকাল স্থায়ী হইলেও তাঁহার রাজত্বের ইতিহাস জনহিতকর কার্য্যে গৌরবময় হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার বিচক্ষণ নিয়ম প্রণালী সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না বলিলেই হয়। কিন্তু আমরা এইটুকু মাত্র জানিতে পারি যে, তিনি পণ্ডিত সঙ্গ ভাল বাসিতেন, এবং পণ্ডিতদিগের সঙ্গেই তাঁহার আহারাদি ক্রিয়া সমাধা হইত।২

সের সাহের শিক্ষালাভ সম্বন্ধে আমরা নিম্ন লিখিত বিষয় জানিতে পারি :—

সের সাহের পিতা হোসেনের ৮ পুত্র ছিল। ফরিদ (পরে সের সা) এবং নিজাম পাঠান বংশীয়া এক রমণীর সন্তান ছিলেন এবং অন্যান্য পুত্রগণ সকলেই দাস বংশীয়ারমণীদিগের গর্ভজাত। হোসেন তাহার পুত্রদিগকে স্নেহ করিতেন না এই কারণে ফরিদ পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া, জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা জামালের অধীনে সৈনিকের কাজ লইলেন। হোসেন শাসিরাম হইতে জামালকে অনুরোধ করিয়া, তাহার পুত্রকে ফিরাইয়া দিতে এবং তিনি শাসিরামে তাহার পুত্রকে পড়াইতে পারেন এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিলেন। ফরিদ পিতার কথামত কাজ করিতে স্বীকৃত হইলেন না, তিনি জৌনপুরেই থাকিতে চাহিলেন, এবং বলিলেন শিক্ষা সম্বন্ধে জৌনপুর শাসিরাম অপেক্ষা প্রকৃষ্ট স্থান হইবে। পিতাকে এই বলিয়া আশ্বাস দিলেন যে তিনি গভীর পরিশ্রম করিয়া পাঠাভ্যাস করিবেন। শীঘ্রই তিনি বিদ্যাচর্চ্চায় যথেষ্ট উন্নতি দেখাইলেন, এত উন্নতি যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সাদির গ্রন্থাবলী তাঁহার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল।

ইতিহাস এবং কাব্য পাঠেতিনি অধিকাংশ সময় দিতেন। পাঠাভ্যাসে তাঁহার সদাশয় শাসনকর্ত্তার অনুমতি এবং উৎসাহ পাইয়াছিলেন।৩ সিকন্দর নামা, গুলিস্তান, বাস্তান প্রভৃতি তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল; তিনি দর্শন শাস্ত্রও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে যখনই কোন পণ্ডিতব্যক্তি

1. C. Stephen's *Archæology of Delhi*, p. 207; also Fanshawe's *Delhi past and present*, p. 232: "On the top of the building, round the drum below the dome, are a number of rooms and pavilions once occupied by a *college* attached to the mausoleum, and reminding one of the colony of St. Peter's Dome."

2. *Tarikhi-Shir-Shahi* of Abbas Khan Elliot iv, P. (*I bid.*, *Garcin de Tassy's* transl., p. 143); *Waqi' ati-Mushtaqi*, Elliot iv. P. 538; *and Tariki-Fan-Fahan* MS. in ASB, leaf 98.

3. Stewart's *Hist. of Bengal* pp. 127, 128; also *Ferishta* vol. ii. p. 100.

সাহায্যপ্রার্থী হইয়া আসিত তিনি তাঁহাদিগের প্রত্যেককেই 'হাসিয়া হিন্দি' সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেন কারণ তিনি ইতিহাস গ্রন্থ এবং প্রাচীন রাজগণের জীবনী খুব পছন্দ করিতেন। ১

সের সাহ, কাজি সাহাবুদ্দিনের ভাষ্য সমেত আরবী গ্রন্থ 'কাফিয়া' (ব্যাকরণ গ্রন্থ) পাঠ করিয়া আরব্যভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং তৎসঙ্গে প্রাচীনকালের রাজগণের জীবনীও পড়িয়াছিলেন। তিনি দরগা (মঠ) ও উচ্চবিদ্যালয় সমূহ পরিদর্শন করিতেন এবং আত্মোন্নতির নিমিত্ত, সুপণ্ডিত ও সেখদিগের সঙ্গে মিশিতেন। ২

হিসার ও জয়পুরের মধ্যবর্ত্তী 'বওল' রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ৩২ মাইল পশ্চিমে 'নরনৌল' নামক স্থানে সম্রাট সের সাহ কর্ত্তৃক একটী মাদ্রাসা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই বিদ্যালয়টী উক্ত নগরের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গৃহ। এইখানেই সের সার প্রপিতামহ শিবওয়েথের সমাধি মন্দির রহিয়াছে। এই সমাধি মন্দির উত্তোলন করিতে সুলতানের প্রায় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। একখানি খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে ঐ মাদ্রাসা ৯২৭ হিজীরা (১৫২২ খৃঃ অব্দে) নির্ম্মিত হইয়াছিল। ৩

সের সাহের পুত্রও বিদ্যার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তিনি সদ্য কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তিনি প্রায়ই, সেখ আবদুল হাসান কাম্বু এবং সেখ আবদুল্লা সুলতান পুরী মখদুম-উল-মলক এই পণ্ডিত দ্বয়ের সঙ্গে মিশিতেন। ৪ সেখ অলাই তাঁহার সময়ের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, এম্-এ, বি-এল।

স্বোপার্জ্জিত জলকষ্ট

(২)

(সর্ব্বজনীন জলকষ্ট)

কষ্টের কারণ কি?—স্থূলতঃ বুঝিতে পারেন না এমত লোক পৃথিবীতে আছেন কিনা সন্দেহ। বৈশাখে বৃষ্টি না হইলে জমিতে চাষ দেওয়া যায় না। বৈশাখ মাস অতীত হইল অথচ জমিতে কাহার চাষ পড়িল না—ইহার কারণ কোন কৃষকেরই অবগত হইতে বাকি থাকে না। জ্যৈষ্ঠ মাসে 'বীজতলায়' ধান্যের বীজ ছিটান হইল না—কেন হইল না! ইহার কারণ যে বৃষ্টির অভাব তাহা কি বুঝিতে বাকি থাকে! কার্ত্তিক মাসে বৃষ্টি না হইলে ধান্যের জমিতে জলাভাব হয়,—তাহার নাম কৃষি ভাষায় 'কেতেরা'।

কার্ত্তিক মাসে হৈমন্তিক ধান্যের 'শীষ' বাহির হয়। আশ্বিনের শেষে—'থোড়' হয় এই সময়ে ধানগাছ জল বেশী টানে—কার্ত্তিক মাসে ধান্যের জমিতে জল থাকার প্রয়োজন

1. *Muntakhabul-Tawarikh*, vol. i, (Ranking) p. 446; and *Tarikhi-Shir-Shahi* Elliot iv, P. 311.
2. *Ibid.*
3. Arch. Survey Report, vol. xxiii, p. 27.
4. *Tarikhi Fan-Fahan*, MS. in ASB, leaf 103.

কিন্তু যদি বৃষ্টি না হয় তাহা হইলে ধান 'ফুলায়' না, বা ভাল শীষও বাহির হয় না। শ্রাবণ মাসে ধানগাছ 'বিয়ান' ছাড়ে। তখনও জলের আবশ্যক।

কৃষকেরা বলিতে পারেন কেন শীষ 'ঝাড়িয়া' বাহির হইল না। কেন ভাল করিয়া ফুলাইতে পারিল না। যখন ধান ফুলায় তখন ঝড় জল হইলে ধান গাছ পড়িয়া যায়। ফুল ঝরিয়া পড়ে—ধানে 'দুধ' হয় না কারণ ধানে—চাউল পূর্ণ না হইয়া শূন্যগর্ভ হইয়া পড়ে—এই প্রকার শূন্য গর্ভধান কোন স্থানে 'আগড়া,' কোন স্থানে 'পাতান' ইত্যাদি নামে পরিচিত। কৃষক মাত্রেই অবগত আছেন কেন এমন হয়।

কষ্টের কারণ গুলি সকল ফসলের পক্ষে সমান না হইলেও, কৃষকগণ বুঝিতে পারেন কি কারণে কোন্ কোন্ ফসল হইল না। কিন্তু এমন কতকগুলি কারণ আছে যাহা কৃষকেরা বুঝিতে পারেন না।

কলাই, গাছে পাতে ভালই হইয়াছে—কিন্তু 'হদ্লাইয়া' গেল—গাছে পাতে বাড়িল কিন্তু 'শুঁটি' আদৌ হইল না—কেন এমন হয় তাহা কৃষকগণ অবগত আছেন। সময় সময় দেখা যায় 'শন' প্রচুর হইল—গাছে পাতে বাড়িল —ফুল প্রচুর হইল কিন্তু ফল মোটেই হইল না বা যাহা হইল তাহা নগণ্য—ইহার কারণ কৃষকগণ স্থির করিতে পারেন না।

পটল, গাছে পাতে লতে খুব হইয়াছে, ফুলও (পুষ্প) ধরিতেছে অথচ পটল ধরিতেছে না। কচি পটল, পাকার মত বর্ণ ধরিয়া শুষ্ক হইয়া যাইতেছে—কেন এমন হইতেছে তাহা ধানের চাষী বুঝিবেন না; কিন্তু পটলের চাষী বুঝিবেন।

পটলের কৃষক ইহার কারণ অচিরে নির্ণয় করিতে পারেন তিনি দেখিতে পাইবেন পুং-পটলের লতা তাঁহার ক্ষেত্রে নাই, অথবা পুংপুষ্পতাঁহার ক্ষেত্রে বা পারিপার্শ্বিক ক্ষেত্রেও নাই, সেই কারণে পটল ধরিতেছে না।

সময়ে সময়ে বিলাতী কুমড়ার লতায় সকলই স্ত্রীপুষ্প হয় কুমড়া ফুলের সঙ্গে সঙ্গেই শুষ্ক হইয়া যায়। কৃষক বুঝেন কেন তাঁহার কুমড়া ধরিতেছে না।

একবার দেখা গেল তিলগাছ, গাছ পাতায় ভালই হইয়াছে, যথেষ্ট ফুল ধরিয়াছে, তিলের ফলও ধরিয়াছে কিন্তু তিলের ফলে বীজ জন্মে নাই, অথবা যাহা জন্মিয়াছে তাহা নগণ্য কেন এমন হইল তাহা কৃষক বুঝেন না।

এই রকম প্রত্যেক ফসলের অজন্মার কারণ কি তাহা কতক কৃষক জানেন আবার কতক কারণ অবগত হইতে পারেন না। কিন্তু জলাভাবে ফসলের অবস্থা কীদৃশ হয়, তাহা সকলেই বিশেষ ভাবে অবগত আছেন।

ধান্যের চারার অভাবে যথা সময়ে ক্ষেত্রে ধান্য রোপণ হয় না তাহার কারণ বৈশাখে বৃষ্টির অভাব। এমনও দেখা গিয়াছে পুষ্করিণী বিল খালের জল ছেঁচিয়া জমি সেঁওতা (আর্দ্র) করা হয় তৎপরে জমির 'বাত' করিয়া লইয়া বীজধান ছিটান হয়। তাহাতে যে 'বীচ' (চারাধানগাছ) হয়, তদ্দ্বারা জ্যৈষ্ঠের জলে জমি আবাদ করিয়া ধানের চারা রোপণ করে। যাঁহারা বৈশাখের বৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়া 'বীজ-তলায়' ধান ছিটাইয়া চারা করিতে পারেন নাই—তাঁহারা জ্যৈষ্ঠ মাসে তাড়াতাড়ি 'নেয়াচ' বীজ প্রস্তুত করিয়া ধানের চাষে প্রবৃত্ত হন। নেয়াচ বীজের ধান—ধূলার বীজের মত হয় না।

এখন দেখা যাইতেছে কৃষক বৃষ্টির জল ও খাল, বিল তড়াগাদির জলে নির্ভর করিয়া

কৃষিকার্য্য করিয়া থাকেন। বুঝা যাইতেছে বৃষ্টির জল এবং জলাশয়ের জল এই দুই প্রকারের জলের উপর নির্ভর করিয়া কৃষক ফসল উৎপন্ন করিতে পারেন।

অন্তরীক্ষ জল এবং ভৌম জল—এই দুইটী কৃষিকার্য্যে আবশ্যক। বঙ্গদেশে প্রায়ই এই উভয়বিধ জলের অভাব পরিলক্ষিত হয় না।

অন্তরীক্ষ জল বলিলে বৃষ্টির জলই বুঝায় —শীলাবৃষ্টি ও বরফের জল যে বুঝায় না তাহা নহে শীলাবৃষ্টি হয় বটে কিন্তু তদ্দ্বারা ফসলের হিতাপেক্ষা অহিতই অধিক হয়।

ভৌমজল বলিলে নদ নদী, তড়াগ, কূপ ইত্যাদির জলই বুঝিতে হয়—ইহার মধ্যে কৃত্রিম ও অকৃত্রিম উভয়বিধ ভৌম জল সংগ্রহের উপায় আছে। নদী বিল প্রভৃতি স্বভাবজাত অর্থাৎ অকৃত্রিম। পুষ্করিণী, কূপ, ক্যানেল পালি প্রভৃতি কৃত্রিম উপায়ের জলাধার।

অন্তরীক্ষ জল

আমাদের বাঙ্গালা দেশে অন্তরীক্ষ জলের অপ্রতুলতা নাই বলিলেই হয়। সকল প্রকার ভৌম জলাধার অন্তঃরীক্ষ জলের উপর নির্ভর করে। সুবৃষ্টি না হইলে নদ নদী, বিল, খাল, পুষ্করিণীতে জল জমে না। সুতরাং অন্তরীক্ষ জলের উপর কৃষিকার্য্য মূলতঃ অপেক্ষা করিতেছে।

ভাণ্ডার বা দোকানে যদ্রূপ মানবের আবশ্যক দ্রব্যসম্ভার সংগৃহীত থাকে, আবশ্যক হইলেই তথা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্রূপ জলও ভাণ্ডারে সময়ে সংগ্রহ করিয়া না রাখিলে আবশ্যক মত জলপ্রাপ্তির সুবিধা হয় না।

বৃষ্টির জল সময়ে ভূপতিত হইয়া ক্ষেত্রে প্রচুর জল সঞ্চিত হয় কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই বৃষ্টির অভাব নিবন্ধন তাহা শুষ্ক হইয়া যায়। জমির জল প্রবাহ—নদী, খাল, বিলে গিয়া পড়ে। নদীতে যাহা পড়ে তাহা সাময়িক বন্যার সৃষ্টি করিয়া চলিয়া যায়। সকল সময়ে বন্যাও হয় না এবং বন্যা অসময়ে হইলে ফসলের বিস্তর ক্ষতি হয়। সুতরাং অসময়ে বন্যা প্রবাহ যাহাতে কৃষিক্ষেত্র প্লাবিত না করিতে পারে তাহার উপায় করিতে হয়।

জলকষ্ট নিবারণের জন্য বিল খালের মুখে বাঁধ দিয়া আবশ্যকমত জল রক্ষার উপায় করিয়া রাখিতে হয়। যে স্থানে এই প্রকারের কোনই বন্দোবস্ত নাই তথায় জল কষ্ট অনিবার্য্য।

ফসল ঋতুভেদে নানাবিধ উৎপন্ন হয়। সকল ঋতুতে কিছু বৃষ্টি হয় না। এবং সকল ফসলেই বৃষ্টির আবশ্যক নাই—উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে সর্ষপ যখন পুষ্পিত হয় তখন বৃষ্টির কোনই প্রয়োজন নাই—বৃষ্টি হইলে এ ফসল জন্মে না। সর্ষপ-বীজ যখন উপ্ত হয় তখন জমিতে বাত থাকিলেই যথেষ্ট তৎপরে দু পাঁচ পাতা হইলেই ফুল বাহির হইতে থাকে, তখনও বৃষ্টির প্রয়োজন নাই—বৃষ্টি হইলে 'গাঁধি' লাগে অর্থাৎ এক রকম পোকা ধরিয়া সর্ষপের পাতা খাইয়া নষ্ট করিয়া দেয়। ফুলের সময় বৃষ্টি পড়িলে—ফল ধরে না। সুতরাং সর্ষপে জলের প্রয়োজনই নাই।

আলু, যব, গম, মটর, মুসুরী প্রভৃতি ফসলে বৃষ্টির জলের প্রয়োজন অতি সামান্য। ভৌম জলের আবশ্যক অত্যধিক। আলু বৃষ্টির জল চায় না—বৃষ্টির জলে ইহার অনিষ্ট বই ইষ্ট হয় না। যব, গম, মটর, মুসুরী কিঞ্চিৎ অন্তরীক্ষ জলের প্রত্যাশী তাহা দেখা যায়।

যাহাহউক অন্তরীক্ষ জলের সাময়িক প্রয়োজন যে অমৃত্য তুল্য মূল্যবান তাহার আর ভুল নাই। কিন্তু আমাদের আবশ্যক মাত্রেই বৃষ্টির জল পাইতে পারি না। যদি বুদ্ধিমানের মত অন্তরীক্ষ জল সংগ্রহ করিয়া রাখিবার উপায় করিয়া রাখি তাহা হইলে জলকষ্ট আদৌ অনুভব করিতে হয় না। ধান ভুট্টা প্রভৃতি বর্ষাতি ফসলে অন্তরীক্ষ জলের একান্ত প্রয়োজন কিন্তু অন্তরীক্ষ জলের অভাব হইলেও ভৌম জল সেক দ্বারা উক্ত অভাব বিদূরীত হইতে পারে।

অন্তরীক্ষ জল রক্ষার উপায় ও অপচয় নিবারণ

কৃষিবিদ্যাবিদ্ পণ্ডিত কৃষকগণ বলেন "একবিন্দু অন্তরীক্ষ জল যাহাতে বৃথা অপচয় না হয় কৃষক মাত্রকেই তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।" অন্তরীক্ষ জলের প্রত্যেক বিন্দুর সৎব্যবহার করিতে শিক্ষা করা আবশ্যক।

স্বভাব জাত অকৃত্রিম জলাধার

বাঙ্গালার সকল স্থানেই দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলার থাকবস্তি জরিপের মানচিত্র সন্দর্শন করিলে দেখিতে পাইব যে নদ, নদী, কাঁদোড়, খাল, বিল, বাঁওড় প্রভৃতি জলাধারে প্রায় পরিপূর্ণ। কোথাও বেশী কোথাও কম।

দেশের মধ্যে যেমন উচ্চ ভূমি আছে তেমনি নিম্ন ভূমিরও অভাব আদৌ নাই। বৃষ্টির জল গড়াইয়া যে ভূখণ্ডের উপর দিয়া কোন স্থানে সঞ্চিত হয় বা প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যায় তাহাই নিম্ন ভূমি। বৃষ্টির জল বর্ষাকালে বা অন্য সময়ে ঐ সকল ক্রমনিম্ন স্থান হইতে অপেক্ষাকৃত গভীর স্থানে গিয়া জমা হয়। যাহা মানবকৃত খাত নহে, তাহাকে 'অকৃত্রিম জলাধার' বলা যায়।

মানবকৃত—কৃত্রিম জলাধার

কাটাখাল—ক্যানেলের নালা, দীঘি, পুষ্করিণী ও কূপ ইত্যাদি কৃত্রিম জলাশয় নামে উক্ত হইয়া থাকে। খাল, নালা, দীঘি ইত্যাদিতে অন্তরীক্ষ জলেরই প্রাধান্য এবং কূপ ও দীঘি প্রভৃতিতে ভূগর্ভস্থ জলস্রোত এবং চোঁয়াট জলের আধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথায় ভৌম ও অন্তঃরীক্ষ জলের অপ্রতুলতা তথায় ওয়েল পাইপ দ্বারা বা সুগভীর কূপ খনন করিয়া ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন করা যায়।

কৃত্রিম ভাণ্ডারে ও অকৃত্রিম জলাধারে

জল রক্ষার উপায় বর্ষাকালেই করা সম্ভব। বৃষ্টির জল যখন কৃষিভূমি প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হয়; সেকালে সেই জলধারা যাহাতে বাহিত হইয়া নদী খালে গিয়া পড়িয়া না যায় তাহার জন্য জলস্রোত আবদ্ধ পুষ্করিণী, তড়াগ, বিল, খালে জমা করিয়া রাখিবার উপায় কৃষককেই করিতে হয়; যাহাদের জলের খরচ বেশী, তাহাদিগকে ঐ প্রকারে অন্তরীক্ষ জলকে ভৌম জলাধারে সঞ্চিত করিয়া রাখিতে হইবে।

আহারার্থ যদ্রূপ ধান চা'ল গোলাজাত বা ভাণ্ডারজাত করিয়া রাখিতে হয়। যাহার সংসারে যেমন খরচ তাহাকে হিসাব করিয়া বৎসরের উপযুক্ত ধান চাল সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়। এই কার্য্যটি যেমন ব্যক্তি ভাবে করিয়া থাকে। অন্তরীক্ষ ও ভৌম জলও তদ্রূপ কৃষকের বৎসরের ফসলের উপযুক্ত মত সংগ্রহে যত্নবান হইতে হয়।

কৃষক ব্যক্তিগত ভাবেও সংগ্রহ করিতে

পারেন এবং সমষ্টিগত ভাবেও সংগ্রহ করিতে পারেন। স্বীয় জলাশয়ের জন্য কৃষক ব্যক্তিগত ভাবেই বৃষ্টির জল সংগ্রহ করিয়া থাকেন। জমির 'ঘাই' কাটিয়া পয়ঃপ্রণালীর জলস্রোত ফিরাইয়া, পুষ্করিণীর মোহানা দিয়া পুষ্করিণী জলপূর্ণ করিবার চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য।

জলস্রোত ফিরাইয়া না দিলে, জল কিছু আপন ইচ্ছায় জলাশয়ে গিয়া জমা হইবে না। জল-ভাণ্ডার পূর্ণও হইবে না। বৎসরে যত জলের প্রয়োজন বা ঐ জলাশয় হইতে যত জল পাইবার আশা করা যায়, তাহা কখনই পাইবার আশা থাকে না।

সময়ে হউক অসময়ে হউক জল পাইলেই কৃষি উপযোগী জলভাণ্ডারে তাহা সাদরে গ্রহণ করা চাই। গৃহে প্রচুর অর্থ বা শস্য থাকিলেও যদি অতিরিক্ত ফসল পাওয়া যায় তাহা কেহই গ্রহণ পূর্ব্বক ভাণ্ডারজাত করিতে তিলার্দ্ধ বিলম্ব করেন না।

জল অতি প্রয়োজনীয়—স্নান, পান ও সংসারে সকল সময়েই প্রয়োজন। জলের যে মূল্য কত যথায় একবার জলাভাব বা জলকষ্ট হইয়াছে তথাকার লোকে হৃদয়-গ্রাহী রূপে বুঝিয়াছেন। কদর্য্য পর্য্যুষিত অন্নাহারে জীবন যেমন বিপন্ন হয়, কদর্য্য ও সমল জল পান ও ব্যবহার তদপেক্ষা অধিক অনিষ্টকর ও বিপদের মূল।

সকল স্থানেই দেখা যায় দুর্ভিক্ষের মূল-কারণ জলাভাব। সময়ে বারিপাত না হইলে শস্য জন্মে না। অসময়ের জলের ব্যবহার দেশের লোক ভাল মতে অবগত আছেন বলিয়া মনে হয় না। অসময়ের জলের যে মূল্য আছে তাহা বুঝিতে পারেন না, একেবারে উদাসীন থাকেন।

জলাধারে যে জল আছে, তাহাতেই চলিয়া যাইবে এবং যথাকালে বৃষ্টি হইলে জলে পূর্ণ হইবে। যদি সময়ে জল অল্প হয় বা বিলম্বে হয় তাহা হইলে অসময়ের জলের যে মূল্য কত তখন বুঝিতে আর বাকি থাকে না। তখন অনুতাপ ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই!

সে অনুতাপ কেবল বাঙ্ময় নহে—অন্তরে জ্বালামালার সৃষ্টি করিয়া ভীষণ কষ্ট অনুভব না করাইয়া ছাড়ে না।

সময়ের বা অসময়ের বৃষ্টিজল বুদ্ধিমান কৃষকগণ কখনই পরিত্যাগ করিবেন না। পল্লীর ও মাঠের জলাধারে যত্ন সহকারে সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। ভাণ্ডারে জলপূর্ণ থাকিলে প্রভূত উপকার ব্যতীত বিন্দুমাত্র অপকারের আশঙ্কা নাই।

ব্যক্তিগত স্বার্থ যে স্থলে প্রবল তথায় গৌণভাবে সাধারণ স্বার্থও বিদ্যমান আছে। সেই জন্য জল সংগ্রহ ব্যপদেশে ব্যক্তিগত স্বার্থের সহিত পল্লীর সমষ্টিগত স্বার্থ মিলিত করিয়া জল সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য। মানবের মানবত্ব তাহা হইলে স্ফুটতর হয়, নচেৎ পশুত্বেরই বিকাশ স্ফীত করে।

বর্ষাকালে নদী খাল জাত বন্যা প্রবাহ যখন কৃষিক্ষেত্র প্লাবিত করে সেই সময়ে মাঠের ও পল্লীস্থ জলাশয়ে যত্নসহকারে জল গ্রহণ করিয়া জল-ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া রাখিতে হয়।

বৃষ্টির জলে দুদিন পরে জলাশয় পূর্ণ হইবে এ চিন্তা বা ধারণা ত্যাগ করিয়া যাহা উপস্থিত তাহাই গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য। বৃষ্টি হয় হইবে—সে ভবিষ্যৎ জলের আশায় বর্ত্তমান জল ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্যাগ করার মত নির্ব্বোধের কার্য্য আর নাই।

কোন দুরবর্ত্তী স্থানের বৃষ্টির জল নদ নদী প্লাবিত করিয়া বহুদুর দুরান্তরের ভূমিভাগ প্লাবিত করে। সেই জল অসময়ে হইলেও তাহা জল-ভাণ্ডারে যত্নতঃ গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যতের আশা ও চিন্তা হইতে নির্লিপ্ত থাকা উচিত।

বন্যার জলে যে সকল তড়াগ, খাল, বিল ও পুষ্করিণী, যে পথ দিয়া পূর্ণ হইতে পারে তদ্দেশবাসী কৃষক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। সুতরাং এমন সুযোগ পরিত্যাগ করিতে নাই। বর্ত্তমানে যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে; ভবিষ্যতে এমত সুযোগ আর উপস্থিত নাও হইতে পারে। নিশ্চিতের আশা ত্যাগ করিয়া অনিশ্চিতের আশা পোষণ করা—'কুকুর ও প্রতিচ্ছায়া' গল্পেই শোভা পায়—মানবে তাহা আদৌ শোভা পায় না।

অনেক স্থানে দেখা গিয়াছে, বর্ষার পূর্ব্বে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইলে কৃষক উহা উপেক্ষার সহিত ত্যাগ করেন। জমিতেও আবদ্ধ করিয়া রাখেন না। কারণ তৎকালে জমি জলপূর্ণ করিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই। জমিতে যাহাতে 'বাত' হয় তাহারই চেষ্টা করেন। ভূমি কর্ষণ করিবার মত যে জলের প্রয়োজন ইহার অতিরিক্ত থাকিলে, জমিতে চাষ চলে না।

সেই প্রচুর জল জমির 'ঘাই' দিয়া বাহিয়া খালে ও শেষে নদীতে পড়ে অথবা বিলে গিয়া সঞ্চিত হয়। বরং বিল খালে সঞ্চিত হওয়া ভাল তত্রাচ নদী প্রবাহের গতি বর্দ্ধনে কিছুই লাভ নাই।

উপেক্ষায় যে জল ত্যাগ করা হইল তাহা আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না, জমিতে চাষ পড়িল কিন্তু আর পূর্ব্বের মত বৃষ্টি সময়ে হইল না; সুতরাং চাষ করা জমি পড়িয়া থাকিল, জলাভাবে তাহা সময়ে আবাদ হইল না।

যাঁহারা সেই জল যত্ন সহকারে জলাশয়ে রক্ষা করিয়াছিলেন—তাঁহারা জলাশয় হইতে জল উত্তোলন করিয়া আবাদ আরম্ভ করিলেন। দশ দিন পরে যে বৃষ্টি হইল তাহাতে তাঁহাদের আবাদী জমিতে প্রচুর জল জমিয়া গেল। ফসল খুব জোর ধরিল। কিন্তু যাঁহারা অসময়ের জলকে অবজ্ঞা করিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা নূতন জলে জমি আবাদ করিয়া শেষ করিতে করিতে জলাভাব দেখা দিল। যদি তাহাও না দেয় তাহা হইলে অগ্রে যাঁহারা আবাদ সারিয়াছেন তাঁহাদের মত ফসল পাইলেন না। যদি বৃষ্টি বেশী না হয় তাহা হইলে যাঁহারা অগ্রে আবাদ সারিয়াছেন তাঁহাদের জলকষ্ট হইল না কিন্তু শেষের জলে যাহারা আবাদ করিয়াছেন তাঁহাদের ঘোর জলকষ্ট উপস্থিত হইল।

অসময়ের জলকণা এই উপায়ে সংগৃহীত থাকিলে সময়ে তাহা কাজে লাগে। একথা কৃষক মাত্রকেই মনে করিয়া জল সংগ্রহে যত্নশীল হওয়া অবশ্যক।

গর আবাদি পড়া জমির জল বিনা উপকারে বহিয়া চলিয়া যায়; সুতরাং সে জল যাহাতে মানবের উপকারে লাগে তাহা করিতে হয়। বর্ষার জল পতিত ভূমি হইতে যে পথে গড়াইয়া যায়, সেই পথ হইতে যত্ন সহকারে, মোড় ফিরাইয়া নিকটবর্ত্তী জল-ভাণ্ডারে প্রবেশ করাইতে হয়। পতিত গর আবাদি জমির জল সংগৃহীত করিয়া রাখিতে পারিলে সময়ে আবাদী ভূমির শস্য রক্ষায় সাহায্য করে। তখন বুঝা যায় পতিত জমির অযত্নপ্রবাহিত জলের মূল্য কত।

পতিত জমির জল অতীব মূল্যবান, পতিত ভূমিতে গোচারণ হয় বলিয়া গোময় ও গোমূত্র সংগৃহীত থাকে। শ্মশানের ও গো-ভাগাড়ের ধৌত জলও মূল্যবান—জৈবীক সারে পরিপূর্ণ। কৃষিভূমির জল জলাশয়ে গ্রহণ করিয়া ঐ সকল ভূখণ্ডের ধৌত জল ক্ষেত্রে রক্ষা করিলে ভূমি উর্ব্বর হয়।

বর্ষার প্রথম প্রচুর জল যাহা পল্লীগৃহ ও পল্লীপথ প্লাবিত করিয়া বহিয়া যায় তাহা পল্লীমধ্যস্থ কোন পুষ্করিণীতে যাহাতে সঞ্চিত না হইতে পারে তাহার উপায় করিতে হয়। পল্লীধৌত জল যাহাতে পল্লীপার্শ্ববর্ত্তী কৃষি ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া তন্নিকটবর্ত্তী জলাশয়ে গিয়া পতিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা বুদ্ধিমানের কার্য্য।

প্রথম পল্লীধৌত জল ক্লেদ ও মলপূর্ণ এবং বিষাক্ত অথচ সারবান। এই জল পল্লী ব্যবহার্য্য জলাশয়ে পতিত হইলে অশেষ রোগের মূলীভূত কারণ হইয়া পড়ে। কিন্তু ঐ জল পল্লীপার্শ্বস্থ কৃষিক্ষেত্রে পতিত হইলে প্রচুর সারের কার্য্য করে কারণ ইহাতে যে 'পাঁক' পড়ে তাহা সার পূর্ণ। কৃষি ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া, ভূমিতে সার দিয়া শেষে মাঠের জলাশয়ে সঞ্চিত হইয়া ভবিষ্যতের কৃষি ভূমির জলাভাবও দূর করে।

এই সকল উপায় দ্বারা অগ্রে মধ্যে ও শেষে কৃত্রিম ও অকৃত্রিম জলাশয়ে জল পূর্ণ রাখিবার চেষ্টা প্রতি কৃষককে যত্ন সহকারে করিতে অভ্যস্ত হওয়া উচিত। ইহাতে যে কীদৃশ উপকার সম্ভব তাহা কৃষক মাত্রেই অবগত থাকিয়া উদাসীন হন।

এ করিবে, ও করিবে, সে করিবে ইত্যাকার "গয়ংগচ্ছ" ভাব দ্বারা সর্ব্বসাধারণের জলভাণ্ডার প্রায় শূন্য থাকিয়া যায়।

বিল, খাল, বাঁওড়, কাঁদোড় প্রভৃতির মোহানা গুলি যত্নসহকারে—সাধারণের ব্যয়ে বাঁধ দিয়া সুরক্ষিত করা আবশ্যক এবং অতিরিক্ত জল যাহাতে বাঁধের পার্শ্বস্থ প্রণালী দিয়া বহিয়া যাইতে পারে তাহা সর্ব্বাগ্রে করিতে হয়। আবশ্যক মত জল সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে—অতিরিক্ত জল ছাড়িয়া দিয়া বাঁধ রক্ষা করিতে হইবে ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক।

এই উপায়ে অন্তরীক্ষ জলের অপচয় ও অপব্যবহার নিবারণ করা যায়।

ভৌম জল

জলের অপচয় ও অপব্যবহার

ভৌম জলের অপচয় ও অপব্যবহার বলিলে জল-ভাণ্ডারের জলের অপব্যবহার বুঝায়। ইহা যত প্রকারে হইয়া থাকে তাহা বর্ণনা করা সহজ নহে। স্থূল স্থূল অপচয়ের কারণগুলির বর্ণনা মাত্র এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

রাঢ়দেশে কাঁদোড়ের অভাব নাই—কাঁদোড় কাহাকে বলে পূর্ব্বে তাহা বর্ণিত হইয়াছে—কেদার বাহিনী স্রোতস্বিনী ইংরাজীতে যাহাকে Brook বলে ইহা তাহাই। কৃষকগণ এই কাঁদোড়ে বাঁধ বাঁধিয়া জলপ্রবাহ রোধ করে, এবং সেই জল ফুলিয়া উঠিলে, জমির 'ঘাই' কাটিয়া বা পয়ঃপ্রণালী দিয়া জলের নালা দিয়া; কাঁদোড়ের বা কাঁদড় অপেক্ষা কিছু বড় নদীর জল ক্রমশ নিম্ন কৃষিক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হয়।

কাঁদোড়ের শত স্থানে বাঁধ বাঁধা হয়, দৈবাৎ বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইলে উভয় বাঁধের মধ্যগত জল বাহির হইয়া যায় কিন্তু ইহাতে তাদৃশ ক্ষতি হয় না।

প্রত্যেক বাঁধের এক পার্শ্বে অতিরিক্ত জল বাহির হইয়া যাইবার জন্য ক্ষুদ্র প্রণালী আছে। সেই জল প্রণালী দ্বারা জল বাহির হয়। রাঢ়দেশে প্রতি বাঁধের জমা আছে; যে বা যাহারা জমা লয়েন তাঁহারা বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। 'আড়া' নামক মাছ ধরিবার এক প্রকার সহজ ও সরল কৌশল আছে। যে পথে জল বাহির হইয়া যায় সেই জলে 'বাঁড়ে' পুতিয়া 'আড়া' দেওয়া হয়। উজান বাহিয়া মাছ ঐ পথে গমন কালে আড়ায় গিয়া পড়ে।

যাঁহারা বাঁধ রক্ষা করেন তাঁহাদের নজর থাকে মাছের উপর—তাঁহাদের জ্ঞান অতি সামান্য, তাঁহারা স্বীয় স্বার্থই বোঝেন, দশের

অপকার হইবে কি উপকার হইবে সেদিকে বড় লক্ষ্য থাকে না। দিবসে আড়ায় চুণো মাছ ছাড়া অন্য মাছ পড়ে না। জলের বেগ অধিক থাকিলে দিবসে কাঁদোড়ের জল ছাড়িয়া দিতে হয়। তখন জমাদার আড়া দিয়া থাকেন। কিন্তু যখন জলের বেগ হ্রাস প্রাপ্ত হয়, তখন দিবসে বা রাত্রে জল ছাড়া হয় না। এই জল টানের সময় আবার মাছও বেশী পরিমাণে আড়াতে পড়ে।

বাঁধরক্ষক পাছে কাঁদোড়ের জল ছাড়িয়া দেয়, এই জন্য পল্লীর কৃষকগণ তীব্র দৃষ্টি রাখেন। কিন্তু লোভী আড়ার ও বাঁধের জমাদার গভীর রাত্রে জল ছাড়িয়া আড়া দেন, তাহাতে অচিরাৎ কাঁদোড়ের জলাভাব উপস্থিত হয়। এই উপলক্ষে কৃষকগণের সহিত বাঁধ রক্ষকের বিবাদ হয়, অনেক স্থলে মোকদ্দমাও রুজু হয়।

কাঁদোড়ের নিম্ন অংশের পল্লীবাসীগণের কৃষিক্ষেত্রে জলাভাব হইলে, উপরের বাঁধ কাটিয়া তাহারা স্বীয় বাঁধের মধ্যে জলবেগ বর্দ্ধিত করিয়া লয়। এবং গভীর রাত্রে গিয়া উপরের বাঁধ কাটিয়া দেয়।

প্রতিহিংসা সাধনের জন্য উপরের বাঁধের পল্লী কৃষকগণ গোপনে গিয়া নিম্নের বাঁধ কাটিয়া দেয়। তাহাদের ইহাতে যদিও কোন লাভ নাই, কিন্তু প্রতিহিংসা চরিতার্থ তাঁহারা ইহা নিয়ত করিয়া থাকেন। নিজেদের জল যখন বাহির হইয়া গেল, তখন সেই জল লইয়া নিম্নের লোক কৃষিকার্য্য করিবে ইহা সহ্য হয় না। সুতরাং উভয়েরই সমান দশা লাভ হয়।

এই প্রকার বাঁধ কাটাকাটি ব্যাপারে জলের অপচয় ও অপব্যবহার হইয়া, ক্ষেত্রের জলকষ্টের সময় জলাভাব উপস্থিত হয়।

খালের জলও ঐ প্রকারে অপচয় হয়। খালের যে মুখ দিয়া জল বাহিয়া যায় তথায় বাঁধ বাধা হয়। এই প্রকার বাঁধকে শাস্ত্রে 'পালী' বলা হয়। 'পালী'রক্ষার বন্দোবস্ত প্রাচীনকালে যে প্রকার ছিল, বর্ত্তমানে সে প্রকার নাই।

খাল যদি স্থানে স্থানে প্রশস্ত হইয়া জলাভূমির সৃষ্টি করে তাহা হইলে জলের অপচয়ের ভিন্ন ব্যবস্থা হয়; খাল, কাঁদোড় ও কেদার বাহিনী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী যে প্রশস্ত নিম্ন সমতল বা ক্রমনিম্ন ভূখণ্ডের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়, তাহা পূর্ব্বকালে গরআবাদী বা পতিত থাকিত। বাঁধ বাধিয়া দিলে, খাল কাঁদোড়ের জল ফুলিয়া ঐ নিম্ন জলাভূমি পূর্ণ করিয়া রাখিত। এবং উহার উপরের কৃষিক্ষেত্রে জলাভাব হইলে সিঁওতী বা ডুনী দ্বারা জল ছেঁচিয়া কৃষিক্ষেত্রে দেওয়া হইত। তাহাতে ফসলের জলাভাব নিবারিত হইত।

ক্রমে ক্রমে বিবিধ কারণে ঐ সকল ঘাসের জমি, পতিত জমি, জমিদার বা পত্তনীদারগণ প্রজা বিলি করিতে আরম্ভ করেন। প্রথমে ঐ নিম্ন জলাভূমি 'আমন' ও 'বোরো' ধান্যের কৃষির জন্য বন্দোবস্ত লয়।

ক্রমশঃ ঐ পতিত জমি আবাদী হইলে উহাতে জলের অভাব দৃষ্ট হয় না দেখিয়া, আমনের ক্ষেত্রে উচ্চ আলী বাঁধিয়া ধান্য রোপণ করিবার বন্দোবস্ত করে। হৈমন্তিক ধান্য রোপণ আরম্ভ করিলে অতিরিক্ত জলের আবশ্যক হয় না; অর্থাৎ জলাভূমির আমনের মত জলের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু উপরের হৈমন্তিক কৃষকগণের জমিতে জল পাইতে হইলে—বাঁধটি উচ্চ করিয়া বাঁধিতে হয়। বাঁধ উচ্চ হইলে জলও ফুলিয়া উঠে এবং বিলান জমি ডুবিয়া যায়। যাহারা সামান্য বিলান জমি জমা লইয়াছে, তাহারা স্বীয় অনিষ্ট দেখিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। তাহাদের সামান্য অনিষ্ট যে না হয় তাহা নহে কিন্তু তাহাদের অনিষ্ট অপেক্ষা উপরের প্রচুর হৈমন্তিক ক্ষেত্রের জলাভাব নিবন্ধন প্রচুর অনিষ্ট হয়।

জলাভূমির ক্ষেত্রস্বামিগণ স্বীয় স্বীয় ক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণে জল রাখিবার জন্য, বাঁধ গোপনে বা প্রকাশ্যে কাটিয়া খাল, কাঁদোড় বা বিলের জল বাহির করিয়া দেয়। এই সকল 'বিলকাণা' জমিতে 'চৌমাস-চাষ' করিতে পারিলে সর্ষপ, ভোড়া, শোরগুঁজি, মটর, যব, ভুট্টা প্রচুর পরিমাণে জন্মায়—ইহা

কাল কর্দ্দমাক্ত সারবান মাটি (Dark clay soil)। কার্ত্তিকের আরম্ভে ইহার জল অপসারিত হইলে চাষ দিবার সুবিধা হয়। সুতরাং তাহারা আশ্বিন মাসে যাহাতে ঐ সকল জমির জল শুষ্ক হইয়া যায় তাহার জন্য বিলের বা খালের মোহানের বাঁধ কাটিয়া দেয়।

আশ্বিনমাসে সেই সকল নিম্ন ভূমি জল-শূন্য হয় বটে কিন্তু ইহাতে 'বিলকাণার' জমিওয়ালাদের যেমন উপকার হয়, তাহা অপেক্ষা 'বিলকাণার' উপরের হৈমন্তিক কৃষকগণের প্রচুর ক্ষতি হয়। তাহারা 'কেতারী'র জলকষ্ট নিবারণের কোন উপায় করিতে পারে না। সুতরাং মাঠকে মাঠ জলাভাবে শুষ্ক হইতে হয়। এই কারণে তাহারা বাঁধ বাঁধে ও বাঁধ রক্ষার উপায় করে। ইহাতে কৃষকগণের মধ্যে বিবাদ বাধে, লাঠালাঠি, মাথা ফাটাফাটি হয়। ফৌজদারী মোকদ্দমা বাধে এই প্রকার অশান্তি উৎপাদনের একমাত্র কারণ জমিদার মহাশয়গণের কিঞ্চিৎ লোভ নিবন্ধনই হইয়া থাকে। ফসল নষ্ট ও জলাভাব কেবল বিলকাণার কোন কোন জমির বিলি বন্দোবস্ত নিবন্ধনই হয়।

যদি দুইজন জমিদারের জমি ঐ সীমাতে পড়ে তাহা হইলে জমিদারে জমিদারেও বিবাদ বাধে। কেহ বাঁধ বাঁধেন, কেহ বা কাটিয়াদেন। এই উপলক্ষে যে কত মামলা মোকদ্দমা হয় তাহার তালিকা দেখিলে অর্থের অপব্যয়ের সংখ্যা উপলব্ধি হইবে।

এই কারণে খাল বিলের জলের অপচয় ও অপব্যবহার প্রায়ই হইয়া থাকে। ইহাতে

"স্বল্পক্ষতি মূলীভূত প্রশস্ত মঙ্গল।
তোমা হেন বিজ্ঞ কাছে নিন্দিত কেবল॥"

এই কথাই মনে পড়ে। দেশের 'অর্জ্জিত জলকষ্ট' কীদৃশ ভাবে উপস্থিত হয় তাহার অনুসন্ধান প্রজাহিতৈষী জমিদার মহোদয়-গণকে চিন্তা করিতে বলিলে অন্যায় হইবে না।

বিলান জমির কথা এই সমস্তার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। উপরে হৈমন্তিক ক্ষেত্র, তাহার নিম্নে ভাদই, কলাই, মটর, পাট প্রভৃতির ক্ষেত্র, তন্নিম্নে আমনের ক্ষেত এবং সকলের নিম্নে বিলতল পার্শ্বে 'বোরো' ধানের ক্ষেত।

এই সকল ক্ষেত্রই প্রজাবিলি থাকে। সকলের স্বার্থ পৃথক্ পৃথক্; কাহার জলের আবশ্যক, কাহার নাই কাহার কার্ত্তিক মাসেই জলের টান পড়া প্রয়োজন। এই প্রকার বিভিন্ন স্বার্থের ঘাত প্রতিঘাতে, জলের অপ-চয় করা হয়।

তদুপরি বিল, খাল ও জলা জমিতে 'মাছের মহল' বিলি আছে, তাহাতে জমিদার-গণের দশ টাকা ঘরে প্রবেশ করে। যাহারা মাছের মহল জমা লয় তাহাদের বিল খালে বর্ষার প্রারম্ভেই জল প্রবেশ পথ উন্মুক্ত রাখিতে হয়। কারণ তাহা হইলে প্রথম জলের স্রোতে বড় বড় মাছ বিলে প্রবেশ করে ও তাহাদের জালে পড়ে। ইহাতে ধীবরগণের দশ টাকা লাভ হয় কিন্তু আমন, হৈমন্তিক ও ভাদই ক্ষেত্রের ফসলের যথেষ্ট অনিষ্ট হয়। সে সর্ব্বজনীন অনিষ্ট বড় সামান্য নহে, কিন্তু মাছমহলের আয়টি রক্ষার জন্য ধীবরদিগকে সে জন্য কোনই 'কৈফিয়ৎ' দিতে হয় না।

এদিকে যেমন বর্ষার প্রারম্ভে জল প্রবেশের পথ উন্মুক্ত রাখা হয়, বর্ষান্তে তদ্রূপ ধীবর-গণ, যাহাতে বিল খালের জল শীঘ্র শীঘ্র বাহির হইয়া যায় তাহার চেষ্টা করে। তাহাতে বিলের জল শীঘ্র শীঘ্র কমিয়া যায়। বিলের জল বহির্গত হইবার সময় ধীবরগণের জালে প্রচুর মাছ পড়ে, তাহারা জল বাহির করিয়া দেয়। ইহাতে বিলকাণা জমি ও বোরা ও আমনের উপকারও হয়। কিন্তু হৈমন্তিকের প্রভূত ক্ষতি হয়।

বিলে জল পূর্ণ থাকিলে ম্যালেরিয়া হয়, না, বিলের জল শীঘ্র পচিয়া উঠে। দেশে ম্যালেরিয়া এই কারণে কার্ত্তিকে প্রবল হয়। ফাল্গুন চৈত্রে বিলের জল মরিয়া যাইলে— অল্পজলে মাছ ধরিবার সুবিধা হয় বলিয়া ধীবরগণ বিলের জল বাহির করে।

'যে বিলে জল পূর্ণ থাকে কার্ত্তিক মাসে

তথায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপও কম থাকে। বিল ক্রমশঃ ভরাট হইয়া যাইতেছে। কোন কোন বিলের তলভূমি পর্য্যন্ত কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং বিলের জল যতশীঘ্র পারা যায় তত শীঘ্র বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা হয়। ইহাতে হৈমন্তিক জমি প্রায়ই অজন্মা হয়। এবং উহার মূল্য কমে। দেশের কৃষকগণ বলেন উচ্চ জমি ক্রমশঃ অনুর্ব্বর হইতেছে।

পূর্ব্বে যাহা হতাদরে পতিত ছিল এখন বিলান জমি জল নিকাশের জন্য উর্ব্বর কৃষি ক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে। আওল জমি উচ্চ হইয়া পড়িতেছে। হৈমন্তিক ধান্যের আবাদি জমি অনেক সময় এই কারণে পতিত হইয়া থাকে।

জমির আদর বাড়িতেছে বা জমি হ্রাস পাইতেছে এ সমস্যার মীমাংসা এ স্থলে করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল দেখিতে পাইতেছি স্বোপার্জ্জিত জলকষ্ট এই কারণে বর্ত্তমানে প্রবল হইয়া পড়িয়াছে।

মেঠো পুষ্করিণীর জলের অপচয় ও অপব্যবহার

বর্ষার জল বা নদী প্রভৃতির জল দ্বারা পুষ্করিণী পূর্ণ করা প্রাচীন কৃষকগণের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান ছিল। জমিতে জল রাখিবার পূর্ব্বে তাঁহারা পুষ্করিণীতে অগ্রে জল সঞ্চয় করিতে আগ্রহ ও যত্ন করিতেন।

বর্ত্তমানকালে কৃষকগণ এই সনাতন প্রথার নিয়ম গুলিতে যে উদাসীন তাহা মাঠের পুকুর গুলি দেখিলেই বুঝা যাইবে। অধিকাংশ মেঠোপুকুর গুলির 'পাড়' প্রায় সমতল এবং কোন কোন স্থলে কৃষিক্ষেত্রে পরিণতি নিবন্ধন বর্ষার জলে পাহাড়ের মাটি ধৌত হইয়া জলাশয়ে পতিত হইতে হইতে পুকুর ভরাট হইয়া পড়িতেছে। মেঠো পুকুরের মোহানা বড় ও উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। বর্ষার জল সঞ্চিত করিবার ভাল বন্দোবস্ত নাই। জমিলে মোহানা দিয়া বাহির হইয়া যায়। মাঠের পুকুরে কার্ত্তিকে 'আড়া' দিয়া জল বাহির করা হয়। কেতারী হইলে দেখিতে দেখিতে মেঠোপুকুরের সামান্য সঞ্চিত জল তুলিয়া লওয়া হয়। কেহ পায়,কাহার কম হয়, কাহার কিছুই হয় না। 'ছেঁচা জল ও মিছা কথা স্থায়ী নহে'—কেতারির টান মাঠের পুকুরে ঘুচাইতে পারে না। সুতরাং ধান দাঁড়াইয়া মরে। স্বোপার্জ্জিত জলকষ্ট এই প্রকারে হয়।

কোন কোন বৎসর কেতারি যদি কম হয়, তাহা হইলে মেঠো পুকুরে জল জমিয়া থাকে। ঐ জল যদি রাখিয়া দেওয়া হয়; তাহা হইলে পরবৎসর প্রথম বর্ষাতেই পুকুর পূর্ণ হইয়া যাইতে পারে এবং ভবিষ্যতের জন্য জল সঞ্চিত করিয়া রাখাও হয়। প্রত্যেক বৎসর কিছু বৃষ্টি সমান হয় না। কোন বৎসর বেশী, কোন বৎসর কম হয়। পূর্ব্ব বৎসরের জল থাকিলে অল্প বৃষ্টিতে যত্ন করিয়া জল ধরাইলে পুকুর ভরিতে পারে। কিন্তু শীতান্তে মেঠো পুকুরের মাছ ধরিবার জন্য জল ছেঁচিয়া জল শূন্য করা হয়। সুতরাং সেই জল 'না দেবায় না ধর্ম্মায়' অপচয় হইয়া যায়। পর বৎসরে স্বোপার্জ্জিত জলকষ্ট এই প্রকারে পূর্ব্ব বৎসরে অর্জ্জিত করিয়া রাখা হয়।

পল্লী পুষ্করিণীর জলের অপচয় ও অপব্যবহার

পল্লী পুষ্করিণী যে জলপূর্ণ রাখিতে হয়, একথা পল্লীবাসিগণ বিলক্ষণ অবগত আছেন। কিন্তু 'স্বার্থ বড় বালাই'—এই 'বালাই' দূর না হইলে পল্লীর শ্রী ফিরিবে না ইহা সুনিশ্চয়।

রাঢ় দেশের সমুদায় প্রাচীন পল্লীতে সংখ্যায় যথেষ্ট পুষ্করিণী আছে। সংখ্যাগত ভাবে পুষ্করিণীর অভাব নাই এ কথা সত্য। কিন্তু একটি পুষ্করিণীও পরিষ্কার আছে কি না সন্দেহ। পুষ্করিণীতে প্রচুর জলও যে নাই তাহা নহে। তত্রাচ সুপেয় জলের একান্ত অভাব।

পূর্ব্বে জল সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা কৃষি সাধন সম্বন্ধে 'স্বোপার্জ্জিত জলকষ্টের' কথাই অধিক। এক্ষণে যাহা বলা হইবে তাহা পানীয় ও পল্লীর ব্যবহার্য্য জলের কথাই অধিক থাকিবে।

পল্লীর কেন্দ্রগত পুষ্করিণী

পল্লীর মধ্যভাগে যে সকল ছোট বড় জলাধার আছে, তাহার অবস্থা যে কীদৃশ

যে মধ্যবিত্তশ্রেণী এক সময়ে উচ্চ নীচ সমগ্র শ্রেণীর পরিচালক ছিল, আজ সেই শ্রেণীর দুর্দ্দশা দেখিয়া মনে হয় নাকি একদিন সমাজের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাইবে। এখনও সময় থাকিতে সমাজের অগ্রণীগণ ত বটেই গবর্ণমেণ্টকেও এই শ্রেণীর দুর্দ্দশার প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিতে হইবে। এই যে দেশে সেটেলমেণ্ট হইয়া খরচা আদায় হইতেছে, ইহাতে জমিদার ও কৃষককুলের উপর বেশী কিছু গড়াইতেছে না। কিন্তু মধ্যস্বত্ব বিশিষ্ট মধ্যবিত্তের খরচাই বেশী দিতে হইতেছে। এই স্বত্ব অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে অতি কমই আছে। গবর্ণমেণ্ট কৃষি প্রজার জন্য অনেক সুবিধা করিয়াছেন। কিন্তু বিপন্ন মধ্যবিত্তের দুর্দ্দশা একটুও হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন না।

এই সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্তদিগেরও নিজের পায়ের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইতে হইবে। ভদ্রতার হানি বলিয়া যে কথাটী চলিতেছে—তাহার মূল্য অতি অল্প। আজ যদি সমস্ত ভদ্রলোক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া নিজের কাজ নিজে করে নিজের জমিতে চাষ আবাদ করে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য অগ্রসর হয় নিজের মোট হাতে করিয়া বহিয়া লয় তাহা হইলে কালে সেইটীই ভদ্রতাসূচক হইয়া দাঁড়াইবে। যেরূপ দেশ কাল পড়িয়াছে তাহাতে এসব না করিলে আমাদের ভদ্রতা নাই। চাকুরী চাকুরী করিয়া ফিরিলে আর চলিবে না। বঙ্গমাতার শস্য শ্যামল অঙ্কে বাস করিয়া যে কৃষিকার্য্যকে অবহেলা করে সে প্রকৃতই মাতার কুসন্তান। একটু স্থির বুদ্ধিতে বিবেচনা করিলে কৃষিকার্য্য চাকুরী হইতে সহস্রগুণে সম্ভ্রমসূচক। আমাদের আর্য্যনাম কৃষিকার্য্য হইতেই হইয়াছে। এই সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিও মনোনিবেশ করিতে হইবে। যতদিন মধ্যবিত্ত ব্যবসা বাণিজ্য কৃষিকার্য্য ইত্যাদির দিকে ধাবিত না হইবে, ততদিন তাহারা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া যাইবে। আর যতদিন এটীতে ভদ্রতা হানি, ওটীতে সম্মান হানি ভাবিবেন, ততদিন তাঁহাদের পদে পদে ঠকিতে হইবে। "নিজের কাজে দোষ নাই।" এই মূলমন্ত্র গ্রহণ করতঃ যেদিন হইতে মধ্যবিত্ত নিজের সমস্ত কার্য্য অম্লান বদনে দশের সাক্ষাতে করিতে পশ্চাৎপদ হইবে না, সেই দিন হইতে মধ্যবিত্তের আবার পূর্ব্ব গৌরব ফুটিয়া উঠিবে।

সুরাজ।

২। দেশ ব্যাপী জলকষ্ট

ব্যাধি প্রপীড়িত বঙ্গের জলাভাব চিরসহচর হইয়া দাঁড়াইতেছে। কয়েক মাস বারিপাত না হইলেই বঙ্গ পল্লি শতমুখী হইয়া "দে জল" "দে জল" বলিয়া চীৎকার করে ইহা আমরা প্রতি বৎসর দেখিতেছি। দুইচারিটা সহরে সুপেয় জল সংস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু দুই চারিটা সহর লইয়া ত আর বাঙ্গালা নয়; দুই চারিটা সহরে পরিষ্কৃত জল সরবরাহের জন্য রাশি রাশি অর্থব্যয় করিলেই বঙ্গের জলাভাব বিদূরিত হইল ইহা ত মনে করিলে চলিবে না; এক বার বঙ্গের পল্লিগ্রাম গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে যে তাহারা কিরূপ দুর্দ্দশা গ্রস্ত। আর পল্লিগ্রাম লইয়াই বাঙ্গালা; পল্লিগ্রামই বঙ্গের প্রাণ, সহর বাহিরের চাকচিক্য মাত্র; পল্লিগ্রামই বাঙ্গালা-মহীরুহের মূল, সহরগুলি তাহার দুই চারিটা ফুল মাত্র। মূল নষ্ট হইয়া যাইতেছে, দুই চারিটা ফুলের বাহার লইয়া কি করিব!

চীৎকার বহুবার করিয়াছি, আবার করিতেছি, কিন্তু এ যেন অরণ্যে রোদন হইতেছে। কে না দেখিতেছে কে না বুঝিতেছে। বৃষ্টির অভাবে প্রায় সমগ্র বাঙ্গালায় ভীষণ জলকষ্ট উপস্থিত হইতেছে। সংবাদ পত্রে নিত্য এই জলকষ্টের হৃদয়বিদারক চিত্র অঙ্কিত হইতেছে কে না তাহা দেখিতেছে। বঙ্গের দুই চারিটা ভাগ্যবান পল্লি ভিন্ন যাবতীয় পল্লি একবাক্যে সমস্বরে এই করুণ বেদনা জানাইতেছে যে "গ্রামে একটীও ভাল পুষ্করিণী নাই; যাহা ছিল তাহা বহুদিন বৃষ্টি না হওয়ায় শুষ্কপ্রায় হইয়া গিয়াছে; পঙ্কিল জলে পিপাসা নিবারণ করিতে হইতেছে; ভদ্র-রমণীগণকে দুই তিন ক্রোশ হাঁটিয়া জল আনিতে হইতেছে ইত্যাদি।" এই কথাই

সর্ব্বস্থান হইতে উঠিতেছে, ইহা ত আমরা প্রত্যহই শুনিতেছি।

কিন্তু শুনিয়া জানিয়া বুঝিয়া, আমরা কি করিতেছি। কিছুই করিতেছি না। আমরা এরূপ নির্লজ্জ হইয়া গিয়াছি, যে এ কথা বলিতে জিহ্বা জড়তা প্রাপ্তও হইতেছে না। আমাদের অন্তর এতই কঠিন হইয়া গিয়াছে, যে মুখে আমরা দেশভক্ত স্বদেশ বৎসল, দেশের দুঃখ মোচনের জন্য আমরা বদ্ধ পরিকর এইরূপ নানা রসাল রসাল লম্বা চওড়া বাক্যে গগন বিদীর্ণ করিতেছি, সংবাদ-পত্রের স্তম্ভ পূর্ণ করিতেছি, মহাসমিতি প্রাদেশিক সমিতি, জেলা সমিতি কতই সমিতির গঠন করিতেছি, কিন্তু কার্য্যের সময় আমাদের টিকি দেখিতে পাইবে না। কুমীরের কান্না কাঁদিয়া লোক ভুলাইতেছি। দেশের লোক সুপেয় জলের অভাবে পিপাসাকুলিত হইতেছে চাতক পাখীর ন্যায় "ফটীক জল" "ফটীক জল" বলিয়া চীৎকার করিতেছে, প্রতিকারের প্রকৃত ব্যবস্থা কি করিতেছি?

সম্মিলিত চেষ্টায় যে ফল হয় না ইহা স্বীকার করিয়া লইতে পারিব না। পল্লিগ্রামের জল কষ্ট দূর করা অবশ্য সহজ ব্যাপার নহে, সবিশেষ ব্যয় সাধ্য, মানি; কিন্তু উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকিলে যে দুর্দ্দশা বর্দ্ধিতই হইবে। দেশে সদাশয় ধনাঢ্য লোকের ত অভাব নাই; উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর সম্মানার্থ সান্ধ্য সম্মিলন, উদ্যান সম্মিলনে অকাতরে অর্থব্যয় করিবার লোকের ত অভাব দেখিতে পাই না; শাসন কর্ত্তৃগণের প্রস্তর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জলের মত অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন না এরূপ অর্থশালী ব্যক্তিও ত বিরল নহে। বিলাসিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া নগর বাসের লোভ সম্বরণে অসক্ত এরূপ রাজা জমীদারের অভাব ত দেখিতে পাই না। ইঁহারা মন করিলে কি দেশের এই জলাভাব দূর করিতে পারেন না? তাঁহারা যে সকল রাজপুরুষের সম্মানার্থ সান্ধ্য সম্মিলন উদ্যান সম্মিলন প্রভৃতিতে অর্থব্যয় করেন, তাঁহাদের নামে জলাভাবক্লিষ্ট জনপদে জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়া দিউন না; এস্মৃতিচিহ্ন চিরস্থায়ী-কল্প হইয়া থাকিবে প্রস্তর মূর্ত্তিতে অর্থব্যয় না করিয়া দীর্ঘিকা খনন করিয়া দিয়া তাঁহাদের ভক্তিভাজন শাসনকর্ত্তৃগণের নামে তাহার নামকরণ করিয়া দিউন না এইরূপ করিলে যে এক ঢিলে দুই পাখী মারা হইবে নগরে বাসের ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া আপন আপন জমীদারীর অন্তর্গত গ্রামসমূহের উন্নতিবিধান করুন না। ইহার উপর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও গবর্ণমেণ্ট যদি সাহায্য করেন তাহা হইলে অচিরেই দেশের জলকষ্ট বিদূরিত হইবেই হইবে।

মনের আবেগে আমরা কত কথাই বলি; হইতে পারে অনেকে মনে করিবেন এ সকল প্রস্তাব "কাগজে কলমে" বলা যত সহজ কার্য্যে পরিণত করা তত সহজ নয়। সহজ অবশ্য নয়, কিন্তু একেবারে অসম্ভবও নয়। মোট কথা জলাভাবে বঙ্গের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে, অধিকাংশ ব্যাধিই সুপেয় জলের অভাব হইতে উৎপত্তি লাভ করে, ইহা বিশেষজ্ঞগণের মত। দেশে পানীয় জলের সংস্থান হউক, দেখিবে মৃত্যু সংখ্যার হ্রাস হইতেছে। আর ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা ভাল নহে। স্বায়ত্ত শাসনাধিকার প্রাপ্তির আশায়, আমরা নাচিয়া উঠিতেছি অথচ আমাদের দেশের এই নিদারুণ দুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাত হইতেছে না। এ কলঙ্ক কালিমা অঙ্গের ভূষণ করিয়া আর কত দিন থাকিব।

বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী।

"আর মানুষ হ'তে হ'লে এই নৈরাশ্যের মধ্যেই আশার স্থান
খুঁজে নিয়ে পূর্ণ উদ্যমে মঙ্গল কর্ম্মের উদ্দেশ্যে চলতে
হবে। আপাতমধুর জিনিষ প্রকৃত মঙ্গলময় নয়।
তাই কষ্টকে আলিঙ্গন ক'রে, দারিদ্র্যকে
মস্তকে ধারণ করে, নৈরাশ্যের ভীতি-
কেই একমাত্র সহায় ক'রে
জীবনের কঠোর কর্ত্তব্যময়
কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ
হ'তে হবে।"

"সাধনা"

সপ্তম খণ্ড সপ্তম বর্ষ	১৩২৩, আষাঢ়	নবম সংখ্যা।

আলোচনা

১। সাহিত্যের দুর্দ্দিন

ভাবিয়াছিলাম সাহিত্য-সম্মেলন লইয়া আর আলোচনা করিব না। ধুরন্ধর সাহিত্যিকেরা যখন আর আমাদের কথায় কর্ণপাত করা আবশ্যক মনে করেন না তখন "আপন মান আপনি রাখ, কাটা কাণ চুল দিয়ে ঢাক।" তাই এবারকার সম্মেলন সম্বন্ধে আমরা কোন উচ্চ বাচ্য করি নাই। কিন্তু অনেক চিন্তা করিয়া শেষে পুনরায় কলম ধরাটা শ্রেয় মনে করিলাম। আমরা পূর্ব্ব হইতেই চীৎকার করিয়া আসিতেছি যে, সাহিত্য-সম্মেলন অচিরে কংগ্রেসের দশাপ্রাপ্ত হইবে। আমাদের উক্তি যে কথায় কথায় ফলিতেছে সেইটী আজ চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিব। আচ্ছা; জিজ্ঞাসা করি তোমাদের সাহিত্য-সম্মেলনের কি উদ্দেশ্য ?

কতকগুলি টাকার শ্রাদ্ধ? না কতকগুলি দাম্ভিক বিদ্যাগর্ব্বী বিলাসী নাগরিকের নাম জাহির? আমরা জানি, সম্মেলনের উদ্দেশ্য হয় লোকমত গঠনের জন্য সাধারণ্যে কোন বিষয়ের প্রচার অথবা সত্য আবিষ্কারের জন্য কোন বিষয় না বিষয়সমূহের আলোচনা। আর সাহিত্য সম্মেলনের উদ্দেশ্য—সাহিত্যের প্রচার; কেন না—কোন ঐতিহাসিক তথ্য বা কোন দার্শনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে যে আলোচনা আবশ্যক হয় তাহার জন্য সম্মেলনের প্রয়োজন কি? এত ছাপাখানা, মাসিক পত্র, সাপ্তাহিক পত্র, দৈনিক পত্র, এত স্কুল, কলেজ, সাহিত্য পরিষৎ, বিজ্ঞান পরিষৎ, অনুসন্ধান সমিতি, এত লাইব্রেরী, লেবরেটারী, ইন্‌ষ্টিটিউটের সাহায্যে কি সে কাজ সাধিত হয় না? দেশের টাকার অপব্যবহার চিন্তাশীল নেতা সাজিয়া কিরূপে যে যে তোমরা কর আমরা কিন্তু একটুও বুঝি না। তোমরা কি দেখিতেছ না তোমাদের জাতি আজ অনশনক্লিষ্ট, ছিন্নবাস! কত বিনিদ্র যামিনী তাহার সহচর! তোমরা কি বুঝিতেছ না যে, যে বিশাল বেদনা তাহার বুকের মধ্যে শেলের বেদনার মত বাজিতেছে তোমরা যদি তাহার প্রতীকারে যত্নবান না হও তাহা হইলে তাহার বিষম ফল একদিন তোমাদিগকেও ভোগ করিতে হইবে? তোমরা না প্রচার করিয়া থাক 'মাৎস্যন্যায়মপহিতুং—'?

* *
*

২। পূর্ব্ব কথা

এটাও গেল আমাদের মামুলী কথা। ইহার সার্থকতা ইতিমধ্যেই কতদূর অগ্রসর হইয়াছে এখন তাই দেখাইতেছি। তোমরা বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে ঢাকায় একদল লোক 'পূর্ব্ববঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনের' নাম দিয়া নূতন একটা সম্মেলনের সৃষ্টি করিতেছে। বহুদিন হইতে ইহা লইয়া জল্পনা কল্পনা চলিতেছিল। চট্টগ্রাম সম্মেলনে সাহিত্যিকদিগের মধ্যে একটা মতভেদের সূত্রপাত হয় পরে কলিকাতার সম্মেলনে তাহা স্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে। ফলে, এই ভাবী সম্মেলনের সৃষ্টি কল্পনা ছাড়িয়া কার্য্যে পরিণত হইতে একটু দ্রুততার অবলম্বন করিয়াছে। কলিকাতার সাহিত্যিকেরা প্রথমে এই সম্মেলনে আপত্তি তুলিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা বরাবরই ইহার পক্ষপাতী। কারণ, আমাদের কাছে সম্মেলনের উদ্দেশ্য—প্রচার। সুতরাং উহার যতই অনুষ্ঠান হইবে ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। তবে কলিকাতার সম্মেলনে, পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যিকেরা সম্মেলনের শাখা বিভাগ লইয়া মতভেদ হইলে যখন সমর্থনকারীর সংখ্যাল্পতায় হারিয়া যান তখন হইতে বৈষয়িক অন্যান্য বিভাগের ন্যায় এখানেও পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ দুই দলের সৃষ্টি হইয়াছে। অবশ্য এই উভয় দলেই উভয় বঙ্গের লোকই আছেন। কিন্তু সাহিত্যসমাজে এই যে ঈর্ষ্যাবহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে ইহা গ্লানিকর। আমাদের মনে হয়, বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনকে একদিন এই আগুনে পুড়িয়া মরিতেই হইবে; অথবা বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের আন্দোলনকারীরা সাবধান হইবেন। ঢাকা ও পূর্ব্ববঙ্গের লোকে যাহা চাহিতেছেন তাহাই সত্য তবে তাঁহারা কলিকাতা সম্মেলনে যে হারিয়া গিয়াছেন তাহার একমাত্র কারণ, সম্মেলন কলিকাতায় হইয়াছিল। কলিকাতাসহরব্যতীত অন্য কোন স্থানে সভার অনুষ্ঠান হইলে পূর্ব্ববঙ্গ-

বাসীরা জিতিতেন সন্দেহ নাই; কারণ তাঁহারা যাহা চান আমাদের বিশ্বাস তাহাই দেশ চায়। এ বিষয়ে ইহার অধিক ইঙ্গিত করা প্রয়োজন বোধ করি না। যদি থাকে ভবিষ্যতে বলিব।

* *

৩। নারী-নিগ্রহ

এবারকার সম্মেলন সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে কিন্তু নির্ব্বিবাদে নয়। এবার সেখানে নারীনিগ্রহের পালা অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এই ব্যাপারটা নিতান্তই লজ্জাকর। নেতা সাহিত্যিকেরা! তোমরা ইহার একটা চরম মীমাংসা করিতে পার না? মাঝে মাঝে তোমরা যে স্ত্রীজাতির সম্মান রক্ষা করিতে গিয়া তাঁহাদের প্রতি অজস্র অসম্মান বর্ষণ করিতেছ ইহা কি পৌরুষ? ভারতবর্ষ এখনও সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয় ভাবাপন্ন হয় নাই। এদেশে বহুদিন হইতে স্ত্রীলোকেরা পর্দ্দানশীন। কিন্তু তাই বলিয়া স্ত্রীজাতি যে সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থিত ছিল বা রহিয়াছে তাহার দাবী দাওয়া অগ্রাহ্য করা হইয়াছে বা হইতেছে একথা আমরা মনে করি না। মানকুমারী এ পর্য্যন্ত কোন সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা পাঠ করিয়াছেন এমন আমরা শুনি নাই তাই বলিয়া কি তাঁহাকে কবি বলিয়া আমরা উচ্চ আসন দিতেছি না? পুরুষ ও স্ত্রীজাতির মধ্যে অবাধ মিলন হিন্দুর চোখে বিষদৃশ লাগে তাই যেখানে তাহারা হিন্দু জাতির মধ্যে এই মিলনের সমর্থন হইতে দেখে সেইখানে প্রতিবাদ করে। সুসংস্কার হোক আর কুসংস্কার হোক জাতি যখন একটা ধারণাকে হৃদয় হইতে একেবারে দূর করিতে পারিতেছেনা তখন জোর করিয়া তাহাকে মুছিতেই হইবে এমন কি কথা? জোর করিয়া সংস্কার হয় না—সংস্কার হয় চারিত্র বলে।

সাহিত্যক্ষেত্রে অনেক লেখিকা নামিয়াছেন তাঁহাদের লেখা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহারা পুস্তকাদি রচনা করিতেছেন তাহা স্কুল কলেজের পাঠ্য হইতেছে। ইহাতেও তাঁহাদিগকে উৎসাহ দেওয়া হইতেছে না? তাঁহাদের রচনাবলী অনেক সভাসমিতিতে অন্য কর্ত্তৃক পঠিত হইয়া থাকে, ইহাতেও কি তাঁহারা আর মনে করিতে পারেন যে পুরুষেরা তাঁহাদের উন্নতিতে উদাসীন? যদি এমনই হয় তাহা হইলে সেও ত একটা ভ্রান্ত সংস্কার! আমরা আশাকরি, সাহিত্যসমাজের নেতারা এ দিকে একটা স্বতন্ত্র ব্যবস্থা সত্বরই করিবেন।

* *

৪। মন্দিরে প্রবেশ

আমাদের সমালোচনার তৃতীয় বিষয় সম্মেলন-মন্দিরে প্রবেশাধিকার বিধি। বর্দ্ধমান সম্মেলন হইতে নিয়ম হইয়াছে প্রত্যেক প্রতিনিধিকে সম্মেলন-মন্দিরে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে হইলে দুই টাকা করিয়া নজর দিতে হইবে। দর্শকেরা এক টাকা মূল্যে টিকেট ক্রয় করিয়া সম্মেলন মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিবেন। এবার যশোহরে দেখিলাম অনেক প্রতিনিধিই বিনামূল্যে টিকেট ক্রয় করিয়াছেন। যাহারা আনাড়ী পল্লীবাসী অথবা টিকেট বিক্রেতার অপরিচিত তাহাদিগকেই টিকেট কিনিতে বাধ্য করা হইয়াছে। শুনিয়াছি যাঁহারা সাহিত্যিক অর্থাৎ সম্মেলনে নিমন্ত্রিত হন নাই কিম্বা কোন পরিষৎ বা সমিতি কর্ত্তৃক প্রেরিত হন নাই তাঁহারা যদি সম্মেলনে প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে ইচ্ছা করিলে বিনা দর্শ-

নীতে টিকিট পাইবেন এই রূপ একটা কথা ছিল কিন্তু আমরা ঠিক জানি দুই চারিজন ভদ্রলোককে এরূপ টিকেটের দাবী করিয়া অপদস্থ হইতে হইয়াছে। সাহিত্যক্ষেত্রেও যদি এইরূপ পক্ষপাত নীতি অনুসৃত হয় তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে উহার অবস্থা কি দাঁড়াইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। সম্মেলনের কর্ত্তাদিগকে অনুরোধকরি যেন ভবিষ্যতে তাঁহারা এই কুপ্রথা রহিত করিয়া সাধারণের অনুরাগভাজন হইতে চেষ্টা করেন। যদি তাঁহারা এই নজর প্রথা রাখাই একান্ত আবশ্যক স্থির করেন তাহা হইলে যেন উহা শ্রেণী নির্ব্বিশেষে প্রবর্ত্তিত হয়।

৫। প্রবন্ধ সমস্যা

চতুর্থ কথা এবার সম্মেলনের প্রত্যেক শাখাতে যথেষ্ট সংখ্যক প্রবন্ধ পাঠের জন্য আসিয়াছিল। সময়াভাবে অবশ্য সবগুলির পাঠ সম্ভব নহে তাই কতকগুলি প্রবন্ধ অন্যান্য বৎসরের ন্যায় পঠিত বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাতে অপঠিত প্রবন্ধের রচয়িতারা অসন্তুষ্ট হইতে পারেন এই আশঙ্কায় বোধ হয় এবার একটা নূতন প্রস্তাব হইতেছিল যে প্রত্যেক শাখায় প্রবন্ধের পুরস্কার ঘোষণা করা হউক। যাঁহাদের প্রবন্ধ পুরস্কারের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাঁহারাই পাঠের অধিকার প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। এই পাঠ সমস্যা মীমাংসা কি কঠিন তাহা ত আমরা বুঝি না। এইরূপ একটা ব্যবস্থা করা যায় না কি? সম্মেলনের দুই কি তিন মাস পূর্ব্বে কোন এক নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রেরিত হইল তাহা সম্মেলন-সমিতি কর্ত্তৃক পঠিত ও অনুমোদিত হইলে সম্মেলনের প্রবন্ধ নির্ব্বাচনী সমিতিতে আলোচনার জন্য রাখা হইল। পরে সভাপতিরা স্বীয় বিভাগীয় প্রবন্ধ গুলির বিস্তৃত আলোচনার জন্য উহাদিগকে কতকগুলি শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া কয়েকজন যোগ্য ব্যক্তির উপর পাঠের ভার দিলেন। তাঁহারা ঐ সমস্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য স্থির করিয়া বিষয় নির্ব্বাচন সভায় জানাইলেন। সভাপতি সেইগুলিকে সভ্যমণ্ডলীর মতানুযায়ী তালিকা-বদ্ধ করিলেন। যদি তখনও প্রবন্ধ সংখ্যা এত অধিক হয় যে সভায় সবগুলির পাঠ শেষ হওয়া অসম্ভব তাহা হইলে সভাপতি যে সমস্ত প্রবন্ধ পাঠ হওয়া আবশ্যক ও সম্ভব বোধ করেন সেইগুলিই ঘোষণা করিয়া দিবেন ও অন্যগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইবে। ইহাতে কাহারও ক্ষোভের কারণ থাকিবে না এবং সম্মেলনে নিম্নশ্রেণীর প্রবন্ধও খুব কমই আসিবে। প্রবন্ধ-তালিকা পাঠারম্ভের পূর্ব্বেই প্রচার করিয়া দেওয়া উচিত। নতুবা অনেক পাঠককে বড় বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। আমাদের এই প্রস্তাবটী সম্মেলন কর্ত্তৃপক্ষ একবার ভাবিয়া দেখিবেন। মুখ দেখিয়া প্রবন্ধ নির্ব্বাচন করাতে একদিকে সম্মেলনের যেমন ক্ষতি অন্যদিকে সভাপতিরও কলঙ্ক। আমরা দুই একটা প্রবন্ধের কথা জানি; সে গুলি অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য ও বিবেচ্য প্রস্তাবে পূর্ণ ছিল কিন্তু তাহারা সভাপতি কর্ত্তৃক পঠিত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে আর এক দিকে চর্ব্বিত চর্ব্বন সমর্থিত হইয়াছে। এ গুলি কি সভাপতির যোগ্যতার পরিচায়ক?

* *

৬। ব্যক্তির প্রভুত্ব

সম্মেলন সাধারণের জিনিষ। সেখানে আমরা ব্যক্তিবিশেষের প্রভুত্ব দেখিতে চাহি না। আমরা বরাবর দেখিয়া আসিতেছি কয়েকজন লোক সম্মেলনে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বদা নিজেদের মতানুযায়ী সম্মেলনকে পরিচালন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। সভাপতির পরিবর্ত্তে তাঁহাদের প্রভাব আমরা কিছু বেশী অনুভব করিয়া থাকি। অনেকে তাঁহাদিগের কোন কোন ব্যক্তিকে সভাপতি মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন। সম্মেলন কর্ত্তৃপক্ষও সেই সেই মহাত্মাগণ সানুগ্রহে আমাদের এই কথাগুলি একটু ভাবিয়া দেখিবেন। নব্য ধরণে সভাসমিতি করা আমরা প্রতীচ্যদেশ হইতে শিক্ষা করিয়াছি। কিন্তু অনুকরণেও যে সবিশেষ পটু হইতে পারি নাই তাহা ত আমরা ভাবি না। সভা সমিতি করিতেছ অথচ তাহার ধুরন্ধরগিরি করিতে পার না ইহা লজ্জার কথা নহে কি? বিশেষতঃ তোমরা হইলে দেশের শিক্ষিতশ্রেণী, দেশের উচ্চ স্তর, দেশের নিয়ন্তা তোমাদের যদি এই অবস্থা তাহা হইলে আমাদের এই অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের আশা কোথায়?

* *

৭। শেষ জিজ্ঞাসা

শেষকালে একটি ভিতরের কথা জিজ্ঞাসা করি। অন্যান্য বারে আমরা দেখিয়া থাকি যেন ইতিহাস শাখাটা সম্মেলন দ্রুমের মাথার উপরে অন্য শাখাগুলিকে পরাভূত করিয়া কিছু বেশী রকম 'মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।' এবার হঠাৎ সে একটু খাটো হইয়া গিয়াছে। ঝড়ে ভাঙ্গিয়া গেল নাকি?

* *

৮। আত্মরক্ষা

নামের চটকে মেকি আসল বলিয়া চলিয়া যায়, অসত্যকে সত্য বলিয়া মনে হয়। আত্মঘাতী স্বার্থপরতাকে বিজ্ঞতার মুখোস পরাইয়া "চাচা আপন বাঁচা" এই একটা উপদেশ বাক্য বাঙ্গালায় অনেকদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। পশুধর্ম্মী মানুষ স্বকৃত অন্যায়কে সমর্থন করিবার জন্য বরাবরই এই প্রবাদ বাক্যটার দোহাই দিয়াছে। দেবধর্ম্মী এ কথা কখন গ্রহণ করে নাই। কিন্তু সমাজে দেবধর্ম্মী কয়জন আছে? "চাচা আপন বাঁচা"—এই নীতির অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালী আজ কি বাঁচাইতে পারিয়াছে? যদি পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় তাহা হইলে অতি সহজেই বুঝা যাইবে যে, আত্মরক্ষার পরিবর্ত্তে বাঙ্গালী আত্মহত্যা করিতেছে।

আত্মরক্ষা প্রাণীমাত্রেরই ধর্ম্ম। বৃক্ষলতাও নানা উপায়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়া থাকে। আর পশু রাজ্যের ত কথাই নাই। পশুগণের হিংসাবৃত্তির কথা আলোচনা করিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। কারণ সেখানে পরস্পরের ভক্ষ্য ভক্ষক সম্বন্ধ। একে অপরকে আক্রমণ ও বধ করিয়া ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর নৃশংসতা মূলে আত্মরক্ষার চেষ্টা ছাড়া আর কোনও উদ্দেশ্য বর্ত্তমান নাই। মারামারি কাটাকাটি করিয়া সাহসী ও বলবান বাঁচিয়া থাকিবে এবং ভীরু ও দুর্ব্বলের অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। প্রকৃতি রাজ্যে আবহমান কাল ধরিয়া যোগ্যতমের প্রতিষ্ঠা হইয়া আসিতেছে। এখানে অযোগ্যের স্থান নাই।

মানুষের মধ্যেও যুদ্ধ বিগ্রহ, মারামারি কাটাকাটির অভাব নাই। যোগ্যতমের

প্রতিষ্ঠা ও অযোগ্যের ধ্বংস—যা পশুরাজ্যের নিয়ম—তা মনুষ্যরাজ্য সম্বন্ধেও খাটে তবে মানুষ ও পশুর যোগ্যতার লক্ষণগুলি যে একই তাহা অবশ্য কেহই স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। কারণ তাহা হইলে মানুষকে পশুর গণ্ডীর মধ্যে ফেলিয়া দিতে হয় এবং তাহাতে যে, সকল মানুষই নারাজ তা বলাই বাহুল্য। মানুষ ও পশুর কতকগুলি সাধারণ ধর্ম্ম আছে যেমন আহার, বিহার, নিদ্রা প্রভৃতি। কিন্তু তাহা ছাড়া মানুষের যা আছে পশুর তা নাই। মানুষের বুদ্ধি আছে, বিচারশক্তি আছে, দয়াদাক্ষিণ্য, প্রীতি, ভালবাসা, ত্যাগ, ধৈর্য্য প্রভৃতি বৃত্তি নিচয় আছে, তাহাদের অনুশীলনের চেষ্টা আছে, মানুষের সমাজ ও ধর্ম্ম আছে, সাহিত্য, নীতি, বিজ্ঞান ও শিল্পকলা আছে, জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে, বেঁচে থাকার একটা অর্থ আছে। কাজেই একই আদর্শে মানুষ ও পশুর যোগ্যতার বিচার হইতে পারে না। "চাচা আপন বাঁচা" পশুর নীতি হইতে পারে, কিন্তু মানুষের কখনও নহে।

সাধারণতঃ মানুষ নিজেকেই সুখী করিবার চেষ্টা করে; নিজে ভাল খাইবে, ভাল পরিবে স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতে পারিবে, সাধারণ মানুষ এই চিন্তা লইয়াই থাকে। সে সাবধানে লাভক্ষতির হিসাব করে, চারিদিক চাহিয়া বুঝিয়া সুঝিয়া এক পা বাড়ায়—কি জানি কখন কি বিপদ ঘটে। কিন্তু এইরূপ নিশ্চয়তার মধ্যে সকল সময়ে শুধু আপনাকে বাঁচাইয়া চলাটাই আপনার ধর্ম্ম নহে। জীবনে এমন দিন আসে, প্রাণে এমন ভাব জাগে, যুগধর্ম্মের এমন পরিবর্ত্তন হয় যখন এই মানুষই আবার নির্ভয়ে অনিশ্চিতে ঝাঁপ দিয়া মরণকে বরণ করিয়া লয়; বিপদ তখন তার পরম সম্পদ হইয়া দাঁড়ায়; শত বেদনা কামনার বস্তু হইয়া পড়ে! মানুষ তখন এই সত্যটা প্রত্যক্ষ করে যে আত্মদানেই প্রকৃত সুখ, আত্মত্যাগেই যথার্থ আত্মোপলব্ধি।

একটা অঙ্গকে শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আলাদা বাঁচাইয়া রাখা যায় না। কারণ দেহের সঙ্গে তার একটা জীবন্ত সংযোগ আছে যার অভাবে হাজার যত্ন সত্ত্বেও সে রক্ষা পায় না—পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরস্পর সংযোগ ও সহকারিতা জীবদেহকে বাঁচাইয়া রাখে। মানুষের সমাজও একটা জীবন্ত জিনিষ। বিভিন্ন দেশে সমাজের বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজ সর্ব্বত্রই জীবন্ত, সর্ব্বত্রই একটা Organic Unity, যার প্রত্যেক অঙ্গের সহিত অপর অঙ্গের একটা নাড়ীর টান আছে। দেহ হইতে বিছিন্ন হইয়া যেমন কোন অঙ্গের বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই, সমাজ দেহ হইতে বিছিন্ন হইয়া সেইরূপ কোন ব্যক্তিরই প্রকৃত মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা নাই। বিছিন্ন হইলে ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়েরই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

আমি সমাজের মধ্যে বাঁচিয়া আছি, সমাজের মধ্যেই আমার গতিবিধি, প্রকৃতপক্ষে "আমি সমাজেরই একজন "এছাড়া মানুষ নিজের সম্বন্ধে অন্য কোন ধারণা করিতে পারে কি না সন্দেহ। কিন্তু যখন নানা কারণে দেশ হইতে উচ্চ আশা, উচ্চ চিন্তা, মহৎভাবের সাধনা লুপ্ত হয়, তখন মানুষের হৃদয় স্বতঃই সঙ্কুচিত হইয়া উঠে, সে তখন সমষ্টির সহিত সংযোগ সূত্র ছিন্ন করিয়া শুধু নিজের স্বার্থের দিকে ষোল আনা নজর রাখে। সকলেই ভাবে নিজেকে এইরূপে বাঁচাইয়া

চলিলেই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু পরস্পরের সহিত সংযোগ ও সহানুভূতির অভাবে সকলেই অজ্ঞাতসারে আত্মরক্ষার পরিবর্ত্তে আত্মনাশ করিয়া থাকে এবং সমাজের অধঃপতনের কারণ হয়!

এই স্বার্থব্যাধি আমাদের সমাজের প্রত্যেক স্তরে সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে মুমূর্ষু করিয়া ফেলিয়াছে; বাঙ্গালীর ঘরে রোগ শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ডাকিয়া আনিয়াছে। আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী তাই আজ চোখ মেলিতেছে—সকল দিকে এই পরিপূর্ণ সর্ব্বনাশের চিহ্ন দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে এবং কি করিয়া আপনার ঘর সামলাইবে তাহারই ভাবনা ভাবিতেছে। বাঙ্গলায় আত্মঘাতী স্বার্থপরতার যুগ কাটিয়া যাইতেছে নূতন যুগের সূচনা হইতেছে।

এই যুগের প্রধান লক্ষণ হইতেছে আত্মত্যাগ—আত্মদানের মধ্য দিয়া আত্মোপলব্ধি। সমষ্টির মধ্যেই ব্যষ্টির প্রকৃত জীবন এবং সমষ্টির অর্থাৎ সমাজ ও দেশের সেবাতেই ব্যষ্টির স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ বিকাশ, এই সত্যগুলি দেশের যুবকদের নিকট ক্রমশঃ প্রতিভাত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে আত্মদান ও নিঃস্বার্থ কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। নীরব কর্ম্মী লোক চক্ষুর অন্তরালে পূর্ণ একাগ্রতায় ও অখণ্ড বিশ্বাসে সাধনা আরম্ভ করিয়াছেন। এই নবজাগরণের দিনে, এই অনিশ্চিতে ঝাঁপ দিবার দিনে, অন্যান্য ঘটনার সহিত চন্দননগরের বাঙ্গালী সৈন্যের কথা স্বতঃই মনে পড়িতেছে।

বাঙ্গালীর ছেলে ননীর পুতুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পোকা বলিয়াই পরিচিত। সে হঠাৎ নিশ্চয়তার গণ্ডী ছিড়িয়া আত্মীয় স্বজনের মায়া কাটাইয়া মরণের মুখে ছুটিয়া চলিল! বাধা মানিল না, নিষেধ মানিল না, ভয়ে টলিল না,—সাহসে ভর করিয়া আগুণে ঝাঁপ দিতে গেল। তাহার স্বভাবের এ অভাবনীয় পরিবর্ত্তন কি করিয়া ঘটিল? বাস্তবিক মহাভাবকে আশ্রয় করিলে মানুষের এইরূপ বিচিত্র পরিবর্ত্তনই হইয়া থাকে—মূক তখন বাচাল হয়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে। মানুষ তখন লাভ ক্ষতির গণনা ভুলিয়া যায়, তাহার সঙ্কুচিত হৃদয় প্রসারিত হইয়া সিন্ধুতে পরিণত হয়, সে তখন প্রতিদিনের তুচ্ছতা, নীচাশয়তা ও কাপুরুষতাকে পায়ের তলায় রাখিয়া মহত্ত্বের আলোকে উদ্ভাসিত এক নূতন রাজ্যের অভিমুখে ছুটিতে থাকে। কাহারও আকুল আহ্বান, সে মহাযাত্রায় বাধা দিতে পারে না।

শতাব্দীর সঞ্চিত অন্ধকার উষার আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিলে মানুষ যখন অবসাদের পর নূতন জীবনের সন্ধান পায় তখন নিশ্চয় ছাড়িয়া অনিশ্চিতে ঝাঁপ দিতে সে আনন্দ অনুভব করে এবং তাহার উন্মত্ত উৎসাহ, অপরাজেয় আশা ও বিরাট আকাঙ্ক্ষা দেশবাসীর প্রাণ জাগাইয়া তুলে! কয়েকজনের জীবন কোটির দেহে প্রাণ সঞ্চার করে। বাঙ্গালী সেনার সংখ্যা আঙ্গুলে গণা যায় বটে কিন্তু তাদের প্রাণের স্পন্দন কোন্ যন্ত্রের সাহায্যে নিরূপিত হইবে? বাঙ্গালীর ললাটের কলঙ্ক রেখা মুছিয়া আজ তাহারা তেজে ও দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। "চাচা আপন বাঁচার" মন্ত্রকে তাহারা পদাঘাত করিয়াছে; তাহারা দেখাইয়াছে—মানব জীবনে ত্যাগেই আনন্দ ভোগে নহে; বিসর্জ্জনেই প্রতিষ্ঠা, রক্ষণে নহে।

* *
*

৯। সচিত্র পত্র

আমাদের দেশে মাসিক পত্র বা পত্রিকা অনেক শ্রেণীরই দেখিতে পাই। সাহিত্য সম্বন্ধীয় মাসিকই তন্মধ্যে বেশীর ভাগ। বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় মাসিকও ২।৪ খানি দেখা যায় এবং আমাদের দেশের বিজ্ঞানচর্চ্চার হিসাবে তাহারা খুবই উন্নত মনে করি। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান প্রভৃতিও সাধারণতঃ বিজ্ঞান নামেই অভিহিত হয়। ব্যবসা থাকুক বা না থাকুক ব্যবসা সম্বন্ধীয় ও ২।৪ খানি পত্রিকা, আমাদের শিল্পবিজ্ঞানের অধঃপতিত অবস্থায় নীরবে তাহাদের কাজ করিয়া যাইতেছে। জানিনা কোন আশায়, তাহারা সুদূর পরাহত কালের দিকে চাহিয়া আপন আপন পথে চলিয়া যাইতেছে। যাহা হউক আমরা আরও একখানি পত্রিকার আবশ্যকতা বোধ করিতেছি।

আমাদের শিক্ষিত সমাজের জন্য নানান রকমের মাসিক থাকা সত্ত্বেও, বহু বিষয়ের চিত্র সমন্বিত কোন পত্রিকাই দেখা যায় না। আমাদের দেশে খোদাই চিত্রকর অনেকেই আছেন, যাহাদের চিত্র আমাদের দেশে সসম্মানে গৃহীত হইয়া থাকে, তাহাদের সহায়তায় এবং উদ্যোগে ২।১ খানি সচিত্র মাসিক যে অনায়াসে প্রচারিত হইতে পারে একথা বলাই বাহুল্য। আমাদের বিশ্বাস অন্যান্য মাসিকের চেয়ে সচিত্র কোন একখানি অধিক লাভবান্ হইবে। সাহেবদিগের পরিচালিত বিখ্যাত ২।১ খানি কাগজ লাইব্রেরী ও ক্লাব ঘরে দেখা যায়।

এখন ভাবা দরকার এতদিন কোন সচিত্র মাসিক বা সাপ্তাহিক বাহির হয় নাই কেন? দেশের লোক তাহার অভাব বোধ করে নাই কেন?

আমরা দেখিতেছি—সচিত্র মাসিকের পাঠক বা দর্শক তথাকথিত শিক্ষিত বাঙ্গালী জনকয়েক মাত্র। তাঁহারা পাঠাগারের সভ্য; পাঠাগারে অথবা নির্দ্দিষ্ট দিন কয়েকের মধ্যে আপনাদের ঘরে বসিয়াই দেখিয়া দেন। কারণ অপরিমিত মূল্য দিয়া নিজের জন্য সচিত্র পত্রিকা গ্রহণ এই দরিদ্রদেশে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। অবশ্য ২।১ খানি মাসিক সাপ্তাহিক অনেকেই গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাই বলিয়া বলিতে হইবে না তাহারা চিত্র দর্শনে অনিচ্ছুক বা রসবোধ হীন। আধুনিক যুগে দ্বিজেন্দ্রলাল ও রজনী-কান্তের হাসির গান ও কবিতা পড়িয়া এবং তাহাদের পূর্ব্বেরও কোন কোন কবির গান শুনিয়া, শিক্ষিত বাঙ্গালীর পেটে খিল্ ধরিয়া গিয়াছে, তবুও তাঁহারা তৃপ্ত হন হন নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত নব্যবঙ্গের দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে আপনাদের গঠিত হাস্য-ময়ী মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া বঙ্গের চির দুঃখ কষ্ট কিঞ্চিৎ ভুলাইয়া ছিলেন তবুও বাঙ্গালা দেশ হাসি ছাড়ে নাই। সেই বাঙ্গালা দেশ রসবোধ হীন—এটা ভাবাও অন্যায়।

আমরা যে সকল ব্যঙ্গচিত্র বা নদী, পাহাড়, সৈন্যশ্রেণী, নূতন আবিষ্কৃত যন্ত্র ইত্যাদি দেখি তাহা প্রধানতঃই বিদেশী কাগজ হইতে গৃহীত হয়। বিদেশী ব্যঙ্গচিত্র সাধারণতঃ দেশী কাগজের মধ্যে ইংরাজী "মডার্ণরিভিউ" নামক মাসিক পত্রে, এবং দেশীয় ধরণে সময়ে 'দর্শক' পত্রেও দেখা যায়। মূল চিত্রগুলি আমেরিকার কাগজ হইতেই লওয়া হইয়া থাকে। আমরা উহারই দুই চারিটি লইয়া আনন্দিত হই। এমন অবস্থায় যদি কেহ আমাদিগকে রসবোধহীন বলেন তাহা হইলে অন্যায় বলা হইবে। ঐ সকল কাগজ

আমাদের দ্বারা চালিত হয় না কেন তাহার কারণ আছে।

সচিত্র পত্র বাহির করিতে অক্ষমতার কারণ—

(১) যদি কাহারও কখনও বাহির করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে তাহা হইলে টাকার অভাবে হয় নাই।

(২) ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিক চিত্রাবলী সংগ্রহ করিতে যতটুকু পরিশ্রম, ও ভ্রমণের প্রয়োজন ততটুকু অনর্থক ও স্বাস্থ্যহানির কারণ মনে করা।

(৩) ব্যঙ্গচিত্র বাহির করিতে হইলে যেরূপ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন তাহা হয়ত জুটিয়াই উঠে না। মোট কথা হাস্যরসের পূর্ণতা, সৌন্দর্য্যজ্ঞান এবং একাগ্রতা পূর্ণমাত্রায় থাকা চাই।

এখন আমাদের সাহিত্যিক জীবনে রসসঞ্চার করিতে হইলে এবং দেশকে বুঝাইতে হইলে কি কি উপায় অবলম্বন দ্বারা সচিত্র পত্র প্রকাশিত হইতে পারে তাহাই দেখিতে হইবে। প্রথমতঃ উপরোক্ত অভাবগুলি পূরণ করা, দ্বিতীয়তঃ দেশের লোকের সুবিধা সৃষ্টি করিতে গেলে দেখিতে হইবে—

শিক্ষিতদিগের সকলেই বাঙ্গালা ভাষা জানেন। সুতরাং ঐ সকল চিত্রকে বাঙ্গালা ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া। আবশ্যক মত কোন কোনটীর যথাযথ বিবরণও দিতে হইবে, যাহাতে পরিবারের শিক্ষিতা মহিলারা নিজেরাই ছবিগুলি বুঝিতে পারেন।

দেশের শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিতেরা যাহাতে কিনিয়া পড়িতে পারেন তাহার বন্দোবস্ত করা। ইহাতে সর্ব্বত্র সুলভ প্রচারের সুবিধা হইবে।

ইহাতে আর একটা লাভ হইবে দেশের চিত্র জনসাধারণের কাছে বেশ পরিচিত হইবে। প্রাচীন ভাস্কর্য্য, বিধ্বস্তনগরী, বিলুপ্তপল্লীর চিত্র বেশ ফুটিয়া উঠিবে—দেশের নদী, পুল, পাহাড়, খাল, বিল নূতন ভাবে দেখা দিবে। দেশের জননায়ক ও নায়িকাগণের চিত্র এবং তৎসঙ্গে পাহাড়িয়া ও অশিক্ষিত জাতিসমূহের গার্হস্থ্য জীবনের প্রতিকৃতি দেওয়াও সহানুভূতির পরিচায়ক হইবে। দেশকে চিনিবার জানিবার পক্ষে একটা উপযুক্ত অভিভাবক পাওয়া যাইবে। বিশেষতঃ ইউরোপের নব নব জ্ঞানবিজ্ঞানের চিত্র সহজেই আমাদের নিকট পরিচিত হইবে। কলকব্জার বিষয় না পড়িয়াও তাহার একটা মোটামুটি ধারণা সকলেই করিতে পারিব। আবিষ্কারকের জীবনী ও চিত্র ঐ সঙ্গে বাহির হইলে ব্যাপারটা গুরুগম্ভীর হইয়া মানুষ তৈয়ারীতে সাহায্য করিবে। বিশেষতঃ এই সকল পত্রের দ্বারা শিশুরা শৈশবের ধূলা খেলা পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে নূতন খেলার সামগ্রী পাইয়া আনন্দিত হইবে—তাহাদের জীবন নূতন ভাবে গঠিত হইবে—আপনার যাহা কিছু তাহার একটা চিত্র হৃদয়ের মধ্যে থাকিয়া যাইবে। তাহার তরুণ হৃদয় একটা অক্ষয় চিত্রফলক হইয়া থাকিবে।

* * *

১০। শিক্ষাক্ষেত্রে বৈপরীত্যের কারণ

রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী হইলেও কোন কোন স্থলে বৈপরীত্য দেখা যায়। প্রাচীন জাতির অবস্থান্তর হইলেও যদি তাহার বংশ গৌরব ধারাবাহিক চলিয়া আসিতে থাকে তাহা হইলে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলেও ভাবের পরিবর্ত্তন হয় না। ইউরোপীয় জাতিসমূহের

মধ্যে পোলাণ্ড একতম পরাধীন জাতি হইলেও জগতের বিদ্বৎ সমাজে শিল্পবাণিজ্যের ইতিহাসে তাহার একটা দাবী আছেই। পোলাণ্ড তাহার বীরেন্দ্র সমাজের গৌরবে চিরদিনই গর্ব্বিত। ত্রিশক্তির পরাধীনতা স্বীকার করিয়াও তাহার নিজস্ব বজায় রাখিয়াছে। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে যে সকল ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র দেশ আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষার আশায় ধ্বংস হইয়া গেল, তাহাদের হয়ত অনেকেরই পোলাণ্ডের মত পণ্ডিত সমাজে স্থান নাই। একমাত্র শ্রেষ্ঠ স্বাধীন জাতি সমূহের পরস্পরের স্বার্থ সংরক্ষণ জন্যই তাহাদের স্বাধীনতা লাভ হইয়াছে।

ব্রিটিশ ভারতে কিন্তু তাহাও দেখিতে পাই না। নেপাল, ভোট ও মণিপুর প্রভৃতি রাজ্য স্বাধীনভাবে শাসন কার্য্য পরিচালনা করিতে থাকিলেও ভারতের মত তাহাদের প্রতিষ্ঠা নাই। ইংরেজ রাজত্বেই উক্ত রাজ্য সমূহ ভৌগলিক সীমাবদ্ধ হইয়া পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ষ আপনার জাতীয়তা অনেকটা হারাইলেও, বর্ত্তমান জগতের সঙ্গে দাঁড়াইবার মত যতটা শক্ত হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত রাজ্যত্রয় ততটা হইতে পারে নাই। তাহারা স্বাধীন হইলেও অথবা আপনাদের স্থিতিতে আপনারা সন্তুষ্ট হইলেও জগৎ তাহাদিগকে কতটা সম্মান করে তাহা জগতের রাষ্ট্রশক্তিরাই জানেন। ভারত পরাধীন হইয়াও আপনার যতটা সুফল দেখাইতে পারিয়াছে স্বাধীন নেপাল, ভোট ও মণিপুর প্রভৃতি রাজ্য ততটা অধোগামী হইয়াছে। পরাধীন হইয়া নিজস্ব হৃত হওয়া, জাতিসমূহের নিজেদের ব্যবহারের উপরও নির্ভর করে।

বিজিত এবং বিজেতার ভাব মিশ্রণেই সময়ে সময়ে নূতন ভাবের প্রবর্ত্তন হয়। অপেক্ষাকৃত উন্নত বিজেতার দ্বারাই বিজিত জাতির সাহিত্য, ধর্ম্ম খর্ব্ব হইতে থাকিলেও গৌণভাবে তাহাদের দ্বারাই অনেক সময়ে সুপ্রচারিত হয়। ভারতবর্ষের সাহিত্য ও ভাষা দেশ বিদেশে প্রচারিত হইয়া দেশের প্রতি তৃণগুল্মের গৌরব ঘোষনা করিতেছে। কিন্তু বিদেশ হইতে, আমরা যতটা লইতে পারিয়াছি স্বাধীন নেপাল, ভোট ও মণিপুর ততটা লইবার মত উপযুক্ত হয় নাই। জগতের অন্যান্য স্বাধীন জাতিসমূহের সঙ্গে চলিতে হইলে জ্ঞান বিজ্ঞানে যতটা অধিকার বা ভাব গ্রহণে সমর্থ হওয়া উচিত তাহা ইহাদের নাই। ইহারা আপনাদিগকে বর্ত্তমান জগতের উপযোগী করিবার জন্য আজও চেষ্টিত হয় নাই। উক্ত স্বাধীন রাজ্যসমূহ পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থিত হইয়া স্বতন্ত্রভাবে আপনাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে থাকিলেও পার্ব্বত্য বন্ধনের ফলে জ্ঞান বিজ্ঞানের রাজ্য হইতে ধীরে ধীরে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতেছে। ইউরোপীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহের ন্যায় ইহাদের কতকটা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আছে সত্য কিন্তু তাহাদের তুলনায় শক্তি কতটুকু, তাহা হয়ত আদৌ চিন্তা করে নাই। এইরূপ প্রাকৃতিক বন্ধনে নেপাল, ভোটান কেন অন্যান্য অনেক দেশেরই ঠিক এই অবস্থা। সমতল ভারতের সঙ্গে পার্ব্বত্য ভারতের এই জন্যই বৈষম্য রহিয়াছে।

ভারতের অঙ্কে যাহারা আজও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে, ব্রিটিশ ভারত যে তাহাদের অপেক্ষা নানা বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে একথা বলা নিষ্প্রয়োজন। তাহারা শারীরিক বলে ও সমরে যথেষ্ট নৈপুণ্য লাভ করিতে পারিয়াছে সত্য, কিন্তু বালক-

দিগের শিক্ষার জন্য সুবন্দোবস্ত করিতে পারিয়াছে কি না তাহা আজ পর্য্যন্তও জানা যায় নাই। তাহারা অপেক্ষাকৃত উন্নত হইলেও ভারতের পার্ব্বত্য জাতি অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই। আধুনিক শিক্ষা লাভ করিয়া বিলাসিতা দ্বারা অভিভূত না হইলেও বর্ত্তমান সময়ের যাহা শ্রেষ্ঠ বিষয়, মানবের মস্তিষ্ক হইতে যাহা ভগবানের অনন্ত মহিমার বিকাশ করে তাহাকে দূরে রাখিয়া দিতেছে। একদিক হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া অন্যদিকে হৃতসর্ব্বস্ব হইতেছে।

তাহারা যে বর্ত্তমান সময়ে আপন আপন দেশের উন্নতি চিন্তায় বিরত তাহা সহজেই বুঝা যায়। দেশের অন্যান্য অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সমূহের সঙ্গে যে তাহাদের যোগ নাই তাহা কতকটা উপলব্ধি হয়। ব্রিটিশ ভারতের শিক্ষা দীক্ষার ধারা, অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, শিল্প-বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ চিন্তা এবং সফলতা-বিফলতা, আশাও নৈরাশ্যের চিন্তায় তাহাদিগকে সম্পূর্ণ উদাসীন দেখা যায়, তাহার অন্যতম কারণ সংবাদ পত্রের অভাব। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বিভিন্ন ভাষায় সংবাদ পত্র ও মাসিক প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়া যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন সংবাদ ও সুচিন্তা এবং শিক্ষা বিস্তারের সহায়তা করিতেছে তাহারা পরস্পরে সেই সকল সুবিধা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। তাহাদের নিজ নিজ দেশের জন্যও কোন সংবাদ পত্রাদি প্রকাশিত হয় না। মোট কথা তাহাদের অবস্থা ব্রিটিশ ভারত অপেক্ষা বড়ই অনুন্নত। কিন্তু তাহাদিগকে ব্রিটিশ ভারতের সমকক্ষতা লাভ করিতে হইলে বিভিন্ন উপায় অবলম্বনের দরকার। তাহাদের উচিত অন্যস্থান হইতে উপযুক্ত শিক্ষক গ্রহণ করিয়া আপনাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করা। পার্ব্বত্য বন্ধনকে উপলক্ষ্য করিয়া শিক্ষাক্ষেত্র হইতে বঞ্চিত থাকা সভ্যজগতের পক্ষে ঘোর কলঙ্কের কথা।

১১। ব্যক্তির দায়ীত্ব

সমাজে প্রত্যেকের কাছেই প্রত্যেকের দাবী আছে; এবং প্রত্যেকের এক একটা দায়ীত্বও আছে। এই দাবী ও দায়ীত্বের জন্যই সমাজ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সমাজের মঙ্গলের জন্য কেহ বিদ্যা দেন, কেহ বুদ্ধি দেন, কেহ অর্থ দেন আবার কেহ বা ঐ সকলকে সংগ্রহ করিয়া কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত আপন শক্তি দেন। সুতরাং মোট কথা—সমাজ চিরদিনই বিদ্বান-বুদ্ধিমানকর্ম্মী ও ধার্ম্মিক-ধনবানকর্ম্মী চায়।

আমরা বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে অর্থের অভাব উপলব্ধি করিতেছি। অর্থের অভাবে নব নব কর্ম্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠিত কর্ম্ম কেন্দ্রের পরিপুষ্টি কিছুই হইতেছে না। এই সুজলা সুফলা দেশে অর্থের অভাব নাই আছে শুধু প্রাণের অভাব। তারপর যাঁহারা দেশের ধনবান ও কর্ম্মী তাঁহাদের উভয়েরই প্রাণ ও চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে কিছু কিছু ফাঁক রহিয়া গিয়াছে। নচেৎ আমরা বিভিন্নদিকে চিন্তার ও ভাবের সমাবেশ দেখিতে পাইতেছি না কেন? সমাজ আমাদের কৃপণ নয়; মুষ্টি ভিক্ষাই আমাদের সমাজপ্রীতির পরিচায়ক। সমাজের উপকারার্থে অর্থ ত তুচ্ছ, কতজন প্রাণ অবধি দান করিয়া সমাজের গৌরব, ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। বিক্রমাদিত্য-অশোক, হর্ষবর্দ্ধন ও ধর্ম্মপাল, পাঠান ও মোগল সম্রাটগণ এবং মহসীন ও বিদ্যাসাগরের দেশবাসী সমাজের জন্য কার্পণ্য প্রকাশ

করিতে পারেন না। আমাদেরই সমাজে নীতি বাক্য রহিয়াছে—

"ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ"

জ্ঞানী ব্যক্তি পরের জন্য ধন এবং জীবন উভয়ই ত্যাগ করেন।

যাঁহার বুকের উপর—পাহাড়ের গায়ে, তটিনীর কল কল স্বরে, রাজবর্ত্মের ধারে ত্যাগের কথা রহিয়াছে তাঁহার সন্তানেরা সমাজ সেবায় পরাঙ্মুখ হইবেন না।

কর্ম্মীদিগকেই কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত করিতে হইবে। যাহার চোখ দেখে না তাহাকে দৃষ্টিশক্তি দিতে হইবে, যাহার কাণ শোনে না তাহাকে শ্রুতিশক্তি দিতে হইবে, যাহার হৃদয় বোঝেনা, হৃদয় গলিয়া অশ্রু বাহির হয় না তাহার হৃদয়কে বুঝাইতে হইবে গলাইতে হইবে—ইহাই কর্ম্মীর কাজ। যদি এই ভাব আমাদিগের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত না দেয় তাহা হইলে সমাজ-উন্নতির আর কি কোন প্রকৃষ্ট উপায় আছে?

আমাদের দেশবাসিগণ ত্যাগের উৎসে নিত্য স্নান করিতেছেন। ধন বহন করিয়া যাওয়াই আমাদের স্বভাব নয় আমাদের সৎ স্বভাবের পরিচয়—পরার্থে। সুতরাং যাঁহাদিগকে আমরা আজ অর্থভুক্ বলিতেছি তাঁহারা একবার আপনাদের অবস্থা উপলব্ধি করুন, দেশের শিল্পবাণিজ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। তারপর ভবিষ্যতে তাঁহাদিগের আদর্শ চরিত্রগুলি সমাজেতিহাসে স্থান পাইবার জন্য আমাদিগকেও এমন কতকগুলি নূতন নূতন বিষয় বাছিতে হইবে যাহাতে তাঁহারা পেছনে পড়িয়া থাকিতে আপনা হইতেই লজ্জিত হন। আমাদিগকে আরও সত্যান্বেষী, সংযতচরিত্র হইতে হইবে যাহাতে তাঁহারা আপনা হইতেই দেশের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর পরের গঠিত ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির কারণ মনে না করিয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের এক মহাসুযোগ মনে করেন।

যদি কেহ আজই মনে করেন তিনি সমাজের জন্য যাহা কিঞ্চিৎ করিয়াছেন তাহা অন্যের অসাধ্য এবং তাঁহার কাজ শেষ হইয়া গেল তাহা হইলে আমরা বলিতে চাই উন্নতিমুখী সংসারের কাছে তাঁহার স্থান অতি নিম্নে। তিনি, যে দেশের, বা যে জাতির, তাহাদিগকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র করিতেও তাঁহার কুণ্ঠা নাই। তাঁহার চিত্তের গভীরতা অনুসারে তিনি মুহূর্ত্তেই জগৎকে মাপিয়া লইতে পারেন। যাঁহারা বাস্তবিকই আত্মোন্নতি চাহেন তাঁহারা কায় মন ও বাক্য দ্বারা সমাজের উন্নতি প্রার্থনা করেন। তাঁহাদের প্রার্থনা ২।১ জন্মের নয়, তাঁহারা সমাজের উন্নতির জন্য নানাসময়ে নানাপ্রকার উপায় সৃষ্টি করিয়া লন। জগৎটা তাঁহাদের শিক্ষার স্থান, তাঁহাদেরই ভাঙ্গা গড়ার বিষয়। তাঁহারা আজীবন কর্ম্ম করিয়া গেলেও ক্ষণেকের নিমিত্ত চিত্তে শান্তি আনিতে পারেন না। শৈশব হইতে যাহার ফল জলের সহিত পরিচিত হন তাহাকে এক জন্মে কি বলিয়া ভুলিয়া যাইবেন?

তাই বলিতে চাই—সমাজকে আরও ভাল করিয়া জানিতে হইলে, প্রতি বিভাগ উপবিভাগ, কেন্দ্র, শাখাকেন্দ্রগুলিকে জানিতে হইবে; সকলকে বিপদে আপদে আপনার সাথী করিতে হইলে আরও প্রাণ দিয়া ভাল বাসিতে হইবে। আমরা সমাজের মঙ্গলের জন্য যাহা কিছু করিব তাহা এই সময় হইতেই ঠিক করা ভাল। আমাদের জীবন অল্প, আশা বিপুল। সর্ব্বদা প্রাণ মন এক করিয়া উপাস্য দেবতার কাছে বলিতে হইবে আমায় পথ দাও, আমার

কর্ম্মক্ষেত্র আরও বিস্তৃত কর, সকলকে আপন করিয়া লইবার মত শক্তি দাও আমার শরীরের শেষ শোণিতবিন্দু সমাজ সেবায় উৎসর্গীকৃত হউক।

* *
*

১২। কর্ম্মক্ষেত্রে বিহার ও উৎকল

ইতঃপূর্ব্বে বিহার ও উড়িষ্যার শাসন কার্য্য বাঙ্গলা হইতে পৃথক্ হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি শিক্ষাকার্য্যও পৃথক হইল। বিহার-উড়িষ্যার পার্থক্যের ফলে আমরা একটা নবীন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই। বিহার ও উড়িষ্যায় ইহার ফলে শিক্ষাক্ষেত্র বিস্তৃত হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৫০ বৎসরে যে কয়টি বিদ্যালয়কে আপনার কক্ষে স্থান দিয়াছে এই শিক্ষাপ্রচার, জ্ঞান-লাভের যুগে বিহার ও উড়িষ্যাবাসী তাহা লাভ করিতে বেশী দিনের অপেক্ষা করিবে না। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে আমরা দেখিতে চাই, বিহার ও উড়িষ্যাবাসী বাঙ্গালাদেশ হইতে কোন কিছু লাভ করিয়াছেন কি না, আমরা দেখিতে চাই এই মিলনে তাঁহারা কি নূতন উপাদান সংগ্রহ করেন! বিহারী বাঙ্গালীর সঙ্গে প্রাণে প্রাণে মিশিয়াছেন, বিহারী কর্ম্মবীরগণ বাঙ্গলাদেশে কর্ম্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তার পর অপেক্ষাকৃত নিকট ভাষা-ভাষী উড়িষ্যা-বাসীরা বাঙ্গলাদেশেরই অংশ ছিলেন। তাঁহাদের ভাষা অনেকটা বাঙ্গলার সঙ্গে এক। বাঙ্গলা দেশকে কে কতটুকু আপন করিয়াছেন, তাহা এইবার দেখিতে পাইব।

শিক্ষাপ্রচারে কোন কোন বিষয়ে আমরা উড়িষ্যাকেই বরং উন্নত দেখিতে পাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রিকাদি যে পরিমাণে আছে তাহার তুলনায় পাঠক আছে কি না সন্দেহ। উড়িষ্যাবাসিগণ নব প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিবাদনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেই হয়। উড়িষ্যার ও বিহারের জিলায় জিলায় এক একটি মাত্র সরকারী বিদ্যালয়ই যথেষ্ট নহে। তাঁহারা নিজ নিজ আকাঙ্ক্ষাকে বড় করিতে থাকুন। উচ্চচিন্তা, দ্রুত উন্নতির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই সব চাই। উড়িষ্যা ও বিহারের সমাজ অঙ্গ যে যে বিষয়ের জন্য দুর্ব্বল, উক্ত প্রদেশদ্বয়ের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাহার পুষ্টির উপায় নির্দ্ধারণ করুন, কর্ম্মীরা তাহার প্রতিকারের জন্য প্রস্তুত হউন, আপনার দায়ীত্ব কাঁধে লইতে প্রস্তুত হউন, ইহাতে একদিকে আপনাদের কার্য্য দক্ষতা বাড়িবে অন্যদিকে গভর্ণমেণ্টকে সাহায্যদানে ভবিষ্যতে আরও সুযোগ পাইবার আশা রহিবে।

প্রাচীন গৌরবে উড়িষ্যা ও বিহার উভয় দেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠাই উজ্জ্বল। এইবার তাঁহারা আপনাদের গৌরব লক্ষ্য করিয়া ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইতে সাহায্য পাইবেন। এতদিন আমরা যাঁহাদিগকে দেখিতে পাই নাই আজ তাঁহারা অবশ্যই আপনাদের অভাব, দৈন্য ও কর্ত্তব্য বুঝিয়া প্রস্তুত হইবার জন্য বাহিরে আসিবেন। বাঙ্গলা দেশের বালকসমাজে তাঁহাদের জীবনী অন্যতম আলোচ্য বিষয় হইবে! উড়িষ্যা ভাষায় রচিত প্রাচীন শিল্প-বিজ্ঞান দর্শন ও পণ্ডিতব্যক্তিগণের জীবনী এইবার বিহারী ইতিহাসের সঙ্গে সমভাবে প্রকাশিত হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগের দ্বারা আমরা যেন সঙ্কীর্ণমনা না হই। বাঙ্গলা দেশে

২টী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ইহা আমাদের সুখের বিষয়। আমরা আরও অধিকতর সুখী হইব যেদিন উড়িষ্যা নিজের বুকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান দিতে পারিবে। হিন্দুস্থান, পঞ্চনদ, মহারাষ্ট্র দ্রাবিড় প্রত্যেকেই আরও শত শত ভাগে বিভক্ত হইয়া শত শত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য শক্তিলাভ করুক। প্রত্যেক পল্লীতে পল্লীতে শিক্ষা প্রচারিত হইয়া আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের সাহিত্য, পঞ্চনদের প্রাচীনেতিহাস, মহারাষ্ট্রের ব্যবসাগৌরব, গুর্জ্জর-দ্রাবিড়ের সাহিত্য, উৎকলের ভাস্কর্য্য, প্রাচীন বিহারের শিক্ষা-গৌরব, নব্য বঙ্গের কর্ম্মাকাঙ্ক্ষা, হিন্দুস্থানের ধর্ম্মপ্রবৃত্তিকে সর্ব্বত্র পরিচিত করিয়া দিক্।

শেষ কথা এই, আমরা নব প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়কে শীঘ্রই বিহারী ও উড়িয়াদের নবীন কর্ম্মক্ষেত্ররূপে দেখিতে চাই। তাঁহারা গর্ব্ব করিয়া বলিতে শিখুন এই পাটনাই পুণ্য-তোয়া গঙ্গারতীরে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পাটলি-পুত্র নামে আখ্যাত হইয়াছিল। এক সময়ে ইহাই বহু বহু পণ্ডিতগণের বিহারভূমি হইয়াছিল। নালন্দা ও বিক্রমশীলা এই দেশেই প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জ্ঞানপিপাসুগণের তীর্থক্ষেত্ররূপে ইতিহাসে পরিচিত রহিয়াছে। আমরা প্রার্থনা করি নবীন বিশ্ববিদ্যালয়টী বিহারের প্রাচীন শিক্ষাগৌরবে গঠিত হউক, তারপর উড়িষ্যার শিল্পজ্ঞানে ভূষিত হইয়া ভারতের বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে আপনার কৃতিত্ব প্রদর্শন করুক।

* * *

১৩। বর্ত্তমান ভারতের ধর্ম্মসম্প্রদায়

দীর্ঘকাল যাবৎ এদেশে নানান ধর্ম্ম প্রচারিত রহিয়াছে, প্রচারিত হইতেছে। বিভিন্ন ধর্ম্ম—প্রচারক গন্তব্যস্থান এক, লক্ষ্য এক জানিয়াও বিভিন্ন ভাবে পন্থা নির্দ্দেশ করিতেছেন। তাহাদের কতকগুলি সম্প্রদায় শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণবের অঙ্গে অঙ্গে যুক্ত রহিয়া আপনাদের মতবাদ প্রচার করিতেছে। কেহ কেহ বা, বেদান্ত উপনিষদের পথে চলিয়া আপনাদিগকে প্রচারিত করিতেছে। আমরা বলিতে চাই এই সকল সম্প্রদায় আরও প্রতিষ্ঠিত হউক, আরও বিভিন্ন প্রচারক বা তত্ত্বানুসন্ধায়ীদিগকে পাইতে চাই। তাঁহারা ভগবৎ লাভের উপায় নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হউন বা নাই হউন এদেশের মাটিতে জন্মিয়া কাহাকে কিছু করিতে হইলে ঐভাবে আংশিক লাভবান হইতেই হইবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান যাহাই কেন প্রচারিত হউক না সেই বেদান্ত উপনিষদের ভিতর দিয়াই তাহার বাণী প্রচারিত হইবে। নতুবা তাহার পরিণতি অনতিদূরেই দৃষ্ট হইবে।

বর্ত্তমান দশপনের বৎসরের ভিতর যে সকল সম্প্রদায় স্থাপিত হইয়া চলিতেছে আমরা তাহাদের উন্নতির সহিত দৃঢ় প্রতিষ্ঠা কামনা করি। উহাদের কোন কোনটী ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় হইলেও অধিকাংশই সমাজ-সম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠান। এই সকল সম্প্রদায়ের প্রচারকগণ যুগে যুগেই অধিনায়কত্ব লইয়া সমাজকে পুষ্ট করিবার জন্য চেষ্টিত রহিয়াছেন। তাঁহাদিগকে যেমন বিভিন্নভাবে দেখিতে পাই, তাঁহাদের বাণী, তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানগুলিও সেইরূপ বিভিন্ন আভরণে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

আমরা চাই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যই চিরকাল অবিকৃত অবস্থাই থাকুক। একবার অবস্থার বিকৃতি ঘটিলে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। জগৎ নিত্য পরিবর্ত্তন শীল। একটা সম্প্রদায় চিরদিনই এক পথ বা এক মত লইয়া চলিবে

এটা কখনই হইতে পারে না। কিন্তু পরিবর্ত্তন তখনই সম্ভব যখন পরিবর্ত্তনকারী প্রতিষ্ঠিত সমাজের মতবাদকে সময়োপযোগী পরিবর্ত্তন দ্বারা সামলাইয়া লইতে পারেন। দীর্ঘকাল সাধনা দ্বারা উদ্দেশ্য সুদৃঢ় না হইলে মতবাদ কখনই স্থায়ীত্বলাভ করিতে পারিবে না। এই কারণেই বৌদ্ধধর্ম্মপ্লাবিত অর্দ্ধজগৎ ভক্তি-প্রণত হইয়াও স্থির থাকিতে পারিল না। বুদ্ধের বাণী তাঁহার জীবিতকালে লোকে যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, তাঁহার মৃত্যুর পর পারিপার্শ্বিকের আঘাতে সে ভাব টিকিল না। তারপর চৈতন্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেক পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। চৈতন্য যে ভাবে চলিতেছিলেন, দুই এক পুরুষ বা কিঞ্চিদধিক কাল তাঁহারই পদাঙ্কানুসরণ করিয়া চলিয়াছিল তাহার পরেই বিকৃতি ঘটে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় এক শঙ্করাশ্রম ব্যতীত পুরাতন সম্প্রদায়গুলির কোনটীই অবিকৃত নাই। প্রতিষ্ঠাতারা তাঁহাদের স্বল্প জীবনে যাহা গড়িয়া তোলেন তাহার ভিত্তি দৃঢ় হইতে না হইতেই ভাঙ্গিয়া যায়। একটী সম্প্রদায়কে লইয়া গড়িয়া ভাঙ্গিয়া ধরিয়া রাখিবার মত শক্তিমান কর্ম্মী আবশ্যক, তবে উহা অবিনশ্বর অবস্থায় পৌঁছে।

আমাদের আশার বিষয় বর্ত্তমান সম্প্রদায় গুলি যেখানে জন্মিতেছে সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রতিষ্ঠার সহিত চলিতেছে। অথবা অন্যত্র তাহার হাব্‌ভাব্‌ চতুর্ম্মুখ হইয়া বিকাশ পাইতেছে।

যাহারা সাম্প্রদায়িক কাজ কর্ম্মের ভার লইয়া থাকে তাহারা যদি ভক্তিমান হয় তাহা হইলেই পতনের আর কোন আশঙ্কা থাকে না। প্রত্যেকেরই ভাবা উচিত আমাকে লইয়াই এই সম্প্রদায়। আমার শরীরের শেষ শোণিতবিন্দু ইহার জীবনীশক্তির রক্ষক। আমরা দেখিতে পাইতেছি, ঊনবিংশ শতাব্দীতে যাহারা এই সব সম্প্রদায়ের জন্ম দিয়াছে এবং এই বিংশশতাব্দীতে যাহারা লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া একহাতে কর্ত্তব্যকে টানিতেছে অন্যহাতে দুর্দ্দৈবকে ঠেলিয়া দ্রুত অগ্রসর হইবার জন্য ব্যগ্র, তাহাদের পরিপন্থী কেহই নাই। সাফল্যের স্বর্ণচূড়া তাহাদের দৃষ্টিতেই প্রথম পতিত হইবে।

১৪। হিন্দুর গৃহে দুরবস্থা

আমাদের দারিদ্র্যের এক কারণ যেমন ব্যবসা বাণিজ্যের অভাব এবং শিক্ষাহীনতার এক কারণ যেমন অর্থাভাব তেমন অন্যান্য কারণও আছে। এক কথায় বলা যাইতে পারে অসময়ে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশই দুরবস্থার অন্যতম কারণ। অর্থের অভাবে লোক ধর্ম্ম কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বসিয়াছে সৎকর্ম্মে সদুদ্দেশ্যে এক কপর্দ্দক দান করিতে নানা প্রকার যুক্তির অবতারণা করে, দরিদ্রের হাতে একমুষ্টি চাল দিতে তাহারা দারিদ্র্যের করুণগীতি গাহিয়া থাকে অথচ পুত্রের বিবাহ দিয়া অভাবকে শত ভাবে বরণ করিয়া লইতেছে। যে বিদ্যা পুরুষের এক মাত্র সম্পত্তি, সেই বিদ্যাচর্চ্চাই যেন আজ গৌণ বিষয় হইয়া পড়িতেছে।

বিবাহের জন্য বঙ্গীয় যুবক সবই ভুলিতে পারে। দেশ, ধর্ম্ম জাতমান সকলই যেন ত্যাগ করিতে পারে। যুবকের উদ্দাম লালসার পশ্চাতে পিতামাতার একান্ত ইচ্ছাই বিবাহকে মুখ্য করিয়া ফেলিয়াছে। পিতা মাতা

বুঝিতে পারেন না বা ভাবিবার জন্য অবসর লইতে চাহেন না—বিবাহ কাহার জন্য? তাঁহারা কে? তাঁহাদের অস্তিত্ব কোন যুক্তির ভিতরে বিরাজমান রহিয়াছে? সমাজে পিতামাতার পুত্রস্নেহ এতটা প্রকাশ না পাইলে সন্তানের বিবাহের ইচ্ছা প্রবলাকার ধারণ করিতে পারিত না। যে পিতামাতা ধর্ম্মার্থে সবই করিতে পারিতেন, আপনাদের হস্তে পুত্রকে বধ করিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, ধর্ম্মকে বড় করিয়াছেন, সেই পিতা মাতা আজ সমাজের কর্ত্তব্য চিন্তা সমাজের উন্নতির জন্য সামান্য ক্ষতি স্বীকার করিতেও চাহেন না। সন্তান উপযুক্ত হইয়া বংশের গৌরববৃদ্ধি করিবে তাঁহারা যেন সেটা চাহেন না। খ্যাতনামা পুত্র যে তাঁহাদেরই সাধনার ফল তাঁহারাই যে সেরূপ সন্তানকে পাইতে পারেন এটা যেন মোটেই ভাবিতে পারেন না। তাঁহাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম তাঁহাদের সদালাপ, সচ্চিন্তা যে বংশপরম্পরায় বাহিয়া যাইবে, আর উহারই স্পর্শে শত শত জগৎ-কর্ম্মীর উত্থান হইবে তাহা কি তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন? পিতামাতা পুত্রস্নেহে মুগ্ধ হইয়া ভাবিতে পারেন না একমাত্র শিক্ষার অভাবে, অসময়ে লালসার তাড়নায় অসংযত হওয়াতে, গার্হস্থ্য চিন্তা প্রবলাকার ধারণ করায় বংশের গৌরব অচিরেই ডুবিয়া যাইবে। যে সন্তানের জন্য পিতামাতার গৌরব, সেই সন্তানকে তাঁহারাই পঙ্কে নিমজ্জন করিতেছেন। এই রকম পিতামাতার সন্তান হইতে সমাজ কিছুই পায় না। এই সকল সন্তানগণ কেবল মাত্র বোঝা হইয়াই চিরদিন বাস করে। স্নেহাতুর পিতা মাতা পুত্রের অনিষ্ট সাধন করিয়া শত্রুর কার্য্য করিতেছেন। সন্তানের ভবিষ্যৎকে তাঁহারা মুহূর্ত্তে ভাসাইয়া দিতেছেন। তাহাকে বিশাল জগৎ দর্শন, বিপুল চিন্তা করিবার জন্য কিঞ্চিৎ সময় দেওয়া হয় না।

ভারতবর্ষ ত্যাগীর দেশ। আদর্শ ত্যাগী যেমন তাহার লক্ষ্য, আদর্শ গৃহস্থও তাহার প্রার্থনীয়। গৃহস্থই সন্ন্যাসীর আশ্রয়। সন্ন্যাসীর সম্মান গৃহস্থের কাছেই। তাই মনে করি আদর্শ গৃহস্থ হইবার জন্য যে সকল গুণ বা শিক্ষাপ্রয়োজন বর্ত্তমান যুবকগণের সে সব নাই। তাঁহারা বিবাহকে একটা খেলার সামগ্রী মনে করিয়া কতকগুলি বাঁধা নিয়মের মধ্য দিয়া হিন্দুরসমাজ শক্তিকে, হিন্দুর আদর্শকে খর্ব্ব করিতে চলিয়াছেন। পিতৃগৃহে সম্পূর্ণ শিক্ষা লাভ না হওয়ায় বিবাহিত বালিকা তাহার শিক্ষা দ্বারা কর্ম্মক্ষেত্রে পৌঁছিতে পারে না। পিতামাতার স্নেহ অতি অল্প বয়সেই একটা প্রথার মধ্য দিয়া চালিত হইয়া তাহাকে সংসারের কাছে অনুপযুক্ত করিয়া রাখিতেছে। তাহার দ্বারা হিন্দুর সংসারে আদর্শ চরিত্রের প্রবর্ত্তন না হইলেও আপনার সন্তানকে শিক্ষা দিবার মতও কিছুই সংগ্রহ করিতে অবসর পায় না।

হিন্দুর সংসার আদর্শ জননীর কর্ম্মক্ষেত্র। কিন্তু বঙ্গ বালিকা ভবিষ্যসন্তানের সুশিক্ষয়িত্রী হইতেছেন না। হিন্দুর গৃহ এই প্রকারে একটা ভোগের আড্ডা হইয়া চলিতেছে। লজ্জানিবারণ ও উদরপূর্ত্তিই হিন্দুর ধর্ম্ম নহে। দেশের উন্নতির পরিবর্ত্তে গাঢ় তমিস্রা অগ্রসর হইবে কি? একদিক চিরোদ্ভাসিত দেখিতেছি সত্য কিন্তু অমনিই অন্য দিক কুজ্ঝটিকাময় হইয়া উঠিতেছে।

সাহিত্য-প্রচার*

দেশে একটা প্রবল তর্ক উঠিয়াছে—আমাদের সাহিত্য কোন্ পথে চলিবে? দুই বৎসর যাবৎ মাসিক পত্র সমূহে এই বিষয় লইয়া বিষম লড়াই চলিতেছে। একদল বলেন, আমাদের আধুনিক সাহিত্য বস্তুতন্ত্র-হীন, তাহার বেষ্টনী হইতে বিচ্ছিন্ন এবং এই জন্যই সে আর যুগপ্রবর্ত্তক নহে, সে লোকশিক্ষক নহে। বিরুদ্ধবাদীর কথা—সাহিত্যের মধ্যে যেটা আমরা খুঁজি, সেটা রসবস্তু। "এই রসটা এমন জিনিষ যাহার বাস্তবতা সম্বন্ধে তর্ক উঠিলে হাতাহাতি পর্য্যন্ত গড়ায় এবং এক পক্ষ অথবা উভয় পক্ষ ভূমিসাৎ হইলেও কোন মীমাংসা হয় না। লোক যদি সাহিত্য হইতে শিক্ষা পাইতে চেষ্টা করে তবে পাইতেও পারে কিন্তু কোন দেশেই সাহিত্য স্কুল মাষ্টারীর ভার লয় নাই। রামায়ণ মহাভারত দেশের সকল লোকে পড়ে তাহার কারণ এ নয় যে তাহা কৃষাণের ভাষায় লেখা বা তাহাতে দুঃখী কাঙালের ঘর করণার কথা বর্ণিত। তাহাতে বড় বড় রাজা, বড় বড় বীর ও বড় বড় বানরের বড় বড় ল্যাজের কথাই আছে। আগাগোড়া অসাধারণ। সাধারণ লোক আপনার গরজে এই সাহিত্যকে পড়িয়াছে। সাধারণ লোক মেঘদূত, কুমার-সম্ভব শকুন্তলা পড়ে না। খুব সম্ভব দিঙ্‌না-গাচার্য্য এই ক'টা বইয়ের মধ্যে বাস্তবের অভাব দেখিয়াছিলেন। কিন্তু কালিদাস যদি কবি না হইয়া লোকহিতৈষী হইতেন তবে সেই পঞ্চম শতাব্দীর উজ্জয়িনীর কৃষাণদের জন্য হয়ত প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী কয়েক-খানা বই লিখিতেন,—তাহা হইলে তারপর এতগুলা শতাব্দীর কি দশা হইত? তুমি কি মনে কর লোকহিতৈষী তখন কেহ ছিল না? লোকসাধারণ নৈতিক ও জাঠরিক উন্নতি কি করিয়া করিতে পারে সে কথা ভাবিয়া কেহ কি তখন কোন বই লেখে নাই? কিন্তু সে কি সাহিত্য?" আর একস্থলে অভিযুক্ত দলের উক্তি এই—'যিনি প্রকৃত কবি তিনি সত্যের দ্রষ্টা। তিনি রসের মধ্য দিয়া আনন্দময়ের—সুন্দরের প্রকৃত রূপকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছেন।" ফরিয়াদীগণ আবার বলিতে-ছেন যে, "সাহিত্যে যুক্তি ও তর্ক অবলম্বন করিলে, একটা তত্ত্ব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিলে, লোককে শিক্ষা দিবার ভার গ্রহণ করিলে, সত্যপ্রকাশ ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টির অন্তরায় হয় কি না তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।"

এই উক্তিগুলি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে এত কথাকাটাকাটি সাহিত্যের আদর্শ লইয়া নয়, সত্য প্রকাশ ও সৌন্দর্য্যসৃষ্টির কথা লইয়াও নয়। প্রকৃত কারণ এই যে আধুনিক সাহিত্য কেন সমাজের অন্তস্তল স্পর্শ করিতেছে না। কেন আধুনিক সাহিত্য রামায়ণ মহাভারতের মত ঘরে ঘরে আদৃত হয় না। একদল মনে করেন, বুঝি আমরা তাহাদের সুখ দুঃখের কথা লইয়া আলোচনা করিতেছি না তাই এমন ঘটিল। অপর দল বলিতেছেন, আমরা শিক্ষা ও সাধনাবলে এত

* বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের নবম বার্ষিক যশোহর অধিবেশনে পঠিত।

ঊর্দ্ধে উঠিয়াছি যে আমাদের চিন্তাপ্রণালী বা ভাষা সাধারণের বোধাতীত হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের ভাব বুঝিবার জন্য তাহাদিগকে শিক্ষা দ্বারা উপযুক্ত করিয়া তোলা দরকার। বস্তুতঃ উভয় দলের উক্তিই এক একটা খণ্ড সত্য। খণ্ড সত্য কেন না, দেশের সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষার কথা লইয়া দেশের চলিত ভাষায় সাহিত্য রচিত হইলেই যে তাহা সর্ব্বজনাদৃত হইবে, এমন নয়। রামায়ণ মহাভারত ভিন্ন তত্তুল্য আর কোন বই কি আমাদের জাতীয় সাহিত্যে নাই? তাহাদের নাম জনসাধারণ জানে না কেন? আর এক কথা সরল ভাষায় রচিত হইলেই যদি পুস্তকের বহুল প্রচার হয়, তবে ত বটতলার নাটক নভেলের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আদর হওয়া উচিত ছিল।

পক্ষান্তরে তথাকথিত শিক্ষিত হইলেই যে বর্ত্তমান সাহিত্যের আদর বাড়িবে, তাহাতে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হয়। রবিবাবুর নোবেল পুরস্কার পাইবার পূর্ব্বে তাঁহার পুস্তক কয়জন শিক্ষিত বাঙ্গালী পড়িত? আজ যাঁহারা পড়েন, তাহাদের কয়জনই বা তাঁহার সহিত একমত? সুতরাং রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় তাঁহার পুস্তক কোন কালে এত বেশী লোকের নিকট সমান আদরের হইবে কি? আসল কথাটা হইতেছে এই, আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্যকে সর্ব্বজন সমাদৃত করিবার ও তাহাকে বিশ্বসাহিত্যের পদে উন্নীত করিবার পথ—মানবের চিরন্তন আদর্শকে সাধনালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা বা ভগবদ্দত্ত প্রতিভার সাহায্যে জাতীয় জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া সাহিত্যে ফুটাইয়া তোলা এবং নানা উপায়ে এই আদর্শকে জাতির সমক্ষে ধরা। 'সবুজ-পত্র'-সম্পাদক একটা বড় সত্য কথা বলিয়াছেন, বর্ত্তমান বাঙ্গালার সাহিত্য-সেবক-সেবিকারা আর কিছু করুন বা না করুন অন্ততঃ ভাবী গুণীর আসর জমাবার জন্য পাঠকসমাজকে উদ্বুদ্ধ করিয়া রাখিতেছেন। তবে তিনি যে আর এক জায়গায় বলিয়াছেন, —বালিকাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়, উভয়-স্থলেই নবসাহিত্য সমভাবে ও সমতেজে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হচ্ছে, এই কথার সহিত আমার মনের একটুও মিল নাই। কেন নাই সেটি আমি পরে বলিব।

এখন কথা এই, আমরা কি কি উপায়ে বর্ত্তমান জাতীয় সাহিত্যকে সমাজ-জীবনের অন্তরে প্রবেশ করাইতে পারি। এই খানেই আমার প্রবন্ধের প্রকৃত আরম্ভ। History repeats itself—দেখিতেছি আমাদের সাহিত্য-ক্ষেত্রে অতীতের আংশিক পুনরাভিনয়ের প্রয়োজন হইয়াছে। সাহিত্যসেবী মাত্রেই জানেন বঙ্গের এক রাষ্ট্রীয় শক্তি লুপ্ত হইবার পর যখন মুসলমানেরা দেশ অধিকার করিয়া বসিল তখন ভারতীয় সাহিত্যেরও অধঃপতন আরম্ভ হইল। নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়, বিক্রমশীলা বিহার প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উঠিয়া গিয়াছে; প্রিয়দর্শী, শিলাদিত্য ও শিক্ষানুরাগী পালবংশীয় রাজারা এখন কোথায়? সুতরাং তপনদেব হাসিয়া উঠিলে অন্ধকারের যে দশা হয় ভারতীয় সাহিত্যেরও তদবস্থ হইতে বেশী দেরী হইল না। হিন্দুসমাজনেতৃরূপ বৃক্ষের আড়ালে মুখ গুঁজিয়া সে কোনরূপে বাঁচিয়া গেল মাত্র। ধর্ম্মভাব হোক, জাতীয় ভাব হোক, যা কিছু ভাব হোক না কেন সবই প্রকাশ পায় মানুষের ভাষার সাহায্যে, প্রচার হয় তাহার সাহিত্যে। রাজাই যখন মুসলমান তখন বর্ত্তমান যুগের ন্যায় রাজ ভাষাই সমাজে

আদর পাইতে বসিল। রাজজাতির আচার ব্যবহারই সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হইতে লাগিল। হিন্দু সমাজের ভগ্নদশাও আরব্ধ হইল।

ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিতে, পতিত অথচ যোগ্য জাতিকে উদ্ধার করিতে ত ভগবান চিরদিনই ক্ষিপ্রহস্ত; তাই সারাটা ভারতময় একটা ধর্ম্মান্দোলনের সৃষ্টি হইল। বঙ্গদেশও সে আন্দোলনে সাড়া দিয়াছিল। আমাদের এত গৌরবের যে বঙ্গসাহিত্য তাহা এই আন্দোলন হইতে সমুদ্র মন্থনোদ্ভুত অমৃতের ন্যায় উঠিয়া আসিল। আমি বৈষ্ণব সাহিত্যের উৎপত্তির যুগের কথাই বলিতেছি।

মুসলমান ধর্ম্মের কবল হইতে ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে বাঙ্গালা দেশে যুগাবতার শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। তখনকার শাক্তবৈষ্ণবের দ্বন্দ্বই বর্ত্তমান সাহিত্যের জন্মদাতা। আজ যে, দেশে একটা নূতন সুর বাজিয়া উঠিতেছে সেই অতীত যুগেও এইরূপ একটা সুর বাজিয়াছিল। আজিকার ন্যায় সেই যুগেও সুরটীকে সমাজজীবনে প্রবিষ্ট করিতে নানা চেষ্টা চলিয়াছিল। সেই চেষ্টা সেই অতীত যুগের আদর্শকে সমাজে ধরাইয়া দিতে পারিল তাহার কারণ, সমাজ বুঝিল যে এটা আমারই জিনিষ। সাহিত্য যে সেই তামসযুগে সমাজের প্রধান আন্দোলনের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল সাহিত্যে নূতন আদর্শসৃষ্টি যেমন তার একটী কারণ, সাধারণ্যে সেই যুগাদর্শ প্রচারের জন্য নানা মণ্ডলী গঠন ও সেই সাহিত্য প্রচারের জন্য বিশিষ্ট একদল সন্ন্যাসীর আবির্ভাবও তার অন্যতম। যদি চৈতন্য-দেবের ন্যায় প্রতিভাবান চিন্তাশীল ও প্রচারক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব না হইত তবে হয়ত বাঙ্গলা দেশের সাহিত্য বর্ত্তমান অবস্থায় দাঁড়াইতে পারিত না। অথবা তাহাকে বৈষ্ণবীয় যুগের ভাব সম্পদগুলি হারাইতে হইত। যুগাদর্শ প্রচার উদ্দেশ্যে যে মণ্ডলী গঠনের কথা আমি বলিতেছি, সেটী কিন্তু বঙ্গ সমাজের নেতৃবৃন্দেরই কর্ত্তব্য; যাঁরা সাহিত্যক্ষেত্রে কর্ম্মী তাঁদের কর্ম্ম দ্বিতীয়টী। অবশ্য আমার এ প্রস্তাবটী একেবারে নূতন নয়। আমা অপেক্ষা বহুজ্ঞানবান লোকে একথা পূর্ব্বেই দুই একবার প্রস্তাব করিয়াছেন কিন্তু সেদিকে এখনও আমাদের দৃষ্টি পড়ে নাই। বিদেশে সাহিত্য প্রচার ত পরের কথা, এই বাঙ্গালা দেশের কয়টা জেলাতে রংপুর, ঢাকা, রাজসাহী জেলার ন্যায় একটা করিয়া উপযুক্ত শাখা সাহিত্য পরিষদ আমরা এখনও গড়িয়া তুলিতে পারিলাম না। যশোহর খুলনা কলিকাতার এত নিকটে এবং অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় মনীষি ও সাহিত্য-সেবিগণ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভ্য অথচ সেই জেলা দুইটাই এ বিষয়ে সকলের পশ্চাতে পড়িয়া আছে। তবে একথা আমি বলি না যে এটা শুধু তাঁদেরই কর্ত্তব্য। আমরা চাই, জেলায় জেলায় বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, রংপুর সাহিত্য পরিষদের নেতাদের মত অক্লান্তকর্ম্মী আর একটী করিয়া সাহিত্য আলোচনার কেন্দ্র। কিন্তু এটাও গেল একটা মণ্ডলী গঠনেরই কথা যাহা দ্বারা সাহিত্য সৃষ্টি ও প্রচার দুই কাজই চলে এবং তাহা সাহিত্যের পরি-পোষকেরা প্রকৃত সাহিত্যসেবী না হইলেও গড়িয়া তুলিতে পারেন। সাহিত্য প্রচারকল্পে ইতিপূর্ব্বেই আমি যে একদল প্রচারক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব কামনা করিলাম তাঁহাদের দ্বারা কি কাজ হইবে, তাঁহাদের আদর্শ কি ও তাঁহাদের পথ-ই বা কোনটী তাই এখন আমাদের আলোচ্য। সাহিত্যের কথা

ভাবিতে ভাবিতে যখন অতীতের দিকে তাকাই, তখন কি দেখি না শিষ্যগণ পরিবৃত শিক্ষাব্রতধারী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সংস্কৃত সাহিত্যে কোন উপহার দিয়াছেন, মধ্যযুগের সন্ন্যাসী শঙ্কর, রামানুজ, কুমারিলভট্ট প্রভৃতি মনীষিরা লোকশিক্ষার জন্য মতবাদ প্রচার করিতে গিয়া সাহিত্যের কতটা গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন? আমরা কি পুরাণেতিহাসে উপমন্যু আরুণির উপাখ্যান পড়ি নাই? অধুনা আমরা পাশ্চাত্য মোহে অভিভূত তাই এই সমস্ত শিক্ষকজীবনের সার্থকতা দেখিতে পাই না। এরূপ লোকশিক্ষক এখনো বর্ত্তমান থাকিলেও সমাজে তাঁহাদের জন্য আদর ত নাই বরং বিদ্রূপবাণী আছে—"কোন ক্ষমতা নাই কাজেই উনি ত্যাগী, কাজেই উনি বিদ্যালয়ের শিক্ষক।" ইঁহারাই যে দেশের প্রকৃত নিয়ন্তা সে কথা আমরা জানিয়াও জানিতে চাহিতেছি না। দেশের যে কোন প্রকার উন্নতি যে ইঁহাদেরই হাতে তাহা ভুলিয়াছি আমাদের দরিদ্রতায়। তাই সাহিত্য আলোচনার বা প্রচারের প্রধান কেন্দ্র যে দেশের শিক্ষালয়গুলি তাহাত আমাদের মনে নাই। বৈদিকযুগে শুনি, স্ত্রী পুরুষ উভয়জাতি সব কাজই করিত। স্ত্রীলোক শাস্ত্রাদি রচনা করিতেন। সে যুগের ইতিহাস অন্ধতমসাচ্ছন্ন, ঐতিহাসিকেরা বলেন সে যুগে ভারতবর্ষ যে খুব বেশী উন্নতিলাভ করিয়াছিল এমন নয়। বৌদ্ধযুগে দেখিয়াছি লোকশিক্ষার ভার ধর্ম্মযাজক বা সন্ন্যাসীদিগের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যাদি চর্চ্চার জন্য বিশেষ বিশেষ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজদরবারে সাহিত্যের আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সন্ন্যাসীরা কেহ কেহ শিক্ষাব্রত লইয়া জীবনের পথে যাত্রা করিয়াছেন। এই যুগ হিন্দুসভ্যতার চরমোৎকর্ষের যুগ। এ সময়ে সাহিত্যক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের প্রতিষ্ঠা কমিয়া আসিতেছে। মধ্যযুগের বা মুসলমান যুগের প্রথমভাগে সন্ন্যাসীরাই লোকশিক্ষক রহিলেন কিন্তু বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষাই প্রাধান্য লাভ করিল। ধর্ম্ম ও দর্শন সাহিত্যই সমাজ-জীবনে প্রতিপত্তি লাভ করিতে লাগিল। রাজ-সাহায্য অভাবে অন্যান্য সাহিত্য ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গেল। তদানীন্তন যুগসাহিত্যে স্ত্রীলোকের নাম বড় দেখা যায় না। ইহার পর হইতে শিক্ষার ভার সন্ন্যাসীর হস্ত হইতে রাজার হস্তে আসিল। লোকশিক্ষা সাহিত্যসৃষ্টির উপায় না থাকিয়া জীবিকা-সমস্যা সমাধানে প্রবৃত্ত হইল। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত আমাদের জাতীয় অধঃপতনের যুগ চলিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে আবার স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতি বাক্‌দেবীর আরাধনা করিতেছেন বটে কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ্য ক্রমশঃ জীবিকা অর্জ্জনের দিকে হেলিয়া পড়িতেছে। এখন আর লোকশিক্ষক ধর্ম্মবেত্তা বা শিক্ষাব্রতধারী সন্ন্যাসী নহেন। সাহিত্য সৃষ্টিও এখন তাঁহাদের কার্য্য নহে। এখন যাঁহারা একাধারে উপাসক ও শিক্ষাব্রতধারী তাঁহাদের এ দুইটী বিষয়ের মধ্যে আর আগেকার ন্যায় যোগ নাই। বর্ত্তমান যুগের সাহিত্য প্রচার ও আলোচনার যে নূতন কেন্দ্র আমরা সৃষ্টি করিয়াছি সেগুলি হইতেছে—পরিষৎ, সম্মিলন ও পাঠাগার। প্রচার কার্য্যে ইহাদের মধ্যে সম্মিলনই অগ্রণী। কেন না ইহা প্রতি বৎসরই বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়া লোকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতেছে। কিন্তু একটু ভাবিলেই দেখি এত বড় একটা বিশাল দেশ—যাহার লোক

সংখ্যা প্রায় সাড়ে আট কোটী এবং শতকরা ৮ জন মাত্র শিক্ষিত; সে দেশে বৎসরান্তে এমন দুই একটা সম্মিলন বা দুই দশটা পুস্তকাগার-পরিষদে বাস্তব পক্ষে কতটুকু কাজ হওয়া সম্ভব। আর সম্মিলনে ত কয়েকজন লোকে কয়েকটা সন্দর্ভ পড়েন মাত্র। সে সন্দর্ভও সাধারণ লোকের অবোধ্য। স্থতরাং তাহাতেই বা প্রচার কার্য্য কতটুকু অগ্রসর হইতেছে? আবার আজকাল সম্মিলন ত বিশেষজ্ঞের সম্মিলন স্থান হইতে চলিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে আজকাল দেশীয় ভাষা শিক্ষার বন্দোবস্ত হইয়াছে। কলেজগুলি এখন এক একটা সাহিত্য কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এখানে নব সাহিত্য সতেজে বাড়িয়া উঠিতেছে। এটা কিন্তু এখনকার মত একটা ভুল ধারণা। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলে মেয়েরা যে বাঙ্গালা শিখে তাহাতে তাদের লিখিবার ক্ষমতা জন্মে না। সংবাদ পত্রাদিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ছাত্র ছাত্রীগণের প্রবন্ধ দেখিয়া আমরা একটু আশান্বিত হই, অনুসন্ধানে জানা যায় তাহার অধিকাংশই সহরের ছাত্রছাত্রীগণ কর্ত্তৃক লিখিত এবং লেখকদিগের প্রতিবেশ প্রভাব ঐ কার্য্যের অনুকূল। এ সব লেখায় জাতির ভাষা ফুটিয়া উঠিতেছে না—সে নিশ্চয়। সবুজ পত্র সম্পাদকের সহিত এই কারণেই আমার মতানৈক্য।

স্বদেশী আন্দোলনে একটা সত্যপথ দেখাইয়াছে যে তোমরা ঘরে ফের। পল্লীর দিকে একবার তাকাও। সেইখানেই তোমার যত কিছু বল নিহিত। আরো পল্লীসংস্কার কর তারপর জগতের কাছে তোমার দাবী করিও। এই হতভাগ্য পল্লীগুলি লইয়া সেই কারণেই আজ এত টান পড়িয়াছে যে কলমের খোঁচায় তাহাদের শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল। কিন্তু প্রকৃত লোক ত বাহির হইল না। সাহিত্যিকেরাও কেহ কেহ আজ কাল একটা ধুয়া ধরিয়াছেন—"সাহিত্যে দরিদ্রের ক্রন্দন তোল, পল্লীসেবক সাজিয়া সাহিত্যসেবক, পল্লীগ্রামে প্রবেশ কর।" জিজ্ঞাসা করি, কে তাহা করিবে? আপনারা ত সহরবাসী, গ্রামে ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি রোগের বীজ ছাইয়া আছে। আপনারা সেখানে যাইয়া কাজ করিতে পারিবেন না তবে এ আদেশ পালন করিবে কে? যাহারা এতকাল পল্লীর সেবা করিতেছিল সেই কর্ম্মক্ষেত্রে এখনও তাহারাই কর্ম্মী। তাদের সহায় নাই, সম্পত্তি নাই, বল নাই, বুদ্ধি নাই, আছে কেবল দৈন্য আপ্লুত হাহাকার, আর মুমূর্ষুর বাঁচিবার আশার বদ্ধশ্বাস ত্যাগের শেষ চেষ্টা। তাই বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছে, ওসব Patriotic Philosophy বা দেশ প্রীতিতত্ত্বে শুধু কাজ হইবে না অথবা তাহাতে সাহিত্যের আভিজাত্য ঘুচিয়া যাইবে না। সাহিত্য লোক-শিক্ষক সাজিয়া সমাজের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিলেও কোন ফল ফলিবে না। যে প্রণালীতে চলিলে সাহিত্য সমাজ-জীবনের অন্তর্গত হইয়া পড়িবে তাহা পল্লীবাসীর মুখে শুনিয়া তদনুযায়ী ব্যবস্থা করা উচিত। এইটী মনে করিয়া আজ আমি আপনাদের সকাশে সাহিত্য সম্বন্ধীয় একটা প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতেছি। আপনারাই ভাবিয়া দেখিবেন এটা কতদূর কার্য্যকরী।

আমি পূর্ব্বেই একবার বলিয়াছি সাহিত্য-ক্ষেত্রে হয়ত আমাদিগকে আর একবার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করিবার সময় আসিয়াছে। আমার মনে হয় দেশের শিক্ষালয় গুলিকে শুধু

অর্থাগমের যন্ত্র স্বরূপ ব্যবহার না করিয়া আমরা প্রকৃত জ্ঞান সাধনা বা সাহিত্য আলোচনার কেন্দ্ররূপেও গ্রহণ করিতে পারি এবং সেটী এক মাত্র সম্ভব এদিকে বিদ্যালয় সমূহের কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ দ্বারা। বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা যদি সাহিত্য সম্মিলন ও আন্দোলন ব্যাপারে যোগদান করেন তবে তাঁহাদের মধ্য দিয়া সমগ্র দেশের চিত্র আমরা লাভ করিতে পারি। তাঁহারা যে সাহিত্য সৃষ্টি করিবেন তাহাই প্রকৃত জাতীয় সাহিত্য হইবে। কারণ তাঁহারা যত বেশী সময়-পল্লীর সুখ দুঃখের সহিত, দরিদ্রের আশা ভরসার সহিত, গ্রাম্য কুসীদজীবীর ব্যবহারের সহিত পরিচিত, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আর কেহই তত নহেন। তাঁহারাই বঙ্গের ভাবী-যুগপ্রবর্ত্তকের শিক্ষাগুরু সুতরাং তাঁহারাই ত আমাদের ভবিষ্যতের নিয়ন্তা। দেশে যে সুবাতাসের একটা আভাস আমরা পাইতেছি তাহাতে আমি অনুভব করিতেছি বঙ্গীয় শিক্ষকমণ্ডলী আমাদের সমাজ দেহে পুনর্জ্জীবন দান করিবেন। দেখিব তাঁহারাই সেই অতীত যুগের সর্ব্বত্যাগী শিক্ষাব্রতধারী লোক শিক্ষক-রূপে আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পথ দেখাইয়া দিতেছেন। তাঁহারাই আবার লোক শিক্ষকরূপে নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছেন। তাঁহাদের সংস্পর্শে যে সব নবীন জীবন গড়িয়া উঠিবে তাহাতেই বঙ্গের প্রকৃত বাণী ফুটিয়া উঠিবে। তখন আমাদের আজিকার সাহিত্যও জাতীয় সাহিত্যে পরিণত হইবে। সে দিনের জন্য অপেক্ষা করা দরকার কিন্তু যাহাতে সে দিকে অগ্রসর হইতে পারি তাহার ব্যবস্থাও দরকার।

এখন ভাবিবার বিষয়, বিদ্যালয়গুলিতে সাহিত্য সাধনার কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত করিয়া কোন্ ীতে কার্য্য আরম্ভ করিলে আমরা অধিক ফল পাইব। আমার প্রস্তাব, শিক্ষক-মণ্ডলী ও ছাত্রমণ্ডলীকে লইয়া প্রত্যেক পল্লী বিদ্যালয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অধীনে এক একটা পল্লী পরিষদ গঠন করা হোক। এই পল্লীসমিতিগুলি স্থানীয় ঐতিহাসিক বিবরণ, সামাজিক সমস্যা, আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করুন এবং তাহার ফলাফল সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশ করুন। তাহাতে শীঘ্রই আমরা দেখিতে পাইব এমন অনেক নূতন সত্য তথ্য পল্লীর ভাষাতে ফুটিয়া উঠিতেছে যাহা কবি, দার্শনিক সমাজ-সংস্কারক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক সকলেরই আদরের সামগ্রী, সকলেরই আলোচনার বিষয়। আর এক-দিকে পল্লীর এই শিক্ষা বাহকেরাই নব্যভাব ও নব্য-সাহিত্য প্রচারে যত সহায়তা করিতে পারেন অন্য কাহারও পক্ষে তত সম্ভবপর নহে। তাঁহারাই পল্লী কবির গানে নূতন সুর ধরাইবেন; পল্লীর রাখাল তাঁহাদেরই কাছে 'স্কুল মাষ্টারের ন্যায়' রবি বাবুর 'ফাল্গুনী' নাটকের বাউল সাজিতেও শিখিবে; পল্লীর গায়ক হরি সংকীর্ত্তনের ন্যায় দেশ-কীর্ত্তন গাইতেও জানিবে। তখন আর আধুনিক সাহিত্য আভিজাত্য গৌরবে দূরে সরিয়া যাইবে না, পক্ষান্তরে উহার 'উচ্চ ভাব' সমূহ পল্লীকৃষকেরও আয়ত্ত হইবে। সাহিত্যে বাস্তব লইয়া তখন আর বেশী গোলযোগের কারণ থাকিবে না। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদও সে দিন ধন্য হইবে যে দিন তাহার ভাণ্ডার প্রতি পল্লীতে পল্লীতে বিরাজ করিয়া প্রত্যেক বঙ্গবাসীর ধমনীতে ধমনীতে জীবনরস সঞ্চালিত করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু সেদিন আর কতদূর!

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

জীবাভিব্যক্তিবাদ

"বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥" কঠোপনিষৎ।

আজ কাল বিজ্ঞানবিদ্‌গণের কৃপায় নানা প্রকার অশ্রুতপূর্ব্ব তত্ত্বের উদ্‌ঘাটন হইতেছে, তাঁহারা অভিব্যক্তিকে সার্ব্বভৌম নিয়ম—সর্ব্বার্থ সাধিকা—বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সুতরাং জীবের আবির্ভাব সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা সিদ্ধান্ত করিবেন তাহার প্রতিবাদ বিড়ম্বনা মাত্র। তথাপি সকলের বুদ্ধিবৃত্তি সমানভাবে পরিবর্দ্ধিত না হওয়ায় কেহ কেহ এবিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্ত নহেন। গ্রন্থকার সেই শ্রেণীর অন্তর্গত, তাই জীবাভিব্যক্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক হইতেছে।

বর্ত্তমান জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ ধরিয়া লইয়াছেন অভিব্যক্তি যখন সর্ব্ববস্তু উৎপত্তির নিয়ম, তখন জীবের উৎপত্তিও ঐ নিয়মের অন্তর্গত। সুতরাং কোন এক অপরিজ্ঞেয়—অলক্ষণ, কিম্ভূতকিমাকার বীজ হইতে, ভিন্ন ভিন্ন পরিবেষ্টনীর প্রভাবে—কি উদ্ভিদ, কি জঙ্গম সর্ব্বপ্রকার প্রাণীই ক্রমশঃ স্ব স্ব আকৃতি প্রাপ্ত হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মূর্ত্তিতে ব্যাকৃত হইয়াছে। ঐ মূল বীজ আমাদের দৃষ্টির অগোচর—অনির্দ্দেশ্য। ইহাতে কোন বিশেষ ধর্ম্ম নাই। কিন্তু ইহা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার মধ্যে পড়িয়া ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি প্রাপ্ত হয়। জগতে স্থাবর ও জঙ্গম সর্ব্বপ্রকার জীবের মূল কারণ ঐ বীজ। উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া এই যে বীজের ক্রমবিকাশ, ইহা কোন জ্ঞানশক্তি পরিচালিত নহে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন প্রভৃতি এই জীববৈচিত্র্যের ও জীবন সমরে জয়ী হইবার বিশেষ সহায়ক। এই ক্রমবিকাশের মূলে কোন জ্ঞানশক্তি বা কোন উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত নাই। ঐ বিকাশ উদ্দেশ্যশূন্য—লক্ষ্যশূন্য নিয়ন্তাশূন্য—ইহাই ইহাঁদের স্ফুট সিদ্ধান্ত। প্রাণীতাত্ত্বিকগণ বলেন পৃথিবীর শৈশব অবস্থায় এই প্রকারেই জীব সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু অধুনা প্রকৃতিদেবী আর এক বীজ হইতে বিভিন্ন প্রাণীর সৃষ্টি করেন না। অধুনা তাঁহার রীতি নীতি একটু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাই ঐ প্রকারে জীবাভিব্যক্তির দৃষ্টান্ত আজ কাল দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। যাহা হউক, সময়ের আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যখন অনেক নিয়মের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তখন উক্ত নিয়মের বিপর্য্যয় ঘটিবে, ইহাতে বিচিত্রতা কি? পক্ষপাত শূন্য হইয়া একবার কল্পনার কনকপক্ষে আরোহণপূর্ব্বক অদূর অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, আমাদের এ সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীভূত হইবে, আমাদের অনুমান সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

মহামতি স্পেনসার বলেন—"The investigations of Wolff, Goethe, and von Baer, have established the truth that the series of changes gone through during the development of a seed into a tree, or an ovum into an animal, constitute an

advance from homogeneity of structure to heterogeneity of structure. In its primary stage, every germ consists of a substance that is uniform throughout, both in texture and chemical composition. The first step is the appearance of a difference between two parts of this substance ; or, as the phenomenon is called in physiological language, a differentiation. . . . . This process is continuously repeated—is simultaneously going on in all parts of the growing embryo ; and by endless such differentiations there is finally produced that complex combination of tissues and organs constituting the adult animal or plant. This is the history of all organisms whatever." (Spencer's Essays—A selections—R. P. A. series.

বাস্তবিক আমরা প্রতিনিয়ত দেখিতে পাই একটি বীজ,অবস্থার প্রভাবে,কিছু দিনের মধ্যেই একটি অঙ্কুরে, পরে মহান অটবীতে পরিণত হইতেছে। এই পূর্ণমূর্ত্তি অটবী ও ইহার মূল বীজে বৈলক্ষণ্য এত বেশী, যে কোন প্রকার সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া দুঃসাধ্য। কি আয়তনে, কি গঠনে, কি বর্ণে,কি আকারে কি রাসায়নিক উপাদানে উভয়ের মধ্যে কোন সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না। কিন্তু তথাপি কতিপয় বৎসরের মধ্যেই বীজটি ঐ বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তন এত আস্তে আস্তে—এত সূক্ষ্মভাবে সম্পাদিত হইয়াছে যে, কোন মুহূর্ত্তে এ কথা বলিতে কাহারও সাধ্য হয় নাই—"এইখানে বীজের শেষ, এইখানে বৃক্ষের আবির্ভাব।" উর্দ্ধতন প্রাণী সম্বন্ধেও এইরূপ। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভ্রোণ পরিবর্ত্তনকে অনুবীক্ষণ সহযোগে নিরীক্ষণ করিয়াও পরিবর্ত্তনের সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম ক্রমপরম্পরাকে ধরিতে পারে কাহার সাধ্য? ধীরে ধীরে যখন ঐ পরিবর্ত্তন মূলমূর্ত্তিতে আগমন করে, তখনই আমার একটা বিভিন্ন বিশিষ্ট পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারি। যাহা হউক প্রাণী নিচয় যে মূলীভূত বীজ হইতে ক্রমে ক্রমে ব্যক্তাবয়ব হয় পূর্ণমূর্ত্তিতে আগমন করে, তাহা প্রত্যক্ষ-লব্ধ-সত্য, অস্বীকার করিবার যো নাই। বৃক্ষ ও ভ্রূণের ক্রমবিকাশ কে অস্বীকার করে? পরন্তু একই প্রকার অলক্ষণ (Homogeneous) বীজ হইতে সমস্ত উদ্ভিদ ও জঙ্গম প্রাণীর অভিব্যক্তিসম্ভাবনীয় কি না তাহাই আমাদের আলোচ্য। আমরা বিবেচনা করি অভিব্যক্তিবাদিরা যদি সকল দ্রব্য হইতে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয় এই প্রকার কল্পনা করেন তাহা হইলে তাঁহাদের কল্পনা সমীচীন নহে। তাহা হইলে ইহাঁরা এক হস্তে আমাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছেন অপর হস্তে পুনর্ব্বার তাহা ছিনাইয়া লয়েন এবং এ প্রকার হইলে,—কি প্রকৃতির রাজ্যে, কি মনের রাজ্যে আমাদের গবেষণার সমস্ত বৈজ্ঞানিকতা বিধ্বস্ত হইয়া যায়।

সাংখ্যকার বলিয়াছেন সর্ব্বদা সর্ব্ব বস্তু হইতে সর্ব্ব বস্তুর উদ্ভব হয় না। আমরা সাংখ্যের এ মতে কোনপ্রকার ভ্রান্তি দেখিতে পাই না। সকল বস্তু হইতে সকল বস্তুর উৎপত্তি দৃষ্টান্তবাধিত। মৃত্তিকা হইতে ঘটের আবির্ভাব হয়, সিকতা বা বারি হইতে হয় না; ভিন্ন বীজেই ভিন্ন জাতীয় তৃণ

আবির্ভূত হয়, বটবৃক্ষ আবির্ভূত হয় না। বট বীজ হইতে এরণ্ড ক্রম জন্মে না। ইত্যাদি স্থলে আমরা দেখিতে পাই এক উপাদানে বিভিন্ন জাতীয় বস্তুর উৎপত্তি হয় না। তেমনি মনুষ্যের বীজ বৃক্ষোৎপত্তির কিম্বা মানুষের প্রাণীর উৎপত্তি কদাচ পরিদৃষ্ট হয় না। সুতরাং একই প্রকার বীজ হইতে বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর অভিব্যক্তি হইয়াছে এ মত কি প্রকারে গ্রহণীয় হইতে পারে ?

অবশ্য প্রচুর ক্ষমতাপন্ন অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর উপাদানীভূত বীজে কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য ধরা যায় না। একটি হংসডিম্বের মধ্যে যে দ্রব্য পরিলক্ষিত হয়, একটি কুক্কুট অণ্ডের অভ্যন্তরেও সেই দ্রব্য দৃষ্ট হয়। মনুষ্য বীজেও বোধ হয় সেই এক দ্রব্য দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ দ্রব্যকে রাসায়নিক দৃষ্টিতে দেখিলেও কোনপ্রকার বৈচিত্র্য অনুভূত হয় না। কিন্তু তাই বলিয়াই কি ঐ তিন দ্রব্য বস্তুতঃ একই জিনিষ? একটি অশ্বত্থ বীজ ও একটি বট বীজ হস্তের উপর রাখিয়া কোনটি কি জাতীয় বীজ তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় না বটে; কিন্তু তাই বলিয়াই কি উভয় একই দ্রব্য ? উভয়ের বিভিন্নতা অবগতির কি ইহা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই ? এমন কি হইতে পারে না যে ঐ বিশিষ্টতা ঐ বৈচিত্র্য এতই সূক্ষ্ম যে তাহা চর্ম্মচক্ষুর কিম্বা যন্ত্র শক্তির অগম্য ? অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে ঐ সকল পদার্থের বীজগত শক্তি ভিন্ন ভিন্ন, উপাদান বিষয়ে উহারা যতই কেন অভিন্ন বা একাকার বলিয়া প্রতিভাত হউক। শক্তির পার্থক্য ফলের পার্থক্য হইতে অনুমেয়। কার্য্য-দর্শনেই শক্তির অনুমান। কার্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া শক্তি দুর্নির্ণেয়। যদি একথা স্বীকার্য্য হয়, তবে ফলগত বৈলক্ষণ্য দর্শনে উপাদান শক্তির বৈলক্ষণ্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। তাই যখন দেখিতে পাই হংসডিম্বে কোন হংস, মনুষ্য বীজে কেবল মনুষ্য, পশুর বীজে কেবল পশু উৎপন্ন হয় তখন তত্তৎ বীজ শক্তি যে পৃথক পৃথক তাহা আমরা অনুমান করিয়া থাকি। এবং ঈদৃশ অনুমান সর্ব্বথা যুক্তি সিদ্ধ।

স্পেনসার স্বয়ং একথা স্থানান্তরে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সেখানে তিনি বলিতেছেন—

"We are still in the dark respecting those mysterious properties in virtue of which the germ, when subject to fit influences, undergoes the special changes that begin the series of transformations. All we aim to show is, that given a germ possessing those particular proclivities distinguishing the species to which it belongs, and the evolution of an organism from it, probably depends on that multiplication of effects which we have seen to be the cause of progress in general, so far as we have yet traced it." (Essays. pp. 27 25).

স্পেনসার উক্ত বাক্যে যাহাকে প্রচ্ছন্ন গুণ বা প্রবৃত্তি বলিয়াছেন তাহা জীব অভিব্যক্তি ব্যাপারে নিতান্ত নগণ্য সামগ্রী নহে। আমার বোধ হয়, জীবগত পার্থক্য ব্যাখ্যাতই হইতে পারে না যদি না উহা ধরিয়া লওয়া যায়। সুতরাং কোন বীজ কোন পূর্ণমূর্ত্তিতে পরিণত হইবে, অভি-

ব্যক্তির প্রথম হইতেই তত্তৎ বীজে তাহার নিয়ামিকা শক্তি নিহিত হইয়াছে। পূর্ব্ব হইতেই অবধারিত আছে অমুক বীজ অমুক মূর্ত্তি পর্য্যন্ত অগ্রসর বা অভিব্যক্ত হইবে, তাহার বাহিরে যাইবে না। প্রত্যেক উদ্ভিদ্ ও জঙ্গম প্রাণীর মৌলিক বীজ যে ভিন্ন ভিন্ন এবং নির্দ্দিষ্ট অবস্থা হইতে ক্রমবিকাশ লাভ করে, স্পেনসারের বাক্যে তাহারও সঙ্কেত রহিয়াছে।

তাই ভট্ট মোক্ষমূলার বলিয়াছেন—"From this admission of different beginnings it follows that each living cell can only become what, according to different philosophical points of view, it was fit or meant or willing to become, and that after it has fulfilled this purpose it remains fixed and does not go beyond. . . . . It follows from this that no living being and no class of living beings should be derived from any other, if they possess a single property which thus supposed ancestor does not possess either actually or potentially." (Science of thought p. 94).

পুনশ্চ—"If two things, be they roots or cells or any thing else, which appear to be alike, become different by evolution, their difference need not always be due to outward circumstances (commonly called environment), but may be due to latent dispositions which in their undeveloped form, and beyond the powers of human perception. . . . . if two germs, though apparently alike, grow under all circumstances, the one always into an ape and never beyond, the always into a man and never below, then the two germs, though undistinguishable at first, and though following for a time the same line of embryonic development, are different from the beginning, whatever their beginning may have been." (p. 187).

কিন্তু পূর্ণ বিকাশিত অবস্থায় প্রাণীদিগের সম্পূর্ণ পার্থক্য থাকিলেও, তাহাদের অবস্থা পরম্পরার বিশ্লেষণ করিতে করিতে যদি ভ্রূণ অবস্থায় ব্যবহারতঃ কোন বৈচিত্র্য লক্ষিত না হয়, তাহা হইলেই বীজের অন্তরালস্থ অদৃশ্য বৈলক্ষণ্যগুলিকে অস্পষ্ট বাকপ্রপঞ্চের মধ্যে চাপা দেওয়াই আজ কালকার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রীতি। ঐ বৈলক্ষণ্যগুলি যখন কার্য্যতঃ অদৃশ্য ও অপরীক্ষণীয় তখন ঐ গুলিকে বৈজ্ঞানিকগণ অপলাপ করিতে প্রবৃত্ত। কিন্তু যদি দেখিতে পাইতাম তাঁহাদের এ প্রবৃত্তি সর্ব্বত্র প্রসারিত তাহা হইলে তাঁহারা কতকটা প্রশংসা ভাজন হইতে পারিতেন। তাঁহাদের গবেষণার অন্যান্য স্থলে অদৃশ্য ও প্রচ্ছন্ন শক্তি সগর্ব্ব স্বীকৃত হইয়াছে। শক্তিতত্ত্বের অবিনশ্বরতা প্রতিপাদনপরায়ণ বৈজ্ঞানিকবৃন্দ কেবল উদ্ভূত শক্তির গণ্ডী মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলে, ঐ শক্তির অবিনশ্বরতা প্রতিপাদন করা দুর্ঘট হইত। তাই তাঁহারা শক্তির

অনুদ্ভূত প্রচ্ছন্ন একটা অবস্থা কল্পনা করিয়া থাকেন। এবং মনে করেন যখন শক্তিকে অবিনাশী বলা হয়, তখন এই উভয় শক্তির সমষ্টিই অবিনাশী; বিষয়ব্যাখ্যানুরোধে যেমন তাঁহারা প্রচ্ছন্ন শক্তির সত্ত্বা স্বীকার করিতে বাধ্য; বিষয় ব্যাখ্যানুরোধে তেমনি তাঁহারা ভ্রৌণ অবস্থার অন্তরালস্থ প্রচ্ছন্ন বৈলক্ষণ্য স্বীকার করিতে বাধ্য। উহা অস্বীকার করিলে জীববৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ থাকে। ডিউক অব আরগাইন বলিয়াছেন—

"If, for example, in the albumen of an egg there be no discernible differences either of structure or of chemical composition, but if, never-the less, by the mere application of a little heat, part of it is differentiated into blood, another part of it into flesh, another part of it into bones, another part of it into feathers, and the whole into one perfect organic structure, it is clear that any purely chemical definition of this albumen or any purely mechanical definitions of it, would not merely fail of being complete, but would absolutely pass by and pass over the one essential characteristic of vitality which makes it what it is, and determines what it is to be in the system of Nature." (Unity of Nature).

এক্ষণে যে প্রণালীতে একটী হংস ডিম্ব পূর্ণ হংসে বিকাশিত হয়, ঠিক সেই প্রণালীতেই একটী কুক্কুট ডিম্ব পূর্ণ কুক্কুটে অভিব্যক্ত হয়—ইহা বুঝা যাইতেছে। বাহ্য প্রণালী উভয়ত্রই একবিধ; কিন্তু যাহা এই বিশিষ্টতার নিয়ামক তাহা অবশ্যই মূলে সন্নিবিষ্ট না থাকিলে এই ফলবৈশিষ্ট কোথা হইতে আসিবে?

যাহাকে অভিব্যক্তি (evolution) বলা হইতেছে তাহা একটি বিস্তৃত প্রক্রিয়া মাত্র (a mere process)। প্রক্রিয়া কি কখনও লক্ষ্যবর্জ্জিত? তাহা নহে এই লক্ষ্য প্রাপ্তির যাহা প্রণালী তাহাই অভিব্যক্তি। সুতরাং অভিব্যক্তি স্বতঃ বস্তুবৈশিষ্টতার নিয়ামক নহে, পরন্তু অভিব্যঞ্জক। প্রত্যেক প্রক্রিয়ারই আরম্ভ ও উপসংহার আছে। এবং বস্তুর পূর্ণ মূর্ত্তি প্রকাশ করাই উহার উপসংহার। যে পর্য্যন্ত এই মূর্ত্তি বিকাশিত না হয়, সে পর্য্যন্তই প্রক্রিয়া চলিতে থাকে। দৃষ্টির দিক হইতে দেখিতে গেলে অবশ্য এই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অভিব্যক্তির ফল বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু বুদ্ধির দিক হইতে দেখিতে গেলে উহা যে প্রাক্‌সিদ্ধ তাহা বুঝিতে গোল হয় না। ঐ লক্ষ্য ভাবরূপী এবং উহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টাই ঐ প্রক্রিয়া।

দার্শনিক ইতিহাস প্রণেতা লিউয়েন কিন্তু এ মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। অভিব্যক্তির মূলদেশে যে একটা লক্ষ্য আছে—একটা উদ্দেশ্য আছে, তিনি তাহা স্বীকার করিতে ইচ্ছুক নহেন। তিনি বলেন জীবদেহ কোন উদ্দেশ্যের অনুবর্ত্তী হইয়া সৃষ্ট হয় না; পরন্তু উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিন্যাস দেখিয়াই আমরা একটা উদ্দেশ্যের আরোপ করিয়া থাকি। উদ্দেশ্য গোড়া হইতে উহার উপাদানিভূত বীজকে পরিচালিত করে না, কিন্তু অবয়ব-

গুলির সামঞ্জস্যেই একটা উদ্দেশ্য উদ্ভূত হয় (the parts with their adjustments evolve a plan)। নিম্নে তাঁহার বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি।

"Let us first see what experience tells us of the development of an organism. The ovum and the seed are starting-points from which an animal and a plant may, *under requisite conditions*, be developed. This is the expression of our experience. . . . . By a regressive movement of Thought. We carry the developed organism back again to its starting-point (*minus* the conditions of development, therefore), and form a concept of the ovum and seed as *potentially* containing the animal and the plant. * * * * Assuredly not that the lineaments of the animal are actually present in the ovum they do not exist. When you say that they exist *potentially*, what is the translation of your phrase ? It is, that under a given history—under a successive series of particular conditions a special result will ensue. If we know the conditions and their succession we may foretell the result. The law of causation determines it. Any variation in any one of the conditions will be followed by a corresponding variation in the result. * * * In mathematical phrase, the Plan is the function of Development and Developing conditions, and is variable with every variation of either." Science and Speculation).

লিউয়েন সাহেবের যুক্তিহীন বাক্যে আমরা সায় দিতে পারিতেছি না। অবস্থা বিশেষের ক্রমপরম্পরার অধীনে জীবের অভিব্যক্তি ঘটে বটে, কিন্তু তাহা সর্ব্বজীবেই সাধারণ। যাহা সর্ব্বজীবে সাধারণ, তাহা জীবের বিশিষ্টতার নিয়ামক হইতে পারে না। যে অবস্থা-পরম্পরার অধীনে রাখিলে হংস ডিম্ব হইতে হংস শাবক আবির্ভূত হয়, সেই অবস্থা পরম্পরার অধীনে একটি কুক্কুট ডিম্ব হইতেও কি হংস শাবকের আবির্ভাব হইবে? তাহা কখনও হইবে না। পক্ষান্তরে তাঁহার মতে উভয় ডিম্বের মধ্যে কোন প্রকার উপাদানগত বৈচিত্র্য বা বিশেষ শক্তিও নাই। সুতরাং কেন যে কুক্কুট অণ্ড হইতে ঐ অবস্থা পরম্পরার অধীনে হংস শাবক আবির্ভূত হইবে না, তাহারও কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। স্বীকার করি অবস্থা বিপর্য্যয়ে ভাবী জীবের অঙ্গাদির বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে; কিন্তু তাহাতে কি প্রমাণিত হয়? তাহাতে ভাবী জীবের জাত্যন্তর ঘটিবার সম্ভাবনা প্রমাণিত হয় না; তাহাতে এইটুকু মাত্র সপ্রমাণ হয় যে ঐ ভাবী জীব পূর্ণাঙ্গ না হইয়া বিকলাঙ্গ—বা অসম্পূর্ণাঙ্গ জীবরূপে আবির্ভূত হইবে। হংস ডিম্ব হইতে অবস্থার বিপর্য্যয়ে হংস জাতীয়ই একটি বিকৃত জীব অর্থাৎ একটি বিকৃত হংস আগমন করিবে। পরন্তু হংস ডিম্ব হইতে একটি ভিন্ন জাতীয় জীব আবির্ভূত হইবে এ কথা সত্য বলিয়া

স্বীকার করা যায় না। ভাবী জীবের বিশিষ্টতার নিয়ামক কেবল তদ্বীজের বিশিষ্টতা। অভিব্যক্তির কারণ কলাপ জানিতে পারিলে অবশ্য আমরা পূর্ব্বে হইতেই বলিতে পারি জীব অভিব্যক্ত হইবে কি না। কিন্তু কোন জাতীয় জীব অভিব্যক্ত হইবে, তাহা আমরা কদাচ অনুমান করিতে পারি না, যদি বীজের জাতিগত বৈশিষ্ট সম্বন্ধ আমাদের পূর্ব্বে কোন জ্ঞান না থাকে। অতএব ভাবী বা উৎপাদ্য জীব বা উদ্ভিদ যে অভিব্যক্তির পূর্ব্বে শক্তিরূপে তত্তৎ বীজে অবস্থিত, তাহা অনিচ্ছা সত্বেও আমাদের স্বীকার করিতে হয়। ঐ শক্তি প্রাণরূপী শক্তি—কেবল বাহ্য কারণ কলাপ সহায়ে আত্মপ্রকটন করে মাত্র। তাই একজন দার্শনিক বলিয়াছেন,—

"An acorn cotains potentially a whole sak forest All that is required is the stimulating influence of soil, water, light, air, and heat, *to act* upon it, and then the acorn must perforce grow into an oak. The tendency which is inherent in the seed is a part of its being—indeed, essential to it—therefore the acorn cannot become anything else. It may, owing to its environment, become a crippled, dwarf tree, and as whither away, or it may become an oak forest extending for miles; never, however, under any possible circumstances, could it become a potato-filed or a flock of sheep." (Monism by S. P. H. Mercus M.D.). তাই হয় ত পণ্ডিত হক্সলী বলিয়াছেন—"A whole does not lend to vary in the direction of producing feathers, nor a bird in the direction of producing a whole-bone."

আরও একটি বিষয় দ্রষ্টব্য। নির্দ্দিষ্ট অবস্থাধীনে জীবকোষের যে ক্রমিক বিবর্ত্তন সংসাধিত হয়, তাহা সর্ব্বত্রই এক প্রকার ক্রমশঃ একটি পরিবর্ত্তনের পরে আর একটি পরিবর্ত্তন, তৎপরে অন্যটি ইত্যাদি—যে পর্য্যন্ত না জীবের পূর্ণ অভিব্যক্তি সম্পন্ন হয়। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন পরম্পরা কোন স্থলে দ্রুত সম্পাদিত কোন স্থলে অপেক্ষাকৃত ধীরে সংসাধিত। অনুধাবন পূর্ব্বক দেখিলে প্রতীয়মান হইবে, তাহারও একটা নিগূঢ় অর্থ রহিয়াছে। উৎপাদ্য জীব যে প্রকার জীবন যাপন করিবে, তাহার সাধনানুকূল যে সকল অঙ্গের আরও প্রয়োজন, সেইগুলিই দ্রুত বিকাশিত হয়, কিন্তু যে অঙ্গগুলি বিলম্বে ব্যবহৃত হইবে তাহারা অপেক্ষাকৃত ধীরে অভিব্যক্ত হইতে থাকে। সুতরাং ভাবী জীবের প্রয়োজন অনুসারেই এই অভিব্যক্তি প্রক্রিয়া কোথায়ও বা ঝটিতে, কোথায়ও বা অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে সম্পাদিত। ডিউক অব আরগাইন বলেন—

"Sir J. Lubbock tells us that whilst these transformations as a whole are in a sense the same in all cases, they differ widely in the rapidity with which different organs are developed in different Insects; and he adds that the condition of those organs at the time of birth or hatching of the egg,

depends mainly on the manner of life which the larva is intended to lead. Those organs are well developed which are requisite for immediate use in the larval state, whilst those other organs which are destined for a future stage are present only in rudiments or in germ. (Unity of Nature.)

অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি পণ্ডিত লিউয়েসের সগর্ব্ব বাক্যের কিছুমাত্র সারবত্তা নাই। ক্রমোন্নতির বিভিন্ন স্তরগুলিকে প্রদর্শন করিলেও, ক্রমোন্নতির ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ থাকে। যে অদৃশ্য শক্তির পরিচালনায় ঐ স্তরগুলি উত্তরোত্তর প্রকটিত হয়, তাহা যে পর্য্যন্ত প্রদর্শিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কোন পরিবর্ত্তনের স্তর বা ক্রমগুলি দেখাইয়া দিলেই অভিব্যক্তির রহস্য ভেদ হয় না। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ সে শক্তিকে ধরিতে না পারিয়া, তাহাকে চাপা দিতেই বদ্ধপরিকর। ইহা সাহসের পরিচয় নহে, বরং ভীরুতারই নিদর্শন। তাই একজন অজ্ঞাতনামা পণ্ডিত বলিয়াছেন—

—"As in the case of the oviparous species, scientists have ascertained by dissection all the stages through which the embryo passes till its exit from the womb complete and alive. But of the nature of the power which conducts it through all these stages they seem entirely ignorant ,and the Darwinian must acknowledge the inability of his theory to solve the mystery." পুনশ্চ—" It is true that biologists can tell us hour by hour all the progress made in the process of conversion of two structureless substances into a live chicken. But that throws no light on the question, what is the formative power which causes the whole process. One certain truth is that this cause is invisible, and if therefore the microscopist observers were enabled to see through the shell of the egg, and were to watch every thing that went on inside it from the moment when the egg was laid till the chicken came out of it, they would learn no more than what we know at present."

যাহাহউক অভিব্যক্তিবাদে কতকগুলি পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে; তাহাদের অর্থের প্রতি দৃষ্টি করিলে তাহাদের অসম্পূর্ণতা পরিস্ফুট হইতে পারে। প্রথমতঃ Homogeneityর প্রতি লক্ষ্য করা যাউক। Homogeneous কাহাকে বলে? Fiske বলেন:—"An object is said to be *homogeneous* when each of its parts is like every other part. An illustrations is not easy to find, since perfect homogeneity is not known to exist. But there is such a thing as relative homogeneity ; and we say that a piece of gold is homogeneous as compared with a piece of wood ; or that a wooden ball is homogeneous as compared with an orange."

এক্ষণে কথা হইতেছে জীবাভিব্যক্তির মূলীভূত বীজ সম্পূর্ণ নির্ব্বিশেষ কি না তাহা জানা যায় না। যদি সম্পূর্ণ নির্ব্বিশেষ নামে কোন বস্তু সংসারে না থাকে, তবে অবশ্যই ঐ বীজ সম্পূর্ণ নির্ব্বিশেষ বস্তু নহে। তাহা হইলে উহা আপেক্ষিক নির্ব্বিশেষ সন্দেহ নাই। তাহার অর্থ, ঐ বীজের অংশ বিশেষের কোন বিশিষ্টতা নাই; এবং অপরাপর বীজের তুলনায়ও উহার কোন বিশিষ্টতা নাই ("Each part of the germ-cell is as nearly as possible like every other part, in molecular texture, in atomic composition, in temperature, and in specific gravity......... In the first place all animal germs are homogeneous with respect to each other; ....in the second place, each germ is homogeneous with regard to itself.")

দ্বিতীয় শব্দটি heterogeneity। ইহার অর্থ কি? Fiske বলেন—"An object is said to be heterogeneous when its parts do not resemble one another." আমাদের ভাষায় ইহার তাৎপর্য্য—বৈচিত্র্য।

তৃতীয় শব্দটি Differentiation। ইহার অর্থ কি? Fiske বলেন—"Differentiation is the arising of an unlikeness between any two of the units which go to make up an aggregate. It is the process through which objects increase in heterogeneity."

এ শব্দগুলি ছাড়া আরও কতিপয় পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়—যথা Influence of environment (পারিপার্শ্বিক প্রভাব), Natural Selection (প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন), Sarvival of the fittest (যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন)। Accidental variation (আকস্মিক ব্যতিক্রম), Heredity বংশানুক্রম), ইত্যাদি।

অন্যান্য শব্দগুলির বিষয়ে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে এই তিনটি শব্দের তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করা যাউক।

প্রথমতঃ, জীবসমূহের বীজগুলির আভ্যন্তরীণ প্রভেদ নাই অর্থাৎ স্বগত ভেদ নাই এবং স্বজাতীয় ভেদ নাই ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। যে বস্তুতে স্বগত ও স্বজাতীয় ভেদ অস্বীকার করা হইল, পরক্ষণে তাহাতে বৈচিত্র্যের উৎপত্তি হইল—যাহা পূর্ব্বে নির্ব্বিশেষ ছিল তাহা বিচিত্র হইল। কি প্রক্রিয়াতে ইহা সম্পন্ন হইল? Differentiation দ্বারা। অর্থাৎ অবিশেষ বস্তু বৈচিত্র্যাগম দ্বারা বিচিত্র, বিশিষ্ট হইয়া উঠিল। দেখা গেল যে বস্তু পূর্ব্বে একাকার—অবিশেষ ছিল, এক্ষণে তাহার অভ্যন্তরে বৈলক্ষণ্যের উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু কেন হইল—কোন শক্তির পরিচালনায় হইল তাহার কিছু আভাস পাওয়া যাইতেছে কি? পরিবর্ত্তন পরম্পরা ত দেখিতেছি—কোন শক্তি কর্ত্তৃক উহা নিয়মিত তাহা দেখিতেছি কি? Differentiation একটা পরিবর্ত্তন—একটা কার্য্য—সুতরাং তাহার নিজেরই ব্যাখ্যা (account for) করা চাই; তাহাকে কারণ বলিয়া ধরা যাইবে না।

তার পর অন্যান্য শব্দগুলির তাৎপর্য্য আলোচনা করা যাউক।

Natural Selection (প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন), নির্ব্বাচন শব্দের অর্থ 'বাছিয়া লওয়া'। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন অর্থে তাহা হইলে প্রকৃ-

তির বাছিয়া লইবার ক্ষমতা মনে করিতে হইবে। কিন্তু বাছিয়া লওয়া ভাবটির মধ্যে যে সকল উপকরণ নিহিত আছে তাহাদের বিশ্লেষণ করিয়া দেখা উচিত। উহার প্রথম উপকরণ—প্রায় সমান উপযোগী—বহুবস্তুর উপস্থিতি। দ্বিতীয় উপকরণ—তুলনামূলক বিচারশক্তি। চতুর্থ উপকরণ—ইষ্টসিদ্ধি জ্ঞান। বোধ হয় চতুর্থ উপকরণটি সর্ব্ব প্রথম হওয়া উচিত ছিল। কেননা উহা দেহ রক্ষা বা আত্মসংরক্ষণের উপযোগিত্ব জ্ঞাপক। কোন বস্তু আত্মসংরক্ষণের অনুকূল সে বোধ পূর্ব্ব হইতে সিদ্ধ না থাকিলে মনোনয়ন কার্য্য চলিতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে বাছিয়া লওয়া ব্যাপারটি একটি জটিল আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া (subjective activity)। উহা কোনও মতে অচেতন নিষ্ট কৃতিত্ব (objective activity) নহে। সুতরাং প্রকৃতিতে আত্মভাব বা চৈতন্য আরোপ না করিয়া আমরা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন শব্দের কোন অর্থই লাভ করিতে পারি না। পক্ষান্তরে অচৈতন্য পদার্থের অর্থাৎ অচেতন প্রকৃতির নির্ব্বাচনতা যদি ঈদৃশ নির্ব্বাচন না হইয়া আমাদের জ্ঞানাতীত অন্যকোন প্রকার প্রক্রিয়াই হয়, তাহা হইলে তাহা আমাদের বুদ্ধিগম্য কি না, এবং ঐ প্রক্রিয়াকে নির্ব্বাচন আখ্যা প্রদান করা সঙ্গত কি না পাঠকবর্গ তাহার বিচার করিবেন।

Influence of Environment (পারিপার্শ্বিক প্রভাব)। এই কথা দুইটির অর্থ বৃত্তির (surroundings) প্রভাব। এই প্রভাবটি আত্মসংরক্ষণের অনুকূল অথবা প্রতিকূল তাহা বিবেচনা করা উচিত। ইহাকে অনুকূল বলিতে আমার ভয় হয়, কেননা আত্মশক্তির অভাবে শরীরের উপর উহার বিপরীত প্রভাবই দৃষ্ট হয়। কেহ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে অগ্নি আমাদের অনুকূল অথবা প্রতিকূল,—তাহার উত্তরে যেমন আমি বলিব—যতক্ষণ উহা আত্মপ্রযত্ন দ্বারা নিয়মিত—নিয়ন্ত্রিত, ততক্ষণই উহা আমাদের অনুকূল, যখনই আত্মপ্রযত্ন মন্দীভূত বা অসতর্ক তখনই ভয়াবহ—সর্ব্বনাশকর;—ইহার সম্বন্ধেও ঠিক সেই প্রকারই বলিব। জীবনান্তে দেহে যে বিক্রিয়ার লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহাই পারিপার্শ্বিক প্রভাবের স্বরূপতঃ আনুকূল্য জ্ঞাপক। জীব বাহ্যশক্তিসমূহকে প্রযত্নপূর্ব্বক আত্মসংরক্ষণের অনুকূল করিয়া তোলে এই মাত্র। সুতরাং ঐ প্রভাবের নিয়মে জীবের অভিব্যক্তি ঘটে কি প্রকারে বলা যায়? ঐ প্রভাব বশতঃ বীজবস্তুতে একটা বিকার সম্ভবপর হইতে পারে বটে, কিন্তু সে বিকার বৈচিত্র্য হইলেও অভিব্যক্তি আখ্যা লাভ করিতে পারে না।

Survival of the fittest (যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন)। যোগ্যতম যে সর্ব্বত্র জয়ী হইবে এ কথাটা ঠিক। যোগ্যতম না হইলে সমরে জয় লাভ অসম্ভব। অবশ্য শঠতা, প্রতারণা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি যোগ্যতার অঙ্গীভূত। কিন্তু কেমন করিয়া জীব যোগ্যতম হয় সেইটিই প্রশ্ন। যোগ্যতা বাহির হইতে অর্জ্জন করিতে হইলেও ভিতরকার একটা যোগ্যতা থাকা নিতান্তই আবশ্যক। কোন জীব যোগ্যতম কি না তাহা কি প্রকারে বুঝা যায়? তাহার স্বীয় কর্ম্মক্ষেত্রে জয় দেখিয়া। অর্থাৎ যোগ্যতম কে? না, যে জয়ী। আবার যদি জিজ্ঞাসা করি কে জয়ী হইবার পাত্র?—না, যে যোগ্যতম? সুতরাং যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন এই বাক্যটি যোগ্যতার হেতু

বিষয়ক কিছু আভাস প্রদান করে না। যোগ্যতা থাকিলে তাহার উদ্বর্ত্তন সম্ভবপর এই তাৎপর্য্যটুকু প্রকাশ করে মাত্র। কিন্তু এ কথাটার কিছু নূতনত্ব নাই। আমরা বলিতে চাই এই যোগ্যতার স্বরূপ কি এবং উহা কোথা হইতে আগমন করে?

Accidental Variation (আকস্মিক ব্যতিক্রম)। অভিব্যক্তিবাদীর ইহাও একটি অমোঘ অস্ত্র। অথচ ইহার তাৎপর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কথাটাকে নিতান্ত অসার বলিয়া মনে হয়। ব্যতিক্রম একটা ব্যাপার একটা পরিবর্ত্তন—অথচ উহা আকস্মিক—অর্থাৎ অহেতুক—ইহা অতি অশ্রদ্ধেয় মত। বলিতে হইবে এই ব্যতিক্রমের হেতু অজ্ঞাত; এই অজ্ঞাত হেতু বুঝাইতেই আকস্মিক শব্দের ব্যবহার। কিন্তু যে স্পর্দ্ধার সহিত ঐ শব্দটির ব্যবহার হয়, তাহাতে মনে অন্যভাবের উদয় হয়।

Struggle for existence (জীবন-সংগ্রাম) আর একটি বাক্য। আত্মরক্ষণ চেষ্টা হইতেই উহার উৎপত্তি। এবং এই আত্মরক্ষণপ্রবণতাই সর্ব্ব চেষ্টার মূলীভূত কারণ। ইহা হইতেই ক্রমশঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকাশ, পুষ্টি ও পটুতা। মূল বীজের মধ্যে এই চেষ্টা নিহিত; নতুবা তাহার সম্বন্ধে জীবনসংগ্রাম অসম্ভব। নির্জীব পদার্থের জীবনসংগ্রাম স্ববিরোধীভাব। অভিব্যক্তির ইতিহাস নিরবচ্ছিন্ন লাভের ইতিহাস নহে। লাভ ক্ষতির মধ্য দিয়া ঐ অভিব্যক্তি সাধিত হয়। ইতর জন্তুর দেহই সর্ব্বস্ব, বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত ছোট কথা। তাহাদের দেহ তাই বলিষ্ঠ, পুষ্ট ও সুদৃঢ়। মানুষের চক্ষু, কর্ণ, দন্ত, হনু, পৃষ্ঠবংশ, পঞ্জর, হস্ত, পদ প্রভৃতি ইহাদের তুলনায় দুর্ব্বল, অপটু, অপরিপক্ব। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি এই সকল অপূর্ণতার পরিপূরণ করিয়া থাকে। তাহার ক্ষেত্রে বুদ্ধিই প্রধান—তাই সে এখনও ধরাপৃষ্ঠে জীবিত, কেবল জীবিত নহে, প্রভুত্ব সহকারে জীবিত। অথচ কত ম্যামথ, কত ডোডো প্রভৃতি জীবের অস্তিত্ব চির বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মানুষের বীজশক্তিতে অবশ্যই এই বুদ্ধিশক্তি প্রচ্ছন্নভাবে না থাকিলে, পারিপার্শ্বিকের ঘাত প্রতিঘাতে উহা প্রকটিত হইত না, কিম্বা উহা প্রকটিত হইবার পূর্ব্বেই ঐ বীজের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

বংশানুক্রম (heredity)। ইহার সম্বন্ধেও অনেক কথা বলিবার আছে। কার্য্যের পুনঃ পুনঃ অভ্যাস বশতঃ দেহের অংশ বিশেষে ঐ কার্য্যের একটা প্রতিমুদ্রা (impression) অঙ্কিত হয়। উহাকেই সংস্কার বলা যায়। এই সংস্কার তদ্দেহসম্ভূত প্রাণীদেহে সংক্রমিত হইয়া থাকে। উত্তরকালজাত প্রাণী যেন উত্তরাধিকারীসূত্রে ঐ সংস্কার লাভ করে। এবং ঐ সংস্কার সংক্রম ফলেই, বুদ্ধির পরি-চালনা নিরপেক্ষে, ভাবী প্রাণিবর্গ স্ব-অন্বয় সম্বন্ধ পূর্ব্বজাত প্রাণীবর্গের আচরণ সদৃশ আচরণ করিতে সমর্থ হয়। ঐ সংস্কার পরিশেষে বদ্ধমূল হইয়া প্রাণীর স্বাভাবিক পটুত্বরূপে (instinct) পরিব্যক্ত হয়।

কিন্তু এই সংস্কার নিচয়ের অস্তিত্ব ও সংক্রম ব্যাপারটি যে রহস্যপূর্ণ তাহা আর কাহাকেও বলিতে হইবে না। একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। ধরুন যেন একটা সদ্য প্রস্ফুটিত হাঁসের ছানা। ডিম্ব হইতে বাহির হইয়াই উহা জলে সাঁতার কাটিতে পারে। এখানে মনে করা হয়, শাবকটির পূর্ব্বপুরুষের বহু চেষ্টার ফলে সাঁতার শিক্ষা করিয়া, অবি-রত সাঁতার কাটিতে কাটিতে, সাঁতারকে

দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত করিয়াছিল, এবং ঐ স্বভাব বা অভ্যাস উহাদের কোন দৈহিক অবয়বে একটা প্রতিমুদ্রা বা ছাপরূপে অঙ্কিত হইয়াছিল। জীবনরক্ষণের অনুকূল হওয়ায় উহা ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া পড়িল। পরে উহা ব্যক্তিগত সংস্কার হইতে, সংক্রম নিয়মে, একটা জাতিগত পটুতায় পর্য্যবসিত হইল। শরীরের কোন অবয়বে ঐ সংস্কার সঞ্চিত ছিল তাহার নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। হয়ত কোন স্নায়ুমণ্ডলীর এক দেশে অথবা মস্তিষ্ক কোণে আণবিক একটা পরিবর্ত্তন-রূপে সঞ্চিত ছিল। ঐ সংস্কার জীবান্তরে সংক্রামিত হইয়া উপযুক্ত স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজনা করে বলিয়া ঐ জীবও পূর্ব্বপুরুষের আচরণ অবিকল অনুকরণ করিয়া থাকে।

কিন্তু দেহের কোন অংশে স্নায়ুমণ্ডলীর কোন স্থানে এই প্রতিমুদ্রা অঙ্কিত হয়, তাহার আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা চলে না। একটা প্রতিমুদ্রা অঙ্কিত হয়, এই প্রকার ধরিয়া লওয়া হয় মাত্র। কোন অণুবীক্ষণ এ কাল পর্য্যন্ত ঐ প্রকার কোন ছাপ বা দাগের চিহ্ন আবিষ্কারে সমর্থ হয় নাই। যাহা হউক ঐ দাগের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া লইলেও কি প্রকারে উহা ভাবী সন্তানে সংক্রমিত হয় তাহা বুঝা যায় না। সংস্কারের আশ্রয়ীভূত দেহাংশ বিশেষকে স্থানান্তরিত করিতে না পারিলে, দৈহিক অবয়বাশ্রিত সংস্কারকে স্থানান্তরিত করা সম্ভবপর কি না তাহাও বিবেচ্য। আমাদের গৃহীত দৃষ্টান্তের প্রতি মনোযোগ করা যাউক। প্রথমতঃ হাঁস হইতে অণ্ডের উৎপত্তি হয়। ঐ অণ্ডস্থ পদার্থটি সর্ব্বাংশে অবিশিষ্ট (homogeneous)। উহার মধ্যে অবয়ব বিশেষের কোন লক্ষণ নাই। উহাতে তখনও স্নায়ুমণ্ডলী অনুৎপন্ন—মস্তিষ্ক অবিশিষ্ট। সুতরাং সংস্কারটি সাশ্রয় উন্মূলিত হইয়া উহাতে নীত হইলে, অণ্ডের বিশ্লেষণে ঐ বিশিষ্টতার চিহ্ন পাওয়া উচিত। কিন্তু তাহা পাওয়া যায় না। অতএব সংস্কারটি সাশ্রয় সংক্রমিত হয় এ প্রকার অনুমান অমূলক। আবার যদি স্বাশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র সংক্রমিত হয়, এই প্রকার মনে করা যায়, তাহাও অমূলক কল্পনা মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। কেননা যাহাতে সংস্কার সঞ্চিত থাকে বা যাহাতে প্রতিমুদ্রা অঙ্কিত হয়, তাহাকে বাদ দিয়া কেবল সংস্কারটিকে স্থানান্তরিত করা যায় এ প্রকার কোন দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ সংস্কারের আশ্রয়টিকে যে অবিকল দেহ হইতে দেহান্তরে সঞ্চালিত করা যায়—এই পরিবর্ত্তনে ঐ আশ্রয়টি যে বিকল বা বিকৃত হইয়া যায় না—ইহাই বা কি প্রকারে বিশ্বাস করা যায়? ইত্যাদি কারণে প্রাণীর দেহ নিবদ্ধ সংস্কার যে দেহান্তরে সংক্রমিত হয় সে মতটি নিঃসন্দেহ গ্রহণ করিতে পারা যায় না। কেবল 'হয় ত হইতে পারে'—এ প্রকার একটা কল্পনাকে সত্যের স্থান দেওয়া যাইতে পারে না।

এই প্রকারে আমরা দেখিতে পাই জীবাভিব্যক্তি ব্যাখ্যা করিতে যে সকল শব্দ প্রযুক্ত হয় তাহার কতকটা ঔপচারিক (figurative) এবং কতকটা অস্পষ্ট (confused in meaning) কিন্তু আশ্চর্য্য এই, বৈজ্ঞানিকগণ মানবীয় ভাবারোপের প্রতিকূলতাচরণ করিতে যাইয়া যে সকল শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা যে আত্মপ্রতারিত, সে বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি অতি অল্প।

যাহাহউক, অভিব্যক্তি প্রক্রিয়াবশে জীবজগতের আবির্ভাব হইতে পারে; কিন্তু প্রক্রিয়ার মূলদেশে যে শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকিয়া উহাকে নিয়মিত করিতেছে, যে পর্য্যন্ত তাহার তাৎপর্য্য বা মর্ম্ম উদ্ঘাটিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত কেবল বাহ্য প্রক্রিয়া মাত্র লইয়াই অভিব্যক্তি তত্ত্ব নিরূপিত হইতে পারে না। প্রজ্ঞা উহা লইয়াই নিশ্চিন্ত বা সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না—ইহাই আমার বক্তব্য।

শ্রীপ্রফুল্লনাথ লাহিড়ী।

শঙ্খের জন্ম কথা

'নুলিয়া'দের পাতায় ছাওয়া ঘর
সাগর তীরে যাচ্ছে যেথা দেখা,
স্বর্গদ্বারের কাছেই নিরন্তর
ভক্ত সাধু বাস করিত একা।

(২)

ফণা তুলে নীলাম্বুধির ঢেউ
তাঁরে দেখেই লুটতো এসে কূলে,
শুক্তি আহা দেখত না ত কেউ,
মুক্তা তাঁহার ঢালতো পাদ মূলে।

(৩)

রত্নাকরের রত্ন ভরা থালা
তাঁহার কাছে আনতো জনে জনে
স্তব করিত নিত্য সাগর বালা
সাধ্য কি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণে।

(৪)

সন্ধ্যাকালে ভক্ত গভীর স্বরে
ভগবানকে ডাকতো গভীর প্রেমে,
বইত তুফান বিশ্ব চরাচরে
সিন্ধুর রোল ক্ষণেক যেত থেমে।

(৫)

সঙ্গে তাঁহার উঠতো গেয়ে পাখী
উচ্ছ্বসিয়া উঠতো সাগর জল
ফুলগুলি সব মেলত কোমল আঁখি
ফুটতো শশী কনক শতদল।

(৬)

সে ডাক শুনে নর নারীর প্রাণ,
কাহার লাগি উঠতো যেন কেঁদে,
প্রাণের মাঝে বাজত কিসের টান,
রাখতে ধরা পারত নাকো বেঁধে।

(৭)

কোথা হতে উঠছে এমন স্বর
এমন মধুর প্রাণ মাতানো রব,
সন্ধান তার চললো ধরা পর
রাজা প্রজা খুঁজতে লাগলো সব।

(৮)

অচেনা এক শবর হঠাৎ আসি
বল্লে আমি খোঁজ পেয়েছি তার,
ছুটলো লোকে আনন্দেতে ভাসি
লোকে লোকে ভরলো সাগর ধার।

(৯)

'চক্ষু মুদি' ডাকছে সাধু মরি !
ব্যাকুল প্রাণে সেই সে নিরঞ্জনে
অযুত আঁখির পর আলোক পড়ি'
ধ্যানটী তাঁহার ভাঙলো কতক্ষণে।

(১০)

চাইলে সাধু—জোৎস্নারি ধারে,
ভূতল গগন উঠলো আহা ভেসে,
নরনারী সবাই একে বারে
চরণতলে পড়লো তাঁহার এসে।

(১১)

কোথায় সাধু মিলিয়ে গেল ধীরে
আঁধার হয়ে উঠলো শোকে ধরা
দেখলে লোকে ভাসি নয়ন নীরে
যূথীর রাশি কমণ্ডলু ভরা।

(১২)

পুণ্য হিয়ার শুভ্র প্রেমাঞ্জলি
ভাসিয়ে দিলে সাগর বুকে যবে,
সাগর বালা সিন্ধু নীরান্দোলি,
হস্তে লয়ে নৃত্য করে সবে।

(১৩)

দেব বালার ফুৎকারেতে ত্বরা
শঙ্খ হলো সাধুর ফুল রাজি,

আনন্দেতে ব্যাকুল করে ধরা
গভীর স্বরে উঠলো আহা বাজি।

(১৪)

চকিত হয়ে শুনলে নরনারী
ক্ষণেক তরে ভুলি সকল ব্যথা ;
কাতর ব্যাকুল পরাণ পাগল কারী
কণ্ঠ সাধুর কণ্ঠে তাদের গাঁথা।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

ভূপৃষ্ঠের গঠনরহস্য

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ধরিত্রীদেহ সম্ভবতঃ শীতল উল্কাপুঞ্জ সমবায়েই সমুদ্ভূত হইয়াছে কিন্তু তাহা হইলেও মোটের উপর ভূপৃষ্ঠটি এক সময়ে বর্ত্তমান কালাপেক্ষা উষ্ণতর অবস্থায় ছিল। ইহা সহজেই অনুমেয়। উল্কা পিণ্ডগুলি একত্র জমাট বাঁধিবার পূর্ব্বে কিছু-কাল পরস্পরের মধ্যে খুবই সংঘর্ষ ঘটিত এবং উহার ফলে উহারা প্রচণ্ড উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপ আঘাত জনিত উত্তাপ কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয় না শীঘ্রই বিকীর্ণ হইয়া যায়। এদিকে আবার তাপক্ষয় সহকারে পদার্থসমূহের আয়তন সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং এই সঙ্কোচ সাধন কালে সঙ্গে সঙ্গে একটা উত্তাপেরও উৎপত্তি হয়, সুতরাং মোটের উপর তাপক্ষয়ে বিলম্ব ঘটে। সঙ্কো-চন জনিত এই তাপোৎপত্তি ব্যাপারটি একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝান যাইতে পারে। শক্তির প্রকৃত পক্ষে হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, শুধু রূপান্তর গ্রহণ করিয়া ইহা প্রকাশ পায় মাত্র। এখন মনে কর উচ্চ এক প্রাচীরের উপর কোন এক পদার্থ অবস্থিত রহিয়াছে। ঐরূপ ঊর্দ্ধে অবস্থিত রহিবার জন্যই উহার ভিতরে যে শক্তিটুকু সঞ্চারিত হইয়াছে নিম্নে ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত রহিলে সেইটুকু আর থাকিতে পারে না। যদ্রূপ পদার্থটি ভূপতিত হইলে সেই শক্তিটুকু তাপের আকারে রূপান্তরিত হইয়া প্রকাশ পায়, তদ্রূপ উল্কাপুঞ্জের সঙ্কোচন ঘটিবার সময়ও তদন্তর্গত উল্কাপিণ্ডগুলি যেন কোন উচ্চস্থান হইতে উল্কাপুঞ্জের কেন্দ্র বা মধ্যবিন্দু অভিমুখে ধীরে ধীরে নিপতিত হইতে থাকে ও সেই সময় তদ্ধেতু একটা তাপোৎপত্তি হয়।

ধাতুসমূহ তাপের উৎকৃষ্ট পরিচালক। সুতরাং লৌহপ্রধান উল্কাপিণ্ডগুলি সঙ্কুচিত হইবার কালে উহাদের সর্ব্বাংশ শীঘ্রই সম-ভাবে উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে এবং বহির্ভাগ হইতেও নিয়মিত ভাবে তাপক্ষয় ঘটিতে থাকিবে। ভিতরের প্রচণ্ড তাপে উল্কাপিণ্ড-গুলির কিয়দংশ দ্রবীভূত হইয়া যাইবে। কঠিন পদার্থ তরল হইবার সময় আয়তনে বৃদ্ধি পায়। ঊর্দ্ধাংশের গুরুভার হেতু উল্কা-পিণ্ডগুলির খুব ভিতরের অংশ আয়তনে

বাড়িতে পারিবে না, কাজেই খুব ভিতরের অংশ দ্রবীভূত হইবে না, বহির্ভাগের নিকটস্থ অংশই দ্রবীভূত হইবে। এদিকে বহির্ভাগের সুকঠিন ধাতব অংশ যতই সঙ্কুচিত হইতে থাকিবে ততই চাপ দিয়া ভিতরের এই দ্রবীভূত অংশটিকে বাহিরে ঠেলিয়া দিবে। হাপরে খনিজ পদার্থ গলাইয়া ধাতু নিষ্কাশনের সময় দেখা যায় যে দ্রবীভূত অবস্থায় উক্ত খনিজ পদার্থের ধাতব এবং প্রস্তরময় অংশ পৃথক্ হইয়া পড়ে এবং ধাতব অংশটুকু হাপরের নিম্ন প্রদেশে সঞ্চিত হয়। ঠিক অনুরূপ প্রক্রিয়াতেই ভূগর্ভে ধাতুময় এবং ভূপৃষ্ঠে একটা প্রস্তরময় স্তর সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে।

ধরিত্রীগর্ভে বহুদূর প্রবেশ করিয়া প্রত্যক্ষ ভাবে উহার অবস্থা পরিজ্ঞাত হইতে এখনও আমরা সমর্থ হই নাই, তথাপি ভূগর্ভ যে ধাতুময় অনুমান করিবার আরও অনেক কারণ আছে।

বিশেষজ্ঞগণ হিসাব করিয়া বলেন ভূগর্ভের ভার সমায়তন ভূপৃষ্ঠের প্রায় দ্বিগুণ। সহজেই মনে হয় ভূগর্ভের ধাতুময় অবস্থাই উহার এইরূপ গুরুভার হইবার কারণ।

গ্রীক্ ভাষায় ব্যারস্ (ভারঃ) শব্দের অর্থ ভার। এই হেতু পৃথিবীর এই গুরুভার ধাতুময় অভ্যন্তর প্রদেশটি Barysphere নামে অভিহিত। লঘুভার প্রস্তরময় ভূপৃষ্ঠের নাম Lithosphere।

প্রফেসর Strutt প্রমাণ করিয়াছেন, যে সমুদয় পদার্থের অস্তিত্ব হেতু ভূপৃষ্ঠটি radio-active গুণসম্পন্ন (অর্থাৎ ইহার উপরিস্থ বায়ুরাশিতে তাড়িত শক্তি প্রকাশিত হয়), ধরণী গর্ভে সেইরূপ পদার্থ সম্ভবতঃ ৪৫ মাইল অবধি মাত্র বিস্তৃত। এতদপেক্ষা অধিক দূর অবধি বিস্তৃত থাকিলে উক্ত radio-active গুণটিও অধিকতর মাত্রায় প্রকাশ পাইত। পরীক্ষায় জানা যায় লৌহময় উল্কাপিণ্ডগুলির radio-active গুণ নাই এবং পৃথিবীতে এইরূপ radio-active গুণহীন পদার্থের সংখ্যাও অধিক নাই। এই হেতু মনে হয় Barysphere বা ভূগর্ভটি উল্কা-পিণ্ড সমূহে দৃষ্ট নিকেল লৌহেই প্রধানতঃ গঠিত।

হাপরে ধাতু গলাইবার সময় উপরে গাদ জমিয়া যে একটা কঠিন আবরণ উৎপন্ন হয় ভূপৃষ্ঠের পাহাড় পর্ব্বতগুলি সেইভাবে সমুৎপন্ন হইয়াছে। স্বর্ণকারের দোকানে যে ধুলা জমে তাহার ভিতরে একটু আধটু সোণা থাকে। সেই জন্য অনেকে পয়সা খরচ করেও ঐ আবর্জনারাশি ক্রয় করে এবং গলাইয়া সোণা বাহির করিতে চেষ্টা পায়। ধাতু দ্রব্য গলাইবার সময় যে গাদ বাহির হয় তাহার ভিতরও ঐরূপ অনেকটা ধাতু রহিয়া যায়। পৃথিবীর পাহাড় পর্ব্বতগুলিও এইরূপ বহু ধাতুর আকর। প্রস্তর মাত্রই এক বা একাধিক ধাতু সমবায়ে সমুৎপন্ন। জল দিয়া ধুইয়া, হাত দিয়া বাছিয়া প্রভৃতি সহজ উপায়েই অনেক সময় প্রস্তরচূর্ণ হইতে বহু-ধাতু পৃথক করা যায়। অনেক প্রস্তর আবার ধাতু দ্রব্যগুলি মিশ্রিত ও দ্রবীভূত হইয়া সমুৎপন্ন হয়। এই প্রস্তর গুলি আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর প্রস্তরের খনিজ পদার্থগুলি দ্রবীভূত হইবার পর মিশ্রিতা-বস্থায় থাকে, অন্যগুলিতে যে খনিজ পদার্থ সমূহ দৃষ্ট হয় সেগুলি এত সহজে উৎপন্ন হয় নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ Quartz নামক পদার্থে একভাগ সিলিকা ও দুই ভাগ অক্সিজেন থাকে কিন্তু তাই বলিয়া সিলিকা দ্রব করিয়া

Quartz প্রস্তরে পরিণত করিতে পারা যায় নাই। প্রবল চাপ অত্যুষ্ণ সলিল এবং কোনরূপ Catalyser প্রভৃতির সাহায্য বিনা ঐগুলি উৎপন্ন হয় নাই। যে পদার্থের গুণে এইরূপ সমীকরণ প্রক্রিয়াদি সহজে ও শীঘ্র সম্পন্ন হয় তাহার ইংরাজি নাম Catalyser, যেমন সোহাগার সাহায্যে সহজে সোণা গলে।

ধাতুদ্রব্যগুলি সহজে দ্রবীভূত ও মিশ্রিত হইয়া যে শ্রেণীর প্রস্তর সমুৎপন্ন হয়, সেই শ্রেণীর প্রস্তর স্তরই সম্ভবতঃ ভূপৃষ্ঠের আদিম বা প্রাচীনতম প্রস্তর।

এই গুলিতে লৌহ, ম্যাগ্নেশিয়ম্, কৃষ্ণাভ্র প্রভৃতি ধাতু দৃষ্ট হয় এবং সিলিকার ন্যূনতা পরিলক্ষিত হয়। এই শ্রেণীর প্রস্তরের ইংরাজি নাম কেমিক বা বেসিক প্রস্তর। বাসাণ্ট নামধেয় প্রস্তরগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রস্তরে acids, alkalies প্রভৃতির প্রাচুর্য্য এবং শ্বেত অভ্র quartz, felspars, hornblende প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়। গ্রানিট্ নামধেয় সুকঠিন প্রস্তর এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত।

ধরণীর দেহ এইরূপ ত্রিভাবে গঠীত বা সজ্জিত। মধ্যাংশটি গুরুভার ধাতুময়; অনন্তর acid, alkalies, quartz প্রভৃতি বিশিষ্ট প্রস্তর স্তর; সর্ব্বোপরি লৌহ, ম্যাগ্নে-শিয়া, চূণ প্রভৃতি সমবায়ে সমুৎপন্ন ভূপৃষ্ঠ।

শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গে বাল্যজীবন

চৈত্র মাসের গৃহস্থে শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন মহাশয়ের "বঙ্গে বাল্যজীবন" শীর্ষক প্রবন্ধ পড়িয়া প্রীত হইয়াছি। সেন মহাশয় যথার্থ বলিয়াছেন "বঙ্গ বালকের বিষাদপূরা বিমলিন মুখমণ্ডল দেখিলে হৃদয়ের সমস্ত আশা ভরসা দমিত হইয়া যায়।" বাস্তবিক কথা—শিশুরাই দেশের আশাস্থল—তাহাদের রুগ্ন দেখিলে প্রাণে যে আতঙ্ক সঞ্চার হইবে তাহাতে সন্দেহ কি আছে? শিশুই দেবশিশু—তাহা-রাই দেশের ভবিষ্যৎ আশাস্থল তাদের অনিষ্ট দেখিলে প্রাণ কেনইবা অবসন্ন না হইবে? বঙ্গে বাল্যজীবন সম্বন্ধে আমি অনেক দিন ভাবিয়াছি এই ভাবনাতে অনেক বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছি। আমার ভাবনাগুলি আজ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

বাল্যজীবন কতদিন, প্রথমেই এই কথাটা আসিতে পারে। মোটামুটি হিসাবে আমরা জন্ম হইতে ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাল্যজীবন ধরিয়া লইলাম। শাস্ত্র একথা বলিয়াছেন—প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ। এই ষোড়শ বর্ষ একটা বয়ঃসন্ধির কাল। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ও তাই ষোল বৎসরে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সময় ধার্য্য করিয়া-ছেন।—এই সময় ছেলেরা হঠাৎ "বালক" হইতে "ভদ্রলোকে" পরিণত হয়। কাজেই বাল্যজীবন বলিতে আমরা জন্ম হইতে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত বুঝিব। আমরা এই সময়টার আলোচনা করিলেই মোটামুটি হিসাবে বাল্যজীবনেরই আলোচনা করা হইবে।

"আমরা যেন পক্ককেশ, কুব্জনত দেহযষ্টি লইয়াই মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইতেছি।" কথাটা খুব ঠিক আমাদের শিশু যা জন্মিতেছে তার জীবনীশক্তি অতি অল্প বলিয়াই মনে হইতেছে। জীবনীশক্তি বা vitality জিনিসটা বাঙ্গালী শিশুতে বড়ই কম। কেন? তার অনেক কারণ আছে—তাহার মধ্যে কতকগুলি প্রধান। বাঙ্গালী শিশুর জীবনীশক্তি বাড়াইতে হইলে এই কারণগুলির অনুসন্ধান করিয়া যথাযথভাবে তার প্রতিকার করিয়াই কাজে নামিতে হইবে। বাজে চীৎকারে সভাসমিতিতে বড় বড় মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলে সেই মন্তব্যগুলি আলমারির মাথায় পড়িয়া ধুলা খাইবে আর কিছুকাল পরে তাহা শিশিবোতলওলার কৃপায় বেণের দোকান হইতে মশলা বাঁধিয়া গৃহস্থের গৃহে প্রচারিত হইবে। বৈজ্ঞানিকভাবে অনুসন্ধান ও তাহার প্রতিকার না করিলে কাজ কিছুই হইবে না। বৃথা শব্দে লোকের প্রাণ "আঁৎকাইয়া" উঠিবে কিন্তু কাজ কিছুই হইবে না। তাই আমরা প্রথমে এই সকল কারণ আলোচনা করিব, তাহার পর প্রতিকারের কথাও বলা যাইবে।

বাঙ্গালী শিশু দিন দিন দুর্ব্বল জীবনশক্তি হীন, ব্যর্থ জীবন লইয়া জন্মাইতেছে কেন? কেনই বা অকালে এত শিশু মরিতেছে? আমার মনে হয় এর প্রধান কারণ পিতামাতার দুর্ব্বলতা। আজকাল সকলেই জানেন যে, শিশু পিতামাতার দৈহিক বল, সাদৃশ্যও গুণ লইয়া জন্মাইবে। বিজ্ঞানের এই তত্ত্ব আজকাল স্কুলের বালকগণও জানেন। বাঙ্গালী, পিতামাতা কেমন এ আলোচনাটা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অতি অল্প বয়সেই পক্ককেশ, কুব্জনত হইতেছেন। পিতা—খাদ্যের অভাবে, সংসার চিন্তায় মানসিক কষ্টে ও জ্বর-বিকার, ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি যম সদৃশ ব্যাধির উপদ্রবে বাঙালি পিতা আজ কুব্জনত। আমার এক বন্ধু সম্প্রতি রবিবাবুর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। কথায় কথায় রবিবাবু বলিয়াছিলেন যে "আমাদের দেশের যুবারা যেন বৃদ্ধ।" "যৌবনের বেগ চলিয়া যাইবে—কে জানে কাহার কাছে" এই ভাবটা নাই—তাহারা যেন মরিয়া রহিয়াছে। আর্থিক কষ্টের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য জুটে না। সম্প্রতি আমরা যা হিসাব পাইয়াছি তাহা হইতে দেখিতে পাই প্রতি ইংরাজের বাৎসরিক আয় ৪৫ পাউণ্ড অর্থাৎ ৬৯০ টাকা প্রতি জার্মাণের ২৯ পাউণ্ড বা ৪৩৫ টাকা; প্রতি ইংরাজ প্রতি বৎসরে ৩৮ পাউণ্ড বা ৫৭০ টাকা ও প্রতি জার্ম্মেণ ২৩ পাউণ্ড বা ৩৪৫ টাকা খরচ করিয়া থাকে। এই আয় ও ব্যয় হইতে আমরা এই বুঝিতে পারি যে আর্থিক কষ্ট ইহাদের কিছুই নাই বা হইতে পারে না। কাজেই খাদ্যের অভাবে এসব জাতির পতন হইতে পারে না। কাজেই ইহারা কোমর তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে আর্থিক কষ্ট কাহাকে বলে ইহারা জানে না। প্রত্যেক কানাডা ও অষ্ট্রেলেসিয়াবাসীর বার্ষিক আয় ৪৮ পাউণ্ড বা ৭২০ টাকা। আমাদের আয় কত? কে বলিবে? কাজেই আমরা আজ খাইতে না পাইয়া মরিব না ত কি? যদি বাঁচিয়া থাকি তা হইলে নিশ্চয়ই জড়পিণ্ডবৎ থাকিব—কাজেই আমাদের শিশুসন্তান বিজ্ঞানের মতে জড়পিণ্ডবৎ হইবেই। নানা কারণে আমাদের অধিকাংশ লোকেরই সাহস গিয়াছে—আমরা সকলে না হইলেও অধিকাংশ লোকেই ভীরু কাজেই আমাদের শিশু বিজ্ঞানের মতে ভীরুই হইবে। আমাদের অধিকাংশ লোকের

না খাইতে পাইয়া—না মুক্ত স্থানে বাস করিতে পাওয়ায় জীবনীশক্তিহীন বা lowered vitality হইয়া পড়িয়াছে কাজেই আমরা বৎসরের অধিকাংশ সময়ই রুগ্ন অবস্থায় কাটাইয়া দিই। বিজ্ঞান বলিয়াছে রুগ্নের শিশু রুগ্নই হইবে—কাজেই বাঙ্গালী শিশু জন্মাবস্থা হইতেই রুগ্ন। যে কারণেই হউক আনন্দ বাঙ্গালা হইতে বিদায় লইয়াছে কাজেই বিজ্ঞানের মতে বাঙ্গালী শিশু নিরানন্দ হইবে। কুসংস্কার ত আমাদের অঙ্গের ভূষণ কাজেই শিশুও কুসংস্কারগ্রস্ত হইবে। মানসিক বল আমরা অনেক স্থলে ইচ্ছা থাকিলেও চালাইতে পারি না— বিজ্ঞান বলিয়াছে তোমার মানসিক বল কম হইলে তোমার ঔরসজাত শিশু মানসিক বলে বলীয়ান হইতে পারিবে না।

পিতার তরফের কথাই আমরা এতক্ষণ বলিলাম। এখন মাতার কথা বলি—বাঙ্গালী জননী চিররুগ্না—শিশু ত চিররুগ্ন হইবেই, কুসংস্কারাচ্ছন্ন কাজেই শিশুও তাই হইবে— আর শেষের কথা দুর্ব্বল কাজেই শিশুও দুর্ব্বল হইবে।

আমি এ সব কথা যাঁহাদের কাছে বলিয়াছি তাঁহারাই বলিয়াছেন যে কি করা যাইবে এই সকলের উপর আমাদের হাত নাই। হাত নাই সত্য; কেবল আংশিক সত্য; কতকগুলার উপর ত হাত আছে। অনেক স্থলেই গভর্ণমেণ্টের সাহায্য আবশ্যক কিন্তু তাহা না হইলে কি আমরা কিছুই করিতে পারি না? পারি! কিন্তু বহুকালের অভ্যস্ত আলস্য আর ত্যাগ করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আবার যে গুলাতে আমাদের হাত আছে তাই বা করিতেছি কই। বিবাহটাতে আমাদের হাত আছে কিন্তু তাহার সংস্কার হইতেছে কৈ? আমাদের দেশের লোক এখনও অতি অল্প বয়সেই কন্যার বিবাহ দিতেছেন কেন? ইহাতে কি আমাদের হাত নাই? সমাজ শাসনটাতে যদি হাত না থাকে তবে হাত আছে কিসে? আইন থাকিলেও, ১২ বৎসরের বালিকা শিশুমাতা এই দৃশ্য গৃহে গৃহে দেখিতে পাওয়া যায়। এই বালিকা মাতার নিজের অর্দ্ধেক হাড় তখনও পুষ্টি লাভ করে নাই তখন তার ছেলে কিরূপে ভাল হইবে একথা বুঝাটা কি এতই শক্ত। আমাদের দেশের শতকরা ৯৮ জন অশিক্ষিত কিন্তু যে দুইজন শিক্ষিত তাহারাই বা এ বিষয়ে নজর দেন না কেন? দুই জন শিক্ষিত লোকের ১.৯ জন লোকও অতি অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দেন। এরূপ ক্ষেত্রে জাতীয় পতন অনিবার্য্য।

এমন দুই চারিজন লোক দেখিয়াছি তাঁহারা এ বিষয়ে মস্ত মস্ত শাস্ত্র কথা আনিয়া এই "গোলমালে" জিনিষটাকে আরও "তাল-গোল" পাকাইয়া দেন। দুই একজন বলেন যে ইহা সনাতন পদ্ধতি সেই আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে ইহাতে দোষ থাকিতে পারে না। ইহার উত্তরে আমি এই সামান্য কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইতে চাই যে একটা জাতির উত্থান পতন দুই এক পুরুষে বুঝা যায় না—অনেক সময় লাগে। এ সম্বন্ধে বিজ্ঞান আলোচনায় ভুল ধারণা দুরীভূত হইবে। দুই চারিজন আবার এক আধ পাতা শরীর-তত্ত্ব বা Physiology পড়িয়া বলেন যে "menstruation indicates maturity in sexuality" কিন্তু তাঁহাদের কাছে সবিনয় অনুরোধ তাঁহারা যেন শরীরতত্ত্ব সবটা পড়িয়া নিজেদের মতামত প্রচার করেন। আমাদের দেশে বালিকারা সাধারণতঃ ১৩ বৎসর বয়সে ঋতুমতী হইয়া থাকে। কিন্তু

তাহাদের দেহের হাড় পুষ্ট হয়* ২৬ বৎসর বয়সে। ইহুদী বালিকারা আরও অল্প বয়সে ঋতুমতী হইয়া থাকে। তাহা বলিয়া ৭।৮ বা ৯ বৎসর বয়সের বালিকার সন্তান হওয়াটা বাঞ্ছনীয় মনে করেন কি ?

ঋতু অনেক কারণে ঘটিয়া থাকে—দেশের জলবায়ু, স্বাস্থ্য, খাদ্যের অভাব বা প্রাচুর্য্য, দৈহিক শ্রম বা আলস্য। একেবারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া মস্ত ভুল—menstruation indicates maturity in sexuality. কতকগুলি ফল অকালেই পাকিয়া থাকে—এঁচড়ে পাকা কাঁটাল কথাটা সকলেই জানেন—এই ফল কখনও সুস্বাদু হয় না।—আর তা ছাড়া এই কাঁটালের বীজে যে বৃক্ষ হয় তাহার ফল অতি অপকৃষ্ট ধরণের একথা অনেকেই জানেন।

* বাঙ্গালী শিশুর মেরুদণ্ড সরল দেখিতে হইলে বালিকাদের বিবাহের দিন আরও পিছাইয়া দিতে হইবে।—১৬ বৎসরের কম কোনও কারণেই বিবাহ দেওয়া উচিত নহে। এ সম্বন্ধে দেশে অনেক সভাসমিতি হইয়াছে কিন্তু ফলাফল কি নারায়ণে অর্পিত হইয়াছে ?

তাহার পর শিশুর জন্মের কথা। আমাদের কুসংস্কার এখানে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান—শিশুকে আমরা নারায়ণ, দেব শিশু, প্রভৃতি বড় বড় আখ্যা দিই কিন্তু এই নারায়ণের আহ্বান হয় বাড়ীর অপকৃষ্ট গৃহে, গোয়ালে বা বাহিরে একটা গোল পাতা ছাওয়া ঘরে। কাজেই আমাদের দেশের শিশুর মৃত্যুর হার অত্যন্ত অধিক। আমি কলিকাতা সহরের জন্ম মৃত্যুর হার দিতেছি।

জন্ম মৃত্যুর হিসাব

সাল	হাজার করা জন্ম	হাজার করা মৃত্যু
১৯১২	২১ ৬	২৮°১
১৯১৩	২০ ৫	২৯°২
১৯১৪	১৯°৪	২৮°৩

কলিকাতা সহরে ১৯১১ সালে ১ বৎসর বয়স্ক ১০০০ শিশুর মধ্যে ২৫১ জনের মৃত্যু হইয়াছে আবার ১৯১৪ সালে এই সংখ্যা ২৮২°৭ দাঁড়াইয়াছিল।

কলিকাতার ন্যায় সহরে যখন হাজার করা ৩০০ শত শিশুর মৃত্যু হয় তখন বঙ্গের পল্লীতে কত হয় তাহা অনুমেয়। খাদ্যের অভাব, উপযুক্ত বাসের অভাব ইত্যাদিতে অনেক শিশুই মরিতেছে। তাহা ছাড়া ভয়ানক কথা এই যে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হার বাড়িয়া চলিয়াছে। ইংলণ্ডে জন্মের হার মৃত্যুর হারের অপেক্ষা অনেক বেশী তবুও সে দিন Lancet পত্রিকায় দেখিতে ছিলাম ইংলণ্ডের জননায়কগণ শিশুর মৃত্যু সংখ্যা হ্রাস করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন আর আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছি।

সে দিন ব্যবস্থাপক সভায় এ সম্বন্ধে এক সভ্য গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন কিন্তু গভর্ণমেণ্ট অতি "দুঃখের" সহিত বলিয়াছেন এ বিষয় গৃহস্থের হাত তাঁহারা কিছু করিতে পারেন না। গভর্ণমেণ্ট বা মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তব্য প্রত্যেক স্থানে উপযুক্ত

সংখ্যক শিক্ষিত ধাত্রী রাখা। অনেক শিশু ধাত্রীর অজ্ঞতায় মারা পড়ে গভর্ণমেণ্ট যদি শিশু-মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করেন তাহা হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখিতে পাইবেন যে, তড়কা বা tetanusই অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ। আর অজ্ঞতাই এই tetanus রোগের প্রধান কারণ সে বিষয়ে কি সন্দেহ আছে?

জন্মের পর দারিদ্র্য নিবন্ধন অনেক শিশু না খাইয়া বা কু-খাদ্য খাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর যাহারা কোনও রকমে বাঁচিয়া যায় তাহারা দিন দিন দুর্ব্বল ও রুগ্ন হইতে থাকে। তাহার উপর দেশে রোগের অভাব নাই—একটা রোগ ধরিয়া চিরকালের মত পঙ্গু করিয়া দেয়। এ সব প্রতিকূল সম্বন্ধ ছাড়াইয়া বাঙ্গালী শিশুকে উঠিতে হয়। তাহার কাছে কি আশা করা যাইতে পারে? সে "নতকুব্জ" ত হইবেই।

এইবার শিক্ষার পালা। শিশুকে শান্ত শিষ্ট দেখিতে বাঙ্গালী বড় ভালবাসে। যে যত কম নড়িবে বাঙ্গালীর সেই তত আদর্শ শিশু। সভ্য করিবার জন্য বাঙ্গালী পিতামাতা অতি শিশু অভ্যাস হইতে পীড়ন আরম্ভ করেন। কি কুক্ষণেই Discipline বাঙ্গালায় ঢুকিয়াছিল—স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ই যে কেবল Discipline যন্ত্র ফেলিয়া বাঙ্গালীর হৃদয়ের Raw-meat juice বাহির করিতেছে তাহা নহে এমনি কি মা বাপও এই যন্ত্রের হাতল ঘুরাইয়া শিশুর হৃদয় পেষণ করিতেছেন। রবি বাবু এখানে সত্যই বলিয়াছেন—

"বিধাতার নিয়মানুসারে বাঙ্গালী ছাত্রদের এই বয়ঃসন্ধিকাল যখন আসে তখন তাহাদের মনোবৃত্তি যেমন একদিকে আত্মশক্তির অভিমুখে মাটি ফুঁড়িয়া উঠিতে চায় তেমনি আর একদিকে যেখানে তারা কোনও মহত্ত্ব দেখে, যেখান হতে তারা শ্রদ্ধা পায়, দরদ পায়, প্রাণের প্রেরণা পায় সেখানে নিজেকে উৎসর্গ করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠে। মিশনারি কলেজের বিধাতাপুরুষের বিধানে ঠিক এই বয়সেই তাহাদিগকে শাসনে, পেষণে, দলনে, দমনে নির্জ্জীব জড়পিণ্ড করিয়া তুলিবার জাঁতা কল বানাইয়া তোলা জগদ্বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—ইহাই প্রকৃত নাস্তিকতা।"

শিশুর মনোবৃত্তি দলন করাটা যে কত বড় অমার্জ্জনীয় পাপ তা বলা যায় না। আমাদের বাঙ্গালী মা বাপ আজ সেই পাপে লিপ্ত। শিশুর মনোবৃত্তিকে দলন করিবার জন্য তারা ভূত প্রেত জুজু প্রভৃতি শিশুর মাথায় কশিয়া পেরেক ঠুকিয়া মারিতে ছাড়েন না। ছেলেরা বিগতভীঃ হওয়া দূরে থাকুক ক্রমশঃ একটা জড়পিণ্ড হইয়া দাঁড়ায়।

শিশুকে মুক্ত বাতাসে জগতে বেড়াইতে দাও—এইটাই হচ্ছে এ যুগের বিজ্ঞানের শিক্ষা। আর এই শিক্ষাই অবলম্বন করিয়া জার্ম্মেণী, ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জাপানে শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। জগতের প্রত্যেক বস্তুর সহিত তাহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ভরিয়া মিশিতে দেওয়াই হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া কিন্তু আমরা তা দিই কয়জন। অতি শিশুকাল হইতেই আমরা তাকে কেবল সভ্যতার মাপকাটি দিয়া মাপিয়া থাকি আর যা কিছু এই মাপকাটির বাহিরে পড়ে তাহা চোক কান বুজিয়া ছাঁটিয়া দিই। ছেলেকে শিক্ষা দিতে হইলে তাহাকে সংসারে বিশ্বের মুক্ত বাতাসে বেড়াইতে দিতে হইবে—কেবল রক্ষা করিতে হইবে এলো মেলো বাতাস হইতে, ঝড় হইতে কিন্তু বাঙ্গালী মা বাপ কয়জন এই

নীতি পালন করিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? বালককে মুক্ত আলোকে সূর্য্যের প্রখর কিরণে বেড়াইতে দিতে হইবে আর মাথায় কোনও রকমে যাহাতে কোনও প্রকার কুসংস্কার না প্রবেশ করে সেইটাই দেখিতে হইবে—

"আরো আলো আরো আলো প্রভু নয়নে মোর ঢাল" এই নীতিই জোর করে শিখাইতে হইবে কিন্তু আমরা কি করি—অন্ধকার হইতে আরও অন্ধকারে লইয়া যাই না কি? শিশুর প্রাণের মধ্যে এইটাই প্রথম হইতে জোর করিয়া গাঁথিয়া দিতে হইবে—

বাতাস জল আকাশ আলো
সবারে কবে বাসিব ভালো
হৃদয়-সভা জুড়িয়া তারা
বসিবে নানা সাজে।

তাকে বেশ করিয়া বুঝাইতে হইবে যেন তার মূল মন্ত্র এই দাঁড়ায়—

নয়ন দুটি মেলিলে কবে
পরাণ হবে খুসি
যে পথ দিয়া চলিয়া যাব
সবারে যাইব তুষি।

তার মনের মধ্যে প্রথম হইতে কাহাকে ছুঁইলে নাহিতে হইবে—কাহার প্রদত্ত মিষ্টান্ন খাইতে নাই এসব শিক্ষা দিলে চিরকালই তার বিষময় ফল ভোগ করিতে হইবে। শিক্ষকতার অভাবে পিতামাতার পালনদোষে শিশুকুঁড়ি মানব পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। মানুষের মধ্যে দেবভাব যদি কখনও থাকে—যদি সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার ভাব কখনও থাকে সেটা শিশুকাল। এই জন্য যীশু বলিয়াছিলেন শিশুদিগকে আমার কাছে আসিতে দাও।

এই দেব শিশুর মন দলন করার পাপ যে কি ভয়ঙ্কর তাহা আমরা বাঙ্গালী জীবনে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। আমরা এই শিশুর মন যেমন ভাবে গড়িব ভবিষ্যতে ফল ঠিক তেমনি পাইব। শিশুকে বিশ্বের সহিত পরিচিত করিতে হইবে—বিশ্বে সমস্ত সংবাদ প্রকৃতির সমস্ত দৃশ্যের সহিতই তাহাকে পরিচিত করাইতে হইবে। তাকে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার নীতি পূরা মাত্রায় ভোগ করিতে দিতে হইবে। কিন্তু এইটাই হচ্ছে সব চেয়ে দুঃখের বিষয় যে ত্যাগ, সত্য, আত্মদানের সাড়ায় মাতা পিতা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রবল প্রতাপান্বিত গভর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠেন। নেলসন বলিয়াছে—আমরা কেবল পড়িব Fear! what is it grandmama? কিন্তু আমরা শিশুর মুখে এই কথা শুনিলেই মুখ চাপিয়া ধরিব! তাহার উপরে এই কুসংস্কারের আর একটা মস্ত অংশ নাস্তিকতা; অনেক সময় আমরা এই নাস্তিকতাটা শিশুর মাথায় ঢুকাই কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই—

রয়েছ তুমি একথা কবে
জীবন মাঝে সহজ হবে
আপনি কবে তোমারি নাম
ধ্বনিবে সব কাজে।

এইটাই হিন্দুর প্রাণের কথা—শিশুহৃদয়ে এই বীজ বপন করাই হচ্ছে সব চেয়ে ভাল।

শিশু পারিবারিক কুসংস্কারের মধ্যে বাড়িতে বাড়িতে এইবার শিক্ষার ক্ষেত্রে আসিয়া পড়ে। এখানেও ঘোর কুসংস্কার। সেইগুলা ছেলের অস্থি মজ্জায় ঢুকিয়ে দেবার জন্য মস্ত মস্ত বেত আছে। আমার বেশ মনে আছে আমার ধারণা ছিল যে লোকে যাকে যম বলে সেইটাই হচ্ছে এই গুরুমশায় আর এই ধারণাটা কতকটা বেতের জন্য আর কতকটা

আত্মীয় স্বজনের গুরুমশায়কে আমার যম বলিয়া উল্লেখ করার জন্য মাথায় ঢুকিয়াছিল। শিক্ষক হতে পারে কে? যে প্রাণ ঢালিয়া ছেলেদের সঙ্গে মিশিতে পারে সেই ছেলের শিক্ষক হইবার উপযুক্ত। "ছাত্রদের ভার লইবে কে? ছাত্রদের তাঁরাই লইবার অধিকারী যাঁরা নিজের চেয়ে বয়সে অল্প, জ্ঞানে অপ্রবীণ ও ক্ষমতায় দুর্ব্বলকেও সহজেই শ্রদ্ধা করিতে পারেন—যাঁরা জানেন "শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা" যাঁরা ছাত্রকেও মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না।"— রবীন্দ্রনাথ

কিন্তু শিক্ষক বলিলে আমরা এই বুঝি যে ছাত্র দলনের একটা যন্ত্র বিশেষ। পাঠশালায় ও স্কুলে মাষ্টার মহাশয় ছাত্রদের সহিত মিশিতে একটা মস্ত লজ্জার কথা বুঝেন এমন কি এই ভাবটাও কলেজ পর্য্যন্ত গড়াইয়া আইসে। গুরু শিষ্যে এই পার্থক্য থাকলে শিক্ষায় একটা মস্ত "ছাড়" পড়িবে তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

আমরা পৃথিবীর সব আবহাওয়া বাদ দিয়ে শিক্ষা দিতে চাই—ঘরের দ্বার রুদ্ধ করে শিক্ষা দিতে চাই—তাইতে আমাদের দেশের ছেলের শিক্ষাটা বরণ কোম্পানির ছাঁচে ফেলা ইটের মত—সবগুলাই সমান পার্থক্য কিছুই নাই। আবহাওয়া—প্রকৃতি—বিশ্ব এই সব বাদ দিয়ে শিক্ষা হয় না। আমাদের দেশের শিক্ষা আগে গুরুর গৃহে হইত তখন শিক্ষা থেকে কোনও জিনিসই বাদ পড়িত না। এখন আবার সেই শিক্ষার প্রচলন হওয়াটা দরকার হয়েছে। অবশ্য কথা হইতেছে দেশ কাল পাত্র সবই দেখিতে হইবে। আমেরিকায় এখন মুক্ত বায়ুতে বিদ্যালয় (Open Air School) স্থাপনের একটা মস্ত হুড়াহুড়ি পড়িয়াছে। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে। এখন অবশ্য এইটুকু বলিলেই চলিবে যে আকাশ, আলো, বাতাস, জল প্রকৃতি এ সব বাদ দিলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে না—হইতে পারেই না। আমেরিকার কথা ছাড়িয়া দিয়া আমাদের ঘরের কথা বলাই ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত। বোলপুরে যে বিদ্যালয় আছে সেইটারই উদ্দেশ্য এই রকম কিন্তু এই বিদ্যালয়টা একঘরে হইয়া রহিয়াছে এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি যতদূর পড়া উচিত ছিল ততদূর পড়ে নাই। বাঙ্গালা ছাড়া পাঞ্জাবেও এইরূপ একটি আধটি বিদ্যালয় আছে।

লঙ্কাদ্বীপে বা সিলোনে এখন School Garden পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এখন সেখানে ২৮৭টি স্কুল এ প্রণালীতে চলিতেছে।

উদ্যানে, মুক্ত বাতাসে, প্রকৃতির সঙ্গে শিক্ষাটা যেমন হয় সে রকম আর কোথাও হয় না। এই খানে বাস্তবিকই হৃদয়ের দুয়ার খুলিয়া যায়। দেবশিশুকে দেবভাব বাড়াইতে দাও তাহার প্রাণ ভরিয়া তৃষা হরিয়া আরো আরো আরো দাও প্রাণ; তার চোখে আরো আলো ঢাল এখানে কার্পণ্য করিও না। কবি বলিয়াছেন—

"To kiss the sun for pardon,
The song of bird for mirth,
One is nearer God's heart in
the garden
Than any where else on earth."

বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন "বালকদের উপযোগী সরল ও সুলভ পুস্তকের প্রচার চেষ্টা করিতে হইবে, তাহার সাহায্যে বালক-হৃদয়ে মানবত্বের সবল অঙ্কুর রোপণ করিতে হইবে। বালকের উদ্দামতা তদীয় জীবনের ঔদ্ধত্য ও

শৃঙ্খলাবর্জ্জনোন্মুখতা যাহাতে স্বধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত হইয়া তাহার জীবন সংস্থান গঠনের সহায়করূপে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে তদ্ধেতু আমাদিগকে আপ্রাণ চেষ্টায় রত হইতে হইবে।" কথাগুলা খুব খাটি। বালকদিগকে শিক্ষা দিবার উপযোগী বই খুব কম। এসব বই কেন হয় না আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য—Central Text Book Committee বোধ হয় এই সব বই প্রচলনের চেষ্টা করেন না। না হইলে হয়ত এতদিনে হইত। আমার বোধ হয় উক্ত কমিটি এইসব বই প্রচলনে বাধা দেন। আবার দুই চারি খানা ভাল বই যা আছে স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ তাহা ভয়ে চালাইতে চাহেন না। এ সম্বন্ধে আমার অনেক কথা বলিবার আছে বারান্তরে বলিব। তবে শিক্ষার জন্য উপযুক্ত বই নিশ্চয়ই চালাইতে হইবে। শিশুহৃদয় বিকশিত করিবার জন্য নানা সদ্‌গুণের ভাবপূর্ণ পুস্তক চালাইতে হইবে। যাহা ভাল তাহাই শিক্ষা দিতে হইবে তবেই আমাদের শিশুদের পরিণত বয়সে শিক্ষা হইবে। দেশীয় বীরের বীরত্ব কাহিনী ছেলেদের পড়াইতে হইবে। ইহাতে ভয় পাইবার কি আছে? আমাদের সম্রাট স্বয়ং স্বহস্তে আমাদের দেশের বীরগণকে V. C. medal পরাইয়া দিতেছেন নিজের মা, বাপ, ভাই, বন্ধু, দেশকে ভালবাসে না কে? দেশের যা ভাল তা শুনিতে বা শুনাইতে ভয় কি? আমি এখনও পর্য্যন্ত শুনি নাই যে কোনও ইংরাজ নেলসন-কাহিনী পড়িবার সময় আঁৎকাইয়া উঠিয়াছেন কিম্বা কোন ফরাসী নেপোলিয়ান-কাহিনী পড়িবার সময় মূর্চ্ছা গিয়াছেন।

সৎশিক্ষার অভাবে উপযুক্ত খেলার অভাবে healthy recreationএর অভাবেই আজ আমাদের দেশের ছেলেরা নানা প্রকার আমোদ প্রমোদে রত হইতেছে। সত্য সত্যই আমাদের ব্রহ্মচর্য্যের ঘ্যাণঘ্যাণানী বাঙ্গালার হাটে, পথে, ঘাটে মাঠে চলিতেছে। ছেলেরা যদি প্রাণ ভরিয়া খেলিতে পায় যদি বেদম হওয়া পর্য্যন্ত দৌড়াইতে পায়, যদি সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত তাকে দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে হয় তা হইলে আর তাহার মধ্যে কোনও প্রকার কদর্য্য ব্যাধি ঢুকিবে না। আর যদি তাহাকে শান্ত শিষ্ট করিয়া ঘরে বসাইয়া রাখ পৃথিবীর যা কিছু জঘন্য ব্যাধি আছে সবই আসিয়া তাহাকে আধার করিয়া বসিবে এই কথা একেবারে ধ্রুব সত্য। হৃদয় বৃত্তির বিস্তৃতি না পাইয়াই এসব জঘন্য ব্যাধি আসিয়াছে। তাহাকে শাসনের দড়ি দিয়া আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধিও না। মুক্তি দাও সে ঘুরিয়া বেড়াক তাহা হইলেই সে সুস্থদেহ ও সবল মন লইয়া উঠিবে। তাহাকে আলোকে ও রৌদ্রে ঘুরিতে দাও কুজ্ঝটিকায় ও "লু"তে নয় তাহা হইলেই সে ঠিক সোজা হইয়া উঠিবে। অঙ্কুর যে দিকে আলো দেখে সেই দিকেই যায়—হৃদয়অঙ্কুরও তাই করে। আলোর অভাবেই তাহা আগাছায় পরিণত হয়। তাহাকে এই মহামন্ত্র শিখাও—

বিপদে মোরে রক্ষা কর
এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ তাপে ব্যথিত চিতে
নাই বা দিলে সান্ত্বনা
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।

আমি আমার বক্তব্য শেষ করিয়াছি। এক্ষণে গুণিগণ যদি বঙ্গের বাল্য-জীবন সমস্যা লইয়া মতামত প্রকাশ করেন এবং আলোচনা করেন তাহা হইলে জনসাধারণের বড়ই উপকার হয়। কি উপায়ে আমরা উঠিতে পারি আমাদের মেরুদণ্ড সোজা হয় এইটা আমার মতে মস্ত প্রশ্ন। আর এইটার সমাধান হওয়াই প্রধান আবশ্যক।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পল্লীরাণী

(১)

চোখ্‌ভরা কার স্নেহের দৃষ্টি বুক্‌ভরা কার ভালবাসা ?
মুখভরা কার মধুর বাণী প্রাণভরা কার তরুণ আশা ?
সূর্য্য কাহার তেজের সারে'—সকাল বিকাল সোণার ধারা—
ছড়িয়ে দে' যায়,—গড়িয়ে তোলে কাহার রূপের মোহ কারা ?
নিশীথে কার চাঁদের আলো স্বপন র'চে বুকের'পরে— ?
'শিউরে' উঠে দেহটী কার গভীর রাতের বাঁশীর স্বরে ?
(কোরাস্) সে যে আমার পল্লীরাণী—তরুবল্লীর ছায়াঘেরা,
সারা দেশের প্রাণটী যাহার স্নেহাঞ্চলে আছে বেড়া ॥

(২)

ধানের ক্ষেতের সোণার আঁচল দোলায় কাহার মৃদুল হাওয়া ?
ফুরায় না কার গাছের তলায় রাখালগণের গোঠের গাওয়া ?
দুপুর বেলার রোদে কাহার খেলার মাঠে শিশুর মেলা ?
লক্ষ্মী কাহার অঙ্গে অঙ্গে প্রীতির সঙ্গে করেন খেলা ?
কাহার ক্ষুদ্র নদীর বক্ষ পল্লীবধূর হাস্য রোলে—
ভরে' ওঠে সকাল বিকাল নেচে ওঠে হাওয়ার দোলে ?
(কোরাস্) সে যে আমার পল্লীরাণী, তরুবল্লীর ছায়াঘেরা—
সারা দেশের প্রাণটী যাহার স্নেহাঞ্চলে আছে বেড়া ॥

(৩)

আঙ্গিনা কার অঙ্গনাদের—পুণ্যব্রতের মহোৎসবে,—
পূর্ণসদা,—শিশুর হাস্যে ? অভ্যাগতের উচ্চরবে ?
কাহার উদার বক্ষমাঝে,—পক্ষপাতের নাইক' ছায়া,—
ধনীর সনে দীনের মনের—সমান প্রীতি সমান মায়া ?—
কাহার কোলের সকল ছেলে সকল বাড়ীর সকল কাজে—
সমান সুখে সমান দুঃখে যুক্ত সদা—মুক্ত লাজে ?
(কোরাস্) সে যে আমার পল্লীরাণী তরুবল্লীর ছায়াঘেরা,
সারা দেশের প্রাণটী যাহার স্নেহাঞ্চলে আছে বেড়া ॥

(৪)

মণ্ডপে কার বিকাল বেলা, বৃদ্ধগণের শ্রদ্ধাভরা—
মধুর কণ্ঠে বেজে ওঠে পুরাণ কথার 'সপ্তস্বরা' ?
কাহার সাঝের কাসর ঘণ্টা গভীর ছন্দ জাগায় প্রাণে,
বেঁধে দিয়ে স্বরটী আমার বিশ্ববীণার মধুর তানে ?
কাহার সরল শান্তিমাখা, মুক্ত প্রাণের উৎসজলে,—
বিশ্ববাসীর সুপ্ত আশা তপ্তস্রোতে পড়্ছে গলে' ?
(কোরাস্) সে যে আমার পল্লীরাণী তরুবল্লীর ছায়াঘেরা
সারা দেশের প্রাণটী যাহার স্নেহাঞ্চলে আছে বেড়া ॥

শ্রীকালীকৃষ্ণ সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী।

দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ইতিহাস

ভারতীয় জনসংখ্যা

দক্ষিণ আফ্রিকাতে সর্ব্বশুদ্ধ ১৪৯৭৯১ জন ভারতবাসী নিবাস করেন। উঁহাদের মধ্যে ৯৩৮৮৬ জন পুরুষ ও ৫৫৯০৫ জন স্ত্রীলোক। নেটাল প্রদেশে ৮০১৬০ জন পুরুষ আর ৫২৮৭১ জন স্ত্রী একত্রে ১৩৩০৩১ জন; ট্রান্সভালে ৮০৫০ জন পুরুষ আর ১৯৯৮ জন স্ত্রী, একত্রে ১০০৪৮ জন; কেপকলোনীতে ৫৫৯০ জন পুরুষ আর ১০১৬ জন স্ত্রী একত্রে ৬৬০৬ জন; অরেঞ্জফ্রিষ্টেটে ৮৬ জন পুরুষ আর ২০ জন স্ত্রী একত্রে ১০৬ জন; ভারতীয় নরনারী অধিবাস করেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ১১৫৪৮০ জন হিন্দু, ২০৮৯২ জন মুসলমান, ৩১৪ জন পারসী, এবং ১২৯৭৮ জন অন্য সম্প্রদায়াবলম্বী ভারতীয়ের বাস। দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্মগ্রহণকারী পুরুষের সংখ্যা ৩২৪০৮ ও স্ত্রীর সংখ্যা ৩১৩৬৮ একত্রে ৬৩৭৭৬ জন। আসাম প্রদেশে জন্মগ্রহণকারী পুরুষের সংখ্যা ৩০ আর স্ত্রীর সংখ্যা ১ একত্রে ৩১ জন। বাঙ্গালা দেশে জন্মগ্রহণকারী পুরুষের সংখ্যা ১০৬৬২ আর স্ত্রীর সংখ্যা ৫৫০৩ একত্রে ১৬১৬৫ জন। বোম্বাই প্রদেশে জন্মগ্রহণকারী পুরুষের সংখ্যা ৯৭১৫ আর স্ত্রীর সংখ্যা ১১৬৮ একত্রে ১০৮৮৩ জন। ব্রহ্মদেশে জন্মগ্রহণকারী পুরুষের সংখ্যা ৩০ আর স্ত্রীর সংখ্যা ৩ একত্রে ৩৩ জন। মধ্যপ্রদেশে ও বরারের জন্মগ্রহণকারী পুরুষের সংখ্যা ৪৪, আর স্ত্রীর সংখ্যা ৫ একত্রে ৪৯ জন। পূর্ব্ববঙ্গের জন্মগ্রহণকারী পুরুষের

সংখ্যা কেবল ৩ জন মাত্র। মান্দ্রাস প্রদেশে জন্মগ্রহণকারী পুরুষের সংখ্যা ২৭৮৪৭ আর স্ত্রীর সংখ্যা ১৩৬৬৭ একত্রে ৪১৩১৪ জন। পঞ্জাব প্রদেশে জন্মগ্রহণকারী পুরুষের সংখ্যা ৩১২ ও স্ত্রীর সংখ্যা ৩০ একত্রে ৩৪২ জন। যুক্তপ্রদেশ, আগরা ও অযোধ্যা প্রদেশে জন্মগ্রহণকারী পুরুষের সংখ্যা ১৮৮ ও স্ত্রীর সংখ্যা ৭৮ একত্রে ২৬৫ জন। অজানিত প্রদেশে জন্মগ্রহণকারী পুরুষের সংখ্যা ১১৯৬৫ ও স্ত্রীর সংখ্যা ৩৯৫৬ একত্রে ১৫৯২১ জন। অন্য প্রদেশে জন্মগ্রহণকারী পুরুষের সংখ্যা ৬১২ ও স্ত্রীর সংখ্যা ৩৫৭ একত্রে ১০০৯ জন। বাঙ্গালা প্রদেশের সংখ্যা, বাঙ্গালা ও বিহার এই দুই মিলাইয়া ধরা হইয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকাতে ভারতীয় বিবাহিত পুরুষের সংখ্যা ৩৫৮২৪ ও বিবাহিতা স্ত্রীর সংখ্যা ২৬৮৬৮ একত্রে ৬২৬৯৩ জন। অবিবাহিত পুরুষের সংখ্যা ৫৫৪৬২ ও স্ত্রীর সংখ্যা ২৬৮৪৪ একত্রে ৮২৩০৬ জন। মৃতদার পুরুষের সংখ্যা ২২৪৫ ও বিধবা স্ত্রীর সংখ্যা ২০৯৯ একত্রে ৪৩৪৪ জন। স্ত্রীর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্নকারী পুরুষের সংখ্যা ১২২ ও স্বামীর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্নকারিণী স্ত্রীর সংখ্যা ৪৪ একত্রে ১৬৬ জন। অজ্ঞাত পুরুষের সংখ্যা ২৩৩ ও স্ত্রীর সংখ্যা ৫০ একত্রে ২৮৩ জন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ২০ বৎসরের নীচে পুরুষের সংখ্যা ৩২৬৮৬ ও স্ত্রীর সংখ্যা ২৯৫৩৭ একত্রে ৬২২২৩ জন। ২০ হইতে ৩৯ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের পুরুষের সংখ্যা ৪৪৬৫০ ও স্ত্রীর সংখ্যা ২০৫৭৩, একত্রে ৬৫১৯৩ জন। ৪০ হইতে ৫৯ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের পুরুষের সংখ্যা ১৪১১৪ ও স্ত্রীর সংখ্যা ৪৮৫৭ একত্রে ১৮৯৭১ জন। ৬০ বৎসরের অধিক বয়সের পুরুষের সংখ্যা ২৪২২ ও স্ত্রীর সংখ্যা ৯৫৮ একত্রে ৩৩৮০ জন। অজানিত বয়সের পুরুষ সংখ্যা ১৪ ও স্ত্রীর সংখ্যা ১০ একত্রে ২৪ জন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় কেবল নিজের নিজের কাজ করে, এমন পুরুষের সংখ্যা ৬৭৫ ও স্ত্রীর সংখ্যা ৫৪ একত্রে ৭২৯ জন। ঘরের কাজ করে এমন পুরুষের সংখ্যা ৭৭৫৭ ও স্ত্রীর সংখ্যা ২৩৫৮২ একত্রে ৩১৩৩৯ জন। ব্যবসা বাণিজ্য করে এমন পুরুষের সংখ্যা ৯৫৬৩ ও স্ত্রীর সংখ্যা ৭৪৪, একত্রে ১০৩০৭ জন। চাষের কাজ করে এমন পুরুষের সংখ্যা ২৯১৮৬ ও স্ত্রীর সংখ্যা ৭০৫২ একত্রে ৩৬২৩৮ জন। কারিকরের কাজ করে এমন পুরুষের সংখ্যা ২১০১০ ও স্ত্রীর সংখ্যা ৮৫১ একত্রে ২১৮৬১ জন। অনিশ্চিত কাজ করে এমন পুরুষের সংখ্যা ৩১৬ ও স্ত্রীর সংখ্যা ৮৩৩ একত্রে ১১৪৯ জন। পরের অধীনে কাজ করে এমন পুরুষের সংখ্যা ২৪৬৯১ ও স্ত্রীর সংখ্যা ২২৬০০ একত্রে ৪৭২৯১ জন। অজানিত কাজ করে এমন পুরুষের সংখ্যা ৬৮৮ ও স্ত্রীর সংখ্যা ১৮৯ একত্রে ৮৭৭ জন।

এই গণনাতে যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে জন্মগ্রহণকারী ভারতবাসীর সংখ্যা যে কম হইয়াছে, তাহা ভ্রমমূলক বলিয়া মনে হয়। কেননা এই উভয় প্রদেশেরই অধিক লোক এখানে বাস করে। ইহা শ্বেতাঙ্গ গণনাকারিগণের অসাবধানতার জন্যই বোধহয় এইরূপ গণিত হইয়াছে। এই গণনা সন ১৯১১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাসের রিপোর্ট অনুযায়ী দেওয়া হইয়াছে।

আড়কাটীগণের কুহক জাল

বিদেশে কুলী প্রেরণের ভয়ঙ্কর প্রথা

অনেক অভাগা ভারতবাসীর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। ভারতবর্ষে মহামারী, বিসূচিকা ও দুর্ভিক্ষ তো লাগিয়াই রহিয়াছে; আর এই ভয়ানক বিপদের জন্য দেশের যে দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহা বর্ণন করিতে লেখনী কম্পিত হয় আর মুখ হইতে এই শোক বাক্য নির্গত হয় :—

অন্ন বিনা অর্দ্ধ মৃত,
চিন্তাজ্বরে জীর্ণ।
অস্থি মাংস একত্রিত,
ভোজন বিনা তনুক্ষীণ।

যেখানে পৃথিবীর ভিন্ন দেশ আজ উন্নতির পথে বেগে ধাবমান হইতেছে, সেখানে আমাদের হতভাগ্য দেশ কেবল অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছে। সরকারী কর ও জমিদারের অত্যাচারে কত কৃষক না খাইতে পাইয়া মরিতেছে। ভারতের ইতিহাস বিবেচনা পূর্ব্বক পড়িলে জানা যাইবে যে, ভারতবর্ষে দিন দিন দুর্ভিক্ষের প্রকোপ প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছে। সন ১৮০১ খৃষ্টাব্দ হইতে সন ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে দশ লক্ষ লোক না খাইতে পাইয়া মরিয়া গিয়াছে। সরকারী রিপোর্ট পড়িলে অবগত হওয়া যাইবে যে, সন ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে সন ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ছয়বার দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। এই দুর্ভিক্ষে ৫০ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দুর্ভিক্ষ এতদপেক্ষা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সকলকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়াছিল। শেষ ২৫ বৎসরে ভারতবর্ষে ২৫ বার দুর্ভিক্ষাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল এবং তাহাতে প্রায় ২ কোটী ৬০ লক্ষ লোক ভস্মীভূত হইয়াছিল।

বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট সার চার্লস এলিয়ট যে সময় যুক্তপ্রদেশ বন্দোবস্ত করিবার জন্য শাসক নিযুক্ত হন, সে সময় তিনি দেশবাসীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, "বৃটিশ ভারতে কৃষকগণের মধ্যে অর্দ্ধেক লোক বৎসরের মধ্যে একদিনও পেট ভরিয়া খাইতে পায় না।" ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে আধা সরকারী সমাচার পত্র 'পাইওনীয়র' ভারতবর্ষের দরিদ্রতা বিষয়ে লিখিয়াছিলেন যে "বৃটিশ ভারতে প্রায় ১০ কোটী অধিবাসী অত্যন্ত দরিদ্রাবস্থায় দিন অতিবাহিত করে।" এই হিসাব দেখিলে প্রতীত হইবে যে, ভারতবর্ষ কেবল দুর্ভিক্ষের নিবাসভূমি। এইরূপ দুঃসময়ে ভারতবাসীর বিদেশে কুলী হইয়া যাওয়া স্বাভাবিক। একেতো ভারতবাসী দুর্ভিক্ষের আগুনে সর্ব্বদা জ্বলিতে থাকে, তার উপর এই সকল সরল প্রাণ কৃষককে ভুলাইয়া বিদেশে প্রেরণ করিবার জন্য আড়কাটীগণ কুহক-জাল বিস্তার করিয়া রাখে। এই আড়কাটীগণ ভারতবাসীকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া আপন বশে আনয়ন করে। হতভাগ্য ভারতবাসীকে বলা হয় যে, বিদেশে তোমাকে খুব বড় কাজ দেওয়া হইবে। হয় সরদার হইবে নয় জমাদার হইবে। এই প্রকার মিষ্ট কথা বলিয়া বেচারা কৃষককে নিজের বশ করিয়া লয় এবং গোলামের ন্যায় বিক্রয় করিয়া আপনাদের স্বার্থ সিদ্ধি করে।

এই কুলী-প্রথায় পাশ বদ্ধ হইয়া কত ভদ্র ঘরের ছেলে, কত উচ্চ বংশের সন্তান, এখানে চলিয়া আসে। কত ছেলে ঘরে ঝগড়া করিয়া কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থানে চলিয়া আসে এবং তথায় আড়কাটীর জালে বদ্ধ হইয়া বিদেশের পোষা পাখী হইয়া

যায়। উহাদের পিতা মাতা আপনাদের পুত্রগণের বিয়োগে নানারূপ পরিতাপ করিতে থাকে। কেহ কেহবা সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিয়া অতিশয় কষ্ট সহ্য পূর্ব্বক সাধারণ রাজকর্ম্মচারী হইতে উচ্চাধিকারী পর্য্যন্ত আবেদন নিবেদন করার পর আপনার সন্তানগণকে ফিরাইয়া পায়। কিন্তু অধিকাংশ যুবকের ঠিকানা পাওয়াই মুস্কিল হয়।

যদিও গভর্ণমেণ্টের এরূপ ব্যবস্থা রহিয়াছে যে, কোনও কুলী তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদেশে প্রেরিত হইতে পারিবে না, তথাপি কুলীগণকে একত্র করিবার পর আড়কাটীগণ নানারূপ ছল কপট দ্বারা কুলীদের প্রত্যেককে নূতন কথা শিখাইয়া লয়। প্রথমে যখন কুলীকে ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়, তখন তাহাকে বিদেশের সুখ, দুঃখের কথা শুনান হয়। একেতো ঐ অবোধ কুলী কঠিন সর্ত্তসমূহ কিছুই বুঝিতে পারে না, তার উপর আড়কাটীগণ তাহাকে প্রথমেই শিখাইয়া পড়াইয়া রাখে; সুতরাং ম্যাজিষ্ট্রেটের কথিত প্রত্যেক সর্ত্তই সে স্বীকার করিয়া লয়। এই প্রকার জালে ফাঁসিয়া গিয়া ভারতীয় মজুর বিদেশে প্রেরিত হয়। ইহাদের মধ্যে কোন কোন মজুরের, মা, বাপ, সন্তান প্রভৃতি পরিবারবর্গের সহিত সারা জীবনের জন্য সম্বন্ধ ছুটিয়া যায়।

নেটাল প্রদেশে ভারতীয় মজুর

সন ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে নেটালকে কেপকলোনী হইতে পৃথক করা হয়। এখানকার ইংরাজ অধিবাসিগণ অনুমান করেন যে, পূর্ব্ব দেশে উৎপন্ন প্রায় সমুদয় জিনিস এখানে উৎপন্ন হইতে পারে। ইক্ষু, চা প্রভৃতির চাষ তথায় দিন দিন বাড়িতে থাকে, কিন্তু মজুরের অভাবে তাহারা অতিশয় কষ্ট অনুভব করিতে থাকে। স্থানীয় কাফ্রিগণ শ্বেতাঙ্গগণকে বেশ করিয়া চিনিতে পারিয়াছিল; সুতরাং তাহারা উহাদের জমীতে মজুরী করিতে ভালবাসিত না। এজন্য নেটালীয় শ্বেতাঙ্গগণের দৃষ্টি ভারতবাসিগণের উপর পতিত হয়। উদ্যোগী ভারতবাসিগণের মেহনত দ্বারা লাভ উঠাইবার প্রলোভন সামলাইতে ইঁহারা অপারগ হন। ইঁহাদের চেষ্টাতে নেটাল গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে ভারত গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হয় যে, ভারতবর্ষ হইতে সর্ত্তবদ্ধ করিয়া মজুরগণকে এখানে প্রেরণ করা হউক। অনেক লোকের ধারণা যে, ভারতবাসিগণ স্বেচ্ছায় এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষ ভাবে প্রণিধান করিলে দেখা যাইবে যে ইহার মূলে কোন সত্যতা নাই। নেটালস্থ শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের কথনানুযায়ী নেটাল গভর্ণমেণ্ট তথায় মজুর প্রেরণ করিবার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টকে বাধ্য করেন। এই বিষয়ে সর্ত্ত ছিল যে, কোন মজুর পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত কোনও শ্বেতাঙ্গ জমিদারের অধীনে কার্য্য করিলে পর স্বাধীন হইয়া যাইবে এবং নেটালে বসবাস করিতে পারিবে। এমনকি জমি জায়গা দেওয়ারও প্রলোভন দেখান হয়। এই প্রকার লোভে সরল ভারতীয় মজুর নেটালে আসিতে আরম্ভ করে। এক্ষণে কেবল নেটালে ভারতবাসীর সংখ্যা ১৩৩০৩১ জন। ইহাদের মধ্যে ৩২ হাজার সর্ত্তবদ্ধ মজুর। আর ৩২ হাজার মজুর, সর্ত্ত সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে কিম্বা পূর্ব্বে নেটালে সর্ত্তবদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল এমন লোকের সন্তান।

মজুরদের উপর অত্যাচার

যে ভারতবাসী সর্ত্তবদ্ধ হইয়া মজুরী করিবার জন্য নেটালে আসে, তাহাকে পাঁচ বৎসর

পর্য্যন্ত শ্বেতাঙ্গ কৃষকের অধীনে কাজ করিতে হয়। এখানে বেচারা মজুর নানারূপ কষ্টে পতিত হয়। শ্বেতাঙ্গ কৃষকের আদেশানুযায়ী অনেক রকম কার্য্য করিতে হয়। কোন কাজ করিতে অস্বীকার করিলে শ্বেতাঙ্গ কৃষক চাবুক দিয়া মারিতে থাকে। প্রত্যেক মজুরকে সারাদিনের জন্য ঠিকায় কাজ করিতে হয়। এই ঠিকার পরিমাণ এতবেশী হয় যে, বড় বড় জো.ান মজুরও সমস্ত দিনে পুরা কাজ করিতে সমর্থ হয় না। শ্বেতাঙ্গ কৃষক ভারতীয় মজুরকে 'ড্যাম ফুল ব্লাডী কুলী' বলিয়া গালি দিয়া থাকে। মজুরগণ সর্ত্তবদ্ধ হইয়া মজুরী করিতে আসায় শ্বেতাঙ্গ কৃষকগণের হস্তে বিক্রীত হইয়া যায়। শ্বেতাঙ্গ কৃষকগণ ইহাদের উপর ইচ্ছামত অত্যাচার করিতে থাকে। কাজ না করিতে পারিলে ইহাদিগকে অপমানিত করা হয়। সর্দ্দার ও সাহেবের লাথি খাইতে হয়। পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত পরাধীন মজুরগণের উপর তুলসীদাস গোস্বামীর এই দোঁহা ঠিক খাটে :—

"পরাধীন স্বপনেও সুখ নাহি-পায়"

নেটালে চিনি প্রস্তুত করিবার জন্য বড় বড় কারখানা আছে। তাহাদের মালিক প্রায় সমস্তই ইয়োরোপীয়ান। মজুরগণকে আকের জমিতে সমস্ত দিন কাজ করিতে হয়। কখন কখন রাত্রিকালেও ইহাদের দ্বারা কাজ করান হয়। মজুরগণকে ময়লার টোকরি মাথায় করিয়া লইয়া গিয়া জমিতে ঢালিতে হয়। বৃষ্টি হইলে, ঐ টোকরির ময়লা চুয়াইয়া এই হতভাগ্যগণের মুখে ও সমস্ত শরীরের উপর টপ্ টপ্ করিয়া পড়িতে থাকে। কাজে কিছু ভুল হইলে দাঁত ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় অথবা বেত, লাথি কিম্বা চাবুক দিয়া খুব প্রহার করা হয়। এই অমানুষিক অত্যাচারে মজুরগণের জীবন অতিশয় ভারাবহ হইয়া উঠে। কতজন সমুদ্র জলে লাফ দিয়া, কতজন গলায় দড়ি দিয়া আপন প্রাণ পরিত্যাগ করে। কেহ কেহ অন্যরূপে নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিয়া শ্বেতাঙ্গ কৃষকের হাত হইতে মুক্তিলাভ করে। কেহ কেহ বা এই ঘৃণিত অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া আপনাদের হাত, পা কাটিয়া ফেলে।

ভারতীয় মজুরগণকে মাসিক বেতন স্বরূপ পাঁচ টাকা করিয়া দেওয়া হয় এবং খাইবার জন্য চাউল, ডাইল ও নুণ দেওয়া হয়।

ভারতীয় মজুরগণের উন্নতি

ভারতীয় মজুর সর্ত্ত শেষ করিয়া স্বাধীনভাবে ব্যবসাতে মনোনিবেশ করে। অধিকাংশ মজুরই চাষের কাজ করিতে থাকে। কেহ কেহ ছোট ছোট দোকান করিয়া এবং কেহ কেহ বা পরওয়ানা লইয়া ফেরি-করিয়া জিনিস বিক্রয় করিতে থাকে। মোটের উপর প্রত্যেক ভারতবাসী আর্থিক উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। আস্তে আস্তে ইহাদের উন্নতি হইতে থাকে। ইহারা অনেক প্রকারে রোজগার করিয়া উপার্জ্জিত টাকা নানা রকমে সুদে খাটাইতে আরম্ভ করে। ভারতবাসী আফ্রিকার অধিবাসীর চেয়ে উদ্যোগী, পরিশ্রমী ও চতুর হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য ইহারা খুব ভালরকমে বুঝিতে পারে। তজ্জন্য ইংরাজ ব্যবসাদারগণের সহিত ইহাদের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। ইহারা কম লাভ লইয়া সস্তাদরে জিনিস বিক্রয় করে। ভারতবাসী বাল্যাবস্থা হইতেই পরিশ্রমী ও অল্পব্যয়ী হয়। উহাদের সমুদয় অভাব অল্প অর্থে পরিপূরণ হয়। এজন্য এখানকার প্রায় ছোট বড় ব্যবসা ইহাদের

হাতে আসে। আর সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় ধনের এক সর্ব্বপ্রধান অংশ ইহাদের নিকট উপস্থিত হয়। ইহারা সহস্র সহস্র বিঘা জমির অধিপতিত্বে পরিণত হয়।

ভারতীয় মজুরগণ অল্পদিনের মধ্যে আশাতীত উন্নতি করিয়া লয়, দেশ ধনধান্যে পরিপূর্ণ হয়। যেখানে আগে বন্যজন্তু বিচরণ করিত, সেখানে এখন সবুজবর্ণের ক্ষেত্র সমূহ পবন হিল্লোলে নাচিতে থাকে; আম্র, দ্রাক্ষা, রতালু, সেও প্রভৃতি বৃক্ষ সমূহ উদ্যানাকারে শোভা পাইতেছে; কপি, সীম, আলু ও আদ্রক প্রভৃতি নানা রকমের দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয়। এই সব মজুরগণের পরিশ্রমে দক্ষিণ আফ্রিকার মত অসভ্য জঙ্গলীদেশও সুসভ্য মনুষ্যের অধিবাসের উপযোগী হইয়াছে। ভারতবাসিগণের উদ্যোগে নেটাল আপন পায়ের উপর দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছে।

শ্বেতাঙ্গগণের বিদ্বেষ

যে সময় এ দেশ নিবিড় বনে আচ্ছাদিত ছিল, বৃহৎ বৃহৎ সিংহের ভীম গর্জ্জনে ও হস্তিগণের বৃংহিত ধ্বনিতে নিস্তব্ধ অরণ্যানী ভয়ানক কোলাহলময় হইয়া উঠিত; যে সময় এই ভয়াবহ বন প্রদেশে কাহারও প্রবেশ করিবার সাহস মাত্রও ছিল না, শস্য, ফলমূল প্রভৃতি মনুষ্য খাদ্যের নামমাত্রও কোথাও দৃষ্ট হইত না, সেই সময় ভারতীয় মজুরগণ অসীম সাহসের সহিত জঙ্গল কাটিয়া শস্যক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছে। ইহাদের দ্বারা ধীরে ধীরে সভ্যতার প্রচার হইতে আরম্ভ হয়। ঐ সময় শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীর দৃষ্টিতে ভারতবাসী সব রকমে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ ছিল। শ্বেতাঙ্গগণ ভারতীয়গণকে নানা প্রকারে উৎসাহিত করিত। কিন্তু যেই দেশ ধনধান্যে পূর্ণ হইয়া উঠিল, সব রকমের আবশ্যক জিনিস মাত্রই উৎপন্ন হইল ইউরোপ হইতে আগত দরিদ্র শ্বেতাঙ্গের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে থাকিল, অমনি ইংরাজগণের সুর বদলাইয়া গেল। তাহারা ভারতবাসীকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিল। উহাদের স্বার্থ দৃষ্টিতে ভারতবাসী কণ্টকের ন্যায় বিদ্ধ হইতে লাগিল। শ্বেতাঙ্গগণের এই অত্যাচার ও বিদ্বেষের কারণ স্বার্থবুদ্ধি; আর এই স্বার্থপ্রণোদিত বুদ্ধির দ্বারাই সংসারের অধিকাংশ মনুষ্য পরিচালিত। ইহার জন্য যে কেবল দক্ষিণ আফ্রিকার গোরাগণই দোষী, তাহা নহে। এখানকার গোরাদিগের ন্যায় আমেরিকানগণেরও ভারতবাসীর আগমন অরুচিকর বলিয়া বোধ হইতে থাকে। এই হেতু ইহারা প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করে। এখানকার গোরাদিগের চেয়ে কোন কোন স্থানে আমেরিকানগণের বেশী পরিমাণে স্বার্থ জড়িত ছিল। প্রথম নিয়মিত আমেরিকান আন্দোলনকারী মিঃ ফৌলরের উক্তির সারাংশ এই যে, "পূর্ব্ব ও পশ্চিম কখনও এক হইতে পারে না; এই হেতু এসিয়াবাসীর কর্ত্তব্য যে তাহারা যেন কখন আমেরিকান ভূমির উপর পদার্পণ না করে।" এ কথার আসল উত্তর এই যে, আমেরিকানগণেরও কখন চীন, জাপান ও ভারতবর্ষে প্রবেশ না করা উচিত। যদি আপনার দেশের লোক আপনার দেশেই থাকে, তাহা হইলে সংসার হইতে এই বাদ বিসম্বাদ চিরকালের জন্য নিবৃত্তি হইয়া যায়।

ভারতবাসিগণের জাগরণ

সন ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে নেটাল গভর্ণমেণ্ট ভারতীয়গণের বিরুদ্ধে একটি আইন প্রস্তুত করিতে চাহেন। ভারতবাসিগণকে প্রচলিত

অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া নূতন বিধান প্রস্তুত করা এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল। এই সময় ভারতমাতার উপযুক্ত সুপুত্র লোকমান্য মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী নেটালে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই আইনের সম্বন্ধে ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বহুদিন হইতে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ভারতবাসীর নবজাগরণের সময় উপস্থিত হয়। উহাদের আপনার ভালমন্দর দিকে দৃষ্টি পড়ে। উহারা একটি বৃহৎ সভা আহ্বান করিয়া নেটালে গভর্ণমেণ্টের নিকট তারযোগে এই আইন সম্বন্ধে আপনাদের অপ্রসন্নতা জ্ঞাপন করে। এই আইনের প্রতিবাদ করিবার জন্য প্রতিনিধিও প্রেরিত হয়। এই আইন জারী হইবার উপক্রম হইয়াছিল, এমন সময় তখনকার প্রধান শাসনকর্ত্তা সার জোন রোবিন্স ভারতবাসিগণের প্রার্থনায় মনোযোগ প্রদান করিয়া আইনের কয়েকটী ধারা বদলাইয়া দেন। নেটালের সংবাদপত্র সমূহে ভারতবাসিগণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। স্থানীয় ভারতবাসিগন লোকমান্য গান্ধীর অনুমতি অনুসারে দশ হাজার মনুষ্যের স্বাক্ষরিত এক খানি প্রার্থনা পত্র লর্ড রিপণের নিকট প্রেরণ করেন। ইহার পরিণাম এইরূপ হয় যে, সম্রাট এই আইন না মঞ্জুর করাতে ইহাকে চাপিয়া রাখা হয়। সর্ত্তে আবদ্ধ ভারতীয় মজুর এক প্রকার গোলামীর নরকে পচিতে থাকে। এই প্রকার প্রবল আন্দোলন করাতে উহাদের কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ হয় এবং আপনাদের কর্ত্তব্য পথে দণ্ডায়মান হয়। লোকমান্য গান্ধীর 'প্রযত্নে নেটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস' ও 'নেটাল ইণ্ডিয়ান এডুকেশনল্ এসোসিয়েসন' স্থাপিত হয়।

৩ পাউণ্ডের কর

ভারতীয়গণকে এই প্রকার উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে দেখিয়া গোরা অধিবাসীর মনে খলতা আসিয়া প্রবেশ করে। উহাঁরা ভারতবাসিগণের শ্রীবৃদ্ধি নষ্ট করিবার জন্য একদল প্রতিনিধিকে ভারতগভর্ণমেণ্টের নিকট এই অভিপ্রায়ে প্রেরণ করে যে, এখন হইতে যে সকল ভারতীয় মজুর সর্ত্তবদ্ধ হইয়া নেটালে আসিবে, তাহাদের সর্ত্ত সমাপ্তি হইলে পর স্বদেশে ফিরিয়া যাইবে। আর যদি এদেশে বাস করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্টকে ২১ পাউণ্ড অর্থাৎ ৩১৫ টাকা বার্ষিক কর স্বরূপ প্রদান করিতে হইবে। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনসাধারণ ঘোর আন্দোলন আরম্ভ করে। ভারতগভর্ণমেণ্টও এই অদ্ভুত প্রস্তাব স্বীকার করেন নাই। সমস্ত দেশে একটা কোলাহল পড়িয়া যায়। স্থানীয় গোরাগণের স্বার্থপরায়ণতা সকলের হৃদয়ঙ্গম হয়। ভারতীয়গণের প্রবল আন্দোলনেও শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরা আপনাদের হঠকারিতা পরিত্যাগ না করিয়া বরং এই প্রস্তাব স্বীকার করাইয়া লইবার জন্য ভারতগভর্ণমেণ্টকে বাধ্য করে। অবশেষে ভারত গভর্ণমেণ্টের পরামর্শে বার্ষিক কর ২১ পাউণ্ডের স্থলে ৩ পাউণ্ড হয়। সন ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ ধারা অনুযায়ী কোন ভারতীয় মজুর এদেশে আসিলে তাহাকে প্রতিবৎসর তিন পাউণ্ড হিসাবে গভর্ণমেণ্টকে কর প্রদান করিতে হইবে কিম্বা স্বদেশে চলিয়া যাইতে হইবে।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর ভারতবাসী প্রথম এদেশে আগমন করে। তখন কেবল তিন বৎসরের জন্য তাহাদের কার্য্য

করিবার সর্ত্ত ছিল। সর্ত্ত শেষ হইলে এখানে অধিবাস করিবার পুরা অধিকার তাহারা প্রাপ্ত হয়। তখন পর্য্যন্তও শ্বেতাঙ্গগণ তাহাদিগকে জমি প্রদান করিয়া উৎসাহিত করিত। এই প্রকার সর্ত্তবদ্ধ মজুরীর নিয়ম ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বজায় থাকে। ইহার পরে কিছুদিনের জন্য এই প্রথা রহিত করা হয়। এই প্রথা রহিত হওয়াতে নেটালের ব্যবসা সম্বন্ধে বিশেষ ক্ষতি হয়। এজন্য ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে এই নিয়ম পুনরায় জারী হয়। ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত নেটালের খুব উন্নতি হইতে থাকে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় বিবাদের সূত্রপাত হয়। ভারতীয় মজুরের এখানে আসা কেন বন্ধ হইবে না এ সম্বন্ধে একটি কমিশন নিয়োজিত হয়। কমিশন অনেক অনুসন্ধান করিয়া আপনাদের মত প্রকট করেন যে, ভারতীয় মজুর ব্যতিরেকে নেটালের কাজ চালান অসম্ভব। অবশেষে এই প্রথা যথাপূর্ব্ব রহিয়া যায়।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে পুনরায় বিরোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠে। এই বৎসরে ঔপনিবেশিক আইন অনুযায়ী ১৭ ধারার নিয়ম এই বলিয়া পরিবর্ত্তিত হয় যে, কোন ভারতীয় মজুর পাঁচ বৎসরের গোলামী হইতে খালাস হইলে স্বদেশে চলিয়া যাইবে কিম্বা ৪৫ টাকা করিয়া বার্ষিক কর প্রদান করিবে। ঐ সময়ে ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনেরল লর্ড ডফারিণও কর ধার্য্য সম্বন্ধে একমত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি দয়া করিয়া ইহা নির্ণয় করিয়া দিয়াছিলেন যে, যদি কোন ভারতবাসী কর প্রদান করিতে অসমর্থ হয় তবে তাহার উপর যেন ফৌজদারী অভিযোগ আনয়ন করা না হয়। ইহা প্রণিধানের যোগ্য যে, ঐ সময় কোন স্ত্রী কিম্বা বালকের উপর কর ধার্য্য হইবে এরূপ কিছু নির্ণয় হয় নাই।

করের জন্য দুর্দ্দশা

এই মারাত্মক করের জন্য ভারতীয়গণের দুর্দ্দশার একশেষ হয়। এই কর সম্বন্ধে "লণ্ডন টাইমস্" স্পষ্ট লিখিয়াছিলেন যে, "ইহা এক প্রকার গোলামী প্রথার সমতুল্য।" একখানি রেডিকল পত্র বলেন যে, "এই ভীষণ অন্যায় বৃটিশ প্রজার পক্ষে অপমানজনক।" যে সময়ে এই আইন পাশ হয়, সে সময় নেটালের অনেক সহৃদয় লোকও ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। নেটালীয় কমিশনের একজন সদস্য মিঃ জেম্স্ আর সৈণ্ডার্স, স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, "যদি তোমাদের মনে এতই অভিমান হয়, তবে মজুর আসা বন্ধ করিয়া দাও কিম্বা সর্ত্ত সমাপ্তি হইয়া যাইলে স্বাধীনতা প্রদান কর, নতুবা এরূপ ভাবে জুলুম করা ঘোর অন্যায় অত্যাচার।"

এই কর সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, যাহারা এগ্রিমেণ্ট সমাপ্ত হইয়া যাইবে, সে যদি স্বাধীনভাবে থাকিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে তাহাকে ৩ পাউণ্ড হিসাবে বার্ষিক কর প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু উক্ত মজুর যদি পুনরায় সর্ত্তবদ্ধ হইয়া মজুরী করিতে স্বীকার করে তাহা হইলে এই আইন তাহার উপর প্রয়োগ হইবে না অর্থাৎ সে বার্ষিক ৩ পাউণ্ডের মারাত্মক কর হইতে অব্যাহতি পাইবে। ইহার পরিণাম ফল এই হইবে যে, মজুরগণের কার্য্যের সর্ত্ত শেষ হইয়া গেলে ৩ পাউণ্ড হিসাবে বার্ষিক কর দিবার ভয়ে সে পুনরায় সর্ত্তবদ্ধ হইয়া মজুরী করিতে বাধ্য হইবে। এইরূপে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারের সর্ত্ত চলিতে থাকিবে। শেষ কথা, ভারতীয়

মজুর চিরকালের জন্য গোলামী শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে। ঐ সময় কথিত হয় নাই যে, স্ত্রী ও বালকের উপর কর নির্দ্ধারিত হইবে, কিন্তু এক্ষণে ১৬ বৎসরের অধিক বালকের উপর, এমন কি ১৩ বৎসরের অধিক বালিকার উপরও কর ধার্য্য হয়। অনুমান করুন একটি পরিবারে ৪ জন লোক বাস করে, তন্মধ্যে পুরুষ একজন, স্ত্রী একজন, বালক একজন ও বালিকা একজন; ইহাদের সকলকে ১২ পাউণ্ড অর্থাৎ বৎসরে ১৮০ টাকা করিয়া কর প্রদান করিতে হইলে, মাসে ১৫ টাকা করিয়া প্রদান করিতে হয়। বিবেচনা করুন ভারতীয় মজুরগণের বেতন মাসিক ২ পাউণ্ড অর্থাৎ ৩০ টাকা কিম্বা এর চেয়ে কিছু বেশী। তাহা হইলে কেমন করিয়া সে পরিবার প্রতিপালন করিবে আর কেমন করিয়াই বা গভর্ণমেণ্টের বার্ষিক কর প্রদান করিবে? ইহা কি সম্ভব-পর? যে স্ত্রীলোক বিধবা তাহাকেও এই কর প্রদান করিতে হইত। এজন্য কত স্ত্রীলোক ব্যভিচার দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গভর্ণমেণ্টকে কর প্রদান করিতে করিতে অবশ হইয়া যাইত, আর কত পুরুষ চুরি প্রভৃতি কু-কাজে নিযুক্ত হইত। ইহা দ্বারা অনুমিত হইবে যে, ভারতীয়গণের আচ-রণের উপর এই মারাত্মক কর কিরূপ অন্যায় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আগে বলা হইয়াছিল যে, "যদি কোন মজুর কর প্রদান করিতে অসমর্থ হয়, তবে তাহার উপর ফৌজদারী অভিযোগ আনয়ন করা হইবে না," কিন্তু এ কথা রক্ষা করা হয় নাই। যে কেহ ঐ কর প্রদানে অসমর্থ হইত, তাহাকেই গ্রেপ্তার করিয়া কারাদণ্ড প্রদান করা হইত। স্ত্রীলোকেও কর দিতে না পারিলে জেলে প্রেরিত হইত, এমন কি বালক বালিকা-গণকেও কারাদণ্ড দেওয়া হইত।

কেবল কারাদণ্ড ভোগ করিলেই যে, সে এই কর হইতে মুক্তি পাইত তাহা নহে; প্রত্যুত কারাগার হইতে মুক্ত হইবার সময় তাহাকে শুনান হইত যে, "তুমি শীঘ্র অর্থ উপার্জ্জন করিয়া এই কর প্রদান করিবে, নতুবা পুনরায় তোমাকে জেলে বন্দী করা হইবে।" দীন, দুর্ব্বল ও রোগার্ত্ত পুরুষ এবং স্ত্রীগণ কর প্রদান করিবার অসমর্থতাহেতু জেলে প্রেরিত হইত। ভারতবাসিগণকে এই কর ঘোর বিপদাপন্ন করিয়া ফেলে—উহারা না খাইয়া মরিতে থাকে, ঘৃণিত জীবন অতিবাহিত করিতে থাকে, কিম্বা পুন-রায় মজুরীর সর্ত্তে আবদ্ধ হইতে থাকে। এই দীন হীন ভারতীয় মজুরগণকে এদেশে লইয়া আসিয়া এমন প্রভুর অধীনে রাখা হয়, যাহাদিগকে চিনিবার সামর্থ্য উহাদিগের নাই; যাহাদের ভাষা, রীতি নীতি, উহারা কিছুই অবগত নহে। এইরূপ প্রথার যে কোন নাম দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ইহা সর্ব্বদাই অমানুষিক ও পাশবিক।

স্বতন্ত্র ভারতীয়গণের প্রতিরোধ

পরতন্ত্র ভারতীয় মজুরগণের এই দেশে বসবাস রোধ করিবার জন্য এই খুনিকরের সৃষ্টি হয়, এবং তজ্জনিত নানারকমের অত্যাচারও আরম্ভ হয়। কিন্তু স্বতন্ত্র ভারত-বাসিগণের এই দেশে প্রবেশের পথ রোধ করিবার জন্য আজ পর্য্যন্তও কোনও বিধান ছিল না এখন এই কথা শ্বেতাঙ্গ অধিবাসিগণের মনে উদয় হয়। তাহারা স্বতন্ত্র ভারতবাসীর আগমন বন্ধ করিবার জন্য যথা শক্তি চেষ্টা করিতে থাকে। পরিশেষে ইহাদের মনোবাসনা পূর্ণ হয়। স্বতন্ত্র

ভারতবাসিগণের আগমন রোধের জন্য একটি আইন প্রস্তুত হয়।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ঔপনিবেশিক আইন রচিত হয়, ইহার অভিপ্রায় এই যে, এখন হইতে কোনও স্বতন্ত্র ভারতবাসী এদেশে আসিতে পারিবে না। যদি কেহ স্বদেশে যাইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহাকে ঔপনিবেশিক শাসনকর্ত্তার নিকট হইতে সনন্দ (Domicile Certificate) লইয়া যাইতে হইবে এবং দেশ হইতে যখন ফিরিয়া আসিবে তখন ইহা দেখাইয়া প্রবেশ করিতে সক্ষম হইবে। সনন্দ দেখাইতে না পারিলে পুনরায় স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে হইবে। এই আইনের আর একটি ধারা এই যে, যে ভারতবাসী ইংরাজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে এবং ইংরাজী ভাষায় পূর্ণ বিদ্বান হইবে, সে আপনার যোগ্যতা প্রমাণিত করিয়া এখানে বাস করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইবে।

এই আইন ভারতবাসীর উন্নতির পথ নষ্ট করিয়া দেয় এবং নূতন ভারতবাসিগণের এখানে আসিবার পথ একেবারে রুদ্ধ করে। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ঔপনিবেশিক শাসনকর্ত্তা মিঃ স্মিথের লিখিত রিপোর্ট পড়িলে বিদিত হওয়া যায় যে, ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে নেটাল বন্দরে সর্ব্বশুদ্ধ ৬৭৮৩ জন যাত্রীকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। ইহাদের মধ্যে ৩২৪৪ জন বৃটিশ রাজ্যের ভারতীয় প্রজা ছিল। এই আইন অতিশয় কঠোর আকার ধারণ করে, ইহার আমলে বৃটিশ রাজ্যের ভারতীয় প্রজা (British Indians) গণকে বড়ই কষ্টে পড়িতে হয়। ভারতবাসী ইহা বুঝিতে সক্ষম হয় নাই যে, বৃটিশ উপনিবেশ পরিশ্রম করিয়া দিনাতিপাত করিবার সুবিধা তাহাদের ভাগ্যে নাই। উহারা বহু দূরদেশ হইতে আগমন করে, জাহাজের মাস্তুলের জন্য শত শত টাকা খরচ করে, অনেকে আবার অন্যের নিকট হইতে ধার লইয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। যখন বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন বুঝিতে পারে যে, স্বতন্ত্র ভারতবাসীর এখানে আসিবার অধিকার নাই। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বশুদ্ধ ১৮৬৯ জন এসিয়াবাসীকে এদেশে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। উহাদের মধ্যে ১১ জন চীনা, ১ জন ইজিপ্সিয়ান, ৩৮ জন গ্রীক, ৮ জন সিংহলী, ১ জন সিরিয়ন, ৮ জন তুর্কী আর শেষ সমুদয় ভারতবাসী ছিল। যে সকল ভারতবাসী এখানে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ১৮৫ জন ইংরাজী ভাষায় পূর্ণ বিদ্বান ছিলেন। এই হিসাব হইতে বুঝা যাইবে যে, ভারতবাসিগণের সন্মার্গপথে কিরূপ প্রতিবন্ধক উৎপন্ন করা হইয়াছে। ইহার অতিরিক্ত 'নেটাল লাইসেন্সিং এক্ট' রচনা করিয়া ভারতবাসীকে বাণিজ্য করিবার পরওয়ানা দেওয়া রহিত করা হইয়াছে। এই বিচিত্র 'এক্ট' ভারতবাসীর প্রায় লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি করিয়াছে। ব্যবসাদার-গণকে জব্দ করিবার আর এক উত্তম উপায় এই যে, যখন কোন দোকান খুব ভাল রকম চলিতে থাকে, হয়ত এমন সময় তার পরওয়ানার নির্দ্দিষ্ট সময় শেষ হয়, তখন ব্যবসাদার নূতন পরওয়ানার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট গমন করে; সেখানে তাহাকে বলা হয় যে, তুমি দোকান উঠাইয়া লইয়া অমুক জায়গায় চলিয়া যাও, নতুবা তোমার পরওয়ানা রহিত করা হইবে।

দোকানদার তখন নিরুপায় হইয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে দোকান উঠাইয়া লইয়া যায়।

স্থানের পরিবর্ত্তন জন্য গ্রাহক সংখ্যা কমিয়া যায়। যে স্থানে ঐ দোকানদার দোকান লইয়া গিয়াছে সেস্থানে হয়ত কোন ইংরাজ ব্যবসাদারের দোকান আছে। কিন্তু পরিশ্রম ও বিশ্বাসের জন্য ভারতীয় ব্যবসাদার যেখানে গমন করে সেইখানেই সে ব্যবসাতে প্রতিপত্তি লাভ করে। এই সময় পুনরায় তাহার উপর সেই পূর্ব্বোক্ত আদেশ প্রদান করা হইয়া থাকে।

প্রতি বৎসর এখানকার ব্যবসাদারগণের ক্রয় বিক্রয়ের পুস্তক গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে পরিদর্শন করা হয়। ঐ পুস্তক হইতে কোথাও একটি সাধারণ ভুল বাহির করিয়া পরওয়ানা রহিত করিয়া দেওয়া হয়। এই প্রকার কুটিল প্রযত্নের দ্বারা ভারতবাসিগণের এ দেশে বসবাস করিবার পথ রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

মজুর প্রেরণ রহিত

এই প্রকার ভারতবাসিগণের প্রতি ঘৃণিত ব্যবহার দেখিয়া ভারতীয় জনসাধারণ অতিশয় দুঃখিত হয়। ভারতগভর্ণমেণ্টেরও এই অত্যাচারের উপর দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। মাননীয় গোখ্‌লের কোমল হৃদয় এই অন্যায় অত্যাচারে দ্রবীভূত হয়। অতঃপর মাননীয় গোপাল কৃষ্ণ গোখ্‌লে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, নেটালে ভারত হইতে মজুর প্রেরণ করা বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক। অধিকাংশ সভ্যগণ এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেন। সকলের সম্মতি অনুসারে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। অবশেষে ভারত গভর্ণমেণ্ট নির্দ্ধারণ করেন যে, ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই হইতে নেটালে ভারতীয় মজুর প্রেরণ করা চিরকালের জন্য বন্ধ হইয়া যাইবে। এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নেটালের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরা অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত ও দুঃখিত হন। আশ্চর্য্যান্বিত হন এই জন্য যে, ভারতের ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট কেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে এইরূপ আইন প্রস্তুত করিলেন; আর দুঃখিত হন এই জন্য যে নেটালে ভারতীয় মজুর আসা বন্ধ হওয়াতে ইক্ষু-ক্ষেত্রের বিশেষ ক্ষতি হইবে। ইঁহারা সভা করিয়া ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন যে, আপনি ভারত গভর্ণমেণ্টকে বলুন যেন এই সময়ের পরিমাণ আরও কিছু বাড়াইয়া দেওয়া হয়। ইঁহাদের অনুরোধ অনুযায়ী ঔপনিবেশিক গভর্ণমেণ্ট ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট সময় বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট উত্তর প্রদান করেন যে, ১লা জুলাই ব্যতীত আর দিন বৃদ্ধি হইতে পারিবে না। এই উত্তরে অসন্তুষ্ট শ্বেতাঙ্গ কোম্পানী আপনাদের অধীনস্থ মজুরগণকে ভারতবর্ষ হইতে মজুর যোগাড় করিয়া লইয়া আসিবার জন্য প্রেরণ করেন। যে সকল লোক মজুর সংগ্রহের জন্য মাদ্রাসের দিকে যায়, তাহারা অনতিবিলম্বে ৫০০ মজুর সংগ্রহ করে আর যাহারা কলিকাতার দিকে মজুর সংগ্রহ করিতে যায়, অদৃষ্ট বশতঃ তাহাদের মজুর প্রাপ্ত হইতে কিছু বিলম্ব হয়। এমন সময়ে যে ষ্টীমার মজুরগণকে লইয়া যাইবার জন্য কলিকাতার বন্দরে অপেক্ষা করিতেছিল তাহা বিলাতে প্রস্থান করে। এ দিকে কলিকাতার ডিপোতে নেটালে প্রেরণ করিবার জন্য ৫০০ শত মজুর সংগৃহীত হয়। শেষে যখন এই সংবাদ নেটালের শ্বেতাঙ্গ কৃষকগণ প্রাপ্ত হন তখন তাহারা কলিকাতার এজেণ্টকে কোনও ষ্টীমার ভাড়া করিয়া

মজুরগণকে প্রেরণ করিবার আদেশ করেন। তদনুসারে এজেণ্ট একখানি জাহাজ ভাড়া করেন, কিন্তু ভারত গভর্ণমেণ্ট ঐ জাহাজ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মজুর লইয়া যাইবার অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন।

এক্ষণে এস্থানে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় বড়ই মুস্কিলে পতিত হন। কিরূপে মজুর লইয়া আসিবেন তাঁহারা ইহার উপায় চিন্তা করিতে থাকেন। শেষে তাঁহারা স্থির করেন যে, কলিকাতা হইতে রেলগাড়ী করিয়া তুতীকোরিন পর্য্যন্ত এবং তুতীকোরিন হইতে ষ্টীমার করিয়া সিংহল পর্য্যন্ত মজুরগণকে লইয়া আসিতে পারিলে পুনরায় নেটাল হইতে ষ্টীমার গিয়া তাহাদিগকে লইয়া আসিবে। এই কথা ভারতীয় এজেণ্টকে জানান হয়। তিনি রেলগাড়ী করিয়া মজুরগণকে তুতীকোরিণে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করেন। পরন্তু এখানেও ভারতগভর্ণমেণ্ট রেল গাড়ীতে মজুর লইয়া যাওয়া বন্ধ করিয়া দেন। এইখানে বিবাদের নিষ্পত্তি হয়। মজুর লইয়া যাওয়া চিরকালের নিমিত্ত বন্ধ হইয়া যায়। নেটালস্থ শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীগণের দুঃখের পরিসীমা থাকে না। নেটালের সুপ্রসিদ্ধ দৈনিকপত্র "মারকির্ভরি" অতিশয় দুঃখের সহিত লিখিয়াছিলেন যে, আজ হইতে ভারতীয় মজুর আসা চিরকালের নিমিত্ত বন্ধ হইয়া গেল।

নূতন মজুর আসা বন্ধ হওয়াতে পুরাতন মজুরগণের অবস্থা কিছু ভাল হয়। স্বাধীন মজুরগণকে শ্বেতাঙ্গগণ অধিক বেতন দিয়া নিয়োগ করেন এবং পূর্ব্বের চেয়ে খুব ভাল ব্যবহার করেন। এই উদারতার জন্য মাননীয় গোখ্‌লে ও ভারত গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বোচ্চ ধন্যবাদের পাত্র।

শ্রীসেবা ভিক্ষু জীবন।

যক্ষ্মা রোগে কয়েকটি বিশেষ উপসর্গের সহজ প্রতিকারোপায় বা গৃহ চিকিৎসা

(গত বৈশাখ মাসের ৬৫৮ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

গলা দিয়া রক্ত উঠা

যক্ষ্মা রোগে অনেক সময়েই গলা দিয়া রক্ত উঠিতে দেখা যায়। হাসপাতাল সমূহে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে যক্ষ্মা রোগীদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৬০, ৭০, জনেরই ব্যাধির এক সময় না এক সময় গলা দিয়া রক্ত উঠিয়া থাকে। কাহারও বা গলা দিয়া রক্ত উঠিয়াই এই ব্যাধির সূত্রপাত হয়। হয়ত তাহার পূর্ব্বে কোনরূপ অসুখ বোধ হয় নাই, বেশ সচ্ছন্দে দৈনন্দিন জীবন যাপন করিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ রক্ত উঠাতে ভয়ে অস্থির হইয়া ডাক্তার ডাকা হইল। ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া এই ব্যাধি সম্বন্ধে হয়ত সন্দিহান হইলেন নতুবা ব্যাধিতে

আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। রোগী ত রক্ত দেখিয়াই আতঙ্কে অস্থির হয়। রক্ত যদি ১ ছটাক উঠে, সে মনে করে যে নিশ্চয়ই একসের উঠিয়াছে; সমস্ত দেহের রক্তই যেন বাহির হইয়া আসিয়াছে। রক্ত দেখিলে স্বতঃই আমাদের ভয় আসে। উহা আমাদের দেহের একান্ত সার পদার্থ সুতরাং উহার মোক্ষণ দেখিয়া যে রোগী শঙ্কায় কাতর হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তবে রক্ত উঠাতে বাস্তবিক উপস্থিত ভয়ের বেশী কোন কারণ নাই যেহেতু শুধু রক্তপাতের দরুণ ক্ষয় রোগীকে বড় একটা মরিতে দেখা যায় না। হয়ত উহাতে শতকরা ২।১ জন মরিয়া থাকে, কাজেই উহার জন্য ভয়ে আধমরা হওয়া কখনই সঙ্গত নহে।

সাধারণতঃ যক্ষ্মা রোগের দুই অবস্থায় রক্ত উঠিয়া থাকে। এক ব্যাধির প্রথম ভাগে, অপর শেষের দিকে। প্রথম ভাগের দিকে যে রক্ত উঠে উহা সাধারণতঃ ফুস্‌ফুসে রক্তাধিক্যের কারণ। আমাদের শরীরের যে কোন স্থানে আঘাত লাগুক না কেন সেই স্থানেই রক্তাধিক্য ঘটে। দেহের একটা স্থানে যদি সূঁচ বিঁধিয়া পড়ে বা কোন স্থানে যদি একটা সামান্য ক্ষুদ্র পিপীলিকাও দংশন করে, সেই স্থানই যে লাল হইয়া উঠে ইহা সকলেই দেখিয়া থাকিবেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শরীরের যে স্থানই কোনরূপে উত্তেজিত হউক (irritated) সেই স্থানেই রক্তাধিক্য ঘটে। এই রক্তাধিক্য তথাকার আক্রমণকারী শত্রুকে বা দূষিত পদার্থকে দূর করিয়া দিতে চেষ্টা করে এবং সেই স্থানকে পুনরায় স্বাভাবিক সুস্থ-অবস্থায় আনিতে সহায়তা করে। এইরূপ ফুসফুসেও; ফুস্‌ফুসে যদি কোনওরূপ আঘাত লাগে বা তথায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ক্ষয় জীবাণু বা অপর বীজাণু যাইয়াও যদি প্রবাহ (irritation) উৎপাদন করে তাহা হইলে তথায়ও রক্তাধিক্য ঘটে। এই রক্তাধিক্যের কারণে রোগের প্রথম অবস্থায় অনেক সময় রক্ত মোক্ষণ হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবহানাড়ী (capillaries) যেখানে রক্তাধিক্য ঘটে, সেখান হইতে রক্ত চুয়াইয়া (By Diapedesis) শ্বাসনালীতে যায়, এবং তথা হইতে কাসীর সহিত গলা দিয়া উঠে। সময় সময় এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবহানাড়ীগুলি ছিড়িয়াও রক্ত মোক্ষণ হয়। প্রথম ভাগে যে রক্ত উঠে উহা প্রায়শঃই পরিমানে অল্প—হয়ত কাসীর সহিত মিশ্রিত সামান্য রক্ত। সময় সময় যে বেশীও না উঠে তাহাও নয়, তবে সাধারণতঃ ৩।৪ আউন্সের বেশী উঠে না।

ব্যাধি অগ্রসর হইলে বা শেষের দিকে যে রক্ত উঠে উহা প্রায়ই রক্তবহানাড়ী (artery) ছিঁড়িয়া বাহির হয়। ক্ষয় জীবাণু ও উহার নিঃসৃত বিষাক্ত পদার্থ সকল ক্রমশঃ ফুস্‌ফুসের ক্ষয় সাধন করে। উহার ফলে ফুসফুসের ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত হয় (cavity formation) এবং উহার কার্য্য চলিতে থাকিলে উহা ক্রমে বৃহদায়তনও হয়। ফুস্‌ফুস্ যে পদার্থে তৈয়ারী তাহা অপেক্ষা রক্তবহা-নাড়ীগুলি কঠিন উপাদানে নির্ম্মিত এবং এই কারণে ফুস্‌ফুসের ক্ষয় হইলেও সঙ্গে সঙ্গেই রক্তবহানাড়ীগুলির ক্ষয় না। ঐ নাড়ীগুলি, চারিদিকে খোলা জায়গা পাওয়াতে ও উহাদের উপরকার চাপ কমিয়া যাওয়াতে এবং নিজেদের সাধারণ স্থিতি-স্থাপকতাগুণ থাকা বশতঃ প্রসারিত হয় বিশেষতঃ ভিতরকার রক্তসঞ্চালনের

বেগ যদি কোন কারণে বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে আরও সহজে হয়। এইরূপ ক্রমে প্রসারিত হইতে হইতে উহাদের আবরণগুলি (walls) পাতলা হইয়া পড়ে ভিতরে কোন কারণে রক্ত চলাচলের জোর বৃদ্ধি হইলেই উহার আবরণ ফাটিয়া যায় এবং শ্বাসনালীর ভিতর রক্ত আসিয়া পড়ে ও তথা হইতে কাসীর সহিত গলা দিয়া উঠে। সকল সময়েই যে নাড়ী এইরূপে প্রসারিত হইয়া ফাটিয়া যায় তাহা নহে। ফুস্‌ফুসের ক্ষয় আরম্ভ হইলে শেষে অনেক সময় উহা এই নাড়ীও খাইয়া দেয়। নাড়ীর চারিদিক খোলা পড়িলে, শরীরে যদি হঠাৎ কোনরূপ আঘাত লাগে কিংবা খট্‌কা টান লাগে তাহা হইলে উহাতেও ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। এই অবস্থায় সময় সময় বৃহদাকার নাড়ী ছিঁড়িয়া যায় বলিয়া রক্ত বেশী পরিমাণ উঠে। ২।৩ আউন্স হইতে আরম্ভ করিয়া ২।৩ পাইণ্ট (২০ আউন্স— ১ পাইণ্ট) অর্থাৎ ১½ সের, ২ সের পর্য্যন্ত রক্ত উঠে। রক্ত খুব অধিক পরিমাণে উঠিলে সময় সময় ভয়ের সম্ভাবনা আছে। উহা শ্বাসনালীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দম বন্ধ হইয়া প্রাণনাশ করিতে পারে। একবারে যদি খুব অধিক রক্ত উঠে তাহা হইলে মস্তিষ্ক রক্তশূন্য হইয়া, মূর্চ্ছা রোগে মৃত্যু ঘটিতে পারে। (death by syncope from cerebral anaemia) তবে উহার সম্ভাবনা খুব কম। পূর্ব্বোক্ত ভাবেই মৃত্যুর আশঙ্কা বেশী, তাহাও শতকরা ২।৩ জনের অধিক যে হইতে দেখা যায় না সে কথাও ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি।

এই যে গলা দিয়া রক্ত উঠে উহা উজ্জ্বল লালবর্ণ ও ফেনিল (frothy)। উহা যখন অল্প পরিমাণে উঠে তখন প্রায়শঃই কফের সহিত মিশ্রিত থাকে। সময় সময় রক্ত গলা হইতে পাকস্থলীতে যায় এবং কিছুকাল পরে যখন বমনের সহিত উঠিয়া আইসে তখন উহার বর্ণ কিছু কাল দেখায়। পাকস্থলীতে বেশী পরিমাণে প্রবেশ করিলে ক্বচিৎ মলের সহিতও নিঃসৃত হয় উহার বর্ণ তখন কাল।

গলা দিয়া যে রক্ত উঠে উহার সহিত অনেক সময় ক্ষয় জীবাণু মিশ্রিত থাকে।

এই রক্ত উঠার কারণ সব সময়ে সবিশেষ নির্দ্দেশ করা যায় না। হঠাৎ কোন জোরের কাজ করিতে যাওয়া, অতিরিক্ত শ্রম বা কোনরূপ মানসিক উত্তেজনা, মলত্যাগের সময় জোরে কোঁথানি দেওয়া, অনবরত কাসিয়া অস্থির হওয়া, ঋতুশ্রাব বা কোনও কারণে রক্ত চলাচলের বেগ হঠাৎ বৃদ্ধি হইলে, হঠাৎ অতিরিক্ত গরম বা ঠাণ্ডার সংস্পর্শে আসিলে বা অত্যধিক মদ্যপান করিলে রক্ত উঠার সম্ভাবনা হয়। কিন্তু অনেক সময় বিনা কারণেও রক্ত উঠিয়া থাকে। হয়ত রোগী বিছানায় শুইয়া আছে, কিংবা সুস্থভাবে আরাম কেদারায় বসিয়া আছে—হঠাৎ গলাটা একটু সুর সুর করিল, বুকটা একটু চাপা চাপা বোধ হইল—পরক্ষণেই গলা দিয়া রক্ত উঠিয়া পড়িল।

গলা দিয়া রক্ত উঠিলেই যে উহা যক্ষ্মাজনিত এ কথা মনে করা উচিত নহে। নানাবিধ কারণে গলা দিয়া রক্ত উঠিতে পারে। প্রথমেই নাকের ও গলার ভিতর হইতে কোনরূপ রক্ত বাহির হইবার কারণ কিছু পাওয়া যায় কিনা তাহা সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। দাঁতের গোড়া হইতেও অনেক সময় রক্ত যাইয়া কাসীর সঙ্গে আইসে, উহাও ভাল করিয়া দেখা উচিত। তারপর নানাবিধ হৃদ্‌রোগে, কণ্ঠনালীর ক্যান্সারে (cancer), নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাই-

টীস্, ও লিভারের সিরোসিস্ এ (Cirrhosis of liver) এবং বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি নানাবিধ রোগে ও রক্ত সম্বন্ধীয় ব্যাধিতেও (Diseases of blood) এইরূপ রক্ত উঠিয়া থাকে। এ সমস্ত বর্জ্জন করিলেও যদি কোথাও কিছু না পাওয়া যায় তাহা হইলে সচরাচর উহা ফুস্ফুস্ জাতই মনে করিতে হইবে কারণ যক্ষ্মার প্রথম অবস্থায় প্রায়শঃই কোন উপসর্গ ধরা যায় না। যখন ফুস্ফুসে ব্যাধির লক্ষণ পাওয়া যায় তখন ত সন্দেহের কারণই থাকে না। রক্তের ভিতর ক্ষয় জীবাণু পাওয়া গেলে উহা যক্ষ্মা-জনিত বলিয়া নিঃসন্দেহে মনে করা যাইতে পারে। স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাব কখনও কখনও যে স্বাভাবিক পথে না হইয়া তৎপরিবর্ত্তে মাসে মাসে গলা দিয়া রক্ত উঠে এ কথাও মনে রাখা দরকার।

আয়ুর্ব্বেদে রক্তপিত্ত বলিয়া একটা অবস্থার সবিশেষ বিবরণ দেখা যায়। উহাকে কবি-রাজগণ যক্ষ্মা বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন পিত্ত কুপিত হইয়া রক্তকে দূষিত করে এবং ঐ দূষিত পিত্ত ও রক্ত উভয়ে মিলিত হইয়া কখনও গলা দিয়া কখনও মলদ্বার পথে, প্রস্রাবের পথে, যোনীদ্বার পথে, কখনও বা লোমকূপ পথে বহির্গত হয়। উহা হইতে আমার অনুমান হয় অবস্থা বিশেষে যকৃতের কার্য্য কোন বিশেষভাবে বিকৃত হইলে উহা রক্তের বিশেষ এক পরিবর্ত্তন ঘটায় এবং তখন উহা নানা পথে নির্গত হইবার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই পরিবর্ত্তন কি এবং কোন উপায়ে ঘটে তাহা আমি নির্দ্দেশ করিতে পারি না, তবে আশা আছে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে ইহার একটা কুল কিনারা হইতে পারে। যকৃতের রক্তের উপর একটা বিশেষ ক্রীড়া আছে বলিয়া আমার মনে হয় কিন্তু এ বিষয়ে সম্যক অনুসন্ধান হয় নাই।

যখন গলা দিয়া রক্ত উঠে তখন রোগীর মুখ একেবারে ফ্যাকাসে দেখায়, শরীর বিবর্ণ ও ঠাণ্ডা হইয়া যায় এবং রোগী ভয়ে কিং কর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়। শরীরের তাপ স্বাভাবিক হইতে অনেক নীচে নামিয়া যায়। এই সময়ে রোগীর বিশেষ সাবধানতা লওয়া দরকার, ডাক্তারের জন্য ত লোক যাইবেই কিন্তু নিজেদেরও একটু সতর্কতা লইতে হইবে। রোগীকে নাড়াচাড়া করিবে না, যেখানে থাকে সেইখানেই অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় রাখিবে একেবারে শোয়ার চেয়ে পিঠের ও মাথার নীচে বালিস দিয়া আধশোয়া করিয়া দেওয়াই ভাল। যদি ডাক্তার পূর্ব্বে বলিয়া থাকেন কোন দিক হইতে রক্ত উঠিবার আশঙ্কা আছে এবং সেইদিকে শোয়াইয়া দিতে পারা যায় তাহা হইলে রক্তটা যাইয়া ভাল দিকের শ্বাস নালীর ভিতরপ্রবেশ করিয়া শ্বাসকষ্ট করিতে পারিবে না। যদি বেশী রক্তমোক্ষণের জন্য মূর্চ্ছা যাইয়া থাকে তাহা হইলে উহা ভাঙ্গিবার জন্য ব্যস্ত হইবার দরকার নাই। কারণ এই মূর্চ্ছার দরুণ রক্তের জোর কম থাকে এবং উহা রক্ত উঠা বন্ধ করিতে সহায়তা করে। ঘরটা যাহাতে ঠাণ্ডা থাকে ও উহাতে বেশ হাওয়া চলাফেরা করে তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ঘরে যাহাতে কোনরূপ গোল না হয় তাহাও করিতে হইবে। ঘরটা বরং একটু অন্ধকার করিয়া রাখিলে ভাল হয়। রোগীকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে রাখিতে হইবে। কথা বলা এক রকম বন্ধ থাকিবে। কোন-রূপ সাংসারিক বা মানসিক চিন্তা ও স্ত্রীলোক হইলে ছেলে পিলের হাঙ্গামা না করিতে হয়। পটীর মধ্যে কোনরূপ গোল না হয়। ডাক্তার

আসিলেও রোগীর বুক ঠুকিয়া পরীক্ষা বা জোরে জোরে শ্বাস নিতে বলা উচিত নহে। কেবল 'ষ্টেথেস্কোপটি' আস্তে বুকে লাগাইয়া স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসের অবস্থা একটু দেখা। একবার রক্ত উঠিলে পুনঃ পুনঃ উঠার আশঙ্কা থাকে। ২।১ টুক্‌রা ছোট বরফ, মাঝে মাঝে খাইতে দেওয়া যায়, তবে বেশী না, উহাতে পাকস্থলীর গোলমাল হইয়া বমন আরম্ভ হইতে পারে এবং পুনরায় রক্ত উঠার আশঙ্কা থাকে। অল্প পরিমাণ রক্ত উঠিলে বিশেষ কোন ঔষধ পত্রের প্রয়োজন হয় না—উপরোক্তরূপ সাবধানতা নিলে আপনা আপনি বন্ধ হইয়া যায়, তবে রক্ত বেশী উঠিতে থাকিলে ও ডাক্তার আসিতে বিলম্ব ঘটিলে আধ ছটাক পরিমাণ আদা পানের রস খাইতে দেওয়া যায়। জেলেটিন (geletine) জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া উহার একটু একটু খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। বুকের যে দিক হইতে রক্ত উঠে সেই দিকের উপরে আইস্ ব্যাগে করিয়া বরফ দেওয়া যাইতে পারে। উহাতে বিশেষ উপকার হউক না হউক রোগীর মনটা শান্ত হয় এবং রোগী মনে করে যে একটা কিছু করা হইতেছে। অন্ততঃ বুকের ধড় ফড়ানিটা বারণ করে। অন্যান্য ঔষধাদি ডাক্তারের উপদেশ মত দেওয়া কর্ত্তব্য।

রক্ত উঠিবার অব্যবহিত পরেই পথ্য দেওয়া উচিত নহে। কয়েকদিন শক্ত জিনিস খাইতে দেওয়া উচিত নহে। তরল পথ্য ঠাণ্ডা করিয়া দিবে। ৩।৪ ঘণ্টা বাদে বাদে ২।৩ আউন্স করিয়া ঠাণ্ডা দুধ, দুধবার্লি বা দুধসাগু এমন কি অবস্থা বিশেষে হরলিকস্ মল্টেড্‌ফুড্ (Horlick's Malted Food) দিবে। কলাদির রসও ঠাণ্ডা করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। ৩।৪ দিন একাদিক্রমে রক্ত ওঠা বন্ধ থাকিলে তবে পথ্যাদি সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইতে পারে। এই অল্প পথ্যের দরুণ রক্ত চলাচলের জোর কম থাকে এবং রক্ত উঠার আশঙ্কাও কম হয়। এ সময় ব্র্যাণ্ডী বা কোন উত্তেজক ঔষধ দেওয়া উচিত নহে।

বাহ্যি যাহাতে বিশেষ পরিষ্কার থাকে তাহা করা কর্ত্তব্য। কাসী হইতে থাকিলে রক্ত উঠার আশঙ্কা থাকে সুতরাং কাসী যাহাতে না হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা উচিত। কাসী আসিলে অনেক সময় ইচ্ছা করিয়া কতকটা বন্ধ করা যায়। দরকার হইলে এ সম্বন্ধে ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য। যাহাতে কাশীর উত্তেজনা করিতে পারে সেরূপ কোন জিনিস নিকটে না থাকে তাহা দেখিতে হইবে। তামাক ও সিগারেট অভ্যাস থাকিলে উহা এ সময় বন্ধ থাকিবে, ঘরে অপর কেহও ধুম পান করিতে পারিবে না! কোন রূপ ধুঁয়া বা উগ্রগন্ধ বিশিষ্ট জিনিস যাহাতে রোগীর নিকট পৌছিতে না পারে তাহার বন্দোবস্ত দেখিতে হইবে। যে সব লোক রোগীর জন্য বৃথা ব্যস্ত হয় বা সামান্য ব্যাধিকে বৃহৎ করিয়া রোগীর আতঙ্কের সৃষ্টি করে সেরূপ আত্মীয় বা অপর কাহাকেও রোগীর নিকট যাইতে দেওয়া সমীচীন নহে।

এইরূপ সাবধানমত রাখিলে সত্বরেই রোগীর রক্ত উঠা বন্ধ হইবে। রক্ত উঠার শেষ দিন হইতে ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত বিশেষ সাবধানে থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। তখন পথ্য সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ দুধসুজি, বা দুধরুটী অথবা পাউরুটী পরে আস্তে আস্তে দুধ ভাত আরম্ভ করা

যাইতে পারে। মাংসটা কয়েক দিন না খাওয়াই ভাল।

সামান্য ছিটে ফোটা রক্ত উঠিলে পথ্যের এতটা কড়াকড়ির প্রয়োজন নাই। রক্ত উঠাটা যে সব সময়ই খারাপ তাহা নহে। প্রথম অবস্থায় উহা হইতে অনেক সময়ে উপকার হইতেও দেখা যায়। এই রক্ত উঠার পর কখনও কখনও ফুস্‌ফুসের সমস্ত লক্ষণ লোপ পাইতে দেখা গিয়াছে ও রোগী ক্রমশঃ সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে। আবার ইহা হইতে খারাপও যে না হয় তাহা নহে। অনেক সময় রক্ত মোক্ষণের পর ব্যাধি নানা স্থানে নূতন করিয়া সঞ্চারিত হয় ও দ্রুত বাড়িয়া যায়। সুতরাং এই রক্ত মোক্ষণের পর রোগীর অবস্থা বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করা প্রয়োজনীয়। রক্ত মোক্ষণে যদিও আশু ভয় নাই—কিন্তু রক্ত হানির দরুণ শারীরিক দুর্ব্বলতাও ঘটে। যাহাতে বিশেষ সাবধানে থাকিয়া শরীর সারিয়া উঠে সে জন্য একান্ত দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

রোগী অনেক সময় রক্ত গিলিয়া ফেলে উহা কদাচিৎ উচিত নহে। উহাতে ক্ষয় বীজ নানা স্থানে নীত হইয়া নানা স্থানের ব্যাধি উৎপাদন করিতে পারে।

হাঁসপাতালে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে একজনের রক্ত মোক্ষণ হইলে সেই সময়ে অপর কতকগুলি রোগীরও রক্ত মোক্ষণ হইতেছে। উহা হইতে অনেকে অনুমান করেন যে সম্ভবতঃ উহা কোন রূপ সংক্রামক উপায়ে ঘটিয়া থাকে। এই জন্য রক্ত উঠিলেই রোগীকে আলাহিদা স্থানে ভিন্ন ভাবে রাখার বন্দোবস্ত করা হয়। অবশ্য নিজ বাটীতে সেরূপ করার আবশ্যক হয় না।

আবার কেহ কেহ মনে করেন যে এইরূপ এক সময়ে রক্ত মোক্ষণের কারণ জল হাওয়ার অবস্থার দরুণ ঘটে। যখন স্যাৎস্যাতে গরম হাওয়া দেয় প্রায় সেইরূপ সময়েই ইহার আধিক্য দেখা যায়। শীতকালে ততটা বেশী রক্ত উঠিতে দেখা যায় না।

পরিশেষে এই বক্তব্য যে রক্ত উঠিলেই একটা হৈ চৈ করিবে না। রোগীর ত স্বভাবতঃই ভয় পাইবার কথা। ভয় পাইলে আরও রক্ত উঠিতে থাকে মাত্র।

রোগীকে অভয় ও আশ্বাস দিবে। বাস্তবিক ভয়ের সেরূপ কোনও কারণই নাই। রোগী যদি সুস্থভাবে বিশ্রামে থাকে ও যে সব নিয়ম এই প্রবন্ধে বলা হইয়াছে তাহা পালন করে তাহা হইলে সহজেই রক্ত বন্ধ হইয়া যাইবে।

অনেকে রক্ত উঠাতে ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি বায়ু পরিবর্ত্তনে যাইবার জন্য ব্যস্ত হয় কিন্তু উহা কখনই কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু দীর্ঘ পথ যাইতে হইলে অধিক নড়াচড়া হওয়ার সম্ভাবনা ও উহাতে রক্ত উঠার আশঙ্কা আছে।

যাহাদের বার বার রক্ত উঠে তাহাদের সম্বন্ধে আরও বিশেষ সাবধানতা লওয়া দরকার। ডাক্তারের নিকট হইতে সবিশেষ ব্যবস্থা লইয়া দৈনন্দিন জীবন যাত্রার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

রক্ত উঠা সম্বন্ধে আর একটা কথা বলি নাই। এই প্রথম ভাগে যে রক্ত উঠে উহা সাধারণতঃ শিরা (vein) হইতে নির্গত হয় বলিয়া উজ্জ্বল রক্তবর্ণ দেখায়। ফুস্‌ফুসের শিরা সমূহে বিশুদ্ধ রক্ত (oxygenated) থাকে কিন্তু ধমনীতে (Artery) দূষিত রক্ত থাকে সেইজন্য শেষ দিকে যে রক্ত উঠে উহা উজ্জ্বল লালবর্ণের নহে বরং একটু কালো রঙ্গের।

রক্ত উঠার সময় শরীরের তাপ যেমন স্বাভাবিকের নীচে যায় পরে আবার একটু স্বাভাবিকের উপরে উঠে তবে ক্রমশঃ উহা স্বাভাবিক হইয়া আসে।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

পল্লী-কথা

সে আজ চল্লিশ বৎসরের কথা; আমাদের বর্ত্তমান আয়ুর অনুপাতে একটু বেশী বলিয়া মনে হইলেও কালের হিসাবে—এই সে দিন—বলিলে চলে। সহরতলির বেচারাম সুর মহাশয়ের গৃহিণী প্রসবান্তে পীড়িতা হওয়ায়—মধু ডাক্তার মহাশয়—চা সেবন করিবার ব্যবস্থা দেন। কিন্তু ব্যবস্থাটা যত সহজে দেওয়া হইয়াছিল, তাহা কার্য্যে পরিণত করাটা সুর মহাশয়ের পক্ষে তত সহজ ছিল না; তাঁহাকে এই উপলক্ষে আর্ত্তের ন্যায় স্বার্থের শরণ লইতে হইয়াছিল। পরে অনেক অনুসন্ধানে রাজনারায়ণ বেণের দোকানে হাঁড়ির মধ্যে—হাড়ির হালে অবস্থিত চীনের চা পাইয়া ও পাদরি সাহেবের পেয়াদা পীরবক্সের নিকট তাহার পাকপ্রণালী সংগ্রহ করিয়া সুর মহাশয় এই দুরূহ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে সমর্থ হন। অকস্মাৎ ভূমিকম্পের ন্যায় এই অভিনব সংবাদটি সমগ্র পল্লীটিকে সচকিত করিয়া তোলে। গ্রামের প্রান্ত হইতেও পুরমহিলারা এই উৎসব দেখিতে আসিয়াছিলেন এবং অঞ্চলাংশে নাসারন্ধ্র রোধ করিয়া একটু ব্যবধানে থাকিয়াই তাঁহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিয়াছিলেন। এমন কথাও উঠিয়াছিল—সুর মহাশয় আর জাতে থাকিতে পাইবেন কি না?

তাহার পর ইংরাজী আবহাওয়ার মধ্য দিয়া চল্লিশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে কবিবরের "অসভ্য জাপান" সুসভ্যের সাত হাত উর্দ্ধে সাইনবোর্ড তুলিয়াছে, মানুষের পালক উঠিয়াছে, মানচিত্র বহুরূপী সাজিয়াছে, বিজ্ঞানের বন্যা বহিয়াছে, পুরোহিত-ঘরণী ঘাগ্‌রা পরিয়াছে, মস্তকের প্রথমার্দ্ধ উর্ব্বর ও পরার্দ্ধ উষর হইয়াছে, কুরুক্ষেত্রের উপমাটা জন্মের মত কানা হইয়াছে। কবিবরের "ঘুমাইয়া রয়ে"র আক্ষেপ আমরা রাখি নাই,—আমাদেরও অনেক রকম হইয়াছে; তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য চা ও চশমা", কেবল "চৈতন্যটি" নয়। চল্লিশ বৎসরের মধ্যে এত দ্রুত উন্নতি এক "বাক্য বীরত্ব" ছাড়া আমাদের আর কোন ডিপার্টমেন্টেই হয় নাই,—বোধ হয়, "সুগন্ধি তৈলেও" নহে। আমার এই অনুমানটা সম্ভবতঃ সরকার মহাশয়ের মত সাবধানী ঐতিহাসিকও অস্বীকার করিবেন না।

সকলের একই রকম গুণ থাকে না। আমরা ভগবানের কৃপায় নিজের অভাব সৃষ্টি করিতে সিদ্ধহস্ত; অপরে আবার দয়া পরবশ হইয়া আমাদের অজানা অভাবগুলিকে জাগাইয়া তুলিতে যত্নবান। শুনিতে পাই প্রখর প্রতিভাশালী বুদ্ধিধুরন্ধর মহামতি লাট কর্জ্জন মহোদয়ের নিকট যখন চা-করেরা দুঃখ জানাইয়া বলেন "প্রচুর পরিমাণে চা উৎপন্ন করিয়া আর ফল কি, কাটতি কোথায়, এ দেশের লোক চা খায় কয়জন?" তখন তিনি তাঁহাদেরই লজ্জা দিয়া বলিয়াছিলেন—"তোমরা এ দেশের লোককে চা ধরাইবার উপায়টা কি করিয়াছ, তোমাদের সে চেষ্টাই বা কোথায়?"—এবং ঐ সঙ্গে তাঁহার মূল্যবান মন্ত্রণা দ্বারা, তাঁহাদের যন্ত্রণা নিবারণের উপায়টাও ইঙ্গিতে উপদেশ করিয়াছিলেন।

ভাগ্যবান বাণিজ্যবীর মাননীয় ইউল সাহেবের উর্ব্বর মস্তিষ্কে সেই উপদেশ উৎকর্ষ লাভ করিয়া চা-টা ক্রমশঃ নির্ব্বিবাদে বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে প্রবেশাধিকার পাইল। পুরাকালে যেমন রাজপুত্রেরা দিন দিন শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইত, ইহাও সেইরূপ সকাল সন্ধ্যা বৃদ্ধি পাইয়া, অল্পদিনের মধ্যেই বাবুদের কাবু করিয়া বউঝিদের পর্য্যন্ত আক্রমণ করিল। তাঁহারাও অনেকেই ইহাকে সাদরে বরণ করিয়া, প্রাতঃকৃত্যের মধ্যে পরিগণিত করিয়া লইলেন। মহাজনের অমোঘ মন্ত্রণা মহিমান্বিত হইল। এখন ইহা নেশায় দাঁড়াইয়াছে, চা ব্যতিরেকে মনে উৎসাহ, দেহে স্ফূর্ত্তি, প্রাণে বল ও কাজে হাত পা আসে না। অনেককে স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে শুনি—"ভাত দাও আর নাই দাও, এক কাপ্ চা দিয়ে সারা দিন খাটিয়ে নাও তাতে আমার কোনও কষ্টই হবে না।"

আবার সে দিন "বসুমতীতে" দেখিলাম—

"এ দেশের চা-ব্যবসায়ীরা এ দেশে চা'র ব্যবহার বিস্তারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ইঁহারা এই বিজ্ঞাপন বাবদে অনেক টাকা খরচ করিয়াছিলেন। সেবার অ্যান্ড্রু ইউল্ কোম্পানী পয়সায় পুলিন্দা চা বিক্রয় করিয়াছিলেন—লোকের মৌতাত জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাতে ফলও ফলিয়াছে। সেই সময় হইতেই কলিকাতার পথে পথে চা'র দোকান বসিয়াছে। তখন এই কোম্পানীতে সংবাদ দিলেই তাঁহারা সভাসমিতিতে উৎসবে অতি সামান্য খরচ লইয়া চা যোগাইয়া আসিতেন। চা, চিনি, দুগ্ধ, পিরিচ, পেয়ালা—সবই তাঁহারা আনিতেন, গৃহস্থ কেবল উনান ও কয়লার ব্যবস্থা করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারিত। এখন যে, বিবাহ বাড়ীতে চা'র আয়োজন থাকে, সেও সেই সময় হইতে। এবার আবার চা-ব্যবসায়ীরা আদাজল খাইয়া লাগিয়াছেন। এবার তাঁহারা বিজ্ঞাপন বাবদে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিবেন। যাহারা ইহাদের সাহায্য লইয়া চা'র দোকান খুলিতেছে—ইহারা তাহাদিগকে লোক জমাইবার জন্য দোকান সাজাইবার খরচ দিতেছেন, গ্রামোফোন কিনিয়া দিতেছেন। মফঃস্বলে মেলায় চা বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইতেছে। সংবাদ পত্রে "চা পান করিলে হয় তৃষ্ণা নিবারণ" প্রভৃতি বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইতেছে।"

ইহা অপেক্ষা চেষ্টার চূড়ান্ত আদর্শ আর কি হইতে পারে। এরূপ উদ্যোগকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। কারণ—চায়ের প্রচলনে উপকার যে কিছুই হয় নাই তাহা বলিলে নিতান্ত নিমকহারামী হয়। অনেক গরীবেরই ক্ষুধামান্দ্য ঘটিয়াছে—তাহাতে এই একটানা অন্নকষ্টের দিনে কতকটা বাঁচোয়া বলিতেই হইবে। আবার অনেকে প্রমোশন্ পাইয়া ডিস্পেপ্সিয়ার ডিপ্লোমা আদায় করিয়াছেন, অন্নচিন্তা একেবারেই নাই, সাত্ত্বিক ভাবে সামান্য জলসাবুতেই পরিতুষ্ট। ইহাও দেখা গিয়াছে—পল্লীগ্রামের কোন কোন ভদ্র পরিবার এক পেয়ালা চা ও এক মুটো মুড়ি অবলম্বনেই একবেলা কাটাইয়া দেন। এটা, ক্রমে অনটন বশতঃই অভ্যাসে দাঁড়াইয়া যাইতেছে। যেখানে শতকরা ন্যূনাধিক তিরিশটি সংসারের রোজগারী লোকগুলি ম্যালেরিয়ায় শয্যাগত, সেখানে চা সেবনের ভাবি পরিণাম সম্বন্ধে নীতিকথা শুনাইতে যাওয়া আর তাহাদের পরিহাস করা—একই কথা। উহাই

এখন বহু অন্নক্লিষ্টের উপজীব্য। সুতরাং এ স্থলেও চায়ের "উপকারার্থে বা জীবন-ধারণার্থে প্রয়োগ"ই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। কাজেই চায়ের বিরুদ্ধে আমার কোন বক্তব্যই নাই। কথাটা পাড়িলাম—কেবল মাত্র চায়ের প্রচলনার্থে প্রচেষ্টা ও তাহার সাফল্য দেখাইবার জন্য। তবে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে মহা মহারথীরা মেলা কথা বলিয়াছেন, আমিও না হয় একটা বলিলাম।

জীবতত্ত্ববিদেরা জানেন—একটা মশা দিনে কত ডিম্ পাড়ে। তাহাদের বংশবৃদ্ধির সৌভাগ্য লাভ করিবার জন্য যে কত রাজা মহারাজাও লালায়িত, অপুত্রক বিষয়ী লোকেরাও তাহা জানেন। এ হেন রক্ত-বীজের ঝাড় উজাড় করিয়া ম্যালেরিয়া তাড়াইতে আমরা উপদিষ্ট। চেষ্টা থাকিলে সকলই সম্ভব। কিন্তু, সিংহগুলা শুনিয়াছি—এক বনে একটা থাকে—এক কামড়ে একটা মানুষ মারে, এবং সিংহিনী নাকি বার বৎসর অন্তর একটি করিয়া সন্তান প্রসব করে। কই—আজিও ত তাহাদের নির্ব্বংশ হইবার কোন সংবাদই পাওয়া যায় নাই।

যাহা হউক—এই মশক মারণ মহোৎসব না হয় মিউনিসিপাল মহাশয় চালাইতে থাকুন। কিন্তু যাহারা ম্যালেরিয়ায় মরে—দেশের মহোদয়দের নিকট তাহাদেরও দু একটা কথা বলিবার সাধ হয়। জানি—তাহাদের কথাগুলা চিরদিনই বাজে কথা বলিয়াই গণ্য। অতএব আজ যাহা বলিতে যাইতেছি—তাহা যে হঠাৎ মূল্যবান হইয়া দাঁড়াইবে ও দশের নেক নজর আকর্ষণ করিবে, বা তাঁহাদের একটু ভাবিয়া দেখিবার ইচ্ছা উদ্বুদ্ধ করিবে, এরূপ দুরাশা আমার নাই। তবে বলা ভিন্ন উপায়হীনের আর অন্য পথ কি আছে,—তাই বলি।

দুর্ভাগ্য দেশে চায়ের মত একটা লোক-শেনে আস্‌বাব এক চালেই ফট করিয়া চলিয়া গেল। দেশে পূর্ব্বে কখনও কেহ তাহার জন্য অভাব বোধও করে নাই এবং তাহার আবশ্যকের কোন কারণও উপস্থিত হয় নাই; অথচ পাঁচনটার প্রচুর অভাব ও আবশ্যকতা সত্বেও তাহা দুষ্প্রাপ্য ও অচল হইয়া রহিয়াছে। আমাদের সম্ভ্রান্ত ও ভাগ্যবান কবিরাজকুল একবার কোমর বাঁধিলে, ম্যালেরিয়ার পাঁচনটিকে কি প্রত্যহ প্রাতে প্রস্তুত অবস্থায় পল্লীর দ্বারে দ্বারে সকলের সুলভ ও সহজ প্রাপ্য করিয়া উপ-স্থিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন না? যাহাতে গরীব দুঃখীরা ঘরে বসিয়া প্রত্যহ এক পয়সা খোরাক হিসাবে ready made পাঁচন পায় তাহার উপায় কি হইতে পারে না? সহরে আসিয়া, ব্যবস্থা লইয়া ঔষধ সংগ্রহ করিবার সুবিধা ও সামর্থ্য অনেকেরই নাই। অনেকেই ভুগিয়া ভুগিয়া জীর্ণ ও নিরুৎসাহ; তাহাদের আর কোন উদ্যমই নাই,—জীবনে হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া বসিয়া আছে। এমন অর্থও আর নাই যে টাকা ফেলিয়া শিশির পর' শিশি ম্যালেরিয়া মিক্‌-শ্চার খায়। এই হতাশ অসমর্থদের প্রতি বঙ্গের বদান্য বৈদ্যবংশের কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে না কি? তাঁহারা কি বঙ্গদেশের এই বিপন্নদের বাঁচাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইবেন না? যদি একা না সম্ভব হয় ত দশ জনে মিলিয়া সঙ্ঘ গঠন করিয়া ইহার একটা উপায় বিধান করুন, আর নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট থাকিবেন না।

প্রথমতঃ পল্লীতে পল্লীতে সহৃদয় লোক পাঠাইয়া পাঁচনের উপকারিতা, তাহা পাই-

বার উপায় ও সুবিধা, তাহা ব্যবহারের নিয়ম এবং তাহার মূল্যের অকিঞ্চিৎকরত্ব বুঝাইবার ব্যবস্থা করা চাই। পরে, চায়ের মত প্রস্তুত অবস্থায় পাঁচনটি নিত্য নিয়মিত সরবরাহ বা ফেরী করান চাই। যেখানে বহু লোকের সহজ প্রাপ্য হওয়া সম্ভব এমন এক একটি গ্রামে ডিপো খুলিলেও মন্দ হয় না। কিন্তু সমস্ত কাজটি সঙ্ঘের লোকের দ্বারা পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। নচেৎ মেকী ঢুকিয়া এই সদুদ্দেশ্যটিকে নিষ্ফল করিয়া দিবে। গ্রীষ্মাবকাশে, পূজার বন্ধে ও বড়দিনের ছুটিতে কলেজের ছাত্রেরা এই মহৎ প্রচেষ্টা-টিকে সাফল্য দিবার জন্য, তাঁহাদের পরার্থপর হৃদয় ঢালিয়া নিশ্চয়ই এই মহাব্রতের প্রধান সহায় স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবেন।

এই কার্য্যটিকে "হিতসাধন ব্রত" বলিয়াই গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। চাই কি ভবিষ্যতে ইহা একটি সমূহ লাভজনক অনুষ্ঠান বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে, কিন্তু "ব্যবসা" বলিয়া যেন ইহাকে কলুষিত না করা হয়। আপাততঃ এই উপায়ে দেশকে ম্যালেরিয়ার কবল হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা করিতে পারিলেও, দেশের ও দশের মর্ম্মকুহর হইতে স্বতই যে আশীর্ব্বাদ উঠিবে—তাহার মূল্য নাই, তাহা দুর্লভ।

চায়ের মত একটা অকেজো বিলাসের বস্তু এই অল্পদিনের মধ্যে যে দেশের অলিতে গলিতে এবং পর্ণকুটিরে প্রভাব বিস্তার করিল, সেই ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত মুমূর্ষু দেশে ম্যালেরিয়া নাশক পাচনের মত এত বড় একটা প্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রচার জন্য কোন চেষ্টাই কি হইবে না, কোন চেষ্টারই কি আবশ্যক নাই?

বৈদ্যবংশ শিরোমণি বিশেষজ্ঞ ও সম্পন্নেরা কৃপা করিয়া গরীবদের হতাশ হৃদয়ের এই প্রতিধ্বনি ও প্রস্তাবটা একবার ভাবিয়া দেখিলে কৃতার্থ হইব। উচ্চ জনে ম্যালেরিয়া উচ্ছেদসাধন কল্পে মশক কুল নির্ম্মূল করিতে এবং কুইনাইনের কামান চালাইতে থাকুন; আপনারা মানুষের ম্যালেরিয়া মুক্তির ভারটা লইয়া দেশের দুঃখ নিবারণ করুন।

আশা করি কলিকাতার নব প্রতিষ্ঠিত "হিতসাধন সমিতি"ও এ সম্বন্ধে চিন্তা ও চেষ্টা করিবেন।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারতীয় মুসলমান রাজগণের সাহিত্যসেবা ও শিক্ষাবিস্তার

মোগল রাজবংশ

জাহাঙ্গীর

জাহাঙ্গীর তাঁহার উদার পিতা অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে হীন হইলেও সাহিত্যের রস হইতে বঞ্চিত ছিলেন না। আমরা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি তাঁহার শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট যত্ন লওয়া হইলেও কতকগুলি

দোষ তাঁহার চরিত্র স্পর্শ করিয়া তাঁহার জীবনকে কলুষিত করিয়াছিল। জাহাঙ্গীরের শিক্ষকদিগের মধ্যে মৌলানা মীর কালান মুহদ্দিস একজন। তিনি আকবরের ১ রাজত্বসময়ে হিরাট হইতে হিন্দুস্থানে আসিয়াছিলেন; এবং আবদুল রহিম মীরজার সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি ২। আমরা আরও জানিতে পারি যে, কুতবুদ্দিন মহম্মদ খাঁ (৯৮৭ হিঃ ১৫৬৯ অব্দ পর্য্যন্ত) তাঁহার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন; এবং ইহার নিয়োগের সময় বহু সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ আহূত হইয়াছিলেন। প্রথানুসারে এইরূপ ঘটনা উপলক্ষে শিক্ষক তাঁহার পদের উপযোগী হস্তী প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্য উপহার দিতেন এবং শিক্ষক যুবরাজকে কাঁধে লইয়া সোণা ও মণি-মুক্তাপূর্ণ ছোট থালা (রেকাবী) জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিতে আদেশ দিতেন ৩। পারস্য-ভাষায় ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে সম্রাটের নিজের উক্তি হইতে জানা যায়, তিনি হিন্দুস্থানে লালিত পালিত হইলেও তুর্কীভাষার লেখা পড়ায় অজ্ঞ ছিলেন না। তুরস্কভাষায় সুপণ্ডিত হকিন্স জানিতে পারিয়াছেন সম্রাট উক্ত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ৪ এই অভিজ্ঞতা হইতে সম্রাট বাবরের মূল জীবনস্মৃতি (ওয়াকি-আতি-বাবরী) পড়িতে সমর্থ হইয়াছিলেন। (সম্রাট) জাহাঙ্গীর বাবরের স্বহস্ত লিখিত যে গ্রন্থখানি পাইয়াছিলেন উহাতে চারিটী অধ্যায়ের অভাব ছিল। জাহাঙ্গীর উক্ত অধ্যায় চারিটী নিজে লিখিয়া মূল পুস্তকের সহিত যোগ করিয়া দেন এবং উহাতে তাঁহারই কৃতিত্বের পরিচয়ের জন্য তুরস্ক ভাষায় কয়েক পংক্তি লিখিয়াছিলেন ৫। ইতিহাসের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল এবং অন্যান্য মোগল বাদসাহদিগের ন্যায় তাঁহারও রাজত্বকালের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিবার বিশেষ অভিপ্রায় ছিল। এই অভিপ্রায়ে তিনি তাঁহার জীবনস্মৃতি স্বহস্তে এবং মহম্মদ হাদি ও মুতামদ খাঁ ঐতিহাসিকদ্বয় একমত হইয়া লিখিয়াছেন। জীবনস্মৃতি সম্পাদিত হইলে তিনি পাঠাগারের অধ্যক্ষকে আদেশ দেন যে, উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদিগের মধ্যে বিতরণ করিতে এবং দেশের সর্ব্বত্র গণ্যমান্য লোক-দিগের নিকট প্রেরণ করিতে। প্রথমখণ্ড সাহজাহানকে অর্পণ করা হয় ৬।

জাহাঙ্গীরের নাম একটী সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়মের সহিত যুক্ত হইয়া তাঁহাকে রাষ্ট্রের সর্ব্বত্র সুপরিচিত করিয়া দিয়াছিল। ঐ বিজ্ঞাপনের দ্বারা তিনি এরূপভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন যে যখনই কোন প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি অথবা কোন সম্পত্তিশালী ব্যক্তি উত্তরা-ধিকারী না রাখিয়া মারা যাইতেন তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইত এবং তদ্দ্বারা অট্টালিকা উত্তোলিত হইত এবং মাদ্রাসা ও দরগা সমূহের স্থাপন ও সংস্কার সাধিত হইত ৭।

1 *Muntakhabul-Mir' atul-Alam*, MS. in Boh, Coll., p. 29 ; Elliot viii, p. 159.

2 Noer's *Akbar*, vol. ii, p. 247.

3 *Muntakhhabul-Tawarikh*, vol. ii, (Lowe's), p. 278.

4 Elphinstone (9th ed.), p. 548.

5 *Wakiati-Jahangiri*, Elliot vi, p. 315.

6 *Ibid.*, Elliot vl, p. 360.

7 Khafi Khan's *Muntakkhabul-Lubab (Bibl. Indica)*, Pt, i, p. 249 ; *Tarikhi-Akbari*, MS. in ASB, Leaf 66

তারিখি—জান-জহানে এইরূপ লিখিত আছে যে, যে সকল মাদ্রাসা পশু পক্ষীর আবাসভূমি হইয়াছিল তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের পরে তিনি সেই গুলির সংস্কার করেন এবং শিক্ষক ও ছাত্রদিগের দ্বারা পূর্ণ করেন। ১

আকবরের সময়ে আগরা যেমন সর্ব্বপ্রধান স্বারস্বত কেন্দ্র হইয়াছিল জাহাঙ্গীরের সময়েও ঠিক সেইভাবেই চলিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। তুজাক গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, "আগরার অধিবাসিগণ আপনাদের উদ্যমে নানাপ্রকার হস্তশিল্পে নৈপুণ্য লাভের জন্য যত্নবান হইয়াছিল। বিভিন্ন ধর্ম্মের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু অধ্যাপক উক্ত নগরে তাঁহাদের বাসস্থান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ২।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মকতুব খাঁ রাজকীয় পাঠাগার ও চিত্রশালার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়াছিলেন ৩। যখন জাহাঙ্গীর গুজরাটে গমন করেন তখন সঙ্গে একটা লাইব্রেরী লইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার পুস্তকপ্রীতি উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁহার চরিত্রে কতকটা বর্ত্তিয়া ছিল। তাঁহার সঙ্গের লাইব্রেরী হইতে গুজরাটের সেখদিগকে তফ্‌সিরি হুসাইনি, তফ্‌সিরি কাসসফ্ এবং রজ্জাতুল অবাব উপহার দিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক পুস্তকের পরিশিষ্টে তাঁহার গুজরাটে আগমন ও পুস্তক উপহারের তারিখ লিখিয়া দিয়াছিলেন ৪।

জাহাঙ্গীর অত্যন্ত পুস্তকপ্রিয় ছিলেন। মিষ্টার মার্টিন বলেন—"পুস্তকসংগ্রাহক অভিযোগ করেন হস্তলিখিত পারশিক গ্রন্থসমূহের জন্য অত্যন্ত অর্থব্যয় হইতেছে, তথাপি পুস্তকের পূর্ব্বতন মালিকেরা যত ব্যয় করিয়াছেন তাঁহার তুলনায় অতি অল্পই ব্যয়িত হইয়াছে। ঐ সকল হস্তলিখিত পুস্তক সংগ্রহের জন্য তিন হাজার স্বুবর্ণমুদ্রা দেন—উহার মূল্য ১০,০০০ পাউণ্ডের সমান—২০০০ পাউণ্ড দিলেও আজ পারিস হইতে কিনিতে পাওয়া যায় না। আমরা সংক্ষিপ্ত বিবরণী এবং রাজকীয় হিসাব সমূহ হইতে দেখিয়াছি বিহজাদের (বিখ্যাত পারসিক চিত্রকর) প্রত্যেকখানি ছোট ছোট ছবির শত শত পাউণ্ড মূল্য ছিল এবং তাহার কতকখানি স্বহস্ত অঙ্কিত ছবির বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা দশগুণ মূল্যও ছিল। কয়েকদশবর্ষ গত হইল যখন প্রাচীন গ্রন্থাগার পূর্ব্বাংশে বর্ত্তমান ছিল সেই সময় বর্ত্তমান লণ্ডন অথবা প্যারিসের মূল্য অপেক্ষাও অনেক বেশী দিতে হইত। পরবর্ত্তী কয়েক শতাব্দী যাবৎ, পুরাতন পুস্তকের জন্য ঐরূপ যত্ন প্রাধান্যলাভ করিলে এবং রোমব্রানড্‌টস ও ভন্‌ডিকসের গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য আমেরিকদিগের ন্যায় অতিরিক্ত মূল্য দিতেছে। মোঙ্গলীয়, তৈমুরবংশীয় এবং মোগলবংশীয় সম্রাট ও আমীরগণ যে অর্থব্যয় করিতেন তাহা আমরা কদাচিৎ ধারণা করিতে পারি এবং এইরূপ কার্য্যে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই কারণ হস্তলিখিত কোর্‌আন সংগ্রহের জন্য ব্যয়িত অর্থ বর্ত্তমান মুদ্রা

1 Tarikhi-jan-jahan by Jan-Jahan Khan, MS. in ASB. We learn that in 1623 A. D. Muhammad Safi, Diwan of the Subah of Gujrat founded *madrasahs at Jubbalpur* in front of the gate of the fort Irk, and beside Sayif khan's *madrasah (Mirati-Ahmadi* by 'Ali Muhammad Khan, vol, i, p. 200).

2 *Tuzaki-Jahangiri*, by Rogers and Beveridge, p. 7.

3 *Ibid.*, p. 12.

4 *Tuzaki-Jahangiri*, by Rogers and Beveridge, pp. 439, 440.

প্রচার আফিসের (currency) লক্ষ ফ্রাঙ্কের সমান হইবে।"১

জাহাঙ্গীর চিত্রবিদ্যার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। চিত্রকরদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। ফরাখবেগ তাঁহার সময়ের সর্ব্বপ্রধান চিত্রকর।২ তাৎকালিক অন্যতম প্রধান চিত্রকর আবুল হসন দরবারে আসীন সম্রাটের একখানি চিত্র আঁকিয়া সম্রাটকে উপহার দিয়াছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরনামার মুখপত্রে ঐ চিত্রখানি ব্যবহার করিতেন। হসন কোন লোককে দেখিয়া অথবা তাহার বর্ণনা শুনিয়া চিত্র অঙ্কনেও সুপারগ ছিলেন। মনসুর অন্য আর একজন বড় চিত্রকর তিনি নাদির-উল-অসল উপাধিতে সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন।৩

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে চিত্রবিদ্যা উন্নতির চরমাবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। কাত্রুটো বলেন "এই সময়ে ভারতীয় চিত্রকরগণকে ইউ-রোপীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিত্রসমূহের প্রতিকৃতি অঙ্কন করিতে দেখা যায়! ঐ গুলি যে মূল চিত্র হইতে পৃথক নয় তাহা নিঃসন্দেহে ধারণা হয় ৪।"

সার টমাস্ রো জাহাঙ্গীরের দরবারে অবস্থান কালে একখানি চিত্র তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের সর্ব্ব প্রধান চিত্রকরকে উহা দেখিতে দেওয়া হইলে তিনি বলিলেন ঠিক অনুরূপ একখানি আঁকিয়া দিতে পারেন। কিছুদিন পর সম্রাট্ মাননীয় রো-কে ছয় খানি ছবি দেখিতে দিলেন উহাদের পাঁচখনি তাঁহার আপন চিত্রকরের হাতের অঙ্কিত। ছবিগুলির মধ্যে ইতর বিশেষ না থাকায় গোধূলির আলোতে একটিকে অন্যটি হইতে তফাৎ করিবার উপায় ছিল না। এক ঘণ্টা নিরীক্ষণ করার পর রো সাহেব তাঁহার উপহৃত ছবি বাহির করিলেন। রাজদূত বলিলেন তিনি এতদূর আশা করিতে পারেন নাই যে ছবিগুলি এত সুন্দর হইবে।৫

জাহাঙ্গীর তাঁহার জাহাঙ্গীরনামাকে প্রাণী-দিগের ছবি দ্বারা সরস ও চিত্তাকর্ষক করিবার নিমিত্ত চিত্রকর নিয়োগ করেন। ঐ সকল ছবি গোয়ার সামুদ্রিক বন্দর হইতে মুকাররব খাঁ তাঁহার নিকট এই উদ্দেশ্যে আনিয়াছিলেন যে, "তাহাদের মৌখিক বর্ণনা অপেক্ষা ছবিদ্বারা বুঝাইলে পাঠকের মনে অধিকতর বিস্ময় আনিতে পারিবে।৬

তুজাক্ ও ইক্‌বাল্ নামা জাহাঙ্গীরের দরবারের নিম্নলিখিত গায়কদিগের নাম করেন—জাহাঙ্গীরদাদ, চতর খাঁ, পরবিজ-দাদ, খুরমদাদ, মখু এবং হমজন।

1 Martin's *Miniature Painting and Painters of Persia, India and Turkey*. vol. i, p. 58,

2 *Tuzak-Jahangiri*, by Rogers ahd Beveridge, p. 159.

3 *Waqi'ati-Jahangiri*, Elliot vi, p. 359. "Jahangir was a great lover of birds, and had a painter Mansur who portrayed his favourites (birds) in a way often worthy of Durer."—Martin's *Miniature Painting and Painters of Persia, India and Turkey* vol. i, p. 88.

For an account of the painters of Jahangir and their paintings existing in the British Museum and other places, see *ibid.*, pp. 131, 132.

4 Catrou's *History of the Mughal Dynasty*, p. 178.

5 *Purchas His Pilgrims*, vol iv, pp 344 ff.

6 *Waqi'ati-Jahangiri*, Elliot vi, p. 331.

জাহাঙ্গীরের দরবারের নিম্নলিখিত পণ্ডিত ব্যক্তিগণের নাম করা যাইতে পারে:— মির্জ্জা ঘোসবেগ, "অত্যুৎকৃষ্ট রচনায় ও পাটীগণিতে অদ্বিতীয় ছিলেন।" ১ নকিব খাঁ, তাঁহার ইতিহাসজ্ঞানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন—ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত মুতমদ্ খাঁ এবং নিমতুল্লা উভয়েই জাহাঙ্গীরের জীবনী লেখক ছিলেন।২ সামানের হয়বৎ খাঁ আফগান জাতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে যে সকল উপাদান সংগ্রহ করেন, জাহাঙ্গীরের পৃষ্ঠপোষকতায় নিমতুল্লা সেইগুলিকে সাজাইয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।৩ আবদুল হক্ দিলাবী, সেই সময়ের অন্যতম সুপণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি জাহাঙ্গীরের সহানুভূতি লাভ করেন এবং ভারতীয় সেখদিগের জীবনী রচনা করিয়া তাঁহাকে উপহার দেন। ৪

জাহাঙ্গীর "তুজাকে" লিখিয়াছেন যে, শুক্রবার সন্ধ্যাকালে তিনি পণ্ডিতব্যক্তি, ফকীর এবং কার্য্যে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের সঙ্গে আলাপ করিতেন।৫

ইকবাল-নামা-ই জাহাঙ্গীরি হইতে আমরা সম্রাটের সমসাময়িক কয়েকজন কবি ও পণ্ডিতদিগের নামের একটি তালিকা পাই।

পণ্ডিত ব্যক্তি

১। মুল্লা রুজবাহান সিরাজী
২। " শুকরুল্লা সিরাজী
৩। " তুক্যয়ৈ সুস্তরী
৪। মীর আবুল কাশিম গিলানী
৫। আ'মী আ'মরী
৬। মুল্লা বকর কাশমীরী
৭। " " তুতরী
৮। " মকশুদ আলী
৯। কাজী নূরুল্লা
১০। মুল্লা ফাজিল কাবুলী
১১। " আবদুল হাকীম সিয়ালকুটী
১২। " " মুতালিব সুলতানপুরী
১৩। " " রহমন ভুরা গুজরাটী
১৪। " হসন ফরাঘী গুজরাটী
১৫। " হসেন গুজরাটী
১৬। খাজা ঔসমান হিসারী
১৭। মুল্লা মহম্মদ জৌনপুরী।৬

উক্ত গ্রন্থ হইতে নিম্নলিখিত কবিদিগের নাম পাওয়া যায়

১। বাবা তালিব ইস্‌ফাহানী
২। মুল্লা হয়াতী গীলানী
৩। " নজীরী নীশাপুরী
৪। " মহম্মদ সূফী মাজনদ্রানী
৫। মলিক-উল-শুয়ারা তালিবাই আমুলী
৬। সৈদাই গিলানী
৭। মীর মসুম কাশী
৮। ফসুনী কাশী
৯। মুল্লা হাইদার খসালী ৭ এবং
১০। সৈদা

1 Price's *Jahangir*, p. 26.
2 Elliot v, p. 67.
3 See Dorn's Preface to *Makhzani-Afghani*.
4 *Waqi'ati-Jahangiri*, Elliot vi, p. 336.
5 *Tuzaki-Jahangiri*, by Rogers and Beveridge, p. 21.
6 *Iqbal-Numah-i-Jahangiri*, (*Bibl. Indica*), p. 308.
7 *Ibid.*, p. 308.

সাজাহান ও দারাসেকো

সাজাহান বৃহৎ বৃহৎ ইমারতের দ্বারা সাজাহানাবাদকে শোভিত করিয়াছিলেন অথবা প্রিয় এবং আত্মীয়গণের স্মৃতি-চিহ্ন-স্বরূপে সেগুলি স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই জন্যই তাঁহার প্রসিদ্ধি। কিন্তু শিক্ষার উন্নতি কিম্বা নিজের এবং প্রকৃতিপুঞ্জের শিক্ষা-বিস্তারকল্পে তাঁহার আগ্রহ তত ছিল না, তথাপি পিতা অথবা পিতামহের শিক্ষা-কার্য্যকে তিনি লোপ করিয়াছিলেন, এরূপ কিছু বুঝা যায় না। পরন্তু অপরদিকে দেখা যায় 'তাফ্রিহুল ইমারাৎ' ১ সাক্ষ্যদিতেছেন যে, তিনি আকবরের পন্থানুসরণ করিয়া চলিতেন।

প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক্ বার্নিয়ার এই সময়ে ভারতবর্ষে আসেন এবং হিন্দুস্থানের শিক্ষা সম্বন্ধে একটি দুঃখের চিত্র (ইতিহাস) রাখিয়া গিয়াছেন। ঐ লেখা (মন্তব্য) অনেকটা অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয় তিনি বলেন—

"খুব বেশী ও গভীর অজ্ঞতা রাজ্যের সর্ব্বত্র বিস্তৃত ছিল। সুতরাং ইহা কিরূপ বিশ্বসনীয় হইতে পারে যে, সে সময়ে অনেক সাধারণ ও উচ্চ বিদ্যালয় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল? এই রকম বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-তার নাম কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়? এবং যদি তাহাই হয় তাহা হইলে সুপণ্ডিতদিগের নামই বা কোথায় পাওয়া যায়? জনসাধারণের এইরূপ প্রচুর অর্থ কোথায় যদ্দ্বারা সন্তানদিগকে উচ্চশিক্ষা দিতে পারে? এবং যদিই বা উচ্চশিক্ষা পাইয়া থাকে তাহা হইলে অর্থশালী কাহাকেও দেখা যাইত না কি? তাহারা যদি উচ্চশিক্ষিত হইয়া থাকে তাহা হইলে, জ্ঞান ও শক্তির নিদর্শন সেই সকল ধর্ম্ম-প্রাণতা, উন্নতিশীলতা ও পদগৌরব কোথায়, যাহা যুবকগণকে প্রাণ দিয়া গড়িয়া তোলে? ২"

যদিও সাজাহানের রাজত্বকাল শিক্ষা-ক্ষেত্রের কোন নূতন ধারায় খ্যাতি লাভ করে নাই তথাপি বার্নিয়ারের বিবরণ হইতে খাঁটী বিষয় জানিতে পারা যায় না। তিনি যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একজন ধ্বংস-কারী ছিলেন না তাহা এই ঘটনা হইতেই বুঝা যায় যে, সর্ব্বপ্রকার শিক্ষাকেন্দ্র, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সম্রাট, উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী এবং সাধারণ শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগের প্রদত্ত যথেষ্ট ভূসম্পত্তি দ্বারা চলিতেছিল, এবং তাহার রাজত্বকালেও সেইগুলি আপনাদের গৌরব লইয়া জীবিত ছিল। অন্যত্র আমরা দেখিতে পাই সাজাহান শিক্ষার জন্য একটী অতি প্রয়োজনীয় ও সুপরিজ্ঞাত দান করিয়াছিলেন, উহার দ্বারা দিল্লীতে জমিমসজিদের সন্নিকটে একটী রাজকীয় কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্ ষ্টিফেন (Carr Stephen) সাহেবের বিবরণ হইতে জানা যায়—

"দিল্লীর জমিমসজিদের উত্তরদিকে রাজকীয় ঔষধালয় এবং দক্ষিণদিকে রাজকীয় কলেজ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই দুইটী অট্টালিকাই ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহের অনেক পূর্ব্বেই ধ্বংসাবস্থায় পতিত হইয়াছিল, এবং উক্ত ঘটনার কিছুকাল পরই উহা সমভূমিতে পরিণত হয়। এই দুই অট্টালিকাই ১০৬০ হিজীরার (১৬৫০ অব্দে) মস্‌জিদের সঙ্গে নির্ম্মিত হইয়াছিল।" ৩

সৈয়দ আহম্মদ আরও বলেন যে, সাজা-হানাবাদের সদর-উল-সুদুর মৌলবী মহম্মদ সদ্রুদ্দিন খাঁ বাহাদুর, তাৎকালিক দিল্লীর

1 *Tafrihul-'Imarat*, by Silchand, MS. in ASB, leaf 41.
2 *Bernier*, p. 210 (Ouldinburgh's edition).
3 C. Stephen's *Archaeology of Delhi*, p. 255.

সম্রাটের রাজত্বের কিছুকাল পরেই মাদ্রাসাকে তাহার ইচ্ছামত পরিবর্ত্তিত করেন, এবং অট্টালিকার সংস্কার ও নানা বিষয় যোগ করিয়া, তাঁহার নবীন চিন্তাশক্তির বলে উহাকে নবভাবে সঞ্জীবিত করেন। ১

সাজাহান সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসোন্মুখ দার-উল-বকা (অনন্তের আবাসস্থান) নামক কলেজটী মেরামত করান। সম্রাট্ কলেজটী মেরামত করাইয়া উহার জন্য কয়েকজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ব্যক্তিকে অধ্যাপক নিয়োগ করেন। কলেজটীকে সমৃদ্ধিশালী করিবার নিমিত্ত সম্রাট্ দিল্লীর প্রধান বিচারপতি মৌলানা মহম্মদ সদ্রুদ্দিন খাঁ বাহাদুরকে উহার ডিরেক্টর নিয়োগ করেন। এই কলেজের নিকটে জলের দুইটী বড় বড় সরোবর একটী মসজিদ্, একটী হাসপাতাল এবং একটী বড় বাজার ছিল। ২

সাজাহানের স্বহস্ত লিখিত দৈনিক কর্ম্মের তালিকা হইতে দেখা যায় যে, রাত্রে পাঠের জন্য সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল।

"রাত্রি প্রায় ৮॥০ টার সময় রমণীদিগের প্রাসাদে আসিতেন। ২ ঘণ্টা কখন কখন তিন ঘণ্টা অবধি স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া কাটাইয়া দিতেন। অতঃপর সম্রাট শুইতে যাইতেন এবং নিদ্রাকালে গ্রন্থাদি পাঠ করা হইত। সু-পাঠকগণ সম্রাটের শয়নকক্ষের পাশে এক ঘরে বসিতেন এবং উচ্চৈঃস্বরে ভ্রমণকাহিনী, সাধুমহাত্মাদিগের জীবনী এবং জ্যোতিষী ও পূর্ব্বতন রাজগণের ইতিকথা পাঠ করিতেন—প্রত্যেক গুলিই গভীর উপদেশপূর্ণ। ঐ সকল জীবনীর মধ্যে 'তৈমুরের জীবনী' এবং 'বাবরের আত্মজীবন চরিতই' ৩ সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। ৪"

সাজাহান সঙ্গতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, এবং বোধ হয় তিনি নিজেও সুগায়ক ছিলেন। ৫ রামদাস ও মহাপাত্তর তাঁহার প্রধান গায়কদ্বয় ছিলেন। ৬

সাজাহান চিত্রশিল্পেরও উৎসাহদাতা ছিলেন। মহম্মদ নাদির সমরকন্দি তাঁহার দরবারের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীদিগের অন্যতম ছিলেন। ৭ সাজাহানী চিত্রন-পদ্ধতি অনেকটা জাহাঙ্গীরী চিত্রন-পদ্ধতির অনুরূপ হইলেও উভয় পদ্ধতিই আকবরী চিত্রন-পদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ৮

মহম্মদ আমিনী—কাজবিনী সম্রাটের আদেশে বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ বাদ্‌শা

1 *Asarul-Sanadid*, by Sayyid Ahmad, 3rd chap., p. 69.

2 Garcin de Tassy's transl. of Sayyid Ahmad, p. 152, corresponding to *Asarul-Sanadid*, 3rd chap., p. 69.

3 It appears from *Shah-Jahan-Namah*, *by* Muhammad Amin-i-Qazwini (MS. in ASB, leaf 34), that a copy of the *Memoirs* in Babar's handwriting was in Shah Jahan's Library.

4 J. Sarkar's *Anecdotes of Aurangzib and Historical Essays*, p. 174.

5 *Mir'atul-'Alam*, MS. in the Boh. Coll., leaf 181 ; also J. Sarkar's *Anecdotes of Aurangzib and Historical Essays*, pp. 173, 174.

6 Willard's *Treatise on Hindu Music*, p. 213.

7 See Martin's *Miniature Painting and Painters, etc.*, vol. i, p. 132. For an account of the Paintings executed by the painters of Shah Jahan's Court, see pp 131, 132 (*ibid.*).

8 *Ibid.*, p. 82.

নামা রচনা করেন। সম্রাট সাজাহানের নাম চিরদিন উহার সঙ্গে জড়িত থাকিবে।১

সাজাহান পণ্ডিত ব্যক্তিগণকে পুরস্কার বৃত্তি দ্বারা উৎসাহিত করিতেন।২ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তাঁহার রাজত্ব সময়ের পণ্ডিত ও কবি ছিলেন—

১। সৈয়দ বুখারী গুজরাটী
২। ,, জামালুদ্দিন
৩। সেখ মীর লাহুঅরি
৪। খাজা খান্দ মামুদ (আলাউদ্দিন অত্তরের দৌহিত্র)
৫। সেখ বহলুল কাদিরী
৬। মীর্জা জিয়াউদ্দিন
৭। মৌলানা মুহিবালি সৈয়িদি
৮। সেখ নাজীর
৯। মুল্লা স্বকুল্লা সিরাজী
১০। মীর আবদুল আসিয়া ইরাণী
১১। মুল্লা মহম্মদ ফাজিল বদখ্সী প্রভৃতি।৩

রাজপরিবার যুবরাজ দারার মত সুপণ্ডিত লাভ করিয়াছিল। আরবী ও পারশী উভয় ভাষাতেই তাঁহার আধিপত্য ছিল এবং কয়েকখানি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থের পারশী অনুবাদ দ্বারা সংস্কৃত ভাষাতেও তাঁহার ব্যুৎপত্তি দেখাইয়াছেন। তাঁহার গৃহশিক্ষক দিগের অন্যতম সুপণ্ডিত খোরাসানবাসী সেখ হিরবী, মৌলানা আবদুল সালীমের ছাত্র ছিলেন।৪ যুবরাজ দারা তাঁহার শেষ জীবনে হিন্দুর ধর্ম্ম ও তাঁহার প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন এবং তাঁহাকে সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণ, যোগী ও সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গীরূপে দেখা যাইত। হিন্দুর জ্ঞানের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট ভক্তি ছিল। বেদপাঠ শ্রবণে তিনি ভক্তি প্রণোদিত হইয়া বেদের অনুবাদের নিমিত্ত দেশের সর্ব্বস্থান হইতে সুপণ্ডিত হিন্দুদিগকে আহ্বান করেন। হিন্দুর ধর্ম্মানুরাগ থাকায় তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়াছিল, কারণ তিনি হিন্দুর ধর্ম্মোপদেশগুলি সুপ্রচারিত করেন, এবং তাহার হীরক ও রুবি প্রভৃতির অঙ্গুরীতে হিন্দী ভাষায় 'প্রভু' শব্দটী খোদিত করাইয়াছিলেন।৫

দারাসেকো নিম্নলিখিত বৃহৎ গ্রন্থগুলির প্রণেতা ছিলেন—

(১) সির্-উল-অসরার (রহস্যের রহস্য) এই গ্রন্থ কখনও কখনও সির্-উল-আকবর বলিয়াও কথিত হয়, গূঢ়"রহস্য।" গ্রন্থখানি উপনিষদের পারস্যানুবাদ। আমরা তাঁহার গ্রন্থাবলীর ভূমিকা হইতে দেখিতে পাই তাঁহার কাশ্মীরে অবস্থিতিকালে তিনি সুফী-প্রধান মুল্লাশার শিষ্য হইয়াছিলেন। তিনি সুফী মতবাদ সম্বন্ধে কতকগুলি গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন, কিন্তু একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে বেদ বিশেষতঃ উপনিষদ ব্যতীত আর কোথাও তৃপ্তিদায়ক উপদেশ পান নাই। সুতরাং কাশী

1 *Vide Khafi Khan*, Pt. i, p. 237.

2 For an account regarding this point, see *Bad ah-Namah*, by 'Abdul Hamid Lahauri, vol. i, pp. 106, 318, 364, and vol. ii, pp. 127, 138, 184 and 309; also *Mir' atul-'Alam*. MS. in the Boh. Coll. leaf 190. 'Abdul Hakim Siyalkuti was on one occasion given his weight in silver.

3 *Shah-Jahan-Namah*, MS. in ASB, leaves 574 ff.

4 Elliot viii, p. 159 (from *Jami'-Jahan-Numa* of Muzaffar Husain).

5 Alamgir-Namah. Elliot vii. p. 179.

তখন তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল, তিনি কাশী হইতে কয়েকজন পণ্ডিতকে আহ্বান করেন, এবং তাঁহাদের দ্বারা উক্ত গ্রন্থগুলির অনুবাদ করেন। এই কার্য্য ১৬৫৭ খৃঃ অব্দে সম্পাদিত হয়। ১

(২) ভগবদ্গীতার অনুবাদ

(৩) যোগ বাশিষ্ঠ রামায়ণের অনুবাদ করেন। এই গ্রন্থের আরও দুইখানি অনুবাদ আছে, একখানি কোন অজ্ঞাত লোকের প্রণীত এবং অপরখানি মহাত্মা আকবরের রাজত্বকালে কোন হিন্দু সুপণ্ডিতের দ্বারা অনুদিত হয়।

(৪) মুকালম-ই-বাবা লাল দাস—হিন্দু সন্ন্যাসী জীবন এবং তাঁহাদের উপদেশাবলী সম্বন্ধে যুবরাজ ও বাবা লাল দাস এই উভয়ের কথোপকাহিনী

(৫) সফিনত-অল অলিয়া—ইস্লামের প্রারম্ভ হইতে গ্রন্থকারের সময় পর্য্যন্ত মহাপুরুষদিগের জীবনচরিত। (এই কাব্য ১৬৪০ অব্দে সম্পাদিত হয়)।

(৬) সকিনত--উল--অলিয়া—-ভারতীয় মহাপুরুষ মিয়ানমীর ও তাঁহার শিষ্যগণের বিবরণী (১৬৪২ খৃঃ অব্দে সম্পাদিত হয়)।

৭। নাদির-উল-মুকাত,

৮। হসনত-উল- অরিফিন,

৯। রিসালা-ই-হকনামা

সুফী মতবাদসম্বন্ধীয় গ্রন্থত্রয়।

১০। মজমা-উল-বহরেইন—হিন্দু একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে পারিভাষিক শব্দ এবং সুফী একেশ্বরবাদ গ্রন্থে ঐগুলির অর্থ সামঞ্জস্য সম্বন্ধে একখানি ভাষ্য। ২ দুইটি প্রণালীর বিশদ ব্যাখার জন্য (১৬৫৪ খৃঃ অব্দে) লিখিত হয়।

দারাসেকো আরঙ্গজেবের দুরভিসন্ধি সত্ত্বেও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন যদি জনসাধারণের শিক্ষাপ্রাণতা অনুরূপ হইত। লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল শ্লীমেন যুবরাজের সমাধি দেখিয়া আক্ষেপ করেন যে—

"এইখানে একখণ্ড মারবল পাথরের নীচে হতভাগ্য দারাসেকোর ছিন্নমস্তক সমাহিত রহিয়াছে। সম্ভবতঃ তিনি তাহার কিঞ্চিৎ দৃঢ়ধারণার জন্য তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তন দ্বারা ভারতের ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন। যে ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ডের নীচে তাঁহার মস্তক চিরবিশ্রাম লাভ করিতেছে উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অমনি ভাবি প্লাবন এবং অনাবৃষ্টি দ্বারা যে আকস্মিক বিপদ আসে তাহা ক্ষুদ্র এবং মস্তিষ্কের চিন্তাশক্তি ও হৃদয়ের অনুভূতি যাহাদের উপর জাতির এবং সাম্রাজ্যের ভাগ্য অনেক সময়ই নির্ভর করে তাহা অপেক্ষা আরও ক্ষুদ্র।" ৩

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা।

---

1 It was rendered into Latin by Anquctil-Duperron, and published by him at Paris in 1801. (See Constable's *Bernier*, p. 323 n.

2 For some of my information regarding Dara-Shikuh, I am indebted to Prof. Hidayet Husain.

3 Sleeman's *Rambles* and Recollections, vol, ii, pp. 270, 271.

স্বোপার্জ্জিত অন্নকষ্ট

(১)

আত্মবিস্মৃতি

আত্মবিস্মৃতির ন্যায় মহাপাপ আর নাই—ইহা সকল পাপের সেরা—সকল অনর্থের মূল। স্বোপার্জ্জিত অন্নকষ্ট কেবল মাত্র আত্মবিস্মৃতির দ্বারাই উপভোগ হয়, অন্য কিছুতে নহে। আমার আমিত্ব জ্ঞান যতদিন থাকে, ততদিন আমি ষোল আনা আমিই থাকি, আমিত্ব যে পরিমাণে কমিতে থাকে সেই পরিমাণে আমারও ওজন হাল্কা হইতে থাকে। আমার ওজন আমিত্বের উপর নির্ভর করে। আমিত্বই আমাকে লোক-লোচনের গোচরীভূত করিয়া রাখে।

'আমিত্ব' কোথায় যায়? যায় না কোথাও, আমার মধ্যেই বন ঠাসা হইয়া আছে, সঙ্কুচিত হইয়াও থাকে—আকুঞ্চনত্ব ও প্রসারণত্বই আমিত্বের ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম হইতে কখন আমিত্বকে বঞ্চিত করা যায় না। আমিত্ব যখন প্রসারণত্ব ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া চলে তখন 'আমি' স্ফুটতর হই; সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিতে সমর্থ হই। আবার আমিত্ব যখন আকুঞ্চনত্ব ধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া কুর্ম্মের ন্যায় স্ব শরীরে লুক্কায়িত হয়, তখন সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের অন্তরালে সুষুপ্তাবস্থায় স্পন্দনহীন হইয়া পড়ি। তখন আমি থাকি কিন্তু আমিত্ব প্রায় থাকে না। থাকায় না থাকায় সমান হইয়া পড়ে।

আমিত্ব দু'মুখো,—হয় প্রসারণত্ব ধর্ম্ম বিশিষ্ট, না হয় আকুঞ্চনত্ব ধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া থাকে। আমিত্ব যখন আত্মশক্তির উদ্বর্দ্ধনে হস্ত প্রসারণ করে, নয় আত্মশক্তির সংহরণ দ্বারা প্রসারিত হস্ত ধীরে ধীরে গুটাইয়া লয়। কর্ম্ম লোপ পায় না শক্তির বিদ্যমানতার অভাব পরিলক্ষিত হয় না।

পুষ্প কোঁরকের বিস্মৃতি বা বিকাশ আমিত্বের সৌরভে পূর্ণ। প্রসারণত্বই পুষ্পের বিকাশক। যেখানে বিকাশ নাই—সেখানে পুষ্পের আমিত্বের একান্ত অভাব। সৌরভত্ব বিকীর্ণ হইতে পায় না। যেখানে সৌন্দর্য্য এবং সৌরভ নাই—সেখানে পুষ্পের অস্তিত্বও নাই। সেস্থলে ফল কামনা নিরর্থক।

পুষ্পের আকাঙ্ক্ষা ফলোন্মুখী, পুষ্প আপনাকে ভুলিতে চায়—ফলের মুখ চাহিয়া। ফল প্রাপ্তিই পুষ্পের আকাঙ্ক্ষা! এস্থলে পুষ্প আত্মহারা হয় কিন্তু আত্মবিস্মৃতি হয় না—তাহার লক্ষ্য, তাহার আকাঙ্ক্ষা ফলের অভিমুখে আত্মস্মৃতি জাগাইয়া তুলে—ফল কামনা করিলে—একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় আত্মহারা হইতে হয়। পরিণতির দিকেই সৃষ্টির লক্ষ্য। আত্মবিস্মৃতি উদ্বর্দ্ধনের চিহ্ন নহে—স্বোপার্জ্জিত গতিশক্তির দ্বারা জড়ত্ব বাড়াইয়া তুলিতে হয়। লক্ষ্য স্থির রাখিয়া স্বোপার্জ্জিত গতিশক্তির উদ্বর্দ্ধন দ্বারা আত্মহারা নামক ভাবাবেশে বিভোর হইতে হয়। সকল চিন্তা লক্ষ্যের দিকে সরল রেখার ন্যায় ছুটিতে থাকে বলিয়াই অগ্র রেখান্ত বিন্দুটির গতিও বাড়িয়া যায়। সকল দিক হইতে চিন্তাকে গুটাইয়া ঐ নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকেই ছুটাইতে থাকে বলিয়া চিন্তার অর্জ্জিত শক্তি বড়ই বাড়িয়া যায়—এই অবস্থার বাহ্যিক

ভাবের নাম—সমাধি—সমাধি-ভাব আনাই যোগের উদ্দেশ্য—মন যখন চিন্তা, কল্পনা সকল দিক্ ভুলিয়া লক্ষ্যের দিকেই ধাবিত হয় তখন স্মৃতি থাকে 'আত্মহারা' ভাবাবেশ হয়, কিন্তু আত্মবিস্মৃতি হয় না।

কর্ম্ম-চিন্তা-শক্তি বিন্দুটি যখন আরও আগে আরও আগে দৌড়াইতে থাকে লক্ষ্যকে ধ্রুব করিয়া অনন্ত কাল-সমুদ্রের উপর তুফান তুলিয়া ছুটে, তখন উহার গতি-পথটিকেই আমরা কল্পনা নেত্রে সন্দর্শন করি। উহারই নামান্তর 'কর্ম্মরেখা' বা 'কর্ম্মপথ'—ইঞ্চি, ফুট, গজ বা মাইলের মাপ কাটি দিয়া কর্ম্ম পথটির পরিমাণ করি—পথের দূরত্ব বুঝিবার জন্য কর্ম্মকেন্দ্র রূপ মাইল ষ্টোন বসাইয়া যাই।

কর্ম্ম বিন্দুটিই কর্ম্মী,—কর্ম্মীর কর্ম্ম-লক্ষ্যাভিমুখে দ্রুত গমন কালে কর্ম্মী ফিরিয়াও দেখেনা ভাবেও না যে কতদুর অগ্রসর হইল।—সে যে আত্মহারা—কর্ম্ম পাগল অর্জ্জিত গতি শক্তিতে আপনার জড়ত্ব বাড়াইয়া আমিত্বের বিকাশ ও উদ্বর্দ্ধন করিয়া ছুটিয়াছে—তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। সে কর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়াছে—সে বিশ্বসৌন্দর্য্যে অন্ধ হইয়া কেবল লক্ষ্য পদার্থ বা বিষয়টিই দেখিতে পায়। পথের দূরত্ব, পথের ক্লেশ কিছুই মনে পড়েনা বলিয়া তাহার আত্মহারা ভাব আশে—সে বিশ্বের সকল সুখ সৌন্দর্য্য লক্ষ্য মধ্যেই দর্শন করে সে আত্মহারা কিন্তু লক্ষ্যহারা নহে—তাহার এই ভাবকে 'আত্মবিস্মৃতি' বলা যায় না। তাহার আত্মস্মৃতি লক্ষ্যগত ব্যক্তিগত নহে—সে আত্মহারা লক্ষ্যস্মৃতি বিশিষ্ট যোগী। লক্ষ্য স্থানে গমনই তাহার উপাসনা।

সেই আত্মহারা লক্ষ্যস্মৃতি বিশিষ্ট যোগীর কর্ম্ম সমূহ—অপর কর্ম্মীর কর্ম্মপথ, তাঁহার নহে। তিনি পথ করিয়া চলিয়াছেন কিন্তু পথ হইতেছে কি না তাহা তাঁহার চিন্তার বিষয়ীভূত নহে। কর্ম্মরেখা বা কর্ম্মপথের সন্ধান অন্যান্য কর্ম্মেচ্ছু কর্ম্মিগণ গড়িয়া লয়েন। মাইলষ্টোন পুতিয়া কর্ম্মের পথরেখার দূরত্ব মাপিতে থাকেন। কিন্তু যে লক্ষ্যের দিকে আত্মহারা হইয়া ছুটে সে গত পথের সন্ধান জানেনা—তাহার গতি শক্তি কেবল অগ্রে আরও অগ্রে ছুটিয়া চলে।—এই যে ভাব ইহাকেই 'আমিত্বের প্রসারণত্ব' বলা যায়।

আমিত্বের প্রসারণত্বই লক্ষ্যের নিকটে যায়—যখন লক্ষ্যটি ধরি ধরি হয় আর একটু এই হাতে ঠেকিতেছে—তখন কর্ম্মীর ভিতরে যে মহান্ ভাবের উদয় হয় তদ্দ্বারাই বুঝা যায় উহাতে আদৌ আত্মবিস্মৃতি নাই—আত্মস্মৃতিতে পরিপূর্ণ।

ভগবান বুদ্ধে, ভগবান শঙ্করাচার্য্যে, ভগবান শ্রীচৈতন্যে এই আত্মহারা ভাব ছিল—আত্মবিস্মৃতি ছিলনা—আত্মবিস্মৃতির প্রকৃত মূর্ত্তিই ঐ প্রকার। অনন্য কর্ম্ম অনন্যলক্ষ্যদ্বারা আত্মস্মৃতি-শক্তি গতিশীল ও উদ্বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। এই নিয়মে যে কর্ম্মী লক্ষ্যস্থির রাখিয়া অনন্য মনে তদভিমুখে প্রবল বেগে ধাবিত হন তিনিই 'আদর্শ কর্ম্মী'।

আহারে, বিহারে, শয়নে স্বপনে যাঁহার কর্ম্মের প্রতিলক্ষ তিনিই স্মৃতিশীল, তাঁহার স্মৃতি স্বার্থ বিজড়িত বা স্বার্থশূন্য হইতে পারে কিন্তু তিনি কখনই আত্মবিস্মৃতি বিশিষ্ট নহেন। জগতে যত কিছু মঙ্গল অমঙ্গল সাধিত হইয়াছে তাহা এই প্রকারের অনন্য কর্ম্মীর দ্বারাই হইয়াছে।

দ্রোণ বলিলেন—"কি দেখিতেছ"?
"কেবল পক্ষীর চক্ষু দেখিতেছি"।
"এইবার তীর ছোড়"
সিদ্ধি অনিবার্য্য!

যাহা বলা হইল উহার নাম—আমিত্বের হস্ত প্রসারণ। আমিত্বের হস্তসঙ্কোচন যাহা ঘটে তাহাই আত্মবিস্মৃতির বিষ-ফল। সুধা ও বিষ—অমৃতের কায়া ও ছায়ামাত্র। আমিত্বের প্রসারণত্ব ঠিক কায়া—কায়া না থাকিলে তাহার ছায়া থাকেনা—আলোয় ছায়া নাই। ছায়ারও ছায়া নাই! আমিত্বের সঙ্কোচনত্ব উহার ছায়া। আছে কিন্তু নাই—আলোকের অভাবই ছায়া, আবার ছায়ার অভাবই আলোক। সম্বন্ধ বড় ঘনিষ্ঠভাবে বিদ্যমান। দুইটিই চাই নতুবা একের অস্তিত্বের প্রমাণ অসম্ভব হইয়া উঠে—তুলনা দ্বারাই অস্তিত্ব বোধ হয়।

বাস্তব আত্মবিস্মৃতির কথা কিছুই না। প্রকৃত আত্মবিস্মৃতি বিশিষ্ট যাহারা তাহাদেরই প্রকৃত নাম পাগল বা উন্মাদ। চিকিৎসা শাস্ত্রে উন্মাদের যে লক্ষণ বর্ণিত আছে তাহার বর্ণনার জন্য এই প্রবন্ধ লিখিতে বসি নাই। নূতন লক্ষণগুলি স্ফুটতর ভাবে প্রদর্শনের চেষ্টাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কর্ম্মজগতে পাগলের সংখ্যাও অনেক এবং রকমও অনেক—মনুষ্যের মনুষ্যত্ব লইয়াই মানুষ। মানুষ হইতে যদি মনুষ্যত্ব বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে পড়িয়া থাকে অমানুষত্ব। তখন আর মানুষ বলা যায় না। মানববৎ হস্ত পদাদি বিশিষ্ট "অনর"। পশুর ভাব বর্জ্জিত হইয়া নর, পশুশ্রেষ্ঠ হইয়াছে। মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছে বলিয়াই ত মানব! যদি উহাই বাদ পড়ে তাহাহইলে বানরাকৃতি বিহীন "নৃ-বানর" ঠিকের তলায় দেখা যায়।

আমি কে? আমি নর, না বানর! আমার কর্ম্ম নৃধর্ম্মমুখী, কি বানর বা পশুধর্ম্ম মুখী? এচিন্তা যাহার নাই সেই আত্মবিস্মৃতি বিশিষ্ট। নর হইয়া যদি সর্পের ন্যায় খল ও ক্রূর স্বভাব বিশিষ্ট হয়, ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্রক হয়—কাকের ন্যায় চোর হয় তাহা-হইলে তাহার আত্মবিস্মৃতি যে স্ফুটতর তাহা বুঝা যায়।

মানবের মূল্য কত—তাহা পশুভাবগুলির বারিবর্জ্জন দ্বারাই নিরূপিত হয়। যে মানবের পশুত্ব যত কম তাহার মূল্য তত বেশী। মানব − পশুত্ব = প্রকৃত মানব।

পশুত্বের শক্তি যত, তাহা যে মানবে যত কম—সেই মানবের মনুষ্যত্ব তত বেশী।

পশুত্বের শক্তি যদি ১০ হয়। আর মানবে ঐ শক্তিগুলি যত ন্যূন হইবে মানবের মনুষ্যত্ব ততই শক্তিতে বাড়িবে।

মানব − পশুশক্তি৩, = মনুষ্যত্ব, ৩ হইবে। আদর্শ মানবে পশুত্ব শক্তি নাই হইয়া যায়। মনুষ্যত্ব তিন হইলে আত্মবিস্মৃতির পরিমাণ সাত হইবে। অর্থাৎ সেই তিন পশুত্ব ভাব-মুক্ত মানবের আত্মবিস্মৃতির পরিমাণ সাত।

এই নিয়মে মানবের মনুষ্যত্বের ওজনের ন্যূনাধিকতার পরিমাণ করা যাইতে পারে। মনুষ্যত্বের ওজন যত বাড়িবে ততই মানবের আত্মবিস্মৃতির পরিমাণ হাল্কা হইয়া যাইবে। এখন এক এক করিয়া মনুষ্যত্বের ওজন নির্ণয় এবং আত্মবিস্মৃতির পরিমাণ নির্ণয় করিলে প্রকৃত মানব কতগুলি তাহাই অবগত হওয়া যাইবে।

আত্মবিস্মৃতির পরিমাণানুসারে সভ্যতার তারতম্য নির্ণয়

যে মানব জাতির আত্মবিস্মৃতি যত কম; সেই মানবজাতি তত সভ্য, নচেৎ নহে। আত্মবিস্মৃতির নামই "বর্ব্বরতা"। বর্ব্বরতাই স্বোপার্জ্জিত অন্নকষ্টের মূলীভূত কারণ বলিয়া প্রমাণ করা যাইতে পারে।

· উন্মাদ ও বর্ব্বর একই বৃন্তের দুইটি ফল। উন্মত্ততা এবং বর্ব্বরতা কেবল আত্মবিস্মৃতি হইতে জন্মগ্রহণ করে।

সভ্যতার আর্খ্যা বা ব্যাখ্যা যাহাই হউক না তাহার বিষয় লইয়া গোলযোগ বা তর্ক বিতর্কের সমাবেশের প্রয়োজন দেখিনা।

সভ্যতার্থে এই বুঝি—মানবে পশুভাব সংখ্যার ন্যূন্যাধিক্যের পরিমাণ কত? আত্ম-বিস্মৃতির ওজন বেশী না আত্মস্মৃতির ওজন বেশী। আত্মস্মৃতির ওজন যে সমাজে যত বেশী—সেই সমাজ তত সভ্য। উন্মত্ততা ও বর্ব্বরতা আত্মবিস্মৃতির ওজন বাড়ায়। আত্মস্মৃতি—উন্মত্ততা ও বর্ব্বরতা দূর বনে তাড়াইয়া দেয়।

আত্মবিস্মৃতির ওজন যেখানে যত বেশী সেইখানেই 'অসভ্য' নামক জীবনিবাস।

এখন বুঝিতেছি—(১) অসভ্যতা অর্থে আত্মবিস্মৃতিত্ব।

(২) সভ্যতা অর্থে আত্মস্মৃতিত্ব।

সভ্যতা ও অসভ্যতার নিক্তির কাঁটা ঠিক থাকেনা

একটি 'পাল্লার' একদিকে মানবসমাজ অপর দিকে সামাজিক সভ্যতা যদি চাপাইয়া রাখা যায় তাহাহইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে কাঁটা কাঁপিতেছে। একদিকে সভ্যতা এক দিকে অসভ্যতা রাখিলেও দেখা যাইবে, নিক্তি দুলিতেছে—স্থির হইবেই না, হইতে পারেই না। সভ্যতা এবং বর্ব্বরতা চিরস্থির নহে। সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে ঘড়ির টিক্ টিক্ ধ্বনির সহিত নিক্তির কাঁটার উঠা নামা হই-তেছে। মুহূর্ত্তের জন্যও এক ভাবে থাকে না।

'দশ' এই সংখ্যাটি পরিমাণার্থে গ্রহণ করা হউক। তাহাহইলে দেখা যাইবে নিক্তির কাঁটা কেন ঠিক থাকে না।

বর্জ্জিত পশুভাবই আত্মস্মৃতি)

নং									
১ নং—	সমাজের	বর্জ্জিত	পশুভাব	৫,	সুতরাং	মনুষ্যত্ব	৫,	আত্মবিস্মৃতি	৫
২ নং—	,,	,,	,,	৪,	,,	,,	৪,	,,	৬।
৩ নং—	,,	,,	,,	৩,	,,	,,	৩,	,,	৭।
৪ নং—	,,	,,	,,	২,	,,	,,	২,	,,	৮।
৫ নং—	,,	,,	,,	১,	,,	,,	১,	,,	৯।
৬ নং—	পশুত্ব পূর্ণ								

আত্মস্মৃতি ও আত্মবিস্মৃতির যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে ইহা দ্বারাই 'সভ্যতার' একটি পরিমাণ পাওয়া যাইবে। বিশ্বমানব এখন এই তালিকার উপরে উঠিতে পারিয়াছে কিনা তাহা বুঝা যায় না। পশুত্ব এখন মানবত্বে প্রভুত্ব করিতেছে—মানব পশুত্ব ভাব হইতে মুক্তির চেষ্টা করে নির্ম্মল দেবত্বের আশা পোষণ করে কিন্তু এ পর্য্যন্ত পূর্ণ মাত্রায় সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। পশুত্বই মানব নামক দ্বিপদ পশুকে মানবত্বে পূর্ণ অধিকারী হইতে দিতেছে না।

মানব উন্নত দ্বিপদ পশু—এই জাতীয়ত্ব ভাব হইতে মানব মুক্তিলাভে সমর্থ হইতেছে না। "Natural instincts are lost with domestication" কিন্তু মানবই মানবকে domesticate করিতেছে, সুতরাং domes-ticator এর যে প্রচ্ছন্ন পশুত্ব তাহাই সংক্রামিত হইয়া পড়িতেছে বলিয়া মানব পশুত্বে নির্ম্মুক্ত নহে।

আত্মস্মৃতি বা বর্জ্জিত পশুভাবের ওজন সমান রাখা সহজ নহে—এই যেখানে দেখা গেল বর্জ্জিত পশুভাবের পরিমাণ যেখানে পাঁচে। পরমুহূর্ত্তেই দেখা গেল ঘটনা বৈচিত্র্যের মধ্যে আবর্ত্তিত—নিম্নতর আত্ম-বিস্মৃতির আধিক্য বিশিষ্ট সমাজের সংঘর্ষে—হইয়া স্বীয় ওজন ঠিক রাখিতে পারিতেছে না—Temper ঠিক থাকিতেছে না।

বর্জ্জিত পশুভাবময় আত্মস্মৃতি নামিয়া পড়িল, আত্মবিস্মৃতি বাড়িয়া গেল—এই রকমের নামা উঠা (Fluctuation) নিয়ত ঘটিতেছে, সুতরাং মানবত্ব ঠিক থাকিতেছে না।

ধর্ম্মসমর, স্বার্থসমর সভ্যতাসমর, অসভ্যতা-সমর নামে পাশব বৃত্তির পরিচয় দিয়া মানবত্বে হাল্কা হইয়া পড়িতেছে—মানবত্বে হাল্কা হইলেই তাহার সভ্যতার কাঁটা বর্ব্বরতার দিকে হেলিয়া পড়িতেছে। সভ্যতার দিক হইতে কত ডিগ্রী অসভ্যতা বা বর্ব্বরতার দিকে গেল তাহা ধরা পড়িতেছে। লাভ লোকসানের পরিমাণ এই প্রকারে নির্ণয় করা যায়।

আবার সামলাইয়া উঠিলে কাঁটাও সভ্যতার দিকে ডিগ্রীতে ডিগ্রীতে উঠে বা সরে। সুতরাং এই হিসাবে সভ্যতা যেমন বর্ব্বরতার দিকে হেলিয়া পড়ে, বর্ব্বরতাও তেমনি এই নিয়মে সভ্যতার দিকে ঝুকিয়া যায়। কিন্তু চিরস্থির থাকেনা। আত্মস্মৃতি আত্ম-বিস্মৃতির গায়ে পড়ে আবার আত্মবিস্মৃতি আত্মস্মৃতির গায়ে পড়ে। এই উপায়ে সাড়া-দেয় ও সাড়া লয়।

সভ্যতা ও বর্ব্বরতার ওজন ঠিক থাকিত যদি 'সভ্যতা' বা 'বর্ব্বরতা' জাতিগত 'উপাধি' হইত। ইহা ত আর জাতিগত উপাধি বা পদবী নয়! ইহা বংশগত বা জাতিগত কিম্বা সমাজগত অথবা ধর্ম্মসম্প্রদায়গত 'খেতাব'ও নয়। সভ্যতা বা মনুষ্যত্ব ব্যক্তিগত বা সমাজগত আত্মশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে কাহার মৌরসী পাট্টা বা দখলিকার স্বত্ব জন্মায় না। আত্মবলের উপর ভাবশুদ্ধির দ্বারা অর্জ্জন করিতে হয়।

বিদ্যা অর্জ্জন দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা 'ভট্টাচার্য্য' উপাধি লাভ হয়—কিন্তু দেখা যাইতেছে ভট্টাচার্য্যের মূর্খ পুত্রেরও নামান্তে 'ভট্টাচার্য্য' সংযুক্ত হয়। ইহা যেমন বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যত্ব বর্ত্তমান যুগে 'সভ্যতা'ও তদ্রূপ জাতিবাচক শব্দের পূর্ব্ব বা পশ্চাতে সংযুক্ত হইয়া—বর্ব্বর জাতিকেও লোকলোচনে ধূনা দিয়া 'সভ্য' এই আখ্যায় বিভূষিত করিয়া রাখিয়াছে।

হাতে করিয়া স্বীয় ঘড়ির কাঁটাটি ঘুরাইয়া আটটার সময় দশটা বা বারটার সময় দশটা বাজাইয়া রাখিলে কি ঠিক দশটা বেলা বুঝাইবে! তাহা কখনই বুঝাইবে না।

অহঙ্কার ও বীর্য্যের দ্বারা "সভ্যতা" 'সভ্য' এই আখ্যা বা উপাধি দুর্ব্বলের মুখে বলান যাইতে পারে—কিন্তু 'ধর্ম্মের ঢাক বাতাসে বাজে।' পশুত্ব বর্জ্জনের নামই সভ্যতা। যেখানে পশুত্বভাবের ষোলআনা অধিকার তথায় বর্ব্বরতারই যে রাজত্ব ইহা স্থির নিশ্চয়। বুঝিতে হইবে তাহাদের মনুষ্যত্ব কমিয়াছে—আত্মস্মৃতি আত্মবিস্মৃতির কোলে মাথা নোয়াইয়া শয়ন করিতেছে। তাহাদের বর্জ্জিত পশুভাব পুনঃ অর্জ্জিত হইয়াছে—তাহারা মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশুত্বের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। আত্মবিস্মৃতির পরিমাণ হু হু শব্দে বাড়িতেছে।

যে সমাজের বর্জ্জিত পশুভাব পাঁচ ছিল—সেই সমাজের বর্জ্জিত পশুভাব দুই হইয়া পড়িয়াছে। মনুষ্যত্বও দুই হইয়া গিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিস্মৃতির পরিমাণ আট

হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ১নং সভ্যতা ৩নং সভ্যতায় নামিয়া পড়িয়াছে।

যাহারা ৩নং সভ্য ছিল এখন উন্নত ১নং সভ্যগণ তাহাদেরই সমান হইয়া গিয়াছে—তাহাহইলে বলিতে হইবে এক নম্বর সভ্যগণ স্বস্থানচ্যুত হইয়া অধঃপতিত হইয়াছে 'সুসভ্য' আখ্যা আর বর্ত্তমানে তাহাদের নাই, তাহারা 'অর্দ্ধসভ্য' দাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তত্রাচ যদি তাহারা বলে আমরা 'সুসভ্য জাতি' তাহা তাহাদের গর্ব্বের ও আহাম্মকীর পরিচায়ক—পশুত্বের শক্তি তাহাদের মধ্যে প্রবল বলিয়া, তাহারা পশুত্বের পরিচায়ক মিথ্যা গর্ব্বই করিতেছে।

আত্মস্মৃতি ও আত্মবিস্মৃতির 'মিটারে' তাহাদের সে জুয়াচুরী ও কৃত্রিমতা ধরা পড়িতেছে। বিজ্ঞান সত্যাবিষ্কার করে। তাহাদের গর্ব্ব এবং অভিমান পশুভাবই ব্যক্ত করে।

বর্জ্জিত পশুভাব, আধ্যাত্মিক বা মানসিক শক্তির পরিচায়ক 'বাহ্যিক' নহে। মনুষ্যত্ব যদি বেশভূষা হইত তাহা হইলে একটা গাধাকে ঐ বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া মনুষ্যত্ব উন্নীত করিয়া দেওয়া চলিত। আত্মস্মৃতি মানসিক সম্পত্তি শারীরিক সম্পত্তি নহে।

আত্মস্মৃতি মানসিক রাষ্ট্রের পরম শক্তি

বাহ্যিক কোন কিছু দিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া সভ্যের মত, কাকের ময়ূরপুচ্ছ ধারণের মত সভ্যতার ভ্রমোৎপাদন করা যায় কিন্তু তাহা পুত্তলিকার নৃপসাজে সজ্জিতের ন্যায়, নাট্যশালার অভিনেতৃগণের ন্যায় অলীক ও কৃত্রিম।

আত্মস্মৃতি মানসিক (mental), বাহ্যিক বা শারীরিক (Physical) নহে। ভারতের প্রাচীন হিন্দুসভ্যতা বাহ্যিক বা শারীরিক ভাবে বিকাশ পায় নাই মানসিক ভাবেই দেখা দিয়াছিল। কেবল ভারত কেন, যেখানেই সভ্যতা মানসিক কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল সেই স্থানই প্রকৃত সভ্যপদে উন্নীত হইয়াছিল।

অর্জ্জুন, ভীম, অশোক প্রভৃতির বীরত্ব মানসিক ভাবের দিক্ দিয়াই স্ফুরিত হইয়াছিল। আর রঙ্গালয়ের অভিনেতাগণ যখন অর্জ্জুন, ভীম নেপোলিয়ানবেশে সজ্জিত হইয়া ঐ ঐ ব্যক্তিগতভাবে অভিনয় করে তাহা 'একদম্' বাহ্যিক—ইহাতে মানসিকত্ব কিছুই নাই।

আত্মস্মৃতি বা সভ্যতা হারাইয়া আত্মবিস্মৃতির দাসত্বে যাহারা বর্ব্বর হইতেছে তাহাদের আত্মস্মৃতিমূলক মানসিক সভ্যতার ভান একদম্ 'বাহ্যিক' পশুত্বের বিকাশক ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা কাকের শোভাবর্দ্ধনের মত।

এখন বুঝা গেল 'সভ্যতা' ব্যক্তিগত বা জাতিগত একচেটিয়া উপাধী বা পদবী নহে। ইহার বিকাশ মানসিক কেন্দ্রমূলক বাহ্যিক বা শারীরিক নহে। আত্মবিস্মৃতির ধারা এই প্রকারে নির্ণয় করা যায়। সভ্য এই নিয়মে বর্ব্বর হয়।

বর্ব্বরতার কাঁটাও ঠিক থাকে না

আত্মবিস্মৃত জাতি রঙ্গালয়ের অভিনেতাগণের পোষাকী ভাবে আত্মস্মৃতি জাগাইয়া তুলিতে পারে না। আধ্যাত্মিক বনাম মানসিক ভাবশুদ্ধি দ্বারা আত্মবিস্মৃতির ওজন কমাইয়া আত্মস্মৃতি বাড়ান যায়। বুদ্ধদেব ইহা বুঝিয়াছিলেন—সেই জন্য তাঁহার বহির্দৃষ্টি অন্তর্মুখী হইয়াছিল—ভাবশুদ্ধির দ্বারাই আত্মস্মৃতি বনাম সভ্যতা অর্জ্জিত হইতে পারে ইহাই বৌদ্ধ সভ্যতার মূলমন্ত্র।

আধ্যাত্মিক ভাবে পশুভাব বর্জ্জিত হইলেই আত্মস্মৃতির ওজন বাড়ে, সভ্য হওয়া যায় অনুকরণ দ্বারা নহে অনুষ্ঠান দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হয়। বর্জ্জিত পশুভাবের যতই ওজন বাড়ে—সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বই বর্দ্ধিত হয় আত্মবিস্মৃতির ওজনও কমে।

ভারত ও জাপানের বর্জ্জিত পশুভাব দ্বারা মনুষ্যত্বের বা সভ্যতার পরিমাণ নির্ণয় করিতে পারিলে, সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। জাপান বর্জ্জিত পশুভাবের উদ্বর্দ্ধন দ্বারাই মনুষ্যত্বে উন্নীত হইতেছে—তাহারা মানসিক উন্নতি দ্বারা পশুত্ব বিমোচন করিতে যত্নবান হইতেছে। বাহ্যিক বা পোষাকী ভাবে নহে। সভ্যতার প্রতিষ্ঠান বাহ্যিক ভাবে হয় না—সভ্যতার গৌণ লক্ষণ পোষাকী ভাব মূলক বটে কিন্তু মুখ্য লক্ষণ মানসিক শক্তির উদ্বর্দ্ধন এবং পশুত্বের পরিহার।

সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় জাপানের বর্জ্জিত পশুত্ব বিকাশের ধারা গুলিরই বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে জাপান মনুষ্যত্ব লাভ করিতেছেন বর্জ্জিত পশুত্বের মানসিক ওজন বাড়াইয়া—বাহ্যিক পোষাকী ভাবে নহে।

সেই জন্য তিনি ছত্রে ছত্রে পত্রে পত্রে দেখাইতেছেন—জাপান আজিও বাহ্যিক বেশভূষায়, চাল চলনে, হাব ভাবে, আহার বিহারে ষোল আনা বাঙ্গালীই হইয়া রহিয়াছেন। কেবল মানসিক কেন্দ্রে বর্জ্জিত পশুত্বের ওজন বাড়াইতেছেন।

বাঙ্গালী এখন উল্টা পথ বা উল্টা গতি রেখায় ছুটিয়া অগ্রে না যাইয়া ক্রমশঃ দ্রুত গতিতে মূলোৎপত্তির অভিমুখে ছুটিয়া আত্মবিস্মৃতির বোঝা বাড়াইয়া ভারি করিতেছেন। বাঙ্গালী বর্জ্জিত পশুত্ব মানসিক দিক দিয়া না বাড়াইয়া বাহ্যিক বা পোষাকী ভাবের দিক দিয়া বর্জ্জিত পশুত্বের ওজন বাড়াইতে চলিয়াছে—ইহাতে হইতেছে কি? না—আত্মবিস্মৃতির বোঝা ক্রমশঃই ভারী হইতেছে—মনুষ্যত্ব কমিতেছে—পশুত্ব বাড়িতেছে।

বাঙ্গালী বাহ্যিক ভাবটাই বর্জ্জিত পশুত্বের বৃদ্ধির উপায় ঠিক করিয়া ক্রমশঃ অর্জ্জিত পশুত্বের শক্তি বাড়াইয়া ফেলিতেছেন। সভ্যতার ওজন না বাড়িয়া কমিতেছে। জাপান মানসিক শক্তির উদ্বর্দ্ধন (বর্জ্জিত পশুত্বের ওজন বাড়াইয়া) করিয়া লইতেছেন। তাহারা চিত্তের ভাবশুদ্ধির দ্বারা মানসিক ভাবে উদ্বর্দ্ধনের গতিরেখায় ধাবিত।

বাঙ্গালী চিত্তশুদ্ধির দ্বারা মানসিক শক্তির উদ্বর্দ্ধন না করিয়া বাহ্যিক বেশভূষার অনুকরণপ্রিয়তার দ্বারাই বর্জ্জিত পশুত্বের ওজন বাড়াইতে চাহেন, ইহার ফলে আত্মবিস্মৃতির ওজনই বাড়িতেছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি আত্মবিস্মৃতিই উন্মত্ততা বা বর্ব্বরতা—সভ্যতা নহে। কৃত্রিম সভ্যতা রঙ্গালয়ের সভ্যতার অভিনয় মাত্র।

এই প্রকার তুলনা দ্বারাই দেখিতে পাইব বাঙ্গালী 'অর্জ্জিত অন্নকষ্ট' উপভোগ করিতেছেন—জাপান নব নব উপায়ে অন্নকষ্ট বর্জ্জন করিতেছেন। বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃতি বা বক্তৃতা ও বর্ব্বরতামূলে স্বোপার্জ্জিত অন্নকষ্ট বর্দ্ধিত করিতেছেন।

বাঙ্গালী আমিত্বের আকুঞ্চন দ্বারা উন্নত হইতে চাহেন। জাপান আমিত্বের প্রসারণ দ্বারা উদ্বর্দ্ধিত হইতে চাহেন—ইহাই যা প্রভেদ, নচেৎ প্রভেদ নাই। বাঙ্গালী যে দিন আমিত্বের প্রসারণের গতি পথ ধরিবে সেই দিন সভ্য ও চিন্তাবীর হইবে পাগলামি ও বর্ব্বরতা ঘুচিয়া সভ্য হইবে।

বাঙ্গালীর স্বোপার্জ্জিত অন্নকষ্টের কারণ বিশ্লেষণ

আত্মস্মৃতি বনাম জাগরণ

সভ্যতার মাপকাটিতে যে কয়টি মানচিত্র আছে তাহা 'আত্মস্মৃতি,' আত্মবিস্মৃতি, বর্জ্জিত পশুভাব, পশুত্ব, মনুষ্যত্ব। সভ্যতার মধ্যে মাপকাটি ছাড়িয়া দিলে অস্থির দণ্ডটির কাঁটা যে দাগে গিয়া দাঁড়ায়—সভ্যতার ওজন তখন সেই চিহ্নের দ্বারা সূচীত হয়।

ন্যায়দণ্ড কাহার খাতির রাখে না—যাহা সত্য তাহাই ব্যক্ত করে। পার্থিব সভ্যতার বেষ্টনীবদ্ধ জাতি বা সমাজ-স্রোতের মধ্যে একে একে মানদণ্ডটি ডুবাইয়া দিয়া পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইব—বর্ত্তমান সভ্যসমাজ যতদূর সভ্য বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে।

'বর্জ্জিত পশুভাব' যত বেশী বলিয়া মনে হইতেছিল বাস্তবিক তাহা নহে—পশুত্বের দিকেই সূচী লম্বিত হইতেছে। প্রকৃত মনুষ্যত্ব যেমন দেখায় তেমন নয়। পোষাকী ভাবেরই আধিক্য সমধিক।

সভ্য মানব, যে জাতি বা সমাজকে অসভ্য বর্ব্বর বা অর্দ্ধ সভ্য বলেন ঠিক তাহারা তত নহে। ন্যায়দণ্ড দ্বারা উহাদের ওজন বুঝিলে দেখা যায়, তাহাদের বর্জ্জিত পশুভাব নেহাত হাল্কা নহে!—তাহাদের মনুষত্বের ওজন মন্দ নয়। তাহারা পোষাকী সভ্যতার ময়ূরপুচ্ছে আত্মদেহ আবৃত করে নাই। এই কারণে বাহ্যিক দৃষ্টে তাহারা অসভ্যের মতই দেখায়।

ইহাদের আত্মস্মৃতি জাগরিত হইয়াছে, আত্মবিস্মৃতির ওজন হ্রাস পাইতেছে। পশু-ভাব প্রকৃতপ্রস্তাবে কমিতেছে। বর্ত্তমান কৃত্রিমতার লৌহযুগে ইহারা কৃত্রিম সভ্যতার পাল্লা ভারি করিতেছে না। শারীরিক সভ্যতা বাঙ্ময় সভ্যতা অপেক্ষা মানসিক সভ্যতার আদর যাঁহারা করেন, তাঁহারাই কৃত্রিমতা-পূর্ণ লৌহ-যুগ-সভ্য মানবের নিকট অসভ্য ও বর্ব্বর বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন।

সত্যকে যদি কেহ অসত্য বলে, তাহাতে সত্যের ওজন কমে না, মানেরও লাঘব হয় না। কিন্তু 'সত্য'* যদি অসত্যের মোহে বিমোহিত হইয়া তাহার মত পোষাকী ভাবে সজ্জিত হয়, তবেই সত্যের ওজন কমে, নচেৎ নহে।

বর্ব্বরতার 'পোষাকী কায়দা' যদি বাহ্যিক ভাবে ধরিয়া রাখা যায়, তাহাতে বড় ক্ষতি নাই, কিন্তু বর্ব্বরতার ছাপ যদি মানবপটে অঙ্কিত হইয়া যায়, তবেই মনুষ্যত্বের উপর বর্ব্বরতার বনাম উন্মাদের আধিপত্য বিস্তার লাভ হয়।

আসুরিক সভ্যতা বনাম বর্ব্বরতা

বর্ত্তমান সভ্যতার যুগ—যাহা সভ্যতার বিশিষ্ট উপায় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইতেছে, প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা আসুরিক সভ্যতা। ইহাতে বর্জ্জিত পশুভাবের ওজন বড়ই কম, সুতরাং মনুষ্যত্ব ও আত্মস্মৃতিও কম—পাল্লা ভারি হইয়াছে আত্মবিস্মৃতিতে। কাজে কাজেই বলিতে হয়—উন্মাদ ভাব ও পশুভাব বৃদ্ধি হইয়া 'সুসভ্য-বর্ব্বরতা' আখ্যা দিয়াছে —ঠিক নাম কপট সভ্যতা।

'সুসভ্য বর্ব্বরতা' বনাম কপট সভ্যতা বলিলে বুঝা যায়—জাগিয়া ঘুমান। 'জাগিয়া ঘুমান' কথাটা 'আমার মা বন্ধ্যা' গোছের মত, কিন্তু ঠিক তাহা নহে। প্রকৃত বর্ব্বরতা

*সত্য—সত্যভাবযুক্ত মানব।

ভাল, কিন্তু 'সুসভ্য বর্ব্বরতা' অতীব ভীষণ কপটতা—ঠিক বিষকুম্ভপয়ঃমুখ।

এই 'সুসভ্য বর্ব্বরতা' মধ্যে কেবল পশুত্ব কেবল উন্মত্ত ভাব—উহাতে প্রাকৃত অপেক্ষা অপ্রাকৃতের পরিমাণ বেশী। এমন কি চৌদ্দআনাই কপটতা।

পাগলের অনুকরণ করিলে, পাগল না হইলেও লোকে পাগল বলে। সভ্যতার অভিনয় করিতেছি বলিলেও বর্ব্বরতা তাহার সর্ব্বাঙ্গে মসি লিপ্তের ন্যায় বৈচিত্র্য সমাবেশ করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সভ্যতা বা বর্ব্বরতা জাতিগত বা বংশগত পদবী নহে যে জাতি বা সমাজ নামাস্তে উহা মৌরসি পাট্টা লইয়া বসিয়া থাকিবে! শতবৎসর ভোগ করিলেও সভ্যতায় দখলিকার স্বত্ব জন্মে না। সভ্যতার কতকগুলা বাহ্যিক রীতি নীতি কাঁচারঙ্গের মত 'ছোব্' ধরাইয়া রাখে মাত্র সে সবই পোষাকী—একদম্ বাহ্যিক —মানসিক নহে—ধোপে টেকে না—পোড় সয় না!

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে—আত্মস্মৃতি মানসিক কেন্দ্রে তরঙ্গ উৎপন্ন করে, সাড়া দেয় সাড়া নেয়; মানসিক ভাবশুদ্ধির দ্বারাই পশুত্বের বিমোচন হয়—বর্জ্জিত পশুভাবের ওজন বাড়িয়া উঠে। যেখানে মানসিক বল অপেক্ষা শারীরিক বলই আদৃত, তথায় অসুরত্ব পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত—দেবত্ব অস্তগত।

হিন্দু নামক জাতি যখন বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ রচনা করিতেছিলেন,—যোগ বিজ্ঞানের উন্নতি চরমত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, জ্যোতিষ, ভেষজ, গণিত, শিল্প, কৃষি, নীতিশাস্ত্রের রচনা দ্বারা মানসিক বলের পরিচয় দিতেছিলেন—তখনকার সেই 'সভ্যতা' বর্ত্তমানে নাই। ইতিহাস ইহাই বলেন। নূতন নূতন কল্পনা, আবিষ্কার ক্ষমতা দ্বারা আত্মস্মৃতি উদ্বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তখন তাহাই হইত।

তাহার পর স্বাধীন কল্পনা ও আবিষ্কার শক্তি যেমন স্থির বা মন্থর হইয়া গেল, অমনি বর্জ্জিত পশুভাবের উদ্বর্দ্ধন না হইয়া আত্মবিস্মৃতি দেখা দিল। পশুত্বের দিকে কাঁটা ঢুলিয়া ঢুলিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া হেলিয়া পড়িতে লাগিল।

'সভ্যতা' যদি জাতীয় উপাধি হইত, তাহা হইলে হিন্দুর গায়ে উহা মৌরসী পাট্টা করিয়া বসিয়া থাকিত।

আর একটি বৈদিক মন্ত্র রচিত হইল না, জ্যোতিষ, গণিত, যোগ, বৈদ্যক শাস্ত্রের আর একটি শ্লোকও রচিত হইল না! চিন্তাশক্তি যে আছে তাহার প্রমাণ দুষ্প্রাপ্য হইয়া গেল। পারদ শোষণের একটি নূতন প্রথার আবিষ্কার হিন্দু করিতে পারিল না। মকরধ্বজের মত একটি ঔষধ আর বৈদ্যক শাস্ত্রপণ্ডিতগণ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইলেন না। চরক শুশ্রুতের মত আর একখানি বিজ্ঞান আর হিন্দুর চিন্তা ও ভাব রাজ্যে সাড়া দিয়া আবিষ্কৃত হইল না। এই রকমে প্রত্যেক দিক দিয়া হিন্দুর স্বাধীন চিন্তা ও আবিষ্কার থামিয়া গেল। এই সময় হইতে হিন্দু বাপ পিতামহের নামে বিকাইতে আরম্ভ করিলেন।

হিন্দু ঐ যুগে সভ্য ছিল—বর্জ্জিত পশুভাব বাড়িয়াই চলিয়া ছিল, মনুষ্যত্বের ওজন ভারী হইতেছিল। আত্মবিস্মৃতির ওজন হাল্কা হইয়া আত্মস্মৃতির পাল্লা ভারী হইতেছিল। কিন্তু এখনও সেই জাতি সেই প্রাচীন সভ্যতার দাবী করিতে চাহেন—সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে কলস ঘৃত শূন্য হইয়া পড়িয়া আছে, মোহ বশতঃ তাহাতেই হস্ত প্রবেশ করিয়া ঘৃত

পানের আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন। ইহাই ভ্রম বা বাতুলতা। সেই পাকা কলসে ঘৃত পূর্ণ করিতে হইবে! তবে ঘৃত পানের আশায় হস্ত প্রসারণ করিলে ঘি মিলিবে, নচেৎ নহে।

যোগ না জানিয়া যোগী, ধন না থাকিলেও ধনী, বিদ্যা না থাকিলেও পণ্ডিত আখ্যা যেমন নিরর্থক—হিন্দুর প্রাচীন সভ্যতার দাবীও তদ্রূপ। এখন হিন্দুর "মামাদের নিয়ে সাতখানি হাল!"

প্রাচীন শাস্ত্রগুলি চর্ব্বণ করিয়া উদ্গার উত্তোলনই বর্ত্তমান পাণ্ডিত্যের চিহ্ন। প্রাচীন আবিষ্কার, প্রাচীন সভ্যতা, প্রাচীন চিন্তার, প্রাচীন ভাবের, প্রাচীন রীতিনীতি-গুলির বাঙ্ময় ভাবেই গ্রহণ করিয়া—প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার দাবী করা হয়। তাই ত লোকে শুনে হাসে, দেখে ঠাট্টা করে—"মা না বিয়োল বিয়োল মাসি ঝাল খেয়ে মল পাড়া পড়শী।"

সভ্যতা ব্যক্তিগত রাষ্ট্রগত নহে

সভ্যতা চিন্তাজগতের বিষয়গত—অর্জ্জন দ্বারা সংরক্ষণ করিতে হয়। ইহা ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রগত নহে। সমবায় অর্জ্জিত সভ্যতা দ্বারা সমাজ বা জাতিকে সভ্য করে। যে জাতির মধ্যে ব্যক্তিগত সভ্যতা সমষ্টিগত পরিমাণের অর্দ্ধেকের উপর সেই জাতিই সুসভ্য। এই প্রকারে সভ্যতার 'পজেটিভ' ও 'সুপারলেটিভ' ডিগ্রি হয়!

পিতা রায় বাহাদুর হইলে, ছেলে যে রায় বাহাদুর হইবে তাহার আশা নাই। মান্ধাতার আমলের হিন্দু সভ্যতা বর্ত্তমান হিন্দুর উপর বংশাবলীক্রমে বংশগত উপাধির ন্যায় থাকে না। "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল"বৎ আপনা আপনি সভ্য হইয়াই আছি—এই চিন্তায় হিন্দু বিভোর আছে।

হিন্দু জাতির অনুলোম বিলোম নামক একটা উঠা নামা আছে। উহাও একরকম সভ্যতার উঠানামা—উহা সে কালের সভ্যা-সভ্যের একটা জলন্ত ইঙ্গীত!

প্রাচীন পৈতৃক সম্পত্তি উপভোগ করা, আর স্বয়ং উপার্জ্জন দ্বারা পৈতৃক সম্পত্তির পরিবর্দ্ধন করা—এক কথা নহে। পিতা সাধু পুত্র চোর কিন্তু বংশগত পদবী সমান। পিতা সাধু সুতরাং সভ্য, পুত্র চোর সুতরাং বর্ব্বর। উপাধি ও জাতি এক থাকা সত্বেও সভ্যতা এক রহিল না। স্বাধীন চিন্তা ও আবিষ্কার হীন বর্ত্তমান হিন্দু—পৈতৃক পাণ্ডিত্য সভ্য-তায় এখন সভ্য বলিয়া মস্ত একটা 'কেও কেটা'ই হইয়া আছে মনে করেন—সেটা স্বীয় পরমায়ুর মত জ্ঞান।

বর্জ্জিত পশুভাবের ক্রমিক অধিকার লাভ দ্বারা আত্মস্মৃতি জাগাইয়া তুলিতে হয়। সভ্য হইতে হয়। এখন, হিন্দু যখন পশুভাব বর্জ্জন দ্বারা আত্মস্মৃতির উপার্জ্জনে অক্ষম তখন তাহার কৃতিত্ব কোথায়! সম্মুখে যে আদর্শ পট বিলম্বিত তাহা বর্ব্বরতার উপরে সভ্যতার ক্ষীণ প্রলেপ দ্বারা অতিরঞ্জিত। বিগত হইতেই আগত জন্মায়—বর্ত্তমান, বিগত ও আগতের মধ্য বিন্দু মিডিয়ম। এই 'মিডিয়ম' যতই আবিষ্কারোন্মুখ হইবে—সেই জাতির ভবিষ্যৎ সভ্যতা ততই ওজনে বাড়িবে।

প্রাচীন হিন্দুর চিন্তা, কল্পনা আবিষ্কার যখন বর্ত্তমান হিন্দুর মধ্যে নাই—কেবল প্রাচীন সভ্যতার চিন্তা, কল্পনা আবিস্কৃত বিষয়ান্তর্গত শ্লোকগুলির তোতাপক্ষীর ন্যায় আবৃত্তি ব্যতীত যখন গত্যন্তর নাই—তখন এই জাতি যে প্রাচীন সভ্যতায় বহু সোপানের নিম্নে

অবস্থিত তাহার আর সন্দেহই নাই! চিত্ত-শুদ্ধিব্যতীত কেবল পৈতৃক 'নামাবলী' গায়ে জড়াইয়া রাখিলে 'সাধু' নাম হয়ত থাকিতে পারে—লোকে ভ্রম ক্রমে সাধু বলিতে পারে, কিন্তু কদিন বলিবে—প্রকৃত সাধুত্ব কি ঐ কেবল পৈতৃক নামাবলী বেষ্টিত হইয়াই লাভ করা যায়?

প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার কীর্ত্তি-নাম কেবল নামাবলী বাহ্যিক ভাবে গায়ে জড়াইতে বা বাহ্যয় ভাবে ব্যবহার করিতে পাইলেই কি সভ্যতা আকাশ হইতে নামিয়া আসিবে? তাহা নহে, উহা অর্জ্জন করিতে হয়—পৈতৃক ধন বস্ত্রাদি উপভোগের মত উপভোগ করা যায় না ইহা স্বোপার্জ্জিত!

যদি জোর জবরদস্তী করিয়া বলা যায় পূর্ব্ব পুরুষ সভ্য ছিলেন সুতরাং বর্ত্তমানে আমরা সভ্য। তাহা হইলে বুঝা যায় উহা সভ্যতার ভান—কৃত্রিম সভ্যতা—পোষাকী সভ্যতা—মানসিক নহে। এই প্রকার বাহ্যিক সভ্যতা হিন্দুর আর্য্যসভ্যতা বা দেব সভ্যতা নহে—আসুরিক সভ্যতা বনাম বর্ব্বরতা।

এই প্রকারে ভারতীয় সভ্যতা বা বঙ্গীয় সভ্যতা কৃত্রিমতাপূর্ণ—সভ্যতার ভান মাত্র। সভ্যতার ভান ও বাহ্যিকতাই হিন্দুর অর্জ্জিত অন্নকষ্ট বাড়াইয়া দিতেছে। জাপান সভ্যতার ভান ছাড়িয়া অর্জ্জন ও আবিষ্কারের গতি রেখায় ধাবিত। সেই কারণে জাপানের অন্নকষ্ট বিদূরিত হইয়া ভারতাভিমুখে প্রধাবিত। তাহারা পুরাতন ত্যাগ করে নাই—তাহার উদ্বর্দ্ধন করিতেছে মাত্র। দশের মধ্যে টেক্কা দিয়া চলিতেছে তাহাই তাহারা সভ্য কিন্তু পোষাকী হিসাবে জাপান বর্ব্বর এখনও আছে। ইহাতে "সাচ্ছা" সভ্যতা নাই—পোষাকী কখন 'সাচ্চা' হইতে পারে না!

ভারত আবিষ্কারহীন, স্বাধীন-চিন্তাহীন হইয়া অসভ্য হইতেছে—ভারতের মধ্য দিয়া দেশ বিদেশের সভ্যতা জাপান ভাবশুদ্ধি দ্বারা মানসিক ভাবে উপার্জ্জন করিতে তৎপর। ভারত তাহাদের পোষাকী বাহ্যয় ফাঁকা সভ্যতা লইতে ব্যস্ত।

জাপান কখন ভারতের সভ্যতায় বাহ্যিক পোষাক স্বীয় গাত্রে স্থান দিবে না। ভারত কেন? কোন দেশেরই সভ্যতার বাহ্যিক বেশে জাপান সজ্জিত হইবে না। স্বীয় জাতীয় ভাবমূলক স্বভাবের উদ্বর্দ্ধন দ্বারাই জাপান সভ্য হইবে অন্ন অর্জ্জন করিবে। ভারত domesticate হইতে চায়—ঐ সকলের পোষাকী চাল চলনে।

যেদিন দেখিতে পাইব, জাপান পরের পোষাকে নিজের দেহ সজ্জিত করিতেছে—মানসিক গতিপথ হইতে স্খলিত হইয়াছে—সেইদিন বুঝিব জাপান পুনশ্চ বর্ব্বরতা বনাম পশুত্বে পরিণত হইতেছে। তাহারা আত্ম-স্মৃতি হইতে বঞ্চিত হইয়া আত্মবিস্মৃতির কূপে লাফাইয়া পড়িতেছে।

ভারত আত্মবিস্মৃতির কূপে ঝাঁপ দিয়া পশুত্বে পরিণত হইয়াছে বাহ্যিক পোষাকী ভাবই ইহাদের সভ্যতার প্রকৃত পন্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং 'স্বোপার্জ্জিত অন্নকষ্ট' উদ্বর্দ্ধিত হইবেই হইবে।

স্বাধীনচিন্তা এবং আবিষ্কারের গতিপথে প্রধাবিত হইলে 'সভ্য' হওয়া যায়। পিতৃ-পুরুষগণ স্বাধীনচিন্তা নব নব আবিষ্কার দ্বারাই 'সভ্য' এই আখ্যা লাভে সমর্থ হইয়া-ছেন—প্রাচীনের উপর নূতনের প্রতিষ্ঠা দ্বারা 'সভ্যতার ওজন বাড়ে ও ঠিক থাকে।

স্থানিক অন্নকষ্ট প্রকৃত মানসিক ও আবি-ষ্কৃত সভ্যতার তাড়নে ভিন্ন দেশে নীত হয়,

এক স্থানের অন্নকষ্ট অন্য স্থানে বিতাড়িত করিয়া তৎস্থানে স্বোপার্জ্জিত অন্নকষ্টের সৃষ্টি না করিতে পারিলে অন্ন অর্জ্জন করা যায় না। পরকে পোষাকী সভ্যতায় ভুলাইয়া স্বয়ং প্রকৃত চিন্তাবীর হইয়া মানসিক ভাবে সভ্য হইতে হয়।

ইউরোপের সভ্যতা পরিবর্দ্ধনের মূলীভূত কারণ তৎস্থানের অন্নকষ্ট ভারতে প্রেরণ বশতঃই হইয়াছে ইহা বলা যায়। যেখানের পোষাকী সভ্যতা যতই ভারতের সঙ্গে বিজড়িত হইয়া ভারতকে কৃত্রিম সভ্যতার পথে ঠেলিয়া লইয়া চলিল ততই তাহারা প্রকৃত সভ্য হইল। ভারতকে স্বোপার্জ্জিত অন্নকষ্টের বিষয়ীভূত করিতে পারিয়াছে বলিয়াই ইউরোপ সভ্য এবং অন্নকষ্টের হাত হইতে বিমুক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানে যেদেশে সভ্যতা বনাম বর্ব্বরতা দ্বারা পশুভাব বর্দ্ধিত হইতেছে তথায় 'অর্জ্জিত অন্নকষ্ট' বিকাশ পাইতেছে। ভারত অন্ন সংস্থানের 'মিডিয়ম' —অন্ন সংস্থানের কর্ম্মভূমি—জাপান ইহা বুঝিয়াছে। সেই জন্যজাপান স্বীয় অন্নকষ্ট ভারতের মধ্য দিয়া অন্যত্র প্রেরণ দ্বারা, অন্নের সংস্থান করিতেছে। সেই জন্যই জাপানের শিল্পজাত দ্রব্য ভারতের মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিতেছে। জাপানের দুর্ভিক্ষ ধীর গতিতে ভারতের মধ্যদিয়া দেশ দেশান্তরে প্রবেশ লাভ দ্বারা স্বরাষ্ট্রের সুভিক্ষ আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

শ্রীহরিদাস পালিত।

মফঃস্বলের বাণী

১। ভারতীয় প্রকৃতি ও ভারতীয় ভাবের অন্তর্দ্ধান

যখন সোঁসোঁরবে ঝড় তুফান উঠিয়া আইসে, আকাশ রাশি রাশি মেঘে ভরিয়া যায়, উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল বায়ু যাহা সম্মুখে পায়, তাহাই উড়াইয়া লইয়া যাইতে থাকে, তখন গৃহহীন উন্মুক্ত পথের পথিক ভগ্ন অকর্ম্মণ্য বা পরের অধ্যুষিত যে কোন গৃহ সম্মুখে পায়, তাহারই অভিমুখে ছুটিয়া যায়; তখন বিদ্যুদ্বিভার মত তাহার পরিত্যক্ত ক্ষুদ্র শান্তিময় কুটীর খানি মুহূর্ত্তের তরে স্মৃতির অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের অবস্থা ঠিক এইরূপ। আমরা আমাদের গৃহ ছাড়িয়া জাতীয় সমাজ, জাতীয় রীতি নীতি ও আচার-ব্যবহারের প্রতিচ্ছবি, জাতীয় সাহিত্যের আলোচনা হইতে বিরত হইয়া, বিদেশীয় সমাজ ও বিদেশীয় রীতিনীতিকে লক্ষ্য করিয়া আদর্শ করিয়া, জীবন-পথে অগ্রসর হইতেছিলাম; কিন্তু দেখিতেছি বিদেশীয় সভ্যতার তুফানে বিদেশীয় আদর্শের সংঘর্ষ আমাদের আকাশের দুই একখানি মেঘ উড়াইয়া লইলেও তৎসঙ্গে আমাদের "আমার" বলিবার যাহা কিছু ছিল সব উড়াইয়া লইতেছে—পরিধেয় উত্তরীয় বস্ত্র খানিও আর বুঝি রক্ষা পায় না। তাই আজ দূরে পরিত্যক্ত স্বদেশীয় সমাজ, স্বদেশীয় রীতি নীতি স্বদেশীয় আচার ব্যবহার, অতীতের ধ্বান্তময় প্রকোষ্ঠে মুহূর্ত্তের তরে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

মনে পড়ে এদেশের ভক্তিশাস্ত্রের চরমোৎ-

কর্ম্মসাধন, মনে পড়ে এদেশের "তৃণাদপিসুনীচ" সাধকের দীনতা, মনে পড়ে এদেশের ধর্ম্মে তন্ময়তা এ দেশের ধর্ম্মে বিলাস ছিলনা, কর্ম্মে কপটতা ছিলনা—একটা আন্তরিকতায় এদেশে ভক্তি, দয়া, মায়া, মূর্ত্তিমতী হইয়া ভারতকে ভারতে পরিণত করিয়াছিল। এ দেশের সন্তান, পিতামাতার চরণান্তিকে নতজানু হইয়া প্রণত হইত, দেবমন্দিরে "সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত" করিত, গুরুজনের চরণরেণু মাথায় লইয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিত—কর্ম্মে ধর্ম্ম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এদেশে বিরাজমান ছিল। কিন্তু কোন্ এক ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালে, কোন্ এক মায়াবীর মায়ায় সব যেন অসীম শূন্যে মিশিয়া যাইতেছে। আজ ভক্তির দেশে ভক্তি অন্তর্হিত, শ্রদ্ধা উদাসীনতা বা Nil admirari spirit এ পরিণত আজ কেহ দেববিগ্রহের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করেনা, আজ হিন্দুসন্তান আরাধ্য দেবতাকে দূর হইতে অন্ততঃ মানস "প্রণামে"রও পরিবর্ত্তে লোক দেখানো হাত তুলিয়া "নমস্কার" বা সেলাম করিয়া চলিয়া যায়। আজ শিক্ষিত পুত্র পিতার পদধূলি মাথায় তুলিয়া লওয়াকে অসভ্যতা মনে করে, পত্নী পতিকে পরমগুরু বা দেবতার চক্ষে দেখাকে "সেকেলে কুসংস্কারে"র মধ্যে গণনা করিয়া থাকে; আজ পিতা "ভেনারেবল ফ্রেণ্ড" (শ্রদ্ধেয় বন্ধু), ও স্বামী প্রাণের প্রিয়তম এয়ার। গরীব ভারতবাসীর শান্তিময় "জয়েণ্ট ষ্টক কম্পানি" বা "যৌথ কারবার" ধীরে ধীরে এদেশ হইতে উঠিয়া যাইতেছে—এখানে কেহ প্রধান পরিচালক নাই, এখানে আর ভরত মিলে না, কেহ আর লক্ষ্মণ হইতে চাহেনা, আত্মত্যাগ, আত্মবলিদানের মন্ত্রের এখানে কোন প্রভাব নাই এখানে "সবাই স্বাধীন, সবাই প্রধান" "Ours is to doanddia" নীতি শুধু সৈন্যবিভাগে ও কবির কল্পনাতেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। সাম্য স্বাধীনতার বাতাসে, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল প্রভঞ্জনে ভারতের প্রাচীন শিল্প প্রাচীন সাধনার ফলগুলি একে একে সব ঝড়িয়া পড়িতেছে। ভারতের সমাজ মানুষ তৈয়ারি ও মানুষ রক্ষা করিবার একটি সুন্দর যন্ত্র ছিল। এখানে যাঁহারা জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনায় মত্ত থাকিতেন, সমাজের দ্বার তাঁহাদের নিকট অবারিত ছিল, যাঁহারা সংসারের সুখ অপেক্ষা ধর্ম্মের সুখই শাশ্বত বলিয়া মনে করিতেন—মানসিক শ্রম-লব্ধ জ্ঞান ও ধর্ম্মের ফলগুলি সাংসারিক লোকের মুখে বিনামূল্যে তুলিয়া দিতেন, ভারতের সমাজ তাঁহাদের সকল ভার মাথা পাতিয়া লইতেন—তাই এদেশে ব্যাস-বশিষ্ঠ তাই এদেশে শঙ্করাচার্য্যের জন্ম হইয়াছে—তাই এদেশের সমাজে ব্রাহ্মণের এত সম্মান তাই তাহার সাত খুন মাফ্। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মণের আর সে সম্মান নাই, বর্ত্তমান যুগের বিশ্বামিত্র জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রভৃতি গভর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ ব্যতীত অচল। সমাজে তাঁহাদের জীবিকার ব্যবস্থা নাই, থাকাও কেহ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন না। বেশী দিন পূর্ব্বের কথা নহে, এক দীন হীন দিগ্বিজয়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্ত্রী "এয়োতীর" চিহ্ন স্বরূপ রঞ্জিত সূত্র হস্তে ধারণ করিয়াও কোন রাণীর নিকটে গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন আর রাণী সেই অভিমান সূচক বাক্য শুনিয়াও তাঁহাকে যথেষ্ট ধনরত্ন প্রদান করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে কোন ন্যায় বা বেদান্তের বিবিধ তত্ত্বোদ্ঘাটনে ব্রতী কোন দীনহীন পণ্ডিত

যদি কোন জমিদারের দ্বারস্থ হয়, তাহা হইলে তাহার নগদ বিদায় এক পয়সা। বর্ত্তমান সময়ে সকলেই মনে মনে রাসবিহারী ঘোষ, রতন তাতা জমিদার, মহাজন হইতে চায়, অর্থ প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষা করে। বর্ত্তমান যুগে বিদ্যা, ধর্ম্ম, সাহিত্য সমুদায় একটা "ফ্যাসানে" পরিণত! শত শত যুবক দর্শন লইয়া বিএ, এম এ পাশ করিতেছেন, বিজ্ঞান লইয়া বি, এস, সি, এম, এস, সি, উপাধি লাভ করিতেছেন, কিন্তু তন্মধ্যে কয় জন ঐ সমুদায়কে জীবনের লক্ষ্য করিতে পারিয়াছেন? অধিকাংশই উকীল, ডাক্তার, এঞ্জিনীয়র "ডেপুটী" মুন্সেফ, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট হইবার জন্য লালায়িত; হইতেছেনও তাই; এ সমুদায় বিদ্যার পুঁথিগত যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ শুধু লক্ষ্মী ও লক্ষ্মীর পুত্রগণের স্তবের জন্য, শুধু বিবাহের রজতঃ রুধির ধারা আকর্ষণের নিমিত্ত শুধু একটা ফ্যাসানের অনুরোধে ও বিস্মৃতির বিশাল কুক্ষি পূর্ণ করিবার নিমিত্ত মাত্র। পূর্ব্বে এদেশে বিদ্যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যা। এ দেশের ব্রাহ্মণ সন্তান—ন্যায় বেদান্ত স্মৃতি অধ্যয়ন করিতেন, ঐ সকল বিষয়ে পাণ্ডিত্য লাভ করিবার নিমিত্ত, ঐ সমুদায়কে চিরজীবনব্যাপিনী সাধনা ও জীবনের অবলম্বন করিবার জন্য—ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মলিন ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিলেও অন্য ব্যবসায়, অবলম্বন করিতে ঘৃণা বোধ করিতেন। আর বর্ত্তমান সময়ে তাহার অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। সেকালে ছিল "বিদ্যা জ্ঞানায়" আর বর্ত্তমান সময়ে হইয়াছে "বিদ্যা ধনায়"—তথাপি আমরা আমাদের বিদ্যাবত্তার অহঙ্কার করিতে বিমুখ হই না।

প্রাচীন ভারতে যে কেবলমাত্র জ্ঞানের প্রকৃত সাধনা ছিল তাহা নহে, সমাজের প্রত্যেক স্তরে সেই সাধনা ও জ্ঞান প্রচারের প্রণালীও উৎকৃষ্ট ছিল। গ্রামে গ্রামে পুরাণ পাঠকেরা ভাগবত প্রভৃতি পাঠ করিয়া উপাখ্যানছলে ধর্ম্মের, সাধনের গভীর তত্ত্ব সমূহ বুঝাইয়া দিতেন, কথকেরা কথকতাচ্ছলে আবালবৃদ্ধ বনিতার হৃদয়ে ধর্ম্মের বীজ বপন করিতেন—ভারতের নরনারী ধর্ম্মভাবে, আধ্যাত্মিকতায় অনুপ্রাণিত হইত। বর্ত্তমান সময়ে আর কেহ পুরাণ শুনিবার জন্য সমুৎসুক নহে, কারণ ঘরে ঘরে আজ পুরাণের পরিবর্ত্তে উপন্যাস প্রচলিত—বর্ত্তমান যুগের "শিক্ষিত শিক্ষিতা"গণ সীতা সাবিত্রীর পরিবর্ত্তে কুন্দ নন্দিনীর "করুণ কাহিনী" পাঠেই অধিকতর আগ্রহান্বিত, তাই ঘরে সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি সীতার পরিবর্ত্তে আমরা স্নেহ্লতার অভিনয় দেখিতেছি, আজ যে দিকে দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই প্রাচীন ভারতীয় ভাবের অভাব ও উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল ইয়োরোপীয় সমাজের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইতেছে। এই সমুদায় দেখিয়া শুনিয়াও কি আমাদের চক্ষুরুন্মীলিত হইবে না, আমাদের চৈতন্যের সঞ্চার হইবে না? এখনও সময় আছে, এখনও সাবধান হইলে আমাদের অনেক ভাল জিনিষ রক্ষা পাইতে পারে, নতুবা দীপ নির্ব্বাণতা প্রাপ্ত হইলে তাহাতে তৈলদানের সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইবে।

রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ।

২। শিক্ষার উদ্দেশ্য

শিক্ষার বিস্তার কর, শিক্ষার বিস্তার কর,—এই ধ্বনি এইক্ষণ সর্ব্বত্র শুনা যায়! ভারতের স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া শিখেন না, তাঁহারা অন্ধকারে রহিয়াছেন, তাঁহারা শিক্ষাবিহীন হওয়ায় ভারতের অর্দ্ধাঙ্গ রোগ

হইয়াছে, তাঁহারা না জাগিলে ভারত জাগিবে না,—ইত্যাদি হেতু প্রদর্শনে সর্ব্বত্র বালিকা স্কুল স্থাপনের ধূম লাগিয়া গিয়াছে। ভারতের সাধারণ লোকেরা লেখাপড়া জানে না, তাহারা স্বেচ্ছায় লেখাপড়া শিখে না, অতএব বাধ্যতামূলক শিক্ষা বিস্তারের জন্যও প্রস্তাব উঠিয়াছে। সম্প্রতি depressed class এর লোকদিগকে তুলিবার আর এক ধূয়া উঠিয়াছে,—সেখানেও শিক্ষার বিস্তারই প্রধান কার্য্য।

ইংরাজী শিক্ষা হইতেই ঐ প্রকারের ভাব আমাদের মন অধিকার করিয়াছে। রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় ইংরাজ সমালোচকেরা আমাদেরে ভর্ৎসনা করেন,—যে দেশের উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরাও জ্ঞানের আলো হইতে বঞ্চিত, এমন কি সূর্য্যের আলো হইতেও বঞ্চিত—অন্দর মহল হইতে বাহিরে যাইবার উপায় নাই,—যে দেশের সাধারণ লোকদের সহিত লেখাপড়ার সম্পর্ক নাই—শতকরা ৯৯ জন মূর্খ, সে দেশের লোকেরা কোন্ মুখে রাজনৈতিক উচ্চ অধিকারের দাবী করে?

পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল লাভ ও রাজনৈতিক উন্নতি কামনা—এই দুইটিই এইক্ষণ যুগপৎ আমাদেরে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষভাবে তাড়না করিতেছে। আমাদের গবর্ণমেণ্টও অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের শিক্ষার জন্য এইক্ষণ বিশেষ সাহায্যদান করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে দেশের সর্ব্বত্র পল্লীতে পল্লীতে উচ্চ ইংরাজী স্কুলের সংখ্যা বাড়িতেছে; জেলায় জেলায় কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে; এক এক প্রদেশে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলিতেছে। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইয়াছে; মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় ও মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগ চলিতেছে। এই সমস্ত এই নূতন যুগের ফল। ইউরোপ আমেরিকা, জাপান প্রভৃতির দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া আমাদের দেশকে ঐসমস্ত দেশের ন্যায় গড়িয়া তুলিবার যে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি তাহাতেই বর্ত্তমান শিক্ষানীতির মূল নিহিত রহিয়াছে।

বর্ত্তমান যুগের প্রত্যেক ব্যাপারের সহিত লেখাপড়ার সম্পর্ক থাকা একান্ত আবশ্যক বিবেচিত হইতেছে। ইদানীং যত দোকানপাট দেখা যায় তাহাদের কোনটির পরিচালকেরা লেখাপড়া জানে না এরূপ কেহই মনে করিবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রেড্যেট যখন মিষ্টান্নের দোকান দিতেছে, শেলাইর কাজ করিতেছে, ধোপার কারখানা খুলিতেছে, জুতা বিক্রয় করিতেছে তখন আর অন্যের কথা কি?

আমাদের ইংরাজ সমালোচকেরা বরং লেখাপড়া শিখিয়াই ঐরূপ কাজে মনোযোগ দেওয়ার জন্য আমাদেরে উৎসাহিত করিয়া থাকেন, লেখাপড়া শিখিয়া কেবলই চাকরী চাকরী, বা ওকালতি ডাক্তারি করিবে কেন? আমরাও আমাদের দেশের যুবকদেরে ঐরূপ উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়াছি। তাহার ফলে এইক্ষণ এদেশের উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত লোকেরা পর্য্যন্ত যাহাতে দু'পয়সা পাওয়া যাইবে মনে করেন সেই ব্যবসায়ই অবলম্বন করিতেছেন। এইক্ষণ আর ব্যবসায়ে জাতি বিচার নাই।

বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা ব্যবসায়ে জাতি বিচার উঠাইয়া দিতেছে। পূর্ব্বে এদেশের এক একটি ব্যবসায় এক একটি জাতির উপর ন্যস্ত ছিল এইক্ষণ লেখাপড়া শিখিয়া যে যা সুবিধাজনক মনে করে তাহাই সে

অবলম্বন করে। ব্রাহ্মণ সন্তান লেখাপড়ার ফলে শুঁড়ি মুচির ব্যবসা ধরিতেও কুণ্ঠিত নহে। আমরা যে দেশের শিক্ষালাভ করিতেছি, সে দেশের শিক্ষার ফল আমরা পাইব,—ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। পাশ্চাত্য দেশে ব্যবসায়ে জাতি বিচার নাই, অর্থবল ও তাহার পরিপোষক বিদ্যাবুদ্ধি লইয়াই তাহাদের সামাজিক জাতিবিচার। তথায় মুচি মেথরের ছেলে অর্থবলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতে পারে। সেখানকার শিক্ষার ব্যবস্থাই এইরূপ।

ভারতে বহুকাল ধরিয়া জাতিভেদ চলিয়া আসিতেছে; প্রত্যেক কর্ম্মে, প্রত্যেক আচারে ব্যবহারে জাতিভেদ রহিয়াছে। শিক্ষায়ও জাতিভেদ রহিয়াছে। সুতরাং ভারতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার উদ্দেশ্য এক হইতে পারে না; দুই দিকের শিক্ষার উদ্দেশ্য দুই দিক্ হইতেই দেখিতে হইবে।

জ্যোতিঃ

৩। অন্ন-সমস্যা

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি পল্লী সমাজের আর্থিক উন্নতি না হইলে কিছুতেই আমাদের দেশে অন্নচিন্তার প্রকৃত সমাধান হইতে পারে না এবং কি কি উপায় অবলম্বিত হইলে আমাদের তত্তৎ অভাব দূরীভূত হইতে পারে, আমাদের এক্ষণে তাহাই প্রণিধানের বিষয়।

বঙ্গ দেশের পল্লী সমাজে সামান্য সংখ্যক ভদ্রসন্তান ও অবশিষ্টই প্রায় কৃষিজীবী লোকে পরিপূর্ণ। ভদ্রসন্তান যিনি যাহাই লেখা পড়া করুন না কেন তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য—একমাত্র লক্ষ্য—পরপদ সেবন অর্থাৎ চাকুরী এবং অবশিষ্ট কৃষিজীবী প্রজাগণের লক্ষ্য, তাহাদের পৈতৃক যৎকিঞ্চিৎ জমি যাহা কিছু আছে তদ্দ্বারা ঠিক অন্যূন সহস্রাধিক বর্ষের পূর্ব্বের বিধানানুসারে হল চালনা করা।—বর্ত্তমান কালের জ্ঞান বিজ্ঞান সম্মত নূতন কিম্বা অভিনব কোনরূপ চাষের উন্নতির চেষ্টা নাই। এজন্য কৃষি সম্প্রদায় দায়ী কিম্বা দোষী নহে। ভদ্র সমাজ—বিশেষতঃ জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষিত উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালী যুবকবৃন্দ এবং তাঁহাদের কার্য্যের পথ প্রসারণ করিতে যে অর্থের প্রয়োজন তদুপযুক্ত অর্থদ্বারা যাঁহারা কার্য্যারম্ভ করাইতে সক্ষম—অথচ তৎকার্য্যে সম্পূর্ণ উদাসীন—এই দুই শ্রেণীর লোকের দ্বারাই পল্লী সমাজের দিন দিন অধঃপতন ঘটিতেছে এবং ফলতঃ ইঁহারাই সম্পূর্ণ বাঙ্গালী জাতির জাতীয়ত্বের ক্রমশঃ লোপের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী।

আমরা পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া আসিতেছি আমাদের পল্লী সমাজে যতদিন ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণীদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন নিত্য আবশ্যকীয় সংসার যাত্রার ব্যবহার্য্য বিষয়ের প্রস্তুত করণ শিক্ষা দেওয়া না হইবে, যতদিন এইরূপ শিক্ষাকল্পে দেশের মনীষীগণের উর্ব্বর মস্তিষ্ক ধাবিত না হইবে, ততদিন কিছুতেই সমাজের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইতে পারিবে না।

আমরা সর্ব্বদা পরমুখাপেক্ষী, এবং পরমুখাপেক্ষিতাই আমাদের অর্থশোষণের সর্ব্বপ্রধান কারণ, নিত্য ব্যবহার্য্য বহুবিধ দ্রব্য আমরা সততই চক্ষুর সম্মুখে দেখিতেছি এবং এই গুলিই ব্যবহারের জন্য অন্য দেশ অন্য জাতির দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া লইতেছি, ইহাতে আমাদের অর্থ প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদেরই ভোগবিলাসের সামগ্রী হইতেছে।

স্বদেশজাত কাঁচামাল (Raw Materials)

বিদেশে রপ্তানী করিলে যে মূল্য বিনিময়ে লাভ হইতে পারে, রূপান্তরভেদে অনুরূপ ব্যবহার্য্য দ্রব্যে পরিণত হইলে তাহাদের মূল্য তদপেক্ষা যে বহুগুণে অধিক ইহা একটী সহজ ও স্বতঃসিদ্ধ কথা।

এই জন্যই আমরা, পল্লী সমাজে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণের হস্ত চালিত মোজা গেঞ্জির কল, পিতল কাঁসার বাসন ও তৈজস পত্রাদির প্রস্তুত করণ শিক্ষা, সাধারণ সুতী মালা কৌটা প্রভৃতি প্রস্তুত ইত্যাদি সাধারণ শিল্প শিক্ষা যাহাতে দেশ মধ্যে অতিরিক্ত মাত্রায় প্রচলিত হয় তদ্বিষয়ে আমরা প্রত্যেক স্বদেশ বৎসল মহানুভবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বর্ত্তমান কিণ্ডার গার্ডেন শিক্ষা প্রণালী দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে দেশে কোন প্রকার উন্নতি সাধন হইতেছে কি না তদ্বিষয়টী আমাদের প্রধান দ্রষ্টব্য স্থল হইয়াছে। আমরা বক্ষ্যমান বিষয় ক্রমশঃ আলোচনা করিব।

৪। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা

আমরা উন্নতিকামী বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকি; উন্নতি সোপানে আরূঢ় বলিয়া সময়ে সময়ে গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াও থাকি; কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে আমাদের উন্নতির পথ দিন দিন যেন কণ্টকাকীর্ণ হইতেছে; আমাদের অবস্থা দিন দিন যেন শোচনীয় হইতেছে, আমরা দুর্দ্দশাগ্রস্তই হইয়া পড়িতেছি। আমরা যে একেবারে নিশ্চেষ্ট, উদাসীন দৃষ্টিহীন একথা বলিতে পারি না; আমাদের প্রজারঞ্জক শাসনকর্ত্তৃগণ আমাদের কিসে মঙ্গল হইবে তাহার জন্য যাবতীয় উপায় উদ্ভাবনে, ব্যবস্থা করণে সর্ব্বদা অবহিত একথাও অস্বীকার করিলে নিরয়গামী হইতে হইবে, কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তার বিধানে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় আশানুরূপ ফল লাভ হওয়া দূরে থাক আমরা যেন দিন দিন আমাদের লক্ষ্য হইতে দূরে গিয়া পড়িতেছি আমরা যে কি বা কাহার অভিসম্পাতে হীন হইতেছি তাহা জানিনা কিন্তু দারুণ সত্যকে লুক্কায়িত রাখিলে চলিবে কেন আমাদের শোচনীয় দুর্দ্দশা যে যথার্থই ঘটিতেছে একথা গোপন করিতে ত পারিব না।

আমরা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধিশালী নৃপতির প্রজা হইয়া অর্থহীন, আমাদের দারিদ্র্য জগতের সর্ব্বত্র ঘোষিত; বলিতে জিহ্বা জড়তা প্রাপ্ত হয়, অনেকের মতে আমরা নাকি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দরিদ্র; আমরা রাজনীতি অর্থনীতি প্রভৃতি বুঝিতে চাহি না, তবে এটা নিত্য দেখিতেছি যে এক বৎসর অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টিতে কোন স্থানে অজন্মা হইলেই দেশময় হাহাকার পড়িয়া যায়; ইহা ত ভীষণ দারিদ্র্যেরই লক্ষণ।

আমরা সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বঙ্গ জননীর সন্তান হইয়া জানিনা বিধির কোন বিধানে "হা অন্ন" "হা জল" করিয়া আমাদিগকে গগন বিদীর্ণ করিতে হইতেছে। দুর্ভিক্ষ ও জলকষ্ট যেন আমাদের নিত্য সহচর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অন্নাভাবে বঙ্গের নানা স্থানের লোকের যে কি দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহার আলেখ্য ত নিত্যই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে, আর এই দারুণ গ্রীষ্মে জলাভাবে কেবল মানুষের নয়, গো মহিষাদি গৃহপালিত পশুগণেরও যে কি কষ্ট হইয়াছে তাহা বুঝাইবার নহে; যাহা কিছু বলিব

তাহাই অতিরঞ্জন বলিয়া প্রতীত হইবে; কষ্ট এতই ভীষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সুপেয় ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে ও আবদ্ধ জল নিঃসরণের রীতিমত ব্যবস্থা না থাকায় দেশে নানাবিধ সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পূর্ব্বে দেশের নদ নদীর প্রবাহ অক্ষুণ্ণ থাকাতে উহাদের তীরবর্ত্তী জনপদবাসিগণের পানীয় জলের অভাব অনুভূত হইত না; যাঁহার সামান্য কিছু সম্পত্তি থাকিত তিনি জলাশয় প্রতিষ্ঠা মহা পুণ্য কাজ বিবেচনা করিয়া পুষ্করিণী দীর্ঘিকা খননে অর্থব্যয় করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেন; ইহার ফলে বঙ্গ জলকষ্ট কাহাকে বলে তাহা জানিত না। কিন্তু কালের কুটীল গতিতে অনেক নদ নদী মজিয়া গিয়াছে দেশের সঙ্গতিশালী লোকের আর আজ কাল জলাশয় প্রতিষ্ঠায় আস্থা নাই, তাঁহাদের মতি গতি নাই অন্যরূপ হইয়া গিয়াছে। অনেক ধনাঢ্য হয় ত কোন সহরে জলের কল প্রতিষ্ঠার জন্য বিপুল অর্থ সাহায্য অকাতরে করিবেন অথচ জলাভাবক্লিষ্ট স্বগ্রামে বা তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামে দুই একটা পুষ্করিণী খননের কথা উঠিলেই ভ্রূ কুঞ্চিত করিবেন এমন কি বর্ত্তমান জলাশয়গুলির সংস্কার সাধনেও পরাঙ্মুখ, ইহার ফলে প্রতিবৎসর গ্রীষ্ম সমাগমে বাঙ্গালার সর্ব্বত্রে জলকষ্টের জন্য হাহাকার উঠে এবং বহু নরনারী পঙ্কিল দূষিত বারি পানের ফলে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে; স্বাস্থ্য হীন হইতে হীনতর হইতেছে।

আর আমাদের শিল্প। সে কথা বলিয়া আর প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির প্রয়োজন নাই। আমাদের দেশের শিল্প বাণিজ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে; ইহার ফলে ধনাগমের পথ রুদ্ধ হইয়াছে আমরা পদে পদে পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতেছি; দেশের ধন বিদেশীর হস্তগত হইতেছে। আজ বস্ত্র, চিনি, কাগজ প্রভৃতির জন্য আমরা পথ পানে চাহিয়া আছি, কই ক্ষোভে ঘৃণায়, লজ্জায় অনুশোচনায় ম্রিয়মান, ম্লানমুখ হইতেছি কই! আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য সকল জিনিসের জন্য নিত্য পরের দ্বারস্থ হইয়া আছি, ইহাতে শত বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা হইতেছে কই?

এই ত আমাদের অবস্থার কতক পরিচয় প্রদান করিলাম! সব কথা বলার স্থান নাই; মোট কথা আমরা অর্থহীন, স্বাস্থ্যহীন, জলাভাবক্লিষ্ট, দস্যু তস্করের অত্যাচারে ভয় বিহ্বল, আমাদের শিল্প বাণিজ্য নাশ প্রাপ্ত। আমরা অমিত ক্ষমতা শালী ইংরাজ রাজের রাজভক্ত অনুরক্ত প্রজা। আমাদের রাজার রাজ্যে ভগবান অংশুমালী অস্তাচল চূড়াবলম্বী হন না এ গর্ব্ব পৃথিবীর আর কোন রাজার প্রজা করিতে পারে? আমাদের রাজার ন্যায় হিতকামী শুভাকাঙ্ক্ষী পৃথিবীতে আর কোনও রাজা আছেন কি না জানি না, জানিতেও চাহিনা; সর্ব্বশক্তিমান যে শক্তিমান হৃদয়বান নৃপতির শাসনাধীনে আমাদিগকে রাখিয়াছেন তাঁহারই স্নেহচ্ছায়ায় আমরা যেন চিরকাল থাকিতে পাই। আমরা আর কাহাকেও জানি না, হে ইংরাজ তোমাকেই জানি, তুমিই বলিয়া দাও, কবে আমাদের সুদিন ফিরিবে?

বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী

৫। আমাদের করণীয়

এই বিশ্ববিধ্বংসী বিপ্লব আরম্ভ হওয়া অবধি আমরা ভারতবর্ষের শিল্প বাণিজ্যের

দুরবস্থার কথা ও তন্নিবারণ কল্পে দেশবাসী এবং গভর্ণমেণ্টের করণীয় সম্বন্ধে অনেক কথাই প্রতিনিয়ত শুনিয়া আসিতেছি কিন্তু এই বাইশ মাস মধ্যে আমরা কিছুই করিয়া উঠিতে পারি নাই। গভর্ণমেণ্টের শিল্প বাণিজ্য কমিশন ও আমাদের মন্তব্য প্রকাশ সমফল প্রসূ হইয়াছে। অথচ দিনের পর দিন আমরা দুরবস্থার চরম সীমায় উপস্থিত হইতেছি। আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় বহু জিনিষ আজ এক প্রকার অঘট হইয়াছে, যাহা অঘট হয় নাই তাহা অতি দুর্ঘট হইয়াছে। এক পয়সার জিনিষের দাম ২০৲ টাকাও হইতেছে। রং এবং ছুঁচের উদাহরণটাই তাহার প্রধান উদাহরণ স্থল। তারপর কাগজ, কাপড়, টীন, চিনি, লবণ, কাচ প্রভৃতির কথা। আমরা ইহার কোনও জিনিষ দেশে উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করি নাই। গভর্ণমেণ্ট ও কিছু করিতেছেন না। আমরা গভর্ণমেণ্টকে কোনও দোষ আজ কাল দিতে চাইনা কারণ এখন তাহারা আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত, ভারতবর্ষের ব্যয় বহুল শিল্প বাণিজ্য রক্ষা কল্পে মনোযোগ প্রদানের অবসর তাহাদের নাই। এখন কথা হইতেছে যে, আমরা গভর্ণমেণ্ট নিরপেক্ষ হইয়া কি করিতে পারি? অবশ্য পারি অনেক, তদপেক্ষাও পারা উচিত অনেক। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় দু একটা কাজ আমরা ভিন্ন আর কেহ করিতে পারেই না। রক্ষা-শুল্ক এদেশীয় শিল্পোন্নতির এক মাত্র প্রধান উপায় এ কথা আজ সর্ব্বসম্মতি ক্রমে স্বীকৃত হইয়াছে। অথচ গভর্ণমেণ্ট সহজে এমন কি স্বেচ্ছায় সে পথে পদক্ষেপ করিতে পারেন না। কারণ চিরাচরিত অবাধ বাণিজ্য নীতি এমতাবস্থায় Prestige তাহার প্রধান অন্তরায় অতএব প্রজার দিক দিয়া তাহাদিগকে উদ্বেজিত না করিলে তাহারা অবাধ বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। লাটকাউন্সিলে সার এব্রাহিম রহমতুল্লা, মি দাদাভায় প্রভৃতি এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে বেশ জোর করিয়া ধরিয়াছিলেন ফলও যে কিছু না পাইয়াছেন তাহা নহে। কিন্তু তাহাদের প্রস্তাবের পশ্চাতে সমগ্র দেশ দণ্ডায়মান আছে কিনা তাহা ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট তথা ইংলণ্ডীয় গভর্ণমেণ্ট জানিতে পারেন নাই! এই দেশবাসীর আত্মরক্ষাকল্পে রক্ষাশুল্ক প্রবর্ত্তনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা সুস্পষ্টভাবে গভর্ণমেণ্টকে জানান কর্ত্তব্য। কোনও কোনও নেতা মনে করিতে পারেন এ সময় গবর্ণমেণ্টকে কোনও আব্দার জানাইতে গিয়া বিরক্ত করা উচিত নহে। আমরা বলি সেকথা একান্তই ভ্রমাত্মক ও ভাবাত্মক কারণ ইংলণ্ড এবং মিত্ররাজ্যসমূহ এ বিষয়ে নীরব নহে। প্যারিসে এ যুদ্ধের পরের বাণিজ্য নীতি লইয়া ক্রমাগত আলোচনা হইতেছে এবং সার রিজের প্রশ্নে স্পষ্ট বুঝা যায় সে সমিতিতে ভারতবর্ষকে মাত্রই হিসাবে আনা হইতেছে না। অপর দিকে ম্যানচেষ্টার চেম্বার অব কর্মাস রক্ষা শুল্ক প্রবর্ত্তন কল্পে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতে ইংলিশম্যান প্রভৃতি ঐ প্রস্তাব সমর্থন করিতেছেন। অতএব অপ্রীতিভাজন হইবার ভয়ে আমাদের নীরব থাকা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। সময় ফুরাইয়া গেলে তখনকার চীৎকার বাতুলের প্রলাপ মধ্যে গণ্য হইবে।

তাই আমাদের মনে হয় ভারতবর্ষের প্রতি সহর প্রতি গ্রাম হইতে সভা সমিতি করিয়া ভারতীয় ও ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টকে রক্ষাশুল্ক প্রবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করা কর্ত্তব্য। এই সভা সমিতি করিতে কোনও আশঙ্কার হেতু নাই। নীরব নিস্পন্দ

হতভাগা দেশ আবার একটু কার্য্যকরী পথে অগ্রসর হউক।

সঙ্গে সঙ্গে দেশের বড় লোকগণ নিত্য আবশ্যকীয় একটা আধটা জিনিষের কল কারখানা প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর হউন। আমরা গতবারে বলিয়াছি এবারও বলি বহু জমীদার এবং ধনী এদেশে আছেন যাহারা ইচ্ছা করিলে শিল্প প্রতিষ্ঠার পরীক্ষা স্থলে দুএক লক্ষ টাকা নষ্ট করিলেও তাহারা বিপন্ন হন না। দেশের একদল লোক আবার সেই ভাবে বড় লোকদিগের পশ্চাতে একটু উঠিয়া পড়িয়া লাগুন। স্বায়ত্ব শাসন প্রবর্ত্তন ও সখের সেনা প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা এই কার্য্যগুলি কোনও অংশে ন্যূন নহে। আশা করি অচল দেশ আবার একটু সচল হইবে।

বরিশাল হিতৈষী

"আর মানুষ হ'তে হ'লে এই নৈরাশ্যের মধ্যেই আশার স্থান
খুঁজে নিয়ে পূর্ণ উদ্যমে মঙ্গল কর্ম্মের উদ্দেশ্যে চলতে
হবে। আপাতমধুর জিনিষ প্রকৃত মঙ্গলময় নয়।
তাই কষ্টকে আলিঙ্গন ক'রে, দারিদ্র্যকে
মস্তকে ধারণ করে, নৈরাশ্যের ভীতি-
কেই একমাত্র সহায় ক'রে
জীবনের কঠোর কর্ত্তব্যময়
কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ
হ'তে হবে।"

"সাধনা"

সপ্তম খণ্ড সপ্তম বর্ষ	১৩২৩, শ্রাবণ	দশম সংখ্যা।

আলোচনা

১। ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা

মানব সমষ্টির মধ্যে কি করিয়া ব্যক্তিত্ব-প্রতিষ্ঠা হয় তাহা অনেকেই খোঁজ রাখার প্রয়োজন মনে করেন না। বড় হইতে সকলেরই ইচ্ছা। সকলেই ইচ্ছা করে আমি বড় হইব, জগতের বুকের উপর অক্ষয় ফলকে আমার নাম চিরদিনের জন্য আঁকা থাকিবে, ক্ষুদ্র স্বার্থের ছায়ামাত্র আমার চরিত্রের পার্শ্বে স্থান পাইবে না; আমার জননী ও জন্মভূমিকে সকল শক্তির ও কর্ম্মের কেন্দ্র করিয়া জগতের জলস্থলের শেষ সীমা পর্য্যন্ত আমার কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত করিব। ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনচরিত সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে এই রকম ভাবই প্রকাশ করে। তাঁহারা জল স্থল ত দূরের কথা চন্দ্রসূর্য্যকেও আপনাদের করতলগত করিতে চাহিয়াছেন। বড় হওয়ার

অর্থ ইহা নয় যে, দশ পাঁচ জন আমার অধীন হইয়া থাকুক, আমার আদেশ মত হুকুম তামিল করুক, তাহা হইলেই আমার ক্ষমতার বিকাশ। বিশ্ববিশ্রুত মহাত্মাগণ সেরূপ ক্ষমতাকে তুচ্ছ মনে করেন।

যাঁহারা সমষ্টির সম্মুখে ব্যক্তিত্বের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন তাঁহাদিগকে পূর্ব্ববর্ত্তী চরিত্রগুলির রহস্য তন্ন তন্ন করিয়া বাহির করা দরকার। জ্ঞানে হউক, ধর্ম্মে হউক আর কর্ম্মেই হউক সকল বিভাগেরই এক একটা ধারা আছে। রুচি অনুসারে এক একজন এক একদিক বাছিয়া লন। সংসারে জন্মিয়া সকলকেই কিছু না কিছু করিতে হইবে। আমাকে কিছু করিতে হইবে, আমার জন্য এই জগতে কোন কিছু নূতন প্রতিষ্ঠার জন্য এই ভাব না থাকিলে চলিবে না। জগৎ কোন দিন একজনের নিয়ম মানিয়াই চলে নাই। তাহা হইলে মানব সমাজের গতিবিধি অন্যরূপ ধরিয়া চলিত। আকাঙ্ক্ষাই মানবের দেবত্ব লাভের সোপান। একজন জননায়ক তাঁহার সমসাময়িক সমাজকে যে উন্নতির পন্থা দেখাইয়া যান পরবর্ত্তী কোন মহাপুরুষের অভ্যুত্থান পর্য্যন্ত জড় সমাজ তাহাই মানিয়া চলিতে থাকে এবং এই নিয়মের দ্বারাই পরবর্ত্তী যুগের কর্ম্মবীরগণ আপনাদের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে সুবিধা লাভ করেন।

অধিকাংশ মানুষই মহাত্মাগণের ভিতরের শক্তির দিকে লক্ষ্য করিতে চায় না। তাহাদের দৃষ্টি অত সূক্ষ্মভাবে দেখিতে চায় না— তাঁহারা কোন বিশেষ শক্তির বলে আপনাদের চরণ টলিতে দেন নাই, শত প্রকার প্রলোভন শত প্রকার অন্যায় অপবাদকে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, দারিদ্র্য-ব্যাধি তাঁহাদের মুখে কালিমারেখা পাত করিতে পারে নাই। প্রত্যেক সমাজে প্রত্যেক ধর্ম্মেরই এক একটা বিশেষ শক্তি আছে। সেই শক্তিই তাহার সমাজের মেরুদণ্ড। সেই শক্তির দ্বারাই আত্মবোধ জাগ্রত হয়, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জন্মে। সেই শক্তির দ্বারাই কর্ম্মপ্রবর্ত্তক স্থিরচিত্তলাভ করিয়া তন্ময় হইতে থাকেন। সেই সর্ব্বশক্তি তাঁহাকে আকাশ, বাতাস, জল, স্থল, অগ্নি, সূর্য্যকে অবধি আপনার করিয়া দেয়। যিনি আপনার পায়ে দাঁড়াইয়া নীরবে নির্লিপ্তভাবে আপনার কর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন তিনিই জগন্মাতার আশীর্ব্বাদ লাভ করেন ও তিনিই সেই শক্তি লাভ করিতে সমর্থ। সেই উন্মত্ত, শক্তিলাভী জননায়ক তখন তাঁহার সমশ্রেণীর মানবদিগের নিকট নিজের মত প্রচার করেন। তাহাদিগকে শক্তি দেন—

"তোমারি চরণতলে রহিয়াছে পড়ি
দৈন্যনাশি ধরণীর সমগ্র রতন।"

যাঁহার শক্তি আছে, প্রাণ আছে আপনার যাহা করিবার তাহা নীরবে করিয়া যাইতে ইচ্ছা আছে তিনিই আপনার দেশ, আপনার ধর্ম্মকে, বিশ্বসমাজকে ভালবাসিতে পারেন। তাঁহারা দেশ ধর্ম্মের নবাভ্যুদয়ের নিমিত্ত, যাহা প্রয়োজন বোধ করেন তাহাই সৃষ্টি করিতে পারেন। জগতের নূতন খণ্ডসৃষ্টিই তাঁহাদিগকেই প্রকাশ করে। তাঁহারা ধ্রুব ও বিশ্বামিত্রের ন্যায় শক্তিমান্, অসম্ভবে সম্ভব তাঁহাদেরই ধারণায় আসে। শক্তি ও ভক্তির পূর্ণতাতেই তাঁহারা নূতন কিরণপাত করেন। তাই ভয় ভাবনা তাঁহাদিগকে বাধা দিতে পারে না।

ধ্রুব, বিশ্বামিত্র যে মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন তাহা কয় জনে লাভ করিতে চাহেন?

বিশ্বামিত্রের ন্যায় নূতন রাজ্য গঠনকারী কয়জন ইতিহাসে দেখা দিয়াছেন ? মানুষ ত দূরের কথা দেবতার সৃষ্টিতে বৈচিত্র্যের লীলা প্রদর্শন করিতে তাঁহারাই সমর্থ। শক্তিমান উন্নতিকামিগণ যাহা গঠন করিয়া যান জড়মানব তাহা অলীক মনে করে। তাহাদের শক্তি সে তেজ সহ্য করিতে পারে না তাহাদের দৃষ্টি অতদূর পৌঁছিতে পারে না।

আমরা চাই বিশ্বামিত্র যে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন তাহা প্রত্যেক মানুষ লাভ করুক। সকলেই নূতন নূতন কর্ম্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করুক, নব নব চিন্তা প্রণালী আবিষ্কার করুক, মরিয়া হইয়া জগতে শত শত নূতন রাজ্য গঠন করিতে প্রস্তুত হউক। জগন্মাতার আশীর্ব্বাদ দুর্ব্বল ও হীনবিশ্বাস মানবের হৃদয়ে অফুরন্ত ভাবে বিরাজ করুক। চিত্তে দুর্ব্বলতার প্রতিষ্ঠা না করিয়া শক্তিমান হইয়া শত শত শক্তিমান মানবের সমষ্টি আপনাতে প্রতিষ্ঠিত করুক।

* *
*

২। সমাজ সেবক

আমাদের দৃষ্টি যত বেশী দূরে পতিত হইবে, আমরা যত বেশী সূক্ষ্মভাবে দেশকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে শিখিব ততই সমাজের জন্য সমাজের উন্নতির নিমিত্ত ভালবাসা জাগিবে। আমরা দেখিতে পাইব "সর্ব্বভূতে ভগবানে"র স্নেহ বিরাজমান রহিয়াছে, বিভিন্ন লোকচরিত্রে তাঁহারই মহান ভাবের বিকাশ মাত্র। সমাজসেবক, রাষ্ট্রনায়ক, শিক্ষাপ্রচারক আমাদেরই বিভিন্ন রুচির পরিচায়ক।

আমরা দেখিতে পাইতেছি—একশ্রেণীর সমাজ সেবক বন্যায় আর্ত্তকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত, দুর্ভিক্ষে অন্নদানে সাহায্য করিবার জন্য না যাইয়াও রোগ শয্যায় মুমূর্ষু রোগীর সেবা না করিয়াও কাজ করিয়া যাইতেছেন। সেখানে মানসমাজের যশের লোভ নাই প্রচারের ক্ষেত্র নাই ভবিষ্যৎ গৌরব অর্জ্জনের কোন সুবিধাই নাই। তাঁহারা ভাষার নীরবতার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের আবেগকে অবধি রুদ্ধ করিয়া যাহাদিগকে সেবা করিতেছেন, তাহারা আমাদেরই আপন হইতে আপন, ভাব ও ভাষার রুদ্ধ প্রস্রবণ অন্ধ, মূক ও বধির বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ।

যে মহাত্মার চিন্তাপূর্ণ মস্তিষ্ক হইতে এই সমাজ প্রীতির ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, তিনি যে প্রকৃত সমাজসেবক ছিলেন সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। আর যাঁহারা তাঁহারই পন্থানুসারে চলিয়া যাইতেছেন তাঁহাদিগকেও প্রকৃত শিক্ষাপ্রচারক বলিতে পারি। নিম্নশ্রেণীকে সমাজে উন্নয়ন, অশিক্ষিতে শিক্ষাদান এই গুলিও সমাজ সেবার আধার, কিন্তু মূক্-অন্ধ-বধিরকে জাতি নির্ব্বিশেষে শিক্ষাদান প্রকৃত ভালবাসা, খাঁটি শিক্ষা প্রচারকের কাজ।

স্থাননির্ব্বিশেষে, কোন সহরকে কেন্দ্র না করিয়া ইহাদের জন্য বিদ্যালয় প্রস্তুত হইলে আমাদের সমাজপ্রীতি বিস্তৃত হইবে। দেশের ধর্ম্মের উন্নতির জন্য কোন স্থান নির্ব্বাচনের প্রয়োজন করে না। কর্ম্মীর কর্ম্ম অনুসারে—তাঁহার সংযম তাঁহার ক্ষুদ্রস্বত্যাগ বুঝিয়া স্থান আপনা হইতেই কেন্দ্র হইয়া পড়িবে। আজ পর্য্যন্তও বড় জোর ২।১টী স্কুল ব্যতীত মূক, অন্ধ, বধিরকে শিক্ষাদানের কোন বন্দোবস্ত হইয়াছে কি না জানা যায় নাই। কুষ্ঠাশ্রম, প্রভৃতিও যেন এইরূপ ২।১টী প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে।

নব নব কর্ম্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা দ্বারা যেমন

ব্যক্তির চিন্তাশীলতা বৃদ্ধি পায়, তেমনি পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা সমাজের উন্নতি অবনতির ক্রম, নূতনের আবশ্যকতা বুঝা যায়। সমাজস্থ ধনী ব্যক্তিদের দান এইরূপ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে ব্যয়িত হইয়া সমাজকে উঁচু করে, ব্যক্তিগত চরিত্রকে আদর্শ করিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ করিয়া দেয়।

সমাজ সেবার কোন নির্দ্দিষ্ট পন্থা বা মতবাদ নাই। সমাজ সকলের; যিনি যে ভাবে, যত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সমাজকে নিরীক্ষণ করিবেন তিনিই তত উচ্চ সমাজ সেবক হইবেন। ব্যক্তিগত প্রশংসাবাদের দিকে লক্ষ্য না করিয়া কার্য্য করিলে সমাজ নিজেই তাঁহাকে যশের মুকুট পরাইয়া দিবে। সমাজ কর্ম্মীর একাগ্রতা ও ভক্তিতে রক্ত-মাংস লাভ করে। সুতরাং তদ্গতচিত্ত হইয়া ভাবিতে হইবে—আমার শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত শৈশবের মাতৃক্রোড়,কৈশোরের ক্রীড়াভূমি আজ যৌবনে যেন আমার দ্বারা পরিত্যক্ত বা লাঞ্ছিত না হয়। সমাজ সেবায় ছোট বড় উচ্চ নীচ নাই। সাময়িক বিস্তৃতি ও সঙ্কোচনেই কাহারও মাপ-কাঠি তৈয়ারী হয় না। সমাজ বিরাট মাতৃ-মূর্ত্তিতে বিরাজমানা, যিনি যত বেশী আবদার করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন তিনিই তত বেশী মাতৃস্নেহ লাভ করিবেন। একবার স্থির হইয়া ভাবিলে—শত শত মূক-অন্ধ-বধির ছাত্রসমাজ, শত শত কুষ্ঠাশ্রম আসিয়া চোখের সামনে উপস্থিত হইবে। নূতনের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বোধ হইবে। সমাজকে উপলব্ধির জন্য প্রাণে ব্যাকুলতা না আসিলে জীবনটা জড় হইবে, পরের কথায় একটা ভোগের মন্দিরে আশার উচ্চ চূড়া দেখা দিয়া চুরমার হইয়া যাইবে।

৩। হেতমপুরের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম

আজ পর্য্যন্ত হিন্দু সন্তানের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ সন্তানের উন্নতি বিধানের জন্য নানা রকম, যুক্তি তর্ক অনেককেই বড় ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। যখন সময় আসে তখন বৈঠকে বসিলে অল্পবিস্তর সকলেই দায়িত্বলাভে যত্নবান হন। তিন বৎসর যাবৎ যে ব্রহ্ম-চর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য এত আন্দোলন চলিতেছে তাহার ফলে আশ্রম প্রতিষ্ঠার কোন চিহ্নই আন্দোলনকারীদিগের দ্বারা দেখা দিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আজকার মত দিনে লোকে যে ধনের দোহাই দিয়া কর্ম্মবিরতি দেখায় তাহারও অভাব দেখি না। আমরা প্রতি পদেই লক্ষ্য করিতেছি এই "সুজলা সুফলা" দেশে প্রাণের অভাবে সলিল-পূর্ণ নদ নদী পর্য্যন্ত শুকাইয়া যাইতে পারে। যাহা আমাদের সমাজের পুষ্টিবিধায়ক বলিয়া কোন দিনই ধারণা হয় নাই বিলাতী সভ্যতা সমাজকে শত ভাবে আচ্ছন্ন করিলেও সেই অর্থের অভাবে প্রতিষ্ঠানের অভাব রহিবে এ কথা বিশ্বাস করি না। যখন সমাজ রক্ষক নরপতিগণ ধর্ম্মের জন্য নিঃস্ব হইতে পারিতেন সেই দিনত কোনও ব্রহ্মচারী আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য, ব্রাহ্মণ তৈয়ারীর জন্য ধনীর দ্বারস্থ হন নাই। শত শত ব্রহ্মচারী যাঁহারা হিন্দু সমাজকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহাদের সঙ্গে ধনের সম্পর্ক ছিল না। ধনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিয়া এদেশের সমাজশাসন পুষ্ট লাভ করে নাই। যদি কখনও আমাদের দেশে আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে সংসার ত্যাগী ব্রাহ্মণের দ্বারাই হইবে। সমাজ রক্ষক ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকে প্রথমাবস্থায় দীনভাবে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেই হইবে। আজ পর্য্যন্ত আশ্রম

প্রতিষ্ঠার জন্য কেবল অর্থের কচ্ কচ্ করিতেই কাটিয়া গেল। হিন্দু সন্তানের পিতামাতা যদি সমাজের দিকে ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য করিতেন তাহা হইলে আমরা আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য কোন কথাই বলিতাম না। আমরা চাই দেশের ভবিষ্যৎ গৌরবের জন্য খাঁটী সন্তান তা তিনি ব্রাহ্মণই হউন আর বৈদ্য বা কায়স্থই হউন। ব্রাহ্মণের দ্বারা ব্রাহ্মণ সন্তানের গঠনের জন্য কোন স্থায়ী উপায় নির্দ্ধারিত হইলে সমাজের বিভিন্ন কক্ষেও একটা নূতন জীবন গঠনের উপায় দেখা যাইত। হিন্দু সমাজে সাম্যবাদ প্রচারিত হইলেও খাঁটী হিন্দুত্বের ভিত্তির উপর যাঁহার আসন প্রতিষ্ঠিত হইবে তিনিই যে এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবেন এটা নিশ্চয়।

হিন্দু সমাজ বিষম পরিবর্ত্তনের পথে দাঁড়াইলেও সমাজের অধিকাংশ লোকই যে খাঁটী ব্রাহ্মণের মতগ্রাহী তাহা বুঝা যায়। সুতরাং বর্ত্তমান সমাজ উন্নতির জন্য খাঁটী ব্রাহ্মণ সন্তানের বিশেষ প্রয়োজন আছে। মানুষ হিসাবে যতটা খাঁটী ভাব আসিতে পারে তাহা কে না চায়?

সম্প্রতি হেতমপুরে একটী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলের গুরুকুল ঋষিকুলের ন্যায় ইহার নাম ধাম খুব জাঁকাল রকমে না দাঁড়াইলেও আমরা ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি প্রার্থনা করিতেছি। হেতমপুরের আশ্রমের চারি পাশে যুক্তি তর্ক মূর্ত্তিমান হইয়া দেখা দেয় নাই তাই কার্য্যক্ষেত্রে ইহার সাত্ত্বিকভাব দেখা দিবে

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পূর্ব্বভাব ফিরাইতে ২।১ বৎসরের কাজ নয়। অধ্যাপকের কার্য্য ও চরিত্রের মাধুর্য্য ছাত্রগণের জীবনে স্পর্শ করিলে তবে কোন দিন ইহার সুফল পাওয়া যাইবে। আমরা আশাকরি আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, ছাত্রগণকে বর্ত্তমান জগৎ হইতে সরাইয়া লইবেন না। এখন হিন্দুর জ্ঞানই একমাত্র জগতের শিক্ষণীয় বিষয় নয়। যদি আবার হিন্দুর জ্ঞান এই সকল আশ্রমের ভিতর হইতেই বাহির হইবে মনে হইয়া থাকে তাহা হইলে বর্ত্তমান জগতের জ্ঞান ভাণ্ডার যাহাতে তাহারা দখল করিয়া লইতে পারে তাহার প্রতি অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতাকে নজর রাখিতে হইবে। এই সকল ব্রহ্মচারী যাহাতে বর্ত্তমান গৃহস্থগণের শিক্ষাগুরু হইয়া সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে তাহাই করিতে হইবে।

হেতমপুরের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নব্য বঙ্গের নূতন জিনিষ, ভবিষ্যৎ আকাঙ্ক্ষার চারা গাছ। সুতরাং ইহা অধ্যাপকের একাগ্রতায় উক্ত প্রতিষ্ঠাতার ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগে পুষ্ট এবং বঙ্গবাসীর গাঢ় স্নেহ ও ভবিষ্যৎ আশার উপর বিস্তৃত হইয়া ফলবান হইবে।

* *
*

৪। সাহিত্য পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্র

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের ময়মনসিংহ অধিবেশনে আমরা যে ২।১ টী প্রস্তাব শুনিয়াছিলাম এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাহার কোনই ফল দেখা যায় নাই। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে সেই বিষয় লইয়া আর কোন কথাই হয় নাই। সুতরাং এই পাঁচ বৎসর পরেও তাহার পুনরুত্থাপন পুরাতন বিষয়ের আলোচনা নহে। যাহা কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির প্রথম প্রসূত তাহাও নূতন, আবার যাহা আমাদের মধ্যে আলোচিত হইয়াও আমাদের চিন্তা বা কর্ম্মের মধ্যে স্থান পায় না তাহার পুরাতন প্রস্তাবও নূতন।

উক্ত সম্মিলনে কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহি-

ত্যিক গ্রন্থানুবাদ সম্বন্ধে কয়েকটী নূতন কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্তও তাহার ক্রিয়া দেখিতে পাইতেছি না কেন তাহাই দেখাইতে চাই।

একে একে তিনটী মূল সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইলেও তাহাদের কার্য্যাবলী এখনও স্থির হইয়া দাঁড়ায় নাই। তবুও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ প্রবন্ধ রচনার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গ্রন্থ রচনার জন্যও এইরূপ পুরস্কারের ব্যবস্থা হইলে কিছু হইত বলিয়া আশা করা যায়। এখন পর্য্যন্ত সাহিত্যানুরাগ বর্দ্ধিত হইতে থাকিলেও, সাহিত্য-প্রীতি গাঢ়ভাব ধরে নাই; এবং সেই প্রীতি বর্দ্ধিত করিতে হইলে যে যে উপায়ের প্রয়োজন তাহা আদৌ চিন্তিত হয় নাই। সাহিত্য-পরিষদের প্রতি আকর্ষণ করিবার জন্য কোন উপায় গৃহীত হইয়াছে কি? লোককে ধরিয়া আনিতে হইবে উপযুক্ততা হিসাবে কাজের ভার দিতে হইবে। গ্রন্থ রচনা একটা উদাহরণ মাত্র, মাতৃভাষার প্রচারের জন্য ছোট বড় উপায়গুলি সবই গৃহীত হইবে। আমরা দেখিতে চাই সাহিত্য পরিষদ কতকগুলি বইয়ের গুদাম নয় পরন্তু উহা সাহিত্যরথীর বৈঠক, ভবিষ্যতের শিক্ষা প্রচারে বোর্ড। দেশে শিক্ষা প্রচারে যে সব অভাব থাকিবে কিছুদিন পর সেগুলি বর্ত্তমান নায়কগণেরই দোষের আশ্রয় লইবে।

আমরা চাই না সাহিত্য-পরিষদগুলি কেবল মাত্র নামে পরিচিত হউক। সাহিত্য-পরিষদ গৃহগুলি বাহিরের একটা ঠাট্ লইয়া বাঁচিয়া থাকুক। সাহিত্য-পরিষদ্ আজ পর্য্যন্ত বৎসরান্তে একবার সম্মিলনেই তৃপ্ত হইবে এটা যেন আমাদের মনে বদ্ধমূল না হয়—তাহাই চাই। সাহিত্য পরিষদ্ শুধু সম্মিলনের ভার না লইয়া দেশে নানারূপ শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে পারেন। সাহিত্য-পরিষদের পুরস্কার গুলি কেবল মাত্র পুরুষ ছাত্রগণই পাইবে এমন কোন কথা নাই।

বাঙ্গালা দেশে যে তিনটী মূল সাহিত্য পরিষদ্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে আপাততঃ তাহাদের দ্বারাই কাজ বেশ চলিবে। যাঁহারা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন বা নূতন প্রতিষ্ঠানের জন্য পদক্ষেপ করিবেন তাঁহাদিগকে অন্ততঃ একটা অভাব পূরণ করিতে হইবেই।

বালিকাদিগের জন্য বিদ্যালয় এবং অন্তঃপুর শিক্ষাপ্রচারের বন্দোবস্ত করা দুইই সাহিত্য-পরিষদগুলির উপর নির্ভর করে। আমরা সুপ্রতিষ্ঠিত ও নব প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-পরিষদ্‌গুলির কার্য্যের মধ্যে এইরূপ নূতন নূতন প্রতিষ্ঠানের আয়োজন দেখিতে চাই।

দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে বোর্ড যতটা ভার লইয়া কাজ করিয়া থাকেন সাহিত্য-পরিষদ গুলি সেই কাজ করিতে পারিবেন। সভ্যগণ সকলেই কৃতী। এক একটী শিক্ষা-কেন্দ্র পরিচালন করা শুধু তাঁহাদের চেষ্টা ও ঐকান্তিকতার উপর নির্ভর করে। সাহিত্য পরিষদগুলির দ্বারা শিক্ষা কার্য্য প্রচারিত হইতে থাকিলে কোন শিক্ষিত লোকই অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না।

সাহিত্য-পরিষদ যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত হউক কিন্তু সকলেই যদি মামুলী পথ ধরিয়া চলিতে থাকেন—খান কতক বই, প্রত্নতত্ত্বের কলরব আর মাসিক বা বার্ষিক অধিবেশনই উহার উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে অধিক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নাই। কি উদ্দেশ্য লইয়া তাহারা প্রতিষ্ঠিত হয় আর কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা কি কি নূতনত্ব দেখিতে পাই তাহার আলোচনা করিলে

দেখা যায় পরিবর্ত্তন ইহাদের লক্ষ্য নয়, কোন নূতন সৃষ্টি ইহারা চাহে না! নূতনের প্রতিষ্ঠা করে না বলিয়াই ইহারা দেশের মধ্যে পূর্ণ সহানুভূতি লাভ করিতে পারে নাই। সাহিত্য-পরিষদগুলির যাহা অনায়াস লভ্য অন্যের তাহা শ্রম সাপেক্ষ।

দেশের যুবকসমাজ সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত হয় নাই কেন তাহা আজ পর্য্যন্ত কোন সাহিত্যরথী চিন্তার মধ্যে স্থান দিলেন না। কোন কোন যুবক হয় ত পরিষদকে আপন করিয়াছেন কিন্তু তবু পরিষদ এখনও দেশের রক্তে পুষ্ট হইতেছে না। সাহিত্য-পরিষদ বলিলে জন কয়েক শিক্ষিত জ্ঞানী বৃদ্ধের একটা বৈঠকই যেন এখনও বুঝা যায়। যুবক বৃদ্ধ যেন দুই দল দুই দেশের।

* *

৫। রঞ্জন শিল্পের ভারতীয় উপাদান

জার্ম্মাণীর রং আবিষ্কৃত হইলে ব্যবসা জগতে যেমন সুবিধা লাভ হইয়াছে সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে উহার দিকে চাহিয় থাকিয়া তেমনি অসুবিধাতেও পড়িতে হইয়াছে। জার্ম্মাণীর রং আমাদের ফাগ্‌খেলার একটা বড় উপাদান, জার্ম্মাণীর রংয়ে কাপড়ের পাড় রঞ্জিত হয়, জার্ম্মাণীর রং চিত্রশিল্পের সহায়।

আমরা রসায়ণ বিজ্ঞানে যেমন উন্নত নই ইতিহাসেও প্রায় তদ্রূপ। এই জার্ম্মাণী রং বাহির হইবার পূর্ব্বে আমরা কি ব্যবহার করিতাম, রঞ্জন বিভাগের ও চিত্রশিল্পের অবস্থাই বা কি ছিল ইত্যাদি বিষয় বিশেষজ্ঞের জানা থাকিতে পারে। কিন্তু আমরা তাহার কোন আলোচনাই শুনিতে পাই না।

আমাদের দেশের প্রায় প্রতি জিলাতেই কুসুম ফুল উৎপন্ন হয়। প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বেও জার্ম্মাণী এই সব কুসুম ফুল ক্রয় করিয়া রং বাহির করিয়া বিক্রয় করিত।

বঙ্গীয় কৃষকগণ আজকার মত লাভের বেলা সিকি পয়সাই পাইত বাকি পয়সা জার্ম্মাণীর ধন ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইত। তখন জার্ম্মাণ আড়ৎদারেরা বেশী মূল্য দিয়া ফুল কিনিত বঙ্গীয় কৃষকের উহাই একমাত্র নগদ আয়ের পন্থাছিল। কতক বৎসর পূর্ব্বে বিলাতী কারখানার নিমিত্ত তুলাও এই ভাবেই উৎপন্ন হইত। মধ্য ভারতের কৃষকগণের অন্য কোনও দিকে লক্ষ্য ছিল না। তারপর আমেরিকার তুল্য বাহির হওয়ার পর ভারতের তুলার বাজার বন্ধ হইয়া গেল।

আমাদের কারখানা নাই সুতরাং তুলারও বিশেষ প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষে তুলার প্রয়োজন—গদি, তাকিয়ার জন্য, ইংলণ্ড ফরাসীর দরকার ব্যবসার জন্য, জার্ম্মাণীর দরকার বিস্ফোরকের নিমিত্ত। তিন বৎসর পূর্ব্বেও বঙ্গীয় কৃষক ডাণ্ডি ও ম্যাঞ্চেষ্টারের কারখানাগুলির জন্য রৌদ্রে পুড়িয়া জলে ডুবিয়া পাট তৈয়ারী করিতেছিল। তাহারা ইহাকেই আপনার বৈষয়িক উন্নতির একটা প্রধান উপায় স্বরূপ মনে করিয়াছিল তাই ভাবিতেও পারে নাই কুসুম ফুলের দশা, তুলার দশা পাটেরও হইতে পারে।

এই ফুল এক সময়ে ৮০।৮৫ টাকায় বিক্রয় হইত। তারপর ১৫।২০ টাকায় পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়াছিল। কেহ এই ফুল গাছের একটী পাতা ছিঁড়িলে রাজদরবারে দণ্ডিত হইত। বঙ্গীয় কৃষক এক একটী করিয়া গাছ বুনিত, ফুল পাকিলে মুটে কৃষকদের একটা মরসুম চলিত। তারপর উহাকে মাড়াইয়া টাকার ন্যায় গোল করিলে কলিকাতার আড়তে পাঠান হইত। ফুলের পরিত্যক্ত তৈলে কৃষক পরিবারের

রন্ধনাদি কার্য্য হইত। প্রতিবৎসর শীতকালেই এই ফুল জন্মিয়া থাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় এই প্রকার গাছকে বার্ষিক উদ্ভিদ (annual plant) বলিয়া থাকে।

এই ফুল অল্প বিস্তর এখনও উৎপন্ন হয়। ভারতীয় বিজ্ঞানবিদগণ জার্ম্মাণীর ধরণে পরীক্ষা করিয়া লাভালাভ ভালমন্দ বুঝিতে পারিবেন। এমন অনেক দেশ আছে যেখানে রং উৎপাদনের কোন উপাদান বা বন্দোবস্ত নাই সেখানে এই রং বিক্রয় হইলেও বেশ সুবিধা হইবে। জার্ম্মাণীর অপেক্ষা বেশী লাভ হইবে সন্দেহ নাই, কারণ এই সময় দ্রুত পরীক্ষায় ইহার উপকারিতা পাওয়া যাইতে পারে এবং অন্য কারণ জার্ম্মাণ ব্যবসাদারেরা দেশে পৌছাইতে যে খরচ আদায় করিত তাহা হইবে না।

৬। বর্ত্তমান ভারতের শিক্ষণীয় বিষয়

অতি প্রাচীনকাল হইতেই চীনের শিল্প জগতের সভ্য ও অর্দ্ধসভ্য জাতি সমূহের কাছে পরিচিত ছিল। ভারতবাসী এশিয়ার জাতি সমূহের মধ্যে সর্ব্ব পুরাতন। বিভিন্ন বিষয়ে কৃতবিদ্য হইলেও তাহার শিক্ষনীয় কোন কোন শিল্প বিষয় রহিয়াছে। ভারতের সেই সকল বিষয়ে গুরু হইবার জন্য একমাত্র চীনরাজ্যই উপযুক্ত ছিল। চীন আজও কোন কোন বিষয়ে ভারতের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিবার ভার লইতে পারে।

চীন ভারতকে সম্মান করিয়াছে। যে যুগে ভারতীয় সভ্যতা, ভারতীয় শিক্ষা দীক্ষা জগৎময় ব্যাপ্ত হইতেছিল, সেই যুগে একমাত্র চীনই ভারতীয় সভ্যতা বিকাশে সহায়তা করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ৬৭ অব্দ হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত চীনের রাজদরবারে ভারতীয় শ্রমণ পণ্ডিতগণই একমাত্র আধিপত্য স্থাপন করিয়া রহিয়াছিলেন। সেই যুগের শিক্ষা-সভ্যতা প্রচারক আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ চীনকে আপনাদের কর্ম্মক্ষেত্র করিয়াছেন, প্রাণে প্রাণে ভাল বাসিয়াছেন সত্য কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা চীনীয় প্রতিভার বিকাশ সম্বন্ধে যত্ন লইতে অবসর পান নাই। চীন তাঁহার শিক্ষনীয় বিষয় সমূহ লইয়া আজও সারা জগতের মধ্যে আপনার ক্ষমতা দেখাইতে পারে। সেই যুগের ভারতীয় সভ্যতা প্রচারক ও পণ্ডিতমণ্ডলী যাহা অসম্পুর্ণ রাখিয়াছেন, এইযুগের প্রচারকগণ সেইগুলি সম্পূর্ণ করিয়া তুলুন।

বর্ত্তমান ভারত যেন মনে রাখেন আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধোপকরণ সমূহ আমাদের দেশেও প্রস্তুত হইত। কিন্তু চীনই বর্ত্তমান আগ্নেয়াস্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা। নাবিকদিগের কম্পাস চীনীয়দিগের আবিষ্কৃত। শিল্প জগতে আমরা প্রাধান্য লাভ করিলেও চীনের কাছে আমাদের শিক্ষনীয় বিষয় অনেকই রহিয়াছে। ভারতবর্ষের হাটে বাজারে আলিতে গলিতে চীনামাটীর বাসন ছড়াইয়া রহিয়াছে। চীনের কাগজশিল্প সভ্য-জগতের কাছে এক নূতন জিনিষ। শিল্পজগতে নূতন পণ্ডিত সূত্রধরের কাজ আমাদের দেশেও উন্নত হইলে চীনীয় মিস্ত্রীরা যে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বাস্তব জগতের অধিবাসী আমাদিগকে যে সকল বিষয় শিক্ষা করিতে হইবে, চিনীয় শিল্প শিক্ষা ও চীনীয় প্রণালীতে কর্ম্মশিক্ষা তাহার অন্যতম। দেশের সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের যেমন চীনে যাইয়া প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধান

একটা বড় কাজের মধ্যে ধরা হয়; চীনে যাইয়া চীনীয় বিদ্যায় পারদর্শী হওয়াও আমাদের একটা বড় কাজের মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত।

হিন্দু গৃহস্থের ব্যবহৃত সিন্দূর চীন হইতে আমদানি করা হয়। জার্ম্মানীর সুচ ও চীনের সিন্দুর আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে রহিয়াছে।

এখন আমাদিগকে ভাবিতে হইবে বুঝিতে হইবে পশ্চিম জগতের শিল্প শিক্ষা যেমন জীবনধারণের উপায়, ঘরের কাছে পূর্ব্ব জগতের বিদ্যাও জীবন ধারণের অন্যতম উপায়।

ভারতভূমি যেমন অতীত কাল হইতেই বিভিন্ন ধর্ম্মকে আপনার মধ্যে স্থান দিতে পারিয়াছে, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীকেও আপনার ক্রোড়ে লইয়াছে, ভবিষ্যযুগে জ্ঞানের বিকাশ কালেও তাহার বিভিন্ন জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইবেই। পূর্ব্ব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ হইতে যাহা কিছু শিক্ষণীয় আছে, ভারতকে তাহাই আয়ত্ত করিতে হইবে। আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার দিনে ভারত পেছনে পড়িয়া না থাকে তাহাই আজ ভাবিয়া, বুঝিয়া, শুনিয়া লইতে হইবে। ইহাই আমাদের বর্ত্তমান সমস্যা—চিন্তনীয় বিষয়। ভারতের মানুষ কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, ভারতের মাটি উর্ব্বর, ইহা হৃদয়ে অনবরত ধ্বনিত হউক।

* *
*

৭। বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ যুগ

১৯০৫ সাল হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত যে যুগটী কাটিয়া গেল তাহাতে আমরা ভারত-বাসীর বাঙ্গালীর বিভিন্ন বিষয়ের উন্নতি, বিভিন্ন বিষয়ে নাড়াচাড়া, ভাঙ্গাগড়ার ইচ্ছা সবই দেখাইয়াছি। এই যুগ বাঙ্গালীর শক্তির একটা হিসাব লইয়া গেল। দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের বিদ্রোহ, দামোদরের প্লাবন ও ত্রিপুরা-বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষে, মহান্ সেবা ভাব, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দিগের সহিত মিশ্রণ, সাহিত্য সেবার আকাঙ্ক্ষা এইগুলিকেও সামান্য বোধ হইবে সেই যুগে যে যুগ ১৯১৬ হইতে আরম্ভ হইয়া ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে। বাঙ্গালী আজ হয় ত ভাবিতে-ছেন যাহা করিয়াছেন তাহা বিপুল, যাহা চিন্তা করিয়াছেন তাহা মহান্, অকাট্য,—কিন্তু তাহা নয়। যাহা হইয়াছে তাহা অতি সামান্য। আমাদের জাতির নামে, ধর্ম্মের নামে, পূর্ব্বগৌরবের নামে তাহা অতি ক্ষুদ্র। বিশ্বজগতের কাছে এক কণিকা মাত্র।

ভবিষ্য যুগে শত শত দামোদরের প্লাবন উপস্থিত হইবে, হাজার হাজার নরনারী ত্রিপুরা—বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষের ন্যায় প্রাণ দিতে থাকিবে, সত্যের জন্য পদে পদে বিবাদ বিসম্বাদ হইবে—এইগুলি লইয়াই কর্ম্মীর কর্ম্ম আরম্ভ হইবে। মোট কথা আগামী দশ বর্ষ বাঙ্গালী জাতির এক বিষম যুগ। এইবার আমাদের সাহিত্য চর্চ্চা, রাজনৈতিক আলোচনা, শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবনা বিরাট ভাবে আমাদের আলোচ্য বিষয় হইবে। বাঙ্গালী জাতিকে তাহা করিতে হইবেই। আগামী দশ বর্ষই সারা জগতের সঙ্গে বুঝাপড়া করিবার সময় করিয়া দিবে। বাঙ্গালী জীবনের ধারা এই দশ বর্ষেই ঠিক পথ ধরি-বার জন্য ব্যস্ত হইবে। বাঙ্গালী ভারতবাসী দেখিতে পাইবেন তাঁহারা এতদিন যাহা করিয়াছেন তাহারই ভিত্তির উপর ভবিষ্যতের মন্দির গঠিত হইতেছে।

যেদিন এই যুদ্ধের শেষ হইবে সেই দিন হইতে আমরা ১৯১৬ সালের গণনা ধরিব।

কারণ মহাযুদ্ধের ফলে বিভিন্ন পক্ষের রাষ্ট্রীয় সীমার নির্দ্দেশ, ইউরোপীয় যুযুৎসুদিগের মত্ততার পরিবর্ত্তন, দেশ কাল পাত্র হিসাবে শিল্প বাণিজ্যের প্রবর্ত্তন হইবে। বাঙ্গালী জাতিও তাহার উন্নতির জন্য আপন পথ ধরিয়া লইবে। এই দশ বৎসরে বাঙ্গালীর সাহিত্য একটা নূতন পথে চলিবে। লোকের চিন্তাশক্তি পাকা রকমে প্রকাশ না পাইলেও পাকিতে বেশী দিনের অপেক্ষা করিবে না। বাঙ্গালী মাত্রেই সচ্চিন্তা, সদালাপের জন্য ব্যাকুল হইবে। সকলেই আপনার কিছু দেখাইবার জন্য শক্তি অর্জ্জন করিতে চেষ্টা করিবে।

ধর্ম্মের দ্বারা শক্তি অর্জ্জনই একমাত্র লক্ষ্য হইবে। সমাজের অতি নিভৃত কোণেও ধর্ম্মের শক্তিজাল বিস্তৃত হইয়া সকলকে মানুষ করিয়া তুলিবে। দেশের নরনারী ধর্ম্মের দ্বারা দৃঢ়বদ্ধ হইলেই পরিপূর্ণ শান্তির দিকে দেশ অগ্রসর হইবে।

আগামী দশ বৎসরে আমরা কতটুকু বড় হইব তাহা অনেকেই এখন ধারণা করিতে পারিবেন না। তাঁহাদের ধারণায় মুহূর্ত্তের জন্যও আসিবে না—যাঁহাদের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের ছায়া মাত্র দেখা যাইতেছে না, যাঁহাদের শিল্পজগতে কোন আসন নাই—যাঁহারা শুধু কাঁচামালের উৎপাদক, সমাজ যাঁহাদের অন্নচিন্তায় চমৎকৃত, মেরুদণ্ড যাঁহাদের ভগ্ন তাঁহারা বড় হইবেন কি ভাবে? আমরা বলিতে চাই মানুষে যাহা করে তাহার মূল্য বেশী নয়, মূল্য হয় মানুষের। সংসার চিরদিনই এই ভাবে পড়িয়া থাকিবে, তাহাকে যে ভাঙ্গিতে গড়িতে পারিবে সে তাহারই হইবে। এক একজন শক্তিমানের চাপেই সংসার দুলিতে থাকে। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিষুবরেখার উপর দিয়া তাঁহারই জয়গীতি ধ্বনিত হয়। সংসার জড়—মানুষ চেতন। সুতরাং শিল্পজগতের কোন বাহাদুরীর দিকে লক্ষ্য না করিয়া, আধুনিক বিজ্ঞানের ছাপ না দেখিয়াও জাতিকে ভাল বাসিয়া যাও, আর বিশেষরূপে লক্ষ্য কর বিগত দশ বৎসরের ভিতর মনুষ্যত্বের নামে, ধর্ম্মের নামে শক্তির পুত্র ভারতবাসিগণ কিছু করিয়াছেন কি না? আমাদের পিতৃপিতামহের সঞ্চালিত রক্ত স্রোত আমাদের দ্বারা পবিত্র রহিবে কিনা, আমরা মানুষ, জগৎ একথা স্বীকার করিবে কিনা।

মানুষ মাত্রেই, জাতি মাত্রেই প্রথম শ্রেণীর গুণনিচয় লইয়া জন্মে না। অপরকে বড় ভাবিবার সময় নিজের দিকেও তাকাইতে হইবে—আমি জড় সংসার নই আমি চেতন-মানুষ। শিল্প-বিজ্ঞান আমারই চিন্তার ফল। আজকার ভাব বা চরিত্র উন্নত হইয়া মাপকাঠির জন্য কাল অপেক্ষা করিবে না। একমাত্র জড়ই মাপকাঠির মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া যায়, মানুষ কখনও মাপকাঠির মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না।

বিগত দশ বৎসরের পূর্ব্বে বাঙ্গালী ভারতবাসী যে অবস্থায় ছিলেন, বিগত দশ বৎসরে তাহা অপেক্ষা উন্নত হইয়াছেন কিনা, এবং পূর্ব্বের তুলনায় মাপকাঠির মধ্যে আছেন কিনা এইটুকু আগে দেখিতে হইবে। তাহা হইলেই বুঝা যাইবে বিগত দশ বৎসরের অপেক্ষা আগামী দশ বৎসরে সমস্ত পৃথিবীর কাছে বাঙ্গালী ভারতবাসীর এক নূতন ভাবের পরিচয় হইবে। কোন শিল্প-বিজ্ঞানের আবিষ্কার না দেখিয়াও তাহাকে বড় বলিয়া বোধ হইবে। তাহার দ্বারা যদি জগৎ কিছু লাভ করে হয়ত উহাই এই শতাব্দীর বিশেষ

গৌরব হইবে তাহা হইলেই কি কম কথা? আগামী দশ বৎসরে যাঁহারা বাঙ্গলা দেশকে, বাঙ্গালী জাতিকে বড় করিতে বড় দেখিতে চাহেন তাঁহারা বিগত অধ্যায়টী আর একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লউন, নতুবা আশু হইতে বাধা পড়িবে।

* *
*

৮। যুদ্ধের পর আমাদের বৈষয়িক অবস্থা

যুদ্ধের শেষে বাণিজ্য ব্যাপারে কাহার কি অবস্থা দাঁড়াইবে তাহা যে সকলেই কিছু কিছু না ভাবিতেছেন এমন নহে। আমরা যুদ্ধের পরের কথা আলোচনা করিতেছি—আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা উপলব্ধির নিমিত্ত। রাষ্ট্রীয় ব্যাপার, জগদ্ব্যাপ্ত বাণিজ্য-নীতি আলোচনা করার আপাততঃ আমাদের কোনই প্রয়োজন নাই।

যুদ্ধের পর বাণিজ্য ব্যাপারে বর্ত্তমান বাণিজ্যকুশল জাতিমাত্রেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিবে। তখন অর্থোপার্জ্জনই তাহাদের লক্ষ্যের মধ্যে দাঁড়াইবে। যাহারা এ যুদ্ধে আদৌ লিপ্ত হয় নাই তাহারাও দু'পয়সা হাতে করিতে আসা যাওয়া করিবে। সমস্ত পৃথিবীটা বাণিজ্যের তাণ্ডব নৃত্যে কম্পিত হইবে। মোটের উপর এই যুদ্ধে পৃথিবীর যদি কোন অংশে "ঘা," নাও পড়ে পরে বাণিজ্য-সংগ্রামে সে আর বাদ যাইবে না।

ইংরেজ-ফরাসীর বিপরীত পক্ষের শিল্প দ্রব্য ভারতবাসী যতটা কিনে ততটা অন্যের নিকট হইতে নহে এটা ঠিক। জার্ম্মাণী আমাদের বাজার যে সব জিনিস দ্বারা পূর্ণ করিতে পারে নাই বা করে নাই অষ্ট্রীয়ানগণ তাহা করিয়াছিল। পুনরায় যে সময় আমরা জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রীয়ার শিল্পাদি লইতে থাকিব সে সময়ে যদি এদিকে বৈদেশিক দ্রব্যের উপর বিশেষতঃ জার্ম্মাণ ও অষ্ট্রীয়ান শিল্পের উপর অতিরিক্ত মাত্রায় কর ধার্য্য হয়, তাহা হইলে আমরা যতটুকু অসুবিধা ভোগ করিতেছি তাহার চতুর্গুণ দুর্দ্দশা ভোগ করিব। সূচ অবধি না কিনিলে চলিবে না, অথচ শরীরের রক্ত জল হইয়া যাইবে। জার্ম্মাণী, অষ্ট্রীয়া আমাদের প্রকৃতি বুঝিয়া লইয়াছে। অতিরিক্ত মাত্রায় শুল্ক ধার্য্য হইলেও তাহারা পিছু হইবে না—মূল্য বৃদ্ধি করিয়া দিবে। আজ ২ বৎসর যাবৎ উপায় দেখাইতে কেহ ত্রুটি করেন নাই। আমরা দেখিতেছি যদি ভবিষ্যৎ আমাদের এই রকমই হয় তাহা হইলে "নাকের জলে চোখের জলে" এক হইবে। দরিদ্র ভারতবাসীরা নিজেই দারিদ্র্যের প্রতিমূর্ত্তি সুতরাং শ্রমজীবিগণ আর দাঁড়াইতে পারিবে না। তাহাদের অর্থ আমরা ভোগ করিতেছি, আমরাও দাঁড়াইতে পারিব না। এখন দেখিতেছি অশিক্ষিত ও রক্ষণে অক্ষম শ্রমজীবিগণের অর্থ যাহাদের কাছে রক্ষিত তাঁহাদেরই এখন সাড়া দেওয়ার সময়। তাঁহারাই এদেশের লক্ষপতি ক্রোড়পতি—বর্ত্তমান যুগ, ভবিষ্যতের জন্য তাঁহাদেরই শক্তির অপেক্ষা করিতেছে।

যে সময় জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য আপনার শক্তিকে এক বিরাট দেহে রক্ষিত করিতেছিল, আধুনিক জাপানীদিগের প্রায় সেই সময়েই পরিবর্ত্তনের যুগ। এক কথায় সেই সময়টা বর্ত্তমান উন্নতিমুখী জাতিসমূহের উন্নতিরই আকাঙ্ক্ষা দিয়াছিল। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে জাপানী শিল্পের ধ্বংসের জন্য যখন আমেরিক ব্যবসায়িগণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল, জাপান ধ্বংস করিতেও কুণ্ঠিত ছিল না সেই সময় জাপানের সওদাগরগণ তাহাদের

সম্পত্তি মিকাডোর কাছে দান করিয়াছিল। তাহাদের অর্থ সরকারে গৃহীত হয় নাই। তাহাদের পরামর্শে ও তাহাদের ত্যাগের দ্বারা উদ্দীপিত হইয়াই নব্য জাপানের বিভিন্ন কেন্দ্রের পণ্ডিতমণ্ডলী বিদেশ হইতে মানুষ হইয়া আসিলেন। আজ জাপানের শিল্প আমেরিকার শিল্পজগতকে চুরমার করিতে ব্যস্ত। পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাইতেছে আমরা ৪০ বৎসর পূর্ব্বের জাপানীদিগের অবস্থার নীচে আছি। জাপানীদিগের তবুও কিছু ছিল। তাহাদের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা আমাদের অপেক্ষা স্বতন্ত্র হইলেও শিল্পজগতের কাজ এ অবস্থায়ও চলিতে পারে।

বিদেশী কৃতবিদ্য ছাত্র আমাদের যথেষ্ট আছেন, কাজের অভাবে তাঁহারা দেশের জাতের ধরণেই চলিতেছেন। সমাজের একজনেই সকল কাজ করে না। তাঁহারা সম্মুখে আগু হইতে প্রস্তুত, তাঁহাদের পশ্চাতে শক্তি চাই। ব্যবসা সম্বন্ধে তখনকার জাপানীদিগের অবস্থায় আমরা এখন আছি কিন্তু জাপানীদিগের প্রাথমিক অবস্থার কাজ আমরা অনেক পূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছি।

এদেশের লক্ষপতি ক্রোড়পতিগণ যাহাকে রক্ষণ মনে করিতেছেন তাহাতেই বিনাশ। দেশের লোক যে অর্থের কণিকা পাইয়া ধন্য হইবে ধনীর ধন তাহাতেই সার্থক হইবে। গোটা কতক কারখানা উঠিয়া গেল বলিয়া মনে করিলে চলিবে না এদেশের লোক অকর্ম্মণ্য। একটা শিল্পের পরীক্ষা করিতে তাহাকে বাজারে পছন্দ সই করাইতে ২।১ দিনে হয় না। ২।১টা পেন্সিল বা দেশালাইয়ের কারখানাই আমাদের সকল অভাব পূরণ করিয়া দিবে না। অভাব বহু, চিন্তা কম, সঙ্গে সঙ্গে পন্থাও রুদ্ধ। যদি এখনও ঠিক উপলব্ধি না হয়, আমরা যে ভিটা মাটি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিব তাহাতে আশ্চর্য্য কি? জার্ম্মাণ, অষ্ট্রীয়া, জাপান, আমেরিকা ও পোলাণ্ড অবধি আমাদের রক্ত শোষণ করিতে থাকিবে। তাহারা ভ্যাম্পায়ারের মত আরও ভালবাসা দিয়া সর্ব্বনাশ করিতে আর বেশী দিন দেরী করিবে না। সমানে অসমানে ভালবাসা হয় না। ব্যবসায়ে আমরা রুদ্ধ তাহারা মুক্ত, আমরা শুষ্ক তাহারা পুষ্ট, আমরা পরমুখাপেক্ষী তাহারা স্বাধীনজীবী।

যুদ্ধের শান্তি হইলে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা কোথায় পৌছিবে তাহা কি কেহ ধারণা করেন নাই? ধনী সম্প্রদায় এখনই আগুহউন, উপযুক্ত ব্যক্তিকে ডাকিয়া লউন, প্রকৃত বিদ্বান-বুদ্ধিমান ক্ষুদ্রস্বার্থত্যাগী ব্যক্তির উপর আপনার বিশ্বাস স্থাপন করুন আমরা সর্ব্বত্র যোগ্যতার মূর্ত্তি দেখিতে পাইব। আপাততঃ ব্যবসা নিপুণ জাতিসমূহের সহায়তা গ্রহণে যেন ক্রটী না হয়। বর্ত্তমানে প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্যই চেষ্টা করা হউক। উপযুক্ত ক্ষেত্র বুঝিয়া অর্থ দান করা উচিত। এক একটী দিন চলিয়া যাইতেছে আর ভবিষ্যতের বিরাট দশন মূর্ত্তি আগু হইয়া আসিতেছে। আর কিছু দিন পর দেশের লোক বুঝিতে পারিবে যাহা রক্ষণ তাহাই বিনাশ। ৪০ বৎসর পূর্ব্বের জাপানী স্বভাব পরিবর্ত্তিত হউক বিধাতার কাছে এই প্রার্থনা।

* * *

৯। বঙ্গের বাহিরে মাতৃভাষার অর্চ্চনা

আমরা দেখিতেছি আমাদের মাতৃভাষার প্রচার জন্য উত্তর ভারতের সর্ব্বত্রই পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ব্রহ্মদেশ হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত এবং ডেরাদুন হইতে বিন্ধ্য পর্য্যন্ত

প্রায় প্রসিদ্ধ স্থানগুলিই বাঙ্গালা ভাষার প্রচারভূমি হইতেছে। বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর কীর্ত্তি মূর্ত্তিমতী হইবে। আমরা লক্ষ্য করিতেছি যাহারা বঙ্গের বাহিরে বঙ্গীয় সাহিত্যের প্রচার করিতেছেন তাঁহারাও এই যুগের শিক্ষাপ্রচারক। তাঁহাদের পরিষদ গুলি ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইবে নিশ্চয়। আমাদের মাতৃভাষা দ্বারাই হয়ত একদিন সমস্ত দেশ মুখরিত হইবে। সে কথা আজ যুক্তি তর্কের ভিতরে নিহিত থাকিতে পারে, এবং সমস্ত দেশ বুঝিতে বা গ্রহণ করিতে দ্বিরুক্তিও করিতে পারে। আমাদের মাতৃ-ভাষাই হয়ত একদিন ভারতের ভাষা সামঞ্জস্য বিধান করিবে এবং ভারতীয় ভাষা সমূহের প্রতিনিধি হইয়া এশিয়া মহাদেশের ফরাসী ভাষায় পরিণত হইবে। বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সাহিত্যপ্রচারক্ষেত্রে বাঙ্গালী জাতির সাহিত্য ও ভাষা প্রাধান্য লাভ করি-তেছে। ভারত জননীর সমস্ত পণ্ডিত সন্তানগণ যে তাহাকে আপনাদের করিতে বদ্ধ পরিকর হইবেন সে আশা করিতে পারি।

রঙ্গলাল হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত কবিগণ ভারতজননীকে নানাভাবে সেবা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহারা আমাদেরই পিতৃ পিতামহের ভারতবিজয় গীতি গাহিয়াছেন। তাঁহাদের সাহস, বিদ্যা-বুদ্ধিকে শতভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহাদের কাব্যে রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড়-কলিঙ্গ, বাঙ্গালা-হিন্দুস্থান-পঞ্চনদ কোন দেশেরই চিত্রই বাদ যায় নাই। বাঙ্গলার সংসার ভারতীয় ঐতিহাসিক স্তোত্রে মুখরিত; বাঙ্গলার শিশু সন্তান ভারতীয় চিত্র দর্শনে প্রথম দ্রষ্টা।

সম্প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মীরাট শাখার সভাপতি মাতৃভাষার সেবক পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যা বিনোদ, বিদ্যারত্ন সাহিত্যভূষণ তত্ত্বনিধি মহাশয় যে কার্য্যবিবরণী পাঠাইয়াছেন আমরা তাহাতে মাতৃভাষার সেবকগণের ভক্তি দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছি যে মীরাট সাহিত্য-পরিষদ ক্রমেই উন্নতির দিকে চলি-তেছে। এইরূপ কিছু দিন চলিলে আমরা বোধ হয় আশা করিতে পারি উত্তর ভারতের মধ্যাংশ মীরাট সাহিত্য-পরিষদের দ্বারাই দীক্ষিত হইবে। তাঁহার লিখিত বিবরণীতে ৩রা বৈশাখ অধিবেশনে "হিমালয় দর্শনে" শীর্ষক একটী কবিতা এবং "বোপদেব গোস্বামীর জীবন"—সম্বন্ধে একটি তথ্য বহুল প্রবন্ধ পঠিত হয় এই মাত্র ছিল। বিশেষতঃ ঐ অধিবেশনে সাহিত্য-পরিষদের প্রাণস্বরূপ ৺ব্যোমকেশ বাবুর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইয়াছে। ব্যোমকেশ বাবুর জীবনী আলোচনাই উক্ত অধিবেশনের প্রধান বিষয় ছিল।

১০। পণ্ডিত রজনীকান্ত

৺পণ্ডিত রজনীকান্তকে আমরা ঐতি-হাসিক তথ্যানুসন্ধানে, প্রত্নতত্ত্ববিদের সভায়, সুপণ্ডিতের আসরে, রসিক পুরুষদের বৈঠকে আর দেখিতে পাইব না।

৺ পণ্ডিত রজনীকান্ত মালদহের অধিবাসী না হইলেও তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র মালদহে, তাঁহার শেষ পরিণতিও মালদহে। জন্মস্থানে কিছু আসে যায় না! তিনি মালদহকে কতটুকু ভালবাসিয়াছেন, মালদহ তাঁহার জন্য আপনার বুকের উপর কতটা অধিকার দিয়া-ছিল, তাহা আমরা তাঁহাকে মালদহের পণ্ডিত বলিলেই বুঝিয়া লইতে পারি।

মানুষ মাত্রেই যশঃ চায়, পণ্ডিত রজনীকান্ত ও চাহিতেন। কিন্তু সাহিত্যের ভাষায় বলা যায় অর্থগৃধ্নু বলিলে যাহা বুঝায় তিনি সে ভাবের যশোলিপ্সু ছিলেন না। তারপর সাহিত্যিক যাহার দ্বারা সমাজে পরিচয় লাভ করেন তিনি সেরূপ কোন কাব্য বা উপন্যাস গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তিনি গ্রন্থরচনা করিয়াছেন তাহা রংপুর সাহিত্য-পরিষদের সম্পত্তি। দরিদ্র সাহিত্যসেবী, ঐতিহাসিকের গ্রন্থ "সুপ্তগৌড় লুপ্তগৌড়ের" সঙ্গে ধীরে মিশিয়া যাইতে থাকিলেও অন্ততঃ তাহার এক পংক্তিও "অভিশপ্ত দেশে"র ললাটে বাঁধা থাকিবেই। ঐতিহাসিকগণ দেখিতে পাইবেন উহার একদিকে বিধ্বস্ত মহানগরীর যশঃসম্ভার অন্যদিকে পণ্ডিতপ্রবরের দুঃখস্মৃতি, মাঝখানে একটা অক্ষয় প্রীতিরেখা রহিয়াছে।

সুপণ্ডিত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় মালদহের ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে স্বর্গীয় পণ্ডিত মহাশয়কেই তাঁহার সাহায্যকারী পাইয়াছিলেন। ৺ পণ্ডিত মহাশয় কোন দিন কাহারও সঙ্গে দেখা করিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিবার জন্য ব্যস্ত হয়েন নাই। নিজের ভাবেই তিনি সর্ব্বদা আপনার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। যাহারা আলাপ করিতে চাহিত তাহারা কেহই প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। কেহ আহ্বান করিলে তাহা তিনি অগ্রাহ্য করেন নাই ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব ছিল। বৃদ্ধ বয়সেও পণ্ডিত মহাশয়, একটা পুরা জীবনে যে বইগুলি পড়িয়া শেষ করা কষ্টকর তাহা শেষ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। "অজরামরবৎ প্রাজ্ঞ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ" ইহা তাঁহার জীবনে আমরা দেখিয়াছি। তিনি অন্যের (ঐতিহাসিকের) মতামত সাধারণের কাছে প্রচার করিয়া তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করেন নাই অন্যকেও সে দিকে টানেন নাই। কথাপ্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ অবতারণা করিতেন মাত্র।

প্রাচীন গৌড়ের সাহিত্য-ক্ষেত্রের ধোয়ী, পশুপতি, হলায়ুধ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের নাম শুনিতে পাই, আর আমাদের জীবনে আমাদের মধ্যে বিজন গৌড়ের স্মৃতিরযুগে পণ্ডিত মহাশয়কেই পাইয়াছিলাম। পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার অগাধ জ্ঞানের সামান্যই দান করিয়াছেন। কেহ তাহা আদায় করিবার জন্য আগ্রহান্বিতও হয় নাই। পণ্ডিত মহাশয়ের বাক্‌শক্তি চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। নব্য মালদহের বর্ত্তমান যুবক সম্প্রদায় কিছুদিনের জন্য তাঁহার লিখিত চিন্তার প্রস্রবণ ব্যতীত উত্তরাধিকারীসূত্রে সাহিত্য ক্ষেত্রে আর কিছুরই ধারা বহাইতে পারিবেন না। বসুধা রত্নপ্রসবিণী, কত জন্মিতেছে, জন্মিবে, পণ্ডিত রজনীকান্তের আগেও লোক ছিল পরেও হয়ত কোন মহাপুরুষের আবির্ভাবে মালদহ গৌরবান্বিত হইবে। কিন্তু কিছুদিনের জন্য সে আসন যে খালি থাকিয়া যাইবে ইহা নিশ্চয়। মালদহের বর্ত্তমান যুবক সম্প্রদায় ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অনুভব করিবেন। কারণ তাঁহাদেরই জীবনকালে মালদহের সাহিত্যক্ষেত্র শূন্য বোধ হইবে। সুতরাং যে পর্য্যন্ত অন্য কোন সাহিত্যসেবীর অভ্যুত্থান না হয় সে পর্য্যন্ত পণ্ডিত মহাশয়ের মৃত আত্মার সম্মানের জন্য তর্পণ হউক। মালদহের সাহিত্যসমাজের জন্য পণ্ডিত মহাশয়ের আবার আবির্ভাবের জন্য প্রার্থনা চলুক।

* *

১১। দেশীয় পত্রিকার প্রকৃতি

জন সাধারণের অবস্থা জানিবার জন্য কোন সরকারী বিবরণীর দরকার হয় না। দেশের

লোক কি ভাবে আছে, তাহাদের শক্তি সামর্থ্যের পরিমাণ কত তাহা সহজেই ধারণা করা যায়। সরকারী বিবরণীর পরিবর্ত্তে আমরা দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্রগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারিব দেশের লোক কি চায়, তাহাদের কণ্ঠস্বরে কোন সুর অহরহ বাজিতেছে।

সংবাদপত্রগুলির যে সকল স্থান বিজ্ঞাপনের দ্বারা পূর্ণ থাকে, তাহার পোণে ষোলআনাই ব্যাধির ঔষধের, বাকি কয়টী অন্যান্য রকম ব্যবসার। সংবাদপত্রের কোন স্থানে আজ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই দেশীয় কোন শিল্পালয় বা কোন কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

নানা প্রকার ঔষধ—কবিরাজী, পেটেণ্ট, মুষ্টিযোগ, বিভিন্ন রকমের চিকিৎসা পুস্তক, এলোপ্যাথিক হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কিছুই বাদ যায় নাই।

গড়ে এক একটী ঔষধের অন্ততঃ ৪।৫ টী পত্রিকায় বিজ্ঞাপন খরচ, তাহাদের নিত্য খরচ, দোকান ভাড়া ও লোকের মাহিনা ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় দেশের লোক কি ভাবে আছে; কি ভাবে তাহারা মরিয়া বাঁচিয়া দুর্ব্বিসহ জীবন বহন করিতেছে। সকল ব্যাধির মধ্যে ম্যালেরিয়ার দ্বারাই যে তাহারা অধিকতর আক্রান্ত তাহা উহাতেই বেশ বুঝা যায়। কত রকম ঔষধ দেখা দিতেছে, কত বিভিন্ন চিন্তা শক্তি লইয়া ঔষধ বিক্রেতা দেখা দিতেছেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইবার নহে। হইবে না তাহারও কারণ আছে। একে অভিশপ্ত দেশ ব্যাধিদ্বারাই তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে, রোগ-শোক শত রকমে জর্জ্জরিত করিয়া দিতেছে। তারপর যাহারা ঔষধ প্রস্তুত কারক তাহারা অধিকাংশই উপায়হীন অসময়ে গৃহস্থ। এ শোকভার দূর করিতে গেলে যে নূতন ধন্বন্তরীর প্রয়োজন তাহা সহজেই বুঝা যায়।

সংবাদপত্র প্রকাশিত হইবার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত সংবাদপত্রগুলিতে দেখা যাইবে ঔষধের বিজ্ঞাপনের ধারা ব্যাধির দ্বারা ক্রমেই খরস্রোতা। বিভিন্ন দেশের লোক আপনাদের উন্নতির পরিচয় দিতেছে আপনাদের রুচির দ্বারা আমরা রুচির পরিচয় দেই ঔষধে। তারপর আরও দেখা যায় যে বিদেশে ঔষধ প্রস্তুত হয় সেগুলি যেন আমাদেরই জন্য। ভারতবর্ষের বাজারগুলি দেশী বিলাতী ঔষধের গুদাম, দেশী ও বিলাতী ব্যবসাদারদের মিলন স্থান। বিদেশের যে কোন সাজ সরঞ্জাম ভারতবর্ষের জন্যই আবিষ্কৃত হয়।

পৃথিবীর এক এক দেশের এক এক বিষয়ে বিশেষত্ব থাকিতে পারে কিন্তু ভারতবর্ষের বিশেষত্ব বজায় রহিয়া গেল ঔষধ সেবনে। ভারতবর্ষের সংবাদ পত্রগুলিকে ব্যাধির ইতিহাসও (History of diseases) বলা যাইতে পারে। শরীর-বিজ্ঞান ও রোগ নিদান শিক্ষার জন্য ভারতবর্ষের যে কোন পরিবারকে শিক্ষালয়রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

এইরূপে ব্যাধির ক্রম প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। নিজ জীবন পরিবার রক্ষার উপায় সকলকেই করিতে হয়। কিন্তু শত দৈন্যের মধ্যে ভাবার সময় যে নাই।

১২। হিন্দুর ভবিষ্যৎ সংসার

আমাদের মনে হয় আজকার দিনের হিন্দুর সংসার ভবিষ্যতে আর এ রকম থাকিবে না। আজকার দিনের হিন্দু ও ভবিষ্যতের হিন্দুতে কতটা পার্থক্য হইবে তাহা ভাবিতেই আমরা পুলকিত হইতেছি। সেই ধারণা যে দিন প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি হইবে, সেই ভাবনাতে যখন হিন্দু সমাজ তন্ময় হইবে তখন হিন্দুর ভবিষ্যৎ যুগের নূতন কিরণ সম্পাতে পৃথিবীও উজ্জ্বল হইবে। আজ হিন্দু আপনাকে বুঝিয়াছেন বুঝিতে চলিয়াছেন ইহাতে চলিবে না, তাহার সমাজ বড়, তাহার জ্ঞান বিজ্ঞান গূঢ় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার লক্ষ্য সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, দূরে অতিদূরে, তাহার আশা বিপুল, সাধারণ মানুষের ধারণার অতীত সুতরাং তাহার ধ্যান ধারণা ক্ষণস্থায়ী হইলে চলিবে না। তাহার আকাঙ্ক্ষা যে দিন তাহার প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজনকে

প্রবুদ্ধ করিতে পারিবে সেই দিন আমরা আবার খাঁটী হিন্দুর সংসার দেখিতে পাইব। প্রত্যেক হিন্দুকেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে আমার সংসার আমার সমাজ আমিই ভাঙ্গিব আবার আমিই গড়িব। সত্যের জন্য প্রাণ দান, তুচ্ছ ভয় ভাবনা মায়া মোহ পরিত্যাগ, সকল প্রাণীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিজের শক্তির ব্যবহার, আপনাকে জাত মানের গৌরবে গৌরবান্বিত আপনার ধর্ম্ম সমাজ রক্ষার জন্য সর্ব্বস্ব দান করিতে পারিলে মোটের উপর নিজস্ব রক্ষা করিতে হইলে যে সব গুণ ও শক্তির প্রয়োজন যাহা দ্বারা মানুষ মানুষ বলিয়া খ্যাতিলাভ করে সেই সব প্রতি হিন্দুর চরিত্রে, হিন্দুর শয়নে স্বপনে ভাবনার বিষয় হওয়া চাই। যাহার নাই তাহাকে দান করা, যাহার কিছু আছে তাহার নিকট হইতে মাগিয়া লওয়াই প্রকৃত হিন্দু শিক্ষার্থীর কাজ। যাহা থাকার সম্ভব, যাহাকে না পাইলে প্রকৃত মনুষ্যত্ব, হিন্দুত্ব, আত্মবোধ জাগিবে না তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা। তাহার কর্ম্মের প্রতি ভক্তি তাহার চরিত্রের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখিলেই সব হইবে—আপনার চরিত্র বড় হইবে।

হিন্দুর চরিত্র হিন্দুর সংসার সমাজ বড় হইলে আমরা দেখিতে পাইব হিন্দু সন্তানের জননী চিন্তাশীলা হইয়াছেন, জগৎ গৌরব সন্তান তাহাদের পুণ্যের ফলে লাভ হইয়াছে, পিতামাতা সন্তানের ভবিষ্যৎ ফল লাভের পথ সুগম করিয়া দিতেছেন। স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিয়াছে, ব্যাধির ছায়া মাত্র আর কোথায়ও দেখা যাইবে না। ক্ষুদ্র স্বার্থ, দম্ভ, বৃথা দর্প প্রভৃতি যাহা হীনচরিত্রের লক্ষণ তাহার পরিবর্ত্তে সাহস, সংযম, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, ধৈর্য্য প্রভৃতি তপস্বীর গুণনিচয় দৃষ্ট হইবে। শিক্ষা দীক্ষা জননীর দ্বারাই প্রচারিত হইবে। ভবিষ্যৎ হিন্দু পরিবারের জ্ঞান আহরণই একমাত্র লক্ষ্য হইবে। বর্ত্তমান অর্থ চিন্তা জর্জ্জরিত হিন্দু সমাজ অর্থের কবল হইতে রক্ষা পাইয়া সুস্থ সবল ও সচ্চিন্তান্বিত হইবে। আমাদের সমাজ সেবাধর্ম্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া হিন্দু গৃহস্থকে ত্যাগের দিকে লইয়া যাইবে। দরিদ্র নারায়ণের সেবা, দেব মন্দির ও জলাশয় প্রতিষ্ঠা, কৃষির উন্নতি বিধান, দোল-দুর্গোৎসব, বার মাসে তের পর্ব্ব যাহা দীনতায় হীন হইয়াছে সেই গুলি আবার গৃহস্থের নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্যের মধ্যে গণ্য হইবে। শিল্পশিক্ষা বিলাসবাসনা চরিতার্থের কারণ না হইয়া এক নূতন ভাবে জ্ঞানের পরিচয় দিবে। সকল জ্ঞানের আধার প্রকৃত ব্রাহ্মণ এবং সমাজ রক্ষক হিন্দু ভূস্বামী অবশ্যই দেখা দিবেন।

হিন্দু পরিবার লক্ষ্য করিলে, তবেই আমাদের সমাজ উন্নতি, তবেই আমাদের সাধনা এক অভূতপূর্ব্ব অচিন্তনীয় সত্য ধারণায় দাঁড়াইবে। হিন্দু সেই দিনই হিন্দু হইবেন। যতক্ষণ ব্যাধি দৈন্যের দ্বারা কবলিত, অভাবের তাড়নায় ঘূর্ণ্যমান, লোভে মোহে আচ্ছন্ন, নিজের শক্তিতে বিশ্বাস হীন, ততক্ষণ হিন্দুর অস্তিত্ব কোথায়?

পুণ্ড্রজাতির ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

পুণ্ড্র শব্দের ব্যুৎপত্তি

পুণ্ড্র শব্দ জাতিবাচক

যেমন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য জাতিবাচক শব্দ, তদ্রূপ পুণ্ড্র জাতিবাচক শব্দ। পুণ্ড্র নামক ক্ষত্রিয় জাতি যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে বাস করিত সেই দেশের নামটি পর্য্যন্ত 'পুণ্ড্রদেশ' বলিয়া বিখ্যাত ছিল। পুণ্ড্র জাতির বাস নিবন্ধন সেই দেশটীকে পৌণ্ড্রদেশ বলিত। কালক্রমে ঐ দেশ 'পুণ্ড্রবর্দ্ধন' বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নামে খ্যাত হয়; এবং পুণ্ড্র দেশের রাজধানীর নাম 'পুণ্ড্রবর্দ্ধন' হয়। এক সময় বর্ত্তমান বগুড়া জেলার মহাস্থান নামক ভূভাগ 'পুণ্ড্রবর্দ্ধন' নগরী ছিল।

পুণ্ড্রজনপদের উৎপত্তি

হিন্দুশাস্ত্রে পুণ্ড্রদেশ সম্বন্ধে বহু উপাখ্যান বর্ণিত আছে। যে সময়ে বঙ্গদেশ অনার্য্য নিবাস ছিল বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, সেই সময়ে 'বলী' নামক ক্ষত্রিয় রাজার ক্ষেত্রজ পুত্র 'পুণ্ড্র' আত্মীয় স্বজনগণ সহ বঙ্গদেশের যে ভূখণ্ডে বাস করেন সেই দেশের নাম 'পুণ্ড্রভূমি' বা 'পুণ্ড্রদেশ'।

পুরাণ শাস্ত্র মতে 'পুণ্ড্র', এই পুণ্ড্রদেশ স্থাপন পূর্ব্বক, তথায় রাজ্যশাসন করেন। পুণ্ড্র বংশধরগণ ও তাঁহার জাতিগণ 'পুণ্ড্র-জাতি' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। পুণ্ড্র ক্ষত্রিয়গণ—দ্বিজ এবং ক্ষত্রিয়বর্ণ।

সেই সময় হইতে বঙ্গের অন্তর্গত পুণ্ড্রদেশ যজ্ঞীয় ভূমি হইয়া আর্য্যনিবাসে পূর্ণ হইয়া উঠে। অনার্য্য নিবাস জনিত পতিত ভূমি, যজ্ঞীয় দেশে উন্নীত হয়। মনু-শাসনে যে ভূমি অনার্য্য দেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল এবং যথায় তীর্থযাত্রা ব্যতীত গমন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিবার বিধান ছিল, সেই দেশই তাঁহার পরবর্ত্তী কালে আর্য্যনিবাস এবং যজ্ঞীয় ভূমি হইয়া 'পতিত' আখ্যা হইতে মুক্ত হইয়া যায়।

পুণ্ড্রজাতি বালেয় ক্ষত্রিয়

এই যজ্ঞীয় আর্য্যভূমি পুণ্ড্রদেশবাসী 'বালেয় ক্ষত্রিয়'দিগকে ভারতের আর্য্যগণ 'পুণ্ড্র-ক্ষত্রিয়' বলিতেন, এবং তাহাদের আদি নিবাস ভূমিকে পুণ্ড্র-দেশ বলিয়া অবগত ছিলেন।

অঙ্গো, বঙ্গ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চতে সুতাঃ।
তেষাং দেশা সমাখ্যাতাঃ স্বনাম কথিতাভুবি ॥"

(ভারত, আদিপর্ব্ব ১০৪।৫০)

"মহাযোগী স তু বলির্বভূব নৃপতিঃ পুরা।
পুত্রানুৎপাদয়া মাস পঞ্চবংশ করাণ ভুবি ॥
অঙ্গ প্রথমতো যজ্ঞে বঙ্গ সুহ্ম স্তথৈবচ।
পুণ্ড্র কলিঙ্গশ্চ তথা বালেয়ং ক্ষত্রমুচ্যতে ॥"

(হরিবংশ ৩১।৩৩—৩৪)

ভারত ও হরিবংশ মধ্যে বালেয় ক্ষত্রিয় পঞ্চের বিবরণ দেখিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে যে, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামক বালেয় ক্ষত্রিয়গণ এক ক্ষত্রিয় বংশের বিভিন্ন শাখা মাত্র, এবং তাঁহারা প্রথমে

যে যে ভূভাগ শাসন করিতেন, সেই সেই ভূভাগ তাঁহাদের নামানুসারে বিখ্যাত হয়।

'পুণ্ড্র' প্রথমে এক জন ক্ষত্রিয়ের নাম ছিল, তাঁহার শাসিত রাজ্য 'পুণ্ড্র-দেশ' নামে খ্যাত হয়, এবং তদ্দেশবাসী ক্ষত্রিয়গণ পুণ্ড্রক্ষত্রিয় নামে পরিচিত হয়।

পুণ্ড্রী বা পুণ্ডরী জনপদবাসীর সাধারণ উপাধি

পুণ্ড্রদেশের অপর সাধারণ জনগণ, পুণ্ড্র-দেশবাসী বা পুণ্ড্রজনপদবাসী বলিয়া উক্ত হইতে পারে। এই হিসাবে মিথিলার জনগণকে মৈথিলী, উৎকলের অধিবাসীকে উৎকলী, বঙ্গের অধিবাসীদিগকে বাঙ্গালী বলা হয়। সুতরাং পুণ্ড্রদেশের সাধারণ জনগণকে সমষ্টিগত ভাবে 'পুণ্ড্রী' বা 'পুণ্ডরী' বলাও যাইতে পারে।

এই হিসাবে 'পুণ্ড্র' একব্যক্তির নাম, জনপদের নাম এবং জনপদবাসীর নামও হইতে পারে; পুণ্ড্রের বংশধরগণ পুণ্ড্রবংশ বা পুণ্ড্রক্ষত্রিয়, তাঁহাদের বাসভূমি পুণ্ড্রদেশ বা পুণ্ড্ররাজ্য।

পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি

কালক্রমে পুণ্ড্রদেশ 'ভুক্তি' রূপেও খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। পাল ও সেন রাজগণের সময়ের তাম্রশাসন-পট্টে পুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির উল্লেখ দৃষ্টে ইহাই মনে হয়। 'গৌড়' নগর পুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির সীমা মধ্যে ছিল। বিক্রমপুর পর্য্যন্ত একদা পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যান্তঃপাতী ছিল।

পুণ্ড্র শব্দের ব্যুৎপত্তি গত অর্থ তাহা হইলে হইতেছে—পুণ্ড্রদেশ, পুণ্ড্র নামক ক্ষত্রিয় বংশ এবং জনপদগত সাধারণ উপাধি।

পুণ্ড্রক—পুণ্ড্র

'পুণ্ড্র' ও 'পুণ্ড্রক অর্থে তিলক, সম্প্রদায়গত বিভিন্ন প্রকার 'পুণ্ড্রক' দৃষ্ট হয়। তিলকের বর্ণ ও চিত্র দর্শনে, পুণ্ড্রকধারী কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, তাহা অতি সহজেই অবগত হওয়া যায়।

উর্দ্ধ পুণ্ড্র, ত্রিপুণ্ড্র ইত্যাদি তিলকে নাম দৃষ্ট হয়। তিলকধারী ব্যক্তিকে পুণ্ড্রক বা পৌণ্ড্রক বলা যায়।

পুণ্ড্র জাতি এই প্রকারের কোন বিশিষ্ট ধরণের 'পুণ্ড্র' ললাটে অঙ্কিত করিত কি না বলা যায় না। প্রাচীন কালে 'তিলক-ব্যবচ্ছেদ' বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইত। চৌষট্টি বিদ্যার মধ্যে ইহা অন্যতম। অতি প্রাচীন কালে প্রথমে শোভার জন্য তিলক ধারণ করা হইত।

পুণ্ডরীক

অর্থে পদ্মকে বুঝায়। পুণ্ড্রদেশজাত পদ্মকে পুণ্ডরীক বলিত কি না বলা যায় না। পুণ্ডরীক পুষ্পপত্রের আকারের তিলককে প্রথমে 'পুণ্ড্র' বা 'পুণ্ড্রক' বলিত কি না তাহাও বলা যায় না।

পুণ্ডরীকাক্ষ

পদ্ম-পুষ্প-পত্রের ন্যায় যাহার অক্ষ বা চক্ষু। ভগবান বিষ্ণুর একটি নাম।

পুণ্ড্র-ইক্ষু বা পুণ্ড্রেক্ষু

পুণ্ড্রদেশজাত ইক্ষু, চলিত কথায় 'পুঁড়ী-আক' বলে। ইহা দ্বারা মনে হয় পুণ্ড্র দেশে প্রাচীন কালে এক জাতীয় ইক্ষুর কৃষি ছিল।

বৈশ্বামিত্র পুণ্ড্র—দস্যু

বিশ্বামিত্রের এক শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পঞ্চাশটির বংশধরগণ 'অন্ত্যজ' হইয়াছিল ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ইহার বৃত্তান্ত আছে।

নন্দিনীফেণজ পৌণ্ড্র—ম্লেচ্ছ

ঋষি বিশ্বামিত্রের নন্দিনী গাভী ছিল, সেই গাভীর ফেণ হইতে পৌণ্ড্র—ম্লেচ্ছের উৎপত্তি হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

-০❀০-

পুণ্ড্র জাতির বিভিন্ন কেন্দ্র

কালক্রমে পুণ্ড্রদেশ কখন আকারে বৃহৎ কখন বা ক্ষুদ্র হইয়াছিল। কাল সহকারে পুণ্ড্রান্ত ভূভাগ বিভিন্ন রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত হইয়া বিভিন্ন শাসনে শাসিত হইয়াছে।

পুণ্ড্র জাতির জনসংখ্যা বৃদ্ধি হেতু বা বিবিধ কারণে পুণ্ড্র জনপদের বহির্ভাগে পুণ্ড্রগণকে বসবাসে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। এই প্রকার বিভিন্ন রাষ্ট্রে বাস নিবন্ধন পুণ্ড্র জাতির নামান্তর গ্রহণ বিচিত্র নহে। বংশ পরম্পরায় তাহারা তাহাদের আদি স্থানের নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে।

কাল সহকারে মূল কেন্দ্র হইতে এবং স্বজাতিগণের মূল সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিবিধ উপায়ে জীবন যাপন ব্যপদেশে তাহাদের জাতীয় ভাবের পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে।

ভারতের বহু ধর্ম্মের উত্থান পতনের মধ্য দিয়া এই জাতি মূল ধর্ম্ম কাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন যে হইয়াছিল, তাহার আর সন্দেহ মাত্র নাই। পুণ্ড্র জাতির আদি বৈদিক ধর্ম্ম কাল সহায়ে ভারতের অপরাপর জাতির ন্যায় ম্লান হইয়াও গিয়াছে।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাস নিবন্ধন তাহাদের জাতীয় ভাষা পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছে। ভাষার ক্রম পরিবর্ত্তন কালসহকারে হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত সত্য। একই জাতিকে এই কারণে বিভিন্ন কথিত ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে শুনা যায়। পুণ্ড্রজাতিও এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া বিভিন্ন ভাষা ভাষী হইয়াছে। বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলাবাসী পুণ্ড্রগণ এই কারণে তত্তৎ জেলায় কথিত ভাষায় অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

বিভিন্ন স্থানে বাস নিবন্ধন তত্তৎ জেলার রীতিনীতি, আচারব্যবহার হাবভাব তাহাদের মধ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া, বিভিন্ন সমাজের গঠন করিয়াছে। মূল সমাজ বন্ধন হইতে এই কারণে তাহারা পৃথক পৃথক হইয়া, বসবাস করিতেছে।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম শাসনকালে সমাজ বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতে আরম্ভ করে। পরবর্ত্তী কালে হিন্দু, মোসলেম ও ইংরাজ শাসনের ফলে সমাজের মধ্যে যে সাড়া পড়ে, তাহারই ফল বর্ত্তমান কালে উপলব্ধি হইতেছে।

বর্ত্তমান কালে পুণ্ডরী সমাজশাসন, সম্ভবতঃ এই কারণে বিভিন্ন কেন্দ্রের সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং পুণ্ড্র সমাজ, বিভিন্ন স্থানে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিতাকারে বিদ্যমান রহিয়াছে দৃষ্ট হইবে।

মূল বৈদিক ধর্ম্ম যদ্রূপ সকল সমাজেই কালক্রমে পরিবর্ত্তিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইয়া বহু উপধর্ম্মের কুক্ষিগত হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে, পুণ্ড্র সমাজের ধর্ম্মও তদ্রূপ

পরিবর্ত্তিত হইয়া বিবিধ ধর্ম্মাচরণের মিশ্রণে নূতনত্ব লাভ করিয়াছে।

যে কারণে মৌলিক জাতির বিবিধ শাখার মধ্যে বিভিন্ন দেশাচার কুলাচার ও ধর্ম্মাচরণের সমাবেশ দ্বারা এবং বৃত্তি জনিত কর্ম্ম দ্বারা অভিনব রূপ ধারণ করিয়াছে, সেই কারণ নিচয় এই জাতির মধ্যে বর্ত্তমান থাকা নিতান্ত সম্ভব।

একই জাতিকে বিভিন্ন ভূভাগে বাসনিবন্ধন যেমন সেই সেই দেশের অধিবাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় এবং সেই সেই দেশবাসীর পরিচয়ার্থ যে উপাধি বিশিষ্ট হইয়া থাকে। পুণ্ড্রজাতিও সেই একই কারণে বিভিন্ন দেশোপাধি দ্বারা উপাধি বিশিষ্ট হইয়াছে।

রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বঙ্গজ, উৎকলী প্রভৃতি আখ্যা তত্তৎ দেশে বাস নিবন্ধনই হইয়া থাকে। মূলে তাহাদের জাতিগত ঐক্য ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে বিদ্যমান রহিয়া যায়।

রাঢ়ী বারেন্দ্র প্রভৃতি বিভাগ স্থানগত, জাতিগত নহে। জাতি এক হইলেও দেশজ উপাধি দ্বারা তাহাদিগকে পৃথক বলিয়া বোধ হয়। কালক্রমে একই জাতীয় সমাজ, দেশ ভেদে পৃথক সমাজ মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়ে, এবং এক এক সমাজের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া বিবেচিত হয়।

রাঢ়ীয় সমাজ, বারেন্দ্র বা উৎকলী সমাজের সহিত, কালক্রমে, দেশক্রমে, পৃথক হইয়াছে বলিয়া, উক্ত সমাজগুলির মধ্যে ছোট বড় ভাব জাগিয়া উঠে। সমাজে সমাজে একতার চিহ্ন আদৌ পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু তাহারা যে আদিতে একজাতি এক ধর্ম্মী ও এক সমাজে অবস্থান করিত, তাহা তাহারা ভুলিয়া গিয়া পৃথক জাতি বলিয়াই বিবেচনা করে।

এই প্রকারে একই জাতির বিভিন্ন সমাজের গঠন করিয়া পৃথক পৃথক বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থান করে, এবং পরস্পরের মধ্যে কোন প্রকার সামাজিক ব্যবহারে বঞ্চিত হইয়া, ক্ষুদ্র বেষ্টনীর দ্বারা আবদ্ধ হইয়া জাতীয় শক্তির খর্ব্বতা সাধন করে।

এই প্রকারে পুণ্ড্রদেশবাসী পুণ্ড্রগণ, কাল সহকারে বিভিন্ন পৃথক সমাজের বিকাশ দ্বারা জাতীয় একতার বল খর্ব্ব করিয়া ফেলিয়াছে, এবং এই উপায়ে পুণ্ড্রজাতির বিভিন্ন সমাজ গঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে বিভিন্ন পুণ্ড্র-সমাজের মধ্যে আদৌ সহানুভূতি পরিলক্ষিত হইতেছে না। তাহারা যেন পৃথক পৃথক জাতিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

প্রত্যেক সমাজগত পুণ্ড্রগণ, আপন আপন সমাজ যে অন্য সমাজ হইতে শ্রেষ্ঠ তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্ম, নীতি, রীতি ও আচারগত ভাবে সমাজগুলি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিলেও তাহারা আপন আপন সমাজে যে শ্রেষ্ঠ ইহা মানিয়া লইতে হয়। তাহা না করিলে তাহাদের মৌলিকত্ব রক্ষা হইতেই পারে না।

এ সমাজ বড় বা কুলীন ও সমাজ ছোট বা অকুলীন বোধ করা কোন সামাজিকের উচিত নহে। আপন আপন সমাজে ছোট বড় ভাব কার্য্য কারণ দ্বারা বিধিবদ্ধ হইতে পারে কিন্তু অমুক পুণ্ড্রসমাজ, অমুক পুণ্ড্রসমাজ হইতে নীচ বা উচ্চ ভাবা দোষাবহ। ইহাই জাতীয় মৌলিকতা প্রতিপন্ন করিবার একমাত্র অন্তরায়।

বাঙ্গালী পুণ্ড্রগণ মধ্যে বহু সমাজ-কেন্দ্র

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, উহা দেশের প্রকৃতিজাত। মূল জাতিগত নহে। সমাজে সমাজে বিবাহ বা ভক্ষ্য ভোজ্যের সংশ্রব না রাখিলে বিশেষ কোন ক্ষতি মুখ্যভাবে উপলব্ধি না হইতেও পারে কিন্তু গৌণভাবে যে বিশেষ ক্ষতি তাহা বিবেচনা করা যায়।

যাহাই হউক এক পুণ্ড্রজাতির এক সমাজ যে বহুধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছে—তাহা অবগত হওয়া যায়। বহুকাল হইতে তাহারা সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া একেবারে নূতন হইয়া পড়িয়াছে। পরস্পর সমাজগত জনগণ, যে এক জাতি এবং একই জাতির অভিব্যক্তি মূলে উদ্বর্দ্ধিত হইয়া পৃথক হইয়া পড়িয়াছে ইহাও স্বীকার করিতে চাহে না।

"অসৌহি ব্রাত্যক্ষত্রিয়ঃ ক্রমাদ্দেশান্তরং গতঃ।
রাঢ়ে বঙ্গে ক্রমেনৈব দক্ষিণে রাঢ় এব চ॥
ওড্রে চ স্থানভেদেতু ভিন্নাখ্যাঃ পরিকীর্ত্তাতে।
এতেষাঞ্চ সুতা যে যে তেঽপি তদ্দেশ
সংজ্ঞকাঃ॥"
(কুলতন্ত্র)

স্থানভেদে জাতীয় সমাজের আখ্যালাভ

এই মতটি যতই আধুনিক হউক না কেন, ইহার মূলে প্রভূত সত্য বিদ্যমান রহিয়াছে। এই প্রকার ভিন্ন স্থানে বাস নিবন্ধন যে ভিন্নাখ্যা লাভ হইয়া থাকে তাহা ধ্রুব।

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, বৈশ্যেতর সকল জাতির মধ্যে স্থান ভেদে বাস নিবন্ধন বিভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার প্রমাণাভাব আদৌ নাই এবং সংস্কৃত বচনও আছে।

ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, এক জাতির সংজ্ঞাভেদ দেশ জনিত, জাতি নিবন্ধন নহে।

অপরাপর হিন্দু জাতীয় সমাজের ন্যায় পুণ্ড্র জাতিরও দেশভেদে বাসনিবন্ধন বিভিন্ন আখ্যালাভ হইয়াছে। জাতীয় অনৈক্যের কোন কারণ নাই।

পুণ্ড্রজাতির চারিটি সমাজ

"দক্ষিণোত্তর রাঢ়ীয়ৌ বঙ্গজ শ্চৌড্র ত্রবহি।
শ্রেণী চতুষ্টয় স্ত্বেতে পৌড্র জাতি সমুচ্যতে॥"
(কুলতন্ত্র)

দক্ষিণরাঢ়ী, উত্তররাঢ়ী, বঙ্গজ ও ওড্রভেদে চারি সমাজের পুণ্ড্রজাতি দৃষ্ট হয়।

'কুলতন্ত্র' রচনার কালে পুণ্ড্রজাতির এই প্রকার চারি শ্রেণী ছিল, তাহা উপলব্ধি হইতেছে। এই বিভাগের দ্বারা দৃষ্ট হইবে একমাত্র রাঢ় দেশেই—উত্তর এবং দক্ষিণ দুইটি বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে।

রাঢ়বাসী পৌণ্ড্রগণ উত্তররাঢ়ে ও দক্ষিণ রাঢ়ে বাসনিবন্ধন দুইটি সমাজের গঠন করিয়াছে। বঙ্গজ সমাজ পূর্ব্ববঙ্গ বাসের ফল এবং উৎকলবাসী পুণ্ড্রগণ ওড্র সমাজের অন্তর্গত হইয়াছে।

রাঢ়ীশ্রেণী পুণ্ড্র

মহানন্দার ও ভাগীরথীর পশ্চিমভাগবাসী পুণ্ড্রগণ রাঢ়ীশ্রেণী পুণ্ড্র। কিন্তু রাঢ় আবার দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল—এই কারণে এক রাঢ়ীশ্রেণী পুণ্ড্র আবার উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ় ভেদে পৃথক হইয়া স্ব স্ব সমাজ গঠন করিয়াছিল।

উত্তর রাঢ়ী পুণ্ড্র সমাজ

মালদহের পশ্চিমাংশ, মুরসিদাবাদ, এবং বীরভূমির উত্তরাংশকে উত্তর রাঢ় বলিয়া ধরা চলে। সুতরাং ঐ তিন জেলার আদি পুণ্ড্র সমাজ উত্তর রাঢ়ীয় থাকের অন্তর্গত।

দক্ষিণ রাঢ়ী পুণ্ড্র সমাজ

দক্ষিণ বীরভূমি, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, নদীয়া, হাবড়া, হুগলী দক্ষিণ রাঢ় বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এই সকল জেলার পুণ্ড্রগণ দক্ষিণ রাঢ়ীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

উৎকলী বা ওড্র পুণ্ড্র সমাজ

উড়িষ্যা ও মেদিনীপুর অঞ্চলের পুণ্ড্রজাতি উৎকলী বা ওড্রসমাজ ভুক্ত হইবার যোগ্য।

বঙ্গজ পুণ্ড্র সমাজ

দিনাজপুর, রঙ্গপুর, পূর্ব্ব-মালদহ, রাজসাহী, যশোহর, ২৪ পরগণা লইয়া সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ ও বঙ্গজ পুণ্ড্রসমাজ গঠিত হইয়াছিল।

এই চারি পুণ্ড্রসমাজ মধ্যে তিনটি সমাজ বঙ্গীয় পুণ্ড্র বা বাঙ্গালী পুণ্ড্র বলিয়া বর্ত্তমানে খ্যাতি লাভ করিতে পারে। মেদিনীপুরের পুণ্ড্রসমাজ বর্ত্তমানে দক্ষিণ-বঙ্গের অন্তর্গত কিন্তু সম্ভবতঃ পূর্ব্বে উহা ওড্র পুণ্ড সমাজ মধ্যে ধরা হইয়া থাকিবে। কেবল ওড্র সমাজ বাঙ্গালা হইতে ভাষায় সম্পূর্ণ পৃথক।

উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিমবঙ্গবাসী এবং উৎকলবাসী পুণ্ড্রসমাজ

বর্ত্তমান কালে উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গ এবং উড়িষ্যা এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া পুণ্ড্রসমাজ নির্ণয় করা যাইতে পারে। কিন্তু কুলতন্ত্র মতে বোধ হইতেছে, পুণ্ড্রদেশবাসী পুণ্ড্রগণ ক্রমে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

বর্দ্ধমান পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভূক্তি ও ওড্রদেশবাসী পুণ্ড্র

ভূক্তি হিসাবে বিভাগ করিলে দৃষ্ট হইবে যে দক্ষিণ রাঢ় বর্দ্ধমান ভূক্তির অন্তর্গত। উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভূক্তির অন্তর্গত। তৎপরে ওড্র দেশান্তর্গত। এই হিসাবে পুণ্ড্রজাতির তিনটি বিভাগ দৃষ্ট হইবে।

পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভূক্তির অন্তর্গত পুণ্ড্রগণ আদি পুণ্ড্রদেশ ত্যাগ করিলেও কতক স্বীয় আদি ভূমিতে বাস করিতেছে। কতক বঙ্গজ সমাজ বঙ্গ সমাজেই রহিয়াছে। দক্ষিণরাঢ়ী বর্দ্ধমান ভূক্তিতে বাস করিতেছে। এবং উৎকলী পৃথকই রহিয়াছে।

উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ী পুণ্ড্রসমাজ এবং বঙ্গজ পুণ্ড্রসমাজ এখন বাঙ্গালা রহিয়াছে। কেবল ওড্রসমাজ সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় সমাজ মধ্যে বাস করিতেছে বলিয়া বাঙ্গালী-পুণ্ড্রগণের নিকট পৃথক বিবেচিত হইবে।

এই নিয়মে দৃষ্ট হইবে যে বর্ত্তমানে বাঙ্গালী ও উড়িয়া পুণ্ড্র নামে দুইটি বিভাগ রাষ্ট্র শাসনের ফলে গণিত হইতে পারে।

পুণ্ড্রবর্দ্ধনের সাময়িক কেন্দ্রভূমি মহাস্থান বর্ত্তমান বগুড়া জেলার অন্তর্গত; তথায় এখন পুণ্ড্রজাতি বাস করিতেছে। তাহারা পুণ্ড্রবর্দ্ধন ত্যাগ করে নাই। মালদহের ও রাজসাহীর পুণ্ড্রগণ এখন পুণ্ড্রদেশেই বাস করিতেছে বলিতে হইবে। রাঢ়বাসী পুণ্ড্রগণ বর্দ্ধমান ভূক্তির অধীন সুতরাং তাহারা আদিস্থান পুণ্ড্রদেশ ত্যাগ করিয়াছে। মেদিনীপুরের দক্ষিণাঞ্চলের এবং উড়িষ্যায় পুণ্ড্রগণ ওড্রবাসী ইহা স্বীকার করিতে হয়।

এই চারি শ্রেণী ব্যতীত আরও পুণ্ড্রজাতি ও পুণ্ড্রজনপদ আছে

এই উপায়ে আমরা কয়েকটি পুণ্ড্রজাতির কেন্দ্র স্থানের সন্ধান পাইলাম। কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণরাঢ়ী, বঙ্গজ এবং ওড্র-পুণ্ড্র নামক

চারি শ্রেণী ব্যতীত আরও কতিপয় পুণ্ড্র জাতির সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পুণ্ড্রদেশ বা পুণ্ড্রবর্দ্ধন ব্যতীত এই নামের স্বতন্ত্র জনপদ ছিল।

সেই সেই জনপদবাসীগণ পুণ্ড্রনামে খ্যাত ছিল। শাস্ত্রে বিভিন্ন জনপদ ও জনপদবাসী পুণ্ড্রের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বিশ্বকোষে পুণ্ড্রদেশের (পুণ্ড্রদেশের-পুণ্ড্রবর্দ্ধনের) যে সীমা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

পুণ্ড্র দেশের সীমা

"উত্তরে হিমালয় পাদমূল ও তিমিরদেশ, পূর্ব্বে প্রাগজ্যোতিষপুর প্রান্ত, দক্ষিণে বঙ্গ ও সমুদ্রকূল, পশ্চিমে বিহারান্ত ও কৌশিকী নাম্নী নদীর পূর্ব্বকূল", এই সীমা মধ্যস্থ ভূভাগ পুণ্ড্রদেশ বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন দেশ নামে একদা খ্যাত ছিল। এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড প্রথম পুণ্ড্র নরপতির সময়ের রাজ্যসীমা নহে।

ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মাণ্ড খণ্ডের পুণ্ড্রদেশ

ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মাণ্ড খণ্ডে লিখিত আছে "ভারতের পূর্ব্বাংশে পুণ্ড্রদেশ—সপ্তখণ্ডে বিভক্ত; যথা—গৌড় বরেন্দ্র, নিবৃত্তি, সুম্ভের নিকট বনসমাচ্ছন্ন বারিখণ্ড, বরাহভূমি, বর্দ্ধমান, এবং বিন্ধ্যাপাদস্থিত বিন্ধ্যপার্শ্ব।"

পুণ্ড্রদেশ এতদূর বিস্তীর্ণ ছিল কিনা তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ এখন উপস্থিত হয় নাই।

পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র প্রাচ্য জনপদ

"প্রাগ্ জ্যোতিষাশ্চ পৌণ্ড্রশ্চ
বিদেহাস্তাম্রলিপ্তকাঃ।
মালা মাগধ গোনন্দাঃ প্রাচ্যাং জনপদাঃ
স্মৃতাঃ॥"
(ত্রিকাণ্ড শেষ)

এই পৌণ্ড্র জনপদ পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে অভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র—পশ্চিমে অঙ্গ বা ভাগলপুর জেলা, পূর্ব্বে বঙ্গদেশ (ঢাকা মৈমনসিং জেলা), উত্তরে দিনাজপুরের কতকাংশ, মালদহ, রাজসাহী, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্দ্ধমানের কিয়দংশ। (বিশ্ব কোষ)

পৌণ্ড্রিক বা পৌণ্ড্রক

"পৌণ্ড্রিকাঃ কুক্কুরাশ্চৈব শকাশ্চৈব
বিশাম্পতে।
অঙ্গ বঙ্গাশ্চ পুণ্ড্রাশ্চ শাণবত্যা গয়াস্তথা॥"
ইত্যাদি (ভাঃ সভা ৫২।১৬)

পৌণ্ড্রিক বা পৌণ্ড্রক নামক দেশ কোথায় তাহার সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

বিশ্বকোষে লিখিত আছে—"দিনাজপুর ও রঙ্গপুরের উত্তরাংশ এবং হিমালয় প্রদেশের পূর্ব্বাংশে।" ইহার বিশিষ্ট কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তবে কুক্কুর, শক প্রভৃতির সহ উল্লিখিত হওয়াতে অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে এই মাত্র। ইহাতে বুঝিতে হয়—পৌণ্ড্রিক পুণ্ড্র দেশের উত্তরাংশ—উত্তর পুণ্ড্র বা পার্ব্বতীয় পুণ্ড্র

সুপুণ্ড্রক

"বঙ্গাঃ কলিঙ্গাঃ মগধা স্তাম্রলিপ্তাঃ সুপুণ্ড্রকাঃ
দৈবালিকাঃ সাগরকা পত্রোর্ণাঃ শৈশবাস্তথা॥"
(ভাঃ সভা ৫২।১৮)

বিশ্বকোষ বলেন—"সুপুণ্ড্রক (দক্ষিণ পুণ্ড্র) বর্দ্ধমানের দক্ষিণাংশে জঙ্গল-মহল ও মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশ।" ইহারও ঠিক প্রমাণ নাই।

পুণ্ড্রবর্দ্ধনই ঐতিহাসিক দেশ

পূর্ব্ব বর্ণিত ত্রি-পুণ্ড্র জাতি বা দেশের ইতিহাস পৃথক ভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ঐ সকল পৌরাণিক পুণ্ড্র দেশের মধ্যে পুণ্ড্রবর্দ্ধনই ঐতিহাসিক দেশ ও নগর।

কাশপৌণ্ড্র

"কোশলাঃ কাশপৌণ্ড্রশ্চ কলিঙ্গা মগধাস্তথা।"
(ভাঃ কর্ণ পর্ব্ব ৪৬ অঃ)

বিশ্বকোষ বলেন—"কাশ প্রধান পৌণ্ড্র। জনপদ বিশেষ।"

'কাশ পৌণ্ড্র' শব্দ স্থানান্তরে কাশ ও পৌণ্ড্র শব্দ পৃথক পৃথক দুইটি জনপদ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কাশ প্রধান পুণ্ড্র বুঝাও যাইতে পারে, যথায় কাশ তৃণ পর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হইত। তাহা হইলেও ইহা পুণ্ড্র দেশান্তর্গতই হইতেছে।

পুণ্ড্রী ও পুণ্ড্রক নগর

থানেশ্বর, কুরুক্ষেত্র, কর্ণাল ও আম্বালা প্রভৃতি স্থানে যে সকল পুন্দীর রাজপুত পূর্ব্বে বাস করিত, এখন তাহারা পঞ্জাব শ্রেণীর পুন্দীর নামে অভিহিত। পুণ্ড্রী, রস্তা, হাব্রী ও পুণ্ড্রক নগর তাহাদের অধিকারভুক্ত ছিল।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে প্রায় ছাপ্পান্ন হাজার পুন্দীর রাজপুতের বাস আছে, তন্মধ্যে প্রায় সাতাইশ হাজার ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।

পাণ্ড্রেথান নগর

বিশ্বকোষে 'পুরাণাধিষ্ঠান' শব্দার্থে লিখিত আছে ইহা কাশ্মীর রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী, তথায় 'পাণ্ড্রেথান' নামক নগর।

পাণ্ড্য দেশ

বৃহৎ সংহিতায় এই দেশ দক্ষিণ দিকে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পাণ্ড্য ঐতিহাসিক দেশ। এখন দাক্ষিণাত্যে বিদ্যমান রহিয়াছে।

ভারতবর্ষে এই সকল পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রানুরূপ দেশ বা নগরের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পুণ্ড্রদেশ বা পুণ্ড্রবর্দ্ধন সর্ব্বপরিচিত ঐতিহাসিক স্থান।

পুণ্ড্রবর্দ্ধনীয়া

জৈন ষষ্ঠ শ্রুত কেবলী ভদ্রবাহু ৩৫৭ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে নির্ব্বাণ লাভ করেন। তিনি মগধাধিপতি চন্দ্রগুপ্তের সময় জীবিত ছিলেন। তিনি জৈনগণের মধ্যে চারিটি শ্রেণী বিভাগ করেন। তন্মধ্যে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের জৈনগণ বা জৈনসমাজ কে

পুণ্ড্রবর্দ্ধনীয়া জৈন শ্রেণী

মধ্যে গণ্য করা হইয়াছিল। এই দেশের জৈনগণ 'পুণ্ড্রবর্দ্ধনীয়' নামে খ্যাত হয়। সকল জাতীয় লোকই এই সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিল। জৈনগণকে হিন্দুরা 'পাষণ্ডী' বলিত। হিন্দুসমাজ তাহাদিগকে বিধর্ম্মী বলিত এবং ঘৃণাও করিত। দেবকোট জৈনগণের তীর্থস্থান। দেবকোটের প্রাচীন নাম 'কোটিকপুর।'

পুণ্ড্র বৌদ্ধ

অশোকের রাজত্বকালে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে স্তূপ, বিহার, সঙ্ঘারাম প্রভৃতি নির্ম্মাণ হয়। অশোকের আত্মীয়গণ এই দেশ শাসন করিতেন। জৈন জম্বুস্বামী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে ধর্ম্মপ্রচার করিতেন। ৪৬৩ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে দেবকোটেই নির্ব্বাণলাভ করেন। বুদ্ধদেব তাঁহার সময়ে পুণ্ড্রদেশে তিন মাস ধর্ম্মপ্রচার করিয়া ভ্রমণ করিলে জম্বুস্বামী জৈনধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন।

৪৩৩ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিবেশী পুণ্ড্রদেশের পদ্মরথ (দেবকোটের রাজা) নামক রাজার রাজত্বকালে শ্রুত কেবলী ভদ্রবাহু, মন্ত্রী সোমশর্ম্মার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতার নাম সোমশ্রী। তিনি এদেশে জৈনধর্ম্ম প্রচার করিতেন।

জম্বুস্বামীর পর শ্রুত কেবলী ভদ্রবাহু জৈন ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। অশোক যখন

পুণ্ড্রদেশে আগমন করেন সেই সময়ে বুদ্ধদেব যে স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন তথায় স্তূপ, সঙ্ঘারাম, বিহার নির্ম্মাণ করেন। বুদ্ধ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৩৩২ সালে দেহত্যাগ করেন।

এই সময়ে পুণ্ড্রদেশে বৌদ্ধ প্রভাব পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। পুণ্ড্রবর্দ্ধনীয় জৈন-শ্রেণী তখনও বিদ্যমান ছিল এবং 'পুণ্ড্র-বর্দ্ধন বৌদ্ধ'গণও প্রবল হয়।

পুণ্ড্রবর্দ্ধনের 'পুণ্ড্রার্ক সৌর' সম্প্রদায়

শাকদ্বীপীয় মগদ্বিজগণ পূর্ব্বকালে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। পারস্য দেশকে শাকদ্বীপ বলিত। তথায় ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ ছিল। তাঁহাদের সহিত যে চতুর্থবর্ণ এতদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে 'মন্দগ শূদ্র' বলিত তাহারা

"সবিতুঃ পরিচারকাঃ"

নামে খ্যাত হয়। ব্রাহ্মণগণকে 'শাকল ব্রাহ্মণ' বলিত। আমরা দেখিতে পাই শাকদ্বীপিগণের মধ্যে চতুর্ব্বিংশতি অর, দ্বাদশ মণ্ডল ও সপ্ত অর্ক ভেদে কালক্রমে শ্রেণী বিভাগ হইয়াছিল। 'গৌড়ীয়াশ্চোৎকলা' সকলেই তাঁহাদের প্রশংসা করিত। গৌড় দেশে ইহাঁরা আচার্য্য নামে খ্যাত ছিলেন। 'মন্দক'গণও এদেশে বাস করিতেন।

পুণ্ড্রার্ক

পুণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্তর্গত বিখ্যাত মন্দিরে (বর্ত্তমানে সূর্য্যপুরের কাঠাম) যে সূর্য্য মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাহা 'পুণ্ড্রার্ক নামে বিখ্যাত ছিল।

সপ্তার্ক—পুণ্ড্রার্ক

"উল্লঃ পুণ্ড্রো, মার্কণ্ডেয়, বালো, লোলঃ
বোণশ্চনাঃ।
শাকদ্বীপী ক্ষোণী দেবৈঃ সপ্তাবন্যাং
পূজ্যাশ্চার্কাঃ॥"

কৃষ্ণদাসের মগব্যক্তিতে পুণ্ড্রার্ক ও পুণ্ডরীকার্কের

প্রসঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উড়িষ্যার 'কোণার্ক' শাখা কর্ত্তৃক কোণার্ক (কনরক) সৌরমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। কোনার্ক মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই পুণ্ড্রদেশে

পুণ্ড্রার্ক বা পুণ্ডরীকার্ক

নামক সূর্য্য মূর্ত্তি সম্বলিত সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। পুণ্ড্রদেশের সূর্য্য মূর্ত্তি সপ্তার্কগণের এক শাখা—'পুণ্ড্রো' সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। পুণ্ড্রদেশ বাসী সৌর-গণ 'পুণ্ডরীকার্ক' শাখার অন্তর্গত।

বর্ত্তমান কালেও মালদহের পুণ্ড্র বা পুণ্ডরী জাতিকে পুণ্ড্রার্কের উপাসনা করিতে দৃষ্ট হয়। সূর্য্য পূজা ও সূর্য্য পূজার সামগ্রী গৌড়ীয় আচার্য্যগণের প্রাপ্য অন্য কোন ব্রাহ্মণের ইহাতে অধিকার নাই। বর্ত্তমানে এই প্রথা বিদ্যমান নাই।

মগদ্বিজ ও মন্দগ শূদ্র এদেশে ছিল। তাহারা পুণ্ড্রার্ক শাখার অন্তর্গত। এদেশের চতুর্ব্বর্ণও পুণ্ডরীকার্কের মত গ্রহণ করেন। এদেশে ছোট বড় বহু সূর্য্যমূর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। মাধাইপুরের সূর্য্য মূর্ত্তি ধর্ম্মরাজ বলিয়া পূজা পাইয়া থাকেন।

সূর্য্যমূর্ত্তিগুলি পাদুকা (হাণ্টিংবুটপরা) মগ ব্রাহ্মণ ও মন্দগগণের মূর্ত্তিও তাহাতে আছে—তাহাদের দীর্ঘ দাড়ী, মস্তকে গম্বুজা-কার টুপী পরান রহিয়াছে দেখায়। এই সকল মূর্ত্তির উপাসকদিগকে পুণ্ডরীকার্কের শাখা মধ্যে গণ্য করা যায়।

এই পুণ্ড্রার্ক ও পুণ্ডরীকার্কের সহিত পুণ্ড্র বা পুণ্ডরীজাতির কোন সম্বন্ধ আছে কি না বলা যায় না। মাঘ মাসের রবিবারে এই পুণ্ডরীকার্কের উৎসব হয়। সুলতান হোসেনশাহী আমলের গুণরাজ খান বিরচিত 'সূর্য্যের ব্রত কথা' নামক পুথি এদেশের প্রধান সূর্য্য ব্রত কথার পুথি। মালদহে এই পুথি যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়। মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতির সংগৃহীত কয়েকখানি গুণরাজের পুথি আছে।

পুণ্ড্র বা পুণ্ডরীগণ ঐ প্রাচীন কাল হইতে পুণ্ডরীকার্কের পূজা করিয়া আসিতেছে। তাহারা ঐ সময়ে সৌরমত গ্রহণ করিয়াছিল বুঝা যায়। এক সময়ে মগদ্বিজগণের সহিত গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ বৈবাহিক সম্বন্ধে লিপ্ত ছিলেন দেখা যায়। সেই সময়ে সম্ভবতঃ 'মন্দগ' সূর্য্য পরিচারকগণ এদেশে বাস করেন।

পৌণ্ড্রক বাসুদেব বংশ
বাসুদেব পুণ্ড্র

হরিবংশানুসারে বাসুদেবের পিতার নাম বসুদেব। বসুদেবের দুই পত্নী ছিলেন। একজনের নাম 'সুতনু' অপরের নাম 'নারাচী'। সুতনু বাসুদেবের জননী, কপিল নারাচীর পুত্র। কপিল সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করেন। দেবকী নামক পট্টমহিষীর গর্ভে শ্রীবাসুদেব কৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করেন।

কেহ কেহ বলেন বর্ত্তমান খুলনা জেলায় যে কপিলমুনি গ্রাম আছে, যেখানে কপিলমুনির মেলা হয়, সেই স্থানে কপিলেশ্বরী কালীও আছেন। তথায় বাসুদেবের ভ্রাতা কপিলের আশ্রম ছিল।

কিন্তু খুলনা তখন সাগর গর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছিল কি না সন্দেহ। যদি ইহাই সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে বাসুদেবের এক ভ্রাতা তৎকালে খুলনা জেলায় অবস্থান করিতেন। তাঁহার যে শিষ্য ছিল ইহাও সম্ভবপর।

এই সময়ে বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কিরাত রাজ্যের অধিপতি পৌণ্ড্রকরাজ জরাসন্ধের সহিত সখ্যতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। মগধের রাজধানী রাজগৃহে তখন জরাসন্ধ সার্ব্বভৌম নরপতি। কামরূপে নরক, মথুরায় কংস নিষাদরাজ একলব্য সহ তখন মিলিত বল। (মহাভারত সভাপর্ব্ব)

বাসুদেব পৌণ্ড্রক দ্বারাবতী অবরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেনাগণের মধ্যে পুণ্ড্রদেশবাসী সকল ক্ষত্রিয়ই ছিল। এই সময় বঙ্গ-পুণ্ড্র-কিরাত রাজ্যত্রয় মিলিত পৌণ্ড্রক দেশে বা পুণ্ড্ররাষ্ট্রে পরিণত হয়।

দেখা যাইতেছে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"পূর্ব্বে আমি তাহাকে নিহত করি নাই বলিয়াই সে মগধ রাজের আশ্রয় লইয়াছে।" (ঐ)

পৌণ্ড্রক বাসুদেবের সময়—'বঙ্গ পুণ্ড্র ও কিরাত' এই তিনটি রাজ্য একত্র হইয়া 'পুণ্ড্র-রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সময়ে রাষ্ট্র কেন্দ্র 'পুণ্ড্রবর্দ্ধন' (?) হইতে পৌণ্ড্রক বাসুদেব পক্ষীয় কর্ম্মচারিগণ তত্তৎ দেশে বাস করিয়া থাকিবে, এবং বঙ্গপুণ্ড্রের বানেয় ক্ষত্রিয় শাখায় বিদ্যমান ছিল।

পৌণ্ড্রক বাসুদেবের পক্ষে যাহারা কৃষ্ণদ্বেষী হইয়া দ্বারাবতী পুরী অবরোধ করিতে গিয়াছিল তাহারা যে কৃষ্ণপক্ষের নিকট নিন্দনীয় হইয়াছিল তাহা অক্লেশে বুঝা যায়।

শ্রীকৃষ্ণের মাতুল মথুরাধিপতি কংস যিনি মগধরাজ জরাসন্ধের জামাতা (অস্তি ও প্রাপ্তী নামক দুই জরাসন্ধ কন্যাকে বিবাহ করেন) পুরাণে 'কংশাসুর নামে খ্যাত।

কৃষ্ণদ্বেষী বলিয়া কংস অসুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চেদীপতি শিশুপালও জরাসন্ধ মিলিত-বলের অন্তর্গত ছিলেন। জরাসন্ধও রাজদ্রোহী অসুর ছিলেন। অথচ তাঁহারা ব্রাহ্মণ বিরহিত সংস্কার বর্জ্জিত ছিলেন না।

পুণ্ড্র বঙ্গ কিরাতবাসী পুণ্ড্ররাষ্ট্রের নরগণ কৃষ্ণদ্বেষী বলিয়া অসুরাখ্যা পাইয়া থাকিবে। দ্বারাবতী যুদ্ধ ক্ষেত্রে পৌণ্ড্রক বাসুদেব নিহত হয়েন এবং এই রাষ্ট্র দ্বারকার শাসনাধীন হইয়া পড়ে।

কথিত আছে বলদেব স্বর্ণবিন্দুখচিত বঙ্গদেশনির্ম্মিত গদা ব্যবহার করিতেন। এই সময়ে বঙ্গদেশের লৌহশিল্প উন্নত ছিল। বলদেব পুণ্ড্রদেশে করতোয়াতীরে মহাস্থান নামক নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

বাসুদেবপৌণ্ড্রক নিহত হইলে সৈন্যগণ কতক নিহত ও কতক দিগ্বিদিকে পলায়ন করে।

বৃষ্ণিবংশীয় ক্ষত্রিয়গণও সম্ভবতঃ মহাস্থানে বাস করিয়া থাকিবেন। অনেকে বলেন মালদহের গঙ্গাতীরের রামকেলী গ্রাম বলরাম কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাসুদেব পৌণ্ড্রকবংশ বহুকাল পুণ্ড্রদেশ শাসন করিয়া থাকিবেন। পুরাণাদিতে বাসুদেব পৌণ্ড্রকবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের কোন উল্লেখ নাই। যেমন পুণ্ড্র বানেয় ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের এইটি বাসস্থান ছিল, তদ্রূপ বাসুদেব ক্ষত্রিয়গণের পরবর্ত্তী কালের কোন ইতিহাস শ্রুত হওয়া যায় না। অনুমান দ্বারা বাসুদেব ক্ষত্রিয়বংশের অস্তিত্বের কথা বলা যায় মাত্র। সুতরাং বাসুদেব ক্ষত্রিয়গণের বিবরণ পৌরাণিক ভিত্তির অনুমান মাত্র, এবং অস্তিত্বও সম্ভব!

করতোয়া বা বাহুদা নদীতীরে শঙ্খ ও লিখিত নামে দুই ভাই ঋষিরূপে অবস্থান করিতে। তাঁহাদের লিখিত সংহিতা শাস্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে—তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র রচয়িতা ছিলেন।

করতোয়া প্লাবনে কূর্ম্মপৃষ্ঠাকার পুণ্ড্রদেশ তৎকালে প্লাবিত হইত। স্কন্দ পুরাণে করতোয়া মাহাত্ম্যে একথা লিখিত আছে। স্কন্দ গোবিন্দের মূর্ত্তি এই দেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কাশ্মীর রাজতরঙ্গিনীতে কার্ত্তিকেয় মন্দিরের প্রসঙ্গ আছে। পৌণ্ড্রগণ স্কন্দ গোবিন্দের উপাসনা করিত।

এই যুগের পরবর্ত্তী যুগের কোন ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

পদ্য রাজ (পোদ)

(পদ্ম জাতি)

"করিয়া চত্বর বসাল নগর
রাজার বসত বাটী॥
করিয়া আসন গাড়িয়া নিশান
সম্মানে বসাল পদ্য। * * (পদ্ম ?)
সুধর্ম্ম মণ্ডিত বিধর্ম্ম খণ্ডিত
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বৈদ্য॥"

(ধর্ম্ম মঙ্গল)

"সম্মানে বসাল পদ্য"—শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের এই 'পদ্য' জাতিকে 'পদ্যরাজ' বলিয়া এবং ঐ পদ্যরাজই চব্বিশপরগণাবাসী 'পোদ' জাতি বলিয়া অনেকে মনে করেন। বাস্তবিক 'পদ্য' জাতি বাচক শব্দ নহে, অর্থবাচক—পুণ্ডরী

* * . 'পদ্য' শব্দ ধর্ম্মমঙ্গলকার জাতিবাচকভাবে ব্যবহার করিলেও 'পদ্য' নামে সে সময়ে কোন জাতি ছিল না—'পুণ্ডরী' শব্দ স্থানে. পদ্যের মিলনার্থ 'পদ্য' লিখিত হইয়াছে। মূল পুস্তকে 'পদ্য' ছিল। পুণ্ডরীক অর্থ পদ্ম। 'পুণ্ডরী' জাতিকে পুণ্ডরী অর্থাৎ পদ্ম অর্থে লিখিত হইয়াছে।

অর্থে পদ্ম, এই পদ্মকে মুদ্রাকর প্রমাদে 'পদ্য' করিয়াছে। মূল হস্তলিখিত পুস্তকে 'পদ্ম' আছে। পুণ্ডরীক পদ্মহইতে পদ্য হইয়াছে।

'পদ্য জাতি' যে পোদ এবং পদ্যের অপভ্রংশে 'পোদ' হইয়াছে, ইহা সহজেই অনুমান করা চলে। পদ্ম (পুণ্ডরীক) নামের অপভ্রংশে পদ্য বা পোদ হইয়াছে।

আমি ব্যক্তিগতভাবে গোপালনগর, চেতলা, টালিগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলের পদ্য-রাজগণের সহিত অবস্থান কালে উক্ত জাতির সহিত বিশেষরূপে পরিচিত হইয়াছিলাম।

আমার বাল্যবন্ধু ও সহপাঠীগণের মধ্যে অনেকেই পদ্যরাজ ছিলেন। আলিপুর গোপালনগরের মাইনর স্কুলটির সম্পাদক স্বয়ং পদ্যরাজ জাতীয় ছিলেন। উক্ত বিদ্যালয়ের-সম্পাদকের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত দাস মহাশয় আমার সেই সময়ের সহপাঠী ছিলেন।

গোপালনগর একটি বিশিষ্ট 'পদ্য-রাজ' সমাজ। আমি ঐ সমাজের আচারব্যবহার, রীতিনীতি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অবগত আছি।

চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত নাজরা, উখ্‌ড়ি, নৈনান, একতারা, ঘটকপুর প্রভৃতি গ্রামে বিস্তর সম্ভ্রান্ত পদ্যজাতির বাস দৃষ্ট হয়

মিঃ এফ্, এ, গেইট এফ্, এস্ এম্ সাহেব ১৯০১ সালের ভারতের সেনসস্ রিপোর্টে 'পোদ' জাতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। (এপেণ্ডিক্স)—

পোদ

চাষী......................	পশ্চিম বঙ্গ
ছাঁচি (Chhanchi) ...	ঐ
যশোরী	ঐ
বাসুদেব পৌণ্ড্র ...	মধ্যবঙ্গ
শাণ্ডপর	ঐ

"The Basudeb Paundra claims descent from the family of Pundra the son of Basudeb. While the Santaparhs say that are descended from Bali Raj, the son of Sutapa. The Basudeb Paundras are divided into two section, the Uttar Rarhi and Dakshin Rarhi. The Santaparhs are also divided into two sections, the Utkal or Oriya and the Bangaj."

(Census Report 1901—Pods)

বাসুদেবপৌণ্ড্র বংশীয় পদ্য

বাসুদেব পৌণ্ড্রগণ পুণ্ড্রবংশসম্ভূত বলিয়া দাবী করে, পৌণ্ড্রক বাসুদেব তাহাদের বীজ পুরুষ। এই পুণ্ড্রক বাসুদেব শ্রীশ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।

শাণ্ডপর পদ্য বলীরাজ বংশীয় উত্তর ও দক্ষিণ রাঢী

শাণ্ডপর পদ্য আপনাদিগকে সুতপাপুত্র বলীরাজের বংশধর বলিয়া থাকে। এই বাসুদেব পৌণ্ড্র দুই শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—উত্তর রাঢী এবং দক্ষিণ রাঢী।

শাণ্ডপর উৎকলী ও বঙ্গজ পদ্য

শাণ্ডপর আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত বলে যথা—উৎকলী বা উড়িয়া ও বঙ্গজ।

মেছুয়া ও যশোরী পদ্য

চাষী ও ছাঁচি নামক উচ্চশ্রেণী গুলির মধ্যে মেছুয়া ও যশোরী থাক আছে। ১৯০১ সালের আদম সুমারীর বিবরণী মধ্যে সুচতুর গেট সাহেব লিখিয়াছেন যে—

Census Report 1901 Page 363

"The Koch has sunk considerably since the days of his supremacy and so has the Pod, who claim to be considered a Bratya or follow Kshattriya is doubtless due to a vague reminiscence of the time when this tribe ruled on the banks of the Karatoya"

যাহাই হউক ১৯০১ সালের আদম সুমারীর সময়ে এই জাতির মধ্যে জাতি ও বংশ নির্ণয়ের তরঙ্গ উঠিয়া ছিল, এবং প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ জাতির বিবরণ সম্বলিত আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছিল। উক্ত আবেদনের সারমর্ম্ম রিপোর্টে গৃহীত হইয়াছে মাত্র।

১৯০১ সালের সেনসাস্ রিপোর্টের ৩৭২ পৃষ্ঠায় ৫৯২ প্যারায় দেখিতে পাই—

"The Pods are divided into the higher class, who live by cultivation and call themselves Padma Raj or Bratya Kshattriya, and the fishing Pods. The former claim a higher position which is not usually conceded to them. In Burdwan their touch defiles and they rank very low in consequence.

এবং ১৯০১ সালের রিপোর্টের ৩৮২ পৃষ্ঠায় ৬১৬ প্যারায় লিখিত আছে যে—

"The higher class Pods who live by cultivation and call themselves Padma Raj urge that they are of Kshattritya origin and have no connection with the fish Pods. They have, however, quite failed to establish any racial difference between themselves and the Pods who live by fishing and the connection is clearly indicated by the fact that they are still willing to accept the daughter of the fishing Pods, as their wives though they will no longer give them own daughter in marriage to members of that section of the caste."

পদ্ম জাতির মধ্যে যাহারা কৃষি কার্য্য দ্বারা জীবন ধারণ করে, তাহারা আপনাদিগকে 'পদ্ম রাজ' বলিয়া থাকে এবং তাহারা পতিত ক্ষত্রিয় (ব্রাত্য) গণের বংশধর বলিয়া বিবেচনা করে। মেছুয়া পোদগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধও হয়। মেছুয়া পদ্মগণের কন্যা গ্রহণ করে কিন্তু কন্যা প্রদান করে না।

এই সূত্রে মেছুয়া পদ্মগণের সহিত এক জাতিত্ব সম্বন্ধ যে বিজড়িত আছে তাহা উপলব্ধি হইতেছে। জাতীয় স্বভাবের উন্নতি ও অবনতি—সংসার যাত্রার প্রকৃষ্ট পথ দ্বারাই ব্যবসা ভিন্ন ভেদ হইয়া; এক জাতির মধ্যে শ্রেণীভেদ সংঘটিত করে।

এক জাতি, কাল সহকারে জীবন-সংগ্রামে জয় পরাজয়ের সমস্যার মীমাংসা করিতে গিয়া বিভিন্ন ব্যবসায়ীর মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে। কর্ম্ম দ্বারাই উচ্চ নীচ ভেদজ্ঞান আইসে, কর্ম্মই জীবন যাত্রায় অমৃত।

সামাজিক প্রথার বা বাঁধাগতের মধ্যে বাঁধ সুরের মধ্যে কিঞ্চিৎ বেতালা বা বেসুর হইতে

জাতীয় সমাজ পৃথক হয়। ব্যবসার পার্থক্য হেতু জাতীয় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। জাতি ব্যবসা গত বলিয়া এই প্রকার হইয়া থাকে।

পদ্মজাতি কর্ম্মদ্বারা আত্মোন্নতি করিতে পারিলে, সমাজ তাহাদিগকে পথ দিবে। আপনাপন সমাজ কেবল যে ব্যবসা ত্যাগ দ্বারাই উন্নত হয় ইহা অপেক্ষা অন্ধ বিশ্বাস আর নাই।

আচরিত চিরাভ্যস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে, বিদ্যা ও বিজ্ঞান দ্বারা অন্নসংস্থানের মূলীভূত কর্ম্ম ত্যাগদ্বারা নূতন কর্ম্ম দ্বারা সংসার নির্ব্বাহের নূতন পথ আবিষ্কার করা বিড়ম্বনা মাত্র।

বর্ত্তমান কালে বাঙ্গালী এই প্রকারে এক দিকে যেমন দুর্ব্বল ও দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে, অন্য দিকে তদ্রূপ জাতীয় ব্যবসার উন্নতি দ্বারা বহু স্থানে উন্নতির চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে; এবং জাতীয় ব্যবসার অঙ্গীভূত করিয়া অন্য ব্যবসা অবলম্বন করায় ব্যবসা ও জীবন যাত্রার পথ সুগম হইয়া উঠিতেছে।

পদ্ম জাতির যতই শ্রেণী বিভেদ থাকুক না তাহাতে কিছুই যায় আসে না। ব্যবসা ত্যাগ দ্বারা জীবন যাত্রার পথটি বিপদ সঙ্কুল করিয়া দরিদ্র হইবার প্রয়োজন আদৌ দৃষ্ট হয় না।

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য যে জাতির নিকট নীচ কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়, যাহারা দাসত্বই জীবন যাত্রার প্রকৃষ্ট পন্থা বিবেচনা করে সেই ভ্রষ্ট কর্ম্মিগণের মন্ত্রণায় বহু জাতি কেবল মৌখিক উন্নতি সাধনের জন্য দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে।

সম্মিলিত শক্তি দ্বারা জাতীয় সমাজগুলিকে দৃঢ়াবদ্ধ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। যত বহু দলে বিভক্ত হইবে, ততই তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিবে। ততই তাহারা হত বল হইয়া দরিদ্র হইয়া পড়িবে। সংখ্যায় কম হইয়া বেষ্টনী বদ্ধ হইলে সে জাতির বা সম্প্রদায়ের কখন উন্নতির আশা নাই।

আদম সুমারীর বিবরণ পুস্তকে—মানচিত্রে 'পোদ' বাসভূমির পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, (Map showing the distribution of the Pod caste in Bengal—Page 395 1901 A. D.) ইহাতে দৃষ্ট হয়, ২৪ পরগণা, খুলনা হাওড়া, মেদিনীপুর, নদীয়া, যশোহর, হুগলী প্রভৃতি জেলায় কমবেশী পোদগণের বাসভূমি বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছে।

মালদহ, রাজসাহী, মুরসিদাবাদ, বীরভূমি প্রভৃতি জেলায় পদ্ম জাতির বাস চিহ্ন প্রদত্ত হয় নাই। ইহা দ্বারা বুঝা যায় উক্ত জেলায় পদ্ম জাতির বাস নাই।

সেনসস্ রিপোর্টে পদ্মজাতিকে "Half brother of Chadal" ও বলা হইয়াছে। ইহা অন্যায় উক্তি,—এবং পুণ্ড্রজাতিকে Half brothers of pods ও বলা হইয়াছে। ভবিষ্যতে ইহাই নজির হইবে এবং ভারত বহির্ভূত সুসভ্যদেশের জনগণ এদেশের আদম সুমারীর বিবরণী পাঠ করিয়া বুঝিবে বাঙ্গালী অপদার্থ ও হীনজাতি। বাস্তবিক কি তাহাই। কখনই নহে—যাহারা এ সম্বন্ধে উদার মত পোষণ করেন তাঁহাদের এ যুক্তি শোভা পায় না।

পুণ্ডরী মালি

"In the state of Bud there is a small group of person known as Pundari Mali. They grow flowers and vegetables, * * * but the similarity of name and occupation would seem to suggest their ori-

ginal identity with the Pundaris or Puro of Bengal."

ছোটনাগপুরের এক প্রান্তে 'Bud state' আছে। তথায় অল্পসংখ্যক 'পুণ্ডরী মালি' নামক এক জাতি বাস করে। তাহাদের পূর্ব্ব নিবাস কোথায় ছিল তাহা প্রায় অজ্ঞাত—তাহারা কৃষিকার্য্য করিয়াই জীবন ধারণ করে।

কৃষিকার্য্য পুণ্ড্রগণের আদি ব্যবসা না হইলেও বর্ত্তমানে মুখ্যভাবে ব্যবসা স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

নবদ্বীপবাসী পুণ্ডরিগণ তরিতরকারীর কৃষি করিয়া থাকে—কৃষিকর্ম্ম এই জাতির ব্যবসা—

"In Nadia they are vegetable growers and cultivators and believe that the growing of vegetables was there original occupation" (Cen-Rep. 425, para 711pp.) 1901 A.D

নবদ্বীপ বা নদীয়া জেলার পুণ্ডরিগণের মধ্যে যাহারা যে উদ্ভিদের কৃষি অত্যধিক করিত, দেশের লোকে সেই উদ্ভিদের উৎপাদককে উদ্ভিদ সংজ্ঞায় বিভূষিত করিয়া থাকিতে পারে যথা

"In Nadia also there are three sub-caste, but they here know as Begune, piyaza and peto."

বেগুণে, পেঁয়াজে, পেটো পদবী। শান্তিপুরের মধ্যে ব্রাহ্মণ মহলে—গোঁজ, দড়া, পাটী প্রভৃতি পদবী আদিও শুনা যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিদাস পালিত।

তাজা ভা
ধর্ম্ম ও দর্শন

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস লিখিয়াছেন—"ভারতবর্ষ জীবিতও নাই এবং গ্রীস ও রোম মরেও নাই।" এই কথা যুবক ভারতের প্রথম স্বতঃসিদ্ধ। এই কথা স্বীকার করিয়া লইয়াই বর্ত্তমান ভারতের ভাবুকগণ কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াছেন। তবে কথার মারপ্যাচে হয়ত এই সত্যটা কিছু ধোঁয়াটে ভাবে রহিয়াছে। কিন্তু এই গোঁজামিল ও অস্পষ্টতা আর বেশী দিন টিকিবে না। ভারতের জনসাধারণ শীঘ্রই মরাভারতকে মরা ভারতই বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত হইবেন। ভারতীয় "অমরতা"র আলোচনা সম্প্রতি "ধামা চাপা" থাকিবে।

২। এই লেখকের রচনায় ধর্ম্মতত্ত্বের নূতন আলোচনাপ্রণালী প্রকটিত হইয়াছে। প্রণালীটা ভারতবর্ষে নূতন—পুরাপুরি নূতন-নয়—কথঞ্চিৎ নূতন। দুনিয়ার সর্ব্বত্র এই প্রণালীতে ধর্ম্মতত্ত্বের যাচাই সুরু হইয়াছে। তাহার ফলে আধ্যাত্মিক জগতের বার্ত্তা আজকাল নূতন কাণে শুনা হইয়া থাকে। নবীন চন্দ্র দাস বলিতেছেন—"আধুনিক মানুষ প্রকৃতির প্রতিকূল শক্তিপুঞ্জের হাত এড়াইবার জন্য ভগবানের সঙ্গে আর "চুক্তি" করে না—স্বীয় বুদ্ধিবলে বিশ্বশক্তির সহিত "বুঝা পড়া" করে—প্রকৃতির উপর কর্ত্তৃত্ব করে।" "শুনিতে পাই মানুষ প্রথম অবস্থায়

নিরাকার ব্রহ্মের সম্পূর্ণ ধারণা ও সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে না—পূজা করিবে কাহার? সুতরাং পণ্ডিতগণ নিজেদের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কল্পনা বলে মূর্খের ধর্ম্মপিপাসা নিবারণের জন্য নানা দেবদেবীর সৃষ্টি করিলেন। * * * কিন্তু * * * নিরাকার ব্রহ্মের উপাসকগণ বা উপনিষৎকারগণের দ্বারা এত সংখ্যক অদ্ভুত দেবদেবীর সৃষ্টি ত যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। খুব সম্ভব এই সমস্ত দেবদেবীর সৃষ্টি নিম্নস্তরের জাতিগণ কর্ত্তৃকই সম্পন্ন হইয়াছিল। * * * ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমাজ ধর্ম্ম ও পূজা পদ্ধতি আর্য্য ও অনার্য্যের অথবা সভ্য এবং অসভ্যের মিশ্রণজাত।" এই আলোচনা প্রণালী এন্থ্রাপলজি বা নৃ-তত্ত্বের সামিল। আজকালকার পণ্ডিত মহলে আত্মা, পরকাল, ভগবান ইত্যাদির আলোচনা ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনার গোড়ার কথা নয়। গোড়ার কথা আচারতত্ত্ব, কুসংস্কার-তত্ত্ব, ভুতুড়ে গল্প, এক কথায় লৌকিক ধর্ম্ম এবং আচার ব্যবহার। এই সকল কথা বুঝিয়াই আধ্যাত্মিকতার ব্যাখ্যা করিতে অগ্রসর হওয়া যুক্তি সঙ্গত। ইহাতে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য অথবা আধ্যাত্মিকতার গৌরব কিছু মাত্র কমিবে না। মানুষ যে পশু এই কথাটা স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে মাত্র। তাহা না বুঝা বেকুবি। তাহার ফলে মানুষের দেবত্বও আরও স্পষ্ট হইয়াই উঠিবে। নৃতত্ত্বের দিক হইতে ভারতীয় ধর্ম্মের বিশ্লেষণ সুরু করিলে আর একটা মস্ত লাভ হইবে। আমাদের হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের ধারাবাহিক ক্রমবিকাশটা পরিষ্কার হইতে থাকিবে। দেখিতে পাইব যে প্রত্যেক পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে আমাদের জীবন যাপনের রীতিনীতি বদলাইয়া গিয়াছে। দেখিতে পাইব যে, "মাৎস্যন্যায়", অন্তর্ব্বিদ্রোহ বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণ, ঘরোয়া লড়াই এবং রক্তারক্তি ভারতবর্ষে অসংখ্যবার ঘটিয়াছে। ইহা ভারতবাসীর দুর্ব্বলতা নয়—দুনিয়ার সর্ব্বত্রই এইরূপ ঘটিয়া থাকে, ঘটিয়াছে এবং ঘটিবে। আর দেখিতে পাইব যে, হিন্দুত্ব এবং হিন্দুসমাজের দলভেদ, জাতিভেদ, বিধিনিষেধ এবং ধর্ম্মশাস্ত্র বা স্মৃতিশাস্ত্রগুলি এই মাৎস্যন্যায়ের প্রভাবে নানা যুগে নানা আকার ধারণ করিয়াছে। অর্থাৎ ভারতীয় যুদ্ধ বিগ্রহের ইতিহাস না বুঝিলে ভারতের ধর্ম্মতত্ত্ব, জাতিভেদ, বর্ণসঙ্কর এবং সামাজিক অনুশাসন বুঝা যাইবে না। এই সকল কারণে যুবক ভারতে নৃতত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক।

৩। 'গৃহস্থে'র "আলোচনা"য় "নব হিন্দুত্বের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। "গৃহস্থ" প্রচার করিতেছেন—"হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় কেবল প্রত্নতত্ত্বের কোষাগার নহে। ইহা হিন্দুত্বের নূতন জীবনের উৎস। * * * যে হিন্দুত্ব আজ ভারত প্রত্যাশা করিয়া আছে তাহা কেবল একটা শাস্ত্রগত সূত্র নহে। নব হিন্দুত্ব একটা জীবনের ধারা। আমাদের সমাজের প্রত্যেক বিভাগে এই হিন্দুত্ব নূতন প্রেরণা, নূতন সৃষ্টি আনয়ন করিবে। এই হিন্দুত্ব হিন্দুকে জগতের মধ্যে কেবল একটা ব্যতিরেক বা "এক্‌সেপ্‌শন" করিয়া ঘিরিয়া রাখিবে না। এই নূতন জীবন ধারার স্রোত বিশ্বমানব সাগরের মধ্যে যাইয়া পড়িবে, এবং এই জীবনের প্রেরণায় হিন্দু পৃথিবীর সকল জাতির সকল ধর্ম্মের সঙ্গে বুঝা পড়া করিয়া লইবে—সকলের সমক্ষে নির্ভয়ে নিজের ব্যক্তিত্ব সপ্রমাণ করিতে দণ্ডায়মান হইবে।" পৃথিবীতে কোন দিন বিশ্ববিদ্যালয় বা ছেলে পিটিবার আখড়া হইতে নবজীবন

গজাইয়াছে কিনা খতাইয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই। কাশীর নব প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে যুবক ভারত তাজা এবং সরস আদর্শের নায়াগ্রা ঝোরা পাইবেন কি না তাহাও এক্ষণে আলোচনা না করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় টাটকা মাল যোগাইতে পারেন—ভাল কথা। আর যদি এই প্রতিষ্ঠান মরা পচা ও বাসি মালেরই গুদাম ঘর হইয়া থাকে তাহাতেও দুঃখিত হইবার কারণ নাই। নাই মামার চেয়ে কাণা মামাও ভাল।

আসল কথা "নব হিন্দুত্ব"—দুনিয়ার লোকের পাতে দিবার উপযুক্ত ভারতধর্ম্ম—বর্ত্তমান জগতের একটা শক্তি স্বরূপ ভারতবাসীর দর্শন ও জীবন। এই হিন্দুত্ব, এই ভাবতধর্ম্ম এবং এই দর্শন ও জীবনের কথাই যুবক ভারতের সকল আন্দোলনের ভিতরকার কথা। এই নবীন হিন্দুত্বের আলোচনা খোলাখুলি বোধ হয় এখনও কেহ করেন নাই। কিন্তু অন্ততঃ বিগত দশবৎসরের সকল প্রচেষ্টাই এই "নূতন জীবনের উৎস" হইতেই বাহির হইয়াছে। যুবক ভারত আগাগোড়া বর্ত্তমান-নিষ্ঠ এবং ভবিষ্যপন্থী বা "ফিউচারিষ্ট"। "গৃহস্থ" নব্য ভারতের ফিউচারিজ্‌ম্‌-তত্ত্বটা অর্থাৎ "ভবিষ্যবাদ"ই স্পষ্টভাবে ধরিয়াছেন।

যুবক ভারত "আর্কিঅলজি" প্রত্ন-তত্ত্ব বা কবরতত্ত্ব বা মরাতত্ত্ব বা অস্থিকঙ্কালতত্ত্বও আলোচনা করিয়া থাকেন। মরা ভারতের কবর এবং চিতাভস্ম খুঁড়িয়া আমরা ভাস, বরাহমিহির, রসরত্নসমুচ্চয়, রাজপুত, "পাহাড়ী" চিত্রশিল্প, "সঙ্গীত রত্নাকর" কৌটিল্যনীতি, ধর্ম্মপাল ও রাজেন্দ্রচোলকে বাজারে দাঁড় করাইয়াছি। কালিদাস, বিদ্যাপতি, কবিকঙ্কণ চণ্ডী ইত্যাদির আসর দিন দিন বেশ জমকাল করিয়া তুলিতেছি। কথায় কথায় যুবক ভারত অতীতের নজির বাহির করিয়া থাকেন—অতীতের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন সকল ক্ষেত্রেই তুমুলভাবে দেখা দিয়াছে। তাজা ভারতে বাসি ভারতের কথা এত বেশী হয় কেন? কেহ কেহ সন্দেহ করিতে পারেন তবে বুঝি যুবক ভারত অতীতেই ডুব মারিল রে! বস্তুতঃ ইয়োরোমেরিকার কোন কোন পণ্ডিতমহলে এই ধরণের সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা বিশ বৎসর হইতে একটা মজা দেখিতেছেন। সকল ভারতবীরই পাশ্চাত্য পণ্ডিতমহলে অতীত ভারতের বুলি শুনাইয়া গিয়াছেন। বিবেকানন্দের ঝুলিতে ছিল বেদান্ত। পণ্ডিতেরা জিজ্ঞাসা করিলেন সে কথাত জানি। ততঃ কিম্‌?" ব্রজেন্দ্রনাথ লণ্ডনের "বিশ্বমানব পরিষদে" জবাব দিলেন—"অহিংসা" এই খানেই শেষ নয়। আজ রবিবাবুর নামে দুনিয়ায় ভারতের নাগরা বাজিতেছে। কিন্তু নাগরার আওয়াজে শুনা যায় কেবল তথা কথিত "মিষ্টিসিজ্‌ম্‌।" আর সিংহলের ভাবুক কুমারস্বামীও বিলাতে বসিয়া ভারতশিল্পের অধ্যাত্মতত্ত্বই প্রচার করিতেছেন। বিবেকানন্দের যোগতত্ত্ব হইতে রবীন্দ্রনাথের কবীরতত্ত্ব পর্য্যন্ত ইয়োরামেরিকানেরা ভারতের এক সুর শুনিতে পাইলেন। পুরাণা ভারতের কথা—মরা ভারতের কথা—এবং সেই পুরাণা ভারতেরও অকেজো দিকটা। দেখিয়া শুনিয়া পাশ্চাত্যেরা হাসিতেছেন এবং ভাবিতেছেন—"যাক্‌, বাঁচা গেল। নব্য-ভারত আজও সেই থাড়া বড়ি থোড় লইয়া মাতিতেছে। সুতরাং ইহারা জগতে নবশক্তি আনিতে পারিবে না। মরাভারতের কবর "লাভা" প্রস্তরের মত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। এই জমাট বাঁধা মঞ্চের উপর আর নবজীবন গজিতে পারিবে না। অতএব ভারতবর্ষের

নামটা খরচের খাতায় লেখ। ভারতের ত্রিশকোটি নরনারী জগতের কোন কাজে লাগিবে না। হিন্দুস্থান বিশ্বশক্তির বহির্ভূত সৃষ্টিছাড়া মৃৎপিণ্ড বিশেষ।"

বিদেশীয়েরা যুবকভারত সম্বন্ধে এইরূপ ভাবিতেছেন—দেশীয় লোকেরাও অনেকটা এই রূপই সন্দেহ করিতেছেন। বস্তুতঃ আমাদের "ভবিষ্যবাদে" প্রত্নতত্ত্বের মূল্য কতখানি? যুবকভারত অতীত কথাকে কোন্ কানে শুনিতেছেন? আলোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধ লেখা হইয়া পড়িবে। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, যুবক ভারত অতীতের জন্য অতীতের আদর বিন্দুমাত্র করেন না। পুরাণা আধ্যাত্মিকতার বড়াই আমাদের "ভবিষ্যবাদে" এক কাঁচ্চাও নাই। আমরা মোগল ভারতের গৌরব যুগ, অথবা গুপ্ত-বর্দ্ধন-পাল চোল-সেন আমলের হিন্দুত্ব, অথবা কাণিষ্কশাসিত আর্য্যাবর্ত্তের এবং আন্ধ্রশাসিত দাক্ষিণাত্যের ভারতকীর্ত্তি অথবা মৌর্য্য ভারতের জীবন, দর্শন ও ধর্ম্ম সবই বাতিল বিবেচনা করিয়া থাকি। এই সকল হিন্দুত্বের দোহাই দিয়া যুবক ভারত হিন্দুত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে চাহে না। যুবক ভারত বৃহত্তর কালিদাসের বৃহত্তর হিন্দুত্ব গড়িবে এবং বৃহত্তর উপনিষৎ, বৃহত্তর গীতা ও বৃহত্তর বেদান্ত রচনা করিয়া জগতে বৃহত্তর আধ্যাত্মিকতা আনিবে। আর এই বিরাট সৃষ্টি হইতে বর্ত্তমান যুগের মানবজাতি জগতের সর্ব্বত্র উদ্দীপনা লাভ করিতে পারিবে। যুবক ভারত দুনিয়ায় এক প্রধান শক্তি হইয়া থাকিবে। বিশ্ববাসীর বিবেচনায় হিন্দুস্থান আর "অতীতের দেশ" মাত্র পরিগণিত হইবে না।

তথাপি তাজা ভারতে বাসি ভারতের বুলি এত বেশী আওড়ান হয় কেন? "জবাব অতি সহজ। প্রথম কথা এই যে, আমরা বনিয়াদি ঘরের লোক। এই কথাটা দুনিয়ায় স্বীকৃত হয় না। আমাদের কুলজী পুথি বাহির করিয়া তাহা স্বীকার করাইতে চাই। ঊনবিংশশতাব্দীর পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা আমাদের পুরাণা ভারতখানাকে বেকুব নরনারীর দেশ বিবেচনা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কুসংস্কার নকল করিয়া আমাদের দেশীয় পণ্ডিতেরাও পুরাণা হিন্দুস্থানকে অকর্ম্মণ্য চরিত্রহীন এবং মরা স্ত্রীপুরুষের জন্মভূমি বিবেচনা করিয়াছেন। এই কুসংস্কারের ফলে বর্ত্তমান ভারতের নরনারী পূর্ব্ববর্ত্তী চৌদ্দ-পুরুষের নিন্দা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন এবং দুনিয়ায় মুখ দেখাইতে লজ্জা বোধ করেন। কাজেই পাশ্চাত্য এবং দেশীয় পণ্ডিতগণের কুসংস্কার ধ্বংস করা ভবিষ্যবাদী যুবকভারতের সর্ব্বপ্রথম কার্য্য। আমরা দেখাইতে চাহি যে, আকবর, প্রতাপাদিত্য, শাজাহান শিবাজী, আওরাংজেব, তানসেন, আবুফজল, রামদাস, বিদ্যাধর, বাজীরাওয়ের ভারত ষোড়শ ও সপ্তদশ এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীর ইয়োরোপ হইতে কোন অংশে খাটো নয়। পাশ্চাত্য নরনারীর যতগুলি দোষ ছিল ভারতবাসীর দোষ ঐ যুগে তাহা অপেক্ষা বেশী ছিল না। পাশ্চাত্য নরনারীর গুণ যতগুলি ছিল ভারতীয় হিন্দুমুসলমানের গুণ ঐ যুগে তাহা অপেক্ষা কম ছিল না। আমরা ঘরে ঘরে কামড়া কামড়ি করিয়াছি—ইয়োরোপীয়েরা ঠিক সেইরূপ কামড়াকামড়ি করিয়াছেন। আমাদের আওরাংজেব হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন—হিন্দুতে মুসলমানে লড়াইয়াছেন। আওরাংজেবের সমসাময়িক ফরাসী নরপতি জগদ্বিখ্যাত চতুর্দ্দশ লুই অবিকল এই মোগল সম্রাটের জুড়িদার ছিলেন। ফরাসী

বিপ্লবের সময়ে (১৭৮৯) ইয়োরোপের যে অবস্থা ছিল ভারতেরও তখন সেই অবস্থা ছিল। সুতরাং মোগল মারাঠার যুগ ভারতের নিন্দনীয় যুগ নয়। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের কথা তুলিলেও বুঝিতে পারি যে, ইয়োরোপের মানুষ দেবতা নয়, এবং ভারতের মানুষ জানোয়ার নয়। যুগে যুগে ইয়োরোপীয়ানের যতগুলি দুর্ব্বলতা-সবলতা ছিল ভারতবাসীরও ঠিক ততগুলি দুর্ব্বলতা সবলতা ছিল। রক্তমাংসের মানুষ ইয়োরোপে হাসিত, কাঁদিত, নাচিত, গায়িত, লড়িত, মরিত, হিংসা করিত, ভালবাসিত, দলাদলি করিত, ধর্ম্মচর্চ্চা করিত, কুসংস্কারে মজিত। রক্তমাংসের মানুষ ভারতেও হাসিত কাঁদিত, নাচিত, গায়িত, লড়িত, মরিত, হিংসা করিত, ভালবাসিত, দলাদলি করিত, ধর্ম্মচর্চ্চা করিত, কুসংস্কারে মজিত।

এই কথাটা ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা এক শতবৎসরের প্রভুত্বের ফলে বিশ্বাস করিতে চাহেন না। আমাদের পণ্ডিতেরাও বিশ্বাস করিতে অনেকটা নারাজ। এই জন্য যুবক ভারতের প্রথম অস্ত্র "হিষ্টরিক্যাল ক্রিটিসিজম্" এবং "কম্পারেটিভ হিষ্টরি" অর্থাৎ "ঐতিহাসিক আলোচনা প্রণালী" অথবা বিশ্ব সমালোচনায় ইতিহাসের প্রয়োগ। বলা বাহুল্য এই আলোচনা প্রণালীতে প্রত্নতত্ত্বের স্থান খুব বড়। বস্তুতঃ প্রত্নতত্ত্বের "ব্যাখ্যা" ও ভাষ্যই এই বিচার প্রণালীর জীবন। এই কারণে যুবক-ভারত বাসি-ভারতের কথা ঘাঁটা ঘাঁটি করিতে বাধ্য। ব্যাখ্যা কার্য্যে "প্রাণ-বিজ্ঞান" (বায়লজি) যুবক-ভারতের প্রধান সহায়। দ্বিতীয়তঃ, অতীতকে চাগাইয়া তোলা হইতেছে—কিন্তু অতীত কি অতীত বেশে দেখা দিতেছেন? দেখা দিলেও সেই অতীত বর্ত্তমানের আলোকে ও উত্তাপে ঝলসিয়া যাইতেছে না কি? বস্তুতঃ যুবক ভারতের হাতে অতীত নবজীবনের একটা উপকরণ মাত্র। অধিকন্তু ইহা একমাত্র উপকরণ নয়। যুবকভারত নানা উপকরণ নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিতেছেন। সমগ্র বিশ্বই যুবক-ভারতের ল্যাবরেটরি—মরা-ভারত অর্থাৎ ভারতের প্রত্নতত্ত্বটা বাদ পড়িবে কেন? বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার করিতে অগ্রসর হইয়া পুরাণা ভারতের শক্তিপুঞ্জ ফেলিয়া দিলে বেকুবি করা হইবে। পাশ্চাত্য দেশের দৃষ্টান্ত দিতেছি। মান্ধাতার আমলের গ্রীক সাহিত্য, গ্রীক দর্শন, ও গ্রীক চিন্তা প্রণালীই ষোড়শ শতাব্দীর নবীন ইয়োরোপ গড়িয়াছিল। ইয়োরোপের মনু এরিষ্টটল খৃঃ পূঃ ৩৮৪-২২। তিনিই বেকন-অবতারে (১৫৬১-১৬১৬) নবরূপে দেখা দিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে "রেণাসাঁস" বা নবাভ্যুদয় ব্যাপারটা আগাগোড়া মরা-গ্রীসেরই নবজীবন লাভ বৈ আর কিছু নয়। মরা হাড়েও ভেল্কি খেলান যায়। মরা হাড় ফেলিয়া দেওয়া চতুর মানুষের কার্য্য নয়। আরও একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। এই সেদিন ইয়োরোপে একটা বিরাট আন্দোলন হইয়া গেল। উহা ফরাসী-বিপ্লবের ও নেপোলিয়ানী যুগান্তরের সমসাময়িক ১৭৮৯-১৮১৫। নাম রোমান্টিক আন্দোলন। জার্ম্মাণি, ইংল্যণ্ড, ফ্রান্স সর্ব্বত্রই এই আন্দোলনে নরনারী নবজীবন লাভ করিয়াছে। ভিতরকার কথা খতাইয়া দেখিলে বুঝি যে এই আন্দোলনও অনেকাংশে মরা জিনিষেরই চাঁড়ান মাত্র। রোমান্টিক আন্দোলনের ভাবুকগণ মধ্যযুগের গল্প গুজব বীর কাহিনী "রেলিক্স্" অর্থাৎ প্রত্নতত্ত্ব এবং অতীত কথার সরস ব্যাখ্যা ও রংচড়ান টিপ্পনী

সাজাইয়াই কিস্তীমাত করিয়াছিলেন। জার্ম্মাণ হার্ডার (১৭৪৪-১৮০৩) এবং বিলাতী স্কটের (১৭৭১-১৮৩২) কথা অনেকেরই জানা আছে। সাহিত্যবীর গেটে (১৭৪৯-১৮৩২) গট্জ্ নামক ষোড়শ শতাব্দীর এক জার্ম্মাণ ডাকাইত-বীরের জীবন বৃত্তান্ত নাটকাকারে প্রচার করেন। ইহা ১৭৭১ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। ইয়োরোপে রোমাণ্টিক আন্দোলনের ইহাই সূত্রপাত। পুরাণা "নিবেলুঙ্" গাথাই ভাবুক জার্ম্মাণির জীবন ছিল। গে'টের "ফৌষ্ট" কাব্য ও এই ধরণেরই প্রত্নতত্ত্বের এক সদ্ব্যবহার।

কয়েকদিন হইল ইতালীতে ভাবুক প্রবর ম্যাজিনি (১৮০৫—৭২) মধ্যযুগের দান্তে-সাহিত্যকে (১২৬৫—১৩২১) নব-জীবনের ফোয়ারা রূপে ব্যবহার করিয়াছেন। আধুনিক ফরাসীদের "লামিজারেব্ল্ গ্রন্থ (১৮৬৩) দুনিয়ার জনসাধারণের পুরাণ এবং দরিদ্রের গীতা স্বরূপ। ভবিষ্যবাদের এই টাট্কা বিশ্ব-কোষ খানা যাঁহার রচনা তাঁহার কাব্য নাট্য গদ্যেও মধ্যযুগ বহু কথা কহিয়াছে।

ভারতে বিক্রমাদিত্যের কালিদাস ও তাঁহার কুমার সম্ভব এবং রঘুবংশ রচনা করিতে যাইয়া পুরাণা মালেরই সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। আবার মধ্যযুগে কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস অতীতকে "ফিউচারিজমের" উপকরণ স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। হিন্দুস্থানের "আদি কবি" বাল্মীকি দিগ্বিজয়ী গুপ্ত সম্রাটগণের আমলে নববেশে দেখা দেন। আবার মোগল ভারতের রেনাসাঁস বা নবাভ্যুদয় কালে তাঁহার নূতন মূর্ত্তি প্রকটিত হয়।

মরা হাড়ে ভেল্কি খেলান দুনিয়ার কবি সম্রাটগণের কার্য্য। মরা জিনিষের সদ্ব্যবহার "পূর্ব্ব সূরি"গণের মাল মশলায় কায়দাফলান অতীতকে জাগান, প্রত্নতত্ত্বকে জীবনতত্ত্বে দাঁড় করান কালিদাস-দান্তে-সেক্সপীয়ার-গেটে-হিউগোর অমর কীর্ত্তি। অতীত অতীত-বেশে আসেন না—ভবিষ্যবাদের পথ প্রস্তুত করিবার জন্য নবরূপে দেখা দেন। কাজেই যুবক ভারতের ভবিষ্যবাদে অতীত-নিষ্ঠা বিচিত্র নয় অতি স্বাভাবিক।

তৃতীয়তঃ, যুবক ভারত দেখাইতে চাহেন যে, অতীত ভারত কোনদিনই সৃষ্টি ছাড়া দেশ ছিল না। অন্যান্য মানবসমাজের সঙ্গে হিন্দুস্থানী মানবসমাজের লেনদেন প্রচুর ছিল। হিন্দুত্ব চিরকালই বিশ্বশক্তির বিরাট ঘূর্ণিপাকের মধ্যে অন্যতম ঘূর্ণিপাকরূপে বিরাজ করিত। দুনিয়ায় হিন্দুসমাজ তাহার দাতব্য দান করিয়াছে। দুনিয়া হইতে হিন্দু-সমাজ নব নব উপকরণ লাভ করিয়াছে। জগতের অন্যান্য শক্তিগুলিকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া ভারতের নরনারী একাকী জীবন-ধারণ করে নাই। কাজেই বর্ত্তমান যুগে যুবক ভারত হিন্দুত্বকে যে কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান করিয়াছেন তাঁহার উপর দাঁড়াইতে হিন্দুত্ব অতি সহজেই সমর্থ হইবে। বহুযুগে বহু যুবক ভারত হিন্দুত্বকে নব নব কর্ম্ম ক্ষেত্রে আহ্বান করিয়াছিলেন। হিন্দুত্ব প্রত্যেক ডাকেই সাড়া দিয়াছে। এই জন্যই হিন্দু সভ্যতা অমর। ভারতের জীবন ও দর্শন কোন দিনই জগতে পশ্চাৎপদ ছিল না—আজও পশ্চাৎপদ থাকিবে না। ইহাই হিন্দুত্বের বিচিত্র অমরতা। ভবিষ্যপন্থী বর্ত্তমাননিষ্ঠ জাতি মরিতে পারে না—যুগে যুগে নব নব শক্তি হজম করিয়া অগ্রসর হয়। ভারতের জীবন ও দর্শন প্রথমে এশিয়ার নরনারীকে খাড়া করিয়া তুলিবে-তাহার পর ইয়োরামেরিকার জীবন ও দর্শনের সঙ্গে বুঝা পড়া

করিবে। জগতের ভবিষ্যৎ মানব সমাজ সেই নবীন হিন্দুত্বের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। প্রত্নতত্ত্ব হইতেই যুবক ভারত এই ইঙ্গিত পাইতেছেন। এই জন্যই "বায়লজির" সেবক হইয়াও আমরা "আর্কিওলজি"তে মাতিয়াছি। যরা ভারতের আসল মূর্ত্তি যতই পরিষ্কার হইতে থাকিবে ভবিষ্যৎ পন্থীদিগের কার্য্য ততই সহজ হইয়া পড়িবে।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

জড় ও শক্তি তত্ত্ব

(MATTER AND ENERGY)

আমরা ইতিপূর্ব্বে ভূততত্ত্বের সাধারণ আলোচনা করিয়াছি; গভীরভাবে আলোচনা করি নাই। সম্প্রতি ঐ বিষয়টিই একটু গভীর ও সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিব।

যাঁহারা যথার্থ চিন্তাশীল নহেন, যাঁহারা ভূত-তত্ত্ব সম্বন্ধে কোন দিন ভাবেন নাই, তাঁহাদের বিশ্বাস ভূত বা জড় জিনিসটা এতই সরল ও সহজবোধ্য, যে তৎসম্বন্ধে চিন্তাপ্রয়োগ পণ্ডশ্রম মাত্র। নেত্র উন্মীলন মাত্রেই যখন উহার অস্তিত্ব ও স্বরূপ প্রকাশিত হয়, তখন উহা লইয়া বৃথা বাক্‌বিতণ্ডা মূঢ়তার পরিচয়।

কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে ভূত বা জড় বস্তুটা এত সহজবোধ্য জিনিস নহে। ইহা একটা স্বতঃসিদ্ধ বস্তু নহে; ইহার স্বরূপ লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক চলিতেছে ও চলিবে।

দেখা যাউক ভূত বা জড় বলিতে আমরা কি বুঝি। অন্য কথায় কার্য্য নাই; ব্যবহারিক বুদ্ধিতেই দেখা যাউক উহার স্বরূপটা কেমন? ব্যবহার জগতে যাহার দেশ ব্যাপ্তি (entension) আছে তাহাই ভূত বা জড়। অর্থাৎ যাহা স্থান অধিকার করিয়া থাকে তাহাই জড়। কিন্তু ছায়াও ত স্থান অধিকার করিয়া থাকে; তবে ছায়াও কি জড়? তাহা ত নয়; ছায়া অবস্তু—আলোকের অভাব। অতএব বলিতে হইবে জড়ের লক্ষণটি ঠিক হয় নাই।

কেহ বলিবেন যাহার ব্যাপ্তি আছে ও গতি (motion) আছে, তাহাই জড়; কিন্তু এ লক্ষণটিও ছায়াতে প্রযুক্ত হইতে পারে। ছায়াও চলে—এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরিয়া যায়।

অপর কেহ বলিবেন, গতি থাকুক আর না-ই থাকুক, দেশব্যাপ্ত ও ভারী হইলেই উহা জড় হইবে। যে বস্তু স্থান অধিকার করিয়া থাকে ও ভারী তাহা নিঃসন্দেহে জড়বস্তু।

এ লক্ষণটি অনেকটা ঠিক। কিন্তু ভারীত্ব জড়ের একটা আগন্তুক ধর্ম্ম—একটা নৈমিত্তিক গুণ, স্বাভাবিক (essential) গুণ নহে। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে জড়বস্তুর ভারীত্ব থাকে না; পৃথিবীর কেন্দ্রাতিদেশেই উহার ভারীত্ব থাকে। সুতরাং পৃথিবীর কেন্দ্রগত হইলে কি জড় বস্তু অ-জড় হইয়া যাইবে? অতএব জড় বস্তুর জড়ত্ব ভারে নহে। পৃথিবী বা

তদ্বিধ কোন একটা বৃহৎ বস্তুর সামীপ্যেই জড় বস্তুর ভারীত্ব। ১।

তবে বলিব, পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা গ্রহণ করা যায় তাহাই জড়। অর্থাৎ চক্ষু কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—ইহাদিগের যাহা গ্রাহ্য তাহাই জড় বস্তু। কিন্তু তাহাও বলা যায় না; কেন না প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় ভিন্ন ভিন্ন; চক্ষু যাহা দর্শন করে, কর্ণ তাহা শুনিতে পায় না; কর্ণ যাহা শুনিতে পায়, চক্ষু তাহা দেখিতে পায় না; নাসিকার যাহা গ্রাহ্য, ত্বকের তাহা গ্রাহ্য নহে; সুতরাং কোন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়কে জড় বলিবে? প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়কে জড় বলিলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—প্রত্যেককেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রভাবে জড় বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। এবম্বিধ স্বতন্ত্রতা যেখানে বিদ্যমান সেখানে স্বতন্ত্র বস্তুগুলিকে একত্র করিতে না পারিলে, কোন বাহ্য বস্তুকেই সংজ্ঞা দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না; এবং ঐ বস্তুতে একত্ব বুদ্ধির উদয় ও সম্ভবপর হয় না। কিন্তু সংযোজক কোন পদার্থ স্বীকার করিলেই তাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতার সীমা লঙ্ঘন করিবে, এবং এই সংযোজক পদার্থকে জড়বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিলে, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুই জড়,—এ সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্তে পরিণত হইবে।

আবার যদি বলা যায়, এই সংযোজক পদার্থটি জড় নহে, পরন্তু শক্তি স্বরূপ—শক্তিই শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধকে সংযুক্ত করিয়া ঐ সংযোগকে একত্ব প্রতীতির অবলম্বন করিয়া তোলে;—তাহা হইলেও অন্য প্রকার সমস্যা উপস্থিত হয়। বলা হইয়াছে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিষয়গুলিই জড়। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এই শক্তি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য পদার্থ নহে বলিয়া জড়ের অতিরিক্ত একটা জিনিস, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু শক্তি পদার্থটা যখন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে, এবং জড়ও নহে, তখন উহার অস্তিত্বের প্রমাণ কি?

পক্ষান্তরে শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধকে জড় না বলিয়া জড়ের গুণ বলিয়াই যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও গুণীস্থানীয় জড়ের সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়ের যে পরিচয় নাই, তাহাও বুঝা যাইতেছে। ইন্দ্রিয় জানে গুণকে, গুণীকে নহে, তবে গুণীকে জানিবে কে? গুণী যদি স্বয়ং প্রকাশ হইয়া গুণের সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করে ইহা বলা যায়, তাহা হইলে ঐ গুণীস্থানীয় জড় আর জড় থাকে না, আত্মার সংজ্ঞাভেদ মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। আত্মা হইতে উহাকে পৃথক বা বিভিন্নরূপে উপলব্ধি করা যায় না। আর যদি গুণীস্থানীয় জড় স্বয়ং প্রকাশ না হয়, তাহা হইলে তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ কি? যাহা হউক, এ সকল দার্শনিক সমস্যা পরিত্যাগ করিয়া আমরা একবার বিজ্ঞানের দিক হইতে জড়ের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিব। তবে একটা কথা বিবেচনা করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিকেরা জড়ের সংজ্ঞা বা স্বরূপ নির্ণয় সম্বন্ধে খুব সূক্ষ্মভাবে কোন কথা বলেন নাই। জড় বস্তুর সত্তা তাঁহারা মানিয়া লইয়াই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। উহার স্বরূপ সম্বন্ধেই তাঁহাদের পরীক্ষা ও অন্বীক্ষা প্রযুক্ত হয়। জড়ের স্বরূপ লইয়া সকল বৈজ্ঞানিকই যে একমত, তাহা বলা যায় না। জড় পরীক্ষার আয়ত্ত হইলেও উহার স্বরূপ সম্বন্ধে যথেষ্ট মত বৈষম্য দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, আমরা ক্রমশঃ তাহা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিতেছি।

১। Matter, Et er and motion by Dolbear; জিজ্ঞাসা ৪০১ পৃঃ।

অনেক বৈজ্ঞানিকের মতে জড় মাত্রা কণিকার সমষ্টি (aggregate of mass-points)। কি প্রকারে এই মাত্রাবিন্দুগুলির উদ্ভব হয় প্রথিতনামা লর্ড কেলবিন (Lord Kelvin) তাহার একটা বিবরণ দিয়াছেন। উহা সংক্ষেপতঃ এই প্রকার। পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে একটা অপরিচ্ছিন্ন, অনবরোধক নিরতিশয় দ্রব পদার্থ (continuous, frictionless, perfect fluid) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সর্ব্বতঃ ব্যাপিয়া বিরাজমান। এই পদার্থটির নাম ঈথর (ether)। কোন অজ্ঞাত কারণ বশতঃ এই অপরিচ্ছিন্ন পদার্থের অংশাবচ্ছেদে এক প্রকার ভ্রমিচক্রের (vortex-rings) উৎপত্তি হয়। এই ভ্রমিগুলি স্থূল সূক্ষ্ম নানাবিধ মূর্ত্তিতে প্রকাশ পায়। সূক্ষ্মতম ভ্রমিগুলিই পরমাণুবাদীর পরমাণু স্থানীয়। অনেক ভ্রমি একত্র মিলিয়া স্থূল ভূত নির্ম্মাণ করে। পরমাণু স্থানীয় সূক্ষ্মতম ভ্রমিচক্রগুলি ঈথরেরই সূক্ষ্মতম মাত্রাবিন্দু। মাত্রা অর্থে পরিমাণ (quantity) কিন্তু এখানে মাত্রা ঈথরেরই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরিমাণ। এই পরিমাণ বা মাত্রার ইংরাজী নাম mass। এই মাত্রাই জড়ের জড়ত্ব। ইহাই জড়ের স্বরূপ। কিন্তু এই মাত্রা নির্গুণ, অতএব স্বরূপতঃ অজ্ঞেয়। শক্তি সম্বন্ধেই উহা সগুণ জড় বস্তুরূপে প্রকাশিত।

যাহা হউক, এই মাত্রাতত্ত্ব আলোচনা করিবার পূর্ব্বে উহার মূলীভূত যে ঈথর বস্তু তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা বাঞ্ছনীয়। কেন না বিজ্ঞান জগতে ঈথরের স্থান কোথায়—এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বোধ না থাকিলে বিশ্বব্যাপারের তত্ত্ব উদ্ঘাটন করা বড়ই কঠিন। কিন্তু এই ঈথরের স্বরূপ এখনও বৈজ্ঞানিকগণ নিরূপণ করিতে পারিয়াছেন কিনা তাহা দৃঢ়তার সহিত বলা যায় না। অনেকে মনে করেন ঈথর পদার্থটি জড়ের উপাদান বটে, কিন্তু স্বয়ং জড়ধর্ম্মী নহে। কেন না জড় বলিতে যে সকল ধর্ম্ম বুঝা যায়, ঈথর তৎবিপরীত ধর্ম্মী। কেহ বলেন উহা তড়িন্ময় পদার্থ, কিন্তু তথাপি উহা জড় নহে। তড়িৎ জড়ের উপাদান, অথচ স্বয়ং অ-জড়। অতএব ঈথরের স্বরূপ সম্বন্ধে একটু বিশেষভাবে চিন্তা করা ও উহার বিশেষণগুলিকে সম্যক বিশ্লেষণ করিয়া দেখা নিতান্তই উচিত। এক্ষণে তাহাই করা যাউক।

১। ঈথর যে perfect fluid, তাহার অর্থ কি?

ইহার অর্থ এই যে, ইহা এত দ্রব যে ইহার মধ্যে চলন্ত কোন বস্তুই ইহা কর্ত্তৃক ঘর্ষণ জনিত বাধা প্রাপ্ত হয় না। অন্যান্য দ্রব পদার্থই তন্মধ্যস্থ চলন্ত বস্তুর বাধা জন্মায়। অন্য সকল দ্রব পদার্থেরই ঘর্ষণ জনিত বাধা দিবার ক্ষমতা আছে। কেবল ঈথরের সেই গুণটি নাই। ইহা সম্পূর্ণ অনবরোধক (absolutely frictionless) পদার্থ। শীতকালে ধূমপান পান করিয়া সেই ধূম জোরে মুখ হইতে নিষ্ক্রান্ত করিলে, দেখা যাইবে, উহা কুণ্ডলীর আকারে আকাশ মার্গে উত্থিত হইতেছে। এই কারণ বারিতে (primitive fluid) সেই প্রকার ঘূর্ণ্যমান কুণ্ডলীর বা ভ্রমি চক্রের (vortex-rings) উৎপত্তি হয়। কিন্তু ধূমের কুণ্ডলী বায়ুর ঘর্ষণে যেমন বিধ্বস্ত হইয়া যায়, ঈথরের কোন প্রকার ঘর্ষণ শক্তি না থাকায়, ঐ ভ্রমি চক্রের মূর্ত্তিগুলি স্থায়িত্ব লাভ করে। নিরতিশয় দ্রব (perfect fluid) হইলেও আবর্ত্তের বেগে ভ্রমি-চক্রের কাঠিন্য উপজাত হয়। বাস্তবিক কাঠিন্য (hardness, rigidity) গতি-বেগ জনিত গুণ বিশেষ।

২। বলা হইয়াছে এই অনবরোধক দ্রব পদার্থের ভ্রমি-চক্রই স্থূল জড় রূপে পরিণত হয়। বেশ কথা। কিন্তু এতাদৃশ পদার্থে ভ্রমি-চক্রের উৎপত্তি সম্ভাব্য কি না তাহা বিচার করিয়া দেখা যাউক। সচরাচর অল্প বিস্তর দ্রব পদার্থে (imperfect fluids) এ প্রকার ভ্রমি-চক্রের উৎপত্তি-নিবৃত্তি আমাদের পরিচিত। সে সকল স্থলে যে যে কারণে ঐ ভ্রমি-চক্রের উৎপত্তি হয় তাহার কতকটা সেই সেই দ্রব পদার্থের আত্মগত; আর কতকটা তাহার বাহ্য। আত্মগত বা আভ্যন্তরীণ কারণের মধ্যে দ্রব পদার্থের অসম্পূর্ণতা (imperfection) ঘর্ষণ (friction) এবং সংশক্তি (viscosity) বাঞ্ছনীয়। যে দ্রব পদার্থে এই ধর্ম্মগুলি নাই; তাহাতে যে ঘূর্ণীর উৎপত্তি হয়, তাহার প্রমাণ কি? ঈথর বস্তুতে এমন কোন ধর্ম্মই স্বীকৃত হয় নাই। উহাকে এক প্রকার অনির্দ্দেশ্য নির্ব্বিশেষ বস্তু বলিয়াই প্রচার করা হইয়াছে। সে অবস্থায় তাহার ভ্রমি-চক্রের উৎপাদন যোগ্যতাই অসিদ্ধ। পণ্ডিত Flint বলেন :—

"But a perfect fluid can neither explain its own existence nor the commencement of rotation in any part of it. Rotations once commenced in a perfect or frictionless and incompressible fluid would continue for ever, but it never could naturally commence. There is nothing in a perfect fluid to account either for the origin or cessation of rotation, and consequently nothing, on the vortex-atom hypothesis, to account either for the production or destruction of an atom of matter. The origin and cessation of rotation in fluids are due to their imperfection, their internal friction, their viscosity.' (Theism pp. 114—115).

অপরিচ্ছিন্ন (continuous) এবং নির্ব্বিশেষ (homogeneous) বাহন পদার্থের (medium) যদি অংশ বিশেষে কোন আবর্ত্ত-গতিই উৎপন্ন হয়, তাহা হইলেও ইহার নির্ব্বাধত্ব ও নির্ব্বিশেষত্ব হেতু, স্থানচ্যুতির পরে ইহার পূর্ব্বোত্তরকালীন অবস্থার কোন বৈশিষ্ট্য উৎপন্ন হইবে না। সুতরাং ঘূর্ণীর বৈচিত্র্য বা বৈষম্য সম্ভবপর হইবে না। এক অখণ্ড স্বগতভেদ শূন্য ঈথরই অবশিষ্ট থাকিবে। Karl Pearson (১) বলেন;

"Treating the ether not as a conception but as a phenomenon, we find it difficult to realise how a *continuous* and *same* medium could offer any resistance to a sliding motion of its parts, for the continuity and sameness would involve, after any displacement, every thing being the same as before displacement. The idea of a perfect jelly appears to involve some change in structure as we magnify smaller and smaller elements larger and larger. Finally, any relative motion of translation as distinct from one of relation seems excluded by the idea of absolute incompressibility.

1. Grammar of Science p. 324.

এ প্রকার দ্রব পদার্থে যদি ভ্রমির (rotation) উৎপত্তি স্বীকার করাও যায়, তাহা হইলেও সে ভ্রমিগুলির পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য ও বৈলক্ষণ্য রক্ষার কোন সম্ভাবনা নাই। যে বস্তু অল্পাধিক পরিমাণে দ্রব—যাহার সংশক্তি গুণ আছে—তাহাতেই ভ্রমি-চক্রের উৎপত্তি প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। যে বস্তু অতি অল্প পরিমাণে দ্রব, তাহাতে উৎপন্ন ভ্রমি-চক্রের স্থায়িত্ব অল্পকাল ব্যাপী; এবং যে বস্তু অধিক পরিমাণে দ্রব, তদুৎপন্ন ভ্রমি চক্রগুলি অপেক্ষাকৃত অধিককাল স্থায়ী; কিন্তু যে বস্তু নিরতিশয় রূপে (perfectly) দ্রব, ভ্রমি-চক্রোৎপাদক কোন দৃষ্ট হেতুর কার্য্য-কারিতা সম্ভবপর নহে। পণ্ডিত Ward বলেন :—

Vortex-rings in an absolutely perfect fluid would remain self-identical and undistinguished for ever; vortex-rings in an indefinitely perfect fluid would so remain, not for ever but indefinitely long. But, *per contra*, vortex-rings in an indefinitely frictionless fluid could be originated through such processes as we find setting up vortices in the imperfect fluids about us; on a perfect fluid such processes would have no hold."

৪। ঈথর এক অখণ্ড পদার্থ বলিয়া অঙ্গীকৃত। যে বস্তু অখণ্ড তাহা সাবয়ব (atomic) হইতে পারে না; কেন না, যাহা সাবয়ব, তাহা ক্ষুদ্রতম অবয়বের (component parts) সংহতি মাত্র। সংহত বা সাবয়ব বস্তুমাত্রেই জন্য ও অনিত্য। যাহা জন্য ও অনিত্য, তাহাকে জগতের মূল প্রকৃতি বলিয়া স্বীকার করা যায় না; এবং সাবয়ব বস্তুর অবয়ব নিরপেক্ষ সত্তা সিদ্ধ নহে। এমন কি উহার অবয়ব রাশিই সত্তাশীল; অবয়ব সত্তাতিরিক্ত সত্তা উহার নাই। ঈথরকে যৌগিক বা সংঘাত পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে আরও এক দোষ আসিয়া পড়ে। উহার অবয়বের মধ্যে ব্যবধান স্বীকার করিতে হয়। এই ব্যবধান অবশ্য শূন্য (empty space)। তাহা না হইলে—অর্থাৎ এই ব্যবধানের মধ্যে যদি অন্য ঈথরের সত্তা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধেও ঐ প্রকার আপত্তি উঠিতে পারে। এই প্রকারে অনবস্থা regresses and infinitism) দোষ উপস্থিত হয়। আবার অবয়বান্তর্গত ব্যবধান শূন্য হইলে সর্ব্ব ভৌতিক বস্তুর পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এই ব্যবধানের এই শূন্যের ভিতর দিয়া হয়, ইহা না মানিয়া উপায় নাই। কিন্তু ভৌতিক বস্তুর এই নিরালম্ব ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া action at a distance বৈজ্ঞানিকগণ শিকার করিতে পরাঙ্মুখ। ইত্যাদি কারণে সাব্যস্ত হইয়াছে ঈশ্বর অখণ্ড বস্তু। অর্থাৎ ইহার অবয়ব নাই। বেশ কথা।

এখানে আপত্তি এই;—যাহার অবয়ব—অংশ নাই, এমন বস্তুর ভ্রমি বা ঘূর্ণী কেবল কোন অংশাবচ্ছেদে হইতে পারে না। উহা বস্তুত যাবত-দ্রব-বৃত্তি হওয়াই উচিত। ঈথ-রের অংশ না থাকায়, ঐ ভ্রমিগুলিকে অংশ বিশেষে সমুৎপন্ন বলিয়া স্বীকার করা ন্যায় সঙ্গত নহে। বিশেষতঃ ঈথর নির্ব্বিশেষ বস্তু; উহার অংশ বিশেষ কল্পিত হইলেও, ঐ কল্পিত অংশেরও কোন বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে না; কেন না তাহাতে নির্ব্বিশেষত্বের হানি হয়।

ইত্যাদি হেতু বশতঃ বলিতে হইবে ঈথরের ঘূর্ণী ব্যাপ্যবৃত্তি, অব্যাপ্যবৃত্তি নহে। অর্থাৎ ঈথরের অখণ্ড আলোড়নে বা ঘূর্ণনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভ্রমি-চক্রের উৎপত্তি হইবে না। ঈথর তাহার অনন্ত বিস্তৃত কায় লইয়া স্বয়ং একাকার ভাবে ঘূর্ণ্যমান হইবে। এক অখণ্ড, সমাকারে ঘূর্ণ্যমান পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হইবে না। খণ্ড খণ্ড জড় বস্তুর উৎপত্তি হইবে না—বৈচিত্র্যের উৎপত্তি হইবে না। পূর্ব্বেও যে নির্ব্বিশেষ ছিল, এখনও সেই নির্ব্বিশেষ থাকিবে। এক্ষণে সুধীগণ বিচার করিয়া দেখিবেন ইহা হইতে জগৎ বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করা কতদূর সম্ভাব্য।

৫। ঈথরের গতির অর্থাৎ আবর্ত্ত গতির (rotation) উৎপত্তি সম্বন্ধেও সন্দেহ বিদ্যমান। প্রথমতঃ ঈথর নির্ব্বিশেষ পদার্থ এবং অনন্ত বিস্তৃত। সুতরাং তাহার বাহিরে কোন বস্তু নাই। যদি বাহিরে কোন বস্তু না থাকে, যদি পারিপার্শ্বিক না থাকে, তবে ঘাত প্রতিঘাতের অভাবে নির্ব্বিশেষ বস্তুর সাম্যভাবের বিচ্যুতি অসম্ভব। অগত্যা বলিতে হইবে ঈথরে যে গতি বিদ্যমান তাহা অনাদি; অর্থাৎ গতি ঈথরের স্বাভাবিক ক্রিয়া; ঈথর যতদিন, উহার গতিও ততদিন। কিন্তু যেহেতু ঈথর নির্ব্বিশেষ বস্তু, সেই হেতু ইহার গতিও সর্ব্বত্র সমাকার (uniform) ; গতির প্রকার ভেদ ও বৈচিত্র্য তবে কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে? বাহ্যকারণ না থাকায় ঐ গতি চিরকাল অভিন্নরূপে চলিতে থাকিবে; এবং ইহার দিক (direction) ও হার (rate) সর্ব্বদা একই প্রকার থাকিবে; তাহার কিছুমাত্র ইতর বিশেষ হইবে না। পক্ষান্তরে এই ঈথর যদি গোড়া হইতেই নিশ্চল থাকে, তবে তাহার গতি সত্বাই বাহ্যকারণ নিরপেক্ষ অব্যাখ্যেয় হইয়া পড়ে। পণ্ডিত Stalls বলেন:—

But apart from this, it is plain that the derivation of the forms and movements of the stiller and planetary systems from a primordial homogeneous mass uniformly diffused through out space is impossible. In the first place, such a mass must be either at rest or in uniform motion, and this state of rest, or uniform motion according to the most elementary principles, could be changed only by extraneous impulses or attractions. And there being no 'without' to the all—embracing cosmos or chaos, the original state of rest or uniform motion would necessarily be perpetuated. (Concepts of Modern Physics.)

মহামতি Clifford তাঁহার "Lectures and Essays" নামক গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ২৩৮ (*f*) পৃষ্ঠায় বলিতেছেন :—

"A true explanation describes the previous unknown in terms of the known ; thus light is described as a vibration, and such properties of light as are also properties of vibrations are thereby explained. Now a perfect fluid is not known a thing, a pure fiction. The imperfect liquids which approximate to it, and from which

the conception is derived, consist of a vast number of small particles perpetually interfering with one another's motion....... Thus a liquid is not an ultimate conception, but is explained—it is known to be made up of molecules ; and the explanation requires that it should not be frictionless. The liquid of Sir William Thompson's hypothesis is continuous, infinitely divisible, not made of molecules at all, and it is absolutely frictionless. It it as much a mere mathematical fiction as the attracting and repelling points of Boscovich.

৬। ঈথরকে যে দ্রব (fluid) পদার্থ বলিয়া বর্ণনা করা হয়, সে বর্ণনাও সত্য হইতে অনেক দূরে। দ্রবত্ব, কাঠিন্য, বাষ্পীয়ত্ব তরলত্ব, প্রভৃতি ধর্ম্ম অবয়বের সংস্থান সংঘটিত। নিরবয়ব পদার্থে তাহাদের আরোপ সর্ব্বথা অযৌক্তিক। ইহারা নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম (definite qualities); কিন্তু ঈথর অনির্দ্দেশ্য; সুতরাং দ্রব, কঠিন, বাষ্পীয় ইত্যাদি কোন প্রকার বিশিষ্টতাবোধক বিশেষণই তাহাতে প্রযোজ্য নহে। অধ্যাপক Lodge বলেন—

"Ether is often called a fluid, or a liquid, and again it has been called a solid...........but none of these names are very much good ; all these are molecular groupings and therefore not like ether ; but let us think simply and solely of a continuous frictionless medium possessing inertia, and the vagueness of the motion will be nothing more than is proper in the present state of our knowledge.—The Ether and its functions.

৭। যদি আমরা অধ্যাপক Lodge এর অনুরোধে ঈথরকে উক্ত লক্ষণে লক্ষিত করি তাহা হইলে ফলে কি দাঁড়ায়? দাঁড়ায় এই যে, ঈথরে ও শূন্যে (space) কোন বৈলক্ষণ্য থাকে না। ঈথর যেমন অসংকোচ্য (in compressible) অবিস্তার্য্য (ineaxtensible) নির্ব্বাধ (frictionless) নির্ব্বিশেষ Structurelessএবং অনন্ত (infinite) শূন্যও সেই প্রকার বিশেষণে বিশেষিত। সুতরাং উভয়ের পার্থক্য না থাকায় ঈথর-বাদ শূন্যবাদে পরিণত হইয়া পড়ে। ইহাই কি বিজ্ঞানের চরম পরিণতি?

কেহ উত্তর করিতে পারেন—এ সকল ধর্ম্মে ঈথর ও শূন্যের কোন ভেদ নাই বটে, কিন্তু ঈথরের মাত্রা (mass) বা জড়ত্ব (inertia) আছে, শূন্যের তাহা নাই। এই মাত্রা বা জড়ত্বই উভয়ের ভেদক ধর্ম্ম। এ কথার জবাবে অধ্যাপক Ward যাহা বলিয়াছেন অনতিবিলম্বে তাহা বিবৃত হইবে। আপাততঃ এই ঈথর সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক শিরোমণি Haeckelএর মতটা একটু বিচার করিয়া দেখা যাউক।

মহাত্মা হিকেলও ঈথরের ঐ প্রকার লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন। তবে কেলবিণের ন্যায়, তাহাতে ভ্রমি-চক্রের উদ্ভব হয়, তাহা তিনি স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে ঈথরে একটা শক্তি আছে, যাহাকে সান্দ্রতা প্রবৃত্তি বা প্রবণতা (tendency to con-

densie—to contract)। এই প্রবণতা বশতঃ ঈথর সমুদ্রে অসংখ্য সান্দ্রতার কেন্দ্র (centres of condensation) সমুৎপন্ন হয়। জমাট বাঁধিবার তারতম্য হেতু ঐ কেন্দ্র নিচয়ের আয়তনের হ্রস্ব দীর্ঘতা ঘটে; কিন্তু ঐ কেন্দ্রগুলির আয়তন অনপায়ী। ইহারা পরমাণুবাসীর পরমাণুর অনুরূপ। অনেক-গুলি কেন্দ্র সম্পিণ্ডিত হইয়া মহৎ পরিমাণ পিণ্ডের আবির্ভাব হয়। ইহাদের প্রভাব সন্নিহিত অপরাপর পিণ্ডের উপর প্রসারিত হয়। এই প্রণালীতে মৌলিক ঈথরের সাম্যাবস্থাও বিপর্য্যস্ত হইয়া নানাবিধ বিচিত্র বস্তুর অভিব্যক্তি হয়। (১)

উপরি-উক্ত মতের বিরুদ্ধে দুইটি প্রধান আপত্তি আছে। "Religion as a credible doctrine" নামক গ্রন্থ প্রণেতা Mallock তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম আপত্তি এই :—

The ether, as we have seen, is structureless, homogeneous, the same always and everywhere. Why then, if it tends to condense into ponderable matter at all, does it tend to condense in one place more than in another ? How do the atoms which result from its condensation acquire that variety of character to which their subsequent contributions are due ? In a word, how does absolute simplicity resolve itself into specific complexity ?

তাঁহার দ্বিতীয় আপত্তি :—The elementary substance either consists of minute separate particles, or it is continuous. If it consists of disjoined atoms, separated by empty spaces, all action must be "an action at a distance" which science rejects as absurd and impossible. If it is continuous yet the atoms of ponderable matter arise from it by condensation then we are postulating condensation and rarefaction in a substance which has no particles to be pushed closer together or thrust wide asunder. But the elementary substance must be one or the other so that in either case we accept a contradictory proposition ."

ইহার তাৎপর্য্য এই প্রকার। ঈথরীয় পরমাণুর মধ্যে ব্যবধান স্বীকার করিলে শূন্যের মধ্যদিয়া জগতের ক্রিয়াদি হয় ইহাও স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু ইহা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ, এবং যে বস্তুর পরমাণু নাই, তাহার সান্দ্রভাব কল্পনা ইহাও স্ববিরোধী। এই বিকল্পের যে পক্ষই ধরা যায়, এই প্রকার সমস্যা দুর্ণিবার হইয়া পড়ে।

এক্ষণে দেখা যাউক, শূন্য হইতে ঈথরের পার্থক্য কোথায়। বলা হইয়াছে ঈথরের মাত্রা বা জড়ত্ব আছে, শূন্যের তাহা নাই; সুতরাং ইহাদ্বারাই ঈথরকে শূন্য হইতে পৃথক করিতে হইবে। আচ্ছা জড়ত্ব বা

(১) The Riddle of the Universe—R. P. A. series pp. 77-78 and 81. (মূলপ্রকৃতির নাম "Prothyl")।

জাড্য জিনিসটা কি, উহা নিরূপণের উপায় কি ?

"পদার্থবিদ্যা এই উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ধাক্কা দিবার ও ধাক্কা খাইবার ক্ষমতাই জড়ত্ব। এই ক্ষমতা দেখিয়া বস্তুর মাত্রা নিরূপিত হয়। যে কোন দ্রব্যে ধাক্কা দিলে উহা বিচলিত হয়, অর্থাৎ কতকটা বেগ অর্জ্জন করে। যদি সমান ধাক্কা খাইয়া সমান বেগে চলিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে উহাদের উভয়ের বস্তু সমান বলিয়া গৃহীত হয়। যদি সমান বেগ অর্জ্জন না করে, তাহা হইলে উভয়ের বস্তু অসমান বলিয়া গণ্য হয়। যেটার বেগ অধিক হইবে, সেটার বস্তু অল্প যেটার বেগ অল্প হইবে সেটার বস্তু অধিক * * * * * * পরস্পরের ধাক্কা খাইয়া যাহা অধিক বিচলিত হয় তাহাতে অল্প বস্তু ও যাহা অল্প বিচলিত হয় তাহাতে অধিক বস্তু আছে। দুই সমান বস্তু সমান ধাক্কা পাইয়া সমান বেগই অর্জ্জন করে। বস্তু পরিমাণের ইহাই বিজ্ঞান সম্মত উপায়। ওজন করিয়া বস্তু নির্দ্দেশের চেষ্টা অনুচিত, কেননা, স্থানভেদে ভারের তারতম্য হয়; কিন্তু যাহাকে বস্তু বলিতেছি, যাহা জড়ের জড়ত্ব, স্থানভেদে তাহার কোন তারতম্য হয় না। * * * পূর্ব্বে বলিয়াছি ধাক্কা খাইবার ক্ষমতা দেখিয়া বস্তুর নিরূপণ হয়, জড়ের জড়ত্ব প্রতিপন্ন হয়। ঘোড়া হঠাৎ ছুটিলে সওয়ার পিছনে ঝুঁকিয়া পড়েন; ঘোড়া থামিলে সওয়ার সম্মুখে টলেন; ইহাতে প্রতিপন্ন হয় ঘোড়া এবং সওয়ার উভয়েরই দেহ জড়ত্বযুক্ত।"*

ত্রিবেদী মহাশয়ের বাক্যগুলির অর্থ বুঝিতে আমার একটু গোল হইতেছে। তিনি একবার বলিতেছেন "ধাক্কা দিবার ও ধাক্কা খাইবার ক্ষমতাই জড়ত্ব"; আবার বলিতেছেন "বস্তুই জড়ের জড়ত্ব।" অতএব গোল হইতেছে ব্যাপারটা কি! ক্ষমতাই কি বস্তু? আমরা কি বলিতে পারিব, জড়ত্ব = ক্ষমতা = বস্তু? আবার উদ্ধৃত বাক্যের শেষাংশ দেখিয়া মনে হয়, তিনি যেন inertiaকেই জড়ত্ব বলিতেছেন। কিন্তু inertia ক্ষমতা নহে, বরং ক্ষমতার অভাব। জড়ের জড়ত্ব কি? Mass। Mass কি? মাত্রা বা পরিমাণ। কিসের পরিমাণ? ইহার উত্তরে যদি বলা যায়, quantity of matter অর্থাৎ জড়ের মাত্রা, তাহা হইলে ফলে এই প্রকার দাঁড়ায়—জড়ত্ব = জড়ত্বের মাত্রা। কিন্তু ইহার কোন অর্থ হয় না। অতএব mass অর্থে মাত্রা বলিলেও, কিসের মাত্রা, তাহা না জানিতে পারিলে জড়ত্বের কোন ধারণা হয় না। সেইপ্রকার Mass অর্থে 'বস্তু পরিমাণ' গ্রহণ করিলেও যে পর্য্যন্ত ঐ বস্তুটির স্বরূপ জানা না যাইবে সে পর্য্যন্ত জড়ত্বের কোন পরিস্ফুট ধারণা হইবে না। মনে রাখিতে হইবে আমাদের প্রশ্ন "জড়ত্ব কি?" সুতরাং জড়ের ভাষায় উহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিলে চলিবে না।

যাহা হউক এই mass বা বস্তুমাত্রা জিনিসটা কি তাহার সম্বন্ধে একটু বিশেষ-ভাবে চিন্তা করা যাউক। পণ্ডিতবর Ward এই বস্তুতত্ত্ব বুঝাইতে যাইয়া বলিতেছেন:—

"To each body a number is to be assigned, such that the changes of their motion are inversely proportional to these numbers. Such number answers to the mass of the

* ৪০২, ৪০৭, পৃঃ।

body to which it belongs. Its determination, of course, in any real case involves measurement, and is the business, not of abstract dynamics, but of experimental physics. The actual number again depends on the standard employed, but, once so determined, by dynamical transaction with the standard it is determined once for all for every other dynamical transaction with other masses numbered according to the same unit. The appropriateness of defining mass as quantity of intertia, i.e. as the measure of that tendency to persistence of the *motor status quo* which preceded the particular dynamical transaction under investigation, is thus evident, for the greater the mass, the less in any given case the change of motion that ensues ; the less the mass the greater the change of motion—kinematically estimated of course. Thus, if the mass of one of the two bodies is infinite, its kinematic circumstances are unaltered ; if the mass of one be zero, that of the other, however small, under goes no acceleration ; where both are equal, the acceleration of both are equal ; and so for every other case. So far then from falling under the category of substance, a mass as it occurs in abstract dynamics is but a coefficient affecting the value of the acceleration to which it is affixed. *

উপরি উদ্ধৃত বাক্য হইতে বুঝা যাইতেছে mass=inertiaর মাত্রা। এ জিনিসটায় mass অধিক, ইহার অর্থ এ জিনিসটায় inertiaর মাত্রা অধিক। কিন্তু এই inertia একটা দ্রব্য (substance) নহে, একটা অভাবাত্মক ধর্ম্ম (negative property)। ইহাকে ক্ষমতা বলা সঙ্গত কি না তাহা বিবেচ্য। আমার মনে হয় সঙ্গত নহে, বরং ইহাকে ক্ষমতারাহিত্য বলিলে সত্যের অনেক কাছাকাছি হয়। ইহার অর্থের প্রতি দৃষ্টি করিলেই সন্দেহ বিদূরিত হইতে পারে। ইহার অর্থ "inability of matter to alter its existing state." ইহার বাঙ্গালা প্রতিশব্দ কি হইবে ঠাহর করিতে পারিতেছি না।

বোধ হয় ইহাকে 'স্ব-ভাব-স্থিতি-সংস্কার' বলা যাইতে পারে। এই সংস্কার আছে বলিয়াই চলন্ত দ্রব্য নিজের বেগ বাড়াইতে বা কমাইতে পারে না, একই ভাবে চলিতে থাকে ; অথবা স্থির দ্রব্য গতিশীল হইতে পারে না। অতএব স্ব-ভাবের পরিবর্ত্তন করিতে না পারাই inertiaর বা স্ব-ভাব স্থিতি সংস্কারের অর্থ।

গতির বেগ দ্বারা এই সংস্কারের নিরূপণ করা চলে বটে, কিন্তু সমস্ত দ্রব্য সম্বন্ধেই উহা সম্ভবপর। যেখানে দ্রব্যটি অসীম, সেখানে ধাক্কা দিবার ও ধাক্কা খাইবার কথা

* Naturalism and Agnosticism.—p.p. 59. Vol. I.

উঠিতে পারে না। ঈথরের mass থাকিলে তাহাও যেমন অপরিমেয়, ঐ সংস্কারের মাত্রাও তেমনি অপরিমেয়। কিন্তু অপরিমেয় মাত্রা এই দুটা শব্দ পরস্পর বিরোধী। অপরিমেয়ের সম্বন্ধে মাত্রা শব্দ ব্যবহার করা যুক্তি সঙ্গত নহে। অসীম দ্রব্য সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইলে পরিমাণ গুণের পর্য্যায় হইয়া দাঁড়ায় (quantity becomes quality)।

এক্ষণে যদি আমরা প্রশ্ন করি জড়ের জড়ত্ব কি? তাহার উত্তরে বলা যায় mass, অর্থাৎ quantity of inertia, অর্থাৎ স্ব-ভাব-স্থিতি সংস্কারের মাত্রা। তাহা হইলে জড় হইতেছে তদ্বিশিষ্টতা, অর্থাৎ ঐ সংস্কার বিশিষ্টতা। তাহাই জড় যাহা ঐ সংস্কার বিশিষ্ট।

কিন্তু এই সংস্কার বিশিষ্টতার দ্বারা অসীম দুইটি পদার্থের মধ্যে ভেদ নির্দ্দেশ করা দুরূহ। ঈথর অসীম; শূন্যও অসীম; এস্থলে যদি বলা যায় এই সংস্কার বিশিষ্টতা থাকায় ঈথর শূন্য হইতে ভিন্ন তাহা হইলে বাস্তব ভেদ নিরূপিত হয় না। কেন না, পূর্ব্বে বলিয়াছি এই সংস্কারটি অভাবাত্মক ধর্ম্ম (negative property)। এই অভাবাত্মক ধর্ম্ম দ্বারা ইহাকে শূন্য হইতে ভেদ করা যায় কি প্রকারে? যদি কেহ আপত্তি করেন, "শূন্য নিজেই অভাবাত্মক; ঈথর ভাবাত্মক সুতরাং ঈথর শূন্য হইতে পারে না।"—ইহার প্রত্যুত্তরে বক্তব্য, ঈথর অতীন্দ্রিয় পদার্থ; শূন্যও অতীন্দ্রিয় পদার্থ; ঈথরের সত্তা প্রমাণাধীন; শূন্যের সত্তাও প্রমাণাধীন। যে ধর্ম্ম দ্বারা ঈথরের সত্তা সিদ্ধ হইবে, সে ধর্ম্ম দ্বারা শূন্যের সত্তাও সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, যে সকল ধর্ম্ম দ্বারা ঈথরের সত্তা সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করা হয়, সে সকলগুলি অভাবাত্মক ধর্ম্ম। একটিও ভাবাত্মক নহে। ঈথর নিরবয়ব (structurcless), নির্ব্বিশেষ (distinction less), অপ্রতিরোধক (frictionless), অসংসক্তি (wanting in viscosity), অসংকোচ্য (in comp ressible, অবিস্তার্য্য (inextensible), অসীম (infinite)। এক্ষণে কেবল দেখিতেছি উহার mass আছে। কিন্তু এই mass ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছি উহা স্ব-ভাব-স্থিতি সংস্কারের মাত্রা। স্বভাবস্থিতি সংস্কারের অর্থ, স্বভাবের অন্যথা ভাব করিবার অক্ষমতা (inability to alter its existing state),। সুতরাং ইহাও অক্ষমতার পরিচায়ক। ইত্যাদি কারণে ঈথরকে শূন্য হইতে ব্যাবৃত্ত করিবার উপায় কি?

পুনরায় আপত্তি হইতে পারে, শূন্যের সান্দ্রত্ব (density) নাই, ঈথরের সান্দ্রত্ব আছে; ইহাই উহার ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম! সান্দ্রত্ব বিশিষ্টতাই ঈথরকে শূন্য হইতে স্বতন্ত্র করিতেছে। এ আপত্তিও অসার। কেনন', ঈথরের সান্দ্রত্ব, অনুভবের হিসাবে, কিছুই নহে। উহার কোন প্রকার হ্রাস বৃদ্ধি বা পরিবর্ত্তন নাই। বিশেষতঃ গতি-বিজ্ঞান অনুসারে গতি সান্দ্রত্ব-সাপেক্ষ নহে সুতরাং সান্দ্রত্ব থাকিলেও উহার সার্থকতা নাই। উহা না থাকিলেও যাহা হইত, থাকিলেও তাহা হইতে পারে; উহার অস্তিত্ব ঈথরের বিশিষ্টতার নিয়ামক নহে। আবার নিরবয়ব দ্রব্য সান্দ্রতা বিশিষ্ট কি প্রকারে হইতে পারে, তাহাও বুঝা যাইতেছে না। ঈথর হইতে ভ্রমি-চক্রের উৎপত্তি যেমন একটা পৃথক ও বিস্ময়কর ঘটনা; শূন্য হইতে উহার উৎপত্তি তদপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়কর ব্যাপার নহে।

স্ব-ভাব-স্থিতি সংস্কার বিষয়টা কি ও তাহার দ্বারা ঈশ্বরের সত্তা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইতে পারে কি না Ward তাহার সম্বন্ধে যে গবেষণা করিয়াছেন তাহা পাঠকের কৌতুহল চরিতার্থ উদ্ধৃত করা গেল।*

কেহ বলিতে পারেন ঈশ্বরকে নিষেধমুখে (negatively) লক্ষিত না করিয়া বিধিমুখেও (positively) লক্ষিত করা যায়। ঈশ্বর মাত্রা বিশিষ্ট (massive), নিয়তসান্দ্র (of constant density), নিরতিশয় চলস্বভাব (perfectly mobile), অত্যন্ত এক রস (absolutely homogeneous) অত্যন্ত দ্রব (perfectly fluid)—এ প্রকার বলিলে ঈশ্বরকে ভাবমুখেই ব্যক্ত করা হয়। নিষেধ মুখে বর্ণনা একটা কথার মারপেঁচ মাত্র, তাহাতে উহার সত্তার বাধা হয় না। এ আপত্তিটি আপাতরমণীয়, কিন্তু বিচারসহ নহে। ঈশ্বরের বিশেষণগুলিকে বিশ্লিষ্ট করিলে ইহারা যে নিষেধমুখী বিশেষণ তাহা বুঝিতে পারা যায়। যে সকল ভাবমুখী বিশেষণ ঈশ্বরে আরোপিত হইয়াছে, তাহাদের বিশেষণ গুলির সহিত একত্র গ্রহণ করিলে, ঐ ভাবমুখী বিশেষণগুলিও নিষেধমুখে পর্য্যবসিত হয়! বিশেষতঃ সাপেক্ষ ভাবের সহিত (with relative ideas) নিরপেক্ষ ভাবের (absolute ideas) সংমিশ্রনে প্রতি-

* "Inertia is a qualitative term and in its primary sense of inability or incapability is obviously negative. So young defined inertia as the incapability of matter to alter its existing state except under the influence of some external cause. To allow that this universal plenum has inertia then does not remove its indeterminateness. Before it can be determined in any way, some cause must intervene from without, and such intervention will not admit of physical description. Such cause is of the nature of creation or miracle ; it is neither a force in the sense of attraction or repulsion by which Boscovich and Kant sought to explain matter, nor is it force in the modern sense of mass-acceleration. In other words, in the kinetic ideal of matter we shall find that the notion of mass is used with two distinct and inconsistent connotations. Abstract Mechanics, as we have seen, sets out from definite masses or bodies having assignable positions, between every two of which there are dynamical transactions. *Two* masses, that is to say, measure each other by their mutual accelerations ; in other words, mass is a strictly quantitative notion, and as such implies a relation to a standard. Not only is mass in this wise always a relative quantity, but it is relative again in implicating the correlative notion of moving forces or stress between masses which, as just said, is the only means of determining mass. If we attempt to apply this notion of mass to a universal homogeneous plenum, it lapses back into merely the qualitative notion of incapability of change evenly diffused through all immensity. And definite forces—necessarily present where there are definite masses to interact—seem here excluded. . . . . Every thing chemical or thermal or electrical is excluded, for the medium is throughout homogeneous and structureless. In like manner gravity, elasticity, and cohesion seem incompatible with absolute inviscidity and uniform density. Accordingly, to secure stability, when this medium is churned up into a labile ether it must be provided with a fixed boundary or be extended to infinity. Mathematically these alternatives may come to the same thing, though the latter, *i.e.*, infinite extension, seems the simpler and less arbitrary of the two, again showing how little there is to choose between a vacuum and this plenum (Naturalism and Agnosticism Vol. I—p. 133.)

পাদ্য বস্তুটি আরও দুর্ব্বোধ্য করা হয়, সুগম করা হয় না। ধ্রুব ভাবটি সাপেক্ষক; কিন্তু উহার বিশেষণটি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষক। এই প্রকার অন্যত্র।

অতএব দেখা যাইতেছে ঈথরের এমন কোন ধর্ম্মই উপপন্ন হইতেছে না যদ্দ্বারা উহাকে শূন্য হইতে বিশেষিত করা সম্ভবপর। ঈথরে inertia অর্থাৎ স্বভাব-স্থিতি-সংস্কার আছে। যাহা এই সংস্কারের আশ্রয়, তাহা তদতিরিক্ত বাহ্যশক্তির ক্রিয়া ব্যতীত স্বয়ং প্রবৃত্ত হইতে পারে না। তাহার প্রবৃত্তি তাহার স্বায়ত্ত নহে, অন্য হইতে আগত। এমন বস্তুর সঙ্ক্ষোভ বা আবর্ত্ত পরায়ত্ত। যাহার প্রবৃত্তি ও সত্তা পরতঃ সিদ্ধ, তাহাকে জগতের মূল প্রকৃতি বলা সঙ্গত কি না সুধী-গণের বিচার্য্য। গতি-বিজ্ঞানের প্রথম সূত্র বাধিত হয় বলিয়া ঈদৃশ বস্তুর স্বাধীন প্রবৃত্তিও স্বীকার করা যায় না।

শ্রীপ্রফুল্লনাথ লাহিড়ী।

রবির রবি

কোথাও সে ত লুকায়ে নাই　　জ্বালিছ মিছে প্রদীপচয়
সে ত গো নহে ঘন তমসালিপ্ত,
অতীন্দ্রিয় করেছে তারে　　আলোর ভূমা, অভাবে নয়
ভানুর ভানু সে যে গো মহাদীপ্ত।

অযুতরবি জ্বেলেছে যেবা　　সেকি গো কভু আঁধারে রয়,
আলোকজালে হারালে পথভ্রান্ত,
ভানুরে কেবা হেরিতে বলো　　প্রদীপ জ্বালে গগন ময়,
আলোর ভূমা হয়েছে তব ধ্বান্ত।

তাহার পানে চাহিতে ওগো　　ঝলসি যাবে তোমার চোখ
আগুন হয়ে উঠিবে সারাগাত্র,
যে আঁখি তব ঝলসি যায়　　সে আঁখি তব দগ্ধ হোক্
চাহিতে হবে তবুও অহোরাত্র।

যে আঁখি তব তাহার তেজ　　সহিতে কভু পারেনা হায়
দগ্ধ হলে সে আঁখি সন্দিগ্ধ,
অন্তরে যে খুলিবে তব　　নূতন আঁখি উজল ভায়
রৌদ্র হবে চন্দ্রালোক স্নিগ্ধ।

ফুটিলে সেই মনের আঁখি　　ইন্দু হয়ে দীপ্যমান
সে যে গো প্রাণকুমুদে সুধা বণ্টে
কঠোর তপে দেহের আঁখি　　কোটর গত হইলে ম্লান
প্রাণের আঁখি হেরে গো নীলকণ্ঠে।

শ্রীকালিদাস রায়

সৈয়দ মর্ত্তুজার নূতন পদাবলী

মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে সৈয়দ মর্ত্তুজার সদৃশ কবি খুব কম। তাঁহার মত এত পদ মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে আর কেহ রচনা করেন নাই। তাঁহার রচিত বহু পদ পাওয়া গিয়াছে সে গুলি বঙ্গের বিভিন্ন মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়া ইতিপূর্ব্বেই বাঙ্গালী পাঠকবর্গের গোচরীভূত হইয়াছে। কয়েক বৎসর হইল রাজসাহী—ঘোড়ামারানিবাসী সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল মহাশয় আমা হইতে সংগ্রহ করিয়া নিয়া মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী বিভিন্ন খণ্ডে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। সৈয়দ মর্ত্তুজার জীবনী প্রভৃতি তৎকর্ত্তৃক বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গৃহস্থেও সৈয়দ মর্ত্তুজার সম্বন্ধে একবার আলোচনা করিয়াছিলাম। এজন্য তাঁহার সম্বন্ধে এখানে আর বেশী কিছু বলা আবশ্যক মনে করি না।

সম্প্রতি প্রাচীন পুঁথির সন্ধান করিতে করিতে একখানি অতি প্রাচীন 'রাগনামা' (গ্রন্থ) আমার হস্তগত হইয়াছে। তাহাতে হিন্দু মুসলমান বহুল কবির বহুল পদাবলী সংগৃহীত রহিয়াছে। তন্মধ্য হইতে সৈয়দ মর্ত্তুজার নূতন পদগুলি বাছিয়া লইয়া অদ্য 'গৃহস্থের পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম। পদগুলি যেমন পাইয়াছি, বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন না করিয়া তেমনই উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি।

রাগ—ধানশী।

আমি সে তোহ্মার নাথ আহ্মি সে তোহ্মার।
সবে মাত্র বুলিএ আহ্মার। ধু।
মনে জানে তনের কথা কারে বা বুঝাইমু।
আহ্মার ধন তোহ্মারে দিআ তোহ্মার হৈআ রৈমু॥
বার মাসের তের ফুল ফুটিআ রৈল ডালে।
আমার প্রভু ঘরে নাই ফুল গাথিআ দিমু কার গলে॥
বার মাসের তের ফুল ফুটিছে স্থাবরে।
মুই নারীর করম দোষে ফুল ঝরিআ ঝরিআ পড়ে॥
ঐ কুলে বন্ধুর বাড়ী মধ্যে ক্ষীর নদী।
উড়ি জাইতুম সাধ করে পাখা না দে(য়) বিধি॥
ছৈঅদ মর্ত্তুজাএ কহে এহি বার বার।
ঝরিল বৃক্ষের পত্র ন লাগিব আর॥ ১।

রাগ—ধানশী।

দারুণ পূআ হামো না বোলাএ।
দারুণ জীউ মোর ধরান না জাএ ॥ ধু।
একহি শশুরি মোর বহুল সতীন।
সব ভেল ভাগ্যবতী হাম ভেল হীন ॥
বসন চরাইমু অঙ্গে মুড়াইমু কেস।
ঘরে ঘরে পূআ লাগি করিমু উদ্দেশ ॥
শিঙ্গা ফুকিমু রে ডুমুরু বাজাইমু।
দেশে দেশে পূআর লাগি ভিক্ষা মাগি খাইমু ॥
ছৈঅদ মর্ত্তুজাএ কহে হাম অভাগিনী।
জীবনের সাধ নাই তেজিমু পরানি ॥ ২।

রাগ—মালব।

সজনি গো সই তুহ্মি নাকি আহ্মারে বোল।
কালিআ কানুর বাঁশী বোলে কথ রোল ॥ ধু।
দেখা নাহি শুনা নাহি নাহি পরিচয়।
তেকারণে কানাইর বাঁশী রাধার নাম লএ ॥
চূড়াএ শিখণ্ডী পুষ্প জলধর কালা।
বআনে পুরল বাঁশী কদম্ব সে হেলা ॥
শুনিতে বাঁশীর ধ্বনি পিকরব জিনি।
হেলাএ হরল মন কুলের কামিনী ॥
ছৈঅদ মর্ত্তুজাএ কহে আধা সোণা বাঁধা।
নাম ধরি ডাকে বাঁশী মোর নাম রাধা ॥ ৩।

রাগ—ধানশী বেলাবলী।

জানি জানি অগো রাই
কালা জাইবে আহ্মারে ছমুজাই ॥ ধু।
কালা জাইব নাএ নাএ আহ্মি জাইমু তরে।
কালার আহ্মার হৈব দেখা ঐ কদম তলে ॥
ঐ কুলে কালার বাড়ী মাঝে ক্ষীর নদী।
উড়ি জাইতুম সাধ করে পক্ষ না দে(য়) বিধি ॥

ঐ কুলে বাজাএ বাঁশী ঘরে বসি শুনি
কিরূপে হইমু পার কোলে জাদু মণি ॥
ছৈঅদ মর্ত্তুজা কহে শুন বনমালি।
পালিআ পুসিআ জৌবন কারে দিমু ডালি ॥ ৪

রাগ—রামক্রিয়া ভাটীয়াল

সখি নাগর কানাই বিনে আর জীব না।
আর জীব না রে সখি আর জীব না ॥ ধু।
পৃআ পৃআ করিআ বালুশে দিলুম কোর।
উলটি পলটি দেখম পৃআ নাহি মোর ॥
কলসীত জল নাহি জমুনা বহু দুর।
চলিতে না চলে পাও চরণে নেপুর ॥
ঘরে আছে গুরু জন তারে না ডরাই।
মনের ভরমে আহ্মি কানুরে হারাই ॥
কেহো বোলে কালা কালা কেহো বোলে শ্যাম।
মুছলমানে কল্‌মা পড়ে হিন্দু বোলে রাম ॥
ছৈঅদ মর্ত্তুজা কহে প্রেম অনুদিন।
রাধা কানুর এক প্রাণ শরীর নহে ভিন ॥ ৫।

রাগ—কানাড়া

রে শ্যাম তোহ্মার মুরলি বড় রসিয়া। ধু।
উচ্চ স্বরে বাঁশী বাজে কুলের কামিনী সাজে
কোটি কোটি চান্দ পড়ে খসিআ ॥
তোহ্মার হৃদের মাঝে অমূল্য রতন আছে
দেখিলে গোপিনী নিব কাড়িআ।
নন্দের ছাওআল বুলি পন্থে করে ঠেলাঠেলি
কেলিআ কদম্বতলে বসিআ ॥
সাধিতে আপনা কাজ তাত নাহি কুল লাজ
জলের নিঅরে রৈলাম বসিআ।
ছৈঅদ মর্ত্তুজা কহে পর কি আপনা হএ
কলঙ্ক রহিল জগ ভরিআ ॥ ৬।

রাগ—নট গান্ধার।

মন মোর কি দিআ বান্ধিমু।
আজু কালু করি মন কথেক ভাবিমু * ॥ ধু।
উঠিল তরঙ্গ ঢেউ প্রাণি থর থর।
প্রিআ বিসরণে মোর ঝুরে নিরন্তর ॥
আপনা করম দশা কি বুলিমু কারে।
খেমা কর অপরাধ কৃপা কর মোরে ॥
ছৈঅদ মর্ত্তুজা কহে তেজিলুং সংসার।
পরাণের বৈরী হৈল পিরীতি তোমার

রাগ—তুরি ভাটিয়াল।

শ্যাম আর না লএ মনে।
ভুবন মোহন রূপ লাগিছে মরমে ॥ ধু।
মণিময় কুণ্ডল কর্ণেতে দোলে।
নব রঙ্গ বনমালা হিআর মাঝে লোলে ॥
চরণে শরণ লৈলুম ন ভাসিঅ ভিন।
সহজে অবলা মুঞি পরের অধীন ॥
ছৈঅদ মর্ত্তুজা কহে রসময় শ্যাম।
চরণে শরণ লৈলুং পাইআ নিজ নাম ॥ ৮।

তুরি গৌরী আছোয়ারী।

মজাইলু রে জাতি রসিয়া নাগরের হাতে। ধু।
তুহ্মি বন্ধু বাজাও বাঁশী আমি মরি লাজে।
কলঙ্ক রহিল রাধের গোকুল সমাজে ॥
এক হাতে গুআ বন্ধু আর হাতে পান।
জাহার বন্ধুআ তুহ্মি তাহার পরাণ ॥
ছৈঅদ মর্ত্তুজা কহে প্রেমের জ্বালা কালা।
ষোল শত গোপিনীর মধ্যে রাধা গলার মালা ॥ ৯

---

* 'ভাবিমু' স্থলে 'ভারিমু' (ভাঁড়িমু) ও পাঠ করা যায়। ভাঁড়িমু—প্রবঞ্চনা করিব।

ঠশা মালশী রাগ।

সই বোলম্ মুই জীব না লো কানু আনিআ দে।
কালার ভাবে চিত বেআকুল আকুল করিআছে ॥ ধু।
চুরা নহে কলা নহে দধি মাখিআ খাইতুম।
ঝলক দাপন নহে মুঞি নঅন ভরি চাইতুম ॥
কাম সিন্দুর নহে রে মুঞি তুলি দিতুম শীষে।
বন্ধুর ভাবে চিত বেআকুল অঙ্গ ছাইছে বিষে ॥
চান (চান্দ) বেকা কান বেকা ঐ কদম তটে।
চাম্পা কলিকার ফুল প্রতি ঘটে ঘটে ॥
ছৈঅদ মর্ত্তুজা কহে ঘটের কামনা।
মথুরা পুরেতে গেলে পাইবা সেই জনা ॥ ১০।

তুরি পটমঞ্জরী।

জোবন গেল মোর রে। ধু।
হেদে রে সজনী সই রে দুঃখ হৈল সার।
হারাইলু লাখের জোবন ন পাইমু আর ॥
আবাল আছিলু ভালে কি হৈল বাড়িআ।
দিনে দিনে বাড়ে জোবন পাঞ্জর ভেদিআ ॥
হাটে জাম মুঞি ঘাঠে জাম মুঞি মুণ্ডে আঁচল দিআ।
কথ কাল রাখিমু জোবন লোকের বৈরী হৈআ ॥
অভাগী খোঁআরি (?) লাগি ন আইল ভ্রমরা (?)।
সুখনা পুষ্পের মাঝে ন পড়ে ভ্রমরা ॥
ছৈঅদ মর্ত্তুজা কহে শুন বনমালি।
পালিআ পুসিআ জোবন কারে দিলু ডালি ॥ ১১।

রাগ—পঞ্চম সিন্ধুরা।

বন্ধু মোরে ছুইঅ না।
ছুইঅ না রে নন্দের ঘরের কালা কানুরে মোরে ছুইঅ না ॥ ধু।
কদম তলে থাক কানুরে কদম পুষ্প চাইআ।
প্রাণি হরিআ নিল শ্যামে বাঁশীটি বাজাইআ ॥
কদম তলে থাক কানুরে বাজাও মোহন বাঁশী।
বাঁশীর স্বরে খসি পড়ে রাধের কাঙ্খের কলসী ॥

রাজ পন্থে থাক কানুরে কর বাটোআরি।
ছাড়ি দেঅ নেতের আঞ্চল বন্ধু ভাঙ্গিব ঘাঘরি॥

মাঠে থাক ধেনু রাখো রাখোআলের মতি।
তুহ্মি নি রাখিতে পার বন্ধু সুজনের পিরীতি॥

জাঙ্গালে সে আইস বন্ধু জাঙ্গালে সে জাও।
কথ ধন দিবা করি বন্ধু ফিরিআ ন চাহ॥

ছৈঅদ মর্ত্তুজা কহে পিরীতি তোহ্মার।
মদনের ঘাত আহ্মি নারি সহিবার॥ ১২।

———

রাগ—আহীর।

মালিনিরে লৈ জারে তোর কুল।
সোআমী ঘরেত নাহি চিত্ত বেআকুল॥ ধু।

এক হাতে শত শঙ্খ আর হাতে ক্ষীর।
এখলি (একলি) শঅনে মোর আখি বহে নীর॥

গলার গলিআ (?) মোর শীষের সিন্দুর।
কেবা হরি নিল মোর পাএর নেপুর॥

মন্দিরে আছএ মোর খাট সিংহাসন।
কোন বিধি হরি নিল গাএর ওড়ন॥

চারি মাস বারিষা মুঞি আছিলু ভাল।
মাঘ ফাল্গুনের শীতে বুকে লাগে শাল *॥

কাহাকে না পাম লাগ কহিআ † পাঠাম।
আনল গরল বিষ খাইআ মরি জাম॥

ছৈঅদ মর্ত্তুজা কহে করমের পাক।
তম গেলে হরি আইলে পাইবা পহু লাগ॥ ১৩।

———

রাগ—জালালি।

কি আজু কুদিন ভেলিএ।
ছাড়িআ গোকুল নন্দলাল মথুরা চলিআ গেলিএ॥ ধু।

আজু মথুরা উঝল ভেলিএ।
গোকুল মলিন আজু রাত্রিএ॥

মর্ত্তুজা গাজিএ কহএ সারএ।
নন্দসুত বাটোআর কানু নিশ্চয়এ॥ ১৪।

অবশিষ্ট পদাবলী বারান্তরে প্রকাশ করা যাইবে।

আবদুলকরিম সাহিত্য-বিশারদ

———

* 'শাল' স্থলে' আল'—পাঠান্তর।
† 'কহিআ স্থলে' বুলিআ'।

ডোমরাইলের চিড়ে ঐতিহাসিকের কথায় ভিজেনা

মালদহের গোপালভোগ, খিরসাপাতী, বৃন্দাবনী প্রভৃতি আম পাকিয়া প্রায় শেষ হইয়া গেল। চিড়ে, মাড়া দিয়া আম সেবার একটা মহৎ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। যাঁহাদের ভাগ্য ভাল তাঁহারা মালদহের আম ও ডোমরাইল বা ডমরুলের হাটের চিড়ে দিয়া ক্ষীরসহ আনন্দ উপভোগ করিতেছেন।

'অমরতী' অঞ্চলের নাগরাইনগণ ইংরেজ বাজারের হাটে মাড়া, ছাতু প্রভৃতি বিক্রয় করিতে আসে। মালদহের যাঁহারা খাস অধিবাসী তাঁহারা একমুঠা ডমরুলের হাটের চিড়া না হয় অমরতীর নাগরাইনদের মাড়ার সহিত খিরসাপাতী, গোপালভোগ মাখিয়া হাসিমুখে উদরগহ্বর পূর্ণ করিতেছেন। ঐতিহাসিকদের ভাগ্যে এ সুযোগ ঘটে না!

ডমরুলের চিড়ে অমরতীর মাড়া মালদহের উত্তরার্দ্ধের, বিশেষ পুরাতন মালদহ, ইংরেজ বাজার মকদমপুর প্রভৃতি অঞ্চলের ভদ্রেতর সকলেই একদিন না একদিন খাইয়াছেন। অনেকের মনে আছে আবার অনেকের খাইয়াও মনে নাই।

ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অনেকেই হয় ত 'ডোমরুল' বা 'ডোমরাইলের' হাটের চিড়া বা 'অমৃতীর' নাগরাইনদের হাতের 'মাড়া' ও ছাতু কিম্বা ভাদুইধানের চিড়া সেবা করেন নাই। কিন্তু মালদইয়া আম সম্ভবতঃ না খাইলে তাঁহার ঐতিহাসিকত্বের দাবিই কমিয়া যাইবে।

'চিড়ে কোটা ব্যবসা'—কেবল কৌশলে থেৎলাইয়া চেষ্টা করিবার প্রয়াস। যাঁহারা চিড়ে কোটেন তাঁহারা গোটাকে ভাঙ্গেনও না, গুঁড়োও করেন না কেবল পদদলিত করিয়া চেপ্টা করেন।

অমরতীর মাড়া, ডোমরুলের চিড়ে এখন দরিদ্রের অন্নসংস্থানের পন্থাবিষ্কার মাত্র। সেখানে ত আর পাল বা কৈবর্ত্ত নগরী নাই! সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই। এখন টেনে বুনে—ঐতিহাসিকগণ সেই প্রাচীন স্থানগুলিকে স্বীয় স্বীয় অনুসন্ধান গণ্ডীর মধ্যে ফেলিতে ব্যস্ত! বিক্রমপুর-রামপাল-রামাবতী-জগদ্দল-ডমর-লক্ষণাবতী-গৌড়, পাণ্ডুনগর, পুণ্ড্রবর্দ্ধন প্রভৃতি মহাস্থানগুলি স্বস্থান চ্যুত হইবার উপক্রম হইয়াছে।

বড় বড় ঐতিহাসিকগণের যখন এই 'ধন্দ' বাধিয়াছে তখন চিংড়ি পুঠি গোছের ঐতিহাসিকগণের আর কথা কি বলিব! আমরা যে চিংড়ি পুঠির সামিল।

রামাবতীর সংস্থান লইয়া মৈত্র মহাশয় প্রমুখ জগৎ বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ মহোদয়গণ কয়েক মাস ধরিয়া অনেক লেখালেখি করিয়াছিলেন। তাহাতে বারেন্দ্র মধ্যেই পুনর্ভবা ও করতোয়া মধ্যবর্ত্তী স্থানেই পালনরপতি-প্রতিষ্ঠিত রামাবতীর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল। সুযোগ্য মৈত্র মহাশয় যখন বরেন্দ্র মধ্যে রামাবতীর প্রতিষ্ঠায় তৎপর, তখন তিনি যে অমরতীর 'মাড়া' কখন আহার করেন নাই তাহা সুনিশ্চয়।

আপনাপন মতবাদ সহজে কেহ নস্যাৎ করিয়া দিতে রাজি নহেন। কয়েক মাস ধরিয়া তিনি রামাবতী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। হউক না কেন জগদ্দল ২৪ পরগণায়, হউক না কেন রামাবতী বরেন্দ্রে বা সমুদ্রতীরে তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আমাদের বাঙ্গলাটা এদেশে থাকিলেই হইল; এখন যে ইন্দ্রপ্রস্থ, হস্তিনাও ভারতের বাহিরে চলিয়াছে! বিক্রমপুর লইয়া কত কথাই উঠিল। গৌড়ও হয় ত মালদহে থাকিবে না।

সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত কাব্য বলিয়াও ঐতিহাসিক ভিত্তি হারাইতে হারাইতে মুখ চাহিয়া রক্ষা পাইয়াছে। শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের রমতী রামাবতী নাও হইতে পারে—রামাবতী ও অমরতী বা রমতী মালদহের বা গিলাবাড়ী হইতে যে অধিক দূর নহে, তাহা শ্রীধর্ম্মমঙ্গল থাকিলেও বিশ্বাস যোগ্য না ও হইতে পারে। রাজতরঙ্গিনীর তরঙ্গ আবশ্যকমত বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের তুফান তুলিয়াছে—গরজে গয়লা ঢেলা বহেন—গরজ বড় বালাই! আমাদের গরজ নাই—হলেও ভাল, না হ'লেও ভাল।

'আর্য্যাবর্ত্তে'—জগদ্দল, ডমরনগর (ডমরাইল—ডোমরুল) রমতী (রামাবতী) প্রভৃতি কতিপয় প্রাচীন স্থান সম্বন্ধে কিছু লেখা হইয়াছিল। জগদ্দল-মহাবিহার রামাবতীর নিকটে বা অনতিদূরেই ছিল বলা হইয়াছে। নদীপ্রবাহে নষ্ট হইয়া গিয়াছে—একথা অলীক কি সত্য তাহার প্রমাণ দিব কি করিয়া। পূর্ণিয়ার জগদ্দল, মালদহের দুই তিনটি জগদ্দল, দিনাজপুরের জগদ্দল, ২৪ পরগণার জগদ্দল প্রভৃতি জগদ্দল এবং মালদহের 'একডালা,' নদীয়ার 'একডালা,' ঢাকার 'একডালা' এখন আছে। মালদহের 'একডালা' প্রাচীন, বিলমধ্যস্থ নূতন বস্তী—স্থলটা সকল রকমে পুরাতন। সে নামটার সন্ধান—ডোমরুলের চিড়ে বাঁধিয়া খুঁজিতে যাইতে হইবে। ম্যাপে বা লোকমুখে তাহার শীঘ্র সন্ধান মিলিবেনা। অমরতীর জগদ্দল এখন নাই।

রমতী বা অমৃতীর (অমরতী) নিকটে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত যে 'ডমর নগর' সে কথা বোধ হয় কোথাও বলা হয় নাই। ডোমরোলের হাট-টা এখন নদীর ওপারে দিনাজপুরের সীমায় বসিয়াছে। কিন্তু সুযোগ্য ঐতিহাসিক ৺ রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় ডোমরুলের চিড়ে খাইয়া থাকিবেন এবং হয়ত মানচিত্রে নদীর ওপারে হাটের সংস্থানটিই দেখিয়া থাকিবেন। কিন্তু এক পা এদিকে, নদীর ধারে মালদহের সীমায় কিছু প্রাচীন স্মৃতি দেখা যায় কিনা হাটুরিয়াগণকে জিজ্ঞাসা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। হাটে গিয়া কাজ নাই! উদারতা ও স্বার্থশূন্যতা বা হুঁ এ হুঁ দেওয়া ভাবটা ত্যাগ করিয়া স্বাধীন ভাবের ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিলেই—ডোমরুলটি হাটে কি নদীর দুইধারে কি নদীর পশ্চিম তীরে নিশ্চয় দেখিতে পাইবেন।

বর্ত্তমানে ডোমরাল বা ডমরুলের হাটটা এপারে নয়, তাহাত স্বীকার করিতেই হইবে। এখন ম্যাপে না হয় একটি বিন্দুতে 'ডমরাইল' নির্দ্দিষ্ট হইতেছে—কিন্তু উহার সীমা ও বিস্তার কোন দিকে কতদূরে ছিল তাহার একটা কথাও ত ভাবিতে হইবে। পরগণে রুক্নপুর রাজহাট ও অপর অপর পরগণাগুলি দেখিলে ক্ষতি কি? উত্তরার্দ্ধ মালদহেই যে, প্রাচীন কীর্ত্তিনিকেতনগুলি বিদ্যমান ছিল।

অমরতীও যে, পিছলী, গঙ্গারামপুর, ভগীরথপুর, নাগরাইন, সোনাতলা, কাঞ্চনসহর

প্রভৃতি লইয়া বা আরও কতদূর লইয়াছিল তাহা কে বলিবে। গৌড়হণ্ড হইতে গঙ্গারামপুর পিছলী পর্য্যন্ত ও পাণ্ডুনগর পর্য্যন্ত একটা জনস্রোত ছিল তাহা আজিও প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্ট হয়। পাণ্ডুয়া নদীর ওপার—অমরতী, গঙ্গারামপুর নদীর এপার। তাহার পর ভঙ্গন প্রভৃতি কতিপয় নদীর ওপারে। পাণ্ডুনগর হইতে কিছু দূরে নদীর এপারে ওপারে জগদ্দল বিহারের স্থান। এপারে ভগ্নস্তূপ ওপারে জগদল গ্রাম (নূতন বস্তী)। ইহা ছাড়া আরও 'জগদল' আছে। অমরতীর জগদল নাই। কালিন্দী ও বড়গঙ্গার প্রবাহে কাটিয়া গিয়াছে—বস্তীও নাই। যখন কালিন্দী বর্ত্তমান খাতে ছিল না, তখন টোদোয়রে—বল্লাল কাকঠান দেখা যাইত। পিছলী গঙ্গারামপুর নাগরাইন কঠাল—টোদোয়ার দুই ক্রোশ ব্যবধান হইলেও এক ছিল। গড় দেখিলেই চক্ষুকর্ণের বিবাদ মিটিয়া যায়।

যেখানে বল্লাল কাঠান—গৌড়হণ্ড তাহার পরপারে—দূরে ছিল। 'গৌড়হণ্ড' গড়টির উচ্চভূমি বইড়হাট, হাতিণ্ডা লইয়া তিন ক্রোশ হইবে। প্রাচীন চিহ্নে সুচিহ্নিত। এখন পালের ভিটা থাক্‌বস্তির ম্যাপে আছে। সেইটাই যে পালদের গৌড় নয় তাহা ত কেহ বলিতেছেন না।

এই গৌড়হণ্ড—হইতে হাতীণ্ডা লইয়া যে সীমা তাহার পরই—কিছুদূরে 'ডোমরাইলের হাট'—সে হাট পাণ্ডুনগর হইতেও দূরে নহে। বরেন্দ্রের ও গৌড় (পাল) নগরের অতি সন্নিকটে কিন্তু অঙ্গাঙ্গীভাবে নয়।

পালদিগকে পরাজয় করিয়া পালগৌড়-সীমার কিছুদূরে যে কৈবর্ত্তনগর 'ডমরপুর' তাহা ত দেখিলেই দেখা যাইবে। পাল-গৌড়ের পরিখার সহিত পরিখা মিলাইয়া যদি 'ডমর উপপুর' প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার কথা মিথ্যা হইয়া যাইবে।

অমরতীর গায়ে বা রামাবতীর প্রাচীরে প্রাচীর মিলাইয়া 'ডমর' নগর প্রতিষ্ঠার কথা রামচরিতেও নাই আমিও কোথাও বলি নাই। পালগৌড়ের ও কড়িরআইল ভীমের জাঙ্গালের মধ্যে ডমরনগর। ঐ পথেই পাল-গৌড় হইতে কৈবর্ত্তনগরী 'ডমর' দিয়া বরেন্দ্রের মুখ্য একটা পথ ছিল, তাহা ম্যাপেও দেখা যায় —'অকুস্থলে' গিয়া দেখিলেও দেখা যায়। ঐ পথেরদক্ষিণে'বরেন্দ্র'নগরের স্থান—মানচিত্রেও 'বরেন্দ্র' বলিয়া একটা স্থান লেখা আছে।

রামাবতীর (অমরতী) পূর্ব্বে বর্ত্তমান মুচিয়া ষ্টেশন হইতে উত্তরে পুস্তনের বিল—তাহার পশ্চিমে পূর্ব্বতন মালদহ হইতে একটা গড় পাণ্ডুয়ার দিকে একটা সূর্য্যপুরের কাটাল দিয়া পুস্তনের দিকে গিয়াছে। পূর্ব্বে বুলবুলচণ্ডী ঐ দিক দিয়াই কিছু উত্তরে পুস্তনের ম্যাপ বিখ্যাত পুনর্ভবা পর্য্যন্ত প্রকাণ্ড গড় বা আইল। ঐ আইলের নাম পুস্তনের আইল। এটা পাণ্ডুয়ার পূর্ব্বে আইলের উপর। কড়ির আইল নামক সাঁকো তাহার কিছু উত্তরে যাইলেই ডোমরাইলের হাট এবং তাহার উত্তরে—একটা 'জগদ্দল'। এ জগদ্দলের সহিত অমরতীর জগদ্দলের কোন সম্বন্ধ নাই। সুযোগ্য মৈত্র মহাশয়েরও রামবতীর সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। তবে জগদ্দল কয়েকটি আছে।—এখানে মকদুম সাহেবের তাকিয়া নাই!

সুযোগ্য শ্রীল শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়—"The Palas of Bengal" নামক প্রবন্ধ যাহা ১৯১৫ সালের Memoirs of the A. S. Bengalএ লিখিয়াছেন তাহাতে দেখিতে পাই—

"Ramauti is an exact transliteration of Ramavati………, and the identity of Ramauti with Ramavati has been made certain by the discoveries of Babu Haridas Palit in the Malda district. This gentleman has industriously searched the environment of Ramavati and has traced the following villages leaving ancient mames : Amrauti or Ramauti (Ramavati) Jagadala (Jagaddala), Damral (Damara)." (Page 91).

ইহাতে বিশেষ কিছুই যায় আসে না কিন্তু ১১৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"I have since been informed by Pandit Rajanikanta Chakarvarty of Malda, and Babu Akshaykumar of Rajshai that Babu Hari das' identification of Amarti with Ramauti is not correct. I am also informed that there are no villages called Jagdala or Damral near amarti in the malda District." (Ibid).

এই ১১৩ পৃষ্ঠায় লিখিত পণ্ডিত মহাশয় ও বিখ্যাত মৈত্র মহাশয়ের উক্তির বিষয় যাহা ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই লইয়া একটু বলিব। বুঝি অমরতীর 'মাড়া' আর ডমরাইলের চিড়া আমার ভাগ্যে নাই!

"Haridas' identifications of Amarti with Ramauti is not correct."

ইহা কিসের উপর নির্ভর করিা বলা হইল তাহাত মৈত্র মহাশয়ের 'রামাবতী' ও পণ্ডিত মহাশয়ের—'গৌড়ের ইতিহাস' পাঠেও বুঝিলাম না!

ইংরেজবাজার (English Bazar) হইতে কিছু পশ্চিমে 'বাগ্‌বাড়ী'; উহার অনতিদূর পশ্চিমে প্রাচিত চিহ্নাঙ্কিত ভূখণ্ডে—অমৃতী নালার ধারে অমৃতির হাট। ম্যাপও আছে—লোকেও বলে এবং স্বয়ং অমৃতীর 'মাড়া' ও গোপালভোগের সহিত খাইয়াছি।

ধর্ম্মমঙ্গলও বলেন—"বামে থুয়ে মালদহ দক্ষিণে গিলাবাড়ী"—রমতী হইতে পূর্ব্বমুখে লাউসেন কর্পূরধ্বজের সহিত যুদ্ধার্থে গিয়াছিলেন। পুরাতন মালদহ ও গিলাবাড়ীর কিছু পশ্চিমেই অমৃতী সুতরাং—এইটিই রমতী। আইন আকবরীর মতেও লক্ষণাবতীর অতি সন্নিকটে 'রমতী'। রমতীর দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে—লক্ষণাবতী। ডাল, চাল, ঘি, মসলা, জল দিয়া অগ্নিপক্ক করিলেও যদি খিচুড়ী নাম না পায় তাহা হইলে আর কি করিব।

'Damral' অমৃতীর (অমরতীর) নিকটে নহে—হইতেও পারে না—নন্দী মহাশয় রামচরিতেও সে কথা বলেন নাই! 'পাল-গৌড়' ও বরেন্দ্র মধ্যে কৈবর্ত্তরাজ-প্রতিষ্ঠিত 'ডমরনগর' অমরতীর সহিত যে অঙ্গাঙ্গীভাবে থাকিবে তাহা ত জানি না। সেদিনকার মালদহের সীমা বিভাগে ডমরুলের হাট বা ডমরাইলের হাট দিনাজপুরে পড়িতেছে কিন্তু ডমরাইলের প্রাচীরস্মৃতি যে আধুনিক মাল-দহের নাকের উপর ব্রণের মত রহিয়াছে। ম্যাপ দেখিলে কি 'Damral' মালদহে মিলিবে?

সুযোগ্য মৈত্র মহাশয় না হয় ডমরুলের চিড়ে ও গোপালভোগের সহিত মিলিত করিয়া উহার সদ্ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু

গুরুদেব তুল্য বৃদ্ধ পণ্ডিতমহাশয় ডমরুলের হাটের চিড়া দিনাজপুরের বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন হাট-টা দিনাজপুরের সীমান্তে,কিন্তু মালদহে যে প্রাচীন ডমরুল! চিড়ের সহিতই বুঝি ডমরলের সম্বন্ধ—চিপিটকেরকৃপায় উদর তৃপ্তি হয় কিন্তু ইতিহাসে গড়িয়া উঠে না।

"Amarti ও Ramauti এক নয়"!—আইন-ই-আকবরির কথা ও ধর্ম্ম মঙ্গলের 'কাউর যাত্রার' 'বামে থুয়ে মালদহ দক্ষিণে গিলাবাড়ী'—পূর্ব্ব মুখে রমতী হইতে যুদ্ধ যাত্রার বর্ণনা ত আমার মনগড়া নয়!

'জগদ্দল বিহার' অমরতীর নিকটে মালদহে নাই। নাই ত সত্য—অমরতীর অবস্থাটা কি হইয়াছে সেটা কি দেখেন নাই?—চৌদ্দ আনা গঙ্গাপ্রবাহে ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে। গঙ্গাতীরে বা কোন প্রনষ্ট নদীতীরে ছিল তাহার প্রমাণ 'অকুস্থলে' যাইলেই দেখিতে পাইবেন। ব্রহ্মপুর, কমঠ গঙ্গাগর্ভে গিয়াছে জগদ্দলও গিয়াছে এখন 'দেয়াড় ভূমি'। আমি স্থানীয় বৃদ্ধগণের নিকট একটা বড় মন্দিরের কথা শুনিয়াছি যাহা অমৃতীর পশ্চিমে রাজ-মহলের দিকে ছিল। একটা বড় বুদ্ধ মূর্ত্তিও গঙ্গারামপুরের কাঁঠাল তলায় পড়িয়া আছে। সেইটি নাকি ঐ রকমের মন্দির হইতেই মসজিদের জন্য আনিত। পাঁচটা জগদল যে জেলায় আছে সেখানে যে ঐ বৃদ্ধগণের কথা মিথ্যা-একথা আমি বলিতে পারি না।—আমিও আর্য্যাবর্ত্তে বলিয়াছি—এখন নাই—গঙ্গাপ্রবাহে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। কীর্ত্তি-নাশার কাহিনী দুদিন পরে ঐতিহাসিকগণের নিকট চিড়ের মত চেপটা হইবে বলিয়া মনে হয়।

ডমরলের চিড়ে, অমরতীর 'মাড়া'র সন্ধান না পাইলে খিরসাপাতী আমের সহিত মজিবে না। 'কথার দ্বারা যদি চিড়ে ভিজে' তবে পূজনীয় ঐতিহাসিক রাখাল বাবুর—'The Palas of Bengal'এর ১১৩ পৃষ্ঠার প্যারাটি সত্যসত্যই ফলারের উপযুক্ত হয় নাই, তাহাই বলিতে হয়—এবং ইতিহাসের মত ভিজে নাই শুষ্কই রহিয়া গিয়াছে।

শ্রীহরিদাস পালিত।

যুগধর্ম্ম—নাম সঙ্কীর্ত্তন

"নাম্নস্ত যাদৃশী শক্তিঃ পাপ নির্হরণে হরে।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকীজনঃ॥"

বৈষ্ণব কবি গাহিলেন "নামের এতদূর শক্তি যে একবার মাত্র নাম জিহ্বায় উচ্চারণ করিলে, যত পাপ ধ্বংস হয়, জীব জীবনে তত পাপ করিতে পারে না।" নামের এই শক্তি বর্ণনা করিয়া ভক্ত কবি নাম সঙ্কীর্ত্তনের উৎকর্ষ দেখাইলেন।

জগতে আসিয়া জীব ক্রমাগত মায়ার ক্রীড়নকরূপে আপন পরমাত্মীয়ের নিকট হইতে বহুদূরে পড়িয়া কেবল অপরিচিত, চির বিচ্ছিন্ন জীবের সহিত সংমিলিত হইতে চেষ্টা করে। প্রবাসের সাথীগণকেই আপন জ্ঞানে, তাহাদের সুখ সাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য

সকল রকম কার্য্যই অকুণ্ঠিতভাবে সম্পাদন করে। তাহাদের সুখে রাখিবার জন্য মিথ্যা, প্রতারণা, নরহত্যা, দস্যুতা প্রভৃতি কোন অপকর্ম্মকেই অকর্ম্ম বলিয়া মনে করে না, যদি তৎ সাধনে কিছু অর্থাগম হইয়া ভোগ সুখের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দেয়।

যখন দস্যু রত্নাকর, ব্রহ্মা ও নারদকে হত্যা করিবার সঙ্কল্পে তাঁহাদিগকে বন মধ্যে ধৃত করে তাঁহারা এরূপে নরহত্যা করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রত্নাকর বলিয়াছিল "পিতা মাতা ও স্ত্রী পুত্রাদির প্রতিপালনের অন্য উপায় না থাকায় দস্যুবৃত্তি দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করি।"

নারদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন" আচ্ছা, বৎস তাহা যেন হইল, কিন্তু এরূপ কার্য্যকে পাপ বলিয়া তোমার মনে হয়?"

রত্নাকর। নিশ্চয়।

নারদ। তবে তোমার এ পাপের ভাগী কেহ হইবে কি? যাও বৎস, গৃহে যাও, যাহাদিগের জন্য এই পাপ রাশি সঞ্চয় করিয়া নিশ্চয় নিরয়ের পথ প্রশস্ত করিতেছ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা তোমার পাপের অংশ গ্রহণ করিবে কি না।

রত্নাকর তখন হাসিয়া বলিল "বেশ, ঠাকুর তুমি ত খুব সেয়ানা! কিন্তু আমায় এত বোকা পাও নাই যে তোমাদের ছাড়িয়া যাইব, আর তোমরা পলাইবে। তাহা হইবে না।"

নারদ উত্তর করিলেন "বৎস, আমাদিগকে বন্য লতার দ্বারা উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া রাখিয়া যাও আর আমরা সত্য করিয়া বলিতেছি যতক্ষণ না তুমি প্রত্যাবৃত্ত হও, ততক্ষণ আমরা এইখানেই অপেক্ষা করিব।"

তাঁহাদিগকে বন্ধন করিয়া দস্যু আপন আলয়ে গমন করিয়া পিতামাতা, স্ত্রী পুত্র সকলকেই ওই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল "আমি তোমাদের জন্য এত পাপ করিতেছি, তোমরা কেহ কি এ পাপের ভাগ লইবে?"

পিতামাতা উত্তর করিলেন "তোমাকে শিশুকাল হইতে লালন পালন করিয়া আমরা এখন বৃদ্ধ হইয়াছি, এখন তোমার কর্ত্তব্য আমাদিগকে পালন করা। তোমার কর্ত্তব্য করিতেছ। আমরা ও পাপ করিতে বলি নাই। আমরা কেন ভাগী হইব?

স্ত্রী-পুত্রও বলিল "তোমার কর্ত্তব্য আমাদিগকে পালন করা, তাহাতে পাপই কর আর যাহাই কর, আমাদের তাহাতে কি?"

দস্যু এই কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল ও সত্বর বন মধ্যে আগমন করিয়া ব্রহ্মা ও নারদের বন্ধন মোচন করিয়া বলিল "ঠাকুর, আমি মহাপাতকী, কেহই আমার পাপের ভাগী হইবে না। আমার উপায় কি হইবে? এই বলিয়া তাঁহাদের চরণে পতিত হইল। তাঁহারা তাহাকে দিব্যজ্ঞান দিয়া রক্ষা করিলেন। এই রত্নাকরই ভারতের প্রধান ও প্রথম কবিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

আমরা এই প্রবাসের সাথীগণকে সুখে রাখিবার জন্য যাহা কিছু করি, সে সকলের জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী, আর কাহাকেও তাহার জবাবদিহি করিতে হইবে না! তাহাত আমরা বুঝি না। এমনি অন্ধ আমরা, এমনি জ্ঞানহীন, সব জানিয়া শুনিয়াও ঠিক পথ ধরিতে পারি না। মায়া আসিয়া ভুলাইয়া দেন। তাই ভগবান বলিয়াছেন—

মামেব যে প্রপদ্যন্তে
　　　　মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

এই সুদুস্তর মায়া সাগর পার হইবার এক মাত্র উপায় ভগবানের শরণাগতি। এখন

এই শরণাগতি কিরূপে আসে? তাঁহার পাদ কিরূপে প্রপন্ন হওয়া যায়?

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, ও কলি এই চারি যুগের সাধন পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকারের, কারণ সাধনা শক্তি অনুসারে হইয়া থাকে। সত্যে বায়ু পর্য্যন্ত সাত্বিকতায় পূর্ণ ছিল, সে সময়ের সাধনা কেবলমাত্র ধ্যান, ত্রেতায় ধ্যানের শক্তি জীবের কমিয়া আসিয়াছিল বলিয়া যজ্ঞের দ্বারা, কর্ম্মপথে জীব ভগবানের শরণাগত হইত। আরও শক্তি হ্রাস হইলে, দ্বাপরে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সেবা দ্বারা ভগবল্লাভ হইত, তাই গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়া জগতে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। কলিতে পাপ পূর্ণাধিকার বিস্তার করিলে, জীবের কোন শক্তি রহিল না তাই শাস্ত্র বিধান দিলেন—

"কৃতে তদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং
যজতে মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি
কীর্ত্তনাৎ॥"

সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে বিভিন্ন প্রকারের সাধনা দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইত, কলিতে এক হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা সে সমস্ত ফল লাভ হইবে। কলির নাম সঙ্কীর্ত্তন মাত্র সাধনা। আর দ্বিতীয় সাধনা নাই।

এই হরি কীর্ত্তন কিরূপে করিতে হয়? নরোত্তম দাস ঠাকুরকে তাঁহার প্রভু শিক্ষা দিয়াছিলেন যে উর্দ্ধরেতা না হইলে, যোগ আশ্রয় না করিলে হরি কীর্ত্তন ঠিক হয় না যথা:—

"হরি যদি চাও কর যোগ অনুষ্ঠান
যোগমার্গ সার পন্থা শাস্ত্রের বিধান।"
রত্নাকর।

কিন্তু সংসারী লোক উর্দ্ধরেতা হইতে পারে না। যোগপথও অতি কঠিন পথ। আর সকলেই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া সন্ন্যাসী হইলে এ খেলা চলে কি? তাই শাস্ত্রকার বলিলেন—

"বস্তু শক্তিঃ ন বুদ্ধিমপেক্ষতে।"

নাম যে রূপেই কর, নামের কার্য্য নাম করিবে। তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। অনলে হস্তার্পণ করিলেই তাহা দগ্ধ হইবে। গরল পান করিলেই মৃত্যু হইবে, ইহার কারণ অকারণ দেখিয়া ফল নাই। গরল পানে কেন মরিবে এ প্রশ্নের উত্তর নাই। গরলের শক্তি জীবের প্রাণনাশ করা, সে তাহা করিবেই। সেইরূপ নামের যে পাপহারী, কল্মষনাশী শক্তি, যেরূপেই নাম কর, জিহ্বায় একবার উচ্চারিত হইলেই হইল। নামের কার্য্য নাম করিবে। একবার নাম উচ্চারিত হইলেই তোমার হৃদয়ের সকল কালিমা বিদূরিত হইয়া হৃদয় মন পবিত্র হইয়া নামীর আসনের উপযুক্ত হইবে, কারণ নাম ও নামী, শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। নাম করিতে করিতে নামে রুচি আসে, নাম হৃদয়ে দৃঢ় হইয়া যায়, তখন নামীর উদয় হয়। নামের সম্পূর্ণ মূর্ত্তি যুগলকিশোর রূপ হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়। তখন নামকারী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়া, সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তর নিজ দেহ, দেহাত্মবুদ্ধি পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া নাম সুধাপানে বিভোর, বাহ্যজ্ঞান হারা হইয়া যায়।

নাম ধরিয়া না ডাকিলে কি কেহ সাড়া দেয়? তোমাকে নাম ধরিয়া ডাকিলে তবে তুমি শুনিতে পাইবে। অযাচিত কে কোথায় প্রেমদান করিয়া থাকে—ভাল বাসিয়া থাকে? সংসারী জীব তাহা পারে না, কারণ তাহাদের জন্মই স্বার্থ বিজড়িত—কিছু প্রতিদানাশা না থাকিতে কেহ কোন কার্য্য করে

না। আমাদের মতন করিয়া ধরিয়া লইলেও, তাঁহাকে ডাকা চাই। সর্ব্বত্যাগিনী হইয়া, প্রতিদানাশা বর্জ্জিত হইয়া ভালবাসিতে পারিয়াছিলেন কেবল ব্রজদেবীগণ, তাই তাঁহাদের "পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি"—ত্যাগ করিয়া এক পদও বাড়িতেন না। তাঁহাকে না পাইলে গোপীগণ জীবন্মৃতা হইত, নিমেষে যুগবোধ করিত "ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্" এবং সেই সরল প্রাণা, সর্ব্বত্যাগিনী ব্রজদেবীগণ না হইলেও তাঁহার রাস হইত না। শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী রাস শব্দে ব্যাখ্যা করিলেন "রসস্য বিধূননং ইতি রাসং" তুলা যেমন ধুনিয়া লইতে হয়, সেই "রসো বৈ সঃ" সর্ব্ব রসের আকর তিনি, সেই রসসাগর উন্মন্থন করিয়া তবে নিষ্কাম প্রেম লাভ হয়। যেমন দুগ্ধ উন্মন্থন করিলে ক্ষীরের উৎপত্তি হয়। সেইরূপ সেই রসসাগরকে মথিত আলোড়িত করিতে পারিলে তবে শুদ্ধাভক্তি লাভ হয়। ইংরাজী ভাষায় যাহাকে "Love for loves' sake" বলে।

এই নিষ্কাম প্রেম অতি দুর্লভ—মাত্র ব্রজদেবীগণের মধ্যে ছিল। কলিপাবন নিত্যানন্দ প্রভু এই প্রেমধন অকাতরে জগতে বিতরণ করিয়াছেন। সেইজন্য বহুতর মহাপুরুষের আবির্ভাবে আমরা ও আমাদের বঙ্গভূমি ধন্য হইয়াছে। নতুবা গূঢ় রহস্য স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের রহস্য ভেদ করিবার শক্তি জীবের হইত না। হরি সঙ্কীর্ত্তনই এই কৃষ্ণপ্রেমের জননী। নাম ভিন্ন নামীর উদ্দেশ পাওয়া যায় না, কারণ আমরা নামরূপ উপাধিধারী, তাই নামরূপ বিবর্জ্জিত কোন বস্তু আমাদের ধারণার অতীত। তাই মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বলিয়াছেন।

"রূপং রূপ বিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন
　　যৎ কল্পিতং।
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিল গুরো
　　দূরীকৃতা যন্ময়া॥
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো
　　যত্তীর্থ যাত্রাদিনা।
ক্ষন্তব্যং জগদীশ, তদ্ বিফলতা
　　দোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥

অর্থাৎ তুমি রূপ বিবর্জ্জিত আমি ধ্যানে যে তোমার রূপ কল্পনা করিয়াছি, তুমি অখিল গুরু বাক্যের অতীত, আমি মুখের দ্বারা তোমার যে সেই অনির্ব্বচনীয়তা দূরীকৃত করিয়াছি এবং তুমি সর্ব্বব্যাপী অথচ আমি তীর্থযাত্রাদি দ্বারা তোমার যে সেই সর্ব্বব্যাপিত্ব নষ্ট করিয়াছি, হে জগদীশ, মৎকৃত এই তিনটি বিফলতা দোষ ক্ষমা করুন।"

এখানে মহর্ষি স্পষ্টই বলিতেছেন যে তিনি "নিরাকার, তিনি "আবাঙ্মনসোগোচরং" বাক্য মনের অতীত বস্তু ও সর্ব্বব্যাপী, তাঁহাকে পুরাণাদিতে কল্পনার দ্বারা হস্ত পদাদি বিশিষ্ট মায়ামনুষ্যরূপে বর্ণনা করিয়াছেন কারণ গুণময় দেহ ও বুদ্ধিবৃত্তি লইয়া নির্গুণ নির্ব্বিশেষ ভগবৎ সত্তা উপলব্ধি করা যাইতে পারে না, তাই নাম ও রূপ দ্বারা তাঁহার অসীমত্বকে সসীমত্বে আনয়ন করিয়া তবে আমাদের বুদ্ধিগম্য করা যাইতে পারে। তাই নামের এত প্রয়োজন, আর নাম ও নামী অভেদ "যেই নাম সেই কৃষ্ণ" ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। তাই নাম সঙ্কীর্ত্তন এত প্রয়োজনীয়। তাই মহাপ্রভু জগতে অকাতরে, জাতিনির্ব্বিশেষে এই নামসুধা বিতরণ করিয়া গিয়াছেন।

স্বয়ং মহাপ্রভু এই নাম সঙ্কীর্ত্তনের উৎকর্ষ দেখাইবার কারণ এক সময়ে কয়েকটি শ্লোক বলিয়াছিলেন তাহার প্রথমটি এই :—

"চেতোদর্পণ মার্জ্জনং ভব মহাদাবাগ্নি
নির্ব্বাপনং।
শ্রেয়ং কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং
বিদ্যাবধূ জীবনং॥
আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধনং প্রতিপদং
পূর্ণামৃতাস্বাদনং।
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে
শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনম্॥"

"পরম মঙ্গলস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন বিজয়-লাভ করুক" এই বলিয়া কীর্ত্তনের গুণ বলিতেছেন "সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা চিত্তদর্পণ সুপরিস্কৃত হয়। মহাদাবাগ্নি স্বরূপ ভবযন্ত্রণার নিবৃত্তি হয়। শ্রীকৃষ্ণানুরাগরূপী কুমুদকে যে প্রস্ফুটিত করে, সেই চন্দ্রিকায় স্নিগ্ধ কৌমুদী বিস্তারকারী, কৃষ্ণ প্রেমের জননী, আনন্দ-হ্লাদিনী শক্তি বৃদ্ধিকারী, নিত্যশুদ্ধ প্রেমাস্বাদের কারণ স্বরূপ, সর্ব্বেন্দ্রিয় তৃপ্তি-কারক এই কৃষ্ণকীর্ত্তন বিজয়লাভ করুক।"

এই কৃষ্ণকীর্ত্তন সর্ব্ব জড় ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করিয়া, সাংসারিক সকল অভাব দূর করে। আবার বলিতেছেন :—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।

"হে ভগবন, তোমার এমন কৃপা, যে মুখ্য গৌণাদি ভেদে নাম বহু প্রকার দিয়াছ এবং সেই নামে সর্ব্বশক্তি আরোপ করিয়াছ। নাম সঙ্কীর্ত্তনের সময় অসময়ও রাখ নাই তথাপি আমি এমনি হতভাগ্য যে এমন নামেও আমার অনুরাগ নাই।"

নামে সর্ব্বশক্তি নিহিত করিয়াছেন। এই সর্ব্বশক্তি সমন্বিত নাম একবার মাত্র জিহ্বায় উচ্চারিত হইলে যে আনন্দ, জগতের শত সহস্র সম্ভোগে নিমগ্ন হইলেও সে আনন্দের লেশ মাত্রও পাওয়া যায় না। তাই বৈষ্ণব কবি গাহিলেন—

"অনন্ত কৃষ্ণের নাম অনন্ত মহিমা
নারদাদি ব্যাসদেব দিতে নারে সীমা।
নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার.
অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার।
শতভার সুবর্ণ গো কোটি কর দান
তথাপি না হয় কৃষ্ণ নামের সমান।
যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি।
শুন শুন ওরে ভাই নাম সঙ্কীর্ত্তন
যে নাম শ্রবণে হয় পাপ বিমোচন।"

এই নাম সঙ্কীর্ত্তন মাত্রই এই অসার সংসারে একমাত্র সার বস্তু। নাম করা চাই কিন্তু এই নাম করাই কঠিন। কিরূপে নাম করিতে হয়? নাম করিবার কালাকাল নাই বটে কিন্তু কিরূপে করিলে এবং কিরূপ হইলে নামগান করিবার উপযোগী জীব হইতে পারে? তাই মহাপ্রভু বলিলেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণু না
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

তৃণের অপেক্ষা নীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু ও অমানীর মানদ হইলে তবে হরি নাম উচ্চা-রণের অধিকারী হইতে পারা যায়। ইহা বড় কঠিন কথা। সংসারের শত সহস্র স্বার্থ পূর্ণ, অহঙ্কারে স্ফীত মোহান্ধ জীব, কিরূপে আত্মাভিমান বর্জ্জন করিয়া তৃণের ন্যায় সুনীচ হইবে? বৃক্ষকে যে ছেদন করে, তাহাকেও ছায়াদানে সে বিরত হয় না, সেই তরুর ন্যায় সহিষ্ণু কিরূপে মায়িক জীব হইতে পারে? সর্ব্ব স্বার্থ ত্যাগ না করিলে "তরোরিব" সহিষ্ণু মানব হইতে পারে না? "অমানীনা মান দেন"—

যে ব্যক্তি সমাজে সম্মানের উপযুক্ত, তাহাকে ত সকলেই মান্য করেন, যে অনুপযুক্ত তাহাকে মান দেওয়াই মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্ব-হীন ব্যক্তি হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের অধিকারী নয়।

নাম সঙ্কীর্ত্তনের বলে, অহরহ নাম করিতে করিতে দম্ভ, অহঙ্কার পরিশূন্য হইয়া হৃদয় পবিত্র ও নির্ম্মল হইয়া যায়। তখন স্বতঃই নামকারী বিনয়ী ও নির্ম্মৎসর হয়। তখন হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয়। সেই ভক্তির বলে জীব ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে, সেই পূর্ণব্রহ্ম বাসুদেবের নিত্যলীলা-গণ মধ্যে পরিগণিত হইয়া অনন্তকাল সেবা-নন্দ ভোগে ধন্য হইতে পারে। নামের শক্তিতে হৃদয়ের অপূর্ণতা ঘুচিয়া যায় কারণ নাম সর্ব্বদাই পূর্ণ।

"পূর্ণমিদং পূর্ণমদঃ" ইত্যাদি। যাহা পূর্ণ তাহার অণুকণা পর্য্যন্তও পূর্ণ শক্তি ধারণ করে। বিন্দুমাত্র অমৃত পানে কি জীব অমর হয় না? অমৃতের ভাণ্ড পূর্ণ থাকিলে তাহাতে যে শক্তি, বিন্দুতেও সেই শক্তি। এক কলস জলের যে গুণ, যে শীতলতা, এক বিন্দু জলেরও সেই গুণ সেই শীতলতা। বিন্দুমাত্র বিষপানে কি জীব মরে না? সেইরূপ এই নামে সর্ব্ব-শক্তিমানের পূর্ণশক্তি ওতঃপ্রোতঃ ভাবে বিরাজিত, তাই নাম করিতে করিতে হৃদয়ে নামের শক্তি সঞ্চারিত হইয়া যায়, সেই শক্তি বলে নামীকেও লাভ করা যায়। ইহা মুখে বলিয়া বুঝাইবার কথা নহে অনুভূতির বিষয়। মন স্থির করিয়া মনে মুখে এক করিয়া সরল প্রাণে একবার ডাক দেখি, তাহা হইলেই আমার বাক্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবে।

বীজস্বরূপ নামে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা বিরাজিত।

"বীজের মধ্যে বটগাছটি
আছে যেমন আঁকা,
ঐ নামের মধ্যে আছে
তেম্‌নি চূড়া ধড়া বাঁকা।"

নাম বীজস্বরূপ, এই নামরূপ বীজে ভক্তি-বারি সিঞ্চনের দ্বারা ভক্ত যে মহান্ মহীরুহ সৃষ্টি করিতে পারে তাহাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। নামবীজ ভক্তিবারিদ্বারা কৃষ্ণফল উৎপত্তি। তাই আর্য্য ঋষিগণ বলিয়াছেন নাম ভিন্ন গতি নাই।

"হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামেব কেবলং
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"
বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

এই নাম সঙ্কীর্ত্তন মাত্র সাধনা। সুর-তান-লয় গঠিত বাক্যের দ্বারা ভগবানের গুণানু-কীর্ত্তনই সঙ্কীর্ত্তন। শাস্ত্র বলেন সুর স্বয়ং ব্রহ্ম। নাদই পরমা বিদ্যা। এই নাদ প্রণবাত্মক। এই প্রণবের সুরে বিশ্ব ভরিয়া আছে। অহরহ এই সুরে প্রকৃতি আপন অধীশ্বরের স্তুতি করিতেছে। এই মাত্র মূল সাধনা। তাই হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের এত মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রে দেখিতে পাই।

নামের শক্তিতে অত্যন্ত দুষ্কৃতকারীও সুকৃতিপরায়ণ হইয়া যায়। কারণ নাম শুদ্ধ ও পবিত্র। "শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং" নামের এই পবিত্রতাহেতু নাম করিতে করিতে নামকারীরও হৃদয় অমল, কল্মষ বিহীন হইয়া যায়। "তিন লক্ষপতি" যবন হরিদাস এক সময়ে একস্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করতঃ নাম জপে নিমগ্ন ছিলেন। তথাকার রাজা রামচন্দ্র খাঁন ঈর্ষ্যাবশতঃই হউক বা হরিদাসের শক্তি পরীক্ষার্থেই হউক পরমাসুন্দরী এক বেশ্যাকে

তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। সর্ব্বালঙ্কারে দেহ ভূষিত করিয়া মোহিনীমূর্ত্তিতে এক বেশ্যা হরিদাসের নিকট উপস্থিত হইয়া আপন মনোভিলাষ জ্ঞাপন করিল। জপ শেষ হইলে মনোভিলাষ পূর্ণ করিবেন বলিয়া হরিদাস আবার জপে মনোভিনিবিষ্ট করিলেন। জপ শেষ করিতে নিশাও শেষ হইল, সুতরাং রমণী বিফল মনোরথ হইয়া সে দিনের জন্য প্রত্যাবৃত্ত হইল। এই জপে তিন দিন সে সাধুকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু হরিদাসের মুখে নাম শুনিতে শুনিতে তাহার দুর্ব্বাসনা চলিয়া গেল। সে তৃতীয় দিবসে সর্ব্বত্যাগিনী হইয়া সাধুর চরণে কৃপাভিক্ষা করিল। হরিদাস তাহাকে উদ্ধার করিলেন।

যে বেশ্যা, রমণীসুলভ কোমলতা বা ধর্ম্ম যাহার প্রাণে বিন্দুমাত্রও নাই, আজীবন যে অসঙ্কোচে পাপকার্য্য সাধন করিয়াছে, আপন ইন্দ্রিয়ের দাসী হইয়া শত পুরুষের সেবা করিয়াছে, নামের বলে বহুদিনের সঞ্চিত তাহার হৃদয়মল বিদূরিত হইয়া গেল। সে নাম পাইয়া ধন্য হইল। একবার নাম করিলে কোটি কল্পের পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। শত সহস্র বৎসরের মলিনতামাখা লৌহ খণ্ড একবার মাত্র স্পর্শমণি স্পর্শেই সুবর্ণ কান্তি ধারণ করে। নামের এমনি শক্তি, নিজের সর্ব্বশক্তি দিয়া নামকে পূর্ণ করিয়াছেন বলিয়া, একবার নাম উচ্চারণেই সর্ব্ব পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে ও মরমের মলিনতা বিধৌত করিয়া দেয়। তখন নামবলে পরিমার্জ্জিত, সুপরিষ্কৃত হৃদয়ে নামীর উদয় হয় ও সেই রূপ দর্শনে ভক্ত বিভোর হইয়া যায়। সেই জন্য বৈষ্ণবের নবধা সাধনের মধ্যে "শ্রবণ ও কীর্ত্তন" প্রথম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা :—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদ সেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম নিবেদনং ॥"

নাম সঙ্কীর্ত্তনের বিধান জীবের মহামঙ্গলের হেতু কারণ সারাদিন সংসারের কটু কষায় সম্ভোগের মধ্যে বাস করিয়া ও তৎপ্রসঙ্গে কালযাপন করিয়া প্রাণ পরিম্লান হইলে, ভগবৎ কথা কীর্ত্তন বা শ্রবণে সে মলিনতা বিদূরিত হয়। তাই চৈতন্যচরিতামৃতকার বলিলেন—

"আন কথা না কহিবে, আন কথা
না শুনিবে।"

আমাদের পল্লীগ্রামের মধ্যে আজ কাল দেখিতে পাই যেখানে পাঁচ জন নিষ্কর্ম্মা লোক একত্রিত হইয়াছে, সেই খানেই তাস, পাশা বা পরনিন্দা, এই সমস্ত আরম্ভ হইয়াছে। এই জন্যই আমরা এত অবনত। জগতে যত উন্নত জাতি আছে, চাহিয়া দেখ, তাহাদের মধ্যে এক ত নিষ্কর্ম্মা লোক অতি বিরল, অথবা যাহারা নিষ্কর্ম্মা তাহারা নিজের চেষ্টাতেই বিব্রত। আমাদের অবস্থা ঠিক তাহার বিপরীত। গৃহে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই যাহা আছে তাহাও শত গ্রন্থীযুক্ত। তৈলাভাবে গৃহলক্ষ্মীর কেশ উলুবনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই স্বয়ং বেশ হাস্য-পরিহাসাদি ও তাশ পাশা লইয়া দিনাতিপাত করেন। স্ত্রীপুত্র অনাহারে কষ্ট পাইতেছে চক্ষে দেখিয়াও তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করা দূরে থাকুক, একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া বসেন। ইহাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

তাই শাস্ত্রকার বিধান দিলেন যখনি সময় পাইবে, অবসর যখনি হইবে, ব্যর্থ কথা না কহিয়া ভগবৎ প্রসঙ্গ কর, হরিগুণ গান কর

ইহকালে শ্রেয়ঃ লাভ হইবে ও পরকালে সদ্গতি হইবে। অহোরাত্র তাই নামজপের বিধান দিয়াছেন। চিরজীবন অভ্যাস থাকিলে শেষের সে দিনেও নাম ভুলিবে না। অহরহ জিহ্বায় নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এমনি অভ্যাস হইয়া যাইবে, যে নাম আর জিহ্বা ত্যাগ করিবে না। মৃত্যুকালে ইন্দ্রিয়বৃত্তি স্বকর্ম্ম ত্যাগ করিলেও জিহ্বায় নাম রহিবে। তাহাই প্রার্থনীয় কারণ গীতায় ভগবান বলিতেছেন—

"যং যং বাপি স্মরণ ভাবং ত্যজত্যন্তে
কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা
তদ্ভাবভাবিতঃ॥"

মৃত্যুকালে যে ভাব লইয়া দেহত্যাগ করিবে, সেই ভাবানুসারে পরজন্মে তোমার গতি নির্দ্ধারিত হইবে। শেষ সময়ে যদি ভগবৎ-ভাবে হৃদয় পূর্ণ থাকে, তদ্গতি লাভ হইবে। অজামিল অতি দুর্ব্বৃত্ত ও দুষ্কৃতকারী হইলেও, যমদূতের ভয়ে নিজ পুত্র "নারায়ণ"কে নাম ধরিয়া ডকিয়াছিল বলিয়া তাহাকে বিষ্ণুদূতে লইয়া গেল। তবুও সে ঈশ্বরবোধে "নারায়ণ" বলে নাই। তাই বলিয়াছি "বস্তু শক্তিঃ ন বুদ্ধিমপেক্ষতে" জানিয়াই কর আর না জানিয়াই কর, হেলায় কর বা শ্রদ্ধায় কর, নামের কার্য্য নাম করিবে। তাই একবার নাম উচ্চারণ করিলেই তাহার সর্ব্ব পাপ ধ্বংস হইয়া গেল কারণ "নাম্নস্ত যাদৃশী শক্তিঃ" ইত্যাদি।

তাই নাম সঙ্কীর্ত্তনই কলিগত ভারতবাসীর একমাত্র সম্বল। সে জানে তাহার কেহ না থাকিলেও, কাঁদিয়া মনোবেদনা জানাইবার তাহার একজন আছেন, তাঁহাকে ডাকিলেই তাহার সর্ব্ব দুঃখ বিনষ্ট হইয়া বিমল আনন্দে মন প্রাণ পূর্ণ হইয়া যাইবে। তাই দরিদ্র ভারত তাঁহাকে ডাকে—পাঁচ জন মিলিত হইয়া মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পথে খোল করতালি সংযোগে তাঁহার গুণগান করে, আর চিন্তাদগ্ধ প্রতপ্ত প্রাণ শীতল করে। তাই তাহার কাছে নাম এত—প্রিয়তম বস্তু। আর "শ্রীকৃষ্ণ" এই অক্ষর কয়টি মুখে উচ্চারিত হইবা মাত্রেই লোক মুক্তি পায়, কোন ব্রত, নিয়ম বা পূজাচরণাদি কৃচ্ছ্র সাধনার প্রয়োজন হয় না যথা :—

"আকৃষ্টিঃ কৃত চেতসাং সুমহতামুচ্চাটনং
চাংহসা
মাচাস্তালমক লোক সুলভো বশ্যশ্চ
মুক্তিশ্রিয়ঃ।
নো দীক্ষাং ন চ সংক্রিয়াং ন চ
পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোঽয়ং রসনা স্পৃগেব ফলতি
শ্রীকৃষ্ণ নামাত্মকঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ নামরূপ মন্ত্র রসনা স্পর্শ মাত্রেই ফলদায়ী সর্ব্ব শাস্ত্রেই ইহা পাওয়া যায়। নাম ও নামীর অভেদত্ব হেতু নামীর পূর্ণ শক্তিমত্তা নামে আরোপিত আছে, তাই নাম করিতে করিতে নামের বলে নামীকে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং সেই বলে, ইন্দ্রিয়গ্রাম বলবান্ হইলেও নামকারীকে বিমুগ্ধ করিতে পারে না। সংসারের শত সহস্র প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিতে নাম মাত্রই অভেদ্য বর্ম্মস্বরূপ নাম বর্ম্মে জীব আচ্ছাদিত হইলে, মায়ার বা রিপুর তীক্ষ্ম সায়কজাল তাহাকে বিদ্ধ করিতে পারে না পরন্তু নাম বলে বলীয়ান নামকারী অবহেলে রিপুর শাসনকে পদদলিত করিয়া, মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। নাম সর্ব্বসিদ্ধির সোপান। নাম চতুর্ব্বর্গদায়ী—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই

চতুর্ব্বর্গই নামে লাভ হয়। নামে সিদ্ধ হইলে জীব ভগবৎ সান্নিধ্য লাভ করে। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব বলিতেন "যেমন বড় বড় জাহাজ আপনিও পারে যায় ও সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোককেও পার করিয়া দেয়, "সেইরূপ নামে সিদ্ধ হইলে নামকারী স্বয়ং ভগবৎ সান্নিধ্য লাভ করে এবং সেই অমূল্য নামধন বিতরণ করিয়া বহু জীবকেও মোক্ষধামে লইয়া যায়। তাই মহাপ্রভু বলিলেন এই নামে "প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্" নামের প্রতি অক্ষর অমৃতময়, নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে" তাই নাম সাধনার এত প্রয়োজন সর্ব্বশাস্ত্রে কথিত হয়। এই নাম শক্তির বলে "তিন লক্ষ পতি" যবন হরিদাস বাইশ বাজারে কোড়া খাইয়া মহাত্মা যিশুর ন্যায় বলিয়া ছিলেন "দয়াময়, আমার নির্য্যাতনকারিগণকে ক্ষমা করুন। উহারা জানে না কাহাকে মারিয়াছে।

নামই জগৎ সৃষ্টির মূল। আনন্দই যদি সৃষ্টির মূল হয়, তাহা হইলে নাম ও নামীর সম্মিলনই এই বিশ্বের জননী। নাম ও নামী, শ্রীমতী ও শ্রীমান, শক্তি ও শক্তিমান, অভিন্ন বলিয়া দুইয়ের মিলনই হ্লাদিনী পরাশক্তির স্থান এবং এই দুইয়ের সম্মিলনেই মহারাস প্রতিষ্ঠিত। কারণ আনন্দই সর্ব্বময়। এই আনন্দই বিশ্বজনীন প্রেমের জননী এবং এই আনন্দই সর্ব্বশক্তি সমন্বিত নাম। নামই সকল আবৃত করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছে। নামে পবন চলে, রবি শশী আপন কিরণ জাল বিস্তারে জগৎ পুষ্ট করে, নাম বলেই গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্রাদি স্ব স্ব পথে বিচরণ করিয়া প্রকৃতির কার্য্য সাধন করে। নামে নদী চলে, পাখী গায়, এই বিশ্ব এক মহান সঙ্কীর্ত্তন মণ্ডপ—নামে ভরিয়া আছে। অহরহ প্রকৃতি এই নাম নাদ স্বরে ধ্বনিত করিতেছে, তাই আদি পুরাণ বলিলেন—

"ন নাম সদৃশং জ্ঞানং ন নাম সদৃশং ব্রতম্
ন নাম সদৃশং ধ্যানং ন নাম সদৃশং ফলম্।
ন নাম সদৃশ স্ত্যাগো ন নাম সদৃশঃ শমঃ
ন নাম সদৃশং পুণ্যং ন নাম সদৃশী গতিঃ॥"

কোন সাধনাই এই নাম সাধনার তুল্য নহে কারণ শ্রীভাগবৎ বলিতেছেন

"মধুর মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকল নিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপং
সকৃদপি পরিগীতং হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণ নাম।"

"মধুর হইতে মধুরতর, সকল মঙ্গলের আলয় এই কৃষ্ণ নাম হেলায় বা শ্রদ্ধায় একবার উচ্চারণ করিলেই জীব উদ্ধার পায়। এই নাম মাত্র যাহার সার, জগতে সেই শ্রেষ্ঠ জীবকারণ জীবমাত্রেই এই নামের বশীভূত, তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিলেন

"জীবের স্বভাব হয় নিত্য কৃষ্ণদাস।"

সুতরাং জীবমাত্রেই বৈষ্ণব পদবাচ্য। আর এই নাম সর্ব্বত্যাগী সাধুগণ সর্ব্বদাই গান করিয়া থাকেন যথা শ্রীভাগবতে ১০।১।৪ শ্লোকে বলিতেছেন—

"নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্
ভবৌষধাচ্ছোত্র মনোহভিরামাৎ
ক উত্তম শ্লোক গুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ।"

"পশুঘাতী কিরাত বা আত্মহত্যাকারী ব্যতীত কোন ব্যক্তি, ভোগ-তৃষা বর্জ্জিত মুক্ত পুরুষ কর্ত্তৃক উপগীয়মান, ভবরোগের ঔষধ স্বরূপ, শ্রবণ ও মনের সুখদায়ক, উত্তম শ্লোক ভগবানের গুণানুকীর্ত্তন হইতে বিরত হয়?" মহারাজ পরীক্ষিত উক্ত কথা বলিয়া হরি কথা শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা করিলে শ্রীশুকদেব উত্তর করিয়াছিলেন

"বাসুদেব কথা প্রশ্নঃ পুরুষাং স্ত্রীন্ পুনাতি হি।
বক্তাং প্রস্থকং শ্রোতৄং স্তৎপাদ সলিলং যথা॥"
১০।১।১৬

"ভগবান বাসুদেবের চরণ জল যেমন যিনি সেচন করেন যাঁহাকে সেচন করা যায়, আর তদুভয়ের সঙ্গী, এই ত্রিবিধ পুরুষেরই পবিত্রতা সম্পাদন করেন; তাঁহার কথা বিষয়ক প্রশ্নও তদ্রূপ প্রশ্নকর্ত্তা, বক্তা ও শ্রোতা তিন জনকেই পবিত্র করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই।"

নামকারী, শ্রোতা এবং শুনিতে ইচ্ছুক যাহারা, এই তিন জনকেই নাম পবিত্র করিয়া দেয়। নামেই চতুর্ব্বর্গ সংস্থিত। এই নাম সঙ্কীর্ত্তন মাত্রই যুগধর্ম্ম। ইহাপেক্ষা অন্য সাধনা আর নাই। শতাশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিলে জীবের যে ফললাভ হয়, একবার নাম উচ্চারণে তদপেক্ষা অধিক ফল লাভ হয়। ভক্তের নিকট এই নাম বড় মধুর। সতী স্ত্রীর নিকট স্বামীর নামটি যেমন অতি মধুর বার বার শ্রবণেও যেন তৃপ্তি সাধন হয় না, সেইরূপ এই নাম একবার অভ্যাস করিতে শিখিলে আর জিহ্বা ছাড়ে না, তাই চণ্ডীদাস বলিয়াছেন

"সইরে কেবা শুনাইল শ্যাম নাম,
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো অবশ করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে,
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে।"

এই মধুমাখা নাম একবার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে, আত্মানুভূতি আসে ও সেই বলে ভক্ত অন্তরের অন্তরতম দেশে প্রাণারামের আনন্দ-ঘন মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বন্ধন কাটাইয়া মুক্ত হইয়া যায়। নামের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে যদি লক্ষ জন্মাধিক কাল কাটিয়া যায়, তথাপি সে অনন্ত মহিমার কণিকামাত্রও বর্ণন হয় না। হৃদয় রঞ্জন নামীর এই মধুর নাম তাই জীবের একমাত্র সাধনার সার বলিয়া মহাপ্রভু জগতকে শিখাইলেন। দয়াময় জীবের আত্মবিস্মৃতি দর্শন করিয়া, তাহাদিগকে উদ্বোধিত করিবার কারণ এই নামরূপ মহৌষধি প্রদান করিলেন। জীব নামৌষধি পানে ভবব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া যাহাতে বিস্ময়ধামে অনন্ত সম্ভোগের মধ্যে অনন্তকাল বাস করিতে পারে তাহাই বিধান করিলেন। কলিতে এই নাম মাত্র সাধনা। অন্য সাধনা আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। ইহাই যুগধর্ম্ম ইহাই জীবের একমাত্র গতি।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু।

দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ইতিহাস

তৃতীয় অধ্যায়

ট্রান্সভালে ভারতবাসী

নেটাল হইতে সর্ত্তবদ্ধ মজুরীগিরি শেষ করিয়া কতিপয় ভারতবাসী ট্রান্সভালে আসিয়া বাস করিতে থাকে। এখানকার অধিবাসিগণ অপেক্ষা ভারতবাসী অধিকতর বুদ্ধিমান হওয়াতে তাহারা নানা রকমের

বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করে। এই সকল কারণে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ট্রান্সভালস্থ বুয়রগণ একটি স্বর্ণহরী কায়দা (Golden Law) প্রস্তুত করেন যে, ট্রান্সভাল প্রদেশে কোনও ভারতবাসী ভূমির অধিপতি হইতে পারিবে না। এই আইন ভারতবাসীর উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করে কিন্তু ইহাতে বিচলিত না হইয়া ভারতবাসিগণ আপনাদের উন্নতি বিধানের জন্য কটিবদ্ধ হয়। ইহারা ট্রান্সভালের সুপ্রসিদ্ধ নগর জোহান্সবর্গের সমীপবর্ত্তী স্থান ৯৯ বৎসরের জন্য ইজারা লয় এবং তদুপরি 'বস্তি' নির্ম্মাণ করে। ইহা ছাড়া প্রিটোরিয়া বোক্সবর্গ ও জর্মিষ্টন প্রভৃতি নগরেও তাহারা বসবাস করিতে আরম্ভ করে। এইরূপে ট্রান্সভালের ছোট বড় ব্যবসা তাহাদের হাতে আসে। দেশের ধনের এক প্রধান অংশ তাহারা প্রাপ্ত হয়। ভারতবাসিগণের কতিপয় শ্রেষ্ঠ গুণপনাও ইহাদের অধিকতর :কষ্টের কারণ হয়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবাসিগণের উপর এক একটি করিয়া বিপদ পতিত হয়। বুয়র রাজকর্ম্মচারিগণের বুদ্ধির দোষেই এই সকল বিপদ ও কষ্ট উপস্থিত হয়। এই সকল লোক ভারতবাসিগণের রীতি নীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিয়া নানা প্রকারের অন্যায় অত্যাচার করিত। এই দুঃসময়েও ভারতবাসিগণের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, বুয়র রাজ্যে সভ্যতার বিস্তার হইলে তাহাদের দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া যাইবে। তাহারা বিশ্বাস করিত, ভারতবর্ষ ইংরাজের রাজ্য, তাহারা ঐ রাজ্যের প্রজা, সুতরাং তাহাদের দুঃখের কথা শুনিবামাত্র ভারতগভর্ণমেণ্ট ইহার প্রতিবিধান করিবেন। বুয়র গভর্ণমেণ্টের অত্যন্ত ঘৃণিত অত্যাচারের কথা জানিয়া বৃটিশরাজদূত সার কোনিংহাম গ্রীন, দুর্ব্বল ভারতবাসিগণকে সর্ব্বদা সহায়তা করিতেন। কিন্তু বুয়র গভর্ণমেণ্ট মিঃ গ্রীনের কথা বিন্দুমাত্রও গ্রাহ্য করিতেন না। এজন্য মিঃ গ্রীন নিরুপায় হইয়া ভারতবাসিগণকে রক্ষা করিবার জন্য রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়াকে ডচগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার পরামর্শ প্রদান করেন।

বুয়র যুদ্ধে ভারতবাসী

ভারতবর্ষ বীরত্বের জন্য প্রসিদ্ধ। যদিও বৃটিশ উপনিবেশ নেটাল ও কেপকলোনিতে যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে প্রবাসী ভারতবাসিগণের উপর উত্তম ব্যবহার করা হইত না তথাপি যুদ্ধারম্ভ হইবামাত্র এখানকার ভারতবাসিগণ ইংরাজগণের পক্ষে জীবন বিসর্জ্জন করিবার জন্য দণ্ডায়মান হয়। শ্বেতাঙ্গের যুদ্ধে কৃষ্ণাঙ্গের মিলিত হইবার অধিকার নাই এজন্য তাহারা সম্রাটের জয়ের জন্য যুদ্ধ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই। ভারতবর্ষের অনেক রাজন্যবর্গ এই যুদ্ধে আপনাদের বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের উৎসাহ কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তথাপি ভারতবাসিগণ আহত সিপাহিগণের সেবা করিবার জন্য বন্দোবস্ত করেন। প্রথমে ইংরাজগণ এই সহায়তা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, পরে বারম্বার ভারতবাসিগণের প্রার্থনাতে কেবলমাত্র আহত সৈনিকগণের সেবা শুশ্রূষা করিবার অনুমতি প্রদান করেন। জগতের কোথাও কি এমন জাতি আছে যাহারা রাজভক্তিতে ভারতবাসীর সমকক্ষ হইতে পারে? একটি পরাধীন জাতি বারম্বার বিফল মনোরথ হইয়াও রাজার জাতির শুশ্রূষা করিবার জন্য প্রার্থনা করিতে থাকে, ইতিহাসের কোথাও কি এরূপ উদাহরণ পাওয়া

যাইবে? শেষে গভর্ণমেণ্ট এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলে ভারতবাসিগণ তৎক্ষণাৎ একটি সেবকদল সৃষ্টি করেন। স্বজাতিবৎসল গান্ধী ইহাদের নেতা নিযুক্ত হন। এই সকল ভারতীয়গণ রণক্ষেত্রে অনবরত অগ্নিস্রাবী কামানের ভীম গর্জ্জন, বন্দুকের গুড়ুম গুড়ুম ধ্বনি শ্রবণ করিতেছিলেন, এবং উদ্যত তরবারির নীচ হইতে আহত সৈনিকগণকে আনিয়া তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করিতেন। এই যুদ্ধে ভারতবাসিগণ ইংরাজ সৈনিকগণের যেরূপ সেবা করিয়াছিলেন, তাহার প্রশংসা প্রধান সেনাপতি লর্ড রবার্টস্ হইতে আরম্ভ করিয়া রাজনীতিবিদ্‌গণ পর্য্যন্ত সকলেই করিয়াছিলেন। দরবন হইতে প্রকাশিত দৈনিক পত্র 'নেটাল এডভারটাইজার' ভারতবাসিগণের প্রবল শত্রু ছিলেন। কিন্তু যুদ্ধে ভারতবাসীর সহায়তা দেখিয়া পুরাতন শত্রুতা ভুলিয়া যান। পত্রের এক অঙ্কে লিখিত হয় যে, ভারতবাসিগণ ত বৃটিশ সম্রাটের প্রজা, বৃটিশসম্রাট্ কখনও ইহাদের এই আত্মসমর্পণ ভুলিবেন না। ভারতের রাজন্যগণ যখন দেখিলেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া সাহায্য করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব তখন তাঁহারা অন্য প্রকারে ইংরাজ সিপাহিগণের সাহায্য করিতে লাগিলেন। এই যুদ্ধে ইংরাজগণের সাহায্যার্থ ভারতবর্ষ হইতে ৮০০০ গোরা অফিসার সৈনিক, ৩০০০ মনুষ্য ৬৭০০টী ঘোড়া ১৬০০ খচ্চর ও টাট্টু ১০০০০ গরম কোট, ৪০০০০ খাদ্য রাখিবার থলিয়া ৪৫০০০ টুপি, ৭০০০০ জোড়া জুতা, ২৬৫০ জীন, ৪৬০ জন কারিগর ও ২৬৫০ জন মিস্ত্রি প্রেরিত হয়। ইহা ছাড়া ২৬৫০টী অশ্ব, দেশীয় রাজগণের অশ্বারোহী সৈন্য ও সৈন্য সমূহ প্রেরিত হয়। অবশেষে ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৩১ মে ট্রান্সভাল ইংরাজের অধিকারে আসে।

ভারতীয়গণের হর্ষ ও বিষাদ

ট্রান্সভাল ইংরাজ রাজ্য হওয়াতে ভারতবাসিগণের আনন্দের আর পরিসীমা থাকে না। তাহারা সর্ব্বদা নানারূপ আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে থাকে। ভারতবাসিগণের দৃঢ় বিশ্বাস যে এক্ষণে তাহাদের দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া যাইবে। তাহাদের এই বিশ্বাস হওয়া স্বাভাবিক যে, যুদ্ধে ভারতবাসী ইংরাজ রাজের জন্য যেরূপ আত্মোৎসর্গ করিয়াছিল, সেই উৎসর্গের পরিবর্ত্তে তাহাদের এই দুঃখ দূর করিবার জন্য ইংরাজ রাজ বিশেষ চেষ্টা করিবেন। তাহারা এই আশায় নিমগ্ন হইয়া মনে করিত যে, শীঘ্রই পরিপূর্ণ সুখ ও শান্তি লাভ করিবার দিন অতি নিকটে আসিয়াছে। এই প্রকারে উহাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা আনন্দের প্রবাহ চলিতে থাকিত। কিন্তু দুঃখের সহিত লিখিতে হইতেছে যে, ভারতবাসিগণের এই আশা নিরাশায় পরিণত হয়। ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ বুয়রদিগের অনুকরণ করিতে থাকেন। তাঁহারা বুয়রদিগের ন্যায় ভারতবাসিগণের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। এমন কি বুয়রগণের রাজত্বকালে ভারতবাসিগণকে যেরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হইত, ইংরাজের রাজত্ব কালে তাহা অপেক্ষাও ভীষণ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। যে সকল দুঃখের নাম মাত্রও বুয়র রাজত্বকালে ছিল না, বৃটিশ রাজত্বকালে সেই সকল দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। ভারতবাসিগণের দাবী দাওয়ার উপর ভীষণ আক্রমণ হইতে থাকে। ইহাতে ভারতবাসীরা একেবারে নিরাশ হইয়া পড়েন। ঐ সময়ে তথায় 'ট্রান্সভাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন' নামক একটি সভা স্থাপিত হয়। শ্রীযুক্ত জয়রাম সিংহ বর্ম্মা উহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং লাল বাহাদুর সিংহ,

বন্ত্রা আত্মারাম ব্যাস, ডোমন, বল্লভরাম ঝীনাভাই দেশাই, পি, কে, নায়ডু প্রভৃতি ৪২ জন ইহার সভ্য নিযুক্ত হন। ভারতবাসিগণের দাবী দাওয়া রক্ষা করাই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল।

ভারতীয়গণের বাসস্থান হরণ

১৯০৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে জোহান্স বর্গের মিউনিসিপ্যালিটি—এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন জারী করেন যে, যেখানে যেখানে ভারতবাসিগণ বাস করে সেই সেইস্থান গ্রহণ করিয়া তাহাতে বাজার বসান হইবে। এই আকস্মিক বিপদের সংবাদ শুনিবামাত্র ভারতীয়গণের হৃদয়ে ঘোর আতঙ্কের সঞ্চার হয়। তাহারা সকলে পরিতাপ করিতে থাকেন। যে সকল ভূমি বুয়র গভর্ণমেণ্ট ৯৯ বৎসরের জন্য ভারতবাসীদিগকে ইজারা দিয়াছিল, সেই সকল ভূমি আজ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট উক্ত সর্ত্ত শেষ হইতে না হইতেই কাড়িয়া লইতে চাহিতেছেন। এর চেয়ে বেশী জুলুম আর কি হইতে পারে? ভারতবাসিগণ দুঃখিত অন্তঃকরণে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে। হাজার হাজার টাকা খরচ করে ও নানা রকমে প্রাণপণ চেষ্টা করে, তবুও তাহারা ন্যায় বিচার প্রাপ্ত হইবে কেন? ভারতবাসীদিগের পক্ষ হইতে লোকমান্য গান্ধী এই মহা অন্যায় পূর্ণ প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করেন। বড় বড় উকিল ও ব্যারিষ্টারগণ ইহাদের পক্ষ হইতে গভর্ণমেণ্টের নিকট এই আইন বিরুদ্ধ কার্য্যের জন্য মহা আন্দোলন উপস্থিত করেন। সাধারণ রাজপুরুষ হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চ পদাধিকারিগণের নিকট পর্য্যন্তও আপনাদের দুঃখের লাঘব করিবার জন্য প্রার্থনা করে। এমন কি বিলাতের পার্লামেণ্টেও এই বিষয় গোচর করা হয়, কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গের প্রার্থনাতে কেহই মনোযোগ প্রদান করেন নাই,সব প্রার্থনা বিফল হয়। পরিশেষে ভারতবাসিগণের বাসস্থান ইংরাজদিগের বাসস্থানের শামিল করা হয়। ভারতবাসীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ভূমির মূল্যের চতুর্থাংশ প্রদান করা হয়

ভারতবাসিগণের জমী গ্রহণ করিয়া জোহান্সবর্গের মিউনিসিপ্যালিটির সহযোগিণী স্বাস্থ্যরক্ষিণী সভা (Public Health Committee) আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, যেস্থানে কাফ্রিগণ বাস করে, তাহা ভারতবাসীকে প্রদান করা হইবে। স্থানীয় শ্বেতাঙ্গ অধিবাসিগণ উক্ত সভার সভাপতিকে জানান যে, কাফ্রিগণের বাসস্থানে ভারতবাসিগণকে বসিতে দেওয়া ঠিক নয়, উহা শ্বেতাঙ্গ বস বাসের উপযোগী। এই প্রতিবাদে স্বাস্থ্য রক্ষিণী সভা সমমতাবলম্বী হন ও পূর্ব্বমত পরিহার করেন।

এই উপনিবেশ শ্বেতাঙ্গগণের। ইহাঁদের ইচ্ছানুযায়ী সভার কার্য্য পরিচালিত হয়। যে যে স্থানে উক্ত সভা ভারতবাসিগণকে বসাইবার জন্য ঠিক করিয়াছিলেন, সে স্থান হইতে হেড্ পোষ্ট অফিস পৌণে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। যে আইন অনুসারে ভারতীয়গণের বাসস্থান কাড়িয়া লওয়া হয়, সেই আইন অনুসারে পুরাতন বাসস্থানের নিকট নূতন বস্তি স্থাপিত হওয়া উচিত ছিল। এ বিষয়ে ভারতীয়গণ খুব আন্দোলন করিতে থাকেন কিন্তু তাহাদের বৃথা চীৎকার কাহারও কর্ণপথে প্রবিষ্ট হয় না। এক্ষণে ভারতবাসীকে অন্ত্যজ জাতির ন্যায় পৃথক ভাবে বসান হইতেছে। এই সময়ে যে সকল ভারতবাসী যেখানে যেখানে বসবাস করিয়া আছে, আদেশ পাইবা মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সে স্থান তাহাদিগকে খালি করিয়া দিতে হইতেছে।

জোহান্সবর্গে মহামারী

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে জোহান্সবর্গের চতুর্দ্দিকে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টির পরিমাণ অধিক হওয়ায় নগরের আবর্জ্জনা সমূহ পচিয়া দুর্গন্ধময় হইলে ভারতীয়গণের পল্লীতে প্লেগের আবির্ভাব হয়। এই পীড়াতে অতিশয় যন্ত্রণা পাইয়া অনেক লোক মরিতে থাকে। অল্পদিনের মধ্যে ৫১ জন ভারতবাসী যন্ত্রণায় ছটফট করিয়া মরিয়া যায়। এই অনর্থক মৃত্যু দূরীভূত করিবার জন্য সমাজ-সেবক গান্ধী, বি মদনজীত, ডাক্তার গোডফ্রে ও বাবু জয়রাম সিংহ প্রভৃতি মহোদয়গণ একটি হাঁসপাতাল স্থাপন করিয়া পীড়িত ভারতবাসিগণের উত্তমরূপে সেবা শুশ্রূষা করিতে থাকেন ও বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। কিছুকাল পরে এই পীড়ার সংবাদ সাময়িক সমাচার পত্রে প্রকাশিত হয় এবং গভর্ণমেণ্টকে ইহার প্রতিবিধান করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। গভর্ণমেণ্ট তৎক্ষণাৎ ভারতবাসিগণের পল্লীতে পাহারাওয়ালা নিযুক্ত করিয়া এই আদেশ প্রদান করেন যে, কেহ যেন পল্লীর বাহির হইয়া না আসে। গভর্ণমেণ্টের এইরূপ কার্য্যের জন্য ভারতবাসীর প্রায় সকল রকম ব্যবসা বন্ধ হইয়া যায়। তাহারা উদ্যম বিহীন হইয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে। এই অবসরে জননায়ক গান্ধী গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিয়া ভারতবাসিগণকে আহার্য্য সামগ্রী প্রদানের বন্দোবস্ত করেন। কিছু দিন পরে ভারতবাসিগণকে তথা হইতে ক্লীপ্স্রুট নামক স্থানে প্রেরণ করা হয়। সেখানে তাহারা এক মাস অবস্থানের আদেশ প্রাপ্ত হয়। তার পর কোরন-টায়ন নামক স্থানে এক মাস বাস করিতে বলা হয়। তাহাদিগের অবস্থানের জন্য তথায় ছোট ছোট তাম্বু খাটান ছিল। এই স্থানে কেহই রোগাক্রান্ত হয় নাই। সকলকে এজন্য মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার পর অনেক লোক ট্রান্সভালে বাস করিতে আরম্ভ করে, আর কতক লোক নেটাল ও ভারতবর্ষে চলিয়া আসে। নেটাল যাত্রিগণকে পাঁচদিন চার্লিষ্টন কোরনটায়নে থাকিতে হইয়াছিল।

ভারতবাসিগণকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া তাহাদের পল্লী জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। ট্রান্স-ভাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভাপতি শ্রীযুক্ত জয়রাম সিংহ বর্ম্মা স্বদেশ যাত্রা করেন। ট্রান্সভালস্থ ভারতীয়গণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন দেওয়া হয়। তাঁহার স্থানে শ্রীযুত লালবাহাদুর সিংহ সভা-পতি নিযুক্ত হন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের এসিয়াটিক এক্ট

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে এশিয়াবাসিগণের জন্য এক অপমানজনক আইন প্রস্তুত হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য, প্রত্যেক ভারতবাসীকে আপন আপন নাম রেজেষ্টারী করিয়া লইবার জন্য বাধ্য করা। ঐ সঙ্গে প্রত্যেককে পৃথক পৃথক দশ অঙ্গুলির ও একত্রে চার'চার অঙ্গু-লির সর্ব্বসমেত অষ্টাদশ অঙ্গুলির ছাপ প্রদান করিতে হইবে। এই আইনে স্পষ্টভাবে ভারতীয়গণের পক্ষে 'কুলী' শব্দ প্রয়োগ-ই উপযুক্ত হইবে। চোর, লম্পট ও আততায়ি-গণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হয়, ঠিক সেইরূপ ব্যবহার ট্রান্সভাল প্রবাসী ভারতবাসিগণের উপর হইতে থাকে। স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট পুরাতন ভারতবাসিগণকে আপন আপন নাম রেজেষ্টারী করিবার আদেশ প্রদান করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নূতন ভারত-

বাসিগণের দেশে বসবাস করা রহিত করেন। এ স্থানের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসিগণ প্রথম হইতেই ভারতবাসিগণের উপর দুর্ব্যবহার করিতে থাকেন, কিন্তু যখন দেখিতে পাইলেন যে, কষ্ট সহ্য করিয়াও ভারতবাসী আপনাদের বাসস্থান খালি করিতে অনিচ্ছুক তখন তাঁহারা আর এক নূতন আইন গঠিত করিয়া কঠোরতার সহিত তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে ইচ্ছুক হইলেন। এ স্থানে বহুদিন হইতে ভারতবাসী আপনাদের অধিকার সংস্থাপন করিয়া রহিয়াছে, অল্পলাভ লইয়া সস্তাদরে জিনিস বিক্রয় করিতেছে, শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়িগণ বৃথা আড়ম্বরের জন্য ইহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, এক্ষণে নূতন আইনের দ্বারা উহাদের ব্যবসা বন্ধ হইয়া যাইবে। কি সুন্দর আইন। কি সুন্দর ব্যবস্থা! জগতের আর কোথাও কি কেহ এইরূপ অদ্ভুত আইনের কথা শ্রবণ করিয়াছেন? তখন বুয়র যুদ্ধের সময় বলা হইয়াছিল যে, ভারতবাসী দিগের দুঃখ দূর করিবার জন্য এই বুয়র যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে আর এখন যুদ্ধ পরিসমাপ্ত হইলে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের হাতে রাজ্যাধিকার আসিয়াও ভারতবাসীর দুঃখ দূরের পরিবর্ত্তে আরও অধিক দুঃখের সৃষ্টি হইল। স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট নূতন নূতন আইন প্রস্তুত করিয়া ভারতবাসীর রাস্তা কণ্টকাকীর্ণ করিতে লাগিলেন। তার উপর নানা অত্যাচার ভারতবাসীকে দুঃখের অমোঘ পাশে আবদ্ধ করিতে লাগিল। এই আইন অনুযায়ী ১৬ বৎসরের অধিক বয়স্কের বালকগণকে নাম রেজেষ্টারী করিতে হইবে এবং এসিয়াটিক রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট নামক একখানি পরওয়ানা সর্ব্বদা আপনার নিকট রাখিতে হইবে। সিপাহী জিজ্ঞাসা করিলেই তৎক্ষণাৎ পরওয়ানা দেখাইতে হইবে এবং এই আইন ভঙ্গকারীকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

বিলাতে প্রতিনিধি

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এই আইন প্রস্তুত হয় আর ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তাহার অনল চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে আইন প্রস্তুত করিয়া সম্রাটের মঞ্জুরের জন্য প্রেরণ করা হয়। ঐ সময় স্থানীয় ভারতবাসী ও বিলাতে আপনাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে চাহে। হিন্দুগণের পক্ষ হইতে লোকমান্য গান্ধী এবং মুসলমানগণের পক্ষ হইতে মিঃ অলী প্রেরিত হন। ইঁহারা বিলাতে গমন করিয়া ভারত সচিব ও ঔপনিবেশিক সচিব মিঃ এলগিনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সার হেনরীকটন প্রভৃতি পার্লামেণ্টের সভ্য এবং কতিপয় ভারত হিতৈষী ইংরাজ ইঁহাদের কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করেন। ইংলণ্ডের সমাচার পত্র সমূহও ভারতবাসিগণের দুঃখ দূর করিবার জন্য পরামর্শ দান করেন। স্বয়ং সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডও আইনের প্রতিলিপির উপর দস্তখৎ করা মুলতবী রাখেন। ইহাতে আশা হইয়াছিল যে, ভারতবাসীদিগের ভাগ্য ফিরিলেও ফিরিতে পারে। শ্রমজীবি সম্প্রদায়ের সভ্যগণ (Laboural Members) ভারতবাসীর কষ্ট দূর করিবার জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করিতে থাকেন। ইঁহারা গভর্ণমেণ্টকে খোলাখুলি পরামর্শ দেন যে, ঔপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গগণ ভারতবাসীর প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিতেছে, তাহা বন্ধ করিবার জন্য শীঘ্রই চেষ্টা করা উচিত। যদিও দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী ভারতবাসিগণ সম্পূর্ণরূপে

নিরাশ হইয়াছিল তথাপি একবার বিলাতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া তথাকার কর্ত্তৃপক্ষকে তাহাদের দুঃখের কথা শুনান বাকী ছিল, এক্ষণে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া তাহার সুফলের আশায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। এ সময় কিছু সফলতার লক্ষণও দেখা যায়। যখন ভারতবাসীদিগের প্রতিনিধি ভারত সচিব লডমর্লির সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন ভারত সচিব, প্রতিনিধির প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া আইনের প্রতি লিপির উপর তীব্র আলোচনা করেন। শ্রমজীবি পক্ষের ৬০জন সভ্য একটি সভা করিয়া এই আইনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব সমর্থন করেন। এদিকে এই প্রকার প্রবল আন্দোলন হইতে থাকে আর ওদিকে বিলাতেও ভারতীয় প্রতিনিধির অনুকূলে আন্দোলন আরম্ভ হয়। শ্বেতাঙ্গ প্রবাসীগণ ইহা সহ্য করিতে অসমর্থ হন। তাঁহারা এই মহৎ কার্য্যে বাধা প্রদান করিবার জন্য যথা শক্তি চেষ্টা করিতে থাকেন। যখন ঔপ-নিবেশিক মন্ত্রী লর্ড এলগিনের সমীপে ভারতবাসীর প্রতিনিধি গমন করেন, তখন তিনি প্রতিনিধির উপর সহানুভূতি দেখাইয়া একটি বিস্ময়জনক কথা বলেন, তাহাতে ডেপুটেশন সভ্য চমকিত হন। মাননীয় এলগিন বলেন, "প্রবাসী ভারতবাসিগণ এই মর্ম্মে আমার নিকট তার করিয়াছে যে, ডেপুটেশনের সহিত তাহাদের মতের মিল নাই, তাহারা উক্ত সভ্যের সহিত বিন্দুমাত্র সহানুভূতি রাখিতে ইচ্ছা করে না। অবশ্য এই সংবাদ যেরূপ আশ্চর্য্যজনক, সেইরূপ অবিশ্বাসযোগ্য। যখন দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতবাসীর উপর অন্যায় অত্যাচার নির্ব্বি-বাদে সিদ্ধ হইতেছে, তখন তাহা দূরীভূত করিবার জন্য যে মতভেদ হইবে ইহা সম্ভব পর নহে। কোনও নীচ প্রকৃতির লোক এই দুষ্কার্য্য করিয়া থাকিবে ইহা আশ্চর্য্য নহে। বিশেষতঃ যাহারা ভারতবাসীকে শূল দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে তাহারাই যে এইরূপ করিতে পারিবে না, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, লর্ড এলগিনের মত বিচারনিপুণ লোক কিরূপে এই মিথ্যা খবর বিশ্বাস করিয়া লই-লেন। এরূপ তুচ্ছ কথায় বিশ্বাস করা বুদ্ধি-মানের কার্য্য নহে।

আন্দোলনের প্রস্তাব

বিলাতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া নানা-রূপ প্রার্থনা করা হইল, কিন্তু সবই নিষ্ফল হইল। শেষে আইনের প্রতিলিপিতে সম্রাট স্বাক্ষর করিলেন। যখন ভারতবাসীর প্রার্থনা পদদলিত করিয়া আইন পাশ করা হইল, তখন ভারতবাসীরা আইনের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করিবার জন্য সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া স্থির করিলেন যে, চন্দ্র, সূর্য্য আপনার স্বাভাবিক গতি লঙ্ঘন করিয়া বিপথে ধাবমান হইতে পারে, কিন্তু আমরা কখনও আমাদের এই প্রতিজ্ঞা হইতে বিমুখ হইব না। আমরা কিছুতেই এই অপমানজনক আইন স্বীকার করিয়া লইব না। যদি আমাদিগকে ইহার জন্য জেলে যাইতে হয়, তাহাও শ্রেয়স্কর তথাপি মাতৃভূমি ভারত-বর্ষের নামে কলঙ্ক অর্জ্জন করিব না। মান অপমানের ঘাত প্রতিঘাতে ভারতবাসীর আত্মশক্তি জাগিয়া উঠে। আইনের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন হইতে থাকে। ভারতবাসী হয়ত ভাবিতেছে, তাহাদের এই দৃঢ়তা ও মনুষ্যত্ব দেখিয়া ইংরাজ জাতি কিছু নরম হইবে। ইংরাজজাতির অন্তঃকরণ কখন

ও এত নীচ হইবে না যে, কোন জাতির মনুষ্যত্বকে তাহারা পদদলিত করিবে। নেটাল এবং ট্রান্সভালের ভিন্ন ভিন্ন নগরে সভা করিয়া ভারতীয়গণ এই আইনের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করিতে থাকে। দরবনের সভাস্থলে এই কথা স্পষ্ট ভাবে বলা হয় যে, যে ব্যক্তি এই প্রতিজ্ঞা অটল ভাবে রক্ষা না করিবে, সে ব্যক্তি কোটী কোটী ভারত-বাসীর অপমানকারী ও জননী জন্মভূমির পবিত্র নামে কলঙ্ক আরোপকারী অতি হেয় বলিয়া পরিগণিত হইবে। যদি অন্যায় পূর্ব্বক জেলে দেওয়া হয়, তাহা হইলে সেই জেলকে আরাম ভবন মনে করিতে হইবে। আপ-নার সম্মান রক্ষার জন্য জীবন বলি প্রদান করিতে হইবে। আমাদের উপর এর চেয়ে অধিক আর কি অত্যাচার হইতে পারে? আমরা দ্বিগুণ মূল্য দিয়াও জমি কিনিতে পাই না, মাল গুজারি প্রদান করিয়া, বৃটিশ ভারতের প্রজা হইয়াও আমাদের কোন দাবী দাওয়া নাই! ইহা যদি অন্যায় না হয় তাহা হইলে আর কি অন্যায় নামে অভিহিত হইবে? ট্রান্সভালের ভারতীয়ের জন্য সকল হইতে শ্রেষ্ঠ জেল গৃহ প্রস্তুত রহিয়াছে। এই অপমান সাধারণ অপমান নয়, ভারতীয় ডাক্তার ও ব্যারিষ্টারগণকেও দশ দশ অঙ্গু-লির ছাপ প্রদান করিতে হইবে। বৃটিশ পতাকা লক্ষ্য করিয়া সভা বলিতে থাকে—১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে আমরা এই পতাকার আশ্রয়ে আসিয়াছি, আমাদের প্রতিষ্ঠা, আমাদের মান-মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যে বাক্য প্রদান করিয়াছিলেন, সে বাক্য আজ পালন করা হইতেছে না। আমরা কি এই আইন অঙ্গীকার করিয়া নিজদিগকে হীন প্রতিপন্ন করিব? জগতে আজ পর্য্যন্ত কোনও জাতির রাজা তাঁহার প্রজার বিরুদ্ধে এরূপ আইন প্রচার করেন নাই। উক্ত সভাতে নিম্ন লিখিত কবিতাও গীত হয়—

রেভীরু,

কত কাল রবে আর নিদ্রায় মগন,
জড়তা আলস্য বশে হারায়েছ সব,
উঠ এবে, নবোৎসাহে ঘোর নিদ্রা ত্যজি,
ভবিষ্যত আশা তব অতীব মহান।
ঐ দেখ সঙ্গী তব হয় আগুয়ান,
লক্ষ্য পথ অতীব নিকট; পাইয়াছ
সময় উত্তম, কর ব্যবহার তার।
বুদ্ধিমান চিন্তাশীল জন,
যবে আসে সময় উত্তম,
দ্বিধা করে সমুদ্রেরে চক্ষের নিমিষে,
পর্ব্বত কাটিয়া নদী করে প্রবাহিত।

সন্ধির চেষ্টা

যে সময়ে এই প্রকার ঘোর আন্দোলন চলিতে থাকে, সে সময় ট্রান্সভাল গভর্ণমেণ্ট সন্ধি করিবার জন্য সুপারিশ করিতে থাকেন। তখন এই সর্ত্তে সন্ধি হয় যে, ভারতবাসী প্রসন্নতা সহকারে আপনাদের নাম রেজেষ্টারী করিলে, ট্রান্সভাল গভর্ণমেণ্ট এই আইন রহিত করিয়া দিবেন। যখন আইন যথোচিত সংশোধনের কথা বলা হয়, তখন কতিপয় ভারতবাসী সন্তুষ্ট হইয়া আপনাদের নাম রেজেষ্টারী করেন। ভারতীয়গণ এই সর্ত্তের উপর নির্ভর করিয়া আপনাদের নাম রেজে-ষ্টারী করেন যে, টান্সভাল গভর্ণমেণ্ট পরে এই আইন রহিত করিয়া দিবেন। পরন্তু নাম রেজেষ্টারী করা হইয়া গেলে এ সম্বন্ধে কিছুই করা হয় না, বরং প্রত্যুত্তরে বলা হয় যে, এরূপ সর্ত্তে সন্ধির কথা বলা হয় নাই। যখন ভারতবাসীরা ইহা অবগত হইলেন যে, ট্রান্স-

ভাল গভর্ণমেণ্ট বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছেন, তখন তাঁহারা অতিশয় দুঃখিত হইলেন। ইহার উপর আশ্চর্য্য এই যে, ট্রান্সভাল পার্লামেণ্টে যে নূতন আইনের প্রতিলিপি উপস্থিত করা হয়, সেই আইনে স্পষ্ট বলা হয় যে, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই মের প্রথম ভাগে যে সকল লোক প্রসন্নতা সহকারে আপনাদের নাম রেজেষ্টারী করিয়া লইয়াছে, সেই সকল লোকই বাণিজ্য করিবার কিম্বা ফেরী করিয়া বিক্রয় করিবার পরওয়ানা প্রাপ্ত হইবে। যাহারা পরওয়ানা না লইয়া দেশের মধ্যে ব্যবসা করিবে, তাহাদের ৪০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৬০০০ টাকার অর্থদণ্ড কিম্বা দুই বৎসরের জন্য কঠোর কারাদণ্ড হইবে। প্রথমে বিশ্বাসঘাতকতা, তার উপর আবার ভয় প্রদর্শন। ইহাতে জনসাধারণ সাতিশয় রুষ্ট হয়। জোহান্সবর্গ, প্রিটোরিয়া প্রভৃতি নগরে সার্ব্বজনিক সভা হয় আর সকলের সম্মতি অনুসারে ইহা নির্ণীত হয় যে, রেজেষ্টারীতে কিছুতেই নাম লেখান হইবে না। ইহা ছাড়া সহস্র ভারতবাসী, বৃহৎ সভাস্থলে আপনাদের সনন্দকে আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া দেয়, সহস্র ভারতবাসী সভা করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন পত্র পাঠায় যে, গভর্ণমেণ্টরচিত সন্ধিপত্রের নিয়মাবলী তাহারা কিছুতেই স্বীকার করিয়া লইবে না।

সত্যাগ্রহের লড়াই

যখন ভারতবাসী নবীন উদ্যমে পুনরায় আন্দোলন আরম্ভ করেন তখন গভর্ণমেণ্ট আন্দোলনকারী নেতা ও ছোট বড় সকলকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে প্রেরণ করিতে সুরু করেন। নূতন আইন অনুসারে দেশ পরিত্যাগের আদেশ ভঙ্গ করার অপরাধে শ্রীযুক্ত হরিলাল গান্ধির একমাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড হয়। এ সময় স্বজাতিবৎসল গান্ধি স্বয়ং বলিতে থাকেন যে, চুপচাপ বসিয়া থাকিয়া, আপনার দেশবন্ধুগণের দুর্দ্দশা দেখার চেয়ে যদি আমার সমস্ত জীবন জেলে অতিবাহিত হয়, তবু তাহাও শ্রেয়স্কর। যখন ভারতবাসিগণকে গ্রেপ্তার করিয়া দেশবহির্ভূত করিবার আদেশ প্রচলন হইতে আরম্ভ হয়, তখন ভারতবাসীরা এই আধুনিক আদেশকে ভঙ্গ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তাঁহাদিগকে যদি ট্রান্সভাল পরিত্যাগ করিবার দণ্ড দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহারা পুনরায় যে কোন রকমে ট্রান্সভালে প্রবেশ করিয়া সাজা লইবার জন্য মনস্থ করেন।

পাঠকগণ, এই প্রকারে সত্যাগ্রহের লড়াই চালাইয়া ভারতবাসীরা, ট্রান্সভালের গভর্ণমেণ্টকে আপনাদের নির্ভরতা ও বীরত্বের পরিচয় প্রদান করেন। ট্রান্সভালের চালচলন খুব সরগরম হইয়া উঠে। প্রবাসী ভারতবাসিগণ যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদনুসারে জানিয়া শুনিয়া ট্রান্সভালের এই অত্যাচারী আইন ভঙ্গ করার জন্য আনন্দে কারাভোগ করিতে থাকেন ও সত্যাগ্রহের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেন। ট্রান্সভাল গভর্ণমেণ্ট মিঃ রুস্তমজী পার্শী, মিঃ দাউদমহম্মদ এবং মিঃ আব্দলিয়াকে গ্রেপ্তার করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। সঙ্গে সঙ্গে আরও ১১ জন ভারতীয় নেতার দেশবহিষ্কৃতির আজ্ঞা হয়। এই আদেশ ভঙ্গ করিবার জন্য তাঁহারা পুনরায় ট্রান্সভালে চলিয়া আসেন। ট্রান্সভালের গভর্ণমেণ্ট সকলকে গ্রেপ্তার করিয়া তিন মাসের জন্য সশ্রম-কারাদণ্ড প্রদান করেন। ইঁহাদের মধ্যে তিনজন যুদ্ধের সময় স্বেচ্ছাসেবক সৈনিক সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। সমস্ত প্রবাসী

ভারতবাসী এই সকল সুশিক্ষিত ধনাঢ্য পুরুষগণের এই প্রকার কারাদণ্ডের আদেশকে মহা অন্যায় বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। জেলে প্রেরিত দেশবাসীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য ট্রান্সভাল ও নেটালের সমুদয় গুদাম বন্ধ করা হয়। দরবন, জোহান্সবর্গ, ও প্রিটোরিয়াতে ভারতবাসিগণের সার্ব্বজনীন সভা হয় ও বিলাতে গভর্ণমেণ্টের নিকট দুঃখসূচক টেলিগ্রাম প্রেরিত হয়। প্রবাসী ভ্রাতৃগণের প্রধান নেতা শ্রীযুক্ত মোহন দাস করম্‌চান্দ গান্ধিও গ্রেপ্তার হন। তাঁহার সঙ্গে আরও ৫ জন ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করা হয়। ইঁহারা সব নেটাল হইতে ট্রান্সভালে গমন করিতেছিলেন। ট্রান্সভালস্থ হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ও পারসীগণ সকলে একত্রিত হইয়া দৃঢ় সাহসসহকারে আন্দোলন করিতে আরম্ভ করেন। মিঃ সোরাবজী পারসী দেশ পরিত্যাগের আদেশ লঙ্ঘন করাতে এক মাস কঠোর কারাদণ্ড প্রাপ্ত হন। জেল হইতে মুক্ত হওয়ার পর তাঁহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু তিনি পুনরায় ট্রান্সভালে প্রবেশ করিয়া সত্যাগ্রহের শপথ পূর্ণ করেন। তখন গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করিয়া ৫০ পাউণ্ড জরিমানা কিম্বা তিন মাসের কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন। মিঃ সোরাবজী অর্থদণ্ড না দিয়া কারাগৃহবাস স্বীকার করেন। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের জন্য রণক্ষেত্রে নিজের রক্ত প্রবাহিত করিতে ও অকাতরে নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন এমন অনেক বেতন ভোগী ভারতীয় সিপাহী ট্রান্সভালে বাস করিতেন। ইঁহারা সকলে একমত হইয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা পত্র প্রেরণ করেন যে, ভারতীয়গণের বিরুদ্ধে রচিত এই অন্যায়পূর্ণ ও মহাজুলুমী আইন ভারতীয়গণ কখনও মানিয়া লইবে না। ভারতবাসীদের উপর এই আইন প্রয়োগ অপেক্ষা আফ্রিকার যে ভূমিতে আমরা ব্রিটেনের বিজয়ের জন্য রক্তস্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলাম, সেই স্থানে আমাদিগকে দাঁড় করাইয়া গুলি দ্বারা মারিয়া ফেলা হউক।

বিলাতে লর্ড এম্পথীল, সার মচরজীভাও-নগরী ও সাউথ আফ্রিকার কমিটি ভারতীয়গণের পক্ষে ঘোর আন্দোলন করিতে থাকেন। অনেক সভা ভারতীয়গণের দুঃখ দূর করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে পরামর্শ প্রদান করেন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সি এসোসিয়েসনের মুখপাত্র সার ফিরোজ শাহ মেহতা, ভাইস্‌রয় ও ভারত সচিবের নিকট এই মর্ম্মে তার প্রেরণ করেন যে, "সুশিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত, ও ধনাঢ্য ভারতীয়গণকে বৃটিশ প্রজার সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের সর্ব্বত্র রক্ষা করা উচিত। দক্ষিণ আফ্রিকাতে ভারতবাসীর প্রতি অন্যায় অত্যাচার হইতে দেখিয়া ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ দুঃখিত, ক্ষুব্ধ ও সন্তপ্ত হইয়াছেন। অন্য কোন দেশে যদি ভারতীয়গণের প্রতি এইরূপ অপমানজনক ব্যবহার করা হইত, তাহা হইলে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট উহাদের কষ্ট নিবারণের জন্য চেষ্টা করিতেন, কিন্তু বৃটিশ উপনিবেশেই উহাদের সহায় কেহ নাই। ট্রান্সভাল গভর্ণমেণ্টের এই অনুচিত ব্যবহারে ভারতবাসীর মনে নিদারুণ আঘাত লাগিয়াছে। এজন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট উভয় পক্ষে মধ্যস্থ থাকিয়া প্রবাসী ভারতবাসিগণকে এই অপমানজনক ও কষ্টদায়ক আইনের কবল হইতে মুক্ত করুন। লণ্ডনে ভারতীয়গণের একটি বিরাট সভা হয়, উহাতে

বঙ্গদেশের সুপ্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন,—"আজকাল দেশনেতা গান্ধি মহাশয়কে বুয়র গণের অধীনে পাথর ভাঙ্গিতে হইতেছে। কিছু চিন্তা নাই, দেশসেবার পথে কণ্টক ছড়াইয়া রহিয়াছে। দেশের জন্য আমাদিগকে নানা প্রকারে কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। লোকমান্য গান্ধির সহিত আমার পূর্ণ সহানুভূতি রহিয়াছে, আর আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, লোকমান্য গান্ধি যেন সর্ব্বদা আনন্দ মনে ও সুস্থ চিত্তে সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে থাকেন।"

সত্যাগ্রহের ধূম ধাম

স্থানে স্থানে অনেক প্রকারের সভা সমিতির অধিবেশন হইয়া, প্রবাসী ভ্রাতৃগণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শিত হইতে থাকে। কিন্তু দিনের পর দিন তাহাদের কষ্টের মাত্রা বর্দ্ধিত হইল। সার ভেষ্ট রিজবে, আপনার মত প্রকাশ করিয়া বলেন যে, ট্রান্সভালের ভারতবাসিগণ অতিশয় বদমায়েস, যদিও তাহাদিগকে প্রায় সমুদয় সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে, তথাপি তাহারা অধিকতর সুবিধা পাইবার আশায় এইরূপ গণ্ডগোল করিতেছে। রুটবেও প্রকাশ করেন যে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সমস্ত অবস্থা পরিদর্শন করিয়াও চুপচাপ বসিয়া আছেন। ইহাতে এইরূপ মনে হয় যে, ট্রান্সভাল গভর্ণমেণ্ট কাহারও প্রতি পক্ষপাত না করিয়া স্বীয় সদ্বিবেচনা ও ঔদার্য্যের গুণে সমুদয় মীমাংসা করিয়া দিবেন। ঔপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গগণের অপক্ষপাত ও ঔদার্য্যের ভাণ দেখিয়া ভারতীয়গণের ইহা দৃঢ় অনুভব হয় যে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের এই আশ্বাস বাণী কখনও বিশ্বাসে পরিণত হইবে না। দক্ষিণ আফ্রিকায় অসন্তোষ জনক আন্দোলন যথাপূর্ব্ব চলিতে থাকে। প্রবাসী ভারতবাসিগণের সাহস ও দৃঢ়তা দেখিয়া ট্রান্সভাল গভর্ণমেণ্টও কিছু ঘাবড়াইয়া যান। পুনরায় সন্ধি হইবার গুজব উঠে, কিন্তু মিলিয়া মিশিয়া সন্ধি করার কথা সব নিষ্ফল হয়। প্রবাসী ভারতীয়গণের বাণিজ্যের পরওয়ানা রহিত করিবার আইন রচিত হয়, ইহাতে নেটালে পুনরায় অসন্তোষের সঞ্চার হয়। বাবরটনে ৩৬ জনকে গ্রেপ্তার করিয়া উহাদের উপর অভিযোগ আনীত হয়, এবং প্রত্যেককে ২৫ পাউণ্ড জরিমানা কিম্বা দুই দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। সকলে জরিমানা প্রদান না করিয়া জেলে যাইতে রাজি হন। জর্মিষ্টনের বাবু লালবাহাদুর সিংহ, বাবু হজরা সিংহ ও শ্রীযুত নাঞ্জেপা নায়ডুকে আন্দোলনের নেতা বলিয়া গভর্ণমেণ্ট গ্রেপ্তার করেন এবং দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। পুনরায় এই সাহসী পুরুষগণ নেটালে প্রবেশ করেন। এই হেতু ট্রান্সভাল গভর্ণমেণ্ট ইহাদের উপর ঔপনিবেশিক আইন ভঙ্গকরার অপরাধে তিন তিন মাসের কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ দেন। হেডলবর্গের মিঃ ভয়াত, মিঃ সোমনাথ, মিঃ বি, পটেল, মিঃ মহম্মদ হাজী, মিঃ ইস্মাইল, মিঃ কাসিমজী, ইয়ুসফজী, মিঃ হোসেন সুলেমান, মিঃ মুসা মহম্মদ সীদাত প্রভৃতি সজ্জনগণ; জোহান্সবর্গের মিঃ নাদির শাহকামা, মিঃ মুল্লাকি রোজ, ইণ্ডিয়ান পোর্ট অফিসের ভূতপূর্ব্ব ক্লার্ক মিঃ বাপুজী, মিঃ উমরজী, মিঃ গৌরীশঙ্কর ব্যাস, মিঃ ডেভিড অরনেষ্ট, মিঃ সোলোমন অরনেষ্ট, মিঃ বল্লভরাম মিঃ এম কৈঁসী প্রভৃতি; জর্মিষ্টনের মিঃ কে, কে, পটেল, মিঃ সাহজী আকুজী; বালকরেণ্টের মিঃ মনজী নাথুভাই, মিঃ মহম্মদ পটেল প্রভৃতি সত্যাগ্রহীদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া

গভর্ণমেণ্ট জেলে প্রেরণ করেন। পরিশেষে ট্রান্সভালের প্রত্যেক নগরে এই ধরপাকড় আরম্ভ হইতে থাকে। ইহার পরে ভারত মাতার সুসন্তান লোকমান্য গান্ধি গ্রেপ্তার হন। ইহার উপর সত্যাগ্রহের অভিযোগ আনীত হয়। তিনি জোহান্সবর্গের ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে নিজের জবানবন্দীতে বলেন যে, আমার নাম রেজেষ্টারী না করার অপরাধে এই দ্বিতীয় বার আমার উপর অভিযোগ আনীত হইয়াছে, এই অভিযোগ আমি প্রসন্নতা সহকারে স্বীকার করিয়া লইতেছি। আমি জানিয়া শুনিয়া এই অমানুষিক আইনের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছি। এই অন্যায় পূর্ণ আইনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মানের জন্য অনেক ভারতীয়গণকে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে, ইহাতে আমার অন্তঃকরণ অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, আমি ন্যায় চাহিতেছি, কিন্তু ইহার বিপরীত করা হইতেছে। আমি এই জুলুমী আইনের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া জেলে গমন করা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। এই বিষয়ে আমি অধিক হইতে অধিকতর অপরাধী হইতে পারি। ম্যাজিষ্ট্রেট আপনার রায়ে বলেন যে, মিঃ গান্ধির সহিত আমার পূর্ণ সহানুভূতি রহিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট যে আইন প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার ব্যবস্থানুযায়ী কার্য্য করা আমার একান্ত কর্ত্তব্য। এজন্য আইনের ব্যবস্থানুযায়ী আমি মিঃ গান্ধিকে ৩ মাস কারাদণ্ড প্রদান করিতেছি।

কয়েকজন ভারতীয় যুবক ইংরাজের পাচকের কাজ করিতেছিল, তাহাদিগকে বলা হয় যে, তোমরা সত্যাগ্রহ ছাড়িয়া দাও, নতুবা কার্য্য হইতে বরখাস্ত করা হইবে। উহারা সাফ জবাব দেয় যে, কাজ ছাড়িয়া দিতে আমরা প্রস্তুত আছি, কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে প্রস্তুত নহি। কত ফেরীওয়ালাকে গ্রেপ্তার করা হয়, আর তাহাদের উপর অভিযোগ আনয়ন করিয়া জেলে প্রেরণ করা হয়। ফল কথা, ভারতবাসীরা, আপনাদের স্বার্থত্যাগ, সাহস ও বীরত্বের খুব পরিচয় প্রদান করিতে থাকে। সর্ব্বশুদ্ধ ৩৫০০ জন ভারতবাসী জেলে প্রেরিত হয়, আর প্রায় ১০০ জনকে দেশ বহিষ্কৃতির দণ্ড প্রদান করা হয়।

জেলের কাহিনী

ভারতীয় কয়েদীকে জেলে যেরূপ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল, উহার উদাহরণ কেবল একটি মাত্র বৃত্তান্ত হইতে পাঠকগণ অবগত হইবেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ২০শে এপ্রিল ৬৫ জন ভারতীয় কয়েদীকে বালকরস্ট হইতে জুট পোর্টের জেলে প্রেরণ করা হয়। দিনে ১০ টার সময় বালকরস্টে তাহারা ট্রেণে চড়ে ও রাত্রি ৯টার সময় জুটপোর্টে পৌছে। ঐ রাত্রিতে তাহাদিগকে কিছু খাইতে দেওয়া হয় না। দুইটি ক্ষুদ্র কুঠরীতে সকলকে পশুর মত আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে উহাদের রাত্রি অতিবাহিত হয়। সকালে উহাদিগকে খাইবার জন্য রেঙ্গুনের চাউল ও কুমড়ার তরকারি প্রদান করা হয়। খাইবার সময় ইহারা অনেকবার জেলের অধ্যক্ষের নিকট অভিযোগও করে, কিন্তু অধ্যক্ষ সাফ জবাব দেন যে, তোমাদের উপর এইরূপই কঠিন ব্যবহার করা হইবে; তবেই তোমাদের অহঙ্কার নষ্ট হইবে, তবেই তোমরা গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ কিম্বা রাজনৈতিক আন্দোলন করিতে সমর্থ হইবে না। কিছু দিন পরে ইহাও বন্ধ করিয়া দিয়া কাফ্রিদিগের খাবার

দেওয়া হয় ও তরকারী খাওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কেবল চাউল খাইতে খাইতে কতলোক পীড়িত হইতে থাকে। পীড়িতাবস্থায় অনেকে জ্ঞান শূন্য হইয়া যায়; জেলের কর্ম্মচারী এই অবস্থাতেও কিছুমাত্র দয়া না করিয়া কঠিন পরিশ্রমের কার্য্য সমূহ করাইতে আরম্ভ করেন। কয়েদী কাফ্রিগণকে পীড়িতাবস্থায় খাঁটি দুধ খাইতে দেওয়া হইত, কিন্তু ভারতীয় কয়েদিগণকে দুধ দেওয়া হইত না। পায়খানাতে এক সঙ্গে ২০ জনকে বসাইয়া দেওয়া হইত। স্নান করিবার জন্য কাফ্রিগণের স্নানাগারে যাইতে হইত। কোন কথা-জিজ্ঞাসা করিলে অফিসার অতিশয় রাগান্বিত হইয়া উঠিতেন। অধ্যক্ষও কুলী প্রভৃতি খারাপ শব্দ ব্যবহার করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেন না।। কাহারও ধর্ম্মকর্ম্মের উপর কোনরূপ খেয়াল না করিয়া মাংস প্রভৃতি ঘৃণিত পদার্থ খাইতে দেওয়া হইত। মারপিট করা, গালাগালি দেওয়া প্রত্যেক সাধারণ কথার মধ্যে পরিগণিত হইত। ফলকথা কাফ্রি কয়েদিগণের চেয়েও ভারতীয় কয়েদীগণের খারাপ দশা হইয়াছিল। এইরূপ কষ্ট প্রদান করার প্রধান উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া এই সকল লোক আইন স্বীকার করিয়' লইবে এবং পুনরায় কখনও জেলে আসিবার নাম পর্য্যন্তও করিবে না।

সহানুভূতিসূচক সভা

এই ঘৃণিত অত্যাচারের জন্য দরবন, পীটর মেরিট্‌স্‌বর্গ, লেডিস্মিথ, জোহান্সবর্গ, প্রীটোরিয়া, বাবরটোন, কেপটাউন, কীম্বর্লী, ইষ্টলণ্ডন, পোর্টআলিজাবেথ প্রভৃতি দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন নগরে নগরে সার্ব্বজনিক সভা হয় এবং সত্যাগ্রহিগণের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা হয়।

এ সম্বন্ধে 'নেটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস,' 'ট্রান্সভাল বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন' ও 'ট্রান্সভারোমেন্স এসোসিয়েসনের' অধিবেশন হয়। ট্রানিদাদ, মরিশশ্, ফিজি প্রভৃতি স্থানের ভারতবাসীরা সত্যাগ্রহিগণের দুঃখে শোক প্রকাশ করেন। লণ্ডন নগরে সত্যাগ্রহিগণের বিষয়ে একটি সভা হয়। ইহা ছাড়া ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অনেক নগরে ভ্রাতৃগণের প্রতি সহানুভূতি জানাইবার জন্য সভা করা হয়। বোম্বায়ের একটি সুবৃহৎ সভাতে ট্রান্সভালের শ্রীযুক্ত পোলক উপস্থিত ছিলেন। পোলক মহোদয় আপনার বক্তৃতায় বলেন যে, ট্রান্সভালের ভারতবাসিগণ জননী জন্মভূমির প্রতিষ্ঠার জন্য এই সকল কষ্ট অকাতরে সহ্য করিতেছেন। তাঁহারা জেলের মধ্যে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক তথাপি স্বদেশের নামে কলঙ্ক অর্জ্জন করিতে ইচ্ছুক নহেন। উঁহারা স্বদেশবাসীর ভরসা করেন, এজন্য এক্ষণে আপনাদের নিকট তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। যদি আপনারা তাঁহাদের সহায়তা না করেন, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ তাঁহারা "প্রাণ যায় তবু বচন না ত্যজি" এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবেন। তাঁহাদের পক্ষে ইহা তো অতি গৌরবের কথা। কিন্তু বলুন তো আপনারা তাঁহাদের শোকার্ত্তা স্ত্রীও সন্তানগণকে কিরূপে মুখ দেখাইবেন? তাঁহারা আমাকে কেবল ইহা বলিবার জন্যই প্রেরণ করিয়াছেন যে, তাঁহারা সমস্তই সহ্য করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু আপনারা কি ইচ্ছা করেন যে, তাঁহারা এই সব সহ্য করেন? আপনারা এইরূপ বলিতে কি প্রস্তুত আছেন?

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবর শ্রীযুক্ত গান্ধি লণ্ডনের নিউরিফর্ম ক্লাবে বক্তৃতা

দিবার সময় বলিয়াছিলেন যে, রণক্ষেত্রে শারীরিক বল প্রয়োগ অপেক্ষা আত্মিক বলদ্বারা যে বিরোধ করা হয়, তাহাতে সাহস ও বীরত্বের অধিক আবশ্যক হয়। ভারতবাসিগণ মানসিক বল প্রয়োগ দ্বারাই ট্রান্সভাল-গভর্ণমেণ্টের সম্মুখীন হইয়াছিল; এইরূপ উদাহরণ পৃথিবীর অন্য কোন জায়গায় দৃষ্ট হইবে না।

ট্রান্সভাল গভর্ণমেণ্টের বিশ্বাসঘাতকতা

১৯১১ খৃষ্টাব্দে ট্রান্সভাল গভর্ণমেণ্টের হর্ত্তা-কর্ত্তা জেনেরল স্মউস্ স্বজাতিবৎসল গান্ধিকে ডাকিয়া বলেন যে, এ সময় আপনি আইন স্বীকার করিয়া লউন। পরে পার্লামেণ্টের অধিবেশনে এই আইনের উচিত সংশোধন করা হইবে। লোকমান্য গান্ধি জেনেরল স্মউসের মত উচ্চপদস্থ শাসন কর্ত্তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন উচিত মনে করিয়া নাম রেজেষ্টারী করিতে স্বীকার করিলেন। তাঁর আশা এই যে, গভর্ণমেণ্ট এই খুনী আইন রহিত করিয়া দিবেন। সে সময় সকল ভারতবাসী প্রসন্নতা সহকারে আপন আপন নাম রেজেষ্টারী করিতে থাকেন; কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এই আইন রহিত করিবার কোনই ব্যবস্থা করেন না; তাহা যথাপূর্ব্ব বজায় থাকে। এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া ভারতীয়গণের হৃদয়ে ঘোর অশান্তির আবির্ভাব হয়। সকলে ট্রান্সভাল গভর্ণমেণ্টকে এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ধিক্কার দিতে থাকে। কত অবোধ লোক শ্রীযুক্ত গান্ধীকে বলিতে থাকে;—আপনি কেন জেনেরল স্মউসের নিকট হইতে লেখা পড়া করিয়া লন নাই? ইহাতে গান্ধী উত্তর দেন যে, জেনেরল স্মউসের মত উচ্চ পদস্থের কথায় বিশ্বাস না করা আমার অনুচিত হইত, আর যখন ভারতীয়গণ ট্রান্সভাল গভর্ণমেণ্টকে রণক্ষেত্রে ফেলিয়া দিয়াছে, তখন নীচে পতিত ব্যক্তির নিকট হইতে লিখিয়া লওয়া দুর্ব্বলতার পরিচয় মাত্র। আমরা যেমন একবার গভর্ণমেণ্টকে ফেলিয়া দিয়াছি সেইরূপ অনেকবার করিতে পারিব। এ সময় সত্যাগ্রহের দ্বন্দ্বযুদ্ধ শান্তরূপ ধারণ করিয়াছিল, কিন্তু গভর্ণমেণ্টের এইরূপ ব্যবহারে ভারতীয়গণের ক্রোধাগ্নি পুনরায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। অনুমান হইতে লাগিল, শীঘ্রই যেন ভয়ানক সংগ্রাম হইবে।

মাননীয় গোখলের আগমন

যে সময় ট্রান্সভাল গভর্ণমেণ্ট ও প্রবাসী ভারতীয়গণের মধ্যে দিন দিন মনোমালিন্য বৃদ্ধি হইতে থাকে, সে সময় ভারতবর্ষ হইতে মাননীয় গোখলে দক্ষিণ আফ্রিকায় আগমন করেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি ইংলণ্ড হইতে কেপটাউনে পদার্পণ করেন। আফ্রিকার ভিন্ন ভিন্ন নগরে ভ্রমণ করিয়া প্রবাসী ভারতীয়গণের দশা নিরীক্ষণ করেন। তথাকার ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে তাঁহাকে শত শত অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়। যখন তিনি নেটালে ৩ পাউণ্ড করপ্রদানকারী ভারতীয় মজুরগণের অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন, তখন তাঁহার কোমল হৃদয় বিদীর্ণ হয়। স্থানীয় ইংরাজগণ তাঁহার বক্তৃতা মন দিয়া শুনিতে থাকেন। তিনি দরবনের টাউন হলে বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করেন। উহা ভারতীয়গণ পূর্ব্বে কখনও ব্যবহার করিতে পায় নাই। তিনি বক্তৃতাতে স্থানীয় শ্বেতাঙ্গগণের কুটীল ব্যবহার সম্বন্ধে খুব আলোচনা করেন। প্রিটোরিয়ায় গমন করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা সংহতির প্রধান মন্ত্রী জেনেরল বোথা, জেনে-

রল স্মউস ও রাজস্ব সচিব মিঃ কিশারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ৩ পাউণ্ড খুনী করকে রহিত করিবার পরামর্শ প্রদান করেন। ভারতবাসিগণের অন্যান্য দুর্দ্দশার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তাহা দূরীভূত করিবার জন্য অনুরোধ করেন। দক্ষিণ আফ্রিকা-সংহতির উপরোক্ত তিনজন মন্ত্রী এই কর রহিত করিবার ও ঔপনিবেশিক আইন সংশোধন করিয়া দিবার জন্য মিঃ গোখ্‌লের সন্নিধানে প্রতিশ্রুত হন। মাননীয় গোখলে চারি সপ্তাহের অতিথি ছিলেন। তাঁহাকে মিষ্ট ব্যবহারে প্রসন্ন করা হয়। তিনি নভেম্বর মাসে ভারতবর্ষে চলিয়া আসেন। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে মিঃ গোখলে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলে সকলের মনে ধারণা হয় যে, দক্ষিণ আফ্রিকার সমুদয় কষ্ট শীঘ্রই বিদূরিত হইয়া শুভ দিনের আবির্ভাব হইবে।

শ্রীসেবাভিক্ষু জীবন।

ভিখারী

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

কে তুমি কোথায় যাও হে মহা তাপস!
ললাটে উদার ভাব,
ভাবনার নাহি ভাব,
প্রশান্ত মূরতি তব, প্রফুল্ল মানস
চির-মধুময় যথা ফুল্ল তামরস।

কিছুতে আকাঙ্ক্ষা নাই অপার বাসনা,
লোকে ফেলে দেয় যাহা,
সুখে তুলে লও তাহা,
সংসারের হাব ভাব কিছুই জান না,
কাল কি হইবে তার নাহিক ভাবনা।

কে কোথায় পড়ে আছে, কেবা দেখে তায়!
অবিশ্রাম চলে যাও
কার পানে নাহি চাও
সম্মুখে মহান্ বিশ্ব পবিত্র আভায়,
পশ্চাতে যাহাই থাক্ কিবা আসে যায়!

চলেছে পথিকবর সাগর সন্ধানে,
জগতের কোলাহলে
মন তার নাহি ভুলে,
মেতেছে হৃদয় তার সাগরের গানে,
মোহিত পাগল প্রাণলহরীর তানে।

শ্রীযশোদানন্দন ঘোষ।

ভারতীয় মুসলমান রাজগণের সাহিত্যসেবা ও শিক্ষাবিস্তার

(৮৪৪ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

বাহাদুর সা

(১৭০৭—১৭১২)

আরংজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ইস্লাম গৌরব ম্লান হইয়া পড়িল। বাহাদুর সাহের সিংহাসনাধিরোহণের পর হইতে সরকারী ও ব্যক্তিগত জনহিতকর কার্য্যসমূহ ক্রমেই হ্রাস পাইতেছিল। বাহাদুর সাহ সুশিক্ষিত ছিলেন এবং পণ্ডিতসমাজ ভালবাসিতেন ১; তবুও আমরা তাঁহার রাজত্ব সময়ে দিল্লীতে কেবল মাত্র দুইটী কলেজ প্রতিষ্ঠার ঘটনাই দেখিতে পাই। প্রথম কলেজটি ঘাজিউদ্দিন এবং দ্বিতীয়টী খাঁ ফিরোজ জং কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। খাঁ ফিরোজই পরে তাঁহার মাদ্রাসার ভিতরে (১১২০ হিজিরা) ১৭০৮ অব্দে সমাহিত হইয়াছিলেন ২। ঘাজিউদ্দিন দাক্ষিণাত্যের নিজামবংশের প্রতিষ্ঠাতা আসফজার পিতা। তিনি আরংজেবের প্রিয় কর্ম্মচারী ছিলেন এবং বাহাদুর সার দরবারে প্রধান আমীরদিগের অন্যতম ছিলেন। দিল্লীতে আজমীর গেটের (ফটকের) সন্নিকটে একটী কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং কলেজের বেষ্টনীর মধ্যে তাঁহার নিজের কারুখচিত স্মৃতিসৌধ এবং একটী মসজিদ ও স্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল বড় বড় ইমারৎ সাজাহানাবাদের বড় বড় ইমারৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল, কিন্তু ১৮০৩ অব্দে যখন ব্রিটিশগভর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রাচীরের সংস্কার হয় তখনই ঐ গুলি আধুনিক দিল্লীর সংলগ্ন হইয়াছে। একটী সুন্দর ফটকের ভিতর দিয়া ঐ বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করিতে হইত। ফটকের দেয়ালের সঙ্গে যে সকল গোলাকার কুঠরী ছিল সেগুলিকে মাদ্রাসার ছাত্রগণের রান্নাঘর মনে হইত। ১৭৯৩ অব্দে অর্থাভাবে কলেজটী উঠিয়া যায় ৩। মধ্যযুগের ইউরোপে ধর্ম্মার্থেদের ভূসম্পত্তি যেরূপ একই বেষ্টনীর মধ্যে একটী উপাসনা গৃহ প্রতিষ্ঠাতার সমাধি স্তম্ভ, একটী আবাসগৃহ, এবং শিক্ষাগৃহ যাহাদের জন্য শিক্ষকদিগকে ভার লইতে হইত এইগুলি প্রতিষ্ঠাতার জীবিতকালেই নির্ম্মিত হইত; একটী কলেজ, একটী সমাধি স্তম্ভ এবং ঘাজিউদ্দিনের সমাধির উপর মসজিদ নির্ম্মিত হইয়া একই বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া সেইরূপ কতকগুলি নমুনার মধ্যে একটী নমুনা দেখাইয়া ছিল ৪ ঘাজিউদ্দিনের প্রতিষ্ঠিত কলেজটী সম্প্রতি বাসের অযোগ্য হইয়া গিয়াছে ৫।

1. *Zubdatul-Tawarikh*, by 'Abdul Karim, p. 70.
2. *Mirati-Ahmadi*, vol. i, p. 410.
3. Stephen's *Archaeology of Delhi*, p. 264; Hearn's *Seven Cities of Delhi*, p. 44; Francklin's *Shah 'Alam*, p. 200.
4. Fanshawe's *Delhi Past and Present*, p. 64.
5. Francklin's *Shah 'Alam*, p. 200.

এই সম্রাটের রাজত্ব সময়ে কানৌজে আর একটী কলেজ প্রতিষ্ঠিত ছিল। উক্ত মাদ্রাসার ফখরুল মরাবি নাম ছিল। মৌলবী আলিমুদ্দিন এবং মৌলবী নাইমুদ্দিন এই বিদ্যালয়েই তাঁহাদের পাঠ শেষ করেন১। এই মাদ্রাসার নামের সঙ্গে প্রায় এই রকমের অন্য কোন নাম যুক্ত হওয়া উচিত হয় নাই। যেমন—তারিখি ফরুখাবাদী গ্রন্থের প্রণেতা মহম্মদ ওয়ালিউল্লা কর্ত্তৃক ফরক্কাবাদে পরবর্ত্তী সময়ে ফররুল-মরাবী রুবউল মফাখির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।২

মহম্মদ সা

(১৭১৯—১৭৪৮)

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের মনোনীত সম্রাট মহম্মদ সা দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করার পর দেশে অশান্তির সূত্রপাত এবং ঠিক কিছুকাল পরেই নাদির সাহের আক্রমণ সত্বেও দেশের এমন একটা সজীব আকৃতি দেখা যাইতেছিল যাহাতে মন আপনা হইতেই আনন্দ পাইত। অম্বরের রাজা এবং জয়পুর রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা সেবাই জয়সিংহের প্রতিভা সেই সময় বৈজ্ঞানিক কেন্দ্র বিশেষতঃ জ্যোতিষ শাস্ত্রকেই বিশেষ আকর্ষণ করে। তিনি বেক্ষণাগারগুলি কেবলমাত্র জয়পুর, উজ্জয়িনী, মথুরা এবং কাশীতেই নির্ম্মাণ করান নাই। দিল্লীতেও নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তৎ নির্ম্মিত বেক্ষণাগারটী মোগল সাম্রাজ্যের রাজধানীতে মহম্মদ সার রাজত্বের তৃতীয়বর্ষে ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজা জয়সিংহের প্রতিভার স্মৃতিস্তম্ভ এখনও দিল্লীর প্রাচীরের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। যদিও কখনও ইহার কার্য্য সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই এবং উত্তোলনের পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই জাট, দস্যুগণ অত্যন্ত নষ্ট করিয়া দিয়াছিল তবুও ইহা যে উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে যথেষ্টই রহিয়াছে।৩ এই বেক্ষণাগার হইতে বিভিন্ন পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা যে বিখ্যাত জ্যোতিষ তালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল উহা মহম্মদ সাহী তালিকা নামে পরিচিত ছিল; উক্ত তালিকা জয়সিংহের তত্বাবধানে মির্জ্জা খাইরুল্লা ও সেখ মহম্মদ মুহদ্দিস্ কর্ত্তৃক লিখিত হয় এবং তালিকাতে যে রকম লিখিত আছে, ১১৫৪ হিজীরাতে (১৭৪১ অব্দে) দুইটী গ্রহের মিলনের ফলেই তালিকার সত্যতা প্রমাণিত হয়।৪ দিল্লীর বেক্ষণাগারে একটী বৃহৎ জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় পাত আছে যাহা জ্যোতিষচর্চ্চা এবং সত্য নির্ণয়ের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত, উহা জয়সিংহের সম্রাত যন্ত্র বলিয়া পরিচিত ছিল। গ্রহগণের দূরত্ব ও দিগংশ(Azimuth)নির্দ্ধারণের নিমিত্ত জ্যোতিষ পাতের ধারা এবং যে কোন বৃত্তের পরিধির পরিমাণে অঙ্কিত ছিল। ইহা সত্বেও দুইটী গোলাকার সৌধ এবং একটী ছোট দূরত্ব পরিমাপক যন্ত্র ছিল।৫ ১৭২২ অব্দে সম্রাট মহম্মদ সার রাজত্ব সময়ে নবাব সরফুদ্দৌল্লা একটী মাদ্রাসা ও তৎসংলগ্ন একটী মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।৬

1. *Tarikhi-Farrukhabadi*, MS. in ASB, leaf 227.
2. *Tarikhi-Farrkhuabadi*, MS. in ASB, leaf 295.
3. Stephen's *Arch. of Delhi*, p. 269; Fanshawe's *Delhi Past and Present*, p. 247.
4. *Tarikhi-Farrukhabadi*, MS. in ASB, leaf 56; *Siyarul-Mutaakhkhirin*, vol. iii, p. 220.
5. Hearn's *Seven Cities of Delhi*, p. 45; Stephen's *Arch. of Delhi*, pp. 269 ff; Garcin de Tassey's *Sayyid Ahmad*, pp. 167-174: and Fanshawe's *Dilhi Past and Present*, p. 247.
6. *Asarul-Sanadid*, by Sayyid Ahmad, ch. iii, p. 81.

যখন নাদির সা দিল্লী আক্রমণ করেন তখন তিনি ধ্বংস, লুণ্ঠন ও হত্যায় দিল্লীকে বিধ্বস্ত করেন। তবসিরাতুল নাজি-রিন ১ গ্রন্থে লিখিত আছে যে যখন তিনি রৌশনুদ্দৌল্লার মাদ্রাসা বসিয়াছিলেন তখন এই আদেশ প্রচার করেন। যাহা হউক অন্যান্য ঐতিহাসিকেরা বর্ণন করেন যে যখন নাদির রৌশনুদ্দৌল্লার মসজিদে বসিয়াছিলেন তখন মাদ্রাসাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই হত্যা করিবার আদেশ দেন। যেরূপই হউক নাদির দিল্লীর অপরিমিত ধনের সঙ্গে রাজকীয় লাইব্রেরীটী সহ পারস্যে প্রত্যাগমন করেন। মোগল সম্রাটগণ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই লাইব্রেরীতে গ্রন্থ রাখিয়া আসিতেছিলেন।২ দুরদৃষ্ট তাই এই সকল মূল্যবান গ্রন্থের কতকগুলি পরে অত্যন্ত কম মূল্যে পারস্যে বিক্রীত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় সাহ আলম

দেখা যাইতেছে যে, মোগল রাজবংশ, নাদিরের লুণ্ঠনের ফলে, রাজপরম্পরায় সংগৃহীত পুস্তকের মূল্যবান পাঠাগারটী হারাইলেন। উক্ত লাইব্রেরীটী (১৭৫৯-১৮০৬) দ্বিতীয় সাহ আলমের রাজত্বকালে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। কারণ ইব্রাত নামাতে উল্লেখ আছে যে নরাকৃতি সয়তান গোলাম কাদির সম্রাটের চক্ষু দুইটী উৎপাটিত করে, লুণ্ঠনের ৩ দিন পূর্ব্বে মণিকুঠরীতে প্রবেশ করে, উহা হইতে একটী লৌহ সিন্দুক, ও একটী মণিপূর্ণ বাক্স এবং লাইব্রেরী হইতে কয়েক খানি কোর-আন্ ও ৮টী বড় বড় বাক্সপূর্ণ বই লইয়া যায়। ৪

হসন রাজা খাঁ অযোধ্যার আসফুদ্দৌলার মন্ত্রী ছিলেন। তিনি সাহ আলমের রাজত্ব-কালে ফরক্কাবাদে একটী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মৌলানা আব্দুল ওয়াহিদ খাইরা-বাদী উক্ত মাদ্রাসার অধ্যাপক ছিলেন। ৫

স্ত্রীশিক্ষা

মুসলমান ভারতের স্ত্রী-শিক্ষা প্রতিও যে যত্ন লওয়া হইত তৎসম্বন্ধে আমাদের কতিপয় প্রমাণ আছে। নিঃসন্দেহ যে, স্ত্রীশিক্ষা পর্দ্দা-প্রথার দ্বারা বিষমভাবে অবরুদ্ধ হইয়াছিল। স্ত্রী-শিক্ষার জন্য একটী নির্দ্দিষ্ট বয়সে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিবার নিয়ম ছিল। কিন্তু যেখানে যুবতী শিক্ষার্থিনীরা প্রেরিত হইত সেখানে কোন অবরোধকতা ছিল না। আমরা জাফর সরীফ হইতে অবগত হই যে বালিকারা বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিত। তিনি কানুনি ইস্‌লাম ৬ গ্রন্থে বিশেষ সূক্ষ্ম-ভাবে বর্ণন করিয়াছেন যে, বালক অথবা বালিকা যে হউক কোর-আন্ পাঠ শেষ করিয়া আহূত সভাতে শিক্ষককে উপ-ঢৌকন দিত। গ্রন্থকার আরও বলেন যে, যখন কোন বালক বা বালিকা বিদ্যালয়ে যাইত, তখন সাধারণ বিধি হেতু শিক্ষক একটা ঈ-দী (ঈদ সম্বন্ধে কোন কবিতা)

1. *Tabsiratul-Nazirin*, MS. in ASB, by Sayyid Muhammad-i-Biigrami, p. 443.
2. Martin's *Miniature Painting and Painters of India, Persia and Turkey*, vol. I. pp. 58, 77.
3. *'Ibrat-Namah*, by Faqir Khairuddin Muhammad, Elliot viii, p. 249.
4. *Tarikhi-Farrukhabadi*, MS. in ASB, leaf 124.
5. *Qanuni-Islam*, pp. 47-50.
6. *Ferishta* vol. iv. p. 236.

অথবা চিত্রিত কোন কাগজে শিশুদিগের প্রতি আশীর্ব্বাদ সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া দিতেন। উক্ত লিখিত বিষয়টী শিশু পিতামাতার সম্মুখে পড়িত এবং তাঁহারাই শিক্ষককে উপঢৌকন দিতেন যখনই ছাত্র কোন বই পড়িতে আরম্ভ করিত—তখন শিক্ষককে ভোজন করাইতে হইত, উহাকে হদ্যা বলা হইত; এবং পিতামাতা কর্ত্তৃক প্রদত্ত অর্থ তাঁহাকে উপহার দেওয়া হইত। তদুপলক্ষে অর্দ্ধ দিবস বিদ্যালয়ের কাজ হইত। যুবতী শিক্ষার্থিনীরা নিয়মিতরূপে বিদ্যালয়ে শিক্ষিতা হইত ইহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। শিক্ষার্থিনী বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ প্রথার প্রমাণ ব্যতীত আমরা একটী ঐতিহাসিক ঘটনা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে দিল্লীর সিংহাসনে আরূঢ়া আউতামাসের উত্তরাধিকারিণী রাজিয়া (রিজিয়া) একজন শিক্ষিতা সাম্রাজ্ঞী ছিলেন। আরও দেখা যায় যে, সুলতান ঘিয়াসুদ্দিন, যিনি ১৪৬৯—১৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মালবে রাজত্ব করিয়াছিলেন তিনি আপন প্রাসাদের মধ্যে পৃথক পৃথক আফিস, দরবার এবং ১৫ হাজার স্ত্রীলোক এক সময়ে থাকিত। এই সকল বিভাগের মধ্যে শিক্ষয়িত্রী সঙ্গীতজ্ঞ, স্তোত্রপাঠকারিণী স্ত্রীলোক, এবং নানাপ্রকার বৃত্তি ও ব্যবসাধারী পুরুষেরা ছিলেন।"[১] তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীদিগকে প্রাসাদে রাখিতেন, ইহা হইতেই বুঝা যায় ঐ সকল শিক্ষয়িত্রীর নিকট হইতে প্রাসাদের মহিলারা শিক্ষা পাইতেন।

মোগল বাদশাহদিগের সময়েও যে অন্ততঃ রাজকুমারীদিগকেও সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হইত তৎসম্বন্ধেও কতিপয় প্রমাণ আছে; এবং তাঁহারা যে অজ্ঞের ন্যায় জীবনধারণ করিয়া মরিতেন সে ধারণার কোন কারণ নাই।

বাবরের কন্যা গুল-বদন-বেগম হুমায়ুন নামা লিখিয়াছিলেন। তিনি কি ভাবে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন যদিও তাহার লিখিত নিদর্শন কিছুই নাই তথাপি তিনি যে বিদুষী মহিলা ছিলেন সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। আরও জানা যায় যে, গুল-বদন তাঁহার নিজের লাইব্রেরীর জন্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিতেন। [২] হুমায়ুনের ভাগিনেয়ী, তাঁহার ভগ্নী গুলরুখের কন্যা সলিমা সুলতানাও একজন বিদুষী নারী ছিলেন। তিনি মখ্‌ফি[৩] (অজ্ঞাত) নামে অনেক পারশী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পূর্ব্ব স্বামী বৈরাম খাঁর মৃত্যুর পর আকবরের সহিত পরিণীতা হইয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে আকবরের স্তন্যদাত্রী ধাত্রী মাহম আনখা একজন সুশিক্ষিত ছিলেন এবং দিল্লীতে একটী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

আকবরের সময়ে রাজ পরিবারের মহিলাদিগকে নিয়মিত শিক্ষা দেওয়া হইত এইরূপ প্রতীত হয়; কারণ তাঁহার ফতেপুর সিক্রির প্রাসাদে আকবর মহিলাদিগের শিক্ষার জন্য কয়েকটী কক্ষ পৃথক রাখিয়াছিলেন।

জাহাঙ্গীরের পত্নী সর্ব্বজন পরিচিতা নুরজাহান পারশী ও আরবী সাহিত্যে সুপণ্ডিতা ছিলেন,[৪] এবং তিনিই তাঁহার স্বামীর জীবদ্দশায় শাসন প্রণালী পরিচালন করিয়াছিলেন।

1. *Humayun-Namah* of Gul-Badan Begam, by A. S. Beveridge, p. 76.
2. Malleson's *Akbar*, p. 185 ; Blochmann's *Aini-Akbari*, p. 309.
3. Smith's *Fathpur Sikri*, Pt. i, p. 8. Mr. Havell has also given a plan in his *Handbook of Agra etc.*, where the school also appears.
4. *The Nineteenth Century*, 1899, p. 756 (article by Justice Amir Ali).

ইহাতেই, রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্ম্ম বুঝিতে তাহার প্রখর বুদ্ধিমত্তা এবং যথেষ্ট শিক্ষার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সাজাহানের প্রিয়তমা পত্নী মমতাজ মহল পারস্য ভাষায় বিদুষী ছিলেন এবং উক্ত ভাষায় কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। সাজাহানের জ্যেষ্ঠা কন্যা জাহানাপ বেগমও শিক্ষিতা ছিলেন এবং তাঁহার সমসাময়িক পণ্ডিতদিগকে পুরস্কার ও বৃত্তি দিয়া উৎসাহিত করিতেন। তিনি নিজেই তাঁহার সমাধি স্তম্ভের জন্য ফলক লিখিয়াছিলেন; উহা গভীর নম্রতা এবং চূড়ান্ত সরলতা পূর্ণ। উহাতে এইরূপ আছে—

"ঘাস এবং সবুজবর্ণ দ্রব্য ছাড়া আমার সমাধিক্ষেত্র আর কিছুতেই আবৃত হইবে না কারণ দরিদ্রের সমাধির আবরণের জন্য ঘাসই যথেষ্ট। সাজাহানের কন্যা জাহানারা বেগম—ফকির, পথিক এবং চিস্তীর সৎ পরিবারের শিষ্যা—ভগবান তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করুন।" ১

তিনি নিজামুদ্দিন অলিয়ার সমাধির পার্শ্বে তাঁহাকে সমাহিত করিয়া তদুপরি এই ফলক-স্থাপন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। সতি-উন্নিসা নাম্নী বিদুষী মহিলা জাহানারার গৃহ শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। তিনি কোর আন আবৃত্তি করিতে পারিতেন এবং পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি মমতাজ মহলের স্ত্রী-নাজির ছিলেন। তাঁহারই অনুরোধে সাম্রাজ্ঞী, দরিদ্র পণ্ডিতগণের কন্যাদিগকে, ভগবৎ তত্ত্ববিদ্ এবং ধার্ম্মিকগণকে বৃত্তি এবং এককালীন দান দিতেন। ২ আরংজেবের পাঁচ কন্যার মধ্যে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠা জীবউন্নিসা বেগম শিক্ষিতা কুমারী ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, এবং কোর-আনে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি পারশী এবং আরবী ভাষাও জানিতেন এবং চিত্রিত হস্তাক্ষরে তিনি বিশেষ নিপুণ ছিলেন। তিনি অনেক পণ্ডিত, কবি ও লেখকদিগকে নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা জীব-উন্নিসাকে অনেক মূলগ্রন্থ ও বিষয় নির্ব্বাচিত করিয়া লিখিত পুস্তক সমূহও উৎসর্গ করিয়া-ছিলেন। আরংজেবের তৃতীয়া কন্যা বদরুন্নিসা যদিও কোর-আন তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল তথাপি তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মত অতটা শিক্ষিতা ছিলেন না। ৩

যদিও ভারতীয় মুসলমান রমণী ও রাজকুমারী-গণ শিক্ষাক্ষেত্রে স্পেনের মুসলমান মহিলাদের মত জেইনাব, হামদা, ফতিমা আয়সা, মরিয়ম প্রভৃতি ৪ উপাধি প্রাপ্ত হন নাই তথাপি আমরা যে সকল উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা হইতেই বেশ ধারণা হইবে যে, ভারতীয় মুসলমান মহিলারা শিক্ষায় হেয় নহেন; এবং তাঁহাদের তুলনায় ভারতীয় মহিলাগণের নির্জ্জনে অব-স্থান বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে, কিছুকাল তাঁহারা যে উন্নতি দেখাইয়াছিলেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়

অবশ্য এই সকল উদাহরণ কেবলমাত্র ভারতীয় সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত মুসলমান বংশধরগণ অনুসরণ করিতেন। অতএব এখন আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, মুসলমান রাজত্ব-কালে মুসলমান মহিলাগণ সাধারণতঃ যেরূপ ধারণা হয় অতদূর অজ্ঞ ছিলেন না।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা।

---

1. Hearn's *Seven Cities of Delhi*, p. 116.
2. Prof. J. Sarkar's *Anecdotes of Aurangzib*, pp. 151 173.
3. *Maasiri Alamgiri (Bibl. Indica)*, pp. 568 ff.
4. Justice Amir 'Ali's *Short Hist. of the Saracens*, p. 560 ; Conde's *Arabs in Spain*, vol. i, p. 484.

মফঃস্বলের বাণী

১। বাঙ্গালীর এত রোগ কেন ?

অভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশে রোগেরও বৃদ্ধি হইতেছে। এখন বন্ধু বান্ধব পাড়া প্রতিবেশী যাহার সঙ্গেই দেখা হয়—কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, কেহই আর বলে না—"ভাল আছি।" বাস্তবিক, আমাদের এক-দিকে অন্নের ভাবনা সহস্র বিভীষিকা লইয়া যেমন দেখা দিতেছে, অন্য দিকে তেমনই আমরা দিন দিন রোগ চিন্তাতেও অস্থির হইতেছি।

কেন এমন হইল ? বঙ্গদেশে এত রোগের বৃদ্ধি হইল কেন ? এই যে তোমার আশে পাশে এত লোক—উহাদের স্বাস্থ্য সম্পদের গর্ব্ব কোথায় গেল ? বাঙ্গালীর শরীর এমন ব্যাধি মন্দির হইয়া পড়িল কেন ? বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এত ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, আসিডিটি ও ডাইবিটিসের প্রভাব কেন ? ইহার উত্তরে তোমরা যাহাই বল না কেন, আমাদের মনে হয়—এ রোগ বৃদ্ধির এক মাত্র কারণ—দেশোচিত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন। কথাটা একটু খুলিয়া বলা যাক্।

আমাদের দেশে আগে যেরূপ ব্যবস্থা ছিল, নানা কারণে সে ব্যবস্থা এখন উল্টা-ইয়া গিয়াছে। আগে এদেশের ব্যবস্থা ছিল—প্রাতঃস্নান ও পুষ্প চয়ন উদ্দেশে—প্রাতর্ভ্রমণ—সেই যে গঙ্গার কূলে কূলে—"আপহিষ্টেতি" মন্ত্র—প্রাতঃস্নান নিরত পুরু-ষের কণ্ঠ হইতে সন্ধ্যার ছলে ধ্বনিত হইত, তুমি হিন্দু—তোমাকে আজ সে মন্ত্রের অর্থ বুঝাইতে হইবে কি ? হিন্দুর প্রাতঃসন্ধ্যা সায়ংসন্ধ্যা—ঋষির সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কল্পনা—সূর্য্যালোক, বিশুদ্ধ বায়ু ও বিশুদ্ধ জলের স্তুতি বন্দনা। শরীর ধারণ করিতে হইলে, এই তিনটিই ত চাই ;—আলোক, বাতাস, জল,—হিন্দুর বেদে, পুরাণে, দর্শনে, বিজ্ঞানে—অমৃতের সহোদর নামে অভিহিত। এই আলোক বাতাস জল—দেহ জগতে পিত্ত, বায়ু, শ্লেষ্মা ; আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ইহারই নাম সত্ত্ব রজঃ তমঃ। এসব কথা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে বুঝান যায় না। এখন যে কথা বলিতে বসিয়াছি, তাহাই বলি।

আগে লোকে প্রাতঃস্নান ও প্রাতর্ভ্রমণ করিত। স্নানের জন্য নদীতে গমন, সন্ধ্যা-হ্নিক ফল তোলা প্রভৃতির জন্য—দেবালয়ে-গমনে, উদ্যান ভ্রমণে—লোকের দেহ স্বাস্থ্যের অরুণাভায় সুরঞ্জিত হইত। তা'রপর মধ্যাহ্ন ভোজন, মধ্যাহ্ন-বিশ্রাম। বৈকালে বিষয় কর্ম্ম, সূর্য্যাস্তের পর আবার সেই সন্ধ্যার ছলে নদী তীরে—বিমুক্ত বায়ু সেবন। এ সব ব্যবস্থা বাঙ্গালীর দেহের অনুকূল ছিল। কাজেই তখনকার বাঙ্গালীর অজীর্ণ, অম্ল, বা বহুমূত্র হইত না। মুসলমান শাসন কালে এবং ইংরাজ রাজ্যের প্রথমাবস্থায়ও এই ব্যবস্থা ছিল। লর্ড ক্লাইব হইতে ব্লাক ওয়ার পর্য্যন্ত—দিনে দুইবার কাছারি করি-তেন। তখন বাঙ্গালীর দেহ—এমন জীর্ণ শীর্ণ ব্যাধিসঙ্কর হইয়া উঠে নাই।

এখন আফিস আদালত, দোকান পসার, হাট বাজার সমস্তই মধ্যাহ্নকালে হইয়া থাকে। সূর্য্যের দীপ্তি যত বৃদ্ধি পায়—লোকের শারীরিক পরিশ্রমও তত বৃদ্ধি

পাইতে থাকে! কর্ম্মক্ষেত্রের তাড়নায় লোকে মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে—ক্ষুধার উদ্রেক না হইতেই আহার করিতে বাধ্য হয়। এই পূর্ব্বাহ্নে—আহার অম্ল ও অজীর্ণের কারণ নয় কি?

তারপর বিশুদ্ধ বায়ু। বাঙ্গালীর দেহে আর বিশুদ্ধ বায়ুর স্পর্শ আনন্দ-পলক সঞ্চার করে না। মধ্যাহ্নের ময়ূখ সন্তপ্ত প্রভাবের সময়—বাঙ্গালীকে জুতা, মোজা, গেঞ্জি, জামা, চোগা, চাপকান পরিয়া—আহারের অব্যবহিত পরেই—কর্ম্মভূমে প্রবেশ করিতে হয়। বস্ত্র স্তূপের গরমে দেহ গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠে! এ অবস্থায় পরিপাক যন্ত্রটা কতদূর উদ্বেল হইয়া পড়ে, তাহা আর কষ্ট করিয়া বুঝাইতে হইবে না। রাত্রের আহারেও ঐরূপ গোলযোগ! সমস্ত দিনের কঠোর পরিশ্রমের পর, কুপিত পিত্তের প্রসাদে নৈশ আহার অম্লাজীর্ণ সম্ভব বিষে পরিণত হয়। তাই এখন বাঙ্গালীর দেহে—এত অজীর্ণ, এত উদরাময়, এত গ্রহণী, অতিসার ও কোষ্ঠ-বদ্ধতার প্রাদুর্ভাব। যে দেশে প্রাতঃস্নান প্রাতঃ ভ্রমণের ছলে—বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের ব্যবস্থা ছিল, সেই দেশে বিছানা হইতে উঠি-য়াই ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে—বেলা ৯টা পর্য্যন্ত জামাজোড়ায় গাত্র আচ্ছাদন। যে দেশে বেলা ৮টা পর্য্যন্ত তুষার পাত হয়, ৯টা পর্য্যন্ত সূর্য্যের মুখ দেখিবার যো নাই—সে দেশের ব্যবস্থা এ দেশে চালাইলে, তাহার বিপরীত ফল অবশ্যম্ভাবী! আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ একখানি উত্তরীয় কাঁধে ফেলিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতেন, তাহাতেই তাঁহাদের ভদ্রতা রক্ষিত হইত। আমাদের এক পাড়া হইতে অন্য পাড়ায় যাইতে হইলে,—গায়ে কোট কামিজ ওয়েষ্ট কোট না চড়াইলে সভ্যতার পরিচয় দেওয়া হয় না! ইহাতেই ত দেশের সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছে!

চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ।

২। আমাদের ছাত্রবর্গ ও বিচারপতি উড্রফ

কে তুমি হে বীরহৃদয় এই অভিশপ্ত বঙ্গীয় ছাত্রবৃন্দের তপ্ত প্রাণের অবসাদ যবনিকা উত্তোলন করিয়া শান্তির উশীর প্রলেপ মাখিয়া দিলে! কে তুমি তোমার স্বদেশ-বাসিগণের প্রচলিত বদ্ধমূল সংস্কারের বিরুদ্ধে এমন ন্যায়ের কুঠার উত্তোলন করিলে! ধন্য তুমি শাস্ত্রদ্রষ্টা উদার হৃদয় বিচারপতি! কোন্ ভারতবাসী তোমায় বন্ধুবরের ন্যায় অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে ধারণা না করে, যে ভারতবাসী এবং ভারতবর্ষ মৃত! কে আজ দুঃসাহসিক বলিতে পারে আমরা মৃত নহি, জীবিত, জাগ্রত? তুমি কোন্ সাহসে, কি বলে, বল, যে শক্তির অংশ আমাদের ছাত্রবৃন্দ মৃত নহে সঞ্জীবিত? যখন প্রতি মুহূর্ত্তে স্বার্থ রক্ষার নামে আত্মহত্যা করি-তেছি, যখন আত্মরক্ষার নামে ভয় ভীত প্রাণে অহরহ মিথ্যার প্রশ্রয় দিতেছি তখন কেমনে বলিব আমরা জীবিত? তুমি ফ্রেণ্ডস সানরাইজ লিটারেরী ক্লাবে (Friends Sunrise Literary Club) এ বলিলে 'Those who are dead believe themselves to be dead—Is the Indian student dead?"—যাহারা মৃত তাহারা নিজদিগকে মৃতভাবে—ভারতীয় ছাত্র কি মৃত? তুমি বলিয়াছ You saw in the students the commencement of a future of great worth—(ছাত্র-দিগের মধ্যে ভবিষ্যতের মহতী আশা দেখিতে পাই) একথা কে অস্বীকার করিবে? এমন

আশা কাহার নাই? তবে আজকাল চারিদিক হইতে ছাত্র কলঙ্কের যে তীব্র কলরব উঠিতেছে তাহাতে দুর্ব্বল প্রাণ আমরা নীরব না হইয়া পারিনা, তুমি সে নীরবতা ভঙ্গ করিলে বলিয়া আমরা কৃতজ্ঞ। জানি আজ আমাদের ছাত্রবর্গ অনেক দুঃসাহসের দুষ্কার্য্যের কলঙ্কে কলঙ্কিত—কিন্তু যখন দেখিতে পাই অর্দ্ধোদয় যোগে, বাখরগঞ্জ দুর্ভিক্ষে, বর্দ্ধমান প্লাবনে, মেসোপটেমিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে তাহারা বীরের ন্যায় অকুতোভয়ে বিপদবরণ করে তখনও কি বুঝি তাহারা মৃত। যখন দেখিতে পাই তাহাদের ক্ষুদ্র প্রাণে ত্যাগের মহিমোজ্জল মূর্ত্তি দিক্ বিভাসিত করিয়া তুলে, অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তাহারা ক্ষুধিত আত্মীয়ের জন্য কপর্দ্দক গ্রহণ করে না—তখন প্রাণে কত ভক্তি আসে! আবার যখন দেখি বরপণ গ্রহণে অভিভাবকের তূণে তাহারা অক্ষয় ধনু তখন প্রাণে বেদনা পাই—নরহত্যার কলঙ্কে যখন তাহাদের হস্ত কলুষিত, দেখিতে পাই প্রফেসর প্রহারে তাহারা কলঙ্কিত হস্ত, তখন প্রাণে দারুণ ব্যথা লাগে। সারজন উড্রফ বলেন—

The students had been much criticised of late but if he judged them right they would not be depressed over it. For himself he was not alarmed at their condition. Nothing in the world was perfect nor wholly worthless as the Sanskrit proverb ran. Every good quality carries with it the liability of certain defects. The broad way of looking at matters was to sec whether the qualities outweighed the defects The students had faults who has not? but these were connected with certain qualities of energy and self-respect which they had acquired and which are in themselves praiseworthy. Of course all wished the defects away but speaking for himself, he would rather they had these faults than that they should be torpid, servile and lacking in self-respect. For himself he saw in the students the commencement of a future of great worth."

"ছাত্র-সম্প্রদায় সম্বন্ধে এখন খুব সমালোচনা চলিতেছে।—কিন্তু আমি যদি ঠিক বুঝিয়া থাকি তাহা হইলে, আমাদের মুহ্যমান হইবার কোনও কারণ নাই। তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমি ত ভীত হইবার কোনও কারণই দেখি না। সংস্কৃত প্রবচনে আছে—জগতে কিছুই পূর্ণ বা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, পক্ষান্তরে, মূল্যহীন নহে।—প্রত্যেক গুণের সঙ্গে দোষের সম্ভাবনা থাকে। উদারভাবে ইহাই দেখিতে হয়, দোষের অনুপাতে গুণের পরিমাণ অধিক কি না?—(মহাকবি কালিদাসকে মনে পড়ে)—ছাত্রদিগেরও দোষ আছে। কাহার নাই? কিন্তু সেই দোষের সঙ্গে আত্মমর্য্যাদা ও শক্তির বিকাশ আছে।—তাহা তাহাদের স্বোপার্জ্জিত, তাই প্রশংসনীয়। কাহার ইচ্ছা নয় যে, দোষগুলি তিরোধান করুক? আমি বলি বরং তাহাদের দোষ থাকে থাক, কিন্তু তাহারা যেন জীবনীশূন্য, তামসিক-ভাবাপন্ন, দাসপ্রকৃতি ও আত্মমর্য্যাদাহীন না হয়।

আমি ত ছাত্র-সমাজে মহান্ ভবিষ্যতের সূচনা দেখিতেছি।"

তাই আমাদের দুর্ব্বল প্রাণে হতাশ প্রাণে ব্যথিত প্রাণে গঙ্গার সুশীতল সীকর সিক্ত মৃদুপবন হিল্লোল বহিয়া যায়—তাই বলিতে ছিলাম হে মহামতি তোমার উদারতা ও বীরতাকে ধন্যবাদ দিতেছি। ভগবান করুন আমাদের ভবিষ্যৎ আশা ভরষাস্থল যুবক-বৃন্দের প্রতি তোমার বিশ্বাস সফল হউক।

বরিশাল হিতৈষী।

৩। জীবিকার্জ্জনে শিক্ষা

সংসারে থাকিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইলেই অর্থের প্রয়োজন। অর্থ সংগ্রহ, তাহার সমুচিত ব্যয় ও ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় এই তিনটি লইয়াই গৃহস্থদিগকে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়। আপনার আমার নিত্য অর্জ্জন, নিত্য ব্যয় চলিতেছে। এইজন্য আমরা যাহা করিতেছি তাহার ভবিষ্যৎ কি দাঁড়াইবে অনেকেই তাহা ভাবি না।

অন্য দেশের কথা আমাদের আলোচ্য নহে। এই বঙ্গদেশে প্রথমতঃ অর্থোপার্জ্জনের প্রণালী নির্দ্ধারণ করিতেই আমাদের অনেকে ভ্রম করিতেছেন। তাঁহারা স্কুল কলেজের পড়াকেই অর্থোপার্জ্জনের উপায় ঠিক করিয়া থাকেন। অনেক অভিভাবকের মুখে শুনা যায়—'ছেলেটি অন্ততঃ মেট্রিকিউলেশন পাশ না করিলে অন্নের জোগাড় করিবে কি করিয়া? বিশ্ববিদ্যালয়ের একখানা সার্টিফিকেট পাইলে হয় ত কোন অফিসে ২০।২৫ টাকার চাকরী পাইবে।' মেট্রিকিউলেশন পাশ করিলে এফ এ পড়াইয়া ওকালতি বা এফ এ পাশ করিলে বি এ পড়াইয়া বি এল পাশ করাই-বার কথাই তাঁহারা ভাবেন। এইরূপে হয় চাকরী, নয় ওকালতিই দেশের শিক্ষিত যুবক-দের জীবনের লক্ষ্য হইয়াছে।

স্কুল কলেজের শিক্ষাকে অর্থোপার্জ্জনের প্রধান উপায় স্থির করা মারাত্মক ভ্রম। এই দুর্নীতি অল্পদিন মাত্র এদেশে প্রবেশ করি-য়াছে। ভারতবর্ষ জাতি-ভেদের দেশ। জাতিভেদে ব্যবসায় ভেদ এখনও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বেশ প্রবল আছে। পূর্ব্বে এক একটি ব্যবসায় এক এক জাতির এক-চেটিয়া ছিল। পুস্তক পড়িয়া কাহারো কোন ব্যবসা শিখিতে হইত না। পাশ্চাত্য রাজ্যে জাতিভেদ না থাকিলেও বিদ্যাচর্চ্চাকেই তাঁহারা অর্থোপার্জ্জনের একমাত্র লক্ষ্য করেন নাই। সেখানকার কৃষক, শিল্পী ও ব্যবসায়ী বিদ্যানুশীলনের সাহায্য লইয়া থাকেন মাত্র। ওকালতি ও ডাক্তারী ব্যবসায়ে বিদ্যাচর্চ্চার আবশ্যক বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য রাজ্যের লোকেরা ঐ দুইটিকে সর্ব্বপ্রধান ও একমাত্র অবলম্বনীয় ব্যবসায় করেন নাই। তাঁহারা শিল্প-বাণিজ্য-কৃষিকেই অর্থাগমের শ্রেষ্ঠ উপায় মনে করেন। তাঁহাদের সমাজও সেই ভাবেই পরিচালিত হইতেছে।

এদেশে যে কোন শিল্পের বা ব্যবসায়ের সহিত পূর্ব্বে লেখা পড়ার সংস্রব ছিল না। লক্ষ্মী সরস্বতীর বিবাদ ত এদেশের প্রবাদ বাক্য। অধুনা সকল ব্যবসায়ী লেখাপড়ার আশ্রয় লইতেছেন সুতরাং লক্ষ্মীও তাঁহাদেরে ছাড়িয়া যাইতেছেন। যে কোন ব্যবসায়ে উন্নতি সাধন অধীত গ্রন্থ-সাপেক্ষ নহে। এদেশেই বলুন, আর অন্য দেশেই বলুন, যাঁহারা সৌভাগ্যলক্ষ্মীর অর্চ্চনা করিতেছেন, ব্যবসা বাণিজ্যে বা শিল্পনৈপুণ্যে বিপুল অর্থ আয়ত্ব করিতেছেন স্কুল কলেজের বিদ্যা চর্চ্চার সহিত তাহাদের সম্পর্ক অতি অল্প। এদেশের

রামধন, তারিণীচরণ, ঢাকার গণিমিঞা, কলিকাতার বটকৃষ্ণ, মাড়োয়ারীদের ভগবানদাস, বোম্বাইর তাতা, আকিয়াবের রেগ্যথু বা ব্রিটনের রথচাইল্ড, রকফেলার, কার্ণেগি প্রভৃতি যাঁহার নামই করুন তাঁহারাই কার্য্য-প্রণালী আমাদের উক্তি সমর্থন করিবে।

স্কুলে পড়িয়া শুনিয়া বাল্যকাল হইতে আমাদের সংস্কার জন্মিয়াছিল যে লেখা পড়া না শিখিলে মানুষের মনুষ্যত্বই বিকাশলাভ করে না। মূর্খলোকের কোন সদ্‌গুণ থাকিতে পারে না। তাহারা জগতের কলঙ্ক-স্বরূপ। প্রায় ১০ বৎসর পূর্ব্বে এই নগরে একটি স্বর্ণকার আমাদের সে ভ্রম অনেকটা ঘুচাইয়া দেয়। গয়নাপত্রের কারুকার্য্যে তাহার বিচক্ষণতায় কত সৌখিন ইংরাজ পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইতেন, কথাবার্ত্তায় সাংসারিক কাজেকর্ম্মে তাহার চতুরতা ও বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া তৎপূর্ব্বে দশ বৎসরের মধ্যে কখনো মনেও করিতে পারিয়াছিলাম না যে লোকটার বর্ণজ্ঞান নাই। কিন্তু সত্য সত্যই একদিন ধরা পড়িল—তাহার নিজের দলিলে সে নিজের নামটাই লিখিতে পারিল না।

তৎপর এই কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতায় সুস্পষ্ট দেখিতেছি বিদ্যাচর্চ্চাকে অর্থাগমের উপায়স্বরূপ করিয়া আমরা তাহাকেই কলঙ্কিত করিতেছি। শুধু বিদ্যাচর্চ্চার অধঃপাত নহে, আমাদেরও সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান স্কুল কলেজের বিদ্যাচর্চ্চা আমাদের অনেকের জাতিগত ব্যবসাবুদ্ধি বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। আমরা কেহই স্বধর্ম্মানুমোদিত ধনাগমের পথ অনুসরণ করিতে চাহি না, কেবলই পরের অনুকরণে—পরের সুখ সৌভাগ্যের প্রলোভনে আত্মহারা ও ভ্রমান্ধ হইয়া যথেষ্ট ছুটাছুটি করিতেছি।

এক নিরক্ষর কৃষকও আমাদের কিঞ্চিৎ চৈতন্যসঞ্চার করিয়া দিয়াছে। স্বকর্ম্মনিষ্ঠা ও পরিমিতাচারের ফলে এক কালের নিঃস্ব কৃষক আজ ২০।২৫ হাজার টাকার লগ্নি কাজ করে। পুত্র পৌত্রাদি লইয়া সুখে সংসার করিতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার এত টাকা, তোমার এই সুন্দর বুদ্ধিমান নাতিগুলিকে পড়াও না কেন? সে উত্তর দিল,—বাবা! ইহারা আমার স্বীয় কাজকর্ম্ম বেশ করে, খায়দায়ও ভাল, আধিব্যাধিও খুব কম ভোগে। লেখা পড়া শিখিলে ইহারা বাবু হইবে, ষণ্ডামি করিবে, ব্যারামে ভুগিয়া আধমরা হইবে, আর আমার টাকাগুলি উড়াইবে,—অবশেষে ভিক্ষা মাগিবে। দরকার নাই আমাদের এই লেখাপড়ায়।

বস্তুতঃ এদেশের যে সমস্ত শিল্পকার্য্য জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিল তাহাদের জন্যও শিল্পীদিগকে স্কুল কলেজে পড়িতে হইত না। শিল্পীরা সকলেই নিরক্ষর ছিল। শুধু তাহা কেন, বর্ত্তমানে আমরা স্কুল কলেজের শিক্ষাকে যে ভাবে গ্রহণ করিতেছি, অর্থাৎ এই শিক্ষা না হইলে সংসারের কোন কাজই চলিবে না বলিয়া যে মনে করি, এরূপ জ্ঞান এদেশে পূর্ব্বে কখনো ছিল না; এবং ভাবিয়া দেখিলে এখনো উহার ততটা প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হইবে না। কর্ম্মনিপুণতা ও প্রকৃষ্ট জ্ঞান কর্ম্মক্ষেত্রেই আয়ত্ত হইয়া থাকে।

জ্যোতিঃ।

৪। ভারতের শিক্ষাসমস্যা

কিছুদিন হইতে এ দেশে শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে প্রায়ই আন্দোলন আলোচনা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। অমুক অমুক দেশে এত লোক সাক্ষর, আর এ দেশে এত লোক

নিরক্ষর বলিয়া একটা আক্ষেপের সুর উঠিয়া বাতাসে মিশিয়া যাইতেছে—যেন অন্ততঃ আক্ষরিক বিদ্যা বা বর্ণপরিচয়ও নিরক্ষরতা অপেক্ষা শ্রেয়স্কর। কিন্তু এই "শিক্ষা" জিনিষটা কি, আমাদের শিক্ষার আদর্শ কি হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে খুব কমই আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। বিলাতে হার্ব্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি মনীষীগণ শিক্ষাবিষয়ে বহু গবেষণা করিয়া গিয়াছেন, আর আমাদের দেশে শিক্ষা-সম্বন্ধে যাহা কিছু পুস্তকাদি প্রকাশিত হইতেছে তাহা বিদ্যালয়কক্ষে কিরূপে ছাত্রদিগের শৃঙ্খলা রক্ষা করা যায়, কি করিলে ছাত্রদিগকে ভাষা, গণিত প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে এই সমুদায় উচ্চবিষয় লইয়াই লিখিত—তাহাও আবার বিলাতী ঋষিগণের মতের প্রতিধ্বনি মাত্র। কোথাও স্বাধীন চিন্তা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিদ্যুদ্বিকাশ নাই।

আজ কাল যে শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে তারস্বর উঠিয়াছে তাহা এদেশ প্রচলিত। আধুনিক শিক্ষা যাঁহার জীবন যে ভাবে গঠিত তিনি যে সেই ভাবেই বিশ্ব দর্শন করিবেন, ইহা খুবই স্বাভাবিক। মানুষের আত্মপ্রকৃতিই বহিঃপ্রকৃতি-বোধের মানদণ্ড। সুতরাং আমরা যে শিক্ষা অর্থে যে কামস্‌কাট্‌কা ও হনোলুলুর অবস্থান জ্ঞান, পরের মুখে পরের দেশের গুণবর্ণনা, বিজ্ঞানের দুই চারি পাতা, বিদেশী দর্শনের দুই চারি পাতা, জ্যোতিষের যৎকিঞ্চিৎ এবং উচ্চগণিতের প্রথমাক্ষর কয়েকটি গণিয়াই আমাদের পল্লব গ্রাহিতাকে প্রকৃত বিদ্যাবত্তা বলিয়া মনে করিব, ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা দেখিয়াও দেখি না, এ বিদ্যা-বহ্নি সংসারের চাপে প্রজ্বলিত হওয়া দূরে থাকুক, একেবারেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। যখন পরিবার প্রতিপালনের গুরুভার স্কন্ধে পতিত হয় তখন দেখি, এই সমুদায় অধীত বিদ্যাগুলি প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়া অর্দ্ধস্মৃতি অর্দ্ধবিস্মৃতির তরল অন্ধকারে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে—কখন কখন দেখি, গুয়াটিমালা-টিটিকাকা-প্যারাবোলা-হরবোলার দল অন্ধকারময় কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আমাদের স্মৃতির মন্দিরে উকি মারিয়া আমাদিগকে উপহাস করিতেছে—কখন কখনও বা লাফিং গ্যাস প্রেতলোক হইতে নির্গত হইয়া উকীলের কক্ষে হো হো সোঁ সোঁ করিয়া হাসিয়া হাসাইয়া অনন্ত সমীরণে মিশিয়া যাইতেছে। কখন কখন বা "ম্যাগনাচার্টা" ভূত আসিয়া এমনই ভাবে স্কন্ধে চাপিয়া বসে যে আমরা ভুলিয়া যাই, ভারতবর্ষ ইংলণ্ড নহে, ভারতীয় জাতি স্বাধীন বৃটিশ জাতি নহে—"ম্যাগ্‌নাচার্টা"র অন্তরালে অবস্থিত শাণিত কৃপাণের প্রভা ভারতে পতিত হইলে পুলিশ, প্রেমের শিকলি পরাইয়া সাদরে লইয়া যাইবে। এই সমুদায় দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, আমাদের এ শিক্ষা কি শিক্ষা? না শিক্ষার অগ্নিমান্দ্য?

আবার যে বর্ণপরিচয় বা আক্ষরিক শিক্ষাকেও আমরা স্পৃহণীয় বলিয়া মনে করি, সেই "ভয়ঙ্করী অল্পবিদ্যা"র ফলে দেখিতেছি কৃষকনন্দন কৃষিবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া সিগারেট ধরিয়াছে, শিল্পিকুমার শিল্পাদিকে অপমানজনক মনে করিয়া পাঁচ সাতটাকার "মুহুরীগিরি"র জন্য ঘুরিতেছে, আমাদের মহিলাগণ স্ত্রী ও মাতৃধর্ম্মকে দাসীপণা মনে করিয়া "আয়ার" কোলে সন্তানসমর্পণ পূর্ব্বক নাটক নভেলে মনোনিবেশ করিয়াছেন আর কুমারী বা অজাতসন্তানা যুবতীগণ কুন্দনন্দিনী অভিনয়ে বাহাদুরী লইবার চেষ্টা করিতে-

ছেন। পাঠশালায় যাইয়া দেখি বার চৌদ্দ-বৎসরের কিশোরগণকে "একে বলে হাত, আর একে বলে পা" প্রভৃতি অজ্ঞাতপূর্ব্ব ও শিক্ষণীয় "কর্ম্মসঙ্গীত" শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ইহারই নাম কি লোক-শিক্ষা বা তথাকথিত "মাস্‌এডুকেশন"?

আধুনিক শিক্ষার এই অবস্থা দেখিয়া প্রাণ স্বতঃই জিজ্ঞাসা করিতে চায়, শিক্ষা জিনিষটা কি, শিক্ষার উদ্দেশ্য কি, শিক্ষার আদর্শই বা কি? যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে মানুষ করা হয়, মানুষের ঐহিক ও পারত্রিক প্রকৃত সুখপ্রাপ্তিই শিক্ষার লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিকবিদ্যাই আমাদের শিক্ষার মানদণ্ড হওয়া বাঞ্ছনীয়। অবশ্য এই সমুদায়ে প্রগাঢ় জ্ঞান লাভ করিতে হইলে আধ্যাত্মিকবিদ্যার উৎস, দর্শন, যোগ ও ভক্তিশাস্ত্র এবং ব্যবহারিক-বিদ্যার জনক বিজ্ঞানের আলোচনা অপরিহার্য্য। কিন্তু স্বল্প-পরিসর মানব জীবনে এই সমুদায়ের সবিশেষ আলোচনা একরূপ অসম্ভব। যাহাকে গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্মপালন করিতে হইবে, যাহাকে অর্থোপার্জ্জনই জীবনের লক্ষ্য করিতে হইবে, তাহার পক্ষে দর্শনবিজ্ঞানের আলোচনা অসম্ভব এবং অধর্ম্ম। যাহার উপরে দশজনের প্রতিপালনের ভার ন্যস্ত, সে যদি মাতালের মত দর্শন বিজ্ঞানের আলোচনায় মত্ত থাকে তাহা হইলে গৃহে "হা অন্ন হা অন্ন" রব উঠা অনিবার্য্য। তাই আমাদের দেশের অনেক কৃতবিদ্য যুবক দর্শন বিজ্ঞানের উচ্চপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতী, মুন্সেফী বা ডেপুটীগিরিতে জীবনের সকল শক্তি ব্যয় করিয়া ফেলিতেছেন—দর্শনবিজ্ঞান আর তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য হইতে পারিতেছেনা, তাঁহাদের সাধনা অন্য আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দর্শন-বিজ্ঞানের আলোচনা তাঁহাদের অবসরের সঙ্গীত, নিশীথের ক্ষণিক ও নিভৃত বংশী-ধ্বনি। আবার যাঁহারা এই আশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে মনে মনে লক্ষ্মীর উপাসক হইয়াও সুযোগের অভাবে শক্তি ও ভক্তি শূন্য হইয়াও বাণীর মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাই এ দেশে শিক্ষার বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে না, বিদ্যা ফলবতী হইতেছে না।

প্রাচীন ভারতে এই নিমিত্তই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ দর্শন-বিজ্ঞান লইয়া জীবন কাটাইয়া দিতেন, সমাজ তাহার ফল ভোগ করিত। সংসারের লোক সমাজের লোক ব্যবহারিক-বিদ্যা লইয়া, অর্থোপার্জ্জন লইয়া তদ্বিষয়ে উন্নতি সাধন করিত আর ব্রাহ্মণগণ আপনাদের সাধনা ও গবেষণালব্ধ জ্ঞান সহজভাবে সংক্ষিপ্তভাবে তাহাদিগকে প্রদান করিতেন। ব্রাহ্মণগণ বেদান্ত প্রভৃতি কঠিন দর্শনশাস্ত্র প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যাদির আলোচনা করিতেন ও শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ রচনা করিয়া দর্শন ও ভক্তিশাস্ত্রের সিদ্ধান্তসমূহ জনসাধারণে প্রচার করিতেন। এই উপায়েই ভারতের নিম্নশ্রেণীর মধ্যেও দয়া, মায়া, আতিথেয়তা ও ভক্তি প্রভৃতি নানা গুণ বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে। সংসারের লোক এই দানের নিমিত্ত ব্রাহ্মণকে সর্ব্বোচ্চ সম্মান প্রদান করিয়াছে, রাজা ও প্রজা ব্রাহ্মণ রক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বস্বপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন। এই রূপেই হিন্দুসমাজ গঠিত ও পুষ্ট হইয়াছে, এই রূপেই প্রাচীন ভারতে লোকশিক্ষা বা "মাস এডুকেশন" বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।

বর্ত্তমান যুগেও স্বার্থজ্ঞানশূন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ভারতের প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র, ভক্তি শাস্ত্র, সমাজশাস্ত্র (স্মৃতি) প্রভৃতি রক্ষা করিবার জন্য দারিদ্র্যকে আলিঙ্গন করিয়া ছিন্নবস্ত্রে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেছেন, এ দেশের টোল দোকান নহে—টোলে "ফী" নাই—অধ্যাপককে ছাত্রদিগের আহার্য্যও সংগ্রহ করিতে হয়। এ দেশের "টোল" এ দেশের বিনা-বেতনের "রেসিডেন্‌সাল ইউনিভারসিটী"। এ দেশের সমাজ তাই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সকল ভার গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু হায়! এখন আমরা ইহাঁদিগকে সমাজের গলগ্রহ বলিয়া মনে করি! ইহাঁরা জগতের কোনই খবর রাখেন না, লড়াইয়ের খবর বলিতে পারেন না, কামস্‌কাট্‌কা ও হুনোলুলুর বিবরণ বলিতে পারেন না, এডিসন প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বার্ত্তা আওড়াইতে পারেন না, ইহাঁদের পল্লবগ্রাহিতা নাই, ন্যায় বেদান্ত ভক্তিশাস্ত্র প্রভৃতি "সে কেলে" বিদ্যার আলোচনায় ইহাঁরা তন্ময়, জ্ঞান যে কি করিয়া প্রাচীন হয় তাহা ইহাঁদের বুদ্ধির অগম্য—ইহাঁরা মনে করেন, যাহা সত্য, তাহা শাশ্বত, তাহা অবিনাশী, তাহা চিরসমুজ্জ্বল।

আমাদের মনে হয় যাঁহারা বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞানের আলোচনা করিবেন, তাঁহাদিগকেও এইরূপ প্রলোভনশূন্য ক্ষুদ্র বিষয়ে আকর্ষণশূন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইয়া সমাজের কল্যাণে সাধনক্ষেত্রে ব্রতী হইতে হইবে। প্রকৃতপক্ষেও জগদীশচন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্র, কিংবা ব্রজেন্দ্রনাথ শীল হইতে হইলে অর্থের প্রতি আকর্ষণ শূন্য হইতে হইবে। এ পথে অর্থ নাই, এ পথে লক্ষ্মী পরিভ্রমণ করেন না। আর যাঁহারা অর্থোপার্জ্জনকে জীবনের লক্ষ্য করিবেন তাঁহাদের পক্ষে দর্শনাদি গভীর তত্ত্বসমূহের জন্য মস্তিষ্ক ব্যয় না করিয়া ভূগোল খগোলে সময়ক্ষেপ না করিয়া মিক্যানিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং, ইলেক্‌ট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং বিবিধ শিল্প, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি অর্থকারী ব্যাবহারিক বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যিনি যে পথে যাইবেন, তাঁহাকে সেই পথের শিক্ষা দেওয়াই প্রকৃত শিক্ষা—নতুবা ক্ষুদ্রমস্তিষ্কে বিশ্বজ্ঞান প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিলে পণ্ডশ্রম, অর্থব্যয় ও "অজীর্ণ" রোগোৎপত্তিরই অধিকতর সম্ভাবনা।

রঙ্গপুরদিক্‌প্রকাশ।

"আর মানুষ হ'তে হ'লে:এই নৈরাশ্যের মধ্যেই আশার স্থান
খুঁজে নিয়ে পূর্ণ উদ্যমে মঙ্গল কর্ম্মের উদ্দেশ্যে চলতে
হবে। আপাতমধুর জিনিষ প্রকৃত মঙ্গলময় নয়।
তাই কষ্টকে আলিঙ্গন ক'রে, দারিদ্র্যকে
মস্তকে ধারণ করে, নৈরাশ্যের ভীতি-
কেই একমাত্র সহায় ক'রে
জীবনের কঠোর কর্ত্তব্যময়
কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ
হ'তে হবে।"

"সাধনা"

সপ্তম খণ্ড সপ্তম বর্ষ	১৩২৩, ভাদ্র	একাদশ সংখ্যা।

আলোচনা

১। মনুষ্যত্বের শিক্ষা

শিক্ষা এবং মানুষের বিষয় ভাবিতে গেলে মানুষকে দেবতাবোধে পূজা করিতে ইচ্ছা করে। মানুষ নেপোলিয়ন সৃষ্টি করিয়াছে, মিলের জন্ম দিয়াছে। মানুষ রাজা হইবার স্পর্দ্ধা করিয়াছে, বীরের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া মানুষ তাঁহাকে ডাকিয়া আদর করিয়া নরেল মুকুট পরাইয়া দিয়াছে—এত বড় শক্তি মানুষের। বিস্মিত হইতে হয় বটে।

আমরা পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া নিজেকে গঠন করিতেছি। সেইটাই আত্মগঠন। আত্মগঠন করিতে পারিলে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব, ইতিহাস রচনা করিতে পারিব, যুগযুগান্তরের আশা আকাঙ্ক্ষা, ধর্ম্ম, জীবন, সমস্ত আমার মধ্যে টানিয়া রাখিতে পারিব। বীজ কি একদিনের বীজ? একটি বীজের মধ্য দিয়াই ত চিরকালের উদ্ভিদ জন্মিতেছে। মানুষও একদিনের জন্য

নহে—এক বৎসরের জন্য নহে। লক্ষ লক্ষ যুগের জীবনধারা একক মানুষকে ধারণ করিয়া আছে। লক্ষ লক্ষ যুগ ধরিয়া বিভিন্ন জাতি সাম্রাজ্য ব্যাপিয়া তাহার সেই চির-কালের সঞ্চয় ব্যয় করিতেছে।

আমাদের রামমোহন রায়ের মধ্যে কি এই যুগব্যাপী মানুষটি ছিল না? বঙ্কিমচন্দ্র কি মাত্র ৫৫ বৎসর বাঁচিয়াই ক্ষান্ত রহিয়া গিয়া-ছেন? সেই ৫৫ বৎসরের আরও ২১ বৎসর গত হইতে চলিল—তিনি এখনও মরেন নাই। না জানি আরও কত বৎসর তিনি বাঁচিবেন।

সুতরাং আমরা দুই একদিনের জন্য এই পৃথিবীতে আসিয়াছি এমন মিথ্যা কথা হৃদয়ে পোষণ করিয়া জীবনের গুরুত্ব উপেক্ষা করিও না। যে মানুষ নেপোলিয়ন সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে, বল কি সে দুই দিনের জন্য আসি-য়াছে? যে মানুষ বেদের মন্ত্রে স্বর্গ নির্ম্মাণ করিতে পারিয়াছে সে মানুষ কখনও মরিতে আসে নাই। শোন আকাশ বলিতেছে, মানুষ তুমি মরিতে এস নাই। আমি চির-কাল তোমার মস্তকোপরি এই নক্ষত্র খচিত নীলচন্দ্রাতপ ঝুলাইয়া দিব। কবি বলিতেছে, এই প্রেমের রাজ্য—এই পৃথিবী মানুষের চিরকালের লীলাক্ষেত্র, এখানে কেহ মরেনা—

> "Nothing will die,
> All things will change
> Through eternity—"

আমাদের ঋষি আমাদের আশীর্ব্বাদ করি-তেছেন, বলিতেছেন, তোমরা যে অমৃতের পুত্র—তোমাদের ভয় নাই। আমাদের কবি আমাদিগকে আশায় উদ্বোধিত করিয়া বলি-তেছেন, "প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে প্রকাণ্ড জগৎ।" এই যে প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে প্রকাণ্ড জগৎ, ইহার সঙ্গে পার্থিব জগতের পূর্ণ সমাবেশেই শিক্ষার সার্থকতা। চোখের সম্মুখে প্রকৃতির পুষ্প পুঞ্জীকৃত হইয়া ফুটিয়া আছে। এই বহিঃ প্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃ প্রকৃতির সন্ধি করিতে হইবে। বাহিরের ফুলের সঙ্গে মনের ফুল ফুটাইয়া এক গম্ভীর শান্ত সৌন্দর্য্যের সূত্রপাত করিতে হইবে। ইহাই মনুষ্যত্বের শিক্ষা।

* *
*

২। অতিমানুষের মূল্য

"মানুষ উঠ্‌ছে—ভগবান নামছেন," বলিয়া একটা কথা আছে। কিন্তু এই ওঠা-নামার মধ্যে বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই। একই অবস্থার দুইরূপ বর্ণনামাত্র। মানুষই উন্নতি করিতে করিতে অতিমানুষের মত বিবেচিত হইতে থাকে—ভগবান মানুষেরই একটা অবস্থাবিশেষ। তাহা ছাড়া ভগবান বলিয়া আজগুবি—একটা কিছু আছে কি? তবে উন্নতির শেষ দেখে না বলিয়াই—শক্তির চরম পরিচয় পায় না বলিয়াই মানুষ কোথাও তাহার দাঁড়ি টানিতে পারে না, সে মনে করে একটা অসীম অনন্ত শক্তির স্বতন্ত্র সত্তা আছে। সেই শক্তিকেই সে ভগবান বলিয়া অভিহিত করে, ভয় করে, ভক্তি করে। কিন্তু প্রকৃতি ছাড়া কি সেই শক্তির অবস্থিতি সম্ভব? প্রকৃতির লীলাখেলার মধ্যেই কি সেই শক্তির বিকাশ নহে? এই শক্তির মধ্যে ডিগ্রির তারতম্য দেখিতে পায় বলিয়াই মানুষ ইহার চরম কোথায় ধরিতে পারে না, তাই বলে, শক্তি অসীম, শক্তি অনন্ত।

পূর্ব্বে বলিয়াছি ভগবান মানুষেরই একটা অবস্থাবিশেষ। এ অবস্থারও শেষ নাই। কারণ অতি মানুষ হইতে অতি মানুষে মানুষ

ক্রমাগত উন্নীত হইতে পারে। এদিক দিয়াও সে অনন্ত অর্থাৎ ভগবান অনন্ত।

অতি মানুষের রূপ আমরা ধার্ম্মিকের মধ্যে দেখিতে পাই, অতি মানুষের রূপ আমরা সয়তানের মধ্যে দেখিতে পাই, আবার যিনি মানুষ হইয়াও নিষ্ক্রিয় হইতে পারেন, তিনিও হয়ত অতি মানুষ।

ঘোরতর পাপী, ঘোরতর পুণ্যবান দুইই ভগবানের ভক্ত—দুইই স্বর্গফল লাভ করিয়া থাকে—আমাদের পুরাণেতিহাসে এইরূপ কথাই আছে। আমার মনে হয়, তাহারা অতি মানুষ বলিয়াই তাহাদের ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটে, কারণ ভগবান যে তাহাদের নিজেরই অবস্থা।

চরম ডিগ্রি ছাড়া আর কাহারও কথা গণনার মধ্যে আনা হয় না। তাহার পূর্ব্বে মানুষ যে দ্বন্দ্বের মধ্যে অবস্থান করে। এইটা ভাল, ঐটা মন্দ, এইটা করিব, ঐটা করিব না ইত্যাদির বিতণ্ডায় পড়িয়া ঘুরপাক খায়। কিন্তু যেটাই ধরুক সেইটাই যদি হৃদয় দিয়া একবার ধরে এবং তাহাকে প্রাণে মনে জীবনে অনুকরণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করে, তবেই তাহার বিকাশ চরম ডিগ্রির দিকে ধাবমান হয়।

কিন্তু যাহারা ততখানি পৌছিতে পারে না, তাহারা কি তবে ব্যর্থ? তাহারা কি তবে ভগবানের বিকাশ নহে? না তা কেন? সব সফল, সকলেই আংশিক ভগবান। তুমি আমি সমাজের মনগড়া মাপকাঠি দিয়া যেটাকে ব্যর্থ মনে করি, ঘৃণ্য ভাবি, সেটা সত্যসত্যই ব্যর্থ নয়, তাহারও একটা মূল্য আছে, সেটা সত্যসত্যই ঘৃণ্য নয়, তাহার মধ্যেও একটা সৌন্দর্য্য আছে। ভুল করিয়ো না, পাপ পুণ্য সমাজেরই সৃষ্ট পদার্থ। চরম দৃষ্টিতে "তুল্য মূল্য সবাকার"!

* *
*

৩। সেবা ও শিক্ষা

আমরা মানুষ হইয়া জন্মিয়াছি। দেশ, ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র এইগুলিকে আমাদের আশ্রয় করিয়াছি। আমারই সুবিধার নিমিত্ত এইগুলিকে প্রয়োজন মত টানিতেছি অপ্রয়োজনে সরাইয়া দিতেছি। টানা ছাড়া, ভাঙ্গা গড়া, কে না চায়? আপন শক্তি জাহির করিতে, মানুষের মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে, বন্ধু বান্ধবের মধ্যে প্রীতিবর্দ্ধন করিতে সকলেই চায়। সকলেরই ইচ্ছা হয় পরবর্ত্তী কালের জন্য আমার নামটী অক্ষয় হইয়া থাকুক—সে আশা যাঁহার আছে তিনিই আপনাকে দাঁড় করাইতে পারেন। আশা, উদ্যম, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস, সাহস, সংযম প্রভৃতি পুরুষের গুণ ব্যতীত কেহ বড় হইতে পারে না। এই সকল গাছ হইতে পড়ে না অথবা দেবতার উদ্দেশ্যে হাত জোড় করিয়া বসিয়া কাঁদিলেও মিলে না। আমাদের মধ্যেই এইগুলি রহিয়াছে। বিকাশের জন্য নানা ভাবের ক্ষেত্রও রহিয়াছে। মানুষের মনুষ্যত্ব প্রকাশের নিমিত্তই এই সকলের সৃষ্টি, পশুর জন্য নয়। মানুষে পশুতে এইখানেই প্রভেদ। যাহারা মানুষের মত আকার ধারণ করিয়াও পশুভাবাপন্ন তাহাদের সঙ্গেও পশুর একটু প্রভেদ আছে। পশু চিরদিনই পশু, মানুষ চিরদিনই পশু থাকে না। সময়ে সে মানব-সমাজেও দেবতাকে আহ্বান করিতে পারে। সুখ ভোগ, অত্যাচার গ্রহণ, শক্তিহীনতার প্রমাণ এবং স্মৃতি ধ্বংস করিয়া দিয়া গত কল্যের বিষয় উত্থাপন অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনা করাও তাহার কর্ম্ম নয়। মানুষের চরিত্রে যখনই অপ্রয়োজনীয় উদাস ভাব আসে, সে যখন প্রয়োজন অপ্রয়োজনের বিচার করিতে বসে, তখনই দুঃখ হয়, তাহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া

চিন্তিত হই। তখনই বুঝি তাহার ধর্ম্মভাব লোপ পাইয়াছে, বিস্মৃতি তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। তাই বলিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাহার চরিত্র সমালোচনা করিলে চলিবে না। সমালোচক ও সমালোচ্য এক ভাবের না হইলে অঙ্গুলি সঙ্কেতের অবসর কোথায়? ধীর চল্‌তিতে তাহাকে ধাক্কা দিতে হইবে, তাহার আমোদের আসর ভাঙ্গিয়া দিয়া মনে উত্তেজনার সঞ্চার করিতে হইবে, তবুও তাহাকে উঠাইতে হইবে, মার খাইয়াও তাহাকে টানিতে হইবে। হউক সে অত্যাচারী ভূস্বামী, হউক সে দুর্ব্বৃত্ত মহাবলশালী, হউক সে ক্ষীণজীবী, অথবা হউক সে আমার নীচাশয় আত্মীয় পরিজন—তাহাকে চাই-ই। কার্য্যারম্ভে ভাবিতে হইবে সে আমারই আত্মীয় স্বজন, আমারই দেশবাসী বিদ্বান-বুদ্ধিমান, আমারইত প্রতিবেশী; তাহার দুঃখে দুঃখিত হইবে তাহারই ভালর জন্য। তারপর যখন তুমি মহদুদ্দেশ্য লইয়া উন্মত্ত হইয়া ছুটিয়াছ তখন আর আপন পর কি? মহাশক্তির আহ্বানে সাড়া দিবার নিমিত্ত, তাহাকে কর্ম্মের উপযুক্ত করিবার জন্য, তোমার পথের পথিক করিতে—তাহার ঘোর তন্দ্রা দূরীকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্যত্বের বিকাশ অবধি সকল কার্য্য তোমাকেই করিতে হইবে। তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য দেবতার সঙ্গে যুদ্ধেরও প্রয়োজন হইতে পারে মানুষ ত দূরের কথা। আমরা হিন্দু, দেবতাই আমাদের শত্রু, দেবতাই আমাদের পরম মিত্র, দেবতারাই আমাদের আদর্শ।

যে পরের ভার কাঁধে লইবে মানুষের ত কথাই নাই, সমস্ত জগতের যেখানে যাহা প্রয়োজনীয় আছে, তাহা তাহাকেই আয়ত্ত করিতে হইবে।

হীন বিশ্বাস, অসংযত, দুর্ব্বল মানুষকে, আমারই অনুবর্ত্তীকে বুঝাইব দৌর্ব্বল্য তোমার শোভন নয়, ভীরুতা তোমার ভূষণ নয়, চাপিয়া থাকা তোমার ধর্ম্ম নয়, মনুষ্যত্বের নামে পশুত্বের পূজা তোমার উদ্দেশ্য নয়, স্মৃতি রাখিয়া, আশা রাখিয়া উৎসাহপূর্ণ হৃদয়কে বিস্মৃতির ও হীনজ্ঞানের দ্বারা চাপা দেওয়া তোমার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। এই দেশের মাটি তোমারই কর্ম্মভূমি। তুমি একটা মানুষ তোমার জন্মটা শুধু একটা ভেল্‌কি বাজির জন্য নয়, সময়ে সময়ে মৃত্যুর প্রার্থনা করাই উচ্চান্তঃকরণের কাজ নয়, আবিল ভোগের জন্য তোমার জন্ম হয় নাই। তুমি পশু নও—আহার নিদ্রাই তোমার চরম নয়। মানুষে মানুষে যেখানে সমতা আছে যে সকল গুণের দ্বারা মানুষ মানুষ বলিয়া গণ্য হয় তাহাই তোমার লক্ষ্য। তোমার সমাজের প্রতিষ্ঠা করা, তোমার ধর্ম্মভিত্তি তোমার হৃদয়ে কতখানি গাঁথিয়া উঠিয়াছে তাহা নিজের ব্যক্তিত্বের দ্বারা বিকাশ করা, তোমার ইতিহাসের ধর্ম্মবীর কর্ম্মবীর জ্ঞানবীর ও ভক্তশ্রেষ্ঠগণের চরিত্রবল প্রস্ফুটিত করা তোমার জীবনের উদ্দেশ্য। ধর্ম্মশাস্ত্র ও ইতিহাসের চর্চ্চা, সমাজ সমস্যার মীমাংসা, শিক্ষাপ্রচার এবং রাষ্ট্রনীতির আলোচনা করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে তাহাদের পরিচালন তোমার উদ্দেশ্য।

সময় আমাদের খুবই কম। ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার সময় সন্নিকট। আমাদের শাস্ত্রবাক্য আছে "গৃহীতৈব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ।" সুতরাং সত্য প্রতিষ্ঠা করিতে মনুষ্যত্বের অর্জ্জনে ভয় ও দুর্ব্বলতার দ্বারা হইবে না। আমরা বুঝিতে চাই অন্যকে বুঝাইতে চাই মহাশক্তি আমার প্রাণের তারটী

বাজাইয়া আমাকে যে পথের পথিক করিতে চায়, তাহাই সত্য, তাহাই শ্রেয়ঃ, তাহাই প্রেয়, তাহাতেই ধর্ম্মের বিকাশ, অধর্ম্মের বিনাশ, আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা, দুর্ব্বলতার বিসর্জ্জন।

* *
*

৪। আমাদের বিচার-বুদ্ধি

প্রতি বৎসরই কংগ্রেস কনফারেন্সের সভাপতি মনোনয়ন ব্যাপারে দেশময় একটা হট্টরোল চলিতে থাকে। বাঙ্গলা দেশে শারদীয় পূজা যেমন ছেলে মহলের একটা আমোদের বিষয়, শিক্ষিত বৃদ্ধ মহলে কংগ্রেস কনফারেন্স ব্যাপারটাও তদ্রূপ। তবে এই দুইটার মধ্যে যে যথেষ্ট পার্থক্য না আছে এমন নহে। শারদীয় পূজায় কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই প্রচার করিয়া বেড়ান না অথবা পূজা দাতার প্রতিবেশী বা গাঁয়ের লোক দল বাঁধিয়া অন্য পক্ষকে বলেন না আমাদের প্রতিমা ভাল, সাজ সজ্জার ঢং আমাদেরই উত্তম। কংগ্রেস কনফারেন্সের কর্ত্তাদের ঐখানটায়ই যত গোল।

সমাজ, ধর্ম্ম, ও গৌরব লইয়াই দেশ, এই গুলি অল্পবিস্তর সকল দেশেরই আছে। পশুও এই দেশেরই তাই বলিয়া ধর্ম্ম বা গৌরবে তাদের কোন ধারই নাই। তার আছে সমাজ মাত্র তাও প্রাণী বিশেষে পার্থক্য আছে। সুতরাং পশুমাত্রেই সমাজবদ্ধ নয়।

আমরা দেশের উন্নতি চাই, দেশের গৌরবকে আবার তাজা করিয়া নবীন ভাবে উপলব্ধি করিতে চাই, আমাদের সমাজে মানুষ চাই আমরা যে সবই খাঁটী চাই। তাই কতকগুলি হ য ব র ল লইয়া বাস করিতে চাই না, এ ধারণা সকলেরই আছে। যখন দেশ চাই, দেশের গৌরব চাই তখন ব্যক্তিগত আধিপত্য স্থাপন বা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনে আমাদের লক্ষ্য থাকিবে কেন? যাহাতে দেশ উপযুক্ত লোকের দ্বারা ভূষিত হইতে পারে তাহারই উপায় করা কর্ত্তব্য।

তেত্রিশ কোটী ভারতবাসীকে লইয়াই এই দেশের অস্থি, পঞ্জর, মেদ, মাংস শিরা, শোণিতবিন্দু। অবশ্য এমন দিন আমাদের আসে নাই যে দিন দেশের প্রতিনিধি সকলের অভিমতে মনোনীত হইবেন, তবুও দেশের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত, হয়ত তাঁহারা রাষ্ট্র-নীতি ক্ষেত্রে গলাবাজি করেন নাই অথবা সমাজ বিজ্ঞানে বা শিল্প-ব্যবসায়ের জন্য উৎকৃষ্ট চিন্তার পরিচয় দেন নাই তথাপি, তাঁহাদিগকে বাদ দেওয়া হয় কেন? সম্পাদকগণ সভ্য জাতির গৌরবের বিষয় তাঁহারাও এ বিষয়ে পৃথক পড়িয়া থাকেন কেন? আজ যাঁহারা সভাপতি হইয়া দেশের গৌরববৃদ্ধি করিতে ব্রতী, তাঁহারা দেশের কোন্ কোন্ বিষয়ে জনসাধারণের কাছে পরিচিত? পরবর্ত্তী-যুগের সন্তানগণ তাঁহাঁদের অভিভাষণ ও বক্তৃতাপাঠ ব্যতীত আপনাদের জীবন পথে আর কি সহায় পাইবে? প্রতিনিধিগণ গাত্রোত্থান করিবার পূর্ব্বে সমস্ত দেশ তাঁহাদিগকে জাগায় না কেন?

এক একটী বৎসর সভা সমিতি লইয়া অগ্রসর হইতে থাকে আর পরহিতব্রত নায়কগণ দেশ রক্ষার জন্য জীবন দান করিতে আগু হইতে থাকেন। বাঙ্গলা, পঞ্চনদ, মহারাষ্ট্র হইতে এক একজন প্রতিনিধি দাঁড়াইয়া পড়েন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ হয়ত ভাবের বক্তা, কেহ হয়ত ২।৪টী কর্ম্মের ডঙ্কা বাজাইয়া রাখিয়াছেন আবার কেহ হয়ত নীরব কর্ম্মী। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই কি তাঁহাদিগকে জানে শুনে? হয়ত এক ভাষা-

ভাষী ব্যক্তিই আপন প্রদেশে বিশেষ পরিচিত নহেন। এদিকে বোম্বাই হয়ত বাঙ্গালাকে আসন দিলেন, বাঙ্গালা হয়ত যুক্তপ্রদেশকে টানিলেন। সভাপতিগণ এবং যাঁহারা তাঁহাদিগকে বরণ করেন তাঁহারা ছাড়া আর সম্পূর্ণ দেশটা কি তাঁহাদের তুলনায় একটা অজ্ঞ অসভ্যের বিচরণ ভূমি? সকলেই যে তাঁহাদিগকে জানিবে এমন কোন কথা নাই। ইহাতে উভয় পক্ষেরই ত্রুটী আছে। কিন্তু কংগ্রেসাদি সভা সমিতির সভাপতিগণ আজ যেমন দেশে প্রতিষ্ঠিত হইতে যাইতেছেন, পূর্ব্বে যদি তদ্রূপ আত্ম-প্রতিষ্ঠারচেষ্টা করিয়াও থাকেন তবুও প্রত্যেকের যোগ্যতা নিরূপণের জন্য তাঁহাদের কার্য্যদক্ষতা সাধারণে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কারণ দেশের জনসাধারণ যেন তাহাদের সভাপতিকে জানিয়া শুনিয়া লইতে পারে। এক এক প্রদেশের এক এক জনের উত্থান সত্ত্বেও যেন মনোনয়নে পার্থক্য দেখা যায় এবং দেশবাসী দূরে থাকিয়া ইহার রহস্য বুঝিতে পারে না যে, মান্দ্রাজী পঞ্জাবীকে ডাকিতেছে কেন। তাই আমরা বলিতে চাই প্রতিবৎসরেই যখন একজন দক্ষ সভাপতিরই আহ্বান হয় তখন সকলে এক বাক্যে একজনকে আহ্বান করে না কেন? উপযুক্ত যে, সে সর্ব্বত্রই উপযুক্ত, তাহার আসন টিকিবেই, তাহার প্রতিষ্ঠা হইবেই। দেশের মুখপাত্র সংবাদ পত্র প্রভৃতি তাঁহাদিগকে ডাকেনা কেন? সভাপতিগণ যখন আপনা হইতেই সাজসরঞ্জাম প্রদর্শন করিতে থাকেন তখন মনে হয় দেশের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে আত্মপ্রতিষ্ঠা আত্মভোগই প্রধান উদ্দেশ্য তাই তাঁহারা অপেক্ষা করাকে সুসময় নষ্ট করা ব্যতীত আর কিছুই মনে করিতে পারেন না ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। "যার যখন হতেছে সময় রঙ্গ ভূমির অভিনয়" তিনি তখনই দেখা দেন কিন্তু বৎসর মধ্যেই আর তাঁহাদের অনেকেরই সাড়া পাওয়া যায় না— সে কেবল আজ।

আজ কংগ্রেস রাখাটা যেন একটা নিয়মের মধ্যে দাঁড়াইতেছে। সে প্রাণ আর প্রীতি ঢালে না। যাক, তবুও যদি কোন দিন এ মন্দিরের পূজারীভাবে উমেশচন্দ্র, লাল মোহন, গোখ্‌লে, রমেশ দত্তের মত কেহ আবার দেখা দেন এই যা আশা।

* *

৫। সাহিত্যসম্মিলনের কাজ

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশই আপনাদের মাতৃভাষার উন্নতির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। ইহা খুবই সুখের বিষয়। ইহার ফলে আমাদের বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্য নূতনের সঙ্গে পুরাতনের যোগ করিয়া দিবে। প্রাচীন কবি, বাদক, গায়ক, শিল্পী ও লেখককে মাটি খুঁড়িয়া বাহির করিবে। প্রাচীন সমাজসেবক ও সাধু মহাপুরুষদিগের ত্যাগনিষ্ঠা, সংযম ও সেবাদ্বারা সমাজ গতির ধারা কিরূপ প্রবাহিত হইয়াছিল তাহার বিবরণও বেশ ফুটিয়া উঠিবে। আমাদের সমাজ পুরাতন। এই পুরাতন সমাজ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা চালিত হইয়া আজ নূতনের প্রতিষ্ঠার জন্য নানা শ্রেণীর সেবক, নানা ভাবের ভাবুক দিতে পারিতেছে। এই ভাবুকতা আমাদের মধ্যে বেশ প্রভাব বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছে সত্য, কিন্তু সমুদয় দেশ এখনও সেভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করে নাই। শুধু প্রাচীন পুঁথির অন্বেষণ ও স্থান নির্ণয়ের দ্বারাই ইতিহাস পুষ্ট হয় না, নব্য ইতিহাসের শক্তি বৃদ্ধির জন্য ঐ গুলিই

একমাত্র উপাদান নহে। তবুও বাঙ্গলা দেশে প্রাচীনকে বুঝিবার জন্য যতটা আগ্রহ দেখা যাইতেছে আর কোন প্রদেশে তেমন ভাব খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

সাহিত্যের ভিতর দিয়া দেশকে বুঝিবার নিমিত্ত কেবল উড়িষ্যা, পঞ্চনদ ও গুর্জ্জর-সম্মিলিত মহারাষ্ট্রকেই দেখিতে পাইতেছি না। হিন্দুস্থান ও অন্ধ্র, সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করিয়াছেন সত্য কিন্তু ভাষার ভিতর দিয়া আপনাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখাইয়া নূতন ভাব সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। বাঙ্গলার প্রান্ত হইতে সুদূর রাজপুতনার সীমান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র হিন্দী প্রদেশ দাঁড়াইতে চাহিতেছে, শুধু ভাষার উপর। আপনার ভাণ্ডার খুলিয়া জ্ঞানদানের জন্য ততটা আগ্রহ আজও দেখাইতে পারে নাই। সমগ্র দেশে যদি মনুষ্যত্ব সাধনের জন্য একটা দেবভাব আসিয়াছে তাহা হইলে গতি অমন মন্থর কেন? যে ভাবে যে ভাষায় যে স্পন্দনে মানুষ সজীবতা লাভ করে আমরা তাহাদিগকে পাইয়াও এমন নিশ্চল কেন? তাহার একমাত্র কারণ সাহিত্যসেবা বা স্বদেশের উন্নতির জন্য বিভিন্ন বিষয়ের প্রবর্ত্তন করিতেছেন যাঁহারা, তাঁহারা নিজেদের ছাড়িয়া আর বেশীদূর পৌঁছাইতে যেন ইচ্ছা করেন না। তাঁহারা যে, শিক্ষা চাহেন তাহা সত্য। শিক্ষাই মানুষকে দেবত্বে পরিণত করিবে, কিন্তু বড় জোর বৈশবিদ্যালয়ই তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র শিক্ষাপ্রচারের পন্থা হইয়া রহিয়াছে।

আমাদের এই সময়ও যে এইভাবে বসিয়া থাকা তার কারণ শুধু নিজেদের মধ্যে এমন শক্তি নাই যাহার দ্বারা নিজেরা শক্তি দিয়া কর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া আর দশজনকে খাড়া করিয়া তুলিতে পারি। তারপর সে শক্তির ভিখারীও নাই। আমরা সবই চাই বিপুল, কিন্তু যে শক্তিতে শক্তিমান মনে করি, সে শক্তিতে আর কুলায় না। তাই আজ সর্ব্বত্র নিরাশা, কর্ম্মে বীতস্পৃহা, গড়িয়া না উঠিতেই ফলের দিকে লক্ষবার দৃষ্টি, আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস।

যে শক্তির প্রয়োজন তাহা দূরে রহিয়াছে। তাহাকে কেহ কাছে টানিতে চাহে না। সদ্য ফললাভের আকাঙ্ক্ষাই এই অনিচ্ছার কারণ। বিভিন্ন কর্ম্মকেন্দ্রে, বিভিন্ন জননায়কের চরিত্রে যদি এই প্রকার শক্তিহীনতার প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা হইলে সমাজ স্থির থাকিবে কি করিয়া? কোন কিছুর প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে বীতস্পৃহ হওয়ার চেয়ে প্রতিষ্ঠায় উদাসীন থাকাই শ্রেয়ঃ। মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া তাহাতে উদাসীন না হওয়াই যোগ্যতমের কার্য্য।

দেশ জন-সংঘকে লইয়া, জনকয়েককে লইয়া নহে—ইহা সকলেই বুঝেন। যাঁহারা কোনদিন কর্ম্মের সেবক হন নাই, একটা মৌখিক ভালবাসাকে জাতীয় জীবনে কর্ম্মের সহায় করিয়াছিলেন তাঁহারা যে সর্ব্বত্র নিরাশ হইবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? আমরা জনসাধারণকে টানিতে চাই কিন্তু যখনই দেখিতে পাই তাহারা ভাষার মারপ্যাচ শিখে নাই, ইতিহাস বা প্রত্নতত্ত্বের উদ্ধার করিতে জানে না অমনি দূরে সরিয়া যাই। তাহারা প্রাণহীন কি না সেটা ভাবি না ভাবিবার ধারও ধারি নাই।

আমরা কি আশা করিতে পারি—আজ যাহারা আমাদিগের কটাক্ষে পতিত, অশিক্ষিত বলিয়া উপেক্ষিত তাহারা কোন দিন আমাদেরই পাশে বসিবে আমাদেরই মত সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত হইবে? সেইদিন আমা-

দের সাহিত্য-সমাজ পুষ্টিলাভ করিবে। যতই অনুসন্ধান চলুক সাহিত্যের প্রকৃত ভাব সেই দিন দেখা দিবে। সমগ্র বঙ্গ, হিন্দুস্থান, পঞ্চনদ, দ্রাবিড় এই বিষয়টা উপেক্ষা করিয়াই চলিয়াছে। বিশাল ভারতের জন্য যত শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে তাহার শতগুণ চাই। যত জন নায়ক দেখা দিয়াছেন তাহাপেক্ষা শতাধিক নায়কের অভ্যুত্থান চাই।

আজ পর্য্যন্তও কেহ ভাবিলেন না সাহিত্য-সম্মিলন শুধু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নয়, জন-সমাজের। জনসাধারণের মধ্যে যাহারা উপযুক্ত তাহারা আজ পর্য্যন্তও ইহার স্বাদ পাইল না। পরিচালকগণ তাহাদিগকে ডাকেন নাই, তাঁহারা বুঝিতে পারেন না, যাঁহারা উপেক্ষিত তাহারা কি করিয়া একাসন লাভের জন্য দাবী করিবে।

বাঙ্গলা দেশে ত চাই-ই—হিন্দুস্থান প্রভৃতি প্রদেশ সমূহের সাহিত্যসমাজে কাহাকেও যেন বাদ দেওয়া না হয়। কে বিদ্বান বুদ্ধি-মান তাহার বিচার আজ নহে। কাহার প্রাণ কতটুকু, ভাবে কাহার চক্ষু হইতে কতটা অশ্রুধারা প্রবাহিত হয় তাহাই দেখিতে হইবে। যাহার সাহিত্য তাহাকে বাদ দিয়া অনুসন্ধান হয় কি? অজ্ঞাত অশ্রুত অনেক থাকিবেই।

* *

৬। দ্বারপণ্ডিতের কর্ত্তব্য

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত আমাদের দেশের রাজদরবারে পণ্ডিতগণ সম্মানিত হইয়া আসিয়াছেন। রাজা-বাদশাহগণ কেবল মাত্র রাজ্য-রক্ষার্থে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতেন না, পরন্তু যথেষ্ট অর্থ বিদ্যাদানের জন্যও ব্যয় করিতেন। তাঁহাদের সভা ও দরবার সর্ব্বদাই পণ্ডিতগণের দ্বারা শোভিত থাকিত। প্রথাটা আজও চলিয়া আসিতেছে। আজও দেশের জমিদারদিগের আশ্রয়ে দ্বারপণ্ডিত প্রতি-পালিত হইতেছেন। সদুদ্দেশ্যে অর্থব্যয় কাজে আসুক বা না আসুক অগত্যা ব্যয়টা সার্থক। প্রথাটা চলিয়া আসিতেছে কিন্তু তাঁহাদের পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছ হইতে আমরা পাইতেছি কি? যিনি অর্থ দান করিতেছেন তিনি হয়ত আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন কিন্তু একবার নিজেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না কি আমি অর্থের বিনিময়ে, উদ্দেশ্য রক্ষার প্রতিপালনে পাইতেছি কি? আর যিনি অর্থ বা দান গ্রহণ করিতেছেন, তিনিও নিজেকে প্রশ্ন করিতে পারেন না কি আমি অর্থের বিনিময়ে দিতেছি কি?

আমরা বলিতে চাই না এই সকল পণ্ডিত-গণকে দূর করিয়া দিয়া দাতা অর্থ সঞ্চয় করুন। আমরা চাই শত শত দ্বারপণ্ডিত আবার এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে পাণ্ডিত্য প্রচার করুন। প্রাচীন রাজা-বাদশাহগণের নাম স্মরণ করিয়া ভূম্যধিকারীদিগের গৃহ জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাবিত করিয়া তুলুন। কিন্তু আজকার দুর্দ্দিনে, আমাদের সাহিত্যিক দৌর্ব্বল্যের দিনে তাঁহারা যে নীরব তাঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধির ফলাফল কোথায়?

কালিদাস-ভবভূতির উত্তরাধিকারী আজ কোন্ নবীন মহাকাব্য রঘুবংশ-রামচরিতের অনুকরণে রচনা করিয়াছেন? আজ আর কোন দিগ্বিজয়ী শঙ্কর অথবা বল্লভাচার্য্য আগমন করিবেন না, আজ আর কোন কালিদাস রাজসভায় আগমন করিয়া কাব্য নৈপুণ্যে চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি উপহার লইতে আসিবেন না, তবে দ্বারপণ্ডিত, সভাপণ্ডিত করিতেছেন কি?

দ্বারপণ্ডিত অথবা সভাপণ্ডিত ভূম্যধি-কারীর গৃহে উজ্জ্বল নক্ষত্র সন্দেহ নাই—

"বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে।" তিনি হয়ত প্রাচীন অথবা নব্যন্যায়ের উপাধিধারী অথবা প্রাচীন স্মার্ত্তের বর্ত্তমান বংশধর। কিন্তু তাঁহার পরিচয় কোথায়?

এত আক্ষেপের পর আমরা বলিতে চাই কি?—আমরা বলিতে চাই পণ্ডিতগণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিবেন তাহা বচনে হউক আর রচনাতেই হউক এক রকমে তার প্রকাশ চাই-ই। যদি বিদ্যা ও বিদ্যার্থীকে উৎসাহ দেওয়াই উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে তাহার সার্থকতা দেখিতে পাই না কেন? বিদ্যাদানের কাছে অর্থদান কিছুই নয়, আমাদের দেশের প্রাচীন পণ্ডিতমণ্ডলী টাকা পয়সার দিকে নজর না দিয়াও আপনাদের দাতব্য দান করিয়া গিয়াছেন। সে অনেক দিনের কথা। আজ সংরক্ষণ-নীতির আংশিক প্রচলন সত্ত্বেও ভূম্যধিকারী আপনার জ্ঞান-কোষে কি অমূল্য জিনিষ সংগ্রহ করিয়াছেন?

আমরা কথার জোর বাড়াইবার জন্য বলিতেছি না, শত শত দ্বারপণ্ডিত আবার এ দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে পাণ্ডিত্য প্রচার করুন। আমরা চাই আজকার দিনে যে সাহিত্য, যে কাব্য রচনার প্রয়োজন তাহাই হউক। তাই বলিয়া সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের কোন প্রয়োজন নাই একথা বলিতেছি না। নূতনের সঙ্গে পুরাতনকে নূতন চক্ষে দেখিতে হইবে তাহার সার্থকতা বাড়াইবার জন্য নব্য জ্ঞানের বিস্তৃতি আবশ্যক।

সুতরাং টাকার মতে টাকা খরচ হইল "কাজের বেলা রম্ভা দেখিব কেন"? যাহাতে টাকা সার্থক হয়, পরিশ্রম সার্থক হয়, দান ও গ্রহণ সার্থক হয় সে দিকে নজর রাখিয়া "সাহিত্য-ক্ষেত্রে সংরক্ষণ-নীতির" প্রচলন চেষ্টা হয় না কেন? আমরা চাই কেহ যেন শক্তি লইয়া কুড়ে না হয়, বুদ্ধি রাখিয়া জড় না হয়, ধন লইয়া কৃপণ না হয়। বুদ্ধির দোষে অযথা এই গুলির প্রয়োগ অথবা স্বেচ্ছাচার না হয়। সকল সময় নিজেকে বিশ্লেষণ করিতে হইবে, ভাবিতে হইবে আমার নিজের নিজত্ব কতটুকু? এই ভাবনার মধ্যেই ত্যাগ ও ভোগ, ইহার মধ্যেই আপনার ও পরের চিন্তা সমভাবে বিরাজমান, ইহারই মধ্যে তমঃ ও রজঃ অবস্থিত। ধনী ব্যক্তির সবলের যে প্রয়োজন, সবলের ও বুদ্ধিমানের এবং বুদ্ধিমানের ও ধনীর সেই প্রয়োজন; সুতরাং অযথা অথবা স্বেচ্ছাচার দ্বারা পরিচালিত হইলেই দেশবাসী বলিবে সমাজকে ঠকাইয়া ধনী ধন ভোগ করিতেছেন, শঠতা ও প্রবঞ্চনার ইহাই নামান্তর মাত্র, বিদ্বান বিদ্যার নামে মাথায় মুকুট পরিয়া অন্যায় ও অশিক্ষায় দেশকে অন্ধ করিয়া দিতেছেন।

* *
*

৭। হিন্দু পরিবারে ছাত্রাবাস

হিন্দু পরিবারের বিশেষত্ব কোথায় তাহা দেখিলে বুঝা যাইবে কত বড় চিন্তাশক্তির উপর ভিত্তি পত্তন করিয়া হিন্দুর শক্তি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। হিন্দু পরিবার একটা বিরাট সংঘের খণ্ড পুঞ্জশক্তি। বর্ত্তমান যুগে যাহাকে 'অরগেনিজেসন' বা গঠিতদল বলে হিন্দুর সমাজ পুরাকাল হইতেই তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিয়াছে। একটী দলে যেমন একজন নেতা থাকেন হিন্দু পরিবারও সেইরূপ এক-জন বিচক্ষণ ব্যক্তির দ্বারা চালিত হয়। সেখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দেখাইবার সুবিধা নাই। পরিবারের কর্ত্তাকেও সময়ে পরামর্শ লইতে হয়। বিভিন্ন পরিবারে যে সকল উৎকৃষ্ট নীতি প্রতিপালিত হয়, সমাজে তাহার

বিকাশের জন্য যথেষ্ট স্থান রহিয়াছে। হিন্দুর পরিবারে সন্তানগণ শৈশব হইতে পিতার শাসন ও মাতার কোমলতায় বর্দ্ধিত হইয়া হৃদয়কে সরস রাখিতে পারে। বাল্যে তাহাদের গণিত বা মানসাঙ্ক শিক্ষার জন্য গণিতের আর্য্যা মুখস্থ করিতে হয় না, তাহারা ব্যবহারিক গণিত যাহা শিক্ষা করে উত্তরকালের জন্য তাহাই মস্তিষ্ককে উর্ব্বর করিয়া দেয়। নীতি শ্লোক তাহার চরিত্র গঠনের শিক্ষক, তোতাপাখীর মত সেই সরল প্রাণে যাহা শিক্ষা করে তাহা ভবিষ্যৎ জীবনে পদে পদে মনে জাগ্রত হইয়া সুপথে চালিত করে।

হিন্দু ছাত্রের জীবন বিদেশ যাপনে ব্যস্ত ইহা হিন্দুসন্তানের পক্ষে নূতন বা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আজ তবুও ডাক বিভাগের ও যাতায়াতের সুবিধা দৃষ্ট হয় কিন্তু তখনকার দিনে কত বন জঙ্গল অতিক্রম করিয়া, নদী পার হইয়া উপযুক্ত গুরুগৃহের উদ্দেশ্যে তাঁহারা গমন করিতেন। পিতা মাতাকে শারীরিক কুশল-সংবাদ দেওয়ারও সুবিধা ছিল না। আপন পরিবারের পিতা মাতাকে ছাড়িয়া জ্ঞানের রাজ্যে নূতন পিতামাতার আশীর্ব্বাদ পাইবার জন্য তাঁহারা ছুটিয়া যাইতেন, সেখানে একটী নূতন সংসারকে আপন করিতেন, পরের অধীনে কি ভাবে জীবন যাপন করিতে হয় তাহাই শিক্ষা করিতেন।

চিরদিন কখনও একভাবে যায় না। ইংরাজ-শাসনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইল। শিক্ষা-ক্ষেত্রের উপযুক্ত বন্দোবস্তও হইল, কিন্তু হইল না কেবল শিক্ষা ক্ষেত্রের উপযুক্ত বিধান আর ঘুচিলনা ছাত্র-জীবনের অর্থ-দৈন্য। যাহা হউক বাসস্থানের বিধান হইল, ভারতীয় ছাত্র-জীবন টোলবাস পরিবর্ত্তন করিয়া মেস্-জীবন লাভ করিল। ইহার ফলে আমরা গার্হস্থ্য জীবনের কোন লভ্যই দেখিতে পাই না তবে কিঞ্চিৎ লাভ হইয়াছে বার দেশের বারটী ছাত্র একস্থানে মিলিতে পারিয়াছে বারজনকে ভালবাসিয়াছে। কিন্তু তাহাও যে নূতন কথা নয়। এই ত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখা যায় নালন্দা, ওদন্তপুরী, ও বিক্রমশীলার মঠে কত হাজার হাজার ছাত্র একত্র বাস করিত। মেসের জীবনের ভালবাসা ততদিন যতদিন তাহারা শিক্ষাক্ষেত্রে।

যে সকল ছাত্র বিদেশে বা মেসে বাস করে প্রথমতঃ আহার সম্বন্ধেই তাহাদের বিশেষ কষ্ট হয়। দরিদ্র ভারতীয় সন্তানের আহার্য্য লইয়াই যত গোল। পরিবারে যথেষ্ট পয়সা খরচ না করিয়াও খাওয়া দাওয়া রুচিকর হয়। বৎসরে দুইবার অবকাশে গৃহগমনের সুবিধা হইলেও আবার পরিবারে যাইয়া শান্তি-লাভ করিতে পারিলেও বৎসরের নয়মাস তাহাদিগকে মাটী খাইয়া থাকিতে হয়। ছাত্রে ছাত্রে পরিচয়টা যত নিকটতর বোধ হয়, তাহাদের পরিবারের সঙ্গে পরিচয়ে ঘনিষ্ঠতা ততবেশী নিকটতর হয়। উহাই চিরদিন স্মৃতিতে থাকিয়া যায়। কিন্তু আজ সেই অভাব বেশী রকম রহিয়া গিয়াছে। ভিন্ন দেশের রীতি নীতি ভিন্ন পরিবারের সন্তান-চরিত্র গঠন প্রণালীর অভিজ্ঞতা লাভের সুবিধা নাই।

তাই আমরা বলিতে চাই বিভিন্ন গ্রন্থাদির আলোচনা দ্বারা যেমন জ্ঞান পুষ্ট হয়, বিভিন্ন প্রকার রুচিকর ও তৃপ্তিদায়ক খাদ্যের সমবায়ে তাহাদের দেহেরও পুষ্টিলাভ আবশ্যক। নানারূপ অভিজ্ঞতা লাভেরও একান্ত প্রয়োজন। প্রাচীন কালের ছাত্র-প্রতিপালন ব্যাপারটী কালধর্ম্মে একপ্রকার অভাবনীয় বিষয়ে পরিণত হইতে চলিয়াছে। বর্ত্তমানে

উহা যেন টোলের অধ্যাপকদিগের ধর্ম্মের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। বাঙ্গলা দেশের কোন কোন স্থানে বিদেশী দরিদ্র ছাত্রগণ স্থানীয় সম্পন্ন ব্যক্তিগণের নিকট আহার পাইয়া থাকেন। এইরূপ অন্নদান ব্যবস্থা সকল স্থানেই হওয়া কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ এই প্রস্তাব করিব যাঁহারা নিজ অর্থব্যয়ে বিদেশে অবস্থান করেন তাঁহাদের অবস্থিতির ব্যবস্থা কোন পরিবারে হইলে, সে পরিবার আর্থিক ক্ষতি-গ্রস্ত হইবেন না। ইহাতে ছাত্রও নিজের সম্বন্ধে কতকটা সুবিধা পাইবেন, গৃহস্থও আপনার আপদ বিপদে একজন সহায় পাই-বেন। এরূপ ব্যবস্থা পাশ্চাত্য জগতেও আছে। বিভিন্ন দেশীয় ছাত্রগণ পরিবারে থাকিয়া বিদ্যা শিক্ষা করেন, বিভিন্ন দেশের সহিত তাহা-দের পরিচয় হয়, সভ্যতা পদ্ধতি জানা যায়। তবে একটা কথা এই তাঁহারা যে ঘর ভাড়া নিয়া থাকেন সেটা ব্যবসার খাতিরে। আমাদের দেশে সেটা যেন ঠিক অন্যতম বিলাতি নকল হইয়া দাঁড়াইবে এবং ভারতীয় পরিবারগুলি এক একটা টাকার বাজারে পরিণত হইবে। মোটের উপর সে ভাব হজম হইবে না। এখন দরিদ্র ছাত্রদের ব্যবস্থা কি হইবে ? উহাই একমাত্র ভাবিবার বিষয়। 'গরীবের কপাল চিরদিনই পোড়া' একথা সকলেই জানে। সুতরাং তাহারা যদি বিদ্যা শিক্ষা করিতে না পাইল তাহা হইলে ধনীর অর্থের সদ্ব্যবহার কোথায় ? এদেশের গৌরব কোথায় ?

অবশ্য কোন কোন ব্যক্তি দরিদ্র ছাত্রের অন্নদানের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই পদ্ধতিটা দেশময় প্রচারিত হইলে এক নূতন ভাবের আবির্ভাব হইবে। আয়ের দিক দিয়া ভারতীয় কোন মধ্যবিত্ত পরিবারই সচ্ছল নহেন। প্রত্যেক পরিবারে আপনাদের প্রয়োজনীয় খরচ বাদে যেটা বাজে বা বিলাসিতার জন্য ব্যয়িত হয় সেটা সমাজের প্রাপ্য। টোল, মকতব, চতুষ্পাঠীর প্রাপ্য উঠিয়া গিয়াছে সুতরাং সমাজের দাবী আর নাই। যে দেশ দীন, অনাহারে যাহার তণুক্ষীণ, হৃদ্‌পিণ্ড যাহার অনবরত স্পন্দিত, সঞ্চয়ের পরিবর্ত্তে ব্যয়ই তাহার অর্থনীতি পাঠের ফল। সেই দেশে বিলাসিতা উপহাসের বস্তু, বাজে ব্যয় তাহার অনুপযুক্ত জীবনের পরিচয় দেয়—কর্ম্মক্ষেত্রে সদ্ব্যয়ের কালে। "ঘরে যার খেতে নাই তার শুতে রাঙ্গা পাটী"র কি প্রয়োজন। যদি কখনও সৃষ্টিকর্ত্রীর চক্রে আমাদের অবস্থা পরিবর্ত্তনের পালা আসে, আমাদের শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠালাভ করিবার পথে দাঁড়ায় তাহা হইলে তখন ভোগটা শোভনীয় হইবে। ক্ষমতাবান ভোগ করিবে ইহা সৃষ্টিকর্ত্রীরই অভিপ্রেত। ভোগ্য বস্তু ক্ষমতাবানের ভোগের জন্যই অপেক্ষা করে। অতএব আপাততঃ ওরূপ ভোগ বিলাসিতার নামান্তর। উহার দিকে দৃষ্টি দিলে হিন্দুসমাজ বিনাশের গর্ত্তে পতিত হইবে। এখন বাজে খরচের সময় তাহার নাই। বাজে খরচ বন্ধ করিয়া সেই অর্থে যাহাতে কোন রকম সদনু-ষ্ঠান হয়, তাহারই ব্যবস্থা করা প্রত্যেক পরিবারের এখন কর্ত্তব্য। তাই বলিতেছি, হিন্দু পরিবার দরিদ্র ছাত্রের অবস্থানের সুবিধা করিয়া দিয়া একটা সদনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন করুন। তাঁহাদের এই সচ্চেষ্টার অভাবে দরিদ্রের শুষ্ক প্রাণের, অকৃত্রিম ভালবাসা প্রভৃতি গুণ যেন চাপা পড়িয়া না যায়, তাহার প্রাণটা যেন অন্নদাতার উপকারে ভরপুর থাকিয়া সমাজে আদর্শের সৃষ্টি করে।

অন্নদাতাকেও মনে রাখিতে হইবে আমার

পরিবারের লোক, অন্নগ্রহীতাকেও মনে রাখিতে হইবে, আমার নিজের পরিবার। তাহা হইলেই আর কোন গোল থাকিবে না।

সহরে বাবুগিরি ছুটিয়া গিয়া অনেকগুলি সদ্ভাবের বিকাশ হইবে। অনেক স্থানে ছাত্রগণ নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি হাতে করিতে লজ্জা বোধ করে। সে সব দূরে গিয়া নিজের অবস্থার সমতা সাধিত হইবে। ভবিষ্যতে ছাত্রসম্প্রদায় খাওয়া দাওয়া চলাফেরা প্রভৃতির মধ্য দিয়া নানা প্রকারে অসুবিধা বোধ করিবে। তাহাদের শারীরিক দুর্ব্বলতা যদি মানসিক সুবিধা লাভের প্রতিকূল হয় তাহা হইলে এ জাতি শীঘ্র মাথা তুলিতে পারিবে না। নানা প্রকার ব্যাধি লুক্কায়িত থাকিয়া ছাত্র-জীবনে ধ্বংসের কারণ হইয়া তাহাদের পিতা মাতার দুর্দ্দশা বাড়াইতেছে। অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থাপন্ন ছাত্রদিগের জন্য ছাত্রাবাস সুবিধাজনক হইতে পারে কিন্তু যাহারা খাটিয়া খাইবে মাথার ঘাম পায়ে পড়িয়া যাহাদের পরিশ্রমের নিদর্শন দিবে মোট কথা যাহারা আপনার চিন্তা করিতে করিতে পরের জন্যও এক আধটুকু করিতে ইচ্ছা রাখে তাহাদের ভবিষ্যৎ প্রত্যেক হিন্দু পরিবারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলেই মঙ্গল সাধিত হইবে।

আমরা যে বিষয়ের প্রস্তাব করিতেছি ইহা একদিন প্রকৃত ভাবে কার্য্যে পরিণত হইবেই। অন্নদান দ্বারা শিক্ষার উৎসাহদান কিছু কাল এক রকম বন্ধ আছে কিন্তু একবার আরম্ভ হইলে দেশে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়িবে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন পরিবার আমাদের আপনার হইতে আপনার হইয়া পড়িবে। আপনার পরিবার হিন্দু সন্তানের পক্ষে যথেষ্ট নয়। আপনার মা বাপ ভাই বোনের স্নেহ ভালবাসা প্রত্যেকেরই প্রাপ্য। কিন্তু হিন্দুর স্নেহ ভালবাসা অত ক্ষুদ্র-ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকিয়া গেলে হৃদয়টা প্রকৃত প্রশস্ততা লাভ করিবে কি ?

* *

৮। উড়িষ্যার সাহিত্য সাধনার পন্থা

ভারতবর্ষের প্রদেশ সমূহের মধ্যে উড়িষ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র। ভাষা, সাহিত্য, জ্ঞান, ধন যাহার একটা কিছুর অভাবে দারিদ্র্যের সূচনা করে, উড়িষ্যা সেগুলিদ্বারা জর্জ্জরিত। উড়িষ্যা এতদিন বাঙ্গালার সঙ্গে ছিল তাই তাহার সত্বা উপলব্ধির কোন প্রয়োজন হয় নাই। উড়িষ্যা ভাবিতেও পারে নাই, তাহার অস্তিত্ব প্রদর্শনের সুযোগ কোন দিন উপস্থিত হইবে। ভগবানের সৃষ্ট পদার্থের কোন কিছুই যে তাঁহার কাছে হেয় নয় ইহাই বুঝা যাইতেছে। উড়িষ্যা নিজের কোন খোঁজ না রাখুক, নিজের জাতভাইয়ের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার অবসর না থাকুক কিন্তু যাঁহাকে সৃষ্ট পদার্থমাত্রেরই খোঁজ রাখিতে হয় তিনি কখনও দূরে থাকিতে পারেন কি ? তাই সুপ্ত উড়িষ্যার আজ জাগরণের সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহার লুপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ভগবানের নিকট হইতে তাহার উত্থানের আদেশ আসিয়াছে।

আমরা ইতঃপূর্ব্বেই বলিয়াছি, উড়িষ্যার অতীত হীন নহে, উড়িষ্যার অতীত বিস্মৃতির গর্ভে নিমগ্ন। ভারতের তৃণ অবধি অতীতের স্মৃতি লইয়া জীবিত, উড়িষ্যা ত দূরের কথা। নিজের যাহা কিছু কুৎসিত হউক না কেন তাহা অন্যের রুচিকর না হইতে পারে তাহাতে ক্ষতি কি ? কুৎসিতকে সুশ্রী করিতে

হইলে, অন্যের চেয়ে হীন, দীন এই কথা যদি মনে থাকে, তাহা হইলে হীনতার পঙ্কে না ডুবিয়া, উঠিতে হইবে। নব্য উড়িষ্যার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে অতীত উড়িষ্যার আশ্রয় লইতে হইবেই। এইবার উড়িষ্যার ইতিহাসের নূতন অধ্যায় প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত সাহিত্য-সমিতি গঠনের প্রয়োজন। নতুবা জাতীয় জীবনে কৃতিত্বলাভ অসম্ভব। জাতীয় উন্নতির নিমিত্ত কিরূপ সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়োজন তাহা উড়িষ্যার কর্ম্মী পুরুষদিগকে বলা বাহুল্য। কর্ম্মক্ষেত্রেই তাহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইবে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিতে হইবে বাঙ্গলাদেশ নানাদিকে উন্নত হইতে পারে কিন্তু তাহার মজ্জায় মজ্জায় যে গোয়েন্দাকাহিনী ও কুরুচিপূর্ণ উপন্যাসের মোহ জড়িত রহিয়াছে তাহা যেন উড়িষ্যার অনুকরণীয় না হয়! গোয়েন্দা-কাহিনী পাঠ করিয়া জগদ্বিখ্যাত গোয়েন্দাগণ প্রাধান্য লাভ করেন নাই; কুরুচিপূর্ণ উপন্যাস পাঠ করিয়া বঙ্গীয় যুবক-সমাজের গতি কি আকার ধারণ করিতেছিল তাহা আজ বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য প্রচারের যুগে ঠিক ধারণায় না ও আসিতে পারে। নব্য উড়িষ্যার ভবিষ্যৎ সংসার গঠনের জন্য আদর্শ চরিত্র, প্রয়োজনীয় বিষয় এবং সংক্ষিপ্ত উপায়ের অবতারণা করার প্রয়োজন। উপন্যাসদ্বারা সাহিত্য উন্নত হয় কিন্তু সুরুচির পরিবর্ত্তে বাঙ্গলাদেশের বটতলার অনুকরণ না করাই শ্রেয়ঃ। উড়িষ্যার চতুষ্পার্শবর্ত্তী স্থান সমূহ হইতে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা শীঘ্রই দেখিতে চাই উড়িষ্যার সাহিত্যে কাঠিন্য ধর্ম্মের আহ্বান করা হইয়াছে। নব্য উড়িষ্যার শিক্ষার্থিগণ সাহিত্যে আর পেছনে না থাকিয়া যাহাতে উৎকলসাহিত্য প্রচারিত হয় তাহার দিকে নজর দিন। উড়িষ্যাকে নানাভাবে গড়িবার এই প্রকৃষ্ট সময়।

উড়িষ্যায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক, অনধ্যায়ী বংশের, দরিদ্রের সন্তানগণকে ডাকিয়া ঐ সকল বিদ্যালয়ে ছাত্র-সম্মিলনী, বিচার-সভা, নৈতিক শিক্ষাদান সমিতি গঠিত হউক। এইগুলিই বিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজকে সঞ্জীবিত ও কর্ম্মপ্রবণ করে। ছাত্রদিগের চরিত্রে যাহাতে ধর্ম্মভাব পরিস্ফুট হইয়া হিন্দুত্বের মনুষ্যত্বের বিকাশ করে তাহাই আমাদের লক্ষ্য হইবে। যে কোন শিক্ষাপ্রণালী ধর্ম্মের দ্বারা চালিত না হইলে প্রতিপদেই নিরাশা, অশ্রদ্ধা, অঙ্কুরে ফলাকাঙ্ক্ষা জন্মিয়া নিজের জীবনটাকে অকর্ম্মণ্য করিয়া দিবে এবং সমগ্র উড়িয়া সমাজ তাহার কর্ম্মের দ্বারা প্রতিহত হইয়া ধ্বংসের অবস্থায় উপস্থিত হইতে দেরী করিবে না।

যাহা হউক আমরা চাই উড়িষ্যার সর্ব্বত্র সাহিত্যসাধনা আরম্ভ হউক। আপাততঃ সাহিত্য-সম্মিলনের সৃষ্টি করিয়া অর্থব্যয় করা অপেক্ষা শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত জনসমাজের সম্মিলনে সাহিত্য-সেবাই অধিক প্রয়োজনীয়। প্রতি তীর্থে ও দেবমন্দিরে, সরোবরের কূলে কূলে, গ্রাম ও নগরবাসিগণের প্রতি মহল্লায় এবং সমুদ্রের উপকূলে সর্ব্বত্র এই সাহিত্য-সাধনার কথা প্রচারিত হউক, প্রত্যেকের সাধনা হউক—ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম, বঙ্গীয় সাহিত্যের অংশী, আমাদের মাতৃ-ভাষাকে দাঁড় করাইতেই হইবে।

উড়িষ্যার এই সাহিত্য প্রচারে যে প্রতিবন্ধক না আছে এমন নহে। উড়িষ্যার অধিবাসিগণের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। তাহারা অধিকাংশ স্থলেই জমিদারদিগের

দ্বারা পীড়িত। বাঙ্গলা দেশের ন্যায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বারা উড়িষ্যার আসর খুব বেশী জমে নাই সুতরাং দরিদ্র সাহিত্যসেবিগণের দ্বারা প্রচার কার্য্য চলিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু যেখানে অর্থের প্রয়োজন সেইখানেই বাধা পড়িবে। সুতরাং আমরা বলিতে চাই উড়িষ্যার জমিদার ও রাজাগণ উড়িষ্যার মূর্খতা দোষ দূর করিয়া প্রাচীন রাজগণের গৌরবের ভূমিকা আশ্রয় করুন। ভারতীয় শিল্পের ধ্বংসের যুগে উড়িষ্যার লুপ্ত শিল্প তাঁহাদের উৎসাহে ও সহায়তায় পুনরুজ্জীবিত হউক। অল্পাক্ষর ভারতের একটি প্রদেশ পূর্ণ অজ্ঞ থাকিলে তাঁহাদেরই কলঙ্কের সূচনা করিবে। সাহিত্য সমাজে উড়িষ্যার স্থান হইবে না। ধনীর ধন ও দরিদ্রের সাধনা একত্রিত হইয়া নব্য ভারতের সাহিত্যক্ষেত্রে নবীন উড়িষ্যা বরণীয় ও মহনীয় হউক।

৯। ব্রাহ্মণ-সমাজের কর্ত্তব্য

চারিদিকের লোকই ব্রাহ্মণ-সমাজকে আহ্বান করিতেছে। ব্রাহ্মণ-সমাজ যে অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছেন তাহা নিশ্চয়, নতুবা এত ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির প্রয়োজন ছিল না, ব্রাহ্মণ-সমাজ আজ সভা সমিতির আয়োজন করিতেন না।

তর্জ্জনী হেলিত কাহার ? ব্রাহ্মণের। যিনি জ্ঞানে প্রবীন, শোকে ধীর, অত্যাচারে খড়্গ-হস্ত, দুঃখে সান্ত্বনাদানকারী, কর্ম্মক্ষেত্রে অটল অচল, যুবকের ন্যায় কর্ম্মকুশল, প্রৌঢ়ের ন্যায় স্থিরপ্রতিজ্ঞ, বৃদ্ধের ন্যায় স্থিরমস্তিষ্ক তিনিই ত ব্রাহ্মণ! ঐগুলি যাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা সংখ্যায় হীন ছিলেন না। তাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের রক্তস্রোত যেখানে বা যাঁহাদের মধ্যে প্রবাহিত তাঁহারাও লাভ করিতে পারেন। যাহা ছিল, যাহার সন্ধান পাওয়া যায় তাহাকে আয়ত্ত করিতে বেশী পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না।

মাসিক 'ব্রাহ্মণসমাজে' ব্রাহ্মণ জাতির অভ্যুত্থানের সাড়া বেশ পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু আমরা জানিতে চাই ব্রাহ্মণ সমাজ আপনাদের অভ্যুত্থানের জন্য কোন্ কোন্ উপায় গ্রহণ করিলেন। আমূল পরিবর্ত্তিত ব্রাহ্মণ-সমাজের দ্রুত উন্নতির জন্য তাঁহারা কোন্ পথ ধরিতেছেন? একজন ব্রাহ্মণকে দাঁড়াইতে দেখিলেই বুঝিব ব্রাহ্মণের শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে। প্রকৃত ব্রাহ্মণ সমাজ গতি চালিত করিতে দাঁড়াইয়াছেন।

যে শক্তির বলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ, যে শক্তিতে তিনি অমিততেজা, যে ক্ষমতায় তিনি ধরণীর রাজাধিরাজগণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন সেই শক্তি আর কত দূরে! সেই শক্তি লাভ ত দূরের কথা সেই পথের পথিক হইতেই যে কঠোর তপস্যার প্রয়োজন—তাহার দিকেই বা কয়জন অগ্রসর?

ব্রাহ্মণ-সমাজ তাঁহার দরিদ্র নিরক্ষর ব্রাহ্মণ সন্তানের শিক্ষার জন্য কোন্ কোন্ বিধি গ্রহণ করিলেন? অশিক্ষিত বা অবজ্ঞাত হইতে থাকিলে তাহারা একটা নূতন সম্প্রদায় হইয়া পড়িবে।

ব্রাহ্মণ সমাজ সমাজবিধির পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে তাঁহাদের দরিদ্র ছাত্রের শিক্ষার বন্দোবস্ত করুন। মেল, পঠির উচ্ছেদ—এত সামান্য কথা। যে সম্প্রদায় এইগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন তাঁহাদের ভাবের ঢেউ আর বেশীদূর গড়াইবে না কি? আমাদের মনে হয় যাহারা আজও সমাজের ভাবনার মধ্যে আসে নাই তাহাদের উত্থান

ব্যতীত এ সকল চিন্তাপ্রণালী কার্য্যে পরিণত হইবে না। সম্প্রতি এই চিন্তাগুলি যাঁহাদের দ্বারা প্রসূত তাঁহারা শুধু নাড়াচাড়া করিবার অধিকার ব্যতীত আর নূতনত্ব কিছুই দেখাইতে পারিতেছেন না, কারণ আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে শক্তিতে আমরা শক্তিমান সে শক্তিতে আর কুলায় না। এটা অক্ষমতার কথা বটে কিন্তু আজকার মত দিনে লজ্জার কথা নয়। আজ চেষ্টার যুগ। প্রকৃত কর্ম্মের টান পড়িয়াছে কিন্তু কর্ম্মীর অভ্যুত্থানের সময় এখনও যেন হয় নাই। এ তরঙ্গ যেখানে যাইয়া বিস্তৃত হইয়া পড়িবে সে স্থানে আজও ঢেউ পৌঁছে নাই।

সমাজের বিভিন্ন অংশ যতই কেন উন্নতিমুখী হউক না কেন ব্রাহ্মণ-সমাজের উন্নতির উপরই যে তাহাদের কর্ম্মপ্রণালী কতকটা নির্ভর করিতেছে, তাহা বলা বাহুল্য।

ব্রাহ্মণ সমাজের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপথ অতি জটিল। সমস্ত সমাজটাকে নিঃস্বার্থ বুদ্ধির দ্বারা চালনা করিতে হইবে। একদিন ছিল যেদিন দেশবাসী জ্ঞানপিপাসু হইয়া ব্রাহ্মণের কাছে ছুটিয়া আসিত, জ্ঞানলাভ করিয়া ধর্ম্মপথের জন্য প্রস্তুত হইত আজ আর সেই দিন নাই। আজ বিভিন্ন ধর্ম্মের মতবাদ তাহাদিগকে তরলীকৃত করিয়া দিতেছে। আজ ব্রাহ্মণের বলিলে চলিবে না, যাহারা প্রকৃত ধর্ম্মগ্রাহী তাহারা ছুটিয়া আসিবেই। খৃষ্টিয়ান মিশনারীর মত ব্রাহ্মণ কোনদিন ধর্ম্মপ্রচার করেন নাই, আজও ধর্ম্মপ্রচার তাঁহার কাজ নয়। ধর্ম্মদান উদ্দেশ্য।

আজ দেশবাসী ধর্ম্ম চায় কিন্তু দেয় কে? কালের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সুতরাং ব্রাহ্মণকেও তাঁহার পথ ঘুরাইতে হইবে। যে, ধর্ম্ম চাহিবে না তাহাকে বুঝাইতে হইবে, লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মদান করিতে হইবে। বৈতালিকের ন্যায় রজনী শেষে তাঁহাকে ধর্ম্মকথা শ্রবণ করাইতে হইবে। তবে ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবেন তখনই যদি লোক আবার ঘর ছাড়িয়া ব্রাহ্মণের কুটীরে আসে। চিরদিন একভাবে যায় না, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ব্রাহ্মণগণ কি ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, কি ভাবে ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী লোকের মধ্যে বাস করিয়াছিলেন তাহারও একটা ইতিহাস দেখা দরকার।

দেশবাসীর ধর্ম্মপ্রবৃত্তি জাগাইতে, ধর্ম্মের জন্য আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করিতে, ধর্ম্ম রক্ষার জন্য এমন কি সর্ব্বস্ব দান করিতে যেন দেশবাসী কুণ্ঠিত না হয়; ব্রাহ্মণকে তাহাই শিক্ষা দিতে হইবে। এই দেশে যাহার জন্ম এই দেশের কীর্ত্তি, এই দেশের প্রতিভা যাহার গৌরবের বস্তু এই দেশের জলবায়ুতে যাহার পুষ্টি এই দেশের ফল জল যাহার জীবন মরণের সহায় সেই দেশের ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হইয়া দেশবাসীকে ধর্ম্মপথে আহ্বান চিরদিন করিয়াছেন, আজও করিবেন। ধর্ম্মদানে কালাকাল নাই দাতা তাঁহার ক্ষেত্র বুঝিয়া চলিবেন।

* *
*

১০। আমাদের অবস্থা

আমাদের দেশের লোক অনাহারে মরে কেন, রোগে ভুগে কেন, জল বিনা হাহাকার করে কেন তাহার কথা কেহ কখনও ভাবিয়াছেন মনে হয় না। জানিনা, তাহারা পিতাপিতামহের অতিথি সেবা, বর্ত্মের ধারে ধারে জলসত্র প্রতিষ্ঠা এবং রোগে শোকে

উপহাস বা অনাদর করিয়াই আজ ব্যথিত, অভুক্ত হইয়া দিন কাটাইতেছে কি ?

আজও যাহার ঘরে অতিথির অশ্রদ্ধা হয় না, কোন দিনই যাহারা আর্ত্তকে শরণ দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই আপনার জীবনকে মুঠোর মধ্যে রাখিয়া, নিজের আহার্য্য অপরকে দান করিয়াছে অতিথি যাহার কাছে দেবতা, আজও যাহারা স্থানে স্থানে জলসত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া বংশগত দেশ প্রচলিত রীতির অনুষ্ঠান করিতেছে, বিলাতী ঔষধের প্রচলন হইলেও গৃহকর্ত্রীগণ জড়ি বড়ি লইয়া হাজির থাকেন তাহাদের দেশের লোক আজ এ অবস্থায় কেন ?

সময়ের পরিবর্ত্তন বড় ভয়ানক। ভারতীয় শিল্পরাজির ধ্বংস, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্রমহ্রাসের ফলেই যে আজ দেশ নগ্ন এবং উন্মাদগ্রস্ত তাহা যে কোন লোকেই বুঝিয়া লইতে পারেন। কিন্তু দুঃখের ভীষণ-মূর্ত্তি যখন সম্মুখে দাঁড়ায়, অনাহারে যখন হস্তপদ দুর্ব্বল হইয়া হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দন প্রায় স্থগিত করিতে থাকে তখন কাহার না মনে হয় এ অদৃষ্টের দোষ নহে ?

বাগ্‌দেবীর অভিপ্সীত আশীর্ব্বাদের ফলে তাঁহার সেবকগণ যে ভাবে দিন কাটাইয়া যান এই হতভাগ্য দেশবাসিগণ তাঁহাদের পথের পথিক হইবার মতও শক্তিলাভ করিতে পারে নাই, হয়ত তাহা অঙ্কুরিত হইতেই পারিল না, আবার যাহাদের শক্তির স্ফুরণ হইতেছিল তাহারাও বিকাশ পাইল না। তাই আজ আর ভাটিয়ালগান নূতন কণ্ঠ হইতে বাহির হয় না, গ্রাম্য মাঝি নদী-বক্ষে নৌকারোহণে আপনার চিত্তকে শান্ত করিবার মত নূতন উপাদান কিছুই পায় না। সায়ংকালের পল্লীবৈঠকে নূতন ধরণের বাউল সঙ্গীত রচিত হইয়া গায়কের কৃতিত্ব এবং শ্রোতাদের কর্ম্মক্লান্ত মনকে বিমোহিত করে না। আজও যাহা হইতেছে, যাহা হইল, তাহা আর বেশী দিন টিকিবে না। আমাদের প্রতিবেশী গায়ক, বাদক, কবি বিভিন্ন গৃহকর্ম্মে পটু গৃহস্থগণ আর বেশী দিন সাহিত্য জগতে দাঁড়াইতে পারিবে না। হাহাকার ও অশ্রুবিসর্জ্জনই শেষ পরিণতি হইবে।

চীনা কবিদের প্রকৃতি-নিষ্ঠা *

এই পর্য্যন্ত প্রায় হাজার লাইন চীনা কবিতা দেখা গেল। নানা রসেরই আস্বাদন করা গিয়াছে। সকল রসেই প্রকৃতি কিছু না কিছু ভিজান পাইলাম। চীনা কাব্য চাখা সুরু করিতে না করিতেই প্রকৃতির গন্ধ পাওয়া যায়। চীনারা প্রকৃতি-নিষ্ঠ জাতি।

ঝালে ঝোলে অম্বলে-নুণ সর্ব্বত্রই বিরাজ করেন। চীনারা সেইরূপ শয়নে স্বপনে নিশিজাগরণে প্রকৃতির চর্চ্চা করিয়া থাকে। প্রকৃতির অংশ বাদ দিলে বোধ হয় চীনা কবিতার বার আনা বাদ পড়িবে। শোক সাহিত্যে প্রকৃতি পাইয়াছি—হর্ষ সাহিত্যেও প্রকৃতি পাইয়াছি। খেয়ালে খোসগল্পে প্রকৃতি পাইয়াছি—বনবাসে নির্ব্বাসনে প্রকৃতি পাইয়াছি—যুদ্ধ যাত্রায় প্রকৃতি পাইয়াছি—বিরহে প্রকৃতি পাইয়াছি—মিলনে প্রকৃতি পাইয়াছি। চীনের সকাল দেখিয়াছি—মধ্যাহ্ন দেখিয়াছি, সন্ধ্যা দেখিয়াছি, নিশীথ দেখিয়াছি। চীনের শরৎ দেখিয়াছি, বসন্ত দেখিয়াছি, গ্রীষ্ম দেখিয়াছি, শীত দেখিয়াছি, আর বৃষ্টিপাতও দেখিয়াছি। চীনের নদীর ধার চোখে পড়িয়াছে, স্যাঁত স্যাঁতে জঙ্গলা বনভূমি চোখে পড়িয়াছে, বিকট মরু প্রান্তর চোখে পড়িয়াছে, বাগবাগিচা চোখে পড়িয়াছে। চীনা আকাশের গ্রহ নক্ষত্র রবি শশী চোখে পড়িয়াছে—চীনা ধরাতলের মাছি মশাও চোখে পড়িয়াছে।

চীনা কাব্যে ফাল্গুনের ঘ্রাণে পাগল করা আমের বন পাই নাই। পাইয়াছি পীচ পেয়ারের ফুলের খোসবুই। ক্রৌঞ্চ-মিথুন, অথবা চক্রবাকযুগল অথবা চকোর চকোরী চোখে পড়ে নাই। পড়িয়াছে ম্যাণ্ডারিণ হংস ও ম্যাণ্ডারিণ হংসী। তমালপাশে কনকলতা চীনে দেখা গেল না। দেখা গেল শাখায় শাখায় জড়াজড়িওয়ালা এক বিচিত্র তরুবর। বাঙ্গালার প্রকৃতিতে আর চীনের প্রকৃতিতে বোধ হয় এইটুকুই প্রভেদ। খুঁজিলে অবশ্য আরও অনেকই পাওয়া যাইবে। কেন না চীনের আয়তন সুবৃহৎ। কাজেই চীনা কাব্যে অনেক নূতন তরুলতা জীবজন্তুর প্রভাব পড়া স্বাভাবিক। কিন্তু অন্যান্য যাহা কিছু সবই আমাদের যেন ঘরের কথা।

চীনা কবি জোনাকির মিটি মিটি আলো দেখাইয়াছেন—মাছরাঙার উড়া দেখাইয়াছেন—আকাশের গায়ে হাঁসের ঝাঁক দেখাইয়াছেন। চীনা গ্রীষ্মের সারস ও "গাল," চীনা শরতের পদ্ম ও কুমুদ, চীনা আকাশের ছায়াপথ, চীনা সূর্য্যাস্তের গোলাপী আভা, চীনা জলাশয়ে গিরিশৃঙ্গের প্রতিবিম্ব, চীনা চাঁদের রজতকিরণ, চীনা বর্ষার ঝম ঝম, চীনা নিশীথের পেঁচার ডাক, চীনা মরুর ভীষণ পবন, চীনা মেঘের কালো বরণ, চীনা জলাশয়ে নলের বন, চীনা সাঁঝের খগ কাকলী, চীনা দরিয়ায় নৌকার সারি, চীনা শস্তের মধুর হাঁসি—সবই দু একবার পাইয়াছি। আর এই সবই বাঙ্গালীর সুপরিচিত। পাহাড়ের সবুজ রং, নীল রং, ভীষণ দৃশ্য

* "হিমাচলের অপর পার" গ্রন্থের এক অধ্যায়।

কমণীয় দৃশ্য, জলাশয়ের ভীমামূর্ত্তি, মধুর রূপ, আর চাঁদের বাহার—এ গুলিও আমাদের নূতন নয়।

চীনা হৃদয়ে প্রকৃতির কোন্ কোন্ বস্তু সব চেয়ে বেশী আদরের? প্রশ্নটার জবাব দেওয়া কঠিন। কিন্তু চিত্রশিল্পের বহু নমুনা দেখিয়া আর কাব্যের প্রমাণ লইয়া মনে হয় যে, বাঁশের সারি অথবা ঝোপ, চীনাদের অতি প্রিয়। পাহাড়ের শোভা নানা ভাবে ইহারা উপলব্ধি করিয়াছে। দরিয়ার দৃশ্য যেন চীনা পারিবারিক চিত্রের একটা আট পৌরে জিনিস। হংস-মিথুন চীনা দাম্পত্য জীবনের পরম পবিত্র বস্তু বলাই বাহুল্য। এমন কি বিবাহের সময়েও বরপক্ষ এবং কন্যাপক্ষ এক জোড়া হংস হংসী অদল বদল করিয়া থাকে। মেপ্‌লতরুর লালপাতার কথা বোধ হয় ইহারা বেশী পাড়ে না—কিন্তু পীচের গন্ধ শুঁকিতে ইহারা যারপর নাই লালায়িত। আর মাছধরা এবং শিকার করার সখ চীনা জীবনের একটা মস্ত খেয়াল।

"আম জাম নারিকেল খেজুর কাঁঠাল, চাঁপা শেফালিকা বক তমালের ঝাড় সারি সারি আছে বন করিয়া আঁধার।" ইত্যাদির ক্যাটালগ করিয়া গেলেই প্রকৃতিনিষ্ঠা প্রমাণিত হয় না। অবশ্য এই ক্যাটালগেরও মূল্য আছে। কাব্যের কোন কোন স্থানে এইরূপ এক ক্যাটালগের মূল্য লাখ টাকা। কিন্তু চীনা কবিরা জীবজন্তু ও তরুলতার নাম বা তালিকা করিয়াই সন্তুষ্ট নন। ইঁহারা এই গুলির রূপরস গন্ধ স্পর্শ শব্দ নানা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে "চাখিয়া" দেখিয়াছেন। ইহাঁদের দেখিবার ক্ষমতা আছে—এক একটা বস্তুকে আপনার করিয়া লইবার ক্ষমতা আছে—নিজের জীবন মাখাইয়া প্রাকৃতিক পদার্থগুলিকে জীবন্ত করিয়া রাখিবার ক্ষমতা আছে। চীনা কাব্যের ভিতর আসিয়া নদ নদী পর্ব্বত সাগর তরুলতা পশু পক্ষী আমাদের মানব সংসারেরই অধিবাসী হইয়া রহিয়াছে। এক একটা মানুষ জগতে তাহার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব লইয়া দণ্ডায়মান। একবার যাহাকে দেখিব তাহাকে ভুলিতে পারিব না। প্রত্যেক নরনারীরই একটা বিশেষত্ব নিজস্ব কিছু না কিছু আছে। আমরা চীনা কাব্যের প্রাকৃতিক বস্তুগুলিকেও ঠিক সেইরূপ ব্যক্তিত্বময় স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ নিজস্বভরা ভাবে পাইতেছি। এক জলাশয়ে আমার আত্মা যাহা পাইল অন্য জলাশয়ে তাহা পাইল না। এক সন্ধ্যায় আমার হৃদয়ে যে তরঙ্গ উঠিল অন্য সন্ধ্যায় সে তরঙ্গ উঠিল না। চীনা কবিগণ ভিন্ন ভিন্ন হৃদয়-ভাবে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু মাখাইয়া রাখিয়াছেন। আমরা প্রত্যেকটাকে স্বতন্ত্র দেখিতেছি। কোন সময়ে চাঁদ আমার এক গেলাসের ইয়ার—কোন সময়ে চাঁদ দেখিবা মাত্র দেশের কথা মনে পড়ে। নিশীথে কোথাও বা, খানা পীনা ভোজ, কোথাও "দুখিনীর আঁখিতে বরষা দ্রবে।" ফড়িং দেখিয়া একবার মনে হইল "আহা কি মজার জীবন।" আর একবার মনে হইল "ক দিনের প্রাণ?" একটা ফুল রাখিয়া দিলাম অসংখ্যবার "ছাড়াছাড়ির" বেদনা মনে করিবার জন্য। ফুলটা অমর হইয়া রহিল। আর একটা ফুল ইয়াংসিকিয়াঙে ভাসিয়া কতদূর যাইতেছে কে জানে? অমনি ভাবিলাম "দুনিয়ার চরম সত্য কখনও বুঝা যাইবে কি?" কাকের পাখা চোখে পড়ে সুন্দরীর চুল তার চেয়েও কালো সপ্রমাণ করিবার জন্য। আর পাখীর সন্ধ্যাকালে বাসায় ফেরা দেখে মনে হয় "হায় আমি একাকিনী!"

পদ্মবীজের লাল কেন্দ্র দেখিতেছি কেন? ওটা আমার প্রেমপূর্ণ হৃদয়েরই জুড়িদার বলিয়া। বায়সকে দূত করিতেছি—মেঘকে দূত করিতেছি—হংসীকে দূত করিতেছি। ইহারা সকলেই বিরহের সহচর। গগনমণ্ডলে দেখিতেছি হয় গান বাজনার সঙ্গত না হয় প্রেমিক-যুগলের আড্ডা। সহরের বাহিরে আসিবামাত্র নিজ শরীরে মুক্ত বায়ুর প্রভাব বুঝিতেছি—মাঝিরা সারি গান ধরিতেছে চীনা প্রকৃতি-সাহিত্যে কবিদের চামড়ার চোখ্ কানও দেখা গেল—আবার "মরম" হৃদয়, প্রাণ এবং ধরা ছোঁয়া যায় না যাহা সেই আত্মাও পাওয়া গেল। অতএব চীনা কবিরা দুনিয়ার অন্যান্য শ্রেষ্ঠ কবির সভায় বিনা বাক্যব্যয়ে কুলীনের প্রাপ্য পান সুপারি দাবি করিতে পারেন।

এতক্ষণ যে সকল কবিতা দেখিয়াছি সেগুলি পুরাতন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পরের কোন নিদর্শন পাই নাই। এক্ষণে একটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি। বোধ হয় সপ্তদশ কিম্বা অষ্টাদশ শতাব্দীতে এইটা লিখিত। চীনে সরকারী চাকরী পাইতে হইলে কঠোর পরীক্ষার ভিতর দিয়া পার হইতে হয়। ছাত্রেরা কবিতা রচনায়ও পাশ হইতে বাধ্য। এই কবিতাটা একজন কৃতকার্য্য পরীক্ষার্থীর রচনা। কবিতার নাম "ছাত্রের পর্য্যটন।" ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থের "নাটিং" কবিতার যে ভাব ইহারও তাই। বস্তুতঃ ওয়ার্ডস ওয়ার্থের প্রকৃতি-"পূজা" এই চীনা কবির প্রকৃতি-পূজা হইতে গভীরতর নয়। চীনা কবিতাকে প্রকৃতিপূজক মাত্রেই তাঁহাদের "ওঁ" স্বরূপ ব্যবহার করিতে পারেন। প্রকৃতিকে জীবন্ত সহচরী বিবেচনা করা, প্রকৃতির প্রভাবে জীবন গঠন করা, ইত্যাদি সকল তত্ত্বই এই রচনায় সংক্ষেপে পাইতেছি।

বাঁধা থাক্‌তে পার্‌ল না আর
দপ্তর খানায় কেতাব নিয়ে
নীল আকাশের মরকত ভুঁয়ে
চোখের চটক্ রঙবেরঙে
হৃদয় তাদের আকুল আজি
ভাণ্ডার হ'তে প্রকৃতি মায়ের
ছাড়ল তারা পুঁথি পত্র,
বেরুল তারা হুটাপুটি কর্‌তে
ক্রোশের পর ক্রোশ চলে তারা
কোথাও কুলকুল্ নদীর ধারে
কানে তাদের দরিয়ার গান,
পশলার পরে তাজা ঘাসে,
জমিন্ পরে পাহাড় বিরাট্,
দুনিয়ার এই চিড়িয়া খানায়
চলার, বসার, মরার, বাঁচার—
তারই ফলে সিজিল্ মিছিল্
দেখে শুনে ভেবে বুঝে
মাতাল হ'য়ে ছুট্‌লো রক্ত
স্বর্গের কথা, মর্ত্ত্যের জিনিষ,—
এমনতর আপনার এসব
বিশ্বেশ্বরের পূজাকালেও
হ'লই বা দেউল শ্বেত পাথরের
নীল্-চাপ্‌কান্-আঁটা ছাত্রের দল,
আর ছিপ্ হাতে নাড়্‌তে নদীর জল।
সাদা মেঘের মেষ বিচরে,
বসন্তের হাত ধরণী পরে।
চাখ্‌তে তাজা নূতন জীবন,
আন্‌তে নব শক্তি রতন।

টোল মাদ্রাসার তকেয়া ফরাস্ ;
পায় যেখানে সবুজ ঘাস।
বসে' কোথাও গাছের তলায়,
কোথা বা গিরির ঝোরার গায়।
নিঃশ্বাসেতে মধুর পবন—
ধরায়, ফুলে যাহার বহন।
উর্দ্ধে আশ্‌মানের অসীম ওসার ;
জ্যান্ত জীবের হরেক বাহার,
সবারই ভিতর শক্তি রাজে,
যেথায় নইলে গোলমাল্ বাজে !
চমক্ তাদের লাগ্‌ল প্রাণে ;
শিরায় শিরায় বানের টানে।
আজকে এরা হ'ল নিজের,
কখনো বুঝা হয়নি তাদের।
পায়না মানুষ এমন জীবন,—
কিম্বা পল্লীর দেবায়তন !

প্রকৃতির সতেজ ফোয়ারায় স্নান করিয়া ছাত্রেরা ঘরে ফিরিতেছে। এই পর্য্যটনের প্রভাব জীবনে থাকিয়া গেল। ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থের অনেক কবিতাই এই প্রভাবের চিত্র। "লুসী", "ড্যাফোডিল্‌স," "হাইল্যাণ্ড গার্ল", "সলিটারি রীপার", "এডুকেশন অব্ নেচার" ইত্যাদির নাম সুপরিচিত।

অবশেষে অনিচ্ছাতে
ফির্‌ল তারা ঘরের দিকে ;
কিন্তু তারা ভুল্‌বে নাক
পূজ্‌তে প্রকৃতি দেবীকে।
পথে পড়্‌ল অনেক অনেক
লম্বা "সরল"-গাছের বন,
আর স্রোতস্বতীর কূলে কূলে
"উইলো" কত কালো বরণ।
অনেক কালের চাপা হৃদয়
এতক্ষণে খুল্‌ল দুয়ার ;
গলা ছেড়ে গাইল তারা
নামজাদা গান সব বারবার।
কখনো তারা গায় দল বেঁধে
একা একা কখন বা গায়,
তালে তালে আওয়াজ তাদের
সাঁঝের বাতাস বয়ে নে যায়।
শুনে তাদের গানের ধ্বনি
গাঁ-পুকুরের দরিয়ার
চাঙ্গা হয় চিড়িয়া সকল
ভেঙে গ্রীষ্মের তন্দ্রাভার।
ছোঁড়ার দলের গানের তালে
গাওয়া সুরু করে চাষীর দল,
গেয়ে গেয়ে দিনকে বিদায়
দেয় এইরূপে ধরাতল।
কীট পতঙ্গ বিহগ সবে
এরাও দেয় যোগ সন্ধ্যাগীতে ;
সবার গীতই পূর্ণ এবে
বিশ্বপতির জয় ধ্বনিতে।
পশ্চিমেতে আস্তে আস্তে
রবি ডুবে যায় ধরায়,
অমরদিগের রাজ্য এবে
ভেসে উঠ্‌ল আলোর বন্যায়।
বেদিস্থান হ'তে প্রকৃতির
খস্‌ল পুত গোলক বহ্নির,
উচু খেয়াল আর নয়া রোশনাই
বাসিন্দা হ'ল ছাত্র হৃদির।

এই সুরের কবিতা ও গান চীনা সাহিত্যে প্রচুর। সুরটা নিতান্তই আধুনিক। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে রোমান্টিক আন্দোলনের প্রভাবে এই সুর পাশ্চাত্য মহলে উঠিয়াছে। পূর্ব্বে ইয়োরোপীয় সাহিত্যে এই সুর ছিল না। সাবেক কালের প্রকৃতিসাহিত্যে এই রস পাওয়া যায় না। প্রকৃতিকে খোলাখুলি শিক্ষয়িত্রী ও প্রিয় সখী বিবেচনা করা বর্ত্তমান ইয়োরোপের পক্ষে নূতন বস্তু।

"দেখে শুনে ভেবে বুঝে চমক তাদের লাগ্‌ল প্রাণে,
মাতাল হ'য়ে ছুট্‌ল রক্ত শিরায় শিরায় বানের টানে।"

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এই সম্বন্ধ গানে প্রচার করা প্রাচীন ও মধ্যযুগের এশিয়ায় অসংখ্য হইয়াছে। ইহা এশিয়াবাসীর এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ ও প্রথম স্বীকার্য্য তত্ত্ব।

রোমাণ্টিক সাহিত্যের প্রকৃতি জীবনময়ী। জীবনময়ী বলিয়া মানুষের মত প্রকৃতিরও সুখ দুঃখ হর্ষ বিষাদ আছে। আর এই জন্যই সে মানুষের সুখ দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিতে সমর্থ। এই জন্যই সে মানুষকে হাসাইতে নাচাইতে কাঁদাইতে পারে। এই জন্যই তাহার প্রভাবে মানুষ জীবন গঠন করিতে সমর্থ। এই সকল কথা আমাদের রামায়ণে-গোটা কালিদাসী সাহিত্যে এবং মধ্যযুগের পদাবলীতে মুড়ী মুরকীর সমান মামুলি। বিলাতের ওয়ার্ডস ওয়ার্থ ইয়োরোপে এই তত্ত্ব নূতন প্রচার করিয়াছেন। প্রকৃতিকে মানুষের জন্য ইস্কুল মাষ্টারণী করিলে জীবনের বিকাশ কিরূপ হইবে তাহার নানা চিত্র ইনি দিয়াছেন। একটা হইতে কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিতেছি :—

"বালিকার খেলা হবে হরিণীর প্রায় ;
শ্যামল প্রান্তরে অথবা পাহাড়ে
মাতিয়া আনন্দে যে হরিণী লাফায়।
তুফান উঠিলেও কাঁপাতে ধরায়,
সুষমা দেখিবে বালা সে কাঁপায় ?
কুমারীর অঙ্গ উঠিবে গড়িয়া
তুফানের সাথে তার নীরব ভালবাসায়।
হর্ষ সুধু প্রাণ-বাড়ান বালার হিয়ায়
থাকবে ; তাতেই পুষ্ট হবে বাড়্‌তি-গরিমা ;
কুমারীর বক্ষ ও স্ফীত হবে তায়।"

এই ধরণের কুমারী জীবন ভারতীয় সাহিত্যে অনেক। চীনা "ছাত্রের পর্য্যটনে" ও এই আকাঙ্ক্ষাই পাইলাম।

"হৃদয় তাদের আকুল আজি চাথ্‌তে তাজা নূতন জীবন,
ভাণ্ডার হ'তে প্রকৃতি মায়ের আন্‌তে নব শক্তি রতন।"

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

শ্রাদ্ধ ও স্মৃতি

মানবের আত্মায় আত্মায় একটা বন্ধন আছে। তাই পিতা মাতার সম্মুখে সন্তান-হৃদয় অকৃত্রিম ভক্তিতে স্বতঃই নত হয়ে যায়, সন্তানকে দেখ্‌লে পিতামাতার হৃদয় সন্তান-বাৎসল্যে উদ্বেলিত হ'য়ে উঠে; তাই ভাই ভগ্নিতে অতরল ভালবাসা, পতি-পত্নীতে সরল উদার পবিত্র গভীর প্রেম; তাই মানুষ সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হ'য়ে একে অন্যকে ভাল বাস্‌তে পারে, একের আনন্দে অন্য আনন্দিত হয়, একের শোকে অন্য মর্ম্মন্তুদ মানস যাতনা ভোগ করে, দুঃখার্ত্তের দুঃখ এবং বিপন্নের বিপদ নিবারণে নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করতে পারে। কেবল মানুষের আত্মায় আত্মায় এই বাঁধন নয়, এই বাঁধন বিশ্বজীবের আত্মায়। তাই, বিদ্যাসাগরের প্রাণ বাছুরের কষ্ট দেখে কেঁদে উঠেছিল, তিনি জন্মের মত দুধ খাওয়া ছেড়ে দিলেন। ইহার কারণ সমুদয় জীবজগৎ সেই বিরাট পুরুষ সচ্চিদা-

নন্দের প্রাণে প্রাণবান্, তাঁহারই চৈতন্যে চৈতন্যশালী। সুতরাং বিশ্বজীবের আত্মিক যোগ অনিবার্য্য। মানবের প্রাথমিক ব্যষ্টি জ্ঞান সমুদয় জগতের জ্ঞানের ভিতর দিয়ে গিয়ে পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করবে বা পরমাত্মায় লীন হ'বে—এই হয়েছে মানবের চিরন্তন সাধনা। এই আত্মিক যোগ ধারা ধোরেই মানবের জ্ঞান বিকাশ আরম্ভ হয়। আত্মার যোগ রক্ষণের চেষ্টা যে করে, তাহারই মধ্যে এই বন্ধনটি সুদৃঢ় হ'য়ে যায় এবং জীবাত্মা ক্রমশঃ নিকট হ'তে নিকটতর হয়ে আসে; আর যাহারা যে বাঁধনকে দৃঢ় ক'রে তুলতে চায় না, তাহার হৃদয় পাষাণ সদৃশ হ'য়ে উঠে এবং সেই পাষাণের নীচে, দয়ামায়া স্নেহ ভক্তি প্রভৃতি হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি—জীবাত্মার বন্ধনের বা সম্বন্ধের বিবিধ প্রকাশ নিদ্রিত অবস্থায় মাথা গুজে পড়ে থাকে সে ক্রমশঃ জীবজগৎ হ'তে পৃথক হয়ে পড়ে। তাই সাধু মহাত্মা দের প্রাণ কীট পতঙ্গ প্রভৃতি জীবের (যাহারা আমাদের কাছে নগণ্য) দুঃখ দেখলেও আকুল স্বরে কেঁদে উঠে; আর আমরা সোদর ভাইয়ের অসহ্য দুঃখ যন্ত্রণা বা অনশন কষ্ট দেখেও গভীর গাম্ভীর্য্য রক্ষা করতে পারি, বড় জোর গভীর দুঃখ প্রকাশক একটা দীর্ঘ নিশ্বাসের ভাণ করে থাকি। কারণ দয়া-মায়া-স্নেহ-ভক্তি-রূপ আত্মিক সম্বন্ধটা আমাদের হৃদয়ে সুপ্তাবস্থায় আছে বলেই ওর ডাক আমরা শুনতে পাই না।

জীবজগতে আমাদের লৌকিক সম্বন্ধগুলি যত কাছাকাছি হয়, আত্মার সম্বন্ধটাও আমাদের কাছে ততই পরিস্ফুট হ'য়ে উঠে। পিতা মাতা, ভাই ভগ্নী, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আত্মিক সম্বন্ধ অতীব সুস্পষ্ট, অন্যান্য আ স্বজনদের মধ্যে তার চেয়ে আরও কম পরিস্ফুট, এবং যাহাদের সহিত আমাদের কোন, লৌকিক সম্বন্ধ নাই তাহাদের সহিত আরও কম পরিস্ফুট। কিন্তু ইহাদের মধ্যে পিতা মাতার সহিতই আত্মিক যোগটা স্পষ্টতম এবং নিকটতম। কারণ—"আত্মাবৈ পুত্র নামানি" "তজ্জায়া জায়া ভবতি যদস্মিন্ জায়তে পুনঃ" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পুত্র পিতারই আরেক সংস্করণ। সেই জন্য পিতা পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা, পুত্র পিণ্ড প্রয়োজনঃ, এবং পুত্রও ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কত কায়ক্লেশ সহ্য করিয়া পিতার শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করে থাকে। এ রকম আদান প্রদান করে উভয়েই পরস্পরের ইহলোকে ও পরলোকে জ্ঞান বিকাশে ও অন্যান্য মঙ্গলবিধানে সাহায্য করে। এবং সেই জন্যই বোধ হয় পরলোক-গত আত্মার স্মৃতিরক্ষা ও তৎপ্রতি সম্মান দেখানোর বিশেষ বিশেষ বিধিব্যবস্থা সভ্য, অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য সব সমাজেই আছে। অবশ্য শিক্ষা ও সভ্যতার অনুপাতে সেই বিধিব্যবস্থাগুলির আদর্শের তারতম্যও আছে এবং থাকিবে। সাধারণ ভাবে দেখ্‌লে এই স্মৃতিরক্ষা ব্যাপারকেই হিন্দুশাস্ত্র শ্রাদ্ধ বলেছে। শ্রদ্ধার সহিত যাহা দেওয়া বা করা যায় তাহাই শ্রাদ্ধ। অবশ্য বন্ধু-বান্ধবদিগকে বা অন্যান্য গুরুজনদিগকে যাহা শ্রদ্ধার সহিত দেওয়া যায় তাহা শ্রাদ্ধ নয়। তা হ'লে অনেক গ্রন্থকারই অশেষ ভক্তি ভাজন পূজ্যপাদ পিতৃতুল্য ব্যক্তিদিগের পবিত্র নামে ভক্তির চিহ্নস্বরূপ ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি উৎসর্গ করে, এবং সোদরপ্রতিম বন্ধুবর-দিগকে স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ উপহার দিয়ে তাহাদের শ্রাদ্ধ করে ফেলতেন। যদিও

বর্ত্তমানে এরূপ সাহিত্যিক শ্রাদ্ধের দৌরাত্ম্য চলেছে বটে, তবুও conservative বা রক্ষণশীল শাস্ত্রটা এ রকম উৎসর্গ ও উপহার দেওয়াটাকে শ্রাদ্ধ বল্‌তে চায় না। তা হলে আজ শ্রাদ্ধের ব্যয়ের কোঠায় একটা অখণ্ড মণ্ডলাকার অশ্বডিম্ব শোভা পেতো। অবশ্য অনেকের জীবিতকালেও শ্রাদ্ধ ক্রিয়াটা সুসম্পন্ন হয়ে যেত এই যা গণ্ডগোল। যা হোক শাস্ত্রিক শ্রাদ্ধের অর্থ হয়েছে প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ ও তদানুসঙ্গিক ব্যাপার।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, মানবজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ও চিরন্তন সাধনা হয়েছে—সে যেখান থেকে এসেছে সেই শেষ স্থানে যাওয়া, বা দার্শনিক পরিভাষায় পরমাত্ম জ্ঞান লাভ করে পরব্রহ্মে লীন হওয়া, অথবা জীব শিবে পরিণত হওয়া। তদুদ্দেশ্যে মানুষ তাহার জীবনের প্রথম প্রভাতের প্রথম মুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করে পরব্রহ্মে লীন হওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই জ্ঞানার্জ্জন করে আস্‌ছে। জ্ঞানার্জ্জনের একটা বিশেষ ধারা আছে। সুতরাং ইহাকে ক্রমবিকাশের ধারা বলা যেতে পারে। জীবের জ্ঞানার্জ্জন বা ক্রমবিকাশের ধারাকে প্রথমতঃ তিন বৃহৎ পর্য্যায়ে বিভাগ করে, প্রত্যেকটিকে আবার সাত সাত অন্তর্পর্য্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। এই অন্তর্পর্য্যায় গুলিকেই ভূর্ভুবস্ব প্রভৃতি লোক বলা হয়। বলা বাহুল্য যে জীবাত্মা স্থূল জগতের স্থূল শরীর পরিত্যাগ ক'রে, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গণ সমন্বিত দেহধারণ করে সূক্ষ্ম জগতে চলে যায়। আমাদের এই স্থূল জগতের অন্নাদি ভোগ্য বস্তু তখন তাহাকে স্পর্শ কর্‌তেও পারে না। সহসা পার্থিব কর্ম্মধারা চ্যুত হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। পার্থিব জীবাত্মার ভক্তি শ্রদ্ধা ও তৃপ্তিই তখন তাহার নিরাশ্রয় নিরবলম্ব অবস্থায় তাহার কাছে পৌছয় এবং তাহার জ্ঞানবিকাশের সাহায্য করে থাকে। তাই শ্রাদ্ধ কর্ত্তা বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত পিণ্ড শয্যা ভোজ্যাদি দান ও ধনী-দরিদ্র ব্রাহ্মণচণ্ডাল সাধুসন্ন্যাসী সকলকে নিমন্ত্রণ করে সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত ও চর্ব্বচুষ্যলেহ্যপেয়াদি দ্বারা তৃপ্ত করে থাকে। শ্রাদ্ধকর্ত্তার অকৃত্রিম ভক্তি ও ইহলৌকিক জীবাত্মার তৃপ্তিই পরলোকের আত্মাকে শান্তিদান ও জ্ঞানবিকাশে সাহায্য করে। তাই হিন্দুরা বছর বছর পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ তর্পণ করে থাকে। এইরূপেই হিন্দুরা পরলোকে প্রেতাত্মার জ্ঞানবিকাশে সাহায্য করেছে ও ইহলোকে তাহার স্মৃতিরক্ষা করেছে।

বর্ত্তমানে স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান ক'রে প্রেতাত্মার প্রতি সম্মান দেখানোর ও স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থাও প্রচলিত হইতেছে। মৃত ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যু তিথিতে স্মৃতি সভার অনুষ্ঠান করার প্রথাটা বোধ হয় খাটি ইউরোপীয়। ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান, সভ্যতা বিলাসিতা, ও আধিব্যাধির সঙ্গে সঙ্গে এই অভিনব বস্তুটারও আমদানী হয়েছে। এ পদ্ধতিটি ভারতীয় সমাজের সহিত কতদূর খাপ খেয়েছে জানি না, তবে ইহারও একটা মূল্য আছে। এতদিন আমার ধারণা ছিল যে, স্মৃতিসভাগুলি বুঝি কতগুলি নিষ্কর্ম্মা ও বাক্যবাগীশ লোকের সময়ক্ষেপের একটা বিশেষ উপায় মাত্র। অবশ্য কার্য্যকলাপ দেখেই ধারণাটা হয়েছিল। বছর বছর সকলে একত্র হয়ে মৃত ব্যক্তির কার্য্যাবলীর বিশ্লেষণ ও গুণাবলীর আলোচনা করে,

কখনো বা আপন মনগড়া সদসৎ অর্থ ক'রে নিজের বাগ্মিতার পরিচয় দেয় মাত্র। ইহাতে প্রকৃত কাজ কিছুই হয় না। এতদিন স্মৃতি-সভাগুলি এ রকমই অনুষ্ঠিত হ'য়ে আস্‌ছিল। গত ১২ই শ্রাবণ ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতিসভায় সে ধারণা বদ্‌লে গিয়েছে। এখন বুঝ্‌তে পেরেছি যে স্মৃতিসভারও একটা সার্থকতা আছে। ইহার দ্বারাও material work এবং Spiritual gain দুই-ই হয়।

আমাদের অনেকের হৃদয়ই পাষাণময় ব'লে, কোন একটা উচ্চভাব বা মহনীয় আদর্শ স্থায়ী হ'তে পারে না; জোয়ারের জলের মত অমনি আসে আর অমনি চলে যায়। কিন্তু সেই উচ্চভাব বা আদর্শ পুনঃ পুনঃ হৃদয় সম্মুখে উপস্থিত হ'লে ক্রমে তাহা স্থায়ীত্ব লাভ করতে পারে না। স্মৃতিসভায় আলোচিত মৃত ব্যক্তির গুণাবলী—তাহার অসাধারণ প্রতিভা, মেধা, অসম সাহস ও অধ্যবসায়, কার্য্যক্ষমতা ও আত্মোৎসর্গ, স্বদেশপ্রেম ও স্বজনানুরাগ, দয়ামায়া-স্নেহ-প্রীতিভক্তি-বিশ্বাস ও সর্ব্বোপরি পূতচরিত্র—ইহার প্রত্যেকটি অন্ততঃ তখনকার জন্য আমাদের উপর ইন্দ্রজাল বিস্তার করে বসে, তাহার জীবনাদর্শ আমাদের প্রাণে প্রাণে—একটা স্বর্গীয় প্রেরণা জাগিয়ে দেয়, একটা বিরাট্ মহত্ত্ব এসে আমাদের হৃদয়সিংহাসন দখল ক'রে তাহার অনুল্লঙ্ঘনীয় আদেশ জারী করতে আরম্ভ করে। তখন আমরা সেই প্রেতাত্মার আবির্ভাব প্রাণে প্রাণে অনুভব করি, আপনাকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হ'য়ে প্রত্যেকেই এক একজন বিদ্যাসাগর বা বিবেকানন্দ হ'য়ে যাই। এ বছর বিদ্যাসাগর-স্মৃতিসভায় তাই প্রত্যক্ষ অনুভব করা গিয়াছে। যেমনি বক্তা পূর্ব্ববঙ্গের অসংখ্য দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নরনারীকে দুর্ভিক্ষের করালগ্রাস থেকে উদ্ধারার্থ যথাশক্তি অর্থ ও বস্ত্র প্রার্থনা করেছিলেন, অমনি যেন দীনবন্ধু আর্ত্তসেবানিরত দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের আত্মা দিব্য সিংহাসন থেকে নেমে দেহধারণ ক'রে উদাত্তস্বরে বলে উঠেছিল—তোমারই ভাই, তোমারই মায়ের মত শত শত প্রৌঢ়া, তোমারই ভগিনীর মত শত শত রমণী, তোমারই সন্তানের মত শত শত সন্তান মা বাপ ভাইয়ের চোখের সম্মুখে—হা অন্ন হা বস্ত্র বলে চিরতরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে চলেছে, আর তুমি নেহাৎ উদাসীনের মত চেয়ে দেখবে? যে যাহা পার সাহায্য কর। হাত পেতে এসে দাঁড়ায় নাই, বিদ্যাসাগরের তেজোময় আত্মা যেন জোর করে এসে টাকাকড়ি, চাদর ঘড়ি নিয়ে গেল; আর সকলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়িয়ে থাক্‌ল। সকলের প্রাণে তখন যে প্রেরণা আস্‌ছিল, তাহা নিজেই বোধ হয় কেহ জান্‌তে পারে নাই। ভাষার আবরণে ধরে রাখার চেষ্টা বৃথা। কেহ কেহ হয়ত ইহাকে ঝোঁক্ বল্‌বেন; কিন্তু ইহা ঝোঁক্ হইলেও এ ঝোঁক্ স্বার্থপর হিংসা-দ্বেষময় জগতের নয়, এ ঝোঁক্ দিব্য, এ প্রেরণা দয়াময় প্রেমময় ভগবানের হৃদয় প্রকোষ্ঠে ঘুমোয়। এই যে পূর্ব্ববঙ্গের বন্যা পীড়িত অন্নক্লিষ্ট অসংখ্য নরনারীর সেবা করতে রামকৃষ্ণমিশন প্রাণপাত চেষ্টা করছে একেও ঝোঁক্ বল্‌বেন? বর্দ্ধমান জলপ্লাবনে যাহারা নিজের জীবনকে তুচ্ছ ক'রে বিপন্ন নরনারীকে উদ্ধার করতে গিয়েছিল একেও ঝোঁক্ বল্‌তে চান্? এই যে প্রতীচ্য জগতে—যেখানে ঈশ্বরের শত্রু রক্তপিপাসু লক্ষ লক্ষ সৈন্য একটা নেহাৎ ক্ষুদ্র স্বার্থপরতার বশে, একটা জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করতে এসে প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে—

সেখানেও যাঁহারা আপনার নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও ক্লিষ্ট আহত সৈন্যদের সেবা করতে গিয়েছে তাঁহারও কি (মারাত্মক) ঝোঁকের বশে গিয়েছে ? এটা যদিও ঝোক্ হয়, তবুও এই ঝোঁকের স্বপ্ন না মিলাতে মর্‌তে পার্‌লে অমর হওয়া যায়। মাঝে মাঝে এ রকম এক একটা দিব্য প্রেরণা এসেই মানুষকে বুঝিয়ে দেয় যে মানুষ এখনও দয়ামায়াহীন নিরেট পশু হয় নাই, মানুষ এখনও মানুষ। ইউ-রোপীয় মহাযুদ্ধ শিখিয়ে দিতেছে যে স্বার্থ হিংসা দ্বেষের ভিতর দিয়েও মানব-প্রাণে প্রেমের অজস্র ধারা বহিতেছে ; পূর্ব্ববঙ্গের জলপ্লাবন ও অন্নকষ্ট শিক্ষা দিতেছে যে জলের বন্যার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর প্রাণে পবিত্র মানব-প্রেমের বন্যাও এসেছে আর বিবেকানন্দ ও বিদ্যাসাগরের আত্মাও তারই আগে আগে ভেসে চলেছে। তাই আমরা সেদিন বিদ্যাসাগরের স্মৃতিসভায় তাঁহার আত্মারও সাড়া পেয়েছিলাম। যাহারা পরমহংসদেব এবং স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব বা তিরোভাব উৎসবে বেলুড়মঠে বা যোগোদ্যানে গিয়েছেন তাহারা জানেন যে স্মৃতিসভা বা স্মৃতি-উৎসবের অর্থ কি। যখন পঞ্চ সহস্রাধিক দীন দরিদ্র পীড়িত নরনারী আনন্দে কেহবা 'আলুর দম' 'কপির ডালনা' কেহবা 'দই' 'মোহনভোগ' চেয়ে নিয়ে সাধ মিটিয়ে খাচ্চে, যখন ঘর্ম্মাক্ত কলেবর স্বেচ্ছাসেবকেরা অবিরত পরিশ্রমেও কাতর না হয়ে সকলকে ভোজ্যাদি দিয়ে যায়, আর সেই হর্ষোৎফুল্ল চীৎকার ও সংকীর্ত্তন ধ্বনির মধ্যে মুণ্ডিত মস্তক স্বামী সারদানন্দ ও তাহার সহযোগিগণ হাসিমুখে দাঁড়াইয়া তখন মনে হয় না কি যে স্বয়ং নারায়ণই এই দীন দরিদ্র মূর্ত্তি ধরে আমাদের কাছে আসেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের মত ভাগ্যবানই সেই দরিদ্র নারায়ণকে চিন্‌তে পারেন।

যেখানে শ্রাদ্ধ স্মৃতি-সভা বা স্মৃতি-উৎসবের এই উদ্দেশ্য থাকে এবং এই উদ্দেশ্যানুসারে কাজ করতে পারে, সেখানেই ওগুলির সার্থকতা আছে, নতুবা লক্ষ টাকা ব্যয় কর্‌লেও পিতৃশ্রাদ্ধ হয় না, টাকার শ্রাদ্ধই হয় ; আর গলাবাজি ক'রে "অগ্নিময়ী ভাষায়" সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেও তাহা বাতুলের প্রলাপে পর্য্যবসিত হয়। ইহাতে প্রেতাত্মার প্রতি সম্মান দেখানোও হয় না, সমাজেরও কোন উপকার হয় না। *

শ্রীশশিভূষণ পাল।

---

* গত ১২ই শ্রাবণ ৺ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুতিথি উপলক্ষে মেট্রোপলিটান কলেজে দরিদ্র বিদায় ও কাঙ্গালী ভোজন হয়েছিল। কয়েকজন অধ্যাপক এ বিষয়ে খুব তত্ত্বাবধান নিয়েছিলেন। বৈকালে তাঁহাদেরই উদ্যোগে অত্রত্য রাম-মোহন লাইব্রেরী গৃহে এক বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। কিন্তু সহরের দু'চার জন গণ্যমান্য লোক ছাড়া কাহাকেও সভায় দেখা যায় নাই (অবশ্য ইহারাই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অত্যন্ত ভক্তি করেন এবং অন্য জাতির কাছে বিদ্যাসাগরের গর্ব্বে স্ফীত হয়ে উঠেন)। সভায় শতাধিক টাকা চাঁদা উঠেছিল। পূর্ব্ব বঙ্গের দুর্ভিক্ষ পীড়িত নর নারীর সাহায্যার্থ রামকৃষ্ণমিশনের হস্তে দেওয়া হয়েছে।

পুণ্ড্রজাতির ইতিহাস

তৃতীয় অধ্যায়

(৮৯৫ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

বাঙ্গালার পুণ্ড্রজাতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

পুণ্ড্রজাতির বিভিন্ন অঙ্গ

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে উত্তর ও দক্ষিণ-রাঢ়ী পুণ্ড্র এবং বঙ্গজ পুণ্ড্র বর্ত্তমান বাঙ্গালী পুণ্ড্র মধ্যে গণ্য। বাঙ্গালার সকল জেলাতেই এই জাতি বিদ্যমান নাই। সমগ্র বঙ্গের মধ্যে কোন কোন জেলায় পুণ্ড্রজাতির বাস আছে।

পুণ্ড্রজাতির বাসস্থান

"The Pundaries or Puro are found mainly in Birbhum, Malda, Rajshahi and Murshidabad."

(Census Report Page. 425,
Para 771)
A. D. 1901

পুণ্ডরী বা পুড়োজাতি প্রধানতঃ বীরভূমি, মালদহ, রাজসাহী এবং মুরশীদাবাদ জেলায় বাস করে।

এতদ্ব্যতীত বর্দ্ধমান, বগুড়া নবদ্বীপ ও পূর্ব্ব বঙ্গের কোন কোন জেলায় এবং ভূষণা গ্রামে পুণ্ড্রজাতি দৃষ্ট হয়। ইহারা সংখ্যায় অতিশয় কম এবং নগণ্য। ভূষণা সমাজ মন্দ নহে। তথাচ এই জাতির সংখ্যা নিতান্ত কম নহে।

পুণ্ডরী বা পুড়ো (Puro) জাতির সহিত পোদ (পদ্ম) জাতির অভিন্নতা সম্পাদনের জন্য মিঃ গেট যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন।—

"The name seems to indicate that they are in reality Pods, but by residence at a distance from the head quarter of the caste, they have gradually come to lose connection with it, and the Puro of Malda profess to know nothing of the Pods of the 24 Parganas, though they admit that they belong to the same caste as the Puros of Birbhum." (C. Rept. Page 425, Para 771—Pundari (Puro) A. D. 1901)

পুণ্ডরী বা পুড়ো নামের সহিত পোদ (পদ্ম) নামের সাদৃশ্য দর্শনে বলিতে চাহেন পুড়ারা প্রকৃত প্রস্তাবে পোদ জাতির এক শাখা মাত্র। কিন্তু মালদহবাসী পুড়োরা চব্বিশ পরগণার 'পোদ'গণের সম্বন্ধে কিছুই জানেনা বলিয়া থাকে। কিন্তু মালদহের পুণ্ডরিগণ বীরভূমের পুণ্ডরীদিগকে স্বজাতি বলিয়া অবগত আছে।

কুলতন্ত্রের বচনটি সেনসস্ রিপোর্টের মন্তব্যের আনুকূল্যই করিতেছে বলিয়া ধারণা হইয়া থাকে—

"অসৌহি ব্রাত্যক্ষত্রিয়ঃ ক্রমাদ্দেশান্তরং গতঃ।
রাঢ়ে বঙ্গে ক্রমেনৈব দক্ষিণে রাঢ় এব চ ॥
ওড্রে চ স্থান ভেদেতু ভিন্নাখ্যাঃ পরিকীর্ত্তিতে।
এতেষাঞ্চ সুতা যে যে তেঽপি তদ্দেশ
সংজ্ঞকাঃ ॥"
(কুলতন্ত্র)

একই জাতির জনগণ, ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাস নিবন্ধন ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। দেশজাত সংজ্ঞা প্রাপ্তি বিচিত্র নহে।

উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী বঙ্গজ ও উৎকলী পুণ্ড্রগণ দেশ ভেদে জাতীয় আখ্যা লাভ করিয়াছে।

রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ পুণ্ড্রগণ পুণ্ড্র বা পুণ্ডরী ও পুড়া নামে প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু চব্বিশ পরগণা, মেদিনীপুর ও ওড়্বাসিগণ পুণ্ডরী বা পুড়া নামে খ্যাত নহে বর্ত্তমানে পদ্ম ও শাস্তপর নামে খ্যাত। পদ্ম শব্দ 'পদ্ম' শব্দের অপভ্রংস মাত্র। পুণ্ডরী বা পদ্ম হইতে পদ্ম হইয়াছে। ওড়্রদেশে 'শাস্তপর' এবং দক্ষিণ বঙ্গে পোদ বা পদ্মরাজ নামে খ্যাত রহিয়াছে। দক্ষিণ বঙ্গের পোদ ও শাস্তপর উড়িয়া ওড্র-পুণ্ড্র বলিয়া বিবেচনা করা নিতান্ত অযৌক্তিক হইবে না। 'বঙ্গজ-পুণ্ড্র' ও ওড্র-পুণ্ড্রগণই বর্ত্তমানে 'পদ্ম' জাতি।

ওড্র গত পুণ্ড্রগণের কোন পরিচয় রাঢ়-বাসী পুণ্ড্রগণের অজ্ঞাত থাকিলেও তাহাদের অস্তিত্বের কথা কুলতন্ত্রে ও সেনসস্ রিপোর্টেও দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমানে পোদ ও শাস্তপর পোদ জাতির বিস্তার দর্শনে ওড্র-পুণ্ড্রের অস্তিত্বেরই পরিচয় প্রদান করিতেছে।

ধর্ম্মমঙ্গলোক্ত 'পদ্য' জাতির সন্ধান বর্ত্তমানে অপ্রাপ্ত হইলেও পদ্য যে পোদ তাহা সহজেই অনুমান করা চলিতে পারে। তাহারাও বাসুদেব পুণ্ড্র বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদানে সমুৎসুক হইয়াছে। বাসুদেব দ্বাপর-যুগে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে রাজত্ব করিতেন, সেইজন্য জনপদের নামের সহিত তাঁহার নাম সংযুক্ত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব এবং বাসু-দেবের পুত্র, পুণ্ড্ররাজ বাসুদেব ও বসু-দেবের পুত্র দুই বাসুদেবের পার্থক্য সম্পাদ-নের জন্য পুণ্ড্ররাজ বাসুদেবকে 'পৌণ্ড্রক বাসুদেব' বলা হইয়াছে।

খ্রীষ্টীয় ১৯০১ সালের আদম সুমারির সময়ে প্রত্যেক জাতি স্বীয় স্বীয় 'জাতি মালার' গঠন করিতে তৎপর হয় এবং আপন আপন সমাজস্থ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনার্থ যে জাতি-মালা গঠন করিয়াছিল, তাহা পৃথক পৃথক সমাজগত জাতীয় উৎকর্ষ অপকর্ষ প্রদর্শনমূলক নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়।

মালদহবাসী পুণ্ড্রগণ রাঢ়বাসী পুণ্ড্র হইতে যে শ্রেষ্ঠ তাহার পরিচয় প্রদানার্থ ব্যস্ত হইতে দেখা গিয়াছিল এবং মালদহস্থ দুই শ্রেণীর পুণ্ড্রগণ এই সময়ে ও একমতাবলম্বী হইতে পারে নাই। ইহা মঙ্গলের চিহ্ন নহে। জাতি এক, একথা স্বীকার করিলে কোন দোষস্পর্শে না সমাজ পৃথক ত রহিয়াই যাইতেছে। পুণ্ড্র একটি জাতি—পুঁড়া, পুণ্ডরী, পোদ বা পদ্য উহার নামান্তর মাত্র।

এক জাতির মধ্যে পৃথক সমাজ বিদ্যমান থাকা দোষাবহ নহে বরং স্বাভাবিক বলিয়াই বুঝিতে হয়। ব্রাহ্মণের মধ্যেই এই প্রকার বিভিন্ন সমাজ বিদ্যমান রহিয়াছে। কুলীন মৌলিক ভাবই বিদ্যমান রহিয়াছে, উচ্চ নীচ ভাবও বর্ত্তমান কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতিতে এক, পৃথক নহে। "বার রাজপুতের তের হাঁড়ী" থাকিলেই হইল। জাতীয় বল ক্ষীণ করা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে।

পদ্য জাতি, বানেয় ক্ষত্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ হইবার অভিলাষ নিবন্ধনই, স্বীয় বংশপতি পৌণ্ড্রক বাসুদেব বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। বলীপুত্র পুণ্ড্র ক্ষেত্রজ পুত্র কিন্তু পৌণ্ড্রক বাসুদেব ক্ষত্রিয় ঔরস জাত পুত্র।

যাহাই হউক, ইহার মূলে কোন সত্য নিহিত থাকুক আর নাই থাকুক তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই।

বলীপুত্র বানেয় পুণ্ড্রগণ সত্যান্ত কালের সমকালীন বলিয়া ধরা যায়। রামচন্দ্রের সময়ে পুণ্ড্ররাজ্য এবং পুণ্ড্রক্ষত্রিয় বিদ্যমান ছিল।

পুণ্ড্রক বাসুদেব দ্বাপরান্তের লোক, তিনি সুপ্রাচীন পুণ্ড্রদেশের যখন অধিপতি হয়েন, সেই সময়ে পূর্ব্ব পুণ্ড্রবাসী ক্ষত্রিয়গণের রাজ্যেই রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

পুণ্ড্ররাজ শাসিত রাষ্ট্র, কাল সহকারে বানেয় ক্ষত্রিয়গণের বংশধরগণ কর্ত্তৃক শাসিতই হউক বা অন্য কোন রাষ্ট্রপতির দ্বারাই শাসিত হউক, দ্বাপরান্ত কালে পুণ্ড্রক-বাসুদেব কর্ত্তৃক শাসিত হইয়াছিল ইহা পৌরাণিক মত।

পুণ্ড্ররাষ্ট্রের বানেয় ক্ষত্রিয়গণ দ্বাপরান্তে সংখ্যায় বর্দ্ধিতই হইয়া থাকিবে। যখন পৌণ্ড্রক-বাসুদেব পুণ্ড্ররাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হইয়াছিলেন তখন তিনি যে সূত্রেই রাষ্ট্রপতি হউন না কেন, তাঁহাকে বানেয় ক্ষত্রিয় প্রধান পুণ্ড্ররাজ্যই শাসন করিতে হইয়াছিল, এবং বাসুদেবের সহিত অন্য এক সম্প্রদায়গত ক্ষত্রিয়ের পুণ্ড্রাধিকার অসঙ্গত নহে।

এই সময়ে বানেয় ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য মন্দীভূত হইয়া বাসুদেব প্রমুখ বৃষ্ণিবংশীয় বা বহু-বংশীয় ক্ষত্রিয় নেতা বাসুদেবের শাসনকাল প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাসুদেবকে পৌণ্ড্রক বা পুণ্ড্রপতি বিশেষণে বিশেষিত হইতে হইয়াছিল। পৌণ্ড্রক বাসুদেবের জাতি বানেয় জাতি হইতে পৃথক হইলেও ক্ষত্রিয় ছিল। এই সময় হইতে পৌণ্ড্রক বাসুদেবের জাতিও পৌণ্ড্রক জাতি এবং বানেয়গণও পৌণ্ড্রকজাতি বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল। এই উভয় জাতির মধ্যে একমাত্র কুলপরিচয় ব্যতীত পৃথক করিবার অন্য উপায় ছিল না।

সুতরাং বানেয় বা অন্য ক্ষত্রিয় জাতি পুণ্ড্রদেশে বাস নিবন্ধন পুণ্ড্রবাসী হইয়া পড়ে। ভিন্নরাষ্ট্রের জনগণ পুণ্ড্ররাষ্ট্রবাসিগণকে পুণ্ড্র-বাসী বা পৌণ্ড্রক * বলিত।

পুণ্ড্রের অপত্যার্থেই হউক বা পুণ্ড্রদেশ-বাসী বলিয়াই হউক—তৎকালে পুণ্ড্র জনপদ-বাসী মাত্রেই 'পৌণ্ড্রক' এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই জন্য ভিন্নবংশীয় বাসুদেব 'পৌণ্ড্রক বাসুদেব' নামে খ্যাত হইয়া-ছিলেন।

পুণ্ড্রদেশের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রাদি জাতিও 'পৌণ্ড্রক' এই দেশজ আখ্যা পাইয়াছিল। মৈথিলী ব্রাহ্মণ, উপাধির মত। পুণ্ড্রদেশবাসী জনগণই 'পৌণ্ড্রক' বিশেষণে বিশেষিত হইত।

সত্যান্তে বানেয় ক্ষত্রিয় প্রভাব পুণ্ড্রদেশে ঘটে, তৎপরে বাসুদেব ক্ষত্রিয় প্রভাবের অভ্যুদয় হয়। বাসুদেব ক্ষত্রিয় রাজ্য যখন পুণ্ড্ররাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হইল সেই সময় আজি-কার দিন হইতে পাঁচ সহস্র বৎসরের মধ্যে বা পরে ঘটিয়াছিল। এই সুদীর্ঘকালের ধারা-বাহিক বংশবিবরণ এবং ইতিহাস বর্ণন অসম্ভব।

* পুণ্ড্র শব্দে অপত্যার্থে ষ্ণুক্ প্রত্যয় করিয়া 'পৌণ্ড্রক' পদ সিদ্ধ হইয়াছে।

এই সহস্র সহস্র বৎসরের প্রাচীন পৌণ্ড্র-বর্দ্ধনের রাষ্ট্রীয়, জাতীয় এবং সামাজিক ইতিহাসের মূলোদ্ঘাটন করা একেবারেই অসম্ভব। এই ইতিহাসের ধারা কিছুতেই স্পষ্টতর ভাবে দেখা দিবে না। সংযোজক সূত্র বহুবার বহুস্থানে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে—'Missing link' এবং সন্ধান কিছুতেই মিলিবে না।

ইহাও মনে রাখা কর্ত্তব্য সেই প্রাচীন যুগে ইউরোপীয় সভ্যতা নবপ্রস্তরাব্দে সোপানে আরোহণ করিতেছিল। সেই যুগের পৌণ্ড্রেতিহাস আনুপূর্ব্বিক বর্ণনার মধ্যে সহস্র ভ্রম এবং স্তূপাকার কল্পনা বিদ্যমান থাকিবেই থাকিবে।

কুলতন্ত্র এই কাল হিসাবে নগণ্য। তত্রাচ কুলতন্ত্রের রচনাকালে বঙ্গদেশের প্রবাদ ও জাতিগণের যে কুলজী বিদ্যমান ছিল এবং তৎকালীন পুণ্ড্রসমাজের বিভাগ দর্শনেই লিখিত হইয়া থাকিবে।

এই হিসাবে ওড্রবাসিগণ যে এই পৌণ্ড্রক-গণের শাখা তাহা দৃষ্ট হয়। তাহারা উত্তর-দেশ হইতেই দক্ষিণে সমুদ্রকূলে গিয়া বাস করিয়াছিল, কিন্তু কবে গিয়াছিল তাহার ইতিহাস নাই।

চব্বিশপরগণা ও অপরাপর জেলাবাসী বঙ্গজ, রাঢ়ী এবং উৎকলী পুণ্ড্রের বসবাস হেতু যশুরে, শাস্তপর, এবং পোদ (পদ্ম) একত্রে মিলিত হইয়া নূতন জাতির বিকাশ করিয়া থাকিবে। উড়িষ্যায় শাস্তপর উড্রপুণ্ড্র দক্ষিণবঙ্গে বাস কালে 'পদ্য' * জাতিতে পরিণত হওয়া বিচিত্র নহে। বর্ত্তমানে তাহার নিদর্শনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

আদম সুমারির রিপোর্টে সেই কারণে পোদদিগকে প্রকারান্তরে 'Half brothers' পুণ্ডরী বলা হইয়া থাকিবে। 'ওড্রপুণ্ড্র' ও 'বঙ্গজ পুণ্ড্র'গণই 'পদ্ম' জাতি।

একই জাতি স্থানভেদে পৃথক শ্রেণী হইতে পারে—উচ্চ বা নীচ হইয়াও অবস্থান করিতে পারে। পূর্ব্ববঙ্গের উত্তরে "পাঞ্চ-চয় কায়েত" নামক এক অপরাধী নিম্নস্তরের জাতি দৃষ্ট হয়। তাহারা কায়স্থ শাখা হইতে ছিন্ন হইয়া কর্ম্মদ্বারা ধর্ম্ম ও নীতি বলে নিম্ন হইয়া গিয়াছে। তাহাদের সমাজে তাহারা শ্রেষ্ঠ এবং বর্ত্তমান কায়স্থগণ হইতে বহু নিম্নে হতমানে অবস্থিত রহিয়াছে।

মূলস্থানের পুণ্ডরিগণের সহিত দক্ষিণ ও ওড্রবাসিগণের পার্থক্য অসম্ভব নহে। পুণ্ড্র-পদ্ম বা শাস্তপর ওড্র-পুণ্ড্র সমাজের সহিত উত্তর রাঢ়ী, দক্ষিণ রাঢ়ী ও বঙ্গজ পুণ্ড্রগণের সহিত সমাজগত ভাবে আদৌ সংস্রব নাই ইহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু মৌলিকতা হিসাবে জাতিগত হিসাবে যে তাহারা পৃথক নহে ইহা স্বীকার করিলে কোন দোষ বা অপরাধই হইতে পারে না। এবং প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারা একজাতি কুলতন্ত্র ইহাই বলিয়া থাকে।

বিশেষতঃ কুলতন্ত্রে যে ওড্র-পুণ্ড্রগণের কথা আছে তাহা অস্বীকার করিয়া বেদ পুরাণের অতি প্রাচীন ঘটনার মধ্যে বর্ত্তমানের সাম-ঞ্জস্য বিধান কতদূর সম্ভব তাহা ঐতিহাসিক-গণই বিচার করিবেন।

বেদ পুরাণের সহিত পুণ্ড্রজাতির যে সম্বন্ধ তাহা উচ্চাঙ্গের ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, কিন্তু 'কুলতন্ত্রের' মর্ম্ম এই সূত্রে উপেক্ষিত

* পূর্ব্বে 'পদ্য' শব্দ 'পোদ' শব্দে ব্যবহৃত হইত না—'পদ্ম' শব্দ পুণ্ডরী শব্দের ভেদ মাত্র। পুণ্ডরী বা পুড়ো শব্দই 'পোদ হইয়াছে।

হওয়া দোষাবহ ও নিন্দনীয়। কুলতন্ত্রকে মান্য করিতেই হইবে। বেদ পুরাণাদি হইতে বর্ত্তমান পুণ্ড্র জাতির বংশ ধারা একেবারে লুপ্ত বা অজ্ঞাত।

নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলে বলিতে হইবে যে—উৎকলী শাস্তপর পুণ্ড্র সমাজ যদি বর্ত্তমানে বিদ্যমান থাকে তাহা 'শাস্তপর-পদ্ম' বলিয়াই অনুমান করিতে বাধ্য হইতে হইবে। উহারাই 'বঙ্গে ওড্র পুণ্ড্র'

উৎকলী কায়স্থ 'মুদ্রাবয়নিক্' জাতি কায়স্থ কিন্তু তাহাদের সমাজ বিভিন্ন, সে সমাজের সহিত বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজিক ভাবে সংস্থষ্ট নহে, তত্রাচ জাতিগত ভাবে এক একথা স্বীকার করিতেই হইবে।

সেই প্রকার সিদ্ধান্ত দ্বারা ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে—উত্তর-রাঢ়ী, দক্ষিণ-রাঢ়ী, বঙ্গজপুণ্ড্র সমাজ যেমন সমাজগত ভাবে পৃথক তদ্রূপ ২৪ পরগণা ও উৎকলী পুণ্ড্র সমাজ ও পৃথক। কিন্তু জাতিগত ভাবে এক।

কুলতন্ত্রের মতানুযায়ী উৎকলী পুণ্ড্র শাখার কিয়দংশ এবং বঙ্গীয় পুণ্ড্র সমাজের কিয়দংশ এবং অপরাপর পুণ্ড্র শাখার মিশ্রণে ২৪ পরগণার 'পদ্ম' শাখার বিকাশ ও উৎপত্তি হইয়াছে। সমাজগত ভাবে সকল দেশের পুণ্ড্র পৃথক কিন্তু জাতিগত হিসাবে এক।

সকল দেশের বিভিন্ন আখ্যাধারী পুণ্ড্র শাখা আদৌ পুণ্ড্রবর্দ্ধন পুণ্ড্র শাখার শাখা প্রশাখা মাত্র। মূল কাণ্ড হইতে পৃথক হইয়া পৃথক পৃথক মহীরুহে পরিণত হইয়া পৃথক হইয়াছে।

বাঙ্গালী পুণ্ড্রশাখা

বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বাস নিবন্ধন পুণ্ড্রগণের বহু শ্রেণীর সমাজ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। প্রত্যেক সমাজ পৃথক পৃথক বেষ্টনীর মধ্যে বহুকাল হইতে অবস্থান করিয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। কেহ কাহার খোঁজ খবর পর্য্যন্ত রাখে নাই।

সেনসস্ কার্য্যের ফলে এক্ষণে বিভিন্ন বঙ্গীয় পুণ্ড্র শাখায় সন্ধান প্রাপ্তির সুবিধা হইয়াছে। প্রত্যেক সমাজ হইতে কুল-পঞ্জিকায় উদ্ভব হইয়াছে কিন্তু কোন সমাজই পূর্ব্বাপর পুণ্ড্র জাতির সমাজের সংযোগসূত্র নিরবছিন্ন ভাবে প্রদান করিতে পারিবে না, ইহা অসম্ভব কখন যে সম্ভব হইবে ইহা বিশ্বাসও হয় না।

"Missing link" শত স্থানে বিদ্যমান। কেবল বর্ত্তমান জাতিবাচক পদ বা শব্দ দ্বারা বৈদিক যুগের সহিত সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে মাত্র। এই বিরাট পুণ্ড্রজাতিটি যে লোপ পায় নাই ইহা নিশ্চয়! কিন্তু তাহাদের বৈজ্ঞানিক ভাবে পরিচয় দিবার কোন উপায়ই নাই।

বিরাট পুণ্ড্রজাতি এক স্থানে আবদ্ধ নাই ইহা নিশ্চয়, ভারতের বহু স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—ধর্ম্মান্তর দ্বারা কত পুণ্ড্র ভিন্নাখ্যা ও ভিন্ন জাতি হইয়া গিয়াছে—তাহার ইতিহাস নাই।

যাহারা মূল কুলস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দেশান্তরে বাস করিয়াছে, তাহাদের সংখ্যার নির্ণয় অসম্ভব। তাহারা নিম্নেতর জাতি মধ্যে বিলীন হইয়াও গিয়াছে। যাহারা বর্ত্তমান আছে, তাহারা মূলধর্ম্ম ও জাতি এবং জাতিগত কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া সম্পূর্ণ পৃথকই হইয়া পড়িয়াছে।

পৌণ্ড্রক বাসুদেবের পর হইতে এই পুণ্ড্র জাতির রাষ্ট্রীয় প্রতাপ ইতিহাসে বা পুরাণে লিখিত হয় নাই। সম্ভবতঃ এই পুণ্ড্র জাতি আর রাষ্ট্রীয় শাসকরূপে দেখা দেয় নাই। দিলেও হয় তাহাদের ইতিহাস নাই, নয়

ভিন্নাখ্যা প্রাপ্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞেয় অবস্থায় সহস্র সহস্র বৎসর এই বঙ্গদেশে বাস করিয়া পৃথক জাতি, পৃথক সমাজবেষ্টনী দ্বারা আবদ্ধ হইয়া স্বতন্ত্রভাব গ্রহণ করিয়াছে।

একমাত্র কুলতন্ত্রের প্রভাবে এই সুপ্রাচীন জাতির নূতন পরিচয় বদ্ধমূল হইয়াছে। 'পুণ্ড্র জাতি যে আছে' একমাত্র গ্রন্থের প্রমাণ স্থলে কুলতন্ত্রই প্রধান।

কুলতন্ত্রকে অমান্য করিলে পুণ্ড্র জাতির অস্তিত্ব প্রমাণ অসম্ভব হইয়া যাইবে। কেবল উহারই প্রভাবে দ্বাপরান্তের পুণ্ড্রজাতিকে এই সহস্র সহস্র বৎসর পরে কুলতন্ত্রের প্রভাবে চিনিতে পারা যায়।

সহস্র সহস্র বৎসরের আবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তন প্রভাবে জাতিগত ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপী রাষ্ট্রীয় এবং ধর্ম্ম বিপ্লবের মধ্য দিয়া একটি জাতি অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় অবস্থান করিতে পারে না। পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।

পরিবর্ত্তননীতি প্রভাবে পুণ্ড্রজাতির পরিবর্ত্তন অসম্ভব নহে। বর্ত্তমানে এই জাতিই উড়িষ্যা ও ২৪ পরগণার শাস্তপর জাতি এবং পোদ বা পদ্য। বঙ্গে উহারাই পুণ্ড্র, পুণ্ডরী বা পুড়ারূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।

মালদহের পুণ্ডরী জাতি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত

ছোট পুণ্ড্র এবং বড় পুণ্ড্র ভেদে উত্তর-রাঢ়ে দুই শ্রেণীর পুণ্ডরী বিদ্যমান রহিয়াছে। বড় পুণ্ডরী এবং ছোট পুণ্ডরীর দুইটি সমাজ। বড় পুণ্ডরী আদৌ গৌড় বা পুণ্ড্রবর্দ্ধনবাসী। বগুড়ার পুণ্ড্রগণও মহাস্থান কেন্দ্রের পুণ্ড্রবর্দ্ধনবাসী। বাঙ্গালায় পুণ্ড্রগণ বঙ্গজ পুণ্ড্র, ইহারাও বহু পূর্ব্বে পুণ্ড্রবর্দ্ধনবাসী ছিল। কুলতন্ত্রে ইহারা 'বঙ্গজ পুণ্ড্র' আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছে।

বড় পুণ্ড্র গৌড় ও বরেন্দ্রবাসী—ছোট পুণ্ড্রগণ বীরভূম 'পাকুড়' হইতে আসিয়া এতদ্দেশের মুরশিদাবাদ এবং মালদহে বাস করে। সম্ভবতঃ বর্গীর হাঙ্গামার সময় বা রাষ্ট্রবিপ্লবে তাহারা মালদহে আসিয়াছে। সেই কারণেই মালদহের বড় ভাগের সহিত তাহাদের সমাজগত ভেদ রহিয়া গিয়াছে। তাহারা কুলতন্ত্রের হিসাবে 'দক্ষিণ রাঢ়ীয় পুণ্ড্র' এবং মালদহের বড় ভাগ উত্তর রাঢ়ীয় পুণ্ড্র।

সমাজ হিসাবে 'বড় ভাগ' 'ছোট ভাগ' হইতে পৃথক কিন্তু জাতিগত ভাবে পৃথক কখনই নহে।

বীরভূম ও মুরশিদাবাদবাসী পুণ্ড্রগণ দক্ষিণ রাঢ়ী। এই দক্ষিণ রাঢ়ীয় পুণ্ড্রগণ, মালদহের ছোট ভাগের সহিত অভিন্ন। ছোট ভাগ দক্ষিণরাঢ়ের পাকুড়ীয়া শাখার অন্তর্গত। মালদহে বাসনিবন্ধন দক্ষিণ রাঢ়ীয় পুণ্ড্রগণের সহিত—বীতসম্বন্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

রাজসাহী, নবদ্বীপ, বগুড়া প্রভৃতি জেলাবাসী পুণ্ড্রগণ 'বঙ্গজ-পুণ্ড্র' শ্রেণীর অন্তর্গত। নবদ্বীপ ও রাজসাহীর সহিত পারিপার্শ্বিক জেলাগত সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকায়, মালদহ ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় পুণ্ড্র সংশ্রব উক্ত জেলাদ্বয়ের সহিত অসংস্পৃষ্ট থাকিতে পারে।

নবদ্বীপ, বগুড়া, রাজসাহীর পুণ্ড্রগণ 'বঙ্গজ-পুণ্ড্র' শাখার অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হয়। কালসহকারে পারিপার্শ্বিক স্থান হইতে বিভিন্ন কারণে আগমনিগম হেতু একই জেলায় পৃথক পৃথক পুণ্ড্র সমাজের বিকাশ-সাধন হইয়াছে।

বাঙ্গালার সকল জেলাবাসী পুণ্ড্রগণের সহিত আদি কুলস্থান পুণ্ড্রবর্দ্ধনের সহিত

সম্বন্ধ বিজড়িত হইয়াই রহিয়াছে। জেলাগত, কালগত, এবং সমাজগত ভাবে তাহারা পৃথক হইয়া পড়িয়াছে।

মালদহের বড় পুণ্ড্র মধ্যে অনেকেই বরেন্দ্রবাসী ও গৌড়বাসী, বরেন্দ্রভূমে এখনও বড় পুণ্ড্রের বাস আছে এবং বরেন্দ্রস্থ ভাগন ও পুনর্ভবা তীরমধ্যস্থ ভূখণ্ড হইতে অনেকে দক্ষিণে আগমন করিয়াছে।

মালদহ, রাজসাহী, নবদ্বীপ, বীরভূম এবং মুরশিদাবাদের পুণ্ড্রগণের মধ্যে কৃষিই প্রধান।

মালদহের দুই শ্রেণীর পুণ্ড্র মধ্যে কুলীন মৌলিক ভাব বিদ্যমান আছে। রাজসাহী প্রভৃতি স্থানেও এই ভাব দৃষ্ট হয়।

উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী ও বঙ্গজপুণ্ড্র মধ্যে কুলীন মৌলিক ভাব এবং বংশগত মর্য্যাদা যথেষ্ট আছে। সামাজিক ভাবে তাহারা বহু কুলপ্রথা, সমাজ প্রথার নিয়ম পালনে বাধ্য।

মালদহের বড় থাকের মধ্যেই পরস্পর অন্ন গ্রহণ প্রচলিত নাই। ছোট থাকের মধ্যেও ঐ প্রকার দৃষ্ট হয়। জেলাগত পুণ্ড্র সমাজ মধ্যে এই প্রকারের ভেদনীতি বদ্ধমূল রহিয়াছে—"বার রজপুতের তের হাঁড়ী"—পুণ্ড্র জাতির মধ্যে দেখা যায়।

প্রত্যেক জেলায় পুণ্ড্র সমাজ মধ্যে বিভিন্ন রীতি নীতির প্রচলন থাকিলেও প্রায়ই এক রকম দেখা যায়।

বিবাহ চূড়াকরণ প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মমূলক সংস্কারগুলি সকল বঙ্গীয় পুণ্ড্র মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে।

পুণ্ড্রগণ পূর্ব্বে শাক্ত ও শৈব ধর্ম্মের আচরণ করিত, তৎপরে বৈষ্ণব ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলেও অদ্যাবধি কুলধর্ম্মানুসারে সকল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে গ্রাম্য-দেবতার পূজা প্রদান করিয়া থাকে। বিষহরি এবং মঙ্গলচণ্ডীর প্রাধান্য নিতান্ত বদ্ধমূল ছিল। বর্ত্তমানে বহুস্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে ইহা জাতীয় অধঃপতনের চিহ্ন নহে—জাতীয় ভাব রক্ষার চিহ্ন মাত্র, ইহা পরিত্যাগ করিলে প্রাচীন ভাবও সঙ্গে সঙ্গে ত্যাজ্য হইয়া যাইবে।

কেবল যে বাঙ্গালী পুণ্ড্র সমাজই বিষহরি এবং মঙ্গলচণ্ডীর পূজা ও উৎসবে এবং গীতে বিভোর হইয়াছিল তাহা নহে।

হিন্দু বাঙ্গালী মাত্রেই চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্ব্বে এবং সময়েও ঐ প্রকার বিষহরি মঙ্গলচণ্ডীর পূজার পক্ষপাতী ছিল।

"ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পাতুলি করয়ে কেহ দিয়া মহাধন॥"
* * * * (চৈতন্য ভাগবত)
"বাসুকী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।" (ঐ)

এই সকল ধর্ম্মভাব সাময়িক সার্ব্বজনীন্ কোন জাতিগত বা সমাজগত ভাব বিজ্ঞাপক নহে। কেবল যে পুণ্ড্রসমাজই উক্ত দেবীর পূজা করিত তাহা নহে বাঙ্গালী হিন্দু মাত্রেই কালধর্ম্মের বশে ঐ প্রকার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

মোটের উপর বাঙ্গালী পুণ্ড্রগণের ধর্ম্ম কর্ম্ম ও সংস্কার সাধারণ হিন্দু বাঙ্গালী হইতে বিভিন্ন নহে।

পুণ্ড্রজাতির কৃষি প্রধান

বাঙ্গালী পুণ্ড্রগণের কৃষিকার্য্যই যে প্রধান অবলম্বন তাহার আর সন্দেহ মাত্র নাই। এই জাতি বাঙ্গালায় 'নবশাখ' জাতির ন্যায় কৃষিকার্য্যই করিয়া থাকে, স্বহস্তে হলচালনায় কোন আপত্তি নাই। কৃষিকার্য্য এবং হলচালনা পরিত্যাগই যে উন্নত জাতির লক্ষণ তাহা নহে।

হিন্দু শাস্ত্রের মধ্যে কৃষি কার্য্য বৈশ্যজাতির কর্ম্ম মধ্যে গণ্য থাকিলেও, সেই কালেই শ্রেষ্ঠ বর্ণত্রয়ের মধ্যে কৃষিকার্য্য দেখা গিয়াছিল— শিল্প ও বাণিজ্যাপেক্ষা কৃষিকেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-গণ সর্ব্বপ্রথমে গ্রহণ করেন।

অন্ন-সংস্থানার্থ কৃষিকর্ম্ম দোষাবহ নহে, 'কৃষি পরাশর' নামক কৃষিশাস্ত্রে কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকার্জ্জনের ব্যবস্থা আছে। কালক্রমে কৃষিকার্য্য হীনকার্য্য মধ্যে পরিণত হইয়া দেশের দুরবস্থার চরম হইয়াছে।

দাসত্ব অতি নীচ কার্য্য, এই নীচ কার্য্য গ্রহণ দ্বারা সভ্য হওয়া অপেক্ষা স্বাধীন ভাবে কৃষি অবলম্বন করা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। হলচালনা ও কৃষি, দাসত্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং অন্যান্য হীন কর্ম্ম অপেক্ষা মূল্যবান্।

বাঙ্গালী পুণ্ড্রগণ কৃষি কর্ম্মোপজীবী ইহা তাহাদের জাতীয় লক্ষণ :—

"দাতা বলী হিতরত সুমনা দেব সেবকঃ।
কৃষি কর্ম্মোপজীবী চ ষড়বিধ পৌণ্ড্র লক্ষণম্॥"
(কুলতন্ত্র)

কুলতন্ত্রের রচনাকালে পুণ্ড্রজাতি কৃষি-প্রধান জাতি বলিয়া গণ্য ছিল। বর্ত্তমান কালে বঙ্গীয় পুণ্ড্রগণ মাত্রই কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। যদিও বাণিজ্য ও শিল্পকার্য্য উপেক্ষিত হয় নাই, তত্রাচ উহা নগণ্য বলিয়াই বোধ হয়।

রেশমকীট পালন

বাঙ্গালী পুণ্ড্রগণ মধ্যে কোন কোন জেলাবাসী পুণ্ড্রগণ রেশমকীট পালন আরম্ভ করিয়াছে। এ ব্যবসা তাহাদের জাতিগত ব্যবসা কি না বলা যায় না। তবে মালদহ, রাজসাহী, মুরশিদাবাদ, বীরভূম প্রভৃতি জেলার পুণ্ড্রগণ তুঁতের কৃষিসহ রেশমকীট পালন করিয়া থাকে।

রেশমসূত্রপ্রস্তুতকরণ

রেশমগুটি বা কোয়া (Cocoons) হইতে 'খাই' বা চর্কার সাহায্যে সূতা প্রস্তুত করে। এই প্রকার রেশমসূত্র-শিল্পকে "ঘাই কাটা" বলে। পুণ্ড্রিগণ ঘাই কাটে, এবং পলু (পীলু রেশমকীট) পোষে।

তাঁতের কার্য্য

পুণ্ড্র সমাজের মধ্যে তাঁতের কার্য্য অতি প্রবল ছিল। সকলেই তাঁত বুনিত। মটকা, মসরু, সূতী ও রেশমী বস্ত্র বয়ন দ্বারা জীবিকার্জ্জনের পন্থা আবিষ্কার করিয়াছিল। কার্পাস সূত্র হইতে তাঁত সাহায্যে বস্ত্রবয়ন অতি প্রাচীন আর্য্যগণের কার্য্য ছিল।

কৃষিকার্য্য মধ্যে তরিতরকারী ও শাক সব্জীর উৎপাদনে এই জাতি স্থান বিশেষে দক্ষতার পরিচয় দিয়া থাকে।

কলাবাগান, আমবাগান ও তরিতরকারীর ক্ষেত্রগুলি পরিপাটিরূপে দক্ষতার পরিচয় প্রদান করে।

মালদহের পুণ্ড্রগণ রেশমকীট পালনে তৎপর ও সুদক্ষ, রাজসাহী জেলার গুয়েপাড়া ও গঙ্গারামপুরের পুণ্ড্রগণ রেশমকীট পালন করে তত্রাচ তথায় কৃষি প্রধান। মুর্শিদাবাদের পুণ্ড্র সমাজ এবং বীরভূমির পুণ্ড্রগণও রেশমকীট পালন করে।

নবদ্বীপ, বগুড়া, বীরভূম, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় পুণ্ড্রগণ অপরাপর কৃষির সহিত মুখ্যভাবে তরিতরকারীর কৃষি করিয়া থাকে।

"In India also there are three sub-castes but they are here known as Beguna, Piyaza and Peto".

পিয়াজিয়া, বেগুণে ও পেটো পদবী কৃষি-গত, জাতিগত নহে। শান্তিপুরে অনেক

ব্রাহ্মণগণের মধ্যে গোঁজ, দড়া, উপাধি দৃষ্ট হয়—ইহা পরিহাস পদবী মাত্র।

"In Nadia they are vegetable growers and cultivators and believe that the growing of Vegetables was their original occupation" (Census Report. Page 425, Para 771; 1901 A. D.)

নবদ্বীপের পুণ্ড্র সমাজ একমাত্র কৃষিকার্য্য দ্বারাই জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে। ইহাই তাহাদের জাতীয় কর্ম্ম।

"Their (Pundaris) usual occupation in Malda is the cultivation of the mulberry plant and the rearing of silk-worms, but some are Zamindars, occupancy and not-occupancy raiyots and land less labourers".

সকল জেলানিবাসী পুণ্ড্রগণই কৃষিকে মুখ্যকার্য্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে। বর্ত্তমানকালের ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে পুণ্ড্র জাতির মধ্যে উকীল, মোক্তার, ও কেরাণীজীবী দৃষ্ট হইতেছে।

জমিদারের গোমস্তা, পাটোয়ার, নায়েবী প্রভৃতি কার্য্যও ইহারা করিয়া থাকে। বীরভূমের পুণ্ড্রগণের মধ্যে জমিদার, রেশম কুঠিয়াল ও আড়তদার অনেকেই আছে। বীরভূমের মধ্যে শিক্ষিত লোক যত, অন্য জেলায় পুণ্ড্রগণের মধ্যে তত দৃষ্ট হয় না। মালদহের মধ্যে উকীল, মোক্তার, সব্‌এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন হইয়াছে, কেহ কেহ কেরাণীর কাজও করে।

পুণ্ডরিগণের উপাধি

বাঙ্গালার পুণ্ড্রগণের মধ্যে 'দাস' উপাধিই অধিক, কিন্তু মণ্ডল, চৌধুরী, সাহাতন, সরকার পুরকাৎ, সাহ, বারিক, প্রামাণিক, সরকার প্রভৃতি উপাধিও দৃষ্ট হয়।

পুণ্ড্রজাতির গোত্র সংখ্যাও বহু, বোধ হয় সর্ব্বশুদ্ধ আশী প্রকার গোত্র সংখ্যায় হইবে। প্রত্যেক জেলাবাসী পুণ্ড্রগণের মধ্যে এই সকল গোত্রের লোক দৃষ্ট হয়।

"In Malda there are five exogamous gotras, Chandra Rishi, Ala Rishi, Mug Rishi, Tula Rishi and Kashyapa Rishi, said to be named after the spiritual guides of the original families from whom the present, members of the caste claim descent."

(C. Rept. 1901, Page 425, Para 771)

মালদহবাসী পুণ্ড্রগণ মধ্যে বড়ভাগ পুণ্ড্রগণ, দরখাস্ত দ্বারা তাহাদের জাতিতত্ত্ব সম্বলিত কুলপঞ্জিকা প্রদান কালে কেবল মাত্র পাঁচটি গোত্রের উল্লেখ করিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়।

চন্দ্র ঋষি, আলা ঋষি, মুগ ঋষি, তুলা ঋষি এবং কাশ্যপ ঋষি এই পাঁচটি গোত্রের মাত্র নাম করিয়াছিল। বাস্তবিক পাঁচটি গোত্র নাই—গোত্র অনেক আছে, মালদহের পুণ্ড্র অধ্যায়ে সকল গোত্রের নামোল্লেখ করা হইবে।

ঐ পাঁচ গোত্র কেবল মাত্র কয়েকটি সম্ভ্রান্ত পুণ্ড্র পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ রহিয়াছে।

ছোট থাক পুণ্ড্রকে বাদ দিয়া সম্ভবতঃ এই আবেদন পত্র লিখিত হইয়াছিল, কারণ বড় থাক তাহাদিগকে স্বজাতি বলিয়া স্বীকার করে নাই। গোত্রের নামোল্লেখ ব্যাপারে ইহাই উপলব্ধি হইতেছে।

পরবর্ত্তী সেনসস্ কালে আমি মালদহে উপস্থিত ছিলাম, তৎকালে ছোট ও বড় থাক গণ আবেদন করিয়াছিল। ১৯০১ সালের রিপোর্ট মধ্যে বড় থাক আপনাদিগকে 'পুণ্ড্র' এবং ছোট থাককে পুণ্ড্রীক এবং অপর জেলার জনগণকে 'সুপুণ্ড্র' নাম প্রদান করিয়াছিল।

"Their endogenous groups are reported from Malda viz. Pundra, Poundrik and Supundra. The first two it is said, are found in Malda and the third in Birbhum." (Ibid)

মালদহের পুণ্ড্রগণ যে দরখাস্ত করিয়াছিল তাহা প্রকৃত নহে। সমাজগত এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনই ইহার উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়।

মালদহ বা উত্তররাঢ়ীয় এবং দক্ষিণ রাঢ়ীয় পুণ্ড্রগণ মধ্যে উত্তররাঢ়ীয় বড়ভাগ এবং দক্ষিণ রাঢ়ীয় ছোট থাক পুণ্ড্র বাস করে।

এমন কোন প্রমাণ বিদ্যমান নাই যদ্দ্বারা বড় ভাগই 'পুণ্ড্র' এবং ছোট ভাগ 'পৌণ্ড্রিক' এবং দক্ষিণরাঢ়ী বীরভূমবাসী ক্ষত্রিয়গণ 'সুপুণ্ড্র' নামে পরিচিত হইতে পারে।

এই প্রকার বলিবার উদ্দেশ্য—বানেয় ক্ষত্রিয়গণই 'পুণ্ড্র', এবং ইহারা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে দ্বারপাল কর্ত্তৃক যজ্ঞস্থলে গমনে বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। ইহারা আদি পুণ্ড্র বংশীয়। ইহা ভ্রম মাত্র।

দ্বিতীয় পৌণ্ড্রক বাসুদেব বংশীয়; বর্ত্তমান ২৪ পরগণার পদ্যরাজগণ এই বংশীয় বলিয়া দাবী করিতেছে।

পুণ্ড্রিক বা পুণ্ডরীক বাসুদেব-বংশ আদি পুণ্ড্র নহে, দ্বাপরান্তে বাসুদেব পুণ্ড্রদেশের রাষ্ট্রপতি হইয়া ঐ পুণ্ডরীক বাসুদেব আখ্যা পাইয়াছিলেন। মালদহের ছোট থাককে ভ্রম ক্রমে ঐ 'পুণ্ডরীক' বেষ্টনীর মধ্যে ধরা হইয়াছে।

এই স্থলে ছোট থাকের প্রতি একটু সহানুভূতি প্রদর্শন করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

"পৌণ্ড্রিকাঃ কুক্কুরাশ্চৈব শকাশ্চৈব বিশাম্পতে।
অঙ্গা, বঙ্গাশ্চ পুণ্ড্রাশ্চ শাণবত্যা গয়াস্তথা॥
সুজাতয়ঃ শ্রেণিমন্ত শ্রেয়াংসঃ শস্ত্রধারিণঃ।
আহর্ষুঃ ক্ষত্রিয়া বিত্তং শতশোঽজাত শত্রবে।"
(ভারত-সভা ৫২ ১৬-১৭)

উত্তর পুণ্ড্রদেশবাসী 'পৌণ্ড্রিক' এবং পুণ্ড্রবর্দ্ধনবাসী 'পুণ্ড্র' অপরাপর সুজাতি, গোষ্ঠিমন্ত, শ্রেষ্ঠ ও শস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়গণের ন্যায় যুধিষ্ঠিরের জন্য শত শত ধন আহরণ করিয়াছিলেন।

পুণ্ড্র এবং পৌণ্ড্রিক শ্রেণী এই প্রকারে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। পুণ্ড্র মূলতঃ বানেয় ক্ষত্রিয়—ইহারাই পুণ্ড্রদেশের প্রতিষ্ঠাতা। ইহা সত্যযুগান্ত কালের কথা।

দ্বাপরান্তে—পৌণ্ড্রিক বা পুণ্ডরীক বাসুদেব পুণ্ড্রদেশের নরপতি হইয়াছিলেন। ইনি মহামতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা—পুণ্ড্রদেশে বাস নিবন্ধন পুণ্ডরীক বা পৌণ্ড্রিক আখ্যালাভ করিয়াছিলেন।

বানেয় পুণ্ড্র অপেক্ষা এই বংশ পরবর্ত্তী কালের, এবং পুণ্ড্রদেশের উত্তরাংশের নিবাসী বলিয়া বিশ্বকোষে লিখিত আছে। বাস্তবিক ছোট ভাগ দক্ষিণরাঢ়ী সমাজ, বড় ভাগই উত্তরাগত।

বীরভূমবাসিগণকে সুপুণ্ড্রক বলা হইয়াছে বাস্তবিক তাহারা দক্ষিণ রাঢ়ীপুণ্ড্র।

"বঙ্গাঃ কলিঙ্গাঃ মগধা স্তাম্রলিপ্তাঃ সুপুণ্ড্রকাঃ।
দৈবালিকাঃ সাগরকাঃ পত্রোর্ণাঃ শৈশবাস্তথা॥"
(সভা—৫২।১৮)

'সুপুণ্ড্রকা' দাক্ষিণাত্যবাসী এবং ইহারাই যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞস্থলে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং পুণ্ড্র এবং পৌণ্ড্রিক শ্রেণী হইতে অবশ্য হীন হইবারই কথা। কিন্তু কয়েকটি সুসজ্জিত হস্তী দিয়া দ্বারপ্রাপ্ত হন।

ছোট ভাগ মালদহের পুণ্ড্র সমাজের উত্তরবাসী, পুণ্ড্রগণ মধ্যবাসী এবং বীরভূম পুণ্ড্রদেশের দক্ষিণ সুতরাং তথাকার অধিবাসিগণ 'সুপুণ্ড্রক' হইবারই কথা। এই ক্ষুদ্র ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই এই প্রকার শ্রেণীভেদ হইয়া থাকিবে। 'সুপুণ্ড্রক' জাতি যদি থাকে তাহা হইলে তাহারা 'ওড্র-পুণ্ড্র' হইবারই সম্ভব।

এই সকল উচ্চ নীচ ভেদ জ্ঞান সমাজগত হইলেও সমীচীন নহে। আপন আপন সমাজে সকলেই শ্রেষ্ঠ।

স্থূলতঃ বলিতে হয় কোন্ সমাজ পৌণ্ড্রিক, কোন্ সমাজ পুণ্ড্র, এবং কোন সমাজ 'সুপুণ্ড্র' তাহার আদৌ ইতিহাস নাই।

বর্ত্তমানকালে ঐ প্রকার ত্রিপুণ্ড্রের ভেদাভেদ ও উচ্চ নীচ ভাব কেবল কল্পনামাত্র। কুলতন্ত্রের মত বর্ত্তমানে গ্রহণ করিতেই হইবে—ইহা বর্ত্তমান পুণ্ড্রসমাজের পরিচয় জ্ঞাপক একমাত্র মৌলিক গ্রন্থ।

কুলতন্ত্রের মতে পুণ্ড্র, পৌণ্ড্রিক ও সুপুণ্ড্রের কোন কথাই নাই। উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় বঙ্গজ এবং ওড্র শ্রেণীর কথা আছে মাত্র।

সুতরাং বর্ত্তমান বাঙ্গালী পুণ্ড্রমধ্যে উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, বঙ্গজ এবং মিশ্র ওড্র শ্রেণীই দৃষ্ট হইতেছে। ইহার অতিরিক্ত কোন কথাই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না।

গোত্র, সমাজ ও জাতি সম্বন্ধে পুণ্ড্র সমাজ পূর্ব্বে কোন আলোচনাই করে নাই, বর্ত্তমানে যাহা হইতেছে তাহা স্বার্থ বিজড়িত থাকায় ঐতিহাসিক ভিত্তি দৃঢ়ভাবে গড়া হইতেছে না।

জাতিগত ভাবে উচ্চ নীচ শ্রেণীর সৃষ্টি করা বর্ত্তমানে অসম্ভব কিন্তু সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করিবার প্রয়াস তর্ক ও যুক্তির বহির্ভূত।

একেত ঐতিহাসিকগণ পুণ্ড্রজাতির অস্তিত্বেই সন্দেহ করেন। আদম সুমারির রিপোর্টেও সেই কথা ছত্রে ছত্রে পত্রে পত্রে দৃষ্ট হয়। এমত স্থলে পুণ্ড্র, পৌণ্ড্রিক ও সুপুণ্ড্র শ্রেণীর কল্পনা হাস্যকর বলিয়াই উপলব্ধি হইবে।

দ্বাপরান্তে, এই চারি পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, পুণ্ড্র জাতির যে শ্রেণী বিভাগ ছিল, বর্ত্তমানে তাহার অস্তিত্ব উপলব্ধিই দুরূহ। চারি হাজার বৎসরের ইতিহাস যে জাতির অন্ধকার—সে জাতিকে ঐ প্রকার পৌরাণিক এবং বৈদিক বিভাগে বিভাগ করা অসম্ভব। সে চেষ্টার প্রয়োজনই বা কি? আমরা পুণ্ড্র আমাদের পূর্ব্ব বাসস্থান পুণ্ড্রদেশ আমরা বাঙ্গালী ক্ষত্রিয়—ইহাই কি যথেষ্ট নয়? আমরা সেই জাতি ইহার আবার প্রমাণ কি দিব।—আমরা সেই জাতি ইহাই জানি।

কুলতন্ত্রের মত গ্রহণ দ্বারা পুণ্ড্র জাতির সমাজ ও জাতি মীমাংসা মাত্র সম্ভব, নচেৎ আর অন্য উপায় নাই। পুণ্ড্র জাতি এক, কেবল—উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ী, বঙ্গজ ও ওড্র নামে শ্রেণীভেদ আছে মাত্র। আমরা সকলে এক জাতি।

পুণ্ড্র জাতি কোন্ বর্ণের—আলোচনা অধ্যায়ে তাহার যথাসাধ্য বিবরণ প্রদত্ত।

হইবে। জাতিমালায় বচনগুলিরও মীমাংসার প্রয়োজন হইবে।

মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বগুড়া, নদীয়া, ভূষণা, পূর্ব্ববঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ, উৎকল যেখানেই যে নামে পরিচিত থাকুক্ না কেন—কেহ পুড়া, কেহ পুণ্ডরী, কেহ পদ্ম, কেহ পোদ বলিয়াই নামকরণ করুক্ না—মোটের উপর এই বঙ্গোড্রবাসী পুণ্ড্রগণ এক জাতি।

শ্রীহরিহাস পালিত।

সমাজ প্রসঙ্গ—পণপ্রথা

আবার সেই কথা—পণপ্রথা! স্নেহলতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে আলোচনাটি যেমন রসপূর্ণ বোধ হইয়াছিল, এখন আর তেমন হয় না। পুরাতনের দোষই এই! তথাপি এই আলোচনার বিরাম নাই। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, সে সকল কথা আর না বলাই ভাল। বলিলেই বা শুনিবে কে? পূর্ব্বে পণপ্রথার বিষয়ে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহা তাহার কুফল বুঝিয়া। এখন সেই সকল কথা পাল্টাইয়া বলিতে গেলে অনেক পাঠকই নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিবেন, "আবার সেই কথা—পণপ্রথা!"

যিনি তাঁহার পাশ-করা ছেলেকে কত পণে কন্যাকর্ত্তার হাতে ছাড়িয়া দিতে পারা যায় এ বিষয়ে গোপনে দিবারাত্র গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও বলিবেন, "পণপ্রথার উচ্ছেদসাধন ব্যতীত আমাদের মঙ্গল নাই।" সুতরাং পণপ্রথার কুফল সমাজকে বুঝাইতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। যে প্রথায় অমঙ্গল ব্যতীত মঙ্গল নাই, যে প্রথায় আমরা মানুষ হইয়াও মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছি, যে প্রথার উচ্ছেদসাধন ব্যতীত আমাদের উন্নতি লাভ অসম্ভব, সেই কুপ্রথাকে আমরা পরম স্নেহে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া আছি কেন? নৈতিক অবনতি ইহার একমাত্র কারণ। পানাসক্ত ব্যক্তি জানে মদ খাইলে মানুষকে কিরূপ লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ করিতে হয়, তথাপি সে মদ খায়। আমাদেরও অবস্থা এইরূপ হইয়াছে সেইদিন, যেদিন আমরা হিন্দু সমাজের নাম দিয়াছি "বাঙ্গালী সমাজ"। আজ অশান্ত ইয়ুরোপ বংশরক্ষার জন্য সাজাত্যবৃদ্ধির জন্য চিরন্তন যে সকল আচার নিয়ম রক্ষায় অসমর্থ হইয়াছে, শান্ত হিন্দু আমরা সেই আদর্শে সমাজ গঠন করিয়া সংস্কারের নামে সংহারে উদ্যত হইয়াছি। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর ধর্ম্মরক্ষাই কাম্য। ধর্ম্মে আঘাতের ফলে যে সংস্কার হিন্দু তাহাতে কর্ণপাত করিবে না, ইহাই হিন্দুর অন্তরের কথা। বাহিরের অশান্তি হিন্দু সমাজে অন্তরের ভাবের কাছে পৌঁছিতে পারে না। এই জন্যই বিধবা বিবাহ সমাজ সংরক্ষণের পক্ষে আমরা যতই মঙ্গলজনক মনে করি না কেন, প্রস্তাবটি অন্তরে প্রবেশ করিলেই কেমন একটা অশ্রদ্ধার ভাব জাগিয়া উঠে,—প্রবল হইতে প্রবলতর যুক্তির ছাপ সেখানে লাগে না। জাতীয় সংস্কারের ইহাই বিশেষত্ব। ঝড় উঠিলে নদীর জল নাচিয়া উঠে—উপরে, নীচে তাহা একই ভাবে বহিয়া যায়। সমাজের স্রোত এই ভাবেই বহি-

তেছে। হিন্দুসমাজ অবিশ্রান্ত ঝড়-তুফানে পরিবর্ত্তনের পথে চলিয়াছে, উদ্ভ্রান্তভাবে ছুটিয়াছে,—বাহিরের বেশ বদলাইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার মূল প্রকৃতি একচুলও এদিকে বা ওদিকে যায় নাই, যতদিন পর্য্যন্ত একজনও প্রকৃত হিন্দুর অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন যাইবে না।

পণপ্রথার সমর্থনের জন্য এ সকল কথা বলিতেছি না। কিরূপে এই কুপ্রথা হিন্দু সমাজের হাড়ে-মাসে জড়িত হইয়াছে, তাহারই আভাস দিতেছি মাত্র। পণপ্রথার বিরুদ্ধে যত রকমের অকাট্য যুক্তির অবতারণা করা যাউক, এই প্রথার উচ্ছেদসাধন কিরূপে অসম্ভব হইয়াছে, তাহাই বলিব।

পণপ্রথার উচ্ছেদসাধনের অন্তরায় কি? প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে, সালঙ্কারা কন্যা দানের ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে। বসনভূষণে সাজাইয়া গুছাইয়া যৌতুকসহ কন্যাদান পূর্ব্বেও ছিল। ছিল না কেবল অসমর্থ কন্যা কর্ত্তার উপর পাত্রের পিতার অযথা জুলুম। কিন্তু এই জুলুমের জন্য দোষী কে? ধনী ও দরিদ্র লইয়াই সমাজ। সমাজে ধনীর সংখ্যা কম, দরিদ্রের সংখ্যা বেশী। দরিদ্র চাহে সামাজিক আচার-ব্যবহারে ধনীর পার্শ্বে দাঁড়াইতে, কিন্তু ধনী মুখে কোন কথা না বলিলেও পিছাইয়া সরিয়া দাঁড়ায়। এই ভাবে বংশগত সম্মানের পরিবর্ত্তে ধনগত সম্মানের আদর এযুগে বাড়িয়াছে। বংশগত সম্মানও এযুগে একেবারে যায় নাই। ক্রিয়া-কলাপে পংক্তিভোজন কালে ধনীরা স্বজাতীয় দরিদ্রদের সহিত এখনও মিশিয়া থাকেন, দরিদ্রের টানা হুঁকায় দুইটান দিয়া উদারতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে বিরত হ'ন না; কিন্তু পরবর্ত্তী ব্যবহারেই সপ্রকাশ হয়, এতখানি নীচতা তাঁহাদের মধ্যে নাই, যে, সকল সময়েই তাঁহাদিগকে দরিদ্রদের সহিত তুল্য-রূপে ব্যবহার করিতে হইবে,—হইল বা সে স্বজাতীয়, বংশগত "প্রেষ্টিজ" (মর্য্যাদা)টা কোন মতেই যে নষ্ট করা যায় না! সকল ধনীই পুত্রের বিবাহে মোটা রকমের যৌতুক ল'ন না, কিন্তু মাত্র কুল ও শীল দেখিয়া কয়জন ধনী দরিদ্রের কন্যাকে পুত্রবধূরূপে পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা ধনীরাই হিসাব খতাইয়া দেখিতে পারেন। গভীর নৈরাশ্যে অশ্রু মোচন করিয়াও দরিদ্ররা আকাশকুসুম পাইবার জন্য ব্যস্ত। হইলাম বা দরিদ্র, তাহা বলিয়াই মেয়েটাকে গলায় দড়ি বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দিতে ত পারি না—দরিদ্র কন্যা-কর্ত্তার অন্তরের কথা ইহাই। ধনীরাও এই সুযোগে নিজের অযোগ্য পুত্রকেও নীলামে চড়াইয়া দেন। এ সম্বন্ধে আমি সম্প্রতি "ব্রাহ্মণ সমাজ" পত্রিকায় "ব্রাহ্মণ সমাজ" শীর্ষক প্রবন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন বোধ করি।

এখন দেখিতে হইবে বরপণরূপ সমাজের ব্যাধি দূর করিবার জন্য কোন্ বৈদ্য কিরূপ ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছেন, এবং সেই সেই ঔষধ প্রয়োগে সুফল প্রসূত হইতে পারে কি না। ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা অনেকেই করিয়াছেন, কাহারও ব্যবস্থাপত্র অসার প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা আমার মত অ-বৈদ্যের পক্ষে শোভন নহে; বিশেষতঃ ব্যবস্থাপত্রে দোষ বাহির হইলেও, যে ব্যবস্থার মূলে সাধু সঙ্কল্প বিদ্যমান, তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু উদ্দেশ্য সাধু হইলেও সুফল সহজে পাওয়া যায় না, এবং কুফল ফলিলে উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হয়। ফলাফলের দিকে লক্ষ্য করিয়াই এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

শ্রাবণের প্রবাসীর "বিবিধ প্রসঙ্গে" "বরপণ" প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে, "**পুরুষ ও নারীর পরস্পরকে জানিয়া চিনিয়া ভালবাসিয়া বিবাহ করা চাই।** এরূপ বিবাহ ভারতবর্ষে নাই বা চলিবে না, ভাবিয়া, আঁৎকিয়া উঠিলে চলিবে না। এরূপ আদর্শ বিবাহ আগে ভারতবর্ষে কোন কোন স্থলে হইত; পাশ্চাত্য দেশেও অনেকস্থলে হয়, কিন্তু সকল স্থলে নয়। **বরপণ ও কন্যাপণ-রূপ নীচতা ও বর্ব্বরতা নাশের ইহাই এক মাত্র অমোঘ অস্ত্র।** এই অস্ত্রলাভ ও প্রয়োগ করিবার জন্য সকল সমাজের লোক প্রস্তুত ও অগ্রসর হউন।"

বর্ত্তমান যুগে প্রবাসী সম্পাদক মহাশয়ের ন্যায় চিন্তাশীল লেখক এবং নির্ভীক সমালোচক বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে অতিবিরল, সুতরাং তাঁহার প্রত্যেক কথাই ভাবিয়া দেখা উচিত।

তিনি যে "পুরুষ ও নারীর পরস্পরকে জানিয়া চিনিয়া ভালবাসিয়া" বিবাহ করিবার ব্যবস্থা দিতেছেন, তাহা আমাদের সাধ্যের সীমার মধ্যে আছে কি না, আগে তাহাই দেখিতে হইবে।

হিন্দুরা এই ব্যবস্থাকে হাসিয়া উড়াইবার চেষ্টা করে কেন? যে কোন ব্যবস্থা—প্রাচ্যই হউক আর পাশ্চাত্যই হউক—সুফল প্রসব করে, তাহাই সর্ব্বজন গ্রাহ্য। কুইনিন জ্বরের মহৌষধ, কিন্তু সকল রকমের জ্বরেই ডাক্তাররা কুইনিনের ব্যবস্থা করেন না। রোগীর অবস্থা এবং রোগের গতি দেখিয়াই ঔষধের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার করিতে হইলে সমাজের গতি ও সমাজভুক্ত ব্যক্তিবর্গের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে হইবে।

বর্ত্তমান কালে হিন্দু সমাজের অবস্থার কথা বলিতে হইলে, অনেক গুপ্ত রহস্য বাহির হইয়া পড়িবে। শতসহস্র লোক লইয়া যে সমাজ, সেই সমাজে প্রকৃত কর্ম্মীর অভাব। আঁতি পাঁতি খুঁজিলে চরিত্রবান, ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি কয়জন পাওয়া যায়? ঘরে ভাত নাই, হৃদয়ে বল নাই, মস্তিষ্কে প্রতিভা নাই, অথচ "ধামবড়" লোকের সংখ্যা হুবহু বাড়িয়া উঠিতেছে। বাহিক বেশবিন্যাসে আমরা ভদ্রলোক সাজিয়াছি। ধর্ম্মের কথায় শ্রোতৃগণকে মুগ্ধ করিবার ক্ষমতা আমাদের মধ্যে অনেকেরই আছে, কিন্তু ধর্ম্মপথে চলেন কয়জন? ধর্ম্ম কোশাকুশির মধ্যে নাই, তুলসী কাষ্ঠের মালার মধ্যে নাই, টিকির মধ্যেও নাই। যাহাতে আত্মার প্রসার বাড়ে, পরকে নিজের বলিয়া ভাবিবার শক্তি আসে, সংযম শিক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম্ম। বর্ত্তমান অবস্থায় পুরুষের দেহের মনের হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনের পথ রুদ্ধ হইয়াছে। নারীদের ত কথাই নাই,—তাহারাও সকল কাজেই পুরুষের মুখাপেক্ষী সমাজের এই দুর্দ্দিনে একটা কথা মনে জাগিতেছে—নয় মণ তেলও পুড়িবে না, রাধাও নাচিবে না!

পুরুষ ও নারীর পরস্পরকে জানিয়া চিনিয়া ভালবাসিয়া বিবাহ করিলে বরপণ ও কন্যাপণ রূপ নীচতা ও বর্ব্বরতা অপেক্ষাকৃত সহজে বিনষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্তু এ বাজারে যথার্থ ভালবাসার প্রতিষ্ঠান অসম্ভব। রূপের নেশা ও ধনের মোহ যে সমাজের অঙ্গভূষণ, জানিয়া চিনিয়া ভালবাসিয়া বিবাহ করিবার সুযোগ পাইলে সে সমাজে জাতি বিচার

উঠিয়া যাইবে। কারণ, এই সুযোগে ব্রাহ্মণের কন্যা শূদ্রের পুত্রের রূপে, ধনে, ব্যবহারে বা আর কিছুতে মুগ্ধ হইয়া ভালবাসিবে না, এমন কোন যুক্তি নাই। জাতি বিচারই যে সমাজের ধর্ম্ম, সেই সমাজভুক্ত কোন ব্যক্তিই এই জন্য এই প্রস্তাবের সমর্থন করে না। এই রকমের প্রস্তাব শুনিলে একাকারের আশঙ্কায় হিন্দুরা ত আঁৎকিয়া উঠিবেই। যে সমাজে জাতি বিচার নাই, এই ভাবের বিবাহ পদ্ধতিতে সে সমাজ উপকৃত হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু হিন্দু সমাজের পক্ষে ইহা সংস্কার নহে—সংহার।

প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় এক স্থলে বলিয়াছেন, "দেখা যাইতেছে, যে ছেলে ইংরেজী শিখিয়া যত পাস করে বিয়ের বাজারে তাহার দর তত চড়া হয়।" কথাটা খুবই সত্য। তাহার পর তিনি বলিয়াছেন, ইংরেজি জানা ছেলের সংখ্যা দেশে বড় কম। তাহাদের সংখ্যা বাড়িলে কাজে কাজেই দরটা কমিতে পারে।" যত গোল ঐখানে। ইংরেজি জানা ছেলের সংখ্যা বাড়িলে দেশের গৌরব বাড়িবে সন্দেহ নাই, কিন্তু সমাজ তাহাতে কি পরিমাণে উপকৃত হইবে, চিন্তার বিষয়।

দেখা যাইতেছে, ইংরেজি লেখাপড়া শিখা আজ কাল চাকুরীর জন্য। ইংরেজি জানা অল্প সংখ্যক ছেলেরাই চাকুরীর বাজার যে রকম গরম করিয়া তুলিয়াছে, ইহার চতুর্গুণ ছেলে ইংরেজি জানা হইলে চাকুরীর বাজার একেবারে "লাল" হইয়া উঠিবে। বিশ বৎসর পূর্ব্বে কেহ বি-এ পাস করিলে ডেপুটিগিরি পাইবার আশা করিতেন, এখন বি-এ পাস করিয়া অনেকের ভাগ্যে কেরানীগিরিই জুটে না। ফলে অনেকে বি-এল পাস করিয়া কেহ কেহ ছয় মাসে গাউনের খরচই তুলিতে পারেন না। শিক্ষা বিভাগেও উপযুক্ত আদর নাই। পাঠ্যাবস্থায় দরিদ্র পিতার কষ্টার্জ্জিত অর্থ প্রচুর পরিমাণে ব্যয় করিয়া শেষে চল্লিশ টাকার ইস্কুল মাষ্টারিতে জীবন অতিবাহিত করিতে হইতেছে। অনেকে আবার স্বল্প বেতনে জমিদারের ঘরে ইন্সপেক্টর, সার্কেল-অফিসার, নায়েব ইত্যাদি পদ লাভ করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেটের সঙ্গে সুপারিস পত্র সংগ্রহ করিয়া দরখাস্ত পেশ করিতেছেন। পদ একটি, উমেদার অনেক; কাজেই অনেককে হতাশার দীর্ঘ শ্বাস সম্বল করিয়া ঘরে ফিরিতে হইতেছে। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ইহাই।

তাহার পর ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যতে ইংরেজি জানা ছেলের সংখ্যা যত বাড়িবে, পাত্রের বাজার দর তত কমিবে। অর্থাৎ এখন যে টাকায় ম্যাট্রিকুলেশন্ পাস-করা পাত্র পাওয়া যায়, কালে সেই দর হইবে বি-এ পাস-করা পাত্রের। কিন্তু তাহাতে পণ প্রথার উচ্ছেদ সাধন কিরূপে হইবে! মেয়েটির ভরণ পোষণের কোনরূপ কষ্ট না হয়, ইহা ভাবিয়াই কন্যাকর্ত্তা সাধারণতঃ পাত্র নির্ব্বাচন করেন। অর্থাৎ পাত্রের উপার্জ্জনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই কন্যাকর্ত্তা দর যাচাই করেন। সুতরাং শিক্ষাবিস্তারের ফলে ম্যাট্রিকুলেশন্ হইতে এফ-এ, এফ-এ হইতে বি-এ, বি-এ হইতে এম-এ—ক্রমশঃ উর্দ্ধদিকে সাধারণ গৃহস্থ কন্যাকর্ত্তাদিগের লক্ষ্য পড়িবে। সাধারণ গৃহস্থরা অর্থাৎ মধ্যবিত্ত গৃহস্থরা সমাজকে যে দিকে চালাইতেছেন, সমাজ সেই দিকেই চলিতেছে।* সুতরাং দেখা

* খুব ধনী এবং খুব দরিদ্র এই সমস্যার বাহিরে আছেন। ধনীরা পণ বলিয়া যাহা লন বা দেন, তাহা

যাইতেছে, ইংরেজি জানা ছেলের সংখ্যা বাড়িলেই পণ প্রথার কঠোরতা হ্রাস হইবে, এরূপ আশা নাই।

"কন্যারা চলিত আইন বা সামাজিক রীতি অনুসারে যদি পিতার ধনের আংশিক উত্তরাধিকারিনী হইত, তাহা হইলে বরপক্ষ পণের জন্য হয়ত এত কষাকষি করিত না।" অনুমান মাত্র। তাহা হইলে পণপ্রথা সাধারণতঃ টাকার আকারে না দাঁড়াইয়া জমি, বাড়ী জমিদারী এবং কোম্পানির কাগজের আকারে দাঁড়াইত মাত্র।

স্ত্রীজাতির দিক্ দিয়া দেখিলে ইহা ভাল; পুরুষ জাতির দিক্ দিয়া দেখিলে ইহা মন্দ। ইহাতে সাম্যে বৈষম্যের সৃষ্টি হইবে। এ ব্যবস্থাতেও পুত্রের পিতারই লাভ, কন্যার পিতার অবস্থা—দা'র উপর কুমড়া, অথবা কুমড়ার উপর দা!—পরিণাম ফল একই। স্ত্রীধনেএখন স্বামীর কোনই অধিকার নাই—আইনের কথা বলিতেছি। তথাপি যে সমাজে বিবাহিতা কন্যার অলঙ্কার বেচিয়া খাইবার প্রলোভন আছে, সে সমাজে কন্যা অর্থের পরিবর্ত্তে ভূসম্পত্তি আনিলে তাহাও ছলে, বলে বা কৌশলে ষোল কড়াই কাণা হইবে না, বলা যায় না। পুত্রের পিতার বা অন্য অভিভাবকের এবং জামাতার অভাব মোচন ও স্বভাব পরিবর্ত্তন না হইলে কন্যার সুখের কল্পনা নিষ্ফল। পিতার ঐশ্বর্য্যে কন্যা অংশতঃ ঐশ্বর্য্যশালিনী হইয়া পতিগৃহে আসিলে বহুবিবাহের পথ অনেকখানি রুদ্ধ হইতে পারে। বহুবিবাহের জন্য দোষী প্রধানতঃ কুলীনরা, কিন্তু আজকাল অনেক ধনশালী ব্যক্তি কুলীনদিগকে তাহাদের এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেছেন। বহুবিবাহের দোষ আর যাহাই থাকুক, ইহাতে পণের কষাকষি নাই!

অধিকন্তু এ ব্যবস্থায় অনেক বড় ঘর ফেরার হইবে। ধনিনী তথা মানিনী পত্নীর হাতে দরিদ্র পতির লাঞ্ছনার আশঙ্কা নাই, এমন কথাও বলা যায় না; কারণ—বর্ত্তমান শিক্ষার দোষেই হউক, বা অন্য কিছুতেই হউক—পূর্ব্বের আদর্শে পতিপরায়ণা রমণীর সংখ্যা এ বাজারে বড়ই অল্প। এই প্রকারের রমণী পিতৃধনে ধনিনী হইলে সমাজে বিবাহবন্ধন উচ্ছেদ প্রথার সৃষ্টি হইবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে। এই সকল কারণে মনে হয়, কন্যা চলিত আইন বা সামাজিক রীতি অনুসারে পিতার ধনে আংশিক উত্তরাধিকারিণী হইলে সমাজে শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তির সৃষ্টি হইবে।

তাহার পর কন্যাকে বেশী বয়স পর্য্যন্ত কুমারী রাখিলে কি হয়, দেখা যাউক।

এইরূপ ব্যবস্থায় পণপ্রথা অচিরাৎ উঠিয়া যাইতে পারে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু কিসের বিনিময়ে? এই ব্যবস্থায় সমাজে যে অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতার মাত্রা বাড়িবে তাহা রোধ করিবার উপায় কি? অল্প বয়সে মেয়ের বিবাহ দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য—দেশপ্রচলিত কথায়—"কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করবে ট্যাঁস ট্যাঁস।" একান্নবর্ত্তী পরিবারের সুখশান্তি বিধানের জন্য হিন্দু সমাজে যে সকল আচার নিয়ম অনুষ্ঠিত হয়, বাল্যবিবাহ প্রথা তাহাদের

তাহাদের খোসমেজাজের পরিচায়ক মাত্র। দিলেও কোন কথা নাই, না দিলেও কোন কথা নাই। আর যাহারা খুব দরিদ্র, তাহাদের আবার পণ সমস্যা কি? তাহারা নিজেও যেমন হা ঘ'রে তাহাদের মেয়েগুলোও পড়ে তেমনই হা-ঘরের—হা-ঘ'রের হাতে!—লেখক।

অন্যতম। একজন বাল্যকালের সঙ্গী, অপর পরিণত বয়সের সঙ্গী,—ভালবাসার প্রবলতর আকর্ষণ কোথায়? বাল্যবিবাহের দোষ যতই থাক, তাহার গুণ এই, জানিয়া চিনিয়া ভালবাসিবার কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না, যাচাই করা ভালবাসার বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয় না, সময়ের প্রতীক্ষাও করিতে হয় না। দেখা যায়, অনেক চরিত্রহীন যুবক বিবাহের পর হঠাৎ "চরিত্রবান" হইয়া উঠে। প্রথম অবস্থায় ইহার কারণ রূপের নেশা বলা যাইতে পারে। রূপের নেশার আকর্ষণ যতখানি, আদর তাহার শতাংশের একাংশও নাই, সত্য, কিন্তু এই রূপের নেশাই কালে প্রকৃত ভালবাসার পথ দেখাইয়া দেয়।

কন্যাকে অধিক বয়স পর্য্যন্ত কুমারী রাখিতে হইলে তাহাকে চোখে চোখে রাখিতে হইবে, উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা সংযমী করিতে হইবে, তবেই সেই কন্যা যে পরিবারে যাইবে, সেই পরিবারকে সুখী করিবে। কারণ, শিক্ষার গতি এখন ফিরিয়াছে। ইব্‌সনের থিয়রী এখন অনেক মেয়ের মগজে ঢুকিয়াছে। সেই জন্যই সন্তান প্রতিপালনের ভার এখন দাসীর উপর, রন্ধনশালার ভার পাচক ব্রাহ্মণের হাতে, স্বামী এখন প্রেমের নভেলের নায়ক। সুতরাং পুরুষরাও এখন মেয়েদিগকে অন্নপূর্ণা বা জগদ্ধাত্রীরূপে দেখে না। তাহারা বুঝিয়াছে স্ত্রীজাতি বিলাসের একটা বস্তু মাত্র। এমন অবস্থায় মেয়েদিগকে অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখিলে তাহাতে পণপ্রথার ভাগ্যে যাহাই থাকুক, হিন্দুসমাজে কেলেঙ্কারী বাড়িবে।

স্ত্রীশিক্ষার জন্য আজকাল অনেকেই মাথা ঘামাইতেছেন, কিন্তু কিরূপ শিক্ষা স্ত্রীজাতির পক্ষে আবশ্যক সে আলোচনা কয়জন করিতেছেন? নারীকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা করিয়া শিক্ষয়িত্রী সাজাইবার কি প্রয়োজন? তিনি শিক্ষয়িত্রী হইবেন সুসন্তান প্রসবে, সন্তান প্রতিপালনে, রন্ধনকার্য্যে সকল রকমের গৃহ কর্ম্মে। হিন্দুনারীর বিকাশ মাতৃরূপে। যে হিন্দুনারী পুরুষের অধিকারলাভে যতটুকু হাত বাড়াইয়াছেন, তিনি পুরুষের চক্ষে ততটুকু অবজ্ঞার পাত্রী হইয়াছেন। দোষ পুরুষের নহে, দোষ সমাজে শৃঙ্খলা ভাঙ্গিবার চেষ্টার। উপযুক্ত শক্তি উপযুক্ত কাজে ব্যয়িত হউক, তবেই সমাজের মঙ্গল হইবে সকল সমস্যার সমাধান হইবে। শিক্ষার বিভ্রাটে পুরুষের সহিত নারীর প্রতিযোগিতায় সমাজে দুর্ব্বলতা বাড়িতেছে। পুরুষ ও নারী উভয়েই আলেয়ার আলোকের পিছনে ছুটিয়াছে, তাহাদের উচ্ছৃঙ্খল গতি রোধ করিবে কে?

তবে কি পণপ্রথার উচ্ছেদসাধন অসম্ভব? পণপ্রথা কেন, সকল রকমের কুপ্রথা সেইদিন হিন্দুসমাজ হইতে দূরীভূত হইবে, যেদিন দেশে শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতির দ্বারা হিন্দুর ঘরে ঘরে অন্নের সংস্থান হইবে; যেদিন এই ভারতের আকাশপবন সামগানে আবার মুখরিত হইবে; যেদিন প্রকৃত কর্ম্মী যুগাবতার সমাজের প্রকৃতি বুঝিয়া আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সংস্কারে ব্রতী হইবেন।—সেই দিন!

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রার্থনা

শঙ্কা যদি করিতে হয় করিগো যেন তাঁরে
অতি দারুণ ভীতিরও যিঁনি ভীতি,
দুর্ব্বলের পীড়নকারীজনের যেন দ্বারে
দাঁড়াতে কভু না হয় মোর প্রীতি।

(২)

শরণ যদি লইতে হয় লইতে যেন পারি
শরণের শরণ্য রাঙা পায়,
যিঁনি সকল রাজার রাজা দর্প মদহারী
পরাণ যেন তাঁহারি কৃপা চায়।

(৩)

মিত্র যদি লভিতে হয় তাঁহারে যেন লভি
মিত্র যিঁনি বিপদে সুখে দুঃখে,
ডাকিলে দীনবন্ধু বলে উদে পুলক রবি
ঝরিয়া পড়ে শান্তি ধারা বুকে।

(৪)

বিপদে আমি ডরিলে ওগো রাখিতে পারি লিখি
মধুসূদন নামটী হৃদে যদি,
অপমানও যে ভূষণ হবে সঁপিতে যদি শিখি
সকল ফল সে পদে নিরবধি।

(৫)

লজ্জা মোরে কে দিবে বল লজ্জা নিবারণে
বুকেতে যদি রাখিতে পারি বাঁধি
কাঁদাতে মোরে পারে কে বল যদি গো নারায়ণে
পরাণ ভরে ডাকিতে পারি কাঁদি।

(৬)

একেরে পেলে সকল মেনে সেই সে ধন চাহি
তাঁহারি কৃপা পিয়াসী ওগো আমি,
সব গীতের বিরাম যেথা সেই যে নাম গাহি
জীবন বীণা যায় গো যেন থামি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ইতিহাস

(৯৪৭ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

চতুর্থ অধ্যায়

নূতন আইন রচনা

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে কেপটাউন নগরে সংযুক্ত পার্লামেণ্টের অধিবেশন হয়, ইহাতে ভারতীয়গণের দুঃখ দূর করিবার কথা দূরে থাকুক, বরং পুরাতন স্বত্বসমূহ লোপ করিয়া আরও অধিক কঠিন নিয়ম সমূহ সংযোজিত করা হয়। তথাকার নেতা জেনেরল হরজোগ বলেন যে, "প্রথমে আমি বুয়র জাতিকে রক্ষা করিব, তারপর ইংরাজের রক্ষা বিষয়ে মনোযোগ দিব। ইংরাজের সুবিধার জন্য কখনও নিজের জাতির সুখ ও সুবিধাসমূহ নষ্ট করিতে পারি না। ইংরাজ সম্বন্ধে যখন এই কথা, তখন দুর্ব্বল ভারতবাসীর সম্বন্ধে কোনরূপ বিচার বিবেচনাই চলিতে পারে না। নূতন আইনে একটি নিয়ম রচিত হয় যে, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের পশ্চাতে আগত কোন ভারতীয় মজুর এখানকার ভূম্যধিকারী বলিয়া আদৌ পরিগণিত হইতে পারিবে না, এবং স্বদেশে গমন করিলে পুনরায় এ স্থানে ফিরিয়া আসিতে পারিবে না। এখন পর্য্যন্তও এই দেশে জন্মগ্রহণকারী ভারতবাসী বিনা বাধায় কেপকলোনীতে যাইতে পারিত, কিন্তু নূতন আইনে বিধান রচিত হয় যে, যে সকল ভারতবাসী ইংরাজী ভাষায় পূর্ণ বিদ্বান হইবে, কেবল তাহারাই কেপকলোনীতে যাইতে সক্ষম হইবে। ফ্রীষ্টেটে কোন ভারতবাসীকে যাইতে হইলে লিখিয়া দিতে হইবে যে, সে তথায় গিয়া কোনরূপ ব্যবসা বাণিজ্য করিতে পাইবে না। কেবল মজুরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের অধিকার সে প্রাপ্ত হইবে। তিন পাউণ্ড অর্থাৎ ৪৫ টাকার বার্ষিক কর যথাপূর্ব্ব রহিয়া যায়। সর্ব্বাপেক্ষা আর একটি ভয়ানক নিয়ম রচিত হয় যে, যে ধর্ম্মে একটির অধিক বিবাহ হইতে পারে, এইরূপ বিধান আছে, সেই ধর্ম্মানুযায়ী কৃতবিবাহ অপ্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইবে। প্রত্যেক হিন্দু ও মুসলমানকে আপনার বিবাহ আদালতে যাইয়া রেজেষ্টারী করিতে হইবে। এই বিচিত্র আইন অনুসারে হিন্দু ও মুসলমানের একাধিক বিবাহিতা স্ত্রীকেও রেজেষ্টারী করা হয় নাই। এরূপ বিবাহিতা স্ত্রীকে, রক্ষিতা স্ত্রী স্বরূপে ও তাহাদের সন্তানগণকে জারজ সন্তান বলিয়া অভিহিত করা হইবে। সংযুক্ত পার্লামেণ্টের মিঃ মায়নর, মিঃ চেপলীন, মিঃ আলেকজেণ্ডর প্রভৃতি সদস্যগণ এই আইনের তীব্র প্রতিবাদ করেন। নেটাল ও ট্রান্সভালে ভারতীয়গণ সভা করিয়া এই নূতন আইন রহিত করিবার জন্য বারম্বার প্রার্থনা করেন, কিন্তু কাহারও প্রার্থনাতে মনোযোগ না দিয়া আইন পাস করা হয় ও সম্রাটের

স্বীকৃতির জন্য উহার প্রতিলিপি লণ্ডনে প্রেরিত হয়। এদিকে ভারতবাসিগণ লর্ড গ্লাডষ্টোনের নিকট টেলিগ্রাম দ্বারা প্রার্থনা করেন যে, ভারতবাসীর পক্ষে ঘোর অমঙ্গল ও অপমানজনক এই আইনে সম্রাট যেন স্বাক্ষর না করেন। লর্ড গ্লাডষ্টোন আইনের প্রতিলিপিতে সম্রাটের স্বাক্ষর করাইয়া প্রবাসী ভারতবাসিগণকে সম্পূর্ণ নিরাশ করেন।

মিঃ কাছলিয়ার পত্র

'ট্রান্সভাল বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে'র সভাপতি মিঃ কাছলিয়া লোকমান্য গান্ধির অনুমতি অনুসারে দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণমেণ্টের নিকট এক প্রার্থনা পত্র প্রেরণ করেন যে, সংযুক্ত পার্লামেণ্টে ভারতীয়গণের জন্য যে নূতন আইন প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা সভ্য জাতির পক্ষে সম্পূর্ণরূপে নিন্দনীয় ও অপমান জনক। এই হেতু আইনে নিম্নলিখিত সংশোধন হওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে সত্যাগ্রহের লড়াই আরম্ভ হইবে।

(১) ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় ঔপনিবেশিক আইনের সংশোধিত ধারার পশ্চাতে আগত ভারতবাসীকে এ স্থানে বাস করিতে দিবার ও ভারতবর্ষে গমন করিলে পুনরায় তথা হইতে এ স্থানে ফিরিয়া আসিতে দিবার অধিকার প্রদান করিতে হইবে।

(২) দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্মগ্রহণকারী ভারতবাসীকে কেপকলোনীতে যাইতে হইলে, আগে যেরূপ আইন প্রচলিত ছিল, সেইরূপ আইন পুনঃ প্রচলন করিতে হইবে।

(৩) হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের রীত্যনুসারে বিবাহকে ন্যায় বিবাহ বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে।

(৪) ফ্রীষ্টেটে যাইবার জন্য ভারতবাসিগণকে যে গোলামিগিরী করিবার সর্ত্ত লিখিয়া দিতে হয়, তাহা রহিত করিতে হইবে।

(৫) ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের পশ্চাতে যে সকল ভারতবাসী এখানে আসিয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে বার্ষিক ৩ পাউণ্ড অর্থাৎ ৪৫ টাকা কর গ্রহণ করার প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা রহিত করিতে হইবে। এই করের জন্য নির্ধন ভারতবাসী অসীম কষ্ট ভোগ করে, ইহা রহিত করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট মাননীয় গোখ্‌লের নিকট স্বীকারোক্তি করিয়াছেন।

(৬) পুরাতন ও নূতন আইনে ভারতীয়গণ যেন সম্পূর্ণ ন্যায় ব্যবহার প্রাপ্ত হয়।

আন্দোলনের প্রস্তাব

মিঃ কাছলিয়ার এই উচিত প্রার্থনাতে, গভর্ণমেণ্ট আদৌ মনোযোগ দেন না। ভারতবাসীর মনে ইহাতে অতিশয় উত্তেজনার আবির্ভাব হয়। তাহারা এই আইনের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করিতে আরম্ভ করে। যদ্যপি প্রবাসী ভারতবাসিগণের বিরুদ্ধে এই আইন রচিত হয় এবং তাহাদিগকে এই আইন স্বীকার করাইয়া লইবার জন্য নানা প্রকার যন্ত্রণা প্রদান করা হয়, তথাপি ভারত সন্তান নিরাশ অন্তঃকরণেও ইহার সম্মুখে মস্তক অবনত করে নাই, বরং ইহার প্রতিবিধানের জন্য সত্যাগ্রহের লড়াই আরম্ভ করিবার সংকল্প করে। এই কার্য্যে যোগ দিবার জন্য কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি পারসী, কি খৃষ্টান, সমস্ত জাতি ও সমস্ত ধর্ম্মের লোক কটিবদ্ধ হয়। লর্ড এম্পথীল ও মাননীয় গোখ্‌লে এই আইনের বিরুদ্ধে বিলাতে আন্দোলন করিতে থাকেন। মাননীয় গোখ্‌লে পীড়িত হওয়ার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে মিঃ হেনরি

পোলক তথায় প্রেরিত হন। এ বিষয়ে তিনি প্রসিদ্ধ রাজপুরুষগণের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। এস্থানেও লোকমান্য গান্ধী এই আইন সম্বন্ধে প্রবল আন্দোলন করিবার জন্য কটিবদ্ধ হন। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন নগরেও এই বিষয়ে সভা হইতে থাকে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সী এসোসিয়েসনের অধ্যক্ষ সার ফিরোজশাহ মেহতা ভারত গভর্ণমেণ্ট ও ভারত সচিবের নিকট জন-সাধারণের পক্ষ হইতে এক আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। তিনি পত্র লিখেন যে, এই সভা রাজরাজেশ্বর সমীপে নতশিরে প্রার্থনা করিতেছে যে, দক্ষিণ আফ্রিকার সংযুক্ত পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক রচিত আইন কার্য্যে পরিণত না হইতে দিবার জন্য সম্রাট যেন বাধা প্রদান করেন।" এইরূপে নূতন আইনের প্রতিকূলে সর্ব্বত্র আন্দোলন হইতে থাকে।

উদ্বোধন

"হে হিন্দী ভাষী, আর কতকাল শুইয়া থাকিবে? তুমি অলস নিদ্রায় মগ্ন রহিয়াছ, দেখিতেছ না, তোমার সর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়া গেল? হিতৈষিগণ, তোমাকে জাগাইতে জাগাইতে ক্লান্ত হইয়াছেন; এক্ষণে তোমাকে জাগাইবার জন্য আর কোন্ ব্যক্তি আগমন করিবে; ঐ দেখ তোমার নৌকা ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আর হে হিন্দীবাসিগণ, কেবল আলস্যে ও প্রমোদ নিদ্রায় মগ্ন হইয়া রহিয়াছ, ঐ দেখ সংযুক্ত পার্লামেণ্টে কি কঠিন আইন প্রস্তুত হইতেছে, তোমার দাবী দাওয়া কিছুই থাকিবে না, তোমার সব অধিকার নষ্ট হইবে। এই আইনের সম্মুখে মস্তক অবনত করিও না। সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়া তোমাদের সাহস প্রদর্শন কর। লণ্ডন কমিটিকে অর্থদ্বারা সাহায্য কর। তাঁহারা তোমার দাবী রক্ষা করিবেন। হে হিন্দু ভ্রাতৃগণ ভবানী দয়াল তোমাদের নিকট মিনতি করিতেছেন যে, তোমরা একবার ঘোর নিদ্রা পরিত্যাগ কর।"

সত্যাগ্রহের আরম্ভ

লোকমান্য গান্ধী ও দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণমেণ্টের মধ্যে নূতন ঔপনিবেশিক আইন সংশোধন করিবার জন্য যে সমস্ত আলোচনা চলিতেছিল, শেষে কিন্তু তাহার কিছুই সমাধান হয় নাই। এই জন্য পুনরায় সত্যা-গ্রহের লড়াই আরম্ভ হয়। মিসেস গান্ধী আপনার শ্রদ্ধাস্পদ স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এই আইন অনুসারে আমি কি আপনার ধর্ম্মপত্নী বলিয়া পরিগণিত হইব না? গান্ধী উত্তর দেন যে, নূতন আইন অনুসারে তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী বলিয়া কিম্বা তোমার গর্ভ-জাত পুত্রও আমার পুত্র বলিয়া পরিগণিত হইবে না। এই কথা শুনিয়া মিসেস গান্ধী বলেন যে, এমন পৈশাচিক আইনের দেশে না থাকিয়া চলুন আমরা স্বদেশে চলিয়া যাই। মাননীয় গান্ধী বলেন, স্বদেশে চলিয়া যাওয়া দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। যখন আমাদের লক্ষ লক্ষ ভ্রাতার উপর এই বজ্ররূপী আইনের পতন হইবে, তখন দেশে থাকিয়া কি লাভ? মিসেস গান্ধী পুনঃ পুনঃ স্বামীর নিকট প্রার্থনা করেন যে, আপনি কি আমাকে এই আইনের বিপক্ষে বিরোধ করিবার জন্য জেলে যাইতে আদেশ করিবেন? গান্ধী তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া বলেন যে, তোমার শরীর ভাল নয়, জেলে বড় কঠিন কাজ করিতে হয়, তোমার দুর্ব্বল শরীরে জেলের কষ্ট সহ্য হইবে না। শেষে পত্নীর বারবার অনুরোধে তাঁহাকে জেলে যাইবার অনুমতি প্রদান

করেন। সকলের প্রথমে ১৬ জন লোকের একটি দল দরবন হইতে প্রস্থান করে, তাহাতে চারিজন মহিলা ছিলেন। প্রথম মিসেস গান্ধী ব্যারিষ্টার, দ্বিতীয় মিসেস ডাক্তার মতিলাল ব্যারিষ্টার, তৃতীয় মিসেস ছগনলাল, ও চতুর্থ মিসেস মগনলাল। নিম্নলিখিত পুরুষগণ ছিলেন, 'নেটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসে'র সহকারী সভাপতি পারসী রুস্তমজী শেঠ, গুজরাতী ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের সম্পাদক ছগনলাল, রঘুগোবিন্দ, রাওজী ভাই পটেল, মগন ভাই পটেল, সোলোমন রায়পন, গোবিন্দ্রাজ, শিবপূজন, কুপুস্বামী, মনুলাইট, রেওয়াশঙ্কর, গোকুলদাস ও রামদাস গান্ধী। যৎকালে এই ১৬ জন দলবদ্ধ হইয়া ট্রান্স ভালের সীমানায় উপস্থিত হন, সে সময় ঔপনিবেশিক শাসনকর্ত্তা তাঁহাদের নিকট হইতে সনন্দ দেখিতে চাহেন। সনন্দ না দেখানর দরুণ সকলকে তিন দিনের মধ্যে ট্রান্সভাল পরিত্যাগ করিয়া যাইবার আদেশ হয়, কিন্তু ইঁহারা এই আদেশ লঙ্ঘন করিয়া জেলে যাইবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তার-পর ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর প্রত্যেককে তিন তিন মাস সশ্রম কারা-দণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। সকলে কারা-বাসের আদেশ শুনিয়া আনন্দিত হন।

মিঃ বদ্রির জেল

প্রথম দল জেলে গেলে পর লোকমান্য গান্ধী দরবন হইতে মিঃ বদ্রীকে সঙ্গে করিয়া জোহান্সবর্গে গমন করেন। দরবন ষ্টেশনে মিঃ বদ্রিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বহু-সংখ্যক ভারতবাসী উপস্থিত হন। যখন মিঃ বদ্রি মেরিৎসবর্গের ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন সেখানেও কতিপয় ভারত-বাসী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। বেদধর্ম্ম সভার সভ্য বাবু পদ্ম সিংহ এখানে তাঁহার সহিত মিলিত হন। ড্রেন হাউজার নামক ষ্টেশনে মিঃ বদ্রিকে দেখিবার জন্য অনেক ভারতবাসী একত্রিত হন। এখানে মিঃ ভবানী ও মিঃ ঢকু সত্যাগ্রহের লড়াইয়ের জন্য সম্মিলিত হন। যৎকালে ইঁহারা বালকরষ্টে উপস্থিত হন, সে সময় ঔপনিবেশিক শাসন কর্ত্তা বিনা সনন্দে ট্রান্সভালে প্রবেশ করার অপরাধে ইঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করেন ও ৩০শে সেপ্টেম্বর প্রত্যেককে তিন তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। মিঃ বদ্রি ৩২ বৎসর হইতে দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করিতেছেন। ইনি শাহাবাদ (আরা) জেলার হেতমপুর গ্রামের জমিদার। 'ট্রান্স-ভাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে'র ইনি সহকারী সভাপতি ছিলেন। জোহান্সবর্গে এক সময়ে ইহার অনেক জমি জায়গা ছিল। মিঃ চেম্বর লেনের নিকট প্রিটোরিয়া নগরে যখন এক ডেপুটেশন গমন করে, তখন মিঃ বদ্রি তাহাতে একজন প্রতিনিধি ছিলেন। মিঃ বদ্রি তাঁহার স্বদেশবাসীর কষ্টে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন বলিয়া অধিক লোক প্রিয় ছিলেন।

জোহান্সবর্গে সত্যাগ্রহ

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর মিঃ কাছলিয়ার সভাপতিত্বে অতিশয় সমারোহের সহিত 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে'র এক অধিবেশন হয়। লোকমান্য গান্ধী সত্যা-গ্রহের লড়াই চালাইবার জন্য একটি উত্তেজনা উৎপাদক বক্তৃতা প্রদান করেন। মিঃ এল, ডব্লিউ রীচ ব্যারিষ্টার, মিঃ কেলনবেক, মিঃ জোজফ রোয়পন ব্যারিষ্টার, মিঃ অম্বী নায়ডু প্রভৃতি সজ্জনগণ ইহার সমর্থন করেন। ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের চীফ রিপোর্টরি,

'আর্য্যাবর্ত্তের' সহকারী সম্পাদক ভবানীদয়াল প্রভৃতি সমাচার পত্রের সংবাদ দাতাগণ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাতে সত্যাগ্রহের লড়াই আরম্ভ করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভা ভঙ্গ হইলে 'ইল্‌ষ্ট্রেটেড ষ্টারে'র সংবাদ দাতা, প্রতিনিধিগণের চিত্র গ্রহণ করেন। ঐ দিন 'ট্রান্সভাল ইণ্ডিয়ান উইমেন্স এসোসিয়েসনে'র অধিবেশন হয়। তথায় ভারতীয় রমণীগণ সত্যাগ্রহের লড়াইয়ে সম্মিলিত হইবার জন্য দৃঢ় নিশ্চয় হয়েন এবং কারাবদ্ধ রমণীগণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। রবিবারে এই সভা হয় আর সোমবারে মিঃ প্রাক্তজী দেশাই, সুরেন্দ্রনাথ মেঢ় ও মণিলাল গান্ধী প্রভৃতি মজুরের বেশে বিনা পরওয়ানায় ফেরী করিবার জন্য বাহির হন। তাঁহারা নানা চেষ্টা করিয়াও সেদিন গ্রেপ্তার হইতে পারেন নাই। এদিন নিরাশ অন্তঃকরণে তাঁহারা গৃহে ফিরিয়া আসেন। দ্বিতীয় দিন কমিশনর ষ্ট্রীটে ইঁহারা গ্রেপ্তার হন, ইঁহাদের প্রত্যেককে সাত সাত দিনের জন্য কঠোর কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। জেল হইতে বহির্গত হইয়া পুনরায় ইঁহারা ঐরূপ ভাবে ফেরী করিতে আরম্ভ করেন, এজন্য দ্বিতীয় বার প্রত্যেককে দশ দশ দিনের জন্য কঠোর কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। এইরূপে মিঃ রাজু ও বীলী দণ্ডিত হন।

মিসেস ভবানীদয়ালের প্রস্থান

মিসেস গান্ধীর জেলে যাইবার সমাচার প্রাপ্ত হইয়া মিসেস ভবানীদয়াল অতিশয় দুঃখিত হন এবং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর নিজের এক বৎসরের বালক রামদত্ত বর্ম্মাকে ক্রোড়ে লইয়া জোহান্সবর্গে গমন করেন। তিনি তথায় লোকমান্য গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে, উভয়ে নিম্ন লিখিত কথাবার্ত্তা হয়।

গান্ধি—আপনি কি জেলে যাইতে মনস্থ করিয়াছেন?

মিসেস ভবানী—হাঁ, প্রসন্ন মনে।

গা—জেলে ভাল কাপড় পাওয়া যাইবে না।

মিঃ ভঃ—আমি জেলের কাপড়কে উত্তম পরিধান বলিয়া মনে করিব।

গা—সেখানে নিজের ইচ্ছামত খাওয়া পাওয়া যাইবে না।

মিঃ ভঃ—আমি জেলের আহারকে উত্তম খাদ্য বলিয়া মনে করিব।

গা—তথায় কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে।

মিঃ ভঃ—আমি সকল রকমের কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি।

গা—আপনি কেন জেলে যাইবেন?

মিঃ ভঃ—নিজের স্বত্বের জন্য।

গা—আপনার কোন্ স্বত্ব নষ্ট হইয়াছে?

মিঃ ভঃ—যে নূতন আইন প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে ভারতীয় স্ত্রীগণকে রক্ষিতা স্ত্রী বলিয়া বুঝা যাইবে।

গা—আপনি আনন্দের সহিত জেলে গমন করিয়া ভারতের যশ ও কীর্ত্তি বিস্তার করুন।

ইহার পরে মিসেস ভবানীদয়াল, 'তামিল বেনিফিট সোসাইটি'র সভাপতি মিঃ নায়ডুর গৃহে গমন করেন। সেখানে সত্যাগ্রহী মহিলাগণের একটি প্রীতিভোজ হয়, এবং সত্যাগ্রহী মহিলাগণের চিত্র গ্রহণ করা হয়।

জোহান্সবর্গের বীরাঙ্গনা

জোহান্সবর্গের ভারতীয় রমণীগণ সীমা বিশিষ্টা ছিলেন। তাঁহারা যে পূর্ণা বীরাঙ্গনা ছিলেন ইহাতে সন্দেহের কোন কারণ

ছিল না। লোক মান্য গান্ধি স্ত্রীলোকদিগের সভাতে জেলের কষ্ট সমূহ সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করেন। তাঁহারা বিন্দুমাত্র দুঃখের কথা না ভাবিয়া জেলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হন। মিসেস নায়ডু, মিসেস ভবানীদয়াল প্রভৃতি ১১ জন মহিলা আপনাদের স্বামী, সন্তান-সন্ততি ও গৃহ পরিবার প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া চলিতে আরম্ভ করেন। এই সকল রমণীর ক্রোড়ে ছোট ছোট ছয়টি বালক বালিকাও ছিল। মিঃ কেলনবেক ইঁহাদের সঙ্গে গমন করেন। এই সকল বীরাঙ্গনা নির্ভয় অন্তরে ফ্রীষ্টেটে প্রবেশ করেন, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট ইঁহাদিগকে সত্যাগ্রহী জানিয়া ছাড়িয়া দেন। এই সকল রমণীগণ নিরাশ হইয়া ফ্রীনিখনে চলিয়া যান। তথাকার প্রবাসিগণ এই সকল বীরাঙ্গনাকে হৃদয়ের সহিত অভ্যর্থনা করেন। ইঁহারা বলেন যে আমরা এক্ষণে ফিরিয়া ঘরে যাইব না, এস্থানে বিনা পরওয়ানায় ফেরী করিয়া গ্রেপ্তার হইব। ফ্রীনিখনের প্রবাসিগণ ইহাতে স্বীকৃত হইয়া ফেরি করিবার সমুদয় জিনিস তাঁহাদিগকে যোগাড় করিয়া দেন। ইঁহারা ফেরি করিয়া যে পয়সা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা সত্যাগ্রহী ফণ্ডে জমা প্রদান করেন। এই বিষয়ে 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' লিখিয়াছিলেন যে, জোহান্সবর্গের ১১ জন মহিলা আপনাদের সন্তানকে কোলে লইয়া দেশের জন্য ফেরি করিয়া বেড়াইতে-ছেন, স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য কষ্ট স্বীকার করিতেছেন, ইহা অবগত হইয়া ভারতীয়গণ কি উত্তেজিত হইবে না? এই মহিলাগণের মধ্যে অধিকাংশই তামিল জাতীয়া ছিলেন, কেবল মিসেস ভবানীদয়াল বিহারের অধি-বাসিনী ছিলেন। যদি ইঁহারা জেলে যাইবার জন্য চেষ্টা না করিতেন, তাহা হইলে আমরা উহাদের কিছুই করিতে পারিতাম না। তাঁহারা নিজেদের অপমানের প্রতিশোধার্থ এই আই-নের প্রতিবাদ করিবার জন্য বাহির হইয়া-ছেন। যখন ভারতীয় রমণীগণ আপনা-দের দায়িত্ব বুঝিয়া দেশের মঙ্গল সাধনের জন্য অগ্রসর হইয়াছেন, তখন ভারতের জাতীয় গগনে সূর্য্যাস্ত হয় নাই। এই সকল বীরাঙ্গনার দ্বারা ভারতবাসী এই মহান যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া আপনাদের নাম ইতিহাসে অমর করিয়া রাখিবে। যখন এই সকল বীরাঙ্গনা জেলে যাইবার জন্য বহির্গত হইয়াছেন, তখন আমাদের যুদ্ধে বিজয় হইয়াছে এরূপ ভাবা উচিত।

ফ্রীনীখনে কুচ

যৎকালে এই সকল বীরাঙ্গনা গ্রেপ্তার হইবার জন্য নানাপ্রকারের চেষ্টা করিয়াও সফল মনোরথ হইলেন না, তখন তাঁহারা ১০ই অক্টোবর তথা হইতে চার্লিষ্টনে যাইবার জন্য রওনা হইলেন। জোহান্সবর্গের সুপ্রসিদ্ধ নেতা মিঃ অম্বী নায়ডু ইঁহাদের সঙ্গে গমন করেন। ইঁহারা ফ্রীনীখনের ব্যবসাদারগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে, ব্যবসাদারগণ ইঁহাদের সকল প্রকারে সহায়তা করেন। এইরূপ ঠিক হয় যে, যে গ্রামে সত্যাগ্রহিগণ গ্রেপ্তার হইবার জন্য গমন করিবেন, সেই গ্রামের প্রবাসিগণকে তাঁহাদের ভোজনা-চ্ছাদন ও রেলের মাশুল প্রদান করিতে হইবে। যদি তথাকার অধিবাসিগণ ইহা প্রদান করিতে অস্বীকৃত হয় তাহা হইলে সত্যাগ্রহিগণ পায়ে হাঁটিয়া একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিবেন। ফ্রীনীখনের অধিবাসীরা, সত্যাগ্রহী বীরাঙ্গনাগণকে আনন্দের সহিত অভ্যর্থনা করেন ও তাঁহারা

যখন বিদায় হন তখন গাড়ীভাড়া প্রভৃতি প্রদান করেন।

জর্মিষ্টনে সত্যাগ্রহ

৩রা অক্টোবর জর্মিষ্টন হইতে ছয়জন স্ত্রীলোক ও ২০ জন পুরুষ গ্রেপ্তার হইবার জন্য বহির্গত হন। সকলের হাতে ফল ও ফুল প্রভৃতির টোকরি ছিল। ইঁহারা সমস্ত সহর ফেরি করিয়া বেড়ান, কিন্তু গ্রেপ্তার না হওয়ায় রেলওয়ে ষ্টেশনে গমন করেন। ষ্টেশন মাষ্টার ইঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলেন যে, কৃষ্ণাঙ্গই হউক অথবা শ্বেতাঙ্গই হউক, কেহই এখানে বিনা পরওয়ানায় ফেরি করিয়া বিক্রয় করিতে পারিবে না। ষ্টেশন মাষ্টারের কথায় তাঁহারা তথা হইতে প্রস্থান না করিয়া টেলিফোন দ্বারা মিঃ গান্ধির নিকট সম্মতি প্রার্থনা করেন। মিঃ গান্ধি উত্তর দেন যে যদি তাঁহারা বিনা দাঙ্গা হাঙ্গামায় গ্রেপ্তার হইতে পারেন তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়। মিঃ গান্ধির এই সম্মতি অনুযায়ী তাঁহারা প্লাটফরমের উপর খাড়া রহেন। নিরুপায় হইয়া ষ্টেশন মাষ্টার তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করেন। ইঁহাদের গ্রেপ্তারের কথা শুনিয়া জর্মিষ্টনে হৈ চৈ পড়িয়া যায়। কেবল ছয় ঘণ্টাকাল হাজতে রাখিয়া ইঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিবার জন্য সিপাহীর উপর আদেশ প্রদত্ত হয়। হতাশ অন্তরে সত্যাগ্রহীরা আপন আপন গৃহে চলিয়া যান। এই বিষয়ে 'রেড ডেলি মেল' লিখিয়াছিলেন যে, জর্মিষ্টনের ভারতবাসীর জন্য জেলে স্থানাভাব হইয়াছে। 'ট্রান্সভাল লীডার' লিখেন যে ভারতবাসী এই উপায়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই সকল সত্যাগ্রহিগণের নাম নিম্নে লিখিত হইল।—মিসেস বন্ধু, মিসেস নন্দন, মিসেস মাতাবদন, মিসেস স্বয়ম্বর, মিসেস মহাবীর ও মিসেস বিহারী প্রভৃতি স্ত্রীলোকগণ; ভবানী-দয়াল, বাবু লালবাহাদুর সিংহ, পূজারী গোলাব দাস, ত্রিলোকী সিংহ, রঘুবর, গয়াদীন মহারাজ, উমরাও সিংহ, শিবপ্রসাদ, রামনারায়ণ ওলেহারিয়া প্রভৃতি পুরুষগণ। জর্মিষ্টনে নিরাশ হইয়া ভবানীদয়াল প্রভৃতি ৭ জন সত্যাগ্রহী ফ্রীনীখনের কুচে সম্মিলিত হন।

বালকরষ্টে প্রস্থান

এই ১১ জন স্ত্রী ও ৮ জন পুরুষের দল নেটালের সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হন। বালকরষ্টের ঔপনিবেশিক শাসনকর্ত্তা নেটালে প্রবেশ করিবার অধিকারপত্র দেখিতে চাহেন। সনন্দ না দেখানর জন্য সকলকে গাড়ী হইতে নামাইয়া ঐ রাত্রির জন্য আটকাইয়া রাখা হয়। দ্বিতীয় দিন দুই প্রহরের সময় সকলকে ডাকিয়া রাজস্ব সচিবের তার পড়িয়া শুনান হয়। তারের মর্ম্ম এই যে, গবর্ণমেণ্ট ইঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে চাহেন না, ইঁহারা যথা ইচ্ছা যাইতে পারেন! রাত্রিতে সত্যাগ্রহীরা পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট খাবার ও কম্বল প্রার্থনা করেন। কম্বল না দিয়া তাঁহাদিগকে বিলাতী রুটী খাইবার জন্য দেওয়া হয়। দারুণ শীতে অতিশয় কষ্টের সহিত তাঁহাদের রাত্রি অতিবাহিত হয়।

দ্বিতীয় দিন গভর্ণমেণ্ট গ্রেপ্তার করিবার অনিচ্ছা প্রকাশ করায় সত্যাগ্রহিগণ নিরাশ হন এবং তথা হইতে চার্লিষ্টনে গমন করেন আর ঐ রাত্রি মিঃ বলী ভাইয়ের ঘরে অতি-বাহিত করেন। তৃতীয় দিন চার্লিষ্টন হইতে নিউকাসেলে রওনা হন। নিউকাসেলের ষ্টেশনে সত্যাগ্রহিগণকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ভারতবাসিগণ বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া-

ছিলেন। যখন ষ্টেশনে গাড়ী উপস্থিত হয়, তখন 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে ষ্টেশন নিনাদিত হইতে থাকে। সত্যাগ্রহিগণকে লইয়া যাইবার জন্য ষ্টেশনে পূর্ব্ব হইতে কয়েক খানি বগী অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু তাঁহারা গাড়ীতে না গিয়া পায়ে চলিতে থাকেন ও তথায় মিঃ ডি, লাজরমের গৃহে অতিথি হন।

বালকরষ্টে সত্যাগ্রহিগণের জেল

মেরিৎসবর্গের মিঃ গায়সিংহ, মিঃ মতিলাল, মিঃ জুঠাপ্রেমজী পটেল ও মিঃ ত্রিলোক নাথ প্রভৃতি বিনা সনন্দে ট্রান্সভালে প্রবেশ করার জন্য তিন তিন মাসের কারাদণ্ডের আদেশ হয়। টোংগাটের মিঃ গোকুল দাস গান্ধি, মিঃ নায়ডু, মিঃ পেরুমল, মিঃ জানকী, মিঃ সূর্য্যপাল সিংহ ও মিঃ আব্দুলকে ৬ই জানুয়ারী এবং ডেন হাউজরের মিঃ রামরত্ন মহারাজ, মিঃ লক্ষ্মণ ও মোহনকে ১০ই জানুয়ারী ট্রান্সভালে প্রবেশ করার অপরাধে ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। মিসেস সেখ মহতাব, তাঁহার মাতা ও পরিচারিকা জেলে যাইবার জন্য বালকরষ্টে আগমন করেন। এই স্থানে গভর্ণমেণ্ট এই তিনজনকে গ্রেপ্তার করেন। মিসেস সেখ মহতাবকে জোরে ধাক্কা দিয়া আঙ্গুলের ছাপ লইতে চাহিলে তিনি কিছুতেই ছাপ প্রদান করেন না। ট্রান্সভাল গভর্ণমেণ্ট এই তিন জনকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইবার দণ্ড প্রদান করেন, কিন্তু ইহারা পুনরায় ট্রান্সভালে প্রবেশ করিয়া সত্যাগ্রহের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেন। এই কারণে গভর্ণমেণ্ট তিন জনের প্রত্যেককে তিন তিন মাসের জন্য কঠোর কারাদণ্ড প্রদান করেন। এই প্রথম মুসলমান মহিলা যাঁহারা সত্যাগ্রহের সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিলেন। এই তিনজন ছাড়া আর অন্য কোন মুসলমান মহিলা জেলে গমন করেন নাই। এজন্য মুসলমান মহিলাগণের মধ্যে মিসেস সেখ মহতাবের আসন সর্ব্ব প্রথমে।

নিউকাস্‌লে বিরাটসভা

১৮ই অক্টোবর 'নেটাল উইটনেস্' নামক সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয় যে, ১৫ই অক্টোবরে নিউকাস্‌লে একটি বিরাট সভা হয়, মিঃ সীদান সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মিঃ রবিন্সন প্রভৃতি ইউরোপীয়ান সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। মিঃ অম্বী নায়ডু ভারতবাসিগণের উপর কৃত অত্যাচারের বর্ণন করেন। এই অত্যাচারকে পদদলিত করিয়া পেষণ করিবার জন্য সত্যাগ্রহের লড়াইয়ের আবশ্যকতা বক্তৃতাতে বিশদরূপে বলা হয়। ইহার পরে আর্য্যাবর্ত্তের সহকারী সম্পাদক মিঃ ভবানীদয়াল অতিশয় ওজস্বিনী ভাষায় সত্যাগ্রহের লড়াই চালাইবার জন্য জনসাধারণকে উত্তেজিত করেন। মিঃ ইকরহীম, মিঃ সীদাত, মিঃ লাজরস, মিসেস নায়ডু, মিসেস মুরগণ, মিসেস পি, কে, নায়ডু প্রভৃতি পুরুষ ও মহিলাগণ সত্যাগ্রহের লড়াইয়ের সমর্থন করেন। ঐ দিন তথায় সত্যাগ্রহ সভা স্থাপিত হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভার পরিচালক নিযুক্ত হন। সভাপতি—মিঃ আই, সীদাত, সেক্রেটারী মিঃ ইকরহীম, কোষাধ্যক্ষ মিঃ অহমদ, অন্তরঙ্গ সদস্য—মিঃ লাজরস, মিঃ চেটী, মিঃ পিল্লে, মিঃ টোমী, মিঃ করিম, মিঃ থাকী, মিঃ সুলেমান ও মিঃ সীদাত দাউদজী। সভাস্থলে কয়েকজন ভারতীয় জেলে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

ধর্ম্মঘট আরম্ভ

১৪ই অক্টোবর মিঃ অম্বী নায়ডু ও ভবানী দয়াল প্রভৃতি পুরুষগণ ১১জন মহিলা সমভি-

ব্যাহারে নিউকাস্‌লের রেলওয়ে ওয়ার্কসে গমন করেন। মিঃ অম্বী নায়ডু তামিল ভাষাতে ও মিঃ ভবানী দয়াল হিন্দি ভাষাতে ভারতীয় মজুরগণকে ধর্ম্মঘট করিবার জন্য স্যারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। এই সময় কোন নিরপেক্ষ লোক ষ্টেশন মাষ্টারকে জানায় যে সত্যাগ্রহী লোকগণ আপনার মজুরদিগকে ধর্ম্মঘট করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিতেছে। ষ্টেশন মাষ্টার আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনারা এখানে কি করিতেছেন? সত্যাগ্রহিগণ উত্তর দেন, আমরা আপনার মজুরগণকে এই উপদেশ দিতেছি যে, যে পর্য্যন্ত না গভর্ণমেণ্ট তোমাদের উপর ধার্য্য তিন পাউণ্ড কর রহিত করেন, সে পর্য্যন্ত তোমরা একযোগে কর্ম্ম পরিত্যাগ কর। ষ্টেশন মাষ্টার বলেন আপনাদের উপর গণ্ডগোল বাধাইবার অভিযোগ আনীত হইবে। সত্যাগ্রহীরা বলেন, আপনার যেরূপ খুসী আমাদের উপর অভিযোগ আনয়ন করিতে পারেন। আমরা মজুরগণের উপর কিছু জোরজবরদস্তি করিতেছি না, যাহারা কাজ করিতে যাইতেছে, তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিতেছি না, কিন্তু সকলকেই ধর্ম্মঘট করিবার পরামর্শ প্রদান করিতেছি আর এই পরামর্শ অবশ্যই আমরা প্রদান করিব। অবশেষে ষ্টেশন মাষ্টার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে ডাকিয়া মিঃ অম্বী নায়ডু, মিঃ ভবানী দয়াল ও রাম নারায়ণ প্রভৃতি নেতাগণকে গ্রেপ্তার করান। অবশিষ্ট পুরুষ ও স্ত্রীগণ আপনাদিগকে গ্রেপ্তার করাইবার জন্য চেষ্টা করেন কিন্তু বিফল মনোরথ হন। স্ত্রীগণ পুলিশদিগের সামনে উচ্চৈঃস্বরে মজুরদিগকে ধর্ম্মঘট করিবার উপদেশ প্রদান করেন ও পুলিশকে বলেন, যেমন পুরুষগণ সকলকে ধর্ম্মঘট করিবার জন্য উত্তেজিত করিতেছেন সেইরূপ আমরাও সকলকে উত্তেজিত করিতেছি। আমাদিগকে গ্রেপ্তার করা আপনাদের একান্ত কর্ত্তব্য। পুলিশ কেবল ৩ জন সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়, আর সমস্ত রাত্রি তাঁহাদিগকে হাজতে বন্ধ করিয়া রাখে। দ্বিতীয় দিবস প্রাতঃকালে ইহাদিগকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ইহারা পূর্ব্বের কথার পুনরুক্তি করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সমস্ত শুনিয়া প্রথম অভিযোগ রহিত করিয়া বিনা আদেশে রেলওয়ে ওয়ার্কসে প্রবেশ করার জন্য প্রত্যেককে দুই দুই পাউণ্ড করিয়া জরিমানা করেন। সত্যাগ্রহিগণের নিকট টাকা ছিল না এজন্য তাঁহারা উহা প্রদান করিতে অস্বীকার করিয়া কারাবাস দণ্ড প্রার্থনা করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন, চলিয়া যাও, যদি আমার জরিমানা আদায় করিবার ক্ষমতা থাকে তাহা হইলে উহা আদায় করিয়া লইব। ইহার পর সকলকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আদালতের বাহিরে দর্শকগণের অতিশয় ভিড় হইয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসে ভারতীয় মজুরগণের ধর্ম্মঘটের এই প্রথম দৃষ্টান্ত।

ধর্ম্ম ঘটের বৃদ্ধি

এই সকল সত্যাগ্রহিগণ মুক্ত হইয়াও চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার লোক ছিলেন না। ঐ দিন সন্ধ্যার সময় তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষ একত্রিত হইয়া 'করেলী কোলরী' নামক স্থানে গমন করেন। তথায় ভারতীয় মজুরগণকে ধর্ম্মঘট করিবার জন্য মিঃ অম্বী নায়ডু ও ভবানী দয়াল তামিল ও হিন্দি ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার প্রভাবে উক্ত কয়লার খনির প্রায় শতাধিক মজুর ধর্ম্মঘট-

করে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর তারিখে রাত্রি ১০টার সময় মিঃ কেলনবেক, মিঃ অম্বী নায়ডু, ও ভবানী দয়াল বৈলঙ্গীর কয়লার খনিতে গমন করেন। ইতিপূর্ব্বে কোনও দুষ্ট লোক টেলিফোন দ্বারা কয়লার খনির অধ্যক্ষকে সংবাদ দেয় যে, আপনার মজুরগণকে ধর্ম্মঘট করাইবার জন্য কয়েকজন সত্যাগ্রহী নেতা তথায় গমন করিতেছে, আপনি সাবধান থাকিবেন। উক্ত খনির অধ্যক্ষ সত্যাগ্রহীদিগকে নানারূপ কুবাক্য বলিয়া চাবুক দ্বারা প্রহারের ভয় দেখান। উক্ত রাত্রিতে তাঁহারা নিউকাসলে ফিরিয়া আসেন। মিঃ কেলনবেক জোহান্সবর্গ রওনা হন আর মিঃ হেনরী পোলক ধর্ম্মঘট-কারিগণের সাহায্যের জন্য নিউকাসলে আসিয়া উপস্থিত হন। নিউকাসলে পুরা দমে ধর্ম্মঘট চলিতে থাকে। হাঁসপাতাল, লৌণ্ডরী, হোটেল ও খনির মজুরগণ এমন কি মেথর পর্য্যন্ত সকলেই ধর্ম্মঘট করে। দলে দলে ধর্ম্মঘটকারী নরনারী নিউকাসলের রাস্তার উপর বেড়াইতে থাকে। সত্যাগ্রহ এক্ষণে ধর্ম্মঘটের রূপ ধারণ করে। গভর্ণমেণ্ট ধর্ম্মঘটকারিগণকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে পাঠাইতে আরম্ভ করেন। শ্বেতাঙ্গ অধিপতি-গণের ক্রোধের আর পরিসীমা থাকেনা। অনেক মজুরকে চাবুক দ্বারা প্রহার করা হয়। বৈলঙ্গীর খনিতে একজন মজুরকে জীবিতা-বস্থায় মারিয়া ফেলা হয়। এই সকল কারণে ধর্ম্মঘটের অগ্নি চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর গভর্ণ-মেণ্টের আদেশে ভবানী দয়াল গ্রেপ্তার হন। ঐ দিন ইহাদের নামীয় অভিযোগ নিউ-কাসলের ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে উপস্থিত করা হয়। স্ত্রী-পুরুষে প্রায় তিন চারিশত জন আদালতের চারিদিকে দণ্ডায়মান ছিল। আসামী আপনাদিগকে নির্দ্দোষী বলিয়া স্বীকার করেন। ভবানী দয়ালের মাথায় টুপি দেখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ টুপি খুলিয়া রাখিতে বলেন। তিনি বলেন মুসলমান ছাড়া অন্য কোন জাতির টুপি মাথায় দিয়া আদালত গৃহে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ। ভবানী দয়াল উত্তরে বলেন, আমি জাতিতে হিন্দু, আমি জাতীয় টুপিই পরিধান করিয়াছি, সুতরাং এ টুপি কিছুতেই খুলিতে পারি না। এই জবাব শুনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট আর কিছু বলেন না। ভবানী দয়াল আপনার জবান বন্দীতে বলেন, যে সময় আমাদের পূজনীয় নেতা মাননীয় গোপাল কৃষ্ণ গোখলে এদেশে আসেন, তখন জেনেরেল বোথা, জেনেরেল স্মটস্ ও মিঃ কিশর তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞা করেন যে, পার্লামেণ্টের আগামী অধি-বেশনে ৩ পাউণ্ড কর রহিত করিয়া দিবেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন নাই। এজন্য আমি ভারতীয় মজুরগণকে উপদেশ দিতেছি যে, যে পর্য্যন্ত না গভর্ণমেণ্ট ৩ পাউণ্ড খুনী কর রহিত করেন, সে পর্য্যন্ত তোমরা ধর্ম্মঘট বাহাল রাখ। মিঃ শিবপ্রসাদও এইরূপ জবানবন্দী করেন। ইহার পরে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, হেড্ কনষ্টেবল প্রভৃতির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

সকলেই বলেন যে, ভবানী দয়াল সত্যা-গ্রহিগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ নেতা, সকলেই জানে যে, ইহার জন্যই আজ নিউকাসলে এইরূপ গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে। এই গুরুতর অপরাধের জন্য ইহাদের কঠোর দণ্ড পাওয়া উচিত। পরিশেষে ম্যাজিষ্ট্রেট আপনার বিস্তৃত রায় পড়িয়া শুনান। তাহার সারাংশ

এই,—"তোমরা যে উদ্দেশ্য লইয়া এই কার্য্য আরম্ভ করিয়াছ তাহা তোমাদের সিদ্ধ হইবে না। তোমরা গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে বিবাদ করিতে চাহিতেছ, কিন্তু প্রকারান্তরে তোমরা ব্যবসায়িগণের ব্যবসা নষ্ট করিতেছ। তোমাদের উপদেশ শুনিয়া কত হতভাগ্য স্ত্রী ও পুরুষ কাজ পরিত্যাগ করিয়াছে, উহারা না খাইতে পাইয়া মরিয়া যাইবে। ইহার দায়ী তোমাদিগকেই হইতে হইবে। আজ পর্য্যন্তও তোমাদের জন্য কোনও কঠোর আইন প্রস্তুত হয় নাই। কিন্তু পার্লামেণ্টের আগামী অধিবেশনে তাহা রচিত হইবে। এই অপরাধের জন্য আমি তোমাদের প্রত্যেককে তিন তিন মাসের কারাদণ্ড প্রদান করিতেছি।"* দণ্ডের কথা শুনিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ সহাস্য বদনে ম্যাজিষ্ট্রেটকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। যেমন এই অভিযুক্ত-ব্যক্তিগণকে আদালত হইতে লইয়া যাওয়া হয় অমনি মিঃ গুলাব দাস, ও মিঃ রঘুবর আসিয়া পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ মেকাণ্ডজনগুকে বলেন যে, আমরা উভয়েই সত্যাগ্রহী আপনি আমাদিগকে গ্রেপ্তার করুন! তাঁহাদের উভয়কেই গ্রেপ্তার করিয়া তিন তিন মাসের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। ইহা ছাড়া নিউ-কাসেলের শত শত ধর্ম্মঘটকারীদের দ্বারা জেল পরিপূর্ণ হয়। ২০শে অক্টোবর স্থানা-ভাব বশতঃ সমস্ত সত্যাগ্রহিগণকে তথা হইতে মেরিৎসবর্গের জেলে প্রেরণ করা হয়। সত্যাগ্রহীদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য নিউকাসেলের ষ্টেশনোপরি মিঃ পোলক প্রমুখ মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

ধর্ম্মঘটের প্রভাব

নিউকাসলে ধর্ম্মঘট খুব প্রবলাকার ধারণ করে। লেডিস্মিথ ও ডাণ্ডীপর্য্যন্ত ধর্ম্মঘটের উত্তাপ অনুভূত হয়। ২০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ২৫০০ জন ধর্ম্মঘটের ফলে বন্দী হয়। ট্রান্সভালের ১১ জন বীরাঙ্গনা ধর্ম্মঘট বিস্তার করিবার জন্য অধিকতর চেষ্টা করেন এজন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করেন। এই বীরাঙ্গনাগণ জবান-বন্দীতে বলেন যে, আমরা ট্রান্সভাল হইতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। ভারতীয় মজুরগণকে আমরা ইহাই উপদেশ দিতেছি যে, যে পর্য্যন্ত না গভর্ণমেণ্ট ৩ পাউণ্ড কর রহিত করিয়া দেন সে পর্য্যন্ত তোমরা কোনও কাজ করিতে যাইও না। আমরা মজুরদের উপর কোনরূপ বল প্রয়োগ করিতেছি না, কেবল উহাদিগকে বুঝাইয়া কাজ পরিত্যাগ করাইতেছি। ম্যাজিষ্ট্রেট সমুদয় শুনিয়া প্রত্যেককে তিন তিন মাসের কারাদণ্ড প্রদান করেন। মিঃ পোলক আদালতে উপস্থিত ছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট জেলের আদেশ শুনাইবার সময় মহিলাগণের উপর যেরূপ খারাপ শব্দ প্রয়োগ করেন, সভ্যজনের পক্ষে তাহা সর্ব্বতোভাবে নিন্দনীয়। এই বীরাঙ্গনাগণ জেলের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় সুখী হন এবং আনন্দের সহিত জেলে গমন করেন। জেলে যাইবার সময় এই মহিলাগণ দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী ভারতবাসীর নিকট বলিয়া পাঠান যে, যে পর্য্যন্ত না গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে ন্যায্য অধি-কার প্রদান করেন, সে পর্য্যন্ত লড়াই যেন বন্ধ না হয়। যে সকল বীরাঙ্গনা নিউকাসেলে কঠোরদণ্ড প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের নাম যথা,—(১) মিসেস ভবানী দয়াল, (২) মিসেস অম্বী নায়ডু (৩) মিসেস এন, পিল্লে, (৪) মিসেস কে, এম, পিল্লে (৫) মিসেস এ, পি, নায়ডু (৬) মিসেস কে, সি, পিল্লে (৭) মিসেস পি,

কে, নায়ডু, (৮) মিসেস এন, সি, পিল্লে, (৯) মিসেস আর এ, মুনিয়াম, (১০) মিসেস এম পিল্লে (১১) মিসেস এম, বি, পিল্লে। ছয়জন বালক বালিকা যাহারা আপনার মাতার সহিত জেলে গমন করে তাহাদের নাম, বালিকা—মিসি শেষুমা নায়ডু, মিসি রাজুমা পিল্লে ও আঞ্জল পিল্লে। বালক—রামদত্ত বর্ম্মা, সভাপতি পিল্লে ও বেলু নায়ডু।

এ সম্বন্ধে ২৯শে অক্টোবরের 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নে' গুজরাটী ভাষায় 'সাবাস ঔরতো' শীর্ষক এক সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়। উহার সারাংশ এই, ট্রান্সভালের বীরনারীগণ বহুদিন হইতে জেলে গমন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এক্ষণে নিউকাসলে ধুমধামের সহিত গ্রেপ্তার হইয়া জেলে উপস্থিত হইয়াছেন। এ খবর আমরা গত সপ্তাহে প্রদান করিয়াছি। পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, এই বীরাঙ্গনাগণ ফ্রীনীখনের সীমানাতে গ্রেপ্তার হইবার জন্য কিরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ চেষ্টাতে সফলকাম না হইয়া গ্রেপ্তার হইবার জন্য ফেরীওয়ালীর বেশে ফেরি করিয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। এখানেও গ্রেপ্তার হইবার কোনও লক্ষণ না দেখিয়া বালকরষ্টের সীমানাতে গমন করেন, কিন্তু সেখানেও গ্রেপ্তার না হওয়াতে প্রতিজ্ঞা করেন যে, যে পর্য্যন্ত না গভর্ণমেণ্ট ৩ পাউণ্ড কর রহিত করেন, সে পর্য্যন্ত নিউকাসল ও তাহার চতুর্দ্দিকে ভারতীয় মজুরগণকে ধর্ম্মঘট করিবার উপদেশ প্রদান করিবেন। তাঁহাদের উপদেশ ভারতীয় মজুরগণের উপর মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করিতে আরম্ভ করে, চারিদিকে ধর্ম্মঘটের আগুণ জ্বলিয়া উঠে। পরিশেষে গভর্ণমেণ্ট ইঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়ে অবগত হওয়া যায় যে, প্রথম হইতেই ইঁহাদের উপর গভর্ণমেণ্টের কোপদৃষ্টি ছিল। এই বীরাঙ্গনাগণকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

সত্যাগ্রহিগণের ভরপুর

নিউকাসলের ব্রজমোহন, ভাগীরথী, রামখেলাওন, কৃষ্ণা, স্বয়ম্বর, রামপ্রকাশ, গোকুল, চীনাপন, মুত্তু ও শেখফরীদ; দরবনের রত্নস্বামী পিল্লে, রামকৃষ্ণ, পপাইয়া ও ইয়েম্বনী সবেস টিয়ণ, চার্লিষ্টনের রামস্বামী গবন্ডর ও পুনস্বামীকে ২৪শে অক্টোবর তারিখে ট্রান্সভালের সীমানায় প্রবেশ করিবার অপরাধে তিন তিন মাসের কঠোর কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। মেরিৎসবর্গের হনুমন্ত বেঙ্কট স্বামী, দরবন ও নিউকাস্‌লের ডোমনীফ্রেন্সীস, কন্দাস্বামী, বেভীবল মুড়লী, শেন মখন দোরাস্বামী, জোজফ মেরীয়ম ও গয়াদীন মহারাজ; জোহান্সবর্গের সুব্রহ্মাণি পিল্লে, অনামল্লে, বীরাফ্রেন্সীস ও মণিলাল গান্ধীকে ২৭শে অক্টোবর তারিখে তিন তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। যখন মিঃ গান্ধির পুত্র শ্রীমান্ মণিলাল গান্ধি দেখিলেন যে, আমি এই বেশে থাকিলে গ্রেপ্তার হইব না, তখন তিনি মিরজাই, ধুতি, চাদর ও পাগড়ী পরিধান করিয়া ভারতীয় পোষাকে বালকরষ্টে আসিয়া উপস্থিত হন। ঔপনিবেশিক শাসনকর্ত্তা ইঁহার এই নূতন পোষাক দেখিয়া চিনিতে না পারায় ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করিয়া কারাদণ্ড প্রদান করেন। মিঃ প্রাগজী দেশাই নিউকাসলের ভারতীয় ধর্ম্মঘটকারিগণের সহায়তা করার অপরাধে ৩ মাসের কারাদণ্ড প্রাপ্ত হন। মিঃ লালমহম্মদ ও মিঃ পিল্লে এইরূপে দণ্ডিত হন। ডেন হাউজরের ৩৫ জনকে

ধর্ম্মঘট করার অপরাধে দুই দুই মাসের জন্য কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। নিউকাসেলের ২০০ জন মজুরকে লইয়া মিঃ অম্বী নায়ডু ট্রান্সভালের সীমানাতে আসিয়া উপস্থিত হন। বৈলজীর কয়লার খনির মজুর সুন্দর ও বজরের প্রত্যেককে ছয় মাসের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। সুন্দরের বয়স ১৭ মাত্র। ইহাদের মধ্যেও একদল জেলে যাইবার জন্য রওনা হয়।

এই সময়ে সু অবসরে শ্রীযুত গান্ধি রাজস্ব সচিব জেনেরল স্মটস্‌কে পত্র লিখিয়া জানান যে, "যদি আপনি ৩ পাউণ্ড কর রহিত করিবার প্রতিজ্ঞা করেন, তাহা হইলে আমি ভারতীয় মজুরগণকে পুনরায় কার্য্যে যোগ দিবার পরামর্শ প্রদান করি।" জেনেরল স্মটস ইহার কোনও উত্তর প্রদান করেন নাই। নিউকাসেলে ১৬০ জন ভারতীয় মজুর কার্য্যে না যাওয়ার অপরাধে ছয় ছয় মাসের কারাদণ্ড প্রাপ্ত হয়। নিউকাসল হইতে যখন ভারতীয় মজুরগণ জেলে যাইবার অভিপ্রায়ে বালকরষ্টে আসিতে থাকে, তখন দুইটী বালকের মৃত্যু হয়। অত্যধিক শীতের জন্য একটি বালকের মৃত্যু হয় ও অপরটি নদীতে ডুবিয়া মরিয়া যায়। প্রথম বালক মরিবার সময় তাহার মাতাকে বলে যে, "মা যে মরিতে যাইতেছে, তার জন্য কেন দুঃখ করিতেছ, যে জীবিত আছে তার জন্য চেষ্টা কর।" বালকের বাক্য কি মর্ম্মস্পর্শী! ভারতীয় বালক ব্যতীত অন্য কোন দেশের বালকে এইরূপ সাহস, স্বার্থত্যাগ ও দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যাইবে না। দেশসেবার জন্য দুইটি বালকের আত্মসমর্পণ দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসে সর্ব্বদা জাজ্জ্বল্যমান রহিবে। নিউকাসল, ডাণ্ডী, লেডিস্মিথ ও চার্লিষ্টন প্রভৃতি স্থানে শত শত ভারতীয় মজুর গ্রেপ্তার হইয়া জেলে প্রেরিত হয়, তাহাদের সংখ্যা গণনা করা এক্ষণে কঠিন। যখন জেলে স্থান কুলাইয়া উঠিল না, তখন গভর্ণমেণ্ট "মজুরগণের ডিপো"কে জেলে পরিণত করেন। ঐ জেলে বেচারা ধর্ম্মঘটকারিগণ কয়েদ হইতে থাকে ও তাহাদিগকে লইয়া গিয়া কয়লার খনিতে কাজ করান হয়।

লোকমান্য গান্ধির গ্রেপ্তার

৬ই নভেম্বর মিঃ গান্ধি ৪০০০ চারি হাজার মজুরকে ট্রান্সভালের সীমানা পার করাইতে থাকেন। ঐ সময়ের দৃশ্য বড়ই করুণাব্যঞ্জক হইয়া উঠিয়াছিল। দলে দলে ভারতবাসী বালকরষ্টের সীমানাতে প্রবেশ করিতে থাকে, স্ত্রীগণ আপনাদের ছোট ছোট ছেলেকে কোলে করিয়া সীমানা পার হইতেছে এবং পুরুষগণ আপনাদের খাইবার জিনিস মাথায় করিয়া সীমানার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। মনে হইতেছে, যেন একটি বৃহৎ সেনাদল কোন দেশ বিজয় করিবার জন্য সানন্দে গমন করিতেছে। সেনাপতি মিঃ গান্ধি উহাদিগকে প্রবল সাহস ও দৃঢ়তা সহকারে চলিবার উপদেশ প্রদান করিতে করিতে গমন করিতেছেন। স্ত্রীগণকে এই যাত্রাতে লওয়া হইবে না এইরূপ প্রথমে মনে করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের দেশ সেবার প্রবল আগ্রহ দেখিয়া বাধা দেওয়া হয় নাই। ঐ সময় ইহা প্রত্যক্ষ হইয়াছিল যে, এই সব স্ত্রীগণের শরীরে সীতা ও গার্গীর পবিত্র রক্তস্রোত বহিতেছে। আনন্দধ্বনি ও বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিতে করিতে এই সেনাদল ট্রান্সভালের সীমানায় প্রবেশ করে, ও বালকরষ্ট নগরের বাহিরে যাইয়া আপনাদের আড্ডা গাড়ে। পুলিস ইহাদের কিছুই

করিতে পারে না। দ্বিতীয় একদল নিউ-কাসেলের দিক হইতে আসে, চার্লিষ্টন নগরে ইহাদের আড্ডা ছিল। মিঃ কেলনবেক এই দলকে সঞ্চালন করিবার জন্য চার্লিষ্টনে গমন করেন। মিঃ গান্ধি, প্রথম দলের সহিত ছিলেন, ঐ দলে একটি লোক ভিড়ে চাপা পড়িয়া মারা যায়। ট্রান্সভালের সীমানাতে ৫০০০ ভারতবাসী একত্রিত হয়। শ্বেতাঙ্গগণ ইহাদের সহিষ্ণুতা, ইহাদের সাহস, ও ইহাদের বীরত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হন ও আপনাদের হৃদয়ের সহানুভূতি জানাইতে থাকেন। ৬ই নভেম্বর মিঃ গান্ধি পামফোর্ড নামক স্থানে গ্রেপ্তার হন ও অবশিষ্ট দলকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কিন্তু আপনাদের কুচ জারী রাখে। দ্বিতীয় দিন মিঃ গান্ধিকে বালকরষ্টের ম্যাজিষ্ট্রেটের সাম্‌নে হাজির করা হয়। তাঁহার উপর অনধিকারী লোককে ট্রান্সভালে প্রবেশ করানর অভিযোগ আনীত হয়। মিঃ গান্ধি জামিনের জন্য প্রার্থনা করেন, সরকারী উকিলের নানারূপ আপত্তির পর ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে ৫০ পাউণ্ড (৭৫০ টাকার) জামিনে খালাস দেন। মহাত্মা গান্ধি তৎক্ষণাৎ আপনার যে দল কুচ করিয়া যাইতেছিল তাহাদের সঙ্গে মিলিত হন। প্রিটোরিয়া হইতে একটি টেলি-গ্রামে প্রকাশিত হয় যে, গভর্ণমেণ্ট এই দলকে গ্রেপ্তার করিয়া ভারতীয় জনসাধারণের বিক্ষেপের কারণ হইবেন না। মিঃ গান্ধি গ্রেপ্তার হইয়া গভর্ণমেণ্টকে এই মর্ম্মে একটি তার প্রেরণ করেন—সত্যাগ্রহের প্রধান প্রচারককে গ্রেপ্তার করিয়াছেন, গভর্ণমেণ্টের পক্ষে ইহা অতিশয় আনন্দের কথা। কিন্তু এই সঙ্গে আমি ইহা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে, আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া গভর্ণমেণ্ট যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই নির্দ্দয়তা ব্যঞ্জক। গভর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, এই দলে ১২২ জন স্ত্রীলোক ও ৫০টী বালক রহিয়াছে। ইহাদিগকে কেবল মাত্র জীবন রক্ষার জন্য অল্প অল্প খাইতে দেওয়া হইতেছে। এই অবস্থাতে গভর্ণমেণ্ট আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া ন্যায় ও দয়ার বিরুদ্ধে কাজ করিতেছেন। বিগত রাত্রিতে আমাকে গ্রেপ্তার করা হই-য়াছে, ঐ সময় আমি কাহাকেও কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিয়াছি। এজন্য হয়ত উহারা অতিশয় রাগান্বিত হইবে। আমি গভর্ণমেণ্টের নিকট বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে, আমাকে উক্ত দলে সম্মিলিত হইবার আজ্ঞা প্রদান করুন, কিম্বা গভর্ণমেণ্ট সকলকে রেল গাড়ীতে চড়াইয়া 'ট্রান্সভাল ফার্মে' পৌছাইয়া দেন এবং ঐ সঙ্গে তাহাদের ভোজনেরও ব্যবস্থা করুন। যদি ঐ সকল লোকগণের মধ্যে, বিশেষতঃ স্ত্রী ও বালকের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হয়, তাহা হইলে গভর্ণ-মেণ্টকে ইহার উত্তর প্রদান করিতে হইবে। ৭ই নভেম্বর মিঃ গান্ধি ষ্টাণ্ডর টাউনের সমীপে দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার হন। স্থানীয় ম্যাজি-ষ্ট্রেটের নিকট তাঁহাকে হাজির করা হয়। মিঃ গান্ধি বিচারের দিন পরিবর্ত্তন করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। তদনুসারে ম্যাজিষ্ট্রেট ২১শে নভেম্বর পর্য্যন্ত মোকদ্দমা মুলতবী রাখিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। মিঃ গান্ধি তথা হইতে মুক্ত হইয়া আপনার দলে আসিয়া যোগ দেন। ডাণ্ডীর ম্যাজিষ্ট্রেট পরওয়ানা লইয়া গ্রেলীঙ্গষ্টাড নামক স্থানে তৃতীয়বার তাঁহাকে গ্রেপ্তার করেন। গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহাকে ডাণ্ডীতে লইয়া আসা হয়। গান্ধির দলকেও গ্রেপ্তার করিয়া রেলগাড়ীতে বসাইয়া নেটালে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

কোনও ভারতবাসী বালকরষ্টে প্রবেশ করিতে না পায় এই উদ্দেশে তথায় সেনা নিবাস স্থাপন করা হয়। নিউকাসেলের নিকটবর্ত্তী বৈলঙ্গীর কয়লার খনিতে একজন ভারতীয় মজুরকে তাহার শ্বেতাঙ্গ মালিক জীবিতাবস্থায় মারিয়া ফেলে। লোকমান্য গান্ধি গ্রেপ্তার হইলে ভারতীয়গণের মধ্যে আন্দোলনের তুফান বহিতে থাকে। মাউণ্ট এজকোম্ব, বেরুলম, টোঙ্গাট, প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্মঘটের আগুণ ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। দরবনের মিঃ সোরাবজী পারসী, ও মিঃ মতিলাল দীবান মজুরগণকে কার্য্যে পুনরায় যোগ দিবার জন্য উপদেশ দেন, কিন্তু কেহই সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া আপনাদের ধর্ম্মঘট বরাবর বাহাল রাখে।

শ্রীসেবাভিক্ষু জীবন।

জড় ও শক্তিতত্ত্ব

(৯১৩ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

ঈথর জড় বা অ-জড় কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত ?

অনেক বৈজ্ঞানিকের মতে ঈথর অ-জড় শ্রেণীর অন্তর্গত। কেন না জড়ের যে সকল ধর্ম্ম থাকা চাই, ঈথরের তাহা নাই। জড় ঈথর সম্ভূত—ঈথরের কার্য্য কিন্তু নিজে জড় নহে। পণ্ডিত Dolbear তাঁহার Matter, Ether and Motion নামক গ্রন্থে লিখিতেছেন—"If, then, the ether fills all space, is not atomic in structure, presents no friction to bodies moving through it, and is not subject to the laws of gravitation, it does not seem proper to call it matter," কিন্তু আমার মনে হয় বৈজ্ঞানিকগণ যদি একটু যুক্তিবিজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলেন তাহা হইলে শব্দপ্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁহারা কতকটা সতর্ক হইতে পারেন। যুক্তিবিজ্ঞানের প্রতি ঔদাসীন্য বশতঃ তাঁহারা যাদৃচ্ছিক শব্দপ্রয়োগে কুণ্ঠিত নহেন; কিন্তু পরিশেষে আপনার জালে আপনি বদ্ধ হইয়া পড়েন। তাঁহারা জড়ের যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা একটা কাল্পনিক পারিভাষিক সংজ্ঞা মাত্র। তাঁহাদের স্বীকৃত ঈথরে যে তাহা প্রযুক্ত হইতে পারে না, সে দোষ ঈথরের নহে, তাঁহাদের প্রদত্ত সংজ্ঞার। ঐ সংজ্ঞা অতি সঙ্কীর্ণার্থক। কিন্তু পারিভাষিক জড় সংজ্ঞা ঈথরে প্রযোজ্য না হইলেও, চেতনার বিরোধীত্ব প্রযুক্ত ঈথর কেন অচেতন হইবে না তাহা বুঝা যাইতেছে না; এবং যাহা অচেতন—তাহাই দৃশ্য—প্রতিভাস—সুতরাং জড়, একথা অক্লেশে মনে করা যাইতে পারে। আর ঈথরই বা পারিভাষিক জড় সংজ্ঞার বাহিরে পড়িবে কি প্রকারে? mass বা inertia বিশিষ্টতা যখন অপরাপর বাহ্য দ্রব্যের ন্যায়, ঈথরেও আছে, তখন

ঈথর অবশ্যই জড়শ্রেণীর অন্তর্গত হইবে, ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। অতএব Dolbear যে বলিয়াছেন "it does not seem proper to call it matter," তাহা বিস্ময়জনক। আমি বরং আর একটু সতর্ক হইয়া বলিতে চাই—"it does not seem proper to call it existent."। আমরা পূর্ব্বে যে সকল তর্কের অবতারণা করিয়াছি তাহা হইতে ঈথরের অসত্তাই (non-existence) যেন সমর্থিত হয়। অতএব জড়বাদের চরম সীমা শূন্যবাদ। পণ্ডিত Dolbear সেই কথাটি বলিতে বলিতে রহিয়া গিয়াছেন, মনে হয়। প্রত্যয়লব্ধ উপকরণ হইতে নিকৃষ্ট কল্পনা দ্বারা প্রত্যয়গুলির উৎপাদকরূপে আমরা কতকগুলি মূল ধারণায় উপনীত হই এবং ঐগুলিতে আত্মসত্তার অধ্যাস করিয়া বাহ্য স্বতন্ত্র বস্তুরূপে ব্যবহার করিয়াই ব্যবহারিক জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করি। ঈথর, পরমাণু, তড়িৎ, ঘট, পট, মঠ, প্রভৃতি সমস্তই এই প্রকারে সত্তাশীল। যাহা হউক, ও প্রস্তাব এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

আজ কাল আবার বৈজ্ঞানিক মহালে একটা নূতন সুর আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি রেডিয়ম নামক এক প্রকার ধাতু আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহার গাত্র হইতে নাকি অসংখ্য তাড়িতকণা অবিরত ছুটিয়া বাহির হইতেছে। এই তাড়িতকণাগুলির বেগ অতি বেশী। ইহারা জড় পদার্থ কি না তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই, এবং ইহাদের ভারীত্ব আছে কি না তাহাও এ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। তবে ইহাদের চঞ্চল অবস্থায় ধাক্কা দিবার ও ধাক্কা খাইবার ক্ষমতা আছে, ইহা জানা গিয়াছে। যতক্ষণ এই কণাগুলি স্থির থাকে ততক্ষণ উহাদের জড়ত্ব অর্থাৎ ধাক্কা দিবার ও ধাক্কা খাইবার ক্ষমতা থাকে না। অত্যন্ত বেগে ছুটিলেই উহাদের জড়ত্ব জন্মে। বেগ যত বেশী হয়, জড়ত্বও তত বাড়িতে থাকে। ইত্যাদি দেখিয়া অনেকে জড়পদার্থের পরমাণুগুলিকে তাড়িৎকণার সংহতি বিশেষ বলিয়া মনে করিতেছেন। ইঁহারা বিবেচনা করেন, এক একটি পরমাণু বহুসংখ্যক তাড়িত কণার ঘূর্ণী। ঘূর্ণীর মধ্যে পড়িয়া ঐ কণাগুলি অত্যন্ত বেগে ঘুরিতেছে তাই উহাদের জড়ত্ব। এই জড়ত্ব যখন উহাদের বেগ সম্ভূত, তখন জড়ের অবিনাশিত্ব প্রতিপালন চেষ্টা কতদূর সঙ্গত তাহা সুধীমণ্ডলীর বিচার্য্য। ১

উক্ত তাড়িত কণার সহিত ঈথরের সম্বন্ধ কি প্রকার তাহা নির্ণীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। হইতে পারে ঈথর বস্তুটি তড়িন্ময়; হইতে পারে নিজে তড়িন্ময় না হইলেও উহা হইতে তাড়িত কণা নির্গত হইয়া থাকে। এই তাড়িতকণার ইংরাজী প্রতিশব্দ electrons। ঈথর অখণ্ড বস্তু (continuous medium) এবম্বিধ পদার্থ হইতে তাড়িত কণা কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, সে প্রশ্নের মীমাংসা প্রয়োজনীয় (there remains the question of the formation of these electrons themselves from a continuous medium)। কিন্তু এ মীমাংসা আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

এতাবৎ আমরা জড়তত্ত্ব সম্বন্ধে যে প্রকার আলোচনা করিলাম তাহা হইতে এইটুকু দেখা যাইতেছে বিজ্ঞান একটা সৎ

১ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কৃত 'জিজ্ঞাসা' দ্রষ্টব্য।

পদার্থের অন্বেষণ করিতেছে; এবং ঈথরে সেই সৎপদার্থের আভাস পাইতেছে। কিন্তু ঈথর তত্ত্ব প্রকৃত পক্ষে সেই সৎ পদার্থ কি না তাহা কোন মতে বলা যায় না। উহার পরিণতি শূন্য বাদে (physical nihilism)। এক্ষণে অন্য তন্ত্রের মতবাদটা পরীক্ষা করিতে হইবে। সে তন্ত্রের সিদ্ধান্তে জড়তত্ত্ব শক্তি-তত্ত্বে পর্য্যবসিত। জড়ের স্বরূপ লইয়া অন্য একদল বৈজ্ঞানিক যে গবেষণা করিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাই-তেছে। ইঁহারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন যে, যাহাকে জড় বলা হয়, তাহা বস্তুতঃ বলের অতিরিক্ত পদার্থ নহে। তাঁহাদের মতে জড়কে বিশ্লেষণ করিলে জড় বলতত্ত্বেই (force) পর্য্যবসিত হয়। ইঁহারা বলেন যাহাতে আমাদের আত্মাপেশী প্রযুক্ত বলকে (muscular effort) প্রতিরোধ (resist) করে, তাহাই জড়। কিন্তু বলের প্রতিরোধে কেবল বলেরই পরিচয় পাওয়া যায়, তদতি-রিক্ত কোন পদার্থের পরিচয় পাওয়া যায় না। বল দ্বারাই বল প্রতিরুদ্ধ বা প্রতিহত হয়। সুতরাং বলিতে হইবে জড়ের স্বরূপ (essence) বল। জড়ীয় ধর্ম্মগুলিকে বিশ্লেষণ করিলে এই বাক্যের সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে।

১। জড়ের দেশব্যাপ্তি (extension) আছে। কিন্তু দেশব্যাপ্তির অর্থ সেই স্থানে অন্য বস্তুর প্রবেশে বাধা দেওয়া। বস্তু যে পরিমাণে চলিষ্ণু, সেই পরিমাণেই উহা দেশের অংশ বিশেষে প্রবিষ্ট হইতে পারে, বা প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে।

২। প্রতিরোধকতা (resistance)। ইহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

৩। কাঠিন্য (hardness)। ইহা অবয়-বের মিলন প্রবণতা; সুতরাং বলের বাচক।

৪। গতি (motion) বল প্রয়োগেই জড় গতিশীল হয়।

এই প্রকার বিশ্লেষণে দেখা যায় জড়ের স্বরূপ বল। এই বল নিরপেক্ষে কোন জড় পদার্থই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর হয় না। ক্ষিতি, অপ, মরুৎ, ব্যোমকে আমরা কখনও অনুভব করি না। যাহা অনুভবের বিষয় তাহা, উহার ধাক্কা—গতি—বলক্রিয়া। এই ধাক্কা অনুভব করিয়া—গতি দর্শন করিয়া—উহার আধাররূপে যাহা কল্পনা করি তাহাই লৌকিক হিসাবে জড়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ঐ ধাক্কা—গতি প্রভৃতি বলেরই ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া। এই বলের ধারণা-টাকে বাদ দিয়া আমাদের জড়ত্বের ধারণাই সম্ভবপর নহে।

মহামতি Herbert Spencerএর সিদ্ধান্ত এই প্রকার, তাহা পূর্ব্বে এক স্থানে বলিয়াছি। তাঁহার শিষ্য পণ্ডিত Fiske বলেন—

"Since we cognise any portion of matter only in an aggregate of co-existent positions which offer resistance to our muscular energies, since it is primarily by virtue of such resistance that we distinguish matter from empty space, it follows that our idea of matter is built up of experiences of force, and that the indestructible element in matter is its resisting power or the force which it exerts."২

২ Cosmic Philosophy vol. I, p. 282.

বিখ্যাত পণ্ডিত Faraday ও Boscovich প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ জড়কে এই ভাবে বলতত্ত্বে পর্য্যবসিত করিয়াছেন। বিজ্ঞান বিশারদ Helmholtz বলেন—

"It is manifest that when applied to nature the conceptions of matter and energy are not to be separated. Pure matter would for the rest of nature be a thing of indifference, since it would never determine any change in this or in our senses. Pure energy would be something that ought to exist and yet again ought not to exist, for the existent we call matter. Both conceptions are abstractions from the actual formed in the same way; we can in truth perceive matter only through its energies, never in itself." ৩

Helmholtzএর কথায় উপরোক্ত সিদ্ধান্তই সমর্থিত হইতেছে। শক্তি ব্যতীত জড় আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে। তবে Helmholtz শক্তির অতিরিক্ত একটা জড়ের সত্তায় অপ্রত্যয় করিতেছেন না। কেন যে করিতেছেন না তাহার কোন কারণও বুঝা যাইতেছে না। ব্যবহারের অনুরোধে কি সহজাত সংস্কারের প্রেরণায়—তাহা স্পষ্টতঃ তিনি বলেন নাই। কিন্তু শক্তি ব্যতীত যদি জড়কে তিনি কখনও প্রত্যক্ষ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে জড়ের স্বতন্ত্র সত্তার অঙ্গীকার যে একটা যুক্তিযুক্ত ব্যাপার তাহা ত মনে হয় না।

অধ্যাপক Tait মহোদয়ও শক্তি ও জড়ের দ্বৈত সত্তা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু শক্তিকে এতই প্রাধান্য দিয়াছেন যে তাহার ভারে জড় একপ্রকার বিলুপ্তই হইয়াছে। তিনি জড়কে শক্তির আধাররূপে কল্পনা করেন। অথচ এই বিশুদ্ধ আধারের ধারণা যে হইতে পারে তাহা তিনি দেখাইতে চেষ্টা করেন নাই। আধারের সত্তাই আধেয়গম্য, একথা তিনি প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে জড় যে শক্তির আধার, এ প্রকার ধারণার কোন মূল দেখা যায় না। আধারকে আধেয় হইতে পৃথক ভাবে না জানিলে একটিকে আধার ও একটিকে আধেয় রূপে কি প্রকারে জানা যাইবে? শক্তি লইয়াই আমাদের কারবার। শক্তিই বাহ্য জগতের উপাদান বলিয়া গণ্য; জড়ের নাম উল্লেখ না করিয়া, ইঁহাদেরই মতে, প্রকৃতির সর্ব্বপ্রকার গতিবিধির প্রণালী ব্যাখ্যাত হইতে পারে। এ স্থলে কাল্পনিক একটা সত্তার কোন প্রয়োজন নাই।

কিন্তু বলের কথা আরম্ভ করিয়া শক্তির কথা আনিয়া ফেলিয়াছি। বৈজ্ঞানিকেরা হয় ত পড়িয়া মনে মনে হাসিবেন। ভাবিবেন লেখকের বল ও শক্তির পার্থক্যজ্ঞান নাই। উভয়কে একত্র মিশাইয়া একটা গণ্ডগোল করিয়া ফেলিয়াছেন। বিজ্ঞান যাহাকে শক্তি বলে তাহা energy অর্থাৎ কার্য্য করিবার ক্ষমতা। বল(force) অন্যবিধ পদার্থ। এককে আর করিয়া লেখক অবৈজ্ঞানিকতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।

কথাটা ঠিক। তবে লেখক বৈজ্ঞানিক নহেন, দার্শনিকও নহেন, সুতরাং তাঁহার এ প্রমাদ অবশ্যম্ভাবী। তবে মূল কথাটার

৩ Introduction to his Essay on the 'Conservation of Energy.'

বিশেষ গোল হয় নাই বোধ হয়। হয় জড়কে বলে পর্য্যবসিত করা হউক, না হয় শক্তিতে পর্য্যবসিত করা হউক। জড়ের স্বতন্ত্র সত্তা ইহারা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত সেইটুকুই আমার দেখাইবার ইচ্ছা। পারিভাষিক হিসাবে এখানে শক্তি ও বল ভিন্ন হইলেও বস্তুগত্যা ভিন্ন হইতেছে না। Dynamics এর নিকট বলেরও স্বাতন্ত্র্য নাই; সেখানে উহা গতির উৎপাদক ও নিবর্ত্তকরূপে পরিকল্পিত হয় নাই। অনুভবের দিক দিয়া দেখিলে শক্তি ও বলের বৈজ্ঞানিক প্রভেদ স্বীকার্য্য কি না সে কথাটাও বিচার্য্য। শক্তি বা বল ইন্দ্রিয়লব্ধ বস্তু নহে not a datum of sensation, বুদ্ধি পরিকল্পিত সামান্যভাব মাত্র (a mere concept)। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে এই ভাবটি গতির—বিকৃতির, সম্ভাবনা মাত্র (a mere potentiality of changes) পর্য্যবসানযোগ্য, কিন্তু এই সম্ভাবনা মাত্রকেই বাস্তব সত্তা বলিয়া গ্রহণ করিতে মনুষ্য চিন্তা কুণ্ঠিত হয়। সে যাহা হউক। যে সকল বৈজ্ঞানিকের কথা বলিতেছিলাম তাঁহারা এই বল বা শক্তিকেই জগতের সর্ব্বেসর্ব্বা মনে করেন। তাঁহাদের মতে যাহা কিছু দেখা শুনা যায় এই বল বা শক্তি তাহার মূল।

অপর সম্প্রদায় বল বা শক্তি উভয়কেই উড়াইয়া দেন। তাঁহাদের মতে জগতে যাহা কিছু অনুভবের বিষয় যাহা কিছু দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য—সমস্তই গতি—স্পন্দ—চাঞ্চল্য। যাহাকে শক্তি বা জড় বলা হয়, তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ নহে। তাহাদের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কেবল গতির সহিত। Romanes বলেন—"All our knowledge of the actual world is a knowledge of motion. For all the forms of energy have now been proved to be but modes of motion; and even matter, if not in its ultimate constitution, at all events is known to us only as changes of motion: all that we perceive in what we call matter is change in modes of motion. ৪

এমন কি Pure molar and molecular mechanics এর প্রধান লক্ষ্যই প্রকৃতি রাজ্যের বাস্তব ও কাল্পনিক গতির বর্ণনা করা। জড়ের রহস্য উদ্ঘাটন বা কার্য্যের কারণ নির্দ্ধারণ করা ইহাদের অবান্তর উদ্দেশ্য। এই প্রকার গবেষণার পরিণতি গতিবাদে—অনুভূয়মান গতিতত্ত্বে। এই হিসাবে অনুভূয়মান গতি ব্যতীত ও গতির রূপান্তর ব্যতীত দুনিয়ায় আর কোন বস্তু নাই। উত্তাপ এক প্রকার গতি (a mode of motion); স্থিতিস্থাপকতা (elasticity) এক প্রকার গতি; আলোক এক প্রকার গতি; চৌম্বক শক্তি এক প্রকার গতি; এমন কি বস্তুমাত্রা (mass) পরিণামে, একটা অনির্ব্বাচ্য পদার্থের এক প্রকার গতিতেই গিয়া দাঁড়ায়—যে পদার্থটি না কঠিন, না তরল না বায়বীয় না পিণ্ড, না পিণ্ডসমষ্টি, না ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না নির্গুণসৎ (a mode of motion of something that is neither solid nor liquid nor gas, that is neither itself a body nor an aggregate of bodies, that is not phenomenal and must not be nominal—Ward.)

৪ Mind and Motion and Monism.—p. 23.

উক্ত মতবাদটিকে যুক্তির অনুবীক্ষণে পরীক্ষা করিতে গেলে, উহা শূন্যবাদে না হয় আত্মবাদে পর্য্যবসিত হয়। যদি গতি বা স্পন্দ বা পরিবর্ত্তনকে কোন বস্তুর গতি, স্পন্দ বা পরিবর্ত্তনরূপে ধারণা করা না যায় তবে গতিকে—স্পন্দকে—পরিবর্ত্তনকে পরিবর্ত্তন-রূপেই ধারণা করা যায় না। অপরিবর্ত্তনীয় কূটস্থ কোন বস্তুর সহিত সম্বন্ধ ও তুলনা ব্যতীত পরিবর্ত্তনের বোধই সম্ভব। সুতরাং এই গতির মূলে এই পরিবর্ত্তন রাশির ভিত্তি স্বরূপ যদি একটা স্থায়ী কিছু না থাকে—যাহা এই পরিবর্ত্তন পরম্পরার মধ্যেই স্থির অপরিবর্ত্তনশীল—তবে গতিজ্ঞান অসম্ভব। এই অপরিবর্ত্তনীয়—স্থির বস্তুটিকে যদি বাহ্যজগৎ হইতে নির্ব্বাসিত করা যায়—তাহা হইলে, গতি থাকিলেও উহা জ্ঞানাতীত—কল্পনাতীত ভাবেই থাকিবে। তখন শূন্য হইতে ইহাকে প্রভেদ করিবার হেতু না থাকায় উহাকে শূন্য-অসৎ বলিয়াই ধরা যাইবে।

আর যদি একটা নিত্য অপরিণামী বস্তুসত্তা বাহিরে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে জড়—বা গতি প্রভৃতির কোন ভাবেই ধারণা করাই উচিত নহে; কেননা তাহা নিজে জড় বা গতিশীল না হইয়াও আমাদের মনে জড়ত্ব বা গতিবোধের উপকরণ উপস্থাপিত করিতে পারে। গতি বা স্পন্দকে আমার ক্রিয়া বলিয়া—কৃতিত্ব (activity) বলিয়া বুঝিতে পারি, কেননা কৃতিত্ব কাহাকে বলে আত্ম-কৃতিত্ববোধে তাহার পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি। বাহ্যক্রিয়া বা কৃতিত্বকে আত্ম-কৃতিত্বের বোধে ক্রিয়া বা কৃতিত্ব বলিয়া বুঝি। এই আত্মকৃতিত্বের বোধ অপরোক্ষ ভাবে প্রাপ্ত না হইলে, কোথায়ও ইহার জ্ঞান সম্ভবপর হইত না। বিচক্ষণ পণ্ডিত Kant বলেন—

"We should not recognise the moving forces of matter, not even through experience, if we were not conscious of our own activity in ourselves, exerting acts of repulsion, approximation &c."

ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী এক মহান আত্মতত্ত্বের কর্ত্তৃত্ব (activity) রূপে আমরা জগতের যাবতীয় গতি, স্পন্দ পরিবর্ত্তনকে বুঝিতে পারি। আত্মকৃতিত্ব ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর কৃতিত্ব আমাদের অপরোক্ষ ভাবে জানা নাই। সুতরাং আমাদের কৃতিত্ব যেখানে কল্পনা করিতে পারি না, সেখানে অন্য আত্মার কৃতিত্ব কল্পনা করিতে আমরা বাধ্য। তাই জনৈক দার্শনিক দৃঢ়তার সহিত বলিয়া-ছেন :—

"জড়স্পন্দ ক্রিয়ায়াং যা শক্তিঃ সা
কর্ত্তৃতাত্মনঃ।"

অতএব গতিবাদ এই হিসাবে আত্মবাদে পর্য্যবসিত, তাহা বুঝা যাইতেছে। বাস্তবিক জড়বাদ, শক্তিবাদ, গতিবাদ, ইত্যাদি বহুবিধ মতবাদের প্রচার দেখিয়া আমার মনে বেদান্তের প্রাচীন ঋষির—

"একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি"

এই অমূল্য বাক্যটি নিতান্ত সার্থক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

জড় ও শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে মতবৈষম্য থাকিলেও বৈজ্ঞানিকগণ প্রায় সমস্বরে জড় ও শক্তির নিত্যতা প্রচার করিয়া থাকেন। আপাততঃ সেই সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিব। যদি

ঈথর হইতে জড়ের উৎপত্তি স্বীকার করা যায়, এবং যদি ঈথরকে জড়ের স্বজাতীয় বলিয়া স্বীকার না করা যায়, তবে জড় কি প্রকারে অজ, নিত্য, হ্রাসবৃদ্ধির অতীত, হইতে পারে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। জড়ের পরমাণু লক্ষ লক্ষ তাড়িত কণিকার সংহতি মাত্র। এই তাড়িত কণিকাগুলি মূলতঃ বোধ হয় ঈথরের বিন্দুলিঙ্গ মাত্র। তাহা হইলে ইঁহাদের মতে সমস্ত জড় বস্তুই জন্য ও বিনশ্বর। রাসায়নিকের মূল ভূতগুলিও সুতরাং ঈথরীয় কণিকাতে পর্য্যবসিত হইতেছে। জলকে উত্তাপ প্রয়োগে বাষ্পাকারে পরিণত করিয়া, ও বাষ্পকে জলে পরিণত করিয়াই জড়ের নিত্যত্ব, ও অজত্ব সপ্রমাণ করা হয় না। আরও নিম্নে, আরও সূক্ষ্মে উপনীত হইতে হইবে। একেবারে মূলে না পৌছিলে, জড়ের নিত্যতানিত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রকার বাঙ্নিষ্পত্তি হঠকারিতা মাত্র।

যাঁহারা জড়ের নিত্যতাবাদী, তাঁহাদের বিশ্বাস রূপান্তরিত জড়ের সমস্ত টুকরাগুলি অবিকল কুড়াইয়া সংগ্রহ করিতে পারিলে দেখা যাইবে, উহার কিছু মাত্র বিলুপ্ত হয় নাই, কেবল রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে মাত্র।

এই নিত্যতা প্রমাণের মানদণ্ড নিকৃতি। নিকৃতিরও তোলে ঐ রূপান্তরিত বস্তুর পরিমাণ যদি অরূপান্তরিত অবস্থার পরিমাণের সমান হয়, তবেই বুঝিতে হইবে বস্তু উভয় অবস্থায় অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

এ যুক্তিটি আপাতরমণীয়। সহজেই নির্ভুল বলিয়া প্রতীয়মান হয়; কিন্তু ইহাকে নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে সতর্ক বিচার আবশ্যক।

১। কোন্ দ্রব্যে কতগুলি তাড়িত কণিকা আছে, তাহা সর্ব্বাগ্রে নির্ণয় করিতে হইবে। তাড়িত কণিকার সংখ্যা না জানিলে, রূপান্তরিত অবস্থায় দুই একশত তাড়িত কণিকা উহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঈথরের আত্মভূত হইয়াছে কি না তাহা ঠাহর করা যাইবে না।

২। তাড়িত কণিকা ধরিবার ছুঁইবার জিনিষ নহে যে, তাহাকে গণনা করিয়া তাহার সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইবে। ইহাদের গণা পড়া গড় ধরিয়া (average) হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে কণিকার হ্রাসবৃদ্ধি না ঘটিলে, বস্তুর ওজনের হ্রাসবৃদ্ধি ধরিবার উপায় নাই।

৩। বস্তুর ভারিত্ব, উহার অবয়ব সংস্থানের ফলে ঘটে কি না; তাপাদির সহিত ইহার কোন সংস্রব আছে কি না, তাহার নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।৫

৪। যে প্রক্রিয়া বশে ঈথর হইতে তাড়িত কণিকা বিদীর্ণ বিচ্ছুরিত হয়, সেই প্রক্রিয়া বশে, রূপান্তর গ্রহণ কালে, বস্তুর অন্তর্হিত পরমাণুর পরিবর্ত্তে অভিনব তাড়িত কণিকা আসিয়া সেই শূন্যস্থান পূরণ করে কি না, ইহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। যে পরিমাণ তাড়িত-অণু ঈথরে বিলীন হইয়া গেল, সেই পরিমাণ তাড়িদণু যদি উহার শরীর হইতে তৎক্ষণাৎ নির্গত হইয়া শূন্য স্থান পূরণ করে, তাহা হইলে, বস্তুর ওজন সমান হইলেও নূতন বস্তুর অভ্যুদয় হইয়াছে বলিতে হইবে।

৫ অধ্যাপক Tait বলেন—"Weight is an accidental property, connected with the presence of another mass of matter." অধ্যাপক লজ বলেন বস্তুর গুরুত্ব অবয়বসংস্থান ও তাপ নিরপেক্ষ কিনা, ঠিক বলা যায় না।

৫। বস্তুর ভারিত্বই সর্ব্বেসর্ব্বা নহে; এক একটি বস্তু গুণরাশির সমষ্টি মাত্র। এমত স্থলে যদি পনর আনা গুণ বদলাইয়া যাইয়া, কেবল ভারিত্বের মাত্র সাম্য থাকে, তাহা হইলে বস্তু অভিন্ন থাকে কি না তাহা বিচার করিতে হইবে। অর্থাৎ একটি বস্তু যদি অন্যান্য সকল গুণেই অপর একটি বস্তুর বিপরীত হইয়া কেবল গুরুত্বে উহার সমতুল হয়, তাহা হইলে উভয় বস্তুর একত্ব প্রতিপাদন করা যায় কি না, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

৬। আমাদের ব্যবহারিক গণ্ডীর মধ্যে যতটুকু জড়ের সহিত আমাদের পরিচয়, তাহার বাহিরে জড় বলিয়া যদি কিছু থাকে তবে তাহার গণনা না করিয়া, জড় অবিনশ্বর, জড়ের ভাণ্ডার অক্ষয় ইত্যাদি বাক্য প্রযোক্তব্য কি না বিবেচনা করিতে হইবে।

৭। জড়ের উৎপত্তি যখন প্রমাণসিদ্ধ, উহার ঈথরে বিলয়ও যখন সপ্রমাণ, তখন কি প্রকারে বলা যায়—জড় অজ নিত্য শাশ্বত?

৮। বিশ্বজগতের পরিমাণ (mass) নির্দ্দিষ্ট ও অপরিবর্ত্তনীয়,—ইহার অকাট্য প্রমাণ ও সম্যক্ জ্ঞান না থাকিলে, এই পরিমাণ স্থির ধ্রুব কি না তাহা অবগতির উপায় কি? এবং এই অকাট্য প্রমাণ ও সম্যক জ্ঞান লাভ করিবার পূর্ব্বে বস্তুমাত্রাকে জড়বস্তু (matter) হইতে বিভিন্ন করিয়া বিচার বা পরীক্ষা করিতে হইবে।

৯। যাহাকে একান্ত সৎ বলিয়া সাব্যস্ত করা হইবে তাহা যে জড়-ভারিত্ব বিশিষ্ট জড়—হইবে, তদতিরিক্ত আর কিছু হইতে পারিবে না, যে পর্য্যন্ত এ সত্য প্রতিপন্ন না হইবে, সে পর্য্যন্ত নিকৃতির দোহাই দিয়াই বস্তুমাত্রার অক্ষয়ত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারিবেনা (when some one shall have shewn that what exists must exist as matter is necessarily ponderable matter, then, but not before, the old maxim *Ex nihils nihil fit* and the appeal to the balance will be relevant to the question).

১০। জড়ের স্বরূপ এ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয় নাই। জড় বাস্তবিক কি জিনিষ—বাস্তবিক উহা শক্তির অতিরিক্ত জড় বলিয়া একটা কিছু কি না সেই বিষয়ই যখন সন্দিগ্ধ, তখন উহার পরিমাণ অচ্যুত, নিত্য, এ বাক্যের তাৎপর্য্য কি বুঝা দুঃসাধ্য।

১১। দেখিতে হইবে যে বস্তু তুলিত হইবে তাহার পরিমাণ ও যে বস্তুর মাপে তুলিত হইবে তাহার পরিমাণ—এ উভয়ের একটা বিশিষ্ট অণুপাত আছে কি না; যদি উভয়ের পরিমাণ সমান অনুপাতে পরিবর্ত্তিত হয়, তবে, তাহাদের অনুপাত ঠিকই থাকিবে বটে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি হইলেও, সেটা ধরা পড়িবে না "(if both these quantities, were to vary, in the same proportion, their ratio, of course, would remain unaffected; hence it can afford us evidence of such Variation. We assume however, that our standard is fixed, or what comes to the something *for metrical purpose* that, if there is any variation, it is a uniform variation through out the universe)."

১২। একটি সরোবরের জলরাশি সর্ব্বদাই

যদি সমতল রেখা নির্দ্দেশ করে, তাহা হইলে ঐ জলরাশির পরিমাণ স্থির। ইহা যদি সত্য কথা বলিয়া স্বীকার না করা যায়, তবে আমাদের দৃশ্য জগতের উপরিভাগের বস্তুরাশি সর্ব্বদাই সমান বলিয়া বস্তুরাশির ক্ষয় নাই অনুমান করা কতদূর সত্য, তাহাও বিচার্য্য।

১৩। জড় কিম্বা শক্তির অক্ষয়ত্ব পর্য্যবেক্ষণলব্ধ সত্য; উহার স্বতঃসিদ্ধতা নাই; সুতরাং উহাকে অবশ্যম্ভাবী সত্যরূপে গ্রহণ করা যায় কিনা তাহাও বিবেচ্য।

জড়ের অক্ষয়ত্ব সম্বন্ধে যে সকল বিষয় বিবেচ্য, শক্তির অক্ষয়ত্ব সম্বন্ধেও সেই প্রকার বিবেচনা করিতে হইবে। তবে সংক্ষেপতঃ দুই চারিটি আপত্তির উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। বৈজ্ঞানিকগণ শক্তি অর্থে মুখ্যতঃ কার্য্যকরী শক্তিকেই বুঝিয়া থাকেন। ইহার অবিনাশিতা অর্থে এই বুঝা যায় যে, শক্তি নানাবিধরূপ গ্রহণ করিয়া থাকে; কিন্তু তাহার পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। জগতে সর্ব্বদাই শক্তির আনাগোনা চলিতেছে কিন্তু তাহাতে শক্তির পরিমাণের ইতর বিশেষ হইতেছে না। জগতে ক্রিয়াশীল যাবতীয় শক্তির যাবতীয় মূর্ত্তি কুড়াইয়া সঙ্কলিত করিলে দেখা যাইবে, উহার পরিমাণের ক্ষয়ও নাই বৃদ্ধিও নাই। সর্ব্বদা এক রকমের শক্তি পাওয়া যায় না। কোন স্থানে কোন রকমের শক্তির তিরোভাব ঘটিলে অন্বেষণ করিলেই দেখা যাইবে, কোন না কোন স্থানে অন্য রকমের শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। শক্তি পক্ষে এই সমানতা কিরূপ? এক রকমের শক্তি খরচ করিয়া যখন আমরা তাহার বিনিময়ে অন্যরূপ শক্তি পাই এবং সেই বিনিময়ের হার যখন বাঁধা আছে, কতটার বদলে কতটা পাওয়া যাইবে, তাহা বাঁধা আছে, তখন ইহার ঐ দুই মূর্ত্তিভেদকে সমান বলা যায়। এখানে সমানতার অর্থ তুল্যমূল্য (equivalent)। শক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপের মধ্যে কোন সাদৃশ্য বা সজাতীয়তা নাই। বিনিময়ের হার বাঁধা থাকিলেই কারবার চলিয়া যায়। যতক্ষণ এই হার বজায় থাকে, ততক্ষণ শক্তির অবিনাশিতাই ধরিয়া লওয়া যায়। কিন্তু মূল্য সমান থাকিলেই যে বস্তু সমান হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য নহে। পণ্ডিত Ward বলেন—

"The Bank of England issues notes equivalent in value to the gold in its cellars, and pays the gold out again to whoever presents the notes, and is so far unconcerned as to all the transactions that have intervened. Whether these transactions were many or few, domestic or foreign, industrial or financial—is of no amount. So here: our ignorance of one or many possible transformations does not affect the main doctrine, provided we never find a transformation in which energy appears or disappears, unaccounted for.

২। একটা নির্দ্দিষ্ট সমষ্টির অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তি ক্ষর, বিনাশশীল হইলেও, যদি প্রত্যেক ক্ষর ব্যক্তির স্থানে অভিনব ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে, তাহা হইলে—যেমন সমষ্টি স্থিরই থাকে; শক্তি সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা বলা যাইতে পারে।

৩। শক্তিকে যে নিত্য, অনপায়ী বলা হয়, তাহা কেবল কার্য্যকরী শক্তি—কেবল

সক্রিয় শক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বলা হয় না। শক্যতা (potential energy) যাহাকে প্রকৃতপক্ষে শক্তি বলিতে পারা যায় না—যাহা শক্তির কার্য্য করিবার সম্ভাবনা মাত্র (capacity for capacity for work), তাহাও শক্তিতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত। দ্বিতীয়তঃ অপব্যয়িত (dissipated) শক্তি—অর্থাৎ যে শক্তি কার্য্য করিবার ক্ষমতা হইতে চিরবঞ্চিত হইয়াছে—যাহাকে কার্য্যে লাগাইবার সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়াছে—তাহাও এই শক্তিতত্ত্বের পরিবারস্থ বলিয়া গৃহীত। তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক ভৌতিক যন্ত্রের অভ্যন্তরে একটা অজ্ঞাত, অনির্দ্দিষ্ট পরিমাণ প্রচ্ছন্ন শক্তি (latent energy) আছে, এই প্রকার কল্পনা করিয়া তাহাকেও এই শক্তিতত্ত্বের অন্তর্গত ধরা হয়।

এই বিভিন্ন প্রকারের শক্তিগুলিকে সঙ্কলিত করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ শক্তির অবিনাশিত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। কেবল কার্য্যকরী শক্তির সমষ্টিকে নিত্য বলা সম্ভবপর নহে জানিয়াই অপ্রকাশস্বরূপ শক্তির কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বাস্তবিক যে শক্তি গতিগত নহে, পরন্তু স্থিতিগত; অর্থাৎ যাহার কার্য্য বিরুদ্ধ—অতএব ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য—তাহাকে শক্তি বলা সঙ্গত কি না তাহা বিবেচনা করা উচিত। শক্তির কার্য্য যেখানে নাই, সেখানে শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করা অন্ততঃ বৈজ্ঞানিকতা বিরুদ্ধ। বৈজ্ঞানিকগণ যখন তখন গতিহীন বা কার্য্য হীন শক্তির (potential energy) কল্পনা করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহা গতিহীন বা কার্য্যহীন তাহা যে শক্তিরূপেই অবস্থান করে তাহার প্রমাণ কি? ভবিষ্যমান শক্তির অর্থ যে শক্তি বর্ত্তমানে নাই, কিন্তু উপযুক্ত কারণ সমবায়ে উৎপন্ন হইবার যোগ্য। কিন্তু উৎপন্ন হইবার যোগ্যতা এক কথা, আর উপজাত অন্য কথা। উপজাত কার্য্যই যদি শক্তি শব্দের কার্য্য হয়, তবে অনুপজাত কার্য্য অবশ্যই অ-শক্তি অর্থাৎ শক্তির অভাব হইবে। বিজ্ঞানের মতে শক্তি = energy = কার্য্যগত বা কার্য্যকরী ক্ষমতা (capacity for doing work)। তাহা হইলে ভবিষ্য শক্তি (potential energy) = কার্য্যগত বা কার্য্যকরী ক্ষমতার যোগ্যতা। কিন্তু এটা যেন আমার কাছে একটা প্রকাণ্ড হেঁয়ালী বলিয়া মনে হয়। শক্তির নিত্যতাবাদে কিন্তু হেঁয়ালীটাকে হেঁয়ালী বলিয়া ধরা হয় না। পণ্ডিত Ward বলেন—"we must remember too that this assumed constancy is only kept on its leg at all by counting in, first, the so called *potential* energy which is not actually energy at all nor mechanically of the same dimensions—capacity for work and capacity for capacity for work not being on a par; by counting in, secondly *dissipated* energy, which is capacity for ever devoid of opportunity; and by allowing, finally, that an every material system there is an in-determinate amount of *latent* energy, of which nothing is known."

এখানে আরও দুই একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। সে কথা কয়েকটি এই। বৈজ্ঞানিকগণ বাস্তব শক্তি (actual energy) ছাড়াও শক্তির সম্ভাবনাকে (potentiality) শক্তি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত

করিতে বদ্ধপরিকর। যে শক্তির ক্রিয়া নাই তাহাকেও শক্তি বলিয়া ঘোষণা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা যেখানে কারণে শক্তির অনুমান করিতে প্রবৃত্ত তাঁহারা সেখানে কোন প্রকার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে রাজী নহেন। হাইড্রজেন ও অক্সিজেন পরিমাণ বিশেষে মিশ্রিত হইলে জলীয়ত্বের উদ্ভব হয় সেখানে আমরা ঐ বায়বীয় পদার্থদ্বয়ের একটি না একটিতে জলীয়ত্বশক্তি বিদ্যমান ছিল, মিশ্রণে তাহার বিকাশ হইল মাত্র। কিন্তু এখানে বৈজ্ঞানিক মহাশয়েরা আপত্তি করিয়া বলেন—না, তাহা নহে। ঐ পদার্থদ্বয়ের একটিতেও জলীয়ত্ব শক্তি ছিল না, কেননা তাহার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। কিন্তু যদি আমরা বলি জলীয়ত্ব যখন শক্তিরূপে থাকে তখন তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে না, ঐ শক্তি কার্য্যগম্য; কার্য্য দর্শনেই উহা অনুমিত হইবার যোগ্য,—তাহা হইলে আমাদিগকে নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক বলিয়া উপহাস করা হয়। অথচ শক্তির যেখানে পরিচয় নাই—সেখানেও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ অবাধে শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারেন, দেখা যাইতেছে। তবে সকল সময়ে যে সে কল্পনা তাঁহারা করিতে চাহেন না তাহাও ঠিক; কিন্তু সেটা অপরের বেলায়!. বিজ্ঞানবিদ্‌গণ কেবল শক্তি ও জড় ব্যতীত জগতে তৃতীয় বস্তুর সত্তা স্বীকারে অনিচ্ছুক। সুতরাং জলোৎপত্তিস্থলে বলিতে হইবে, হয় অভিনব জড় উৎপন্ন হইয়াছে, না হয় অভিনব শক্তি উৎপন্ন হইয়াছে—কিন্তু তাঁহাদের সিদ্ধান্তে নূতন জড়েরও উৎপত্তি নাই, নূতন শক্তিরও উৎপত্তি নাই। তবে এই জলটাই কি মিথ্যা বস্তু নহে? যাহা হউক এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি। সুতরাং আর চর্ব্বিতচর্ব্বণ নিষ্প্রয়োজন। *

জড়, শক্তি বা গতিরূপে যাহাকে নির্দ্দেশ করিতেছি—জ্ঞানের দিক হইতে দেখিলে উহাদিগকে ইন্দ্রিয়বৃত্তির সঙ্কল ও অধ্যাস ভিন্ন আর কিছু বলিয়া প্রতীত হইতে পারে না। বাহ্যজগৎ আত্মপ্রতীতির অতিরিক্ত নহে। প্রতীতিগুলিকে যেন পিণ্ডিত করিয়া আত্মা হইতে নিক্ষিপ্ত (projected) করিয়া বাহ্য জগৎ সৃষ্ট। বাস্তবিক সৃষ্টি শব্দের অর্থই ছুঁড়িয়া ফেলা (projection)। কেবল ছুঁড়িয়া ফেলা নহে, আত্মার একত্ব—কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতিকে সঙ্গে সঙ্গে ঐ গুলিতে আরোপ করা। ইন্দ্রিয় বৃত্তির বা প্রতীতির উৎপাদকরূপে বাহ্যবস্তুকে জানিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। কেন না ইন্দ্রিয়বৃত্তি বা প্রতীতিগুলিই প্রাপ্ত (given); উৎপাদকটি প্রাপ্ত নহে। উৎপাদকটি অনুমিতও নহে; নিত্য সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তির জ্ঞান না থাকিলে অনুমান হইতে পারে না। উৎপাদক ও উৎপন্নের নিত্য

* According to ostwald's definition, the concept of energy would comprehend not only these potentialities, but actual work as well; he thus calmly postulates, that the causes and effects of work are of the same nature as work itself. Now is it evident that the cause of a phenomenon need be homogeneous with the phenomenon itself? Is not one of the most serious objections to the machanical theory that from the fact that heat electricity, &c, *can cause* motion, it draws the conclusion that heat, electricity & are motions?—The Idealistic Reaction against Science-Energetics by Prof. Aliotta.

সম্বন্ধ আমাদের অগোচর। তবে উৎপাদকটি একটি কল্পিত পদার্থ ছাড়া আর কি হইতে পারে? কিন্তু এই কল্পনারই বা উপকরণ কি? বলিতে হইবে ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি বা প্রতীতিগুলিই উহার উপকরণ। তাহা হইলে যাহাকে যাহার উৎপাদকরূপে সপ্রমাণ করিতে যাওয়া হইতেছে, তাহা তদুৎপাদন গঠিত বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে; এবং এই কল্পিত মূর্ত্তিটিকে আত্মসত্তা—আত্মএকত্ব ও আত্মকৃতিত্ব অর্পণ করিয়া উহাকে স্বতন্ত্র সত্তাশীল বলিয়া দাঁড় করান হইয়াছে, ন্যায়ের অবাধ যুক্তিতে ইহাই সপ্রমাণ।

কেহ যদি বলেন, "তথাপি একটা বাহ্য সত্তা স্বীকার্য্য, কেন না অন্যথা ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি বা প্রতীতিগুলি অবিরত উৎপত্তি-বিনাশশীল; সুতরাং উহারা অবশ্যই একটা সত্তা কর্ত্তৃক উৎপন্ন। কিন্তু আমরা নিজে উহাদিগকে ত উৎপাদন করি না, তাহারা অনেক সময়ে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও উৎপন্ন হয়। এমত স্থলে বাহ্যসত্তা স্বীকার না করিয়া উপায় কি?" ইহার প্রত্যুত্তরে বক্তব্য—উহারা উৎপত্তি-বিনাশশীল বটে, এবং উহারা কোন সত্তা কর্ত্তৃক উৎপন্নও বটে; কিন্তু সে সত্তা যে আমাদের বাহিরে তাহা কি প্রকারে জানা যাইবে? যদি তর্কের খাতিরে একটা বাহ্য-সত্তা স্বীকারও করা যায়, তাহা হইলেও তাহা কেবল 'অস্তি' এই মাত্র বলা যাইতে পারে; তাহার প্রদত্ত প্রতীতিগুলির সহিত তাহার কোন প্রকার সাদৃশ্য নাই। তাহাতে যে গুণাবলীর কল্পনা তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়-বৃত্তির উপকরণে গঠিত তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; কেন না, উহারাই জ্ঞাত, সে সত্তাটি জ্ঞাত নহে। তাহার বিশিষ্টতা কেবল প্রতীতির ভাষায়। সুতরাং তাহার যাহা কিছু গুণ তাহা আমাদেরই প্রদত্ত। ঐ গুণগুলি উহারই স্বরূপ নহে; কাজে কাজে উহাকে নির্ব্বিশেষ সত্তা বলিতে হয়; কিন্তু নির্ব্বিশেষ সত্তাকে কারণ রূপে বিশিষ্ট না করিলে, উহাকে প্রতীতির উৎপাদক বলা যায় না। সুতরাং উহাকে সৎ বলিয়াও প্রতীতির কারণরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। এবম্বিধ বাহ্যসত্তা স্বীকারের সার্থকতা কি তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। প্রস্তাবান্তরে এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা যাইবে। প্রস্তাবের উপসংহারে আমি বলিতে চাই সদ্বস্তু বাহিরের বস্তু নহে। একটা সদ্বস্তু যে অবশ্যই আছে, কি বৈজ্ঞানিক কি দার্শনিক সকলেই তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। তবে দেখা যাইতেছে বৈজ্ঞানিক-প্রণালী অবলম্বনে, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে সে সদ্বস্তুর সন্ধান পাওয়া গেল না। বাহিরে খুঁজিয়া তাহার সাড়া মিলিল না। প্রথমতঃ পরমাণুকেই সদ্বস্তু বোধে জড়াইয়া ধরিয়াছিলাম; পরে বুঝিলাম ভুল করিয়াছি; উহা সদ্বস্তু নহে, বিকারী পদার্থ। খুঁজিতে খুঁজিতে ঈথরে যাইয়া পৌঁছিলাম। দেখিলাম তাহার ধারণা বিবাদ সঙ্কুল, পরস্পর বিরোধী, সন্দিগ্ধ। ছাড়িয়া দিয়া শক্তিকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করিলাম; শক্তি গতিরূপে বিলীন হইয়া গেল। গতিকে কি সদ্বস্তু বলিয়া স্বীকার করিব? না, তাহাও ত পারি না। গতি প্রত্যয়সমষ্টি কতকগুলি অনুভূতি পরম্পরার সমষ্টি ব্যতীত গতিকে ত আমরা জানি না। তাহার স্বতন্ত্র সত্তা কোথায়? যাহাকে সদ্বস্তু বলিব, তাহা কি প্রমাণাধীন, প্রমাণ সাপেক্ষ হইতে পারে? তাহা পারে না? তাহা নিশ্চিতই সর্ব্বপ্রমাণ নিরপেক্ষ, স্বতন্ত্র, স্বতঃসিদ্ধ বস্তু হইবে? যে হেতু তাহা

সকলের উপজীব্য—আশ্রয়—অবলম্বন, সেই হেতুই তাহা সর্ব্বপ্রমাণের উপজীব্য, স্বয়ম্ভু, স্বয়ংসিদ্ধ। যাহা ঈদৃশ লক্ষণযুক্ত নহে, যাহাকে প্রমাণ প্রয়োগে প্রতিপন্ন করিতে হইবে, তাহা আর কিছু হইতে পারে, কদাচ সদ্বস্তু হইতে পারে না। এমন সদ্বস্তু কি বহু হইতে পারে, একাধিক হইতে পারে? কখনই নহে। যদি বহু হয়, তবে সেই বহুর অন্তর্গত প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইবে কি প্রকারে? প্রত্যেকেই যদি স্বয়ম্ভু, স্বাতন্ত্র্য ও স্বয়ংসিদ্ধ হয়, তবে উহাদের ভেদক ধর্ম্ম কি! ভেদক ধর্ম্ম না থাকায় সেখানে বহু পরস্পরের সহিত মিলিয়া একই হইয়া যায়। দেশ কালকেও এই ভেদক ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করা অসাধ্য; কেন না, ইহারাও স্বয়ংসিদ্ধ বস্তু নহে, সেই স্বয়ংসিদ্ধ বস্তুর আশ্রয়েই ইহাদের সিদ্ধি। সুতরাং সেই স্বতন্ত্র স্বয়ংপ্রভ সদ্বস্তু এক ভিন্ন দুই হইতেই পারে না। বাহিরে খুঁজিলে এবম্বিধ সদ্বস্তুর সন্ধান কেন মিলিবে? যাহাকে "বাহিরের সদ্বস্তু" মনে করিয়া পরীক্ষা চালাইতেছি তাহা আমাদের মনঃ কল্পিত, ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত সদ্বস্তু। তাহা প্রকৃত পক্ষে সদ্বস্তুই নহে। ঈথর বল, জড় বল, শক্তি বল, বল বল,—সমস্তই জ্ঞানবেদ্য, জ্ঞানবিধৃত, জ্ঞানাশ্রয় সিদ্ধ; সুতরাং উহাদের স্বতঃসিদ্ধতা নাই; স্বয়ংসিদ্ধতা নাই বলিয়া উহারা নিরপেক্ষ সৎপদার্থ হইবার অযোগ্য। অথচ সকলের মনে সদ্বস্তুর একটা আভাস আছে বলিয়াই, আমরা তাহার অন্বেষণ করিয়া থাকি। প্রকৃত সদ্বস্তু যাহা স্বয়ংপ্রভ সকলের অবলম্বন তাহা বাহিরের মরীচিকায় লব্ধব্য নহে। প্রজ্ঞানেত্রে তাহাকে দেখিতে চেষ্টা করিলে তাহা আত্মা হইতে অভিন্নরূপেই প্রতিপন্ন হইবে। ৭

শ্রীপ্রফুল্লনাথ লাহিড়ী।

পো-চুইয়ের "বীণাওয়ালী" *

কোন চীনা সমালোচক একটা কবিতার নিম্নলিখিত তারিফ করিয়াছেন:—"রচনার ভাষা দেখিয়া মনে হয় যেন ভাবের প্রতিধ্বনি শুনিতেছি। এই কবিতায় পাঠকের হৃদয় এক বিচিত্র পুলকে ভরিয়া উঠে। সেই আবেগ স্বর্গীয়—তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব। বৌদ্ধদের সুপরিচিত "সমাধি"র সঙ্গে সেই মনোভাবের তুলনা করা চলে। এইরূপ কবিতা হাজার বৎসরে একটা লেখা হয়।"

এই "লাখে হাজারে একটা" কবিতার নাম "বীণাওয়ালী"। কবির নাম পো-চুই (৭৭২-৮৪৬)। ইনি হ্যান্-য়ুর সময়কার লোক। চীনে কবিরা সকলেই উচ্চ শিক্ষিত—এবং সকলেই প্রায় বড় চাকুরে। আর সময়ের ফেরফারে অনেকের কপালেই দুই একবার করিয়া নির্ব্বাসন বা বনবাস ঘটে। পোও মফঃস্বলে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। সিয়াং-শান্ নামক স্থানে পো আড্ডা গাড়েন। এইখানে

৭ "Outside of spirit," says Bradley in his 'Appearance and Reality' "there is not, and there cannot be, any reality and the more that any thing is spiritual so much the more is it veritably real."

(* "হিমাচলের অপর পার" গ্রন্থের এক অধ্যায়)

আর আটজন কবির সঙ্গে তিনি বেনামী জীবনযাপন করিবার সুযোগ পান। তাঁর "ছয় ইয়ায়ের" মত পোর "সিয়াং-শানের নয় বুড়ো" চীনা সাহিত্যে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

বনবাসে যাইবার পথে পো এক গৃহে অতিথি হন। সেখান হইতে পুনরায় যাত্রা করিতেছেন এমন সময়ে নৌকায় বসিয়া বীণার ঝঙ্কার শুনিতে পাইলেন। এই ঘটনাটা চীনা কাব্যে অমর হইয়া রহিয়াছে। জাইল্‌স্ এই কবিতার বিবরণ দিয়াছেন গদ্যে ক্র্যান্‌মার-বিঙ দিয়াছেন পদ্যে। কিন্তু এই বিবরণে খাঁটি চীনা কথা কতখানি আছে আর ইংরেজির ফোঁড়ন কতখানি আছে তাহা বিশ্লেষণ করা কঠিন।

অনুবাদ মাত্রেই মূলের ঝাড়াবাছা ও কাটা-ছাঁটা আবশ্যক হয়। কবি হয়ত এক প্রকার উপমা ব্যবহার করিয়াছেন—অনুবাদক হয়ত আর এক রূপক ব্যবহার করিলেন। অথবা কবি হয়ত কয়েকটা শব্দ ব্যবহার করেনই নাই; কিন্তু অনুবাদক তাঁহার ভাষাভাষিগণের পক্ষে বিদেশী কথাগুলি সহজবোধ করিবার জন্য দুই চারিটা নূতন শব্দ বসাইয়া দিলেন। এইরূপে বিদেশী মাল স্বদেশী দ্রব্যে পরিণত হয়। সকল অনুবাদ সাহিত্যই এই ধরণের "শোধন করা" জিনিষ—স্বদেশী ছাঁচে ঢালাই করা বিদেশী মাল—অর্থাৎ "এডাপ্টেশন"। আমি চীনা কবিতার ইংরেজি এডাপ্টেশন পড়িয়া তাহার আবার বাঙ্গলা এডাপ্টেশন করিতেছি। সুতরাং পো-চুইয়ের আত্মার পিণ্ড চট্‌কান হইতেছে বলিতে বাধ্য। তবে চীনা হৃদয়ের তারে তারে বীণার তারের মতই সূক্ষ্ম গভীর সকল প্রকার ঝঙ্কার উঠে—অন্ততঃ এইটুকু বুঝিতে পারিব—

আসিলাম রজনীতে নদীর ধারে
মেপ্‌ল্ তরুর তলায়;
ফুলের মতন তার পাতা লাল বরণ
শরতে একলা গজায়।
হল শেষ এবে বিদায় বচন,
বসিলাম নৌকাপরে;
নেমে গেল বন্ধু, সব নীরব নিঝুম,
ঠাণ্ডা জ্যোৎস্না নদী-বক্ষ ভরে।
বীণা সেতারের তারে নাইক ধ্বনি
মদিরায় আনন্দ হিয়ার;
বন্ধু ফিরে যায় ঘরে; হঠাৎ কানে
ঝঙ্কার প্রবেশিল বীণার।
থমকিল বন্ধু অতিথি অচল
কোথা হ'তে আসে তান?
জনহীন দরিয়ায় কেবা বাজায় বীণ?
বুঝি প্রকৃতির গান?
কাছে আসিল ভাসি তরী এক খানা,
নীরব তাহার ভিতর,
সলজ্জ রমণী এক সওয়ারি তাহার'
মাত্র বীণা সহচর।
বলা হ'ল তারে আসিয়া এ দলে
বীণার শুনাতে গান;
ভরা পেয়ালায় বাতির আলোয়
গুল্‌জার আবার উৎসবের স্থান।
বহু সাধা সাধির পর অপরিচিতা
ছাড়িল সে নিজ তরী;
বীণায় ঢাকিয়া মুখ দাঁড়ায়ে আসরে
উপরোধ রক্ষা করি'।
এইবার তারে হাতের আঙ্গুল পড়িল—
একবার দুইবার তিনবার
তারেতে আঙ্গুল তার
চাঁড়া দিল কাঁপিয়া;
বীণাতে আওয়াজ হায়
উঠিল না ধ্বনিয়া!

তারপর সুরু হল হৃদয়ের গান,
সে গানে শুনিলাম বিষাদের তান ;
ক্রত অঙ্গুলিতে সে মাথা নোয়াইয়া
আশাহীন ভাঙ্গা পরাণের ব্যথা—
গেল যেন গাহিয়া।
এই মৃদু এই ধীর
গতি অঙ্গুলির ;
বিচিত্র সুরের খেলা

উচ্চ ধ্বনিতে শুনি ঝম্ ঝম্ বরষার স্বর ;
কানে কানে কথা প্রায় কোমল খাদের ;
চড়া-নরম এক সঙ্গে যেন মুক্তার মর্ম্মর
পাথরের রেকাবিতে পতন-কালের।
কভু সে দেয় সুর তরল ঢালি
ঝোঁপে যেন পাখীর কাকলী ;
ধীরে তাহা যায় নামিয়া
নদী সম নীচু দিকে বহিয়া।
তারপর থামিল বীণা একবার,
চরম আবেগভরে স্তব্ধ অন্তর ;
বরফের আলিঙ্গনে প্রিয়া দরিয়ার
নিস্পন্দ জমাট যেরূপ হৃৎকন্দর।
আবার পড়িল আঙুল বীণার তারে ;—
ঘোড় সওয়ারের বর্ম্মের ধ্বনি
ঠেকিলে শত্রুর অস্ত্রে ;
অথবা আওয়াজ ছিঁড়ি পর যেমন
শুনায় রেশমী বস্ত্রে ;
কিম্বা কলসী ভাঙ্গিলে
জল গড়ায় যে শব্দে।
শুনিলাম সে সব তান শেষ ঝঙ্কারে।
এই গেল বীণাওয়ালীর গুণপনার বর্ণনা।
তারপর সে আত্মকাহিনী বলিতে লাগিল—
বিরাজিল নীরবতা ;
স্থির রহিল মুগ্ধ পবন ;

স্রোতস্বতীর বুকে ঢালে
শরতের চাঁদ রজত কিরণ।
দীর্ঘ শ্বাসিল রমণী, কহিল বিদায়ের পূর্ব্বে :—
"রাজধানীতে পাহাড়ের কোলে
শৈশব কাটে মোর গর্ব্বে।
তের বছর বয়স কালেই আমার
গানের বাজনার গৌরব
ছড়িয়ে দিল সহরের মাঝে
ওস্তাদ কীর্ত্তির সৌরভ।
রূপসীরা সবে হিংসায়
মরে দেখিয়া আমার মুখ,
যুবকের দলে আড়া আড়ি চলে
বাড়াতে আমার সুখ।
ছোট এক গানে লভিতাম
কত অমূল্য উপহার—
মদিরা-সিক্ত লাল রেশমী ঘাঘ্‌রা
আর সোনার অলঙ্কার,
কিম্বা রূপার "পিন্" ঘন ঘন
"বাহবা"র ধ্বনি সহ ;
বসন্তে শরতে ঐরূপ
হাসি খেলা অহরহ।
এই জীবনের তুলনা—
"আমার কুসুম কোমল হৃদয়
সহেনি কখনো রবির কর,
আমার মনের কামিনী
পাপ্‌ড়ি সহেনি ভ্রমর চরণভর,
চিরদিন সখি হাসিত খেলিত,
জ্যোছনা আলোকে নয়ন মেলিত।" ইত্যাদি।
তাহার পর কিরূপ হইবার কথা ?—
"সহসা সজনি চেতনা পেয়ে
সহসা সজনি দেখিনু চেয়ে
রাশি রাশি ভাঙ্গা হৃদয় মাঝারে
হৃদয় আমার হারিয়েছি !"

পো-চুইয়ের বীণাওয়ালীও "প্রভাত কিরণে"র খেলাধুলার পর সহসা চেতনা পাইতেছেন এই চেতনা কিছু অন্য রকমের।

ভাই গেল কান্সু
প্রদেশের যুদ্ধে;
মৃত্যু হ'ল মাতার;
রাত যায় দিন আসে;
দিন যায় রাত;
লাবণ্য মোর টিকে না আর।
লোকের ভিড় নাই আমার দুয়ারে,
থাকিল দু এক জন;
পতিত্বে বরিলাম ব্যবসাদারে;
ধনাগমে তার মন।
হৃদয়ের পিপাসা নাই তাহার,
না বুঝে সে বিরহ;
ফেলে' মোরে চা কিনিতে
স্বচ্ছন্দে ছাড়িল গৃহ।
একাকিনী দশমাস ক্ষুদ্র তরী
বাহি রাত্রিকালে;
সুখের স্মৃতি আর আঁখি ভরা জল
বুঝি মোর কপালে!

এই বৃত্তান্তে বিষাদটা ঘনাইয়া উঠে নাই বলিতে হইবে। "ফেলে মোরে চা কিনিতে স্বচ্ছন্দে ছাড়িল গৃহ।" এই তথ্যের উপর হাহুতাশ খানিকটা হাস্যাস্পদ হইবারই কথা। কাজেই ঘোরতর "ট্রাজেডির" "ভাঙ্গা হৃদয়" "বীণাওয়ালী"তে পাইলাম না। যাহা হউক নির্ব্বাসিত কবিবর বিরহিণীর দুঃখে নিজ দুঃখেরই চিত্র দেখিতে পাইতেছেন।

বীণার করুণ তানে
হৃদয় আমার
গিয়াছিল গলিয়া।
ব্যথিত পরাণের
এই মরম কথায়
ছিঁড়ে গেল যেন হিয়া।

বলিলাম তারে "বাছা,
কপাল দুজনারই এক;
দুর্ভাগ্যেতে বন্ধু মোরা!
রাজধানী ছেড়ে গতবর্ষে
পৌছিলাম এ দেশে
জ্বর গায়ে আত্মহারা।
এ মুলুক শ্মশান প্রায়,
বীণা সেতারের ধ্বনি
হেথা কেহ না পায় শুনিতে।
জঙ্গলা নদী কিনারায়
বেঁড়ে বাঁশ ও লম্বানলের সারি;
তারি মাঝে হইতেছে জীবন
যাপিতে।
দিনে বা নিশায়
সাড়া শব্দ নাই হায়!
মাত্র এক বিকট ডাক
নৈশ চিঁড়িয়ার,
অথবা হাহাকার
অলক্ষী পেঁচার।
অথবা শুনিতে পাই
পাহাড়ী সঙ্গীত,
পাড়া গেঁয়ে বংশীধ্বনি
বেসুর বেতাল।
আজ কতদিন পরে
শুনি বীণার আলাপ
ভাবিতেছি স্বর্গে যেন
কেটে গেল কাল।
অতএব কৃপা করি
বস একবার,
আরেক খানা গেয়ে দাও
যাইব লিখে কাহিনী তোমার।

পো-চুই নিতান্তই বে-রসিক দেখিতেছি! ঘোড়া বা ফড়িং সামনে রাখিয়া চিত্রকরেরা ছবি আঁকায় হাতে খড়ি দেয়। পো-চুই

বীণাওয়ালীর সঙ্গীত শুনিতে শুনিতেই তাঁহার কাহিনী লিখিয়া রাখিতে চাহিতেছেন! গল্প হিসাবে রচনাটা জমাট বাঁধিল না। বিরহিণীর দুঃখ আর নির্ব্বাসিতের দুঃখ হয়ত ওজনে সমান। কিন্তু পো এই সমতা ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। গল্পের ভিতর বিরহের দুঃখও ভারী করিয়া তোলা হয় নাই—আর বনবাসের দুঃখও ভারী করিয়া তোলা হয় নাই। ঠিক যেন যশোহরের ম্যালেরিয়াগ্রস্ত বাঙ্গালী হুঁকা হাতে দুঃখ করিতেছেন--"আরে! কি বলিব দুঃখের কথা। পনর মাস ধরে জ্বরিয়ে মরছি হাতে পয়সা নাই যে ওষুধের ব্যবস্থা করি। যাক্ দেখ্‌ছি তোমার কষ্টও আমারই মত। তোমার গরুটা আজ খোয়াড়ে আট্‌ক। বড়ই আপশোষের কথা। আমাদের ব্যথা আমরা ছাড়া আর কেহ বুঝবে না।" পোর গল্পে শিল্প নৈপুণ্য নাই—আট্‌পৌরে জীবনের কথা সাদাসিধা ভাবে বলা হইয়াছে। মামুলি কথা লইয়া অতি উচ্চ অঙ্গের কায়দা দেখান আছে গেটের হার্ম্যান ও ডরোথিয়ায়। তাহার তুলনায় বীণাওয়ালীকে পো ফেল মারিয়াছেন বলিতে হইবে। তবে বীণাধ্বনীর বর্ণনাটা মূলে নিশ্চয়ই "লাখে হাজারে এক।" অনুবাদের অনুবাদে "সমাধি" উপভোগ করা অসম্ভব। গল্পাংশের কথা ছাড়িয়া দিলে কবিতাটা সত্য সত্যই উচুঁ দরের। জীবনের একটা সাধারণ অভিজ্ঞতা সরসভাবে ফলাইয়া লেখা হইয়াছে। বস্তুতঃ এটা গল্পের কবিতা নয় নানা দৃশ্যের ভিতর দিয়া কবি তাঁহার সঙ্গীত-প্রীতি দেখাইয়াছেন। সেই প্রীতি স্পষ্টই ফুটিয়াছে।

এতক্ষণ রমণী
দাঁড়ায়ে ছিল।
অনুরোধে এইবার
বসে' গায়িল।
এ আওয়াজ ভরা
কেবল করুণ কোমলে,
তা শুনি সকলের
আঁখি গলিল
আমার বুকও ভিজিল জলে।

চীনা জাতি খুব সঙ্গীত প্রিয়। ইহাদের সাহিত্যে গান বাজনার তারিফ অনেক দেখা যায়। আর মাছ ধরা, শিকার করা নদীর কিনারায় আড্ডা গাড়া ইত্যাদিও চীনাদের অতি প্রিয় কার্য্য। কিন্তু বোধ হয় নাচের আদর কিছু কম।

নির্ব্বাসন হইতে ফিরিবার পর পো রাজ-দরবারে বড় বড় চাকুরি পাইয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তিনি সমরবিভাগের সচিব হন। কাব্যে হানেয়ু অপেক্ষা পো বড়। সুতরাং লী ও তুর সঙ্গে পোকেই "ত্রিবীরে"র দলে ফেলা যুক্তি সঙ্গত। পো তাঙ্ আমলের এক শ্রেষ্ঠ কবি। "বীণাওয়ালী"র মত তাহার আরও অনেক নাম জাদা কবিতা আছে। সর্ব্বপ্রসিদ্ধ রচনার বিষয় মিং হুয়াঙ ও তাইবেলের প্রেম। এই বিষাদাত্মকে প্রেমের কাহিনী চীনা সাহিত্যের শকুন্তলা।"

৬১৮ হইতে ৯০৫ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত তাঙ্ বংশের রাজত্ব কাল। এই তিনশত বৎসরের ভিতর যত কবিতা রচিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে ৪৮৯০০টা সংগৃহীত আছে। এইগুলি ৯০০ ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত।

চীনা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কোন চীনা সমজদারের মত নিম্নে বিবৃত হইতেছে—

"শি-কিঙে (খৃঃ পূঃ ৫০০) সঙ্কলিত তিনশত গীত সাহিত্য-বৃক্ষের শিকড় স্বরূপ। এইগুলি কন্‌ফিউশিয়াসের সংগ্রহ। সু-উ এবং লী-লিঙের কবিতা "বৃক্ষকাণ্ডে"র প্রাথমিক অবস্থা। ইহাঁরা দুইজন এক সময়ের লোক

—হান্ আমলের প্রথম অর্দ্ধে জীবিত ছিলেন। খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে ইহাঁদের কাল। হান্-আমলের দ্বিতীয় অর্দ্ধে বিশেষতঃ কিয়েন-এনের রাজত্ব কালে (১৯৬ খৃঃ অঃ) কাণ্ডটা বাড়িতে থাকে। এই সময়ে কয়েকজন নাম-জাদা লেখকের আবির্ভাব হয়। ২২০ হইতে ৫৮৭ পর্য্যন্ত ছয়, রাজবংশের আমল। এই সময়ে চীনা কাব্যতরুর শাখা প্রশাখা জন্মে এবং পাতা গজাইয়া উঠে। অবশেষে তাঙ্ আমলে শাখা প্রশাখা এবং পত্রের সমধিক বিকাশ হয়। অধিকন্তু ফুল ও ফল এই যুগের উৎপত্তি। অর্থাৎ সাহিত্যতরু এই সময়ে চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে।" চীনাকাব্য আলোচনা করিবার প্রণালী সম্বন্ধে সমালোচক মহাশয় বলিতেছেন "পুরাণা শি-কিঙ্ বাদ দিও না। তাহা হইলে চীনা সাহিত্যের গোড়ার কথা বুঝিতে পারিবে না। আর গোড়ার রস না পাইলে ডালপালা ফুল ফলের গৌরব উপভোগ করিতে পারিবে না।" অর্থাৎ চীনের কালিদাস-ভবভূতির সঙ্গে আলাপ করিবার সময়ে চীনা বেদব্যাস ও মনুর বচন-গুলিও কাছে রাখিতে হইবে। বস্তুতঃ শি-কিঙে অনেক সরস কবিতা পাওয়া যায়। সেগুলি তুচ্ছ করা চলে না।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

ভারতীয় মুসলমানরাজগণের সাহিত্যসেবা ও শিক্ষাবিস্তার

(৯৫২ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর।)

আকবর

পাঠান রাজবংশের এবং আকবর পর্য্যন্ত মোগল রাজবংশের প্রধান প্রধান সম্রাট-গণের মধ্যে আমরা যাঁহাদিগকে পাইয়াছি, আকবর তাঁহাদের অন্যতম। আমরা সম্প্রতি তাঁহারই রাজত্বকাল সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আকবর তাঁহার রাষ্ট্রনীতি এবং বিদ্যোৎসাহিতার জন্য সমভাবে বিখ্যাত। যাহাহউক কোন কোন ঐতিহাসিক বর্ণন করিয়াছেন যে, তিনি সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষর ছিলেন। নোর[১] উদাহরণ স্বরূপ কোন একজন অজ্ঞাত লেখকের লেখার উপর নির্ভর করিয়া নিরক্ষর সত্বেও তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। 'তুজাকি জাহাঙ্গীরী' এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি প্রদর্শন করিতেছেন :—

"আমার (জাহাঙ্গীরের) পিতা, বিভিন্ন শ্রেণীর জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিগণের সহিত বিশেষতঃ হিন্দু-স্থানের পণ্ডিত এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। যদিও তিনি নিরক্ষর ছিলেন তথাপি অনবরত পণ্ডিত ও চতুর লোকদিগের সহিত আলাপের ফলে তাঁহার ভাষা এতদূর মার্জ্জিত হইয়াছিল যে, কেহই তাঁহার কথাবার্ত্তা হইতে বুঝিয়া লইতে পারে নাই, তিনি

---

১ Noer's *Akbar*, vol. ii, pp. 56, 243.

সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন। এমন কি তিনি গদ্য রচনা করিতে ও কবিতার সৌন্দর্য্য ধরিতে এতদূর পারগ ছিলেন যে, তদপেক্ষা অধিকতর কৃতী লোকেরও তাহা ধারণা করা অসম্ভব।" ১

এইখানে সম্রাট্ তৎপুত্র জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক বিবৃত হইতেছেন এবং তাঁহার আত্মজীবন চরিত তুজাক স্বীকার করে যে, তিনি—"সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষর ছিলেন।" অন্যদিকে ওয়াকি আতি জাহাঙ্গীরী, রাজবংশের বিখ্যাত ব্যক্তিগণের অন্য একখানি আত্মজীবন চরিত গ্রন্থ, বলে যে, যদিও আকবর গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ছিলেন না, তথাপি পণ্ডিত ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ পরিচয় প্রসঙ্গে এতটা অধিকার লাভ করিয়াছিলেন যে, যে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে জ্ঞানের যে কোন বিভাগের, শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া স্বীকার করিত। তিনি সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষর ছিলেন ইহা (ওয়াকি আতি) স্বীকার করে না। প্রমাণটী এইরূপ :—

"এই সকল পণ্ডিতগণের সহিত আমার পিতার (আকবর) বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করা একটা বাধা রীতির মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। তিনি, বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়ের হিন্দুদিগের মধ্যে জ্ঞানী পণ্ডিতগণের সঙ্গ করিয়াছিলেন সত্য ; এবং যদিও তিনি ঐ লব্ধ সঙ্গ হইতে জ্ঞানের কোন বিশেষ সুবিধা লাভ না করিয়াও থাকেন, তথাপি তিনি গদ্য ও পদ্য উভয় রচনার সৌন্দর্য্যবোধ জ্ঞান এইরূপ লাভ করিয়াছিলেন যে, কোন ব্যক্তি যে তাঁহার উদারচরিত্র ও পদের ঘটনাবলীর সঙ্গে পরিচিত নয় সে তাঁহাকে যে কোন জ্ঞানবিষয়ে গভীর পণ্ডিত বলিয়া ধারণা করিতে পারে।" ২

উপরোদ্ধৃত দুইটী বিবরণই দুইটী বিভিন্ন মতের উপর স্থাপিত। ইহাদের যে কোন একটী কতকগুলি পুস্তকের মধ্যে দেখা যায় এবং সেগুলি জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনচরিত বলিয়াই প্রমাণিত হয়। যথা—ইক্‌বাল নামা, তারিখি সলিম সাহী, জাহাঙ্গীর নামা ইত্যাদি এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক বিবরণীতেও পাওয়া যায়। যাহাহউক আকবর নিরক্ষর ছিলেন এই বিষয়টা অনেকগুলি কারণে বিশ্বাসযোগ্য নয় বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। হুমায়ুন তাঁহার পুত্রের গৃহ-শিক্ষকস্বরূপ আবদুল লতিফকে নিয়োগ করেন, তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আবদুল লতিফ রাজসভায় আগমন করেন নাই। যাহা হউক এই ঘটনা হইতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁহার পুত্রের শিক্ষার জন্য আবদুল লতিফ নির্জ্জনতা উপভোগ করেন এবং ইহা আদৌ মনোমত হয় না যে, হুমায়ুন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর আকবরের অভিভাবক বৈরামখাঁ ভবিষ্য সম্রাটের শিক্ষাদান অবহেলায় স্থগিত রাখিয়া ছিলেন। দেখা যায়, বৈরাম পরে আবদুল লতিফকেই আকবরের শিক্ষক নিয়োগ করিয়াছিলেন। ৩ আরও সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে যে, পীর মহম্মদ খাঁ। ৪ এবং হাজী মহম্মদ খাঁ। ৫ ও তাঁহার শিক্ষকদ্বয় ছিলেন। সম্পূর্ণরূপে অশিক্ষিত অথবা "অজ্ঞ" হইয়া কোন লোক পণ্ডিত

1 *Tuzaki-Jahangiri*, by Rogers and Beveridge, p. 33 ; *Tuzaki-Jahangiri*, translated by Lowe, p. 26, Fasc. i, *(Bibl. Indica)*

2 *Waqi' ati Jahangiri*, Price's transl. (1829), pp. 44, 45.

3 Noer's *Akbar* vol. i, p. 127.

4 *Ferishta* vol. ii, pp. 193, 201 ; Elphinstone, vol. ii, (ed. 1841), p. 262.

5 *Ferishta* vol. ii, p. 194.

ব্যক্তিগণের কথাবার্ত্তা অনুধাবন করিতে কিংবা তাঁহাদের তর্ক উপলব্ধি করিতে অথবা তাঁহাদের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইতে, এবং সাহিত্য রচনার সৌন্দর্য্য উপভোগে আদৌ সমর্থ হয় না। এই প্রতিপাদ্য বিষয়টা সম্বন্ধে আবুল ফজল যে কোন রকমে পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন। তিনি আকবরের শিক্ষালাভ সম্বন্ধে কতকগুলি সঠিক কারণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ১৫৪৭ খৃ: অব্দের ২০ নবেম্বর যে দিন সম্রাট, ৪ বৎসর ৪ মাস ও ৪ দিনের হইলেন ১ সেদিন তিনি বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইলেন এবং মৌলবী আজিমুদ্দিন তাঁহাকে শিক্ষিত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। ২

হুমায়ুন স্বীয় জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অভিজ্ঞতা দ্বারা শুভমুহূর্ত্ত নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিলেন কিন্তু যখন সেই সময় আসিল আকবর বালক সুলভ আমোদে কোথায় যে লুক্কায়িত রহিলেন তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। আজিমুদ্দিন দীর্ঘকাল শিক্ষক ছিলেন না। আকবর পায়রা উড়াইতে বিশেষ আসক্ত বলিয়া তিনি পদত্যাগ করেন এবং তাঁহার স্থানে মৌলানা বায়জিদ নিযুক্ত হইলেন। পরে তাঁহাকে সামরিক শিক্ষাদানের নিমিত্ত মুনিম খাঁ নির্ব্বাচিত হইলেন। ৩

এই সকল প্রমাণ পাইয়া আমরা সহজেই বিশ্বাস করিতে পারি না যে, আকবর বর্ণজ্ঞান রহিত হইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। অন্যত্র আমরা দেখিতে পাই কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁহাকে ইতিহাসে সুপণ্ডিত এবং কবিতা রচনায় ও হাফিজের কতকগুলি ছোট ছোট কবিতা আবৃত্তি করিতে দক্ষ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ৪

আকবর ভারতীয় রূপকথা শুনিতে খুব ভাল বাসিতেন। উহার কারণ মীর হম্জা বেশ দক্ষতার সহিত ৩৬০ টী গল্প রচনা করেন এবং প্রত্যেকটী গল্প সহজবোধ্য করিবার নিমিত্ত ছবি দ্বারা তাহাদিগকে মনোজ্ঞ করিয়া তুলেন। ৫ তিনি সারা জীবনটা তাঁহার বই পাঠের দিকে নজর দেন নাই। প্রত্যেকদিনই কোন একজন যোগ্য ব্যক্তি তাঁহাকে বিভিন্ন বই পড়িয়া শুনাইতেন, এবং তিনি মন দিয়া গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ শুনিতেন। যেস্থান পড়া হইয়া যাইত

1 Humayun also went through the same ceremony as noticed above.

2 *Akbar Namah*, vol. i, (Beveridge), ch. xliv, p. 518. The remarks of Mr. Beveridge are important in this connection, as they are directed towards the solution of this perplexing question : "The truth as far as it can be seen through the maze of Abul Fazl's rhetoric seems to be that Akbar was an idle boy, fond of animals and out-door amusements, and that he would not learn his lessons. This corroborated by Jahangir's description of him as an unlettered man, and one who in his youth was fond of the pleasures of the table. It seems probable, too, that Akbar never knew how to read and write. This seems extraordinary in the son of so learned a man as Humayun, but apparently the latter was not to blame for this. We are told that A'zamuddin, the first teacher, was removed for his addiction to pigeon-flying. This was a taste he communicated to his pupil, if indeed the boy did not inherit it from his great-grandfather ' Umar Shaik."—*Akbar-Namah*, vol. i, (Beveridge) p. 518 n.

3 Noer's *Akbar* (transl. by Annette S. Beveridge), vol. i, p. 125.

4-5 Elliot iv, p. 294 ; and *Ferishta* vol. ii, p. 280.

সেস্থানের শেষে তারিখসহ চিহ্নিত করিয়া রাখিতেন এবং পঠিত পৃষ্ঠার হিসাবে পাঠককে কিছু দিতেন। শ্রবণে এইরূপ দ্রুত উন্নতির ফলে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন; এবং আবুল ফজল বলেন যে, "কচিৎ কোন বিশেষ চিন্তালব্ধ বিজ্ঞান-গ্রন্থ অথবা ইতিহাস সম্রাটের নিকট পড়া হইত; কিন্তু তিনি ঐ সকল বিষয় পুনঃ পুনঃ শ্রবণ সত্ত্বেও কিছুমাত্র ক্লান্ত হইতেন না, বরং সর্ব্বদাই অত্যন্ত উৎসুক হইয়া শুনিতেন। ১ নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিই একাধিকবার তাঁহার নিকট পঠিত হয়—

অখলাক ই—নাসিরী,
কীমিয়া ই—সা আদত,
কাবুস—নামা,
মুনের সরফের গ্রন্থাবলী,
গুলিস্তান,
হকীম সনাই প্রণীত হডীখুল,
মানাবীর মসনাবী,
জাম—ই—জাম,
বুস্তান,
শা—নামা,
সেখ নিজামীর মসনবীস
মৌলানা জামী ও খুসরুর গ্রন্থাবলী,
খাকানী আনওয়ারীর দীবান এবং কতকগুলি ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ২

গুরুতর ও ন্যায্য রাজকীয় কর্ত্তব্য সত্ত্বেও রাত্রির একাংশ ঐ সকল গ্রন্থ পাঠের জন্য ব্যয়িত হইত; কিন্তু সম্রাট তাঁহার অতৃপ্ত জ্ঞানলালসা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত আনন্দের সহিত কিছু সময় দার্শনিক, সুফী এবং ঐতিহাসিকদিগের সহিত কথাবার্ত্তায় কাটাইতেন। তাঁহারা গভীর বিষয়ের আলোচনায় ভোজনে ব্যাপৃত হইতেন। তিনি সর্ব্বদাই পণ্ডিত ব্যক্তিগণের সমাজ পছন্দ করিতেন, এবং আহুত সভাতে চিন্তাপূর্ণ বৈজ্ঞানিক তর্ক, প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস, এবং ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়—মোটের উপর "যাবতীয় পার্থিব পদার্থের বিষয়েই উৎসাহ দিতেন।" এই জ্ঞানানুরাগ তাঁহার ফতেপুর সিক্রির নবনির্ম্মিত অট্টালিকার বিখ্যাত ইবাদত খাঁ নির্ম্মাণের কারণ হইয়াছিল। এই অট্টালিকা রাজকীয় উদ্যানে স্থাপিতছিল। ইহার চারিটি বড় বড় ঘরের পশ্চিমটীতে সৈয়দ অথবা জ্যোতিষীর বংশধরগণ বাস করিতেন, দক্ষিণটীতে পণ্ডিতসমাজ (উলমাস) উত্তরটীতে সেখ ও স্তাবকগণ এবং পূর্ব্বটী সম্ভ্রান্ত ও রাজদরবারের কর্ম্মচারিগণের যাহার অভিমত পূর্ব্বোক্ত এক বা একাধিক শ্রেণীতে সমর্থন করিত তাঁহাদের দ্বারা অধিকৃত ছিল। বিদ্বেষপরায়ণ যাহারা সভাতে আসন এবং শ্রেষ্ঠ পদ গ্রহণের জন্য লালায়িত হইয়াছিল তাহাদের জন্য পৃথক্ কুঠুরী ছিল। প্রতি শুক্রবারে ৩ রবিবারে এবং ধর্ম্মরাত্রেও সুফী, ডাক্তার, প্রচারক, আইনব্যবসায়ী, সিয়া, সুন্নী, ব্রাহ্মণ, জৈন, বৌদ্ধ, চার্ব্বাক, খৃষ্টান, ইহুদী, জরোয়াস্তারগণ এবং প্রত্যেক ধর্ম্মের পণ্ডিতগণ রাজকীয়

1 *Ferishta* vol. ii, p. 280.

2-3 For the above information, *vide* Blochmann's *A' ini-Akbari*, p. 103; ani-Gladwin, p. 85. 'Abdul Qadir, in his *Muntakhabul-Tawarikh*, tells us that Naqib Khan often used to read before the Emperor the book called *Hayat-ul-Haiwand* [*Muntakhabul-Tawarikh*, by 'Abdul Qadir, p. 207, vol. ii, translated by W. H. Lowe (*Bibl. Indica*)].

সমিতিতে আমন্ত্রিত হইতেন এবং প্রত্যেকেই নির্ভয়ে তাহার তর্ক ও যুক্তি উত্থাপন করিতেন। "বিজ্ঞানের গভীর সমস্যা, ইতিহাসের কুতূহল বিষয় এবং প্রকৃতির আশ্চর্য্য বিষয়সমূহ তাঁহার চির আলোচনার বিষয় ছিল।" কখন কখন তর্ক খুব বেশী জাঁকিয়া উঠিত ১ এবং এত গোলমাল ও চীৎকার হইত যে, রাজসভায় শ্রোতাদিগের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিত। সুতরাং কোন ঘটনা উপলক্ষে তিনি তারিখি বাদাউনির প্রণেতার নিকট দমনকারী শক্তি ব্যবহারের প্রস্তাব করেন, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। যদিও এই সভাগৃহে অত্যন্ত গুরুতর তর্কের মীমাংসা হইত তথাপি কোন কোন সময় সম্রাট মৌলানা আবদুল্লা সুলতানপুরী নামে কোন পণ্ডিত ব্যক্তির বিরক্তির জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে হাজী ইব্রাহিম এবং আবুল ফজলকে তর্ক করিবার নিমিত্ত তৎসময়ের আমোদ নষ্ট করিতেন।

আকবর তর্কস্থলে মৌলানার রাগোদ্রেকের জন্য তাঁহাকে থামাইয়া দিতেন এবং আশ্চর্য্যজনক শব্দ ব্যবহার করিতে ও বক্র দৃষ্টি করিয়া বিদ্রূপ হাস্য করিতে তাঁহার বন্ধুদ্বয়কে সঙ্কেত করিতেন। কিন্তু এই রকম ঘটনার ফলে তর্ক এত গভীর ভাবে দাঁড়াইত যে, গোয়ার ধর্ম্মপ্রচারক পাদ্রী রাডল্‌ফ্‌ (রডলফো আকাভিভা ২) তাঁহার বিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্ত্বা দ্বারা খৃষ্টীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া বসিতেন, এবং ভারতীয় পণ্ডিতদিগের পরাজয়ের জন্য বুদ্ধিমত্ত্বার মল্লক্ষেত্রে অবতরণ করিতেন। এই সকল বিষয়ে সম্রাট্‌ খুব উদার ছিলেন, এবং যে কোন ব্যক্তি তাঁহার অন্যায্য নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিত তিনি তাঁহার নিকট হইতে নূতন কিছু লাভ করিবার জন্য সর্ব্বদাই তাঁহার হৃদয়কে প্রশস্ত রাখিয়াছিলেন। নিম্ন শ্রেণীয়দিগের দরবার গৃহের সভাতে গমন করিয়া তর্কে স্থান গ্রহণ করার ফলেই তাঁহার এই কথা বলা হইতেছে না অন্যান্য আরও অনেক কাজেই তাঁহার উদারতা দেখা যায়। এইরূপ ঘটনা উপলক্ষে ইয়োরোপীয় পাদ্রিগণ তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মের সত্যতা প্রতিপাদন করিতে অগ্রসর হইতেন। রাজা যুবরাজ মুরাদকে খৃষ্টের জীবনী কিছু কিছু শিক্ষা করিয়া কার্য্যতঃ প্রতিপালন করিতে এবং আবুল ফজলকে ঐগুলি অনুবাদ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।

ইবাদত খানাতে লিখিত আছে যে, কোন এক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাকালে আবুল ফজল প্রস্তাব করেন রাজাই ধর্ম্মজীবন ও মসজিদের একমাত্র চালক হইবেন। এই প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গেই ঝটিকার ন্যায় নানা প্রতিবাদ আরম্ভ হইল, কিন্তু মুজতাহিদ্‌ (আইন বিভাগের সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তা) উপাধিধারী আইন প্রবর্ত্তক, সম্রাটের নিকট ইহার মীমাংসা পাঠাইয়াছিলেন। ৩

ইবাদত খানাতে আছে, সভা যাঁহাকে যোগ্যতম ব্যক্তি বলিয়া ঘোষণা করিতেন সম্রাট্‌ তাঁহাকে এক মুষ্টি আসরফি বা টাকা দিতেন। যাহাহউক যাঁহারা এই ভাবের

1 The accounts differ as to the days on which the meeting took place.

2 Specimens of the discussion are given in the Persian work *Dabistan.*

3 *Vide* Blochman's *A'ini-Akbari*, vol. i, p. 167; and Murray's *Discoveries and Travels in Asia*, vol. ii.

কোন পুরস্কার গ্রহণ করিতে রাজি হইতেন না শুক্রবার প্রাতঃকালে তাঁহাদিগকে এক এক মুষ্টি টাকা দান করা হইত।

ইবাদত খানাতে উল্লিখিত আছে অনেক সময় দুপুর রাত্রির পর পর্য্যন্তও তর্ক চলিত এবং কখন কখন সম্রাটের সভাপতিত্বে যখন প্রাতঃসূর্য্যের নূতন কিরণ বিচার গৃহের উৎফুল্ল সভ্যগণের সম্মুখে পতিত হইত তখন সভা ভঙ্গ হইত। ১

এইরূপ সারগর্ভ যুক্তিতর্ক সমূহের অনুধাবন করিয়া স্বীয় জ্ঞানের সীমা বিস্তৃতির উদ্দেশ্যে সম্রাটের যথেষ্ট উৎসাহ থাকিলেও এই সকল জ্ঞানের প্রকাশক সাহিত্যের পুষ্টির জন্যও তাঁহার উৎসাহ কম ছিল না, এবং ইহাই দেশের বিরাট অমূল্য সম্পত্তি হইয়াছিল।

সম্রাটের আদেশে সংস্কৃত ও বিভিন্ন ভাষার গ্রন্থরাজি পারশী এবং হিন্দীতে অনূদিত হইয়াছিল।

১৫৮২ খৃঃ অব্দে মহাভারতের পারশী অনুবাদের জন্য আদেশ হয়। সম্রাট কয়েক জন পণ্ডিত হিন্দুকে আহ্বান করেন এবং তাঁহাদিগকে ব্যাখ্যা কার্য্যের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দেন; তিনি স্বয়ং নকিব খাঁর অর্থবোধের জন্য কয়েকরাত্রি জাগরণ করিয়াছিলেন। তিনি, 'তারিখি বাদাউনী'র প্রণেতা আবদুল কাদিরকে তাঁহার ব্যাখ্যা কার্য্যে সহায়তা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। ৩|৪ মাসের মধ্যেই ১৮ অধ্যায়ের ২ অধ্যায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইল। মুল্লা শী এবং নকিব খাঁ এক অংশ ও সেই সময়ে সুলতান হাজী থানেশ্বরী অন্য অংশ অনুবাদ করেন। সেখ ফয়জী গদ্য ও পদ্যে খস্‌ড়া অনুবাদের জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ২ অধ্যায়ের বেশী অনুবাদ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তৎপর হাজীই ফয়জীর কাজ করিতেছিলেন কিন্তু একশত পাত শেষ না করিতেই কার্য্য বন্ধ হইল।

এই অনুবাদ বিরাট গ্রন্থের একটী চুম্বক স্বরূপ হইয়াছিল। উহা রজ্‌ম্ নামা (লড়াই গ্রন্থ) নামে অভিহিত হয় এবং পরে উহার চরিত্রগুলি সুন্দররূপে লিখিত হইয়া চিত্রেরদ্বারা সুসজ্জিত হইয়াছিল। আবুল ফজল দুই পাতা ব্যাপী ভূমিকা লিখিয়া দেন। সম্রান্ত ব্যক্তিগণ প্রত্যেকেই কিনিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। ২

চারি বৎসর ব্যাপী কঠোর পরিশ্রমের পর ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে আবদুল কাদের রামায়ণের পারশী অনুবাদ সম্পাদন করেন। ৩

হাজী ইব্রাহিম সরহিন্দী অথর্ব্ববেদের, ৪ ফয়জী লীলাবতীর, মুকুম্মল খাঁ গুজরাটী জ্যোতির্বিজ্ঞানের একখানি ভাষ্য তাজকের, মীরজ খাঁ খাঁনান ওয়াকি আতি বাবরীর তুর্কী ভাষার এবং মৌলানা শা মহম্মদ সাহাবাদী কাশ্মীরি ভাষার কাশ্মীরের ইতিহাসের পারশ্যানুবাদ করেন। ৫ আবদুল কাদের জমিউল রসীদীর অনুবাদ করেন।

1 Gladwin, p. 559, f.n.

2 For all the above information *re*'Ibadat Khanah, *vide Tabaqati-Akbari*, Elliot v, pp. 390-391 ; *Tarikhi-Bada'uni* (or *Muntakhabul-Tawarikh*), Elliot v, pp. 517-519 and 526-529. Abul Fazl's *Akbar-Namah*, Elliot vi, pp. 59, 60.

3 Gladwin's *A'ini-Akbari*, p. 85 ; and *Tarikhi-Bada'uni*, Elliot v, pp. 537, 538.

4 *Tarikhi-Badauni*, Elliot v, p. 539.

5 'Abdul Quadir says that the work of translation was first entrusted to a learned Brahman a convert to Muhammadanism, who came from the Deccan, and to 'Abul Fazl, and next on Haji Ibrahim. Lowe's *Muntakhabul-Tawarikh*, vol. ii, p. 216.

আরব্য ভাষায় লিখিত ভৌগলিকপাঠ মুজামুল বুলদানকে মুল্লা আহ্মদ তলা, কাশিমবেগ, সেথ মুনাব্বর এবং আবদুল কাদের প্রভৃতি পণ্ডিতমণ্ডলী পারশী ভাষায় অনুবাদ করেন।১ হরিবংশেরও পারশ্যানুবাদ হয় এবং তৎসঙ্গে নশ্রুল্লা মুস্তাফা ও মৌলানা হসন ওয়াইস কলিয়া দমনা নামে পঞ্চতন্ত্রের পারশ্যানুবাদ করেন। এই পণ্ডিতগণের অনুবাদ অতিশয় কঠিন হইয়াছিল কাজেই আয়য়র-দানিশ নামে একটী সহজ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

চিত্রের দ্বারা সুবোধ্য করিয়া লয়লা ও মজনুর আদর্শে কাব্যে নল-দময়ন্তীর পারশ্যানুবাদ রচিত হয়।

যখন শীরগড়ে, অন্যত্র কনৌজে, দরবার ছিল, সেই সময় আবদুল কাদেরকে বত্রিশ সিংহাসনের গদ্য ও পদ্যানুবাদের নিমিত্ত সম্রাট উপদেশ প্রদান করেন। একজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ কাদেরকে ভাষান্তরিত করিয়া দিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। গ্রন্থখানি রচিত হইবার পর খিরদ অফজা নামা নামে পরিচিত হয়; নামের দ্বারাই গ্রন্থখানির রচনার তারিখ ইঙ্গিত করিতেছে।২ শা নামা গদ্যে রচিত হয় এবং হয়াতুল হাইবানের অনুবাদ হয়। আমরা ইতঃপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি আবুল ফজল 'গোসপেলে'র (খৃঃ ধর্ম্মবাণীর) অনুবাদের ভার লইয়াছিলেন।৩

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি বাবরের রাজত্বকালে উল্লাবেগ কর্ত্তৃক যে জ্যোতিষ তালিকা প্রস্তুত হয় তাহার একাংশ আমীর ফথুল্লা সীরাজীর তত্ত্বাবধানে অনূদিত হয়, এবং সংস্কৃত গ্রন্থাবলী কিষণযোশী, গঙ্গাধর এবং মহেশমহানন্দের অনুবাদ আবুল ফজল সম্পাদন করেন।৪ ১৫০০ খৃঃ অব্দে বাবরের জীবনচরিত আবদুল রহীম খাঁ খাঁনান কর্ত্তৃক তুর্কী হইতে পারশ্য ভাষায় পরিবর্ত্তিত হয়।৫

নকিব খাঁ এবং আরও কয়েকজন একত্রিত হইয়া তারিখি আল্‌ফি ৬ অর্থাৎ সহস্র বৎসরের ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করেন। নির্ব্বাচন কার্য্যে মৌলানা আহ্মদ তাহটহাবীর যথেষ্ট দাবী ছিল। জাফর বেগ এবং আসফ খাঁ ইহাকে সম্পন্ন করেন। ৭

1 'Abdul Quadir made an abridgement of the history of Kashmir, which is said to have been translated from the original Hindi by Mulla Shah Muhammad Shahbadi, and was called *Rauzahi-Tahirin*, but apparently not the *Rajtarangini*, for the translation of that work is usually attributed to Maulana Imamuddin. According to Professor Willson there were frequent remodellings or translations of the same work, but among those he notices he does not mention the one by Mulla Shah Muhammad Shahabadi; *vide* Elliot v, p 478; *Asiatic Researches*, vol. xv, p. 2; and Blochmann's *A'ini-Akbari*, vol. i, p. 103.

2 *Tarikhi-Bada'uni*, Elliot v, p. 478.

3—4 *Tarikhi-Bada'uni*, Elliot v, pp. 483, 484 and 513.

5 Blochmann's *Aini-Akbari*, p. 104.

6 Elliot iv, p. 218.

7 "The Literary circle which followed the Imperial Court appears to have been peculiarly active during its sojourn at Lahore. It was here that the voluminous history of Muhammadanism from the earliest period up to the thousandth year of the Hijri era compilled by the order of the Emperor was finished and revised; and it was here that the translation of the *Mahabharata* and the *Rajtarangini* into Persian was undertaken," p. 10, *A Brief Account of the History and Anquities of Lahore*, 1873 (author not mentioned)—(in the Calcutta Imperial Library).

তৈমুরের বংশধরগণের প্রত্যেকেরই জীবন চরিত লেখা সম্বন্ধে যথেষ্ট পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়, বাবর এবং জাহাঙ্গীর তাহার উদাহরণ। কিন্তু যাহারা নিজেদের জীবনচরিত লেখেন নাই তাঁহারা পরবর্ত্তী কালে জীবনচরিত এবং কার্য্যকলাপের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করার জন্য মন্তব্য রাখিয়া দিতেন। এইটী আকবরের সম্বন্ধে দেখা যায়। ওয়াকি নবীশ সম্রাটগণের কার্য্যকলাপের দৈনিক তালিকা রাখিতেন উদাহরণ স্বরূপ, তিনি যাহা খাইতেন বা পান করিতেন, যে সকল বই তাঁহার কাছে পড়া হইত এবং এইরূপ যাহা কিছু হইত। কোন একটী বিবরণ রক্ষিত হইবার পূর্ব্বে দৈনিক কার্য্যতালিকা আকবর এবং তাঁহার কয়েকজন কর্ম্মচারীর দ্বারা অনুমোদিত হইত। ওয়াকি নবীশের এই কাজ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সম্রাটগণের রাজত্ব সময়েও বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু আবুল ফজল বলেন ইহার দ্বারা কোন সদুদ্দেশ্য প্রতিপালিত হয় নাই।

সম্রাট্ তাঁহার পুস্তকাগারে যথেষ্ট বই রাখিতে খুব যত্নবান ছিলেন, সকল প্রকার পুস্তক রাখা তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্মের মধ্যে ছিল। রাজকীয় পাঠাগারের কতকগুলি বই স্ত্রীলোকদিগের মহলে এবং অবশিষ্ট বাহিরের ঘরে থাকিত। তাঁহার পাঠাগারের সুশৃঙ্খলা বিধানের নিমিত্ত কয়েকজন লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং পুস্তকমাত্রেই বিজ্ঞান ও ইতিহাসের শ্রেণীতে বিভক্ত হইত। ১

সম্রাট গুজরাট জয়ের সময় ইটমাদ খাঁ গুজরাটীর পুস্তকাগারটী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত পুস্তকাগারে অনেকগুলি দামী বই ছিল, সেইগুলি রাজকীয় লাইব্রেরীতে রক্ষিত হয় এবং সেই সময়ে সম্রাট পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের মধ্যেও বিতরণ করিয়াছিলেন। আবদুল কাদিরও অশরুল মস্‌কটের একখণ্ড উপহৃত হইয়াছিলেন। ২

ফয়জী ৩ মৃত্যু সময়ে ৪৬০০ খণ্ড পুস্তকের একটী লাইব্রেরী রাখিয়া যান। তন্মধ্যে কতকগুলি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠস্থানীয় ছিল সেই গুলিকেই অত্যধিক ব্যয়ে এবং অনিয়মিত যত্নে নকল করা হয়। সেইগুলির অধিকাংশই তাহাদের শ্রদ্ধেয় প্রণেতাগণের জীবনী ছিল অথবা অনেকগুলিই অন্ততঃ তাহাদের সমসাময়িক ভাষ্যকারগণের নকল বই। সমস্ত বই সম্রাটের লাইব্রেরীতে নীত হইল এবং তিনটী বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া উহাদের তালিকা ও সংখ্যা করা হইল। প্রথম ভাগে কবিতা, চিকিৎসা বিজ্ঞান, ফলিত জ্যোতিষ

1 *Tarikhi Bada'uni*, Elliot v, p. 519; *Tarikhi-Akbari* M.S. in ASB, leaf 58.

2 It is gratifying to learn that the houses at Fathpur Sikri of both Faizi and Abul Fazl, which stand very near each others are being used as a Zilla School, and have not now been appropriated to some other purpose (*vide* Smith's *Fathpur Sikri* pt. iii, p. 29).

3 *Tarikhi-Bada'uni*, Elliot v. p. 548. Though we learn that there was an Imperial Library, which grew richer in its collection by additions made by the Emperor, we are quite in the dark as to the number of volumes in it, and hence unable to it with the libraries established at such centres of Muslim learning as Cordova, Cairo, Merv, Bukhara, Baghdad, etc. For an account of these libraries see Justice Khuda Bakhsh Khan's *Islamic Libraries*.

এবং সঙ্গীত, দ্বিতীয় ভাগে ভাষাবিজ্ঞান, দর্শন শাস্ত্র, সূফী মতবাদ, বিজ্ঞান জ্যোতিষ এবং জ্যামিতি; তৃতীয় ভাগে বহু ভাষ্য, বহু প্রবাদ কাহিনী, ধর্মগ্রন্থ এবং আইন গ্রন্থ। ঐ সকলের মধ্যে ফয়জীর সংগৃহীত ১০১টী 'নল-দমনে'র কবিতা ছিল। ১

আগ্রার দুর্গের ভিতর যে ঘরটীতে পাঠাগার ছিল তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। মাননীয় হ্যাভেল উহার অবস্থিতি সম্বন্ধে বলেন:—

"এই সকল (অর্থাৎ শমনবরজের সন্নিহিত আকবরের ছোট ছোট ঘরগুলি) অতিক্রম করিয়া, আমরা একটী লম্বা ঘরে প্রবেশ করিলাম উহাই লাইব্রেরী বলিয়া ধারণা হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উক্ত ঘরটী হইতে চিত্র-সজ্জা উদ্ধার করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইতে হয় নাই।" ২

আমাদের বলা অনুচিত নয় যে, যখন পাঠাগারগুলিতে অধ্যয়ন করিতেছিলেন সেই সময়, রাজকীয় পাঠাগারের বইগুলি উদাহরণার্থ এবং সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনার্থ কিরূপ চিত্রিত হইয়াছিল। পারস্য ভাষার গদ্য ও পদ্য গ্রন্থাবলী বিখ্যাত চিত্রকরগণের দ্বারা অতি সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছিল। দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত 'ওশিয়া হমজা' অত্যধিক উদাহরণের জন্য ১৪০০ চিত্রে শোভিত হইয়াছিল; এবং এইরূপ অনেক গ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিত গুলিই সুসজ্জিত হইয়াছিল, যথা—চঙ্গিস্-নামা, জাফর-নামা, ইক্‌বাল-নামা, রজম-নামা ৩ (মহাভারত), রামায়ণ, নলদময়ন্তী, কলীলা-দমনা (পঞ্চতন্ত্র) এবং পঞ্চতন্ত্রের সহজ পারস্যানুবাদ অয়য়র-দানিশ।

চিত্রবিজ্ঞানে সুদক্ষ শিল্পিগণ গ্রন্থগুলির পত্রের সীমা রঞ্জিত করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং গ্রন্থের বাঁধাই কার্য্যের উপরও যথেষ্ট কারিগরী করা হইয়াছিল। ৪

জ্ঞানালোচনার চেয়ে কলাবিদ্যার প্রতিও আকবরের অনুরাগ কম ছিল না। তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভ হইতেই তিনি চিত্রশিল্পের উৎসাহদাতা ছিলেন, এবং তাঁহার আদেশে চিত্রশিল্পিগণ পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা ক্রমেই তাঁহাদের শিল্পের উন্নতি করিতেছিলেন। সম্রাট্ একটী চিত্রশিল্পালয় স্থাপিত করেন, সেখানে শিল্পিগণ সমবেত হইয়া শিল্পের দ্রুত উন্নতি দেখাইতে ছিলেন। প্রত্যেক সপ্তাহেই দারোগাগণ প্রত্যেক শিল্পীর চিত্র সম্রাটের নিকট আনিতেন; সম্রাট তাহাদের দক্ষতানুসারে বেতনবৃদ্ধি ও অর্থের দ্বারা পুরস্কৃত করিতেন। রাজদরবারের বিখ্যাত চিত্রশিল্পিগণ মীর সৈয়দ আলী

1 E. B. Havell's *Handbook to Agra and the Taj, Sikandra Fathpur-Sikri and the Neighbourhood*, p. 66.

2 The famous manuscript of *Razm-Namah* is said to have cost Akbar about £40,000—a sum which in our days would be much greater. It is now at Jaipur (see Martin's *Miniature Painting and Painters of India, Persia, and Turkey*, vol. i, p. 127).

3 Gladwin's *A'ini-Akbari*, p. 87.

4 Blochman's *A'ini-Akbari*, pp. 96 off.; Gladwin, p. 89. For a list of painters in Akbar's Court, and their paintings still preserved, see Martin's *Miniature Painting, etc.*, vol. i, pp. 127—131.

তব্রীজী, খাজা আব্দুল সমদ শীরীকলম সীরাজী
দশবন্ত (জনৈক পাল্কীবাহকের পুত্র)
বসাবন,
কেসু,
লাল,
মুকুন্দ,
মুস্কিন,
কল্মাক ফরখ,
মাধু,
জগন,
মহেশ,
খেমকরণ,
তারা,
সান্ওলা
হরিবংশ এবং
রাম।

দরবারের সকল প্রধান কর্ম্মচারীর প্রতিকৃতিই দরবারের চিত্রশিল্পিগণের দ্বারা অঙ্কিত হইয়া বৃহৎ পুস্তকাকারে বাঁধান হইয়াছিল। ১

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা।

জন্মান্তর

কোন অতীন্দ্রিয় পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করিলে তাহার বিরুদ্ধ প্রমাণ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাই বলিয়া যে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের অতীত কোন পদার্থ নাই, একথাও প্রকৃত নহে। প্রত্যক্ষ উপলব্ধি না হইলেও প্রকৃত মীমাংসকগণ যুক্তি, চিন্তা ও তর্কাদি সাহায্যে ইন্দ্রিয়াতীত অনেক বস্তু আছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। জন্মান্তর এই প্রকার একটি ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়, সুতরাং ইন্দ্রিয়জ্ঞানের দ্বারা ইহার অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের অতীত বলিয়াই যে ইহা অপ্রকৃত, একথা বলাও যুক্তিসঙ্গত নহে। আমাদের দেহের মধ্যেই চৈতন্য, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি অংশগুলি ইন্দ্রিয়ের অতীত হইলেও ইহাদের অস্তিত্ব সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে। আমাদের অন্তরে বাহিরে সর্ব্বদা প্রবাহমান বায়ু দর্শনেন্দ্রিয়ের অতীত হইলেও স্পর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করিয়া তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছি। এইগুলি যেমন যুক্তি চিন্তাদির সাহায্যে স্বীকার করিতেছি, জন্মান্তর সম্বন্ধেও যদি সেই প্রকার সু-যুক্তিমত কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে জন্মান্তর নাই বলিবার কোন কথা থাকে না। এখন আমাদের এই জন্মাই শেষ, কি আবার জন্মান্তর আছে, তাহা বুঝিবার জন্য জন্ম-জন্মান্তর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

শরীর ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মার সংযুক্তাবস্থাকেই জীবিত বলিয়া উল্লেখ করা যায়, সুতরাং ইহাদের অসংযুক্তাবস্থার নাম মৃত। এখন একটি প্রশ্ন এই যে, মৃতের অর্থাৎ অসংযুক্ত দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মার মধ্যে জন্মান্তর হয় কাহার ?

যদি দেহের বলা যায়, তবে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় যে, মৃত মানবদেহ সমাধি কিম্বা অগ্নি সহায়ে ধ্বংস করিয়া ফেলা

১ For the above information, *vide* Blochmann, pp. 107, 108.

হয়, সুতরাং তাহার আর পুনর্জন্ম কি হইতে পারে? ইন্দ্রিয় সমূহের জন্মান্তর হয়, শাস্ত্রে একথাও উল্লেখ হয় নাই। আত্মার জন্ম-মৃত্যু দুই-ই নাই, ইহাই শাস্ত্রের অভিমত। আর আত্মার জন্ম মৃত্যু না থাকিলে মনেরও জন্ম জন্মান্তর থাকিতে পারে না; কারণ মন আত্মা বা চেতনার সহিত নিরবচ্ছিন্ন সংযুক্ত রহিয়াছে, তাই যেখানে আত্মার অভাব রহিয়াছে সেখানে মনেরও অভাব আছে এবং মনের অভাব জন্য তাহার কার্য্য, চিন্তা, স্মৃতি, তর্কাদিও কিছুই নাই, যেখানে চেতনা-শক্তি অন্ধ, সেখানে মনও দুর্ব্বল। সুতরাং চেতনার ন্যায় মনেরও জন্মান্তর থাকিতে পারে না। আর যদি বল আত্মা, মন, ইন্দ্রিয় ও দেহ এই চারিটিরই একত্রে জন্মান্তর হয়, তবে তাহারও প্রমাণাভাব হইবে। কারণ দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলি তো সকল জীবেরই নষ্ট হইয়া যায়। আরও এক কথা এ পর্য্যন্ত এমন কোন জীব বা মানব জন্ম গ্রহণ করে নাই, যাহা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন জীব বা মানবের তুল্য আকৃতি প্রকৃতি বিশিষ্ট। আত্মা, মন, দেহ ও ইন্দ্রিয় লইয়াই জীব, ইহাদের যখন পৃথক সমবেত কাহার জন্মান্তর গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না, তখন জন্মান্তর হয় কাহার?

এই প্রকার প্রশ্ন যেমন স্বাভাবিক, সেই প্রকার ইহাও স্বাভাবিক প্রশ্ন যে, শুভ হউক, অশুভ হউক যাহা একটা আমরা অনুভব করি, তাহা কোন একটা নিষ্পন্ন কার্য্যের পরিণাম ফল; তবে শুভ কার্য্যের পরিণামে শুভ এবং অশুভ কার্য্যের পরিণামে অশুভ ফলভোগই স্বাভাবিক। সেই প্রকার যেখানে শুভ এবং অশুভ উভয়বিধ কার্য্যই বর্ত্তমান সেখানে তাহার পরিণাম ফলও শুভাশুভ মিশ্রণে গঠিত হয়। আর যেখানে কোন প্রকার কার্য্য নাই, সেখানে তাহার পরিণাম ফলও কিছু নাই বুঝিতে হইবে। যদি তাই হয়, তবে যে গৃহবিত্তহীন দরিদ্র সন্তানকে ধনবান কর্ত্তৃক পালিত পুত্ররূপে গ্রহণ করিতে দেখা যায়, সে ক্ষেত্রে শিশুর এমন কোন কার্য্য বা চেষ্টা নাই যাহাতে সে ধনীর পুত্ররূপে গৃহীত হইতে পারে। জন্মান্তরবাদী বলিবেন, যদি তাহার কোন কার্য্য না থাকে, তবে এই কার্য্য পরিণাম কোথা হইতে আসিবে। তবে এই কার্য্য যখন ইহ জন্মে দেখা যাইতেছে না, তখন যে কোন পূর্ব্ব এক জন্মের কার্য্য আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

অবশ্য এখানে একটি কথা বলিতে পারা যায় যে, অপুত্রক ধনীর চেষ্টায় বা দরিদ্র পিতার চেষ্টা ফলে দরিদ্র সন্তান অর্থবান হইতেছে। একের কার্য্যফলতো অন্যে ভোগ করে, পিতার সম্পত্তি বা ঋণ কি পুত্রে যায় না? সেই প্রকার পিতার অথবা ধনীর চেষ্টায় দরিদ্র সন্তান ধনবান হইতেছে বলিতে পারা যায় না কি?

কিন্তু এ যুক্তিতেও আমাদের সন্দেহের কারণ থাকিয়া যাইতেছে। যে দরিদ্র সন্তানটি ধনীর পালিত পুত্ররূপে গৃহীত হইতেছে, তাহার ন্যায় শত সহস্র সন্তান দেশে আছে। তাহার অপেক্ষা রূপবান মহৎ কুলের দরিদ্র সন্তানের অভাব না থাকিতে পারে, ধনীও অপর স্থানে সন্তান অনুসন্ধান করিয়াছেন, অন্য দরিদ্র পিতাও নিজ পুত্রের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু এই সমুদয় অন্যের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া একটি মাত্র শিশু ফল ভোগী হইল কেন? মাত্র ইহাই নহে, একই পিতা মাতার জাত এবং

সমান মাতৃ পিতৃ স্নেহে লালিত পালিত ও শিক্ষা প্রাপ্ত সন্তান সমূহের বল, বুদ্ধি, বর্ণ, স্বর, আকৃতি, প্রকৃতি, ভাগ্য প্রভৃতির পার্থক্য হইতে কি আমাদের জন্মান্তরের কর্ম্মফলের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় না?

অবশ্য পিতামাতার খাদ্য, পান, বিহার, কালধর্ম্ম প্রভৃতি বাহিরের কার্য্য কারণের বিভিন্নতা হইতে জাত সন্তানের বল, বর্ণ, আকৃতি প্রকৃতির পার্থক্য সম্পাদিত হয় সত্য, কিন্তু এই যে আহার বিহারাদির বিভিন্নতা, যাহা এক পুত্রের জন্মকালে হীনভাবে, অপর পুত্রের জন্মকালে উন্নতভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া পুত্রদ্বয়ের ভাগ্যবিপর্য্যয় সম্পন্ন করিতেছে, তাহা দৈব বা পূর্ব্বজন্মের কার্য্যের ফলভোগ জন্য নহে কি? নতুবা এক পুত্রের জন্মকালে পিতা মাতার আহার আচার অনিন্দিত, কালই বা অনুকূল হইবে কেন; আর অপর পুত্রের জন্মকালে সেই পিতা মাতারই নিন্দিত আহার বিহার, কালধর্ম্মই বা প্রতিকূল হইবে কেন? এইরূপ কাহার বিনা চেষ্টায় পরকীয় সম্পত্তি প্রাপ্তি, কাহার বা দৈবাদেশ প্রাপ্ত ঔষধে স্বাস্থ্যলাভ, সমচেষ্টায় একবিধ কার্য্যে ব্যক্তিবিশেষে ফলবিশেষ প্রভৃতি দেখিয়াও কি আমরা জন্মান্তরীয় কর্ম্মফলের কথা ভাবিয়া অন্যায় করি?

রাম ও শ্যাম দুই জন যমজ ভাই, তাহাদের আকারগত সাম্য এত বেশী যে, সাধারণে অনেক সময় বুঝিতে পারে না। কে রাম আম কে শ্যাম। কি এ প্রকার আকারগত সাম্য প্রবল হইলেও যমজ সন্তানের প্রকৃতিগত বৈষম্য বহুপরিমাণে থাকে, ইহা আমরা বহুক্ষেত্রে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিবার অবকাশ পাইয়াছি। এই আকৃতিগত সাম্য ও প্রকৃতিগত বৈষম্য ইহ জন্মের কোন কার্য্য ফলে কি পূর্ব্ব কোন জন্মের কার্য্যফলে তাহা চিন্তার বিষয় নহে কি? এই সমুদয়ের মীমাংসা করিতে হইলে জন্ম-জন্মান্তর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক হইবে।

জন্ম শব্দের অর্থ উৎপত্তি, সুতরাং উৎপন্ন পদার্থ মাত্রই প্রাপ্ত জন্ম বা জাত পদার্থ। জল একটি উৎপন্ন পদার্থ, বিজ্ঞান সাহায্যে প্রতিপন্ন হইয়াছে সৃষ্টির সর্ব্ব প্রথম অবস্থায় জল ছিল না, কিন্তু জলের পূর্ব্বে বায়ু ও তাপ ছিল। এই বায়ুর অংশবিশেষের সহিত তাপের অংশবিশেষের সংযোগে জল উৎপন্ন হইয়াছে, কারণ এখনও এই উপায়ে বায়ু বিশেষের সহিত তাপের অংশ বিশেষের সংযোগ করিয়া জল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাই জলের জন্ম-পরিচয়। এখন একটি কথা এই যে, ভূগর্ভ হইতে সুদূর নভোমণ্ডল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই বায়ু ও তাপ অবস্থিত রহিয়াছে, এই বায়ুর মধ্যে জল উৎপাদক বায়ুর অংশও আছে, তাপও আছে, আর ইহাদের যে সংযোগ নাই,—এ কথাও বলিতে পারা যায় না। যদি তাহাই হয়, তবে সর্ব্বত্র জলময় দেখিতে পাই না কেন? দেখিতে পাই না তাহার কারণ, বায়ুর যে অংশবিশেষের সহিত যে পরিমাণ তাপের সংযোগ হইলে জল উৎপন্ন হয়, তাহার অভাব আছে, তাই সর্ব্বত্র জলময় দেখা যায় না। তবে যেমন অভাব আছে সেই প্রকার ভাবও থাকে। যেখানে অভাব থাকে যেখানে যেমন জলের জন্ম নাই, সেই প্রকার সেখানে ভাব আছে সেখানে তাহার জন্মও রহিয়াছে। সে কারণেই আকাশ হইতে ভূগর্ভ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই জলের জন্ম বা উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহার জন্ম বা উৎপত্তি আছে তাহার মৃত্যু

বা অভাবও দেখিতে পাওয়া যায়। জল উৎপন্ন পদার্থ, তাই তাহার অভাবও দেখিতে পাওয়া যায়। বায়ু ও তাপের যে অংশ-বিশেষের সংযোগে জল উৎপন্ন হয়, পরীক্ষার দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে, জলের অভাবে বায়ু ও তাপের সেই অংশের পুনরুদ্ভব হয়। ইহা হইতে এই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, বায়ু তাপের অংশবিশেষের মৃত্যু বা অভাবে জল উৎপন্ন হইতেছে, কিন্তু সেই জলের মৃত্যু বা অভাবে বায়ু এবং তাপের সেই অংশের পুনরুদ্ভব হইতেছে। আবার পুনরুদ্ভূত সেই বায়ু ও তাপের অংশ বিশেষের সংযোগ করিলে পুনর্ব্বার জলের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই উপায়ে প্রতিপন্ন হইতেছে জল, বায়ু, তাপ প্রভৃতির জন্ম, মৃত্যু ও পুনর্জ্জন্ম রহিয়াছে। এখন উৎপন্ন জল, বায়ু, তাপাদির মৃত্যুর পর যে পুনর্জ্জন্ম সম্ভবপর হইতেছে; উৎপন্ন পদার্থ মাত্রের পক্ষেই তাহা সম্ভবপর হইবে না কেন?

কিন্তু এ বিষয়ে একটি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, জড় পদার্থ জলের উপমা হইতে অচেতন জীবের পুনর্জ্জন্মের বিচার কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে। চেতন ও জড়ের একটা পার্থক্য তো আছে?

জড় কাহাকে বলে? জড় শব্দের অর্থ অপ্রজ্ঞ বা অচেতন। আমরা যাহাকে চেতন বলিয়া জানি সেই রাম-শ্যামরূপী জীবের সমুদয় অংশই চেতন কি তাহাতে জড়ের অংশ কিছু আছে তাহা দেখা যাউক। আমরা রাম বা শ্যামের ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে তাহার চেতনার পরিচয় পাই, তাহার জ্ঞান ও কর্ম্মের পরিচয় পাই, কিন্তু একদিন সেই রাম-শ্যাম এমন অবস্থা পাইবে, যে দিন সে আর কোন চেতনার পরিচয় দিতে পারিবে না, জ্ঞান-কর্ম্ম কিছুই থাকিবে না। লোকে এই অবস্থাকে মৃত্যু বলে। সুতরাং মৃত রাম আর চেতন নহে, তখন সে জড়মাত্র। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে রাম-শ্যাম কেহই মাত্র চেতন নহে, চেতন ও জড়ের সংযোগ মাত্র। এখন যে জলকে আমরা মাত্র জড় পদার্থ বলিতেছি, তাহাতে যে চেতনার কোন অংশ নাই, তাহা কে বলিতে পারে? যে জলের সাহায্যে আমাদের চেতনা রক্ষিত হয়, যাহার অভাবে চেতনা বিলুপ্ত হয়, তাহাতে চেতনার কোন অংশ নাই বিশ্বাস হয় কি? জলে চেতনা না থাকিলে অচেতন জল হইতে আমাদের চেতনা সম্পাদিত হয় কি প্রকারে? জল কেন আর্য্যগণের মতে তাপ, বায়ু, আকাশ, মৃত্তিকা উদ্ভিদাদি সৃষ্ট সমুদয় পদার্থই সচেতন, কেবল যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চেতনার বিকাশ হয়, সেই ইন্দ্রিয় সমূহের দুর্ব্বলতা বা হীনতার জন্য ইতর পদার্থের চেতনার সম্পূর্ণ বিকাশ হয় না। *

এখন জিজ্ঞাস্য রাম, শ্যাম বা মৃত জীবের চেতনা, মন, ইন্দ্রিয় বা দেহ ইহাদের কোন্ অংশের পুনর্জ্জন্ম হয়। প্রথমে দেখা যাউক দেহের জন্মান্তর হইতে পারে কি না। মৃত-দেহ সমাধি বা চিতাগ্নি দ্বারা অভাব হইলেও নিঃশেষ হয় না; পরন্তু রূপান্তর গ্রহণ করে।

গর্ভাশয়ে পিতার শুক্র ও মাতার আর্ত্তব সংযোগে আমাদের দেহ গঠিত হইয়া থাকে। এই দেহবীজ শুক্র ও আর্ত্তব মানবের নিত্য গৃহীত খাদ্যের সারভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

* এ সম্বন্ধে ১৩২১ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'গৃহস্থে' প্রকাশিত 'পদার্থের চেতন অচেতন সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের অভিমত' শীর্ষক প্রবন্ধে সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে।

শুক্রার্ত্তবের উপাদান খাদ্যসমূহ উদ্ভিদ্ ও প্রাণীজ দুগ্ধ-মাংসাদি হইতে গৃহীত হইয়া থাকে। প্রাণীজ খাদ্যাংশগু মূলতঃ উদ্ভিদ হইতে গঠিত, কারণ খাদ্য আকারে গৃহীত উদ্ভিদ্ হইতেই উদ্ভিদভোজী প্রাণীর রস, রক্ত, মাংস, চর্ম্মাদি সমুদয় দেহই গঠিত হইয়া থাকে। আবার উদ্ভিদেরা ভূগর্ভস্থ রস গ্রহণ করিয়া উৎপত্তি, পুষ্টি, বৃদ্ধি প্রভৃতি লাভ করে। আর্য্যঋষিগণের মতে এই রস আকাশাদি পঞ্চ পদার্থের সমবেত অংশবিশেষ। যেহেতু এই আকাশাদির কোন একটির অভাবে বীজ বৃক্ষ রূপে পরিণত হইতে পারে না। এই উপায়ে জগতের প্রথমোৎপন্ন আকাশাদি পঞ্চ পদার্থের সমবেত অংশবিশেষ, রস আকারে প্রথমে বীজ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহের গঠন ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে। * এই কারণেই আর্য্য-ঋষিগণ দেহকে পাঞ্চভৌতিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

জল যেমন যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, রূপান্তরে আবার তাহারই আকার প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার দেহও রূপান্তরিত অবস্থায় কতক অংশ মৃত্তিকা, কিছু জল, কিছু বায়ু, তাপ ও আকাশ পরমাণুরূপে পরিণত হয়।

সমাহিত বা ভস্মীভূত দেহ এই উপায়ে মৃত্তিকা, জল, বায়ু ও তাপাদিতে পরিণত হইলে, সেই অংশগুলি পুনরায় উদ্ভিদ্ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া খাদ্য আকারে এবং অন্য উপায়েও জীবগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া দেহগঠনের উপাদান রূপে পরিণত হয়। ব্যাধিদূষিত দেহের দূষ্য পদার্থগুলি সমুদয় দেহের সহিত মৃত্তিকা-জলাদিরূপে রূপান্তরিত হইলেও তাহার দূষিতভাব বহুদিন পর্য্যন্ত পরিণত মৃত্তিকা জলাদির মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া সম্পূর্ণ বা আংশিক দোষ উদ্ভিদ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়; সেকারণেই সমাধি শ্মশান বা তৎসংলগ্ন ক্ষেত্র হইতে ঔষধ বা খাদ্যাদির উপকরণ সংগ্রহ আয়ুর্ব্বেদাদিশাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি—দেহের জন্মান্তর আছে; তবে রামের সম্পূর্ণ দেহ শ্যামের বা কোন শৃগাল কুক্কুরের সম্পূর্ণ দেহাকারে পরিণত না হইতে পারে, পরন্তু অনেক জীবেরই দেহের অংশ বিশেষরূপে জন্মিতে পারে।

পুকুর বা অন্যতম জলাশয়ের জল যখন প্রাকৃতিক নিয়মে রূপান্তরিত হইয়া বায়ু ও তাপের অংশে পরিণত হয় এবং তাহার পর যখন উহা পুনরায় জলের আকার প্রাপ্ত হয়; তখন যে তাহা সেই জলাশয়েই পড়িবে, এমন নহে। পুকুরেও কিছু পড়িতে পারে, ক্ষেত্রেও পড়িতে পারে আবার বৃক্ষ পত্রে দুই দণ্ডের জন্য জল আকারে থাকিয়া পুনরায় মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে পারে। দেহও সেই প্রকার জন্ম প্রাপ্ত হয়, কিন্তু কতদিনে, কোথায় কাহার আকার প্রাপ্ত হইবে, তাহা বলা যায় না।

অবশ্য দেহের এই প্রকার জন্মান্তর গ্রহণের সহিত প্রকৃতপক্ষে জীবের জন্মান্তর গ্রহণ সূচিত হয় না, কিন্তু জীবের জন্মান্তরের সহিত দেহের এই প্রকার জন্মান্তর গ্রহণের সম্বন্ধ রহিয়াছে। কারণ এই রূপান্তরিত দেহাংশ লইয়াই জীবের দেহ গঠিত হইয়া থাকে আর জীব-চেতনা স্বীয় কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগের জন্য দূষিত বা অদূষিত উপাদানে গঠিত দেহে আশ্রয় লাভ করিয়া শুভাশুভ ফলভোগ করিয়া থাকে।

এখন ইন্দ্রিয়সমূহের জন্মান্তর হইতে পারে কি না দেখা যাউক। যে যুক্তিতে দেহের

* এ সম্বন্ধে ১৩২০ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় গৃহস্থে প্রকাশিত 'মৌলিকতত্ত্ব' প্রবন্ধে সবিশেষ বলা হইয়াছে।

জন্মান্তর সূচিত হইতেছে সেই যুক্তিতেই ইন্দ্রিয়ের জন্মান্তর সূচিত হইবে। কারণ দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহ একবিধ পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ধ্বংসে বা রূপান্তর গ্রহণে একই অবস্থা প্রাপ্ত হয়। জীবের দেহের ন্যায় ইন্দ্রিয়গুলিও মৃত্তিকাদি পঞ্চ পদার্থের সমবেত অংশ লইয়া গঠিত হয়; কেবল মৃত্তিকাদি স্থূল অংশের উপাদানে দেহ ও সূক্ষ্ম অংশের উপাদানে ইন্দ্রিয়সমূহ গঠিত হয়, ইহাই প্রভেদ মাত্র। শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়গুলি আকাশাদি পদার্থের অংশবিশেষ সমবায়ে গঠিত হয় বলিয়া এই পঞ্চ আদি পদার্থের নিজস্ব গুণ শব্দ, স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি হইয়া থাকে। আমরা পাঞ্চভৌতিক আহার বিহার হইতে স্থূল ভৌতিক উপাদানের ন্যায় সূক্ষ্ম ভৌতিক অংশ প্রাপ্ত হই, সেকারণেই আহার বিহারের উৎকর্ষাপকর্ষতা হইতে ইন্দ্রিয় শক্তিরও সবলতা অথবা দুর্ব্বলতা পাইয়া থাকি। সুতরাং দেহের ও ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি এবং হানি যখন একই উপায়ে সম্পাদিত হইতেছে, তখন পুনরুৎপত্তি যে একই প্রকারে ঘটিবে তাহাতে সন্দেহের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

অতঃপর আত্মা ও মন সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাম, শ্যাম কোন জীবই মাত্র চেতন নহে, জড় ও চেতনার সমবায় মাত্র। ভারতীয় মনস্বিগণ এই চেতনাকে আত্মা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই আত্মা 'জ্ঞ' অর্থাৎ জ্ঞানময়; কিন্তু এই জ্ঞানের প্রকাশ মন ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগে ঘটিয়া থাকে। সুতরাং মন এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই চেতনার প্রকাশ হইয়া থাকে। সেই কারণেই 'জড়-চেতন' সমবায়ে গঠিত রামের যে চৈতন্য প্রকাশ থাকে, ব্যাধি বা স্বভাব ধর্ম্মে দেহের হীনতা আসিয়া ইন্দ্রিয় ও মন বিমলিন হইলে, রামের আর সে চেতনার প্রকাশ হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আত্মার জন্ম-মৃত্যু দুই-ই নাই, কিন্তু জন্ম মৃত্যু না থাকিলেও অন্য প্রকারে তাঁহার দুইটী ভাব আছে; একটি নিষ্ক্রিয়, অপরটি ক্রিয়াশীল। এই নিষ্ক্রিয় ভাব ক্রিয়াশীল জীবের পক্ষে সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্টরূপে বোধগম্য হওয়া সম্ভবপর নহে। তবে সে ভাব জানিবার উপায়ও নির্দ্দিষ্ট আছে। সত্যানুসন্ধিৎসু ঋষিগণ মাত্র মৌখিক উপদেশ দেন নাই। যিনি সে ভাবে সাধনা করিয়া নিজে নিষ্ক্রিয়াবস্থা প্রাপ্ত হইবেন, তিনি তাহা জানিতে সমর্থ হইবেন; আর যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট পথে না গিয়া কোন যন্ত্রের সাহায্যে আত্মার নিষ্ক্রিয় ভাবের স্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা করিবেন, তাঁহারা বিফল প্রযত্ন হইবেন, ইহা বলাই বাহুল্য। আত্মার ক্রিয়াশীল ভাবই ইন্দ্রিয় ও মনের সংযোগ পদার্থে অবস্থান করিয়া জীব নামে অভিহিত হন এবং সুখ, দুঃখ, লোভ, মোহ, ইচ্ছা, দ্বেষাদির দ্বারা জীবের চেতনার পরিচয় প্রদান করেন। আর যাহা তাঁহার নিষ্ক্রিয় ভাব, তাহার কর্ম্ম অর্থাৎ সুখ, দুঃখ, ক্রোধ, লোভাদি কিছু নাই, কেবল জড়ের সহিত চৈতন্যের মাত্র সম্বন্ধ যুক্ত থাকে। এই সম্বন্ধ হইতে মৃত জড়দেহের পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয় হানির জন্য সুখ, দুঃখাদি কিছু থাকে না। এজন্যই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন,—

"করণানি মনোবুদ্ধি বুদ্ধি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণিচ।
কর্ত্তুঃ সংযোগজং কর্ম্ম বেদনা বুদ্ধি রেবচ॥
নৈক প্রবর্ত্ততে কর্ত্তুং ভূতাত্মা নাশ্নুতে ফলং।
সংযোগাদ্বর্ত্ততে সর্ব্বং তমৃতে নাস্তি কিঞ্চিন॥"

চরক, শাঃ ১অঃ

অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, ইহারা করণ। ইহাদের সহিত সংযোগে কর্ত্তার কর্ম্ম, দুঃখ, ইন্দ্রিয়-বুদ্ধি প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত হয়। কেবল মাত্র কর্ত্তা বা জীবাত্মা কর্ম্ম নিষ্পাদনে বা কর্ম্মফল ভোগে প্রবৃত্ত হয়েন না। সংযোগেই এই সমুদয় হয়, সংযোগ ব্যতীত কিছু হয় না।

আত্মার এই ক্রিয়াশীল ও নিষ্ক্রিয় ভাব দুইটি হইতে আর্য্যঋষিগণ তাঁহার তিনটি ক্রম বা অবস্থার পরিচয় পাইয়াছেন। নিষ্ক্রিয় ভাব হইতে অনাদি, অনন্ত, অচিন্ত্য, অব্যক্ত, বিভুরূপী পরমাত্মা; আর ক্রিয়াশীল ভাব হইতে ষড়্ধাতুকী চতুর্ব্বিংশতিকী অবস্থা।

সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন আকাশ, তাপ, জল, বাতাস কিছুই ছিলনা, আর্য্যঋষিগণ সে সময়ে নিত্য, অব্যয়, অনন্তরূপী একমাত্র পরমাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, কারণ সেই কর্ত্তার অস্তিত্ব ব্যতীত সৃষ্টি সম্ভবপর হয় না। কিন্তু এই কর্ত্তাও সৃষ্টির পূর্ব্বকালে নিষ্ক্রিয়, সূক্ষ্মতম হইতে সূক্ষ্ম ছিলেন, তখন তিনি জ্ঞান-অজ্ঞান, চেতন-অচেতন উভয় ভাবের অতীত ছিলেন। অথচ তাঁহাতেই জ্ঞান-অজ্ঞান, চেতন-অচেতন সমুদয় আশ্রয় করিয়াছিল। সূক্ষ্ম বীজে যেমন জড় ও চেতন উভয় অংশই বিদ্যমান রহিয়া কালে বৃক্ষের প্রকাশ হয়, সেই প্রকার জড়-চেতন সমবায়ী আত্মার ক্রিয়াশীল অবস্থায় তাঁহা হইতে সৃষ্টির প্রকাশ হয়। সুতরাং, সৃষ্টির বীজ সূক্ষ্মভাবে পরমাত্মার নিষ্ক্রিয় অবস্থায় তাঁহাতে লীন থাকে। আর ক্রিয়াশীল অবস্থায় প্রকাশ হয় মাত্র। এই জন্য মহর্ষিগণ "আদি-র্নাস্ত্যাত্মনঃ ক্ষেত্র পারম্পর্য্যমনাদিকং" বলিয়া আত্মা এবং ক্ষেত্র উভয়ের অনাদিত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

সৃষ্টির মূল যে সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতম পরমাত্মায় অবস্থিত ইহা আমরা অনুভব করিতেছি মাত্র। তাহার পর এই সূক্ষ্ম বা প্রথম অবস্থা হইতে সৃষ্টিপ্রবাহ যত বাড়িয়া চলিয়াছে, সেই অনুপাতে সূক্ষ্ম ও ক্রমশঃ স্থূলে পরিণত হইয়াছে। তাই আকাশ পরমাণু হইতে স্থূলতর বায়ু, বায়ু হইতে স্থূল তাপ, তাপ হইতে স্থূল জলের এবং জল হইতে স্থূলতর মৃত্তিকার উৎপত্তি সম্ভবপর হইয়াছে। সূক্ষ্মের এই স্থূল পরিণতি হইতে চেতনা অংশের ও স্থূল ও স্থূলতর—ষড়ধাতুকী ও চতুর্ব্বিংশতিকী অবস্থা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—মন আত্মার সহিত নিরবচ্ছিন্ন সংযুক্ত রহিয়াছে। এই মন অন্যান্য সৃষ্ট বা প্রকাশমান পদার্থের ন্যায় পর-মাত্মায় লীন থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে স্থূল চেতনা—ষড়ধাতুকী ও চতুর্ব্বিংশতিকী আত্মায় সংযুক্ত থাকিয়া কার্য্যকরী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। চেতনার সৃষ্টিক্রিয়া নিষ্পন্ন জন্য যে অংশের উপর বুদ্ধি, চিন্তা, স্মৃতি প্রভৃতি নির্ভর করে তাহাই 'মন' নামে অভিহিত হইয়াছে। সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন পরমাত্মার নিষ্ক্রিয়ত্ব হেতু কোন কার্য্য ছিল না, তখন বুদ্ধি, স্মৃতি, চিন্তারও আবশ্যক হয় নাই, সুতরাং মনেরও বিকাশ হয় নাই। নিষ্ক্রিয় পরমাত্মায় সৃষ্টির জন্য প্রথম ক্রিয়াশীলভাব আসিয়াছি—জ্ঞানে। ক্রিয়াশূন্য অবস্থায় যিনি জ্ঞান অজ্ঞান উভয়ের অতীত ছিলেন, ক্রিয়াযুক্ত হইয়া তিনিই জ্ঞানময় হইলেন, কারণ সৃষ্টির জন্য জ্ঞানই প্রথম আবশ্যক। এইখানেই তিনি "জ্ঞ" অর্থাৎ জ্ঞানময় নামে কথিত হইয়াছেন। এই জ্ঞানের ধারণার জন্যই মনের আবশ্যক হইয়াছিল। পরমাত্মা জ্ঞান-অজ্ঞান উভয় ভাবের অতীত স্বীয় স্বভাব

পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানময় রূপে স্বভাবের বিকৃতি পাইলেন, তখন সেই বিকৃতির পরিচয় হইল মনে। এজন্যই মনকে আত্মার বিকার বলা হইয়াছে। এইরূপে জ্ঞানময় আত্মা মনের সাহায্যে কেবলমাত্র নিজের অস্তিত্ব দেখিয়া যখন অহং অর্থাৎ আমিত্ব অনুভব করিলেন, তখন তিনি নিজকে বহুত্বে পরিণত করিবার জন্য তাঁহাতে নিহিত সূক্ষ্ম জড়াংশ—আকাশ, বায়ু, তাপ, জল ও মৃত্তিকা ক্রমশঃ প্রকাশ করিয়া জগতের যাবতীয় পদার্থের অবয়ব গঠনের উপকরণ রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পঞ্চ সূক্ষ্ম জড়পদার্থের সহিত চেতনার সংযোগেই তাঁহার ষড়ধাতুকী অবস্থা। আত্মার এই ষড়ধাতুকী অবস্থায় মন, বুদ্ধি, স্মৃতি, চিন্তা, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বিষয়ক জ্ঞান, সমুদয় আছে, কিন্তু সূক্ষ্ম উপাদানে গঠিত এই অবস্থায় কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অভাবে শব্দ, স্পর্শাদি উপভোগের উপায় নাই।

এই সমুদয় উপভোগ জন্য ও সৃষ্টিপ্রবাহ বৃদ্ধির সহিত উক্ত ষড় অংশে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় যুক্ত হইয়া যখন মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ জ্ঞান কার্য্যকরী—অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। তখন সেই ষড়ধাতুকী আত্মাই এই স্থূল দেহে জীবাত্মা বা চতুর্ব্বিংশতিকী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

জীবাত্মা স্থূলদেহে রূপ রসাদি উপভোগ জন্য মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ পরিচালনা করিয়া থাকেন। এই উপভোগে কোথাও ইচ্ছা কোথাও দ্বেষ উপস্থিত হইয়া কখন বাসনার উদ্ভব কখন বা নিবৃত্তি আনয়ন করে। এই প্রকারে কামনা হইতে কামনান্তরের সৃষ্টি হইয়া পুনঃ পুনঃ ইন্দ্রিয় সঞ্চালন ও ইন্দ্রিয় বিষয়-রূপরসাদি উপভোগের ইচ্ছা যেখানে বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেখানে তাহার উপভোগ জন্য ইন্দ্রিয়গুলিরও আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু যখন বার্দ্ধক্য বা ব্যাধি প্রভাবে দেহের ও ইন্দ্রিয়ের শক্তি হানি হয়, তখন ঐ সমুদয় জীর্ণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপ-রসাদি উপভোগ সুচারুভাবে সম্পাদিত হয় না; অথচ পূর্ব্ব সংস্কার জন্য বাসনার কিছু অভাব হয় না, বরং বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই অবস্থায় মৃত্যু হইলে অর্থাৎ দেহ-ইন্দ্রিয় অকর্ম্মণ্যতা হেতু স্বীয় কার্য্যে শক্তিহানি জন্য জীবাত্মা জীর্ণ দেহেন্দ্রিয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, তখনও তাঁহার বাসনা সম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, অথচ দেহ ও ইন্দ্রিয় অভাবে উপভোগ হয় না।

সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের উৎপত্তি এবং স্থূলের ধ্বংস পুনরায় সূক্ষ্মে পরণতি, বায়ু, তাপ, জলের দৃষ্টান্তে পূর্ব্বেই দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। সূক্ষ্ম ষড়ধাতুকী আত্মা রূপ-রসাদি উপভোগ জন্য যে স্থূল দেহেন্দ্রিয় প্রাপ্ত হইয়া চতুর্ব্বিংশতিকী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই দেহেন্দ্রিয় যখন নষ্ট হইল, তখন অবিনশ্বর আত্মা পুনরায় ষড়্ধাতুকী অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। এ সম্বন্ধে মহর্ষি অগ্নিবেশ বলিয়াছেন,—

"অব্যক্তাদ্ব্যক্ততাং যাতি ব্যক্তদব্যক্ততাং পুনঃ।"

অর্থাৎ সেই অব্যক্ত হইতে ক্রমশঃ ব্যক্ততা প্রাপ্ত হন এবং ব্যক্তভাব নষ্ট হইলে অব্যক্ত ভাব পুনঃ প্রাপ্ত হন।

দেহ ত্যাগের পর সূক্ষ্মাবস্থা হইতে বাসনা উপভোগজন্য যে পুনর্ব্বার দেহ ধারণ করেন, সে সম্বন্ধে মহর্ষি অগ্নিবেশ বলিয়াছেন,—

সম্পূর্ণ ধাতু পুরুষের এবং বিশুদ্ধ শোণিত

গর্ভাশয়া সম্পন্না নারীর—

"যদা ভবতি সংসর্গ ঋতুকালে,

যদা চানয়োস্তথৈব যুক্তয়োঃ

সংসর্গেতু শুক্র শোণিত সংসর্গমন্তর্গভাশয়

গতং জীবোবেক্রামতি

সত্ব সম্প্রযোগাৎ, তদা

গর্ভোঽভিনির্ব্বর্ত্ততে।"

চরক, শাঃ ৩য় অধ্যায়—

যখন ঋতু শুদ্ধির পর মিলন হয় এবং যখন উভয়ের এই প্রকার যুক্তি হইতে গর্ভাশয়ের শুক্র-শোণিত সম্মিশ্রিত হয়, তৎকালে (ষড়-ধাতুকী অবস্থায় স্থিত) জীবাত্মা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মবশে মনোবেগে গর্ভাশয়গত মিলিত শুক্র-শোণিতকে প্রাপ্ত হন, তখন গর্ভের উৎপত্তি হয়।

দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলি জরা ব্যাধি প্রভাবে নষ্ট হইলে মন কিছু নষ্ট হয় না, কারণ মন ঐ গুলির ন্যায় ভৌতিক পদার্থ নহে। তাহা জীবদেহে যেমন জীবাত্মায় সংযুক্ত ছিল, আত্মার দেহ ত্যাগের পরও সেই প্রকার সংযুক্ত থাকিবে। এই মনের অবস্থিতি হেতু পূর্ব্বের সকল প্রকার অতৃপ্ত বাসনা আত্মায় থাকিয়া যায় এবং এই অতৃপ্ত বাসনার উপ-ভোগ জন্যই আত্মার আবার স্থূল দেহ-ইন্দ্রিয় গ্রহণের আবশ্যক হয়। এই প্রকার দেহান্তর সংযোগ কালে চেতনার বাসনানুরূপ দেহ ও ইন্দ্রিয়গ্রহণের আবশ্যক হয়। এই আবশ্য-কানুযায়ী দেহের গঠনকার্য্য সম্পন্ন জন্য জীবের ধ্বংস প্রাপ্ত দেহাংশ মৃত্তিকা, জল, তাপাদির ও খাদ্যাদির ভিতর দিয়া শুক্র শোণিতাখ্য দেহের বীজরূপে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। ইহাই জন্মান্তর ব্যাপারের ভিত্তি। এখন ইহা হইতে রাম-শ্যামরূপী জীবের কোন্ অংশের জন্মান্তর সিদ্ধ হইতেছে দেখা যাউক। পূর্ব্ব আলোচনায় প্রতিপন্ন হইয়াছে রাম শ্যাম বা জীবের দেহের ও ইন্দ্রিয় সমূহের জন্মান্তর হয়, কিন্তু জীবের দেহেন্দ্রিয়ের এই প্রকার জন্মান্তরে অপরের সম্পূর্ণ দেহেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি না হইতেও পারে—এমন কি হয় না একথাও বলিতে পারা যায়। জীবের মন সংযুক্ত চেতনা অংশের পুনর্ব্বার দেহ গ্রহণে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেও তাহার পূর্ব্বজন্মের সকল প্রকৃতি যে পরজন্মে বর্ত্তমান থাকিবে, তাহা বলিতে পারা যায় না। কারণ অতৃপ্ত বাসনা উপভোগ জন্যই যদি জীবাত্মার জন্মান্তর গ্রহণ আবশ্যক হয়, তবে পূর্ব্ববর্ত্তী জন্মের যে সমুদয় দেহী তৃপ্তি পাইয়াছে, তাহার অভাব থাকিবে। এই কারণেই ভূতপূর্ব্ব কোন জীবের প্রকৃতির সহিত বর্ত্তমান কোন জীবের প্রকৃতির সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং বুঝিতে পারা যাইতেছে, দেহ-ইন্দ্রিয়-মন ও আত্মা প্রকারান্তরে সকলেরই জন্মান্তর হইয়া থাকে। এই প্রকারে সকলের জন্মান্তর স্বীকৃত হইলেও মনযুক্ত চেতনার দেহান্তর গ্রহণেই প্রকৃত জন্মান্তর গ্রহণ স্বীকা-রের উদ্দেশ্য নির্ভর করে বলিয়া ইহাকেই জন্মা-ন্তর বলা হয়; তবে দেহেন্দ্রিয়ের জন্মান্তরের সহিত ইহার কিছু সম্বন্ধ আছে এই মাত্র। এখন দেহীর এই প্রকার জন্মান্তর স্বীকারের স্বার্থকতা কি দেখা যাউক। জীবের মন যুক্ত চেতনার জন্মান্তর হয় অতৃপ্ত বাসনার পূর্ণভোগের জন্য, আরও তাহাকে পুনর্জন্ম গ্রহণকালে বাসনানুরূপ দেহ ও ইন্দ্রিয় গ্রহণ করিতে হয়। এই বাসনা শুভ হইলে শুভ ফলভোগ জন্য শুভ অর্থাৎ সুস্থ সবল দেহেন্দ্রিয়ের আবশ্যক হইবে, আর অশুভ

হইলে অশুভ ফলভোগ জন্য বিকৃত দেহেন্দ্রিয় প্রাপ্ত হইতে হইবে। শুভাশুভ কার্য্যসমূহ হইতেই শুভাশুভ প্রবৃত্তিসমূহের বিকাশ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি চিরদিন সৎকার্য্যে দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন নিয়োগ করিয়া শুভফল উপভোগ করিয়াছে ও শুভ কামনার প্রবৃত্তি পাইয়াছে, তাহার চৈতন্য অকর্ম্মণ্য দেহ ইন্দ্রিয় ত্যাগ কালে পূর্ব্ব সংস্কার বশে শুভ প্রবৃত্তি লইয়া যাইবে ও শুভ বাসনার উপভোগ জন্য সুস্থ সবল দেহেন্দ্রিয় প্রাপ্ত হইয়া ইষ্টফল লাভ করিবে, আর চিরদিন অশুভ কার্য্যে নিয়োগ জন্য শুভ চিন্তার অভাবে যাহার চিত্ত কলুষিত, তাহার চেতনা অসৎ প্রবৃত্তির তাড়নায় অশুভ ফলপ্রদ দেহেন্দ্রিয় লাভ করিবে। যখন সদসৎ বাসনার জন্য চেতনা অংশকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, দেহ ও ইন্দ্রিয় অংশও যখন সদসৎ কার্য্যফলে অদুষ্ট ও দূষিত ভাব প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় যে কোন জীবের পরবর্ত্তী জন্মের শুভাশুভ ফললাভের সহায়তা করে, তখন জন্মান্তরে বিশ্বাস রাখিয়া দুষ্প্রবৃত্তির দমন করিতে পারিলে এই রোগ-শোক-তাপ জর্জ্জরিত নরবাসীর কোন স্বার্থকতা নাই কি?

শ্রীজীবনকালী রায় বৈদ্যরত্ন।

সাহিত্য পরিচয়

বাসিফুল—একখানি গল্পের বই—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত।

গল্পপ্লাবিত বাঙ্গলা দেশ সাময়িক এক একজন গল্প লেখকের তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছে। গল্প লেখকের অভাব নাই গল্পের বইয়েরও অভাব নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় বই লেখা ব্যাপারটা প্রধানতঃ ব্যবসার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশ ধর্ম্ম সমাজ বলিয়া কেহ আর বড় একটা খোঁজ রাখেন না। আমাদের দেশের লোক এখন গল্পের পূজক, গল্পের সেবক গল্পের ভাবে ভরপুর। সুতরাং দশখানির মধ্যে একখানি তেমন বই চাই দশের মধ্যে একজন তেমন লেখক চাই যিনি শুধু সমাজ গতির পরিবর্ত্তন, সমাজ-আদর্শের সৃষ্টি করিতেই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন। গল্পের ভিতর দিয়াই সাহিত্যের প্রচার বিজ্ঞানের বিকাশ, ইতিহাসের আলোচনা সম্ভব নতুবা লেখকের শ্রম পণ্ড উদ্দেশ্য বৃথা হইয়া পড়িবে।

দেবেন্দ্র বাবুকে সাহিত্যসেবিগণের একজন এবং বাজারের দশখানি গল্পের বইয়ের ভিতর তাঁহার রচিত 'বাসিফুল'কে একখানি উৎকৃষ্ট গল্পের বই বলিতে পারি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট বলিয়া সমালোচনা শেষ করা সহজ বটে, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য তাহার গতি একটা আছেই। সমালোচনা করা বিজ্ঞ ব্যক্তির কাজ। বই হাতে পড়িয়াছে ভাল মন্দ না বলাও অন্যায়। দশের আলোচনার উপরই গ্রন্থকারের কৃতকার্য্যতা নির্ভর করে।

গল্পগুলির অধিকাংশই করুণ রচনায় তাজা হইয়া পুষ্টিলাভ করিতেছে, ধর্ম্মপথ আশ্রয় করিয়া সকলকে আপনার সঙ্গে টানিয়া লইতেছে। সে টানে অনেকেই বাদ পড়িবেন না—আমরাও পড়ি নাই। গ্রন্থে অন্যান্য ত্রুটী থাকিলেও এইটুকুই বিশেষত্ব এইটুকুই ভবিষ্যৎ সাফল্যের সূচনা করিতেছে। সমাজশক্তির সাহায্য ব্যতীত নূতন পথ, নূতন দাঁড়া

ধরিয়া দাঁড়ান এবং অন্যকে আকর্ষণ করাও দুষ্কর এককথায় উদ্দেশ্যের বিফলতাই সূচনা করে।

যাহা হউক সম্প্রতি 'বাসিফুল' সম্বন্ধে আমাদের সমালোচনার পূর্ব্বে সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের অভিমত দিলেই ইহার অন্তরের কথা ফুটিয়া বাহির হইবে। ফুল চিরদিনই তাজা থাকে না—প্রথম দৃষ্ট সদ্য প্রস্ফুটিত ফুল তাহার একদিনের কথাই মনে চিরদিন জাগাইয়া রাখে। দেবেন বাবু একটী মাত্র বাসিফুলের যে সৌরভ আমাদিগকে দিয়াছেন, আমরা ভবিষ্যতের আরও নানা বর্ণের নানা সৌরভের তাজা ফুলের প্রার্থী। ফুল-দেবতার ভোগ্যবস্তু। সাহিত্য-সংসারে বাসিফুল তাজা ফুলের ন্যায় একটা উন্মাদনা আনিয়া দিক্।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন—"শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের 'বাসিফুল' উল্লেখযোগ্য পুস্তক। এখানি কয়েকটি ছোট গল্পের সমষ্টি। কি হইলে ছোট গল্প পূর্ণতা লাভ করে সে কথা এখন বলিব না, এ পুস্তকে সকল গল্প পূর্ণতা লাভ করে নাই—প্রথমটি ও শেষেরটি যেমন হইয়াছে, মাঝের গুলি তেমন হয় নাই। আজি কেবল 'বাসিফুলের' ভাষায় কথা বলিব—ইহার ভাষা অতুল্য বলিলেও অতিরঞ্জন হইবে না। আজি কালি সবুজভাষা, নীলভাষা, পীত-ভাষার বৈচিত্র্যে চোখে ধাঁধা লাগিতেছে, সাদাভাষার কারচুপি আর দেখিতে পাই না। এই গ্রন্থে তাহা পাইয়া মহা আনন্দিত হইয়াছি। একটু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি :—

"মানব হৃদয়ে একদিন না একদিন বসন্তের বিকাশ হয়। যেদিন পাখীর প্রমত্ততান সুপ্ত প্রাণ জাগাইয়া তোলে; যেদিন ফুলের গন্ধ মদিরার ন্যায় মনে মত্ততা সঞ্চার করে; যেদিন ভৃঙ্গ গুঞ্জনে হৃদয়ের তার বাজিয়া উঠে; যেদিন সমীর সংস্পর্শে অন্তর নবরাগ রঞ্জিত কিশলয়ের ন্যায় তর তর করিয়া কাঁপিতে থাকে, যেদিন কিশোর যৌবন রূপের ডালি লইয়া উপাস্য দেবতার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহে; যেদিন ব্যাকুল বাসনা ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া আরাধ্যের অন্বেষণে ছুটিয়া যায়, তৃষিত চিত্ত মিলনের সাগর সঙ্গমে স্নাত হইবার নিমিত্ত অধীর হইয়া সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়।"

দেখিবেন বসন্তের ও যৌবনসুলভ মানব হৃদয়ের একত্র সমাবেশের কি সুন্দর বায়স্কোপ চিত্র। যে চিত্রে শ্রীমতী বলিয়াছিলেন "বাঁশী কাণে বাজে বা প্রাণে বাজে"—এ সেইরূপ চিত্র, মধুকর মালতী মুকুলে বসিয়া গুন্ গুন্ করিতেছে—হৃদয়ের মাঝে কে যেন কিসের লাগি সেই মধ্যম স্বরে স্বর মিলাইয়া—গুন্ গুন্ করিতেছে। সাহিত্যের অপূর্ব্ব বায়স্কোপ এটাও দেখাইতেছে ওটাও শুনাইতেছে। নব কিশলয় কাঁপিতেছে, আর বসন্ত সমীর যেন আনন্দে অঙ্গস্পর্শ করিতেছে, সাধারণ জড় বায়স্কোপ কেবল দেখা যায়, দেবেন্দ্র বাবুর এই অপূর্ব্ব সাহিত্য বায়স্কোপ দেখা যায় শুনা যায় স্পর্শ করা যায়। দেবেন্দ্র বাবু এইরূপ লেখা লিখিয়া ধন্য হইয়াছেন, এই কথাটা বুঝাইয়া দিবার সুযোগ পাইয়া আমরাও ধন্য হইলাম।"

মফঃস্বলের বাণী

বাঙ্গালীর কি হইল?

আজ বাঙ্গালীর প্রতি ঘরে ঘরে "হা অন্ন হা অন্ন" আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে কেন? অতীতের সেই ক্ষেত্র সেই নদনদী সেই পরিশ্রমী কৃষককুল বিদ্যমান তবুও কেন বাঙ্গালী উদরান্নের জন্য এত দুর্দ্দশাগ্রস্ত! এ দুর্দ্দশা তাহাদের স্বকৃত দোষের ফল। তাহারা বহুমূল্য কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া কাঁচ লইবার জন্য ব্যস্ত। কি করিলে দেশের এই দুঃখ দুর্দ্দশা দূরীভূত হইবে কি উপায়ে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা হ্রাস না পাইয়া বৃদ্ধি পাইবে, কি করিলে কৃষককুল সুস্থকায় ও কার্য্যক্ষম হইবে, কি করিলে ধ্বংসোন্মুখ গোজাতির রক্ষণ হইবে, এই সমুদায় আবশ্যকীয় ও আলোচ্য বিষয়গুলি আমরা উপেক্ষা করিতেছি। যদিও এই সমুদায় বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট এবং দেশের কর্ম্মবীর সন্তানগণ মনোনিবেশ করিয়াছেন, তথাপি কোনও সুফল ফলিতেছে না। বর্ত্তমানে বাঙ্গালীর কর্ম্মজীবনে যতগুলি কঠিন ও আশু প্রয়োজনীয় সমস্যা দাঁড়াইয়াছে তন্মধ্যে এইটিই সর্ব্ব প্রধান। উদরে অন্ন নাই গৃহে লক্ষ্মী নাই পরিধানে বস্ত্র নাই অথচ ডেলিগেট কার্ড পাইয়া সাহিত্য সভায় ছুটিয়াছি। গৃহে পুত্রটি ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছে—নব্য যুগের স্ত্রীটি নব্য রোগে আক্রান্ত, মাতা চোখে দেখেন না পিতা হয়ত স্থবীর, আর ঘরেত অন্ন নাই এত চিরন্তন প্রথা। অন্যদিকে সভ্যটি দুইটী কবিতা লিখিয়া কবিতার বিকট উন্মাদনায় উন্মত্ত হইয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে ছুটা ছুটি করিতেছে। অন্য দিক হইতে দলে দলে নামধারী সভ্যগণ বিভিন্নরঙের জাতীয় পতাকা লইয়া ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলন কায়স্থ সভা ক্ষত্রিয় সভা প্রভৃতি কত কি সভায় ছুট পাট করিয়া দীর্ঘশ্বাসে ছুটিয়াছেন! বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে তাঁহারা সভাপতির অভিভাষণ, অন্যান্য সভ্য মহোদয়গণের ওজস্বিনী বক্তৃতা, বিখ্যাত লেখকবৃন্দের সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রভৃতি শুনিয়া মনে করিলেন দেশের দুর্দ্দশা ঘুচিল; এবার আমরা মানুষ হইলাম। সভা করিয়া দুর্ভিক্ষরাক্ষসীকে তাড়াইব, প্রবন্ধের মন্ত্র আওড়াইয়া ম্যালেরিয়া প্রেতিনীকে বিদূরিত করিব ওজস্বিনী বক্তৃতায় গ্রামের নদনদী ও পুষ্করিণীগুলিকে বর্ষার যৌবন আনিয়া দিব; শ্রোতৃবর্গ অবাক হইয়া শুনিতেছেন ভাবিতেছেন আর "মনসি মথুরাং গচ্ছতি" করিতেছেন এবং উৎফুল্ল হইয়া মাঝে মাঝে করতালি দিতেছেন সভা ভাঙ্গিল সভামণ্ডপ আবার অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল। সভ্যমহোদয়গণ গৃহাভিমুখী হইলেন। দেশহিতৈষণার ভাব স্রোতে ও সামাজিক উন্নতি সাধনের উদ্যম-প্রবাহে ভাটা পড়িল। ভাটা এক বৎসর চলিল। দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের প্রারম্ভে জোয়ার ছুটিল। এত বড় বিকট অপ্রাকৃতিক জোয়ার! তোমার জোয়ার ছয়মাস আর ভাটা ছয়মাসই থাকুক, জোয়ার মাত্র একমাস রহিল কেন? নদীর জোয়ার ও ভাটা দুইতো সমকাল স্থায়ী! সমাজ নীতিত প্রকৃতির গণ্ডীর বাহিরে নয়। কোনও বক্তা বা শ্রোতা গৃহে ফিরিয়া

শুনিলেন পুত্রের বিবাহের সম্বন্ধ আসিয়াছে। ছেলেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র; পিতার পণ নিবারণী প্রথার প্রতিজ্ঞাবন্ধন শিথিল হইয়া গেল রজতখণ্ডের মোহিনী-মূর্ত্তি কল্পনা নেত্রে ভাসিতে লাগিল পুত্রটীকে দুই হাজার টাকায় বিক্রয় করিলেন। মেয়েটি যেমন বয়স্থা হইয়া উঠিল আবার সভায় যোগ দিয়া পণ-প্রথার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়া আসিলেন। তখন আবার পণ প্রথার প্রতিজ্ঞার ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি, কন্যার উড়ন্তবয়সের বাতাসে ধক্ ধক্ জ্বলিতে লাগিল; হৃদয় আবার উত্তপ্ত হইল। উষ্ণ শোণিতপ্রবাহ প্রবল বেগে ছুটিল! সেই আগুনে প্রতিবাসী সামাজিক ভ্রাতৃবৃন্দের নির্ব্বাপিত অগ্নিকণা পুনরুদ্দীপিত করিতে চেষ্টা পাইলেন! চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তাঁহাদের হৃদয়ে অগ্নি নাই, জ্বলিবে কিসে? সভ্যটির পূর্ব্বাবস্থারই ন্যায় তাঁহাদের আছে শুধু ভস্ম। বুকের আগুন বুকেই জ্বলিল; তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া কন্যাটিকে বিদায় করিতে হইল। এই কি সভার উদ্দীপনা ও সাধনা?

অন্য দিকে ব্রাহ্মণ সভার সভামণ্ডলী ভারতীয় সমুদয় ব্রাহ্মণের উন্নতিসাধন-কল্পে মহামিলনের জন্য; কায়স্থ সভ্যগণ চাতুর্ব্বর্ণিক কায়স্থদিগের মধ্যে বিবাহ-প্রথা প্রচলনের ও একতা বন্ধনের জন্য বেশ মোটা মোটা প্রস্তাবনা করিলেন সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবনা গৃহীত হইল। ইহা কি সভ্যগণের "ভাঙ্গা ঘরে চুনকাম করা নয়? সভ্যগণ একতা নিবন্ধনে সচেষ্ট; ব্রাহ্মণেরা উন্নতিকল্পে প্রাণপণে সভা করিতেছেন; নিজের ঘরের দিকে দৃষ্টি নাই; ছেলেটি গায়ত্রি ভুলিয়া গিয়াছে পৈতা হয়ত পকেটস্থ হইয়া রজকগৃহে বিশ্রাম লাভ করিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইসেন্স (Licence) প্রাপ্ত মেছ—বোর্ডিংয়ে 'সবুট' আহার করিতেছেন গৃহের রত্নগুলি যদি এমন তবে গৃহসজ্জার উপায় কি? দেশে পুরোহিত নাই, যাঁহারাও আছেন তাঁহারা সংস্কৃত ভাষাকে নিজেদের সম্পত্তি মনে করিয়া সেই গুলি বেশ সযত্নে মুলতবি রাখিয়া 'বিদ্যাস্থানে ভয়েবচঃ' মন্ত্র পড়িতেছেন। এই কি ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব? আধুনিক অধিকাংশ ব্রাহ্মণই 'থার্ড ক্লাসের ইট' দেশে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ জ্ঞানবান্ ও প্রণম্য ব্রাহ্মণ আছেন; তাঁহারা ভাবের বিপাকে পড়িয়া থার্ডক্লাস ইট দ্বারা সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণে সচেষ্ট হইয়া বিশ্বকর্ম্মার কলঙ্ক রটাইতেছেন।

কায়স্থের ঘরে ঘরে গৃহবিচ্ছেদ নিজের ভাইকে সরাইয়া দিয়া সস্ত্রীক নব্যজগতে কবিত্বময় রাজ্যে রাজত্ব করিতেছেন; তাঁহারাই আবার চাতুর্ব্বর্ণিক মিলনের জন্য ব্যস্ত! এরূপ মিলন কি সম্ভব? সমাজ ক্ষেত্রে সংসারের প্রতি সভ্যের ভিতরেই সমাজের সমস্ত গুণগুলি নিহিত করিতে হইবে। ব্যক্তিগত প্রাণেই ও পবিত্র সংসার বন্ধনেই সমাজের প্রাণপ্রতিষ্ঠা। ব্যষ্টির উন্নতি না হইলে কি সমষ্টির উন্নতি সম্ভব?

আমরা এখন ভাঙ্গাঘরে চূণকাম করা চাই না। আমরা চাই—ছোট খাট শান্তির নিকুঞ্জবনে একখানি দীর্ঘকাল স্থায়ী পর্ণকুটীর। আমরা ক্ষণিক সামাজিক উন্মাদস্রোতে প্রবলবেগে ভাসিতে চাই না; আমরা চাই ক্ষুদ্র কুটীরে সংসারের ক্ষুদ্র প্রবাহিনীর মৃদুমন্দ-স্রোতে অবগাহন করিতে। আমরা প্রস্তাবনা চাই না; আমরা চাই সাধনা; আমরা ঘরের জিনিষ ফেলিয়া দিয়া এরূপ সভায় ছুটাছুটি করিতে চাই না; আমরা চাই—প্রতি গৃহে শান্তিময়ী সভা ও সুশৃঙ্খল রাজ্য সংস্থাপন। আমরা অনৈসর্গিক উপায়ে সমাজের আয়তন স্ফীত করিয়া শেষে স্ফোটকাক্রান্ত হইতে চাই না। আমরা চাই ক্ষুদ্র গৃহে শীর্ণকায় হইয়াও সুস্থ ও সবলদেহে আর্য্য ঋষিগণের ন্যায় পরম পদ চিন্তা করিতে। আমরা চাই পবিত্র সংসার বন্ধন। আমরা চাই প্রেমের পবিত্রতা, জ্ঞানের গভীরতা, কর্ম্মের কঠোরতা আর ভক্তির নীরবতা।

রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ।

"আর মানুষ হ'তে হ'লে এই নৈরাশ্যের মধ্যেই আশার স্থান
খুঁজে নিয়ে পূর্ণ উদ্যমে মঙ্গল কর্ম্মের উদ্দেশ্যে চলতে
হবে। আপাতমধুর জিনিষ প্রকৃত মঙ্গলময় নয়।
তাই কষ্টকে আলিঙ্গন ক'রে, দারিদ্র্যকে
মস্তকে ধারণ করে, নৈরাশ্যের ভীতি-
কেই একমাত্র সহায় ক'রে
জীবনের কঠোর কর্ত্তব্যময়
কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ
হ'তে হবে।"

"সাধনা"

সপ্তম খণ্ড সপ্তম বর্ষ	১৩২৩, আশ্বিন	দ্বাদশ সংখ্যা।

আলোচনা

১। আবাহন

আহ্বান করিব কাহাকে? প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে যাঁহার আশ্রয়ে আছি, যাঁহাকে আহ্বান করিতেছি আজ আবার নবীনভাবে তাঁহাকে আহ্বান করিতে হইবে কি মা, এস!

সন্তান নিকট হইতে দূরে চলিয়া যায়, কোলের গুটান স্নেহ দূরে গিয়া মমতার সূত্র বৃদ্ধি করে, সে তো তোমার আমার পক্ষে, সংসারী মানুষের কছে। এস একবার ভাবি মা কি সেই—যিনি চতুর্ভুজা-বীরেন্দ্রকেশরী-পৃষ্ঠ বিহারিণী, যিনি দেবদানবের যুদ্ধে কভু চামুণ্ডা, কভু বা শঙ্করবুকে দণ্ডায়মানা ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাত্রী কালিমাময়ী মা। তাঁকে তুমি আমি ডাকিয়া লইব কি করিয়া, আজ তুমি আমিই তাঁর আহ্বানে মিলিত। আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, তন্দ্রা-নিদ্রা যত কিছু করণীয় সবই যেন ভুলিয়া যাইতেছি। দীর্ঘ প্রবাসী, দুঃখ কাতর সন্তান আজ মায়ের কাছে সমাগত।

দীর্ঘ বরষের কত সুখের কাহিনী আজ আমাদের হৃদয় হইতে উথলিয়া উঠিতেছে, কত দুঃখের স্মৃতি আমাদের পঞ্জর ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সুখ তখনই যখন দমন দলন হাসিয়া তুচ্ছ ভাবি, ঝড়-ঝটিকার আক্রমণ খর্ব্ব করিয়া বাধা বিঘ্নকে দলিত করিয়া মা বলিয়া ছুটিতে চাই। আর দুঃখিত হই তখন যখন ভাবি সৃষ্টির সময় যে আদেশ লইয়া জন্মিয়াছি তার কিছুই করি নাই, আমাদের চারিদিকে শত শত অভাব বিদ্যমান রহিয়াছে দেখিয়াও মানুষের মত আগু হইয়া সেগুলিকে বরণ করিতে পারিতেছি না, "নিজেরে ভাবিয়ে অক্ষম দুর্ব্বল" কেবল ভয়-ভীতির বৃদ্ধি করিতেছি তাদের দূরীকরণের কোন উপায়ই করিতেছি না, হৃৎপিণ্ডে রক্ত সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই আদেশ আমাকে চালাইতে চাহিতেছে আর আমি অনবরত কেবল উপেক্ষা করিয়া সময় চাহিতেছি।

ক্লান্তসন্তানের জননীর কাছে বেশী বলা অনাবশ্যক তাই আর বলিতে চাহিনা—আজ আমরা শয্যাগত, দেহ আমাদের অস্থিগত, বদনমণ্ডল বিশুষ্ক, চলনে মূর্চ্ছিতপ্রায়, শীর্ণ ও জীর্ণ মূর্ত্তিই আমাদের আলোচনার বিষয় ব্যাধির সংবাদ বহন করাই আমাদের কর্ম্মময় জীবনের অন্যতম কাজ।

বাঙ্গালী-ভারতবাসি! আজ তুমি আমি মাকে পূজা করিব ভাবিয়াছি, কিন্তু পূজা করিতে জান কি? বাঙ্গালার পুষ্পোদ্যান কোথাও শুকাইয়া গিয়াছে, কোথাও বা জলে ডুবিয়া আপন অস্তিত্বের সন্ধান পাইতেছে না, তবে কি পূজা করিবে না? আছে তোমার আমার পক্ষে এক উপায়, এতদিন যাহা বসিয়া ভাবিয়াছি, তারই আবেগস্রোতে সমস্ত হৃদয় আমাদের ভিজিয়া যাক, আর তারই মধ্যে সঞ্চিত খাঁটী ভক্তিটুকু দিয়াই পূজা করিব। উহা দুঃখ ও আশার তাপে-জলে বর্দ্ধিত সুতরাং প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের খর কিরণ অথবা বর্ষার ভীষণ প্লাবন তাহাকে নষ্ট করিতে পারিবে না।

কর্ণ-শিবি রাজার দেশের মাটির উপর দাঁড়াইয়া, দুর্ভিক্ষ-ব্যাধির করাল-মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়াও একবার বলি—সে কথা তুমি আমিই বলিতে পারি মায়ের পূজায় আমরাই চক্ষু উৎপাটিত করিয়া দিতে পারি। তবেই না আমাদের শুষ্ক কণ্ঠের অস্ফুট স্বরে মায়ের শুষ্ক মুখ হাস্যময় হইবে।

এই দেশে যদি জন্মিয়াছ আবার একবার মা বলিয়া ডাক! মা ডাকিতে দ্বিধা কেন, একবার ক্ষীণ কণ্ঠের ভিতর দিয়া প্রাণপণে ডাক—মা! আজ যিনি জড়ভাবে দণ্ডায়মানা কাল তিনিই চেতনভাবে রক্ষাকর্ত্রী, আজ তুমি যাহাকে লইয়া সাকার নিরাকারের তর্কে ব্যস্ত কাল তুমিই তার ভাবে বিভোর হইবে।

মা আমাদের হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনি আমাদিগকে জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারা সঞ্জীবিত করুন, সাহস সংযম ও ত্যাগের দ্বারা পুষ্ট করুন, স্মৃতি ও প্রীতির দ্বারা আমাদিগকে দীপ্তিমান্ করুন, শৌর্য্য-বীর্য্য ও সেবাধর্ম্মের দ্বারা শিক্ষাদান করিয়া কর্ম্ম-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তুলুন তাহা হইলে তুমি আমি সর্ব্বত্রই উপলব্ধি করিব "সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।" আমাদের মনুষ্যত্বের বিকাশেই মাতৃমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা, আমাদের হৃদয় দৌর্ব্বল্যেই মায়ের বিসর্জ্জন।

* *

২। ইতালীয় সাহিত্য

লাটিন উদ্ভূত ভাষার মধ্যে প্রভেঁসাল, ফরাসী ও স্পেনীয় ভাষাই সর্ব্ব-

প্রধান। ইহার মধ্যে প্রভেঁসাল ভাষাতেই সর্ব্ব প্রথম সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। আধুনিক ইতালীয় সাহিত্যের যখন সূত্রপাত হয় তখন প্রভেঁসাল সাহিত্যের গৌরব-রবি ঠিক মধ্যাহ্ন গগনে উঠিয়াছিল। উহার প্রকৃতি-গত একতা, স্থানগত সান্নিধ্য এবং ঐতিহাসিক ঘটনা বশতঃ আদি ইতালীয় সাহিত্য প্রভেঁসাল সাহিত্যের ছায়ায়ই জন্মে এবং ঐ ছায়ায়ই বর্দ্ধিত হয়।

খৃঃ অব্দ ১২২০ সালের পূর্ব্বে প্রকৃত ইতালীয় সাহিত্যের সূত্রপাত লক্ষিত হয় না। এমন কি এই সময়েও প্রকৃত স্থলভাগ ইতালীতে ইতালীয়ের আবির্ভাব হয় নাই। সিসিলী দ্বীপের রাজধানী প্যালার্ম্মো নগরে, দ্বিতীয় ফ্রেডেরিকের উৎসাহে সর্ব্ব প্রথম ইতালীয় সাহিত্যের উদ্ভব হইতে থাকে। এই ইতালীয় সাহিত্য-সম্পদ কবিতামূলক, প্রভেঁসাল সাহিত্যের আভাষ ইহাতে বিশেষ অনুভূত হয়। কিন্তু এই সাহিত্যের ভাষা টাস্কানীতে প্রচলিত অনুভাষার সদৃশ। ফ্রেডেরিক স্বয়ং কবি ছিলেন। সিসিলীবাসী অন্যান্য কবির মধ্যে সিয়েলো দাল কারণো সর্ব্ব প্রধান। "প্রণয়ী এবং প্রণয়িণীর আলাপ" ইহাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। জাকোপো অন্য একজন সিসিলীয় কবি। গ্রাম্যতাদোষ ইহাঁর প্রধান অন্তরায় কিন্তু কবিত্ব বিষয়ে ইনি নগণ্য নহেন।

ইতালীয় সাহিত্যাগ্নির এক স্ফুলিঙ্গ সিসিলী হইতে টাস্কানীতে আসিয়া পড়ে। ঘটনা অনুকূল থাকায় এই স্ফুলিঙ্গ ক্রমেই আয়তনে বাড়িয়া দীপ্ত সাহিত্যালোকে সমুদয় টাস্কানী এবং ইতালীয় অন্যান্য অংশ উদ্ভাবিত করিয়া তুলিল। কয়েকটী রাজনৈতিক ঘটনা এই দীপ্ত এবং সুস্নিগ্ধ সাহিত্যালোকের প্রভাব বৃদ্ধির অনুকূল হইয়া উঠিল। হোহেনষ্টাউফেন রাজবংশ ইতালীতে নির্ম্মূল হইলে পর টাস্কানীতে প্রবল প্রতাপান্বিত এমন কোন একটী রাজকুল বা রাজা রহিল না যাহার একেশ্বরত্বে সমুদয় সন্নিহিত রাষ্ট্রকুল, একীভূত হইবে। ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রকুল মধ্য ইতালীকে বিশেষতঃ টাস্কানীকে যেন এক স্বাধীনতার মন্ত্রপূত জালে বেষ্টন করিল। সাধারণতন্ত্রের মূল প্রকৃতি জনসাধারণের রাষ্ট্র-সম্বন্ধীয় এবং অন্নেতর অন্যান্য যাবতীয় জীবনের উচ্চ অংশে ও আলোচনায় প্রবেশাধিকার। সাধারণের এই প্রবেশাধিকারের ফলে সাধারণের ভাষা রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় এবং অন্যান্য যাবতীয় ব্যাপারে নিযুক্ত হইতে লাগিল। লাটিনে কাব্য-রচনা করিলে কেবল মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকে বুঝিত, কিন্তু জনসাধারণের ভাষায় লিখিত হইলে তদপেক্ষা বহুসংখ্যক লোকে উহা বুঝিত। আরও সাধারণতন্ত্রের ফলে দেশভক্তি এবং নিজ নিজ বাসভূমির গর্ব্ব যেমন জনসাধারণের মুখে প্রচারিত হইত তদপেক্ষা অনেক বেশী ভাবুক কবিগণের হৃদয়ে জ্বলিত। আর হৃদয়ের এই সৃজনশীল উত্তাপ মাতৃভাষায় নিঃসরণ করিয়াই যেন কবিকুল সার্থক মনে করিতেন।

এই জাতীয়তাপূর্ণ, জনসাধারণের ভাষায় লিখিত ইতালীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি দান্তে। দান্তে যে ইতালীর সর্ব্বকালীন কবিকুলের শিরোমণি তা নয়—তিনি ইতালীয় সাহিত্যের আদি কালের কবি এবং চিরন্তনের জন্য ইতালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিগণের মধ্যে একজন।

কিন্তু আদিম কালের ঘোরতর অরণ্যভূমি এককালেই জনপূর্ণ, স্বীয় ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত, জ্ঞানালোকে দীপ্ত নগরীতে পরিণত হইতে

পারে না। একদল লোক অরণ্যকে প্রান্তরে পরিণত করে। সর্ব্বপ্রথমে হয়ত ঐ প্রান্তরে গরু মহিষাদির উপভোগ্য ঘাস ভিন্ন অন্য কিছু বা কোন শস্য জন্মে না, ক্রমে হয়ত ঐ ভূমিতে শস্য জন্মিবার উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে। ক্রমে নগরীতে কৃষি, শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বর্য্য ও জ্ঞান আসিয়া সভার পরিষদত্ব গ্রহণ করে। ইতালীয় সাহিত্যে দান্তের স্থান জগদ্বিখ্যাত, সমৃদ্ধ নগরীর ন্যায়। কাজেই এই নগরী এক চোটেই অরণ্যানী হইতে মাথা তুলে নাই। মধ্যে অরণ্য পরিষ্কারান্তে প্রান্তর এবং ক্রমে শস্যভূমিরও কাল অতিবাহিত হইয়াছিল।

এই অন্তর্ব্বর্ত্তী কালের কবির মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান—

১। গুইটোনে ডি আরেট্‌সো

অল্প বয়সে ইনি প্রণয়-কবিতা লিখিতেন। তাঁহার প্রেম কবিতাগুলিকে অনেক বিষয়ে পেট্রার্কের উপযুক্ত পূর্ব্বানুকালিক কবিতা বলা চলে। মধ্য বয়সে ইনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া সমর অনুকূল "কাভালিয়েরি ডি সাণ্টা মারিয়া" নামক ভ্রাতৃকুলের পক্ষ অবলম্বন করেন। ইহার পর তিনি গীতি, ধর্ম্ম এবং মাঝে মাঝে রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক কবিতা লিখিতেন।

২। গুইডো গুইনি চেল্লি

ইহাঁর জন্মস্থান "বলোনা"। ইহাঁর কাব্যগুলি ভূতপূর্ব্ব কবিগণ অপেক্ষা অনেক বেশী ভাবপূর্ণ। প্রভেঁসাল ভাষার কবিগণের প্রণয়-কবিতা গুলির গাম্ভীর্য্য খুব কম। কিন্তু গুইডোর প্রণয়-কবিতা সমধিক ভাবপূর্ণ, তেজ প্রকাশক এবং সম্মান-উৎপাদক।

অন্যান্যের মধ্যে "গুইডো দেল্লে কলোম্নে" এবং "রাষ্টিকো দি ফিলিপ্পোর" নাম উল্লেখ যোগ্য। অধিকাংশ সাহিত্যেরই আদি বিকাশ কবিতায়। ইতালীয় সাহিত্যের পক্ষে এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। দান্তের "ভিটান্ওভা"র পূর্ব্বে প্রকৃত ইতালীয় গদ্য নাই বলিলেও চলে। কিন্তু "ভিটান্ওভা"র গদ্যেরও পূর্ব্বে নিম্নস্তরের ইতালীয় গদ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

"ব্রুণেটো ল্যাটিনি"র "টেসোরেট্রো" তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। ইনি তত্তৎকালের সর্ব্বজ্ঞ (Encyclopaedist) বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, "টেসোরেট্রো"তে ইহার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। "ব্রুণেটো ল্যাটিনি" কবিতায় একটি স্বপ্নের বিবরণ দেন। দান্তের ডিভাইন কমেডির গঠন কল্পনা ইহা হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিল সন্দেহ নাই।

ব্রুণেটো ল্যাটিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ বিখ্যাত ইতালীয় লেখক। দান্তের পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য যে কয়জনের নাম উল্লিখিত হইল উহাঁরা সকলেই চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক। কাজেই চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শীর্ষে উহাঁদের নাম লিখিতে পারা যায়।

* *
*

৩। ব্যাঙ্কের কাজ

ব্যাঙ্ক জিনিষটা কি তা দেশের অন্ততঃ মধ্যবিৎ অবস্থার সকল লোকেই জানেন। কিন্তু ব্যাঙ্ক-কথাটার প্রকৃত তাৎপর্য্য এবং ব্যাঙ্ক জিনিষটার যাবতীয় কার্য্য প্রকরণ অতি অল্প লোকেই সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন। উত্তম জামিন (Security) দিলে ব্যাঙ্ক হইতে মহাজন অপেক্ষা অল্প সুদে টাকা পাওয়া যায়, একথা কার্য্যতঃ বা মৌখিক অনেকেই জানেন। কিন্তু মহাজন, অর্থাৎ যে সহজে টাকা ধার দেয় সে চামাড়ে যেমন চামড়া হইতে মাংস খুঁচিয়া বাহির করে এবং

মুদি যে রকম পিঁপড়া মারিয়া গুড়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ঠিক সেই ভাবে সুদ আদায় করে। তাহার মধ্যেও দৃষ্টি-রোচক দালানে অবস্থিত ভদ্রবেশী কেরাণী কর্তৃক বিভূষিত এবং প্রায়ই সশস্ত্র প্রহরী বর্তৃক দিবারাত্রি সুরক্ষিত ব্যাঙ্কের মধ্যে যে তফাৎ কিছুই নাই—উভয়েরই মধ্যে যে উদ্দেশ্য, কার্য্য এবং এমন কি কার্য্য-প্রণালীও অন্ততঃ অনেকটা এক—একথা বলিলে অনেকেই হয়ত ভদ্রভাবে অবিশ্বাসের হাসি হাসিবেন এবং হয়ত গুপ্ত অবিশ্বাস প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য স্বীকারসূচক শির সঞ্চালন করিবেন। কাজেই আলোচনা করিয়া দেখা যাউক কি কি বিষয়ে মহাজন এবং ব্যাঙ্ক এক। মহাজন জায়গা-জমি বা গহণা "বন্ধক" রাখিয়া টাকা ধার দেয়। টাকার রীতিমত সুদ লয়। অথবা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে "বন্ধক" রাখা জিনিষের উৎপাদ্যের ভাগী হয়। ব্যাঙ্কেরও এক কাজ অবিকল এইরূপ। যার টাকার প্রয়োজন—ব্যাঙ্কের সন্তোষের মত জামিন লইয়া উপস্থিত হইলেই প্রচলিত সুদে টাকা দিতে প্রস্তুত হইবে। ব্যাঙ্কের ও মহাজনের মধ্যে প্রভেদ কেবল প্রত্যেকেরই কার্য্যকারিতার বিভিন্নতায়। মহাজন হয়ত সুদের লোভে বা ঋণ গ্রহীতার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় বা বন্ধুতার সূত্রে জামিনের ভালমন্দ বিচার না করিয়া টাকা ধার দিবে। কিন্তু ব্যাঙ্কের বন্ধুতা করিবার সময় বা অবসর অতি অল্প। যদিও ব্যাঙ্কও বন্ধুতার খাতির কখন কখনও দেখায় সে কেবল মিষ্টবাক্যে গ্রাহক তুষ্ট রাখবার জন্য। আরও ব্যাঙ্ককে সর্ব্বদা নিজ উত্তমর্ণগণকে চাওয়া মাত্র টাকা দিতে প্রস্তুত থাকিতে হয়। কাজেই যে রকম জামিন প্রয়োজন হওয়া মাত্র নগদ টাকায় সর্ব্বাপেক্ষা অল্প সময়ে ও অল্পায়াসে পরিণত করা যায় সেই রকম জামিনে মাত্র টাকা ধার দিতে হয়। কিন্তু অবস্থাভেদে ব্যবহারের এই পার্থক্য থাকিলেও ব্যাঙ্ক ও মহাজনের মধ্যে সাদৃশ্য এই—উভয়েই জামিন লইয়া টাকা ধার দেয়। উভয়েই টাকার সুদ লয়।

কিন্তু ব্যাঙ্কের কাজ কেবল জামিন লইয়া টাকা ধার দেওয়াতেই সীমাবদ্ধ নয়। ব্যাঙ্কের অন্যবিধ কার্য্যকলাপ দেশের অন্য একটী ব্যবহারের সাহায্যে সহজে বুঝা যায়। উহা পোষ্ট অফিস। সকলেই জানেন ন্যূনপক্ষে ২৫৲ টাকা লইয়া যে কোন পোষ্ট অফিসে গেলেই পোষ্ট অফিস উহা রাখিবে। পোষ্ট অফিস একখানি বইএ এই ঋণ-স্বীকার করিবে। উহাতে কত টাকা জমা রাখা হইল তাহার জন্য একদিক ও কত টাকা তুলিয়া লইল তাহার জন্য অন্য দিক নির্দ্ধারিত আছে। অন্যান্য বিস্তারিত নিয়মাবলীতে এখন আমাদের যাওয়ার প্রয়োজন নাই। তবে এইটুকু মাত্র বলা দরকার যে সাধারণতঃ চাওয়া মাত্র টাকা লইবার বন্দোবস্ত করিলে পোষ্ট অফিস গচ্ছিত টাকার উপর কোন সুদ দেয় না।

ব্যাঙ্কেরও অন্যবিধ কাজ এই। যাহার গচ্ছিত রাখার মত টাকা আছে তিনি কোন ব্যাঙ্কে গিয়া টাকা রাখিতে পারেন। টাকা কি ভাবে লওয়া হইবে সেই অনুসারে ব্যাঙ্কের গচ্ছিত টাকার উপর সুদ দেওয়া বা না দেওয়া হইয়া থাকে। অর্থাৎ চাওয়ামাত্র টাকা নেওয়ার বন্দোবস্ত করিলে পোষ্ট অফিসের ন্যায় ব্যাঙ্কেও কোন সুদ দেওয়া হয় না। ভিন্ন ভিন্ন অন্তরে টাকা তোলার নিয়ম করিলে ব্যাঙ্কে সুদের বিভিন্নতা কিরূপ তাহা স্থানান্তরে বিশদভাবে বলা হইবে। এখন মাত্র এই কথা উপলব্ধি করান উদ্দেশ্য

যে, ব্যাঙ্কে পোষ্ট অফিসের ন্যায় টাকা রাখা চলে। টাকা তোলার পার্থক্য অনুসারে ব্যাঙ্ক এই টাকার উপর সুদ দিয়া থাকে, না ও দিয়া থাকে।

পোষ্ট আফিসে টাকা রাখিলে যেরূপ একখানি পুস্তক দেওয়া হয়—ব্যাঙ্কে টাকা রাখিলে সেইরূপ টাকা জমা এবং টাকা তোলার হিসাব রাখার জন্য একখানি পাস বুক (Pass book) টাকার মালিককে দেওয়া হয়। কিন্তু টাকা প্রকৃতপক্ষে তোলা হয় এক একখানি চেক দিয়া এই চেক বুকের প্রত্যেক পাতায় চার পয়সার ষ্ট্যাম্প থাকে। ইহাতে ব্যাঙ্কের নাম ছাপা থাকে এবং গচ্ছিতকার যাহাকে টাকা দিতে চান তাহার নাম এবং কত দিতে চান তার পরিমাণ লিখিবার মত স্থান থাকে। গচ্ছিতকারককে অবশ্যই নাম সহি করিতে হয়। যাহার নামে গচ্ছিতকার চেক কাটান সে নাম সহি করিয়া ব্যাঙ্ক হইতে লিখিত পরিমাণ টাকা আদায় করিতে পারে। এখন, ব্যাঙ্কের স্বরূপ প্রকাশক দুইটী কার্য্য প্রণালী নির্দ্ধারণ করা গেল—ব্যাঙ্ক জামিন লইয়া সুদে টাকা ধার দেয়, ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখা যায়। ঐ টাকা তুলিবার রীতির বিভিন্নতা অনুসারে ব্যাঙ্ক কখন এই টাকার উপর সুদ দেয় কখন সুদ দেয় না।

এই কথাটা উপলব্ধি করিয়া সামান্য চিন্তা করিলে এবং মানুষ কি ভাবে নিত্যনৈমিত্তিক কাজ চালায় তাহার জ্ঞান সামান্য মাত্র রাখিলে—অনেকগুলি প্রশ্নই এককালে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়। ঐ প্রশ্নগুলি অবশ্যই সত্বর তুলিব এবং যথাসম্ভব উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে ব্যাঙ্ক বিষয়ে একটী সাধারণ নীতি স্মরণ করা আবশ্যক। ব্যাঙ্ক জিনিষটা হাঁড়ি ঘটীর মত একটা প্রত্যক্ষ জিনিষ। উহাকে বুঝিতে চাহিলে যদি নীতি (Theory)র অবতারনা করা হয় তাহা হইলে সকলেরই ধৈর্য্য-চ্যুতি হইতে পারে। কিন্তু বঙ্কিম চন্দ্রের বিষবৃক্ষেরও দু এক অধ্যায়ের পরই তিনি পাঠককে সহিষ্ণু হইতে বলিয়াছেন। তঙ্কার লোভটা সাধারণ হইলেও তাহার উপার্জ্জন এবং আলোচনা তৃপ্তিকর হওয়া স্বাভাবিক নয়। কাজেই এই প্রথম নীতিটী সহিষ্ণুতার সহিত আয়ত্ত করিতেই হইবে।

যা বলা হইয়াছে তা এক কথায় বলিতে গেলে ও দেশের মুদ্রার কথা না বলিলে—টাকার আদান প্রদানই ব্যাঙ্কের কাজ। কাজেই টাকা জিনিষটা কি তা সর্ব্বপ্রথম বুঝা প্রয়োজন। কথাটা অর্ব্বাচীনের প্রলাপের মত শুনা যাইতে পারে। টাকা কে না চিনে, টাকা তঙ্কা রূপেয়া প্রভৃতি নামের বিভিন্নতাও যে না বুঝে প্রকৃত বস্তুটী সম্মুখে স্থাপন করিলে উহার মাহাত্ম্য বুঝিতে কাহাকেও কালক্ষেপ করিতে হয় না। মধ্য আফ্রিকার বর্ব্বরই হউক আর মধ্য এসিয়ার অর্দ্ধ বর্ব্বরই থাক—অথবা মধ্য ইয়োরোপের সুসভ্যই হউক—ঐ বস্তুটী উত্থাপনমাত্রই উপলব্ধি, জ্ঞান ও বাসনা সব একাধারে উপস্থিত হয়। যাহোক টাকার অর্থ তঙ্কা—রৌপ্য, স্বর্ণ তাম্র মুদ্রা, অথবা রাজা বা তৎপ্রতিনিধি কর্ত্তৃক অনুমোদিত আধুনিক ভূর্জ্জপত্র, যাই কেন না হোক—টাকার প্রকৃত তাৎপর্য্যটা কি?

আপনি আমি আবালবৃদ্ধ বনিতা টাকার জন্য মরি কেন, মারি কেন? "যাহার টাকা আছে তার নাই কি" এই জন্য নয় কি? কিন্তু এ কথারই বা তাৎপর্য্য কি? টাকা বলিতে আমরা ধাতব মুদ্রা বা রাজা বা তৎপ্রতিনিধির

নামাঙ্কিত কাগজ যা বুঝি—তার বিনিময়ে আমরা ঐ টাকার পরিমাণ মত যাবতীয় জিনিষেরই অধিপতি হইতে পারি। কাজেই টাকার প্রকৃত তাৎপর্য্য বিনিময়ের কথা। আরও সোজা কথায় টাকার টাকাত্ব টাকা দ্বারা অন্য যাবতীয় দ্রব্য সম্ভার ক্রয় করিবার ক্ষমতায়। যদি একথা সহজ বলিয়া বোধ হয়, যদি একথার যাথার্থ্য বিষয়ে কোন সন্দেহ না থাকে—তাহা হইলে এখন হইতে টাকা অর্থে মুদ্রা বা নোট না বুঝিয়া টাকা অর্থে **ক্রয় করিবার ক্ষমতা** এই কথা বরাবর স্মরণ রাখিতে হইবে। ক্রমে উপলব্ধি হইবে যে, টাকা অর্থ "ক্রয় করিবার ক্ষমতা" এই প্রকৃত কথা সময় মত স্মরণ না রাখিলে ব্যাঙ্কিং নরকতুল্য হইয়া উঠিবে। তখন "অর্থমনর্থং" এই মোহমুদ্গর সাকারে আসিয়া উপনীত হইবে। কিন্তু এই পার্থক্যটী স্মরণ রাখিলে এবং যোগ্য স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রয়োগ করিলে "মানি স্থইটার দ্যান্ হানি ব্রাইটার দ্যান সান্ সাইন্" এই গান মনমক্ষিকা কাণে গুন্ গুন্ গাহিবে।

ব্যাঙ্কের কার্য্য ক্রয় করিবার ক্ষমতা—আদান প্রদান। ব্যাঙ্ক এই ক্ষমতা গচ্ছিত লয় এবং কখন কখনও এই ক্ষমতা লওয়ার বিনিময়ে সুদ দেয়। ব্যাঙ্ককে জামিন দিলে ব্যাঙ্ক এই ক্ষমতা অন্যকেও দিতে প্রস্তুত হয়।

৪। ধন-শাস্ত্র

ধন-শাস্ত্রের বিশদ এবং বৈজ্ঞানিক আলোচনা ইয়োরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় অন্ততঃ গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষে ধন-শাস্ত্রের আলোচনার সূত্রপাতও ভাল করিয়া হয় নাই বলিলেই চলে। সামান্য সংখ্যক যে কয়জন "ভারতীয় অর্থ-শাস্ত্র" এই নামটীর উৎপত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পাশ্চাত্য জগতের অবস্থাদৃষ্টে সংগঠিত কতিপয় নিয়মাবলী ভারতীয় অবস্থায় প্রয়োগ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন মাত্র। কিন্তু ধন-শাস্ত্রের নিয়মাবলী সামাজিক বাস্তব জীবনের অবস্থাদৃষ্টে গঠিত। আর পশ্চিম ইয়োরোপ ও উত্তর আমেরিকা এবং ভারতবর্ষের উপস্থিত অবস্থাদৃষ্টে নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে উভয়ের যে কি বিভিন্নতা তাহা উপলব্ধি করা কাহারও পক্ষে কঠিন হইবে না। ক্রমে আলোচনা করা যাইবে ভারতীয় ধন-শাস্ত্র কেন পৃথক স্থানীয় মতে করা প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, ভারতীয় ধন-শাস্ত্র উপস্থিত পাশ্চাত্য ধন-শাস্ত্রের অনেকানেক নিয়মাবলীর অযথার্থ্য প্রমাণ করিবে অনেকানেক ভারতীয় ধন-শাস্ত্রের নিয়মাবলী পৃথিবীতে যুগান্তরের পথ প্রস্তুত করিবে। এস্থলে এই কথা বলা ভিন্ন প্রমাণের উপায় নাই। শুধু ধান হাতে করিয়া পোলাও জিনিষটী কি বুঝান সুকঠিন। ধান হইতে চাউল, চাউলের সঙ্গে মসলা ও মাংস এবং এতগুলি মিশ্রণের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন মত উত্তাপ এতগুলি জিনিষ এবং এতগুলি স্তর একত্র হইলে পোলাও। ভারতীয় অর্থ-শাস্ত্রের নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, যজ্ঞোপবীত এবং গুরুগৃহে বাস সমাধা হোক তখন ব্রহ্ম তেজ কি বুঝা যাইবে। তারপর ব্রহ্মতেজ ও অব্রহ্মতেজ কি ইহাদের পার্থক্য বুঝা যাইবে।

বর্ত্তমানে একথা বুঝিলেই হইবে যে, যে শাস্ত্রই কেন হোক না, বা যেখানেই কেন ইহার উদ্ভব হোক না, শাস্ত্রের প্রকৃতি এবং

শাস্ত্রসম্মত বৈজ্ঞানিক আলোচনা বিধি সর্ব্বত্রই একরূপ। পাশ্চাত্য জগতে বৈজ্ঞানিক বিধিমত ধন-শাস্ত্রের আলোচনা হইয়া আসিয়াছে। কাজেই অন্ততঃ সূত্রপাতে সেই বৈজ্ঞানিক বিধি অবলম্বন করিয়া ভারতীয় ধন-শাস্ত্রের আলোচনায় হিত ভিন্ন অহিত হওয়ার কোনই কারণ নাই।

প্রচলিত রীতি অনুসারে সূত্রপাতেই শাস্ত্রের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে। বস্তুতঃ শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং সম্যক উপলব্ধির অবসানেই সংজ্ঞা প্রকৃতপক্ষে আয়ত্ত হইতে পারে। কিন্তু নাম জপ করিবার আগে "রাম," "হরি," "পরব্রহ্ম" প্রভৃতির একটী নিরূপণ করিয়া জপে প্রবৃত্ত হইতে হয়। সাধারণের বিশ্বাস মতে কয়জন সেই নাম সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে? কিন্তু তাই বলিয়া রেলগাড়ী, এরোপ্লেনের যুগেও ত জপ করিবার লোকের তিরোভাব হয় নাই! কাজেই সংজ্ঞার সম্যক আয়ত্তীকরণ ভবিষ্যতের আশায় রাখিয়া সংজ্ঞার উদ্বোধন আরম্ভ করা যাউক।

ধন-শাস্ত্র ধনের উৎপত্তি, ব্যবহার এবং বিনাশবিষয়ক যাবতীয় ঘটনাবলী, ঐ ঘটনাবলীর পরস্পরের সম্পর্ক, ঐ ঘটনাবলীর সকল সমষ্টি আকার ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য ঘটনাবলীর কি সম্পর্ক তাহার আলোচনা করে। এখন একমাত্র ধন কথাটার তাৎপর্য্য বুঝিলেই এ সংজ্ঞার মোটামুটি জ্ঞান জন্মিবে। ধন কি? কেহ বলিবেন টাকাই ধন কেন না টাকায় না মিলে কি? কেহ বলিবেন জমিই ধন কেননা টাকা থাকিলেও টাকা চিবাইয়া ক্ষুধা মিটে না। টাকা দিয়া অন্য কিছু লাভ করা প্রয়োজন, আর ঐ অন্য কিছু যাহাই কেন হোক না—শেষ পক্ষে নিশ্চয়ই কোন জমি হইতে সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎ মতে উৎপন্ন। কাজেই জমিই ধন। অন্য একজন হয়ত বলিবেন জমি বল, টাকা বল, সবারই পিছনে মানুষের হাত। জমি ত কতই পড়িয়া আছে! কিন্তু মানুষের হাত না লাগাইলে ধনের গন্ধ কোথায় পাওয়া যায়? আর টাকা ত মানুষ ভিন্ন সম্ভবেই না! এই রকম মত অনেকগুলিই প্রকাশ করা যায়। আর এর মধ্যে কোন মতই সম্পূর্ণরূপে সত্যতা বিহীন নয়। আবার এর মধ্যে কোন মতই একাকী পূর্ণ সত্যের অধিকারী নয়। উপরের তিনটী মত এবং উক্তবিধ যাবতীয় মত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে অন্ততঃ দুইটী পৃথক জিনিষ পাওয়া যায়। মানুষ এবং পরিদৃষ্ট, অনুস্পৃষ্ট, অনুভূত ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় দ্রব্যরাজি। মানুষের সহিত সম্পর্কিত এই দ্রব্যরাজিই মানুষের ধন।

কিন্তু এই দ্রব্য-সম্ভার মানুষের সম্পর্কে আসে বলিয়াই যে ধনরূপে পরিগণিত হইতে পারে তা নয়। এই দ্রব্য গুলিতে মানুষের প্রয়োজন আছে। ক্ষুধা নিবৃত্তি, শীতোষ্ণ প্রভৃতির আতিশয্যের রক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বোচ্চ আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে এই ধনরাজির প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। কাজেই মানুষের জীবন-ধারণ এবং যাবতীয় সদবৃত্তির প্রসারণে এই দ্রব্যরাজির উপযুক্ততাতেই ইহাদের ধন-গুণ নিহিত। অতএব মানবের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল অনুকূল দ্রব্যরাজি সংস্পৃষ্ট হিতই ধনের স্বত্ব-প্রতিজ্ঞাপক। এই জন্য দ্রব্য সম্বন্ধীয় মানবের মঙ্গলই মানবের ধন।

কথাটা শুনিতে বোধ হয় একটুকু কটমট লাগে। কাজেই আর একটুকু খুলিয়া বলা যাউক। বলা গেল ধন-অর্থে মানুষের দ্রব্য-

সম্বন্ধীয় মঙ্গল। অর্থাৎ দ্রব্য-সম্ভার মানুষের প্রয়োজনে আসিয়া মানুষের যে হিত বিধান করে সেই হিতই মানুষের ধন। এই হিত এক জন বা দুই জন, এক দেশের বা বিশেষ কোন দেশের হিত নয়। এই হিত যাবতীয় মনুষ্যের হিত। মানবজাতি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের দ্রব্য-রাজির ব্যবহার করিয়া যে হিত লাভ করে সেই হিতই মানব-জাতির ধন।

এটা কি আমার মন-গড়া অর্থ না কি? কোন মতেই নয়। কারণ, জায়গা বলুন, নিয়োগ বলুন, পরিশ্রম বলুন, সকলেরই উদ্দেশ্য দ্রব্য সম্বন্ধীয় মানুষের হিত। পরিশ্রমের বলে উপায় সাহায্যে জমি হইতে শস্য উৎপন্ন হয়। কিন্তু শস্য উৎপন্ন হয় কেবল উৎপাদনের জন্য নয়। শস্য উৎপাদন হয় মানবের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য। ক্ষুধা-নিবৃত্তির উদ্দেশ্য জীবন রক্ষণ এবং জীবনের যাবতীয় উদ্দেশ্যের যথাসম্ভব সাধন। কাজেই শস্য-উৎপাদন—অথবা সাধারণ ভাষায় বলিতে গেলে দ্রব্য সম্বন্ধীয় হিতই মানবের ধন।

কিন্তু শস্য-উৎপাদন হয় ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য, ক্ষুধা নিবৃত্তি জীবন রক্ষার জন্য, জীবন-রক্ষা হইলে যাবতীয় হিতসাধন সম্ভব হইতে পারে। কাজেই একেবারে চরম উদ্দেশ্য হিতসাধনকে সার করিয়া ধনের এবং ধন-শাস্ত্রের সংজ্ঞা কেন করা হইল? এর উত্তর এক কথায় চলে না। চলিতে পারে যদি লেখকের কথায় পাঠকের প্রত্যয় থাকে। তাহা এই—অর্থ শাস্ত্রের যে যে আলোচনা হইয়াছে তাহাদের ধারাবাহিক আলোচনায় দেখা যায় যে দ্রব্য সম্বন্ধীয় মানবের হিত সাধন এই অর্থে না লইয়া ধন শাস্ত্রের সংজ্ঞা ধনের আংশিক প্রকৃতি উদ্ভূত কোন ধারণা হইতে লওয়ায় ধন-শাস্ত্রের বিস্তৃতি এবং এমন কি সামাজিক উন্নতিরও সন্দেহ বিগ্রহ ঘটিয়াছে। দুই একটী দৃষ্টান্ত দিলে হয় ত ধাপ্পা দেওয়ার অপরাধটা ঘুচিবে। ইংলণ্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে এবং ফ্রান্সে তৎপূর্ব্ব এবং ঐ শতাব্দীতে ধন অর্থে যথাক্রমে স্বর্ণ-রৌপ্যাদি মুদ্রা এবং জমি-উৎপন্ন শস্য বুঝাইত। তাহার ফলে একশত বৎসর পর্য্যন্ত অর্থশাস্ত্রকে পুনর্জ্জন্ম লইয়া ডিম্বাবস্থায়ই কাটাইতে হইয়াছিল। সমাজের দিক হইতে দেখিতে গেলে—ইংলণ্ডে কেবল স্বর্ণরৌপ্যাদির সঞ্চয়ই জাতীয় উন্নতি এবং ফ্রান্সে কেবল কৃষি কার্য্যেই জাতীয় উন্নতি এই বিশ্বাস যথেচ্ছাচার শাসন করিয়াছিল। তার ফলে ইংলণ্ডে আন্তর্ব্বাণিজ্যের সঙ্কীর্ণতা এবং ফ্রান্সে শিল্প কার্য্যের প্রতি অমনোযোগে যে কত ক্ষতি হইয়াছিল তাহা ইতিহাস পাঠেই বুঝা যাইবে। আমাদের যুগের ট্যারিফ রিফর্ম, সোসিয়ালিজ্‌ম্ প্রভৃতি নানাবিধ ধন-সম্বন্ধীয় তর্ক বিতর্ক এবং উহাদের অমীমাংসা হেতু নানাবিধ বিগ্রহ ঘটিতেছে। স্থানান্তরে বিশদভাবে বলা যাইবে যে ধন অর্থ যে জন-সাধারণের দ্রব্য-সম্বন্ধীয় হিত এই কথার বিস্মরণই সমুদয় অমীমাংসা ও অনিষ্টের মূলীভূত কারণ।

কাজেই দ্রব্য-সম্বন্ধীয় জন-সাধারণের হিতই জগতে মানবের ধন। আর জাগতিক ও দ্রব্য-সম্বন্ধীয় জনসাধারণের হিতই ধনশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়।

* *
*

৫। ধনশাস্ত্রের আলোচনা

ধন অর্থে জনসাধারণের দ্রব্যরাজি-সম্বন্ধীয় হিত এবং ধন-শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় এই জনসাধারণের দ্রব্যরাজি সম্বন্ধীয় হিত ইহা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এবংবিধ অর্থ-

শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সাধারণ ধরণের কয়েকটী বিষয় বলা প্রয়োজন। অবশ্যই এই প্রয়োজনীয়তা প্রথমে বুঝা কঠিন। কেননা ঐ সকল সাধারণ বিষয় গুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না রাখিলে যে কি কি অনিষ্ট হইতে পারে তা প্রকৃত অর্থ-শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবেশ না করিলে বোঝা যায় না। কিন্তু নারিকেলের ছোবড়া ফেলিয়াই প্রকৃত শক্ত নারিকেল পাওয়া যায়, পরে শক্ত "মালা" ভাঙ্গিয়া শাঁশ পাওয়া যায় একথা আমাদের দেশের ছেলেকেও শেখান পাগলামি হইতে পারে। কিন্তু একথা ইয়োরোপের অশীতি বৎসর বয়স্ক অনেককেও বলিয়া বিশ্বাস করান সহজ না হইতে পারে। এই সাধারণ কথাগুলির কি প্রয়োজনীয়তা এই অর্থশাস্ত্রের সারে ঢুকিলে বুঝা যাইবে।

* *

৬। ধন-শাস্ত্র এবং ধনসম্পর্কিত বাস্তব জীবনের বিভিন্নতা

ধন-শাস্ত্র এবং ধন-শাস্ত্রের আলোচনা এবং ধন লইয়া আমরা নিত্যনৈমিত্তিক যে রকম জীবন যাপন করি এই দুইটী কোনমতেই এক নয়। আপনি বা আমি প্রকৃতপক্ষে যেমন—আপনার বা আমার বিষয়ক আলোচনা ঠিক ঐ রকম নাও হইতে পারে। এমন কি আলোচনা যথাযথ হইলেও আলোচনা এবং আমাদের প্রকৃত আত্মত্ব এক নয়, একথা সহজে বোধ হইতে পারে। এখন অর্থ-শাস্ত্র অর্থ-শাস্ত্রের আলোচনায় এবং আর্থিক জীবনের প্রতি একথা প্রয়োগ করিলে সাধারণ ভাবে বলা যাইতে পারে যে, শাস্ত্র এবং শাস্ত্রের বিষয়মূলক প্রকৃত জীবন এক নয়। একটুকু তলাইয়া এ কথাটা বুঝিতে হইবে।

ধন-শাস্ত্র বা ধন-বিজ্ঞানকে যদি পদার্থ-শাস্ত্র বা পদার্থ-বিজ্ঞানের সঙ্গে স্থান দিতে হয় তবে বলিতে হইবে পদার্থ-বিজ্ঞান প্রভৃতি গণিতিক ভিত্তিমূলক বিজ্ঞানের ন্যায় ধন-বিজ্ঞান বা ধন শাস্ত্রেরও প্রণালী এবং মীমাংসাকে সম্পূর্ণ যথাযথ করিতে হইবে। কিন্তু ধন-শাস্ত্রের আলোচনা যদিও পদার্থ-বিজ্ঞানাদির গণিত-সম্মত সম্পূর্ণ ত্রুটী হীনতায় আনা বাঞ্ছনীয়—তবু মানবের প্রকৃতি এবং ধন-শাস্ত্রের মানবের প্রকৃতির সহিত অবশ্য সম্পর্ক থাকা হেতু, ঐ আদর্শ সম্যক কার্য্যে প্রয়োগ করা যায় না। আর তা না যাওয়াতে ক্ষতিও যে বিশেষ কিছু আছে তা নয়।

কিন্তু গণিতিক বিধি অনুযায়ী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পদার্থ-বিজ্ঞানেও প্রকৃত শাস্ত্র-গত আলোচনায় বরং বাস্তব পদার্থগত ঘটনার সর্ব্ব-সাকল্য ঐক্যতা সম্ভব তবে সর্ব্বযুগে সম্ভব নয়।

কিন্তু ধন-শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ মানব। মানবের হিতের জন্য ধনের প্রয়োজন। কাজেই ধনশাস্ত্রের আলোচনায় মানবের হিত একটী শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। কিন্তু ধনগত হিত মানবের একমাত্র বা সম্পূর্ণ হিত কোন মতেই নহে। মানুষের অর্থের প্রয়োজন কিন্তু অর্থ ব্যতিরেকে অন্যান্য বহু জিনিষেও মানুষের প্রয়োজন। কাজেই ধন-শাস্ত্রের আলোচনা সম্পূর্ণ মানবীয় আলোচনার এক অংশ মাত্র। জড়পদার্থ এই যুগে সর্ব্বত্রই একরূপ এবং একবিধ পাদার্থিক নিয়মের বশীভূত। কিন্তু কোন দুইটী মানুষও সম্পূর্ণ-রূপে এক নয়। আবার একই মানুষ প্রত্যেক মুহূর্ত্তের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হই-তেছে। ইহার ফলে যে যে শাস্ত্র বা বিজ্ঞানে মানুষের সম্পূর্ণ বা আংশিক স্থান—যেমন, মন-বিজ্ঞান, নীতি-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান

এবং বর্ত্তমানে আলোচ্য অর্থ-বিজ্ঞান—সেই সেই শাস্ত্রে সর্ব্বপ্রথমত দুইটী স্বীকার্য্য লইয়া আরম্ভ করিতে হয়।

প্রথম স্বীকার্য্য এই—অর্থ-বিজ্ঞান বা মনো-বিজ্ঞান বা অন্য যে কোন বিজ্ঞানই কেন আলোচনার বিষয় হোক না—ঐ ঐ সকলের বৈজ্ঞানিক আলোচনা আংশিক বৈজ্ঞানিক। পূর্ণ মানবের এক অংশ হইতে ঐ বিশেষ বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলি উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু মানবের বিশেষ বিশেষ কামরায় আবদ্ধ বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি বা বৃত্তি নাই। কার্য্যকালে ঘটনা সাপেক্ষে এক বা ততোধিক বৃত্তি একাঙ্গী বা মিশ্রণে, বিশেষ ঘটনায় প্রবল হইতে পারে এবং সাধারণ চক্ষে ঐ ঘটনা বৃত্তি বিশেষ বা প্রকৃতির অংশ বিশেষ হইতে উদ্ভূত মনে হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ বৃত্তি বা আংশিক প্রকৃতি যখন প্রবল ছিল তখন অন্যান্য বৃত্তি বা প্রকৃতির অন্যান্য অংশ মরিয়া ছিল না। কাজেই জীবনের ঘটনার আংশিক আভাস লইয়া মানবসম্বন্ধীয় যাবতীয় শাস্ত্রের বিধিগুলির উৎপত্তি হয়। এজন্য যাবতীয় মানবীয় শাস্ত্রের বিধিগুলিতে এই আংশিক আভাস স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

দ্বিতীয় স্বীকার্য্য—চিরপরিবর্ত্তনশীল মানব কোন বিশেষ মানবীয় বিজ্ঞানের চক্ষে পরিবর্ত্তনশীল নয়। অথবা পরিবর্ত্তনশীলতা স্বীকার করিলেও উহা এইভাবে করা হয়—মানবপরিবর্ত্তনশীল কিন্তু দেখা যায় বালক এই রকম, বালিকা ঐ রকম, যুবক এক রকম, এবং প্রৌঢ় আর বৃদ্ধ অন্য ভাবে একই অবস্থায় ব্যবহার করিয়া থাকে। কাজেই মানবীয় কোন্ বিজ্ঞানে হয় প্রকাশ্যে নয় অপ্রকাশ্যে মানবের কোন অংশ বা কোন কোন অংশের সম্মিলিত অবস্থা উক্ত বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় তা স্থির করিয়া লওয়া হয়। যেমন মনোবিজ্ঞানে শিশু ও বালক মন, প্রৌঢ় মন, নারী মন, সুস্থ মন, অসুস্থ মন প্রভৃতি নানাবিধ বিভাগ। কিন্তু প্রত্যেক মানবীয় বিজ্ঞানেই এতগুলি ভাগ সম্ভব নাও হইতে পারে। যেমন ধন-বিজ্ঞানে শিশু এবং বালকের স্থান অতি সামান্য। কেন না ধন উৎপাদন, সংরক্ষণ প্রভৃতিতে তাহাদের অংশ অতি অল্প।

কিন্তু এই সব কথা স্বীকার করিলেও শেষে এই কথায় আমরা উপনীত হই—মানব যত শীঘ্র এবং যতদূর পরিবর্ত্তনশীল—ধন-শাস্ত্রের নিয়মগুলি তত শীঘ্র বা ততদূর পরিবর্ত্তনশীল নয়। ধন-শাস্ত্রের নিয়মগুলি মানবের এই পরিবর্ত্তনশীলতা হেতু, বহু-সংখ্যক ঘটনা দেখিয়া গঠন করিতে হয়। কাজেই মানবের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব-প্রযুক্ত নিয়মগুলি পরিবর্ত্তন করা সহজ নয়।

এই স্বীকার্য্য দুইটির ফলে ধন-শাস্ত্র এবং ধন-সম্বন্ধীয় বাস্তব জীবন যে পৃথক এবং এই পার্থক্যের কথা স্মরণ না রাখিলে হয়ত ভবি-ষ্যতে সমূহ অনিষ্টের আশঙ্কা আছে একথা সহজে বুঝা যাইবে।

প্রথমতঃ ধন বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় অন্যান্য মানবীয় সম্বন্ধে আবদ্ধীকৃত বরাবর দ্বিতীয়তঃ মানবের পরিবর্ত্তনশীলতাহেতু এবং ধন-বিজ্ঞানে মানবীয় অংশ প্রভূত থাকায়, ধনশাস্ত্রের নিয়ম কখনও মানবের পরিবর্ত্তনের সহগামী হইতে পারে না ও পারে। তার ফলে ধন-শাস্ত্রের নিয়মগুলি ধন-সম্বন্ধীয় বাস্তব জীবনের প্রতি ঘটনার সহিত ঐক্য না রাখিতেও পারে।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে ধন-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য দ্রব্য সম্বন্ধীয় মানবের হিত। দ্রব্য প্রত্যক্ষের বিষয়। কিন্তু ধন-শাস্ত্রের নিয়ম গুলি প্রত্যেকে প্রত্যক্ষ বিষয় নাও হইতে পারে। এ হেন বিজ্ঞানে তবে প্রয়োজন কি? আর ঐ নিয়মগুলির বৈজ্ঞানিকতাই বা সম্পূর্ণ কোথায়?

একেবারে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক এবং নিষ্কলঙ্ক নিয়ম সীমাবদ্ধ মানবের ক্ষমতা বহির্ভূত। ধন-শাস্ত্রের পক্ষে বিশেষতঃ এ সম্পূর্ণতা সম্ভব নয় কেন বলা হইয়াছে।

কিন্তু তাই বলিয়া ধন-শাস্ত্রের নিয়মগুলি যে অবাস্তর ঘটনা লইয়া গঠিত ইহা বলা চলে না। আর অসম্পূর্ণতা স্বীকার্য্য হইলেও, পরিবর্ত্তনশীলতা অসুবিধার মধ্যে হইলেও, ধন-শাস্ত্রের কোন বিধিই প্রকৃত ঘটনার সাহায্য ভিন্ন গঠিত হইলে ঐ বিধির কলঙ্ক থাকিয়া যাইবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংলণ্ডের ধন-শাস্ত্রজ্ঞগণ পরিশ্রম, মূলধন এবং ভূমির প্রাপ্য অংশ পূর্ব্ব বৎসর হইতে পর বৎসর পর্য্যন্ত স্থির নির্ণীত আছে ইহা বিশ্বাস করিতেন। ঘটনার অনুসন্ধান করিয়া এ বিধি নিরূপিত হয় নাই। ধন-উৎপাদনে পরিশ্রম, জমি এবং মূলধনের প্রয়োজন—কাজেই উৎপাদনের অংশ প্রত্যেকেরই প্রাপ্য। কাজেই উৎপাদ্য এত হইলে তিনে ভাগ করিয়া নিবে। ইহার ফলে এই বিশ্বাস দাঁড়াইয়া ছিল যদি পরিশ্রমের অংশ বেশী হয় তবে তাহা হইলে অন্য দুইটার বা একটার অংশ কমিবে। এ হেন ভুল ধারণায় মূল প্রকৃত ঘটনার প্রতি অমনোযোগ এবং পুঁথিগত ভাবে দৈনিক ঘটনার আলোচনা হয়, ইহাই বুঝায়। আমাদের যুগে নানাবিধ ধন-শাস্ত্রীয় বিধি এইরূপ ভুলের বশবর্ত্তী। কাজেই ধন-শাস্ত্রের বিধিগুলি প্রকৃত ধন-সম্বন্ধীয় জীবনের ঘটনার সহগামী এবং সম্পূর্ণ সমসূত্রানুযায়ী না হইলেও, বাস্তব জীবনের ঘটনা ক্ষণকাল চক্ষুর অন্তরাল করিলে উপনীত বিধিতে দোষ ঘটিবে। অথচ ধন-শাস্ত্র আলোচনা করিবার সময় ধন-শাস্ত্র বিষয়ক বিধিগুলির বাস্তব জীবন হইতে পার্থক্যও মানিয়া চলিতে হইবে।

ধন-শাস্ত্র ও তাহার আলোচনা এবং বাস্তব ধন-সম্পর্কিত জীবনের ঘটনার বিভিন্নতার উপলব্ধি এবং স্মরণ উক্ত উদ্দেশ্যেরই জন্য।

* *
*

৭। মানবের তন্ময়তা

মানুষ জন্মমৃত্যুর সীমার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের ভিতর অনেক কাজ করিতে আসিয়াছে। শুধু শয়ন, ভোজন, গল্প গুজব বা বৃথা আমোদের আসর তৈয়ার করিতে আসে নাই। তাহার ক্ষণজীবনে কীর্ত্তির দৃঢ় মন্দির রচনা করিতে হইবে, যাহা অনুপযোগী তাহা দূর করিয়া প্রয়োজনকে আহ্বান করিতে হইবে, সুতরাং শত রকমের পরিবর্ত্তন তাহার কার্য্যকলাপে দৃষ্ট হইবেই তাই বলিয়া সে ভ্রান্ত এ কথা বলিলে চলিবে না। সে রক্ত মাংসের জীব তাহার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সহজ উপায় আবিষ্কার করিতে হইবে। সে কর্ম্মের জন্য জীব জগতে আশ্রয় লইয়াছে, কর্ম্মই তাহার জীবনের উদ্দেশ্য, ফললাভ তাহার উদ্দেশ্য নয় তাই সে আপন ইচ্ছামত কাজ করিয়া যাইতেছে। সুতরাং তাহার ভ্রম-ভ্রান্তির উল্লেখ করিয়া তাহার পদে পদে বিঘ্ন জন্মাইবার কোন প্রয়োজন নাই। তাহার কর্ম্মের সহায় হইয়া তাহার অনুষ্ঠিত পথে তাহাকে সুস্থতার ভিতর দিয়া লইয়া যাইতে হইবে। যদি তাহা না হয় জগৎখানি তোমার

জন্যও পড়িয়া রহিয়াছে তুমি তোমার ইচ্ছামত চালাইয়া লও, তোমাকে কেহই বাধা দিবে না। সে হৃদয়কে এক ভীষণ শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া লয় তাই কাহারও দিকে দৃষ্টি দেয় না, আপন মনে শুধু কর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতেই আসিয়া থাকে তাই শতজনের শতভাবের নিন্দা সমালোচনার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না, শত জনের শতভাবের নামকরণকেও সে কর্ণকুহরে স্থান দেয় না। সে অত্যাচারকে কর্ত্তব্য পথের ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক কণ্টক বলিয়া হীন মনে না করিয়া ভগবদ্দত্ত আশীর্ব্বাদ মনে করে, তাই অত্যাচার তাহাকে কিছুই করিতে পারে না বরং অত্যাচারকে সম্মানেরই নামান্তরমাত্র মনে করে। যেখানে যথেষ্ট সম্মান লুক্কায়িত থাকে সেখানে অত্যাচার অগ্নিমূর্ত্তিতে পরীক্ষাচ্ছলে দেখা দেয়। সাধারণ জীব সম্মানের দাবী করিতে পারে না তাই অত্যাচারকেও ভগবদ্দত্ত আশীর্ব্বাদ মনে করিয়া লইতে পারে না। হৃদয়বান ধার্ম্মিক পুরুষগণ মানুষের হাতের কত দণ্ডই আজ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা যে সকলকে সম্মানের দান মনে করিয়াছেন, মানুষকে ভগবানেরই রূপান্তর মনে করিয়াছেন—তাই যীশু, মহম্মদ, চৈতন্য, রাণাপ্রতাপ, শিবাজী, গুরুগোবিন্দ ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। সম্মানের চূড়ান্ত হইতেই অত্যাচারের চরম দৃষ্ট হইয়া থাকে। অত্যাচারী মানুষকে সে ঘৃণা করে না বরং তাহাকে ভগবৎ প্রেমে দীক্ষিত করিয়া লইতে চায়। মানুষ মাত্রেই অত্যাচারী হইতে পারে না, যার তার ভাগ্যেও অত্যাচার জোটে না। নতুবা মানুষে মানুষের অত্যাচার গ্রহণ করিবে এ কি কখনও সম্ভব! উভয়েই সৃষ্টি কর্ত্রীর সমান আশীর্ব্বাদ লইয়া জন্মিয়াছে, জীবনের ও জীবনধারণের অন্যান্য ব্যাপারগুলিও প্রায় একই প্রকার তবে একজন শাস্তা আর একজন দণ্ডিত কেন? হিংসা, প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষা উভয়ের ভিতরেই ত আছে। একজনকে বড় করিয়া আদর্শ চরিত্র দাঁড় করাইবার নিমিত্তই অত্যাচারের সৃষ্টি হইয়াছে, অবনতির পর্য্যায় রহিয়াছে নতুবা সৃষ্টি কর্ত্রীর মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইবে কি করিয়া? তাই একজন রোষকষায়িতলোচনে দম্ভের অভিনয় করেন অন্যজন উপাস্য দেবতার নামে প্রতি মুহূর্ত্তেই নিজকে উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইতে থাকেন।

আশীর্ব্বাদ সকল সময়ে মঙ্গলের সূচনা করিয়াই দেখা দেয় না, শাশ্বত আনন্দ লাভের পরিমাণ অনুসারে দুঃখও ততটা দেখা দেয়। স্থিরপ্রতিজ্ঞ, ধার্ম্মিক পুরুষই তখন হৃদয় স্থির রাখিতে পারেন। তিনি সংসারে কর্ম্মের প্রবর্ত্তক—লৌকিক ভাবেই তাঁহার আসক্তি দেখা যায়, ভিতরে তিনি অনাসক্ত তাই পুত্র পরিবারের মমতা তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না, তাহাদের শোকে ম্রিয়মান হন না, তিনি উপলব্ধি করেন ইহারা শত্রু হইতেও পরম শত্রু এবং মিত্র হইতেও পরম মিত্রভাবে লোক বিশেষের কাছে দেখা দেয়। তিনি সংসারে আবদ্ধ থাকিতে চাহেন ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য, সুতরাং তিনি দুঃখিত, শোকাকুল হইলে চলিবে কেন!

ধীরে ধীরে আত্মাকে সর্ব্বদা অণু পরমাণুতে ভাগ করিয়া সমুদয় পদার্থের সঙ্গে মিশাইলে দেখিতে পাইবে, তুমি তাহাদেরই জন্য, তোমার নিজের বলিয়া কিছুই থাকিবে না। যদি তুমিই একমাত্র পুরুষ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে চাও তাহা হইলে অনাসক্ত ভোগের জন্য অসম্ভবে সম্ভব কর, আপন পথে চল—ভুল

ভ্রান্তির জন্য অপেক্ষা করিও না, সম্মান ও অত্যাচারকে উপেক্ষা কর। দেখিতে পাইবে তুমি দৃপ্ত, উজ্জ্বল, অথচ স্নিগ্ধ এক পুরুষমূর্ত্তি। তখন ধ্বনিত হইবে,—সর্ব্বত্র অচল, অটল দেখিয়া তোমার ভিতর হইতে—আমিই সেই।

৮। সাহিত্য বিস্তারে মুসলমান সম্প্রদায়

দুই শত বৎসরের ভিতর ভারতীয় মুসলমান সমাজ যেন একেবারে চাপা পড়িয়া গিয়াছেন। স্পেন হইতে ভারত পর্য্যন্ত বিশাল রাজ্য দীর্ঘ সহস্র বৎসর কাল যাঁহাদের জ্ঞান বিজ্ঞানে ঝঙ্কৃত ছিল তাঁহারা আজ অবসন্নতা হেতু নীরবতা অবলম্বন করিয়াছেন। হয় তাঁহারা পূর্ব্ব পুরুষের গুণাবলীকে কতকটা কল্পনা করিয়া ধরিতে পারিতেছেন না অথবা ধরিবার চেষ্টাও আদৌ করেন না। আমরা আজ বার বৎসরের মধ্যে কোন মুসলমান ঐতিহাসিক বা প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ীকে দেখি নাই, ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য সত্য। ষষ্ঠ হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যাঁহারা ধর্ম্ম প্রচারেরপর শিক্ষা প্রচারে রত ছিলেন এত বড় যাঁহাদের কাজ ছিল তাঁহারা আজ যেন মৃত। কর্ম্মমন্ত্রে দীক্ষিত মানব আজ নীরব, ধরাপৃষ্ঠে তাহার কোন সাড়া শব্দ নাই কেন? জাতি ত লুপ্ত হয় নাই। যে জাতি সুধার ফল-জল, ভোগ-বিলাস সমভাবে উপভোগ করিতেছে পিতৃপিতামহের নাম স্মরণ করিয়া শিক্ষা প্রচারে, ধর্ম্ম-প্রচারে, রাষ্ট্রনীতিতে, রণোন্মত্ততায় গৌরব করিতেছে সে জাতির ইতিহাসের পৃষ্ঠা কোথায়?

আজ পর্য্যন্ত কোন শিক্ষিত মুসলমান ব্যক্তিকে আমরা ঐতিহাসিক দেখি নাই। ইতিহাস আলোচনা করিয়া তাঁহার ইতিহাসের লুপ্ত ও প্রক্ষিপ্ত অংশ উদ্ধার করা কি কাজ নয়? বিংশ শতাব্দীর নীরবতা শুধু নিজের দেশকেই কলঙ্কিত করিয়া ধ্বংস পথে টানিবে না পরন্তু, সমস্ত সভ্য জাতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে, রাজা, রাজ্য, প্রচারক-উপদেষ্টা সকলকেই কলঙ্কিত করিবে। আপনাদের জাতির নামে, ধর্ম্মের নামে কলঙ্ক আনাইয়া শত শত বৎসর ভোগ করিতে হইবে।

মুসলমান সমাজকে আমরা অন্যত্রও দেখিতে পাই না। বিজ্ঞানালোচনায় সাহিত্য সম্মিলনে কোথাও তাঁহাদের ছায়ামাত্র দৃষ্ট হয় না। তাঁহারা শুধু বাঙ্গলা ভাষা গ্রহণ করিলেই কি দেশ বড় হইবে? ভাবের রাজ্যে তাঁহারা কোন নূতন প্রস্তাব বা প্রস্তাবনা দ্বারা নূতন কর্ম্মকেন্দ্রের গঠন, প্রতিষ্ঠান, কর্ম্মকেন্দ্রের সংস্কার প্রভৃতি কোন কিছুই করিতেছেন না।

তাঁহারা হয়ত শিক্ষার সুবিধা নাই বলিয়াই অপেক্ষা করিতেছেন, কিন্তু অপেক্ষা করার সময় আর আছে কি? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের সময় কম, কাজ বহু সুতরাং পর পর শৃঙ্খলার অপেক্ষা করিলে জীবনটা পথে মারা যাইবে। অনেক কাজ এখন টানিতে হইবে, তাহার জন্য ভাবনা নাই, লক্ষ্য স্থির রাখিলে সব গুলিই আপনা হইতে শৃঙ্খলা ধরিয়া চলিবে। যাহার জীবন উন্নতি চায় সে কখনও মন্থর গতিতে চলিতে পারিবে না। মুসলমান সমাজের শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ যেন মনে রাখেন তাঁহাদের সন্তানের সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করা নিতান্ত আবশ্যক। প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান জগৎ

এই ধর্ম্মের দ্বারাই বড় হইয়াছিল। সুতরাং ধর্ম্মশিক্ষাকে যেন প্রাচীন পদ্ধতির ভিতর স্থান দেন। অন্ততঃ এশিয়াবাসীর জল বায়ুতে ধর্ম্মহীন শিক্ষা স্থায়ী হইবে না। তাঁহার সমাজ যতই কেন হীন হউক না ভবিষ্যতের উন্নতির জন্য তাঁহার স্থায়ীত্ব ধর্ম্মের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইবে।

হিন্দু ও মুসলমান সন্তানে যথেষ্ট প্রীতি থাকিলেও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে, নব নব কর্ম্ম-কেন্দ্রে তাহাদিগকে একত্র দেখা যায় না। তাহারা নিজের সমাজকে অশিক্ষিত অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করিলে এই দেশের সম্মান লাভের আর কোন উপায় থাকিবে কি? আমরা চাই আর কালবিলম্ব না করিয়া মুসলমান সমাজ প্রয়োজনীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করুন। ইতিহাসালোচনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রত্নতত্ত্বের উদ্ধার নিতান্ত প্রয়োজনীয়। দেরী করার সময় নাই কারণ জগৎখানি পলে পলে যে কত পরিবর্ত্তিত হইতেছে আর তার অনুপাতে স্থিতিশীল বস্তু মাত্রেই পিছনে পড়িতেছে। একবার পিছনে পড়িয়া থাকিলে আর উঠিবার ভরসা নাই। স্কুল প্রতিষ্ঠা দ্বারা শিক্ষাদান নানা রকমে অসম্ভব হইলে মকতবের ভিতর দিয়াই তাহার ধারা বহাইতে হইবে। তার জন্য যেন শিক্ষার ব্যাঘাত না হয়। টোল মকতব যে দেশের শিক্ষা ক্ষেত্র সে দেশে শিক্ষাদনের কষ্ট কি?

* *

৯। প্রত্নতত্ত্ববিদের বৃহত্তর ক্ষেত্র

আমরা ভারতবাসিগণ বড় জোর ব্রহ্ম-দেশকেই বৃহত্তর ভারত পর্য্যন্ত একটা ধারণা করিয়া লইয়াছি। ভাষার রাজ্যে তাহারা আমাদের অতি নিকটতর হইয়াছে, কিন্তু ভাব, তেমন প্রবল হয় নাই যাহাতে ব্রহ্মদেশ ভারতের অতি নিকট হইতে পারে। অবশ্য ভাষাও খুব প্রবলাকার ধারণ করে নাই। ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে ভারতবর্ষ কোন কোন শিল্পের নামেই পরিচয় পাইয়াছে। ব্রহ্মদেশের মত কত বৃহত্তর ভারত গড়িবার স্থান রহিয়াছে তাহার খোঁজ রাখে কে? ভারত মহাসাগরের দ্বীপ উপদ্বীপ ভারতীয় দিগেরই উপনিবেশ। আমরা দুই বৎসর পূর্ব্বে "যবদ্বীপে হিন্দুটোলা" শীর্ষক প্রবন্ধে যবদ্বীপের কথা বলিয়াছিলাম। নব্য ভারতের ঐতিহাসিকগণ পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে-ছেন কিন্তু সেই অনুসন্ধান আরও গভীরতর হওয়া উচিত, আরও ব্যাপকভাবে স্থান-বিস্তৃতির আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা দেশকে বুঝিয়াছেন, বুঝাইতে চাহিতেছেন কিন্তু তাঁহারা আজও বসিয়া ভাবিলে অগ্রসর হইবার সময় কোথায়। তাঁহারা ঐতিহাসিক স্তরে উন্মাদনা আনিতে চাহিলে শুধু দেশে বসিয়া ভাবিলেই চলিবে না। চীন হইতে মিশরের পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত ভূভাগ তাঁহাদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র। হিন্দু-বৌদ্ধ, শক-হূণ, গ্রীক এবং মুসলমানের অস্তিত্ব উহার পরতে পরতে মিশিয়া রহিয়াছে। প্রাচীন এশিয়ার বুকের উপর কত শত তাণ্ডব নৃত্য হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আজ এশিয়া জীবন্মৃত আজ তাহার বুকের উপর ধর্ম্মবীরের ধর্ম্মপ্রচার, কর্ম্মীর সেবাধর্ম্ম, প্রেমিকের প্রেমধর্ম্ম, যোদ্ধার ভৈরব হুঙ্কার তাহাকে জাগ্রত করিতে উত্থিত হইতেছে না। তাই বলিতে চাই—দেশকে ভাল বাসিতে হইলে যখন যেমন প্রয়োজন হইবে তখন তেমন ব্যবস্থা করিতে হইবে। শুধু ঘরে বসিয়া আলোচনা করিবার দিন আর নাই। আমার যা তাকে বড় করিতে হইবে, পরের

মুখে ঝাল না খাইয়া নিজের রুচির মত করিতে হইবে, এই ভাব যদি থাকে তাহা হইলে জড়ীয় ভাব আর কি আটকাইয়া রাখিতে পারে? ২।৪ জন প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ই এই দেশের পক্ষে যথেষ্ট নয় তারপর সমুদয় এশিয়া ব্যাপিয়া ভারতের সম্বন্ধ খুঁজিতে গেলে যথেষ্ট ঐতিহাসিকের প্রয়োজন। অনুসন্ধান সমিতি গুলি দেশের ভিতর ইহার একটা নেশা না দিলে দ্রুত কাজ হইবে না। ইংরাজ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ ও ঐতিহাসিকের ন্যায় অরণ্যাণীতে, ভীষণ মরুভূ মধ্যে, বরফ-সঙ্কুল পর্ব্বত-প্রদেশে ঘুরিতে ফিরিতে হইবে, কত জনের হয়ত প্রাণ পর্য্যন্তও বিনষ্ট হইবে, কিন্তু তাহাতেও একটা আনন্দ আছে। ইহাতে রাজশক্তির সাহায্য লইবার বা সাহায্য প্রার্থনা করিবারও প্রয়োজন হইবে না। বহু বহু ইংরাজ নাবিকগণ এই ভারতবর্ষের অনুসন্ধানের জন্য ঘুরিয়া ফিরিয়া মরিয়াছেন, তাহাতে লাভ হইয়াছে এই, ইংরাজের ইতিহাস উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে, হাজার হাজার নরনারীর ভিতর তাৎকালিক পুরুষরত্নদিগের নাম অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। আমাদের দেশের যাঁহারা এ সকল বিভিন্ন কার্য্যের জন্য ব্রতী হইবেন তাঁহাদিগকে অসাধ্য সাধন করিতে হইবে, তাঁহাদিগের নামও এইরূপ অক্ষয় হইয়া থাকিবে। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর ন্যায় রোগে মরিয়া, শোকে পুড়িয়া, দুর্ভিক্ষে হাহাকার করিয়া প্রাণ দেওয়ার চেয়ে ইহা প্রীতিকর বোধ হইবে। নব্য ভারতের পূর্ব্বপুরুষগণ যাহা করিয়া গিয়াছেন আজ তাঁহাদিগকে বুঝিবার সময়, তাই মাটী খুঁড়িয়া পাহাড় খুঁজিয়া আমাদের সম্পত্তির উদ্ধার করিতে হইবে। ইহার ফলে দেশের ইতিহাস ত সুখলাভ পুষ্টিলাভ করিবেই পরন্তু বিংশশতাব্দীর শিক্ষা-দীক্ষার গভীর প্রেরণা সমুদয় এশিয়াকে ভারতবাসীর পদদাপে কম্পিত করিয়া দিবে। ঐ সকল অভিজ্ঞতার নানা ভাবের ফলে উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনীও পুষ্টিলাভ করিবে।

ইহাতে অর্থের প্রয়োজন যথেষ্ট আছে। প্রথমে দেশের অন্ন-সংস্থান করার প্রয়োজন বটে, কিন্তু আমরা খাইতে পাই না বলিয়া বিলাস বাসনা বিবাহ শ্রাদ্ধ কিছুই ত বাদ দিতে পারি নাই। সমাজে থাকিতে সামাজিকতা রক্ষা করিতে হইবে, জগতে বাস করিতে হইলে তাহার বুকের উপর জীবিত ভাবেই বিচরণ করিতে হইবে, নতুবা ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। আমাদের কিছু থাকুক আর না থাকুক সময় তাহা বুঝিবে না, সে সময় মত তাহার তাড়া দিবেই। সুতরাং ওলন্দাজ-যবদ্বীপ বলি-সুমাত্রা, ফরাসীর মাদাগাস্কার, ইয়াঙ্কি-আমেরিকা এবং ইংরেজের মিশর ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে। তাহাতে প্রাণপাত অর্থপাত দুইই হইবে। এদেশের সাপ-বেঙের কাছেও সাত রাজার ধন থাকে, আমাদের কর্ত্তব্য, অবস্থা, সময়, বুঝিয়া মনকে স্থির করিলে কিছুরই অভাব হইবে না।

পল্লী-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

"পল্লীর মধ্য দিয়াই ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে।" ইহা অতি খাঁটি কথা। "কাজেই যাহাতে মৃতপ্রায় পল্লীসমাজ পুরাতন আদর্শে আবার উজ্জীবিত হইয়া উঠে, যাহাতে পল্লীর নরনারীগণ দুঃখ-দারিদ্র্য মুক্ত হইয়া আবার সনাতন জীবন ধারায় জীবন মিশাইতে পারে, (দরিদ্রের ক্রন্দন নামক পুস্তকের) লেখক তাহারই পন্থা উদ্ভাবনে ব্রতী হইয়াছেন।" (মাঘ সংখ্যা, পৃঃ ২৯৭)। আমাদের জাতীয় চিন্তাস্রোত এই দিকে ধাবিত হইতেছে ইহা অতি সুখের ও আশার কথা। সাত-সমুদ্র তের-নদীর পরপারে বাস করিতেছি বলিয়া "দরিদ্রের ক্রন্দনের" সহিত আমার এখনও সাক্ষাৎ হয় নাই। সুতরাং বইখানাতে কি আছে তাহা বিশদভাবে জানিতে পারিলাম না। সে যাহা হউক, আমি নিম্নে যে কয়েকটা কথার অবতারণা করিতে ইচ্ছুক তাহা উক্ত পুস্তকের অনভিজ্ঞতায় বিশেষ কিছু আসিয়া যাইবে না বলিয়া আমার বিশ্বাস।

"দরিদ্রের ক্রন্দন" সমালোচনা করিতে যাইয়া আপনারা ২৯৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :— "পল্লীসমাজকে সভ্যতার কেন্দ্র করিতে হইলেই পল্লীতে যাহাতে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সন্তুষ্টচিত্তে জীবন-যাপনপূর্ব্বক দেশে নূতন নূতন চিন্তাজগত সৃষ্টি করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।" কয়েক পংক্তি অন্তর আবার লিখিয়াছেন "কাজেই, আজকাল যাহারা চিন্তাবীর তাঁহাদিগকেই গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। নতুবা গ্রাম কখনই সভ্যতার কেন্দ্র হইতে পারিবে না।" কথাগুলি খুবই সুন্দর। কিন্তু, কতদূর কার্য্যকরী?

যতই উক্ত কথাগুলি লইয়া আলোড়ন বিলোড়ন করিতেছি ততই উহার কার্য্য-কারিতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়িতেছি। গ্রামে কি "চিন্তাবীর"গণের "সন্তুষ্টচিত্তে" চিরবাস সম্ভবপর? আমাদের বাংলা দেশে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও প্রফুল্ল চন্দ্র রায় উভয়েই চিন্তাবীর। এই দুইজনকেই যদি আমরা পোটলা পুটলি বাঁধিয়া পল্লীতে পাঠাইয়া দেই তাহা হইলে ভারত-সমাজ ইহাঁদিগের নিকট হইতে কি আশা করিতে পারে? প্রতিকূল বিশ্ব-শক্তির সংস্পর্শে আসিয়াই মানব চিন্তাশীল হইয়াছে। ১৩২০ সালের মাঘের "গৃহস্থে" "প্রতিভা বিকাশের সুযোগ" নাম দিয়া এক প্রবন্ধে বঙ্গদেশেরই চিন্তাবীরগণের জীবনী আলোচনা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, গ্রামের পারিপার্শ্বিক চিন্তাশীল ব্যক্তি প্রণয়নের প্রতিকূল। ইয়োরোপ ও আমেরিকাতে ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে। ভারতবর্ষেও যে এই মন্তব্য খাটিবে তৎসম্বন্ধে আমি যে সমস্ত কথার আলোচনা উক্ত প্রবন্ধে করিয়াছিলাম এস্থানে তাহার পুনরোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কলিকাতায় যখন জাতীয় বিদ্যালয় প্রথম সংস্থাপিত হয় তখন রব উঠিয়াছিল প্রফুল্ল বাবু উক্ত বিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক হইবেন। কিন্তু পরে শুনিতে পাইলাম প্রফুল্ল বাবুর জাতীয়

বিদ্যালয়ে প্রবেশ কিছুতেই হইতে পারে না। প্রফুল্ল বাবু তখন যে সকল রাসায়নিক গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন তৎসাধনের সরঞ্জাম বঙ্গদেশে কেবলমাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজেই আছে। জাতীয় বিদ্যালয়ের সে সরঞ্জাম ক্রয় করার শক্তি নাই। তাই নবাবিষ্কারে বঙ্গদেশের, ভারতবাসীর, পৃথিবীর মুখোজ্জ্বল করিবার জন্য রায় মহাশয়কে প্রেসিডেন্সি কলেজেই থাকিতে হইল। পল্লী কি তবে "চিন্তাবীর" প্রফুল্লের আবাসস্থান হইতে পারে? পল্লী কি শীল মহাশয়ের গবেষণারও কেন্দ্রস্থান হইতে পারে? পল্লীতে বিরাট পুস্তকাগার কোথায়? আর, পল্লীতে যদি তুমি লেবোরেটরী ও পুস্তকাগার স্থাপন করিতে চাও তাহা হইলে কি সে পল্লী পল্লী রহিল? না সহর হইয়া গেল! সকল দেশের চিন্তাবীরগণ সহরেই শিক্ষিত। ইহাতে সহর জিনিষটীর মাহাত্ম্য কিছুই নাই। বিদ্যালাভ করিতে যে সকল সুপারিপার্শ্বিকের প্রয়োজন তাহা কেবল সহরেই মিলিবে। গ্রামে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কর, লেবোরেটরী, কারখানা, পুস্তকাগার স্থাপন কর—তৎক্ষণাৎ গ্রাম সহর হইয়া যাইবে। নালন্দা, ওদন্তীপুরী, বিক্রমশীলা, তক্ষশীলা প্রভৃতি শিক্ষাকেন্দ্র সমূহ পরিশেষে সহরেই পরিণত হইয়াছিল না কি? চিন্তারশ্মি চিরদিন নগর হইতেই গ্রামে যাইবে, গ্রাম হইতে নগরে আসিবে না। গ্রাম স্থিতিশীল; নগর উন্নতিশীল। গ্রামের অনুপ্রেরণা নগর হইতে আসে; নগরের অনুপ্রেরণা পৃথিবী হইতে আসে। নগর পৃথিবীর সহিত সংযুক্ত। গ্রাম তাহা নহে। গ্রাম প্রত্যক্ষভাবে বিশ্বশক্তি উপলব্ধি করিতে পারে না। তজ্জন্য গ্রাম সভ্যতার কেন্দ্র হইতে পারিবে না।

তাই বলে আমি গ্রামের অপ্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিতে চাই না। পল্লীশূন্য জাতির স্থায়িত্ব অল্পকাল। সমাজে পল্লীর কাজ অন্যরূপ। মানুষ যাহা অর্জ্জন করে তাহার উদ্বৃত্তাংশ সে অতি যত্নে এক নিরাপদ নিভৃত কোণে সঞ্চিত করিয়া রাখে। "ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্ম্ম"ও সেইরূপ আমরা পল্লীর মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি। সেই খানেই আজ হিন্দুজাতির জীবন। সেই পুরাকাল হইতে উৎপাতের পর উৎপাত আসিয়া ভারতের নগরসমূহ ধ্বংস করিয়া গিয়াছে, কিন্তু তৎসঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর হিন্দুত্ব ধ্বংস হয় নাই। পল্লী হিন্দুসভ্যতার রক্ষণ-গৃহ। পল্লীবাসী হিন্দুসভ্যতার প্রহরী। বিশ্বের ধ্বংসকারী শক্তি সেখানে পৌঁছাইতে পায় না। আজ ভারত পল্লীবহুল বলিয়াই সে জীবিত।

তাই পল্লীকে আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবেই। "চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ"কে গ্রামে বাস করাইয়া কাজ সমাধা করিবার প্রয়াস বিড়ম্বনামাত্র। এ আশা অযুক্তি-সঙ্গত, অস্বাভাবিক ও অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এ সম্বন্ধে আমার ক্ষীণবুদ্ধিতে আমি যে দুই একটা কথা ভাবিয়াছি তাহা নিম্নে লিখিতেছি।

আমার বিষয় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আর একটি কথা বলিতে চাই। ১৩২২ সালের চৈত্র সংখ্যার গৃহস্থের ৪৯৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "২।৩ বৎসর পূর্ব্বে মালদহের এক পল্লীতে মালদহ সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে এবং সম্প্রতি মুন্সীগঞ্জে বিক্রম-পুর সাহিত্য-সম্মিলন নিষ্পন্ন হইয়াছে। এইরূপ পল্লীতে সাহিত্যকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া পল্লী-সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বারা যত শীঘ্র মাতৃভাষার

উন্নতি এবং লোকের ধারণা ও মনোগতভাব উচ্চাকার ধারণ করিবে, সহরের সংখ্যা করা ২।৪টী সম্মিলনের দ্বারাও দেশের তেমন বিস্তর কাজ হইবে না।" ইহা অতি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব। কিন্তু সাহিত্য-পরিষৎ সভার উদ্দেশ্য ভিন্ন। ইহা একটি উচ্চাঙ্গের অনুসন্ধান সমিতি। পল্লী-সমস্যাসমূহের সহিত ইহার সাদৃশ্য খুব কম। পল্লীতে যদি সাহিত্য-কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করা হয় তাহা হইলে নূতন ভাব ও নূতন যন্ত্রপাতি লইয়া তাহাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে।

এখন দেখা যাউক পল্লীর অভাব কি কি।

১। শিক্ষার অভাব
২। ক্রীড়ার "
৩। পরস্পর মিশ্রণের সুযোগাভাব
৪। সেনিটেশনের অভাব।

এইগুলির প্রত্যেকটীর সহিতই আমরা সুপরিচিত। কাজেই এইগুলি বুঝাইতে যাইয়া আমাদের সময় ও কাগজ নষ্ট করিবার প্রয়োজন দেখি না। এখন দেখা যাউক কি উপায়ে এই অভাবগুলি দূর করা যায়। সাহিত্য-কেন্দ্র দ্বারা যে, একাজ করা যাইতে পারে না তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। আমাদিগকে অন্য এক সভার অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

আমাদের যাঁহারা দেশের বাহির হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই জগতের দুইটী অনুষ্ঠান দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকিবেন। একটি কুক্ কোম্পানির আফিস; দ্বিতীয়টী ওয়াই, এম, সি, এর গৃহ। প্রথমটীর সহিত আমাদের এ ক্ষেত্রে কোনও সম্বন্ধ নাই। ওয়াই, এম, সি, এ লইয়া একটু আলোচনা করা যাউক। পৃথিবীর যাবতীয় প্রধান প্রধান সহরেই এই কোম্পানির এক একটি আড্ডা আছে। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ব্যতীত যদিও অন্য কেহ এই অনুষ্ঠানের প্রধান সভ্য হইতে পারে না, তথাপি পৃথিবীর যে কেহ ইহার অনুষ্ঠান গৃহে যাইয়া আড্ডা পাতিতে পারে। গল্প গুজব, হাসি, ঠাট্টা, রং তামাসা বা গভীর আলাপ করিবার ইহাই এক সাধারণ স্থান। নানা ক্রীড়া-সরঞ্জামও এখানে দেখিতে পাইবে। এই অনুষ্ঠান-গৃহের সাজ-সজ্জায় আকৃষ্ট হইয়া সকলেই একবার ভিতরে ঢুকিতে চায়। বন্ধুবান্ধবের মিলন ও আদর অভ্যর্থনা করিবার ইহা অতি চমৎকার স্থান। ভারতবর্ষে যদিও এই অনুষ্ঠানের ততটা আধিপত্য দৃষ্ট হয় না কিন্তু এসিয়ার অন্যান্য স্থানে—বিশেষতঃ চীন দেশে ও পাশ্চাত্য দেশ সমূহে ইহার প্রভাব খুবই লক্ষিত হয়। এই অনুষ্ঠান গৃহে নিম্নলিখিত কাজগুলি অতি সুন্দরভাবে সাধিত হয়—

১। সাধারণ শিক্ষাপ্রচার
২। ক্রীড়ার সুযোগ
৩। পরস্পর মিশ্রণসুযোগ
৪। নানাপ্রকার উপদেশ ও নৈতিক শিক্ষা
৫। ধর্ম্ম শিক্ষা।

একই অনুষ্ঠানের দ্বারা যদি এতগুলি কার্য্যের সমাধা হইতে পারে তবে আমরা কেন ইহারই অনুরূপ অনুষ্ঠান স্থাপন করি না? আমাদের গ্রামে যাও দেখিবে অধিকাংশ গ্রামেই সাধারণের জন্য পাঠাগার নাই, ক্রীড়ার সুযোগ নাই; দিনান্তে পরিশ্রমের পর গ্রামবাসিগণের একত্র মিলিত হইয়া গল্প গুজব করিবার স্থান নাই। যেখানে সমাজ-জীবন (community life) তৈয়ার করিবার সরঞ্জামের অভাব সেখানে সমাজ-শক্তির (community spirit) স্ফুরণ হইবে কি করিয়া? আমরা মানিয়া লইয়াছি আমাদের জাতীয়-কেন্দ্র পল্লী।

সুতরাং যদি গ্রাম্যজীবন (*village life*) এর উৎকর্ষণেই আমরা অপারগ হই তাহা হইলে জাতীয় ভাবের মূলই কাঁচা রহিয়া গেল। পল্লীকে শত আবর্জ্জনা শত বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায় প্রত্যেক পল্লীতে social centre বা মিলন-কেন্দ্র স্থাপন করিতে হইবে। এই পল্লী-গৃহ সাধারণের সম্পত্তি; কোন ব্যক্তি বিশেষের ইহাতে কোনই অধিকার নাই। পল্লীর কল্যাণসাধনের জন্যই এই মন্দিরের সৃষ্টি এবং তাহাতেই ইহা উৎসর্গীকৃত হইবে। নিজের কোন সম্পত্তি থাকিলে যেমন তাহার প্রাণে আনন্দ সঞ্চার হয় সমস্ত গ্রামবাসীও সেইরূপ এই দুর্লভ সম্পত্তির অধিকারী হইয়া গৌরবান্বিত বোধ করিবে। কেবল স্বীয় পরিবারের উন্নতির কথা না ভাবিয়া পল্লীবাসিগণ পল্লীর উন্নতির কথাও ভাবিবে। ধীরে ধীরে তখন তাহারা বুঝিবে যে, পরিবার-ভুক্ত বলিয়া তাহাদের যেমন পরিবারের প্রতি একটা কর্ত্তব্য আছে, পল্লীবাসী বলিয়া পল্লীর প্রতিও তাহাদের একটা কর্ত্তব্য আছে। পল্লীর উন্নতিতে তাহাদেরই উন্নতি, অব-নতিতে তাহাদেরই অবনতি। এই ভাবে ক্রমশঃ পল্লীতে community spirit, civic spirit ও rights and duties of citizenship এর অর্থ প্রতি পল্লীবাসীই বুঝিতে পারিবে। পাশ্চাত্য জগত যাহা লইয়া বড়াই করে তাহা আপনা আপনিই আমাদের ঘরে আসিয়া হাজির হইবে।

বিষয়টা আর একটু তলাইয়া দেখা যাউক। পল্লীগৃহে একজন গৃহস্বামী থাকিবে। একটি পুস্তকাগার থাকিবে, পাঠাগার থাকিবে, বৃষ্টি বাদল হইলে ঘরের মধ্যে একটি খেলিবার ঘর থাকিবে, একটি গল্পগুজব করিবার ঘর থাকিবে। অল্পবয়স্ক ছেলেদের জন্যও একটি খেলিবার ও মিলিবার—পৃথক ঘর থাকিবে। গৃহস্বামীর আবাসস্থান পল্লীগৃহে থাকিলেই ভাল। পাঠাগারে বিশেষ পুস্তক রাখিবার প্রয়োজন নাই। (অর্থ থাকিলে যত পুস্তক কেনা যায় ততই ভাল) দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা রাখাই বিশেষ প্রয়োজন। ভিতরে ও বাহিরে নানা প্রকার পুষ্টিকর খেলার সরঞ্জাম রাখিতে হইবে। গান বাজনার বন্দোবস্ত থাকাও একান্ত কর্ত্তব্য। গ্রামে এইরূপ একটি কেন্দ্রস্থান নির্ম্মাণ করিতে পারিলে গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি সুনিশ্চিত।

প্রতি শনিবার বা রবিবারে গৃহস্বামী সমবেত পল্লীবাসী-সম্মুখে বক্তৃতা করিবেন। মহিলাগণকেও বক্তৃতা শুনিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইবে। বক্তৃতার বিষয় খুব সাধারণ হওয়া উচিত। ভারতের অতীত গৌরবের কথা বেশী না গাহিয়া বর্ত্তমানের উপরই নজর রাখা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। অন্যান্য দেশের কথাও ইহাদিগকে শুনাইতে হইবে। ভারতবর্ষ যে কেবল বঙ্গদেশ নয়—ও পৃথিবীটা যে কেবল ভারতবর্ষ নয় ইহাও শুনাইতে হইবে। পল্লীর বালকগণকে লইয়া গৃহস্বামীর সর্ব্বদাই ব্যাপৃত থাকিতে হইবে। যখনই সুবিধা হইবে তখনই উহাদের সহিত মিশিতে হইবে। নৈশ-বিদ্যালয়ের বন্দোবস্ত করিতে পারিলে খুবই ভাল হয়। প্রতি রাত্রিতে বিদ্যালয় না বসাইলেও দোষ নাই। সপ্তাহে তিন রাত্রি হইলেই যথেষ্ট বিবেচনা করিতে হইবে। ছোট ছোট বালক বালি-কারা তাহাদের গ্রামখানিকে যেন অতুলনীয় বস্তু বলিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিতে শিখে তাহারই বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

এই মন্দির কোন ধর্ম্ম বিশেষের সঙ্গে লিপ্ত থাকিবে না। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান সকলেই এই গৃহে প্রবেশ করিবার অধিকারী। এ গৃহের মূলমন্ত্র—গ্রামের উন্নতি সাধন। ব্যক্তিগত বা ধর্ম্মগত স্বার্থ সাধন নহে।

এইরূপ অনুষ্ঠান স্থাপন করিতে হইলে কি বিশেষ অর্থের প্রয়োজন হইবে? খুব সম্ভবতঃ গৃহ নির্ম্মাণের স্থান বিনামূল্যেই মিলিবে। উদ্দেশ্যসাধনোপযোগী গৃহ নির্ম্মাণ করিতে কিছু খরচ হইবে। মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে একজন উপযুক্ত গৃহস্বামী মিলিবে আশা করা যাইতে পারে। অন্যান্য খরচ ও পুস্তকাগারের জন্য মাসিক আরও ২৫৲ টাকা খরচ ধর্ত্তব্য। সুতরাং মাসিক খরচ ৭৫৲ টাকার উপরে উঠিবে না। আমার প্রাণভরা বিশ্বাস আছে যে, এত আশা ও উদ্যমের দিনে অনেক পল্লীই এইরূপ শুভানুষ্ঠানের জন্য মাসিক ৭৫৲ টাকা খরচ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। এ কাজের কৃতকার্য্যতা নির্ভর করিবে ইহার আন্দোলনকারীর উপর। যদি আমার এই কল্পনা সাধনোপযোগী হয় তাহা হইলে অনেকেই হয়ত ইহা সাধন করিতে অগ্রসর হইবেন।

পত্রিকার সম্পাদকগণের নিকট আমার এক নিবেদন আছে। জনসাধারণের মঙ্গল-কামনার জন্যই আপনারা পত্রিকা ছাপাইতেছেন। জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ, রীতি-নীতি সমাজ সমক্ষে প্রকাশ করা আপনাদের কর্ত্তব্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু যতই সময় যাইতেছে আর একটি কর্ত্তব্য আপনাদের ঘাড়ে আসিতেছে। আপনাদের এখন কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে হইবে। আপনারাই সকল কাজে আগুয়ান হইয়া চলিবেন। নূতন নূতন অনুষ্ঠান আপনাদিগকেই স্থাপন করিতে হইবে। পল্লীগৃহ স্থাপন যদি যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় তাহা হইলে আপনাদিগকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

অধ্যাপক ও শিক্ষক মহোদয়গণের নিকটও কয়েকটা কথা বলিবার আছে। এস্থানে তাহা সন্নিবদ্ধ করিলে বোধ হয় বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না। আমাদের কলেজের অধ্যাপকগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কেবল ছাত্র পড়ান। জার্ম্মাণীর এক আধুনিক শিক্ষা-বিভাগের রিপোর্টে দেখিতে পাই "জনসাধারণের সুশাসন বা অন্য কোন কার্য্য সম্বন্ধে যে সমস্ত গভীর সমস্যার উদয় হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ তৎসম্বন্ধে মত প্রকাশ করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া জানিবেন।" আমেরিকার যুক্তরাজ্যের উইস্কন্‌সিন্ প্রদেশেও এই নিয়মের প্রচলন দেখিতে পাই। উইস্কন্‌সিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ কেবল ক্লাসে ছাত্র পড়াইয়া বা লেবোরেটরীতে রাসায়নিক গবেষণায় ব্যাপৃত থাকিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন না। তাহাদের আরও অনেক মহৎ কাজ করিবার আছে। অর্থনীতি (Economics), সমাজ-তত্ত্ব, আইন প্রণয়ন প্রভৃতি সম্বন্ধে যে কোন সমস্যা উপস্থিত হয় গভর্ণমেণ্ট অমনি তৎসম্বন্ধে অধ্যাপকগণের নিকট উপদেশ লইবার জন্য অগ্রসর হন। অধ্যাপকগণ অনেক সময়ে দেশবাসীর উন্নতি ও সুখ বৃদ্ধির জন্যই খাটিতেছেন মনে রাখিয়া বিনা বেতনেই গভর্ণমেণ্টের খাটুনি খাটিয়া দেন। ইহাই Community spirit (সমাজ-শক্তি)।

আমাদের দেশে গভর্ণমেণ্ট ও অধ্যাপকগণে কোনও সম্বন্ধ দেখি না। জার্ম্মাণী বা উইস্কন্‌সিনের মত Community spirit

দেখাইবার সুবিধা আমাদের অধ্যাপকগণের নাই। কিন্তু পল্লীতে পল্লীতে যখন পল্লী-গৃহ স্থাপিত হইবে তাহার সংস্পর্শে আসিয়া অধ্যাপক ও শিক্ষকগণ তাহাদের স্বদেশ-হিতৈষণার ভারটা প্রত্যক্ষ ভাবে দেখাইতে অনেক সুযোগ পাইবেন। শুনিতে পাই প্রফুল্ল বাবু নাকি গ্রীষ্মাবকাশে দুর্জ্জয়লিঙ্গ বা শিমলা শিখরে সুখান্বেষণে না যাইয়া নিজ গ্রামে আসিয়া গ্রামবাসিগণের হৃদয়ে উচ্চভাব ঢুকাইবার চেষ্টা করেন। আশা করি বঙ্গ-দেশে আজ এ পথের পথিক প্রফুল্ল বাবু একা নহেন। পল্লী-গৃহ স্থাপিত হইলে গৃহস্বামী মাঝে মাঝে সহরের অধ্যাপক ও শিক্ষকগণকে ডাকিয়া আনিয়া গ্রামবাসিগণের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিবেন। এরূপে আজ একজন ডাক্তার আসিয়া, কাল একজন ধনবিজ্ঞানবিদ্ আসিয়া তারপর দিন একজন আধুনিক চাষ-বাসে অভিজ্ঞ লোক আসিয়া গ্রামখানিকে কিরকম ভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয়, co-operative credit system কাহাকে বলে, ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে ইত্যাদি সম্বন্ধে সহজ ভাষায় বক্তৃতা দিবার আয়োজন করিতে হইবে। ইহার জন্য অধ্যাপকগণকে কিছু সময়ের জন্য সহরের সুখ সাচ্ছন্দ্য ছাড়িয়া পাড়াগাঁয়ের পঙ্কিল পথে আসিয়া বিদ্যাসাগরের মত ময়রার দোকানে ছাতা পাতিয়া বসিতে হইবে। তবে যদি পল্লী আবার প্রাণ পাইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

পল্লীগৃহ তখন কেবল পল্লীর মিলন-কেন্দ্র নয়; ইহা তখন সহর ও পল্লীর—উভয়েরই মিলন-মন্দির। কেবল সহর লইয়া দেশ হয় না; কেবল গ্রাম লইয়াও দেশ হয় না। সহর চিন্তাবীরের আবাসস্থান বটে, কিন্তু সহরের সাধারণ লোক চঞ্চল প্রাণ; প্রতি-দিনই সহস্র প্রভাব আসিয়া তাহাদের মন অধিকার করিয়া বসিতেছে। মৌমাছির মত তাহারা এ ফুলে ও ফুলে মধু আহরণ করিতে চায়। কোনও একটা জিনিষ মনে ধরিয়া রাখিবার শক্তি তাহাদের অপেক্ষাকৃত কম। তাহাদের আশে পাশে যে সব জিনিষ ঘটিয়া যাইতেছে তাহা কেবল দেখিয়াই তাহারা সুখী। কিন্তু পল্লীবাসীর ধারণ করিবার শক্তি খুব বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। হইতে পারে ইহা তাহাদের অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন জীবন যাপনের ফল। তাহাদের অন্তরে যাহা একবার প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহা বাহির হইয়া যাইবার সম্ভাবনা খুবই কম। তাই বলিতেছিলাম পল্লী জাতীয় সভ্যতার রক্ষাকর্ত্তা আর সহর তাহার উৎপাদক। এখানে হয়ত বলিতে পারেন যদি তাহাই হয় তবে ভারতীয় বা চীন সভ্যতার মূলে যে মুনিঋষিগণ রহিয়াছেন তাঁহারাও পাড়া গাঁয়েরই সন্তান। তাহা খাঁটি বটে। কিন্তু আমরা এখন বিংশ শতাব্দীর হাওয়ায় মানুষ হইতেছি তাহা যেন ভুলিয়া না যাই। আমাদের এখন কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে প্রথমাবধি যুগসমূহের অর্জ্জিত জ্ঞানভাণ্ডার হজম করিতে হইবে এবং যাহাতে হজমকার্য্য অল্পসময়ে ও অনায়াসে হইতে পারে তদনুযায়ী অনুষ্ঠানেরও প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। অর্থাৎ—পুস্তকাগার চাই; লেবোরেটরী চাই; কারখানা চাই, মুদ্রাযন্ত্র চাই—এক কথায় একটি সহর চাই। বর্ত্তমান-কালের সমাজে সুখ-শান্তি আনিতে হইলে অনেক নূতন দোহাই দিতে হইবে। তাই আজ প্রাচীন পদ্ধতির পরিবর্ত্তন, প্রবর্দ্ধন ও সংযোজনার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু পঞ্চনদের উপকূলে বসিয়া যে মহাত্মারা আমাদের জাতীয় মন্ত্র লিখিয়া গিয়াছেন তাহাদের পশ্চাতে চাহিয়া দেখিবার দরকার হয় নাই। কারণ তাহারা নিজেরাই মানব সভ্যতার সৃজন কর্ত্তা। সকলই তাহাদের সম্মুখে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সন্তান অগ্র পশ্চাৎ দুইদিকেই চোক বুলাইতে বাধ্য।

দেখা গেল, পল্লীবাসী ও সহরবাসীর ধাত বিভিন্ন। তজ্জন্যই উভয়ের মিলন আবশ্যক; নচেৎ সভ্যতা টিকিবে না; এবং পল্লীগৃহই এই কাজ সাধন করিবার একমাত্র পন্থা। সহরের অধ্যাপক ও পাড়াগাঁয়ের দরিদ্র কৃষক মুখোমুখি হইয়া যখন ভারতীয় সভ্যতার বিচার করিতে বসিবে তখন নিশ্চয়ই ভাবিতে হইবে ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে নূতন জীবন দেখা দিয়াছে।*

শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর রক্ষিত।

---

* "চৈতন্ত লাইব্রেরী" বা "রামমোহন লাইব্রেরী" প্রভৃতি যে সমস্ত লাইব্রেরী আছে তাহারাও পল্লী গৃহস্থের উন্নতি বিধানে অনেক সাহায্য করিতে পারেন। এক সপ্তাহ কি এক মাসের জন্য অনায়াসেই তাহারা নানা প্রকার বই পল্লীবাসীর ব্যবহারের জন্য ডাকে পাঠাইয়া দিতে পারেন। ইহাতে তিনটী কাজ সাধিত হইবে—প্রথমতঃ, পুস্তক কিনিবার জন্য গৃহস্বামীকে বিশেষ অর্থব্যয় করিতে হইবে না। দ্বিতীয়তঃ—ডাকে সহরের "কর্ত্তাদের" নিকট হইতে পাড়াপড়শীদের পড়িবার জন্য বই আসিলে ঐ বই গুলির সম্মান দ্বিগুণ বাড়িয়া যাইবে এবং কৌতূহলবশতঃ বই পড়িবার আগ্রহ শতগুণ বৃদ্ধি পাইবে। তৃতীয়তঃ, সহরের বড় কর্ত্তারা যে গ্রামবাসীদিগকে ভুলিয়া নাই, তাহারা দূরে বসিয়াও যে তাহাদের পাড়াগাঁয়ের ভাইদের কথা এক আধটু ভাবে তাহাও বেশ প্রতীয়মান হইবে। সহর ও গ্রামের ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া যাইবে। সাহিত্য-পরিষৎও এই কাজে অগ্রসর হইতে পারে। এ সম্পর্কে বরদা রাজ্যের চলন্ত পুস্তকাগারের (circulation Library) কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক। আমেরিকার উইস্‌কন্‌সিন্‌ বিশ্ববিদ্যালয় চলন্ত-পুস্তকাগারের সাহায্যে গ্রামবাসীদিগকে কিরূপে শিক্ষিত করা যাইতে পারে তাহা সুন্দর রূপে দেখাইয়াছে। উইস্‌কন্‌সিন্‌ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি গ্রামে কেবল পুস্তক পাঠাইয়াই নিরস্ত থাকে না। অধ্যাপকগণ প্রতি বৎসরে গ্রামবাসীর নিকটে ৫০০ হইতে ৭০০ বক্তৃতা দিয়া থাকেন। কয়েকটি গ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা আমাকেও বক্তৃতা করিতে পাঠাইয়াছিলেন। পুস্তক ও বক্তৃতা পড়িয়া গ্রামবাসীরা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অধ্যাপকগণকে অনেক প্রশ্ন করিয়া থাকে। অনে সময় তাহারা চিঠিতেও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। ১৯১৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয় এইরূপ ১৫০০ চিঠির উত্তর দিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট ডাক্তার ভেন্‌হাইস্‌ একদিন সভায় বলিয়াছিলেন "আমরা এই প্রদেশের ধনী নির্ধন ও জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট হইতেই কর আদায় করিয়া এই জ্ঞান-মন্দিরটী নির্ম্মাণ করিয়াছি। এখন যদি আমরা উইস্‌কন্‌সিনের প্রতি গৃহে জ্ঞানের মহিমা বিস্তার করিতে অপারগ হই তাহা হইলে আমরা জনসমাজে মুখ তুলিব কি করিয়া তাই আজ উইস্‌কন্সিনে জ্ঞানালোক বিস্তারে এত চেষ্টা। ইহাই "The spirit of the University of Wisconsin." "The University is by the people, of the people, for the people" আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রাণ যদি এইভাবে অনুপ্রাণিত না হয়ে থাকে, তবে পল্লীর ক্ষুদ্র "পল্লী গৃহ"কেই ঐ ভাবে গড়িয়া তোলা যাক্‌।

প্রকাশের আনন্দ

জগতের সকলেই প্রথমে স্বভাবকে সঙ্গী করিয়া জন্মগ্রহণ করে। জীবের সেই প্রথম সঙ্গী জীবকে পালন, বর্দ্ধন, উন্নতি, ও বিকাশের মধ্য দিয়া আবার জীবের চরম-সীমায় লইয়া যাইয়া উহারই ধ্বংস সাধন করে। যে স্বভাব জীবনধারণের প্রধান সহায় তাহাই আবার কালক্রমে জীবন ক্ষয়ের হেতু হইয়া দাঁড়ায়, মানবেতর জীবের উহাই একমাত্র গতি ও পরিণতি, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মনুষ্যজাতির মধ্যে ইহা একটা প্রধান লক্ষ্যের বিষয় যে, মানব স্বভাবকে আশ্রয় করিয়া, স্বভাবের কোলে প্রতিপালিত হইলেও উহা হইতে ছুটিয়া যাইতে চাহে, এবং জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই স্বভাবের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দেয়। আর সেই যুদ্ধের ফলেই মানবজাতির জন্য অভ্রভেদী প্রাসাদ, লোমহর্ষণ ভীষণ অস্ত্র, অসীম সমুদ্রবাহী অর্ণবপোত প্রভৃতি পদার্থ সৃষ্টি করিতে দেখা যায়। স্বভাবের অনুগমন করিতে পারে না বলিয়াই মানুষের সমাজ-নীতি, অর্থনীতি ও ধর্ম্মনীতির দরকার। যে স্বভাব কাব্য, চিত্র, ভাস্কর্য্য, দর্শন প্রভৃতির জন্মদাতা সেই স্বভাবের উপর আধিপত্য করিতেই উহাদের জন্ম।

আমি এই প্রবন্ধে মানবের সৃষ্ট যাবতীয় বিষয়ের উৎপত্তির আলোচনা না করিয়া কিরূপে মানুষ প্রথমে স্বভাব হইতে ভাষার সৃজন করিয়াছে এবং সেই সৃজনের মূলে কি তথ্য নিহিত রহিয়াছে তাহারই সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা অতি সংক্ষেপে আপনাদিগের নিকট উপস্থিত করিব।

প্রকাশের আনন্দ হইতেই ভাষার সৃষ্টি। শব্দ নিত্য কিনা, শব্দের সহিত অর্থের নিত্য সম্বন্ধ আছে কিনা তাহা বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের আলোচনার বিষয় নহে। তবে বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, জীবের শব্দের সহিত ভাবের সম্বন্ধ রহিয়াছে। ভাব অর্থে reasoning বা logical thought আমার উদ্দেশ্য নহে, অন্তঃকরণের মধ্যে স্বভ-বের প্রেরণায় কতকগুলি মানসিক বৃত্তি কার্য্য করিতে থাকে। সেই ভাবগুলি বা মানসিক বৃত্তিসমূহ যখন ভ্রূণ অবস্থায় থাকে, তখন ঐ সমস্ত মানসিক ব্যাপারগুলির (mental processes) সহিত সাধারণ সংস্কার (বা instinct) এর পার্থক্য করা সুকঠিন; এমন কি অধিকাংশ স্থলে উহারা একই শ্রেণীর বলিয়া বোধ হয়। পশুপক্ষী প্রভৃতি মানবেতর জাতির মানসিক কার্য্যাবলির সহিত মানব-শিশুর মানসিক কার্য্যের পার্থক্য প্রথমতঃ অতি সামান্যই অনুভূত হয়। মানব শিশুর অর্দ্ধস্ফুট বাক্যগুলি প্রথমতঃ আমাদের আলোচনার বিষয় হইবে। মানবেতর জন্তুর কোন ভাষা আছে কিনা তাহা লইয়া পাশ্চাত্যদার্শনিকেরা অনেক গবেষণা করিতেছেন এবং তাঁহারা যে মীমাংসা করিয়াছেন তাহা সকলে স্বীকার করিবেন কি না জানি না। সুতরাং ঐ সমস্ত জন্তুর ভাষা বাদ দিয়া মানবের ভাষা সম্বন্ধেই আলোচনা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ কারণ মানবের ভাষা নাই একথা অন্ততঃ কোন মানুষেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন না।

প্রথমে বালক যখন অর্দ্ধস্ফুটভাবে শব্দ উচ্চারণ করিতে থাকে, তখন তাহার মনের

মধ্যে কতকগুলি মানসিক বৃত্তি কার্য্য করিতে থাকে। স্বভাবের প্রেরণায় বালক উহা প্রকাশ করিতে চাহে, প্রকাশ না করিলে বালক স্থির থাকিতে পারে না। উচ্চারণ-শক্তির অভাব ও স্বভাবের প্রেরণা এই দুয়ের মধ্যে একটা তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়; এবং শেষে বালকের উচ্চারণ-শক্তি ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করিয়া সংগ্রামে জয়লাভ করে। বালক এই জয়ের ফলে, এই মানসিক বৃত্তির প্রকাশের ফলে, স্বভাবের এই তীব্র প্রেরণার ফলে বিপুল আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। যতই সে প্রকাশ করিতে পায় ততই তাহার আনন্দ উছলিয়া উঠে। বালক উচ্চারণ শক্তি যতই বেশী লাভ করিতে সমর্থ হয় ততই একের পর আর একটী করিয়া ক্রমশঃ মানসিক বৃত্তি প্রকাশ করিয়া নির্ম্মল আনন্দ লাভ করিতে থাকে এবং প্রকাশের আনন্দ যতই সে উপলব্ধি করিতে থাকে ততই তাহার বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে শেষে ইহাই তাহার ভাষার আকার ধারণ করে। প্রসঙ্গক্রমে ইহা বলাও বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিও অনেক সময় আবেগের বশবর্ত্তী হইলে অজ্ঞাতসারে মানসিক বৃত্তি প্রকাশ করিয়া অনেকটা আশ্বস্তি (relief) অনুভব করে এবং অনেক সময় বিপুল আনন্দও উপভোগ করে। ইহা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেই বোধ হয়।

প্রকাশের এই যে আনন্দ ইহা সামান্য বিষয় নহে। যে সমস্ত বিশ্বকবির পদতলে পড়িয়া কত পাপী তাপীর হৃদয় শীতল হইয়াছে, কত শত মুমূর্ষু জাতি জাতীয় পথ অনুসন্ধান করিয়া জগতের ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে, যাহাদের কৃপায় কত শত নরপিশাচের হৃদয়-মরুতে প্রেমের পূত মন্দাকিনী বহিয়াছে, এক কথায় যাহাদের কৃপায় ধরা এখনও জ্ঞান ও প্রেমের হিল্লোলে বিভোর রহিয়াছে তাহাদের রচনার মূলেও ঐ প্রকাশের আনন্দ রহিয়াছে। যদিও কবিগণ কখনও কখনও একটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া রচনা করিতে বসেন কিন্তু অধিকাংশ সময়েই ঐ উদ্দেশ্য আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠে, আনন্দই মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়, reason aestheticকেই উচ্চ আসন প্রদান করে। কবি মনের ভাব প্রকাশ করিয়া আনন্দ পান তাই তাহার কাব্য অথবা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না তাই তাঁহার কবিতা। কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, বালকের ঐ যে অর্দ্ধস্ফুট শব্দ তাহাতেই কাব্যের ব্যঞ্জনা রহিয়াছে ভাষার এক একটী শব্দ বা কথা এক একটী খণ্ড কাব্য তাই মনীষী দার্শনিক পণ্ডিত Emerson বলিয়াছিলেন "Language is fossil poetry—Every word was once a poem." মানুষের ভাষা আছে তাই মানুষ মানুষ তাই অন্য জীব হইতে মানবের আসন এত উচ্চে, ভাব প্রকাশের এই উপায় আছে তাই মানুষের এত ধর্ম্ম, নীতি, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শন কারণ "The man is only half himself the other half is his expression" তাই বুঝি বেদের কর্ম্মকাণ্ডে শব্দের এত সম্মান তাই বুঝি "স্ফোটের" এত আদর তাই বুঝি পাশ্চাত্য জগতে Logosএর এত গৌরব। আবার একটু অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যায় এই Logos সৃষ্টি-রহস্যের সহিত কিরূপ নিগূঢ়ভাবে জড়িত। বাইবেলে দেখিতে পাই in the beginning of the world

there was Logos আবার এই Logos শ্রীমদ্ভাগবতে "ব্রহ্মার নাদে"র মূর্ত্তিতে সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত জড়িত হইয়া রহিয়াছে।

একটু তলাইয়া দেখিলে ইহা বলাও বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, প্রকাশের এই আনন্দ হইতেই বিশ্বের এই সৃষ্টি। সচ্চিদানন্দের আনন্দের দিকটা এই ভাবে দেখিলে তাহার স্বরূপের বিকাশ অনেকটা উপলব্ধি হইতে পারে। যাহার মূলে একদিন বালকের অর্দ্ধস্ফুট শব্দের সন্ধান পাইয়াছিলাম তাহার মূলেই আবার বিশ্বনিয়ন্তার সৃষ্টিরহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে। যিনি পূর্ণব্রহ্ম তাঁহার আবার সৃষ্টির প্রয়োজন কি? তাঁহার সৃষ্টির প্রয়োজন এই যে, তিনি নিত্য আনন্দস্বরূপ, তাঁহার আনন্দ অনন্ত, অফুরন্ত, এই আনন্দের উপলব্ধির নিমিত্তই তাহার সৃষ্টি, এই সৃষ্টির মধ্যেই তিনি আনন্দের সন্ধান পাইয়া থাকেন তিনি "রসোবৈসঃ" এই সৃষ্টিই God's realisation—God realises himself in through the world (Hegel) তাঁহার এই যে realisation তাহাই তাঁহার প্রকাশের আনন্দ, তাহাই তাঁহার সৃষ্টি—তাই বুঝি গোলোক রাধিকার প্রীতিময় বোধ হয় নাই, তাই যখন বৃন্দাবনের মোহন মুরলী বাজিয়া উঠিয়াছিল তখন তিনি গোলোক ছাড়িয়া বৃন্দাবনের মধুরলীলার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন—তাই বিষ্ণু কেবল বিষ্ণু হইয়া স্থির থাকিতে পারেন নাই শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও বৃন্দাবনে নিজ প্রকাশের আনন্দ জগতকে বিলাইয়াছেন তিনি দেখাইয়াছেন যে, তিনি "মধুর মধুর মেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাম্"আর সেই মধুর রস আবার আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে স্বয়ং গৌরাঙ্গ বেশে আস্বাদন করাইয়া জগতে আনন্দের প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবনের নিত্যলীলার সেই মধুর লীলার রহস্য জীবকে বুঝাইয়া গিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণশশী গোস্বামী।

কর্ম্মের আহ্বান

(রবীন্দ্রনাথের 'হৃদয়-যমুনার' ছন্দানুসরণে)

যদি অমর হইতে চাও, এস বীর এস, মোর
হৃদয়-মাঝে!
হেথা নিশি-দিনমান, কাঁপাইয়া ভূ-বিমান,
গভীর আঁরাবে রণ-দামামা বাজে!
আজি বক্ষে আসি মম, স্খলিত কুসুম সম
জড়তা ভীরুতা যত মরিছে লাজে!
এস বীর-পদ-ভরে, বৃথা-শঙ্কা ফেলি দূরে,
নির্ভীক হৃদয়ে এস সমর-সাজে!
যদি অমর হইতে চাও, এস বীর এস, মোর
হৃদয়-মাঝে!

যদি পঙ্কিল-সমাজ দেহ, ধুইয়া ফেলিতে চাহ
নীতির জলে ;
ম্রিয়মান স্বদেশেরে, যদি চাও তুলিবারে—
জাগায়ে ধরমে জ্ঞানে আপন বলে ;—
এস বীর এস চলি, ক্ষুদ্র স্বার্থ পায়ে দলি,
মায়ার নির্ম্মোক চারু দূরেতে ফেলে !
দাঁড়ায়ে হৃদয়ে মোর, মুছিয়া নয়ন-লোর,
স্বদেশ চাহিয়া দেখ আকাশ-তলে !
যদি পঙ্কিল সমাজ-দেহ, ধুইয়া ফেলিতে চাহ
নীতির জলে !

যদি মানবে দেখাতে চাহ, সত্যের নির্ম্মল পথ
ভুবন ধামে ;
আভিজাত্য-গিরি ত্যজি, নীরবে এস গো আজি,
নিখিল মানব মাঝে ভূতলে নেমে !
ভেদাভেদ যাও ভুলি, ভালবাস ভাই বলি,
ছোট বড় সকলেরে গভীর প্রেমে !
দেখিবে এ বসুধায়, আপন আলয় প্রায়,
সতত বরিষে সুধা তারকা-সোমে !
যদি মানবে দেখাতে চাহ, সত্যের নির্ম্মল পথ
ভুবন-ধামে !

যদি অমর হইতে চাও, এস বীর এস, মোর
হৃদয়-মাঝে !
গভীর মরম দেশে, দেখিবে করম শেষে
কি শীতল শান্তি-সুধা স্থির বিরাজে !
ধরার সন্তাপ নাশি, ছড়ায়ে বিমল হাসি
কি অমৃত গীত-গান সতত বাজে !
তাই বলি এস চলে, স্বার্থের বন্ধন-খুলে,
পায়ে দলি, বীরমণি, সঙ্কীর্ণ কাজে !
যদি অমর হইতে চাও, এস বীর এস, মোর
হৃদয়-মাঝে !

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী

ভারতীয় মুসলমানরাজগণের সাহিত্যসেবা
ও
শিক্ষা বিস্তার

১০৪৪ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আকবর

চিত্রশিল্পের সহোদরা সঙ্গীতবিদ্যাও সম্রাটের দ্বারা যথেষ্ট উৎসাহিত হইয়া এবং তাঁহার রাজত্বকালেই উন্নতির চরম সীমা লাভ করিয়াছিল। তাঁহার সভায় সঙ্গীতজ্ঞ হিন্দু, ইরাণী, তুরাণী ও কাশ্মীরি পুরুষ ও রমণীগণ বাস করিতেন। এই সকল সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণ সাত ভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন; প্রত্যেক ভাগের জন্য সপ্তাহে একদিন নির্দ্দিষ্ট ছিল। ১ জগদ্বিখ্যাত গায়ক মিঞা তানসেন আকবরের দরবারের গায়ক ছিলেন। তিনি মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন; গোয়ালিয়রে তাঁহার সমাধিস্থান ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞগণের নিকট তীর্থস্থানরূপে পরিণত হইয়াছে। ঠিক সেই সময়ে তানসেনের সঙ্গীত-গুরু হরিদাস এবং দ্বিতীয় তানসেন রামদাসও লক্ষ্ণৌ হইতে আসিয়া মিলিত হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, কোন একটী ঘটনা উপলক্ষে খাঁ খানের ২ নিকট হইতে এক লক্ষ টাকা উপহার পাইয়াছিলেন। তানসেন এবং রামদাস সত্বেও আকবরের সভায় নিম্নলিখিত গায়কগণও ছিলেন ৩:—

সুভান খাঁ,
শ্রীগ্যান খাঁ, গোয়ালিয়রের,
মিঞা চাঁদ

সুভান খাঁর ভ্রাতা বিচিত্র খাঁ,
মহম্মদ খাঁ ধারী,
দাউদ ধারী,
সরুদ খাঁ } গোয়ালিয়রের
মিঞা লাল }

তানসেনের পুত্র তানতরঙ্গ খাঁ,
বাদসাহ-নামা৪তে উল্লেখ আছে,
তানসেনের অন্যতম পুত্র বিলাস,
মুল্লা ইসাক্ ধারী,
গোয়ালিয়রের নানক জরজু,
রামদাসের পুত্র সুরদাস,
গোয়ালিয়রের চাঁদ খাঁ
আগ্রার রঙ্গসেন,
মুল্লা ইসাকের ভ্রাতা রহমতুল্লা এবং পীরজাদা।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সঙ্গীত-যন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগের বিখ্যাত বাদক ছিলেন;—

সরমণ্ডল যন্ত্রে—গোয়ালিয়রের বীরমণ্ডল খাঁ কৃতী ছিলেন;

1 *Aini-Akbari*, p. 612 (Blochmann).

2 *Tarikhi-Baduuni*, Elliot v, p. 482; and N. A. Willard's *Treatise on Hindu Music*, p. 214.

3 Willard, pp. 213 ff., and Blochmann's *Aini-Akbari*, pp. 612, 613.

4 *Badshah-Namah*, by 'Abdul Hamid Lahauri, vol. ii, p. 5.

বীণ যন্ত্রে—শিহাব খাঁ ও পুরবীন খাঁ;

ফ্লুট (ন্যাই) যন্ত্রে—মস্‌হদের উস্তা দোস্ত;

করণা যন্ত্রে—সেখ দেওয়ান ধারী;

তাম্বুরা যন্ত্রে { হিরাটের উস্তাই য়ুসুফ, মশহদের সুলতান হাশিম, উস্তা মহম্মদ আমীন এবং উস্তা, মহম্মদ হোসেন।

ঘিচক যন্ত্রে { মশ্‌হদের মীর সৈয়দ আলী ও হিরাটের বৈরাম কুলী,

কুবুজ্ যন্ত্রে কিপচাকের তাস্ বেগ,

কাশিম, কুবুজ ও রুবাব যন্ত্রের মধ্যবর্ত্তী স্বরবিশিষ্ট এক যন্ত্র আবিষ্কার করেন,

সুর্‌ণা যন্ত্রে উস্তা শা মহম্মদ এবং কানুন যন্ত্রে মীর আবদুল্লা সুপণ্ডিত ছিলেন।

আকবরের রাজত্বকালে সঙ্গীতশিল্পও উন্নতির চরম সীমায় পৌছিয়াছিল। যন্ত্র সঙ্গীতের সঙ্গে, স্বর সঙ্গীতও তুল্যরূপে আদৃত হইয়া বিভিন্ন 'রাগ-রাগিণী'তে বিকাশ পাইয়াছিল; কিন্তু চর্চ্চার অভাবে সেগুলি এখন বিস্মৃত প্রায়। ১

সঙ্গীতরাজ্যে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই সঙ্গীত বিষয়ে যাহা কিছু দাতব্য ছিল তাহাই পরস্পরকে দান করিয়া বড় করিয়া তুলিতে ছিলেন। আকবরের রাজত্বেই এই অন্তরঙ্গ ভাব নূতন নহে বরং আরও অনেক পূর্ব্ব হইতেই এই ভাব চলিয়া আসিতেছিল। মুসলমানগণের আগমনের পর হইতেই, ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসের ন্যায়, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমবায় ও সৌহৃদ্যের এরূপ আর একটী অধ্যায় প্রস্তুত হয় নাই। উদাহরণ স্বরূপ জৌণপুরের সুলতান হোসেন শরকী 'খেয়ালে'র আবিষ্কারক; উহা হিন্দু সঙ্গীতের একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে এবং এতৎসঙ্গে ধ্রুপদ দ্বারা মুসলমান সঙ্গীত বিভাগও যথেষ্ট সম্পত্তিশালী হইয়াছে। ২ প্রাচীন সময়ে ভারতীয় সঙ্গীতের ধারা বর্ত্তমান যুগের সঙ্গীতের ধারা অপেক্ষা হীন ছিল না। দীর্ঘ শত শতাব্দী যাবৎ এইরূপ সংমিশ্রণের ফলে যথেষ্ট লাভেরই প্রমাণ দেয়।

এই সময়ে দেশের বিভিন্ন অংশেই সঙ্গীতের চর্চ্চা হইতেছিল। আমরা ইতঃপূর্ব্বেই দেখিয়াছি মালবের বজ্‌বাহাদুর কিরূপভাবে ইহার উন্নতি ও উৎসাহের জন্য নিজেকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন। আবুল ফজলের মতে দেখা যায় কাশ্মীরে সে সময় অনেক উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন। ৩

কেবলমাত্র সম্রাট অথবা প্রাদেশিক প্রধান কর্ম্মচারিগণই যে এই কলার দিকে নজর দিয়াছিলেন এমন নহে বরং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এবং তাঁহাদের পরিবারমাত্রেই এই আমোদে প্রীত হইতেছিলেন। ৪

মুসলমান রাজগণের দ্বারা কলাবিদ্যার শাখাবিশেষ চিত্রিত হস্তাক্ষর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আদৃত হইয়াছিল এবং আকবরের রাজত্বে নিম্নলিখিত লিখন প্রণালী প্রবল ছিল। ৫

---

1 *Vide* Willard, pp. 101 ff.
2 *Vide* Willard, pp. 101 ff.
3 Gladwin, p. 411.
4 Gladwin, p. 735.
5 Blochmann's *Aini-Akbari*, p. 99.

সালস
তৌকি
মহক্ কক্
নস্খ
রেইহান
রিকা এবং
ঘুবার,

৯২০ খৃঃ অব্দে ইবনি-মুক-লাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

যাহা হউক কেহ কেহ ধারণা করেন ইয়াকুট মুস্তাসমী নস্খ পদ্ধতির আবিষ্কারক। তালিক ভিন্ন পদ্ধতির অক্ষর, তাজি সলমানীতে উহার বিষয় লিখিত আছে। আস্‌রফ্‌ খাঁ সম্রাট আকবরের নিকট মীর মুন্সী বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তিনি এই পদ্ধতির হস্তাক্ষর লেখায় যথেষ্ট কৃতী ছিলেন। সুবিখ্যাত নষ্টালীক বর্ণমালার সমুদয়ই বক্রভাবের। এইরূপ উক্ত আছে যে তৈমুরের রাজত্ব সময়ে খাজা মীর আলি তব্রীজী, নস্খ ও তালিক উভয়ের কতকাংশ লইয়া উহা রচনা করেন। আবুল ফজল বলেন উক্ত সম্রাটের রাজত্বের পূর্ব্বেই ঐ লিখন প্রণালী প্রচলিত ছিল; সুতরাং মীর আলী উক্ত বর্ণমালার রচয়িতা নহেন।

আকবর সুলেখক বিশেষতঃ নষ্টালীক বর্ণমালার লেখকদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। মুদ্রণ পদ্ধতি আবিষ্কারের পূর্ব্বে পরিষ্কার ও সুদৃশ্য হস্তাক্ষরের প্রয়োজন ছিল; সুতরাং এই শিল্পের উপর এত বেশী জোর দেওয়ার ইহাই একমাত্র কারণ ছিল। আকবরের দরবারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট লেখক ছিলেন—

মহম্মদ হোসেন কাশ্মীরী জরিকলম,
মুল্লা মীর আলী এবং তৎপুত্র,
মৌলানা বাকির,
মহম্মদ আমীন মশ্‌হদী,
মীর হুসাইনী কুলঙ্কী,
মৌলানা আবদুলহায়ী
মৌলানা দৌরী,
মৌলানা আবদুল-রহীম,
মীর আবদুল্লা
নিজামী কাজবীনী
আলী চমন কাশ্মীরী
নূরুল্লা কাশিম আর্শলান। ১

সম্রাট আকবর তাঁহার পুত্র ও পৌত্রদিগের শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট যত্ন লইয়াছিলেন। তাহাদের শিক্ষার তত্ত্বাবধানের জন্য সুখ্যাতি-সম্পন্ন পণ্ডিত নিয়োগ করেন। কুতবুদ্দীন খাঁ ও আবদুল রহীম মীরজা—সলীমের; ফৈজী ও শরীফ খাঁ—মুরাদের এবং শৈয়দ খাঁ চাল্‌তাই—দানিয়ালের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মুরাদ খৃষ্ট-ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে শিক্ষা পাইয়াছিলেন। তিনি কোন কোন খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকের নিকট বাইবেলের একার্দ্ধ (New Testament) পড়িয়া ছিলেন। সম্রাট তাঁহার এক পৌত্রকে আবুল ফজল ও একজন ব্রাহ্মণের শিক্ষাধীন রাখিয়াছিলেন। ২

1 Blochmann, p. 103.
Noer's *Akbar*, vol. ii, p. 247.

Faizi was once appointed Daniyal's tutor (*vide Muntakhabul-Tawarikh*, vol. ii, (Lowe), p. 297). "Akbar committed the education of his favourite son Murad to Father Manserrat to be instructed in the sciences and religion of Europe. One day the young prince began his lesson in the Emperor's presence with these words, 'In the name of Almighty God.' 'Add, my son,' said Akbar, 'and of Jesus Christ, the true Prophet.'—Hough's *Christianity in India*, p. 270.

আকবরের রাজত্বকাল নিম্ন ও উচ্চ বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাপ্রণালীর নূতন ধারা প্রবর্ত্তনের এক নূতন যুগ। শিক্ষার যে নূতন ধারা প্রবর্ত্তন এবং উন্নতির পন্থা প্রদর্শিত হইয়াছিল ইহা সম্রাটের উদার হৃদয়ের কাজ; এবং তাহার চরিত্রবত্তা আরও অনেক দিকে বিকশিত হইয়াছিল। আমরা আকবরের চরিত্রে, খুব সম্ভবতঃ মুসলমান ইতিহাসে এই প্রথম দেখিতে পাই যে, একজন মুসলমান সম্রাট সরল অন্তঃকরণে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সমভাবে শিক্ষাবিস্তারের জন্য উৎসুক ছিলেন। আমরা এই প্রথম দেখিতেছি হিন্দু ও মুসলমান একই স্কুলে ও কলেজে পাঠ করিতেছিলেন। পাঠের এই রকম সংস্কার সত্ত্বেও সম্রাট পড়াইবার ধারা ও পাঠ্য তালিকা প্রভৃতির অনেক সংস্কার সাধিত করিয়া-ছিলেন। পাঠের সুফল দর্শন করিয়া আবুল ফজল গর্ব্বের সহিত বলিয়াছিলেন "সমুদয় সভ্য জাতিরই যুবকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয় আছে; কিন্তু হিন্দুস্থান তাহার বালকদিগের বিদ্যামন্দিরের জন্য বিখ্যাত। ১

বালকদিগকে প্রথমেই উচ্চারণ ও ছেদভেদে পারশী বর্ণমালা শিক্ষা করিতে হইত। এইরূপে এত দ্রুত উন্নতি হইতেছিল যে, দুই অক্ষরের বানান শিক্ষা করিতে দুই দিনের বেশী আবশ্যক হইত না। এক সপ্তাহ পর ছাত্রগণ গদ্যে অথবা পদ্যে ধর্ম্ম কিংবা নীতিবিষয়ক ছোট ছোট লাইন পড়িতে পারিত, ঐ পাঠের মধ্যে সাধারণতঃ ঐ সকল বানান দেখিতে পাইত। যখনই তাহারা নিজে ঐ পাঠ শিক্ষা করিত তখনও শিক্ষকের নিকট হইতে সাহায্য পাইত। তারপর কিছুদিন শিক্ষক এক নূতন রকমের বর্ণযোজনা শিক্ষা দেওয়ার পর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ছাত্রগণ দ্রুত পড়িতে পারিত। শিক্ষক যুবক ছাত্রদিগকে দৈনিক চারিটী কাজ দিতেন যথা—বর্ণমালা, শব্দ গঠন একটী নূতন শব্দের সন্ধি অথবা বিশ্লেষণ এবং পূর্ব্বে তাহারা যে পাঠ করিয়াছে তাহার পুনরাবৃত্তি করা। এই প্রণালীদ্বারা যথেষ্ট উন্নতি হইতেছিল; পূর্ব্বে যাহা কয়েক বৎসরের নির্ব্বাচন ছিল এখন তাহা কয়েক মাসের মধ্যেই প্রসিদ্ধির সহিত সম্পন্ন হইতেছিল। নিম্নলিখিত প্রণালীতে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত:—নীতি, পাটীগণিত, হিসাব, কৃষি, জ্যামিতি, জরিপি, জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান, শাসন-প্রণালীর বিশেষত্ব, পদার্থবিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, বাজার দর, ধর্ম্মতত্ত্ব এবং ইতিহাস। হিন্দুগণ জ্ঞানের জন্য ব্যাকরণ, বেদান্ত এবং ও পতঞ্জলি প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও অবস্থার সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত করিয়া শিক্ষা করিতেন। আবুল ফজল বলেন এই নিয়ম প্রণালীর দ্বারা বিদ্যালয় গুলি নূতন আকারে এবং কলেজগুলি প্রাণ পাইয়া সাম্রাজ্যের গৌরবের বস্তু হইয়াছে।২

সম্রাট এইরূপে শিক্ষার পরিবর্ত্তন করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি ক্রমাগত দুর্গ, প্রাসাদ, কলেজ এবং মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়া ৩ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন।

আকবর ফতেপুর সিক্রিতে একটী বড় কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। "খুব কম পরিব্রাজকই এইরূপ বড় আর একটীর নাম

1 Gladwin, pp. 192, 193.
2 Blochmann's *Aini-Akbari*, pp. 278, 279; Gladwin, pp. 192, 193.
3 Gladwin, p. 146

করিতে পারিয়াছেন।" ১ লালা শীলচাঁদ খুব সম্ভব এই মাদ্রাসা সম্বন্ধেই বলিয়াছেন "আকবর আজমীর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ফতেপুর সিক্রিতে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন এবং মাদ্রাসা, ও থাঁকা সমন্বিত বহু অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।" ২ এই কলেজ ব্যতীত আকবরের রাজত্ব কালে নগরের মধ্যে আরও কতকগুলি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ৩

আগ্রাতেও কতকগুলি মাদ্রাসা ছিল, সেখানে মুসলমান বিদ্যা-জগতের বিখ্যাত কেন্দ্র সিরাজ হইতে কয়েক জন অধ্যাপক আনয়ন করা হইয়াছিল। ৪ শীলচাঁদ লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাহার সময়েও আগ্রাতে খুব বৃহৎ একটী মাদ্রাসা বর্ত্তমান ছিল। আকবর সিরাজের একজন দার্শনিককে এই বিদ্যালয়ে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ৫

উল্লেখ করা উচিত যে, দীল্লির কলেজ মাত্রেই ছাত্রাবাস ছিল না। সুপণ্ডিত সেখ আব্দুল হক ২০ বৎসর বয়সে ব্যবহারিক জ্ঞানের অনেকগুলিতেই কৃতিত্বলাভ এবং কোর-আনের সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন ৬। তাঁহার বিবরণী হইতে জানা যায় যে, তিনি দীল্লির কোন কলেজে গ্রীষ্ম ও শীত ঋতুতে প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় পাঠার্থ উপস্থিত হইতেন। নিজের বাসায় ফিরিয়া আহারের জন্য খুব কম সময়ই পাইতেন, তাঁহার আবাস স্থান কলেজ হইতে ২ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল; সুতরাং তাঁহাকে দিবসে ৮ মাইল যাতায়াত করিতে হইত ইহাতে তাঁহার যথার্থ শিক্ষানুরাগ প্রমাণ করিতেছে। ৭

যখন আমরা সেই সময়ের স্কুল, কলেজের বিষয় আলোচনা করি তখন যেন খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের গৃহশিক্ষা দানের কথা ভুলিয়া না যাই। ইতঃপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সাহিত্য-সমিতিগুলি যে কাজ আরম্ভ করিতেন তাঁহারা সেই কাজ প্রচারিত করিতেন এবং বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হওয়ার পর কলেজ শ্রেণীর পাঠের বন্দোবস্তও করিতেন। এইরূপ জানা যায় যে, তারিখি বাদাউনীর প্রণেতা আব্দুল কাদির তাঁহার আগ্রার পাঠ শেষ করিয়া, এই উদ্দেশ্যেই তাঁহার বসোয়ারের বাড়ী ছাড়িয়া শিক্ষাগুরু মীর আলী বেগের গৃহের উদ্দেশে যাত্রা করেন এবং সেই খানেই

1 *Aini-Akbari*, vol. ii, (Jarrett), p. 180.

2 *Tafrihul'-Imarat*, by Lala Silchand, MS. in ASB, leaf 243. The Persian MS. *'Imaratul-Akbar*, by Chahtar Mal, which gives a detailed account of the edifices built by Akbar, and which has been so highly spoken of by Mr. Beale in *F.A.S.B.* (1875) pp. 117, 118, very probably mentions the Sikri College. I regret I could not use this rare MS., as the one belonging to ASB procured by Prof. Blochmann is missing.

3 *Vide Khulasatul-Tawarikh*, as quoted in J. Sarkar's *Topography of the Mughal Empire*, p. 24, corresponding to *Khulasatul-Tawarikh*, MS. in ASB, leaf 25.

In Gujrat there was a madrasah built by Sadiq Khan. Shaikh Wajihuddin Ahmad used to teach here, and when he died he was buried within this college (1589 A.D.),—*Mirati-Ahmadi*, vol. ii, p. 45.

4 *Tafrihul-'Imarat*, MS. in ASB, leaves 39, 41.

5 *Ibid*, leaf 41.

6 *Badshah-Namah* of 'Abdul Hamid Lahauri, Elliot, vi, p. 176.

7 *Akhbarul-Akhyar*, 'Abdul Haqq, Elliot, vi, p. 176, corresponding to its lithographed ed. p. 357.

বাসা করিয়া জ্ঞানার্জ্জন করিতেছিলেন।১ এইরূপ শিক্ষাদানের রীতি সুদূর কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছিল; বিশেষতঃ কলা ও বিজ্ঞানের যে সকল বিভাগের জন্য স্কুল ও কলেজ নির্ম্মিত হইয়াছিল সেই সব বিষয়ের কোন কৃতিত্ব লাভই ঘটে নাই,—যেমন সঙ্গীত, চিত্র ও অন্যান্য কলা, নানাবিধ শিল্প, কোন এক বিষয়ের উচ্চ শিক্ষা এবং এইরূপ আরও অন্যান্য বিষয়।

সম্রাট আকবর ফিরোজ শাহের ন্যায় সর্ব্বদাই কলা বিদ্যার উৎসাহ দান করিতে এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ যাঁহারা কৌতুকাবহ কলকব্জার আবিষ্কার করিতে পারিতেন তাহাদিগকে পুরস্কার দিতে মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি যেসকল কলকব্জার কার্য্যের জন্য পুরস্কার দিয়াছেন উহা বিংশ শতাব্দীর কোন কারিগরের পক্ষেও যথেষ্ট সুখ্যাতির বিষয় হইত।২

আকবর এবং তাঁহার বংশধরগণের রাজত্বকালেও দেখিতে পাই কেবলমাত্র সম্রাট নহেন, মধ্যবিত্ত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিমাত্রেই শিক্ষাবিস্তারে পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৫৬১ খৃঃ অব্দে (৯৬৯ হিজিরাতে) আদম খাঁর মাতা সম্রাট আকবরের স্তনদাত্রী ধাত্রী মাহম আনূগ কর্ত্তৃক একটী মাদ্রাসা নির্ম্মিত হইয়াছিল।৩

ইহা নিশ্চয়ই সুখ্যাতির ও প্রশংসার কথা যে, তিনি এই প্রণালীই শিক্ষোন্নতির একমাত্র কারণ ভাবিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত বিবরণটী হইতে দেখা যায় যে, এই মাদ্রাসার সন্নিহিত মসজিদটী অতিশয় সুদৃশ্য ছিল।

ইহা "লাল রঙের দ্বারা চিত্রিত প্রস্তর ও গ্রেনাইট এবং সুদৃঢ় প্রস্তর ও আস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল; ফটকটী কতকাংশে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে কিন্তু এক সময়ে যথেষ্ট সুদৃশ্য ছিল। মসজিদের

1 *Tarikhi-Badauni*, Elliot v, 493.

2 "One of the wonders of art which was exhibited this year, 1003 A.H. (1594 A.D.), was the work of Sayyid Husain Shirazi. He used to stand with a box in his hand, and when any one gave him a rupee, he threw it into the box, and it kept on rolling until it fell to the bottom. Upon this a parrot which was chained to it, began to speak and two fowls began also to cackle at one another. Then a small window opened, a which a panther put out its head and let a small shell fall from its mouth into a dish which was placed on a lion's head and the shell then came out of the lion's mouth. A thort time elapsed when another window opened and another lion came forth, took the shell into its mouth and retired, and the windows again closed. Two elephants then appeared with perfect trunks, and there were also two figures of men who sounded drums. A rope then thrust itself forward and again retreated of its own accord. Two other men then advanced and made obeisance. Shortly after another window opened and a puppet came forth with an ode of Hafiz in its hand, and when the ode was taken away from the puppet, it retired and the window was closed. In short, whenever a piece of money was placed in the hands of Husain Shirazi, all these marvels wer eexhibited. The King first gave a gold *mohar* with his own hand and witnessed the sight. He then ordered his attendants to give a rupee each. The odes which were presented were given by the King to Naqib Khan, by whom they were read out. The exhibition lasted for several nights."—*Zubdatul-Twa-rikh* by Shaikh Nural Haqq, Elliot vi, p. 192.

3 C. Stephen's *Archaeology of Delhi*. pp. 199 ff.; also *Assarul-Sanadid*, by Sayyid Ahmad,. 3rd chap., p. 54.

ভিতরের অংশ রঞ্জিত আস্তর এবং মসৃণ টালি দ্বারা বিশেষরূপে শোভিত হইয়াছিল, কিন্তু এখন ইহার অনেক স্থানেই দাগ পড়িয়া গিয়াছে। মসজিদের সম্মুখভাগ এবং ফটকটী রঞ্জিত বক্র করা পাথর ও বক্র পাথরে খোদিত ফুল দ্বারা সৌন্দর্য্যবিধান করা হইয়াছিল। ব্যবহৃত রংগুলি নীল, পীত, লাল, বেগুনে, শুভ্র, সবুজ, কাল এবং শ্বেত ছিল। মসজিদের উপরিভাগে ঠিক মধ্যস্থলে খাটো রকমের একটী গুম্বুজ ছিল এবং ঠিক কিলা কোণা মসজিদেরই মত উপরিভাগে বিশিষ্ট ভাবের একটী সরু ধরণের মন্দির ছিল। মসজিদের দেওয়ালগুলি বরাবর খাড়া ও গুম্বুজগুলি গড়ান ধরণের ছিল এবং সম্মুখভাগ মঠ-কি মসজিদের ন্যায় দেওয়াল পর্য্যন্ত হেলান ছিল। ধর্ম্মাবাস গুলিই এই মসজিদের বিশেষত্ব ছিল।" ১

সুরঞ্জিত মসজিদের সহিত মাদ্রাসার দৃশ্য কেমন সুন্দর দেখাইত কিন্তু দুরদৃষ্ট তাই কোন আকস্মিক ঘটনার সঙ্গে ইহার নামটী চিরকাল যুক্ত থাকিয়া ইহার অনিন্দ্য-সৌন্দর্য্য কলঙ্কিত করিবে। আকবরের রাজত্বের ৮ম বর্ষে, উক্ত কলেজের ছাদের উপর হইতে তাঁহার জীবননাশের জন্য একটী চেষ্টা করা হইয়াছিল। উক্ত বিষয় সম্বন্ধে তবকাতি আকবরীর ২ প্রণেতা লিখিয়াছেন।

"যখন শরফুদ্দিন হোসেন দরবার হইতে নাগোরে পলায়ন করেন সেই সময় হইতেই তাঁহার পিতার অন্যতম ক্রীতদাস কুকা ফুলাদ সর্ব্বদাই সম্রাটের অনিষ্ট করার জন্য গোপনে নানা বিষয়ের কৌশল আঁটিতেছিল। এই হতভাগ্য ব্যক্তি রাজ-শিবিরে আসিয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল। যে সময় সম্রাট শিকার যাত্রা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দীল্লির বাজার পার হইয়া মাহম্ আনখের মাদ্রাসার নিকটবর্ত্তী হইলেন ঠিক সেই সময়ে এই রক্তপিপাসু ব্যক্তি সম্রাটের উপর তীর নিক্ষেপ করে, কিন্তু যিনি সম্রাটের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিলেন, সেই পরমেশ্বরের কৃপায় তিনি রক্ষা পাইলেন। ইহাতে খুব গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত না হইলেও চর্ম্মের উপর আঁচড় কাটিয়াছিল। সম্রাটের ভৃত্যগণ তৎক্ষণাৎ আততায়ীকে আক্রমণ করিল এবং তরবারি ও ছোরার আঘাতে তাহাকে কালগ্রাসে পাতিত করে।" ৩

এই ঘটনা হইতে স্মরণ হয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সম্রাট হুমায়ুনেরও এরূপ একটী বিপদ ঘটিয়াছিল। যে সময় অত্যল্পকালের জন্য ফতেপুর সিক্রির বাগানে বিশ্রাম লাভ করিতেছিলেন সেই সময় তিনিও আকবরের ন্যায় সঙ্কীর্ণাবস্থা হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। ৪

মাদ্রাসাটীর এখন ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু ইহার ভিক্ষুদিগের গৃহগুলি এখানে সেখানে পতিত দেখা যায়। ইহা পুরানা কিল্লার পশ্চিম-দিগের ফটকের প্রায় সম্মুখে অবস্থিত এবং সের সাহের দীল্লির পশ্চিম ফটকের নিকটেই অবস্থিত ছিল। ৫

1 Beglar, quoted in C. Stephen's *Archaeology of Delhi*, pp. 199, 200.

2 *Tabaqati-Akbari*, MS. in ASB, pp. 260 ff.

3 C. Stephen's *Archaeology of Delhi*, p. 200; *Akbar-Namah*, vol. ii, (Beveridge) p. 312.

Khafi Khan, in his *Muntakhabul-Lubab (Bibl. Indica)* Pt. i, p. 164, mentions the incident, but not the madrasah.

4 See Jauhar's *Tazkiratul-Waqait*, transi. by Stewart, p. 24.

5 C. Stephen' *Archaeology of Delhi*, p. 199. The inscription on Muhammad, woh is great Akbar among the just kings, maham Begam, the root of purity, laid the foundation of this house for good men but the building of this gracious house was helped by Shahabuddin Ahmad Khan Bazil; what blessing there are in this auspicious building that its date is found in the words, 'Blessed Among House'!"

মাহম বেগমের কলেজ ব্যতীত আমরা জনৈক খাজা মু-ইনের কলেজের কথাও জানি। এখানে ১৫১১ খৃঃ অব্দ হইতে তিন বৎসর-কাল মীরজা মুফ্রিস্ সমরকান্দী শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ১

আকবর পণ্ডিতদিগকে পুরস্কার ও বৃত্তিদান করিয়া উৎসাহিত করিতেন। যখন তিনি কাশ্মীর জয় করেন সেই সময় কাশ্মীরের কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তিকে এই উদারতা দেখাইয়াছিলেন। ২ তাঁহার নানাপ্রকার সাহিত্যানুরাগের যশঃ-সৌরভ রাজ্যের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং তিনি কেবলমাত্র মুসলমানদিগের নহেন, পরন্তু ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের লোকদিগের শ্রদ্ধা-ভক্তিও লাভ করিয়াছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়; সম্রাটের সমসাময়িক ত্রিবেণীর বাঙ্গালী কবি মাধবাচার্য্য তাঁহার 'চণ্ডীমঙ্গলে' সম্রাটের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। ৩

সম্রাটের নিকট হইতে যাঁহারা উৎসাহ পাইতেছিলেন 'তব্‌কাতি আকবরী' তাঁহাদের কয়েকজন কবি ও পণ্ডিতের নাম দিয়াছেন। নিম্নে কয়েকজনের মাত্র নাম দেওয়া হইতেছে :—

১। আমীর মীর তকি শরীফী,
২। মুল্লা সৈয়দ সমরকান্দী,
৩। সেখ আবুল ফজল,
৪। মুল্লা আলাউদ্দিন হিন্দী,
৫। মুল্লা সাদিক্ হলবাই,
৬। মীরজা মুফ্লীস্,
৭। হাফিজ তাশকান্দি,
৮। মুল্লা আবদুল্লা সুলতানপুরী,
৯। সেখ আব্দুল নবী-দিলাবী,
১০। কাজী জালালুদ্দিন হিন্দী, প্রভৃতি।

তালিকাতে ৭৫ জনের নাম আছে। তবকাত সেই সময়ের একটী নামের তালিকা দিয়াছেন উহাতে ৯৩ জন কবির নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

আকবরের অভিভাবক বৈরাম খাঁ, সাহিত্যের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি পার্শী, তুর্কী, আরবী ও হিন্দিভাষা অনর্গল লিখিতে পারিতেন। তিনি কবিও ছিলেন এবং সাধারণের কাছে রহীম বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। তিনি ১৫৮৮ খৃঃ অব্দে বাবরের জীবনস্মৃতির পারশ্যানুবাদ করিয়া উহা আকবরকে উৎসর্গ করেন। ৪ তিনি পারশী পণ্ডিতগণের শিক্ষাকেন্দ্র বাল্‌খে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ৫ তিনি ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া মৌলানা জৈনুদ্দিন মহম্মদ কামান্‌গরের শিক্ষাদান গ্রহণ করিলেন; এবং তাঁহার নিকট য়ুসুফ জুলেখা ও অন্যান্য পুস্তক সমাপ্ত করেন।

খাঁ খান আব্দুল রহীমের পুত্র মীরজা ইরাজও সুশিক্ষিত ছিলেন। মীরজা জান-সিরাজীর অন্যতম ছাত্র মৌলানা খাইরুদ্দিন

1 *Muntakhab-tabaqati-Akbari* (bound up in the same volume with *Muntakhabul-Miratul'-Atams*), MS. in the Both. Call., p. 20. The work only mentions that the *madrasah* was in Hindustan.

2 *Tarikhi-Kashmir* (or *Gauhar-i-'Alms*), by Muhammad Aslam 5th Tabaqah.

3 Mr. Dinesh Ch. Sen's *Hist. of Bengali Literature*, pp. 335, 336 (newed.).

4 Noer's *Akbar*, vol. ii, p. 89.

5 *Ibid.*, vol. i, p. 126.

কমী এক সময়ে তাঁহার গৃহশিক্ষক ছিলেন। তিনি আমেদাবাদের কোন মাদ্রাসাতে অন্য একজন শিক্ষকের অধীনেও ২৩ বৎসর শিক্ষা-লাভ করিয়াছিলেন। ১

আব্দুল-রহীমের একটী পাঠাগার ছিল, সেখানে বহু পণ্ডিত ব্যক্তি পাঠার্থ ও আত্মোন্নতির জন্য সমাগত হইতেন। ২ তাঁহার পাঠাগারটী কত বড় ছিল সে সম্বন্ধে আমরা প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ভারতীয় এবং অন্যান্য স্থানের মুসলমান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের প্রাচীন পাঠাগারগুলির চিত্র খুব কমই পাওয়া যায়। আমি এইখানে পারস্যের হালবানের একটী প্রাচীন পাঠাগারের বিষয় উল্লেখ করিতেছি, উহা রহীমের জন্মস্থান বদক্শনের অতি নিকটবর্ত্তী একটী দেশ। পাঠাগারের অন্তর সামঞ্জস্যবিধান কিরূপ ছিল তৎসম্বন্ধীয় কয়েকটী বিষয়ে আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ হইবে।

বহু ব্যক্তি খাঁ খাঁনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আসিতেন। ৩ মা-আসিরি রহীমী বর্ণন করেন, ৯৫ জন পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহার বিভিন্ন জ্ঞানের সাহায্য লাভ করিয়া অনুগৃহীত হইয়া ছিলেন। ৪

আমরা পূর্ব্ববর্ণিত বিভিন্ন প্রমাণ এবং বিবরণী হইতে জানিতে পারিয়াছি যে, একমাত্র আকবরই তাঁহার সময়ের ভারতীয় সাহিত্য-জগতে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী মুসলমান সম্রাটগণের রাজত্বকালের সঙ্গে উদার নীতি ও উদার হৃদয়ের দ্বারা তাঁহার রাজত্বকালের তুলনা করিলে দেখা যায়, শাসনবিভাগ, রাষ্ট্রনীতি, ধর্ম্মবিষয় এবং সাহিত্যালোচনা প্রভৃতি যে কোন বিষয়েই তাহাদের অপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তিনি তাঁহার প্রজাবৃন্দের ধর্ম্মবিশ্বাস এবং ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে কুসংস্কার উপলব্ধি করিয়া হিন্দুদিগের জ্ঞান ও ধর্ম্মপন্থা আলোচনার ফলে যে পন্থা পাইয়াছিলেন তাহার দ্বারা প্রজাসাধারণকে সরল ভাবে নূতন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন এবং এইরূপ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা আমরা ফিরোজ শাহ তোগলকেই প্রথম দেখিতে পাই। ফিরোজ শাহ জ্বালামুখীর লাইব্রেরী এবং অশোকস্তম্ভ প্রভৃতি হিন্দু-সভ্যতার স্মৃতিস্তম্ভের মূলস্থান-চ্যুতির দ্বারা ঐ সকলের প্রতি যত্ন গ্রহণ করায় কয়েকটী ঘটনার ফলে আলাউদ্দিনের সাহিত্যানুরাগকেও হার মানাইয়া ছিলেন। ৫ যাহা হউক, আমরা ইতঃপূর্ব্বেই বিভিন্ন মাদ্রাসায় মুসলমান বালকগণের সহিত হিন্দুবালকের একত্র অধ্যয়নে; ইবাদত খাঁনাতে গোঁড়া হিন্দু পণ্ডিতদিগের সঙ্গে তর্কের ফলে ঐ মত গ্রহণ করেন, হিন্দুর জ্ঞানের প্রতি গভীর সহানুভূতি এবং হিন্দুসাহিত্য ও ধর্ম্ম গ্রন্থাদির অনুবাদে ও প্রচারে তাঁহার উৎসাহ প্রদর্শন করেন; এবং সর্ব্বশেষ দেখা যায়, বিখ্যাত হিন্দুগণ তাঁহাদের সঙ্গীত ও চিত্র প্রভৃতি কলাবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতার জন্য সরকারী সাহায্য লাভ

1 *Ibid.*, leaf 487.
2 *Ibid.*, leaf. 480
3 'Abdul Baqi proposes, in the Table of contents of his *Maasiri-Rahimi* (MS. in ASB), to speak of Abdul Rahim Khan Khanan's Madrasahs in the third book, but much to my disappointment, he omits the subject altogether.
4 *Maasiri-Rahimi*, MS. in ASB, leaf 486.
5 *Ibid.*, leaves 488 ff.

করিয়াছিলেন, এইরূপে তাঁহার উদারতার পরিচয় পাইয়া বুঝিয়াছি হিন্দুসাহিত্যের জন্য ধীর ও ধারাবাহিক সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

আমরা আরও দেখিয়াছি আকবর সাহিত্য-জগতে তাঁহার দৃঢ়োৎসাহ এবং সদিচ্ছাকে বুদ্ধিমত্তা দ্বারা চালনা করিতে (তাঁহার সম্বন্ধে নিরক্ষর ধারণার পরিবর্ত্তন হইবে,) দক্ষ হইয়াছিলেন। উক্ত বুদ্ধিমত্তার প্রেরণা তাঁহাকে সর্ব্বদাই আবুল ফজল, ফয়জী আব্দুল কাদির প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের সঙ্গে, বিশেষতঃ এই রকম যাঁহারা তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত মিশিয়া বাণী-কমলার মধ্যে কঠোর সামঞ্জস্য বিধান করিতে প্রণোদিত করিয়াছিল। আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য সেই বুদ্ধি-বিকাশের চেষ্টাই, ইবাদত খানাতে দেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান ও মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রতিনিধি-গণকে একত্রিত করে এবং সাধারণ প্রতি-যোগিতা ক্ষেত্রে তর্ক ও বিভিন্ন যুক্তি দ্বারা নিজ নিজ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া ধর্ম্মালোচনার একটী স্মরণীয় বৎসর রাখিতে ও দেশের জ্ঞানরাজ্যের দ্রুত উন্নতির এই চেষ্টাই আকবরের, নূতন কর্ম্মপ্রবর্ত্তন। আকবরের অন্যান্য বিখ্যাত কার্য্যাবলীর মধ্যে আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, পণ্ডিতদিগকে প্রচুর বৃত্তি ও পুরস্কার দান, নূতন নূতন শিক্ষালয় নির্ম্মাণ, শিক্ষার্থে প্রথম ভূ-সম্পত্তি দান এবং বহুসংখ্যক পণ্ডিত ব্যক্তি জ্ঞানা-লোচনার জন্য এবং রাজকীয় অনুগ্রহ লাভ করিয়া রাজধানীতে আনীত হইয়াছিলেন, সুতরাং শাসন পরিষদগুলিও শিক্ষার ও জ্ঞান লাভের কেন্দ্র হইয়া পড়িয়াছিল।

আরঙ্গজেব

প্রধান ছয়জন মোগল সম্রাটের সর্ব্বশেষ সম্রাট আরঙ্গজেবের রাজত্ব সম্বন্ধেই এখন আলোচনা করিব। তাঁহার শিক্ষানীতি কালক্রমে সমধর্ম্মাবলম্বীদিগের স্বার্থ-সংরক্ষণার্থ সাম্রাজ্য-শাসনের সাধারণ নীতিতে পরিণত হইয়াছিল। ইহার ফলে বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রজাসাধারণ অতি কৌশলে এবং নিশ্চয়তার সহিত পরা-ধীনতা ভোগ করিতে থাকিল। আকবরের মত, তিনি হিন্দু-সাহিত্যের উন্নতির জন্য কোনই চেষ্টা করেন নাই। ১৬৬৯ খৃঃঅব্দের এপ্রিল মাসে তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগকে হিন্দুদিগের স্কুল ও মন্দির ধ্বংস করিতে এবং তাঁহাদের শিক্ষাদান ও ধর্ম্মালোচনা বন্ধ করিতে আদেশ দেন।১ যাহা হউক তিনি অতি সত্বরেই মুসলমান যুবকদিগের শিক্ষো-ন্নতি এবং সাম্রাজ্য ব্যাপিয়া ইসলামীয়-সাহিত্যের প্রচার জন্য যথেষ্ট যত্ন লইয়া-ছিলেন। মুসলমান যুবকদিগকে শিক্ষাদানের নিমিত্ত, সাম্রাজ্যের, বিভিন্নাংশের বিদ্যালয় গুলিতে অধ্যাপক নিয়োগ করেন। ছাত্র-দিগের পাঠের উন্নতি অনুসারে তাঁহাদিগকে বৃত্তি দেওয়া হইত।২

মিঃ কীন্ তাহার 'মোগল এম্পায়ার' (মোগল সাম্রাজ্য) নামক গ্রন্থে অন্যান্য সৎকর্ম্মের সঙ্গে

---

1 J. Sarkar's *Anecdotes of Aurangzib and Historical Essays*, p. 11.
2 *Miratul-'Alam*, by Bakhtawar Khan MS. in the Boh, Coll., leaf 257 ; *Alamgir-Namah*, by Maulawi Munshi Muhammad Kazim (*Bibl. Indica*), p. 1085 ; *Maasiri-Alamgiri* by Mahammad Saqi Musta'id Khan (*Bibl Indica*) p. 529 ; *Tabsiratul-Nazirin*, MS. in ASB, p. 158.

তাঁহার শিক্ষাকার্য্যের বিষয়ও সংগ্রহ করিয়াছেন "আরঙ্গজেব কঠোর শাস্তি উঠাইয়া দেন, কৃষির উৎসাহ দেন, বহুসংখ্যক স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং শৃঙ্খলামত বত্ম´ও সেতু নির্ম্মাণ করান।" ১ এই দীর্ঘকাল পরে সেই সকল বিদ্যালয়ের অনেকগুলির কথাই জানা যায় না। কিন্তু একটী প্রমাণ পাওয়া যায়, লক্ষ্ণৌ নগরের যে অংশে ফিরিঙ্গি মহলে ওলন্দাজদিগের অট্টালিকাদি ছিল সেইগুলি সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া মুসলমানদিগের মাদ্রাসার জন্য ব্যবহার করেন।২ তিনি গুজরাটের দেওয়ান মক্রমৎখাঁকে এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য দেওয়ানদিগকেও আদেশ দিয়াছিলেন, উচ্চ নীচ যে কোন বংশের, যে সকল ছেলেরা 'মীজান' ও 'কশ্‌শফ' পড়িবে তাহারা কলেজের অধ্যাপকগণের এবং স্থানীয় সর্দ্দারের অভিমতিতে রাজকোষ হইতে অর্থ সাহায্য পাইবে। আরও আদেশ হইয়াছিল যে, ঐ সকল ছাত্রের নামের সঙ্গে আহম্মদাবাদ, পৈথান এবং সুরাটের তিনজন অধ্যাপকের এবং আহম্মদাবাদের ৪৫ জন ছাত্রের নাম যুক্ত হইবে। ৩ ১৬৭৮ খৃঃ অব্দে গুজরাটের মাদ্রাসাগুলির সংস্কার জন্য রাজকোষ হইতে অর্থ দেওয়ার আদেশ করেন। ১৬৯৭ খৃঃ অব্দে সর্দ্দার অক্রমুদ্দিন খাঁ ১,২৪০০০ হাজার টাকা নিজব্যয়ে আহম্মদাবাদে একটী কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া সম্রাটের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন। তদ্ধেতু আরঙ্গজেব তাঁহাকে শুণ্ড গ্রাম (সানোলি পরগণাতে) এবং সিঁচিয়া গ্রাম (কড়ি পরগণাতে) জায়গীর দেন। ৪

আরঙ্গজেব গুজরাটের ভদ্রদিগকে শিক্ষিত করিতে সচেষ্ট হইয়া তাহাদের জন্য শিক্ষক নিয়োগ করেন এবং মাসিক পরীক্ষার ফলাফল তাঁহার নিকট পাঠাইতে বলেন। যাহা হউক উহাদের মধ্যে কেহ কেহ পাঠে দুরন্ত থাকায় সম্রাট শাস্তিদানের জন্য আদেশ করেন যে, তাহাদের বাধ্যকরা শিক্ষার ব্যয় কমিটি হইতে প্রদত্ত হইবে। ৫ সর্দ্দার অক্রমুদ্দিন খাঁর কলেজ ব্যতীত অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তির প্রতিষ্ঠিত অনেক মাদ্রাসা ছিল। বিয়ানাতে কাজীউন-কি-মসজিদের সন্নিকটে কাজী রফিউদ্দিন মহম্মদ একটী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১০৮০ হিজিরা (১৬৭০ খৃঃ অঃ) খোদিত-ফলক একখানি উহাতে দেখা যায়। ৬

আরঙ্গজেবের রাজত্বকালে শিয়ালকোট মুসলমানশিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল। দেশের বিভিন্ন স্থানের পণ্ডিতমণ্ডলী এইখানেই সম্মিলিত হইয়াছিলেন। এই সহরে সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষক মৌলবী আবদুল হকীমের প্রতিষ্ঠিত কোন স্কুলে তৎপুত্র মৌলবী আবদুল্লা শিক্ষকতা করিতেছিলেন। এইখানে মনে রাখা উচিত, শিক্ষাকেন্দ্ররূপে শিয়ালকোটের

---

1 Keene's *Mughal Empire*, p. 23.
2 Constable's *Bernier*, p. 292 n.
3 *Mirati.Ahmddi* by Ali Muhammad Khan, vol. i, p. 272. "Aurangzib assisted students of Mizan received 1 anna, of Munshaib 2 annasand up to Sharhi·Wiqayah Fiqh 8 annas per diem."—*Tarikhi-Fazrh-Bakhsh* of Muhammad Faiz Bakhsh, translated by W. Hoey, p. 104.
4 *Mirati-Ahmadi*, by Ali Muhammad khan, vol. i, p. 363,and vol. ii, p. 37.
5 *Mirati--Ahmadi*, vol. pp 377, 378.
6 *Archaelogical Survey Report*, vil. xx, pp. 76, 77.

খ্যাতি আকবরের সময় হইতেই লাভ হইয়াছিল। ১ সম্ভবতঃ, শিয়ালকোটে পণ্ডিতগণ অবস্থান করিতেন ও এখানে প্রচুর কাগজ ব্যবহৃত হইত এবং বিশেষতঃ মানসিংহীও ভাল, স্থায়ী, পরিষ্কার রেশমী কাগজ প্রস্তুতীর জন্যই ইহার প্রসিদ্ধিলাভ হইয়াছিল। ঐ সকল বস্ত্র নগরের উপকণ্ঠে তিনটী গ্রামে তৈয়ারী হইয়া দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রপ্তানি হইত এবং বেশীর ভাগই দীল্লির সম্রাটগণের দরবার সমূহে ব্যবহৃত হইত। ২

আমরা ইতঃপূর্ব্বে দেখিয়াছি প্রায় প্রত্যেক মোগলসম্রাটই প্রজাদের শিক্ষা এবং সাহিত্য বিস্তারের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে তাহারা যে ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া আসিতেছিলেন ইহা যে তাহারই ফল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নিকোলাও মনাকৃচি বলেন ইহা অভ্যাসের ফল, কারণ যখন যুবরাজগণ পাঁচ বৎসরের হইতেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদের মাতৃভাষা তাতার অথবা প্রাচীন তুর্কীদিগের ভাষায় লিখিতে পড়িতে শিখিতেন। তারপর তাহারা পণ্ডিতের শিক্ষাধীন থাকিতেন এবং পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে, উদার ও সামরিক শিক্ষা দান করিতেন। যাহাতে তাঁহাদের আমোদের মধ্যেও জগতের জ্ঞানলাভ করিবার আগ্রহ জন্মে এবং তাহাদের অভ্যাস ও রুচি সংস্কৃত হয় পণ্ডিতগণ সেইরূপ যত্নই লইতেন।৩ অন্যান্য যুবরাজদিগের ন্যায় আরঙ্গজেবও বাল্যেই শিক্ষালাভ করেন। তাহার সর্ব্ব প্রথম শিক্ষক সাদুল্লা খাঁ, পরে সাজাহানের অন্যতম মন্ত্রী হইয়াছিলেন। মীর মহম্মদ হসিম তাঁহার অন্য এক শিক্ষক ছিলেন। যুবরাজের তীক্ষ্ণবুদ্ধি থাকায় যাহা পড়িতেন তাহা দ্রুত আয়ত্ত করিতে পারিতেন। তিনি কোর-আন্ ও হদী কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন; আরবী ও পারশী দ্রুত লিখিতে ও পড়িতে পারিতেন এবং তাঁহার বহু উর্দ্ধতন পুরুষদিগের ভাষা চঘতাই-তুর্কীর উপর যথেষ্ট আধিপত্য ছিল। কোর-আন্ ও হদীর ভাষা, গির্জ্জার নিয়ম এবং ইমাম্ মহম্মদ ঘজ্জালির গ্রন্থ প্রভৃতি ধর্ম্ম-গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি গোঁড়া হইয়া ছিলেন। তাঁহার প্রথম বয়সের ধর্ম্মমত সম্বন্ধীয় রচনাদি পাঠের রুচি তাঁহাকে গোঁড়া মুসলমানদিগের মধ্যেও গোঁড়া এবং প্রাচীন রুচির পোষক করিয়া দিয়াছিল। ইহার ফলে যাহাতে নৈতিক উন্নতির কোন ইঙ্গিত ছিল না এইরূপ চিত্র, সঙ্গীত প্রভৃতি, এমন কি যাহাতে ইসলাম ধর্ম্মের চিহ্নমাত্রও ছিল না তাহাই তাঁহার ঘৃণার বিষয় হইয়া পড়িয়া ছিল।

যাহা হউক আরঙ্গজেব তাঁহার শিক্ষকের৪ নিকট হইতে যাহা শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া তাঁহাকে

---

1 *Khulasatul-Tawarikh.* MS. in ASB, leaf 47 ; see also J. Sarkar's *Topography of the Mughal Empire*, p. 96.

2 J. Sarkar's *Topography of the Mughul Empire*, p. 95. and *Imp. Gazetteer*, xii. As Siyalkut (Sealkot) was famous for paper manufacture, so was Kashmir for its ink (*ibid.*, 112).

3 *Storia do Mogor*, by Niccolao Manucci, vol. ii.346,347.

4 Both Bernier and Manucci give the name of this teacher as Mulla Salih (*Bernier's Travels*, Constables' ed., p. 154 ; Manucci's *Storia do Mogor* vol. ii. p. 30) ; but Prof. J. Sarkar denies that Mulla Salih was the teacher of Aurangzib (*Hist. of Aurangzib*, vol. i, p. 4.)

প্রসিদ্ধ তিরস্কারটী করিয়াছিলেন; রাজপরিবারের যুবরাজের কিরূপ শিক্ষা পাওয়া উচিত তৎসম্বন্ধে বার্ণিয়ার তদুক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন "পৃথিবীর প্রত্যেক বিখ্যাত জাতির সহিত আমাকে পরিচিত করিতে; ইহার অর্থাগম-নীতি এবং রাষ্ট্রশক্তি, যুদ্ধনীতি, সামাজিক রীতিনীতি, ধর্ম্ম, শাসনপদ্ধতি প্রধানতঃ কোন স্থানে ইহাদের স্বার্থ সংগঠিত; এবং ধারাবাহিক ইতিহাস পাঠের দ্বারা ঐ সকল রাষ্ট্রের প্রাথমিক অবস্থা, তাহাদের উত্থান পতনের কারণ। প্রসিদ্ধ ঘটনাবলী, আকস্মিক ঘটনা ও ভ্রম-ভ্রান্তি যে সকল দ্বারা বিষম পরিবর্ত্তন ও বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে, সেগুলি বুঝাইয়া দেওয়া কি আমার শিক্ষকের উচিত ছিল না।" ১

আরঙ্গজেব তাঁহার পিতা সাজাহানের ন্যায় কর্ত্তব্য কর্ম্মের জন্য সময় ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতে ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত কোর-আন্ পাঠ করিতেন, এবং বৈকালে ২॥ টা হইতে ৩॥ টা পর্য্যন্ত কোর-আন্ পাঠও উহা দেখিয়া লিখিতেন এবং ইসলাম-ধর্ম্মের মহাপুরুষদিগের গ্রন্থাবলী আলোচনা করিতেন। তিনি প্রতি বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যাকাল ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ এবং প্রার্থনায় কাটাইতেন। ২ তাঁহার শেষ জীবনের উইল হইতে দেখা যায়, তিনি কোর-আনের নকল করিয়া বিক্রয় করিতেন এবং ঐ অর্থে নিজের খরচ চালাইতেন। তাঁর মৃত্যু সময়ে থলিতে ৩০৫ টাকা ছিল। ৩ মির-আতুল আলমে লিখিত আছে আলমগীর মহম্মদ কনৌজীর সহিত সপ্তাহে তিনদিন ইহাই উলুম ও অন্যান্য গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিতেন।৪ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সম্রাট খৃষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে ভাল বাসিতেন এবং তাঁহার রাজ্যের প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞদিগকে আহ্বান করিয়া, পরিমিত অর্থব্যয়ে মুল্লা নিজামের তত্ত্বাবধানে ফতাওয়াই আলমগীরি রচনা করিতে, আদেশ দেন। ৫

আরঙ্গজেবের ধর্ম্মানুরাগ তাঁহাকে তফসীর, হদীর ও ফিখে'র গ্রন্থাবলী সংগ্রহে প্রণোদিত করিয়াছিল। রাজকীয় লাইব্রেরীতে এইরূপে সংগৃহীত গ্রন্থাদি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল।৬

শ্রীনরেন্দ্র নাথ লাহা।

---

1 Bernier's *Travels*, p. 156.

2 J. Sarkar's *Anecdotes Aurangzib and Historical Essays*, p. 177

3 J. Sarkar's *Anecdotes of Aurangzib and Historical Essays*, p. 52; *Asiatic Annual Register*, vol. iii p 94.

4 M*untakhal. Miratul., Alam*, MS. in Boh. Cooll., p. 3·

5 *Maasiri-'lAlamgiri* (*Bibl. Indica*), p. 520.

6 *Miratul-'Alam*, MS. Boh Coll., leaf 251·

পুণ্ড্রজাতির ইতিহাস

তৃতীয় অধ্যায়

(৯৯৭ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

বাঙ্গালী পুণ্ড্রজাতির ধর্ম্ম ও উৎসব

বর্ত্তমান পুণ্ড্রজাতির মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্মভাব অত্যধিক মাত্রায় দৃষ্ট হয়। দেখিলেই মনে হইবে এই জাতি অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। বাস্তবিক বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ, ক্রমশই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া প্রায় অধিকাংশ পুণ্ড্রগণই বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ প্রচলিত বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পুণ্ড্রজাতি মাত্রেই বৈষ্ণব হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা ভেক গ্রহণ দ্বারা 'বৈরাগী' হয় নাই। ইহারা সংসারী এবং বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত।

অনেক পুণ্ড্র নর-নারী ভেকাশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক বৈরাগী হইয়া গিয়াছে এবং হইতেছে।

পুণ্ড্রজাতি কিছুদিন পূর্ব্বে ঘোর শাক্ত ছিল, প্রতি চণ্ডীমণ্ডপে চণ্ডী পূজা হইত। ছাগ, মহিষ, মেষ বলিদানের ধূম ছিল। মাংসাহার প্রচলিত ছিল। মঙ্গলচণ্ডী ও বিষহরি পূজায় ছাগবলি হইত। দুর্গোৎসবের যথেষ্ট ধূম ছিল।

শাক্তগণ প্রায়ই শৈব—শিবপূজা করা এবং শিবোৎসবে নৃত্যগীতাদি করা পুণ্ড্রজাতির বিশেষত্ব। গম্ভীরা উৎসব, ধর্ম্মের গাজন, শিবের গাজন পুণ্ড্রগণের ধর্ম্মোৎসবের প্রধান অঙ্গ।

মালদহে ধর্ম্মের গাজনের কোন আয়োজন উদ্যোগ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু মালদহের মধ্যে অনেকগুলি "ধর্ম্মপুর" নামক পল্লীর সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। মোড়গাঁ, মাধাইপুরে ধর্ম্মের উৎসব হইত অবগত হওয়া যায়। মাধাইপুরের বামুনী মন্দিরে গম্ভীরা উৎসব হইত, তথায় বহুবিধ পাষাণময়ী দেবদেবী মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে, ধর্ম্মমূর্ত্তিও বিদ্যমান রহিয়াছে। অনেক স্থলে সূর্য্যমূর্ত্তিকে ধর্ম্মমূর্ত্তি বলা হয়।

শিবের গাজনে পুণ্ড্রগণ সন্ন্যাসী হইয়া থাকে। সমগ্র বঙ্গ ব্যাপিয়া পুণ্ড্রগণ শিবের গাজন ও গম্ভীরা করে। রাঢ় দেশে পুণ্ড্রগণ এখন ধর্ম্মের গাজন বা গম্ভীরা উৎসব করিয়া থাকে, এবং ধর্ম্মের সন্ন্যাসীও হয়।

সাধারণ বাঙ্গালী হিন্দুগণ যে সকল উৎসব ও পূজাদির অনুষ্ঠান করে, পুণ্ড্রগণ তাহাই করিয়া থাকে।

বৌদ্ধধর্ম্মে ইহারা আস্থাবান ছিল, বর্ত্তমান পুণ্ড্রগণকে দেখিয়া তাহা মনে হয় না। সাধারণ হিন্দু-বাঙ্গালীর বৌদ্ধধর্ম্মে যে প্রকার অনুরাগ ছিল, ইহাদেরও তদ্রূপ ছিল বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমানে হিন্দুগণ যেমন বুঝিতে পারেনা যে কখন তাহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল কিনা, ইহারাও তদ্রূপ বুঝিতে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে পুণ্ড্রগণের মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বহুকাল পর্য্যন্ত বৌদ্ধ প্রভাব ও তান্ত্রিক-বৌদ্ধ প্রভাব বিদ্যমান ছিল,। তৎপরে শাক্ত ও শৈব ধর্ম্মে আস্থাবান হয়। বর্ত্তমানে বৈষ্ণবধর্ম্মে অনুরাগ পরিলক্ষিত হইতেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

বাঙ্গালী পুণ্ড্রজাতির সমাজ পরিচালন
ও
শাসন পদ্ধতি

পুণ্ড্র জাতির সহিত যাঁহার কোন প্রকার সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, অথবা যাঁহারা কোন পুণ্ড্রপল্লীতে দিন কয়েক অবস্থান করিয়াছেন, তাঁহারাই এই জাতির সমাজ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভে সমর্থ হইবেন।

বাঙ্গালার পুণ্ড্রসমাজগুলি প্রায়ই একই প্রকার নিয়মে বদ্ধ রহিয়াছে দেখা যায়। বিভিন্ন জেলায় বাস নিবন্ধন রীতি নীতির যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র। তত্রাচ এই জাতির সমাজ-পরিচালন এবং সমাজ-শাসন পদ্ধতি যেন এক সূত্রে গ্রথিত।

মাণ্ডলিক পদ্ধতি

"প্রত্যেক গ্রামে একাধিক 'মণ্ডল' থাকে। মণ্ডল গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তি। পূর্ব্বে গ্রামের সমুদায় কার্য্যাদি মণ্ডলের আদেশে সম্পাদিত হইত। জমিদার মণ্ডলকে মান্য করিতেন। আদায় তহশীলাদি মণ্ডলের আদেশে সহজে সম্পাদিত হইত। পল্লীতে রাজকর্ম্মচারিগণ কোন কার্য্যোপলক্ষে আগমন করিলে মণ্ডল সেই কার্য্যনির্ব্বাহার্থ সাহায্য করিতে বাধ্য থাকিতেন। ইহাতে সহজে কার্য্যোদ্ধার হইত।"

পুণ্ড্র সমাজের সমাজপতি 'মণ্ডল'। তিনি সমাজ-পরিচালন ও সমাজ-শাসন ব্যাপারে লিপ্ত থাকেন। পুণ্ড্রগণ তাঁহার শাসন মান্য করিয়া থাকে। সামাজিক কোন কার্য্য মণ্ডলের সহিত পরামর্শ না করিয়া, ব্যক্তিগত ভাবে কেহই করিতে পারে না

মণ্ডল সমাজপতি হইলেও একাকী তিনি কোন কার্য্য করেন না। সামাজিক যে কোন কার্য্যই হউক না মণ্ডলের তাহাতে প্রভুত্ব থাকিলেও, সমাজের জনগণকে আহ্বান করিয়া একটি 'বৈঠক' বা সভা করা হয়। সেই সভার সভাপতি মণ্ডল, মন্ত্রী, বারিক, প্রামাণিক, প্রভৃতি পদবী বিশিষ্ট প্রধানগণ সভাপতির অন্তরঙ্গস্বরূপ বিদ্যমান থাকেন।

সভাপতি মণ্ডল, ঐ সকল সামাজিক শাসক কর্ম্মচারিগণের সহিত, সভার কার্য্য সম্পাদক করেন। এই সভায় পল্লীর বা পল্লী সমাজের সকল পুরুষগণকে উপস্থিত থাকিতে হয়। সকলেই উপস্থিত হইতে বাধ্য, অন্ততঃ বাড়ী-প্রতি এক এক জনকে আসিতেই হয়। প্রস্তাবক, সমর্থক প্রভৃতি মণ্ডলের অবৈতনিক কর্ম্মিগণ, এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবিত বিষয়ের মীমাংসার চেষ্টা করা হয়।

সভায় সভ্যগণ ও কর্ম্মিগণ আলোচিত

কার্য্য সম্বন্ধে বাদ প্রতিবাদ করিতে পারে। এই প্রকার বাদ-প্রতিবাদ দ্বারা সভার কার্য্য সম্পাদন, মাণ্ডলিক পদ্ধতি।

শেষে সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে আলোচিত বা প্রস্তাবিত বিষয়ের মীমাংসা হইয়া গেলে মণ্ডল তাহা প্রকাশ করেন। বারিক-পরামাণিক সেই কার্য্য যথাযথ সম্পাদনের ভার প্রাপ্ত হন।

কোন অপরাধের বিচার এই প্রকারে সামাজিক শাসন দ্বারা মীমাংসিত হইয়া যাইত। বিবাহ, অন্নপ্রাসন, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি যে কোন কার্য্যে 'পঞ্চাইতি'র আবশ্যক হয় তাহাও এই প্রকার বৈঠকে শেষ মীমাংসিত হইয়া যায়। 'ঘটক' উপাধিক স্বজাতি বিবাহের ঘটকালি করিত।

সামাজিক প্রত্যেক কার্য্যের জন্য কর্ম্মী নিযুক্ত আছে, তাহারাই মণ্ডলের সামাজিক কর্ম্মচারী। দ্রব্যাদির সংগ্রহ, কার্য্যসম্পাদনের বিলি বন্দোবস্ত মণ্ডল ও কর্ম্মিগণ দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

কৃতী ব্যক্তিকে কার্য্যের শৃঙ্খলাবিধানের জন্য ব্যস্ত হইতে হয় না, কার্য্য-নির্ব্বাহার্থ বারিক, মন্ত্রী, পরামাণিক প্রভৃতি মণ্ডল দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে, এমন কি নিমন্ত্রণ করিবার ভারও বারিক বা পরামাণিকের উপর ন্যস্ত আছে। পুণ্ড্রগণের স্বজাতিগণই বংশপরম্পরায় মণ্ডল, বারিক, মন্ত্রী, পরামাণিক, দূত প্রভৃতির কার্য্য করিয়া থাকে। প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মান্যও নির্দ্দিষ্ট আছে। কর্ম্ম-কর্ত্তাকে সেই 'মান' সর্ব্বাগ্রে দিতে হয়।

সুপারির দ্বারা নিমন্ত্রণ করিতে হয়—সুপারির সংখ্যা হিসাবে, নিমন্ত্রণের সঙ্কেত আছে।

কোন ব্যক্তি যদি দুই এক ঘর বা কোন বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করে তাহা হইলে মণ্ডলকে অবগত করাইতে হয় না সেটা সামাজিক ব্যাপার মধ্যে গণ্য নহে।

সমষ্টিগত ভাবে কোন কার্য্য করিতে হইলে বা একটি মণ্ডল-শাসনের অন্তর্গত সমাজ সম্বন্ধে কোন কার্য্য করিতে হইলে—'মাণ্ডলিক বৈঠক' বসাইবার প্রয়োজন হয়।

সম্মিলিত মাণ্ডলিক পদ্ধতি

একাধিক মণ্ডলের শাসিত সমাজকে একত্রিত ভাবে কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইলে, প্রত্যেক মণ্ডল ও মণ্ডলের কর্ম্মি-গণকে লইয়া কর্ম্মকেন্দ্রের মণ্ডল একটি বৈঠক করেন। এই বৈঠকে মীমাংসিত বিষয় অবলম্বনে কর্ম্মকেন্দ্রের মণ্ডল নিজ শাসনে বৈঠক বসাইয়া—আপন বেষ্টনীর জনগণের মতগ্রহণপূর্ব্বক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।

এক গ্রামিণ সম্মিলিত মাণ্ডলিক পদ্ধতি

ঐ প্রকারে একই গ্রামের মণ্ডলগণ এক যোগে যে কর্ম্ম করেন তাহার কার্য্য-নির্ব্বাহার্থ কর্ম্মকেন্দ্র ও মণ্ডল সম্পূর্ণ দায়ী। কোন প্রকার কার্য্যের ত্রুটি হইলে সপারিষদ্ মণ্ডল তাহার জন্য দায়গ্রস্ত হন।

দশ গ্রামিণ সম্মিলিত মাণ্ডলিক পদ্ধতি

উপরোক্ত রীতি-নীতির ন্যায় গ্রাম হইতে গ্রামান্তরের মণ্ডলের সহিত মিলিত হইয়া জাতীয় বৈঠক বসাইয়া উভয় গ্রামবাসী মণ্ডলগণের বেষ্টনগত পুণ্ড্রগণ একত্রে কার্য্য করিয়া থাকে।

দশগ্রাম, বিশগ্রাম বা সমগ্র জেলাবাসী পুণ্ড্রগণ এই প্রকার মাণ্ডলিক শাসন দ্বারা সম্মিলিত হইয়া জাতীয় পঞ্চায়তি করিয়া

থাকে। যে কার্য্যের সহিত ভোজন ব্যাপারের সংস্রব আছে—সেই সম্বন্ধে বৈঠক এবং একত্রে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ গমন ব্যাপারকে 'পঞ্চায়ত' এবং পঞ্চায়তি' বলে।

প্রত্যেক জেলার পুণ্ড্র-সমাজ প্রায় উপরোক্ত নিয়মে কার্য্য করিয়া থাকে। ইহাদের কার্য্য-প্রণালীর ধারা দৃষ্টে মনে হয় এই জাতি সমাজ-পরিচালনায় একান্ত পটু।

যখন কোন জাতীয় কর্ম্ম নাই তখন পুণ্ড্রগণ যেন একেবারে স্বাধীন, কিন্তু সমাজ বহির্ভূত কার্য্য করিলে দণ্ডিত হইবার ভয়ে আদৌ তাহা ব্যক্তিগত ভাবেও করিতে পারে না।

সমাজ মধ্যে কর্ম্মের সূচনা হইবামাত্র মণ্ডলের নেতৃত্বে সকলে একত্র দলবদ্ধ হইয়া যেন একটি হইয়া যায়। সকলের সম্মতি লইয়া মণ্ডল যে আদেশ প্রদান করেন তাহাই সকলে পালন করে। ঘরোয়া বিবাদ থাকিলেও তাহা উপস্থিত ভুলিতে হয়। ব্যক্তিগত যে, কি প্রকারে সমষ্টিগত হইয়া যায় ইহাই তাহার নিদর্শন।

এক মণ্ডলের সমাজ শত মণ্ডলের সমাজের সহিত কার্য্যোপলক্ষে কি প্রকারে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিত হইয়া এক বিরাট সম্মিলিত শক্তিতে পরিণত হয়—এই জাতি তাহা এখন অবগত আছে।

এই বিরাট জাতীয় সঙ্ঘ পরিচালনার্থ 'দশ গ্রামিণ মণ্ডল'ও আছেন কিন্তু প্রত্যেক মণ্ডল ও তাঁহার কর্ম্মিগণ আপন আপন সমাজটি পরিচালনের জন্য পূর্ণ মাত্রায় দায়ী।

প্রত্যেক মণ্ডলের নেতৃত্বে বিরাট জেলাগত জাতি পরিচালিত হইতে পারে। পূর্ব্বে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, বৃষোৎস্বর্গ, শ্রাদ্ধ, বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ব্যপদেশে এই প্রকার পুণ্ড্র জাতির বিরাট সম্মিলন হইত।

এই প্রকার পুণ্ড্রজাতীয় মাণ্ডলিক-প্রথা যেন রাজপুত-রাষ্ট্রনীতির অনুরূপ। যেন 'ফিউডেল সিষ্টেম'। পুণ্ড্ররাষ্ট্রের শাসন-পদ্ধতি যেন এখন এই জাতির মধ্যে বিদ্যমান। রাষ্ট্রশাসনের মূলনীতি এখন অব্যক্ত ভাবে এই জাতির মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে।

পূর্ব্বাপর জাতীয় স্বভাব হইতে এই জাতি এখনও বিচ্যুত হয় নাই। এখনও কায়ক্লেশে তাহারা পৈতৃকধর্ম্ম, রীতি-নীতি রক্ষা করিয়াই চলিতেছে। বর্ত্তমান শিক্ষার প্রভাব যথায় উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, সেই স্থানবাসী পুণ্ড্রগণের মধ্যে এই সুন্দর নীতিটি কথঞ্চিৎ উপেক্ষিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। তাঁহারা ভাবেন এ প্রথা অসভ্যতার চিহ্ন, কিন্তু তাঁহারা রাষ্ট্রনীতির রন্ধ্রপথে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবেন এই নীতিটিই একমাত্র প্রাচীন রাষ্ট্রনীতি ব্যক্ত করিতেছে। উহাকে বিসর্জ্জন না দিয়া রক্ষণই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কার্য্য।

ঐ মাণ্ডলিক সমাজ-নীতির উৎকর্ষবিধান দ্বারা জাতীয় সমাজ পরিচালন করিতে শিক্ষা করা ভবিষ্যৎ জাতীয় উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায়।

বাইশী বৈঠক বা ছত্রিশী বৈঠক

এই প্রকারে পুণ্ড্রগণ জাতীয় একতা সম্পাদন দ্বারা সমাজের উন্নতি বিধান করিয়া থাকে। কিন্তু যদি ভিন্ন জাতির সহিত একত্রে কোন কর্ম্ম করিতে হয় তাহা হইলে ভিন্ন জাতির মণ্ডল বা প্রধান সমাজপতির সহিত মিলিত হইয়া সকল জাতীয় জনগণে মিলিত ভাবে একটি বৈঠক বসে।

এই প্রকার মিলিত বৈঠককে সকল জাতিই সম্মান করিতে বাধ্য। দুই জাতির মধ্যে একত্র ভাবে যে বৈঠক বসে তাহা 'বাইশী' বৈঠক। ছত্রিশ জাতি একত্রে যে

বৈঠক করে তাহা 'ছত্রিশী বৈঠক'। ছত্রিশী বৈঠককে মান্য ও ভয় করিয়া চলিতে সকলেই বাধ্য।

বৈঠকের ছত্রিশ জাতি বসিয়া থাকিলেও প্রত্যেক জাতিকে বৈঠককে মান্য করিতে হয়।

"পঞ্চ নারায়ণ"

কারণ দশজন যথায় একতা দ্বারা সম্মিলিত হয়েন তথায় এই দশ শক্তি "নারায়ণী শক্তি" বলিয়া জ্ঞান করিতে হয়। ব্যক্তিগতভাবে সভ্যগণ নারায়ণ বলিয়া সম্মান পাইবে না, কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে 'নারায়ণ' রূপে মান্য পাইবে। নারায়ণী শক্তি, আদ্যা শক্তি (দুর্গাচণ্ডী ইত্যাদি) সম্বন্ধে যে প্রকৃত জ্ঞান তাহা ইহাদের যদ্রূপ আছে শিক্ষিত সমাজে তাহা নহে, তথায় এই মিলিত শক্তি উপেক্ষিত বলিতে হয়।

জাতি বিজাতি একত্রিতভাবে দলবদ্ধ হইয়া কি নিয়মে কর্ম্ম করিতে হয় তাহা এই বাইশী ও ছত্রিশী বৈঠকই অবগত আছেন। বর্ত্তমান কালের সভাসমিতি প্রাচীন বাঙ্গালী পদ্ধতির বাহিরের বলিয়াই মনে হয়। তথায় সমবেত শক্তির স্ফুরণ দৃষ্ট না। দশজনে মিলিত হইলেই যে একটা শক্তির আবির্ভাব হয়, এবং তদ্দ্বারা যে নব-ভাবের বিকাশ হয় তাহা আদৌ উপলব্ধি হয় না।

মিলন হয় বটে—হাট বাজারের, কেনা-বেচার মত—আপন আপন নির্দ্দিষ্ট অভিনয় সম্পাদন করিয়া চলিয়া যায়। যেন এ এক জাতীয় "থিয়েটার"। আপন আপন বক্তৃতার অংশটুকু বলিতে পারিলেই সম্পর্ক ফুরাইল—এখানে পুতুলের নাচ হয়—প্রাণময় জীবের সমাবেশ হয় না। মনে হয় হইল—কার্য্য-প্রণালী দৃষ্টে মনে হয় দশের ভিতর হইতে একটা একপ্রাণতা শক্তি বাহির হইয়াছে কিন্তু সকলি 'সংশক্তি বিহীন'—প্রাণহীন।

সম্মেলনী বা সম্মিলনী যাহাই হউক উহা যতকাল পর্য্যন্ত 'ছত্রিশী' ধরণে না হইতেছে ততদিন ইহার মধ্য হইতে সমষ্টিগত শক্তির স্ফুরণ হইবে না। ব্যক্তিগত শক্তির ক্ষণিক চমক্ দৃষ্ট হইয়া অনন্তাকাশে বিলীন হইয়া যাইবে।

"No member of any subcaste can gain admission to another, and each subcaste has its own Pradhan or headman, who deals with all social and ceremonial matters."

পঞ্চম অধ্যায়

বাঙ্গালী পুণ্ড্রের দশকর্ম্ম ও সংস্কার

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, অপরাপর শ্রেষ্ঠ হিন্দুসমাজের ন্যায় বঙ্গদেশের পুণ্ড্র সমাজও ব্রাহ্মণ-শাসন দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। হিন্দুশাস্ত্রের বিধানগুলির মধ্যে যেগুলির অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইবে তাহাই এই জাতি যত্নসহকারে পালন করে।

তত্রাচ দেখা যায় বাঙ্গালী জাতির বিভিন্ন হিন্দুসমাজের মধ্যে দেশাচার, সমাজনীতি ও কুলাচার প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ ভাবের সমাবেশ হইয়াছে। পুণ্ড্রজাতি এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া—দেশাচার, সমাজনীতি ও কুলাচার-গুলি পালন করিয়া থাকে।

এক এক জাতির সামাজিক প্রথা, কুলাচার, দেশাচার যেমন অন্য জাতির সহিত কোন কোন বিষয়ে বিভিন্ন এই পুণ্ড্র জাতির মধ্যেও দেশাচার, কুলাচার প্রভৃতি আচার, রীতি-নীতি ও পদ্ধতির বিভিন্নতা কিঞ্চিৎ পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

প্রত্যেক শুভ কার্য্যে রমণীগণ জাতীয় মঙ্গল গীত গাহিয়া থাকে। বিবাহ, কর্ণবেধ, পুনর্বিবাহ, অন্নপ্রাসন প্রভৃতি যাবতীয় হিন্দু-সংস্কার এই জাতি পূর্ণমাত্রায় সম্পাদন করে।

বাঙ্গালীর বাস্তু দেবতা, ষষ্ঠী, ও মনসা পূজা হইতে দোল-দুর্গোৎসব পর্য্যন্ত সকলই এই জাতির মধ্যে দৃষ্ট হয়।

বিবাহাদি শুভকার্য্য এবং শ্রাদ্ধাধি পারলৌকিক অনুষ্ঠানগুলি শাস্ত্রবিধিমত প্রতিপালিত হইয়া থাকে। কোন প্রকার অঙ্গহানি বা ত্রুটী পরিলক্ষিত হয় না। অবশ্য উহার আহত দেশাচার, কুলাচার ও জাতীয় সমাজনীতির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

এই জাতি পরস্পরের সিদ্ধান্ন গ্রহণ করে না, যাহাদের সহিত যাহাদের ভক্ষ্যভুক্ত আছে তাহাদের সিদ্ধান্ন গ্রহণ করে। জল গ্রহণের বাধা প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। পক্কান্ন ইহাদের মধ্যে সর্ব্বজনীন ভাবে আদৃত রহিয়াছে। কুলীনগণ মৌলিকের কন্যা গ্রহণ করে কিন্তু মৌলিকের সিদ্ধান্ন গ্রহণ করে না। চিড়া দৈ 'ফলাহার' প্রচলিত আছে।

চিড়া দধি দ্বারা যে খাদ্যানুষ্ঠান হয় তাহা 'ফলাহার' নামে খ্যাত রহিয়াছে। এই প্রকার ফলাহার বাঙ্গালীর সকল স্তরেই পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল—বর্ত্তমান সভ্যতার প্রভাবে এই প্রকার চিড়া দৈ ফলাহার প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে ইহা অবাধ প্রচলিত ছিল।

কেবল পুণ্ড্র জাতির মধ্যেই যে এই ফলাহার প্রচলিত তাহা নহে ইহা বাঙ্গালীর প্রাচীন পদ্ধতি।

"No inter-marriage can take place among the different subcastes. The uttar Rarhi and the dakshin Rarhi sections of the Basudeb Pundras do not eat cooked rice each other house, but may take pakhi food to gelher." (1901 A. D. Census Report—Pods)

১৯০১ খৃঃ অব্দের আদম সুমারির বিবরণে পদ্মজাতির (বাসুদেব পুণ্ডরী) মধ্যে বিভিন্ন থাকের সহিত বিবাহ প্রথা প্রচলিত নাই এবং সিদ্ধান্ন গ্রহণেরও নিয়ম পরস্পরের মধ্যে বিদ্যমান নাই কিন্তু পক্কান্ন গ্রহণে কোন বাধাই নাই।

এই প্রথা সকল পুণ্ড্রসমাজেই বিদ্যমান দেখা যায়। ইহা যে কেবল বাসুদেব পুণ্ডরী সমাজে আবদ্ধ তাহাও নহে। এই হিসাবে ইহাদের জাতীয় একতা বিদ্যমান রহিয়াছে।

"The oriya' sections of the Santaparhs will take cooked rice in the house of the uttar Rarhi or Dakshin Rarhi Pods, but not vice varsa." (Ibid)

উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় পদ্ম জাতির সিদ্ধান্ন শান্তপর নামক উড়িয়াশ্রেণী গ্রহণ করে, কিন্তু তাহাদের সিদ্ধান্ন উত্তর বা দক্ষিণ রাঢ়ী বাসুদেব পুণ্ডরিগণ গ্রহণ করে না।

অপরাপর পুণ্ড্রজাতির মধ্যে এ নীতি বিদ্যমান নাই। বঙ্গীয় পুণ্ড্রগণ বিভিন্ন সমাজান্তর্গত পুণ্ড্রগণের সিদ্ধান্ন গ্রহণ করে

না কিন্তু পক্কান্ন গ্রহণে বিশেষ কোন আপত্তি দৃষ্ট হয় না। এই প্রকারে বাঙ্গালী পুণ্ড্রগণ সমাজ-শাসনে আপন আপন জাতীয় সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে যত্নবান রহিয়াছে।

সকল জাতীয় পুণ্ড্রগণের মধ্যে বিধবা বিবাহ আদৌ প্রচলিত নাই। অপরাপর ব্রাহ্মণেতর হিন্দুগণের ন্যায় পুণ্ড্রজাতি বিধবা বিবাহ দোষাবহ নিন্দনীয় ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিবেচনায় পরিত্যাগ করিয়াছে।

শ্রীহরিদাস পালিত

আত্ম-তত্ত্ব

(Mind, Self.)

"ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"

পূর্ব্ব প্রস্তাবগুলিতে জড় ও শক্তির সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহা হইতে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে কতকটা আভাস পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু মুখ্যতঃ আত্মতত্ত্ব এ পর্য্যন্ত আলোচিত হয় নাই। বর্ত্তমান প্রস্তাবে আত্মতত্ত্বই বিশদভাবে আলোচিত হইবে।

আত্মা পদার্থটা কি? প্রথমেই এই প্রশ্ন উঠে। ইহার মোটামুটি উত্তর—যাহার জ্ঞাতৃত্ব, ভোক্তৃত্ব ও কর্ত্তৃত্ব আছে তাহাই আত্মা। যাহা জানে, ভোগ করে ও ইচ্ছা করে তাহাই মোটা কথায় আত্মাশব্দবাচ্য (১) দ্বিতীয় প্রশ্ন,—কে জানে, কে ভোগ করে, কে ইচ্ছা করে? এই প্রশ্নের তিন প্রকার উত্তর দেওয়া যাইতে পারে।

প্রথমতঃ জড়বাদীর বা দেহাত্মবাদীর উত্তর। ইঁহার মতে জড় বস্তুই পারমার্থিক সদ্বস্তু; উহাই দেহাকারে পরিণত হইলে জানে, ভোগ করে ও ইচ্ছা করে। জীব-দেহে যে চৈতন্য বা জ্ঞানের এবং ইচ্ছাদির অনুভব হয়, তাহা জড়েরই ধর্ম্ম বা দেহেরই গুণ। দেহাতিরিক্ত একটা স্বতন্ত্র আত্মা বলিয়া কিছু নাই। চার্ব্বাক বলেন—

চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে।
কিণ্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রব্যেভ্যো
মদশক্তিবৎ ॥

অর্থাৎ মাদকাদির হেতুভূত দ্রব্যাদির মিশ্রণ বিশেষে যেমন মাদকতা শক্তির আবির্ভাব হয়, ক্ষিত্যপতেজমরুৎ এই ভূত চতুষ্টয়ের মিশ্রণ বিশেষে তেমনি চৈতন্যের উৎপত্তি হয়। প্রত্যেক ভূতে পৃথক পৃথক ভাবে চৈতন্য না থাকিলেও মিশ্রণ বিশেষের ফলে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়। সেই মিশ্রণ বিশেষ কি, না ভূত চতুষ্টয়ের সুষ্ঠু দেহাকারে পরিণতি। এই দেহেই 'অহং' প্রত্যয় জন্মে; ইহা দেহ মাত্র নয়। লোক ব্যবহার তাহার দৃষ্টান্ত। আমি কৃশ, আমি গৌর, আমি সুস্থ, আমি গতিশীল প্রভৃতি ব্যবহার হইতে দেহই যে অহং শব্দ বাচ্য তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ

---

(১) যদাপ্নোতি যদাদত্তে যচ্চাত্তি বিষয়ান্ ইহ।
যচ্চাস্য সন্ততং ভাবঃ তস্মাদাত্মেতি কীর্ত্ত্যতে॥

নাই। পুনশ্চ দেহের ক্লেশে আমার ক্লেশ, দেহের স্বাস্থ্যে আমার স্বাস্থ্য, দেহের বিনাশে আমার বিনাশ দেহের সত্তায় আমার সত্তা যখন নিরন্তর প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন আমি ও আমার দেহে পার্থক্য কোথায় ?

অস্মদ্দেশীয় চার্ব্বাকের মত উক্ত প্রকার। অন্যান্য দেশে চার্ব্বাকের জ্ঞাতি বন্ধু যাঁহারা আছেন তাঁহারাও চার্ব্বাক মতাবলম্বী। মহাত্মা Clifford তন্মধ্যে একজন। ইনি বলেন—"Reason, intelligence and volition are properties of a complex made up of elements themselves not rational, not intelligent, not conscious." (১)

ধীমান Huxley বলেন, ইতর জীবের চৈতন্য তাহাদের মস্তিষ্কাভ্যন্তরীণ আণবিক স্পন্দনের পরিণতি বা ফল। ইতর জীবের পক্ষে যদি ইহা সত্য হয় তবে উচ্চ শ্রেণীর জীবের পক্ষেই বা তাহা সত্য না হইবে কেন। আমাদের চৈতন্য আমাদের মস্তিষ্কের আণবিক স্পন্দন সম্ভূত—স্পন্দন ক্রিয়ার ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে যথা—

"It is quite true that to the best of any judgment, the argumentation which applies to the brutes, holds equally good of men ; and therefore that all states of consciousness in us, as in them, are immediately caused by the molecular changes of the brain substance. It seems to me that in man, as in brutes, there is no proof that any state of consciousness is the cause of changes in the motion of the matter of the organism".

মনস্বী পণ্ডিত Lewes বলেন—জীবন্ত শরীরের দুই প্রকার ক্রিয়া; এক প্রকার স্নায়বিক স্পন্দন; অন্য প্রকার চেতনা। এ উভয়ের মধ্যে প্রথমটি যে শরীরসম্ভূত, সে বিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই। বিবাদ কেবল দ্বিতীয়টি লইয়া। অর্থাৎ চৈতন্য শরীরের ক্রিয়া কি না আমাদের এই বিষয়েই মত বৈষম্য। কিন্তু তাঁহার মতে এ তর্কের মীমাংসা অতি সহজ। সে মীমাংসাটা কি প্রকার তাহা তিনি দেখাইতেছেন। তিনি বলেন—শরীরের যে স্পন্দনাদি ক্রিয়ার ক্ষমতা আছে ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। অর্থাৎ শরীর যে কতকগুলি ক্রিয়ার কর্ত্তা তাহা অবিসংবাদিত। এক্ষণে দেখিতে হইবে যাহাকে চেতনা বলিতেছি তাহার কর্ত্তৃত্ব শরীরের বা অপর কোন বস্তুর। ঐ কর্ত্তৃত্ব অপর কোন বস্তুর—এ প্রকার সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে দেখিতে হইবে শরীর অতিরিক্ত অন্যকর্ত্তার অস্তিত্ব আমাদের পরিজ্ঞাত কি না। তাঁহার মতে,—উহা পরিজ্ঞাত নহে। শরীর ব্যতীত আর কোন বস্তুর কর্ত্তৃত্ব আমরা বিদিত নহি। অন্য কর্ত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে হইলে আমাদের জ্ঞানের রাজ্য ছাড়িয়া কেবল কল্পনার রাজ্যে উপনীত হইতে হয়। ইহা বৈজ্ঞানিকতা বিরুদ্ধ। অতএব চেতনার কর্ত্তৃত্বও শরীরের—ইহাই সমীচীন সিদ্ধান্ত। শরীরই উভয়বিধ কার্য্যের সাধারণ কর্ত্তা।

পণ্ডিত Lewes তাঁহার "study of psychology" নামক গ্রন্থে এই মর্ম্মে নিম্নের মত পরিব্যক্ত করিয়াছেন যথা :—" What

(১) On the Nature of things themselves, Mind, vol III p. 67.

we know, is that the living organism has among its manifestations the class called sentient ……and states of consciousness.… It is not known, nor is there any evidence to suggest that one of these classes is due to the activity of the organism, the other to the activity of another agent. The only agent is the organism. The organism. e. g., is not only the bearer of neural tremors, but it feels, thinks and wills. Thus the organism has two sets of functions broadly contrasted as subjective and objective."

অন্য একদল বৈজ্ঞানিকের মতে, যকৃৎ হইতে যেমন পিত্ত নিঃসৃত হয়, মস্তিষ্ক হইতে সেইপ্রকার চিন্তা নিঃসৃত হয় (the brain secrets thought as the liver secrets bile)। অতএব চেতনা বা জ্ঞান মস্তিষ্কেরই কার্য্য।

এই প্রকারে চার্ব্বাক হইতে আরম্ভ করিয়া অধুনাতন নাস্তিকগণ পর্য্যন্ত সকলেই জড়ের সত্তাকে স্বতঃসিদ্ধ মনে করিয়া চৈতন্য, জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতিত্বকে তাহারই দেহাকারে পরিণতির ফল বলিয়া স্থির করিয়া আসিতেছেন। ইহাঁদের মতে অহংএর সত্তাটা কাল্পনিক, জড়ের সত্তাই বাস্তব। অথবা অহংএর সত্তা পরোক্ষ, জড়ের সত্তা অপরোক্ষানুভূতির বিষয়। কিন্তু আমরা ইতিপূর্ব্বে জড়তত্ত্বের যে আলোচনা করিয়াছি তাহাতে দেখা গিয়াছে উহার সত্তাই অহংএর একটা কল্পনা। উপরি উক্ত জড়বাদিগণ প্রকৃত জ্ঞানের তত্ত্ব না বুঝিয়াই জড়ের সত্তার এত আদর ও মর্য্যাদা করিয়াছেন। জ্ঞানের ও বিষয়াবগতির প্রকরণ বিষয়ে একটু চিন্তা করিলে ইহাঁদের মতবাদ কতদূর ভ্রান্ত—বিপর্য্যস্ত, তাহা ইহাঁরা অনায়াসে বুঝিতে পারিতেন। আশ্চর্য্য এই যে, ইহাঁরা সে সম্বন্ধে একেবারেই খেয়াল করেন নাই। যাহা হউক আমি বিষয়াবগতির প্রকরণ সম্বন্ধে আপাততঃ কোন প্রসঙ্গ না তুলিয়া জড়তত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়াই এ মতের ভ্রান্তি প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব। ফলাফল সুধীগণের বিভাব্য।

১। আমরা জড় জগতে দেখিতে পাই কার্য্যগুণ কারণগুণ পূর্ব্বক; কারণে যে গুণ, ধর্ম্ম বা শক্তি পূর্ব্বসিদ্ধ নাই, কার্য্যে তাহার আবির্ভাব হইতে পারে না। অবশ্য এ সত্যের আপাত ব্যভিচার অনেক স্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কারণে অনেক সময়ে অনেক শক্তি বা গুণ দৃষ্ট হয় না, যাহা কার্য্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু সেখানে ঐ শক্তির বা গুণের অনস্তিত্ব কল্পনা করা উচিত নহে; কারণ সমবায়ের অভাবই ওখানে ঐ শক্তি বিকাশের প্রতিবন্ধক, এই মাত্র বলা যাইতে পারে। এক্ষণে জড় পরমাণুতে যদি জ্ঞান বুদ্ধি চৈতন্য পূর্ব্বসিদ্ধ—প্রচ্ছন্ন ভাবেই হউক বা প্রকাশতঃ হউক—না থাকে, তাহা হইলে, উহাদের সংঘাতে জ্ঞান, বুদ্ধি, চৈতন্যের আবির্ভাব সর্ব্বথা অসম্ভব। কেন অসম্ভব? কারণ, কারণ ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি স্ববিরোধী, কার্য্যকারণ প্রস্তাবে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। চার্ব্বাকের উদাহৃত মাদকতা শক্তির কথাই ধরা যাউক। যে সকল দ্রব্যের সমবায়ে মাদকতার উৎপত্তি হয়, ঐ সকল দ্রব্যে মাদকতা-শক্তি পূর্ব্বসিদ্ধ বলিয়াই, উহাদের সমবায়ে

উহার বিকাশ হয়, অন্যথা হয় না; সিকতা হইতে কখন মদ্যের উৎপত্তি হয় না কেন? এ প্রশ্ন খুবই সঙ্গত; কিন্তু কেহই ইহার সঙ্গত উত্তর দানে সমর্থ নহেন। কেবল মিশ্রন বিশেষ দ্বারা অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হয় না। সিকতাকে যে প্রকারেই মিশ্রণ কর না কেন, মদ্যের উৎপত্তি হইবে না। অতএব পরমাণুর চৈতন্য না থাকায়, তৎসংহতির চৈতন্য জন্মিতে পারে না। তাই সাংখ্যকার কপিল বলিয়াছেন—

"মদশক্তিবচ্চেৎ প্রত্যেক পরিদৃষ্টে সে ৎ সাংহত্যেতদুদ্ভবঃ।"

"অর্থাৎ চৈতন্য মদশক্তির ন্যায় নহে। মদশক্তি প্রত্যেক মদ্যবীজে সূক্ষ্মরূপে থাকে সুতরাং সংহত হইলে তাহার উদ্ভব অর্থাৎ বিস্পষ্ট বিকাশ হয়। ভূতে সূক্ষ্ম চৈতন্য থাকা সপ্রমাণ হয় না; সুতরাং তাহার সংঘাতে চৈতন্যোদ্ভব দৃষ্ট হয় না এবং তাহা স্বীকার করাও যায় না।" * পুনশ্চ :—

"ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ।"

অর্থাৎ দেহাবয়বগুলিকে পৃথক করিলে যখন ঐ সকল অবয়বে চৈতন্য দৃষ্ট হয় না, তখন ভৌতিক দেহের চৈতন্য স্বাভাবিক নহে উহা আগন্তুক—আত্মার অধিষ্ঠান নিমিত্তক। *

২। চৈতন্য, জ্ঞান, বুদ্ধিকে ভূতসূক্ষ্মের ধর্ম্মও বলা সঙ্গত নহে। কেন না, বৈজ্ঞানিকদিগের মতে যে দ্রব্যের স্নায়বিক বিধান নাই—বা মস্তিষ্ক নাই তাহার চৈতন্য নাই। পরমাণ্বাদির স্নায়ুবিধান বা মস্তিষ্ক নাই সুতরাং তাহা চৈতন্যের আধার হইতে পারে না। কেননা চৈতন্য স্নায়ুবিধানেরই পরিণতি। আর যদি স্নায়ুবিধান নিরপেক্ষ চৈতন্য সম্ভবপর হয়, এবং সেইজন্য পরমাণ্বাদির চৈতন্য কল্পিত হয়, তাহা হইলে এক দেহে অনেক চেতনার সমাবেশ স্বীকার করিতে হয়। ইহা প্রথমতঃ অনুভব বিরুদ্ধ; দ্বিতীয়তঃ যুক্তিবিরুদ্ধ। অনুভব বিরুদ্ধ এইজন্য যে, আমরা অহংকে বা আত্মাকে দর্শন স্পর্শনের একমাত্র কর্ত্তা বলিয়াই অনুভব করিয়া থাকি। দর্শন চাক্ষুষ ব্যাপার, স্পর্শন ত্বকের ব্যাপার, শ্রবণ কর্ণের ব্যাপার; কিন্তু এই সকল ব্যাপারে কর্ত্তা কেবল অহং বা আত্মা। অতএব দর্শন স্পর্শনে এক কর্ত্তৃত্বেরই প্রতিসন্ধান অনুভব সিদ্ধ। কিন্তু অনেক চৈতন্যের ঐকমত্য সম্ভবপর নহে; শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গস্থ চৈতন্যের অনুভবাদি সমস্তই ভিন্ন ভিন্ন; সুতরাং এক দেশের চৈতন্য যাহা অনুভব করে, অপরদেশস্থ চৈতন্য তাহার কিছুই জানে না। পদের বেদনা পদস্থ চৈতন্যবেদ্য; হস্তের বেদনা হস্তস্থ চৈতন্যের অনুভূত। এই প্রকার যখন দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা ভিন্ন ভিন্ন হইতেছে, তখন সকল জ্ঞানের একই জ্ঞাতা, সকল দৃশ্যের একই দ্রষ্টা, এ প্রকার অনুভবই অসম্ভব। অথচ সকলের অনুভবই এই এক কর্ত্তৃত্বের সাক্ষ্য দেয়; অতএব জ্ঞাতা, দ্রষ্টা একই চৈতন্য। দ্বিতীয়তঃ চেতনদিগের পরস্পর বিরুদ্ধ ইচ্ছার উৎপত্তি হইলে শরীর উন্মথিত বা নিষ্ক্রিয় হইতে পারে।

৩। দেহাত্মবাদে পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ অসম্ভব। আমাদের যত কিছু জ্ঞান, অতীতকে জড়াইয়া। সমস্ত জ্ঞানই অতীতকে টানিয়া আনিয়া বর্ত্তমানের সহিত মিশাইয়া নিষ্পন্ন হয়। ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান সর্ব্বস্থলেই কতকটা প্রত্যক্ষ ব্যাপার, আর কতকটা অতীতের উদ্বোধন। স্মৃতি বা স্মরণ এই

* সাংখ্যদর্শন—৩।২০, ৩।১৮; ৫।১৩০

অতীতকে বর্ত্তমানে উপস্থাপিত করা। শরীরাবয়বের স্থিরতা নাই। বাল্য শরীরের অবয়বগুলি বৃদ্ধ শরীরের অবয়ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। সুতরাং বৃদ্ধদশায় বাল্যানুভূত বিষয়ের স্মরণ অসম্ভব। একের অনুভূত বিষয় অন্যে স্মরণ করিতে পারে না। "মস্তিষ্ক কতকগুলি অণুপরমাণুর সমষ্টি। এই অণুপরমাণুগুলি অবিরত স্পন্দনশীল। বিষয় অনুভব ঘটিলে এই স্পন্দনশীল পরমাণুপুঞ্জের একটা পরিবর্ত্তন (modification) সাধিত হয়; এবং অনুভূত বিষয়ের একটা প্রতিমুদ্রা বা ছাপ (impression) উহার উপর অঙ্কিত হয়। সময়ান্তরে যখন কোন কারণ বশতঃ ঐ প্রতিমুদ্রাগুলি উত্তেজিত (excited) হয়, তখনই অনুভূত বিষয়ের স্মরণ হয়"— ইহাই দেহাত্মবাদীর সিদ্ধান্ত। এ প্রকার ভৌতিক উপায়ে (mechanically) স্মৃতি ব্যাখ্যাত হইতে পারে কি না, বিচার করিয়া দেখা যাউক। প্রথমতঃ মস্তিষ্কের যাহা উপাদান তাহা অতি কোমল ও তরল পদার্থ। এই কোমল ও তরল পদার্থ আবার চির-কম্পিত-চিরস্পন্দিত। এমত অবস্থায় তাহাতে একটা ছাপ অঙ্কিত হইলেও উহার স্থায়িত্ব ও স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে কিরূপে? বিচিত্র জ্ঞানোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের আণবিক সংস্থান পরিবর্ত্তিত, বিপর্য্যস্ত হইতেছে। মস্তিষ্কের পরিধিও সসীম। সুতরাং যদি কোন চিহ্ন বা ছাপ উহার উপর অঙ্কিতও হয়, তাহা যে ক্ষণভঙ্গুর হইবে না তাহারই বা প্রমাণ কি? এবং ক্রমান্বয়ে একটি ছাপের উপর উপর্য্যুপরি অসংখ্য ছাপ পড়িলে পূর্ব্বাঙ্কিত ছাপগুলির সংরক্ষণ কি প্রকারে সম্ভবপর হইবে? সকল ছাপগুলি মিলিয়া মিশিয়া একটা কিম্ভূত কিমাকারছাপে পরিণত হইবে না কি?

দ্বিতীয়তঃ, ধর যেন ঐ ছাপগুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবেই মস্তিষ্ক-উপাদানে অঙ্কিত থাকে; কিন্তু তথাপি গ্রন্থপত্র বিন্যস্ত বর্ণমালার ন্যায় মস্তিষ্ক-উপাদান বিন্যস্ত ছাপগুলির কেহ বোদ্ধা না থাকিলে উহাদের তাৎপর্য্য গ্রহণ কে করিবে? ছাপগুলি অক্ষর বা বর্ণের ন্যায় কতকগুলি সঙ্কেত মাত্র। যে ঐ সঙ্কেতের তাৎপর্য্য বুঝে না, তাহার নিকট উহাদের কোন অর্থ নাই। বিশেষতঃ ঐ ছাপগুলির দৈশিক একটা সম্বন্ধ থাকিলেও অতীত-বর্ত্তমান-রূপ কালগত কোন সম্বন্ধ নাই, ইহা বুঝা যায়। উহাদের উত্তেজনা বর্ত্তমান ঘটনা, কিন্তু তাহা অতীতের পরিচায়ক হইবে কি প্রকারে? অতীতকে ধরিব কেমন করিয়া? ঐ ছাপগুলিতে সন তারিখ অঙ্কিত থাকে না; সুতরাং উত্তেজিত হইলে উহারা বর্ত্তমান ব্যাপার বলিয়াই পরিগণিত হইবে। অতীতের কোন পরিচয় প্রদান করিবে না। বর্ত্তমান ও অতীতকে ধরিয়া রাখিতে হইলে কালিক সম্বন্ধকে অতিক্রম করিতে হয়; কিন্তু যাহা কালোৎপন্ন তাহা কালকে অতিক্রম করিবে কি প্রকারে? আরও একটি কথা। এই যে ছাপগুলির কথা বলা হইল, ইহাদের অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় সপ্রমাণ নহে। অণুবীক্ষণ সাহায্যে মস্তিষ্কে ঐ প্রকার কোন ছাপ বা দাগের চিহ্ন পাওয়া যায় না। এ গুলিকে দেহাত্মবাদীর মনঃকল্পিত বলিয়াই নির্দ্ধারিত করিতে হইবে।

৭। আত্মায় ও শরীরে একটা সম্বন্ধ আছে বটে; কিন্তু দেহাত্মবাদী ঐ সম্বন্ধের যে প্রকার কল্পনা করেন, তাহা অতীব অশ্রদ্ধেয়। আত্মা কোন শারীর যন্ত্রের ক্রিয়া নহে। শরীর অনেকগুলি যন্ত্র দ্বারা নির্ম্মিত (the

body is composed of many organs)। প্রত্যেক যন্ত্রের কার্য্য (function) ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নির্দ্দিষ্ট। চরণের কার্য্য চলন; পক্ষের কার্য্য উড্ডয়ন; পাকস্থলীর কার্য্য ভোজনের সংরক্ষণ ও আংশিক সমীকরণ; যকৃতের কার্য্য পিত্ত নিঃসারণ। এই প্রকার প্রত্যেক শারীর যন্ত্রের কার্য্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। দেহাত্মবাদী মনে করেন মস্তিষ্কেরও ঐ প্রকার একটা কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে এবং সেই কার্য্যই চৈতন্য, বুদ্ধি প্রভৃতির নিঃসারণ। অর্থাৎ চৈতন্য, জ্ঞান, বুদ্ধি প্রভৃতি মস্তিষ্ক যন্ত্রের ক্রিয়া বা কার্য্য। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অযৌক্তিক। কারণ—শরীরস্থ যাবতীয় যন্ত্রের কার্য্যই আমাদের পরিচিত;—ইহারা ভৌতিক ব্যাপার—কোন না কোন প্রকার গতি। যন্ত্রগুলিকে এবং যন্ত্রের কর্ত্তব্য কার্য্যগুলিকে আমরা পরীক্ষা করিতে সমর্থ। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উহাদের জ্ঞান হয়। অন্যান্য ভৌতিক পদার্থ যেমন পরীক্ষার যোগ্য, দেহস্থ যন্ত্রগুলিও সেই ভাবে পরীক্ষা যোগ্য। মস্তিষ্ক যন্ত্র-সম্বন্ধেও সেই কথা। অন্যান্য ভৌতিক যন্ত্রের ন্যায় ইহা সমীক্ষা ও পরীক্ষার যোগ্য। যদি ইহাকে আমরা পেশী-সঙ্কোচনকারী স্নায়বিক বলের কেন্দ্রস্থানীয় বলিয়া ধরি—তাহা হইলে ইহার কার্য্যটা কি তাহাও আমরা বুঝিতে পারি। এই কার্য্য পৈশিক গতি (muscular motion) ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু মানসিক ব্যাপারগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয়—ভৌতিক যন্ত্রের গতি আত্মক ব্যাপার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার। ভৌতিক গতিরূপে আমাদের চৈতন্য, জ্ঞান, বুদ্ধির অপরোক্ষানুভূতি নাই। বরং আত্মা পরিচালক—মস্তিষ্ক পরিচালিত—আত্মা নিয়ন্তা, মস্তিষ্ক উহারই আজ্ঞাবহ এইরূপেই আমরা আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া থাকি। লৌকিক প্রত্যয় অধ্যাসমূলক তাই আত্মধর্ম্ম দেহে, দেহের ধর্ম্ম আত্মায় আরোপিত দেখা যায়। সেই জন্য আমি স্থূল, আমি গৌর, আমি হ্রস্ব, আমি গমনশীল ইত্যাদি ব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু এই ব্যবহারকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

৫। সমগ্র চিন্তা বা চিন্তাসমষ্টি অবয়বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্তার সমষ্টি হইলেও, ঐ চিন্তার মূলীভূত অহং বুদ্ধি অবশ্যই প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন, কেননা ঐ অহং বোধটি মিশ্র বোধ নহে, পরন্তু সকল জ্ঞানের আকর স্বরূপ। কিন্তু তাহা হইলেই এক দেহে বহু অহংএর সমাবেশ স্বীকার করিতে হয়, এবং জ্ঞানের একত্ব প্রতিসন্ধান অসম্ভব হয়। সাদৃশ্য নিবন্ধন এই একত্বানুভব সম্ভবপর,—একথাও বলিতে পারা যায় না। সাদৃশ্য জ্ঞাতৃবেদ্য এবং সদৃশ বিষয়দ্বয়ের সম্বন্ধ বোধ-মূলক। যেখানে গ্রহিতা ভিন্ন ভিন্ন সেখানে সাদৃশ্য বোধ অসম্ভব। "ইহা উহার সদৃশ"—এই প্রকার জ্ঞান তাহার পক্ষে সম্ভবপর যে ইহা এবং উহাকে গ্রহণ করিয়াছে এবং পরে স্মরণ করিতে পারিতেছে। দেহাবয়ব অবগমাপায়ী আসিতেছে যাইতেছে। সুতরাং উহাদের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার মধ্যে যে সাদৃশ্য আছে, তাহার জ্ঞান কাহার হইবে? এবং এই প্রকার একটা সাদৃশ্য না থাকিলেও দেহাত্মবাদীর মতে দেহের অবস্থা পরিবর্ত্তনের মধ্যে একত্ব প্রতিসন্ধান অসম্ভব হইয়া পড়ে।

৬। অনেকে চৈতন্যকে এক প্রকার গতি ((a mode of motion) বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাহেন। দেখা যাউক এ কথা সত্য হইতে পারে কি না। আমি বলি তাহা

পারে না। কেন পারে না তাহা বলিতেছি। শরীরের যে স্নায়ুবিধান আছে, তদ্দ্বারা দেহের দূরতর অঙ্গ হইতে একটা গতি-তরঙ্গ স্নায়ু-বিধানের কেন্দ্রস্থানে অর্থাৎ মস্তিষ্কে নীত হয়; তাহার ফলে মস্তিষ্কগত পরমাণুর গতি বা স্পন্দন উত্তেজিত হয়। ইন্দ্রিয়গণের শেষ প্রান্ত হইতে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত গতিপরম্পরা—স্নায়বিক কম্পন—সমস্তই ভৌতিক ব্যাপার; সমগ্র মার্গটার মধ্যে কোথায়ও গতি বিবর্ত্তিত হইয়া চৈতন্যাকার লাভ করে না; কিন্তু দেহাত্মবাদী মনে করেন, ঐ গতি মস্তিষ্কে নীত হওয়া মাত্রই মস্তিষ্কের যে কম্পন আরব্ধ হয়, সেই কম্পনই চৈতন্যাকার প্রাপ্ত হয়। এটি একটি বিশুদ্ধ কল্পনা। কেননা, মস্তিষ্কের উপাদান ও স্নায়বিক পরমাণুতেও সেই প্রকার স্পন্দন; উভয়ের উপাদানগত কোন বৈলক্ষণ্যও নাই; সুতরাং এক স্থানে ঐ স্পন্দন স্পন্দনই রহিয়া যায়, অন্যত্র উহা চৈতন্যাকারে বিবর্ত্তিত হয় এ কথার কোন প্রমাণ নাই। জড় জগতের কুত্রাপি আণবিক স্পন্দনকে স্পন্দনাতিরিক্ত পদার্থে পরিবর্ত্তিত হওয়ার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ মস্তিষ্কাণুর যে স্পন্দন তাহাও একটা অজ্ঞাত, অদ্ভুত রকমের স্পন্দন নহে; জড়-জগতের সর্ব্বত্র যে স্পন্দন পরিদৃষ্ট হয়, ইহাও তজ্জাতীয়, ইহা বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়া থাকেন। সুতরাং একই জাতীয় স্পন্দন এক স্থানে চৈতন্যাকারে পরিবর্ত্তিত, অন্যত্র, স্পন্দনরূপেই অবস্থিত কেন, বিজ্ঞানে ইহার উত্তর নাই। অধ্যাপক Tyndall দেহাত্মবাদের প্রতি এই প্রকার আপত্তি উত্থাপন পূর্ব্বক বলিয়াছেনঃ—"The passage from the physics of the brain to the corresponding facts of consciousness is unthinkable. Granted that a definite thought and a definite molecular action in the brain occur simultaneously; we do not possess the intellectual organ, nor apparently any rudiment of the organ which would enable us to pass, by a process of reasoning, from the one phenomena to the other. They appear together, but we do not know why. Were our minds and senses so expanded, strengthened, and illuminated, as to enable us to see and feel the very molecules of the brain; were we capable of following all their motions, all their groupings; all their electrical discharges, if such there be; and were we intimately acquainted with the corresponding states of thought and feeling,—we should probably be as far as ever from the solution of the problem. How are these physical processes connected with the facts of consciousness? The chasm between the two classes of phenomena would still remain intellectually impassable." অধ্যাপক Tyndall তাঁহার Birmingham বক্তৃতায় আরও বলিয়াছেন "It is no explanation to say that the objective and subjective effects are two sides of one and the same phenomenon. Why should the phenomenon have two sides? This is the

very core of the difficulty. There are plenty of molecular motions which do not exhibit their two sidedness. Does water think or feel when it forms into frost-forms upon a window-pane ? if not, why should the molecular motion of the brain be yoked to this mysterious companion—consciousness ?"

উক্ত মতবাদের যে কেবল ইহাই একমাত্র দোষ—তাহা নহে ; অন্যান্য দোষও আছে। যদি ভৌতিক জগৎ স্বয়ংপূর্ণ (self-complete) হয়, এবং ইহার গণ্ডীর অন্তর্গত শক্তির সমাবর্ত্তন (correlation of forces) বৈজ্ঞানিক সত্য হয়, তাহা হইলে উক্ত মতবাদে ঐ সত্য সম্যক্ বাধিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। শক্তির যে অন্যোন্য-পরিবর্ত্তন নিয়ম, তাহার একটা বাঁধা হার আছে ; সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যেই ঐ হার নির্দ্দিষ্ট আছে। এক্ষণে ঐ শক্তির কতকটা যদি চৈতন্যাকারে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে ভৌতিক জগতে (মস্তিষ্কে) সমপরিমাণে উহার লাঘব অবশ্যম্ভাবী। ভৌতিক জগতে একস্থানে কোন শক্তির অভাব হইলে, অন্যত্র সমপরিমাণে অন্য শক্তির আবির্ভাব হয় ; কিন্তু ভৌতিক জগৎ হইতে কোন শক্তি অভৌতিক জগতে প্রবেশ করিলে, ভৌতিক জগতে উহার ন্যূনতা অনিবার্য্য। কার্য্যতঃ কিন্তু তাহা দৃষ্ট হয় না, ভৌতিক জগতের শক্তির পরিমাণ অচ্যুতই থাকে। ভৌতিক জগতে শক্তির এই যে আদান প্রদান, ইহা মানসিক জগতের আদান প্রদান হইতে ভিন্ন ধরণের। ভৌতিক জগতে যে বস্তু শক্তি দান করে, তাহার শক্তি ব্যয়িত হয়, যে শক্তি গ্রহণ করে তাহার শক্তি উপচিত হয়। এইরূপ আদান প্রদানই ভৌতিক জগতের নিয়ম। কিন্তু মানসিক জগতে, ভাব, জ্ঞান, বুদ্ধির বিনিময়ে দাতার জ্ঞান-বুদ্ধির পরিমাণ অল্প হয় না, গ্রহিতার ভাব, জ্ঞান, বুদ্ধির পরিমাণ (?) উপচিত হয় বটে। সুতরাং ভৌতিক জগতের গতি বা শক্তি চৈতন্যাকারে পরিবর্ত্তিত হয়—এ মতবাদটি সম্পূর্ণ অসার ও অশ্রদ্ধেয়। (১)

৬। দেহাত্মবাদী জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের বৈপরীত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। শক্তি, জড় প্রভৃতি সমস্তই বিষয়—জ্ঞেয় স্থানীয়। দেহ, মস্তিষ্ক, স্নায়ু, ইন্দ্রিয়—প্রভৃতিও বিষয়—জ্ঞাতার জ্ঞেয় বিষয়। ইহাদের স্বতঃসিদ্ধতা নাই। ইন্দ্রিয়বৃত্তি বা সংবেদনসমূহ একত্র, সজ্জিত, ব্যবস্থিত করিয়া ইহাদের একটা ধারণা করা হয়। সুতরাং Lewes মহামতি যে ইহাদিগকে, কল্পনার সাহায্য না লইয়া, একেবারে কি প্রকারে পাইলেন তাহাও বুঝা যায় না। সংবেদনই (sensations) আগে, না দেহটাই (organism) আগে ? Lewes এ সম্বন্ধে মনোনিবেশ করিলে দেখিতে পাইতেন তাঁহার দেহটা কতকগুলি সংবেদনের একটা পারিভাষিক সংজ্ঞা মাত্র।

(১) "The master generalisation of the physical world, that of the conservation of energy, would be violated by the assumption that energy could appear or disappear in one form without at once disappearing or reappearing to a precisely equivalent amount in another. Brain changes could not then be transformed into sensations or volitions be transformed into brain changes without a breach of physical continuity and of such a breach there is supposed to be no evidence" Ward.

অনবধানতা বশতই তিনি দেহটাকে সংবেদনের পূর্ব্বে পাইতে পারিয়াছেন, সন্দেহ নাই। যদি দেহ, মস্তিষ্ক, স্নায়ু, জড় প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের অপরোক্ষ জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের সত্তা ও কার্য্য-প্রণালীদ্বারা আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা হইতে পারিত বটে; কিন্তু Lewes 'গোড়া কেটে আগায় জল' ঢালিয়াছেন। পণ্ডিত Reihl এ মতবাদের অসারতা প্রতিপাদন পূর্ব্বক বলিতেছেন—"As for the assertion of the physiologist it is impossible to understand as meaning that we are conscious of sensations originally as stimulations of our nerves, since we possess no innate knowledge of the nerves and the brain.···Even the physiologist does not know sensations immediately as stimulations of nerves, they are given for him as elements of perception; and it is only by perception, i.e., on the basis of sensations that he arrives at the knowledge of the existence of nerves. †

শরীর সুতরাং অপরোক্ষানুভূতিসিদ্ধ বস্তু নহে; সংবেদনসমূহকে আত্মার বাহিরে নিক্ষেপ করিয়াই আমরা শরীরের সত্তা কল্পনা করি; কেবল শরীর নহে; অন্যান্য সকল ভৌতিক বস্তুই এই প্রকারে বহির্নিক্ষিপ্ত সংবেদন সমষ্টি (Projection of sensations)। জ্ঞাতা কিন্তু এই সংবেদনসমূহেরও জ্ঞাতা; কাজে কাজেই ইহা জ্ঞেয় উৎপাদ্য নহে। আত্মা নিজেই আপনাকে জ্ঞেয় হইতে ভিন্ন বলিয়া জানে, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞেয়কেও প্রকাশ করে। তাহাকে বিষয়ীর পদ হইতে কদাচ বিষয়ের পদে বসাইতে পারা যায় না। যদি শরীর এই প্রকারে জ্ঞেয়কে প্রকাশ করে ও সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে তাহা হইতে ব্যাবৃত করে, তাহা হইলে শরীর ও আত্মার কেবল নাম মাত্রে পার্থক্য থাকিতেছে। আর শরীরকে সেই জন্য জড় বলিয়া নির্দ্দেশ করাও সঙ্গত হইতেছে না। উহা অবশ্যই আত্মার ন্যায় স্বয়ং প্রকাশ। কিন্তু শরীরকে জড়াবয়ব সমষ্টি বলিয়া তন্নিষ্ঠ শক্তির দ্বারা চৈতন্যোৎপত্তির ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। এ সম্বন্ধে পণ্ডিত Watson, Lewesএর প্রতিবাদে যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলেন—"Now an organism that separates between its own subjective and objective aspects, apprehending two distinct sets of functions as in essential relation to each other, must be self-conscious—conscious of itself as a unity combining these opposite states. The organism thus becomes a term for a self-conscious being, comprehending at once subject and object.···We have seen that, taken by themselves they (subjective and objective states) cannot be regarded as either objective or subjective but are both equally indifferent to such a distinction. Objcetive and subjective exist only for that which is

† Science and metaphysics by Reihl.

conscious of the distinction of object and subject. ‡

পুনশ্চ। দেহাদি সমষ্টির যখন শব্দাদি বিষয় হইতে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই, এবং জ্ঞেয়ত্ব অংশেও যখন উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র বিশেষ নাই, অর্থাৎ শব্দাদি বিষয়ের ন্যায় দেহাদি সংঘাতও যখন অচেতন এবং জ্ঞেয় পদার্থ; তখন দেহাদি সংঘাতেরও জ্ঞাতৃত্ব সঙ্গত হইতে পারে না। আর দেহাদি সংঘাত যদি রূপাদির স্বরূপ বা অনুরূপ হইয়াও রূপাদি বিষয়সমূহকে জানিতে পারে, তাহা হইলে স্বয়ং দৃশ্যরূপাদি বিষয়সমূহও পরস্পরে পরস্পরকে জানিতে পারিত, অথচ তাহা কখনই হয় না—শঙ্কর বলেন—"নন্থ দেহাদি সঙ্ঘাতস্যাপি শব্দাদি স্বরূপত্বাবিশেষাদ্ বিজ্ঞেয়ত্বাবিশেষাচ্চ ন যুক্তং বিজ্ঞাতৃত্বং। যদি হি দেহাদি সঙ্ঘাতো রূপাদ্যাত্মকঃ সন্ রূপাদীন্ বিজানীয়াৎ,তর্হি বাহ্য-অপি রূপাদয়োঽ ন্যোন্যং স্বং স্বং রূপঞ্চ বিজানীয়ুঃ, ন চৈতদস্তি। তস্মাৎ দেহাদি লক্ষণাংশ্চ রূপাদীন্ এতেনৈব দেহাদি ব্যতিরিক্তেনৈব বিজ্ঞানস্বভাবেন আত্মনা বিজানাতি লোকঃ।" (২)

৭। পাঠককে একবার Huxleyর মত শুনাইয়াছি। অন্য একস্থল হইতে আরও কএক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব, সেখানে তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহা তাঁহার পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তির সমর্থন ত করেই না, বরং তাহার বিরুদ্ধমতই প্রমাণিত করে। Huxleyর সেই উক্তিটি এই :—"The arguments used by Descartes and Berkeley, to show that our certain knowledge does not extend beyond our states of consciousness appear to me as irrefragable now as they did when I first became acquainted with them half a century ago. All the materialistic writers I know of who have tried to bite that file have simply broken their teeth." (৩)

পাঠক এখানে দেখিলেন Huxley জড়বাদীকে কি প্রকারে শ্লেষ করিয়া অধ্যাত্মবিজ্ঞানবাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে চিন্তা করিয়া বুঝিতে গেলে এই সকল মনস্বিগণের চিন্তায় এত বৈসাদৃশ্য—অসঙ্গতি পরিদৃষ্ট হয়, যে অবাক হইয়া যাইতে হয়। যখন জড়বাদের পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক ইহাঁরা বাঙ্‌নিষ্পত্তি করেন, তখন ইহাদিগকে 'থাম থাম' বলিয়াও নিবৃত্ত করা দুষ্কর। আবার যখন মতান্তরের সমর্থন করেন, তখনও সেই দশা। যাহা হউক।

৮। দেহাত্মবাদী হটিবার পাত্র নহেন। উপরি উক্ত যুক্তি-প্রণালী পাঠ করিয়া তিনি হয়ত বলিবেন—"জ্ঞাতার একত্ব প্রতিসন্ধান (reference of phenomena to an identical self) এত দুর্ব্যাখ্যেয় কেন হইবে? তোমরা তিলকে তাল করিয়া বৃথা চীৎকার করিয়া মরিতেছ। দেহাকারে পরিণত জড়ভূতই আত্মা, আত্মা বলিয়া আর স্বতন্ত্র কোন বস্তু নাই; শরীরস্থ ভূতনিচয়ের স্থায়িত্ব না থাকিলেও শরীরের একত্ব প্রতীতির বাধ হয় না। কেন হয় না বলিতেছি।

‡ Kant and his English critics by J. Watson
(২) কঠোপনিষৎ—দ্বিতীয়াধ্যায় তৃতীয় শ্লোকভাষ্যও দ্রষ্টব্য।
(৩) Fortnightly Review—Decr. 1886.

তোমরা কি কোন সভা সমিতিতে বহু সভ্যের বা ব্যক্তির ঐকমত্য লক্ষ্য কর নাই? শরীরস্থ ভূতসমূহ মিলিত হইয়া—একমত হইয়া ক্রিয়া সম্পাদন করে বলিয়াই আত্মগত ভাবনিচয়ের এককর্তৃত্বের প্রতিসন্ধান সম্ভবপর হয়। ঐ ভূতসমষ্টি সমবেত হইয়াই চিন্তা করে, ইচ্ছা করে, জানে, শারীর ক্রিয়া পরিচালনা করে, তাই উহাদের সমষ্টিভূত ক্রিয়া শক্তিকেই আত্মা নাম দেওয়া হয় যখন কোন ভূতসূক্ষ্ম ঐ দেহ সভা হইতে অপসৃত হয়, তখনও শারীরিক মানসিক ক্রিয়াগুলি একভাবেই চলিতে থাকে। কেবল সভ্যের 'অদলবদল' মাত্র;—সভার কার্য্য সমানই চলে। নূতন সভ্য পুরাতন সভ্যের স্থান অধিকার করিয়া সভার নিয়মানুবর্ত্তী হইয়াই কার্য্য করেন; সেই জন্য সভার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। দেহ সভার সম্বন্ধেও ঐ যুক্তি। পূর্ব্বোত্তরকালীন কার্য্যের সাদৃশ্য দর্শনে সভাকে যেমন এক সভা বলা হয়; শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়ার একত্ব দর্শনে, উহার নির্ব্বাহক বৃন্দকে এক বলিয়াই মনে হয়। এতক্ষণে বুঝিলে ব্যাপারটা কি?"

এতদুত্তরে বক্তব্য—কিছুই বুঝিলাম না; বরং যেটুকু বুঝিয়াছিলাম তাহাও গুলিয়া গেল। প্রথমতঃ এ উক্তিটি একটা উপমামূলক। উপমা প্রমাণের পদারূঢ় হইবার যোগ্য নহে। প্রমাণ দ্বারা বস্তুসিদ্ধ হইলে উপমা দ্বারা উহার অর্থ পরিস্ফুট—বিস্পষ্ট হইতে পারে বটে; কিন্তু যুক্তির সহিত সংযুক্ত না হইলে ইহার কিছুমাত্র প্রামাণ্য নাই। দ্বিতীয়তঃ; এখানে পরোক্ষজ্ঞানকে অপরোক্ষজ্ঞান হইতে অতি উচ্চ আসন প্রদান করা হইয়াছে। সভাসমিতির জ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞান; আর আমাদের জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্বের জ্ঞান—একত্বের জ্ঞান—অপরোক্ষ জ্ঞান। অপরোক্ষ জ্ঞান দিয়াই পরোক্ষ জ্ঞানের সত্যাসত্যতা নির্দ্ধারণ করিতে হয়। তদ্বিপরীতে, পরোক্ষজ্ঞান দ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞানের বিচার চলে না। বাচস্পতি মহাশয় কিন্তু করিতেছেন তাহাই। তৃতীয়তঃ সভার সভ্য মহোদয়েরা সভা হইতে আপনাদিগকে ভিন্ন ব্যক্তিরূপেই জানেন। কোন বিষয়ে ঐকমত্য থাকিলেও, সকলেই স্ব স্ব জ্ঞান-বুদ্ধিমত বিচার করিয়া ঐ মতে উপনীত হয়েন এবং তাঁহাদের প্রত্যেকেরই অহংবোধ ভিন্ন ভিন্ন। দেহাবয়বের সম্বন্ধে কিন্তু সেটি দেখা যায় না। তাহার অর্থ কি! সুতরাং বাচস্পতি মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধা সত্ত্বেও তাঁহার কথায় সায় দিতে পারিলাম না। কিন্তু বাচস্পতি মহাশয়ের অস্ত্রাগারে অস্ত্রের অভাব নাই। এবার তিনি বজ্র নিক্ষেপ করিয়া হয়ত বলিবেন—

৯। "দীপশিখাবচ্ছেৎ" অর্থাৎ আত্মার একত্ববোধটা দীপশিখার ন্যায় একত্ববোধ মাত্র। যেমন দীপশিখা অনেকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রভার সমষ্টি মাত্র, অথচ অতিদ্রুত উদ্গমনহেতু অগ্রজাত প্রভা পশ্চাজ্জাত প্রভার সহিত মিশিয়া একীভূত হইয়া যায়, এবং উহাই বস্তুর প্রকাশক হয় সেই প্রকার ভূতাণুগুলি, মস্তিষ্কাকারে পরিণত হইলে উহাদের সমষ্টিভূত স্পন্দন চৈতন্যরূপে প্রতীয়মান হয় এবং স্পন্দনের অতিদ্রুততা নিবন্ধন ঐ চৈতন্য একীভূত বলিয়া বোধ হয়। এ প্রকার বলিলে উপায় কি? এতদুত্তরে বক্তব্য—বাচস্পতি মহাশয় ভ্রান্তি বশতঃ যাহাকে বজ্র বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহা বজ্র নহে, কোমল কমলপলাশ মাত্র। দীপশিখার যে একত্ববোধ ঐ বোধটা কাহার, বাচস্পতি মহাশয়ের না দীপশিখার?

যদি বাচস্পতি মহাশয়ের হয়, তাহা হইলে প্রভার সাদৃশ্য ও দ্রুততানিবন্ধন ঐ প্রকার ভ্রান্তিবোধ সম্ভবপর বটে। যাহা যে প্রকার নহে, তাহাকে সেই প্রকার বলিয়া বোধ করাই ভ্রান্তি। দীপশিখা বাস্তবিকপক্ষে একটিমাত্র প্রভা নহে, বহু প্রভার সমষ্টি, তাহাকে এক বলিয়া বোধ করাই ভুল। বাচস্পতি মহাশয় নিজেই তাহা স্বীকার করিতেছেন। দ্রষ্টা বা বোদ্ধার পক্ষে বিষয় সম্বন্ধে ঐ প্রকার ভ্রান্তি সম্ভবপর হইলেও, দীপশিখার জ্ঞাতৃত্বসিদ্ধ হইতেছে না। উহা যে বেদ্য—যে জ্ঞেয় সেই জ্ঞেয়ই থাকিতেছে। পক্ষান্তরে আত্মার অস্তিত্বের যদি নিত্যসাক্ষাৎকারত্ব না থাকে, তবে অন্যান্য বস্তুর ন্যায় আত্মার অস্তিত্বেও সংশয় উপস্থিত হইতে পারে অর্থাৎ আমি আছি কি না এইরূপ সংশয় হইতে পারে, পরন্তু তাহা কদাচ হয় না; এবং এই অহংএর উপরই অন্যান্য যাবতীয় বিষয়জ্ঞান নির্ভর করে। বাহ্যবিষয়ে যে প্রত্যভিজ্ঞা (recognition) তাহা সাদৃশ্যনিবন্ধন (due to similarity); কিন্তু অহং বা বেত্তা বিষয়ক যে প্রত্যভিজ্ঞা তাহা স্বরূপনিবন্ধন (due to identity)। ইহা অনুভবসিদ্ধ, অপরোক্ষ জ্ঞান। সুতরাং দীপশিখার দৃষ্টান্ত অসৎ দৃষ্টান্ত মনে করিতে হইবে।

আর যদি দীপশিখাকেই একত্ববোধের আশ্রয়, অর্থাৎ ঐ দীপশিখাই 'অহংএকঃ' এই বলিয়া বোধ করে, একথা বলা হয়, তাহা হইলে বক্তব্য অগ্রে দীপশিখার বোদ্ধৃত্ব প্রমাণিত হউক, পরে উহার একত্ববোধ-বিষয়ে মীমাংসা করা যাইবে। দীপশিখা যে বেত্তা, দ্রষ্টা, কর্ত্তা বা চেতন এ প্রতিজ্ঞা ত এখনও সপ্রমাণ হয় নাই। বেত্তার লক্ষণ বিষয়কে আপনা হইতে পৃথক করিয়া উহাকে আপনার প্রকাশে প্রকাশিত করা। তাই পুরাতন ঋষি মহামতি কপিল বলিয়াছেন—

"জড়ব্যাবৃত্তো জড়ং
প্রকাশয়তি চিদ্রূপঃ।" (১)

অতএব দীপপ্রভার চৈতন্য অনুপপন্ন হওয়ায়, তাহার একত্বপ্রতীতিও অনুপপন্ন হইতেছে।

১০। বুধোপম অশেষ জ্ঞানসম্পন্ন Herbert spencer এখানে উপস্থিত হইয়া হয়ত বলিবেন—আধ্যাত্মিক ব্যাপারগুলি একটা অজ্ঞেয় সত্তার চিহ্ন (symbol) মাত্র। ভৌতিক ব্যাপার যেমন একটা চির-অজ্ঞেয় সত্তার চিহ্ন, আধ্যাত্মিক ব্যাপারও তাহাই। সুতরাং হয় আধ্যাত্মিক ব্যাপারকেই ভৌতিক ব্যাপারে পর্য্যবসিত কর, বা ভৌতিক ব্যাপারকেই আধ্যাত্মিক ব্যাপারে পর্য্যবসিত কর, কথা একই। উভয় ব্যবস্থাই সঙ্গত। তিনি বলেন—

"We see that the whole question is whether these symbols should be expressed in terms of those or those in terms of these—"question scarcely worth deciding, since either answer leaves us as completely outside of the reality as we were at first."

কিন্তু এ কথা সত্য কি? ভৌতিক ব্যাপারকে আধ্যাত্মিক ভাষায় ব্যাখ্যা করা চলে; কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যাপারকে ভৌতিক ভাষায় ব্যাখ্যা করা চলে কি? তাহা চলে না? জড়ই জ্ঞানের ভাষায় জ্ঞাত ও পরিব্যক্ত! কিন্তু জ্ঞানকে জড়ের ভাষায় ব্যক্ত করিবার চেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল; এবং যাহাকে তিনি অজ্ঞেয়

(১) সাংখ্যদর্শন ৬.৫১

সত্তা বলিয়া কল্পনা করিতেছেন, তাহা যে বিশুদ্ধ কল্পনা নহে তাহাও বুঝা যাইতেছে না। আত্মার সম্বন্ধে একটা অস্ফুট জ্ঞান—আত্মা যে অপরিণামী—নিত্যবর্ত্তমান স্বভাব—এ প্রকার একটা জ্ঞান তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কেন না, স্বাত্মবোধের মধ্যেই ঐ জ্ঞান নিত্য নিহিত বলিয়া তিনি বিবেচনা করেন। সুতরাং তাহাকে কেবল একটা চিহ্ন মাত্র বলায় তাঁহার বাক্যের সঙ্গতি বজায় থাকে না। তাঁহার বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি—

"Besides that definite consciousness of which Logic formulates the laws, there is also an idefinite consciousness which cannot be formulated. To say that we cannot know the absolute, is by implication to affirm that there is an absolute. In the very denial of our power to learn what the absolute is, there lies hidden the assumption that it is; and the making of this assumption proves that the absolute has been present to the mind not as a nothing, but as a something." পুনশ্চ As we can in successive mental acts get rid of all particular conditions and replace them by others, but cannot get rid of that undifferentiated substance of consciousness which is conditioned anew in every thought; there ever remains with us a sense of that which exists persistently and independently of conditions.……And since the only possible measure of relative validity among our beliefs is the degree of their persistence in opposition to the efforts made to change them, it follows that this, which persists at all times, under all circumstances, and cannot cease until consciousness ceases, has the highest validity of any."

পাঠক, ইহা হইতে কি বুঝিতে পারিতেছেন? এই 'নিরুপাধিক চৈতন্য' কি একটা অজ্ঞেয় সত্তার চিহ্ন (symbol) মাত্র? তাহা নহে; ইহা প্রতিবোধবিদিত—প্রতি জ্ঞানের সহিত নিত্য বর্ত্তমান। তবে তাঁহার পূর্ব্ব বাক্যকে সত্য বলিয়া মনে করিব কি প্রকারে? শুনুন তিনি নিজেই এ সম্বন্ধে আর কি বলিয়াছেন—

"Of the two it seems easier to translate so-called matter into so-called spirit than to translate so-called spirit into so-called matter (which latter is, indeed, wholly impossible)." Spencer এর কথা হইতে কি বুঝা যায়? জড়কে মনোবৃত্তিতে পরিণত করা সম্ভবপর, কিন্তু মনকে জড়ের গতিতে পরিণত করা সর্ব্বদা অসম্ভব।

১১। জড়বাদীরা জড়কে প্রাপ্ত বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন; দেখা গিয়াছে সেটা ঠিক নহে; যাহাকে জড় বলা হয় তাহা কতিপয় ম্লান চিত্তবৃত্তির বর্ণে রচিত; ঐ রচিত মূর্ত্তির অনুরূপ বাহিরে একটা কিছু আছে এ কল্পনা স্বাভাবিক হইতে পারে বটে কিন্তু উহা নিতান্ত আবশ্যকও নহে, যুক্তিযুক্তও

নহে। চিত্তবৃত্তি ও আণবিক গতি এতদুভয়ের মধ্যে যদি একটিকে বাস্তব, অপরটিকে মিথ্যা বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে চিত্তবৃত্তি ও জ্ঞানকে বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করাই অধিকতর সঙ্গত এবং পরমাণু ও তাহার গতিকে মিথ্যা বলিয়া গ্রহণ করাই সমীচীন। কেননা, জড় জগতের তুলনায় চৈত্ত্য বিষয়গুলিই অব্যবহিতরূপে জ্ঞাত; জড় জগৎ উহাদের হেতুরূপে পরিকল্পিত মাত্র। এই কল্পিত সত্তাই বিজ্ঞানের অবলম্বন,—এ কথা বলায় কার্য্যতঃ বা ব্যবহারতঃ কোন ক্ষতি নাই। বৈজ্ঞানিকের রুষ্ট হইবারও কোন হেতু নাই। পূর্ব্বে এ কথা একবার বলিয়াছি; কিন্তু এ কথাটা এত সহজেই লোকে ভুলিয়া যায় যে, ইহা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক। তাই লেখকের পুনরুক্তি বোধ হয় মার্জ্জনীয়। কোন প্রসিদ্ধ চিন্তক বলিয়াছেন—"The sensation is *actual* and given but in the atoms nothing is at bottom given except the remains of faded sensations by means of which we create the image of them. The idea that something extended absolutely independent of our subject, corresponds to the image may be very natural but not absolutely necessary and conclusive. If therefore, of the two objects—sensations and atomic movement one must be taken as reality, the other as mere appearance, there would be much more reason to take sensation and consciousness as real and the atoms and their movements as mere appearance. That we construct natural science upon this appearance cannot make any difference." (২)

মহামতি Dr. Brain এই জড়বাদ বা দেহাত্মবাদ সম্বন্ধে কি বলেন পাঠক শ্রবণ করুন। তিনি বলেন—

"There is no possible knowledge of a world except in reference to our minds. knowledge means a state of mind: the notion of material things is a mental fact. We are incapable even of discussing the existence of an independent material world; the very act is a contradiction. We can speak only of a world presented to our minds."

দেখা যাইতেছে, আত্মানিরপেক্ষ বাহ্য জগতের ধারণাই যখন স্ববিরোধী তখন নিরপেক্ষ জড়ের গতিবশতঃ মস্তিষ্কে চেতনার উদ্রেক হয়, এ প্রকার ধারণাও স্ববিরোধী। আমরা কেবল জ্ঞানোপস্থাপিত জড়জগতের ধারণাই করিতে পারি, তদতিরিক্ত জগতের ধারণা করিতে পারি না। অতএব জড়তত্ত্ব দ্বারা আত্মতত্ত্ব পরিব্যাখ্যানের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। আত্মতত্ত্বের দিক হইতে দেখিলে জড়তত্ত্বের দশা এই প্রকারই দাঁড়ায়। আবার জড়তত্ত্বের দিক হইতে আত্মতত্ত্বের সান্নিধ্যেই উপনীত হওয়া যায় না। এ কথা আর বিশদ করিয়া না বলিলেও বুঝা যাইতেছে। তথাপি জড়তত্ত্বের দিক হইতে আর দুই একটি কথা বলিব।

(২) Lange's History of materialism.

১২। জড়বাদী বলেন—আত্মা শরীরেরই ক্রিয়া, কেননা যেখানে শরীর নাই, সেখানে আত্মার মস্তিষ্ক উৎপন্ন হয় না শরীর সুস্থ থাকিলে আত্মা সুস্থ থাকে, শরীরের ক্লেশে আত্মা ক্লিষ্ট হয়, শরীর পাতে আত্মা বিনষ্ট হয়। অতএব শরীর ব্যাপক, আত্মা ব্যাপ্য। ব্যাপক দর্শনে ব্যাপ্যের অনুমান হয় না, পরন্তু ব্যাপ্য দ্বারা ব্যাপকের অনুমান হয়। সুতরাং যেখানে যেখানে আত্মা, সেখানে সেখানে শরীর, কিন্তু যেখানে যেখানে শরীর সেখানে সেখানে আত্মার অনুমান হয় না।

ইহার উত্তরে বক্তব্য, জড়ের ক্রিয়া অবয়বগত ক্রিয়ার সমষ্টি এবং ঐ ক্রিয়া গতি-আত্মক। অবয়বের গতি কল্পনা না করিয়া জড়বস্তুর গতিশীলতা কল্পনা করা যায় না; এবং এই গতি-আত্মক ক্রিয়া অপরোক্ষবোধ-সিদ্ধ নহে। কিন্তু আত্মার ক্রিয়া ইচ্ছা, চিন্তাদি অবয়ব—গতি নিরপেক্ষ অনুভবসিদ্ধ। যাহার ক্রিয়া অবয়ব-গতি নিরপেক্ষ-অনুভব-সিদ্ধ, তাহার ক্রিয়া অবয়বক্রিয়াসাপেক্ষ নহে। যাহার ক্রিয়া অবয়বক্রিয়াসাপেক্ষ নহে, তাহার ক্রিয়া গতি-আত্মক নহে, কেননা গতি-আত্মক ক্রিয়া অবয়ব ক্রিয়ার সমষ্টি। যাহার ক্রিয়া গতি-আত্মক নহে, তাহা ভৌতিক বস্তু নহে; অতএব আত্মা ভৌতিক বস্তু নহে, বা ভৌতিক বস্তুর ক্রিয়া নহে, ইহা বিস্পষ্টভাবে বুঝা যাইতেছে। শরীর ভৌতিক বস্তু সুতরাং আত্মা শরীরের ক্রিয়া নহে। তবে ভৌতিক ক্রিয়ার অর্থাৎ মস্তিষ্কগত স্নায়ুমণ্ডলীর গতি-আত্মক ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে, আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে, সমান্তরাল ভাবে ভৌতিক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, জড়বাদে এইটুকু পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু এই দুই শ্রেণীর বিপরীত ক্রিয়া কেন এ প্রকার সমান্তরাল ভাবে নিষ্পন্ন হয়, জড়বাদী তাহার কোন সদুত্তর দিতে পারেন না। জড় ও আত্মার পৃথক সত্তা স্বীকারে এই সমস্যা অমীমাংস্য। জড়বাদী তাই আত্মাকে জড়ের গতিতে পর্য্যবসিত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সে চেষ্টা যে নিষ্ফল তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই জন্য জড়কে আত্মক্রিয়া সমুদ্ভূত বলিয়া মীমাংসা করা সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রফুল্লনাথ লাহিড়ী।

বৰ্দ্ধমান জেলার মেলার বিবরণ

দধিয়া বৈরিগীতলার মেলা

পুণ্যভূমি ভারতের গৌড়দেশে, বৰ্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমায় দধিয়া বৈরিগীতলা অবস্থিত। বৈষ্ণবমণ্ডলীর নিকট বোধ হয় এ গ্রামের অধিক পরিচয় দিতে হইবে না, কারণ বহুকাল হইতেই এই স্থানে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটী মহামহোৎসব হইয়া আসিতেছে। তবে সাধারণ পাঠক পাঠিকার জন্য গ্রাম খানির একটু পরিচয় আবশ্যক

দধিয়া বৈরিগীতলা একখানি অতি ক্ষুদ্র পল্লী। নবনির্ম্মিত কাটোয়া-আমাদপুর রেল-পথে কাঁদরা ষ্টেশন হইতে চারি মাইল দক্ষিণে এই গ্রাম অবস্থিত। গ্রামের পূর্ব্ব প্রান্তে মেলার স্থান। স্থানটী বেশ মনোরম। গ্রামের চারি মাইল দক্ষিণে ভৈরবমূর্ত্তি অজয় নদ প্রবাহিত।

মেলার স্থানের চারিদিকে আম্রকানন। নিদাঘকালের মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে তাপিত রাখাল বালকগণ বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নানাপ্রকার আমোদপ্রমোদে কালাতিবাহিত করে। তাহাদিগের হাবভাব দেখিলে ব্রজরাখালগণের কথা মনে পড়ে। আম্রবৃক্ষগুলি এত ঘনসন্নিবিষ্ট যে, সূর্য্যদেবও তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন না। সন্ধ্যাকালে নানা দিগ্দেশ হইতে পক্ষিগণ তথায় আগমন করিয়া মধুরস্বরে আম্রকানন মুখরিত করে; দেখিলে মনে হয় সেই শান্তিময় আম্রকানন এবং পক্ষিগণ ভগবানের মহিমা কীর্ত্তনে বিভোর! আম্রকাননের পার্শ্বে সাঁওতা নামে একটী সরোবর। সরোবরে প্রস্ফুটিত পদ্মসৌরভে আমোদিত স্নিগ্ধ বায়ুরাশি স্থানটীকে আরও মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। স্থানটীতে গমন করিলে মনে স্বভাবতঃই পবিত্র ভাবের উদয় হয়, মনে হয় যে, শান্তিদেবী তথায় চিরবিরাজমানা। স্থানটীর এমনই স্বর্গীয়ভাব যে, তথায় উপস্থিত হইলেই ঘোর বিষয়াসক্ত ব্যক্তির মনেও সংসার বৈরাগ্য উপস্থিত হয়।

সন ১১৬০ সালের কিছু পূর্ব্বে গোপাল দাস নামক জনৈক কনৌজ ব্রাহ্মণ শ্রীরঘুনাথ-জী নামক একটী বিগ্রহ সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হন। গোপালদাস সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময় ঐ স্থানটী নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। সেখানে কেহ বসবাস করিত না; কেবল স্থানীয় দুই চারিজন মৃত বৈষ্ণবের সমাধি হইত। গোপালদাস আসিয়া সেই জনশূন্য নিবিড় জঙ্গল মধ্যে একখানি পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার উপাস্য ৺রঘুনাথ জীর সেবায় মনোনিবেশ করিলেন। ক্রমে ক্রমে সেই গ্রামের এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকগণ তথায় যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। সমাগত ব্যক্তিদিগকে লইয়া গোপালদাস ধর্ম্মালোচনায় পরম সুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন। ভগবান্ ৺রঘুনাথ জীর উপাসক ভক্ত গোপালদাস সেই সকল লোক লইয়া একটী "ধর্ম্মপরিষদ্" গঠন করিলেন। এই পুণ্য পরিষদ গ্রামে গ্রামে যাইয়া মহোৎসব দিতে আরম্ভ করিলেন এবং গ্রামে গ্রামে প্রচার করিতে লাগিলেন যে, প্রত্যেক বৎসর মাঘ মাসের মাকরী সপ্তমীর দিন ৺রঘুনাথজীর নিকট যাইয়া সকলে মহোৎসব করিবে। গোপালদাস গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিয়া প্রথমতঃ—মহোৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বেশী দিন তাঁহাকে আর ভিক্ষা করিতে হইল না। সকল লোকেই তাঁহাকে একজন পরম যোগী ও সাধুপুরুষ বলিয়া চিনিতে পারিলেন। তখন দলে দলে লোক তাঁহার নিকট ব্যাধি উপশম বা অভীষ্ট সিদ্ধির আশায় আসিতে লাগিল, তিনিও যোগবলে সকলের অভিলাষ পূর্ণ করিতে লাগিলেন। গোপালদাসের পসার জমিয়া গেল; আর তাঁহাকে ভিক্ষা করিয়া মহোৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইল না, জনসাধারণ মহোৎসবের সমস্ত ব্যয় সরবরাহ করিতে আরম্ভ করিল।

অপরিমেয় অলৌকিক শক্তির আকর হইলেও

আত্মমহিমা ঢাকিয়া রাখাই প্রকৃত সাধুর স্বভাব। তবে যে, কোন কোন সময়ে কোন কোন সাধু তাঁহাদের অলৌকিক শক্তির দুই একটী পরিচয় প্রদান করেন, তাহা জরতি প্রকৃতির লোকের অজ্ঞান চক্ষু উন্মোচনের জন্য মাত্র। গোপালদাসও মধ্যে মধ্যে ঐরূপ লোকদিগের জন্য তাঁহার অলৌকিক শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

কথিত আছে, তিনি যখন প্রথম প্রথম মহোৎসব দিতে আরম্ভ করেন, তখন জাত্যাভিমানী দুই চারিজন ব্রাহ্মণ মহোৎসবের অন্ন গ্রহণ করিলে জাতি নষ্ট হইবে বলিয়া তাঁহার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। শ্রীপুরনিবাসী প্যারীমোহন চট্টোরাজ মহাশয় দিগের পূর্ব্বপুরুষগণ গোপালদাসের মহোৎসবের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করেন এবং তাঁহাদের গ্রামের অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকেও উক্ত মহোৎসবের নিমন্ত্রণে যাইতে দেন নাই। গোপাল দাস কিন্তু তাহাতে দৃক্‌পাত না করিয়া মহা সমারোহে মহোৎসব সম্পন্ন করিলেন, তাঁহার "ধর্ম্ম পরিষদ্"ভুক্ত অন্যান্য গ্রামের ব্রাহ্মণসজ্জনগণ মহোৎসবে যোগ দিয়া পরমানন্দে মহোৎসবের অন্নগ্রহণ করিলেন। সেইজন্য শ্রীপুরনিবাসী ব্রাহ্মণগণ উক্ত ব্রাহ্মণগণের সহিত পংক্তি ভোজন বন্ধ করিলেন। এদিকে গোপালদাস তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন তোমাদের কোন ভয় নাই, শীঘ্র দেখিবে শ্রীপুরনিবাসী ব্রাহ্মণগণ স্বয়ং আসিয়া মহোৎসবের অবশিষ্টান্ন, যাহা আমি মৃত্তিকা গর্ভে গর্ত্ত করিয়া পুঁতিয়া রাখিয়াছি, তাহা গ্রহণ করিবেন। তোমরা মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়াছ, তোমাদের জাতিমারে কে? মহাপ্রসাদ গ্রহণে জাতি বিচার নাই। যাহারা মহাপ্রসাদ গ্রহণে জাতিবিচার করে তাহারা শাস্ত্র জ্ঞানহীন মূর্খ! তাহারা মহাপাপী, তাহাদের সংসর্গে থাকা তোমাদের এক্ষণে কর্ত্তব্য নহে।

এই ঘটনার অল্প দিবস পরেই শ্রীপুর গ্রামে ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধি, জলকষ্ট প্রভৃতি নানাপ্রকার অমঙ্গল উপস্থিত হইল। তখন গ্রামের অনেকেই 'কাণাঘুসা' করিতে লাগিল যে, গোপালদাসের মহোৎসবে না যাওয়াতেই বোধ হয় আমাদের এই প্রকার অমঙ্গল ঘটিল। ঠিক সেই সময়ে একদিন গোপালদাস শ্রীপুরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। হঠাৎ গোপালদাসকে দেখিয়া গ্রামের লোক যেন অকূলে কূল পাইল! গ্রামস্থ সকলে আসিয়া গোপালদাসের পদ প্রান্তে পতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিল। গোপাল দাস বলিলেন "মহাপ্রসাদে অবহেলা করাতেই আপনাদের এরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে, আপনারা সকলে যাইয়া সেই মহোৎসবের মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলেই আপনাদের সকল অমঙ্গল দুর হইবে। সেই মহোৎসবের অন্ন আমি মাটিতে পুতিয়া রাখিয়াছি, আসুন, সকলে আমার সহিত যাইয়া ভক্তিভরে মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়া ধন্য হইবেন, আপনাদের সকল আপদ বিপদ দূরে যাইবে।" গ্রামের প্রত্যেক গৃহ হইতে দুই একজন করিয়া গোপালদাসের সহিত তথায় গমন করিলেন। গোপাল দাস মৃত্তিকা নিম্ন হইতে সেই সমস্ত মহোৎসবের অন্নব্যঞ্জন তুলিয়া দিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই বহুদিনের অন্নব্যঞ্জন সমস্তই অবিকৃত ছিল।

শ্রীপুরবাসিগণ ভক্তিপূর্ব্বক সেই মহাপ্রসাদ ভোজন করিলেন এবং ভোজনাবশেষ মস্তকে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া গৃহলক্ষ্মীগণকে ও উত্থানশক্তি রহিত পীড়িত ব্যক্তিগণকে ভোজন

করাইলেন। সেই দিন হইতে শ্রীপুরের আপদ বালাই দূর হইল।

দধিয়ার পার্শ্ববর্ত্তী কোন গ্রামে মাণিক হালদার নামে একজন কৃষক বাস করিত। গোপালদাস কোন সময়ে কিছু দেবোত্তর জমী কর্ষণ করাইবার জন্য মাণিক হালদারকে ডাকিয়া আনিলেন। গোপালদাসের কথা শুনিয়া মাণিক বলিল "প্রভু, আমার ভগিনী আজ প্রায় এক বৎসর হইল বাতে পঙ্গু হইয়া পড়িয়া আছেন, তাঁহার অবস্থা বড় শোচনীয়, তাঁহার একটু 'আরাম' না হইলে কি করিয়া আপনার ভূমি কর্ষণ করিতে আসি।" এই কথা শুনিয়া গোপালদাস বলিলেন—"আচ্ছা, তোমার ভগিনীকে আগামী কল্য আমার নিকট পাঠাইয়া দিবে, আমি তাহার রোগ ভাল করিয়া দিব।" মাণিক কহিল "প্রভু, তিনি পঙ্গু হইয়াছেন, কিরূপে এতদূর আসিবেন, তাই ভাবিতেছি।" গোপালদাস বলিলেন—"কোন চিন্তা নাই, আমি বলিতেছি, তাহাকে আমার নিকট আসিতে বলিলেই সে আসিতে পারিবে।" তখন মাণিক বলিল "প্রভু, আপনার জমি কোথায় আমি চিনি না, জমী চিনাইয়া দিন।"

গোপালদাস বলিলেন "জমী আর কি দেখাইয়া দিব, তুমি আমার আরাধ্য দেবতা শ্রীশ্রী৺রঘুনাথজীর নাম করিয়া যে জমী কর্ষণ করিবে, সেই জমীই আমার।" পরদিন মাণিক তাহার ভগিনীকে গোপালদাসের আশ্রমে যাইতে বলিলেন, কিন্তু তাহার ভগিনী "উঠিতে পারিব না" বলায় মাণিক একটী ঝুড়িতে তাহার ভগিনীকে বসাইয়া মাথায় লইয়া গোপালদাসের আখড়ায় উপস্থিত হইল। তখন গোপালদাস নিজ উপাস্য দেবের পূজা করিতেছিলেন। পূজা শেষ হইলে তিনি খড়ম পায়ে দিয়া বাত ব্যাধিগ্রস্ত স্ত্রীলোকটীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "তোকে হাঁটিয়া আসিতে বলিয়াছিলাম,—হাঁটিয়া না আসিয়া মাণিককে কষ্ট দিলি কেন? উঠ, নহিলে তোকে 'খড়ম পিটে' করব।" তখন স্ত্রীলোকটী অতিশয় কাতর কণ্ঠে বলিল "মের না বাবা, আমার উঠিবার শক্তি থাকিলে কি আর আমি উঠি না।" তখন গোপালদাস খড়মের দ্বারা তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন, দুইচারি ঘা মা'র খাইয়া স্ত্রীলোকটী উঠিয়া বসিল। তাহার পর তিনি পুনর্ব্বার আদেশ করিলেন—"উঠিয়া দাঁড়া, নতুবা আবার মারিব।" স্ত্রীলোকটী ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল "না বাবা, আমি উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিব না।" তখন তিনি আবার তাহাকে খড়মের দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। দুই চারি ঘা প্রহার খাইয়া স্ত্রীলোকটী উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন গোপালদাস তাহাকে একরাশি গোময় দেখাইয়া দিয়া বলিলেন "ঐখানে যা, যাইয়া ঘুঁটে প্রস্তুত কর।" স্ত্রীলোকটী বলিল "বাবা, হাতে পায়ে একটুও বল নাই, আমি ওখানে গিয়া কিছুতেই ঘুঁটে প্রস্তুত করিতে পারিব না।" তখন তিনি তাহাকে আবার খড়মদ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। দুই চারি ঘা প্রহার খাইয়াই স্ত্রীলোকটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া 'নেদি' * দিতে—লাগিল। তখন গোপাল দাস তাহাকে আদেশ করিলেন "গোবর দেওয়া শেষ করিয়া, সাঁওতা পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া আসিবি এবং ভগবান শ্রীশ্রী৺রঘুনাথজীর প্রসাদ খাইয়া বাড়ী যাইবি, তোর

* গোময়দ্বারা ঘুঁটে প্রস্তুত করা

আরোগ্য হইয়াছে।" মহাপুরুষের আদেশানুযায়ী স্নানান্তে প্রসাদ খাইয়া স্ত্রীলোকটী পদব্রজে বাটী গিয়াছিল। তৎপর দিন মাণিক হালদার লাঙ্গল লইয়া আসিয়া একখানি বৃহৎ জমীতে "জয় রঘুনাথজীউ" বলিয়া লাঙ্গল দিতে লাগিল এবং পরে জানিতে পারিল যে, সেই জমীখানি গোপালদাসের দেবোত্তর জমীই বটে।

গোপালদাস প্রত্যহ হবিষ্যান্ন করিতেন। গোপনে কুটীর মধ্যে নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া প্রবেশ করিতেন, তৎপরে হবিষ্যান্ন প্রস্তুত করিয়া গৃহমধ্যেই ভোজন করিতেন, কেহ কখন তাঁহার ভোজন দেখিতে পাইত না। ভোজনান্তে স্বয়ং গৃহ পরিষ্কার করিয়া পাকপাত্র জলে ফেলাইয়া দিতেন। তাঁহার ভোজনাবশেষ বা প্রসাদ কখন কেহ পাইত না। বৈষ্ণবপদাবলী লেখক অমর কবি চণ্ডীদাসের সাধনভূমি বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামের জনৈক লোক তাঁহার প্রসাদ পাইবার আশায় তাঁহাকে কোন সময়ে নিজ বাটীতে লইয়া যান এবং তাঁহার আহারের জন্য এক'পাতন।' চিঁড়ে প্রদান করেন, ইচ্ছা অত চিঁড়ে তিনি খাইতে পারিবেন না, সুতরাং কিছু প্রসাদ থাকিবেই থাকিবে। তৎপরে তিনি গোপালদাসকে ভোজনের জন্য অনুরোধ করিলে তিনি নিয়মমত একখানি গৃহমধ্যে গোপনে ভোজন করিতে বসিলেন; সে ব্যক্তিও গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া দ্বারে বসিয়া রহিলেন, ইচ্ছা ভোজনাবশেষ গোপালদাস যেন কোন প্রকারে ফেলাইয়া দিতে না পারেন। প্রহরাধিক কাল ঐ ভাবে দ্বারে বসিয়া থাকিবার পরও যখন গোপাল দাস ভোজনান্তে গৃহ হইতে বাহির হইলেন না, তখন সেই ব্যক্তি অতিশয় অধীর হইয়া পড়িলেন এবং দ্বার খুলিয়া দেখিলেন গৃহমধ্যে গোপালদাসও নাই, কণামাত্র চিঁড়াও নাই। এই অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া লোকটী অবাক হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় দেখেন গোপালদাস স্নান করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত!

এইরূপে গোপালদাসের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া লোকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। মাত্র দুই চারিজন অবিশ্বাসীর মনে কেমন একটা 'খট্‌কা' লাগিল। তাঁহারা গোপালদাসের 'বুজরুকি' নষ্ট করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। সেরাণ্ডীগ্রামনিবাসী কয়েকজন গোপালদাসকে পরীক্ষা করিবার জন্য একদা আশ্বিন মাসে গোপালদাসের আখড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন? এবং গোপাল দাসকে বলিলেন "বাবাজি! আমরা আম দিয়া সল মাছের ঝোল খাইতে ইচ্ছা করিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি, আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করুন।" তাঁহাদের ধারণা আশ্বিন মাসে বাবাজী আমের সহিত সল মাছের ঝোল কখনই দিতে পারিবেন না, তখন সেই বুজরুককে বেশ করিয়া 'উত্তম মধ্যম' প্রদান করিয়া চলিয়া যাইব। গোপালদাস যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বসাইলেন এবং জনৈক শিষ্যকে বলিলেন "বাপু হে, সাঁওতা পুষ্করিণীর পশ্চিম ধারের একটা খালে একটা সল মাছ আছে ধরিয়া আন তো।" তৎপরে অপর একজন শিষ্যকে বলিলেন "বাপু, অদূরে ঐ যে আম গাছ দেখিতেছ ঐ গাছের দক্ষিণ দিকের ডালে এক থলা আম দেখিয়াছি বোধ হইতেছে, আম থলাটি পাড়িয়া আন তো।" তাঁহার আদেশানুযায়ী উভয়েই অল্পকাল মধ্যে আম ও সল মাছ লইয়া উপস্থিত হইল। তৎপরে উক্ত ভদ্রলোক

দিগকে আম ও সল মাছ রন্ধন করিয়া ভোজন করিতে অনুরোধ করিলেন। ভদ্রলোক কয়েকজন গোপালদাসের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া ভয়ে ভয়ে আম-সল রন্ধন করিয়া ভোজন করিলেন এবং ভোজনান্তে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। গোপালদাস বলিলেন "আপনারা তো কোন অপরাধ করেন নাই, তবে আর ক্ষমা করিব কাহাকে, আম ও সল মাছ না পাইলে আমাকে প্রহার করিবেন মনে করিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নহি, ইচ্ছা করেন তো প্রহার করুন।" তখন ভদ্রলোক কয়েকজন লজ্জিত, ভীত ও স্তম্ভিত হইলেন এবং অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া গোপাল দাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

কোন এক সময়ে বর্ষাকালে ভৈরবমূর্ত্তি অজয় নদের তীরে খেয়া না পাইয়া মাধব নামে জনৈক কৃষক গালে হাত দিয়া ভাবিতেছে, এমন সময়ে গোপালদাস তথায় উপস্থিত হইয়া সেই বিপন্ন কৃষককের হাত ধরিয়া নদীর উপর দিয়া হাঁটিয়া নদী পার হইয়াছিলেন।

কোন সময়ে দধিয়ার বহুলোক বৃন্দাবন যাত্রা করেন; তাঁহাদের বৃন্দাবন গমনের পর উক্ত গ্রামের জনৈক পরামাণিকের শ্রীধাম দর্শনে যাইবার ইচ্ছা বলবতী হইল, কিন্তু তখন বর্ত্তমান কালের ন্যায় বৃন্দাবন যাওয়া সোজা কাজ ছিল না। একাকী বৃন্দাবন যাওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল। সুতরাং পরামাণিক আসিয়া গোপালদাসের শরণাপন্ন হইল। গোপালদাস তাহার ব্যাকুলতা ও ভগবদ্ভক্তি দেখিয়া বলিলেন, "তুমি নিশ্চিন্ত থাক, যেদিন গ্রামের অন্যান্য লোক বৃন্দাবন পৌঁহুছিবে, সেইদিন তোমাকেও বৃন্দাবন পৌঁহুছাইয়া দিব।" বাবাজীর আশ্বাস বাক্যে বিশ্বাস করিয়া পরামাণিক বাড়ী ফিরিল এবং যে সময়ে গ্রামের বৃন্দাবন যাত্রী বৃন্দাবন পৌঁহুছিবার সম্ভব, সেই সময়ে পুনর্ব্বার পরামাণিক গোপালদাসের নিকটে আসিয়া তাহাকে বৃন্দাবন পৌঁহুছাইয়া দিবার জন্য অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল। তখন গোপাল দাস তাহাকে চক্ষু মুদিয়া বৃন্দাবন যাইতেছি মনে করিতে বলিলেন। তাঁহার আদেশানুযায়ী পরামাণিক একাগ্রচিত্তে "বৃন্দাবন যাইতেছি" চিন্তা করিতে করিতে মানসনেত্রে দেখিল যেন সে রাধাহৃদিরঞ্জন পীতবসন বনমালীর বিহারভূমি শ্রীবৃন্দাবনের যমুনা-পুলিনে উপস্থিত হইয়াছে। তখন সে গোপালদাসের চরণে ধরিয়া তাঁহার নিকট থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল. কিন্তু গোপালদাস তাঁহাকে গৃহে ফিরিতে আদেশ দিলেন এবং বলিলেন "বৎস, তোমার এখানে থাকিবার আবশ্যক নাই, গৃহে যাও। তোমার যখনই শ্রীবৃন্দাবন দেখিতে ইচ্ছা হইবে, তখনই ৺রঘুনাথজীকে স্মরণ করিয়া চক্ষু মুদিবে এবং শ্রীবৃন্দাবন যাইতেছি একাগ্রচিত্তে এই চিন্তা করিবে, তাহা হইলেই তোমার হৃদয়-দর্পণে শ্রীধামের চিত্র প্রতিফলিত হইবে। তবে একথা কাহাকেও বলিবে না, বলিলেই তোমার মৃত্যু হইবে।" কিন্তু পরামাণিক এতই তন্ময় হইয়াছিল যে, এ ঘটনা অপ্রকাশ রাখিতে পারিল না। এই অলৌকিক ব্যাপার প্রকাশ হইবার অল্প দিন পরেই সে ইহলোক ত্যাগ করিল।

এই প্রকারে গোপালদাস নিজ মহিমা প্রকাশ করিয়া ১১৬০ সালের ২৭শে পৌষ তারিখে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার পরলোকগমনের পূর্ব্বে তিনি তাঁহার ভক্তগণকে কনৌজ ব্রাহ্মণ দ্বারা তাঁহার

সৎকার করাইতে আদেশ দিয়া যান। ভক্তগণ তো ভাবিয়া অস্থির, কি করিয়া মহাপুরুষের আদেশ রক্ষা করিবেন! হঠাৎ বঙ্গদেশে কনৌজ ব্রাহ্মণ কোথায় পাওয়া যাইবে! কিন্তু কি আশ্চর্য্য ঘটনা, গোপালদাস যেদিন ইহলোক ত্যাগ করিবেন, ঠিক সেই দিন কতকগুলি পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণ আসিয়া গোপালদাসের আখড়ায় উপস্থিত হইলেন এবং গোপালদাসের পরলোকগমনের পর তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। কথিত আছে তিনি চিতায় বালক বেশ ধারণ করিয়া চিতাগ্নির সহিত খেলা করিয়াছিলেন।

গোপালদাসের ইহলোক ত্যাগের সংবাদ প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার পরিচিত জনৈক ব্রাহ্মণ দধিয়া শিষ্য বাড়ী আসিতেছিলেন; পথিমধ্যে গোপালদাসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি বলিলেন "বাবাজী, কোথায় যাইতেছেন? আমি আশা করিয়া আসিতেছি দধিয়া গিয়া দুই একদিন আপনার সহবাসে জীবন সার্থক করিব।" বাবাজী বলিলেন "আমি অযোধ্যা যাইতেছি, অযোধ্যা হইতে বৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছা আছে।" এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ বড়ই ম্রিয়মাণ হইলেন, এবং গোপালদাসকে প্রণাম করিয়া গমনোদ্যত হইলে বাবাজী বলিলেন "আপনি যখন দধিয়া যাইতেছেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার একটী কাজ করিলে বিশেষ উপকৃত হইব।" ব্রাহ্মণ আগ্রহের সহিত বলিলেন "কি কাজ আদেশ করুন, সানন্দে সম্পন্ন করিব।" বাবাজী বলিলেন "আমার আশ্রমে যে শিষ্য আছে, তাহাকে বলিবেন, আমার কুটীরের উত্তরদিকে যে বেদী আছে সেই বেদীর নিম্নে কিছু টাকা আছে, সেই টাকা তুলিয়া মহোৎসবের জন্য আবশ্যক দ্রব্যাদি যেন খরিদ করা হয়।" ব্রাহ্মণ স্বীকৃত হইলেন। তৎপরে দধিয়ায় গিয়া শুনিলেন, যেদিন তাঁহার সহিত গোপালদাসের সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাহার কয়েকদিন পূর্ব্বেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। যে দিন উক্ত ব্রাহ্মণের সহিত গোপালদাসের সাক্ষাৎ হয়, ঠিক সেই দিনই আইওপুরনিবাসী সিউড়ী প্রবাসী বিশ্বম্ভর গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গোপালদাস বলেন "আপনাকে আমার ঠাকুরের নাটমন্দির নির্ম্মাণ জন্য কাষ্ঠ খরিদ করিয়া দিতে হইবে।" গোস্বামীজী কাষ্ঠ খরিদ করিয়া দিতে স্বীকৃত হওয়ায় গোপালদাস তাঁহাকে কাষ্ঠের মূল্য এবং দধিয়া কাষ্ঠ পাঠাইবার জন্য গাড়ী ভাড়া মিটাইয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন। দুই এক দিন পরে বিশ্বম্ভর গোস্বামী কাষ্ঠ খরিদ করিয়া স্বয়ং কাষ্ঠের গাড়ীর সহিত দধিয়া গমন করেন, এবং গোপালদাস পরলোক গমন করিয়াছেন শুনিয়া বিস্মিত হইলেন।

গোপালদাসের দেহ রক্ষার পর ব্রজবাসী দাস দধিয়ার আখড়ার অধিকারী হন। ইনিও কনৌজ ব্রাহ্মণ ছিলেন। দধিয়ার মেলা তলায় ইঁহার দুইটী কীর্ত্তি এখনও বিদ্যমান আছে,—একটী বাগান এবং দ্বিতীয়টী সাঁওতার পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত একটী পুষ্করিণী। ইনিই এই আখড়ায় ৺রঘুনাথজীর পার্শ্বে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ব্রজবাসী দাসের মৃত্যুর পর গোপীচন্দ্রদাস, তৎপরে কল্যাণদাস, তৎপরে মোহনদাস এবং মোহন দাসের মৃত্যুর পর লছমনদাস উক্ত আখড়ার মোহান্ত হইয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই কনৌজ-ব্রাহ্মণ ছিলেন। লছমনদাসের মৃত্যুর পর কোন মোহান্ত না থাকায় উক্ত আখড়ার মজুত টাকা কড়ি যাহা ছিল সমস্তই

গবর্ণমেণ্ট আটক করেন। এই ঘটনা সন ১৩০৭ সালে সংঘটিত হয়।

কাটোয়ার তাৎকালিক সব্‌ডিভিসনাল অফিসার সারদা বাবু স্বয়ং আখড়ায় আসিয়া ৯০০০ টাকা লইয়া যান। কথিত আছে সারদা বাবু আখড়া হইতে টাকা লইয়া যাইবার পরক্ষণেই ৺রঘুনাথ জীর পাঁচ চূড়া মন্দিরটী হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। সারদা বাবুও কঠিন পীড়াগ্রস্ত হন। তখন তিনি সেই দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভের জন্য কোনরূপ চিকিৎসা না করাইয়া গোপাল দাসকে মানস করিয়া আরোগ্যলাভ করেন। তারপরে সারদা বাবু দধিয়া ও দধিয়ার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের ভদ্রলোকদিগকে উক্ত আখড়ার নূতন মোহান্ত নির্ব্বাচন করিবার ভার অর্পণ করেন। তদনুসারে একজন অযোধ্যাবাসীকে মোহান্ত করিবার জন্য অযোধ্যায় লোক পাঠাইয়া জনৈক কনৌজ ব্রাহ্মণ আনান হয়। তাঁহার নাম রামপদদাস। এক্ষণে ৺রঘুনাথজীর যে সকল মন্দির আছে তাহা ইঁহারই নির্ম্মিত।

সন ১৩০৮ সালে রামপদদাস কাটোয়া কালেক্‌টরী হইতে পূর্ব্বোক্ত ৯০০০৲ টাকা বাহির করিয়া আনিয়া রামপদদাস লছমন দাসের তিরোভাব মহোৎসব সম্পন্ন করেন। ১৩০৮ সালের ৬ই মাঘ উক্ত মহোৎসব হইয়াছিল। মহোৎসবে ১৮৴০ মণ ময়দা ও ৪০৴ মণ চাউল পাক হয়। দধিয়া অঞ্চলের ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকল জাতিকেই এই মহোৎসবে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। বহু অভ্যাগত বৈষ্ণব ও দীন দরিদ্রকে যত্নপূর্ব্বক ভোজন করান হইয়াছিল। ভারত বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়া ৺রসিকদাসের কীর্ত্তন গান হইয়াছিল। মহোৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া যে টাকা উদ্বৃত্ত ছিল তাহাতে ৺রঘুনাথ জীর মন্দির ও নাটমন্দির এবং গোপালদাসের পবিত্রাস্থির সমাধি মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার সাধিত হইয়াছে।

সাঁওতা পুষ্করিণীর ঈশান কোণে ৺রঘুনাথ জীর দক্ষিণ দুয়ারী মন্দির। মন্দিরের সম্মুখ ভাগে নাটমন্দির, তাঁহার দক্ষিণে গোপাল দাসের সমাধিমন্দির, সমাধি স্তম্ভের উপর শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও দুই খানি শ্রীচরণ-চিহ্ন অঙ্কিত আছে। এই সমাধি মন্দিরের দক্ষিণে গোপালদাসের পরবর্ত্তী মোহান্তগণের সমাধিস্তম্ভ বিদ্যমান রহিয়াছে। গোপাল দাসের পরবর্ত্তী মোহান্তগণও উক্ত আখড়ায় অনেক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে এই আশ্রমে ৺রঘুনাথ জীউ, সীতা, লক্ষ্মণ, হনুমান, নল, নীল, সুগ্রীব, জাম্বুবান, বালী, চারিটী চতুর্ভুজ নারায়ণ বা বাসুদেব মূর্ত্তি, শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি, তিনটী শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি, বটকৃষ্ণ (গোপাল) মূর্ত্তি একটী, লালাজী (গোপাল) মূর্ত্তি একটী, নাড়ুয়া গোপাল মূর্ত্তি ছয়টী এবং শালগ্রাম শিলা ষাটটী সর্ব্বসমেত ৮৬টি বিগ্রহ আছেন। বর্ত্তমান সময়ে ১০০ একশত বিঘা নিষ্কর দেবোত্তর জমী রামপদদাস মোহান্তের দখলে আছে। মেলার সময় পাঁচ সাতশত টাকা প্রণামী—জমা হইয়া থাকে। দৈনিক পূজার ব্যবস্থা তত ভাল নহে, পূজার সময় একবার ও সন্ধ্যাকালে শীতলের সময় একবার আরতি হইয়া থাকে। পূজার সময় কিছু ফল ও মিষ্টান্ন ভোগ হইয়া থাকে, মধ্যাহ্নে অন্ন—ভোগ হয় এবং সন্ধ্যাকালে দুগ্ধ বা মিষ্টান্নের শীতলভোগ হইয়া থাকে। গোপালদাস বাবাজীর সমাধি মন্দিরে গোপাল দাসের গোলকগত আত্মার উদ্দেশেও পূজা এবং

প্রত্যহ ভোগ দেওয়া হইয়া থাকে। গোপাল দাসের তিরোভাব উপলক্ষে প্রত্যেক বৎসর মাঘ মাসে বিরাট মহোৎসব ও তিনবার মেলা হইয়া থাকে, মাঘ মাসের মাকরী সপ্তমীর দিন মেলা আরম্ভ হয়। সেইদিন চিড়া মহোৎসব হয়। তৎপর দিন বিরাট অন্ন মহোৎসব হইয়া থাকে। অন্নমহোৎসবের দিন পাঁচশত মণের উপর চাউল পাক হইয়া থাকে। অন্ন মহোৎসবের পরদিন ধূলোট হইয়া থাকে। মহোৎসবের সময় দুইশতেরও অধিক আখড়া স্থাপিত হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক আখড়াতেই মহোৎসব হইয়া থাকে। অন্ন মহোৎসবের ব্যয় দেবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে করিতে হয় না। দধিয়া বৈরিগীতলার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে দলে দলে লোক—চাউল, দাইল, তরিতরকারী প্রভৃতি লইয়া মহোৎসব দিতে আগমন করিয়া থাকেন। আহুত, অনাহুত, রবাহুত, আউল, বাউল, সাঁই, দরবেশ, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, শূদ্র, ভদ্র যে কেহ মেলা স্থলে উপস্থিত হইয়া ইচ্ছমত প্রসাদান্ন পাইয়া থাকেন। মেলা দেখিতে আসিয়া কাহাকেও আহারের জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তা করিতে বা বেগ পাইতে হয় না। মহোৎসবের সময় ভাল ভাল কীর্ত্তন সম্প্রদায়ের সংকীর্ত্তন গান হইয়া থাকে, বিশেষতঃ ধূলোটের সময় নগরসংকীর্ত্তনের এত ধূম হয় যে, হরিনামধ্বনিতে আকাশ পূর্ণ হইয়া উঠে, পথে এরূপ জনতা হয় যে কাহারও ইচ্ছা হইলে একপদ অগ্রসর হইবার ক্ষমতা হয় না। বাংলা দেশে আর কোথাও এত বড় মেলা হয় কিনা—সন্দেহ। কলিকাতা, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নবদ্বীপ, রাজসাহী প্রভৃতি স্থান হইতেও সকল প্রকার দ্রব্যের বড় বড় দোকান এই মেলায় আসিয়া থাকে। ছয় সাতশত মিষ্টান্নের দোকান, দুইশতের উপর মনোহারী-দোকান, প্রায় একশত কাটা পোষাকের দোকান, পঞ্চাশ পঞ্চান্ন খানি পিতল কাঁসার বাসনের দোকান, বহু শীল, জাঁতা, পাথর, লাঙ্গল, জোয়াল, প্রভৃতি কৃষি যন্ত্রের দোকান, দশ বার খানি জুতার দোকান, অসংখ্য ফল মূলের দোকান উপস্থিত হইয়া থাকে। এক কথায় বলিতে হইলে বলা যায় যে, বাংলা দেশের যেস্থানে যাহা কিছু পাওয়া যায় দধিয়া বৈরিগীতলার মেলায় তৎসমুদায়ই পাওয়া যায়। দধিয়া বৈরিগীতলার আম্র কানন ঐ সময় একটী বড় সহরে পরিণত হইয়া থাকে। কলিকাতা হইতে থিয়েটার, সার্কাস প্রভৃতিও আসিয়া থাকে। মহোৎসবের পর এক মাসের অধিককাল মেলা থাকে। মেলায় সকল প্রকার দ্রব্যেরই বেশ খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে।

অন্যান্য স্থানের মেলার ন্যায় এখানকার মেলাতেও মাতাল ও বেশ্যার উপদ্রব হইয়া থাকে তবে কড়া পুলিশ পাহারার বন্দোবস্ত থাকায় দর্শকগণের তত বেশী কষ্ট হয় না।

দধিয়া বৈরিগীতলা এক্ষণে বর্দ্ধমান জেলার দাঁইহাটনিবাসী ধাম্মিক জমিদার শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জমীদারীর অন্তর্ভুক্ত। তবে যেস্থানে মেলা বসে তাহার কতকাংশ গোপালদাসের দেবোত্তর সম্পত্তির অন্তর্গত।

এখনও এই অঞ্চলের বহুলোক কঠিন পীড়ার হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য গোপাল দাসের মানস করিয়া থাকে এবং ব্যাধি আরোগ্য হইলে মেলার সময় ক্ষমতানুসারে একটী মহোৎসব দিয়া থাকে। ঈশিত্ব বশিত্ব সাধনার পথে ভীমরুল বোলতার

ন্যায় যন্ত্রণাপ্রদ এবং প্রকৃত সাধকের নিকট ঘৃণ্য, তুচ্ছ ও অতীব বিরক্তিকর হইলেও সাধক গোপালদাসকে দেশ কাল পাত্রের অবস্থা বিবেচনায় সময়ে সময়ে ঐ সকল অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। ঐরূপ না করিলে বিদেশ হইতে আসিয়া তিনি এত শীঘ্র আত্ম-মহিমা প্রচার করিতে পারিতেন না, কারণ ঐ সময়ে বঙ্গদেশের সাধারণ লোকের বড়ই অধঃপতন হইয়াছিল!

উপসংহারে বর্দ্ধমান জেলার নিগননিবাসী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় মহাশয়ের নিকট, এই মেলার বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দেওয়ার জন্য, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীভোলানাথ ব্রহ্মচারী।

মঙ্গলদূত

গ্রামের প্রান্তে বেঁধেছিল বাসা বেদে দুই ভাই আসি
দিনের বেলায় নাচাত ভালুক রাত্রে বাজাত বাঁশী
গভীর রাত্রে সহসা ধরিল ওলাউঠা এক ভায়
সাথী ভাই গেল ডাক্তার বাড়ী একেলা ফেলিয়া তায়
ডাক্তার কহে রাত্রি দুপুরে কিছুতে পারি না যেতে
"কত টাকা দিবে অগ্রিম দাও" বলে সে হাতটী পেতে
বেদে কহে কাঁদি "দিতে না পারিব এক টাকা ছাড়া কিছু"
দুয়ারের পাশে রহিল দাঁড়ায়ে মাথাটি করিয়া নীচু।
ডাক্তার কহে রাত্রি দুপুরে জ্বালাতে আসিলি হেন
অনেক হাতুড়ে রয়েছে বাজারে ডাক দিয়ে নেয়া কেন?

সাত দিন গত। গোখুরা সর্পে সেদিন গভীর রাতে
ঐ ডাক্তার বাবুর ছেলেরে দংশিল বাম হাতে
পিতার বিদ্যা সবি হ'লো সারা সবার চেষ্টা শেষ
দেশের রোজায় ঘুচাতে নারিল কালের গরল লেশ
নীল হ'য়ে গেল দেহটি তাহার শায়িত তুলসি তলে
নাড়ির স্পন্দ হইল বন্ধ কাণে হরিনাম বলে।
হেন কালে সেই বেদে দুইজন উপজিল সেই ঠাঁয়ে
শেষ চেষ্টাটি করিবে তাহারা কহিল ছেলের মায়ে
মন্ত্র পড়িল জল পড়া দিল আরো কি করিল কত
ফিরিল জীবন মেলিল নয়ন বিষ দোষ হ'ল গত
ডাক্তার কেঁদে যোড় হাতে কয় "যাহা চাও তাই দিব"
সন্তানে মোর দিয়াছ ফিরায়ে চরণের ধূলি নিব।

বেদে কহে বাবু শুভ মঙ্গল সুমতি তোমার হোক্
কিছুই নিবনা এমনি করিয়া ঘুরি মোরা সাত লোক
মোরা বিধাতার মঙ্গলদূত বেদে বেশে ফিরি দোঁহে
ভ্রান্ত অন্ধে দেখায়ে সুপথ চেতনা বিতরি মোহে
বিপদে পড়িয়া ছল করে ডাকি না ডাকিতে ত্রাণ করি
জীব জগতের ধ্রুব মঙ্গল যাচি মোহ ঘোর হরি
এত কহি সেই অলোক মূর্ত্তি আঁধারে মিলাল ছলি
পুনর্জীবিত বালকে ঘেরিয়া সবে নাচে হরি বলি।

শ্রীকালিদাস রায়।

দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ইতিহাস

(১০১৮ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

সমাজসেবক গান্ধির জেল

১১ই নভেম্বর ডাণ্ডির ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট গান্ধির নামে অভিযোগ উপস্থিত করা হয়। মিঃ গান্ধি আপনাকে দোষী বলিয়া স্বীকার করেন। মিঃ গোডফ্রে (সরকারী উকিল) আইন অনুযায়ী কঠিনদণ্ড প্রদান করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটকে অনুরোধ করেন। মিঃ গান্ধি আপনার জবানবন্দীতে বলেন যে, আপনার পক্ষ সমর্থনের ও ভারতীয় প্রজার ন্যায়ের জন্য আমার বলা উচিত যে, যে অপরাধ আমার উপর আনীত হইয়াছে, উহার দায়িত্ব আমি নেটালের এক পুরাতন জমীদারের মস্তক হইতে নিজের মস্তকে গ্রহণ করিতেছি। আমি ইহা স্বীকার করি যে, এই সকল লোককে এক উপনিবেশ হইতে অন্য উপনিবেশে বাস করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। আমি ইহাও বলিতেছি যে কয়লার খনির মালিকের ক্ষতি করা আমার আদবেই ইচ্ছা নয়। ধর্ম্মঘটের জন্য ব্যবসায়িগণের অনেক লোকসান হইতেছে ইহা অবগত হইয়া আমি অতিশয় দুঃখিত। যে সকল শ্বেতাঙ্গ স্বামীর অধীনে মজুরগণ কাজ করিতেছে, তাহাদের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, এই তিন পাউণ্ড কর আমার স্বদেশ বন্ধুর উপর ভয়ানক বোঝা স্বরূপ; ইহা রহিত করিবার প্রযত্ন তাঁহাদেরই করা উচিত। মাননীয় গোখলের নিকট জেনেরল স্মটস্ এই কর রহিত করিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন; এক্ষণে এই বাক্য পূর্ণ করা উচিত। যে পর্য্যন্ত না এই কর রহিত করা হয়, সে পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘট বজায় রাখিয়া ভিক্ষা দ্বারা পেট পূর্ণ করিবার পরামর্শ আমার স্বদেশবাসীকে প্রদান করা অতিশয় কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

বিনা কষ্ট স্বীকারে এই অন্যায় কখনও সমাপ্ত হইবে না। ম্যাজিষ্ট্রেট রায়ে বলেন যে, "মিঃ গান্ধি অপরাধ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তিনি একজন সুসভ্য, সুশিক্ষিত ও সদ্বংশজ হইয়াও জানিয়া শুনিয়া সরকারী আইন উল্লঙ্ঘন করিতেছেন। যে পর্য্যন্ত না ধর্ম্মঘট শান্ত হয়, সে পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট তিন পাউণ্ড কর রহিত করিবার পরামর্শ করিবেন, ইহা অসম্ভব। মিঃ গান্ধি আপনার উপদেশ দ্বারা ভারতীয় প্রজাকে কষ্টে পাতিত করিতেছেন। আমি ভারতীয় মজুরগণকে পরামর্শ দিতেছি যে তাহারা গান্ধির কথা না শুনিয়া যেন কার্য্যে পুনঃ প্রবেশ করে। আইন ভঙ্গ করার অপরাধে মিঃ গান্ধির মত উচ্চ বংশীয়কে দণ্ড প্রদান করিতে আমাকে বাধ্য হইতে হইতেছে, ইহার জন্য আমি অতিশয় দুঃখিত। আমার কর্ত্তব্যের খাতিরে মিঃ গান্ধিকে ৬০ পাউণ্ড জরিমানা (৯০০ টাকা) অথবা ৯ মাসের কঠোর কারাদণ্ড প্রদান করিলাম।" মিঃ গান্ধি স্পষ্ট ও শান্ত স্বরে বলিলেন আমি জেলে গমন পছন্দ করিতেছি। গান্ধিকে দর্শন করিবার জন্য আদালতের বাহিরে ভারতীয়গণের একটি বৃহৎ দল একত্রিত হয়। সিপাহী অতিশয় চতুরতার সহিত তাঁহাকে জেলের মধ্যে লইয়া যায়। মিঃ গোডফ্রে জেলের মধ্যে গিয়া গান্ধিকে দর্শন করেন। তিনি আসিয়া বলেন যে গান্ধি অতিশয় আনন্দে রহিয়াছেন আর ধর্ম্মঘটকারী ভ্রাতাগণকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, যে পর্য্যন্ত না ৩ পাউণ্ড কর রহিত হয়, সে পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘট বজায় রাখিবে। ১৩ই নভেম্বর তারিখে মিঃ গান্ধিকে ডাণ্ডী হইতে বাল্‌করষ্টে লইয়া যাওয়া হয় এবং তাঁহার উপর অনধিকারী লোকগণকে ট্রান্সভালে প্রবেশ করানর অভিযোগ আনীত হয়। মিঃ গান্ধিকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট তিন মাসের জন্য কঠোর কারাদণ্ড প্রদান করেন। সর্ব্বসমেত এক বৎসরের জন্য তাঁহার কারাবাস দণ্ড হয়।

মিঃ হেনরী পোলকের জেল

মিঃ গান্ধি যখন বাল্‌করষ্টে গ্রেপ্তার হন তখন মিঃ পোলক কিছু আবশ্যকীয় কার্য্যের জন্য তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান। তিনি গান্ধির সেনার পরিচালনের ভার নিজে গ্রহণ করেন। এসিয়াটিক রেজিষ্ট্রার মিঃ চিমনী গ্রেলীংষ্টাডের নিকট ভারতীয় দলকে গ্রেপ্তার করিয়া নেটালে প্রেরণ করিতে চাহেন। তিনি দো-ভাষীর দ্বারা ভারতীয়গণকে জিজ্ঞাসা করেন যে "তোমাদের নিকট ট্রান্সভালের সনন্দ আছে কি না? তাহারা উত্তর দেয় যে আমাদের নিকট সনন্দ নাই। মিঃ চিমনী সকলকে গ্রেপ্তার করিয়া নেটালের সীমানা পার করিবার আদেশ দেন। ভারতীয় মজুরগণ বলে যে, আমাদের নেতা গান্ধি আমাদিগকে ট্রান্সভালে যাইবার আদেশ করিয়াছেন, আমরা অন্য কাহারও আদেশের অপেক্ষা রাখিনা, এই বলিয়া মজুরগণ চলিতে আরম্ভ করে। মিঃ পোলক দৌড়িয়া উক্ত দলের সামনে যান এবং তাহাদিগকে বলেন যে, মিঃ গান্ধি তোমাদিগকে এইরূপ করিতে আদেশ করিয়াছেন। গান্ধির আদেশ অবগত হইয়া সকলে শান্তির সহিত রেল গাড়ীতে বসিয়া চার্লিষ্টনে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই স্থানে গভর্ণমেণ্টের সেনা ও খনির শ্বেতাঙ্গ মালিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সিপাহিগণের পাহারার অধীনে মজুরগণ খনিতে কাজ করিবার জন্য প্রেরিত হয়।

ইহার পূর্ব্বে তাহারা কাজ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিল। ভারতীয়গণের পূর্ণহিতৈষী ইউরোপীয়ান মিঃ পোলকও গ্রেপ্তার হন। তাঁহার উপর আইনের ২০ ধারা অনুযায়ী অভিযোগ আনয়ন করা হয়। মিঃ পোলক, মিঃ গান্ধি ও কেলনবেককে সাক্ষী মানেন। মিঃ গান্ধি সাক্ষীতে বলেন যে, মিঃ পোলক ভারতবর্ষ যাইবার সম্বন্ধে আমার সহিত কথা বার্ত্তা কহিবার জন্য আসিয়াছিলেন এবং তিনি শীঘ্রই দরবন হইতে ভারতবর্ষ রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। যদি আমাকে গভর্ণমেণ্ট গ্রেলীগুষ্টাডে গ্রেপ্তার না করিতেন, তাহা হইলে মিঃ পোলক শীঘ্রই দরবনে চলিয়া যাইতেন, কিন্তু আমি গ্রেপ্তার হওয়াতে তিনি ভারতীয় দলকে পরিচালিত করিবার ভারগ্রহণ করেন। গভর্ণমেণ্টের উকীল মিঃ পোলককে কঠোর কারাদণ্ড দিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রার্থনা করেন। মিঃ পোলক আপনার দোষ স্বীকার করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন, যদি তুমি ভারতীয়গণের গণ্ডগোলে যোগ প্রদান না কর তাহা হইলে আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিতেছি। মিঃ পোলক উত্তর করেন, 'আমি সত্যের পক্ষপাতী ও অন্যায়ের পরম শত্রু; এজন্য ইউরোপীয়ান হইয়াও ভারতবাসীর প্রতি আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি রহিয়াছে।' ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পোলককে তিন মাসের সহজ কারাদণ্ড প্রদান করেন।

মিঃ কেলনবেকের জেল

সত্যাগ্রহিগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ ইউরোপীয়ান বন্ধু মিঃ কেলনবেককেও দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণমেণ্ট গ্রেপ্তার করেন। তাঁহার উপর অনধিকারী ব্যক্তি ট্রান্সভালে প্রবেশ করানর অভিযোগ আনয়ন করা হয়। মিঃ কেলনবেক আপনার জবানবন্দীতে বলেন, "বহুদিন হইতে আমি লোকমান্য গান্ধির বন্ধু; এজন্য ভারতীয়গণের কষ্ট আমি সম্পূর্ণরূপে অবগত আছি। গভর্ণমেণ্ট প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন, ইহাও আমি জানি। ভারতীয় জনসাধারণকে গভর্ণমেণ্টের সম্মুখে উপস্থিত করিবার জন্য এক সত্যাগ্রহের সংগ্রাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বিতীয় উপায় নাই। মহাত্মা টলষ্টয়ের অনুগামী হওয়াতে, সত্যাগ্রহের উপর আমার পূর্ণ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি রহিয়াছে। আমি বিচারপতিকে জানাইতেছি যে, গভর্ণমেণ্টের আইনের প্রতিকূলে সত্যাগ্রহের লড়াইয়ে আমি নিরন্তর যোগ প্রদান করিতে থাকিব। এইরূপ করিয়া অতিশয় ভীতিজনক একটি প্রশ্নের নির্ণয় করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট ও ভারতীয় প্রজার সাহায্য করিতেছি, ইহাই আমার ধারণা।" গভর্ণমেণ্টের উকিল, মিঃ কেলনবেককে কঠোর দণ্ড প্রদান করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কেলনবেককে ৩ মাসের সহজ কারাদণ্ড প্রদান করেন।

মেরিৎসবর্গের জেলে উপবাস

সত্যাগ্রহী কয়েদিগণকে মেরিৎসবর্গের সুবৃহৎ জেলে রাখা হয়। তথায় তাঁহারা ঘিয়ের জন্য জেল কর্ম্মচারীর নিকট বারংবার প্রার্থনা করেন। প্রাতঃকালে আট আউন্স মকয়ের হালুয়া, (যাহা কাফিরিদিগকে দেওয়া হয়) দ্বিপ্রহরে ৮ আউন্স চাউলের ভাত, চারি আউন্স বিনের দাল, দুই আউন্স তরকারি ও সন্ধ্যার সময় ৬আউন্স ডবল রুটি এবং ৪ আউন্স মকয়ের হালুয়া খাইতে দেওয়া হইত। ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় কয়েদিগণের পক্ষে বিভিন্ন রকমের খাদ্যের ব্যবস্থা আছে, তার মধ্যে ভারতীয়গণের এই খোরাক। যে

সময় সত্যাগ্রহী কয়েদিগণ ঘিয়ের জন্য বলেন, তখন তাঁহাদিগকে স্পষ্ট বলা হয় যে, ছয় মাস কিম্বা তদধিক সময়ের কয়েদীকে সপ্তাহে তিন দিন মাত্র ঘি দিবার নিয়ম আছে। অতএব তোমাদের ঘি পাওয়া তো কঠিনই বরং একেবারে অসম্ভব। এই অসম্ভবকে সম্ভব করিবার জন্য সত্যাগ্রহী কয়েদিগণ দৃঢ় সঙ্কল্প হয়েন। ১০ই নভেম্বর সোমবার হইতে সত্যাগ্রহী কয়েদিগণ এই প্রতিজ্ঞা করিয়া উপবাস আরম্ভ করেন যে, যে পর্য্যন্ত না ঘি দেওয়া হইবে, সে পর্য্যন্ত তাঁহারা আহার করিবেন না। সোমবারে আর ৪০ জন সত্যাগ্রহী কয়েদী উপবাস করেন। ঐ দিন জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সমুদয় সত্যাগ্রহী কয়েদীকে পাথর ভাঙ্গিবার জন্য প্রেরণ করেন। ক্ষুধার জ্বালায় ইহারা নিশ্চয় ভোজন করিবেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মনে এই রূপ ধারণা হয়। সারাদিন ধরিয়া সকলে পাথর ভাঙ্গেন। সন্ধ্যার সময় জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ গোকুলদাস গান্ধি মিঃ মণিলাল গান্ধি, মিঃ প্রাক্তজীদেশাই, মিঃ সুরেন্দ্রনাথ মেঢ়, মিঃ রাওজী ভাই পটেল ও ভবানীদয়াল এই ছয় জন সত্যাগ্রহীকে আন্দোলনের নেতা বলিয়া আলাদা একটি গৃহে বন্ধ করিয়া রাখেন। অবশিষ্ট সকলকে নানারূপ তিরস্কার করা হয়। তিরস্কার ও ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করিতে না পারার জন্য তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ উপবাস রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। দ্বিতীয় দিন সমস্ত উপবাসী সত্যাগ্রহীকে পুনরায় পাথর ভাঙ্গাইতে পাঠান হয়। উপরোক্ত ছয়জনকে পৃথক পৃথক পিঁজরার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া পাথর ভাঙ্গিতে লাগান হয়। ইতিমধ্যে জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অনেকবার তথায় আসিয়া এই ছয় জন নেতাকে ধমকাইয়া বলেন যে তোমাদের কু-মতলবপূর্ণ উপদেশের জন্য ছোট ছোট ছেলেরা না খাইয়া মরিয়া যাইবে। ইহার উত্তরে সত্যাগ্রহিগণ বলেন যে, আমরা আপনাকে কোন কষ্ট প্রদান করিতেছি না, নিজেরাই কষ্ট ভোগ করিতেছি। মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় সহরের ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়া এ ছয় জন সত্যাগ্রহীকে ডাকিয়া খুব তিরস্কার করেন এবং বলেন যে যদি তোমরা এই আন্দোলন পরিত্যাগ না কর তাহা হইলে তোমাদের কয়েদের মিয়াদ আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইবে। আজ তোমরা ঘি চাহিতেছ, কাল হয় তো দুধ চাহিবে, পরশু ফল চাহিবে, তারপর হয় তো অন্য কোন জিনিস চাহিবে; তোমাদিগকে এই সব জিনিস প্রদান করিতে গভর্ণমেণ্ট অসমর্থ। যদি তোমাদের ঘি, দুধ খাইবার ইচ্ছা ছিল তবে ঘরে থাক নাই কেন? জেলে আসিবার কি প্রয়োজন ছিল? সত্যাগ্রহীরা বলেন, যখন কাফিরি কয়েদিগণকে প্রত্যহ এক আউন্স করিয়া চর্ব্বি দেওয়া হয়, তখন সত্যাগ্রহী কয়েদিগণকে কেন ঘি দেওয়া হইবে না? যদি আপনি কয়েদের মিয়াদ বাড়াইবার অনুকম্পা করেন তাহা হইলে আপনার প্রতি অতিশয় কৃতজ্ঞ হইব। আমরা যে রোজ রোজ নূতন জিনিস প্রার্থনা করিব ইহা একেবারে মিথ্যা। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না আমাদিগকে ঘি দেওয়া হইবে সে পর্য্যন্ত আমরা উপবাস করিব। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রত্যুত্তরে বলেন যে, যদি তোমরা সব মরিয়া যাও তবে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিবার জন্য জমির অভাব হইবে না। এই কথা বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট চলিয়া যান। এ দিকে উপবাসীরা আপনাদের উপবাস বজায় রাখেন।

আজ বুধবার দিন। সত্যাগ্রহীদিগের

মুখের উপর অনশনের কাতরতা-কালিমা অঙ্কিত হইয়াছে, জেলের কর্ম্মচারী তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য খুব চেষ্টা করিতেছেন। ভবানীদয়াল আপনার কুঠরীতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কয়েকদিবস তাঁহার চিকিৎসার জন্য হাঁসপাতালে লইয়া গিয়াছে; অন্য কয়েকজন সত্যাগ্রহীও উপবাসের জন্য কাতর হওয়াতে হাঁসপাতালে আনীত হইয়াছে। মিঃ রামদাস গান্ধি, রেওয়াশঙ্কর সোটা, শিবপূজন, বদ্রি প্রভৃতি অনেক যুবক হাঁসপাতালে আসিয়াছেন, জেলের দৃশ্য ভয়ঙ্কর হইয়াছে! এই সংবাদ বাহিরে প্রচার হইবামাত্র মেরিৎসবর্গের ভারতীয়গণ একটি সভা করিয়া রাজস্ব সচিবের নিকট এই মর্ম্মে তার প্রেরণ করেন যে, সত্যাগ্রহী কয়েদিগণকে ঘি প্রদান করিবার আদেশ করা হউক। ম্যাজিষ্ট্রেট ও কারাগারের কর্ম্মচারিগণ গভর্ণমেণ্টকে এই ভয়ানক আন্দোলনের খবর প্রদান করেন। বুধবার সন্ধ্যার সময় সমস্ত উপবাসী কয়েদিগণকে সারি সারি দাঁড় করাইয়া রাজস্ব সচিবের তার পড়িয়া শুনান হয়, "যদিও তিন মাসের কয়েদিগণকে ঘি দিবার নিয়ম নাই এবং ভারত গভর্ণমেণ্টের সম্মতি অনুসারেই ভারতীয় কয়েদিগণের আহার্য্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তথাপি গভর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া কেবল সত্যাগ্রহী কয়েদীর জন্য প্রত্যহ এক আউন্স করিয়া ঘি দিতে স্বীকৃত হইতেছেন। আশা করি ইহাতে সত্যাগ্রহিগণ সন্তুষ্ট হইবেন। অবশেষে সত্যাগ্রহিগণ আহার করিতে আরম্ভ করেন।

নর্থকোষ্টে ধর্ম্মঘট

ধর্ম্মঘটের প্রভাব ধীরে ধীরে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হয়। নর্থকোষ্টে ধর্ম্মঘট ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। ১৩ই নভেম্বরের "নেটাল এডভারটাইজার" পত্রে লিখিত হয় যে, লামর্শী ও বেরুলেম এই উভয় স্থানের ধর্ম্মঘটকারীদের উপর, বন্দুক, পিস্তল ও বড়লাঠিধারী সিপাহিগণ আক্রমণ করে ও খুব প্রহার করে। তাহাদিগকে জোর করিয়া কার্য্য স্থানে লইয়া যাইবার জন্য সিপাহীরা চেষ্টা করে। "নেটাল এডভারটাইজার" এই লড়াইকে "ফুলর ফলেটের" ময়দানের লড়াই নামে অভিহিত করেন। ইহাদের এই অপরাধ যে, বেরুলমে যাইয়া ইহারা আপনার স্বদেশবাসীকে ধর্ম্মঘট করিবার জন্য উত্তেজিত করিতে চাহিয়াছিল। ইহাদের হাত হইতে আগেই লাঠি কাড়িয়া লওয়া হয়। ১১ই নভেম্বর চিনির কারখানার প্রায় দুই হাজার মজুর ধর্ম্মঘট করে। যে সকল শ্বেতাঙ্গের অধীনে ২০।৫০ জন মজুর কাজ করিত তাহারাও কাজ ছাড়িয়া দেয়। হোটেল ও অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত কার্য্যালয়ের ভারতীয় মজুরগণও ধর্ম্মঘট করে। অনেকে 'চাক সক্রাল ও ষ্টেঙ্গরের' মজুরগণকে ধর্ম্মঘট করাইবার অভিপ্রায়ে আগমন করে। ১১ টার সময় অশ্বারোহী কাফির সিপাহীদল আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা গ্রামে গ্রামে ও কুঠিতে কুঠিতে ঘুরিয়া বেড়ায়। মজুরগণের মধ্যে অতিশয় ক্রোধের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। ১৪ই নভেম্বর টোংগাটের ধর্ম্মঘট অতি ভীষণ রূপ ধারণ করে। মারপিট চলিতে থাকে, তাহাতে কয়েকজন লোকও আহত হয়। ছয় জন ভারতীয়কে কাফির সিপাহিগণ ভালোঁ (কাফিরি চন্দ্রাস্ত্র বিশেষ) দ্বারা আঘাত করে। ডফ্‌সরোড শায়রের কুঠির মজুরগণ কাজ ছাড়িয়া দেয়, যে দুই চারিজন দেশশত্রু কাজ করিতেছিল তাহাদিগকে শ্বেতাঙ্গ স্বামী

কেবল ১ দিনের খোরাক দিতে চাহে, কিন্তু উহা লইতে তাহারা অস্বীকার করে। তখন নিরুপায় হইয়া সাহেবকে এক সপ্তাহের খোরাক দিতে হয়। বেরুলমে দলবদ্ধ মজুর গণকে কুঠির স্বত্বাধিকারী কুঠিতে ফিরাইয়া লইতে চাহিতেছিলেন, এজন্য তিনি ভারতীয় নেতাগণের সহায়তা প্রার্থনা করেন। "নেটাল ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েসনে"র পক্ষ হইতে মিঃ সোরাবজী পারসী প্রভৃতি মহোদয়গণ আসিয়া মজুরদিগকে বুঝান যে, তোমরা আপন আপন গৃহে যাও, তোমাদিগকে কাজ করিতে হইবে না। শ্বেতাঙ্গ মালিকের নিকট হইতে তোমরা খোরাক পাইবে। সিপাহিগণ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া তামাসা দেখিতেছিল, তাহাদের পক্ষে ভারতীয় নেতাগণের সাহায্য ব্যতিরেকে মজুরগণকে কুঠিতে ফিরাইয়া লওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। ভারমোণ্ড হোটেলের সাম্নে ভারতীয় মজুর ও সিপাহীদের মধ্যে মারপিট হয়। এই লড়ায়ে ৮ জন আহত ব্যক্তিকে হাঁসপাতালে পাঠান হয়। এই দুর্ঘটনার জন্য সকলে খুব আন্দোলন করে। শ্বেতাঙ্গগণ নানা প্রকার বুঝাইলেও মজুরগণ বলে যে, যে পর্য্যন্ত আমাদের নেতাগণকে জেল হইতে মুক্ত না করা হয় এবং ৩ পাউণ্ড কর রহিত না হয় সে পর্য্যন্ত আমরা কখনই কার্য্যে যোগ দিব না। ১৪ই নভেম্বর তারিখে মাউণ্টএজকোম্বে প্রায় ২০০০ মজুর ধর্ম্মঘট করে। মিঃ কেম্পবল বলেন যে, এই সকল লোক শান্ত ও সরল স্বভাব আর ইহাদের ব্যবহার অতি শম সভ্যতাব্যঞ্জক। তাহারা বলে যে, আমরা মালিকের ক্ষতি কবিবার অভিপ্রায়ে কাজ ছাড়িয়া দিই নাই; প্রত্যুত আপনার জননী জন্মভূমির গৌরবের জন্য এই আন্দোলনের অংশ গ্রহণ করিয়াছি। টোংগাটের চারিধারে প্রায় সমস্ত কুঠিই বন্ধ হয়। মিঃ এক্ট ধর্ম্মঘট-কারী মজুরদিগকে কার্য্যে যোগ দিবার জন্য নানারূপ সমঝান কিন্তু কিছুই ফল হয় নাই।

ধর্ম্মঘটের দৃঢ়তা

এই কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হয় যে, ভারতীয় মজুরগণকে ভয় দেখাইয়া কাজ পরিত্যাগ করান হইতেছে। ইহাতে যে কি পর্য্যন্ত সত্য নিহিত রহিয়াছে তাহা জেনেরল ল্যুকিনের একটি বৃত্তান্ত হইতে অবগত হওয়া যাইবে। লমর্সার চারিধারে কতিপয় মজুর আপনার স্বদেশবাসীর ভয়ে কাজ ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছে, এই খবর পাইয়া জেনেরল ল্যুকিন তথায় গমন করেন ও দো-ভাষীর দ্বারা মজুরগণকে বুঝান যে, যদি তোমরা কাজ করিতে রাজী হও, তবে গভর্ণমেণ্ট তোমাদের জীবন সম্পত্তি রক্ষা করিবার ভার লইবেন। কিছুক্ষণ পরে মজুরগণ উত্তর দেয় যে, আমাদের নেতা গান্ধী আমাদিগকে নিজের প্রতিজ্ঞাতে দৃঢ় থাকিবার জন্য উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, যদি পুলিশের ইচ্ছা হয়, তো আমাদিগকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু আমরা কখনই কার্য্যে যোগদান করিব না। তাহাদের এই সকল ব্যক্য শুনিয়া জেনেরল ল্যুকিন ফিরিয়া আসেন। ১৫ই নভেম্বর সংবাদ প্রচারিত হয় যে, শ্বেতাঙ্গ মালিকগণ আপনাদের মজুর-গণকে খোরাক দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ইহা জানিবার জন্য "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নে"র একজন প্রতিনিধি বেরুলমে গমন করিয়া এই খবরের সত্যতা অবগত হন। সিপাহী-গণ মজুরদিগকে বাহিরে যাইতে না দেওয়ার জন্য তাহারা অনশনে দিনাতিপাত করিতে থাকে। "নেটাল ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েসন"

শীঘ্র গভর্ণমেণ্টকে টেলিগ্রাম করেন যে, আমাদের স্বদেশবাসী ইক্ষুর কুঠিতে না খাইতে পাইয়া মরিতে বসিয়াছে, এজন্য তাহাদিগকে খোরাক প্রদান করা এসোশিয়েসন আপনার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছেন। ইহার উত্তরে গভর্ণমেণ্ট বলেন যে, জেনেরল ল্যুকিনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপনারা ইহার বন্দোবস্ত করুন। এই খবর পাইয়াই মিঃ অশ্বীনায়ডু, মিঃ লালবাহাদুর সিংহ, মিঃ সোরাবজী, মিঃ সরাফ, মিঃ মুসা, মিঃ উধব কাম্বজী প্রভৃতি, কয়েকজন স্বেচ্ছা সেবককে সঙ্গে লইয়া কুঠিতে গমন করেন ও খোরাক দিতে আরম্ভ করেন। স্বেচ্ছা সেবকগণ মজুরগণের সম্বন্ধে বলেন যে, তাহাদের দৃঢ়তা ও আনন্দের ভাব প্রশংসার বিষয়। ১৬ই নভেম্বর মাউণ্ট এজকোম্বে সিপাহী ও মজুরগণের মধ্যে পরস্পর দাঙ্গা হয়। ইহার কারণ এই যে, কয়েকজন ভারতবাসী ষ্টেট ম্যানেজারের গৃহে যাইয়া মজুরগণকে ধর্ম্মঘট করিবার জন্য পরামর্শ প্রদান করিতে থাকেন। এই হেতু সিপাহিগণকে তথায় আনয়ন করা হয়। সিপাহী ও ভারতীয়গণের মধ্যে বচসা হইতে হইতে দাঙ্গা আরম্ভ হয়। ইহাতে কয়েকজন ভারতবাসী ও কয়েকজন সিপাহী আহত হয়। ঐ দিন মাউণ্ট এজকোম্বের ইক্ষুর জমিতে আগুন লাগে। মিঃ কেম্বল ভারতীয়গণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। ঐ সময় প্রায় ২০০০ ভারতবাসী যাইয়া আগুন নিবাইয়া দেয়। জেনেরল ল্যুকিন তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি ভারতীয় নেতাগণকে কুঠিতে যাইবার জন্য আদেশ করেন। ১৭ই নভেম্বর দরবনে অসাধারণ উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক ভারতীয় মজুর কাজ ছাড়িয়া দেয়, দলে দলে মজুরগণ রাস্তায় বেড়াইতে থাকে। রেলওয়ে কর্পোরেশন ও চিনির কারখানার মজুরগণ ধর্ম্মঘট করে। মেথরগণ কাজ ছাড়িয়া দেওয়াতে কর্ম্মচারীরা অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়েন। কাহাকেও কার্য্যে ফিরাইয়া লইবার আশা ছিল না। হাঁসপাতালের অধ্যক্ষ "নেটাল ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েসনে"র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। অনেক মজুরকে কার্য্যে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তাহারা কাজ করিতে রাজী হয় না, বরং আপনাদের প্রতিজ্ঞাকে অধিকতর সুদৃঢ় করিতে থাকে। ক্লাব, দিয়াশলাই, কারখানা ও ছাপাখানার চাকরগণ সকলেই ধর্ম্মঘট করে। ঐ দিন দরবনে একটি বৃহৎ সভা হয়, মিঃ পারখ সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। সভাতে প্রায় ৫০০০ ভারতবাসী সম্মিলিত হয়। মাননীয় গোখলের তার পাঠ করিয়া শুনান হয়। তারে লিখিত হইয়াছিল—সমুদায় ভারতবাসী, প্রবাসী ভ্রাতৃগণের কষ্টদায়ক সমাচার প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়াছেন এবং আপনাদের আন্দোলনে সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। মিঃ রামঅবতার লগ্নবর্ত্তী হিন্দিতে বক্তৃতা প্রদান করেন। মিঃ ক্রীষ্টোফর, মোর্টোর প্রধান লাইন হইতে আসিয়াছিলেন, তিনি ভারতীয় মজুরগণের দশা সম্বন্ধে হৃদয়োন্মাদক বক্তৃতা প্রদান করেন। ইনি বলেন চাবুকের দ্বারা প্রহার করিয়া এক্ষণে মজুরগণকে কার্য্যে পাঠান হইতেছে। পরিশেষে উপযুক্ত ভারত সন্তান মিঃ গান্ধিকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভা ভঙ্গ হয়। এই প্রকার মেরিৎসবর্গ, জোহান্সবর্গ, কিম্বর্লী' ডেল গোয়াবে প্রভৃতি নগরে ভারতবাসিগণের সার্ব্বজনিক সভা হয়।

ধর্ম্মঘটকারীর উপর অত্যাচার

ভারতীয় ধর্ম্মঘটকারীদের প্রতি খারাপ ব্যবহার হইতে আরম্ভ হয়। এই বিষয়ে পাটচী নাম্নী একজন স্ত্রীলোক আপনার দুঃখের কথা ১৪ই নভেম্বর তারিখে এইরূপ প্রকাশ করে,—"আমার স্বামী দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লার খনিতে দ্বিতীয়বার সর্ত্তবদ্ধ মজুরীর পাট্টা লিখিয়া দিয়া কাজ করিতে থাকেন। তিনিও অপর ধর্ম্মঘটকারীদের মত কাজ ছাড়িয়া দেন। ১১ই তারিখে আমার স্বামীকে পুনরায় কার্য্যে লইয়া আসা হয়। কম্পাউণ্ড ম্যানেজার বলেন, যে পর্য্যন্ত না কার্য্যে যোগদান কর সে পর্য্যন্ত খোরাক বন্ধ থাকিবে। দ্বিতীয় দিন আমার সামনে খনির ম্যানেজার, আমার স্বামী ও অন্যান্য মজুরকে চাবুক দ্বারা প্রহার করেন এবং জোর করিয়া কার্য্যে লইয়া যান। ঐ দিন তাঁহাদিগকে সামান্য রুটি ছাড়া আর কিছুই খাইতে দেওয়া হয় নাই। ১৩ই তারিখে আমার স্বামী কাজ করিতে অস্বীকার করেন, এজন্য তাঁহাকে রীতিমত চাবুক দ্বারা প্রহার করা হয়। অন্যান্য মজুরগণও জুতা, লাথি ও বেতের দ্বারা প্রহৃত হয়। সকলকে জোর করিয়া খাঁচার মধ্যে পুরিয়া কৃষিক্ষেত্রে কাজ করিতে পাঠান হয়। কয়েকজনকে হাতকড়ি দিয়া কাজে লইয়া যাওয়া হয়। রবিবার পর্য্যন্ত মজুরগণকে আধপেটা খাইতে দেওয়া হয়। খনির চারিধারে গোরা সিপাহিগণ বন্দুক লইয়া পাহারা দিতে থাকে। উহারা মজুরগণকে ধমক দিয়া বলে যে, যদি তোমরা কাজ ছাড়িয়া দিয়া বাহিরে যাও তবে তোমাদিগকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিব।

সনাসী নামক একজন ভারতীয় মজুর ১৪ই নভেম্বর তারিখে আপনার দুঃখ পূর্ণ কাহিনী এইরূপ বর্ণন করেন। "ডাণ্ডী কোল কোম্পানীতে আমি দ্বিতীয়বার সর্ত্তবদ্ধ মজুরী করিবার পাট্টা লিখিয়া দিই।" কিছুদিন আগেই এই পাট্টার মিয়াদ শেষ হইয়া যায়। এই সময় আমি 'বরনসায়ড' কলিয়ারীতে কাজ করিতাম। ৩ পাউণ্ড করের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার জন্য আমি কুচের সামিল হই। ১০ই তারিখে আমাকে ও আর কয়েকজন সঙ্গীকে ডেন হাউজারের সামনে গ্রেপ্তার করা হয়। কোন রকমে তথায় রাত্রি অতিবাহিত হয়। দ্বিতীয় দিন কাহাকেও খাইতে দেওয়া হয় না। আমরা কম্পাউণ্ড ম্যানেজারের নিকট খাবার প্রার্থনা করি, তিনি বলেন, যে পর্য্যন্ত না তোমরা কার্য্যে যোগদান করিবে সে পর্য্যন্ত তোমাদিগকে খাইতে দেওয়া হইবে না। তিনি আমাদিগকে ডাণ্ডী যাইবার জন্য আদেশ করায়, আমরা ডাণ্ডীরদিকে অগ্রসর হইতে থাকি; এমন সময় কয়েকজন সিপাহী, শ্বেতাঙ্গ মজুর ও কাফিরিকে সঙ্গে লইয়া, ম্যানেজার আমাদের সামনে হাজির হন। ও চাবুকের দ্বারা মারিতে মারিতে পশ্চাতে হটাইয়া লইয়া যান। চেংগানী নাম্নী একজন ভারতীয় মহিলা চাবুকের প্রহারে আহত হইয়া হাঁসপাতালে প্রেরিত হয়। বিহারী নামক একজন মজুরের স্ত্রীকে অতিরিক্ত প্রহার করা হয়। ১২ই নভেম্বর ডাণ্ডীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ক্রোশ, দো-ভাষীকে সঙ্গে লইয়া খনিতে উপস্থিত হন। আমাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে উপস্থিত করা হয়। বিহারীর স্ত্রীও ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে আসে। ম্যাজিষ্ট্রেট আমাকে বলেন, যদি তোমরা কাজ করিতে গররাজি হও, তাহা হইলে এই স্ত্রীলোকগণকে যেরূপ মারা হইয়াছে, সেইরূপ

তোমাদের সকলকে মারা হইবে। আমি বিনীতভাবে উত্তর প্রদান করি, যে পর্য্যন্ত না ৩ পাউণ্ড কর রহিত হইবে সে পর্য্যন্ত আমরা কাজ করিতে পারিব না। ম্যাজিষ্ট্রেট ইহা শুনিয়া রাগিয়া উঠেন এবং বলেন যে, কম্পাউণ্ডকে জেলে পরিণত করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে, যদি তোমরা কাজ না কর তাহা হইলে কয়েদ করিয়া এই খনিতে কাজ করিবার জন্য পাঠান হইবে। কাজ না করিলে না খাইতে পাইয়া মরিয়া যাইবে ও চাবুকের প্রহার খাইবে। যদি কম্পাউণ্ড ছাড়িয়া বাহিরে যাও তবে গুলি করিয়া মারা হইবে। আমরা কয়েকজন সঙ্গী আপনাদের শরীরের প্রহার চিহ্ন দেখাইয়া বলেন যে, কাফির সিপাহী, লাঠি, ভালেঁা, গদা ও তীর লইয়া এবং গোরা সিপাহী বন্দুক লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ইহারা আমাদের উপর নানা রকম অত্যাচার করিতেছে, আমাদের জন্য আদালতের দরজা বন্ধ রহিয়াছে, খনির মালিকের অত্যাচার বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সেবাভিক্ষু জীবন।

ষোড়শ শতাব্দীর পোল-সাহিত্যিকমণ্ডল

তখনও পোলাণ্ডের পূর্ব্বাকাশে ভবিষ্যতের গৌরব সূর্য্যের প্রথম কিরণ দেখা যায় নাই, তখনও ভিয়েনার উদ্ধার বা তুর্কীদিগের পশ্চাদ্ধাবনের কোন ইঙ্গিতই উপলব্ধি হয় নাই। কেবল মাত্র ধনী ব্যক্তিগণের বিলাসিতায় পোল সমাজ ক্রমেই বিনাশের পঙ্কে ডুবিতেছিল।

আমরা এইখানে পোলাণ্ডের সাহিত্য চর্চ্চার প্রথম সময় হইতে আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব পোলাণ্ড কিরূপভাবে সাহিত্য জগতে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। মাতৃভাষার সেবকগণ কতটা প্রাণ দিয়া পোলাণ্ডকে তুলিতে চাহিয়াছিলেন। আজকার দিনে সভ্যজগতের সাহিত্যিকদিগের বৈঠকে পোলাণ্ডের নাম গন্ধ বেশী রকম না থাকিতে পারে, আজ হয়ত সে রুশ-জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়ার ভয়ে ভয়ে আপনার ব্যক্তিত্বের বিকাশ দেখাইতে পারিতেছে না, প্রাণ দিয়া দান করার শক্তি তাহার নাই কিন্তু যে জাতি আজও দাঁড়াইয়া রহিয়াছে তাঁহার শক্তি কোথায়, তাহাই আমাদের আলোচনার বিষয়। সাহিত্য জাতিমাত্রেরই ভাব ও ভাষার অবিনশ্বর প্রহরী। তাই জাতীয় সাহিত্যের ছেঁড়া পাতাও জাতীয় পতাকার চেয়ে অধিকতর আদরণীয়। বিভিন্ন সময়ের জাতীয় চরিত্র, শিক্ষাপ্রচার, সাহিত্য-সেবা প্রভৃতির উজ্জ্বল ও ক্ষীণালোক সাহিত্যের বুকেই অঙ্কিত থাকিয়া যায়।

প্রত্যেক জাতির পক্ষেই একটা সময় আসে যখন সাহিত্যের উদারতা, ভাষার গাম্ভীর্য্য শিল্প-বিজ্ঞানের প্রভাব ব্যক্তিগত জীবনকে হিল্লোলিত করিতে থাকে। তখন প্রত্যেক পদে পদে আহারে বিহারে সর্ব্বত্রই উৎসাহ-উদ্দীপনার লীলা দেখিতে পাওয়া যায়, তখন ক্ষণিক অসারতার পরিচয়েই জাতির অনিষ্ট হইতেছে বলিয়া ধারণা জন্মে, জাতীয় উন্নতির আকাঙ্ক্ষাই তখন একমাত্র লক্ষ্য হয়; এবং

এইরূপ ভাবের প্রেরণা আসে বলিয়াই জাতি জাতি বলিয়া সময়ে পরিচিত হয় তাহার মহিমা ইতিহাসকে চিরদিন উজ্জ্বল করিয়া রাখে।

যাহা হউক, আমরা দেখিতে পাইতেছি, ১৫৪১-১৬০৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত পোল-সাহিত্যের গৌরব যুগ। এই সময়ের আমাদের দেশের অবস্থাটাও একটু জানিয়া লওয়া ভাল, নতুবা ইতিহাস আলোচনা স্পষ্ট হইবে না। সম্রাট আকবর ১৫৫৬ হইতে ১৬০৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সুতরাং চিত্র, সঙ্গীত প্রভৃতি কলাবিদ্যা, সাহিত্য ও বিজ্ঞান এবং নানা প্রকারে শিক্ষাপ্রচার এই যুগের বিশেষত্ব। এক কথায়, রাষ্ট্রনীতি, শাসনপদ্ধতি, সাহিত্যালোচনা প্রভৃতি বিষয়ে যে কোন দেশকে অতিক্রম করিতে পারিত। সাহিত্যে সংরক্ষণ-নীতি এই যুগেই বিশেষ বলবতী হয়। বাঙ্গলা দেশ তখন চৈতন্যপ্রেমে ভরপুর। বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, লোচনদাস, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, ক্ষেমানন্দ, কাশীরাম দাস প্রভৃতি ভক্ত ও ভাবুক কবিগণ তখন বাঙ্গলাদেশে বিভিন্ন সাহিত্য-মন্দির গড়িতে ছিলেন। আর পোল-সাহিত্য মন্দিরে দেখিতে পাই—কোপারনিকাস্, সাইমোনোইচ ক্রোমার, অরজেচোস্কি, স্কারগা, গোরনিস্কি এবং আরও অনেক সাহিত্যসেবী ছিলেন। ইহাদের দ্বারা পোল-সাহিত্য উন্নত হইলেও নিকোলাস রেজ ও জান কোচানোস্কির নামও উল্লেখ-যোগ্য।

কোপারনিকাস

১৪৭৩-১৫৪৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কোপারনিকাসের যুগ বা পোল-সাহিত্যের অভ্যুদয় কাল। তিনি রোমনগরীতে গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তৎরচিত বিখ্যাত গ্রন্থে বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ টলেমির জ্যোতিষ-চর্চ্চার প্রণালী গ্রহণ করিয়াছেন। কোপারনিকাস্ পোলাণ্ডের সন্তান হইলেও, সাধারণের কাছে রোমের অধিবাসী বলিয়াই পরিচিত। অসময়ে পোল-সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল তাই পোলগণ তাঁহার প্রতি ভক্তির চিহ্নস্বরূপ সমাধির উপর কয়েক পংক্তি লিখিয়া রাখিয়াছে।

নিকোলাস রেজ

১৫০৫—১৫৬৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত। ইনি পোল কবিমণ্ডলের আদি। এই সকল সাহিত্যিকদিগের মধ্যে রেণাসাঁসের (নব-জীবনের) পূর্ণপ্রভাব বিদ্যমান ছিল। পোল-বাল্মীকির গদ্যে লিখিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ খানির নাম "মহাপুরুষগণের জীবনী।" তিনি "জোসেফ্ ইন্ ইজিপ্ট" নামক নাট্য-গ্রন্থের রচয়িতা।

জান কোচানোস্কি

১৫০৩-১৫৮৪খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত। তিনি পোল-কবি-জগতের যুবরাজ বলিয়াই বিখ্যাত ছিলেন। বংশবিশেষে জন্মগ্রহণ করিয়া সহোদর ভ্রাতা, পিতৃব্য পুত্র (cousin) ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে কবিরূপে লাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহারা সকলেই কোন না কোন গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। তাঁহার প্রণীত সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলীর মধ্যে, বিদার "গেম অব চেচ" এর স্বাধীন অনুবাদ প্রসিদ্ধ এবং "ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব্ প্রুশিয়া" নামক গ্রন্থে, পোলরাজের নিকট ব্রাসডেন্‌বার্গের আলবার্টের বিশ্বস্ততার প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে বর্ণন করিয়াছেন। "The despatch of the greek Ambassador" (গ্রীক রাজদূতের প্রত্যাবর্ত্তন) নাম দিয়া ১২টী দৃশ্যের একখানি নাটক রচনা করেন। উহা পঞ্চপদী কবিতায় রচিত। নাটকখানির

ষোড়শ শতাব্দীর ফরাসী নাটকের অনুরূপ কোরাসে রচিত বলিয়া ধারণা হয়। তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বজন বিদিত রচনা "Treny" (ট্রেনি), তাঁহার কন্যা উৎসুলার মৃত্যু উপলক্ষে শোক কবিতা। তাঁহার পোল ভাষার রচনা ব্যতীত লাটিন ভাষায়ও অনেক শোক কাব্য আছে।

সাইমোনোইচ্

১৫৫৭-১৬২৯। গ্রাম্যজীবন সম্বন্ধে কয়েকটী উৎকৃষ্ট কবিতার রচয়িতা। সেইগুলি গ্রাম্য পোলচরিত্রের বিশুদ্ধির ইঙ্গিত করে বলিয়াই অধিক আদরণীয়। তাঁহার মেষপালক সম্বন্ধীয় কবিতাগুলি দেখিয়া সহজেই বুঝা যায় কৃষকদিগের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল।

বাইলোস্কি

প্রসিদ্ধ সমালোচক ছিলেন।

কাশিমির সারবিউস্কি

বিখ্যাত লাটিন কবি। পোপ তাঁহাকে লরেট (রাজকবি) আখ্যাপ্রদান করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের পণ্ডিত সমাজে তাঁহার গ্রন্থাবলীর যথেষ্ট আদর আছে।

মার্টিন ক্রোমার

১৫১২-১৫৮৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত। লাটিন ভাষায় পোলাণ্ডের ইতিহাস রচয়িতা। তিনি পোল ঐতিহাসিক মণ্ডলের যুবরাজ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। ইঁহার ধর্ম্মশিক্ষা ইটালীতেই লাভ হয়। ইটালী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যুবরাজ সিজিস্মণ্ড অগাষ্টাসের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইলেন এবং যুবরাজ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তাঁহাকে জনসাধারণের সেবায় নিয়োগ করেন। ১৫৫২ অব্দে তিনি রাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীর পদ লাভ করেন। সম্রাটের অনুমতিতে রাষ্ট্রের পূর্ব্ব সঞ্চিত বিবরণী দেখিয়া একখানি বৃহৎ ইতিহাস রচনা করেন। ইহাতে প্রাচীনকাল হইতে ১৫০৬ খৃঃ অব্দ অর্থাৎ রাজা আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু পর্য্যন্ত পোল রাজকার্য্যের ধারাবাহিক বিবরণ আছে। ক্রোমার তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের অপেক্ষা অনেকটা কৃতবিদ্য ছিলেন। তাঁহার রচনার মধ্যে একটা উঠা-নামার ভাব ছিল এবং রচনা অতি সুন্দর ছিল। নিকটবর্ত্তী রাজ্য সমূহের রাষ্ট্রনীতিসম্বন্ধেও তিনি দক্ষ ছিলেন। তাঁহার মধ্যে কতকটা ঐতিহাসিক সমালোচকের ভাব ছিল। তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের রচনা বুঝিতে পারিতেন এবং তাঁহাদের রচনার উন্নতি সাধন করেন। ইহাকে বৃহদাকার ইতিহাস প্রণয়নের যুগ বলা যাইতে পারে। ইংলণ্ডের হোলিনসেড, বোহিমিয়ার হাজেক এবং পোলাণ্ডের ক্রোমার সমশ্রেণীভুক্ত। ইতিহাস ব্যতীত তাঁহার অন্যান্য রচনাও আছে। পোলভাষায় তাঁহার সাহিত্যের কোনই আদর হয় নাই। ১৫৮০ খৃঃ অব্দে ক্রোমারের দেহান্ত হয়। তাঁহার মৃত্যুর দুইশত বৎসর পরে এক নূতন ভাবের ধর্ম্মপ্রচারক সুপণ্ডিত ক্রাসিস্কি সেইস্থল পূরণ করেন।

এণ্ড্রু মোদরজিউস্কি

১৬০৩ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনিও যুবরাজ সিজিসমণ্ডের সময়ের লোক। তিনি স্পষ্ট দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের আবশ্যক পরিবর্ত্তন বোধ করিয়াছিলেন। তিনি ইহার অন্তর দৃশ্য দেখাইলেন। হৃদয়ের পূর্ণ স্বাধীন ভাবের সঙ্গে শাসন প্রণালীর বিভিন্ন দিক, পোলসমাজের বিভিন্ন স্তরের সামাজিক অবস্থা এবং শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। রোমের ধর্ম্মযাজকের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া এংগ্লিকানদিগের মন্দিরের আদর্শে জাতীয় ধর্ম্ম-মন্দির স্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি পোলাণ্ডের দুর্দ্দিন লক্ষ্য করিয়া অসীম

ক্ষমতাপরায়ণ পোল ভূস্বামীদিগের উপর প্রথম দৃষ্টি দেন, এবং ফৌজদারী আইনের উন্নতি করেন। তাঁহার সময়ে একজন কৃষককে স্বেচ্ছায় হত্যার জন্য কোন ভদ্রলোকের ১০ গ্রস্চেন (পোল-মুদ্রা) এবং একজন ইহুদীকে হত্যার জন্য দ্বিগুণ অর্থ দণ্ড হয়।

ষ্টেইনল ওরজেচোস্কি

উইটেনবার্গে শিক্ষালাভ করেন এবং সংস্কারের প্রণালী আলোচনা করিতেছিলেন। তিনি লুথার ও মেলাঙ্কথনের শিষ্য হইয়াছিলেন।

তিনিও পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যক্তির ন্যায় রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম্ম ও শিক্ষার সংস্কারে ব্রতী ছিলেন।

এব্রাহাম বাউস্কি

লাটিন ভাষায় প্রসিদ্ধ লেখক। তিনি ডোমিনিকান সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ছিলেন। ১৬৩৭ অব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন। ৯ খণ্ডে ধর্ম্মযাজকদিগের ইতিবৃত্ত বর্ণন করিয়াছেন।

ক্লোনোইচ্

পোল ও লাটিন ভাষায় কতকগুলি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। পোলাণ্ডের রাজধানী ক্রাকো ও ওয়ারসর মধ্যবর্ত্তী প্রবাহিতা বিষ্টুলা নদীর তীরদ্বয়ের একটী সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণন করিয়াছেন। ক্লোনোইচ্ এইরূপে খাল বিলের দৃশ্য লইয়া তাঁহার জন্মভূমির মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে সক্ষম ছিলেন। পোল কবিতার বিষয়গুলি সাধারণতঃ বৈদেশিক ভাব হইতেই গৃহীত।

পিটারস্কারগা

সৌন্দর্য্য, মনোহারিত্ব এবং ভাবের আধিপত্য দ্বারা বক্তৃতা দেওয়ার ধারা পোলাণ্ডে প্রথম প্রচার করেন। স্বেদকের একতার জন্য যাঁহারা চেষ্টা করেন স্কারগা তাঁহাদের প্রথম ও প্রধান উদ্যোক্তাদিগের অন্যতম ছিলেন এবং একতা গঠনের জন্য ১৫৭৭ অব্দে পোল-ভাষায় ধর্ম্মগ্রন্থ মুদ্রিত করেন। তিনি বহুসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন কিন্তু ঐ সকলের মধ্যে তাঁহার ধর্ম্মোপদেশগুলিই বিশেষ স্মরণীয়। তাঁহার উত্তেজনাপূর্ণ বাগ্মীতা দ্বারাই বিচ্ছিন্ন পোল-সমাজ ভীষণ ধ্বংসের মুখ হইতে একত্রিত হইয়া প্রকৃত জাতীয়তার স্বর তুলিয়াছিল।

এই সময়ে ওসাসোস্কি এবং অন্যান্য কয়েকজন লাটিন ভাষায় ইতিহাস রচনা করেন। আলেকজাণ্ডার গগ্নিন্ যে ইতিহাস রচনা করেন তাহা রুশ ও পোল উভয়ের পক্ষেই যথেষ্ট প্রয়োজনীয় যোড়শ শতাব্দীর পোলাণ্ড তাহার নিজের ভাষার লেখক দুই জন ঐতিহাসিকের জন্য গৌরবান্বিত। সুপণ্ডিত ষ্ট্রাইকোস্কি এবং মার্টিন বায়েলস্কি উক্ত প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকদ্বয়। মার্টিন বায়েলস্কি ১৪১৫ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

ষ্ট্রাইকোস্কি

১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পোলাণ্ডের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ধ্বংসাবস্থা দেখিয়া সর্ব্বদাই শোক করিয়া বলিতেন পোলাণ্ড তাঁহার পোল-সভ্যতার নিম্নে সমাহিত রহিয়াছে। তিনি দ্রুত অবনতিশীল প্রাচীন পোল জাতীয়তার ধ্বংসাবশেষ আবার মহিমামণ্ডিত অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। তাঁহার পরিকল্পনাটী অতি উপাদেয় ছিল, কিন্তু তাঁহার প্রতিভা সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত হইতে দেয় নাই। হৃদয়ের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও বিজ্ঞান শিক্ষাতে তাঁহার বড়ই অভাব ছিল, এবং তাঁহার সময়ের প্রায় প্রত্যেক ঐতিহাসিকেরই এই অভাব ছিল। কিন্তু তাঁহার চরিত্রে অতি প্রয়োজনীয় দুইটী গুণ ছিল—জ্ঞানানুরাগ ও শ্রমসুখবোধ। তিনি রুশ ও লিথুনিয়ান ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। লিথুনিয়া ও

লিভোনিয়া প্রদেশে ঘটিত যুদ্ধের ইতিহাস ও সমাধিভূমি খনন করিয়া সর্ব্বত্র ঘুরিতেন। অধিকন্তু তিনি বহুসংখ্যক নগর ও ধর্ম্মমন্দির পরিভ্রমণ করেন। এক কথায় তিনিই প্রথম লিথুনিয়ান প্রত্নতত্ত্ববিদ্। প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় তাঁহার রচিত একখানি গ্রন্থ আছে উহা ১৫৮২ খঃ অব্দে মুদ্রিত হয়। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে দেহত্যাগ করেন।

মার্টিন বায়েলস্কি

পোল ভাষায় প্রথম দেশীয় ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার পুত্র জোয়াচিম ১৫৯৯ অব্দে দেহত্যাগ করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পোলাণ্ডের ইতিহাস রচনায় পিতার সাহায্য করিতেন।

লিউক গোরনিস্কি

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন। তিনি সিজিসমণ্ড অগাষ্টাসের দরবারের কার্য্যাবলীর বিবরণ পোল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি "পোল সম্ভ্রান্ত-পুরুষ" সম্বন্ধে যে উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন উহাই তাঁহাকে সর্ব্বত্র পরিচিত করিয়া রাখিয়াছে, অবশ্য গ্রন্থখানি সমগ্র ইউরোপে সমাদৃত একখানি ইটালীয় গ্রন্থের অনুকরণে লিখিত হইয়াছে।—গোরনিস্কি নিম্ন লিখিত বিষয় তাঁহার রচনায় বর্ণন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে ক্রাকোর নিকটে স্তামুয়েল ম্যাসিইয়োস্কির গ্রামাগৃহে, ক্রাকোর ধর্ম্মযাজক ও সভাপতির নিকট যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিসমাগত হইতেন তাঁহারা সকলেই উক্ত গৃহে একত্রিত হইতেন এবং ঐরূপ মিলিত হওয়া সেই সময়ের রীতি ছিল। তাঁহারা সময় অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত একটী বিষয় ধরিয়া তাহার মীমাংসা করিতেন। যেমন, দরবারের প্রধান কর্ত্তার কি কি গুণে ভূষিত হওয়া উচিত? পালামত সকলেই অভিমত দিতেন এবং তাঁহাদের কথোপকথন পুস্তকের সূচির আকারে গঠিত হইত।

বারটোজস্ (বারথলোমিউ) প্যাপ্রোস্কি এই সময়ের একখানি অদ্ভুত গ্রন্থ উহা পোল বীরত্বের ইতিহাস। ১৫৮৪ খৃঃ অব্দে মুদ্রিত হয়। তুরোস্কি কর্ত্তৃক তাঁহার পোল ভাষার গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া দ্বিতীয় বার মুদ্রিত হয়।

নিকোলাস সেপ জারজিনস্কি

১৫৮১ খৃঃ অব্দে কিঞ্চিদধিক ২০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। পোলসাহিত্যে চতুর্দ্দশপদী কবিতা প্রচলনের জন্য প্রথম চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তীকালে মিকাইউইস্ এবং শ্যাসজিনস্কি কর্ত্তৃক কথঞ্চিৎ উন্নতি লাভ করে।

জাতীয় ভাষায় অনূদিত বিভিন্ন গ্রন্থাদির নামোল্লেখ না করিলেও সম্রাট তৃতীয় সিজিস্মণ্ডের চিকিৎসক, ডাক্তার পেট্রিসি আরিষ্টটলের যে বিস্তীর্ণ কর্ম্মবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রনীতির অনুবাদ করেন উহা দ্বারাই প্রমাণিত হইবে যে পোলাণ্ডে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পোল ভাষার যথেষ্ট আলোচনার ফলে উহা ইউরোপের প্রধান প্রধান ভাষানিচয়ের সমশ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর পোলাণ্ডে লাটিন ভাষার আলোচনা হইতে থাকিলেও পোলাণ্ডের হিতৈষী সন্তানগণ মাতৃভাষার চর্চ্চা করিয়া দেশকে উন্নত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। প্রথমে পোলাণ্ডের সাহিত্য-সম্পদ লাটিনভাষার আবরণের ভিতরে ছিল কিন্তু ক্রমেই একটা জাতীয় প্রেরণা আসিয়া মাতৃভাষার প্রতি সকলকে আকর্ষণ করিয়াছিল।

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী।

জন্মভূমি-স্তোত্র

(১)

ওগো আমার জন্মভূমি,
কেগো জননী তুমি ?
পর্ব্বতে পর্ব্বতে, কন্দরে কন্দরে,
তীর্থময়ী পিঠে পিঠে,
হিমাদ্রি হইতে কুমারী অবধি,
পূরিত একান্ন পিঠে,
পুণ্যময়ী তুমি জননী,
নহ স্বধু ধনধান্যময়ী ধরণী।

(২)

গঙ্গা যমুনা, সিন্ধু কাবেরী,
সরস্বতী গোদাবরী,
নর্ম্মদা আদি তীর্থ সলিলে,
পিতৃতর্পণ করি।
অন্তর বাহির শুদ্ধ মোদের
পূতবারিধারা পানে,
কোটী কলুষ, বিধৌত বিগত,
একদিন যে গঙ্গাস্নানে।
পুণ্যময়ী তুমি জননী।
নহ স্বধু ধনধান্যময়ী ধরণী॥

(৩)

তোমারি বক্ষে, শ্রীগয়াক্ষেত্রে,
না করিলে পিণ্ডদান,
মৃতের হয়না সার্থক জনম,
পিতার হয় না ত্রাণ,
কোন্ জাতি বল এমন করিয়া
মাটিরে করেছে খাঁটি,
মাটি নও মাগো, মাটি নও তুমি,
সত্যই তুমি মা—টী।
ওগো আমার জন্মভূমি,
কেগো জননী তুমি ?

(৪)

ইংরাজ ফরাসী ওলন্দাজ রুষ,
লাটিন্ মার্কিন্ গ্রীক্,
সুখের লালসে স্বদেশ ছাড়িয়া,
ছুটে যায় দশদিক্,
আনন্দে বিহরে চিরকালন্তরে,
যেথা পায় সুখভোগ,
যেখানে তাদের তৃপ্ত বাসনা,
সেখানে মনের যোগ;
তোমারে ছাড়িয়া জননি মোদের
কোথাও ঘুচেনা শোক্,
তোমার অঞ্চলে বাঁধা আমাদের
ইহলোক পরলোক;
পুণ্যময়ী তুমি জননী,
নহ স্বধু ধনধান্যময়ী ধরণী।

(৫)

কোন্ দেশে আছে এমন জননী,
আমার যেমন তুমি,
ভুক্তি মুক্তি ভক্তিদায়িনী
ওগো মা জন্মভূমি,
যে দেশে আমার হউক জনম,
যে দেশেই আমি থাকি,
তুমিই আমার ত্রিবর্গদায়িনী,
তোমারে মা বলে ডাকি।
পুণ্যময়ী তুমি জননী,
নহ স্বধু ধান্যময়ী-ভূমি ধরণী॥

(৬)

মৃন্ময়ী তুমি চিন্ময়ী তুমি,
ব্রহ্মময়ী তুমি মাগো,
জাগায়ে সন্তানে অন্ধে দৃষ্টিদানে,
অন্তরে বাহিরে জাগো;
হওমা স্বাধীনা, হওমা অধীনা,
দীনহীনা কিম্বা রাণী,
শয়নে স্বপনে, জীবনে মরণে;
তোমারে মা ব'লে জানি।
পুণ্যময়ী তুমি জননী,
নহ স্বধু ধনধান্যময়ী ধরণী॥

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা

দেশীয় ভৈষজ্য গুণাবলী

তুলসীর উপকারিতা

পরম কারুণিক মঙ্গলময় শ্রীভগবান মানবের অশেষ কল্যাণ সাধনের জন্য রোগনাশার্থে, মৃতসঞ্জীবনীতুল্য যে কত প্রকার উদ্ভিজ্জের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা হয় না। কিন্তু ইদানিং অনুসন্ধিৎসা ও যথারীতি পরীক্ষার অভাবে আমরা ঐ সকল মহোপকারী ভেষজ সমূহের গুণাবলীর অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন এখন আমাদের সামান্য একটু পীড়া হইলেই ডাক্তারের সহায়তার জন্য ব্যাকুল হইয়া রাশি রাশি অর্থব্যয়ে কুণ্ঠাবোধ করি না। আমাদের গৃহের পশ্চাদ্ভাগে বনে জঙ্গলে যে কত প্রকার অশেষ গুণশালী উদ্ভিদ প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে আপনা আপনি জন্মগ্রহণ করিয়া যত্নাভাবে আবার আপনিই শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, দুঃখের বিষয় কেহই তাহার সন্ধান রাখেন না। পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালি গৃহস্থের গৃহপীঠে যখন লক্ষ্মীস্বরূপিণী গৃহিণীগণ বিরাজ করিতেন তখন বাঙ্গালি এ চিরপ্রণম্য উদ্ভিজ্জাদির গুণাবলী সম্যক্ অবগত ছিল। তখন কথায় কথায় ডাক্তার কবিরাজের সাহায্য গ্রহণের আবশ্যক হইত না। সংসারের শান্তিবিধায়িনী যোষিদ্বর্গ একটী সামান্য মুষ্টিযোগ বিনিয়োগবলে অনায়াসে সুকঠিন রোগ নিরাময় করিতেন।

"সে কালের বুড়োবুড়ি
জাস্তো যত ওষুধ পাতা।
ষোল টাকা ভিজিট ওলা
ডাক্তার সাহেব লাগেন কোথা॥"

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই যাহাতে ভবিষ্যতে শিশু কোন প্রকার শ্বাসযন্ত্র সম্বন্ধীয় পীড়ায় আক্রান্ত না হয় তজ্জন্য একটু তুলসীপাতার রস ও মধু খাওয়াইয়া সাবধান হইতেন। শিশুর একমাস বয়ঃক্রম হইতেই সপ্তাহে দুইদিন মাতৃস্তন্যসহ "আলুই" সেবন করাইয়া নিদারুণ যকৃত রোগের (Infantile Fever) মূলোৎপাটন করিতেন। ফলে তখন এইরূপে বাঙ্গালির বহু অর্থ বাঁচিয়া যাইত ও অপাপবিদ্ধ ভবিষ্যতে পিতামাতার আশা ভরসার স্থল শিশুকুল শ্বাসকাশ, যকৃত প্রদাহ বিকৃত বর্দ্ধন (Rickets) প্রভৃতি কঠোর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া অকালে কৃতান্তকবলে নিক্ষিপ্ত হইত না। এখন আর বাঙ্গালির সে দিন নাই, এখন পাশ্চাত্য রীত্যনুসারে শিক্ষিতা বাঙ্গালি গৃহস্থ কন্যা দৈহিক পরিশ্রম ও সাজসজ্জার অন্তরায় ঘটিবার আশঙ্কায় দেশীয় ভৈষজ্য সমূহের গুণাবলীর তল্লাসে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেন। তাহাতে আমাদের অশেষ কষ্টোপার্জ্জিত যে কত অর্থ নিরর্থক ব্যয়িত হয় তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখেন না বা চিন্তা করিবার অবকাশ পান না। হিন্দু রমণীদিগকে ত্রিকালজ্ঞ আর্য্য-ঋষি প্রণীত সুবিহিত ধর্ম্মশাস্ত্রানুযায়ী সুশিক্ষা না হওয়ার ফল ব্যতীত ইহাকে আর কি মনে করিতে পারি? নব্য সমাজ সংস্কারকগণ! এই অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়ে একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি? শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি

পাইলেই শিক্ষিতা হয় না। সে শিক্ষা পাশ্চাত্য দেশে বিস্ময়োৎপাদন করিতে পারিলেও অথবা তদ্দেশে শিক্ষিতার গর্ব্বিতা হইবার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও আধ্যাত্মিক সংস্কার সম্পন্ন এই হিন্দুর দেশে সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে, পক্ষান্তরে তাহাকে সমাজের নানাবিধ অনিষ্টই ঘটাইয়া থাকে। অবশ্য আমি উচ্চশিক্ষার বিরোধী নহি তবে যে হিন্দুর শয্যাত্যাগ হইতে পুনঃ নিদ্রা যাইবার সময় পর্য্যন্ত প্রতি পদবিক্ষেপে, প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যেক কর্ম্মই ধর্ম্মশাস্ত্রানুযায়ী সম্পন্ন করিতে হয়, সেই হিন্দুর দেশে তাহাদের কুলকন্যাগণের শিক্ষা দীক্ষা ধর্ম্মশাস্ত্রানুযায়ী হওয়াই সুসমীচীন মনে করি। ফলতঃ হিন্দু নারীর শিক্ষা দীক্ষাগুলি পাশ্চাত্য রীত্যনুযায়ী সম্পন্ন হওয়া আদৌ কর্ত্তব্য নহে। পাশ্চাত্য রীত্যনুযায়ী শিক্ষা দীক্ষার ফলে আমাদের শান্তিময় সোণার সংসার যে চির অশান্তির একাধিপত্য দিন দিন ঘনীভূত হইয়া আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে দেখিয়াও যে আমাদের প্রজ্ঞাচক্ষু উন্মীলিত হইতেছে না ইহাই নিতান্ত বিস্ময় ও দুঃখের বিষয়।

যে সময়ে আমাদের মাতৃস্বরূপিণী গৃহাঙ্গনাগণ আধুনিক দৃষ্টিতে অশিক্ষিতা ছিলেন, যখন তাঁহারা স্কুল কলেজে গিয়া পাশ্চাত্য রীতিতে গৃহিণীপনা শিক্ষা করিতে আদৌ অনভ্যস্ত ছিলেন তখন তাঁহারা স্কুল কলেজে না গিয়াও গৃহমধ্যে অবরুদ্ধ থাকিয়াও আদর্শ গৃহিণীরূপে প্রস্তুত হইতে পারিতেন—কি রূপে এই জ্বালাময় সংসার চিরশান্তির আগারে পরিণত হইতে পারে শত অভাব অনটন সত্ত্বেও প্রকৃত শান্তি সদাই সুখ স্বচ্ছন্দ প্রদানে সমর্থ হইতে পারে তজ্জন্য প্রাণপণে সচেষ্ট ছিলেন; আর এখন আমাদের সুশিক্ষিতা গৃহিণীগণ কিরূপ সুখশান্তি প্রদানে সমর্থা, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। "সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যে দক্ষয়া" একথা এখন আকাশকুসুমে পরিণত হইয়াছে।

যাউক যাহা বলিতে ছিলাম তাহাই বলি। এখন আমাদের যেরূপ সময় পড়িয়াছে, তাহাতে সকলকেই মিতব্যয়ী হইতে হইবে। আমাদের চিকিৎসাকল্পে এখন যত অধিক টাকা ব্যয় হয় বোধ হয় আর কিছুতেই তত ব্যয় হয় না। এপক্ষে আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ যদি দেশীয় গাছ গাছড়ার গুণাবলী জানিয়া রাখেন ও একটু আলস্য ত্যাগ করিয়া, নভেল পড়া ও পরচর্চ্চার সময় একটু কমাইয়া স্থিরচিত্তে সেগুলি উপযুক্ত সময়ে, উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন ও স্বহস্তে সন্তানের লালন পালনের ভার গ্রহণ করেন তাহা হইলে আমাদের অশেষ ক্লেশার্জ্জিত প্রচুর অর্থ বাঁচিয়া যায় ও শিশুসন্তানগণ ব্যাধিমুক্ত হইয়া সকলেরই আনন্দ বর্দ্ধন করিতে পারে। কারণ এখন আমরা "আয়ার" প্রতি শিশু পালনের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হই। সুতরাং এখন সন্তান যে কতটুকু মাতৃস্নেহের অধিকারী তাহাই বিবেচ্য। এই জন্যই যে মাতা এখন সন্তানের পক্ষে ভার বোঝা রূপে প্রতীয়মান হয় বোধ হয় একথা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। বিশেষতঃ এখন আমাদের দেশে সুচিকিৎসকের যেরূপ অভাব তাহাতে প্রত্যেক গৃহলক্ষ্মীর দেশীয় গাছ গাছড়ার গুণাগুণ শিক্ষা করাই বিশেষ আবশ্যক। সরকারী বিবরণে প্রকাশ যে, প্রত্যেক বিশ সহস্র নরনারীর চিকিৎসার জন্য একজন মাত্র চিকিৎসক পাওয়া যাইতে পারে। এই প্রবন্ধে তুলসীর গুণাগুণ সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। যদি একটীও বঙ্গ-

মহিলা এগুলি পরীক্ষা করেন এবং তাহার ফলাফল 'গৃহস্থে' প্রকাশিত হয় তাহা হইলে আমাদের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবে এবং শ্রম সফল জ্ঞান করিব ও বারান্তরে এইরূপ বহুতর মহাগুণ সম্পন্ন উদ্ভিজ্জ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ধন্য হইব।

তুলসীর পরিচয় বোধ হয় বঙ্গবাসীকে আর অধিক করিয়া বলিতে হইবে না। যে গৃহপ্রাঙ্গণে তুলসীমঞ্চ নাই সে গৃহ শ্মশান তুল্য ইহাই হিন্দুর ধারণা। তাই পুণ্যবতী হিন্দু রমণীগণ প্রাতঃকালে তুলসীমঞ্চ পরিমার্জ্জন দ্বারা ও সায়ংকালে ধূপ দীপ দানে তুলসীর পূজা করিয়া কৃতার্থ হন। সচন্দন তুলসীপত্র ব্যতিরেকে দেবতার পূজা হয় না, অশুচি শরীরে তুলসীবৃক্ষ স্পর্শে মহা পাপ হয় ইত্যাদি আমাদের শাস্ত্রে তুলসীর এইরূপ অশেষ মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং হিন্দুর নিকট তুলসীর স্বরূপ বর্ণনা করা বাহুল্য মাত্র। আধুনিক বিজ্ঞান-বিদ্‌গণও তুলসীর অশেষ গুণের কথা স্বীকার করিয়াছেন। ম্যালেরিয়া প্রতিষেধার্থে সিন্‌কোনা বৃক্ষ রোপণাপেক্ষা তুলসী রোপণ যে বিজ্ঞানসম্মত, একথা বিলাতী ডাক্তারগণও অকপটে ঘোষণা করিয়াছেন।

এদেশে সাধারণতঃ চারি প্রকার তুলসী দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণতুলসী, শ্বেত-তুলসী, বাবুই বা রামতুলসী ও গন্ধ বা দুলাল তুলসী। দুলাল তুলসী মরুবক নামেও প্রসিদ্ধ। চারি প্রকার তুলসীর মধ্যে দুলাল তুলসীর গন্ধ সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র। সাধারণতঃ শ্বেত, কৃষ্ণ ও বাবুই তুলসী ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাবুই তুলসীর বীজ তোকমারি নামে অভিহিত হয়।

আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ তুলসী সম্বন্ধে বিবিধ মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সাধারণতঃ সকল তুলসীই কফ নিঃসারক, মূত্রকারক, পরাঙ্গ-পুষ্ট কীট নাশক, (Bacteria) বিষনাশক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক ও বাতশ্লেষ্মানাশক কফ, শ্বাস, কাস, কৃমি, বমি, কুষ্ঠ, মূত্রবিকার, বিষদোষ, মূত্রকৃচ্ছ্র, জীর্ণজ্বর, নাসারোগ, পার্শ্ব ও বক্ষোবেদনা, প্রভৃতি পীড়ায় তুলসীপত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শ্লেষ্মা বা কফ রোগে তুলসীর সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

শিশুগণের সর্দ্দি কাসিতে তুলসী অমোঘ মহৌষধ। রোগের প্রথমাবস্থায় শ্বেত বা কৃষ্ণ তুলসীর রস ও আদার রস ১০-১৫ ফোঁটা মাত্রায় কিঞ্চিৎ মধুর সহিত ঈষদুষ্ণ করিয়া সেবন করাইলে সর্দ্দি কাসি তরল হইয়া যন্ত্রণার উপশম হয় এবং ভবিষ্যতের ঘুংড়ি কাসি, ব্রন্‌কাইটিস প্রভৃতি প্রাণান্তকর পীড়ার কবল হইতেও রক্ষা পাওয়া যায়।

শিশুর ঘুংড়ি কাসিতে তুলসী পাতার রস, ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম (শামুকের খোলে ময়ূরপুচ্ছ রাখিয়া শামুকটী প্রদীপের শিখায় ধরিলেই ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম হইয়া যায়) মধু সহ অল্পে অল্পে লেহন করাইলে এবং শিশুর কণ্ঠে, বক্ষে, পার্শ্বদেশে এবং হস্ত ও পদতলে ঈষদুষ্ণ সরিষার তৈল মালিস করিয়া দিতে হয়।

শিশুর বাল্‌সা জ্বরে তুলসী পাতার রস কালমেঘের রস একত্র সেবনীয়।

শিশুর কর্ণশূলে তুলসী পাতার রস, কার্পাস ফলের রস, অথবা পানের রস সহ মিশাইয়া ঈষদুষ্ণ করিয়া ২।৩ ফোঁটা দিলে কর্ণশূল আরোগ্য হয়।

বৃশ্চিক, ভীমরুল, বোলতা বা কোন প্রকার বৈষিক পতঙ্গদষ্টস্থলে তুলসী পাতার রস লবণের সহিত লাগাইলে দংশন জ্বালার নিবৃত্তি হয়।

শ্লৈষ্মিক নাসারোগে শ্বেত বা কৃষ্ণ তুলসীর রস ও বাসক পাতার রসের নস্য লইলে আরোগ্য হয়।

পীনসে (ozaena) শুষ্ক তুলসী পত্র চূর্ণ নস্যরূপে ব্যবহারে উপকার দর্শে।

বাবুই তুলসীর রস আমাতিসার, কফরোগ প্রসবের পরবর্ত্তী ভেদাল বেদনা ও ম্যালেরিয়া বা জীর্ণজ্বরে ব্যবহারে উপকার দর্শে।

সর্দ্দির জন্য নাসারন্ধ্রে ক্ষত ও নিঃশ্বাস রোধে বাবুই তুলসীর রস বা শীত কষায় নাসিকা মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা দিলে আরোগ্য হয়। স্বর্গীয় রায় বাহাদুর ডাক্তার কানাই লাল দে মহাশয় এরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন দেখিয়াছি।

শুঁঠ, মরিচ, কৃষ্ণ তুলসী পত্র, কাল মেঘপত্র ও গুলঞ্চের চিনি সমভাগ একত্রে মর্দ্দনপূর্ব্বক গুটিকাকারে সেবনে সবিরাম (Intermittant) ও অবিরাম (Remittant) জ্বরে বিশেষ উপকার হয়।

পেষিত তুলসী পত্র সহ পক্ক তৈলের নস্য গ্রহণে পূতিনাসাস্রাব (Elaistaxis) আরোগ্য হয় এবং কর্ণশূলে এই তৈল কয়েক বিন্দু দিলে কর্ণশূল তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়।

দদ্রুরোগে কৃষ্ণ তুলসী পত্র লেবুর রস বা চূণের জল সহ মর্দ্দনে আরোগ্য হয়।

বাতরোগে (হস্তপদ স্ফীতিতে) রামতুলসীর রস "গুলে আরমানি" সহ প্রলেপ বিশেষ হিতকর।

রামতুলসী বীজ (তোকমারি) ভিজাইয়া সদাহ মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে (Gonorrhea) সেবনে যন্ত্রণার আশু শান্তি হয়। এতদ্ভিন্ন ব্রণ (ফোঁড়া) পাকাইবার জন্য তোকমারি পুলটিস রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তুলসী পাতার রস সেবনের ব্যবস্থা করিলে অনেকে নাসিকা কুঞ্চিত করেন ও ইহার গুণপনা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েন বলিয়া আমি তুলসীর সক্কস (Succus) প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকি। (তিনভাগ তুলসীপাতার রস ও একভাগ রেক্‌টিফায়েড্ স্পিরিট একত্রে মিশাইয়া সপ্তাহ কাল রাখিয়া ছাঁকিয়া লইলে সক্কস প্রস্তুত হয়।) শিশুগণের সর্দ্দি কাসি ঘুংড়ি ও বাল্‌সা জ্বরে এই তুলসীর সক্কস ব্যবহার করিয়া আমি যে উপকার পাইয়াছি তাহা বর্ণনাতীত। আমার বিশ্বাস কফ সংযুক্ত রোগে হোমিওপ্যাথিক ব্রাওনিয়ার পরিবর্ত্তে ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। আমাদের বাটীতে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আছে জানিয়া পল্লীর অনেকেই ঔষধ লইতে আসিয়া থাকেন। আমি পূর্ব্বে তাহাদিগকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিয়াই নিরাময় করিতাম। কিন্তু এক্ষণে অধিকাংশ স্থলে আমার প্রস্তুতী টিঞ্চার ও সক্কস ব্যবহার করিয়া থাকি এবং কোন কোন স্থলে হোমিওপ্যাথিক ঔষধাপেক্ষা ইহার কার্য্যকারিতা অধিক দর্শনে আমি বাস্তবিকই বিস্মিত হইয়াছি।

প্রায় দুই মাস কাল গত হইল পল্লীর কোন দরিদ্রা স্ত্রীলোক ফুস্‌ফুস্ সম্বন্ধীয় (Pneumonic) পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া আমার চিকিৎসাধীনে আইসে। রোগিণী প্রথমে এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসিত হইয়াছিল। কিন্তু রোগ আরোগ্য না হইতেই অর্থাভাব বশতঃ তাহার আত্মীয়গণ চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণে পরাঙ্মুখ হয়েন। তাহার রোগ বিবরণ এইরূপ ;—রোগিণীর বয়স ২০।২১ বর্ষ, জ্বর ১০২, দক্ষিণ বক্ষঃ ও পঞ্জরে ভয়ানক বেদনা। রোগিণী উঠিতে বসিতে এমন কি নিঃশ্বাস ফেলিতেও কষ্ট বোধ করিতেছিল। রোগ কঠিন দেখিয়া আমি প্রথম দুইদিন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিলাম

কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না। তৃতীয় দিনে তুলসীর সরুস ১০ ফোঁটা জল মিশাইয়া ৬ ভাগ করিয়া দিলাম ও প্রত্যেক মাত্রা তিন ঘণ্টান্তর সেবনের ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে তাহার আত্মীয় ঔষধ লইতে আসিলে শুনিলাম, বেদনা এখন অনেক কম পড়িয়াছে, রোগিণী এখন উঠিয়া বসিতে পারে, নিঃশ্বাস ফেলিতে তাহার আর কষ্ট হইতেছে না এবং জ্বরও কম পড়িয়াছে। ইহার সহিত ৫ ফোঁটা রাস্নার টিঞ্চার যোগ করিয়া ক্রমাগত তিন দিন ঐ ঔষধ দিলাম। দেখিলাম রোগিণী নিজের গৃহকর্ম্ম করিতেছে। ঈশ্বরেচ্ছায় বিগত দুই মাস কালের মধ্যে তাহার আর কোন পীড়া হয় নাই। এক্ষণে মাতৃস্বরূপিণী বঙ্গললনাগণ একবার তুলসীর গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন কি?

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

সাহিত্য-পরিচয়

কাশীর কিঞ্চিৎ—শ্রীনন্দীশর্ম্মা প্রণীত, দক্ষিণা—পাঁচ আনা।

নন্দীশর্ম্মা তাঁহার প্রভুর বিহারস্থলীর প্রবেশদ্বারে দাঁড়াইয়া ওষ্ঠে অঙ্গুলি স্থাপনে সকলকে নীরব থাকিতে আদেশ করিতেছেন না—এবার তিনি পথ-প্রদর্শকরূপে স্থানবর্ণনে নিযুক্ত। তিনি পুরাকালের হাবভাব পরিত্যাগ করিয়া মডার্ণযুগের পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রভুর পুণ্যনিকেতন কাশীধামের মডার্ণ অবস্থা জানাইয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় কাশীর তুচ্ছতম জিনিষটিও বাদ পড়ে নাই। এমন রসাল বর্ণনা, এমন 'রঙ্গদার গাইড' আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া আমাদের মনে হয় না। বর্ণনাটী ছড়ার আকারে ঢালা হইয়াছে। ছড়াগুলি সমস্তই ব্যঙ্গরসে পরিপূর্ণ। কিন্তু এ ব্যঙ্গের মধ্য দিয়া আমরা নন্দীশর্ম্মার বুকফাটা চোখের জল দেখিতে পাইয়াছি। তিনি পুরাতন ভৃত্য, তাই তাঁহার পুরাণো মনিবের স্থানমাহাত্ম্য কোন কিছুতে ক্ষুণ্ণ হইলে তাঁহার ব্যথা লাগিবারই কথা। তবে শিবসহবাসে সংযমের শিক্ষা হইয়াছে বলিয়াই তিনি নিজের ব্যথা রহস্যের মধ্যে চাপা দিতে গিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছি। পাঠক নন্দীশর্ম্মাকে 'গাইড' করিবেন না কি?

কুল-পুরোহিত ও অন্যান্য গল্প—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত, মূল্য ১।০ আনা। প্রকাশক গৃহস্থ পাব্‌লিশিং হাউস। ২৪ নং মিডিল রোড,—ইটালি।

নারায়ণ বাবুর এ গল্পগুলি পূর্ব্বে অনেকগুলি মাসিক পত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার গল্পপাঠক তাঁহার লেখার সহিত পরিচিত। অতএব তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের বেশী কিছু বলিবার নাই। গল্পের বিষয়-নির্ব্বাচনে তিনি বেশ পটু—চরিত্রাঙ্কনেও তাঁহার বেশ ক্ষমতা আছে। তাঁহার ষ্টাইলটা একটু সাবেকী। যাঁহারা পুরাদস্তুর মডার্ণ, তাঁহারা তাঁহার ষ্টাইলকে তত ভাল চোখে দেখিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। তবে অন্যান্য দিক দিয়া বিচার করিলে তাঁহারা যে

বিশেষ হতাশ হইবেন একথা আমাদের মনে হয় না। পুস্তকখানিতে সর্ব্বসমেত পনেরটি গল্প আছে।

রোগ বিজ্ঞানম্‌,—"কবিরাজ শ্রীনিশিকান্ত বৈদ্যশাস্ত্রী কর্ত্তৃক সংগৃহীত।"

রোগোৎপত্তির মূল কারণ কি, কোন্ কোন্ লক্ষণের দ্বারা সেই সেই কারণ নিশ্চতরূপে ধরা যায় ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণ এই গ্রন্থে আছে। বৈদ্যাচার্য্য মাধবকর কৃত "রোগ বিনিশ্চয়" নামক গ্রন্থের পঞ্চনিদান অংশের মূল, মূলের সান্বয় বাঙ্গলা ব্যাখ্যা এবং তাহার উপর মহামহোপাধ্যায় বিজয় রক্ষিত কৃত 'মধুকোষ' টীকার বঙ্গানুবাদ দিয়া গ্রন্থকার পুস্তকখানিকে আয়ুর্ব্বেদশিক্ষার্থীদিগের নিকটে অতি উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছেন। আমরা এবম্বিধ পুস্তক প্রচারের বিশেষ পক্ষপাতী।

মফঃস্বলের বাণী

বোধনের বাঁশি বাজিতে বাজিতেই বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিয়া উঠিয়াছে। স্বদেশ-প্রেম, সমাজের সেবা, আর্ত্তের শুশ্রূষা, পরার্থে আত্মোৎসর্গ প্রভৃতি বিবিধ কুসুম একে একে বিকসিত হইতেছিল আশার অলি গুন্ গুন্ গান ধরিয়াছিল, প্রতি পবনহিল্লোলে একটা প্রাণস্পন্দন অনুভূত হইতেছিল—কিন্তু নন্দীর ইঙ্গিতে অকাল বসন্তের মত আজ সব নীরব নিস্পন্দ! "স্বদেশী"র প্রাণ-মাতানো উৎসাহ ঢালিয়া পড়িয়াছে, নিঃস্ব নরনারায়ণের সেবা-উদ্দীপনা নিভিয়া গিয়াছে প্লাবনে যাহার বিকাস দুর্ভিক্ষে তাহার অবসান, রণাঙ্গনে আর্ত্তের শুশ্রূষা, পরার্থে আত্মোৎসর্গেরও আর অবকাশ নাই, স্বাধীন কর্ম্মপ্রেরণা ও কর্ম্মশক্তি আজ ডুলিবেহারার পরিচ্ছদে পুরস্কৃত!

যাহা অস্বাভাবিক তাহার এই পরিণাম! ব্যষ্টিকে বাদ দিয়া সমষ্টির সেবা এদেশে ছিল না, হইলও না! জননীর প্রতি দৃকপাত-শূন্য হইয়া দেশ-জননীর সেবার অনুষ্ঠান করিয়াছিলে, তিনি গ্রহণ করিলেন না; ভ্রাতার প্রতি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া দেশ-ভ্রাতার শুশ্রূষার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছিলে, তোমাদের আশার এইখানেই সমাধি হইল। এসো এদেশের আশা-ভরসাস্থল, এসো ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসো। চাহিয়া দেখ তোমাদের প্রত্যেকের গৃহে অনন্ত কর্ত্তব্য তোমাদের মুখের পানে তাকাইয়া পড়িয়া আছে, তাহাদিগকে হাত ধরিয়া তোলো; আপনার কর্ত্তব্য আপনি গ্রহণ কর, দেশের কর্ত্তব্য দেশ গ্রহণ করিবে; পয়সার হিসাব লও, টাকার হিসাব আপনি থাকিয়া যাইবে। আশ্রমচতুষ্টয়ের দেশে আশ্রম-ধর্ম্মপ্রতিপালন কর। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সময়ে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষণ কর দেশের ভাবনা, সংসারের ভাবনা বিসর্জ্জন দেও, কেন্দ্রীভূক্ত রবিরশ্মির ন্যায় আপনার অখণ্ড মনোযোগ সাধ্য বিষয়ে অধ্যয়ন-তপস্যায় নিযুক্ত কর, তোমাদের কায তোমরা করিয়া যাও—ভবিষ্যৎ-সৌধের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা কর। যাহাদের কায তাহারা তাহা করিতেছে না, তাই দেশের দুর্গতি। ছাত্রগণ দেশের কার্য্য করিতেছে, আর গৃহস্থগণ পঞ্চমহাযজ্ঞ বিস্মৃত হইয়া স্বার্থের

হোমশিখায় সকল কর্ত্তব্যের আহুতি প্রদান করিতেছে। আমরা পিতৃতর্পণ, পূর্ব্বপুরুষদিগের, দূরাত্মীয় নিরাশ্রয়ের শ্রাদ্ধ, অতীতের ঋণ বিস্মৃত হইয়া বর্ত্তমানের স্বাস্থ্য পান (হেলথ ড্রিংক) করিতেছি, সমুদায় জগতের তৃপ্তির ভার বালকদের উপরে সমর্পণ করিয়া আত্ম-তৃপ্তির মৃগতৃষ্ণিকার পশ্চাদনুসরণ করিতেছি, আজ আমরা পরের কথা ভুলিয়া গিয়াছি, সর্ব্বদা "আপনারে লয়ে বিব্রত" রহিয়াছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তৃপ্তি না হইলে আত্মতৃপ্তি হয় না তাহা বিস্মৃত হইয়াছি। আজ আমরা অতিথি, নিরন্ন উপোষিতের অনুসন্ধান না করিয়া অম্লান-বদনে মুখে অন্ন তুলিয়া দিতেছি; অনাথাশ্রমের সেবকগণ তাহাদের সেবার ভার গ্রহণ করিয়াছে, আমরা কেহ কেহ তাহাতে অর্থ প্রদান করিয়াই আমাদিগকে ধন্য মনে করিতেছি—সেবা, পরিচর্য্যা আমাদের পারিবারিক গণ্ডী হইতে দূরে সুদূরে সরিয়া যাইতেছে। আমরা জনসাধারণের শিক্ষার ভার গবর্ণমেণ্টের উপর তুলিয়া দিয়া কর্ম্মশূন্য চীৎকারে কণ্ঠ নিয়োগ করিয়াছি অথচ যিনি ধনবান্ তিনি একটি নির্ধনেরও মুখে অন্নদান করিতে স্বীকৃত নহেন। জীবে দয়া নামেরুচি যে দেশের ধর্ম্ম সে দেশে কাকেরও অন্ন পাইবার উপায় নাই। পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ যে দেশের নীতি, সেদেশে বালক ও যুবকগণ দলে দলে রামকৃষ্ণ মঠে সন্ন্যাসী হইতেছে, স্বদেশ উদ্ধারের দল পুষ্ট করিতেছে, আর যাঁহারা পঞ্চাশ পার হইয়াছেন তাঁহারাও দেশের কায, ধর্ম্মের কায বালকদের উপরে সমর্পণ করিয়া "চোক বাঁধা বলদের মত" সংসারাশ্রমের ঘানি ঘুরাইতেছেন।

আমাদের সাধের স্বপন ভাঙিয়া গিয়াছে—যাও বেদনা বিস্মৃত হও, "স্বপন অমন ভেঙেই থাকে"। বদ্ধ জলের স্রোতস্বিনীর অনুকরণ বিড়ম্বনারই জন্য। "হোমরুল" আয়র্লণ্ডে সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু তাহা ভারতের জন্য নহে এখানে বেশান্তের প্রতিভা-রশ্মি সম্পূর্ণ বিফল। মরীচিকার অনুসরণ পরিত্যাগ কর যাহা সত্য, যাহা বাস্তব তাহারই দিকে দৃষ্টি সম্বদ্ধ কর। আবার ভারতের প্রাচীন কর্ম্ম স্রোত, জাতীয় জীবন ফিরিয়া আসিবে।

রংপুর দিক্‌প্রকাশ।

খাইব কি ?

আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি—বল দেখি আমরা খাইব কি? সমস্ত জিনিষ দিন দিন দুর্ম্মূল্য হইতেছে, বাঙ্গালার ভোজ্য ভক্ষ্য—ভেজালে বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে—বল দেখি আমরা খাইব কি। যুগ যুগ ধরিয়া নকলনবিশী করিয়া আত্মগৌরব হারাইয়া ফেলিয়াছি, এখন আমরা খাইব কি?

ভাবিয়াছিলাম—সার্ব্ববর্ণিক বিদ্যা চর্চ্চায় আমরা মানুষ হইয়াছি, আমাদের উন্নতি হইবে, কিন্তু তাহা হইল কই? দেশে অন্নকষ্ট, রোগকষ্ট,—দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে * * * গাভীর স্তনে দুগ্ধ নাই, গোলায় ধান্যের সঞ্চয় নাই,—তবে আমরা খাইব কি?

জীবনের এ যে মহা সমস্যা! উদরে অন্ন নাই—তবু ত বিলাসিতার প্রসার—কমিতেছে না। এই যে শতকরা ৩৪ জন বাঙ্গালী—যক্ষ্মা রোগে যমের আতিথ্য গ্রহণ করিতেছে, এই যে ম্যালেরিয়ার ক্রব্যাদি বহ্নি—গ্রামে গ্রামে জ্বলিয়া উঠিতেছে,—তোমরা অবশ্যই শুনিয়াছ ইহার কারণ—পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব। কিন্তু ইহার উপায় করিতেছ কি? কি খাইয়া এই তের কোটী বাঙ্গালী জীবন

ধারণ করিবে? সভ্য সাজিয়া শত স্মৃখস্মৃতি-জড়িত পল্লীবাস উঠাইয়া দিয়াছ, তোমার পিতৃপুরুষের পুণ্য ভিটায় সান্ধ্য প্রদীপ জন্মের মত নিবিয়া গিয়াছে, তোমার সাধের জন্মভূমি—জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে, তোমার শ্যাম-সরসীর স্নিগ্ধ সলিলে—মশককুল ম্যালেরিয়া অণ্ড প্রসব করিতেছে, এখনও তুমি ভাবিতেছ না—তুমি খাইবে কি? ভাবিয়া ছিলে, স্ত্রী-শিক্ষায়, বিদ্যাচর্চ্চায়, বিজ্ঞান প্রসারে, তোমার দুর্দ্দিন ঘুচিয়া যাইবে, মনুষ্যত্ব ফুটিয়া উঠিবে, কিন্তু তাহা হইল কৈ? তুমি বাবু—বরফপানি না হইলে তোমার শুষ্ক কণ্ঠে তৃষা শান্তি হয় না, প্রভাতী চা নহিলে তোমার আলস্য জড়তা দূর হয় না, আদ্ধির জামা, সিল্কের চাদর, বার্ণিশ জুতা—এ সব না হইলে তোমার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হয় না, তোমার বাহিরে এত চাকচিক্য—কিন্তু ভিতরটা যে দিন দিন বিগড়াইয়া যাইতেছে! একটু খাঁটী দুধের অভাবে—তোমার চিত্তরঞ্জন শিশু পুত্র ইন্‌ফেণ্টাইন লিভারে—জীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, ইহাই কি তোমার বিজ্ঞানচর্চ্চার উন্নতি?

শুধু বিজ্ঞান শিক্ষায় কি দেশের উন্নতি হয়? জাতির মনুষ্যত্ব উন্মেষিত হয়? জর্ম্মণ জাতটার কথাই কেন ভাবিয়া দেখ না? বিজ্ঞান বলে তারা কত কলকব্জা গড়িয়াছে, ব্যবসায় বাণিজ্যের জগন্ময় বিস্তার ঘটাইয়াছে, শিক্ষা দীক্ষা জগতের সম্মুখে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু আজ ত্রিসংসার দেখিতেছে—জর্ম্মণ জাতির কোনই উন্নতি হয় নাই। তা'রা মানুষের মত মানুষ হইতে পারে নাই।—তা'রা মানবত্বের বিনিময়ে দানবত্ব লাভ করিয়াছে। তা'দের বিজ্ঞান—বিধির সৃষ্টিতে সৃষ্টিছাড়া পাপ দৃশ্যের গর্ভাঙ্ক রচনা করিয়াছে! নরহত্যা, ব্যভিচার, পররাষ্ট্র-লোলুপতা, হিংসা, জিঘাংসা,—তাঁ'দের মেদ মজ্জায় নরক প্রবাহ মিশাইয়া দিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম—শুধু বিজ্ঞান চর্চ্চায়—মানুষ, মানুষ হয় না।

শিক্ষার বিস্তারেই কি জাতির উন্নতি হয়? তোমার দেশের কলু, ধোপা, কামার, কুমার, চাঁড়াল চুড়েল—কলেজের ডিগ্রী লাভ করিয়াছে তোমার দেশের মেয়ে মর্দ্দে—সাহিত্য চর্চ্চা করিতেছে, তবুও দেশে অন্নাভাব কেন? এই শিক্ষাই কি তাহার প্রধান কারণ নয়? কলু—বই পড়িতে শিখিয়াছে, সে আর ঘানী ঘুরাইতে স্বীকৃত নয়, কলের তেলে এখন তোমার স্বাস্থ্যের স্নেহ ক্রিয়ার প্রয়োজন মিটিতেছে! দেশের লোক জাতীয় বৃত্তির উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছে,—কাজেই জিনিষপত্র মহার্ঘ হইয়া উঠিতেছে। ইহা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ? এ অন্নাভাব—দুর্ভিক্ষ-জাত নহে। দুর্ভিক্ষ ত বরাবরই ছিল; তখন দুর্ভিক্ষ হইত, দুদিন পরেই আবার থামিয়া যাইত। এখন তাহা চিরস্থায়ী হইতেছে কেন? এখনও তুমি তাহা ভাবিবার অবকাশ পাইতেছ না,—চাষার ছেলে চাকুরীর উমেদার হইয়াছে—তুমি খাইবে কি? এখনও বলিতেছি—জীবন সমস্যার সামাধান কর, ছেলেদের জাতীয় বৃত্তি শিখাও,—নাস্তিক্য ভুলিয়া ধর্ম্ম শিক্ষার প্রসার কর, নকলনবিশী ছাড়,—পল্লীলক্ষ্মীর সম্মান রক্ষা কর—তোমার মঙ্গল হইবে। এখনও বলিতেছি—একবার দেশের দিকে চাহিয়া ভাবিয়া দেখ—আমরা খাইব কি? নহিলে ঐ শোন—অদৃষ্টদেব—আকাশবাণীর ছলে বলিতেছেন—

ভস্ম খাও দশ্বানন!

চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ।

"আর ভাব্‌তে পারিনে পরের ভাবনা"

অহর্নিশি যখন নিজের ভাবনা সমুদ্রে হাবুডুবু খাই তখন মনের খেদে সময়ে সময়ে হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে বাহির হইয়া পড়ে "আর ভাবতে পারি না পরের ভাবনা"। পরের ভাবনা না ভাবিলে নিজের ভাবনাকে ডুবাইয়া রাখিতে পারা যায় না একথা তখন ভুলে যাই। নিজের ভাবনা কমাইবার এক মাত্র উপায় পরের ভাবনা ভাবা তাহা তখন মনে আসে না। আমরা বহুকাল এই নীতি, এই সুনীতি অবলম্বন করিয়া আসিয়াছি; ফলে নিজের ভাবনা ভাবিতে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি; নিজের ভাবিবার যে কত বিষয় আছে তাহা অনেক সময়ে মনেই আসে না। আমরা খুব রাজনীতির আলোচনা করিতে শিখিয়াছি; আমেরিকার কখন কে কি কথা বলিল আগ্রহ সহকারে তারের সংবাদে তাহা অবগত হইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রদর্শন করি; চীন রাজা ইয়াংসিকাই কিরূপ পদ বিক্ষেপে অবসর হইয়া রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন তাহা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে অনুধাবন করি, অষ্ট্রিয়াতে কিরূপ শস্য উৎপাদন হইল তাহার তথ্য অবগত হইবার জন্য বিদেশীয় সংবাদ পত্রের স্তম্ভ গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করি; পানামা সংযোজক কাটান হইলে দেশের কি উপকার হইল তাহার আলোচনা করি, এডিসন সাহেবের শেষ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কি তাহা জানিবার জন্য উৎকণ্ঠ উৎসুক্য প্রদর্শন করি, কিন্তু হায় নিজের কি অধঃপতন দিন দিন হইতেছে তাহাও ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাই না। দেশের অবস্থা কি ছিল আর কি হইয়াছে তাহা যেন দেখিয়াও দেখি না; অন্নাভাবে কত শত স্বদেশবাসী জীর্ণ শীর্ণ মৃত প্রায় হইয়া রহিয়াছে, জলাভাবে কত শত নরনারী তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পাইতেছে না; নানাবিধ ব্যাধির প্রকোপে, কতশত হাস্যময়, নন্দনকানন কল্প জনপদ শ্মশানে পরিণত হইতেছে; গবাদি পশুর কিরূপ হীনাবস্থা হইয়াছে; ঘৃত, তৈল, দুগ্ধ প্রভৃতি প্রাণ ধারণের যাবতীয় দ্রব্য কিরূপ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে; ভেজাল দ্রব্যে কিরূপ স্বাস্থ্য হানি হইতেছে—এই সব যে শত সহস্র ভাবনার বিষয় রহিয়াছে, সেগুলি কেমন মোহের বশে উপেক্ষা করিয়া যাইতেছি, তাই বলি পরের ভাবনা ভাবিয়া নিজের ভাবিবার বিষয়গুলির প্রতি মুদিতনেত্র হইয়া রহিয়াছি।

এমন আত্মহারা হইলে ত চলিবে না; লোকে স্বার্থপর বলে বলুক, "আর ভাবতে পারি না পরের ভাবনা" বলিবার কি সময় আসে নাই! কি সে আত্মরক্ষা হয় তাহার উপায় উদ্ভাবন করিবার কি সময় আসে নাই! এখনও যদি না আসিয়া থাকে তাহা হইলে আর কবে আসিবে? আমরা দিন দিন উন্নতির সোপানাবলীর উচ্চতম ধাপে পৌঁছিতেছি এই ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সুখনিদ্রাভিভূত হইয়া থাকিলে ত চলিবে না। ছিল বটে এমন দিন যখন আমাদের কিছুই ভাবনা ছিল না। আমাদের কিছুই ভাবনা ছিল না। আমাদের ক্ষেতভরা শস্য থাকিত, গোলাভরা ধান থাকিত, গোয়াল ভরা গরু থাকিত, পুকুর ভরা মাছ থাকিত। আমাদের তখন ছিল "পেটভরা ক্ষুধা আর মুখ ভরা হাসি" হৃদয় ভরা আনন্দ, বুক ভরা সাহস। আহা সে দিন, সে সুখের দিন ফেরৎ আসিলে নিজের ভাবনা ভাবিবার কিছু থাকিবে না, কিন্তু যত দিন না সে দিন আসিতেছে পাপিয়া যেমন

বারংবার "চোখ গেল" বলিয়া ডাকিয়া থাকে, আমাদিগকেও সেই রূপ "আর ভাবতে পারি না পরের ভাবনা" বলিয়া মনের খেদ জানাইতে হইবে।

আত্মরক্ষার উপায় ভাবিতে হইবে। "উন্নতি" "উন্নতি" করিয়া চীৎকার করিলে কি হইবে? দারুণ সত্য যে চোখের উপর জাজ্বল্যমান রহিয়াছে; কি দিয়া ঢাকিবে? আজ একবার নিজেদের অবস্থা দেখার মত দেখ দেখি; দারুণ ছবি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিবে। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বাঙ্গালা দুর্ভিক্ষের তাণ্ডব নৃত্যে প্রকম্পিত মুহ্যমান; স্বাস্থ্য নিকেতন আমাদের দেশ এখন ম্যালেরিয়া আবাস, ওলাউঠা বসন্ত প্লেগ হাত ধরাধরি করিয়া বার মাস বেড়াইতেছে। আমাদের শিল্প বাণিজ্য রূপ কথার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে; আজ বস্ত্রের জন্য লবণের জন্য আমরা পরমুখাপেক্ষী,—এমন দিন যে কখনও আসিবে তাহা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের স্বপ্নের অগোচর ছিল। শিল্প বাণিজ্য নষ্ট হওয়াতে আমরা আরও দারিদ্র্য যাঁতায় নিষ্পিষ্ট হইতেছি। আমাদের দেশ কৃষি প্রধান দেশ; কিন্তু আমরা কৃষির উন্নতির জন্য কি করিতেছি? কৃষির উন্নতির সহিত গো জাতির উন্নতির সম্বন্ধ খুব নিকট; কিন্তু আমরা গো জাতির হীনাবস্থা দেখিয়াও প্রতিবিধানের জন্য কি করিতেছি? কিছু না; আমাদের সহৃদয় শাসন কর্ত্তৃগণ এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা করিলে তাহার সমালোচনা করিয়া মনে করি আমাদের কর্ত্তব্য পালন করা হইল।

সম্মুখে কাজ রহিয়াছে বিস্তর। স্বাস্থ্যোন্নতি সাধনের জন্য দেশে সুপেয় জলের সংস্থান করিতে হইবে, জল নিকাশের ব্যবস্থা করিতে হইবে, বন জঙ্গল আবর্জ্জনার অপসারণ করিতে হইবে, দেশের ধনাগমের পথ পরিষ্কারের জন্য শিল্প বাণিজ্যকে পুনর্জ্জীবিত করিতে হইবে; অন্নের সংস্থানের জন্য কৃষির উন্নতি করিতে হইবে; স্বাস্থ্যোন্নতি ও কৃষির উন্নতির জন্য গো জাতির হীনাবস্থা যাহাতে দূর হয় তাহা করিতে হইবে; দেশে যাহাতে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার হয় তাহার উপায় বাহির করিতে হইবে। প্রজার মঙ্গলের জন্য আমাদের ইংরাজ-রাজ সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কেবল রাজার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে কি সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হয়! নিজের চেষ্টা উদ্যোগ উদ্যম আবশ্যক, God helps those who help themselves ইহা বিস্মরণ হইলে চলিবে না। ভগবানের কৃপায় আমরা প্রজাবৎসল ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে থাকিয়াও যদি আমাদের অবস্থা দিন দিন হীন হইতে হীনতর হইতে থাকে তাহা হইলে ত বলিতেই হইবে দোষ আমাদেরই। আমরা স্বাবলম্বন নীতি ভুলিয়া যাইতেছি, তাহাতেই আমাদের এত কষ্ট। তাই বলি, "আর ভাবতে পারি না পরের ভাবনা" বলিয়া নিজের ভাবনা ভাবিতে শিখিবার সময় আসিয়াছে।

বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী।

আর কত বাকী?

কি মানুষ, কি জাতি আনন্দব্যতীত কেহই এ জগতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, আনন্দই জীবনীশক্তির উৎস, আনন্দের রবিরশ্মিতেই মানুষ তরুলতাগুল্মের ন্যায় বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। যেখানে আনন্দ নাই, সেখানে প্রাণ নাই, সেখানে সকল শক্তি স্ফূর্ত্তিহীন ও নিষ্প্রভ। যে

সময়ে ভারতের আর্য্যজাতি "জীবন্ত জাতি" বলিয়া পরিচিত ছিল, সে সময়ে আনন্দের মন্দাকিনী শতমুখী হইয়া এ জাতির প্রতি অঙ্গ রসসিক্ত করিত, কি লোকালয়, কি বনভূমি সকল স্থান আনন্দের বীণা নিক্বণে মুখরিত হইত। ভূপতিগণ বৈতালিকের সঙ্গীত ধারায় নয়ন উন্মীলন করিতেন, "প্রভাতী নহবৎ" মধুর স্বরে বাজিতে থাকিত, বিহঙ্গগণ সেই সুরে সুর মিশাইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ছুটিয়া যাইত, গন্ধবাহী মন্দ পবন তালে তালে তরঙ্গে-তরঙ্গে চারি দিকে নাচিয়া বেড়াইত। বনভূমিও সামগানে নিনাদিত হইয়া উঠিত। আজ আর সে দিন নাই, এ দেশে এখনও রাজা জমিদার আছেন, কিন্তু কাহারই গৃহদ্বারে নহবৎ বাজে না, সানাইয়ের মধুর স্বরে কাহারও প্রাণে নূতন উদ্দীপনা জাগাইয়া দেয় না, সঙ্গীতের অমৃত রসাঞ্জনে কাহারও নিমীলিত নয়ন উন্মীলিত হয় না, আনন্দে অমৃতে আমাদের কর্ম্মের উদ্বোধন হয় না।

সে কালে রাজা বাদশাহের সভায় পণ্ডিতের ন্যায় সঙ্গীতাচার্য্য সভাসদ্ থাকিতেন, মাঝে মাঝেই সঙ্গীতের আলোচনায় নীরস ও শুষ্ক প্রাণ সরস হইয়া উঠিত। আজকালও রাজা-জমিদার না আছেন তাহা নহে, কিন্তু সে সভা নাই, সে সভাপণ্ডিত নাই, সে সঙ্গীতাচার্য্যও নাই। কালিদাস তানসেন আজ অতীতের স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত!

আমাদের জীবনের সকল মঙ্গলময় আরম্ভ সঙ্গীতের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইত। জন্মে, অন্নপ্রাশনে, উদ্বাহে নৃত্যগীতবাদ্যে চারিদিক আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিত। আজকালও আমরা ঐ সমুদায়ের অনুষ্ঠান করি বটে, কিন্তু তাহা উপভোগ করিবার নিমিত্ত নহে, না করিলে নয় বলিয়া। তাই ঢুলিগণ যা তা বাজাইয়া যায়—তাহাতে আকর্ষণী শক্তি নাই, সানাইয়ে সে সম্মোহন গুণ নাই, প্রাণে সে হর্ষোচ্ছ্বাস নাই। কেহ শ্রোতা নাই, কেহ উৎসাহদাতা নাই, এ দেশের ঢুলিসম্প্রদায় অতীতের কোন্ এক স্মৃতিহীন যুগে সঙ্গীতের যে এক নূতন বিভাগের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা আজও ঋষি-অনুজ্ঞাত বিন্ধ্যের মত নতশিরাঃ হইয়া দণ্ডায়মান্!

ধর্ম্মোন্মাদনাকে বেগবতী করিবার নিমিত্ত বৈষ্ণবসম্প্রদায় "কীর্ত্তনে"র সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতির পদাবলী স্বরলয়ে গীত হইয়া কীর্ত্তনের বৈদ্যুতিকশক্তি ঘোষণা করিত। বর্ত্তমানযুগ পর্য্যন্তও সেই কীর্ত্তন বাঁচিয়া আছে, কিন্তু লোকের সে আগ্রহ, সে উৎসাহ নাই—তাই রূপাজীব-বারবিলাসিনিগণ সেই মহাজন গীত কুড়াইয়া লইয়া বিলাস ও হাবভাবের মসলা দিয়া তাহা লোকের রুচিকর করিয়া রাখিয়াছে।

আজ শীতল পবনস্পর্শে কৃষকের গীত, নাবিকের গীত, মর্ম্মীর গীত সমুদায় ঝরিয়া পড়িতেছে। কৃষকগণ ধান কাটিতে কাটিতে প্রাণের উৎসাহে আর সে গান ধরে না, সমীর ও নীরস্রোতে মাঝির হৃদয় তরঙ্গায়িত হয় না, আনন্দের স্রোত বহে না—নন্দীর ইঙ্গিতে যেন ভারতের আনন্দ-বসন্ত নিশ্চল ও স্তম্ভিত!

পাশ্চাত্য দেশের কর্কশস্বর হার্ম্মোনিয়াম ও পিয়ানোর নবীনত্বে এ দেশের পুরাতন সেতারের কোমলতন্ত্রী নিশীথ-নিস্তব্ধতায় বেহাগের স্বরে বাজিয়া উঠে না, সোহিনীর নিদ্রালস স্বরে ঘুমন্ত আঁখি জাগরিত হয় না, এসরাজ, বীণা "সভ্যসমাজে"র সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া অশিক্ষিত দোকান-

দারের অপরিষ্কৃত গৃহে স্থান পাইয়াছে—তবলা, পাখোয়াজ বারবনিতার ও গৃহ ত্যাগ করিতেছে, নন্দনের মন্দার তরু আজ ইন্ধন কাষ্ঠে পরিণত! আর শ্যামের বাঁশরী বাজে না, যমুনা উজান বহে না হেথা "নীরব রবাব বীণা মুরজ মুরলী!" আনন্দ নাই, বাস্তি নাই, শান্তি নাই, লক্ষ্মী নাই—এ জাতির জীবনী শক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে; ঝরিয়া পড়িবার আর কত বাকী?

রংপুর দিকপ্রকাশ।